ভারতের আশ্রয়ে দলাই লামা

তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা অবশেষে ভারতবর্ষেই আশ্রয় লাভ করিলেন। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয়দান ভারতের সনাতন নীতি। সুতরাং আচরণের দিক দিয়া ভারত পূর্ব্বপথই অনুসরণ করিয়াছেন। দলাই লামাকে লইয়া ইহার পূর্ব্বে কত গুজবই না ঘটিয়াছিল। এমন কথাও শুনা গিয়াছে, তিনি পার্ব্বত্য দুর্গম পথে চলিতে গিয়া আহত এবং পীড়িত হইয়াছেন—সে সংবাদও সত্য নহে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, দুই ভগ্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আশীজন অনুচর রহিয়াছেন। লাসা হইতে কি ভাবে এবং কি অবস্থায় তিনি এত লোকজন ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া দুর্গম পাহাড়, অরণ্য, নদী পার হইয়া গোপনে তিব্বত ও ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে পৌঁছিলেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। অবস্থা স্বাভাবিক এবং উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিলে হয়ত এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন যে, দলাই লামার মত সম্মানভাজন ব্যক্তি তাঁহার পদমর্য্যাদানুরূপ সম্মান নিশ্চয়ই পাইবেন। আন্তর্জ্জাতিক বিধি এবং আতিথেয়তার স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য।

জগতে রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্রপ্রধানদের দেশত্যাগ এবং নিরপেক্ষ দেশে আশ্রয় প্রার্থনা কোন নূতন ঘটনা নহে। ইতিপূর্ব্বে এরূপ অনেক ঘটনাই ঘটিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক কারণে দেশত্যাগ কোন অপরাধজনক ঘটনাও নহে, বরং অন্যদেশে আশ্রয়লাভ বা গ্রহণ আন্তর্জ্জাতিক বিধিসম্মত। অতএব দলাই লামার সদলে ভারতবর্ষে প্রবেশ এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক সসম্মানে তাঁহাকে আশ্রয়দান নেহরু সরকারের পক্ষে মানবোচিত আচরণ করাই হইয়াছে। কিন্তু এই আচরণের রাজনৈতিক ফলাফল কি হইবে, তাহার জন্য নিশ্চয়ই ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করিতে হইবে।

ধর্ম্মের দিক দিয়া, সংস্কৃতির দিক দিয়া—এমনকি বাণিজ্যের দিক দিয়াও তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। তিব্বতের উপর নয়া চীনের কর্ত্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব সরকারীভাবে চুক্তিগত স্বাক্ষরের দ্বারা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—যে ঘটনা হইতে ১৯৫৪ সনে ইতিহাস-খ্যাত পঞ্চশীলের উদ্ভব: চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক, সুতরাং ভারতবর্ষে নিরাপত্তা ও শান্তি এই মৈত্রীর প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যাঁহারা বলিতেছেন যে, দলাই লামার রাজনৈতিক আশ্রয়লাভে চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল, তাঁহাদের ইহা উদ্ভট কল্পনা!

ভারতে আশ্রয়লাভের পর দলাই লামা কি করিবেন এবং ভবিষ্যতে কোন্ কর্ম্মনীতি অনুসরণ করিবেন, তাহা অবিলম্বেই জানা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন বিবৃতি দিবেন কিনা কিংবা মতামত প্রকাশ করিবেন কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। কিংবা এই ঘটনায় পিকিং গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট হয় নাই। দলাই লামার পলায়নের কারণও এখন অনুমান-সাপেক্ষ। তিব্বতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, সেখানকার সাধারণ মানুষ নূতন গণতন্ত্র এবং আধুনিক উন্নত জীবনযাত্রার জগতে প্রবেশ করিতে চাহেন। হয় ত পুরাতন ও নূতনের মধ্যে এই সংঘর্ষের ফলেই দলাই লামা দেশান্তরী হইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইহাই চীন সরকারের বিবৃতির সারকথা। আসল রহস্য রহিয়াছে এখনও যবনিকার অন্তরালে।

চীন-তিব্বতের গোলযোগ ও দলাই লামার পলায়ন ব্যাপারে চীন সরকার ঐ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের মূল ঘাটি ভারতের সীমান্তের নিকটবর্ত্তী শহর কালিম্পং-এ স্থিত বলিয়া অভিযোগ করেন। আমাদের সরকার তাহা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করিলেও এ দেশের একটি রাজনৈতিক দল—যাহা ভারতের জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী—উল্টা সুর গাহিয়া বিদেশীর মত সমর্থন করিয়াছে। অবশ্য কি কারণে বা কিসের প্রেরণায় এইরূপ কীর্ত্তি-কলাপ সেই দল করিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের বাণিজ্য

ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনীতির সবচেয়ে দুর্ব্বল ভিত্তি হইতেছে আমাদের বহির্বাণিজ্য। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে এই বিষয়ে আলোচনাকালে প্রায় সকল সভ্যই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। বিদেশে প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতীয় রপ্তানী পণ্য হটিয়া আসিতেছে, এবং ইহার প্রধান কারণ হইতেছে ভারতের পণ্যের মূল্য অত্যধিক। অবশ্য উন্নয়নশীল অর্থনীতির ইহা একটি ফল, কারণ, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষকে অধিকতর পরিমাণে মূলধন আমদানী করিতে হইতেছে এবং সেই কারণে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানীর পরিমাণ বেশী হইতেছে। গত বৎসরেও ইহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৯৫৭ সনে ভারতবর্ষ ৬৪৩ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করে এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ১০২৬ কোটি টাকার দ্রব্য। মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৮৩ কোটি টাকায়। ১৯৫৮ সনের প্রাথমিক হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ ৫৮৪ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করে এবং ৭৮৩ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানী করে। ২০০ কোটি টাকার মোট ঘাটতি হইবে। এই হিসাবের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণের আমদানী-রপ্তানীর পরিমাণ ধরা হয় নাই।

১৯৫৭ সনের তুলনায় ১৯৫৮ সনে প্রায় ৬০ কোটি টাকার মত রপ্তানী কম হইয়াছে, এবং ২৪৩ কোটি টাকার মত আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের বাণিজ্যিক ঘাটতি রোধ করিবার জন্য আমদানীর পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে ঘাটতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। ১৯৫৮ সনে

পাটজাত দ্রব্য ও বস্ত্রের রপ্তানী বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার মোট পরিমাণের যদিও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি তাহা এত সামান্য যে, তাহাতে ভরসা করিবার মত কিছু নাই। ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি যেন আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি চিরস্থায়ী ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা কিছু পরিমাণে আমাদের রপ্তানী হ্রাসের জন্য দায়ী। বৈদেশিক সাহায্যের চেয়ে বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি ভারতের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়, কারণ তাহাতে বহির্বাণিজ্য স্থায়ী বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের ফল সাময়িক মাত্র।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে এশিয়া এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে চীন এবং জাপান বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। জাপান ও চীনের অপেক্ষাকৃত সস্তার কাপড় এই সকল দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। চা রপ্তানী দ্বারাই ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, কিন্তু সিংহল এবং চীন সস্তা চা রপ্তানীর দ্বারা বিদেশের বাজার হইতে ভারতীয় চা-কে হটাইয়া দিতেছে।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা সচেষ্ট হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারত হইতে কাঁচা পাট রপ্তানী বন্ধ ছিল, কারণ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পাট উৎপাদন কম হইত। ১৯৫৮ সনে প্রায় ৭০ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহার ফলে প্রায় ৫ লক্ষ গাঁইট পাট বেশী হইবে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা এই অতিরিক্ত পরিমাণ পাট রপ্তানী করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এককালে ম্যাঙ্গানিজ আকর রপ্তানীতে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অসাধুতার ফলে ভারত হইতে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানীর ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং আশা হয় যে, ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রধানতঃ ঘাটতি ঘটে ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ব্যবসায়ে। ভারতকে এই সকল দেশগুলি হইতে অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি মূলধন আমদানী করিতে হইতেছে। ইউরোপের সাধারণ বাজার সৃষ্টির পর হইতে এই সকল দেশে ভারতীয় রপ্তানী আরও হ্রাস পাইয়াছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য এশিয়া এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিকে লইয়া একটি সাধারণ বাজার গঠন করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজী হয় নাই।

খাদ্যশস্যে সরকারী ব্যবসা

কিছুকাল যাবৎ ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কর্তৃক খাদ্যশস্য ব্যবসায় করিবার প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু মত প্রকাশিত হইতেছে এবং এ বিষয়ে আলোচনাও যথেষ্ট হইতেছে। গত ২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে খাদ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা প্রথমে চাউল এবং গমে ব্যবসায় সুরু করিবে। মাধ্যমিক ব্যবস্থা অনুসারে পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিজেদের লোক মারফৎ চাউল সংগ্রহ করিবে এবং নির্দ্ধারিত মূল্যে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা নিজে কোন খুচরা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে না। রাজ্যগুলির উপর খুচরা মূল্য নির্দ্ধারণের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যদি সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত না হয় তাহা হইলে রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রিত মূল্যকে কার্য্যকরী করিবে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের চাষীদিগকে ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

এই পরিকল্পনার প্রথম দিকে বাজারে অতিরিক্ত সমস্ত খাদ্যশস্য সরকার ক্রয় করিয়া লইবেন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থা সম্পূর্ণরূপে খাদ্যশস্যে ব্যবসায় সুরু না করা পর্য্যন্ত রাষ্ট্র অল্প অল্প করিয়া খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিবে। পরে গ্রাম্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রাম হইতে রাষ্ট্র চাষীদিগের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিবে এবং সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির সাহায্যে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। এই স্থায়ী ব্যবস্থা চালু হইলে বেসরকারী পাইকারী ব্যবসায়ীদের আর প্রয়োজন হইবে না। মাধ্যমিক ব্যবস্থাকালেও যতদূর সম্ভব সমবায় সমিতি কর্তৃক পাইকারী ব্যবসায় সুরু করা হইবে।

রাষ্ট্রকর্তৃক খাদ্যশস্য ব্যবসায় সুরু করার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে এমন একটি মূল্যমান রক্ষা করা যাহা চাষীদের পক্ষেও ন্যায্য হইবে এবং জনসাধারণের নিকটও অধিক বলিয়া বোধ হইবে না। অদূরভবিষ্যতে সারা দেশব্যাপী ক্রয়বিক্রয়কারী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহারাই খাদ্যশস্যের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিবে। রাষ্ট্র খাদ্যশস্যে ব্যবসায়ে কোনও লাভের চেষ্টা করিবে না, কিন্তু কোনও ক্ষতি যাহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। প্রত্যেক প্রদেশে কিংবা এলাকায় একই মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করা হইবে, অবশ্য পাইকারী ব্যবসায়ে।

লোকসভায় সরকারী খাদ্যশস্য ব্যবসায়-নীতির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়। শ্রীঅশোক মেহতা ছিলেন বড় সমালোচক, স্মরণ থাকিতে পারে যে, খাদ্যশস্য অনুসন্ধান সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে শ্রীমেহতা কতকগুলি প্রস্তাব করেন এবং তাহার মধ্যে প্রধান ছিল যে, দেশে খাদ্যশস্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব এবং সেই কারণে রাষ্ট্র কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় প্রয়োজন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা যাহা সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে শ্রীমেহতা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই। ভারতবর্ষে চলতি বৎসরে সবচেয়ে বেশী খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে এবং ইহার পরিমাণ প্রায় সাত কোটি টন। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য স্বাধীন ভারতে পূর্ব্বে হয় নাই এবং চাউলের উৎপাদনও (প্রায় তিন কোটি টন) খুব বেশী হইয়াছে। তথাপি বাজারে সুবিধা মূল্যে চাউল পাওয়া যায় না এবং চাউলের সরবরাহ বর্ত্তমানে বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে

সরকার মূক অসহায় দ্রষ্টাহিসাবে থাকিয়া নিজেদের দায়িত্ব খালাস করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা আজ চার বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে সারাদেশে সমবায় গোলাঘর প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল যাহাতে খাদ্যশস্য মজুত রাখা যাইতে পারে। এই বিষয়ে প্রগতি অতীব নৈরাশ্যজনক এবং ফলে দেখা যায় যে, খাদ্যশস্য হয় আছে পাইকারী ব্যবসায়ী কিংবা আড়তদারদের গুদামে আর না হয় আছে চাষীদের বাড়ীতে। ইহাতে প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহের গতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজীতে জনসাধারণের নিগ্রহ বাড়ে। যদি সরকারী কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্যের একটি ব্যাঙ্ক থাকিত তাহা হইলে সরবরাহ অব্যাহত থাকিত এবং খাদ্যশস্যের মূল্যমানও ফাটকাবাজীর হাত হইতে নিস্তার পাইত। কিন্তু খাদ্যশস্য পরিস্থিতি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট উদাসীনতা দেখাইতেছেন এবং মাধ্যমিক ব্যবস্থা অনুসারে বহু-নিন্দিত এবং বহু-সমালোচিত ফড়িয়াদারদের আবার চাউল সংগ্রহকারী হিসাবে লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে এবং বর্তমানে সরকারের হইয়া তাহারাই খাদ্যশস্য চাষীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবে। ইহা যেন ইস্পাহানী কোম্পানীর ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি। ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে ফড়িয়াদাররা যে একটি অবাঞ্ছিত এবং কলঙ্কিত স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। সুতরাং আশ্চর্য হইবার কিছু নাই যে, চাষীরা বর্তমানে তাহাদের উৎপাদন এই সকল ফড়িয়াদারদের নিকট বিক্রয় করিতে রাজী নয়, কারণ তাহারা নাকি ন্যায্য মূল্য পাইতেছে না।

ফলে বাজারে খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যাপারে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। উৎপাদন বেশী হওয়া সত্ত্বেও মূল্যমান হ্রাস পায় নাই। ফড়িয়াদাররা তাহাদের মুনাফার হার যে অতিরিক্ত রাখিবে তাহা স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে দেখা যায় যে, চাষীদের নিকট হইতে যে মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করা হইতেছে এবং বাজারে যে মূল্যে তাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। সুতরাং মাধ্যমিক ব্যবস্থা অনুসারে যে ফড়িয়াদারদের কায়েমী স্বার্থকে পরিপুষ্ট করা হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। স্থায়ী ব্যবস্থা (অর্থাৎ, ফড়িয়াদারদের বাতিল করিয়া দিয়া সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করা) অদূরভবিষ্যতে চালু হইবে কিনা সন্দেহ, মাধ্যমিক ব্যবস্থাই কিছুকাল যাবৎ চলিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

এ বিষয়ে রাজ্যগুলির গাফিলতী যথেষ্ট আছে। রাজ্যগুলিতে ব্যবসায়িক সমবায় সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য ও অকর্মণ্যতা সর্বজনবিদিত। কেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়াই রাজ্যগুলি প্রায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহাদের কর্মবিমুখতা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে ব্যাহত করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের মূল্যমানকে স্থায়িত্ব প্রদান করাই কর্তৃপক্ষের আশু এবং প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত, কারণ, খাদ্যের মূল্য স্থায়িত্ব লাভ না করিলে সমস্ত মূল্যমান স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার অর্থ এই যে, উৎপাদন খরচ ও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাইবে। ভারতের দ্রব্যমূল্য বর্তমানে এমনই অধিক এবং এই কারণে রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং খাদ্যমূল্যের স্থায়িত্ব ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু সরকারী অবিমৃষ্যকারিতার জন্য এই ব্যবস্থা খানচাল হইয়া যাইতেছে।

বর্তমান বৎসরে বাজারে প্রায় দুই কোটি টন খাদ্যশস্য অতিরিক্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে (যদি অবশ্য ইহা নিছক কাগজে-কলমের হিসাব না হয়)। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিয়াছেন। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই কম এবং এই পরিমাণ খাদ্যশস্যকে সঞ্চয় করিয়া রাখার ব্যবস্থাও যথোচিত নহে। যে ধীরগতিতে সরকারী গোলাবাড়ী বর্তমানে নির্মিত হইতেছে তাহাতে প্রয়োজনীয় গোলাবাড়ী নির্মাণ করিতে ২৫ বৎসর লাগিবে। খাদ্যশস্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সামরিক প্রাধান্যের পর্যায়ে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রণাপরিষদ এই সমস্যার গভীরতাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন নাই।

খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে বাজারের সমস্ত অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরকারের ক্রয় করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর উক্তি চিন্তার অভাব প্রকাশ করে। তিনি বলিয়াছেন যে, এরূপ করিলে সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকারের উপর পড়িবে এবং সেই কারণে রাষ্ট্র বর্তমানে বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিবে না। সুতরাং দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়ার জন্যই কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য সঞ্চয় করিতেছেন না এবং বেসরকারী ফড়িয়াদারদের উপর এই ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেওয়া সমাজতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী।

ভেষজ-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান

ভারতে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্য একটা বিরাট পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পেনিসিলিন, সালফা জাতীয় ঔষধ, পি-এ-এস ইত্যাদি জাতীয় ঔষধের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিন জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা কাগজে-কলমে দেখা যাইতেছে। দেশ যাহাতে ঔষধের ব্যাপারে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কর্মপন্থাও স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে, সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতে পাঁচটি কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প। এই পাঁচটি কারখানার মধ্যে প্রথমটিতে পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন ইত্যাদি জাতীয় এণ্টিবায়োটিক ঔষধ ও হরমোন-জাত দ্রব্য উৎপন্ন করা হইবে। দ্বিতীয়টিতে বিবিধ শ্রেণীর সালফা জাতীয় ঔষধ, ক্ষয় ও অন্যান্য

জটিল রোগের প্রতিষেধক ঔষধ এবং বিবিধ শ্রেণীর ভিটামিন আর তৃতীয়টিতে ভারতের বিবিধ ভেষজ গাছগাছড়া হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে। চতুর্থটিতে মাংসগ্রন্থি হইতে উৎপাদিত ইনসুলিন, পিটিউট্রিন, এ-সি-টি-এইচ ইত্যাদি জাতীয় ঔষধ উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা হইবে। এবং পঞ্চম কারখানাটি রহিবে, অস্ত্রোপচারের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য।

গবর্ণমেন্ট আশা করেন যে, এই পাঁচটি কারখানা চালু হইলে দেশের প্রচলিত ও নূতন পরিকল্পিত সমস্ত কারখানায় দেশবাসীর প্রয়োজনীয় ঔষধাদি এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি দেশের ভিতরেই উৎপন্ন হইতে পারিবে।

কিন্তু এত বড় বিরাট পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন অংশই নাই। ইহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনি দুঃখের। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে—যে সময়ে দেশবাসীর হাতে কতিপয় কাপড়ের কল ও অন্য দুই চারিটি শিল্প ছাড়া আর কোন শিল্প ছিল না, সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ভেষজ নির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তবে কেন আজিকার এই বিরাট আয়োজনে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার নীরব রহিয়াছেন ইহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। এ বিষয়ে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রশ্নাবলীও প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন জবাব দেন নাই। সোভিয়েট প্রতিনিধিদল যখন ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশগুলি নির্ব্বাচিত করেন তখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কথা বলেন নাই। হয়ত ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলিতে কারখানা স্থাপিত হইবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এই সব কারখানা স্থাপনের সবচেয়ে বেশী সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে এবং পশ্চিম বাংলায় ভেষজ শিল্পের যে ঐতিহ্য রহিয়াছে, ভারতের আর কোন স্থানে তাহা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উক্ত বিষয়ে সময়মত অবহিত না হওয়ার দরুন বাংলা দেশের এই সুযোগ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা অতীব দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় হইবে। সময় থাকিতে ডাঃ রায় এ বিষয়ে অবহিত হইবেন ইহাই আশা করি। তিনি একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। ভেষজ-শিল্পের গুরুত্ব তাঁহার মত আর কে বুঝিবে? তিনি রাজ্যের কর্ণধার থাকাকালে যদি ভেষজ-শিল্প উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দপ্তর উৎখাতের কোপে কলিকাতা

দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের প্রধান দপ্তর কলিকাতা হইতে উঠাইয়া লওয়া হইবে—এ সংবাদ অনেকদিন হইতেই শুনা যাইতেছে। শুধু এই দপ্তর কেন, বহু দপ্তরই উঠিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। সবই একে একে যাইবে, বোধ হয় কলিকাতার ইহাই নিয়তি। কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে অনেক দপ্তরই সে সময় স্থানান্তরিত হয়। সেই হইতেই সুরু হইয়াছে অপসারণের পালা। পরিচালনার সুবিধার নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ যখন দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল তখন প্রতিবাদ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। জীবন-বীমা কর্পোরেশনের সদর দপ্তর হইল বোম্বাই, ষ্টেট ব্যাঙ্কেরও তাহাই—দুইটি বিমান-সংস্থার একটিরও প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতায় নহে, যদিও ভারতের প্রধানতম বিমানঘাঁটি কলিকাতাতেই।

কলিকাতার গুরুত্বের প্রশ্ন শুধু প্রেষ্টিজের নহে—সহস্র সহস্র বাঙালীর কর্ম্ম-সংস্থানের আশা-নিরাশা ইহার সহিত জড়িত। কর্ত্তারা যত সহজে দপ্তর সরান, কর্ম্মীরা তত সহজে সরিতে পারেন না—কেরাণীদের এজন্য বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। ইহার ফলে প্রায় সব চাকরীই ধীরে ধীরে অন্য প্রদেশীয়দের হাতে চলিয়া যাইতেছে।

এই দামোদর উপত্যকাকে লইয়া দেখিতেছি টানা-হেঁচড়ার আর অন্ত নাই। বিহার প্রথমে আব্দার তুলিয়াছিল, এখন সেই আব্দার নেপথ্য-প্রশ্রয়ের ফলে দাবির আকার লইয়াছে। রাঁচি, ধানবাদ, হাজারিবাগ—পালা করিয়া দাবি উঠাইয়াছে। কিন্তু এবার শুনা যাইতেছে মাইথনের নাম। কোথায় যাইবে, সে প্রশ্নটা বড় নয়—কলিকাতায় থাকিবে না কেন, সেই কথাটাই আসল। কর্পোরেশনের অংশীদার পশ্চিমবঙ্গও, তাহাকেই বা উপেক্ষা করা যায় কি করিয়া?

প্রশ্নটি রাজনৈতিক নহে, প্রাদেশিক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতেও ইহার বিচার চলে না—বিচার করিতে হইবে অর্থনৈতিক প্রশ্নের ভিতর দিয়া। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীর সংখ্যা এক হাজারের মত, সপরিবারে ইহাদের বাসযোগ্য স্থান সমগ্র দামোদর উপত্যকায় কোথাও নাই—না মাইথনে, না রাঁচিতে। অথচ কলিকাতার সুবিধা রহিয়াছে অনেক। যে অঞ্চলে বর্ত্তমানে কাজ চলিতেছে, তাহা কলিকাতার কাছাকাছি, রেল-চলাচল, অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযোগ রক্ষা ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা কলিকাতাতেই বেশী। তথাপি দপ্তর তাঁহাদের উঠাইতেই হইবে। ডি-ভি-সির চলতি বৎসরের বাজেটে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাইথনে কয়েকটি ইমারত নির্ম্মাণের প্রস্তাব আছে। এই ইমারত কি সদর দপ্তরের জন্য? এই সদর দপ্তর সরাইতে হইলে বাড়তি খরচের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা হইবে। কেননা, কর্ম্মীদের জন্য গৃহ-নির্ম্মাণ ব্যতীত প্রয়োজন হইবে হাসপাতালের, অন্ততঃ একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের—ইহা ছাড়া ক্লাব ইত্যাদি ত আছেই। একদিকে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সঙ্কট দেখা দিয়াছে, বিদেশ হইতে ঋণ লইয়াও অর্থাভাব মিটিতেছে না, অন্যদিকে অকারণে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ের কথা উঠিয়াছে—আমাদের সমস্ত উদ্যমের অন্তর্ব্বিরোধ এইখানে।

দিল্লীতে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য যে বৈঠক বসিতেছে তাহাতে বাংলার প্রতিনিধিরাও থাকিবেন। প্রতিনিধিদলে

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নিশ্চয়ই আছেন। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, জাতীয় অর্থ অপচয়ের এই অনর্থকারী প্রয়াসকে তিনি প্রতিহত করুন—কলিকাতার গুরুত্বকে লঘু করিবার চক্রান্ত যেন ব্যর্থ হয়। এবং সেই সঙ্গে একথাও যেন তিনি ভুলিয়া না যান, এই দপ্তর অপসারণের হুজুগের পিছনে শুধু তাঁহাদের অস্থিরচিত্ততা নাই, আছে প্রাদেশিক অপবুদ্ধি।

স্থান নির্ব্বাচনে সরকারের পক্ষপাতিত্ব

ভারতের দ্বিতীয় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানার স্থান নির্ব্বাচন-ব্যাপারে ভারত সরকার যে পক্ষপাতদুষ্ট-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। এই স্থান নির্ব্বাচন ব্যাপারে পরামর্শ লইবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত সরকার ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে আনাইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের মতামতও দাখিল করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত চাপা পড়িয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গের গেঁওখালির দাবি উপেক্ষা করিয়া কোচিনকে নির্ব্বাচিত করিবার চক্রান্তই কি ইহার কারণ? পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, ভিতরের তদ্বিরের ফলে ভারত সরকারের পরিকল্পিত দ্বিতীয় ইস্পাতের কারখানাটি দুর্গাপুরে স্থাপিত হইতে পারে নাই। আরও দেখিয়াছি, আসামের নবাবিষ্কৃত তৈলের খনি হইতে উত্তোলিত তৈল-শোধনের কারখানার জন্য কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা বিহারের বারুণী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প হইয়াছে। আলোচ্য জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প প্রকাশিত হইবার পর আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এই বিষয়ে কোন তথ্যানুসন্ধানের পূর্ব্বেই ভারত সরকারের কোন কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উহা কোচিনে স্থাপিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা এরূপ যুক্তিও দিয়াছেন যে, কলিকাতা একটি সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চল বলিয়া উহার নিকটে জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বর্ত্তমানে এই জেট বিমানের যুগে সীমান্ত ও সীমান্ত-বহির্ভূত সকল অঞ্চলই নিরাপত্তার দিক হইতে এক পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং এই অসার যুক্তি তাঁহারা উপস্থিত না করিলেই পারিতেন।

কলিকাতা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর এবং ইহার নিকটে ভারতের বৃহদাকার শিল্পের অধিকাংশ অবস্থিত। সীমান্ত বলিয়া এই বন্দর এবং এইসব শিল্প স্থানান্তরিত করিবার কোন প্রশ্নই কেহ উত্থাপন করে নাই। এই ধরনের কাল্পনিক বিপদ স্বীকার করিয়া লইলে দুর্গাপুরে ইস্পাত-কারখানা স্থাপনও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তাহা যখন হয় নাই তখন একমাত্র জাহাজ-নির্ম্মাণের বেলায়ই বা কথা উঠিবে কেন? ইংলণ্ডের জাহাজ-নির্ম্মাণ-শিল্প মাত্র চারিটি এলাকায় সীমাবদ্ধ। সেই ক্ষেত্রে ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলে একটিমাত্র কারখানা আছে।

আমাদের বক্তব্য, বর্ত্তমানে ভারতের অর্থসঙ্গতি খুব কম। সেরূপ অবস্থায় কোনও আঞ্চলিক স্বার্থের দিকে না চাহিয়া ভারতের যে স্থানে জাহাজ-নির্ম্মাণের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুকূল অবস্থা রহিয়াছে সেই স্থানেই জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গেঁওখালি জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান, ইহা ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ দলও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তদ্বির-তদারকের ফলে শেষ পর্য্যন্ত কোচিনেই যদি জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে তাহাতে সরকারের চরম পক্ষপাতিত্বই প্রকাশ পাইবে।

সম্প্রতি লোকসভায় ও নানা সাধারণ সম্মেলনে ভারতের নৌ-সম্পদ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও জোর গলায় বলিয়াছেন যে, সেদিকে তাঁহারা অবহিত-ভাবে কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন। একথাও তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের বাণিজ্য পণ্যদ্রব্যাদির শতকরা ৯৫ ভাগ এখনও বিদেশী জাহাজে আমদানী-রপ্তানী হয়। কেননা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নৌ-সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্য যাহা রাখা হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহা হইতে অনেক কম এ পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। জাহাজ-নির্ম্মাণের এই ব্যাপারে তাঁহারা যেরূপ মনোবৃত্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, ঐ সকল কথাই বাজে, সারকথা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর ভার চাপাইয়া অধিকারিবর্গের ও তাঁহাদের আত্মীয়গোষ্ঠির মেদবৃদ্ধি।

বর্ত্তমান সমাজ-জীবন ও দুর্নীতি

পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা এবং ঔদাসীন্যের কথা আমরা বার বার বলিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানি, অপরাধ আমাদের কম নহে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গুণ্ডামি অল্পবিস্তর চিরকালই সবদেশে থাকে, তাহা নূতন নয়। বরং সমাজ-বিরোধী অপরাধ-মূলক দুষ্কৃতির সংখ্যা এদেশেই বেশী। সভ্যতার দিক দিয়া এবং শান্তিপ্রিয় বলিয়া একদা বাংলা দেশের সুনাম ছিল। এখন বাংলার এমন কোনও অঞ্চল বোধ হয় নাই যেখানে প্রত্যহই ছোট-বড় সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ না ঘটিতেছে। পুলিসের উদাসীনতা অথবা অযোগ্যতার উপর সব দোষ চাপাইতে গেলে তাহাদের উপর অবিচারই করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অবশ্য প্রধানতঃ পুলিসের। কিন্তু সমাজের সর্ব্বস্তরে সমাজ-বিরোধী মনোভাব বিস্তৃত হইলে কোন পুলিসবাহিনীই গুণ্ডামি প্রভৃতির অনুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারে না।

প্রায়ই যে সব অপরাধমূলক ঘটনার বিবরণ বাহির হইতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় গুণ্ডারা সঙ্ঘবদ্ধ, জনসাধারণ অসহায় অথবা নিরুদ্যম কিংবা উদাসীন। চাকদহ থানার চাঁদমারী উদ্বাস্তু শিবিরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে একটি বিবাহিতা যুবতীকে যেরূপ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, ইহাতে সেই কথাই স্বতঃই মনে

আসে। ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, চাঁদমারী উদ্বাস্তু-শিবির অঞ্চলে গুণ্ডামি, রাহাজানি, নারীহরণ ইত্যাদি কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি ইহার প্রতিকারের জন্ত পুলিসকে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন, পুলিসের নিস্ক্রিয়তার ফলেই সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ প্রশ্রয় পাইতেছে।

পুলিস নিস্ক্রিয় থাকিলে তাহা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু আরও হতাশাজনক স্থানীয় জনসাধারণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিরুদ্যম মনোভাব। বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে থানা, পুলিস-চৌকি প্রভৃতি বহু দূরে দূরে অবস্থিত। বোমা-বন্দুক লইয়া ডাকাতদল অতর্কিত-ভাবে হামলা করিলে নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা কি করিতে পারে? এসব ক্ষেত্রে পুলিসী-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা না করা দুই-ই সমান। গ্রামরক্ষীদল গঠনের খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুলিস কর্তৃপক্ষ সত্য সত্যই যদি সর্ব্বত্র গ্রামরক্ষীবাহিনীকে আধুনিক ভাবে গড়িয়া তুলিতেন, তাহা হইলে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির উৎপাত সম্পূর্ণ নিবারণ করা যাইত।

গ্রামাঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিই, শহর ও শিল্পাঞ্চলে অন্ততপক্ষে পুলিসের শক্তি কেন্দ্রীভূত, অপরাধ নিবারণের উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্যের অভাব নাই। তাহা সত্ত্বেও কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চল—হাওড়া, বরানগর, বেলঘরিয়া প্রভৃতি জনবহুল স্থানে গুণ্ডামি, রাহাজানি ও বিবিধপ্রকারের সমাজ-বিরোধী উপদ্রব দুষ্টক্ষতের মত আঁটিয়া বসিয়া আছে। একা পুলিসের চেষ্টায় সব রকম সমাজবিরোধী অনুষ্ঠান বন্ধ হইতে পারে না। নানা রকম কদাচার, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নাগরিক জীবনের কুফল হিসাবে দেখা দিবেই। তা ছাড়া সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণেও অপরাধপ্রবণতা বাড়িতেছে। পুলিসের কাজ অপরাধ নিবারণ ও অপরাধ ঘটিলে দুষ্কৃতকারীর সন্ধান করিয়া শাস্তিবিধানের চেষ্টা। অপরাধপ্রবণ দুর্বৃত্তদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিলে পুলিসী-ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হাতে-কলমে পুলিসের। কিন্তু অপরাধপ্রবণ মনোভাব সমাজের নানা স্তরে প্রবল হইতেছে। সেখানে পুলিস কি করিবে? চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ ত সাবেকী ধরনের। বর্ত্তমানে যে সব গুণ্ডামি ও সমাজ-বিরোধী উপদ্রব দেখা দিয়াছে, সেইগুলিই উদ্বেগজনক এবং সমাজ-জীবনে নৈতিক বিপর্য্যয়সূচক। এই বিপর্য্যয় প্রতিরোধ করিবার জটিল সমস্যা আইন-শৃঙ্খলার শক্ত বাঁধনে নাই, তাহা আছে অন্যত্র। তাহাই আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বড়বাজারে দুঃসাহসিক রাহাজানি

৪ঠা এপ্রিল শনিবার দিনদুপুরে বড়বাজারের একটি কর্মব্যস্ত ব্যবসায় অঞ্চলে জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কুড়ি হাজার টাকা ছিনাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর পলায়নরত এক দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করিতে গিয়া জনৈক পথচারী ঐ দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। একটি বেগুনের থলিতে রক্ষিত ঐ টাকা ছিনাইয়া লইতে গিয়া দুর্বৃত্ত উক্ত ব্যবসায়ীর দুই হাতেও ছুরিকাঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে ঐ আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই। স্থানীয় জন-সাধারণ দুষ্কৃতকারীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেও আততায়ীকে ধরিতে পারা যায় নাই। ঐ ব্যক্তি ছুরিকা আস্ফালন করিতে করিতে একটি গলিপথ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত এই সংবাদে আমরা বিস্মিত হইলাম। জনবিরল কোন এলাকায় নহে, নগরীর উপেক্ষিত কোন গলিতেও নহে, লোকবহুল এবং অসংখ্য যানবাহনকণ্টকিত বড়বাজারে, সুস্পষ্ট দিবালোকে একজন মাত্র দুর্বৃত্ত এক ব্যবসায়ীকে ছোরা মারিয়া তাহার টাকা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল এবং অপর এক ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে ছোরা মারিয়া পলায়ন করিল, ইহাতে কি বলিব, কাহাকে দোষ দিব আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না। প্রথমেই মনে হয়, দুর্বৃত্তের পক্ষে এই অসমসাহসিক দুষ্কার্য্যে অগ্রসর হইবার সাহস কোথা হইতে আসিল। নগরীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার শৈথিল্য বা অন্য কোনরূপ দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া সে এইরূপ কাজ করিতে দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। আবার দুর্বৃত্তের আস্ফালনের সম্মুখে জনসাধারণের ভীরুতার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতাও তাহার দুঃসাহস বাড়াইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, এরূপ একটি ব্যাপার সংঘঠন যে সম্ভব হইল, তাহা ভাবিয়াই আমরা বিস্ময়বোধ করিতেছি। কেহ কোনভাবে এই দুর্বৃত্তকে কাবু করিতে পারিল না, কোন দ্রুতগামী যানারোহী আগাইয়া গিয়া তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না, কোন ভ্রমণরত পুলিস-ভ্যানের পক্ষেও তাহার পশ্চাদ-অনুসরণ করা সম্ভবপর হইল না—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কিরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য যখন যেখানে দুষ্কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, সেখানেই পুলিস উপস্থিত থাকিবে ইহা নাও হইতে পারে। কিন্তু দুর্বৃত্তেরা যদি বুঝিতে পারে যে, পুলিসী-সংরক্ষণী ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর এবং তাহাদের শ্যেনদৃষ্টি যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের উপর পড়িতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সাবধান হইতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, পুলিসের কর্ম্ম-শৈথিল্যই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে খুব বেশি।

অবহেলিত ডুয়ার্স

সুদূর ডুয়ার্সে বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইল। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন উত্তর অঞ্চলের দুর্গম প্রান্তে এই ডুয়ার্স। হিমালয়ের পাদদেশে তিস্তা নদী হইতে আসামের সীমান্ত পর্য্যন্ত ডুয়ার্সের বিস্তৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ ভুটান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলার সহিত জুড়িয়া দেন। অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার ফলে ডুয়ার্সের জলবায়ু আর্দ্র। আসামের মত ডুয়ার্সের জমিতে চায়ের চাষ খুব বেশী। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে এক শত বাটটি চা-বাগান

গড়িয়া উঠিয়াছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন চা-গাছ বাড়িয়া উঠিবার খুবই উপযোগী তেমনি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের আর্দ্র আবহাওয়া ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণু পুষ্ট হইবার আদর্শ ক্ষেত্র। দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বেও ডুয়ার্সের নামে লোকের হৃৎকম্প হইত। এই জন্যই ডুয়ার্সে চিকিৎসক সম্মেলনের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক।

এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ এন, জি. ঘটক তাঁহার অভিভাষণে ডুয়ার্সের বিভিন্ন সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, চিকিৎসকদের নানাবিধ সমস্যার কথাও তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন। এই সব সমস্যার প্রতি যদি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দ্রুত উহার সমাধানের চেষ্টা হয়, তাহা হইলেই এই দুর্গম প্রান্তে প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলন আহুত হইবার প্রকৃত সার্থকতা।

ডুয়ার্স জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত হইলেও, এই অঞ্চলের সহিত জেলা সদরের সংযোগ-ব্যবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বর্ষার সময় তিস্তা নদী যখন স্ফীত হয় তখন এই সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে—দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া তখন এই সংযোগ রক্ষা করিতে হয়। বাংলা দেশ বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে জলপাইগুড়ির সহিত কলিকাতার সুন্দর যোগাযোগ ছিল। এখন আকাশ-পথে যাতায়াতের সঙ্গতি যাহাদের নাই, তাহাদের কলিকাতা আসিতে হইলে প্রায় আধমরা হইয়া আসিতে হয়। পূর্ব্বে রেলপথে যেখানে আট-নয় ঘণ্টা সময় লাগিত সেখানে এখন চব্বিশ ঘণ্টারও বেশী সময় যায় রেলপথ ও ষ্টীমার-পথে।

এই দুর্গম অঞ্চলে কয়েকটি মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ এখন কমিয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি নূতন ব্যাধি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে। দেশ বিভাগের পরবর্ত্তীকালে ডুয়ার্সে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকও যেমন বাড়িয়াছে, রোগও বাড়িয়াছে তদনুরূপ। বিশেষ করিয়া কুষ্ঠরোগ অতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। অথচ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। যক্ষ্মা চা-বাগান অঞ্চলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে। ডাঃ ঘটক বলেন, চা-বাগানগুলিতে যক্ষ্মারোগীদের সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশী। চারি বৎসর পূর্ব্বে বক্সা বন্দী-নিবাসকে যক্ষ্মা হাসপাতালে পরিণত করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, এবং সেখানে চা-বাগানগুলির জন্য কিছু শয্যা নির্দিষ্ট রাখিবার কথাও হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। এই অঞ্চলটির জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। ইহা ছাড়া যক্ষ্মাব্যাধির প্রসার নিবারণের জন্য ব্যাপকভাবে বি-সি-জি ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা এবং ভ্রাম্যমান এক্স-রে ইউনিট প্রবর্ত্তিত হওয়াও প্রয়োজন।

চা-বাগানের চিকিৎসকদের সমস্যাগুলির উপর ডাঃ ঘটক বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই ডাক্তারদের গালভরা নাম মেডিক্যাল অফিসার। এই অফিসার একাধারে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ধাত্রী, দাই অনেক কিছু। রোগী দেখেন তিনি, ব্যবস্থাপত্র লেখেন তিনি—আবার তিনিই ঔষধ বণ্টন করেন, ক্ষতস্থান ধুইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার ভারও তাঁহার উপর। তিনিই ছেলে প্রসব করাইতেছেন, ছেলে এবং প্রসূতির পরিচর্য্যাও করিতেছেন। এই বিরাট ও দুরূহ দায়িত্ব যাঁহার স্কন্ধে, তাঁহার বেতন কিন্তু সে তুলনায় অতি নগণ্য।

এই অবজ্ঞাত ও অবহেলিত ডুয়ার্স পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান সম্পদের ক্ষেত্র। দেশোন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে এই ডুয়ার্স। তাহা ছাড়া এই চা-বাগানে প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে, পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য এই চা-শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতে যেমন, মানবিক দিক হইতেও তেমনি ডুয়ার্সের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অনুন্নত তপশীলী সম্প্রদায়ের চৈতন্য

ভারতীয় তপশীলী সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ বহু পূর্ব্ব হইতেই ডাঃ আম্বেদকরের প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ হইয়াও তাঁহারা হিন্দুর সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না। আজ তাঁহারা নাম বদল করিয়া রিপাব্লিকান বলিয়া পরিচিত হইতে চান। কিন্তু কেবল নাম বদল করিলেই মানুষকে উন্নত করা যায় না—মানুষ হিসাবে আর সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মানবিক অধিকারসমূহ তাঁহাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা বিরোধ, বিদ্বেষ বা প্রতিকূলতার পথে নয়, ঐক্য, প্রীতি ও পারস্পরিক আশ্বাস, বিশ্বাস এবং সহযোগিতার পথেই দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতির কাজে তাঁহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তবেই হইবে প্রকৃত রূপ বদল।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বৈদিক আর্য্যেরা পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া কালের প্রভাবে যে সময়ে বর্ণাশ্রমী সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহারা বিজেতা জাতিরূপে এদেশের আদি অধিবাসীদের দাস বা শূদ্ররূপে চিহ্নিত করিয়া তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মর্য্যাদার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। ইহার ফলে সমাজে আসে অস্পৃশ্যতা এবং অসাম্য। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে একদিন বৌদ্ধেরা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং অনুন্নত হিন্দুর এক বৃহৎ অংশই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। আবার ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী অভিজাতেরা আসিয়া যখন দেশ দখল করিলেন, তখন এই নিগৃহীত শূদ্রেরাই দলে দলে মুসলমান হইয়া সমাজের সংহতি ভাঙিয়া ফেলেন। ইহার পরিণাম, সাড়ে সাত শত বৎসর পরে ভারত বিভাগেই প্রমাণিত হইয়াছে। কাজেই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কুফল সম্বন্ধে আজ নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। মনে রাখিতে হইবে, এত ভাঙা-গড়ার মধ্যেও মোট হিন্দুজাতির তিন-চতুর্থাংশই এখনও পর্য্যন্ত এই অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত এবং দেশের কৃষক,

শ্রমজীবী, কারিগররূপে সমাজের শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। এই শ্রেণী যদি বিদ্বেষবশে আজ ধর্ম্মান্তরিত হন বা চিরদিন অপাংক্তেয় হইয়া পিছনে পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও কোন ভবিষ্যৎ নাই, দেশেরও কোন মঙ্গল নাই। তাঁহাদের মানুষ করিবার কাজে উন্নতদেরও যেমন আগাইয়া আসিতে হইবে, এই অনুন্নত শ্রেণীকেও তেমনি সজাগ ও কৃতসঙ্কল্প হইতে হইবে। অর্থাৎ দুই পক্ষের উদ্যোগেই এই ঐতিহাসিক কলঙ্ক দূর হইতে পারে। একথা আজ সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, মানুষে মানুষে এই যে ভেদ—ইহা প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক ও আর্থিক কৌলীন্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে। জ্ঞানে, বিদ্যায়, পদে, সামর্থ্যে বড় হইয়া উঠিলে তখন আর শ্রেণীর কথা মনে জাগে না, ইহা ত আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কাজেই আসল কথা হইল, শিক্ষার বিকিরণ এবং জীবিকার উন্নয়ন।

আজ গণতান্ত্রিক ভারতে হরিজন, তপশীলী, আদিবাসী প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড সংজ্ঞার প্রয়োজন অর্থহীন। সকলকে আজ এক অখণ্ড ভারতবাসী রূপে গণ্য করিতে হইবে, তবেই হইবে দেশের কল্যাণ।

খাতা লইতে পরীক্ষকের লাঞ্ছনা

পরীক্ষার খাতা যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা সম্মানীয় শিক্ষক, একথাও আজ শিক্ষা-পর্ষদকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে ইহা লজ্জার কথা। এই পর্ষদের হাতে খাতাগুলি বণ্টন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ বিতরণ-কার্য্যটি শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারিলেন না! এই পরিবেশন কি কোন-ক্রমেই ভদ্র করা যায় না? প্রতীক্ষারত কাঙালীদের প্রতি দাতার মনোভাব লইয়া ইহাকে সুন্দর করা কোনদিনই যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও শিক্ষকদের অনেককেই ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। তাঁহারা অভিযোগ করেন, সকাল প্রায় দশটা হইতে চৈত্র শেষের চড়া রৌদ্রে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিবার পরও খাতা লইবার জন্য তাঁহাদের ডাক আসে না! অপেক্ষমান বহু পরীক্ষক এইরূপ অভিযোগ করেন যে, মাত্র দুইটি কাউণ্টার হইতে খাতা বিতরণের ব্যবস্থা করায় তাঁহাদের—বিশেষতঃ মহিলাদের—খুব অসুবিধা হইতেছে। অথচ লাইনবন্ধ বা 'কিউ' দিয়া দাঁড়াইবার ব্যবস্থাও সেখানে নাই। ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতেছে। ইহার মধ্যে মফঃস্বলের পরীক্ষকও আছেন—তাঁহাদের রাত্রি পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে বাড়ী ফিরিবার আর কোন উপায় থাকে না। অথচ এপ্রিলের মধ্যে খাতা দেখা শেষ করিয়া ইহাদের প্রধান পরীক্ষকের নিকট খাতাগুলি পেশ করিতে হইবে—ইহাই নির্দ্দেশ।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারা মনুষ্যোচিত ব্যবহারও পাইতেছেন না। বসিবার জন্য কোন আসনের ব্যবস্থা নাই, তৃষ্ণার জল নাই—আছে, মাথার উপর দুপুরের খর-রৌদ্র।

এ আচরণ অন্তত শিক্ষা-বিভাগে থাকা উচিত নয়।

পরিচালন-ব্যবস্থায় রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ

প্রতি বৎসর রেলওয়ে বাজেট-খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, ইহাই দেখা যায়। ভারতের আর কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ লাভজনক নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত টাকা লাভ করিয়াও তাঁহারা গাড়ীগুলির সংস্কার করিতে পারিলেন না। এবং যে যাত্রীদের কল্যাণে তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঘরে উঠিতেছে সেই মানুষের সুখ-সুবিধার দিকে কোন দৃষ্টিই কর্ত্তৃপক্ষের নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জাতে উঠাইবার কথা তাঁহারা বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন শ্রেণী-বিভাগ থাকিবে না—গাড়ীগুলি এক শ্রেণীর হইবে। পরিবর্ত্তন তাঁহারা করিয়াছেন—দ্বিতীয় শ্রেণী এবং মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী তুলিয়া দিয়া। এই শ্রেণী দুইটি তুলিয়া দিয়া সুবিধার পরিবর্ত্তে বরং তাঁহারা অসুবিধাই করিয়াছেন। নিয়মানুবর্ত্তিতার দিক দিয়া আগে গাড়ীগুলি যথাসময়ে ছাড়িত এবং পৌঁছাইত। 'লেট' কথাটি কদাচিৎ শোনা গিয়াছে। আজকাল সময়ে ছাড়া এবং সময়ে পৌঁছানর কোন বালাই-ই নাই। বিশেষ করিয়া লোকাল গাড়ীগুলি এতটা উপেক্ষিত, যাহাতে যাত্রীদের দুর্গতি আজ চরমে উঠিয়াছে। আপিস-যাত্রীরা অভিযোগ করিয়াও গাড়ীগুলিকে নিয়মিত করাইতে পারেন নাই। কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে, কখন ছাড়িবে তাহার বাঁধা-ধরা কোন স্থিরতা নাই। একই লাইনের পিছনের গাড়ীগুলি একে একে চলিয়া গেল, তথাপি ছাড়িবার নাম নাই। ষ্টেশন হইতে কারণও কেহ জানাইলেন না। যাত্রীরা অপেক্ষাই করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও ত ধৈর্য্যের সীমা আছে, তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া অন্য ট্রেণের ভিড় কমিলে তাঁহারা বাড়ী ফিরিলেন। পরে জানা গেল, সিগনাল এবং লাইনের সংযোগ-কেন্দ্রটি খারাপ ছিল, যাহার ফলে উক্ত লাইনের গাড়ীখানি যাইতে পারে নাই। এরূপ স্থলে যাত্রীদের অবগতির জন্য মাইকের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। পূর্ব্বে জানা থাকিলে যাত্রীদের দুর্ভোগ কম হয়। কিন্তু বন্দোবস্ত করে কে? বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, সকল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনই এইরূপ। অর্থাৎ সকল বিভাগেই যোগ্য লোকের অভাব। উপযুক্ত লোক কি পাওয়া যায় না, না আত্মীয়-পোষণের ফলে বিভাগগুলি অচল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যাহাই থাক, ইহার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন।

হাসপাতালের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ

হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আজ নূতন নহে। তবে সম্প্রতি যে সংবাদটি বাহির হইয়াছে তাহা অভিনব। চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সরকারী হাসপাতাল 'কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে'র ওয়ার্ড হইতে অত্যধিক রক্তচাপে আক্রান্ত সত্তর বৎসর বয়স্ক জনৈক রোগীর নিখোঁজ হওয়া যেমনই বিস্ময়কর তেমনই নৈরাশ্যজনক। রোগীর

নাম শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল। তিনি ঐ হাসপাতালের 'চক্রবর্তী ওয়ার্ডে' ডি-৮' নম্বর বেডে গত ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ভর্তি হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র শৈলেন পাল অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন, ৮ তারিখে রোগীকে আমরা ভালই দেখিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু ৯ তারিখে রোগীকে বিছানায় না দেখিয়া বিস্মিত হই। নার্স ও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলেন যে, রোগী পলাইয়া গিয়াছে এবং আমরা বৌবাজার থানাতে সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়াছি। আমরা আর কিছু জানি না বা আমাদের কিছু করিবার নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের বিরক্ত করিবেন না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, থানায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই দেন নাই।

হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং তাহাদের দুর্ব্যবহারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। তাহাদের লইয়া আলোচনাও হইয়াছে বহুবার। আমাদের জিজ্ঞাস্য, গলদ কোথায়? এবং তাহার প্রতিকারই বা হইতেছে না কেন?

অথচ রীতিনীতি এবং ভব্যতার দিক দিয়া এই মেডিক্যাল কলেজের একদিন সুনাম ছিল। ইহাতে পরিচালনার অযোগ্যতার কথাই স্বতঃই মনে আসে।

এই সেদিন আর একটি ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে। রুগ্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে গিয়া হাসপাতালের একজন দারোয়ানের হাতে কি ভাবে বার বৎসর বয়স্ক বালক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত ও নির্যাতিত হইয়াছে সে চাঞ্চল্যকর কাহিনীও কাহারও আজ অবিদিত নাই। ভ্রাতার অস্ত্রোপচারের সংবাদ পাইয়া বালকটিকে অসময়েই হাসপাতালে যাইতে হয়। অসময় বলিয়া দারোয়ান সঙ্কটাপ্রসাদ তেওয়ারী তাহাকে কীল, চড় ও ঘুষি মারে এবং তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া হাসপাতালের বারান্দার মেঝের উপর ফেলিয়া দেয়। ফলে তাহার দাঁত ভাঙিয়া যায় এবং প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে—সে ঐস্থানেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

ইহাই-বর্ত্তমান মেডিক্যাল কলেজের বাস্তব রূপ! ইহার মূলে একদিকে বিভ্রান্ত ও অতিশয় সমাজ-বিরোধী 'রাজনীতি' ও অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা।

হাসপাতাল না জল্লাদখানা

বর্দ্ধমানের 'দামোদর' পত্রিকা লিখিতেছেন:

হাসপাতালের অনাচার ও অব্যবস্থার অভিযোগ নূতন নহে। প্রতিকার করিবার মালিক যাঁহারা তাঁহারাই এক্ষেত্রে উদাসীন।

বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্বন্ধে পুনরায় এক ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। একটি ধনুষ্টঙ্কার-আক্রান্ত রোগী উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে আসিয়া বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছে এবং আরও কয়েকটি রোগীর বসন্ত আক্রমণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন মানুষের একসঙ্গে দুইটি রোগ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বসন্তরোগে আক্রান্ত বিষয়ে হাসপাতালই দায়ী। কারণ এই হাসপাতালে সংক্রামক রোগীদের জন্য যে ওয়ার্ডটি রহিয়াছে তাহাতে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সকল রোগীকেই এক সঙ্গে রাখা হয়। ইহার পূর্ব্বেও এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং সরকারকে আমরা ইহার সুব্যবস্থার জন্য বহুবার অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকার হইল না—সেই নারকীয় ব্যবস্থা এখনও চলিতেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হইতে স্বাস্থ্যবিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সরকারী ব্যয়ে পরিদর্শনের নামে কি তবে প্রমোদভ্রমণ করিতে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন?

মানুষের স্বাস্থ্য ও পৌর প্রতিষ্ঠান

কলিকাতা শহরের অখ্যাতি অনেক, এবং তার সবগুলিই যে ভিত্তিহীন, এমনও নয়। কলিকাতায় যাঁহারা থাকেন, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই থাকেন, না থাকিলেও যদি চলিত, হয়ত থাকিতেন না। নানা কারণে এই শহর আজ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, কলিকাতা আর তাহার উপকণ্ঠ-অঞ্চলকে যে কখনও বাসযোগ্য করিয়া তোলা হইবে, এমন কোন চেষ্টাও কাহারও চোখে পড়ে না। যাহা কদর্য্য ছিল, তাহা কদর্য্যতর হইতেছে, যাহা অমানুষিক ছিল তাহা নারকীয় হইয়া উঠিতেছে। কথাটা খুব অপ্রিয় হইলেও, আমরা বলিতে বাধ্য, দমদম থানা এলাকার অন্তর্গত কয়েকটি অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে যেসব তথ্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহাকে 'নারকীয়' ছাড়া অন্য কোন বিশেষণে বোধ হয় আখ্যাত করা চলে না। কলিকাতা কর্পোরেশন আর বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির একটি ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড ঐ অঞ্চলে আছে, কিন্তু নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনারাশি যাহাতে চারি পাশের আবহাওয়াকে এক জঘন্য বীভৎসতায় পূর্ণ করিয়া না তোলে তাহার কোনও ব্যবস্থা সেখানে নাই। ফলে আশ-পাশের কয়েকটি অঞ্চলের দশ হাজার মানুষের জীবন প্রায় দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। যে অবস্থায় জন্তু-জানোয়ারের স্বাস্থ্যও বিপন্ন হইবার আশঙ্কা, সেই অবস্থায় মানুষ থাকিতে বাধ্য হয়—কোন সভ্য দেশের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে। অথচ, সামান্য একটু পরিশ্রম করিলেই আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান এ অবস্থার প্রতিকার করিতে পারিত। মনুষ্য-বসতি হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া ঐ আবর্জ্জনাকেই সারে পরিণত করা যাইত। কিন্তু ইহার কোনটাই করা হয় নাই। কর্পোরেশন কর আদায় করে। সেইরূপ মিউনিসিপ্যালিটিও যে করে না এমন নয়। কিন্তু কর্ত্তব্য কি শুধু কর আদায় পর্য্যন্ত? তাছাড়া ঐ সব অঞ্চলে 'স্যানিটারি পায়খানাকে'ই বা একটা আবশ্যক ব্যাপার করিয়া তোলাই বা হয় না কেন? এ-কাজ পৌর প্রতিষ্ঠানের। দায়িত্ব তাহাদেরই লইতে হইবে। দাবিটা অসামান্য নয়। জানি না, এ চৈতন্য তাহাদের আর কতদিনে হইবে!

পাকিস্থানী নীতি

ভারত-পাক সীমান্ত নির্দ্ধারণের সুষ্ঠু সমাধান আজও হইল না, যাহার ফলে বিরোধ লাগিয়াই রহিল। ঘটনার পারম্পর্য্য লক্ষ্য করিলে ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে, এক পক্ষ বিবাদকে বাঁচাইয়া রাখিতেই প্রয়াসী। অথচ এই সীমান্ত নির্দ্ধারণের কাজটি ভারত বিভাগের অল্পদিন পরেই সমাপ্ত হইবার কথা ছিল। অন্ততঃ নেহরু-নুন-চুক্তির পরে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্থান এবং আসাম পাকিস্থান সীমানা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটির অন্যায় জেদ, অসঙ্গত আচরণ ও দস্যুসুলভ পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি এবং অপরটির চিত্ত-দুর্ব্বলতা, বিপক্ষের প্রতি মারাত্মক দয়া-প্রদর্শন ও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা রক্ষার বিষয়ে শিথিল মনোভাবের জন্য।

গত এগার বৎসর ধরিয়া আমাদের প্রতিবেশী 'বন্ধু' ভারতের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে তাহাতে তাহাদের ছলনাই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ ছলনার প্রথম প্রকাশ পাইল, অবিভক্ত ভারতের সম্পত্তি বণ্টনের সময়। ভারতের পাওনা সেই সময় প্রায় তিন শত কোটি টাকা। কিন্তু তাহারা আজও সে টাকা পরিশোধ করে নাই। অথচ কাশ্মীর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নগদ ৫৫ কোটি টাকা তাহারা আদায় করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্ব-পঞ্জাব হইতে পশ্চিম-পঞ্জাবকে বিদ্যুৎসরবরাহের জন্য পাওনা টাকা না দিবার জন্য পাক কর্ত্তৃপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে দ্বিধা করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ হইতে নিয়মিত কয়লা সরবরাহ না হইলে পাকিস্থানের চলে না, কিন্তু ঠিকমত দাম দিবার বেলায় এবং ওয়াগনগুলি ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে পাক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশে নির্দ্ধারিত করা হইলেও উহা লঙ্ঘনের চেষ্টায় পাকিস্থানের উদ্দাম লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহাদের চরিত্রের পূর্ব্ব ইতিহাস এইরূপ, তাহারা যে সীমান্ত লইয়া নিয়ত গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করিবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে অকারণ গুলীবর্ষণ করিয়া শত শত ভারতীয় নাগরিকের ধন ও জীবন বিপন্ন করিবার পর পরম সহিষ্ণু ভারত-রাষ্ট্রের অবিরাম চেষ্টার ফলে গুলীবর্ষণ মোটামুটি ভাবে বন্ধ হইলেও পাকিস্থানের কলহ-কণ্ডূয়নের নিবৃত্তি হয় নাই। সীমান্তের সর্ব্বত্র সীমারেখাকে চিহ্নিত করিবার কাজে তাহারা নিয়ত বাধাই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পাকিস্থান কর্ত্তৃক এইরূপ বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে, সীমানা নির্দ্ধারিত না হওয়াকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারত-ভূমির উপর দাবি উত্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া। ভারতের সহিত কারণে অকারণে ঝগড়া করাই যাহাদের স্বভাব তাহারা সীমানা নির্দ্ধারণের কাজ সমাপ্ত করিতে স্বভাবতঃই রাজী হইতে পারে না। তাহারা বিবাদকে বাঁচাইয়া রাখিতেই চাহে।

পরলোকগত সর্দ্দার প্যাটেল একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারত বিভাগ এবং পাকিস্থান সৃষ্টিতে রাজী হইয়া আশা করা গিয়াছিল এইবারে সাম্প্রদায়িক অশান্তি হইতে হয়ত পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না—অশান্তি লাগিয়াই রহিল। প্যাটেলের মৃত্যুর পরেও তাঁহার কথার সত্যতা আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছি। সেই পুরাতন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা এখন একটি সংগঠিত রাষ্ট্রের আকার ধারণ করিয়া তাহার চিরাচরিত কার্য্য করিয়া যাইতেছে। কিন্তু পাকিস্থান যে কেবল ভারতের বাহির হইতেই ভারতের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে। তাহারা স্বাধীন ভারতের অভ্যন্তরেই রাষ্ট্রের বিপদ ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে—ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি কলহ এবং বিদ্বেষপরায়ণ রাষ্ট্রের গুপ্ত ও প্রকাশ্য অনিষ্টাচরণ প্রতিরোধের উপযোগী কঠোর নীতি অবলম্বন না করেন, তবে ঘোরতর বিপদকেই ডাকিয়া আনিবেন।

গ্রন্থাগার প্রত্যর্পণের দাবি

লণ্ডনে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার'টির কথা অনেকেই জানেন। এই গ্রন্থাগারটি ভারতকে অর্পণ করা হইবে এইরূপ একটি কথা পূর্ব্বেও উঠিয়াছিল। আজ আবার নূতন করিয়া সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। কথাই হইতেছে কিন্তু কাজ কিছুই হইতেছে না। লোকসভায় ভারতের সংস্কৃতি-মন্ত্রী জানাইয়াছেন, ভারত এই গ্রন্থাগার ফিরিয়া পাইবার দাবি ছাড়িবে না। এই গ্রন্থাগার আইনত এবং নীতিগত ভাবে ভারতের প্রাপ্য। কিছুদিন আগেও ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে পত্র প্রেরণ করিয়া এই দাবির কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু সে পত্রের উত্তর আজও পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বে যখন এই দাবি উত্থাপন করা হইয়াছিল, তখনও ব্রিটিশ সরকার এমন যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই যে, এই গ্রন্থাগার ভারতের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য নহে। কিন্তু ভারতের দাবিকে বিব্রত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার এক অশোভন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার অংশত পাকিস্থানও দাবি করিতে পারে, এইরূপ মন্তব্য করিয়া ব্রিটিশ সংবাদপত্র পাকিস্থানের সেই মনোবৃত্তি প্ররোচিত করিয়াছিল, যাহা ব্রিটিশের স্বার্থে ভারতকে বঞ্চিত করিবার কাজেই লাগে। পাকিস্থান এই গ্রন্থাগার পাইবার দাবি পূর্ব্বে কখনও করে নাই। কিন্তু ভারত তাহা দাবি করিবার পর এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রে পাকিস্থানকে ভাল কথা স্মরণ করাইয়া দিবার পর পাকিস্থানের পক্ষ হইতে দাবির উৎপাত সুরু হয়।

আজ একথা বলিতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে ইংলণ্ডে আটক করিয়া রাখা এক প্রকারের ঐতিহাসিক

অপহরণ। ভারতের সাংস্কৃতিক নিদর্শনের অজস্র সম্ভার ব্রিটেনে অপসারিত করা ইহা তাঁহাদের অন্যতম অপকীর্ত্তি। ইহা শুধু ভারতেরই দুর্ভাগ্য নহে, আফ্রিকা ও এশিয়ার যে সব জাতি পাশ্চাত্ত্য জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার অধীন হইয়াছে, তাহাকেই এই দুর্ভাগ্য সহ্য করিতে হইয়াছে।

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণে ব্রিটিশের সাহায্য, চেষ্টা এবং দান ভুলিবার নহে। লর্ড কার্জ্জন উদ্যোগী না হইলে অজন্তার গুহা-চিত্রের অস্তিত্বই বোধ হয় লোপ পাইত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাস্তব সত্যের খাতিরে বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, ভারত হইতে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন ইংলণ্ডে চালান করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই তাঁহারা ফেরত দিয়াছেন, যথা স্বাধীনতার পর সারিপুত্ত ও মোগগলনের অস্থি-মঞ্জুষা। সে সময় ব্রিটিশ সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সে সহযোগিতা আর দেখা গেল না।

কোহিনূর আর ফিরিয়া আসে নাই—ভারত তাহা দাবিও করে না। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এবং অন্যান্য সংগ্রহালয়েও ভারতীয় কারু-শিল্পের যে সব নিদর্শন রহিয়াছে, তাহাও কোনদিন ফিরিয়া আসিবে না—ভারত তাহা জানে। কিন্তু যাহা ভারত-ইতিহাসের স্মৃতিময় নিদর্শন তাহা ভারত ফেরত পাইবার দাবী রাখে, আর সভ্যতার দিক দিয়া, নীতির দিক দিয়া ব্রিটিশের তাহা প্রত্যর্পণ করাই উচিত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিন্ন ভাবধারা

বিলাসপুরের ছাত্রসভায় ফরাসী সংস্কৃতি-কেন্দ্রের ডাইরেক্টর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, প্রতীচ্যের অগ্রগামী দেশগুলি বস্তু-বিজ্ঞান ও কারিগরী শিল্পে খুব উন্নতি করিয়াছে এবং তাহার ফলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য ও ব্যাধিকে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু অপর দিকে তাহারা হইয়া উঠিয়াছে আরাম প্রিয়, বিলাসী। অস্বাভাবিক লালসা, অহেতুক প্রতিযোগিতা তাহাদের সমাজ-জীবনকে সর্ব্বদা একটি স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। বিজ্ঞানকে মানুষ আজ সর্ব্বশক্তিমানের আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই নৈতিক ও আত্মিক শক্তির উপর তাহার আর প্রত্যয় নাই। ইহার ফলে জীবনের স্নিগ্ধ রূপটি তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। এই প্রতীচ্যের চিত্রের পাশে তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন প্রাচ্যের ভাবাদর্শ। ভারতবর্ষ বৈজ্ঞানিক সভ্যতার রাজ্যে এখনও শিশু। সে আজও সাবেকী ধারায় চলিতেছে। এই ধারার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পূর্ব্বের আত্মিক শক্তিকে তাহা-দের ফিরাইয়া আনিতে হইবে যেমন, বিজ্ঞানের দিকেও মনোনিবেশ করিতে হইবে সেই অনুপাতে। তবেই আসিবে গৃহে শান্তি, জীবনে আসিবে শ্রী ও তাহার চলার পথে ছন্দ। কিন্তু এই যে আত্মিক সম্পদ—অতি-বিজ্ঞানের আসক্তিবশে কোন দিন তাহার হারাইলে চলিবে না। একথা ডাইরেক্টরও স্বীকার করিয়াছেন। তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির মধ্যে রহিয়াছে প্রমাণগত পার্থক্য। ভারতবর্ষ তাহার নিজস্ব, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া অতীতে বহু শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বৈদেশিক আক্রমণেও তাহারা মিলিত ভাবে কোন প্রতিরোধই করে নাই। বরং বিদেশী অভিজেতাদের দ্বারা ধর্ম্মান্তরিত হইয়া তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, তবু বলপ্রয়োগ করে নাই। আমরা চিরদিনই বিষয় ও বস্তুকে পিছনে ফেলিয়া নীতি এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়াছি, ইহাতে ফল অবশ্যই অতি নিদারুণ হইয়াছে—আমরা সকল রকমে ক্ষতুর হইয়াছি।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের উভয় নীতিই গলদপূর্ণ। দুই পক্ষের জীবন-নীতির এই অসম্পূর্ণতা পূরণের উপায় হইতেছে, আমাদের জীবনে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। কিন্তু তাহাকে সুস্থ মানবিক নীতির বন্ধনে না বাঁধিতে পারিলে, আমরাও উহাদেরই মত ভুল করিব। পরিবর্ত্তন শুধু আমাদের দিকেই আনিলে চলিবে না, প্রতীচ্যের মধ্যেও আমাদের মননশীল নীতির প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সংযত মনুষ্যত্বে দীক্ষিত করিতে হইবে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে "পঞ্চতন্ত্র"

সোভিয়েট বিজ্ঞান-পরিষদ প্রকাশালয় রুশ ভাষায় এই প্রথম "পঞ্চতন্ত্রে"র পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদ করা হইয়াছে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা হইতেই।

১৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ভারতীয় উপকথার এই সঙ্কলনকে সোভিয়েট ভারততত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতগণ ভারত তথা বিশ্বের সাহিত্যে অন্যতম অতি-বিশিষ্ট রচনা বলিয়া মনে করেন। বিখ্যাত রুশ সংস্কৃতপণ্ডিত এস, ওলদেনবুর্গ পঞ্চতন্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই উপকথা সঙ্কলন বাইবেলের পরেই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারিত পুস্তকগুলির অন্যতম।"

পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে জাভা, লাওস ও থাই দেশের ভাষায় পঞ্চতন্ত্র পুনঃ-কথিত হইয়াছে। সোভিয়েট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বি. ব্লাদি মিরস্তক দেখাইয়াছেন, মঙ্গোলীয় উপকথার বহু কাহিনী পঞ্চতন্ত্র হইতে গৃহীত। তিনি বহু বৎসর-কাল মঙ্গোলীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন।

সোভিয়েট পণ্ডিতগণ মনে করেন, পঞ্চতন্ত্রের যে ভাষ্য ভারত হইতে পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূলানুগ। কথিত আছে, ষষ্ঠ শতকে পারস্যের সম্রাট খসরু ভারত হইতে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য রাজদরবারের চিকিৎসক

বাদ্‌ইকে নির্দ্দেশ দেন। পরে চিকিৎসক বার্জ্জই মধ্য-পারসিক ভাষায় উহার অনুবাদ করেন।

এই অনুবাদের ভিত্তিতে নানাভাবে অভিযোজিত ও অনূদিত হইয়া পঞ্চতন্ত্র বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে। সেই মূল অনুবাদটি আজ আর পাওয়া যায় না কিন্তু অন্যান্য ভাষার অনুবাদই প্রমাণ করে না একদা প্রকৃতই উহার অস্তিত্ব ছিল।

কালিলাহ ও দিমনাহ নামে পঞ্চতন্ত্রের আরবী ভাষা অনূদিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। অবশ্য আরবী ভাষ্য মূলকাহিনী হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক।

রুশ পাঠকদের সহিত পঞ্চতন্ত্রের প্রথম পরিচয় হয় এই আরবী ভাষ্যের মারফৎ। রুশ ভাষায় কোনদিনই মূল ভারতীয় ভাষ্যের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩০ সনে অধ্যাপক আর. শোর অনূদিত পঞ্চতন্ত্রের কিছু অংশ সোভিয়েট দেশে প্রকাশিত হয়। এই অপূর্ব্ব সাহিত্যের ভারতীয় ভাষ্যের সহিত সোভিয়েট জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিবার ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। এবং পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করিলেন বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-পরিষৎ।

দলাই লামার বিবৃতি

তিব্বতের উপর চীনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সাম্প্রতিক অধ্যায় সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত দলাই লামার বিবৃতির সারাংশ নিম্নে দেওয়া হইল :

তিব্বতীরা চীনের হানদের হইতে স্বতন্ত্র জাতি, ইহা সর্ব্বদা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তিব্বতী জনসাধারণ সব সময়ই স্বাধীনতা কামনা করিয়াছে। তিব্বতের সমগ্র ইতিহাসে অসংখ্যবার এই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। কখনও কখনও চীন সরকার তিব্বতের উপর তাহাদের আধিপত্য চাপাইয়া দিয়াছে; আবার কখনও বা তিব্বত স্বাধীন দেশরূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে।

১৯৫১ সনে চীন সরকারের চাপে চীন ও তিব্বতের মধ্যে একটি ১৭ দফা চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। তিব্বতীদের পক্ষে কোন বিকল্প না থাকায় চুক্তিপত্রে চীনের আধিপত্য মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু এমনকি চুক্তিতেও তিব্বতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগের ব্যবস্থা বিহিত হয়। অবশ্য পররাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাপার চীন সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবে—এইরূপ বিধি থাকিলেও তিব্বতের ধর্ম্মীয় কর্ম্মকাণ্ড ও রীতিনীতি এবং ঘরোয়া শাসন ব্যাপারে চীন সরকার অনধিকার-চর্চ্চা করিবে না বলিয়া স্থির হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে চীনা সৈন্যরা তিব্বত দখল করার পর তিব্বত সরকারের ঘরোয়া ব্যাপারে পর্য্যন্ত নামমাত্রও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল না; বরং চীন সরকারই তিব্বত শাসনে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকে।

১৯৫৬ সনে তিব্বতের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। উহার সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা এবং জেঃ চ্যাং কুয়ো হুয়া ছিলেন চীন সরকারের প্রতিনিধি। কার্য্যতঃ এই সংস্থারও সামান্য ক্ষমতাই ছিল। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে চীনা কর্ত্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত। দলাই লামা ও তাঁহার পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য ১৭ দফা চুক্তি আঁকড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু চীনা কর্ত্তৃপক্ষের অনধিকারচর্চ্চা সমানে চলিতে থাকে। ১৯৫৫ সনের শেষভাগে খাম প্রদেশে এই সংগ্রামের সূচনা হয়। ১৯৫৬ সনে উহা গুরুতর আকার ধারণ করে। পরিণামে চীনা সশস্ত্র বাহিনী অসংখ্য মঠ ধ্বংস করে। বহু লামাকে খুন করা হয়। বিপুল-সংখ্যক ভিক্ষু ও সরকারী কর্ম্মচারীকে লইয়া গিয়া চীনে সড়ক নির্ম্মাণের কাজে নিয়োগ করা হয় এবং ধর্ম্মীয় ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়ে।

১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিক হইতে তিব্বতীদের সঙ্গে চীনের মন কষাকষি প্রকাশ্যে দেখা দেয়। দলাই লামা চীনাদের সদর দপ্তরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া একমাস আগেই কথা দেন। কিন্তু হঠাৎ ১০ই মার্চ্চ উহার তারিখ স্থির করা হয়। দলাই লামার কোনরূপ ক্ষতি করা হইবে বলিয়া লাসার লোকজন শঙ্কিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে আনু-মানিক দশ হাজার লোক দলাই লামার নরবুলিংকাস্থ গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদের চারিদিকে জমায়েত হয়। তাহারা দলাই লামাকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেয় না।

ইহার পর দলাই লামাকে রক্ষার জন্য একটি রক্ষীদল গঠন করার বিষয় জনসাধারণই স্থির করে। তিব্বতে চীনের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া অসংখ্য তিব্বতী লাসার রাজপথ-গুলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই ঘটনার দুইদিন পর হাজার হাজার তিব্বতী নারী চীনা-শাসন বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দেন। জন-বিক্ষোভ সত্ত্বেও দলাই লামা ও তাঁহার পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট চীনা-দের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে এবং তিব্বতে শান্তি স্থাপন ও জনগণের শঙ্কা দূর করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণকল্পে চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে চেষ্টা করেন।

আলোচনা চলার সময় লাসা ও তিব্বতে মোতায়েন চীনা সৈন্য-দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নূতন চীনা সেনা আমদানী করা হয়। ১৭ই মার্চ্চ মর্টার হইতে ২।৩টি গোলা নরবুলিংকা প্রাসাদের দিকে বর্ষণ করা হয়; সৌভাগ্যবশত গোলাগুলি একটি নিকটবর্ত্তী পুকুরে পড়ে।

এই ব্যাপারের পর উপদেষ্টাগণ দলাই লামার জীবন বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া সতর্ক হন। এই ক্রান্তিকালে দলাই লামা, তাঁহার পরিজনবর্গ এবং উচ্চপদস্থ সরকারিবৃন্দের পক্ষে লাসা ত্যাগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে।

দলাই লামা সুস্পষ্টভাষায় জানাইতে চাহেন যে, তিনি স্বেচ্ছায়

তিব্বত ও লাসা ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়াছেন—কাহারও জবরদস্তিতে নহে।

তিব্বতী প্রজাদের আনুগত্য ও সপ্রীতি সমর্থনের ফলে দলাই লামা ঘোর বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করিতে সমর্থ হন। এই পথে তিনি কিউচু ও সাংমো নদী পার হন এবং চুহাংমুর নিকটবর্ত্তী কানুজে মানেতে ভারত সীমান্তে পৌঁছার আগে ইয়ারালুং উপত্যকার লোকা এলাকা ও পোনাদজংএর মধ্য দিয়া আগাইয়া চলেন।

ত্রিপুরায় পুনর্ব্বাসন সমস্যায় জটিলতা

ত্রিপুরার 'সেবক' পত্রিকা বলিতেছেন :

"শ্রীবংশী ঠাকুর লোকসভায় বলেন, ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে। ফলে সেখানে পুনর্ব্বাসন-সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। যান-বাহনের অসুবিধার দরুন ত্রিপুরায় ক্ষুদ্রশিল্পে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। তিনি প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারকে কৃষির জন্য অন্ততঃ দুই একর জমি বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ জানান। ত্রিপুরায় পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কার্য্যাবলীর পর্য্যালোচনার জন্য তিনি সংসদের সদস্যদের লইয়া একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। শ্রীদশরথ দেব আগরতলায় যে সকল উদ্বাস্তু এখন অনশন ধর্ম্মঘট করিতেছে তাহাদের দ্বিতীয় দফায় ঋণদান এবং কৃষির জন্য জমি বরাদ্দ করার নিমিত্ত যে দাবি করা হইতেছে সরকারকে তাহা মানিয়া লইতে অনুরোধ জানান। ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের ঋণ পরি-শোধের জন্য আরও সময় মঞ্জুর করিতে বলেন। তিনি বলেন, বন্যা এবং অজন্মার ফলে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

টেষ্ট রিলিফ

সংবাদটি পরিবেশন করিতেছেন বাঁকুড়ার 'মল্লভূম' পত্রিকা :

"শোনা যাইতেছে জেলার সর্ব্বত্রই নাকি বর্ত্তমানে হাহাকার আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। যাহাতে স্থানীয় সরকার টেষ্ট রিলিফ খাতে ব্যয় করিবার জন্য আরও অধিক টাকা বরাদ্দ করাইতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে, কারণ এ জেলায় T. R.-এর কার্য্য প্রয়োজন না থাকিলেও দল স্বার্থে চলিতেছে। গত বৎসর শোনা যায় চল্লিশ লক্ষাধিক টাকা T. R.-এ এই জেলায় ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু ঐ টাকায় কতটা Famine Code ১৬ ধারা মত Village works হইয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা বহুবার মল্লভূম স্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সরকার একেবারে নীরব। আমরা বাংলা সরকারের নিকট জানিতে চাই Bengal Famine Code-এর (Chapter I) উক্ত ধারার Village works-এর সঙ্গে আর কোন্ কোন্ কার্য্য (Village works) যোগ করা হইয়াছে এবং কোন্ বৎসর কোন্ বিধানসভায় ঐ ধারাটি সংশোধিত হইয়াছে ? কারণ দেখা যায়, এ জেলায় যে সমুদয় 'হরেকরকমা' বৃক্ষ রোপণ উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া নানান কার্য্যের খাতে T. R.-এর অর্থ ব্যয় হইয়াছে—এরূপ কার্য্য ১৯১৮-১৯ সনের Cook সাহেবের আমল হইতে গত পূর্ব্ব বৎসর (year before la.t) পর্য্যন্ত কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বা ধারণাও করিতে পারি নাই। সেচ ও রাস্তার যে বিবৃতি বাংলা সরকার তাহার প্রচারপত্র 'কথাবার্ত্তা'য় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।"

আমাদের মনে হয়, সর্ব্বসাধারণের অর্থ যখন ব্যয়িত হইতেছে তখন কাজের বিষয়ও সকলের অবহিত হওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার অভাব

বর্দ্ধমানের 'দামোদর পত্রিকা' লিখিতেছেন :

"রায়না থানার গোতান ইউনিয়ানের নিজামপুর গ্রামে কোন বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। উক্ত অঞ্চল জলা ও খালবিলপূর্ণ, সেজন্য ছোট ছেলেমেয়েরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না। গত ১৯৫৮ সনের জুন হইতে গ্রামবাসীদের চেষ্টায় ১০৭ জন ছাত্রছাত্রী লইয়া এবং স্থানীয় তিন জন শিক্ষক লইয়া বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের গৃহও গ্রামবাসী নির্ম্মাণ করিতেছেন। বিদ্যালয়টি মঞ্জুরীর জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনরূপ তদন্ত হয় নাই।

আমরা এ সম্বন্ধে শিক্ষা-পর্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।"

ট্রেনের অভাব

কালনার 'পল্লীবাসী' পত্রিকা হইতে :

"ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত লাইনের দুইধারে এখন অসংখ্য বাস্তুহারার বসতি হইয়াছে। নানা উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়। এই দুই ষ্টেশনের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একখানি শাটল ট্রেন ব্যবস্থা করিয়া দিলে একটি অভাব দূরীভূত হয়। যাত্রীদের সুবিধাবিধানের জন্য মধ্যে মধ্যে প্যাসেঞ্জার এসোসিয়েশনের সভায় আলোচনা হয়। দুঃখের বিষয় এই গুরুতর অভাবটি দূর করিতে কেহই চেষ্টা করেন না। ইহাতে শুধু যে উদ্বাস্তুদেরই উপকার হইবে তাহা নহে, এতদঞ্চলের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে যাতায়াত ও আদালত প্রভৃতিতে যাঁহাদের প্রয়োজন, সেই সব লোকেদেরও বিশেষ উপকার হইবে। ইলেকট্রিক ট্রেন প্রভৃতি হয়ত দেরী হইতে পারে, কিন্তু শাটল ট্রেন একখানি চালু করা নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত সহজ।"

বিষয়টি রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনা দরকার।

শক্তিগড় ডাকঘরের পরিণতি

'দামোদর' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"ক্ষীরোদবরণ হাজরা প্রমুখ শক্তিগড়ের বিশিষ্ট নাগরিক ও

ব্যবসায়িগণ এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন,—শক্তিগড়বাজারে জি. টি. রোড শক্তিগড় আটাঘর রোডের সংযোগস্থলে ডাকবিভাগের নিজস্ব চমৎকার ও মূল্যবান স্থানে পূর্ব্বেকার ডাকঘর ছিল। গত ১৩৫০ সালের দামোদরের প্রচণ্ড বন্যায় ডাকঘরটি ধ্বংস হয়। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ বৎসর বাজারের অন্যস্থানে একটি সঙ্কীর্ণ গৃহে ডাকঘর চলিয়া আসিতেছে। এই আপিস হইতে বৈধা, বড়শুল ও বোরোবলরাম ডাকঘরের ডাকও যাতায়াত করে। স্থান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ থাকায় জনসাধারণের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। শক্তিগড় প্রজেক্ট এলেকা হওয়ায় ৫।৬টি মিল এবং দৈনিক বাজার প্রভৃতি হওয়ায় আগেকার তুলনায় জনসংখ্যা ও ডাকের আদান-প্রদান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য এখানে ডাকবিভাগের নিজস্ব স্থানে একটি আপিস নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে সাব আপিসে পরিণত করিবার জন্য দীর্ঘদিন আবেদন করিয়াও কোন সাড়া পান নাই বলিয়া ইঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন।"

পঞ্চায়েত কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা

"বাঘাড় ইউনিয়নে সিমডালি একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে প্রায় দুই হাজার লোকের বাস। এই গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠাগার ও পোষ্ট আপিস আছে। এই গ্রামটির সহিত বাঘাড় ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামগুলির বহু বিষয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। গ্রামটি বরাবরই বাঘাড় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শোনা যাইতেছে পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রামবাসিগণের অজ্ঞাতসারে এই গ্রামটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষেতিয়া ইউনিয়নে যুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ এই নূতন প্রস্তাবে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে মনে করেন এবং প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।"

বর্দ্ধমানের 'দৃষ্টি' পত্রিকা এই সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এরূপ পরিবর্ত্তন করিলে কোন ক্ষোভেরই কারণ থাকে না। পঞ্চায়েত সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাহাই।

গুসকরায় নীলামদারের উপদ্রব

কয়েক মাস হইতে দেখা যাইতেছে যে গুসকরা হাটে ও হাট-সংলগ্ন পুলিস ফাঁড়ির সম্মুখস্থ সাধারণের রাস্তায় এক শ্রেণীর বে-আইনী নীলামদারগণ প্রতারণার ফাঁদে ফেলিয়া অসহায় সরল-প্রকৃতির গ্রামের মানুষকে সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। নীলাম ডাকে কমিশন দিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের আকৃষ্ট করিয়া পরে ডাকের পুরাতন (চোরাই মাল সম্ভবত) মাল গায়ে ফেলিয়া দিয়া পকেট হইতে টাকা কাড়িয়া লইতে দেখা গিয়াছে। এ বিষয়ে থানা অফিসার ও স্থানীয় পুলিস ফাঁড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তাঁহারা জবাব দিয়াছেন যে উক্তরূপ উপদ্রব বন্ধ করার মত কোন আইন বা ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। কিন্তু হাটের শেষ বেলায় নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে ফাঁড়ির কনেষ্টবলদের উপদ্রবকারী নীলামকারীগণের নিকট যথারীতি সেলামী আদায় করিতে দেখা যায়। এইভাবে উপদ্রবকারীদের নিকট হইতে উৎকোচ লইয়া তাহাদের প্রশ্রয়দানের কোন আইন স্থানীয় পুলিসকে দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা লইয়া জনসাধারণ জল্পনা-কল্পনা চালাইতেছে।"

উপরি-উক্ত সংবাদটি বর্দ্ধমানের 'দামোদর' পত্রিকাটি দিতেছেন। ইহার সবিশেষ তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী গত ৪ঠা এপ্রিল পরিণত বয়সে লোকান্তর প্রয়াণ করিয়াছেন। দুঃখ সেজন্য নয়, এতবড় প্রতিভাধর পণ্ডিত আমাদের দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র সাহিত্য ধর্ম্ম ও ঐতিহ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের প্রধান প্রেরণা। এই একটি সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনাদর্শকে ব্যাখ্যা করা চলে। জ্ঞানের দুশ্চর তপস্যায় যে-কয়জন মুষ্টিমেয় সাধক মনীষী আজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, বিধুশেখর ছিলেন তাঁহাদের অগ্রগণ্য। বারাণসীর গুরুগৃহে যে তরুণ-তাপসটির মনে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের বীজটি অঙ্কুরিত হয়, পরবর্ত্তী কালে শান্তিনিকেতনে সেই অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হইয়া দীর্ঘকাল ফলদানে রত থাকে। শান্তিনিকেতন আশ্রম যে তাঁহার কর্ম্মস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে তিনি প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম তাঁহার যে-কয়জন বিদগ্ধ সহচরের অক্লান্ত সাধনায় একদিন বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়, বিধুশেখরের স্থান তাঁহাদের অগ্রসারিতে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে আশ্বিন মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে বিধুশেখরের জন্ম। বিধুশেখরের পিতামহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সাধক ছিলেন। কাশীতে পণ্ডিতমহলে তাঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। সুধীজন তাঁহাকে আগমচূড়ামণি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই কাশী হইতেই বিধুশেখর বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হন। শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহার আহ্বান আসে ১৩১১ সালে। এখানে তিনি নিভৃত মনোমত পরিবেশই শুধু পাইলেন না—লাভ করিলেন একটি পাঠাগার। এই পাঠাগারের একটি কক্ষেই তিনি নীড় রচনা করিলেন। এবং জ্ঞানতপস্বী সেইখানেই নিজেকে সমাহিত করিলেন।

সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপেই শান্তিনিকেতনে তাঁহার আগমন, কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করিয়া তাঁহার জ্ঞান গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। অধ্যয়নস্পৃহা ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রবল। তিনি

পালি ভাষাও আয়ত্ত করিয়া ঐ ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানচর্চ্চার বিরাম ছিল না তাঁহার। তবু বলিব, কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তাঁহার যথার্থ পরিচয় মনুষ্যত্বে। এমন মানুষ আর হয় না। এমন নির্লোভ, তেজস্বী, বন্ধুবৎসল, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সত্যই বিরল।

মতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায় গত ১০ই এপ্রিল চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আদর্শপূত, বহু কর্ম্ম-ময় একটি মহাজীবনের অবসান ঘটিল। বিপ্লব, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের ত্রিধারায় তাঁহার জীবন প্রবাহিত হইয়াছিল। এককালে এই চন্দন-নগর—ব্রিটিশ এলাকার বাহিরে বলিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের আত্ম-গোপন করিবার বা আশ্রয়লাভের কেন্দ্ররূপে গণ্য হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ এই স্থানেই মতিলালের গৃহে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এই অরবিন্দের প্রভাবেই মতিলালের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মানুরাগ ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের প্রেরণা, বিপ্লব ছিল তাঁহার যৌবনের আকর্ষণ এবং সংগঠন ছিল তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের তপস্যা। তাঁহার এই সংগঠন-প্রবৃত্তি হইতেই "প্রবর্ত্তক" সঙ্ঘের জন্ম। এই সঙ্ঘের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁহার মানব-কল্যাণ ও জনসেবার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী,' 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি,' 'শতবর্ষের বাংলা,' 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা,' 'বেদান্ত-দর্শন,' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়া-ছেন। 'প্রবর্ত্তক' মাসিকপত্রেরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। এবং এই সাধনাতেই তিনি তাঁহার জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। সঙ্ঘ গঠন ছাড়াও তিনি এমন কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে বহু পরিবারের অন্নসংস্থানের সুযোগ প্রশস্ত হইয়াছে। আজ তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইল। আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত।

মন্মথনাথ ঘোষ

প্রবীণ গবেষক ও জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ গত ৬ই এপ্রিল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি 'হিন্দু' 'পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্র ছিলেন। মন্মথনাথ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতাস্থ সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল এবং জেনারেল এ্যাসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনের (বর্ত্তমানে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) কৃতী ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে গণিত তাঁহার বিশেষ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনে ভারতীয় এ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও, সমগ্র জীবন তাঁহার সাহিত্যসেবা এবং গভীর ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ এবং বাঙালীদের সম্পর্কে গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে বিশেষভাবে আন্দোলন তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী

প্রখ্যাত চিকিৎসক ও কলিকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী গত ১৬ই চৈত্র তাঁহার গিরিডিস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে পাকস্থলীর ক্ষতরোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

২৪ পরগণার টাকীর বিখ্যাত জমিদার পরিবারে ডাঃ রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অগ্রসর হন। ১৯১৪ সনে ৭টি স্বর্ণপদক লইয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় পাস করেন এবং তিন বৎসর পরে এম-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়া আপন কৃতিত্ব বলে ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের 'ফার্ষ্ট প্রফেসর অব মেডিসিন' নিযুক্ত হন। পরে কারমাইকেলের অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন।

একজন সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ের চিকিৎসকরূপে ডাঃ রায়চৌধুরী বহু সংস্থা প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁহার স্থান শীঘ্র পূরণ হইবার নহে।

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

অগ্নিযুগের বারীন্দ্রকুমার ঘোষ গত ১৮ই এপ্রিল ৭৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে জীবন একদা প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সে জীবনের আজ অবসান হইল। বাংলার বিপ্লবী ও দেশকর্ম্মীদের নিকট সমধিক পরিচিত 'বারীনদা' ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তমাখা অধ্যায়ে বারীনদার নাম উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিতে গাহিতে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কেহ বা সারাজীবন কারাভোগান্তে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সেই যুগের অল্প কয়েকজন এখনও সেই গৌরবময় যুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছেন। মৃত্যুদণ্ড হইতে রেহাই পাইলেও আন্দামানে কারাবরণের দুঃখ তাঁহাকে পাইতে হইয়াছিল।

আন্দামান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বারীন্দ্রকুমার দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। এক সময় তিনি 'বিজলী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিতও যুক্ত ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। কেবল বিপ্লবসাধনায় নয়, সাংবাদিকতায় ও সাহিত্যসেবায়ও তিনি তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

শ্রীনিকেতনের অবস্থা শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি— এখন আশান্বিত হবো

ইতি ২৮।১০।৩৮ রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

GOURIPUR LODGE.
KALIMPONG.

কল্যাণীয়েষু

শ্রীনিকেতনের কিনারা থেকে তোমার পত্রখানি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলুম। অনেকদিন থেকেই প্রত্যাশা করে ছিলুম। কাজের পথ অভ্যাসের ধারায় জীর্ণ হয়ে আসে— তোমার হাতে তার সংস্কার হবে এই আমার মন উৎসাহিত। নিজে কাজ করতে পারিনে, অসমর্থিত বোধ করি, নূতন দৃষ্টি ও নূতন শক্তি নিয়ে যেমন এসে দাঁড়ালে আমার কীর্তি মন আবার ভরসা পায়। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম চিঠিখানি শ্রীনিকেতনের কর্ম-সচিব স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায়কে কবি মংপু হইতে লিখিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়খানি তাঁহার সচিব-পদ গ্রহণের প্রত্যুত্তরে।

বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

বর্তমান বাঙালীর জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলে মনে হয় আমরা ক্রমশঃ ভোগবাদী হয়ে উঠছি। ভোগে স্বাচ্ছন্দ্যে আরামে বিলাসে এখন আর আমাদের অরুচি নেই, বরং এইগুলি জীবনধারণের অপরিহার্য উপকরণ হয়ে উঠেছে। আমরা বাল্যের পুথি-কেতাবে পড়ি বটে যে, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনাদর্শই হ'ল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এবং বাল্যের সহজাত বিশ্বাস-প্রবণতা নিয়ে সেই ধারণায় আস্থাও স্থাপন করি, কিন্তু একটু বড় হতেই সে ধারণা মন থেকে ধীরে ধীরে উবে যেতে থাকে। পরিণত জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে যখন বাল্যের ওই সরল বিশ্বাসের জন্য নিজের ওপরই নিজের করুণা হয়। শুধু তাই নয়, বাল্যের অর্জিত 'মূঢ়' সংস্কারগুলিকে মন থেকে ধুয়ে-মুছে ফেলবার জন্য তখন চেষ্টার অবধি থাকে না। আজকের দিনে যে কোন বয়স্ক মানুষের জীবনযাপন প্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গী তার বাল্য-সংস্কারের এক মূর্তিমান প্রতিবাদ স্বরূপ।

ইংরেজ আমলেও ভোগের স্পৃহা ছিল, বস্তুতঃ আমাদের একালীন ভোগকামনারও প্রায় সবটাই এসেছে বিজাতীয় শিক্ষাদীক্ষার খাত বেয়ে। কিন্তু তখন তা এত উৎকট ছিল না। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সেই সুবাদে অর্থবিত্ত অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্বচ্ছলতা আর স্বাচ্ছন্দ্য আর ভোগবাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও জনজীবনকে সে আদর্শ তেমন স্পর্শ করতে পারে নি। বিলাসব্যসন প্রধানতঃ সমাজের অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল, সাধারণ মানুষের মনে বিলাসের মোহ উপস্থিত হয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই তার মনোবিকার ঘটিয়েছে। গত দেড়শ' বছর কালের মধ্যে ইংরেজ শাসনের আওতায় বাংলাদেশে যে মধ্য আর নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল সেই সমাজের মানুষ অল্পে তৃপ্ত ছিল, বিলাসী হতে সে কখনও চেষ্টা করে নি। তার মনের প্রবণতা ওইরূপ স্পৃহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল। মধ্য আর নিম্নবিত্ত সমাজেরই যখন এই মানসিকতা, তখন কৃষক আর শ্রমিকেরা যে আরও বেশী ভোগবিমুখ ছিল সে কথা না বললেও চলে।

বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শে বহুকালাবধি অভ্যস্ত। প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতে বিলাসব্যসন ছিল না এমন নয়—অপরিমিত বিলাসব্যসনই ছিল, কিন্তু তা রাজা রাজন্যবর্গ সামন্ত জায়গীরদার শ্রেষ্ঠী বণিক অমাত্য, মুসলমান আমলে বাদশা নবাব আমীর ওমরাহ প্রভৃতি সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ আবর্তিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত স্তরের যে সকল মানুষের জীবনে এই বিলাসের ছিটেফোঁটা লেগেছিল তারা এই বিলাসবানদেরই ছিল প্রসাদভোগী, সুতরাং তাদের কোনক্রমেই মধ্যস্তরের মানুষের প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায় না। মধ্যস্তরের মানুষ সাধারণ ভাবে বিলাসব্যসনের জীবন থেকে দূরে থেকেছে। তারাই সদাচরণ আর কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়ে সমাজের নীতি বজায় রেখে এসেছে। তাদের মধ্যে হয় ত বড় কোন প্রতিভার আবির্ভাব হয় নি, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে তারাই তাদের অনাড়ম্বর ও কর্মময় জীবনাদর্শের দ্বারা জাতীয় প্রতিভাকে ধারণ করে এসেছে। জাতীয় ঐতিহ্যের সংস্কার এবং সৎ জীবনের ধ্যান-ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়েই এক যুগ থেকে অন্য যুগে বাহিত হয়ে এসেছে এবং এইভাবে ঐতিহ্যগত এক অখণ্ড ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করেছে।

সাধারণ মানুষ বিলাসব্যসন ভোগসুখকে প্রশ্রয় দেয় নি, তার কারণ তাদের ভিতর এই সহজবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল যে, ভোগের উপকরণ স্তূপীকৃত করতে হলে বহুকে বঞ্চনা করতে হয়। ওটি ঘোরতর অন্যায় কার্য। তা ছাড়া ভোগবাদের মধ্যেই কোথায় যেন একটা মৌলিক অন্যায় নিহিত রয়েছে। ভোগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে আরও প্রবল হয় এই আমাদের দেশের মনীষীদের বিশ্বাস। ভোগকে একবার প্রশ্রয় দেওয়া আরম্ভ করলে তা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জমিয়ে যেতে থাকে, শেষে এমন হয় যে, গোটা জীবনের মূল্যে ওই ভয়ঙ্কর দেনা শোধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ভোগবাদের সঙ্গে অনীতির সম্পর্ক প্রায়-অচ্ছেদ্য। শোষণ হিংসা বঞ্চনা ছাড়া ভোগ হয় না। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এই তত্ত্ব জানত, তাই ভোগবাসনা থেকে বরাবর সে নিজেকে দূরে রেখে এসেছে।

কিন্তু এখন আর সেকথা বলা যায় না। এখন, বিশেষতঃ

স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে, ভোগেচ্ছা এদেশের সকল স্তরের লোকের মধ্যে বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছে। শুধু যে উপরের স্তরের মানুষেরাই ভোগে বিশ্বাস করে তাই নয়, ওই অসার আদর্শের প্রভাব নিম্নের অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হয়েছে। বড় ছোটর জীবনাচরণে তফাৎ শুধু এই যে, বড় অর্থাৎ সঙ্গতিবানদের জীবনে ভোগসুখ চরিতার্থ করবার সুযোগ অপরিমিত ; ছোট অর্থাৎ সঙ্গতিহীনদের বেলায় সে সুযোগ সংকুচিত। এক ক্ষেত্রে ভোগের সক্রিয় অনুশীলন হচ্ছে, অন্য ক্ষেত্রে ইচ্ছা এখনও পর্যন্ত অনুশীলনের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। কিন্তু অনুশীলন সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় যাই হোক, ইচ্ছার এতটুকু কমতি নেই কোন স্তরেই। লোকে উপকরণবাহুল্য আড়ম্বর বিলাস-বিলাসিতা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছে।

কেন এমন হ'ল ? এর অনেক কারণ, প্রথম যে কারণ চোখে পড়ে তা হচ্ছে, গত বিশ্বযুদ্ধের সর্বব্যাপী অনৈতিক প্রভাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঙালীর অস্তিত্বের একেবারে মূল ধরে নাড়া দিয়ে গেছে বললেও চলে। বলতে পারতাম বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে গেছে, কিন্তু তা বলব না, কারণ বাঙালীর পুনরুজ্জীবনে আমরা বিশ্বাস রাখি। ভাঙা মেরুদণ্ড কখনও জোড়া লাগে না। দ্বিতীয় কারণ, স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে এই রকমের একটা ধারণা জনমনে ক্রমব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে যে, এখন আর আগেকার মত ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংযমের প্রয়োজন নেই, স্বাধীনতা পেয়ে আমরা মর্ত্যের স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে গেছি। পরাধীন যুগের কৃচ্ছ্রসাধনের এখন আর কোন মানে হয় না, এখন চুটিয়ে ভোগসুখ আর সুখভোগের পালা। সাধারণ মানুষের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে এককালীন জাতীয় নেতৃবর্গের বাক্য ও আচরণ আরও বেশী রসান জোগাচ্ছে। ভাল খাওয়া ভাল থাকা ও ভাল পরার উপর উপরের স্তরের নেতারা এত বেশী জোর দিতে শুরু করেছেন যে, লোকে তার কদর্থ করে সেই ভাবে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদের দৃষ্টান্তে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য-স্বচ্ছলতা আর বিলাসিতাকে সমার্থক ভেবে নিয়েছি। যখনই উচ্চ বেতনের কর্মচারীদের মাইনে কমিয়ে উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনের সুদুস্তর ব্যবধান সংকুচিত করবার কথা বলা হয়, তখনই প্রথমোক্তদের কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় শাসন-পরিচালনায় অধিষ্ঠিত নেতৃবর্গ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ওই উচিত প্রস্তাবকে সর্বপ্রকারে বাধা দেন। তার অর্থ আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ ধরে নিয়েছেন, অর্থের বাহুল্য কর্মক্ষমতার সহায়ক ও সংবর্ধক। এই রকম মনে করবার কোনই হেতু নেই। এ একান্ত একটি বিজাতীয় বিশ্বাস এবং বিজাতীয় পরিবেশেই এই বিশ্বাসের পুষ্টি। জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য সকল মানুষেরই একটা ন্যূনতম অর্থ দরকার এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসাপেক্ষে সে অর্থে সকলেরই সহজাত অধিকার। কিন্তু তা বলে জীবনধারণোপযোগী অর্থের দাবি মেটানোর পরও যে অর্থ ফেলাছড়া করে হাতে উদ্বৃত্ত থাকে সে অর্থের দ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—একথা কোনক্রমেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ মত প্রকারান্তরে বিলাসিতার পক্ষেই যুক্তি যোগাচ্ছে এবং তার ফলে জনজীবনে ওই অশ্রদ্ধেয় আদর্শের প্রসার ঘটাচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থ বলতে আমরা বুঝি জৈবিক মানসিক আত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তির উপযোগী অর্থ। সকলের প্রয়োজন সমান নয়, তা বলে দুইয়ের প্রয়োজনের মধ্যে যোজনব্যাপী ব্যবধান রাখবারও যুক্তি নেই। এই ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা সাধারণ মান কষা বোধ হয় সম্ভব। জীবনধারণোপযোগী অর্থ করায়ত্ত হবার পরও যদি অর্থের প্রয়োজনীয়তা থেকে যায়, তা হলে বুঝতে হবে অপরিমিত ভোগবিলাস চরিতার্থ করবার জন্যেই ওই অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে, তারই জন্যে দাবি জানানো হচ্ছে। এর সঙ্গে কর্মক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই, সে প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে ওঠেও না।

অথচ দেশের ভিতর এখন এই দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য। কোথায় স্বাধীনতা পাওয়ার পর জাতিগঠনের তাগিদে আত্ম-সংযমের প্রয়োজন বাড়বে, বিলাসিতা খর্ব হবে, তা নয় বিলাসিতার মোহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। যে দেশে বস্ত্রের একান্ত অভাব, মিলজাত আর কুটিরশিল্পজাত বস্ত্র আর খাদি একত্র সম্মিলিত করলেও যেখানে দেশবাসীর বস্ত্রগত স্বাবলম্বনের প্রয়োজন অনেকাংশে অতৃপ্ত থাকে, সে দেশে অধিক বস্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজনের কথা মনে না রেখে, মিহি সুতোর কাপড় তৈরীর প্রয়োজন বেশী মনে রাখা হচ্ছে। লোকের দেহ আচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত বস্ত্র নেই, বৈষ্ণব মহাজনের ভাষায় বলতে গেলে, এদিকে তনু ঝাঁপতে গেলে ওদিকে উদাস হয়ে যায়, আর আমাদের নেতৃস্থানীয়রা বলছেন কিনা, আর ভাবিত হবার কারণ নেই, শীঘ্রই ভারতীয় মিল থেকে অত্যন্ত মিহি সুতোর কাপড় বাজারে ছাড়া হবে। মিহি সুতোর কাপড়ের অভাবে আমরা জীবন্মৃত হয়ে ছিলাম, আমাদের আশ্বাস দিয়ে চাগিয়ে তোলা নেতৃবর্গ এই মুহূর্তে তাঁদের সর্বপ্রধান করণীয় বলে বিবেচনা করেছেন ! অন্য সব রাজকার্য পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দু'দিন বিলম্বিত রাখবার যো নেই, সে ক্ষেত্রে গোটা শাসন-ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে !

এই ত হ'ল আমাদের উপরের তলার মানুষদের মনোভাব। আমাদের মনোভাব আরও বিচিত্র। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের দল, আজকাল বিদেশী ধরাচূড়ায় সজ্জিত হয়ে বাহিরে বেরনোকে আমাদের পরমার্থ বলে জেনে নিয়েছি। আপিসে-আদালতে ত বটেই, স্কুলে-কলেজেও আজকাল সার্ট-পাৎলুন পরে' যাওয়া রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে; যে-সব কাজের সঙ্গে বিজাতীয় পরিচ্ছদ-সজ্জার দৃশ্যতঃ কোন সম্পর্ক নেই সেখানেও দেখি বিজাতীয় পোশাকেরই আধিপত্য। এতেও আপত্তি ছিল না, আপত্তিকর হ'ল, আমরা যারা জাতীয় পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে রাস্তায় চলাফেরা করি তাঁরা নিজেদের ওই সাহেবী পোশাক-ওয়ালাদের তুলনায় ছোট ভাবতে আরম্ভ করেছি। আমরা নিজেদের যত অকিঞ্চিৎকর আর ক্ষুদ্র মনে করছি তত ওরা নিজেদের এক-একজন কেউকেটা বলে ভাবতে সুরু করে দিয়েছে। বিজাতীয় ধরাচূড়াধারীদের অহঙ্কৃত উদ্ধত মনোভাব অতি প্রকট। এ জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না, রাস্তায় ঘাটে ট্রামে বাসে একটু চোখ-কান খোলা রেখে চললেই 'দিশী সাহেব'দের মতিগতি টের পাওয়া যেতে পারে। সাদাসিধা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত গুণবান ভদ্রলোকের তুলনায় হ্যাট-নেকটাই-শোভিত বাঙালী বিলিতী বাঁদর শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতঃই আজকাল নিজেকে অনেক বেশী কুলীন মনে করে। আর করবেই বা না কেন? সমাজের মধ্যে ওদের জীবনাদর্শের অনুকূলে সমর্থন অতি ব্যাপক ও স্পষ্ট। যে ধুতি-চাদর পরে সেও মনে মনে বিলিতী ধরাচূড়াকে সমীহ করতে শুরু করেছে। আপিসে কাছারিতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সরকারী-বেসরকারী উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানে আজকাল ধুতি-চাদর নিতান্ত ম্লান ও মলিন। আপাদমস্তক বিলিতী পোশাকে আবৃত হয়ে যারা গট্‌গট্‌ করে চলে, হট্‌হট্‌ করে কথা বলে, চলাফেরায় প্রতি পদে 'স্মার্টনেস'-এর চেকনাই বিচ্ছুরিত করে, তাদের সঙ্গে আর কারও তুলনা হয়? তাদের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক না থাকুক কিছু যায় আসে না, শুধু নির্বোধের চক্ষু-সম্মোহনকর পোশাকের দৌলতে তারা সমাজ-জীবনের উপর ছড়ি ঘুরিয়ে চলছে। তাদের আত্মপ্রত্যয় বেশী আত্মপ্রসাদ বেশী, সুতরাং সমাজ থেকে সুবিধা আদায়ের ক্ষমতাও বেশী। সমাজ নিজে হাতে তাদের সর্ববিধ সুবিধা ধরে দেবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে না কেন?

আমাদের চিত্তবৃত্তি এত অসাড় হয়ে গেছে যে, উপরিউক্ত বিজাতীয় আচরণের অন্তর্নিহিত আত্ম-অবমাননা ও লজ্জা আমাদের মন আর স্পর্শ করছে না। আমরা এমনতর বেশবাস অতি স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি; অথচ এ বস্তু আমাদের কারুরই বোধ হয় চোখে পড়ে নি যে, গত দেড়শ' বছরের ইংরেজ-শাসনে ইংরেজ আমাদের সমাজে আমাদের জল-হাওয়ার পরিবেশে আমাদেরই মধ্যে বাস করতে বাধ্য হলেও একদিনের জন্যও আমাদের দিশী পোশাকে আবৃত হবার তাগিদ বা প্রয়োজনবোধ করে নি। এমনকি অভিনবত্বের ক্ষুধা, বৈচিত্র্যের স্পৃহা মেটাবার তাগিদেও তারা ও পথে অগ্রসর হয় নি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, কিন্তু যারা ওই ব্যতিক্রমের কারক তারা আমাদের সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, আমাদের সমাজকে নিজ সমাজ বলে মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ইংরেজ কোন অবস্থাতেই স্বীয় জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগের কথা কল্পনা করতে পারে নি—ভারতবর্ষের ন্যায় প্রবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পচা গরমেও দুই প্রস্থ অন্তর্বাস পরে তার উপর কোট চাপিয়েছে, টাই বেঁধেছে, মোজা পরেছে, সময়ে সময়ে দস্তানাও হস্তগত করেছে। ওদের আত্মসম্মানবোধ প্রখর, স্বধর্মে স্থিতি তাদের স্বভাববৈশিষ্ট্য; আমাদের আত্মসম্মানবোধ নেই সুতরাং স্বধর্মও নেই। আর যেখানে স্বধর্ম অনুপস্থিত সেখানে ধর্মও অনুপস্থিত। দাস্য মনোবৃত্তি আর ভোগস্পৃহা এই দুইয়ে মিলে আমাদের অন্তর্জীবনের আমূল রূপান্তর সাধন করে ফেলেছে বললেও চলে।

শুধু পোশাকে কেন, সর্ব ব্যাপারে আজ আড়ম্বরের আদর্শ জয়যুক্ত। বিত্তে প্রতিপত্তিতে কুলীন না হলে আর এ সমাজে কুলীন হওয়ার যো নেই। আর আড়ম্বর ও দেখানে-পনা (exhibitionism) যেহেতু বিত্তের বিজ্ঞাপন, সেই কারণে আড়ম্বরকে লোকে একান্ত প্রাণের জিনিস বলে আঁকড়ে ধরেছে। এক সময়ে আমাদের দেশে বিত্তহীন বিদ্বানের সম্মান ছিল, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত সর্বরিক্ত হয়েও শুধুমাত্র চরিত্রমাহাত্ম্যে নিষ্ঠার তেজে বিদ্যার বলে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ছিল সততা, সেই সততার কোপানলে পড়ে পরাক্রান্ত অসতের বিকৃতবুদ্ধি বারে বারেই এদেশে দগ্ধ হয়েছে। সত্ত্বগুণের বাড়া গুণ ছিল না। রজঃগুণ সত্ত্বগুণের অনুগত ও অধীন হয়েই বরাবর আপনার চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে।

এখন আর সেদিন নেই। দারিদ্র্য আজ উপহসিত। এমনকি গুণযুক্ত হলেও তার কদর নেই। সাধু দরিদ্রের সম্মান নেই, অসাধু ধনীর প্রবল প্রতাপ॥ যে যত ভোগের উপকরণ স্তূপীকৃত করবার কৌশল জানে সে ব্যক্তি তত মাননীয় জন। মানুষের মর্যাদা আজ নিরূপিত হয় অর্থ কৌলীন্যের দ্বারা, সততার মানদণ্ডে নয় গুণপনার মানদণ্ডে নয়

ভোগবিমুখতার মানদণ্ডে নয়। সুতরাং স্বভাবতঃই অর্থ-কৌলীন্য আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির আদর্শ সমাজ-জীবনে উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। প্রদর্শনবাদ আড়ম্বরপ্রিয়তা উপকরণবাহুল্যকে এখন সচেতন ভাবে ভজনা করা হয়ে থাকে। যা কিছু বস্তু বা বিষয় ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপনরূপে ব্যবহৃত হতে পারে বা হয়ে থাকে, তার 'পরেই আমাদের সবটুকু ঝোঁক। বাড়ীগাড়ী আসবাবপত্র সাজ-সরঞ্জাম গহনাগাঁটি—এসবের 'পরে এমন উৎকট লোভ পূর্বে বোধ হয় কখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। গৃহে সরঞ্জামবৃদ্ধি আসবাবপত্রের আধিক্য সাধারণতঃ রুচির অজুহাতে বিহিত হয়ে থাকে, কিন্তু তার মূলে থাকে অপরের চোখে নিজেকে প্রকট করবার বাসনা। সৌন্দর্যবোধকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় সম্পত্তিবোধের ধারণা। যার যত বেশী আছে তার তত নামডাক। আন্তর সম্পদে বড় হবার কথা কেউ বড় একটা চিন্তা করে না। লোকে শক্তির একটিমাত্র রূপকেই চেনে—সে রূপ ঐশ্বর্যের। অতএব সমাজে ঐশ্বর্যের নির্বিচার ও নির্বিবেক আরাধনা সুরু হয়ে গিয়েছে। শুধু যে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষেরাই ঐশ্বর্যের উপাসক তাই নয়, সাধারণ শ্রেণীর মানুষেরাও ঐশ্বর্যের বিগ্রহের বেদীমূলে গড় করতে পারলে আর কিছু চায় না। বিত্তবানকেই তারা প্রকৃত শক্তিমান বলে মনে করে, চিত্তবানকে নয়। কিন্তু এ জিনিস সকলেরই বোঝা উচিত যে, চিত্তকে উপবাসী রেখে বিত্তের প্রাকার গড়ে তোলবার চেষ্টা করলে সে কাঠামো দু'দিনে তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে, পড়েও থাকে। ধনী-নির্ধন সকলের মনে কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রতি এমন মোহ পূর্বে কখনও দেখা দেয় নি।

সমাজ-জীবনে বিত্তের প্রয়োজন আছে, তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও আছে। সে ভূমিকার গৌরব ক্ষুণ্ণ করা আমার অভিপ্রায় নয়। তা বলে বিত্তকৌলীন্যই একমাত্র কৌলীন্য মনে করে তদনুযায়ী আর সব মূল্যমানের ধারণা গড়ে তোলার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি আন্তর সম্পদে ধনী অথচ বাহিরে রিক্ত, তাঁর সেই বাহ্য রিক্ততাকে সর্বরিক্ততা মনে করবার যে সাংঘাতিক অভ্যাস সমাজ-জীবনে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠছে তাকে সর্বপ্রযত্নে প্রতিরোধ করা আবশ্যক। এ অভ্যাস সময়ে প্রতিরুদ্ধ না হলে কালক্রমে সকল মহৎ মূল্যবোধের সমাধি ঘটতে বাধ্য। যা হালচাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে এক-এক সময় সত্যি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সরল জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী অনাড়ম্বর মানুষ চিত্তৈশ্বর্যের উপাসক হয়ে এ সমাজে আর কল্কে পাবেন বলে মনে হয় না। বরং এ রকম মানুষের লাঞ্ছিত নিগৃহীত হবার সম্ভাবনা পদে পদে। বুনো রামনাথ আর তাঁর পতি-গরবে-গরবিনী লাল সুতোর শাঁখাপরা সতীসাধ্বী সহধর্মিনীর দৃষ্টান্ত এ যুগের মানুষের কাছে পাড়লে তার ওষ্ঠপ্রান্ত অলক্ষিত হাসিতে বিস্ফারিত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়। এখনকার সেয়ানা মানুষ বুনো রামনাথকে বুনোই মনে করবে, তাঁর অন্তর্বিধ গুণপনাকে স্বীকৃতি দিতে চাইবে না। বিদ্যাচর্চায় দাপাদাপি নেই, দেখানেপনা নেই, উত্তেজনা নেই। দাপাদাপি উত্তেজনা না হলে ভিতর-ফোঁপরা এ যুগের মানুষের চলে না। বুনো আর কুনো লোক এ যুগে একেবারেই বাতিল।

বুনো রামনাথ-গৃহিনী নদীয়ার মহারাজার লোককে গর্ব ভরে বলেছিলেন যে, তাঁর হাতে যতদিন ওই লাল সুতোর এয়োতী-চিহ্ন থাকবে ততদিন নদীয়ার গৌরবরবি অস্তমিত হবার নয়। হায় সেকাল আর একাল! বুনো রামনাথের সহধর্মিণীর দৃষ্টান্ত ত একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত,তাই দিয়ে স্ত্রীজাতির সাধারণ মনোভাব পরিমাপ করা অনুচিত। কিন্তু সজ্জা ও ভূষণপ্রীতিতে একালের নারী কি মধ্যবর্তী স্তরেও অবস্থান করছেন? তাঁদের গহনাপ্রীতি, পাঠিকারা মাফ করবেন—উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এখন আর শাঁখা-সিঁদুর দু'গাছি চুড়ি বাজু বা অনন্ত ও হারে কুলোয় না, নিত্য নতুন ডিজাইনের গহনা চাই। মাঝখানে এক সময় গহনার ভার-বাহুল্যের প্রতি শিক্ষিতা মেয়েদের বীতস্পৃহা দেখা গিয়েছিল, এখন আর সেকথা বলা যায় না। এখন পরিমাণ ও উৎকর্ষ দুইয়ের প্রতিই মেয়েদের সমান লোভ। কলকাতার রাস্তায় গহনার দোকানগুলির পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে আলোর জেল্লায় চক্ষু বিভ্রান্ত হবার উপক্রম। প্রায় প্রতি মাসে নতুন দোকান গজাচ্ছে আর আলোয় আলোয় চারদিক ভেসে যাবার দাখিল হয়েছে। এ জিনিস আমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অঙ্গুলিক্ষেপ করছে না, এ আমাদের অপরিমিত ভোগতৃষ্ণারই অসংশয় নিশানা।

গহনা মেয়েদের দুর্দিনের বীমাস্বরূপ—এ যুক্তির ধার এক সময়ে খুব তীক্ষ্ণ ছিল, এখন অনেকটা ভোঁতা হয়ে এসেছে। অনিয়ন্ত্রিত সম্পত্তিবোধের ধারণা থেকে এ যুক্তির উদ্ভব। যে যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে নানা পরোক্ষ করভার দ্বারা সংকুচিত করে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার কথা হচ্ছে সে যুগে এ যুক্তি তার পূর্বতন সারবত্তা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু লোকের পুরনো অভ্যাস ঘুচতে চায় না, পুরনো মনোবৃত্তিরও সহজে বদল হয় না। বছর তিন আগে অন্ধ্র-বিধান-পরিষদে এক সদস্য মেয়েদের গহনার উপর করভার আরোপের প্রস্তাব করেছিলেন, সে প্রস্তাব অন্যান্য সদস্যেরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি সব দিক দিয়ে বৈধ

ও সঙ্গত। এ প্রস্তাবে হাসির কথা কিছু নেই। অথচ এমনি আমাদের মজ্জাগত সংস্কার যে নূতনের প্রস্তাব মাত্রেই তাকে নাকচ করবার কথা আমাদের মনে হয়—ভালমন্দ বিচারের ধৈর্য পর্যন্ত থাকে না। গহনার প্রসঙ্গে পুরুষদেরই যখন এই অবস্থা, তখন স্বভাবসজ্জাপ্রিয় মণ্ডনমুখী স্ত্রীজাতির মনোভাব আর নাই বা বিশ্লেষণ করলাম!

প্রখ্যাত Golden Mean নীতির প্রবক্তা দার্শনিক আরিস্টটলের অভিমত ছিল, পরিমিত ভোগের দ্বারা ভোগের কামনাকে জয় করো। কিন্তু ভোগ কোন্ পর্যায় পর্যন্ত পরিমিত আর কোথা থেকে তার পরিমিতিহীনতার আরম্ভ সে বিষয়ে একমত হওয়া সহজ নয়। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতঃই বিভিন্ন। আমাদের দেশে ভোগ নয়, ত্যাগের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৌদ্ধমতে 'তনহা' বা আকাঙ্ক্ষা বর্জনই হ'ল নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু এ হ'ল কঠিনের সাধনা, সকল সাংসারিক মানুষ এ পথের পথিক হবে এমন আশা করা যায় না। সাংসারিক মানুষের জন্য ভোগ আর ভোগনিবৃত্তি উভয়েরই প্রয়োজন আছে। নয় তো জীবন নিরর্থক হ'ত। তবে তফাতের মধ্যে ইউরোপীয় মধ্যমার্গের সাধনায় ভোগের সীমারেখা নির্দেশিত হয় নি, আমাদের দেশে হয়েছে। ভোগের প্রয়োজন মানব, কিন্তু সর্বপ্রকারে তাকে নিয়মিত করে সংকুচিত করে জীবনকে উঁচু সুরে বাঁধব মহত্তের সুরে বাঁধব—এই হ'ল ভারতীয় দৃষ্টি।

ভারত চিত্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হেরি ভাবাঢ্য ভারত চিত্রে বর্ণের সমারোহ—
মুগ্ধ হইয়া রহি,
জননী আমার সত্য জ্যোতির্ম্ময়ী।
রূপ-সাগরেতে শ্রদ্ধায় অবগাহি,
এ দর্শনের অধিকারী হওয়া চাহি,
অভাজন কোথা পাবে সে পুণ্য আঁখি?
ভক্ত তো আমি নহি।

২

ইলোরা এবং অজন্তা হতে মাদুরা ও তাঞ্জোর—
নদীয়া বৃন্দাবন—
রূপের রসের ভাবের প্রস্রবণ।
পুরুষোত্তমে 'বামনে' দেখিতে রথে,
পূর্ণজন্ম ক্ষপয়িতে ধায় পথে—
তাঁরি রূপ লাগি আঁখি ঝুরে—আর
গুণে ভোর হয় মন।

৩

উঠিছে যাত্রী দ্বাদশ হাজার সোপান অতিক্রমি—
গিরনার পর্ব্বতে—
শ্রীকৃষ্ণের শ্রী-পদ অঙ্কিত পথে।
ওই যে ভূধর নগর অরণ্যানী—
তাঁর দৃষ্টির কস্ লেগে আছে জানি
এর চেয়ে আছে প্রিয় তাঁর এক ঠাঁই—
কালিন্দী সৈকতে।

৪

কোথা হিরণ্যা কপিলার তীরে 'দেহোৎসর্গ' ঘাটে—
যাত্রীরা নাহে গিয়া—
তীব্র বিরহ বেদনা ব্যথিত হিয়া।
শ্রীগৌরাঙ্গ সেখানে নয়নজলে,
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে লুটালেন শিলাতলে,
ব্যাধ-শরাহত শ্রীকৃষ্ণের সে দুটি
রাঙা পদ ভিজাইয়া।

৫

শত বাধা ঠেলি মরু পাড়ি দেয়, হিংলাজ যায় কেহ,
কেহ ছোটে জ্বালামুখী,
তীর্থ ভ্রমণই তপস্যা,—তাতে সুখী।
কেহ পূজা করে সর্ব্ববসিত সে শিবে—
কামনাবিহীন—কি বর চাহিয়া নিবে?
দেখে এ ভুবন ভুবনেশ্বরে এক—
হৃদি পর্য্যুৎসুকী।

৬

কেদারনাথের গৌরীকুণ্ডে শুনি দেবদেবীগণে—
স্নানার্থী হয়ে নামে।
সব দেবময় ভাবের পুণ্য ধামে।
গিরি শিরে শিরে শুভ্র তুষার রাশ,
ঘনীভূত যেন শিবের অট্টহাস,
রূপায়িত হয় মানসের শিবলোক—
মানুষের আত্মধামে।

৭

গোমুখী হইতে গঙ্গাসাগর—সেথা হতে দ্বারাবতী
তাঁর বংশীই বাজে,
সবে ছুটে যায় জুড়াতে তাঁহার কাছে।
ঠাকুরের মালা আসে ফকিরের গলে,
সুধা ভেসে ওঠে লবণ সাগর জলে,
সব দুখ ক্লেশে—চিরদিবসের তরে—
আনন্দ হয়ে রাজে।

৮

রাগের পথেতে কোথায় কেমনে? কেবা যে কি ধন পায়?
ঠিকানা পাইনে খুঁজি—
যাহা পায় তাহা অনুভব দুর—পুঁজি।
গীত গন্ধের প্রসাদী কণিকা উড়ে,
ফোটায় পুষ্প ভাঙা মালঞ্চ জুড়ে,
পাথর যে দেয় নামের ঝুলিতে—কারো
পরশ পাথর গুঁজি।

৯

বসিয়াছে যেন সসাগরা এই বিশাল ভারতব্যাপী
জগ দরশন মেলা,
হিমগিরি শির হইতে সাগর বেলা।
টোডা ও মুণ্ডা লেপচা লুসিয়া নাগা—
সবাই মেলার অংশীদার যে দাগা
দেখে দাঁড়াইয়া, কলরব করে যারা—
কেহ নহে হেলা ফেলা।

১০

সাপ নাচাইছে, ফেরী করিতেছে—বাঁশী বাজাইতে কেহ—
কেহ দেখাইছে বাজি।
বিভিন্ন বহু ফুলের একটি সাজি।
মস্তকে বহি শত সজীর ভার,
কৃষক বালিকা হইতেছে নদীপার,
কোচিনের নীলজলে—নারিকেল ছায়ে
তরী ভিড়াইছে মাঝি।

১১

লকড়ি আহরি চলেছে কিশোরী রাজপুতানার পথে—
স্নিগ্ধ মুখশ্রী,
উষর মরুর ঘন লাবণ্য কি?
বদরীনাথেতে পাহাড়ী রূপসী দল,
শান্ত কান্ত শুচিতায় ঢলঢল,
তন্ময় হয়ে দেবতায় নিবেদিছে—
পূজার সামগ্রী।

১২

বিরাট বিপুল বিচিত্র ভিন্ জাতির সমন্বয়—
দৃশ্য অসাধারণ
অচেনা তবুও জ্ঞাতি যে চিরন্তন।
প্রেমিক ভক্ত ভাবুক শিল্পী কবি
তারাই রচেছে তীর্থ—গড়েছে ছবি
সবাকার এক গৃহস্বামীর ঘরে—
করেছে নিমন্ত্রণ।
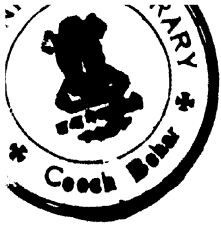
মমতার মূল্য

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শেষ অবধি ওই বাড়ীটাই কিনলেন মহেশ। বাড়ী না বাড়ী! কাঠাতিনেক জমির উপর জরাজীর্ণ দু'খানি ঘর, কোণে একটু অপরিসর বারান্দা; বারান্দার শেষ প্রান্তে খুবড়িমত আরও দুখানা ঘর—রান্না বা ভাঁড়ার যে নামই দেওয়া যাক বেমানান হবে না। শ্যাওলা-পিছল পাতকুয়া-তলা তার পাশেই আধভাঙা পাঁচিলের গা ঠেসান দিয়ে একটি স্বাস্থ্য শ্রীমন্ত পাতিলেবুর গাছ। সারা বাড়ীটার মধ্যে ওই গাছটাই যেন খাপছাড়া। অসংখ্য শাখায় ও সবুজ পাতায় এমন ঝাঁকড়া আর ফুলেফলে এমন শ্রীমন্ত চেহারার গাছ এই এঁদোপড়া বাড়ীতে—আশ্চর্য্যই লাগে! বাড়ীর মালিকও এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা—বাতের ব্যথায় ন্যুব্জ দেহ, বিগলিত দন্ত, চোখে ছানি, চুল সদ্যকাচা পাটের মত ধবধবে সাদা—দীর্ঘকাল অপটু দেহভার বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তারই চিহ্ন মুখের অসংখ্য বলিরেখায়। বুড়ীর তিন কুলে কেউ নাই; জীবনের শেষ ক'টা দিন কাশীবাস করবেন এই সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ীটা বিক্রয় করে দিয়েছেন।

দখল নেবার আগে বাড়ীটা ভাল করে দেখতে এলেন মহেশ—এলেন সপরিবারে। এটা স্বগ্রাম নয়—চাকরিস্থল। পনেরো বছর আগে এই মফঃস্বল-শহরে বদলি হয়ে এসেছিলেন মহেশ। আর বছরকয়েক আছে অবসর নিতে। ইতিমধ্যে যদি বদলির পরোয়ানা আসেই স্ত্রীপুত্রদের ঠাঁই-নাড়া করা চলবে না—এটি ভালমতে বিবেচনা করে বাড়ীখানা কিনেছেন।

ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজ—আলাপ-পরিচয়—কুটুম-কুটুম্বিতা—সামাজিক হৃদ্যতা সমস্তই পাকে পাকে জড়িয়ে গেছে এই শহরের সঙ্গে। দেশের বাস্তভিটায় অনেক দখলদার—সেখানে ভাগে-পাওয়া এক ছটাক জমিতে আধখানা ঘরে মাথা রাখবার ঠাঁই মিলবে না—উপরন্তু দীর্ঘকাল বিদেশ-বাসের ফলে দেশ হয়েছে পরদেশ—আত্মীয়রা ঈর্ষাতুর প্রতিবেশী। সেখানে বাস করার চিন্তা করা যায় না। স্ত্রীর জোর তাগাদাতেই অবশেষে জীর্ণ বাড়ীটাই কিনে ফেললেন।

বাড়ী অবশ্য জীর্ণ থাকবে না—নতুন করে গড়ে তুলবেন। সকলকার সাধ-আশার রঙে রঙীন একটি পরিকল্পনা মিলিয়ে নূতন হয়েই উঠবে। সামনে পিছনে জায়গা আছে খানিকটা—হয়ে যাবে ঠিক। পুরনো ঘর দু'খানা অবশ্য রাখা চলবে না, বারান্দাটি আরও চওড়া হবে, তার কোণে সরু রোয়াকটাও; ইঁটের পঁইঠা ঘুচিয়ে তিন দিক থেকে ওঠা সিমেন্টের পঁইঠা না হলে মানান হবে না। কুয়োটা নুতন করে কাটাতে হবে, বাঁধাতে হবে সিমেন্ট দিয়ে—আর ওই ঝাঁকরা লেবুগাছটা কাটিয়ে ওইখানে একটি বাথরুম—অনুচ্চ স্বরে ভাঙাগড়ার কাজ চালাচ্ছিলেন মহেশ।

স্ত্রী মনোরমা বাধা দিয়ে বললেন, না, না, অমন সুন্দর লেবুগাছটা কেটে ফেলতে পারবে না।

মহেশ একটু হেসে সান্ত্বনা দেবার ছলেই বললেন, কাটবই যে তার ঠিক কি—প্ল্যানটা হলে বোঝা যাবে কোন্‌টা থাকবে কোন্‌টা থাকবে না।

যাই হোক বাবু, গাছ কাটা হবে না। অমন ফলন্ত গাছ—দেখে চোখ জুড়োয়! মনোরমা কণ্ঠে জোর দিলেন।

মহেশ বললেন, ঠিক বলেছ, যা দর লেবুর—ওটা রাখতে পারলেই লাভ। নিজেরা খেয়ে দেয়ে কোন্ দশ-বিশ টাকা না উপরি আয় হবে।

ছেলেমেয়েরা কলরব করে উঠল, গাছটা কাটিও না বাবা, কি সুন্দর গাছ!

২

সদর দরজার কপাট নেই—ওঁরা নিঃশব্দেই বাড়ী ঢুকেছিলেন। ছেলেমেয়েদের কলরবে সাড়া জাগল বাড়ীটায়; নিবন্ধ্যা পুরীতে সেই শব্দের ঢেউ ভাঙা বারান্দার ভিতর দিয়ে পৌঁছে গেল—জীর্ণ একখানি ঘরের মধ্যে। সে ঘরে চুণ-বালির পলস্তারা কবে খসে গেছে দেওয়ালের গা থেকে—উইয়ে-খাওয়া কড়ি-বরগাও ঝুলে পড়েছে একধারে; সাপের দেহের মত মোটা আঁকাবাঁকা একটা অশ্বত্থগাছের শিকড় ভিত ফুঁড়ে ঘরের ভিতরের দেওয়ালের গায়ে হাজারটা সরু শিকড়ের আলপনা আঁকতে সুরু করেছে। দেওয়ালের সেই দিকটা জলের দাগে ও শ্যাওলার সবে কালচে মেরে গেছে। ঠিক ওরই বিপরীত দিকের দেওয়ালে ধুলোঝুলে-ঢাকা একখানি ঠাকুরের পট। সম্ভবতঃ সেটা মা কালীর ছিল। এখন ফ্রেমের কাঁচ থেকে ছবি পর্য্যন্ত সবটাই দিগ্-বসনার কালো রূপে ভরা। তারই কোল ঘেঁষে একখানা

ছ'পেয়ে নড়বড়ে তক্তাপোষ পাতা—তার একধারে গুটানো মলিন একটি শয্যা। তক্তাপোষের ছুটি পায়ায় ইঁটের ঠেকনো—তলায় ঘর-সংসারের যাবতীয় দ্রব্য—হাঁড়ি-কলসী বাসন-কোসন মায় একটা ডালা, তোবড়ানো টিনের বাক্স।

এই ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বসে বাড়ীর একমাত্র মালিক কি যেন গোছগাছ করছিলেন টিনের বাক্সটাতে।

উঠানের কলরব পৌঁছল এ ঘরে—উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। বাইরের রোয়াকে এসে একখানা হাত ভাঙা কোমরে রেখে একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, আর একখানা হাত কপালের উপর ছাউনির মত করে ধরে দৃষ্টির প্রদীপখানি সুদূরবর্ত্তী কোন বস্তুর উপর ফেলবার চেষ্টা করলেন।

কে গা? বাড়ীতে কে এল গো?

মহেশ ছিলেন দলটির পুরোভাগে, এগিয়ে এসে সাড়া দিলেন, আমি মহেশ—দিদিমা।

মহেশ কে?

চাটুজ্জে পাড়ার মহেশ ঘোষাল। বাড়ীটা আমরাই—

ওঃ তাই বল, ঘোষাল-নাতি। এস ভাই এস, তোমরা নিয়েছ শুনে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি, ভিটেয় তবু এক ঘর বামুন বসবে—পুজো আচ্চা-সন্ধ্যে-আহ্নিক—

মহেশের ইঙ্গিতে ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে এগিয়ে এসে টিপ টিপ করে প্রণাম সারছে।

কে—কে? অঃ। এইটি বুঝি মেয়ে? এটি ছেলে? এটি……বেঁচে থাক ভাই—রেতের প্রাতঃ বাক্যে দীর্ঘজীবী হও।

সব শেষে মনোরমা প্রণাম সারলেন।

কে—নাতবৌ? আহা-হা—থাক থাক, এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি পাকা চুলে সিঁদুর পর—দাঁড়া ভাই, একখানা আসন এনে দিই।

বৃদ্ধা ভিতর থেকে একখানা ছেঁড়া শতরঞ্চি এনে রোয়াকে পেতে দিলেন। অতঃপর আলাপ সুরু হ'ল।

মেয়েদের কারও বিয়ে হয় নি বুঝি? বড় ছেলেটি কলকাতায় থাকে—তিনটে পাশ দিয়েছে? আর ছোটটি—

মনোরমা বললেন, বড় ছেলে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছে দিদিমা। সেই ভরসাতেই ত জমিটুকু কিনতে পারলাম।

আহা, বেশ বেশ! তোদের ভিটেয় স্থিতু করে টাকা ক'টা নিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে পড়ব ভাই। এখন তিনি টানলেই সব কষ্ট সার্থক হয়। তা ভাই ঘর-দোরের অবস্থা ত দেখছিস—সারিয়ে-সুরিয়ে নিস ভাল করে।

হাঁ দিদিমা—

দেখ ভাই, আর যাই করিস না ক্রেম নেবুগাছটা যেন বজায় থাকে। কথায় বলে, 'বাড়ীর গাছ—পেটের বাছা।' তারও বাড়া নাতবৌ। ছেলে বউ নাতি-নাতনী এরাও কখনো-সখনো ব্যাজার হয়ে মুখ ঝামটা দেয়—হ'ল দু'চার মাস সংসার খরচই দিলে না, কিন্তু ফলন্ত গাছ কখনও বঞ্চিত করে না ভাই। কম হোক বেশী হোক সে দেয়ই কিছু না কিছু। আমার ত ভাই তিনকুলে কেউ নেই, ওই গাছটুকু সম্বল করে ভিটেয় পড়ে আছি—ও আমার বোজগেরে পুতেরও বাড়া।

বলতে বলতে বুড়ীর গলা ধরে এল। আঁচলে চোখ মুছে বললেন, ওকে যত্ন করিস ভাই, তোদের ভাল হবে।

মনোরমা বললেন, ছেলেরা আপনার গাছ দেখে ভারি খুশী, বলে, অমন সুন্দর গাছ আমরা দেখি নি।

আহা, তোদের মঙ্গল হোক। তা কবে আসবি তোরা জানাস আমাকে।

এখনও দেরী আছে দিদিমা—ভাবছি মাসখানেক বাদে মিস্ত্রি লাগাব। মহেশ উত্তর দিলেন।

তা দু'দিন আগে আমাকে জানাস ভাই, জিনিসপত্তর গুছিয়ে-গাছিয়ে নেব। আর জিনিসপত্তর ত ভারি, ও গুছোতে দুটো দিনও যাবে না।

৩

বাড়ীতে মিস্ত্রি লাগাবার দিনকয়েক আগেকার কথা। মহেশ তখন স্নান সেরে আঙুলে পৈতে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জপের কাজটা সেরে নিচ্ছেন, ওঁর প্রতিবেশী আশু এসে কলরব তুলল, মহেশদা, মহেশদা শীগগির এস—কাণ্ড দেখগে বুড়ীর।

তাড়াতাড়ি জপ সেরে বাইরে এলেন মহেশ। জিজ্ঞাসা করলেন, কি, ব্যাপার কি?

ব্যাপার ভাল। বুড়ী ফড়ে ডাকিয়ে তোমার লেবুগাছের দফা গয়া করছে। শীগগির এস।

লেবুগাছ! মহেশ অবাক হলেন।

হাঁ গো, একগাছ লেবু ফড়ে ডাকিয়ে বিক্রী করে দিচ্ছে। আমরা সবাই বলতে গেলাম তা গাল দিতে লাগল। এখন আবার রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে।

জামাটা গায়ে দিয়ে বার হতে যাচ্ছেন, মনোরমা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। অন্তরাল থেকে তিনি সবই শুনেছেন তবু বললেন, যাচ্ছ কোথায়?

মহেশ বললেন, শুনলে ত সব। কি আক্কেল বল ত বুড়ীর।

সামনে এসে দাঁড়ালেন মনোরমা। বললেন, তাই বলে ঝগড়া করবে বুড়োমানুষের সঙ্গে ?

বাবে, নিজের জিনিস তাই বলে লুটেপুটে নেবে ! সর। মহেশ বহির্গমনের প্রয়াস করলেন।

না, কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না। যাওই যদি আমিও যাব। পথরোধ করে দৃঢ়স্বরে বললেন মনোরমা।

বাড়ীর বাইরে থেকে আশু বলল, আপনি বুঝছেন না বৌদ।

আশুকে শুনিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বললেন মনোরমা, ঠাকুর-পোকে বল আমরা যাচ্ছি এখনই।

খাবারগুলি ঢেকে রান্নাঘরের শিকল তুলে বড় মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন মনোরমা, কোথাও যাসনে যেন, আসছি এখনই।

৪

ওরা যখন পৌঁছলেন বৃদ্ধা তখনও রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছেন। সামনে একখানা দশ টাকার নোটের উপর খুচরো দুটি টাকা আর কিছু রেজগি চাপানো, ফড়ে লেবুভর্ত্তি ঝুড়িটা তুলছে মাথায়।

মহেশ ফড়েকে কিছু বলবার চেষ্টা করতেই মনোরমা বাধা দিলেন, তুমি একটু চুপ কর ত। ফড়েকে উদ্দেশ করে বললেন, দাম সব বুঝিয়ে দিয়েছ ত ? আচ্ছা তুমি যাও।

ফড়ে অপরাধক্ষালনের ভঙ্গিতে বলল, আজ্ঞে মা-ঠাকরোণ—দেড় টাকা করে শ' হলে—সাড়ে আটশোর দাম—

হিসেব তোমায় দিতে বলছি না।

আজ্ঞে, মা-ঠাকরোণ প্রিতিবারই আমাকে ডাকিয়ে লেবু-গুলো দিয়ে দ্যান। বছরে তিনবার আমি—

আচ্ছা, তুমি যাও।

রোয়াকে উঠে এলেন মনোরমা। বৃদ্ধার পাশটিতে বসে বললেন, দিদিমা কাঁদছেন কেন ?

এই কথায় বৃদ্ধার শোকসাগর উথলে উঠল। আরও চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, ওরে নিতাই রে—কোথায় আছিস ভাই, দেখে যা তোর রোজগারের টাকা নিয়ে তোর বুড়ী ঠাকুমা জন্মের মত ভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওরে আমার মাণিক—

দিদিমা, কাঁদবেন না, টাকাগুলো তুলুন। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন মনোরমা।

আরও কিছুক্ষণ শোকপ্রকাশ করে বৃদ্ধা শান্ত হলেন। চীৎকার করে অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ওর গলা ধরে এসে-ছিল, ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন, তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে ভাই, ন্যায্য বিচার কর মহেশ। পাড়ার লোক বলছে—বাড়ী যখন বেচে ফেলেছ নেবুতে তোমার দাবিদাওয়া নেই। যথাধম্মো বলছি ভাই, পরের হক্কের ধন আমি নেব কেন ভাই। একে ত গেল-জন্মে কি মহাপাতক করেছিলাম, কাকে বঞ্চিত করেছিলাম তার প্রিতিফল বিধেতা দিয়েছেন, আবার এ জন্মেও বিশ্বঘাতুকী হব ! না ভাই, মনটায় তোলা-পাড়া করছিল বলেই কাল ভসচাজ্জি মশায়কে শুদিয়েছিলাম —বাড়ী বিক্রীর আগে গাছে ফল ধরেছিল আজ কাল করে বিক্রী হয় নি ফলগুলো গাছেই ছিল। তা এগুলো যদি এখন বেচে দিই। ভসচাজ্জি মশায় বললেন, অনায়াসে বেচে দিতে পার দিদি, ও তোমার হক্কের পাওনা। তুমি ত কাশীবাসী হচ্ছ, আর ত নিতে আসছ না কিছু, মহেশও এতে আপত্তি করবে না। তা ভাই, আমি ত অত আইন-কানুন জানিনে—যদি হক্কের পাওনা হয়, তোমরাই নাও গে টাকা।

না দিদিমা, ও টাকা আপনার। আমাদের গাছ ত রইল, আবারও ওতে লেবু হবে।

আহা, কি কথাই বললে ভাই, শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। ও গাছ নয় ভাই ও আমার শত্তুরের দান। তিনবার ফলে, অঘচ্ছল ফল, খেয়ে-মেখে-বিলিয়ে দু'পয়সা হাতে আসে। তাই সকাল থেকে কোথায় গোবর, কোথায় চুণের খোয়া, কোথায় খড়পচা, মাছের আঁশ-পিত্তি এই সব খুঁজে খুঁজে মরি, আর চেয়েচিন্তে গাছের গোড়ায় ঢালি। চোত-বোশেখে ঘড়া ঘড়া জল ঢালি, কাঁকালে জোর নেই জল তুলতে পারি নে, তবু ঢালি। জল ঢালি, সার দিই আর ভাবি আমার নিতাইকে পাঁচ ব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াচ্ছি। আহা, সে যে আমার পাঁচ ব্যঞ্জন খেতে বড় ভালবাসত ··। বলতে বলতে বৃদ্ধা ছেঁড়া আঁচলটা মুখে তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বাড়ী ফিরবার মুখে মনোরমা বললেন, দেখ, লেবুগাছ ত কাটা হবেই না, দিদিমা যতদিন ইচ্ছে ভিটেয় থাকুন, ওকে ভিটেছাড়া করলে আমাদের মঙ্গল হবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মহেশ বললেন, তাই হোক।

৫

বৃদ্ধা কিন্তু কাশীযাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্ব্বে আর একবার মনোরমার দুটি হাত চেপে ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, দেখিস ভাই, গাছটাকে যত্নআত্তি করিস, ভালই হবে। মানষের মত গাছেরও প্রাণ আছে—ওরাও যত্ন-আত্তি বোঝে। কথা কয় না, ফুল ফল দিয়ে মানুষকে তুষ্ট করে। কথক ঠাকুরের মুখে শুনেছি সবাইয়ের মধ্যে ভগমান আছেন—সবাইয়ের প্রাণ আছে—বৃক্ষলতা—

এ যুগের বিজ্ঞানীরাও সেটি প্রমাণ করেছেন। যাঁদের সঙ্গে মাটির আর গাছপালার সম্বন্ধ নিবিড় তাঁরাও এটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন।

কিন্তু মহেশের বড় ছেলে রবীন থাকে কলকাতায়, চাকরি করে সরকারী আপিসে। দশটা-পাঁচটার আপিস, কাজও নিক্তির তৌলে ওজন করা, একচুল এদিক ওদিক হেলে না। শহরে ইঁটকাঠ লোহার রাজত্ব, জীবনটাও সেই ছাঁচে ঢালা। নানা রকমের বাড়ী দেখে দেখে রবীনের মনেও বাড়ী সম্বন্ধে রুচিবোধ জন্মেছে। নিজেদের বাড়ীর নক্সাটাও তার কল্পনায় রং ধরিয়েছিল।

একদিন বাড়ী এসে বলল মহেশকে, একি অদ্ভুত ধরনের প্ল্যান হয়েছে বাড়ীর। উত্তরমুখী ঘর কেউ করে?

মহেশ বললেন, ওই দিকেই ঘরের পোঁতা রয়েছে কিনা, খরচেও খানিকটা সাশ্রয় হবে।

রবীন বলল, নতুন করে যা তৈরি হবে তাতে অসুবিধার সৃষ্টি করে কি লাভ! এ ত সোনার গহনা নয় যে বার বার ভেঙে তৈরি করানো যাবে। ঘরগুলো দক্ষিণমুখী হওয়াই ভাল।

মনোরমা বললেন, আহা, ওদিকটায় কি সুন্দর একটি লেবুগাছ আছে তুই বুঝি দেখিস নি রবি? বারোমাস লেবু ফলে। খেয়ে বিলিয়ে বিক্রী করলেও খাজনা-টেকসোর দায় থেকে নিশ্চিন্তি।

রবীন হেসে বলল, মা, তোমার বণিক মনোবৃত্তির প্রশংসা করতে পারছি না। সামান্য লেবু যা পয়সা দিলে বাজারে অজস্র মেলে তার জন্য বাড়ীর ডিজাইনটার খুঁত রয়ে যাবে।

মনোরমা ম্লান হেসে বললেন, তা ছাড়া এই লেবুগাছটার গল্প আছে—শোন। হাঁরে—নিতাইকে তোর মনে পড়ে না।

রবীন চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, তাতে কি?

ওই ত লেবুগাছটা এনে পুঁতেছিল। তোর মনে নেই, না?

শোন তবে—

কাহিনীটা সংক্ষেপে শেষ করে বললেন, এখনও কেউ কাশীতে গেলে বুড়ী খোঁজখবর নেয়, হ্যাঁরে আমার লেবু গাছটার কেমন ফলন হয়েছে? ওরা গোড়া খুঁড়ে জলটল দেয় ত, যত্ন করে ত?

হো হো করে হেসে উঠল রবীন। বলল, ওসব সেন্টি-মেন্টের কথা থাক—বাবা, প্ল্যানটা আমায় দিন ত।

কাগজখানা হাতে নিয়ে বলল, এটা বাতিল করে দিতে হবে। দক্ষিণে মুখ করে উত্তর দিকে উঠবে ঘর—দক্ষিণ খোলা না হলে বাড়ীর মানান? সামান্য একটা লেবুগাছের জন্য—হুঁ।

পরে মনোরমার পানে ফিরে বলল, মনে যদি দুঃখ হয় তোমার, খুব ভাল দেখে একটা লেবুর কলম এনে দেব নার্সারী থেকে। এই ধারে পুঁতবে—কেমন, তা হলে আর কোন আপত্তি নেই ত?

মনোরমা কোন কথা বললেন না, ম্লান একটুখানি হাসি ফুটে উঠতে না-উঠতেই ওঁর ঠোঁটের প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

৬

নির্জ্জন দুপুরে ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছিয়ে শোবার আগে অতীত ঘটনাগুলি আর একবার মনে পড়ল। রবির কাছে সংক্ষেপে যা বলেছিলেন সেইটুকু নয় শুধু—আদ্যন্ত অনেক কথা। মনে হ'ল—এই ত সেদিনের কথা, দেখতে দেখতে এই মফঃস্বল শহরে পনেরোটা বছর কেটে গেল। রবি তখন কতটুকুই বা! হাফপ্যান্ট পরে' কাঁধে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে আধ মাইল দূরের বড় ইস্কুলটায় হাজিরা দিচ্ছে। প্রথম ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন বায়না ধরত, মাসদুই পরে তেমনি না যাবার জন্য জিদ। অনেক করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তবে ওকে ইস্কুলে পাঠাতে হ'ত। ইলা তখন তিন বছরেরটি, লীলা কোলে, জিতু-ভোম্বল-খুকী ওরা কেউ জন্মায় নি। দূরের ইস্কুলে পাঠিয়ে দুরন্ত ছেলের জন্য মায়ের মনে স্বস্তি থাকত না। কি জানি কার সঙ্গে বা মারামারি করে বসে—পথ ছেড়ে না বিপথে যায়। আবার পথ চলাতেও বিপদ আছে, গরু বা সাইকেল-রিক্সার উৎপাত। কতদিনই ত শোনা যায়, ছোট ছেলেমেয়ে বা বুড়োবুড়ীরা গরুর শিঙের গুঁতোয় বা সাইকেলের ঠেলায় জখম হয়েছে। মহেশকে একদিন স্পষ্টই বললেন ভয়ের কথা। মহেশ হেসে উড়িয়ে দিলেন প্রথমটা। শেষে চাপাচাপিতে বললেন, একটি ছেলে আছে বটে, ছোট ছেলেমেয়েদের দূরের ইস্কুলে পৌঁছে দেয়, তাকেই না হয় বলি।

কালই ব্যবস্থা কর।

ছেলেটিকে দেখলেন মনোরমা। কালো, রোগা লম্বামত চেহারা। যে বয়সে খাওয়ার ভোগে ছেলেমেয়েরা শিশির-পাওয়া লাউডগার মত সতেজ হয়ে ওঠে, সেই কিশোরবয়সেই কেমন পাকাটে পাকাটে ভাব। তা হোক, মুখখানি ওর কোমল, কথাগুলি মিষ্ট। ছেলেটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন মনোরমা।

দক্ষিণ পাড়ায় থাকি খুড়ীমা, সংসারে এক বুড়ী ঠাকুমা

ছাড়া কেউ নেই। মাকে মনে পড়ে না—বাবাকে একটু একটু মনে পড়ে। একদিন বিদেশে গেল—আর ফিরল না।

আহা! খানিক চুপ করে থেকে মনোরমা বললেন, পারবে ওকে ইস্কুলে পৌঁছে দিতে, ছেলে ভারি ছটফটে।

কেন পারব না,আরও অনেক ছেলে আছে, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে যাবে।

এক টাকা করে দেব মাসে মাসে।

যা আপনার খুশী খুড়ীমা তাই দেবেন।

পরের দিন ছেলে দিব্য শান্ত শিষ্ট হয়ে বই বগলে করল, নিশ্চিন্ত হলেন মনোরমা।

সেই থেকে পরিচয়। বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি নিতাই, কিন্তু সৎস্বভাবের ছেলে, পরোপকারীও। অভাবী বটে, লোভী নয়; ডানপিটেমী করলেও গুণ্ডাপ্রকৃতির নয়।

একটু একটু করে অনেক কথাই মনে পড়ছে। একদিন—রথের আগের দিনই হবে—এসে বলল, আট আনা পয়সা দেবেন খুড়ীমা, কাল গুপ্তিপাড়ার রথ দেখতে যাব।

বেশ ত, আমার জন্যে কি আনবি নিতাই?

মেলায় ত অনেক জিনিস পাওয়া যায়। খানিক ভেবে মাথা নেড়ে বলল, একখানা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি এনে দেব খুড়ীমা।

দুর, আজকাল পিঁড়ির চলন নেই।

কেন খুড়ীমা, মাটির মেঝেয় কি ভিজে জায়গায় পিঁড়ি পেতে বসতেই ত ভাল। দিব্যি ভবিযুক্ত হয়ে বসা যায়। আবারও খানিক ভাবলে নিতাই, তার পর মাথা নেড়ে বলল, তা পিঁড়ি যদি নাই চান, একটা দাঁড়েবসা শোলার টিয়ে কি ময়না এনে দেব, টাঙিয়ে রাখবেন বারান্দাতে।

পিঁড়ি বা শোলার টিয়া-ময়না আনে নি নিতাই, এনেছিল একটা লেবুগাছ। এনে বলেছিল, এই চান খুড়ীমা, বারো-মেসে লেবুর কলম, কাশীর পাতিলেবু।

হেসে বলেছিলেন মনোরমা, হাঁরে লেবুগাছ যে আনলি পুঁতব কোথায় বল্ ত। এটা ত ভাড়া বাড়ী, কাল যদি উঠে যাই লেবু খাবে কে!

বোকার মত খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলেছিল নিতাই, তাই ত খুড়ীমা, এডা ত মাথায় আসে নি! তা'লে কি হবে, পয়সাডা ডাঁহা লোকসান!

লোকসান কেন রে, তোদের ত বাড়ী আছে, সেইখানে পুঁতগে। লেবু ফললে আমাদের বরঞ্চ দিয়ে যাস।

নিতাইয়ের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, সেই ভাল খুড়ীমা, আমাদের বাড়ীও যা আপনাদের বাড়ীও তাই। তা পয়সাডা মাস কাবারে কেটে নেবেন, ছ'আনা দাম।

নারে, ওটা তোকে রথের পার্ব্বনী বলে দিলাম। হাসতে হাসতে বলেছিলেন মনোরমা, গাছটা আমাদের, জমিটা তোদের, ভাগে যেমন ধানচাষ হয়, তেমনি ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে, কি বলিস?

বাঃ, সেই বেশ হবে। নাচতে নাচতে লেবুর কলমটা নিয়ে চলে গেল নিতাই। খানিক পরে এসে বলল, আরও ছ'আনা পয়সা চান, খোল গোবর আর বিচিলি পচিয়ে সার দেব। আর দেখুন—মাছের আঁশ-পিত্তি সব জমিয়ে এক জায়গায় রাখবেন, রোজ এসে নিয়ে যাব।

এর পর লেবুগাছের উপর সব উৎসাহ ঢেলে দিল নিতাই, এমনি করে কয়েক মাস কাটল।

একদিন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, খুড়ীমা গো, তিনু ঘরামী বলল, পুকুরের পাঁক নাকি সবচেয়ে ভাল সার। কাল সকালে দে পুকুর থেকে আনব। বিলের শ্যাওলাও চাপাব গোড়ায়, দেখবেন এইবারেই ঠিক ফলন হবে।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, তা হাঁরে, গাছ কতখানি বাড়ল?

তা একতলা সমান হবে খুড়ীমা। ক'মাসই বা হ'ল এরই মধ্যে মেলাই ডালপালা ছেড়েছে। রোজ বিশ ঘড়া জল ঢালছি গোড়ায়—এই বার্ষে কালেই দেখবেন কি পেল্লায় গাছ হবে, ফুল ধরবে। তবে পাঁকটা এনে দিতেই হবে।

পাঁক আনতে গিয়েই বিপত্তি বাধল। গ্রীষ্মের তাপে পুকুরের জল কমে যাওয়াতে মাছ চুরির উৎপাত বাড়ছিল দিন দিন। জমা নেওয়া পুকুর, জেলেরা থাকে এক ক্রোশ দূরের গাঁয়ে। একদিন তারা পরামর্শ করল ভোর রাতে এসে পুকুরের পাড়ে ভেঁটুর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে—যেমন চোর আসবে মাছ চুরি করতে অমনি হাতেনাতে ধরবে তাকে।

সেই দিন ভোরবেলাতেই পাঁক সংগ্রহ করতে গিয়েছিল নিতাই। সবে পুকুর পাড়ে নেমে এক খাবলা পাঁক তুলেছে, হৈ হৈ রৈ রৈ করে জেলেরা ছুটে এল।

ধৃত নিতাই বলল, আমি ত পাঁক নিচ্ছিলাম।

মাছ যে নাও না তার প্রমাণ কি? অতএব যত আক্রোশ তার দেহের উপর দিয়েই তুলতে লাগল। গোল-মাল শুনে পাড়ার লোক ছুটে এল, তারাই প্রহারজর্জ্জরিত নিতাইকে ছাড়িয়ে দিলে। নিতাই কাঁদতে কাঁদতে, টলতে টলতে চলে গেল। প্রাণান্ত চেষ্টা করেও ও প্রমাণ করতে পারল না যে, শুধু পাঁক নিতে এসেছিল। ওদের বাড়ীতে

মাছ ঢোকে না, বিধবা ঠাকুরমার একটিই হেঁসেল, তাতে নিরামিষ ব্যঞ্জন ছাড়া আমিষজাতীয় কিছুরই প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু কে শুনবে ছেলেমানুষের কথা! তোমাদের বাড়ীতে মাছ নাই ঢুকুক, অপরের হেঁসেলে ত অস্পৃশ্য নয়। তুমি খাও না বলে বিক্রী যে কর না তার প্রমাণ কি? বরং খাওয়ার চেয়ে বিক্রীতেই ত লোভ বেশী হবার কথা, সেখানে নগদ টাকার সম্পর্ক।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরল নিতাই। সেই রাত্রিতেই তার জ্বর হ'ল, প্রবল জ্বর। সময়মত ঔষধ পড়ল না, জ্বর বিকারে পৌঁছাল। তারই ঘোরে লেবুগাছের কথা বলতে বলতেই নিতাই মারা গেল।

সে ভয়ানক দিনের কথা মনে পড়লে আজও মনোরমার বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে, মনে মনে বার বার বলেন, আহা, ছেলেটা বড় ভাল ছিল!

ওর ঠাকুরমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বারকয়েক ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন মনোরমা। বেশ মনে পড়ে, সেই বর্ষা-কালেই গাছের ডালপালাগুলি আরও ঝাঁকড়া হয়েছিল, ফুল ধরেছিল পুরাতন ডালে। তখন ইতুর পালুনি পড়েছে, অগ্রহায়ণের রবিবারে দুপুরের নরম রোদে পিঠ পেতে রোয়াকে বসে চালভাজার কলার মাখছেন, নিতাইয়ের ঠাকুরমা এলেন আঁচলে গুটিকয়েক লেবু বেঁধে। আঁচলের গেরো খুলে লেবুগুলি তাঁর সামনে রেখে বললেন, নাতবৌ নাতবৌ, আমার নিতাইয়ের গাছের পেরথম ফল—তোমাদের নাম করত অষ্টপ্রহর। বুড়ীর চোখের জল উথলে উঠেছিল, বেশ মনে আছে মনোরমার। তাঁর কলারও মনে হয়েছিল নুনে বিষ, কাঁসিটা সরিয়ে রেখেছিলেন।

সেই থেকে গাছ হ'ল বুড়ীর ধ্যানজ্ঞান। নিতাইয়ের হাতে-পোঁতা গাছ, ফলন্ত গাছ। ওর গোড়াতে যত রাজ্যের সার এনে ঢালতে লাগলেন, গ্রীষ্মকালে ঘড়া ঘড়া জল। গাছ নয়—ও যেন নূতন রূপ নিয়ে এসেছে নিতাই। ওকে খাইয়ে-মাখিয়ে যত্নআত্তি করে বুড়ীর বুক ভরে ওঠে। গাছ যত ডালপালা ছাড়ে, যত ফুলেফলে শ্রীমন্ত হয় বুড়ীর আনন্দ আর শোক ততই উথলে উথলে ওঠে। লোককে ডেকে ডেকে বলেন, ওগো, দেখগো তোমরা, সেই শত্তুরের হাতে মানুষকরা গাছ, কেমন হয়েছে দেখ। আমার ভাঙা ভিটে আলো করে রয়েছে। মানুষের যেমন ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনীতে ভিটের শোভা, তেমনি শোভা আমার নিতাইয়ের হাতে মানুষ-করা গাছের। ও গাছ নয়—আমার নিতাই।

এটি আরও কিছুদিন পরে প্রমাণ পেলেন উনি। হাতে তখন টাকার টানাটানি। কোনদিন আহার জোটে, কোন দিন বা কাটে উপবাসে। পরণে শতচ্ছিন্ন বসন। বিধবা মানুষের একবেলা দুটি আতপ চালের বরাদ্দ—তাই জোটান মুশকিল। মাসে দুটো একাদশীর উপবাসের ব্যবস্থা ছিল, তার সংখ্যা বেড়েছে। এখন বয়সের ভারে দেহ হয়েছে দুর্ব্বল, একবেলাও আহার করেও মনে হ'ত রাতে একটা কলা কিংবা একটা মিষ্টি খেয়ে এক ঘটি জল খেতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা করবে কে? এমন সময়ে যত ফড়ে এসে ডাকল, মা ঠাকরোণ বাড়ী আছেন?

কি সমাচার?

লেবু বিক্রী করবেন?

লেবু?

হাঁ মা ঠাকরোণ, আপনি ত একা মনিষ্যি, অত লেবু করবেন কি? বেচে দিন, হাতে কিছু জমুক।

বেচতে মন চায় নি, সম্মানেও বেধেছিল। সেকথা এক দিন দুঃখ করে বলেছিলেন মনোরমার কাছে। বাড়ীতে ফলপাকুড় জন্মালে পাড়ার পাঁচজনকে দিয়ে-থুয়ে যেমন তৃপ্তি তেমন আর কিছুতে নয়; গাছের ফল কি ফড়ের ছালায় তুলে দেওয়া যায়? সেকালে এমনটা হলে নিন্দায় ছেয়ে যেত ত্রিভুবন। কিন্তু এখন?

ফড়ের মুখেই শুনলেন সব। পাড়ার ইতরভদ্র কোন্ বাড়ীটা বা বাকি আছে। কেউ লেবু, কেউ আতা, আম-কাঁঠাল এমনকি কলা, বেল, বাতাবী লেবু কিছুই বাদ দেয় না, চুপি চুপি ফড়ের ছালায় তুলে দেয়। যা মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার, খাওয়াপরায় মানুষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। কে অপযশ রটাবে, টিটকারী বা দেবে কে! সকলকারই মাথা এক ক্ষুরে মুড়ানো—এই অভাবের ক্ষুরে।

লেবু বেচে টাকা ক'টা কোলের কাছে নিয়ে রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসলেন বৃদ্ধা। মনে পড়ল নিতাইকে। সে বেঁচে থাকলে এতদিন কি উপার্জ্জন করে টাকা পাঠাত না তার বুড়ী ঠাকুরমাকে? এই এতগুলি টাকা—যা দিয়ে একবেলার অন্ন আর একবেলার জলখাবার, পরনে একখানা দশি ধুতি, আরও টুকিটাকি কত জিনিসপত্র সবই জোগাড় করতে পারতেন। মনে হ'ল, নিতাই এসে তাঁর হাতে টাকা তুলে দিয়ে বলছে, ঠাকুমা, এই নে, এই নে। ভাল চাল কিনবি, দশমীতে একটু ছানা বা সন্দেশ, দ্বাদশীতে পাকা কলা আর চাল-ভাজার গুঁড়ো, পালেপার্ব্বণে হ'ল বা একটু পায়স, দু'একখানা ভাল তরকারি···এই নে, এই নে। শোক নতুন করে উথলে ওঠে, চিৎকার করে কাঁদেন বৃদ্ধা—অনেক-ক্ষণ ধরে কাঁদেন।

এ পাড়াতেও সে শব্দ ভেসে আসে, মনোরমা বুঝতে পারেন, আজ নিতাইয়ের হাতে পোঁতা গাছের লেবু বিক্রী হ'ল। যখনই নিতাইদের বাড়ীতে আসেন আশ্চর্য্য হয়ে

দেখেন লেবুগাছটাকে। নিতাই চলে গেছে কিন্তু লেবুগাছটা আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আরও ঝাঁকড়া হয়েছে অজস্র শাখায় আর পাতায়, শ্রীমণ্ডিত হয়েছে ফুলেফলে। এত রূপ, এমন স্বাস্থ্য বুঝি মানুষের দেহে ধরে না।

৭

সদর দরজা খোলার শব্দ হ'ল, ছেলেমেয়েরা কলরব করতে করতে ইস্কুল থেকে ফিরল। স্মৃতিজগৎ থেকে ফিরে এলেন মনোরমা। উঃ, ভাবতে ভাবতে আজ আর মেঝেতে আঁচল পেতে শোওয়া হয় নি, একটুও বিশ্রাম হয় নি। দীর্ঘ দুপুরবেলা এত শীঘ্র ফুরিয়ে গেল! আজ কিন্তু কাজের মধ্যে ডুব দিয়েও দুপুরের স্মৃতিকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলেন না, বরং সব কাজের মধ্যেই একটি সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগল, যেমন করে হোক রবীনের মত বদল করাতেই হবে, লেবুগাছটা থাকবেই। ফলের লোভে নয়, অর্থের লালসাতেও নয়, ওটা থাকবে ওরই প্রয়োজনে। মানুষ কি নিজের প্রয়োজনে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না!

মহেশ অনেকক্ষণ ফিরেছেন আপিস থেকে। সন্ধ্যার পাট সারা হয়েছে। ক্রমে রাতে আহারপর্ব্ব মিটল, তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামীর শিয়রে এক গ্লাস জল রেখে মনোরমা হ্যারিকেনের দমটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, ঘুমুলে কি ?

না। একটা হাই তুলে মহেশ বললেন, কিছু বলবে ?

দেখ, আমি বলছিলাম কি—একটু ইতস্ততঃ করলেন মনোরমা, পরে একনিশ্বাসে বললেন, বলছিলাম কি, নাই বা কাটালে লেবুগাছটা। একটু সরিয়ে ভিৎ কাটালে হয় না কি ? রবীনকে বুঝিয়ে বল তুমি। অত্যন্ত করুণ শোনাল ওঁর স্বর।

মহেশ অবাক হয়ে চাইলেন। মনোরমা ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তবু মুখের একাংশ দেখে মহেশ বুঝলেন, গভীর উৎকণ্ঠায় কেমন যেন থমথমে হয়েছে ভঙ্গিটা। সান্ত্বনা দেবার মত করেই মহেশ বললেন, আমিও ত সেদিন ওই কথা বোঝাচ্ছিলাম রবিকে, কতক্ষণ ধরে বুঝিয়েছি। তা ওর মাথায় কি প্ল্যান ঢুকেছে ওই জানে। বলে - সামান্য একটা গাছের জন্য বাড়ীটা বেমানান হয়ে থাকে। উপযুক্ত ছেলে, কাঁহাতক কথা কাটাকাটি করি বল। যা খুশী করুক গে, ওরাই ত ভোগদখল করবে বাড়ী, ওদের পছন্দমতই হোক, আমরা আর ক'দিন!

চোখে প্রায় জল এসেছিল মনোরমার। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাপড়টা খসে পড়ল। কাপড়টা যথাস্থানে তুলে দিতে গিয়ে একগাছি চুল উঠে এল হাতে। হাতটা আলোর সামনে নামাতেই একটি অতি সূক্ষ্ম রূপোর তারের মত সেটা চক্‌চক্ করে উঠল। ঈষৎ চমকে উঠলেন মনোরমা। গভীর একটি নিশ্বাসকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে মহেশের কথাটাই আবৃত্তি করলেন, আমরা আর ক'দিন!

সমুদ্র : একটি প্রশ্ন

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

পুরীর কিংবা দীঘার সে বালিয়াড়ি থেকে
যতবার চোখ দুটো সমুদ্রকে দেখে,
সেই এক আদিম বিস্ময়। দৃশ্যপটে
প্রতিটি মুহূর্তে বর্ণ-সমারোহ ঘটে।
শিল্পী কেউ কুয়াশার রঙ্-তুলি নিয়ে
নতুন প্রচ্ছদচিত্র চলেছে বানিয়ে
কিছু ছায়া-আবছায়া। বলে তাই মনও,
—ফুরায় না সমুদ্রের যৌবন কখনো।

নীল নেশাটুকু পান ক'রে কোন্ ফাঁকে
পরিচিত পৃথিবীর করুণ-কান্নাকে
ভুলে গেছি। খুলে গেল তৃতীয় নয়ন।
জীবিকা-ব্যাধের শরে যে হরিণী মন
আহত, সে অকস্মাৎ প্রশ্ন ধরো ধরো :
তোমার মনের চেয়ে সমুদ্র কি বড়ো ?

চিঠির উত্তর

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সন্ধ্যা নেমেছে গাঢ়, চারিদিক নিরালা নিঝুম,
তারি মাঝে দীপ জ্বেলে গেঁথেছিলে কি কথার মালা
ছোট লিপিকার বুকে ? তার পর, মাঝরাতে ঘুম
আসে নি তোমায় চোখে, বারে বারে শুধু দীপ জ্বালা,
আর সেই লেখা চিঠি পড়া। ক্রমে রাত কেটে যায়,
পাশের সীটের মেয়ে প্রণতি যে তখনো ঘুমায়।

রীতা, আজ প্রাণে শুধু ফেলে-আসা স্মৃতি কথা কয়,
একটি হারানো মেঘ উড়ে আসে মনের আকাশে,
ঝাঁঝালো প্রভাত আনে ভেতো নেশা, চমক, বিস্ময়,
কোথায় কাঁটার জ্বালা মেশানো যে লাজুক বাতাসে।
তবু যেন মনে হয় মাঝে আছে পাষাণ প্রাচীর,
ওপারে আলোর স্বপ্ন, এপারে যে নামিছে তিমির।

কবে গেয়েছিলে গান, স্মৃতি তার আজো অমলিন
ঘুমহারা মাঝরাতে ছায়াঘেরা মনের গহনে,
ব্যবধান থাক্ মরু, আগুনের শিখাভরা দিন,
ঝরাফুল রাখে তবু শেষ সাধ বাতাসে গোপনে।
অসহ আঁধার রাত বেদনার রচে মায়াজাল,
নেমে আসে চুপি চুপি ভীরু পায়ে মায়াবী সকাল!

যে নদী শুকায় পথে সাগর রয়েছে মনে তার,
সেখানে সে মিশে যায় নিরালায় আপন স্বপনে,
মরুতে হারায়ে যাক্ জীবনের শেষ অভিসার,
একটি মিলন-স্বর্গ তবু থাকে একান্ত গোপনে।
কি হবে একথা শুনে ? ঘুম নামে রাতের বাতাসে,
সপ্তর্ষি এখনো জাগে, শুকতারা ওঠে নি আকাশে।

রজনীগন্ধার বনে কালো ঝড় যদি নেমে আসে,
সাধ-ভাঙা মন নিয়ে রাত কাঁদে ককিয়ে ককিয়ে,
শিশির-ভেজানো মাটি শ্বাস ফেলে অশান্ত বাতাসে,
নদীর উতলা ঢেউ খোঁজে চাঁদ কোথায় লুকিয়ে!
একটি দুরন্ত রাত বুকে বয় চাপা হাহাকার,
সে কি চেয়ে রয় না'ক পথখানি সোনালী উষার ?

আমার যে ভাল লাগে তোমার ও প্রজাপতি-মন,
রঙিন্ পাখনা মেলে ফুলবনে শুধু পথহারা,
লাজুক রোদের হাসি ছুঁয়ে যায় ঘুমভাঙা বন,
সেখানে চমক-লাগা দেখা দেয় অজানা ইশারা!
তবু একখানি চিঠি, কাছে আনে হারানো সাগর,
শুধু ঢেউ, শুধু নীল, বুকে রয় কুলভাঙা ঝড়!

শুকতারা ওঠে যদি শেষ রাতে মনের আকাশে
উষার পরশ-লাগা সোনা-মেঘ কভু থাকে দূরে ?
একটি ফুলের গান যদি ভাসে হিমেল বাতাসে
দুরন্ত শীতের শেষে, বসন্ত কি জাগে না সে সুরে ?
যেখানে অসীম রাত্রি, সেথা বৃথা সূর্য্য আরাধনা ;
যেখানে অনন্ত হিম, সেথা বৃথা বসন্ত-কল্পনা।

জানি না ও ছায়াপথ কার অভিসার বুকে রাখে,
তবু সে ইঙ্গিতে তার খুঁজে দেয় অনাদি নিশানা ;
আলোর বিহঙ্গী যেন রাতের দিগন্ত দুটি ঢাকে,
আকাশের কালো নীড়ে জেগে থাকে প্রসারিয়া ডানা
তারি তলে পৃথিবীর দীপ-নেভা এক-কণা ঘর,
সেথায় রয়েছ তুমি, বয়ে চলে নিঃশব্দ প্রহর!

যে মরু দেখে নি ফুল, যে নদী দেখে নি সিন্ধু-তট,
যে উল্কা ছোঁয় নি মাটি ছুটে এসে ধরণীর টানে,
তারি লাগি গেয়ে চলি বেদনায় কোন্ ছায়ানট,
সেকথা তুমিও জান, আর মোর মন শুধু জানে!
তবু একখানি চিঠি, জীবনের স্বপন-বাসর,
দুটি অবলুপ্ত তীর, মাঝখানে কাঁদিছে সাগর!

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী

অধ্যাপিকা শ্রীআভালতা কুণ্ডু

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা কাব্য, নাটক, উপন্যাসে যেমন আপনাকে প্রকাশিত করেছে—রূপক নাট্যের ক্ষেত্রেও তেমনি কতকগুলি অমর অবদানের সৃষ্টি করেছে, রক্তকরবী, মুক্তধারা, অচলায়তন, অরূপ-রতন তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এগুলির মধ্যে রক্তকরবী সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি যক্ষপুরী নামে প্রথম রচনা করেন, ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্ত্তমান আকারে মুদ্রিত হয়।

রক্তকরবী যে রূপকধর্ম্মী নাটক এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ মাত্র নেই। তবুও রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে সম্পূর্ণভাবে রূপক বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। নাটকটির যে রূপক ব্যাখ্যা সম্ভব তা অবশ্য তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন ভূমিকার মধ্যে। কিন্তু স্বীকৃতির পরমুহূর্ত্তে তিনি বলছেন যে, নাটকটিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ না করে সাধারণ নাটক হিসাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। "আমার নাটক একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। কিন্তু শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না করেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান, এইটি মনে রাখুন রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী নামে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের মধ্য দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ,…সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ করে তাকিয়ে দেখেন তা হলে হয়ত কিছু রস পেতে পারেন, নয় ত রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তবে তার দায় কবির নয়।" রস-পিপাসু পাঠকের মন অবশ্য কবির এ পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে না। 'রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে' যে অর্থ লুকানো রয়েছে তা এতই সুস্পষ্ট যে, তাকে উপেক্ষা করে, নাটকটিকে 'নন্দিনী নামে একটি মানবীর ছবি' মাত্র বলে মেনে নেওয়া কঠিন। 'অনর্থ ঘটতে পারে', এই আশঙ্কা দেখিয়ে প্রতিনিবৃত্তি করবার চেষ্টা করলেও, 'রক্তকরবী' রূপকটিকে আশ্রয় করে যে সত্যটিকে কবি প্রকাশ করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টায় পাঠকের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে।

'রক্তকরবী'র মধ্যে রূপকের আশ্রয়ে যে কোন সত্যটিকে রূপ দিতে চেয়েছেন তার নির্দ্দেশ আমরা পাই নাটকের ভূমিকার মধ্যেই। প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে।' 'কর্ষণজীবী' অর্থাৎ পল্লীসভ্যতা এবং আকর্ষণজীবী অর্থে নাগরিক-সভ্যতা এই দুই বিভিন্ন জাতীয় সভ্যতার যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব তাহাই 'রক্তকরবী'র রূপকের ভিত্তি।

নাটকখানির ঘটনা যে পটভূমিকা আশ্রয় করে আছে তা হচ্ছে ভারতবর্ষের একটি কাল্পনিক নগরী—তার নাম 'যক্ষপুরী', কিন্তু ভারতীয় পটভূমিকায় রচিত হলেও 'রক্তকরবী'তে যে সভ্যতার চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা বিশেষ ভাবে ভারতীয় সভ্যতা নয়। সে হ'ল সাধারণ ভাবে আধুনিক জগতের সভ্যতা, ইউরোপ আর আমেরিকায় যার চরম অভিব্যক্তি আর যন্ত্র যার প্রধান বাহন। ইউরোপ মহাদেশে ব্যাপক ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথ এই সভ্যতার স্বরূপকে সম্যক ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এর বিরাট শক্তি আর মোহনীয় আকর্ষণের প্রাবল্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আরও দেখেছিলেন এর দুর্ব্বলতার মূল কোনখানে, এর মৃত্যুবাণ লুকানো রয়েছে কোথায়, তিনি দেখেছিলেন এই যে বিশ্বগ্রাসী যান্ত্রিক সভ্যতা এর আপাত-প্রতীয়-মান প্রাচুর্য্য আর শক্তির বিপুলতার মধ্যেই এর ধ্বংসের বীজ লুকানো রয়েছে. এ সভ্যতা সাধারণ মানুষের জন্য কোন আশীর্ব্বাদই বহন করে আনে না,এর কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ তার মনুষ্যত্বটুকু হারিয়েছে—সে মানুষ নয়, কেবলমাত্র সংখ্যা কেহ ৪৭ফ, কেহ ৬৯ঙ, 'গাঁয়ে যারা ছিল মানুষ তারা যেন হয়েছে দশ-পঁচিশের ছক, বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে,' সেই জুয়োখেলায় লাভবান হয়েছে শুধু সর্দ্দার, মোড়ল আর কেনারাম গোঁসাইয়ের দল—তাদের প্রভুত্বপ্রিয়তাবৃত্তি হয়েছে চরিতার্থ। কিন্তু সাধারণ মানুষের সামনে থেকে সরে গেছে উন্মুক্ত নীল আকাশখানা—উদার অবকাশ আর অনাবিল আনন্দকে সে হারিয়েছে, কাজের মধ্যে কোন আনন্দকে সে আর পায় না, তাই কাজও হয়েছে তার বোঝারই সামিল, সাধারণ মানুষ যন্ত্রের চাপে পড়ে নিষ্পিষ্ট হতে চলেছে—অথচ আধুনিক জগতের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের দিকে তাকিয়ে চোখ ঝল্‌সে যায়। সেই জন্যই ত আজ মানুষে মানুষে ভালবাসার সহজ সম্পর্ক গেছে লুপ্ত হয়ে। অন্তহীন লোভের মধ্যে জন্ম নিয়েছে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর ভয়, কিন্তু চিরদিনই ত এমন করে চলতে পারে না—এর পরিণাম কোথায়? এর শেষ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন সেই দিনটিকে, যেদিন যন্ত্র যাদের দাস করে রেখেছে সেই জনসাধারণ আর যন্ত্রের বশ মানবে না, বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, এতদিন যার দাসত্ব করে এসেছে সেই যন্ত্রকে তারা ধূলোয় লুটিয়ে দেবে। শুধু তাই নয়, অত্যাচারিতদের সঙ্গে যোগ দেবে অত্যাচারীরা নিজেও, অন্তরের

অশান্তি আর অসন্তোষে ক্ষিপ্ত হয়ে এই সভ্যতা তার নিজের বুকে নিজেই মৃত্যুশেল হেনে আত্মঘাতী হবে।

তার পরে নগরকেন্দ্রিক এই সভ্যতার আশ্রয় ছেড়ে মানুষকে আবার ফিরে যেতে হবে পল্লীসভ্যতার সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার মধ্যে, বস্তুবাদী সভ্যতার আকর্ষণে মানুষ একদিন পল্লী ছেড়ে ছুটেছিল নগরের দিকে, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর উপর বস্তু স্তুপীকৃত করেও তার তৃষ্ণা মিটল না, সে যেন আজ বুঝতে পেরেছে যে, মানুষের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য তার অন্তরের ঐশ্বর্য্যে, তার বাহিরের সম্পদে নয়, হানাহানি-কাড়াকাড়ির অভিসম্পাতে ক্লান্ত মানুষকে আবার ফিরে যেতে হবে ফেলে-আসা পল্লীজীবনের মধ্যে আর তার মধ্যেই সে পাবে সত্যকার শান্তির সন্ধান, নাটকের মধ্যে তাই বারে বারে পল্লীমাতার সকরুণ আহ্বান শোনা যায়—"পৌষ তাদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে।"

ফিরে যেতে মানুষকে হবেই—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধ্রুব বিশ্বাস। হৃদয়হীন বস্তুসর্ব্বস্ব এই সভ্যতা মানুষকে কোনদিন শান্তির সন্ধান দিতে পারবে না, কিন্তু ফিরে সে যাবে কেমন করে? তাকে ফিরে যেতে হবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। যে সভ্যতাসৌধকে সে সযত্নে গড়ে তুলেছে তার ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়েই হবে তার ফিরে যাবার পথ, এই বিপ্লব আর ধ্বংস কেমন করে নেমে আসবে বিশ্বের উপর—তাঁরই চিত্র তিনি এঁকেছেন 'রক্তকরবী'র রূপকের মধ্য দিয়ে।

নাটকের নামকরণ : 'রক্তকরবী' নামটির মধ্যেই নাটকের মর্ম্মবাণীটি প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের নায়িকা নন্দিনী এই ফুলটিকে অঙ্গের আভরণ করেছে। নন্দিনীর নিজের মধ্যে বিপ্লবের বাণী মূর্ত্তিমতী, যক্ষপুরে সে এসেছে রক্তকরবীতে হাতে নিয়ে, এ সেই রক্তকরবী—যা তার প্রেমাস্পদ রঞ্জনের বড় প্রিয়। নন্দিনী আর রঞ্জনের প্রিয় ফুল এই রক্তকরবী যেন যক্ষপুরে বিপ্লবের রক্তনিশান, সে শুধু ফুল নয়, রক্তে রাঙানো ফুল—The flower besmeared with blood নাটকের মধ্যে রয়েছে তার একটি বিশিষ্ট স্থান। রক্তকরবীর রাঙা রঙে যক্ষপুরীর প্রত্যেকের মনেই অল্পবিস্তর দোলা লাগিয়েছে, সকলেই দেখেছে কেমন একটা রহস্যের আভাস রয়েছে নন্দিনীর হাতের ঐ রক্তকরবীর গুচ্ছে, যার আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু সম্পূর্ণ স্পষ্ট বোঝা যায় না। ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়ে অধ্যাপক বলেছেন, "সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। রাঙা রঙে কি লিখন তুমি লিখতে এসেছ জানি না।" রাজা দেখেছেন কি এক অপরূপ মায়া রয়েছে ঐ ফুলের মধ্যে—ও যেন সূচিত করছে যক্ষরাজ ও যক্ষপুরীর নিয়তিকেই। "ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয় ঐ যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে।" বালক কিশোরের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ঐ রক্তকরবীর গুচ্ছ—নন্দিনীকে ফুল জোগাবার ভার পেয়ে সে নিজেকে চরিতার্থ মনে করেছে। সাধারণ কারিগর গোকুলের মনেও প্রশ্ন জাগিয়েছে এই রক্তকরবী, তাই সে বলেছে, "দেখি দেখি সিঁথিতে তোমার ঐ কি ঝুলছে? ওর মানে কি?"

..."দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাঙা আলোর মশাল, যাই নির্ব্বোধদের সাবধান করে দিই গে।" তার পর যেদিন নন্দিনীর প্রেমাস্পদ রঞ্জন যক্ষপুরে এল—সেদিন নন্দিনীর সিঁথিতে রক্তকরবীর মঞ্জরী-প্রলয় গোধূলীর মত দেখিয়েছে। নন্দিনী আর রঞ্জনের মিলন ঘটল না। কিন্তু নন্দিনী তার বাণী পাঠিয়েছে—রঞ্জনকে ঐ রক্তকরবীর মঞ্জরী উপহার পাঠিয়েছে। যন্ত্রসভ্যতার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে রঞ্জন নিজে গুঁড়িয়ে গেল—পিছনে পড়ে রইল হাতের রক্তকরবীর গুচ্ছ—সেই রক্তকরবীর গুচ্ছকে নিশান করে যক্ষপুরে এল বিপ্লবের বন্যা—যার বিপুল প্লাবনে যান্ত্রিক সভ্যতার ভিত্তিকে পর্য্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোন্ অতলে।

যে রক্তকরবী এমনি করে সমস্ত নাটকের ঘটনাস্রোতের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে এবং তাকে কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করছেও বলা চলে, সেই রক্তে-রাঙানো ফুলের নামে নাটকটির নামকরণ খুবই সার্থক হয়েছে। নাটকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'যক্ষপুরী" নামে। রক্তকরবী নামটি রবীন্দ্রনাথ পরে দিয়েছিলেন। যক্ষপুরী নামটির মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তুটির আভাস এমন সুন্দর ভাবে পাওয়া যায় না। যন্ত্রসভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ যদি নাটকের মূল উদ্দেশ্য হ'ত, তাহলেই যক্ষপুরী নামটি সার্থক হ'ত। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস এবং বিপ্লবের মধ্যে এর পরিসমাপ্তির কথাটিকেই যখন রবীন্দ্রনাথ নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছেন—সেই হিসাবে রক্তকরবী নামটি অনেক বেশী সার্থক বলে মনে হয়।

নাটকের চরিত্রসমূহ : রক্তকরবী নাটকে বিপ্লবের পটভূমিকায় যে কয়টি চরিত্র রূপায়িত হয়েছে, তাদের মধ্যে নন্দিনী, রঞ্জন, অধ্যাপক এবং বিশু পাগল প্রধান। এ ছাড়াও রয়েছে কিশোর, ফাগুলাল, চন্দ্রা, সর্দ্দার, গোঁসাই ও পুরাণবাগীশ, এরা প্রত্যেকে বিভিন্ন শ্রেণী মানসের প্রতীক এবং সকলে মিলে আধুনিক সভ্যতার একটি নিখুঁত চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে।

নন্দিনী : নাটকীয় চরিত্রগুলির বর্ণনা করতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথমেই মনে পড়ে নন্দিনীকে। নন্দিনীর চরিত্র ব্যাখ্যানকল্পে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতেই বলেছেন যে, "সে পাতালের সামগ্রী নয়—মাটির উপরিতলে যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ আনন্দের", 'কবি দেখিয়েছেন যক্ষপুরে প্রাণের 'পরে কোন দরদ নেই—অনুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে আছে শুধু দুর্নিবার লোভ আর অনির্ব্বাণ তৃষ্ণা। এই যান্ত্রিকতার মধ্যে, প্রাণহীন যক্ষপুরীর মধ্যে এই নন্দিনীর আবির্ভাব হ'ল কেমন করে? যক্ষপুরীর সকলের কাছেই যে বিস্ময়ের বস্তু—তাকে যক্ষপুরে কোন প্রয়োজন?" "এখানকার রাজা কোন প্রয়োজনে ওকে এখানে এনেছেন"—এই প্রশ্ন জাগে সকলকার মনে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর মেলে না, যক্ষপুরে উঁচু প্রাচীর তুলে

আকাশখানাকে আড়াল করে ফেলা হয়েছে—স্বর্গের আলো সেখানে পৌঁছায় না, সেই অন্ধকার যক্ষপুরে "নন্দিনী স্বর্গের আচমকা আলো"—সে সকল প্রয়োজনের বাইরে সকল প্রয়োজনের উর্দ্ধে, যক্ষপুরে সে এসেছে শুধু "অকাজের প্রয়োজনে", দিনরাত্রি "সুন্দরী-পণা" করে বেড়ানই তার কাজ, অথচ মজা এই যে, নন্দিনী শুধু মাত্র "অপ্রয়োজনের আনন্দ" হয়েও যক্ষপুরের সবারই মন ভুলিয়েছে, রাজা তার মধ্যে "চকিতে চকিতে নবীনের মায়ামৃগীকে দেখতে পেয়েছেন", কিন্তু ধরতে পারেন নি, রেগে উঠেছেন তাঁর নিজের উপর আর তাঁর পারিপার্শ্বিকের উপর। অধ্যাপকের বস্তু-তত্ত্ববিত্তার আলোচনার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত নড়ে উঠেছে নন্দিনীর আকর্ষণে। কারিগরদের মধ্যে বিশু পাগল, কিশোর আর ফাগুলাল ওর মুগ্ধ ভক্ত, এমনকি সর্দ্দারদের মনের মধ্যেও সে টান ধরিয়েছে। যক্ষপুরীর ছোট বড় সকলের মনেই সে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছে, সবার সামনে সে তুলে ধরেছে এক মোহনীয় সমাজের ছবি, যেখানে ছোট-বড়র মধ্যে ভেদ নেই—মানুষে মানুষে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক এত কঠিন হয়ে দেখা দেয়নি—যেখানে আছে শুধু মানুষে মানুষে প্রীতির আর প্রাণের সহজ-সম্পর্ক, সে সেই রাজ্যের কথা—সবাইকে শোনাতে এসেছে—"যেখানে মানুষ মা বসুন্ধরার আঁচলকে এমন করে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না—যেখানে "পৃথিবী তাঁর নিজের জিনিস আপনি খুসী হয়ে দেয়।" যক্ষপুরের সকলকে এমনকি স্বয়ং রাজাকে পর্য্যন্ত সে ডাক দিয়েছে, "পৌষের ফসল কাটার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য।" "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে"—এই মন্ত্রে "আকর্ষণ-জীবী সভ্যতাকে সে ফিরে ডাকছে ফেলে-আসা কর্ষণজীবী" দিন-গুলির মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে। কিন্তু ফিরে যাওয়া ত সহজ নয়। কারণ "যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়", তখন তার বিরাট জঠরের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না, ফেরবার একমাত্র পথ হচ্ছে বিপ্লবের পথ—রক্ত-সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে। সেই বিপ্লবের পথে একদিন মানুষ যাত্রা সুরু করল, যেদিন যক্ষপুরে এল নন্দিনীর প্রেমাস্পদ রঞ্জন। উন্মত্ত জনস্রোত সেদিন যক্ষপুরীর প্রাচীর ভেঙে ফেলল দুর্ব্বার শক্তিতে, পৌষের গান মুখে নিয়ে তারা ফিরে চলল সেই পথে—যেখানে রয়েছে সহজ আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের মাঝে মানুষের চিরমুক্তি। বিপ্লবের পথে এল মানুষের মুক্তি—কিন্তু এই বিপ্লবের আগমন এত সহজ হ'ত না যদি নন্দিনী পূর্ব্ব হতে মানুষের মনকে বিপ্লবমুখী করে না তুলত। নন্দিনী চরিত্রের সার্থকতা এরই মধ্যে।

এই নন্দিনী কে? নন্দিনীকে রবীন্দ্রনাথ কিসের প্রতীকরূপে কল্পনা করেছেন? মানুষের মনে সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্য—যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা, নন্দিনীকে তারই প্রতীকরূপে কল্পনা করেছেন বলে মনে হয়। মানুষের সভ্যতা যখন অনাচার, অত্যাচার ও দুর্নীতিতে ভরে ওঠে, তখনও তার মধ্যে সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা একে-বারে লুপ্ত হয়ে যায় না। মুষ্টিমের মনীষিদের মধ্যে সেই সত্য-সুন্দরের অর্চনা জেগে থাকে—আর তাঁরাই পথভ্রষ্ট জনসাধারণকে সত্যের দিকে যুগে যুগে আকর্ষণ করে থাকেন। বাস্তবে বিপ্লব আসবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাই ভাবজগতে চিরদিন বিপ্লব ঘনিয়েছে—বিপ্লবের পূর্ব্বে এসেছে বিপ্লবের বাণী। আর তারই বহুলপ্রচারে বিপ্লবের আগমনের পথ আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। রঞ্জনের আগমনের বাণী নিয়ে রক্তকরবীর মঞ্জরী হাতে যক্ষপুরে নন্দিনীর আবির্ভাব, বিপ্লবের পূর্ব্বে তার সম্ভাবনা নিয়ে বিপ্লবের বাণীর আগমনকেই সূচিত করে। নন্দিনীর নিজের মুখেই এর স্বীকৃতি আছে—"বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন, আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি—ভাঙবে তোমার সর্দ্দারির সোনার চূড়া," রঞ্জন মূর্ত্তিমান বিপ্লব—সে আসবে সোনার নেশায় পাগল যক্ষপুর বাসীদের তন্দ্রা ভাঙাতে। নন্দিনী সেই বিপ্লবিনী বাণী—যক্ষপুরীর অধিবাসীদের সে পূর্ব্ব হতে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, এই কল্পনার মধ্যে যে অবাস্তবতার লেশমাত্র নেই ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। জগতের ইতিহাসে প্রতিটি বিপ্লবের পূর্ব্বেই ভাবজগতে এসেছে বিপ্লব—আর সে বিপ্লব এসেছে প্রধানতঃ সাহিত্যের ভিতর দিয়েই। তাই ত আমরা দেখি ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে দিদেরো, মন্‌টেসক্‌, ভলটেয়ার ও রুশোর আবির্ভাব—রুশ-বিপ্লবের পূর্ব্বে মার্কসএর আবির্ভাব, এ দের প্রাণময়ী বাণী মানুষের মনকে চিরা-চরিত প্রথা আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছিল পূর্ব্ব হতে—তাইত বাস্তবে যখন বিপ্লব এল ফরাসী ও রুশ দেশের জনসাধারণ তাকে এত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল, আধুনিক সভ্যতার উপরে যে বিপ্লবের আসন্ন ছায়াকে কবি ঘনায়মান হতে দেখেছিলেন, তারও অগ্রদূত হয়ে আসবে বিপ্লবমূলক সাহিত্য—এই ছিল কবিগুরুর কল্পনা।

রঞ্জন: নন্দিনীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছে তার প্রেমাস্পদ রঞ্জন। নন্দিনী যে বিপ্লব এবং নবযুগের আগমনের বাণী বহন করে এনেছে রঞ্জনের মধ্যে সেই বিপ্লব মূর্ত্তি-মন্ত। সমস্ত নাটকখানিতে তার আগমনের সম্ভাবনা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, নন্দিনীর বুকের মধ্যে অলক্ষ্য পথে এসেছে তার আগমনের বার্ত্তা—রক্তকরবীর মঞ্জরী আর নীলকণ্ঠ পাখীর পালক নিয়ে সে উন্মুখ হয়ে বসে আছে রঞ্জনের প্রতীক্ষায়। যক্ষপুরে রঞ্জন যে নূতন প্রাণের স্পন্দন নিয়ে আসবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে—নন্দিনী তার জন্য পথ প্রস্তুত করে রেখেছে পূর্ব্বাহ্ন হতে। রঞ্জনের আগমনের পূর্ব্বাভাব পায় যক্ষপুরের ছোট-বড় প্রত্যেকেই, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, রঞ্জনকে নাট্যমঞ্চের মধ্যে একটি বারের জন্যও দেখা যায় না—সে বরাবরই থাকে অন্তরালে। তার মৃতদেহকে আমরা যখন একবার দেখতে পাই যন্ত্রশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জীবনরসের চির-উপাসক তখন ধূলার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, রঞ্জনের চরিত্রটি এই জন্যই আমাদের কাছে এমন রহস্যে আবৃত বলে মনে হয়।

বিপ্লবের বাহন হিসাবে রঞ্জন নামটিও সার্থক। সে রঞ্জন, যে রাঙায়। যক্ষপুরীর বর্ণবৈচিত্র্যহীন অস্তিত্বের মাঝে বর্ণগন্ধময় যে

নবজীবনের আবির্ভাব ঘটবে বিপ্লবের পথে—রঞ্জনের নামটির মধ্যে যেন তারই আভাস পাওয়া যায়।

রঞ্জনকে নাটকের মধ্যে একবারও উপস্থিত না করেও কবি তার চরিত্রটির একটি সুস্পষ্ট পরিচয় আমাদের দিয়েছেন কেবলমাত্র অন্যান্য চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। আজন্ম-বিপ্লবী রঞ্জন যক্ষপুরীর সর্দ্দারের কাছে সে ভয়ের বস্তু। তাদের শাসনের কোন অস্ত্রই তার গায়ে আঁট হয়ে বসে না দেখে তারা হতবুদ্ধি হয়েছে। কিন্তু যারা তার ভক্ত তাদের কাছে সে বড় সুন্দর। তাকে কবি কল্পনা করেছেন সুন্দরের পূজারীরূপে। যক্ষপুরে সে আনল বিপ্লবের রক্তস্রোত, কিন্তু একটা ভাঙা তানপুরা হাতে সে গাইতে গাইতে চলেছে এই ভাবেই কবি তাকে আমাদের কাছে প্রতিভাত করেছেন। আশাবাদ তার মধ্যে মূর্ত্তি নিয়েছে, দুঃখ ও নৈরাশ্যবাদের কোন ধারই সে ধারে না। তাকে সঙ্গে পেলে খোদাইকরদের কাজের রশি যায় খুলে, খোদাই হয়ে ওঠে খোদাই-নৃত্য। সে নবযুগের প্রবর্ত্তক, যা কিছু দীন, প্রাচীন ও গতানুগতিক তাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্যই তার আবির্ভাব। অদ্ভুত তার শক্তিকে নন্দিনী একটিমাত্র বাক্যে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছে। "নদীর মতই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে—" এই হ'ল রঞ্জনের পরিচয়।

রঞ্জনকে জীবিত অবস্থায় আমরা পাই না কেন—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। সমস্ত নাটকখানির মধ্যে আমরা নন্দিনী-রঞ্জনের মিলনের আভাস পাই, কিন্তু সে মিলন বাস্তবে সম্ভব হয় না। নন্দিনী যখন রঞ্জনের সাক্ষাৎ পায়, তখন নিষ্ঠুর যন্ত্রশক্তির নিষ্পেষণে সে প্রাণ হারিয়েছে। "জাগো—রঞ্জন—জাগো"—বলে নন্দিনী তাকে আকুল আগ্রহে ডাকে—কিন্তু রঞ্জন আর জাগে না। যক্ষপুরের রাজাও পারেন না তাকে জাগাতে—বলেন, "আমি জাগরণের মন্ত্র জানি না নন্দিনী, জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।"

রঞ্জনের এই মৃত্যু যক্ষপুরে বিপ্লবের আগমনকে ত্বরান্বিত করবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বিপ্লবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজারী যখন যন্ত্রের চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল, সেই মুহূর্ত্তেই যক্ষপুরে বিপ্লবের সূচনা। নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর মালা আর নীলকণ্ঠ পাখীর পালক পৌঁছেছিল রঞ্জনের হাতে। তার মৃত্যুর মধ্যেই হ'ল বিপ্লবের বিজয়, যাত্রার সূত্রপাত। রঞ্জনের মৃত্যু তাই সার্থক। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সে হ'ল মৃত্যুঞ্জয়। রঞ্জনের মৃত্যুতে নন্দিনী যেমন বিচলিত হয়েছে তেমনি বিচলিত হয়েছে যক্ষপুরের রাজা। নন্দিনী ছুটে গেল উন্মত্ত জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যন্ত্রসভ্যতার বন্দী-দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, যক্ষপুরের রাজা যন্ত্রসভ্যতার অধীশ্বর নিজেও লেগে পড়লেন, নিজের গড়া যন্ত্রকে নিজেই চুরমার করে দেবার কাজে। রঞ্জনের মৃত্যুর সার্থকতা এইখানেই। তার সঙ্গে নন্দিনীর মিলনও এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সাধিত হ'ল। যক্ষপুরে যে নবযুগের সূচনা হ'ল তারই মধ্যে হ'ল নন্দিনী-রঞ্জনের সত্যমিলন। চির-মিলনের যে রক্তরাখী বাঁধা হ'ল বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, তা আর কোনদিন ছিন্ন হবে না।

রাজা : রক্তকরবীর রাজা রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাজার চরিত্রের মাধ্যমে আশ্চর্য্য কৌশলে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করেছেন, যক্ষপুরীর অধীশ্বর এই রাজা থাকেন একটা অত্যন্ত জটিল জালের অন্তরালে। তাঁকে কেউ কোনদিন চোখে দেখে নাই, কিন্তু তাঁরই অদৃশ্য নির্দ্দেশে প্রত্যেকে পরিচালিত। আজকের যুগের সভ্যতা যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেও ত এমনি একটি রহস্যময় শক্তি—যার স্বরূপ কারও কাছে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাত নয়। জটিল জালের আবরণে আবৃত রাজার সাহায্যে এই শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এই রাজা হলেন সভ্যতার প্রাণপুরুষ, তাঁকে মানবাত্মা বা বিশ্বমানবাত্মা যাই বলা হউক না তাঁরই ইচ্ছায় এই সভ্যতা বিবর্ত্তিত ও পরিচালিত। রাজার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় অল্পই—তাঁর পরিচয় প্রধানতঃ আমরা পাই নন্দিনীর বর্ণনায় এবং নন্দিনীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, জালের আবরণ ভেদ করে রাজাকে কেউ চোখে দেখে নি, শুধু নন্দিনী দেখেছে। "দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড, কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ীর সিংহদ্বার। বাহু দুটো কোন দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল", এই হ'ল রাজার মূর্ত্তি, রাজার মধ্যে যে জিনিসটি নন্দিনীকে মুগ্ধ করেছে—সে হ'ল তাঁর শক্তির বিপুলত্ব। "যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে সেগুলোকে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম", এই যে বিপুলশক্তি রাজা, ইনি একদিন জড়বাদীকেই চরম সত্য বলে মনে করেছিলেন। সব জিনিসকেই তিনি বুদ্ধির দ্বারা জানতে চেয়েছেন—যে জিনিস হাত দিয়ে ধরা যায় না, প্রাণ দিয়ে বুঝতে হয় তার 'পরে তাঁর কোন দরদ ছিল না। "সৃষ্টিকর্ত্তার চাতুরী আমি ভাঙ্গি, বিশ্বের মর্ম্মস্থানে যা লুকানো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই।" অদম্য তাঁর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা—"জানব—জানতে চাই" এই হ'ল তাঁর motto। তাঁর তৃষ্ণা আর লোভের অন্ত নাই. বস্তুবাদী যন্ত্রসভ্যতার প্রসাদে বস্তুর স্তূপ যে কত জমেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর অনির্ব্বাণ তৃষ্ণা মেটাতে কত প্রাণ যে বলি দিতে হয়েছে তারও শেষ নাই, তবুও তাঁর পাওয়ার তৃষ্ণা মেটে না, "আমি হয় পাব, নয় ত নষ্ট করব, যাকে পাই নে—তাকে দয়া করতে পারি নে, তাকে ভেঙ্গে ফেলাও খুব এক রকম করে পাওয়া", এই হ'ল তার স্বীকারোক্তি। নন্দিনীর আবির্ভাবে তাঁর মনে এল প্রথম সংশয়ের দ্বন্দ্ব, নন্দিনীকে তিনি কিছুতেই সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন নি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, এই ব্যর্থতা হতেই তাঁর মনের মধ্যে এসেছে একটা নূতন ভাবের প্রবাহ—দৃষ্টি পড়েছে জীবনের সেই দিকটিতে, যে দিকটি বুদ্ধিগ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়—হৃদয় দিয়ে যাকে অনুভব করতে হয়। অন্তরের মধ্যে এই ব্যর্থতাবোধ রাজাকে অধীর করে তুলেছে, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝে

পড়ে তাঁর সমস্ত সত্তা ব্যথিত হয়ে উঠেছে। নন্দিনীর মধ্যে রাজা দেখেছেন, "বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।" তাঁর মনে হয়েছে এতদিন তিনি যাকে পরমার্থ বলে মনে করেছিলেন সে ভুল, যা কিছু পেয়েছেন এবং চেয়েছেন সব মিথ্যা, তাঁর এই ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে কেউ নেই—সঙ্গ দিতে কেউ নেই। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত তিনি একা, একমাত্র নন্দিনীর মধ্যেই তিনি পেয়েছেন শান্তির সন্ধান—বিশ্রামের সন্ধান। বাইরের বাঁধানো ঐশ্বর্য্য আর বিপুল শক্তির অন্তরালে রাজার আত্মার করুণ ক্রন্দন—তাই বারে বারে শোনা যায়, "নন্দিনী, তুমি জান না আমি কত শ্রান্ত।"

রক্তকরবীর রাজার চরিত্রের মধ্যে তাঁর শক্তির বিপুলতা আমাদের তেমন করে চোখে পড়ে না, তাঁর অন্তরের মধ্যে সংশয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতটাই আমাদের মুগ্ধ করে, নন্দিনীর মধ্যে রাজা "নবীনের মায়ামৃগীকে" দেখতে পেয়েছেন। মন তাঁর মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ করে ধরতে পারেন নি বলে তাঁর চিত্তের মধ্যে বেধেছে সংঘাত, রাজার অন্তরের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের জন্যই যক্ষপুরে বিপ্লবের জয়যাত্রার পথ সুগম হয়েছে। রাজা অন্তরে বুঝতে পেরেছিলেন যে, নন্দিনীর মধ্যে যে নবযুগের বাণী সে একদিন জয়যুক্ত হবেই। তিনি নিজেও সেই নবযুগকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন, তাই তিনি বলেছেন, "যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেইদিন আগমনীর লগ্ন লাগবে।"···সেই পালের হাওয়া নিয়ে এল রঞ্জন, যক্ষপুরে যেদিন বিপ্লবের বিষাণ বাজল রঞ্জনের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে সেদিন নন্দিনীর হাতে হাত রেখে নিজের সৃষ্টিকে নিজেই ধ্বংস করার কাজে রাজাই হলেন অগ্রণী। "আজ আমাকে তোমার সাথী কর নন্দিনী", এই বলে তিনি আকুল আগ্রহে নন্দিনীকে ডেকেছেন। নন্দিনী প্রশ্ন করেছে—"কোথায় যাব?" রাজা উত্তর দিয়েছেন—"আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে—কিন্তু আমারই হাতে তোমার হাত রেখে, বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই সুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙ্গে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন, আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক—তাতেই আমার মুক্তি।" এমনি করে আত্মঘাতের মধ্য দিয়ে রাজার সমস্ত অতৃপ্তি, সমস্ত অসন্তোষ, সমস্ত শ্রান্তির ঘটেছে অবসান।

বিশুপাগল: যক্ষপুরে নন্দিনীর মুগ্ধ-ভক্ত ও নিত্যসঙ্গী বিশু-পাগল। আজন্ম স্বপ্নবিলাসী বিশুপাগল—যক্ষপুরীর সঙ্গে সে একেবারে বেখাপ। নন্দিনীর মুগ্ধ-ভক্ত সে চিরদিন। নন্দিনী ওর অন্তরের মধ্যে জ্বেলে দিল অনির্ব্বাণ আলো—কণ্ঠে এনে দিল সুর। সুরে সুরে তাই বিশুপাগল যক্ষপুরে বিপ্লবের আগমনী গেয়ে বেড়িয়েছে। যক্ষপুরে বিশুর থেকে জনপ্রিয় ছিল না কেউ—তাই বিশুকে জয় করার সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক কাজ হয়ে গেছে। বিশুর চরিত্রে সার্থকতার অভাব নেই মোটেই, তাকে না হলে রক্তকরবীর কাহিনী গড়ে উঠতেই পারত না। নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর পরিচয় নূতন নয়। কিন্তু নন্দিনীর হৃদয় জয় করেছিল রঞ্জন। সেখানে বিশুর কোন ঠাঁই ছিল না, বিশু তখন অন্য একটি মেয়েকে বরণ করে নিয়ে নিজের ব্যর্থ জীবনে সান্ত্বনা খুঁজেছিল, সে-ই বিশুকে নিয়ে এল যক্ষপুরের স্বর্ণচূড়ার নীচে। তখন ঘোর ভেঙ্গে বিশু দেখল, যাকে সে তৃষ্ণার জল মনে করেছিল সে মরীচিকা মাত্র, কিন্তু তখন আর ফিরে যাবার পথ ছিল না, বিশুকে তাই যক্ষপুরীর জঠরের মধ্যে তলিয়ে যেতে হ'ল বাধ্য হয়ে, নিরুপায় ভাবে। এমনিই সময় ঘটল নন্দিনীর আবির্ভাব, বিশু চমকে জেগে উঠে দেখল তার মধ্যে এখনও রয়েছে আলো, এখনও রয়েছে সুর। বিশুর কাছে নন্দিনী তাই "দুখজাগানিয়া"। সে কোন দুঃখ, নন্দিনীর মধ্যে বিশু যার সংবাদ পেয়েছে? সে কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ, সে দুঃখ নয়—সে ত পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটিকে বিশু নন্দিনীর মধ্যে দেখতে পেয়েছে। এ দুঃখের পরিচয় নন্দিনী রঞ্জনের কাছে পায় নি, রঞ্জনের মধ্যে আশাবাদ মূর্ত্তিমন্ত দুঃখবাদকে সে আমলই দেয় না, কিন্তু বিশুর মুখের গান শুনে নন্দিনীর মনে হয় তার কাছে বিশুর যেন অনেক পাওনা ছিল; কিছুই তার দেওয়া হয় নি, বিশু ফিরেও চায় নি কিছু। সে সুখী হয়েছে যক্ষপুরে নন্দিনীর বাণীকে প্রচার করে—বিপ্লবের জয়গান করে। নন্দিনীর স্পর্শে ওর মনটা স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠেছে—সর্দ্দারদের ভয় করে চলতে ঘৃণাবোধ হয়েছে। অসন্তোষ তাই মুখর হয়ে উঠেছে বিশুর মুখে। সর্দ্দারকে সে মুখের উপর জানিয়ে দিয়েছে যে, যক্ষপুরীর পাষাণ প্রাচীর কেমন করে ভেদ করা যায়—সেই পরামর্শই তাদের মধ্যে চলছে। যক্ষপুরীর নিয়মানুসারে শাস্তি পেতে তার দেরী হয় না, কিন্তু তার শাস্তিতে যক্ষপুরের সমস্ত খোদাইকরের দল বিদ্রোহী হয়ে উঠে—কারণ তার সুন্দর ব্যবহারের জন্য যক্ষপুরের সমস্ত কারিগর তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসত। বিশুকে যে বন্দীশালায় সর্দ্দারের বন্দী করে রেখেছিল, কারিগরের দল সে বন্দীশালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। তাদের সমস্ত সৈন্যদল নিয়েও সর্দ্দাররা তাদের রুখতে পারে না। যক্ষপুরে এমনই করেই হ'ল বিপ্লবের সুরু।

নন্দিনীর দুই সাথী, বিশু আর রঞ্জন। রঞ্জন নিয়ে আসে নবযুগ—ভেঙ্গে দেয় পুরাণো যুগের প্রাচীর। বিশু গায় বিপ্লবের গান। যক্ষপুরে ঘনিয়ে তুলে অসন্তোষ—ভেঙ্গে দেয় সোনার নেশায় পাগল কারিগরদের মোহনিদ্রা। বিশু আর রঞ্জন তাই পরস্পরের গভীর পরিপূরক। তফাৎ শুধু এই যে, রঞ্জন পায় নন্দিনীর হৃদয়—বিশু চিরবঞ্চিত। বিশু তাই বলেছে, "আমি রঞ্জনের ওপিঠ—যে পিঠে আলো পড়ে না।"

অধ্যাপক: রক্তকরবীর একটি বিশেষ চরিত্র অধ্যাপক। অধ্যাপক হচ্ছে জড়-বিজ্ঞান—আধুনিক সভ্যতার একটি প্রধান স্তম্ভস্বরূপ সে। সমস্ত বস্তুর তত্ত্বকে জানবার জন্য তার অদম্য উৎসাহ—এমনকি নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর রংটুকু পর্য্যন্ত বাদ যায় না তাঁর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কোঠা থেকে। "তোমার রক্তকরবীর কঙ্কণ থেকে একটি ফুল খসিয়ে আমাকে দেবে? ওর রঙের তত্ত্বটি

বাঝবার চেষ্টা করব।" কিন্তু অধ্যাপকের বস্তু-তত্ত্ববিদ্যার ভিত্তিতেও টান লাগাল নন্দিনী। তাই নিরবকাশ লেবরেটারীতে সে তত্ত্বানুসন্ধানে আর মন বসে না অধ্যাপকের। মন ছুটে চলে নন্দিনীর পানে—যাকে দেখে তাঁর মনে হয় জড়-বিজ্ঞানের অতীত একটা কিছু আছে যার নাগাল রাসায়নিক বিশ্লেষণাগারের মধ্যে মেলে না। নন্দিনীকে নিয়ে অধ্যাপকের তাই বিস্ময়ের আর অন্ত নাই। বস্তুতত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাই নন্দিনীর প্রতি অধ্যাপকের আহ্বান—"ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে চলে যাও কেন? যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে! একটু দাঁড়াও—দুটো কথা বলি!"

আজকের দিনে জড়-বিজ্ঞানীদের অন্তরে সংশয় দেখা দিয়েছে যে, বস্তু-বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়ত সম্ভবপর নয়—অধ্যাপকের মনের সংশয়ের মধ্যে সেই সংশয়েরই ব্যঞ্জনা।

কিশোর: আর একটি চরিত্রের সমালোচনা না করলে রক্তকরবীর চরিত্র সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে চরিত্র হচ্ছে বালক কিশোরের। নিষ্পাপ কিশোর, বালিকার মত কচি, প্রাণ-কচি-মুখ কিশোর। নন্দিনীর ভক্ত কিশোর—বড় সুন্দর সুকুমার এই চরিত্রটি। সাধারণের ছেলে সে, যক্ষপুরে সুড়ঙ্গ খোদাই করা তার কাজ, কিন্তু নন্দিনীর বাণী কেমন করে তার প্রাণে জ্বালিয়ে দিল আলো, সে হ'ল নবজীবনের পূজারী, নন্দিনীকে ফুল জোগানোর ভার পেয়ে সে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ মনে করেছে। কাজে ফাঁকি দিয়ে রক্তকরবী খুঁজে আনতে গিয়ে শাস্তি পেতে হয় তাকে, কিন্তু সে শাস্তি তাকে বাজে না। নন্দিনী ব্যথিত হয় তার শাস্তিতে। কিন্তু কিশোর বলে, "ওদের শাস্তির ব্যথায়—আমার ফুল আরও বেশী করে আমারই হয়ে ফোটে, ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।" উপরওয়ালার মারকে সে ভয় করে না সামলে চলতে সে নারাজ—"না, না, না, আমি সামলে চলবো না, চলবো না, ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই তোমাকে ফুল এনে দেব।" নির্ভীক-প্রাণ বালক কিশোরের, শিরায় শিরায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে, নন্দিনী যে নবযুগের দূতী, তার জন্ম একদিন প্রাণ দেবার কল্পনায় তার উৎসাহের সীমা নাই। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী—এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।" সে ইচ্ছা তার অপূর্ণ রইল না, নন্দিনীর কাজেই সে একদিন আত্ম-বলিদান করে ধন্য হ'ল। রঞ্জন যেদিন যক্ষপুরে এসেও সর্দারদের চক্রান্তে নন্দিনীর সঙ্গে মিলিত হতে পারে নি—সেদিন রঞ্জনকে খুঁজে বের করবার কঠিন কাজের ভার নিয়েছিল কিশোর, সে কাজ সে সুন্দরভাবে সমাধান করেছিল—নন্দিনীর দেওয়া রক্তকরবীর কঙ্কণ আর নীলকণ্ঠ পাখীর পালক সে পৌঁছে দিয়েছিল রঞ্জনের হাতে। তারপরে কি ঘটেছিল স্পষ্ট জানা নাই, শুধু এইটুকু জানা যায় যে, উদ্ধত বাক্যে স্পর্দ্ধা করে সে যক্ষপুরীর রাজাকে গিয়েছিল আক্রমণ করতে। তারপরই বুদ্ধদের মত সে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল।

এই কিশোর চরিত্রের মধ্যে রূপ নিয়েছে চিরযুগের কিশোর আর চিরদিনের নবীন। এই কিশোরের দল ফুলের মত নির্ম্মল আর নিষ্পাপ—অথচ সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে নব নব আদর্শকে বুকে তুলে নিয়েছে এরাই—প্রাণভরা শ্রদ্ধায় নতমস্তকে নবযুগের দূতীর পায়ে এনে দিয়েছে পুষ্পাঞ্জলি। পুরাতন প্রচলিত বিধির কঠোর শাসনকে তারা ভয় করে নি—মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছে হাসিমুখে আর তাদেরই রক্তস্রোতে ধুয়ে মুছে গেছে—পুরাতন যুগের যত জীর্ণতা, যত কালিমা।

ক্রমশঃ

পুত্রের প্রতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এ সংসারে তুমি, পুত্র, মোর প্রিয়তম!
আমার আত্মজ তুমি; তোমার জনম
মোর আত্মা হতে। তব রক্তের ধারাতে
বহিতেছে মোর রক্ত। স্বপনের সাথে
মিশে আছে মোর স্বপ্ন। ঐ তব মন
আমারই মনের মাঝে পেয়েছে গড়ন।
আজ আমি ভগ্নস্বাস্থ্য—দূরে যাই চলে!
শতজীবী হয়ে, বৎস, ধরণীর কোলে
তুমি থাকো সগৌরবে—আশীর্ব্বাদ করি।
ভ্রমিণু সংসার-পথে বহু বর্ষ ধরি;
যা শিখিনু শোন বৎস: দীর্ঘসূত্রিতারে
দিও না প্রশ্রয় কভু। উৎসাহী যে—তারে
লক্ষ্মী দেন বরমাল্য। জীবন—লড়াই;
বীরভোগ্যা হেথা নাই দুর্ব্বলের ঠাঁই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে চব্বিশপরগণা

শ্রীকালিদাস দত্ত

চব্বিশ পরগণা জেলা গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময় ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে কালিন্দী ও যমুনা নদী, উত্তরে নদীয়া জেলা এবং পশ্চিমে ভাগীরথী নদী। এই জেলার ভূভাগ কত প্রাচীন তাহা আজিও অজ্ঞাত। এ প্রদেশে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুসমূহের সঠিক বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশিত না হওয়ায় অনেকের ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা ছিল। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, ভাগীরথী নদীর পলিতে বঙ্গোপসাগরে দ্বীপসমূহ গঠিত হইয়া দুই-এক হাজার বৎসরের মধ্যে গাঙ্গেয় বদ্বীপের এই অংশের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণে ভাগীরথী নদীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে কপিলাশ্রমরূপে সর্ব্বপ্রথম এই প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে কথিত আছে যে, পৌরাণিককাল ত্রেতাযুগে, সগর সন্তানগণের উদ্ধার কারণ, সগরবংশীয় নরপতি ভগীরথ গঙ্গানদীকে কপিলাশ্রমে আনয়ন করেন এবং তদবধি গঙ্গা ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধ হয়।

রামায়ণের ঐ কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, ভগীরথের গঙ্গা আনিবার পূর্ব্বে এ প্রদেশে ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল এবং মহর্ষি কপিল সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেচ-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স সাহেব ভাগীরথী নদীকে দেখিয়া উহা, গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন কারণ, গঙ্গার সহিত সংযোগকারী একটি কৃত্রিম প্রবাহ বলিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রামায়ণের উক্ত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :

"If one reads carefully the account in the Ramayana one sees the reference is to the diversion of a portion of the perennial waters of the Ganges, which 60,000 of the king's subjects could not accomplish, but which Bhagirath, the king's grandson, accomplished by his ingenuity. These spiritual interpretations of physical facts in the old classics are delightful studies (১),"

কিছুদিন পূর্ব্বে ভূতত্ত্বানুসন্ধানে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশের ভূগর্ভে যে সমস্ত ভূতত্ত্ববিষয়ক নিদর্শন পাওয়া যায় তদসমুদয় হইতেও জানা গিয়াছে যে, অতীত যুগে তথাকার ভূখণ্ডের একাধিকবার অবনমন সংঘটিত হইয়াছে (২)। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ ওল্ডহাম সাহেব সেখানে ভূস্তর পরীক্ষাকালে ভূগর্ভের অধিক নিম্নদেশে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে অসংস্কৃত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পান, তাহা হইতে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ অতীত যুগে ঐ অঞ্চলে প্রস্তরের পাহাড় ছিল যাহা ভূমি অবনমনে বসিয়া গিয়া এবং তদুপরি পলি পড়িয়া তথাকার বর্ত্তমান ভূখণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে (১)। ঐ বিষয়ে তাঁহারও উক্তির কিয়দংশ এইরূপ :

"The evidence (of depression) is confirmed by the occurrence of pebbles, for it is extremely improbable that coarse gravel should have been deposited in water eighty fathoms deep, and large fragments could not have been brought to their present position unless the streams which now traverse the country had a greater fall formerly, or unless, which is more probable, rocky hills existed which have now been covered up by alluvial deposits (২)."

ভূতত্ত্বানুসন্ধানে লব্ধ উপরোক্ত তথ্যাদি হইতেও জানিতে পারা যায় যে, অতীত যুগে চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বহু প্রাচীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। কোন কোন সময়ে কি কারণে তথায় ঐ প্রকার অবনমন ঘটে তাহা অজ্ঞাত। কেহ কেহ ভূমিকম্পকে উহার কারণ বলিয়াছেন (৩)। উহার জন্যই বোধ হয় ঐ প্রদেশের ভূপৃষ্ঠ অন্যান্য নদীমাতৃক বদ্বীপের ন্যায় সমতল নহে এবং উহার পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্ব্বাংশ নিম্ন (৪)। ইদানীং চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অংশে যে সমস্ত জলাভূমি আছে সেগুলিরও সৃষ্টির বোধ হয় উহাই কারণ। রেণেল প্রভৃতি সাহেবগণের পুরাতন মানচিত্রগুলিতে যমুনা ও ভাগীরথী নদী দুইটির মধ্যভাগে ঐরূপ জলাভূমির সংখ্যা আরও বেশী দেখা যায়। এই সকল নিদর্শন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই জেলার ভূভাগ নবীন নহে এবং ভূমি অবনমনে উহার প্রাচীন অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

---

(১) Lectures on the Ancient System of Irrigation in Bengal. Page 13.

(২) Manual of Geology of India (1892), R. D. Oldham. The Gangetic Delta. Major Sherwell. The Calcutta Review, 1859.

---

(১) ভূগর্ভের অধিক নিম্নদেশে ঐরূপ প্রস্তর থাকায় সম্প্রতি ঐ প্রদেশের লট অঞ্চলে গভীর নলকূপ বসান সম্ভব হয় নাই। সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়াছে।

(২) Manual of Geology of India.

(৩) Hunter's Statistical Account of Bengal. Vol. I. Pages 292-293.

(৪) "The land near the banks of the two great rivers, the Hugli and Meghna, that is to say, in the 24 Parganas and in the Bakargunj districts, lies comparatively high, with the

এতদিন নিম্নবঙ্গের এই অংশ নবীন ধারণায় এখানকার কোন প্রাচীন স্থানে কোনরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বিবেচিত হয় নাই। যদিও বহুদিন পূর্ব্বে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেড়াচাঁপাকে বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্থানগুলির

১। প্রস্তরের ছেদনাস্ত্র (Celt)
প্রাপ্তিস্থান—হরিনারায়ণপুর, থানাকুলপী

অন্ততম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন (১) এবং ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই লেখক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পুরাকীর্ত্তিসমূহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন :

"বাংলার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হইলে বাংলার সমতল ভূমিকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শ্রীকালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহুস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশেও গুপ্ত ও পালযুগের বহু গ্রাম নগর বিত্তমান ছিল। এ অঞ্চলে রীতিমত অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাংলার সমতল ভূমিকে আমরা যতটা নবীন বলিয়া মনে করিতেছি উহা ততটা নবীন নহে এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে নবীন বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না (২)।"

সম্প্রতি উক্ত বেড়াচাঁপা এবং বোড়াল, আটঘরা ও হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বহুসংখ্যক মৌর্য্য ও সুঙ্গযুগের নানারূপ পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে—তদসমুদয় হইতে চব্বিশ পরগণা জেলায় ঐ সময়ের পূর্ব্বকালেও মানবসভ্যতা ছিল, তাহা

২। প্রস্তরের হাতুড়ি (Hammerstone)
প্রাপ্তিস্থান—হরিনারায়ণপুর থানাকুলপী

জানা যাইতেছে (৩)। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমলকুমার দত্ত ঐ প্রদেশে আবিষ্কৃত, প্রাগৈতিহাসিক পুরাবস্তুর অনুরূপ কয়েকটি দ্রব্যের পরিচয় দিয়া Modern Review পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহাতেও তিনি বলেন :

"The chance finds, described above, clerly indicate that Bengal with its lower regions, washed by numerous channels of the Ganges, is not of recent growth and archaeologically is of high importance. From the reference in the Vedic and Pauranik literature it also appears that this province was the home of primitive people for a long time (৪)."

---

ground sloping downwards towards the middle portion, comprising the whole of Jessore (Jessore-Khulna) and the eastern part of the 24 Parganas portion of the Sundarbans. This middle tract is low and swampy, and at no very distant period was doubtless one great marsh." Ibid. Pages 287-288.

(১) চন্দ্রকেতুগড় বার্ষিক বসুমতি, ১৩৩৩ সাল।

(২) প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ পৌষ, রবিবার, সন ১৩৪৪ সাল।

(৩) Archaeological Discoveries in Lower Gangetic Valley. D. P. Ghose, Science and culture, December, 1957. Archaeological Treasures from Harinarayanpur. P. C. Dasgupta. Free—Lance.

(৪) Some Early Antiquities from Lower Bengal. Modern Review, September, 1948.
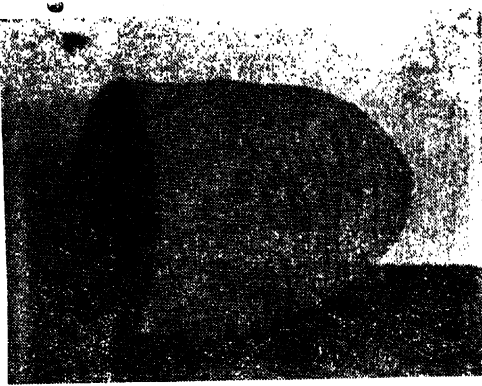
৩। হস্তনির্ম্মিত মৃৎপাত্র
প্রাপ্তিস্থান—রূপনগর, থানাজয়নগর

কিছুদিন হইল আমিও ঐ অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগের শিল্প-নিদর্শনের অনুরূপ কতকগুলি দ্রব্য আবিষ্কার করিয়াছি। তন্মধ্যে একটি Trap প্রস্তরের মসৃণ ছেদনাস্ত্র (Celt), একটি বালি প্রস্তরের হাতুড়ি (Hammerstone) ও একটি basket marks যুক্ত হস্তনির্ম্মিত মৃৎপাত্রের আলোকচিত্রের প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইল (চিত্র ১।২।৩)। পুষ্করিণী ও খাল খননকালে ভূগর্ভের অধিক নিম্নদেশ হইতে গুলি পাওয়া যায়। অবশ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনিত ভূগর্ভের বিদিত স্তরে না পাওয়া যাইলে ঐপ্রকার পুরাবস্তুর বয়স সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তথাপি অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক খননে প্রাপ্ত ঐশ্রেণীর নব্যপ্রস্তর যুগের দ্রব্যাদির সহিত উহাদের আকারগত সাদৃশ্য দেখিলে ঐ সমস্ত পুরাবস্তু ঠিক ঐ সময়ের না হইলেও, তৎকালীন মানবশিল্পের যে উদ্বর্তন (Survival) তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই সকল পুরাবস্তু ব্যতীত প্রত্নপ্রস্তর যুগের প্রস্তর আয়ুধ এবং মহেনজোদরো ও হারাপ্পায় প্রাপ্ত চিত্রিত মৃৎপাত্রের অনুরূপ কতকগুলি দ্রব্যও সম্প্রতি আশুতোষ মিউজিয়ামের সহকারী সংরক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, বারুইপুরের সান্নিধ্যে অবস্থিত, হরিহরপুর গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকাতে তিনি উহাদের সচিত্র বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন :

"The Paleolithic implements which have all come from Hariharpur are altogether four in number consisting of a typical chopper-chopping tool as also two so-called hand-axes and one knife or scraper whose shapes along with the striking platforms and flaking style remind us, among others, of the Levalloisean technique of the pre-historic Soan industry of the Punjab. The chopper is an exceptionally remarkable piece with a flat base, a fan-shaped cutting edge and a sharp piercing point, all of which are completely analogous with similar tools from the basin of the Beas and the Banganga.

"......That the region of Hariharpur-Mahinagar also flourished in pre-historic age long after the paleolithic times is strongly suggested by discovery of pointed pottery and associated archaic wares. While a fragment of a terracotta through incised with concentric circles painted in deep blue recalling similar types from the lower levels of Mohen-jo-Daro, and the blue of polychrome pottery of Nal, other deep wares bear black patches reminding us of similar treatment at Harappa (১)."

প্রস্তর যুগের মানবশিল্পের অনুরূপ উপরোক্ত নিদর্শনাদির আবিষ্কার হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, চব্বিশ পরগণা জেলাতেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের ন্যায় বহু প্রাচীন মানবসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নিম্নবঙ্গের সাগরতীরবর্ত্তী প্রদেশকে বয়সে নবীন বলিয়াছেন বলিয়া বেশী প্রাচীনকালে ইহার অস্তিত্ব ছিল না এইরূপ ধারণায় এখানে কোনরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চেষ্টা না করা ঠিক নহে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলেন এবং তাঁহাদের অনুসন্ধান ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের ন্যায় পাঁচ-সাত হাজার বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে।

আমাদের বিশ্বাস চব্বিশ পরগণা জেলার প্রাচীন স্থানগুলিতেও রীতিমত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য হইলে নিশ্চয়ই এখানকার প্রাগৈতিহাসিকযুগের মানবসভ্যতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। ঐপ্রকার অনুসন্ধানের অভাবে কেবলমাত্র চব্বিশ পরগণা কেন সমগ্র বাংলাদেশেরই ঐ সময়ের পুরাবৃত্ত আজিও অজ্ঞাত হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পিগট সাহেবও ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :

"Bengal a region is still almost unknown from pre-historic antiquities......The reason is that for want of proper and scientific explorations and excavations we do not know the early settlements that are buried deep in the Ganges silt under modern towns and cultivated fields (২)."

---

(১) Amrita Bazar Patrika. Tourist Supplement, March, 1959.

(২) Pre-historic India.
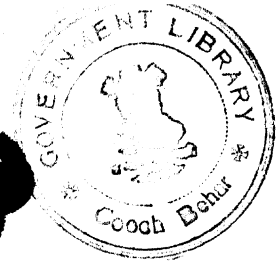
অভাবিত ঘটনাই বটে! অথচ কেউ বিস্মিত হ'ল না। এমনটি না ঘটলেই নাকি সকলে আশ্চর্য্য হতেন। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে ঘটনাটির আরম্ভ সে যে শুধু বিস্মিত হ'ল তাই নয়, কতকটা বিমূঢ় এবং বিহ্বল হয়ে পড়ল। স্বপ্ন সে বহু দেখেছে, কুমারী মনের সবখানি মাধুর্য্য এবং সুষমামণ্ডিত সে স্বপ্ন, যা তার রঙীন কল্পনার ভাঁজে ভাঁজে সযত্নে রক্ষিত আছে। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আজ সে প্রথম অনুভব করল যে, কত সীমাবদ্ধ ছিল তার চিন্তা করবার গণ্ডী। চোখ তার ঝলসে গেল। এত স্বাচ্ছন্দ্য তাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছে। প্রাচুর্য্যের এই যথেচ্ছাচারের মধ্যে সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনের সুরু থেকে আজকের দিনটির পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোথাও এক বিন্দু সামঞ্জস্য নেই, শ্রীমতী আজ এই কথাটাই শুধু বারে বারে ভাবছে।

কেনই-বা সে একথা ভাববে না। খানিকটা শিক্ষা শ্রীমতী পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে কিছুটা রূপও তার আছে। কিন্তু এমন মেয়ের আজকের দিনে অভাব কি? খোঁজ করলে অলিতে-গলিতে অগণিত পাওয়া যায়। অথচ কথাটা তার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কেউই আজ আর মানতে চায় না। যদিও তাদের এই মতামত এমন বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ করতে ইতিপূর্ব্বে আর দেখা যায় নি। অন্ততঃ শ্রীমতী কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না। তবুও শুনতে তার বেশ ভালই লাগছে। তাই সে নিঃশব্দে কান পেতে থাকে—ভাল ভাবে অবস্থাটা চিন্তা করে দেখতে সচেষ্ট হয়ে উঠে। স্বচ্ছদৃষ্টিতে অতনুর পানে চেয়ে থাকে। বলিষ্ঠ চেহারা, উজ্জ্বল গায়ের বর্ণ, ভাল মানুষটির মত চুপ করে বসে আছে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাম্ভীর্য্য নিয়ে। শ্রীমতীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পথে এই শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ কোন দিন পাওয়া যায় নি। তার চেনা মহলের মধ্যে কোনক্রমেই একে ফেলা চলে না। তাদের মধ্যে অতনুর আবির্ভাবটা নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা যেন।

এ ছাড়া অন্য কোন কথা শ্রীমতীর মনে আসছে না। নইলে বিদ্যায়, যশে, অর্থে যার কোথাও অপ্রাচুর্য্য নেই—শুধু নামটাই যাঁর পরিচয়ের বিজ্ঞাপন বহন করে বেড়ায়, এমনি একজন লোকই কিনা শেষ পর্য্যন্ত তাকে সহধর্ম্মিণী করতে চাইছেন। আর তাও উপযাচক হয়ে।

শ্রীমতীর মা প্রায় কেঁদে ফেললেন, বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। দাদা দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি জানাল, যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করে ফেলল সকলকে। মা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট ফুটে উঠল বিরক্তির ভাব। তিনি ধমক দিলেন, খোকা—

অরুণ মায়ের কথা গায়ে না মেখে বলল, তুমি মিথ্যে রাগ করছ মা। একটু ভেবে দেখলেই তুমিও বুঝবে যে, এমন অসম আত্মীয়তা কোনদিনই শেষ পর্য্যন্ত আনন্দের হয় না।

পুত্রকে থামিয়ে দিয়ে রাণী বললেন, শ্রীর ভালমন্দ নিয়ে যাঁর চিন্তা করবার তিনিই করবেন। তুমি দয়া করে চুপ করে থাকলেই আমি খুশী হব অরুণ।

অরুণ মায়ের কথায় হেসে জবাব দিল, আমি কথাটা তোমাদের একবার মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। তা ছাড়া কথাটা বাবাই সব সময় বলেন কিনা—

প্রণব অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলেন। অরুণের আজকের আপত্তিটা তাঁরই শিক্ষার সামান্যতম প্রকাশ। এর পরে রয়েছে শ্রীমতী, অথচ এদের গর্ভধারিণীর ভাবগতিক দেখে তিনি মুখ খুলতেই ভরসা পাচ্ছেন না। তবুও তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভাবতে হবে বৈকি অরুণ। এটা যে একটা ছেলেখেলা নয় তা আমরা জানি। একটা মূল্যবান জীবনের ভবিষ্যৎ কখনও এক কথায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, যার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে আমরা চিন্তা করছি তার মতামতটাও জানতে হবে অরুণ।

অরুণ খুশীমনে প্রস্থান করল। কিন্তু ঘটনাটির এখানেই শেষ হ'ল না। স্কুলমাষ্টার প্রণবের কোন যুক্তিই তাঁর স্ত্রীর কাছে টিঁকল না। স্বামীকে একান্তে পেয়ে তিনি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করলেন। বললেন, তোমাদের মতলবটা কি শুনি?

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, না না, মতলব আবার কি থাকতে পারে।

রাণী প্রশ্ন করেন, তা হলে দ্বিধা করছ কেন?

প্রণব হাসলেন। মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, অতনু একটা প্রস্তাব করেছেন বলেই সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করা চলে না। ভেবে দেখবার অনেক কিছু আছে।

রাণী বললেন, কিন্তু তোমাদের এই দ্বিধাকে যদি সে অপমানজনক মনে করে শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে যায়?

প্রণব গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, তা হলে চিরদিন আক্ষেপ করব রাণী—

আর সেইসঙ্গে অদৃষ্টকে ধিক্কার দেবে না? রাণীর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

প্রণব এ বিদ্রূপ গায়ে মাখলেন না। শান্তকণ্ঠে বললেন, দরকার হলে তা দেব, তবুও কারুর কথায় চোখ বুজে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব নয়।

কথা কটি খুব শান্তকণ্ঠে বলা হলেও এর অন্তর্নিহিত দৃঢ়তায় রাণী ভিতরে ভিতরে বিচলিত হলেন এবং ক্ষণকাল নিঃশব্দে চিন্তা করে তাঁর তূণীর থেকে সবচেয়ে বিষাক্ত বাণটি তুলে নিয়ে নির্ম্মম আঘাত করলেন, তোমার ঐ আদর্শ আদর্শ করে আমার ইহকালটি ত অন্ধকার করে দিয়েছ, সুখ কাকে বলে তার মুখ দেখাও ভাগ্যে হ'ল না, কিন্তু তাই বলে তোমাদের ঐ ফাঁকা কথায় ভুলে আমার একমাত্র মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে তোমাকে আমি দেব না।

এই আকস্মিক আঘাতে প্রণব বিব্রত হলেন। ম্লানকণ্ঠে বললেন, তুমি মিথ্যে রাগ করছ রাণী। এখন তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা।

রাণী থামতে পারলেন না—আলোচনা করবার মুখ থাকলে ত করবে। ত্যাগ আর ত্যাগ। আজীবন নিজের মতে চলে পেলে কতটুকু? শুধু অভাব-অনটনের জ্বালা ছাড়া? স্কুল মাষ্টারের স্ত্রী বলে কি বড় কিছু আশা করতেও নেই!

এ অভিযোগের কোন জবাব প্রণব দিলেন না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে প্রস্থান করলেন এবং নিজের ঘরে এসে এক বাণ্ডিল পরীক্ষার খাতা নিয়ে বসলেন, কিন্তু খাতা দেখায় মন দিতে সক্ষম হলেন না। রাণীর অনুযোগগুলি তাঁর মাথার মধ্যে তাণ্ডব সুরু করে দিয়েছে। রাণী তাঁর সহধর্ম্মিণী, তাঁর সাধনার সম-অংশভাগিনী, এই কথাটাই তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছেন। আঘাতটা তাই বুকে বড় বেশী বেজেছে। কন্যাকে কেন্দ্র করে রাণীর মনের পুঞ্জীভূত অসন্তুষ্টি আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। প্রণব দুঃখ পেলেও কোনপ্রকার প্রতিবাদ করলেন না। তা ছাড়া সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে রাণীকে হয় ত দোষ দেওয়া উচিত হবে না।

প্রণবের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল। শ্রীমতী নিঃশব্দে পিতার পাশে এসে দাঁড়াল। খানিক তাঁর মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলল, খাতা খুলে বসে আছ, কিন্তু একটি লাইনও দেখ নি যে বাবা? কি ভাবছিলে তুমি? কথাটা শেষ করে সে হাতের পেয়ালাটি টেবিলের উপর রাখল। পিতার জন্যে সে চা নিয়ে এসেছে।

প্রণব সংগোপনে একটি নিশ্বাস মোচন করে বললেন, ভাবনার আর অন্ত কি মা! ঘরে বাইরে কোথাও কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবার যো আছে?

শ্রীমতী একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, তুমি লুকাচ্ছ বাবা। এসব ত তোমার রোজকার ভাবনা, অভ্যস্ত হয়ে গেছ তুমি।

প্রণব ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, ঠিক তাই মা, কিন্তু এতদিন ধরে জমিয়ে রেখে রেখে এখন দেখছি তা পর্ব্বত-প্রমাণ হয়ে উঠেছে, তাই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি, এতদিন শুধু নিজের আনন্দেই বিভোর ছিলাম, তাই কারুর কথাই আলাদা করে ভেবে দেখি নি, কিন্তু আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান মা—

শ্রীমতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন জবাব দিল না।

প্রণব থামতে পারেন না—মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি আদর্শ শিক্ষক হতে গিয়ে। যার জন্য পার্থিব অনেক-কিছু থেকেই তোমাদের বঞ্চিত হতে হয়েছে। কথাটা তোমাদের মা আজ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কাজটা তিনি এত দেরীতে করেছেন যে, আজ আর কোন সহজ পথই আমার চোখে পড়ছে না। আমার আদর্শ আমাকে একেবারে গিলে ফেলেছে মা।

শ্রীমতী তার স্বল্পভাষী পিতার মুখে এত কথা শুনে বিস্মিত হ'ল। বলল, তুমি অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠছ বাবা।

প্রণব শান্তগলায় প্রতিবাদ জানালেন, চঞ্চল হই নি মা, ভয় পেয়েছি। মনে হচ্ছে, যে সামান্য পুঁজি নিয়ে আমি সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম তা আমার এত দিনে তলিয়ে গেল, কি নিয়ে বাঁচব বলতে পার শ্রী?

শ্রীমতী রাগ করে বলল, তোমার আজ কি হয়েছে বাবা তা আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কাল্পনিক ভয় তোমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু এ কথাটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে, যাকে নিয়ে তোমাদের এত বড় একটা সমস্যা তাকেই তোমরা সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা করছ কেন বাবা! তার মতামতটা যেন কিছুই নয়।

প্রণব যেন একটু চমকে উঠলেন। শ্রীমতী একথা বলতে পারে। তিনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, উপেক্ষা করব কেন মা। তোমরা সকলে মিলে যদি আমাকে দুর্ভাবনা থেকে রেহাই দিতে পার তা হলে ত বেঁচে যাই। ভাবতে শিখি নি বলেই না আজ এত দুর্ভাবনা।

প্রণব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। শ্রীমতী খানিকটা অপ্রস্তুতের মত ঘর থেকে চলে গেল।

শেষ বিন্দু চাটুকু পান করে প্রণব পেয়ালাটি নামিয়ে রাখলেন। আর একবার নতুন করে খাতাপত্রে মনোযোগ দেবার বৃথা চেষ্টা করে কতকটা নিজেরই উপর রাগ করে সব তুলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন। মাথাটা তাঁর দপ দপ করছে। বাইরের মুক্ত বাতাসের প্রয়োজন বোধ করছেন তিনি।

মুক্ত প্রান্তরে এসে তাঁর মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হ'ল। অনেকক্ষণ আবদ্ধ থেকে কেমন ঝিম ধরে গিয়েছিল। প্রণব অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে অপেক্ষাকৃত একটা নির্জ্জন স্থানে এসে পড়েছেন। এখনও সন্ধ্যা হয় নি, সম্মুখের পাহাড়ের ওপাশটায় আকাশে যেন আগুন ধরে গেছে। রেল লাইনের পাশের পায়ে চলা পথ ধরে তিনি অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। অদূরে জনকয়েক স্ত্রীপুরুষ দেখা দিয়েছে এই সময়টায় এ অঞ্চলে বহু চেঞ্জারের আবির্ভাব ঘটে। আরও খানিক অগ্রসর হতে খেরুয়া নদীর শীর্ণ জলরেখা চোখে পড়ল। আর নয় এবারে ফেরা যাক—প্রণব ভাবলেন। দূরের লোকগুলিও কাছে এসে পড়েছে।

প্রণব হাঁক দিলেন, কেও, প্রিন্সিপ্যাল নাকি? এলেন কবে?

এতক্ষণে ওঁরা কাছে এসে পড়েছেন। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না রেখেই প্রণব পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কত দিন থাকবেন এবারে?

প্রিন্সিপ্যাল সুবিনয় চৌধুরী সবগুলি প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দিলেন, কাল সন্ধ্যায় এসেছি, এক মাসের ছুটিতে। একটু থেমে কতকটা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে তিনি পুনশ্চ বললেন, দেখা হয়ে ভালই হ'ল, আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম। সুখবরটা আমরাও পেয়েছি, বড় আনন্দের কথা।

প্রণব যেন কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কিসের কথা বলছেন আপনি?

সুবিমল হেসে বললেন, শ্রীমতীর কথা বলছিলাম, প্রণব বাবু—

প্রণব চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন। ইচ্ছে করেই তিনি একটু পিছিয়ে পড়লেন। আর সকলে এগিয়ে গেল। প্রণব মৃদুকণ্ঠে বললেন, কিন্তু আপনাদের এই সুখবরটা আমার যে একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে প্রিন্সিপ্যাল।

দুর্ভাবনা! সুবিমল বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এর মধ্যে দুর্ভাবনার কি থাকতে পারে? তবে যদি…।

সহসা তিনি থামলেন, একটু ইতস্ততঃ করে পুনরায় বললেন, অবশ্য শ্রীমতীর নিজস্ব কোন আপত্তি থাকলে সে আলাদা কথা।

প্রণব চঞ্চল হয়ে উঠলেন, না না প্রিন্সিপ্যাল, বাধা শ্রীমতীর তরফ থেকে আসে নি। আমি নিজের মনে সায় পাচ্ছি না, আমার আজীবনের চিন্তাধারার সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছি না।

সুবিমল একটু হেসে বললেন, আপনি বোধ হয় আর্থিক অসমতার কথাটা বড় করে ভাবছেন মাষ্টারমশাই।

প্রণব সায় দিলেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

সুবিমল জিজ্ঞেস করলেন, শ্রীমতী বলে কি?

প্রণব বললেন, শ্রীমতী এবং তার গর্ভধারিণীকে খুব আগ্রহশীল মনে হয়—

সুবিমল হেসে জবাব দিলেন, তা হলে ত চুকেই গেল।

প্রণব বার বার মাথা নাড়তে থাকেন, কিন্তু আমি নিজেকে কি বোঝাব বলতে পারেন। আমি এত দিন ধরে যা কিছু বলে এসেছি সবই যে মিথ্যে হয়ে যাবে প্রিন্সিপ্যা, অরুণ ত স্পষ্টই একথা বলে গেল।

সুবিমল হেসে বলেন, কিন্তু আপনার সমস্যা ত অরুণকে নিয়ে নয় মাষ্টারমশাই। আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তা হয় ত যাবে।

প্রণব বাড়ী ফিরে এসে পুনরায় একই প্রশ্ন করতে শ্রীমতী গভীর কণ্ঠে জবাব দিলে তুমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ বাবা। মুখে তুমি মাকে অনুযোগ দিচ্ছ অথচ ভিতরে ভিতরে তুমি নিজেও যথেষ্ট দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ।

প্রণব কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

শ্রীমতী বলে চলল, আজ তোমার সামনেও একটা পরীক্ষা দেখা দিয়েছে বাবা, তোমার শিক্ষার আর আত্ম-বিশ্বাসের পরীক্ষা। তোমাদের সব কথা আমার কানে গেছে বলেই একথা আমাকে বলতে হচ্ছে, অযথা তুমি মন খারাপ করো না।

প্রণব অভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি তোমার মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করছ মা?

না বাবা। শ্রীমতী জোরের সঙ্গে জানাল, আমি

আমার কথাই তোমাকে বলেছি, তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বলেন, আশীর্ব্বাদ তোমাদের সব সময়ই করি মা। তবে কি জান শ্রী, এক গাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে কি ?

শ্রীমতী মৃদু কণ্ঠে বলল, গাছের কথা জানিনে বাবা, কিন্তু মানুষের বেলায় সবই সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। একটু থেমে সে পুনরায় বলল, তুমি যা শিখিয়েছ আমরা তা শিখেছি, কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে পাছে ভুল করে বসি এই ভেবে তুমি কি পরীক্ষা দিতেও দেবে না ?

প্রণব কন্যাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে পরিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, সাধ করে কি আর তোকে মা বলে ডাকি! আমার এত বড় একটা জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান পাওয়া গেল।

প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শ্রীমতী বলল, আর একটু চা খাবে বাবা ? নিয়ে আসব—

চা ত মন্দ বলিস নি মা, কিন্তু তোর মায়ের কোন অসুবিধা হবে না ত ?

শ্রীমতী হাসল। কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল এবং অনতিকাল মধ্যেই চা নিয়ে ফিরে এসে বলল, চা এনেছি বাবা—

এরই মধ্যে নিয়ে এলি মা ? প্রণব বললেন, হ্যাঁ, এখানে আমার পাশে বোস শ্রী।

শ্রীমতী বসতেই প্রণব পুনরায় বললেন, তুই ঠিক জানিস মা পরীক্ষায় তুই হেরে যাবিনে ?

শ্রীমতী সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল।

তার মুখের পানে চোখ তুলেই এ পরিবর্ত্তনটুকু প্রণবের চোখে পড়ল, তিনি একটু হাসবার চেষ্টা করে মৃদুকণ্ঠে কথা কয়ে উঠলেন, এতদিনের বিশ্বাসটা কি একদিনেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় শ্রী ?

শ্রীমতী কথা কইল না।

প্রণব তেমনি বলে চললেন, আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি তাই মনঃস্থির করেও স্থির হতে পারছি না। অথচ এক অরুণ ছাড়া আর সকলেই এক কথা বলে। প্রিন্সিপ্যাল ত স্পষ্টই বললেন দিনকাল একেবারেই নাকি বদলে গেছে।

শ্রীমতী মৃদু কণ্ঠে জানাল, তিনি সত্য কথাই বলেছেন।

প্রণব কেমন একপ্রকার হেসে বললেন, আমাদের দুনিয়ার পরিধি বড় সীমাবদ্ধ তাই আজন্মের বিশ্বাসটা এত বড় হয়ে উঠেছে। নজরটা এক জায়গায় থেমে আছে। হয় ত তাই মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। এত বড় ধনীর আমার মেয়েকে হঠাৎ বিয়ে করতে চাওয়াকে একটা সাময়িক খেয়াল ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারছি না।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলল, কাকাবাবুকে তুমি এই সব কথা বললে বাবা ?

প্রণব অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন, হ্যাঁ বললাম, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল হেসে উঠে জবাব দিলেন, তাতেই বা এত চিন্তা করবার কি থাকতে পারে। আজকের খেয়াল কাল দেখবেন সত্য হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া এত বড় সৌভাগ্যকে অবহেলা করলে নাকি তোর উপর ঘোরতর অন্যায় করা হবে।

এত বড় সৌভাগ্যকে অবহেলা করতে প্রণব শেষ পর্য্যন্ত পারেন নি। একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ, সামাজিক মর্য্যাদার বহুবর্ণ রঞ্জিত বিভিন্ন ছবি তার চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন তাঁর সহধর্ম্মিনী, বন্ধুবান্ধব ও হিতৈষীর দল। চতুর্দ্দিকের এই প্রবল কণ্ঠরোলের মাঝে প্রণব ও অরুণের দ্বিধা তলিয়ে গেল।

অতনুর হ'ল শ্রীমতী লাভ।...

২

আজ শ্রীমতী চলে যাবে। এখান থেকে সোজা কলকাতা অতনুর সুবৃহৎ বুইক গাড়ীতে—ব্যবস্থাটা অতনুর। সর্ব্বত্রই একটা মাত্রাধিক চাঞ্চল্য, অন্ততঃ অরুণের তাই মনে হ'ল। প্রণব কেমন যেন থেমে গেছেন। অরুণ এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শ্রীমতী স্বেচ্ছায় অতনুর গলায় মালা দিয়েছে। যে অতনু বিরাট পয়সাওয়ালা লোক, যার প্রকাণ্ড বুইক গাড়ীটা তার চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের জৌলুস আর নামের আভিজাত্য সগৌরবে প্রচার করছে। শ্রীমতী শেষ পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যের কাছে যথাসর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিল! নইলে আজকের এই পরিণতিটাই যে আগাগোড়া মিথ্যা হয়ে যায়। আশ্চর্য্য মেয়েদের মন, এরা মুখে এক কথা বলে কাজের বেলা তার উল্টোটি করে, অন্ততঃ শ্রীমতীর বেলা একথা সত্য।

একান্তে ডেকে অরুণ শ্রীমতীকে বলল, কেমন করে এই বিয়েতে তুই সায় দিলি ?

জবাব দিতে শ্রীমতী এক মুহূর্ত্তও দেরী করল না। বলল, বড় স্বার্থের জন্যে ছোট স্বার্থের কথা ভুলতে হয়েছে দাদা।

অরুণ মুখিয়ে উঠল, ও সব বড় বড় কথা তুই রাখ শ্রী—

শ্রীমতী অম্লান কণ্ঠে জবাব দিল, এ তোমার অন্যায় অভিযোগ দাদা।

অরুণ বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিল, মাকে বরং বুঝতে পারি, কিন্তু তোকে আমি সত্যিই ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রীমতী হাসিমুখে বলল, এর মধ্যে বুঝবার কি আছে দাদা আমি বুঝিনে, আমি ভেবেছিলাম বিয়ের পরে বুঝি তোমাদের মনের সব সংশয় দূর হবে—কিন্তু এখন দেখছি 'মরেও না মরে অরি'। আচ্ছা দাদা আমাকে নিয়ে তোমরা কি খুব বেশী বাড়াবাড়ি করছ না?

অরুণ দুঃখিত হয়ে বলল, তুই এড়িয়ে যেতে চাইছিস বলেই ত সব মুছে যেতে পারে না বোন।

শ্রীমতী বলল, এড়িয়ে যাব কেন দাদা। আর তাতেই কি আমার বর্তমানটা মুছে যাবে।

অরুণ সহসা ধৈর্য্য হারাল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, বর্ত্তমানের কথা জানি না শ্রী, কিন্তু অতীতকে দিব্বি ভুলতে পেরেছিস। বিয়ের নাম করে ঐশ্বর্য্যের কাছে আত্ম-বিক্রয় করেছিস।

অরুণের শেষ কথায় শ্রীমতীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, বিয়ের নাম করে নয় দাদা, বিয়ে করে বল। আর আত্মবিক্রয় কথাটার সত্যিই কোন মানে হয় না। তুমি অত্যন্ত রেগে আছ, তাই কি বলছ তা তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না। আর ঐশ্বর্য্যের কথা যদি বল তা হলে আমার বলবার কিছু নেই, কারণ অর্থ আর প্রতিপত্তির মোহ মানুষ মাত্রেরই আছে।

অরুণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সে উষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমাদের বাবার কথাটাও কি একবার তোর মনে হ'ল না শ্রী?

শ্রীমতী রাগ করল না। বলল, বাবার কথা তুমি ছেড়ে দাও দাদা। তিনি সংসারের মধ্যে থেকেও সংসারী নন। নির্লোভ পুরুষ তিনি। কিন্তু যে লোক তাঁর স্তরে উঠতে পারে না অথবা তাঁর মত করে ভাবতে জানে না, তাকে তুমি অনুযোগ দিতে চাইছ কোন্ যুক্তিতে?

আহত কণ্ঠে অরুণ বলল, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে অনেক কিছুরই অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না শ্রীমতী, কিন্তু মানুষের জীবনটা ত শুধু যুক্তি আর বিচারবুদ্ধির সমষ্টি নয় শ্রী। তোর মন বলেও কি কোন বস্তু নেই?

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে জবাব দিল, এ যে আবার নতুন কথা শোনাতে সুরু করলে দাদা। মন ছাড়া মানুষ হয় নাকি?

অরুণ রাগ করে বলল, কোন কথাকেই তুই আমল দিতে চাস না শ্রী। কিন্তু সূর্য্যদার কথাটা কি একবারও ভেবে দেখেছিস?

খানিকক্ষণ বিস্মিত-বিহ্বল দৃষ্টিতে অরুণের মুখের পানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে শ্রীমতী বলল, প্রশ্নটা যে এদিক থেকে উঠতে পারে একথা কোনদিন আমার মনে আসে নি দাদা। তিনি সেবাধর্ম্মের পথ বেছে নিয়েছেন—আমার স্বপ্ন সংসারধর্ম্মকে কেন্দ্র করে। আমাদের দুজনার পথ সম্পূর্ণ আলাদা অথচ—

অরুণ একটু ইতস্ততঃ করে পুনরায় বলল, এতদিন এত কাছে থেকেও লোকটিকে তুই চিনতে পারিস নি?

শ্রীমতী শান্ত গলায় বলল, এতদিন এত কাছে থেকেও যদি না চিনে থাকি তা হলে আজ আর নতুন করে চেনার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে দাদা—

একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবে অরুণ জবাব দিল, হয় নি কিছুই, কিন্তু ভাবছিলাম যে,এই সময়েই সূর্য্যদার হঠাৎ শহরে এমন কি কাজ পড়ল—

আলোচনা ক্রমেই একটা বিশেষ বিন্দুতে এসে পাক খেতে সুরু করেছে। শ্রীমতী অস্বস্তি বোধ করছিল।

অরুণ পুনরায় বলল, আমি তোর শুধু দাদা নই শ্রী। তোর খেলার সাথী, তোর বন্ধু তাই এত কথা বললাম কিন্তু সংশয় আমার ঘুচল না, আরও জট পাকিয়ে গেল। কোন তরফ থেকেই আলোর সন্ধান পেলাম না।

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর সহসা উষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, অকারণে অনেক জল ঘোলা করেছ দাদা এবার থাম। সকল প্রশ্নের এত স্পষ্ট উত্তর পেয়েও কেন যে সন্তুষ্ট হতে পারছ না আমি বুঝি না। তোমাদের শ্রীমতী কি এতই ছেলেমানুষ যে, সে কিছুই বোঝে না?

অরুণ মৃদুকণ্ঠে বলল, সেইখানেই ত বড় বিস্ময় লুকিয়ে আছে শ্রী। আমার বারবারই মনে হচ্ছে তুই আদর্শচ্যুত হয়েছিস।

শ্রীমতী দুঃখিত হ'ল। আহত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের কেমন করে বুঝাব যে তোমরা ভুল করছ।

অরুণ বলল, শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়াল যে, এতক্ষণ ধরে আমি শুধু বাজে বকে মরেছি? তা হলে সত্যি কথাটা কি শুনি?

শ্রীমতী হেসে উঠল, বলল, আমি একটা কথাও মিথ্যে বলি নি দাদা। তুমি একে সত্য বলে যদি না ভাবতে পার সেটা কি আমার দোষ। তুমি সূর্য্যদাকে নিয়ে বহু চিন্তা করেছ, তোমার কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্তও করে ফেলেছ, অথচ এই সিদ্ধান্তগুলি যে অকাট্য তার কোন প্রমাণ তুমি পাও নি। সব ব্যাপারেই দুটো দিক আছে যার একটা দিক তোমার চোখে পড়েছে অপরটা পড়েনি।

সূর্য্যদাকে আমিও কিছুটা জানি বলে বিশ্বাস করি, আর তার চেয়েও বেশী জানি আমাদের বাবাকে, যাঁকে শুধু জানলেই সব কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যায় না কিন্তু সূর্য্যদা সম্বন্ধে তেমন কোন দায়িত্ব আমাদের আছে বলে আমি মনে করি না।

অরুণ পুনরায় বলল, সূর্য্যদা সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কি তুই ভাবতে পারিস না শ্রী?

শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, ভাবতে আর পারলাম কোথায় দাদা। তুমিই যা আজ জোর করে ভাবাতে চাইছ। অথচ যাঁর কথা তোমার সর্ব্বাগ্রে ভাবার কথা সে দিকে তুমি অন্ধ।

অরুণ বলল, তুই যার কথা বলছিস শ্রী? তাঁকে আমরা শান্ত করতে পারতাম।

শ্রীমতী বলল, আপাততঃ থামিয়ে রাখতে পারতে, কিন্তু তার পর?

অরুণ প্রত্যুত্তর করল, তার পর আবার কি। দিন কয়েক রাগ করে থাকতেন—শেষ পর্য্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যেত।

শ্রীমতী পুনরায় হেসে উঠল। বলল, আবার ঘুরে ফিরে সেই এক জায়গায় ফিরে এসেছ দাদা। মা বাইরে শান্ত হলেও ভিতরে জ্বলতেন—যার উত্তাপে বাবা একেবারে ঝলসে যেতেন। আমাদের মাকে কি চেন না? আজ কেন যে সব ছেড়ে এই পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে আমরা পড়ে আছি সে কি তোমার অজানা দাদাভাই। তা ছাড়া বিয়ে একদিন আমাকে করতেই হ'ত—

একটু থেমে খানিক দুষ্টামীর হাসি হেসে শ্রীমতী পুনরায় বলল, তোমার ত বরং খুশী হয়ে ওঠার কথা। এমন নিখরচায় বোন পার হয়ে গেল। দৈবাৎ গলগ্রহ হয়ে পড়তেও ত পারতাম।

অরুণ শ্রীমতীর এই লঘু পরিহাসে যোগ দিতে পারল না, গম্ভীর হয়ে উঠল। সেই দিকে খানিক চেয়ে থেকে শ্রীমতী পুনশ্চ বলল, তুমি রাগ করে চুপ করে থাকলেও সত্য কখনও মিথ্যে হয়ে উঠবে না, একদিন আমার একথাটা তুমি বুঝবে দাদাভাই।

অরুণ একটুখানি হেসে বলল, তুই আমাকে কি মনে করিস শ্রী? কিছু বুঝি না আমি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী বলল, বিলক্ষণ! তা কখনও ভাবতে পারি? তবুও দেখ সব জেনে-শুনেও তুমি শুধু প্রশ্নই করছ—

অরুণ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, একটা অনুমানের উপর নির্ভর না করে তোর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম।

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, অনুমান করা ভাল—ওতে ঝঞ্ঝাট কম। তা ছাড়া জেনেই-বা তুমি করতে কি? কারণ বিয়েটা আমার এবং তা আমার পরিপূর্ণ সম্মতি নিয়েই হয়েছে। এখানে কোন ফাঁক এবং ফাঁকি নেই একথাটা সব সময় মনে রেখ। তা ছাড়া একটা কথা ভেবে আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি দাদা।

অরুণ মুখ তুলে তাকাল।

শ্রীমতী বলতে থাকে, যদি তোমার অনুমানটাও অভ্রান্ত হ'ত তা হলেই বা তোমার এ আলোচনায় যুক্তি কোথায়।

একটা জবাব দেবার জন্যই হয় ত অরুণ মুখ তুলেছিল, সহসা মাকে এই দিকে আসতে দেখে শ্রীমতী তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে এল, প্রিন্সিপ্যাল কাকা আমায় কি উপহার দিয়েছেন জান দাদা? একটা তীরধনুক।

রাণী ততক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি অনুযোগ দিয়ে অরুণকে বললেন, তোরা এখানে আর জামাই একলা ওঘরে বসে আছে। সেখানে গিয়ে একটু গল্পগাছা করলেও ত পারিস?

অরুণ জবাব দিল, তোমার বড়লোক জামাইকে দেখবার লোকের অভাব কি মা, আমি আবার কি বলতে কি বলে বসব।

শ্রীমতী বলল, বড়লোক হওয়াটাই একটা অপরাধ নয় দাদা।

রাণী বললেন, ওকে ভাল করে বল শ্রী। গুণের মধ্যে শুধু তর্ক করাটাই শিখেছে। চল শ্রী আমার সঙ্গে, ওর বাজে কথা শুনে কাজ নেই।

শ্রীমতী মুখখানাকে করুণ করে বলল, আজকেই চলে যাচ্ছি মা, দাদার সঙ্গে একটু ঝগড়া করতে দাও।

রাণী আপন মনে বকতে বকতে চলে গেলেন।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, মা তোমাকে বিশ্বাস করেন না, ভয় পান। আমিও পাই দাদা।

অরুণ চমকে উঠল।

শ্রীমতী বলতে থাকে, যেভাবে সেই থেকে তুমি আমার মন ভাঙাবার চেষ্টা করছ তাতে ভয় হওয়াই স্বাভাবিক দাদা।

অরুণ বিমর্ষ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল। বলল, ভাঙাবার নয় শ্রীমতী বুঝবার চেষ্টা করছিলাম।

শ্রীমতী শান্তকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করল, এই বোঝার ইচ্ছেটা ত শুভ ইচ্ছে নয় দাদা—বিশেষ করে আজকের দিনে। শ্রীমতীকে তুমি এতদিন ধরে কি ভেবে এসেছ আমি জানি না। কিন্তু একথা আমি জানি সে পরিপূর্ণ একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আর দশজনার বিশেষ কোন প্রভেদ আছে বলে আমার

মনে হয় না। সংসারকে সে ভালবাসে—তার সুখদুঃখ কোনটাকেই অবহেলা করে না।

একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে ম্লানকণ্ঠে অরুণ বলল, তোর এই সাংসারিক যুক্তিকে খণ্ডন করবার সাধ্য আমার নেই বোন। অনেক বাজে কথা বলেছি—বুঝেও বলেছি, না বুঝেও বলেছি। মন আমার তোলপাড় করছে নইলে সত্যই ত এখন এসব কথা নিয়ে আলোচনা করা শুধু বৃথা নয়—অন্যায়। আমাকেও তুই জানিস তোকেও আমি জানি। তোর চলে যাবার আগে আর দেখা হবে না তাই যাবার আগে একটা কথা বলে যাই—প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলিস না—

অরুণকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী একটু হেসে জবাব দিল, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি দাদা, সূর্য্যদা আমার বিয়েতে একটা আংটি উপহার পাঠিয়েছেন, নীলরঙের পাথর বসান।

শ্রীমতী আর একবার হাসল। ক্রমশঃ

সন্ধি

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার অবাক মনে সবাক প্রশ্নের ছোঁয়া লাগে।
অবচেতনার থেকে রূপ ধরে নূতন জিজ্ঞাসা।
হঠাৎ কেমন যেন ব্যর্থ মনে হয় অনুরাগে।
অদৃষ্টের নিবন্ধনে বিকলাঙ্গ হ'ল ভালবাসা?

মরুবালুকায় মাথা কুটে মরে দীপ্ত মধ্য দিন,
স্বপ্ন সাধ অতিক্রান্ত মাধুরের বিচিত্র লীলায়।
সন্দেহ-বাসুকী ফুঁসে, আলোকের লগ্ন উদাসীন।
না-মেটা পিপাসা এক মনে কি গো উঁকি দিয়ে যায়?

অগ্নিগিরির লাভা শুধু রবে, হবে না সে চন্দন?
গোমুখী গুহায় লুপ্ত রবে কি চল চঞ্চলা নদী?
প্লাবনের জলে ভিজিবে না আর দৃঢ় হার্ম্যের মন?
ক্ষতি কি মেখলা নভে চন্দ্রমা উঠি উঠি করে যদি।

সন্ধিই যদি হয় আর বন্দীই যদি হও,
তবু জেনে রেখো তুমি অনন্যা, পরাজিতা কভু নও।

শঙ্কর

শ্রীকালিদাস রায়

কৈলাস ত স্বর্গে নয়, সেথা কত জনা
গিয়েছে এসেছে দেখে দিয়েছে বর্ণনা।
গিরীন্দ্রের কন্যা তব জায়া,
দরিদ্র সংসারে তব গৃহলক্ষ্মী নাম মহামায়া।
আমাদেরি মত তুমি সংসারের সব জ্বালা সও,
আমাদেরি একজন, তুমি ত স্বর্গের কেহ নও।
তোমারে দেবতা বলে মূঢ়ে
শ্মশানে বিহার কর, শ্মশান কি আছে স্বর্গপুরে ?
সুধা তব সেব্য নয়, সুধা পান করে দেবগণ,
আমাদেরি মত তুমি কণ্ঠে বিষ করেছ ধারণ।
আমাদেরি মত ভুল কর দিনরাত
তাই তোমা বলে ভোলানাথ।
তোমারি মতন মোরা অন্নের কাঙাল,
তোমারি মতন দগ্ধ মোদের কপাল।
মানুষেরই মত তুমি কর বটে রোষ
পরক্ষণে স্তব শুনে সব ভোল তুমি আশুতোষ।
দেবতারা সাবধানে করে শত্রুমিত্রের বিচার
শত্রুমিত্র সমজ্ঞানে তুমি যে উদার।
কে বলেছে দেবতা তোমায় ?
দেবতা কি ভিক্ষা মাগে ? আমাদেরি ভিক্ষা ব্যবসায়।
জন্মমৃত্যু নাই তব হে আদিপুরুষ,
তবু তুমি এ মর্ত্যেরই মানুষই যে, আদর্শ মানুষ।
এক তুমি বহু হয়ে সারা বিশ্বে সৃজিলে মানব,
দেবতারা মানবেই কল্পনাসম্ভব।
তোমার মহিমা তাই দেবতারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে
তোমার মাঝারে তারা মানুষেরে পূজে।
বহিতেছ জটারূপে মানুষের ত্রিতাপের ভার।
চিরন্তন মানুষের রূপ হেরি মাঝারে তোমার।
দুঃখালয় অশাশ্বত এই বিশ্বভূমি
পরিহার কর নাই তুমি।
দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থলে তব অবস্থিতি
দেবতার রোষ হতে তুমি রক্ষা করিতেছ ক্ষিতি ॥
প্রভু তব চিরন্তন নারীত্বের ভাবরূপা জায়া,
মায়ামুগ্ধ মানবের মাতা মহামায়া।

বিদায়ী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

অনেক করেছি কাজ,
ক'য়েছি অনেক কথা,
আর নাহি লাগে ভালো,—
চাহি শুধু নীরবতা!
ঘাটে ঘাটে নিয়ে তরী
কত আর ঘুরে মরি!—
হাটের এ কোলাহলে
অবিরল বাজে ব্যথা!

আলোকে পুলক নাই,—
দহে শুধু আঁখিরে,
তিমির-তড়াগ-তলে
ডুবে তাই থাকি রে।
কত কিছু হ'ল দেখা,
আঁখিজলে হ'ল শেখা,—
মন বলে সব ঝুঠা,—
সব যেন ফাঁকি রে!

শেষ করো অভিনয়,—
টেনে দাও যবনিকা,
প্রয়োজন নাহি আর,—
নিবে যেতে দাও শিখা।
রে ভিখারী, কেন আর
বৃথা ঘোরা দ্বার দ্বার ?
যা ঘটেছে ঘটিবার,—
সে যে রে করম লিখা।

দিয়েছ অনেক বটে,—
নিয়েছ অনেক কেড়ে,
এইবার দাও ছুটি,—
দয়া করে দাও ছেড়ে।
বেদনাগরলমাখা
এ জীবন লাগে ফাঁকা,
বৃথা কেন আর থাকা ?
যেতে দাও অধমেরে!

শক্তিশেল

(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীসুবোধ বসু
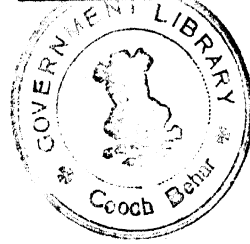
চরিত্রলিপি

পুরুষ	স্ত্রী
রাজা	রাণী
মন্ত্রী	অভিনেত্রী
সেনাপতি	
যুবরাজ	
জেনারেল	
ব্রিগেডিয়ার	
সৈন্যাধ্যক্ষগণ	
মহাবৈজ্ঞানিক	
দ্বাররক্ষক	

রাজপ্রাসাদের বিশ্রাম-কক্ষ। বড় কৌচের একপ্রান্তে রাজা ও অপর প্রান্তে রাণী উপবিষ্ট। রাজার বাম পাশে ৯০° কোণ করিয়া স্থাপিত আরেকটি কৌচে মন্ত্রী। অন্য আসনগুলি শূন্য। রাজা ও মন্ত্রীর কাছে স্ফটিকোজ্জ্বল তেপায়ায় ঠাণ্ডা পানীয়। রাজা, রাণী ও মন্ত্রী কখনও কখনও ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গিতে কথা কহিলেও সকলেই আধুনিক কালের লোক। অর্থাৎ অ্যাটম-যুগের বাসিন্দা।

রাজা। মন্ত্রী, মহাবৈজ্ঞানিকের সম্বর্দ্ধনার আয়োজনের তত্ত্বাবধান তুমি নিজে কর, এই আমার ইচ্ছা। আয়োজনে কোনও রকম ত্রুটিই যেন না থাকে।

মন্ত্রী। নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। আজও আমি স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের প্রধানকে ডাকিয়ে খুঁটিনাটির খোঁজ করেছি।

রাজা। এই মহাপণ্ডিতের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমাদের দেশ ছোট, অথচ সমৃদ্ধিশালী। সারা পৃথিবীর সলোভ দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ। বৃহৎ শক্তিগুলি কোন না কোন ছলে আমাদের গ্রাস করে ফেলত—যদি না মহাবৈজ্ঞানিক তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বলে এমন-সব পরমাণুতত্ত্ব আবিষ্কার করতেন। এরই ফরমুলার আমরা পৃথিবীর প্রবলতম অ্যাটমিক অস্ত্রের অধিকারী। এইগুলি হস্তগত করবার জন্য বৃহৎশক্তিগুলি কোটি কোটি ডলার ব্যয় করতে প্রস্তুত।

মন্ত্রী। মহাবৈজ্ঞানিকের কাছে আমরা কতটা ঋণী সে সম্বন্ধে আমি সম্যক সচেতন, মহারাজ। তাঁর সম্মাননা জাতির কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। ঐ দিন সারা দেশে উৎসব পালিত হবে। ইতিমধ্যেই দিনটি ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছে···

রাণী। মহাবৈজ্ঞানিক গৃহিণীকে এই সভায় যে উপহার দেওয়া হবে, তা আমি নিজে দেখে দেব। শাস্তা বড় খুঁতখুঁতে মেয়ে!

রাজা। [সপরিহাসে] ওটা বৈজ্ঞানিকপ্রবরের উপহারের চেয়েও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। স্ত্রীদের প্রতি বিশেষ সম্মান না দেখালে কি রাজা কি বৈজ্ঞানিক কেউ সন্তুষ্ট হন না।

রাণী। তোমার চেয়ে অনেক বেশি স্ত্রী-অন্তপ্রাণ তিনি।

রাজা। মানে, একটু বেশি স্ত্রৈণ, এই ত! [মন্ত্রীকে] তাই বলছিলাম, হীরামুক্তার যত বিচিত্র ও বহুমূল্য বিকার সৃষ্টি করতে পার, কর। স্ত্রীর খুশিতে বৈজ্ঞানিকবর খুশি হবেন।

মন্ত্রী। রাজমণিকার এই লক্ষমুদ্রামূল্যের হার তৈরীর ভার নিয়েছে। পরীক্ষামূলক ভাবে গাঁথা হলেই মহারাণীর অনুমোদনের জন্য নিয়ে আসব।···মহারাজ, এই সম্বর্দ্ধনাসভায় বৈজ্ঞানিকবরও আপনাকে দুটি নতুন অস্ত্র উপহার দেবেন বলে শুনছি···

রাণী। উপহার হিসেবে তা খুবই অভিনব হবে, সন্দেহ নেই। বৈজ্ঞানিক বুঝে নিয়েছেন, রাজাকে খুশি করতে হলে তাঁকে নিত্য-নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করতে হবে।

রাজা। [সপরিহাসে] যাতে সেই অস্ত্র ব্যবহার করে আমি রাজচক্রবর্তী হতে পারি, কেমন? [মন্ত্রীকে] কি অস্ত্র দেবেন, কিছু শুনেছ কি?

মন্ত্রী। পাকা খবর নয়, মহারাজ, তবে শুনেছি তার একটি হচ্ছে—সীমায়িত হাইড্রোজেন বোমা। একটা সাধারণ হাইপো-ডার্মিক সিরিঞ্জে ভরা। সিরিঞ্জের গায়ের দাগ দেখে মাপ অনুযায়ী টিপলে বিশেষ সীমার মধ্যে তার ধ্বংসলীলা সীমাবদ্ধ থাকবে।

রাজা। এমন! আর একটা কি?

মন্ত্রী। অ্যাটমিক আই! ঠিক অস্ত্র নয়। বিশেষ এক রকম বাইনোকুলার। তার সাহায্যে বহু দূরদেশের ঘটনাবলী ঘরে বসেই নিরীক্ষণ করা যাবে। তা সে ঘোড়দৌড়েই হউক বা ক্যাবিনেট-মিটিং হউক। কোনও রাষ্ট্রের ঘরের কথাই আর অজানা থাকবে না।

রাজা। এর কাছে আমার দেওয়া সমস্ত উপহার তুচ্ছ হয়ে যাবে যে মন্ত্রী! কিন্তু তাই বা কেন। আমিও মস্ত বড় কিছু উপহার দেব। বস্ত্র নয়, অস্ত্র নয়। তারও চেয়ে বড় কিছু।···মন্ত্রী, আমি মনস্থির করেছি, মহাবৈজ্ঞানিকের এই মহাসম্বর্দ্ধনা-সভাতেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ, আমার ঐতিহ্যিক সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করব···

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। তোমার আপত্তি আছে মনে হচ্ছে, মন্ত্রী…

মন্ত্রী। আপত্তি নয়, প্রভু। আপনি উদার। ঔদার্য্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি নে, এমন পাষণ্ড নই। কিন্তু এমন বৈপ্লবিক ঘোষণার আগে চার দিকটা আবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে নেওয়া উচিত নয় কি?

রাজা। তুমি কোন দিকে তাকাতে বলছ?

মন্ত্রী। সৈন্তবিভাগ এতে সন্তুষ্ট নয়।

রাজা। তুমি প্রধান সেনাপতির কথা বলছ? যে ব্যবস্থায় সে নিজে ডিক্টেটর হতে না পারবে, তাতে কোনও দিনই সে সন্তুষ্ট হতে পারবে না।

মন্ত্রী। গুপ্তচরদের কাছে যতটা সংবাদ পেয়েছি, তাতে সন্দেহ নেই নিজের অধীনস্থদের সে এই ব্যাপারে উত্তেজিত করছে…

রাজা। সৈন্তবিভাগের আপত্তিটা কি?

মন্ত্রী। এ বিষয়ে এখনও কোনও নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাই নি, তবে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা বড় রকম বিক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। তাদের বলা হচ্ছে—এখন আর্মি একমাত্র রাজার অধীন, নূতন ব্যবস্থায় তারা হবে হাজার লোকের গোলাম!

রাজা। সৈন্তবিভাগ যাদের টাকায় চলছে, তাদের প্রতি এই তাচ্ছিল্য একেশ্বরতন্ত্রী রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য পরিণাম! শাসকশ্রেণী নিজেদের উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করতে শেখে। এই পাপ দূর করতে হবে। সভ্যদেশগুলির দিকে চেয়ে দেখ। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনসাধারণের নামে রাজ্যশাসন করে। নির্ব্বাচনের জন্ত তুচ্ছতম ব্যক্তির কাছে শ্রেষ্ঠকে হাত জোড় করতে হয়। এই সভ্যতার মধ্যে আমাদের দেশ একটা কিম্ভূত ঐতিহাসিক পরিহাস। আমি রাজা সর্ব্বেসর্ব্বা। আমার সৈন্তবিভাগ কেবল আমাকে সম্মান করে আর কাউকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করে না…

মন্ত্রী। আপনি কি দেশকে পূর্ণ গণতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করতে চান, মহারাজ? হঠাৎ এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা নেই কি?

রাজা। হউক না কিছু বিশৃঙ্খলা। তার মধ্য থেকে শৃঙ্খলার আবির্ভাব হবে। জলে না নামলে কি কেউ সাঁতার শেখে? নাকানি-চুবোনিটাই বড় করে দেখছ কেন?

মন্ত্রী। দেখছি এইজন্ত মহারাজ যে সৈন্তাধ্যক্ষদের আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে। যদি আপনি অবিলম্বে এত বড় একটা রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তন আনতে চান, তবে তার আগে সৈন্তবিভাগের দিকে নজর দিন। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অনুগত লোকের দ্বারা পূর্ণ করুন…

রাণী। মন্ত্রীবর, আপনি কি জানেন না, আপনজনের ক্ষমতায় মহারাজের মোটে আস্থা নেই।

রাজা। যুবরাজকে আমি সহকারী প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করতে অসম্মত হয়েছি। যুবরাজের মা তা কখনও ক্ষমা করতে পারেন না, মন্ত্রীবর…

মন্ত্রী। কিন্তু আপত্তি কি মহারাজ? শৌর্য্যে, রণকৌশল-জ্ঞানে তিনি যে কারও চেয়ে কম নয়, তার বহু পরিচয় ত আমরা বহু রণাঙ্গনে পেয়েছি। আপেক্ষিক তারুণ্য সৈনিকের পক্ষে ত্রুটি নয়, বরং, সৈন্তবিভাগের সাম্প্রতিক হালচাল দেখে আমার মনে হচ্ছে তাঁর ঐ পদে নিয়োগ, এমন কি তদূর্দ্ধ পদটিতে নিয়োগ দূরদর্শিতা হবে…

রাণী। আপনাদের মহারাজ ন্যায়বান! তিনি রাজ্য হারাবেন তবু নিজ পুত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিতে স্থাপন করবেন না—পাছে কেউ তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দেয়…

রাজা। (সহাস্তে) রাজ্য যে নিজের ইচ্ছায়ই হারাচ্ছে, রাজ্য হারাবার ভয়ের অপবাদ তাঁকে স্পর্শও করবে না, রাণী। আমি জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দেশকে প্রকৃত গণতন্ত্ররূপে গঠন করতে চাই। এই আদর্শের পেছনে আছে সারা দেশবাসীর সমর্থন, তাদের আন্তরিক কামনার পরিপূর্ত্তি এটা। কয়েকটা উদ্ধত সৈন্তাধ্যক্ষ কি বাধা দিতে পারে এতে। সারা দেশ আমার পেছনে। কাকে আমি ভয় করি?

[দ্বারদেশে দ্বাররক্ষকের আত্মপ্রকাশ]

দ্বাঃ রঃ। যুবরাজ!

[যুবরাজের প্রবেশ। যুবরাজ ত্রিশোর্দ্ধ সুঠাম যুবক]

যুবরাজ। [অগ্রসর হইয়া] যাত্রার সময় হয়েছে, পিতা আপনাদের প্রণাম করতে এসেছি [রাজার পদস্পর্শ]

রাজা। তোমার জয় হউক। [যুবরাজ রাণীর কাছে অগ্রসর হইল।]

যুবরাজ। [প্রণাম করিয়া] তুমি বলেছিলে আমার সঙ্গে বিমানঘাটিতে যাবে। যেতে পারবে কি? আমার কিন্তু আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে…

রাণী। আমি তৈরিই আছি।

যুবরাজ। তুমি যদি মহারাণী না হতে মা, তবে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম। ক'দিন বেরিয়ে আসতে সীমান্তে।

রাণী। মহারাণী হওয়ায় তাতে বাধা কি?

যুবরাজ। ওরে সর্ব্বনাশ! তোমার জন্ত তবে কত সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করতে হ'ত। কত আয়োজন করতে হ'ত। অনেক দিন আগে থাকতেই যে তার মহড়া দেওয়া দরকার…

রাণী। মহারাজ এই অসুবিধাটা দূর করবার ব্যবস্থা করছেন। তোমার মা যখন আর মহারাণী থাকবেন না, তখন আর পুরোপুরি মা হতে তার কোনই বাধা থাকবে না।

যুবরাজ। সত্যই মা, রাজা-রাণী বড় সেকেলে ব্যাপার। আমরা অন্ত সকল দিকে এত অগ্রসর দেশ, অথচ রাষ্ট্রতন্ত্রের দিক থেকে একেবারে মধ্যযুগীয়। এর যদি অবসান হয় তবে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে…

[সস্নেহে তাকাইয়া] রাজার ছেলে হয়ে যে সুবিধা তুমি পাও নি, আশীর্বাদ করি নতুন রাষ্ট্রবিধানে সেই সুবিধা, সেই স্বীকৃতি তুমি যেন পাও…

রাজা। এ প্রার্থনা আমিও করি পুত্র। যদি সেই স্বীকৃতি অর্জন করতে পার তবে তুমি সত্যই যোগ্যপাত্র। জন্মের সুবিধা নিয়ে, পৃষ্ঠপোষকের সুযোগ নিয়ে তুমি বড় হও নি, স্বকীয় ক্ষমতায় বড় হয়েছ। এই কথা জেনে গর্বে তোমার পিতামাতার বুক ভরে উঠবে। [রাণীর প্রতি] যাও রাণী। সময় হয়েছে। সৈনিকের সময় ক্রন্দন নিষেধ…

রাণী। [আসন হইতে উঠিয়া অসন্তুষ্ট কণ্ঠে] চলে আয়।

যুবরাজ। আসি মন্ত্রীমশায়। নমস্কার।

মন্ত্রী। নমস্কার যুবরাজ। তোমার মঙ্গল হোক। যদি রাজকার্যে প্রয়োজন হয়, আমি সাঙ্কেতিক বেতারবার্তা প্রেরণ করব। তখন আর বিলম্ব কর না। প্রথমলভ্য বিমানে চড়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করো…

যুবরাজ। [চলিতে চলিতে থামিয়া] তার মানে ? [সন্দেহ-পূর্ণ কণ্ঠে] আপনি কি কিছু আশঙ্কা করছেন ?

রাজা। মহাবৈজ্ঞানিকের সম্বর্দ্ধনা সভায় আমি দেশকে গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করব মনস্থির করেছি। সেই উপলক্ষ্যে উপস্থিত হবার জন্ত তোমার উপর নির্দ্দেশ যেতে পারে। মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্যের তাৎপর্য্য এই। কর্ত্তব্যের সঙ্গে সংঘাত না হলে এস।

যুবরাজ। [সন্দেহ সংযত করিয়া] সর্ব্বদা মহারাজের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় থাকব। কিন্তু প্রয়োজনে যেন ডাক পড়ে।

[রাজার প্রতি অভিবাদনপূর্ব্বক যুবরাজের প্রস্থান]।

মন্ত্রী। মহারাজ আমার মনে হয় এ সময় যুবরাজ রাজধানীতে উপস্থিত থাকলে ভাল হ'ত। আমি সম্ভাব্য সঙ্কটের কথাই যুবরাজের কাছে ইঙ্গিতে জানাতে চেয়েছিলাম।

রাজা। আমি সেটা তাকে না-জানাতে চেয়েছি। সৈন্ত-বাহিনীতে সংঘর্ষ তবে অনিবার্য্য হয়ে উঠত।

…মন্ত্রীবর, আমি প্রধান সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছি। তাঁর বক্তব্য আমি স্বকর্ণে শুনতে চাই, তাঁর যুক্তি শুনতে চাই, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। সুস্থ ও স্বাভাবিক লোকমাত্রই যুক্তিদ্বারা প্রভাবিত হয়।

মন্ত্রী। পৃথিবীতে চেঙ্গিস খাঁ তৈমুরলঙ্গের কোন দিনই অভাব হয় নি, মহারাজ। ক্ষমতার লালসা যাদের দুর্দ্দম…

[দ্বাররক্ষকের আত্মপ্রকাশ]

দ্বাররক্ষক। প্রধান সেনাপতি।

[প্রধান সেনাপতির প্রবেশ ও সামরিক কায়দায় অভিবাদন। প্রধান সেনাপতি বলিষ্ঠ ও কঠোর প্রকৃতির মানুষ]।

রাজা। আসনগ্রহণ কর সেনাপতি। আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে চাই।

সেনাপতি। উদ্ধতভাবে, না বসিয়া আমিও আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।

রাজা। [সবিস্ময়ে একবার চাহিয়া] কি প্রশ্ন ?

সেনাপতি। মহাবৈজ্ঞানিক সম্বর্দ্ধনা উৎসবসভায় মহারাজ নাকি দেশকে গণতন্ত্র বলে ঘোষণা করবেন ?

রাজা। [গম্ভীর স্বরে] আমার সেনাদলের সংবাদ সংগ্রহবিভাগ নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে দেখে আমি আনন্দিত।

সেনাপতি। কিন্তু সৈন্তদলের আমরা এতে আনন্দিত হতে পারছি না। সৈন্তদলের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করবার এটা একটা কৌশল মাত্র।

মন্ত্রী [সবিস্ময়ে] আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেনাপতি, আপনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন।

সেনাপতি। আপনাদের স্বার্থপ্রণোদিত পরামর্শে রাজা যদি আর্মিকে তুচ্ছ করেন, আর্মি কি সেই অপমান নীরবে মেনে নেবে ?

মন্ত্রী। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র রাজা এবং রাজনীতিবিদেরা স্থির করবেন। যে বিধানে জনগণের সমর্থন আছে, সেই বিধান প্রবর্ত্তনে কারও আপত্তিই গ্রহণীয় নয়। রাজনীতিতে সৈন্তদলের হস্তক্ষেপ অনধিকারচর্চ্চা। রাষ্ট্রের নিয়মানুবর্ত্তিতা এতে বিপর্য্যস্ত হয়ে ওঠে।

সেনাপতি। গণতন্ত্রের বিধান আমাদের বিধান নয়। আমরা রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের রীতিতে সম্মান করতে আমরা প্রস্তুত নই। রাজা যদি দুর্ব্বল হয়ে পড়েন, সৈন্তদল দেশ-পরিচালনা করতে এগিয়ে আসবে। নিজের রক্ত দিয়ে যারা দেশরক্ষা করে, দেশের উপর অধিকার তাদেরই সবচেয়ে বড়।

রাজা। সেনাপতি !

সেনাপতি। বলুন।

রাজা। আমরা এটম-যুগে বাস করছি। পরমাণবিক মারণাস্ত্রে সমস্ত পৃথিবীই সজ্জিত। আমাদের সৌভাগ্য মহাবৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবনী-মনীষার দৌলতে আমরা আমাদের চেয়ে অনেক বড় বড় দেশগুলির তুলনায়ও বেশি শক্তিশালী। এই মারণাস্ত্র দিয়ে আমরা পৃথিবী ধ্বংস করতে পারি।

সেনাপতি। এই শক্তির সদ্ব্যবহার করে আমরা জগতজয়ী হতে পারি।

রাজা। জগতজয়ী নয়, পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপের উপর প্রেত-নৃত্য করতে পারি। কিন্তু আমার বক্তব্য তা নয়। এই জগত-ধ্বংসী পরমাস্ত্র একাধারে যেমন সৈন্তদলকে আগের ক্ষমতার আসন থেকে বিচ্যুত করেছে, তেমনি শাসকদের কাঁধে গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। যেখানে চল্লিশ হাজার সৈন্তের প্রয়োজন হ'ত, এখন সেখানে দু'শো লোকেরও দরকার হয় না। সবরকম মারণাস্ত্র এখন যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্মি নিজেকে কি করে এতটা ক্ষমতাশালী মনে করে আমি ভেবে বিস্মিত হই।

সেনাপতি। এই পরমাণবিক শক্তিতে শক্তিমান হয়েই কি মহারাজ আর্মিকে তুচ্ছ করা সুরু করেছেন ? তাদের তুচ্ছ জনতার ভৃত্য করার ব্যবস্থা পাকা করেছেন ?

রাজা। কেবল আর্মিকে নয়, নিজেকেও এই জনগণেশের ভৃত্য করবার ব্যবস্থা করেছি। পরমাণবিক শক্তির আবির্ভাবের পর অস্ত্র ব্যবহারের আজ্ঞাদানের কর্ত্তা একজন বা ক্ষুদ্র কোনও গোষ্ঠীর ওপর ছাড়ার মত বিপজ্জনক আর কিছু নেই। একটা মানুষ বা সামান্য ক'টা লোক কারণে বা অকারণে ক্ষেপে গেলে, শারীরিক বা মানবিক কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে সারা পৃথিবীটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

সেনাপতি। তাই বুঝি স্বল্পবুদ্ধি জনতার হাতে তার ব্যবহার ক্ষমতা ছেড়ে পৃথিবীকে বাঁচাতে চান! যাঁরা শ্রেষ্ঠ, উচিত-অনুচিতের বিচার করবার ভার একমাত্র তাদের আছে।

রাজা। এই তথাকথিত শ্রেষ্ঠেরা পৃথিবীকে আজ কোন সর্ব্বনাশের শিখরে এনে উপস্থিত করেছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ না সেনাপতি? যারা শ্রেষ্ঠ নয়, সুস্থ হয়ে, পরস্পরের বন্ধু হয়ে যারা নির্ব্বিরোধ শান্তির জীবন যাপন করতে চায়, এবার ক্ষমতা তাদের হাতে যাওয়া প্রয়োজন। সারা পৃথিবী যদি একটা মাত্র রাজ্য হয়ে উঠতে পারে, আর সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি যদি একত্র হয়ে এই নবরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা করতে পারে, তবেই পারমাণবিক শক্তির এই চ্যালেঞ্জ মানুষ গ্রহণ করতে পারবে। একমাত্র তবেই পৃথিবী রক্ষা পেতে পারে। আর এরই পথ সুগম করবার জন্য আমার নিজের দেশের জনসাধারণকে আমি প্রস্তুত করতে চাই।

সেনাপতি। আপনার এই ক্লীব নীতির ফলে আমাদের দেশ অপূর্ব্ব সুযোগ হারাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে আমরা এমন অস্ত্র লাভ করেছি, যার ক্ষমতায় আমরা জগত জয় করতে পারি—যার ভয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবে। সার্ব্বভৌম হবার এই গৌরব থেকে আপনি সারা দেশকে বঞ্চিত করছেন। আপনার নীতি দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। এই নীতি অনুসরণ করবার আপনার অধিকার নেই।

মন্ত্রী। রাজার বিধানে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে সেনাপতি? আপনি নিজেকে ভুলে যাচ্ছেন। আপনি রাষ্ট্রতন্ত্রের বেতনভুক কর্ম্মচারী মাত্র। রাষ্ট্রের অগণিত জনসাধারণ রাজার সমর্থক।

সেনাপতি। আর্ম্মি যখন নড়ে, তখন আটঘাট বেঁধেই নড়ে।

মন্ত্রী। আমিও দেখব, এই সমর্থকেরা কত শক্তি ধরে।

[উত্তেজনার সঙ্গে হাততালি। সঙ্গে সঙ্গে দুই দিক হইতে দুজন করিয়া চার জন সৈন্যদলের অফিসারের পিস্তল উদ্যত করিয়া প্রবেশ]

মন্ত্রী। [উঠিয়া পড়িয়া] সাবধান! সাবধান সেনাপতি! মহারাজ, সঙ্কেত ধ্বনি করুন।

সেনাপতি। [আগন্তুকদের প্রতি] ফায়ার!

[যুগপৎ রাজা ও মন্ত্রীর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হইল। উভয়েই ধূলিতে লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে অনেকগুলি গুলী ও আর্ত্তনাদের আওয়াজ উঠিল।]

সেনাপতি। [ট্যারা অফিসারের প্রতি] সাবাস জেনারেল! কাজ হতে। আর বিলম্ব নয়। ওয়ারলেসে সমস্ত ঘাঁটিগুলিকে জানিয়ে দাও, জিরো আওয়ার শুরু হয়েছে। যে যার কর্ত্তব্য শুরু করে দিক। এরোড্রোমে যুবরাজ ও রাণী নিশ্চয়ই এতক্ষণে বন্দী হয়েছেন। কোনও বিমান যেন উড়তে বা নামতে না পারে। রেডিও ষ্টেশন, তার অফিস, রেল ষ্টেশন ও পোর্টগুলি সৈন্যদল দখল নিক। সব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সৈন্যদল মোতায়েন হোক।

জেনারেল। আমাদের গুলীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার নির্দেশ ওয়ারলেসে চলে গেছে সেনাপতি। এইবার আপনি তৈরী হোন। জাতির উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আপনাকে বেতার ঘোষণা করতে হবে। ব্রিগেডিয়ার, এখান থেকেই অধিনায়ক, জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ঘোষণা করবেন। বেতার ট্রান্সমিটার এখানে আনবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়।

ব্রিগেডিয়ার। সব ঠিক আছে। আপনার অর্ডারের অপেক্ষা করছি।

সেনাপতি। [অপর দুই সৈন্যাধ্যক্ষকে] কি দাঁড়িয়ে দেখছ তোমরা। মৃতদেহ দুটো সরিয়ে ফেল। ঠেলে দাও গোসলখানার ভেতর—রাজাকে মেরে ফেলা হয়েছে, না সে পালিয়েছে, কোনটা বলব এখনও ঠিক করিনি। [উভয়ে মৃতদেহ সরাইবার কাজে ব্যাপৃত হইল।]

সেনাপতি। [ট্যারা জেনারেলকে] সব কিছুই পরিকল্পনা অনুযায়ী পালিত হয়েছে, এই সংবাদ পাওয়া গেলে তবেই জাতির উদ্দেশ্যে আমার বেতার ঘোষণা প্রচার করব। নূতন লেখাটা তোমাকে পড়ে শুনিয়েছি কি? দেশের কল্যাণের জন্য দুর্ব্বল রাজা ও দুর্নীতি পরায়ণ আমলাগোষ্ঠীকে সরিয়ে আর্ম্মি দেশের শাসন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করেছে। দেশের হিতসাধনই সামরিক প্রধান ও বিপ্লবী সৈন্যাধ্যক্ষদের উদ্দেশ্য। দেশকে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। জনসাধারণের ভীত হবার কোনও কারণ নেই। তারা নিজ নিজ কাজ করে যাক। নীরবে করে যাক। তাদের হিতাহিতের সব ভার এখন আর্ম্মির। কিসে তাদের ভাল হবে, শ্রীবৃদ্ধি হবে এবার থেকে আর্ম্মীই তা স্থির করে দেবে। সস্তা খাদ্য, সস্তা বস্ত্র, সস্তা পানীয়, সস্তা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করাই আর্ম্মির প্রথম লক্ষ্য হবে। দেশের এই হিতসাধনের ব্যবস্থায় যারা বাধা দিতে চেষ্টা করবে, তারা দেশের শত্রু। অন্য রাষ্ট্রের বেতনভুক দালাল। নির্দ্দয় হস্তে তাদের নিষ্পেষিত করে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে।

[অভিনেত্রীর প্রবেশ। অভিনেত্রী যুবতী সুন্দরী ও চটুল-নয়না।]

সেনাপতি। [সবিস্ময়ে] অভিনেত্রী। তুমি। কি করে এখানে এলে অভিনেত্রী?

অভিনেত্রী। [ঠোঁটের কোণে হাসিয়া] যেখানেই শক্তিমান, সেইখানেই সুন্দরী নারী। নারীর বরমাল্য না এলে বিজয়ের মূল্য কি, সেনাপতি? [চকোলেটের পুরিয়া হইতে চকোলেট খুলিয়া] খাবেন চকোলেট। এই নিন্। [ট্যারা জেনারেলকে প্রদান] ব্রিগেডিয়ার, তোমার জন্য এইটা। সাবাস! [সেনাপতিকে] তুমি একটা নেবে? আমার বিজয়োপহার?

জেনারেল। আমি একবার সব কিছু তদারক করে আসি অধিনায়ক, যাতে অবিলম্বে বেতারে ঘোষণা করা চলে।

[ব্রিগেডিয়ার সহ প্রস্থান]

অভিনেত্রী। দেখলে, কেমন বুদ্ধিমানের মত সরে পড়ল। আর যাই হোক, আর্মি অফিসারেরা একেবারে অরসিক নয়।

সেনাপতি। এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে, এই রুদ্র পরিবেশে তুমি কেন, সুন্দরী?

অভিনেত্রী। রাজ্য বদলাচ্ছে, রাজ্য ওলোটপালট হচ্ছে, এত বড় নাটকীয় মুহূর্তে অভিনেত্রী উপস্থিত থাকবে না, এ কেমন কথা?

সেনাপতি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অভিনেত্রী। তোমার ট্যারা জেনারেলের সঙ্গে প্রেম করছিলাম।

সেনাপতি। কিন্তু প্রাসাদে ঢুকলে কি করে? অর্দ্ধঘণ্টা আগে সকল নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অভিনেত্রী। তারও আগে যুবরাজের মোটরে প্রাসাদে ঢুকেছি।

সেনাপতি। যুবরাজ!

অভিনেত্রী। সীমান্ত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন।

সেনাপতি। (অসন্তুষ্টস্বরে) ও, এত সব চলছিল আমার অজ্ঞাতসারে! তুমি কি জবাব দিয়েছ?

অভিনেত্রী। বলেছি, দেশের যে সব চেয়ে শক্তিমান, সর্ব্বাগ্রগণ্য, বরমাল্য শুধু তাঁকেই দিতে পারি।

সেনাপতি। [সগর্ব্বে] সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমানের এবার দেখা পেয়েছ নিশ্চয়ই? কিন্তু এখন সে ভয়ানক ব্যস্ত। এখন তোমার মত সুন্দরীকেও প্রেম জানাবার মত ফুরসৎ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত্তের উপর এই 'কুপের' সাফল্য নির্ভর করছে। রাতে দেখা হবে, তখন তোমার প্রণয়-গুঞ্জন শুনব। এখন যাও।

অভিনেত্রী। তোমাদের এই বীরত্বের অভিনয় দেখে আমার মনেও একটা সর্ব্বনাশা নেশা লেগে গেছে।

সেনাপতি। কিসের নেশা?

অভিনেত্রী। ক্ষমতা যখন বদলই হচ্ছে, আমিই বা তাতে একটা বড় ভূমিকা নিই না কেন। তাই ভাবছি। কি ভাবছি জান?

সেনাপতি। (অধৈর্য্যভাবে) তোমার হেঁয়ালি রাখ অভিনেত্রী। এটা রহস্য করবার সময় নয়।

অভিনেত্রী। ভাবছি, বরমাল্যদানের পক্ষে তুমিই বেশি উপযুক্ত হবে, না তোমার ট্যারা জেনারেল? তোমার চেয়ে সে অনেক বেশি ধৈর্য্যশীল। বীরত্ব বা কর্ম্মদক্ষতায় সে তোমার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আর প্রেমিক হিসাবে তার আন্তরিকতা অনেক বেশি। তবে লোকটা একটু ট্যারা এই যা!

সেনাপতি। (ঈর্ষিতকণ্ঠে) আর অবশ্যই সে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও নয়!

অভিনেত্রী। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। গায়ের জোরে ক্ষমতা কাড়বার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠে তফাৎ অতি সামান্য। একটা গুলীর ওয়াস্তামাত্র! সেই স্ট্র্যাটাজিক গুলীই দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্ণয় করে। (সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়া) কি? ভয় পেয়ে যাচ্ছ? শুনেছি মহাবৈজ্ঞানিক একটা আণবিক বর্ম্ম পরে বেড়ান। কোন গুলীই যাকে ভেদ করতে পারে না। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে, হয় ত এও তার একটা। কিন্তু যদি ওরকম কিছু সত্যি থাকে, তবে সেটা কি সংগ্রহ করতে পার না?

সেনাপতি। আমার সহকর্মীদের আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

অভিনেত্রী। রাজাও তাই করতেন। করতেন বলেই তোমাকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণের সকল পরামর্শ উপেক্ষা করেছেন। যুবরাজের পদোন্নতির স্বপক্ষে রাণীর অনুরোধে পর্য্যন্ত কান দেন নি। তার ফল ত দেখছ! অতএব সাবধানের মার নেই।

সেনাপতি। মিছে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ অভিনেত্রী। তোমাকে আমি বুঝতে পারি না। সত্যি কি তুমি আমাকে ভালবাস, না এও মিথ্যে ছলনা? কিন্তু যাই হোক, এখন দূর হও। আমার সময় নষ্ট করার উপায় নেই। আমাকে অবস্থা তদারক করতে হবে। আমাকে জাতির উদ্দেশ্যে বেতারে ঘোষণা করতে হবে। আমাদের এই 'কুপ' সুপরিকল্পিত। ভণ্ডুল হওয়ার কোন আশঙ্কাই নেই। তবু উদ্বেগে সারা হচ্ছি, যতক্ষণ না পাকা সংবাদ পাই। এবার তুমি যাও অভিনেত্রী। কোথাও গিয়ে বিশ্রাম কর।

অভিনেত্রী। অগত্যা ট্যারা জেনারেলের কাছে। (বাহিরে উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ) ও কে? কার গলা? মহাবৈজ্ঞানিক! সর্ব্বনাশ। ঐ লোকটাকে আমি বড় ভয় করি। যা মেজাজ! একবার ওর সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যেমন অরসিক, তেমন স্ত্রৈণ।

(নেপথ্যে) "মহারাজ কোথায়? 'মহারাজ?'

"তারিখ বদলাতে হবে। তারিখ বদলাতে হবে।..."

সেনাপতি। প্রাসাদে ঢুকল কি করে লোকটা? আর এমন চেঁচাতেই বা দেওয়া হচ্ছে কেন? (অভিনেত্রীকে) এই বুড়োর সঙ্গেও প্রেম করার চেষ্টা করেছিলে? নারীকে খুশি করার মত ওর আছে কি? কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে?

অভিনেত্রী। তোমার মধ্যে যা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। যেখানে শক্তি সেখানেই সুন্দরী নারী। রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ এই পাগলা বৈজ্ঞানিক। তাঁর মত কাম্য আর কে? তাঁরই উদ্ভাবনীশক্তির সহায়তা ভিক্ষা করে তুমি পৃথিবীজয়ের স্বপ্ন দেখছ।

[নেপথ্যে "ঐ দিনটায় গৃহিণীর বাৎসরিক ব্রতের তারিখ পড়েছে। ও তারিখটা বাদ দিতে হবে"]।

সেনাপতি। [রুষ্টকণ্ঠে] সবচেয়ে শক্তিমান! সবচেয়ে কাম্য! বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রের ভৃত্যমাত্র। আমি রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক। আমার আজ্ঞাপালন করে তাকে বাঁচতে হবে। আমাকে কর্ম্মে, ব্যবহারে, বিনয়ে তুষ্ট করতে পারলে তবে তাঁর সম্মান, তবে তাঁর বেঁচে থাকার অধিকার।

[নিকট নেপথ্যে "আপনার সম্বর্দ্ধনাসভার দিন পিছিয়ে দিতে বলতে এসেছি। ওহে, কেউ বলতে পার, মহারাজ কোন্ ঘরটায় আছেন? এইটাই ত তাঁর খাস-কামরা···"]

অভিনেত্রী। সর্ব্বনাশ। একেবারে এসে পড়েছেন। আমি পালাই। কিন্তু খবরদার, একে যেন ঘাঁটিওনা। (দ্রুত প্রস্থান)

[মহাবৈজ্ঞানিকের প্রবেশ। একমাথা শাদা-চুল বব-এর মত ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘ কপাল। চোখে কোনিক আকারের কাঁচবিশিষ্ট চশমা। গায়ে লম্বা শাদা কোট। কালো রঙের প্যান্ট। কাঁধের বাদামী প্লাষ্টিকের স্যাচেল-ব্যাগ নানা জিনিসে ফুলিয়া আছে।]

বৈজ্ঞানিক। গৃহিণী বলছেন, তার তারিখ পাল্টানো অসম্ভব। ঠিক দিনটিতে ব্রত না হলে নাকি আমার দুর্ব্বাশা-মার্কা রাগ বশে থাকবে না। সারা পৃথিবীটাই জালিয়ে দেব। যেন আমি সত্য-সত্যই বদ-রাগী লোক। (অট্টহাস্য)···এই ত মহারাজ। আপনাকে খুঁজে খুঁজে [সহসা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া] তুমি কে? সেনাপতি? মহারাজ কোথায়?

সেনাপতি। আমি সেনাপতি নই। রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক আমি। আমাকে অভিবাদন কর বৈজ্ঞানিক।

বৈজ্ঞানিক। [সকৌতুকে] খুব নেশা করেছ বুঝি? কবে যে আমাদের সৈন্যবিভাগ থেকে পান-দোষ তুলে দেওয়া হবে! এটা অ্যানাক্রনিজম। বুঝেছ, অ্যানাক্রনিজম! যখন সামনা-সামনি লড়াই হ'ত, তখন সাহস বজায় রাখার জন্য এই উত্তেজক মাদকটির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অ্যাটমের যুগে বুদ্ধির স্থিরতাই বড় জিনিস।

সেনাপতি। বৈজ্ঞানিক তুমি বয়োবৃদ্ধ। নইলে এই ধৃষ্টতার শাস্তি অবিলম্বে ভোগ করতে। কি করে তুমি প্রাসাদে ঢুকলে? সৈন্যদল এর চারদিক ঘিরে রেখেছে।

বৈজ্ঞানিক। তা তোমার হঠাৎ এমন বেয়াড়া শখ হতে গেল কেন! প্রাসাদ আক্রান্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে না কি? বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে শুনি নি ত—অথচ আমাকে ছাতের উপরে নামতে হ'ল। তার পর নিচে নামবার সিঁড়ি খুঁজে পাই না।

সেনাপতি। চক্ষুহীন! তুমি আমাকে পাগল বানাবে! (খাপ হইতে পিস্তল খুলিয়া আবার খাপে পুরিল)। একটা রাষ্ট্রবিপ্লবও যদি তোমার চোখে না পড়ে, তবে কি করে তুমি ক্ষুদ্রতম জিনিস আবিষ্কার কর? আর্ম্মি নিজের হাতে রাষ্ট্রের ভার নিয়েছে। দেশের স্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে আমরা শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি।

বৈজ্ঞানিক। কেড়ে নিয়েছ! (অসহায় ভাবে চারদিকে তাকাইল। সহসা রক্ত নজরে পড়িল) রক্ত! রাজাসনে রক্ত? খুন করেছ তাঁকে! খুন করেছ!

সেনাপতি। দেশের জন্য হাজার হাজার লোককে খুন করে থাকে সৈন্যদল। তোমারই আবিষ্কৃত অস্ত্রে সহস্র সহস্র নিরীহ লোককে আমরা বিনা প্ররোচনায় হত্যা করেছি, আর সামান্য একটা-দুটো লোককে হত্যা করতে ভয় পাব?

বৈজ্ঞানিক। সামান্য লোক! সেনাপতি কি পাগল না উচ্ছৃঙ্খল?

সেনাপতি। উচ্ছৃঙ্খল তুমি। মরবার জন্য তোমার ডানা গজিয়েছে!

বৈজ্ঞানিক। যে রাজা স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষমতা জনসাধারণকে দান করে দেন, যে রাজা স্বেচ্ছায় সকল ঐশ্বর্য্য জনসাধারণের হিতে বিলিয়ে দেন, যে রাজা সকল রাষ্ট্রগুলিকে বন্ধুত্বের বাঁধনে বেঁধে জগৎ থেকে হিংসা পরশ্রীকাতরতা দূর করবার কাজে বহুদূর পর্য্যন্ত এগুতে সক্ষম হয়েছেন, সেই আদর্শবাদী রাজাকে তুমি ক্ষমতার লোভে হত্যা করেছ! নৃশংস গুণ্ডা! এর শাস্তি কি জানিস?

সেনাপতি। এর শাস্তি এই [পিস্তল হইতে বৈজ্ঞানিকের প্রতি গুলীবর্ষণ]

গুলী বৈজ্ঞানিকের গায়ে লাগিয়া ছিটকাইয়া বাহির হইয়া মেঝেতে পড়িল। আবার গুলীবর্ষণ। কিন্তু প্রতিটি গুলীই অনুরূপ ভাবে মেঝেতে ছিটকাইয়া পড়িল]

বৈজ্ঞানিক। (ক্রুদ্ধভাবে) পেয়েছ? আর আমি কি করতে পারি জান?

[স্যাচেল-ব্যাগ হইতে কাচের একটা ছোট পিচকিরি বাহির করিল]

সেনাপতি। সাবধান উন্মাদ! এটা ছেলেখেলা নয়। সব চেয়ে শক্তিশালী আণবিক অস্ত্রে আমরা সুসজ্জিত। নিজের উদ্ভাবিত অস্ত্রে নিজেই উড়ে যাবি।

[হাততালি দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের বিপরীত দিকের দরজা দিয়া পিস্তল উদ্যত করিয়া জেনারেল ব্রিগেডিয়ার ও আরও ৪ জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সেনাপতি। (দেখাইয়া) দেশের শত্রু। বিপ্লবের শত্রু! আমাদের শত্রু এই পাগলা বৈজ্ঞানিক। আমাদের সাফল্যের শেষ বাধা।

জেনারেল। দূর করে দিচ্ছি। (সঙ্গীদের) শুট!

সেনাপতি। না, না, ওতে হবে না। ওতে হবে না। গায়ে কি যেন একটা বর্ম্ম পরে আছে। এ্যাটম-বুলেট চাই। অ্যাটম-গ্রেনেড চাই। হাতে এ্যাসিডের পিচকিরি নিয়ে কি রকম ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখছ? উড়িয়ে দাও। গুঁড়িয়ে দাও ক্লীব রাজার এই পদলেহী গোলামটাকে।

বৈজ্ঞানিক। (উন্মাদের কণ্ঠে) পদলেহী গোলাম? তবে দেখ।

সিরিঞ্জ ত্যাগ করিয়া টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট নির্ঘোষে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিল। চারদিক অন্ধকার হইল। এই অন্ধকারের মধ্যে কতগুলি সবুজ ও বেগুনী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চক্র রচনা করিয়া উধাও হইল। দূর-দূরান্তরে ভূমিকম্পের আওয়াজের মত আওয়াজ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

দশ সেকেণ্ড পরে উপর হইতে উজ্জ্বল আলোর এক বৃত্ত নিক্ষিপ্ত হইয়া স্তম্ভিত হতভম্ব বৈজ্ঞানিককে প্রকাশ করিল। চতুর্দ্দিকের গভীর অন্ধকার অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক। কি হ'ল? অ্যাঁ কি হ'ল? সর্ব্বনাশ! এ আমি কি করেছি। টিপে দিয়েছি! রাগে দিশাহারা হয়ে টিপে দিয়েছি।

(সিরিঞ্জটা চোখের খুব কাছে আনিয়া মাপের দাগ লক্ষ্য করিল।)

চার কিউবিক সেন্টিমিটার! মাই গড! চার চার বর্গ-ক্রোশ-ব্যাপী পারমাণবিক ধ্বংসলীলা! (সহসা সাতঙ্কে চিৎকার) শান্তা! শান্তা! সর্ব্বনাশ করেছি।

(ব্যাগ হইতে কম্পিত হস্তে বাইনোকুলার বাহির করিয়া চোখে ধরিল।)

যতদূর দৃষ্টি যায়, সব ভস্মস্তূপ! ধূমায়মান ভস্মস্তূপ আমার নিজগৃহ! আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার আজন্মসঙ্গিনী শান্তা, বর্ব্বর-ক্রোধে সবাইকে পুড়িয়ে দিয়েছি। এক পলকের অসংযমে অর্দ্ধেক রাজধানী শ্মশানে পরিণত করেছি! (বেদনার অভিব্যক্তি) দেশে দেশে, দিকে দিকে যত নিরীহ নিরপরাধ অসহায় শিশু, যত নারী, যত বৃদ্ধ আমারই উদ্ভাবিত মারণাস্ত্রে জীবন হারিয়েছে, সর্ব্বস্ব হারিয়েছে, তাদের পুঞ্জীভূত অভিশাপ আজ বজ্র হয়ে আমার মাথায় ভেঙে পড়ল। বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। ওরে অহংকারী বৈজ্ঞানিক, ভগবানের যে আশাতীত দান হাতে পেয়েছিলি, সৃষ্টির কাজে না লাগিয়ে তা শুধু ধ্বংসের কাজে লাগিয়ে বাহবা কুড়িয়েছিস। সেই ধ্বংস এবার তোর নিজের উপর ধ্বসে পড়েছে! (আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া) ক্রোধ, হিংসা-লালসা, লোভের সমষ্টি মানুষ, অপরিণত জীব মানুষ! মানুষ ক্রীড়নক মানুষ! তার হাতে সৃষ্টি প্রলয়ের এই প্রচণ্ড শক্তি কেন তুমি তুলে দিয়েছিলে ভগবান? শান্তা, শান্তা, এবার আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ব্রতের কত দরকার ছিল। কিন্তু দেরি হয়ে গেল। কয়েক দিনের দেরি হয়ে গেল। (সহসা) কিন্তু ভেবো না। আমিও আসছি। এখনই আসছি। এখনই আসছি। বাঁচবার আর কোন আকর্ষণ নেই। বাঁচবার আমার অধিকার নেই। আমি বেঁচে থাকলে পৃথিবী আরও বহুগুণ প্রকাণ্ডতর সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হবে। তার আগেই যবনিকা টেনে দিই।

(পূর্ব্বোক্ত সিরিঞ্জ মাথার উপর ত্যাগ করিয়া টিপিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ঙ্কর শব্দে চার দিক কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকার নিরন্ধ্র হইল। এই অন্ধকার সবুজ ও বেগুনী দুইটি বিদ্যুৎ তরঙ্গ ক্ষণিক ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। ভূমিকম্পের অশুভ আওয়াজ!

যবনিকা

আমার জীবনে উদিল সূর্য্য

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

'উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ
উদয়াস্ত মনে পুংসাং মহতামেকরূপতা।'

জীবন যখন প্রহেলিকাময় কুজ্ঝটিকায় ঢাকা
প্রাণপণ করি যাহা পাই ধরি শেষে দেখি সব ফাঁকা,—
এক সমস্যা সমাধান হলে আরেক উদয় হয়
তিক্ততা বাড়ে ঘনান্ধকারে বাড়ে সংশয় ভয়।
আমার আকাশে উদিল সূর্য্য হেন সঙ্কটকালে
তিমির বিদার মূরতি উদার তিলক উষার ভালে।

যে রবি উদিত হইল জীবনে সেদিন ভূমণ্ডলে
তাঁহার কিরণ অবিস্মরণ দিবসে নিশীথে জ্বলে,—
সে রবির আলো নয়ন ভুলালো শ্রবণ ভুলালো সুরে
কক্ষচক্রে কত জ্যোতিষ্ক তাহারে ফিরিয়া ঘুরে।
জীবনে মরণে প্রকাশে গোপনে নমি বাক্-কায়-মনে
প্রেয় আর শ্রেয় মিলালো যে জন অচির চিরন্তনে।

যে রবি আপন মহামহিমায় মূর্ত্ত ময়ূখময়
যাহার কিরণে ষোড়শ কলায় চন্দ্রমা উছলয়,
বিশ্বরূপের নাভিপদ্মের নভো নীলিমার মাঝে
জ্যোতিঃসাগরে গভস্তিমান জাগরনয়নে রাজে।
বিশ্ব হৃদয় পদ্ম ফুটিল যাহার কিরণ মাখি
ভূলোকে দ্যুলোকে খগোলে ভূগোলে বাঁধিল মিলনরাখী।

নিখিল নয়ন ইন্দীবরের মধু যে করিল পান
ধন্য করিয়া ধন্য হইল যাহার পুণ্যদান,—
রূপে আনন্দে অমৃত বিভায় রসায়ন পরশনে
রসিয়া তুলিল নয়নে পশিয়া রশ্মি মরমে মনে।
অপরিণতের প্রাণ পরিণতি অবিকশিতের বীজ
ভস্ম করিয়া বিশ্বভুবনে ছড়াইল মনসিজ।

নীরব ওষ্ঠে মুখর যে রবি মুখারবিন্দ চুমি
পুষ্পিত করি তোলে মন্তরে অন্তর মরুভূমি,—
যে রবি রশ্মি সপ্ততন্ত্রী সুর ভারতীর করে
মূর্চ্ছনা তুমি গমকে চমকে নিদ্রিতে ঘরে ঘরে;
নব জাগরণ মন্ত্র দিল সে নব গায়ত্রী পড়ি
নব সবিতুর্ব্বরেণ্য রূপ ভূর্ভুবস্বঃ ভরি।

যে রবি উদিল উষসীর সুরে ভোরে ভৈরবী গাহি
যে রবি চলিল পূরবী গাহিয়া পশ্চিমে অবগাহি
নয়নে শান্তি বদনে কান্তি করুণা সমুৎসার
ঋষির দৃষ্টি বাণী মূর্ত্তি যে ভারতের আত্মার
উষ্ণ পূষন্ দীপ্ত কিরণে উজলি নভস্তল
অস্তমনের স্তিমিত নয়নে বিদায় অশ্রুজল।

যে রবি উদিত করে প্রচোদিত প্রবোধ বুদ্ধ হিয়া
এ কাঙাল কবি দেখাবে কি রবি প্রদীপ দীপিকা দিয়া?
এ নহে প্রভাত প্রদোষের রবি চলেছে অস্তাচলে
উদয়ে অরুণ অস্তে অরুণ রাঙায়ে গঙ্গাজলে,—
আজি একলব্যের একলভ্যের একমুখী অনুরাগে
আঁখির সলিল দিলাম যদি সে সুধী পাদোদকে লাগে।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 'ললিতকলা আকাদেমি'র উদ্বোধন করিতেছেন

রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্যারাসুটবাহিনী প্রত্যক্ষ করিতেছেন

নয়াদিল্লীতে চেকস্লোভাকিয়ার আধুনিক গ্লাস-প্রদর্শনী পরিদর্শনরত ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ

পালাম বিমানঘাঁটিতে মিঃ এণ্ড্রেস্ত, মিঃ মুখিটডিনভ এবং শ্রীমতী আলভা ভায়োলেটসহ ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ
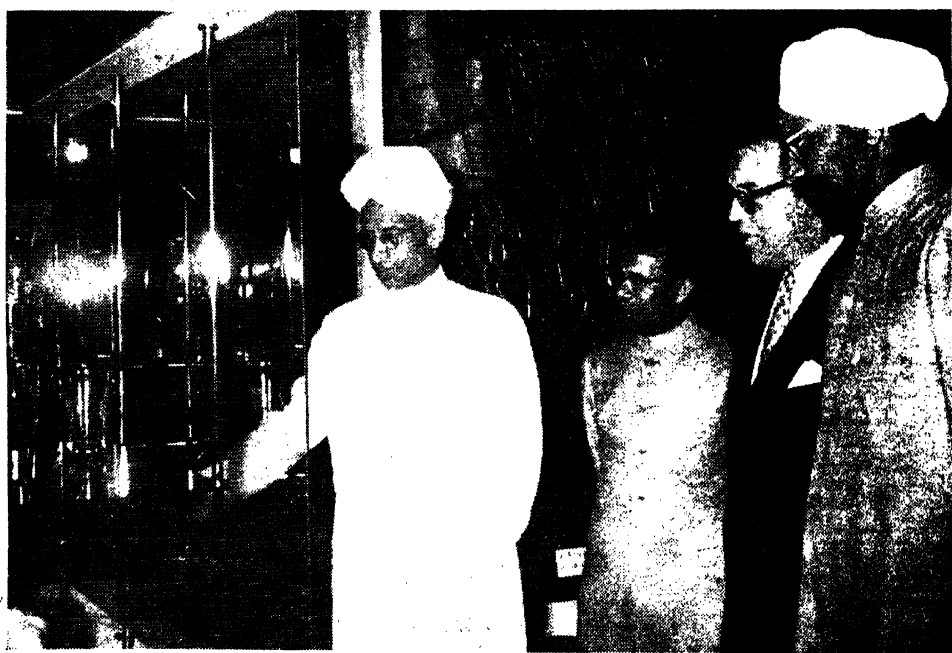
পূর্ব্বরাগ

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

বর্দ্ধমান ষ্টেশন।

পায়চারী করে বেড়াচ্ছে স্বাগতা ও সরোজ।

ডাউন পঞ্জাব মেলের প্রতীক্ষার্থী তারা। কিন্তু ট্রেন আজ এক ঘণ্টা লেট। শীতের সকাল। ঠাণ্ডার প্রকোপটাও একটু বেশী। স্বাগতার গায়ে মেটে রঙের লেডিজ ওভারকোট। কিন্তু সরোজ পুরোপুরি সাহেব। কালো রঙের গরমের সুট আর খয়েরী রঙের টাই-এ সে কিটফাট। ছটফটে যুবক, মনের স্থৈর্য্য নাই; একটুতেই অস্থির। স্ত্রী স্বাগতাকে বলে,—দেখেছ ব্যাপারখানা? এক ঘণ্টা লেট। এ দেশের ট্রেনের উপর নির্ভর করে কোন কাজ করবার কি যো আছে? একটা আস্ত নরককুণ্ড।

স্বাগতা একটু হাসে। কিন্তু উত্তর দেয় না। স্বামীর ব্যস্ততাকে চেনে সে।

—কি করি বলত এখন? নিরুপায় সরোজ, প্রশ্ন করে স্ত্রীকে।

স্ত্রী বলে—কিছু না। করবার কিছু নেই এখানে, শুধু পায়চারী করা ছাড়া আর হাঁ করে লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। তড়বড়ে মানুষ তুমি। তর সয় না কিছুতেই। এসেছ ত আধ ঘণ্টা আগে। তার উপর গাড়ী লেট আরও এক ঘণ্টা! এতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না বাপু। তার চেয়ে বাড়ী ফিরে যাই চল।

—সে কি? বাড়ী? সরোজ অবাক হয়।

স্বাগতা ঘাড় নাড়ে। সম্মতির ঘাড় নাড়া।

—তার পর?

—তার পর এক কাপ চা। শীতের সকালে মন্দ লাগবে না।

—তা লাগবে না। কিন্তু তার পর?

—তার পর আর কিছু নয়। পঞ্জাব মেল যদি এসে পৌঁছয় বর্দ্ধমানে, তুমি আসবে ষ্টেশনে। আমি আর নয়।

—বল কি? একা একা, এই শীতে?

—তাই। গরজ তোমার, আমার নয়। তোমার তেল কোম্পানীর যত সাহেব—বড়, মেজ, সেজ—যখনই যাবে আর আসবে বর্দ্ধমানের উপর দিয়ে, তখনি অভ্যর্থনা করতে হবে তাদের আগু বাড়িয়ে। এ কেমন কথা?

সরোজ একটু ভারীকি হাসি হেসে বলে, চাকরী। চাকরী করতে হয় এদেরই অধীনে। বুঝেছ প্রিয়ে।

—বুঝেছি। সে কর তুমি, আমি না। কিন্তু টানাটানিটা আমাকে নিয়ে কেন?

—করি সাধে নয়। ওঁরা পছন্দ করেন বলেই করি। ভারী সুখ্যাতি করেন সব তোমার। লাহিড়ী সাহেব ত স্পষ্টই বললেন সেদিন, স্ত্রীভাগ্য আপনার সত্যই ভাল মিঃ ব্যানার্জ্জি। এমন সকলের হয় না। আহা বেচারী! স্ত্রীর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই আজ দু' বছর।

—তাই পরের স্ত্রীর ওপর দরদ এত! মাগো, হাতে কড়া পড়ে গেল রাত্রি দিন এদের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করে করে। কি হ্যাংলা সব। মেয়ে মানুষ যেন দেখে নি এমনি ভাবে তাকায়, হাত ঝাঁকানিও দেয় কি তেমনি ভাবে! এমন লজ্জা করে আমার।

—না গো না। ইনি দাস সাহেব। লোক ভাল। একে লজ্জা করবার কিছু নেই তোমার।

—না থাকে ভাল কথা। বলব গুণী লোক দাস সাহেব তোমার। একেবারে সদাশয় ব্যক্তি। কিন্তু আমার কাছে সবাই সমান। তোমার চেয়ে দু টাকা বেশী মাইনে পেলেই সে ত হবে তোমার সাহেব গো। তাই নয়?

সরোজ জবাব দেয় না। একটুখানি হাসে শুধু।

দু' জনে পায়চারী করে পাশাপাশি। এক সময়ে প্ল্যাটফর্ম্মের শেষ প্রান্তে এসে পড়ে তারা। ভোরের দিক। জনবিরল ষ্টেশন। সামনের প্ল্যাটফর্ম্ম আরও ফাঁকা। সেই দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায় সরোজ। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে বলে,—অতীশ নয়? কিন্তু এত সকালে করছে কি ওখানে? নাঃ! ছেলেটা মারা পড়বে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত! পড়াই হ'ল ওর কাল। এই শীতে এত সকালে একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে, এক গাদা বই নিয়ে পড়ছে ফাঁকা মাঠে বসে।

স্বাগতা তাকায়। স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে সে। জনবিরল প্ল্যাটফর্ম্ম। তারই একান্তে বসে আছে একটি যুবক। ঘন কালো দাড়ি-গোঁফে মুখখানি ঢাকা। চোখে পুরু চশমা। বসে আছে, কিন্তু হাতে একখানি মোটা বই। দৃষ্টি উদাস। সুদূরের দিকে প্রসারিত। জীর্ণ পরিচ্ছদ। সেই জন্যই হয়ত এই স্থানটুকু বেছে নিয়েছে সে, রৌদ্রের প্রথম আমেজটুকু উপভোগের জন্য। সরোজ বলে, আশ্চর্য্য ছেলে এই অতীশ। বাংলা দেশের ইতিবৃত্ত রচনার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দেশময়। অথচ নিঃসম্বল। সম্বল শুধু ওর মাধুকরী বৃত্তিটুকু।

—মাধুকরী? মানে?

—মানে আমারও অজানা। জানে শুধু নিশিকান্ত। বলে, ওর মধ্যে কপটতা নেই এতটুকু। ভারী খাঁটি মানুষ ও।

—কিন্তু ওর কথা নিশিকান্ত জানল কি করে?

—নিশিকান্ত বলে, ছেলে বেলায় একই স্কুলে পড়েছি আমরা।

তার পর আমি চলে যাই দিল্লীতে বাবার কাছে। সেই থেকে ছাড়াছাড়ি আমাদের। কলেজ-জীবনে নিশিকান্তর সঙ্গে আবার দেখা হয় আমার স্কটিসে। অতীশ তখন পড়ে সেণ্টজেভিয়াসে। কিন্তু নিশিকান্তর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল অটুট।

—তা হ'লে নিশিকান্তই হংসদূত বল? তোমাদের পুনর্মিলনের সেতু।

সরোজ ঘাড় নাড়ে, সেই। তারই মুখে শুনেছি অতীশের ইতিহাস।

—ইতিহাস? দুঃখের নিশ্চয়ই?

—সুখের ইতিহাস সংসারে বিরল। সাধারণ ইতিহাস প্রায় সবই দুঃখের—অথবা দুঃখকে কেন্দ্র করে। অতীশ এসেছে বর্দ্ধমানে এখানকার ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে। নিশিকান্তই তাকে সঙ্গে করে এনেছে এখানে। আছে আমারই আউট-হাউসে।

স্বাগতা অবাক হয়। বলে,—আউট-হাউসে কেন?

—তোমার এ কেনর সঠিক উত্তর দানে আমি অপারগ। পারঙ্গম একমাত্র নিশিকান্ত।

—নিশিকান্ত? কিন্তু তাকে এত সকালে, এই বর্দ্ধমান ষ্টেশনে, এখন আমি পাব কোথায়? বরঞ্চ তার হয়ে তুমিই না হয় বল, যা জান।

—বেশ বলছি শোন। এ আমার কথা নয়, নিশিকান্তের। শুনলে খুশী হবে না খুব।

—কারণ?

—কারণ অতীশের যত রাগ তোমাদের উপর। অর্থাৎ তোমাদের বয়সী মেয়েদের উপর। নিশিকান্তর মতে, তোমরাই নাকি করে তুলেছ ওকে অতি মাত্রায় স্ত্রীবিদ্বেষী। তার এই অত্যুগ্র স্ত্রীবিদ্বেষই আজ ছন্নছাড়া করেছে ওকে। তাই সব পথই আজ ওর অবরুদ্ধ।

—অদ্ভুত মানুষ ত!

—অদ্ভুতই বটে! তবে সকলের মতে নয়। নিশিকান্ত বলে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছে অতীশ। মেয়ের জন্যেই আজ সে মেয়ে-বিদ্বেষী। একদিন ভালবেসেছিল সেও। তবে সে ভালবাসা পরিণামে শুভ হয় নি।

—শুভ হয় নি মানে? মেয়েটি বিমুখ করেছিল তাকে?

—বিমুখ নয়। বিশ্বাসঘাতকতা, অন্ততঃ নিশিকান্ত তাই বলে। আর তারই ফলে অতীশকে জেল খাটতে হয়েছিল পাঁচ-পাঁচটি বছর।

স্বাগতা চমকে ওঠে। ভ্রু কুঁচকে বলে, জেল? কেন, খুনোখুনি করেছিল নাকি? হতাশ প্রেমিকেরা না পারে এমন কাজ নেই।

—তা নেই বটে! তবে সে ক্ষেত্র বিশেষে। এ ক্ষেত্রে নয়। নিশিকান্ত বলে, মেয়েটির শালীনতা রক্ষার জ ই এত বড় শাস্তি তার।

—শালীনতা? থমকে প্রশ্ন করে স্বাগতা।

—অর্থাৎ মেয়েটির মানসম্ভ্রম। নিশিকান্ত বলে, এক মাতাল ইংরেজ মেজরের হাত থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করেছিল অতীশ। সে দিনের দ্বৈরথ যুদ্ধে অতীশের প্রবল মুষ্ট্যাঘাতে মেজরের নীচেকার দাঁতের পাটিকে পাটি খোয়া গিয়েছিল সেদিন।

—বল কি? স্বাগতার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে, তার পর?

—তার পর? কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পর হয় না। ঐ বেঞ্চিটায় বসি চল। বসে বসে তোমার তার পরের জবাব দেব। সময় কাটবে ভাল।

স্বাগতা বসে। কেমন যেন বিমূঢ় ভাবে আর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অতীশের নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে। তার ঐ ঘন গোঁফ-দাড়ির মধ্যে, ঐ শতজীর্ণ জামার মধ্যে, ওই পুরু চশমায় ঢাকা উদাসী চোখের মধ্যে কি এক ঘন রহস্যের সন্ধানে ফিরে সে।

সরোজ বলে—তোমার তার পরের কথা শোন। এ সব কথা নিশিকান্তর মুখেই শোনা। নিশিকান্ত বলে, রিজেণ্ট পার্কের ভিতর দিয়ে ফিরছিল অতীশ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। ব্ল্যাক-আউটের রাত। তার উপর মিলিটারীর রাজত্ব। মেজর আসছিল বিপরীত দিক থেকে বেশ একটু 'টিপসি' হয়ে। সামনে পড়ল এ-দেশীয় সুন্দরী তরুণী। বেশ একটু ঘোর লাগল মেজরের। অকস্মাৎ কাছে এসে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে।

স্বাগতা শিউরে উঠে। একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে।

সরোজ বলে চলে,—নিশিকান্ত বলে, অতীশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, প্রিয়তমার অপমানে। চক্ষের নিমিষে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল মেজরের ঘাড়ে। তার পর যখন শেষ হ'ল দ্বৈরথ যুদ্ধ, দেখা গেল, রক্তারক্তি কাণ্ড। সাহেবের নীচের পাটির দাঁত হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। আর অতীশ মেয়েটিকে নিয়ে গা ঢাকা দেবার আগেই ধরা পড়ে গেছে পুলিশের হাতে।

—পুলিসের হাতে? নিষ্প্রাণ স্বাগতার কণ্ঠ চিরে কথাগুলি বেরিয়ে আসে কোন মতে।

সরোজ মাথা নাড়ে,—নিশিকান্ত বলছিল বটে। তবে বিশ্বাস হয় না এতখানি।

—কেন? স্বাগতা যেন স্বপ্ন দেখছে। তারই ঘোরে প্রশ্ন করে।

—অত বড় জাঁদরেল মেজর, তাকে কাৎ করল ঐ অতীশ? হাজার হ'ক গোরা ইংরেজ ত, একেবারে লুটিয়ে পড়ল একটা ছেলের দাপটে! আশ্চর্য্য কথা! স্বাগতা উত্তর দেয় না। শুধু মুখ তুলে তাকায়। শ্বেতপাথরের মত মুখ। ভীতিবিহ্বল চোখ। যেন সত্য সত্যই স্বপ্ন দেখছে, ঐ অতীশ লড়ে চলেছে একজন জাঁদরেল মেজরের সঙ্গে। এক পাশে বিবর্ণমুখী এক তরুণী, আর এক পাশে হাতকড়া হাতে নিয়ে পুলিস। স্বাগতা চোখ বোজে ভয়ে।

সরোজ আবার বলে, একটু জোর দিয়েই বলে এবার,—এ অসম্ভব, একেবারে অবিশ্বাস্য।

এতক্ষণে স্বাগতা মাথা নাড়ে। বলে,—অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে। মেয়েদের শালীনতা রক্ষার জন্যে ছেলেরা প্রাণ দেয়। আমাদের দেশের ছেলেরাও দেয়। গভীর ভালবাসা মানুষকে উন্মাদ করে তোলে।

সরোজ বলে,—নিশিকান্তরও মত তাই। বলে, মেয়েটাকে যথার্থই ভালবাসত অতীশ। তার জন্যে সহেছে অনেক, করেছেও অনেক। কিন্তু ঠকেছে শেষ পর্য্যন্ত। মেয়েটি বঞ্চনা করেছে তাকে।

স্বাগতার স্বপ্ন যেন ভেঙে যায়। সচকিত হয়ে বলে উঠে,—বঞ্চনা করেছে? মেয়েটা? বল কি? এ কিন্তু সম্ভব নয়। নিশিকান্ত ভুল শুনেছে। হয় ত ভুল বুঝেছে অতীশের কথাকে।

সরোজ বলে,—এ অতীশের কথা নয়, এ নিশিকান্তের নিজস্ব কথা। অতীশের মতে, মেয়েটি খাঁটি সোনা। কেমন করে খাদ মিশে গিয়েছিল তাতে। যেন এক হাঁড়ী দুধে এক ফোঁটা গোচনা। আমি কিন্তু বিদ্রূপ করে বলি নিশিকান্তকে, অতীশকে বল, মেয়েটি সোনাও নয়, হীরেও নয়। পেতলের উপর নিছক গিলটি করা। পুরুষ-ঠকান ব্যবসা এদের। অতীশ বোকা, তাই ঠকেছিল। আমাদের পাল্লায় পড়লে এক আঁচড়েই গিলটি ঘুচিয়ে দিতাম।

স্বাগতা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বলে,—খাঁটি আর মেকী যে চিনতে পারে না, সে বোকা নিশ্চয়ই। কিন্তু অতীশবাবু বোধ হয় বোকা নন। কাঁচ আর কাঞ্চন তিনি ঠিকই চিনেছিলেন, হয় ত ঠিকই।

—মনে ত হয় না। তবে যেমন শুনেছি তেমনই বলছি। নিশিকান্ত বলে, এদের পরিচয়ের সুরুও যেমনি অদ্ভুত, শেষও তেমনি অদ্ভুত। আই, এ, পরীক্ষার্থীনী মেয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রাম ধরবার আশায়। কিন্তু ট্রামের তার ছিঁড়ে ট্রাম বন্ধ। বাসেও ওঠা দায়। আপিসযাত্রীর ভিড়, স্কুল-কলেজের ভিড়, পরীক্ষার্থীদের ভিড়। মেয়েটি উঠতে পারে না ভিড় ঠেলে। বার বার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তার। পরীক্ষা আরম্ভ হবার সময় এগিয়ে আসে। মেয়েটি হাঁপিয়ে উঠে।

স্বাগতা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আশ্চর্য্য নয়!

—না, তবে আশ্চর্য্য এই যে, ঠিক সেই সময়ে অতীশ চলেছিল সেই পথ দিয়ে তার মোটর-বাইকে। মেয়েটিকে চিনতে পারে সে। অবস্থাটা ও অনুমান করে নেয় মনে মনে। বাইক থামিয়ে কাছে এসে বলে, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন, ব্যাপার কি? পরীক্ষা দিতে যাবেন না? খুণা চলে গেছে অনেকক্ষণ। খুণা অতীশের বোন।

মেয়েটির চোখে জল এসে যায়। বলে, ট্রাম বন্ধ, বাসে ওঠা দায়। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তখন থেকে। কি হবে আমার!

অতীশ সময় দেখে। আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। সেও বিচলিত হয়ে পড়ে। বলে, দাঁড়িয়ে না থেকে, ট্যাক্সি ডাকলেন না কেন? তারপর এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে, দোয়াতটা আর বইখানা আমার হাতে দিন। এবার চট করে উঠে বসুন পেছনের সীটে, দু' হাতে আমার কাঁধটিকে ধরে। কুইক, কুইক। মেয়েটিকে এতটুকু ভাববার সময় দেয় না অতীশ। একেবারে তাকে নিয়ে উড়ে যায় তীব্রবেগে বাতাসের বুক ভেদ করে।

—তারপর?

—তারপর জানি না। নিশিকান্তও বলে নি।

—জিজ্ঞাসা কর নি?

—না। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞাসা করি নি।

—করলে হয়ত জানতে পারতে আরও কিছু।

—মানে, বাতাসের বুক চিরে যাওয়া-আসার কথা?

—খুব সম্ভব তাই। হয়ত এই তাদের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—এ জানতে হয় না, এ স্বতঃসিদ্ধ। রোম্যান্সেরও একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। সে পথ ছাড়া এগুতে পারে না সে।

—জানি।

—না জান না। জানলে নিশ্চয়ই বলতে যে, তাদের এই বাতাসের বুক চিরে যাওয়া-আসার গতি ঐ পরীক্ষার হলে এসেই থেমে যায় নি।

—বারে! এ কথা আমি জানব কি করে? নিশিকান্ত ত বলে নি আমায়, কিন্তু গতি যদি থেমে না যায়, তা হলে হ'ল কি?

—আরও বেড়ে গিয়েছিল। নিশিকান্ত যদি খোঁজ নিত, জানতে পারত যে, এরপর অনেক বিকেল, অনেক সন্ধ্যায় অতীশের পেছনে বসে থাকত মেয়েটি তার পিঠে হাত রেখে, আর বাইক ছুটে চলত বাতাসের বুক ভেদ করে। কত ট্রাঙ্ক রোড, কত এভিনিউ পার হয়ে। হয়ত বসন্তের সন্ধ্যায় অথবা চাঁদিনী রাতে এলিয়ে পড়ত মেয়েটি তার গায়ে, কোন এক নিভৃত মাঠের ধারে অথবা নদীর তীরে।

সরোজ হাসে—তুমি স্বপ্ন-বিলাসী। সবেতেই স্বপ্ন দেখ। তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সুর কেটে গেছে তোমার, সেই সুর তুমি জোড়া দিয়ে চলেছ এখনও। তার জের টেনে চলেছ মনে মনে।

—হবেও বা। তবে স্বপ্নেরও মূল্য আছে। বাস্তবকে ঘিরেই ত স্বপ্ন।

—সব সময় নয়, অন্ততঃ অতীশের স্বপ্ন নয়। মেয়েটা অতীশকে এতখানি ভালবাসে নি যে, তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা চলে।

—না? কিন্তু জানলে কি করে? নিশিকান্তর মুখে শুনে?

—শোনার প্রয়োজন হয় না। চোখে দেখেই জানা যায়। বাসলে, ওকে আজ মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করে আত্মীয়ের ঘরে বাস

করতে হ'ত না এ ভাবে। অথচ ঐ মেয়েটির জন্তে অতীশ না করেছে কি? নিশিকান্তর মুখেই শুনেছি, মেয়েটির বাপের অবস্থা তেমন নয়। পুলিসে চাকরী করে। সামান্ত আয়, তা দিয়ে মেয়েকে বি-এ পড়ান যায় না। শুনে মেয়ের মুখ শুকিয়ে যায়। ছল ছল চোখে বলে অতীশকে, জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার।

অতীশ সান্ত্বনা দেয়। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, না, যাবে না। আমি আছি, ভয় কি? সত্যই সে নির্ভয় করল মেয়েটিকে। অনেক ঘোরাঘুরি ধরাধরি করে শিক্ষা-বিভাগ থেকে একটা স্পেশাল স্কলারশিপ পাইয়ে দিল তাকে।

—এ অতীশের মহানুভবতা। কিন্তু মেয়েটির অন্তরের কথা কিছু বলেছিল নিশিকান্ত?

—মনে নেই। হয়ত বলেছিল যে, এক টুকরো কৃতজ্ঞতার হাসি চলকে পড়েছিল মেয়েটির মুখখানিতে।

—মেয়েটি করল কি?

—মেয়েটি? হয়ত কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল একটুখানি।

—মিথ্যে কথা। নিশিকান্ত মিথ্যে কথা বলেছে তোমায়। মেয়েরাও প্রতিদান দিতে জানে। নিশ্চয়ই মেয়েটি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিল ছেলেটির কাছে।

—হয়ত হবে। কিন্তু নিশিকান্ত সে কথা বলে নি। বলেছিল আর একটি কথা। মেয়েটির কঠিন অসুখের কথা, আর অতীশের আত্মোৎসর্গের কথা। নিরক্ত মেয়েটির দেহে রক্ত চাই। রক্ত জিনিসটি দুর্লভ না হলেও, এখানে সুলভ হ'ল না স্বাস্থ্যের অজুহাতে, ভাই নাচার। বৃদ্ধ বাপ নিরুপায়। কিন্তু অতীশ এ দুয়ের বাইরে। রক্ত দিল সেই দেহ চিরে। এ দেওয়া ফলপ্রসূ হ'ল বটে মেয়েটির পক্ষে কিন্তু ক্ষতি হ'ল অতীশের। রোগে ধরল তাকে মেয়েটির জন্তেই।

স্বাগতা ক্ষুব্ধ হয়। বলে, এক দেশদর্শী তোমরা। পুরুষের দৃষ্টি দিয়েই যাচাই কর সবকিছু। মেয়েদের দিয়ে নয়। অতীশ দেহ চিরে রক্ত দিয়েছে বলেই সে ধন্ত। কিন্তু সুযোগ পেলে মেয়েটিও দিতে পারত। শুধু দেহ চিরে নয়, পারত বুক চিরেও। হয়ত সুযোগ পায় নি। তাই দেয় নি।

সরোজ হাসে। বলে, পেয়েছিল কিন্তু দেয় নি।

স্বাগতা গর্জ্জে উঠে, কক্ষনো নয়। মেয়েরা এতখানি অকৃতজ্ঞ হতে পারে না। নিশিকান্ত সত্য কথা গোপন করেছে তোমার কাছে।

—কিন্তু ঐ মেয়েটি সত্যই অকৃতজ্ঞ স্বাগতা। সে জানল না, ভালবাসা কত গাঢ় হলে এত বড় আত্মোৎসর্গ মানুষ করতে পারে।

স্বাগতা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বলে, মেয়েদের অযথা দোষারোপ করে লাভ নেই। তাদের ভালবাসাও ফিকে নয়। কিন্তু তারা পরাধীন। পরাধীনতার চাপে তারা পঙ্গু। তাই সব সময় অমৃতময় হয়ে উঠতে পারে না তাদের ভালবাসা। ক্ষুব্ধ লাঞ্ছিত ভালবাসা বুকে চেপে গুমরে মরে আজীবন। এ ভালবাসা তাদের তুষের আগুন। অহর্নিশি ধিকি ধিকি জলে আর জালায়। এ মেয়েটির ভালবাসাও যে তুষের আগুন হয়ে উঠে নি, কে জানে।

—সত্যিই হয়ে উঠে নি স্বাগতা, সরোজ মাথা নেড়ে বলে, নিশিকান্ত বলে, অতীশ বিশ্বাস করেছিল মেয়েটিকে, আর বিশ্বাস করেছিল তার ভালবাসার একনিষ্ঠতাকে। তাই পুলিসের হাতে ধরা পড়েও নিশ্চেষ্ট ছিল শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। মেয়েটি যে ইংরেজ মেজরের দুষ্ট অভিযোগকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার নীচতাকে মূর্ত্ত করে তুলবে প্রকাশ্য আদালতে, এ ধ্রুব বলেই মেনে নিয়েছিল অতীশ। কিন্তু তার ধ্রুবই শেষ পর্য্যন্ত ঠকাল তাকে। মেয়েটি আসে নি। কোন তথ্যই প্রকাশ করে নি মেজরের বিরুদ্ধে।

স্বাগতার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠে। একটা দুর্ব্বোধ্য স্বর বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে। কি যেন বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাধা দেয় সরোজ। বলে, অন্ত মেয়ের স্বপক্ষে তুমি যা কিছু বল, শুনতে রাজি আছি; কিন্তু এ মেয়ের স্বপক্ষে বলবার কিছু নেই। স্বার্থপর, জঘন্ত মনবৃত্তির মেয়ে ও। যে বাঁচিয়েছিল তার প্রাণ, মান, ইজ্জত, তাকেই ঠেলে দিল ফাঁসিকাঠে।

—ফাঁসিকাঠে? স্বাগতা আঁৎকে উঠে।

—নয় ত কি। সেদিন বাঙালী যুবকমাত্রই ইংরেজের চোখে এনার্কিষ্ট। ইংরেজের আদালতে অতীশও সহজেই প্রমাণিত হয়ে গেল রাজদ্রোহী এনার্কিষ্ট বলে। মেজরের প্রাণহানি করাই উদ্দেশ্য ছিল তার। তবে ভাগ্যবলে ফাঁসির বদলে জেল হ'ল তার পাঁচ বছরের।

সিতবরণ স্বাগতা বেদনায় অসিতবরণ হয়ে উঠে। এই সীমাহীন নিষ্করুণতা মুহূর্ত্তরে তাকেও যেন বিহ্বল করে ফেলে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠে, জেল হ'ল? না, না, এ হতে পারে না। এ মিথ্যে। নিশিকান্ত মিথ্যে বলেছে।

—না, মিথ্যে নয়। জেলই হয়েছিল তার। কিন্তু আশ্চর্য্য, একটা কথাও বলল না অতীশ আদালতে। শুধু ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে সে সারাক্ষণ খুঁজে বেড়িয়েছে মেয়েটিকে চারিদিকে। এত বড় দাগা যে দিতে পারে মেয়েটি এ ছিল অতীশের স্বপ্নেরও অগোচর। নিশিকান্ত বলে ঘুষ খেয়েছিল মেয়েটি।

—ঘুষ? ছিঃ ছিঃ! স্বাগতা কাতরোক্তি করে উঠে, আমি মেয়ে। মেয়েদের এতবড় দুর্নাম—এ অসহনীয়। ঘুষ খেয়েছিল মেয়েটি, এ কথা বিশ্বাস করে অতীশ?

—জানি না। তবে নিশিকান্ত জেনেছে, মেয়েটির বাপের পদোন্নতি হয়েছে। ভাইয়েরও চাকরী হয়েছে ভাল। আর মেয়েটির বিয়ের জন্তেও নাকি একটা মোটা টাকার ব্যবস্থা গোপনে করে দিয়েছে মেজর। পুলিস কর্ম্মচারীর মেয়ে। এর পর যদি চুপ করে যায় তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। জেল থেকে ফিরে পর্য্যন্ত অতীশ মেয়েজাতটার দিকে তাকায় না ক ফিরে। একটা বিজাতীয় ঘৃণা পেয়ে বসেছে তাকে।

স্বাগতা যেন হাঁপাচ্ছিল। দম নিয়ে বলল, একটা বড়রকমের

গলদ হয়ে গেছে কোথাও। তাই হয়ত বিচারে ভুল করেছে অতীশ। মেয়েদের দায়িত্ব যেমন, দুর্ব্বলতাও তেমনি। হয়ত এই দুর্ব্বলতাই পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটির। বাপ-মা ভাইয়ের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করতে গিয়ে, অকর্ত্তব্যপালন করেছে নিজের প্রতি। হয়ত প্রমোশনের লোভে লোভী বাপ মেয়ের হাত দুটি ধরেছে এসে। চাকরীর লোভে ভাই করেছে বোনের উমেদারী। আর মা, স্বামী-পুত্রের মঙ্গলকামনায় ধরে বসেছেন মেয়েকে। আমি ত এমন মেয়ে দেখি না যে, মায়ের আবেদনে সাড়া না দিয়ে থাকে—যখন মা মেয়ের দুটি হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন সকাতরে, সংসারটাকে বাঁচা মা। হাতের লক্ষ্মীকে ঠেলিস না ক পা দিয়ে। অনেক দুঃখ পেয়েছেন তোর বাপ জীবনে। যদি শেষ বয়সে একটু সুখের মুখ দেখবার সুযোগ এসে থাকে, বিমুখ করিস না তাঁকে।

সরোজ হেসে ফেলে বলে, তোমার ক্ষমতা আছে স্বাগতা। কেসটিকে সাজিয়েছ ভাল। লোকে শুনলে বলবে, নির্দ্দোষী মেয়ে, দোষ যা কিছু সব বাপ-ভাইয়ের। কিন্তু মেয়েটি যে ডুবে ডুবে জল খায়, এ শিবের বাবাও টের পেল না।

স্বাগতা ক্লিষ্ট মুখে বলে, আমি নিজে মেয়ে, তাই কোন মেয়েকেই ছোট ভাবতে পারি না। মনে হয় নিশিকান্ত যে চিত্র এঁকেছে মেয়েটির সে যতখানি ছোট ততখানি অবজ্ঞেয় নয়।

—কিন্তু তার মহত্বটাই বা কোনখানে?

—সে খবর আমি রাখি না। আর নিশিকান্তও তোমায় বলে নি। হয়ত ইচ্ছে করেই বলে নি।

—থাকলে বলত নিশ্চয়।

—না, বলত না। কিছুতেই বলত না। সে প্রকৃতিই তার নয়।

সরোজ হাসে। বলে, সবই তোমার অনুমান।

—অনুমানই ত। ডুবে ডুবে জল খাওয়াটাও ত অনুমান। তবে আমার অনুমানের ধারাও আছে রীতিও আছে। মেয়েমনের প্রতিফলনও আছে। কিন্তু তোমাদের তা নেই।

—মানে?

—যদি বলি, এত বড় বিপদে প্রেমার্ত্ত মেয়ে সব বিবেচনা-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তা হলে দোষ হবে না নিশ্চয়ই?

—নিশ্চয়ই না।

—যদি বলি এই অসহায়াকে লোভ দেখিয়েছিলেন তার বাপ-মা, প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তারা যে অতীশকে মুক্ত করে আনবেন মেজরেরই সহায়তায় গোপন দরজা দিয়ে, যদি সে মেজরের মানটুকু রাখে, তা হলে এ অনুমানটুকুতেও অপরাধ হবে না আমার।

—না।

—মেয়েরা প্রেমে পাগলও যেমন ছাগলও তেমন। তাই এত বড় ধাপ্পা হয়ত ধরতে পারে নি সে। স্বার্থ যে স্নেহেরও পরিপন্থী হতে পারে, এটা বিশ্বাস করতে পারে নি বলেই হয়ত মেয়েটা ঠকেছে।

—আশ্চর্য্য নয়।

—আর ঠকেছে বলেই হয়ত একদিনে তার সকরুণ দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাস সব জমাট বেঁধে শিলীভূত হয়ে উঠেছে তার চারিপাশে।

সরোজ বলে, তোমার মন-বিশ্লেষণে বাহাদুরী আছে স্বাগতা, এ আমি স্বীকার করি। কিন্তু যত বাহাদুরীই থাক, এটা জেনো যে, মেয়েটি একেবারে কচি খুকী ছিল না। তার বুঝা উচিত ছিল, এত কাণ্ড যে করেছে মেজর, এ অতীশকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করবার জন্যে নয়।

স্বাগতা বলে, হয়ত একটা বোঝে নি সে। প্রেমে দুর্ব্বল মন, হয়ত পরমাশ্রয় খুঁজছিল স্নেহের কাছে, তাই ঠকেছিল।

—কিন্তু অতীশ ঠকে নি। তার প্রেম ছিল পরিপূর্ণ প্রেম।

স্বাগতা চুপ করে থাকে। যেন মনের গভীরে তলিয়ে যায়। তার পর হঠাৎ মাথা তুলে বলে, এর পর মেয়েটির কি করা উচিত ছিল বল ত?

—এ প্রশ্নটা আমার। তোমায় করব ভেবেছিলাম স্বাগতা। কেননা, মেয়েদের মনের খবর মেয়েরাই জানে ভাল।

—সব সময় নয়। তবুও আমি বলব, আত্মহত্যাই ছিল এর একমাত্র পথ। হয়ত মেয়েটা আজও বেঁচে আছে, আর আত্মাকে হত্যা করে চলেছে তিলে তিলে। হয়ত সে প্রতীক্ষা করেছিল অতীশের দিনের পর দিন ধরে। কিন্তু সব আশা যেমন ফলবতী হয় না, এ আশাও তার ফলবতী হয় নি। মিলিয়ে গিয়েছিল জীবনের চরম দিনটিতে।

সরোজ বলে, কিন্তু আমার কি মনে হয় জান? মেয়েটি এতখানি এখনও ভালবাসে নি অতীশকে। বাসলে—

—বল, থামলে কেন, বল? বাসলে কি করত সে? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে স্বাগতা।

—বাসলে, তার পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হত না কখনও। যেমন করেই হউক সে খুঁজে বার করত অতীশকে।

স্বাগতা চুপ করে থাকে। দৃষ্টি তার চলে যায় দূরে। স্তব্ধ হয়ে থাকে অতীশের মুখের উপর। তার পর আস্তে আস্তে বলে, মেয়েরা বসুন্ধরার জাত। ওপরে তারা স্থির, অচঞ্চল, কিন্তু ভিতরে অস্থির, চঞ্চল। সেখানে তপ্ত লাভার দাহ।

ঘণ্টা পড়ে। পঞ্জাব মেল আসবার সময় হয়। দূরে ডাউন সিগন্যাল পড়ে। গাড়ী দেখা যায়। সরোজ উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় স্বাগতাও।

পঞ্জাব মেল চলে যায়। এর মধ্যে কখন যে দাস সাহেব গাড়ী থেকে নেমেছেন, তার করমর্দ্দন করে কুশল প্রশ্ন করেছেন, কিছু খেয়াল নেই স্বাগতার। সে তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে উদাস দৃষ্টি মেলে।

সরোজ প্রশ্ন করে, আজ হ'ল কি তোমার? একেবারে উদাসীন। দাস সাহেবের প্রশ্নের কি সব যে উত্তর দিলে, আমিই বুঝতে পারলাম না কিছু। দাস সাহেব বোধ হয় খুবই অপ্রস্তুতে পড়েছিলেন।

স্বাগতা উত্তর দিতে পারে না। সে স্বামীর মুখের দিকে বোবার মত তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

সরোজ তাড়া দেয় চল, দেরী হয়ে গেল অনেক।

—চল, স্বাগতা বলে মৃদুকণ্ঠে। তার পর ফিরে দাঁড়িয়ে চকিতে একবার দেখে নেয় অতীশকে। তেমনিই স্থাণুর মত বসে আছে সে। দৃষ্টি তখনও তার সুদূর প্রসারিত। সামনে বইখানি খোলা, দুটি হাতের মধ্যে ধরা। কি এক উন্মনা মন নিয়ে স্বাগতা ষ্টেশন ত্যাগ করে।

শীতের রাত। ক্রমশঃই গভীর হয়ে আসে। আউট-হাউসের ছোট ঘরখানিতে অতীশ বসে আছে বইখানি খুলে। মাঝে মাঝে নোট টুকে নিচ্ছে খাতার পাতায়। স্বাগতা নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢোকে, তেমনি নিঃশব্দেই দরজাটিকে ভেজিয়ে দেয়। এক মুহূর্ত সে থমকে দাঁড়ায়। তার পর এগিয়ে এসে মৃদুকম্পিতকণ্ঠে বলে, আমি এসেছি।

অতীশ চমকে উঠে। পুরু চশমার মধ্য দিয়ে ভাবেভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে?

—আমি—আমি স্বাগতা।

—স্বা-গ-তা! বিড় বিড় করে বলে অতীশ।

—চিনতে পারছ না?

অতীশ ভাল করে তাকিয়ে দেখে। তার পর চমকে উঠে বলে, পারছি। কিন্তু এখানে?

—এ বাড়ীতে আমরাই থাকি। স্বাগতা উত্তর দেয় নতকণ্ঠে।

—ওঃ! অতীশ বোঝে। তার পর ব্যস্ত হয়ে বলে, কিন্তু কেন, কেন এসেছ তুমি?

—প্রায়শ্চিত্ত করতে।

—প্রায়শ্চিত্ত? কিসের প্রায়শ্চিত্ত?

—কৃতকর্ম্মের। যে অন্যায় করেছি, যে পাপ করেছি, এ প্রায়শ্চিত্ত তারই।

অতীশ শিউরে উঠে। আপাদমস্তক স্বাগতাকে তাকিয়ে দেখে। তার পর ধীরস্বরে বলে, তোমার কি পাপ আমি জানি না। অন্যায় কি তাও আমার অজানা। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের কারণ বুঝি না।

—বোঝ না? ভুলে গেছ সেদিনের কথা? ওগো, আমি যে স্বাগতা। স্বাগতা আর্ত্তনাদ করে উঠে।

—ভুলি নি। মনে পড়ে অনেক—অনেক দিন আগে আমাদের দেখা হয়েছিল এক মরা নদীর তীরে। দাঁড়িয়েছিলাম আমরা মুখোমুখি। চোখে চোখে চেয়ে। তার পর বান এসে গেল নদীতে। একেবারে মহাপ্লাবন। আমি ভেসে গেলাম স্রোতে। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে সেখানে।

—আমি অভাগিনী, তাই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থাকা শুধু জড়দেহে। আমার আত্মা, সত্তা সব ছুটেছিল তোমার সঙ্গে সঙ্গে। আজও ছুটে চলেছে তারা তেমনি ভাবেই। ভাবি, সেদিন স্রোত কেন হ'ল এত নির্দ্দয়। কেন আমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল না তোমার সঙ্গে সঙ্গে।

—যায় নি তোমার মঙ্গলের জন্যে। তোমার সুখ, তোমার শান্তির জন্যে।

—আমার সুখ? না, সুখ আমার নেই। শান্তি হারিয়ে গেছে। সুখ-শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের আশায় দিন গুণে চলেছি।

—মহাস্রোতের সেই আবর্ত্ত দিব্যজ্ঞান দিয়ে গেছে আমায়। আমি ভুলে গেছি সব। বিস্মৃতির অতলান্তে ডুবিয়ে দিয়েছি সব।

—ভুলে গেছ সব? আমাকেও? নিদারুণ ব্যথায় স্বাগতার চোখ দুটি চক্ চক্ করে উঠে।

অতীশ হাসে। একটুকরো ম্লান হাসি ঝরে পড়ে তার ঠোঁটের কোল বেয়ে।

স্বাগতা প্রশ্ন করে যেন মরিয়া হয়ে, প্রতিশোধ নিতে চাও না তুমি?

—প্রতিশোধ? কেন? অতীশ অবাক-চোখে তাকায়।

—কেন? তোমার জীবনের ব্যর্থতার বিনিময়ে। সেটাকে যেমন ব্যর্থ করে দিয়েছি আমি, তেমনি আমারটাকেও কি ব্যর্থ করে দিতে চাও না তুমি?

—না। অতীশের কণ্ঠে দৃঢ়তা। বলে, এ তোমার সুখের পরিবেশ, শান্তির পরিবেশ। এ নষ্ট করে দিতে চাই না আমি।

—সুখ? শান্তি? ভুলেও ভেবনা ও কথা। জীবনটা ব্যর্থ হয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত ওদের সাক্ষাৎ পাব না কিছুতেই।

অতীশ ভয় পেয়ে যায়। ডাকে, স্বাগতা!

স্বাগতা বাধাহীন গিরি-স্রোত। বলে চলে, আমি দ্বিধাহীন। নিজেকে স্বেচ্ছায় তুলে দিলাম তোমার হাতে। তোমার যেমন ইচ্ছা যায়, যে ভাবে প্রাণ চায়, প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ কর আমাকে নিয়ে। আমি এতটুকু প্রতিবাদ করব না, বাধাও দেব না। স্বাগতার চোখের মণি দুটিতে এক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি জ্বলতে থাকে।

—তার পর? সকৌতুকে প্রশ্ন করে অতীশ।

—তার পরের কথা জানি না। শুধু এইটুকু জানি, তুমি পরিতৃপ্ত হলে হয়ত জীবনে শান্তি ফিরে পাব আমি।

অতীশ প্রশ্ন করে, কিন্তু একটা রাতের তৃপ্তিতে মন যদি তৃপ্ত হতে না চায়, যদি নির্ব্বাপিত আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে আবার?

—উঠুক। আমি আত্মাহুতি দেব এ আগুনে! সবাই পেয়েছে শান্তি, পেলাম না শুধু আমি। জীবনের চরিতার্থতা

খুঁজেছে সবাই, পেয়েছেও সবাই। বাবা পেয়েছেন, মা পেয়েছেন, ভাই পেয়েছে, পেয়েছে আত্মীয়-স্বজন সকলেই। পাইনি শুধু আমি। সকলের বাসনা-কামনার আগুনে শুধু আহুতিই দিয়ে এসেছি নিজেকে। এবার শান্তি পেতে চাই।

—কিন্তু আমার বাসনা-কামনা কিছুই নেই স্বাগতা।

—এইটুকুই আমি চাই, চাই বাসনা-কামনাহীন আগুনে পূর্ণাহুতি দিতে নিজেকে। সেই হবে আমার চরম শান্তি। ওগো, চল আমরা যাই।

অতীশ চমকে উঠে, কোথায়?

—যেখানে নিয়ে যাবে তুমি। তা হলে তোমার যে ভয়, একটা রাতের অতি বৃষ্টির পর অনাবৃষ্টির যে আশঙ্কা, পরিতৃপ্তির পর অতৃপ্তির সে ভয় থাকবে না তোমার।

—তুমি সুখী হবে?

—আমি শান্তি পাব। ঋণমুক্ত হতে পারব আমি। যে ঘোরতর অবিচার করেছি তোমার উপর, তারও প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব কিছুটা।

অতীশ ঘাড় নাড়ে, শান্তি তুমি পাবে না স্বাগতা। এ শান্তির পথ নয়। যে মন আজ তোমায় টান দিয়েছে সামনে, সেই মন আবার যখন টান দেবে পিছনে, তখন সামলাবে তুমি কি দিয়ে? এ নেশা যখন কেটে যাবে, পূর্ণাহুতি দেওয়া যখন শেষ হবে তোমার তখন এই হোমানল তোমার কাছে হবে বাড়বানল। সে হবে অসহনীয়। অতীশ থামে। তার পর আবার বলে, আজ তুমি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে ছুটে এসেছ, অতীত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছ, এ শুধু উচ্ছ্বাস। এ উচ্ছ্বাস যে দিন যাবে থেমে, সে দিন আমি নিঃশেষিত হয়ে যাব তোমার কাছে। তোমার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে আমার হোমানল যাবে নিভে। তখন আবার পিছু হটবার বাসনা পেয়ে বসবে তোমাকে।

স্বাগতা প্রতিবাদ করে, আমায় ভুল বুঝেছ তুমি। পিছু হটবার জন্যে এ দুঃসাহসিকতা আমার নয়। আমি তিলে তিলে প্রস্তুত করেছি নিজেকে। এই দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি দিনের পর দিন ধরে।

অতীশের মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠে। প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন এ প্রস্তুতি স্বাগতা, বলতে পার?

—পারি। এ আমারও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের জন্যে। আমি প্রতারিত, আমি প্রবঞ্চিত। স্বাগতা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবেই বলতে থাকে, লোভী ভাই, স্বার্থপর বাপ-মা। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েও দেখল না একবার। অকৃতজ্ঞ তারা, তাই তোমার পরার্থপরতার মর্য্যাদাকে স্বীকৃতি দিতে পারল না জীবনে। আমাদের ভালবাসাকে করল পদদলিত, অপমানিত। আমি নারী, আমার মধ্যে প্রেমও আছে, প্রতিশোধ-স্পৃহাও আছে। দুই-ই এক সঙ্গে চরিতার্থ করব আমি। তুমি চল। ওগো দোহাই তোমার, এ অনুরোধ আমার রাখ। স্বাগতা এগিয়ে আসে। মনে হয় যেন হাতে ধরে তুলতে যায় অতীশকে।

অতীশ তাকিয়ে দেখে। তার চশমার মোটা কাঁচের মধ্য দিয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে স্বাগতার দিশেহারা মুখের দিকে। বোঝে মোহগ্রস্ত সে আর ভাববিহ্বল। কৃতজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দেবার ছলে সে ফেলতে চায় নিজেকে হারিয়ে। এ রূপ অতীশের অপরিচিত নয়। এ রূপকে চেনে সে। তাই ভোলে না। মুখে শুধু বলে, তাই চল স্বাগতা। তোমার প্রেমকে ব্যর্থ হতে দেব না আমি। কিন্তু—

—কিন্তু কি? বল। ইতস্তত: করছ কেন? আমাকে ইতস্তত: করবার কিছু নেই তোমার।

অতীশ বলে, একটা কথা। তোমার যা কিছু শুভ-অশুভ, ইষ্ট-অনিষ্ট, সব ফেলে যেতে হবে এখানে। সঙ্গে নিয়ে যেতে পাবে না কিছুই।

—বেশ, তাই। আমি রাজি। সঙ্গে নেব না কিছুই।

—তোমার ঐ রতন, ভূষণ, সাজ-সজ্জা ফেলতে হবে খুলে, ঐ সিঁথির সিঁদুর ফেলতে হবে মুছে। হাতের ঐ শাঁখা দুখানি ফেলতে হবে ভেঙে নিজের হাতে। পারবে?

স্বাগতা শিউরে উঠে। সে যেন ভূত দেখে সামনে। সন্ত্রাসে বলে, এ কথা কেন বলছ তুমি?

—বলছি প্রয়োজন আছে। এরা না দেবে থাকতে শান্তিতে তোমায়, না দেবে আমায়।

—দেবে, আমায় বিশ্বাস কর তুমি। স্বাগতার স্বরে কাঁপন।

—অবিশ্বাস করছি না স্বাগতা। কিন্তু একদিন ওরা পিছু টানবেই। আজ যেমন তোমায় সম্মুখে টেনে নিয়ে চলেছে তোমার কৃতজ্ঞতা। সে টানের বেগ সে দিন সইতে পারবে না তুমি। একটু থেমে আবার বলে, আজ যাকে তুমি বিসর্জ্জন দেবে, কাল তাকেই ফিরে পাবে আবার। আমি নিজের হাতে নূতন করে পরিয়ে দেব তোমায় সিঁদুর, পরিয়ে দেব শাঁখা।

—ওগো! স্বাগতা আর্ত্তনাদ করে উঠে।

অতীশ হাসে। বলে এ জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার স্বাগতা। এর ঊর্দ্ধে উঠতে পারবে না তুমি, পারব না আমি।

—কিন্তু আমার মুক্তি, ওগো—

—তোমার মুক্তির পথ আগলে আছে তোমার সংস্কার। এর বাধা প্রবল, এর টানও প্রবল। মাধ্যাকর্ষণের মতই এ টান বেগবান। মুক্তি লোভাতুরার। নিষ্ঠাহীন মনকে নিষ্ঠাবান করে তোলে সংস্কার। মুমুক্ষু তুমি। কিন্তু সংস্কারজয়ী হতে না পারলে মুক্তি তোমার নেই। তাই এ পথে পা বাড়াবার আগে, এর ভাল-মন্দ, হিত-অহিত, সবকিছুকেই তোমায় ভেবে দেখতে বলি স্বাগতা।

স্বাগতা বাক-হারা। সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অতীশের মুখের দিকে।

অতীশ একটু ঝোঁকের সঙ্গে বলে, তুমি যাও, তুমি যাও স্বাগতা। নিজেকে বিচার করে দেখ, বিশ্লেষণ করে দেখ তার পর সংস্কারজয়ী হয়ে রাতের আঁধার দিনের আলোর গর্ভে লুকোবার আগেই ফিরে এস। তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব আমি।

আর শুরু হয় দ্বন্দ্ব চলে সারা রাত—সংস্কারের সঙ্গে মুক্তির। নিবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির। সংস্কার মুক্তিকে পথ দেয় না, মুক্তিও বশ্যতা স্বীকার করে না সংস্কারের। স্বাগতা বসে থাকে জানালায়, গরাদে মাথা ঠেস দিয়ে। দৃষ্টি চলে যায় দূরে—আরও দূরে, যেখানে দুজনে চলেছে তারা মোটর বাইকে, পিঠোপিঠি। বায়ুর স্তর ভেদ করে ধূলির ঝড় বইয়ে, উড়ে চলে সর্পিল রাস্তা বেয়ে। পথ, ঘাট, মাঠ পার হয়ে উড়ে চলে এক রহস্যঘন অজানা জায়গায়, এখানে পরীক্ষা নাই, আছে শুধু নিরীক্ষা, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে তারা দুরু দুরু বুকে। কত বাসনা, কত কামনা, ব্যাকুল-করা কত-না-বেদনা, চঞ্চল করেছে তাদের। কত না হাসা-হাসি, ভালবাসাবাসি করেছে তারা, শপথ করেছে হাতে হাত রেখে।

'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' এ গান গেয়েছে কত ছলে, চোখে মাদকতা মাখিয়ে। এ সবই স্পষ্ট মনে পড়ে আজ। এ অবিস্মরণীয়, ভোলা যায় না। এখানে স্থান নাই সংস্কারের। এখানে প্রশ্ন উঠে না নিবৃত্তির। এখানে একজন দাতা, একজন গৃহীতা—উত্তমর্ণ আর অধমর্ণ। অধমর্ণের ঋণ পাহাড় প্রমাণ। এ ঋণের কিছুটাও পরিশোধ করা চাই স্বাগতার। সংস্কার-নিবৃত্তি এদের সে প্রশ্রয় দেবে না। প্রাধান্যও করবে না। স্বাগতা উঠে দাঁড়ায়। রাতের আঁধার দিনের আলোর গর্ভে লুকাবার আগেই ছুটে যায় অতীশের কাছে।

দোর ঠেলে ঘরে ঢোকে স্বাগতা। অন্ধকারে ঢাকা ঘর। অন্ধকারেই চাপা কণ্ঠে বলে উঠে সে, আমি আবার ফিরে এলাম। সংস্কারকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এলাম তোমার কাছে শান্তির আশায়। আর দেরি নয়। এই বেলা আমরা বেরিয়ে পড়ি চল। স্বাগতা হাতড়ে হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জেলে দেয়। ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কিন্তু কোথায় অতীশ। ঘর শূন্য। অতীশের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সেই সঙ্গে চিহ্ন নেই তার বই, তার খাতা, ঝোলা সবকিছুরই। স্বাগতা তাকিয়ে থাকে বিহ্বল দৃষ্টিতে। সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। তার মুক্তি ত্যাগ করে গেছে তাকে শান্তি অপহরণ করে। সে দু'হাতে মাথা টিপে বসে পড়ে অতীশের শূন্য স্থানটিতে।
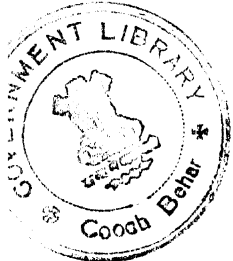
ভস্ম-পুতুল

শ্রীসুনীল বসু

অদৃষ্ট তারাকে অকারণ অবিশ্বাস
সে শুধু ক্রমিক প্রমাদের নিষ্ফল প্রয়াস
প্রতিদিন
সময়-হরিণ
ছুটে চলে অবিশ্রান্ত গতিবেগে—
পাহাড়ে ঝর্ণায় দিগন্তের মেঘে :
তাকে বিদ্ধ করা সইচ্ছার শরে
সেও বাতুলতা,
সে শুধু ছলনা করে
রেখে যায় যৌবনের মরীচিকা—
জরার জড়তা।

আমি জানি
এ-দেহ নিছক মৃত্তিকার ফুলদানী।
নানা আকাঙ্ক্ষার ফুলে ফুলে
সাজায় নিয়তি তারে কম্পিত আঙুলে ;

তারপর
বাসরের সব আড়ম্বর
ভাঙে বিচ্ছেদের ঝড়
শ্মশানের ছাই ছাড়া আর কিছু নয়
মিলনান্তে বিচ্ছেদ প্রণয় !

দিবস শর্বরী,
এই কথা সারাক্ষণ
হে মন,
করো বিশ্বাস, মৃত্যুর প্রহরী
আছে ঘিরে তোমার অস্তিত্ব,—ভালোবাসা বারোমাস—
তুমি শুধু নিষ্ঠুর ভাগ্যের ক্রীতদাস।
সময় ফুরোলে সব নেবে বিস্মৃতির
আঁধার গভীর :
ধুলোর ফরাসে শোবে নৃপতি-ফকির।

মানুচির দেখা মুঘল ভারত (

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়
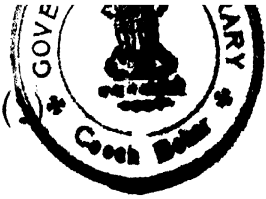
অষ্টম পরিচ্ছেদ

মানুচি এর পর মুঘল সাম্রাজ্যের রাজস্বেরও একটি বিবরণী দিয়েছেন, নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হ'ল।

মানুচির প্রদত্ত ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমি-রাজস্বের হিসাব :

ভূমি-রাজস্বের হিসাব—

প্রদেশের নাম (সীমানা সহ)	ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ (টাকার হিসাবে)
১। দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত আটটি সরকারের (বর্তমানের জেলার অনুরূপ) অধীনস্থ ২৪টি পরগণার রাজস্ব	১,২৫,৫৮,০০০
২। আগ্রা বা আকবরাবাদের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি সরকারের অধীনস্থ ২৭৮টি পরগণার রাজস্ব	২,২২,০৩,৭৫০
৩। লাহোরের অন্তর্ভুক্ত ৫টি সরকারের অধীনস্থ ৩১৪টি পরগণার রাজস্ব	২,৩৩,০৫,০০০
৪। আজমীরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সরকারের অধীনস্থ পরগণার রাজস্ব	২,১৯,০২,০০০
৫। গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত ৯টি সরকারের অধীনস্থ ১৯টি পরগণার রাজস্ব	২,৩৩,০৫,০০০
৬। মালোয়ার অন্তর্ভুক্ত ১১টি সরকারের অধীনস্থ ২৫০টি পরগণার রাজস্ব	৯৯,০৬,২৫০
৭। বিহার বা পাটনার অন্তর্ভুক্ত ৮টি সরকারের অধীনস্থ ২৪৫টি পরগণার রাজস্ব	১,২১,৫০,০০০
৮। মুলতানের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি সরকারের অধীনস্থ ৯৬টি পরগণার রাজস্ব	৫০,২৫,০০০
৯। কাবুলের অন্তর্ভুক্ত ৩৫টি পরগণার রাজস্ব	৩২ ০৭,২৫০
১০। তাত্তওয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	৬০,১২,০০০
১১। বাখরের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	২৪,০০,০০০
১২। উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ১১টি সরকারের অধীনস্থ ১০০টি পরগণার রাজস্ব	৫৭,০৭,৫০০
১৩। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত ৪৬টি পরগণার রাজস্ব	৩৫,০৫,০০০
১৪। এলাহাবাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	৭৭,৩৮,০০০
১৫। আউরঙ্গাবাদ বা দৌলতাবাদের অন্তর্ভুক্ত ৮টি সরকারের অধীনস্থ ৭৯টি পরগণার রাজস্ব	১,৭২,০৪,৭৫০
১৬। বারারের (সম্ভবতঃ বর্তমানে বেরার) অন্তর্ভুক্ত ৬টি সরকারের অধীনস্থ ৯১টি পরগণার রাজস্ব	১,৫৮,০৭,৫০০
১৭। বুরহানপুর বা খান্দেশের অন্তর্ভুক্ত ৩টি সরকারের অধীনস্থ ১০৩টি পরগণার রাজস্ব	১,১১,০৫,০০০
১৮। বাগনালার অন্তর্ভুক্ত ৪৩টি পরগণার রাজস্ব	৬৮,৮৫,০০০
১৯। নামদের-এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	৭২,০০,০০০
২০। ঢাকা বা বাংলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	৪,০০,০০,০০০
২১। উজ্জয়িনীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	২,০০,০০,০০০
২২। রাজমহলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহের রাজস্ব	১,০০,৫০,০০০
২৩। বিজাপুরের (কর্ণাটিকের কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত) রাজস্ব	৫,০০,০০,০০০
২৪। গোলকুণ্ডা'র (কর্ণাটিকের অপরাংশ) রাজস্ব	৫,০০,০০ ০০০
মোট	৩৮,৭১,৯৪,০০০ *

* ভূমি রাজস্বের যোগফলের মধ্যে মানুচি কিছু ভুল করেছেন দেখা যায়। তার হিসাব অনুযায়ী নির্ভুল যোগ করে পরিমাণ হওয়া উচিত ছিল ৩৮,৭২,৫৯,০০০ টাকা অর্থাৎ তাঁর দেয় যোগফলের মধ্যে ৬৫,০০০ টাকা বেশী ধরা রয়েছে। মানুচি যে হিসাব দিয়েছেন তারমধ্যে অযোধ্যা প্রদেশের রাজস্ব ধরা নেই। মানুচির দেয় রাজস্বের পরিমাণ যে কতখানি অতিরঞ্জিত তা নিম্নে প্রদত্ত আর একটি রাজস্বের হিসাব তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে। "শ্রীজগজীবন দাস গুজরাটী প্রণীত মন-তাখাব-উত-তারিখীতে প্রদত্ত ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট বাহাদুর শাহের জন্য প্রস্তুতকৃত রাজস্বের হিসাব-নিকাশ।" (ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুঁথি নং ২৪২৫৩)

হিন্দুস্থান—১৫ সুবা, দাক্ষিণাত্য (বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা যুক্ত)—৬ সুবা, মোট ২১টি সুবা

সুবার নাম	প্রামাণিক পরিমাপ (দামের হিসাবে—৪০ দামে ১ টাকা)	প্রামাণিক পরিমাপ (টাকার হিসাবে)	সমগ্র পরিমাপ (টাকার হিসাবে)	সর্ব্বশেষ লিখিত রাজস্ব আদায়ের হিসাব (টাকার হিসাবে)	মানুচির প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাপ (টাকার হিসাবে)	মন্তব্য
হিন্দুস্থান						
১। আকবরাবাদ	১,১৪,১৭,০৬,০৫৭	২,৮৫,৪২,৬৫১	১,০৬,৯৭,৬৭১,	৬৮,৯২,৮৯৭	২,২২,০৩,৭৫০	
২। শাজাহানাবাদ	১,২২,২৯,৫০,৬৫৮	৩,০৫,৭৩,৭৬৬	৯৪,০৭,০৩০	৬৩,৪৯,১১০	১,২৫,৫৩,০০০	
৩। আজমীর	৬৫, ৩,৪৫,৭০২	১,৬৩,৩৩,৬৪২	১,০৬,৯৭,৩৭১	৬৮,৯২,৮৯৫	২,১৯,০২,০০০	
৪। এলাহাবাদ	৪৫,৬৫,৪৩,২৪৮	১,১৪,১৩,৫৮১	১,০৫,৭৯,৩৭১	৬৮,৯২,৮৯০	৭৭,৩৮,০০০	
৫। অযোধ্যা	৩২,১৩,১৭,১১৯	৮০,৩২,৯২৮	৯১,২৫,৫৫১	৪৭,৮৫,৮৭১	উল্লেখ নেই	
৬। আমেদাবাদ	৪৫,৪৭,৪৪,১৩৫	১,১৩,৬৮,৬০৩	৮৯,৬১,৮০৬	৭১,৮৪,৬৮৫	২,৩৩,৯৫,০০০	
৭। লাহোর (ক্যাংরা পর্ব্বতমালা যুক্ত)	৮৯,,৮১,৩২,১০৭	২,২৪,৫৩,৩০২	৮৭,৪০,৩৮৩	৩০,৪২,৩২৭	২,৩৩,০৫,০০০	
৮। কাবুল	১১,১০,৩৯,৩৫৪	২৭,৭৫,৯৮৩	৪৭,৪০,২২১	৩০,৪২,৩২৭	৩২,০৭,২৫০	
৯। বাহার	৪০,৭১,৮১,১০০	১,০১,৭৯,৫২৭	৯৩,৫০,৯৩১	৫৭,১৪,৮৩৭	১,২১,৫০,০০০	
১০। তাতওয়া	৬,৮৮,১১,৮০০	১৭,২০,২৯৫	৫৩,৬৭,৩৯৭	৩৪,৪৯,৬৫৭	৮৪,১২,০০০†	†বাখর সমেত
১১। মালওয়া	৪০,৩৯,৮০,৬০৮	১,০০,৯৯,৫১৬	৩৪,৭২,২৯১	৪৮,১৩,২৮৩	২,৯৯,০৬,২৫০†	†উদ্ধজিনী যুক্ত
১২। মুলতান	২২,৪৩,৪৯,৮৯৩	৫৮,০৮,৭৪৭	৫১,৬৯,৩৮৯	২৪,৭৫,৬৪৯	৫০,২৫,০০০	
১৩। কাশ্মীর	২২,৯৯,১১,৩০০	৫৭,৪৭,৭৮২	২৯,৬২,৫৯৩	২৪,৮০,৩৮৯	৩৫,০৫,০০০	
১৪। বাংলা	৫২,৪১,৩১,২৪০	১,৩১,০৩,২৮১	উল্লেখ নেই	৮১,১৯,২৮৭	৫,০০,৫০,০০০†	†ঢাকা ও রাজমহল যুক্ত
১৫। উড়িষ্যা	১৪,২৮,১১,০০০	৩৫,৭০,২৭৫	১১,৫৭,৮২১	উল্লেখ নেই	৫৭,০৭,৫০০	
	৭,২৬,০৯,৫৫,৩৭১	১৮,১৫,২৩,৮৭৯	১০,৫৪,২৪,৮২৬	৭,২১,৩৬,১৩০	২২,৯০,৫৬,৭৫০	‡উড়িষ্যার সম্ভাবিত রাজস্বের পরিমাণ
				৯৮,৭৮,৫৫৮‡		
				৮,২০,১৪,৬৮৮		
দাক্ষিণাত্য						
১৬। আউরঙ্গাবাদ	১,০০,৪৯,৬৫,০০০	২,৫১,২৪,১২৫	১,০০,৫১,০০০	৯১,৯৯,০০৬	১,৭২,০৪,৭৫০	
১৭। বারার (বেরার ?)	৮১,৪০,২৫,০০০	২,০৩,৫০,৬২৫	৯০,১১,৩০৯	৭৫,৮৯,২১৯	১,৫৮,০৭,৫০০	
১৮। খান্দেশ	৩৪,৮১,৩০,২০০	৪৭,০৩,২৫৫	৪০,০৬,০১৯	১১,১৯,০১৭	১,৭৯,৯০,০০০‡	‡বাগলানা যুক্ত
১৯। জাফরাবাদ বিদার	৩৭,২৯,৭৪,৩০৭	৯৩,২৪,১৫৭	উল্লেখ নেই	৪২,৪২,৯৩২	৭২,০০,০০০	
২০। বিজাপুর	২,৩৫,৫৫,০০,০০০	৫,৮৮,৮৭,৫০০	উল্লেখ নেই	৫,৮৯,৮৭,৫০১	৫,০০,০০,০০০	
২১। হায়দ্রাবাদ	১,১৫,১৩,০০,০০০	২,৮৭,৮২,৫০০	উল্লেখ নেই	২,৪৭,৮২,৫০০	৫,০০,০০,০০০	
মোট	৬,০৪,৬৮,৯৪,৫০৭	১৫,১১,৭২,৩৬২	২,৩০,৬৮,৩২৪	১০,৭৯,২০,১৭৫	১৫,৮২,০২,২৫০	‡তিনটি সুবার সম্ভাবিত রাজস্ব
			৯,৬৯,০৪,৩৫৭‡			
সমষ্টিগত যোগফল—	১৩,৩০,৭৮,৪৯,৮৭৮	১২,২৮,৯৬,২৪১	২২,৫৪,৮৭,৫১১	১৪,৭৯,৩৪,৮৬৯	৩৮,৭২,৫৯,০০০	

[উপরোক্ত হিসাব থেকেই দেখা যায় যে, মানুচির অতিরঞ্জিত হিসাবের পরিমাণ কত বেশী। জগজীবন দাসের হিসাবের সঙ্গে মানুচির হিসাবের পার্থক্য প্রায় ৫,৪৫,৬২,৭৫৯ টাকা এবং তাও মানুচির বর্ণিতকালের ৭ বছর পরের হিসাব অনুযায়ী। জগজীবন দাসের হিসাবকাল হচ্ছে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ আর মানুচির বর্ণিত হিসাবের সন হচ্ছে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ। মানুচি তাঁর হিসাবকৃত বৎসরের রাজস্বের পরিমাণের চেয়ে প্রায় ১৯,৭৩,৪৪,১৩৭ টাকা বেশী হিসাবে ধরেছেন। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে মানুচি জগজীবন দাস লিখিত সর্বশেষ আদায়কৃত রাজস্বের হিসাবের পরিমাণ নিয়েই তাঁর নিজের হিসাব তৈরী করে থাকেন। অতিরঞ্জিত হিসাবের পরিমাণ দেখে সন্দেহ হয় যে, মুঘল সম্রাটের সঠিক আয়ের পরিমাণ কি খুবই কম ছিল? তাই যদি হয় তবে তাদের ধনঐশ্বর্য ও বাহুল্যের যে পরিচয় বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে পাওয়া যায় তার বহুলাংশই কি অতিরঞ্জিত?—লেখক]

মানুচি বলেছেন যে, ভূমি রাজস্ব ছাড়াও আরও কয়েকটি দিক থেকে সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায় হ'ত, যেমন সম্রাট ব্যবসায়ীদের বিক্রয় পণ্যের উপর একটি বিক্রয়-কর ধার্য করেছিলেন। এই কর হিন্দু ব্যবসায়ীদের পণ্যের উপর শতকরা ৫ ভাগ এবং মুসলমান ব্যবসায়ীদের পণ্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ হিসাবে ধার্য করা হয়েছিল। যে সব ব্যবসায়ীদের সম্রাট এই কর দেওয়া থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন তাদের ভূমি রাজস্ব দেওয়া থেকেও নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। সম্রাট ঔরংজেব ১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া কর' প্রবর্তন করতে উদ্যত হন তখন তাঁর দরবারের ওমরাহ ও রাজন্যবর্গেরা সম্রাটকে এই কর প্রবর্তন না করার জন্য বার বার অনুরোধ করেন, কিন্তু সম্রাট তাদের সে অনুরোধ রাখেন নি। এমন কি বেগম সাহেবা পর্যন্ত সম্রাটের পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিলেন যে, এই অবাস্তব করভার যেন হিন্দু প্রজাদের উপর চাপানো না হয়, কিন্তু তিনিও ব্যর্থকাম হন। বেগম সাহেবাকে সম্রাট বলেছিলেন যে,মহম্মদের প্রবর্তিত ধর্মের প্রসারতার জন্য তাঁকে এই ব্যবস্থা করতেই হবে। এই কর থেকে সম্রাট বেশ মোটা টাকাই পেতেন। এ ছাড়া সিন্ধি, ভারত, সুরাট, কাম্বিয়া প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দরসমূহের আদায়ীকৃত সমগ্র করই সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। একমাত্র সুরাট বন্দরেই আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকারও উপর। করমণ্ডলের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, মুশলিপট্টম থেকে নারসীপুর (বর্তমান রাজমুন্দ্রীর ৩৯ মাইল দূরবর্তী সমুদ্রতট) এবং জিনজরাটি থেকে বালেশ্বর পর্যন্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহের আদায়ীকৃত রাজস্বেরও সবটাই মুঘল সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। হিন্দুনৃপতিবর্গের ও রাজকীয় হিন্দুরাজন্যবর্গের কর্মচারীদের উপর ধার্যকৃত করের পরিমাণও খুব সামান্য ছিল না। এ ছাড়া গোলকুণ্ডার হীরক খনি থেকে উত্থিত যে সব হীরের ওজন এক আউন্সের এক অষ্টম অংশের বেশী হ'ত সেগুলি সম্রাটের প্রাপ্য বলে গণ্য হ'ত।

মুঘল সাম্রাজ্য থেকে যে সব পণ্য বিদেশে বিক্রয়ার্থে রপ্তানী হ'ত তার মধ্যে মসলিন্ সূক্ষ্ম ও মোটা, সাদা ও রঙিন বস্ত্রাদি, নীল, আফিম, রেশম ও রেশমের বস্ত্রাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব পণ্যাদি ইউরোপ, মধ্য-এশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, চীন প্রভৃতি দেশে চালান যেত এবং বিদেশী ব্যবসায়ীরা সোনা ও রূপা মাধ্যমে ক্রয় করত।

মুঘল সম্রাটদের অন্যান্য ঐশ্বর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, সম্রাটের নিজের ব্যবহারের জন্য প্রায় ১ হাজার হস্তী ছিল। এই হস্তীদলকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ও শিকারের উপযুক্ত করে তোলা হ'ত। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শিকারে এদের সাহস ও মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মদ খাওয়ান হ'ত। সম্রাটের হস্তীবাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে যে বেশী শক্তিশালী তাকেই হস্তীবাহিনীর দলপতি করা হ'ত। প্রত্যেকটি হস্তীর তদারকী করার জন্য ৮টি করে লোক নিযুক্ত ছিল। ২ জন মাহুত, ২ জন হস্তীর চেন ধরবার লোক, জরুরী অবস্থায় হস্তীকে শাসন করার জন্য ২ জন বর্শাধারী লোক। ২ জন লোক বারুদ বহনের জন্য, ১ জন হস্তীর মল-মূত্র পরিষ্কার করার জন্য, ১ জন হস্তীর স্নান ও খাওয়ার তদারকী করার জন্য নিযুক্ত ছিল। প্রতিদিন একটি হস্তীর পিছনে আনুমানিক ২৫্ টাকা করে খরচ করা হ'ত। সম্রাটের বিশেষ হস্তীবাহিনী ছাড়াও প্রায় ১৪ হাজার হস্তী ছিল—যারা রাজকীয় দ্রব্যসম্ভার বহনকার্যে নিয়োজিত ছিল। হারেমের অধিবাসীনীদেরও এরাই বহন করে নিয়ে যেত। সম্রাট মাঝে মাঝে ২টি হস্তীর মধ্যে লড়াইয়ের আয়োজন করতে আদেশ দিতেন। প্রত্যেকটি হস্তীর জন্য সম্রাট প্রায় ১৭৫ পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করেছিলেন।

সম্রাটের নিজস্ব একদল শ্রেষ্ঠ আরব, পারস্য ও তুর্কী দেশীয় অশ্ব ছিল। এই অশ্বসমূহ যেমন তেজীয়ান তেমনি বুদ্ধিমান ছিল। এদের খুবই উৎকৃষ্ট ধরনের খাদ্যদ্রব্য খেতে দেওয়া হ'ত, যেমন প্রতিদিন সকালে এদের রুটি,মাখম, চিনি ও সন্ধ্যায় ভাত ও গোদুগ্ধ খেতে দেওয়া হ'ত। সম্রাট তার পুত্রদের উপর খুশী হয়ে কোন উপহার দেবার ইচ্ছা করলে প্রথমেই তিনি তার নিজের ব্যবহৃত কোন প্রিয় অশ্ব তাকে উপহার দিতেন।

সম্রাটের নিজের ব্যবহারের জন্য অনেক রকম ভাল ভাল মণি-মাণিক্য খচিত তরবারী ও ঢাল ছিল। এর প্রত্যেকটির একটি করে বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল। যেমন (তরবারী) ওয়ার-পার, দুশমন সিতান, জোর গয়র ইত্যাদি, (ঢাল) মহতাব-ই-আলম, রোশনি আলম, আকতর-ই-আলম ইত্যাদি। এর মধ্যে এমন অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেগুলি বংশপরম্পরায় সম্রাটরা ব্যবহার করে এসেছেন। সম্রাটের বিশেষ কামানগুলিও বিশেষ নামে পরিচিত হ'ত। যেমন আউরংবার, কালে খাঁ, নার্মদার, দস্তর, তুফান, দলদানি ইত্যাদি।

সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্রাটের তিনটি প্রধান আবাসস্থল ছিল—একটি দিল্লীতে, একটি আগ্রায় ও একটি লাহোরে। সম্রাটের

উপরোক্ত প্রত্যেকটি আবাসস্থলেই একটি করে গম্বুজ ছিল, যার নাম হচ্ছে 'শাহ বুরুজ' অর্থাৎ রাজকীয় গম্বুজ। বলা বাহুল্য, গম্বুজগুলি গোলাকৃতি ও মানিক্যখচিত এবং স্থাপত্য শিল্পের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ। এই গম্বুজের উপর থেকেই সম্রাট হস্তী-লড়াই দেখতেন। প্রত্যেকটি রাজপ্রাসাদের সঙ্গেই ফুলের বাগান ছিল। বাগানকে সৌন্দর্য্যময় করবার জন্য কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী, ঝর্ণা ও জলাধারও বাগানের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি কক্ষের মধ্যেও কৃত্রিম শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত জলাধার ছিল। প্রাসাদের মধ্যে কয়েকটি করে গুপ্ত কক্ষ ছিল। যদিও রাজপ্রাসাদগুলি সম্রাটের রক্ষীদল ও সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তবুও সম্রাট কখনও একই প্রাসাদে বেশীদিন কাটাতেন না, কারণ ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা তাদের সব সময়েই ছিল।

সম্রাটের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বিরাট বিরাট রাজ-উদ্যান ছিল। সেখানে শুধু গোলাপ ফুলেরই চাষ করা হ'ত এবং সেই সব গোলাপ থেকেই আতর তৈরী হ'ত যা সম্রাট ও তাঁর হারেম-বাসিনীরা অজস্র ব্যবহার করতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মানুচি মুঘল সম্রাটদের আড়ম্বরপূর্ণ রাজ্য পরিভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রাজকীয় বিহার যাত্রার আয়োজন দেখে মনে হয় যেন একটি চলমান বিরাট নগরী সম্রাটের পিছু পিছু চলেছে এবং সেই শোভাযাত্রা দেখা দর্শকের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বললে কিছুই মিছে বলা হবে না। মানুচি এই শোভাযাত্রায় যে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়েছেন নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হ'ল।

এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে একদল লোক থাকে, যাদের কাজ হচ্ছে রাজপথ তৈরি ও মেরামতি করা। পথ তৈরি করার পুরো সাজসরঞ্জাম এদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকত। সম্রাটের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এরা নির্দ্দিষ্ট পথের সীমানায় আগেভাগে গিয়ে সেখানকার এক সমতল বিস্তীর্ণ স্থান বেছে নিয়ে তাঁবু ফেলতে সুরু করত, কারণ এই বিরাট বাহিনীকে নিয়মানুসারে সাজিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ রাজকীয় শিবির গোলাকৃতি করেই সাজান হ'ত। এদের মধ্যে সৈন্যবাহিনী, সম্রাটের পাকশালা, সম্রাট বাদশাজাদা ও হারেমের অন্তঃপুরবাসিনীরা, ওমরাহ ও সেনাপতিদের থাকবার জন্য পৃথক পৃথক তাঁবু ফেলা হ'ত।

রাজপথ নির্ম্মাতাদের পরই থাকত, গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী। তাদের সঙ্গে থাকত বড় বড় কামান ও তার সরঞ্জামাদি। এদের পরই থাকত ৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যদল। এদের পর যেত ৩৫০টি উটের একটি দল, যার মধ্যে ২০০টি বয়ে নিয়ে যেত সোনারূপোর টাকা, ১৫০টি বয়ে নিয়ে যেত রাজকীয় তাঁবুর সরঞ্জামাদি। নিয়মানুযায়ী সরকারী নথিপত্রাদিসমূহও সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গেই যেত। ৮০টি উট, ৩০টি হাতী ও ২০টি গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে সেগুলি যেত। এদের সঙ্গে কয়েকটি খচ্চরও যেত, যারা সম্রাটের পোষাকাদি বয়ে নিয়ে যেত। সম্রাটের খাদ্যসম্ভার ও পানীয় জল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ১৩০টি উট যেত, এর মধ্যে ৫০টি খাদ্যাদি বইবার জন্য ও ৮০টি পানীয় জল বইবার জন্য। প্রচলিত নিয়মানুসারে সম্রাটের পাকশালার কর্ম্মচারীরা যাবতীয় খাদ্য-সম্ভার ও খাদ্য প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি নিয়ে আগেভাগেই নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছাত, যাতে সম্রাট শিবিরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও পানীয় পান। এই চলমান পাকশালার সঙ্গে প্রায় ৫০ জন খোজা প্রহরী থাকত, যারা চীনেমাটির ডিসে সাজান ভেলভেটের ব্যাগে শিলমোহরাঙ্কিত অবস্থায় খাদ্যাদি সম্রাটের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করত। সম্রাট তাঁর ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী সেই সব বিশুদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন।

সম্রাটের শিকারে সঙ্গী হবার জন্য একদল পাহাড়ী শিকারীও শোভাযাত্রায় থাকত যাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাজপাখী থাকত। সম্রাটের ঠিক সামনে থাকত ১৩টি হাতী ও ৯টি ঘোড়া। এরা সম্রাটের নিজস্ব ও রাজকীয় পতাকাসমূহ বয়ে নিয়ে যেত। ২ জন অশ্বারোহী সৈন্য এদের সঙ্গে থাকত, যারা আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীর পত্র ও ভেঁপু নিয়ে যেত। মাঝে মাঝে ভেঁপুধারী সৈন্যটি ভেঁপু বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিত।

সম্রাটের দু'পাশে অসংখ্য পদাতিক সৈন্য থাকত, যারা জনসাধারণকে পথের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার রাখত। এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন রং-বেরঙের পতাকাও বয়ে নিয়ে যেত। অনেক অশ্বারোহী সৈন্য সম্রাটের পাশে পাশে সারি বেঁধে চলত। একদল ভিস্তি রাজপথে জল ছড়াতে ছড়াতে যেত। সম্রাটের পাশে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সরকারী নথিপত্র নিয়ে চলতেন এবং যখন সম্রাট স্থানীয় অঞ্চলের কোন খবর জানতে চাইতেন তখন কর্ম্মচারী সম্রাটকে তা নথিপত্র দেখে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিতেন। একদল লোক সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে দড়ি নিয়ে পথের দূরত্ব মাপতে মাপতে যেত এবং সম্রাট জানতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটকে জানিয়ে দিত রাজধানী থেকে বেরিয়ে কতখানি পথ সম্রাট অতিক্রম করে এসেছেন। একজন লোক সময়মাপক কাচ নিয়ে যেত এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্রোঞ্জের তৈরী একটি ঘড়ি পিটে সময় জানিয়ে দিত। এর পর খুব আস্তে আস্তে সম্রাট যেতেন।

সম্রাটের যাত্রাপথে যদি কোন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যেত তা হ'লে সেটিকে সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ত যাতে সম্রাট সেটিকে দেখতে না পান। সম্রাটের ঠিক পিছনেই দশজন অশ্বারোহী সম্রাটের তরবারি, বর্শা, ঢাল, ছোরা, তীর, ধনুক প্রভৃতি স্বর্ণমণ্ডিত আধারে করে বয়ে নিয়ে যেত। তার পরে থাকত সম্রাটের নিজস্ব ৫টি হস্তী, দেহরক্ষীরা ও অশ্বারোহী যন্ত্র-সঙ্গীতের বাদক দল। তাদের পর থাকত ৮ হাজার অশ্বারোহীর একটি বিরাট সৈন্যদল।

এর পর যেতেন সম্রাটের বেগম, উপপত্নী, ভগিনী ও কন্যারা।

হস্তীপৃষ্ঠে পিতাম্বর চেপে যাবার সময় এরা মসলিন ও কিংখাপের পর্দার মধ্য থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করতেন। হারেমের নর্ত্তকী, গায়িকা ও পরিচারিকাবৃন্দেরা, বাঁদীরাও এদের সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। সবশেষে যেত খোজা প্রহরীর দল ও সম্রাটের নিজস্ব বিশ্বাসী ৭ হাজার ক্রীতদাস রক্ষীদল।

সাধারণতঃ সম্রাটের শিবির থাকত ঠিক মধ্যস্থানে এবং তার এক ধারে থাকত অন্তঃপুরবাসিনীদের শিবির, অপর ধারে থাকত ওমরাহ ও বাদশাজাদাদের শিবির। নিয়মানুসারে অন্তঃপুরবাসিনীরা নূতন শিবিরে সর্ব্বপ্রথম গিয়ে পৌঁছতেন কিন্তু শিবির ত্যাগ করতেন সর্ব্বশেষে।

দশম পরিচ্ছেদ

মানুচি তাঁর ৪৮ বৎসর ব্যাপী ভারত-অবস্থান কালের মধ্যে যুবরাজ দারাশিকো রাজা জয়সিংহ গোয়ার শাসনকর্তা ও যুবরাজ শাহ আলমের অধীনে চাকুরী নিয়েছিলেন, কিন্তু কখনই স্থায়ীভাবে কারুর কাছে বাঁধা পড়েন নি। ভারত-অবস্থান কালেই তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন করে এতখানি পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন যে, যুবরাজ শাহ আলম তাঁকে তাঁর প্রধান চিকিৎসকরূপে নিয়োগ করেছিলেন, যা খুব কম বিদেশীর ভাগ্যেই জুটেছিল। মানুচি কখনই এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করেন নি, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে বেড়িয়েছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তিনি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীই ছিলেন না, অনেক ক্ষেত্রে নিজেও কোন কোন সূত্রে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত ছিলেন। সম্রাট ঔরংজেবের উপর যে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন তা তার বিবরণীর বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর রাজ্য শাসন প্রণালী ও চরিত্রের বৈশিষ্টসমূহ বিভিন্ন দিক থেকে বেশ নিপুণতার সঙ্গেই বিচার, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। নিম্নেই তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হ'ল।

সিংহাসনে অপরাপর সম্ভাব্য দাবিদারগণকে নিশ্চিহ্ন করে যখন ঔরংজেব সম্রাটরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন তখন তাঁর মনে ভ্রাতৃ-হত্যার অপকীর্ত্তির জন্য কোনরূপ গ্লানি দেখতে পাওয়া যায় নি বা বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে রেখে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নি। ইংরাজী ১৬ই জুন, ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব মুঘল সম্রাটের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেই ৯ দিন ব্যাপী এক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উৎসব শেষে তিনি সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার ও আইন কানুনের সংস্কার বিধান ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের দিকে বিশেষ করে মনোযোগ দেন, কারণ হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধ মনোভাব বদলানোর ব্যাপারে এগুলিকেই তাঁর হাতিয়ার বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

সিংহাসনে বসবার বহুকাল পূর্ব্ব থেকেই ঔরংজেব দেখেছিলেন যে, হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা বিশেষতঃ দিল্লীবাসীরা খুবই সুরাসক্ত হয়ে পড়েছে, তাই সুরাপান নিবারণের দিকেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাঁর মত কোরাণের অন্ধ ভক্তের পক্ষে এই অনাচার সহ্য করাও সম্ভব নয়। সম্রাট আকবরই প্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীদের সুরা পান করার অনুমতি দেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরাও সুরা পান করতে সুরু করে ও তা চরমে ওঠে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে। সম্রাট ঔরংজেব হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের সুরার প্রতি অত্যধিক আসক্তি দেখে একদিন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, "সারা হিন্দুস্থানে বোধ করি মাত্র ২ জন লোক সুরা স্পর্শ করে না—একজন তিনি স্বয়ং ও অপর জন তাঁরই নিযুক্ত প্রধান কাজী আবদল ওয়াহেব। [প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ডাঃ যদুনাথ সরকার লিখিত Anecdotes of Aurangjeb পুস্তকের এক স্থানে বলা হয়েছে যে ঔরংজেবও যৌবনকালে তাঁর প্রেমিকা জেদন বাঈয়ের অনুরোধে তাঁর প্রতি ভালবাসার প্রমাণ দিতে গিয়ে একবার সুরাপান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত জেদন বাঈ-ই তাঁকে সুরাপান থেকে নিবৃত্ত করেন।]

মানুচি বলেছেন যে কাজী আবদল ওয়াহেব সুরাসক্ত ছিলেন না এটা ঠিক নয় কারণ একবার মানুচি নিজেই এক বোতল মদ কাজীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং কাজী সেই মদ গোপনে পান করেছিলেন বলে তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন।

ঔরংজেব এক আদেশজারী করে সুরা পান প্রস্তুত ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন। একমাত্র খ্রীষ্টানেরাই সুরা পান করতে পারবেন কিন্তু সেই সুরা তাঁরা নিজেরা তাঁদের বাড়ীতেই প্রস্তুত করে পান করবেন বলে তিনি নির্দ্দেশ দেন। খ্রীষ্টান চিকিৎসকরা বাদে অন্যান্য খ্রীষ্টানদের এইজন্য তিনি শহরের সীমানার বাইরে থাকবার আদেশ দিয়েছিলেন। ঔরংজেব শুধুমাত্র আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি শহর কোতয়ালকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টানরা যাতে তাদের বাড়ীর তৈরী মদ বাইরে বিক্রয় করতে বা চালান দিতে না পারে সেইজন্য উপযুক্ত সংখ্যক গুপ্তচর যেন নিয়োগ করা হয় ও অপরাধীকে যেন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এত করেও ঔরংজেব দিল্লীবাসীদের সুরা পান বন্ধ করতে সক্ষম হন নি, কারণ শহরের সুরাসক্ত অধিবাসীরাও যে-যার নিজের বাড়ীতে গোপনে মদ চোলাই করতে সুরু করে। অপেক্ষাকৃত গরীব শহরবাসীরা মদের বদলে ভাং খেতে সুরু করে অবশ্য পরে ঔরংজেব ভাং খাওয়াও নিষিদ্ধ করে দেন।

ঔরংজেব অপর একটি আদেশে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সঙ্গীত চর্চ্চা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ঔরংজেবই সঙ্গীত-বিরাগী ছিলেন। ঔরংজেবই এই সৃষ্টিছাড়া আদেশজারীতে হিন্দুস্থানের অসংখ্য সঙ্গীত-শিল্পীরা ক্ষুব্ধ হয়ে সম্রাটের করুণা লাভের আশায় এক শুক্রবারের প্রভাতে শহরের সমস্ত সঙ্গীত শিল্পীরা তাদের বাদ্যযন্ত্রসমূহ ২০টি শবাধারে বেশ ভাল করে সাজিয়ে এক সঙ্গীত-শব-শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। রাজপথে যখন তারা বিলাপ করতে করতে শবাধারগুলিকে নিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সম্রাটের দৃষ্টি এদের উপর পড়ে

এবং সম্রাট তাঁর কর্মচারীর কাছে এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে জানতে চান। উত্তরে একজন কর্মচারী জানান যে, তাঁর আদেশ পালনার্থে সঙ্গীত শিল্পীরা তাদের বাদ্যযন্ত্রসমূহ সমাধি দেবার জন্য নদীতীরে নিয়ে যাচ্ছে। ঔরংজেব উত্তর শুনে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হয়ে মন্তব্য করেন যে, শিল্পীরা যেন সঙ্গীতকে বেশ ভাল করেই গোর দেয় যাতে সুরের রেশ পর্য্যন্ত শুনতে পাওয়া না যায়। ঔরংজেবের এই আদেশ প্রকৃতপক্ষে প্রধান প্রধান শহরগুলিতেই প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে সঙ্গীতচর্চ্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি, কারণ আমীর ওমরাহেরা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে নিজেদের বাড়ীতে শিল্পীদের স্থান দিয়েছিলেন এবং গোপনে তাদের সঙ্গীত শুনতেন।

দিল্লী শহরের বেশ্যালয়গুলির উচ্ছেদকল্পে ঔরংজেব এক নির্দ্দেশ জারী করে শহরের বাঈজীদের বিবাহিত জীবন যাপন করবার আদেশ দেন। যদি তারা তা না করতে চায় তা হলে তারা মুঘল সাম্রাজ্যের বাইরে অন্যত্র চলে যাওয়ার উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন। এই নির্দ্দেশের ফলে শহরের প্রকাশ্য বেশ্যালয়গুলি অবশ্য আস্তে আস্তে উঠে যায় কিন্তু শহরের বাহিরে গুপ্তভাবে এদের ব্যবসা পুরোদমেই চলতে থাকে। অনেকে অবশ্য বিবাহ করে সংসারী জীবনযাপন করতে সুরু করে।

দিল্লীবাসীদের ভণ্ড ফকিরদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সম্রাট দিল্লীর নাম করা বার জন ফকিরকে দরবারে ডেকে এনে বলেন যে, তারা সরল শহরবাসীদের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এতদিন ধরে ভণ্ড ফকিরি ব্যবসা যা তাঁরা চালিয়ে এসেছেন এখন ত বন্ধ করে দেওয়ার সময় এসেছে। যদি তাঁরা সত্য সত্যই কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হন তা হলে এ সম্বন্ধে তাঁদের চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে হবে এবং যদি তা না দিতে পারেন তা হলে সর্ব্বসমক্ষে তাঁদের চাবুক মেরে তাঁদের মুখোস খুলে দিতে তিনি বাধ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেখাতে পারেন নি, ফলে তাঁদের কয়েকজনকে ঔরংজেব তাঁর সাম্রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করে দেন, বাকী ফকিরদের কারাগারে বন্দী করে রাখেন। এই সব ফকিরদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, এরা সরল ধর্ম্মভীরু মুসলমানদের ধর্ম্মের ভান দেখিয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতার ভোজবাজী দেখিয়ে তাদেরকে নিজেদের অন্ধভক্তে পরিণত করে তাদের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি আদায় করতেন। বিশেষতঃ নারী ভক্তেরা এদের দ্বারা এমন ভাবে বশীভূত হয়ে যেত যে তাঁরা এদের দেহদান করতেও কার্পণ্য বোধ করত না। সাধারণতঃ এই সব ফকিরদের ভোগস্পৃহা এত বেশী ছিল যে, এরা নিজেদের অন্দরমহলে অসংখ্য নারী ও ক্রীতদাসী নিয়ে আমীর-ওমরাহদের মতন বিলাসী অসংযমী জীবন-যাপন করত। এদের ভক্তদলের মধ্যে অনেক হিন্দু ও খ্রীষ্টান নরনারীও ছিল।

ঔরংজেব আরও একটি বিচিত্র নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, সেটা হচ্ছে মুসলমানদের দাড়ি রাখা সম্পর্কে। তিনি মুসলমানদের চার আঙুলের বেশী দাড়ী রাখা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার জন্য একজন কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করেছিলেন, যার কাজই ছিল একদল সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাজপথে চলমান মুসলমান পথিকদের দাঁড় করিয়ে তাদের দাড়ী মাপা ও বাড়তি দাড়ী কেটে দেওয়া। যাদের গোঁফ বড় ছিল তাদের গোঁফও ছেঁটে ছোট করে দেওয়া হ'ত। বলাবাহুল্য যে, এই নিষেধাজ্ঞাটি গরীব মুসলমানদের ওপরই বলবৎ করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ উপরোক্ত কর্ম্মচারীরা মারধোর খাবার ভয়ে ওমরাহ বা সৈন্যবাহিনীর লোকদের কাছে এরা ঘেঁষতে সাহস করত না। ঔরংজেব এই নিষেধাজ্ঞা জারী করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমান-ধর্ম্মের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে তিনি ধর্ম্মীয় নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলতে উদগ্রীব।

ঔরংজেব সিংহাসন অলঙ্কৃত করার পর যাঁরা অনুগ্রহ লাভের আশায় সর্ব্বাগ্রে ছুটে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঔরংজেবের বাল্য-শিক্ষক মালিক শালিয়া অন্যতম। ঔরংজেব কিন্তু তাঁর বাল্যশিক্ষককে কোনরূপ অনুগ্রহ দেখাতে ইচ্ছুক ছিলেন না কারণ তাঁর মতে মালিক শালিয়া তার চরিত্র গঠনের জন্য এমন কিছু শিক্ষা দেন নি যার দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছেন। এই কথাটি তাঁর শিক্ষককে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, "রাজপুত্রদের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে রাজ-শিক্ষকদের সহায়তায়। রাজ-শিক্ষক যদি তাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে না পারেন তা হলে সে ভবিষ্যৎ-জীবনে উন্নতি করতে পারে না। ভবিষ্যতে যাদের একটি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়াবলী শুধুমাত্র দেশীয় যুদ্ধনীতি ও রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, বিদেশীয় যুদ্ধনীতি, রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও রাজ্যশাসন প্রণালীসমূহও তাকে শেখান উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার শিক্ষক তাকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি বা শেখান নি। তিনি যা শিখিয়েছিলেন বর্ত্তমান-জীবনে তার কিছুই কাজে লাগে নি বা ভবিষ্যতে লাগবে বলেও মনে হয় না অতএব তিনি (ঔরঙ্গজেব) তার কাছে মোটেই ঋণী নন। তাঁর পিতা তাকে (মালিক শালিয়াকে) যা দিয়েছেন তাই তিনি ভোগ করুন আর কিছু পাবার আশা তিনি ত্যাগ করুন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট শাজাহানের মতন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবনেও এমন এক মুহূর্ত্ত এসেছিল যখন তাঁর জীবিতকালেই তাঁর পুত্রদের মনে সিংহাসন অধিকার করার বাসনা জাগে, অবশ্য তাঁরা তাঁদের পিতার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করতে সাহসী হন নি। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবই বোধহয় একমাত্র সম্রাট যাঁর অসুস্থকালে রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ প্রকাশ্যবিদ্রোহ ঘোষিত হয় নি বা ঘটে নি।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব একবার (১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মে) হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকি তাঁর কথা বলার শক্তি পর্যন্ত রহিত হয়ে যায় এবং রাজ-চিকিৎসকরাও তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেছিলেন। মানুচি বলেছেন যে, এই সময় দুর্গের বাইরে জনসাধারণের মাঝে একটি গুজব রটে গিয়েছিল যে, স টি মৃত কিন্তু কোন কারণে তার মৃত্যু-সংবাদ বহির্জগতে প্রকাশ করা হচ্ছে না। এর কারণস্বরূপ মানুচি ঔরংজেবের কনিষ্ঠ ভগ্নী রোশেনারা বেগমের বিচিত্র ব্যবহারের কথারই উল্লেখ করেছেন। ঔরঙ্গজেবের শারীরিক অবস্থা যখন খুবই সঙ্গীন তখন তিনি একমাত্র চিকিৎসক ছাড়া আর কাউকে সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করতে না দেওয়ার বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন এবং সম্রাটকে দেখতে দেওয়ার এই যে কড়াকড়ি তাতেই অনেকের মনে সন্দেহ জাগে যে, সম্রাট হয়ত মৃত। রোশেনারা বেগম এমনকি সম্রাটের মহিষীদের পর্যন্ত সম্রাটের কক্ষে ঢুকতে দিতেন না। সম্রাটের সঙ্গীন শারীরিক অবস্থার কথা যখন সাম্রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সম্রাটের পুত্রেরা সকলেই দিল্লীর দিকে সসৈন্যে ছুটে এসেছিল। রোশেনারা বেগমও নিজে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে গোপন পত্র দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যে, সম্রাট যদি সত্যই এ যাত্রায় রক্ষা না পান তা হলে যেন তাঁরা বাদশাজাদা সুলতান আজমকে সিংহাসনে বসান ও তাঁকে এ বিষয়ে সর্ব্ববিধ সাহায্যদান করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি, কারণ সম্রাট সে যাত্রায় মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পান। খানিকটা সুস্থ হলে পর তিনি জোর করে দরবারে উপস্থিত হয়ে সর্ব্বসাধারণের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান। ঔরঙ্গজেব এই অসুখের পর চিরজীবনের মতন সহজ বাক্‌শক্তির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কথা বলতে গেলে তাকে আস্তে আস্তেই বলতে হ'ত এবং অনেক সময় জিবের আংশিক পক্ষাঘাত হেতু কথা এড়িয়ে যেত। ঔরঙ্গজেব ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট রোগমুক্তিস্নান করেছিলেন এবং সেই দিনই তিনি দরবারে তামাকের উপর দেয় কর মুসলমানদের রেয়াত করার কথা ঘোষণা করেন। এর কারণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি দরবারে বলেছিলেন যে, "এতদিন যে দয়া তাঁর স্বধর্ম্মী মুসলমানদের দেখান উচিত ছিল তা দেখান নি বলেই বোধ হয় আল্লাহ তাঁকে এইরূপে শাস্তি দিয়েছেন, এখন থেকে তিনি সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করে যাবেন। তিনি হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মীয় পবিত্র তীর্থস্থানগুলির উপর প্রদত্ত কর সম্পূর্ণরূপে রেয়াত করে দেন, অবশ্য এর জন্য পরে তিনি অনুতপ্তই হয়েছিলেন, কারণ এতে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ অনেকখানি কমে গেয়েছিল। এই ঘাটতি তিনি কর্ম্মচারীদের বেতন কমিয়ে ও রৌপ্যমুদ্রার দাম বাড়িয়ে পূরণ করেছিলেন। তিনি রৌপ্যমুদ্রার দাম ১৪ সৌ থেকে আটাশ সৌ-এ বাড়িয়ে দেন। প্রথমে শরাফরা সম্রাটের এই নির্দ্দেশ মানতে রাজী হয় নি, পরে অবশ্য অবস্থার চাপে পড়ে মানতে বাধ্য হয়েছিল। রোগমুক্তির পর ঔরঙ্গজেব স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে কিছুকাল কাশ্মীরে বেড়িয়ে আসেন। কাশ্মীর-যাত্রার প্রাক্কালে ঔরঙ্গজেব ধরজগতে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু (তার নিজের মতে) সম্রাট শাজাহানকে ধরাতল থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে সফলকাম হন নি। ঔরঙ্গজেব যে চিকিৎসকের উপর শাজাহানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার ভার দিয়েছিলেন সেই মুকারেম খান নিজেই ঔরঙ্গজেব-প্রেরিত বিষপান করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে নিজেকে মুক্তি দেন।

ঔরঙ্গজেব তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় সফল হতে না পেরে তিনি পুনরায় একজন ইউরোপীয়ান চিকিৎসককে (মঃ বার্ণিয়ার নন) গোপন নির্দ্দেশ দিয়ে সম্রাট শাজাহানের কাছে পাঠান, কিন্তু এবারও তাঁর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়, কারণ শাজাহান সেই চিকিৎসককে সন্দেহবশে গ্রহণ করেন নি। জনসাধারণেও এই চিকিৎসক প্রেরণের পিছনে ঔরঙ্গজেবের দুরভিসন্ধি ছিল বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে ভয় পায় নি। ঔরঙ্গজেব জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে অসন্তোষের ভাব দেখে আশঙ্কা করেন—হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে কোন বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে পারে, তাই তিনি শাজাহানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কয়েকটি পত্র লেখেন। শাজাহান তাঁর উত্তরে ঔরঙ্গজেবকে জানিয়েছিলেন যে, ঔরঙ্গজেব তাঁর সঙ্গে এতখানি দুর্ব্যবহার করেছে যে, তার কোন ক্ষমাই নেই, অতএব তাঁর ক্ষমা পাবার আশা যেন ঔরঙ্গজেব ত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গজেব কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে আগ্রা দুর্গের অধিকর্তা ইতিবর খানকে নির্দ্দেশ দেন যে, শাজাহানের সহজ-বন্দী-জীবনকে যেন এমন দুঃসহ করে তোলা হয় যাতে শাজাহান আত্ম-হত্যা করতে সচেষ্ট হন। ইতিবর খান এ বিষয়ে খুবই সচেষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তার কোন ফল হয় নি। যা হউক, এর কিছুদিন পরেই ঔরঙ্গজেবের সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে সম্রাট শাজাহান ১লা ফেব্রুয়ারী ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যরাত্রে দেহলীলা সংবরণ করেন। ইতিবর খানের কাছ থেকে যখন ঔরঙ্গজেব এই সংবাদ পান তখন ঔরঙ্গজেবের সন্দিগ্ধ মন মানতে চায় নি যে, ইহজগতে তাঁর একমাত্র জীবিত শত্রু সত্যসত্যই মৃত, সেইজন্য তিনি তাঁর এক বিশ্বাসী লোককে গোপনে আগ্রায় পাঠিয়ে দেন এবং তাকে নির্দ্দেশ দেন যে, তপ্তলৌহ শলাকা দিয়ে মৃত সম্রাটের পা ও মাথা বিদ্ধ করে সে যেন দেখে যে সম্রাট সত্যই মৃত। ইতিবর খানকে তিনি নির্দ্দেশ দেন যে, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তিনি আগ্রায় পৌঁছচ্ছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন মৃত সম্রাটকে কবর না দেওয়া হয়।

সম্রাট শাজাহানের মৃতদেহ যখন তাজমহলের নিম্নকক্ষ তলে আনা হয় তখন ঔরংজেব বেশ ঘটা করেই চোখের জল ফেলেছিলেন এবং প্রকাশ্যে হা-হুতাশ করেছিলেন। শাজাহানের সমাধিপর্ব্ব শেষ করে তবে তিনি আগ্রার দুর্গে প্রবেশ করেন। দুর্গে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভগ্নী জাহানারা বেগমকে তাঁর হাতে সম্রাট শাজাহানের লিখিত শেষ পত্রখানি তুলে দিয়ে বলেন যে, পিতার

মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তিনি ঔরংজেবের হয়ে পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন এবং এই ক্ষমাপত্রখানি তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেন। চিঠিতে সম্রাট তাঁর পুত্রের সমস্ত অপকীর্ত্তি ক্ষমা করে যাচ্ছেন বলে লিখেছেন। জাহানারা বেগম শাজাহানের প্রিয় হীরে জহরৎ ও মণিমুক্তাদি ঔরংজেবের হাতে নিঃসঙ্কোচে তুলে দেন, কারণ এগুলি পাবার জন্ত ঔরংজেব সম্রাটের জীবিতকালে নানা রূপে চেষ্টা করেছিলেন। ঔরংজেব এর পর জাহানারা বেগমকে নিয়ে দিল্লী চলে আসেন এবং দুর্গের বাইরে জাহানারার নিজস্ব প্রাসাদে দারার কন্তা জানী বেগমকে নিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার অনুমতি দেন। সম্রাট সাজাহান জাহানারাকে যেসব সম্পত্তি দিয়েছিলেন বা মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন, ঔরংজেব তার কিছুরই অদল বদল করেন নি।

সম্রাট ঔরংজেবের কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, ঔরংজেবের মনোবল চিরদিনই অটুট ছিল। কিছুতেই তিনি নিরাশ হতেন না বা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়তেন না। সব সময়েই মেজাজ ঠাণ্ডা রেখেই তিনি কাজ করতেন। তাঁর ৮৬ বৎসর বয়স কালেও ৩০টি দাঁত অটুট ও অক্ষত ছিল। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে পায়নালাগড় দুর্গ অধিকার কালে ঔরংজেব একবার পড়ে যান এবং তাতে তার হাঁটুতে বিশেষ চোট লাগে ও চিরদিনের মত তাঁর ডানপাটি খোঁড়া হয়ে যায়। ঔরংজেব তাঁর এই শারীরিক অক্ষমতার কথা যাতে সকলে জানতে না পারে বা বুঝতে না পারে সেই জন্ত তিনি দরবারে সিংহাসনের সামনের দিকে একটি পর্দ্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সিংহাসনে এসে বসবার পর সেই পর্দ্দা উঠিয়ে দেওয়া হ'ত। শ্রদ্ধেয় ডাঃ যদুনাথ সরকার তার 'Anecdotes of Aurangjib' পুস্তকে জানিয়েছেন যে, ঔরংজেবের শেষজীবন খুবই কষ্টকর হয়েছিল। একমাত্র উদিপুরী বেগম ছাড়া আর কেউই তাঁর কাছে আসতে চাইত না এবং বলতে গেলে তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছিল। রাত্রিকালে তাঁর ভাল ঘুম পর্য্যন্ত হ'ত না, কেবলই বিভিন্ন রকমের ভীতিকর দুঃস্বপ্ন দেখতেন ও চমকে উঠতেন। খুব সম্ভবতঃ নিজের সারাজীবনের অপকীর্ত্তিগুলি দুঃস্বপ্নের রূপ ধরে তার সম্মুখে এসে হাজির হয়ে তাঁর জীবনের চরম ব্যর্থতার কথা বার বার মনে করিয়ে দিত ও বৃদ্ধ সম্রাট পাপপুণ্যের কষ্টিপাথরে নিজের কার্য্যাবলী যাচাই করতে গিয়ে শিউরে উঠতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মানুচি ঔরংজেবের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁর রাজত্বকালে সুবিচার বলে বস্তুটি ছিল না বললেই হয়। তাঁর কর্ম্মচারীরা তাঁর নির্দ্দেশিত নিয়মাবলী অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলত না, ফলে প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগের কোন বিচারই হ'ত না। অত্যাচারী কর্ম্মচারীরা তাঁদের অপকর্ম্মের জন্ত কোনরূপ শাস্তি তাঁর কাছ থেকে পায় নি। মানুচি বলেছেন যে, সম্রাট শাজাহান দুশ্চরিত্র ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রজাদের অভাব অভিযোগ তিনি মন দিয়ে শুনতেন এবং তার যথাযোগ্য বিচার করতেন ও অপরাধীকে শাস্তি দিতেন। এমনও দেখা গেছে যে, তিনি অত্যাচারী রাজকর্ম্মীদের দরবারে বসেই তাঁর সামনে সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটিয়েছেন। ওমরাহদের দোষত্রুটি থাকলে তিনি তাদের পর্য্যন্ত কঠোর শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি এমন অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

ঔরংজেবের হীনমনা চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, তিনি প্রয়োজন ফুরালে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুহৃদকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না, দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুচি রাজা জয়সিংহের উল্লেখ করেছেন, রাজা জয়সিংহ ঔরংজেবের সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাজ্যবিস্তারে প্রধান সহায়স্বরূপ ছিলেন, কিন্তু শিবাজীর পলায়নের সহায়তা করার সন্দেহে ঔরংজেব সেই জয়সিংহকেই ষড়যন্ত্র করে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

রাজা জয়সিংহের পুত্র কিরাতসিংহই ঔরংজেবের নির্দ্দেশে তাঁর নিজের পিতাকে বিষ প্রয়োগে বুরহানপুরের পথে হত্যা করেন— [Tod's Rajasthan, Voll-II, p.p. 342] রাজা জয়সিংহের মৃত্যুতে যখন সারা মুঘল দরবার শোকে মুহ্যমান তখন ঔরংজেব প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করেন যে, তিনি রাজার মৃত্যুতে খুবই খুশী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি জয়সিংহের মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে এক জেহাদ ঘোষণা করেন। হিন্দুদের বিখ্যাত ধর্ম্মস্থানগুলি কলুষিত করে তাদের দেবালয় ও মন্দিরসমূহ ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্ম্মাণ করার ঢালাও আদেশ দিয়েছিলেন। [ঔরংজেব মথুরার মন্দির, কাশীর মন্দির, মায়াপুরের মন্দির ও অযোধ্যার মন্দির কলুষিত ও ধ্বংস করে দিয়েছিলেন বলে মানুচি উল্লেখ করেছেন।] ঔরংজেব যদিও শত শত মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তবুও ভারতপৃষ্ঠ থেকে সেগুলিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন নি, কারণ অনেক বিখ্যাত মন্দির আংশিক ধ্বংস করার পরও হিন্দুরা সেগুলির পুনঃসংস্কার করে আবার পূজা-অর্চনা সুরু করেন। তিনি হিন্দুদের তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠধর্ম্মীয় উৎসব দোলমেলা থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেন। তিনি অনেক হিন্দু রাজকর্ম্মচারী ও রাজন্যবর্গকে বিভিন্ন উচ্চপদ থেকে বিতাড়িত করে সেখানে মুসলমান কর্ম্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। মানুচি বলেছেন যে, ঔরংজেবের চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হচ্ছে উপকারীর উপকার স্বীকার না করা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেওয়া।

পরিশেষে মানুচি বলেছেন যে, ঔরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের যে রকম বিশৃঙ্খলা ছিল ও অরাজকতা দেখা গিয়েছিল তাতে তার এই ধারণাই হয়েছে যে, মাত্র ৩০ হাজার ইউরোপীয়ান সৈন্য নিয়ে মুঘলদের হাত থেকে ভারতের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভবপর এবং এ কাজে ইউরোপীয়ানদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। সমাপ্ত
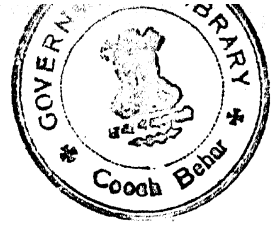
চন্দ্রমল্লিকার মৃত্যু

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বড়দিনের অবকাশে কাশী এসেছি বেড়াতে। সরু গলির মধ্যে পুরণো বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। কাশীর সরু গলি আর পুরণো বাড়ীর প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। আবছায়া অন্ধকারময় এই সব গলিপথে চলতে আমার মনে হয় আরও কতবার কত জন্মে এই পথে চলেছি। দূর বাংলাদেশের মানুষ হলেও নাড়ীর যোগ আছে যেন কাশীর সঙ্গে।

গলির দিকে একটা জানালা, তার পাশে বসে লেখাপড়া করি। সকালে-বিকেলে গলি দিয়ে নানা দেশের লোক চলে, ফেরিওলা ডেকে যায় 'ডাণ্টা চাই', 'কেরোসিন তেল চাই', 'চানাচুর চাই', আরও কত কি। দুপুরবেলা দু'দিকের উঁচু বাড়ীর সামান্য ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে পথে, তখন লোক চলে না, দু'একটা ষাঁড় সেই রোদে দাঁড়িয়ে জাবর কাটে।

গলির ওপারে সামনের বাড়ীটা অতি প্রাচীন। একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে ওতে। ছোট ছোট জানালাগুলি পাথরের কারুকার্য করা, দোতলায় একটা বারান্দা লাল বেলে-পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা। তারই এক কোণে মাটির বড় গামলায় একটা চন্দ্রমল্লিকার গাছ, প্রকাণ্ড একটা সাদা ফুল ফুটে আছে তাতে। মাঝে মাঝে বাড়ীর বউঝিরা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়—তারা কোন্ দেশের ঠিক চিনতে পারি না।

মন্থরগতিতে আমার অলস দিন কাটে। একদিন সকালবেলা জানালা খুলে দেখি সামনের বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ। বিকেলবেলা বেড়াতে যাবার সময় লক্ষ্য করি সদর দরজাটাও বন্ধ। মনে ভাবি, কোথাও বেড়াতে গেছে নিশ্চয়, কলকাতা বা কোনারক। ছুটির সময় আমরা পূবের লোক পশ্চিমে আসি, এরা পশ্চিমের লোক পূবে যায়—এই ভাবে জনতার ভারসমতা রক্ষা হয়।

দিনদুই পরে জানালার ধারে বসে চা খাচ্ছি আর দেখছি সামনের বাড়ীর বারান্দায় পাথরের রেলিঙের উপর বসে একটা পায়রা ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে ডানার পালক পরিষ্কার করছে। হঠাৎ নজর পড়ল চন্দ্রমল্লিকার গাছটার উপর, পাতাগুলি যেন কেমন মুষড়ে পড়েছে। ভাবছি, কেউ ডাল ধরে টানাটানি করেছে কিনা, এমন সময় মনে পড়ল বাড়ীতে ত কোন লোক নাই। তবে কি গামলায় জল দেওয়া হচ্ছে না বলে গাছটা দুর্বল হয়ে পড়েছে? উঠে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখি, সত্যিই গামলার মাটি শুকনো, জল পড়ে নি কয়েকদিন। রাগ হ'ল গৃহস্থের উপর, একি অন্যায়, গাছটাতে জল দেবার ব্যবস্থা না করে চলে গেছে! অসহায় গাছটার প্রতি চেয়ে মন খারাপ হয়ে যায়।

ভোরবেলা উঠে দেখি গাছের পাতাগুলো আজ আবার তাজা হয়ে উঠেছে—একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকি, গাছটার কথা মনে থাকে না, বিকেলবেলা মনে পড়তেই তাড়াতাড়ি জানালার ধারে গিয়ে দেখি, আবার পাতাগুলো নুয়ে পড়েছে। বুঝতে পারি রাত্রের শিশির পেয়ে গাছটা তাজা হয়ে উঠেছিল, দিনের উত্তাপে আবার নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ফুলটা এখনও অম্লান আছে। মস্ত বড় সাদা চন্দ্রমল্লিকাটা কচি মেয়ের মুখের মত ঢলঢল করে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি তার দিকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে, আবছায়া অন্ধকারে তাকে ঘুমন্ত শিশুর মতই দেখা যায়।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই জানালা দিয়ে উঁকি মারি। কাল দেখেছিলাম নুয়েপড়া পাতাগুলো রাত্রের শিশির পেয়ে তাজা হয়ে উঠেছিল, আজ দেখি তারা আরও নুয়ে পড়েছে। ফুলটিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করি না। এটা-ওটা করি আর জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ফুলটিকে দেখি। দুপুরবেলা একরাশি রোদ এসে পড়ে গাছটার উপর, ভয় হয় মাটিতে যে রসটুকু এখনও আছে সেটুকু শুকিয়ে যাবে। যে রোদ ফুলটিকে ধীরে ধীরে দিনে দিনে ফুটিয়েছে সেই রোদ ওকে তিলে তিলে শুকিয়ে মারবে। এ দৃশ্য আর দেখতে পারিনে, জানালাটা বন্ধ করে দি।

বিকেলবেলা জানালা খুলে দেখি ফুলটায় যেন কিছু পরিবর্তন হয়েছে—বোঁটা যেন একটু বেঁকে গেছে। বসে বসে ভাবি, কিছুই কি করবার উপায় নাই? হঠাৎ একটা ফন্দি মনে জেগে ওঠে, দু'বাড়ীর মাঝখানে গলিটা হবে হাতপাঁচেক চওড়া, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গামলায় জল দিতে না পারলেও বালতি করে ছুঁড়ে অনায়াসেই দেওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি উঠে ছোট বালতিটায় জল ভরে

নিয়ে আসি, কিন্তু পথের দিকে চেয়ে দেখি লোক চলতে সুরু করেছে ততক্ষণ। সুযোগের অপেক্ষা করি, পথ খালি হলেই জল ছুঁড়ে দেব ভাবি, কিন্তু সুযোগ মেলে না, লোক চলাচল ক্রমেই বেড়ে যায়। রেখে দি বালতি, ঠিক করি রাত্রে যখন লোকচলাচল বন্ধ হবে তখন জল দেব।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে জানালার ধারে বসি, ক্রমে রাত বেড়ে যায়—লোকচলাচল কমে আসে। রাত গভীর হয়, লোক আর চলে না, দু'পাশের বাড়ীর জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কোথাও কোন শব্দ নাই। গলির মোড়ে একটা আলো জ্বলছে। এই ত সময় এসেছে, এই ত সুযোগ, আমি বালতি করে জল এনে জানালার ভিতর দিয়ে তাক্ করে ছুঁড়ে দি গাছটার দিকে। কিছুটা পড়ে রাস্তায়, কিছু পড়ে গিয়ে ওবাড়ীর বারান্দায়। ঝপ্ করে আওয়াজ হয়, এমন নিস্তব্ধতার রাজ্যে এইটুকু আওয়াজও ভীষণ বলে মনে হয়—পাড়ার লোকেরা হয় ত জেনে যাবে, কি ভাববে তারা। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ি।

সকালবেলা গাছটার অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে যাই এক বালতি জলের এক ফোঁটাও পড়ে নি তাতে। কল্পনায় কাজটি যত সহজ মনে হয়েছিল, বাস্তবে তা মোটেই সহজ হয় না। চন্দ্রমল্লিকা আজ আরও ম্লান হয়ে গেছে, আরও নুয়ে গেছে। ভাবি খারাপ বোধ হয়, ওকে বাঁচাবার আর কোন উপায় খুঁজে পাই না। মনটা পড়ে থাকে ঐ দিকে। নানা কাজের ভিতরে বারে বারে এসে দেখি। নিশ্চয় শুকনো মুখের মত সেটি। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা সৃষ্টি করে।

দিন গিয়ে রাত আসে, রাত গিয়ে দিন আসে। গাছের পাতা কুঁকড়ে গেছে, সরু ডালগুলি বেঁকে গেছে। ফুলটা অনেক ছোট দেখায় আজ। মনে পড়ে কয়েক দিন আগের ওর তাজা ঢলঢলে রূপটি। কোথায় সে রূপ আজ! মনে হয় যেন একটি ছোট মেয়ে, কাল যাকে হাসিখুশী সুন্দর দেখেছি আজ সে মৃত্যুশয্যায় শুয়েছে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখ দুটি বোজা, নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। যেমন করে মা তার রুগ্ন সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে পাশে বসে থাকে, আমিও তেমনি চন্দ্রমল্লিকার পাশে বসে থাকি।

দুপুরবেলা আকাশে একটু মেঘ করে আসে, ভাবি নিষ্ঠুর মানুষ যাকে মরণের পথে ঠেলে দিয়ে গেছে, ভগবান তার বাঁচবার উপায় করছেন। মনটা হালকা হয় কিছু। বারে বারে তাকাই আকাশের দিকে। সন্ধ্যার মুখে মেঘ আরও ঘনিয়ে আসে, সন্দেহ থাকে না আর, রাত্রে বৃষ্টি হবে নিশ্চয়। নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ি বিছানায়।

শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এসে দেখি, না, বৃষ্টি ত পড়ে নি এক ফোঁটাও। তা ছাড়া, আকাশ যে পরিষ্কার, অসংখ্য তারা ঝলমল করছে। ঘরে গিয়ে আর বিছানায় শুতে পারি না, জানালাটা খুলে বসে থাকি। অন্ধকারে চন্দ্রমল্লিকাকে অস্পষ্ট দেখতে পাই, যেন ঘুমিয়ে আছে। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসে, গলির মোড়ে আলো নিভে যায়, দু'একটা পাখী ডেকে ওঠে, লোকজন জেগে ওঠবার সাড়া পাই। পথ দিয়ে গঙ্গাস্নানে চলে দুই-একটি মেয়েপুরুষ। এইবার ভোরের আলোয় চন্দ্রমল্লিকাকে স্পষ্ট দেখতে পাই, আরও শীর্ণ, আরও শুকনো, আরও মলিন।

বেলা বেড়ে যায়, কত লোক চলে গলি দিয়ে, কেউ হাসে, কেউ গান গায়, ফেরিওয়ালা হাঁকে, অথচ এই জনস্রোতের অতি কাছাকাছি একটি প্রাণ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। এক ফোঁটা জল পেলে সে আবার বাঁচতে পারে, কিন্তু সেই এক ফোঁটা জল দেবার কেউ নেই।

দুপুরের রোদটুকু যখন এসে পড়ে, শীর্ণ চন্দ্রমল্লিকাকে তখন আরও শীর্ণ দেখায়। সেই দুধের মত সাদা রং আর নাই, একটা পাণ্ডুরতা ছেয়ে গেছে পাপড়িতে পাপড়িতে।

সারাদিন বসে থাকি জানালার ধারে। দৃষ্টি ফেরাতে পারি না চন্দ্রমল্লিকার শুকনো মুখ থেকে। ওটা যেন ফুল নয়—একটি শিশু, আমার আশেপাশে এত দিন খেলা করে বেড়িয়েছে। সন্ধ্যার ছায়া রাত্রির অন্ধকারে গিয়ে মেশে, গলির মোড়ে আলো জ্বলে ওঠে, আমি বসে থাকি চন্দ্র-মল্লিকার শিয়রে। মনে হয় যেন কবে কোন্ জন্মে একটি শিশুর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে এমনি করে কাটিয়ে-ছিলাম দিন আর রাত।

ধীরে ধীরে বাড়ে রাত, ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী, আমারও চোখে আসে ঘুম, আমিও পড়ি ঘুমিয়ে। ভোরবেলা উঠে জানালা খুলে দেখি আলো এসে পড়েছে সামনের বাড়ীর বারান্দায়, চন্দ্রমল্লিকার পাপড়িগুলি কুঁকড়ে গেছে, কয়েকটা খসে পড়েছে নিচে। বুঝলাম মরে গেছে চন্দ্রমল্লিকা। জানালা দিলাম বন্ধ করে।

বিকেলের গাড়ীতে কলকাতা ফিরে চলি, কাশী আর ভাল লাগে না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
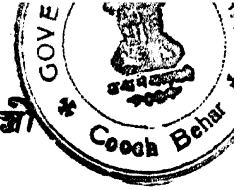
আজ সকালে সংবাদ পেলাম পরমশ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় গতরাত্রে দেহত্যাগ করেছেন। এ সংবাদ আমাদের সকলকে শোকাচ্ছন্ন করেছে। তিনি আমাদের পরম প্রিয়জন, পরম আত্মীয় ছিলেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বিশ্বভারতীর সৃষ্টিকার্য্যে এবং তার বিকাশে শাস্ত্রী মহাশয়ের দান অতুলনীয়। এ বিষয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনায়, তার সকল রচন রচনায়, তার বিদ্যাভবন গঠনে, বিধুশেখর শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপরেই বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগ পরিচালনার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দান করেছিলেন। শিক্ষাভবন, বিদ্যা-ভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, সম্মিলিত ভাবে উত্তর বিভাগ আখ্যা পেয়েছিল। এতগুলি বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। তার পর ক্রমে ক্রমে শিক্ষাভবন, কলাভবন ও সঙ্গীতভবনের পৃথক পৃথক অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। বিধুশেখর শাস্ত্রী তখন বিদ্যাভবন সংগঠনেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। তখনকার বিদ্যা-ভবন সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতের নামকরা প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বিদ্বানগণ একে একে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীতে আগমন করলেন। উইন্‌টারনিট্‌জ, সিলভ্যাঁলেভি, ষ্টেন-কোনো, লেসনি, টুসি, করমিকি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানগণ একে একে বিশ্বভারতীতে এলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজোড়া খ্যাতি এ দের আকর্ষণ করে আনল। তাঁর সঙ্গে এ দের অনুপ্রেরণা দিল। কিন্তু বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং তাঁর সহকর্ম্মী অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী এ দের বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। শাস্ত্রী মহাশয়দের মত সর্ব্ববিদ্যার আধার পণ্ডিতদের সঙ্গই এ দের বিশ্বভারতীতে অবস্থান দীর্ঘতর করল।

এই বিখ্যাত বিদ্বমণ্ডলীর আকর্ষণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীসরোজ দাস, শ্রীতারাপুর ওয়ালা প্রমুখ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ সপ্তাহে সপ্তাহে বিশ্বভারতীতে আসতে লাগলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হতেও বহু সুধীজনের সমাগম হ'ল। তা ছাড়া, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন, জাপান, পারস্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইটালী, নরওয়ে, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্ব প্রান্ত হতে অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী আসতে লাগলেন। নালন্দা বিক্রম-শীলার আদর্শ বিশ্বভারতীতে পুনরায় সার্থকতা লাভ করল।

ভারতে তথা বিশ্বভারতীতে সে এক সুবর্ণ যুগ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন বিশ্বভারতীর প্রসারে সহযোগিতা করল। দেশের সেরা সেরা বিদ্বান, বাছা বাছা ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বভারতীতে আসতে লাগল। এই সব বিদ্যার্থীর অনেকেই আজ সুবিখ্যাত। উড়িষ্যার নবকৃষ্ণ চৌধুরী, বাংলার মালতী চৌধুরী, সৈয়দ মুজতবা আলি, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ত্রিবাঙ্কুরের রামচন্দ্রন, অন্ধ্রের গোপাল রেড্ডি, বিশ্বভারতীর সেই সুবর্ণ যুগের ছাত্র-ছাত্রী।

অধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়, ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সবাকারি পরম শ্রদ্ধাভাজন। বাস্তবিকই, রবীন্দ্রনাথের পরেই সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় দ্বিতীয় ব্যক্তিই ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়। পাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। বেদ, বেদান্ত, দর্শন, কাব্য সমস্তই তাঁর অধিকারে। যেমন সংস্কৃতে, তেমনি পালিতে, যেমন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে, তেমনি বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। বেদ, ত্রিপিটক এবং আবেস্তা, তিনটি প্রাচীন বিরাট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করেছেন এবং অধ্যাপনা করছেন। বিশ্বভারতীর প্রারম্ভে সিলভ্যাঁলেভির কাছে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করে, বিদ্যাভবনের বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ইউরোপের কয়েকটি প্রধান ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছেন। ইংরেজী আগেই জানতেন, ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষাও শিখে নিয়েছেন। তা ছাড়া চীনা শিখছেন। বিশ্বের বিবিধ বিদ্যার, বিবিধ সংস্কৃতির চর্চ্চা ও আদান প্রদান চলেছে বিশ্বভারতীতে।

ইউরোপের নানা ভাষাবিদ্ প্রসিদ্ধ রাশিয়ান পণ্ডিত বোগডানব, বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ কলিনস, ফরাসী ও ইংরেজীর অধ্যাপক পাবসীক মরিস, ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষার অধ্যাপক বেনোয়া বিশ্বভারতীতে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এ ছাড়া এশিয়া ও ইউরোপের অতিথি অধ্যাপকগণ ত আসা যাওয়া করছেনই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হপ্তায় হপ্তায় বহু প্রসিদ্ধ অধ্যাপক এসে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন। ভারতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতেও বহু অধ্যাপক সাময়িক ভাবে আসা-যাওয়া করছেন। এন্‌ড্রুজ পিয়ার্স ন ত আছেনই, তাঁরাও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক।

পুঁথিগত বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে হাতে-কলমেও কাজ শেখা হচ্ছে। কৃষি, নানা প্রকার কারুশিল্প, বস্ত্রবয়নাদির শিক্ষা সমান তালে চলেছে। তারই জন্য শ্রীনিকেতনের স্থাপনা। তরুণ ইংরেজ কর্ম্মী এলমহার্ষ্ট তার ভার নিয়েছেন। প্রদীপের নীচের অন্ধকারও যাতে দূর হয়, বিশ্বভারতীর সমীপবর্ত্তী গ্রামবাসীদেরও যাতে

সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়—তারও জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা চলেছে—বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে।

সরল অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়। একখানা খদ্দরের ধুতি ও চাদর এবং একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটিই তাঁর সম্বল। এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরেরই মত। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং উচ্চ আদর্শবোধ—এরই প্রতীক ছিলেন শাস্ত্রী-মহাশয়।

"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" সমস্ত বিশ্ব যেখানে একটি নীড় বেঁধেছে—বিশ্বভারতীর এই আদর্শ সেদিন সার্থক হয়েছিল। বিবিধদেশ প্রথিত বিচিত্র বিদ্যাকুসুমের মালিকা নিয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের উপাসকগণ বিশ্বভারতীর উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন।

তার চেয়েও বড় কথা, বিশ্বভারতী একটি পরিবারে পরিণত হয়েছিল। যে-পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে স্নেহশীল ছিলেন। অথচ এই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম্মে বিভিন্ন। বিভিন্ন মতবাদী ব্যক্তিগণ সুখে, এক পরিবারে বাস করেছেন। এমন সুবর্ণযুগ, ভারতে বা পৃথিবীর অন্যত্র তখন এবং এখনও দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর আচার-বিচার বিভিন্ন। একজন জাতিভেদে বিশ্বাসী, স্বপাকভোজী। অন্যজন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ এই দুইজনই পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বিভিন্ন মতবাদ পোষণ সত্ত্বেও বিধুশেখর শাস্ত্রীর স্থান ছিল ঠিক রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ পার্শ্বে। পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ অপূর্ব্ব মিলন দুর্লভ। এ ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিশ্বভারতীর বিশেষত্ব। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, আস্তিক, নাস্তিক সকলকে নিয়ে এমন একটি প্রেমপূর্ণ পরিবার গঠন, এ-যুগে পৃথিবীতে একমাত্র গুরুদেবের বিশ্বভারতীতে সম্ভব হয়েছিল। তাই পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাশীল প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বিশ্বভারতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের পরলোকগমন, আমার নিকট পিতৃবিয়োগের ন্যায় শোকাবহ। আমরা তাঁর ছাত্রেরা তাঁর কাছে পুত্রাধিক স্নেহ পেয়েছি। প্রাচীন যুগের গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক এ-যুগে তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আমাদের কাছে তাঁর অভাব অপূরণীয়। শুধু আমাদের বলি কেন, সমস্ত ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল তাঁর তিরোধানে।

"একে একে নিবিছে দেউটি।" একে একে এইসব প্রতিভাবান ব্যক্তি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের স্থান পূরণ হচ্ছে না।

পরিণতবয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক। দেহধারীর কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের ন্যায় মৃত্যুও একটা স্বাভাবিক অবস্থামাত্র। জীর্ণবস্ত্রের মত, জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে তিনি নূতন দেহলাভ করেছেন। আজ তাঁর আনন্দের দিন। আজ তাঁর জন্য—"বাতাস মধু বহন করছে, আকাশ মধু বর্ষণ করছে, স্রোতস্বিনীগণ মধু ক্ষরণ করছে।"

শান্তিনিকেতনে, এই মন্দিরে আচার্য্যের আবাসে বসে তিনি কতবার বলেছেন—"শোক এব পরা পূজা।" 'সেই পরমদেবতার পরম পূজা সাধিত হয় শোকে।" আমি বাল্যকালে এবং যৌবনে তাঁর মুখেই এই কথা প্রথম শুনি। তখন বুঝি নাই, আজও যে সম্পূর্ণ বুঝেছি তা নয়,তবে আজ এ-কথা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে—"শ্মশান বৈরাগ্য।" প্রিয়জনের মৃত্যুতে সাময়িকভাবে আমাদের বৈরাগ্য জন্মে। সাময়িকভাবে আমাদের সত্যদর্শন হয়। ক্ষণিকের জন্য অনন্তের, অসীমের, ভূমার স্পর্শ পাই। কিন্তু হায়! কেবল ক্ষণিকের জন্যই। মাত্র নিমেষের জন্য বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় তাঁর আভাস পাই। আমাদের জীবনে তা স্থায়ী হয় না। কিন্তু যাঁর জীবনে স্থায়ী হয় এমন সৌভাগ্যবানের ত অভাব নাই।

সেইরূপ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই প্রাচীন যুগে ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন। ভূমাকে তিনি লাভ করেছিলেন, অসীমে অবগাহন করেছিলেন, তাই প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিদেহী আত্মার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন—"মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।" আকাশ মধুর, বাতাস মধুর, রাত্রি মধুর, দিবস মধুর—এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্য্যন্ত মধুর।

প্রিয়জনের বিচ্ছেদে মোহজাল তাঁর ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, মেঘ কেটে গিয়েছিল, কুয়াসা অন্তর্হিত হয়েছিল—সবিতা তাঁর নিকট প্রকাশিত হয়েছিলেন।

গৃহের প্রাচীর ভেঙে গিয়েছিল বলেই অনন্ত আকাশ তাঁর নিকট আত্মপ্রকাশ করেছিল—শোক সর্ব্বনাশ করেছিল বলেই আনন্দের আবির্ভাব হয়েছিল—তাই তাঁর জন্য আকাশ মধু বর্ষণ করত, বাতাস মধু ঢেলে দিত।

ক্ষুদ্রকে হারিয়ে তিনি বিরাটকে পেয়েছিলেন, সীমাকে হারিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করেছিলেন—তাই তাঁর কাছে সামান্য ধূলিকণা পর্য্যন্ত মধুময় হয়েছিল—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।"

প্রিয়জনের তর্পণ করতে গিয়ে তিনি বিশ্বজনের তর্পণ করেছেন। দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, ক্রূর সর্প, পাপী, পুণ্যাত্মা, সপ্তদ্বীপনিবাসী সমস্ত প্রাণীকে; ভূতল, রসাতল, স্বর্গ, নরক সকল জগতের সকল অধিবাসীকে আহ্বান করে, তিনি তাঁদের ক্ষুধার শান্তি, পিপাসার উপশম কামনা করে' অন্ন ও পানীয় দান করছেন।১

শত্রু-মিত্র, প্রিয়-অপ্রিয়, ভেদ তাঁর তিরোহিত, বিশ্ব তাঁর কুটুম্ব, এক আত্মা তাঁকে পরিত্যাগ করে, বিশ্বের সমস্ত আত্মাকে তাঁর আত্মীয় করে গেছলেন।

সেই সৌভাগ্যবান ঋষি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমাদের এই ছোট্ট ঘরের বেড়া ভেঙে যাক। এই শোকসাগরে অবগাহন করে, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র হয়ে আমরাও যেন এই শুভলগ্নে, অসীমকে প্রত্যক্ষ করি। মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে, দুঃখের মধ্যে আনন্দকে উপলব্ধি করি। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলে উঠি—"আকাশ মধু
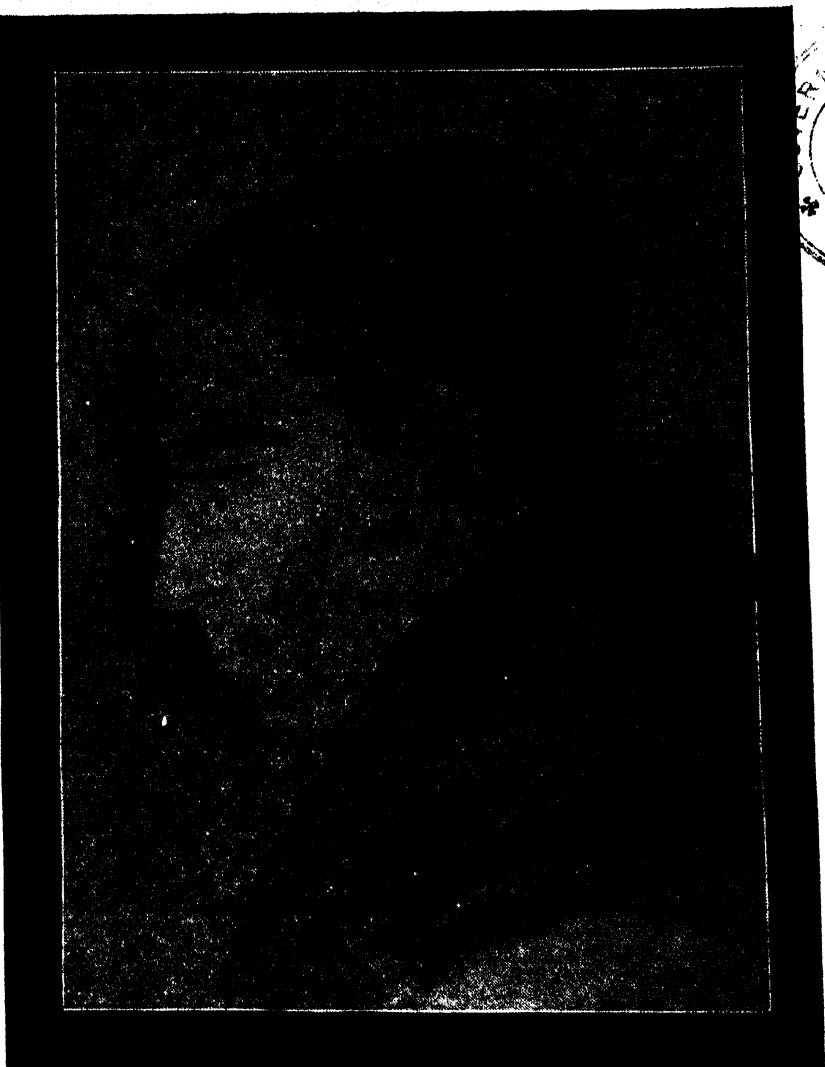
বিধুরে ঘর শাড়ী শিল্পী : শ্রীচিত্রনিভা চৌধুরী

॥ দুখী দেখি বলে নাহি চলে তব নীর।
কিসের লাগিয়া তুমি যাও নাহি তীর॥

[illegible]
শান্তিনিকেতন.
২৪শে চৈত্র, ১৩৫০।

বর্ষণ করছে, বাতাস মধু বহন করছে, স্রোতস্বিনীগণ মধু ক্ষরণ করছে। আমাদের রাত্রি মধুর, দিবস মধুর, আমাদের এই শ্যামলা ধরিত্রী-জননীর চরণ-রেণুকণাগুলিও মধুর।"

আমাদের আত্মপর নাই, শত্রু-মিত্র নাই, আত্মীয়-অনাত্মীয় নাই। বিশ্বজগতের সকল প্রাণীই আমাদের বন্ধু, সকলেই আমাদের আত্মীয়। সকলেই সুখী হউক, সকলেই নিরাময় হউক, সকলের কল্যাণ হউক, কেউ যেন কোথাও দুঃখ না পায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ত আমরা কি প্রার্থনা করব? তিনি ত নিঃস্ব, নিঃসম্বল নন। অপরিমেয় পুণ্যরাশি তাঁর সম্বল। অজস্র কল্যাণকর্ম্ম তাঁর পাথেয়। সেই পাথেয়কে সম্বল করে তিনি লোক-লোকান্তরে দিগ-দিগন্তরে পাড়ি দিবেন।

পরলোকগত পিতৃগণ তাঁর সাথী। তাঁদের সংখ্যা ত কম নয়। ধর্ম্ম তাঁকে পথ দেখাচ্ছেন। পিতৃগণ তাঁর সঙ্গে চলেছেন, তাঁর ইষ্টাপূর্ত্তকে সম্বল করে, কল্যাণকর্ম্মকে অবলম্বন করে, পরম অসীমের মধ্যে তিনি অবগাহন করেছেন। এই সংসারের যা-কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা-কিছু কলুষ, সমস্ত ধুয়ে মুছে, মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করে, জ্যোতির্ম্ময়দেহ পরিগ্রহণ করে, তিনি পুনরায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। যাত্রা তাঁর শুভ হউক।

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভির্যত্রানঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্,
হিত্বায়াবত্তং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ।২

১ তর্পণ মন্ত্র: দেবাযক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
...ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এবস্তত্রস্থিতো যেথিলভূতসংঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমম্বু হি ময়া বিসৃষ্টং তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু।

২ ২২শে চৈত্র রবিবার সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ।

সঞ্চয় ও অপচয়

শ্রীবিভূতি বিদ্যাবিনোদ

১

কবিকে করিল প্রশ্ন, "বল ওহে কবি
কি লাভ করিলে শুধু ভস্মে ঢালি হবি?
কথা শুধু গেঁথে গেঁথে
কি পেলে, কি চাও পেতে?
কিছু ত দেখি না ওহে তোমার সঞ্চয়,
জীবন যে হয়ে গেল বৃথা অপচয়।"

২

অপচয়? ভাবে কবি, সত্য কি এ কথা,
নাইক সঞ্চয় বলে নাইও কোন ব্যথা;
গান গায় বুলবুল,
সে কি বৃথা করে ভুল?
ফুল ফুটে ঝরে যায় অলক্ষ্যে কোথায়,
তা বলে কি ফোটা তার মিছে হয়ে যায়?

৩

ঘন দেখি নৃত্যরত শিখি যবে ডাকে,
নিন্দা স্তুতি অপেক্ষা কি সে কাহারো রাখে?
তটিনীর কলতান
সে কি মিছে, সে কি ভান?
সঞ্চয় ও অপচয় করিবে বিচার,
মূল্য নাই, তৃপ্তি, শোভা কি হে কোনটার?

৪

ভ্রমরের গুঞ্জরণ, পলাশের হাসি,
নীলনভে জ্যোছনা যে উঠে উদ্ভাসি,
কোকিল যে ইসারায়
বেদনা জানায়ে যায়,
সে কি সব অর্থশূন্য সঙ্গতিবিহীন?
সঞ্চয় ও অপচয় বিচার-অধীন।

৫

বেছে বেছে ফুল তুলি কেহ গাঁথে মালা,
বাঞ্ছিতের গলে দিয়ে জুড়াইতে জ্বালা;
শুকায় সে মালা পরে
ধূলায় ঝরিয়া পড়ে,
তবু সে পরিয়ে দেয়, পরাতেই থাকে,
মানা কে করিবে তারে, তবু গেঁথে রাখে।

৬

কথায় জুড়িয়া কথা কবি মায়া সৃজে,
কেন যে একান্তে বসি' বুঝে সে কি নিজে?
উত্তর কোথায় পাবে,
কোনদিন নাহি ভাবে
সঞ্চয় কি অপচয় কি গেল সে করে—
গাওয়া কাজ, গেয়ে যায় প্রসন্ন অন্তরে।

অলসমায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

এক পেয়ালা ধূমায়িত চা হাতে করে এনে পীয়ারসন বললে—"ভারতীয় যখন নিশ্চয়ই চায়ে দুধ-চিনি মিশিয়ে খাও?"

"নিশ্চয়ই," কুমার হাসল—"আর তুমি?"

—"আমি পান করি, টলটলে পাতলা চায়ে একটুকরো সুগন্ধি লেবুর রস দিয়ে।"

—"বল কি? তুমি মানুষ খুন করতে পার।" একটু হেসে কুমার বললে—"আর মানুষবাঁচাতেও। পীয়ারসন, তুমি না থাকলে কাল রাস্তায় পড়ে আমাকে মরতে হ'ত।"

পীয়ারসনও হাসল। তার উসকো-খুসকো চুল আর রেখাঙ্কিত উঁচু কপালে সকালের আলো এসে পড়ল। আর এক কাপ চা হাতে করে পীয়ারসন বললে—"ভারতের বিরুদ্ধে যা বলেছি কাল নেশার ঘোরে, সব আমি উইথড্র করলাম। কারণ ভারতবর্ষই আমাকে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় দান করেছে।"

—"সাধারণত ইংরেজরা ভারতে গিয়ে মাতাল, বদমেজাজী হয়ে ফিরে আসে। বোধ হয় অকারণ সম্মান আর অনুচিত প্রভুত্বের বোঝা বওয়া সাধারণ মস্তিষ্কের পক্ষে একটু মুশকিল হয়, ভারসাম্য ঠিক থাকে না। কিন্তু আমার মন আগে থেকেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। পাহাড়ী প্রকৃতি আর পাহাড়ী মানুষ আমার সেই ক্ষতে ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগিয়েছিল। হিমালয়ের নিভৃতে সেই যে একটি বছর কাটিয়েছিলাম—।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডেভিড বললে—"তার স্মৃতি আমার মনে কখনও মলিন হবে না।"

কুমার অবাক হয়ে ভাবল—এই পীয়ারসনই যে কালকের রাতের মাতাল একথা কে বলবে। জুনির পূর্ব স্বামীর কথা-বার্তা যে এত শিক্ষিত, এমনকি প্রায় সাহিত্যিক সেকথা আগে খেয়াল করে নি কুমার। এখন মনে হ'ল, আগেই বোঝা উচিত ছিল, জুনি যখন আত্মপরিচয় গল্প করছিল, তখনই। শিক্ষিত এবং সূক্ষ্মমনের অধিকারী না হলে কি ভালবাসা যায়? ভালবাসা মনের একটা বিশেষ সংস্কার, যার জন্যে বহুদিনের অজ্ঞাত প্রস্তুতি চাই। আর সূক্ষ্ম বলেই ডেভিডের মন প্রতিকূল আবহাওয়ায় মরচে ধরে ভোঁতা হয়ে যাবার অবকাশ পেয়েছিল। যাই হোক, কুমার অবাক হয়ে দেখলে যে ডেভিডের কথা শুনতে ওর রীতিমত ভাল লাগছে।

পীয়ারসন বললে,—"পাইনের গন্ধঢালা বনভূমির প্রান্তে, সেই নীলে সোনায় মাখামাখি সকাল-বিকেলের আলোয়, সেই লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলা কলনাদিনী ঝরনার ধারে, ঝিঁঝির ডাকে ঘনমন্থর জোনাকজ্বলা সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার ভিতরকার দহনজালাটা একটু যেন শান্ত হয়ে এল। তার উপরে পাহাড়ী মেয়ের সতেজ সুন্দর অকারণ হাসি। আমার জীবনের মূল্য ফিরিয়ে দিল ওরা, যে জীবন হাতে করে জুনির কাছে আমি ধরনা দিয়ে বসেছিলাম, অনাদায়ে যার দাম ডাকাতি করে কেড়ে নিতে চেয়েছি, তার মূল্য যেন না চাইতে নিজে থেকে হাতে এসে পৌঁছল।—"সাহেব তিমি রামরু ছ"—এখনও যেন কানে বাজছে। কি সরল প্রাণে-ভরা। যাই বল কুমার, তোমার দেশের এই অশিক্ষিত পাহাড়ী মেয়েদের মধ্যে যে প্রাচুর্য, যে প্রাণ, যে ঐশ্বর্য আছে, তা তোমাদের সমতলের আধা শহরের আধা কৃত্রিম মেয়েদের কেতাদুরস্ত ভাবভঙ্গিতে নেই। আমার মনে হ'ত, আদিম ভারতবর্ষ তার আদিবাসীদের মধ্যে যেমন করে বেঁচে আছে, এমন আর কোথাও নয়—সাঁওতালদের দেখেও আমার একথাই মনে হয়েছে। সেই হিমালয়কন্যাদের দেহে এবং প্রাণে আদি অরণ্যের বন্য কামনা। ওরা স্বভাবের সহজ ছন্দে দোলে। ওরা পাপ করে বটে, কিন্তু পুণ্যও ওদের কাছে শুধু বাঁধানো কথার ধাঁধা নয়। তাকেও ওরা জীবনের সত্যেই চেনে, ওরা কথায় কথায় কুকরী ছোঁড়ে, এ ওর বউ নিয়ে পালায়, তবু ওদের মধ্যে দেখেছি জীবন্তরক্তের নৃত্য-দোলা। সেই দোলায় ওরা আমাদের ভোলায়, ওদের সঙ্গে কোথায় যেন আমাদের মিল আছে।"

কুমারের মনে হচ্ছিল—জুনি বার্কারের কাছে তার পূর্ব স্বামীর তরুণ বয়সের যে পরিচয় পেয়েছিল, স্বল্পভাষী ভাব-প্রবণ তরুণের পরিচয় কি আজও এর মধ্যে আছে?—আছে, ভাব আছে, স্পষ্ট দেখছে কুমার। কিন্তু এর কথার উৎস খুলে গেছে, এত অজস্র কথা স্রোতের মত বলে যাচ্ছে যে, কুমার আর একটা কথা বলারও সুযোগ পাচ্ছে না। অবশ্য ওর বলারও কিছু নেই, ও শুনতেই চায়। বিভিন্ন মানুষের কাছে কত বিচিত্র পরিচয়। আজ সকালে পীয়ার-

সনের বিন্দুমাত্র লেশা নেই। কথায় আছে চিন্তা ও যুক্তির অসংখ্য প্রমাণ।

পীয়ারসন বলছে,—"কিছু মনে করো না কুমার, আমি তোমাদের গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ধর্মভীরু মেয়েদের যে দেখি নি তা নয়, বরং বিশেষ করেই লক্ষ্য করে দেখেছি, দু'একজনের সঙ্গে হয় ত দু'একটা কথা বলারও সুযোগ হয়েছে। কিন্তু তাদের দেখে প্রাণে তেমন সাড়া জাগে নি। না, কেমন যেন নিস্তেজ। মনে হয়, ধর্ম ও সংস্কারের বোঝা বয়ে বয়ে তারা মনেপ্রাণে ক্লান্ত। সুখ তাদের কাছে পাপ, আর দুঃখ তাদের কাছে পুণ্যের সামিল। কেবল মনে হ'ত, কর্তব্য ও ধর্মের যন্ত্রপেষণে এদের নারীধর্ম শুকিয়ে এসেছে, রক্ত হয়েছে পানসে।—রাগ করলে নাকি? তুমি আবার দেশের নিন্দে শুনলে ক্ষেপে যাও। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন অনেককে জানি, যারা সত্যি কথা শুনলে রাগ ত করেই না, বরং নিজেরাই স্বচ্ছন্দে যোগ দেয়।

কুমার চুপ করে বসে শূন্য দেওয়ালের মাঝখানে টাঙানো ভ্যানগগের আঁকা 'সূর্যমুখী' ছবির দিকে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়েছিল একটু নড়ে-চড়ে চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে বললে—"তুমি কোন্ দলের হে? সত্যি কথা শুনতে যারা ভয় পায় তাদের দলে, না যারা পায় না, তাদের দলে অর্থাৎ, তোমার দেশের নিন্দেকরলে মনোভাবটা কি রকম দাঁড়ায়?"

—"করে দেখ?"

—"তবে শোন,—পাহাড়ী অথবা ভারতের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তোমাদের মত সভ্য ইংরেজের নাড়ীর যোগ আছে, এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না। ওদের মধ্যে বক্র সরলতা আছে মানলাম, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সরলতা নেই—আছে শুধু বক্রতা। এত নকল চুল, নকল দাঁত, নকল কথা, মিথ্যে হাসির সঙ্গে অরণ্যের সহজ সরলতার তুলনা কি করে সম্ভব। তা ছাড়া আমার মনে হয় প্রাণও তোমাদের তেমন উজ্জ্বল নয়। তা হলে এত মদ্যপানের দরকার হ'ত না। তুমি হয় ত দেখ নি, তুমি জান না, অজস্র দুঃখ-অভাবের মধ্যেও আজও আমরা তুচ্ছ কারণে বাড়ী ফাটিয়ে হো হো করে হাসি। আর তোমরা মদ না খেয়ে হাসতেই পার না, ভদ্রতার কম্বল চাপা দিয়ে মেপে মেপে হাস।

—"স্বীকার করছি।" পীয়ারসন হাসলে।

কুমার বললে—"তোমার দেরী করিয়ে দিলাম নাকি? আপিসের বেলা হয়ে গেল?"

পীয়ারসন বললে,—"না, আপিসের বেলা হলে ভদ্রতার দায় মোটেই মানতাম না, ইংরেজ যদি কোথাও কাজ পালায় ত সে ভারতবর্ষে। এদেশে ওসব চলবে না, মদই খাও আর যাই কর, কাজ ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই আমি নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।"

—"ছেড়ে দিয়েছ না ছুটি নিয়েছ?"

—"একেবারেই ছেড়েছি। আমি সারাদিন খেটে যা রোজগার করব তার অর্দ্ধেকেরও বেশী জুনিকে দিতে হবে—তার ছেলেমেয়েদের জন্তে। কি বিচার! এরই নাম ব্রিটিশ জাষ্টিস! তার চেয়ে আমি রোজগারই করব না। তা হলে ত আর ওকে দিতে হবে না। অবশ্য ও এখনও এ খবর জানে না. এমন তা হলে এসে হাঙ্গামা লাগাত। ও জানবার আগেই আমি এখান থেকে চম্পট দেব।"

—"চম্পট দেবে? বল কি, তা হলে তোমার সন্তানদের হবে কি?"

—"ওঃ, তাদের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। অনেক সোসাইটি ইত্যাদি আছে, আর কিছু না থাকে ত আছেন আমাদের সরকার বাহাদুর—না খেয়ে কাউকে মরতে হবে না এদেশে। ছেলেমেয়েদের একটা-না-একটা ব্যবস্থা হবেই।"

একটা ক্ষীণ তুলনা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কুমারের মনের মধ্যে কাঁটার মত ফোটে। এদেশে মানুষের ভার মানুষেরই হাতে। আর ভারতে মানুষের সব ভার এক ভগবানের হাতে। বেচারা ভগবান, একা হাতে কত 'যোগক্ষেমং'র বইবেন, তার উপরে আবার শাস্ত্র বলছেন, তাঁর হাতও নেই—অপানি- পাদ।

তা যাক, ক্ষীণ হাসির অর্ধস্ফুট রেখা ঠোঁটের কোণে স্তব্ধ করে কুমার বললে,—"আর জুনি? তার কি হবে?"

—"তার বিষয়ে আমার ভাববার কথা নয়।"

—"স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি তাকে আজও ভাল-বাস?"

—"ভুল দেখেছ, তার বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোমলতা আর আমার মনে অবশিষ্ট নেই। তাকে যে একদিন ভালবেসে-ছিলাম, এজন্তে রাগ হয় নিজের উপরে। ভেবে পাইনে কি করে দশ বছর তার সঙ্গ মুহূর্তের জন্ম ছাড়তে পারি নি। আজ তার অঙ্গস্পর্শ করতে আমার ঘৃণা হয়। এ কি ভাল-বাসা?"

জুনির জন্তে একটা সূক্ষ্ম বেদনাবোধ কুমারের মনকে

একটু কোমল করে আনল। বেচারা জুনি, ভালবাসার জন্যে চরিত্র খোয়াল। কিন্তু আজ কোথাও ওর জন্যে বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই। কালকে ডেভিডের কথাবার্ত্তায় কুমারের মনে হয়েছিল, এখনও হয় ত ওর নিহিত মনের গহনে জুনির প্রতি প্রেমের অবশেষ আছে। কিন্তু আজ সকালে সেকথা মিথ্যা মনে হচ্ছে। এই ঘৃণার তাপে সব প্রেম শুকিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু সত্যি কি তাই ? নাকি এই তীব্র বিদ্বেষ তীব্র আকর্ষণেরই রূপান্তর।

পীয়ারসন বললে,—এসব কথা থাক, এখন একটু রুটি মাখন খেয়ে পেট ভরিয়ে নাও।"

—"না থাক, তোমার কাছে অনেক নিতে হ'ল, আর বোঝা বাড়াব না।"

—"সে তুমি যা বোঝ।"

পীয়ারসন উঠে কাবার্ডের ভিতর থেকে রুটি-মাখন জ্যাম ইত্যাদি বার করল। একটা দুধের বোতলও বেরুল।

মুখ-হাত ধুয়ে পীয়ারসনের চিরুনী-ব্রাশে চুল আঁচড়ে কুমার যখন সামনে এসে দাঁড়াল, তখন পীয়ারসন কয়েক স্লাইস মোটা নরম রুটিতে পুরু করে মাখন আর মার্মলেড লাগিয়েছে। ওর পাশে রাখা সুগন্ধি কফির কাপের দিকে দৃষ্টিপাত করে কুমার বললে,—"আচ্ছা, আমাকেও বরং দু' স্লাইস রুটি দাও। তোমার কাছে এটুকু ধার আমাকে করতেই হবে। কারণ ডাক্তার আমাকে কিছুদিন নিয়মিত খেতে বলেছে।"

—"বেশ ত নাও না, তাই ত বলছি, এতে লজ্জার কি আছে ?"

রুটির প্লেটটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে মুচকি হাসল পীয়ারসন,—"আরে লজ্জা কি ? ইংরেজ তোমাদের অনেক খেয়েছে, আজ না হয় দু'টুকরো রুটি খেয়ে তার শোধ দিয়ে যাও।"

'চেলসী'র বাড়ীটা যেন স্বপ্ন। বড় রাস্তা পেরিয়ে বাঁ-হাতি গলি ছোট একটা চতুষ্কোণ ভূখণ্ডকে বেষ্টন করে গেছে। জোয়ারের মরাবান এখন বরফে পিছল।

সোনাঝুরি গাছগুলির শুকনো কালো ডালে সাদা বরফের তুলোর সাজ ছিঁড়ে-খুঁড়ে ঝুলে ঝুলে পড়েছে।

এ জায়গাটাকে অনায়াসে সহরতলী বলা চলে। এ পাড়ার সর্বাঙ্গ জুড়ে একটা কেমন যেন সহর-ছাড়া ভাব আছে। বাড়ীগুলি ছোটখাট নিচু নিচু, গাছের ছায়া ঢাকা ঢাকা, লতাকুঞ্জের ঘোমটা টানা টানা।

রমলা সেদিন বলছিল, এই সহরতলী দেখে ওর সেই সহরতলীর কথা মনে পড়ছে—সেই কলকাতার সহরতলী, সেই চারু এভিনিউ, সেই নাকতলা কলোনী। খোলা ড্রেনের পাশ দিয়ে জঞ্জালভরা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা, আর তার দু' ধারে বড় বড় তিন চার তলা বাড়ী। তাদের তলায় তলায় অসংখ্য ফ্ল্যাটে অজস্র বিভিন্ন পরিবার। তাদের ভিন্ন রুচির বিচিত্র শাড়ী ও ধুতি লম্বা লম্বা হয়ে বারান্দা দিয়ে ঝুলছে। খোলা ড্রেনের পচাগন্ধ মাঝে মাঝে বাতাস বেয়ে উঠে আসছে, এমনকি দোতলা তিন তলার উপরেও। আর সেই সরু রাস্তা কাঁপিয়ে, পথচারীদের নর্দমার মধ্যে ঠেলে দিয়ে গর্জন করে ছুটোছুটি করছে বাস, লরী আর মোটর। রমলা সেদিন অবাক হয়েছিল একথা ভেবে, যে, যেসব ইঞ্জিনীয়ররা পয়সা খরচ করে বিলেতে আসে ডিগ্রী নিতে, তারাই দেশে ফিরে অমন বিপরীত বিদ্যে দেখায় কেন ?

এখানে এই ছোট্ট নিচু বাড়ীটায় ওদের এতগুলি লোকের দিব্যি এঁটে গেছে। কুমারের ত এ বাড়ীটা দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে, ও ত এখান থেকে যেতে নারাজ। এদিকে শীগগিরই হয়ত অন্য কোন শহরে ওকে যেতে হবে। কিছুদিনের জন্যে একটা চাকরী নেবে ঠিক করেছে কুমার, ফিরতি প্যাসেজটা জমিয়ে নেবে। যদি না অবশ্য কেউ প্যাসেজশুদ্ধ চাকরী দেয় দেশে। বাবা লিখেছেন, চাকরীর জন্যে ভেব না, আর কিছু না হোক ইঞ্জিনীয়ারিং কোন কলেজের প্রফেসারী একটা বাঁধা তোমার। কিন্তু কুমার পড়াতে চায় না, ও কাজ চায়, কোন গড়ার কাজ। শুধু বস্তুগড়া নয়, সেই সঙ্গে নিজেও প্রতিদিন নতুন ভাবে গঠিত হয়ে উঠতে চায়। অন্ততঃ একটা কোন কাজ হাতে না করে দেশে ফিরে যেতে নারাজ কুমার। এত খরচ করে পাশটাশ করে শেষে বেকার হয়ে দেশে ফিরবে না কি ? এখন একটা মনোমত কাজের কথাই কুমারের মাথায় বেশী ঘোরে, মেরীর কথাও যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে।

দেশের কথা মনে হলেই কুমারের মনটা পালাই পালাই করে। দেশ নয়, তবু যেন এখানে দেশের গন্ধ আছে। রমলা আর তার সব দলবল নিয়ে এই চেলসীতে ওরা যেন ছোট্ট এক টুকরো দেশ বানিয়ে তুলেছে। তার উপরে যখন-তখন মামাবাবুর গল্প আগুনজ্বালা শীতের সন্ধ্যাকে বড় বেশী আপনার করে তোলে।

প্রৌঢ়া বাড়ীওয়ালী গেটের পাশ থেকে বরফ ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে রাস্তার এক পাশে ঠেলে রেখে দেয়। তাই দেখে অবাক হয়ে পার্থ বলে, কি সুন্দর !

বাড়ীটাতে ঢুকেই ছোট হলটার বাঁদিকে বসার ঘর আর তার পাশে উঠানের দিকে বেঁকে এগিয়ে যাওয়া ছোট ঘরটার

কুমার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আর ডান দিকের ছোট ঘরটা বাড়ীওয়ালীর স্বামীর বসার ঘর। এই ঘরটুকু আর উঠোন ছাড়া তাকে দেখা যায় না।

উঠোনের প্রায় কাঠাদশেক জমিতে চমৎকার বাগান ফলিয়েছে বুড়ো। টম্যাটো আর গাজর প্রায় কিনতেই হয় না। ঘরে বসে সারাক্ষণ টাইপ করে বুড়ো, খট্ খট্ খট্ খট্, আর তার পায়ের কাছে নরম কার্পেটে গরম আর গোল হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয় রোমশ কুকুর মাম্বো। আর পাশের ছোট্ট করিডোরটায় দাঁড়ে বসে দুলে দুলে ভুট্টা আর টম্যাটো খায় বুড়ী টিয়া পলি, আর চেঁচায়,—"ডারলিং ইওর কফি", কিম্বা গানের একটা লাইন—"লাভ ইউ আর লাভলি।"

বুড়ো কিন্তু এই বয়সেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে রসের গান গুনগুন্ করে।

দোতলার একটা ঘরে থাকে একটি স্প্যানিশ ছেলে—নাম পিয়েত্রো। পাশের বড় ঘরে রমলা থাকে তার ছেলেকে নিয়ে। ওপাশের কোণের ছোট ঘরটায় রমলার ভাগনী কৃষ্ণা তার বাক্স ইত্যাদি রেখে পড়ার টেবিলে বই গুছিয়ে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। ওর কেমব্রিজের টার্ম সুরু হতে এপ্রিলে সুরু হবে,তাই এ তিন মাস একটা প্রাইভেট কোচিং নিচ্ছে কেমব্রিজে প্রবেশের। আর দেড় তলার একটু বের করা লম্বাটে ঘরটায় মামাবাবুর অধিষ্ঠান হয়েছে। এতগুলি লোক কিন্তু স্নানের ঘর একটি। ভারতে ইংরেজদের যেমন ঘরে ঘরে বাথরুম থাকে, এদেশে তার উলটো—একটি বাথরুম যথেষ্ট। আগে নাকি তাও থাকত না, বেশীর ভাগ বাড়ীতেই স্নানের ব্যবস্থা ছিল না। পিয়েত্রো বলে—ইংরেজরা ভারতের সংস্পর্শে এসে সভ্য হয়েছে, স্নান করতে শিখেছে। আমাদের দেশে এত স্নানের ঘরের বালাই নেই কিন্তু।

এই পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ঘরগুলির মধ্যে পার্থ তার সমস্ত চঞ্চলতা বাক্সে পুরে মনের মধ্যে তালাচাবি আঁটবার ইচ্ছায় ছিল। বুড়ী বাড়িওয়ালী সে তালাচাবি ভেঙে দিল। সমস্তক্ষণ সব কাজে ওকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিত। বাকি সময়টা কাটত মাম্বোর সঙ্গে ভাব করতে। পলির সঙ্গে কিন্তু বেশী জমত না পার্থের, কৃষ্ণাকেই পলি তবু একটু পছন্দ করত বোধ হয়। বুড়ো টমাস ফিন বলত—পলি একটা দারুণ ফেমিনিষ্ট তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পছন্দকরে বেশী, আর সেকেলে সাফ্রেজিস্টদের মত কি দারুণ চেঁচায়।

বুড়ো জীবনে অনেক দুঃখ সয়েছে, অনেক সুখ বয়েছে। কাজ-অকাজ করেছে অনেক, এখন পেনসন নিচ্ছে আর বসে বসে নিজের জীবনী টাইপ করছে। সারাদিন খেটে যা লিখল, পরদিন হয় ত তা আর ভাল লাগল না। বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ বকে, ফের নতুন করে টাইপ করতে সুরু করল।

পার্থ বলে,—"কি তুমি লেখ আঙ্কল ?"

—"গল্প।"

—"কিসের গল্প ?"

বুড়ো হেসে বলে,—"জীবনের।"

মার্কাস বলে ভাগ্যে তোমরা এ বাড়ীটা পেয়েছ। এত মিশুকে ভদ্রতা বেশী দেখা যায় না, বিশেষতঃ এদের শিশু-প্রীতি। সাধারণতঃ ইংরেজরা বাচ্ছাকাচ্চার ঝক্কি সামলান বিশেষ পছন্দ করে না। তোমাদের জন্তে বাড়ী খুঁজতে কম জায়গায় ঘুরতে হয় নি কিন্তু। প্রথম আপত্তি—"

—"ভারতীয়।" পাদপূরণ করে কুমার।

—"ইউ আর রাইট, ধরেছ ঠিক।"

কুমারের সহাস দৃষ্টির ফাঁদ এড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে মার্কাস বলে,—"সবাইকে বোঝাতে বোঝাতে হয়রান হয়ে গেছি। এ এক আচ্ছা কুসংস্কার, কেন বল ত ?"

—"এ যে দেখছি জাতবিচারেরই সামিল, প্রায় ছুঁৎমার্গ আর কি ?"

রমলার গলায় বিস্ময়,—"ভারতের ছোঁয়াচ নাকি ?"

—"দূর দূর, ছোঁয়াচে কিছু হয় না, ভিতরে যদি বিষ না থাকে। অন্ততঃ আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ত এই বলে।"

মামাবাবুর প্রবল হাসি এই সব আলোচনার অন্তর্নিহিত খোঁচাগুলি যেন বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল,—"তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রেও তাই বলেছে, দেহের অবস্থা যদি অনুকূল হয় তবেই বাইরের ছোঁয়াচ চেপে ধরে। মানুষের রক্তে রয়েছে এই বিষ। এক এক দেশে, এক এক জাতে তার এক এক রকম প্রকাশ।"

কুমার বলে,—"কিসের বিষ মামা ? মানুষকে অপমান করা, তাকে হীন প্রতিপন্ন করার দুরারোগ্য ব্যাধির ?"

—"ব্যাধি ? তাই কি ?" ভাবতে চেষ্টা করে মার্কাস,—"আমার ত মনে হয় এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ, স্বাস্থ্যের স্বভাবই হচ্ছে এই যে, সে নিজেকে বাঁচাতে চায়। দেশের সব সমাজব্যবস্থার মূলেই রয়েছে এই বাসনা। এর মধ্যে অপরকে আঘাত করার ইচ্ছের চেয়ে নিজেকে রক্ষা করার বাসনাই প্রবল।"

—"ধর—।" টেবিলের উপরে মুঠো করে ধরে রাখা দু'হাত রেখে একটু ঝুঁকে, মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে,—"ধর, আমি যদি আজ গিয়ে তোমার দেশের কোন সাধারণ গৃহস্থ ঘরে অতিথি হতে চাই, তারা রাজী হবে কি ?"

—"না হবে না।" মামাবাবু ঘাড় নাড়লেন।

—"তারা ভয় পাবে।" মার্কাস বললে,—"কেমন ত? ভাববে, আমি তাদের সমস্ত থেকে মূর্তিমান বিপরীত, ভাববে, তাদের সমাজব্যবস্থায় এ আমার অনধিকার প্রবেশ।"

—"এরাও ঠিক তাই ভাবছে ত? তা হলে তোমরা আমাদের চেয়ে উন্নত কিসে?" তীক্ষকণ্ঠে উঠে দাঁড়ায় রমলা।

—"হেভেন্‌স! নো!" মার্কাস বলে,—"আই নেভার থিঙ্ক উই আর ইন এনি ওয়ে। সত্যিই আমি তা কখনও মনে করি না। উন্নত আবার কিসে?"

—"অন্ততঃ চেহারায়।" মামাবাবু হাসলেন।

—"মামাবাবু, তোমার কাছে একথা আশা করি নি। তুমি নিজেই ত অধিকাংশ ইংরেজের ঈর্ষার পাত্র। তোমার ত তবু বাদামী রং কিন্তু তোমাদের গাঢ় রংই আমাদের পছন্দ বেশী।"

—"শ্রীমতী চ্যাটার্জি!" মার্কাস রমলার দিকে ফিরল, —"জেনে রেখ, তোমার পার্থ যেমন করে মিসেস গ্রেগারের হৃদয় দখল করেছে সাধারণ ইংরেজের ছেলে তা পারত না। ওর বিদেশী টানের মিঠে গিঠে বুলি, আর ঐ মেটে মেটে রং এই দুইয়ে মিলিয়েই ও বুড়ীর মন ভুলিয়েছে সন্দেহ নেই।"

ছেলের প্রসঙ্গে রমলার শুকনো ঠোঁটে হাসি ফুটল। বললে,—"কিন্তু তুমি ত বলছিলে এ দেশে শিশুপ্রীতি কম।"

—"হাঁ সে ত বটেই।" মার্কাস বললে—"অধিকাংশ হোটেলেই ওদের রাখার নিয়ম নেই।"

কুমার বললে,—"শুধু হোটেলে কেন প্রাইভেট বাড়ীতেও প্রায় তাই—ফিডিং বটলের স্টেজ পেরোলেই ত বোর্ডিঙে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

মার্কাস বললে,—"তোমার কি মনে হয় না যে বোর্ডিঙের শিক্ষাই শিশু অথবা কিশোরদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। মা-বাবার আওতা থেকে সরে যাওয়াই ওদের মঙ্গল। ওরা বুঝতে শেখে যে ওরা শুধু মা-বাপের আদরের পুতুল নয়, ওরাও আর পাঁচজনের মত।"

—"ঠিক।" মামাবাবু বললেন,—"খুব ঠিক, বাড়ীতে ওরই জন্যে সব, আর বোর্ডিঙে ওকেও অন্যের জন্যে সমানে করতে হয়। তা ছাড়া নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি অনুরাগ এবং সংযত ব্যবহার বোর্ডিঙেই মানুষ শেখে।"

মামাবাবুর মত মার্কাসের মতের সঙ্গে মিলে গেল, মামাবাবু হেসে বললেন,—"সেই জন্যেই ত পার্থকে এখানে আনলাম। ওখানে থাকলে ও মায়ের কোল ছাড়তে পারত না। যতই বড় হোক সে ওর পিছন পিছন ছুটত। আমাদের দেশে আজকাল ছেলেমেয়েদের বোর্ডিঙে দেওয়ার তেমন রেওয়াজ নেই। অথচ আগেকার দিনে অধিকাংশ ছেলেকেই গুরুগৃহে যেতে হ'ত।"

—"ঠিক ঠিক।" মার্কাস হেসে উঠল—"তোমাদের সেই গুরুগৃহ আর আমাদের এই বোর্ডিং আদর্শের দিক দিয়ে অনেকটা এক।"

—"কি আশ্চর্য!" এতক্ষণে রমলা কথা কইলে। রমলার গলার স্বরে কি একটা আছে যা মানুষকে একসঙ্গে দূরে ঠেলে এবং কাছে টেনে আনে। রমলা বললে—"সেকালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে আধুনিক বোর্ডিং স্কুলের তুলনা কি করে সম্ভব আমি ভেবে পাই না। দুটোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে।"

রমলার দুই কাজলকালো চোখের ভরা দৃষ্টির উপরে নিজের সোনালী পক্ষ্মঘেরা ছোট ছোট নীল চোখের গভীর দৃষ্টি মেলে মার্কাস বললে,—"কি রকম?"

—"কি রকম তা অবশ্য এক কথায় বলা যায় না, তবু বলি—"

রমলার কথা শেষ হতে চায় না, পুরুষের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির সামনে ওর চকিত দৃষ্টি অস্বস্তিতে মুষড়ে পড়ে, সঙ্কোচে নেমে যেতে চায়। মার্কাসের দৃষ্টি নড়তে চায় না, থামতে জানে না, একটা নিশ্চল জিজ্ঞাসার জিদ্ চোখের সামনে মেলে ধরে নিঃশব্দে পড়ে থাকে।

কুমারের চোখের কোণে ছলকে ওঠে হাসি। বলে,—"ঘাবড়াস নে বন্ধু, এদের রকমই ওই। চোখে চোখ রেখে কথা বলা এদের স্বভাব। ওদের কাছে এইটেই সভ্যতা, আমাদের কাছে যা ঘোরতর অসভ্যতা।"

চোখের হাসি চোখে রেখে গম্ভীর ভাবে কুমার কথাগুলি বললে, তেমনি সুরেই জবাব দিতে চাইল রমলা,—"কি করে জানলে যে আমি ঘাবড়ে গেছি," কিন্তু পারল না। কথা শেষ করার আগেই হেসে ফেলল হঠাৎ। যেমন-তেমন হাসি নয়, একেবারে যে পাগলাঝোরার হাসি। দেখে মনে হ'ল হঠাৎ যেন মুহূর্তে ওর বয়স কমে গেছে, নেমে গেছে সংসারের ভার দেহ থেকে, মন থেকে খসে গেছে জীর্ণতা, যেন কোন কষ্ট ওর নেই কোনকালে, ও যেন বিরহিনী নয়, দুঃখিনী নয়, বিধবা নয়। ও যেন বসন্তের একটি আনন্দলতিকা। সেদিকে তাকিয়ে উজ্জল হয়ে উঠল কুমারের মুখ আর মামাবাবুর কপালে নামল স্নেহের ছায়া। দুজনের উৎসুক দৃষ্টি তাকিয়ে

রইল ওর দিকে। ওদের দুজনের স্নেহ-করুণ ভালবাসা যেন হাতে হাতে ধরে ওকে আগলে ঘিরে রইল। সেখানে মার্কাসের প্রবেশের পথ রইল না।

অপ্রস্তুত চোখ তুলে দ্বিধামিশ্রিত ছোট্ট একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে সে বললে,—"এ অন্যায়, রীতিমত অন্যায়। এত হাসির কি থাকতে পারে? আমার গুরুগম্ভীর আলোচনার উত্তরে, এই অকারণ হাসি রীতিমত অপমান।"

শুনে রমলা হাসি থামিয়ে বলেছিল,—"পার্ডন, তোমার কথায় হাসি নি, হেসেছি কুমারের কথায়।"

—"ওঃ, কেন?"

রমলার মুখের চাপা হাসি লাল হয়ে কুমারের চোখে চোখে নিষেধের ইশারা করল।

মামাবাবু বললেন,—"এরই নাম আনফেয়ার এ্যাডভ্যানটেজ নেওয়া। মার্কাস তোমার অভিযোগে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে।"

—"কিছু ভাবনা নেই।" মার্কাস বললে,—"আমিও বাংলা শিখছি। তখন আর আমাকে এমন অপদস্থ করতে পারবে না।"

—"ব্রাভো! সত্যি শিখছ?"

—"নিশ্চয়, দুটো সেনটেন্স পুরো জানি।"

—"টুমার নাম কি? আমার নাম পার্ট।" বলতে বলতে সত্যি এল পার্থ। ওদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেল ড্রইং-রুমে।

সেখানে অনেকে অপেক্ষা করছে। ওদিকে থেকে এসেছে অমিতাভ আর সিরাজ আলি—ওরা দুজনেই ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করে। সিরাজের সঙ্গে কুমারের অনেক দিনের বন্ধুত্ব। ওদের একসঙ্গে দেখলেই মার্কাস বলত—কই তোমরা লড়াই করছ না ত—হিন্দুস্থান পাকিস্থান। আজকাল আর মার্কাস এ ধরনের ঠাট্টা করে না, একটু যেন বেশী চুপচাপ হয়ে গেছে। কুমার মনে মনে হেসে ভাবে—সেটা বোধহয় ভয়ে, ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে ঠিক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে না বলেই বেশীর ভাগ চুপ করে থাকে। অথচ ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছে খুব বেশী বলে, না এসেও পারে না। রোজ সন্ধ্যেবেলা সাউথ কেন্‌স থেকে চেলসীতে এসে গল্পগুজব করে যাওয়া ওর রুটিনে দাঁড়িয়েছে প্রায়।

অমিতাভ আর সিরাজ দুজনেই সভাসমিতি করতে খুব ভালবাসে। এদের চেষ্টায় থেকে থেকেই লণ্ডন শহরের নানা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ক্লাব বা সংঘ গজিয়ে ওঠে, আবার কিছুদিন পরেই মিলিয়ে যায় ফেনার বুদ্বুদের মত। ওরা ঘোরতর দার্শনিক, তাই জানে যে, জীবনটার মতই সভা-সমিতিগুলিও ভবের পদ্মপাত্রে জল—সদাই করিতেছে টলমল—একটুখানি মতান্তরেই অমনি রসাতল। একথা জানে বলেই সভামৃত্যুতে ওরা আর শোকাতুর হয় না—এমনকি সভা বা সংঘ ইত্যাদির জন্মদিনেই তারা তার মৃত্যুর তারিখটা পর্যন্ত অনুমান করতে পারে। তবু ওদের অফুরন্ত উৎসাহ। একটা সংঘ শেষ হতে না হতেই নতুন সংঘসৃষ্টির কথা ভাবে। এমনই একটা নতুন সংঘের উদ্বোধনে ওরা নিমন্ত্রণ করতে এসেছে মামাবাবু ও তাঁর পার্টিকে।

হঠাৎ ঈভ এসে পড়ল। ঈভ আজকাল প্রায়ই আসে, অনেক গল্প করে, অনেক কথা বলে, কিন্তু শুধু সেই কথাটি আজও বলে নি। সেই যে কথাটা একদিন বলবে বলে কুমারের ঠিকানা নিয়েছিল, সেই প্রচণ্ড দুঃখ-ঝড়ের কথা, যে ঝড়ে ওর মাবাপের সংসার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর যে ঝড়ের মুখে ওর মা তৃণের মত কোথায় উড়ে গিয়েছিল। সেই ঝড়ের খবর আর ওর মায়ের খবর আভাসে জানতে পেরেছিল কুমার, আর এও জেনেছিল যে, সেই মায়ের খোঁজ করতে ঈভ একদিন পৃথিবী পরিক্রমা করবে। কিন্তু কিছুদিন হ'ল কুমারের মনে হয় সে সঙ্কল্প শিথিল হয়ে এসেছে ঈভের মনে। এমনকি স্পষ্ট করে সব কথা এখনও কুমারকে বলারই সময় পায় নি। কুমারের মনে হয় সেকথা এই ক'মাসেই তার তীব্রতা হারিয়েছে ওর মনে। কোন একটা হঠাৎ-পাওয়া নতুন সুখ ওকে পুরণো দুঃখের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। সেই সুখের খুসী মেখে ঈভ এসে উপস্থিত হ'ল। মুখে চোখে উৎসাহের বাতি জ্বেলে বললে,—"চললাম,—অনেক সাগর পেরিয়ে।"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ জাহাজে চাকরী নিয়েছে ঈভ, চাকরীটা জুটিয়ে দিয়েছে ওকে ওর নতুন পাওয়া তরুণ ভক্ত।"

—"সে নিজেও বুঝি জাহাজে কিছু—"

—"ঠিক ধরেছ কুমারদা, (এই ডাকটা কুমারের কাছেই শেখা) ও নিজেই একজন নাবিক, তবে নেহাৎ ছেলেমানুষ, সবে সেকেণ্ড মেট পাস করেছে। আমাদের চেয়ে বেশী বড় নয়। ওর কাছে ভ্রমণের গল্প শুনতে আমার যেন নেশা লাগে।"

ঈভ বললে,—"জান কুমারদা ভ্রমণের সঙ্কল্প যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তখন হঠাৎ অচেনা পৃথিবী আমায় ডাক পাঠাল। কখনও ভাবি নি এত বড় সুযোগ আমি পাব।"

ঈভের কলকণ্ঠে নবযৌবনের উচ্ছ্বাস বক বক করতে লাগল।

কুমার কিন্তু ঈভের সৌভাগ্যকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। হঠাৎ মনে হ'ল ওর মায়ের ভাগ্য যেন ওর

পিছন পিছন ছায়ার মত ঘুরছে। ওর মা নিজেকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু নিজের ভাগ্যকে ফেলে রেখে গেছে মেয়ের কাছে। কুমারের কেমন যেন মনে হ'ল ঈভের সঙ্গে শুধু যে আর দেখা হবে না তাই নয়, হয় ত ওর খবরও আর কোনদিন পাবে না। হঠাৎ একদিন হাসপাতালের গেটের সামনে যে বোনকে খুঁজে পেয়েছিল তাকে যে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে এত শীঘ্র তা ভাবে নি কুমার। নিস্পৃহ গলায় কুমার বললে,—"তোমার টমিট আবার কোন দেশের লোক? ইংরেজ নাকি?"

—"কি জানি।" হেসে উঠল ঈভ,—"কোন্ দেশের তা কে জানে, তবে তার বাপ থাকে কানাডায়—আর সে ত থাকে জলে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধর, সে এখনই আসবে।"

—"সে কি শুধুই তোমার বন্ধু?" জিগ্যেস করলে রমলা।

—"নিশ্চয়ই।" ঈভ হাসল,—"কিন্তু কুমার, আমার সেই বন্ধুটি মোজা চেয়েছে, আজ প্রায় দিনদশেক হতে চলল তুমি ওর ধার শোধ করলে না।"

—"আমি কিনে রেখেছি।" কুমার অল্প একটু অপ্রতিভ হাসল,—"তুমি নিয়ে যেও আজ।"

—"বাঃ, আমি কেন পরের বোঝা বইতে যাব। ও নিজেই আসবে—এখুনি এল বলে টমের সঙ্গে।—ওরা কাজিন কিনা।—টম এসে ওদের বাড়ীতেই উঠেছে।

ক্রমশঃ

উপনিষদ মালা

শ্রীপুষ্প দেবী
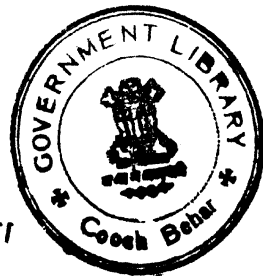
এই ধরণীতে কখনো দিবস কখন বা আসে রাতি
আলো ও আঁধার এই দুই জন তাহার যে চির সাথী
বিশ্বের সব সীমানার পার
যেখানে আলোক চিরদিনকার
নাহি দিবা সেথা নাহিক রাত্রি চির উজ্জ্বল ভাতি
সকল নিয়ম সেখানেতে শেষ নাহি দিবা নাহি রাতি।

তেমনি আমার অহঙ্কারের জড়ত্বে অবগাহি
ঢেকেছে যাঁহার জ্ঞান জ্যোতিকার ক্ষণেক প্রবেশ নাহি
স্বার্থ আড়াল করিয়া দাঁড়ায়
ভুল বুঝি মন নিজ সুখ চায়
সকলেরে ভাল না বেসে কেবল আপনার সুখ চাহি
মোহের আঁধার শুধু চারিধার জ্ঞানের প্রবেশ নাহি।

কবে বলো মোর অহঙ্কারের কিছু আর রহিবে না
তোমার পরশে যত কিছু কালো হইবে নিমেষে সোনা
সকলের হিত করিব কামনা
শুধু নিজ সুখ বারেক চাব না
তখনি পাইব তব দরশন জড়ত্ব যাবে কাটি
বিশ্ব-প্রেমের উজল আলোকে সমতল হবে মাটি।

সেইদিন হতে অন্তরতম যাব আমি তব পানে
যত কিছু বাধা কিছু না মানিয়া শুধু তব সন্ধানে
সত্য ও শিব সকলি হইবে
কল্যাণধারা শুধু বরষিবে
রহিবে না ক্ষয় হব নির্ভয় নাহি হব পথহারা
চলিব ছুটিয়া সকলি প্লাবিয়া ভাঙ্গি অস্মিত্ব-কারা।

যত ক্ষীণধারা যেমন চলেছে মহা জলধির পানে
না থাক শকতি তবু ছুটে চলে অন্তর তার টানে
যা কিছু আমার সঁপিতে সঁপিতে
শুধু তব নাম জপিতে জপিতে
বিশ্বের হিত-ব্রত সম্বল নিঃস্ব হইয়া যাব
জানি সেইদিন দুর্লভ ধন তব দরশন পাব।

বিশ্বের সবে ভালবাসি যদি আপনার জন মানি
তুমি যা দিয়েছ তাহাতেই খুশী আপন প্রাপ্য জানি
মানুষের সব দুর্বলতারে
পারি যদি প্রভু ক্ষমা করিবারে
উদার বক্ষে হেরিব চক্ষে তব মুখ চাঁদখানি
প্রসন্ন মুখে রাখিবে মাথায় তব দক্ষিণ পাণি।

শঙ্কর-দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

১

পূর্ব কয়েকটি সংখ্যায় শঙ্কর-দর্শনে মোক্ষ এবং শঙ্কর-মতানুযায়ী জীবন্মুক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। যে মোক্ষতত্ত্ব শঙ্কর-দর্শনের মূলতত্ত্ব, সেই বিষয়ে আরও কিছু প্রপঞ্চনা করা হচ্ছে।

শঙ্করের মতে, মোক্ষ জীবের জীবত্ব বা 'আমিত্বে'র সম্পূর্ণ বিনাশ। উপাধিরূপ ঘটটি চূর্ণ করে দিলে যেরূপ ঘটের অন্তর্গত আকাশ বাহিরের সর্বব্যাপী ঘটাকাশ বা মহাকাশে নিঃশেষে বিলীন হয়ে একীভূত হয়ে যায়, সেরূপ দেহমন-প্রমুখ উপাধিবিমুক্ত মুক্তজীব, জীবিতাবস্থাতেই হোক বা মৃত্যুর পরেই হোক, পরব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এক ও অভিন্ন হয়ে যান। সেজন্যই শ্রুতি সগৌরবে বলছেন :

"তত্ত্বমসি"। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬-৮) "তৎ" (ব্রহ্ম) "ত্বম্" (জীব) "অসি"—"ব্রহ্মই তুমি, ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩-১৪-১)। সর্ব বস্তুই ব্রহ্ম।

"ইদং ব্রহ্ম...ইদং সর্বং যদয়মাত্মা।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২-৪-৫ ; ৪-৫-৭)

"ইদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২-৫-১)

ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সর্ব বস্তু।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ।"

(বৃহদা, ২-৫-১৯)

এই আত্মাই সর্বানুভবকারী ব্রহ্ম।

"অহং ব্রহ্মাস্মি।"

(বৃহদা, ১-৪-১০)

আমিই ব্রহ্ম।

"ব্রহ্ম খল্বিদং বাক সর্বম।"

(মৈত্রী উপনিষদ্, ৪-৬)

ব্রহ্মই সর্ব বস্তু।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

(মৈত্রী উপনিষদ, ৩-২-৯)

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন।

"ব্রহ্মাহমস্মি।"

(মৈত্রী উপনিষদ, ৫-১০)

আমিই ব্রহ্ম।

"জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ।"

(স্কন্দ উপনিষদ্, ৬)

"স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।"

(স্কন্দ, ৬, ১০)

জীবই শিব, শিবই জীব।
জীব কেবলই শিব।

শঙ্করও বলছেন :

"ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

ব্রহ্মভাব বা ব্রহ্মত্বই হ'ল মোক্ষ।

"মুক্ত্যবস্থা হি সর্ববেদান্তেষেকরূপৈবাবধার্যতে। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা। ন চ ব্রহ্মণোঽনেকাকার-যোগোঽস্তি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৩-৪-৫২)

মুক্তি সর্ববেদান্তেই একরূপেই নির্দিষ্ট হয়েছে—সেটি হ'ল এই যে, ব্রহ্মই মোক্ষাবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার হতে পারেন না—তাঁর স্বরূপ একই। সেজন্য মুক্তিও নানাবিধ নয়, একই প্রকারের।

বদ্ধাবস্থা ও মোক্ষাবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করে শঙ্কর বলছেন :

"যাবদেব...কূটস্থ-নিত্য-দৃক্-স্বরূপমাত্মানমহং ব্রহ্মাস্মীতি ন প্রতিপদ্যতে, তাবজ্জীবস্য জীবত্বম্। যদা তু দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি-সঙ্ঘাতাদ্‌ব্যুত্থাপ্য শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে...তদা কূটস্থ-নিত্য-দৃক্‌স্বরূপাত্মানং প্রতিবুধ্য...স এব কূটস্থ নিত্য-দৃক্‌স্বরূপ আত্মা ভবতি। তদেব চাস্য পারমার্থিকং স্বরূপম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-৩-১৯)

এস্থলে, শঙ্কর তাঁর মূলগত মতবাদ অদ্বৈততত্ত্বের প্রপঞ্চনা করেছেন অতি সুন্দর ভাবে। প্রথমতঃ, প্রশ্ন হ'ল, এই যে, পরিদৃশ্যমান চৈত্র-মৈত্রাদি জীব, তাঁদের জীবত্বই বা কি এবং সেই জীবত্বের কারণ বা কি? জীবের জীবত্ব হ'ল কূটস্থ বা নির্বিকার, নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে না জানা ; অথবা, 'আমিই ব্রহ্ম' এই পরমতত্ত্ব না জানা। কিন্তু যখন অজ্ঞ জীব শাস্ত্রাদি থেকে জানতে পারেন যে, তিনি দেহেন্দ্রিয়-মনের সমষ্টিমাত্র নন, সংসারী নন, চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই মাত্র ; তখন তিনি শরীরাভিমান বিসর্জন করে;

সেই কূটস্থ-নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ হয়ে যান। এরূপ ব্রহ্মত্বই হ'ল তাঁর পারমার্থিক স্বরূপ।

সেজন্য পূর্বেই যা বহুবার বলা হয়েছে, জীবের জীবত্ব মিথ্যা, ব্রহ্মত্বই সত্য।

"মিথ্যা-জ্ঞান-কৃতো এব জীব-পরমেশ্বরয়োর্ভেদো, ন বস্তু-কৃতঃ, ব্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-৩-১৯)

এরূপে, শঙ্করের মতে, এক ঘটের অন্তর্গত আকাশ, অপর ঘটের অন্তর্গত আকাশ ও মঠাকাশ বা মহাকাশ যেরূপ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-ভিন্ন হলেও, প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অভিন্ন, সেরূপ এক জীব চৈত্র, অপর জীব মৈত্র ও পরব্রহ্ম আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অভিন্ন (পৃঃ ১৮১)। এরূপ অভিন্নত্ব উপলব্ধিই হ'ল মুক্তি।

স্বভাব-সিদ্ধ সরল উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করে শঙ্কর বলছেন:

"অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে।...মুক্ত-স্বরূপ-নিরূপণ-পরাণি বাক্যান্যবিভাগমেব দর্শয়ন্তি, নদী-সমুদ্রাদি-নিদর্শনানি চ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৪-৪)।

মুক্ত পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। মুক্তবিষয়ক শাস্ত্র-বাক্যসমূহ এরূপ অভিন্নত্বই প্রমাণ করে। যেরূপ, নদী সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্রেই অভিন্নভাবে বিলীন হয়ে যায়, সেরূপ মুক্ত জীব এ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে বিলীন হয়ে যান।

এরূপ অভিন্নত্বোপলব্ধির একটি সুন্দর উদাহরণও শঙ্কর তাঁর ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যে দিয়েছেন:

"অনন্তরঞ্চ একস্মিন্ ভুক্তে বিদুষি সর্বং জগৎ তৃপ্তং ভবতীত্যুক্তম্; তৎ একত্বে সত্যাত্মনঃ সর্বভূতস্থোপপদ্যতে, ন আত্মভেদে।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্য, ৬-১-১)

অর্থাৎ, একজন মাত্র বিদ্বান্ ভোজন করলেই সর্বজগৎ তৃপ্ত হয়। অবশ্য, সর্বভূতস্থ আত্মার একত্ব উপলব্ধি হলেই কেবল এরূপ সর্বাত্মভাব উপপন্ন হতে পারে, ভেদজ্ঞান নয়।

শঙ্করের মতে, মোক্ষ শাশ্বত দুঃখাভাবই মাত্র নয়, পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। সাংখ্যমতে, দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই হ'ল মোক্ষ, অর্থাৎ, মোক্ষ একটি নঞর্থমূলক, অভাব-রূপী অবস্থাই মাত্র। অবশ্য, এই অভাব পরিপূর্ণ অভাব নয়, আংশিক অভাব; অর্থাৎ, সাংখ্যমতে, মোক্ষকালে জ্ঞানাভাব নেই, যেহেতু মুক্তপুরুষ জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু আনন্দাভাব আছে। কিন্তু বেদান্তমতে, মোক্ষ কেবল জ্ঞানেরই চরমোৎকর্ষ নয়; সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও চরমোৎকর্ষ। তার কারণ হ'ল এই যে, মোক্ষই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানস্বরূপ নন, আনন্দস্বরূপও সমভাবে। এরূপে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই মোক্ষ বলে মোক্ষ পরিপূর্ণ সদর্থক অবস্থা, নঞর্থক একেবারেই নয়।

সেজন্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন:

"ন চ নিগড়-ভঙ্গ ইব অভাবভূতো মোক্ষঃ, বন্ধন-নিবৃত্তি-রূপপদ্যতে, পরমাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাৎ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ-ভাষ্য, ৪-৪-৬)

অর্থাৎ, মোক্ষ শৃঙ্খলভঙ্গের ন্যায় অভাবস্বরূপ হতে পারে না। মোক্ষ যদিও বন্ধাভাব বা বন্ধন-নিবৃত্তি, তথাপি মোক্ষ কেবলমাত্র বন্ধনের অভাবই নয়, স্বরূপের ভাবও সেই সঙ্গে, যেহেতু পরমাত্মার সঙ্গে একীভাবই মোক্ষ। সেজন্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ।

মোক্ষকালীন এই আনন্দের অবশ্যম্ভাবিতা নির্দেশ করে শঙ্কর তাঁর তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ভাষ্যে বলছেন যে, এস্থলেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

"বাহ্যানন্দ-সাধন-রহিতা অপি অনীহা নিরেষণা ব্রাহ্মণা বাহ্যরস-লাভাদিব সানন্দা দৃশ্যন্তে বিদ্বাংসঃ। নূনং ব্রহ্মৈব রসস্তেষাং। তস্মাদস্তি তৎ তেষামানন্দ-কারণং রসবৎ ব্রহ্ম।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ভাষ্য, ২-৭)

অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানিগণ নিশ্চেষ্ট, নিষ্কাম ও বাহ্যিক আনন্দ-সাধনের প্রতি সর্বদা উদাসীন। তা সত্ত্বেও লৌকিক সুখে তৃপ্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁদেরও সদাসর্বদা আনন্দিত দেখা যায়। সেজন্য স্বীকার করতে হয় যে, ব্রহ্মই তাঁদের রস বা আনন্দ। সেজন্য, তাঁদের আনন্দকারণ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আছেন।

এস্থলে অবশ্য বোধসৌকর্যার্থ, ব্রহ্মজ্ঞের আনন্দকে সাধারণ জনের আনন্দের সমতুল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত-কল্পে, ব্রহ্মানন্দ বিষয়সুখাপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক—উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত ও পরিমাণগত প্রভেদ অসীম (পৃঃ ২৭)। ব্রহ্মানন্দ রসপানে ধন্য জীবন্মুক্তের প্রতি শান্ত, সমাহিত আচার ব্যবহারে মূর্ত হয়ে উঠে এক অপূর্ব শান্তি ও তৃপ্তির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। সুতরাং যে ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভেই তাঁদের জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে এই ভাবে, যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক-বিচার ও নিগূঢ়তম জ্ঞানের সকল শুষ্কতা ও কঠিনতা ছাপিয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে নিঃসীম আনন্দের মধুরিমা—সেই ব্রহ্ম বা মোক্ষ যে স্বয়ং অপরিসীম আনন্দ-স্বরূপ—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শঙ্করের মতে, অনুমানের সাহায্যেও মোক্ষের আনন্দ-স্বরূপত্ব প্রমাণ করা যায়।

প্রথমতঃ, জাগতিক প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতেই থাকে সুখলাভের অদম্য অনুপ্রেরণা। এই সুখ প্রকৃতপক্ষে দুঃখের নামান্তরমাত্রই হলেও, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সুখলাভেচ্ছা মানবের সত্তাগত আকাঙ্ক্ষা, যারই জন্য তিনি জীবনধারণ করেন, সকামকর্মে রত হন ও জন্মান্তরকামী হন। সেজন্য এই সুখ-লালসা-চঞ্চল জগতের অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান আছেন এক অচঞ্চল আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, যিনিই ঈশ্বররূপে জীবগণকে ধর্মানুসারে সুখাদি দান করেন (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ২-৭)। এই আনন্দকে আস্বাদ করা যায় কেবল মোক্ষকালে।

দ্বিতীয়তঃ, আনন্দের হেতু হ'ল ভয়শূন্যতা এবং ভয়-শূন্যতার হেতু হ'ল শত্রুহীনতা। সেজন্য, যেখানে দ্বৈত, সেখানেই ভয়,—একের অধিক জন থাকলেই পরস্পর-বিরোধ, ভয় ও দুঃখের সম্ভাবনা। কিন্তু মোক্ষকালে, নানাত্ব-জ্ঞান নিঃশেষে বিদূরিত হয়ে, পরমেকত্বজ্ঞানের পূর্ণ উদয় হয়; সাধক ব্রহ্মস্বরূপে, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; অন্য কিছুই দর্শন করেন না, অন্য কিছুই শ্রবণ করেন না, অন্য কিছুই অনুভব করেন না। কিন্তু অপর থেকেই অপরের ভয় হয়ে থাকে—নিজের থেকেই নিজের ভয় হবে কি করে? সেজন্য, মোক্ষকালে একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই থাকেন বলে, ভয়েরও কোন প্রশ্ন নেই।

শঙ্কর বলছেন:

"ভেদ-দর্শনমেব হি ভয়কারণম্।...তস্মাদাত্মৈবাত্মনো ভয়কারণমবিদুষঃ।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ভাষ্য, ২-৭)

"যদি বিদ্যাবান্ স্বাত্মনোঽন্যৎ ন পশ্যতি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত ইতি স্যাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্য অন্যস্য অভাবাৎ।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ২-৮)

অর্থাৎ, এক পক্ষে ভেদ-দর্শনই ভয়ের একমাত্র কারণ। সেজন্য, অজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই নিজের ভয়ের হেতু,—নিজের অবিদ্যা-দ্বারা তিনি নিজেই নানাত্ব সৃষ্টি করে নানাবিধ ভয়ক্লিষ্ট হন।

অপর পক্ষে বিদ্বান্ যখন আত্মাতে অন্য কিছুই দর্শন করেন না তখন তিনি অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন—যেহেতু ভয়ের কারণস্বরূপ অন্যের অস্তিত্বই সেই সময়ে থাকে না।

এরূপে:

"অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ আনন্দঃ পরমাত্মৈব, ন বিষয়ি-বিষয়-সম্বন্ধ-জনিত ইতি।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য, ২-৮)

একমাত্র ব্রহ্মই হলেন অভিন্ন, স্বাভাবিক আনন্দ—সাধারণ পার্থিব আনন্দ নয়।

মুক্তজীব এই ব্রহ্মস্বরূপ বলে আনন্দস্বরূপ। বস্তুতঃ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম: পরিপূর্ণ সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ।

"স এব বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দে পরমে ব্রহ্মণি, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য ৩-৬)

জ্ঞান প্রভাবে, সাধক পরমানন্দ-ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন বা ব্রহ্মই হন।

এরূপে, সিদ্ধান্ত করা চলে যে, মোক্ষ-পরমানন্দ-পরিপূর্ণ অবস্থা।

সুবিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যে শঙ্কর জীবন্মুক্ত সংসারে বাস করেও যে সংসারক্লেশক্লিষ্ট হন না, তা একটি সুন্দর সহজবোধ্য উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন:

"দ্বৈত-বিষয়ানৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং তস্করস্যেব তপ্ত-পরশু-গ্রহণে বন্ধ-দাহ-ভাবঃ সংসার-দুঃখ প্রাপ্তিশ্চেত্যুক্তা অদ্বৈতাত্ম-সত্যাভিসন্ধস্য অতস্করস্যেব তপ্ত-পরশু গ্রহণে বন্ধদাহাভাবঃ সংসার-দুঃখনিবৃত্তির্মোক্ষশ্চেতি।" (১।১।১)

কোন স্থানে চুরী হলে, চোর ধরবার জন্য একটি সাধারণ উপায় অবলম্বন করা হয়। সেটি হ'ল এই যে, সকলকে একটি তপ্ত কুঠার হস্তে গ্রহণ করতে বলা হয়। যে চোর তার হস্ত দগ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু যে চোর নয়, তার কিছুই হয় না। এস্থলে, একই কুঠার যেমন একজনকে দগ্ধ করে, কিন্তু অন্যজনকে কিছুই করতে পারে না, তেমনি একই সংসার বদ্ধজীবের অসহ দুঃখের কারণ হয়, কিন্তু মুক্তজীবকে স্পর্শমাত্রও করতে পারে না—তিনি সংসারে বাস করেও, দেহ-মনোবিশিষ্ট হয়েও, চিরানন্দময়, আনন্দরসঘন, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম।

জটার জালে

(ভ্রমণ-চিত্র)

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

জয় কেদারনাথজীকী—

মাটির দিকে চোখ। সামনের দিকে ঝুঁকে পা দুটিকে টেনে টেনে শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলছিলাম। যেন পায়ের নীচের পাথরের মতই ভারী পা'দুটি, আর তেমনই শক্ত। পেশীগুলি প্রায় অসাড়, মুড়তে গেলেই কনকনে ব্যথা লাগে হাঁটুতে। অকারণে বলা যায় না। প্রায় চার মাইল খাড়া চড়াই এক রকম একদমে পার হয়ে এসেছি—মোট ৩,০০০ ফুটেরও বেশী। মনের মধ্যে তাড়া ত ছিলই, ওর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির তাড়না। নির্দ্দয় মনিব অনিচ্ছুক ঘোড়াকে যেমন মারে প্রায় তেমনি করেই সারাটা পথ আমার উপর কষে চাবুক চালিয়েছে বৃষ্টির ধারা। থামবার উপায়ই ছিল না।

সে কি বৃষ্টি! মুষলধারে বৃষ্টিপাত কথাটা ছেলেবেলা থেকেই বইতে পড়ে আসছি। বাংলাদেশের স্বাভাবিক স্বর্গমর্ত্ত্য একাকার-করা ধারাবর্ষণ দেখে মনে করেছি যে, ওকেই বুঝি বলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত। আসল জিনিস সেই দিনই সকালে প্রথম দেখলাম। তেমন গায়ে গায়ে লাগা পেঁজা তুলার আঁশের মত ধারা মোটেই নয় ধারা বলেই মনে হয় না। উপর থেকে যা পড়ছে তা এক একটি ফোঁটা ঠিকই, তবে মুষলের মতই মোটা এবং ভারী। সে আবার বরফের মুষল। আমার আপাদ-মস্তক পুরু বর্ম্ম দিয়ে ঢাকা হলে কি হবে? তিন-চার পরতের গরম জামা বা মোজা ভেদ করেও ওর এক একটি ফোঁটা যেন চামড়ায় গিয়ে লাগে। তবু সেখানেই শেষ নয়। সে ফোঁটা চামড়া ভেদ না করেও ওর ভিতর দিয়ে নির্ঘাত হাড়ে ঢুকে তাতে কাঁপন লাগিয়ে দেয়। ওদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায়ই হ'ল যথাসম্ভব ছুটে চলা। পাঁচটি মিনিটও দাঁড়িয়ে ভিজতে গেলে শিরার মধ্যে উষ্ণ রক্তও যে জমে বরফ হয়ে যাবে!

চোখ দুটি খোলা থাকলেও সামনের কিছুই চোখে পড়ছিল না। ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছি। ওতেই ত চোখ, মানে চোখের সামনের সম্পূর্ণ বৃত্তটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তার উপর আবার চোখের দৃষ্টি পাতা আছে নিজেরই চরণ দুখানির উপর। তাও ঐ জন্য আত্মরক্ষারই। খাড়া চড়াই পার হয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে এসে কোথায় একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচব, না তখনই সুরু হ'ল এই নূতন উৎপাত।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—উৎপাত করছে বাঁধান পথ। নিশ্চয়ই আমাদের সুবিধার কথা ভেবেই পথ বাঁধিয়েছেন কর্ত্তারা—পাকা করেছেন কাঁচা রাস্তা। [illegible] পাকা করা! আড়াআড়ি করে পাতা হয়েছে পাথরের ইট, বল্লমের মত উঁচু হয়ে আছে ওদের

কেদারনাথের মন্দির

মাথাগুলি। প্রতি দুখানা ইটের মাঝেই ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক। ঐ সব ফাঁকে খাঁজে খাঁজে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে পা টিপে টিপে চলছিলাম। হোকনা কম এ পথে পা পিছলে ধরাশায়ী হবার সম্ভাবনা, কিন্তু চতুর্গুণ ভয় জাগে পায়ের অঙ্গুলিগুলি এবং গোড়ালীর নিরাপত্তার জন্য। পা ফেলতে একটু যদি ভুল হয়ত এক বা একাধিক অঙ্গুলি চক্ষের পলকে একেবারে বিপরীত-মুখী হতে পারে। তা যদি নাও হয়, জুতার কল্যাণে অঙ্গুলিগুলি বেঁচেও যদি যায় তা হলেও অসতর্ক ভাবে ফেললে পা মচকাবে নির্ঘাত।

সেই ভয়েই সামনের দিকে ঝুঁকে সমস্ত মনোযোগ দুই চোখের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণধার শিলাকীর্ণ পথের উপর নিবদ্ধ করে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলছিলাম। এমনই অবস্থায় কানে এল—জয় কেদারনাথজীকী—

অতি পরিচিত সম্ভাষণ। ঋষিকেশে বাসে উঠে বসবার পর থেকেই সকলের মুখেই ঐ সম্ভাষণ শুনে শুনে এতদিনে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। অভ্যস্ত হয়েছি ঠিক ঐ ভাষাতেই প্রতি-সম্ভাষণ করতেও। শ্রীকেদারনাথের পথে এই হ'ল গিয়ে রীতি। সুতরাং মনের কোন তাগিদেরও প্রয়োজন হ'ল না, বচনেন্দ্রিয় প্রতিধ্বনির মতই উচ্চারণ করল, জয় কেদারনাথজীকী—

তার পরেই কানে এল, আ ত প্ররে, বাবুজী।

সচেতন হয়ে অনুধাবন করল মন যে, এটি চেনা স্বর। নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেও সেই দেবপ্রয়াগ থেকে যে আমাদের সঙ্গে আসছে, আমাদের সমস্ত দুর্বুদ্ধি বিরক্তির বুবে ডুবিয়ে যাকে ছাড়াবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করেও আমরা সফলকাম হই নি, সেই আমাদের পাণ্ডারই কণ্ঠস্বর। সুতরাং হাতের বাঁকা ছাতাটি সোজা করে নিজেও থেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ছাতা মাটিতে পড়ে গেল, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারের শিহরণ অনুভব করলাম যেন, দুটি চোখের দৃষ্টি এক নিমেষেই অচল হয়ে গেল।

মরি মরি! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! অদূরে শ্রীকেদারনাথের মন্দির। তার পিছনে দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের মত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত অমলধবল পর্ব্বতশ্রেণী। কিরীটমণ্ডিত অর্দ্ধবৃত্তের আকার। যেমন বিরাট তেমনি বিচিত্র। গায়ে গায়ে লাগা পাহাড়, নীচে থেকে ধাপে ধাপে আকাশ পর্য্যন্ত উঠে আবার বিপরীত দিকে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। গঠনের পারিপাট্যে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য নিশ্চিহ্ন হয়েও সমগ্রের বিপুল ও বলিষ্ঠ একতার বৈচিত্র্য হয়ে প্রস্ফুটিত। মনে হয় যেন একখানি পাথরই কুঁদে কুঁদে গড়া হয়েছে ঐ বিশাল চালচিত্র। এক একটি শিখর যেন এক একটি কলকা—ময়ূরপুচ্ছের আকার। ওর নীচে খাঁজকাটা মসৃণ বক্ষে স্তবকে স্তবকে খোদাই করা কারুকার্য্য, আগাগোড়া রূপার। পিছনে নির্ম্মেঘ আকাশের নিবিড় নীলিমার পটভূমিকায় বৃষ্টিবিধৌত নির্ম্মল শুভ্রতা অপার্থিব আলোকে ঝলমল করছে।

বরফ-ঢাকা কেদারনাথ পর্ব্বতশ্রেণী, জড়প্রকৃতির আকস্মিক সৃষ্টিগঠনের পারিপাট্যে অপ্রাকৃত মহিমায় মহিমান্বিত। একখানি যেন ছন্দোবদ্ধ পাথরের কবিতা। প্রথম দর্শন অবশ্য নয়। পূর্ব্বেও দেখা গিয়েছে এই পর্ব্বতশ্রেণী। অগস্ত্য মুনি ছাড়বার পর থেকেই থেকে থেকে আভাস পেয়েছি তুষার-ধবল এই কেদারনাথ শৃঙ্গের। অনেক পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়েছে এই শুভ্র মহিমা। কিন্তু তা ছিল ঐ ইঙ্গিতেই—আভাসের আমন্ত্রণ মাত্র। সমগ্রের সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখলাম এই প্রথম। দেখে অভিভূতের মত চেয়ে রইলাম।

পাণ্ডা আবার বললে, ঐ দেখ বাবু, কেদারনাথজীর মন্দির।

দেখবার জন্য চোখ নামাতে হ'ল। কেবল তুলনায় নয়, আসলেও ছোট। সাদাসিধা পাথরের মন্দির। মঠের আকার। চূড়ায় ত্রিশূল না চক্র—হয়ত বা দুই এক সঙ্গে। সোনালী রং—সোনারও তৈরি হ'তে পারে। এত দূর থেকেও মনে হ'ল যে ঝকঝক করছে।

দক্ষিণ ভারতের একাধিক বিরাট, আকাশচুম্বী অনবদ্য কারুকার্য্য খচিত,একাধিক মন্দির দেখা চোখ আমার। সেই চোখেও পলক পড়ে না। যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখছি। পরিবেশের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে ঐ ছোট্ট মন্দিরটি—যেমন মানায় হাস্যমুখী জননীর ললাটে ছোট্ট সিন্দুর বিন্দুটি।

কি আছে ঐ মন্দিরে যার আকর্ষণে এই দুর্গম পথে পায়ে চলার দুঃসহ ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে দেশদেশান্তর থেকে অগণিত নরনারী এখানে ছুটে আসে?

অবসন্ন পা 'দুটিতে কোথা থেকে যে অত শক্তি এল কে জানে। বাকি পথটুকু যেন লাফিয়ে লাফিয়েই অতিক্রম করলাম। মন্দাকিনীর উপরকার পুল পার হয়ে আবার খানিকটা চড়াই ভেঙে সোজা গিয়ে উঠলাম মন্দিরে। ধূলাপায়ে দেবদর্শনই ত শাস্ত্রের বিধান।

পূজার উপকরণ পাণ্ডাই সংগ্রহ করে নিয়ে এল। কি এক-রকমের এক মুঠা ডাল, দু'একটি পেড়াজাতীয় মিষ্টান্ন, চন্দন-কুঙ্কুমের সঙ্গে আরও কি কি বুঝি মিশিয়ে খানিকটা ঘন তরল পদার্থ এবং কিছু ফুলপাতা। পুরোহিত বিনা বাক্যব্যয়ে মন্দিরের দ্বার খুলে দিল।

প্রায় একতলার সমান উঁচু নিরাবরণ চত্বর। আয়তনে তেমন বড় না হলেও ফাকা মাঠের মধ্যে বেশ বড় দেখায়। ওটা অতিক্রম করলে সঙ্কীর্ণ বারান্দা বা নাটমন্দির। ওর পিছনে দু-ধাপ সিঁড়ি নামলে তবে মন্দির। বিরাট সিংহদ্বারের কবাটের গায়ে মোটা মোটা পেরেকের বড় বড় ছাতাগুলি দূর থেকেও দেখা যায় ঝকঝক করছে। তা ছাড়া অলঙ্করণ বলতে একমাত্র চোখে পড়ে চত্বরের কেন্দ্রস্থলে পাথরের বৃষভমূর্ত্তি। সমগ্র অনুভূতি এক সুগম্ভীর শূন্যতার। শ্মশানচারী শিবের মন্দিরের পরিবেশ শ্মশানের মতই রুক্ষ ও রিক্ত। যাত্রীর ভীড় যদি না থাকে ত ওখানে দাঁড়ালে গা ছম ছম করে।

ওর চেয়েও বেশী—গায়ে কাঁটা দিল ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। চত্বর থেকেই মন্দিরের প্রবেশপথে লোহা না দস্তার প্রকাণ্ড দোদুল্যমান ঘণ্টা চোখে পড়েছিল আমাদের। ঐ ঘণ্টা বাজিয়ে যাত্রীর উপস্থিতির জানান দিতে হয় মন্দিরের দেবতাকে। ওটা যাত্রীরই অবশ্য কর্ত্তব্য হলেও ধমধমে পরিবেশে এসে মনের তৎকালীন বিহ্বল অবস্থায় করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা। সে ত্রুটি সংশোধন করে দিল আমাদেরই পাণ্ডা।

গম গম করে উঠল প্রতিধ্বনি। বাতায়নহীন বন্ধ ঘরে যেন আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল ক্রমান্বয়ে এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়ালের গায়ে। সে যেন গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জন। আর কেবলই কি ধ্বনি। যেন কায়া আছে তার। নিজের দেহে সে ধ্বনির স্পর্শ অনুভব করছি, ওর চাপ পড়ছে আমার মাথার উপর, পিছন থেকে আমাকে যেন ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে তা।

রোমাঞ্চিত দেহ ও অভিভূত মন নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। একটিমাত্র প্রবেশদ্বার বাদ দিলে নিরন্ধ্র মন্দির। ভিতরে অন্ধকার। নিবিড়, তবে নিশ্ছিদ্র নয়। মন্দিরের এক কোণে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছে। ওর প্রভাবেই ঈষৎ স্বচ্ছ হয়েছে

অন্ধকার। তার ভিতর দিয়ে আবছায়া মত চোখে পড়ে শ্রীকেদারেশ্বরের বিরাট বিগ্রহ।

না, বিগ্রহ নয়। চোখ দুটি মোটামুটি অভ্যস্ত হতেই বুঝতে পারলাম যে, সেটি বিপুলায়তন এক শিলাখণ্ড। না, সম্পূর্ণ একটি পাহাড়ই? তবে নিঃসংশয়ে অসাধারণ। নীচের দিকটা যেমনই মোটা তেমনই সূক্ষ্ম ওর চূড়া। উচ্চতায় আমার মত লম্বা মানুষকেও ছাড়িয়েই উঠেছে বোধ করি। বিচিত্র গঠন—স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন উপকরণ সজ্জায় সজ্জিত সুগঠিত একখানি যেন নৈবেদ্য। ঠিক শিখর থেকেই নাভিগভীর মোটা একটি রেখা ব্রাহ্মণের উপবীতের মত ভিত্তি পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। ওতেই আরও স্পষ্ট হয়েছে স্তর থেকে স্তরের পার্থক্য। দুই বা ততোধিক পাহাড় পরস্পরের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে যেন এক বিচিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আবছায়া রূপ নিঃসংশয়ে মনকে অভিভূত করবার মতই। সাধ হ'ল আরও অভিনিবেশ সহকারে দেখবার। কিন্তু সময় কোথায়? পাণ্ডা তাড়া দিয়ে বললে, শিগগির পূজা কর বাবু, ভোগের সময় হয়ে এল।

পূজার অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর। কিন্তু উপাসক ও উপাস্যের সম্বন্ধ এখানে অন্তরঙ্গ। কেবলই ফুলপাতায় অঞ্জলি দেওয়া নয়, সুযোগ পেলাম চন্দন-কুমকুম বিগ্রহের অঙ্গে স্বহস্তে লেপন করবার। বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণামও করলাম বিগ্রহকে—না আলিঙ্গন? দুটি হাতেই কেবল নয়, ললাট ও বুকেও নিবিড় স্পর্শ অনুভব করলাম। তৈলাক্ত কোমল স্পর্শ। কতকাল ধরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের অর্ঘ্য ঘৃত, মধু, চন্দন, কুমকুম কঠিন শিলাদেহের উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে কোমল ও পেলব করে রেখেছে শ্রীকেদারেশ্বরের স্পর্শ।

কিন্তু বড় ঠাণ্ডা। নিঃসংশয়ে পাথর। স্বয়ম্ভূ নিশ্চয়ই—মাটি ফুড়ে যে উঠেছিল তা বেশ বুঝতে পারছি। তবু মন ভরে না। এই কি শিব? কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল দেখতে পাই নে। আর কল্পনাই বা কেন বলি। ধ্যানের মন্ত্রে দেবাদিদেব মহাদেবের যে মূর্ত্তি কল্পিত হয়েছে সেই রজতগিরিনিভ অহিভূষণ পিনাকপানি মহাযোগীশ্বর মূর্ত্তি চোখ ফুটবার পর থেকেই ত কতবার কত ভঙ্গিতে দর্শন করেছি। এ কেদারেশ্বর ত সে শিব নন।

বারে বারেই তাকাচ্ছি দেখেই বোধ করি আমাদের পাণ্ডা আমার মনের অবস্থা অনুমান করে আশ্বাসের স্বরে বললে, সন্ধ্যার পর আরতি হবে, বাবু। তখন দেখবেন কেদারনাথজীর শৃঙ্গার বেশ।

সে ত সাজ-সজ্জার চটক। তাতেই কি দূর হবে যে অভাব-বোধ এখন আমার মনকে এমন পীড়া দিচ্ছে। আবার ফিরে তাকাই। দর্শন এখন আর তেমন কষ্টসাধ্য নয়। অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়েছে চোখ। ঘৃত-প্রদীপের শিখাও এখন মনে হয় অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। সেই আলো পড়েছে শ্রীকেদারেশ্বরের দেহে বেশ দেখা যায় এখন। কিন্তু যা দেখছি তা ত আকার নয়, কেবলই আয়তন। নিঃসংশয়ে বিরাট, কিন্তু মহিমা কোথায়? আর এ যে দেখছি কৃষ্ণবর্ণ। ঘৃত-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে মনে হয় যে, সমস্ত মন্দিরে এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিল যে অন্ধকার তাই যেন মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে পুঞ্জীভূত হয়ে কঠিন আকার পরিগ্রহ করেছে।

অতৃপ্ত অন্তর নিয়েই বের হয়ে এসেছিলাম, হঠাৎ কানে এল আমার সঙ্গীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর, ঐ দেখুন মণিদা, আসল কেদারনাথ।

বুঝতেই পারি নি এতক্ষণ যে বৃষ্টি থেমে রোদ উঠেছে। আর তাও কি যেমন তেমন রোদ—গলিত সোনার ঢল নেমেছে যেন। মুখ ফিরিয়ে অনেকখানি চোখ তুলে সেই রোদে আবার দেখলাম মন্দিরের পিছনে সেই বিরাট চালচিত্র। সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটি প্রায় এক হাত লাফিয়ে উঠল যেন। ঠিকই ত বলেছে জিতেন—ঐ ত কেদারনাথ।

ঐ ত মহাদেব—বিপুল মহিমাসমন্বিত রজতশুভ্রদেহ শঙ্করের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ঐ ত স্পষ্ট দেখছি তাঁর কটিতে শার্দ্দূল-চর্ম্মের সংক্ষিপ্ত আবরণ; ঐ ত তাঁর ত্রিশূল, ঐ ত ফণিভূষণ তাঁর বাহুতে ও গলায়, ঐ ত তাঁর উন্নত গগনস্পর্শী মস্তকে বিপুল জটার নিবিড় বন্ধন থেকে সদ্যোমুক্ত জাহ্নবীর কল্লোলিত প্রবাহ, ঐ ত তাঁর শুভ্র ললাটের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তৃতীয় নয়নে ধিকি ধিকি জ্বলছে বহ্নিশিখা। কিন্তু অতি প্রশান্ত, হাস্যময় মুখ।

সদ্য মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কোমল সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত হয়েছে পিছনের তুষারমৌলী পর্ব্বতশ্রেণী। শিখরের সঙ্গে শিখরের পার্থক্য এখন বেশ বুঝা যায়; স্পষ্ট চোখে পড়ে এক একটি শিখরের বিচিত্র গঠন—ত্রিশূলেরই আকার যেন ওদের একটির। তীক্ষ্ণ বাটালি দিয়ে কোঁদা পাথরের পিচ্ছল মসৃণতার মত ফাঁকে ফাঁকে খাঁজগুলিও আরও স্পষ্ট হয়েছে, বেশ দেখা যায় এক একটি পাহাড়ের সারা অঙ্গ জড়িয়ে জড়িয়ে শৃঙ্গগর্ভে শুভ্র জল-প্রপাতের লম্বিত পতিপথগুলি। বরফের নীচে স্বাভাবিক পিঙ্গল-বর্ণ পাহাড়ের মেখলায়, উচ্চে এক একটি শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ-রাশিকে ভেদ করে, মোটা মোটা রেখায় বিক্ষিপ্ত করে উপরে উঠে গিয়েছে। রূপের মধ্যে অরূপের আভাস এনেছে সোনালী রোদ, সেই সোনাই আবার শুভ্র গভীরতাকে পূর্ণ করে বর্ণ ও আকার দিয়েছে তাকে। সোনার জলে স্নান করে তুষারের শুভ্রতা এখন আরও বেশী শুভ্র, খাঁজ ও গহ্বরের স্বাভাবিক অন্ধকার আবার ওরই প্রতিফলনে অগ্নিশিখারই মত চিক চিক করছে।

জিতেন আবার বললে, পূজা যদি করতে হয় ত ঐ শিবকেই। আমি চললাম ঐ উপরে।

খপ করে হাত ধরে ফেললাম তার। বললাম, এখান থেকেই প্রণাম কর।

যাওয়া কি আর হয়—পায়ে পায়ে বাধা। অথচ কতদিন

থেকেই সাধ, মহাপ্রস্থানের পথে নিজেও একবার যাত্রা করে পরখ করে নেব সশরীরে স্বর্গে যাবার উদ্দেশ্যে পঞ্চপাণ্ডব আসলে কতখানি ক্লেশ সহ্য করেছিলেন। মনের সাধ মুখেও প্রকাশ করে বলতাম যখনই কোন অন্তরঙ্গের সাক্ষাৎ মিলত। বলেছিলাম একদিন জিতেনকেও।

বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ঐ জিতেন। ওর নিজের মুখেই ওর চল্লিশ বৎসরের জীবনের অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনে মাঝে মাঝে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েছি আমি; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—যেমন জেলখানায় সাহচর্য্যের ভিতর দিয়ে—তেমন বেশি না থাকলেও যেটুকু ছিল তারই জন্য ওর কোন কাহিনীই অবিশ্বাস করতে পারি নি। জীবনের যাত্রাপথে প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই মাঝে মাঝে গতি পরিবর্ত্তন করতে হয়। কিন্তু ও যখনই গতি পরিবর্ত্তন করেছে তখনই একেবারে বিপরীত দিকে। কিশোর বয়সে কোন দাদার কাছে যেন তার দীক্ষা হয়েছিল যাতে সাহিত্যের ভাষায় বলে অগ্নিমন্ত্র তাইতে। পরে সে দীক্ষা নিয়েছিল আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে। রীতিমত মস্তক মুণ্ডন করে, কৌপীন বহির্বাস ধারণ করে পিতৃদত্ত নাম পর্য্যন্ত বর্জ্জন করে গুরুর আশ্রমে গুরুভাইদের সঙ্গে সাধনাও সুরু করেছিল সে। তৃতীয় পর্ব্বে সে আবার গৃহী—তার গুরুদেবের আদেশেই নাকি সে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

তার সঙ্গে দেখা আমার হয়েছে কম, কিন্তু দেখেছি তার প্রায় প্রত্যেকটি রূপই। আজ সে স্বদেশী ডাকাত, কাল সে চোরাকারবারী, আজ তার গৈরিক বসন, কাল সে স্যুট পরে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছে হলিউড মার্কা ছবি দেখতে। কাল গিয়েছে তার অর্দ্ধাশন, আজ সে দু'হাতে খোলামকুচির মত টাকা ছড়াচ্ছে। কোনটা যে তার আসল রূপ তা ঠিক করতে পারি নি। তবে গত বছর দুই যাবৎ মনে হচ্ছিল যে, অনেক ঘাটের জল খাওয়ার পর শেষ পর্য্যন্ত সে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত এক বন্দরে জীবন-তরণীর নোঙর ফেলেছে।

ধূমকেতুর মতই মাঝে মাঝে আবির্ভাব হ'ত তার। কিন্তু আমার কাছে আবদার ও আমার উপর দৌরাত্ম্য তার চলত যেমন ছিল বছর পঁচিশ আগে ঢাকা জেলের রাজবন্দী ওয়ার্ডে আমাদের বাধ্যতামূলক সহ-অবস্থানের কালে। বছরে অন্ততঃ একটিবার আমাকে সে তার বাসায় টেনে নিয়ে যেতই, সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করে এবং তার স্ত্রী বেচারীকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়ে চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় দিয়ে অতিথি সৎকার করত সে।

সেই জীতেন। বছর খানেক আগে তাকে একদিন আমার এক আড্ডায় পেয়ে কথায় কথায় মুখ ফুটে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম পরিহাসের সুরেই, কিন্তু শুনে সে রীতিমত বিস্মিত হয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই শরীর নিয়ে খাস হিমালয়ের চড়াই উৎরাই ভাঙতে পারবেন আপনি?

উত্তর দিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই পারব, তবে লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

সেই আমার কৃতকর্ম্মের ফল। ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকে একদিন সে ঝড়ের মত আমার ঘরে ঢুকে বললে যে, পনর দিনের মধ্যে আমি যদি স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে মহাপ্রস্থানের পথে তার সহযাত্রী না হই তবে সে আমাকে তার কাঁধে তুলে নিয়েই নির্দ্দিষ্ট দিনে যাত্রা সুরু করে দেবে।

আমার সব ওজর-আপত্তি তার উৎসাহের ঝড়ের মুখে একমুঠি শুষ্ক তৃণের মত উড়ে গেল।

একরাশ পাতলা ও মোটা, সচিত্র ও অচিত্রিত ইংরেজী ও বাংলা বই আমার টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে উপসংহারে সে বললে, আমাদের আগে গিয়ে যারা কেদারবদরী দেখে এসেছেন তাদের লেখা ভ্রমণকাহিনী এগুলি। অবসরমত চোখ বুলিয়ে নেবেন একবার।

আমি হাত দিয়ে বইগুলি সরিয়ে দিয়ে উত্তর দিলাম, আমি নিজেই যখন ওদিকে যাচ্ছি তখন নিজের চোখ দুটির উপর অপরের অভিজ্ঞতার ঠুলি চাপাতে যাব কেন? আমি যেতে চাই সংস্কারমুক্ত মন আর সাদা খোলা চোখ নিয়ে।

কিন্তু মন বাদ দিলেও দেহ থাকে, চোখ বাদ দিলেও দেহের অবশিষ্ট যা থাকে তার প্রয়োজনকে ত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে প্রয়োজন মেটাবার জন্য অভিজ্ঞজনের পরামর্শ নিতে হ'ল।

অভিজ্ঞতা যে বিচিত্র তার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেল পরামর্শের বৈচিত্র্য থেকেই। সকলেই বলেন যে, যথাসম্ভব হালকা হয়ে চলতে হবে, কিন্তু তারা যে ফর্দ্দ দাখিল করেন তার প্রত্যেকটিই দীর্ঘ এবং কোন দুজনের দেওয়া "অবশ্য প্রয়োজনীয়" দ্রব্যের তালিকা সম্পূর্ণ এক নয়। খতিয়ে দেখে চমকে উঠি—তিল তিল করে নিলেও এ যে নির্ঘাৎ তাল হয়ে উঠবে। দুর্ব্বল মনের উপর চাপ পড়ে—এ কোন বনবাসে চলেছি যে এত-সব খুটিনাটি জিনিস অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করতে রীতিমত হাঁফিয়ে উঠলাম। মনে মনে একটু যেন বিরক্তও হলাম জীতেনের উপর, সেইত ঐ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কতকটা ঐ রকম মনের অবস্থা নিয়ে যাত্রার দিন দুই পূর্ব্বে জীতেনের বাসায় গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে বেশ একটু অতিরঞ্জিত করেই সরমাকে বলব তার স্বামীর পাল্লায় পড়ে আমার নাজেহাল অবস্থার কথা। কিন্তু যা ঘটল তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

গিয়ে দেখি যে, জীতেন বাসায় নেই। তাতে অবশ্য আতিথ্যের কমতি হ'ল না। কিন্তু তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, কেমন যেন থম থম করছে তা। ও যে বজ্রগর্ভ মেঘ তা টের পেলাম একটু পরেই। চায়ের পেয়ালাটি আমি নিঃশেষ করবার পূর্ব্বেই সুরমা বললেন, ওকে নাচিয়ে যে তুললেন, শেষ রক্ষা করতে পারবেন ত?

চমকে উঠে বললাম, আমি নাচিয়ে তুললাম ওকে? তাই বলছে নাকি জীতেন?

বলতে হবে কেন? আমি কি এতই বোকা? বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

ঐ হাসির অর্থ বুঝি। ওতে ইঙ্গিত রয়েছে আমার সমগ্র অতীত জীবনের প্রতি। অতীতে আমি যে ছেলে-ছোকরাদের নাচিয়ে বেড়িয়েছি, আরামের গৃহ থেকে টেনে এনে দুর্যোগের রাত্রে দুর্গম পথে তাদের ঠেলে দিয়েছি তা ত আমার অস্বীকার করবার জো নেই। সুতরাং এমন মিথ্যা অভিযোগটিও হাসিমুখে হজম করে উত্তরে সুরমাকে বললাম, তুমি ভাবনা করো না, দিদি। কত লোকই ত আজকাল ওদিকে যাচ্ছে, নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেও আসছে তারা।

সুরমা বললে, অত লোককে ত আমি চিনি নে, চিনি আপনাকে।

মানে, আমি যে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারব, সে বিশ্বাস তোমার নেই, তাই বলছ নাকি সুরমা?

না, না, বেশ যেন অপ্রতিভ হয়েই সুরমা প্রতিবাদ করল, কিন্তু পরক্ষণেই মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল তার, করুণ চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে অনুনয়ের স্বরে সে আবার বললে, তবু আপনার সঙ্গে উনি যাচ্ছেন বলেই ওকে ছেড়ে দিলাম আমি। ওঁর সব ভার রইল আপনার উপর।

এ কথারও প্রতিবাদ করা চলে না। সুতরাং মনে মনে আমি অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেও আশ্বাসের স্বরেই সুরমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে প্রবাসে জীতেনকে আমিই আগলে রাখব—সুরমার আশঙ্কার কোনই কারণ নেই।

একেই বুঝি ইংরাজীতে বলে টেবেল ওলটানো। ওর প্রথম ফল হ'ল এই যে, জীতেনের সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা ভেবে আবার নূতন করে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ফর্দ প্রস্তুত করলাম আমি, নূতন করে কেনাকাটাও করতে হ'ল। ফলে লটবহর বা জমল তার আকার হিমালয়কে মনে করিয়ে দেবার মতই।

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সহযাত্রীদের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে দুজনেই গলদঘর্ম হয়ে অনেক কষ্টে বাক্স, বিছানা, ঝোলা-ঝুলি যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে গুছিয়ে রাখবার পর চারিদিকে চেয়ে যখন বুঝতে পারলাম যে, অন্ততঃ সে রাত্রে শোয়া দূরে থাক, পা দুটিকে কোন বেঞ্চের নীচেও সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে বসতে পারব না তখন জীতেনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, গাড়ীতে উঠে বসলে কি হবে, এ জন্মে আমার আর সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হ'ল না।

আমার উদ্দেশ্য ছিল একটু লঘু পরিহাস করা যাতে তৎকালীন অসহ্য অবস্থা কতকটা সহনীয় হয়। কিন্তু জীতেন অপ্রত্যাশিত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে বসল, কেন?

চেয়ে দেখি বেশ ভার ভার মুখ তার—কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব। তথাপি পরিহাসের সুরটি বজায় রেখেই আমি বললাম, দেখছ না আমার লাটবহর—আমার পাপের বোঝা। এই নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে।

হঠাৎ কি যেন হ'ল জীতেনের। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রায় উদ্ধত স্বরেই বললে, এর চেয়েও বড় বাধা আছে, মণিদা, জানেন তা কি?

কি?

কর্তব্যজ্ঞান।

সর্বনাশ! বলে কি জীতেন! এরই উপর নির্ভর করে আমি এই দুর্গম পথে প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করছি!

কিন্তু এখন আর ফিরবার উপায় নেই—গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

ভোর হ'ল লাকশার ষ্টেশনে। দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে চোখে ধরা পড়বার আগেই হিমালয় চোখে মায়াকাজল বুলিয়ে দিল যেন।

মায়াকাজলই হবে। নইলে ইতিপূর্বে পাহাড়-পর্বত কতই ত দেখেছি। এই ত গাড়ীতে আসতে আসতেই হাজারিবাগ, গয়া ও মির্জাপুর পার হতে হতে সারি সারি কত পর্বতশ্রেণী দেখে এলাম। কিন্তু সেই ভোরের আলোতে হিমালয়ের যে রূপ চোখে পড়ল তা মনে হ'ল অদৃষ্টপূর্ব।

নাই বা ঝলকে উঠল তার তুষারের মুকুট, নাই বা মেঘ-লোককে ছাড়িয়ে উঠল তার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ। তথাপি সহজ তার আকর্ষণ; আর তা অপ্রতিরোধ্য।

উত্তরে দিগন্ত অদৃশ্য হয়েছে। গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঠিক চোখের সামনেই যা দেখছি তা নিরেট পাহাড়ের দুর্গ-প্রাকার যেন—রেলপথের সমান্তরালে চলেছে ত চলেইছে। কোথাও ফাক নেই; ছেদ থাকলে পিছনের সারিতে তার দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ। সেখানে আরও কঠিন পাথরের আরও নিরেট গাঁথনির দ্বিতীয় প্রাকার—আরও বিপুল তার আয়তন, উচ্চতায় সামনের সারিকে ছাড়িয়ে উঠেছে। কঠিন, কিন্তু রুক্ষ নয়, পাথর, কিন্তু কালো নয়—কেমন যেন গেরুয়া গেরুয়া রং।

কিন্তু তা কেবল পাদদেশে। চোখের পাতা ঈষৎ একটু তুললেই গাড়ীতে বসেই বেশ দেখা যায় যে, হাত তিনেক উঁচুতেই নিষ্প্রাণ পাষাণের বক্ষ বিদীর্ণ করে বিজয়ী প্রাণের ধ্বজা উড়ছে। বিপুল অরণ্যসম্পদে সমৃদ্ধ এই পর্বতশ্রেণী। বিরাট এক-একটি মহীরুহ সোজা আকাশে উঠে গিয়েছে। তাদের শাখায় শাখায় নিবিড় কোলাকুলি। নীচে লতা, গুল্ম ও তৃণের প্রাচুর্য্য। নাম জানি নে সব গাছের, তবে সব গাছই অচেনাও নয়। শাল-অশ্বত্থ চোখে পড়ছে, বড় বেশী চেনা আম-জামের হাতছানিও থেকে থেকে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে গেল সমতলভূমিতে পাশাপাশি কয়েকটি পেয়ারা বাগান এবং আরও একটু নীচে কার্পেটের মত সুদৃশ্য ও কোমলদর্শন সবুজ ধানের ক্ষেত।

তার পরেই দুদিকেই বড় রকমের একটি ছেদ পড়ল। গাড়ী একটি পুলের উপর উঠেছে। নীচে ছোট একটি নদী, ওর অপরিসর অগভীর গর্ভে শেষ বর্ষার সিক্তরজ ঘোলা জল।

সহযাত্রী কজন রাজপুতানী প্রায় গানের সুরেই সমস্বরে বলে উঠল, জয় জয় গঙ্গামাইকী জয়।

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, এই গঙ্গা নাকি হে, জীতেন?

হেসে উত্তর দিল সে, তা গঙ্গা না হলেও তাঁর কোন সহচরী নিশ্চয়ই হবেন। ইনিও ত জটার জাল থেকেই বের হয়ে আসছেন দেখতে পাচ্ছি।

ততক্ষণে গাড়ী পুল পার হয়ে এসেছে—নদী আর চোখে পড়ে না। সুতরাং জীতেন যাকে জটার জাল বলে বর্ণনা করল সেই অরণ্যসমন্বিত পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, হরিদ্বার এসে গেল নাকি?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন?—উত্তর দিল জীতেন, দেখছেন না গেরুয়া রং? হরিদ্বার সন্ন্যাস আশ্রমের আশ্রয় বলেই পাহাড়ও এখানে সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধারণ করছে।

সত্য হলেও অর্দ্ধসত্য। ও বর্ণনা খাটে বড় জোর মাটি থেকে হাত তিনেক উঁচু পর্য্যন্ত। তার পরেই অন্য রং! দেরাদুনের পথ। পাহাড় এখানে সত্য হলেও যেন গৌণ; মুখ্য দৃশ্য এদিকে বন। কি ডাইনে কি বাঁয়ে, কি মাটিতে কি পাহাড়ের চূড়ায় চোখে পড়ে কেবল গাছ আর গাছ, ছাড়া ছাড়া, আলাদা আলাদা গাছ নয়, অসংখ্য বৃক্ষের বিরাট ও বিপুল সমগ্রতা। শেষ বর্ষার প্রকৃতি—ইন্দ্রের উদার ও অপরিমেয় দাক্ষিণ্যে সমৃদ্ধ। নীচে পাহাড়ের শিলাময় দেহের মত উপরে গাছের শাখাগুলিও নীবিড় পত্রপুঞ্জের অন্তরালে অদৃশ্য। পাতায় পাতায় একাকার। চোখে যা পড়ে তা কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণ। সবুজ নয়, যেমন দেখেছিলাম কেরালা রাজ্যে—রাজধানীর প্রবেশদ্বারে, কন্যাকুমারীর ছায়াশীতল পথের ধারে ধারে। ভারতের এ উত্তর সীমা দক্ষিণ সীমান্তের ঠিক বিপরীত না হলেও অন্য রকম নিশ্চয়ই। অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিমা, এখানে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নয়। এই যদি শ্যামবর্ণ হয় ত গোকুলের শ্যামচাঁদ ছিলেন নিঃসংশয়ে কালো।

তবে অবিসংবাদিত এ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য। যে দেশে আমরা থাকি, প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ যাত্রাপথে যে সব জনাকীর্ণ জনপদ ও পল্লী আমরা পার হয়ে এলাম তাদের সঙ্গে এ রাজ্যের পার্থক্য স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাছেও প্রকট। এ যদি স্বর্গের দ্বার হয় তবে স্বর্গ নিশ্চয়ই পৃথিবী থেকে ভিন্ন।

আমার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অধিকাংশই এরই মধ্যে ঐ পার্থক্য সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়েছে। স্তরের পর স্তর নিবিড় শ্যামবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে মনে হয় যে, উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ শ্যামল সমুদ্র যেন অকস্মাৎ কোন দেবাদিদেবের দর্শন লাভ করে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে নির্ব্বাক ও নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। এ যুগের দুর্দ্দান্ত দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটেও যেন সংক্রামিত হ'ল আদিযুগের সেই সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের এক-একটি পরমাণু। শ্লথ হ'ল গাড়ীর গতি, স্তব্ধ হ'ল লৌহগজের তীক্ষ্ণ, কর্কশ বৃংহতি।

বাইরে মাঝে মাঝে বসতি চোখে পড়ে, কিন্তু জনপ্রবাহ ক্ষীণ। সহযাত্রীরা অনেকেই নেমে গিয়েছে—গাড়ীর ভিতরে ভিড় এখন অনেক কম। জীতেন দেখছি তন্ময় হয়ে হিমালয়ের শোভা দেখছে। সকলের মধ্যেই যেন কিছু-না-কিছু সংক্রামিত হয়েছে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের শান্ত গাম্ভীর্য্য।

সুতরাং হরিদ্বার ষ্টেশন দেখে তেমন বিস্মিত হলাম না। হৈ-হল্লা একেবারে নাই। প্লাটফর্ম্মের উপরেই কয়েকটি গাছ—একটি ত বিশাল মহীরুহ। সেটিরই নীচে খান-দুই টেবিল পাশাপাশি সাজিয়ে সরকারী রেস্তোরাঁর চায়ের দোকান বসেছে। রুটির সঙ্গে যে মাখন পেলাম তা দুধ না দই থেকে সদ্যতোলা সাদা রং-এর টাটকা জিনিস—যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ। যিনি প্রাতঃরাশ পরিবেশন করছিলেন তিনিই পিছনে প্লাটফর্ম্মের বাইরে একটি পাকাবাড়ী দেখিয়ে আমাকে বললেন, যে ঐ টিই খোদ রেল দপ্তরের পরিচালিত হোটেল।

এতক্ষণ বুঝতে পারি নি, এবার বুঝলাম, কত উঁচু দিয়ে আমাদের গাড়ী চলে এসেছে। প্রাসাদের মত উঁচু বিশ্রামগৃহ; তবু এখানে দাঁড়িয়েই তার ছাদের উপরটা বেশ দেখতে পাচ্ছি—যেন একটু এগিয়ে গিয়ে পা বাড়ালেই সে পা গিয়ে পড়বে ঐ ছাদের উপর। শহর আরও নীচে। বিহ্বলের মত একবার উত্তরে পাহাড় ও দক্ষিণে শহর দেখছি লক্ষ্য করে, পরিবেশক ভদ্রলোকটি আবার বললেন, এই হোটেলেই উঠতে পারেন আপনারা। সরকারী হারে ভাড়া দিতে হবে, খাবেন আমাদের নিরামিষ রেস্তোরাঁতে।

নিরামিষ কেন?—আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

উত্তর পেলাম: এ ত তীর্থস্থান। এখানে মাছ-মাংস খাওয়া বা দেওয়া বারণ।

নাতিদীর্ঘ প্লাটফর্ম্মটির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আবার নিরীক্ষণ করে দেখলাম। গাড়ী চলে গিয়েছে। প্লাটফর্ম্ম প্রায় শূন্য। সোনা-ঝলমল রোদ ছড়িয়ে পড়েছে খোলা জায়গায়, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে গলে পড়ছে আমাদের 'মুখের উপরে চোখের উপরে'। কেমন যেন সংশয় জাগল মনে—রেলের ষ্টেশন নাকি এটি? কণ্বমুনির আশ্রম মনে করতেও বাধা নেই।

ক্রমশঃ

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

এর সঙ্গে অপর্ণার চীৎকার, ছড়া সংযোগে ঝগড়া, অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি, পাওনাদারদের সঙ্গে কচলাকচলি, ছেলেমেয়েদের মারপিট এবং অকালপক্কতা—সব মিলিয়ে যে নরকের দৃশ্যটি দেখা যায় মহাকবি দান্তেও তা কল্পনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। অপর্ণা কি করছে কে জানে। টুকুনের ল্যাকটোজেন কিনে দিয়ে আসা হয় নি। যা কাণ্ড করে দিনরাত, কোন মানুষের কি মনে থাকে? দোকানের ভুবন সাহাকে অবশ্য বলাই আছে, বাড়ীতে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের কথা, বাজার বোধ হয় বাসন মাজা ঝিটাকে দিয়েই চালিয়ে নেবে। কিন্তু একটা মুশকিল, গত তিন মাসের ঝিয়ের মাইনে ছ'টাকা হিসাবে আঠারো টাকা এখনও দেওয়া হয় নি। দোকান নমিতাই করতে পারবে। চৌদ্দ-পনর বছর বয়স কিন্তু পাকিয়ে গিয়েছে, ভাল খাদ্যের অভাবে থেমে গিয়েছে তার কৈশোরের বৃদ্ধি। এক রকম ভালই, ফ্রক পরিয়ে বেশ কিছুদিন খুকী সাজিয়ে রাখা যাবে, সবিতার মত বাড়ন্ত গড়ন হলেই ত চিন্তির। সবিতার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হবে—ভাবল ধীরেন ভড়। কিছু টাকা জোগাড় না করতে পারলে আর ভদ্রস্থ নেই। চিন্তা করতে করতে ধীরেন ভড় এগিয়ে চলল সুনীল রায়ের সঙ্গে দেখা করতে, সুনীল রায় যদি মেয়েটাকে বাগাতে পারে তা হলে একটা হিল্লে হয়।

কি ব্যাপার? সুনীল রায় বেরিয়ে এল কামরা থেকে। ধীরেন ভড়কে দেখে সে খুশী হয় নি।

একটা জবর খবর আছে ব্রাদার।

কি বল ত?

একটা মেয়ে আমাদের কম্পার্টমেন্টে রয়েছে, অদ্ভুত। আধবোজা চোখের একটা সরস ইঙ্গিত করল ধীরেন ভড়।

তুমি নতুন মেয়ে দেখলেই ত অদ্ভুত বল।

না না সুনীল, এ রকম ফিল্ম কেস এত দিনে একটাও দেখি নি, মাইরি বলছি, যদি বাগাতে পার তা হলে কেল্লা ফতে। কিছুদিন মৌজ করতে পারি। চল ভাই একবার।

এদিকে সামলাবে কে? ইসারায় সুনীল রায় হাসনুর দিকে দেখালে।

ছাড়পত্র নিয়ে এস না বাবা, কতক্ষণ আর লাগবে। এ রকম জিনিস হাতছাড়া করতে মায়া লাগছে ভাই। ধীরেন ভড়ের গলার স্বর যেন বেদনায় ভারী হয়ে গেল। সুনীল রায় অনুমতি নিতে ফিরে গেল হাসনুর কাছে, তার পর ধীরেন ভড়ের সঙ্গে চলল।

কেট্ ডগলাসও প্ল্যাটফরমে নেমে এগিয়ে চলল ইঞ্জিনটার দিকে। কেট্ খুব খুশী হয়েছে, সাড়ুজীর দয়ায় আবার তার শান্তি ফিরে আসবে। রবার্টকেও খবরটা জানাতে হবে, রবার্টও খুশী হবে নিশ্চয়ই। আবার সেই আকুলতাভরা সুন্দর সজীবতা ফিরে আসবে তাদের জীবনে।

নানুভাই দেশাই ভাবছেন তাঁর নিজের কথা। সুদূর গুর্জর দেশ থেকে যখন এই বাংলাদেশে বাবার সঙ্গে আসেন তখন তাঁর বয়স বছর বারো হবে। বড়বাজারে তাঁদের বাসনের দোকান ছিল। হ্যারিসন রোডের প্রান্তে ছোট বাসনের দোকান। ঝকঝকে সাদা পালিসকরা গেলাস, থালা, ডেকচি, হাঁড়ি থেকে সুরু করে টিফিনকেরিয়ার মায় চামচ পর্য্যন্ত। সামনে একটা ওজন করার জন্ত দাঁড়িপাল্লা ঝোলান। খরিদ্দারের পছন্দমত বাসন ওই পাল্লাতে ওজন করে সের হিসাবে দাম ঠিক করে বলতে হয়। ঝকঝকে বাসনগুলো নাড়াচাড়া করতে নানুভাইয়ের বেশ ভাল লাগত, টাকাপয়সা হিসাব করতেন ওঁর বাবা জীবনলাল দেশাই। বাবাকে মনে আছে নানুভাইয়ের, মাথার চুলগুলো পেকে গিয়েছিল, কিন্তু শরীর বেশ শক্ত ছিল। রোজ ভোরে গঙ্গা-স্নান করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পূজো করতেন তিনি। বেশ শান্ত প্রকৃতির ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন জীবনলাল। অপূর্ব্ব নিষ্ঠা ছিল তাঁর—কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি বৈষয়িক ব্যাপারে, কি ব্যবসায়ে। প্রত্যেকটি কাজই নিয়মিত ভাবে পরিপূর্ণ শক্তিতে করতেন তিনি। 'দিনগত পাপক্ষয়' গোছের ভাব ছিল না। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে ফলপ্রসূ করার সার্থকতা তিনি নানুভাইকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার নামই যে বাঁচা সেকথাও ছোটবেলা থেকে নানুভাই শিখেছিলেন। এখনও সেই মূলমন্ত্রই নানুভাইয়ের জীবনের ধ্রুবতারা বলা চলে। তার পর কত উত্থানপতনই যে তাঁর জীবনে এসেছে তার হিসাব রাখা শক্ত। বাবা মারা যাবার পর বাসনের দোকান তুলে দিতে হ'ল নানু-

ভাইকে, জীবনলালের দান এবং দেনা দুই-ই তার জন্তে দায়ী। গামছা কাঁধে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে নানুভাই তাঁর নিজস্ব ব্যবসা সুরু করেছিলেন। তার পর এক এক করে কত জিনিসই যে কেনাবেচা করলেন তার সমস্ত কথা এখন আর নানুভাইয়ের মনেই নেই। একদিন লক্ষ্মী প্রসন্না হলেন। এক-একটা বালু জমতে জমতে বিরাট পাহাড় হ'ল, ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে এখন বিরাট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। দিনের পর দিন তিনি সঞ্চিত করে এসেছেন প্রচুর ঐশ্বর্য্য আর মেদ। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর স্ফীত উদরের প্রতিযোগিতায় কাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায় তা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। বহুদিন পূর্ব্বেই বড়বাজারের একটা নোংরা গলিতে, ততোধিক নোংরা পরিবেশে নানুভাই তাঁর সংসার পেতেছিলেন, এখনও সেইখানেই বসবাস করেন তিনি, ব্যবসায়ের সুবিধা হয় অনেক, কারণ বাসার নীচেই তাঁর গদি আছে। অবশ্য আধুনিক রুচিসম্মত আপিসও ডালহৌসী স্কোয়ারে আছে। বড়বাজারের গদি আর ডালহৌসী স্কোয়ারের আপিস দুটোরই পৃথক কার্য্যকারিতা আছে, দুটোই সমভাবে লাভজনক। অন্য কয়েক জায়গায়ও তাঁর বাড়ী আছে, সেগুলো ভাড়া দিয়েছেন—অবশ্য একটি বাদে, সেটা হ'ল পানিহাটির বাগানবাড়ী দেশাই লজ। বাড়ীটা দেখবার মত—প্রকাণ্ড লন, মাঝে একটা ফোয়ারা, এক কোণে মালীর ঘর, সামনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রকাণ্ড হল, তার চার পাশে চারটে ঘর। হলঘরের সজ্জাটা অসাধারণ, সমস্ত মেঝে জুড়ে মোটা কার্পেট বিছানো, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাল ভেলভেটের তাকিয়া। প্রত্যেক দেওয়ালে প্রকাণ্ড আয়না টাঙানো—বিভিন্ন আকৃতির সেগুলো, কোনটা লম্বা কোনটা বা গোল। মেঝের যে কোন অংশ যে কোন অবস্থাতেই ছায়া প্রতিফলিত হবে আয়নার উপরে। সিলিঙে আগেকার ধরনের কয়েকটি ঝাড় টাঙানো, কিন্তু ভেতরে রয়েছে ইলেকট্রিক বাল্‌ব। দরজার গায়ে মোটা ভারী পর্দ্দা ঝোলান। দেশাই লজ নানুভাইয়ের প্রমোদ ভবন। অবসর সময় চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। মাসের মধ্যে দু'একটি শনিবারে দেশাই লজে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাগম হয়। বিভিন্ন আমোদপ্রমোদের মধ্যে ব্যবসা-সংক্রান্ত লেনদেনও সম্পন্ন হয়ে থাকে। মনোরম পরিবেশ মনকে যে দরাজ করে এ সংবাদ নানুভাই রাখেন।

নানুভাই সতৃষ্ণ নয়নে এবার দিকে আর একবার তাকালেন। টাকায় সব জিনিসই কেনা যায় একথা নানুভাই বিশ্বাস করেন। তাঁর জীবনে কয়েকবারই সে সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে।

মনে পড়ল কয়েক বৎসর আগের কথা, একটা মেয়ের ব্যাপারে বেশ জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পানিহাটিতে দেশাই লজে মেয়েটিকে আনা হয়েছিল। মেয়েটির নাম ছিল কৃষ্ণা, সে দুর্য্যোগের রাত্রের কথা মনে পড়ল নানুভাইয়ের। সে রাত্রে কয়েক জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিমন্ত্রণ ছিল দেশাই লজে। বেশ কিছু খরচ হয়েছিল নানুভাইয়ের, শুধু মেয়েটাকে বাগাতেই হাজারখানেক দিতে হয়েছিল। কৃষ্ণা নিজে হাত পেতে টাকাটা নিয়েছিল, মনে আছে।

বলেছিল, এত কম? কৃষ্ণা যেন আশ্চর্য্য হয়েছিল।

হাজার টাকা কম হ'ল, বল কি? আমি ত এর আগে একশ' দেড়শ'র বেশী দিই নি।

নানুভাই মিথ্যা বলেন নি, তবে একথাও ঠিক—সে এ ধরনের মেয়ে নয়—তারা সাধারণ মনোরঞ্জনকারিণীদের দলেই পড়ে।

বেশ তাই দিন। হাত পেতে টাকাটা নিলে কৃষ্ণা তার পর বললে, কখন আসবেন তাঁরা?

রায়বাহাদুর আসবেন সাতটার সময়, তার পর স্যার দেবীপ্রসাদ, সেনসাহেব, মুখার্জ্জী সাহেব সব একে একে আসবেন, সেই নাচটা হবে ত? বিগলিত ভাবে বললেন নানুভাই।

হ্যাঁ হবে বৈকি, নাচগান সব হবে। টাকাটা নিয়ে কৃষ্ণা ধীরেন ভড়ের হাতে দিয়ে বলল, আমার বাবাকে পৌঁছে দিন, পারবেন ত?

হ্যাঁ তা পারব বৈকি।

বাবার হাতের একটা রসিদও নিয়ে আসবেন।

ঘণ্টাখানেক পর ধীরেন ভড় ফিরে এল রসিদ নিয়ে, কৃষ্ণা বাবার হাতের লেখা রসিদটা ভাল করে দেখে নিল। হ্যাঁ বাবার হাতের লেখাই বটে। বাসকসজ্জা সম্পূর্ণ করতে গেল সে।

নানুভাই দু'হাত কচলে ধীরেন ভড়ের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললে, টাকাটা দিয়েছ ত? না নিজে মেরেছ?

না না, কি যে বলেন, ওর বাবা হ'ল গিয়ে আমার বিশেষ জানাশোনা।

ও তাই নাকি? তা বেশ—হ্যাঁ দেখ ত একবার হলঘরে গিয়ে সব রেডি কিনা।

ধীরেন ভড় হলঘর পর্য্যবেক্ষণ করে ফিরে এল, সব ঠিক আছে। রিপোর্ট দিল সে।

মুন্না এসেছে?

না, কৈ মুসাকে ত দেখলাম না—

দেখলাম না।—ভেংচি কাটলেন নান্নুভাই, তা হলে ককটেল করবে কে—তুমি? যাও—গাড়ী পাঠিয়ে দাও—কোন কাজ যদি তোমার দ্বারা হয়—আর হ্যাঁ শোন—

থমকে দাঁড়াল ধীরেন ভড়।

রান্নাঘরেও অমনি দেখে এস—

ধীরেন ভড় দ্রুত রান্নাঘরের দিকে গেল, কিরে লতিফ তোদের হ'ল?

হ্যাঁ বাবু, আমরা রেডি।

ওটা কিরে?

চিকেন রোষ্ট, একটু দেখবেন নাকি?

দে একটু চেখে দেখি। একটা প্লেটে একটু মাংস দিলে লতিফ।

নিন দেখুন টেষ্ট করে।

ধীরেন ভড় ধীরে ধীরে খাচ্ছে। মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে লতিফ। ধীরেন ভড়ের মন্তব্য শুনতে সে উৎসুক।

কি রকম হয়েছে বাবু? জিজ্ঞাসা করল সে।

ভালই! তবে কি রকম একটু যেন গন্ধ লাগছে।

হুঁ। কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লতিফ। তার সহকারী ইসাককে বলল, কিরে ইসাক, তখন বলি নি আমি যে অতটা পিঁয়াজ দিস না, দেখ এখন সাহেবরা কি বলেন।

খেতে খারাপ হয়েছে নাকি বাবু?

না খেতে ভালই হয়েছে।

আমতা আমতা করে বললে ধীরেন ভড়। নমুনা হিসাবে রোষ্টের পরিমাণ এত অকিঞ্চিৎকর ছিল তাতে কোন কারণেই রন্ধনকারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা চলে না। রুমালে হাত মুছে ধীরেন ভড় ককটেলবিশারদ মুসার সন্ধানে চলল।

কি ওস্তাদ, রোষ্টে অল্প কিছু দেবে নাকি? ইসাক জিজ্ঞাসা করল।

দুর, মাথা খারাপ নাকি, ও বাবু জীবনে কখনও রোষ্ট খেয়েছে?

এই দু'একবার যা পেসাদ পায়। উত্তর দিলে লতিফ, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল ওরা।

ধীরেন ভড় ফিরে গেল নান্নুভাইয়ের ঘরে। নান্নুভাই ইতিমধ্যে পোশাক পালটেছেন। গিলে করা পাঞ্জাবী, চুনোট করা ধুতি, হীরের আংটি ও বোতাম, গলায় সোনালী রঙের জরীর কাজ করা চাদর রয়েছে তার অঙ্গে। সযত্নে আতর মাখছেন নান্নুভাই গোঁফে কানে, গলায় ভলায়। অতঃপর হাতটা সোনালী চাদরের ওপর মুছলেন তিনি। নান্নুভাই বড় খুশী হয়েছেন, সুগন্ধি ও সুন্দর কাপড় মানুষকে প্রফুল্ল করে একথা তিনি স্বীকার করেন।

কি হে? হাসিমুখে তাকালেন তিনি ধীরেন ভড়ের দিকে।

মুসা ত এসে গিয়েছে। বললে ধীরেন ভড়।

হ্যাঁ সে খবর আধ ঘণ্টা আগে পেয়েছি। এতক্ষণ কি করছিলে?

এই মানে চারিদিক দেখে এলাম। তাড়াতাড়ি কথাটা বললে ধীরেন ভড়।

তোমার পাঞ্জাবীর ওপর মাংসের ঝোলের দাগ পড়েছে। ওটা ধুয়ে ফেল, খারাপ দেখাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখল পাঞ্জাবীর দিকে ধীরেন ভড়—ইস, সত্যিই ত! লতিফ কৃত কাউল রোষ্টের একটুকরো হয় ত তার অজান্তে কোনসময়ে জামায় পড়ে থাকবে। অপ্রস্তুত ভাবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ধীরেন ভড়।

পোর্টিকোতে রায়বাহাদুরের ক্যাডিলাক এসে গিয়েছে, নান্নুভাই ছুটলেন চাদর সামলাতে সামলাতে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। একে একে সকলেই এলেন—স্যার দেবীপ্রসাদ, সেনসাহেব, মুখার্জ্জিসাহেব, মিত্রা দেবী, আবদুল হাফেজভাই, বিশ্বনাথ আঢ্য, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি, কুমারস্বামী, লেডী কর্ম্মকার কেউ বাদ নেই, একেবারে জমজমাট ব্যাপার। কয়েকবার ককটেল দেওয়া হ'ল, পান-সিগারেট-চুরুট চলতে লাগল সমানে।

রায়বাহাদুর বললেন, দেশাই আর একটা কি যেন প্রমিস করেছিলে।

ও হ্যাঁ, এইবার হবে, এ রকম নাচ আপনি দেখেন নি রায়বাহাদুর—

তাই নাকি? রায়বাহাদুরের গালটা যেন শিরশির করে উঠল।

তবে আর বিলম্ব কেন?, কি বল হাফেজভাই।

বিশ্বনাথ আঢ্য লোহার ব্যবসা করলেও মনটা নরম, অনেক কালচারাল এসোসিয়েশনে সভাপতিত্ব করেছেন, সুতরাং চারুকলার যোগ্য সমজদার তিনি।

হাফেজভাই সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে, জরুর।

ধীরেন! নান্নুভাই ডাকলেন। ধীরেন এসে দাঁড়াল। একবার খবর দাও রুকুকে, আর কতক্ষণ ধরে সাজবে? ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নান্নুভাই।

নাচ এবং সাজ দুটোই ভাল হওয়া চাই দেশাই। মন্তব্য করলেন সেনসাহেব।

দেখুন—তার পরে বলবেন। নানুভাই হাত কচলালেন।

ধীরেন ভড় কৃষ্ণাকে ডাকতে চলল।

নানুভাই ঠিকই বলেছিলেন, কৃষ্ণা সাজছিল, অনেকক্ষণ ধরে যত্নসহকারে মনোহর বেশে সেজেছিল সে।

নাচতে সে খুবই ভাল জানে, আর শুধু নাচ কেন, সুন্দর চেহারার জন্ম খ্যাতিও তার কম নয়! কিন্তু অর্থের অভাব তাদের সংসারে। তিনটি ছোট ভাই, উপার্জ্জনহীন বৃদ্ধ বাবা। তার সৌন্দর্য্যের আর দেহের চাহিদাও কম নয়, তা সে জানে। আশপাশের পাড়াপড়শী থেকে সুরু করে আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত সকলেই সাহায্য করতে উন্মুখ, তার বদলে যে দাম তারা দিতে চায় সেটা কিন্তু সামান্য, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং নীলামে চড়াতে হ'ল তার দেহ-সুষমাকে। দেশাই সর্ব্বোচ্চ দাম দিয়েছেন সুতরাং—

ধীরেন ভড় দরজায় টোকা মারল। হাসি হাসি মুখ তার, বিচারকদের কাছে কৃষ্ণাকে হাজির করে আবিষ্কারক হিসাবে বাহাদুরী নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে তার। আবার জোরে কড়া নাড়ল—কড়াটা বেশ জোরে জোরেই নাড়ল। না হাসি মিলিয়ে গিয়েছে ধীরেন ভড়ের।

কি হ'ল কৃষ্ণা? এস, সকলেই এসে গিয়েছেন যে—

সকাতরে অনুনয় করল ধীরেন ভড়, কোন সাড়া নেই। ব্যস্ত হয়ে হলঘরে ফিরে গেল ধীরেন ভড়, নানুভাইয়ের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, কৃষ্ণা সাড়া দিচ্ছে না—

সে কি?

হ্যাঁ।

চল।

নানুভাই ও ধীরেন ভড় কৃষ্ণার ঘরে গেল, অনেক চেষ্টা করা হ'ল, কৃষ্ণা কিন্তু দরজাও খুলল না, সাড়াও দিল না। শেষ পর্য্যন্ত দরজা ভেঙে দেখা গেল, কৃষ্ণা শুয়ে আছে। সাপের মত বেণী, ফুলের মালা দিয়ে জড়ান এক পাশে ঝুলছে। পাতলা বেনারসী শাড়ী, ঘন লাল রঙের ব্লাউজ, পায়ে নূপুর, হাতে বাবার দেওয়া রুলিদুটো। কৃষ্ণা বিষ খেয়ে মরেছে।

অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম মেয়েছেলে! দাঁতে দাঁত দিয়ে চাপলেন নানুভাই। অনেকগুলো টাকা নিয়েছে, আরও যাবে ওই একটা মেয়েছেলের জন্যে। নানুভাইয়ের দেহ বিকল আক্রোশে আর ভয়ে অবশ হয়ে গেল।

বরাত জোরে রায়বাহাদুর আর স্যার দেবীপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন তাই কোন রকমে জিনিসটা ঢাকা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

নানুভাইয়ের মনে পড়ল সে সময় কি দুশ্চিন্তায়, অনিদ্রায় না তাঁর দিন কেটেছিল! পুলিসের ঝঞ্ঝাট ত বটেই তা ছাড়া তাঁকে বেশ কিছু টাকাও অপব্যয় করতে হয়েছিল:

কৃষ্ণা মেয়েটা অনেকটা এই ধরনের ছিল বলেই মনে হ'ল। তাড়াতাড়ি দৃষ্টিটা এধার দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন নানুভাই।

ব্রজেশ্বর ব্যানার্জ্জি একটু চিন্তিত হয়েছিলেন, হবারই কথা। বাসদেও শর্ম্মাকে না পাঠিয়ে বিজয়কে স্বামাজীবেশী নানকুর মত দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের কাছে পাঠিয়ে ভুল করলেন কিনা তাই চিন্তা করছিলেন তিনি। যদি কোন প্রকারে নানকু জানতে পারে যে, বিজয় তার পিছু নিয়েছে তা হলে তাকে ধরতে রীতিমত বেগ পেতে হবে।

চাদরটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ব্রজেশ্বরবাবু। এবার যেন একটু ঠাণ্ডা লাগছে তাঁর। সাবেংহাটি ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ করেছেন ব্রজেশ্বরবাবু, সেই সঙ্গে কলকাতায় সেন সাহেবকেও খবরটা জানিয়ে রেখেছেন। এসব কাজে তাঁর কোনদিনই খুঁত থাকে না। এখন ভালয় ভালয় জালটা গুটিয়ে তুলতে পারলে হয়। ব্যাপারটা মিটে গেলে তারপর বাড়ী যেতে পারলে বাঁচেন তিনি। বুড়ী মানে কল্যাণীর বিয়ের কথাটা যদি নৃপেশ ডাক্তারের ভাইয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে যায় তা হলে মাসখানেক ছুটির জন্যে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিতে হবে। বলা যায় না, কোন সময়ে আবার এই রকম একটা ঝামেলা এসে পড়তে পারে। মেয়ে সম্প্রদান করার সময় তিনি ত আর সে সব ছেড়ে, চোর-জোচ্চোরের পিছু ধাওয়া করতে পারবেন না। বেআক্কেলে ওপরওয়ালাদের কাছ থেকে সে সময়ে ও ধরনের আদেশ পেলেও আশ্চর্য্য হবেন না তিনি! বুড়ীর বিয়ের ব্যাপারে তাঁকে নিজেই সব করে নিতে হবে—তিনি ছাড়া অন্য লোক কোথায়? তাঁর এক শ্যালক অবশ্য আছে, তবে সে ভালোর চেয়ে খারাপই করতে পারে বেশী। বি-এ পর্য্যন্ত পড়ে তিনি গায়ক হয়েছেন। আধুনিক গায়কদের মধ্যে নাকি নাম আছে তাঁর। বুড়ী ত মামার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ।

ব্রজেশ্বরবাবুও শুনেছেন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তাঁর ভাল লাগে নি। যেমন গানের কথা তেমনি গানের সুর। দুনিয়ায় যত রকম ফুল আছে এক এক করে তার নাম উচ্চারণ, তৎসঙ্গে নীল আকাশ, পাহাড়, নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ক নানা অবাস্তব কথা আর পরিবেশে 'তোমায় আমায় আবার দেখা হবে' ইত্যাকারের স্তোক দেওয়া। সুরও তথৈবচ। আজকাল সুরকারেরা চালাক হয়েছেন, আধুনিক গানে তাঁরা মামুলী সুর সংযোজনা করেন

না, পাঁচমিশেলী করে দেন। ইংরেজী রেকর্ড থেকে নকল করে, দেশী ছাঁচে ফেলে সেটা চালিয়ে দেন। তাল, লয় সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ ওয়াকিবহাল তা নয়, তবে তাঁর মনে হয় ও জিনিসের রেওয়াজটা উঠে গিয়েছে। শ্রুত, অশ্রুত নানারকম যন্ত্র সহযোগে যে যত অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারেন তার মিউজিক তত নাকি বাহবা পায়।

সে যাই হোক, বুড়ীর বিয়ের ব্যাপারে শ্যালক মহাশয়ের হাতে কোন কাজের ভার দিলে বিপদ অনিবার্য্য, তার প্রমাণ তিনি আগেই পেয়েছেন। আরামবাগে তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধের সময় এই শালাবাবুকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন বাজার করতে। বাজার অবশ্য পৌঁছেছিল কিন্তু কাজের একদিন পরে। কোন রকমে অবশ্য ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন ব্রজেশ্বরবাবু, পরে শোনা গেল শালাবাবু নাকি নির্দ্দিষ্ট দিনটা ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর সেদিন রেডিওতে সিটিং ছিল কিনা সেই জন্য। ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে তাঁর, আজকালকার ছেলেদের এই রকম চরিত্রের শিথিলতা দেখে। তাঁর ছেলে নেই এক পক্ষে ভালই হয়েছে। গুণধর মাতুলের মত ওই রকম গায়ক হলেই ত চক্ষুঃস্থির হয়ে যেত। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল, তা ছাড়া ছেলে হলে ঝামেলার ঠেলায় অস্থির হতে হ'ত। তার চেয়ে এই বেশ, মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই ব্যাস, হাঙ্গামা মিটে গেল, ব্রজেশ্বর বাবু দু'খিলি পান মুখে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তির একটা নিশ্বাস পড়ল তাঁর।

ধীরেন ভড় সুনীল রায়কে নিয়ে বীরদর্পে ফিরে এল। একটা নতুন আয়ের পন্থা পাওয়া গেল বলে মনে মনে সে খুব খুশী।

সুনীল রায় কামরায় ঢুকে এষাকে লক্ষ্য করে চীৎকার করল, এষা তুমি ?

সুনীলদা আপনি ?

দুজনেই অবাক হয়ে গিয়েছে। একেবারে এষার পাশে গিয়ে বসল সুনীল রায়।

কোথায় যাচ্ছ ? প্রশ্ন করল সুনীল।

চাকরী করতে।

সে কি ?

কেন অবাক হবার কি আছে ? উত্তর দেয় এষা।

তা ঠিক অবাক আর কিছুতেই হওয়া উচিত নয়—

কেন ?

তুমি যে এ ট্রেণেই যাচ্ছ তা আমার ধারণাই ছিল না।

এখন এষার ভাল লাগছে, অনেকক্ষণ একলা চুপ করে বসেছিল সে। সুনীলদা আসাতে তার মনের অবশ ভাবটা কেটে গিয়েছে। এতক্ষণ গুমোট নিঃসঙ্গতায় হাঁফিয়ে উঠেছিল এষা। অনেক সময় সে লক্ষ্য করেছে সঙ্গীরা অকারণে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। হয় ত কোন দোষ নেই, ত্রুটিবিচ্যুতিও নেই অথচ সঙ্গটা বিষবৎ লাগে। পাশের পেটুক ভদ্রলোক বা ওদিকের বসা মাড়োয়ারী ভদ্রলোক কিংবা লাল হরিণ-মার্কা জামাপরা টেকো ভদ্রলোক তার কোনই ক্ষতি করে নি, কোন অসঙ্গত ব্যবহারও করে নি, কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছিল আর কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে থাকলে হয় ত ওর দমবন্ধ হয়ে যেত। এষা জানে কয়েকজন লোক আছে তাদের দেখলেই মনটা বিষিয়ে ওঠে আবার কেউ কেউ আছে তাদের প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে, আর ভাল না লাগলেও মনে এ ধরনের বিদ্রোহের ভাবটা নিশ্চয়ই আসে না।

সুনীলেরও ভাল লাগছে, হঠাৎ যেন স্বাভাবিক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে সে এসে পড়েছে। হাসনুর কাছে নিজের সত্তাকে লুকিয়ে যেন শুধু দেঁতো হাসিই হেসেছে এতক্ষণ, সে হাসির মধ্যে প্রাণ ছিল না। সান্নিধ্যে উত্তেজনা ছিল সত্যি কিন্তু মাধুর্য্য ছিল না। স্নায়ু অবশ করার সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদনা ছিল হয় ত কিন্তু দীপালোকে কোমলতা ছিল না। আর একটা সত্য সুনীল রায়ের কাছে প্রকট হয়ে উঠল। উদ্বেগজনিত পরিস্থিতি, মানসিক অশান্তি, একটানা উত্তেজনা, এত দিনের অস্বাভাবিক জীবনের অসারতা হঠাৎ তার কাছে যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল। সুনীল রায় যেন বিপদজনক ভাবে একটা গিরিবর্ত্মের একধারে এসে পড়েছে, নীচের খাদের ঘন অন্ধকারে আর ভয়াবহ গভীরতাটা আচম্বিতে তার কাছে যেন প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিভিন্নমুখী দুটো নারীর মন আর পরিবেশ সুনীল রায়ের নিজের মনকে চিনিয়ে দিলে যেন !

কি ভাবছেন সুনীলদা। এষা জিজ্ঞাসা করল সুনীল রায়কে।

ভাবছি এষা, এতদিন কি করেছি।

তার মানে ?

একটা সাংঘাতিক সত্যের মুখোমুখি এসে পড়েছি।

সাংঘাতিক সত্য ?

হ্যাঁ, সত্যের অজানা ভিন্ন রূপটা প্রকট হলে কোন কোন সময় সাংঘাতিক মনে হয় বৈকি।

হঠাৎ এষার মনে পড়ে গেল, মালতীদির কথা। এই লোকটাই তার স্নেহের বোনটিকে আঘাত দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে—তার আদরের হাস্যমুখী স্নেহময়ী মালতীদি। রাগে, দুঃখে, অপমানে এষার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল। চোখ জলে

ভরে এল তার, মুখ ফিরিয়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে।

এষা! ডাকল সুনীল রায়।

উঁ।

আমার ভুল কি আমি শোধরাতে পারি না? সুনীল রায়ের কণ্ঠস্বরে আকুলতা ফুটে উঠেছে অকস্মাৎ।

এষা তাকিয়ে দেখলে সুনীলের দিকে, তার পর প্রশ্ন করল, কি হয়েছে সুনীলদা?

ওই ত বললাম—

কিন্তু একথা কি আগে কোনদিন ভাবেন নি?

হ্যাঁ ভেবেছি, কিন্তু ভুল করছি বলে ত মনে হয় নি, এমনকি এই কামরায় ঢোকবার আগের মুহূর্ত্তেও মনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি আমার।

তবে অনুশোচনায় পরিবর্ত্তন হ'ল নাকি? এষার কথায় শ্লেষের আভাস রয়েছে।

না, অনুশোচনা নয়। যখনই এ ধরনের কাজ করেছি উন্মুক্ত মন নিয়েই করেছি। তুমি বোধ হয় জান না, এটা শুধু আমার নেশা নয়, পেশাও বটে।

অবাক হ'ল এষা, বলল, পেশা?

হ্যাঁ, কিন্তু সে পেশার পিছনে যে একটা ভীষণ আত্মঘাতী পরিণতি আছে সেটা আগে কোনদিন অনুভব করিনি, এমনকি বিশ্বাসও করি নি। হাস্যকর নীতিবোধকে অবহেলাই করেছি সুখ আর সম্ভোগের পরিপন্থী বলে। এর সঙ্গে কোনদিন সত্যের এত স্পষ্ট রূপটা ধরা পড়ে নি আমার কাছে।

তা হলে বোধ হয় ভয় পেয়েছেন সুনীলদা। এষার ব্যঙ্গটা এবারে সুস্পষ্ট।

হ্যাঁ, তা পেয়েছি। পাল্লার একদিকে ভার চাপিয়ে তাকিয়ে খুশী হয়েছিলাম এতদিন, অপর পাল্লাটার ওপর নজরই পড়ে নি। সেটা যে আপেক্ষিক লঘুত্বের জন্য অকেজো হয়ে গিয়েছে কিংবা গোটা দাঁড়িপাল্লাটাই যে হুড়মুড় করে একদিন ভেঙে পড়বে এ সম্ভাবনার কথা আগে মনে আসে নি—তা ছাড়া এ শুধু ভয় নয় এষা, তোমার আর হাসনুর মধ্যে বিরাট পার্থক্যটাও হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। নিজের মনের কথাটা বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল সুনীল রায়।

হাসনু কে সুনীলদা?

ফিল্মের শ্রীলেখা দেবী, তাকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম।

সে কি?

শুধু তাই নয়, আপিসের সত্তর হাজার টাকাও আত্মসাৎ করেছি সেই সঙ্গে।

সুনীলদা! অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠল এষা।

ভয় পেও না এষা।

তা হলে কি হবে?

আর্ত্তস্বরে প্রশ্ন করল এষা, সুনীল রায় হাসল। বলল, কেন ভালই ত হবে, এত দিনে তোমাদের দুঃখের অবসান হবে, দুর্বৃত্তের দমন হবে। কিন্তু তার জন্যে আমি চিন্তিত নই—আমি ভাবছি মালতীর কথা। আবার হাসল সুনীল রায়, তুমি বোধ হয় আমার সুবুদ্ধির আকস্মিক আগমনে আশ্চর্য্য হচ্ছ?

মনের পরিবর্ত্তনের কথা এখন কি করে বুঝব?

সারেংহাটি স্টেশনের পুলিসের কাছে সারেণ্ডার করার পর হয় ত বুঝতে পারবে।

সে কি? চমকে উঠল এষা।

এটার দরকার আছে এষা, জিনিসটা শেষ করতে চাই তাড়াতাড়ি।

না। দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে এষা, কর্ত্তৃত্বের ভার আর দায়িত্ব নিল সে।

কেন?

আমায় আগে ভাল করে বুঝতে দিন ব্যাপারটা।

বোঝবার কি আছে, আপিসের টাকা চুরি করে পালাচ্ছি আর সঙ্গে রয়েছে ফিলমস্টার শ্রীলেখা—এত খুব সহজ ব্যাপার। কথাটা বলে সুনীল রায় তাকাল এষার দিকে।

তা হোক, আপনি এখন কিছু করতে পারবেন না। আদেশ করল এষা।

তবে কি করব বল?

সারেংহাটি ষ্টেশনে আমরা দুজনাই নেমে যাব।

তার পর?

তার পর টেলিগ্রাম করব, কলকাতা পুলিসের অনিল সেনকে। তার আগে আপনি এ গাড়ী থেকে যেতে পারবেন না।

বেশ তাই হবে।

ভাল হয়ে বসল সুনীল রায়, সমস্ত জিনিসটার যেন মীমাংসা হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। সব অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। সুনীল রায়ের মাংসপেশী আর স্নায়ুতন্ত্রী কঠিন নিষ্পেষণ থেকে সহসা যেন মুক্তি পেয়েছে, বেশ হালকা লাগছে তার—ঠিক যেন মুক্ত হাওয়ার মত হালকা, মনের মধ্যে যে তুফানের সৃষ্টি হয়েছিল, এতক্ষণে সেটা যেন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। একটা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক চাপ পড়েছিল তার স্নায়ুর ওপর, এবার সেটার তীব্রতা অনেক কমে গিয়েছে। বিভিন্ন উত্তেজনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার

শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন ফিরে আসছে তার মনের সজীবতা। হঠাৎ নজর পড়ল ওধারে বসা ধীরেন ভড়ের ওপর। ধীরেন ভড় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

সুনীল রায়ের সঙ্গে মেয়েটার আলাপ আছে দেখে খুশীই হ'ল ধীরেন ভড়। ট্রেণের শব্দে ওদের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না বটে, তবে এককালে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলে মনে হ'ল। যাক, মেয়েটাকে তা হলে বাগানো যাবে—আত্ম-প্রীতিতে মনটা ভরে উঠল তার। ইসারায় সুনীল রায় ধীরেন ভড়কে ডাকল।

মৃদু আপত্তির সুরে অস্পষ্টভাবে এষা বলে উঠল—ওঁকে আবার ডাকছেন কেন?

তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে।

লোকটা কিন্তু ভাল নয়।

কেন?

না কোন কারণ নেই, তবু যেন ভাল লাগছে না—

ধীরেন ভড় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত ধীরেন ভড়, দেশাই কোম্পানীর ফিলম ডাইরেক্টর। পরিচয় করিয়ে দিলে সুনীল রায়।

নমস্কার। বিগলিত ভাবে বললে ধীরেন ভড়।

আর ইনি এষা চৌধুরী, আমার একমাত্র শ্যালিকা।

সুনীল রায় আলতো ভাবে শেষের কথাটা উচ্চারণ করলে।

অ্যাঁ। ধীরেন ভড় যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

হ্যাঁ। আবার সুনীল রায় বললে, আমার একমাত্র এবং নিজস্ব শ্যালিকা।

অঃ! ধীরেন ভড় এতক্ষণে বিশ্বাস করেছে, কিন্তু বিস্ময়প্রসূত মুখের 'হাঁ'টা এখনও বন্ধ হয় নি।—ইয়ে, আলাপ করে খুশীই হলাম। অবশেষে আমতা আমতা করে বললে ধীরেন ভড়, তাড়াতাড়ি ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়।

বেলুনটা চুপসে গেল। এষার দিকে তাকিয়ে সুনীল রায় ধীরে ধীরে বললে। এতক্ষণে বোধ হয় সুনীল রায়ের মনের স্বাচ্ছন্দ্যটা ফিরে এসেছে।

সে আবার কি? রহস্যটা বুঝতে পারে না এষা।

আছে, পরে বলব। কারণটা ঠিক প্রকাশযোগ্য নয় বলে চুপ করে গেল সুনীল রায়।

সুনীল রায় ও এষার পাশে বসে রয়েছেন ব্রজেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়। ওদের কথোপকথনের কিছুটা অংশ কানে গিয়েছে তাঁর। তাজ্জব ব্যাপার! পাশের মেয়েটি যে ওই চোরটার শ্যালিকা তা তিনি ধারণাই করতে পারেন নি, আরও আশ্চর্য্যের কথা হ'ল, তারা যে একই ট্রেণে ভ্রমণ করছে পরস্পর তাও জানে না। সুনীল রায় অবশ্য ঘটা করে সকলকে জানিয়ে আসতে পারে না, কারণ পলায়নটা যত গোপনে হয় ততই তার পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু লোকটা এ কম্পার্টমেণ্টে আসায় একটু বিপদ হ'ল তার। ব্রজেশ্বর বাবু দুজনকে একই কামরায় নজরবন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন স্বামীজী ওরফে নানকু এক জায়গায় আর সুনীল রায় অপর জায়গায় থাকাতে অসুবিধার সম্ভাবনা রয়ে গেল। বিজয় অবশ্য নানকুর ওপর নজর রেখেছে, আবার কোন ঝামেলা না করে। সুনীল রায়কে ধরায় কোন ঝঞ্ঝাট হবে বলে মনে হ'ল না। হয় ত একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। এতগুলো লোকের সামনে, বিশেষতঃ শ্যালিকার সামনে, গ্রেপ্তার করতে গিয়ে হয় ত নিজেই লজ্জায় পড়ে যাবেন। কিন্তু কি আর করবেন কোন উপায় নেই। তাঁকে তাঁর কর্ত্তব্য করতেই হবে, তা সে যত অপ্রিয়ই হোক না কেন। আর এ রকম অপ্রিয় কাজ তাঁকে কয়েকবারই করতে হয়েছে, এ বিষয়ে পুলিসের কাজ ডাক্তারদের কাজেরই অনুরূপ। ডাক্তার যখন তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে দেহের বিষাক্ত অংশটা অনায়াসে বাদ দিয়ে দেন তখন তার পেছনে রুগীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই থাকে, সমাজকে নির্দ্দোষ ও পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য তাঁদেরও এ সব করতে হয়। ব্রজেশ্বরবাবু পরবর্ত্তী ছবিটা মনে মনে কল্পনা করে নিলেন।

আপনার নাম?

আমায় বলছেন? হয় ত সুনীল রায় আশ্চর্য্য হবে।

হ্যাঁ।

আমার নাম সুনীল রায়, কিন্তু কেন বলুন ত?

আপনি কি গ্রেসাম জোন্‌সে কাজ করেন?

তখন সুনীলের মুখটা নিশ্চয়ই পাংশুবর্ণ হয়ে যাবে। না-বোঝার ভান করতে পারে, ভ্রুকুঞ্চিত করে হয় ত বলতে পারে, কেন বলুন ত?

আমি পুলিসের লোক।

ব্রজেশ্বরবাবুকে তখন নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বলবেন তিনি, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। তার পর হয় ত আর কোন আপত্তি উঠবে না। মেয়েটি তখন কি করবে কে জানে? চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাবে, না শান্ত হয়ে আঘাতটা গ্রহণ করবে?

আসামী সুনীল রায়ের দিকে তাকালেন ব্রজেশ্বরবাবু।

সুনীল রায় শ্যালিকার সঙ্গে প্রাণখুলে নিশ্চিন্তমনে আলাপ করছে। সত্যিই নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুনীল রায়।

এষাকে বলছিল সে, তুমি একলা যাচ্ছ কেন?

দোকলা পাব কোথায়? হাসল এষা।

কেন সেই যে— । সুনীল রায় নামটা ঠিক মনে করতে পারছে না।

কে?

কি যেন নামটা—হাঁা হ্যাঁ—সঞ্জীব— সঞ্জীব দত্ত—

কেন, সে যাবে কেন আমার সঙ্গে?

যাবে না?

না।

কেন আপত্তি কিসের?

কি মুশকিল, তার ত অন্য কাজ থাকতে পারে, আর তা ছাড়া আমি যাচ্ছি চাকরী করতে, সে যাবে কোথায়?

তোমার চাকরী করতে। রসিকতা করলে সুনীল রায়।

হাসল এষা। কতদিন বাদে সুনীলদা আবার স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গে কথা বললেন। ঠিক এই স্বাভাবিকতাটা যদি সুনীলদার বজায় থাকে তা হলে আবার মালতীদিকে ফিরে পাবে তারা।

সঞ্জীব এলে আপনার আর কি লাভ হ'ত? একটু হেসে বলল এষা।

আর কিছু না হোক একটু আড্ডা জমান যেত, ওখানের লোকগুলোর সঙ্গে ঠিক জমানো যাচ্ছে না—

কেন?

বলছি শোন—এক নম্বর হ'ল স্বামীজী, তিনি পাশে একটা বোঁচকা নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝে অন্য যাত্রীদের হস্তরেখা বিচার করে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করছেন বা মাদুলী গছাচ্ছেন। দু'নম্বর হলেন একটা মোটা মেম সাহেব—পরিধি প্রায় ধীরেন ভড়ের মতই হবে, বোধহয় এংলো-ইণ্ডিয়ান—তিনি ত সাভুজীর নামে ঢোক গিলছেন—তৃতীয় জন হ'ল একজন গুণ্ডা—

গুণ্ডা?

মানে গুণ্ডা কিনা জানি না, তবে চেহারা দেখলেই তাই মনে হয়, তিনি একটা খবরের কাগজে মুখ লুকিয়ে অন্য লোকের ওপর নজর দিচ্ছেন।

কেন?

বদ মতলব আছে নিশ্চয়ই। তারপর চতুর্থ নম্বর একজন কবি।

কবি?

নির্ঘাৎ—

কি করে বুঝলেন?

লক্ষণ দেখে আবার কি। হাতে খাতাকলম, ঘন ঘন জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে আর কি যেন লিখছে, গোঁফদাড়ি কামানো, মাথার চুলটা তোলা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা—চোখ দুটো সর্ব্বদাই আধবোজা ভাব, কবি না হয়ে যায় না।

তা হলে কি—

সুটকেসে লেখা আছে কে সরকার।

তা হলে নিশ্চয় কমলাকান্ত সরকার—

চেন নাকি?

হাঁ, পোষ্ট গ্রাজুয়েটে পড়তেন ভদ্রলোক। সঞ্জীবের কাছে ওর কথা প্রায়ই শুনেছি। রেবা বলে একটি মেয়েকে ভালবাসতেন ভদ্রলোক, কিন্তু মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল অন্য জায়গায়—বোধ হয় মালদহে এক উকিলের সঙ্গে, কিছুদিন পরে রেবা বিধবা হ'ল।

ইস্, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তার পর?

তার পর শুচিবাইগ্রস্তা শাশুড়ীর পাল্লায় পড়ে, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে অবশেষে শুনলাম নার্স হয়ে রেলওয়ে না কোন হাসপাতালে যেন কাজ নিয়েছে।

এই সেই কমলকান্ত? জিজ্ঞেস করল সুনীল রায়।

হ্যাঁ।

তা হলে ত তোমায় ও কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে একবার দেখা করতে হয়।

কথাটা বলেই সুনীলের মনে পড়ল ও কামরায় আরও একজন আছে—হাসনু। সঙ্গে সঙ্গে একটু অপ্রস্তুত আর লজ্জিত হয়ে পড়ল সে।

সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ ঘনিয়ে এল এষার মনে, সুনীলের দিকে একবার তাকাল সে। এত তাড়াতাড়ি কি মানুষের স্বভাব পরিবর্ত্তন সম্ভব? হয় ত সম্প্রতি কোন কারণে এ জীবনে অরুচি কিংবা বিপদের সামনে এসে একটু বোধ হয় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—তা হোক, দেখা যাক সারেংঘাট ষ্টেশনে গিয়ে কি হয়। চিন্তাটা মনে আসতেই এষা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

রবীন সরকারও গম্ভীর ভাবে তাকিয়েছিল ওদের দিকে। হঠাৎ লোকটা কোথা থেকে এসে মেয়েটার সঙ্গে দিব্যি আলাপ জমিয়ে তুলেছে। অবশ্য তার কিছুই নয়—তবুও

রবীনের কেমন যেন খারাপ লাগছিল। খারাপ লাগার কারণটা রবীন ঠিক বলতে পারে না, তবে সে লক্ষ্য করেছে ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে আগন্তুকের ওপর সে অকারণে বিরক্ত হয়ে ওঠে। আসল কথা সে একটু হিংসুক—ইংরেজীতে যাকে বলে জেলাস, তাই। এজন্যে কয়েকবারই সে লজ্জায় পড়েছে—যেমন এই মাস দুই আগের ব্যাপারটা ঘটেছিল—

সেদিন রবিবার ছিল। পাশে রামধন মুস্তফীর বাড়ীতে মীরা গিয়েছিল বেড়াতে। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, মিণ্টু ঘুমিয়ে আছে। পাশে রাখা সেই ঘোড়াটার গায়ে একটা হাত রাখা—মা যেমন শোবার সময় তার গায়ে একটা হাত রাখেন ঠিক সেই রকম ভঙ্গীতে। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হ'ল, দরজাটা খুলে দিয়ে এল রবীন। হ্যাঁ, মীরাই বটে! মাথায় ছাতা ধরে আছে রামধন মুস্তফীর বড় ছেলে সুধীর মুস্তফী—রেণুর দাদা। ফিরে এসে নভেলটা আবার তুলে নিলে রবীন। দরজাটা বন্ধ করে মীরা মন্তব্য করলে, বাবা, যা বিষ্টি।

কোন জবাব নেই, মন্তব্যের সমর্থনও এল না রবীনের কাছ থেকে।

মিণ্টু ওঠে নি ত? জিজ্ঞেস করল মীরা।

উত্তর নেই, রবীন যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইটা পড়ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা অক্ষরও এগোয় নি তার।

কি হ'ল? কাছে এসে মীরা রবীনের গায়ে হাত রাখলে।

কৈ, কিছু হয়নি ত। রবীনের নির্ব্বিকার ভঙ্গীটা সন্দেহজনক।

বুঝেছি।

কি?

আসতে দেরী হয়েছে বলে বিরক্ত হয়েছ?

আমার বিরক্তিতে তোমার কি এসে যায়? রবীনের স্বর ভারাক্রান্ত।

কি করব বল? রেণু কিছুতেই ছাড়ল না, পুরো গানটা তুলে দিয়ে তবে ছুটি পেলাম—

হুঁ—

কথা বলছ না যে? মীরা ওর বিরক্তির কারণটা জানতে চায়।

ঘরেবাইরে ত অনেক কথা শুনলে, বললে, তাতেও সাধ মিটল না?

তার মানে? এবার বিরক্ত হয়েছে মীরা ইঙ্গিতটায়, তীক্ষ্ণতা স্পর্শ করেছে তাকে।

মানে ত খুবই স্পষ্ট। মুস্তফীর বাড়ীতে আড়াই ঘণ্টা গল্প করে এলে, তার পর বাইরেও কতক্ষণ তার ঠিক নেই—

বাইরেও?

হ্যাঁ ওই যে ছত্রধারকের সঙ্গে—

ও ত রেণুর দাদা।

তাই নাকি? তা হলে ত কথাই নেই, একেবারে নিকট-আত্মীয় বলা যায়। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা রবীনের স্বরে স্পষ্ট।

তা কেউ বলেনি। মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে মীরা।

না বলে নি, তবে ব্যবহারে তাই প্রকাশ পায়। চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলে রবীন।

ব্যবহারে?

হ্যাঁ, ওই যে আত্মীয়সুলভ ব্যবহার। মাথায় ছাতা ধরে, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে সযত্নে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন।

দেখ! কয়েক পা এগিয়ে এল মীরা।

বল। মুখ তুলে চাইল রবীন।

অসভ্যতা করো না।

অসভ্যতা?

হ্যাঁ, তোমার ইঙ্গিতটা খুব ভদ্র নয়। মুখটা আরক্ত হয়ে উঠেছে মীরার।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, কোন ভদ্রলোক যদি একজন মহিলাকে এভাবে সাহায্য করেন তাতে ও ধরনের ইঙ্গিত করার কোন কারণ নেই।

তা ঠিক, তবে ওর জন্যে ভদ্রলোকের সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুস্তফীর বাড়ীতে কি চাকরের অভাব আছে?

অভাব নেই, তবে ভদ্রলোক বেরুচ্ছিলেন—

সুতরাং তোমায় সঙ্গদানে কৃতার্থ করলেন।

মীরা উত্তর না দিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা অবশ্য সেই রাতেই মিটে গিয়েছিল স্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। না, স্ত্রীকে সন্দেহের কথা নয়, তবে রবীনের ওদিক দিয়ে সহ্যশক্তি কম। মীরাও সামনাসামনি আপত্তি জানিয়েছে, প্রতিবাদ করেছে, বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু রবীনের স্বভাবটা থেকেই গিয়েছে।

এখা এবং ঐ ভদ্রলোকের সম্পর্কের কথা যখন তার কানে পৌঁছল তখন রবীন যেন নিজের উপরই একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

ক্রমশঃ

নববর্ষ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হইল। অন্যান্য আর সকল উৎসবের ন্যায় ইহাও আজ প্রাণহীন আড়ম্বরসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছে, পার্কে পার্কে কুচকাওয়াজ এবং কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বর্ষবন্দনা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আমরা নববর্ষ পালন করিলাম।

নূতন বর্ষে পুরাতন বৎসরের সকল দুঃখ-বেদনা বিস্মৃত হইয়া নবজীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আমরা প্রতি বৎসরই পুরাতন বৎসরের দুঃখ-বেদনার জের টানিয়া লইয়া চলিতেছি, আমাদের সমস্যাজর্জরিত জীবনে অভাব-অনটনের যেন আর শেষ নাই।

স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাহার প্রকৃত আস্বাদ সমগ্র জাতি এখনও পায় নাই; তাই অন্যান্য বহু দেশে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে তাহার লেশমাত্র ভারতবর্ষের পূর্ব-প্রান্তশায়ী এদেশের নববর্ষে লক্ষিত হয় না, বাঙালী তাহার প্রাত্যহিক জীবন লইয়া আজ এতই বিব্রত যে, কোন বিশেষ দিনের আবেদন তাহার হৃদয়ে আর পৌঁছায় না; রোগ, শোক, বেকারী এবং দারিদ্র্যজর্জরিত বাঙালীর জীবন আজ যেন একটা বিরাট নিস্তব্ধ শোক-মিছিলের ন্যায়। দিশাহারা বাঙালী পথ হারাইয়া অন্ধকারে মুহ্যমান নববর্ষের শুভলগ্নে নবজীবনের অঙ্গীকার গ্রহণের মানসিক সামর্থ্য আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

গ্রাম বাংলার পথে-প্রান্তরে অভাবের ধূলিঝঞ্ঝা উড়িতেছে, পুষ্করিণীতে জল নাই, ক্ষেতে ফসল নাই, ধান্যের মূল্যের ক্রম-উর্ধ্বমান গতি সবকিছু মিলিয়া পল্লীজীবনের সকল স্বাভাবিকত্বকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; চতুর্দিকেই 'নাই নাই' রব। সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় এতই সীমিত যে তাহা অনুভূতই হইতেছে না।

জাতির দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য নানা কল্যাণকর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এমন ভাবে কার্যে পরিণত হইতেছে যে, যাহা সমগ্রের সমৃদ্ধির জন্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের সুখভোগ হইতেছে। বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হইতেছে তাহার এক বৃহৎ অংশ কোন্ অন্ধকার পথে যে অন্তর্হিত হইতেছে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার হদিস পাওয়া সম্ভব নহে।

জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে কেবল সরকারের সমালোচনা করিলে অবশ্য ফল হইবে না, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদেরও যে কর্তব্য আছে তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, আপন স্বার্থচিন্তায় আমরা সকলে এত অধিক নিমগ্ন যে, কোনক্রমেই বৃহত্তর কোন আদর্শের কথা আমরা ভাবিতেই পারিতেছি না; যে কোন প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জন মিলিতেছি সেখানেই পাঁচটি পৃথক মত লইয়া পরস্পর মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছি; সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারেই ইহা আজ এত বেশী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন কল্যাণকর কার্যে অগ্রসর হওয়া আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সরকারী ঔদাসীন্য এবং আমাদের জাতিগত দুর্বলতা উভয় মিলিয়া আজ আমাদের বর্তমান দুরবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা দূর করিতেই হইবে। নববর্ষের সূচনায় আমাদের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে নূতন ভাবে জাতীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিবার; জাতির সমবেত অঙ্গীকার যদি কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় তাহা হইলে সরকারী শৈথিল্য দূর হইয়া যাইবে, আমরা নববর্ষে প্রার্থনা করিব, আজিকার জাতীয় সঙ্কট যেন আমাদের অন্ধকার উত্তীর্ণ হইবার সাহস প্রদান করে;
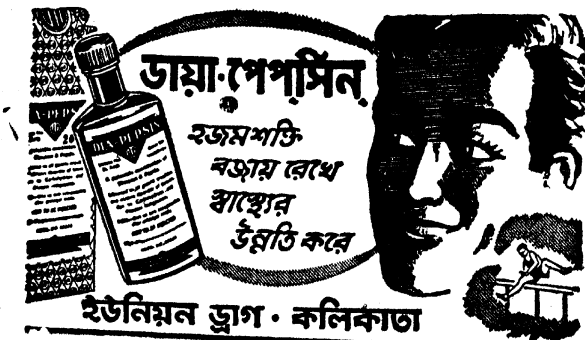
ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আর্য্যভট্ট

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বাগল

ইউরোপের নবজ্ঞানের অভ্যুদয় যে সময় আরম্ভ হয় নাই, পশ্চিমাকাশ যখন অন্ধকারে মগ্ন সেই সময় ভারতের পূর্ব্বদিগন্তে বালার্কের কিরণ দেখা দিল। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন আর্য্যভট্ট—৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কুসুমপুরে—বর্ত্তমান পাটনায়। আর্য্যভট্ট ইউরোপের কোপানিকাসের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ 'আর্য্যভট্টতন্ত্রে' প্রকাশ করিলেন। অল-বিরুণীর ভারত সম্পর্কিত ইতিহাস পড়ে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যভট্টের জন্ম কুসুমপুর, বর্ত্তমান পাটনায়। তাঁহার সময় কুসুমপুর ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। রাজধানী কুসুমপুরে নানাশাস্ত্রের পণ্ডিত এবং গুণীজনের সমাবেশ হইত। এইভাবে ভারতবর্ষের রাজধানীসমূহ, উজ্জয়িনী ও ভোজরাজের রাজধানী ধারানগরীতে বিদ্বান এবং গুণীব্যক্তিগণের সমাবেশ হইত। আর্য্যভট্টের সময় ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভাস্করাচার্য্যের সময় ১১শ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে শিক্ষাসংস্কৃতির এক গৌরবময় যুগ ছিল। তখনকার যুগে ভারতের জাতীয় জনচিত্ত বর্ত্তমান যুগের ন্যায় যন্ত্রচালিত কৃত্রিম সভ্যতায় মোহাসক্ত ছিল না। আড়ম্বরহীন সাধু ও সরল জীবনযাত্রার ভিতরে লোক-প্রীতির সাধনা—সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা করা হইত। সেই যুগের কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, সংস্কৃত ভাষায় কাব্য, রাজাদিগের কীর্ত্তিগাথা শ্রবণে ও অধ্যয়নে আজিও ভারতবর্ষের জনচিত্ত মহান্ গৌরবে গর্ব্বান্বিত হয়। আর্য্যভট্ট ছিলেন মৌলিক গবেষক, পক্ষান্তরে তাঁহার পরবর্ত্তী কালের বরাহমিহির ছিলেন গ্রন্থের সার সঙ্কলয়িতা। আর্য্যভট্ট পঞ্চম শতাব্দীতে—"মৃজ্জলশিখীবায়ুময়ো ভূগোল সর্ব্বতোবৃত্ত"—পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ প্রথম ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় সহস্র বৎসর পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কোপানিকাস সাহেব পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ ইউরোপে প্রকাশ করিলেন। আর্য্যভট্ট-রচিত আর্য্যভট্টতন্ত্রের গীতিকাপাদে পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্পর্কিত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্য্যভট্ট প্রথম বয়সে 'আর্য্যভট্টতন্ত্র' রচনা করেন, তার পর বৃদ্ধ বয়সে ঐ গ্রন্থের সংস্কার করিয়া 'আর্য্যভট মহাসিদ্ধান্ত' নামকরণ করিলেন। সেইজন্ত সম্ভবতঃ পণ্ডিতগণের ভিতরে আর্য্যভট্ট এবং বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট একই ব্যক্তির দুই নামের প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আর্য্যভট্ট সম্পর্কে দ্বিমত প্রাধান্য থাকিলেও, পণ্ডিতগণ বলেন যে, আর্য্যভট্টের যৌবনকালের গ্রন্থ আর্য্যভট্টতন্ত্র এবং বার্দ্ধক্যের সংস্কারের গ্রন্থ 'আর্য্য-মহাসিদ্ধান্ত'। ডক্টর থিবো আর্য্যভট্ট সম্পর্কে বলেন যে, আর্য্যভট্টই সর্ব্বপ্রথম ক্যালকুলাস-এর সূক্ষ্ম গণিত প্রয়োগ করেন। ইহা ব্যতীত তিনি প্রথমে পৃথিবী নিজ অক্ষরেখায় দৈনিক আবর্ত্তিত হয় বলিয়া দিবারাত্রির কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। ক্যালকুলাস গণিতের আবিষ্কার সম্পর্কে আর্য্যভট্টের আর্য্যমহাসিদ্ধান্ত, মুঞ্জালভট্টের লঘুমানস, ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে ক্যালকুলাস গণিতের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের পশ্চিমমুখী চিন্তানায়কগণ বলেন যে, ক্যালকুলাস গণিতের আবিষ্কর্ত্তা 'স্যার আইজ্যাক নিউটন' সাহেব। ইতিহাসের ক্রমগতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিউটন সাহেবের ক্যালকুলাস গণিতের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণ ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। স্যার আইজ্যাক নিউটনের জন্ম ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর। পক্ষান্তরে আর্য্যভট্ট ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ, মুঞ্জালভট্ট ৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ, ভাস্করাচার্য্য ১১শ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। আর্য্যভট্টের মহাসিদ্ধান্ত, মুঞ্জালের লঘুমানস, ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থসমূহ নিউটনের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থসমূহে ক্যালকুলাস গণিতের প্রয়োগ রহিয়াছে।

ভূ-ভ্রমণ প্রসঙ্গ :—আর্য্যভট্ট রচিত আর্য্যভট্টতন্ত্রের গীতিকাপাদের ১ম শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, ৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষে এক চতুর্থ যুগে পৃথিবীর গতি সম্ভূত ভ-গণ ১৫৮,২২,৩৭,৫০০ সংখ্যক বৎসর, মাস, দিনে হয়—সূর্য্যের নহে। তারপর পৃথিবী ঘূর্ণনের দ্বিতীয় প্রমাণ ঐ গ্রন্থের ৯ম শ্লোকে সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

অনুলোম গতি নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদবৎ,

অচলানি ভানি (নক্ষত্রসমূহ) তদবৎসম পশ্চিম গানি লঙ্কায়াম্।

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ: কোন নৌকারোহী সম্মুখদিকে (অনুলোমগতি) নৌকা গমনের সময় আরোহী যেরূপ নদীর উভয় তটে অচল বা স্থির দণ্ডায়মান বৃক্ষসমূহ পিছন দিক (বিলোম গতি) বা পশ্চিম দিকগামী বলিয়া দেখেন, তদনুরূপই পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য নিরক্ষদেশ লঙ্কায় অচল বা স্থির নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমে দৃষ্ট হয়। এই উক্তির পরে আর্য্যভট্ট তাঁহার গ্রন্থের গোলপাদের ১০ম শ্লোকে এই বিষয় অধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ দিলেন।

উদয়াস্তময় নিমিত্তং প্রবহেন* বায়ুনাক্ষিপ্তঃ,

লঙ্কাসম পশ্চিমগো ভ পঞ্জরঃ স গ্রহো প্রমতি।

ভাবার্থ: রব্যাদি গ্রহগণ উদয়াস্তের জন্ম নক্ষত্রগোলক প্রবহ নামক বায়ু দ্বারা সদা-তাড়িত বা আক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহগণের সঙ্গে সমবেগে পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই উক্তিসমূহের সাক্ষ্য করিয়া সংশয় না রাখিয়া বলা যায় যে, আর্য্যভট্টই পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে কোপানিকাসের পূর্ব্বে পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্পর্কে স্বকীয় মতবাদ ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আর্য্যভট্টের সমসাময়িক ভারতীয় জ্যোতিবিদগণ এবং তার পরবর্ত্তী খ্রীষ্টের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ আর্য্যভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বিভ্রমে পতিত হইয়া উহার বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বরাহমিহির, প্রথমে আর্য্যভট্টের পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদের বিরুদ্ধাচারণ করিলেন। বরাহের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বরাহ বলিতেছেন—পৃথিবী যেন একটি ঘূর্ণমান ভূ-চক্রে (নক্ষত্রগোলক বা রাশিচক্রে) স্থাপিত হইয়া ঘুরিতেছে। যদি ইহাই হইত, তাহা হইলে গগনমার্গে উড্ডীয়মান পক্ষীসমূহ আপন কুলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না…। আর্য্যভট্টের টীকাকার পরমেশ্বর বলিতেছেন—"পরমার্থতস্তু স্থিরেব ভূমিঃ; ভূমে প্রাগ গমনং নক্ষত্রানাং গত্যভাবশ্চেচ্ছুন্তি কেচিৎতন্মিথ্যাজ্ঞান বশাদিত্যাহ"।

ভাবার্থ—পৃথিবী স্থিরই কিন্তু কতিপয় পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর পূর্ব্ব দিকে গতি, নক্ষত্রগণের গতির অভাব তাহা নক্ষত্রগতির ন্যায় মিথ্যাজ্ঞান। তার পর আর্য্যভট্টের শিষ্য লল্লাচার্য্য মহাশয় গুরুর ভূ-ভ্রমণ মতবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি পৃথিবী ভ্রমণ করে তাহা হইলে গগনমার্গে প্রক্ষিপ্ত শর পশ্চিম দিকে পতিত হয় না কেন? পক্ষীগণ নীড় ত্যাগের পর স্ব স্ব কুলায় ফিরিতে পারে কেন? এই সকল কৌতূহলোদ্দীপ্ত আত্মবিস্ময়ের পর পুনরায় তিনি বিস্ময়চিত্তে বলিতেছেন, যদি বল যে, পৃথিবী মৃদু মৃদু গতিতে চলিতেছে, সেই কারণে গতি অনুভূত হয় না, তাহা হইলে একদিনে কি প্রকারে পৃথিবী সম্পূর্ণ আবর্ত্তন শেষ করিতে পারে?

এক্ষণে ভারত জ্যোতিষের উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক ব্রহ্মগুপ্ত মহাশয়ের পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিরুদ্ধাচারণ সম্পর্কে বলা যাইতেছে। ব্রহ্মগুপ্তকৃত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত গ্রন্থের তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায় ১৭ শ্লোকে তর্ক তুলিয়া বলিতেছেন:

প্রাণেনৈতি কলাংভূর্য্যাদি তহির্কুতো ব্রজেৎ কমর্ধ্বানম্।

আবর্ত্তন মূর্দ্ধাশ্চের পতন্তি সমুচ্ছ্রায়া কস্মাৎ।

অর্থাৎ—এক প্রাণে (৬ প্রাণ ১ কলা ১ মিঃ) যদি পৃথিবী ১ কলা চলে, তাহা হইলে উহা কোন্ পথে কোন্ স্থান হইতে চলিতেছে? যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনই সত্য হয় তাহা হইলে রাশিকৃত বস্তু উর্দ্ধ হইতে কেন পতিত হয় না? এইভাবে আর্য্যভট্টের সময় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথুদক স্বামী দশম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ ভূ-ভ্রমণ মতবাদ কোনক্রমেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের অজ্ঞতার জন্য বালোচিত জ্ঞান প্রকাশ দ্বারা নিজেদের পাণ্ডিত্যের ভ্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীষ্টের দশম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথুদক্ স্বামী আর্য্যভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাস্তব জ্ঞানের বিশ্লেষণে প্রমাণ করিলেন।

"ভূ-পঞ্জরঃ স্থিরো ভুয়েবাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈবসিকৌ,

উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্র গ্রহানাম্।"

নক্ষত্রগোলক স্থির। পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্যই গ্রহ-নক্ষত্রগণের দৈনিক উদয়াস্ত সম্পাদিত হইতেছে। স্বামীজী অধিক স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, পৃথিবীর উপরিস্থিত দ্রব্যসমূহ নিম্নে কেন পতিত হইবে? কারণ, পৃথিবীর উদ্ধও যাহা এবং অধঃও তাহা। প্রকৃতপক্ষে দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে দৃষ্টিতে উর্দ্ধ এবং অধঃ ভেদজ্ঞান হয়।

পৃথুদক্ স্বামী—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বনাম পৃথুদক চতুর্ব্বেদী ছিল। তিনি জোতির্ব্বিদ্ শ্রীপতির কিছু পূর্ব্বে ছিলেন। কারণ শ্রীপতির জাতকপদ্ধতিতে পৃথুদক স্বামীর পরিচয় রহিয়াছে। শ্রীপতি ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ছিলেন।

এক্ষণে কোপানিকাস সাহেবের চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ প্রচার সম্পর্কে দেখা যায় যে, কোপানিকাস যে সময় পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ প্রচার করিলেন, তখনকার সময় ইউরোপের প্রখ্যাত জোতিষী টাইকোব্রাহী-পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী যদি পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে,

*প্রবহেন বায়ুনাক্ষিপ্ত…রচনাটি বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন না। কারণ প্রবহ নামক বায়ুদ্বারা আক্ষিপ্ত নক্ষত্রগোলক এবং গ্রহগণের সঙ্গে সমবেগে ভ্রমণ বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলে কোন বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলে বিদ্যুৎতরঙ্গের প্রভাব বিদ্যমান। ভূ-বায়ু গ্রহজগতে পৌঁছিতে পারে না। অতঃপর আর্য্যভট্টের প্রবহ নামক বায়ুদ্বারা আক্ষিপ্ত নক্ষত্রগোলক কথাটি অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে।

তাহা হইলে লোষ্ট্র ঊর্দ্ধ গগনে নিক্ষেপ করিলে তাহা পশ্চিমদিকে পতিত হয় না কেন? এই প্রকার ভারতবর্ষের ন্যায় ইউরোপেও সহজ জ্ঞানে পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ গৃহীত হয় নাই। বরং পশ্চিমী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ টলেমীর অবাস্তব মতবাদ পৃথিবীর স্থিরত্বকে সহজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে পৃথূদকস্বামী যে প্রকারে বাস্তব ব্যাখ্যা দ্বারা পৃথিবীর চলত্ব প্রমাণ করিলেন; তদনুরূপই ইউরোপে গ্যালিলিও সাহেব ষোড়শ শতাব্দীতে নূতন নভোবীক্ষণ যন্ত্র† আবিষ্কার করিয়া উহার সাহায্যে বসুন্ধরার চলত্ব প্রমাণ করিলেন। তখন হইতে ইউরোপে ভূ-ভ্রমণ মতবাদ সর্ব্বত্র গৃহীত হইল। পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক, অর্দ্ধ-জানিত, অজানিত এবং সংশয়মূলক জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মানব সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎ যে পুঞ্জীভূত অজ্ঞতা বা কুসংস্কার প্রচলিত থাকে, তাহা মানব মন হইতে সহজে দূরীভূত হয় না। যুক্তি তর্ক বাস্তব প্রমাণ দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর না হয় ঠিক তত সময়ই মানব সমাজ অজ্ঞান বা কুসংস্কারকেই মান্য করিয়া থাকে। অতঃপর আর্য্য ভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদ দশম শতাব্দীতে পৃথূদক স্বামী বাস্তব ব্যাখ্যা প্রদান করিলেও কেন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না? গ্যালিলিওর নভোবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর চলত্ব প্রমাণের পর কেন পৃথিবীর ঘূর্ণন গ্রাহ্য হইল? এই সকল সন্দেহমূলক প্রশ্নের উদয় মানবমনে সম্ভবপর।

ঐ প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পৃথূদক স্বামীর পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য একাদশ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্য-ভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ না করায় এবং আর্য্য-ভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদের প্রতি অনুদার ও উপেক্ষার মনোবৃত্তি দর্শন করায় ভারতবর্ষে ভূ-ভ্রমণ মতবাদ প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি সম্ভবপর। তারপর ভাস্করের উদীয়মান প্রতিভার মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তখন রাষ্ট্র বিপ্লবে নগরের কোলাহল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় বিজ্ঞান বৃক্ষে কোন নবাঙ্কুর উদগমনে নূতন ফল প্রদানে সক্ষম হইল না। বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য দেশের শান্তি শৃঙ্খলা আবশ্যক। দেখিতে দেখিতে আরবীয় জ্যোতিষ বন্যার স্রোত প্রবাহের ন্যায় ভারতীয় জ্যোতিষের সহিত মিশিয়া গেল। আর্য্যভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদ ভারতবর্ষে তখন কে প্রচার করিবে? ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ ঐ সময় মুঘল সম্রাট, এবং আমীর ওমরাহগণের তুষ্টি বিধানে তৎপর হইয়া উঠিলেন; ভারতীয় জ্যোতিষ এবং আরবীয় জ্যোতিষের মিশ্রণে তাঁহারা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন।

জয়পুরপতি-জয়সিংহের সভাপণ্ডিত এবং ভাস্করাচার্য্যের সম-প্রতিভাশালী জ্যোতিষী জগন্নাথ পণ্ডিত স্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেবের তুষ্টির জন্য টলেমীর অলমাজিস্ত গ্রন্থ, তাতারপতি তৈমুরলঙ্গের পুত্র উলুঘবেগের আরবী অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতে 'সিদ্ধান্ত সম্রাট' নামে গ্রন্থ রচনা করিলেন। রামদৈবজ্ঞের ন্যায় তীক্ষ্ণধী জ্যোতিষী টোডরমলের সন্তুষ্টির জন্য সংস্কৃতে টোডরানন্দ নামে জ্যোতিষসংহিতা রচনা করিলেন। এই ভাবে দীর্ঘকাল বৈদেশিক রাষ্ট্রচক্রে পতিত ভারতবর্ষে আর্য্যভট্টের ভূ-ভ্রমণ মতবাদ প্রচারে নানাপ্রকার বিঘ্ন থাকা সম্ভবপর। তারপর চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে কোপানিকাসের পৃথিবীর ঘূর্ণন মতবাদ গ্যালিলিও ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচার করায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিনা বাধায় স্বীকৃত হইল। দুঃখের বিষয় যে, ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত আর্য্যভট্ট তন্ত্রের গোলপাদের বস্তুশ্লোকের বচন —বৃত্তোভপঞ্জর মধ্যে কক্ষা পরিবেষ্টিতঃখমধ্যগতঃ। মৃজ্জলশিখী বায়ুময়ো ভূগোলঃ সর্ব্বতো বৃত্তঃ। এই বচন সমূহের গলিতার্থ কেন বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। পৃথিবীর বর্ণনায় আর্য্যভট্ট বলিতেছেন যে, বৃত্তাকার রাশিচক্রের মধ্যস্থলে গ্রহকক্ষা পরিবেষ্টিত মৃ-জল-অগ্নি বা তেজ বায়ু সমষ্টিতে সর্ব্বদিকে গোলাকার পৃথিবী। এই অর্থে স্পষ্টই বোঝা যায় যে গ্রহগণের আকর্ষণে পৃথিবী স্থির থাকিবে কি প্রকারে? এই ইঙ্গিত ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতের না বুঝিবার কারণ কি? তিনি যদি ভূ-ভ্রমণ মতবাদ স্বীকার করিতেন তাহা হইলে সহজে ভারতবর্ষে ভূ-ভ্রমণ মতবাদ, ইউরোপের প্রকাশের পূর্ব্বে প্রচারিত হইত। আর্য্যভট্ট পৃথিবীর মধ্যরেখা লঙ্কা হইতে এবং দিবারম্ভ লঙ্কার মধ্যরাত্রি হইতে গণনা করিতেন। আর্য্যভট্ট আরবদেশে অর্জ্জভর, যবনদেশে অন্দুবেরিয়স বা অর্দ্ধবেরিয়স নামে খ্যাত ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রাতঃসূর্য্যের উদয় ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের আবির্ভাব সময়। তারপর অংশুমালীর কিরণ জ্ঞান বাতায়নে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ গগনে উঠিয়া ভাস্করাচার্য্যের সময় একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষণকাল ভারতের মধ্য গগনে আলোকদান করিয়া মধ্য গগনেই আকস্মিক অস্তমিত হইল। গজনির মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন, ভারতসূর্য্যের রমণীয় শোভা তিমিরে আচ্ছন্ন হইল।

† Galileoর নভোবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে তাঁহার শ্যালক Landucei সাহেবের নিকট পত্রে জানাইয়াছিলেন—I write now because I have a piece of news for you……you must know, then, that two months ago there was a report spread here that in Flanders some one had presented to count Maurice of Nassau a glass manufactured in such a way as to make distant objects appear very near, so that a man at the distance of two miles could be clearly seen. This seemed to me so marvellous that I began to think about it. As it appeared to me to have a foundation in the Theory of Perspective I set about contriving how to make it and at length I found out, and have succeeded so well that the one I have made is far superior to "Dutch talescope." ETC, রবার্ট বল কৃত Great Astronomers পুস্তক ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণ ৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্জিকা সংশোধন ও ভারতীয় নববর্ষ

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার একটি 'পঞ্জিকা সংশোধন সমিতি' (Calender Reform Committee) গঠন করেন। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। আমিও ইহার একজন সভ্য ছিলাম। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন পঞ্জিকা এখনও প্রচলিত আছে। এই সমিতি যাবতীয় প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি বিচার করিয়া ভারতের বর্ত্তমান বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিবিধ সমাজ সংক্রান্ত পরিস্থিতির মধ্যে যতদূর সম্ভব বিজ্ঞান-সম্মত এবং ভ্রম-প্রমাদশূন্য একবিধ পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতে বর্ত্তমান সময়ে ৩০টি বিভিন্ন পঞ্জিকার প্রচলন আছে। এই পঞ্জিকাগুলি ভারতের অতীত রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের পরিচয় দেয়। ভারত এক্ষণে স্বাধীন হইয়াছে এবং সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য অপসারণ করা উচিত। বর্ত্তমানে যাহাতে সমগ্র ভারতে একবিধ ভ্রমশূন্য পঞ্জিকা প্রচলিত হইতে পারে তাহার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন। একবিধ পঞ্জিকার প্রচলন ভারতে সুপ্ত জাতীয়তাবোধ এবং ঐক্যভাব জাগ্রত করিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। আমাদের দেশে বিবিধ পঞ্জিকার প্রচলন থাকাতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে গণেশ চতুর্থী কিংবা সরস্বতী পূজা একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। সময়ে সময়ে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী এবং উৎকল দেশীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী রথযাত্রার দিবস—দুইটি পৃথক দিবস এবং ইহাদের মধ্যে এক মাসের ব্যবধান আছে। এইরূপ বৈসাদৃশ্যের আরও উদাহরণ দিতে পারা যায়, যথা—Gregorian পঞ্জিকার ২১শে মার্চ্চ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ দিবসটি বঙ্গদেশে ৭ই চৈত্র, উৎকল প্রদেশে ৮ই চৈত্র এবং দাক্ষিণাত্যে ৮ই ফাল্গুন ছিল।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক পৃথক পঞ্জিকার প্রচলন থাকাতে নানান্ স্থানে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকার মতানুযায়ী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির অব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে অনেক সময় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ঘটনাগুলির যথার্থ কাল নির্ণয় করিতে গিয়া সমস্যার সম্মুখীন হন। ইহার ফলে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। এই নিমিত্ত যাবতীয় প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি সমন্বয় করিয়া একটি মাত্র কার্য্যকরী পঞ্জিকা সমগ্র ভারতের জন্য প্রণয়ন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার সকল রাজ্যে একটি মাত্র গ্রেগরীয় পঞ্জিকার প্রচলন আছে। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী রাজ্যগুলিতে একমাত্র হিজিরা পঞ্জিকা প্রচলিত আছে। [illegible] ভারতে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের জন্য একটি মাত্র পঞ্জিকার প্রচলন কেন সম্ভবপর হইবে না তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। হিন্দুধর্ম্মের পূজা-পর্ব্ব পালনের জন্য সৌর-পঞ্জিকার বিধি অনুযায়ী ঋতু নির্দ্ধারিত হয় এবং চান্দ্রমাসের বিধি অনুসারে তিথি ও কাল স্থিরীকৃত হয়।

পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। একটি, জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা, যাহার দ্বারা আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র এবং গ্রহাদির স্থান ও কাল নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারিত করা যায়, আর অন্যটি, পূজা-পর্ব্ব উপলক্ষে বিবিধ দেশের বিভিন্ন প্রথা—যাহা অধুনা প্রচলিত আছে। সৌর-পঞ্জিকা প্রণয়নে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা :—

ক) সৌর-বৎসরের কালমান (Tropical year) জ্যোতিষ শাস্ত্র যাহা নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। একবার মেষ বা মহাবিষুব সংক্রান্তি (Vernal equinox) হইতে পুনরায় মেষ সংক্রান্তিতে ফিরিয়া আসিতে সূর্য্যের যে সময় লাগে তাহাকেই সৌর-বৎসর বলা হয়। সৌর বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিবস ৫ ঘণ্টা এবং ৪৮·৮ মিনিট।

খ) ঋতুগুলি প্রকৃতভাবে অবধারণ করিতে হইবে এবং ইহাও দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ঋতু সর্ব্বদাই স্থিরীকৃত দিবস হইতেই যেন আরম্ভ হয়।

গ) সৌর-দিবস অর্দ্ধ রাত্রি হইতে আরম্ভ হইবে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে মেষ বা মহাবিষুব সংক্রান্তি (vernal equinox) হইতে বৎসরের আরম্ভ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতীতকালে ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা মেষ এবং তুলা সংক্রান্তির অগ্রসরণ (precession of the equinoxes) বিষয়ে অবগত ছিলেন না। সূর্য্য-সিদ্ধান্তীয় বৎসরের কালমান ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২·৬ মিনিট। সূর্য্য সিদ্ধান্তের গণনায় সৌর-বৎসরের কাল নির্দ্ধারণে ২৩·৮ মিনিট পরিমাণ ভ্রম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচিত হইবার পর চৌদ্দ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ভ্রমের পরিমাণ যদি ২৩·৮ মিনিট হয় তাহা হইলে চৌদ্দশত বৎসরে ইহার সমষ্টি ২৩ দিন হইবে। সূর্য্য সিদ্ধান্ত যখন রচিত হয় সেই সময় মেষ সংক্রান্তি ২১শে মার্চ্চে পড়িত, এক্ষণেও মেষ সংক্রান্তি ২১শে মার্চ্চ পড়ে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের প্রচলিত পঞ্জিকায় ১লা বৈশাখ বা ইংরাজী ১৫ই এপ্রিল হইতে বৎসরারম্ভ হয়, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র মতে মেষ সংক্রান্তি হইতে বৎসরারম্ভ করা বিধেয়। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বৎসরারম্ভে ২৩ দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

বিমল আর বিনয় বসেছিল। উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন ভুতোদা।

ভুতোদা: ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কালে কালে কি হোল!

বিমল: আবার কি হোল?

ভুতোদা: জানিস আমাদের ছোটবেলায় বড়লোকের বাড়ীর বৌ মেয়েদের পাল্কী শুদ্ধু নদীতে ডুবিয়ে আনা হোত যাতে মুখ কেউ না দেখতে পায়। আর এখন বুড়োধাড়ী মেয়েরা সব আপিসে কাজ করে বেড়াচ্ছে?

বিনয়: তাতে আপনার হোল কি?

ভুতোদা: আমাদের মধুপুরের কেলো এখানে এক সদাগরী আপিসে কাজ করে। কাল গিয়েছিলাম দেখা করতে। ঢোকার মুখেই এক রংচং মাখা আধুনিকা পথ আটকালো। ইংরাজীতে চটাং চটাং করে কি বলল।

আমি বললাম "মা লক্ষী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বলল "ও, মিষ্টার রে—আপনার স্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বসুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?"

বিমল: ঠিকই তো বলেছে!

ভুতোদা: কাজকরা মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরিজী বুলি।

বিমল আর বিনয়ের একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।

বিনয়: ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুননা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পারের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।

ভুতোদা: তা যাব এখন।

বিকেলে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা বিমল আর বিনয়।

বিনয়: এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। ও একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।

ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ

মিলি: কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?

ভুতোদা: (ভয়পেয়ে): না, না, কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজকর্ম করাই পছন্দ করি।

মিলি: (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা।

বিমল: মিলি আমাদের খাওয়াবিনা?

মিলি: নিশ্চয়ই।

মিলি সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষীই মনে হচ্ছে!

বিমল: (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ে। কাছে যাবেন না। কামড়ে দিতে পারে।

ভুতোদা: থাম্।

খেতে বসে

ভুতোদা: খাবার তো অনেক করেছো মা। মাছের ঝাল, মাংস, আলুপটলের ডালনা। ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।

মিলি: না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।

ভুতোদা: তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।

মিলি: খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।

ভুতোদা: বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। নাঃ পড়ে আর কিছু থাকলনা। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা? তেল তো মনে হচ্ছেনা!

বিমল: কি দিয়ে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।

ভুতোদা: (চটে)—আবার রসিকতা করছিস?

মিলি: না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' রাঁধা।

ভুতোদা: আমি তো জানতাম ভাজাভুজি মিষ্টি ফিষ্টিই 'ডালডায়' হয়!

মিনি: না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।

বিনয়: শেষ শেষ ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।

ভুতোদা: আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এমনটি—

মিলি: না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করার জন্যেই। বাড়ীর কাজেও তারা কোন অংশে খারাপ নয়।

বিমল: ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত সৌর-বৎসরকে সমভাবে স্থায়ীরূপে ছয় ঋতুতে বিভক্ত করিয়াছে। উপরোক্ত ভ্রম হেতু নির্দ্দিষ্ট সৌরমাসের ঋতু নির্ণয়ও নির্ভুল হইতেছে না। ইংরেজী গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকায় এই প্রকার ভ্রম দৃষ্ট হইয়াছিল এবং পোপ গ্রেগরী XIII এর আদেশ মতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই পঞ্জিকা সংশোধিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ১৭০ বৎসর পরে ইহা সংশোধন করেন। তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আমাদের পঞ্জিকাগুলি সংশোধন করিতে কেন পরাঙ্মুখ হইব? অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, পঞ্জিকাগুলিতে পূজা ও পর্ব্বের যে দিন ও কাল নির্ণীত হইয়াছে তাহা সঠিক ঋতুতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শরৎ পূর্ণিমা হেমন্ত ঋতুতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের পঞ্জিকাগুলি শাস্ত্রসম্মত বা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। অয়ন মণ্ডলের ৩০° যাইতে সূর্য্যের কখনও ২৯ দিন কখনও ৩২ দিন এবং কখনও বা ৩০ কিংবা ৩১ দিন লাগে। সেই জন্য হিন্দু পঞ্জিকাগুলিতে সৌরমাস কখনও ২৯, ৩০, ৩১ বা ৩২ দিনের হয়। কিন্তু শাসনকার্য্য এবং সামাজিক বিষয়ে এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল সৌরমাস বিশেষ অসুবিধাজনক। সেইজন্য ৩০ এবং ৩১ দিনে সৌরমাস নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মতে ভারতের পক্ষে শকাব্দ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী অব্দ। ভারতের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা সকলেই শকাব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতের সকল প্রকার আদি বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতিষ গ্রন্থে শকাব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। কথিত আছে, শক জাতীয় নৃপতি শালিবাহন ভারতীয় নৃপতিদের পরাজিত করিয়া শকাব্দের প্রবর্ত্তন করেন। এই ঘটনাটি খ্রীঃ পূঃ ১২৩ সালে হইয়াছিল। ইহার ২০০ শত বৎসর পরে রাজা কণিষ্কের রাজত্ব আরম্ভ হয়। রাজা কণিষ্ক পুরাতন শকাব্দের প্রচলন উঠাইয়া দিয়া নূতন শকাব্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। নূতন এবং পুরাতন শকাব্দের মধ্যে ২০০ বৎসরের প্রভেদ এবং খ্রীষ্টাব্দ ও শকাব্দের মধ্যে ৭৮ বৎসরের প্রভেদ। প্রচলিত শকবর্ষ এক্ষণে কোন কোন স্থানে সৌর বৈশাখের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ হয় এবং কোন কোন স্থানে চান্দ্রমাস চৈত্রের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ হয়। কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন যে শকাব্দের প্রবর্ত্তনের এক কুফল এই যে ইহা বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের নিকট ভারতবাসীর পরাজয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেইজন্য ইহা ভারতের পক্ষে বিশেষ অপমানজনক। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দ্রাবিড় এবং আর্য্যজাতি প্রথমে বিজয়ী আক্রমণকারী রূপে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং প্রাচীন অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীরা ন্যায়ত বলিতে পারিত যে, দ্রাবিড় এবং আর্য্যজাতির বিজয় স্মারকবার্ত্তা বা ক্ষোদিত লিপি তাহাদের পক্ষে বিশেষ অপমানজনক। শক জাতি আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতির ন্যায় যথাকালে ভারতীয় জাতি বলিয়া গৃহীত হইল এবং শকাব্দের প্রবর্ত্তন ভারতের পক্ষে অপমানজনক এই অনুমান করিবার আর কোন কারণ রহিল না। শকদ্বীপের পণ্ডিতেরা তৎকালীন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা শকাব্দ ব্যবহার করিতেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পঞ্জিকা ও জন্মপত্রিকা প্রণয়ন করিতেন। পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদেরাও শকাব্দ ব্যবহার করিতেন।

নানা বিষয় বিচার করিয়া "পঞ্জিকা সমিতি" নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

ক) ভারতীয় পঞ্জিকা প্রণয়নে সৌর বৎসর (Tropical year) ব্যবহৃত হইবে এবং এই বৎসরের কাল পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা এবং ৪৮'৮ মিনিট হইবে।

খ) সমগ্র ভারতের জন্য সমাজীয় এবং শাসননীতি ও প্রণালী সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞানসম্মত সৌর-পঞ্জিকা প্রণয়ন করা আবশ্যক এবং ২২শে মার্চ্চ এই পঞ্জিকা-বৎসর আরম্ভ হইবে।

গ) জাতীয় পঞ্জিকায় শকাব্দ ব্যবহৃত হইবে এবং খ্রীষ্টীয় বৎসর ১৯৫৪-১৯৫৫, ১৮৭৬ শকাব্দের বৎসর হইবে।

ঘ) ভারতবর্ষে একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র (Central Station) কল্পনা করিতে হইবে এবং যাবতীয় জ্যোতিষ সম্পর্কিত গণনা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে করিতে হইবে। এই কেন্দ্রের স্থান হইবে ৮২৷' পূর্ব্ব দ্রাঘিমা (Longiude) এবং ২৩°-১১´ উত্তর লঘিমা (Latitude) (উজ্জয়িনীর লঘিমা)।

ঙ) একটি "নিয়মিত" বৎসরে (Normal year) ৩৬৫ দিবস থাকিবে এবং একটি অতিবর্ষে ৩৬৬ দিবস থাকিবে। কোন শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ দিলে যোগফল যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তাহা হইলে সেই বৎসর 'অতিবর্ষ' বলিয়া ধার্য্য হইবে। যদি যোগফল ১০০'র গুণিতক সংখ্যা (multiple) হয় তাহা হইলে যদি ইহা ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে ইহা একটি 'অতিবর্ষ' হইবে। যদি ১০০ দ্বারা বিভাজ্য হইয়াও ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য না হয়, তাহা হইলে ইহা 'অতিবর্ষ' হইবে না এবং কেবল একটি 'নিয়মিত' বৎসর হইবে।

(চ) বৎসরের প্রথম মাস চৈত্র হইবে এবং ২২শে মার্চ্চ ১লা চৈত্র হইবে। নিয়মিত বৎসরে চৈত্র মাসে ৩০ দিন কিন্তু অতিবর্ষ চৈত্রমাসে ৩১ দিন থাকিবে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস প্রত্যেকটিতে ৩১ দিন থাকিবে। আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন প্রত্যেক মাসে ৩০ দিন থাকিবে। জাতীয় পঞ্জিকার প্রত্যেক মাসের প্রথম দিবস গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার দিবসের সঙ্গে তুলনা করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

১ চৈত্র—২২ মার্চ্চ
১ চৈত্র—২১ মার্চ্চ (leap year) অতিবর্ষ
১ বৈশাখ—২১ এপ্রিল
১ জ্যৈষ্ঠ—২২ মে
১ আষাঢ়—২২ জুন
১ শ্রাবণ—২৩ জুলাই

১ ভাদ্র—২৩ আগষ্ট

১ আশ্বিন—২৩ সেপ্টেম্বর

১ কার্ত্তিক—২৩ অক্টোবর

১ অগ্রহায়ণ—২২ নবেম্বর

১ পৌষ—২২ ডিসেম্বর

১ মাঘ—২১ জানুয়ারী

১ ফাল্গুন—২০ ফেব্রুয়ারী

(ছ) সংশোধিত পঞ্জিকায় ভারতীয় ঋতুগুলি স্থায়ীরূপে নির্দ্দিষ্ট মাসগুলিতে সমভাবে বিভক্ত হইবে। যথা:

গ্রীষ্ম—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

বর্ষা—আষাঢ় ও শ্রাবণ

শরৎ—ভাদ্র ও আশ্বিন

হেমন্ত—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ

শীত—পৌষ ও মাঘ

বসন্ত—ফাল্গুন ও চৈত্র

(জ) সামাজিক কার্য্য এবং শাসননীতি ও প্রণালীর জন্য ভৌগোলিক কেন্দ্রের নির্দ্ধারিত অর্দ্ধরাত্রি হইতে পরবর্ত্তী অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত একটি 'দিবস' গণিত হইবে।

(ঝ) সংশোধিত বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা এবং প্রচলিত পঞ্জিকা-গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রচলিত পঞ্জিকা-গুলির বিধি অনুসারে পূজাপর্ব্ব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। সহসা বহুল পরিবর্ত্তন করিলে, আন্দোলন এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। সেইহেতু সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য পঞ্জিকা সংশোধন সমিতি' পূজাপর্ব্ব এবং ক্রিয়াকর্ম্ম পালনের জন্য এক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিলেন। সৌরমাসের সাহায্যে চান্দ্রমাস নির্ণয় করিতে হইবে। সূর্য্যের দ্রাঘিমা যখন ২৩°-১৫´ তখন সৌর-বৈশাখ আরম্ভ হইবে এবং যথাক্রমে সূর্য্যের দ্রাঘিমা যখন ৩০° করিয়া বৃদ্ধি পাইবে তখন অন্যান্য মাসের আরম্ভ হইবে। এইরূপে চৈত্র মাস যখন আরম্ভ হইবে তখন সূর্য্যের দ্রাঘিমা হইবে ৩৫৩°-১৫´।

(ঞ) পূজাপর্ব্ব পালনের জন্য স্থানীয় সূর্য্যোদয় হইতে দিবস আরম্ভ হইবে। অমাবস্যা হইতে চান্দ্রমাস আরম্ভ হইবে। এই অমাবস্যা যে সৌরমাসে পড়িবে, চান্দ্রমাস সেই সৌরমাসের নামেই অভিহিত হইবে। অয়নাংশ বৎসরে ৫০°২১ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় (precession of the equinoxes)। সূর্য্যসিদ্ধান্তের সময় হইতে এতদিনে ২১শে মার্চ্চ ১৯৫৬ পর্য্যন্ত অয়নাংশের সমষ্টি ২৩°১৫´ হইয়াছে। যে সকল পূজা ও পর্ব্বের কাল বা সময় কেবলমাত্র সূর্য্যের স্থান ও গতিদ্বারা নিরূপিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটির বৎসরের পর বৎসর নির্দ্দিষ্ট ঋতুতেই অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু যেগুলির কাল ও সময় চান্দ্র-পঞ্জিকা দ্বারা নিরূপিত হয় সেইগুলির ঋতু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহাতে ভ্রমপূর্ণ গণনার জন্য ঋতুর পরিবর্ত্তন আর বৃদ্ধি না পায় এবং স্থায়ী থাকে, সেইজন্য ভবিষ্যতের সকলপ্রকার গণনায় সৌর-বৎসরের সঠিক পরিমাণ লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে পূজাপর্ব্ব যে সময় অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে তাহা হইতে অধিক প্রভেদ না হয় সেইজন্য ধর্ম্মকর্ম্ম পালনের জন্য সৌর-বৎসর আরম্ভ করা হইবে যখন সূর্য্যের দ্রাঘিমা ২৩°-১৫´ থাকিবে। অবশ্য ইহাতে ঋতু গণনায় কিছু ভ্রম থাকিয়া যাইবে, কিন্তু ভ্রম আর বৃদ্ধি পাইবে না।

'পঞ্জিকা সংশোধন সমিতি'র প্রস্তাবানুসারে শকাব্দ ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত (১৯৫৪-৫৫ হইতে ১৯৫৮-৫৯) পাঁচ বৎসরের জাতীয় পঞ্জিকা অগ্রিম প্রস্তুত করা হইয়াছে। উপরোক্ত সমিতির প্রস্তাবে ভারত সরকার 'Indian Ephemeris and Nautical Almanac' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদির স্থান ও কাল অগ্রতঃ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'পঞ্জিকা সংশোধন সমিতি' আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতের একটি যথাযোগ্য স্থানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি জাতীয় মানমন্দির নির্ম্মাণ করা হউক। মানমন্দির পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। আশা করি ইহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। ভারত সরকার "পঞ্জিকা সংশোধন সমিতি"র প্রায় সব প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন এবং নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, জাতীয় পঞ্জিকা মার্চ্চ ২২, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ বা ১ চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ হইতে গৃহীত হউক। ভারত সরকার আরও স্থির করিয়াছেন:

(ক) গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকা আপাততঃ সরকারী এবং সামাজিক বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে থাকুক।

(খ) "The Garette of India"তে গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার তারিখ এবং নূতন ভারতীয় পঞ্জিকার তারিখ থাকিবে।

(গ) ভারতীয় বেতার বার্ত্তায় যখন বিবিধ ভারতীয় ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হয় তখন গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার তারিখ এবং নূতন পঞ্জিকার তারিখ দুইই ঘোষিত হইবে।

(ঘ) ভারত সরকার যে সকল পঞ্জিকা বা তালিকা প্রচার করিবেন তাহাতে গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার তারিখগুলির সহিত নূতন পঞ্জিকার তারিখগুলিও দেওয়া হইবে।

(ঙ) গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার সঙ্গে উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারদের নির্দ্দেশ দিবেন।

(চ) পূজাপর্ব্ব দিবসগুলি এক্ষণে যে ভাবে পালন করা হয় সেই প্রচলিত প্রথার কোনও ব্যতিক্রম থাকিবে না, কিন্তু যতদূর সম্ভব "সংশোধন সমিতি"র নির্দ্ধারিত তারিখগুলি গ্রহণ করিতে হইবে।

অবশেষে ইহা বলা অযৌক্তিক হইবে না যে, একটি বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভুল আন্তর্জাতিক পঞ্জিকা প্রণয়নের বিশেষ আবশ্যক আছে। গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকা নির্ভুল নহে, ইহাতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে। সুখের বিষয় ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থার (United Nations Organisation) নিকট আন্তর্জ্জাতিক পঞ্জিকা প্রণয়নের প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন।

১৯৫৯-৬০ সনের রেলওয়ে বাজেট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

শ্রীজগজীবন রাম হলেন ভারত সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় ১৯৫৯-৬০ সনের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেছেন। এই মর্মে অনুমান করা হয়েছে যে, ১৯৫৯-৬০ সনে রেলওয়ের চার শত বাইশ কোটি তিন লক্ষ টাকা আয় হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, সংশোধিত হিসাব অনুসারে চলতি বছরের অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সনের আয় দাঁড়িয়েছে তিন শত চুয়ানব্বই কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা। রেলওয়ে মন্ত্রী বলেছেন, ১৯৫৮-৫৯ সনে বিভিন্ন প্রকার খরচ মিটিয়ে মোট তের কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। অন্য দিকে আগামী বছরে অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সনে নীট উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে একুশ কোটি উনিশ লক্ষ টাকা।

রেলওয়ে বাজেট সমালোচনা করে লোকসভার সদস্য শ্রীঅটল বিহারী বাজপেয়ী মন্তব্য করেছেন :

"There are only two prominent features in the budget—decreasing revenues and increasing working expenses. This is not a happy sign."

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলির মধ্যে রেলওয়ে হ'ল সব চাইতে বড়। যদি রেলওয়ে-গুলি তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারে তা হলে রেলওয়ে উন্নয়নের জন্য দেশের ভিতর সম্পদাদি সংগ্রহ করার সম্ভাবনা কম। অবশ্য একথা ঠিক যে, দেশে রেলওয়ের অনেক মালপত্র উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যান্ত দেশে অবস্থিত কারখানাগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয় নি এবং এই সব কারখানাকে পুরোপুরি কাজে লাগান হয় নি।

রেলওয়ে মন্ত্রী বলেছেন, ১৯৫৭-৫৮ সনে যাত্রী এবং মাল ভাড়া বাবদ প্রকৃত আয় হয়েছে তিন শত উনআশী কোটি আটাত্তর লক্ষ টাকা। সংশোধিত হিসাবে আয় ধরা হয়েছিল তিন শত চুরাশী কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মোট ঘাটতির পরিমাণ হ'ল চার কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা। অন্য দিকে চলতি বছরের অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সনের বাজেটে মাশুল বাবদ আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল দু'শত চল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মাশুল বাবদ মোট

আয়ের পরিমাণ হবে দু'শত পঁয়তাল্লিশ কোটি তিয়াশী লক্ষ টাকা। আবার ১৯৫৯-৬০ সনের বাজেটে অনুমান করা হয়েছে, মালের মাশুল বাবদ আয় হবে দু'শত বাহাত্তর কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সনের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় এটা ছাব্বিশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বেশী। এ ছাড়া এই মর্মে অনুমান করা হচ্ছে যে, চলতি বছরের অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সনের ১লা অক্টোবর থেকে মাশুলের যে নূতন হার চালু করা হয়েছে সে হারের ফলে মোট পাঁচ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাবে। এটাও এই হিসাবে ধরা হয়েছে। রেলওয়ে মন্ত্রী বলেছেন, এই বছর নূতন ইস্পাত কারখানাগুলি চালু হবার দরুণ রেলওয়েকে অতিরিক্ত এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টন মাল বহন করতে হবে: এতে রেলওয়েতে মোট পনের কোটি দশ লক্ষ টন মাল বহনের পরিমাণ দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে। 'দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা' একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন:

"Yet goods traffic, other than coal, has not increased this year as much as was expected; this deserves to be noted not only by those concerned with the financial consequences to the railways, It is undoubtedly due in part to the slower tempo of industrial production and might therefore be considered by the Finance Minister when making his Budget proposals".

'দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা' আরও বলেছেন:

"In the coming year there is expected to be a large additional demand for rail transport; this estimate is based on the working of the new steel plants, on more promising crops and on the effects of that momentous event for Eastern India, the opening of the bridge over the Ganga at Mokameh next April, Whether this expectation is fulfilled will again depend in part on industrial and commercial users, who generally feel that they need a stimulus from the General Budget."

১৯৫৮-৫৯ সনের বাজেটে যাত্রীভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ একশত চব্বিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। অথচ সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী একশত ষোল কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশী আয় হবে না। অবশ্য অন্যান্য গাড়ীভাড়া এবং বিবিধ আয় সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও হতে পারে। এর ফলে ১৯৫৮-৫৯ সনে মাল এবং যাত্রী বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ তিনশত চুরানব্বই কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

অন্যদিকে ১৯৫৯-৬০ সনে যাত্রীভাড়া বাবদ একশত আঠার কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা আয় হবে বলে রেলওয়ে মন্ত্রী অনুমান করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্য গাড়ীভাড়া বাবদ চব্বিশ কোটি টাকা আয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে। রেলওয়ে মন্ত্রী এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, পার্শ্বেলের পরিমাণ কিছুটা কমে যাবে। তাই তিনি ১৯৫৮-৫৯ সনের সংশোধিত হিসাবের তুলনায় এটা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা কম দেখিয়েছেন। অনুমান করা হয়েছে, ১৯৫৯-৬০ সনে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা বিবিধ খাতে আয় হবে। অর্থাৎ ভাড়া এবং মাশুল বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ চারশত বাইশ কোটি তিন লক্ষ টাকা দাঁড়াবে বলে হিসাব করা হয়েছে। মাদ্রাজের 'হিন্দু পত্রিকা' মন্তব্য করেছেন:

"The Railway Minister did not explain why passenger earnings are going down. There is room to think that the surcharge on fares was ill-advised and that it has adversely affected passenger traffic. The Railway and Finance Ministers should examine the effect of the surcharge, though it was levied for the purpose for providing funds to the States."

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, লোকসভায় রেলওয়ে মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১৯৫৯-৬০ সনে যাত্রীভাড়া অথবা মালের মাশুলের হার বাড়ান হবে না। তাঁর অভিমত হ'ল এই যে, ১৯৫৮ সনের ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া এবং মাশুলের যে নয়া হার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে আরও কয়েক মাস গত না হলে সে হারের ফলাফল সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভবপর নয়। এখানে একথা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯৫৮-৫৯ সনে যাত্রী-ভাড়া এবং মাশুল বাবদ আয় কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, অবশ্য সম্প্রতি কয়েক মাসে উন্নতির আভাস পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে এমন অনেক স্থান চোখে পড়ে যেসব স্থানে রেললাইন বরাবর সড়ক পরিবহনের ব্যবস্থা আছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, যদিও এই সব স্থানে অতিরিক্ত মাল বহনের ক্ষমতা রেলওয়ের আছে তবুও সড়ক যানেই অধিক পরিমাণে মাল বাহিত হয়েছে। রেলওয়ে মন্ত্রী বলেছেন, যাতে দেশের সীমাবদ্ধ পরিবহন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় রদবদলের কথা সরকার বিবেচনা করছেন। আমাদের মনে হচ্ছে, সরকার যদি রেলওয়েগুলোর ক্রমক্ষীয়মান ভাড়া বাবদ আয় বৃদ্ধি করার জন্য সড়ক পরিবহনের ক্ষতিসাধন করেন তা হলে অন্যায় হবে। বরং কেন এবং কি ভাবে রেলওয়ের হাত থেকে অধিক ভাড়ার মালপরিবহন সড়কযানের হাতে গিয়ে পড়েছে সেটা সরকারের ঠিক করা দরকার। যদি সড়ক পরিবহনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা লোপ করা হয় তা হলে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে না।
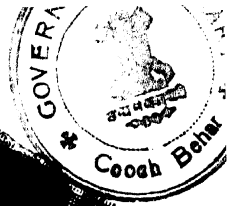
মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব লাবণ্যের অধিকারী। কি করে তিনি লাবণ্য এত মোলায়েম ও সুন্দর রাখেন?
"বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে", মালা সিনহা আপনাকে বলবেন। চিত্রতারকাদের প্রিয় এই মোলায়েম ও সুগন্ধ সৌন্দর্য সাবানটির সাহায্যে আপনারও ত্বকের যত্ন নিন। মনে রাখবেন স্নানের সময় লাক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 599-X52 BG

তাছাড়া যাত্রী, ব্যবসায়ী কিংবা শ্রমিক কেউ রেলওয়ের কার্য্যাবলীতে সন্তুষ্ট নন। আরও দেখা যাচ্ছে, যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে সে অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রেলপথগুলির আয় এবং যোগ্যতা বৃদ্ধি পায় নি। লোকসভার কংগ্রেসী সদস্য সর্দার বাহাদুর সিং বলেছেন :

"It will be unfair to restrict the area of operation of road transport. The small operators will be hard hit by such a decision." বরং "There should be more co-ordination between rail and road transport and there should be no curbs or restrictions on the latter."

তাছাড়া ভাড়ার ব্যাপারে কারসাজি করে সড়ক পরিবহনকে গলাটিপে মারা রেলপথগুলির কর্ত্তব্য নয়। যদি সড়ক পরিবহনের সঙ্গে রেলপথগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তা হলে তাঁদের যোগ্যতা এবং মালপত্র চলাচলে নিরাপত্তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। 'দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা' মন্তব্য করেছেন :

"It is unnecessary for the railways to cast jealous looks at" diversion of high-rated traffic to road transport" ; with the economy working all out there will be need for every form of transport."

১৯৫৮-৫৯ সনের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক রেলওয়েকর্ম্মী কর্তৃক রেলওয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পরিবর্ত্তে পেন্সন ব্যবস্থা গৃহীত হবার দরুণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ রেলওয়ের দেয় মোট দুই কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা রাজস্ব খাতে জমা পড়েছে।

অনুমান করা হয়েছে, ১৯৫৯-৬০ সনে রেল সংস্থাপন, কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ী বাবদ মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে দু'শত পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫৮-৫৯ সনের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ হচ্ছে দু'শত পঁয়তাল্লিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭-৫৮ সনে দেখা গেছে, সাধারণ পরিচালনা বাবদ সংশোধিত হিসাবে খরচের পরিমাণ ২৫৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা দেখানো হলেও পাঁচ কোটি দু' লক্ষ টাকার মত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সনের বাজেটে অনুমান করা হয়েছিল, সাধারণ পরিচালনা বাবদ খরচের পরিমাণ হবে দু'শত আটষট্টি কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। তবে খরচ পাঁচ কোটি সাতাশী লক্ষ টাকা বেড়ে যাবার দরুণ এর পরিমাণ দাঁড়াবে দু'শত চুয়াত্তর কোটি বাইশ লক্ষ টাকা। বলা হয়েছে, একমাত্র কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রেলওয়ের খরচ বেড়েছে প্রায় এক কোটি টাকার মত। এছাড়াও বকেয়া বিক্রয়কর বাবদ, সাজসরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধি বাবদ, নিরাপত্তা রক্ষার অতিরিক্ত ব্যবস্থা বাবদ এবং মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭-৫৮ সনেও দেখা গেছে দুর্ঘটনা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা রক্ষার এবং মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐ বৎসরে অন্যান্য ক্ষেত্রে খরচের বাড়তি-কমতির হিসাব নিলে নীট উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় তের কোটি আটত্রিশ লক্ষ টাকা। সংশোধিত হিসাবে এর পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ২১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। জানা গেছে উদ্বৃত্ত টাকাটা উন্নয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আশা করা যাচ্ছে, ১৯৫৮-৫৯ সনের নীট উদ্বৃত্তের পরিমাণ তের কোটি টাকার মত দাঁড়াবে। এই টাকাটা উন্নয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হবে। আরও বলা হয়েছে, উন্নয়ন তহবিল থেকে রেলওয়ে পরিকল্পনা বাবদ খরচের পরিমাণ প্রায় ৯২ কোটি টাকার মত। লোকসভায় সদস্য শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী মন্তব্য করেছেন :

"I do not understand why the railways should continue to contribute more than their capacity to the general revenues and later ask for loans for its development funds. Progressive decrease in the development fund means less allocation for passenger amenities and labour welfare. The situation can be solved only by reducing the contribution to the general revenues,"

এছাড়া অনেক কংগ্রেসী সদস্য সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

"The reason for a small budget surplus is the increasing cost of administration. Today the railways are asking for loan from the general budget. The trend in the railway finances is a serious matter which should be seriously considered. The railways should cut their coat according to the cloth available."

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট সম্বন্ধে বিতর্ক সুরু হলে শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ পূর্ব্ব-রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রেলওয়ে মন্ত্রীর উপর চাপ দিতে থাকেন, কারণ তিনি মনে করেন, পশ্চিমবাংলার পক্ষে এই শাখার উন্নতি একান্ত জরুরী। একথা অনস্বীকার্য্য যে, ভারতীয় রেলওয়েতে শিয়ালদহ শাখাটি সব চাইতে বেশী অবহেলিত। অবশ্য পাট ব্যতীত অন্যান্য মাল এই শাখায় বেশী চালান যায় না। তবে এই শাখায় শহরতলীর যাত্রীর অত্যধিক ভীড়ের কথা খুবই সুবিদিত। কাজেই যাতে সময় মত ট্রেণ চলাচল সুনিশ্চিত হয় এবং যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্ভবপর হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত দরকার। এ ছাড়া রেলওয়ে মন্ত্রীর কাছে আরও দুটো দাবি জানান হয়েছে। প্রথমতঃ বারাসত-বসিরহাট রেলপথ খোলার কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে এবং কালীঘাট-ফলতা লাইনে রেল সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের হয়ত জানা আছে, বারাসত-বসিরহাট রেলপথের জন্য
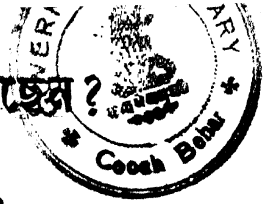
দুই কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অথচ এ পর্য্যন্ত চৌদ্দ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং বাজেটে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটা সত্যি দুঃখের কথা যে, পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত করতে অত্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে। অবশ্য বিলম্বের কারণ হ'ল এই যে, পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করার জন্য যে পদ্ধতি অনুসারে জমি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হয়েছে, সে পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, এক খণ্ড জমির জন্য হাইকোর্টে এখনও মামলা দায়ের আছে। কখন মামলাটির নিষ্পত্তি হবে বলা শক্ত। কাজেই এই জমিটুকু বাদ দিয়ে লাইন বসান যায় কিনা সেটা সরকারের পক্ষে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

রেলওয়ে মন্ত্রী এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ১৯৫৯ সনের এপ্রিল মাসে মোকামায় গঙ্গার উপর সেতু লোকজন এবং যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জন টেলিকো এবং ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীর উল্লেখে রেলওয়ে মন্ত্রী বলেন যে, চিত্তরঞ্জনে আগামী বছরে ১৬৮টি ইঞ্জিন তৈরি করা যাবে বলে সরকার আশা করছেন। চিত্তরঞ্জনে সাত হাজার টনের একটা ইস্পাত ঢালাই কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৫৮-৫৯ সনে এবং আগামী বৎসরে টেলিকো একশতটি ইঞ্জিন সরবরাহ করবে। মোট কথা হচ্ছে, রেলওয়ে মন্ত্রী বুঝাতে চেয়েছেন, দেশে ইঞ্জিন, বগী, রেলের সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের 'হিন্দু পত্রিকা' একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "The most gratifying feature of the Railway Minister's speech is the steady advance the country is making towards self-sufficiency in regard to locomotives, rolling stock and a variety of railway equipment. It is heartening to leran that the manufacture of mechanical components of electric locomotives is to be taken up."

রেলওয়ে মন্ত্রী নূতন রেলপথ খোলার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর এই আশ্বাস একেবারে অমূলক নয়, কারণ নূতন নূতন রেলপথ খোলা হচ্ছে। কিন্তু নূতন নূতন রেলপথ খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে পুরাতন রেলগুলোর তুলনায় নূতন রেলপথের খরচ অনেক কম হবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল সে আশা পূর্ণ হয় নি। তা ছাড়া রেলপথে মাল চলাচল দ্রুততর হবে বলে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সে আশ্বাসও সরকার কার্য্যে পরিণত করতে পারেন নি। বরঞ্চ আগের চাইতে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। শ্রীগোপাল সত্যিই বলেছেন, মালগাড়ীগুলির গতিবেগ বর্দ্ধিত করা উচিত এবং মালের ভাড়া বাবদ আয় বৃদ্ধির জন্য ওয়াগনগুলিকে ঠিকভাবে কাজে লাগান উচিত।

বৈশাখী বন্দনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পিছনে চেয়ো না ফিরে শোন নি কি নবীনের ডাক ?
প্রীতি সম উষ্ণ তাই প্রভাতের সমীর-পরশ,
সুবিস্তীর্ণ ক্ষিতি তাই শষ্পে তৃণে শ্যামল সরস।
অতীত? খুঁজো না তারে, বিস্মৃত সে স্মৃতি হয়ে থাক্।
আগত মাধবে হোক্ মধুচ্ছন্দে মধুময় বাক্,
মধ্যাহ্নে মধুপ কোথা গুঞ্জরিয়া ফেরে নিরলস,
সুদূরের পথ-যাত্রী মন বুঝি মানে না কো বশ,
শোননি আহ্বান তার নব বেশে এসেছে বৈশাখ!

আছে আলো, আছে ছায়া, মেঘরৌদ্রে মধুর ধরণী,
আছে দুঃখ, আছে সুখ, পৃথিবীতে আছে ভালবাসা,
চিরপরিবর্ত্তমান, তাই সে যে বিচিত্র-বরণী
সে যে অপরূপ, কোথা খুঁজে পাই বন্দনার ভাষা ?
গীতধ্বনি স্বাগতের—মনে মনে উঠিতেছে রণি,
বৈশাখ এসেছে নিয়ে নব সূর্য্য, নব নব আশা।

অঞ্জলি—শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—দু টাকা।

এখানি কবিতার বই। চৌত্রিশটি কবিতা আছে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রেম-পরিচায়ক, দু' একটি প্রকৃতিবর্ণনাত্মক এবং কয়েকটি ভক্তিমূলক। সূচনায় লেখক লিখিতেছেন,

সিক্ত শিশিরে ভাসি ঝরা পাতা ফুলরাশি
কুড়ায়ে এনেছি গোছা অঞ্জলি ভরি।

জগৎ 'মায়ামরীচিকাময়' একথা কাব্যকার বিশ্বাস করেন না। তাঁহার কাছে "জীবন নহেক শুধু রসহীন মরু ধূ ধূ।" 'ধূলির ধরণী' হয়ত কখনও কখনও ভাল লাগে না,

সন্ধানে ফিরি তাই তাপ-জ্বালা যেথা নাই,
তৃপ্তভরা সুধা-ঝরা নূতনের আলো।

কিন্তু তাঁহার আশা আছে। তিনি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, "তোমার সাথে বেড়াই ছুটে পক্ষীরাজের পক্ষপুটে।"

তিনি 'গোলাপ'কে সম্বোধন করিয়া বলেন,

গোপনে কার চুমায় পরশ,
অধর টল টল,
ঝরালি চুরি কোন্ রূপসীর
প্রেমের পরিমল ?

আর "অপরূপের রূপের ফাঁদে পরাণখানি ফুকরে কাঁদে।" তিনি মনে করেন "মায়াবিনী মহামায়া কায়া মাঝে রূপছায়া।" 'শেষ কথা'য় তিনি বলেন,

বিদায় গোধূলি বেলা,
শুন সখি ভালবাসি শেষ দুটি কথা।

লেখক সাম্য ও শান্তির প্রত্যাশী।

এস এস এস প্রেমের ঠাকুর
বরিষ অমিয় সুধা,
শান্তির বারি সিঞ্চন করি
মিটাও ধরার ক্ষুধা।

ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,

সম্বল মোর আর কিছু নাই—
একটি বেলের পাতা,
অশ্রুকণায় পূজব চরণ
নিশীথ বেলার ধাতা।

'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় "অঞ্জলি'র ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "ছন্দ, ভাষা ও ভাবে পূর্ণ কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাগবতী প্রেমের কথায় পূর্ণ, কাজেই আমার মত যে-কোন ভারতীয় পাঠকের সেগুলি ভাল লাগিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্কেচ—শ্রীমদন দাস। ইসারা প্রকাশনী—৩১, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৩। দাম ২৲ টাকা।

গল্পের বই। গল্পগুলি আকারে ছোট. ঘটনার সংঘাত কম। নীচুতলার মানুষ ও তাহাদের সঙ্কীর্ণ মনোজগতের নানা বৃত্তির প্রকাশ—মিশ্র ও ক্ষুদ্র ঘটনার টানা পোড়েনে পরিপূর্ণ এক একটি গল্পকে স্কেচের মধ্যে হয়ত পাওয়া যাইবে না, কিন্তু সংক্ষিপ্ত রেখায় ও চরিত্রের রূপ-উদ্ভাসে ইহার কোন কোনটি পাঠকমনকে দোলা দিয়া যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এইগুলিকে যাচাই করিবার অবকাশ থাকিলেও লেখকের দরদী মনের পরিচয় এটুকুর মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। উচ্ছাসবর্জ্জিত ভাষা সংক্ষিপ্ত চিত্রেরই উপযোগী।

এরা দু'জন—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।.শরৎ পুস্তকালয়, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫৲ টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানির ভূমিকায় লেখকের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে গল্প সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্যটি মোটামুটি ভাবে জানা যায়। তিনটি সামাজিক প্রশ্নকে গল্পের মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন লেখক। বলাবাহুল্য যুগ-প্রভাবিত জীবনের উপর সেগুলির ক্রিয়া অপরিহার্য্য।

প্রথম প্রশ্ন—প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটিলে জীবন কি শুধুই দীর্ঘনিশ্বাসের বোঝায় ভারী হইয়া উঠিবে, না কর্ম্মযজ্ঞে সফলতার সন্ধান করিবে ? দ্বিতীয় সমস্যা প্রাক্‌-বিবাহ প্রেম-সমস্যা। স্বামী বা স্ত্রীর অন্যাসক্ত জীবন কেমন করিয়া সার্থক হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত। শেষ প্রশ্নটি আরও সঙ্গীন—কুমারী কন্যার মাতৃত্ব লাভের প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলিকে তিনটি যুগ্ম নরনারীর জীবনের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়া লেখক গল্পের মালা গাঁথিয়াছেন। সমস্যাগুলি মূলতঃ বিভিন্ন হইলেও গল্পের সূত্রটি অখণ্ড এবং সবগুলিকে মিলাইয়া গল্পটিও সাবলীল ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে ভাষা—ঘটনার আবর্ত্ত নাই—তথাপি প্রথম দুটি পর্ব্ব পাঠক-চিত্তকে কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া রাখে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রাশিয়ায় যৌথ কৃষি—ফিডর বেলফ। অনুবাদক—অমলেন্দু সেন। পার্ল পাবলিকেসন প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই—১। মূল্য ৫০ নয়া পয়সা, পৃষ্ঠা ২০৩।

"The History of a Soviet Collective Farm" গ্রন্থের অনুবাদ লেখক একজন সোভিয়েট নাগরিক ছিলেন—রুশ বিপ্লবের একটু পরে উক্রেনের এক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। দেশের নানা কাজে ইনি লিপ্ত ছিলেন—যৌথ কৃষি পরিচালনাতে অভিজ্ঞতাও ইহার আছে। শেষ পর্য্যন্ত ইনি সোভিয়েট ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থা হারান এবং ১৯৫১ সনে পশ্চিম জার্ম্মানীতে পলায়ন করেন। বর্ত্তমানে ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

পুস্তকের বিষয় বস্তু নয়টি অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে। কলখস বা যৌথ খামার সোভিয়েট রাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামোর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। কিরূপে ক্রমে ক্রমে যৌথ খামার গঠিত হয়, জমি ও চাষের একীকরণে কৃষকের ও শ্রমিকের, দেশের গৃহস্থ ও পরিবারগুলির কি সুবিধা ও অসুবিধা হইয়াছে তাহার সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। গ্রাম ও কৃষিকে কিরূপে সহর ও শিল্পের নিকট বলি দেওয়া হইয়াছে লেখকের বর্ণনায় তাহার ইঙ্গিত ও বর্ণনা আছে। একনায়কত্বের দেশেও গণতন্ত্রের নামেই কাজ হয়, তবে কার্য্যত: আমলাতন্ত্রই প্রবল এবং উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নহে। চুরি, অসাধুতা, কাজে ফাঁকি, ঘুষ গ্রহণ প্রভৃতি সোভিয়েট সমাজেও যথেষ্ট আছে জানা যায় এবং এ জন্ত শাস্তির ব্যবস্থাও কঠোর, তবে সকল সময় প্রকৃত দোষী বা আদৌ দোষী যে শাস্তি পাইবে এরূপ নহে—যেরূপ ধনতন্ত্রের দেশেও হয়। কম্যুনিজম চেষ্টা করিয়াও দেশের লোকের খৃষ্টধর্ম্ম বা ধর্ম্ম বুদ্ধি কিংবা অন্যান্ত সংস্কার দূর করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের নামে এবং সর্ব্বহারাগণের হিতার্থে এক বিরাট শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের রাজত্ব চলিয়াছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে কিন্তু কৃষির শ্রমিক এবং কলের শ্রমিকের মধ্যে বেশ পার্থক্য বর্ত্তমান। আর আমলাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা ত আছেই।

বর্ত্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামাজিক উন্নতি জনগণের সমবেত শক্তিতেই হইয়াছে—কিন্তু উহার যৌথ কৃষি ব্যবস্থার ভাল-মন্দ উভয় দিকই এই পুস্তক হইতে জানা যাইবে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সমবায় মূলক যৌথ কৃষি প্রচলন সম্পর্কে ভারত সরকার তথা জাতীয় কংগ্রেসদল তৎপর হইয়াছিল।

অন্যান্ত দেশে রুশ কিংবা চীনে 'সমবায়' বা 'স্বেচ্ছা'র ভিত্তিতে যৌথ কৃষি হয় নাই, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সংখ্যালঘুদল সংখ্যাগুরুকে সর্ব্বহারার হিতের জন্ত যৌথভাবে কৃষির কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ভারত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রাখিয়া সমবায়ী যৌথ কৃষির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অন্যান্ত কৃষি প্রধান ব্যক্তি স্বাধীনতা-কামী দেশ নিশ্চয়ই ভারতের সফলতায় উৎসাহিত ও উপকৃত হইবে। দেশের কৃষির উন্নতিতে আগ্রহশীল প্রত্যেক ব্যক্তিরই আলোচ্য পুস্তকখানি পড়িয়া দেখা উচিত।

স্বাধীন ভারতের রূপ ও গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত ডাঃ মাখনচন্দ্র শাস্ত্রী। লেখক কর্ত্তৃক মালদহ হইতে প্রকাশিত, মূল্য—।৵০, পৃষ্ঠা ৬২।

পুস্তকখানি একাদশটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, স্বাধীন ভারত গঠনের পরিকল্পনা, বর্ত্তমান কংগ্রেস ও ভারত সরকার, স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে কাহার? পরাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন ভারতের তুলনা, স্বরাজের নমুনা, প্রতিকারের উপায়, মহাত্মা গান্ধীর বাণী ইত্যাদি। গ্রন্থকার গান্ধীজীর 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়াছেন এবং কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতাগণকে ইহার জন্ত দায়ী করিয়াছেন। তিনি প্রতিকারের উপায় বলিয়াছেন। কিন্তু উপায় নির্দ্ধারণ ও প্রতিকার সম্পাদন এক বস্তু নহে। আদর্শ ও বাস্তব এই উভয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক—লেখক। নিজেও যে ইহা অনুভব না করেন তাহা নহে। লেখক বর্ত্তমানে কংগ্রেস কর্ম্মী এবং কংগ্রেস রাষ্ট্র পরিচালকগণের মধ্যে মহাত্মাজীর আদর্শের অনুসরণ আরও ব্যাপক ভাবে দেখিলে খুশী হইতেন। যাঁহারা কংগ্রেসের শত্রু এবং ভারতের শত্রু ছিলেন, সেই আমলা এবং আই-সি-এস তন্ত্র আজও দেশ শাসন করিতেছে এবং বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতাগণ ইহার সমর্থক—এই নিদারুণ সত্য লেখকের মনে পীড়া দিয়াছে। মনে হয় যেন আমলা তন্ত্রের জন্ত দেশ স্বরাজ পাইয়াছে, দেশবাসীর জন্য স্বরাজ হয় নাই। স্বরাজের আমলে দুঃখ কষ্ট নৈতিক হীনতা বাড়িয়াছে।

কিন্তু সহজে এই সকল দুঃখ দৈন্যের প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। আর এই বিরাট দেশে মহাত্মাজীর রামরাজ্য আদৌ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা তাহাও ভাবিবার। গান্ধীজী দেশকে এবং দেশবাসীকে চিনিতেন এজন্য শেষকালে 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' করিতে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে ভাঙিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। যাহা হউক এই পুস্তকখানি পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

অনাথবন্ধু দত্ত

কৈশোরক—ডক্টর মতিলাল দাশ। আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩। পৃঃ ১৮২। মূল্য ৩৲ টাকা।

শতাব্দীর প্রথম দশকগুলির পর থেকে ক্রমশঃ প্রকৃতি-বিমুখ, কল্পনাদীন, নগ্ন-চিত্রণে যেখানে বাংলা গ্রন্থজগৎ ছেয়ে গেছে সেখানে জীবনের অনেকাংশের স্নাল যথার্থ রূপায়ণে শ্রীদাশের 'কৈশোরক'-এর মত পুস্তক মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করে। একটি কিশোর জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির কথাই 'কৈশোরক'-এর বিষয়বস্তু। ভীম ভৈরবতীরের ক্ষুদ্র, দুরন্ত এক মানবকের বারাসতে পিতার নূতন কর্ম্মস্থল যাত্রায় জন্মভূমির পরিচিত পরিবেশ ত্যাগের বেদনায় কাহিনীর আরম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে টিলটিল ঘটনা-ঢেউয়ে-ভরা স্বচ্ছ-সলিলা ইছামতি দেশে নূতন জীবনের বিস্ময়েরও সুরু। গো-

গাড়ীর ভ্রমণ, অর্জ্জুন ঠাকুরের হাতের রান্না, ম্যাজিসিয়ান খোয়েলদা, নীরদ ও গুর্ব্বিণী উপাখ্যান, আজিমার জিজ্ঞাসা, সংস্কৃতের এম-এ পাস সহিদুল্লা সাহেব, এগ্রিকালচারাল ডেমন্‌ষ্ট্রেটার সুবলদা, শ্যাম-বাবুর কথা : পুঁথি পড়ে পড়ে গ্রন্থকীট হয় না, গাধার বোঝা বয়ে লাভ কি ?—ইন্‌স্পেক্টার আপিসের দুর্নীতি, বন্দরীর মত আঁকা-বাঁকা পথের পাশে লীলাদের বাড়ী, জ্যোৎস্নালোকিত খর্জ্জুরবীথিতে অশরীরীর নীলাঞ্চলা রাবেয়া—রঙ্গস্থলীতে এমনি কত ঘটনা ও চরিত্রের শোভন দৃশ্যাভিনয়ের পর পরিচিত সকলের মমতা ও দেবতার মহিমা স্মরণে এই জীবন-পাঞ্চালীর শেষ।

লেখক সুপণ্ডিত। তবু ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সুকৌশল মিশ্রণে উপন্যাসের অলঙ্কারস্বরূপ ভারতধর্ম্মের একটি সারমর্ম্মের উপস্থাপন তাঁর রসিকমনেরই পরিচয় বহন করে।

এখন ভাল এবং আরও ভালর পরিপ্রেক্ষিতে—'কৈশোরক'-এর দু-একটি বিষয় অবশ্যবিচার্য্য। নায়কের পিতা গীতার নিষ্কাম-কর্ম্মী অথচ সব মানুষ এক এই নব মতবাদ তাঁর এখনও অনায়ত্ত? রবীন্দ্রনাথের লেখা দেশের মর্ম্মধারার সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে এ যুগের গল্পের নায়কের পক্ষেও এ চিন্তা অভাবনীয়। 'আমি নির্ম্মম নই, স্নেহহীন নই, অথচ মানুষের সঙ্গে আমার অতলস্পর্শ বিচ্ছেদ'—সাহিত্যব্রতী অজিতের এই নিসঙ্গতা নিঃসন্দেহে সকল শিল্পীরই, কিন্তু 'সুখ নাই স্বস্তি নাই' শিল্পীর সুস্থ জীবন-দার্শনিকতায় এ আক্ষেপের শেষাবকাশ কোথায়? 'কৈশোরক' ছোট-বড় বহু চরিত্রের মেলা। শ্রীচরণ মামা, হাবু, অজিতের পিতা, সুবলদা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশেরই আগমন, অবস্থান এবং বিদায় অল্প-বিস্তর ক্ষণস্থায়ী এবং দ্রুতগতি। বাস্তব-জীবনে হয়ত এরূপই হয়। কিন্তু নিছক বাস্তবই কি রস-সাহিত্য? বাস্তব-সঙ্কলন মাত্র কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্রের পূর্ণ-বিকশিত রূপেই কি উপন্যাসের গল্প-সফলতা নয়? এই হিসাবে সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগে 'কৈশোরক'-এর স্থান উপন্যাস অপেক্ষা অনেকাংশে জীবনী-পর্য্যায়ে।

শ্রীমোহনলাল চট্টোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য নাট্য আকাডেমির নূতন ভবন উদ্বোধন

গত ১লা বৈশাখ ১৩৬৬ সন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য নাট্য আকাডেমির (সঙ্গীত ভবন) নূতন গৃহের উদ্বোধন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্য মন্ত্রী বলেন, ১৩৬৮ সনে রবীন্দ্র জন্ম শত বার্ষিকী উৎসবে এই সঙ্গীত ভবন সম্প্রসারণ করিয়া 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। তিনি আরও বলেন, 'যে বাঙ্গলা গানের দেশ, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যান্ত কাব্য ও সুরের মন্দাকিনী ধারা বাংলা তথা, ভারতকে ধন্য করিয়াছে।' সত্যই বাংলায় সঙ্গীতের কাব্য-ভাব ও সুর-ভাবের যে সমন্বয় হইয়াছে, তাহা অতুলনীয় এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে যখন ভারতের সঙ্গীত এবং অন্যান্য শিল্প সংস্কৃতি লুপ্ত হতে চলেছিল তখন বাংলাই সঙ্গীতের ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া তাহার মর্য্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়াছিল। তিনি বলেন, 'সঙ্গীত নৃত্যাদি অনুশীলনই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ কথা নয়—রবীন্দ্রনাথ ভারতকে 'মহামানবের সাগর তীর' বলিয়াছেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহার স্বপ্ন, তাঁহার সাধনা, তাঁহার আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইবে, মহামানব গড়িয়া তুলিয়া এবং সেই ভার প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের উপর। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সাধনা, অনুশীলন ও গবেষণা করিবার জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে—যেখানে সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র প্রভৃতিতে তাঁহার অবদানের আলোচনা ও শিক্ষাদান হইবে এবং তৎসঙ্গে ভারতের সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির চির প্রচলিত ধারাও উপেক্ষিত হইবে না। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষির নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সমগ্র দেশবাসীর কাম্য। বর্ত্তমান আকাডেমির গৃহ রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো বাটির সংলগ্ন। এই সমগ্র স্থানটি রবীন্দ্রনাথের নামে জগতের এক শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হইবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠোনর পর আকাডেমির

ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের মিলিত সঙ্গীতানুষ্ঠান—সঙ্গীত বিভাগের সুচারু, সুশৃঙ্খল ও যোগ্য শিক্ষাদান ও আদর্শের পরিচয় দিয়াছে—স্বনামখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়কত্বে এই বিভাগ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নৃত্য বিভাগও তাঁহার পরিচালনাধীনে ও উপযুক্ত শিক্ষকগণের সহযোগিতায় অপেক্ষাকৃত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। নাট্য-বিভাগ নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নায়কত্বে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছে।

শিক্ষা নিকেতন, কলা নবগ্রাম

বর্দ্ধমানের সন্নিকট পাল্লারোড ষ্টেশনের অনতিদূরে কলা নবগ্রামে কয়েক বৎসর হইল একটি বুনিয়াদি শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্য পর্য্যন্ত এই কেন্দ্রের বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। সুখের বিষয়, মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদি শিক্ষার যে আদর্শের কথা বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাই মূলতঃ এখানে অনুসৃত হইতেছে।

"গান্ধীজীর নির্দ্দিষ্ট পথে শিক্ষার ভিতর দিয়া গ্রাম গঠনের আদর্শ লইয়া ১৯৩৫ সনে শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা কারণে ১৯৪১ সন হইতে ১৯৫০ সন পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৫১ সন হইতে আবার নূতন করিয়া ইহার কাজ আরম্ভ হয়। গত আট বৎসরই ইহার প্রকৃত কার্য্যকাল। এই আট বৎসরে শিক্ষা-নিকেতনের কাজ ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে শিক্ষা-নিকেতনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি শিক্ষা ও সেবা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। তাহার মধ্যে কয়েকটি শিক্ষা-নিকেতনের অঙ্গীভূত। অপর কয়েকটি তাহা না হইলেও নানাভাবে শিক্ষা-নিকেতনের সহিত যুক্ত আছে এবং শিক্ষা-নিকেতন তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

শিশু-বিদ্যালয়

শিশু-বিদ্যালয়ে তিন হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় প্রধানতঃ অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেদের জন্য। তাহা হইলেও এখানে কিছু কিছু উচ্চশ্রেণীর ছেলেও আছে। এখানে শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, শুদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া কথা বলা, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজে করা, পাঁচজনে এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকা এবং নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলা শিক্ষা দেওয়া হয়। নানাবিধ খেলার সাহায্যে শিশুর শরীর এবং বুদ্ধিচর্চ্চার ব্যবস্থা করা হয় এবং শেষের দিকে একটু একটু লিখিতে পড়িতে শেখান হয়। আলোচ্য বৎসরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৪০ ছিল; তাহার মধ্যে বালক ২৩ এবং বালিকা ১৭।

এই বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রকে দুধ ও জলখাবার দেওয়া হয়। বর্দ্ধমান রেডক্রশ সোসাইটি প্রয়োজনীয় সমস্ত দুধ দেন। জলখাবার বিদ্যালয় হইতে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে এজন্য যে টাকা বরাদ্দ আছে তাহাতে ৪০টি শিশুর জলখাবারের সমস্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য গ্রামবাসীদের নিকট সাধ্যানুসারে মুড়ি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানান হইয়াছিল। তাহার ফলে ১০ জন গ্রামবাসী কিছু কিছু করিয়া মুড়ি দিতেছেন। এখন মাসে গড়ে ৬ টিন মুড়ি পাওয়া যায়। এই মুড়িতে সারা মাসের খাবার হয় না। মাসে অন্ততঃ ১৬ টিন মুড়ির প্রয়োজন হয়।

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছয় হইতে দশ বৎসরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়টিও বিশেষ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য। তাহা হইলেও এখানেও কিছু কিছু উচ্চ শ্রেণীর ছেলে আছে। এই বিদ্যালয়ে কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। বাগান করা এবং সুতা কাটাই এখানকার প্রধান কাজ। এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৮৬ ছিল, তাহার মধ্যে বালক ৪৭ এবং বালিকা ৩৯।

দরিদ্র ছেলেদের জন্য এই বিদ্যালয়ে একবেলা আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের জীবিকার জন্য অন্যের বাড়ীতে রাখালি করিতে হইত এবং সেইজন্য ইহারা পড়ার সুযোগ পাইত না। এই বৎসরের প্রতিদিন গড়ে ১৬ জন ছাত্র খাইয়াছে। এই বাবদ খরচ হইয়াছে ১০৫৪ টাকা। তরকারি ছেলেরা নিজেরাই তৈয়ারি করিয়াছে। চাল কলা নবগ্রাম, দাদপুর এবং সিঙ্গুর হইতে মুষ্টিভিক্ষার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের শ্রীরামলাল গুপ্ত প্রতিমাসে ১ মণ করিয়া চাল এই উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। অপরাপর খরচ কয়েকটি বন্ধুর প্রদত্ত অর্থ হইতে শিক্ষা-নিকেতন বহন করিয়াছে। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের নিয়মিত ভাবে দুধ দেওয়া হয় এবং এই দুধ বর্দ্ধমান রেডক্রশ সোসাইটি দেন। দরিদ্র ছাত্রদের জামা কাপড় বিদ্যালয় হইতে দেওয়া হয়। এই বৎসর ৫৮ জনকে জামা প্যান্ট দেওয়া হইয়াছে। কিছু জামা কাপড় পশ্চিমবঙ্গ হরিজন বোর্ড ও বর্দ্ধমান রেডক্রশ সোসাইটি হইতে পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের প্রদত্ত অর্থ হইতে তৈয়ারি করা হইয়াছে। এই বৎসরে ছাত্রদের কাজ হইতে ৪৬৪ টাকা আয় হইয়াছে।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এগারো হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক বালিকারা পড়ে। এখানে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া হয়। এখানকার পাঠ শেষ করিয়া ছাত্রেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারে। এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫৮ ছিল, তাহার মধ্যে বালক ৫১ ও বালিকা ৭। এখানেও কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁত সেলাই ও চাষ এখানকার প্রধান কাজ। সঙ্গে সঙ্গে একটু কাঠের কাজও শেখান হয়।

ছেলেরা যাহাতে শিক্ষার ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের অন্নবস্ত্র ও গৃহোপকরণের বিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই কাজগুলি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। এখানে প্রত্যেক ছেলে সুতা কাটে এবং সেই সুতায় কাপড় বুনিয়া তাহা হইতে নিজেরাই নিজেদের স্কুলের পোষাক তৈয়ারি করিয়া নেয়। যাহাতে তাহারা খাবারের বিষয়েও যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহার চেষ্টা হইতেছে।

ছেলেদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষার সময়ও বাড়াইবার প্রয়োজন হয়। দেখা গিয়াছে, এই বয়সের ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে ১০টা-৪টা স্কুল করিলে চলে না, সেইজন্য এই বৎসর হইতে ছেলেদের সারাদিন বিদ্যালয়ে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছেলেরা সকালে আসে, সন্ধ্যায় যায়। পড়াশোনা, কাজকর্ম্ম এবং খেলাধুলা তাহারা বিদ্যালয়েই করে। কাছাকাছি গ্রামের ছাত্রেরা দুপুরে বাড়ি গিয়া খাইয়া আসে। দূর গ্রামের ছাত্রেরা বিদ্যালয়েই খায়। বিদ্যালয়ে রান্না হয় এবং ছেলেরাই রান্নার ব্যবস্থা করে। একবেলা খাওয়ার জন্য প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে তিন টাকা ও পাঁচ সের চাল দিতে হয়। যাহারা দিতে পারে না তাহাদের খরচ শিক্ষা-নিকেতন দিয়া থাকে। প্রয়োজনীয় তরকারি ছাত্রেরা নিজেরাই তৈয়ারি করে।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হয়। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অর্দ্ধবেতনে ও বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা আছে। এই বৎসর হইতে সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে বালিকারা বিনা বেতনে পড়িতেছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এই বৎসরে তাহাদের কাজের দ্বারা ১৪৬০ টাকা আয় করিয়াছে।

শিল্প-বিদ্যালয়

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া ছেলেরা এই শিল্প-বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। যাহারা অন্য বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়াছে তাহারাও ইচ্ছা করিলে এই বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল তিন বৎসর। শিল্প-শিক্ষা এই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হইলেও যাহাতে ছেলেরা বিশেষজ্ঞ শিল্পী হইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে উন্নততর শিল্প-শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য এখানে শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর সরকারের শিল্প-শিক্ষাবিভাগ হইতে ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে। এই বৎসরে এই বিদ্যালয়ে ২৪ জন ছাত্র ছিল।

শিশু-বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্প-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সাধারণ রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থাও বিদ্যালয় হইতেই করা হইয়া থাকে।

শিক্ষা-সম্প্রসারণ-বিভাগ

শিশু-বিদ্যালয় হইতে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত ছেলে ও মেয়ে এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। তাহার পর ছেলেরা ইচ্ছা করিলে শিল্প-বিদ্যালয়ে পড়িতে পারে। কিন্তু মেয়েদের পরবর্ত্তী শিক্ষার জন্য কোন বিদ্যালয় নাই। তাহা হইলেও মেয়েরা ইচ্ছা করিলে যাহাতে আরও পড়াশুনা করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করিয়া স্কুল ফাইনাল পর্য্যন্ত পড়িতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাও দিতে পারে।

গ্রন্থাগার মণ্ডল

যাহারা লেখাপড়া শিখিবার চর্চ্চার অভাবে ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছে তাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার জন্য একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গ্রন্থাগার মণ্ডল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শিক্ষা-নিকেতনে একটি আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধীনে আটটি গ্রামে আটটি পল্লী-গ্রন্থাগার আছে। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার হইতে শাখা গ্রন্থাগারে বই দেওয়া হয়।

বাণী-চিত্র-প্রচার-বিভাগ

লোকশিক্ষার জন্য বাণী চিত্রের সাহায্যে প্রচারের একটি ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিল্ম লাইব্রেরী ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চলচ্চিত্র সহযোগে শিক্ষা প্রচার করা হইয়া থাকে। এই বৎসরে বিভিন্ন গ্রামে ১০১ বার ছবি দেখানো হইয়াছে এবং আনুমানিক ৪৬,৫০০ জন লোক এই ছবি দেখিয়াছে।

সমাজসেবা-শিবির

সামাজিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে প্রতি বৎসর শিক্ষা-নিকেতনে একটি সমাজ-সেবা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে সমাজ-সেবার সহিত বহুমুখী সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। দেশকে ভাল করিয়া জানিতে বুঝিতে এবং দেশের যোগ্য নাগরিক হইতে হইলে যাহা কিছু শিখিতে হয় তাহা এই শিবির-জীবনের স্বল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব শিখাইবার চেষ্টা করা হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

শিক্ষা-নিকেতনের সহিত সংশ্লিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে। এখানে ৬০ জন শিক্ষার্থীর স্থান আছে। শিক্ষার্থীদিগকে মাসিক ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহারা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। আলোচ্য বৎসরে ৫৬ জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৩৩ জন পুরুষ ১৮ জন স্ত্রী।

শুশ্রূষা-শিক্ষণ-কেন্দ্র

স্বল্প শিক্ষিত অনাথ মহিলাদের এই শিক্ষণ-কেন্দ্রে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষাদানের যোগ্য করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহারা সমাজের সেবা করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনেরও যোগ্যতা লাভ করেন। এই শিক্ষণ-কেন্দ্রের শিক্ষাকাল তিন মাস এবং এখানে শিক্ষার্থীদের মাসিক ৩০ টাকা

করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা মাসিক ৬০ টাকা বেতনে নিম্ন বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষাদানের কাজ করেন। এই বৎসরে ৫৯ জন শিক্ষার্থী এখানে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল-কেন্দ্র

সমাজ-কল্যাণ বোর্ডের সাহায্যে শিক্ষা-নিকেতনে মায়েদের ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রে সমাগত সকল রোগীকেই বিনা মূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। এই বৎসর মোট ১,৩২৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

চক্ষু-চিকিৎসা-কেন্দ্র

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা-সমিতির সাহায্যে দরিদ্র রোগীদের বিনা মূল্যে ছানি কাটার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বর্গীয় আশুতোষ দাসের সহকর্মী ডাঃ অনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক রোগীদের ছানি কাটিয়া দিয়াছেন ও পরিচর্য্যা করিয়াছেন। ১৯ জন রোগীর ছানি কাটা হইয়াছিল, সকলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

চিকিৎসার ঔষধাদি অধিকাংশ খরচই আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতি বহন করেন। তাহা হইলেও কিছু খরচ শিক্ষা-নিকেতনকেও বহন করিতে হয়। পূর্ব্ব বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে রোগীদের মধ্যে অনেকেই বিছানা আনিতে পারেন না। সেইজন্য আলোচ্য বৎসরে রোগীদের বিছানার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে চক্ষু চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে ২১ খানি তোষক, ১২টি মশারি, ৩টি বিছানার চাদর এবং নগদ ১৪৭৮ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ৪৫১ টাকা খরচ হইয়াছে, ১,০০০ টাকা আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতির তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে।

আত্যন্তিক উন্নয়ন অঞ্চল

শিক্ষা-নিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া মেমারি ও বর্দ্ধমান থানার ছয়টি ইউনিয়ন লইয়া একটি আত্যন্তিক উন্নয়ন অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। জাতীয় সরকার যে ভাবে সমগ্র দেশে শিক্ষা উন্নয়ন করিতে চান এই অঞ্চলে তাহারই একটা পরীক্ষা করা হইতেছে। এই অঞ্চলে ১৫২ খানি গ্রাম আছে, ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৬৭ হাজার। ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের ছেলে মেয়ের সংখ্যা ৮,৫০০। বর্ত্তমানে এই অঞ্চলের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যাহাতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের সমস্ত ছেলেমেয়ে যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পায় তাহার চেষ্টা হইতেছে। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য ও সুধীরচন্দ্র সাহা যুগ্ম সম্পাদক, শিক্ষা-নিকেতন।"

ডঃ ধীরেন্দ্রলাল দে

কলিকাতা উইমেন্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দে এম এ, (ইতিহাস ও দর্শন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পি-এইচ-ডি (লণ্ডন) গত ১৬ই মার্চ্চ সোমবার দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল বাট বৎসরের কিছু বেশী। বহুদিন যাবত তিনি ব্লাড প্রেসারে ভুগিতেছিলেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দে মহাশয় পরিচিত মহলে "ডাক্তার দে" বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অভাব ও ক্ষতি হইল তাহা একদিক দিয়া অপূরণীয় বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ চরিত্রবান্ উদারচেতা আদর্শনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ বিরল—বিশেষতঃ দেশব্যাপী এই দুর্নীতির ও হীন স্বার্থপরতার দিনে তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, উৎসাহ, দৃঢ়তা ও কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাস ও দর্শনে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনে পি, এইচ ডি ডিগ্রি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে আর্থিক অনটন ও ক্লেশের মধ্যে তিনি লণ্ডনে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা তাঁহার সংগ্রামশীল জীবনের একটি অপূর্ব্ব অধ্যায়। তাঁহার মেরুদণ্ড অতি সবল এবং সুদৃঢ় ইস্পাতের মত শক্ত ছিল বলিয়াই তিনি নিদারুণ অভাব ও অমানুষিক ক্লেশের মধ্যে লণ্ডনে থাকিয়া ঈপ্সিত ডক্টরেট ডিগ্রি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন। সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়, প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং অসাধারণ তিতিক্ষার বলে তিনি জীবনের নানা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ছাত্র জীবনেই তিনি স্বামী ভোলানন্দ গিরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে তিনি গেরুয়া পরিধান না করিয়াও জিতেন্দ্রিয় ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি প্রায় বিনা সম্বলে কতিপয় অনুরক্ত কৃতবিদ্য সহকর্মীর সহায়তায় উইমেন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে পদে পদে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, বিরূপ নির্ম্মম সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে। কিন্তু কোন বাধা বা সমালোচনা তাঁহাকে বিচলিত বা সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। তাঁহার চালচলন ছিল নিতান্ত সাদাসিধা এবং পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ। যদিও তিনি ছিলেন বিলাত ফেরত তথাপি তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া আর কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন নাই। তিনি ছিলেন সর্ব্বতোভাবে জাতীয়তার উপাসক। দেশীয় পোষাক পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, চাল-চলন ও আচার-অনুষ্ঠানের তিনি সমর্থক ও পক্ষপাতী ছিলেন ইহা বলিলে যথেষ্ট বলা হয় না। তিনি ছিলেন স্বাদেশিকতার ও স্বাজাত্যবোধের একনিষ্ঠ ভক্ত।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ
১ম খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ { ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গতগৌরব হৃতআসন

চারিদিকে একটা কথা চলিয়াছে যে, পশ্চিম বাংলা এখন উপেক্ষিত ও অবহেলিত। অনেক বিষয়ে এই প্রদেশের উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু কোনকিছুই বিশেষ করা যাইতেছে না, কারণ কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে টাকা আসিতেছে না। অর্থাভাবে প্রদেশের সবকিছুই নষ্ট হইতে চলিয়াছে যদিও এই প্রদেশ কেন্দ্রীয় তহবিলের আয়ের কোটা অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী জোগায়।

রপ্তানির হিসাবে ভারতের প্রধান আয়ের আকর, অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা আনিবার প্রধান উৎস যে কয়টি আছে তাহার মধ্যে পাট ও পাটজাত বস্ত্র, চা ও কাঁচা খনিজ, যথা কয়লা, পশ্চিম বাংলাই বেশী জোগায়, অন্য কোন প্রদেশ সে তুলনায় বিশেষ কিছু দেয় না। এবং রপ্তানির মধ্যে ঐ কয়টির স্থান এখনও গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানির হিসাবে কলিকাতা বন্দর এখনও ভারতের শীর্ষস্থানে, এবং এক হিসাবে ভারতের বহির্মুদ্রার সর্ব্বপ্রধান আকর কলিকাতা বন্দর।

আয়কর হিসাবেও পশ্চিম বাংলার স্থান অতি উচ্চে, যদিও আয়তনের হিসাবে অধিকাংশ প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কলিকাতার বাজার বৃহত্তম। কলকারখানার হিসাবে পশ্চিম বাংলার প্রতিযোগী কোনও দুইটি প্রদেশ একত্রে হিসাব করিলেও সমান হয় কিনা সন্দেহ।

এক কথায় পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রের আয়ের বৃহত্তম উৎস। পশ্চিম বাংলা অন্য দিকেও, যথা শিক্ষাদি ব্যাপারে কোনও প্রদেশ অপেক্ষা কম নহে, যদিও এখন সে সবেরই অধোগতি হইতেছে—শৃঙ্খলার অভাবে, সংস্কারের অভাবে এবং উদ্যমের অভাবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখনও যাহা আছে তাহা অন্য কোনও প্রদেশের তুলনায় কম নয়, বরং প্রায় সকলের অধিক। সুতরাং সে হিসাবেও পশ্চিম বাংলা ছোট হইয়া যায় নাই।

অথচ এই উপেক্ষা ও অবহেলা এখন বিষম বাস্তবরূপ ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা বন্দর ত মজিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে, কলিকাতা নগরও জলাভাবে নষ্ট হইতে চলিয়াছে। পথঘাট ধোওয়া, শহরের মলক্লেদবাহী নালীপথে জলস্রোত দেওয়া, অগ্নিকাণ্ড নিবারণে জলপ্রবাহ উচ্চ-চাপে দেওয়া, এ ত প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। এখন পানীয় জল বিস্বাদ, জীবাণুযুক্ত ও লবণাক্ত হইয়াছে। পরিশ্রুত জলের সরবরাহও ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বন্দররক্ষা, নগররক্ষা এ সবেরই একমাত্র উপায় যে ফরাক্কার গঙ্গা-বাঁধ, একথা এখন কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বীকার করিয়াও কিছু করিতেছেন না।

নূতন বন্দর ও পোতনির্ম্মাণকেন্দ্র ভারতে প্রয়োজন। ইহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল অর্থের সংস্থান করিতে প্রস্তুত। বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞের দল নানা অঞ্চল ঘুরিয়া, তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া যে প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়াছেন তাহাতে যে কয়টি জায়গার নাম ও বিবরণ আছে তাহার মধ্যে গেঁয়োখালি নানা হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নূতন পোতনির্ম্মাণকেন্দ্র ও পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ এবং গঠনে স্থলমাহাত্ম্যের বিচার অনেক দরকার হয়, যথা নদীপথের গভীরতা, জোয়ারভাটায় জলস্ফীতি ও ভাটার প্রভেদ, লৌহাদি কাঁচামালের কারখানার সান্নিধ্য, কুশলী কারিগর ও শ্রমিকের সংস্থান ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ভারতের কোথায়ও সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ কোনও অঞ্চল নাই। যেখানে সর্ব্বাধিক পরিমাণে অধিকাংশ গুণের সংস্থান আছে তাহার নাম গেঁয়োখালি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার সকল তথ্য মিথ্যার জালে চাপা দিয়া নিজের "কাজীর" বিচারে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ঐ কেন্দ্র স্থাপন করিতে চলিতেছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার এ বিষয়ে অসহায় অবস্থা অনুভব করিতেছেন। এই অসহায় অবস্থা তাঁহারা ক্রমে অনেক বিষয়েই অনুভব করিতেছেন ও শীঘ্রই আরও করিবেন, এই ত সবে কলির সন্ধ্যা।

পশ্চিম বাংলা এই ভাবে "গতগৌরব হৃতআসন" হইয়া অস্তাচলের পথে চলিয়াছে কেন? তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম বাংলার সন্তানবর্গ এখন মূক, বধির ও পঙ্গু জড়ভরতের অবস্থায় নিজের ইচ্ছায় গিয়াছে।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সরকারের দান

সঙ্গীত, নাটক এবং নৃত্যাদির অনুশীলনার্থে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইতেছে। গত ২৮শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভবনের নাম হইবে 'রবীন্দ্র-ভারতী'। মুখ্যমন্ত্রী এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, একটি জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের সঙ্কল্প সরকার অনুমোদন করিয়াছেন। এই গৃহ-নির্মাণের খরচ হইবে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতের সংস্কৃতি-স্রষ্টা ও মন্ত্রদাতা। দেশকে তিনি নবজীবনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, আবার ভারতীয় মনীষার দ্যুতি পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার নামাঙ্কিত সংস্কৃতি-সদনের মধ্য দিয়াই ভারতবর্ষে তাঁহাকে চির-জাগরূক রাখা সম্ভব হইবে।

কিন্তু এইরূপ বৃহৎ পরিকল্পনার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, ইহা মনে করিতেও ভয় পাই। কারণ চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি শান্তিনিকেতনের পরবর্তী অবস্থা। যে-বিভাগে আজও যাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেইসব বিভাগে কোন যোগ্য লোকই স্থান পান নাই। তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ কোথাও রক্ষিত হইতেছে না। আমরা দেখিতেছি রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নৃত্যের ধারায় ব্যভিচার ঘটিয়াছে।

'রবীন্দ্র-ভারতী' সম্বন্ধেও আমরা সেই কথাই বলিতে বাধ্য হইতেছি। ইহা কি শুধু নৃত্য, নাট্য এবং সঙ্গীতাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে? সংস্কৃতির নামে যে-ব্যবস্থা, অর্থাৎ সঙ্গীত-নাটক-আকাডেমী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে করিয়াছেন, সেখানেও দেখা যাইতেছে গুণিজনের আদর নাই। শুধু নামের জন্যই যাঁহাদের রাখিয়াছেন তাঁহারা অপ্রয়োজনের মতই একপাশে পড়িয়া রহিয়াছেন। সুতরাং 'রবীন্দ্র-ভারতী' প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কোথায়? সংস্কৃতির নামে কয়েকজন অপোগণ্ড পোষণ করিলে রবীন্দ্রনাথের নামের অপব্যবহারই করা হইবে, ইহাই আমরা বলিতে চাই।

সরকারের প্রচেষ্টা ভাল। সে সম্বন্ধে বলিবারও আমাদের কিছু নাই। কিন্তু তাহাকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করিতে হইলে রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত হওয়া দরকার।

নৃত্যের মধ্যে একটা শালীনতা বোধ থাকা অত্যাবশ্যক। সেই জন্যই এত নাচ থাকিতে রবীন্দ্রনাথ 'মণিপুরী-নৃত্যে'র ধারার নূতন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। গানের সুর সম্বন্ধেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। কোন ব্যতিক্রমকেই তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার অবর্তমানে সে-ধারা অনুসৃত হইতেছে কি? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষায় তিনি গানে ও ছন্দে যে হ্রস্বদীর্ঘের সুস্পষ্ট প্রভেদ রাখিতেন আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীত নামে যে বিকৃত পদার্থ চলিতেছে তাহাতে সেই পার্থক্য থাকে কি? তাই মনে হয়, তাঁহার নাম লইয়া এরূপ ছেলেখেলা আর না করাই উচিত।

সংস্কৃতি রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন ইহা অবশ্য আশার কথা। দুঃস্থ সাহিত্যিক যাঁহারা অর্থাভাবে তাঁহাদের পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না, যাঁহারা আজীবন সাহিত্য-সাধনা করিয়া আসিয়া বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যকল্পে উপযুক্ত অর্থসাহায্য এবং ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সরকার সহৃদয়তারই পরিচয় দিয়াছেন যদিও সকলক্ষেত্রে যোগ্য-অযোগ্যের বাছাই হয় না। 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত পুস্তকের চিত্র-সাফল্যের জন্য ১৮,০০০ টাকা পুরস্কার হিসাবে সরকার দিয়াছেন। এটা আনন্দের বিষয়। মাসিক ভাতা হিসাবে লেখকরা পাইয়াছেন ২৩,৫০০ টাকা এবং পুস্তক প্রকাশের জন্য লেখকদের দেওয়া হইয়াছে ২০,০০০ হাজার টাকা।

পূর্বে দেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতি ধনী শ্রেণীর লোকেরাই কবি সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণিজনকে পোষণ করিতেন। সে দায়িত্ব লইয়াছেন আজ সরকার। যদিও ইহা আরও পূর্বে হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, যাহার শেষ ভাল তাহার সব ভাল। বাংলা দেশের কয়েকটি পত্রিকা-প্রতিষ্ঠানও তাঁহাদের দ্বারা বিবেচিত যোগ্য লেখকদের প্রতিবৎসর পুরস্কার-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টাকেও অভিনন্দন করি।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, মহৎ উদ্দেশ্যে টাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই চলে না। সঙ্গীত নাটক নৃত্য চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আনুষঙ্গিক শিক্ষাদানের প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব। শান্তিনিকেতনও গুরুদেবের মহা-প্রয়াণের পর সকলদিকেই দ্রুত অবনতির পথে চলিয়া আসিতেছে। এমত অবস্থায় নীচের ভিত্তি না গাঁথিয়াই বিরাট সৌধ নির্মাণের চেষ্টা বিফল ত হইবেই উপরন্তু বহু অসৎ লোকের প্রভাব বাড়িবে। আমাদের অনুরোধ, কর্তৃপক্ষ 'কর্ণে ন পশ্যতি' এই নীতি ছাড়িয়া নিজেরা চোখ চাহিয়া দেখুন। কুপোষ্য-পোষণের ব্যবস্থায় তাঁহারা ত কোটি কোটি টাকার অপব্যয়ের পথ ত রাখিয়াছেনই, তবে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র নামের সঙ্গে আরও অনাচারের পথ খোলা কেন?

জাতীয় আয়

ভারতের জাতীয় আয়ের সংশোধিত হিসাব সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাব প্রধানতঃ দুই ভাবে করা হয়—১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যমান অনুসারে এবং বর্তমান মূল্যমান অনুসারে। ১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যমান অনুসারে সংশোধিত হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতীয় জাতীয় আয় ছিল ১১,০০০ কোটি টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে ইহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১০,৮৩০ কোটি টাকায়। এই দুই বৎসরে মাথাপিছু গড়ে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ছিল ২৮৩ টাকা এবং ২৭৫ টাকা। ১৯৪৮-৪৯ সনের মূল্যমান অনুসারে জাতীয় আয়

২২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিগত আয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ মাত্র ১২ শতাংশ।

বর্ত্তমান মূল্যমান অনুসারে ১৯৫৬-৫৭ সনে জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ ছিল ১১,৩১০ কোটি টাকা এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে ছিল ১১,৩৬০ কোটি টাকা। বাৎসরিক গড়ে ব্যক্তিগত আয় বর্ত্তমান মূল্যমান অনুসারে যথাক্রমে দাঁড়ায় ২৯১.৫ টাকা ১৯৫৬-৫৭ সনে এবং ২৮৯,১ টাকা ১৯৫৭-৫৮ সনে। বর্ত্তমান মূল্যমানের ভিত্তিতে ১৯৫০ সনের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সনে ১৯ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৯ শতাংশ।

ভারতের জাতীয় আয় সংগঠনে বিভিন্ন শাখার মধ্যে এখনও পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতের অর্থনীতি এখনও প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। ১৯৫০-৫১ সনে কৃষি এবং পশুপালন প্রভৃতি হইতে আয় হইয়াছিল ৪,৮০০ কোটি টাকা এবং ইহা জাতীয় আয়ের ৫১.৩ শতাংশ ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সনে কৃষি এবং পশুপালন হইতে ৫,৩০০ কোটি টাকা আয় হয় এবং ইহা জাতীয় আয়ের ৪৭ শতাংশ।

খনিজ এবং শিল্পোৎপাদন হইতে জাতীয় আয় কৃষির তুলনায় এখনও অল্প। ১৯৫০-৫১ সনে এইগুলি হইতে মোট ১৫ কোটি টাকা আয় হয় এবং ইহা জাতীয় আয়ের ছিল ১৬ শতাংশ। ১৯৫৭-৫৮ সনে ইহা হইতে আয় হয় ২১ কোটি টাকা এবং ইহা জাতীয় আয়ের ছিল ১৮.৪ শতাংশ। সুতরাং দেখা যায় যে, যদিও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বলে শিল্পোন্নতির উপর জোর দেওয়া হইতেছে তথাপি শিল্প-প্রগতি তেমন দ্রুত হইতেছে না, ফলে জাতীয় সমৃদ্ধি প্রায় নিশ্চল হইয়া আছে। ১৯৫৬-৫৭ সনের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সনে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি প্রায় নগণ্য এবং ব্যক্তিগত আয় হ্রাস পাইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি। কিন্তু গত বৎসর ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে এবং গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয় কম হইয়াছে। ক্রমবর্দ্ধনশীল মূল্যমান ইহার জন্য দায়ী, অর্থাৎ যে হারে আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার অধিক হারে মূল্যমান বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধি মূল্যমানবৃদ্ধির পিছনে পড়িয়া থাকিতেছে। অর্থাৎ, আয়ের চেয়ে খরচ হইতেছে বেশী।

বর্ত্তমান অর্থনীতিবিদদের মতে শুধু জাতীয় আয়বৃদ্ধি সমৃদ্ধির পরিচায়ক নহে। ব্যক্তিগত আয় তথা জীবনমানের সহিত তুলনায় ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির হিসাব করিতে হইবে এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির ভিত্তিতে জাতীয় সমৃদ্ধি বিচার্য্য। জনসাধারণের দারিদ্র্যমোচনই জাতীয় প্রগতির মাপকাঠি হওয়া উচিত এবং যাহারা জীবনধারণের প্রান্তিক সীমানার কিংবা তাহার নীচে আছে তাহাদের উন্নতি ব্যতীত সত্যিকার জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। পরিকল্পনার প্রগতির বিচার করিতে হইলে প্রয়োজন জাতীয় জীবনমানের উপর ইহার প্রভাবের অনুমান। ব্যক্তিগত গড়পড়তা আয়ের মূল্য বিচার করিতে হইলে ন্যূনতম আয়ের প্রয়োজন ও পরিমাণ বিচার করিতে হইবে।

ক্ষুদ্রশিল্প-প্রগতি ও কার্য্যক্রম

বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করিতেছেন। যে দ্রুতহারে বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রশিল্পের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অধিকন্তু গ্রাম হইতে জনসাধারণ শহরে চলিয়া আসিতেছে কার্য্য-সন্ধানে। ইহার ফলে গ্রাম্য-জীবন বিপর্য্যস্ত হইতেছে এবং শহরের জীবন সঙ্কটময় হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থার হাত হইতে এড়াইতে হইলে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ও বিস্তৃতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সেই কারণে ভারতীয় অর্থনীতিতে এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্প একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইতেছে। এই শিল্পের কার্য্যসৃষ্টির সম্ভাবনা বিশাল আছে এবং ইহার উৎপাদনশীলতা প্রায় সীমাহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সরকারী শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য ৬১ কোটি টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং ইহা প্রায় দেড় লক্ষ লোকের কর্ম্ম সংস্থান করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন প্রধানতঃ রাজ্য-সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু দেশীয় অর্থনৈতিক জীবনে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারগুলিকে নীতি এবং কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণে সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থসাহায্য দিয়াও রাজ্য-সরকারদের সাহায্য করিতেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ক্ষুদ্রশিল্পের কি প্রগতি হইয়াছে এবং কি কার্য্যক্রম গৃহীত হইয়াছে তাহাই এখানে আলোচিত হইবে।

ক্ষুদ্রশিল্প বলিতে সেই শিল্পকে বোঝায় যাহার মূলধন স্বল্প এবং অল্প লোক দ্বারা যাহা চালিত হয়। সরকারী ব্যাখ্যা অনুসারে যে সকল শক্তিচালিত শিল্পে পঞ্চাশের নিম্নে কর্ম্মচারী নিয়োজিত আছে কিম্বা বিনা শক্তিতে পরিচালিত এক শতের কম কর্ম্মচারী নিয়োজিত আছে এবং যাহাদের মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার অনধিক তাহাদিগকেই ক্ষুদ্রশিল্প হিসাবে অভিহিত করা হয়। সম্প্রতি এই সংজ্ঞার কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। নূতন সংজ্ঞা অনুসারে শ্রমিকের সংখ্যা সমগ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইয়া প্রতি বেলার খাটুনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ তিন খাটুনীতে যদি মোট ১৪৫ শ্রমিকও কাজ করে তবুও তাহাকে ক্ষুদ্রশিল্প হিসাবে পরিগণিত করা হইবে, কারণ প্রত্যেক খাটুনীতে পঞ্চাশের নিম্নে শ্রমিক কার্য্য করিবে।

ক্ষুদ্রশিল্পের মালিককে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তার বহু অভাব—মূলধনের অভাব, কারিগরী শিক্ষার অভাব, অভাব যন্ত্রপাতির এবং তাহার আছে ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞানের অভাব।

রাষ্ট্র ক্ষুদ্রশিল্পকে বিভিন্ন অবস্থায় এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করে এবং ইহার পরিকল্পনা পর্য্যন্ত বহুক্ষেত্রে নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, কারিগরী উপদেশ দিয়া সাহায্য করে এবং উৎপাদনের ধারা শিখাইয়া দেয়, মূলধন বিষয়ে সাহায্য করে এবং কারিগরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

কারিগরী জ্ঞান এবং শিল্প-সংস্থা বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য আছেন ক্ষুদ্রশিল্প-উন্নয়ন কমিশনার এবং ক্ষুদ্রশিল্প কর্ম্ম ও বিস্তৃত কেন্দ্র। ছোট ছোট সংস্থাগুলির মালিকরা সাধারণতঃ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারে না টাকার অভাবে। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুদ্রশিল্প-সেবাসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রতিরাজ্যে ঐরূপ একটি করিয়া সংস্থা আছে। এই সংস্থা কারিগরী বিষয়ে ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে সাহায্য করে এবং শিল্প-সংস্থা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উপদেশ দেয়। বর্ত্তমানে এইরূপ ১৫টি সংস্থা আছে। এই সংস্থাগুলির অধীনে প্রতি অঞ্চলে শিল্প-বিস্তৃতি কেন্দ্র আছে এবং এই আঞ্চলিক সংস্থাগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্রশিল্পকে অভিজ্ঞ উপদেশ প্রদান করে। মোট ৬২টি বিস্তৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং ১৪টি ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্পতালুক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে ১০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল এবং পরে এই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৫ কোটি টাকা করা হইয়াছে। ১১০টি শিল্পতালুক সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই ৯৬টি শিল্পতালুক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাদের জন্য ১১ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে এবং এই ৯৬টি শিল্পতালুকে প্রায় ৩,৬০০ কারখানা থাকিবে এবং ৫০,০০০ লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। এই ৯৬টি শিল্পতালুকের মধ্যে ২০টি আছে গ্রাম্য এলাকায় এবং নয়টি আছে পরীক্ষামূলকভাবে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। যে ২২টি শিল্পতালুক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে ৫১৪টি কারখানা আছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের মূলধনের যথেষ্ট অভাব আছে, সেই কারণে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল শিল্পকে অর্থসাহায্য দিতেছেন। রাজ্যশিল্প বিভাগের মারফৎ এই সাহায্য দেওয়া হইতেছে। গত তিন বৎসরে রাজ্য সরকারগুলি ১২,৫৪৫ ক্ষুদ্রশিল্প এবং ৪২৬ শিল্প-সমবায়কে প্রায় ৭ কোটি টাকার ঋণ দিয়াছেন। কিন্তু যদিও প্রাথমিক অবস্থায় রাজ্যসরকারের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া সম্ভবপর তবুও ইহা অনুভূত হইতেছে যে সংস্থাগত ঋণই ভাল এবং ইহার জন্য রাজ্য ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে প্রকৃষ্ট হইবে। এমনকি সরকারী ঋণও রাজ্য ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মারফৎ দেওয়ার বন্দোবস্ত হইতেছে। রাজ্য ফাইন্যান্স কর্পোরেশনও প্রায় আড়াই কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে।

১৯৫৬ সনের প্রথম দিকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক পরীক্ষামূলক ভাবে বোম্বাই, সুরাট, কোলাপুর, মাদ্রাজ, দিল্লী, লুধিয়ানা ও আগ্রা ক্ষুদ্রশিল্পকে অর্থ সাহায্য দেওয়া সুরু করেন। বর্ত্তমানে ঋণদানের ব্যবস্থাকে সহজ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ঋণ যে কোনও সংস্থা হইতে আসুক না কেন, ঋণের আবেদন ষ্টেট ব্যাঙ্কের যে কোনও শাখায় দিলেই হইবে। প্রয়োজনানুসারে হয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক নিজেই ঋণ দেয়, তাহা না হইলে অন্য সংস্থার নিকট আবেদনপত্র হস্তান্তরিত করিয়া দেয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ইহার ৪৯০টি শাখাগুলায় এই বন্দোবস্ত করিয়াছে। সাধারণতঃ কাঁচামাল কিংবা উৎপন্ন দ্রব্যের বিরুদ্ধে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়। ১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক প্রায় ৮০০ ব্যক্তিকে ২.৬৩ কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে। মূলধনী সম্পত্তির বিরুদ্ধে যেমন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি, ষ্টেট ব্যাঙ্ক মাধ্যমিক মেয়াদী (অর্থাৎ সাত বৎসর পর্য্যন্ত) ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী না করিয়া দেশে উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। পশ্চিম জার্ম্মানী ও আমেরিকার কারিগরী সাহায্য-সংস্থার সহযোগিতায় ভারতবর্ষে রাজকোট এবং ওখলায় উৎপাদনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করার জন্য বৃহত্তর উৎপাদন-সংস্থার সহিত ছোট ছোট সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা হইতেছে। ক্ষুদ্রশিল্পের আর্থিক সংস্থান অল্প, এবং সেই কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয় করাতেই যাহাতে সমস্ত মূলধন নিঃশেষিত হইয়া না যায় তাই জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প-সংস্থার মাধ্যমে কিস্তিবন্দিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সনে ধারে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সুরু হয় এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ২ কোটি টাকার দ্রব্য কিস্তিবন্দিতে সরবরাহ করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন কাম্য। বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক বস্তি গড়িয়া উঠে এবং এই বস্তিগুলি সর্ব্বপ্রকার নোংরামি, অনাচার ও কদাচারের কেন্দ্র হইয়া উঠে। ক্ষুদ্রশিল্পের বিস্তৃতিতে বস্তীগুলির বিস্তৃতি রুদ্ধ হয় এবং ইহাই সমাজতত্ত্ববিদদের মত। আর শহরমুখী গতিতে রোধ করার জন্যও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন।

পঞ্চশীল নীতি ?

তিব্বতের ব্যাপার লইয়া ভারতের বিরুদ্ধে পিকিং হইতে যেসব অভিযোগ করা হইতেছে এবং যে ভাষায় মন্তব্য করা হইতেছে তাহা দেখিয়া যে কোন ধীরমস্তিষ্ক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহাই কি পঞ্চশীলসম্মত বন্ধুত্ব রক্ষার রীতি ? শ্রীনেহরু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, এরূপ আচরণের ফলে ভারত-চীন সম্পর্কে অবনতি না ঘটিয়া পারে না। শ্রীনেহরুর বিবৃতি সর্ব্বদাই সংযত অথচ সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক। বাস্তবিক, তিব্বতের ব্যাপারে ভারত এমন কিছু করে নাই যাহার জন্য চীন আপত্তি করিতে পারে। ভারত ও চীন এই উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব সম্পর্কে যদি অবনতি ঘটিয়া থাকে এবং ঘটে তার জন্য ভারত

দায়ী নহে। সন্দেহ নাই যে, তিব্বত লইয়া এশিয়ার সর্ব্ববৃহৎ দুইটি রাষ্ট্র ভারত ও চীনের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের স্থায়ী পরিবেশ রচিত হইলে তাহা মঙ্গলজনক হইবে না। এবং ইহার জন্য দায়ীও চীন সরকার। কারণ চীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অনেকে যে ভাষায় ভারতের উপর দোষারোপ করিতেছেন তাহা কেবল যুদ্ধকালে শত্রুর প্রতিই ব্যবহার করা যায়।

অবশ্য ইহা সত্য যে, পিকিং অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজিত ও বিচলিত হইয়াছে। বোধ হয় তাহার কারণ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ উদারভাবে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সম্ভবতঃ নয়া চীনের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের নাই। ফলে সম্পূর্ণ অকারণে পঞ্চশীল-সঙ্গত সাধারণ সৌজন্যটুকুও তাঁহারা বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে এই বিষ উদ্গীরণ করিয়াছেন। 'সাম্রাজ্যবাদ,' 'সম্প্রসারণবাদ' ইত্যাদি কতকগুলি বাছা বাছা বাঁধা বুলি এমন ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে যেন তিব্বত দখল করিতে ভারতই হাত বাড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা চীন সরকারের—বিশেষত চৌ এন-লাইয়ের অজ্ঞাত নয়। ভারত-রাষ্ট্র তিব্বতে যে সব বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত তাহা চীনের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া শ্রীনেহরু স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সে ত্যাগের কথা তাঁহারা ভুলিয়াই গেলেন। প্রতিবেশী চীন কম্যুনিষ্ট শাসিত রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ভারত যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভারত চীনের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ থাকুক, শ্রীনেহরু এখনও তাহা কামনা করেন। কিন্তু বন্ধুত্ব একতরফা হয় না। চীনের আচরণ এবং কথাবার্ত্তা ভারতের প্রতি প্রবল বিদ্বেষপরায়ণ হইলে সঙ্গত কারণেই ভারতের নিরাপত্তা সম্পর্কে সংশয় ও শঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমানে তাহাই হইতেছে।

শুধু সংশয় ও শঙ্কা নয়, তিব্বতে চীন সরকারের কার্য্যকলাপে ভারতের জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। চীন সরকার তাঁহার অন্ধ মতবাদ ও গোঁড়ামি বর্জ্জন করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ভারতের জনমত স্বভাবতই তিব্বতের জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল। যতই দরিদ্র, অনুন্নত ও দুর্ব্বল হউক, কোন জাতিই এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদেশী আধিপত্য স্বেচ্ছায় মানিয়া লয় না, ভারতবাসীরা তাহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রীনেহরুর প্রগতিবাদী খ্যাতি বিপুল এবং চীনের প্রতি তাঁহার বন্ধুত্ব-ভাবও নিশ্চয়ই সকল সন্দেহের অতীত। তিব্বতে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে চীন সরকারের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়াছে। তিব্বতে বিদ্রোহ ঘটিবার কারণ, চীন সরকার তিব্বতীয়দের স্বায়ত্তশাসন অধিকার রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন! এ ব্যাপারে ভারতের পক্ষ হইতে বন্ধুভাবে কিছু বলিবার অধিকার শ্রীনেহরুর নিশ্চয়ই আছে। চৌ এন-লাই প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, চীন সরকার তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবেন। সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া শ্রীনেহরু দলাই লামাকে চীনের সহিত চুক্তি করিতে সম্মত করান। এখন যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, চীন তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই, দলাই লামা স্বেচ্ছায় স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় লইয়াছেন তখন তিব্বত ব্যাপারে ভারত নিশ্চয়ই কিছু বলিবার অধিকার রাখে। এবং সেই কথাই আজ মনোমত হইল না বলিয়া, তাঁহারা সম্প্রসারণবাদ' বলিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। অথচ তিব্বতের উপরে নয়া চীনের অধিকার সম্প্রসারণে ভারত সরকারই সাহায্য করিয়াছিলেন, তখন ভারত সরকারের মধ্যস্থতা চীনের অপছন্দ হয় নাই। তবে তিব্বতীয়দের দুর্গতি দেখিয়া ভারত সরকার পিকিংকে তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিলে আজ তাহা অন্যায় বলিয়া গণ্য হইবে কেন? চীন যেন এ কথা না ভোলে, ভারতের নিরাপত্তা, ভারত-চীন বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব আজ নির্ভর করিতেছে তিব্বত-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর। যদি সে বন্ধুত্ব না থাকে তবে ক্ষতি একা ভারতের নয়, এ কথা বোধ হয় অবান্তর বা অবাস্তব নয়। এবং মনে হয় চীন কর্তৃপক্ষের মনে উহা উদয় হইয়াছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারের ঔদাসীন্য

ইংরেজ আমলে শুধুমাত্র স্কুল-কলেজের সাবেকী শিক্ষার উপর বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে মোহ এককালে প্রবল ছিল তাহা কাটিয়াছে অনেকদিন। অথচ স্কুল-কলেজের সেই পুরাতন শিক্ষার ঢালাও বন্দোবস্তটির যুগোপযোগী সংস্কার এখন পর্য্যন্ত করা হয় নাই। সেই পুরাতন নেমি-চক্রে হাজার হাজার ছেলে নিষ্পিষ্ট হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে সেই পুরাতন চাকুরির সন্ধানে। বাঙালী মধ্যবিত্ত তরুণের সম্মুখে এতকাল পর্য্যন্ত জীবিকার্জ্জনের গুটিকয়েকমাত্র পথ খোলা ছিল। স্কুল-কলেজের চৌকাঠ কোনও মতে পার হইবার পর অধিকাংশ বাঙালী সন্তানকে ছোট-বড় কেরাণি ও আমলাগিরি অথবা মাষ্টারীর সন্ধান করিতে হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সে চাকুরির বাজারেও ভিড় বাড়িয়াছে, কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ এখন প্রায় দুর্লভ হইয়া আসিয়াছে। এই অসহনীয় নৈরাশ্যময় পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে? দায়ী তাঁহারাই, যাঁহারা দ্বিতীয় পথ খোলা রাখেন নাই।

জীবিকার তাগিদে বাঙালীর ছেলেদের বাঁধা লাইনে স্কুল-কলেজী শিক্ষার গণ্ডি ভাঙিয়া আজ বাহির হওয়া প্রয়োজন। আজ তাহাদের মধ্যে যে-কোনরূপ শিক্ষানবিশী, কারিগরী ও ব্যবহারিক বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ দেখা দেওয়া উচিত। কিন্তু যাঁহাদের উপর এই রাজ্যের শিক্ষা-উন্নয়ন এবং কর্ম্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে, তাঁহারা সেই পুরাতন আমলের শিক্ষা-যন্ত্রটিকেই পরম যত্নে আগলাইয়া আছেন।

দেশব্যাপী শিল্পোন্নয়নের যুগে নূতন জীবনমানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিক্ষার নূতন বিন্যাস রচনা করা হইবে এবং তাহারই

প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল এইরূপ শুনিয়াছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বক্তৃতায় এইরূপ বড় বড় কথা অনেক বলিয়াছেন। কিন্তু কথা এবং কাজ এক জিনিস নহে। অন্য অনেক রাজ্যে গত দশ-এগারো বৎসরে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রসারিত করিয়াছেন লোক-শিক্ষার নামে নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত প্রভৃতি জমকালো আমোদ-প্রমোদের। শুনিলে আশ্চর্য্যই মনে হইবে, গত দশ-এগারো বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটিও নূতন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খুলিতে পারেন নাই। অথচ সরকার জানেন, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার দিকে ঝোঁক বাঙালী ছাত্রদের এখন বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের আগ্রহ এবং যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা সুযোগ পাইবে না, কর্ম্মক্ষেত্রে পিছনে পড়িবে—এই অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিবার জন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারই। ভারতে মোট আশীটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে মাত্র তিনটি। তাহাও কোনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ব্রিটিশ আমলের সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। যাদবপুরেরটি স্বদেশী আমলের দান। খড়্গপুরের 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজি' ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বভারতীয় সংস্থা। এখানে বাঙালী ছাত্র শতকরা কুড়িটির অধিক নয়। অন্য অনেক রাজ্যের অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল। কেরালার মত স্বল্পসম্বল রাজ্যেও একটির স্থানে তিনটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ খোলা হইয়াছে, বোম্বাইয়ে তিনটির স্থানে এগারোটি, মাদ্রাজে একটির স্থানে নয়টি। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবল ভরসাটুকুই দিয়া রাখিয়াছেন—চমৎকার ব্যবস্থা!

অভাব কেবল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের নয়—অভাব বাঙালী কিশোর ও তরুণদের জন্য বাস্তবানুগ সুসমঞ্জস শিক্ষা-ব্যবস্থার। আধুনিক শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষিকর্ম্মের ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রাখিয়া প্রাথমিক হইতে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্য্যন্ত শিক্ষার সমস্ত স্তরে নবরূপায়ণ অবিলম্বে প্রয়োজন। জানি না, সরকারের চৈতন্য আর কতদিনে হইবে? বেকার-সমস্যার কি অবহেলায় সমাধান সম্ভব।

শিক্ষার ধারা কোন্ পথে?

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন দেখিয়া মনে করা খুবই স্বাভাবিক পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা-সঙ্কোচ করিবার একটি অপচেষ্টা চলিয়াছে। অথচ শিক্ষার খাতে ব্যয়-সঙ্কোচ সরকারের নাই ইহাও দেখা যাইতেছে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ যথেচ্ছাচার কাহারা করিতেছে?

দেশকে শিক্ষিত করিবার কাজে সরকার গ্রামে গ্রামে বিদ্যাভবন নির্ম্মাণ করাইতেছেন, বিনা বেতনে অনেক স্থলে পড়াইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাধিক্যে দরিদ্র অভিভাবকরা পীড়িত হইতেছেন। একই শ্রেণীর বইগুলি পরের বৎসরে চলে না—চালাইবার নির্দ্দেশও শিক্ষাপর্ষদের নাই। সুতরাং দাদার বই ভাই পড়িয়া যে পিতার ব্যয়ভার লাঘব করিবে তাহারও উপায় নাই। ফলে, তাঁহারা ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়াইতে বাধ্য হইতেছেন। শিক্ষা-সঙ্কোচের কথা এই কারণেই আসিতেছে। ইহার পর আছে ছেলেমেয়েদের উপর পাঠ্যপুস্তকের চাপ। চতুর্থ শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে যাহারা উঠিতেছে তাহারা ত অগাধ সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। তিন-চারখানি বাংলা এবং পাঁচখানি ইংরেজী, যেমন: Oriental Primer, Children's English Grammar, Children's English Translation, In the class Room, Pick up the words প্রভৃতি। অথচ চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্তও তাহাদের হয় নাই—সেই অশিক্ষিত শিশুমতি বালকবালিকাদের পক্ষে ইহা বোঝার সামিল ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার উপর আছে অঙ্কের বই দুখানি, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, জ্যামিতি: পরিশেষে আছে প্রাথমিক হিন্দী ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা। কোন্ উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত উদ্ভাবনীর ফলে শিক্ষা-রীতির এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিতেছে আমাদের অবশ্য জানা নাই। কিন্তু কর্তৃত্ব যাঁহাদের হস্তেই থাকুক, তাঁহারা যে নিয়মানুগ পথে চলিতেছেন না ইহা অনস্বীকার্য্য।

অবশ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার নব রূপায়ণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দ্বিমত হইবার কোন কারণই নাই। 'কাব্য কম কর, যুগের সঙ্গে পা ফেলিয়া চল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাল করিয়া শেখ'—নূতন শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যে এ জাতীয় যে মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে অতিবড় নিন্দুকও দোষ ধরিতে পারিবে না। কিন্তু গোল বাধিয়াছে পরিমিতি বোধ লইয়া। ষোল-সতের বৎসরের কিশোরদের কলা-বিজ্ঞান-বাণিজ্যে রাতারাতি পণ্ডিত করিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা পাত্রোপযোগী হয় নাই। পুরাতন ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস লোপ করিয়া তাহার সমস্ত কোর্সটি একাদশ শ্রেণীর মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়ার মধ্যে কোন সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ একাদশ শ্রেণীতে পঠনীয় বাংলা ভাষার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরাতন ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কোর্সের বাংলা ভাষা হইতে ইহা অনেকটা উচ্চমান। বর্ত্তমান অনার্সের কিছু কিছু অংশও ইহাতে রাখা হইয়াছে—যেমন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও অলঙ্কার। তাহা ছাড়া চার-পাঁচটি করিয়া দ্রুতপাঠ্য বই দেওয়ার মধ্যেও কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। ইহার ফল হইবে যে, ছাত্রেরা কোন কিছুই ভালভাবে শিখিতে পারিবে না। অবশেষে সেই একই ব্যবস্থা দেখা দিবে। বৎসরান্তে নোট বই, সাজেসসনরূপ যে অসংখ্য ব্যাঙের ছাতা বাজারে গজাইবে, ছাত্রেরা বেমালুম তাহা গিলিয়া পরীক্ষার হলে আসিবে। কিন্তু ইহাই কি শিক্ষা?

তবু এই শিক্ষার ধারাই নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত

সমানে চলিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও কর্তৃপক্ষের কম অক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যেকটির নামোল্লেখ সম্ভব নয়। একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। বইখানির নাম 'জ্ঞাতব্য'। লেখক শ্রীমৌলিক। ইহাতে ছেলে-মেয়েদের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত করিতে গিয়া লেখক কয়েকখানি ছবি এবং তাহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ছবিগুলি যথাক্রমে শ্রীজহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতির। শ্রীমল্লিকের নীচে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এবং পরে রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, নেতাজী এবং সর্ব্বশেষে রাণী রাসমণি। ঠিক পরের পৃষ্ঠায়—শিরোনামায় বাঙালীদের মধ্যে কে কিসে যশস্বী তাহাই বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যেও ক্রম আছে। প্রথমেই বলা হইয়াছে, অভিনেতা-সমাজে কাহারা যশস্বী—হাস্যকৌতুকে, কণ্ঠসঙ্গীতে, যাদুবিদ্যায়, নৃত্যকলায়, শরীরচর্চ্চায়, খেলাধূলায় কাহার কৃতিত্ব কতখানি। সর্ব্বশেষে দেখান হইয়াছে, ধর্ম্মসাধনায়, দেশের সেবায়, দানকার্য্যে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন কাহারা।

শিক্ষা-পর্ষদের এই রুচিবিকার দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি! দেশকে ইহারা কোথায় লইয়া চলিয়াছেন? সরকার কি এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নন? যাহাই হউক, শিক্ষা-বোর্ডের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, যেন এই সমস্ত বিকারগ্রস্ত লেখকদের হাত হইতে 'শিশুদের' রেহাই দিয়া তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ হইতে নিষ্কৃতি দান করেন।

সরকার 'কিশলয়' হাতে লইয়া যেমন পুস্তক ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা খানিকটা আয়ত্তে আনিয়াছেন, আমরা সরকারকেই অনুরোধ করিতেছি অন্যান্য পুস্তকগুলির সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া এই অসৎ আচরণের পথ বন্ধ করুন। নহিলে শিক্ষার খাতে সরকারের ব্যয় অযথাই হইবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তন

ইংরেজীকে স্থানচ্যুত না করিয়া যথারীতি উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বজায় রাখার পক্ষে অভিমত দিয়াছেন লোকসভায় 'বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন'। অল্প কয়েক জন প্রতি রাজ্যের মাতৃভাষাকেই কলেজী শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি করেন। বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত, তবে বিষয়টির সহিত সমগ্র জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বিজড়িত। কাজেই বাস্তব প্রয়োজনের দিক হইতে ইহার আলোচনা আবশ্যক।

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত, আইন ও উচ্চ কারিগরী বিদ্যা সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থই মাতৃভাষায় রচিত হয় নাই ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও কি সত্য নয় যে, ভারতের সমুন্নত ভাষাগুলি এখনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার বিকল্প মাধ্যমরূপে গৃহীত হয় নাই বলিয়া উহার চেষ্টা হয় নাই। একথা বলাই বাহুল্য, যখন রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব হইতে সুরু করিয়া সব কিছুরই পঠন-পাঠন মাতৃভাষায় সর্ব্বোচ্চ সোপান পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে, তখন প্রয়োজনের তাগিদেই বিদ্যাব্রতীরা এই সব বিষয়ে বই-পুঁথি লিখিতে বসিবেন। মাতৃভাষায় উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইলে, সমাজের সর্ব্বস্তরেই তাহার প্রভাব পড়িবে। এমনি করিয়া ইংরেজী ভাষাও একদিন সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কল্যাণেই মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা উচিত এবং তাহা অবিলম্বেই।

এই মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা হইলে, ইংরেজীকে ষোল আনা নির্ব্বাসন দেওয়া হইবে কিনা এবং তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় লাভজনক হইবে কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠিবে। কিন্তু ইংরেজী শেখা আর ইংরেজীর মাধ্যমে সবকিছু শেখা এক জিনিস নয়। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিবার জন্য এবং তাহা আত্মস্থ করিয়া আপন জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার জন্য। আমাদের বক্তব্যও পৃথিবীর কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন। এই জ্ঞানই সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলিতে হইতেছে যে, উচ্চশিক্ষার মত প্রতি রাজ্যের শাসনকার্য্যও মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। একাধারে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় যদি মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেন তবে দেশের সামাজিক ও মানসিক চেহারা একেবারে বদলাইয়া যাইবে।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইন

বিবাহে পণ এবং যৌতুক লওয়ার বিধি সমাজে দুষ্টক্ষতের মত বহুদিন হইতেই রহিয়া গিয়াছে। এই ক্ষত যে ক্ষয়কারক ইহা জানিয়াও আমরা লালন করিয়া চলিয়াছি। কত স্নেহলতা আগুনে পুড়িয়াছে, কত পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হয় নাই।

কিছুদিন আগেও দেখিয়াছি, পণ বা যৌতুক দাবি করিতে বিবাহেচ্ছু যুবক একটা নৈতিক সঙ্কোচ বোধ করিত, কিংবা অভিভাবকের দোহাই দিয়া সে সঙ্কোচের দায় কাটাইতে চাহিত। কিন্তু আজ আর সে চক্ষু-লজ্জা নাই, আজ পাত্রই দাবি করিতেছে তাহার অভীপ্সিত বস্তুর। ইহাতে কন্যার পিতা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পথে বাহির হইলেও পিতা-পুত্রের কিছুই যায় আসে না। সমাজও সেইজন্য বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বোধ করে না। সমাজকে আমরা এত নীচে নামাইয়া লইয়া গিয়াছি। নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই কসাইবৃত্তির মধ্যে যে অমানুষিকতা রহিয়াছে তাহাও আমাদের চোখে পড়ে না। চোখে পড়িলেও লোলুপতার আড়ালে তাহা ঢাকিয়া যায়। তাহা না হইলে যেখানে চিরদিনের জন্য দুইটি পরিবারের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক হইতে চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে এই ভ্রূক্ষেপহীন লুব্ধতার সামঞ্জস্য কোথায়?

ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রহিয়াছে সমাজ। কিন্তু সমাজ যেখানে নির্জ্জীব, নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিশূন্য, ব্যক্তির অনাচার সেখানে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবেই। আজ সমাজ নাই, রহি-

যাছে তাহার কঙ্কাল। তাই সমাজের কাজ আজ রাষ্ট্রকে লইতে হইতেছে। লোকসভায় আইনমন্ত্রী যৌতুক-দান বা গ্রহণ-বিরোধী বিল উত্থাপন করিয়াছেন। বিলে আছে, দুই হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার-বস্ত্রাদি দান বা গ্রহণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহার অতিরিক্ত মূল্যের যৌতুকাদি দিলে বা লইলে ছয় মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা হইতে পারিবে। আইন অমান্য করিয়া যদি কেহ যৌতুক গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহা যাহাতে বিবাহিতা কন্যা বা তাহার উত্তরাধিকারী পায়, তাহার বিধানও বিলে করা হইয়াছে।

বিলটি অবশ্য আইনে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে কি রূপ লইবে তাহা বলা এখন সম্ভব নয়। লোকসভায় আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ফলে আইনের বিধান যেরূপই হউক, এই বিল যে একটা কল্যাণমুখী প্রচেষ্টা ইহাতে সন্দেহ নাই। বিলের পরিবর্ত্তিত রূপের জন্য অপেক্ষা না করিয়াও আমরা উহার বিধান সম্বন্ধেই দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আইন অমান্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কে উত্থাপন করিবে— ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহই যদি কেবল অভিযোগ উত্থাপনের অধিকারী হয়, তাহা হইলে এই আইন হইতে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আইন করিয়া আইনে ফাঁক রাখিবার রাস্তা যেন কোথাও না থাকে।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি। আইন দ্বারা সামাজিক ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণ সম্ভবপর হয় না। তাহা দূর করিতে হইলে সমাজমানসের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। অবশ্য আইন সমাজমানসের পরিবর্ত্তনে অনেকখানি সাহায্য করে। আইনের পক্ষপাতী আমরা সেইজন্যই।

হিন্দু-বিতাড়ন-যজ্ঞে পাকিস্থানার পূর্ণাহুতি

পাকিস্থানের গণপরিষদে পাকিস্থানের স্রষ্টা জিন্না সাহেব এক-দিন বলিয়াছিলেন যে, স্বাধীন পাকিস্থান-রাষ্ট্রের চোখে হিন্দু-মুসলমান এক, কিন্তু পাকিস্থানের পরবর্ত্তী সমস্ত কার্য্যকলাপই যে কি ভাবে জিন্না সাহেবের এই ঘোষণাকে উপহাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে, তাহার আলোচনা আজ না করিলেও চলে। যে সমস্ত হিন্দু পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছেন বা পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহাদের জমি-জমার বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাকিস্থান ষ্টেট ব্যাঙ্কে জমা না দিলে বিক্রয়ের দলিল যে রেজিষ্টারি করা যাইবে না, ইহা সাব-রেজিষ্ট্রারদের উপর গোপনে নির্দ্দেশ দেওয়া থাকিলেও এইবারে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর এই নির্দ্দেশের ফলে পূর্ব্বোক্ত হিন্দুদের পাকিস্থানস্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

নিজেদের সামান্য ভূ-সম্পত্তি এবং নিকট-আত্মীয়দের পাকিস্থানে পরিত্যক্ত যে ভূ-সম্পত্তি তাহাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাহার কর ইত্যাদি পরিশোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইতে রক্ষণা-বেক্ষণের পারিশ্রমিক বাবদ লব্ধ অর্থ ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া বহু হিন্দু এখনও পাকিস্থানে কোনরূপে টিকিয়া আছে। ভারতে আগত উদ্বাস্তুগণও তাহাদের সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজনের রক্ষণাবেক্ষণে আছে, অতএব অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে তাহার সুযোগ-সুবিধা তাহারা পাইতে পারিবে, এই আশা এখনও করিতেছে। তাই পাকি-স্থান সরকারও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া-ছেন। অতঃপর পাকিস্থানবাসী হিন্দুদের তত্ত্বাবধানে আত্মীয়স্বজনের যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহার বিবরণ সরকারের নিকট পেশ করিতে ও তাহা হইতে লব্ধ অর্থ ট্রেজারিতে জমা দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহার ফলে পাকিস্থানত্যাগী হিন্দুদের সম্পত্তি প্রাপ্তির ভবিষ্যৎ আশা যেমন বিলুপ্ত হইতেছে তেমনই যাহারা কোনরূপে সেখানে টিকিয়া আছে, তাহাদের অবস্থিতিও অসম্ভব করিয়া তোলা হইতেছে। এইভাবে হিন্দু-বিতাড়ন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করা হইতেছে।

ইহা তাহারা করিবেই। শত অনুরোধ-উপরোধেও তাহা-দিগকে নিবৃত্ত করা যাইবে না। এই অনুরোধ-উপরোধের ভাষা না বুঝিলেও পাল্টা জবাবের ভাষা তাহাদের সম্পূর্ণ অধিগত। ভারত-ত্যাগী মুসলমানদেরও অনেক সম্পত্তি ভারতে রহিয়া গিয়াছে। ভারত সরকার সে-সব সম্পত্তি সম্পর্কেও পাকিস্থানের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন—এই দাবি আজ সকলেই করিবে।

পৃথিবীকে মনুষ্য-শূন্য করিবার আয়োজন

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মারিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে। আণবিক অস্ত্র তৈয়ার করিয়াও তাহারা তৃপ্ত নয়। মানুষ-শূন্য পৃথিবীতে জানি না তাঁহারা কাহাদের লইয়া বাস করিবেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাকি আক্রমণকারী আততায়ীর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য একরকম বিষ তৈয়ার করিতেছেন। ইহার নাম "বটুলিনাস টক্সিন।" এক আউন্স পরিমাণ এই বিষ দ্বারা নাকি পনের কোটি নর-নারীর প্রাণনাশ করা যায়। ব্রিটেনের সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসক সমিতির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই বিষ প্রস্তুত করা এবং ইহা লইয়া গবেষণা করার কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই বিষ ছড়াইয়া দিলে মানুষ অল্পক্ষণের মধ্যেই রুগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং বিষের সংস্রবে আগত লোকদের মধ্যে শতকরা একজনেরও প্রাণরক্ষা হইবে না।

বিশ্বশান্তি-সংস্থার ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ডাঃ ব্রক চিশলম বলিয়াছেন যে, একশত লোক যদি দ্রুতগতিতে উত্তর আমেরিকার চারিদিকে এই বিষ ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে দুই-একদিনের মধ্যেই সমস্ত শহর, সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারিবে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এইরকম ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক বিষ যে নিজেদের দেশের লোককেই ধ্বংস করিবে না তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যদি বিষের ভাণ্ডার

খুলিয়া দেয় অথবা দুর্ঘটনার ফলে বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে কিংবা শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ অথবা বোমা নিক্ষেপের ফলে যদি ঐরূপ হয়, তবে নিজেদের বিষের আক্রমণে নিজেদেরই লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ধ্বংসের মুখে প্রেরিত হইবে। এইজন্ত ডাঃ চিশলম প্রমুখ বিশ্ব-হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জনেরা এইরূপ মারাত্মক ও বিপুল ধ্বংসাত্মক বিষ প্রস্তুতের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু পরস্পরের ধ্বংসের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিরা কি কাহারও কথা কানে তুলিবেন? এখন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়, বিজ্ঞান আমাদের কি দিল? সেই আদিম যুগ হইতে কতটা আগাইয়া আসিলাম।

মালগাড়ী হইতে কয়লা লুঠ

বনগাঁ লাইনের হাবড়া ষ্টেশনের নিকট একটি মালগাড়ী আটকাইয়া কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী ওয়াগন হইতে প্রচুর পরিমাণ কয়লা লুঠপাট করিয়া লইয়া যায় বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই ঘটনার ফলে ঐ লাইনে গাড়ী চলাচল প্রায় আড়াই ঘণ্টা বন্ধ থাকে এবং আটখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আটক পড়িয়া যায়।

এই মাল গাড়ীটি চিৎপুর ইয়াড হইতে বনগাঁ যাইতেছিল। হাবড়া ষ্টেশন ত্যাগের কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন লোক মালগাড়ীতে লাফাইয়া উঠে এবং ওয়াগন হইতে কয়লা লাইনের দুই ধারে ফেলিতে থাকে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন জুটিয়া ঐ মাল-গাড়ীটি থামাইয়া ফেলে। ইহা দেখিয়া গাড়ীর ড্রাইভার ভয় পাইয়া মালগাড়ী হইতে ইঞ্জিন আলাদা করিয়া লইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশন গোবরডাঙ্গায় চলিয়া যায়।

পুলিশ অবশ্য তদন্ত চালাইতেছে। হয়ত কয়েকজন ধরাও পড়িবে—শাস্তিও হইবে। কিন্তু দেশের অবস্থা দেখিয়া সত্যই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়—দেশ কি অরাজক? রেলগাড়ী চলাচলের কোনও কিছু স্থিরতা নাই, রাত্রে নিরাপদে যাতায়াত সম্ভব নহে এ ত সাধারণ কথায় দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু যদি এরূপ প্রকাশ্যে লুঠ হয় তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে, পুলিশ ও রেল বিভাগের উচ্চ হইতে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সকলেরই এ বিষয়ে যোগসাজস আছে, কাহারও প্রত্যক্ষভাবে কাহারও পরোক্ষভাবে।

'খাদ্যসঙ্কটে' মন্ত্রীমহাশয়ের অভিমত

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের বর্ত্তমান অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে যে ইহা কি আকার ধারণ করিবে তাহা অনিশ্চিতের কোটায়। অথচ কাগজে-কলমে দেখিতেছি, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী চাউল সব সময়ই তাঁহারা কেন্দ্রীয় শস্য-ভাণ্ডার হইতে পাইবেন। যদিও এ চাল কাহার হাত দিয়া কোথায় কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তাহার উল্লেখ খাদ্যমন্ত্রী করেন নাই। তিনি না করিলেও, আমরা ধরিয়া লইতে পারি, সরকারি রেশন মারফৎ উহা বিলি করিবার ব্যবস্থার কথাই তিনি হয়ত বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার হয়ত জানা নাই, বহু লোক সরকার-প্রদত্ত রেশনের দোকান হইতে নানা কারণে চাউল সংগ্রহ করিতে পারেন না। এদিকে দেখা যাইতেছে, প্রত্যহই চালের দাম দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

কলিকাতার শহরতলীর—এমন কি মফঃস্বলের বাজারেও উপযুক্ত মূল্যে চাল পাওয়া যাইতেছে না, ইহা এত সর্ব্বজনজ্ঞাত সত্য যে, এ কথা কাহারও অজানা থাকিতে পারে ইহা কল্পনারও অতীত। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আর যাঁহারা মন্ত্রিত্বের গদিতে আসীন হইয়া আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ঠিক একই রাস্তা ধরিয়া চলে না।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, তাঁহার খবর হইতেছে, 'সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে। তবে চাউল-ব্যবসায়ীরা হয়ত মোটা চাউল মাঝারী এবং মাঝারীটা সরু বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ধরা শক্ত।'

মন্ত্রীদের বুঝি হাট-বাজারে যাতায়াত করা নিষেধ? জন-হিতার্থে একদিন না হয় ছদ্মবেশেই বাহির হইলেন—তবু ত লোক খাইয়া বাঁচিবে।

মন্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন যে, সরকার-নির্দ্দিষ্ট দর ব্যতীত খোলা বাজারে কেহ বেশী মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছে, এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট চাউল-ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, খুচরা বা পাইকারী কাহাকেও রেহাই দেওয়া হইবে না।

মন্ত্রীমহাশয়ের কথাগুলি সত্য হইতে পারে। কিন্তু এই 'অভিযোগ' করিবে কে? অভিযোগ করার সঙ্গে থানা-আদালতে দৌড়াদৌড়ির যে ঝামেলা-ঝক্কি জড়ানো থাকে, মন্ত্রীমহাশয়ের বর্ত্তমানে তাহা পোহাইতে না হইলেও, অজানা থাকিবার কথা নয়। ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইবার, উনুনে-চড়ান হাঁড়িতে চাউল না যোগাইয়া মুনাফাবাজ চাউল-ব্যবসায়ীকে ধরাইবার মত সময়, উৎসাহ বা সামর্থ্য কয়জনের থাকিতে পারে।

আমাদের অনুরোধ মন্ত্রীমহাশয় এবার কথা ছাড়িয়া কাজে নামুন—কথা শুনিবার ধৈর্য্য আর জনসাধারণের নাই। অবাস্তব আত্মতুষ্টি ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পক্ষে শুধু অহিতকর নয়, বিপজ্জনক। সরকারের কথিত তত্ত্বে ও তথ্যে জনসাধারণ যদি আস্থা স্থাপন না করিতে পারে, তাঁহাদের উক্তি যদি প্রত্যক্ষ সত্যের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম যে শুভ হইতে পারে না, মন্ত্রী হইলেও এ-বোধ তাঁহাদের থাকা উচিত বলিয়া মনে করি।

বসিরহাট হাসপাতালে একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

অব্যবস্থা ও অবহেলার অভিযোগ শুধু কলিকাতার হাসপাতালের বিরুদ্ধে নহে, ছোঁয়াচে রোগের মত মফঃস্বলের হাসপাতালগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। বসিরহাট হাসপাতালে কর্ত্তব্যরত নার্সের

অবহেলায় জনৈকা প্রসূতির জীবননাশের এক অভিযোগ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগকারিণী হইতেছেন ঐ হাসপাতালেরই অপর একজন প্রসূতি। তাঁহার চোখের সম্মুখে শ্রীমতী বিমলা দাসী কিভাবে প্রাণ হারাইলেন, তাহার এক করুণ বিবৃতি তিনি দিয়াছেন।

যোগিনী ভর্ত্তি হইবার দুই ঘণ্টা পরে অর্থাৎ রাত্রি বারটায় প্রসব-বেদনা উঠিলে, নার্সদের ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও তাঁহারা নাকি ধমক দিয়া বলেন, "প্রসব হইবার সময় হইলে আপনা হইতেই সব হইবে। চেঁচামেচি করিয়া বিরক্ত করিও না।"

ইহার পর বিমলা নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে খাট হইতে পড়িয়া যান। তখন নার্সরা ছুটিয়া আসে এবং একজন ডাক্তারকেও ডাকিয়া আনে। কিন্তু ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন বিমলার দেহে প্রাণ নাই।

কৈফিয়ৎ তাঁহারা অবশ্য একটি দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বলিবার কথা, মানুষ যখন মানবোচিত বৃত্তিগুলি হারাইয়া ফেলে তখন মানবতার দোহাই দিয়া আবেদন-নিবেদন করিয়া, কর্ত্তব্যের পবিত্রতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কোন ভাবেই সেগুলিকে তাহার মধ্যে ফিরাইয়া আনা যায় কিনা? বোধ হয় যায় না। কারণ, হাসপাতালের অনাচার, অব্যবস্থা, হৃদয়হীনতার কথা নানাভাবে নানা দিক হইতে আলোচিত হইয়াছে. কিন্তু কোন অভিযোগেরই নিবৃত্তি হইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। অভিযোগ সত্য হইলে, একথা বলিতেই হইবে যে, এরূপ ব্যাপারের জন্য যাঁহারা দায়ী, মানবিকতা তাঁহাদের মধ্য হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে। দুইজন নার্সের কর্ত্তব্যপালনে নির্ম্মম অবহেলাই প্রসূতিটির মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। নারী হইয়া অপর একজন নারীর চরম সঙ্কটকালে এরূপ হৃদয়হীন অমানুষিকতার পরিচয় কেহ দিতে পারে, ইহা ভাবিতেও ইচ্ছা করে না।

অবিলম্বে এ সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যদি অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে অপরাধীদের আদর্শ দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়

হাওড়ায় কোন স্থানে চোরকাঁটার বীজে মাটি ও অন্যান্য জিনিস মাখাইয়া তাহাকে জিরায় পরিণত করার একটি চোরাই কারবার ধরা পড়িয়াছে। বাজারে এখন জিরার দাম অনেক, সুতরাং নকল জিরার কারবারীরা মোটা মুনাফা কামাইতেছিল। পুলিস ইহাদের সাধে বাদ সাধিয়াছে। অবশ্য এজন্য ইহাদের কি দণ্ড হইবে জানি না। কারণ একই দিনের কাগজে দেখা যায়, হাজারিবাগের জেলা-শাসক এক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, তথায় খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার গোটা ত্রিশেক ঘটনা অল্পদিনে ধরা পড়িয়াছিল, যাহার প্রত্যেকটিতে মাত্র পনের হইতে কুড়ি টাকা হিসাবে জরিমানা হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভেজালদারদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রচলিত আইনে এই অপরাধ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য নাকি ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ডদানের কোন ব্যবস্থা নাই। যখন তাহা নাই, তখন হীরা হইতে জিরা পর্য্যন্ত সবই জাল ও ভেজাল হইবে—কেই বা রোধ করিবে?

আসল কথা কিন্তু তাহা নহে। ভেজাল ঢুকিয়াছে আমাদের জাতীয় চরিত্রে। তাহা শোধন করার ক্ষমতা পুলিসের নাই। করিতে হইবে মনুষ্যত্বের পুনরুদ্ধার। কিন্তু তাহা কে করিবেন? পাঁকে যে সকলেই ডুবিয়া আছি।

'বালিয়া হাসপাতালে' মনুষ্যত্বের অভাব

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীদাভান 'বালিয়া জেলা হাসপাতাল' কর্ত্তৃপক্ষের নিদারুণ ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার প্রতি তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের দেশের সংবিধানে ও আইনে মানবজীবনের পবিত্রতা ও মূল্যবোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও, এক্ষেত্রে কিন্তু হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন—সাধারণ মানবতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কুকুর-বিড়ালের বেলাতেও সে মনোভাবের পরিচয় দেন না। তিনি বলেন যে, কি ঘটিয়াছিল এবং তাহার জন্য কে দায়ী তাহা তদন্ত করা আমার কাজ নয় কিন্তু মানবজীবনের প্রতি এই ধরনের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার জন্য যদি যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোথাও নিশ্চয়ই কোন রকম গুরুতর গলদ আছে।

এক ব্যক্তি সকাল ৮টায় আহত হন কিন্তু 'বালিয়া হাসপাতালে' তাহাকে ভর্ত্তি করা হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। ভর্ত্তির কুড়ি মিনিট পরেই হতভাগ্য লোকটি মারা যায়। আহত লোকটিকে সন্ধ্যা ৬টায় হাসপাতালে আনা হয় বটে কিন্তু সাড়ে সাতটার আগে তাহাকে ভর্ত্তি করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যে লোক মরিতে বসিয়াছে তাহাকে কেন ভর্ত্তি করিয়া লইতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল, তাহার কোন কারণই পাওয়া যাইতেছে না। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'স্বাধীন ভারতের এক মুমূর্ষু নাগরিকের প্রতি যেমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে ততটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বোধ হয় মানুষ মাছ-মাংসের প্রতিও দেখায় না।' তিনি বলিয়াছেন, 'সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পুলিস কর্ত্তৃপক্ষও হতভাগ্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লইতে বেশী উদ্‌গ্রীব ছিলেন। লোকটির উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য কাহারও কোন মাথাব্যথা যে ছিল না তাহার প্রমাণ বালিয়ার ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস আসে অথচ লোকটির মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লওয়ার জন্য তাহাকে বাস-ষ্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলিয়া রাখা হয়।'

এই ঘটনায় জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের আচরণ সম্পর্কে

যথোচিত তদন্তের জন্ত বিচারপতি তাঁহার রায়ের একটি কপি রাজ্য-সরকারকে প্রেরণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

আসানসোলে অরাজকতা

কয়েকজন যুবকের বেপরোয়া দৌরাত্ম্যে আসানসোল শহরের অভিজাত পল্লী চেলিডাঙ্গায় একরূপ নৈরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিস ইহাদের আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না। শুনা যাইতেছে, ইহারা ইতিমধ্যে রহিম ব্রাদার্স, রাম ইকবাল পাণ্ডে ও ভগলু মিস্ত্রীর তিনখানা বাড়ী পর পর বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইয়াছে। ইহারা স্ত্রীলোকের উপরও অত্যাচার করিতেছে। জবরদস্তি চাঁদা আদায়, পথচারীর সর্ব্বস্ব ছিনাইয়া লওয়া, দোকানীদের উপর উৎপীড়ন প্রভৃতি অভিযোগও উহাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ আছে। লোকের মনে এমন আতঙ্ক দেখা দিয়াছে যে, উহাদের নামে কোন মামলা দায়ের করিলে প্রাণের ভয়ে কেহ সাক্ষ্য দেয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে এই এলাকায় কোন ভদ্রসন্তানকে প্রকাশ্যে রাস্তার উপর দিবালোকে খুন করা হয়। কিন্তু সাক্ষ্য দিতে লোকে সাহস পায় নাই, সুতরাং আসামীরা বেকসুর খালাস পায়।

চেলিডাঙ্গায় একটি দোকান আক্রমণ ও লুঠ করিবার অভিযোগে পুলিস ইহার মধ্যে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিস দোকানের সম্মুখে একটি হাতবোমা ও লোহার ডাণ্ডা পাইয়াছে।

আসানসোল শহরের মত জায়গায় এরূপ অরাজকতা স্বাধীন দেশের পক্ষে খুব গৌরবের নয়। জানি না, এই বিশৃঙ্খলার অবসান কতদিনে হইবে।

নাবালিকা অপহরণে অভিনব পন্থা

কিভাবে একটি তাবিজ পরার সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হইয়া দশ বৎসরের বালিকা কৌশল্যা কয়েকজন লোকের সহিত নানা স্থানে গিয়া তাহাদের জন্ত ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়, শুক্রবার হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএ. কে. রায়ের এজলাসে সে তাহা বিবৃত করে। কৌশল্যা তাহার বিবরণীতে বলে যে, সে ডোমজুড় থানার অন্তর্বর্ত্তী বাঁকড়া গ্রামে পিতামাতার সহিত বাস করিত। প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যায় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রের জন্ত আশ্রয় চায়। তাহাদিগকে আহার্য্য ও আশ্রয় দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে তাহারা বলে যে, তাহারা কাজের খোঁজে নিকটবর্ত্তী ইটখোলায় যাইতে চায় এবং ইটখোলায় রাস্তা দেখাইয়া দিবার জন্ত কৌশল্যাকে যাইতে দিতে কৌশল্যার মাকে অনুরোধ করে। ইটখোলায় পৌঁছাইয়া কৌশল্যাকে একটি তাবিজ পরিতে দেয়। এই তাবিজটি পরার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসামীরা বর্দ্ধমান ও পরে আসানসোল যায় ও কিছুকাল থাকে। কৌশল্যাকে তাহাদের জন্ত ভিক্ষা করিতে বলা হয় এবং না করিলে মারধর করা হইবে বলিয়া ভয় দেখান হয়। ৭ই মে তাহারা ডানকুনির কাছে আসে এবং কৌশল্যাকে একটি ইটখোলার নিকট লইয়া গিয়া ভিক্ষা চাহিতে ভিতরে পাঠাইয়া দেয়। সেখানে একজন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সে সব কথা খুলিয়া বলে। লোকজন জড়ো হইয়া ঐ দুইজনকে পুলিশের নিকট অর্পণ করে। ধৃত শম্ভু চামার ও রাখিয়া চামারকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

দেশে ছেলেধরার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাও নিত্য সংবাদপত্রে দেখিতেছি। পুলিসের ঔদাসীন্যে মানুষের সমাজ-জীবন আজ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দার্জ্জিলিং অভিমুখে সরকার এবং সরকারি দপ্তর

ইংরাজ আমলে দেখিয়াছি, গরম পড়িলেই সরকার তাঁহার দপ্তর তুলিয়া লইয়া গিয়া সিমলা-দার্জ্জিলিংয়ে বসবাস করিতেন। ইহা ছিল তাঁহাদের বিলাস। আমরা তখন কত প্রতিবাদই না করিয়াছি। আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে—সেদিন যাঁহারা জোর গলায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, আজ তাঁহারাই ক্ষমতার আসনে বসিয়া দার্জ্জিলিংয়ের পথে পা বাড়াইতেছেন। উঁহারা বলিবেন, ইহা বিলাস নহে, আরামের জন্তও তাঁহারা যাইতেছেন না—তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেছে ফাইলের বিরাট বোঝা। অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, যদি শুধু শীতলতা উপভোগ করাই একমাত্র কর্ত্তব্যে পরিণত না হয়। শুধু ফাইলের সম্পর্কে দায়িত্ব-সচেতন হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়াও যথেষ্ট নহে, কারণ মন্ত্রী ও সচিবেরা গ্রীষ্মের কলিকাতার তপ্ত পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কি দার্জ্জিলিং যাইবার সময়? দেশে আজ অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে, সরকার তাহাদের কি ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন? তাঁহাদের এই আরাম-যাত্রাকে নিরন্ন জনসাধারণ কখনই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না।

আমাদের বলিবার কথা, আজিকার দার্জ্জিলিং যেন অতীতের দার্জ্জিলিংয়ের মত এমন ধারণা লাভ না করে যে, অতীতে যেমন সাদা সাহেবলোগ আসিতেন, তেমনই দেশী সাহেবলোগ আসিয়াছেন। সরকারী ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয় জনসমাজের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান আজ নিতান্ত অবাস্তব এবং অসঙ্গতও বটে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আজ মনে হইতেছে, রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এই শৈল-বিহার সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, এই বিলাস যদিও আমি সমর্থন করি না, কিন্তু দার্জ্জিলিংয়ের দুঃস্থ পাহাড়িয়ারা সারা বৎসর এই কয়েকটি দিনের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকে। কারণ, এই কয়দিনে—সরকার প্রদত্ত অর্থে তাহাদের সারা বৎসরের খাবার সংস্থান হইয়া থাকে।

ইহার পর আমাদের অবশ্য বলিবার কিছু নাই, কিন্তু সরকারের শৈল-বিহার অবসর-বিনোদনের বিলাসমাত্র যেন না হয়—নিরন্ন বাঙালীর ইহাই আবেদন।

প্রাকৃতিক রঙীন তুলা

গাছে যে তুলার গুটি জন্মায়, সেই প্রাকৃতিক তুলার রং

সর্ব্বদাই সাদা হইয়া থাকে। এই তুলা হইতে সুতা বানাইয়া উহাকে কৃত্রিম উপায়ে রং করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ইহা করিতে যে সময়, পরিশ্রম ও খরচ পড়ে, তাহা বাঁচাইবার জন্য সোভিয়েট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন জাগে—সরাসরি গাছেই রঙীন তুলার গুটি জন্মানো যায় কিনা।

সোভিয়েট দেশের তুলা-প্রধান এলাকার অরণ্য অঞ্চলগুলিতে এক ধরনের হালকা কালচে-হলুদ রঙের বন্য তুলা জন্মাইতে দেখা যায়। এই দিকে রং-এর প্রাকৃতিক বন্য তুলাকে লইয়া উজবেকিস্থান ও তুর্কমেনিয়া উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে গবেষণার কাজ সুরু করেন এবং কিভাবে এই প্রাকৃতিক তুলার রং ধরে তাহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করেন। পরে, আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে গবেষণাগারে প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা পরীক্ষামূলকভাবে প্রাকৃতিক রঙীন তুলা উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। গোড়ার দিকে এই তুলার রং ছিল ফিকে। এইগুলির মধ্যে নানা রকম সাঙ্কর্য্য ঘটাইয়া, কলম জুড়িয়া ও অন্যান্য কতকগুলি জটিল ধরনের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই তুলার রংকে ক্রমশঃ বেশ গাঢ় করিয়া তোলা গিয়াছে।

সম্প্রতি আশ্‌কাবাদের উদ্ভিদ ও কৃষি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা সাড়ে সাত বিঘা জমি জুড়িয়া পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ রকম রং-এর প্রাকৃতিক তুলার ফসল ফলাইয়াছেন। পাঁচটি সারিতে রোপণ-করা এই তুলার ঝোপগুলির এক-একটি সারিতে সবুজ, হালকা নীল, গাঢ় নীল, হলুদ ও বাদামী রঙের তুলার গুটি ধরে। এই প্রাকৃতিক রঙীন তুলা হইতে নির্ম্মিত বস্ত্র মস্কোর স্থায়ী নিখিল সোভিয়েট কৃষি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বর্ত্তমানে ব্যাপক হারে এই প্রাকৃতিক রঙীন তুলা উৎপাদনের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

আসানসোলের অসহায় পল্লী-অঞ্চল

"বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইলেও এবং আসানসোল প্রভৃতি কয়লা খনি অঞ্চলের শহর ও গঞ্জগুলিতে সাধারণতঃ দুর্দ্দশার ছাপ দেখা না যাইলেও আসানসোল মহকুমার পল্লী-অঞ্চলের দুর্দ্দশার সীমা নাই। পানীয় জল এবং যে কোন প্রকারের জলের যে নিদারুণ কষ্ট তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই মহকুমার অধিকাংশ পল্লীতেই জলের অভাবে প্রায় প্রতি বৎসর অজন্মা লাগিয়াই আছে। জমি যাহা আছে, তাহা অধিকাংশ স্থানেই অন্য রাজ্য বা জেলা হইতে আগত ধনী সম্প্রদায়ের অধিকৃত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার জন্য জমির মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ক্রমে ক্রমে অধিকৃত হইতেছে। অবশিষ্ট জমির একটা বিরাট অংশ পরিত্যক্ত কয়লাখনির জন্য ধ্বসিয়া শুধু অন্নসঙ্কটই সৃষ্টি করিতেছে না—মানুষকে সুদীর্ঘ দিনের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া উদ্বাস্তু হইতে হইতেছে। হীরাপুর থানার ভরতচক কোলিয়ারীর চতুর্দ্দিকস্থ এলেকা ও গ্রাম বিপজ্জনক এলেকা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং অধিবাসীদিগকে তৎপরতার সহিত তাহাদের বাসস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। কোলিয়ারী হইতে কয়লা তুলিয়া লইবার পর মৃত্তিকার নীচে যে অজস্র সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা কোলিয়ারী মালিক বালু দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে বাধ্য বলিয়া বিধান আছে। গ্রামের পার্শ্বে জমি বসিয়া বিপজ্জনক সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে গরু, ছাগল এমন কি ছেলেপুলের জীবন্ত সমাধি হইয়াছে, তথাপি সেই স্থান ঘেরিয়া দেওয়া হয় নাই।"

বর্দ্ধমানের 'দামোদর' পত্রিকা উপরি-উক্ত সংবাদটি দিতেছেন। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দেশের উন্নয়ন যাঁহাদের হস্তে অর্পিত তাঁহারা কি কলিকাতার বাহিরের কোনই খবর রাখেন না?

শহর ও শিল্পাঞ্চল-সংযুক্ত মগরা থানা

হুগলীর 'বর্ত্তমান ভারত' প্রদত্ত নিম্নের সংবাদটিতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে পুলিসী-ব্যবস্থা এইরূপই হইয়াছে।

"হুগলী সদর মহকুমার মগরা থানা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কারণ, এই থানা এলাকার মধ্যে রহিয়াছে—বাঁশবেড়িয়া শিল্পাঞ্চল—যেখানে জুট মিল, বোন মিল, ইটখোলা প্রভৃতিতে হাজার হাজার শ্রমিক কার্য্য করিয়া থাকে। ত্রিবেণী শহর—যেখানে দৈনিক শত শত বহিরাগতের যাতায়াত, চন্দ্রহাটী—যেখানে এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রিবেণী টিস্যু ফ্যাক্টরী অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত যে এলাকার মধ্যে বৃহৎ রেয়ন ও কটন মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে মগরা একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহরে পরিণত হইতেছে এবং এই থানার অন্তর্গত বহু গণ্ডগ্রামও রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর যুগে শহর ও শিল্পাঞ্চল-সংযুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ থানায় কোন টেলিফোন যোগাযোগ নাই যে, প্রয়োজনবোধে থানায় জরুরী সংবাদ প্রেরণ করা যায়।

আরও জানা গিয়াছে, সেথায় এমন কোন মোটরযানও নাই যে, সত্বর পুলিস পাঠানোর প্রয়োজন ঘটিলে পাঠানো যাইতে পারে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে গ্রামে চুরি-ডাকাতির সংবাদ পাইয়াও পুলিস যথাসময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাইতে পারে নাই।

সম্প্রতি মগরা থানার অন্তর্গত গ্রামে বা শহরাঞ্চলে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ চুরি-ডাকাতি লাগিয়াই আছে। এমতাবস্থায় স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ কি-ই বা সাহায্য করিতে পারে?

জেলার ঊর্দ্ধতন পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সত্বর দৃষ্টি দিবেন কি?"

উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধের জন্য অভিভাবক সংস্থা

সমাজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতার ভাব লক্ষ্য করিয়া শক্তিগড় কলোনীর কিছুসংখ্যক অভিভাবক উদ্যোগী হইয়া আগামী দিনের অভিভাবক ও নাগরিকগণকে (বর্ত্তমান ছেলেমেয়েদিগকে) জীবনের গোড়া হইতেই সদাচার, সমবায় ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবার জন্য একটা 'অভিভাবক সংস্থা' সংগঠন করিয়াছেন। ইহার পরিচালনায় নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের সাহায্যে গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে খেলা-ধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চ্চা চলিতেছে। সংস্থার ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন কার্য্যক্রম হইতেছে প্রাতরুত্থান, সকালের দিকে বাড়ীতে বাড়ীতে জটলা বা খেলা না করিয়া পাঠাভ্যাস ও বাড়ীর কাজ ইত্যাদি করা, এবং বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিয়মিত ভাবে খেলাধূলা, প্যারেড ও সাংস্কৃতিক চর্চ্চা। সংস্থার নিয়ম অনুসারে অভিভাবক সদস্যকেও যথাসম্ভব ভাল ভাবে জীবন চালাইতে হইবে, যাহাতে ছেলেমেয়েরা অন্যায় আদর্শ অনুকরণের সুযোগ না পায়। ক্রমশঃ এই সংস্থার সদস্য ও ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং একটা উৎসাহ ও আনন্দবোধ জাগ্রত হইতেছে। সংস্থার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার অভিভাবক সদস্য-গণ চাঁদা দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

গত কয়েক দিন সংস্থার ছেলেমেয়েরা সমবেত ভাবে কোদাল-খুরপী লইয়া নিজ হাতে কলোনীর রাস্তার পার্শ্বে নির্ম্মিত ইটের ড্রেনের আগাছাগুলি পরিষ্কার করে। ইহাতে স্থানীয় সকলে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেন।

উপরের সংবাদটি দিয়েছেন, জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকা। বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এইরূপ সংস্থার প্রয়োজন আছে।

হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকায় টাইফয়েড

হুগলীর 'বর্ত্তমান ভারতে'র নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটির প্রতি পৌর-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি: হুগলী-চুচুড়া পৌর-এলাকায় টাইফয়েড রোগ সংক্রামকরূপে দেখা দিয়াছে। জানা গিয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউ, পি, বি, দল পরিচালিত পৌরসভা এ সব বিষয়ে মাথাই ঘামান না। এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। টাইফয়েডের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানিনজাইটিস রোগও হানা দিয়েছে। পৌরসভার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পৌর এলাকার ভগ্ন ও জীর্ণ নর্দ্দমাগুলিতে ময়লা পচিয়া ভট ভট করিতেছে, রাস্তার উপর আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত রহিয়াছে। পৌর-সভার পরিচালন-ব্যবস্থা আজ এমনই দুর্ব্বল হইয়াছে যে, এ সকলের প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই তাহার নাই। কেবলমাত্র হেলথ অফিসারের মাসিক মাহিনা ২৫৲ টাকা কমাইয়া দিলেই কি কর্ত্তব্য শেষ হইল? হেলথ অফিসার মহাশয় নাকি সারাদিন ঘর বাড়ীর প্ল্যান, পায়খানা ও নর্দ্দমার নক্সা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। কাগজে-কাইলে স্বাক্ষর করিতেই তাঁহার দৈনিক দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়। তিনি এই পৌরসভায় ১ লক্ষ ২০ হাজার নরনারীর স্বাস্থ্যের বিষয় কিইবা চিন্তা করিতে পারেন যদি পৌর কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে চিন্তা করিবার ক্ষমতা না থাকে!

পৌর কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে জরুরী সভা ডাকিয়া ব্যাপকভাবে টি, এ, বি, সি, টিকা দিবার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য না দিলে পৌর এলাকায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।'

দ্বিধা-খণ্ডিত বর্দ্ধমান

কালনার "ভাগীরথী" পত্রিকা নিম্নের সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন:

"সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তাঁহাদের শাসনতান্ত্রিক কার্য্যের সুবিধার জন্য বর্দ্ধমান জেলা দ্বিধাবিভক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আসানসোল মহকুমাকে একটি পৃথক জেলায় পরিণত করার পরি-কল্পনা করা হইয়াছে। আসানসোল এলাকা শিল্পপ্রধান অঞ্চল, সেইহেতু নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যের চাপে জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে সময়ে সময়ে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হয়। দুর্গাপুরের বিখ্যাত কোক-চুল্লী প্রতিষ্ঠার পর হইতে ঐ কার্য্যের চাপ আরও যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণ রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনাটিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। উপরন্তু, তাঁহারা বিভিন্ন সভায় ইহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রতিবাদে তাঁহারা বলিতেছেন, রাজ্য সরকারের এই কার্য্যের দ্বারা বর্দ্ধমান জেলার পরিসর অত্যন্ত সীমিত হইয়া পড়িবে এবং জেলার ঐতিহ্য বিনষ্ট হইবে। আসানসোল শিল্পপ্রধান অঞ্চল হওয়া হেতু পূর্ব্ব হইতেই অবাঙালী শ্রমিকদের অধ্যুষিত এলাকা বলিয়া স্বীকৃত। এবং বর্ত্তমানে দুর্গাপুরে কোকচুল্লী নির্ম্মিত হওয়ায় অদূরভবিষ্যতে সমগ্র অঞ্চলটি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন অনুষ্ঠানে বিহার সরকারের করতলগত হইবার আশঙ্কা করা যায়।

শাসনতান্ত্রিক কার্য্যের অসুবিধার কথা, যাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিতেছেন—তাহা একটি অতিরিক্ত সহযোগী জেলা শাসকের দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আইনের মাধ্যমে আসানসোল মহকুমা শাসকের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে তথাকথিত অসুবিধার নিরসন হইতে পারে। সুতরাং রাজ্য-সরকার যে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে অসমর্থ হইবে।

আমরা রাজ্য সরকারকে বিষয়টি পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।"

ত্রিবেণীর সরস্বতী নদীর সেতু

নিম্নের এ সংবাদটিও পরিবেশন করিয়াছেন 'বর্ত্তমান ভারত'।

রাজ্যসরকার এ বিষয়ে অবহিত না হইলে কোন সুরাহাই হইবে না।

১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ার ধনী জমিদার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ হালদার প্রায় ১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ত্রিবেণীতে সরস্বতী নদীর উপর বর্ত্তমান ভগ্নপ্রাপ্ত দোদুল্যমান সেতুটি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন বলিয়া "পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট—হুগলী" পুস্তকে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তদবধি এই সেতুটির কোনও বিশেষ সংস্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন্ সময় উহা ভাঙিয়া পড়িবে কে জানে? সেজন্যই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার কোন ভর্ত্তি রিক্সা, মালপত্র বহন, একসঙ্গে অতিরিক্ত লোকজন যাতায়াত আইনতঃ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তি অবাধে রিক্সাযোগে এই সেতুর উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। পুলিস কনষ্টেবল এই বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তাঁহারা উহা গ্রাহ্যও করেন না। বরং তাহাদের উপর চক্ষু রাঙাইয়া থাকেন। এই আইন ভঙ্গ করিয়া তাঁহারা জনসাধারণকে বিপদের সম্মুখে আগাইয়া দিতেছেন নাকি?

ত্রিবেণী হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হইতে দৈনিক শত শত পুণ্যার্থী এখানে আগমন করেন। কোন কোন বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এখানে লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশও দেখা যায়। যতদূর জানা যায়, বর্ত্তমানে এই সেতুটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনাই সরকারের নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, ইহা একটি প্রয়োজনীয় সেতু এবং ইহার আশু সংস্কার আবশ্যক।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা

নিম্নস্থ সংবাদটি বিশেষ বিচার্য্য :

নয়াদিল্লী, ২২শে এপ্রিল—সরকারী ভাষা-সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে শ্রীফ্র্যাঙ্ক এন্টনী—সমগ্র রিপোর্টটির সমালোচনা করিয়া কুড়ি পাতায় তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন। তাঁহার মতে, সংবিধানে ভাষা নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোনও মৌলিক নির্দ্দেশ নাই। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা ও জনগণের ক্রমবর্দ্ধমান দাবি অনুযায়ী ভাষা নির্ব্বাচন বিষয়ের পুনর্ব্বিবেচনা একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন, ভারতে ইংরাজী বিদেশী ভাষা হিসাবে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইলেও উহা "কার্য্যতঃ ও আইন অনুযায়ী" একটি ভারতীয় ভাষা। এই কারণে হিন্দী অথবা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত উহাও অপরিহার্য্য।

তিনি কমিটির রিপোর্টে 'হিন্দী ও অন্যান্য জাতীয় ভাষা' কথা উল্লেখের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং বলেন যে, উহার ফলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত সরকারী চিন্তাধারায় একটি বহু-জাতিতত্ত্ব আমদানী হইবে, যাহার ফলে দেশে বিভেদের সৃষ্টি হইবে। তাঁহার মতে, 'জাতীয় স্বার্থের সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিমতই হিন্দী ভাষা আরোপের বিপক্ষে।' এই কারণে তিনি সুপারিশ করেন যে, 'অন্ততঃ যত দিন পর্য্যন্ত সংসদ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষা প্রশ্নটি সম্পর্কে পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা অথবা কর্ম্মপন্থাসমূহ বিশেষ সতর্কতা সহকারে নির্দ্ধারণের সুযোগ পাইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থা চালু রাখা উচিত।'

সরিষায় ভূত

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ প্রতিনিধি কলিকাতার বাজার সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল : অনাচারের বিবরণ ত এরূপ অনেক কিছুই রসালো ভাষায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রতিকারের স্পষ্ট নির্দ্দেশ কেহই দিতে চাহেন না। দোষটা যে আমাদের এবং আমরা নিজ বুদ্ধিতে যাঁহাদের উচ্চাসনে বসাইয়াছি তাঁহাদের হাতে সকল ক্ষমতা দিয়া যে ত্রুটি আমাদের হইয়াছে ইহার তো স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। কোনও বিশেষ মন্ত্রীর স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইলেই কি আমাদের পরিত্রাণের পথ খুলিয়া যাইবে?

কথায় বলে, একে মা মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ। চাউলের বাজারের বৃত্তান্ত কতকটা যেন তা-ই।

দর হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। খোলা বাজার ত তপ্ত উনান। বাধ্য হইয়াই লোকে ন্যায্য মূল্যের দোকানে ভিড় জমায়। কিন্তু সেখানেও বিস্তর ঝামেলা। বৈশাখের "চাঁদি-ফাটা রৌদ্রে" মাথা পাকাইয়া, রক্ত-জল-করা মেহনতের টাকার বিনিময়ে যে তণ্ডুল ভিক্ষা মেলে, দাঁতের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া নাক-মুখ বুজিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিতে হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়ত হয়, কিন্তু ভোজনের আনন্দ দুর্লভ। মুনাফাশিকারী নিষাদ দলের লোভের শরাঘাতে ঘায়েল হইয়া নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে।

মুনাফাশিকারীদের দলে আবার এক শ্রেণীর অসাধু রাজকর্ম্মচারীও আসিয়া ভিড়িয়াছেন। ইহাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এনফোর্সমেণ্ট পুলিসের তৎপরতাও কিভাবে বানচাল হইয়া যাইতেছে তাহার এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, চাউলের মূল্য বা সরবরাহ সম্পর্কে রাজ্য-সরকারের নিকট কোন মহল হইতে বিশেষ কোন অভিযোগও পাওয়া যায় নাই। অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

খাদ্যমন্ত্রীর উপরোক্ত বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের জনৈক পদস্থ পুলিস অফিসারের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি সম্পর্কে একজন পুলিস অফিসার হিসাবে তাঁহার কোন প্রকার মন্তব্য করা সঙ্গত হইবে না।

তবে পুলিসের পক্ষ হইতে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে চাউল ও খাদ্যশস্যের ব্যাপারে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব অভিযোগের সত্যতাও প্রমাণিত হইয়াছে। কতক কতক ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তিও হইয়াছে। অসাধু-ব্যবসায়ীদের গুপ্ত গুদাম তল্লাসী করিয়া এনফোর্সমেণ্ট পুলিস প্রচুর পরিমাণ চাউল ও অপরাপর খাদ্যশস্য আটক করিয়াছে।

উক্ত পুলিস অফিসার কথাপ্রসঙ্গে একটি গুপ্ত রহস্য ফাঁস করিয়া দেন। তিনি বলেন, 'যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়াইব, সেই সরিষাতেই ভূত'। কয়েকজন বড় বড় অফিসারসহ রাজ্য-সরকারের খাদ্যবিভাগের এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী খাদ্যের ব্যাপারে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেছেন। পুলিসের নিকট অভিযোগ আছে যে, এক শ্রেণীর বিভাগীয় সরকারী কর্ম্মচারীর যোগসাজসে চোরাকারবার দিন দিন ফাঁপিয়া উঠিতেছে। এমনও অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, সম্প্রতি কলিকাতার বড়বাজারে জনৈক চাউল ব্যবসায়ীর বাড়ীতে "চা-মজলিসের" চা নামে শতাধিক ব্যবসায়ী ও খাদ্যবিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারীর (কোন কোন অফিসারও উপস্থিত ছিলেন) এক গোপন বৈঠক হইয়া গিয়াছে। উক্ত গোপন বৈঠকে নাকি সরকারের অতি-মুনাফা রোধ ও ধান-চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আইন বানচাল করা সম্পর্কে একটি অলিখিত "সহাবস্থান" চুক্তি হইয়া গিয়াছে। চক্রান্তকারীগণ ফাঁদে ফেলিয়া পুলিস ও দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্ম্মচারীদের 'দাঁও'-এর অংশীদার করার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, দুর্নীতি দমন বিভাগ ইতিমধ্যেই খাদ্যবিভাগের কয়েকজন পদস্থ কর্ম্মচারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। দুর্নীতি দমন বিভাগ রাজ্য-সরকারের নিকট শীঘ্র একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী রিপোর্ট দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা গেল।

সংবাদ লইয়া আরও জানা গিয়াছে যে, গত জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত একমাত্র কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল হইতেই এনফোর্সমেণ্ট পুলিস ধান-চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের বাজারে অতি-মুনাফা ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ অমান্য করা সম্পর্কে জনসাধারণ ও জন-প্রতিনিধিদের নিকট হইতে প্রায় দুই শতাধিক অভিযোগ পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে সমগ্র রাজ্যব্যাপী তদন্ত চলিতেছে।

"নলকূপ ষড়যন্ত্র"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' কলিকাতা পৌরসভার এক চৌরচক্রের পুলিস আদালত পাড়ায় সংবাদ নিম্নরূপে দিয়াছেন :

বুধবার ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে অবস্থিত কলিকাতা পুলিস আদালত ভবনে এডিসনাল স্পেশাল কোর্টে জজ শ্রী এন. এন. বাগচী কলিকাতা কর্পোরেশন নলকূপ ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিয়াছেন। উহা টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের ১,৬৭৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। এই মামলার সর্ব্বোচ্চ দণ্ড ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক বলিয়া কথিত কণ্ট্রাক্টর রমেশচন্দ্র রায়ের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, ১১,২৭৩ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আসামীদের মধ্যে একজন রাজারাম সিদ্ধিরাম ফার্ম্মের সিদ্ধিরাম খালাস পাইয়াছে। কাউন্সিলার সুব্রত সেনশর্ম্মা সহ অবশিষ্ট ১৭ জন আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা (বিশ্বাসভঙ্গ) অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহারা সকলে দণ্ডবিধির ৪০৯ সহিত পঠিত ১২০(খ) ধারা (বিশ্বাসভঙ্গের ষড়যন্ত্র) অনুযায়ীও দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু জজ এই দফা অভিযোগে দণ্ড দিতে বিরত থাকেন।

জজ কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন কমিশনার শ্রী বি. কে. সেনের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়াও তীব্র মন্তব্য করেন।

আসামীদের মধ্যে কর্পোরেশনের তিন জন কর্ম্মচারী ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের ডেপুটি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এস. কে. দাস এবং দুই জন স্পেশাল টিউবওয়েল ইনস্পেক্টর আর. সি. মহলানবিশ ও আর. এন. চক্রবর্ত্তী ৪০৯ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রত্যেকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার সুব্রত সেনশর্ম্মা, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী জে. সেন এবং কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যশোদানন্দন ব্যানার্জ্জী ৪০৯।১০৯ ধারা (বিশ্বাসভঙ্গে সহায়তা) অনুযায়ী প্রত্যেকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কর্পোরেশনের পাঁচ জন টিউবওয়েল ইনস্পেক্টর—সনৎকুমার ঘোষ, এন বি. সরকার, ইমদাদুল হক, দেবব্রত সেনগুপ্ত, এন, গাঙ্গুলী, এবং অপর পাঁচ আসামী—ম্যাঙ্গো লেনের ইউনিয়ন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কে. সি. চক্রবর্ত্তী ও সত্যরঞ্জন ব্যানার্জ্জী, টিউবওয়েল ডিলার্স সিণ্ডিকেটের নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও এক ভুয়া ফার্ম্মের হরিপদ ব্যানার্জ্জী ও জে, সি. দাস ৪০৯।১০৯ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

উত্তরপত্রের কাহিনী

কলিকাতার ছাত্র পরীক্ষার ব্যাপার ক্রমেই প্রহসনে দাঁড়াইতেছে। তাহারই এক অঙ্কের চিত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিম্নরূপ দিতেছেন :

গত ১৬ই এপ্রিল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ইতিহাসের যে ২৯৮টি খাতা খোয়া গিয়াছিল তাহা সোমবার কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। হাওড়া-বালীগঞ্জ রুটের জনৈক কণ্ডাক্টর বালীগঞ্জ ডিপোতে একটি ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর ঐ খাতাগুলি ঐদিনই কুড়াইয়া পান। খাতাগুলি ট্রাম কোম্পানীর সদর কার্য্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। ট্রাম-কর্তৃপক্ষ উহা গোয়েন্দা পুলিস দপ্তরে প্রেরণ করেন।

নগরীর গোয়েন্দা পুলিস ইতিমধ্যে সদর ষ্ট্রীট এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেকগুলি দোকানে হানা দিয়া খোয়া-যাওয়া ভূগোল-পত্রের কতকগুলি খাতা লইয়া বানানো ১,২৫৮টি ঠোঙা উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে পুলিস সন্দেহক্রমে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ভূগোলপত্রের খাতাগুলি গত ১৩ই এপ্রিল খোয়া গিয়াছিল ঐ দুইটি ঘটনা-সংক্রান্ত সংবাদ পূর্ব্বেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ইতিহাসের উত্তরপত্র উদ্ধার সম্পর্কিত প্রাপ্ত বিবরণে প্রকাশ যে, হাওড়া-বালীগঞ্জ রুটের ট্রাম কণ্ডাক্টার শ্রীসুশীল মজুমদার হাওড়া হইয়া একখানি গাড়ী ঘুরিয়া বালীগঞ্জ ডিপোতে উপনীত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তিনটি প্যাকেট কুড়াইয়া পান। তিনি উহা যথারীতি স্থানীয় আপিসে জমা দেন। পরদিন ১৭ই এপ্রিল প্যাকেটগুলি ট্রাম কোম্পানীর সদর কার্য্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ট্রাম কর্তৃপক্ষ হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, যাঁহার প্যাকেট হারাইয়াছে তিনি ট্রাম কোম্পানীতে খোঁজ লইবেন। কিন্তু ঐ সম্পর্কে কেহ কোনরূপ খোঁজ লন না। প্রকাশ, ঐ প্যাকেটগুলি নাড়াচাড়া করিবার ফলে কাগজের মোড়কের কোন কোন অংশ ছিঁড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ইতিহাসের উত্তরপত্র খোয়া যাওয়ার সংবাদ বাহির হয়। ট্রাম কর্তৃপক্ষ ছিন্ন অংশের মধ্য হইতে লক্ষ্য করিয়া উহা খোয়া-যাওয়া উত্তরপত্র হইতে পারে অনুমান করিয়া সোমবার কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিস কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। লালবাজার হইতে অফিসার প্রেরণ করা হয়। মোড়কে বাঁধা খাতাগুলি লালবাজারে লইয়া আসা হয় এবং ঐ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেওয়া হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হইতে কর্ম্মচারিগণ আসিয়া ঐ খাতাগুলির ভার গ্রহণ করেন। ঐ তিনটি প্যাকেটের সীল নাকি অভগ্ন ছিল।

ইতিহাসের উত্তরপত্রগুলি ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পাওয়া যায়। অথচ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক খোয়া-যাওয়া উত্তরপত্রগুলি সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, তাঁহার ভ্রাতা ঐ উত্তরপত্রগুলি একটি ট্যাক্সিতে লইয়া হাজরা জংশনে আসেন। সেখানে তিনি একটি কুলী ভাড়া করেন এবং আর একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিবার জন্য যখন তিনি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ঐ কুলী সরিয়া পড়ে। ঐ পত্রে তিনি ইহাও জানান যে, এক জরুরী কাজ থাকায় তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে উত্তরপত্রগুলি তাঁহার টালীগঞ্জের বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের উত্তরগুলি মফঃস্বল কেন্দ্রের এবং ভূগোলের উত্তরপত্রগুলি কলিকাতা কেন্দ্রের ছিল। ভূগোলের প্রায় ৩০০ উত্তরপত্র খোয়া যায়। এই সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ জানান যে, যে সব উত্তরপত্র দিয়া ঠোঙা তৈয়ারী করা হইয়া গিয়াছে তাহার আর কোন উপায় নাই। সে সকল উত্তরপত্র সম্পর্কে পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। তবে তল্লাসী করিয়া যদি কোন পুরা উত্তরপত্র পাওয়া যায় তবে সে সকল উত্তর-পত্র সম্পর্কে আর পরীক্ষা গৃহীত হইবে না।

বিভিন্ন স্থানের অভিভাবকদের তরফ হইতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিয়াছে যে, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে পর্ষদ স্কুল অথবা ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু যে সব 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' পরীক্ষকের জন্য পরীক্ষার খাতা হারাইয়া যাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে পর্ষদ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই অভিযোগের উত্তরে পর্ষদের জনৈক মুখপাত্র দৃঢ়ভাবে জানান, যে সব পরীক্ষকের অবহেলার দরুন এরূপ ঘটিয়াছে বা ভবিষ্যতে ঘটিবে তাঁহাদের ভবিষ্যতে কখনই পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইবে না।

কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে মৃত্যু হইয়াছে। ২৬শে রবিবার সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং পরদিন ভোরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ১৮৯২ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত ডাক বিভাগে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণের পর তিনি একান্ত-ভাবে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধসহ তিনি প্রায় চল্লিশখানি বই লিখিয়াছেন। শেষ জীবনে 'শব্দবিজ্ঞান' নামে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা পাণ্ডুলিপির আকারেই রহিয়াছে, মুদ্রণ ও প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', 'সাহিত্যকথা','সাহিত্যিকা','মীরাবাঈ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। ইহা ছাড়াও ১৯২৯ সনে তিনি সাপ্তাহিক 'দীপালি' এবং ১৯৪৭ সনে 'মহিলা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালন করিয়াছিলেন। অমায়িক মিষ্টভাষী কৌতুকালাপী এই সাহিত্য-সাধকের আর একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি সাহিত্যে নূতন লেখকদের বিশেষ উৎসাহ দিতেন। নূতন লেখকদের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ অনুরাগ স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ঔ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আত্মীয়ের চিত্ত

এবং কর্মক্ষেত্রে থেকে নানা কর্তব্যের
তাড়নায় তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে
দেরি হয়ে গেল। অনেক দিন পরে এবং আবার
দুর্লভ অবকাশ আকস্মিক পরিষ্কার
হল. এসেছে তাই সব প্রথমেই তোমাদের
উদ্দেশে আশীর্বাদ পাঠাতে বসলুম।
আবার অনতিবিলম্বেই ঘুলিয়ে আসবে
আমার অবকাশ। তোমার কবিতার
বইখানি গ্রহণ করলুম আনন্দের সঙ্গে।
তোমাদের সঙ্গে মিলিত ফোটোগ্রাফটি
বেশ ভালো হয়েছে, তাতে দিলুম আমার
স্বাক্ষর। — এইবার এক ভিড় উপরের
ছুটি এসে পৌঁছল আমার এখানে
আমার বেশি সময় নেই। সংক্ষেপে
তোমাদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিই।
ইতি ১১ মাঘ ১৩৪৫

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা পুষ্পদেবীকে লিখিত।

শিক্ষাদর্শন

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

মানুষের যে চারিত্র্য-প্রবণতা সহজাত ভাবে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে পুষ্টতা সমৃদ্ধ করে তোলাই হ'ল শিক্ষার কাজ। মানুষ অতীত জীবনের সম্পদকে বহন করে নিয়ে আসে তার বর্তমান জীবনে। পূর্ব জীবনের কৃতকর্মের ফলবত্তায় বিশ্বাস না করলে একই পরিবারের আবহাওয়ায় পুষ্ট একই পিতামাতা থেকে জাত দুটি সন্তানের ভিন্ন মননধর্মিতার কোন সদব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য এই বিভেদকে একান্তভাবে আকস্মিক বললে আর জন্মান্তরবাদ দিয়ে একে ব্যাখ্যা করতে হয় না। তবে শুধুমাত্র 'আকস্মিক' বলে ব্যাখ্যা করলে তাকে আমরা ব্যাখ্যা বলব না; তাকে অপব্যাখ্যা (Explaning it away) বলব। মানুষের মধ্যে এই শক্তিসামর্থ্যগত প্রভেদগুলি পণ্ডিতজনস্বীকৃত। মহাদার্শনিক প্লেটো থেকে আরম্ভ করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এই প্রভেদকে স্বীকার করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ভিত্তিতে এই পারস্পরিক বিভেদকে প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্যালটন, চারেট, ক্যাটেল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা মানুষের মধ্যেকার আত্যন্তিক বিভেদটুকুকে পরিষ্কার করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। এঁদের মধ্যে কেউবা ব্যক্তিজীবনে বংশানুক্রমিকতার প্রভাবকে সবচেয়ে বড় বলেছেন; আবার কেউবা বলেছেন যে, মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাবই প্রধান। কোন্ প্রভাবটা সবচেয়ে বড় সেটা নির্দেশ করা দুরূহ। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বংশানুক্রমিকতা এবং পরিবেশ—এ দুটোই শিশুর উত্তর-জীবনকে প্রভাবিত করে।[১] শিক্ষক শিক্ষার্থীর বংশানুক্রমিকতা এবং তার সহজাত শক্তিটুকুকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হবেন। যথাযোগ্য পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করে সুন্দর মানুষ, কৃষ্টিবান মানুষ, আদর্শবাদ মানুষ গড়ে তোলা যায়, এটাই হ'ল সমস্ত শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহজাত বুদ্ধি, কল্পনা, মেধার বিশেষ পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। বংশানুক্রমিক যে সব প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে দেখা যায় তারও মূলোচ্ছেদ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্য হবে খারাপ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে ভাল প্রবৃত্তিগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। এর জন্যই আমরা শিক্ষার লক্ষ্য এবং আদর্শের কথা চিন্তা করি। এর জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানান দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ করা হয়। অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মতই শিক্ষাদর্শনও সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়ে ওঠে।

শিক্ষাদর্শন বলতে একটা বিশিষ্ট দর্শনমতের সামগ্রিক প্রয়োগ বুঝব শিক্ষাক্ষেত্রে, এমনধারা পণ করলে সে পণ রক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব দর্শনমত আমরা প্রয়োগ করি তার বহু বিচার এবং পরিবর্তন সাধন করতে হয় প্রয়োগের সুবিধার জন্য। Naturalism বা স্বভাববাদ বলতে আমরা দর্শনের ক্ষেত্রে যে বিস্তৃত প্রকৃতিবাদকে বুঝি শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক ভাবে বুঝি না। তার বহু সঙ্কোচন ঘটে। দর্শনের প্রকৃতিবাদ বলতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের প্রকৃতিবাদকে বুঝি, যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদকে বুঝি ও প্রাণজ প্রকৃতিবাদকে বুঝি; শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশেষোল্লিখিত প্রকৃতিবাদের প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত হয়েছে। যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদের সামান্য প্রভাবও পড়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই উক্তির সত্যতা আরও উদ্‌ঘাটিত হবে যদি আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বভাববাদীদের অগ্রগণ্য রুশোর মতামত নিয়ে আলোচনা করি। বস্তুতঃ, প্রকৃতিবাদ হ'ল রেনেসাঁসের অনমিত মানবতাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তিনি তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ Emile (Education)-এ বললেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থাকে উল্টে দাও তা হলেই ঠিক পথে চলা হবে। আমরা যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি তা আমাদের নিবুদ্ধিতা এবং স্ববিরোধী চিন্তার কথাই ঘোষণা করছে। কাজে কাজেই এই ধরনের স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে তাদের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করার তিনি বিরোধী ছিলেন। বালককে 'সুবোধ বালক' করতে গিয়ে আমরা তার মানবিক গুণগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলি। আমরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বর্তমানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। তার ফলে ভবিষ্যতের স্বপ্নও অলব্ধ থাকে, বর্তমানের সত্যও উপেক্ষিত হয়। তাই প্রকৃতিবাদী ম্যাকডুগ্যাল বললেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাভাবিক পথে চালিত করে প্রকৃতিমনা জীবনের-

---

১। Gates-এর Psychology for Students of Education গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। একথাই এঁরা বলছেন যে, প্রকৃতি মানুষের জন্য কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শ নির্দেশ করে দেয়নি, পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটলেই ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তাই আমাদের শিখতে হবে কেমন করে চললে প্রকৃতির সঙ্গে, আমাদের পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে চলা যায়। যেন কোথাও তালভঙ্গ না ঘটে। নব্য ডারুইনীয় মতবাদের প্রভাবে শিক্ষাবিদরা একথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, পরিবেশের সঙ্গে মানুষকে সম্যকরূপে মানিয়ে চলার শিক্ষা দেওয়াই হ'ল নব্য প্রকৃতিবাদের গোড়ার কথা। স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠবে যে, প্রকৃতি বা আমাদের পরিবেশের সঙ্গে যদি আমাদের জীবনযাত্রা কোথাও অসঙ্গত না হয় তা হলে শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বটুকু নির্বিঘ্ন হবে না অন্য কোন ফললাভও মানুষের ভাগ্যে ঘটতে পারে? যে বিবর্তনের সরণী বেয়ে আমরা প্রাণীজগতের নিম্নতম সোপান বেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বর্তমান জীবনের অধিকারী হয়েছি, সেই বিবর্তনের ওপর প্রকৃতিবাদের প্রভাব কতটুকু? বার্নার্ড শ' প্রমুখ মনীষীরা এর উত্তরে বললেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে নব্য প্রকৃতিবাদের প্রয়োগ করলে একথা আমাদের বুঝতে হয় যে, বিবর্তনের ধারাকে এই শিক্ষা দ্রুততর করবে। বংশানুক্রমিকতার মধ্য দিয়ে আমরা যে সব উন্নত গুণাবলীর অধিকারী হই সেই গুণগুলিকে যথাযথ রক্ষা করা, তা অনুচারী বংশধরদের দিকে যাওয়া, এবং এই গুণগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো, এটাই হ'ল শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণজ প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য।

রুশোর কথা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। তাঁর কথায় আবার ফিরে আসি। রুশো বললেন যে, প্রকৃতিবাদের সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, শিশুকে শিশুর মত করে বিচার করতে হবে। রুশোর শিক্ষাদর্শনের ভাষ্যকার মনরো বললেন যে, রুশোর মতে শিক্ষা হ'ল সেই পদ্ধতি যার দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আনন্দময়, শিশুর মনকে স্ফূর্তিপূর্ণ, শিশুকে সমাজের প্রয়োজনীয় মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। এই পদ্ধতিটা অবশ্যই শিশুর জীবনধারার কোথাও কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে অনুসরণ করতে হবে। শিশুর মনোযোগ আপনা থেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই মনোযোগ আকৃষ্ট হবার ফলেই সে জানতে চাইবে। তার শিক্ষার সূত্রপাত এইভাবে হওয়া চাই। কোন শিক্ষকের নির্দেশে যেন শিশুর শিক্ষার সূত্রপাত না হয়, এটা প্রকৃতিবাদীরা বারবার বলেন। এই শিশুচিত্তের প্রবৃত্তিগুলিকে বিকাশিত হতে সাহায্য করার জন্যই মন্তেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর জন্য এমন সব খেলনার বন্দোবস্ত করা হয়েছে যার দ্বারা শিশু সহজেই আপনার সুপ্ত সামর্থ্যকে জাগ্রত করতে পারে এবং শেখবার জন্য আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। রুশো বললেন যে, প্রকৃতিবাদের দুটো অঙ্গ রয়েছে—একটি অসদর্থক, অন্যটি সদর্থক। রুশো প্রথম অসদর্থক (Negative) দিকটির আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন যে, ৫ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুজীবনে শিক্ষার অসদর্থক অঙ্গটির (Negative aspect) প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এই সময়ের শিশুকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে। এই সময়ে শিশু তার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে উন্মুখ, তীক্ষ্ণ এবং অনুসন্ধানী করে তুলবে। যাতে করে যথাসময়ে সে সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারে। ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে উঠলে উত্তরজীবনে জ্ঞানলাভ খুব শক্ত হয় না। শিক্ষার এই অসদর্থক অঙ্গটি শিশুকে শূন্য করতে শেখায় না, কাম থেকে নিবৃত্ত হতে শেখায়; কিন্তু এই সময়ে সত্যজ্ঞান লাভ না করলেও সে ভুল না করতে শেখে। কাজে কাজেই এই ৫ থেকে ১২ বছর সময়টুকু শিশুজীবনের 'অনন্তকাল' (Idle time) নয়।

একথা অসংশয়িত সত্য যে, এই প্রকৃতিবাদ মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রেও রুশোকে পথিকৃৎ বলে স্বীকার করতে হয়। তিনিই প্রথম বললেন যে, শিশুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ওপর লক্ষ্য রেখে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিশুর বৈশিষ্ট্য জানতে হলেই শিশুমনের খবর নিতে হয়। রুশোর এই মূলসূত্রটি থেকে পেস্তালৎসী, হার্বার্ট, ফ্রোবেল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাঁদের মনস্তত্ত্বনির্ভর শিক্ষাদর্শন গড়ে তুললেন। আজকের যুগের শিক্ষাগত প্রকৃতিবাদ মনঃসমীক্ষণকে আশ্রয় করে অনেক দূর এগিয়েছে। সেক্স মানুষের সর্বপ্রকার চিন্তা-কর্মের নিয়ন্তা, একথা উত্তর-ফ্রয়েডীয় যুগে বসে অসংকোচে বলা চলে। প্রাক্-ফ্রয়েডীয় যুগে সেক্স সম্বন্ধে আমাদের যে গোপনতাবিলাস ছিল আজ আর ঠিক তা নেই। পণ্ডিতজন একথা বলছেন যে, এই একটি বিলাসে বিলসিত হওয়ার ফলে সমগ্র মানব-সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। মানুষের পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবন পর্যুদস্ত হয়েছে সেক্স অবদমনের জন্য। সেক্স এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে আমরা শিশুকালে যে অবদমন অভ্যাস করি উত্তরজীবনে তার ফল হয় সুদূর-প্রসারী। এই জন্য শিশুকাল থেকেই সেক্স সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া এবং সে সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনায় সুপারিশ করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাবিদেরা। মনঃসমীক্ষণের ফলে সেক্সের

প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এ ছাড়াও যে কোন ধরনের ইচ্ছাকে অবদমিত করার বিরুদ্ধে শিক্ষাবিদেরা বলেছেন। অবদমিত ইচ্ছাই আমাদের চরিত্রের নানা রকম বিকার এবং জটিলতার জন্য দায়ী। এ যুগের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের অবদমনকে অস্পৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে। দৈহিক শাস্তি বা অন্য ধরনের শাস্তি নিষিদ্ধ হয়েছে। নীতিবাগিশতায় শিশুদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। শিশুরা, রুশোর মতে, নীতিই হোক আর প্রকৃতি পরিচয়ই হোক, সবই নিজে নিজে শিখবে। এই নিজে নিজে শেখার কথা বলতে গেলেই খেলার কথা বলতে হয়। খেলার মধ্য দিয়েই শিশু অনেক সামর্থ্য এবং যোগ্যতার বিকাশ ঘটায় এবং শিক্ষকও বুঝতে পারেন যে, কোন পথে শিশুর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটবে। সুতরাং শিক্ষায় প্রকৃতিবাদীরা খেলাতে প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই প্রকৃতিবাদ কেমন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তার বিবরণী দিয়েছেন এ. এস. নেইল ; তিনি তাঁর 'That dreadful school' গ্রন্থে বলছেন তাঁর সামারহিল বিদ্যালয়টির কথা। এই বিদ্যালয়টিতে শিশুদের সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তারা মুক্ত প্রাঙ্গণে খেলাধূলা করে ; তাদের ভয় দেখানো হয় না। তাদের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা প্রভৃতি জন্মাবার সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারা নানা ধরনের খেলনা নিয়ে সারাদিন খেলে বেড়ায়। যদি তারা কোন কিছু তৈরী করতে চায় তবে তাদের সে কাজে বাধা দেওয়া হয় না। তারা যে ধরনের কাজকে মূল্যবান মনে করে তাদের সেই ধরনের কাজই করতে দেওয়া হয়। একথা মনে রাখা হয় যে, শিশুদের মূল্যবোধ বয়স্ক মানুষদের মূল্যবোধ থেকে স্বতন্ত্র। আমরা ক্লাসিকাল সঙ্গীত বা ক্লাসিকাল পেন্টিং ভালবাসি বলে শিশুরাও যে সেটা ভালবাসবে এমন কোন কথা নেই। কাজে কাজেই শিশু বয়সে তাদের মাথায় বড় বড় কালচার সম্পর্কিত ধারণা সামারহিল বিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার কোন বন্দোবস্তই নেই। সামারহিল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-অধিকর্তা নেইল বলছেন যে, প্রকৃতিবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের দুটি দিক রয়েছে। একটী 'অসদর্থক' বা Negative এবং অন্যটি সদর্থক বা Positive ; যখন এই প্রকৃতিবাদকে এই ভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন তার অসদর্থক অঙ্গ হ'ল শিশুকে কোন ব্যাপারে বাধা না দেওয়া এবং সদর্থক অঙ্গটি (Positive aspect) হ'ল শিশুর সব কাজকে ক্ষমার চোখে দেখা এবং শিশুকে ভালবাসা। শিশুদের খোলাখুলি আলোচনায় উৎসাহিত করে দেখা গেছে সেক্স-সম্পর্কিত এবং আনুষঙ্গিক অবদমনে তাদের মনের স্বাভাবিক বিকাশের কোন ক্ষতি হয় না। তারা যাতে করে নিজেদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তার জন্য তাদের স্বনির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী দ্বারা তাদের বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রাবাসের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থাপক-মণ্ডলী প্রয়োজন হলে শাস্তির ব্যবস্থা করে। তবে এই শাস্তিদানের ফলে শিশুচিত্তের কোন ক্ষতি হয় না। কোন ঘৃণা, বিদ্বেষ বা দলাদলি সামারহিল বিদ্যালয়ে দেখা যায় নি বলে নেইল দাবি করেছেন। পরন্তু এদের মধ্যে এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে এদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতির কোন অবনতিই ঘটে নি। আত্মশক্তির সুপ্তাবস্থা থেকে জাগ্রতাবস্থায় উত্তরণই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তবে এই প্রক্রিয়ায়ই সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজসাধ্য হয়। এই ভাবে স্বশাসন এবং প্রবৃত্তি-উৎসাহিত কর্মে আত্ম-নিয়োগের ফলে শিশুর আত্মবিশ্বাস এবং স্বনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। শিশুর সুপ্ত চারিত্রধর্ম জাগ্রত হয়ে ওঠে। অন্তরশায়িত গুণাবলী বিকশিত হয়ে ব্যক্তিচরিত্রকে সমৃদ্ধ করে। নেইল বলছেন যে, শিশুদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত এবং বিকশিত করার ব্যাপারে অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান-পদ্ধতির উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থা সামারহিল বিদ্যালয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

প্রকৃতিবাদ শিক্ষাদানের সুষ্ঠু পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও এই তত্ত্বে শিক্ষার কোন আদর্শ নির্দিষ্ট হয় নি। কেবলমাত্র 'বাধা দিয়ো না', 'বারণ করো না' এই সব অসদর্থক নীতির ওপর কোন সুষ্ঠু শিক্ষাদর্শন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বর্তমান কাল এবং নিকটবর্তী ভবিষ্যতের ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ার জন্য প্রকৃতিবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে একেবারে অবহেলা করেছে। শিশুর স্বভাবের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটাতে চায় প্রকৃতিবাদ। অবশ্য আমরা 'প্রকৃতি' বলতে যদি মানুষের ইন্দ্রিয়গত জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে বুঝি তবে প্রকৃতিবাদের অনেক দুর্বলতাই দূর হয়। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ঘটানোর কাজেও যদি প্রকৃতিবাদ আত্মনিয়োগ করে তা হলে প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির অনেক কারণই চলে যায়। তবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করার কাজে প্রকৃতিবাদ অক্ষম ; শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের (Idealism in Education) আলোচনা করতে হবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হলে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কোন দিগদর্শন করতে না পারলেও শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করেছে, একথা অসংশয়ে বলা যায়। রাস্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Philosophical Bases of Education-এ বলছেন যে, মানুষের

পরিবেশকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বস্তুগত পরিবেশ এবং (খ) কৃষ্টিগত পরিবেশ। বস্তুগত পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষের কলাকুশলতা অসীম। অনেকে এমন কথা বলেন যে, জীবজন্তুর মধ্যেও এই বস্তুগত পরিবেশ সৃষ্টির কলা-কুশলতা দেখা যায়। বস্তুগত পরিবেশ সৃষ্টিতে মানুষ ও জীবজন্তুর কলাকুশলতা স্বীকার করে নিলেও একথা অবিসংবাদিত সত্য যে,কৃষ্টিগত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেরই আছে, জীবজন্তুর নেই। এই কৃষ্টিগত পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে মানুষের সহজাত মননশক্তির বিকাশ হয়। মানুষ তার মননশক্তির সহায়তায় সৃষ্টিধর্মী কর্মে ব্রতী হয়। ধর্ম, নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য, গণিতশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান হ'ল মানুষের মননকর্মের ফল। এই মননকর্মের ফলেই মানুষের কৃষ্টি উপজাত হয়। এই কৃষ্টির অধিকার শুধু মানুষের। এই কৃষ্টিকে পুষ্ট করা এবং পরিবর্ধিত করা সমগ্র মানবসমাজের অবশ্য কর্তব্য : শিক্ষাপদ্ধতির সহায়তায় এই কৃষ্টিকে বংশানুক্রমিক ভাবে হস্তান্তরিত করা হয়। কৃষ্টি যত ব্যাপক হবে শিক্ষার দায়িত্বও ততই বাড়বে। কেননা পূর্বপুরুষের কৃষ্টিকে উত্তরপুরুষের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব দেশের শিক্ষাব্যবস্থার। সেই কৃষ্টির ধারাকে প্রাণবন্ত এবং শক্তিশালী করার দায়িত্বও শিক্ষাব্যবস্থার। রাস্ক বলছেন যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত কেমন করে আমরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কম খরচে এই কৃষ্টিগত ঐতিহ্যকে অন্য লোকের হাতে তুলে দিতে পারি তার ব্যবস্থা করা। গ্রীকদার্শনিক প্লেটোর মতে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হ'ল আমাদের কৃষ্টিগত জীবনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করা। ভাববাদী দার্শনিকেরা বিশ্ব-সংসারকে Rational বলেছেন। এই Rational বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পাপ আছে, দুঃখ আছে, অন্যায় আছে, অসত্য আছে; এদের জয় করাই মানুষের সাধনা। যে কোন শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য হওয়া উচিত এই দুরূহ সাধনায় মানুষকে সাহায্য করা।

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে সেটা দেখা দরকার। ফ্রোবেল একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে শিক্ষকের ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যালয় যদি উদ্যান হয়, শিশুশিক্ষার্থী যদি বৃক্ষশিশু হয় তবে শিক্ষক হচ্ছেন যত্নশীল উদ্যানরক্ষক। তাঁর কাজ হচ্ছে বাগানের গোলাপগুলিকে বাড়তে যেমন সহায়তা করা তেমনি বাঁধাকপিগুলিকেও বাড়তে সহায়তা করা। অর্থাৎ বিভিন্ন সহজাত-শক্তি এবং প্রকৃতিসম্পন্ন শিশুদের নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য। 'আত্মোপলব্ধি' (Self-realisation) হ'ল ভাববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য; শিক্ষক শিশুকে 'আত্মোপলব্ধি' করতে সাহায্য করেন মাত্র। প্রকৃতিবাদীদের মতে আত্মস্ফুরণই শিক্ষার লক্ষ্য। সুতরাং এই শিক্ষাদর্শনে শিক্ষকের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে এই যে "আত্মোপলব্ধি"র কথা বলা হ'ল এই আত্মোপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব সমাজিক জীবহিসেবে। সুতরাং ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে সামাজিক পটভূমিকে অস্বীকার করা হয় নি। ব্যক্তি যে কল্যাণের (উদাহরণস্বরূপ প্লেটোনিক আদর্শের কথা ধরা যাক) আদর্শকে সত্য করে তুলতে চায় তার সার্বিক ধর্ম সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা সাযুজ্য বোধ এনে দেয়, তাদের মধ্যে একটা আত্মিক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে। আধুনিক প্রকৃতিবাদে মনস্তত্ত্ব যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবাদের প্রবর্তন করেছে তার বিরুদ্ধে ভাববাদ বলল যে, বংশানুক্রমিকতার (Heredity) দ্বারা শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে একথা বললে শিক্ষাদর্শনে নৈরাশ্যবাদ (Pesimism) প্রতিষ্ঠা পাবে এবং এর ফল খুবই খারাপ হবে। আমরা যদি শিশুর মানসিক সামর্থ্য মেপে বলে দিই যে শিশুর এই হারে মানসিক সামর্থ্য আছে, সুতরাং তার দ্বারা বিশেষ কিছু হবে না; তা হলে এর থেকে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুতঃ শিশুর আত্মস্ফুরণের সম্ভাবনা অনির্দেশ্য। তাকে মনস্তাত্ত্বিকের পরীক্ষণ-রীতির দ্বারা একেবারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। এই মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষণ-রীতি মানুষের মূল্যের যে জগত (World of Values) রয়েছে তাকে অস্বীকার করেছে। ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে মানুষের মূল্যবোধ পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে। এঁদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, এই মূল্যবোধটি মানুষের মনে জাগ্রত করে দেওয়া। মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ত্রিমূর্তি—সত্য, শিব ও সুন্দর। এই সত্য-শিব-সুন্দরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা তিন রকমের কাজ করি—বুদ্ধিগত, নৈতিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক; এই ত্রিবিধ কর্মই হ'ল আধ্যাত্মিক কর্ম২; শিক্ষাবিদ রসের মতে এই ত্রিবিধ কর্মই ধর্মে সমন্বিত হয়। আমরা তাকেই জীবনধর্ম বলব যার মধ্যে সকল প্রকার কর্মই বিধৃত। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় আমাদের এই ত্রিবিধ কর্মের ব্যাপ্তি এবং উন্নতি ঘটানো তবে অবশ্যই শিক্ষার লক্ষ্য হবে আমাদের ধর্মজীবনের সম্যক পুষ্টিসাধন করা। কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম হ'ল আমাদের ধর্মের সমার্থক। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের ধর্মজীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। এই ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে

২। Clutton Brook লিখিত 'The ultimate Belief' দ্রষ্টব্য।

মানুষের বস্তুগত পরিবেশ এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্বীকৃতি রয়েছে। এই দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনই ভাববাদী শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য৩।

এবার প্রয়োজনবাদ বা Pragmatism-এর আলোচনা করা যাক।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হ'ল মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধকে এই তত্ত্ব অস্বীকার করেছে। এই মতের পোষকরা বলেন যে, মূল্য উপজাত হয় যখন আমরা কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করি। মানুষের মনে মূল্যের কোন সংস্কার নেই। এঁদের মতে শিক্ষাপদ্ধতি শিশুর মনে তার নিজের মত মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। এঁরা ভাববাদীদের মত বিশ্বাস করেন না যে, শিক্ষা হ'ল মূল্য-দর্শনের ক্রিয়াশীল রূপ। এঁদের মতে শিক্ষার্থীর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য যে সব অসুবিধা রয়েছে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষাদর্শনের কাজ৪। এই অসুবিধাগুলি দূর করতে গিয়ে আমরা নতুন নতুন মূল্যের সৃষ্টি করি।৪ প্রয়োজনবাদীরা বলেন যে, শিশুকে যথাযোগ্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশটুকুর মধ্যে স্থাপন করলে তার মানসিক বৃত্তিগুলো যথাযোগ্য ভাবে স্ফুরণ লাভ করে। অর্থাৎ প্রয়োজনবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, যথাযোগ্য সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে আমরা অনুকূল পথে শিশুর মানসিক উন্নতিকে এগিয়ে দিতে পারি। এখানেই প্রয়োজনবাদীদের সঙ্গে প্রকৃতিবাদীদের মৌল পার্থক্য। তবে প্রকৃতিবাদীদের মতই এঁরাও বিশ্বাস করেন যে,শিক্ষার কোন পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে না। শিশুর মানসিক বৃত্তি, তার সামর্থ্য এবং পছন্দ, এইগুলিকে পরিবর্ধিত এবং পরিপুষ্ট করাই শিক্ষার লক্ষ্য। কোন উচ্চ আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষজনিত যে অভাব শিশু বোধ করে তার নিরাকরণ করাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই ধরনের শিক্ষার সুযোগ হ'ল এই যে শিক্ষার্থী অত্যন্ত ক্রিয়াশীল চলমান বুদ্ধির অধিকারী হয়। জীবনের যে কোন পরিস্থিতির মধ্যেই সে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে। জীবনের কোন অবস্থাতেই সে পরিবেশের সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে পড়ে না। সমাজের সঙ্গে তার যোগসূত্রটি কখনও ছিন্ন হয়ে পড়ে না। সমাজের সঙ্গে এই সযত্নলালিত আত্মীয়তাবোধটি নানা সদ্ কর্মে তাকে অনুপ্রাণিত করে। সমাজের ক্ষতিকারক কোন কাজে সে আত্মনিয়োগ করে না। এই ভাবে সকলে যখন পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে তখন সামাজিক জীবনের প্রভূত উন্নতিবিধান হয়। তবে এই প্রয়োজনবাদের একটা বড় ত্রুটি হ'ল যে, শিশুর শক্তিসামর্থ্যে যে জন্মগত প্রভেদ রয়েছে তাকে যথাযথ ভাবে এই শিক্ষাদর্শন স্বীকার করে না।

প্রয়োজনবাদের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষ। সেখানে কোন পূর্বনির্দিষ্ট আদর্শ নেই। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে যখন প্রয়োজনবাদকে প্রয়োগ করা হয় তখন দেখা যায় যে, শিশুই শিক্ষকের মূল উপাদান ; কোন আদর্শ, কোন লক্ষ্য, কোন ভবিষ্যতের স্বপ্নই শিশুর বর্তমান প্রয়োজনটুকুকে খর্ব করে না। বর্তমানকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছে প্রয়োজনবাদ। তাই মূলতঃ প্রয়োজনবাদ পদ্ধতি-মূলক, লক্ষ্যকেন্দ্রিক নয়। এই মতবাদ শিশুকে সৃষ্টিধর্মী কাজ এবং সাধারণ কাজের মধ্য দিয়ে শিখতে বলে। প্রয়োজনবাদীদের মতে সত্যিকারের জ্ঞান হ'ল পুস্তক বা গুরুজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা নয় ; এ জ্ঞান হ'ল কোন একটি পরিবেশে ঠিক কাজটি করা। প্রয়োজনবাদ তাই শিশুকে কোন্ পরিবেশে কি ভাবে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে তার নির্দেশ দেয়। এই কাজকে কেন্দ্র করে যে পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার কাছে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কৃত্রিম ভেদটা গৌণ হয়ে পড়ে। তাই প্রয়োজনবাদীরা বলেন যে,বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কৃত্রিম ভেদটা মানার দরকার নেই। দার্শনিক দেকার্ত এবং কান্ত মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অখণ্ডতা প্রচার করেছিলেন, প্রয়োজনবাদ তাঁদের মতবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। আডাম হাক্সলে৫ এঁদের অনুসরণ করে বললেন যে, জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার স্বাঙ্গীকরণ (integration) ঘটাতে হলে মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করতে হবে। শিশুশিক্ষার্থী তার শিক্ষার সময়েই বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের পরস্পর নির্ভরশীলতাটুকু হৃদয়ঙ্গম করে। তাই প্রয়োজনবাদী রেমণ্ডকে যখন এই শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের স্বাঙ্গীকরণের পটভূমিকায় প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তা হলে পরীক্ষা-ব্যবস্থার কি হবে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন :

৩। Rusx লিখিত 'The Philosophical Basses of Education' গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

৪। Dewy লিখিত 'Democracy and Education' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৫। তাঁর Ends and Means গ্রন্থের ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬। Modern Education : its Aims and Methods, পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য।

"If the present examination system is to be regarded as irrevocably fixed, we may as well cease to think about education at all."

অর্থাৎ এঁরা প্রয়োজনবাদের মূলনীতিগুলির আলোয় পরীক্ষণ-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন চান। বিশেষজ্ঞের দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের পরিপন্থী বলে প্রয়োজনবাদীরা বিশেষজ্ঞের দ্বারা শিশুদের শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার্থীর জীবনের সমস্যার সমাধানের জন্য এঁরা বিশেষজ্ঞের দেওয়া শিক্ষা অনুমোদন করেন।

প্রয়োজনবাদ নৈতিক শিক্ষাকে একেবারে প্রকৃতিবাদের মত উপেক্ষা করে না। এঁরা বলেন যে, সুপরিকল্পিত বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পেলে তাদের মধ্যে Self-discipline বা নিয়মানুবর্তিতা দেখা দেবে। তবে পূর্ববর্তী যুগের মানুষেরা তাদের নৈতিক আদর্শ, তার পরবর্তী যুগের মানুষদের হাতে তুলে দেবে, আর তারা সেটাকে আদর্শ বলে মেনে নিয়ে কাজ করে যাবে অন্ধ ভাবে, একথা প্রয়োজনবাদ স্বীকার করে না। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা প্রয়োজনমত নৈতিক আদর্শ সৃষ্টি করবে। তারা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নীতি, আদর্শ প্রভৃতির উদ্ভাবন করবে। একে এঁরা Project Method নাম দিয়েছেন। এঁরা বলছেন যে, এই শিক্ষাদান পদ্ধতি বাইরের ব্যবহারিক জীবনের মতই বাস্তব এবং উদ্দেশ্যমূলক হবে। তাই এঁরা এঁদের Project Methodএর মাধ্যমে বাইরের জীবনের নানা বিষয়ের (ডাকঘর, দোকানপাট প্রভৃতি) সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েরা এই সব কাল্পনিক বাস্তব জগৎ নিয়েই খেলা করে। এই খেলার মাধ্যমে তারা পড়তে, লিখতে এবং অঙ্ক কষতে শেখে। কেননা এইগুলো না শিখলে তাদের খেলা ভালভাবে জমে না। তবে এই Project Method-এর আত্যন্তিক দুর্বলতা হ'ল যে, শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা কমে যায়। কেননা তখন কিভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে তা পূর্বে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। এই ভাবে শিক্ষাপদ্ধতিটা পূর্ব-নির্দিষ্ট হলে শিক্ষাপদ্ধতি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল, এই কথা বলা হবে। সেটা প্রয়োজনবাদের নীতিবিরুদ্ধ। তবে Project Method কাজের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা দেয় তার মধ্যে বহু ফাঁক থেকে যায়। এই ফাঁকগুলি পূর্ণ করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হওয়া দরকার। তাই অধ্যাপক গডফ্রে টমসন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলছেন যে, এই Project Methodকে পূর্ণতাদান করতে হলে শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে অপরিকল্পিত রাখলে চলবে না। তা ছাড়া শিশুকে যদি কোন একটা সমস্যার সম্মুখীন করে তার সমাধান চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাকে শিক্ষিত করে তুলতেই হয়, তবে সব সময়ে যে বাস্তব সমস্যার দরকার হবে এমন নয়। বুদ্ধিগত কোন সমস্যাও (যেমন, জ্যামিতি বা গণিতের কোন সমস্যা) শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা যায়। আবার যদি শিক্ষার্থীর এই সব বুদ্ধিগত সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহ থাকে তবে এই ধরনের সমস্যা উপস্থাপন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। Project Method-এর দোষগুলি আলোচনা করে রেমণ্ড বলছেন যে, শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে Project Method'ও অন্যান্য পদ্ধতির মতই অসম্পূর্ণ।[৭]

সবশেষে বাস্তববাদের (Realism) আলোচনার সূত্রপাত করা যাক। শিক্ষায় বাস্তববাদ (Realism in Education) এল পুঁথিগত পণ্ডিতীর প্রতিবাদ হিসাবে। শিক্ষা যখন ইংলণ্ডে রেনেসাঁ-উত্তর যুগে কেবল শুষ্ক পণ্ডিতী আর ব্যাকরণের কচকচিতে এসে ঠেকল তখন বাস্তববাদের অভ্যুদয় ঘটল। বাস্তববাদীরা বললেন যে, মানুষ এবং তার পরিবেশ হবে আমাদের অধ্যয়নের বিষয়বস্তু। শিক্ষার্থীকে দেশবিদেশে ভ্রমণ করতে বলা হ'ল। মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ঘটাতে চাইলেন এই বাস্তববাদীরা। এঁদের মতে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে জ্ঞানার্থীর সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সার্বভৌমত্বার কথা প্রচার করলেন এই বাস্তববাদীরা। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সার্বভৌমতা-তত্ত্ব পুনঃপ্রচার করলেন এঁরা। বিজ্ঞানের জ্ঞানে এঁরা আস্থাবান। সাহিত্য এবং ভাষাগত জ্ঞানে এঁদের আস্থা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বাস্তববাদ সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নিল। বিজ্ঞানের অভাবিত প্রচার এবং অকল্পনীয় অগ্রগতি শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দাবিকে অগ্রগণ্য করে তুলল। হার্বার্ট স্পেনসার এবং টমাস হেনরী হাক্সলে প্রমুখ মনীষীরা বিজ্ঞানের এই অগ্রগমনের পটভূমিকায় শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব-বাদের প্রতিষ্ঠা ঘটাবার জন্য প্রয়াসী হলেন। এঁরা বললেন যে, সাহিত্য এবং ভাষা না পড়ে আমাদের মনোনিবেশ করা দরকার আমাদের পরিবেশে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পরিবেশের বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। তবেই শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

এই বাস্তববাদের প্রান্তিক মতানুসারীরা বললেন যে,

৭। তাঁর The Philosophical bases of Education গ্রন্থের পৃঃ ৮৪ দ্রষ্টব্য।

পুস্তক পড়ার দরকার নেই। জ্ঞান হবে বস্তু থেকে উপজাত এবং বস্তু-অভিমুখী। এঁরা ভাষা, কথা, ধ্বনি,৮ এদের নির্বাসিত করতে চাইলেন শিক্ষার জগত থেকে। এঁদের মতে কেবল বস্তু এবং বস্তুজ্ঞান থাকলেই চলবে। অর্থাৎ আরাম-কেদারায় শুয়ে কেবল পণ্ডিতী করলেই চলবে না। বাস্তবতাবিবর্জিত যে জ্ঞান শুধুমাত্র ভাষা আশ্রয় করে থাকতে চায় তা বাস্তববাদীদের কাছে অগ্রাহ্য। 'পাত্রাধার কি তৈল কিংবা তৈলাধার কি পাত্র' এই নিয়ে নৈয়ায়িক তর্কযুদ্ধে মেতে উঠলেও বাস্তববাদীদের কাছে এই সূক্ষ্ম তর্কের কোন মূল্যই নেই ; কেননা এই বিশ্লেষণ শুধুমাত্র ভাষাগত, এই বিশ্লেষণ বা এই আলোচনা জীবনকে কোথাও স্পর্শ করে না। তাই বিভিন্ন দেশে এই বাস্তবতাবিবর্জিত শিক্ষাদর্শনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উগ্র হয়ে উঠেছে। স্পেন্স রিপোর্টে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে বলা হয়েছে যে, সেখানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের বাস্তবজীবনের কোন যোগ নেই। এই সত্যটুকু উপলব্ধি করতে ইংলণ্ডে কমিশন বসাবার প্রয়োজন থাকলেও এদেশে সে প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যহীন শিক্ষালাভ, তাদের শিক্ষা উত্তরজীবনের ব্যর্থতা এবং হতাশা এই সত্যটুকুকে আমাদের সকলের কাছে অবশ্যস্বীকার্য করেছে। শিক্ষা কেবলমাত্র কৃষ্টিমূলক হবে, এমন কথা আমরা আর এদেশে কেউ বলব না। জীবনের যুদ্ধে যোগ্য সৈনিক হবার যোগ্যতা মানুষকে দিতে পারে এমন শিক্ষার দরকার। যে শিক্ষা একদিকে জীবিকার্জনের জন্ম আমাদের ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা দেবে এবং অন্যদিকে তাদের সংস্কৃতিকে দৃঢ় বনিয়াদে পত্তন করবে তেমন শিক্ষার দরকার। শিক্ষা যদি একমুখী হয় তবে তা নিরর্থক হবে। শিক্ষা শুধুমাত্র আমাদের কর্মজীবনেরই ধারক এবং বাহক হবে এমন কথা ভাবলেও আবার ভুল ভাবা হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন কাজ আছে তেমনই কর্মবিরতির অবকাশও ত আছে। শুধু কাজের ঠাসবুনানি যদি হয় জীবনটা তা হলে মানুষ হাঁফিয়ে উঠবে। যেখানে শুধু কাজ আর কাজ, অবকাশের আকাশ যেখানে কাজের চাপে সঙ্কুচিত সেখানে জীবন ফুলেফলেপল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, আকাশের ফাঁক না থাকলে বাঁশি বাজে না। যেখানে কাজের ফাঁক নেই, সেখানে জীবনেরও কোন মাধুর্য নেই। কাজ সেখানে শুধুমাত্র বোঝা। তাই কর্মীর জীবনে অবকাশকে একান্ত দরকার। যে শিক্ষাদর্শন শুধুমাত্র কাজকে স্বীকার করে অবকাশকে স্বীকার করে না সে দর্শন একদেশদর্শী। তার দ্বারা মানুষের বহুমুখী জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবতাবাদ আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পারে না। শুধু জীবিকার্জনের পথনির্দেশ সুষ্ঠুরূপে করলেই শিক্ষাদর্শনের কাজ শেষ হ'ল না। কাজের পরে আমরা জীবনের অবকাশটুকুকে যাতে মাধুর্যে পূর্ণ করতে পারি, সে-ধন্য করতে পারি আমার কর্মবিরতির অবসরটুকুকে, তেমন শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এ যুগের শিক্ষাদর্শনে কাজের সঙ্গে অবকাশকে যুক্ত করে ব্যক্তিমানুষের এই অখণ্ড জীবন-প্রবাহকে সামগ্রিক ভাবে দেখে তার জন্ম এক সমন্বয়ী শিক্ষা-পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এই অনুভূতিটুকু আধুনিক মানসিকতার লক্ষণ। কোন দেশে এর প্রকাশ দেখেছি কয়েক বছর আগে, আবার কোন এক দেশে বা একে প্রত্যক্ষ করছি চলতি কালের পটভূমিতে। এই প্রয়োজনটুকু জন্ম নিয়েছে নতুন যুগের নব্য শিক্ষাদর্শনে। এই শিক্ষাদর্শন ট্রাডিশনাল শিক্ষাদর্শনগুলি থেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদেরই সমন্বয়ভূমিতে এই নব্য শিক্ষাদর্শন জন্ম নিয়েছে। এই নবজাতক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করলে দেশে দেশে শিক্ষাসমস্যাগুলি সহজ হয়ে উঠবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৮। T. H. Hunley লিখিত 'Collected Essays Vol. iii পৃঃ ১০০ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী

শ্রীআভালতা কুণ্ডু

রক্তকরবীর ঘটনা-প্রবাহ

রক্তকরবী একাঙ্ক নাট্য—এর ঘটনাস্রোতকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্ক কিংবা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত না করে একাঙ্ক নাট্যের একটানা খাতে প্রবাহিত করেছেন, অবশ্য শুধু রক্তকরবীতে নয়—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রূপক নাট্যগুলিতেই নাটক রচনার এই নূতন টেক্‌নিক্‌টি ব্যবহৃত হয়েছে। রক্তকরবীর ঘটনাকাল একটিমাত্র দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যক্ষপুরে যেদিন বিপ্লবের বন্যাস্রোত বয়ে গেল—সমস্ত বাধাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, মাত্র সেই দিনটিকেই কেন্দ্র করে আছে রক্তকরবীর ঘটনা। এদিক থেকে দেখলে নাটকের অন্যতম প্রধান আঙ্গিক "কালগত ঐক্য" রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি ভাবেই বজায় রেখেছেন, নাটকের মধ্যে ঘটনার স্থান পরিবর্তন ঘটে নি একবারও। যক্ষপুরীর রাজা যে প্রাসাদে বাস করেন সে প্রাসাদ অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে আবৃত, সেই জালের আবরণই এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য, সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাটকের অপর আঙ্গিক স্থানগত ঐক্যও রক্তকরবীতে অক্ষুণ্ণ আছে।

নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন দৃশ্য বিভাগ না করলেও কয়েকটি দৃশ্য পরিবর্তন স্বভাবত আমাদের চোখে পড়ে, এ পরিবর্তন অবশ্য স্থানগত নয়, পাত্রগত, নাটকের এই পাত্র পরিবর্তনের উপরে নির্ভর করে আমরা রক্তকরবীকে মূলত সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত করতে পারি, এই সাতটি দৃশ্য অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি দৃশ্যের পর আর একটি দৃশ্য ধীরে ধীরে ঘটনাস্রোতকে নাটকের অনিবার্য পরিণামের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়।

প্রথম দৃশ্যে নন্দিনীর আগমনে যক্ষপুরে যে আলোড়ন জেগেছে তারই আভাস পাই নন্দিনীর সঙ্গে কিশোর অধ্যাপক, গোকুল এবং রাজার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক কিশোর 'নন্দিনী' 'নন্দিনী' 'নন্দিনী' বলে ডাক দেয়। নন্দিনীকে বার বার নাম ধরে ডাকতে ওর ভাল লাগে। কাজ কামাই করে ও ফুল তুলে এনেছে নন্দিনীর জন্য—জানতে পারলে যক্ষপুরীর সর্দারদের কাছে ওর লাঞ্ছনার বাকী থাকবে না তাও সে জানে। তবু সে ভয় পায় না, সে শাস্তিকে সাবধানে গোপন করতেও চায় না—সে নন্দিনীর প্রতি তার অসীম আকর্ষণের কথা। তার প্রতি অনুরক্তির জন্য কিশোরকে শাস্তি ভোগ করতে হয়—একথা ভেবে নন্দিনীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়, কিন্তু বালক কিশোরের অন্তরে জ্বলেছে উঠেছে নব যুগের নতুন আলোকবর্তিকা—নন্দিনীর জন্য শাস্তি ভোগ করাকে সে গৌরব অনুভব করে। "না, না, না, আমি সামলে চলব না, ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই তোমাকে ফুল এনে দেব"—এই কথা বলতে বলতে কিশোর প্রস্থান করে।

কিশোরের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে অধ্যাপক—অধ্যাপক জড়বিজ্ঞানের উপাসক—গবেষণাগারে বস্তুর স্বরূপ বিচার নিয়ে কাটে তার দিন। নন্দিনীর প্রতি তার করুণ আবেদন—"নন্দিনী ? যেও না, ফিরে চাও।" নন্দিনী বুঝতে পারে না তাকে নিয়ে অধ্যাপকের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। তাই সে জিজ্ঞাসা করে "আমাকে তোমার কিসের দরকার ?" অধ্যাপকের মনে নন্দিনী জাগিয়েছে বিস্ময়মিশ্রিত অনুরাগ। উত্তর সে জানায়,—"নন্দিনী, তুমি যে সকল প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে," "কিন্তু নন্দিনী তুমি যে সোনা সে ত শুধু ধূলোর নয়, সে যে আলোর, দরকারের বাঁধনে কে তাকে বাঁধবে ?" নন্দিনী যে সকল প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে তাই নয়—যক্ষপুরে তার আবির্ভাব পরম বিস্ময়ের বস্তু। যক্ষপুরের মানুষের স্বর্ণতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি ঘটে না কোন মতে। নিরবকাশ নিরানন্দ তাদের জীবন, এর মধ্যে নন্দিনীর আবির্ভাব সম্ভব হ'ল কেমন করে ? এ প্রশ্ন অধ্যাপকের মনকে দোলা দেয়। নন্দিনীকে তাই অধ্যাপক বলে, "সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা, যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।" অধ্যাপকের বড় সাধ নন্দিনীকে নিয়ে একটু সময় সে নিভৃত আলাপ করে। কিন্তু নন্দিনী বলে তার এখন সময় হবে না, সে এসেছে রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখবে বলে। অধ্যাপক বলে তা সম্ভব নয়—রাজা তার জালের আবরণের মধ্যে কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। কিন্তু নন্দিনী দমবার পাত্রী নয়—সে বলে "আমি জালের বাধা মানি না—আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে", তার পর নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে এখানকার রাজা "আমাকে নিয়ে এল—রঞ্জনকে আনল না কেন ?" অধ্যাপক বলে—একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দারেরা হতবুদ্ধি হয়ে আছে—রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কি ?" তখন নন্দিনী অধ্যাপককে বলে—"যক্ষপুরীর সর্দারেরা জানে না যে তারা কি অদ্ভুত—তাদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন—তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে—রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।" অধ্যাপক বলেন যক্ষপুরীর সর্দারদের টলাতে হলে শুধু চাই গায়ের জোর। নন্দিনী উত্তরে বলে, "রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মত। নদীর মতই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। তার আগমনের সংবাদ আজ

পৌঁছেছে আমার কাছে। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।" অধ্যাপক এবার নিজ গৃহের পথে পা বাড়ায়। একটু গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে, "নন্দিনী, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না?" নন্দিনী ভেবে পায় না ভয়ের কি আছে। অধ্যাপক তখন বলে— "যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা পুরী—ও নিজে আস্ত নয়—কাউকে আস্ত রাখতে চায় না—যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি করে—মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেড়ে না সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাক গে।" তার পর অধ্যাপক বলে, "নন্দিনী, তোমার ডান হাতে যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল আমাকে দেবে?" কেন, কি করবে তুমি? নন্দিনী জিজ্ঞাসা করে, অধ্যাপক বলে, "কতবার ভেবেছি তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর তার একটা কিছু মানে আছে, ঐ রক্ত আভায় কি যেন একটা ভয়-লাগান রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য্য নয়।" নন্দিনী বিস্মিত হয়ে বলে—"আমার মধ্যে ভয়?" অধ্যাপক বলে সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা।···সব ফুল বাদ দিয়ে এ ফুল কেন বেছে নিলে?" নন্দিনী বলে, "রঞ্জন আদর করে কখনও কখনও আমাকে রক্তকরবী বলে ডাকে।···আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালবাসার রক্ত-রাঙা সেই রঙ গলায় পরেছি—বুকে পরেছি—হাতে পরেছি।" অধ্যাপক বলে, "তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, ক্ষণকালের দান হিসাবে—ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করব।" নন্দিনী একটি ফুল দিয়ে বলে, "এই নাও, আজ রঞ্জন আসবে—সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম।"

ফুল নিয়ে অধ্যাপক প্রস্থান করে। তখন প্রবেশ করে সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুল, সে সাধারণ খোদাইকর নন্দিনীকে সে বুঝতে পারে না, তার মনে কেমন একটা বিপদের আশঙ্কা জাগে নন্দিনীকে দেখে। তার ব্যবহারে নন্দিনীকে অকারণ অপমান করার প্রচেষ্টা—"সর্ব্বনাশী তুমি! তোমার ঐ সুন্দরপানা মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে।" হঠাৎ গোকুলের দৃষ্টি পড়ে নন্দিনীর সিঁথির রক্তকরবীর মঞ্জরীর উপর। চকিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে দেখি দেখি সিঁথিতে তোমার ঐ কি ঝুলছে?" "রক্তকরবীর মঞ্জরী"—নন্দিনী উত্তর দেয়। ওর মানে কি? প্রশ্ন করে গোকুল। "ওর কোন মানেই নেই, নন্দিনী বলে। গোকুলের মন এ কথা মানতে চায় না, নন্দিনীকে দেখে তার মনে হয় ভয়ঙ্করী, "দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাঙা আলোর মশাল", যাই নির্ব্বোধদের বুঝিয়ে বলি গে "সাবধান, সাবধান, সাবধান," এই কথা বলতে বলতে সে প্রস্থান করে।

নন্দিনী তখন এগিয়ে যায় জালের দরজার দিকে, ডাক দেয় জালের আবরণে ঢাকা যক্ষপুরীর রাজাকে, শুনতে পাচ্ছ? নেপথ্য হতে উত্তর আসে, "নন্দ', শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বারে বারে ডেক না, আমার সময় নেই—একটুও না।" নন্দিনী আবেদন জানায়, "আজ আমার রঞ্জন আসবে সেই আনন্দে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই, রাজা অনুমতি দেন না—যা বলতে হয় বাইরে থেকে বল।" নন্দিনী তখন বলে দূরের থেকে পৌষের ফসল কাটার গান ঐ শোনা যাচ্ছে, তুমিও বেরিয়ে এস রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই। রাজা বলেন, মাঠে গিয়ে কোন্ কাজে লাগব আমি? নন্দিনী বলে, মাঠের কাজ যক্ষপুরীর কাজের থেকে অনেক সহজ, অনেক সুন্দর, তোমার বিপুল শক্তি নিয়ে তুমি বেরিয়ে এস রাজা, পৃথিবী খুশী হয়ে উঠুক তোমার শক্তিতে। রাজার মনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে মোহ, নন্দিনীকে তাঁর মনে হয় অপরূপ, মনে হয় এতদিন যে যন্ত্রবাদের সাধনা তিনি করেছেন সে বুঝি মিথ্যা, সে বুঝি ব্যর্থ। নন্দিনীর মধ্যে তিনি দেখেন নবযুগের আভাস—নবতর সত্যের ইঙ্গিত। সম্পূর্ণ তাকে বুঝতে পারেন না। তাঁর মনে হয় এতদিন যার সাধনা করেছেন তার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে নন্দিনীকে যদি পাওয়া যায় সে হবে চরম পাওনা। রাজা জানেন রঞ্জন পেয়েছে নন্দিনীর হৃদয়, তার প্রতি কেমন একটা ঈর্ষার ভাব জাগে তাঁর মনে। তাঁর কথার মধ্যে প্রকাশ পায় তাঁর অন্তরের গভীর ব্যথা, গভীর ক্লান্তি। তাঁর দিন যে শেষ হয়ে আসছে তা যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পান তবুও নন্দিনীকে তখনই আহ্বান করেন না ঘরের মধ্যে—তাকে ফিরিয়ে দেন—বলেন, তোমার আগমনের লগ্ন একদিন আসবে, কিন্তু আজ নয়—এখনও সময় হয় নি। নন্দিনী প্রস্থান করে, যাবার সময় বলে যায়— "আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে—কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারে না।"

এবার ঘটে দৃশ্য পরিবর্ত্তন—ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রা প্রবেশ করে। এ দৃশ্যে প্রকাশিত হয়েছে যন্ত্র-সভ্যতার স্বরূপ। যক্ষপুরে সেদিন ছুটির দিন—ফাগুলালের ছুটি কাটাবার জন্য চাই মদ, চন্দ্রা মদ লুকিয়েছে—ছুটি পেয়েছে বলেই মদ খেতে হবে, এর কোন অর্থ সে দেখতে পায় না। দেশে থাকতে পার্ব্বণের ছুটিতে ত ফাগুলালের কিন্তু মদ চাই-ই, যক্ষপুরে কাজ যত বড় বোঝা হউক ছুটি তার চেয়ে বিষম বালাই। চন্দ্রা বলে তবে এমন কাজে দরকার কি? কাজ ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে চল, ফাগুলাল বুঝিয়ে দেয়—যক্ষপুরে যে একবার এসেছে তার ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়েছে চিরতরে, এমন সময় দেখা যায় বিশুপাগলকে, গান গাইতে গাইতে সে আসছে। চন্দ্রা বলে, কিছুদিন থেকে ওর গান খুলে গেছে। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে—সে ওর প্রাণও টেনেছে, গানও টেনেছে, "মোর স্বপন তরীর কে তুই নেয়ে" এই গানটি গাইতে গাইতে বিশু প্রবেশ করে। ওর সঙ্গে চন্দ্রা, ফাগুলাল আর গোকুলের কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পায় নন্দিনীর অপরূপ আকর্ষণ আর অসামান্য প্রভাব। বিরাট একটা বিপ্লব যে ঘনিয়ে আসছে তারও আভাস মেলে। যক্ষপুরীর প্রচলিত বিধিনিষেধ আর স্বর্ণতৃষ্ণার কথাও বাদ যায় না। এদের কথাবার্ত্তার মধ্যে এসে প্রবেশ করে সর্দ্দার, সঙ্গে তার কেনারাম গোঁসাই। খোদাইকরের দলকে বশে রাখবার এ একটা নূতন ফন্দি। কেনারাম গোঁসাই সত্যকার ভক্ত নয়—সেও যক্ষরাজেরই চেলা—তার একদিকে সর্দ্দার আর একদিকে গোঁসাই।

খোদাইকরের দলকে সে ভগবানের নাম শুনিয়ে ভোলাতে চায়, তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে, যক্ষপুরে যে রীতি প্রচলিত সেই ভাল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। খোদাইকরদের কাছ হতেই এর প্রণামীটা আদায় হয়ে যাবে এই ছিল সর্দারের মতলব। কিন্তু সর্দারের উদ্দেশ্য বুঝতে দেরী হয় না এদের। ফাগুলাল বলে—"সর্দার এত বড় অপব্যয় কিসের জন্য? প্রণামী আদায় করতে চাও রাজি আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।" সর্দার দেখে এখানকার আবহাওয়া নাম শোনাবার অনুকূল নয়, তাই গোঁসাইকে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করে।

চন্দ্রা—বিশু আর ফাগুলালের আলাপ আরও কিছুক্ষণ চলে, এমন সময় নেপথ্য হতে আহ্বান আসে—'পাগল ভাই' সে আহ্বান নন্দিনীর কণ্ঠের, চন্দ্রা আর ফাগুলাল বোঝে বিশুকে আর তাদের মধ্যে ধরে রাখা যাবে না। তাই তারা প্রস্থানের উদ্যোগ করে, চন্দ্রা বলে, "কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বল দেখি?" বিশু উত্তর দেয় "ভুলিয়েছে দুঃখে", চন্দ্রা সাধারণ মেয়ে, এ উত্তরের কোন অর্থ বুঝতে পারে না। ফাগুলালও বোঝে না কিছু, বলে, "বিশুদাদা স্পষ্ট কথা বল, নইলে রাগ ধরে।" বিশু তখন বলে বলছি শোন—"কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের, আমার সেই চির দুঃখের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।" চন্দ্রা একথারও কোন অর্থ বুঝতে পারে না, চন্দ্রা ও ফাগুলাল প্রস্থান করে, চলে যাবার সময় বলে, এ সব কথা বুঝিনে বেয়াই··· কিন্তু আজ বলে রাখলাম ঐ মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

নন্দিনীর প্রবেশের পর তৃতীয় দৃশ্যের আরম্ভ ধরা যেতে পারে, এ দৃশ্যের মধ্যে নন্দিনীর আর বিশুপাগলের কথার মধ্য দিয়ে রঞ্জনের আসন্ন আগমনের পূর্ব্বাভাস সূচিত হয়েছে। নন্দিনীর বুকের মধ্যে পৌঁচেছে রঞ্জনের আগমনের সংবাদ তাই কপালে তার কুঙ্কুমের টিপ, আঁচলে নীলকণ্ঠের পালখ, মুখে অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি, যক্ষপুরীর বদ্ধ গড়ের মধ্যে দূরের থেকে পৌষের ফসল-কাটার গান শোনা যায়। নন্দিনী জানে ঐ গানেরই সুরে যক্ষপুরীর শ্রমিকের দল উঠবে পাগল হয়ে, ভেঙ্গে ফেলবে যক্ষপুরীর অভ্রভেদী সোনার চূড়া। নন্দিনী জালের আড়াল মানে নি জালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে দেখেছে যক্ষরাজকে। সে বিরাট শক্তির চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছে নন্দিনীর মন, তার স্বরূপকে বুঝতে ওর বিলম্ব হয় নি। বাহিরে রাজার বিপুল শক্তি, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি কি রকম একা আর কত ক্লান্ত তাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি, নন্দিনী জানে শেষ হয়ে এসেছে তাঁর দিন—তবু অপূর্ব্ব মমতা আর করুণায় ভরে ওঠে তার মন—রাজাকে সে ভাল না বেসে পারে নি। এই সব কথাই সে বলছিল বিশুকে; ইতিমধ্যে সর্দারের আবির্ভাব ঘটে অকস্মাৎ। সে জিজ্ঞাসা করে, "কি নিয়ে আলাপ চলছে?" বিশু বলে, "কি করে তোমাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।" "সর্দার অবাক হয়ে যায় বিশুর দুঃসাহস দেখে। বলে, "বল কি, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই।" বিপ্লব যে আসন্ন সে কথা সর্দারের আর বুঝতে বাকি থাকে না। এর পর তাই সর্দারের তরফ থেকে চেষ্টা সুরু হয় বিপ্লবের প্রতিরোধ করবার, সে প্রস্থান করতে উদ্যত হলে নন্দিনী তাকে বলে,"সর্দারজী, তুমি যে বলছিলে রঞ্জনকে আজ এনে দেবে?" সর্দার বলে, "আজ তাকে দেখতে পাবে।" মনের খুশীতে নন্দিনী তার হাতের কুন্দফুলের মালাগাছটি সর্দারকে উপহার দেয়—সর্দার মনে মনে ক্রুর হাসি হেসে প্রস্থান করে।

নন্দিনী আর বিশু জালের জানলার কাছে এগিয়ে যায়। নন্দিনী রাজাকে ডাক দেয়, "শুনতে পাচ্ছ?" নেপথ্য সাড়া আসে, "কি বলতে চাও বল।" নন্দিনী ঘরের ভিতরে যাবার অনুরোধ জানায়, সে অনুরোধ রক্ষা করেন না রাজা, জানালার কাছে এসে দাঁড়ান। এবার রাজা ও নন্দিনীর মধ্যে যে কথোপকথন সুরু হয় তার মধ্যে স্পষ্ট ভাবে রূপ নেয় রাজার সংশয়দোলায় দোলায়িত দ্বিধাগ্রস্ত চিত্রটির স্বরূপ। নন্দিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় একবার তিনি হয়ে ওঠেন ভয়ঙ্কর, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাঁর কণ্ঠে বাজে মিনতির সুর। নবীনের আহ্বানে রাজার অন্তরে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী যেমন করুণ তেমনই মধুর। প্রথম দৃশ্যে যেখানে রাজার সঙ্গে নন্দিনীর সাক্ষাৎ বর্ণিত হয়েছে সেখানে দেখি নন্দিনী রাজাকে ডাক দিয়েছে জালের অন্তরাল ছেড়ে পৃথিবীর মাটিতে পা দেবার জন্য—পৌষের ফসল-কাটার কাজে যোগ দেবার জন্য। রাজা তখন সম্মত হন নি, কিন্তু নন্দিনীর সে আহ্বান তিনি ভুলতে পারেন নাই; তাঁর অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে জমে উঠেছে বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ আর নবীনের প্রতি আকর্ষণ। এ দৃশ্যের মধ্যে তাই দেখি। বিশুকে দেখিয়ে রাজা বলেন, "নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে?" নন্দিনী বলে, "ও আমার সাথী, আমাকে গান শোনায়।" রাজার গলার সুর অকস্মাৎ হয়ে উঠে গম্ভীর—বলেন, "ওকে যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হলে কি হয়?" নন্দিনী চমকে ওঠে সে সুর শুনে! বলে, "থাম তুমি, তোমার কেউ সঙ্গী নাই নাকি?" "মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কেউ সঙ্গী আছে?" এই হ'ল রাজার উত্তর। আপন বিরাট শক্তির ভারে রাজা হয়ে উঠেছেন শ্রান্ত, তাঁর চিত্ত খোঁজে বিশ্রাম। নন্দিনীর মধ্যে যে অপরূপ মায়া মূর্ত্তি নিয়েছে তার প্রেমাস্পদের আগমনবার্ত্তার মধ্যে যে মাধুর্য্য, তার রক্তকরবীর আভরণের মধ্যে যে রহস্য—তা যেন রাজাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। একবার ভাবেন নন্দিনীরঞ্জনের মিলনের মধ্যে যে মাধুর্য্য তাকে সম্পূর্ণ করে জানার গণ্ডীর মধ্যে না আনা পর্য্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। কখনও ভাবেন নন্দিনী যদি তার রক্তকরবীর মালা পরিয়ে দেয় তা হলে বুঝি মৃত্যুও হবে তাঁর পরম রমণীয়। পর মুহূর্ত্তেই নন্দিনীকে ভয় দেখিয়ে বলেন, "রঞ্জনকে যদি ধূলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই—আর তাকে একটুও চেনা না যায়?" নন্দিনী বিশ্বাস করতে পারে না যে, রাজা এত নিষ্ঠুর হতে পারেন। বলে, "আজ তোমার কি হয়েছে? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন?" নন্দিনী

জানত না রাজা কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর হতে পারেন, সে জানত না রঞ্জনের সঙ্গে তার মিলন ঘটবে না জীবনে। রাজা তাকে সত্যই দেবেন ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে। রাজার কথার মধ্যে যে তার অজ্ঞাত ভবিতব্য সূচিত হচ্ছে তা কেবল ভাগ্য-পুরুষই জানতেন, তবু রাজা যে ভয়ঙ্কর, তার তৃষ্ণা যে দুর্নিবার এই ত রাজার শেষ পরিচয় নয়, তার চেয়েও বড় সত্য এই যে, রাজার চিত্ত নন্দিনীর মধ্যে খোঁজে বিশ্রাম—খোঁজে চিরশান্তির বাণী। প্রস্থানোন্মুখ নন্দিনীকে ফিরে ডেকে তাই তিনি বলেন, "নন্দিনী, তুমি জান না আমি কত শ্রান্ত।" রাজার এই করুণ স্বীকৃতির মধ্যে পাই নন্দিনীর কাছে তাঁর আত্ম-সমর্পণের পূর্ব্বাভাস, রাজার কথা শুনে নন্দিনী আরম্ভ করে গান—সেই ভালবাসার গান—যে ভালবাসায় আকাশ-বাতাস হয়েছে পরিব্যাপ্ত। দিগদিগন্ত হয়ে উঠেছে ব্যথিত। এই গান শুনতে শুনতে রাজার অন্তরে কেমন এক অসহ্য অনুভূতি জাগে, তিনি সেখান হতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করেন।

রাজার প্রস্থানের পরে বিশু ও নন্দিনী প্রস্থান করে সেই পথের দিকে—যে পথ দিয়ে রঞ্জনের আসবার কথা।

এবার আরম্ভ হয় ৪র্থ দৃশ্য—সর্দ্দার আর মোড়ল প্রবেশ করে। এ দৃশ্যে সমস্যা হয়েছে জটিলতর। রঞ্জন যে আসবে সে সংবাদ এসেছে যক্ষপুরের সর্দ্দারের কাছে, সে যাতে নন্দিনীর সঙ্গে কিছুতেই না মিলতে পারে এ দৃশ্যে সর্দ্দার আর মোড়লের মধ্যে তারই ষড়যন্ত্র। একা নন্দিনীর আগমনেই যক্ষপুরের নিয়মতন্ত্রের ভিত্তিতে লেগেছে রূঢ় আঘাত—রঞ্জন এলে তার অস্তিত্বমাত্রও থাকবে না, সর্দ্দার সেকথা ভাল করেই জানে। নন্দিনীর সঙ্গে রঞ্জন যাতে মিলতে না পারে সর্দ্দারের সেই একমাত্র লক্ষ্য। অথচ রঞ্জনের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে, তাকে বাঁধা যায় না—তাকে নিয়ম মানিয়ে কাজ করা যায় না। তাকে বাঁধতে গেলে বাঁধন খুলে কখন বেরিয়ে আসে, খোদাইকরদের দলে ভিড়িয়ে দিলে তাদের উপর থেকেও চাপ নেমে যায়। সর্দ্দার আর ছোট সর্দ্দার মিলে তাই পরামর্শ করে—রঞ্জন আর রাজার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবার। সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে রঞ্জন যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা হলেই যক্ষপুরীর বিপদের আর কোন আশঙ্কা থাকবে না, এই হ'ল সর্দ্দারের বিশ্বাস। এই পরামর্শকে কাজে পরিণত করবার জন্য তারা প্রস্থান করে।

এর পরে পঞ্চম দৃশ্যের অবতারণা, এ দৃশ্যে দেখতে পাই। রাজার ঘরের মধ্য হতে আসে ভয়ঙ্কর শব্দ। তাই শুনে অধ্যাপক আর পুরানবাগীশ ভয় পায়; বুঝতে পারে রাজা নিজের উপর নিজে রেগেছেন, নিজেরই তৈরী কি একটা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন, যক্ষপুরে সুরু হয়ে গেছে ভাঙনের পালা—যক্ষপুরীর শেষ-দিন এল ঘনিয়ে। পঞ্চম দৃশ্যে বিভিন্ন খণ্ডদৃশ্যের মারফতে এই আসন্ন বিপ্লবেরই সূচনা মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠেছে।

রাজা নিজেরই উপর নিজে বিরক্ত হয়েছেন—বিরক্ত হয়েছেন অধ্যাপকের বস্তুতত্ত্বের উপর। তিনি বলেন, "অধ্যাপক তুমি করেছ কি? কোন বস্তুর শেষ রহস্যের উদ্ঘাটন ত তুমি করতে পার নি। তোমার বিদ্যে ত সিধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আর একটা দেওয়াল বার করেছে। কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দরমহল কোথায়?" আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টির কোন শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। কিন্তু রাজা চান চরম ও পরম সত্যের সন্ধান, তাই তাঁর এই অসন্তোষ। তাঁকে কিছুদিন ভুলিয়ে রাখবার জন্য পুরানবাগীশকে আনা হয়েছে, পুরাতত্ত্ব দিয়ে তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য। কিন্তু রাজা পুরানবাগীশের নাম শুনেই চটে যান। তিনি বলেন, পুরান বলেই কোন জিনিসই নাই, মহাকাল চিরদিন ধরে নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছেন। পুরানবাগীশ শুধু সেই কথাটাকে চাপা দিতে চায় মাত্র।

অধ্যাপক ও পুরানবাগীশের কথাবার্ত্তার মাঝে দ্রুত প্রবেশ করে—নন্দিনী, দূরে দেখা যায় রাজার খিড়কী দরজা দিয়ে কারা বেরিয়ে যাচ্ছে ছায়ামূর্ত্তির মত। নন্দিনী তাদের দেখে ভয় পায়, বলে ওঠে "ওকি ওকি" "প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি?" নন্দিনী এতদিন যক্ষপুরে আছে, সে শুধু রাজার বিরাট শক্তিই দেখে এসেছে—দেখেছে আর মুগ্ধ হয়েছে, আজ তার চোখে পড়ল—এই শক্তির উৎস কোথায়, লক্ষ লক্ষ মানুষ "মাংস মজ্জা মনপ্রাণ" সব হারিয়ে ছায়ামূর্ত্তিতে পরিণত হচ্ছে—কত সজীব সবল প্রাণ চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে—আর তবেই না যক্ষপুরীর স্বর্ণচূড়া আকাশে গিয়ে মিশল। নন্দিনীর সামনে আজ যক্ষপুরীর সমস্ত রহস্য মুহূর্ত্তে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তার মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠে তীব্র প্রতিবাদ, "এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়—তাহলে চাই না আমার হওয়া"···তার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ প্রলয় গোধূলির মত দেখায় যেন।

এদিকে বিশুকে পাওয়া যায় না, নন্দিনী তার জন্য চিন্তাতুর হয়ে পড়ে, একটু পরেই যক্ষপুরীর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের আর একটি নিদর্শন নন্দিনীর সামনে উপস্থিত হয়, জগৎবিখ্যাত এক পালোয়ান এসেছিল রাজার সঙ্গে লড়াই করতে। সে যখন বাইরে আসে তখন সে একেবারে নিঃশক্তি হয়ে পড়েছে, উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও নেই, অথচ তাকে আশ্রয় দেওয়া বা সেবা করা যক্ষপুরীর বিধান মতে পাপ। এর কাহিনী শুনে নন্দিনী আবার চমকে উঠে, এমনি করে সমস্ত মানুষের শক্তি শোষণ করেই কি তবে যক্ষপুরীর এই চোখ-ঝলসানো ঐশ্বর্য্য? নন্দিনীর প্রাণের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে,···এর প্রতিকার কোথায়, এর প্রতিকার কোথায়—এই প্রশ্নই করে সে বার বার।

এর পরেই নন্দিনী খবর পায় যে,বিশু বন্দী, তাকে বিচারশালায় ডেকেছে, এই আঘাতই হ'ল চরম, সে বলে ওঠে, এত অত্যাচার কখনই সইবে না, যক্ষপুরীর শেষ দিন এল বলে, সর্দ্দারকে সে বলে, "বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন, আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি—ভাঙবে তোমার সর্দ্দারির সোনার চূড়া।"

নন্দিনী জানে আজ তার রঞ্জন আসবে কিন্তু সর্দ্দারের কাছে

কোন খবর সে পায় না, সর্দ্দারের প্রাণপণ চেষ্টা যেন রঞ্জন নন্দিনীর সঙ্গে মিশতে না পারে, নন্দিনী কিন্তু জানে স্থিরনিশ্চয় যে, রঞ্জনের সঙ্গে আজ তার মিলন হবেই—কেউ আটকাতে পারবে না, বালক কিশোরের সাহায্যে নন্দিনীর সঙ্গে বিশুর সাক্ষাৎ হয়, বিশু তখন বন্দী অবস্থায় বিচারশালায় চলেছে, সে সংবাদ দিয়ে যায় যে, রঞ্জন যক্ষপুরে পৌঁছেছে, কিশোর তাকে খুঁজে বের করবার ভার নেয়, বিশু যাবার আগে বলে যায়, "এবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হউক।"

এর পরে ষষ্ঠ দৃশ্য: যক্ষপুরীর সর্দ্দারেরা জেনেছে—রঞ্জনের সঙ্গে নন্দিনীর মিলন ঘটলে যক্ষপুরীর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য, তাই তারা রঞ্জনকে নন্দিনীর সঙ্গে মিলতে না দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, ষষ্ঠ দৃশ্যে রঞ্জনকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু যক্ষপুরীর বিপদ ত শুধু বাইরে থেকে নয়, তার বিপদ রয়েছে তার অন্তরে, রাজার মনের মধ্যে অসন্তোষ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, যক্ষপুরীর সোনার নেশায় তিনি আর ভুলে থাকতে চাইছেন না—নন্দিনীর কাছে যে নবীন প্রাণ-প্রাচুর্য্যের সন্ধান পেয়েছেন তাতেই তাঁর মন মুগ্ধ হয়েছে, যক্ষপুরীর সর্দ্দারের দল রাজার এই মনোভাবেই ভয় পেয়েছে বেশী, তারা তাই রাজার অনুমতি না নিয়েই রঞ্জনকে ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র করলে—আর সৈন্যদল প্রস্তুত করে রাখলে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য।

এর পর সপ্তম দৃশ্য: যক্ষপুরে বিপ্লবের বন্যা এল বলে, "দেখতে দেখতে সিন্দুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল, ওই কি আমাদের মিলনের রঙ।" এই কথা বলতে বলতে নন্দিনী প্রবেশ করে, সন্ধ্যা হয়ে এল এখনও যে তার রঞ্জন এল না, রাজার রুদ্ধ দরজায় গিয়ে সে আঘাত হানে—ডাকে, "শোন, শোন, দিনরাত এখানে পড়ে থাকব—যতক্ষণ না শোন।" কেনারাম গোঁসাই এসে জিজ্ঞাসা করেন, কাকে সে চায়। সে নন্দিনীকে ভোলাতে চায় শান্তিমন্ত্র দিয়ে, নন্দিনী তাকে ফিরিয়ে দেয় অবজ্ঞাভরে।

এদিকে বিশুর বন্দিত্বের সংবাদে উন্মত্ত কারিগরের দল কারাগার ভেঙে ফেলতে চায়, তাদেরই একদল নন্দিনীকে সামনে পেয়ে তাকেই বিশুর বিপদের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। নন্দিনী ভয় পাবার মেয়ে নয়, কারিগরেরা তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে চলে যায় নিজের কাজে।

নন্দিনী খোঁজ পায় না রঞ্জনের, ধ্বজা পূজার নৈবেদ্য বয়ে যারা চলেছে তাদের একে একে জিজ্ঞাসা করে, "রঞ্জনকে দেখেছ?" "ওগো রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা জান?" কেউ বলে না সে কথা স্পষ্ট করে, শেষে একজন বলে, "রাজাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি জানেন।" নন্দিনী তখন রাজার দরজায় আঘাতের পর আঘাত হানে। রাজা বিরক্ত হন, দ্বার খুলতে চান না—ভয় দেখান তাকে, কিন্তু নন্দিনী কিছুতেই মানে না, আজ তার ভয় নেই—আজ সে রাজার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়, তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় আজ সে নেবেই, রাজা ক্রোধভরে দ্বার খুলে দেন, মুক্ত দ্বারপথে দেখা যায় রঞ্জনের মৃতদেহ, "ওকি, এ কে পড়ে? রঞ্জনের মত দেখছি যেন? রাজা চমকে ওঠেন, সে কি" রঞ্জনকে কে পাঠাল তাঁর কাছে—তাঁর সর্দ্দারেরা আজ তাঁকে ঠকাতে আরম্ভ করেছে, তাঁর যন্ত্র মানে না তাঁর বশ, রাজা স্তম্ভিত হয়ে যান। নন্দিনী কাতর হয়ে বলে, 'রাজা', রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও।" কিন্তু রাজা যে জানেন না জাগরণের মন্ত্র—তিনি শুধু জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই জানেন, নন্দিনী বুঝতে পারে রঞ্জন আর জাগবে না, বুকের থেকে নীলকণ্ঠ পাখীর পালক নিয়ে মৃত রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দেয়। বলে, "বীর আমার নীলকণ্ঠ পাখীর পালক এই পরিয়ে দিলাম তোমার চূড়ায়।' "তোমার জয়যাত্রা আজ থেকে সুরু হয়েছে।" রাজাকে ডেকে নন্দিনী বলে, রাজা এইবার সময় হ'ল।...এইবার আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই। "রাজা বিস্মিত হন, "আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্ত্তেই মেরে ফেলতে পারি। তার পর থেকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমার সেই মড়া তোমাকে মারবে, আমার অস্ত্র নেই—আমার অস্ত্র মৃত্যু।" দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে সংশয়দোলায় দোলায়মান রাজার মন এতক্ষণে যথাকর্ত্তব্য স্থির করে ফেলে,নন্দিনীর হাত তিনি তুলে নেন নিজের হাতে। নিজের হাতে ভেঙে ফেলেন যক্ষপুরের ধ্বজ দেবতার দণ্ড। তাঁর নিজের সৃষ্টিকে আজ তিনি নিজের হাতে ভেঙে ফেলতে চান—কারণ সেই ভেঙে ফেলার মধ্যেই তিনি দেখেছেন তাঁর চরম মুক্তি। "আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি। এখনও অনেক ভাঙা বাকি—তুমি যাবে নন্দিনী প্রলয়পথে, আমার দীপশিখা?" নন্দিনী বলে, "যাব আমি।"

উন্মত্ত কারিগরের দল বিশুর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। রাজার সঙ্গে নন্দিনীকে দেখে ওদের বিস্ময় লাগে, কিছু বুঝতে পারে না। নন্দিনী বলে, "রঞ্জনকে তোমাদের মধ্যে আনতে চেয়েছিলাম—ঐ দেখ সে এসেছে।" ফাগুলাল আর্ত্তনাদ করে ওঠে—"সর্ব্বনাশ ওই কি রঞ্জন নিঃশব্দ পড়ে আছে।" নন্দিনী বলে—"নিঃশব্দ নয়, মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে—ও মরতে পারে না।" আর দুঃখ করে না নন্দিনী—রঞ্জনকে সে যক্ষপুরে আনতে চেয়েছিল। রঞ্জন ত এসেছে, যক্ষপুরীর চারিদিকের লোহার প্রাচীর ত আজ খসে পড়ল, তবে আর দুঃখ কিসের?

দূরে দেখা যায় সর্দ্দারের দল সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে আসছে। সর্দ্দারের বর্শার ডগায় দোলানো নন্দিনীর দেওয়া কুন্দ-ফুলের মালা, "জয় রঞ্জনের জয়" বলে নন্দিনী ছুটে চলে সর্দ্দারের দিকে। ঐ মালাকে তার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিতে, তার পশ্চাতে যান রাজা।

দ্রুত প্রবেশ করে অধ্যাপক, সেও রাজার প্রদর্শিত পথে চলে, তার পিছনে আসে কারিগরের দল, বন্দিশালা ভেঙে ওরা বিশুকে

মুক্ত করে নিয়ে এল। নন্দিনীকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না, ধূলায় লুণ্ঠিত রঞ্জনের দেহ চোখে পড়ে—আর চোখে পড়ে নন্দিনীর হাত হতে খসা রক্তকরবীর কঙ্কণ, বিশু সেটিকে তুলে নেয় বুকে—নন্দিনীর এই শেষ দান।

যক্ষপুরীর স্বর্ণসৌধ লুটিয়ে পড়ল ধূলায়। দূরের থেকে ভেসে এল গান—"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয়, আয়, আয়।"

যৌবনের আশ্বাস

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রভু, তোমার সেবা পূজার—
সেরা সময় যৌবনই তো।
এ মালঞ্চ পুষ্পে ভরা,
লাবণ্যেতে বিভূষিত।
সতেজ, সবল, তনু ও মন,—
সকল কাজের সেই শুভখন,
যৌবন এত ক্ষণস্থায়ী
মিলিয়ে যাবে কে জানিত?

২

ভাবনা ও ভাব লয়ে যে—
কাটাইলাম দিবস যামি,
যৌবনের সে জোয়ার গেল—
বৃথায় তারে ডাকি আমি।
উন্মাদনা আজকে কোথা?
কই সে নিষ্ঠা একাগ্রতা?
কোথায় নিবিড় সে আনন্দ—
আধেক পথে গেল থামি?

৩

যৌবন কয় যাইনি আমি
আছি তোমার স্নিগ্ধতাতে,
যে জন চির-কিশোরে চায়—
আমিও রই তাহার সাথে।
ও ভারাভার আমিই নেব,
ভক্তি তেজ ও শক্তি দেব,
পূর্ণাহুতি দেওয়াইব—
সিদ্ধি ও বর তপস্যাতে।

৪

যৌবনের সে রবিই আমি
চন্দ্র হবো জরার রাতে,
নির্ম্মল ও বুক ভরে দিব—
অপূর্ব্ব এক জ্যোৎস্নাতে।
এনে দেব প্রসন্নতা,
শুচিতা ও পবিত্রতা
বসাইব কুম্ভমেলা—
ধূসর বুকের ও বেলাতে।

৫

নির্ম্মিয়মান মানস দেউল—
সকল দেব গড়ে তুলে,
পঞ্চপ্রদীপ ঘুরাইতে
আমিই রব ও অঙ্গুলে।
চন্দন আমি দেব ঘষে,
ধ্যানে তুমি রইবে বসে,
সলিল হয়ে থাকবো তোমার
দু নয়নের কূলে কূলে।

৬

তোমার সকল প্রার্থনাতে—
যা বলাবে তাই বলিব,
জেনো ও ক্ষীণ কণ্ঠে তোমার
আমার কণ্ঠ মিলাইব।
দেখতে শ্রীমুখ দেবো এনে,
নূতন জ্যোতি ও নয়নে,
এবার তোমায়—সামান্য নয়—
দিব যা তা অপার্থিব।

৩

শ্রীমতী তার স্বামীর গৃহে এসেছে। সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশ। তার অতীত দিনগুলির সঙ্গে কোথাও একবিন্দু মিল নেই। তথাপি একটা নতুন উন্মাদনায় তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শ্রীমতীকে উপলক্ষ্য করেই যে উৎসবের এই বিপুল আয়োজন একথা এ বাড়ীতে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের কথাবার্ত্তায় এবং কাজে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাকে একটা বিশেষ উচ্চস্থানে বসিয়ে অনাবশ্যক এত বেশী গুঞ্জন চলেছে যে, ভাল লাগার মাধুর্য্যও যেন ফিকে হয়ে গেছে।

অতনুকে কাছে পেয়ে শ্রীমতী স্মিতহাস্যে বলল, বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে। এত স্তব-স্তুতিতে মাথা ঠিক রাখতে পারব না যে।

চলে যেতে যেতে অতনু হেসে জবাব দিল, এ বাড়ীর এইটেই রেওয়াজ। ভয় পেয়ো না, অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

শ্রীমতী পুনশ্চ তাকে আহ্বান জানাতে অতনু ফিরে দাঁড়াল, আর কিছু বলবে নাকি?

শ্রীমতী জবাব দিল, হ্যাঁ, বলছিলাম যে এটা ভয় নয়, অস্বস্তি।

অতনু তেমনি হেসেই জবাব দিল, ও একই কথা।

শ্রীমতী সহসা অন্য প্রসঙ্গে এল, এমনি উৎসব আর কত দিন চলতে থাকবে?

অতনু বলল, তোমার ভাল না লাগলে আজ থেকেই বন্ধ করে দিতে পারি। যদিও উপস্থিত কারুরই তা ভাল লাগবে না।

শ্রীমতী কুণ্ঠিত কণ্ঠে জবাব দিল, তা হলে ওঁদের যতদিন ভাল লাগে—

তার কথার মাঝে প্রবল বেগে হেসে উঠল অতনু। পরমুহূর্ত্তেই কেমন একটা অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে বলল, ওদের তাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় নইলে ওরা বোঝে না, বুঝতে চায়ও না।

শ্রীমতী কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ওঁরা তোমার আত্মীয়, না?

অতনু জবাব দিল, ওরা তাই বলতে চায়।

শ্রীমতী তেমনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে পুনরায় বলল, বলতে চাইলেই কি তা হতে পারে?

অতনু হেসে জবাব দিল, সেইজন্যই ওরা তোমাকে উপলক্ষ্য করে আমাকে খুশী করতে চাইছে। কিন্তু তোমার যখন ভাল লাগছে না তখন আমাকে খুশী করবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

বাড়াবাড়ি—অথচ শুনতে ভালই লাগছে, বিশেষ করে আজকের দিনে। শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, তুমিও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ দেখছি।

অতনু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, বিলক্ষণ। কিছুটা যোগ আছে বৈকি, নইলে এই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব হ'ত না।

শ্রীমতী বলল, মিথ্যা অর্থের এত বড় অপব্যয়—

তাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে অতনু বলল, স্থান, কাল এবং পাত্রভেদে ও শব্দটির ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায় শ্রীমতী।

অতনুর উত্তর দেবার এই ভঙ্গিটির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল। শ্রীমতী অন্তরে চমকিত হ'ল, মুখে সে ভাব প্রকাশ পেল না। বরং পরিহাসের ছলে সে বলল, কথাটা সত্যিই আমার অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল এবং মনের অস্বস্তিকে বাইরের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখলেই ভাল হ'ত, কিন্তু এ সব আলোচনা থাক, তার চেয়ে এ বাড়ীর যেটা প্রচলিত প্রথা সেইটে তুমি আমাকে জানিয়ে দাও।

অতনু হেসে উঠল, তুমি শুধু ভাল শিকারী নও, সুন্দর কথা বলতেও জান দেখছি।

একটু থেমে পুনরায় সে বলল, এ বাড়ীতে প্রচলিত প্রথা হচ্ছে অনিয়ম—এ বাড়ীতে তোমাকে নিয়েই সর্ব্বপ্রথম গৃহপ্রতিষ্ঠা হ'ল, সুতরাং ওটা তোমাকেই প্রতিষ্ঠা করতে

হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোন বাঁধাধরা রাস্তায় চলতে আমি অভ্যস্ত নই। অপরের স্বাধীন চলার পথে অনধিকার প্রবেশ করাটাও আমি পছন্দ করি না। আমার ঠাকুরদা কথাটা মানতেন না বলেই আমাদের সংসারে— ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ অতনু থামলে। বলল, না, আজ থাক। সময়ে সবই জানবে, আজ এসব কথা থাক। সে অন্যমনস্ক ভাবে শিস্ দিতে দিতে প্রস্থান করল।

অতনু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে বাড়ীর প্রধান ভৃত্য কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত হ'ল। সে নিঃশব্দে এসে শ্রীমতীর সম্মুখে দাঁড়াল।

শ্রীমতী হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিছু বলবে কেষ্ট?

একটু ইতস্ততঃ করে কেষ্ট বলল, দাদাবাবুর মেজাজটা কি আজ ভাল নেই? অমন করে চলে গেলেন কেন?

তার কথার ধরনে শ্রীমতী বিস্মিত হলেও সে ভাবটা গোপন করে বলল, কোন কারণ ত দেখছিনে কেষ্ট। আর যদি হয়েই থাকে তাতেই বা ভাবনার কি আছে?

কেষ্ট শঙ্কিত ভাবে একবার চতুদ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, অনেকদিন ধরে দেখছি কিনা, তাই বৌদিরাণী। দাদাবাবুকে শিস দিতে দেখলেই আমি বুঝতে পারি। তবে এখন আপনি এসেছেন—

কথাটা শেষ না করে কেষ্ট অন্যত্র প্রস্থান করল।

শ্রীমতীর বড় অদ্ভুত লাগছে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি লোককে—বড় বেশী কৃত্রিম, এমন কি অতনুও। ব্যবহারে আন্তরিকতার স্পর্শ থাকলেও কোথায় যেন একটা মস্তবড় ফাঁক আছে। কথাটা কেউ বলে না দিলেও সে যেন তার আপন সংস্কার বশেই টের পাচ্ছে। ছোটবড় নানা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্ব্বে সে যেমনটি দেখেছে, যে ভাবে ভেবেছে, স্বপ্ন দেখেছে তার সঙ্গে বর্ত্তমানের মস্তবড় প্রভেদ আছে। ফলে শ্রীমতী অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে। সতর্ক পায়ে তাকে এগোতে হবে। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে সে নারাজ। তার নিজের জন্যও বটে, বাপের জন্যও বটে। তা ছাড়া আরও কত গোপন ইচ্ছা বাসা বেঁধে রয়েছে তার সুকুমার মনের অলিগলিতে। যার বাস্তবরূপ দেখতে হলে অতনুকে তার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মনে তার যত কল্পনাই থাক না কেন এরই মধ্যে সে হাঁফিয়ে উঠেছে। বার বার তার বাবার শান্ত-সৌম্য মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠছে—মনে পড়ে মায়ের কথা, দাদার কথা। সূর্য্যদাও এসে দাদার পাশে দাঁড়ায়। শুধুই কি তাই, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে খেরুয়া নদীর বিশীর্ণ জলধারা তার উপর প্রতিফলিত হয়েছে অস্তপথযাত্রী সূর্য্যের রক্তিম আলো। মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে অসংখ্য বুনো হাঁস। অনুভব করছে শালবনে পাগলা হাওয়ার মাতামাতি। শ্রীমতী আত্মভোলা হয়ে বসে থাকত। ক্ষিরিয়া তাকে কত দিন ধমকে ফিরিয়ে এনেছে। ফিরে আসতে আসতে কত গল্প শুনিয়েছে সে। কি ছিল আর কি হয়েছে তারই কাহিনী। মানুষের ভয়ে ওরাও সাবধান হয়ে গেছে। নইলে কতদিন যে ক্ষিরিয়া এমনি সময়ে এই পথে চলতে ফিরতে শালমহুয়ার ফিসফিসানি শুনেছে তার কি হিসেব আছে।

শ্রীমতী তাকে ঠাট্টা করে বলেছে, গাছে গাছে কানাকানি! তুমি পাগল ক্ষিরিয়া।

ক্ষিরিয়া রাগ করে বলত, হ্যাঁ লো হ্যাঁ, আমরা নিজের কানে শুনেছি। শুনবার কান থাকা চাই, মনের বিশ্বাস চাই।

শ্রীমতী গম্ভীর হয়ে বলত, একদিন শোনাবে ক্ষিরিয়া?

ক্ষিরিয়া মোটেই না দমে জবাব দিয়েছে, তা আর কেমন করে সম্ভব হবে দিদি, তোমাদের যা অবিশ্বাসী মন। ওঁরা হলেন গিয়ে দেবতা—

রহস্য করে শ্রীমতী জবাব দিত, মানুষের ভয়ে দেবতা পালায় এ আবার কেমন কথা?

ক্ষিরিয়া অন্যমনস্ক হয়ে যেত, ভয় নয় দিদি পাপে—

ক্ষিরিয়ার অন্যমনস্কতা ও ভাবপূর্ণ মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্রীমতী কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ত। ফিসফিস করে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, চোখে না দেখে কেমন করে বিশ্বাস করি ক্ষিরিয়া। তার পরেই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে তার একখানা হাত চেপে ধরে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করেছে, এখন কি আর তা শোনা যায় না ক্ষিরিয়া?

ক্ষিরিয়া খুশী হয়ে জবাব দিয়েছে, শুধু শুনবে কেন দেখতেও পার কিন্তু ওখানে তুমি যাবে কেমন করে—

শ্রীমতী উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। সে জবাব দিয়েছে, তুমি যেমন করে যাও—তখন কত আর বয়স, মাত্র বছর দশ। কয়েক মাস পূর্ব্বে ওখানে স্থায়ীভাবে একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছেন তার বাবা। সঙ্গী বলতে সখী বলতে একমাত্র ক্ষিরিয়াই তাকে অষ্টপ্রহর ঘিরে রয়েছে। তার বয়স বছর কুড়ি কিংবা কিছু বেশী। আঁটসাঁট দেহের গড়নে কিছু বুঝবার জো ছিল না। দিনের বেলা তাদের বাড়ীর যাবতীয় কাজ করে দিয়ে রাত্রে ফিরে যেত ছোটকি দরিয়ার ওধারে কোন এক পল্লীপ্রান্তে।

ক্ষিরিয়া জবাব দিয়েছিল, কিন্তু শুনলে মাষ্টার বাবু গোঁসা হবেন।

শ্রীমতী জবাব দিয়েছিল, দোষ না করলে বাবা রাগ করেন না, না হয় বাবাকে জিজ্ঞেস করে নেব।

কিন্তু ক্ষিরিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয় নি, বলেছে, তুমি খুব ছোট দিদি। আর একটু বড় হলে নিয়ে যাব।

শ্রীমতী ক্ষিরিয়ার উপর রাগ করেছে, মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছে। আর কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলবে না এমন ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু ক্ষিরিয়া শুধুই হেসেছে, জবাব দেয় নি।

তখন না বুঝলেও আজ সে বোঝে যে, ক্ষিরিয়া তাকে মিথ্যে বলে নি।

বুকে অদম্য সাহস আর দৃষ্টির স্বচ্ছতা না থাকলে ও বস্তু দেখা যায় না, অনুভব করা যায় না।

সেই দিনের সেই ঘটনার পর থেকে ক্ষিরিয়া তাকে নিয়ে নতুন ভাবে মেতে উঠেছিল। তার বাবা হাসতেন, কিন্তু মা রাগ করে বলতেন, মেয়েটার ইহকাল-পরকাল তুমিই ঝরঝরে করে দেবে। মেয়েকে বিয়ে-থা দিতে হবে না? মা এমনি তীর-ধনুক নিয়ে বনেজঙ্গলে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ালে চলে যাবে?

বাবা কিন্তু শান্তভাবেই মাকে বুঝিয়ে দিতেন যে, তিনি অকারণে ব্যস্ত হচ্ছেন। তিনি বলতেন, বুদ্ধি হলে আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে। যে ক'টা দিন হেসে-খেলে নিতে পারে নিক।

মা রাগ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, চিরদিন শুধু একই রকম দেখে এলাম, যা ভাল মনে করবেন সেইটেই ঠিক। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে কি সব সময় অভ্যাসকে ঠেকিয়ে রাখা যায়? আমার এ কথাটার জবাব দাও।

জবাব বাবা মাকে দেন নি বটে, কিন্তু সুযোগমত মেয়েকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, শ্রী, তুমি এখন বড় হয়ে উঠেছ। খেলাধুলো ভাল মা, তাই বলে পড়াশুনায় অবহেলা করো না। তা ছাড়া তোমার মাকেও তোমার সাধ্যমত সাহায্য করা উচিত।

বয়সটা তখন ওর আরও বছরতিনেক এগিয়ে গেছে। বাবাকে ব্যথা দিতে কোনদিনই শ্রীমতী চায় নি। নিজের চলাফেরাকে যথাসম্ভব গণ্ডীবদ্ধ করবার চেষ্টাও সে করেছে যদিও পুরোপুরি পারে নি। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায় মন তার উদাস হয়ে উঠত। বাবা তখন স্কুলে আর মা দিবানিদ্রায় অচেতন। অদূরে শালমহুয়ার ঘন বন—একটানা মৃদুকণ্ঠে তাকে ডাক দিত। শ্রীমতী আত্মভোলার মত বেরিয়ে পড়ত তার তীর-ধনুক হাতে করে। ক্ষিরিয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে, বনানীর অস্ফুট ভাষা সে তখন বুঝতে শিখেছে। জন্তু-জানোয়ারের সন্তর্পণ গতিবিধির খবর ওদের কাছে পাওয়া যায়। কত অগণিত দ্বিপ্রহর তার বনে বনে কেটেছে। কখনও একলা কখনও ক্ষিরিয়ার সঙ্গে। তার পর এই জনবিরল স্থানটিতে মানুষের বসবাস বৃদ্ধি পেতে লাগল, শাল-মহুয়ার বন দূর থেকে দূরান্তরে সরে যেতে লাগল, পল্লীতে বইতে সুরু হ'ল শহুরে হাওয়া, উঠল স্বাস্থ্যনিবাস। বছরের একটা সময় চতুর্দ্দিকের শান্ত গাম্ভীর্য্য টুটে যেত, শ্রীমতী চঞ্চল হয়ে উঠত ক্ষিরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গভীর অরণ্যে যাবার জন্য। যারা স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসে তাদের শ্রীমতী বরদাস্ত করতে পারত না। ওদের কৃত্রিম জীবনযাত্রা আর অকারণ জাঁকজমক আর মাতামাতি তার কাছে অসহ্য ঠেকত। তাঁরা একবারও কি ভেবে দেখেন নি যে, কেমন করে ওখানকার সরল, নির্লোভ লোকগুলির মধ্যে তারা কি বস্তু ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

চতুর্দ্দিকের এত কোলাহল আর প্রাচুর্য্যের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাই বারে বারেই তার অতীতের কথাগুলি মনে পড়ছে। এত স্তবস্তুতি আর হট্টগোলের মধ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে দু'দণ্ড যদি কোন নির্জ্জন স্থানে চুপ করে বসে থাকতে পারত তা হলে খুশী হ'ত শ্রীমতী। জীবনের এদিকটার সঙ্গে তার পরিচয় নেই বলেই এই পথে সে চিন্তা করতে সুরু করেছে।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াল। জানালার ঠিক নীচেই চমৎকার ফুলের বাগান, নানা জাতের অজস্র ফুল ফুটে আছে। ইচ্ছে হয় ওখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে। দিনরাত বসে থেকে থেকে তার হাত-পায়ে বাত ধরে গেছে, কিন্তু সে জানে না এ বাড়ীর রীতিনীতি। তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে খানকয়েক পাথরে আবৃত ঘর, এর বাইরে সে এক পা এগোতে চায় না। না জেনে হয় ত অপরাধই করে বসবে। এখানে চলে আসবার দিনে মা বহু উপদেশ দিয়েছেন—কথাগুলি তার মনে আছে। তা ছাড়া এ বাড়ীর বউ হয়েই যখন সে এসেছে তখন এদের মত করেই নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তুচ্ছ সুবিধা-অসুবিধার কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে সে চায় না। সূর্য্যদার মত বন্ধনহীন জীবনকে সে যখন মেনে নিতে পারে নি তখন সংসারের মধ্যে থেকেই সে তার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। শ্রীমতী জানালার কাছ থেকে সরে এসে একখানি বই নিয়ে বসল।

অতঃপুর বাড়ীখানি বেশ বড়। সম্মুখভাগে ফুলের বাগান। বাগানটিকে ঘিরে রয়েছে পাথরকুঁচি বিছানো সরু পথ। পশ্চাতে খেলার স্থান, চাকর-বাকরদের কোয়ার্টার,

ধোপা ও মালির ঘর। এ ছাড়া আছে উদ্বৃত্ত আসবাব-পত্র রাখার গুদাম। উগ্র বিদেশীয়ানার দেশীয় অনুকরণ।

অতনুর নিজের জন্ম রয়েছে বসবার ঘর, সাজসজ্জার ঘর, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দেবার ঘর, সাহেব কিংবা মান্ত অতিথিদের জন্ম পৃথক অংশ।

এক নজরে দেখতে গেলে মনে হয়, একের জন্ম বহুর প্রয়োজন—প্রয়োজনের জন্মে নয়। মোটকথা বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ধূলিকণায় প্রকাশমান। এতদিন তার একলার জন্মই এত আয়োজন ছিল, আজ শ্রীমতী একটি অংশীদার বাড়ল।

স্বামী আর স্ত্রী—সংসারের প্রধান, কিন্তু পুষ্যি অনেক। দাসদাসী, বয়-খানসামা ছাড়াও বহু বাড়তি আছে।

অতনু বলে, ওরা আর ক'দিন! দু'দিনের জন্মে এসেছে দু'দিন পরেই চলে যাবে।

ওরা বলে অন্ম কথা—শ্রীমতীর শুভাগমনের ফলেই নাকি এই নতুন ব্যবস্থা। কৌতূহল মনে জাগে, কিন্তু প্রকাশ পায় না। বরং অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে, একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে যত্নবান হয়। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, চোখে চোখে কি কথা হয়। শ্রীমতী ঠিক বুঝতে না পারলেও অনুভব করে যেন ওরা ভয় পেয়ে আরও বেশী দূরে সরে যাচ্ছে। শ্রীমতী এর কারণ খুঁজে পায় না, তাই অতনুকে একান্তে পেয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানায়।

অতনু হেসে বলে, কিছু অসঙ্গত কাজ করে নি ওরা। তোমার সঙ্গে ওদের ব্যবধানটার কথা স্মরণ করেই এ কাজ করেছে, ওরা অনুগ্রহপুষ্ট।

শ্রীমতী যেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি এমনিভাবে বলল, তাতে কি হয়েছে?

অতনু তার বক্তব্যটা আর একটু পরিষ্কার করে বলল, পরের অনুগ্রহের উপর যাদের বেঁচে থাকতে হয় তারা সব ভুললেও নিজেদের অবস্থার কথা ভুলতে পারে না শ্রী। ওদের নিয়ে তুমি অকারণ মাথা ঘামিও না।

এর পরে আর কথা বলা চলে না, কিন্তু শ্রীমতীকে যে বাঁচতে হবে একথাটা সে ভুলবে কেমন করে। সকলের কাছ থেকে নির্ব্বাসন দিয়ে একক জীবনযাপনের কথা ভাবতেও তার ভয় লাগে। তাই মাথা ঘামাতে নিষেধ করলেও সে প্রশ্ন না করে পারল না। বলল, কিন্তু ওদের সে কথা ভাববার অবকাশ যদি আমি না দিই?

অতনু হো হো করে হেসে উঠল। বলল, তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ওদের তুমি জান না বলেই একথা তোমার মনে এসেছে। ওদের দয়া দেখালেই দাবি জানাবে। সহসা কথার মাঝে থেমে অতনু শ্রীমতীর অত্যন্ত সন্নিকটে এগিয়ে এল। তার চোখে চোখ রেখে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, আমাদের বিয়ে অল্প ক'দিন আগে হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে তুমি আমাকে বাদ দিয়ে...। অতনু থামল, তার মুখে একটুখানি অর্থপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল।

শ্রীমতী আরক্ত হয়ে উঠল। আপত্তি জানিয়ে জবাব দিল, তুমি বেশ লোক যা হোক। তোমাকে বাদ দিলে আমি দাঁড়াব কোথায়?

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলে, রাতের সুরুতেই একদিনও সকাল হতে দেখলাম না। নাওয়া-খাওয়াটাও ঘড়ির কাঁটার সঙ্গেই হচ্ছে।

শ্রীমতীর বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, অর্থাৎ...

অতনু বলল, অর্থাৎ এতটুকু চাঞ্চল্য কোথাও চোখে পড়ে না। অবশ্য একথা তুমি বলতে পার যে, আমার কি সে বয়স আছে যে—

শ্রীমতী সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল, তুমি ত কম অসভ্য নও।

অতনু গম্ভীর কণ্ঠে বলল, কথাটা ত মিথ্যে নয়—

শ্রীমতী দুষ্টমীভরা কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু পিছন ফিরে না তাকিয়েও থাকতে পারছ না ত, যতই বয়সের দোহাই দিচ্ছ?

অতনু হেসে বলল, ওটা মানুষের ধর্ম্ম। দোষ আর গুণ সবটা মিলিয়েই একটা গোটা মানুষ।

শ্রীমতী সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, একথা তোমার কাছে আমি শুনতে চাইছি না।

অতনু বলল, কিন্তু আমি শুনতে চাই আর আগেই শুনিয়ে রাখতে চাই, কারণ এ এমনই একটা প্রশ্ন যা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পথে প্রতিনিয়তই নিঃশব্দে আত্মগোপন করে আছে।

শ্রীমতী বলল, এমন কত প্রশ্নই ত চোখের আড়ালে মনের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না। যার আত্মপ্রকাশ ঘটল না ওটা একটা প্রশ্নও নয়।

অতনু শ্রীমতীর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে পুনরায় বলল, তোমার একথার অর্থ?

খুব সহজ। শ্রীমতী বলল, যেটা আমি জানি না—জীবনের যে অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল না তা নিয়ে মাথা ঘামালে মাথার উপর অবিচার করা হয়।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল, কিন্তু মানুষের আগ্রহ যে ঐখানেই বেশী।

শ্রীমতী তেমনি হাসিমুখে বলল, অপরের কথা জানি না, আমি আমার কথা বলছি।

কথাটা বলে ফেলেই অতনু একবার নতুন করে পিছন ফিরে তাকাল—বড় বেসুরো লাগল নিজের বলা কথা কটা তার নিজেরই কানে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে হাসল, কোন জবাব দিল না শ্রীমতীর কথায়।

শ্রীমতী একটু বিস্মিত হ'ল তার হাসির ধরনে। বলল, তুমি হাসছ?

অতনু দুষ্টুমীভরা কণ্ঠে জবাব দিল, তবুও দেখ আমি প্রকাশ্যেই হেসেছি।

শ্রীমতীও হেসে ফেলল, তুমি লোকটি খুব সুবিধের নও।

অতনু তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বলল, অথচ আজ এই মুহূর্ত পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমি কোন দুর্ব্ব্যবহার করি নি শ্রীমতী।

দুজনেই একসঙ্গে হাসতে থাকে।

মহাশয় বেশ কথা বলতে পারেন কিন্তু। হাসি থামিয়ে শ্রীমতী বলে।

অতনু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়, আর মহাশয়া খুব ভাল শর ক্ষেপণ করতে পারেন। মহাশয়ের কথায় ধার নেই, কিন্তু মহাশয়ার শরে ধারের সঙ্গে গতি আছে যা প্রাণসংহার করে।

শ্রীমতী মনে মনে একটু চাঞ্চল্য বোধ করলেও প্রকাশ্যে গম্ভীর কণ্ঠে কথা কয়ে উঠল, রক্ষার জন্যেই সংহারের প্রয়োজন, মহাশয়ের একথাটা জানা উচিত ছিল—

সহসা কথা থামিয়ে শ্রীমতী অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, কে আসছে।

হাতে একরাশ ফুল নিয়ে কেষ্ট এসে ততক্ষণে কাছে দাঁড়িয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অতনু বলল, আমার কেষ্টচন্দ্র কখনও কাজে গাফিলতি করে না। কেষ্ট একথার কোন জবাব না দিয়ে ফুলগুলি নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করল।

শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, কেষ্ট তোমাদের বহুদিনের পুরনো চাকর বুঝি?

অতনু মুহূর্ত্তের জন্য হয় ত একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল পর মুহূর্ত্তেই জবাব দিল, তা পুরনো বলা চলে। তবে ওকে চাকর না বলে আমার মনিব বলাই উচিত। আজ পর্য্যন্ত আমার কোন গুণই ওর চোখে পড়ে নি, সব সময় শুধু ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে।

শ্রীমতী হাসল।

অতনু বলতে থাকে, হাসির কথা নয়। একমাত্র আমার বিয়ে করাটা কেষ্টচন্দ্র সুনজরে দেখেছে।

শ্রীমতী বলল, বরাৎ আমার ভাল বলতে হবে।

অতনু বলল, অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বছরের পর বছর ওর হুকুম তামিল করেও যা পাই নি, তুমি দু'দিন হয় এ বাড়ীতে এসেই তার চেয়ে বেশী পেয়ে গেছ। ব্যাটা কম শয়তান মনে করেছ?

কেষ্ট চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল, একবার শ্রীমতীর একবার অতনুর মুখের পানে চেয়ে দেখে মুচকি হেসে চলে গেল।

অতনু বলল, ব্যাটার হাসিখানা দেখেছ শ্রী—

শ্রীমতী নিরীহগোছের মুখভঙ্গী করে বলল, দেখবার মত হাসি বুঝি?

অতনু জানাল, অর্থপূর্ণ হাসি।

শ্রীমতী বলল, অর্থটা কি শুনি—

অতনু শ্রীমতীর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে গেল।

শ্রীমতী দু'হাতে অতনুর মুখটা ঠেলে দিল। ফিসফিস করে বলল, বয়স হয়েছে না তোমার। উঁহু—এখন নয়। ছিঃ, বাড়ী ভরতি লোকজন—তোমার কি কোন জ্ঞান—এই জন্যেই বুঝি ওর হাসিটা—না না না। শ্রীমতী আরক্তিম হয়ে ওঠে। চঞ্চল পদে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে।

দুজনের মধ্যে সমান ব্যবধান রেখে অতনুও তার অনুসরণ করে।

লজ্জায়, আবেগে আর হাসিতে মাখামাখি হয়ে উঠেছে শ্রীমতীর মুখখানা, বিহ্বল কণ্ঠে বলে, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত—

যাকে কথাটা বলা হ'ল সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলল, ও বস্তুটি আমার চিরদিনই একটু কম, ওতে সব সময়ই লোকসান হয়।

শ্রীমতী অতনুর একখানা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে লজ্জা জড়ান কণ্ঠে বলল, তুমি বড্ড লোভী কিন্তু, এত লোভ থাকা ভাল না।

অতনু জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট দুখানা বারকয়েক লেহন করে বলল, আকাঙ্ক্ষা থাকলেই না পাওয়ার প্রশ্ন দেখা দেবে। জান শ্রীমতী, আমার মধ্যে ছিল দুর্জ্জয় লোভ, তাই আমার চাওয়া কোনদিন ব্যর্থ হয় নি, জীবনের সকল স্তরে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শ্রীমতী অতনুর মুখের পানে চেয়ে থেকে বলল, কিন্তু লোভটা বড় খারাপ, চাওয়ারও শেষ নেই।

অতনু কথাটা একপ্রকার মেনে নিয়ে বলল, কথাটা ঠিক। সবকিছুই যদি পাওয়া হয়ে গেল তা হলে আর এখানে কেন, বানপ্রস্থে গেলেই হয়। এ সব হচ্ছে শাস্ত্রের কথা, আমার কাছে আমার শাস্ত্র আর ধর্ম্ম হ'ল নিজের মনের নির্দ্দেশ। একেই আমি সবচেয়ে বড় মর্য্যাদা দিয়ে এসেছি। আমার জীবনদর্শন ঘটেছে ঘোরা পথে—যে পথ সহজ এবং স্বাভাবিক নয়। কথাটা প্রথম বুঝলাম যখন নিজেকে চিনতে সুরু করেছি। ভাবতাম এ কি শিক্ষা ঠাকুর্দ্দা আমাকে দিচ্ছেন। প্রতিবাদ করতে পারি নি নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে। কত আর বয়স তখন আমার, তা ছাড়া প্রতিবাদ করে যেখানে নিজের এক-মাত্র পুত্র···

বলতে গিয়েও অতনু কথাটা শেষ করল না। মুহূর্ত্তের জন্য তার মধ্যে একটা সাময়িক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল মাত্র। সুরুতেই নিজেকে সামলে নিল। বলল, এ সব কথা আজ থাক শ্রীমতী। এমন মুখর সন্ধ্যাটাকে আমি মাটি করতে চাই না, বরং চল বাগানে গিয়ে একটু গল্প করি।

শ্রীমতী খুশী হয়ে উঠে দাঁড়াল, অতনু ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে।

৪

অতনু আর শ্রীমতী বাগানে এসে উপস্থিত হ'ল। সুন্দর বাগানটি, সবুজের সমারোহ। একটি লতাকুঞ্জের কাছে এসে শ্রীমতী প্রথমে বসে পড়ল, তার পরে শুয়ে পড়ল। অতনু নিঃশব্দে তার পাশে উপবেশন করল। শ্রীমতী তার কোলের উপর নিজের একখানি হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তার পর—

অতনু কথাটা কি তা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, কিসের তার পর শ্রী?

শ্রীমতী তার অপর হাতে অতনুর কোমর বেষ্টন করে কতকটা আবদারের ভঙ্গিতে বলল, তুমি রাগ করো না —আমি তোমার মা-বাবার আর ঠাকুরদার কথা শুনতে চাইছিলাম।

অতনু একটুখানি হাসল। কিছুক্ষণ চুপ করে কি চিন্তা করে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, যাদের কথা তুমি শুনতে চাইছ শ্রী তাদের কতটুকু আমি জানি? মাকে আমার চোখে দেখারও সুযোগ হয়নি, আর বাবাকে চোখে দেখলেও তাকে দেখা বলে না—

শ্রীমতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তোমার একথার মানে?

অতনু একটু দুঃখের হাসি হাসল। বলল, মানে খুবই সোজা, আমার জন্মাবার অল্প কিছুদিনের ব্যবধানেই মা মারা যান।

আর তোমার বাবা? শ্রীমতী প্রশ্ন করে।

অতনু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়, সেইটেই আজও আমার কাছে একটা রহস্য, শুনেছি আমার দু'বছর বয়সের সময় বাবা গৃহত্যাগ করেন।

শ্রীমতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তোমার ঠাকুরদা যেতে দিলেন? বাধা দিতে পারলেন না তিনি?

অতনু ম্লানকণ্ঠে জবাব দিল, শুধুই কি দিলেন, তাকে চলে যেতে বাধ্য করলেন।

কিছুক্ষণ দুজনার কারুর মুখেই কোন কথা জোগাল না, নীরবতা ভঙ্গ করে শ্রীমতীই প্রথমে কথা কইল, তোমার বাবা তোমাকে দাবি করলেন না?

অতনু একটু হেসে বলল, করেছিলেন—দাবি নয় আবেদন। কিন্তু ঠাকুরদা তাঁকে আদালতে যাবার উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন। ঠাকুরদার সন্তান হলেও তাঁর শিক্ষিত ভদ্র মন অতটা এগোতে পারে নি।

অতনু থামল। তার মন আবার অতীত স্মৃতির সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে সুরু করেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবার অপরাধ?

অপরাধের কথা ঠিক জানি না। অতনু বলল, ঠাকুরদার মতে বাবা তাঁকে নাকি দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটু থেমে সে আবার বলল, বাবার কথা আমি জানি না, তবে এটুকু জানি যে, ভরাডুবি যদি কেউ করে থাকেন ত সে আমার বাবা নন—ঠাকুরদা।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে উঠে বসল, ভারি অদ্ভুত লাগছিল অতনুর কথাগুলি। অতনু থামতেই তার মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল, তার পর?

অতনু ধীরে ধীরে বলে, এ সব কথা আজ থাক শ্রী। এ সব চিন্তা আমাকে বর্ত্তমান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আমি ভয় পাই।

শ্রীমতী সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, বেশ ত থাক না। কিন্তু এতে ভয় পাবার কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝি না।

শ্রীমতী আরও একটু ঘন হয়ে বসে গভীর কণ্ঠে আবার বলল, বলতে যদি তুমি ব্যথা পাও তা হলে কোন দিন বলো না। আমার জিজ্ঞাসা শুধু কৌতূহল। অতনুর এক-খানি হাত পুনরায় নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দিল সে।

অতনু যেন নিজের মনেই বলে উঠল, ব্যথা···! বড় বিশ্রীভাবে সে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে শ্রীমতী চমকে উঠল। অতনু স্পষ্ট অনুভব

করল সে চমক। নিজের হাসির শব্দটা তার কানেও বড় বেসুরো ঠেকেছে। মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে আরম্ভ করল, তোমাকে মিথ্যে বলছি না শ্রী। ব্যথার চেয়েও সত্যিই আমি ভয় পাই সেদিনের কথা ভাবতে গেলে। তবুও তোমাকে আমি বলছি—

বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, না থাক সে সব কথা। ও আমি শুনতে চাই না। তুমি ঠিকই বলেছিলে, আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যাটা ভারাক্রান্ত করে তুলবার কোন অধিকার আমার নেই।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি বড্ড লোভী, কিন্তু আমার লোভের জাত আলাদা শ্রী, এখানে আমি ঠাকুরদার মন্ত্রশিষ্য। সহজলভ্যে মন ওঠে না, বরং বিপথগামী হয়।

শ্রীমতী উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে। অতনু বলে চলে, এ বাড়ীর কুলবধূ হয়ে যখন এসেছ তখন আজই হোক, কালই হোক সব কথাই তুমি জানবে। আমি বললেও জানবে, আমি না বললেও জানবে। কাজেই আমার কাছ থেকে জেনে নেওয়াটাই ভাল নয় কি? তা ছাড়া—

একটু থেমে সে পুনরায় সুরু করল, আমার হাসির শব্দে একটু আগে তুমি চমকে উঠেছিলে। উঠবারই কথা, কারণ সব কথা ঠিক তোমার বুঝবার মত করে আমি গুছিয়ে বলি নি। ঘটনাগুলি আমার মনে এত বেশী আনাগোনা করেছে যে, আরম্ভ এবং শেষ সব একাকার হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ শুনলে দুর্বোধ্য ঠেকে। আমি ভুলে যাই যে, কাহিনীটা আমি নিজেকে শোনাচ্ছি না শুনছে অপরে। অতনু থামল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাদের আশেপাশে প্রচুর চাঁদের আলো ছড়িয়ে ছিল, হঠাৎ একখণ্ড কালো মেঘ ভেসে এসে তাকে আড়াল করল।

অতনু পুনরায় আরম্ভ করল, তাই আমি গোড়া থেকেই তোমাকে শোনাচ্ছি—আমার ধারণা ঠাকুরদার খামখেয়ালী আর অবিবেচনার জন্যই তাঁর বিশাল সম্পত্তি একেবারে ডুবে গেল। কিন্তু এ ঘটনা হ'ল ঠাকুরদার জীবনের শেষপর্ব্ব। যে পর্ব্ব আমার জীবনে একটা নতুন দিকের সন্ধান দিল। এই নতুন দিকের কথা বলতে গেলে আমাকে আবার পুরাতন দিনে ফিরে যেতে হবে, নইলে বলাটা আমার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

শ্রীমতী আগ্রহভরে শুনছে—একাগ্র ও তন্ময় হয়ে শুনছে অতনুর পূর্ব্ববর্ত্তীদের অজ্ঞাত কাহিনী।

অতনু বলতে থাকে, আমি শুনেছি যে, বাবা চলে যাবার পর দাদু নাকি দিনকয়েক খুব লাফালাফি করেছেন। বাবাকে উপলক্ষ্য করে তিনি নিজেকেই বহু অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে উপস্থিত থাকে না সেখানে এর পরমায়ু নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, আমার ঠাকুরদার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। তিনি একেবারে থেমে গেলেন। বাবার সম্বন্ধে তাঁর মুখে ভাল-মন্দ কোন কথাই আর কোনদিন কেউ শোনে নি। কিন্তু নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি আমাকে নিয়ে মেতে উঠলেন। ঠাকুরদার নির্দ্দেশে তার ছ'বছরের নাতি অতনুর শিক্ষা সুরু হ'ল। সব কথা তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না—আমার নিজের কাছেও কেমন ধোঁয়াটে লাগে আজ। তবুও মাঝে মাঝে আত্মবিশ্লেষণ করতে বসে মনে হয় ঠাকুরদা একটা জিদের বশে কত বড় অন্যায় করে গেছেন। আর একটু ধৈর্য্য, আর একটু উদারতা যদি তাঁর থাকত তা হলে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতে পারত। অতনুর এত পয়সা আর নামডাক হয় ত হ'ত না, কিন্তু পলে পলে আত্মবিশ্লেষণের হাত থেকে অব্যাহতি পেত।

শ্রীমতী অকস্মাৎ তাকে বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু এ নিয়ে তুমি দুঃখ পাচ্ছ কিসের জন্যে। যে নিজের দোষত্রুটি বিশ্লেষণ করতে পারে সে অনেক শক্ত পথই ডিঙিয়ে যেতে পারে।

অতনুর চোখেমুখে খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি দেখা দিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, চুপ করে রইলে যে? মিথ্যে বলেছি আমি?

সত্যি মিথ্যে জানি না শ্রী। অতনু বলল, কিন্তু আমি মানুষ হয়েছি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। আমার কাছে বেঁচে থাকার অর্থ আলাদা রকমের। তোমরা তাকে কোনদিন স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারবে না।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, বড্ড বড় বড় কথা বলছ তুমি।

অতনু জবাব দিল, হঠাৎ শুনলে তাই মনে হয় শ্রী, তবে তোমাকে আমি আমার মনের কথাই বলেছি। এক দিন হয় ত কোন কথাই তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে না। তখন ভয় পেয়ো না—পিছিয়ে যেয়ো না। তোমার সাহস আছে, মনের জোরও আছে। চেহারার গৌরব তুমি করতে পার—কারণ তুমি রূপসী। কিন্তু আমি তোমার রূপ চাই নি—ওটা আমার কাছে সহজলভ্য—

সহসা শ্রীমতীর মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সে চুপ করল।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, আমাকে তোমার কাহিনীর মধ্যে এনে ফেলেছ কিসের জন্য?

অতনু অকস্মাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। খানিকক্ষণ এমনি ভাবে আলস্য ভাঙল, খানিক একাগ্র দৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চেয়ে থেকে কিছু সন্ধান করে নিয়ে পরমুহূর্তেই অনেকটা সতর্ক হয়ে উঠল।

অতনু অকারণে বহুক্ষণ ধরে হো হো করে হাসল, তার পরে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগল, জান শ্রী, টাকা উপায় করা আর কথা বলা এ দুটো আলাদা জিনিস, দুইয়ে অনেক প্রভেদ। তেমন গুছিয়ে কথা বলতে আমি জানি না, কিন্তু আমার কাহিনীর মধ্যে তোমার আবির্ভাবটা মিথ্যে নয় শ্রী। বরং এইটেই সবার সেরা সত্য। ডাক্তার বলেন, আমার জীবনে শ্রীমতী লাভটাই সুন্দর আর সত্য, তাকে আঁকড়ে থাকলেই নাকি অতনুর মোক্ষলাভ হবে।

অতনু পুনরায় হেসে উঠে বলল, ডাক্তারবাবু একটি পাগল। কি বল?

শ্রীমতীর বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, ডাক্তারবাবু! কে তিনি? তাঁর কথা এর আগে কোনদিন শুনি নি ত?

অতনু বলল, আমাদের গৃহ-চিকিৎসক। অকারণে তাঁর সাক্ষাৎ মেলে না। আমাদের বিয়েটা একরকম তাঁর পরামর্শেই হয়েছে।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, তুমি কারুর পরামর্শমত কাজ কর?

অতনু হাসিমুখে জবাব দিল, মনের মত পরামর্শ দিলে করি। ঠাট্টা নয় শ্রীমতী, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ডাক্তারবাবু সত্যিই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তাঁর কথা আজ থাক, ঠিক সময় তুমি তাঁর দেখা পাবে।

অতনু আবার তার পূর্ব্বকথায় ফিরে এল, হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ঠাকুরদার যদি আর একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকত তা হলে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হ'ত।

একটু থেমে একটি নিশ্বাস মোচন করে অতনু পুনরায় বলতে লাগল, কিন্তু যা হয় নি তা নিয়ে আর কথা বলে লাভ কি। অথচ এমনই আশ্চর্য্য যে, এই ভাবনার হাত থেকে আমি আজও রেহাই পাই না। তুমিই বল শ্রী, এ কি কখনও ভোলা যায়? একটা অবোধ শিশুর অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তার উপর চলল ঠাকুরদার পরীক্ষা। জমিদারের ছেলে হয়ে বাবা মানুষের স্বভাবধর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন—তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে সুরু করল দু'বছরের অতনু। অজ্ঞান শিশু আমি, আমার পৃথিবী দাদু—তাঁকে প্রদক্ষিণ করে আমি পৃথিবী দেখতাম। দাদুর হাতে আমার শিক্ষা সুরু হ'ল - যে পথ ধরে তিনি আমায় নিয়ে এগিয়ে চললেন তাকে তোমরা স্বাভাবিক বলে কোনদিন ভাবতে পারবে না। আমার অভিধানে মায়া, দয়া কিংবা ক্ষমাকে বলা হ'ত দুর্ব্বলতা। দাদু আমাকে এই দুর্ব্বলতা সব সময় পরিহার করে চলতে শিখিয়েছেন। তিনি বলতেন, এই দুর্ব্বলতা হ'ল মানুষের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। আর এই অন্তরায়কে যে কাটিয়ে উঠতে পারে না, হয় তার সংসার করা উচিত নয়, নয় ত তাকে চিরকাল অভাব আর অনটনের সঙ্গে লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জীবন পাত করতে হবে। বাবার সঙ্গে ঠাকুরদার মতবিরোধ এই পথেই প্রথম দেখা দিয়েছিল বলে আমি শুনেছি। সম্ভবতঃ সেই জন্যই ঠাকুরদা সযত্নে আমার মধ্যের এই সুকুমার বৃত্তিগুলিকে গলা টিপে মারতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এই কারণে তোমার বাবাকে তিনি ত্যাগ করলেন?

অতনু জবাব দিল, তাই শুনেছি, তবে ঠাকুরদার কাছে নয়। আশ্চর্য্য কঠিন তাঁর প্রাণ ছিল। বাবা চলে যাবার পরে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে এতটুকু পরিবর্ত্তন কেউ কোন দিন দেখে নি। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত না। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে দাদুকে বড় দুর্ব্বল আর অসহায় মনে হ'ত। মনে হ'ত একটা বড় বেদনা থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়েই তিনি নিজেকে আরও বেশী করে নিপীড়ন করে গেছেন।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, তোমার কথাগুলি পরস্পরবিরোধী হয়ে যাচ্ছে, এই বলছ কঠোর প্রাণ আবার বলছ দুর্ব্বল অসহায়, আত্মনিপীড়ন—

তাকে বাধা দিয়ে অতনু বলল, চুলচেরা হিসেব করলে কি দাঁড়াবে তা আমি জানি না শ্রী, কিন্তু আমার অতীত এবং বর্ত্তমান জীবনটা পর্য্যটন করে যে কথাটা আমার মনে এসেছে তাই তোমাকে জানিয়েছি, তার বেশী নয়।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা আর একদিনের জন্যও দেখা দিলেন না?

অতনু মাথা নেড়ে জবাব দিল, না—তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। আমার সামনে যদি তিনি এসে আজ দাঁড়ান তা হলেও তাঁকে আমি চিনব না। বাবার একখানা ছবি পর্য্যন্ত ঠাকুরদা রেখে যান নি। কিন্তু এত করেও ঠাকুরদা ভরাডুবি ঠেকাতে পারেন নি। যে ফুটো নৌকায় তিনি পার হতে চেয়েছিলেন তাতে জোড়া-তাপ্পি দিতে কাউকে দিলেন না, তাই ডুবল যখন একেবারেই

তলিয়ে গেল। তখন আমার বয়স কত জান? মাত্র বাইশ বছর।

অতনু একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগল, কেমন করে যে এটা সম্ভব হ'ল তা একদিনের জন্যও বুঝবার অবকাশ পেলাম না। বাবা হয় ত বুঝেছিলেন তাই জোড়া-তাপ্পি দিয়ে রং-পালিশের কথা তুলেছিলেন কিন্তু দাদু ভুল বুঝলেন।

শ্রীমতী বলল, তোমার বাবা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে ত এত বড় অঘটন ঘটত না।

অতনু বলল, বাবা চেষ্টা করেও অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন কিনা সে খবর আমার জানা নেই শ্রী। শুধু শুনেছি পুত্র চেয়েছিলেন প্রজাদের মানুষের মত বাঁচিয়ে নিজেরা বেঁচে থাকতে। আর দাদু চেয়েছিলেন তাঁদের সাবেকী আমলের ঠাট বজায় রেখে তোগলকি শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে। মতান্তর এখানেই চরমে উঠল, বাবা মহলে মহলে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে উদ্যোগী হলেন, ঠাকুরদা দিলেন বাধা। বললেন, এসব ভাব বিলাসিতা—লোকচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। বাবা বললেন, অশিক্ষা আর কুশিক্ষার ছিদ্রপথ ধরেই যত রাজ্যের গোলমাল দেখা দেয়। ঠাকুরদার মতে ঠিক তার উল্টো। এঁদের কার কথা সত্য এ নিয়ে আজকের দিনে একটা থিসিস লেখা যায়। কিন্তু ঠেকে ঠেকে আর দেখে দেখে আজ কিন্তু আমার মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ঠাকুরদার মতটাও একেবারে মিথ্যে বলে ভাবতে পারছি না।

শ্রীমতী বিহ্বলকণ্ঠে বলল, তুমিও তোমার ঠাকুরদাকে সমর্থন কর?

তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনটা অতনু লক্ষ্য করল। সে আপন মনে একটু হেসে নিয়ে প্রকাশ্যে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবেই বলল, ঠাকুরদার কাছেই আমি শিক্ষা পেয়েছি এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন শ্রী, এর প্রভাব কি সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়।

শ্রীমতী সহসা সোজা হয়ে উঠে বসল। অতনুর মুখের পানে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করে অবিচলিত কণ্ঠে বলল, বোধ হয় এইটেই স্বাভাবিক। তোমার মধ্যে তোমার বাবার রক্ত আর ঠাকুরদার শিক্ষার সংঘাত চলেছে।

মুখে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করে অতনু বলল, আশ্চর্য্য ডাক্তারবাবুও ঠিক এই কথাটাই মাঝে মাঝে বলেন। তোমাদের চিন্তাধারার একটা অদ্ভুত মিল আছে দেখছি। তবুও আমার মনে হয় তোমাদের এ যুক্তি সত্য নয়, ডাক্তারকেও আমি বলেছি। কিন্তু আজ আর নয় শ্রী, অনেক রাত হয়েছে। তা ছাড়া আমাকে আবার একবার বাইরের মহলে যেতে হবে—আমার খাস কামরায়। এতক্ষণ হয় ত আমার এক সাহেববন্ধু এসে বসে আছেন।

শ্রীমতী বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়াল এবং কোন কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে চলল। অতনুর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে তখনও পাক খাচ্ছে।

শ্রীমতীকে অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে শিস্ দিতে দিতে বাইরের পথে পা বাড়াতেই শ্রীমতী তাকে পিছু ডাকল, তোমার সাহেব মক্কেলের কাছে বুঝি খুব বেশী দরকার?

অতনু ফিরে দাঁড়াল, দরকার একটু আছে বইকি, কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বেশ যা হোক। শ্রীমতী একটু হাসল, কারণ ছাড়া বুঝি কোন কথা জিজ্ঞেস করতে নেই?

তার কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানি না, কিন্তু অতনুকে শ্রীমতীর অতি সন্নিকটে ফিরে আসতে হ'ল। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, ডাক্তার বলেন সোনার শিকল—কথাটা দেখছি মিথ্যে বলেন নি। তখন যদিও তার মুখের উপর খুব হেসেছিলাম। থাকগে আমার সাহেব মক্কেল, ওরা আমার রোজ দিনের সঙ্গী। অতীতেও ছিল—ভবিষ্যতেও থাকবে। মাঝের ক'টা দিন বৈ ত নয়…

শ্রীমতী অতনুর বলার ধরনে হেসে ফেলল, এ ক'টা দিন তা হলে অপব্যয় করছ কেন?

অপব্যয়? অতনু আরও একটু এগিয়ে এসে প্রায় শ্রীমতীর কানের কাছে মুখ এনে বলল, অতনু অপব্যয় করাটা সব সময়ই অপছন্দ করে শ্রীমতী। অঙ্কশাস্ত্রটা সে খুব ভাল বোঝে।

শ্রীমতী জবাব দিল, তোমার দেখছি খুব অহঙ্কার—

অতনু বলল, তা একটু আছে, ওটা থাকা ভাল।

শ্রীমতী বলল, ঠিক বুঝলাম না।

অতনু জবাব দেয়, দু'দিনেই কি একটা লোকের সব কথা বোঝা যায়? সময় লাগে। তার চেয়ে চল তোমার ঘরেই যাই।

ক্রমশঃ

জটার জালে

(ভ্রমণ চিত্র)

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(২)

আশ্রমেই গিয়ে উঠলাম। কল্পনার আশ্রমের সঙ্গে বাস্তবের মিল যথেষ্ট। তবে নবযুগের নূতন সংস্করণ এটি। দেবতা এখানে রোগক্লিষ্ট মানুষ, সাধনা তাদের সেবা। কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম, মানে আধুনিক হাসপাতাল। স্বহস্তে রোগীর সেবা করেন মিশনের সাধু ও ব্রহ্মচারীরা।

অতিথিশালাও আছে। সেখানে ঘরের আরাম। অতিরিক্ত লাভ সাধুসঙ্গ।

দেখবার মত কি আছে হরিদ্বারে? প্রশ্ন শুনে হাসলেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। ঐরাবতের অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন জাহ্নবী স্বীয় প্রবল জলপ্রপাতের বেগে মুগ্ধ দাম্ভিককে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। স্বামীজী যে ফিরিস্তি দিলেন তাও আমার জিজ্ঞাসার অহঙ্কার চূর্ণ করবারই মত। মাসখানেক ঘুরে ঘুরে দেখলেও এত সব দ্রষ্টব্য স্থানের কেবল বাহ্যরূপটাও বুঝি দেখা শেষ হবে না। সুতরাং লম্বা তালিকার দুচারটি মাত্র জায়গায় লাল পেন্সিলের টিক্ চিহ্ন দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরেই বের হয়ে পড়া গেল।

বাড়ী বলব, না আশ্রম? পথ চলতে চলতে যেদিকে তাকাই কেবল ঐ প্রশ্নই মনে জাগে। গাছ আর গাছ। গাছের জন্য আকাশ যেন চোখেই পড়ে না। প্রাসাদের মত এক একখানা বাড়ী যেন ঢাকা পড়ে আছে, বিরাট প্রাঙ্গণজোড়া অযত্নরক্ষিত বড় বড় বাগানের অন্তরালে। অধিকাংশই হয় মন্দির নয় মঠ। ধর্ম-শালাও আছে। তাদের দু'একটি দখল করেছে পাঞ্জাবী বা সিন্ধী রিফুজিরা। বাকীগুলি ফাকা ফাকা মনে হয়। ফাকা ফাকা লাগছে রাজপথও।

তবে শুনলাম, ঐ যে বড় বড় প্রাসাদগুলি এখন খাঁ খাঁ করছে, শূন্য পড়ে আছে বিরাট বিরাট এক একটি প্রাঙ্গণ, সেইগুলিই যে কোন একটি যোগের সময় মৌমাছির চাকের মত রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে উঠবে, পথের ধারে, গাছের নীচেও তখন স্থান পাবে না অনেক যাত্রী।

তার মানে এখন যেমন আমাদের কলকাতা! মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম যে, কুম্ভ মেলা বা অন্য কোন যোগস্নানের সময় এটি নয়।

কনখলের শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে শাশ্বত যোগভূমির আভাস পাচ্ছি যেন।

কিন্তু এই গঙ্গা নাকি? জিজ্ঞাসা করতে করতে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে মনটা দমে গেল। নিঃসংশয়ে খরস্রোতা। ঘাটেই যে বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি দেখছি জলের উপর মাথা তুলে আছে তাও মনে হ'ল যেন স্রোতের টানে কাঁপছে। কিন্তু ওপার যে একেবারে চোখের সামনে। জলের কাছাকাছি নরম পলিমাটি চোখে পড়ছে, উপরে শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র। যত তাকাই ততই মনে হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গে এই ভাদ্র মাসে এরকম শুখিয়ে যাওয়া-খাল আমরা ত দেখেছি দু'একখানা গ্রাম পরে পরেই।

তুলনায় অনেক বেশী প্রশস্ত যে কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী একটু পরেই রিক্সা চড়ে পুলের উপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম তাও শুনি নহর, মানে সরকারী খাল।

ওপারে হরিদ্বার একালের শহর। রেডিয়োতে 'লারে লাপ্পা' জাতের গান কাণে এল, দেখলাম যে সিনেমাও আছে।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে, রেলের সড়ক মাথার উপর রেখে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে রিক্সা থামল একসারী পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে। সামনের টিলার উপর বিল্বকেশ্বরের মন্দির। সেটি অতিক্রম করে নীচের উপত্যকায় নামলে তবে মিলবে সতীকুণ্ড। এবার হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। ভালই হ'ল। শ'দুয়েক মাইল চড়াই-উতরাই ভাঙবার সঙ্কল্প নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়েছি। এখানে একটু রিহার্স্যাল দেওয়া মন্দ কি!

শিবের জন্য সতী যেখানে তপস্যা করেছিলেন, এ নাকি সেই স্থান। প্রথমে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন মহাদেব সাধিকার কাছে। চিনতে না পেরে বিরক্ত হয়েছিলেন সতী, ক্রুদ্ধ হয়ে-ছিলেন অপরিচিত পুরুষের দুঃসাহসিক ধৃষ্টতা দেখে। তার পর মহাদেব যখন সকৌতুকে হাসতে হাসতে নিজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করলেন তখন সে কি দুরবস্থা সতীর—না পারেন চলতে, না স্থির থাকতে।

কিন্তু কোথায় শিব আর কোথায় সতী? চাপ চাপ সিন্দুর আর রাশি রাশি ফুল-পাতার অন্তরালে কোন বিগ্রহই স্পষ্ট দেখা যায় না। পূজা বলতে ঘটি ঘটি জল ঢালা আর কিছু ফুল-পাতা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রধান অনুষ্ঠান যেন মন্দির পরিক্রমা। তা ক্লান্তপদে ঘর্ম্মসিক্ত দেহে তেমন মধুর লাগে না। মন্দিরের পরি-বেশেও কোন মোহ নেই। পাহাড়টি নেড়া নেড়া, উপত্যকা মনে হয় অন্ধকার।

কেবল একটি ব্যতিক্রম—মরুভূমিতে ছোট্ট একফালি মরূদ্যানের মত। সতী মন্দিরে যাবার সময় দুটিমাত্র পয়সা দিয়ে প্রায় এক সাজি ফুল কিনেছিলাম ছোট একটি মেয়ের কাছ থেকে। তখন ভাল করে দেখিনি তাকে, ফিরতি পথে দেখলাম। পাহাড়ী মেয়ে,

বেঁটে গড়নের কিশোরী। জানু থেকে ঘাড় গলা পর্য্যন্ত কালোপানা কম্বলের মত মোটা একখানি মাত্র বস্ত্রে ঢাকা। কিন্তু নিটোল, সুগোল দুটি বাহু সম্পূর্ণ অনাবৃত, তেমনি তার মাথা ও মুখখানিও। বেণী নয়, অযত্ন-বর্দ্ধিত, অসংস্কৃত কেশরাশি জটার মত ঝুলছে ওর পিঠে, কাঁধের উপর দিয়ে বুকের কাছে, সাপের মত ফণা তুলে আছে ললাটের উপর। অমার্জ্জিত মুখমণ্ডলে বেশ দেখা যায় চাপ চাপ ময়লা। তবু, অথবা বোধ করি সেই জন্যই আরও বেশী চোখে পড়ে তার পাকা সোনার মত রঙ, আপেলের মত গাল, কাকাতুয়ার ঠোঁটের মতই টুকটুকে লাল দুটি ওষ্ঠ, মুক্তার মত ঝকঝকে দন্তপংক্তি আর নৃত্যচটুলা পার্ব্বত্য নির্ঝরিনীর মতই তার হাস্যোজ্জ্বল চোখ দুটির চঞ্চল দৃষ্টি।

সেই দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি গিয়ে মিলতেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, দর্শন মিলা?

ঘাড় নাড়লাম মন্ত্রমুগ্ধের মত। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে তাকালাম মেয়েটির দিকে। তখন যেন মনে আর তত ক্ষোভ নেই। মনে হচ্ছে যে মহাদেবের না হোক, গৌরীর দর্শন যেন পেয়েছি।

খাস হরিদ্বারে অন্যরূপ—যেন রাজ-সাজ। গঙ্গা তীরে বড় বড় মঠ, মন্দির—ভোলাগিরির আশ্রম, গীতাভবন, মায়াদেবীর মন্দির আরও কত কি! উঁকি দিতে দিতে শেষ পর্য্যন্ত একটির ভিতরে ঢুকে গেলাম।

গঙ্গার তীরেই অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট প্রতিষ্ঠান। শুনলাম যে, একাধারে শিক্ষা ও সাধনক্ষেত্র। জিজ্ঞাসুরা আশ্রমের টোলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, সংসারবিরাগী মুমুক্ষুরা করেন সাধন-ভজন।

মোটামুটি সংবাদ পেলাম একজন মাঝবয়সী সাধু না বিদ্যার্থীর মুখে। বাঙালী তিনি। একখানি খোলা বই হাতে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পড়ছিলেন, আমাদের দেখে নীচে নেমে এসে সহাস্যমুখে সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি।

কথা বলতে বলতে তাকিয়ে দেখছিলাম ছোট ছোট ঘরগুলি। অধিকাংশই তালাবন্ধ। যে দু'একখানি খোলা তার ভিতরে খাটিয়া কি তক্তপোষ চোখে পড়ল। পরিপাটি শয্যার উপর গেরুয়া রঙের চাদর পাতা। রঙটুকু উপেক্ষা করলে যে-কোন সমৃদ্ধ কলেজের ছাত্রাবাস মনে করা যায়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটু বাগানের মত, ইট-সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা মসৃণ কয়েকটি বিশ্রামের আসন ও একখানা কাঠ ও বেতের আরাম-চৌকিও রয়েছে দেখলাম। সেটিতে বসে আছেন আর একজন সন্ন্যাসী। বৃদ্ধ তিনি, শীর্ণদেহ, মুখের ভাব মনে হ'ল ক্লিষ্ট।

কিন্তু বড় শান্ত পরিবেশ। রাস্তা পার হলেই গঙ্গা। তার ভীষণ গর্জ্জন এখানে দাঁড়িয়ে শোনা যাচ্ছে যেন কুলুকুলু নাদ।

জিতেনকে একটি ঠেলা দিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, থেকে গেলে হয় এখানে। দেবে থাকতে?

জনান্তিকে বলেছিলাম, কিন্তু শুনে ফেলেছেন সাধু। তিনি সহাস্যকণ্ঠে বললেন, আচার্য্যকে বলুন। তাঁর অনুমতি হলেই থাকা যায়।

ঋষিকেশের গঙ্গা

জিতেন আমার দিকে চেয়ে হাসল, দুষ্টামির হাসি। বললে, তবে সাবধান মণিদা, অভিমন্যুর দশায় পড়বেন না যেন। ঢুকবার আগে বেরুবার রাস্তা জেনে নেওয়া দরকার।

শুনে সাধু কিন্তু পরিহাস তরলকণ্ঠেই বললেন, ঢুকতে যদি পারেন ত বেরুবার রাস্তা খুঁজতে হবে না। তা সব সময়েই খোলা পাবেন।

আমি অপ্রতিভ বোধ করছিলাম। বললাম, এরকম স্থানে আসবার পর আবার ছেড়ে যায় নাকি কেউ?

উত্তর হ'ল, যায় বই কি। আর গেলে দোষও ত কিছু নেই। সন্ন্যাসী হলে তাঁর ত আর কোন বন্ধনই থাকে না।

একটু থেমে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে নির্দ্দেশ করে তিনি আবার বললেন, ঐ যেমন উনি। প্রায় পাঁচ বছর এক মঠে থাকবার পর ছেড়ে বের হয়ে এসেছেন। এখন উনি পরিব্রাজক। এ আশ্রমে দু'দিনের অতিথি মাত্র।

ফিরে তাকিয়েছিলেন তিনিও, কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মনে হ'ল যেন একটু বিরক্তই হয়েছেন তিনি।

অস্বস্তির ভাব বেড়ে গেল আমার মনে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

এবার সোজা ব্রহ্মকুণ্ড। কুম্ভস্নান ত ওখানেই হয়। কত-শত বৎসর পূর্ব্ব থেকে চলে আসছে, কে জানে। আজও এই বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ও লক্ষ

লক্ষ গৃহী নরনারী নির্দ্দিষ্ট যোগের সময় ঐ কুণ্ডে একটি ডুব দেবার জন্ত সকল রকম ক্লেশ সহ্য করে এখানে ছুটে আসেন। নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন তাঁরা যে, এর ফলে তাঁরা অমৃত লাভ করবেন। এত যার প্রতিষ্ঠা, অমন যার আকর্ষণ, কেমন সে কুণ্ড?

দেখে কিন্তু নিরাশ হতে হ'ল। কত শাস্ত্রে কত উপাখ্যান এই ব্রহ্মকুণ্ড সম্বন্ধে। তবু চোখে দেখে মনে হয় যে, ওর সার্থক-বর্ণনা সেই শাস্ত্রকারই করেছেন যিনি বলেছেন যে, গঙ্গা এখানে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডলু বলেই আয়তনে যা একটু বড়।

দেখে আর একটি দৃশ্য মনে পড়ল। কন্তাকুমারীতে গিয়ে যে রাজকীয় হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে দেখেছিলাম সমুদ্রের পুকুর—তিন তিনটি সমুদ্রের সঙ্গম যেখানে এবং যাদের একটি আবার মহাসমুদ্র, সেখানেই বেলাভূমিতে পাথরের উঁচু প্রাচীর তুলে একটি মাত্র মাঝারি আকারের ফুটোর ভিতর দিয়ে এনে খানিকটা সমুদ্রের জল আটক করে তরঙ্গভীত ভ্রমণকারীর সমুদ্র-স্নানের অক্ষম বাসনার আংশিক পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কেইপ হোটেলের কর্তৃপক্ষ। এও যেন তাই। সিমেণ্ট-কংক্রীটের বলয়-বেষ্টনীর মধ্যে গঙ্গার খানিকটা জল। যার বেগ ধারণ করবার জন্ত স্বয়ং মহাদেবকে তাঁর জটাজুটসমন্বিত বিশাল মস্তক তুলে দৃঢ়পদে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল সে জাহ্নবীর প্রবাহ হর-গৌরীর বলয়-বেষ্টনীর বাইরে। তাড়াতাড়ি পুল পার হয়ে হরের পিঁড়ির শেষ সীমায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

এতক্ষণ পর পরিপূর্ণ তৃপ্তি।

সঙ্গম নয়, কিন্তু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবার পূর্ব্বের অবস্থা ওখানে গঙ্গার। বিপুল তাঁর আয়তন, প্রবল তার উচ্ছ্বাস। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে চাওয়া যায়, দেখা যায় শুধু জল আর জল। তরঙ্গ নেই, কুটিল আবর্ত্ত নেই, আছে শুধু গতি—বিপুল, বিশাল জলরাশির অবিরাম ক্ষুরধার গতি। আর আছে যেন নিখুঁত তানলয়সমন্বিত অসংখ্য জলতরঙ্গের সমাপ্তিহীন সুললিত ঐকতান সঙ্গীত।

ওপারে অনেক দূরে ডানদিকে দেখি স্তবকে স্তবকে কনখলের অগণিত তরুশ্রেণীর পুঞ্জীভূত নীবিড় শ্যামলিমা। বামে আকাশচুম্বী হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর কোলে কোলে মনোহারিণী নীলমায়ার চঞ্চল-নৃত্য। উভয়ের মাঝখানে শ্যাম ও নীলের শিখর থেকে অনেক নীচে এক অস্পষ্ট ধূসর রেখা সমান্তরালে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রলম্বিত। বন্দিনী জাহ্নবীর চরণে আর একটি শৃঙ্খল ওটি। কনখল শহরকে বন্তার সর্ব্বনাশা গ্রাস থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আর একটি বাঁধ তুলে গঙ্গার মূলধারাকে হিমালয়ের কোলের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্যই ত কনখলের ঘাটে দাঁড়িয়ে অমন শীর্ণ দেখেছিলাম গঙ্গাকে। ও ত জাহ্নবীর দাক্ষিণ্য নয়, মানুষের দয়ার দান। সেচ-বিভাগের বাস্তকারেরা কল টিপে গঙ্গার মূলধারা থেকে যতটুকু জল ছেড়ে দিয়েছেন, কনখলের খাল তার বেশী পাবে কোথায়?

পাশের একজন যাত্রীর হাত থেকে তার দূরবীণ ধার নিয়ে তাই চোখে লাগিয়ে তাকালাম বামদিকে নীলাভ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে, বেশ চোখে পড়ল এবার। তিনতলা বাড়ীর সমান উঁচু বাঁধের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মূল গঙ্গার বিপুল জলধারা দ্বিগুণ বেগে ওপারে হিমালয়ের কঠিন শিলাময় চরণপ্রান্তে গিয়ে প্রবল আবেগে আছাড় খেয়ে পড়ছে আর পুঞ্জে পুঞ্জে ভেসে উঠছে অপরিমেয় শুভ্র-ফেনরাশি।

কালিদাসের বিরহী যক্ষের মুখে মহাদেবের মাথায় বিপুল জটা-জালের আশ্রয়ে স্বর্গ থেকে সন্তাবতীর্ণা গঙ্গার বর্ণনা মনে পড়ে গেল :

তস্মা'দ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্তাং সগরতনয় স্বর্গসোপান পঙক্তিম।
গৌরীবক্ত্র ভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণম করোদিন্দুলগ্নোর্ম্মি হস্তা।

মহাকবি ত এই কনখলেই গঙ্গার অবতরণ কল্পনা করেছিলেন, হয়ত এপারে কাছাকাছি কোন জায়গায় দাঁড়িয়েই গঙ্গার ফেণোচ্ছল মূর্ত্তি দর্শন করেছিলেন তিনি। সেদিনের রূপটি একালে ঠিক তেমনই না থাকলেও আজও জাহ্নবী সপত্নী-বিদ্বেষে জর্জ্জরিতা গৌরীর ভ্রূকুটিকে উপহাস করে ওপারে তেমনই ফেনার হাসি ফুটিয়ে ছুটে চলেছেন।

হরকী পৌড়ী কাশীর যে কোন ঘাটের মত। একটু দূরে দূরেই শাস্ত্রপাঠ বা কথকতা চলছে। সাধুরা বসে আছেন নানা ভঙ্গিতে। পাণ্ডারা শাস্ত্রীয় কৃত্য করাচ্ছেন তাদের যজমানদের দিয়ে। ফুলের মালা বা প্রিয়জনের মঙ্গলকামনায় জলন্ত প্রদীপ খরস্রোতা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যুবতীদের মত বৃদ্ধারাও দুরুদুরুবক্ষে শঙ্কিতনয়নে ওদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মানুশীলনের সঙ্গে সমান তালে চলেছে ব্যবসা। পায়ে পায়ে দোকান, পায়ে পায়ে ফেরিওয়ালা। পুরোদমে বেচা-কেনা চলছে—তীর্থমাহাত্ম্য প্রচারের পুস্তিকার সঙ্গে নানারকম ঔষধ দেবভোগ্য মণ্ডামিঠাইয়ের সঙ্গে মৎস্যভোগ্য চার। আটার সঙ্গে আরও কি কি মিশিয়ে নাড়ুর মত আকারের মাছেদের মিষ্টান্ন। বড় বড় ডালায় তাই সাজিয়ে নিয়ে ছেলেবুড়ো, স্ত্রীপুরুষ ঘুরে ঘুরে বেচছে সেই নাড়ু। নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা তাদের। শেষ বর্ষার ঘোলা জলে মাছ তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না বলেই ওদের প্রতিযোগিতা আরও তীব্র। মাছ ভাসিয়ে তুলে যাত্রীকে দেখিয়ে তবে তার কাছে মাল বেচবে বলে কতজনের কত নাড়ুই অপচয় হতে দেখলাম। কোন লাভ নেই জেনেও তাদের মুখের দিকে চেয়ে না কিনে পারলাম না তাদের মাল। কিনতে হ'ল একাধিক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে।

সারি সারি খাবারের দোকানে সস্তাদামের রুটি-তরকারি ও ভাজাভুজি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। জিতেন বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। দোকানে খাবার তৈরি আছে, চারিদিকে আছে সাধু-

সন্ন্যাসী ও দরিদ্রনারায়ণ। দু-এক আনা, এমনকি দুটিমাত্র পয়সা খরচ করেও কাছে বসিয়ে অতিথিসৎকার করে পুণ্যসঞ্চয় করতে পার।

তবে ব্যতিক্রমও আছে। বড় বড় ইংরেজী ও দেবনাগরী হরফে নোটিশ চোখে পড়ল চলতে চলতেই—সমর্থ ব্যক্তিকে ভোজ্য বা ভিক্ষা দিয়ে অলসতার প্রশ্রয় দেবেন না।

একদিকে সেকালের প্রদোষ, আর একদিকে একালের উষা। যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন উষার বর্ণচ্ছটা আরও প্রস্ফুটিত হচ্ছে। গঙ্গার বুকে সান-বাঁধানো চত্বরে ধর্ম-পিপাসু যাত্রীদলের ভীড়ের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মর্মরমূর্তি দেখে মন্ত্রাভিভূতের মতই গতি থেমে গেল আমাদের। তৎক্ষণাৎ আমার স্মৃতির পটে একটি যুগের ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যেন—কত বেদনা আর কি গৌরবের সে ইতিহাস!

অতঃপর উত্তরাখণ্ডের পথে যতই এগিয়ে গিয়েছি ততই শুনেছি "সুভাষবাবুর" কথা। কুলি, পাণ্ডা, চটিওয়ালা আমাদের বাঙালী বলে চিনতে পারলেই পরক্ষণেই নেতাজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেছে। জলন্ত বিশ্বাস তাদের যে, সুভাষবাবু জীবিত আছেন, আবার ফিরে আসবেন তিনি এবং তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবাসীর দুঃখ ও দারিদ্র্য সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতই দূর হয়ে যাবে।

রাত্রে খুঁত খুঁত করেছিল মনটা। সকালে উঠেই জিতেনকে বললাম, চল গঙ্গায় স্নান করে আসি।

সে সবিস্ময়ে বললে, আবার যাবেন সেই ব্রহ্মকুণ্ডে?

না, অতটা পারব না, উত্তর দিলাম আমি। তবে হরিদ্বারে এসেও গঙ্গাস্নান যদি না করি তবে দেশে ফিরে মুখ দেখাব কেমন করে? তাই ভাবছি যে, বাড়ীর কাছেই কাল যাকে দেখলাম তিনি স্বয়ং গঙ্গা না হলেও তাঁরই ত দুহিতা বা দৌহিত্রী। ঐখানেই একটা ডুব দিয়ে আসি, চল।

কিন্তু অতিথি ভবনের পরিচ্ছন্ন আধুনিক স্নানাগার ছেড়ে গঙ্গায় যেতে রাজী হ'ল না জীতেন। সুতরাং সর্বাঙ্গে তেল মেখে শুধু গামছাখানা দিয়ে বুক পিঠ ঢেকে একাই চললাম কনখলের গঙ্গায়।

আশ্চর্য ব্যাপার। এ তীর্থ মাহাত্ম্য নাকি? না উত্তরাখণ্ডের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এটি?

"শহুরে" বলে বন্ধুমহলে অখ্যাতি আছে আমার। তার উপর আছে বুকের ব্যারাম, আক্ষরিক অর্থে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর আমার দেহের চর্ম। কলকাতার বাসায় চৈত্র-বৈশাখ মাসেও গরম জলে স্নান করি আমি। অথচ সেই আমিই গঙ্গা স্নান করে তা উপভোগ করলাম!

একখানা পাথরের উপর বসে জলে হাত ডুবাতেই অবশ্য বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত হাত টেনে নিয়েছিলাম—এতই ঠাণ্ডা ঐ জল। কিন্তু সাহস করে কোমর জল পর্যন্ত নেমে তোয়ালেখানা ভিজিয়ে মুখে একবার বুলাতেই সবই বদলে গেল যেন। অনাস্বাদিতপূর্ব স্নিগ্ধ স্পর্শ। হাত-পা, বুক-পিঠ যত রগড়াই ততই যেন বেশী করে বুঝি দেহমন জুড়িয়ে যাওয়া কাকে বলে। যত ডুব দিই ততই যেন আরও ডুব দিতে ইচ্ছা হয়। উপরে উঠে গা-মুখ মুছে শুখনা কাপড় পরবার পর মনে হ'ল বুঝি নবজন্ম হয়েছে আমার।

ফিরে এসে দেখি যে জীতেন ঝোলাঝুলি বেঁধে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে বললে, আমি গঙ্গা দেখব ঋষিকেশে গিয়ে—দু' পাঁচ মিনিট নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেন, জানেন?

নিজেই বুঝিয়ে বললে সে, ঋষিকেশের গঙ্গার বর্ণনা স্বামী বিবেকানন্দের বইতে পড়েন নি? আমি পড়েছিলাম বাংলা পড়তে শিখবার পরেই। সে দিন যে কৌতূহলের বীজ পড়েছিল আমার মনের মাটিতে প্রায় ত্রিশ বছর পর তারই ফল ফলেছে এই আমাদের যাত্রায়। আসল যাত্রার সুরুও ত হবে ঐ ঋষিকেশ থেকেই। সুতরাং এখানে আর সময় নষ্ট করা নয়।

বিদায় নিতে গেলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বললেন, আপনাদের মালপত্র বইবার জন্য কুলি চাই ত? একজন এসেছিল আমার কাছে—সের প্রতি দুটাকা হারে মজুরি নেবে সে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের চেনা লোক নাকি?

মুখ চেনা।

তবে থাক্‌, বললাম আমি, শুনেছি যে ঋষিকেশে কি একটা সরকারী না অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান আছে, যার মারফতে কুলি নিলে মালপত্র খোয়া যাবার ভয় কম।

কিন্তু অতিথিশালায় ফিরে যেতেই একটি লোক সেলাম করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গেই তেনজিংকে মনে পড়ে গেল আমার। তাঁরই আত্মজীবনীতে পড়েছিলাম যে,পার্বত্য পথের সঙ্গী তার মত বাহাদুর শেরপাকে 'টাইগার' মানে ব্যাঘ্র অভিধা দেওয়া হয়। সে সব মহারথীদের চোখে দেখি নি। কিন্তু এই লোকটিকে এক পলক দেখেই মন সায় দিয়ে ফেলল যে, একে বাঘ বলা যায়। বেঁটে গঠন, মোটা মোটা হাত-পা, চামড়ার রং গাঢ় হলুদ আর বাঘের মতই যেন মুখের গঠন তার। আরও আশ্চর্য সাদৃশ্য এই যে, কালো ডোরা কাটা একটি জামা গায়ে দিয়ে এসেছে সে। পার্থক্য কেবল তার মুখের ভাবে। চোখের দৃষ্টি তার নম্র, ভারী মিষ্টি ওষ্ঠ-প্রান্তের হাসিটুকু। ভয় জাগে না মনে তাকে দেখলে, বরং আশ্বাস পাওয়া যায়।

নাম কি তোমার—শের বাহাদুর?—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

না হুজুর, বীর সিং।

তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

না হুজুর, দুসরা লোক দেব আমি। এখান থেকেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

শুনে ভাটা পড়ল আমার উৎসাহে, বললাম, তবে দরকার নেই, ঋষিকেশে গিয়ে দেখা যাবে।

কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। লক্ষ্যই করিনি যে, পিছনে পিছনে এসেছে আমাদের। বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছবার পর ওরাই আমাদের মালপত্র গাড়ীতে তুলে দিল। আমি তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে ড্রাইভারের পাশের সীটটি দখল করে বসতেই বীর সিং আবার আমাকে একটি সেলাম ঠুকে জিজ্ঞাসা করল, ওর টিকেট কিনেছেন, বাবুজী?

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলাম, আমি কেন ওর টিকেট কিনতে যাব?

কিন্তু বীর সিং নির্ব্বিকার। সে বললে, কোই হরজা নেহি বাবুজী। নিজের পয়সা দিয়েই টিকেট কিনবে ও। ঋষিকেশে আপনাদের খিদমত করবে। আমিও আসছি সেখানে, এর পরের গাড়ীতেই।

বনের ভিতর দিয়ে পথ। বাস রেলের লাইন পার হ'ল বার-দুয়েক। মাঝে মাঝে ঝরণা চোখে পড়ছে, ছোটখাটো জনপদও। কিছু কিছু সহযাত্রীদের নেমে গিয়ে আবার ফিরে আসতে দেখে বুঝতে পারছি যে মন্দির আছে ওখানে। আমার মন ও চোখ অন্য দিকে। ভারী সুন্দর দৃশ্য সব। ঝা ঝা করা রোদ, দূরে দূরে পাহাড়, কিন্তু মোটামুটি সমতল ছায়াশীতল পথ। মাঝে মাঝে ঝরণা দেখে মনে হয় যেন ওরই মত আমিও 'যত কাল আছে বহিতে পারি।'

ঘণ্টা দুই পর বাস যেখানে গিয়ে থামল সে জায়গাটা শহর। কিন্তু জীতেনের মুখের দিকে তাকাতেই সে বললে, আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু। আর রাজসিক আরামের খোঁজ করা নয়। এবার চলুন কোন ধর্ম্মশালায়।

কোথায় ধর্ম্মশালা? তা ছাড়া জীবনে কোন দিন ধর্ম্মশালায় থাকিনি, কি করতে হয় ওখানে আশ্রয় পাবার জন্য তার কিছুই জানা নেই—দিশেহারা হয়ে পড়লাম বই কি! কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কে একজন লোক আমাদের লটবহর নামিয়ে রাজপ্রাসাদের মতই বিরাট এক চারতলা বাড়ীর দেউড়িতে কার যেন হেফাজতে সে সব রেখে খানিকটা দূরে আর একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল আমাদের। কালীকমলী ওয়ালার ধর্ম্মশালার দফতর ওটি। ওখান থেকে টিকেট পেলেই থাকবার ঘরও খোলা পাওয়া যাবে।

কত দিতে হবে? কিছুই না। জমিদারী সেরেস্তার মত একটি দপ্তরে আধ-ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর যে যুবক কর্ম্মচারীটি আমাদের নামধাম লিখে নিয়ে আমার হাতে একটি টিকেট দিল সে, আমার প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে বললে, বাবার ধর্ম্মশালায় থাকবার জন্য ভাড়া লাগে না, বাবুজী। তবে সদাব্রতের জন্য কিছু দান করবার ইচ্ছা যদি হয় ত ঐ বাক্সে ফেলে দিন।

ধর্ম্মশালায় থাকবার ঘর ভালই। কিন্তু রান্নাঘরের অবস্থা দেখেই জীতেনের মুখ শুকিয়ে গেল। সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, হোটেলের মত কিছু এখানে আছে কি না, খুঁজে দেখলে হয় না?

খুঁজতে হ'ল না। রাস্তার ওপারেই পাঞ্জাবী হোটেল—আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য পাঞ্জাবী রিফ্যুজির উদ্যোগ।

খাওয়া সেরে ধর্ম্মশালায় নিজেদের ঘরে যাব, দেউড়িতে ঢুকতেই দেখি সেই বাঘমুখো বীর সিং। বাবু মতন একটি যুবককে দেখিয়ে সে আমায় বললে যে, সরকারী সমিতির কেরানীকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে, এখন আমি রাজী হলেই কুলির সঙ্গে আমার চুক্তি পাকা হয়ে যেতে পারে।

কাগজপত্র ঠিকই আছে দেখলাম। সত্যই রেজেষ্টারী করা সমিতি—নাম তীর্থযাত্রা মজদুর এজেন্সি। তা ছাড়া হরিদ্বারে থাকতে মনে যে জেদ ছিল তা আর এখন নেই। এই অপরিচিত দেশে অত সব লটবহর নিয়ে আমার মত দুর্ব্বল দেহ লোক কত যে অসহায় তা বেশ বুঝতে পারছি তখন। আর যে লোকটি ইতি-মধ্যেই আমি না চাইতেই এবং আমার অবজ্ঞামিশ্রিত ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করেই এতক্ষণ অত সাহায্য করেছে আমাদের, তার প্রতি নিজের অজ্ঞাতসারেই কৃতজ্ঞতায় সিক্ত হয়েছে আমার মন। সুতরাং তার সঙ্গেই চুক্তি করতে রাজী হয়ে গেলাম।

সের প্রতি দুই টাকা হারে মজুরি, আমাদের দুজনের মাল এক মণ দশ সেরের জন্য মোট এক শত টাকা শুধা মজুরি। তার মানে পথে কুলি খাবে তার নিজের খরচে, বাস ভাড়া দেবে তার নিজের মজুরি থেকে।

একুশ টাকা অগ্রিম দিলাম কুলিকে। তা থেকে এক টাকা সমিতির প্রাপ্য, দশ টাকা গেল বীর সিংয়ের পকেটে। বুঝি ওটা তার কমিশন।

(৩)

হৃষিকেশ না ঋষিকেশ? ধাঁধা লেগেছিল হরিদ্বারে থাকতেই। দেবতার নামটিতেই অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু বাসের গায়ে দেখলাম বড় বড় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা রয়েছে ঋষিকেশ। এখানেও সর্ব্বত্রই দেখি ঐ বানান। ঐটিই যে যথার্থ নাম, অন্ততঃ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম একটু পরেই। হৃষীকেশ একক আছেন তাঁর নিজস্ব মন্দিরে, কিন্তু ঋষিদের দেখছি সর্ব্বত্র।

শহর আর কতটুকু? বাজার এলাকা অতিক্রম করে লছমন-ঝোলার দিকে যত এগিয়ে যাই ততই ঋষিদের দেখছি। দেখছি তাঁদের আশ্রম, তাঁদের তপোবন। গঙ্গার উভয় তীরেই ছোট বড় মঠ ও মন্দির। ওপারে গীতাভবন ও এপারে স্বামী শিবানন্দের দিব্যজীবন সমিতির (Divine Life Society) নাম ও প্রতিষ্ঠা ভারতবিখ্যাত। গঙ্গার বুকে ছায়া পড়েছে এ সব নাম-করা প্রতিষ্ঠানের প্রাসাদের মত ভবনের। তা ছাড়াও আরও কত আশ্রম। ঝোপের মধ্যে, গাছের নিচে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কুটির। পাকা গাঁথুনীর বাড়ীও এ কুটিরই মনে হয়। যে কোন উপাদান কোন রকমে স্তূপাকারে সাজিয়ে মাথা গুঁজবার

ঠাই আর কি। তবু ছবির মত বলতে যদি হয় তবে এদের সম্বন্ধেই বলব সে কথা।

লছমনঝোলা পার হয়ে নীলকণ্ঠ পর্ব্বতের পাদমূলে স্বর্গাশ্রমের পথে চলতে চলতে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে নির্ব্বাক হয়ে যাই। পথের দু'ধারেই সারি সারি আম গাছ—সাধুদের উদ্দেশে নিবেদিত ভক্তদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য। ছায়া-সুশীতল প্রায় নির্জ্জন পথ। গাছের ফাঁক দিয়ে ডান দিকে গঙ্গার পারে ও বাম দিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে সত্যই শান্তির নীড় ঋষিদের আশ্রম চোখে পড়ছে। শুনলাম যে, অধিকাংশ কুটিরই সাধুরা নিজের হাতেই গড়েছেন। ইটের উপর ইট বা পাথরের উপর পাথর বসিয়ে মাটি দিয়েই লেপে দিয়েছেন হয় ত দেয়াল। সামনে তেমনই সুমার্জ্জিত ছোট একটু প্রাঙ্গণ। কোনটিতে দু'চারটি ফুলগাছও আছে। আবার কোন কোন সাধুর কুটির বলতে হয় ত পর্ব্বতের একটি সঙ্কীর্ণ গুহাই, শুধু প্রবেশপথটুকু ঢাকবার জন্যই বাইরের উপাদান ব্যবহার করেছেন তাঁরা। এই রকম যার যার কুটিরে একা একা বাস করেন সাধুরা, আপন মনে সাধন-ভজন করেন।

স্বর্গাশ্রমের এলাকায় প্রবেশ করবার পর আর কণ্বমুনির আশ্রমের কথা মনে পড়ে না। শকুন্তলা-অনসূয়া দূরে থাক, গৌতমীকেও মনে করিয়ে দেবার মত কেউ নেই কোথাও। নেই কোন শিশুও। স্বয়ং ঋষিদের অবস্থিতিও এখানে প্রধানতঃ অনুমানসাপেক্ষ। আত্মগোপন করাই ধর্ম্ম নাকি ওঁদের। রাজপথ থেকে বেশ একটু দূরে দূরেই তাঁদের কুটির। পথের ধারে এসে বসেন নি কেউ। বহু-পরিচিত ভিক্ষা প্রার্থনা একবারও কানে এল না এখানে, কারও চরণে প্রণামী অর্পণ করবারও সুযোগ পেলাম না। কেবল দূর থেকে দেখলাম—কেউ হয় ত তাঁর কুটিরের প্রাঙ্গণে সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন বা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার ঘাটে নেমে যাচ্ছেন। নিরাসক্ত দৃষ্টি তাঁদের চোখে—হয় ত উদাস, হয় ত বা ঢুলু ঢুলু ভাববিহ্বল। আর একটি জগতের কোন এক দুর্লভ বস্তু লাভ করেছেন বলেই বুঝি এ জগতে কিছুই যেন তাঁদের চাইবার নেই।

সামান্য ব্যতিক্রম দেখলাম কেবল একজনের মধ্যে। স্বর্গাশ্রমের এলাকায় প্রবেশ করেই দেখেছিলাম তাঁকে। পথের ধারে একটি গাছের নিচে বসে ছিলেন তিনি। আমরা বার বার তাঁর দিকে তাকাচ্ছি দেখে তিনি নিজেই আমাদের সম্ভাষণ করলেন। বাংলায়।

আপনারা বাঙালী?

কিন্তু তার পর আর কোন কথা নয়, কেবল হাসি আর ইঙ্গিত।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিন এখানে বাস করছেন আপনি?

ইঙ্গিতে বোঝালেন, কে ওসব হিসাব রাখে।

শান্তি পেয়েছেন?—মূঢ়ের মত প্রশ্ন আমার, হয় ত উদ্ধতও।

কিন্তু তিনি হাসলেন, সে হাসি যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

বিস্ময়কর তাঁর ঐ প্রথম সম্ভাষণটিই—আপনারা বাঙালী?

ভাষার যে ঐক্য তার টান কি সংসারত্যাগী সর্ব্বমোহমুক্ত সন্ন্যাসীর চিত্তকেও বিচলিত করে? তবে আমাদের দেশের কয়েকজন বড় বড় নেতা সে কথা বোঝেন না কেন?

ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল আমাদের কর্ম্মসূচী। ঋষিকেশের গঙ্গা দেখবার জন্য অত সাধ জিতেনের। আমারও কম নয়। কিন্তু যেটি খাস ঋষিকেশের খাঁটি ঘাট সেখানে গিয়েই আমাদের দু'জনেরই চক্ষুস্থির। একে মাথার উপর দুপুরের সূর্য্য, তায় আবার ধূ ধূ করছে বালির চর। এপারে কাছাকাছি একটিও গাছ নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে বালি পার হয়ে জলের কাছে গিয়ে দেখি যে, হাত-দশেক জায়গার মধ্যেই লাখখানেক গোল গোল উপলখণ্ড ছড়িয়ে পড়ে থাকলেও যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্য্যন্ত আরাম করে বসবার মত জুতসই পাথর একখানিও নেই। স্বামীজী এ ঘাটের কোথায় যে বসে গঙ্গাদর্শন করেছিলেন তা ভেবে পেলাম না আমি। সুতরাং আমাদের গঙ্গাদর্শন আপাততঃ স্থগিত রেখে আগে লছমনঝোলা দেখাই স্থির করেছিলাম আমরা।

ধর্ম্মশালার কাছে ফিরে এসে শুনি যে, সেদিন বাস আর ওদিকে যাবে না। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন, একজন টাঙ্গাওয়ালা দু'জন মহিলাকে তার গাড়ীতে বসিয়ে আর দু'জন যাত্রীর খোঁজ করছিল। শুনেই রাজী হয়ে গেলাম আমরা—মাথাপিছু ভাড়া দিতে হবে মোটে আট আনা।

তখন তাকিয়ে দেখি নি তাঁদের দিকে। টাঙ্গাতে আমরা দু'জন সামনের সীটে বসবার পর মাঝে মাঝেই তাঁদের কোন এক জনের মাথার সঙ্গে আমার মাথার ঠোকাঠুকি হতে থাকলেও সে সময় তাঁদের কারও মুখ দেখবার উপায়ই ছিল না। দু'জনকেই প্রথম ভাল করে দেখলাম লছমনঝোলার উতরাই-এর মুখে টাঙ্গা থেকে নেমে প্রথম যখন মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা।

একজন বৃদ্ধা আর একজন যুবতী। উভয়েই রঙীন শাড়ি কুঁচিয়ে পড়েছেন, উভয়েরই গায়ে পুরোহাতা ব্লাউজ—গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা, পায়ে জুতা, বাম কাঁধে সুতী-কাপড়ের ঝোলা। ভদ্রঘরের হিন্দুস্থানী মহিলাদের সাজ। তবু এক নজরেই বোঝা যায় যে, ওঁরা সমতলবাসিনী নন। গৌরবর্ণে লালের চেয়ে হলুদের অংশ বেশী। হাতের আঙুল দেখলেই বোঝা যায় যে, রীতিমত পেটা-শরীর ঐ যুবতীর। গোলগাল মুখ, খেবড়া নাক ও ছোট ছোট চোখ। বৃদ্ধার লোলচর্ম্মেও স্বাস্থ্যশ্রী আছে। যুবতীর চোখ দুটি অবিকৃত বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে।

সেই চোখ দুটি মেলে সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে যুবতী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারাও কেদার-বদরীর যাত্রী ত?

ঘাড় নাড়লাম।

কুলি ঠিক হয়েছে আপনাদের?

হ্যাঁ।

কি হারে ঠিক হ'ল ? জিজ্ঞাসা করছে যাতে আমরা না ঠকি।

হিসাবটা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর কে আছেন আপনাদের দলে ?

উত্তর হ'ল, কেবল আমি আর মা। আর কেউ নেই।

আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক। বোধ করি আমার মনের অবস্থা অনুমান করেই মেয়েটি হাসতে হাসতে বললেন, এ আর কি এমন কঠিন পথ ? আমি একাই ত মাকে কৈলাসও দেখিয়ে এনেছি। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি হয় ত আসছে বছর যাব গঙ্গোত্রী।

ভয় করে না আপনার ? জিতেন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

ভয় কেন করবে ? একটু যেন উদ্ধত মেয়েটির স্বর।

আমি মোলায়েম সুরে বললাম, মানে, দুর্গমপথ কিনা, তাই ওকথা মনে হয় আমাদের।

আমাদের কাছে দুর্গম নয়। মেয়েটি হেসে উত্তর দিলেন, এ পথে চলতে আপনাদের মত কষ্ট হয় না আমাদের। জন্ম থেকেই আমরা পাহাড়ে চড়াই-উৎরাই ভাঙছি।

এই অঞ্চলেই বাড়ী বুঝি আপনাদের ?

না, আলমোড়া ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ী। জন্ম নেপালে, কর্ম্ম উত্তরপ্রান্তে। সুতরাং দুটি দেশই আমি আপন বলে ভাবতে পারি।

একটু থেমেই তিনি আবার বললেন, তবে তাতে একটু অসুবিধাও আছে। দু'দেশের লোকই কেমন যেন পর পর মনে করে আমাদের।

শেষের দিকে চলতে চলতে কথা বলছিলাম আমরা। ওটা উৎরাই-এর পথ—খাড়া গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। দল ভেঙে গেল আমাদের। জিতেন দেখি অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছে, আর বৃদ্ধা রয়েছেন অনেকখানি পিছনে। মেয়েকে তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকতে বলে আমিও পা চালিয়ে এগিয়ে চললাম নিচের দিকে।

ডানদিকে লক্ষ্মণের মন্দির। দুর্গের মত সুরক্ষিত ভবন। ভিতরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেটি অতিক্রম করবার পর নাটমন্দির। মূল মন্দির আমাদের দেশের মত—বারান্দা থেকে বিগ্রহ দেখা যায়, কিন্তু যাত্রীর অধিকার নেই ভিতরে গিয়ে পূজা করবার। ভারি সুন্দর পরিবেশ, চমৎকার চিত্র-বিচিত্র দেয়াল ও স্তম্ভগুলি। ভিতরে সুন্দর মূর্ত্তি বিগ্রহের। হরিদ্বার ও ঋষিকেশে ক্রমাগত কদাকার বা আকারবিহীন দেবমূর্ত্তি দেখে দেখে মনে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল এক নিমেষেই তা সব মুছে গেল যেন। সুগঠিত, সুঠাম লক্ষ্মণের মূর্ত্তি এখানে। দেহের বর্ণ কালো না নীল, চোখ দুটি সাদা। রামসীতার বনবাস কালে গোদাবরী তীরে তাঁদের পর্ণকুটিরের সামনে সুদীর্ঘকাল রাতের পর রাত ধনুর্ব্বাণ হস্তে অতন্দ্রনয়নে দণ্ডায়মান থেকে যে জিতেন্দ্রিয় মহাবীর স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করেছেন, শিল্পীর বাটালি ও তুলিতে আমার সেই কল্পনার লক্ষ্মণই এই মূর্ত্তির মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যেন। সৌভ্রাত্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার সার্থক রূপায়ণ।

তবে পরিপূর্ণ তৃপ্তির মধ্যেও একটু বিহ্বল ভাব আমার। রামলক্ষ্মণকে মনে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে দণ্ডকারণ্য আর লঙ্কা। বড় জোর অযোধ্যা যা এখান থেকে অনেক নিচে পথে ফেলে এসেছি আমরা। উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে তাঁদের কি যে সম্পর্ক তা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত সে কাহিনী শুনলাম মাত্র একটি টাকা পারিশ্রমিক দেবার সর্ত্তে জিতেন ইতিমধ্যে যে পথপ্রদর্শক নিয়োগ করে বসেছে তার মুখে।

এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতির সঙ্গে স্বয়ং রাবণকে বধ করে লঙ্কা জয় ও সীতা উদ্ধার করবার পর শ্রীরামচন্দ্র গুরুর মুখে জানতে পারলেন যে, ধর্ম্মযুদ্ধে তিনি জয়ী হলে কি হবে, ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়েছে তাঁর। লক্ষ্মণেরও তাই। তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করতে না পারলে পাপক্ষালন হবে না তাঁদের। সুতরাং সেই গুরুর আদেশেই আবার রাজ্য ছেড়ে বনবাসে এসেছিলেন তাঁরা কৃচ্ছ্রসাধনা করতে। এই গঙ্গাতীরে এইখানেই নাকি লক্ষ্মণ তপস্যা করে পাপমুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তপস্যা করেছিলেন আরও অনেকখানি দুর্গম পথ অতিক্রম করে গিয়ে আরও উপরে দেবপ্রয়াগে।

শাস্ত্র না কিংবদন্তি ? বিচার করে স্থির করবার মত পাণ্ডিত্য নেই। কিন্তু শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ওপারে অন্ধকার-বর্ণ ঐ পাহাড়গুলির মতই বিষণ্ণ-গম্ভীর আমার মন। এও ভারতের শাশ্বত বাণীরই আর এক উপাখ্যানরূপ—যুদ্ধ দ্বারা কোন লাভ হয় না, ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হয়েও নয়।

হয়ত ভরত-শত্রুঘ্নও ওখানে তপস্যা করে থাকবেন—তাঁদেরও মন্দির কাছাকাছিই আছে। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরও আছে ওখানে। কিন্তু আর কোনটিই দেখা হ'ল না। ততক্ষণে স্বর্গাশ্রম হাতছানি দিয়েছে আমাদের।

স্বর্গাশ্রমের সীমান্ত সেটি হোক বা না হোক, আমাদের তপোবন পরিক্রমা শেষ হ'ল বাবা কালী-কমলীওয়ালার সদাব্রতে গিয়ে। সেটি অবশ্য প্রকাণ্ড ভবন। অনেকগুলি দালান, দফতর, ভাঁড়ার ঘর, রন্ধনশালা আর স্বয়ং বাবার সমাধিমন্দির। অনেক লোকজন কাজ করছে দেখলাম; শুনলাম যে এখান থেকেই সাধুরা নিয়মিত-ভাবে বিনামূল্যে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপকরণ পান। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজে। সেই ধ্বনি শুনে শত শত সাধু তাঁদের কুটির বা গুহা থেকে বের হয়ে চলে আসেন এখানে, সারি দিয়ে দাঁড়ান, খাবার নিয়ে আবার যার যার কুটিরে ফিরে যান। এক বেলা নয়, দু'বেলা; দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এমনই চলে আসছে।

কি খাদ্য পান তাঁরা ? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

— রুটি বা ভাত আর ডাল।

ওস্তেই চলে সাধুদের। গীতার শ্লোক মনে পড়ল: বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

এখান থেকে খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাবার সংক্ষিপ্ত পথ। খেয়ার কড়ি লাগে না, কারণ এও বাবার প্রতিষ্ঠানের যাত্রীসেবা।

ঘাট পর্য্যন্ত যেতে বেশ খানিকটা উতরাই ভাঙতে হয়। সেখানে গিয়েই দেখি সেই মা ও মেয়ে। বৃদ্ধা স্নান করে বসেছেন। সামনে ঘটিভরা জল, মেয়েটি তাঁর ঝোলা থেকে বের করছেন কিছু ফলমূল।

আমাদের দেখেই সহাস্য-সম্ভাষণ মেয়েটির। আর শুধুই কি তাই? তৎক্ষণাৎ তিনি বেশ বড় একটি আপেল জীতেনের হাতে প্রায় গুজে দিলেন, আমাকে দিলেন দুটি কলা। সম্পূর্ণ সহজ ব্যবহার, যেন কতদিনের চেনা আমরা। আমার মুখের দিকে চেয়ে পরিহাসতরলকণ্ঠে তিনি বললেন, আপনার ত চাচা, প্রায় আমার মায়েরই হাল। তাই নরম ফল দিলাম।

কটাক্ষ আমার দন্তহীনতার প্রতি; তাকিয়ে দেখি যে বৃদ্ধাও আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছেন।

কিন্তু হাসিতে কি সব ঢাকা পড়ে! ঢাকা পড়ে নি বৃদ্ধার পক্ককেশ, লোলচর্ম্ম, নিষ্প্রভ দুটি চোখ; ঢাকা পড়ে নি আরও নিচে বিষণ্ণতার হালকা-কালো কিন্তু স্থায়ী মেঘখানি।

হঠাৎ মুখে এসে গেল, ছেলে নেই আপনার?

বৃদ্ধা অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখিয়ে দিলেন যুবতীকে।

ঠিক বলেছেন, না বলে থাকতে পারলাম না আমি। ছেলে থাকলেও এর চেয়ে বেশী আর কি হ'ত।

তার পর যুবতীকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন কর্ম্মস্থানের কথা বলছিলেন। চাকরি-বাকরি করেন নাকি আপনি?

পরিচয় দিলেন তিনি। আলমোড়ার শহরতলিতে এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী তিনি। আরও বললেন, আলমোড়ার দিকে কখনও যদি যান দেখা করলে খুশী হব আমরা।

জীতেন ফস করে বলে বসল, দেখা করতে হলে আরও একটু সূত্র চাই যে।

মেয়েটি হেসে উত্তর দিলেন, আমার নাম দাদা, গঙ্গোত্রী। ওখানে গিয়ে এই নাম বললে আমার বাসা খুব বেশী খুঁজতে হবে না।

বড় ভাল লাগছে এই বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ মেয়েটিকে। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম, নামটা মনে হচ্ছে, ঠিক রাখা হয় নি। যেরকম ছুটতে পারেন আপনি তাতে আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল ভাগীরথী।

এবার মেয়েই অঙ্গুলিসঙ্কেতে তার মাকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আমি ছুটছি ত ওঁর জন্য।

তাই অনুমান করেছিলাম আমি। তথাপি খেয়া নৌকাতে উঠে বসবার পর গঙ্গোত্রীকে চুপি চুপি বললাম, আপনার মায়ের যা বয়স তাতে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁকে ঘরে রাখাই ত ভাল।

গঙ্গোত্রী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, চেষ্টা কি আর কম করেছি! কিন্তু উনি মানেন না। আমি সঙ্গে না এলে হয়ত একাই বেরিয়ে পড়বেন।

নিজেও জানি, বৃদ্ধবৃদ্ধাদের স্বভাবই তাই। উত্তরে বলবার মত কোন কথা আমার মনে এল না। কিন্তু একটু থেমে গঙ্গোত্রীই আবার বললেন, তবু ভাবি যে, এই ভাল। তবু ত আশা আছে। আর আশা আছে বলেই বেঁচেও আছেন।

কিসের আশা? আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তর না পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি গঙ্গোত্রী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একটু বিব্রত ভাব নাকি তার।

তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করলাম, Do you mean faith?

গঙ্গোত্রী যেন উৎফুল্ল হয়ে উত্তর দিলেন, Exactly

সংশয়ের ঘোমটা কেটে গেল আমার। আমি বললাম, তা ঠিক। অসীম শক্তি পাওয়া যায় ঐ বিশ্বাস থেকে। তা তো চোখেই দেখছি। ওকে আফিম বললেও বলা হয় যে ওর শক্তি আছে।

খেয়া নৌকা দিব্য জীবন সমিতির ঘাটে এসে ভিড়ল। নিচে নেমে গঙ্গোত্রী বললেন, আসবেন নাকি আশ্রমে আমাদের সঙ্গে? তবে আমাদের অনেক দেরী হতে পারে। স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে দেখা করব। কিছু কথা আছে তাঁর সঙ্গে।

আমার অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঋষিকেশের গঙ্গা জীতেনের মাথায় ঢুকে রয়েছে। তার তাড়া খেয়ে আমাকেও তখনই ফিরতে হ'ল।

সৌভাগ্য বলব, না দুর্ভাগ্য? বেশ একটু বেলা থাকতেই ঋষিকেশের গঙ্গার ঘাটে আবার গিয়ে পৌঁছলাম বলেই না পূর্ণ হ'ল আবাল্যের একটি সাধ। কিন্তু ঐ জন্যই তালও কেটে গেল। ওপারে স্বর্গাশ্রমের পথে চলতে চলতে মনের বীণার সূক্ষ্ম তন্ত্রীটি আপনা থেকেই যেন উচ্চ সপ্তকে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সে তার ছিঁড়ে গেল।

ঘাটে দেখি সেই সন্ন্যাসী—কাল হরিদ্বারে যিনি একটিবার আমাদের দিকে তাকিয়েই অপ্রসন্ন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। আজ কিন্তু তিনি নিজেই হস্ত সঙ্কেতে আমাদের আহ্বান করলেন।

খুব না হলেও বৃদ্ধ। জটাজুট নেই। তার মুণ্ডিত মস্তকে পাকা চুল আবার ইঞ্চিখানেক বড় হয়েছে। মুখমণ্ডলেও খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি মনে হয় অশান্ত।

আমারই মুখের দিকে চেয়ে তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল ওখানে কি বলছিলেন আপনারা? দীক্ষা নিয়ে আশ্রমে বাস করতে চান নাকি?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। আমি লজ্জায় চোখ নামিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, না, না।

শুনে যেন প্রীত হয়ে বললেন তিনি, অমন কর্ম্মও করবেন না। অনেক টাকা নিয়ে নিজে যদি আশ্রম করে বসতে পারেন ত ভাল। কিন্তু আর কোন আশ্রমে যাবেন না, তা সে যত নামকরা আশ্রমই হউক।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কথা কেন বলছেন আপনি?

ঠকে শিখেছি কি না, তাই শেখাচ্ছি আপনাদের যাতে আপনারাও না ঠকেন।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবার পর আমি বললাম, শুনতে আগ্রহ হচ্ছে আমার। বলবেন আপনার কথা? অনেক সময় লাগলেও শুনব।

উত্তর হ'ল: সময় কেন লাগবে? মূল কথা ত একটি। আশ্রমেই আমি ছিলাম—প্রায় পাঁচটি বছর। তার পর আর থাকতে না পেরে বের হয়ে এসেছি—একটি বিখ্যাত আশ্রমের নাম করলেন তিনি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, জানেন? সম্পূর্ণ আশ্বাস তারা আমায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে আমার বাকি জীবনের সব ভার তারা নেবেন। মুগ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে, পরিবার ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমে ঢুকেছিলাম। কিন্তু আজও পারলাম না।

কেন?

কিছুই পেলাম না—না ঈশ্বর না মানুষ।

কি করতেন আপনি সেখানে?

ঐ দেখুন—ও যা করছে।

সন্ন্যাসীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসরণ করে দেখলাম একটি যুবককে। তারও সন্ন্যাসীর বেশ। কিন্তু জলভরা প্রকাণ্ড একটি ঘড়া কাঁধে নিয়ে ক্লান্ত পদে বালিচর ভেঙে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে সে। অনেক উপরে একটি মন্দির, না মঠ। সেই দিকেই গতি যুবকটির।

মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাতেই তিনি আবার বললেন, আমাকে দিয়ে, মশায়, ঐ রকম চাকর খাটিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এই বুড়ো হাড়ে কি ওসব সয়!

কি উত্তর দেব? মুখে আমার কথা ফুটল না। কিন্তু জীতেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন তাহলে কি করবেন আপনি?

একটি যেন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী বললেন, চেষ্টা করছি নিজের একটি আশ্রম করবার। আমার কয়েকজন শিষ্য আছে। চিঠি লিখেছি তাদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য। গোয়ালিয়রের এক জনের কছে থেকে কিছু আশ্বাসও পেয়েছি। তবে আপাততঃ চলেছি বদরীনারায়ণ। একবার নিচে নেবে গেলে আর হয়ত এ দিক আসাই হবে না।

নিজের নাম তিনি বললেন সত্যানন্দ আশ্রম।

ফিরতি পথে জীতেন আমাকে বললেন, শুনলেন ত মণিদা? আশ্রম আর সাধু দেখলেই অমন ঝুঁকে পড়বেন না। পড়লে হয়ত শেষে এমনি আফশোষ করতে হবে।

চোখেমুখে দুষ্টামির চাপা হাসি তার। দেখে আমি একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বললাম, এতদিনে তোমার একজন দোসর পেলে বুঝি?

চাপা হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সে উত্তর দিল, মোটে না। আমি ত সংসারে ফিরে এসেছি, জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছি নিজেরই ঘাড় পেতে। আর উনি? শুনলেন না? নিজে একটি আশ্রম করবেন। কেন? নিজের ঘর তাহলে কি দোষ করেছিল? বোগাস।

হয়ত তাই। তথাপি মনটা সমবেদনায় টনটন করছিল আমার। কি করুণ অনধিকারীর এই ব্যর্থ সাধনা। কিন্তু কার এ ব্যর্থতা—শিষ্যের না গুরুর? তবে যে শুনি, পরশ পাথরের ছোঁয়া লাগলে লোহাও সোনা হয়!

পরদিন সকালে পাঞ্জাবীর হোটেলে বসে চা খাচ্ছিলাম। জীতেন ছুটতে ছুটতে এসে বললে, শীগগির টাকা দিন, মণিদা, এখনই বাস ছাড়বে।

বাস ষ্ট্যাণ্ড কাছেই। মিনিট পাঁচেক পর সেখানে গিয়ে দেখি গঙ্গোত্রী আর তার মা একটি বাস এর গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছেন, জীতেন বিরক্ত মুখে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখেই জীতেন বললে, একটুর জন্য একসঙ্গে যাওয়া হল না। টাকা আনতে গিয়ে দেরী হল বলে ওদের বাসে আর সীট পাওয়া গেল না।

গঙ্গোত্রী আমাকে বললেন, বেশ হ'ত এক সঙ্গে যেতে পারলে। তবে পথের সাথী ত আমরা—এ রকম ছাড়াছাড়ি অনিবার্য্য। তবু আশা রইল যে আবার দেখা হবে। দেবপ্রয়াগেই আমরাও থাকব।

আমাদের বাস ছাড়বে প্রায় এক ঘণ্টা পর। সীট নিয়ে মারামারি নেই, মালপত্রের তদারক করছে জীতেন। সুতরাং নিশ্চিন্ত চিত্তে ময়দানে পায়চারি করছিলাম। হঠাৎ দেখি সেই বাঘমুখো নেপালী কুলির সর্দ্দার। ঝুঁকে সেলাম করে সে বললে, ও আপনার লড়কা, বাবুজী।

বলে কি লোকটা! আমাদের কুলিটাকে দেখিয়ে বলছে যে সে আমার ছেলে! "লড়কার" দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম এই প্রথম। তারও বেঁটে গঠন, পেটানো লোহা দিয়ে তৈরী যেন তার হাত পা ও বুকের মাংসপেশীগুলি। কিন্তু এ লোকটির দেহের বর্ণ বাদামী। ডান হাতের দুটি অঙ্গুলি থ্যাবড়া নাকের নীচে পাতলা গোঁফ জোড়ার একটি প্রান্তে ক্রমাগত নবাবের মত চাড়া দিচ্ছে সে।

আমি তার দিকে তাকাতেই সে গোঁফ ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে সেলাম করল আমাকে। সঙ্গে সঙ্গেই তার সারা মুখ হাসিতে ভরে গেল।

নাম কি তোমার?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সে উত্তর দিল, বীর বাহাদুর।

ক্রমশঃ

অসামান্য

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

মন মুগ্ধ করার মত চেহারা তার একটুও নয়। রোগা আর কালো। মুখের চোয়াল দুটো প্রায় পুরুষের মত দৃঢ়। পুরু ঠোঁট, থাকবার মধ্যে রয়েছে শুধু দুটো গভীর কালো চোখ আর বেণীতে বাঁধা কোঁকড়ানো চুল।

চোখ আর চুল দেখে যে কোন দিন কেউ তারও প্রেমে পড়বে এমন কল্পনাকে কণিকা এক মুহূর্ত্তের জন্তেও মনে স্থান দেয় নি। সে জানে তার বাপ নেই; বড় ভাই মার্চেন্ট আপিসের বাঁধা মাইনের চাকরে। বড় ভাইয়ের সংসারে স্ত্রী ও দুটো বাচ্চা, আর আর মাথার উপর অরক্ষণীয়া বোন।

কাজেই তার মধ্যে কল্পনা নাই। চেহারায় কোন বাহুল্য-বিলাস নাই। বরং এতই রুক্ষ ও সাধারণ তার বেশভূষা যে, বৌদি কমলাও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। বলে—আয় দেখি, চুলটা বেঁধে দিই। মুখে একটু স্নো-পাউডার দিলে কি মুখটা তোর অশুচি হয়ে যাবে?

কণিকা কালো কালো চোখ তুলে চায়। বলে—দেখ বৌদি, এই এক রাশ চুলের খোঁপা বেঁধে বেড়াতে আমি পারব না। ও আমার চেহারায় মানায় না। আর স্নো-পাউডারে আমার বৌদির মুখটা সুন্দর দেখাতে পারে, কিন্তু আমার কয়লার মত রঙ কি সাদা দেখাবে?

—মুখপুড়ি, তোর চোখ দেখলে অনেক পুরুষের মন টলবে। আমি যদি পুরুষ হ'তাম তবে···

—থাক্ বৌদি, ওই জন্তেই তুমি পুরুষ হও নি।

মোটা ছিটের ব্লাউজের উপর একরঙা তাঁতের শাড়ীটা জড়িয়ে চামড়ার স্লিপারটা পায়ে দিয়ে কণিকা বেরোবার জন্তে প্রস্তুত। সন্ধ্যা সাতটায় তার ট্যুইসন। মেয়ে পড়ায় শ্যামপুকুর রোডের এক বাড়ীতে।

কণিকার বৌদি কমলাকে মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। হাসলে এখনও গালে টোপ পড়ে। কমলা কৌতুকের হাসি হেসে বলল, আমি আর এখন সুন্দরী নইরে। মেয়েমানুষ বিয়ে হলেই বুড়ি। দেখিস নি, সেদিন বাড়ীওলার ছেলে এসে তোর সঙ্গে কথা বলার জন্তে কতক্ষণ বসে রইল।

কণিকা গর্জ্জে উঠল—মিথ্যে কথা বল না বলছি। তিনি বসেছিলেন তোমার জন্তে। নিজের চেহারাটা আয়নায় ত অনেকক্ষণ ধরে দেখ। শুধু শুধু আমার পেছনে কেন লাগ বল ত?

কণিকার চোখের কোণ সজল হয়ে উঠল। কমলা দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল—পাগলি মেয়ে, ঠাট্টাও বুঝিস না? রূপ কি শুধু গায়ের রঙ?

কণিকা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তারপর কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল। আজ দেরী হয়ে গেছে তার।

ছাত্রী দীপ্তি ক্লাস নাইনে পড়ে। বেশ চতুর মেয়ে। অঙ্কে ভারি সুন্দর মাথা। কণিকা যত্ন করে পড়ায়।

আজ পড়ায় মন বসছে না দীপ্তির। অঙ্ক করতে করতে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা কণিকাদি, আপনি সিনেমা দেখেন না?

কণিকা গম্ভীর মুখে বলল—না, তুমি অঙ্কটা আগে করে নাও।

হু। জানেন কণিকাদি, সুচিত্রা সেনকে সাজলে ভারী সুন্দর দেখায়। আচ্ছা, আপনি একটুও সাজেন না কেন?

—সাজলেও আমাকে সুচিত্রা সেনের মত দেখাবে না বলে। কিন্তু পড়ার সময় ওসব কথা নয়। এখন অঙ্কটা দেখ দীপ্তি।

দীপ্তি হাসিমুখে বলল, আজ অঙ্ক করতে ভাল লাগছে না! কিন্তু এ আপনার অন্যায়। সুচিত্রা সেনের মত দেখাবে না বলে আপনি সাজবেন না?

—তর্ক কর না। পড়তে ভাল না লাগে, বই বন্ধ করে দাও

কণিকার মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠল। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই দীপ্তি অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বলে উঠল, ছোট দাদা বলছিল কিনা? বলছিল যে, তোর কণিকাদি অমন কেন রে? একটু সাজগোজ করতেও জানে না?

—দাদা বলছিল? রাগে কণিকার মুখ লাল হয়ে উঠল। উঠে পড়ে বলল, আজ পড়া থাক্। আমি যাচ্ছি।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে কণিকা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে থাকে। রাগে তার চোখে জল এসে গেছে। এ বাড়ীতে সে আর পড়াবে না। একটা নূতন ট্যুইসন খুঁজে নিতে হবে।

কণিকা পথ হাঁটতে হাঁটতে ভাবে—মানুষ কত হালকা। কত সামান্ত। শুধু রঙীন ফানুসের মত সে উড়ছে আকাশে। ভুলে যাচ্ছে মাটিতে পা রেখে হাঁটতে।

বাড়ীতে এসে কাপড় জামা না বদলিয়েই শুয়ে পড়ল কণিকা। আজ খাবে না সে। ভাল লাগছে না বলেই খাবে না।

তবু মাঝে মাঝে ঝড় আসে। হয়ত ঝড়ের মত একটুখানি হাওয়া। কোন এক রুদ্ধ দুয়ারের একটুখানি ফাঁক দিয়ে সে ঢুকে পড়ে ভেতরে। আর তার ছন্দহীন দাপটে চঞ্চল হয়ে উঠে এক শান্ত মেয়ের বুক।

ঘরে সেদিন বসে বসে এক উদাস বিকেলে তানপুরোর তুপালিয়

সুর সাধছিল সে। সুরের আলাপে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে যে দাদা এসেছেন ফিরে আর তাঁর সঙ্গে এসেছে দাদার বন্ধু শোভন, তা সে খেয়ালই করে নি। শুধু এক সময় তানপুরোটা নামিয়ে রেখে উঠতে যাচ্ছে সে, এমন সময় কাণে এল অনুচ্চ সিত মৃদু স্বর একটুখানি—অপূর্ব্ব!

শোভনের মা এ বাড়ীর মালিক। উপরের তলায় থাকে ওরা। শোভন কোন একটা কলেজে দর্শন পড়ায়। নীরব লাজুক লোক। অত্যন্ত ভাল লাগলে এর চেয়ে বেশী সে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ সামনাসামনি এ ভাবে পড়ে যাওয়াতে ভারী লজ্জা পেল কণিকা। আর তার চোখেও পড়ে 'গেল যে, ভদ্রলোক দুই মুগ্ধ চোখ মেলে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে।

দাদা ফিরে এলেন ঘরে।

—কিরে, থামলি যে? শোভনবাবু গান ভালবাসেন। রাস্তা থেকে এসে দেখি—বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনছেন গান। তাই ত জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

সেদিন কণিকা লজ্জা পেলেও আশ্বস্ত হয়েছিল। ভদ্রলোকের চোখে চটুলতা নেই। তাঁর দৃষ্টি শিল্পীর দিকে নয়, সুরের মূর্চ্ছনার দিকে।

একদিন নিজেই উপরের তলায় উঠে গেল কণিকা। পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসছে। অথচ প্রস্তুতি মোটেই নেই। বইগুলিকে যেন সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে। দাদাই বললেন, যানা, এ সময় শোভনবাবু তাঁর ঘরের লাইব্রেরীতে বসে আছেন। তোকে খুশী হয়েই সাহায্য করবেন। পড়াশুনা নিয়েই থাকেন ভদ্রলোক।

কণিকা এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তবু যে ভদ্রলোকের তার দিকে পড়ল না এতে সে যেন খুশীই হ'ল। হ্যাঁ, ধ্যানের ছায়া আছে; তন্ময়তার ছবি।

কণিকা শেষ পর্য্যন্ত সামনে এসে বসল, বলল—আমি এসেছিলাম।

হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠল শোভন।—আপনি? কই কতক্ষণ এসেছেন?

কণিকা কুণ্ঠিত হয়ে বলল, সামনে পরীক্ষা, দাদা বললেন যে, আপনার কাছে একটু সাহায্য পাব। তাই···

খুশী হয়ে ফিরল কণিকা। চমৎকার বোঝান ভদ্রলোক। অন্য-দিকে দৃষ্টি নেই। অবহেলা নেই। গায়ে-পড়া ভাবও নেই। এমন লোকের সঙ্গে মিশে সুখ আছে।

বৌদি মুখ টিপে হাসল—কিরে, কেমন পড়ালেন শোভনবাবু?

—ভারী সুন্দর বৌদি। এত যত্ন করে পড়ালেন···গভীরতা না থাকলে অত সহজ করে বোঝান যায় না।

—মনে ধরেছে বল?

বৌদির মুখভর্ত্তি হাসি। কণিকা চিৎকার করে উঠল—বৌদি সব তাতেই অসভ্যতা তোমার।

দাদা পাশের ঘরে ছিলেন। বললেন, কি হ'ল রে কণি?

কোন উত্তর না দিয়ে কণিকা আর একবার অগ্নিদৃষ্টি হানল বৌদির দিকে। তার পর আলনা থেকে শাড়ী তুলে নিয়ে স্নান-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কলেজের আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে সচরাচর মেশে না কণিকা। যতটুকু ফাঁক পায় ও যায় লাইব্রেরীতে। একান্তে বসে একখানা বই নিয়ে ডুবে থাকতে পারলে ও যেন শান্তি পায়।

সংস্কৃতের ক্লাসে তর্করত্ন বড্ড রাশভারী লোক। সপ্তাহে একদিন ক্লাস নেন তিনি। ওই একটা দিনের জন্যে সবাই উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। কালিদাস পড়াতে গিয়ে তর্করত্ন যখন নারীর অঙ্গ বর্ণনা দেন তখন সকলেই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর নতমুখ হয়ে থাকে কণিকা। এমন নগ্ন বিশদ বর্ণনায় সে লজ্জা পায়, অস্বস্তি বোধ করে।

তাদের ক্লাসের মায়ার নাম ডাক আছে সুন্দরী বলে। মায়া বেছে বেছে তার পাশটিতেই বসে। বড় বেমানান সে মায়ার পাশে। মায়া একদিন কানে কানে বলল—তুই বড্ড সাধারণ কণি। জামাকাপড়ের ষ্টাইল একটা বদলা দেখি।

কলেজের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কণিকা ভাবে—কি দরকার? তার ত আর মায়ার মত সুন্দর শরীর নয়। হঠাৎ তার চোখে পড়ল—আর একজোড়া পুরুষ দৃষ্টি একাগ্র হয়ে আছে তার দিকে। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে যায় তার। এলোমেলো হয়ে এগিয়ে চলে কণিকা। বাসের ভীড় ঠেলে উঠতে গিয়ে মনে হ'ল, কে যেন ইচ্ছাকৃত চাপ দিল পাঁজরে। একজন ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে পাশে। তার দৃষ্টি বিঁধে যাচ্ছে তার সস্তা ব্লাউজের গায়ে। বড্ড লোভী মানুষ, বড় সাধারণ তার বাসনা। একটা সীটে কোন রকমে বসে পড়ে ঘৃণায় সিটকোতে থাকে কণিকা।

আশ্চর্য্য স্বভাব শোভনলালের। এক ঘণ্টা তিনি বিশ্লেষণ করলেন 'মানুষের মন'। কিন্তু একমুহূর্ত্তও তাঁর চোখ পড়ল না কণিকার দেহের দিকে। নির্লিপ্ত অসামান্য পুরুষ।

শোভনলালের পিসতুতো বোন রেডিওতে গান গায়। সেদিন সে এসে হাজির হ'ল হঠাৎ। শোভনলাল সঙ্গে সঙ্গে ডাকিয়ে আনল কণিকাকেও। বলল, আজ দুজনের গানে মুখর হউক এই ছোট্ট বাড়ীটুকু।

গাইয়ে বলে গর্ব্ব আছে শেফালীর। কিন্তু শোভন তার সামনেই হঠাৎ কণিকার গানের প্রশংসা সুরু করল। শোভনলাল বলছিল—আধুনিক গানে সামান্যর দিকে লক্ষ্য। যেন একটু ধরা-ছোঁয়ার আভাস; কিছুটা পাওয়ার লক্ষ্য। কিন্তু মার্গ সঙ্গীতের পরিধি অসীম। অনন্ত আশা ও অনন্ত বিরহ···এরই মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে মার্গ সঙ্গীতের সুরধারা।

কণিকা মুগ্ধ হয়ে গেল শোভনলালের বিশ্লেষণে। এমন সময়ে শোভনলালের অনুরোধ এল—আর একটা। আপত্তি না করে কণিকা গাইতে সুরু করল।

বৌদি বললে—উঃ! কি ভীষণ ভাল তুই গাইছিলি ভাই··· আর অধ্যাপক মানুষের দুই চোখ···যদি দেখতিস তবে···

কণিকা রেগে উঠল—মিথ্যে কথা বল না বৌদি। উনি কোনদিন মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকেন না।

—আমি কি বলেছি তোর দিকে চেয়ে ছিলেন? নিজের গায়ে কেন টেনে নিসরে? আমি বলছিলাম যে, অধ্যাপক মানুষের দুই চোখ গানের ধ্যানে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল।

মুখে রাগ করলেও মনে মনে এই প্রথম একটু খুশী হয় কণিকা। এই একটি মানুষ দেহের দিকে যে তাকায় না, দেহের অতীতে যে সত্তা তারই প্রতি তার লক্ষ্য। শোভনের ওপর শ্রদ্ধা বাড়ে তার।

কণিকা মাঝে মাঝে ঘরে বসে এই বিরাট পৃথিবীর দিকে তাকায়। জানলার ফাক দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায় ওইটুকুই তার দূরবীক্ষণের মাধ্যম। আকাশের ওইটুকুর মধ্যেই রয়েছে তার অগাধ হয়ে থাকা অস্তিত্ব। ওই দূর-দূরান্তে নীল আকাশ আর এই সদাজাগ্রত পৃথিবী—এরই মধ্যে কণিকা নিজেকে মিলিয়ে দেখতে চায়।

কমলা যেন কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কণিকা ফিরে চাইতেই বৌদি হাসল—কিরে, তুই কোন্ জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকিস বল ত? আমি ত দেখতে পাই না কাউকে।

কণিকা চাপা স্বরে গর্জ্জন করে—তোমাদের চোখ তোমাদের মনের মতই ছোট। শুধু ছাদ আর জানলা—এর বেশী কিছু জান তোমরা?

বৌদি সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল—কি করে জানব বল, ওই ছাদ আর জানলার আড়ালে কোথায় তোর মনের আলো?

—বৌদি···

একটা চিৎকার করে কণিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বৌদির হাত থেকে কি নিস্তার আছে? সারা বাড়ী তার গুনগুনানিতে ভরে উঠল—বল ভাই, আমি তারে কোথায় পাই···

শোভনলাল বলছিলেন, মানুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষা সামান্যের আকাঙ্ক্ষা। সেই সামান্য যখন ধুলো হয়ে যায়, তার মনও আঘাত পায়। কিন্তু তার স্বপ্ন অসীমের। তাই স্বপ্নকে যদি আকাশের দিকে মেলে রাখা যায়, যদি এই ক্ষুদ্রতায়, তুচ্ছতার আশা থেকে মনকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে হৃদয় সান্ত্বনা পায় অসীমের সান্নিধ্যে এসে।

কণিকা নতমুখে শোনে। তার মন ভরে ওঠে আনন্দে। এই একটি জায়গা আছে, যেখানে সে পায় তার হৃদয়ের সাড়া। যেখানে সে সমস্ত পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র একটি মানুষের কথা শুনতে পায়।

ট্যুইসনি সেরে ফিরতে সেদিন একটু দেরী হ'ল কণিকার। আজ জবাব দিয়ে এসেছে সে। এখানে আর পড়ানো তার সম্ভব নয়। কারণ তার পরীক্ষা সামনে।

অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। ছাত্রী দীপ্তির দাদা শ্যামল প্রায়ই বিরক্ত করে বাজে কথায় টিপ্পনি ছুঁড়ে। সহ্য করে আসছিল সে এতদিন। কিন্তু ইদানীং বড় বাড়িয়েছে।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল একটি তরুণী আর একটি তরুণ পাশাপাশি চলেছে গল্প করতে করতে। তরুণীটি সত্যিই সুন্দরী। তার বেশের বাহুল্য নেই, কিন্তু ত্রুটিও নেই যেন। যুবকটি চলেছে মুগ্ধের মত সঙ্গে সঙ্গে।

হঠাৎ নিঃসঙ্গ বোধ করল সে। কেমন যেন একা একা বোধ এল। বাড়ীতে ঢুকবার আগের মুহূর্ত্তে একটু ক্লান্তি।

ওপরের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে শোভনলালের কণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করছে শোভন—"ওই দেখ তরী তোর হয়েছে মুখর" দরজাটা বন্ধ করতেই কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। রুদ্ধ ঘরের মধ্যে এসে ঘামে-ভেজা ব্লাউজটা ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়ল। নিজের সমস্ত চেহারাটা ফুটে রয়েছে দর্পণে। কালো পরুষ সে চেহারা। শুধু একজোড়া কালো চোখে কি আকর্ষণী সৌন্দর্য্য আছে? আচমকা কণিকার মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন ভেসে উঠল—"তবে পরাণে ভালোবাসা কেন যে দিলে।

যদি রূপ নাহি দিলে বিধি হে—"

কণিকার দাদা অপূর্ব্ব নেহাৎ ছাপোষা লোক। কিছুদিন থেকে অনেকগুলি বাড়তি খরচ হওয়ায় তার হাত শূন্য হয়েছিল প্রায়। কমলা পেটের একটা যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছিল। একজন ডাক্তার টিউমার সন্দেহ করায় বাধ্য হয়ে ষোল টাকা ফী'র ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হ'ল। নানা কারণে তার দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়ল।

কণিকার অবশ্য এ সব কথা জানার নয়। সেদিনও সে ওপরে গিয়েছিল শোভনের ঘর থেকে একটা বই চেয়ে আনতে। ছোট্ট একটা লাইব্রেরী তার ঘরে। শোভন নিজেই বই বেছে দিল। প্রায় খানচারেক বই হাতে নিয়ে খুশীতে ভরপুর হয়ে কণিকা বলল—আমি যে প্রায়ই এমন জালাতন করি আপনাকে, অসুবিধে হয় না ত?

দুই স্থির চোখ তুলে বলল শোভন—না। বরং সারাদিন ত একা একাই কাটে; তুমি এলেই বরং ভাল লাগে।

উৎফুল্ল দুই চোখ তুলে চাইল কণিকা। শোভন বলে চলল—তোমার মধ্যে একটা সুরের ঝরণা আছে, আর একটা জ্ঞানের চাতক আছে। আর পাঁচ জনের থেকে তুমি স্বতন্ত্র। তাই বলছি, তুমি এলে ভালই লাগে।

—ভালই লাগে। সারাদিন কানের মধ্যে গুনগুনিয়ে রইল কথার সুরটুকু। বাথরুমে, ছাদের অলিন্দে, ঘরে তার বিছানায় একান্তে চুপিচুপি সে নিজের কাছে বার বার উচ্চারণ করল কথাটুকু—তুমি এলে ভালই লাগে। তার পর বিকেলে স্নানের পর চুল বাঁধতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল।

হঠাৎ ধাক্কা খেল সারাদিনের স্বপ্ন। ভাললাগার স্থায়িত্ব কতটুকু হতে পারে? উঁচু চওড়া কপাল আর দৃঢ় চিবুক, পুরু

ঠোঁট আর কালো রঙ—এ নিয়ে চেহারা গড়ে ওঠে না। সত্যিই কি পুরুষের মন চেহারাকে, শরীরকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে সুখী হতে পারে? শুধু মনকে ছুঁয়ে?

তখন অপরাহ্নের ছায়া নামছে আকাশে। ঘরের খোলা জানালাটা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে গুন গুন করছিল কণিকা। হঠাৎ একটা গুঞ্জন তার কানে এল। পাশের ঘরে কথা বলছে বৌদি। অপরা শোভনের বিধবা মা। এমন কিছু ছিল তাঁদের কথায় যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কান পাতল কণিকা।

—তা তোমার ঠাকুরঝির বয়েসটা ত হ'ল। এখনও বিয়ের চেষ্টা করছ না?

বৌদি কি বললেন শোনা গেল না।

—টাকা না ঢাললে ও মেয়ের বিয়ে হওয়াও শক্ত। রূপ না থাকলে লোকে টাকা চাইবেই। আমার শোভনের কত সম্বন্ধ আসছে। আমি বলি, টাকার দরকার নেই। রূপসী মেয়ে আমার চাই-ই। যেন আমার ঘর আলো হয়ে থাকে তার রূপে। কত সম্বন্ধ আসছে। মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না।

উঠবার সময় গলা খাঁকারি দিলেন মহিলা। তা' দু'মাসের ভাড়া যে বাকি পড়ে গেল। আমাদেরও ত টাকার দরকার। ভারী অসুবিধে হচ্ছে বলেই বলছি।

মহিলা চলে গেলে কণিকা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কে যেন তার শরীরের শক্তি নিঃশেষ করে নিয়ে গেছে।

সকালে উঠেই কণিকা বলল, বৌদি আমি বেরুচ্ছি।

—এত সকালে কোথায় বেরুচ্ছিস আবার?

—দরকার আছে।

কথা না বাড়িয়ে কণিকা তার ঝোলাটায় পুরণো বই অনেকগুলি পুরে নিল। তার পর চটিটা পায়ে গলিয়ে বার হয়ে পড়ল।

কণিকা ফিরল অনেক বেলায়। রৌদ্রে ক্লান্তিতে সমস্ত মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ছুটির দিনের অবকাশে অপূর্ব্ব তখনও খবরের কাগজ নিয়ে বসে। অপূর্ব্ব একা নয়, কণিকা দেখল তার পাশে শোভনও রয়েছে। কণিকা সোজা ঘরে ঢুকে গেল। ভেতর থেকে প্রায় চিৎকার করে ডাকল—দাদা।

—কিরে?

অপূর্ব্ব গলা বাড়াল।

—বৌদি ডাকছে তোমায়।

—তুই এদিকে আয় না। শোভন এসেছে।

কণিকা এল না। সে তখন কমলার হাতে দশ টাকার তিনখানা নোট গুঁজে দিচ্ছে।

—লক্ষ্মী বৌদি, দাদাকে টাকাটা দিয়ে বল, এক মাসের ভাড়া এখনই দিয়ে দিক। শোভনবাবুর হাতেই।

হঠাৎ টাকাটা হাতে নিয়ে শোভন একটু বিস্মিত হয়ে চাইল। বলল—আমি ত এখন টাকা চাইতে আসি নি।

—আপনার মা এসেছিলেন।

অপূর্ব্ব মৃদুস্বরে বললেন।

শোভন একটু চুপ করে চেয়ে রইল। তার পর টাকাটা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে ওদের চাকরের হাতেই বইগুলো ফেরত দিল কণিকা। সবে কালই বইগুলো সে চেয়ে এনেছিল। এখনও একটা পাতাও ওন্টাতে পারে নি।

কণিকা আর একটা ট্যুইসনি খুঁজে নিল। এটিও ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়ে। কিছুদিন পরে সে হঠাৎ সর্টহ্যাণ্ড শিখতে আরম্ভ করল। বৌদি বাধা দিলে সে বোঝাল শুধু ত শিখছি বৌদি। শিখতে দোষ কি?

তবু তার অভিমানী জেদী মনটা এক নিরালা মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করে বসল। আর সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল তার কি অসহায় এই মেয়েজীবন? এ জীবনের সার্থকতা কি শুধু পরনির্ভরশীল? কেন সে পারবে না আপনাকে নিয়ে পূর্ণ হতে?

মনের অলিগলিতে পা বাড়াল কণিকা, আর তার একুশ বছরের হৃদয়ের এক দুর্ব্বার স্বপ্নবাসনাকে প্রত্যক্ষ করে হঠাৎ শিউরে উঠল। হায়! "পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
যদি রূপ নাহি দিলে বিধি হে..."

হঠাৎ একদিন ট্রামের মধ্যে দেখা হয়ে গেল। ধর্ম্মতলা থেকে ফিরছিল কণিকা। ভীড়ের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে কোন মতে লেডিস সীটে বসে পড়ে সে হাঁপ ছাড়ছে, এমন সময় চোখে পড়ল সামনের সীটেই বসে রয়েছে শোভন। ইচ্ছে করেই সে মুখটাকে ফিরিয়ে রাখল পথের দিকে। ভীড়ের মৃদুগুঞ্জন ও সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে তবু বার বার যেন বিশিষ্ট হয়ে উঠছে সেই একটি চেহারাই। শ্যামবাজারে এসে একই জায়গায় নামল দুজনে। কণিকা রাস্তা পার হওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় ডাক এল মৃদুকণ্ঠের—শোন।

কণিকা থামল একটু। শোভন ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলল—সেদিন বইগুলো পড়তে নিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিলে কেন? মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। কি বল ত?

কণিকা নতমুখে বলল, সময় পাই না মোটে। টাইপ শিখি, সংসারের কাজ করি। ট্যুইশনও করতে হয়, তার পরে ক্লাসের পড়া। কলকাতায় বাস করার মূল্য হিসেবে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রম দিতে হয়। রাস্তায় চলতে যেমন ট্রাম ভাড়া দিতে হয়, বাস করতে তেমনি বাড়ীভাড়া। সময় কোথায়?

কণিকা মুখ নিচু করে হাঁটছিল। তাই সে অনুভব করল না শোভনের মুখে কি পরিবর্ত্তন ঘটল। শুধু এক সময় বুঝল সে যে, শোভন সঙ্গে নেই আর।

এতদিনে মনে একটা খুসীর আমেজ এলো। তবু একটু ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। আঘাত না দিলেই মানুষ তার দৈনন্দিনতার খোলস থেকে মানুষের স্বরূপ খুঁজে পায় না। পৃথিবীতে সে নিজের চোখের বাইরে জানতে শেখে না।

সন্ধ্যের পর সেদিন একা বসে বসে গুনগুন করে সুর ধরল

একটা। অনেকক্ষণ ধরে এলোমেলো একটা সুর। তার পর তানপুরোটা টেনে নিয়ে বসল। বেহাগের সুরে আলাপ করতে। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে সে সুর টানছিল। তবুও তার কণ্ঠ এক সময়ে ঘর ছাপিয়ে কখন বাইরে গিয়ে পৌঁছাল।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ মনে হ'ল, কে বুঝি ডাকছে বাইরে। আর দরজা খুলেই অবাক হ'ল সে। একটু দূরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শোভন।

দরজা খোলার শব্দে চকিতে চমকে উঠল সে। আর সামনে কণিকাকে দেখে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলল—এই যাচ্ছিলাম নিচে। হঠাৎ কানে এল বেহাগের আলাপ। তাই দাঁড়িয়েছিলাম একটু।

শোভন দ্রুত পালিয়ে গেল যেন ধরা পড়ে গিয়েছে কানপাতায়। আর কণিকার একবার ইচ্ছে হ'ল সে ডেকে আনে ওই লোকটাকে। ঘরে বসিয়ে প্রাণভরে গান শোনায়। আর ক্ষমা চায় তার ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু তার পরেই মনে হ'ল, কি লাভ? কণিকার মত মূল্যহীন মেয়ের সাহচর্যে হয়ত খুশী হবে না শোভন। সে যে অনেক উপরে বাস করে। সেখান থেকে চোখে পড়ে শুধু আকাশের নীল আলো আর বাতাস। ধুলোকাদার পৃথিবীকে তারা কতক্ষণ সহ্য করবে?

হঠাৎ একটি দুঃসংবাদ এল। একদিন ক্লান্ত অপূর্ব আপিস থেকে ফিরে এসেই শুয়ে পড়ল। জামা কাপড় ছাড়বারও সময় হ'ল না তার। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল কমলা আর কণিকা। যে সংবাদ পাওয়া গেল তা যেমন ভয়প্রদ তেমনি নিদারুণ। অপূর্বরা যে আপিসে কাজ করে সেই আপিস গুটিয়ে নেওয়ার কথা চলছে। আর তা হলেই একটা বড় রকমের রিট্রেঞ্চমেণ্ট সুরু হবে।

কণিকা চিন্তা করছিল—কি করতে পারে সে? চাকরী···এই সময়ে যদি একটা চাকরীতে ঢুকে যেতে পারে সে তবে হয়ত একটা বিপদ এলেও টিকে থাকবার মত একটা উপায় থাকবে।

চাকরী···চাকরী—কণিকার সমস্ত জীবনের স্বপ্নলোকে কুয়াশার ছায়া নামল।

সেদিন ট্যুইসন সেরে বাড়ী ফিরতেই কণিকা দেখল বাড়ীওয়ালী অর্থাৎ শোভনের মা বেরিয়ে গেলেন তাদেরই ঘর থেকে।

কমলা বলল, হ্যাঁ, উনি এসেছিলেন জানাতে যে, সামনের অগ্রহায়ণেই ছেলের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে। এখন শুধু ছেলের মত হলেই হয়। তবে মায়ের কথার কখনও কথা বলে না শোভন। এখন উনি বলছিলেন যে, বিয়ের সময় আত্মীয়স্বজন ত সকলেই আসবে। তখন গোটা বাড়ীটা না হলে জায়গা করা যাবে না। অন্ততঃ দুটো মাসের জন্যেও যদি বাড়ীটা খালি করে দেয়, শোভনরা···

কণিকার কাণ গরম হয়ে উঠল। ওদের ছেলের বিয়ে, তার জন্যে আমাদের বাড়ী ছাড়তে হবে? কেন? ইচ্ছে করলেই ভাড়াটেকে তুলে দেওয়া যায়? কোর্ট নেই?

অপূর্ব বলল, না। এক কথায় ওরা বাড়ী দিয়েছিল। কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। ওদের দরকার পড়েছে। আমি যেমন করেই হউক ছেড়ে দেব।

কাজেই সুরু হ'ল বাড়ী খোঁজা। আর কলকাতা ছাড়িয়ে সিঁথিতে গিয়ে তবে পাওয়া গেল দু'খানা ঘর। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাড়ী ছাড়বে—ওরা জানিয়ে দিল।

সেদিন ঘর গুছোতে গুছোতে হঠাৎ নজর পড়ল কণিকার—একটা খাতা পড়ে আছে তার বাক্সের তলায়। শোভনের লেখা কতকগুলি প্রবন্ধ। একদিন শোভন তাকে পড়তে দিয়েছিল। পড়াও হয়েছিল। কিন্তু তার পর একেবারে ভুলে গিয়েছিল সে।

পরিষ্কার ঝরঝরে হাতের লেখায় ভর্ত্তি খাতা। জীবন যে সুন্দর, মধুর, আশা যে ছলনাময়ী নয় তারই অবতারণা। জীবনবাদে বিশ্বাসী মানুষের মহৎ কল্পনা। পড়তে খুব ভাল লাগে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে কি মিলবে?

ওরা চলে যাচ্ছে পরশু দিন। তার পর কোনদিনই আর হয়ত দেখা হবে না। কোন্ স্মৃতির অতলতলে হারিয়ে যাবে শোভনলালের ছায়া। রূঢ় কঠিন জীবনের অগ্নিসংঘাতে নির্ম্মম নতুন হয়ে উঠবে নতুন দিনের কণিকা।

তবু আজ শেষদিনের মত খাতাটা নিজের হাতে গিয়ে ফেরত দেবার বাসনা হ'ল তার। সবে সন্ধ্যের ছায়া নামছে আকাশে। বাড়ীতে বোধ হয় কেউ নেই। আজ সকালেই শোভনের বোনেরা এসে পৌঁছেছে। আর তাদেরকে নিয়ে তার মা বোধ হয় বেরিয়েছেন মার্কেটিং-এ। এ ঘরে বৌদি ব্যস্ত রান্নাঘরে। কণিকা খাতাখানি বুকের কাছে ধরে লঘুপদে এগিয়ে গেল ওপরে। শোভন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছিল একখানা। অকস্মাৎ চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল সে। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে কণিকা, কণিকাই।

কণিকা বলল মৃদুকণ্ঠে—আমরা ত উঠে যাচ্ছি এ বাড়ী থেকে। আপনার একটা খাতা ছিল আমার কাছে। তাই ফেরত দিতে এলাম। আর যাওয়ার আগে ক্ষমা চাইতে এলাম যদি কোন অপরাধ করে থাকি···

বেদনায় গাঢ়কণ্ঠে বলল শোভন—তোমরা কেন চলে যাচ্ছ কণিকা?

—কেন? আপনারা বলেছেন বলে। আপনাদের বাড়ী আর আমরা ভাড়াটে বলে। আমার মত সামান্য একটা মেয়েকে আপনি অনেক দয়া দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

—দয়া?

শোভন পাংশুমুখে বলল—তুমি চলে যাচ্ছ বলেই বলছি। দয়া আমি করি নি। আমার সমস্ত মন ভরে আমি একটি মেয়েকেই শুধু দেখেছি। একটি মেয়েকে—যে তার পাখীর মত সুরের ধারায় আমায় ভরিয়ে দিয়েছে। যার সহজ স্বচ্ছ মনকে আমার ভাল লেগেছে। যার চোখে ছলনা নেই, আছে জিজ্ঞাসা। যার

মধ্যে প্রকাশ নেই কিন্তু আছে উন্মোচন। আর সে মেয়ে···একি তুমি কাঁদছ কণিকা?

কণিকা কাঁদছে। এক আকস্মিক আবিষ্কারে সে অভিভূত হয়ে গিয়েছে। শোভন কি ছলনা করছে? কিন্তু না, তার মুখে ত অপ্রত্যয়ের ছায়া নেই।

শোভন এগিয়ে এসে তার কম্পমান শীর্ণ হাত ধরে বলল—আমার বিশ্বাস কর—আমার জীবনে আমি একটি মেয়েকেই শুধু জেনেছি। আর সে মেয়ের নাম কণিকা। তুমি অনুমতি দাও, সে নামকে আমার মায়ের কাছে বলে আসি।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাতে লাগল কণিকা। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। মনে হচ্ছে সমস্ত বুকের মধ্যেটায় একটা ওলট-পালট হচ্ছে। ভীরু আশার মূল ধরে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল—দাঁড়াও, আমি সহ্য করতে পারছি না। আমায় একটু সময় দাও।

শোভন তাকে দু'হাতে ধরে সস্নেহে শুইয়ে দিল চেয়ারে। তার পর পাশে বসে নিজেই পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল তার মুখে ও মাথায়।

বিশ্ব বেদুইন

বিভা সরকার

চির যাযাবর ধরণী দুলাল
হে বিশ্ব বেদুইন
জন্ম উদাসী শেষ ব্রাহ্মণ
চিত্ত ভাবনা হীন।
জীবন মরুর অকরুণ রূপ দেখেছ নয়ন ভরি
কন্টকময় দুর্গম পথে চলেছ ধৈর্য্য ধরি।
অধীর তোমায় করেনি হে বীর দুঃখ দাহন জ্বালা
হৃদয়ের ধন মরণে দিয়েছ পূজার আকুতি ঢালা।
জ্ঞানালোকে তব দেখিতে পেয়েছ মৃত্যু জ্যোতির্ম্ময়
মরণ বিজয়ী হে নীলকণ্ঠ পেলে চির বরাভয়।
হাসি কান্নার আলো ও ছায়ার নিত্য দোলনে দুলি
ভেসে গেছ কবি এ জীবন স্রোতে সকল ভাবনা ভুলি।
নিয়েছ দিয়েছ অঞ্জলি ভরি আসক্তি নাই কিছু
মনের গহনে আপনা বিভোর চলেছ কালের পিছু।
হিমাদ্রি সম বক্ষ পাতিয়া নিয়েছ বজ্র জ্বালা
মহৎ ও প্রাণ সদা অম্লান পরিয়া কাঁটার মালা।
পাষাণ ও বুকে আছিল উছল প্রেমের নির্ঝরিণী
উপল চপল পায়ে পায়ে এল গান গেয়ে ঝিনীঝিনী।
ভরিল ধরার নব শ্যামভারে মুকুলিত ফুলে ফলে
সোনার ফসলে ভরি দিল মাঠ অজস্র ধারা জলে।
ক্ষ্যাপার মতন নিশিদিন যান পরশ-পাথরে খুঁজি
দেশ হতে দেশে ছুটিয়া বেড়ালে পেলেনা ঠিকানা বুঝি?
হে রাজকুমার বারেক শুধাই পরশমণির ছোঁয়া
পেয়েছিলে কবি, হারায়ে ফেলেছ সে মানিক গেছে খোয়া!
সে পরশে তুমি সোনা হয়ে গেছ আমরা পারিনি নিতে
ও পরশমণি পরশ দেয়নি ক্ষুদ্র জনের চিতে।
গর্ব্ব মোদের তুমি আনন্দ যুগের স্রষ্টা তুমি
নব ভারতের হে দীক্ষাগুরু ধন্য জন্মভূমি—
লভিয়া তোমায় বক্ষের মাঝে কি নিবিড় অনুরাগে
দেশজননীর মমতা গভীর আকুল হইয়া জাগে।
ঘর যে তোমায় পারেনি বাঁধিতে রাজভোগে উদাসীন
শান্তির নীড়ে বেঁধেছিলে নীড় শুনিয়া কাহার বীণ?
সেই বিরাটের চরণ চিহ্ন দিল কি গেরুয়া ধূলি
এ মাটির রবি প্রভাত রবিরে বন্দিছে সব ভুলি।
দেবদুর্লভ সে অরূপ ছবি ধন্য দেখেছে যারা
মহা বিটপীর নিবিড় ছায়ায় সফল হয়েছে তারা।
পিতার আসন বন্ধুর দেশ বেসেছিলে তারে ভালো
বিশ্ব মিতালী করিতে রচনা একেলা প্রদীপ জ্বালো।
সে দীপের আলো পথ দেখালো বিশ্বমৈত্রী মাঝে
সবার লাগিয়া কবি কণ্ঠের মিলন বাঁশরী বাজে।
মিত্র সাজিয়া এস ইংরাজ রাশিয়া জাপান এস!
এস সিংহলী জাভানী বর্ম্মী কে আছ কোথায় এস!
নেপালী পাহাড়ী ভুটানী মেওয়ার দ্রাবিড়ী ও দক্ষিণী
এস তুমি নারী কল্যাণী করে বাজাইয়া কিঙ্কিণী
ভোরাই আকাশে কি মধুর ভাবে মিলন রাগিনী বাজে
এস মহাচীন ভাবনা বিহীন এ বিশ্ব সভা মাঝে।
মরুর মাঝারে শ্যাম ছায়া রচি মহা সে বিটপী ভাকে
তাই বন্ধনহীন চির বেদুইন চরণ চিহ্ন রাখে।

শিশুশিক্ষার নব রূপায়ণ

শ্রীচারুশীলা বোলার

শিশুর প্রক্ষোভ জনিত জীবন

১৩৬৫ সনের ফাল্গুনের প্রবাসীতে শিশুর প্রক্ষোভ ঘটিত সমস্যায় শিক্ষার মূল্য কতখানি তার কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই সম্বন্ধে বহু মনোস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষানবিশ তাঁদের পর্য্যবেক্ষণের তথ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, শিশুর ভিতর তিনটি প্রক্ষোভ জন্মগত,—ভাললাগা, রাগ ও ভয়। অন্যান্য প্রক্ষোভগুলি পরবর্ত্তী জীবনে এই গুলিকেই ভিত্তি করে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

জন্মের পর থেকেই শিশু তার নিরাপত্তা, আরাম ও যত্নের যোগাযোগ করছে তার মায়ের সঙ্গে, সুতরাং মায়ের মুখ, মায়ের গলার স্বর, মায়ের পায়ের শব্দে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। মাকে দেখলে তার হাসি ধরে না, কোলে যাবার জন্যে হাত বাড়ায়, এই তার ভাললাগার প্রকাশ। মা বলেই যে শিশুর মাকে ভাল লাগে তা নয়, কিন্তু ঐ মানুষটির কাছেই সে জন্মের পর থেকে নিরাপত্তা, আরাম ও যত্ন পেয়ে এসেছে এই জন্যে। মায়ের অবর্ত্তমানে মায়ের জায়গায় যে থাকে শিশু তাকেও সেই রকমই ভালবাসে। অনেক সময় দেখা গেছে, মা ছোট শিশুকে কোনও কারণে কারও কাছে রেখে স্থানান্তরে গেছেন, মাস খানেকের মধ্যে ফিরে এসে দেখেন শিশু মাকে আর চিনতে পারে না। যে কারও কাছ থেকেই নিরাপত্তা, আরাম ও যত্ন পেলেই শিশু তাকে ভালবাসে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিশু শৈশব অবস্থা থেকে পিতামাতার সঙ্গে জড়িত। সুতরাং বড় হয়ে যখন সে দেখে যে মা-বাবা এতদিন আদরে লালন পালন করেছে তাঁরাই আজ ধৈর্য্য হারিয়ে মার-ধোর করছেন, তখন সে বিব্রত হয়ে পড়ে এবং সব কিছু গোলমেলে ঠেকে। এতে তার ভয় ও রাগের উদ্রেক করে। তাতে শৈশবের সেই ভালবাসা প্রথমে আহত পরে নিহত হয়। পিতামাতার এই ব্যবহার শিশুর প্রক্ষোভজনিত জীবনধারায় বাধা সৃষ্টি করে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু মেজাজী ও অবাধ্য হয়। বয়সে ছোট শিশুদের উপর অত্যাচার করে। কেউ কেউ বাড়ী থেকে পালিয়েও যায়।

মা-বাবার ভালবাসা ও নিরাপদ আশ্রয় সম্বন্ধে শিশু যেন আস্থা না হারায়। এতে কেবল তার নিরাপত্তাবোধ নয়, কিন্তু নিজের ও অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পথ তার সহজ হয়, ফলে ভবিষ্যৎজীবনে পূর্ণ বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে সব কিছুর সম্মুখীন হতে পারে। অন্যের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারে—সমাজজীবনে সঙ্কোচ বা ভয় থাকে না, উপদ্রবকারী (aggressive) ও হয় না। ভালবাসা এমন জিনিস যে, সেটা শিশুকে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকাশ করতে সাহায্য করে। সুতরাং শিশু ও পিতামাতা, উভয়েই যদি পরস্পরের ভালবাসা ও বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করে, তবে শৈশব থেকে সুরু করে, যৌবনে পূর্ণ প্রবেশ পর্য্যন্ত (১০ থেকে ২৪) তার আচরণঘটিত সমস্যা দেখা দেবে না।

ছোট শিশু পছন্দসই কিছু না হলে কাঁদে, প্রবল আপত্তি জানায়, পরে চিৎকার করে ও হাত পা ছোড়ে। বড় শিশু আর একটু বেশী প্রবল ভাবে তা প্রকাশ করে। সে কামড়ায়, লাথি মারে, জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দেয়। যদি তার কোনও খেলনা নিয়ে নেওয়া হয় অথবা ইচ্ছামুরূপ কাজে বাধা দেওয়া হয়। একবার যদি সে বুঝতে পারে যে, চেঁচালেই তার আবদার মেটান হবে, তা হলে সে বার বার সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করবে এবং কালে অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারী, জেদী ও অসংযমী হয়ে উঠবে।

অনেকে মনে করেন, 'মেজাজ' বুঝি উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। একথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রত্যেক স্বাভাবিক শিশুরই রাগের প্রবণতা থাকে। সেটার বৃদ্ধি নির্ভর করে শৈশব অবস্থায় তার প্রক্ষোভ ঘটিত সমস্যাগুলি কি ভাবে পরিচালিত হয়েছে তার উপর। শিশু কেন রাগ করছে তার কারণ খুজে বার করা দরকার। পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই সব বিক্ষোভের কারণ কয়েকটি শারীরিক ও অন্যগুলি মানসিক। যেমন—

(ক) শিশু যদি প্রয়োজনমত আরামে ঘুমাতে না পারে, যথা, হয় ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যথেষ্ট জামা, কাপড়, বিছানাপত্রের অভাব,অথবা অত্যন্ত গরম, বা জানালা বন্ধ থাকায় হাওয়া-বাতাসের অভাব। এতে শিশু শারীরিক অস্বস্তি বোধ করে, তার ঘুমাতে কষ্ট হয়। কখনও বা মানসিক উৎকণ্ঠা, ভয় ইত্যাদির কারণেও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

(খ) শিশুর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। অনেক সময় মায়ের অজ্ঞতার দরুণ শিশুকে অধিক পরিমাণে খাওয়ান হয়, তার হজমের গোলমাল হয় বা বমি হয়ে যায়। কখনও বা হয় ত কাজের ঝামেলায় মা শিশুকে সময়মত খাওয়াতেই ভুলে যান, অথবা পরিমাণে কম খাওয়ান, তাতে তার পেটে ক্ষিদে থেকে যায়—অস্বস্তি বোধ করে—কাঁদে, চিৎকার করে। বড় শিশুদের বেলায় দেখা যায়, অনেক সময় তাদের ইচ্ছার বা রুচির বিরুদ্ধে অনেক কিছু তাদের খাওয়াতে চেষ্টা করা হয়। এতে তারা বিরক্ত হয়, বাধা (resist) দেয়—কেঁদে, চিৎকার করে, হাত পা ছুড়ে।

(গ) কৃমি, কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation), হজমের গোল-

মাল, টন্‌সিল বা এ্যাডিনয়েডস এই সবের কারণেও শিশু শারীরিক অসুস্থতা বোধ করে। ঘ্যান-ঘ্যান, প্যান-প্যান লেগেই থাকে।

(ঘ) আলো, বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য ছাড়াও শিশুর জীবনে সমবয়সী খেলার সঙ্গী-সাথীর বিশেষ প্রয়োজন। সুস্থ শিশু যদি যথেষ্ট খেলাধুলার সুযোগ না পায়, শরীর ও মনে সে ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

(ঙ) চোখের বা কাণের দোষে শিশু যদি ঠিক মত দেখতে বা শুনতে না পায় তা হলেও তার মানসিক অশান্তির কারণ ঘটে।

(চ) স্বাস্থ্য খারাপ থাকলে, শিশু সর্ব্বদাই ঘ্যান-ঘ্যান করে, রাগ করে, কান্নাকাটি করে।

অনেক শিশু আছে যারা অন্যদের চেয়ে একটু বেশী রাগ করে। সর্ব্বদাই তাদের কিছু না কিছু চাই-ই। চাহিদা না মিটালেই তাদের রাগ, চিৎকার, কান্নাকাটি, মাটিতে গড়াগড়ি। অনেকক্ষেত্রে পিতামাতা বা বয়স্ক ব্যক্তি এর জন্যে দায়ী। কেন দায়ী, সে কথা পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করেছি। সব সময়েই যে তাদের চাহিদা মিটাতে হবে তা নয়। এই রকম শিশুর জন্যে গৃহ পরিবেশে শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার প্রয়োজন। সকল শিশুকেই শিখতে হবে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়। শৈশব অবস্থা থেকেই তার ভিতর শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে হবে। খুব বেশী প্রয়োজন না হলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রয়োজনে বয়স্ক ব্যক্তিকে দৃঢ়চেতা হতে হবে। ধৈর্য্য ও সহানুভূতির দ্বারা শিশুমনে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগিয়ে তুলবেন।

শিশু যতবেশী বুদ্ধিমান হয় প্রক্ষোভ তার ভিতর ততবেশী দেখা যায়। 'ভয়' সবচেয়ে শক্তিশালী প্রক্ষোভ। ভয়ের সম্মুখীন হতে এবং ভয় থেকে নিজেকে সংযত করতে শিশুকে শিখতে হবে। London Child Guidance Clinic দ্বারা প্রকাশিত এক পত্রিকায় Children Fears সম্বন্ধে W. Moodie বলেছেন :

"Intelligent children experience fear much more acutely than dull ones···They see so much, think so much and appreciate so much and all the influences that flood on the mind are so acute that they suffer for being intelligent in this way···One of the definitions of the feeble-minded child is that he does not appreciate danger and fear as he should···he will expose himself to danger without realizing that he is in danger···he is not brave—just stupid."

শিশু সাধারণতঃ আকস্মিক ঘটনায় ভীত হয়। মেঘের কড়কড় শব্দে চমকে ওঠে, ভয় পায়। অদ্ভুত কিছু দেখলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। নতুন জায়গা, নতুন মানুষের সঙ্গ, অন্ধকার, ইত্যাদিতে নিরাপত্তাবোধ থাকে না। বড়দের মধ্যে ঝগড়ায় (বিশেষ করে পিতামাতার মধ্যে) শিশু ভয় পায়, কারণ অসহায়-বোধ করে। সব শিশু একই পরিস্থিতিতে যে ভয় পায় তা নয়। বহুরূপী সাজে নাচ দেখতে গিয়ে আলো চিৎকার করে ওঠে। তুলু হঠাৎ কেঁদে চিৎকার করে ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে শিক্ষিকার পিছনে আশ্রয় নেয়—কেন? কি হ'ল? দেখা গেল রাস্তা দিয়ে চলেছে এক সাধু, বড় বড় দাড়ি। সারা গায়ে ছাই মাখা। ছোট্ট আড়াই বৎসরের রুমু কালো কুচকুচে 'gollywog' পুতুলটা কিছুতেই কোলে নিতে চায় না, ভয় পায়।

শিশুদের এই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভয় পর্য্যবেক্ষণ করায় ভিতর একটা আনন্দ আছে। টুলুর (৫) মা বলেন, "কি বলব দিদিমণি, এমন ডানপিটে ছেলেটা, ভয় বলে কিছু নেই, অন্ধকারে কোথায় না যায়, বনবাদাড়ে কোথায় না ঘোরে।" অথচ ঐ টুলুই নার্সারী বিদ্যালয়ে অন্য শিশুদের উপর কি অত্যাচারই না করে। নতুন কিছু শিখতে চায় না। ছোটদের উপর তার ভারী হিংসা—তাদের খেলনা কেড়ে নেয়, ঠেলা দিয়ে ফেলে দেয়। অথচ অন্য শিশু যদি ও গায়ে হাত তুলেছে, অমনি ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করা—এগুলি তার দৈনন্দিন ব্যাপার। এই ব্যবহারগুলি তার ভয়ের নিদর্শন, আত্মবিশ্বাস কম। সর্ব্বদাই তার ভয়, এই বুঝি সে বঞ্চিত হ'ল, অন্যরা অবহেলা করল, ছোটদের কাছে হেরে গেল—নিরাপত্তাবোধ তার কম, সাহসের সঙ্গে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সেগুলি সমাধান করতে সে পারে না। অন্যের ক্ষতি করে, অন্যকে অসুখী করে সে নিজেকে বাঁচাতে চায়।

অনেক শিশু অন্ধকার, জীবজানোয়ার, পুলিস, ডাক্তারকে ভয় করে। সন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত পুলিস দেখলেই দৌড়ে পালিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকত। গোপা ডাক্তারবাবুর নাম শুনলেই ভয়ে কেঁদে অস্থির হয়ে ওঠে। এই ধরনের ভয়কে বলা হয় 'objective fear'—বিশেষ কোনও বস্তুর উপর ভয়। এগুলি acquired fear-ও বটে, কারণ কেউ শিশুকে এদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভীতিজনক কিছু বলেছে। আবার অনেক শিশু কাল্পনিক ভয়ে ভীত হয়। যেমন —খোকন গর্ত্ত দেখলে ভয় করে না, কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু কিছু পরেই বলে ওঠে, 'বাবা পালাই ওর ভেতর বড় একটা সাপ আছে'। এটাকে বলা হয় 'subjective fear', সামনে কিছু না দেখলেও কল্পনায় সে ভীত হয়ে ওঠে। এই কাল্পনিক ভয়ই শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং জীবনপথে (attitude of life) বাধা (affect) সৃষ্টি করে।

বর্ত্তমানে সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, 'ভয়' ঠিক জন্মগত নয়, তবে পরিবেশের পরিস্থিতি শিশুর উপর প্রভাবিত হয়ে শিশুকে ভীত করে তুলতে বাধ্য করে। কারণ আত্মরক্ষণশীলতারূপ সহজ প্রবৃত্তি (instinct)-র সঙ্গে ভয় পাওয়ার প্রবণতা ও ক্ষমতা (capacity for feeling fear) জন্মগত। বুবু শৈশব অবস্থাতে এঘর-ওঘর, বারান্দা উঠোন চষে বেড়াত সন্ধ্যের পরেও। কিন্তু মা নিজেই ভীত হলেন, কি জানি কোথায় পড়েটড়ে যাবে, কি না কি ভাঙবে, সাত-সতেরো ভেবে সর্ব্বদাই বলেন, 'বুবু শেয়াল আছে বাইরে

মুসৌরিতে দলাই লামার বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও দলাই লামা

বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান শিক্ষা-কেন্দ্র
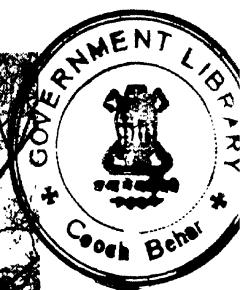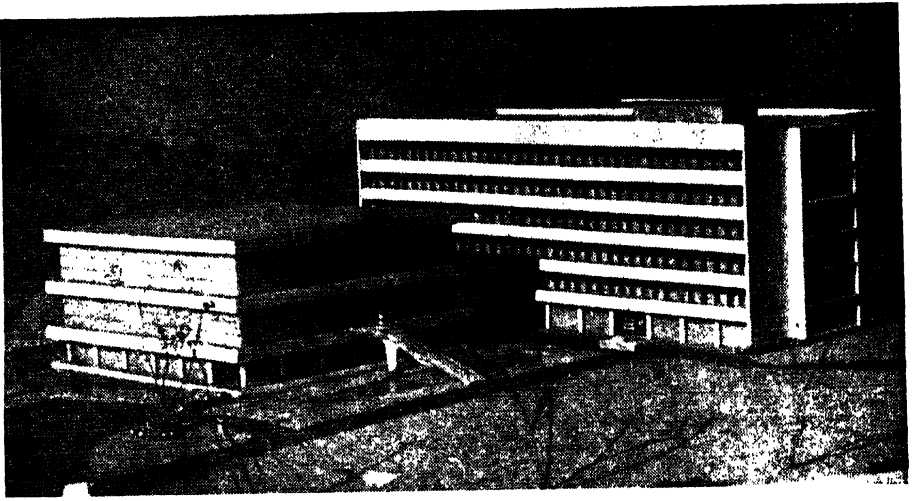
'রবীন্দ্র-ভবনে'র মডেল—সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ইহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন

মহাকবি কালিদাস-রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এর একটি দৃশ্য যাহা দিল্লী হইতে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' কর্তৃক ও অভিনীত হইয়াছে

যেও না'। সেই শেয়ালের ভয়েই বুবু সন্ধ্যের পর বাইরে আর পা বাড়াতে চায় না। অনেক শিশু উত্তেজিত (stimulated) হয় কম, কাজেই ব্যবহারে তার ভয়টা খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না। কিন্তু অনেকে খুব অনুবেদী (sensitive) একটুতেই প্রভাবিত হয়। অনেকে আবার সাংঘাতিক ভীতু হয়ে পড়ে। এদের চলা-ফেরায়, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে সেটা খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। যে সব বড় শিশু খুব উদ্ধত, আত্মবিশ্বাস কম, উত্তেজনাপ্রবণ (nervous), স্নায়ুরোগপ্রবণ (neorotic) উৎকণ্ঠিত (over-anxious) সর্ব্বদাই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা খুঁজে দেখলে দেখা যায়, শৈশব অবস্থায় এরা খুব ভয় পেত। অনেকে বলেন, 'ও মেয়েটা একেবারে ওর মায়ের ভয় পেয়েছে—অন্ধকারে কিছুতেই যেতে চায় না, ওর মা বা ভীতু!' মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিশু এত অনুবেদী (sensitive) যে, চারিপাশে যারা থাকে তাদের সবকিছু তাকে স্পর্শ করে। মায়ের সান্নিধ্যে থেকে 'ভয়' তার ভিতর অঙ্কুরিত (build up) হয়েছে। Watson তাঁর পর্য্যবেক্ষণে দেখিয়েছেন শিশু জন্মের পরেই কেবল দুইটি পরিস্থিতিতে ভয় পায়,—একটি হ'ল হঠাৎ কোনও জোরে শব্দ শুনে এবং অন্যটি, যদি তাকে ওপরের দিকে একটু ছুঁড়ে হাত সরিয়ে নেওয়া হয়।

বিশেষ কোনও জিনিস মাত্রকেই যে শিশু ভয় পায় তা নয়, তবে তার সঙ্গে যদি যোগাযোগ থাকে ভয় পাবার মত তবেই ভয় ঢোকে। ছোট দুই বৎসরের রীতা, কুকুরের বাচ্চাটাকে আদর করতে যাওয়া মাত্র বাচ্চাটি তার হাতটি মুখের ভিতর পুরে আদর জানাতেই সে চিৎকার করে ওঠে। সেই যে ভয় ঢুকলো, কুকুর দেখামাত্র অনবরত সে চিৎকার করে। বিদ্যুৎ চমকালে ত শিশু ভয় পায় না। ঐ মেঘের কড়কড় আওয়াজেই তার ভয়। অন্ধকারকেও শিশু ভয় পায় না—কিন্তু 'ধরল শিয়ালে', 'ঐ জুজুবুড়ী বসে আছে', এই সবের যোগাযোগেই সে ভয় পায়। অর্থাৎ নিজেদের সুবিধার জন্যে আমরা এমনি করে শিশুর ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ করি।

শিশুর এই ভয়ের জন্যে বয়স্ক ব্যক্তি অনেক দিক দিয়েই দায়ী। দুর্ব্বলচেতা, ধৈর্য্যহীন, অবুঝ অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলের নামে ভীত। মা-মাসী-দিদি নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্যে তাকে অনবরতই ভয় দেখায়। দাঁড়াও তোমার দিদিমণিকে বলে দেব—খু-ব পিটাবে। কাজেই দিদিমণির কাল্পনিক মারের ভয়েই সে স্কুলে আসতে নারাজ।

রাতে ভয় পাওয়া, বিছানা ভেজান, স্নায়ু দৌর্ব্বল্য এগুলোর জন্যে অনেকাংশে আমরাই দায়ী। পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শিশুর ক্ষতি যেন তাঁরা না করেন। ভয় দেখিয়ে শিশুকে মানুষ করা যায় না।

নার্সারী বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে শিশুকে অনেক দিক দিয়ে সাহায্য করা যায়। তার নৈতিক দিক গঠনের জন্যে তাকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ভয়ের কারণ অনুসন্ধান করে শিক্ষিকা শান্ত ভাব অবলম্বন করার চেষ্টা করেন। "শিশু ভয় পায় এমন কিছু করা উচিত নয়" এ কথা শিক্ষিকা সর্ব্বদাই মনে রাখেন। ভয়ের ব্যাপারগুলি খেলাধূলায় পরিবর্ত্তিত করে শিশুকে যোগ দেবার সুযোগ দেবার চেষ্টা করেন। অঞ্জলি (৩) ৮ বার চেষ্টা করেও সড়সড়িতে (slide) চড়তে সাহস পায় নি। এ অবস্থায় শিক্ষিকা তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাই করেছেন তার সাহস না আসা পর্য্যন্ত। সমবয়সী শিশুদের দেখে তার যাতে ভয় ভাঙে এমন উৎসাহই বরাবর দিয়ে এসেছেন। তার ভয় দূর করার জন্যে হেসে অবস্থাটাকে আরও সহজ করার চেষ্টা করেছেন। আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, হাসিটা যেন ঐ ভয়ের কারণটার উপর থাকে, শিশুকে নিয়ে নয়। দেখতে হবে, সে যেন ভয়ের সম্মুখীন হতে পারে, পালিয়ে না যায়।

শিশুর অভিজ্ঞতায় এমন অনেক কিছু ঘটে যেটা সে বুঝতে পারে না। দীপু ত (৪) রোজই কলে হাতমুখ ধোয়। সেদিন কল খুলতেই ভক ভক আওয়াজ হতেই সে চমকে উঠে ভয়ে একেবারে দৌড়। এই ভয়ের কারণেই বহুদিন পর্য্যন্ত সে কলে হাতই দিত না। সারাদিনের পর প্রথম জলটা আসার সময় যে একটা শব্দ হয় এটা তার জানা ছিল না।

শিশুর মনে উৎকণ্ঠা ভাব খুব বেশী থাকে—এটা তার ব্যবহারেই প্রকাশ পায়। ছোট্ট বাপী (৩) দুপুরে ঘুমোবার সময় ছটফট করে, বহুক্ষণ সময় লাগে তার চোখে ঘুম আসতে। এটা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। কিছু দিন আগে তার নতুন ভাই জন্মেছে, মায়ের মনোযোগ তার প্রতি একটু কম হয়ে গেছে, সেটার জন্যে সে মনে মনে উৎকণ্ঠিত। শিক্ষিকা তার কাছে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে তার কোলের কাছে একটা পুতুল দিয়ে তবে তাকে ঘুম পাড়াতে পারেন। এই ভয়, উৎকণ্ঠা এগুলি স্থায়ী থাকলে পরবর্ত্তী বয়সে অনেক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। তখন তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এবং সে চিকিৎসা একমাত্র বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত মনোস্তত্ত্ববিদ্‌রাই করতে পারেন। তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা খেলাধূলার ভিতর দিয়েই শিশুকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন। এই প্রক্ষোভের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে শিশুর কতগুলি উপকরণের প্রয়োজন, যেমন, জল, বালি, কাদা, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, এবং ভেঙে চুরে খেলার জন্য কতগুলি জিনিস। খেলাধূলার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রবাসীতে আমি আলোচনা করেছি। শিক্ষিকা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবেন ভয়, চিন্তা, ও উৎকণ্ঠার নিদর্শনের জন্যে, এবং সেই মত তার উপযুক্ত খেলার উপকরণ দিয়ে তাকে সাহায্য করবেন। সব দিক দিয়ে শিশুকে তিনি দেখাবেন তাকে তিনি ভালবাসেন এবং যত্ন নিতে প্রস্তুত।

হাসির ভিতর দিয়ে শিশু নিজেকে সহজ করে আনে। যে শিশু স্বাভাবিক সুখী সে সহজে কাঁদে, সহজে হাসে। হাসি হচ্ছে

স্বাভাবিক শিশুর লক্ষণ। তাই নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন ভাবে সৃষ্টি করা হয় যেখানে শিশু স্বাধীন ভাবে আনন্দের সঙ্গে সারাদিন কাটাতে পারে। একটি আদর্শ নার্সারী বিদ্যালয়ে, বিনা হাসি-আনন্দে, কখন দিন অতিবাহিত হয় না।

দিনান্ত চাহে শান্তিতে হতে লীন

শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস

খুশির খেলায় হাল্‌কা ছোঁয়ার ভারে,
তরবারি তব নিমিষে বিঁধিতে পারে।
মনের বল্গা যখন আল্‌গা রয়,
হে অধিকারিণী, তখনই তোমার জয়।
ও অসি কুটিল, বাঁকা—
মনোমোহিনী গো, এনো না নয়ন আগে,
রাখো তারে খাপে ঢাকা।

কত না রজনী, উজ্জ্বল দিনমান
কাটিয়া করেছ নিঃশেষে খানখান।
এসেছি চলিয়া ভয়ে ভয়ে এত দূরে—
কেন বার বার এখনও আস গো ঘুরে।…
উত্তর বায়ু বহে,—
মঞ্জীর ধ্বনি কেন গো শুনাও ধনি,
স্থান তব হেথা নহে।

আমার মনের শীতল শান্তি আর
সহিতে চাহে না ও আলো-বহ্নি ভার।
আজি নিরালায় চলিতে সাধ যে একা,—
শান্তিহারিণী, দিও না এখানে দেখা।
আজও বেঁচে আছি বুঝি,
এই সাধটুকু বুকে লয়ে চুপে চুপে
আনজনে পথে খুঁজি।

বিগত শরৎ, হেমন্ত উদাসীন,
দিনান্ত চাহে শান্তিতে হতে লীন।
সন্ধ্যামালতী কুটিল কুটির ছায়,
আহত বক্ষ তাহারই স্পর্শ চায়।
রক্ত গোলাপ নয়,
উগ্র-সুরভি,—রক্ত-পিপাসাতুরা,
সে যে শুধু জ্বালাময়।

কালিদাস সাহিত্যে লক্ষ্মী-সরস্বতী

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

ধন ও ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী আর জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নিয়ে মহাকবি কালিদাস তাঁহার সাহিত্যের মাঝে মাঝে অনেক হৃদয়গ্রাহী কথা বলেছেন, এখানে কয়েকটি দেখান গেল।

কালিদাসের সময়েও সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দুই দেবীর কেহ কাহাকেও দেখতে পারেন না ও এক জায়গায় একসঙ্গে দুইজনে থাকতে চান না। ঠিক এই ভাবটি তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের শেষাঙ্কে 'ভরতবাক্যে' দেখা যায়:

'পরস্পরবিরোধিন্যোরেক সংশ্রয়-দুর্লভম্।

সঙ্গতং শ্রীসরস্বত্যোর্ভূয়াদ্ভূতয়ে সতাম্'। (বিক্রম—৫ম অঙ্ক)।

যাঁহারা দুইজন পরস্পরের বিরোধিনী, এবং যাঁহারা কোনও একজনকে আশ্রয় করে একত্র রয়েছেন এমন বড় একটা দেখা যায় না, সেই শ্রী ও সরস্বতীর সৎ লোকের উন্নতির নিমিত্ত মিলন হ'ক।

যে আন্তরিকতার সহিত মহাকবি এখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র বাসের প্রার্থনা জানিয়েছেন, তা' ভাবলে মনে হয় কালিদাসের কেবল সমসাময়িক কালে নয়, তারও হয়ত অনেক পূর্ব্ব হতে যাঁহারা কেবল বাণীর আরাধনায়—বিদ্যাচর্চ্চা করে—জীবনযাপন করতেন, তাঁহারা প্রায়ই কমলার কৃপা হতে বঞ্চিত থাকতেন, ধনোপার্জ্জন করা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে উঠত না, দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহাদের জীবন শেষ হ'ত। অপরপক্ষে, যাঁহারা প্রভূত ধনের অধিকারী হতেন, বিদ্যার সঙ্গে তাঁহাদের বড় একটা সম্পর্ক থাকত না। বিদ্বান ও সৎ লোক যে সংসারে ধনোপার্জ্জন করতে না পেরে সারা জীবন অর্থকষ্ট ভোগ করবেন, হয়ত তিনি ইহা দেখতে পারতেন না তাই লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনের জন্য তাঁহার অন্তরের এ আকুলতা।

অনেকটা এইরূপ ভাব তিনি 'রঘুবংশের' ষষ্ঠ সর্গেও প্রকাশ করেছেন:

'নিসর্গভিন্নাস্পদমেকসংস্থম্।

অস্মিন্ দ্বয়ং শ্রীশ্চ সরস্বতী'চ। (রঘু—৬।২৯)।

যদিও শ্রী ও সরস্বতী স্বভাবত বিভিন্ন স্থানে বাস করেন (একসঙ্গে দুইজনে একস্থানে থাকতে পারেন না) তবু কিন্তু এই অঙ্গদেশের রাজার কাছে তাঁহারা দু'জনে একসঙ্গে রয়েছেন।

এখানে মহাকবি বলতে চেয়েছেন যে, যদিও বাণী ও কমলার এক জায়গায় একসঙ্গে থাকা স্বভাব নয়, তবু এই অঙ্গদেশের রাজার বেলা যেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। অঙ্গদেশের রাজার যেমন ধন ও ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, তেমনি তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানেরও তুলনা হয় না। তাঁহার গৃহে মনে হয় যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী একসঙ্গে বাস করেন।

এখনকার মত দেড় হাজার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে—সেই কালিদাসের যুগেও লোকদের বিশ্বাস ছিল লক্ষ্মী চঞ্চলা, একস্থানে বাস করতে পারেন না বেশী দিন। এই ভাবটি নিম্নলিখিত শ্লোকে পাওয়া যায়:

'যেন শ্রিয়: সংশ্রয়দোষরূঢ়ম্।

স্বভাবলোলেত্যযশঃ প্রমৃষ্টম্'। (রঘু—৬।৪১)।

লক্ষ্মী যাঁহাকে আশ্রয় করে থাকেন, তাঁহারই দোষ থেকে উৎপন্ন যে দুর্নাম—'লক্ষ্মী চঞ্চল স্বভাবা' লক্ষ্মীর সে দুর্নাম ঘুচিয়েছেন ইনি—এই রাজা প্রতীপ।

মহাকবির টীকাকার মল্লিনাথ এ শ্লোকটির অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি বলেন যে, 'কেবল মূর্খ লোকেরাই লক্ষ্মীর নামে অপবাদ দেয় তিনি চঞ্চল-স্বভাবা', এক জায়গায় থাকতে পারেন না বেশী দিন, কিন্তু কালিদাসের মত তা' নয়, মহাকবির মতে লক্ষ্মী চঞ্চলা নন, তিনি একস্থানে চিরকাল বাস করতে চান, তবে যাঁহার আশ্রয়ে তিনি থাকেন, তিনি যদি ঐশ্বর্য্যে মত্ত হয়ে আলস্যে দিন কাটান, অন্যায় আচরণ করতে থাকেন কিংবা মদ্যপান, জুয়াখেলা, পতিতাসক্তি প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হয়ে পড়েন, লক্ষ্মীর তখন তাঁহার কাছে আর বাস করা চলে না, তাঁহাকে ছেড়ে চলে আসতে তাঁহাকে বাধ্য হতে হয়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মা লক্ষ্মী চলে যান নিজের চঞ্চল স্বভাবের জন্য নয়, আশ্রিতের এই সমস্ত দোষ তাঁহাকে চলে যেতে বাধ্য করে। তিনি এগুলি সহ্য করতে পারেন না বলে চলে যাওয়া ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর থাকে না। রাজা প্রতীপ অলস নন, অন্যায় কাজ তিনি কখনও করেন না, কোনও ব্যসনে তাঁহার আসক্তি নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট লক্ষ্মীর বাস করার কোনও বাধা নাই। তিনি অচঞ্চলা হয়ে বাস করেন তাঁহার ঘরে।

তবে, তাঁহার সময়ে অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল লক্ষ্মী চঞ্চলা, তাই কালের রীতি অনুসারে কিছু চলে আর নিজের মতও কিছু দিয়ে তিনি অপর এক জায়গায় লিখলেন:

শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্র চলামভূ।

দনলসোনেলসোমদ্যুতিঃ'। (রঘু—৯।১৫)।

তিনি (রাজা দশরথ) ছিলেন অগ্নির মত দীপ্তিমান ও চন্দ্রের মত কান্তিমান। তিনি দেখলেন লক্ষ্মী আশ্রিতকে ছেড়ে চলে

যাবার জন্ত ছিদ্র খোঁজেন, তিনি তাই আলস্তবিহীন হয়ে রাজকার্য্য করতে লাগলেন।

এই শ্লোকটিতে দেখা গেল, লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে থাকেন, তাহাকে কি করে ছেড়ে চলে যাবেন কেবলই তার ছিদ্র অন্বেষণ করেন, এবং যদি তাহার মধ্যে আলস্ত কিংবা জুয়াখেলা, মদ্যপান ইত্যাদি দোষ দেখতে পান, তাহাকে ছেড়ে অপর জায়গায় চলে যাবার ব্যবস্থা করে বসেন। রাজা দশরথ এ কথা জানতেন পাছে তাঁহার মধ্যে কোনও দোষ পেয়ে লক্ষ্মী তাঁহাকে ছেড়ে চলে যান তিনি তাই আলস্তবিহীন ও ব্যসনবিহীন হয়ে সারাদিন নিজেকে কাজকর্ম্মে নিয়োজিত করে রাখতেন, যার ফলে লক্ষ্মীকে তাঁহার ঘরে অচঞ্চলা হয়ে বাস করতে হ'ত।

'রঘুবংশের' সপ্তদশ সর্গে মহাকবি লক্ষ্মীকে চঞ্চল-স্বভাবা বলে স্পষ্টভাবে অভিহিত করেছেন।

রাজা অতিথির সৌভাগ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> 'প্রসাদাভিমুখে তস্মিন্ চপলাপি স্বভাবতঃ।
> নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী।' (রঘু-১৭।৪৬)।

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা হলেও কষ্টিপাথরে স্বর্ণের রেখার মত সেই রাজার কাছে স্থিরা হয়ে রহিলেন।

যাহাই হ'ক চঞ্চল স্বভাবের জন্তই হ'ক বা আশ্রিতের মধ্যে আলস্ত প্রভৃতি দোষের জন্তই হ'ক মা লক্ষ্মী যাঁহার আশ্রয়ে কাটালেন এতদিন তাঁহাকে যখন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, তার যতই দোষ থাকুক না কেন, তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে দুঃখিতা হয়ে অশ্রুবিসর্জ্জনও করেন। রামের শুভজন্ম বর্ণনায় মহাকবি বলেন যে, 'রাম যে মুহূর্তে জন্মালেন, রাবণের মুকুটের মণিগুলি ভূমির উপর পড়ে গেল। দেখে মনে হ'ল যেন রাবণের রাজলক্ষ্মী রাক্ষসরাজকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করে নিলেন'।

লক্ষ্মী যেমন আলস্তপরায়ণ ব্যক্তিদের ঘর থেকে চলে যেতে চান, তেমনি আবার নিজের মনোমত গুণসম্পন্ন পুরুষের গৃহে স্বেচ্ছায় আসবার জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। 'রঘুবংশের' পঞ্চম সর্গে রাজকুমার অজের সম্বন্ধে কালিদাস বলেন যে, যখন তিনি গুরুর গৃহ হতে বিদ্যালাভ করে ফিরে এলেন, সারা দেহে তখন তাঁহার যৌবনের অপূর্ব্বকান্তি, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখলে মনে হত—

> 'শ্রীসাভিলাষাপি গুরোরনুজ্ঞাম
> ধীরেব কন্যা পিতুরাচকাঙ্ক্ষ।' (রঘু—৫।৩৮)।

যেমন ধীরা কন্যারা তাহাদের মনোমত পতি বরণ করার পূর্ব্বে পিতার অনুমতির অপেক্ষা করে থাকে, মনে হ'ত যেন রাজলক্ষ্মীও তেমনি অজের প্রতি অভিলাষিণী হয়েও তাঁহার পিতার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছেন।

রাজলক্ষ্মী রাজকুমার অজকে বরণ করার জন্ত উদ্গ্রীব, কিন্তু তাঁহার পিতা রঘু যতক্ষণ না তাঁহার অভিষেকের ব্যবস্থা করেন, তিনি তাঁহাকে বরণ করেন কিরূপে।

কেবল এ শ্লোকেই নয়, আরও কয়েক স্থানে কালিদাস রাজ্য-সম্পদকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করেছেন। কলিঙ্গরাজ সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, তিনি যেমন দক্ষিণ হাতে তেমনি বাম হাতেও সমান ভাবে শরনিক্ষেপ করতে পারেন বলে, 'তাঁহার দুটি বাহুতেই জ্যা-আঘাতের দুইটি চিহ্ন হয়ে গেছে, দেখলে মনে হয় যেন বিপক্ষ পক্ষের রাজলক্ষ্মীকে বন্দিনী করার সময় তাঁহার কাজল-মিশান অশ্রুর দাগ এঁর দুটি বাহুতেই মুদ্রিত হয়ে রয়েছে' (রঘু—৬।৫৫)।

এখানে বিপক্ষ পক্ষের রাজলক্ষ্মীকে বন্দিনী করার সময় এই কথা বলাতে বুঝতে হবে বিপক্ষ পক্ষের রাজ্য জয় করার সময়। শ্রীর সহিত রাজ্যসম্পদের উপমা।

রাজ্যশ্রীকে মহাকবি রাজার বধূরূপেও স্থানে স্থানে কল্পনা করেছেন—রাজকুমার অতিথির পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাকে যখন সিংহাসনে অভিষেক করার ব্যবস্থা করা হ'ল, এবং মুক্তার অলঙ্কার ও পুষ্পের মালা এবং হংসচিহ্নিত পোশাক পরান হ'ল, তাঁহাকে দেখাতে লাগল 'যেন বর রাজ্যশ্রীরূপ বধূর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন'।

রাজ্যসম্পদ ছাড়া সৌভাগ্যকেও মহাকবি লক্ষ্মী বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দুমতীর 'স্বয়ংবরসভায় বিবরণ দিতে গিয়া কালিদাস বলেন :

> 'তস্মাদপাবর্ত্তত দূরকৃষ্টা
> নীত্যেব লক্ষ্মীঃ প্রতিকূলদৈবাৎ।' (রঘু-৬।৫৮)।

পুরুষকারের সাহায্যে ভাগ্যলক্ষ্মীকে অতি নিকটে এনেও মানুষ দৈবের বিড়ম্বনায় তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয়।

মহাকবি এখানে লক্ষ্মী যে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহাই বুঝাতে চেয়েছেন।

শ্রী সম্বন্ধে মহাকবি 'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশে' একটি বেশ নূতন কথা বলেছেন। লক্ষ্মী যাঁহারা তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ অথবা প্রিয়পাত্র, স্বয়ং নাকি তাঁহাদের মস্তকে পদ্মপত্রের ছত্র ধরে থাকতে ভালবাসেন।

'কুমারসম্ভবে' পাওয়া যায় যে, পার্ব্বতীর সহিত মহেশ্বরের যখন বিবাহ হয়ে গেল, এবং বরবধূকে রত্নাসনে বসান হ'ল, লক্ষ্মী তখন নিজের হাতে একটি দীর্ঘনালরূপ দণ্ডবিশিষ্ট পদ্মের পাতা ছত্রের মত তাঁহাদের মস্তকের উপর ধরে রইলেন (কু—৭।৮৯)।

বৃদ্ধবয়সে রাজা দিলীপ যখন সংসার ছেড়ে বনে চলে গেলেন এবং তাঁহার পুত্র রঘু রাজ্যশাসন করতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁহাকে কিরূপ দেখাত মহাকবি তাহা নিম্ন শ্লোকে বলে দিতেছেন :

> 'ছায়ামণ্ডল লক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ং।
> পদ্মা পদ্মাতপত্রেন ভেজে সাম্রাজ্য দীক্ষিতম্।' (রঘু—৪।৫)।

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পর রঘুর দেহ হতে এমন একটা ছটা বার হ'ত, যা দেখলে মনে হ'ত বুঝি স্বয়ং মা লক্ষ্মী তাঁহার মস্তকে পদ্মপত্রের ছাতা ধরে রয়েছেন, অদৃশ্যভাবে থেকে।

টীকাকার মল্লিনাথ তাঁহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, লক্ষ্মী যে বাস্তবিক রঘুর মাথায় ছাতা ধরে থাকতেন, তা নয়, রঘুর তখন দেহের কান্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল, ও তাঁহার মাথার পিছন হতে এমন একটা অস্বাভাবিক তেজের ছটা বার হ'ত অবশ্য সেটা যে প্রত্যক্ষ করা যেত তা নয়, তবে অনুভব করা যেত এবং অনুমানে বুঝা যেত, এবং মনে হ'ত লক্ষ্মী বুঝি স্বয়ং রঘুর নিকটে অদৃশ্যভাবে থেকে তাঁহার মাথার উপরে পদ্মপাতার ছাতা ধরে রয়েছেন। মল্লিনাথ শেষে বলেছেন, 'নহিলে এ কান্তি-সম্পদ তাঁহার এল কোথা থেকে'।

তেজস্বী এবং লক্ষ্মীবান পুরুষদের দেহে যে একটা অস্বাভাবিক তেজের চিহ্ন থাকে মহাকবি সে কথা রাজা দিলীপের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গেও বলেছেন।

রাজা দিলীপ যখন বনে বনে গুরুর গরু চরিয়ে বেড়াতেন, তখন তাঁহার দেহে রাজ-পোশাক থাকত না, রাজার কোনও চিহ্ন তিনি ধারণ করতেন না, রাখালের বেশে তিনি গরু চরাতেন, তবু—তবু তাঁহার দেহে এমন একটা অস্বাভাবিক তেজ লক্ষিত হ'ত যাহা দ্বারা মনে হ'ত রাজলক্ষ্মী তাঁহার সঙ্গে আছেন, তিনি একজন অসাধারণ লক্ষ্মীবান পুরুষ—রাজা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী সম্বন্ধেও কিছু কিছু বিবরণ মহাকবির সাহিত্যে পাওয়া যায়।

'বিক্রমাঙ্কচরিত্রের' মঙ্গলাচরণে কালিদাস লিখেছেন :

'চতুর্মুখ-মুখাম্ভোজ বনহংসীবধূর্মম।
মানসে রমতাং নিত্যং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।'

চতুর্মুখ ব্রহ্মার বদনরূপ পদ্মবনের হংসবধূ স্বরূপ সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী আমার মনের মাঝে সর্ব্বদা বিহার করুন।

মহাকবির প্রার্থনা, সরস্বতী যেন তাঁহার মনের মাঝে নিত্য বিরাজ করেন, যাহার ফলে তাঁহার মনে নব নব ভাব ও কল্পনার উদয় হয় ও সেগুলি তাঁহার লেখনী দিয়া সুললিত ছন্দে বার হয়ে জনগণের মনোরঞ্জন করতে পারে।

মা সরস্বতীর সবই শুভ্র, তাঁহার দেহের বর্ণ শুভ্র, পরিধানের বস্ত্র শুভ্র, যে পদ্মটির উপর তিনি দাঁড়ান সেটি শুভ্র, যে হংসের উপর তিনি বসেন সেটিও শুভ্র।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে মহাকবি লিখেছেন যে, দেবী সরস্বতী একখানি নাটক রচনা করেছিলেন, তার নাম 'লক্ষ্মী স্বয়ংবর', এবং সে নাটকখানি দেবতাদের সভায় কয়েকজন দেব ও অপ্সরা অভিনয় করেছিলেন।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে পাওয়া যায় শিব-পার্ব্বতীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বরকনেকে যখন একাসনে বসান হ'ল সরস্বতী এমন একটি শ্লোকে তাঁহাদের স্তবগান করলেন, যে শ্লোকটি একসঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুইটি ভাষায় রচিত। সে শ্লোকটির আরও বিশেষত্ব ছিল এই যে, সুললিত সংস্কৃত শব্দগুলির দ্বারা বরের ও সরল প্রাকৃত ভাষার দ্বারা বধূর—দুইজনের একসঙ্গে গুণগান করা হয়েছিল।

মহাকবি তাঁহার রঘুবংশে লিখেছেন যে, রঘু যখন তাঁহার পিতৃদত্ত সিংহাসনে বসলেন, সেই সময় :

'পরিকল্পিত সান্নিধ্যা কালে কালে চ বন্দিষু
স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভিরুপতস্থে সরস্বতী।' (রঘু—৪ ৬)।

চারণেরা—স্তুতি-পাঠকেরা—এমন সুন্দর সুন্দর অর্থযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহার স্তুতি গাইতেন যে, শুনে মনে হ'ত বুঝি দেবী সরস্বতী স্বয়ং তাহাদের মধ্যে থেকে এই মনোহর শব্দগুলির দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করছেন।

অর্থ ও জীবন

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
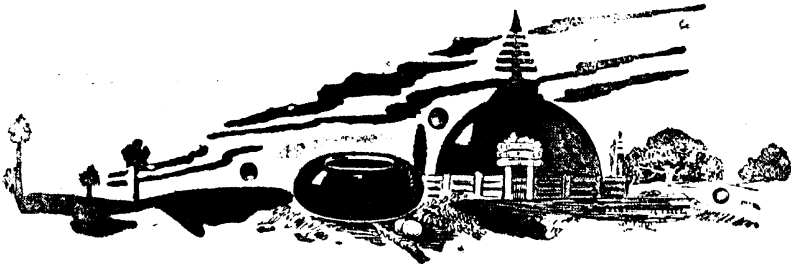
বহুক্ষণ ভোর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সুরপতি শুইয়া শুইয়াই নানা কথা ভাবিতেছিল। উঠিবার বিন্দুমাত্র তাড়া নাই, কারণ তাহার পরের কর্ম্মতালিকা সে স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ঘরখানার দৈর্ঘ্য দশ ফুট, প্রস্থ সাত ফুট, আর উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুটের বেশি হইবে না। একতলায় স্যাঁতসেতে ঘর, একটা অদ্ভুত ভ্যাপসা গন্ধ সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। ঘরের অর্দ্ধেক জুড়িয়া একখানা চৌকি। তাহার উপরে একটা অতি মলিন শতরঞ্চি। উপাধান নাই, কিন্তু তাহাতে সুরপতির কিছু আসে যায় না।

ওদিকে একটা অর্দ্ধ-ভগ্ন টিনের পেঁটরা। তাহারই পাশে একখানা ময়লা কাপড়ের টুকরা পাতিয়া আর একটা কাপড়ের বাণ্ডিল মাথায় দিয়া অন্নপূর্ণা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। জাগ্রত কি নিদ্রিত ঠিক বুঝা যায় না।

স্বামী ও স্ত্রীর শয়ন এইরূপই চলিতেছে—প্রায় তিন মাস যাবৎ। আজ ছয় দিন যাবৎ তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহা হইবার তাহা হইবেই, অযথা আর ভাবিয়া লাভ কি? সুরপতি কিছুই ভাবে না। ফুটপাতে শুইবার অসুবিধা, আর রেল ষ্টেশনে বা পার্কে বেশিক্ষণ থাকিলে পুলিশের উৎপাত আরম্ভ হয়। নহিলে সুরপতি রাত্রেও বাড়ী ফিরিয়া আসিত না।

কোন ফাঁকে একটু আলো ঘরে আসিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সুরপতি ভাল করিয়া চাহিল। মনে হইল, অন্নপূর্ণার আঙুলের পাশটা যেন জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। আরও একটু নজর দিয়া দেখিল, একটা আংটি। অনেক দিন আগের দেওয়া এখন আর দিনক্ষণ মনে নাই; তবে আংটিটা খাঁটি সোনার। বিনিময়ে অন্ততঃ দশটা টাকা ধার নেওয়া চলে।

সুরপতি শয্যাত্যাগ করিল। আস্তে আস্তে সে অন্নপূর্ণার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, অন্নপূর্ণা অঘোরে ঘুমাইতেছে।

ঘুমাক আর নাই ঘুমাক—কথা একই। বাধা দিবার অবসর না দিলেই হইল। আর, বাধা দিলেই কি সে সুরপতির সঙ্গে জোরে পারিবে? সুরপতি সহসা অন্নপূর্ণার বুকে চাপিয়া বসিয়া সোনার আংটিটি ছিনাইয়া লইল। অন্নপূর্ণা জাগিয়াই ছিল। বাধাও দিল না, কথাও কহিল না। সুরপতি একটু অবাক হইল মাত্র।

স্ত্রীকে এই প্রেমালিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া সুরপতি বাহিরে আসিল। রৌদ্র তখন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, জনাকীর্ণ শহর কর্ম্ম কোলাহলে মুখর।

প্রথমেই একটা স্যাকরার দোকান দরকার। সুরপতির জানা-শোনা আছে। সে মোড় ঘুরিয়া সেদিকেই চলিল।

—নমস্কার, সুরপতি বাবু যে?

সুরপতি চমকাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল ওপাড়ার সতীশ বোস। স্কুলের মাষ্টার। বলিল, নমস্কার।

সতীশ বলিল, ছেলেটাকে আর গ্রামের স্কুলে দিলেন কেন? ওখানে বেশ ভাল ছিল সে। গ্রামের স্কুলে কি আর ভাল পড়া হ'বে?

কি আর করি বলুন। তার মাসিমা যে একেবারেই ছাড়ে না—তারও একটি ছেলে ছিল—খোকার সমবয়সী। ঐ একটি সন্তান। সেটিকে হারাইয়া সে এখন পাগলের মত হইয়াছে। নইলে, আমিই কি আর ছেলে বিলাইয়া দিই, পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটি মাত্র ছেলে।

—তাই বলুন, নমস্কার।

—নমস্কার।

'তাই বলুন'। ভাবী আমার দরদী যে। নিজে বাঁচিয়া থাকিলে তবে বাপের নাম। কি চায় এরা? জোড়হাত করিয়া বলিতে হইবে নাকি, মহাশয়, আমারই অন্ন জোটে না তার উপর আবার ছেলে—তাহার পড়াশুনা! মাসিমার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়াছি, পাতের ক'টি ভাত খাইয়া বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এখন ছেলের মাকে কাহারও গলায় বাঁধিয়া দিতে পারিলে হইত।

অর্থ, ভাই অর্থ। জগতে ঐ একটি মাত্রই কাম্য বস্তু। অর্থ না থাকিলে, কে বা কার আর কার বা কে? থাকিলে, স্ত্রী থাকে, পুত্র থাকে—বন্ধু-বান্ধব বজায় থাকে।

এমনিই করিয়া চলিয়াছে এই বিয়াল্লিশ বৎসরের জীবন। কখনও আঠার কখনও বা বিশ। কিন্তু এই তিন মাস যাবৎ পাঁচে আসিয়া ঠেকিয়াছে। স্ত্রীর আহার নাই তাহা সহ্য করা যায়, পুত্রের পাণ্ডুর মুখ দেখিলে কষ্ট হইতে পারে তবে অসহ্য হয় না। কিন্তু নিজের পেটে দানাপানি না পড়িলে আর কোন বাছ-বিচার থাকে না। যাহারা একথা জানে না তাহারা ভণ্ড মিথ্যাবাদী।

এই তিন মাসে বড় জোর দিন কুড়ি অর্দ্ধাহারে মিলিয়াছে। বাকি দিনগুলি যে কেমনে কাটিয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া সহজ

য়। অন্নপূর্ণা কি সাধে একমাত্র ছেলেটাকে বিলাইয়া দিতে রাজী হইয়াছে?

ভিক্ষা করা সুরপতির ধাতে সহে না। চুরি, জাল, জুয়াচুরি, পকেটকাটা কোনটাই তাহার বরদাস্ত হয় না। বন্ধুবান্ধবের কাছে মাথা নোয়াইতে এখনও তাহার লজ্জা হয়। নিঃস্বের এত লজ্জা কেন?

—ওহে রসিক, এই আংটিটা দেখ ত।

রসিক আংটিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া দাগ করিয়া ওজন করিল। বলিল, সোনা মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে আর কত হইবে?

—যাহা হয়, কি আর করি? এখনও যে কোন চাকরী জোগাড় হয় নাই। আবার স্ত্রীরও জ্বর। দশটা টাকা দাও ত এখন।

রসিককে দেশের লোক বলিলেও চলে। সে একটু সুর নিচু করিয়া বলিল, তা এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে?

—যত দিন চলে। উপায় কি? চেষ্টার ত আর কসুর করি না।

—তা গ্রামে গেলে কি আর ভাল হয় না?

সুরপতি চটিয়া গেল। কাঁহাতক এই সব বেয়াক্কা উপদেশ ভাল লাগে? কেহ বলিবে, চাষ কর, কেহ বলিবে, ছোটখাট ব্যবসা কর। বলা সোজা। কে কাহার কথাটা বোঝে?

এমন করিয়া বাঁচিয়াই বা লাভ কি? জীবনের একটি দিনও সে অভাব-অনটনের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিল না। জীবনের একটি দিনও সে বেপরোয়া ভাবে অর্থ ব্যয় করিতে পারিল না। ভাল মাছটা কিনিতে গেলে মনে হইয়াছে, এ অপব্যয়। ট্রামে উঠিলে মনে পড়িয়াছে ছেলের বিস্কুটের কথা। স্ত্রীর জন্য একখানা ভাল শাড়ী কিনিতে গেলে মনে হইয়াছে বাড়ীওয়ালার পাওনার অঙ্ক। জীবনের একটি দিনও কি সে এই চিন্তা হইতে রেহাই পাইয়াছে? এই বাঁচিয়া থাকিবার কি অনন্দ; এ যেন পঙ্গু হইয়া বাঁচা। জীবনের অমর্য্যাদা মাত্র।

জীবনে নূতন অভিজ্ঞতার আর কি বাকি আছে? সে চাকুরি করিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, ছেলেপুলের পিতা হইয়াছে। দেখিবার আর কি বা বাকি আছে? এখন চাই ভাল খাওয়া, ভাল থাকিবার ব্যবস্থা।

—বাবু, একটা পয়সা।

সুরপতি না চাহিয়াই একটা কিছু দিয়া ফেলিল। দিয়া দেখিল একটা টাকা। ক্ষতি নাই, 'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপ্পান্ন।'

ভিক্ষুকটি সশঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার টাকাটার দিকে আবার সুরপতির মুখের দিকে চাহিল। সুরপতির মুখে কোন পরিবর্ত্তন নাই। এ দান যেন তাহার নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির অঙ্গবিশেষ।

সেও ত ভিক্ষুকই। ঘৃণ্য এই ভিক্ষুকের জীবন। আবার সেই চাকুরির চেষ্টা, আবার সেই প্রত্যাখ্যান, স্ত্রীর শুষ্ক মুখ, নিজের উপবাস, অর্দ্ধাহার, অনাহার, কদর্য্য আহার, কদর্য্য বাসস্থান। এ কি জীবন্ত নরকবাস নয়? কি লাভ এ জীবনে? কি অর্থ এ বাঁচায়? সুরপতির মন স্থির হইয়া গেল। এ জীবনের পগার তার পার হইতে হইবে। পরলোকের টিকেট কিনিতে মাত্র কয়েক আনা পয়সার দরকার।

এখনও পুঁজি তার নয় টাকা। নির্ব্বিবাদে সে সাত-আট টাকা খরচ করিতে পারে—একান্ত বেপরোয়া হয়ে। দান করিবে? না, আর দরিদ্রকে দান করা নয়। দরিদ্রকে দান করিবে ধনীরা—যাহারা সে জাতকে জিয়াইয়া রাখিতে চায়। অন্ধ, খঞ্জ না থাকিলে সুস্থ, সবল মানুষের দাম কোথায়? দরিদ্র না থাকিলে ধনীর মূল্য কি? সুরপতি দরিদ্রকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায় না, সে চায় সে জাতকে নির্ম্মূল করিতে। সেকি সোজা কথা? যে জাত অর্দ্ধাশন, অনশনেও বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহাকে মারিবে কি করিয়া? এই দরিদ্র জাতটাই অদ্ভুত। কিসের আশায় তাহারা বাঁচে? কোন রসে তাহাদের জীবন সঞ্জীবিত হয়? কিসের জন্য দিনের পর দিন ওই রিক্ততার ব্যথা সহ্য করে?

ছেলেবেলা হইতেই সুরপতির সেন্টের প্রতি দারুণ লোভ। লোভটা বোধহয় জন্মগত। একবার কাকার দামী সেন্ট চুরি করিয়া গায়ে মাখিয়া তাহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সেকথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তার পর পয়সার অভাবে ভাল সেন্ট ত দূরের কথা কখনও দু'আনার আতরও সে কিনিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। আজ জীবনের শেষদিনে সে সখ মিটাইলে কেমন হয়? ভালই হয়। এত সামান্য সখ সে কেন মিটাইবে না?

সুরপতি পাশের দোকান হইতে সাত টাকা দু'আনায় একটা বিলাতী সেন্ট কিনিয়া ফেলিল। তাহার শবযাত্রায় এটা গন্ধ-পুষ্পের কাজ করিবে।

ইডেন গার্ডেনের উত্তর-পূব কোণের নিরিবিলি বেঞ্চিটা তাহার অতি পরিচিত। কতদিন নেতাজী সুভাষ ষ্ট্রীট হইতে চাকুরির উমেদারিতে বিফলমনোরথ হইয়া সে এখানে আসিয়া বসিয়াছে। এ সময় সেদিকে লোক চলাচল বিশেষ থাকে না। আর সময়ই বা কতক্ষণ লাগিবে? এই সেকেণ্ড তিনেক। তার পর?

পকেটে পোটেসিয়াম সায়নায়েড-এর একটা শিশি তাহার সব সময়ই থাকিত। এক বন্ধু ডাক্তারের কাছ হইতে সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু মরিলেই ত সব ফুরাইয়া গেল! আচ্ছা, মরিয়া সে কোথায় যাইবে? সেখানেও কি আহারের জোগাড় করিতে হয়? ঘরকন্না, সমাজ, সংসার সেখানেও আছে নাকি? থাকে ভাল, না থাকে নাই। একটা নূতন সুযোগ মিলিয়া যাইবে ত। এ জীবনে যে-সকল ভুল সে করিয়াছে, সে-সব ভুল আর সে করিবে না। এই অভিজ্ঞতা লইয়া গোড়াপত্তন করিলে কি আর সিদ্ধিলাভ হইবে না?

কিন্তু তথাপি যেন কেমন লাগে। সুরপতি ভাবিল পৃথিবীটা অত্যন্ত সুন্দর; কোথাও একটু কদর্য্যতা নাই। এই আলো, এই নদী, এই বাতাস, পত্র, পুষ্প স্তরে স্তরে সৌন্দর্য্য ধরিয়া

রাখিয়াছে। সে কাহার জন্য? মানবের জন্যই ত। তবে মরিয়া লাভ?

না, এ সকল দুর্ব্বলতা। মৃত্যুভয় কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। তবে, একবার অন্নপূর্ণার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে ভাল হয়। একত্র ঘর-করা গিয়াছে প্রায় বিশ বৎসর, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না একত্র ভাগ করিয়া লইতে হইয়াছে। আজ যাইবার সময় তাহাকে একটু আদর করিয়া যাইতে দোষ কি?

ভাবিতে ভাবিতে সুরপতি নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই পুরানো ঘর, অসহ্য, অশোভন, কুৎসিত, কদর্য্য। অন্নপূর্ণা প্রায় তেমন করিয়াই শুইয়া আছে।

সুরপতি দেখিল, ঘরের মেঝের উপর একখানা চিঠি পড়িয়া আছে। হয়ত কাল হইতেই পড়িয়া আছে; সে খেয়াল করে নাই। আজও আবার ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মেজাজটা ত খুব ভাল ছিল না!

চিঠিখানা সে তুলিয়া লইল। খামের চিঠি, কালই আসিয়াছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, পুরানো মনিব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে, আজই তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।

সুরপতির তাড়াহুড়া লাগিয়া গেল। সকালের সওদা চৌকির উপর ফেলিয়া দিয়া একঘটি জলের সাহায্যে সে প্রসাধনে লাগিয়া গেল। কোন কিছুতে তাড়াহুড়া লাগিয়া গেলেই সুরপতির রাগ হয়, হইলও তাই।

—ইস, একেবারে মহারাণী আর কি!

—চিঠিটা আসিয়াছে—সে কথা বলিলেও যেন মুখ ব্যথা হয়!

—আমার দিকে কে চাহিয়া দেখে?

—ইচ্ছা করে, মহারাণীর মাথাটা গুঁড়াইয়া দেয়।

কিন্তু প্রেমালাপ একতরফা। অন্য দিক হইতে কোন উত্তর আসে না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? অভ্যাস করিলে একতরফা প্রেমালাপও চলে, যেমন চলে একা একা বসিয়া তাস খেলা।

সুরপতি তাড়াতাড়ি মাথাটা আঁচড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। পয়সা একটিও নাই, হাঁটিয়াই যাইতে হইবে। মনে হইল, সবগুলি পয়সা একেবারে ব্যয় না করিয়া ফেলিলেই হইত। কিছুই বলা যায় না, পুরুষস্য ভাগ্যং।

মনিবের সঙ্গে দেখা হইল। মনিব বড় কাপড়ের দোকানের মালিক। ব্যবসায় কিছু মন্দা পড়ায় লোকজন কিছু কিছু ছাড়িতে হইয়াছিল। এখন আবার সুদিন আসিবে বলিয়া মনে হয়।

মনিব বলিল, তা ভাল সুরপতি, কাল হইতেই কাজে লাগিয়া যাও। তবে এখন আর মাহিনা দেড়শ' দিতে পারিব না, একশ' করিয়া দিব। সুরপতি মাথা হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মনিবটি ভাল মানুষ। বলিল, আগামের দরকার আছে নাকি হে? থাকাই সম্ভব। ওহে মদন, দাও ত, সুরপতিকে দশটা টাকা।

সুরপতি দোকানের পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সহিত গল্পগাছা করিয়া যখন রাস্তায় বাহির হইল তখন বেলা প্রায় আড়াইটা।

চাকুরি ত হইল, তবে মাহিনা কম। তাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। ভাল করিয়া চলিলে ইহাতেই একমত চলিয়া যাইবে। কিন্তু আর সে বোকামি নয়। মাসে মাসে অন্ততঃ দশটা টাকা জমাইতেই হইবে। এবার খুব শিক্ষা হইয়াছে। বাজারের খরচ না হয় আরও কিছু কমাইয়া দেওয়া যাইবে, এ ঘরটা ছাড়িয়া না হয় আরও একটু অল্প ভাড়ার ঘরেই যাওয়া যাইবে। কিন্তু মাসে মাসে কিছু জমানোর অভ্যাস ছাড়িলে চলিবে না।

মনিব লোক ভাল, আর ব্যবসা একটু ভাল চলিয়াছে নিশ্চয়ই। চাই কি, আবার বৎসর খানেকের মধ্যে পুরা মাহিনাই হয়ত পাওয়া যাইবে। তখন আর এত টানাটানি করিতে হইবে না। তার পর মাহিনা যে কখনও যে দুই শত না হইতে পারে তাহা নয়। সুরপতি সে আশা করে। তখন ত অবস্থা দস্তুর মত সচ্ছলই বলিতে হইবে।

খোকাটার লেখাপড়া গোল্লায় গিয়াছে। আর তাহাকে মাসীর বাড়ী ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁচটা নয়, দশটা নয়—এই একটিমাত্র সন্তান। বংশের দুলাল—অন্ধের নড়ি!

অন্নপূর্ণা! আহা কত না ঝড়-ঝাপটা তার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি সে। একটি দিনও সুরপতি তাহাকে একখানা ভাল শাড়ী দিতে পারে নাই, ভাল খাবার ত বেচারী অনেকদিন চোখেও দেখে নাই!

এই ত সংসার, এই ত স্বর্গ। কেমন সুখী সে। স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্রের ভক্তি, বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি—সবই তাহার প্রাপ্য। এমন স্ত্রী কি আর কাহারও হয়? মনে পড়িল তার বিশ বৎসর আগেকার কথা।

সুরপতির মনে হইল, সেই পুরাতন মদির স্পর্শ সে যেন ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই মোহময় গুঞ্জন যেন দূরাগত গানের মত তাহার কানে বাজিতেছে!

আহা, অন্নপূর্ণা বেচারী কষ্টই কি কম পাইয়াছে? উপর্য্যুপরি চারিটি ছেলেমেয়ে মারা যাওয়ার পর আছে এক নন্দ—একমাত্র বংশধর। তাহাকেও কোলছাড়া করিয়া মাসীর বাড়ী ফেলিয়া দিতে হইয়াছে। সে বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গিয়াছে সে খবর নেওয়ারও ফুরসৎ হয় নাই।

সুরপতি ভাবিল, তার নিজের বয়সই বা আর কত হইয়াছে! মাত্র বিয়াল্লিশ আর অন্নপূর্ণার পঁয়ত্রিশ। অথচ আশ্চর্য্য এই তিন মাসের মধ্যে একটি দিনের জন্যও অন্নপূর্ণাকে মিষ্টি কথা বলে নাই। তাহার দিকে সে একটিবার চাহিয়াও দেখে নাই। অথচ তাহারা স্বামী, স্ত্রী!

কিন্তু আর এ অশোভন ব্যাপার চলিবে না। সুরপতি ভাবিল, আজ অন্নপূর্ণাকে সে এমন আদর করিবে যেমনটি সে আর কোনদিন করে নাই। এক দিনের আদরেই সে এই তিন চারি মাসের নিদারুণ অবজ্ঞা ভুলাইয়া দিবে।

অনেকদিন খাওয়া হয় নাই, ভাল খাবার ত দূরের কথা। সুরপতি ভাবিল, আজ সে সব বাছা বাছা খাবার নিয়া যাইবে যা অন্নপূর্ণা ভালবাসে। তার পর দুইজনে মিলিয়া রান্না করিবে, দুইজনে একত্র আহার করিবে।

প্রায় পুরাপুরি দশ টাকার সওদা মুটের মাথায় চাপাইয়া সুরপতি বাড়ী ফিরিল। বাহিরের দরজা খোলাই ছিল। মুটের মাথা হইতে মোট নামাইয়া সে জিনিসপত্র রোয়াকে গুছাইয়া রাখিয়া দিল। মুটেটাকে প্রথমতঃ বিদায় করিতে হইবে। মনের যে অবস্থা তাহাতে যতশীঘ্র অন্নপূর্ণাকে একা পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

সুরপতি চুপি চুপি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সেই ঘর—একটু অপরিষ্কৃত বটে, কিন্তু এমনই বা মন্দ কি? অনেকের ত এমন ঘরও জোটে না। একটু সামলাইয়া গুছাইয়া লইতে পারিলে ইহাই স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে।

দেওয়ালের দিকে মুখ দিয়া অন্নপূর্ণা এখনও শুইয়া আছে। রাগিয়াছে বটে, আর রাগিবারও কথা। বলা নাই, কওয়া নাই—ছোঁ মারিয়া আংটিটা নিয়া দৌড়! কেন, ভাল ভাবে বলিলে কি সে আর আংটিটা ছাড়িয়া দিত না? সত্যি কথা বলিতে কি, সে আজ একটা পশুর মতই ব্যবহার করিয়াছে। ঝোঁকের মাথায় তার কি আর কোনও জ্ঞান ছিল?

—কি গো মহারাণী, রাগ করিয়াছ নাকি?

উত্তর নাই। না থাকিবারই কথা। এত সহজে কি আর মান ভাঙবে?

—অন্নপূর্ণা, অন্নু, ও মহারাণী, বলিতে বলিতে সুরপতি অন্নপূর্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়াই অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণার চক্ষু স্থির, দেহ নিশ্চল—হিমশীতল! পাশে সুরপতির সেই পোটাসিয়াম সায়নাইডের শিশিটি খোলা পড়িয়া আছে। তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা 'বিষ'।

সুরপতি কয়েক মিনিট সেই কঙ্কালসার জীর্ণ মৃতদেহের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পর সকালের কেনা সেই সেন্টের শিশিটা নিঃশেষে সেই দেহের উপর ঢালিয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্প দেবী

আকাশ বাতাস তোমার রূপেতে ভরে দেব সুধা দিয়া
যেদিকে চাহিব মুগ্ধ পরাণ তুমি রবে উজলিয়া
দেবে তুমি যাহা আপন হাতেতে
খুশী মনে যেন নিই হাত পেতে
আর কারো ধনে লোভ নাহি করি তৃপ্ত মনেতে থাকব
তোমারি কর্ম সাধনের তরে শত আয়ু আমি মাগব।

কর্মের যত ফলাফল হবে তোমার চরণে সঁপিয়া
আমি কেহ নই আমি কেহ নই এই কথা যাব জপিয়া
সংসার হতে দূরে নাহি যাব
ভীরু পলায়ন কখনো না চাব
দীর্ঘ জীবন তোমারে স্মরিয়া তোমারি কর্ম সাধব
কর্মের মাঝে ডুবিয়াও নাহি কর্মের ধূলা মাখব।

* ঈশোপনিষদ ১।৩

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

ড্রইংরুমের মাঝখানে এখনও ক্রীস্টমাস ট্রী'টা জরির তুষার-মালা ডালে ডালে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ছাদে ঝুলছে রঙীন কাগজের মালার নক্‌শা দু'একটা বেলুন এখনও উঠে বসে আছে ছাদের গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে কুমারের সেদিনের সেই স্বপ্নের মত উৎসব-রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন এ ঘরে আলোর বন্যা জ্বলেছিল। এখানে-ওখানে রঙীন আলোর মালা। পিয়ানোয় বসে বুড়ী গ্রেগার 'ক্যারল' বাজাচ্ছিল আর ওরা সবাই সাধ্যমত যোগ দিয়েছিল। অনেকে ছিলেন নিমন্ত্রিত, তার মধ্যে ঈভকেও নিমন্ত্রণ করেছিল কুমার। ঈভ বলেছিল তার বন্ধুকেও নিয়ে আসতে পারে কিনা।

—"নিশ্চয়ই।" বুড়ী গ্রেগার সোৎসাহে আমন্ত্রণ করেছিল।

ওদের ছিল সাপার পার্টি—স্যাণ্ডউইচ আর শুকনো পাই আর নতুন ক্রীস্টমাস কেক্। তারই সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ বছরের পুরনো কেকের ছোট একটা টুকরো। সকলের ভাগেই তার অতিক্ষুদ্র ভাগ রইল।

শ্রীমতী গ্রেগার বলেছিলেন,—"এই কেক পঞ্চাশ বছর ধরে আমার কাছে আছে। প্রায় প্রতি বছরই এর দেহ থেকে খসিয়ে নিই একটু-আধটু অংশ। স্বাদ পাই পঞ্চাশ বছর আগের—যখন আমার বাইশ বছরের নতুন জীবনে প্রথম উৎসবের আহ্বান এসেছিল। সেদিন আমার পাশে যে সঙ্গী আমার সব কাজের হাতে হাত লাগিয়েছিল তারও স্পর্শ যেন লেগে আছে এর মধ্যে। শুনে রমলার কৌতূহল হয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল কুমার, কিন্তু কেউ কোন কথা বলে নি।

বুড়ো গ্রেগার দুঃখের ভাণ করে বুকে হাত দিয়ে বলেছিল—"ওহো-ও, তোমার সেই প্রথম স্বামীর কথা আর আমার সামনে বলো না, শুনলে এখনও আমার ঈর্ষায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়।"

শুনে ওরা সবাই হেসেছিল, হাসাবার জন্যেই বলেছিল বুড়ো। বিষাদের যে কুয়াশাটা জমে উঠব উঠব করছিল হাসি দিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে। তবু কুমারের মনে হয়েছিল কথাটার মধ্যে হয় ত খানিকটা সত্য আছে লুকিয়ে।

গ্রেগার বলেছিল,—"আর সে গতকথায় কাজ কি সখি, আমরা দুজনেই ত সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলি পার করে হঠাৎ একদা প্রৌঢ় জীবনের সুরুতে, "উইণ্ডারমীয়ার" হ্রদের ধারের এক ছোট্ট রেস্তোরাঁয় পরস্পরকে দেখে বললাম—'ওয়েলকাম।'

—"সেদিন প্রৌঢ়ত্ব যে আনন্দ, যে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়েছিল যৌবনে তার সন্ধান পাই নি।"

শুনে শ্রীমতী গ্রেগার আবার একটু হেসেছিল, আলো-ঝলমল উৎসবের মাঝখানে মুহূর্তের জন্যে যেন একটা ছায়া পড়েছিল, পরক্ষণেই ছুটে এসেছিল ঈভের বন্ধু ডরোথি। লেস-সাটিনের সাদা স্কার্টের কোণ বাঁ হাত দিয়ে ঈষৎ তুলে ধরে ডান হাতে মিসিলটো নিয়ে কুমারের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলেছিল—"Under the misselto."

সঙ্কুচিত লজ্জায় দু'পা পিছিয়ে এসেছিল কুমার। মামাবাবু মুখ টিপে হেসেছিলেন, কৃষ্ণা আর রমলা তাদের দু' জোড়া কালো চোখ বড় করে অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়েছিল, হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিল ঈভ, বুড়ী গ্রেগার উৎসাহে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন,—"ছাড়াছাড়ি আর নেই, চুমু তোমাকে খেতেই হবে। ক্রীস্টমাস-ঈভের দিন—তরুণী মেয়ে হাতে মিসিলটো নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর তাকে ফিরিয়ে দেবে তুমি? এমন আনশিভ্যালরাস্ কাণ্ড ঘটতে দেবো না, খাও চুমো।"

আদেশ পালন করতে বার বার এগিয়ে এসেছিল কুমার, বার বার তন্বী তার তনু নত করে হেসেছিল আর সেই হাসির ধাক্কায় বার বার ফিরে ফিরে এসেছিল কুমার। শেষে একসময়ে মরীয়া হয়ে ধাঁ করে একটা চুমু দিয়েছিল কুমার। পরক্ষণেই অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়েছিল রমলা আর কৃষ্ণার দিকে। রমলার চোখে ছিল কৌতুকহাস্য, আর কৃষ্ণার চোখে কি তা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে নি কুমার। তার আগেই হাত বাড়িয়ে ডরোথি বলেছিল,—"দাও দস্তানা দাও।"

—"দস্তানা?" কুমার যেন হঠাৎ বোকা বনে গিয়েছিল।

বুড়ো বললে,—"হ্যাঁ, দস্তানা বই কি? সিল্কের কিংবা লেসের কিংবা ঐ রকম কিছু। মেয়েকে চুমু খেলে দস্তানা দিতে হয়, আর ছেলেকে রুমাল।"

—"রুমাল দেবার জন্যে আমার হাত ছটফট করছে—এই দেব।"

পিয়েত্রো যাদুকরের ভঙ্গীতে কোটের হাতের ভিতর থেকে অসংখ্য ছোট ছোট লেসের পাড়বসানো বিচিত্র রুমাল বার করলে, দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে বললে,—"এই দেখ, আমি আগে থেকে দান সংগ্রহ করে রেখেছি, এখন বল দেখি কার কাছে আগে যাব ?"

—"খবরদার!" বুড়ো গ্রেগার চেঁচিয়ে উঠল—"তুমি যার কথা ভাবছ আমিই যাব আগে তার কাছে।"

ওরা দুজনেই দুটি ডাল নিয়ে এগিয়ে গেল কৃষ্ণার দিকে। দেখে কৃষ্ণা সভয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে নিজের কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিল। সেদিকে তাকিয়ে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বুড়ী দয়াপরবশ হয়ে বললে,—"ওকে ছেড়ে দাও, বেচারী মাত্র সাত দিন হয় এদেশে এসেছে।"

—"হ্যাঁ, এই সমস্ত বর্বর কাণ্ডকারখানা ধাতস্থ হতে সময় লাগে বই কি," পিয়েত্রো হেসে হেসেই সরে এসেছিল,—সেজন্যে নাইও আমরা না হয় আর কিছুদিন অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে আগাম দাদন হিসেবে রুমালগুলি মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিলাম।"

উপস্থিত সব মেয়েরা এমনকি বুড়ী গ্রেগারও পেল তার ভাগ।

পিয়েত্রো বললে,—"মেয়েমাত্রই আমার মনে দোলা লাগায়, বুড়ী ছুঁড়ি মানি না।"

সবাই হাসল আর তার মধ্যে গ্রামোফোনে নাচের সুর বাজিয়ে দিল বুড়ী। ফক্সট্রটের নৃত্যরাগিনীর মায়াময় স্বপ্নরা উড়ে বেড়াল, বেলুনের ফাঁকে ফাঁকে রঙীন আলোর ঝরণায়।

আরও কয়েকজন গেস্ট ছিল গ্রেগারদের। মাঝবয়সী বিধবা 'সারা' ও তার তরুণী মেয়ে 'শীলা' আর বসুওয়েল বেকার। আরও কে কে যেন মনে নেই কুমারের।

সবাই নাচল, শুধু কৃষ্ণা আর রমলা চুপ করে বসে বসে দেখল। ঈভের সঙ্গে নাচতে নাচতে পিয়েত্রো কৃষ্ণাদের কথা জিজ্ঞাসা করল,—"ওরা নাচবে না ?"

—"না বোধ হয়, ভারতে কেউ জুড়িনাচ পছন্দ করে না," ঈভ তার সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করেছিল।

—"কেন করে না ?" পিয়েত্রো জিদ করেছিল।

—"আমি জানি না।" ঈভ বলেছিল,—"তুমি কুমারকে জিজ্ঞেস কর।"

'সারা'র সঙ্গে নাচ সেরে মামাবাবু কৃষ্ণাকে এসে ডেকে নিলেন। মামাবাবুর শিক্ষিত পদক্ষেপের তালে তালে কৃষ্ণার পা পড়তে লাগল। ও মামাবাবুর পায়ের দিকে নজর করে বেশ নাচতে লাগল। দেখে মনে হ'ল না প্রথম দিন নাচছে।

মামাবাবু বললেন,—"পায়ের দিকে চেয়ে নাচে না বোকা মেয়ে। মুখ তুলে চাও আর ফিস ফিস করে গল্প কর।"

মামাবাবুর কথা শুনে হেসে ফেলেছিল কৃষ্ণা। ফিসফিস করেই বলেছিল,—কি গল্প করব দাদু ?"

মামাবাবু গম্ভীর ভাবে চুপি চুপি বললেন,—"আর কিছু ভেবে না পাস ত বল না হয় আমার একটা গাধা ছিল—তার কান দুটো সাদা।

—"আমার একটা গাধা ছিল।" বলতে বলতে হাসতে হাসতে কৃষ্ণা মুখ তুলে তাকাল। সামনেই ডরোথি আর কুমার নাচছে। আর মামাবাবু যেমন বললেন তেমনি ফিস ফিস করে কথা কইছে। দেখে কৃষ্ণার হাসি একটু থমকে গিয়েছিল, বলেছিল,—"আচ্ছা দাদু আন্দাজ কর ত ওরা ফিসফিস করে কি বলছে ? গাধার কথা কি ?"

—"দূর দূর।" মামাবাবু হাসলেন—"কুমার কি বলছে জানিস ?"

—"না,—কি ?" কৃষ্ণার চোখেমুখে কৌতূহল উৎসুক হয়ে উঠল।

—"কুমার বলছে—দেখ ডরোথি ঐ যে কালো মেয়েটি আমার ভুঁড়িদার মামার সঙ্গে নাচছে—ওরই সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে মন করেছেন আমাদের বড়রা। তাই কুমারী ডরোথি, তোমার সঙ্গে আমি এখন বেশী প্রেম করতে পারব না।"

—"যাও দাদু, তুমি এত বাজে বকতে পার।" কৃষ্ণা নাকি রেগে মুখ লাল করে আবার পায়ের দিকে তাকিয়ে নাচতে সুরু করেছিল। অন্ততঃ মামাবাবু কুমারকে তাই বলেছিলেন পরে।

হঠাৎ এক মুহূর্তে ক্রিস্টমাস ট্রীটার দিকে তাকিয়ে সে রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল কুমারের। হঠাৎ একদিনে ওরা সকলেই কেমন পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। ধর্ম্ম, সংস্কার, জাত ও ভদ্রতার আড়াল ঘোচানো বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গ সুর ওদের সকলেরই মনে মনে কোথা থেকে উঁকি মারছিল। শুধু রমলা সেদিন চুপ করে বসেছিল। আজও তেমনি করেই বসে আছে। এই রমলার সঙ্গে কুমারের চিরদিনের চেনা দুরন্তপ্রাণা রমলার মিল নেই। বিষাদ যেন এখনও ওকে একটা পাতলা কুয়াশার আবরণে ঢেকে রেখেছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমার বললে,—"ঈভ, তোমার জাহাজ কবে ছাড়বে বল, আর কোন্ ডক থেকে, যদি টিলবেরী থেকে ছাড়ে ত আমরা তোমায় বিদায় দিতে যাব।"

অমিতাভ বললে,—"তারা এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

করেছে, প্রতি পূর্ণিমায় তার অধিবেশন হবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এক এক দিন এক এক বিষয়ে আলোচনা থাকবে। এবারে ফরাসী পণ্ডিত দকতর এন ব্রস্তেকে আনবে ওরা, তিনি নাকি লণ্ডনে এসেছেন। মামাবাবুর গান দিয়ে উদ্বোধন করতে চায়। মামাবাবুর সঙ্গে যদি আর কেউ গায়, তো, খুব ভালো" শিরাজ আর অমিতাভ ভীরু চোখে তাকাল কৃষ্ণা আর রমলার দিকে। তাই দেখে মামাবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন,—"হ্যাঁ, ওরা দুজনেই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গলা মেলাবে। তাতে ভারি জমে উঠবে।"

অমিতাভ খুশী হয়ে বললে,—"দেশী লোকদের সব খবর রেখে।"

শিরাজ বললে,—"না বিলিতীদেরও। হতভাগারা ভাল গান কখনও শুনতে পায় না, তাই দেশী সুরের প্রতি এত অবজ্ঞা।"

—"শুনলেই কি বুঝবে?" কুমার বললে,—"এরা যা কনভেনশনাল জাত, বুঝতে পারলেও ভাণ করবে যেন বোঝে নি। ভাল লাগলেও সেকথা মানতে এদের অহঙ্কারে বা লাগবে।"

—"এ কথায় কিন্তু সায় দিতে ঠিক পারছি না।" মার্কাস বললে,—"অবশ্য যদি বল যে, না বুঝলেও ভদ্রতা করে মিথ্যে বলা উচিত, তা হলে না হয় না বুঝেও জোর দিয়ে বলতে পারি যে অতি চমৎকার হয়েছে।"

—"অর্থাৎ?" প্রশ্ন করলেন মামাবাবু।

কুমার ভয়ে ভয়ে তাকাল রমলার দিকে। এই বুঝি সে কোন তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে, এই শান্ত সন্ধ্যার বুকের মাঝখানে সেই কাঁটাটা বিঁধিয়ে দেয়, যা আজও ওর বুকের মধ্যে রক্ত ঝরাচ্ছে। কিন্তু রমলা কিছু বলল না, হঠাৎ ও যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এমন ও প্রায়ই হয়ে যায়, কে জানে হয় ত সেই মুহূর্তে রঞ্জন এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল। না কি সুকান্তর শোকে আজকাল আর রঞ্জনকে মনে পড়ে না।

হঠাৎ কুমারের মনে পড়ল, রঞ্জনের কথা নিয়ে একদিন মেরীর সঙ্গে তর্ক বেধেছিল। মেরী বলেছিল,—"তোমার ব্যাখ্যা থেকে কিন্তু বোঝা গেল না রঞ্জনের সঙ্গে রমলার কি সম্পর্ক ছিল—ভক্তি না ভালবাসা?"

—"ও দুয়ে বিশেষ তফাৎ আছে কি?" কুমার হেসে ছিল,—"যদি—"

ওর কথা শেষ করতে দেয় নি মেরী। বিদ্রূপ চমকানো গলায় বলে উঠেছিল,—"ভালবাসাকে ভক্তির নাম করে লুকিয়ে রাখা ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।"

সেই মুহূর্তে মেরীকে অসহ্য লেগেছিল ওর। মনে হয়েছিল হৃদয়হীন, মনে হয়েছিল ওর জীবনের সবচেয়ে দরদের স্থানটাতে ও যেন ইচ্ছে করে বারে বারে হাসির ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। কেন বুঝতে পারত না কুমার, এক-একবার সন্দেহ হ'ত যে, রমলার প্রতি কুমারের আন্তরিক স্নেহকে হয় ত ঈর্ষা করে মেরী, তখন রাগ হ'ত মেরীর উপরে। ওর অতি নির্দিষ্ট সুকঠিন মতামতগুলি সহ্য হতে চাইত না—কিন্তু ওর সঙ্গর দুর্নিবার আকর্ষণের হাত এড়ানো কুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যতই রাগ হোক, মেরী এসে যখন হয়ে কাছে বসলে ও আর নড়তে পারত না। কিন্তু—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুমার ভাবলে—এই ত আজ কতদিন হ'ল মেরীর সঙ্গে দেখা নেই, তবু দিন ত চলেই যাচ্ছে বেশ ভাল ভাবেই, খুব যে একটা দুঃখে বুক ফাটছে তাও ত নয়। হঠাৎ কথার ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কুমার। ওদের বাড়ীর ধরণই এই। কৃষ্ণা মামাবাবুর কানের কাছে ফিস ফিসিয়ে বললে,—"দেখুন দাদু, আপনাদের কুমার কার্তিকটি পাঁচজনের মাঝখানে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে দুরবাসী ডরোথির ধ্যান করছেন।"

মামাবাবু হেসে বললেন,—"ও মনকে সুইচ অফ করে দিয়েছে। গ্রেটম্যানরা এ রকম করে থাকেন শুনেছি, কাজেই অন্ততঃ এদিক দিয়ে ওর মহত্ত্বে সন্দেহ করতে পারবি নে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনের বাতি যে নিবাল, সে ডরোথি না কৃষ্ণা তা হলপ করে বলতে রাজী নই।"

কৃষ্ণা হেসে বললে,—"অর্থাৎ?"

ওদিকে মামাবাবুর 'অর্থাতে'র উত্তরে, এতক্ষণ মার্কাস খানিকটা লেকচার দেবার চেষ্টা করছিল। অর্থাৎ ভারতীয় নাচ তার ভাল লাগে বিশেষতঃ ভরতনাট্যম। কুমারী শান্তার নৃত্য দেখেছে। অমন অদ্ভুত, অমন অপরূপ, অমন প্রচণ্ড, অমন দুরন্ত উচ্ছ্বাস আর কোথাও দেখেছে বলে মনে হয় না। সে ত নাচ নয়, যেন নায়গ্রার জলপ্রপাত। রমলা আর্টিষ্ট, এ নাচ তাকে প্রেরণা দিতে বাধ্য। শান্তা এখন ফ্রান্সে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছে, অন্ততঃ একদিনের জন্যে হলেও রমলার দেখে আসা উচিত। রমলা যদি চায়, তা হলে মার্কাস সব বন্দোবস্ত করে দিতে পারে।

—"বুঝলাম।" রমলা বললে,—"সবই বুঝলাম, কিন্তু কথা হচ্ছিল গানের, এর মধ্যে নাচ এল কোথা থেকে?"

—"নাচ ও গানের উৎসমূল একই, তাই মাঝে মাঝে পরস্পরে ডাক বদলে নেয়।" মার্কাস হাসলে,—"এটা আমার সাফাই, অর্থাৎ তোমাদের গান তেমন ভাল না লাগলেও নাচ আমাদের মনকে নাড়া দেয়। অবশ্য যারা সত্যি নাচ জানে তাদের দেখেই—এখানে ত প্রায়ই দেখি,

বিভিন্ন ভারতীয় জলসায় নাচের ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকটি তরুণী সংগ্রহ করে নেহাৎই মামুলী ধরনের হাতপায়ের কয়েকটা অতি প্রচলিত ভঙ্গি আর তার সঙ্গে তেমনি কথা বলা গান কিংবা টমটম ?"

—"টনটম কি ?" কৃষ্ণার গলায় অবাক বিস্ময় ?

কৃষ্ণার মৃদু স্বর কানে গেল শিরাজ আলির। বললে,—"টমটম মানে নিশ্চয় তবলা।"

মার্কাস বলে,—"শাস্তার নাচের সঙ্গেও ভারতীয় গান শুনেছি, কিন্তু কি রকম যেন একঘেয়ে গোঙানির মত।"

অনেকক্ষণ পরে ঈভ কথা বললে,—"ডরোথিও কিন্তু তাই বলে,—ভারতীয় গান ওদের কানে কান্নার মত শোনায়।"

বলতে বলতে বাইরে ঘণ্টা বাজল, ঈভ চমকে বললে, —"নিশ্চয়ই ডরোথি আর টমসন।"

ও ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ওদের নিয়ে এল। ডরোথি বললে,—"হ্যালো কুমার, তোমার দেনার উপরে ডিগ্রীজারী করতে এসেছি।"

—"তোমার মোজা আমার কাছেই আছে, এই নীচের ঘরে—কুমার তার পরদিনই কিনে এনে দিয়েছে।" শ্রীমতী গ্রেগার তার ঘরের দিকে গেলেন।

কুমার বললে,—"দেখলে ত আমি কেমন ভালমানুষ, ঋণশোধের ব্যবস্থা আগেই করে রাখি।"

ডরোথি তার তারার মত উজ্জ্বল চোখ কুমারের কালো চোখে ফেলে রেখে হাসল। তার তরুণ সুন্দর পুরন্ত মুখে আর বাঁশীর মত সরু নাকের ভঙ্গিতে বিজয়িনীর গর্ব। ওর ওই নীল চোখের সোনালী পক্ষ্মগুলি কি করে ও রকম ধনুকের মত বেঁকে উল্টে গেল—ভাবতে চেষ্টা করে কৃষ্ণা, কিন্তু স্পষ্ট করে ওর দিকে তাকাতেও পারে না যেন। মাগো, কি লজ্জা! অমন করে কোন মেয়েকে পুরুষের চোখের দিকে তাকাতে দেখে নি কৃষ্ণা আগে। ও লজ্জায় নিজের চোখই সরিয়ে নেয়।

ঈভ বললে,—"জান টম একজন বেশ পাকা গাইয়ে।"

—"সত্যি নাকি? তা হলে পিয়ানোয় বসোই না।"

—"রক্ষে কর, গানের রিসাইটেল দিতে আমি রাজী নই, তার চেয়ে বরং শোনাই ভাল। এখানে যখন এত ভারতীয়, তখন ভারতীয় গানই হোক না, যদি কারও জানা থাকে।"

পিয়েত্রো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল। যখন অনেক লোকে কথা বলাবলি করে তখন এইটেই তার পোজ। টম-ডোরথির হঠাৎ প্রবেশে বাক্যস্রোতটা একটু যেন থামল, সেই সুযোগে পিয়েত্রো বললে,—"রাইট ইউ, ম্যাম্যাব্যাবো আপনি গান ধরুন, শ্রীমতী গ্রেগার পিয়ানোয় বসুন, আর আমি টমটমের বদলে টিমটিম বাজাই।" ও বড় বড় নিঃশব্দ পা ফেলে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নিজের ঘরের দিকে গেল ক্যাস্টানিনো আনতে।

শ্রীমতী গ্রেগার উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলেন, বললেন,—"রাইট, উই হ্যাড এনাফ টক, যথেষ্ট কথার স্রোত বয়ে গেছে এতক্ষণ, এখন কিছুক্ষণ গানের ঢেউ বয়ে যাক, তার পরে—"

—"আমি সবাইকে কফি খাওয়াব।" রমলা পাদপূরণ করে।

—"তোমার বন্ধুদের এক কাপ করে কফি খাওয়াতে আমি কতুর হতাম না রমলা।"

শ্রীমতী গ্রেগার বললেন, "বাট ইফ ইউ সো উইশ। তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ।" শ্রীমতী গ্রেগার পিয়ানোর ডালা খুলে বললেন,—"নাউ, আমি আগে সুরু করি, তার পরে রায়, তুমি গলায় তোমার ট্রাম্পেট বাজিও। তোমার সঙ্গে যদিও আমি চলতে পারব না, অর্থাৎ তোমাদের মত সুর শুনে বাজাতে পারব না, কিন্তু তোমার জন্যে পথ প্রস্তুত করে রাখতে পারব। অর্থাৎ এই কথার কচকচিভরা সন্ধ্যা-বেলাটাকে দলাই-মলাই করে তোমার জন্যে একটি সুরের 'এটমোসফিয়ার' তৈরি করার চেষ্টা করব।"

পিয়েত্রো তার ক্যাস্টানিনো বাজিয়ে বললে,—"নাউ, নাউ, নাউ।"

অমনই শ্রীমতী গ্রেগারের সত্তর বছরের কোলা কোলা মোটা মোটা আঙুলগুলি ঝনঝন্ করে পিয়ানোর উপরে বেজে উঠল।

কি সুন্দর সেই সন্ধ্যাটা—শ্রীমতী গ্রেগার একটা আদ্যি-কালের সুর ধরলেন, সেই সঙ্গে অনেকেই গুনগুন করে উঠল :

In the isle of Capri, I found her

কৃষ্ণা দৌড়ে গিয়ে মামার ঘর থেকে নিয়ে এল তানপুরা আর করতাল। কুমার তখন তৎপর হয়ে বললে,—"তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি তবলা।"

মামাবাবু বললেন,—"তবলার দরকার নেই, আমার খঞ্জনীই যথেষ্ট আর আছে পিয়েত্রোর ক্যাষ্টিনোনো। এখন দেখ দেখি পিয়েত্রো এর সঙ্গে আমাদের খঞ্জনীর মিল আছে কি না।"

ধীরে ধীরে গুনগুন্ করতে করতে মামাবাবুর গম্ভীর গলায় মীরার ভজন হঠাৎ এক সময় জয়ভেরীর মত বেজে উঠল :

"চাকর রহস্যু বাগ লাগাস্যু,
নিত উঠি দরশন পাস্যু,"

চাকর রব, বাগান সাজাব, নিত্য তোমার দরশন পাব,—তবু এ যেন প্রার্থনা নয় নিবেদন, অনুনয় নয়, এ যেন অর্ঘ্যদান।

ভজনের পরে কীর্তন ধরলেন মামাবাবু, একেবারে পুরনো কায়দায় থেমে থেমে। দুই নারীকণ্ঠ মিলিয়ে খঞ্জনীর দ্রুত ঝঞ্চনায় মামাবাবু গাইলেন। ঘরটা যেন রমরম্ করতে লাগল। কুমার দেখছিল মার্কাস মুগ্ধবিস্ময়ে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে, ভ্রূ একটু কুঁচকে যেন যাচাই করছে মনে মনে, কিংবা বুঝতে চেষ্টা করছে তাও হতে পারে। কিন্তু কুমারের অবাক হবার পালা এল, যখন দেখল মার্কাসের চোখ বুজে এসেছে, কুঞ্চিত ভ্রূ সোজা হয়ে মিলিয়ে গেছে, যাচাই করার স্পৃহা ডুবে গেছে গীতরস ভোগের আনন্দে—

বল বল বঁধু ভাল ত ছিলে ?

গান শেষ হয়ে গেল, স্তব্ধতা নিবিড় হয়ে আলোকিত ঘরটাকে অন্ধকারের মত ঘিরে ধরল যেন। কিছুক্ষণ পরে মার্কাসই প্রথম কথা কইলে, বললে,—"এ কি গান ? এর মানে কি ?"

—"মানে এমন বেশী কিছু নেই।" মামাবাবু বললেন, —"তত্ত্বকথা বেশী কিছু নেই এতে, তথ্য যেটুকু তাও সামান্য। বহুদিন পরে ফিরে এল প্রিয়তম, তাই রাধা বলছেন, এতদিন ভাল ছিলে ত ?"

ছোট্ট একটি প্রশ্ন—কেমন ছিলে ? এর অর্থ সুরবাহিত হয়ে বাক্যকে কতদূরে ছাড়িয়ে যায়। মামাবাবুর মত মার্কাসও হয় ত এই কথাই ভাবছিল, সুরের ধুয়া নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে মাথার মধ্যে ভ্রমরের মত ঘোরে।

একটু চুপ করে মার্কাস বললে,—"এ গান কি টাগোরের রচনা ?"

—"না না।" মামাবাবু হাসলেন,—"এ বাংলার নিজস্ব সুর—শ'পাচেক বছর আগেকার।"

—"বল কি ? অত আগের ?" মার্কাসের গলায় অকৃত্রিম বিস্ময়।

—"আচ্ছা টাগোরের গানেও কি বেশীর ভাগ এই ধরনের সুর ? না খানিকটা ইউরোপীয় ধরন মেশানো আছে। উনি ত এই শতাব্দীরই লোক ছিলেন ?"

রমলা বললে,—"এর উত্তরে মামা, আপনাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাতেই হবে।

মামা বললেন,—"না রে, এর উত্তর তোর হাতে। তুই তোর সুরেলো গলায় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ধরে এই কীর্তনের মোহটা আগে ভেঙে দে। তার পরে আমি আবার গাইব এখন। লোকে মনে করে বাংলা ভাষায় গান নেই, গান সব হিন্দী সংস্কৃতির দান। কিন্তু বাংলার বাউল, ভাটিয়ালী সর্বোপরি কীর্তনের আবেদন যত গভীর, সাধারণ মার্গসঙ্গীতে সে গভীরতা আনা যায় না। ও সিলেক্ট লোকের গান, যারা নিজেরা তার মধ্যে ভাল করে প্রবেশ করেছে, তারাই পারে ওর রসভোগ করতে। কিন্তু বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে কাজেকর্মে সর্বত্র গান। রাজদরবারে যদি বা তার স্থান না হয়ে থাকে, মানুষের প্রাণের মন্দিরে তার জন্যেই পাতা ছিল শ্রেষ্ঠ আসন। তার পরে এযুগে দেখ, ভারতের সব সুর সব রাগরাগিনীর ঐক্যধারাকে আবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ, আর তা থেকে যে নতুন সুরধারা সৃষ্টি করলেন বাংলা ভাষার মাধ্যমেই হ'ল তার প্রকাশ। এর মূল্য যে সামান্য নয়, ভাবী ভারত তা নিশ্চয়ই একদিন বুঝতে পারবে। ভারতের সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানিস, সে নিজের ধন নিজে দেখতে না পেয়ে গরীব সেজে বসে থাকে। থাক, সেকথা।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মামা তাঁর কথা শেষ করলেন,—"আজ তোর থেকেই ঝরুক সেই ঐশ্বর্যের পরিচয়। শোনা একটা গান।"

তানপুরাটা তুলে নিল রমলা, কিন্তু কি গান গাইবে ভাবতে চেষ্টা করল একটু। মামাবাবু সুর করে বললেন,—"বল না—তোমায় গান শোনাব—"

সেদিন রমলা আর একটা কি গান গেয়েছিল মনে নেই, তার পরে মামাবাবু আবার গলা খুললেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা একটা নিবিড় ঘন রসধারায় মন্থর হয়ে উঠল। কুমারের মনে আছে, দেখতে দেখতে মার্কাসের সমস্ত মুখটা যেন টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল, দু'হাত মুঠো করে ও বসেছিল, ওর মধ্যে না-চেনা ইমোশানগুলির লড়াই লেগে- ছিল বোধ হয়। পিয়েত্রো বসেছিল নিঃশব্দে গদীতে মাথা রেখে। তার ফ্যাকাশে মুখ আরো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই সুন্দর সন্ধ্যাটায় বুকের মধ্যেও কোথা থেকে একটা কাঁটা বিঁধে কেবলই খচখচ করতে লাগল—সে ওই টমসন। যত বার ওর দিকে তাকিয়েছে, কুমারের মনে হয়েছে ওর চোখের কোণে আর মুখের রেখায় বিদ্রূপের হাসি। দু' একবার ঈভের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের ইসারা করতেও দেখেছে কুমার, এত সূক্ষ্ম অথচ এত গভীর সুরের লীলা বোঝার মত মন ছিল না ওর, তাই কখন যে হঠাৎ পালিয়ে গেল টের পায় নি কুমার, টের পেল যখন দেখল ঈভও চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করে চলে গেল। কুমার ভেবেছিল, টমকে বিদায় দিয়ে ও আবার ফিরে আসবে, কিন্তু এল

না, যাবার আগে একবার বলেও গেল না, না বলে-কয়ে ফস্ করে কোথায় উঠে চলে গেল।

কফি আর বিস্কুট খাবার সময় খোঁজ পড়ল ওদের—খোঁজ মিলল না। এসেছিল ঠিকানা দিতে আর নিতে, ওর বাবার ঠিকানাও চেয়েছিল কুমার, কিন্তু কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে। টমদনকে কুমারের ভাল লাগে নি, ওর মত লোকের বন্ধুত্বের দাবি মেনে দীর্ঘদিন ধরে ঈভকে এক জাহাজে থাকতে হবে—এ কথায় মন সায় দিতে চাইছিল না। ঈভকে ওর পর বলে মনে হয় না, ওর মধ্যে ভারি একটা শান্তশ্রী আছে বাঙালী মেয়ের মত। আর সত্যিই ত ও বাঙালী মায়ের মেয়ে বটে। ওকে যেন বিপদ থেকে বাঁচাতে ইচ্ছে হয়।

—"কিন্তু পারবে না বাঁচাতে।" মামাবাবু হেসেছিলেন, —"দেখ নি, ও যে আগুনে ঝাঁপ দিতে ছুটেছে। ও যখন টমের পিছু পিছু উঠে গেল, তখন গাইতে গাইতেই আমি এক নজরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। সে মুখ যদি তখন দেখতে তা হলে বুঝতে কি দুর্নিবার নেশা ওকে এই গানের মায়া থেকে টেনে নিয়ে গেল, একেবারে সেই যাকে বলে—পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু।"

সেদিনকার খুঁটিনাটি সব কথা মনে রাখবার মত নয়,—মনেও নেই তাই। শুধু মনে আছে, মার্কাস যাবার সময় একবার রমলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তার পরে মামাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল,—"তোমাদের ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু তোমরা দুজনে আমাকে পূর্ণ করে রেখেছিলে।"

ডরোথি মার্কাসের গাড়ীতে গেল, কিছুদূরে গিয়ে টিউব ধরবে।

ওদের গাড়ীতে তুলে দিতে কুমার যখন গেটের বাইরে এল মার্কাস বললে,—"তোমাকে ধন্যবাদ কুমার, তুমি আমাকে নতুন পৃথিবীর খবর দিয়েছ—

শুনে কুমার অল্প একটু সিনিক্যাল হাসি হেসেছিল। বলেছিল,—"নতুন বলেই হয় ত এত ভাল লাগছে, দু'দিন গেলেই হয় ত দেখবে এও বাসি হয়ে উঠেছে।"

—"তা হোক।" মার্কাস ওকে শেষ করতে দেয় নি কথা—"ভবিষ্যৎকে আমি ভয় করি না, আমি বর্তমানের পূজারী। কবে চোখ খারাপ হবে বলে আগে থেকে চশমা পরা আমার মত নয়। আমি মুহূর্তের রস পান করব মুহূর্তেরই পাত্রে। পরে যদি পেয়ালাটা ভাঙে ত ভাঙুক না, আমি পরোয়া করি না।"

মার্কাস নিজে গাড়ীতে উঠে ডরোথির জন্যে দরজা খুলে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কুমারের ডান হাত নিজের হাতে নিয়ে চোখে তারার ঝিকিমিকি চিকচিকিয়ে ডরোথি বললে,—"অনেক ধন্যবাদ মোজার জন্যে।"

কুমার একটু হাসল, এই প্রথম ওর ধরা হাত একটু আদরের ভঙ্গীতে নেড়ে দিয়ে বললে;—"ধন্যবাদ,—দিতে দিয়েছ বলে।"

ডরোথি খুশী হয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। আর সেই মুহূর্তে কুমারের মনে পড়ে গেল মেরীকে।

কবে যেন একথা কে তাকে বলেছিল, তার সেই কথা নিজের অজান্তেই চুরি করে রেখেছিল মন। আজ সন্ধ্যায় অন্য কাকে ফিরিয়ে দিল সেই চোরাই মাল। সে ত বেশী দিন নয়, এই ত গত বছর শীতের আগে, মৌরি নিজের জমানো টাকা থেকে ওর জন্যে মোটা নরম উল কিনে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিল। সেটা গায়ে পরে' ছেলেমানুষের মত খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল কুমার। আয়নার সামনে নানা ভঙ্গীতে ঘুরে ফিরে দেখে মৌরির দু'হাত ধরে কষে ঝাঁকানি দিয়ে বলেছিল,—"কি করে ধন্যবাদ জানালে সবটা খুশী বোঝান যাবে মৌরী।"

শুনে মৌরি কুমারের ধরা হাতে তার সেই বিশেষ ধরনের চাপ দিয়ে গভীর সুরে বলেছিল,—"ধন্যবাদ,—দিতে দিয়েছ বলে।''

সেই সুর, সেই চাওয়া হঠাৎ সেদিন মনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠেছিল। আশ্চর্য, ভালোবাসার আরও কত স্পষ্টতর প্রত্যক্ষ পরিচয় ত গেছে ভুলে। কিন্তু এই ধরনের ছোট্ট কথা, টুকরো ইঙ্গিত, মাঝে মাঝে কোন অমৃত পান করে বিস্মৃতির মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় কে জানে।

ক্রমশঃ

আন্দামানের জলসম্পদ

ভারত ১৯৫৮ প্রদর্শনী

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু 'ভারত ১৯৫৮' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দিল্লীতে গত ৮ই অক্টোবর। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ যে, বৈদেশিক কয়েকজন গণ্যমান্ত প্রতিনিধি প্রদর্শনী দেখতে দেখতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নাকি মন্তব্য করেছেন, "আপনার এই প্রদর্শনী গড়ে তুলতে যত সময় লেগেছে, আমাদের শুধু দেখতেই তার চাইতে বেশী সময় লাগবে।" এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় এই প্রদর্শনী কত বিরাট ও ব্যাপক। সত্যি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই মুস্কিল যে, ১১০ একর জমির উপর এমনিতর ব্যবস্থা করা সম্ভব। পুরো প্রদর্শনী ঘুরে দেখতে হলে পাকা তেইশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। ছোটখাট একটা শহর প্রায়—তবে ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, এই তফাৎ।

১৯৫৫ সনেও দিল্লীতে অবশ্য ৭৫ একর জমির উপর এক শিল্প-মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে বর্ত্তমান ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য আছে। সেটা ছিল একটা আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-মেলা আর তাতে ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগদানকারী একটি দেশমাত্র—যদিও ভারত সরকারই এই মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রদর্শনীটি পুরোপুরি ভারতীয়।

আজ এগার বৎসরের অধিক হতে চলল আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই সময়ের মধ্যে ভারতে অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আমাদের অগ্রগতির মাপকাঠি অনেকাংশে নির্ভর করে আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি কতটা সাধন করতে পেরেছি। কাগজে-কলমে আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্য পর্য্যায়ে উপনীত এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কথা ও খসড়া রচনা কার্য্য সুরু করে দিয়েছি। কিন্তু এই খসড়া প্রণয়ন তখনই সার্থক হবে যখন আমরা বর্ত্তমান অগ্রগতির পরিমাপ করতে সমর্থ হব। কিন্তু এই ব্যাপারে লোকের মনে সন্দেহের অবকাশ আছে। একদিক দিয়ে যেমন প্রচার চলছে যে, আমরা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছি, তেমনি আর এক পক্ষ বলছে যে, যেদিকে আমরা এগিয়ে চলেছি তা জাহান্নামের পথ। এমনি উল্টো-পাল্টা প্রচারের মধ্য থেকে ক্ষীর গ্রহণ করা জ্ঞানীগুণীদেরও হয়ত মুস্কিল—জনসাধারণের ত কথাই নেই: এমনি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি চলতে থাকলে জনসাধারণ নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। এবং তেমনি অবস্থায় কোন কল্যাণকর কার্য্যেই আবার তাদের সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে না। তার ফলে সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতির পথ হবে রুদ্ধ। তাই প্রয়োজন বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীক রূপ জনগণের চোখের সামনে তুলে ধরা। এবং ভারতের সর্ব্বাত্মক রূপের বিকাশের জন্য এমনি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সময়োচিত ও সমীচীন বলা চলে। সুতরাং বিজ্ঞান-কারিগরি, প্রতিরক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, খাদ্য ও কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য এবং আরও অনেক যা নিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন তা সবই স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীর চার দেয়ালের মধ্যে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রয়োগ ব্যবস্থার সঙ্গে দেশের শিল্প-বাণিজ্য তথা সমগ্র উন্নতি

খাদ্য ও কৃষিভবনে একজোড়া প্লাষ্টারের বলদ

বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

সেচ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি

ক্যালিকো গম্বুজ
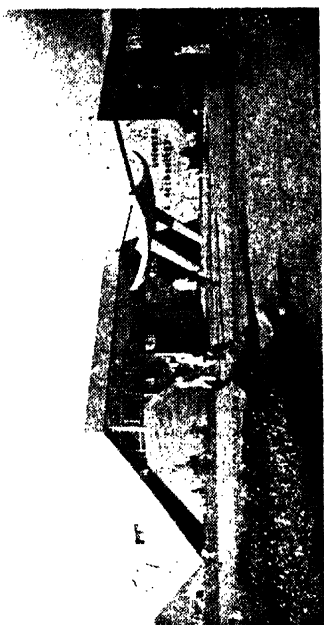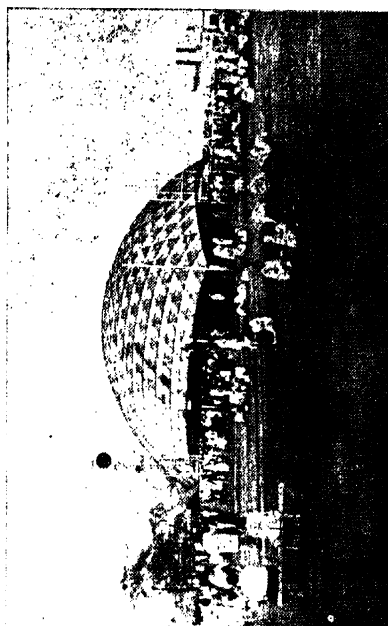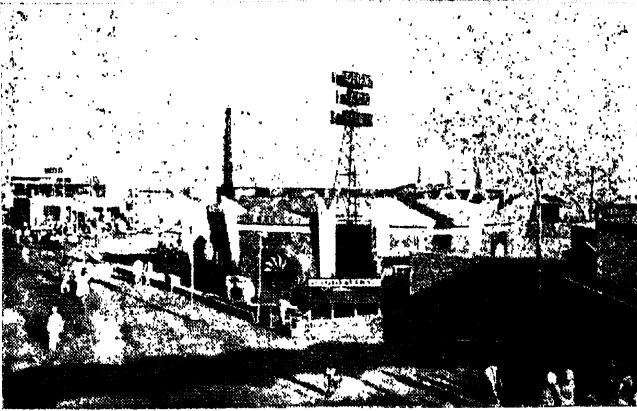
নদীপথে গঠনমূলক কার্য্য

ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। সুতরাং যে প্যাভিলিয়নটিতে বিজ্ঞান-কারিগরির বর্তমান অবস্থা বিন্যস্ত হয়েছে তা অতি সহজেই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। সরকারী ও আধা-সরকারী বিভিন্ন বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের একুশটি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে প্রায় যাটটি সংস্থা তাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়েছে। আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছে নাকি অনুরোধ জানান হয়েছিল প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে নাকি তারা এ অনুরোধ রক্ষা করতে পারে নি বলে দুঃখিত। আবার যারা যোগদান করেছেন তাদেরও সব কিছু বাস্তব অসুবিধার জন্য প্রদর্শিত হতে পারে নি। এই বাছাই করা এবং সংক্ষিপ্ত বিন্যাসের মধ্যেও কিন্তু একটি সত্য অনুভব না করে পারা যায় না। এবং তা হচ্ছে এই যে, আমাদের অর্থাভাব যতই প্রবল হউক না কেন, আমরা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুনির্ব্বাচিত নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে কাজ চালিয়ে যেতে পেছ পা না হই তবে বিপদে ভয় পাওয়ার আমাদের কোন কারণ নেই। কেন না মানুষ আর কাঁচা মাল আছে আমাদের প্রচুর। মৌলিক ও ব্যবহারিক গবেষণাপ্রসূত অনেক কিছুই দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ভাল করে দেখতে গেলে অনায়াসে একটি দিন কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানে। তাই অল্প কয়েকটি সাধারণ জিনিসের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে নিম্নে।

ভাল করে দেখতে যেসব যন্ত্রপাতি সাহায্য করে, যেমন ধরুন চশমা, অণুবীক্ষণ প্রভৃতিতে যে কাচ ব্যবহৃত হয় তা সবই এখন পর্য্যন্ত বিদেশ থেকে আনতে হয়। কলকাতায় অবস্থিত সেণ্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক প্রস্তুত কয়েক খণ্ড কাচের ডেলা দেখে তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে উঠল ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা আমাদের মাটিতেই আমাদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে। আনন্দিত হবার কারণ আছে, কেন না বিশেষ ভাবে এই কাচ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এখানকার পরীক্ষা- মূলক নমুনা বিদেশী সঙ্গে ভাল ভাবেই পাল্লা দিতে পারে।

বৎসর পাঁচেকপূর্ব্বে একবার কোডারমা বেড়াতে যাই। চারিদিকে এখানে ওখানে স্তূপাকৃতি অভ্র চক্ চক্ করছে। চক চ করলে কি হবে, একেবারে অকেজো খোঁজ খবর নিলাম কিন্তু কেউ এর ব্যবহারে পথের সন্ধান দিতে পারল না। কি বিজ্ঞান ভবনে দেখতে পেলাম ঐ ফেলে দেওয়া অভ্র থেকে প্রস্তুত খান ইট অতিশয় উত্তপ্ত চুল্লিতে তাপ সংরক্ষণে জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

সেলেনিয়াম ধাতু বিশেষ মূল্যবান কাচের অলঙ্কারে লাল রং করবার কাজে বিশেষ ভাবে দরকার। কিন্তু জিনিস আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে এমন একটি নিজস্ব পদ্ধ বার করা সম্ভব হয়েছে, যার প্রয়োগ দ্বারা এ ধাতুর আমদা সঙ্কোচ সম্ভব হবে অদূর ভবিষ্যতেই এ ছাড়া রেল ও পুলিস কর্ত্ব ব্যবহৃত লাল রঙের সঙ্কেত কাচ তৈরি করতে এ নূতন পদ্ধ পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়েছে বলে শুনতে পাওয়া গেল।

কয়লা, সিমেণ্ট ব্যবহারের যন্ত্রপাতির মডেল এবং ভিটামি 'সি', নানা রকম ঔষধ এবং কৃত্রিম খাদ্য উৎপাদনকারী য সরঞ্জামের নমুনা দেখে সত্যই মনে উৎসাহ জাগে। এই সম জিনিষ ছাড়াও বিজ্ঞানভবনে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যাপ চ এবং উচ্চাঙ্গের কারুচিত্র এবং চারুশিল্প এই ভবনের অঙ্গসৌ বৃদ্ধি করেছে।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে জড়ি আছে আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপা আমদানী। প্রতিরক্ষা ভবনটি ঘুরে দেখলে মনে এই আশা জা যে, এই খাতে যাতে বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার বর্জ্জন করা যায় ত প্রতি যেন আমরা অনেক পরিমাণ সজাগ হয়েছি। দূরবী অণুবীক্ষণ এবং দু-চারটে ছোট বড় যন্ত্র যদিও এখনই আমা দেশে তৈরী হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয় বল গেলে। এ ভবনটিতে ঢুকলেই প্রথমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক প্যারাসুটে নামার মডেলটি। প্রতিরক্ষার কাজে ডাক্তারী যন্ত্রপা কতখানি প্রয়োজন হয় তারও একটা আন্দাজ জনসাধারণ পে পারে যদিও অতি সামান্যই দেখান হয়েছে, কারণ অধিকাংশ আস বিদেশ থেকে।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে ইস্পাত খনি জ্বালানি দ্রব্যের উপর। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির প্রচেষ্টায় ভবনটিতে এ সব জিনিসের বিন্যাস করা হয়েছে তা দেখলে বি অভিভূত হতে হয়। যে মাটির উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি

শুধু আমাদিগকে আশ্রয়ই দিচ্ছে না, পরন্ত আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্ত কত কত অমূল্য সম্পদ পুরে রাখছে একান্ত মাতৃস্নেহে। যে সব অতিকায় ও অসাধারণ যন্ত্রপাতি এই মস্ত সম্পদ আহরণে প্রয়োগ করা হচ্ছে তাদের কার্য্যকরী নমুনা এ ভবনটিতে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কাম্বেতে প্রাপ্ত অপরিশ্রুত তেলের একটা বোতল সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষেত্রে রেল বিভাগ জুড়ে আছে অনেকটা জায়গা। নতুন ধরনের গাড়ীগুলি দেখে মনে মনে আশা জাগে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মুরগীঠাসা হয়ে রেল-ভ্রমণ বিদূরিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ভারত বিশাল দেশ। ভারতীয় রেল ব্যবস্থা এশিয়ায় সর্ব্ব বৃহৎ এবং পৃথিবীতে চতুর্থ। দৈনিক চলাচলের রেল সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৭০০০ এবং এরা যে পথ অতিক্রম করছে তা দ্বারা পৃথিবীকে বিষুবরেখা বরাবর ২৫ বার বুরপাক খাওয়ান যায়। সুতরাং এত বড় একটা অতিকায় ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যে সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা ভিন্ন সম্ভব নয় তা অতি পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করা যায় এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে।
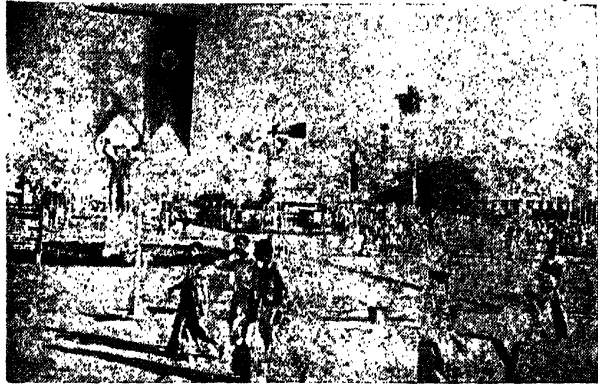
স্বাস্থ্য এবং গৃহ-নির্ম্মাণ বিভাগগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে চোখে পড়ে আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার করাল মূর্ত্তি, ক্ষয়রোগের বিভীষিকা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সর্ব্বোপরি চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। এই অবস্থার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়াস হিসাবে যে পাঁচ দফা কার্য্যসূচী ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ (১) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ, (২) ক্ষয়রোগ নিবারণ, (৩) জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি, (৪) পরিবার নিয়ন্ত্রণ এবং (৫) সাধারণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, পরিষ্কারভাবে দেখান হয়েছে। ওখানকার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব্বের তুলনায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ শতকরা ৭৪ ভাগ কমেছে, ১৮৫টি বিভিন্ন যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং ১৬০০০ শয্যা বাড়ানো হয়েছে আর ১১'১ কোটি লোককে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া উপযোগী বাড়ীঘর তৈরীর ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে তারও মোটামুটি ধারণা জন্মে এই প্রদর্শনীর মারফৎ।

কুটীর শিল্প, সেচ ও বিদ্যুত, খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সমস্যাগুলি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন ভবনগুলিতে। খাদ্য ও কৃষি ভবনে ঢুকতে গেলেই এক জোড়া প্লাষ্টারের বলদ সবাইকে অভি-নন্দন জানায়। একেবারে জীবন্ত। ওদের গর্ব্বোন্নত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে—ওরা মানুষকে যে অক্লান্ত সেবা করছে আমরা মানুষ হয়ে তার যোগ্য সদ্ব্যবহার করছি কি না।

সাধারণ দৃশ্য

আন্দামানষ্টলটি বিশেষ আকর্ষণীয়। ঘুরে দেখতে দেখতে, ওখানকার মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়। কাঠ, বাঁশ, বেত এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরিত জিনিসের কত চমৎকার চমৎকার সব জিনিস চোখের সামনে প্রতি-ফলিত হচ্ছে। জনসাধারণ আন্দামান বলতে আঁৎকে উঠে। যদিও ইংরেজ আমলের ফলস্বরূপ এমনি ভাবে ভাবা কিছু বিচিত্র নয়, তবু আজ দিন এসেছে যখন আমাদের ঐ সাগরপারের লোক-গুলিকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করে ভারতের বিশাল পরিবারভুক্ত করে নেওয়ার। মানুষ বুঝতে শিখুক ওটা এখন আর আমাদের দ্বীপান্তরের আবাস নয়, ওখানে রয়েছে ভারত আত্মার একাংশ।

টাটা যে বিরাট আয়োজন করেছে তা সত্যিই চমৎকার। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা সত্যিকার অতিকায় রেল ইঞ্জিন। দেখে বুক ভরে শান্তি ও গর্ব্বের নিঃশ্বাস ফেললাম। হয় ত পরের উপর নির্ভর করার দিন ফুরিয়ে আসছে।

কেলিকো মিল যে কমলা ও সাদা রঙে রঞ্জিত ডোমটি প্রতিষ্ঠা করেছে তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ৪০ ফুট উচু, ১০০ ফুট ব্যাস যুক্ত ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে তৈরী এই বস্তুটি হাজার হাজার লোকের আকর্ষণ।

এই হ'ল "ভারত ১৯৫৮" প্রদর্শনীর খুব একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। পুরোপুরি বর্ণনা করতে হলে চাই বড় সাইজের মোটা একটা পুস্তিকার। খবর দৃষ্টে প্রকাশ প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষ একটি এক টাকা দামের পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। প্রদর্শনী ঘুরে শুধু দেখাই নয় বিশ্রাম আমোদ-প্রমোদ ও আপনাকে চাঙ্গা করবার জন্ত আছে প্রমোদ পার্ক, রেস্তোরা ও ক্যাফেটোরিয়া এবং চারিদিককার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করিলাম।

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

রবীন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল, ট্রেনটা এবার একটা ছোট গ্রামের পাশ ঘেঁষে চলেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ছোট্ট গ্রামটা—ছোট ছোট কুটিরগুলো আঁকাবাঁকা মেঠো পথের পাশে পাশে মুহ্যমান হয়ে রয়েছে যেন। ঝোপ-ঝাড়গুলো যাদুমন্ত্রে অভিভূত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে—অন্ধকার আর ঘন কুয়াসার হাল ঘিরে ধরেছে গ্রামটার চতুর্দিকে। খুব নিঃসঙ্গ মনে হ'ল রবীনের। আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে আর রহস্যাবৃত বলে তার কাছে ঠেকল। মনটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে রবীনের, হয়ত নবলব্ধ প্রমোশনের উত্তেজনাটা মিলিয়ে গিয়েছে এতক্ষণে, কিংবা হয়ত আনন্দের উচ্ছাসটা সম্যকভাবে প্রকাশ না করার ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কপালের কাছের শিরাদুটো দপ্ দপ্ করছে, কানের মধ্যে তার প্রতিধ্বনিটাও শুনতে পারছে সে, জানলার ধারে মাথাটা রাখল রবীন। লাইনের পাশে পাশে একসুরে ঝিঁঝিঁ পোকার দল ডেকে চলেছে, কামরার মধ্যে বাঙ্কের শিকলগুলো একযোগে আওয়াজ করছে ঝম্...ঝম্... ঝম্। গাড়ীটা দুলছে কিন্তু গতিটা কমে এসেছে। একটা ষ্টেশন এসে পড়েছে। খুশী হ'ল রবীন, অনেকক্ষণ সিগারেট খেতে পারে নি সে; মালিক নানুভাই-এর সাক্ষাতে সেটা সম্ভব নয়। পর পর উত্তেজনা আর অবসাদ এসে রবীনের ধূমপানের তৃষ্ণাটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এরকম ক্ষেত্রে ধূমপানটা প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে, তখন আর এটাকে বিলাস বলা চলে না। রবীন লক্ষ্য করে দেখেছে যে, উত্তেজনা আর অবসাদের মত নিভৃতে চিন্তার সময়ও ওটার সমভাবে দরকারী তখন অবশ্য সিগারেট খাওয়ার ধরনটা পাল্টে যায়; তখন আর ঘন ঘন টানতে হয় না, একটা মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়াটা নাসারন্ধ্রে আর শ্বাসনলীর মধ্যে দিয়ে ফুসফুসের ভিতর পাঠিয়ে দিতে হয় তার পর তার অব্যবহার্য অংশটুকু বেরিয়ে আসে ক্ষীণ ধারায়, নাক এবং মুখ দিয়ে। কথাটা চিন্তা করতেই রবীনের চাঞ্চল্য আরও বেড়ে গেল। এতক্ষণে গাড়ীটা থামল।

অপর বেঞ্চে বসা ব্রজেশ্বরবাবুর চাঞ্চল্যটা বাহ্যত প্রকাশ পায় নি কিন্তু। এইটাই শেষ ষ্টেশন, এর পরেই আসবে সারেংহাটি জংসন। সব ব্যবস্থাই করা হয়ে গিয়েছে বটে তবুও সব জিনিসটা মনে মনে একবার ছকে নিচ্ছিলেন তিনি। অভিজ্ঞ সেনাপতির মত ব্রজেশ্বরবাবু আগামী লড়াই-এর খুঁটিনাটিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করছিলেন মনে মনে। ব্রজেশ্বরবাবু যেন একজন বৈজ্ঞানিক—অনেক গবেষণার পর তাঁর আবিষ্কারের সাফল্যের জন্যে শেষ পরীক্ষাটির ফলাফলের আসায় ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন তিনি।

নিখুঁতভাবে সেইজন্যে তিনি সব দিকেই লক্ষ্য রাখছেন, সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে বিপদ আর পরাজয়ের গ্লানিতে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বহুদিন তিনি পুলিসে কাজ করছেন এবং অনেক শিক্ষার পর সুশৃঙ্খল নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার পদ্ধতিটা আয়ত্ত করেছেন। ট্রেনটা একটা ঝাঁকানি দিয়ে থামল। প্লাটফর্মে নেমে ব্রজেশ্বরবাবু চারিদিকে ভালভাবে দেখে নিলেন সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। ষ্টেশনটা ছোট, প্লাটফর্মের একাংশে করগেট টিনের ছাউনী-দেওয়া কয়েকটা কুঠরী নজরে পড়ল। ইতস্ততঃ কয়েকটা হ্যারিকেনের ধরনের তেলের আলো স্বল্পালোকিত প্লাটফর্মে টাঙ্গান রয়েছে। যাত্রী সংখ্যাও নগণ্য। ব্রজেশ্বরবাবু বাসদেও শর্মার সন্ধানে চোখ ফেরাতেই মাধবীকে দেখতে পেয়ে বিব্রত বোধ করলেন বস্তুতঃ কাজের সময় স্ত্রীলোকদের ঝামেলা যে কত অসুবিধাজনক সে অভিজ্ঞতা তিনি ইতিমধ্যে বহুবারই অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি পাশ কাটাতে সক্ষম হলেন না।

দাদাবাবু, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মাধবী ডাকল।

দাঁড়াতে হ'ল ব্রজেশ্বর বাবুকে, বললেন, কি বল ?

বৌদি আর ছেলেমেয়েরা কোন গাড়ীতে ?

ও, তারা ত আসে নি, আমি একলাই এসেছি—

আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা আমাকে দিন তা হলে কলকাতায় গিয়ে দেখা করব একবার।

আচ্ছা, এর পরের ষ্টেশন মানে সারেংহাটি জংসনে আমার সঙ্গে দেখা করো। কথাটা বলে তিনি এগিয়ে চললেন, বাজে সময় নষ্ট করার মত অবস্থা তাঁর নয়। ক্ষুণ্ণ হ'ল মাধবী।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে পরেশও প্লাটফর্মে নেমেছে। এতক্ষণ একটানাভাবে সঙ্গীহীন অবস্থায় ছোট্ট কামরাটায় গাদাগাদি হয়ে বসে থাকতে তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। পাশের উচ্চশ্রেণীর কামরার দিকে নজর পড়ল পরেশের। এধার পাশে বসা সুনীল রায়কে দাদার বন্ধু বলে চিনতে দেরী হ'ল না তার। মেয়েটির সঙ্গে তার বিলক্ষণ হৃদ্যতা আছে

বলে মনে হ'ল যেন। হাওড়া ষ্টেশনে আরও একজন লোক ফুল নিয়ে মেয়েটিকে 'সী-অফ্' করতে এসেছিল। আর কিছু না হোক মেয়েটিকে দেখাশোনা করার লোকের অভাব নেই, কথাটা মনে হতে মনে মনে হাসল পরেশ।

পরেশ পিছন ফিরতেই ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লাগল তার। পাশ দিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু বেশ দ্রুত-গতিতেই ফিরে আসছিলেন। ভাবী শ্বশুর এবং জামাই পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুতরাং সংঘর্ষণের ফলে স্থানচ্যুত হলেও পরেশই সৌজন্য প্রকাশ করে বলল, সরি—। উত্তরে ব্রজেশ্বরবাবু কিছু বললেন না, শুধু একবার ছোকরাকে তাকিয়ে দেখলেন। এ-ধরনের ভদ্রতা প্রকাশের রীতি তিনি পছন্দ করেন না, এর মধ্যে যেন কিছুটা উদ্ধত ভাবের সংমিশ্রণ আছে বলেই তাঁর ধারণা।

পরেশ নিজের কামরায় উঠে পড়ল। গার্ডের তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ ও সবুজ আলোর রশ্মিটা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

গাড়ীটা চলতে সুরু করে দিয়েছে আবার—।

ঘট্ ঘট্—ঘটর ঘট···তালে তালে কামরাগুলো দুলছে একসঙ্গে। ক্রীচ্-ক্রীচ···ঘটর-ঠং—লাইন থেকে অপর লাইনে ইঞ্জিনের পণিহুইলগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

কুসমী মেথরাণীর ছেলেটা আবার উসখুস করছে তার মায়ের কোলের ওপর, হয় ত পেটের ব্যথাটা আবার কষ্ট দিচ্ছে তাকে। অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছেলেটা। চোখদুটো বন্ধ করে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে যাচ্ছে সে। কুসমী নানাভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টায় আছে।

কাঁধে ফেলে চাপড়ালে কয়েকবার, কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াবারও চেষ্টা করল একবার, নানা রকমের শ্রুত-অশ্রুত শব্দ উচ্চারণ করে ব্যথায়-কাতর শিশুর মনটা অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে চেষ্টা করল কতক্ষণ।

ছেলেটা কিন্তু কেঁদেই চলেছে, আর্তস্বরটা এবারে এক-টানা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে।

সুহাসিনী দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন কুসমীর ছেলেটার দিকে। বিরক্তি বোধ করছেন তিনি নতুন মায়ের অজ্ঞতা লক্ষ্য করে; বেদনার্ত তীক্ষ্ণ স্বরটা চাঞ্চল্য বাড়াচ্ছে তাঁর মুহূর্তে মুহূর্তে, অনভিজ্ঞ মায়ের অস্থিরতায় তিনি নিজেও বিচলিত হয়ে পড়ছেন যেন। শিশুদের ভাষা সুহাসিনী দেবী বুঝতে পারেন, তাদের মাংসপেশীর সামান্যতম প্রসারণ বা সঙ্কোচনের একটা বিশদ মানে আছে তাঁর কাছে।

সুহাসিনী দেবী কুসমীর কোল থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিলেন শিশুটাকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কুসমী তাঁর দিকে। মেথরাণী জেনে যাকে এতক্ষণ সন্তর্পণে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এসেছেন আবার তারই ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন তিনি কি করে?

বজ্রাহতের মত নির্ব্বাক হয়ে শুধু দেখছে কুসমী। সব আনন্দের উত্তেজনাটা গলার কাছে যেন একটা ঢ্যালার মত আটকে গিয়েছে তার।

ছেলেটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়েছে এবার, গোঙানিটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে, যন্ত্রণার তীব্রতা হয় ত কমে আসছে অল্প অল্প করে। ছোট্ট মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। স্ফীত নাসারন্ধ্রের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক বলা যায়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে শিশুটা।

সুহাসিনী দেবী একাগ্রভাবে লক্ষ্য করছেন ছেলেটার ভাবভঙ্গিগুলো। বাঁ হাত দিয়ে ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন তিনি, ছেলেটার দেহের উত্তাপটা অনুভব করছেন যেন। শুষ্ক পঞ্জরঅস্থিগুলো অনেকদিন পরে হারানো উষ্ণ স্পর্শটা আবার ফিরে পেয়েছে। ছেলেটার একটা হাত সুহাসিনী দেবীর বাহুর ওপর রাখা রয়েছে। ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে মুঠো করে যেন সে ধরে রাখতে চাইছে যন্ত্রণার অবসানকে।

ঠিক ননীর মত, প্রত্যেকটি ভঙ্গি যেন নকল করেছে ছেলেটা। সেই আঁকড়ে ধরে থাকা, সেই বুকের ওপর মাথা রাখার ধরনটা, তলার ঠোঁটটা একইভাবে ফুলিয়ে রাখা—সব ননীর মত, এতটুকু তফাৎ নেই।

ট্রেনটা বেশ জোরেই চলছে—একটু অস্বাভাবিক রকমের জোরে বলা চলে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত গাড়ীর কামরাগুলো দুলছে একদিক থেকে অপর দিকে। বাঙ্কের শিকলগুলো আওয়াজ করছে—ঝম্-ঝম্···ঝম। লাইনের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের আওয়াজটা আরও দ্রুত হ'ল এবার।

সুনীল রায় চুপ করে বসেছিল—মনটা তার অকস্মাৎ নিস্তেজ হয়ে থেমে গিয়েছে যেন। এখন আর চিন্তার ঢেউ-গুলো এসে তার মনের ওপর বার বার আছড়ে পড়ছে না—নিস্তরঙ্গ নদীর মত স্থির, নিশ্চল আর সম্ভাবনাশূন্য হয়ে গিয়েছে সে। ফুটো বেলুনের মত সে যেন চুপসে পড়েছে উত্তেজনার গ্যাসটা কোন ফাঁকে বেরিয়ে এসে তার মনের রূপটা বিকৃত করে ফেলেছে অকস্মাৎ। হাসনুর কথা আর মনেই পড়ছে না তার।

ট্রেনটা ছোট ষ্টেশনটা ছাড়বার পরই এষা একবার সুনীলের দিকে তাকাল। সুনীলদাকে কেমন যেন নিরাসক্ত বলে মনে হ'ল তার।

এষার মনে কিন্তু ঝড় বয়ে চলেছে। সমস্ত দায়িত্বটা তার ওপরে হঠাৎ কিভাবে যে এসে পড়ল তা সে নিজেই

বুঝতে পারছে না। নিখুঁতভাবে সাজানো জিনিসগুলো এক মুহূর্তে কে যেন উল্টে-পাল্টে, লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে একেবারে। নতুন চাকরীর কথা, বাবার কথা, মালতীদির দুঃখ, সঞ্জীবের বিরহ—কিছুই আর মনে নেই এষার। সব চিন্তাগুলো ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে এখন। এ ধরনের পরিস্থিতির সামনে তাকে কোন দিনই আসতে হয় নি অবশ্য। বিপদের সামনাসামনি জীবনে সে অনেকবারই এসেছে কিন্তু সেগুলো সামলে নেবার জন্যে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগও পেয়েছে সেই সঙ্গে।

অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাটায় অস্থির হয়ে পড়ল এষা—সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, সুনীলদা—

উঁ—

চুপ করে রয়েছেন কেন? নিজেই চুপ করে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছে সে।

না, এই ভাবছিলাম সব ব্যাপারটা—আর কি—হাল্কাভাবে উত্তর দিল সুনীল রায়,—সমস্ত ঘটনাগুলো অদ্ভুতভাবে একটার পর একটা কে যেন সাজিয়ে রেখেছিল। কথাগুলো খুব দার্শনিকের মত শোনাচ্ছে না? ম্লান হাসি হেসে এষার দিকে তাকাল সে।

না; মাথা নাড়ল এষা, আপনি ঠিকই বলেছেন সুনীলদা, কিছুক্ষণ আগে আমিও ভাবছিলাম ওই কথা।

আমি কিন্তু নিজেকে খুব অপরাধী ভাবছি। তুমি নতুন চাকরীতে হয়ত আমার জন্যে জয়েন করতে পারবে না ঠিক সময়মত—

কয়েক ঘণ্টার দেরীতে খুব ক্ষতি হবে না আমার—

কয়েক ঘণ্টার বেশীও হতে পারে ত—

কেন তা আবার হবে কেন?

সেইটাই ত প্রশ্ন—মনে মনে ভেবে দেখ এষা, আমার, তোমার, এই ট্রেনের হয়ত অনেকেরই নিয়মমাফিক সাজানো রুটিনগুলো পাল্টে গেছে কিনা? তুমি যাচ্ছিলে নবোদ্যমে নতুন কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে আমি কামিনী-কাঞ্চনের রস গ্রহণের আশায়—হাসনু নতুন আবিষ্কারের সন্ধানে···সকলেই ত এক-একটা বাঁধা নিয়মে নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে চলেছিলাম কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে কেন?

কথার জবাবটা দিল না এষা। অনেক প্রশ্ন আছে তার জবাবের প্রয়োজন হয় না এমনকি প্রশ্নকারী হয়ত নিজেও তার আশা রাখে না। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে এষা বলল, সুনীলদা একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলতে আর সঙ্কোচ কিসের এষা, তোমার কাছে আমি ত কিছুই লুকোই নি—

সব জিনিসটা এত স্পষ্টভাবে হঠাৎ প্রকাশ না হলেই ভাল হ'ত বোধ হয়।

তোমার কথা আমার বন্ধু ডাক্তার নৃপেশ মুখার্জ্জির কথা মনে পড়িয়ে দিলে—সে বলে, মানুষ অনেক বেশী সুখী হতে পারে যদি ঠিক সময় মত সে তার মনের আর দেহের রোগ-সম্ভাবনাকে নির্মূল করতে পারে, তাই সেপটিক্ হবার আগেই বিষাক্ত ফোড়াটাকে বহির্মুখী করে দিলাম কিন্তু সে কথা থাক, তুমি যেন কি বলছিলে?

আমি বলছিলাম মালতীদির কথা, কথাটা এষা শেষ করল না।

বুঝেছি এষা, তুমি জানতে চাইছ মালতীকে আমি ভালবেসেছি কিনা? আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসি নি, বাসতে পারি নি। সুন্দর চেহারার গর্ব্ব আমার মনের স্বচ্ছতাকে বহুদিন থেকেই ঢেকে রেখেছে—তাই আমি কোন দিকেই তাকাতে পারি নি, তা ছাড়া—

তা ছাড়া? এষা তাকাল সুনীল রায়ের দিকে, সবটা সে শুনতে চায়।

আমার নিজের ধারণা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সাময়িক—মানে সময়ের ঘায়ে সেটা ভেঙ্গে যেতে বা সময়ের সাহায্যে গড়ে উঠতে দেরী হয় না সেটার। স্ত্রী হিসেবে মালতী আমায় কি দিয়েছে তা আমি কোনদিনই ভেবে দেখি নি।

স্বামী হিসেবে আপনার দানের কথাটাই ভেবেছেন কি?

হাসল সুনীল রায়, তার পর সস্নেহে এষার দিকে তাকিয়ে বলল, জান এষা তোমার এই প্রশ্নটা আমাকে আজ আর একটা অভাব যেন পূর্ণ করে দিলে, ছোট বোন কিরকম হয় জানতাম না, এতদিনে তার যেন একটু স্বাদ পেলাম। লজ্জা পেল এষা, আঘাত করতে গিয়ে নিজেই বেদনাটাকে বরণ করে নিল যেন সে, তবু বলল, আচ্ছা সুনীলদা, ভালবাসার কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু কারও জন্যে কোনদিন কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাও কি হয় নি আপনার?

খুব বেশী নয় এষা; যা কিছু দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তা তা আমি নিজেকে নিয়েই করেছি সর্ব্বক্ষণ। অপরের জন্যে চিন্তা করাকে আমি দুর্ব্বলতা বলেই জেনে এসেছি, কিন্তু জান এষা, এখন আমি যেন কিরকম হয়ে গেছি। এমিটিন ইনজেকসান নেবার পর যেমন রাস্তায় একটা মরা কুকুর পড়ে থাকতে দেখলেও ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে; অনেক দিন রোগ ভোগ করার পর যেমন পাশের বাড়ীর ছেলের কান্না শুনলে মনটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে, এখন আমার প্রায় সেই অবস্থা। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল এষা সুনীল রায়ের

দিকে। সুনীল রায় হাসল একটু, তার পর এষার দিকে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাস করবে কিনা জানি না এষা, তবে ঠিক এই সময়ে মালতীর কথাই মনে পড়ছে বেশী করে। কেন জানি না মনে হচ্ছে সে কাছে থাকলে আমি হয়ত সবই সহ্য করতে পারতাম।

আর পারল না এষা, অভিমানের বাষ্প গলে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। সুনীল রায় বলতে লাগল, জান এষা, কান্না আমার কোনদিনই ভাল লাগে না, মালতীর কান্নাগুলো মনে পড়ছে আমার। মনে আছে, তার চোখের জলের দিকে তাকিয়ে মনটা আমার কঠিন হয়ে উঠত, ব্যঙ্গও করেছি কয়েকবার সে জন্যে। কিন্তু কতদিনের শুকিয়ে যাওয়া মালতীর সেই চোখের জল যেন বন্যার মত আমায় ডুবিয়ে দিতে চাইছে এখন।

বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল এষা, গ্রীবার কাছের মাংসপেশীটা মোটা দড়ির মত টান হয়ে উঠল, পাশের ধমনীটার দ্রুত চলন সুস্পষ্ট হ'ল সেই সঙ্গে। সুনীল রায়ের গলার স্বরটাও শেষের দিকে ভার ভার ঠেকল।

হঠাৎ সুনীল রায়ের নজর পড়ল ধীরেন ভড়ের ওপর—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের নিরীক্ষণ করছে সে। মুখে হাসি টেনে সুনীল রায় এষাকে বলল, এষা ফিল্ম ডাইরেক্টার ধীরেন ভড় আমাদের মানসিক চাঞ্চল্যের কারণটা জানতে খুব উৎসুক হয়ে পড়েছে, কিন্তু ওকে খুশী করা চলবে না, হাসিমুখে তুমি ওর দিকে একবার তাকাও।

মুখ ফেরাল এষা—চিবুকটা কাঁপছে তখনও, কিন্তু হাসি ফুটে রয়েছে ওর মুখে আর সজল চোখে।

বেলুনটা চুপসে গেল আবার, ধীরেন ভড়ের হতাশার ভঙ্গি লক্ষ্য করে হাসিমুখে মন্তব্য করল সুনীল রায়। পাশের ও লোকটি হ'ল আমাদের মালিক নানুভাই দেশাই—কথার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করল সে।

আপনাদের মালিক ? বিস্মিত হ'ল এষা।

দেশাই ফিল্মস্-এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী উনি এবং বর্তমানে আমাদের কর্ণধার—আউটডোর স্যুটিং-এর জন্যে সকলে চলেছেন পশ্চিমের দিকে।

ট্রেনটা যেন বেশী রকমের দুলছে, বলল এষা।

হ্যাঁ, স্পীড বেশী হয়েছে বলে তাই মনে হচ্ছে বটে। বাইরে তাকাল সুনীল রায়।

ব্রজেশ্বরবাবুও দুলছিলেন গাড়ীর তালে তালে, তবে মনটা এখন তাঁর স্থির হয়ে গিয়েছে। এখন তিনি শুধু অপেক্ষা করছেন একটানা দীর্ঘ প্রতীক্ষা। চাঞ্চল্যটা তাঁর কাজের পক্ষে অসুবিধাজনক, সেটা মনের একাগ্রতাকে নষ্ট করে দেয়, স্নায়ু আর মাংসপেশীকে করে অচল, ক্ষিপ্রতা অদৃশ্য হয়ে আসে বিফলতায়। এখন অর্জুনের মত তাঁর একটিমাত্র লক্ষ্যবস্তু—আসামীকে করায়ত্ত করা। টিফিন কেরিয়ারটা কখন বেঞ্চের তলায় কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছে সেদিকে তাঁর নজরই নেই। আরামবাগের মাধবীর কথাও বিস্মৃত হয়েছেন তিনি।

ইঞ্জিনের আওয়াজটা আরও যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—ঝক্ ঝক্-ঝক্।

স্বামীজী বুঝেছে জালটা তার চতুর্দ্দিকে ঘিরে এসেছে, তাই এখন সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে সে। সারেংহাটি ষ্টেশন আসার পূর্ব্বেই তাকে জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে। পাশের থলিটায় হাত রাখল স্বামীজী। ব্রজেশ্বরবাবু প্রেরিত বিজয় সিংহের মুখের সামনে কাগজটা আর আড়াল নেই। এখন দুজনেই দুজনের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আত্মগোপন করে লুকোচুরির প্রয়োজনীয়তার শেষ হয়েছে এতক্ষণে।

এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিজয় সিংহ সাধুবেশী ডাকাতটার দিকে। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করছে তার প্রত্যেক ভঙ্গিগুলি। থলিটা একহাতে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল স্বামীজী, একই সময়ে দাঁড়িয়ে উঠল বিজয় সিংহ। দুজনেই দুজনকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, শিকারী নেকড়ের মত। নিষ্পলক দৃষ্টিটা ঠাণ্ডা ইস্পাতের অনুরূপ। এক মুহূর্তের অসতর্কের ফলে পরাজয় স্বীকার করতে হবে, একথা দুজনেই জানে।

কেট ডগলাস, কবি কমলাকান্ত, হাসনু সকলে বজ্রাহতের মত শুধু তাকিয়ে রয়েছে, আকস্মিক ঘটনার আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে ওরা।

তীক্ষ্ণস্বরে ইঞ্জিনের হুইসিলটা বেজে উঠল। প্রচণ্ড গর্জ্জন করতে করতে ট্রেনটা ছুটে চলেছে লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে।

ছোট ষ্টেশন ছাড়বার পরই ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস পকেট থেকে মোটা চেন দেওয়া ঘড়িটা বার করে দেখল। প্রায় সতের মিনিট লেট চলেছে ট্রেনটা। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অস্ফুটস্বরে কয়েকটা কটু মন্তব্য করল রবার্ট। মেজাজটা ভাল নেই তার। গতকাল কেটের অগোচরে সহিদের সঙ্গে 'সিতারা' হোটেলের ভিতরের ঘরে বসে একটু মৌজ করছিল সে। মৌজের মাত্রাটা যে শুধু বেশী হয়েছিল তাই নয়, গত রাতে তার একটুও ঘুম হয় নি, কেটের তীব্র গঞ্জনার দংশনে। ক্লান্তি আর বিরক্তিতে মনটা তার বিষিয়ে রয়েছে এখনও। সহকারী আবদুল সাহেবের বিরক্তির কারণটা অনুমান করে নিয়েছে। তার নিজের জীবনেও, রাত্রের পানাহারজনিত অবসাদের অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। ড্রাইভার

রবার্ট ডগলাস ট্রেনের স্পীড বাড়াতে নির্দ্দেশ দিল আবদুলকে। এখনও অস্ফুটস্বরে রবার্ট হিন্দী আর ইংরেজীতে মেলান অশ্রাব্য কটু কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করছে।

সাহেবের অবস্থা লক্ষ্য করে আবদুল আমোদ অনুভব করল; তার পর হাসিমুখে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

উজ্জ্বল ক্রাউন প্লেটটা চক চক করছে, সীসার প্লাগগুলো সারিবন্দীভাবে সাজানো তাতে। বিভারসিং হুইলটা নড়ছে ইঞ্জিনের দুলকী চালের সঙ্গে। ফায়ার ডোর হ্যাণ্ডেলটা নামিয়ে দিল আবদুল চুল্লীর আগুনের হল্কাটা অনুভব করল সকলেই, লক্ লক্ করে শিখাগুলো অজস্র সাপের ফণার মত কিলবিল করছে যেন।

ক্র্যাক এক্সেলের সুতীক্ষ্ণ একটানা আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত। স্পীড বাড়াবার জন্যে রেগুলেটার চাপ দিল আবদুল, তাড়া খাওয়া নেকড়ের মত ইঞ্জিনটা গর্জ্জন করতে করতে তীব্রবেগে ছুটে চলল।

ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস পিছনের সিটে এসে বসেছে। বিরক্তি, অবসাদ আর ক্লান্তি রবার্টের চিন্তাশক্তিকে ধোঁয়াটে আর অকর্ম্মণ্য করে দিয়েছে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আবদুল, সাহেব সিটে বসে ঢুলছে। ওয়াটার গেজ আর ভ্যাকুয়াম গেজদুটো ভালভাবে নজর করে দেখল আবদুল।

ইঞ্জিনের চিমনীর ওপর দিয়ে জ্বলন্ত ফুলকীগুলো উড়ে পড়ছে চতুর্দ্দিকে, তীব্রবেগে বাতাস এসে ইঞ্জিনের গায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে; লাইনের পাশে পাশে চাকা আর লাইনের সংঘর্ষণের শব্দটা জেগে রয়েছে, সবেগে বাষ্পটা তার অস্তিত্ব আর সতেজ বলিষ্ঠতা প্রকাশ করছে সুতীক্ষ্ণ বজ্রনির্ঘোষে। ঝক্-ঝক্-ঝক্, এগিয়ে চলেছে ট্রেনটা উন্মত্ত প্রাগৈতিহাসিক বিরাট একটা সরীসৃপের মত।

টেণ্ডারের ওপর খালাসীটা বড় বড় পাথুরে কয়লা ভেঙ্গে চলেছে, ফার্ণেসে জোগান দিতে হবে এখখুনি তাকে। ড্রাইভার রবার্ট ডগলাস এখনও বসে বসে ঢুলছে, কিন্তু অবচেতন মনের পর্দ্দায় বার বার একটা জিনিস ধাক্কা দিচ্ছে—সাহেংহাটি তিন নম্বর কালভার্টের বিপদজনক বাঁকটার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত......।

হুহুঙ্কার গর্জ্জনে লৌহ দানবটা কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে।

ক্রমশঃ

অন্ধ তুমি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

চোখ তো দুটোই আছে! তবু তুমি অন্ধ কেন আজো?
কাছে এলে হেলা ভরে ঘুরিয়ে চোখের তারা দুটি
আভাসে প্রকাশ করো বীতশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণা, ভ্রূকুটি;
তবু ঘুরে ফিরে আসি—যদি প্রেমময়ী সাজে সাজো!

মনের সহস্র চোখে অন্ধ হয়ে আছো—আমি জানি:
প্রেমালোকে যখনি সে রঙিন-পাথর চোখ জ্বলে—
আদিম দুর্ব্বল মনে ঢাকো সবি অহমিকা তলে;
তবু ও এ-পোড়া-মন তোমার ও-মনের সন্ধানী।

তোমার সর্ব্বাঙ্গে ওই যৌবনের লক্ষ চোখ হাসে,
এ পৃথিবী উদাসীন-একা শুধু আমি প্রতীক্ষায়
জেগে থাকি লুব্ধ প্রাণে ও চোখের ইঙ্গিত আমায়
কখন যে ডেকে চলে যাবে, এই ভয়ে ও আশ্বাসে!

অথচ সকল আশা প্রত্যহই স্বপ্নে হয় লয়:
তুমি যে আজন্ম অন্ধ, এটাই কি শেষ পরিচয়?

স্বর্ণ চেতনা

শ্রীসমর বসু

কলে থেক করে অভ্যাসবশেই লেটারবক্সটা খুলে দেখল ভাস্বতী। কোন দিনই তার চিঠি আসে না, অথচ রোজই সে আশা করে আজ হয়ত একটা চিঠি তার আসবে। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে চিঠি পাবার জন্যে মন তার ব্যাকুল নয়। চিঠি সে আশা করে বন্ধুবান্ধবীদের কাছ থেকে, যাদের সঙ্গে কলেজে সে কাটিয়েছে পর পর কয়েকটি বছর, যাদের সঙ্গে দেখাশোনা বন্ধ হয়ে গেছে, তা প্রায় দু' তিন বছর হ'ল।

ছোট দরজাটা খুলতেই একটা ছোট্ট সাদা খাম ঝরে পড়ল ঘরের মেঝের উপর। 'কভারে' তারই নাম লেখা। প্রফেসর ভাস্বতী সরকার এম-এ। খামটা ডাকবিভাগের তৈরী নয়। বাড়ীতে কাগজ কেটে তৈরী করা হয়েছে। হাতের লেখাটা চেনবার চেষ্টা করল ভাস্বতী, কিন্তু পারল না।

ছোট্ট খামের মধ্যে ছোট্ট চিঠি।

ভাস্বতী, ১৪ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ী আসবি, আমায় বরের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব। মানে—ঐদিনই আমার বিয়ে।

—হেনা সেন।

পাশে তারিখ আর ঠিকানা দেওয়া। আড়ম্বরের বালাই নেই কোথাও, তাই চিঠিটা অভিনব বলে মনে হ'ল ভাস্বতীর।

ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ভাস্বতী সরকার আজও অবিবাহিতা। বিয়ের আমন্ত্রণের মধ্যে তবুও সে খুঁজে পায় না আকর্ষণীয় কোনও কিছু, বিশেষ করে হেনা সেন যে বিয়ে করতে পারে একথা নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েও বিশ্বাস হয় না ভাস্বতীর।

ধনবণ্টন-ব্যবস্থার বৈষম্য হেতু সমাজের মধ্যে যে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বর্ত্তমান তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে ভাস্বতী বুঝতে পেরেছে আজকের দিনে বিবাহটা একটা সমস্যা নয়—অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের সুস্থ রাখাই একটা সমস্যা। 'র‍্যাপিড গ্রোথ অব পপুলেশন' পৃথিবীর চিন্তাশীল লোকদের কত বেশী উদ্বিগ্ন করে তুলেছে সেকথা অনেকবার ভেবে দেখেছে ভাস্বতী। হেনা সেনও তাকে বলত—তখনই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের শিক্ষা যখন আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে অন্য অনেকে কিছু শিখতে পারবে। মুখের বাণীর চেয়ে জীবনের বাণী আরও বেশী কার্য্যকরী। হেনা সেন আরও বলত—আজকের দিনে বিবাহটা শুধু নিষ্প্রয়োজন নয় সমাজের ক্ষতিকারকও বটে। আমরা তাই সমাজকে দেখাতে চাই যে, পুরনো রাস্তাটা ভেঙেচুরে নতুন পথ গড়ে তুলতে হবে, তবেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে নইলে পিছনের টানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরতে হবে সকলকেই।

হেনার কথাগুলি খুব ভাল লাগত ভাস্বতীর; ভাল লাগত ওর ইস্পাতকঠিন মনটিকে।

একই আদর্শকে লক্ষ্য করে দুটি জীবন এগিয়ে চলেছিল—পরস্পরের গভীর বন্ধুত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে কোথা থেকে হঠাৎ এই চিঠিটা এসে সব যেন ওলট-পালট করে দিল এক মুহূর্ত্তে। ছোট্ট চিঠিটার দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে যায় ভাস্বতীর। মনে পড়ে যায় হেনাদের বাড়ীর কথা, তার দাদা-বোনেদের কথা।

খুব ছোট বেলায় মা মারা গিয়েছিল হেনার। ছোট ছোট বোনেদের বড় করে তোলার সমস্ত দায়িত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছিল বড় বোনের উপর। তাই স্কুল-কলেজে পড়বার সময় পায় নি হেনা তবুও সে বি-এ পাস করেছে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তার নিবিড় সংযোগ বাধা পায় নি কোথাও। সাজে-পোশাকেই শুধু প্রকাশ পায় নি তার আধুনিকতা, কথাবার্ত্তায় আচরণে সে প্রমাণ করে দিয়েছে স্কুল কলেজে না গিয়েও আজকের দিনের প্রয়োজনানুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে পারে যে-কোনও মেয়ে।

ভাস্বতীর মনে আছে সেদিন সে আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়েছিল হেনার দিকে। সমাবর্ত্তন সম্মিলনে ভাস্বতীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হেনার, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল লেখা—হেনার মেজো বোন। লেখার সহাধ্যায়িনী ভাস্বতী অবাক হয়ে বলেছিল—আপনার কথা অনেক শুনেছি লেখার কাছে। সত্যি আপনি আমাদের আদর্শ। মেপে মেপে কথা বলতে জানে না ভাস্বতী। যাকে ভাল লাগে মুহূর্তে তাকে আপন করে নেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার সংবেদনশীল মন।

তাই হেনাকে সেইদিনই সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হেনাও সে আমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল তাদের বাড়ী।

তারপর দুজনের দুটি অস্তিত্ব এক আশ্চর্য্য পারস্পরিকতায় কবে কেমন করে যে একাকার হয়ে গেল—সেসব কথা আজও ভোলে নি ভাস্বতী।

ভাস্বতীর মনে আছে লেখার বিয়ের দিন দুটি বোনের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্যের টুকরো টুকরো তর্কের কথাগুলি। হেনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল ভাস্বতী—তোর বোনকে বুঝি তোর জীবনাদর্শের কথা জানাস নি? তাই বুঝি তোর আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেল?

—জানিয়ে কোন লাভ হ'ত না। হাসতে হাসতে বলেছিল হেনা।

—ওরা অন্য জাতের। ওরা অস্বাভাবিক ধরনের স্বাভাবিক। মনের কাঠামো ওদের অনেক পুরনো, শিক্ষা থাকলেও সাহস ওদের নেই। জীবনকে নতুন করে আবিষ্কার করার মত কোনও প্রেরণা ওরা খুঁজেই পায় না। তিনটে ছোট ছোট ঘরের মধ্যে ওদের জীবন শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গেলেও ওদের কোনও ক্ষোভ থাকে না। শোবারঘর, রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘর ওদের কাছে যেন স্বর্গ। বিয়ের পর দু'এক বছর ধরে ওদের মুখে লেগে থাকে শুধু দুটো কথা—'আমার স্বামী, আমার স্বামী, আর আমার স্বামী'। কিছুদিন পরে—আমার ছেলে আর আমার মেয়ে। আরও পরে আসে—বড় বৌমা, মেজ বৌমা আর জামায়েরা। তখন আঁতুড় ঘরটায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় বলেই বোধ হয় ঠাকুরঘরের দরজাটা যায় খুলে। আচার-অনুষ্ঠান, পালপার্ব্বণের মধ্যে ডুবে থেকে কেমন যেন শান্তি পায় ওরা। ওরা বুঝতেই চায় না যে দুনিয়া অনেক বড়—সমস্যা সেখানে অনেক। সমাধানের রাস্তা বড় জটিল।

ভাস্বতী চুপ করে শুনছিল হেনার কথা। লেখা কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে নি। তীক্ষ্ণ গলায় সে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বলেছিল—আদর্শের কথা আর বিরাট, দুনিয়ার বিরাট সমস্যার বুলিগুলো তোতাপাখীর মত আউড়ে যাওয়ার মধ্যে গর্ব্বের কিছু নেই দিদি। আদর্শের দিকে তোমাদের নিষ্ঠা যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশী মুখর হয়ে ওঠ তোমরা, সে আদর্শ যখন তোমরা প্রচার কর। তোমরা আর পাঁচ জনের মত সাধারণ নও—এই কথাই জোর গলায় বলতে চাও। জুগুপ্সার আড়ালে যে কামনাটিকে তোমরা লালন কর সেটা নির্লজ্জ ভাবে প্রকাশ পায় তোমাদের সাজসজ্জায়, চলনে-বলনে, আলাপ-আলোচনায়। বিশেষ একটা বয়সের সীমায় নিজেদের বেঁধে রাখবার বিকৃত প্রয়াস দেখে আমাদের হাসি পায়। আমরা যাকে মেনে নেবার জন্যে মনকে গড়ে তুলি তাকেই অস্বীকার করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠ তোমরা, তাই তোমাদের বিলাসের খরচ বাড়ে, সিনেমা না দেখলে তোমাদের সপ্তাহ কাটে না। আর একটা কথা না বলে পারছি না যার জন্যে আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে রাখছি,—তোমাদের আদর্শের কথা মেয়েদের কাছে যত না প্রচার কর তোমরা, তাঁর চেয়ে বেশী বলে বেড়াও তোমাদের ছেলে-বন্ধুদের কাছে। মেয়ে-বন্ধুদের চেয়ে ছেলে-বন্ধুর সংখ্যা তোমাদের বেশী, তোমরা হয়ত বলবে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। ছেলেরা তোমাদের যত বেশী বোঝে মেয়েরা ততখানি বুঝতে পারে না—কিন্তু তার উত্তরেও আমাদের বলার কথা আছে। এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেনা। লেখা সেটা লক্ষ্য করেই হয় ত চুপ করে গেল।

ভাস্বতী কিন্তু ধৈর্য্য হারাল না। বলল—থামলি কেন? যা বলবার বলে যা।

—তোমরা বাইরে যতখানি সজীব, অন্তরে তার চেয়ে অনেক বেশী নির্জীব হয়ে পড়েছ।

লেখার গলা থেকে যেন ফেটে পড়ছিল অনেকদিনের অবরুদ্ধ অভিযোগ। ভাস্বতীকেও সামনে পেয়ে লেখার উৎসাহ যেন আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল—ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের যে বন্ধুত্ব তারই মধ্যে হয়ত বাসনা পূরণের বিকল্প কোনও পথ খুঁজে বেড়ায় তোমাদের অবচেতন মন—তাই স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েদের সঙ্গে তোমরা মিশতে পার না, জোর গলায় বলে বেড়াও ওরা সাধারণ মেয়ে।

—থাম্, যা তোর অধিগম্য নয় তা নিয়ে আলোচনা করবার কোনও অধিকারই তোর নেই লেখা।' অত্যন্ত ধীর গলায় প্রতিবাদ জানিয়ে ভাস্বতীর দিকে চেয়ে একটু মুচকে হাসল হেনা।

—'আমরা নিজেকে বেশী ভালবাসি, তাই নিজেকে বেশী করে সাজাই। নিজেকে ভালবাসি বলেই আমরা এত বেশী আত্মসচেতন, এত বেশী আত্মশ্রদ্ধাশীল। আমরা আত্মবিশ্বাসী তাই আমাদের গতি সর্ব্বত্রই সমান সহজ, সমান স্বচ্ছন্দ। নিজেকে সুন্দর করে রাখার মধ্যে যে আনন্দ তা তোদের অনুভূতির বাইরে, তাই আমাদের সাজসজ্জায় তোরা বিকৃতির সন্ধান করিস, স্বাভাবিক প্রেরণার খবর রাখিস না। আমরা প্রবৃত্তির প্রভু, দাস নই।

এর পর ওদের তর্ক আরও এগিয়েছিল কিনা, ভাস্বতী তা জানে না। কিন্তু ভাস্বতীর মনে আছে লেখার কথাগুলি তাকে খুব বেশী চিন্তিত করে তুলেছিল সেই রাত্রে। নিজের ঘরে এসে নিজের মনকে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করে দেখেছিল ভাস্বতী—সেই সঙ্গে হেনাকেও নতুন করে চেনবার চেষ্টাও সে করেছিল। ভাস্বতীর মনে

পড়ে যায় কলেজে যখন সে পড়ত তখন সাজসজ্জার দিকে নজর ছিল তার তীক্ষ্ণ। সোমবারে যে শাড়ীখানা পরে' সে কলেজে যেত আবার সেখানা সে পরত শুক্রবারে। শাড়ী-নির্ব্বাচনের সঙ্গেই শুধু ক্যালেণ্ডারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল না, কবরী রচনা আর কেশবিন্যাসের সঙ্গেও ছিল তার নিগূঢ় আত্মীয়তা। মা বলতেন, চুলের ত ঐ বাহার, তার জন্যে আবার অত সময় নষ্ট করা কেন?

সত্যিই—ভাস্বতীর চুল তার মায়ের মত অমন দীর্ঘ এবং ঘন নয়, হয় ত সেই দৈন্যটুকু ঢাকবার জন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় তাকে নয়নমুগ্ধকর করে তুলত তাকে। হঠাৎ চমকে ওঠে ভাস্বতী, নিজের মনে বার বার সে প্রশ্ন করে—সত্যিই কি দৈন্যটুকু ঢাকবার জন্যেই। তা যদি হবে—তা হলে কই অধ্যাপনার কাজ পাবার পর থেকে ওদিকে সে ত নজর দেয় নি কোনও দিন। সাজগোছের দিকে কোনও আগ্রহই এখন আর তার নেই। হয় ত কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে নিজেকে একটু সংযত করতে বাধ্য হয়েছে সে, কিন্তু সেই বাধ্যতায় তার মন ত কোনও দিন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি। অথচ হেনা! সরকারী আপিসে চাকরী করে সে, সেখানে অতখানি সংযত না হলেও চলে, তাই নিজেকে সুন্দর করে রাখবার জন্যে আজও হেনা ব্যস্ত। কিন্তু এই ব্যস্ততার আড়ালে কোনও গোপন বাসনা মনের কোণে বাসা বেঁধেছে কিনা কে তার খবর রাখে! লেখার কথাগুলো তর্কসাপেক্ষ হলেও হয় ত খানিকটা সত্যি।

জানালা দিয়ে রাতের আকাশে অনেকক্ষণ কি যেন খুঁজে বেড়াল ভাস্বতী। জলজ্বলে তারাগুলো যেন নেমে এল অনেক নীচে। বাতাস লেগে কেঁপেওঠা কালো জলের উপর পড়ল তাদের ছায়া। ছায়াগুলো দুলে উঠল—আর সেই সঙ্গে দুলে উঠল ভাস্বতীর মন। অন্ধকার রাত্রের নিরবচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে হেনার একটা বিশ্রী-বিকৃত ছবি ফুটে উঠল ভাস্বতীর বোজা চোখের সামনে। ঘৃণায় লজ্জায় শিউরে উঠল সে। হেনার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে হেনাকে এড়িয়ে চলতে হবে এই ধরনের একটা কঠিন সঙ্কল্প মনের মধ্যে যেন দানা বেঁধে উঠেছিল সেদিন।

সত্যি এর পর অনেক দিন ওদের সঙ্গে দেখাশোনা করে নি ভাস্বতী। হেনা অবশ্য দু'একদিন এসেছিল ওদের বাড়ী, ভাস্বতী তখন ঘরে ছিল না। হঠাৎ একদিন হেনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল নিউমার্কেটে। ভাস্বতী আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখেছিল হেনা ঠিক সেই রকমই আছে এতদিনেও তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি—না মনে, না দেহে। তেমনি চটপটে, তেমনি হাসিখুশি, তেমনি প্রাণবন্ত। লেখার খবর জানতে চেয়েছিল ভাস্বতী।

হেনা বলেছিল—এখানেই আছে, বাচ্ছা হবে কিনা! আর বলিস নে ভাই, আমার যেন হয়েছে জ্বালা। সব জিনিস নিজে না দেখলে চলবে না। ভগ্নীপতিকে নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া থেকে সুরু করে, বোনের ছেলেপুলে হওয়ার ব্যবস্থা সব আমাকেই করতে হবে।

একটু যেন বিরক্তি প্রকাশ পেল হেনার ভ্রূ দুটোতে—চিবুকটা যেন একটু কঠিন হয়ে উঠল। ভাস্বতী তা শুধু লক্ষ্যই করল না—বুঝতে পারল হেনার মনে জ্বালা ধরেছে। বোনের স্বামীসুখে, তার সন্তান সম্ভাবনায় হেনা যেন একটু ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, হয় ত খানিকটা ঈর্ষাকাতর।

তা ত করতেই হবে ভাই। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে ভাস্বতী বললে—মায়ের স্থান যখন দখল করেছ তখন এত অল্পে কাতর হলে চলবে কেন?

ভাস্বতীর গলায় বোধ হয় শ্লেষের ঝাঁজ ছিল—তাই হেনা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই চলে গেল হেনা, যাবার সময় একটা কথাও বলে গেল না।

হঠাৎ চিঠিটার দিকে আবার নজর পড়তেই মুহূর্ত্তে কি যেন ভেবে নিল ভাস্বতী। চোদ্দই বিয়ে—মানে সামনের বুধবারে। তা হলে কালই হেনার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তার সামনে বসে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে হবে—সমাজের মধ্যে এমন কি পরিবর্ত্তন তুমি লক্ষ্য করলে, যার জন্যে হঠাৎ এতদিনের অকর্ত্তব্য কাজটাকে অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য বলে মনে হ'ল তোমার? সমাজের সমস্যার চেয়ে নিজের সমস্যাটাই বোধ করি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তাই নিজের জন্যে হঠাৎ তুমি এত সজাগ হয়ে পড়লে আজ। জিজ্ঞেস করতে হবে—ভুল নিশ্চয়ই কোথাও একটা হয়েছে—কিন্তু সেটা কোথায়?

আপিস থেকে এসে সবেমাত্র কাপড়জামা বদলে ঘরে এসে বসেছে হেনা, এমন সময় ভাস্বতী এসে চুপি চুপি বসে পড়ল একটা চেয়ারে। ওকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল হেনা। তার রক্তশূন্য মুখের দিকে চেয়ে ভাস্বতী ভাবল অন্য কথা।

—আপিসে বুঝি খুব খাটুনী, এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোকে? যাক, কেমন আছিস বল্?

—চিঠি পেয়েছিস্ ত, আসছিস্ নিশ্চয়ই। ভীতিবিহ্বল অবস্থাটাকে খুব সহজেই কাটিয়ে উঠেছে হেনা। ভাস্বতী কিন্তু সহজ হতে পারছে না কিছুতেই। কত অভিযোগ নিয়ে সে ছুটে এল অথচ একটি কথাও মুখে আসছে না

তায়। হেনাই বললে—এ্যাট লাস্ট আই হ্যাভ টু সাকাম্ব টু ডেথ।

ওর শিথিল শরীরটা এলিয়ে পড়ল ঈজিচেয়ারে আর হাত থেকে খসে পড়ল—'ফিজিওলজি অব সেক্স' বইটা টিপয়ের উপর।

বইটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ভাস্বতী—বাট হোয়াই ?

সে অনেক কথা, সব কথাই তোমাকে বলব। কেননা কাউকে সেকথা না বললে আমি নিজের কাছেই অপরাধী থেকে যাব। সত্যি আমি ভেবে পাচ্ছি না এই ক্ষুব্ধ মন নিয়ে কেমন করে আমি ভবিষ্যৎ জীবন কাটাব। বিয়েটা শুধু আমি অপছন্দই করতাম না, বিয়ের প্রতি কেমন একটা ঘৃণা, একটা সঙ্কোচ, একটা অশ্রদ্ধা আমার বরাবর ছিল, আজও সেটা দূর হয় নি মন থেকে। তাই ভাবছি সত্যই আমাকে পেয়ে ভাস্কর সুখী হবে কিনা!

ভাস্কর নামধারী পুরুষটি সুখী হবে কি হবে না সে বিষয়ে যে হেতু এখন থেকেই তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ, তখন মনে হয় তাকে সুখী করতে তুমি চেষ্টার কোনও ক্রটি করবে না। তোমার স্বাধীন সত্তা তাতে অক্ষুণ্ণ রইল কিনা সে সম্বন্ধে বোধ করি কিছুমাত্র ক্ষোভ থাকবে না তোমার। সুতরাং ও নিয়ে বর্ত্তমানে মস্তিষ্ক চালনার কোনও প্রয়োজন নেই।

হঠাৎ কেমন যেন কর্কশ হয়ে উঠল ভাস্বতী। হেনা সোজাসুজি তাকাল ওর মুখের দিকে ; দেখলে—ওর চাপা ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গিমায় যেন ঠিকরে পড়ছে একটুকরো অবচেতন অসূয়ার বৈখিক প্রকাশ। মুখের কোণে যে হাসিটা বিদ্রূপের বলে মনে হয় সেটাও যেন কেমন মলিন। হেনা হেসে উঠল ভাস্বতী বোকার মত বোবা চোখে চেয়ে দেখল হেনার সেই উচ্ছল হাসি।

—দাদায় বিয়ের পর—। হাসি থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরু করল হেনা—আমার কর্তৃত্বাধীন সংসারে বৌদির শুভ পদক্ষেপ আমার জীবনে নিয়ে এল চরম অশুভ ইঙ্গিত। আমাদের দেশের বৌদিরা সংসারে ননদের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারে না, তারা চায় কুমারী ননদেরা শ্বশুর বেঁচে থাকতেই যেন বিবাহিত হয়ে যায়। নইলে তাদের বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে দাদাদের উপর। আর্থিক দিক থেকে তাতে বৌদিদের স্বার্থ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না—তবে সেটা ব্যতিক্রমই। ভাস্বতীকে কিছু প্রশ্ন করবার সুযোগ দেবার জন্তেই বোধ করি হেনা থামল। ভাস্বতী কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না।

অবশ্য আমার বিয়ে করাটা ছিল সম্পূর্ণ আমারই কর্তৃত্বাধীন সুতরাং বৌদি কিংবা দাদার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে চলতে হবে এমন কোনও চুক্তিতে আমি আবদ্ধ নই। কর্তৃত্বের উপর মোহ সকলকারই থাকে, আমারও তাই ছিল। কিন্তু বৌদির শুভাগমনে সে কর্তৃত্বটুকু হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপিসের যিনি প্রধান তাঁকে যদি হঠাৎ কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে সেই আপিসেই থাকতে হয় তা হলে তার পক্ষে ভলান্টিয়ারী রিটায়ারমেণ্টের জন্যে দরখাস্ত দাখিল করা বরং শ্রেয়ঃ—তাই আমি আমাদের সংসার থেকে ভলান্টিয়ারী রিটায়ার হতে চাই। ক্ষমতার উপর মানুষের মমত্ববোধ যে কত গভীর তা আজ আমি বুঝতে পেরেছি। তাই মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে আমার কুণ্ঠা নেই।

—কিন্তু সত্যই কি তাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হেনার পক্ষে অন্য উপায় কি কিছুই ছিল না!—একটা বিরাট প্রশ্ন দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ল ভাস্বতীর বুকটাকে খালি করে দিয়ে। হাওয়া ছেড়ে দেওয়া বেলুনের মত কেমন যেন চুপসে গেল ভাস্বতী।

—কি ভাবছিস ? অত্যন্ত উদাস কণ্ঠে প্রশ্ন করল হেনা।

ভাবছি ভাস্কর কত ভাগ্যবান! এমন একটা এ্যাকমপ্লিশ্‌ড লেডি—

ও কথা তুই কেন ভাববি! ও কথা ভাববে আমার অন্য ছেলেবন্ধুরা।

ভাস্বতীকে বাধা দিয়ে হেসে উঠল হেনা—বিয়ের রাত্রে অনেককে গান গাইতে হয় তা বোধ হয় তোর জানা আছে। প্রসঙ্গান্তরে টেনে নিয়ে যাবার হেনার এই সযত্ন প্রয়াস ভাস্বতীর দৃষ্টি এড়াল না। তবুও সে চুপ করেই রইল।

—আমি যেহেতু গান জানি তখন হয় ত আমাকেও গাইতে হবে। আমি কিন্তু গান গাইব না, আমি আবৃত্তি করব :

"ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে,
এসো বরবেশে
আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে—
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহাকে তুমি—
মন্ত্র পড়ি নিয়ো
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে—
পাণ্ডু করি দিয়ো।"

ভাস্বতী অবাক হয়ে চেয়ে দেখল হেনার পাণ্ডুর ঠোঁটে অপূর্ব্ব রক্তোচ্ছাস। শিথিল শরীরের স্নায়ু তন্ত্রীতে যেন

নৃত্যের শিহরণ। এক গভীর অন্তর-আনন্দে হেনা যেন আবিষ্ট।

ভাস্বতী ভাবল—এই-ই হয় ত ভাল হ'ল। অকালমৃত্যু থেকে হয় ত বেঁচে গেল হেনা।

বিয়ের রাত্রেও এসেছিল ভাস্বতী। ভাস্করের পাশে হেনাকে দেখে মনে হয়েছিল হেনা যেন একটি গ্রামের মেয়ে—অত্যন্ত সাধারণ। পরনে বেনারসী, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় সীঁথিমৌর। বিবাহবিদ্বেষী একটি আধুনিক মেয়ের এ কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! ভাস্বতীর হাসি পেয়েছিল, কিন্তু হাসতে পারে নি, ছুটে পালাতে চেয়েছিল কিন্তু লেখা তাকে যেতে দেয় নি।

অনেক রাত্রে ওদের বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল ভাস্বতী। আসবার সময় হেনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল বাসরঘরে। হেনা তখন আবৃত্তি করছিল না, গান গাইছিল—

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর...।"

সারা শরীরটা কেঁপে উঠল ভাস্বতীর। মাথার মধ্যে সে কি অসহ্য যন্ত্রণা। কারোর সঙ্গে কোনও কথা না বলে ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল, চোরের মত অতি সন্তর্পণে।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র

শ্রীগোপাললাল দে

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ, বিদ্যানিধি, ডি, লিট, (রায় বাহাদুর) ঊনবিংশ শতকের ভাস্বর নক্ষত্র পরম্পরাবৎ বঙ্গীয় তথা ভারতীয় মনীষীগণের একতম। অদ্য হইতে ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার দীঘড়া গ্রাম তাঁহার পিতৃভূমি। তাঁহার শৈশবে তদীয় পিতা উচ্চ রাজকার্য্যব্যপদেশে বাঁকুড়া শহরে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের উত্তরে লর্ড সিংহের (এ, পি. সিংহ) পিতৃব্য প্রতাপবাবুর নামাঙ্কিত 'প্রতাপবাবুর বাগানের' দক্ষিণাংশে প্রাচীনতম একতল 'বাঙ্গালো' ধরনের বাড়ীটিতে যোগেশচন্দ্র শৈশবে বাস করিয়াছিলেন। প্রথমে বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং তৎপরে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। আভিধানিক অর্থেই যোগেশচন্দ্র স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ শৈশবে মারা যান। লোকপ্রচলিত রীতিতে তাই তাঁহার নাম রাখা হয় 'হারাধন।' এই নাম শিশুর মনঃপূত ছিল না। বিদ্যালয়ে গিয়া এই নাম আরও অসহ্য হইল। ফলে একদা তিনি স্কুলে যাইতে চান নাই, অথচ পাঠ বিষয়ে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। অনুসন্ধানে পিতামাতা তাঁহার নামবিরক্তির বিষয় জানিলেন। বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। পিতামাতা ও পণ্ডিত মহাশয় বহু সুন্দর নাম প্রস্তাব করিলেও শিশুর যখন মনোনীত হইল না, তখন পিতা পণ্ডিত মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন নানা নামের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করিতে। সেই নামাবলী পড়া হইতে লাগিল। 'নাথ'-অন্ত, 'কুমার'-অন্ত শেষ করিয়া যখন 'চন্দ্র' যুক্ত নাম পড়া হইতেছিল তখন বালক 'যোগেশচন্দ্র' নাম নিজের জন্য বাছিয়া লইলেন। তাঁহার নিজের মুখে এই কাহিনী আমরা শুনিয়াছি। অতঃপর নির্ব্বিবাদে বিদ্যাশিক্ষা চলিতে লাগিল।

বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পাঠ সমাপন করিয়া যোগেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, উপাধি লাভ করেন এবং অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। পাটনায় কিছুকাল, ও পরে কটকের র‍্যাভেনশা কলেজে কর্ম্মজীবনের অধিকাংশকাল তিনি যাপন করেন। স্বর্গত আচার্য্য যদুনাথ পাটনায় তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। অল্পদিন অধ্যাপকতা করিয়াই তিনি জ্ঞানগভীরতা, অকপটতা, গবেষকবৎ (Heuristic) পঠন-পাঠন পদ্ধতির জন্য ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগ এবং জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হন। তাঁহাকে কলেজে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যাপনা করিবার ভার দেওয়া হয়। কালক্রমে তিনি কটক কলেজের অধ্যক্ষের পদও সাময়িক ভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ঐ পদ স্থায়ীভাবে ভারতীয়গণকে দেওয়া হইত না। প্রবল বিদ্যানুরাগবশতঃ তিনি নিজ বিষয় পরিধির বাহিরেও অধ্যয়ন ও গবেষণা করিতে থাকেন। সেইকালে কটকের মেডিক্যাল স্কুলে কোনও কোনও বিষয় শিক্ষা দিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইলে তিনি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সেই কঠিন বিষয়গুলি শিক্ষণের উপযোগিতা উপলব্ধি করেন। তখন হইতেই তাঁহার বাংলা ভাষায় আলোচনা গবেষণার আরম্ভ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষতঃ হিন্দু জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। উড়িষ্যা, খান্দেরপুরের এক মহাজ্ঞানী জ্যোতিষী চন্দ্রশেখর সিংহ-সামন্তকে তিনিই আবিষ্কার করেন এবং লোকসমক্ষে পরিচিত

করেন। তিনি 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' নামে একখানি বহুতথ্যমূলক সারবান গ্রন্থ রচনা করেন। দেশের পণ্ডিত সমাজে ইহা তৎক্ষণাৎ আদৃত হয়। তাঁহার 'রত্ন পরীক্ষা', পত্রাকারে লিখিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক গ্রন্থ 'পত্রাবলী' এবং 'শঙ্কু নির্ম্মাণ' এই তিনখানি গ্রন্থ তাৎকালিক সুধী সমাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করে। দেশের পঞ্জিকা সংস্কার এবং 'মানমন্দির' স্থাপন বিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনার ফল তিনি নিবন্ধাকারে রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষ চর্চ্চা তাঁহার অন্যতম বিদ্যা-বিলাস হইয়া উঠে। বেদের কাল, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কাল, কৃষ্ণের জন্মকাল, কবি কৃত্তিবাসের জন্মকাল ইত্যাদি বহু বিষয় তিনি বিশুদ্ধরীতিতে জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। 'পূজাপার্ব্বণ' 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল', 'পৌরাণিক উপাখ্যান', 'সংস্কৃত সিদ্ধান্ত দর্পণ' এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি সম্পর্কীয় পুস্তক তাঁহার অপরিসীম জ্ঞানগবেষণার পরিচয়রূপে বিরাজ করিয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনসম্পর্কে তিনি নিরলস ভাবে আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হয় এবং বিবাদময় বহু আলোচনার মূল হয়। এই আলোচনার সার নিষ্কর্ষ—বড়ু চণ্ডীদাস বাংলার আদি কবি, তিনি দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি বাঁকুড়া জেলায় ছাতনায় বাস করিতেন। তাঁহার রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে প্রকাশিত গ্রন্থ একখানিমাত্র বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে পাওয়া গিয়াছে। ইহাব্যতীত বড়ু কবির অন্য কাব্যকৃতি পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থ স্বর্গত বসন্ত রঞ্জন রায় কাঁকল্যা গ্রামে আবিষ্কার করেন ও পাঠোদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় পরিষদের সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। গ্রন্থটি বিষ্ণুপুরের রাজ-গ্রন্থাগারের সম্পত্তি ছিল। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ, অন্যান্য বাহ্য প্রমাণ, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা উপরিউক্ত তথ্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে। প্রচলিত পদের কর্ত্তা (১) অপরিসীম কবিত্বের অধিকারী দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং (২) অসংখ্য গণ্য নগণ্য পদের রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্ত্তী কবি।

এই সম্পর্কে তিনি 'চণ্ডীদাস চরিত' নামে একখানি পুরাতন বাংলা পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাহা ততোধিক পুরাতন একখানি সংস্কৃত পুস্তিকার পদ্যানুবাদ। বাংলা পুস্তিকাটি ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক সমাজে যুগপৎ তুমুল বিস্ময় ও হর্ষামর্ষ লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়ে এবং চণ্ডীদাসের ব্যক্তিত্ব, নিবাস ও কাল সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ বর্ত্তমান। এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক বা সিদ্ধান্তের প্রতি প্রবণতাদান আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বাংলা ভাষাতত্ত্বে যোগেশচন্দ্র সমস্ত জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছিলেন। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক রীতিতে তিনি বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের পরেই বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে পথিকৃৎ। দুই খণ্ডে 'বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও শব্দকোষ' তিনি রচনা করিয়াছিলেন। একক প্রচেষ্টায় এই কার্য্য অত্যাবনীয় বলা যায়। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বাংলা বর্ণমালায় সংক্ষেপীকরণ, সরলতা সম্পাদন চেষ্টায় তিনি অসাধারণ মনীষা প্রদর্শন করেন। বাংলা-ভাষা শিক্ষণ, লিখন, বিদেশীয় পক্ষে শিক্ষা এবং বিশেষ ভাবে মুদ্রণ-কার্য্যে বাংলা বর্ণের (letters) উপযোগিতা বৃদ্ধির সম্পর্কে তিনি যে বহু মূল্যবান সঙ্কেত দেন তাহা বহু চিন্তার ফল। ইহার কিয়দংশে 'লাইনো টাইপ' মুদ্রণে গৃহীত হইয়াছে। আরও অনেকাংশ গৃহীত হইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।*

প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত—এই সম্পর্কে যখনই কোন আলোচনা লইয়া লেখকের মত সামান্য ব্যক্তিও আচার্য্যের নিকট গমন করিয়াছে অশীতিপর বৃদ্ধ তখনই তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন ও ধীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিদ্যাচর্চ্চায়, জ্ঞানবত্তায় বা আভিজাত্যের অভিমান তাঁহার ছিল না।

বস্তুত: জ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণা ব্যাপারে যোগেশচন্দ্রের সমগ্র কৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়াও এই অল্পপরিসরে মদ্বিধ ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য। তাঁহার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা ছিল অসীম এবং তাঁহার

---

* এই প্রবন্ধের লেখক একটি বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রে ইহা বার বার অনুভব করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ 'মেথডিষ্ট মিশনের' যুক্তরাজ্য (U. K.) হইতে আগত বহু ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাকে বাংলা ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে লেখক সাহায্য করিয়া আসিতেছে। তাঁহারা লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, বার্ম্মিংহাম, বেলফাষ্ট ইত্যাদির বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, অস্নাতক, এম-এ, ডি-ফিল, ইত্যাদি উপাধি-ধারী। ভাষাজ্ঞান, শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিবিজ্ঞান ইত্যাদিতে তাঁহাদের প্রচুর জ্ঞান থাকায় বিদেশীভাষা শিক্ষা তাঁহাদের পক্ষে সহজই হয়। একটা বৈজ্ঞানিক ভাবে সূত্র ধরাইয়া দিলেই তাঁহারা অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বিস্ময়কর অনুরাগ ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং নিয়মিত বাংলা-সাহিত্য পাঠ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেভারেণ্ড টি, ডি. ফোরবেস (T. D. Forbes) নাম করা যায়। ইনি বর্ত্তমানে বহরমপুর শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। ইনি প্রায় বাঙালীর মত বাংলা বলিতে পারেন, বহু উত্তম বাংলা-সাহিত্য গ্রন্থলেখক সঙ্গে এবং একাকী পাঠ করিয়াছেন এবং এখনও নিয়মিতভাবে বাংলার উত্তম সাহিত্য পাঠ করেন, আলোচনা-সমালোচনা করেন। ইহারা বাংলাভাষার বর্ণবিন্যাস ও উচ্চারণরীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে অনেক অকারণ বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া টিপ্পনী করিয়াছেন। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র এই সম্বন্ধে সরলতা সম্পাদনে অনেক ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, তাহার অনেকই এ যাবৎ গৃহীত হয় নাই।

পরিধি অসংখ্য ক্ষেত্রকে কুক্ষিগত করিয়াছিল। মহামূল্য রত্নপরীক্ষা হইতে চরখার সংস্কার, আকাশের গ্রহনক্ষত্র ও বেদের কৃষ্টি হইতে বনবাদাড়ের গাছপালা ও আঞ্চলিক কথ্যভাষার প্রয়োগ ও অর্থ-দ্যোতনা পর্য্যন্ত সে পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনা, দেশ ও দেশবাসীদের নাম পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে একেবারে শেষ বয়সেও তিনি বহু সঙ্কেত দিয়া গিয়াছেন।

যোগেশচন্দ্রের রচনার অধিকাংশ মহামনীষী, পরমগুণগ্রাহী স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সুবিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যোগেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনের শেষাংশে আমরা অনেকেই তাঁহাকে যেভাবে দেখিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতান্ত অবান্তর হইবে না। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ বাঁকুড়ায় আসেন। বাল্য-কালীন স্মৃতি হয়ত তাঁহাকে এখানে আসিতে কিছুটা আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। প্রথমে তিনি স্কুলডাঙ্গায় যে বাড়ীতে উঠেন পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা গান্ধী বাঁকুড়া আসিয়া ঐ বাড়ীতে ছিলেন। তিনি বাঁকুড়া আসিয়াই সুধী সাহিত্যিক শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, অধ্যাপক শ্রীরামশরণ ঘোষ, অধ্যাপক ৺পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অন্তরঙ্গ হন এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় রামব্রহ্ম কবিরাজের গৃহে তাঁহাকে উচ্চাঙ্গের আলোচনারত কৌতূহলী প্রশ্নকারীরূপে প্রায় দেখা যাইত। কিছুদিনের মধ্যেই বাঁকুড়া নূতন বাটীতে খ্রীষ্টান কলেজের পশ্চিমে একখানি উদ্যান-বাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি বাস করিতে থাকেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন। গৃহের নাম রাখেন 'স্বস্তিক'। গৃহের দেওয়ালে শাস্ত্রীয় স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত আছে। পরবর্ত্তীকালে 'নাজি' দলের চিহ্নরূপে এই স্বস্তিক চিহ্ন জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীটি রেলগাড়ীতে বসিয়াও দেখা যায়। একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে তিনি এই স্বস্তিক নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১৩৬৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ এই স্বস্তিপূর্ণ 'স্বস্তিক' ভবনেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বয়স তখন সাতানব্বই। তাহারই সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঁকুড়া কলেজে বিশেষ সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি দেন (১৭ই এপ্রিল ১৯৫৬)। আচার্য্য রাজ্যপাল স্বর্গীয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সভায় বহু গুণী-জ্ঞানী সহ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত এম-এ, (ক্যান্টাব) সংক্ষিপ্ত ভাষণের শেষে বলেন, "The University in honouring him is honouring itself."

যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রীতিই ছিল যোগেশচন্দ্রের গবেষণা-রীতি। তিনি সর্ব্বদা ব্যাপারের মূলে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণী-রীতিতে তন্ন তন্ন করিয়া তাহার সত্য পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন এবং কার্য্যকারণাত্মক সংশ্লেষণে সে পরিচয় শেষ করিতেন। তাঁহার অসামান্য জ্ঞান-গবেষণার বিষয় অনেকেই আলোচনা করিয়া-ছেন। এত গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানবত্তার সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য্যের চরিত্রে কয়েকটি নিশ্চিত প্রশস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। ভগিনী নিবেদিতার উল্লেখে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের কাজকে অনেকে (ইউরোপীয়) নিজের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে।'

আমাদের সাহিত্য, পুরাণ ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে বহু মহামূল্য তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধার এবং সেগুলির অপক্ষপাত আলোচনা আচার্য্যের যেন নিজের কাজ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপদেশে এত মূল্যবান গবেষণাদির পরেও নিজেকে অপর সকলের উপরে রাখিবার কোন চেষ্টা তাঁহর মধ্যে কদাপি দেখা যায় নাই। বাঁকুড়াবাসী বা বাঙালী সাধারণের প্রতি কোন সূক্ষ্ম অবজ্ঞা তাঁহার মধ্যে কদাপি দেখা যায় নাই। পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানবত্তার সঙ্গে অনেক সময়েই একটা স্পষ্ট রূঢ়তা এবং সজ্ঞান আত্মাভিমান জড়িত থাকে। এই আত্মমূল্য সজাগতা এমনি দুরপনেয় যে বাহ্য চেষ্টায় জ্ঞানস্তর হইতে ইহাকে বিতাড়িত করিলেও ইহা কর্ত্তার অবচেতন মনকে আশ্রয় করিয়া থামিয়া যায় এবং নানা ভাবে লোকব্যবহারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ত্যাগ করা মহাসত্ত্ব ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। আমরা আচার্য্য যোগেশচন্দ্রের মধ্যে ফুলের মত স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া-ওঠা একটি আত্ম-মান-বৈরাগ্য চিরদিন লক্ষ্য করিয়া অসঙ্কোচ হইয়াছি। তাঁহার অপেক্ষা বহুলাংশে ন্যূনতর ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এই অনুকম্পা-মিশ্রিত অবজ্ঞা দেখা গিয়াছে। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের সমক্ষে কিছুটা ধৃষ্টতা মূঢ়তা বা পাণ্ডিত্য অভিমান দেখাইয়াও তাঁহার দিকে এই ভাবটি দেখা যায় নাই। যাহার নিন্দা সমালোচনাও করিয়াছেন তাহাকেও তিনি কদাপি অবজ্ঞা করেন নাই, তাই রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয় নাই। এই গুণের জন্য আচার্য্যদেরও আচার্য্য, ইঁহার সহিত, আমাদের স্তরের লোক, কলেজ-স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অজ্ঞ অশিক্ষিত পথের পথিক ও রাখাল বালক পর্য্যন্ত সমান সঙ্কোচহীনতা ও তৃপ্তির সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারিত ও করিত।

চির-পোষিত বহু পৌরাণিক ধারণায় বিশেষতঃ চণ্ডীদাস সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণায় যখন আচার্য্যের গবেষণা আঘাত দিয়াছিল তখন দেশের বহু পণ্ডিত মনস্বী ব্যক্তির পক্ষেও চিত্তের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার উক্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা অল্পাধিক রূঢ়তা সহকারে ব্যক্তিগত মন্তব্যও করিয়াছেন, কিন্তু তদুত্তরে যোগেশচন্দ্র নিপুণ যুক্তিতর্ক সহকারে তাঁহাদের প্রতিবাদের উত্তরমাত্র দিয়াছেন, রূঢ়তার উত্তরে রূঢ়তা দেখান নাই।

তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিচারফলে পাইতেন তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেন, কিন্তু জয়গৌরবের প্রতি তাঁহার কোন লক্ষ্য ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইবার স্পৃহা তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই। তাই তিনি নিজের অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, পিছনে কোনও দল রাখিয়া যান নাই।

জ্ঞান বিদ্যার যে উচ্চ কোটিতে তিনি অবস্থিত ছিলেন, তাহাতে রাজধানীতে বাস করিয়া দেশের বিশালায়তন নানা প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে অপরিহার্য্য, অন্ততঃপক্ষে মূল্যবান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সে লোভ ছিল না। 'নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম, সেইখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড় আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার ক্ষুধা থাকে।' যোগেশচন্দ্রের নিজ সারবত্তা, পূর্ণতা সম্পর্কে এই ন্যূনতা-বোধ ছিল না, তাই বাংলা তথা বাঁকুড়া শহরের এক প্রান্তে বাস করিয়া 'বাঁকুড়া সারস্বত সমাজ', 'চণ্ডীদাস-পুরাকীর্ত্তিভবন' ইত্যাদি বাহ্যতঃ অল্পায়তন প্রচেষ্টায় নিজেকে যুক্ত রাখিতে তাঁহার কিছুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না।

বাঁকুড়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত গত যোগেশ সম্মেলন সভায় শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীদাস তাঁহাকে লিখিত দুইখানি পত্র হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া পাঠ করেন। যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—তিনি ব্যবহারিক ভাবে পুরাতন রীতির জীবনযাত্রা ভালবাসেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক উন্নতিসহ প্রগতিশীল শিক্ষায় বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন। তিনি একপত্রে লিখিয়াছেন, বিজ্ঞান পড় কিন্তু ধর্ম্মে আস্থা হারাইও না।*

* এই সম্পর্কে, গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীসুখময় সরকারের লিখিত প্রবন্ধে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের কিছু বিরূপ মন্তব্যের উল্লেখ করা নিতান্ত অসমীচীন নয়। আমরা তাঁহাকে যতটা জানিয়াছিলাম তাহাতে কখনও রামকৃষ্ণ মিশন বা অনুরূপ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সম্পর্কে (বা সন্ন্যাস সম্পর্কে) কোন বিরূপ মন্তব্য করিতে শুনি নাই। যে বিতর্কমূলক মন্তব্য তিনি আজ আর অনুমোদন বা সংশোধন করিতে পারেন না তাহা আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রকাশ করা কতটা সমীচীন এ বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় আছে। বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা সাধারণ অর্থে যদি তিনি কিছু মন্তব্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের (কথিত হউক বা সাঙ্কেতিত হউক) উপর চাপাইয়া দেওয়া আচার্য্যদেবের উপর সুবিচার বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের যতটা মনে আছে জ্ঞানে কর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ ও বিশ্বাস ছিল, ত্যাগে বৈরাগ্য তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।

পরিশেষে তাঁহার প্রতি বাঁকুড়াবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। বাঁকুড়াকে তাঁহার শেষ জীবনের বাসস্থানরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া যোগেশচন্দ্র আমাদিগকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। বাঁকুড়া ও ইহার অধিবাসীদিগকে তিনি ভালবাসিয়া একেবারে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। এই স্থানের ভূপ্রকৃতি, পুরাতত্ত্ব, দেবদেবী, পূজাপার্ব্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ঐতিহ্য, ভাষা, রীতি, বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি অগণ্য অবজ্ঞাত বিষয়ে অসংখ্য অনুসন্ধান করিয়া যোগেশচন্দ্র মূল্যবান তথ্যসম্ভার রাখিয়া গিয়াছেন। প্রবাসীপত্রে ধারাবাহিক ভাবে এ সকল প্রকাশিত হয়। এই জেলার এত তথ্য বাঁকুড়াবাসী কেহই সংগ্রহ করেন নাই।

বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে গবেষণা, ছাতনায় চণ্ডীদাসের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা 'চণ্ডীদাস-চরিত' উদ্ধার ও প্রকাশ দ্বারা তিনি বাঁকুড়াবাসীকে গৌরবান্বিত এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিয়া গিয়াছেন।

অথচ বাঁকুড়ার প্রতি তাঁহার এই স্নেহ প্রেম কোন প্রকার দুর্ব্বল মোহভাব দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। বাঁকুড়া ও বাঁকুড়াবাসীর দোষত্রুটী তিনি বিনা দ্বিধায় বার বার প্রকাশ করিয়া বহু বিতর্ক ও বিরাগের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাই যাঁহারা মনে করেন যে, কৃত্রিম ভাবে নিজ বিদ্যাবত্তার প্রভাবে চণ্ডীদাস গৌরব বাঁকুড়া ছাতনায় আরোপিত করিয়া বাঁকুড়ার গৌরব-বর্দ্ধনই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তাঁহারা অলীক কল্পনা করেন কোন মায়া নয়, কোন মোহ নয়, (কারণ বাঁকুড়া তাঁহার জন্মভূমি নয়, জীবিকাভূমি নয়, ঋণভূমি নয়), কেবলমাত্র অনিবার্য্য সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই চণ্ডীদাস সম্পর্কিত তথ্যগুলি তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর এদেশে চণ্ডীদাস সম্পর্কীয় জনশ্রুতিও বহু শত বৎসর যাবৎ প্রচলিত আছে।

তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-কৃতির পুনঃপ্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয় সমগ্র বাংলা দেশের সঙ্গে বাঁকুড়ারও এ বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্য আছে শুনিয়াছি এই ব্যাপারটি অন্যান্য নানা বাধাবিঘ্নের সঙ্গে ভ্রাতৃ-মতানৈক্য রূপ নূতন জটিলতায় জড়িত হইয়াছে। কে বাধা দূর করিবে? জটিলতার গ্রন্থি মোচন করিবে কে?

বয়সে বরিষ্ঠ, বিদ্যায় ভূয়িষ্ঠ, জ্ঞানে গরিষ্ঠ, জীবনে বিশিষ্ট—এই ছিলেন যোগেশচন্দ্র, আবার এমনি একজন কবে আসিবেন?

বিনোবার ব্যূহ রচনা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

কখন কখন মনে হয় ভূদান-গ্রামদানের দম বুঝি বা ফুরাইয়া আসিয়াছে। আরম্ভটা ছিল ভাল। উৎসাহও দেখা গিয়াছিল বেশ। পরে যেন তার গতি মন্দ হইয়া আসিতেছে। মন দমিয়া যায়।

পরক্ষণেই আবার মনে হয়—ভূদান-গ্রামদানের প্রবর্ত্তক ত নিরাশ নহেন। তাঁহার কর্ম্মের গতি ত সমানই চলিতেছে। তাঁহার কর্ম্মে ত বর্ষার বান আর নিদাঘের টান দেখা যায় না।

তাহা হইতে মনের সংশয় দূর হয়। প্রত্যয় ফিরিয়া আসে। পারদের ওঠা নামার মত সাধারণ মানুষ আমাদের অবস্থা। সহজেই মাতিয়া উঠি আবার সহজেই দমিয়া যাই। হাতে হাতে ফল লাভের অধীর আগ্রহে দৃষ্টি আমাদের ঝাপসা হইয়া যায়। তখন গতিটাকেই মনে হয় বিরতি। যেমন তেমন একটু চেষ্টা করিয়াই লাভালাভের অঙ্ক কষিতে বসিয়া যাই। এ যেন বালকের বাগান সাজান। গাছ পুতিয়াই বালক অধীর আগ্রহে তুলিয়া দেখে গাছ কতটা বাড়িয়াছে। হাতে হাতে ফল লাভের আগ্রহে অধীর না হইলে দেখিতে পাইতাম, ভূদান গ্রামদান স্থিরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বিনোবার গতির মতই সেই গতি স্থির ও অচঞ্চল। আর স্থির ও অচঞ্চল বলিয়াই আমাদের ভ্রান্তি জন্মে—গতিটাকেই মনে হয় স্থিতি। কোন যন্ত্র বা চক্র যখন অতি বেগে ঘুরিতে থাকে তখন মনে হয় তাহা স্থির। বিনোবার গতি অতি দ্রুত গতিশীল চক্রের গতির মত।

বিনোবার লক্ষ্য স্থির; গতিও তাঁহার স্থির। হয় গন্তব্যে পৌঁছিবেন অথবা গন্তব্যে পৌঁছিবার চেষ্টায় তাঁহার দেহপাত হইবে। তাঁহার কাছে দুই-ই সমান, দুই-ই পূর্ণ লাভ। এরূপ দৃঢ়ব্রতী পুরুষের কর্ম্মের গতি কখনও শিথিল হওয়ার নয়—হইতে পারে না।

কিন্তু মজা ত এইখানেই—ফল যে চায় না, নিজ হইতে আসিয়া ফল তাহাকেই বরণ করে। বরণ করে তাহার কারণ সমগ্র শক্তি সে কর্ম্মে নিয়োগ করে, ফলপ্রাপ্তির বাসনায় অণুমাত্র তাহা খণ্ডিত নহে।

এখন স্পষ্ট বুঝা না গেলেও এক সময়ে দেখা যাইবে যে, নানা প্রতিকূল শক্তির জন্ত বিনোবা নানা ব্যূহ রচনা করিয়া চলিয়াছেন। স্বার্থ-বেষ্টিতদের পক্ষে যাহা ভেদ করা দুঃসাধ্য হইবে।

গলার হারও সময়বিশেষে গলার ফাঁস হয়। তখন তাহা ছিঁড়িয়া ফেলাতেই মঙ্গল। যুগে যুগে মানুষ তাহা করিয়া আসিয়াছে, আচার যখনই কদাচার হইয়াছে তখন সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এ ভাবে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া সে বাঁচিয়া আছে। এই সময়ে তাহার কাছে আবার পুরাতন ছাড়ার ও নূতন আশ্রয় করার প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত প্রগতির যুগে ব্যাপক না হইলে তাহার আর চলিতেছে না। আমি-আমার এই সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে আসিয়া মানুষকে এখন আমরা-আমাদের এই ব্যাপক ভূমিকায় দাঁড়াইতে হইতেছে। ভারতের আত্মজ্ঞান যে ভূমিকা রচনা করিয়া রাখিয়াছে বিজ্ঞান সেই ভূমিকায় মানুষকে আজ ঠেলিয়া দিতেছে—সামূহিক জীবন না হয় সামূহিক মৃত্যু। দ্বিতীয় পন্থা নাই।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন না করিয়া ভূদান গ্রামদান সেই সামূহিক জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। ভূদান গ্রামদান বলে—তুমি ব্যাপক হও, আমি আমার ছাড়, আমরা আমাদের বল। একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমরা তাহাই করি। ধরুন, কোন একান্নবর্ত্তী পরিবারে পাঁচ ভাই আর তাদের জমির পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘা। পাঁচ ভাইয়ের কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার জমি কতটা? সে বলিবে, আমাদের পঞ্চাশ বিঘা। পঞ্চাশকে পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া সে বলে না—আমার দশ বিঘা। ইহাও তেমন। খোয়াইবার ভয় এখানে মোটেই নাই। খোয়াই ত খোয়াইব গ্রামের বাদ-বিবাদ। আজও গ্রাম বাদ-বিবাদে ভরা।

এখানে প্রশ্ন উঠিবে: আমি-আমার স্থানে আমরা-আমাদের ত শুনিতে ভাল। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়েই যে বনে না। জমি-বিত্ত ভাগ করিয়া পৃথক হইয়া যায়। তার কি? ইহার উত্তর—ভাইয়ে ভাইয়ে আজ যে বনে না তার কারণ ব্যক্তি-মালিকানা। ব্যক্তি-মালিকানার জায়গায় গ্রামের মালিকানা হইলে সে প্রশ্ন থাকিবে না।

ভূদান-গ্রামদানের তত্ত্বটি কি? তাহা এই:

যে জিনিস জীবনের পক্ষে যত বেশী দরকার ভগবানের বিধানে সে জিনিস তত বেশী সুলভ। আলো না হইলে চলে না, হাওয়া না হইলে চলে না। তাই আলো-হাওয়া সুলভ। খুঁজিতে তাহা হয় না। জল না হইলে চলে না, তাই জল সুলভ। অন্ন না হইলেও তেমন চলে না। কিন্তু অন্ন দুর্লভ। তার কারণ, আলো-হাওয়া-জলের মতই যাহা ভগবানের দেওয়া সেই জমিতে মানুষ সীমারেখা টানিয়াছে, তাহা ভাগ-বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এক সময়ে চলিলেও আজ তাহা অচল। তখন লোক ছিল কম আর জমি ছিল যত চাই তার চাইতে ঢের বেশী। আজ অবস্থা তার উল্টা। তাই চার দিকে এত অশান্তি।

এই অশান্তি দূর করার উপায়? জলের মত অন্ন সুলভ করিয়া দেওয়া। ধরুন, কোন পিপাসা-কাতর পথিক আপনার বাড়ী আসিয়া পানীয় জল চাহিল। আপনি কি করেন? পথিককে বসিতে আসন দেন, হাত-মুখ ধোবার জল দেন। তার পরে মাজা-ঘষা পরিষ্কার গ্লাসে পানীয় জল দেন। আর সঙ্গে দেন দুই এক-খানি বাতাসা বা একটু গুড়। এতটুকু করিয়া আপনি তুষ্ট, আর এতটুকু পাইয়া পথিকও তুষ্ট। তাই জলের মত অন্ন সুলভ করিয়া দিন। দেখিবেন অসন্তোষ দূর হইয়া গিয়াছে।

অন্ন সুলভ করার উপায়? জমির সীমারেখা মুছিয়া ফেলা, জমির ব্যক্তি-মালিকানা মিটাইয়া দেওয়া, যে নিজ হাতে জমির সেবা করে, ভূমিমাতার পূজা করে সে কৃষকের হাতে জমির সেবার ভার তুলিয়া দেওয়া। এই জমিতেই তখন সে সোনা ফলাইবে যেমন চীনা কৃষক বিপ্লবের পরে চীনে আজ সোনা ফলাইতেছে। চীন ছিল বিপুল ঘাটতির দেশ, চীন হইয়াছে আজ বিপুল বাড়তির দেশ। অন্ন সুলভ হইলে পথিককে পানীয় জল দেওয়ার মত সহজভাবেই আগন্তুককে দুই মুষ্টি অন্ন দেওয়া যাইবে।

সর্ব্বোদয়ের (সর্ব্বোদয় লক্ষ্য, আর ভূদান-গ্রামদান তথা বিত্তদান-শ্রমদান বা বুদ্ধিদান সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়) সংজ্ঞায় হ্যাভস এবং হ্যাভ-নটস নাই। সকলেই হ্যাভস। কাহারও জমি বা বিত্ত আছে ত কাহারও শ্রমশক্তি বা বুদ্ধি-শক্তি আছে। সকলেরই দেওয়ার আছে। আর যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া সে সমাজের সেবা করিবে। এই অর্থেই গান্ধী বলিতেন—I want to make everyone a Capitalist. সকলেই হ্যাভস এই দৃষ্টি আসিলে, এই মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হইবে। আজ ত সমাজ নাই বা তাহা প্রেতবৎ।

সকলেই হ্যাভস, কেহই হ্যাভ-নট নয়, এই যে বিচার ইহাকে সর্ব্বোদয়ের ম্যানিফেষ্ট বা ঘোষণা বলা যাইতে পারে। সর্ব্বোদয়ের ইহা মন্ত্র। সর্ব্বোদয়ের ইহা চেলেঞ্জ। নূতন মূল্য প্রবর্ত্তনের ইহা আধার। সর্ব্বোদয়ের ইহা বিচার-ব্যূহ।

ভূদান পর্য্যায়ে বিনোবা জমি চাহিয়াছেন (আজও তিনি জমি চান ও পান), জমি পাইয়াছেন, পাওয়া-জমি কৃষকদের বিলি করিয়াছেন। আবার যাহারা জমি দিয়াছে তাহাদিগকে তিনি কখন কখন বলিয়াছেন—জমি দিলেন না ত কন্যা দান করিলেন। কিন্তু দান ত করিতে হয় সাভরণা কন্যা। অতএব জমি দিলেন ত হালের গরু দিন, লাঙ্গল দিন, বীজ-ধান দিন। জলসেচের ব্যবস্থা যেখানে নাই সেখানে বলিয়াছেন, জমি দিলেন, কিন্তু সেচের ব্যবস্থা না করিয়া দিলে ত এই জমি চাষ করা যাইবে না। কুয়া খুঁড়িয়া দিন। আর তাঁহার এই আবেদনে ফলও ফলিয়াছে, সর্ব্বক্ষেত্রে ফলিয়াছে তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফলিয়াছে। কিন্তু ভূমিহীন কৃষকের দৃষ্টিতে তাহাই বড় হইয়া ধরা পড়িয়াছে। ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক বিস্ময়ে ভাবে—এই লোক গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে জমি চায়, জমি পায় এবং সে জমি আমাদের দেয়, আবার তার সঙ্গে হালখানা ও গরুজোড়াও দেয়। আর এই সবই দেয় সে বিনা পয়সায়। জমি ত পায়ই উল্টা খেসারতও আদায় করে দাতাদের কাছ হইতে। আর তাহার মনে দিন দিন এই প্রশ্নটা গভীর রেখাপাত করিতেছে—এক ফকির জমি চাহিতেছে, জমি পাইতেছে, বিনা পয়সায় সেই জমি আমাদের দিতেছে, উল্টা ক্ষতিপূরণ বাবদ দাতার কাছ হইতে হাল-গরু, কুয়া আদায় করিতেছে, আর এত ক্ষমতা যে সরকারের সে সরকার আমাদের জমি দেয় না, আর দিলেও বলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দাও। এ কেমন কথা? বিনোবা যত বেশী ঘুরিতেছেন এই প্রশ্নটা ভারত-জোড়া তত বেশী বৃহৎ আকার ধারণ করিতেছে। গ্রামদানে এই প্রশ্ন আরও অধিক দৃঢ় হইতেছে। এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর (এখানে দুই লাখ একর, ওখানে দুই লাখ একর জমির বিলি সেই উত্তর নয়) কংগ্রেস সরকারকে বা বিরোধীদল গঠিত সরকারকে একদিন দিতে হইবে। আর সন্তোষজনক উত্তর দিতে গেলেই সেই সরকারকে হইতে হইবে গরীবের সরকার। আর না দিতে পারিলে হইতে হইবে হাওয়ায় ভূক। ইহাকে আমরা বলির ব্যবহারিক ব্যূহ—এক।

ভূদান-গ্রামদান ব্যক্তি-মালিকানা মিটাইয়া দিতে চায়। জমি হইবে গ্রামের, বিত্ত হইবে গ্রামের। আর সরকার বাঁধিয়া দিতেছে সিলিং (ceiling)। বিরোধীদলসমূহের এই প্রশ্নে পূর্ণ সমর্থন আছে। কেরলায় কম্যুনিষ্ট সরকার এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের সহিত একই নৌকার যাত্রী। সিলিং-এর প্রশ্নে কম্যুনিষ্ট ও কংগ্রেস এই দুইয়েরই কথার ও কাজের পরীক্ষা হইতেছে। কংগ্রেস গরীবের বন্ধু আর কম্যুনিষ্টও গরীবের বান্ধব। তবে তাহারা সিলিং বাঁধিয়া দেওয়ার কথা ভাবেন ও বলেন কি করিয়া? সিলিং বাঁধিয়া দিলে জমিতে যাহারা আঁচড়ও কাটে না তাহাদের হাতেই ত বেশীর ভাগ জমি আটকিয়া যাইবে। গরীবের কি লাভ হইবে? সিলিং বাঁধার ত প্রশ্নই উঠে না। যদি কিছু বাঁধিতে হয় ত ফ্লোরিং বাঁধিয়া দিতে হয়—বলিতে হয় কোন ভূমিহীন, কোন ছোট কৃষকের পনর বিঘার কম জমি থাকিবে না। বিনোবা বলেন, সিলিং-ফ্লোরিং-এর (ceiling-flooring) ত প্রশ্নই নাই। বাঁধিতে হয় ত ফ্লোরিং বাঁধিয়া দাও। ঘর তৈরি করিতে আগে ভিত গড়ে কি ছাত গড়ে? আগে সকলের জন্ম খাকায় না কতিপয়ের জন্ম যুতায়?

বিনোবা গ্রামসভার হাতে, গ্রাম-স্বরাজ্যের হাতেই জমি সঁপিয়া দিতে চাহেন। কম্যুনিষ্টরা সব কিছু রাষ্ট্রের হাতে সঁপিয়া দিতে চান। গ্রাম-স্বরাজও ত রাষ্ট্রই—হইলই বা ক্ষুদে রাষ্ট্র। সে স্থলে তাঁহারা সিলিং বাঁধিতে চান কেন? যান কেন?

কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল কংগ্রেস সরকারের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য। কংগ্রেসও ত সোস্তালিষ্ট-প্যেট্রনের কথা বলে। তবে সিলিং-এর কথা কি করিয়া উঠে? আর এক দিক হইতেও কংগ্রেস এই ব্যূহে আটকা পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য সব

কিছু পব্লিক সেক্টর (এই মুহূর্তে পুরাটা না হইলেও লক্ষ্য ত তাহাই) আর জমি থাকিবে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে। যদি বলা হয় যে, সিলিং-এর কথা এই মুহূর্তের কথা, পরে তাহা থাকিবে না ত বলিব, ভাল কথা, সে স্থলে ফ্লোরিং আগে না সিলিং আগে ? কংগ্রেস ত এখানে ধনবাদের মত তেলা-মাথায়ই তেল দিতেছে।

এলওয়াল সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন গ্রামদানকে করণীয় কার্য্য বলিয়া দেশবাসীকে ঐ কার্য্যকে সফল করিতে আহ্বান করিয়াছে তখন বিনোবার আর এক বূহ রচিত হইয়াছে। অথবা একথা বলাই ঠিক হইবে যে, বিনোবা-রচিত এই বূহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আটকা পড়িয়াছে। না পারে তাহারা ইহাকে গিলিতে, না পারে ফেলিতে। ফেলে ত জনমত হারায়, গিলে ত রাজনৈতিক সত্তা যায়। কোন রাজনৈতিক দল অপর কোন রাজনৈতিক দলের (সর্ব্বোদয়ের নীতি রাজনীতি নয়। তাহা লোকনীতি। লোকনীতি রাজনীতির শুদ্ধ সংস্করণ) কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজকে তথা নীতিকে সমর্থন করিতে পারে না, করে না। এই ক্ষেত্রে তাহারা তাহা করিয়াছে ঠেকিয়া। স্বেচ্ছাকৃত হউক, অনিচ্ছাকৃত হউক দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও তাহাদের মারফত দেশবাসীর সমর্থন সর্ব্বোদয় লাভ করিয়াছে। এখন উহার বিরোধিতা করিয়া রাজনৈতিক দলসমূহ পার পাইবে না। সাধারণ লোক এত বোকা নয় যত বোকা তাহাদের আমরা মনে করি। অভিনয়ে তাহাদের ঠকান যাইবে না।

বিনোবা-রচিত নানা বূহের কার্য্য নানাভাবে নানা লোকের উপর ক্রিয়া করিতেছে। উন্নয়নমন্ত্রী এস. কে. দে অন্ধ্রদেশের গ্রামদানী গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া আসার পরে বিনোবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিনোবাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা এই : গ্রামদানী গ্রাম দেখিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, গ্রামদানী গ্রামেই মাত্র উন্নয়ন কার্য্য যথাযথ হইতে পারে। অন্য জায়গায় কম্যুনিটিই নাই ত কম্যুনিটি কার্য্য কি করিয়া হইবে। ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে যে কাজ হইতেছে তাহার সুবিধা প্রভাবশালী লোকেরা লুটিতেছে। যাহাদের দরকার তাহাদের কাছে তাহা পৌঁছিতে পায় না। নিজ কর্ম্মের স্বরূপের কথায় কোথাও বিনোবা বলিয়াছেন :

"সূর্য্যোদয়ের পরে কুমুদ তার পাপড়ি গুটাইয়া লয়। কখন কখন মধু আহরণে রত মধুমক্ষিকা সেই কোমল ফুলদলে বন্দি হইয়া যায়।"

বলিব কি যে, বিনোবার সৌম্য সত্যাগ্রহের কোমল আবেষ্টনীতে রাজনৈতিক দলসমূহ ও বড় বড় রাজনৈতিক পুরুষ আটকা পড়িতেছে। কিছুদিন আগে পণ্ডিত জহরলাল, মাষ্টার তারা সিংকে বিনোবার পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আর সেই দিন আচার্য্য কৃপালনি বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণকে লিখিবেন যে, তিনি যেন বিনোবার সহিত দালাই লামার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন, তাহাতে সুফলের আশা আছে। সঙ্কটে সকলের দৃষ্টি বিনোবার উপর পড়িতেছে।

কাব্য রচনা

শ্রীসুনীতি দেবী

কবিতা লেখার জায়গা নিয়েছি ঠিক করে,
কিন্তু তখন কবিতা এল না মনে,
সেদিন শুধুই দেখিয়াছি দুই চোখ ভরে
আকাশ কোথায় মিলেছে সিন্ধু সনে।

আজ শহরেতে চার দেওয়ালের মাঝখানে,
অন্ধ আঁধারে একাকী বসিয়া আছি,
সাগরের ঢেউ হঠাৎ যে কথা কয় কানে,
কবিতাও এসে যে সে বসে কাছাকাছি।

জানি না জলদমন্দ্রে জলধি কি গাহে,
অসীম আকাশ নীরবে কি ধন চায়,
বন্দিনী ধরা বাঁধা পথে ছুটে কি চাহে,
বোঝাতে না পেরে বক্ষ ফাটিয়া যায়।

বিশ্বজগতে যদি না কিছুই বুঝি হায়,
বৃথা কেন তবে কাব্য রচনা সাধ ?
কথা গেঁথে গেঁথে কবিতারে কভু ধরা যায়,
পলাতকা সে যে চিনেছে আমার ফাঁদ।

কলিকাতা

শ্রীরথিন মিত্র

অসংখ্য মানুষের আনাগোনায়, কাজেকর্মে আর ব্যবসা-ব্যাপারে মুখর এই কলকাতা শহরের জীবন বৈচিত্র্য অপূর্ব; কলকাতা কোথাও ঐশ্বর্য বিলাসিনী লাস্যময়ী নারীর মত কোথাও বা সে সর্বরিক্তা ভিখারিণী যেন। কিন্তু শহর কলকাতার রিক্ততা অস্পষ্টতার অন্তরালে থেকে যায় অন্য দেশীদের কাছে, তাঁদের কাছে আর শহরের উপরতলার স্বদেশীর কাছে এখানকার বিলাস-বৈভবই চোখে পড়ে। তাঁরা ভুল করেন নিয়ন আলো-বিচ্ছুরিত রাত্রির চৌরঙ্গী আর পার্ক ষ্ট্রীটকে কলকাতা শহরের যথার্থ রূপ বলে। এঁরা দেখতেই পায় না তৈলমসৃণ রাজপথ আর আলোক-উদ্ভাসিত সৌধাবলীর অন্তরালে থাকা বেদনাপাণ্ডুর শহরকে। শহর কলকাতা আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত করে দেয় কেবল সহৃদয় অনুসন্ধানকারীর কাছে।

শহরের একদিকের অপর্যাপ্ত বিলাস-ব্যসন, অফুরন্ত আনন্দ-উল্লাস আর ঐশ্বর্যের দ্যুতিতে সত্যিই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যায়; শহরের কয়েকটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের উষ্ণ উচ্ছ্বাসের চিহ্ন দেখে কলকাতাকে যৌবনচঞ্চলা বলে যদি নবাগত ভুল করেন সেটা খুব অস্বাভাবিক হবে না। তাঁদের চোখের আড়ালে থেকে যায় অন্ধকারে ভরা শহর, যে অন্ধকার দিন দিন বেদনা-লাঞ্ছনায় কেবল ঘনীভূতই হয়ে উঠছে। চৌরঙ্গী পার্ক ষ্ট্রীট কলকাতার স্বাভাবিক জীবন নয়; বিদেশী পেন্টে রঞ্জিত সুদৃশ্য অট্টালিকাশ্রেণী—যার প্রতিটি ইটে প্রচ্ছন্ন রয়েছে স্বচ্ছন্দ জীবনের ইঙ্গিত তা কিন্তু এই শহরের চলমান জীবনের প্রকৃত পটভূমি নয়। এই কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আছে এমন শত শত বাড়ী যেখানে রঙের রঞ্জন নেই আছে ক্ষয়ের উলঙ্গ প্রকাশ। বহু মানুষ-সমাকীর্ণ এই শহরের আজকাল অনেককে সিল্ক, সীগ্লান আর গ্যাবাডিনে আবৃত দেখা যায়; তারা কিন্তু কলকাতার যথার্থ প্রতিনিধি নয়, তারা এখানকার জীবনতরঙ্গে রঙীন বুদ্বুদের সৃষ্টি করলেও তাদেরই পাশে তারুণ্যের এক বিরাট অংশ আছে যারা করছে প্রাণান্তকর পরিশ্রম বেঁচে থাকার জন্যে, অন্ধকার প্রান্তর থেকে তাদের দীর্ঘশ্বাস জানি না ঐশ্বর্য দীপালোকিত কলকাতার অন্য দিগন্তে এসে পৌঁছয় কিনা, কিন্তু শহরের সামগ্রিক রূপ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা তাদের অপাংক্তেয় করে রাখি।

এ শহরের হাজার হাজার মানুষ থাকেন বস্তীতে, জানি না আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের স্থান এর চেয়েও জঘন্য আর কোথাও আছে কিনা, শত শত ঘর রয়েছে, সে ঘরে রয়েছে মানুষ, কিন্তু অভিশপ্ত তাদের জীবন; গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ তার সমস্ত তেজ অকৃপণ ভাবে সে সব ঘরের চালায় ফেলে আর বর্ষা অযাচিত ভাবে সিঞ্চিত করে তার স্নেহধারায় সে সব ঘরের বাসিন্দাদের, সামান্য বর্ষায় বস্তীর গৃহিণীর রান্না-ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায় আর তখন বস্তীর মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন চালের অজস্র ফুটো দিয়ে আসা বরুণ-দেবের সজল আশীর্বাদ থেকে রুগ্ন সন্তানকে রক্ষা করতে। সে সব ঘরে আলো নেই, নেই হাওয়া; কিন্তু আলো-হাওয়ার প্রত্যাশী মানুষ সেখানে রয়েছে হাজারে হাজারে। বস্তীগুলির কোথাও পৌঁছয় পৌর-প্রতিষ্ঠানের আংশিক কৃপাদৃষ্টি, কোথাও বা তাও নয়। বস্তীতে পাশাপাশি ঘরে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বিভিন্ন আপিসের কেরাণী, পৌর-প্রতিষ্ঠানের ওড়িয়া শ্রমিক আর নানা কর্ম-প্রতিষ্ঠানের নেপালী আর হিন্দুস্থানী দারোয়ান; সেখানে না আছে আব্রু না আছে শালীনতা; আইনগর্হিত কাজে লিপ্ত ব্যক্তি বা সমষ্টির সঙ্গে রয়েছেন সেখানে সংস্কৃতির বাহক বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের এক বৃহৎ অংশ, অবস্থাচক্রে তাদের স্বীকার করে নিতে হয়েছে বর্তমানের এই নিগ্রহ। এই অশ্লীল পরিবেশে যে শিশু বেড়ে উঠেছে সে যে কৈশোরের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছেই সমাজবিরুদ্ধ কাজে হাতেখড়ি নেবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বস্তীর এই বিষাক্ত আবেষ্টনে আর যা কিছু আশা করা যেতে পারে আশা করা অন্যায় সুস্থ চেতনা-সম্পন্ন স্বাস্থ্যবান নাগরিক।

ধোঁয়ায়, ধুলোয়, কাদায়, পাঁকে আর পাপে সাক্ষাৎ নরক রূপে বিরাজ করছে এই সব বস্তী, দৈন্য সেখানে প্রতিনিয়ত জীবনরস নিংড়ে নিচ্ছে, মৃত্যুর শীতল ছোঁয়ায় অকালে নিভে যাচ্ছে কত শত জীবনদীপ আর পাপ সেখানে নষ্ট করছে মানুষের সুকুমার বৃত্তি।

যাঁরা তথাকথিত পাকা বাড়ীতে আছেন তাঁদের জীবন-যাত্রা আরও বেদনাকরুণ, বস্তীর বাসিন্দা আপনার দৈন্যকে প্রকাশ করে ফেলেছে সূর্যালোকে; বাঁচবার তাগিদে তাঁরা মানসম্ভ্রম সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছেন।

কিন্তু এই সব পাকাবাড়ীর মানুষরা এখনও পারেন নি আজন্মসঞ্চিত আভিজাত্য আর বংশমর্য্যাদাকে বিদায় দিয়ে নির্লজ্জ জীবন যাপন করতে। কলকাতার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এমন অনেক পাকা বাড়ী যাদের জন্ম-তারিখ খুঁজতে গেলে বেশ ক'টা বছর আগেকার দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে হবে, নোনাধরা দেওয়াল, পাল্লা-ভাঙা দরজা আর বিবর্ণ বহিরঙ্গ নিয়ে বাড়ীগুলি আজও বহুজনকে আশ্রয় দিচ্ছে। সেখানে কল আছে জল নেই, বিদ্যুতের তার আছে আলো নেই। যে বাড়ী তৈরী হয়েছিল মাত্র কয়জনের জন্যে অর্থগৃধ্নু বাড়ীওয়ালা তার মধ্যে ঢুকিয়েছে বহু সংসার, এই সব অস্বাস্থ্যকর অন্ধকূপে আত্মগোপন করে আছেন বাংলার ক্রতক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সন্তান, এঁদেরই শিক্ষাদীক্ষা আর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা একদিন বাংলাকে বরণীয় করেছিল বৃহত্তর ভারতে। জীবন-সংগ্রামের এক কঠোর রূপ সেখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রত বর্দ্ধমান মূল্যের সঙ্গে সীমিত আয়ের একটা সামঞ্জস্য আনয়নের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলছে সে সব সংসারে, দিনের সুরু থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটান' পরিশ্রম চলেছে বেঁচে থাকার জন্যে কিন্তু তাতে মৃত্যুই ত্বরান্বিত হচ্ছে। ঐ সব বাড়ীর ভাঙা দেওয়ালে মাথা কুটে মরছে অভাব-লাঞ্ছিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিপর্যস্ত ভাগ্য। সুস্থ সমৃদ্ধ জীবনের কল্পনা করাও আজ তাঁদের কাছে বিলাসিতা, জীবন সেখানে আজ কোন-কিছুর আশা করে না—আনন্দেরও নেই কোন ঠাঁই; অন্ধকার আর অপমান সে জীবনের নিত্য সঙ্গী।

বেকার ত বলতে গেলে সব মধ্যবিত্তের বাড়ীতে কেউ-না-কেউ আছেন, এঁরা চাকুরীর অনুসন্ধানে সব কিছুকেই বিসর্জন দিচ্ছেন—এমনকি আত্মসম্মান পর্যন্ত, কিন্তু না-পাওয়ার আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হয়ে আছে এঁদের মন; হতাশা আর ব্যর্থতায় এঁদের জীবন-দিগন্তে অকাল অবসাদের ছায়া নেমেছে।

কলকাতার প্রাসাদের ঐশ্বর্যের পেছনে রয়েছে ভাঙা বাড়ীর দৈন্য, অট্টালিকার উচ্চ শিখর সূর্যের সব আলো আর আকাশের সব হাওয়া আত্মসাৎ করে নিচ্ছে; বস্তী আর অসংখ্য জীর্ণ বাড়ীর জন্যে রয়েছে গভীর অন্ধকার। এ শহরে আছেন শিল্পী, শিক্ষক, অধ্যাপক, কেরাণী আর শিক্ষিত বেকার। শিক্ষা এঁরা দাম দিয়ে কিনেছেন, মন দিয়ে গ্রহণ করেছেন কিন্তু মানুষ হিসাবে কলকাতার তথাকথিত সমাজ আজও এঁদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয় নি, কারণ এঁদের আর্থিক কৌলীন্য নেই, এঁরা সবাই শহর কলকাতার ঐতিহ্যে ঐশ্বর্য এনেছেন কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়নে বিলাসিনী কলকাতার উৎসব-উদ্দীপনায় আজও এঁরা প্রবেশাধিকার লাভ করেন নি।

মহুয়া কাব্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

প্রমের পূর্ণতাই মহুয়া কাব্যের ধ্বনি। তাহাই নানা ভাবে নানা পকে প্রকাশিত মহুয়ার বিভিন্ন কবিতায়। সাধারণ জীবনের হিকতায় এ প্রেম সীমিত নহে—কবি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন রুদ্র-হ্নি নিকষিত সর্ব্ব জগৎগত কল্যাণকামিতার প্রকাশ আছে এর ধ্যে—এ প্রেমে রহিয়াছে প্রেয়ত্ব, রহিয়াছে দেবত্ব। প্রেম মানবকে মোঘ শক্তি প্রদান করে কিন্তু তা যদি কেবলমাত্র ব্যক্তি-আদর্শের ণিক পুলকের ইন্ধনে নিঃশেষিত হইয়া যায় তবে হয় প্রেমের চরম মাননা। এ অবমাননায় প্রেমের স্বর্ণকান্তি শ্রেয়তা হইয়াছে কিত যাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিশোর কবি, তাঁর প্রথম ব্যে "প্রেম পাপ বলে যারা প্রেম তারা চিনে?" গতানুগতিক-তার ঊর্দ্ধে প্রেমের যে প্রকৃত রূপ তাহা যে অন্তরে জাগরিত সেই মনেরই পরিচয় বিশেষ করিয়া স্পষ্ট হইয়াছে 'সবলা', 'প্রতীক্ষা', 'লগ্ন' ও 'বরণ' কবিতায়।

সবলা সে নারী যে গতানুগতিক মোহপ্রস্ততায় লিপ্ত নহে। প্রেমের মুক্তরূপের সৌন্দর্য্য সে জানিয়াছে, সে জানিয়াছে প্রেম সর্ব্বজগৎগত সর্ব্বচেতনগত। জীবন যদি ব্যক্তিগত ছোট সুখে আপন গতি হারাইয়া ফেলে তখন সে প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। প্রেম আনে গতি, আনে মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা। সবলা সূর্য্য উপাসিকা—সেই প্রকৃত প্রেমিকা তার মাঝে আছে বীর্য্যের রুদ্রবীণা—"বাসরকক্ষের বধূবেশে"র ব্রীড়াবগুণ্ঠন তাহার

জন্ত নহে। প্রেমাস্পদের কাছে আপনাকে নির্জ্জন দৈহিকতার মধ্যে নিঃশেষিত করিতে উপস্থাপনা করাই তার সব কথা নহে তার সাধনার প্রেরণা দান, তার জীবনের কল্যাণকামিতায় উদ্বোধনের জন্তই তাহার আগমন। জীবনের কল্যাণময় শক্তির উত্তেজনার উদ্দীপ্তি সঞ্চারে যার আগমন

"বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার"

—প্রেমের ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তের জন্তও ম্লান হইতে দিবে না সে। যেদিন সে তাহার কল্পসৌন্দর্য্য প্রেমিককে পাইবে সেদিন সবলা করিবে আত্মসমর্পণ। কল্যাণচেতনায় উত্তেজিত জাগ্রত হৃদয়ের আত্মসমর্পণ এ মহত্তর আদর্শের কাছে, তাহাকে মহত্তম করিয়া তুলিবার প্রত্যাশায়। এ লজ্জিত অসহায়ের আত্মসমর্পণ নহে, কল্যাণ-কামিতার পথে চলিতে চলিতে জীবনের চরম সত্যোপলব্ধির মাহেন্দ্রক্ষণে হৃদয়ের সর্ব্বোত্তম বাণীর প্রেরণা রাখিয়া যায় প্রিয়ের পায়ে।

"সবলা"র তপস্যাকাম্য প্রেমিকের উক্তি "প্রতীক্ষা" "মানসী" কাব্যেও এমনি প্রেমে নারী ও পুরুষের উক্তি আছে। কিন্তু তাহা প্রেমের মানবিক রূপ—রূপ হইতে রূপাতীতে যাওয়ার আভাস তাহাতে থাকিলেও বিকাশ ছিল না। তাহা স্পষ্ট হইল 'প্রতীক্ষা' ও 'সবলা' কবিতায়। এখানে আছে মহত্তর জীবনে যাওয়ার জন্ত তীব্র আত্মচেতনা। তাই সে প্রতীক্ষা করিতেছে প্রেয়সীর। আনন্দের ব্যঞ্জনায় যে তাহাকে অনুপ্রাণিত করিবে মহাজীবনে চলার পথে। তাহার মাঝে তাহার প্রেমিক পাইয়াছে জীবনের সর্ব্ববিধ বৃত্তির চরমতম প্রকাশকে—সেই তাহার প্রিয়তমা। তাহাকেই প্রেমিক করিবে প্রণাম—প্রকৃষ্টরূপে আত্মসমর্পণ। সেই সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতার অভাবে পুরুষ আজও অর্দ্ধবিকশিত। সে চায় না তার প্রেমিকার কাছ হইতে সীমিত প্রাপ্তির আশাভরা দান, সে চায় প্রিয়তমার মুক্তরূপে সঞ্চারিত হইয়া গতি ও তপস্যার উর্দ্ধি শিখা মেলিয়া জীবনের পথে চলিতে—এ জীবনে যশ, লিপ্সা, তামসিকতার অহং চেতনা আত্মাকে আবরিত করিতে চায় তাহা হইতে মুক্তি লাভই জীবনসংগ্রামের বিজয়। সেই বিজয়ে প্রেরণা দানই নারীর চরম কামনা। সেই প্রেরণাদাত্রীর উপাসনা করিতেছে সূর্য্য-উপাসক প্রেমিক।

যে প্রেমের কথা 'সবলা' ও 'প্রতীক্ষা' কবিতায় বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতির কোন পরিবেশে সার্থক—প্রকাশিত হইয়াছে 'লগ্ন' কবিতায়। আষাঢ়ের সজলতা মনকে করে আপনাতে নিবিষ্ট, সেই আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষণ প্রেমের লগ্ন নহে। বসন্তে প্রকৃতি যখন ভোগের অসংযত বিহ্বলতায় প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তাহাও নহে মিলনের ক্ষণ—এ ক্ষণের প্রেম জীবের তনুতে তনু গ্রহণ করে তাহা মহুয়া কাব্যের প্রেম নহে। গতির উপাসক যে প্রেম—যে প্রেমে নিহিত বিশ্বের কল্যাণ-সৃষ্টির বীজ তাহার বপনক্ষণ আশ্বিনের শুচিস্নাত অপ্রগল্ভ শুভ্রতার মুহূর্ত্ত। প্রেমের তপোলব্ধ শুভ্রতার সুসংযত সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হইল তাহার লগ্ন নির্ব্বাচনে।

মহত্তর চেতনায় উত্তেজিত প্রেমিকার অন্তরের ছবি আছে বরণ কবিতাটিতে। যাহার প্রস্তুতি সবলা কবিতায়—আশ্বিনের তপোলব্ধ প্রাচুর্য্যে যার মিলন-লগ্ন। এ প্রেমিকা চাহিতেছে নরের মধ্যে নরেন্দ্রকে বরণ করিতে। পুরাকালে দময়ন্তী করিয়াছেন দেবতার মাঝে মানব বরণ, আজ সূর্য্যসাধিকা বরণ করিবে মানুষের মাঝে দেবতাকে। 'বরণ' কবিতার ধ্বনি বীরবরণ। মানুষের চাওয়ার মাঝেই প্রকাশিত হয় তার মন। প্রেমের কামনা পূর্ণতার কামনা। যা পাই না তাহার পূর্ণতা লাভ হইবে তাহার বিশ্বাস—তাহাতেই ধরা পড়ে তাহার মনের রূপটি কেমন। প্রেমিকার অন্তরে দেবীত্ব জাগরিত না হয় তবে দেবত্বের দর্শনই হইবে না, তাহাকে লাভ করা ত পরের কথা। দেখিবার ক্ষেত্রেও প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

অর্থ, যশ, কামনা লোলুপতার দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে না। নরেন্দ্রের দেবত্ব উমার ভৈরবী রহিয়াছে এ প্রতীক্ষমানার কণ্ঠে। তপস্যার দৃষ্টিতে সে আবিষ্কার করিবে নরেন্দ্রকে পার্থিব মোহগ্রস্ততার গতানুগতিক ছায়া ফেলে নাই সেজন। এ জীবন তাহার কাছে প্রিয়-দুর্লভ কিন্তু একান্ত নয় সে জানে। সে আপন ব্যক্তিত্বকে রাখিয়াছে ধ্রুবতারার মত চিরজাগ্রত। নিত্যকে সে জানে আর এই অনিত্য জীবনকে সে গ্রহণ করিয়াছে অনাসক্ত আগ্রহে। এই গতানুগতিকতার বিপরীত পথের পথিককেই করিবে বিপ্রলব্ধা মালাদান।

প্রাত্যহিক জীবনের প্রেম 'মহুয়া' কাব্যে এক অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। নর-নারীর প্রেম 'মহুয়া'র বিশ্বপ্রেমের রূপক হিসাবে দেখা দেয় নাই, দেখা দিয়াছে তাহার উৎস হিসাবে। আত্মপ্রেম যেমন করিয়া যাহাকে ভালবাসিয়া তৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি প্রেমের সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি করিয়াই ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছে বিশ্বপ্রেমের চেতনায়। প্রকৃতি ও মানবজীবন তাই হইয়া উঠিয়াছে একাত্ম। একই ক্ষণে উভয়ের প্রেমের লগ্ন আসে—এ প্রেম অপরাজেয় বিশ্ববিধান, নিত্য প্রত্যাশার দীপবারতা আছে এতে। এ চাওয়া কেবলমাত্র গণ্ডীটানা ব্যক্তিজীবনের সীমায় পূর্ণতা পায় না। সেই ব্যাপ্ত প্রেমের উপাসক-উপাসিকার প্রস্তুতি, আত্মসমর্পণের লগ্ন, কামনার স্তরের রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 'সবলা', 'লগ্ন', 'প্রতীক্ষা' ও 'বরণ' কবিতায়—যার বিস্তৃতি মহুয়ার বিভিন্ন কবিতায় বিচিত্র বর্ণবিন্যাসের সৌন্দর্য্যে।

রবার্ট ওয়েন

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ওয়েলস দেশের নিউ টাউন নামক এক পল্লীগ্রামে ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন রবার্ট ওয়েন। তাঁহার জন্ম হয় ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে। লেখা-পড়া তিনি বিশেষ কিছু করেন নাই। নয় বৎসর বয়সে তিনি স্কুল ত্যাগ করিয়া প্রথমে লণ্ডন এবং পরে ম্যাঞ্চেষ্টার সহরে দর্জ্জির দোকানে শিক্ষানবীশ হন। যখন তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স তখন তিনি কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া একজন মিস্ত্রীর সহযোগিতায় কাপড়ের কলের যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিয়া যান। অল্প দিনের মধ্যেই এক সুতার কলের কারখানায় ম্যানেজার হইলেন—কিন্তু সেখানে ভবিষ্যতে অংশীদার হওয়ার লোভ পরিত্যাগ করিয়া, নিজে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন এবং অসাধারণ উন্নতি লাভ করিলেন। তাঁহার সুনামও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি ১৭৯৯ সনে স্কটল্যাণ্ডের ডেভিড ডেলের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইলেন নিউ ল্যানার্ক মিলস—তাঁহার কন্যাকেও ওয়েন বিবাহ করিলেন। ব্যবসায়ের বিরাট উন্নতি ছাড়াও তাঁহার মানবতার এবং সমাজ সংস্কারের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার কর্ম্মে ও চিন্তায় ছিলেন সমসাময়িকগণের অগ্রবর্ত্তী।

প্রথম শিল্পযুগের নিদর্শন নিউ ল্যানার্ক গ্রামটিতে প্রায় ২৫০০ জন বসবাস করিত। ইহাদের সকলের জীবিকা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নির্ভর করিত কারখানার উপর। এই সকল লোকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়—খাটুনী প্রতিদিন ১৩ ঘণ্টা বা ততোধিক. শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, মদ্যপান ছিল স্বাভাবিক, বাসগৃহ ছিল অস্বাস্থ্যকর এবং মজুরী ছিল এরূপ যে তাহাতে পেটের ক্ষুধা মিটিত না।

এই শোচনীয় অবস্থা ওয়েন দূর করিতে চাহিলেন। কিন্তু অংশীদারগণের নিকট হইতে বাধা পাইলেন। এজন্য তাহাকে প্রায়ই অংশীদার বদল করিতে হইত। অবশেষে উইলিয়ম য়্যালেন নামক একজন দানশীল দরদী পোয়েকার এবং দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের সহযোগিতায় আদর্শ সমাজ গঠনে হাত দিলেন। ওয়েন সুশৃঙ্খলতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিমিত আহার-ব্যবহারে উৎসাহ দিতেন, খাটুনীর ঘণ্টা হ্রাস করিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হইল 'চরিত্র গঠন সমিতি।' **(Institute for the Formation of Character)**, স্থাপন বিদ্যালয়, সার্ব্বজনীন মিলন-মন্দির এবং 'খেলার মাঠ' বা কিণ্ডার গার্টেনকে কেন্দ্র করিয়াই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল।

১৮১৬ সনে এই সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি ওয়েন প্রকাশিত "New View of Society or Essays on Principle of formation of Human character" (১৮১৩) পুস্তকে লিপিত তাঁহার অভিমত যথা 'মানুষের চরিত্র তাহার আবেষ্টন হইতেই গঠিত হয়' এই মতবাদ অনুযায়ী পরিচালিত হইত। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"Any general character from the best to the worse, from the most ignorant to the most enlightened, may be given to any community, even to the world at large, by the application of proper means ; which means are to a great extent at the command and under the contest of those who have influence on the affairs of wen".

অর্থাৎ যাঁহারা মানুষের বাস্তব জীবন প্রভাবান্বিত করিতে পারেন এরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যে কোন সমাজে এমন কি বৃহত্তর জগতে খুব ভাল, খুব মন্দ, চরম জ্ঞান কিংবা গভীর অজ্ঞানতা, ইহাদের যে কোনটি, উপযুক্ত ব্যবস্থা ও আবেষ্টনের সৃষ্টি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম।

নিউ ল্যানার্কের স্কুলে এক বৎসর হইতে দশ বারো বৎসরের শিশুদিগকে নেওয়া হইত। তখনকার দিনে পদ্ধতি ছিল, পুস্তকের বিষয় মুখস্থ করান। কিন্তু ওয়েনের এই সকল স্কুলে বক্তৃতার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। আজ যাহাকে আমরা বলি শিক্ষার সহায়ক দ্রব্য (teaching aids), যথা, মানচিত্র, চার্ট, ছবি দ্রষ্টব্য স্থানে ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত কারণ শিক্ষা-দানের মূলনীতি ছিল এই যে, শিক্ষার্থী স্ব-ইচ্ছায় আনন্দের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করিবে, শিক্ষা জোর করিয়া চাপান হইবে না।

যদিও শিক্ষাসূচী সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ছিল এবং এ বিষয়ে ওয়েনের জ্ঞানও ছিল খুবই অল্প—এ শিক্ষায় ছেলে মেয়েদের সামরিক ধরনে শরীর চর্চ্চার এবং কুচকাওয়াজ করিবার ও পাইপ-বাজনার সহিত নাচিবার ব্যবস্থা ছিল। কিণ্ডারগার্টেনে ছোট শিশুদের খেলিবার জন্য খেলনা দেওয়া হইত না—তাহারা নিজেরাই যাহাতে খেলনা তৈরি করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ছিল। কোন শাস্তির বালাই ছিল না—সবাই শিশুর সহিত সৎ ও মধুর ব্যবহার করিবে এরূপ ব্যবস্থা ছিল।

নিউ ল্যানার্কের এই স্কুলটির জন্য দেশ-বিদেশে সাড়া পড়ে, বহু বিদেশের লোক ইহার কার্য্যকলাপ দেখিতে আসিত। দশ বৎসরে ২০,০০০-এর উপর বিদেশী লোক ইহা দেখিতে আসিয়াছিল। রাশিয়ার জারের পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস ইহা দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ওয়েনকে ব্রিটেনের বাড়তি বিশ লক্ষ অধিবাসী সহ রুশদেশে আহ্বান করিলেন এবং যথেষ্ট

জমি দিতে চাহিলেন যাহাতে এই নূতন পদ্ধতির সুষ্ঠু পরীক্ষা হইতে পারে। কিন্তু একদল লোক ধর্মশিক্ষা বিহীন এই শিক্ষা এবং শিশুদের শিক্ষাবিষয়ে এতটা স্বাধীনতার বিরূপ সমালোচনা করিল। কিন্তু একজন আধুনিক লেখক বলেন যে, ওয়েনের শিক্ষা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ অন্তর্দৃষ্টি হইল এই যে,শিক্ষা কেবলমাত্র মানুষের বুদ্ধির বিকাশের জন্য নহে—শিক্ষা মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য।

১৮১৫ সন পর্যন্ত ওয়েন জাতীয় উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার নিজের ভাষায় আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই অনুভব করিতেছি যে, দেশের লোক এবং গবর্ণমেণ্ট উভয়কে অধ্যবসায়ের সহিত এই নূতন শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এই পথে চলিলেই আমার আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ গঠিত হইতে পারিবে। ব্রিটেন তখন সবেমাত্র নেপোলিয়ানের সহিত যুদ্ধ শেষ করিয়াছে—দেশে ভয়ানক মন্দা এবং বেকার-সমস্যা উৎকট ভাবে দেখা দিয়াছে। ওয়েনের পরামর্শ চাহিলে তিনি সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলেন। এই সকল গ্রাম নিজের অভাব নিজেই মিটাইবে। ১৮১৭ সনে তিনি 'পুয়োর ল' সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিলেন তাহাতে সমাজতন্ত্রের মূল তথ্যগুলির ক্ষীণ সন্ধান মিলে। ১৮২১ সনে কাউন্টি অব লেনার্ক সম্পর্কে তিনি যে বিস্তারিত রিপোর্ট দেন তাহাতে তাঁহার সমাজতন্ত্র বিষয়ে মতগুলি আরও পরিস্ফুট হয়। এই সময় ওয়েন একটি ফ্যাক্টরী বা কারখানা আইন পাশ করিতে বলেন—আইনের উদ্দেশ্য ছিল পরিশ্রমের সময় নিয়ন্ত্রণ (হ্রাস) এবং অস্বাস্থ্যকর কর্মস্থলের উন্নতি সাধন। ১৮১৯ সনে পিলের আইন নামে একটি নিকৃষ্ট ধরনের বিধি পাশ হয়—ওয়েন এই আইনের নিন্দা করেন এবং এই আইনের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করেন।

ইংলণ্ডে ওয়েনের স্বপ্ন সফল না হওয়ায় তিনি নিরাশ হইয়া ১৮২৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন এবং ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত নিউ হারমণির জঙ্গলে নূতন এক ইউটোপীয়ান উপনিবেশ বা 'রামরাজ্য' স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই নূতন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা সফল হইল না। এই বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁহার মোটেই ছিল না। অসফলতার ইহাই প্রধান কারণ। ওয়েনের বিপুল সম্পদের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ ইহাতে নষ্ট হইয়া গেল। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন তাঁহার অবর্তমানে ১৮১৭ সনের পরে তিনি যে সকল নূতন তথ্য ও পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কতকগুলি শ্রমিক সঙ্ঘ (ট্রেড ইউনিয়ন) এবং সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যদিও তিনি নিজে এই সকল প্রতিষ্ঠান গড়েন নাই তবুও এই সকলের প্রতিষ্ঠাতাগণ তাহাকেই তাহাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তিনি হইলেন এই নূতন আন্দোলনের জনক—যাহার শক্তি ও প্রসার প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। পার্লামেণ্টের ১৮৩২ সনের শাসন সংস্কার বা রিফর্ম বিল শ্রমিকগণের কোন দুঃখই দূর করিতে পারিল না। সমস্ত দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে একীভূত করিবার জন্য ওয়েন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে Grand National Trade Union স্থাপন করিলেন। কিন্তু তখনও দেশ ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না—অল্প দিনেই প্রতিষ্ঠানটি লোপ পাইল।

১৮৩৬ সনে ওয়েন The Book of the New Moral World নামক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। ইহাই হইল তাঁহার সমাজ-সংস্কারের চরম অভিযান—মনুষ্যসমাজকে আমূল সংশোধন করিবার চেষ্টা—জীবনের শেষ প্রচেষ্টা বলাও চলে। কিন্তু ইহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। তাহার মূল বক্তব্য ছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা সমাজ-সংস্কার। নূতন পরিবর্তনশীল শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজে এই সহজ ও সরল নূতন সমাজ সংগঠন চলিল না—সকলের নিকট ইহা অস্পষ্ট ঠেকিল। আসল কথা ওয়েনের চিন্তায় খুব মৌলিকত্ব ছিল না—গভীরতাও বেশী ছিল না। তাঁহার লেখায় ছিল খুবই পুনরাবৃত্তি এবং এজন্য ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করাও ছিল শক্ত। তাঁহার লেখায় মোটামুটি কয়েকটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যাইত—ওয়েনের নিজ জীবনের নব নব অভিজ্ঞতায় তাঁহার চিন্তার ধারার পরিবর্তন মোটেই দেখা যায় না।

তাঁহার পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েন পিতার চারিত্রিক দুর্বলতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন : তাঁহার সমাজ-সংস্কারের কাজ অন্ততঃ সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল কারণ তাঁহার পূর্ব্বে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি মোটেই অবহিত ছিলেন না এবং খুব চিন্তা করিয়া এবং তথ্যাদির ভিত্তিতেও কাজ আরম্ভ করেন নাই। আর মানুষের ক্রমোন্নতি তিনি খুবই বড় করিয়া দেখিতেন। ধর্মভাবই মানুষকে সভ্যতার উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে সাহায্য করে নিজের শেষ জীবনে এই সত্য তিনি একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বতন উপযোগবাদী (ইউটিলিট্যারিয়ান) দার্শনিক জেরেমি বেনথাম, জেমস মিল এবং ফ্রান্সিস প্লেস দ্বারা ওয়েন প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মকে একেবারে বাদ দিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকগণের মতই আশা করিয়াছিলেন যে সকলেই যুক্তির আবেদনে সাড়া দিবে। তিনি আশা করিয়াছিলেন তর্কদ্বারা লোককে বুঝান যাইবে এবং যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা লোকে নিজেদের ভুল বুঝিয়া ঠিক পথে চলিবে। অর্থনীতির এবং মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম নিয়মগুলি তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং এজন্য নিউ ল্যানর্কের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতাকে সমস্ত জাতি এমনকি সমস্ত পৃথিবীতে প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

সামান্য সফলতার দরুণ এবং চতুর্দ্দিকে শিল্প-বিপ্লবের জন্য দ্রুত পরিবর্তন হওয়ায় ওয়েন এক পুরুষের মধ্যেই আরও বিরাট পরিবর্তন আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল পুঁজিপতিদের বর্ত্তমান

ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে বাধাবিপত্তি বেশী কিছু নাই—নিজের শক্তিতে না কুলাইলেও তিনি তাঁহার অনুগামীগণের সাহায্যে ইহা লাভ করিতে পারিবেন।

সফলতা আসুক আর নাই আসুক ওয়েনের শিক্ষা বিষয়ের সংস্কার প্রচেষ্টা তাঁহার মহান কীর্ত্তি। শিশুদের এত কে ভালবাসিয়াছে! এমন দরদী মন লইয়া তাহাদের শিক্ষার বিষয়ে ওয়েনের সমসাময়িক আর কে ভাবিয়াছে! ডক্টর এণ্ড্রু বেল এবং জোসেফ ল্যাংকাষ্টার দুই জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বহু ছাত্রের বিশেষতঃ শিশুদের সুশিক্ষার জন্ত এক নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভব করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'মনিটরিয়্যাল সিষ্টেম'। এই প্রণালী তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। ভাল ভাল ছেলের কয়েকটি শিক্ষার বিষয় মুখস্থ করান হইত। ইহারা পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছেলেদের মধ্যে যাইয়া মুখস্থ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিত এবং অন্যান্য ছেলেরা তাহা শুনিয়া আবৃত্তি ও মুখস্থ করিত।

ওয়েন তৎকালের এই শিক্ষা মোটেই পছন্দ করিতেন না, তাঁহার মতে ইহা 'কণ্ঠস্থকরা'—ইহা 'শিক্ষা নহে। শিক্ষা আরও বৃহৎ এবং ব্যাপক। এজন্তই তিনি পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষাদানকেও অবিশ্বাসের চোখে দেখিতেন। পাঠ্যপুস্তক খুবই নিরস জিনিস। অবশ্য তৎকালীন পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি দেখিয়াই ওয়েনের মন এরূপ বিরূপ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইবে এই তাঁহার আবিষ্কার, যাঁহারা আজ শিক্ষাব্রতী, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী সকলেই স্বীকার করেন, ওয়েনের মনীষার স্বাভাবিক আবিষ্কার। তাঁহার মন শিশুদের সুখী দেখিতে চাহিয়াছিল; তাঁহার যুক্তিবাদী মন বলিয়াছিল শিক্ষা পাইলেই বয়স্কেরও সুনাম বাড়িবে। সমাজকে তিনি খুবই উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন—এজন্তই বলিয়াছিলেন আবশ্যকীয় জ্ঞান সকলের জন্ত—শিক্ষা হইবে সার্ব্বজনীন।

ওয়েন নিয়মানুবর্ত্তিতা নিশ্চয়ই পছন্দ করিতেন। অথচ বিদ্যালয় হইবে আনন্দের স্থান, এখানেই শিশুরা জ্ঞান আহরণ করিবে। শৃঙ্খলার কঠোরতা এবং শিশুদের যথেষ্ট স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত আনন্দময় পরিবেশের ব্যবস্থা ওয়েনের মনে অবশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার সময়ে এবং মৃত্যুর পরেও বহুদিন কঠোরতার মধ্য দিয়াই শিশুরা শিক্ষা পাইত। ১৮১৬ সনে ওয়েনের আদর্শ শিক্ষাদান কিরূপ অসম্ভব ছিল তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, তিনি কোন শিক্ষক খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি নিজে দুই জনকে এরূপ শিক্ষাদানের জন্ত শিক্ষিত করিলেন—ইহাদের একজন ছিল তাঁতী বেকার, আর একজন গ্রাম্য বালিকা। এই দুই জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পরবর্ত্তী কালে যাহারা ইহাদের অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের লইয়া ওয়েনের শিক্ষাপ্রণালী, পরবর্ত্তী একশত বৎসরে ইংরেজী শিক্ষার উন্নতির পরাকাষ্ঠা আনিয়াছিল।

শ্রমিক ও সমবায় আন্দোলনের জনক, নূতন আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং এজন্ত সার্ব্বজনীন শিক্ষার আদর্শ প্রচার ছিল যাঁহার জীবনের সাধনা সেই মানবহিতাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষ রবার্ট ওয়েন ৮৮ বৎসর বয়সে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

একাকার

শ্রীকালীপদ হালদার

হে ড্যা-চট আর ইটের বালিশ, শ্মশানের কাঁথা,
এই নিয়ে করে শয়ন-রচনা রাত কাটাবার;
মাটির দেয়ালে হাজার কাটল, মাকড়সা আর
চামচিকে কত পরিবার নিয়ে আছে গুঁজে মাথা।

পেটের জ্বালায় কঙ্কালগুলো কোথা চলে যায়!
ক্ষুন্নিবৃত্তি—চিন্তায় সদা ঘোরে জানোয়ার;
রাতের আঁধারে চুপি চুপি ফেরে অন্ধ গুহায়,
কুণ্ডলী হয়ে এক সাথে শোয় গোটা সংসার!

ইঁদুরের মাটি কোণে কোণে জমা, তার সে বিবরে
সাপ থাকে কি না যায় না তা বলা—হয় ত বা থাকে;
চালে খড় নেই, রোদ-জল খেয়ে বহু দিন ধরে
বাঁকারী হয়েছে খড় খড়ে ধূলো—কে খবর রাখে?

মানুষ এবং কুকুর-ছাগলে তফাৎ কোথায়?
পশু ও মানুষ চেনা ত যায় না—সব একাকার!

সন্ধ্যা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

শরীরের প্রতি ভাঁজে ভাঁজে অসীম ক্লান্তি। কপালে ঘাম—কাঁধ-ছেঁড়া লংক্লথের পাঞ্জাবী আর আধ ময়লা গেঞ্জী ঘামে ভিজিয়া চব চব করিতেছে। সকাল বেলায় যে কাপড়-জামা ফরসা ছিল, তাও বহু লোকের ঠেলা ঠেলিতে মলিন হইয়া গিয়াছে। আপিস হইতে বাহির হইয়া সুজিত ফুটপাতে দাঁড়াইল। বৈকালের নরম ছায়া ছায়া লালচে রঙে, চারি ধার ভরিয়া গিয়াছে। ফুটপাতের উপর সরু বকুল গাছটির দিকে তাকাইয়া সুজিত নিঃশ্বাস ফেলে। আপিস ভাঙার পর বন্যার স্রোতের মত ফুটপাতে মানুষের স্রোত চলিয়াছে। বাস বোঝাই লোক—ট্যাক্সী আর দামী দামী প্রাইভেট কার হুস হুস শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। সুজিত এখন নিঃশ্বাস ফেলিতে চায়। আবার এই জনস্রোতের ভিতর, বদ্ধ গাড়ীর মধ্যে সকালের মত বাদুড়-ঝোলা হইয়া যাইতে মন চায় না—শরীরও অশক্ত। আর বাড়ী? এখানে তবুও বাতাস আছে। কিন্তু উত্তরপাড়ার সেই ষষ্ঠী মিস্ত্রী লেনের ভিতর ঢুকলেই, মনে হইবে, হায় কোথায় আসিয়াছি! পৃথিবীর বাতাস আলো কি বন্ধ করিয়া দিল? এক হাত চওড়া রাস্তা দুই পাশে অজস্র ময়লা—সারা গলি পথ ময়লা জল কাদা আর নানা জঞ্জালে থক্ থক্ করিতেছে। না, সেখানে বাতাস নাই—আলো নাই—জীবন নাই। শুধু ভয়াল মৃত্যু, তাহার দুই লোমশ থাবা মেলিয়া ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। সুজিত জোরে নিঃশ্বাস টানিতে থাকে। ইহার মধ্যেই বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এই ভীড়ের মধ্যে সেই গুঁতোগুঁতি আর ভাল লাগে না। বাড়ী ফিরিবার এখন তাড়া নাই—পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় একটা টিউশনি করিত, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার যে টাকা-পয়সার স্বচ্ছলতা হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়—বরং খোকার পরে আর একটি খুকী আসাতে খরচ বাড়িয়াছে। তবুও আর টিউশনি করিতে মন চায় না। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া একটি গাধা ছেলেকে মানুষ করিতে মন চায় না।

সুজিত হাঁটিতে থাকে। রাস্তা পার হইয়া পার্কে ঢুকিয়া পড়ে। আঃ এতক্ষণে সে বাঁচিল? পায়ের তলায় নরম ঘাস—হু হু শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। পার্কের মাঝে একটা পুকুর—পুকুরের ধারে ফুলের গাছ। সমস্ত গাছে অজস্র ফুলের সমারোহ। সুজিত ফুলগাছগুলির কাছেই বসিয়া পড়িল। নরম ঘাসগুলি অদ্ভুত ঠাণ্ডা, পুকুরের জলের গন্ধ, ফুলগুলির মৃদু সুগন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছে। মাথার উপর নীল আকাশ—উদার আর অনন্ত। বৈকালের ক্লান্ত সূর্য্য এখন অস্তগামী। তাহার আবীর রঙ যেন মধু-ভরা, মোহ-ভরা। পাখীর মৃদু কাকলী—জল—ঘাস—ফুলের সুগন্ধ সঙ্গে তাহার মন মিশিয়া একাকার হইয়াছে।

আঃ কি সুন্দর। সুজিত কাৎ হইয়া শুইয়া একটা সুগভীর শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এই খোলা পার্ক—ঠাণ্ডা বাতাস, আর আকাশের নীচে তাহার শরীর মন দুই-ই জুড়াইয়া গিয়াছে। ভাঙা মন ম্রিয়মান চিন্তা সমস্তই যেন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুজিতের খুব ক্ষুধা পাইয়াছে। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, পকেটে পয়সা অল্পই। অল্প দূরে একজন বাদামওয়ালার কাছ হইতে বাদাম কিনিয়া, আবার সেই স্থানে বসিয়া বাদাম চিবাইতে লাগিল।

হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া, পকেট হইতে পাতলা একখানি খাতা বাহির করিয়া লিখিতে লাগিল। একটি অর্দ্ধেক লেখা গল্প। কয়দিন হইতে গল্পটি লিখিতেছে কিন্তু এখনও বেশী দূর লেখা হয় নাই।

সুজিত লেখা বন্ধ করিয়া বাদাম চিবাইতে চিবাইতে পড়িতে থাকে। সুজিত মাঝে মাঝে গল্প লেখে, দুই-একটি পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিতও হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আজ পর্য্যন্ত সে পারিশ্রমিক বাবদ একটি টাকাও পায় নাই বা একখানি পত্রও কোনও সম্পাদকের নিকট হইতে পায় নাই। তাহার লেখা ভাল না মন্দ এ সম্বন্ধে কোন পাঠক কোন সম্পাদকও কিছু জানান নি। সুজিত একমনে গল্পটি পড়িয়া যায়। সুজিত লেখক হইতে চায়, একজন নামকরা লেখক হইবার বাসনা জাগে। কিন্তু সেই উৎসাহ, সেই ইচ্ছা বেশী দিন থাকে না। রাত জাগিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া লিখিতে পড়িতে আর মন চায় না। রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে ছেঁড়া লেপ কাঁথার ভিতর ঠিক পশুর মতই ঘুমাইয়া পড়ে। আবার রাত পোহাইয়া যায়—নূতন সূর্য্য উঠে,—একটির পর একটি দিন অনন্ত কাল-সাগরের মাঝে মৃত্যুবরণ করে। সুজিতের আয়ু হইতে একটির পর একটি দিন খসিয়া যায়। তবুও নেশা ছাড়িতে পারে না, মাঝে মাঝে গল্প লেখে—আর মাঝে মাঝে তাহা প্রকাশিত হয়।

সুজিত নরম ঘাসের উপর শুইয়া পড়ে। ততক্ষণে, স্বাস্থ্যান্বেষীর দল ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ছেলেরা বহুক্ষণ হইল কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখন সন্ধ্যা। সেদিন অনেক রাত্রে সুজিত বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ীর কথা মনে হইতেই, তাহার সারা দেহে যেন বার্দ্ধক্য দেখা গেল। সেই সরু গলির আলোহীন বায়ুহীন ছোট ছোট ঘর।

জল আর কাদা, আনাজের খোসা, কয়লার ধোঁয়া—সব মিলিয়ে যেন একটা নরককুণ্ড। আর বেলা যেন এই চব্বিশ বৎসর বয়সেই বুড়ী হইয়া গিয়াছে। সরু সরু হাতে লাল চুড়ী শাঁখা আর লোহা। পরণে আধ-ময়লা মিলের সাড়ী, তাও ছেঁড়া—তাও অপরিষ্কার—এখানে ওখানে কাদা আর হলুদের ছোপ। বেলার চোখে মুখে সারা শরীরে অকাল বার্দ্ধক্যের ছাপ। কথায় তার ক্লান্তি—শীর্ণ গালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে রুক্ষ চুল কিন্তু চোখ দুটি স্তিমিত নয়—সব সময় যেন দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। অভাব আর দারিদ্র্যের প্রতি তার কি অপরিসীম ঘৃণা। কর্কশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরের শাণিত তরবারিতে, সে যেন এই সমাজকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে চায়। নখে নখ ঘষিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বেলা বলে, মরুক মরুক সব—সরকার কি অন্ধ, চোখে দেখতে পায় না। ত্রিশ টাকা মণ চাল—এই ছেঁড়া টেনা কাপড়—আর এই নরককুণ্ডে বাস—এখানে মানুষ থাকতে পারে? মরুক—ওরা মরুক। কোন্ লজ্জায় সব কাগজে কাগজে ওরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেয়, আমরা হ্যানো করেছি ত্যানো করেছি। যাদের ঘরে নিত্য অভাব তাদের অত লম্বা বক্তৃতা কেন? বেলা দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে, আবার হাত খুলিয়া দেয়। বুঝি একটু পরিষ্কার আলো আর বাতাস ভিক্ষা করে ভগবানের কাছে। কিন্তু কোথায় আকাশ? আকাশও আজ দেখা যাচ্ছে না। পাশের এক ত্রিতল গৃহের আড়ালে গোটা আকাশই ঢাকিয়া গিয়াছে।

অনেক রাত্রে কড়া নাড়িতেই বেলার কর্কশ কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিল বলি, আপিস কি রাত্রেও খোলা থাকে? কি হাজার টাকা মাইনে দেয় যে, রাত্রেও আপিসে কলম চালাতে হবে। পোড়াকপাল আমার—। শব্দ করিয়া, খুলিয়া বেলা ঝঙ্কার দিয়া বলে, বলি ভাল আক্কেল যা হোক। রাত বাজে ন'টা, বাড়ী কি ফিরতে হবে না? কে তোমার ভাত আগলে বসে থাকবে? নাও, খেয়ে নিয়ে আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার কর—। সুজিতের নাকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগিল। নর্দ্দমার পচা জল অথবা ইঁদুর পচার গন্ধ বাতাসে আসিতেছে। সেই খোলা বাতাস, পার্কের হাওয়া, ফুলের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ সব যেন উবিয়া গিয়াছে। দেহের সতেজ ভাব আর নাই, এখন যেন বার্দ্ধক্য নামিয়া আসিয়াছে।

ভাতগুলি ঠাণ্ডা, একটু ধরা-গন্ধ। কলাইয়ের ডাল—তাও বরফের মতন ঠাণ্ডা, একটা তরকারী আর আলু-ভাতে। মাছ, দুধ কোনও ফল, মিষ্টি বা দুটো ভাল তরকারী এসব কিছুই নাই। সুজিত আর কোন কথা বলিল না, গো-গ্রাসে সেই ডেলা ডেলা ঠাণ্ডা ভাত খাইতে লাগিল। ক্ষুধা—খুব ক্ষুধা পাইয়াছে তার। চক্ চক্ করিয়া এক গেলাস জল খাইয়া সুজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকাইল। সেই কাঁচ-ভাঙা কালিময় লণ্ঠন, চারিদিকে ছেঁড়া-কাগজ, ছেঁড়া-কাপড়, রং-চটা কয়টা বাক্স আর তাকের উপর ছিন্ন বইয়ের স্তূপ। দেওয়ালে অজস্র ছিদ্র, কোথাও বা চুণ-লেপা। মাটিতে ছেঁড়া মাদুর, তেলচিটে বালিশ, ছোট ছোট ছেঁড়া কাঁথা। সুজিত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

ময়দানের সেই বাতাস কোথায়?

সে হাওয়া, সেই ঘাস-জল আর ফুলের গন্ধ কোথায়?

পা-ভাঙা তক্তপোষের ওপর ছেলেমেয়েটি ঘুমাইতেছে। খোকার ঘুমন্ত ঠোঁট নড়িতেছে। এখনও তাহার দুই কচি-হাতের মুঠিতে ভাঙা পুতুল ধরা। বোধ হয় খেলিতে খেলিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বেলা বলিল, এই নাও তোমার চিঠি।

—চিঠি? দেখি। খাইতে খাইতেই সুজিত পত্রখানা হাতে লইল। পোষ্টকার্ড নয়, খাম। কে দিল খামেতে চিঠি? খামে পত্র কে দিতে পারে? খাওয়া শেষ হইলে হাত-মুখ ধুইয়া পত্রখানি পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ দিয়া একটা আনন্দের শব্দ বাহির হইল।

—দেখেছ, এক ভদ্রলোক চিঠি দিয়েছেন পণ্ডিতিয়া রোড থেকে। আমার সেই গল্পটা "রুপিনীর চোখ" পড়ে ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়েছেন। খুব নাকি ভাল লেগেছে আর তাই কাল সন্ধ্যেবেলা চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। কিন্তু কি বিপদ দেখ। ভাল জামা-কাপড় এখন পাই কোথায়। সুজিত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়ে। চিঠিখানা বার বার পড়ে সুজিত। যাক্, এতদিনে তবুও একজন লোক তাহাকে সম্মান করিয়াছে। এমন সুন্দর গল্প নাকি তিনি ইতিপূর্ব্বে পড়েন নাই। একটা অনাবিল আনন্দে সুজিতের মন ভরিয়া যায়। যাক্ আজ দীর্ঘ কয় বৎসর পর একজন পাঠক তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছে। তাহার লেখা ভাল লাগিয়াছে, গল্প পছন্দ হইয়াছে আর উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণও করিয়াছে। একি কম সম্মান।

না, সুজিত রায়ের দেহে আবার তারুণ্যের জোয়ার আসিয়াছে, ভরা-যৌবনের সেই অসাধারণ উৎসাহ-দীপ্তি নূতন টাটকা রক্তে সৃষ্টির দুরন্ত কামনা যেন টগবগ করিয়া সারা দেহে ফুটিতেছে। আজ রাত্রে সুজিত রায় আর ঘুমাইতে পারিবে না। ভাঙা লণ্ঠনটি লইয়া সুজিত রায় পত্রখানি পড়িতে থাকে।

বন্ধু বিমলের নিকট হইতে তাহার একখানা ধুতি, একটি পাঞ্জাবী এমনকি তাহার নূতন দামী জুতো-জোড়াটি পর্য্যন্ত সুজিত যোগাড় করিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—অন্যান্য ব্যাপারে যতরকম অমিল করিয়াই ভগবান তাহাকে সৃষ্টি করুন না কেন, বিমলের দেহের সহিত তাহার দেহের অত্যন্ত মিল। তাহার পায়ের জুতো, গায়ের জামা হুবহু মিলিয়া যায়—শুধু মিলে না কপাল। নতুবা বিমল নিত্য-নূতন লেটেষ্ট মডেলের বুইক-কার করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। আর সে পায়ে হাঁটিয়া, বাসে ট্রামে যেবাযেখি করিয়া আপিসে যায়। বিমলদের বাড়ী, গাড়ী, টাকাকড়ি, ধন-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির সহিত তাহার বিন্দুমাত্র মিল নাই। শুধু ভগবান কি যেন, কেন, কোন্ রহস্যচ্ছলে শুধু দেহের মাপটাই একেবারে হুবহু মিল করিয়া পড়িয়াছেন। যাক্, তবুও একটি অনুগ্রহ বলিতে হইবে।

আপিসের ছুটি হইয়া যায়। তখনও বেশ রোদ। আজ আর বেলা রাগিবে না। বেলা জানে, স্বামী আজ কোথায় যাইবে। পণ্ডিতিয়া রোডের দুর্গাদাসবাবু অতি অনুগ্রহ করিয়া স্বামীকে চায়ের

নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কি জানি হয়ত ভবিষ্যতে কপালও ভাল হইয়া যাইতে পারে।

সেই পার্কে আসিয়া সুজিত পকেট হইতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বাহির করিয়া জুতা-জোড়াটি মুছিয়া লইল, হাত দিয়া পাঞ্জাবীটির সম্মুখ দিকটা টানিয়া রুমালে মুখ মুছিয়া ঘাসের উপরে বসিল। এখনও সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে।

বাস হইতে নামিয়া, নম্বর মিলাইয়া সুজিত উপস্থিত হইল। গেটওয়ালা একখানি সুন্দর বাড়ীর সম্মুখে। সম্মুখে ছোট্ট একটি বাগান, বাগানে হরেক রকমের ফুল ফুটিয়া বাগান আলো হইয়া রহিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতেই সুবেশ এক ভদ্রলোক হাসিয়া বলিল, নমস্কার।

—নমস্কার! আপনি বোধহয় দুর্গাদাসবাবু। আমি সুজিত রায়।

ভদ্রলোক অতি খাতির করিয়া সুজিতকে একটি ঘরে বসাইলেন। ঘরে আলমারী ভর্ত্তি বই, দামী টেবিলের উপর ইতস্ততঃ বহু বই ছড়ান রহিয়াছে। দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, আপনার বোধ হয় কিছু অসুবিধা করলাম।

—না, না। অসুবিধে আর কি। হাতের কাছে সিগারেটের কৌটা আগাইয়া দিয়া দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, বসুন একটু। আগে চা খান।

সিগারেট টানিতে টানিতে সুজিত ঘরখানি দেখিতে লাগিল মনে মনে ভাবিল, এমন সুন্দর পরিবেশ পাইলে, এমনি সুন্দর শান্ত জীবন পাইলে সে বড় সাহিত্যিক হইতে পারিত। কিন্তু যাহার নিত্য অভাব, শুধু নাই নাই শব্দ, তাহার পক্ষে কি করিয়া অসামান্য মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। বিশেষতঃ তাহার সেই পরিবেশ —সেই ঘর, সেই নরককুণ্ড—উঃ ভাবিলেই গা শিহরিয়া উঠে।

সামান্য চা নয়। ভদ্রলোক মন্দ আয়োজন করেন নাই। গল্প করিতে করিতে চা খাওয়া চলিতে লাগিল। নানা রকমারী ফল, বিস্কুট, কেক, পুডিং, নানা প্রকারের নোনতা আর মিষ্টি। খাইতে খাইতে মনে পড়িয়া গেল, বেলা আর ছেলে মেয়েটার কথা। আহাঃ, উহারা এমন ভাল জিনিস চোখেও দেখে নাই। সুজিতের যেন সব বিস্বাদ মনে হইল। চা খাইতে খাইতে গল্প চলিতেছে, দেশ-বিদেশের সাহিত্যের গল্প, গল্প লেখার কথা ইত্যাদি। দুর্গাদাস-বাবু বলিলেন, আপনার লেখা চমৎকার। এমন মিষ্টি গল্প, আমি বহু দিন পড়িনি। আমার একটা নিবেদন আছে সুজিতবাবু—

সুজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, বিলক্ষণ। বলুন কি ব্যাপার—

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, আমিও যৎ সামান্য লিখি। কিন্তু আপনার কাছে তা দাঁড়াতে পারে না। যদি অভয় দেন, তবে দু' একটা লেখা শোনাতে চাই—

চায়ে চুমুক দিয়া, সুজিত বলিল, আনুন লেখা। কেন শুনব না? ভাবের আদান-প্রদান হওয়াটা অত্যন্ত দরকার। বাঃ! আপনার দেখছি অনেক বই—

—হাঁ। প্রতি মাসে মাসে ভাল ভাল বই কিনি। বই পড়া আমার একটা নেশা—সখ—যা হয় বলতে পারেন। আচ্ছা লেখা-গুলি নিয়ে আসি—

দুর্গাদাস বাবু উঠিয়া যাইতেই, সুজিত এক কাণ্ড করিল। প্লেট হইতে কেক, মিষ্টি, বিস্কুট, লেবু দুই পকেটে ঢুকাইয়া, গায়ের চাদর খানি ঝুলাইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল।

ইহার পর অনেক সময় চলিয়া গেল। কয়েক কাপ চা, অনেক সিগারেট শেষ হইল। দুর্গাবাবুর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প শুনিতে শুনিতে সুজিত হাই তুলিল, উসখুস করিল, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া, বাড়ী ফেরার কথা ভাবিতে লাগিল। তার পর লেখা সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা প্রশংসা করিয়া, হাসি মুখে বিদায় লইল।

দুর্গাদাসবাবু গেট পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া বলিলেন, আজ সন্ধ্যেটা ভারী চমৎকার কাটল, মাঝে মাঝে আসবেন।

—হাঁ চমৎকার। পকেটের উপর হাত দিয়া সুজিত বলিল, খুব ভাল কাটল। হাঁ—আসব—নিশ্চয়ই আসব। সুজিত ভাবিল, লেখা ওঁর যাই হোক্ না কেন—ভদ্রলোক অতি ভাল। অনেক চা সিগারেট আর ভাল ভাল খাবার খাওয়াইয়াছেন। ইহা ছাড়া—অমন বাড়ীতে এই দু তিন ঘণ্টা থাকিয়াই, যেন দেহে মনে সজীবতা ফিরিয়া আসিয়াছে। আঃ কি খোলামেলা জায়গা—নির্জ্জন—পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন।

রাত অনেক হইয়াছে। বেলা তখনও তাহার জন্য ঠাণ্ডা দলা ভাত লইয়া হাঁড়ী হেঁসেল আগলাইয়া বসিয়া আছে।

দরজার কড়া নাড়িতেই, বেলা দরজা খুলিয়া দিল। আজ আর কর্কশ কণ্ঠস্বর নাই। মৃদুকণ্ঠে বেলা বলিল, অনেক রাত হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে আসিয়া সুজিত বলিল, নাও বই দুখানা রাখ। ভদ্রলোকের কাছ থেকে বই দুখানা পড়তে নিয়ে এলাম। খুব ভাল বই, বহু দিন থেকে পড়ার ইচ্ছে—আর এই-গুলি ধর। পকেট হইতে বিস্কুট, লেবু, কেক, মিষ্টি বাহির করিয়া সুজিত বলিল, লেবু আর কেক্ খেও। ছেলেদের জন্য রেখে দিও। ওরা এ সব ত চোখেই দেখতে পায় না।

বেলা বলিল, চেয়ে নিয়ে এলে নাকি?

—চেয়ে? না—না—এই যাঃ নিয়ে এলাম। অনেক ছিল—অনেক খেলাম, ভাবলাম ছেলেদের জন্য নিয়ে যাই, তাই নিয়ে এলাম। উঃ কি গরম। পাখা দাও, আমি খাব না। তুমি খেয়ে নাও। পকেট হইতে দুর্গাদাসবাবুর দেওয়া সিগারেট বাহির করিয়া বাহিরের একফালি রোয়াকে বসিয়া সিগারেট ধরাইল সুজিত।

লেখকের সম্মান সে পাইয়াছে। এই ত অনেক। কয়েক কাপ চা, অনেক খাবার, অনেক সিগারেট। আবার ছেলেদের জন্য পকেট ভর্ত্তি করিয়া অনেক খাবার আনিয়াছে। আর চাই কি!

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে রামায়ণের প্রভাব

শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

মহাকবি কালিদাসের অনবদ্য সৃষ্টি শকুন্তলা নাটক আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে, রচনার মাধুর্য্যে এবং বিষয়বস্তুর অভিনব মৌলিকতায় বিশ্বসাহিত্যের আসরে আজিও অমর আসন অধিকার করিয়া আছে। শিল্পী প্রতিভার অপরতন্ত্রতার প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেও ইহা অনস্বীকার্য্য যে, বিষয়বস্তু কল্পনায় মহাকবির রচনা সর্ব্বাংশে মৌলিক নহে। শকুন্তলা নাটকের পরিচিত উৎসরূপে মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলোপাখ্যান সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পার্থিব মিলনের সেই অকিঞ্চিৎকর এবং আপাততুচ্ছ কাহিনীকে যে শিল্পীসুলভ নৈপুণ্যের সহিত কালিদাস চিত্রিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাহার অসামান্য সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের মনে হয় কালিদাস-গ্রথিতবস্তু এই অমর নাটকের যে নাট্যরূপ সাধারণতঃ পরিচিত তাহাকে সেইরূপে রূপায়িত করিয়া তুলিবার পশ্চাতে রামায়ণের প্রভাব অনেকাংশে বিদ্যমান। নাটকীয় উপাদান মহাভারত হইতে সংগৃহীত হইলেও মহাকবির মানসচক্ষুতে ভাস্বর হইয়াছিল রামায়ণের সমুজ্জ্বল আদর্শ। কালিদাসের সমগ্র সাহিত্যে সংযম, চারিত্রশুদ্ধি এবং আত্মোপলব্ধির যে বিশাল মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহার মূল বোধ হয় রামায়ণে। শকুন্তলা নাটকের বীজ হইতেছে পুত্রোৎপত্তি। সুতরাং সেই ফললাভের অনুকূল যে সামাজিক মিলন, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে মহান্ সামাজিক কর্ত্তব্য। মহাভারতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলনের কাহিনী এই স্থূল বাহ্য মিলনকে অবলম্বন করিয়া, তাহা আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ, চিরন্তন কল্যাণের কোন স্পর্শ তাহাতে নাই। দেহাতীত মিলনের যে মহত্তর আদর্শ এবং শুচিসুন্দর রূপ আলোচ্য নাটকে রূপায়িত হইয়াছে, তাহা রামায়ণের প্রভাবে। আদর্শগত প্রভাবের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় বাহ্যতঃ অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে অভিজ্ঞান অর্থাৎ স্মৃতিচিহ্নের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। শকুন্তলার জীবনে স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজন এবং তদনুকূল ঘটনাবলীর সৃষ্টি—ইহাদের অনিবার্য্য ইঙ্গিত এই অভিজ্ঞান কথাটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন। মহাভারতোক্ত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়ের কাহিনীর মধ্যে অভিজ্ঞানের কোন অবকাশ নাই। সেখানে নৃপতি শকুন্তলাকে জানিয়াও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্তু দৈববাণী শুনিয়া শেষে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের প্রসঙ্গটি নিম্নরূপ—

"সোহথশ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্যা রাজা স্মরন্নপি।
অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্টতাপসী।
ধর্মার্থকামসম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়াসহ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যথাপীচ্ছসি তৎকুরু
(মহাভারত ২৯-৩০ অঃ)।।"

দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপন মিলন কেবলমাত্র শকুন্তলাকে তনয়ের ভাবী সাম্রাজ্যাধিকারীরূপে অঙ্গীকৃতি লাভের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অভিজ্ঞান দর্শনের কোন প্রসঙ্গ সেখানে নাই। শকুন্তলা নাটকে সম্রাট দুষ্যন্ত 'তদহমেনামনৃণাং করোমি' বলিয়া প্রথমক্লান্তা-শকুন্তলাকে অঙ্গুরী দান করিতেছেন এবং অনিবার্য্য প্রত্যাখ্যানের পরিহারক-স্মারকরূপে তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বলিতেছেন—'জই নাম সো রাএসি পচচহিণ্ণাণ মন্থরো ভবে, তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঙ্কিঅং অঙ্গুলিঅহ্যং দংসেহি।' এই অভিজ্ঞানের প্রসঙ্গের মূল সূত্র কোথায়? কালিদাসের রঘুবংশাদি গ্রন্থের উপর রামায়ণের প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। কোলাচল সূরি শ্রীমল্লিনাথ মেঘদূতের সঞ্জীবনী টীকায় ভূমিকায় বলিয়াছেন—হনুমানের সীতার নিকট সংবাদ প্রেরণের ছায়া অবলম্বন করিয়া এই মেঘদূত খণ্ডকাব্য রচিত হইয়াছে। আমাদিগের ধারণায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের 'অভিজ্ঞান' কল্পনা রামায়ণের হনুমানকর্ত্তৃক সীতার অভিজ্ঞান প্রদর্শনের আখ্যানের দ্বারা বহুল প্রভাবান্বিত রামায়ণে অভিজ্ঞান দর্শনে রামের সানুরাগ বিলাপের সহিত প্রাপ্তস্মৃতি দুষ্যন্তের অঙ্গুরী দর্শনজনিত ব্যাকুল অনুশোচনায় ভাবগত এবং ভাষাগত নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে দেখা যায়—(সুন্দর—৬৬)

—"তং তু দৃষ্টা মণিশ্রেষ্ঠং রাঘবঃ শোককর্শিতঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
যথৈব ধেনুঃ শ্রবতি স্নেহাদবৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিরত্নস্য দর্শনাৎ।
অয়ং হি শোভতে তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ মূর্দ্ধ্নি মে মনিঃ।
অস্যাদ্য দর্শনেনাহং প্রাপ্তাং তামিব চিন্তয়ে।
ইতস্তু কিং দুঃখতরং যদিমং বারিসম্ভবম্।
মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতং বিনা।"

ইহার সহিত শকুন্তলায় দুষ্যন্তের উক্তি তুলনীয়—

'তব সুচরিতমঙ্গুলীয়। নূনং প্রতনু মমেব বিভাব্যতে ফলেন।
অরুণ নখ মনোরমাসু তস্যাশ্চ্যুতমপি লব্ধং পদং যদঙ্গুলীষু।'
এবং—"কথং নু বন্ধুর কোমলাঙ্গুলিং করং বিহায়াঽসি নিমগ্নমম্ভসি।
অথবা—অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়েন্মযৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া।"

আলোচ্য প্রভাবের নিদর্শন পঞ্চমাঙ্কেও পাওয়া যায়। দুষ্যন্ত প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার চতুর্দ্দিকে বিশ্বভুবনব্যাপী নিঃসীম শূন্যতা। বিধাতার অভিশাপ প্রত্যাখ্যানরূপ বজ্ররূপে তাহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিরাট বিশ্বে আপন বলিতে শকুন্তলার কেহ নাই;

স্বামীপ্রত্যাখ্যাতা পিতৃ-বিমানিতা শকুন্তলার একমাত্র আশ্রয় সর্ব্বংসহাধরিত্রী—শকুন্তলা তাহারই কাছে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন—'ভগবতি বসুধে দেহি বিবরম্।' রামায়ণেও দেখা যায়—বারংবার অবমানিতা সীতা বিশ্বের সকল আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া ধরিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় চাহিয়াছিলেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।
মনসাকর্ম্মণাবাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি।"
(উত্তরকাণ্ড—১১১ সর্গঃ)।

রামায়ণের 'বিবরং দাতুমর্হতি' এই উক্তির সহিত শকুন্তলা নাটকের 'ভগবতি বসুধে দেহি বিবরম্' ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ শকুন্তলা নাটকে রামায়ণের প্রভাবের নিশ্চিত পরিচায়ক। নাটকের নাটকীয় কথাবস্তুর সূচনা অভিনব প্রকারের—রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ানুসারীরূপে প্রবেশ করিতেছেন। পাত্র প্রবেশের এই বিশেষ ভঙ্গিমা কালিদাসের একান্তভাবে নিজস্ব সৃষ্টি। মহাভারতে পলায়মান মৃগপোতকের গতি-বৈচিত্র্য, ভয়বেপথু অঙ্গের সঞ্চালন—ইহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় না। রামায়ণে রামের দ্বারা অনুস্রিয়মান পলায়মান ছদ্মমৃগের বিচিত্র গতির এবং ক্রীড়াচঞ্চলতার যে সজীব বর্ণনা তাহার সহিত শকুন্তলায় ধাবমান-মৃগের বর্ণনায় ভাবগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন রামায়ণে—

অতিবৃত্তমিষোঃ, পাতাল্লোভয়ানং কদাচন।
শঙ্কিতং তু সমুদভ্রান্তমুৎপতন্তমিবাম্বরে।
দৃশ্যমানমদৃশ্যঞ্চ বনোদ্দেশেষু কেষুচিৎ।
ছিন্নাভ্রৈরিব সংবীতং শারদং চন্দ্রমণ্ডলম্।
মুহূর্ত্তাদেব দদৃশে মুহূর্দূরাৎ প্রকাশতে।
দর্শনাদর্শনাদেবং সোঽপাকর্ষত রাঘবম্।
(অরণ্যকাণ্ড—৪৪ সর্গঃ।)

ইহার সহিত শকুন্তলা নাটকে ভীতি-চঞ্চল মৃগের বর্ণনা তুলনীয়—

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ।
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈর্দ্ধাবালীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখ ভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা।
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।"

শরপতনভয়হেতু মৃগটি ক্ষণে ক্ষণে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছে। কোনও সময়ে দৃষ্ট হইতেছে অথবা কোনও সময়ে অদৃষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং অধিকাংশ সময়েই উচ্চ লম্ফনের নিমিত্ত যেন শূন্যদেশে আহ্বান করিতেছে।' বর্ণনার এই ভাবগত নিবিড় সাম্য হইতে মনে হয় যে, রামায়ণের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা কবিচিত্তে জাগ্রত হইয়া গতিশীল মৃগের বর্ণনে কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও নাটকে অনুরূপ মৃগানুসরণের প্রসঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না।

রামায়ণের সীতারামের মিলনের যে অপূর্ব্ব শুচিসুন্দর মূর্ত্তি তাহা সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের অন্যত্র বিরল। কিন্তু প্রজানুরঞ্জনের জন্য যখন রামচন্দ্র অপাপবিদ্ধা নিষ্কলঙ্কচরিত্র-সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান করিয়াছেন সীতা এই অলীক অপবাদকে ধিক্কৃত করিয়া দৃপ্তপৌরুষে ঘোষণা করিলেন—

"জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যাচ পরয়া যুক্তা হিতা তব নিত্যশ।
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ।
ময়াহি পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমাগতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্মেণ সুসমাহিতঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি বচনাদ রামো বক্তব্যোমম সংগ্রহঃ।
(উত্তরকাণ্ড—৫৮ সর্গঃ।)

অবমানিতা সীতা আপন মনের গভীর ক্ষোভে কেবলমাত্র 'রাম' এই সম্বোধনের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন, 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। শকুন্তলার চারিত্রিক বিশুদ্ধিতা এবং সতীত্বের উপর দুষ্মন্ত যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিলেন তাহাতে আত্মহারা হইয়া শকুন্তলা তাঁহাকে 'অনার্য্য' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন—'অনজ্জ, অত্তণো হিঅআণুমাণেন কিল সব্বং পেক্‌খসি। কো দাণিং অন্নো ধম্মকঞ্চুঅপ্পবেশিণো তিনচ্ছন্ন-কূবোবমসস তব অণুকিদিং পড়িবজ্জিসসদি।' পরিবেশের সাদৃশ্য হইতে মনে হয় যে, তাৎকালিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং দুষ্মন্তকৃত অপরাধের গভীরতায় স্বর্গীয়া স্বৈরিণীর তনয়ার পক্ষে দুষ্যন্তের প্রতি অনুরূপ উক্তি অসম্ভব নহে, কিন্তু ঘটনাবলীর ঐরূপ বিশেষ উন্নয়নে রামায়ণের প্রভাব হয়ত অলক্ষ্যে কাজ করিয়াছিল। জন্ম হইতে যে অসংযম এবং ভোগের বীজ বিবরস্থ সর্পিণীর ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে যাহার স্বভাবের অন্তঃস্থল হইতে উঁকি মারিতেছে তাহার চরিত্রে যে নম্রতা, বিনয় এবং তিতিক্ষা কালিদাস দান করিয়াছেন তাহাতে সীতার আদর্শ-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে মনে করা একান্ত অসঙ্গত নহে। লব-কুশের প্রথম দর্শনে রামায়ণে রামচরিত্রে পিতৃস্নেহের যে অপরূপ অভিব্যক্তি তাহার সহিত সর্ব্বদমনের প্রথম দর্শনে দুষ্মন্তের পিতৃহৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রচুর সাম্য বিদ্যমান। লাঞ্ছিতা শকুন্তলার মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের সহিত রামপরিত্যক্তাজানকীর বিজন অরণ্যরোদনের সুনিবিড় ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। ঘটনাসমূহের এই সকল সাদৃশ্য শকুন্তলা নাটকের উপর রামায়ণের গভীর প্রভাব সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে স্বতঃই উৎসুক করিয়া তুলে।

তিনটি মহামানবের দর্শনে

শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেটা বোধ হয় ১৯৩৯ সন। হঠাৎ যেতে হ'ল শান্তিনিকেতনে। সবে কলেজ থেকে ফিরেছি—দেখি সাত দিন বাদে এসেছে বাবার চিঠি। "কয়দিন সামান্য অসুস্থতার জন্য তোমায় চিঠি দিতে পারি নাই, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হই নাই—চিন্তার কোনও কারণ নাই।" বাবার চিঠির বাঁধা প্রথম ছত্রই ছিল, "পরম শুভাশীর্ব্বাদ আমি ভাল আছি" সেই মানুষের পক্ষে এরকম চিঠিই যথেষ্টই চিন্তার কারণ।

তাছাড়াও একটা আশঙ্কা ছিল। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে মাস ছয় হ'ল বাবা তাঁর ইনস্পেক্টার-জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশান পদ ত্যাগ করে শ্রীনিকেতন-সচিব হয়ে সেখানে চলে গেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে গেছেন স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, দাস-দাসী, মোটোর যা কিছু প্রাচুর্য্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় চিরকালের আরাম আয়োজন। নামে শ্রীনিকেতন-সচিব হলেও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া গেষ্ট-হাউসের প্রাসাদোপম বাড়ীতেও থাকতে রাজী হলেন না, নিলেন না তাঁর ব্যবহারের জন্য ওখানকার ফোর্ড গাড়ীখানা। বলেছিলেন দরিদ্রের উপকার করতে গেলে উঁচুতে বসে করা যায় না, তাদের কাছে যেতে হবে। গ্রাম-গ্রামান্তরে যেতেন গরুর গাড়ী চড়ে, অধিকাংশ জায়গায় পদব্রজে বা সাইকেলে। জীবনসায়াহ্নে এতটা পরিশ্রম ও কৃচ্ছসাধন মন চাইলেও শরীর মানবে কি না এই ছিল আমাদের আশঙ্কা। মাকে নিয়ে মেজদা গেছেন পুরীতে। কাজেই আমাকেই যেতে হবে।

সকালে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেখি অসম্ভব ভিড়—এই অসময়ে এত ভিড়ের কারণ বুঝলাম না। ট্রেনের কামরায় উঠে শুনলাম এই ট্রেনেই মহাত্মাজীও যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। তিনি চারখানি কামরা বাদেই রয়েছেন তবু ট্রেন থেকে নেমে তাঁকে দেখার চেষ্টা করার সাহস হ'ল না। বাবার অসুখ, যদি ট্রেন ফেল করি। প্রতি ষ্টেশনেই দেখি মহাত্মাজীকে দেখার জন্য বিপুল জনতা অপেক্ষা করছে। ঐ দারুণ গরম, রোদ ও ভীষণ ভিড়ে কিছুই তাদের আগ্রহকে ম্লান করতে পারে নি।

যথাসময়ে ট্রেন এসে বোলপুরে পৌঁছল—সেখানেও জনতা কম নয়। তাঁদের মধ্যে প্রতিমা দেবী, নন্দলাল বসু, গৌরমোহনবাবু, ক্ষিতিমোহন সেন, রথী ঠাকুর, অনিল চন্দ ও ডাঃ সুধীর সেন মহাশয়ের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। তার পর তাঁরা শান্তিনিকেতনে ও আমি শ্রীনিকেতনে ভিন্ন পথে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। বাবার আট দিন ১০৩°১০৪ জ্বর, ডাক্তাররা নিউমোনিয়া বলে অনুমান করছেন। প্রায় আচ্ছন্ন ভাব। সারাদিনটা উদ্বেগের মধ্যেই কাটল। সন্ধ্যার সময় বাবাকে ফলের রস খাওয়াচ্ছি এমন সময় বাইরে গাড়ীর আওয়াজ। বাবা চোখ চেয়ে বললেন, "গুরুদেব এলেন।" বারান্দায় বেরিয়ে দেখি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু সি. এফ এণ্ড্রুজ—দু'জনে আসছেন। আমি তাঁদের প্রণাম করতেই এণ্ড্রুজ সাহেব আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, "তুমি আমার সুকুমারের ছেলে? কখন পৌঁছলে?" বলতে বলতে আমরা ঘরে ঢুকলাম। কবি শান্তস্বরে এণ্ড্রুজকে বললেন, "জানেন সুকুমার কি বলেছে? আমি ওষুধ পাঠিয়েছিলাম তাতে সুকুমার বলেছে, গুরুদেব কবিতা লিখতে জানেন কিন্তু ডাক্তার ত নন—"ওষুধ আমি খাব না।" "এণ্ড্রুজ সাহেবের শান্ত দৃষ্টি কৌতুকে যেন নেচে উঠল। রবীন্দ্রনাথ জামার পকেট থেকে একটি মোড়ক বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ওষুধটা ওকে খাওয়াতেই হবে।"

সেইক্ষণে গোধূলির বেলায় দুটি মানুষের মুখে যে অপূর্ব্ব স্নেহচ্ছবি দেখেছিলাম তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তার আগের মুহূর্ত্তে মনের মধ্যে এই বিদেশে আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় বাবার কঠিন-পীড়ায় যে নিঃসহায় মনে হচ্ছিল তা নিমেষে মুছে গেল—বুক ভরে উঠল ভরসায়। পাশে শুশ্রূষারত সত্যদুলাল বাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনের স্বরে বাবা জেগে উঠলেন। দু'টি যুক্তকর কপালে ও বুকে রেখে বাবা দু'জনকে প্রণাম করলেন। গভীর মমতায় বাবার ললাটে দক্ষিণ হাত রেখে এণ্ড্রুজ সাহেব বললেন, "আজ ত তুমি অনেক ভাল আছ।" বাবা বললেন, "তা হবে।" সামান্যক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ওঁরা দু'জনে চলে গেলেন।

পরদিন সকাল থেকেই চারিদিকে সোরগোল। আজ মহাত্মাজী আসবেন শ্রীনিকেতনে। মাঠ জুড়ে শতরঞ্চি পাতা হয়েছে, বাড়ীর দরজায় দরজায় নব-রোপিত কদলীবৃক্ষ, আম্র-পল্লবের মালায় চারিদিক সুসজ্জিত। বিকেলে আমি বাবার ঘরের জানালায় দেখছিলাম। হাত শুশ্রূষারত ও মন চিন্তাকুল। আজও বাবার জ্বর বেশীর দিকেই রয়েছে—কলকাতায় টেলিগ্রাম করব কিনা ভাবছি হঠাৎ "বন্দে মাতরম্ ও জয় গান্ধীজীকি জয়" ধ্বনিতে চারিদিক ভরে উঠল! দেখি মহাত্মাজী এসে পৌঁচেছেন। পেছনে বিরাট জনতা। মনে ক্ষীণ প্রলোভন হচ্ছিল একবার কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন করার, কিন্তু এ অবস্থায় বাবাকে ছেড়ে যাওয়া ত সম্ভব নয়। কিন্তু ও কি? মহাত্মাজী ত সভামণ্ডপে গেলেন না—তিনি যে এ বাড়ীর দিকেই আসছেন। আমি ঘর থেকে বারান্দায় বেরুতে বেরুতে তিনিও এসে উঠেছেন। যাঁরা মহাত্মাজীর সহিত পরিচিত তাঁরা জানেন তাঁর গতির কি দ্রুততা ছিল। সঙ্গে কস্তুরীবাঈ ও গৌরগোপালবাবু। গৌরবাবু বললেন, 'সুকুমার বাবুকে একবার

দেখতে এসেছেন মহাত্মাজী।" মহাত্মাজীকে দেখে বাবা বললেন, "আমায় একটু ধর—আমি প্রণাম করব।" আমরা দু'জনে মিলে বাবাকে ধরতে বাবা পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন গান্ধীজীকে। গভীর স্নেহে মহাত্মাজী আলিঙ্গন করলেন বাবার জ্বরতপ্ত দেহকে বুকের মধ্যে ধরে। আমি নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ। মহাত্মাজী গভীর মমতায় বাবাকে কুশল প্রশ্ন করলেন, বললেন, "তোমার অসুখ শুনে দেখতে এসেছি, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।" বাবাকে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম।

আমার তখন খেয়াল হ'ল একি আমার যে প্রণাম করা হ'ল না—তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই তিনি আমার ললাটে তাঁর আশীর্ব্বাদ দক্ষিণ হাতটির স্পর্শ দিলেন। আমি ধন্য হলাম সেই অমৃতময় স্পর্শ লাভ করে চিরদিনের জন্য।

আজ দীর্ঘদিন ব্যবধানে এই পুণ্যময় তিনটি মহামানবকে স্মরণ করে জানাচ্ছি আমার জীবনের সেই পরম স্মরণীয় দিন দুটির কথা।

ভালবাসা

শ্রীআশিস গুপ্ত

অনেকে ত অনেক কিছু
দিতে চেয়েছে তোমায়
সেত জানি।
জানি না শুধু
তুমি কিছু গ্রহণ করেছ কিনা।

আমি তোমায় একটি ফুল দেব শুধু
তোমার চুলে পরবে ?
হয়তো কোনও নিদ্রাহীন রাতে
আমার দেওয়া এই ফুল
তোমার এলিয়ে যাওয়া
খোঁপার থেকে ঝরে পড়বে
তোমার দেহগন্ধে ভরা
উষ্ণ কোমল তোমার বিছানাতে,
হয়তো কোন সময়
সেই রাতে তোমার বুকের
খুব কাছাকাছি পড়বে এসে।

তখন কি হবে জান ?
সে ফুল
জানতে পারবে তোমার মনের কথা।
তোমার বুকের মাঝে যে কথা
আছে লুকিয়ে।

আমি তোমাকে সেইরকম
একটি ফুল দেবো,
খোঁপায় পরবে না ?

বাগানে যে ফুল ফোটে
এ ফুল সে ফুল নয়।
সে ফুলের আয়ু ত
মাত্র কয়েক প্রহর।
সকালে ফুটে সন্ধ্যায়
ঝরে যায়।
আর,
এ ফুল ফুটেছে আমার মনের বাগানে
এর আয়ু অনন্তকাল
এ ফুলের নাম
ভালবাসা।

তোমায় দেব আমি
চুলে পরবে ?

নরম বিছানা, ফুল ছড়ান—নানা ফুলের মিষ্টি সুবাস। — অপূর্ব এক পূর্ণিমা রাত্রি। সুসজ্জিত ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, চাঁদের আলো নেভে না।

বোধিসত্ত্ব ডাকল, "মৈত্রেয়ী?" বেনারসী শাড়ী, সোনার গহনা ফুলের সাজ—আজকের এ মধুময় রাত্রিতে মৈত্রেয়ীর মাধুরী যেন আশ্চর্য্য ভাবে ঝরে পড়ছে। শুভরাত্রি জীবনে দুবার আসে না। আর তাদের কত সাধনার, কত কামনার পর বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আজ এসেছে।

কিন্তু মৈত্রেয়ী যেন কত দূরে চলে গেছে, কেমন নিস্পৃহ, উদাসীন আজকে সে, বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারছে না, এ অপূর্ব্ব রাতটা এ ভাবে ব্যর্থ করবার জন্ম মৈত্রেয়ীর কেন এত আয়োজন।

"মৈত্রেয়ী", বোধিসত্ত্বর কণ্ঠস্বর মমতায় ভরা, "কি হয়েছে তোমার?"

"কিছু নয় ত।" কত দূর থেকে যেন কথা বলল মৈত্রেয়ী।

"তুমি আজ একটুও খুসী নও ত!" আকুলতা প্রকাশ পেল বোধিসত্ত্বের প্রশ্নে।

"আমি খুসী নই?" চমকে উঠল যেন মৈত্রেয়ী, তবুও বলল, "কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত, বড্ড ক্লান্ত! আমাকে একটু একা থাকতে দেবে?" মিনতি প্রকাশ পেল তার শেষ কথায়।

কোন কথা বলল না বোধিসত্ত্ব, শুধু ঘর থেকে ধীর পদে বার হয়ে গেল। তখন চাঁদের স্নিগ্ধ আলো মৈত্রেয়ীর সোনালী রঙের বেনারসিটার উপর পড়ে তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছিল, নববধূ-বেশী মৈত্রেয়ীকে আশ্চর্য্য লাগছিল···কিন্তু বোধিসত্ত্ব আর ফিরে চাইল না।

বালিশে হেলান দিয়ে এবার শুয়ে পড়ল মৈত্রেয়ী, সত্যিই সে আজ খুব ক্লান্ত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজকের দিনটি তার জীবনে এসেছে, এ দিনের মূল্য সে জানে। তবু অনেক বুঝে, অনেক বিচার করেও মৈত্রেয়ী নিজেকে স্থির করতে পারল না, শুধু এ দিনটাতে তার অশান্ত মন হার স্বীকার করল। মৈত্রেয়ী জানে, কতটা সে হারাল।

এমন কতগুলি কথা মৈত্রেয়ীর মনে পড়ছিল যেগুলি না পড়লে সে তৃপ্তি পেত, কিন্তু আজকে তার মন নিজের হাতে ছিল না। চোখ বুজল সে।···ওর মুদ্রিত চোখের সামনে ভেসে উঠছে কতগুলি ছবি, এত স্পষ্ট যেন সত্যি তারা পর পর এসে দাঁড়াচ্ছে, তাই ত আজকের দিনটা তার এমন ভাবে ব্যর্থ হ'ল। তবু সে অপারগ··· কিছু করবার নেই মৈত্রেয়ীর।

বোধিসত্ত্বকে মৈত্রেয়ী ভালবাসে, সে গভীর ভালবাসার পরিমাপ জানা নেই—মৈত্রেয়ী নিজেও তা জানে না।

উচ্চ শিক্ষার জন্ম এক সময়ে বিদেশে চলে গিয়েছিল বোধিসত্ত্ব, দীর্ঘ পাঁচ বছর নিশ্চয়ই কম সময় নয়। মৈত্রেয়ীর বান্ধবীর দল সেদিন তাকে বলেছিল, "গাঁটছড়া না বেঁধে ওকে অত দূর পালাতে দিস না, ক্ষতি তোরই হবে—"

ওরা অবশ্য মৈত্রেয়ীকে প্র্যাকটিক্যাল হতে বলেছিল, কিন্তু ওদের মনের মত হতে পারে নি সে। আর বিশ্বাস ছাড়া কোন বন্ধনের মাধুর্য্যকে স্বীকার করে না মৈত্রেয়ী।

বোধিসত্ত্ব চলে গেল। যাবার সময় বলেছিল, 'পড়াশুনা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব। তোমাকে ভুলে থাকতে হবে, তা ত বুঝতে পারছ—আমার কাজে বাধা দিও না কিন্তু। কাজ শেষ হলে ফিরে আসব, তুমি প্রতীক্ষা করে থেক।"

এই ক'টা কথাতেই অনেক কথা বলে দিল বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয়ী জানত, মিছে কথা বলে না সে···দীর্ঘ পাঁচ বছরে পাঁচটা চিঠি দিয়েছিল মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বকে, জবাব পেয়েছিল শেষ চিঠির। বোধিসত্ত্ব জানিয়েছিল, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সে ফিরে আসছে, জয়-টীকা তার কপালে। বোধিসত্ত্ব আবার এসে দাঁড়াল মৈত্রেয়ীর সামনে, আজও বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ীরই আছে। সেদিন মৈত্রেয়ীর খুসীর তুলনা মেলে নি।

কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছরের জীবনকে আজ মৈত্রেয়ীর নানা ভাবে মনে পড়ছে···সে জীবন গৌরবের কি অগৌরবের তা সে জানে না —যখন দিনগুলি সুখ-দুঃখে ভরে উঠত তখনও বোঝেনি।

মনে পড়ল প্রসাদকে, মৈত্রেয়ীর সহপাঠী প্রসাদ রায়। মাত্র দু'বছর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সঙ্গে পড়েছিল। সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারত প্রসাদ, আর সে সময়ে বহু বিচিত্রানুষ্ঠানের পরিচালিকা ছিল মৈত্রেয়ী। সেই সূত্রেই মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্রসাদের। পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিল, দু'জনে দু'জনার বন্ধু হয়ে উঠেছিল—তারা ক্লাস পালিয়ে সিনেমা গেছে, গল্প করেছে, কফি-হাউসে আড্ডা মেরেছে—আর পাঁচ জন ছাত্র-ছাত্রীর গল্পের কেন্দ্রস্থলও হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারত না মৈত্রেয়ী, এতে সে কেমন আনন্দ পেত—কিন্তু সময় কেটেছে। তা ছাড়া সঙ্গী হিসাবে প্রসাদ বড় চমৎকার, চিত্রা, মায়া, নন্দিতা এদের সকলের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দুটো বছর খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল, সিক্সথ ইয়ারের পূজার ছুটির সময় প্রসাদকে একটু বিমর্ষ লেগেছিল, মৈত্রেয়ীরও মন খারাপ হয়েছিল।

পরীক্ষা শেষ হ'ল, রেজাল্ট বার হ'ল, তখনও মৈত্রেয়ীর সঙ্গে প্রসাদের বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয় নি, বরঞ্চ কিছু দৃঢ়। হঠাৎ একদিন চমকে উঠল মৈত্রেয়ী, বোধিসত্ত্বর তীক্ষ্ণ চোখ দুটোর আকর্ষণ-শক্তির কল্পনাও যেন তাকে চঞ্চল করে তুলল।

ভুতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভুতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভুতোদা পট্ পট্ করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

"তিনমাস ধরে জল দিচ্ছি আর মাটি কোপাচ্ছি কিন্তু ফুলের না নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে।

বিমল হন্ত দন্ত হয়ে দৌড়ে এল—

"আহা হা করছেন কি ভুতোদা।"

ভুতোদা : "করব না তো কি?"

বিনয় : দোষ তো আপনারই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভুতোদা : তার মানে!

বিনয় : তার মানে মাটিতে সার মেলান দেখবেন গাছ চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে রসকস কম কিনা।

ভুতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হ্যাঁ : যতসব কলকাতার ছোকরা আমায় বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভুতোদা? গাছ যে মানুষেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মানুষের যেমন পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি!
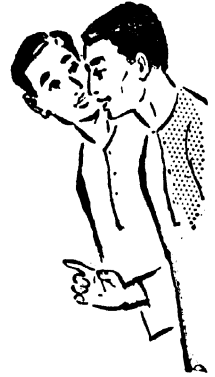
ভুতোদা : বা: বা: তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে?

ভুতাদা : তাই বলেই কি আমার মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল?

বিনয় : নিশ্চই! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা। তবে কিছু সময় লাগবে। পুরনো বিশ্বাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টিকর।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয়?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ গিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি ভাবে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্যগুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষারদেরা প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়েও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। মনে রাখবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী। ভারত সরকারের নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বনস্পতি ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও যে বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর হবে তার কি মানে আছে?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোন আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল: এর পরেও কি ভুল ধারণা থাকতে পারে?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ভুল ধারণা ছিল? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।
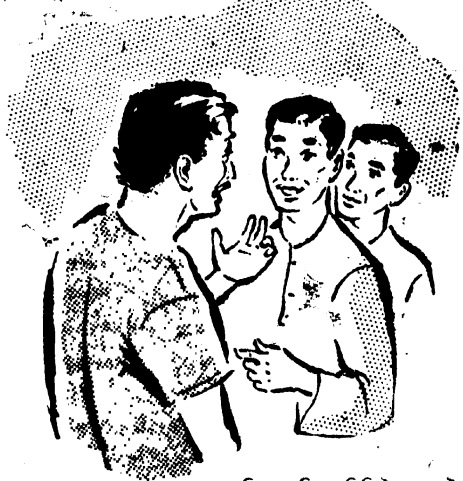
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

ঠিক সেদিন প্রসাদ তাকে বলল, "এমন করে আর কতদিন চলবে বলত ?"

"তার মানে ?" এত বেশী চমকেছিল মৈত্রেয়ী, যে আজও সে কথা মনে হলে তার হাসি পায়।

কল্পনাবিলাসী প্রসাদ রায় সেদিন মৈত্রেয়ীর হাত চেপে ধরেছিল। শুধু শান্ত কণ্ঠে মৈত্রেয়ী বলেছিল, "ছেলেমানুষী করতে নেই।" তার পর সে আর দেখা করে নি প্রসাদের সঙ্গে, নানা ভাবে তাকে এড়িয়ে গেছে।

তখন একটা স্কুলে কাজ করছে মৈত্রেয়ী। বাড়ী থেকে অর্থাৎ কলকাতা থেকে কিছু দূরে এক শহরতলীতে সে তাই রয়েছে। শহরের মেয়েদের বাইরে এসে যা হয়, মৈত্রেয়ীর অবস্থাও তেমনই করুণ হয়ে উঠেছে। কারুর সঙ্গেই সে নিজেকে মেলাতে পারছে না, সমস্ত পরিবেশই যেন কেমন অসহ্য লাগছে তার। এমন সময়ে ক্লাস টেনের ছাত্রী মলয়া তাকে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়ীতে, এই ছোট শহরে প্রথম সেদিন ভাল লাগবার মত কিছু পেল মৈত্রেয়ী।

মলয়ার দাদা অনুপ সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ করে সেই শহরে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে, অনুপের সঙ্গেও পরিচয় হ'ল মৈত্রেয়ীর। তার পর মৈত্রেয়ী একদিন আবিষ্কার করল, এ শহরের 'পরে কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে তার, কলকাতায় কাজ পাবার জন্য মনে তার যে আকুলতা ছিল তা কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে জানতেও পারে নি। কারণ খোঁজে নি মৈত্রেয়ী, ভাল লাগবার আবার কারণ আছে নাকি ? শনিবারগুলিতেও আর বাড়ী যাবার তাড়া ছিল না তার। শহরতলীর বাঁশ ঝাড়, কেয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধ, শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের রাশি—সব তার ভাল লাগল।

শরৎকালের সোনালী রোদে-ভরা একটা দিনে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিল মৈত্রেয়ী, মলয়া, তার বড় বৌদি, অনুপ এদের সকলের সঙ্গে। ক্যামেরা, গ্রামোফোন সবকিছুই ছিল সেদিন, আর ছিল তাদের সকলের প্রাণের প্রাচুর্য্য। দিনটা সুখের হয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিনই, সেই সুন্দর দিনটাতেই একটা অঘটন ঘটে গেল। বৌদি কেমন সব ঠাট্টা আরম্ভ করে দিলেন, এমন একটা ভাব করছিলেন যেন অনুপ আর মৈত্রেয়ীর মধ্যে বেশ একটা রোমান্টিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মৈত্রেয়ী যে তাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠবে তারই বুঝি এক প্রস্তুতি। কিন্তু এমনটি কখনও ভাবে নি মৈত্রেয়ী। গাড়ীতে উঠে পরম আত্মীয়ার মত অনুপের বৌদি তাকে বলেছিলেন, "এই অঘ্রাণেই তবে দিন স্থির ভাই, খবর দিয়ে যাচ্ছি তোমার মায়ের কাছে···আর আমার দেওরটি ত···"

তখন গোপনে সেই শহর থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে মৈত্রেয়ী। অনুপম এসে বৌদির কথারই পুনরাবৃত্তি করে গেল, কিন্তু মৈত্রেয়ী আর নিজেকে চেপে রাখতে পারছিল না, হঠাৎই করজোড়ে সে বলে উঠল, "এর জন্য এত আয়োজনের দরকার ছিল না। আমাকে ক্ষমা করতে হবে।"

মৈত্রেয়ী চলে যাবার পর সেই শহরে তাকে নিয়ে কোন আন্দোলন হয়েছিল কি না সে জানে না। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে তার মনটা কতদিন কেমন যেন বিমর্ষ হয়েছিল। সব ফাঁকা লাগত। সময়ে বোধিসত্ত্বকে সে তার চতুর্থ চিঠি লিখেছিল। অত লম্বা চিঠি সে আর কখনও লেখে নি তাকে। এর পর কয়েকদিন ভীষণ উৎসাহে সে চাকরী খোঁজা আরম্ভ করে দিল। এ সময়ে দিদির দেওর ত্রিদিবের কাছ থেকে এল অযাচিত সাহায্য। মনে মনে সে ত্রিদিবের 'পরে কৃতজ্ঞ হ'ল, কারণ তার এ চাকরী খোঁজার ব্যাপারটা বাড়ীর কেউ সমর্থন করেন নি।

কিন্তু, ত্রিদিবও সেই একই কথা শোনাল···ত্রিদিব বলেছিল, "মৈত্রেয়ী, কি হবে তোমার চাকরী করে···" সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে সে আবার বলল, "আমি যা উপায় করি তাতে সংসারে অসচ্ছলতা আসবার কথা নয়। বরঞ্চ তুমি বাইরে গেলে···"

ত্রিদিবের বলার মাঝপথেই মৈত্রেয়ী বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, "অর্থাৎ ?"

"আমাদের বিয়ের পরের কথা বলছি—" ত্রিদিবের সলজ্জ বিনীত হাসিটা একেবারে বোকার হাসির মত মনে হয়েছিল মৈত্রেয়ীর।

"আমাদের বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।" উত্তপ্ত হয়েছিল তার কণ্ঠস্বর, "আপনার বোধ হয় জানা নেই আমি বাগদত্তা।"

কথাটা উচ্চারণ করবার ইচ্ছা ছিল না মৈত্রেয়ীর, কিন্তু আজ সে সত্যিই উত্যক্ত।

বাড়ী ফিরে এসে মৈত্রেয়ী বুঝল, দিদির বাড়ী থেকে মায়ের কাছেও খবরটা পৌঁছেছে, ত্রিদিব বুদ্ধিমান লোক। কিন্তু মৈত্রেয়ীর সেদিন কান্না পেয়েছিল, প্রস্তাবটা সে গম্ভীর ভাবে প্রত্যাখ্যান করল। অবশ্য বাড়ীর সকলে বিরক্ত হয়েছিল তার 'পরে, আর বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্যেও অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল।

তখন মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বকে তার পঞ্চম এবং শেষ চিঠি লিখল। মৈত্রেয়ী লিখেছিল, "পাঁচ বছর যে কত দীর্ঘ সময়, তুমি তা না বুঝলেও আমি জানছি।···কিন্তু সে তোমার কত বড় ব্রত যে একটা দু'লাইন চিঠি লিখলেও ব্রত ভঙ্গ হয় ?"

এ চিঠির জবাব পেয়েছিল মৈত্রেয়ী। বোধিসত্ত্বর চিঠিটা হাতে নিয়ে মুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিল সে···স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বোধিসত্ত্বর হাসিমাখা মুখখানা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো।

এর উত্তরে বোধিসত্ত্ব তার সাফল্যের সংবাদ জানিয়েছিল, লিখেছিল তার ফিরে আসার কথা। সব শেষে লিখেছিল, "তোমরা মেয়েরা চিরদিন আমাদের ব্রত ভঙ্গ করে আসছ—পুরাণের যুগ ধরে যা চলে আসছে, তার ব্যতিক্রম হবে কি করে ?

···ফিরে এল বোধিসত্ত্ব তাই আজকের এই শুভরাত্রি।

চমকে মৈত্রেয়ীর রাতজাগা চোখ দুটো অজানতেই জলে ভরে উঠল। আকাশের বুকে হাসছে শেষ রাতের শুকতারা।

ভারতে ডিজেল তৈলের সমস্যা

শ্রীতারা রায়

১৯৫৯-৬০ সনের বাজেটের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেন যে, ডিজেলের উপর প্রস্তাবিত কর তুলতে তিনি রাজী নন অর্থাৎ ডিজেলের ব্যবহার যাতে কম হয় সেদিকে সরকার চেষ্টিত। দেশে পেট্রোলের উৎপাদন বেশী হচ্ছে, কিন্তু ডিজেল প্রয়োজনের তুলনায় কম। বিদেশ থেকে ডিজেল আমদানী করতে হয়, এটা সরকারের কাছে একটা সমস্যা।

ডিজেল তৈল সাধারণতঃ শক্তি-চালিত ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়। ডিজেলের ব্যবহার অনেকটা পেট্রোলের মত। এদেশে ডিজেলের ব্যবহার খুব কম হ'ত। ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার জন্ম ডিজেলের ব্যবহারে পূর্ব্বে যে সমস্ত অসুবিধা ছিল আজ তা অনেক পরিমাণে কমে এসেছে। এখন ডিজেলের সাহায্যে শুধু ইঞ্জিনই চলে না—জাহাজ, ট্রাক্টার, যানবাহন গাড়ীও চলে।

ডিজেলের ব্যবহার কিরূপ বাড়ছে তার হিসাব নিচে দেওয়া হ'ল :

সন	হাজার টনের হিসাব
১৯৪৯	৫০৫
১৯৫০	৫০৮
১৯৫১	৬৬৪
১৯৫২	৬৫০

১৯৪৯ সন থেকে ১৯৫৮ সনে ১০ বৎসরে ডিজেলের ব্যবহার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে ১৯৬৩ সনে চাহিদা হবে প্রায় ২,০৮৯ হাজার টন।

আমাদের দেশে যানবাহনে ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার কিরূপ বাড়ছে তার হিসাব :

সন	ডিজেল ইঞ্জিনের সংখ্যা	সন	ডিজেল ইঞ্জিনের সংখ্যা
১৯৫১	২৮৪০	১৯৫৪	৭৫১০
১৯৫২	৩১৯৯	১৯৫৫	১৩৫৩৮
১৯৫৩	৫০৮৫	১৯৫৬	২০০২৩

নিচের পরিসংখ্যা হতে দেখা যাবে ভারতে পেট্রোল-ইঞ্জিন গাড়ীর উৎপাদন কমছে এবং ডিজেল ইঞ্জিন-চালিত গাড়ীর উৎপাদন বাড়ছে—তা ছাড়াও অনেক পেট্রোল ইঞ্জিনকে ডিজেল ইঞ্জিনে পরিণত করা হচ্ছে।

সন	পেট্রোল-চালিত ইঞ্জিন	ডিজেল-চালিত ইঞ্জিন
১৯৫৩	২৪৬৪	২৫২
১৯৫৪	৪২১৩	৮২৪
১৯৫৫	৪৮৩২	৪৫৪৯
১৯৫৬	৪৩৯৯	৯৯৩৪
১৯৫৭	৩১৭৬	১২৪৭৩

ডিজেল তৈলের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণ প্রধানতঃ (ক) টেকনিক্যাল ও (খ) অর্থ নৈতিক।

(ক) ডিজেল তৈলের টেকনিক্যাল ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার্য্য।

১। ডিজেল ইঞ্জিনের উত্তাপ শক্তি বেশী। শতকরা প্রায়

৩০ ভাগ জালানী বাঁচে অর্থাৎ ১০০ গ্যালন পেট্রোলে যে কাজ হয় তা মাত্র ৭০ গ্যালনেই হয়।

২। ডিজেল ইঞ্জিন পেট্রোল ইঞ্জিনের চেয়ে নির্ভরযোগ্য।

৩। একই পরিমাণ তেল রাখতে পেট্রোলের যতটা জায়গা লাগে তার থেকে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ ডিজেলের কম লাগে।

৪। ডিজেল তৈল কম উবে (evaporate) যায়।

ডিজেল ব্যবহারে সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও আছে, যেমন (১) ডিজেল গাড়ী পেট্রোল গাড়ী থেকে প্রায় দেড় গুণ ভারী।

২। ডিজেল ইঞ্জিনের মূল্য পেট্রোল ইঞ্জিনের চেয়ে বেশী।

৩। ডিজেল ইঞ্জিনে মেরামতি খরচ বেশী।

(খ) অর্থনৈতিক দিক থেকে পেট্রোলের ব্যবহার অপেক্ষা ডিজেলের ব্যবহার অধিক লাভজনক। ডিজেল দামে সস্তা। পেট্রোল এক গ্যালনের দাম টাকা ৩·০১ আর ডিজেলের দাম (হাই স্পীড) টাকা ২·২৩ (নূতন কর সমেত)

সুতরাং টেকনিক্যাল ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিচার করে অনায়াসেই বলা যায় যে, ব্যবহারিক ভাবে ডিজেল ইঞ্জিন পেট্রোল ইঞ্জিন অপেক্ষা অধিক লাভবান এবং সুবিধাজনক।

ভারতে যে তিনটি নূতন শোধনাগার এবং ডিগবয়ে যে ছোট শোধনাগার আছে সেগুলি হইতে মোট ডিজেল (হাই স্পীড) উৎপন্ন হচ্ছে ৬৭৪,০০০ টন (১৯৫৮ সনের হিসাব) কিন্তু ভারতের প্রয়োজন প্রায় ৯৫৫,০০০ টন। অর্থাৎ ভারতকে ২৮১,০০০ টন ডিজেল মধ্যপ্রাচ্য হতে প্রধানতঃ আমদানী করতে হয়। গৌহাটি (আসাম) এবং বারাউনি (বিহার) স্থানে যে দুটি শোধনাগার চালু হতে চলেছে সেখান থেকেও কিছু ডিজেল তৈল উৎপাদন হবে। ডিজেলের চাহিদা যে ভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে তাতে ১৯৬৩ সনে চাহিদা হবে প্রায় ২০ লক্ষ টন। ভারতের ঘাটতি পড়বে প্রায় ১০ লক্ষ টন।

ভারতে বর্ত্তমানে তৈলের চাহিদা প্রায় ৬০ লক্ষ টন (কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, লুব্রিকেটিং প্রভৃতির হিসাব)। চারটি শোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা ৪২·৬ লক্ষ টন অর্থাৎ ১৭·৪ লক্ষ টন ঘাটতি। ১৯৬৩-৫ সনে ভারতের চাহিদা হবে প্রায় ৮৫·৫০ লক্ষ টন কিন্তু ভারতে ঐ সময়ে উৎপাদন হবে কমবেশী ৭৫·১ লক্ষ টন। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কেরোসিন এবং ডিজেল তৈল শোধনাগারগুলিতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।

তৈল সম্পর্কে Empire of Oil পুস্তক হতে নিম্নলিখিত উক্তি উল্লেখযোগ্য :

"Petroleum is a certain arrangement of moleculus of hydrogen and carbon which are broken down, rearranged and set up again in different patherns in cracking plants. Crude oil was placed in a closed tank and boiled by heat from a furnace underneath. As the temperature rose, the lighter 'ends' began ascending as vapour naphtha, kerosene and gasolin. They were conducted through a tube into a condenser where they cooled, liquified and were drawn off. What was left was residual oil, sold for fuel oil and heavies sludges for asphalt, tar and coke."

ভারতের যা সত্যিকারের প্রয়োজন সেই ধরনের তৈল উৎপাদনের জন্য শোধনাগারগুলি রূপান্তরিত হওয়া উচিত। বিদেশী তৈল মালিকগণ যে সমস্ত শোধনাগার স্থাপন করেছে সেগুলি পরিপূর্ণ ভাবে জনসাধারণের প্রয়োজনে আসছে না। যাতে এই সমস্ত শোধনাগারগুলির ধরন পাল্টান সম্ভব হয় সেই বিষয়ে সরকারের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

ডিজেল তৈলের উপর আরও শুল্ক চাপিয়ে পেট্রোলের দামের সমান করলে সেই কর এই দরিদ্র জনসাধারণকেই বহন করতে হবে। কারণ ডিজেল তৈলের দাম বাড়লে যানবাহনের ভাড়া বাড়বে, ফলে পরোক্ষভাবে জনসাধারণকেই তা বহন করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ভারতের বর্ত্তমানে বিশেষ সমস্যা, ভারত যে তৈল আমদানী করে তার হিসাবে আমেরিকার মেক্সিকো গালফের চড়া দরে হয়। এর বদলে ভারত যদি পারস্য উপসাগরের তেলের দরে (যেখান থেকে আমাদের তৈল আসে) অপরিশ্রুত তৈল আমদানী করে এবং তাতে যে পরিশ্রুত তৈলের ঘাটতি পড়বে সেই তৈল যদি রুমানিয়া, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশ হতে আনা যায় (সেখানকার তৈলের দাম খোলা বাজার দরের চেয়ে সস্তা) তাহা হলে ভারতের প্রভূত বিদেশী মুদ্রায় সাশ্রয় হয়।
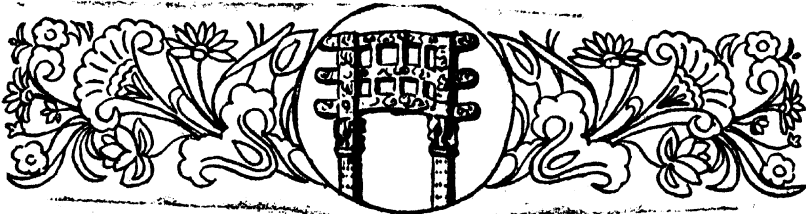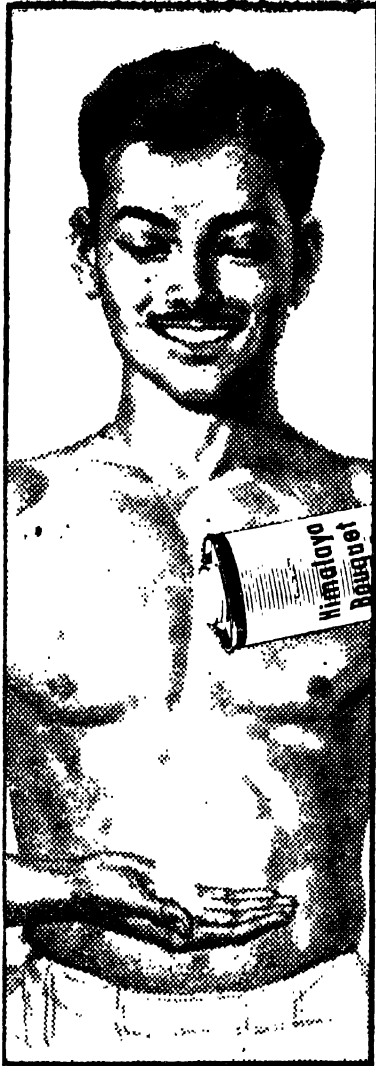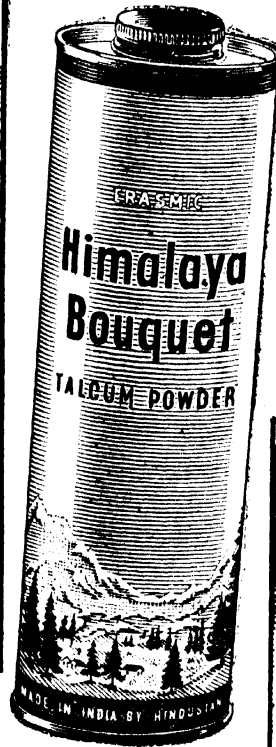
রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅদিতিনাথ রায়

নানাজনে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে দেখেছেন। অনেকের কাছে (মহাত্মা গান্ধীও এদের মধ্যে একজন) তিনি প্রথমত গুরুদেব। বহুলোক তাঁকে জানেন কবিগুরু হিসাবে। যাঁদের মধ্যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাটাই প্রধান তাঁরা কবির ভিতর দেখতে পান সত্য-দ্রষ্টা ঋষিকে, আদর্শ-চরিত্র দার্শনিককে। আবার কেউ কেউ কাছের মানুষও সম্পূর্ণ মানুষ রবিঠাকুরকে, শুধু রবিঠাকুর বলেই জানেন। অথচ এই রবিঠাকুর যে কে ও কেমন, তা তাঁরাও বুঝতে গিয়ে সব সূত্র হারিয়ে ফেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপরের যে নামগুলি, তার কোনটাই পোশাকী নয়। শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদনের মধ্যেই সেগুলি সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটির মধ্যেই কবির ব্যক্তিত্বের কোনও একটা পরিচয় লুকিয়ে আছে। প্রত্যেকটিরই তাৎপর্য্য আছে। গদ্যে, পদ্যে, গানে, কাজে-কর্ম্মে ও জীবনযাত্রার ধারায় কবির নানা রূপ আমরা দেখতে পাই। এই প্রত্যেকটি রূপই ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড রূপ হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তা হয় নি। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের বিরাটত্ব বোঝা যত সহজ, তাঁকে বোঝা তত সহজ নয়।

এ বিষয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। গত শতকে বাংলায় যে-ক'জন মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁরা নানাদিকে নানাভাবে কাজ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত একজন সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না, কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। এ ছাড়া, সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ ও মৌলিক রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যকে তিনি প্রথম সচল ও সরস করে তুলেছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে দান অসামান্য হয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধেও ওই একই কথা সত্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কোনও দিক বোধ হয় নেই, যেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। বাংলা গদ্যকে তিনি নূতন করে গড়ে তুলে, সেই গদ্যে যে রোমান্স ধর্ম্মী উপন্যাস রচনা করলেন, তাতে রোমান্টিক কল্পনার সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্য দিকে, সমালোচনা, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম-দর্শন, কোন বিষয়ই তার লেখায় বাদ পড়ল না। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনায় মধ্যেও তাঁর একটা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতির' এক জায়গায় লিখছেন, "অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় লুট করিয়া লইল।" আর যে হৃদয়গুলি লুট হ'ল, সেগুলিও তুচ্ছ ছিল না।

বাংলার আধুনিক এই দেড়শ' বছরের নূতন সাংস্কৃতিকে চারিদিক থেকে সম্পূর্ণ করে তুলতে এই বিরাট মানুষগুলি তাঁদের শক্তিকে নানাভাবে। নানাবিষয়ে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও নিশ্চয়ই এই প্রেরণা ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের বহুমুখিতায় সেও একটা কারণ।

এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনের সুদীর্ঘকালে দেশে বিভিন্ন ভাব-ধারণার স্রোত বহে গেছে, জীবনযাত্রার perspective বদলে গেছে, অন্তত তার রূপ ও গতির বিশেষ হের-ফের হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মেছিলেন, ও যে-যুগে তাঁর শৈশব ও যৌবনের মন-গঠনের দিনগুলি কেটেছিল, সে-যুগটা ছিল সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কারের যুগ। সে-সময়টা বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে বিরোধের চেয়ে, তারই আলোয় নিজেদের আত্মস্থ হবার সাধনাটাই প্রধান ছিল। বাহিরের আলোয় এ যেন নিজেকে নূতন করে চেনা। এর জন্য চাই চরিত্রের সুদৃঢ় গঠন ও কয়েকটি বিশেষ গুণের বিকাশ। সেই দিনের ব্যক্তি-চরিত্রে এই দৃঢ়তা ও বিশিষ্ট গুণগুলি দেখা যেত।

এর পরে এল, স্বাদেশিকতা ও দেশ-প্রেমের যুগ। 'নীল-দর্পণের' কাল থেকেই বিদেশী বণিকের লোভের বিরুদ্ধে প্রতিকারের দাবি জানান হয়েছিল। ক্রমে বিদেশীদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে দেশের লোকের স্বার্থের সংঘর্ষটা প্রবল হয়ে উঠল। এইটাই স্বাভাবিক।

সংস্কৃতির সাধনাটা একটা গোষ্ঠীর মধ্যে আবধ্য ছিল, কিন্তু স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে সাড়া জাগল। কাজের পটভূমিকা বিস্তৃত হ'ল ও গণদেবতা সেই পঠভূমিকায় একটা প্রধান স্থান জুড়ে বসল।

এই স্বাদেশিকতার যুগের মাঝামাঝি, দুই মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, যন্ত্রসভ্যতার বিকট রূপটা প্রকটিত হয়ে পড়ল। যে-বিজ্ঞান মাত্র কয়েক বছর আগে আমাদের মনে বিরাট আশার সঞ্চার করেছিল, তারই একটা অন্য রূপ আমরা দেখতে পেলাম।

মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের মধ্যেই ঘটেছিল। স্পর্শকাতর কবিহৃদয়ে তার কি রকম ছাপ পড়েছিল, এক যুগের সাধনালব্ধ আদর্শ অন্যান্য যুগের বিভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে কি ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল সেটা পরীক্ষা করে দেখবার বিষয়। রবিঠাকুরকে বুঝতে হলে, তাঁর চরিত্রের অদ্ভুত গতিশীলতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে হলে, কবি-দার্শনিককে ওই চলমান দৃশ্যপটের সামনে রেখে যাচাই করতে

হবে। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের আলোচনা করে দেখলে অবাক লাগে, যে ৮০ বছরের দেহ জীর্ণ হলেও, মনটা তখনও সজীব, সে যেন তখনও এগিয়ে যেতে পারে, সৃষ্টিতে তার যেন ক্লান্তি নেই। সে কোন সাধনা, যাকে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, যা তাঁকে বিভিন্ন কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার ভাব-ধারণার সঙ্গে সমন্বয় সৃষ্টি করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যুগিয়েছিল? মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' কবির জীবনের শেষ দিনগুলির বর্ণনা আছে। অথচ সেখানেও দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের কর্মের গতি কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। হাসি, গানে, কবিতা রচনায় ও ছবি আঁকার মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সেই দিনগুলি রবিঠাকুর বিলাসে, অলসতায় কাটান নি। তখনও নিজের সাধনার ক্ষেত্রে, তাঁর কাজের গতি অব্যাহত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে, যে পারিবারিক পরিবেশে ও আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেও সঠিক ধারণার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতিতে' এই পারিবারিক পরিবেশের উপরই খুব বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁর জীবনী থেকে বোঝা যায় যে, এই গণ্ডীর মধ্যেই তিনি বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিলেন, বাহিরের জীবনের স্পর্শ তিনি পারিবারিক একটা জালের ভিতর থেকে লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্র-জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে, এ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ যে সময় মানুষ হয়েছেন সে সময়টা ছিল পুরোমাত্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। অথচ, রবীন্দ্রনাথের উপর বঙ্কিমের প্রভাব প্রথম থেকেই খুব অল্প। এর কারণ বোধ হয় এই যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ঠাকুর পরিবারে উনিশ শতকের বাংলায় যে বিশেষ সাংস্কৃতিক ধারাটি গড়ে উঠেছিল, তা একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ, অন্যদিকে তেমনই স্বতন্ত্র। অতএব, রবিঠাকুরের পরিবার-আচ্ছন্ন দৃষ্টির কথা যা বলেছি, তার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ছিল না, ছিল একটা নূতন দৃষ্টির পার্থক্যবোধ।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ব্রাহ্ম-গোষ্ঠীভুক্ত ঠাকুর পরিবার তার পৃথক আচার-ব্যবহারের জন্য দেশের সাধারণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। রবিঠাকুর এই হিসাবে, বিশেষ একটা গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। একদিকে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য-বোধ, অন্যদিকে, এই অবরুদ্ধ ভাব, কবির মনে বিরোধের সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, কাজে-কর্মে, সকলের সঙ্গে মেলাবার জন্য যে একটা গভীর আবেগ দেখা যায়, তা এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে কাটিয়ে ওঠার তাগিদ বলেই মনে হয়।

ঠাকুর পরিবারের স্বতন্ত্র সাধনার কথা উপরে বলেছি। রবীন্দ্র-চরিত্র বুঝতে হলে, এই সাধনার বিশেষত্বটুকু কোথায় তা জানা চাই। সে সময়কার মনীষীদের মধ্যে ইতিহাসচর্চ্চার একটা সচেতন প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচর্চ্চার নমুনা থেকে তাঁদের সাধনার বিভিন্নতার পরিচয় কিছুটা পাওয়া যাবে। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে (বৌ-ঠাকুরাণীর হাট) ইতিহাসের যে ছায়া আছে, তার প্রেরণাটা মূলত ইতিহাস রচনার প্রেরণা নয়। সেই জন্য, রবীন্দ্রনাথের 'কথা'র কবিতাগুলিতে যাতে narrative ভঙ্গিতে, কবি ইতিহাস-কল্পনাকে নিয়ে একটা পরীক্ষায় নেমেছেন, তারই সঙ্গে বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুলনায় চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রকাশের মাধ্যমটার পার্থক্য, দু'জনার মনোভাবের বিভিন্নতাটাই এখানে প্রমাণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস দেখা যায়। অতীত সেখানে অতীত হিসাবেই বর্ত্তমানকে ধারণ করছে। অতীতের মধ্যে বর্ত্তমান একটা আশ্বাস খুঁজছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কথা'র কবিতাগুলির মধ্যে ইতিহাসের অবতারণা করেছেন, কতকগুলি শাশ্বত গুণকে ভিন্ন পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলবার জন্য, তার সিদ্ধির বিশেষ রূপটিকে নিজস্ব সাধনার ক্ষেত্রে ধরবার জন্য। সেই হিসাবে, ইতিহাস এখানে কোনও একটা কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়। বর্ত্তমানের ব্যক্তিগত-সাধনারই সে উপাদান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাস আমাদের বর্ত্তমানের ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করে তুলছে, রবীন্দ্রনাথের অতীত একটা নূতন ঐতিহ্য সাধনার উপাদান হয়েছে। এই দু'জনার ইতিহাস পাঠের রীতিটাই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের এই যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, তা একদিকে তাঁরই নিজস্ব। কারণ, ইতিহাস কল্পনার ভঙ্গিটুকু তাঁর নিজের, তাকে গতিশীল করে তোলার মধ্যে যে শক্তিটুকু আছে তাও আত্মলব্ধ। কিন্তু এই কল্পনা ও শক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছে, একটা বিশিষ্ট আদর্শের অভ্যাসের ফলে। এই আদর্শটাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পরিবারের জীবন ধারার সঙ্গে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে একটা লব্ধ ঐতিহ্যের বিকাশ নয়, একটা নূতন ঐতিহ্য গড়ার চেষ্টা দেখা যায়। একদিকে পশ্চিমের যুক্তি-প্রণোদিত কাজ ও অনুষ্ঠান, তার শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্বাধীন চরিত্র-বিকাশের সুযোগ ও সমষ্টিবদ্ধ কাজের মধ্যে শক্তির প্রকাশ তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। নিজের পরিবারের মধ্যে তাই তিনি নূতন আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন, আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ও একত্রে মিলে-মিশে সাধনা-উপাসনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। চরিত্র গঠনের এই সব বাস্তব পদ্ধতির পিছনে মানবতার দৃষ্টিটাই প্রধান। কিন্তু মহর্ষি স্ব-গুণ ঈশ্বর উপাসনার মধ্য দিয়ে এই মানবিক গুণের সাধনাকে একটা আধ্যাত্মিকতার সূত্রে গেঁথে দেবার চেষ্টা করে-ছিলেন। এর মধ্যে যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ আছে কালের বাধাকে অস্বীকার করে তাকেই তিনি বর্ত্তমান জীবনে সম্পূর্ণভাবে পেতে চেয়েছিলেন। এইটাই তাঁর নূতন ঐতিহ্য গড়ার সাধনা। অতীতকে এইভাবে বর্ত্তমানের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টার ফলেই, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন।

এর পরে কবির অন্তরের পরিচয়ের বিষয় এখানে কিছু কথা বলা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের যেটা অন্তরের পরিচয় তা কবি নিজেই "জীবন-স্মৃতিতে" সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবিধ জীবনে, একদিকে রয়েছে নানা বিষয়ের নিয়ম-নিষ্ঠ চর্চা। অন্যদিকে, তাঁর অন্তরকে বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তঃপুরের নারী-প্রকৃতি আকর্ষণ করেছে। ওই প্রকৃতির বিস্ময় তাঁকে জীবনের নূতন স্বাদ দিয়েছে ও তার সঙ্গে যোগ সৃষ্টি করবার জন্য তার মনটা ব্যগ্র হয়েছে। হৃদয়ের এই যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষার পরিচয়, তাকেই আমি কবির অন্তরের পরিচয় বলেছি।

ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কাজে-কর্ম্মে, উৎসব-অনুষ্ঠানে, শিক্ষা-দীক্ষায় আড়ম্বর-আয়োজনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষাটা জেগেছিল। এই বিশেষ কৃতির জন্যই তিনি তাঁর পরিবারের থেকেও স্বতন্ত্র। যতদিন তিনি এই সমস্ত কাজ-কর্ম্মের মধ্যেই নিজের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাটা না মেটাতে পেরেছেন, ততদিন তিনি নিজের মধ্যেই নিজে অনেকটা অবরুদ্ধ। "জীবন-স্মৃতি"তে এই অবরুদ্ধ অবস্থার বর্ণনা আছে। তখন বাহিরের জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগের অভাব। তখন 'কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে" কবির কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করছে।

একটা কথা বুঝতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাধনার সম্পূর্ণ সুযোগটুকু গ্রহণ করেছিলেন। পলায়নপর বৃত্তি তাঁর ছিল না। পরিবারে ও পরে জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নানা কাজের ডাকে সাড়া দিতে, সে বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই মানুষের সঙ্গে ও বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে যোগ সৃষ্টির নিবিড় কামনাটা মেটাতে পেরেছিলেন। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়", রবীন্দ্রনাথের জীবনের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য্য এই।

এই যে জীবন-সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্যহীন ঔৎসুক্য, একদিকে তাইতেই রবীন্দ্র-চরিত্রকে এত গতিশীল করেছে, তার মধ্যে অফুরন্ত কর্ম্ম-প্রেরণা জাগিয়ে রেখেছে। পারিবারিক জীবনে দেশী-বিদেশী ভাবের উদার গ্রহণের ফলে, দেবেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাধনার ফলে, নানা কাজের সুযোগ রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য যে চরিত্রের প্রয়োজন সেই চরিত্র গড়ার সাধনাই তাঁর পারিবারিক সাধনা। এই চারিত্রিক বলের জন্যই রবীন্দ্রনাথ জীবনে অনেক শোক-তাপ নীরবে সহ্য করতে পেরেছেন, শিক্ষা-কেন্দ্র গঠনের ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের গুরুভার বইতে পেরেছেন। বিভিন্ন সময়ে, দেশের ভিন্ন ভিন্ন কাজের ধারার সঙ্গে তিনি যোগ রেখে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম করবার ক্ষমতার কথা আগে বলেছি। যে যুবক বিদেশের অজানা ষ্টেশনে, গভীর শীতের রাত্রে ট্রেনের আশা ত্যাগ করে, স্পেন্সারের "Data of Ethics" নিয়ে বসতে পারে, তার মনের গঠনটা বোঝা শক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনায় কবির প্রকৃতির, তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটার কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এবং সেই জন্যই তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বরূপটা ধরা আমাদের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এই সব বিষয়েই জানা দরকার।

বাজার দরের সেকাল ও একাল

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল বেলায় বাজার থেকে ফিরে এসে ন্যায়বাগীশ মশায় ঘরের দুয়ার বন্ধ করে শয্যা গ্রহণ করলেন। রান্না শেষ হয়ে গেলে তাঁকে স্নানাদি সেরে আহারের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হ'ল। তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না। পরিবারের লোক উদ্বিগ্ন হয়ে দরজায় ঘা দিতে থাকলে তিনি ভিতর থেকে বলে উঠলেন, 'তোমরা আমায় ডাকছ কেন। আজ একদিন খেয়ে লাভ কি। এর পর ত না খেয়েই মরতে হবে।' ব্যাপার কি জানতে চাইলে তিনি উত্তর করলেন, 'বাজারে দেখে এলাম চালের দর প্রতি সেরে দু'কড়া বেড়ে গেছে। আর কি বাঁচতে পারব ?' এ কম-বেশি এক শ' বছর আগেকার বিক্রমপুরের ঘটনা। চালের মণ তখন ছিল এক টাকা থেকে দেড় টাকা। এর দু'শ' বছর আগে, শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে, ঢাকায় এক মণ চাল দু' আনায় বিকত বলে জনশ্রুতি চলে এসেছে। দু'শ' বছরে চালের দর দু' আনা থেকে দেড় টাকায় উঠেছিল। তার উপর মণপ্রতি এক আনা বৃদ্ধিতে ন্যায়বাগীশ মশায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও চালের এত কম দর সেকালে অসম্ভব ছিল না। সে যুগে ভূমিহীন লোক ছিল বিরল। অলস ও অক্ষম ছাড়া আর সবার খাদ্যশস্য জন্মিত নিজের ক্ষেতে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য বিক্রির বাজার না ছিল দেশে, না ছিল বিদেশে। যে সামগ্রীর চাহিদা নেই তা জলের দরে বিকাবে বইকি। তখন দর-বৃদ্ধির একমাত্র কারণ ছিল অজন্মা। অজন্মার ফলে শস্যাভাব ঘটলেও দর খুব বেশি চড়তে পারত না। জনসাধারণের মধ্যে অর্থের অভাব ছিল ব্যাপক। ক্রেতা না জুটলে পণ্যের দর বাড়িয়ে ত লাভ হয় না। বাড়তি দর একমাত্র ক্রেতার শক্তি দ্বারা সীমায়িত

দিনের পর দিন প্রতিদিন...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে
আরও সুন্দর করে
আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ
দেখবেন—আপনার ত্বক আরও নরম, আরও মোলায়েম
দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে
সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার
সরের মত ফেনা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে···রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা প্রো, লিঃ, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত
R.P. 158-X52 BG

থাকত। ক্রয়-শক্তির সীমা এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে দু-এক কড়াতেই তা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিত। ইংরেজ কোম্পানীর শাসন-ক্ষমতা লাভের পর অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটল। অসাধু অর্থলোলুপ ধনীর হাতে চলে গেল দেশের সব জমি। তাদের পীড়নে চাষের জমি পতিত পড়ে থাকত। ক্রমে গড়ে উঠতে লাগল ভূমিহীন কৃষকের দল। নীলকরেরা ধানী জমিতে জন্মাত নীল। বাংলার চাল বাইরে চালান সুরু হ'ল। এবার অজন্মা ছাড়া পণ্য-মূল্য বৃদ্ধির অন্যান্য কারণগুলি সক্রিয় হয়ে উঠল। এর পর থেকে ধান-চালের দর ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবসার ক্ষেত্রে আবির্ভাব হয়েছিল মজুতদার আর কালোবাজারীর। পুতুল-নাচের সুত্রধারের মত তাদের ইচ্ছায় এখন সব-কিছুর বাজার-দর নামা-ওঠা করে থাকে। জিনিসপত্রের দর আর স্বাভাবিক নিয়মের অধীন নয়। মানুষের দ্বারা এখন ইহার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অবস্থা স্থায়ী হবার পূর্ব্বে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল তার এক হিসাব পারিবারিক বাজার খরচের খাতা থেকে নিচে তুলে দেওয়া হ'ল। এ হিসাব বিক্রমপুরের। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর নগরধর্ম্মী পল্লী-অঞ্চল। সেখানে অকৃষি-জীবীর সংখ্যাধিক্য ছিল। বাহির থেকে অধিকাংশ জিনিস আসত বলে সাধারণ পল্লীর চেয়ে সেখানে দর থাকত কিছু বেশি। খন্দের সময় সব জিনিসের দর কম থাকে। অসময়ে দর বেড়ে যায়। ধান-চালের দর বাড়ে বর্ষায়। এখানে গড়-পড়তা দর দেবার চেষ্টা করা হ'ল। সকল জিনিসই বুঝতে হবে অতি উত্তম শ্রেণীর।

	পরিমাণ	১৩১০	১৩১১	১৩২৫	১৩৩০	১৩৩১	১৩৩২	১৩৩৬	১৩৪৬	১৩৪৭	১৩৫০	১৩৫১	১৩৫৪	১৩৫৫
বালাম চাল	১৲	৩৷৷৵০		৫৸৴১০					৪৷৷৵০		৩২৵০	১৫৷১০	৩৪৷৷০	৪২
ধান	১৲				৩৶১০				২৷০			১০৲	১৩৸০ (বোরো)	
আটা	৴১৷০								৵৫	৵১৫	৷৵৫	৷৵০		
ময়দা	৴১৷০								৵১২৷০	৶০				
ছোলার ডাল	৴১৷	৴১৫		৷৴১৫	৶১৫	৶৫			৵৭৷০	৶০		৷৶১০		
মুগ ডাল	৴১৷								৶০	৷৫				
মসুর ডাল	৴১৷	৵০					৶৭৷০		৵১৫	৶০	৷৶১০	১৲		
মটর ডাল	৴১৷								৵৫		৷৶১৫			
খেঁসারি ডাল	৴১৷	৴০				৵৫	৵১৫		৵২৷০		৷৵৫			
মাষকলায়	১৲			৫৷০			৫৷০				১০৷০			
মুগকলায়	১৲						১০৲		৫৲		১৩৷০			
আলু	১৲			২৵০	৪৲		৪৷০	৪৷৸০	৫৷০	২৸৶০	৬৷৵১০	৯৴০		
মিঠা আলু	১৲				২৷০				২৷০	৸৴০	৪৸৴০	১৷০		
গুড়	৴১৷	৶৫				৵১৫		৷৴১৫	৷০		১৲	৸১০		
চিনি	৴১৷	৷৫				৷৷৵০			৷৵০	৷৵১৫	৷৷১৫			
লবণ	৴১৷	৴১০							৴৭৷০			৷১০		
সরিষার তেল	৴১৷	৷৴১২৷৷						৷৷৴১৫	৷৷০		১৷৵১০	২৴১০		
নারিকেল তেল	৴১৷	৷৷৫							৷৴১৫	৷৵৫	১৷৷৴০			
ইলিশ মাছ	৴১	৵১৫						২৲		৷৵০				
ঝিঙে	৴১	৲১২৷৷							৲১০	৴০	৵১০			
পটল	৴১							৵১০	৴০	৴১৫				
হলুদ	৴১	৶০			১৲		৷১৫		৷৴১০	৷১০	১৴১০	৷৷০		
লঙ্কা	৴১			১৴০	৷৫		৷৷০		৷৴১০	৷৴০	৷৷৴১০			
নারিকেল	১৲ টাকায়		১৮			১৩		১০	১৬	১৩				
দুধ	৴১	৴০			৵০	৶০	৶১০		৴৫	৴১০	৷৴০	৷৴৫		৷৴১০
উত্তম দই	৴১		৵০					৷৵১৫						
ক্ষীর	৴১		৷৵০					১৲	৷৴০	৷৶৫				
ঘি	৴১		১৷৴০	২৴০			৩৵০	২৸০	১৸০	১৷৷০		১৷৵০		
রসগোল্লা	৴১								৷৴০	৷৴১০				
অমৃতি	৴১								৷৴১০	৷৷৵০				
খেজুরের রস	৴১								৲৭৷০					
কয়লা	১৲								৷৷১০					
কাঠ	১৲	৷৷৵০										১৵০		

উপরের হিসাবটি অসম্পূর্ণ হলেও প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাজার দরের গতি ও প্রকৃতি বুঝবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ১৩২৫ সনের বাজার দরে। ১৩৪৬ সনে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময় অবধি বাজার দর ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে চলেছিল। যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দরে বিপর্যয় দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল প্রধানতঃ ইউরোপের যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ হয়েছিল মিত্রপক্ষের প্রধান এক ঘাটি। মণিপুর ছাড়া ভারতের ভূমিতে যুদ্ধ হয় নি বটে কিন্তু যুদ্ধের সাজঘর হয়েছিল এ দেশ। সুতরাং তার ভাল-মন্দ সকল ফলই আমাদের ভোগ করতে হয়েছে। উপরের হিসাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহতার পরিচয় মিলে না। তার কারণ যে পরিবারের এ হিসাব সে পরিবার আগে থেকে খাদ্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। সে বছরের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে সরকার মজুত-খাদ্যের এক হিসাব করে। তাতে দেখা গেল, বিক্রমপুরের প্রধান চার বন্দরে পূর্ব্ব বৎসরের অর্দ্ধেক চাল মাত্র মজুত রয়েছে। এর পর লাফিয়ে লাফিয়ে চালের দর চড়ে খোলা বাজারে পঞ্চাশ টাকা আর কালো বাজারে আশী টাকা পর্য্যন্ত উঠেছিল। সরকারের নির্বুদ্ধিতা ও অযোগ্যতা, সামরিক প্রয়োজনের অগ্রাধিকার আর ব্যবসায়ীর নির্ম্মমতার ফলে দেশের যে দুর্দ্দশা ঘটেছিল তার মর্ম্মন্তুদ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উড কমিশনের রিপোর্টে। এখনও আমরা তারই জের টেনে চলেছি। যে পর্য্যায়ে দর উঠেছে তা স্থায়ী হবার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

জিনিসের দর কম ছিল বলেই সেকালের লোক সুখে ছিল এ কথা মনে করা ভুল। তখন জিনিসপত্র ছিল সুলভ কিন্তু টাকাকড়ি ছিল দুর্লভ। দিনমজুরের মজুরী ছিল চার আনা। এ দিয়ে তার পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হয়। দুধের সের দু'তিন পয়সা হলেও দুধ কেনার অর্থ ছিল অতি অল্প লোকের। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন যে,দেড় টাকা যখন চালের মণ তখন কোনও কোনও দিন তাঁকে মিঠে কুমড়া সিদ্ধ খেয়ে কাটাতে হ'ত। মানুষের সুখ ছিল না, ছিল সন্তোষ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এ সন্তোষকে বলেছেন Pig's Contentment বা শুয়োরের সন্তোষ। তা হোক, তবু জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের তাগিদে অর্থ সংগ্রহের ব্যস্ততা ভারতীয় আদর্শের বিরোধী। ক্রমে অর্থসঞ্চয় নেশায় পরিণত হয়ে যায়। দরিদ্র ছুটে চলে প্রথম লক্ষ সংগ্রহের আশায় আর লক্ষপতি খেটে মরে দ্বিতীয় লক্ষের সন্ধানে। টাকার ছড়াছড়ি যত বেড়ে চলে জিনিসপত্রের দর সে হারে বাড়তে বাধ্য। ন্যায়ধর্ম্মবিবর্জ্জিত এ টাকার খেলায় যারা যোগ দিতে পারে না তারা নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে চড়া দরের চাপে।

ঐতিহাসিক শিরোমণি ডঃ যদুনাথ সরকার

শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায় চৌধুরী

প্রদীপের নির্ব্বাণ কখনও হবেই। ভারতের সর্ব্বজনসম্মত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় সুদীর্ঘ ষাট বৎসরেরও অধিককাল তাঁর জ্ঞানসম্ভার বিতরণ করে জগতে এক আশ্চর্য্য আদর্শ সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর দীর্ঘ উন্নত দেহ, বিস্তৃত ললাট, উজ্জ্বল ও আয়ত চক্ষু, উন্নতভঙ্গি ও সর্ব্বোপরি বাক্‌সংযম তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পরিচয়, তাঁর রচনাবলীর মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অনাবশ্যক ভাবপ্রবণতা, বাক্যাড়ম্বরতা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা অথবা অসঙ্গত কল্পনার স্থান ছিল না। মিথ্যা দাম্ভিকতা বা জল্পনায় সময় নষ্ট করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। ঐতিহাসিক বিচারে যদুনাথের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণভঙ্গি নির্ভীক ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার ও রচনাবলী তাঁকে একাধারে পরম বাস্তববাদী অথচ জ্ঞানযোগী হিসাবে পৃথিবীতে পরিচিত করে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি কাজের যে আদর্শ ও মান রেখে ছিলেন তা বর্ত্তমানকালের অগভীর জ্ঞানচর্চ্চা ও গবেষণার অনেক উর্দ্ধে। ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানপদ্ধতিতে ইতিহাস রচনায় আদর্শ পথ-প্রদর্শক তিনিই।

যদুনাথ চিরদিনই জ্ঞানভিক্ষুক বিদ্যার্থী ছিলেন। পুস্তক এবং পুরাতন ও মূল দলিলপত্র তাঁর বড় প্রিয় ছিল। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল যাবৎ কে তাঁর মত একই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে পেরেছেন, যেমন তিনি ঔরঙ্গজীবের বিষয় নিয়ে করেছিলেন? অথচ তাঁর এই অদ্ভুত গবেষণাস্পৃহা তাঁর অন্তরের সত্যকার মানুষটিকে নষ্ট করে ফেলে নি, বরং দেশের ভবিষ্যৎধারা বিশ্লেষণ করবার অন্তদৃষ্টি তাঁর এরই মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। তাঁর ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের বৈশিষ্ট্য ছিল। বিস্মৃতির অতল গহ্বর হতে কেবল অস্থি সংগ্রহ করে এক কঙ্কালের আকারে পরিণত করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। তাতে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করতেন। দৈবজ্ঞের মতই তিনি পুরাতন ইতিহাসের ভিতর দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎকেও অনুধাবন করতে পারতেন। যাঁরা তার ঔরঙ্গজীব অথবা শিবাজীর বিষয়ে লিখিত রচনাবলী বিশেষ ভাবে পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, কেন তিনি ইদানীং গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রায় অধিকাংশ সময় মৌন থেকেছেন এবং সময়ে সময়ে ভারতের গতি-বিধি ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে দৈবজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছেন।

কোন্ উপায়ে তিনি আজ গৌরবের এত উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন? ঐতিহাসিক গবেষণার জন্যে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে পুস্তক, পুরাতন মূল দলিলপত্র ও আলোকচিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে এবং অনুরাগী ছাত্রগণের শিক্ষা ও বিকাশের জন্য অকুণ্ঠভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গেছেন। মুসলীম যুগের ভারতবর্ষকে যথার্থরূপে চেনবার জন্য তিনি পারসিক ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং শিবাজীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে মারাঠী ও অন্যান্য ভাষা শিখতে হয়েছিল। গবেষণার জন্য তাঁকে নানা উৎস হতে কাগজপত্র, দলিল সংগ্রহ করিতে হয়েছিল। প্রকৃত জহুরী যে-ভাবে অলঙ্কার যাচাই করে, সে-ভাবে তিনিও দোষ-গুণ বিচার করে দেখতেন এবং কৃত্রিম দলিলপত্র অবহেলার সহিত অগ্রাহ্য করতেন। ঔরঙ্গজীব ও শিবাজীর সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্যের অনুসন্ধানে তাঁকে ইংরাজী, পর্তুগীজ, ফরাসী, ফ্রেঞ্চ, পারসিক, সংস্কৃত ও মারাঠী ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক, চিঠি ও হস্তলিখিত নথিপত্র দেখতে হয়েছিল। এই বিষয়ে তাঁর পুস্তক-বিবরণী পড়ে চমৎকৃত হতে হয়। গত পূর্ব্ব বৎসর যখন তাঁর সঙ্গে আমার সর্ব্বশেষ সাক্ষাৎ হয় তখন, তিনি এই প্রসঙ্গে বেশ একটু তিক্ততার সঙ্গেই মন্তব্য করেছিলেন যে, গবেষণার মূল উৎস বিষয়ে ভাষাজ্ঞান না থাকলেও অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হতে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়াতে কিছুমাত্র দ্বিধা করা হয় না।

তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ রচনার মধ্যে ঔরঙ্গজীব (পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত), "ষ্টাডিজ অব মুঘল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এণ্ড মুঘল ইণ্ডিয়া," "ফল অব দি মুঘল এম্পায়ার" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে যে-কোন একটি গ্রন্থই লেখককে চির দিন স্মরণীয় করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ঐতিহাসিক গবেষণা ভিন্ন স্যার যদুনাথ সাহিত্য জগতেও একজন বিশিষ্ট সমালোচক ছিলেন। বাংলা ভাষাতেও তিনি একজন প্রতিভা-শালী লেখক ছিলেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তিনি বরাবরই উৎসাহের সঙ্গে সক্রিয় ভাগ গ্রহণ করে এসেছেন। বর্ত্তমান যুগের অনেকেই হয়ত জানেন না যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "গীতাঞ্জলী" রচনার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করার বহু পূর্ব্বেই স্যার যদুনাথ কবির বহু রচনার ইংরেজী অনুবাদ করে জগতের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন।

গত আটত্রিশ বৎসরের কত স্মৃতিই আজ মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে। খুব কমসংখ্যক লোকেই তাঁহার বাহিরের রুক্ষ আবরণে আবৃত স্নিগ্ধ মনটির পরিচয় পেয়েছেন। বাহ্যতঃ তিনি অতি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কেউ তাঁর মূল্যবান সময় অযথা বিনষ্ট করবার প্রচেষ্টা করলে তাঁর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। তবু তাঁর অন্তরের স্নেহ, স্নিগ্ধতা ও মহত্বের যেন কোন সীমাও ছিল না।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একবার তিনি একজন ছাত্রকে

বৎসরাধিক কাল আপন পরিবারেরই একজন হিসাবে নিজ গৃহে রাখার পরও তাকে গ্রীষ্মাবকাশের পর আবার সেখানে ফিরে আসতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ তিনি বলেছিলেন যে, ছাত্রটির গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার মত কোন যোগ্যতাই নেই। অথচ নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকাও তিনি সেই ছাত্রটিকে দিয়েছিলেন যাতে তাকে কোনও রকম আর্থিক অসুবিধায় পড়তে না হয়। যদি কখনও কোন ছাত্র বা বান্ধবকে তিনি একবার পছন্দ করতেন, তাঁর গৃহ তাদের কাছে আপন গৃহের সমান হয়ে যেত। যখন তিনি কটক ও পাটনায় থাকতেন, তখন তাঁর গৃহে সব সময়েই অন্ততঃ পাঁচ-ছয়জন ছাত্র তাঁরই পরিবারভুক্ত হয়ে বিদ্যাচর্চ্চা করত। বিশেষতঃ খাওয়ার সময় তিনি পারিবারিক কর্ত্তার মতই তাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তখন কিন্তু তাঁর কোন রকম গাম্ভীর্য্য থাকত না। যদি কখনও তিনি দুর্ব্বোধ্য ও উদাসীন হয়ে পড়েছেন, তা কেবল তাঁর আপন কাজে অত্যধিক তন্ময়তা অথবা পারিবারিক কোন মর্ম্মন্তুদ শোকের কারণেই—যা তাঁকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহুবারই পেতে হয়েছে। তাঁর মত মহৎজনকেও জীবনে বহুবার পারিবারিক শোক বহন করতে হয়েছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এমনই এক মর্ম্মান্তিক শোকপ্রদ ঘটনার পরই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেই শোকের মধ্যেও তিনি ঠিক আগের মত আন্তরিকতা ও স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং নানা আলাপ-আলোচনা এমনভাবে করেন যে, তাঁর শোক সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করার সুযোগই আমি পাই নি। তাঁর ব্যক্তিগত বিপদের কোন আভাস অপরকে দিতে ভালবাসতেন না। তাঁর আপন দুঃখ যত বেশী গভীর হ'ত, ততই তাঁর কাজের একাগ্রতা বেড়ে যেত। দুঃখ তাঁর পক্ষপাতশূন্য গবেষণা ও জ্ঞানচর্চ্চার উদ্যম এনে দিত এবং সময়বিশেষে তিনি আপনাকে সরিয়ে এনে নিস্পৃহ ভাবে থাকা পছন্দ করতেন। তাঁর এই নির্ব্বাক নিস্পৃহতা তাঁর স্নেহের গভীরতার সাক্ষাৎ দিত। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহুবারই কাল-বৈশাখীর ঝড় নেমে এসেছে—কিন্তু তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে তা সহ্য করেছেন। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন যে, এই নির্ম্মম নিদারুণ দুঃখের বোঝা বহনে তাঁকে কতখানি ত্যাগ সহ্য করতে হয়েছে।

বিহারে তিনি বহু বৎসর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। "বিহার রিসার্চ্চ সোসাইটি", "পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সুহৃদ পরিষদ" এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর মত ব্যক্তি অধুনা বিরল এ কথা গুণী-সমাজ একবাক্যে স্বীকার করবেন। যে ছাঁচে তিনি গড়া তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে ছাঁচ কি নষ্ট হয়ে গেছে ?

প্রদীপ আজ নিভেছে। যাঁদের মানসিক উৎকর্ষতা আছে, তাঁরা চিরদিনই মূল উৎস থেকে নূতন সৃষ্টি করে যেতে পারবেন, স্যার যদুনাথের রচনাবলী তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মনের শূন্যতা কোনদিনই ঘুচবে না। তাঁর দুর্ব্বোধ্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অপরকে বহু সময়ে সন্ত্রস্ত করেছে কিন্তু যাঁরা তাঁর স্নেহভাজন ছিলেন তাঁদের নয়। সাঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কটকের র‍্যাভেনস কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর উচ্চ শিক্ষার্থে পাটনা না এলে হয়ত তাঁর মহৎ অন্তরের পরিচয় আমি কোনদিনই পেতাম না। আমি তাঁর শত-সহস্র শিষ্যের অন্যতম ছিলাম। তাঁর গৃহে কিছুদিন থাকার পর আমি কোন ছাত্রাবাসে চলে যেতে চেয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গের আভাসমাত্র পেয়ে তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন আমি কোনও অসুবিধার মধ্যে আছি কি না। এইখানেই সেই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে, আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁরই পরিবারভুক্ত হয়ে থেকে যেতে হয়েছিল।

সত্যকার মানুষ হিসাবে স্যার যদুনাথের এই হ'ল যথার্থ পরিচয়।

সত্যনারায়ণের পালাগান

শ্রীতুলসীদাস সিংহ

আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সত্যনারায়ণই হলেন এমন এক দেবতা যিনি জাত নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন না। ব্রাহ্মণ, শুদ্র, বাউরী, বাগ্দী, ডোম, দুলে প্রত্যেকের বাড়ীতেই ইনি থাকতে পারেন এবং প্রত্যেকের হাতেই পূজা নিতে পারেন। আবার শুধু হিন্দু কেন মুসলমানের বাড়ীতে উঠতেও ইনি আপত্তি করেন না। সত্যপীর সত্যনারায়ণ একই বস্তু।

অবশ্য আমি এক্ষেত্রে যে সত্যনারায়ণকে নিয়ে টানাটানি করছি ইনি সত্যপীর নন—সত্যনারায়ণই; তবে নিম্নবর্ণের হিন্দুবাড়ীর বাসিন্দা। হিন্দুর মধ্যে ডোম বলে যে একটি সম্প্রদায় আছে—বাঁশের তৈরী জিনিস বিক্রী করে, পালা-পার্ব্বণ, বিয়ে-সাদিতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে যারা দিন চালায় তাদের মধ্যে যে সত্যনারায়ণকে পূজা পেতে দেখেছি আমি সেই সত্যনারায়ণের কথাই বলছি।

পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় আমাদের বাড়ীতে যে সত্যনারায়ণের পূজা হয় তাতে পূজারী থাকেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তিনি এসে আমাদের বাড়ীর তুলসীতলায় ঘটস্থাপন করে সত্যনারায়ণকে আবাহন করেন, পূজা করেন এবং পূজা শেষে পাঁচালী পাঠ করেন। ডোমদের সত্য-নারায়ণের পূজারী ডোমরাই এবং এরা ঘট নয় সত্যনারায়ণের এক-প্রকার বিশেষ বিগ্রহ স্থাপনা করে পূজা করে। আমাদের বাড়ীর সত্যনারায়ণ মাসে একবার ছাড়া খেতে পান না—এদের সত্য-নারায়ণ নিত্যসেবা পান। অবশ্য জমকালো রকম সেবা বলতে যা বোঝায় তা ভক্তের বাড়ীতেই মিলে। পূজাশেষে আমাদের পুরোহিত করেন পাঁচালীপাঠ—ডোম পুরোহিত করেন দল সহ পালাগান। আমাদের পুরোহিতরা জানেন কবে আমাদের বাড়ীতে এসে সত্যনারায়ণের পূজা করতে হবে, পূজার কথা আমরা ভুললেও তাঁরা ভুলেন না। কিন্তু ডোম-পুরোহিতরা খবর বা আমন্ত্রণ না পেলে আপনা থেকে কারও বাড়ীতে যায় না। আর ডোমদের সত্যনারায়ণকে বাড়ীতে আনতে গেলে খরচ একটু বেশী হয় বলে আমরাও কেউ তাকে সহসা ডাকতে যাই না। তবে বিপদে পড়লে সবই করতে হয়। এই ধরুন আপনার মেয়েটা কি ছেলেটা হঠাৎ বড়রকম কোন অসুখে পড়ে গেল, আপনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তার পর ডাক্তার-বদ্যি পর্য্যন্ত যখন হার মেনে গেল তখন আপনি চোখ বুজে সত্যনারায়ণকে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন। হে প্রভু! ছেলেটাকে ভাল করে দাও, আমি তোমাকে সিন্নীভোগ দিব, তোমার পালাগান করাব। সত্যনারায়ণ স্বকানে শুনলেন আপনার কথাটা; আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেল। ব্যস, এবার আপনি আপনার কথা রাখুন—সত্যনারায়ণের পালা-গান করিয়ে মানসিক শোধ করুন।

অন্যান্য অঞ্চলে সত্যনারায়ণের পালাগান কাহারা করেন জানি না—আমি যে-অঞ্চলের কথা বলছি সে-অঞ্চলে এ-কাজটি ডোম-পুরোহিতদেরই একচেটিয়া। পালাগান করানোর মানসিক থাকলে এখানের লোকরা ডোম-পুরোহিতকেই গিয়ে ধরেন। পারিশ্রমিক একটা কিছু ঠিক হয় এবং দিনও ধার্য্য করে নেওয়া হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে ডোম-পুরোহিত সত্যনারায়ণকে কাঁধে নিয়ে দল সহ ভক্তের বাড়ীতে উপস্থিত হন। একটি দলে থাকে মূলগায়েন সহ সাধারণতঃ পাঁচ থেকে আট জন লোক। একটি পালাগান গাওয়াতে গেলে পারিশ্রমিক লাগে পাঁচ থেকে আট টাকা, আর দলের সকলের এক বেলাকার খোরাক। খোরাকটা অধিকাংশ সময় কাঁচা অবস্থাতেই নেয় এরা, অর্থাৎ চাল, ডাল, তেল, নুন, তরিতরকারী পরিমাণমত দিয়ে দিলেই আপনি খালাস। ওর এর পর কাঁচাকে যেভাবে খুশী পাকা করে নেবে। এই কাঁচা অবস্থায় খোরাক দেওয়ার নামই হ'ল 'সিধে' দেওয়া। স্বয়ং সত্যনারায়ণের সিধেটিও ত পাকা নয়—কাঁচা। মূলতঃ কাঁচাসিন্নী তৎসহ কলাপাকা, পাটালী, বাতাসা, আতপচাল, পান-সুপারী, লং-এলাচ।

সিধে দেওয়ার পর যাদের বাড়ীতে গান হবে তারা গোটা গাঁয়ের বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকে বলে আসবে, 'আজ আমাদের বাড়ীতে নারায়ণের গান হবে—শুনতে যাবেন'। এ হ'ল নিয়ম।

পালা আরম্ভ হওয়ার আগে সত্যনারায়ণের বিশেষ বিগ্রহটিকে তুলসীমঞ্চের গোড়ায় খাড়া করে দিয়ে ডোম-পুরোহিত পূজা করতে বসেন। পালাগানের যিনি মূলগায়েন তিনিই হলেন পুরোহিত। মূলগায়েন বা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ঠাকুরের ইচ্ছাতেই একজন মূলগায়েন গেলে আর একজন হয়ে যাবে, আগে থাকতে কাউকে ঠিক করতে হয় না সেজন্য। অর্থাৎ সত্যনারায়ণ যাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন তিনিই মূলগায়েন তথা পুরোহিত হন। দেখলাম এ সত্যনারায়ণটি লোকের কাছে মুখ দেখান না। সর্ব্বদা ঢাকাঢুকি অবস্থায় থাকেন। হাত আড়াইয়েক লম্বা একটা লাউকে যদি লাল শালু দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায় তা হলে যা দাঁড়ায় তাই হ'ল এই সত্যনারায়ণ। পুরুতমশাইকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কাপড়ের তলায় কোন মূর্ত্তি আছে কিনা; পুরুতমশাই বললেন, মূর্ত্তি কিছু নেই এবং এটি খুলে দেখাবারও নিয়ম নেই। তবে বিশেষ ধরাধরি করায় জানা গেল ভিতরে লোহার শিকের মত একটা শিক আছে, শিকের ডগাটা সাপের ফণার মত বাঁকানো, কোন কোন শিকের মাথাটা ঘোড়ার মুখের মত।

পূজা শেষ হওয়ার পর পালা আরম্ভ হবে। পালা এদের

চারটি আছে। তাদের মধ্যে যেটি বিখ্যাত সেটি হ'ল "নিমাইচাঁদের পালা"। বক্তব্যাংশ পনের মিনিটের মধ্যেই বলে দেওয়া যায় কিন্তু এরা এই পনের মিনিটের বক্তব্যটুকুর সঙ্গে নাচ-গান-হাসি-ভণিতা ইত্যাদি জুড়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। দলে একগাদা লোক থাকলেও পালাটাকে জমান আসলে দু'জনেই। তার এক জন হলেন মূলগায়েন, অন্য জন প্রধান নায়ক। দলসুদ্ধ সকলে মিলে প্রথমে বন্দনা গাইলেন। বন্দনা শেষ হলে পর হাতে একটা চামর নিয়ে মূলগায়েন এবার উঠে দাঁড়ালেন। সহযোগী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রথমে তিনি শ্লোক গাইতে লাগলেন, জুড়ীরা পিছনে পিছনে জোড়ন দিতে লাগল। খানিকক্ষণ এই ভাবে চলার পর জুড়ীরা থেমে গেল, মূলগায়েন এতক্ষণের বলা শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। মৌখিক ব্যাখ্যা শেষ হলে পর আরম্ভ হ'ল উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা। আর এই উদাহরণই হ'ল পালাটির এক একটি দৃশ্য। প্রতিটি দৃশ্য শেষে আবার শ্লোক গান হবে, ব্যাখ্যা হবে। সত্যনারায়ণের পালা গানের এইটি হ'ল বিশেষ ঢঙ। এই বিশেষ ঢঙটুকুর জন্যই পালাগান বলতে আমরা যা বুঝি তা থেকে এ আলাদা হয়ে যায়।

মৌখিক ব্যাখ্যা শেষে উঠে দাঁড়ায় নায়ক, মাত্র দু'একজন সহযোগীর সাহায্যেই গোটা পালাটাকে এ একাই জমিয়ে তোলে। এদের নায়ককে হতে হয় হাস্যরস পরিবেশনে দক্ষ।

আমি এদের বিখ্যাত নিমাইচাঁদের পালাটি ঠিক যেমনটি শুনেছি তেমনটিই সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি—এ থেকে আপনারা দেখবেন এদের পালাগুলি কি ভাবে দর্শকদের আনন্দ দেয়। নিমাইচাঁদের পালার বিষয়বস্তু সেই একই সত্যনারায়ণের মহিমা কীর্তন। নারায়ণের কৃপা পেলে অতি দীনও যে অতি ধনী হতে পারে তারই উদাহরণ দেওয়া আছে পালাটির মধ্যে।

নিমাইচাঁদ কাঠুরের ছেলে। কাঠুরের ঘরে অভাব-অনটন নিত্য লেগে থাকে। বনে গিয়ে কাঠ কেটে সেই কাঠ বিক্রী করে যৎসামান্য যা মিলে তাই দিয়ে নিমাইদের দিন কাটে। নিমাইয়ের বাবা নেই—মা আছে এবং সে মায়ের একমাত্র ছেলে। সকাল হলে রোজ কুড়ুল কাঁধে বনে যায় সে—এক বোঝা কাঠ হলে কাঠ-বোঝাটি মাথায় নিয়ে হাটে বিক্রী করতে যায়, বিক্রী হলে যা পায় তা এনে মায়ের হাতে দিলে পর মা চাল-ডাল কিনে রান্না চড়ায়। রোজ যা আনে রোজই তা শেষ হয়ে যায় বলে নিমাইকে রোজই বনে যেতে হয়। এক দিন হ'ল কি, রাত্রে স্বপ্ন দেখলে নিমাই তাকে যেন বাঘে ধরেছে। সকাল হলে সে জেদ ধরে বসল, কোন মতেই বনে যাবে না। মা বোঝালে, বনে না গেলে খাবে কি—উপোস দিতে হবে যে। স্বপ্নে অমন অনেক কিছুই দেখায়, স্বপ্ন সত্যি হয় না কখনও।

নিমাইচাঁদ কিন্তু জিদ ছাড়ে না, আমি স্বচক্ষে দেখলাম একপাল বাঘ আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আজকের দিনটি বরং উপোস থাক—কাল তখন যাব।

মা যত বলে, তা আবার কখনও হয়, নিমাই তত বলে, জেনে-শুনে আমি বাঘের মুখে নিজেকে দিতে পারব না। শেষটায় নিমাই-ই যুক্তি দিলে মাকে, আমার মাসী আমাকে খুব ভালবাসে, আমাকে দেখতে না পেলে নিমাই নিমাই বলে আকুল হয়—তুমি বরং তার কাছে যাও, স্বপ্নের কথাটা বলে আজকের মত তার কাছ থেকে এক সের চাল ধার করে আন।

ছেলের যুক্তি শুনে মা নিমাইচাঁদের মাসীর কাছেই গেল। গিয়ে বললে সব, বলা শেষে চাল ধারের কথাটা পাড়তেই মাসী জবাব দিল, ধারটার দিতে পারব না আমি। আর নিমাইয়ের রোজগার ত রোজ এক সের চাল। এক সের চাল যদি দেওয়াই যায় তা হলে এক দিনে এক সের সে শুধবে কেমন করে। যে দিন শুধবে সে দিন ত উপোস দিতে হবে আর এক দিন যখন উপোস দিতেই হবে তখন আজই সে উপোসটা করুক না কেন।

নিমাইয়ের মা বললে, এক দিনে এক সের না দিয়ে এক পোয়া এক পোয়া হিসাবে চার দিনে শোধ করলেও ত চলবে। তাতে পুরো উপোস পড়ল না, অথচ ধার শোধও হয়ে গেল। তুমি চাল এক সের দাও—পোয়া পোয়া করে চার দিনে শোধ করে দেব।

নিমাইয়ের মাসী উত্তরে বললে, মহাজনরা যদি কাউকে একটি টাকা ধার দেয় তবে নেওয়ার সময় আজ দু আনা, কাল চার আনা, পরশু পাঁচ আনা করে নেয়—না এক সঙ্গে নেয়? গোটা দিয়ে খুচরা খুচরা নিতে পারব না আমি। অর্থাৎ নিমাইচাঁদের মাসী পরিষ্কার জবাব দিয়ে বসল নিমাইকে বাঘেই খাক আর ভাল্লুকেই খাক চাল ধার দিতে সে পারবে না।

তা শুনে নিমাই যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। মাসী তা হলে তাকে লোক দেখানো ভালবাসে, আমাকে দেখতে না পেলে কেঁদে কেঁদে মরে এ তার ধাপ্পা। নিমাইচাঁদ বুঝলে দুনিয়ায় কেউ কাউকে বিপদের সময় দেখে না। মুখে যা বলে তা ঐ মুখের কথাই। কিন্তু তবুও সে বনে যেতে চাইল না। মাকে বললে, একেবারে প্রাণে মরার চাইতে এক দিন উপোস দিয়ে থাকা ঢের ভাল, সুতরাং উপোস দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যাক আজকের দিনটা।

নিমাই আর নিমাইয়ের মায়ের এই কথার মাঝখানে হঠাৎ একজনের আবির্ভাব হ'ল, সব কথা শুনে তিনি বললেন নিমাইকে, এক কাজ করলে বনে যাওয়াও হবে—বাঘেও খাবে না। নারায়ণের নাম করে যদি তুমি বনে যাও তা হলে বাঘের বাবার ক্ষমতা নেই তোমার কাছে ঘেঁষে।

নারায়ণের মহিমার কথা বেশ কিছুক্ষণ ধরে শোনার পর নিমাই শেষে বনে যেতে রাজী হ'ল। কাঁধে কুড়ুল নিয়ে নারায়ণ নারায়ণ বলে বেরিয়ে পড়ল সে।

বনে ঢুকে কাঠ কাটছে নিমাইচাঁদ, কিন্তু মনটা তার পড়ে আছে বাঘের দিকেই। একটা কিছু খড়্খড় করে উঠতেই সে লাফিয়ে উঠে, এই বুঝি তাকে বাঘে ধরলে। প্রায় এক বোঝা কাঠ হয়ে এসেছে এমন সময় ঝোপের ভিতর থেকে পায়ের শব্দ উঠতেই

নিমাইচাঁদ বাবারে—গেছিরে বলে কাঁপতে আরম্ভ করলে। চীৎকার করতে যায় কিন্তু রা সরে না—বাঘের পরিবর্তে একটানা বাপ বাপ শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল মুখ দিয়ে। ঝোপের ভিতর থেকে পায়ের শব্দ সত্যি সত্যিই এসেছিল কিন্তু সেটা বাঘের পায়ের শব্দ নয়—মানুষের পায়ের শব্দ। সে মানুষটি নিমাইয়ের কাছে এসে নিমাইকে কাঁপতে দেখে আর তার মুখ দিয়ে এক টানা বাপ বাপ শব্দ বেরিয়ে আসতে দেখে বুঝে নিলেন, নিমাইয়ের বাঘা-ভেল্কী লেগেছে।

এ লোকটি হলেন সেই লোকটি যিনি সকালে সত্যনারায়ণের মহিমার কথা শুনিয়ে নিমাইচাঁদকে বনে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি যত বলেন বাঘ কোথাও নেই, তুমি ঝোপকে বাঘ ভেবে নিয়েছ—নিমাই তত বাপ বাপ করে কাঁপতে থাকে। লোকটি এবার নিমাইয়ের পিঠে আচ্ছা রকম গোটাকয়েক কিল বসিয়ে দিতেই নিমাইয়ের চৈতন্য হ'ল। চৈতন্য ফিরেছে দেখে লোকটি নিমাইকে বললেন, কেন এতক্ষণ বাপ বাপ করে কাঁপছিলে বল দেখি?

নিমাই বলল, এক পাল বাঘে আমাকে আগলে ছিল।

—বাঘ কখনও একপাল থাকে নাকি—যত সব গাঁজাখুরী তোমার।

—তবে এক পাল নয়, একশো।

—একশ'ও কখনও এক সঙ্গে থাকে না।

—তবে পঞ্চাশ।

—পঞ্চাশও নয়।

—তবে পঁচিশটি। হেই দেখ মাইরি আর কমিও না।

—না, পঁচিশটিও নয়।

—তবে ঠিক বলছি—আড়াইটি বাঘ আমি দেখেছি, আড়াইটি বাঘে আমাকে আগলে ছিল।

—বাঘ আবার কখনও আড়াইটি হয় নাকি?

—খুব হয়। বাঘ একটি, বাঘিনী একটি, আর তাদের বাচ্চাটি আধটি। আড়াইটি হ'ল না?

—তা আড়াইটি বাঘে যদি তোমাকে আগলে ছিল ত তুমি বেঁচে আছ কি করে?

নিমাইচাঁদ এবার বীরের মত বুক ফুলিয়ে বললে, বাঘ যখন এসে এক থাবা বসালে তখন বেটাকে ধরে ঝেঁকে দিলাম—ধপাস করে পড়েই বেটা চিৎপটাং হ'ল। বাঘকে মরতে দেখে বাঘিনী যখন এগিয়ে এল তখন সেটাকে করলাম কি, লেজটা ধরে পাক পাঁচ-ছয় ঘুরিয়ে ছুড়ে দিলাম—ব্যস, পড়ল আর মরল। শেষে যখন বাচ্চাটা ফোঁস ফোঁস করে এগিয়ে এল তখন বাচ্চাটাকে পেড়ে তার পেটটাকে দুটো হাঁটু দিয়ে ফটাস করে ফুটিয়ে দিলাম।

—তা তুমি যদি অত বীর তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাপ বাপ করছিলে কেন?

—তা কে জানে, মনে হয় কোন রকম হাওয়া পেয়ে গেছল।

—সব তোমার ধাপ্পা নিমাইচাঁদ, সব ধাপ্পা। নারায়ণের নাম করে বনে এলে কাউকে কোন দিন বাঘে ধরে না।

—তাই ত দেখলাম।

তার পর কথায় কথায় লোকটি নিমাইচাঁদকে বললেন, তোমার ভারী কষ্ট নিমাইচাঁদ, নারায়ণের উপর তুমি যদি ভক্তি রাখ তা হলে তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। ফল ত হাতে হাতেই দেখলে।

—মুখে অমন অনেক কথাই বলা যায়। মুখের কথায় বিশ্বাস করি না আমি। নারায়ণের উপর যদি আমি ভক্তি রাখি তা হলে নারায়ণ আজকেই বড়লোক করে দিতে পারবেন?

লোকটি বললেন, আচ্ছা তাই হবে। আজই তুমি বড়লোক হবে। নারায়ণকে স্মরণ করে তুমি বল দেখি, হে প্রভু! কাঠ বিক্রী করে আজ যেন আমি এক মোট টাকা পাই, আজই খুব বড়লোক হয়ে যাই—তা হলে তোমাকে সিন্নী দেব, তোমার পালা-গান করব।

—অমন বললে যদি বড়লোক হওয়া যেত তা হলে সবাই ত দিনে দুশো বার করে বলত। এক দিনেই সব দুঃখ চলে যেত।

—এক দিনেই সব দুঃখ চলে যায় নিমাইচাঁদ! তবে কি জান, বলবার সময় সবাই বলে বটে কিন্তু বড়লোক হলে নারায়ণের কথা আর কারও মনে থাকে না। বড়লোক হয়ে নিজের ভোগরাগের দিকে তাকানোর ফলে নারায়ণ অসন্তুষ্ট হন, দুদিনের বড়লোক ফের আবার গরীব হয়ে যায়। আমি বলছি তুমি মানসিক কর, টাকা-গুলি পেলেই আগে নারায়ণের পূজা দেবে—দেখবে কোন কষ্টই আর থাকবে না তোমার।

নিমাইচাঁদ মানসিক করলে এবং কাঠ বিক্রী করে সত্যিসত্যিই সে আজ এক মোট টাকা পেয়ে গেল। নিমাইচাঁদের আনন্দ আজ আর ধরে না। টাকার মোটটা মায়ের সামনে ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে সে বললে মাকে, নে দেখ, আজ কত টাকা পেয়েছি।

ছেলের কথায় নিমাইয়ের মায়ের বিশ্বাস হয় না একটুও, মোটটা খুলে দেখতে গেল সে। কিন্তু নিমাই বাধা দিয়ে বললে, থামো—আমি যা বলি তা শোন আগে। এই দেখ, রোজ রোজ মোটা চালের ভাত খেয়ে মুখ আমার ভোঁতা হয়ে গেছে। মোটা নয় সরু সীতাশাল চাল কিনে আন আজ। শাক-পুই-ডাঁটা নয়—আলু, পটল, বেগুন, কপি, মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি সব নিয়ে এস—নিমাইচাঁদ আর শাক দিয়ে ভাত খাবে না।

নিমাইয়ের মা 'তাই করি' বলে মোটটার দিকে হাত বাড়াতে নিমাই ফের বাধা দিয়ে বললে, দেখ দেখি মা, দক্ষিণ-দুয়ারী একটা ঘর আর পূব-দুয়ারী একটা করলেই বেশ হবে না। চালপাতি কিনতে যাবার পথে রাজমিস্ত্রিকেও বলে আসিস, যেন কাল থেকেই কাজে লাগে।

তাই করি বলে নিমাইয়ের মা মোট খুলতে গেল, নিমাই আবার বাধা দিতে বললে, জানিস মা সবাই বলে আমি পেটের

ভাত জোটাতে পারি না বলে কেউ আমার হাতে মেয়ে দিতে আসে না। এখন ত আমি বড়লোক হয়েছি কালই আমার বিয়ে হওয়া চাই। হলুদতেল মেখে কোমরে জাঁতি গুজে কালই আমি গাঁয়ের মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াব—সবাই দেখুক নিমাই-চাঁদের বিয়ে করার হিম্মত আছে কি না।

নিমাইয়ের মা যখন রাজী হ'ল, হ্যাঁ তাই হবে—কালই একটি টুকটুকে বউ এনে ঘরে তোলা হবে। তখন নিমাই বললে, দেখ তবে এবার। কিন্তু এ কি! নিমাইয়ের মা মোট খুলে দেখে একগাদা ছাই মোট বাঁধা রয়েছে।

ছেলের মিথ্যা ভাঁওতায় মা রেগে উঠল, ছেলেও মাথায় হাত রেখে বসে পড়ল। এ বিশ্বাস হয় না কোন মতেই, নিমাইচাঁদ নিজের হাতে টাকাগুলো গুণেছে, অত ভারীটা ঘাড়ে করে বয়ে এনেছে, নামানোর সময় ঝনাক করে শব্দও উঠেছে, দুঃখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল নিমাইয়ের। মাকে আগাগোড়া সব বললে সে, বনের মধ্যে সেই লোকটির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, সত্যনারায়ণকে মানসিক করার কথা সবই বললে।

মা কতকটা বিশ্বাস করে বললে, তাহলে সেই লোকটিকেই খুঁজে আন আগে।

ঠিক এই সময়ে সেই লোকটি এসে পড়লেন। এসে নিমাইচাঁদকে বললেন, দেখলে তা, কেন সবাই একদিনেই বড়লোক হয়ে যায় না। তোমাকে বললাম টাকাগুলো পেলে আগে সত্যনারায়ণের মানসিক শোধ করবে। তা না করে তুমি আগেভাগেই ঘরবাড়ী, বিয়ে-সাধির কথা ভাবতে আরম্ভ করলে। ঐ জন্যেই ত তোমার টাকার মোট ছাইয়ের মোট হয়ে গেছে।

নিমাই লোকটির পায়ে ধরে বললে, তুমি মানুষ নও গো, ভগবান—যা বললে তাই হ'ল। আর কখনও ভুল হবে না, যা বলবে তুমি তাই করব, এখন বলে দাও কি করলে ছাইয়ের মোটটা টাকার মোট হয়ে যায়।

লোকটি বললেন, আচ্ছা নিজের কথা না ভেবে সত্যনারায়ণের কথা ভাব—তাঁকে ভোগ দেওয়ার কথা আগে চিন্তা কর।

নিমাই তাই করলে। এবং ছাইয়ের মোট টাকার মোট হয়ে গেল।

নিমাই আর সে নিমাই নেই—মস্তলোক হয়ে গেছে সে। গাঁয়ের সবাই তাকে এখন নিমাইবাবু বলে ডাকে। কিন্তু আবার একদিন কালে খেলে নিমাইকে—কিছু দিন গত হওয়ার পর সত্যনারায়ণকে আবার ভুলে বসলে সে। ভুলে যাওয়ার পর আবার সেই গরীব হয়ে পড়তে লাগল—চোর-ডাকাত এসে ধন-দৌলত যা ছিল লুঠ করে নিয়ে গেল। কিন্তু সত্যনারায়ণ এবারও তাকে কৃপা করলেন। বার বার দু'বার ভুল করবার পর সত্যি সত্যিই চৈতন্ত হ'ল নিমাইয়ের। সত্যনারায়ণের উপর তার অচলা ভক্তি হ'ল। রোজই সত্যনারায়ণের পূজা দিতে আর ভুল করল না সে। অভাব যা ছিল চিরদিনের মত দূর হয়ে গেল ধনদৌলত আর ছেলেমেয়েতে তার সংসার পূর্ণ হয়ে উঠল।

শেষে বলি—ব্রাহ্মণ পুরোহিত আমাদের বাড়ীতে এসে যে পাঁচালী পাঠ করেন তার মধ্যেও কাঠুরিয়ার দুঃখ দূর হওয়ার কথা আছে এবং এদের বাকি তিনটি পালার মধ্যে যার যার দুঃখ দূর হয়েছে পাঁচালীটিতেও তার তার দুঃখ দূর হয়েছে। সুতরাং পরিবেশনার ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে পরিবেশিত হলেও মূল একই। ঠিক যেমন রামায়ণ পাঠ আর রামায়ণ গান মূলতঃ রামায়ণাশ্রয়ী। আর যদি গোড়া খুঁজতে যাই তা হলে দেখব আগে এই জাতীয় কথা বা পাঁচালী নৃত্যগীতের মাধ্যমেই পরিবেশিত হওয়ার রীতি ছিল। পাঁচালী কথাটাই তার প্রমাণ। পাঁচালী আসলে পাঁচালী নয়—পঞ্চালিকা। সংস্কৃত পঞ্চালিকা থেকেই চলতি কথায় হয়েছে পাঁচালী। পঞ্চালিকার মানে হ'ল পুত্তলিকা বা নাচের পুতুল। পুতুল নির্ব্বাক—নাচাই তার কাজ, গাওয়া নয় কিন্তু পাঁচালী নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হ'ত একথা জানা আছে। আমার মনে হয় সর্ব্বপ্রথম পুতুলের মত অথবা পুতুলের মুখোশ পরে নির্ব্বাক অবস্থায় থেকে শুধুমাত্র নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে দিয়েই পাঁচালী পরিবেশনের রীতি ছিল। ঠিক ঐ ছৌ-নাচের মত আর কি। চুপচাপ থেকে শুধুমাত্র পুতুলের মত নাচানাচি করার রীতি ছিল বলেই এর নাম হয়েছিল পঞ্চালিকা বা পাঁচালী। নাচের সঙ্গে কথা বা গান যোগ করা হয় তার পরে। এবং বর্ত্তমানের পাঁচালী পাঠের নীতি প্রচলিত হয় তারও পরে।

সুতরাং পরিষ্কার ভাবেই বলতে পারা যায় সত্যনারায়ণের পাঁচালী গোড়ায় নৃত্যের মাধ্যমেই পরিবেশিত হ'ত এবং পরে নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করার রীতি প্রচলিত হয়। এবং এর বিশেষ ঢংটি তখন যা ছিল আজও তা এই জাতীয় পালাগানের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। নৃত্যগীত সহযোগে পাঁচালী পরিবেশনের ক্ষেত্রে মূলগায়েনই হলেন প্রধান—শুধু গান করা নয়, নাচাও তাঁর কাজ। মূলগায়েন এক হাতে চামর দোলাবেন, অন্য হাতে মন্দিরা বাজাবেন—সেই সঙ্গে নৃত্য করবেন। পায়ে নূপুর বাঁধা থাকবে—সে নূপুর বাজবে তালে তালে। এই, যারা এখন সত্যনারায়ণের পালাগান করবে তাদের প্রত্যেকের পায়েই নূপুর বাঁধা আছে—মূলগায়েনের পায়ে ত আছেই। তবে মূলগায়েনের হাতে চামর রয়েছে বটে কিন্তু মন্দিরা দেখলাম না। সত্যনারায়ণের গানকে সত্যনারায়ণের পালাগান বলারও একটি কারণ আছে। মূলগায়েন যখন গান করেন তখন মূলগায়েনের পিছনে পিছনে যারা দোহার গায়—যাদিকে আমরা বলি দুয়ারী—তখনকার ভাষায় তারাই হ'ল 'পালি'। পালি সাধারণতঃ দু'জন করেই থাকার নিয়ম। আমার মনে হয় এই 'পালি' থেকেই পালা কথাটার উদ্ভব। পালাগান অর্থাৎ যে গানের মধ্যে দুয়ারী বা পালিও আছে। শুধু গান বললে ত একা একা কেউ গাইবে বুঝায়।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

—সানলাইটের অতিরিক্ত ফেণাই এর কারণ

সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

S. 260-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

ডাকটিকিটের জন্মকথা—শ্রীশচীবিলাস রায় চৌধুরী। প্রজ্ঞা প্রকাশনী, মূল্য—ছ' টাকা

ডাকটিকিট আজকার দিনে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের জিনিস এবং সেই হিসাবে সকলেরই পরিচিত। কিন্তু এই অতি-প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্ম কোথায় এবং কি ভাবে কি কারণে ঘটেছিল এবং কেমন করে কালের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে তার চাহিদা ও ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে, সে বিষয়ে জানবার বা পড়বার বই এতদিন বাংলা ভাষায় ছিল না।

অন্য দিকে ডাকটিকিটের আর একটি বিশেষত্ব আছে যাহার মূল্য বুঝেন টিকিট সংগ্রহকারীরা। এটা বুঝিতে গেলে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা বিশেষজ্ঞ লিখিত তথ্যপূর্ণ বই, যার সাহায্যে প্রত্যেকটি টিকিটের নির্ভুল যাচাই করা চলে। অন্য দিকে যারা সংগ্রহ করতে সুরু করেছে তাদেরও চাই এমন বই যা দেখে ও পড়ে, সংগ্রহের বিষয়বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি, কোনটা সাধারণ আর কোনটা দুষ্প্রাপ্য, কি কি সংগ্রহ করতে পারলে একটা যুগ বা একটা অঞ্চলের পূর্ণ সংগ্রহ করা হয়, এ সব কথাই জানা যায়। এ রকম বইও বাংলা ভাষায় এতদিন ছিল না।

শচীবিলাস বাবু ডাকটিকিটের—বিশেষে ভারতের ডাকটিকিটের জন্মকথা আলোচ্য বইয়ে সহজ ভাষায় লিখে সে অভাব পূরণ করেছেন। অসংখ্য ছবি ও তথ্যে বইটি পরিপূর্ণ এবং সে হিসাবে ভারতীয় টিকিট সংগ্রহকারীর পক্ষে বিশেষ মূল্যযুক্ত।

জন্মকথায় পারিপার্শ্বিক ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে কিছু ভুল-প্রমাদ আছে। সেগুলি দ্বিতীয় সংস্করণে শোধিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বই সর্বাঙ্গসুন্দর।

ক. চ.

সেই চিরকাল—শ্রীদেবেশ দাস। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

"সেই চিরকাল" পনেরটি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখক উপন্যাস ও গল্প লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। প্রথম গল্প-গ্রন্থেই শ্রীদেবেশ দাসের রচনার একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। সাম্প্রতিক গল্পসঙ্কলনে সেই বৈশিষ্ট্যের সহিত বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টির প্রসার আসিয়া মিলিত হইয়াছে। লেখক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পটু। 'বৌদি', 'কলি বারজেয়ার', 'বিজয়া দশমী', 'সোহো', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি গল্পগুলির দেশসংস্থান ভারতবর্ষের বাহিরে—ইয়োরোপে। শুধু পটভূমিকার অভিনবত্বই ইহাদের আকর্ষণ নয়, গল্পগুলির চরিত্রের মধ্যে নূতনত্ব আছে। প্রথম গল্পের নামেই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে; 'সেই চিরকাল' যুদ্ধকালের একটি নীড়হারা গৃহভ্রষ্ট বাঙালী তরুণীর কাহিনী। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সৈনিক গল্পটি বিবৃত করিতেছেন। আত্ম-সম্মানের মোহ আধুনিক নারীকে কোন্ দুঃখময় জীবনের পথে টানিয়া লইয়া যায় 'অপরা' তাহারই কথা। 'অপরা'র অপরাজিতার মত 'নভচারিণী'র মধ্যেও সেই জটিল আধুনিক মনের খানিকটা আভাস পাই: 'এই ধমনীরে', 'সোহো', 'বাল্মীকি' প্রভৃতি গল্পও অভ্যস্ত জীবনের প্রতিধ্বনি নয়। অন্তঃসলিল একটি করুণ রসের প্রবাহ গল্পগুলির মধ্যে রসসঞ্চার করিয়াছে। যাহা চিরকালীন তাহা এক থাকিলেও যুগে যুগে পথের পরিবর্তন হয়। বাঙালী আজ নবযুগের যাত্রী। শ্রীদেবেশ দাস নবযুগের বাঙালী-জীবনের ছবি আঁকিবার প্রয়াসী। তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গিটি সাবলীল। গতানুগতিকতা নাই বলিয়া "সেই চিরকালে"র গল্পগুলি পাঠকের বিশেষ উপভোগ্য হইবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

একটি প্রহর—অসীমকৃষ্ণ দত্ত, ৪৬।১, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য দেড় টাকা।

'একটি প্রহর' কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। লেখক নবাগত হইলেও লেখকের সম্ভাবনা রহিয়াছে যথেষ্ট। আধুনিক ধারার অনুসরণ করিলেও কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দানুগ মাধুর্য্য আছে। অনেক সময় ছন্দ-মাধুর্য্যে শ্রুতিমধুর হইলেও তাহাতে ভাব-সম্পদের স্বল্পতাহেতু কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয় না। নূতন কবি হইলেও কয়েকটি কবিতা সে বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। যেমন, 'দৃষ্টি প্রদীপ' কবিতাটি ধরা যাক:

"দৃষ্টি যদি আরো স্বচ্ছ হতো
দেখা যেতো
আনন্দ ও বেদনার কূলে
কোন্ প্রিয়তমা তার চম্পক আঙুলে
পরিপূর্ণ জীবনের একখানি মালা গেঁথে যায়
নিত্যের পূজায়
আপনাকে রিক্ত করে সে মালাতে অঞ্জলি সাজায়।"

এইরূপ ভাব-ব্যঞ্জক কবিতার সমষ্টি অবশ্য খুব বেশী নয়। কবির এ বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার।

আর একটি কবিতাকে সার্থক রচনা বলা যাইতে পারে। যেমন :

"একদিন মনে হয়েছিল—
প্রতিকূল জীবনের প্রত্যেক প্রহর,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে
মজ্জমান আমাদের শেষের সম্বল শুধু
ভাসমান দু'টি উড়ো খড়।
আমাদের শুধু বুঝি, মনে হয়েছিল,
ভেসে-যাওয়া ডুবে-যাওয়া আছে
পারে যাওয়া নাই—,
আমাদের মনে মনে বুঝি বা শুধুই—
ঘরভাঙা প্রলয় বিষাণ
ঘর-জোড়া বাজে না সানাই।
তারপর একদিন কখন যে তীরের ছোঁয়ায়
জেগেছিল প্রাণ,
সবুজের সমারোহ ছায়া দিল মায়া দিল
স্মরণের কোণ হতে মুছে দিল বিক্ষোভের দাগ,
মনে হলো, আমাদের এ জীবন শুধুই মাটির
ছায়া স্নিগ্ধ এ মাটির,—সমুদ্রের নয়।"

এক কথায় সুন্দর। রসিক-সমাজে 'একটি প্রহর' সমাদর পাবে।

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের নূতন লাইব্রেরী-ভবন

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের কথা সম্ভবত সকলেই জানেন। গত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে রেভাঃ এল. বি. সাহা এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়া অন্ধ বালক-বালিকার পক্ষে চক্ষুদানের কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই স্মরণীয় দানের কথা দেশবাসী চিরদিন স্মরণ রাখিবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কর্তৃপক্ষ এবং হিতৈষী বন্ধুরা এই বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের জন্য একটি 'ব্রেইলী লাইব্রেরী-ভবন' নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই ভবনটির একতলার কার্য্য শেষ হইয়াছে, কিন্তু এই বৃহৎ প্রাসাদোপম ভবনটি নির্ম্মাণ করিতে ২,৫০,০০০ টাকা খরচ হইবে। সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকের দানেই উহা নির্ম্মিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১,৪০,০০০ টাকা উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। দেশবাসীর কাছে তাঁহারা সবিনয়ে আবেদন জানাইতেছেন, এরূপ মহৎ কাজে যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা সাহায্য করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে একটা অগ্রসর হইতে পারা গিয়াছে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা।

অধ্যক্ষ—

শ্রীঅমল সাহা

বেহালা, কলিকাতা—৩৪।

সংস্কৃত-নাট্যাভিনয়

সংস্কৃত সেবায় দত্তপ্রাণ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী স্থাপিত গবেষণামন্দির "প্রাচ্যবাণী" সম্প্রতি অমূল্য গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশন ব্যতীত সংস্কৃত সঙ্গীত এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেও সংস্কৃত প্রচারণায় বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বিগত মার্চ-এপ্রিল মাসে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন, তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি স্থানে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "শক্তি-সারদম" এবং সম্প্রতি বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে "বিশ্বরূপা"র প্রখ্যাত নাট্যমঞ্চে ডক্টর চৌধুরীর "ভক্ত হরিদাস" বিষয়ক "মহাপ্রভু হরিদাসম" নামক সংস্কৃত-নাটক প্রতিবারেই বহু সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে।

"প্রাচ্যবাণী"র অন্যতম কীর্ত্তি—অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কর্তৃপক্ষের আহ্বানে আকাশবাণী নাট্যোৎসবে সর্ব্বপ্রথম দিল্লীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়। এখানে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যমূলক নাটক "মহিমময় ভারতম" এবং ভাসের প্রসিদ্ধ নাটক "প্রতিমা" অভিনীত হয়। অভিনয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার প্রাচ্যবাণীর সদস্য ও সদস্যা অভিনেতৃগণকে অশেষ আশীর্ব্বাদ এবং এ ভাবে সংস্কৃত-শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার নিমিত্ত বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

উপরিলিখিত সব কয়টি নাট্যাভিনয়ের পরিচালনা করেন অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী। সঙ্গীতাংশে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতবিশারদগণ অংশ গ্রহণ করেন।

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী স্মৃতি-বিতর্ক প্রতিযোগিতা

২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বারভাঙ্গা হলে ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী স্মৃতি-বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিতর্কের বিষয়: "ভারতের নিরপেক্ষতা তার স্বার্থের অনুকূল"। বিভিন্ন কলেজ হইতে সতের জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। অধ্যাপক নীরদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক প্রবোধ ঘোষ ও অধ্যাপক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় বিচারকের কার্য্য করেন। তাঁহাদের মতে বিতর্ক প্রতিযোগিতা খুব উচ্চস্তরের হয়।

২২শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক সভায় পাস হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজের ছাত্র শ্রীমান অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় ও লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী মীনাক্ষী মিত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৬০ সনের সমাবর্ত্তন উৎসবে তাহাদিগকে সাধনা ঔষধালয় প্রদত্ত বৃত্তি হইতে রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।
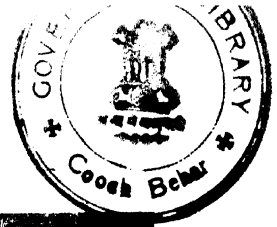
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০.২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মূর্চ্ছিতা বীণা
শ্রীমানবেন্দ্রনাথ বড়ুয়া

রবীন্দ্র-ভারতী হইতে রবীন্দ্র সঙ্গীত বিষয়ক গবেষণায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্তা
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

পুষ্প দেবী ও তৎকন্যা পার্ব্বতীসহ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ ১ম খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৬৬ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সমস্যা পূরণ

সারাদেশ ত অতি জটিল অবস্থার সম্মুখীন। অভাব-অনটন ত বাড়িয়াই চলিতেছে এবং যতদিন সন্তান-সন্ততির প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিত থাকিবে ততদিন ঐ সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না। ১৯৫১ সনের আদমসুমারীতে দেশের লোকসংখ্যা মোটামুটি ছিল ৩৬ কোটি। সম্প্রতি লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের অধিকর্তা অনুমান করিয়াছেন যে, ১৯৬১ সনে উহা হইবে ৪১ কোটি। এই সংবাদ আমরা সকলেই শুনিয়াছি কিংবা অচিরে শুনিব। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে কয়জন?

এ দেশের চাষের জমি—যত সুষ্ঠুভাবেই বণ্টন বা তাহাতে কৃষিব্যবস্থা করা হউক না কেন—কিন্তু তাহা অতি কঠোর সীমাবদ্ধ। বনজঙ্গল এমনিতেই অনেক কম আছে, পতিতজমিও এত অল্প যে, নূতন আবাদের সম্ভাবনা নাই। মরুভূমি যাহা আছে তাহা ত বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহার অগ্রগতি রোধ করাই এক সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। সেখানে সেচের জল দিতে পারিলে অল্পকিছু খাদ্য-সমস্যা পূরণ হয়। কেননা সেই মরু অঞ্চলের লোক কঠোর পরিশ্রমী সুতরাং অগণিত সন্তান উৎপাদনের সময় বা স্পৃহা তাহাদের নাই, এবং সেই কারণে সে অঞ্চলের উষর জমি আবাদ হইলে উদ্বৃত্ত শস্য দেশের খাদ্যসমস্যা পূরণে কাজে লাগিবে, কিন্তু তাহা কতটুকু?

যদি প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ নূতন জীবনের আরম্ভ হয় তবে এ দেশের খাদ্যসমস্যা আগামী বিশ বৎসরে কোথায় উঠিবে? এবং এই সংখ্যাবৃদ্ধির হারও ক্রমেই বাড়িবে, অর্থাৎ এখনকার বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ বৃদ্ধি ক্রমে ৫৫ লক্ষ ও পরে ৬০ লক্ষে দাঁড়াইবে। তাহাদের খাদ্য আসিবে কোথা হইতে, কর্ম্মসংস্থানই বা করিবে কে?

আমরা চতুর্দ্দিকে শুনিতেছি ও পড়িতেছি যে, এই খাদ্য ও অনটন-সমস্যা চীনদেশে আমাদের দেশ হইতেও প্রখর ছিল কিন্তু তাহারা সে সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই সমস্যা-পূরণের কৃতিত্ব চীন গণতন্ত্রের অধিকারী কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী সরকারের। সুতরাং আমরা যদি সেই পথে চলি তবে আমাদেরও সকল সমস্যা পূরণ হইবেই এবং এইরূপ মতামত আমরা শিক্ষিত লোকেদের মুখেই আজকাল বেশি শুনি। তবে তাঁহাদের আরও বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলে একই উত্তর পাই "আপনারাই বা দেশোদ্ধারের কি করেছেন?" অর্থাৎ বর্ত্তমান সরকার—যাহার অধিকারী, চাটুকার বা প্রিয়পাত্র আমরা আদৌ নহি—যেহেতু অপারগ সেই কারণে চীনদেশের শাসনতন্ত্র এদেশে প্রবর্ত্তিত হইলেই সকল সমস্যার পূর্ত্তি হইবেই!

চীনদেশের সমস্যাপূরণ কতটা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার সঠিক খবর আমরা জানি না, যদিও আমরা তাহার প্রকৃত রূপ নির্দ্ধারণের বহু চেষ্টা করিয়াছি এবং নানা দেশের ও নানা মতের প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে সিংহলী, ফরাসী, আরব, মার্কিন ও ইংরেজ সাংবাদিক ছিলেন, ভারতীয় ত ছিলেনই। ইহাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথাবার্ত্তা হইয়াছে এই বৎসরেই। উত্তর নানা প্রকার পাইয়াছি কেননা এই বিদেশীদের মধ্যে দুই জন কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী ছিলেন ও একজন ঘোর বিরোধী মতের ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উত্তর প্রায় সবই বিচার-বিবেচনার পরিচয় দিয়াছে। যে বিচার-বিবেচনার কোনও পরিচয় আমরা বাংলা সংবাদপত্র বা পত্রিকার পাতায় পাই না।

ঐ সকল উত্তরের সারাংশ এই যে, সারা চীনা জাতি অতি কঠোর পরিশ্রমে প্রাণান্ত প্রয়াস করিয়া সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিতেছে এবং চীনা জাতি স্বভাবতই কৃচ্ছ্র সাধনে অভ্যস্ত, কঠোর শ্রমশীল এবং নিয়মানুগত। তাহাদের সংখ্যা আমাদের দেড়গুণ, জমি প্রায় তিনগুণ উপরন্তু ঐ জাতিগত গুণ। অলমতি বিস্তারেণ!

আর আমরা? আমরা বিপ্লবের পথে ভাত খাইয়া, বিপ্লবের পথে গণ-বিক্ষোভের ঢেউ তুলিতে চলি। সেই প্রাচীন কবিরাজের হরীতকীর ন্যায় আমাদের জাতির সকল ব্যাধির ঐ একই মহৌষধ।

জমি বণ্টনের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ

ভারতবর্ষে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে সমস্যার শেষ হইতেছে না। সমস্যা বহু দেখা দিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে যে, ভবিষ্যতে মাথাপিছু সর্ব্বোচ্চ জমির পরিমাণ কি হইবে। জমিদারী প্রথার বিলোপের পর ২৫ একর (অর্থাৎ ৭৫ বিঘা) পর্য্যন্ত চাষ-আবাদী জমি মাথাপিছু ধার্য্য হইয়াছে এবং বাস্তু ও অনাবাদী জমির মিলিত পরিমাণ হিসাবে আরও ২০ একর (অর্থাৎ ৬০ বিঘা) জমি মাথাপিছু থাকিতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে চাষ-আবাদী, অনাবাদী ও বাস্তুজমি মিলাইয়া মাথাপিছু সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৪৫ একর কিংবা ১৩৫ বিঘা জমি রাখা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা এবং আপত্তি উঠিয়াছে। আপত্তির প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষে কৃষকদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূমিহীন শ্রমিক এবং এত অধিক পরিমাণে মাথাপিছু জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলে প্রকৃতপক্ষে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধিত হইতে পারে না এবং তাহাতে ন্যায়সঙ্গত নীতির ভিত্তিতে জমির পুনর্ব্বণ্টনের ব্যবস্থা হইবে না।

ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ কি হইবে তাহা আরও গুরুত্ব ধারণ করিয়াছে ভবিষ্যতের চাষের ব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনার জন্য। সমবায় প্রথা গৃহীত হইলে জোতদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিতে হইবে। জোতদাররা বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে ছোট ছোট জমিদারে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং জোতদারী প্রথার উপর সমবায় চাষ ব্যবস্থার প্রচলন করার অর্থ হইবে জমি বণ্টনে একচেটিয়া সংস্থার সৃষ্টি করা। একচেটিয়া চাষ-আবাদের ফলে বৃহদায়তন মালিকানার যতকিছু দোষ সবই বজায় থাকিবে এবং তাহাতে সামাজিক-অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সাধিত হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজনৈতিক কারণে বর্ত্তমানে কংগ্রেস ও বিপক্ষদল উভয়েই জোতদারী প্রথাকে সমর্থন করিতেছে; গ্রামে রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে জোতদারদের অবশ্যই হাতে রাখিতে হইবে। ধান এবং চাউলের বাজার হইতে উধাও হওয়ার ব্যাপারে যে খেলা চলিতেছে তাহাতে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল এবং জোতদারদের সমবেত প্রাধান্য অনেকখানি আছে। রাজনীতিতে দলীয় স্বার্থই নীতি নির্দ্ধারণ করে; জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ ব্যাপারে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ আইনের যে সংশোধন হইতেছে তাহার খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙে সিলেক্ট কমিটির মিটিং হইয়া গিয়াছে এবং এই কমিটির অনুমোদনের উপরই পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। এই সিলেক্ট কমিটির সভ্য সকল দল হইতেই ছিল এবং প্রায় সকল সভ্যই ৩০ হইতে ৪০ একর পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানায় সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হওয়া উচিত বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। রাজনীতির চালে অর্থনীতি আজ বেচাল হইয়া গিয়াছে। সকল রাজনৈতিক দলই বর্ত্তমানে সন্ত্রস্ত যে, গ্রামে জোতদার না থাকিলে গ্রামের রাজনীতিতে দলীয় প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না।

গ্রামে ৪০ বিঘা (অর্থাৎ প্রায় ১৩ একর) যাহার জমি আছে তাহাকে ছোটখাট জমিদার বলিয়া ধরা হয়। গ্রামে ৪০ বিঘা মাথাপিছু ধানজমি কয় জনের আছে? সে স্থলে আইন করিয়া মাথাপিছু জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ একর (প্রায় ৯০ হইতে ১২০ বিঘা) নির্দ্ধারণ করিবার অর্থ বিলুপ্ত জমিদারী প্রথাকে খিড়কী দরজা দিয়া আনিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, বামপন্থীরা—যাহারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক বলিয়া জাহির করেন—তাঁহারা পর্য্যন্ত জমির বৃহৎ মালিকানাকে সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, তাহা হইলে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে কেন? জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে যে সংস্থাগত শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূরণের আশু কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, একমাত্র সমবায় প্রথার ভিত্তিতে চাষ আবাদ সুরু করিলে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন হইতে পারে।

প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভিত্তির উপর মালিকানার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে, ফ্লাউড কমিশন ১৯৩৮ সনে জমির অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতা ১৫ বিঘা করিয়া ধরিয়াছিলেন। পারিবারিক চাষের ভিত্তিতে ১৫ হইতে ২০ বিঘা (অর্থাৎ ৫ হইতে ৭ একর) অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইহার বেশী জমি চাষ করিতে হইলে ভাড়াটিয়া শ্রমিক দিয়া চাষ করাইতে হইবে, তাহাতে—'চাষী যে জমি তার'—এই নীতি কার্য্যকরী হইবে না। সুন্দরবন, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি এলাকায় বিঘাপ্রতি ৮ হইতে ১০ মণ ধান হয়। বর্ত্তমানে ধানের মণ পড়ে ১৫৲ টাকা; ১৫ বিঘা জমিতে ১৩০/১৫০ মণ ধান হইবে এবং তার মূল্য হইবে কমপক্ষে দুই হাজার টাকা। চাষীর মালিকানার ভিত্তিতে মাথাপিছু ১৫ হইতে ২০ বিঘা জমিই যথেষ্ট। ইহার পর দোফসলী চাষ দ্বারা, অর্থাৎ ধানচাষের পর রবিশস্য চাষ করিলে চাষীদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় সকল জমিতেই দুইবার করিয়া চাষ করা হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একবার করিয়া চাষ করাই রেওয়াজ, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে দুইবার করিয়া চাষ করার ব্যবস্থা অতি অবশ্যভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে যাহাতে চাষীরা সজাগ হয় তাহার জন্য শাসন-কর্ত্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে (যথা, সদর এবং ঝাড়গ্রাম) বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলায় উৎপাদনশীলতা কম, কারণ জমি সাধারণতঃ কাঁকর মাটিপূর্ণ এবং সেখানে কোনওপ্রকার সেচ-কার্য্যের ব্যবস্থা নাই। এই সকল এলাকায় গভীর নলকূপ বসাইয়া সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ-আবাদ করা উচিত।

সমবায় প্রথায় সরকারের হস্তক্ষেপ

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন প্রসারের জন্য কৃষি-ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া যথার্থই হিতকর হইয়াছে। নাগপুর কংগ্রেসে কৃষি-সহায়ক সমবায় প্রসারের সঙ্কল্প ঘোষণা করায় পরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পরিকল্পনা কমিশন এ নীতি মানিয়া লইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পশ্চিম বাংলা প্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলনেও ইহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে এই রাজ্যের প্রতি থানায় পাঁচটি করিয়া কৃষি-সহায়ক সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে কি না বলা কঠিন, তবে রাজ্যের সর্বত্রই সমবায় সংগঠন প্রসারের দ্বারা কৃষক, কুটিরশিল্প, ছোট ব্যবসায়, ও ক্রেতা-সাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাইতে পারে এবং ইহার মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা তৎপরতার সহিত স্বল্পক্লেশে ভারতের বৈষয়িক সমস্যার সমাধানও হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতের প্রধান সম্বল। এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার মারফতে ঐ দুইটি সম্পদের মধ্যে কোনটিরই সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের অভাবে অনেক পদের জন্য লোক পাওয়া যায় না। অন্যদিকে কাজের অভাবে লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম লোক বেকার বসিয়া আছে কিংবা বেগার খাটিতেছে। সেচের, উন্নত-জাতের বীজের এবং সারের অভাবে কৃষিক্ষেত্রে ফলনের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। প্রকৃতির অনুগ্রহে এ দেশের অধিকাংশ জমিতে বৎসরে দুইটি এবং কোন কোন জমিতে তিনটি পর্যন্ত ফসল ফলিতে পারে। তাহাও প্রয়োজনীয় সংগঠনের অভাবে অধিকাংশ চাষীই সে সুযোগ লইতে পারে না। বণ্টন-ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অপ্রতিহত প্রতিপত্তির জন্যও চাষী ফসল বেচিয়া ন্যায্য দর পায় না এবং ক্ষেতে বা গৃহে অপরিহার্য জিনিস-গুলিও ন্যায্যদরে কিনিতে পারে না। অথচ মরশুমের গোড়ায় চাষীর নিকট হইতে কম দরে ফসল কিনিয়া লইয়া আড়তদার, পাইকার, জোতদারশ্রেণী মোটা মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, ভারতে প্রচলিত ব্যবস্থা দরিদ্রকে বঞ্চনার ও বিত্তবানকে তোষণের যন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইলে, জনসাধারণের মুখ চাহিয়া এক নূতন কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা সম্ভব হইতে পারে একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে। ঠিক এই কারণেই আজকের সমবায় সংগঠনে কংগ্রেসের সঙ্কল্পকে বৈষয়িক উন্নতির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পেও অনুরূপ একটি সংগঠন গড়িয়া তোলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। এমনকি, বৃহৎ শিল্পগুলিও কোন কোন পর্যায়ে এ রকম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে মূলধন বা কর্জ, কাঁচামাল, উপকরণ প্রভৃতি সংগ্রহের সমস্যা অনেকটা সহজ হইতে পারে। তবে ইহাও সত্য, সমবায়ের গুরুত্ব বা প্রয়োজন স্বীকৃত হইলেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ইহার প্রয়োগ করিতে বহু আয়োজন ও সময় আবশ্যক।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে এ দেশে কয়েক লক্ষ ঋণদান সমিতি রেজিষ্টারী হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে শতকরা একটি সমিতিরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, মাতব্বর পরিচালকগণ নিজেদের কিংবা অনুগৃহীত ব্যক্তিদের সুবিধার জন্যই এই সব সমিতিগুলিকে কাজে লাগাইয়াছেন।

এখন প্রয়োজন, সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য যে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে তাহা পরিচালনার জন্য পক্ষপাতশূন্য যোগ্য ব্যক্তির, যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে প্রতিষ্ঠানের শুভাশুভ। অবশ্য এ ধরনের কর্মীও সুলভ নয়—উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইহার উপর চাই, পল্লীর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পর্যায় অনুসারে সংগঠন গড়িয়া তোলা। এ সব ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ। তাই বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কাজ এখন হইতেই সুরু করিতে হইবে।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে শতকরা ৭০ জনেরও অধিক কৃষিজীবী, শতকরা ৮০ জনেরও বেশী লোক পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসী, কৃষি-সহায়ক সমবায়ের মাধ্যমে ইহারা সকলেই উপকৃত হইবে। তবে জমিতে মালিকানাস্বত্বের মায়া অত্যধিক প্রবল। সে মায়া কাটাইয়া কৃষকগণ সমবায়ের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চাহিবে কি না সন্দেহ। সেই সন্দেহ করিয়াই সমবায় খামার আপাততঃ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষি-সহায়ক সমবায়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের এবং কৃষিপণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে এই সমিতিগুলি কৃষককে সাহায্য করিতে পারিলে তাহাদের আস্থা আসিবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে কৃষিসহায়ক সমবায়-গুলির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সার্থক হইলে ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায়ের আদর্শ প্রসারের সুযোগ ঘটিবে।

কুটির-শিল্প ও সরকার

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গত বারো বৎসর ধরিয়া এদেশে ক্ষুদ্র ও কুটীর-শিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে শুধু বড় বড় আশার বাণীই উচ্চারিত হইয়াছে। কাজ বিশেষ কিছু আগায় নাই। যাহার ফলে আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা। ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন প্রেরণা ত দূরের কথা, ঐ জাতীয় শিল্পের মাধ্যমে প্রাণধারণও শিল্পীদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলা একদা পিতল, কাঁসা ও তামার বাসনপত্র, শঙ্খ, রেশম, তসর ও সূতীবস্ত্র, লৌহ, লাক্ষা ও তুলসীর মালা এবং তামাক, তালের গুড় প্রভৃতির জন্য খ্যাত ছিল। এইগুলি আজ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। মুর্শিদাবাদের রেশম, বালাপোষ, পিতল-কাঁসা, হস্তিদন্ত প্রভৃতি কুটির-শিল্পেরও আজ চরম অধোগতি হইয়াছে। অবশ্য জনসাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন, শিল্পদ্রব্যের দুর্মূল্যতা, কাঁচামালের অভাব, বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা, পাইকারদের কারসাজি, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি উপরোক্ত কুটির-শিল্পগুলির অবনতির কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ভারতে বর্ত্তমানে বৃহৎ শিল্পের প্রসারের জন্য ব্যাপক তোড়জোড় হইতেছে। দেশের ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসারের জন্যও বহুমুখী চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কুটির-শিল্পগুলি এখন পর্য্যন্ত একরূপ অবজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। অথচ দেশে ধনসম্পদ উৎপাদনে এবং দেশবাসীর কর্ম্মের সংস্থানে এই ধরনের শিল্পের অবদান কম নয়। আমাদের দেশে যেসব শিল্পে পঞ্চাশ জনের অধিক ব্যক্তি কাজ করিয়া থাকে—যাহাতে বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির সাহায্যে কলকব্জা চালিত হয় এবং যাহাতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার কম তাহাই ক্ষুদ্র শিল্প বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যেসব শিল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির সাহায্যে কলকব্জা চালিত হয় না এবং যাহাতে পরিবারভুক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি বাড়িতে বসিয়া, ছোটখাট যন্ত্রের সাহায্যে কায়িক শ্রম দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তাহা কুটির-শিল্প নামে অভিহিত হয়। ঢেঁকি, ঘানি, গুড়, রেশম, হস্তচালিত তাঁত, পিতল-কাঁসা, ঝুড়ি, দড়ি, কামারশালা, সূত্রধরের কাজ, খেলনা, কাঠ ও হাতীর দাঁত হইতে, বিবিধ সৌখীন দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ইত্যাদি অবলম্বনে অগণিত বিচিত্র ধরনের শিল্প এই শিল্পের অন্তর্গত। এই ধরনের শিল্পকাজে যাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ও নিরক্ষর। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে জানে না—মূলধনও তাহাদের নাই, ফলে তাহাদিগকে বাজার হইতে এত উচ্চ সুদে টাকা ধার করিতে হয়—যাহার জন্য তাহারা নিজেদের পরিশ্রমের উপযুক্তরূপ মূল্য পায় না। তাহাদের হাতে ঢেঁকি, ঘানি, হাপর ইত্যাদি যে শ্রেণীর যন্ত্রপাতি রহিয়াছে, তাহার উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নাই। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহেও তাহারা অসমর্থ। তাহাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য কোন সংস্থাও নাই। অনেক সময়েই তাহারা বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ও দেশের অভ্যন্তরে বৃহৎ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না।

সরকার এই কুটীর-শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ নাকি ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু এই অর্থব্যয়ের ফলে উন্নতি কতটা হইল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুফল যে কিছু হয় নাই, তাহার প্রমাণ মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়ার শিল্পাঞ্চলগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। যদি দেখিতাম, এই অর্থব্যয়ের ফলে প্রত্যেক বৎসরে বিভিন্ন কুটীর-শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িতেছে এবং সেই সব শিল্পের মাধ্যমে দেশের বহু ব্যক্তির কর্ম্মের সংস্থান হইতেছে অথবা শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয়ের পরিমাণ বাড়িতেছে, তাহা হইলে বুঝা যাইত সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

সরকার অর্থ ঠিকই ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু যাহাদের পাইবার কথা, তাহারা পাইতেছে না। সরকার এ অপচয় ও চুরি কি কোন ক্রমেই বন্ধ করিতে পারেন না?

খাদ্য-আন্দোলন ও হরতাল

একেই ত খাদ্য-সমস্যা লইয়া আজ মানুষ বিব্রত। তাহার উপর খাদ্য-আন্দোলন আরম্ভের ও আগামী ২৫শে জুন রাজ্যব্যাপী হরতাল আহ্বানের সিদ্ধান্ত—সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। গত বার বৎসর পর্য্যন্ত শাসন-কর্তৃত্ব হাতে লইয়া খাদ্যের ব্যাপারে সরকার যে রকম অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে লোকের প্রাণে অসন্তোষের আর অন্ত নাই। সময়মত, নিয়মিত পরিমাণে বর্ষা হওয়ায় এবং আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনে আশাতীত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত দুই বৎসর খাদ্য-সরবরাহের অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়াছিল। অবশিষ্ট দশ বৎসর ধরিয়াই খাদ্য-সঙ্কট চলিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৪ সনে কণ্ট্রোল প্রত্যাহারের সময় যে দর ছিল, পর বৎসরে দর তদপেক্ষা চড়িয়াছে। তার পরও প্রতি বৎসর দর এক-এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া সরকারী নীতির প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। অথচ দেশ, দরিদ্রের দেশ। চাউল, মাছ, ডাল, গুড়, সব্জী, তরকারী, তৈল—এমনকি মশলা প্রভৃতিরও দর ক্রমশঃ চড়িয়া যাওয়ায় ইহারা যে কি দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, তাহা খাদ্য-সচিব না জানিতে পারেন, কিন্তু কোন সংসারী লোকের অজানা নয়। এরূপ দুঃসহ ক্লেশের জন্য সরকারী খাদ্যনীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে জনসাধারণ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির দ্বারা সেই ক্ষোভ আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি, বামপন্থী নেতাদিগের পক্ষে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আন্দোলন বা হরতাল—যাহাই হউক না কেন, মুখ্য উদ্দেশ্য হইল অন্তর্নিহিত সমস্যাটির প্রতি বিরোধীপক্ষকে জব্দ করা। কিন্তু খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণের কিংবা ক্ষোভ প্রকাশের জন্য এইরূপ ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন আছে কি? খাদ্যনীতির ব্যর্থতা জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতেছে—মুখ্যমন্ত্রীও এই ব্যর্থতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই আন্দোলন বা হরতাল কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য? ইহার সার্থকতাই বা কি? বামপন্থী নেতারা ঘোষণা করিয়াছেন—খাদ্য-আন্দোলন উপলক্ষে মজুত ধান-চাউল উদ্ধার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ন্যায্য দরে বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করা এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের আপিসের বা

বাড়ীর সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট করা হইবে। প্রথম অভিপ্রায়টি ন্যায্যদরে খাদ্য বিক্রয়ের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করিবার অনুকূল। মজুতদারদিগের পরিচয় ও মজুত মালের সন্ধান বাহির করিতে পারিলে, আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলন শুরু না করিয়াও মজুত মাল উদ্ধারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। ভবানীপুরে ঠিক এইভাবেই চাউল উদ্ধার করা হইয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনে ক্রমাগত অভাব, অনটন, অভিযোগ, বঞ্চনার জন্য এমনেই ত ক্লেশের আর অন্ত নাই। ইহার উপর বহু-আলোচিত সর্বজন-পরিজ্ঞাত এই সমস্যা উপলক্ষে হরতালের অনুষ্ঠান করিলে অন্ততপক্ষে সে দিনের মত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণ যেরূপ সচেতন, তাহাতে ইহার কোন প্রয়োজন আছে কিনা সেটা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। আসল কাজ চোরাকারবার বন্ধ করা—সেদিকে বামপন্থীদের কোনও উৎসাহ দেখা যায় না।

খাদ্যনীতি ব্যর্থ হওয়ার জন্য, খাদ্যমন্ত্রী জনসাধারণের উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া সকল অভিযোগ এড়াইতে চাহিয়াছেন। গত ১লা জানুয়ারী ধান-চাউল বিক্রয়ের সব স্তরে সর্বোচ্চ দর আইনানুসারে বলবৎ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দরে বিকিকিনির বাধ্য-বাধকতাও সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। প্রকাশ্য বাজারে ঐ দর চালু হইলে কোন কথা ছিল না। যে সব স্থানে তাহা হয় নাই, সেখানে সরকার যদি 'ন্যায্য দরের দোকান' হইতে বাঁধা দরে, খাওয়ার যোগ্য চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের একটা অংশ চড়া দর দিয়া গোপনে চাউল কিনিতে বাধ্য হইত না। এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য সরকারই দায়ী। এখনও সময় আছে, সরকার এই দিক দিয়া চিন্তা করিয়া বর্তমান সঙ্কট-অবস্থার কিছুটাও সুরাহা করিতে পারেন।

ভেষজ-শিল্প কারখানা স্থাপনে রুশ-ভারত-চুক্তি

সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থানুকূল্যে ও সহযোগিতায় ভারতে ঔষধ ও ঔষধের সরঞ্জাম প্রস্তুত এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া যে পাঁচটি কারখানা স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, সে সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। গত ২৯শে মে মস্কোতে সোভিয়েট ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি চুক্তিও হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া হইতে যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ আমদানির জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে—তাহার মূল্যও বড় কম নয়, প্রায় সাড়ে নয় কোটি টাকা, এ সমস্ত টাকাই সোভিয়েট সরকার ভারত সরকারকে ঋণ হিসাবে সরবরাহ করিবেন। যাহা হউক, এই চুক্তির ফলে, ভারতে ভেষজ-শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টা আরও কিছুদূর আগাইয়া গেল।

এখন কথা হইতেছে, কারখানাগুলি কোথায় স্থাপিত হইবে? কাজে নামিবার পূর্বে, স্মরণ রাখিতে হইবে, ভেষজ-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের যে বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে তাহা ভারতের আর কোথাও নাই। ভেষজ-শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান উপাদান পশ্চিমবঙ্গেই সহজলভ্য। আরও একটি সুবিধার কথা, দুর্গাপুরে কয়লা-চুল্লী অবস্থিত থাকায়, কয়লা হইতে উৎপাদিত বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তাবিত কারখানায় সহজেই ব্যবহৃত হইতে পারিবে। শুধু তাহাই নহে, এইজন্য বিপুল পরিমাণের পরিবহন-ব্যয়ও স্বীকার করিতে হইবে না। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কারখানাগুলি পশ্চিমবঙ্গেই স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ভেষজ-শিল্পের গবেষণায় বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। দুর্গাপুর যে এই ধরনের কারখানার একটি উপযুক্ত স্থান তাহাও সুবিদিত। কিন্তু সরকারের যুক্তি চলে ভিন্ন পথে। এতখানি সুবিধাসত্ত্বেও, কারখানা প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ যদি অগ্রাধিকার না পায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের উপর চূড়ান্ত অবিচারই করা হইবে।

কংগ্রেস সম্মেলনে বহুরূপী দল

বিডন স্কোয়ারে যে কংগ্রেস সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে বড় আকর্ষণ ছিল কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং সম্মেলনের নির্বাচিতা সভানেত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর আগমন। বহুকাল পরে এই সর্বপ্রথম কংগ্রেস সভানেত্রীর দমদম কলিকাতার দীর্ঘ শোভাযাত্রার পথটি অভ্যর্থনায় মুখর হইয়া উঠিবে, ইহাই আশা করা গিয়াছিল কিন্তু পরিবর্তে যে বিক্ষোভ দেখা গেল তাহা অপ্রত্যাশিত। এই বিক্ষোভ যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন—তাঁহাদের ধ্বনি হইল 'পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সংস্কার চাই।' কিন্তু ইহাই কি চাওয়ার রীতি? এই অভদ্র আচরণের সংবাদে যে-কোন সভ্যদেশ লজ্জায় মাথা নত করিবে। অথচ তাঁহারা নাকি লেফটিষ্ট নহেন, কংগ্রেসবিরোধীও নহেন, বরং কংগ্রেসের ভক্ত ও কংগ্রেস সেবক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতবিরোধ পূর্বেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে বিরোধের রূপ জনসাধারণের সম্মুখে সর্বদাই পরিচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বিরোধের সূত্র আদর্শগত। কংগ্রেস কোন্ পথে যাইবে, তাহার কর্মপন্থা কি হইবে তাহা লইয়া আলোচনা চলিত প্রকাশ্যে এবং যাঁহারা এইরূপ আদর্শগত বিরোধে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন আদর্শ-নিষ্ঠ সেবাব্রতী। সংস্কারের নামে এইভাবে তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ করিতে কোনদিনই চাহেন নাই। কিন্তু তথাকথিত এই কংগ্রেস ভক্তরাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া আজ বিষাক্ত করিতেছেন। প্রকাশ্যে ইঁহাদের কিছু বলিবার নাই—বলিবার মত সৎসাহসও তাঁহাদের নাই।

তবে আমরা বলিব, অন্ধ অহমিকা এবং ক্ষমতার লোভ মিলিয়া এই মুখোসধারী কংগ্রেস ভক্তদের যে পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা সর্বনাশের পথ। কংগ্রেসের যথার্থ সেবক হইলে, জনসেবার বিস্তৃতক্ষেত্রে তাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। আজ সারা পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাবের ফলে জনসাধারণের যে ক্লেশ—তাঁহারা

অন্ততঃ সেদিকেও আগাইয়া আসিতেন। সরকারকে গালি দিব, অথচ নিজেরা কিছু করিব না—এই মনোভাব লইয়া কংগ্রেসের সেবা করা যায় না। ইঁহারা মাটিতে নামিবেন না, জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া কংগ্রেসের সেবামূলক ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করিবেন না—শুধু লুব্ধদৃষ্টি রহিবে তাঁহাদের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিবার দিকে।

দেশসেবার বিন্দুমাত্র ঐতিহ্য যাঁহাদের নাই, আত্মপ্রচার ও আত্মসেবায় যাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও দুর্বুদ্ধি নিয়োজিত, তাঁহারা কি করিয়া কংগ্রেস পরিশোধন করিবার আশা করেন।

যাহা হউক, ইঁহাদের প্রচার যন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের উপর যে ভাবে নির্মমভাবে আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছে তাহাতে তাঁহারা দেশের শত্রুরূপে চিহ্নিত হইয়া রহিলেন।

সরকার ও ভেজালকারী

দ্রব্যে ভেজাল আজ নূতন নহে। যুদ্ধের আগেও ছিল, পরেও আসিয়াছে। বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পরে, মূল্যবৃদ্ধি ও পণ্যাভাবের সুযোগে ইহার প্রসার বাড়িয়াছে। খাদ্যে যাহারা খাদ মিশায়, পথ্য ও ঔষধ জাল করে, তাহারা কেবল লোককে প্রতারণাই করে না—প্রাণেও মারে এবং তাহারা একজন বা দুইজন নহে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষের প্রাণনাশ করে। চাউলে যাহারা কাঁকর মিশায় তাহারা মাত্রাহীন লাভের লোভে সাধারণ মানুষকে ঠকায় ওজনে। তেল, ঘি এবং ঔষধে জালিয়াতি যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা ধর্ম্মে সহস্রমারী—অসহায় রোগীরও তাহাদের হাতে রেহাই নাই। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকেও এই শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী মারণযজ্ঞে কাজে লাগায়, ইহারা সামান্য নহে। তাই ঘৃতে পাই বনজ-তৈল আর জান্তব চর্ব্বি। সরিষার তৈলের প্রধান উপাদান বাদাম-তৈল. ইহা ত সকলেই জানেন। কিন্তু রঙ আর এসেন্সের এমনই মহিমা কিছু ধরিবার উপায় নাই। আজকাল ডালেও রঙ মিশানো হইতেছে—উহা ত গরল এবং সে গরল কোনদিনই অমৃত হইয়া উঠে না। দাম দিয়া যে মধু কেনা হয় তাহা গুড়ের সহিত জাল-দেওয়া শূন্য মৌচাকের রসমাত্র। রসায়ন বিদ্যায় এই পারদর্শিতার জুড়ি নাই। তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই—পানের সহিত যে খয়ের খাই, তাহা অনেক সময়েই রক্তাভ খড়িমাটির ডেলা মাত্র, আর জিরা বলিয়া যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা অতি নিপুণভাবে কাটা খড়কুটা। ভেজাল কোথায় নাই?

জাল ঔষধ তৈয়ারির কারখানার খবর প্রায়ই মিলে। মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচাইতে সারা বাজার খুঁজিয়া যে ঔষধ ঘরে আনিলাম তাহা খাঁটি নহে—তাহার মুখে যাহা তুলিয়া দিলাম তাহা বিষ, একথা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। মানবেতর জীবগুলির মধ্যে শত্রুতার ব্যাপারে একটা আপোষ-রফা আছে, সাপের শত্রু বেজী, বিড়াল ইঁদুরের যম, কিন্তু মানুষ? মানুষের শত্রু মানুষ! সভ্যতার শিখরে উঠিয়াও আমরা সেই আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে জিয়াইয়া রাখিয়াছি।

আকণ্ঠ বিষপান করিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। আমাদের সরকার বাহাদুরও সেইরূপ নীলকণ্ঠ হইয়া বুঁদ হইয়া বসিয়া আছেন। জানিয়া শুনিয়াও সেই বিষ তাঁহারাও নিত্য গলাধঃকরণ করিতেছেন, প্রতিকারের হাত তুলিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। পাপের শিকড় বহু গভীরে চলিয়া গিয়াছে, দুই-একটা ধরপাকড়ে, খানাতল্লাসিতে বা নামমাত্র সাজায় কোন ফলই হইবে না। কঠোর আইন এবং তাহার প্রয়োগ চাই। হত্যাকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ভেজাল ব্যবসায়ীদের জন্য সেই দণ্ড কেন দেওয়া হইবে না—আমাদের প্রশ্ন সেইখানেই। সাধারণ খুনী একটি মাত্র লোককে হত্যা করে, কিন্তু ইহারা মারিতেছে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে। আইনের পাতায় কি আছে না আছে আমরা জানিতে চাই না, উহারা বিষপ্রয়োগে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশ করিতেছে, বিচার আমাদের সেইদিক দিয়াই করিতে হইবে।

ভারতে পাকিস্থানী গুপ্তচক্রের ঘাঁটি

সংবাদপত্রগুলিতে যে সব নিত্য নূতন ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উত্তর এবং পূর্ব্ব-ভারতে—বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ও মহানগরী কলিকাতায় পাকিস্থানী গুপ্তচর-চক্র সুকৌশলে তাহার জাল বিস্তার করিয়াছে। সরকারী দপ্তর হইতে পোর্ট, ডক, রেলওয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পাকিস্থানী গুপ্তচরদের কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐগুলি ভারত-রাষ্ট্রবিরোধী নানারূপ অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপ ও গোপন ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। ইহা যে অমূলক সন্দেহমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া এবং পার্কসার্কাসের কতকগুলি সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। পেশাদার বিদেশী গুপ্তচরদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা এবং তাহাদের অবৈধ কার্য্যকলাপ নিরোধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু পাকিস্থানীরা যেরূপ ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষতঃ কলিকাতায় ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাতে মামুলী ধরনের পুলিশী সতর্কতা দ্বারা ইহাদের অবাঞ্ছনীয় কার্য্যকলাপ বন্ধ করা একরূপ অসম্ভব। পাকিস্থানী নাগরিক, এবং পাকিস্থানের প্রতি অনুরাগী এমন বহু লোক পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে যথেষ্ট ক্ষমতা এবং সুবিধা দখল করিয়া বসিয়া আছে। দেশ স্বাধীন হইবার পর প্রায় বার বৎসর অতীত হইল, অথচ এখন পর্য্যন্ত পোর্ট, ডক, জাহাজ কোম্পানী এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে—এমন কি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পাকিস্থানীদের জায়গায় ভারতীয় নাগরিক নিয়োগের কোন ব্যবস্থাই চালু হইল না? কোন স্বাধীন রাষ্ট্রই শিল্প-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ করে না। আমাদের দেশেই ইহার মারাত্মক ব্যতিক্রম দেখিতেছি। এই অদূরদর্শী পরিণাম-চিন্তাহীন ব্যবস্থার ফলে পাকিস্থানীরা সর্ব্বত্র গোপন ঘাঁটি বানাইতে পারিয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং শিল্প-ব্যবস্থার অন্ধি-সন্ধি তাহাদের নখাগ্রে। তাহারা অবাধে

পাকিস্থানকে সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিতেছে, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে বিকল করিয়া দিবার ক্ষমতাও তাহাদের মুঠার মধ্যে।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এখন প্রয়োজন, ঐসব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি হইতে তাহাদের অপসারণ করা। ভুলিলে চলিবে না যে, বিদেশী নাগরিক অথবা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত নাগরিকদের পোষণ করা এবং প্রশ্রয় দিবার পরিণাম অতি ভয়াবহ।

ফারাক্কা বাঁধের পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা ?

ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণে বিলম্ব হইতেছে, অথচ বাণিজ্য-প্রসারের জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন। এই জন্যই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, একটি খাল কাটিয়া গঙ্গা-প্রবাহকে চালু রাখিবেন। কলিকাতা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদী যাহাতে বারো মাস জাহাজ চলাচলের উপযোগী থাকে এবং ভাগীরথী নদীর লবণাক্ততা যাহাতে হ্রাস পায় তজ্জন্যই নাকি এই খাল কাটা দরকার। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং এই কাজে যে খরচ হইবে তাহার একাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন।

এই খাল কাটা হইলে গঙ্গার অনেক জল ভাগীরথীর খাতে প্রবাহিত হইবে। তাহার ফলে ভাগীরথীর জলের লবণাক্ততা হ্রাস পাইবে এবং ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম হইতে কলিকাতা বন্দর পর্য্যন্ত বারোমাস জাহাজ চলাচলের অধিকতর উপযোগী হইবে আশা করা যায়। তবে শীতকালেই ভাগীরথীর জলের লবণাক্ততা বেশী হইয়া থাকে এবং এই সময়েই কলিকাতা বন্দর পর্য্যন্ত জাহাজ চলাচলের পক্ষে অধিকতর অন্তরায় দেখা দেয়। এই সময়ে গঙ্গানদীর জলও অনেক নীচে নামিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় বাঁধ দিয়া জল না আটকাইলে শীতকালে পরিকল্পিত খাল-পথে ভাগীরথীতে প্রয়োজনানুরূপ জল আসিবে কিনা তাহা বুঝা যাইতেছে না। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পূর্ত্তবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রস্তাবিত খালের গভীরতা কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। আরও বলিবার কথা এই যে, উক্ত খালের দ্বারা ভাগীরথীকে বারো মাস জাহাজ চলাচলের উপযোগী রাখা ও ভাগীরথীর জলের লবণাক্ততা হ্রাস—এই দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও উহা দ্বারা উত্তরবঙ্গের সহিত দক্ষিণবঙ্গের রেলপথে সংযোগসাধন এবং ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলের হাজামজা নদীগুলিকে সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। এই জন্যই প্রয়োজন ফারাক্কা বাঁধের। সরকার যেন ফারাক্কা বাঁধের পরিবর্ত্তে উহাকে বিকল্প ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য না করেন, এবং এই খালের কথা ভাবিয়া ফারাক্কা বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করাও যেন অধিকতর বিলম্বিত না হয়।

খালের বিরোধ-মীমাংসায় বিশ্বব্যাঙ্ক

পঞ্জাবের নদীগুলি হইতে জল-সরবরাহ লইয়া পাকিস্থানের সহিত ভারতের গত বারো বৎসর ধরিয়া বিরোধ চলিতেছে। এ সম্বন্ধে বিশ্বব্যাঙ্ক একটি সর্ব্বশেষ প্রস্তাব দিয়াছেন।

সেই প্রস্তাবে জানান হইয়াছে যে, বিরোধ সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত অনেক বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার অমীমাংসিত থাকিলেও, বিরোধের মীমাংসার জন্য এরূপ কতকগুলি নীতি স্থির হইয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বাঞ্চলের নদীসমূহ হইতে ভারত কর্ত্তৃক যে জলের সরবরাহ বন্ধ হইবে, পাকিস্থান যাহাতে পশ্চিম অঞ্চলের নদীসমূহ হইতে খাল কাটিয়া তাহা পূরণ করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক একটি কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছেন এবং পাকিস্থান এই কার্য্যক্রম মানিয়া লইয়াছে। পাকিস্থান কর্ত্তৃক নূতন খাল কাটার জন্য যে অর্থব্যয় হইবে, তাহার একাংশ ভারত প্রদান করিবে এবং এই বিষয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের সহিত ভারত সরকারের একটা বুঝাপড়া হইয়াছে। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে—ভারত আরও প্রায় দশ বৎসর পাকিস্থানকে খালের জল সরবরাহ করিবে এবং এই কারণে রাজস্থান ও অন্যান্য স্থানে জলের যে অভাব দেখা দিবে, তাহা পূরণের জন্য ভারত বিপাশা নদীর উপর একটি জলাধার নির্ম্মাণ করিবে। ভারত এ ব্যাপারে যাহাতে বিদেশ হইতে অর্থসাহায্য পাইতে পারে, সেজন্য বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে।

যদিও ভারত সরকারের এই বিবৃতি অত্যন্ত অস্পষ্ট তবু উহা হইতে দুইটি মূল বিষয় বুঝা যাইতেছে। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে, পাকিস্থানে খাল কাটিবার জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার একটা অংশ ভারত সরকার বহন করিতে রাজি হইয়াছেন। অবশ্য তাহার পরিমাণ কত বিবৃতিতে জানান হয় নাই। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ইহার পরিমাণ ১১৭ কোটি টাকার কম হইবে না। আরও জানা গিয়াছে যে, ১৯৬৫ সনের পূর্ব্বে ভারতীয় এলাকায় নদীগুলির সম্পূর্ণ জল ভারতীয় এলাকায় সেচের জন্য আহরণ করা যাইবে না। এই সর্ত্তে সম্মতির অর্থ হইল, দরিদ্র ভারতের রাজকোষ হইতে পাকিস্থানকে শতাধিক কোটি টাকা "ভেট" দেওয়া এবং পাকিস্থানের জিদের নিকট নতি স্বীকারের দ্বারা ভারতের জলাভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলিকে সেচের জল হইতে বঞ্চিত করা। এ রকম সর্ত্তে তাঁহারা সম্মতি দিয়াছেন কেন সে রহস্য সাধারণের পক্ষে বাস্তবিকই দুর্ব্বোধ্য।

তবে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, খালের জল সংক্রান্ত বিরোধে ভারত সরকার প্রথম হইতে যে রকম ভুল নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন, আলোচ্য সিদ্ধান্ত তাহারই অনিবার্য্য পরিণতিমাত্র।

দেখা যাইতেছে যে, বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ অনুসারে ভারত সরকার সিন্ধু-অববাহিকার ছয়টি নদীপথে মোট জলের শতকরা আশী ভাগই পাকিস্থানকে একচেটিয়া ভাবে কেবল ভোগ করিবার অধিকারই দিতেছেন না, তাঁহারা পাকিস্থানের স্বার্থ পূরণের জন্য এক বিরাট আর্থিক দায়িত্বও মাথা পাতিয়া লইতেছেন।

পাকিস্থানের জন্য ভারতের স্বার্থত্যাগ আজ নূতন নহে, বিনিময়ে পাকিস্থান সকল প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ করিয়াছেন।

সুতরাং এ অনুমান করা কঠিন নয়, কাশ্মীরের বিরোধ-মীমাংসার ভার সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের উপর অর্পণ করিয়া ভারত যেরূপ বিপাকে পড়িয়াছে, খালের জলের মীমাংসার ভার বিশ্বব্যাঙ্কের উপর দিয়াও ভারত সেইরূপেই বিপাকে পড়িবে। কারণ দেখা যায়, বিশ্বব্যাঙ্ক যে দুইটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহার উভয়ই ভারত স্বার্থের প্রতিকূল এবং অপরপক্ষের অনুকূল। অথচ ভারত জানিয়া শুনিয়া ইহাই মানিয়া লইতে যাইতেছেন। ইহার জন্য সরকারের দুর্ব্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত নীতিই দায়ী।

পশ্চিম বাংলার প্রতি ভারত সরকারের নেকনজর

পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান খাদ্যাবস্থার ভয়াবহ রূপ দেখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার নাকি স্তম্ভিত হইয়াছেন! এতদিনে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল ইহাই আশার কথা। রাজ্য সরকার যে পরিমাণ চাউল ও গম চাহিয়াছিলেন, তাহা দিতে কেন্দ্র নাকি কোন কার্পণ্য করেন নাই। তৎসত্ত্বেও এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থা ঘটিল কেন—সে সম্পর্কে তাঁহারা স্বভাবতঃই বিস্ময়বোধ করিতেছেন। প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য এবং কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের সেক্রেটারী কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি এ সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্য-সচিবের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

সরকারী মহল এখন স্বীকার করিতেছেন যে, ধান-চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দ্ধারিত প্রশাসনিক ব্যবস্থাও অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহের স্বাভাবিক ব্যবস্থাও যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে সে কথা অস্বীকার করিবার আজ উপায় নাই।

কিন্তু কেন এমন হইল, উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকেই উহার তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে। পণ্ডিতজীর মতে চলতি বৎসরে ভারতে খাদ্যের উৎপাদন নাকি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই সংবাদে পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ স্বভাবতঃই জানিতে চাহিবে যে, খাদ্যের অবস্থা এত ভাল হইলে ভারত সরকার অন্য রাজ্য হইতে খাদ্য পাঠাইয়া পশ্চিম বাংলার বাজার প্লাবিত করেন নাই কেন? এরূপ ব্যবস্থা করিলে, এখানকার সম্পূর্ণ চাহিদা সাময়িকভাবে পূরণ করিয়া দিলেই এই রাজ্যের অভ্যন্তরে মজুতকারীরা সন্ত্রস্ত হইত এবং ধান-চাউল আটকাইয়া রাখিতেও সাহস করিত না।

পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান খাদ্য-সঙ্কটের সহিত ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরের তুলনা করা যাইতে পারে। সেবারও মন্বন্তরের পূর্ব্বে তৎকালীন সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঘোষণা করিলেও তাহা বলবৎ করার জন্য সেরূপ কড়াকড়ি করেন নাই। সেজন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ অমান্য করিয়াই প্রকাশ্যভাবে চড়া দরে লেনদেন চলিতেছিল। এবারও অবিকল এসব উপসর্গের উদ্ভব হইয়াছে। সেবারে তাঁহারা রাজনীতি কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারের কারণ কি? অথচ একথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবারের দুর্ভিক্ষও বর্ত্তমান কর্ত্তাদেরই সৃষ্টি।

এখনও কয়েকটি বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিলে খাদ্যনীতি সার্থক হইতে পারে। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইল, মজুতকারীদিগকে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করা। এসব ক্ষেত্রে মজুত চাউলের বাড়তি অংশ সরকার আটক করিলে মুনাফা-লোলুপ ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইবে। আর একটি বিষয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—যাহা সরকার এবারে একেবারেই করেন নাই, দেশের সর্ব্বত্র ন্যায্যদরের দোকান খুলিতে হইবে। কেবলমাত্র সরকারী রেশন খুলিয়া এতগুলি লোকের মুখে আহার জোগান যাইবে না। আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত উপরোক্ত কার্য্যসূচী কঠোরভাবে বলবৎ করিলে খাদ্যনীতি এখনও সফল হইতে পারে।

ভারত সরকারের দৃষ্টি প্রসারিত হউক। সুদূর দিল্লী হইতে কলিকাতায় যিনি আসিয়াছেন, তিনি যেন অপরের চোখে দ্রষ্টব্য-গুলি দেখিয়া যাইবেন না—দুর্গত বাঙালীর ইহাই অনুরোধ।

হাসপাতাল ও সমাজ

বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের প্রতি ঔদাসীন্য, নির্ম্মমতা, উপেক্ষা, নিষ্ঠুরতা, দুর্ব্ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনা যায়। এ সম্বন্ধে আলোচনাও বহুবার হইয়াছে, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। হাসপাতালগুলিতে সর্ব্বসাধারণের চক্ষুর অন্তরালে যাহা হয়, সব সময়ই তাহা জনসাধারণের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। রোগীদের পক্ষেও সে বিষয়ের খোঁজ লওয়া আরও কঠিন। কাজেই বহু অনাচার যে অন্তরালের অন্ধকারে থাকিয়া যায় ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যেগুলি সাধারণের গোচরে আসে, তাহারও অধিকাংশ প্রচারিত হয় না। এই সব বাদ দিয়াও যে সব তথ্য মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহাতেই আতঙ্কিত হইতে হয়।

সময়ে সঙ্কটাপন্ন রোগী সম্বন্ধে মনোযোগী না হওয়ায় মৃত্যু ঘটা, তৃষ্ণায় ছটফট করিয়াও জল না পাওয়া, প্রসূতির প্রসব-ব্যবস্থা যথা-সময়ে না হওয়াতে প্রসূতির জীবনান্ত ইত্যাদি অভিযোগ বিভিন্ন হাসপাতাল সম্বন্ধে মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি বড় রকমের দুর্নীতি যাহা বহু বড় হাসপাতালকেও অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা হইল, রোগীর পথ্য ও খাদ্য চুরি। এ অভিযোগ নূতন নহে। গুঞ্জন সর্ব্বত্রই শোনা যায়, কিন্তু হাতে-নাতে ধরিবার মত প্রমাণ থাকে না। সুতরাং মৌখিক অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষ হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। ফলে, দুর্নীতি প্রায় নির্ব্বাধ ভাবেই চলে।

যাহারা রুগ্নের মুখের গ্রাস অপহরণ করে, তাহাদের না হয় বুঝিতে পারি, কিন্তু যাহারা এইসব দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন তাহারাই

দুর্বোধ্য। ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়, অপরাধীর প্রতি এ কারুণ্যের উৎস কোথায়? এই প্রশ্রয়ের ফলেই তাহাদের দুষ্কার্য্যের সাহস বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোন সঙ্কোচই আজ আর তাহাদের অবশিষ্ট নাই।

সমাজ-দেহে আজ পচন ধরিয়াছে। এ পচন বিশেষ কোন অবয়বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহা কাটিয়া বাদ দেওয়া যাইত, কিন্তু সমগ্র দেহে সে অবকাশ কোথায়? সমাজের এই ব্যাধিত অবস্থা যে সত্যই দুশ্চিন্তাজনক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু দুশ্চিন্তার আরও বড় কারণ অন্যত্র আছে। রোগী যখন নিজেকে রুগ্ন বলিয়া বুঝিতে পারে না অথবা বুঝিয়া দুরারোগ্য ব্যাধি সম্বন্ধেও উদাসীন থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার কারণ তখনই হয়। সমাজের সর্ব্বস্তরে দুর্নীতি আছে, আর সেজন্য সমাজের সকলকে নাজেহালও কম হইতে হইতেছে না, তথাপি আশ্চর্য্য উদাসীনতার সঙ্গে সমস্ত সমাজ তাহা সহ্য করিয়া যাইতেছে। যেন যাহা হইতেছে তাহাই স্বাভাবিক, তাহাই নিয়ম।

কিন্তু সরকারও কি ব্যাধিগ্রস্ত? এ উদাসীনতা আর যাহারই সাজুক, সরকারের সাজে না। সরকারকেই এ জঞ্জাল সাফ করিতে হইবে। অসহায় জনসাধারণ আজ সেই প্রতীক্ষাই করিতেছে।

বর্ত্তমান যুবক ও ছাত্রদের নৈতিক পতন

বর্ত্তমান যুবক ও ছাত্রসমাজের অসভ্যতা এবং অভদ্র আচরণের কথা আজকাল প্রায়ই শুনা যাইতেছে। ভারতীয় রেলপথসমূহের জেনারেল ম্যানেজারদের নিকট প্রেরিত এক নির্দ্দেশনামায় রেলওয়ে বোর্ড এইরূপ আচরণ ও গুণ্ডামীর হাত হইতে ছাত্রী ও মহিলা যাত্রীদের রক্ষার জন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ছাত্রসমাজের বৃহৎ একাংশ আজ যেমন বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং মহিলা যাত্রীদের যত্রতত্র বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে সুরু করিয়াছে, রেলকর্ম্মচারীদের মধ্যেও তেমনি ভীরুতা ও গা বাঁচাইয়া চলার মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুইয়ের ফলে মহিলাদের—বিশেষতঃ ছাত্রীদের রেলভ্রমণ ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। এজন্য তাঁহারা রেলকর্ম্মচারীদের প্রয়োজনস্থলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের সাহায্য লইতে এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অন্যথায় অবহেলাপরায়ণ কর্ম্মচারীদের শাস্তি দিবার কথাও বলা হইয়াছে।

সমগ্র সমাজ-মনস্তত্ত্বই আজ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। শুধু ট্রেনে নয়, ট্রাম-বাস, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, সর্ব্বত্র যুবসমাজের ব্যবহার উত্তরোত্তর শালীনতা ও শিষ্টতার বিরোধী পথে চলিতেছে। কলিকাতার সন্নিহিত সহরতলীগুলি গুণ্ডামীর লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি নয়টার পর মফঃস্বল ষ্টেশনগুলিতে মেয়েদের লইয়া নামিবার উপায় নাই, তাহারা জোর করিয়া গায়ের গহনা ছিনাইয়া লয়। বাধা দিবারও কোন উপায় নাই। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই সব গুণ্ডাদের পোষণ করেন ইহাও প্রমাণিত সত্য। সুতরাং রাজনীতির দৌরাত্ম্যে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের বাঁচিবার উপায় নাই, এক শ্রেণীর যুবকও ইহাদের সহিত পাল্লা দিয়া অত্যাচার সুরু করিয়াছে। ইহাদের উৎপাতে মেয়েদের পথে পা দেওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইতেছে। উহাদের এই নৈতিক অবনতির কারণ যাহাই থাক, শাসনের দ্বারা সে গতিপথ বন্ধ হইবার নহে। সেজন্য চাই জাগ্রত ও প্রাণবন্ত নেতৃত্ব—যা বিপুল শক্তিতে তরুণ সমাজকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংগঠনের পথে আকর্ষণ করিবে। আজ তাহারই অভাব। যাহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া, যুবশক্তি একদিন দলে দলে দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে, আজ তাহাদের এই শোচনীয় কুৎসিত রূপ আমরা চোখের উপরই প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং দোষ দিব কার? দোষ শুধু যুবকদের উপর চাপাইলেই বা চলিবে কেন? সংশোধন করিতে হইলে, একেবারে মূল ধরিয়া নাড়া দিতে হইবে। নিজেদের গলদ দূর করিতে না পারিলে, তাহাদের মানুষ করা যাইবে না।

আজকাল প্রায় এই অভিযোগই শুনিতে পাই, স্কুল কলেজে নাকি ভাল পড়াশুনা হয় না—যাহার ফলে ফেলের সংখ্যা ক্রম-বৃদ্ধি হারে বাড়িয়াই চলিয়াছে। শিক্ষকদের উপর সম্পূর্ণ দোষ চাপাইয়া কৌশলে আমরা যে ভাবেই নিজেদের এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করি না কেন, অভিভাবকদের গাফিলতি এবং প্রশ্রয়ের ফলেই ছেলে-মেয়েরা উচ্ছন্নে যাইতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আগে ছেলেরা পড়াশুনা করিত—এদিক দিয়া বাঙালী ছেলেদের সুনামও ছিল। জ্ঞানে, গুণে, দক্ষতায় বাঙালী ছেলের কৃতিত্ব ছিল এককালে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজ তাহারা চাকুরি করিতে গিয়া প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে আমাদেরও ধারণা ছিল, বুঝি বা বাঙালী বলিয়াই অবিচার করা হইতেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি যে, কোন যোগ্যতাই তাহাদের নাই! প্রকৃত শিক্ষা যাহাকে বলে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞানও তাহাদের নাই। আক্ষেপের বিষয়, অভিভাবকরা সে কথা আজও মানিতে চাহেন না।

ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধি বলিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? আজ যে আচরণ তাহাদের শোভা পাইতেছে, কাল অভিভাবকহীন হইলে তাহারা দাঁড়াইবে কোথায়? এ কথা আজ অভিভাবকদেরও বুঝিবার দিন আসিয়াছে। নহিলে তাঁহাদেরই প্রশ্রয়ে ছেলে 'মানুষ' না হইয়া 'গুণ্ডার' সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। কেবল 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বলিয়া চীৎকার করিলেই দেশ তৈরি হইবে না, দেশ ত শুধু মাটিই নয়—দেশ যাহাদের লইয়া—সেই যুবকদেরই আগে মানুষ হইতে হইবে, তবেই দেশ তৈরি হইবে।

গণতন্ত্রের পথে নেপাল

নেপালী কংগ্রেসের নেতা শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালা এবং তাঁহার সহকর্মীগণের শপথগ্রহণ ও মন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রশাসিত নেপাল গণতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করিয়াছে। নেপালের ইতিহাসে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই সর্ব্বপ্রথম দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

আট বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত রাজা ত্রিভুবন যখন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলনের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছিলেন তখন কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই, সেই প্রতিশ্রুতি কবে, কি ভাবে কার্য্যে রূপায়িত হইবে। সেই দিন হইতে এই কয় বৎসর ধরিয়া নেপালে যে রাজনৈতিক ডামাডোল চলিয়াছিল, অনেকে তাহার পর আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, গণতন্ত্রের নামে এই রকম জঘন্য দলাদলি ও ব্যক্তি-স্বার্থের খেলা দেখিয়া নেপালের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবে। ঐ সময়ের মধ্যে এক মন্ত্রীদল ক্ষমতায় আসীন হইয়া প্রকৃত কোন কাজ করিবার পূর্ব্বেই বিরোধীদলসমূহের কারসাজির ফলে অসময়েই গদিচ্যুত হইয়াছেন। এক রাজনীতিক নেতাকে গলাধাক্কা দিয়া রাজনীতিক মঞ্চ হইতে বাহির করিয়া দিবার অপচেষ্টায় অন্য নেতারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন। নেপালী জনগণের কাছে এক রাজনীতিক দল অপর দলের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, নেপালের সাধারণ লোক এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ও বিভ্রান্তিকর ঘটনার মধ্যেও গণতন্ত্রের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস অটুট রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অবশেষে, ১৯৫০-৫১ সনে রাণাশাহীর বিরুদ্ধে বিপ্লব যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের ক্ষীণ সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল, তাহা এবার বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নেপালের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া তাহা শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে।

নেপালী কংগ্রেস বিগত নির্ব্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণের অধিকারও লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনই সেই অধিকারে নেপালী কংগ্রেসের সদস্যেরা মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করিতেছেন না। কারণ, নেপালের পূর্ণাঙ্গ পার্লামেণ্ট গঠিত না হইলে, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অনুসারে কাজ হইতে এখনও প্রায় দুই মাস সময় লাগিবে। রাজা মহেন্দ্র ইচ্ছা করিলে এই দুই মাস পর্য্যন্ত তাঁহার মনোনীত আটজন মন্ত্রী লইয়া শাসনকার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা এবং নেপালের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার জন্য অবিলম্বে মনোনীত মন্ত্রিবর্গকে বিদায় দিয়া জনগণের প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার এই উদার মনোভাব এবং প্রজা-সাধারণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁহাকে নেপালের রাজনীতিক ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে।

নেপালের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতা বহু যুগ পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কেবল ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতাই নহে, নেপালের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পর্কও ভারত-নেপাল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নেপালের বৈষয়িক উন্নতি এবং রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি ভারতেরও একান্ত কাম্য। গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত হইলে নেপাল একটি শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্ররূপে আন্তর্জাতিক জগতেও সম্মানের স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

ডিপ্লোমা সংগ্রহে দুর্ভোগ

টাকা জমা দিয়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ডিপ্লোমা পাওয়া একরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আজ পাঁচ মাস ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই ব্যাপারে প্রায় নিষ্ক্রিয় রহিয়াছেন—এইরূপ সংবাদ 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতেছি, তাঁহারা আরও বলিয়াছেন—বিশেষ ভাবে তদ্বির তদারক করিলে তাঁহারা নাকি একটু তৎপর হন এবং 'আর্জেন্ট' ফী জমা দিলে ডিপ্লোমা সহজলভ্য হয়। তদ্বির-তদারক করিয়া সেখানকার কর্ত্তাব্যক্তিদের কাছে ধরনা দিবার ভাগ্য সকলের নাই, কেবল ভাগ্যবানেরা সেই সুযোগ লাভ করিতে পারেন। আর 'আর্জেন্ট' ফী ব্যাপারটি আরও বিচিত্র! 'ডিপ্লোমা' যাঁহারা লইতে আসেন তাঁহাদের প্রয়োজন জরুরী—ইহা না জানিবার কথা নয়। তাড়াতাড়ি চাই, দুই পয়সা বেশী দিলেই তাড়াতাড়ি মিলিবে। আমাদের শুনিতে লজ্জা লাগে, তাঁহাদের বলিতে লজ্জা নাই।

শোনা যায়, পরীক্ষার সময় পরীক্ষার কাজে এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের একান্তভাবে নিয়োগ করার ব্যবস্থা নাকি অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পরীক্ষা প্রতি বৎসর হইবে এবং এই কাজে অধিকসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনও দেখা দিবে—ডিপ্লোমার চাহিদাও কোনদিন কমিবে না। সুতরাং এই অব্যবস্থা চলিতেই থাকিবে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই অব্যবস্থার আশু প্রতিকার আবশ্যক।

অবশ্য প্রসঙ্গতঃ একথাও বলিতে পারি, অনেকের দুই বৎসর কি ততোধিক বৎসর পরে 'ডিপ্লোমা' সংগ্রহের কথা মনে পড়ে। ইহাও পড়িত না, যদি চাকুরীর সম্ভাবনা না থাকিত। সময়ে ইহা সংগ্রহ না করিলে, তাহাকে ফাইল হইতে উদ্ধার করা কত কঠিন ইহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রে সহযোগিতা না থাকিলে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিচার সেই দিক দিয়াই করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিত্ত সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিত্ত সংস্থা ১৯৫৪ সনে স্থাপিত হয় প্রধানতঃ ক্ষুদ্রশিল্পকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য। বেসরকারী শিল্পসংস্থাকে ২৫,০০০ হাজার হইতে ১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়ার অধিকারী এই রাজ্যবিত্ত সংস্থা। ভারতে দীর্ঘমেয়াদী শিল্পমূলধনের অভাব সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু নূতন তথ্য এই যে, এই অভাব আপেক্ষিক মাত্র। বর্ত্তমানে শিল্পপতিদের অভাব অধিকতরভাবে

পরিলক্ষিত হইতেছে এবং মূলধনের সরবরাহ থাকিলেই শিল্প আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিত্ত সংস্থার কার্য্যাবলী হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। গত পাঁচ বৎসরে এই সংস্থা মাত্র দুই কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করিয়াছে; ইহার মধ্যে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে এবং শিল্পপতিরা ৫১ লক্ষ টাকা ঋণ লইতে অস্বীকার করিয়াছে।

ঋণের স্বল্পতা সম্বন্ধে ম্যানেজিং ডিরেক্টার তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্টে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমতে গত দুই বৎসরে বিত্ত বিনিয়োগ করার অবস্থা অনুকূল ছিল না, সেই কারণে শিল্পপতিদের ঋণ লওয়ার আগ্রহ কম ছিল। শিল্পোন্নতির গতি হ্রাস পাওয়ার ফলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই সহজ সরল ব্যাখ্যা বাংলাদেশের স্বল্পায়তন শিল্পপতিরা গ্রহণ করিতে নারাজ। ১৯৫৪-৫৫ সনে ৮০টি ঋণের আবেদনের মধ্যে ৭৪টি আবেদন অগ্রাহ্য হইয়া যায়। পরের বৎসরে ৯৭টি আবেদনের মধ্যে মাত্র আটটি শিল্পসংস্থাকে কর্তৃপক্ষ ঋণদানের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। নিজেদের দোষকে ঢাকিতে গিয়া বিত্তসংস্থার কর্তৃপক্ষ শিল্পপতিদের উপর দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতে শিল্পবিত্ত বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ-বিমুখ হইয়া উঠিতেছেন এবং ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বেসরকারী শিল্পকে মূলধন দিয়া সাহায্য করার জন্য যে সকল বিভিন্ন বিত্তসংস্থা স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে শিল্পপতিরা আশানুরূপ পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন না।

কিন্তু বেসরকারী শিল্পপতিদের মতে বিত্তসংস্থার ঋণদানের সর্ত্তসমূহ এত কঠিন এবং সুদের হার এত অত্যধিক যে, তাহাতে টাকা ধার লওয়া দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যবিত্ত সংস্থা সাধারণতঃ স্থায়ী সম্পত্তি চায় ঋণদানের জন্য, যেমন জমি, বাড়ী, কলকারখানা ইত্যাদি। বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের মাত্র ৫০ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়, এবং সুদের হার বৎসরে সাত শতাংশ, এবং তিন মাস অন্তর প্রদেয়। বন্ধকী সম্পত্তি যেখানে জমি কিংবা বাড়ী সেখানে স্বচ্ছন্দে মূল্যের ৮০ শতাংশ পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া যাইতে পারে। যদিও ঋণদান বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং ঢালাওভাবে ঋণদান করা উচিত নহে, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঋণদান বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিত্ত সংস্থা প্রাচীন ব্যাঙ্কিং নীতি অনুসরণ করিতেছে। ইহার প্রধান কাজ দেশের শিল্পোন্নয়নকে সাহায্য করা, কিন্তু সে উদ্দেশ্য ইহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে এবং কার্য্যতঃ ইহা একটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহা অভিযোগ করিয়া আসিতেছে যে, শিল্পপতিরা টাকা যথেষ্ট পরিমাণে ধার লইতেছে না। কিন্তু সম্ভবপর উপায়ে টাকা ধার না দিলে শিল্পমালিকরা ধার কেমন করিয়া লইবেন? আর যদি শিল্পসংস্থাগুলি টাকা ধার লইতে বিমুখতা প্রদর্শন করে তাহা হইলে এই বিত্তসংস্থার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। পাঁচ বৎসরে মাত্র ১'২৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া কোনও কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। হাওড়া অঞ্চলে বহু ছোট ছোট লোহার কারখানা আছে, কিন্তু তাহারা ঋণ পায় না যেহেতু তাহারা ভাড়াটিয়া বাড়ীতে কারখানা স্থাপন করিয়াছে। চা-বাগানগুলিকে পুনরায় নূতন চা-গাছ লাগানোর জন্য ঋণদানের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিত্তসংস্থা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে?

সর্ব্বশেষে আমরা জানিতে চাহি ঋণদানের যোগ্যতা বিচার করিতেছেন কে বা কাহারা?

হাসপাতাল সংস্কারে সরকার

কালনার 'ভাগীরথী' নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন:

"কালনা শহরে একটি পঞ্চাশ-বেডের স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্ব্বে রাজ্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কর্তৃক কালনার নানা স্থানে হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্থান নির্ব্বাচনে প্রায় তিন-চার বৎসর অযথা নষ্ট হইল। এই তিন-চার বৎসরের মধ্যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান অধিকর্ত্তাগণও বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করিয়া হাসপাতালের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট বা মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সর্ব্বশেষে তাঁহারা যে স্থানটি (নিভুজীর নিকটস্থ নূতন সড়কের পার্শ্বে) নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বর্ত্তমানে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। নির্ব্বাচিত জমিগুলি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে জমির মালিকগণ হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট জমিগুলি হস্তান্তরিত করিতে জমির মালিকগণ মোটেই আগ্রহশীল নহেন, কেননা, এমন অনেক জমির মালিক আছেন, যাঁহাদের কাছ হইতে ঐ জমি অধিগ্রহণ করিলে তাঁহারা একেবারে নিঃসম্বল ও ভূমিহীন হইয়া নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

"এমত অবস্থায় রাজ্য সরকার যদি নূতন কোন জমি সংগ্রহ না করিয়া পুরাতন হাসপাতালটিকে বর্দ্ধিত করার আয়োজন করেন তবে বিশেষ ভালই হইবে। রাজ্য সরকারকে অনর্থক কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইবে না। শহরের অধিবাসিগণ রোগমুক্তি ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নিশ্চয়ই চাহেন। মনোরম স্থানে হাসপাতাল অবস্থিত না হইলেও তাঁহাদের রোগমুক্তির পথে কোন বাধা থাকিবে না। পুরাতন হাসপাতালটি মিশনারীগণ কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত হইয়াছিল এবং দীর্ঘদিন বহু সুচিকিৎসক এই হাসপাতালের সহিত যুক্ত থাকিয়া এতদঞ্চলের জনসাধারণের সেবা করিয়াছেন। গত দ্বিতীয় মহাসমরের কিছু পূর্ব্বে হাসপাতালটি মিশনারীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। বর্ত্তমানে হাসপাতালটিতে একমাত্র ডাক্তার ব্যতীত অন্যান্য ষ্টাফ প্রায় পঞ্চাশ-বেডের হাসপাতালের অনুরূপ রহিয়াছে।

"রাজ্যসরকার নূতন বিল্ডিং তৈরীর হাঙ্গামা না করিয়া হাসপাতাল-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিরাট গৃহ নিজ দখলে আনিয়া কিছু

সংস্কার করিলেই এই শহরের হাসপাতাল-সমস্যা অনায়াসে মিটিতে পারে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, হাসপাতাল-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আবাসগৃহ স্থানীয় উদ্বাস্তুগণ কর্ত্তৃক জবর-দখল হইয়া রহিয়াছে। এই সকল উদ্বাস্তুগণ প্রায় সকলেই শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী ইত্যাদির দ্বারা দিন গুজরাণ করিতেছে এবং অনেকেই নিজ নিজ গৃহ সরকারী ঋণে করিতে সক্ষম হইয়াছে। অথচ স্বাস্থ্যবিভাগ অযথা ঐ আবাসগৃহগুলির খাজনা ও অন্যান্য খরচাদি বহন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

"স্বাস্থ্যবিভাগ বাড়ীগুলি উদ্বাস্তুদের হস্ত হইতে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া হাসপাতালটির যথার্থ সংস্কারসাধন করুন। পুরাতন স্থানে রাস্তা এখন ভাল হওয়ায় যাতায়াতের কোন অসুবিধা নাই।"

শিয়ালদহ ষ্টেশনের উদ্বাস্তু সমস্যা

শিয়ালদহ ষ্টেশনের অবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে উদয় হয়, ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বুঝি কাহারও নাই। দীর্ঘ বারো বৎসর পরেও ষ্টেশনটিতে সহস্র সহস্র বাস্তুহারা নরনারী তথাকথিত ঘর-সংসার পাতিয়া দুর্গত জীবন যাপন করিতেছে। যে ভাবে ইহারা ষ্টেশন জুড়িয়া ছড়াইয়া আছে, তাহা দেখিতেও লজ্জা করে। মানবিকতার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা, অমানুষিক পরিবেশে মানুষের এই 'স্থায়ী বসবাস' লক্ষ লক্ষ রেলযাত্রীকে নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। শুধু প্রত্যক্ষই নয়, তাহাদের যাতায়াতের পথটিও ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এইসব স্থায়ী বাসিন্দা কাহারা? ইহাতে উদ্বাস্তু সার্টিফিকেটধারী পরিবার আছে, ক্যাম্প হইতে আগত উদ্বাস্তু রহিয়াছে, মাইগ্রেশন ও বর্ডার স্লিপ লইয়া আগত মানুষও এখানে রহিয়াছে। পুনর্ব্বাসন আইন-কানুনের খুঁটিনাটির কথা তুলিয়া ইহাদের পুনর্ব্বাসন দানের দায়িত্ব যে কেন্দ্রীয় সরকার এড়াইতেছেন তাহাও খবরের কাগজে দেখিতেছি।

কিন্তু উদ্বাস্তু সংজ্ঞায় পড়ুক বা না পড়ুক, ইহারা ত মানুষ। মানুষের প্রতি সহজ মানবিক দায়িত্ববোধ হইতেও ত ইহাদের বসবাসের ও জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই কর্ত্তব্য। রেল ষ্টেশনের মালিক কেন্দ্রীয় সরকার। ষ্টেশনটি পরিচ্ছন্ন রাখা, যাত্রিসাধারণের যাতায়াতের পথ সুগম ও ভদ্র করিয়া রাখা, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব। যে অব্যবস্থার ফলে ষ্টেশনটি প্রায় নরককুণ্ডে পরিণত হইয়াছে, তাহা রেল-যাত্রিগণ সৃষ্টি করে নাই—সেই দায়িত্বের বড় অংশই সরকারের। যে করিয়াই হউক, শিয়ালদহ ষ্টেশনটিকে মুক্ত করিতেই হইবে। আশ্রয়হীন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দান করার দায়িত্ব—তাহা যত বড় জটিল এবং গুরুতরই হউক সরকারকেই পালন করিতে হইবে। সরকারের দায়িত্ব পালনের অক্ষমতার জন্য ষ্টেশনের পরিবেশ, দৃশ্য অসহনীয় ও নারকীয় করিয়া রাখিয়া এই ষ্টেশনের রেলযাত্রিগণকে সাজা দিতে হইবে, এই বা কেমন কথা?

বিদ্যালয় সংস্কারে জেলা স্কুল-বোর্ড

"গত ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ভয়ঙ্কর বন্যার কথা ভুলিবার নয়। এই বন্যায় অন্যান্য সকল শ্রেণীর গৃহের সহিত বহুসংখ্যক বিদ্যালয়-গৃহও বিধ্বস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ সকল বিদ্যালয়-গৃহ মেরামত অথবা পুনর্নির্ম্মাণের জন্য রাজ্যসরকার অর্থ মঞ্জুর করেন, এবং জেলা স্কুল-বোর্ডের উপর উক্ত অর্থব্যয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করেন। কয়েকটি ঘটনায় প্রকাশ, জেলা স্কুল-বোর্ড উক্ত অর্থব্যয় ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ফলে এই ব্যাপারে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

"বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন সময়ে রাজনৈতিক স্বার্থে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের একটি নাম-তালিকা প্রণয়ন করা হয়। বাস্তব অবস্থার সহিত ঐ নাম-তালিকার যে কোন সম্পর্ক নাই, জেলা স্কুল-বোর্ডের একটি বিজ্ঞপ্তিতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৬ সনের পর আজ ১৯৫৯ সনের জুন মাস। এই দীর্ঘকালের মধ্যেও ঐ গৃহনির্ম্মাণের অর্থ ব্যয়িত হয় নাই, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ দ্বারা কোন কাজই হয় নাই।"

"বর্দ্ধমানের ডাক" প্রদত্ত সংবাদটির প্রতি আমরা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

হাওড়া পৌরপ্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনে পরিবর্ত্তিত

সংবাদটি দিতেছেন বালির 'সাধারণী' পত্রিকা:

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাওড়া পৌরপ্রতিষ্ঠানকে 'কর্পোরেশনে' পরিবর্ত্তিত করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে হাওড়ার পার্শ্ববর্তী পৌর অঞ্চলেরও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করে এরূপ প্রস্তাব উঠেছে যে হাওড়া ও বালী পৌরসভাকে একত্রিত করে একটি বৃহৎ কর্পোরেশন গঠন করলে কাজের সুবিধা হয় এবং উভয় অঞ্চলেরই উন্নতি হতে পারে। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার তাঁদের মতামত জনসাধারণের উপর চাপিয়ে না দিয়ে বালীর পৌরপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মতামত জেনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা স্থির করে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা না হলেও এ সম্বন্ধে অনেকে যে অবহিত হয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করছেন তা অত্যন্ত আশার কথা। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ পাচ্ছে। সংবাদে যতদূর জানা যায় সাধারণভাবে এই তিন শ্রেণীর মত ব্যক্ত হচ্ছে: (১) কতকাংশ কর্পোরেশন গঠনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন, (২) কতকাংশ সরাসরি কর্পোরেশন গঠনের পক্ষপাতী, (৩) আর এক দল সামঞ্জস্য করে কতকগুলি সর্ত্ত-সাপেক্ষে কর্পোরেশন চান।

"সকল মতাবলম্বী দলই নিজেদের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করেছেন। বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য না করে ইহাই

বলা যায় যে, কলিকাতা মহানগরীর অতি নিকটেই হাওড়া জেলা, বিশেষতঃ হাওড়া ও বালী পৌর অঞ্চল শিল্পপ্রধান হিসাবে বিস্তার লাভ করছে। স্বভাবতঃই বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বসতি এবং লোকসংখ্যাও বেড়ে চলেছে। আজ যখন সর্বত্র উন্নতির আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে এবং নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তখন তার সুযোগ গ্রহণ করে নিজ নিজ অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সকলেই কামনা করে।"

মেমারী-মন্তেশ্বরে পাকা রাস্তা

'বর্দ্ধমানের বাণী' জানাইতেছেন :

"মেমারী-মন্তেশ্বর রাস্তার কুসুমগ্রাম হইতে কালনা-কাটোয়া রাস্তার পাটুলি ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি ১৮ মাইল দীর্ঘ রাস্তা কুসুমগ্রাম ইউঃ, পুটশুড়ি ইউঃ, মুকসিমপাড়া ইউঃ, নিমদহ ইউঃ ও পাটুলি ইউনিয়নের প্রায় একশতখানি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তাটি বর্ষার জন্য ছয় মাস অব্যবহার্য্য থাকে। আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কাঁচা রাস্তাটি পাকা করিয়া দিলে এই অঞ্চলের জনসাধারণের প্রভূত উপকার হইবে। রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানের লোকজনকে ৮.৯ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া কুসুমগ্রাম বাস কিংবা পাটুলি ষ্টেশনে গিয়া মোটর কিংবা ট্রেণে চাপিয়া যাতায়াত করিতে হয়। সরকার নিজ হস্তে এই কাঁচা রাস্তাটি পাকা করিয়া নির্ম্মাণের ভার লইলে এবং আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিলে প্রায় শতাধিক গ্রামবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।"

সংবাদটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মুর্শিদাবাদের আম

বহরমপুরের 'জনমত' জানাইতেছেন :

"মুর্শিদাবাদ জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। পার্শ্ববর্তী জেলা মালদহের তুলনায় যদিও আমাদের জেলা প্রাচুর্য্যের জন্য খ্যাত নহে, তথাপি নানা জাতের যত আম এখানে ফলিয়া থাকে, বাংলা দেশ কেন ভারতবর্ষের কোথাও এত রকমারি আম ফলে না বলিয়াই আমরা জানি। শ্রেণী এবং স্বাদ-বৈচিত্র্যে এ জেলার আম শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অনায়াসেই করিতে পারে। বৈশাখ হইতে সুরু করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত আহার্য্যের বস্তুর যখন দর চড়িতে থাকে এবং এই চড়া দর সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন একমাত্র আম, জাম, কাঁঠালই পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া দরিদ্র জনসাধারণকে বাঁচাইয়া রাখে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের পর হইতে জেলায় আমের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। কারণ জমিদারী চলিয়া যাওয়ার ভয়ে বহু জমিদার তাঁহাদের জমির আম গাছ কাটিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। নূতন করিয়া আম গাছ রোপণের ব্যবস্থা না হইলে ধীরে ধীরে জেলায় আমের ফলন কমিয়া আসিবে সন্দেহ নাই।"

সরকারী হাসপাতালের অবস্থা

জলপাইগুড়ির 'জনমত' জানাইতেছেন :

"জলপাইগুড়ি জেলার মাল থানার অন্তর্গত ৫নং চেংমারী ইউ-নিয়নের সরকারী হাসপাতাল চরম ঔদাসীন্য ও অব্যবস্থার ফলে প্রায় অবলুপ্তির সম্মুখীন। ১৯১০ সনে স্থাপিত এই চিকিৎসা-কেন্দ্র এতদঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি কল্যাণ-ধর্ম্মী প্রতিষ্ঠান। পূর্ব্বে সরকারী হাট তহবিল ও জেলাবোর্ড হইতে আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি পুষ্ট হইত। জেলা বোর্ডের আয় হ্রাস পাইলে চিকিৎসালয়টি পরিচালনার জন্য জেলা বোর্ড হইতে বাৎসরিক ৫০্ টাকা, হাট তহবিল হইতে ৪০০্ টাকা ও ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের তহবিল হইতে ২৫০্ টাকা পাওয়া যাইত। বাকী অর্থ স্থানীয় জোতদারদের নিকট হইতে চাঁদা লইয়া সংগ্রহ করা হইত। ১৯৫০ সনের প্রবল বন্যায় ডাক্তার-খানা ও ডাক্তারবাবুর বাসগৃহ উভয়ই তিস্তাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তাহার পর হইতে অদ্যাবধি অর্থাভাবে ডাক্তারখানা, ঘরবাড়ী ও ডাক্তারবাবুর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। ডাক্তারখানা গৃহ নির্ম্মাণের এক প্রচেষ্টা হিসাবে একটি টিনের দোচালা ঘর তৈয়ারি করা আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু তাহাও অর্থাভাবে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানীয় জোতদার শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় তাঁহার গৃহে সাময়িকভাবে ডাক্তারখানাটি চালু রাখার ব্যবস্থা হয় এবং অপর এক জোতদার শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য পরিবারসহ ডাক্তারবাবুকে নিজ গৃহে বসবাসের সুযোগ দেন। এভাবে বহু অসুবিধা সত্ত্বেও ডাক্তারখানার কাজ বন্ধ হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ১৯৫৭ সনে ডাক্তারবাবু দীর্ঘ ৪২ বৎসর চাকুরীর পর যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। পরিতাপের বিষয় যে, সুনামের সহিত এই দীর্ঘকাল এখানে চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী ডাক্তারবাবুর দেড় বৎসরের মাহিনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু রোগাক্রান্ত হইবার পর হইতেই আলমারীতে ৩,০০০্ টাকা মূল্যের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তালাবদ্ধ অবস্থায় আজ পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। অর্থাভাবে নূতন ডাক্তার নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই।"

স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের এ সম্বন্ধে কি কিছুই করণীয় নাই? সরকারের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

ত্রিপুরায় মৎস্যচাষ

আগরতলার 'সেবক' হইতে আমরা নিম্নের সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ত্রিপুরায় প্রচুর। সম্ভাবনা এত প্রচুর যে, এখানে রীতিমত ভাবে মৎস্য চাষ হইলে ত্রিপুরার চাহিদাই কেবল মিটিবে না, মৎস্য এখান হইতে রপ্তানীও হইতে পারে।

তবে কেন এখানে মৎস্য চাষ হয় না এই প্রশ্নই করিতে হয়। মৎস্য চাষ না হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ ত্রিপুরায় অন্যান্য ভাল

কাজ যে সমস্ত কারণে হইতে পারে না মৎস্য চাষের বেলায়ও সেই কারণ রহিয়াছে। লাল ফিতা, কর্মে শৈথিল্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের দাপটে বানচাল হইতে চলিয়াছে।

"রুদ্রসাগর কিসারী স্কীমের কথা কে না জানে? মৎস্য চাষ করিলে ত্রিপুরার অনেক রুদ্রসাগর স্কীম কার্য্যকরী করা যায়। কিন্তু করিবে কে? এক ডিপার্টমেন্টের স্কীম আর এক ডিপার্টমেন্ট রূপায়ণে মাথা ঘামাইবে কেন? পূর্ত্তবিভাগ সংস্কারের টেকনিকেল বিভাগ। সরকারী নিয়মে বাঁধ নির্ম্মাণ, টেঙ্ক খনন, স্লুস গেট নির্ম্মাণ, জলাশয় সংস্কার ইত্যাদি কাজ পূর্ত্ত বিভাগকে করিতে হয়। প্রকাশ, কি পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কি ত্রিপুরা প্রশাসনের ফিসারী ডিপার্টমেন্টের ফিসারী স্কীমগুলি রূপায়ণে পূর্ত্ত বিভাগ মোটেই উৎসাহ প্রকাশ করে না। রুদ্রসাগর স্কীমে নাসারী, টেঙ্ক, বাঁধ ইত্যাদি কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সনে ৭৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। তিন বছর চলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। স্লুস গেটের জন্য আড়াই লক্ষ টাকার স্কীম নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে মঞ্জুর হইয়াছে। এই স্লুস গেটের কথা ১৯৫২ সন হইতেই শুনা যায়। এই স্লুস গেটের কাজ কবে নির্ম্মাণ হইবে কে জানে।"

জনসাধারণের দিক হইতে এ সম্বন্ধে আন্দোলন হওয়া দরকার।

কৃষকদের অভিযোগ

'বারাসাত পত্রিকা' নিম্নের সংবাদটি দিতেছেন :

"বারাসতের কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক সরকারী বীজধান্যের প্রত্যাশায় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে আবেদন-নিবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মাত্র নহে, অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনে যে কৃষকদের হাতে-কলমে এবং প্রচার পত্রিকায় শিক্ষাদানের কোটি কোটি টাকা খরচ হইতেছে, —সেই কৃষকদের প্রতি ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসের অসৌজন্যমূলক আচরণ কৃষকদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। নিরুপায় কৃষকেরা একান্ত নিরুপায় হইয়া 'বারাসাত বার্ত্তা' সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখিয়া কৃষকগণ তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা জানাইয়াছেন। পত্র প্রেরকগণের মধ্যে মাত্র তিন জন ব্যতীত আর সকলে টিপসহি দিয়াছেন। নিরক্ষর কৃষকদের নিকট রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর দ্বার অজ্ঞাত এবং তাঁহারা (পত্রপ্রেরকগণ) বিষয়টির প্রতি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ও বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।"

পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্থানী

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ বিবৃতি দিয়াছেন—

ভারতে বিদেশীদের অবস্থান ও গতায়াত-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দুই বৎসর আগে যে আইন প্রণীত হইয়াছিল, তদনুযায়ী প্রধানতঃ কলিকাতা অঞ্চলে পাকিস্থানী নাগরিকদের সংখ্যানিরূপণ ও তাঁহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের কাজ ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে কি ভাবে ব্যাহত হইতেছে, তাহারই এক চমকপ্রদ তথ্য বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

প্রকাশ ঐ কাজের জন্য ১৯৫৭ সনে বিশেষ এক গোয়েন্দা পুলিশবাহিনী নিয়োগ করা হয় এবং তাঁহারা এই মহানগরীর প্রত্যেকটি মহল্লা ও বিভিন্ন রাস্তা বরাবর পাকিস্থানীদের সংখ্যা নিরূপণের জন্য আদমসুমারী করিয়া এক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নাকি এক আকস্মিক নির্দ্দেশ আসে যে, ঐরূপ আদমসুমারী করা ঠিক হইবে না, উহার ফলে পাকিস্থানে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও কোন কোন দল কংগ্রেস সরকারের বিরূপ সমালোচনা সুরু করিবে। পক্ষান্তরে রাজ্যসরকার ঐ সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেন এবং উপরোক্ত গোয়েন্দা বিভাগ ঐ সনের মে মাস হইতে ঐ আদমসুমারীর কাজ সুরু করেন।

গত দুই বৎসরে ঐ বিভাগ নানারূপ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কলিকাতার এক লক্ষ সংখ্যালঘুদের গৃহে উপস্থিত হইয়া উক্ত আদমসুমারী পরিচালনা করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র ১১ হাজার মুসলমানকে পাকিস্থানী নাগরিক বলিয়া সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে। কিন্তু উক্ত বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ় ধারণা যে, কলিকাতায় অবস্থানকারী পাকিস্থানীদের প্রকৃত সংখ্যা উপরোক্ত সংখ্যা হইতে অন্ততঃপক্ষে চারগুণ বেশি।

ভারতের বনভূমির অত্যল্পতা

ভারতের বনভূমির পরিমাণ স্বাভাবিক নহে, ইহা অত্যল্প। অন্যান্য দেশে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ। ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ২০ শতাংশ। এই বনভূমির আবার পাঁচ-শতাংশ বিক্ষিপ্ত এবং ইহা রক্ষিত না হওয়ার ফলে জনসাধারণের অবাধ ব্যবহারের ফলে ক্ষয়িষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে কার্য্যকরী বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ষোল-শতাংশ। আন্তর্জ্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অভিমতে ভারতবর্ষে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির অন্ততঃ ত্রিশ-শতাংশ হওয়া উচিত। বর্ম্মাদেশে বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ত্রিশ-শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ষাট-শতাংশ। বনভূমির উন্নয়ন বর্ত্তমানে একটি শিল্প হিসাবে পরিগণিত।

সুতরাং ভারতবর্ষেও পরিকল্পিত উপায়ে বনভূমির বৃদ্ধি, বিন্যাস ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বনজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে আমাদের কাগজ শিল্পের জন্য যে বিদেশী কাঁচামাল আমদানী করিতে হয় তাহার আর প্রয়োজন হইবে না এবং ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাঁচিবে। অধিকন্তু চামড়া কষানোর ব্যাপারেও বনজ উৎপাদন সাহায্য করিবে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনজ উৎপাদন হইতে বহু রকম উপকার পাওয়া যায় এবং সেই সকল বিষয়ে এই বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিবেন। ভারতের বিরাট বনভূমির অনেক শিল্প সম্ভাবনা আছে এবং আধুনিক উপায়ে তাহাকে কার্য্যকরী করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে যদিও কয়েক বৎসর

হইল কেন্দ্রীয় সরকার বনবৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। যদিও ফলাও করিয়া প্রতি বৎসর বনমহোৎসব পর্ব্ব করা হয়, কিন্তু তাহার সত্যিকার ফল এখনও তেমন দেখা যায় না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও পণ্ডিত নেহরু

ভারতে ও বহির্জগতে যে অশান্তি চলিতেছে সে সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর মনোভাব নিম্নস্থ বিবরণে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে :

নয়াদিল্লী, ১০ই জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ তাঁহার মাসিক সাংবাদিক বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, কেরলের কম্যুনিষ্ট সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য সংবিধানবিরোধী পন্থা গ্রহণের তিনি বিরোধী। কেরল বা অন্যত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পিকেটিংয়ের বিরুদ্ধেও তিনি স্পষ্ট প্রতিবাদ জানান। তবে সরকারের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যে আপত্তিজনক কিছু আছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মনে করেন না।

সাংবাদিক বৈঠকে নেহরুজী তিব্বত সমস্যা, খালের জল-সংক্রান্ত, লাওস পরিস্থিতি, স্বতন্ত্র দল ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত পেশ করিলেও বেশীর ভাগ সময় কেরলের সঙ্কট লইয়াই আলোচনা করেন। কেরল প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "একটি রাজনৈতিক বিরোধ বলিয়া যাহা গণ্য হইতে পারিত তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করা হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছি।"

তিব্বত প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তিব্বতের পরিস্থিতি শুধু দলাই লামা নয়, আমাদের পক্ষেও উদ্বেগের বিষয়।" খালের জল সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে বলেন যে, "বৈষয়িক সর্ত্তাবলীর" ক্ষেত্রে "মোটামুটি" ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে ইহার কয়েকটি দিকের পূর্ণ মীমাংসা এখনও হয় নাই। স্বতন্ত্র দল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ভারতের রাজনীতিতে ইহা নূতন প্রাণাবেগের সঞ্চার করিবে।

শ্রীনেহরু বলেন, তিন-চারদিন পূর্ব্বে আমি কেরল সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়াছি।

কেরলের বর্ত্তমান উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার আশু কারণ যেমন রহিয়াছে, তেমন দূরবর্তী কারণও রহিয়াছে। বিবৃতিতে আমি শেষোক্ত কারণগুলিই উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত তেমন-কিছুই আমার বলার নাই। শুধু ইহাই আমি বলিতে চাই যে, একটি রাজনৈতিক বিরোধ বলিয়া যাহা গণ্য হইতে পারিত, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করা হইয়াছে দেখিয়া আমি বিশেষভাবে বিচলিত হইয়াছি।

আর একটি কথাও আমি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করিতে চাই এবং তাহা হইতেছে এই যে, কেরলেই হউক, বা অন্য যে কোন স্থানেই হউক, বিদ্যালয়ের সম্মুখে পিকেটিং করিয়া ছাত্রগণের স্কুলে যাতায়াতে বাধা দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী।

শ্রীনেহরু বলেন যে, কেরল সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক উপায় ছাড়া অন্যভাবে কেরল সরকারের পতন ঘটুক ইহা তিনি কোনক্রমেই চাহেন না। প্রসঙ্গত তিনি কেরল সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লন এবং বলেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে কোন দলের চার্জ্জশীট রচনায় মধ্যে অন্যায় কিছু নাই।

শ্রী নেহরু বলেন যে, কেরলের ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিশপগণ বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও ইহাকে তিনি বিশ্বব্যাপী তথাকথিত ক্যাথলিক চার্চ্চ-কম্যুনিজমের সংগ্রামের অংশ হিসাবে মনে করেন না।

প্রশ্ন : কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের মতামত যাহাই হউক, কেরল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাদি হইতে লোকের মনে এই ধারণাই হয় যে, শুধু চার্জ্জশীট পেশ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়—বৈধ সরকারের পতন ঘটানোর আন্দোলনও তাঁহারা সমর্থন করিতেছেন।

উত্তর : উত্তেজনার মুহূর্ত্তে কেহ কেহ এই ধরনের বক্তৃতা দিয়া থাকিতে পারেন। কেরলের মানুষ—তিনি যে পার্টিরই হউক না কেন, একটু জোর গলাতেই কথা বলিয়া থাকেন। সব সময়েই আমি সংবিধান-বিরোধী পন্থা গ্রহণের বিরোধী। কারণ এক ক্ষেত্রে ঐরূপ পন্থা গ্রহণ করিলে অন্য ক্ষেত্রেও উহা যুক্তিযুক্ত হইয়া উঠিবে।

প্রশ্ন : কেরলে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আশঙ্কা আছে—আপনি বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে কাহারা উস্কাইতেছে বলিবেন কি ?

শ্রী নেহরু : বর্ত্তমানে যে গোষ্ঠী অত্যন্ত সোরগোল সুরু করিয়াছে, তাহা হইল নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের জোট।

প্রশ্ন : উহারা কংগ্রেসেই আছে।

শ্রী নেহরু : ইহা আদৌ ঠিক নয়। বলিতে পারেন, কিছু কিছু কংগ্রেসীদের ক্যাথলিক বলিয়া বিপথচালিত হইতেছেন। তাছাড়া সরকার-বিরোধী হিসাবে এই আন্দোলনের প্রতি সাধারণ-ভাবে তাহাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাহারা নিশ্চয় উপরোক্ত জোটের সহিত হাত মিলান নাই বা তাঁহাদের সমর্থন করিতেছেন না।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যে, কেরল সরকার গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করিতেছেন বা কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বভাবতই গণতান্ত্রিক পথে চলিতে পারে না ?

শ্রী নেহরু : স্বভাবতই কেহ ভাল হওয়ার অযোগ্য এ কথা বলা যায় না। তবে কম্যুনিষ্ট পার্টির স্বাভাবিক ঐতিহ্য গণতান্ত্রিক নয়—ইহা সত্য। আমি মনে করি, পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও কার্য্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। কার্য্যত তাহা ঘটিয়াছেও। কেরলের বহুসংখ্যক লোকের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে। গণতান্ত্রিক আইন-

কানুন ও সংবিধান লঙ্ঘনের সুনির্দ্দিষ্ট কোন দৃষ্টান্ত থাকিলে সাংবিধানিক প্রশ্ন ওঠে এবং উহার মীমাংসাও হয় সংবিধানসম্মত উপায়ে। কিন্তু ইহা ছাড়াও এমন অনেক ব্যাপার আছে, যেগুলিকে সংবিধান-লঙ্ঘন হিসাবে অভিহিত করা যায় না।

তিব্বত পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নেহরু বলেন, "আমার ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহা দলাই লামার এবং অপরাপরের পক্ষেও উদ্বেগের বিষয়।"

প্রশ্ন: আপনি যতদূর জানেন, দলাই লামা কি করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন?

উত্তর: আমার মনে হয়, দলাই লামার ভারতে অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

প্রশ্ন: চীনাগণ দলাই লামার সহিত সাক্ষাতের জন্য যে কোন বার্ত্তাবহকে পাঠাইতে পারেন, এই মর্ম্মে আপনি সংসদে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সাড়া পাওয়া গিয়াছে কি? অথবা দলাই লামা সম্বন্ধে ভারত ও পিকিংয়ের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় নীরবতা-রূপ প্রাচীর রহিয়াছে?

উত্তর: মোটামুটি বলিতে গেলে চীনের সহিত ঐ ধরনের আর কোন সংযোগ স্থাপিত হয় নাই। আমি ইহাকে মধ্যে মধ্যে কানাঘুষাযুক্ত নীরবতা-প্রাচীর বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইহা পুরাপুরি নীরবতা-প্রাচীর নহে, কারণ আমরা সময় সময় তথ্য ও প্রতিবাদ বিনিময় করিয়াছি। এই ব্যাপার কতকটা বেসরকারী-ভাবে চলিতেছে।

ভারত-তিব্বত সম্পর্কে চীনের নিকট ম্যাকম্যাহন লাইনের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে কিনা, জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন, আমি ইহা উত্থাপন করি নাই। তিব্বত সম্পর্কে ইহা উত্থাপনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, জীবনবীমা কর্পোরেশন-মুন্ড্রা ব্যবসায়ে অফিসারদের ভূমিকা সম্পর্কে ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে তিনি খুব 'খুশী' না হইলেও "প্রচলিত প্রথা এবং ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য" সরকার উহা মানিয়া লইয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর উপর অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা হইয়াছে বলিয়া শ্রীনেহরু পূর্ব্বে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুক্তি করেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনেহরু বলেন, "তিনি অতি যোগ্য লোক। যদি প্রয়োজন হয় এবং তিনি যদি ইচ্ছুক থাকেন, তবে তিনি ফিরিয়া আসিতে পারেন।"

কংগ্রেসের তহবিলে দান করার জন্যই শ্রীমুন্ড্রা জীবনবীমা কর্পোরেশনের সহিত কারবার করার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া বসু বোর্ড যে মন্তব্য করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সহিত তাহা অস্বীকার করেন।

খালের জল লইয়া পাক-ভারত বিরোধ সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, এই ব্যাপারে "মোটামুটি আর্থিক সর্ত্তগুলি আমরা মানিয়া লইলেও" কতকগুলি বিষয়ের পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই। কিন্তু ভারত কি কি সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছে, তিনি তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন।

জেনেভায় বৃহৎ চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গের যে বৈঠক চলিতেছে, প্রধানমন্ত্রী সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জেনেভা বৈঠক সম্পর্কে বাস্তবিকই আমার কিছু বলার নাই। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমি আলোকপাত করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তাই বলিয়া আমি অন্ধকারও বাড়াইয়া তুলিতে চাহি না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, লাওসের পরিস্থিতি "অসন্তোষজনক"—পুনরায় আন্তর্জ্জাতিক কমিশনকে ডাকার জন্য ভারতবর্ষ পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। এ অবস্থায় ভারত "আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিবে," ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যায় না। "অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি" জ্ঞান লইয়া আমরা একটি সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়াছিলাম—এখনও সে পরামর্শই দিতেছি।

শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বাধীন নূতন দলকে স্বাগত জানাইয়া তিনি বলেন, উহা আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করিবে।

শ্রীনেহরু বলেন, সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় ১৯৫৮-৫৯ সনে ভারতে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হওয়ায় এক রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়। গত বৎসর ৬ কোটি ২০ লক্ষ টন এবং ১৯৫৬-৫৭ সনে ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হইয়াছিল।

কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পগুলিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনা হইবে বলিয়া সম্প্রতি উটকামণ্ডের আলোচনা বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, এই মর্ম্মে সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইলে প্রধানমন্ত্রী উহা অস্বীকার করেন।

খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, পাকিস্থানে খাল খনন প্রভৃতি বিকল্প কাজের জন্য ভারতের দেয় টাকার সহিত ভারতের নিকট পাকিস্থানের বকেয়া ঋণের কোন সম্পর্ক নাই।

জেনেভা সম্মেলন সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, এ সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নাই। ইহার উপর আমি কোনরূপ আলোকপাত করিতে পারি না। সুতরাং এ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিয়া আমি অন্ধকার আরও ঘনীভূত করিতে চাহি না।

দলাই লামা সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, তিনি ভারতে বেশ কিছুদিন থাকিবেন বলিয়া আমার মনে হয়। তিব্বত সম্বন্ধে চীন-ভারত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, উভয় দেশের মধ্যে এক 'নীরবতার প্রাচীর' সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রাচীরের আড়ালে বহু কানাঘুসা চলিতেছে। তিনি আরও বলেন, বেসরকারী পর্য্যায়ে চীনের সহিত ভারতের কিছু তথ্য আদান-প্রদান হইয়াছে ও কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের নিকট ভারতকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া চীনের সহিত আর কোন সংযোগ সাধিত হয় নাই।
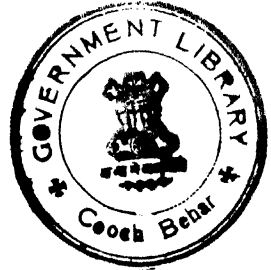
শঙ্কর দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(২)

বৈশাখ সংখ্যায়, শঙ্করের মতানুযায়ী মোক্ষের আনন্দস্বরূপত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় মোক্ষের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে।

মোক্ষ বিষয়ে আলোচনা কালে, 'ব্রহ্ম ভবতি', 'মুক্তঃ ভবতি', 'জীব ব্রহ্ম হন', 'জীব মুক্ত হন'—প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'ভবতি' বা 'হন' বললে, সাধারণতঃ এই অর্থই গ্রহণ করা হয় যে, সেই বস্তুটি পূর্বে সেই অবস্থায় বা সেই ধর্মবিশিষ্ট ছিল না, পরে কালক্রমে সেই অবস্থা বা ধর্ম তার লাভ হয়। একই ভাবে, 'আমরা মুক্তিলাভ করি', 'আমরা মোক্ষপ্রাপ্ত হই'—প্রভৃতি বাক্যও সমভাবে এই যেন নির্দেশ করে যে, আমরা পূর্বে মুক্ত ছিলাম না, পরে সাধন-বলে একটি নূতন বস্তু, ধর্ম, বা অবস্থা লাভ করি বা প্রাপ্ত হই। এই অর্থে, মুক্তি কালক্রমে সৃষ্ট-পদার্থ, জন্য-বস্তু বা উৎপাদ্য-কার্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে, মোক্ষকে অনিত্য বলে গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু কোনো অনিত্য বস্তু আমাদের জীবনের পরম লাভ ও পরম লক্ষ্য হতে পারে কিরূপে? অনিত্য সংসার থেকে যা আমাদের মুক্তি-দান করবে, তা ত স্বয়ং অনিত্য হতে পারে না। যা আমাদের আত্মস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ—তা অনিত্য হলে, আত্মা ও ব্রহ্মই অনিত্য হয়ে পড়েন। সেজন্য, শঙ্কর-মতে, মোক্ষ অনিত্য নয়, নিত্য। অন্য উপায় না থাকাতে অবশ্য আমাদের উপরের অনিত্যতা-বাচী শব্দাদি ব্যবহারে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মোক্ষ নিত্য, শাশ্বত-সিদ্ধ, চির-সত্য।

সেজন্য জীব নিত্যমুক্ত। যথা, রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে, ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক রজ্জুতে সর্প অধ্যস্ত বা আরোপিত হলেও, রজ্জু মুহূর্তমাত্রের জন্যও সত্যই সর্পে পরিণত হয় না, সর্বদাই রজ্জুই থাকে। পুনরায়, ভ্রমাবসানে যখন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুকে রজ্জুরূপেই প্রত্যক্ষ করে, তখনও রজ্জু কোনো নূতন স্বরূপ, ধর্ম বা অবস্থা প্রাপ্ত হয় না—কারণ তা ত আদ্যোপান্ত রজ্জুই ছিল, সর্প বা অন্য কিছুই হয় নি—, এবং ভ্রমকারীও কোনো নূতন বস্তু প্রাপ্ত হয় না বা দর্শন করে না, কিন্তু কেবল সেই পুরাতন রজ্জুরই স্বরূপ উপলব্ধি করে।

একই ভাবে, বদ্ধজীব অবিদ্যাবশতঃ আত্মায় দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির অধ্যাস বা আরোপ করলেও, স্বয়ং আত্মা সত্যই দেহেন্দ্রিয় মন প্রভৃতিতে পরিণত হন না, চিরকাল মুক্তই থাকেন, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনন্ত, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার পরব্রহ্মই থাকেন—যদিও অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীবের নিকট আত্মা দেহধর্মী ও পার্থিব সুখদুঃখাদি অবস্থাভাগী বলেই প্রতীয়মান হন।

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৮-১২-৩) এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে (৪-৪-১—৩) এই বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এস্থলে বলা হচ্ছে যে, "এই সম্প্রসন্ন আত্মা, এই শরীর থেকে উত্থান করে, পরম জ্যোতিসম্পন্ন হয়ে, স্বীয়রূপে অভিনিষ্পন্ন হন।" এক্ষেত্রে "অভিনিষ্পন্ন" শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে: প্রথমতঃ, নূতন জন্মে নূতন আগন্তুক রূপ লাভ করা। যেমন বলা হয়: 'মানব দেবজন্ম লাভ করে, দেবরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েছেন।' দ্বিতীয়তঃ, সাময়িক ভাবে আবৃত, স্বীয় স্বরূপকেই আবরণাভাবে, পুনরায় উপলব্ধি করা। যেমন বলা হয়: 'রোগগ্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ মানব, রোগোপশমে পূর্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়েছেন।' সেজন্য, এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মোক্ষকালে মুক্তজীব কি কোনো নূতন, আগন্তুক, স্বরূপাতিরিক্ত রূপ প্রাপ্ত হন? অথবা, কেবল অনাত্মভাব ত্যাগ করে পূর্বের আত্মস্বরূপেই প্রকাশিত হন?

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, মুক্তজীব কোনো নূতন, আগন্তুক, স্বরূপাতিরিক্ত রূপ লাভ করেন না, কেবলমাত্র "স্বেন রূপেণ", বা স্বীয় স্বরূপেই উদ্ভাসিত হন। যেমন, কোনো ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে, তাঁর স্বরূপের প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হয় না, কেবল, সাময়িকভাবে তা যেন রোগদ্বারা আবৃত হয়ে তিরোহিত হয়ে থাকে। পরে, চিকিৎসকের সাহায্যে রোগোপশম হলে, তাঁর পূর্বস্বরূপ কেবল পুনরায় প্রকটিতই হয় মাত্র, তাতে নূতন কোনো রূপ, ধর্ম, অবস্থাদির সৃষ্টি হয় না। একই ভাবে, বদ্ধজীব

অবিদ্যাগ্রস্ত হয়ে পড়লে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপের কোনো রূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না, কেবল সাময়িক ভাবে তা যেন অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হয়ে তিরোহিত হয়ে থাকে। পরে, গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যে অবিদ্যা নিবৃত্তি হলে, তাঁর পূর্ব ব্রহ্ম-স্বরূপ কেবল পুনরায় প্রকটিতই হয় মাত্র—তাতে নূতন কোনো রূপ, ধর্ম বা অবস্থাদির সৃষ্টি হয় না (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৪-৪-২)।

অপর একটি সাধারণ দৃষ্টান্তও এক্ষেত্রে গ্রহণ করা চলে। যথা: এক ব্যক্তির গলায় একটি স্বর্ণহার থাকা সত্ত্বেও ভ্রমবশতঃ তিনি সেই হারটি অপহৃত হয়েছে ভেবে, তা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন। তখন তাঁর বন্ধু তাঁকে হারটি নির্দেশ করে যদি বলে দেন: 'স্বর্ণ হারটি ত তোমার নিজের গলাতেই আছে',—তা হলে তিনি সেই হার 'প্রাপ্ত' হন। কিন্তু এই 'প্রাপ্তি' নিশ্চয়ই নূতন প্রাপ্তি নয়, যেহেতু হারটি পূর্ব থেকেই তাঁর নিজের কাছেই ছিল, তিনি কেবল সেই সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। এখন বন্ধুর কথায় সেই অজ্ঞতা দূর হলে তিনি পূর্বপ্রাপ্ত বস্তুকেই যেন পুনরায় প্রাপ্ত হচ্ছেন। ("কণ্ঠ-চামীকরসুবর্ণবৎ") একই ভাবে, জীবও সর্বদাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরব্রহ্মস্বরূপ; কিন্তু বদ্ধাবস্থায় তিনি সেই তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন। মোক্ষকালে, তিনি সেই শাশ্বত স্বরূপকেই পুনঃ প্রাপ্ত হচ্ছেন বা উপলব্ধি করছেন।

অদ্বৈতবেদান্তে এই সম্বন্ধে আরও দুটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথমটি হ'ল: 'রাজপুত্র-ব্যাধ-ন্যায়।' শঙ্কর তাঁর বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্যে (২-১-২০) এটি সম্প্রদায়-বিশারদগণের আখ্যায়িকা-ছলে উদ্ধৃত করেছেন। আখ্যায়িকাটি হ'ল এই: কোন এক রাজপুত্র জন্মের পরই মাতা-পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ব্যাধগৃহে প্রতিপালিত হন। বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত থাকায়, তিনি ব্যাধজাতির কর্ম ও আচারানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হন, 'আমি রাজা বা রাজপুত্র' এই মনে করে রাজোচিত কর্মে নয়। পরে, এক পরম করুণাময় পুরুষ, রাজপুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বুঝতে পেরে তিনি যে রাজপুত্র, তাঁকে এই কথা জানাবার জন্য বললেন: 'তুমি ত ব্যাধ নও, তুমি রাজপুত্র, কোনো কারণে ব্যাধগৃহে প্রবেশ করেছ মাত্র।' এই কথা শুনে, রাজপুত্রও ব্যাধোচিত কর্ম ও আচারানুষ্ঠান ত্যাগ করে, 'আমিই রাজা' এই উপলব্ধি করে, স্বীয় পিতৃপিতামহের রাজোচিত-কর্মে রত হন। একই ভাবে, আত্মাও যেন ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দেহারণ্যে পরিত্যক্ত হয়ে, দেহধর্মাদির অনুবর্তন করেন। পরে, আচার্য যখন তাঁকে উপদেশ দেন 'তুমি দেহ নও, পরব্রহ্ম', তখন তিনি স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে, শরীরজ কর্ম পরিত্যাগ করে মুক্ত হন।'

দ্বিতীয় উদাহরণ হ'ল: 'দশমস্ত্বমসি-ন্যায়।' শঙ্কর এটির উল্লেখ করেছেন তাঁর তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ভাষ্যে (২।২)। এই আখ্যায়িকাটি হ'ল এই: দশজন গ্রামবাসী দেশান্তর গমনকালে একটি নদী উত্তীর্ণ হন। অপর পারে উপস্থিত হয়ে সকলেই নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিনা জানবার জন্য, দলের নেতা সকলকে গণনা করেন এবং গণনাকালে নিজেকে বাদ দিয়ে গণনা করবার জন্য একজন কম হয়ে নয়জন হওয়াতে সকলেই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়ে, একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের বিষাদের কারণ জেনে দলপতিকে পুনরায় গণনা করতে বলেন। তিনি পূর্ববৎ নিজেকে বাদ দিয়ে নবম পর্যন্ত গণনা করলে, সেই বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে নির্দেশ করে বলেন: 'তুমিই ত দশম'। এই ভাবে, নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, দলপতির শোক দূর হয়; যদিও এই জ্ঞান কোনো নূতন স্বরূপের জ্ঞান নয়, তাঁর স্বীয়, অজ্ঞাত স্বরূপেরই উপলব্ধি। একই ভাবে, আচার্য 'তুমি ব্রহ্ম' বলে বদ্ধজীবকে উপদেশ দান করলে, তিনিও স্বীয় শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করে শোক-মোহাতীত হন। (বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর-কৃত পঞ্চদশী, তৃপ্তিদীপ ৭-২৩-২৮; বেদান্তপরিভাষা ১)।

এই ভাবে, নানাবিধ সুন্দর উপমার সাহায্যে শঙ্কর মোক্ষের নিত্যতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন।

যুক্তি-তর্কের সাহায্যেও শঙ্কর মোক্ষের নিত্যত্ব স্থাপিত করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের সুবিখ্যাত 'চতুঃসূত্রীর' চতুর্থ সূত্রে তিনি এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন।

প্রথমতঃ, যা অনুষ্ঠেয় বা কর্মের দ্বারা উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্তব্য বা সংস্কার্য তাই হ'ল অনিত্য। যেমন, ঘটটি পূর্বে ঘটরূপে ছিল না, পরেও ঘটরূপে থাকবে না—নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার উপাদান-কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে একটি বিশেষ কর্ম-প্রণালীর সাহায্যে ঘটটির সৃষ্টি করেন; পুনরায় চূর্ণন-প্রমুখ বিশেষ কর্মের ফলেই ঘটটির ধ্বংস হয়। সেজন্য 'উৎপাদ্য' ঘটটি অনিত্য। একই ভাবে, দুগ্ধ পূর্বে দধিরূপে ছিল না; পরেও দধিরূপে থাকবে না—গোপবালক মন্থনরূপ কর্মের দ্বারা দুগ্ধকে দধিরূপে বিকৃত বা পরিণত করেন; পুনরায় জলমিশ্রণাদি কর্মের দ্বারা সেই দধি ধ্বংসও হয়ে যায়। এরূপে, 'বিকার্য'-দধি অনিত্য। পুনরায়, গান্ধারদেশ পূর্বে চৈত্রের প্রাপ্ত ছিল না, পরেও থাকবে না,—গমনরূপ কর্মের দ্বারা গান্ধার-দেশ চৈত্রের প্রাপ্ত হয়; প্রত্যাবর্তনরূপ কর্মের দ্বারা পুনরায় তা অপ্রাপ্তও হয়। এরূপে 'প্রাপ্তব্য' গান্ধার দেশ অনিত্য। পরিশেষে চৈত্রের দেহাদির সংস্কার বা বিশুদ্ধীকরণ পূর্বেও ছিল না, পরেও থাকবে না—স্নানাচমনাদি কর্মের সাহায্যে দেহাদি শুদ্ধ হয়; পুনরায় কর্মক্ষেপ-

দাদি কর্মের দ্বারা অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। এরূপে, 'সংস্কার্য, শুদ্ধত্বাদিও অনিত্য।

সুতরাং, চতুর্বিধ অনুষ্ঠেয় কর্মের ফলে চতুর্বিধ ফললাভ হয়: উৎপত্তি, বিকার (পরিণাম) প্রাপ্তি ও সংস্কার; এবং এই সকল কর্ম ও ফল সবই অনিত্য। কিন্তু মোক্ষ উৎপাদ্য নয়, বিকার্যও নয়, প্রাপ্তব্যও নয়, সংস্কার্যও নয়। সেজন্য মোক্ষ ক্রিয়ানুষ্ঠেয় বা অনিত্য নয়, নিত্য।

এরূপে, মোক্ষ জীবের স্বরূপ বলে উৎপাদ্য বা বিকার্য নয়—যেহেতু স্বরূপের উৎপত্তি ও বিকার অসম্ভব। আত্মা যদি নিত্য হন ত, তাঁর স্বরূপও নিত্য; আত্মা যদি স্থির, পরিপূর্ণ সত্তা হন ত, তাঁর বিকারও অসম্ভব। সেজন্য কায়িক, মানসিক বা বাচিক প্রমুখ কোনোরূপ কর্মের দ্বারাই মোক্ষের উৎপত্তি বা বিকার হয় না।

পুনরায়, মোক্ষ প্রাপ্তব্যও নয়। ব্রহ্ম বা মোক্ষ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, আত্মারই স্বরূপ এবং সেজন্য সদাপ্রাপ্ত। সেজন্য, সর্বগত, সর্বদা-প্রাপ্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম বা মোক্ষের পুনরায় প্রাপ্তি হবে কিরূপে?

পরিশেষে, মোক্ষ সংস্কার্যও হতে পারে না। সংস্কারের অর্থ হ'ল: সংস্কার্য বস্তুর গুণের বৃদ্ধি, অথবা দোষের হ্রাস। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, ব্রহ্মের গুণ-বৃদ্ধি অথবা দোষ-হ্রাস কোনটাই সম্ভবপর নয়। সেজন্য ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষও সংস্কার্য নয়।

এক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে, যেরূপ কাচের ঔজ্জ্বল্য ধর্ম-মলাবরণে তিরোহিত হয়ে থাকলেও ঘর্ষণক্রিয়ার দ্বারা সুসংস্কৃত হয়ে পুনঃ প্রকটিত হয়, সেরূপ আত্মার মোক্ষধর্মও অবিদ্যাবরণে তিরোহিত হয়ে থাকলেও নানারূপ ক্রিয়ার দ্বারা সুসংস্কৃত হয়ে পুনঃপ্রকটিত হয়। এই অর্থে মোক্ষ সংস্কার্য—তার উত্তর এই যে, আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ বলে এরূপ মলাবরণ তার ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়।

পুনরায়, দেহাশ্রিত স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার দ্বারা, অবিদ্যা-গ্রস্ত জীবেরই সংস্কার হয়—শুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার নয়।

এই ভাবে অনায়াসে স্থিরসিদ্ধান্ত করা যায় যে, উৎপত্তি-বিকার-প্রাপ্তি-সংস্কৃতি-শূন্য মোক্ষ নিত্য। সেজন্য মোক্ষে কোনরূপ ক্রিয়ার স্থান নেই।

"ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেরাত্মনঃ। যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া, তমবিকুর্বতী নৈবাত্মানং লভতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

অর্থাৎ, আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় হতে পারে না। যা ক্রিয়ার আশ্রয়, তা বিকারশীল; কিন্তু আত্মা নির্বিকার ও সেজন্য নিষ্ক্রিয়।

দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধানুযায়ী কৃত পুণ্য পাপ বা ধর্মাধর্মরূপ কর্মের ফল যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ। এই সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; শরীর-বাক্য-মন প্রভৃতি কর্তৃক উপ-ভোগ্য, পার্থিব বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফল, এবং ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রাণীতেই বিদ্যমান।

সাধারণতঃই, প্রাণিভেদে এই সকল সুখদুঃখেরও তারতম্য হয়। ফলস্বরূপ সুখদুঃখের তারতম্য থাকায় তাদের মূল কারণ ধর্মাধর্মের তারতম্য থাকতে বাধ্য, ধর্মাধর্মের তারতম্য থাকায় ধর্মাধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এক, অদ্বিতীয়, নির্বিকার, চিরপূর্ণ আত্মায় তারতম্যের নামগন্ধ নেই। সেজন্যই ব্রহ্ম, আত্মা বা মোক্ষ সকাম কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন কোনরূপ বিধির বিষয়ও নয়।

এরূপে, কর্মের ও বিধির অবিষয় মোক্ষ নিত্য।

"অতএব অনুষ্ঠেয়-ফল-বিলক্ষণং মোক্ষাখ্যমশরীরত্বং নিত্যমিতি সিদ্ধম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১)

শঙ্কর বলছেন যে, নিত্য বস্তু ও দুই শ্রেণীর হতে পারে, পরিণামী নিত্য ও কূটস্থ নিত্য। পরিণামী নিত্য হ'ল সেই বস্তু যা বিকৃতি বা পরিণতি প্রাপ্ত হলেও এই সেই বস্তু, এরূপেই প্রতীত হয়; অর্থাৎ বিকার বা পরিণাম সত্ত্বেও যার সত্তা একই থাকে। যেমন, জগন্নিত্যত্ববাদিগণের জগৎ, বা সাংখ্যযোগের প্রকৃতি। অপরপক্ষে, কূটস্থ নিত্য হ'ল সেই বস্তু যার কোনরূপ পরিণাম বা বিকারই নেই। ব্রহ্ম, আত্মা বা মোক্ষ এরূপ কূটস্থ নিত্য।

"ইদন্তু পারমার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্বব্যাপি সর্ব-বিক্রিয়ারহিতং নিত্যতৃপ্তং নিরবয়বং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং, যত্র ধর্মাধর্মৌ সহ কার্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপাবর্ততে, তৎ-শরীরং মোক্ষাখ্যম্।...অতস্তদ্ ব্রহ্ম, যস্যেয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)

অর্থাৎ, মোক্ষ বা অশরীরত্ব পারমার্থিক, কূটস্থ নিত্য, আকাশবৎ সর্বব্যাপী, সর্ববিকাররহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাব, এবং কার্য, ধর্মাধর্ম ও কালত্রয়বিবর্জিত। এরূপ মোক্ষই হলেন ব্রহ্ম, যাঁর বিষয়েই জিজ্ঞাসা বা যাঁকে জানবার ইচ্ছাতেই বেদান্তের প্রারম্ভ।

রাবণের বুকে সীতা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

আমার বুকেতে বাঁধা অনেক দিনের চারু সাধ,
আমার হাতে [illegible] শঙ্কাহরা নীল তরবারী,—
কেন মিছে তবে এই পক্ষপাতী কৃপণ বিবাদ ?
রাবণের যূপ কাষ্ঠে বলি হবে রাঘবের নারী।

এ যজ্ঞ হোমের শিখা লঙ্কার দিগন্তব্যেপে জ্বলে,
জ্বলে যায় আশা, ভয়, পুণ্য, পাপ, স্বদেশ, বিদেশ ;
নেই তার আদি অন্ত। নেই তার চোখের কাজলে
এক ফোঁটা মর্মব্যথা। এতোটুকু করুণার লেশ।

যেদিন রাঘব রাম রক্ষীহীনা বাল-বিধবার
অঙ্গহানি করেছিল তীক্ষ্ণ দীপ্ত আর্য অহঙ্কারে,
সেদিন জটায়ু কোন পাখায় তোলেনি তিরস্কার ;
আজ কেন এতো বাধা আমার এ প্রতি-অত্যাচারে ?

তুমিও ত আর্য নও ; মাংসভুক গৃধ্রের স্বজাতি ;
নামমাত্র পরিচয়, আর্যরাজ দশরথ-মিতা !
তবে কেন হানো বাধা ? অন্যায়ের কেন পক্ষপাতী ?
অহংকৃত আর্যতার ফলে বন্দী সীমন্তিনী সীতা।

জানি আমি ভবিষ্যৎ মুখরিত হবে যার নামে,
যার বন্ধুতার দীপে দীপ্ত হবে মহাকাব্যকার,—
অনার্য সে জটায়ুর জরাক্লিষ্ট পাখার আরামে
মৃত্যু এঁকে হব আমি মূর্ত্ত ভয়ঙ্কর অত্যাচার।

তবু জানি এ আঘাত অপমানিতের রুদ্ররোষ ;
প্রকাশে মর্যাদা আছে ; অপ্রকাশে দরিদ্র পঙ্গুতা।
রাবণ কেটেছে পাখা, জটায়ুর এই অসন্তোষ
ইতিহাসে লিখে যাবে জিঘাংসার ক্ষণভঙ্গুরতা।

নয়ত আরেক কোন দিগন্তের সোনার মিলনে
অন্য আকাশের বুকে শাদা মেঘে এঁকে আলপনা,
ধরার বর্জিতা কন্যা শঙ্খে, দীপে, বরণে, বুলনে,—
আনন্দে নিতাম ডেকে। মন্দোদরী হ'ত পুণ্যমনা।

কিন্তু হায় রাবণের ভাগ্যলিপি, অনার্য ব্রাহ্মণ ;
ধর্ম তার কর্ম নয় ; কর্ম তার ধর্মের প্রলাপ ;
বুকে তাই স্বপ্ন পোড়ে ; পুড়ে যায় সার্থক জীবন ;
পুড়ে যায় ছিন্নপাখা জটায়ুর রক্ত অভিশাপ।

এ সীতা আমার নয় ; রাঘবের প্রাণের বন্দনা ;
অহংকৃত আর্যাবর্ত ললাটের জীবন্ত তিলক।
হরণ মরণ জানি ; তবু জানি স্নিগ্ধ এ গঞ্জনা।
ভগ্ন দর্প বলাৎকারে এ আমার রাক্ষসী পুলক।

এ সীতা আমার নয় ; রাঘবের লুব্ধ অহঙ্কার।
আমার মনের সীতা সীমানা হারিয়ে আজ কাঁদে।
বুকেতে এ সীতা নয় ; এক মুঠো ভাগ্য চুরমার।
রাবণের ভবিষ্যৎ কেঁদে মরে রাবণের ফাঁদে।

যে জটায়ু মরে যায় নারীত্বের রক্ষার প্রয়াসে,
সেই ত অমর হ'ল ; চিরকালে মেলে দিল পাখা।
নিশ্চিত মৃত্যুর বীজ বুকে নিয়ে কিসের আশ্বাসে
ছুটেছে রাবণ ? রক্তে জটায়ুর নখ চিহ্ন আঁকা।

অনেক দূরের পথ। রাবণের মৃত্যু নেই নেই।
নেই মুক্তি, নেই আলো। চায় নি রাবণ কোন সীতা।
কি আশ্চর্য, তবু তাকে অ-চাওয়াকে হ'ল চাইতেই ;
তাই ত আজও জ্বলে অবিশ্রান্ত রাবণের চিতা।
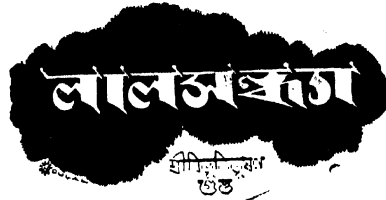
দু'দিনেই একটা লোকের সব কথা বোঝা সম্ভব নয়—। বিশেষ করে অতনুর মত লোকের। যার ব্যক্তিগত জীবনের আরও বহুদিক দিবালোকে কারুর চোখে পড়ে না। কথা প্রসঙ্গে আজ যে কাহিনী সে শ্রীমতীকে শুনিয়েছে এর মধ্যে সত্য অনেকখানি থাকলেও একে আমরা অতীতের একটা ভগ্নাংশ বলেই জানি। সুতরাং অতনু তার কাহিনীর উপর যবনিকা পাত করতে চাইলেও আমরা এখানে থামতে পারি না। আমাদের ফিরে যেতে হবে এই কাহিনীর আরম্ভে। ওদের পারিবারিক বিপর্য্যয়ের গুটিকয়েক প্রধান অধ্যায়ে। যে অধ্যায়ের সঙ্গে অতনুর জীবনের রয়েছে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

অতনুর ঠাকুরদা কেদার মুন্সী ডাকসাইটে বড়লোক ছিলেন। তাঁর বাবা হারান মুন্সী যখন মারা যান তখন তাঁদের জমিদারী পতনোন্মুখ। হারান মুন্সীর সদাশয়তার সুযোগ নিয়ে তাঁর আশেপাশের ভাগ্যান্বেষীর দল তাঁকে প্রায় শেষ করে এনেছিল। কেদার সব খবর জানতেন, কিন্তু বাপকে যথাসময় সতর্ক করে দিয়েও কৃতকার্য্য হন নি। তিনি হেসে বলতেন, ওদের বড্ড অভাব কেদার, নইলে লোক ওরা খারাপ নয়। আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি সে ক'টা দিন আমার মত করেই চলতে দে—

তার পরে বেশীদিন হারান মুন্সী বাঁচেন নি, কিন্তু যে ক'টা দিন ছিলেন তারই মধ্যে অনেক কিছু তলিয়ে যেত যদি-না কেদার মুন্সীর সতর্ক-দৃষ্টি আরও সজাগ হয়ে না উঠত। পিতার মৃত্যুর পরে কোনপ্রকার সাবধান হবার অবকাশ না দিয়ে তিনি শক্ত হাতে তাদের টুঁটি টিপে ধরলেন যারা তাঁদের ধনভাণ্ডারে সিঁদ কেটে সর্ব্বস্বান্ত করতে চলেছিল। তাঁর দৃঢ় মুষ্টির প্রচণ্ড চাপে ওরা চূর্ণ হ'ল। এই কেদার মুন্সীর নাতি অতনু মুন্সী।

কেদারের হাতে যখন ক্ষমতা এল কল্যাণ তখন মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র। ঠাকুরদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেই যে তিনি দেশে এলেন আর তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে দেওয়া হ'ল না। কল্যাণের পড়াশুনার সেইখানেই হ'ল ইতি। কল্যাণ আপত্তি করেছিলেন। কেদার চোখ রাঙ্গিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, এক কথা আমি দু'বার বলা পছন্দ করি না কল্যাণ। ডাক্তারী করে তোমার পয়সা উপায় করতে হবে না।

কল্যাণ মৃদুকণ্ঠে বললেন, টাকা উপার্জ্জনের জন্যই কি পড়াশুনা বাবা—

কেদার হুঙ্কার দিলেন, তবে কিসের জন্য শুনি?

কল্যাণ মৃদুকণ্ঠে জানালেন, জ্ঞান অর্জ্জন—যা মনের প্রসারতা নিয়ে আসে। বিকাশ—

তাঁকে বাধা দিয়ে কেদার বলেন, বলি পড়াশুনা করতে কে তোমাকে নিষেধ করছে বাপু? বিকাশ করাতে চাও ঘরে বসে করাও আর সেই সঙ্গে জমিদারীর কাজটাও শিখে নাও। আখেরে কাজে লাগবে। বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে, দরকার মনে কর ত আরও বই আনিয়ে নাও। কিন্তু কাজ-কর্ম্ম তোমাকে এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে। নিজে আমি অনেক ঠকেছি তোমাকে আর ঠকতে দিতে চাই না।

এত কথার পরেও কল্যাণ বলেছিলেন, আর গোটা দুই বছর কি কোন রকমে—

বাধা দিয়ে পুনরায় কেদার জবাব দিয়েছিলেন, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না কল্যাণচন্দ্র। আমাকে তোমার ঠাকুরদা পাও নি।

কথার মাঝেই কল্যাণ উঠে গেলেন। পুত্রের এই ব্যবহার কেদার সহজ মনে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই প্রকার নিঃশব্দে চলে যাওয়ার মধ্যে তিনি একটা চাপা বিদ্রোহের সন্ধান পেয়ে আরও ঢের বেশী সতর্ক হয়ে উঠলেন এবং সে যুগের লোকেরা যে দাওয়াইকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করতেন তারই প্রয়োগ করা হ'ল। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই কল্যাণকে বিবাহ করতে হ'ল।

কেদার আশ্বস্ত হলেন। কল্যাণ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে জমিদারীর প্রত্যেকটি বিভাগের কাজকর্ম্ম দেখে বেড়াতে

লাগলেন। কেদার সকলের অলক্ষ্যে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। পুত্রবধূর দেওয়া পান মুখে পুরে গড়গড়ায় মৃদু টান দিয়ে আপন মনে কথা কয়ে ওঠেন, যা ব্যাটা এবারে শহরে, তোর মনের বিকাশ ঘটাতে—হুঃ·····

পুত্রবধূ পাশেই অপেক্ষা করছিল, সে খুক্ খুক্ করে হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কার কথা বলছেন বাবা?

কেদার পুত্রবধূর পানে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেন, বলছিলাম ঐ ব্যাটা কল্যেণ মুন্সীর কথা। বলে কিনা শহরে গিয়ে পড়াশুনা না করলে মহারাজার মনের বিকাশ ঘটবে না। দিয়েছি তেমনি এক চালে মাৎ করে। আর কথাটি নেই মুখে।

পুত্রবধূ মাথা নত করল। সেইদিকে খানিক সস্নেহে চেয়ে থেকে তিনি পুনরায় বলেন, সাপের বাচ্চা সব সময় সাপই হয়, তাই সময় থাকতে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। এর পরে যার জিনিস তিনিই ব্যবস্থা করবেন। আমি সময় মত দু'খিলি পান আর একটু তামাক পেলেই তুষ্ট।

বলেই তিনি আর একদফা হো হো করে হেসে উঠলেন এবং পুনরায় গড়গড়ায় বারকয়েক সুখ-টান দিয়ে বলে ওঠেন, তাই বলে নিশ্চিন্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না মা। সুযোগ পেলেই ব্যাটা ছোবল দিতে পারে। পাকা হাতে শ্রীমানের বিষ দাঁতটি ভেঙ্গে দেওয়া চাই।

পুত্রবধূ একটু যেন শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, তার জন্যে ত আপনিই আছেন বাবা।

পানটি মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে কেদার পুত্রবধূর মুখের পানে একদৃষ্টে খানিক চেয়ে থেকে তেমনি হাসিমুখেই পুনরায় জবাব দিলেন, বোকা মেয়ে, সব কাজ কি সকলের দ্বারা হয় মা। পাছে হেরে যাই তাই ত তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

পুত্রবধূ সলজ্জ হাসল। কেদারের তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, এটা হাসির কথা নয়, সত্য কথা। শাসনের বয়েস কল্যাণের পার হয়ে গিয়েছে। তাই চতুর্দ্দিকে একটা মায়ার ব্যূহ রচনা করে রাখতে হবে। ওর বিভিন্নমুখী চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যেন একটি পথ ছাড়া অন্য কোন রাস্তাই ওর চোখে না পড়ে। বন্ধনের শত পাকে ওকে জড়িয়ে ধরা চাই মা।

পুত্রবধূ ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল। মাত্র বছরখানেক তার বিয়ে হলেও এই অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীর চরিত্রের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে শ্বশুরের উপদেশগুলিকে সহজমনে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু খোলাখুলি কিছু বলা উচিত হবে না এ কথাটাও সে অনুভব করে। তাই মুখে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে তুলে নত কণ্ঠে বলল, বড্ড শক্ত কাজ বাবা।

কেদার পুত্রবধূকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, শক্ত মনে করলেই শক্ত—নইলে কিছুই নয়।

পুত্রবধূ এ-কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল। তার শান্ত ভাবলেশহীন মুখের পানে খানিক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কেদার পুনরায় বললেন, তুমি বুঝি ভাবছ, কাজটা যদি সোজাই হবে তা হলে আমার দ্বারা তা হ'ল না কেন? কিন্তু ভুলে যেও না চন্দ্রা মা, যে আমি তার বাপ আর তুমি তার স্ত্রী। যে কথা তোমার কাছে গোপন থাকবে না আমি হয় ত আজীবন সন্ধান করেও তার কোন সন্ধান পাব না।

পুত্রবধূ চন্দ্রা স্মিত কণ্ঠে বলল, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন বাবা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে কেদার উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা সব সময়ই পাবে। তাই বলে কোনদিন ভুল করেও ভুলে যেও না যে, শুধু আশীর্ব্বাদে এ-যুগে কোন কাজ হয় না মা।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বলতে থাকেন, মানুষের মধ্যে মায়া, দয়া এবং অন্যান্য সৎগুণ থাক—এ সকলেই চায়, কিন্তু তাই বলে নিজের স্বার্থের নষ্ট করে যারা নাম কিনতে চায় আমি সে দলের নই।

চন্দ্রা একটু ইতস্ততঃ করে মৃদু কণ্ঠে বলল, কিন্তু কালের প্রভাবকে কি এত সহজে অস্বীকার করা সম্ভব? তা ছাড়া···

কেদার সহসা সোজা হয়ে বসলেন। তিনি খানিকটা গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এবং চেষ্টা করে সহজ কণ্ঠে বললেন, এ সব ত ভাল কথা নয় চন্দ্রা-মা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, হতভাগা তোমার কাছেও বড় বড় কথা বলতে সুরু করেছে। তিনি থামলেন।

অসাবধানে যে কথা চন্দ্রার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে তার জন্য সে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। অস্বীকার করতে পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু পাছে শ্বশুরের মনে অন্যপ্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এই ভয়ে সে নত মস্তকে বসে রইল।

কেদার মুন্সী পাকা খেলোয়াড়—কথার গতি থেকে ব্যাপারটা তিনি এক নিমেষে বুঝে নিলেন এবং মুহূর্ত্তে মধ্যে তাঁর বাহ্যিক গাম্ভীর্য্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দিল প্রসন্ন হাসি। তিনি মধুর কণ্ঠে বললেন, তোমার লজ্জিত হবার কোন কারণ আমি দেখছি না চন্দ্রা মা, বরং কথাটা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে ভাল কাজই করেছ।

এবার থেকে এই বুড়োর বুদ্ধি আর তোমার শক্তি একসঙ্গে কাজ করবে। বুঝলে মা চন্দ্রা, এইখানেই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ যে, কল্যাণচন্দ্র এখনও নিজের ভাল বুঝতে শিখল না। না হয় স্বীকার করে নিচ্ছি যে, তোর সব কথাই সত্য এবং এই সত্যধর্ম্ম পালন করতে গিয়ে যে নিজেকে ভিখারীর তুল্য করে তুলবি এ কথাটা একবার ভেবে দেখ। তা ছাড়া তুই এখন আর একলা নস। বিয়ে করেছিস—আর সামান্য কটা মাসের ব্যবধানে বাপ হতে চলেছিস। তোর কিনা…

চন্দ্রা লাল হয়ে উঠল। কেদার সস্নেহে পুত্রবধূর লজ্জারুণ মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে তোমায় বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম মা। এখন থেকেই বুঝে-শুঝে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধর, নইলে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎকে তোমরা নিজেরাই অন্ধকার করে তুলবে। কথাটা সব সময় মনে রেখ—আমি আর ক'দিন।

কেদার থামলেন। ডিবে থেকে গোটাদুই পান তুলে নিয়ে মুখে পুরলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে সুরু করলেন, তোমাকে এত কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল যে, আজ আমার অথবা কল্যাণচন্দ্রের স্বার্থের চেয়ে তোমার নিজের স্বার্থ ঢের বড় হয়ে উঠেছে।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে সুরু করলেন, তবে যুগধর্ম্মের কথাটা যে বলছিলে ওটা সত্যিই অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু তাকেই বা হতভাগা মেনে চলেছে কোথায়? কে নিষেধ করেছে তাকে বড় বড় বক্তৃতা করতে? কিন্তু কাজের সময় তার উল্টো কাজটি করলে ত আমার বলবার কিছু থাকে না। আমিও এই কথাটা হাজার বার ওকে বোঝাতে চেয়েছি। ওরে বাপু, সংসারটাই হচ্ছে সবার সেরা রাজনীতি ক্ষেত্র। শুধু ফাঁকা কথার প্যাঁচ লাগাও আর নিজের কাজটি হাসিল করে পাঁকাল মাছের মত পিছলে বেরিয়ে এস।

কেদার হস্তধৃত গড়গড়ার নলটি পুনরায় মুখে তুললেন, গোটা কয়েক জোরে জোরে টান দিয়ে হাঁক দিলেন, ওরে কে আছিস, কলকেটা পালটে দিয়ে যা।

ভৃত্য কলকেটি পালটে দিয়ে যেতেই তিনি পুনরায় গোটাকয়েক টান দিয়ে একরাশ ধূম উদ্গীরণ করে পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, কিন্তু আমার কল্যেণ ধরলেন ভিন্ন পথ। তেমনি আমিও কেদার মুন্সী……একেবারে চতুর্দ্দিক থেকে বেঁধে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে তবে ক্ষান্ত হয়েছি, বুঝলে মা চন্দ্রা। তাই বলে একেবারে চুপ করে থাকলেও আমাদের চলবে না, তার নোটিশ একটু আগেই তোমার কাছ থেকে পেয়ে গেছি। আমায় সতর্ক করে দিয়ে তুমি খুবই ভাল করেছ। তাই বলে এখানেই তোমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেব না। ওর ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎটি মাটি করে দিও না যেন। বুড়োর এ আর্জ্জিটা তোমার কাছে পেশ করা রইল মা চন্দ্রা।

কেদার মুন্সীর এতগুলি সদুপদেশের কোন জবাবই আর চন্দ্রা দিল না। তার বিবাহিত জীবনের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সে তার স্বামীকে জানবার বহু সুযোগ যেমন পেয়েছে, শ্বশুর সম্বন্ধেও তেমনি নানা তথ্য তার জানা আছে। এ-বাড়ীতে পদার্পণ করেই তার কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে, শ্বশুরকে তার ভয় ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে একটা সম্মানজনক ব্যবধান রেখেই চলতে হবে। তাই সে কোনদিন একান্ত কাছে এগিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু স্বামীকে যে তার শ্রদ্ধা করতে হবে, কিংবা ভয় করতে হবে এ-কথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে দেখা দেয় নি। ভিতরের তাগিদে সমর্পণের মধ্যেই প্রাপ্তির আনন্দ তাকে মাতাল করে রেখেছে। চোখ তার নেশায় জড়ান। সে চোখে চন্দ্রা শুধু একটি বস্তুই দেখতে পায়। পরিপূর্ণ বিশ্বাস। তাই শ্বশুরের কথায় নিজের জন্য ত নয়ই, তার ভবিষ্যৎ-সন্তানের জন্যও একবিন্দু দুশ্চিন্তা তার মনে ঠাঁই পেল না। কিন্তু এটা তার মনের কথা। মুখে কিন্তু সে উল্টা সুরে কথা কয়ে উঠল, আপনার উপদেশ আমার সব সময় মনে থাকবে বাবা।

কেদার মুন্সী খুশী হয়ে উঠলেন। সস্নেহে বললেন, আমায় তুমি নিশ্চিন্ত করলে মা।

কিন্তু ভগবান বোধ হয় কেদার মুন্সীকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেবেন না। নইলে এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে চন্দ্রাকে ইহধাম ত্যাগ করতে হবে কেন?

কেদার মুন্সী থমকে দাঁড়ালেন। আবার নতুন পথে তাঁকে চিন্তা সুরু করতে হবে। কিন্তু কল্যাণ স্ত্রীর মৃত্যুতে একবার মাত্র ফিরে তাকালেন। দীর্ঘ দুটি বছর সাহচর্য্য দিয়ে, সেবা ও ভালবাসা দিয়ে যে মেয়েটি তাঁর জীবনের একটা মস্তবড় অভাবকে পূর্ণ করে রেখেছিল তাকে আর কোনদিন কাছে পাবেন না। ছোট একটি নিঃশ্বাস সন্তর্পণে চেপে গেলেন তিনি; কিন্তু মুখে একটি শোকবাক্যও উচ্চারণ করলেন না। শুধু ভিতরের জ্বালা তাঁকে আরও বেশী কর্ম্মব্যস্ত করে তুলল। মনের মধ্যে একটা নতুন চিন্তার আলোড়ন উঠল। সে আলোড়নে তাঁর কল্পনা পেল নতুন রূপ। যে-রূপ দর্শনে কেদার মুন্সী প্রমাদ গোণলেন। পুত্রকে ডেকে সংসার সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। কল্যাণ নতমস্তকে তাঁর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু তাঁর চলার পথের কোন ব্যতিক্রম ঘটল না।

দিন চলে যায়। কেদার অধৈর্য্য হয়ে ওঠেন। কল্যাণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। চতুর্দ্দিকে জনরব—তিনি নাকি গ্রামের মধ্যে হাই স্কুল আর প্রসূতি হাসপাতাল গড়ে তুলবার জন্ত উঠে-পড়ে লেগেছেন। সরকারের কাছ থেকে মোটা টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে সুরু করেছেন। নায়েব-গোমস্তারা প্রতিদিনই অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছে কেদার মুন্সীর কাছে। যারা স্কুল এবং হাসপাতাল গড়ে তোলায় সাহায্য দেবে, গ্রামের উন্নতি করতে ব্যয় করবে কল্যাণ তাদের উসুল রসিদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আগুনে ঘি পড়ল, কেদার মুন্সী জলে উঠলেন। তাতে শুকনো কাঠ জোগাল আমলা-কর্ম্মচারিরা। কিন্তু অন্তরের এই প্রচণ্ড দাবানল চেপে রেখে তিনি বাইরে অবিশ্বাস্য রকম শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করলেন। পুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, প্রায় দু'বছর হ'ল চন্দ্রা মা চলে গেছেন। মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকে না কল্যাণ।

কল্যাণ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমাকে কি করতে বলেন বাবা ?

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা, তথাপি কেদার ঘোরা পথের আশ্রয় নিলেন। বললেন, এটা তোমার কেমন কথা হ'ল কল্যাণ ?

কল্যাণ নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপনার নতুন কোন আদেশ আছে কি-না তাই জানতে চাইছি বাবা।

কেদার ধীর কণ্ঠে বললেন, সংসারে যখন একবার মাথা গলিয়েছ তখন তাঁর সুখ-দুঃখ কোনটা থেকেই রেহাই পাবে না। তাই বলে দুঃখের কাছে হার মানতে হবে কেন ? দুঃখটাকে ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াও। আমি তোমার আবার বিয়ে দিতে চাই।

কল্যাণ একটু হাসলেন। একবার পিতার মুখের পানে চোখ তুলে তাকিয়ে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তার সত্যিই কি কোন প্রয়োজন আছে বাবা ?

কেদার মুন্সী ধমক দিলেন, তোমার না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে।

কল্যাণ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, সে প্রয়োজন ত আপনার মিটে গেছে বাবা। আপনার পৌত্র—

তাঁকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে কেদার পুনরায় বললেন, এক পৌত্র পৌত্রই নয়।

কল্যাণ পুনশ্চ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কিন্তু আমাদের বংশের ইতিহাস অন্ত কথা বলে বাবা। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার দ্বারা আপনার আদেশ পালন করা সম্ভব হবে না।

কেদার মুন্সীর এতক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি তিক্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, তা হলে কি সত্তব হবে শুনি ? মহলে মহলে সফর করে বাপের বিরুদ্ধে প্রজা-ক্ষেপান বুঝি ? আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি কল্যাণ—

কল্যাণ পিতার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপনি নিশ্চয় ভুল শুনেছেন।

কেদার সহসা নিজেকে সংযত করে নিলেন। অপেক্ষাকৃত ধীর কণ্ঠে বললেন, তা হলে খাজনাপত্তর আদায় হচ্ছে না কেন শুনি ? প্রজারা আমার নায়েব-গোমস্তাদের অপমান করে বিদায় করে দেবার দুঃসাহস পায় কোথা থেকে ?

কল্যাণ নিরুত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন, ওটা আপনার নায়েব-গোমস্তারাই তাদের শিখিয়েছে। আপনি অন্তায় রাগ না করে একটু ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখলেই আমার কথাটা বুঝবেন বাবা।

কেদার মুন্সী উষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকা উচিত কল্যাণ। আমার নায়েব-গোমস্তারা বহুদিনের পুরানো এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, এ কথাটা ভুলে যেও না।

কিন্তু তারা আপনার ছেলের চেয়ে আপন হতে পারে না, কল্যাণ বললেন।

পুত্রের এই শান্ত প্রতিবাদে কেদার মুহূর্ত্তের জন্ত থমকে দাঁড়ালেন। তার পরে দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, অবস্থা দৃষ্টে তাই আমার মনে হয়। তুমি স্থির জেনো যে, আগুনে হাত ঠেকালে অবুঝও অব্যাহতি পায় না।

কল্যাণ মৃদু কণ্ঠে বললেন, সকলের বেলাই কথাটা প্রযোজ্য। অপরাধ নেবেন না, একটা কথা বলছি—দিন বদলে যাচ্ছে। নিজেদের কথা অল্পবিস্তর সকলেই আজকাল ভাবতে সুরু করেছে।

কেদার অসহিষ্ণু কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, তোমার কাছে আমাকে পাঠ নিতে হবে, না ? দিন বদলে যাচ্ছে··· বদলে বদলে সব যে রসাতলে যাচ্ছে সেটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। তোমরা সব এগিয়ে যাচ্ছ বক্তৃতায়—কাজে নয়। কিন্তু জীবনটা নিছক বক্তৃতা নয় হে কল্যাণ চৌধুরী।

এত বড় অনুযোগেও কল্যাণ থামতে পারলেন না। মৃদু সংযত কণ্ঠে জবাব দিলেন, কোন কথাই যদি আপনি না শুনতে চান তবে আমি আর কি করতে পারি। শুধু আমলা-কর্ম্মচারীর চোখ দিয়েই সব দেখতে চান—আপনার প্রজাদের মধ্যে কোনদিন গিয়ে দাঁড়ালেন না। তাদের কথা শুনলেন না—তাদের সুখ-দুঃখের অংশ নিলেন না······

কেদার ধমক দিলেন, ওসব সস্তা বক্তৃতা আমি ঢের শুনেছি, তোমার কাছ থেকে নতুন করে না শুনলেও আমার

চলবে। যোদ্দা আমার পয়সায় তোমার পরোপকার করবার ইচ্ছাটা ত্যাগ করতে হবে। মুখে বড় বড় কথা বলতে পার, আর না বলে পরের পয়সা আত্মসাৎ করতে তোমাদের সুরুচি আর সুনীতিতে বাধে না?

কল্যাণ আহত কণ্ঠে বললেন, আত্মসাৎ কোন পয়সাই কেউ করে নি, তবে আপনার হয়ে আমি ওদের কিছুটা অভাব মোচন করবার চেষ্টা করেছি। সে অধিকারটুকু আপনার পুত্র হয়েও যদি আমার না থাকে তা হলে স্পষ্ট আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমি আর আপনার কোন ব্যাপারেই থাকব না।

কেদার মুনসী পুনরায় উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কথাটা তোমাকে বহুবার জানান হয়েছে, কিন্তু তোমার পরোপকার প্রবৃত্তিটা এতই উগ্র যে, অধমের কথাটা তোমার কানেই পৌঁছায় নি।

কল্যাণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার বুঝবার ভুল হয়েছিল বাবা, আমাকে ক্ষমা করবেন। বলেই কেদার মুনসীকে আর দ্বিতীয় কথার অবকাশ না দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। তখনকার মত চলে গেলেও এইখানেই যে সবকিছুর শেষ হয়ে গেল না একথাটাও তিনি ভাল করে বুঝে গেলেন।

কল্যাণের এই ভাবে নিঃশব্দে চলে যাওয়াটা কেদার মুনসীর খুব ভাল ঠেকল না। তিনি বহুক্ষণ যাবৎ ঘরময় পায়চারী করে একসময় ভৃত্যকে আহ্বান করে নায়েব মশাইকে তলব করবার কথা জানালেন এবং তিনি উপস্থিত হতেই তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খোকাবাবু ত আমাকেই আপনাদের অভিযোগের তদন্ত করবার কথা জানিয়ে গেলেন।

নায়েব মশাই কথাটা লুফে নিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন, এর চেয়ে আর ভাল কথা কি হতে পারে? আপনি নিজেই তা হলে সত্যি-মিথ্যার—

কথা শেষ না করে তিনি অন্য প্রসঙ্গে এলেন, তবে আমি বলছিলাম কি যে, যা হবার তা হয়েই যখন গেছে তখন ও নিয়ে আর জল ঘোলা করে কি হবে। যতই অন্যায় করুন না কেন তিনি আপনার ছেলে, তা ছাড়া তিনি যখন তাঁরই প্রজাদের মঙ্গলের জন্য—মানে আসল কথাটা হচ্ছে স্ত্রীবিয়োগের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার জন্যই তিনি একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আপনার সবই যখন একসময় তাঁর হবে তখন এ নিয়ে—

এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে নায়েব মশাইয়ের কথাগুলি শুনছিলেন, কিন্তু এই শেষ কথাটায় সহসা কেদার জলে উঠলেন, আপনাকেও দেখছি বক্তৃতায় পেয়েছে নায়েবমশাই।

নায়েবমশাই অধিকতর বিনয়ে একেবারে অবনত হয়ে পড়লেন, বললেন, আজ্ঞে এটা আপনি কি বলছেন? আপনার কাছে বক্তৃতা দেব আমি! প্রশ্নটা দাদাবাবুকে নিয়ে, তাই এত কথা বলবার সাহস পাচ্ছি। তিনি অন্যায় অবশ্যই করেছেন, আপনার অনুমতি আর আশীর্ব্বাদ নিয়ে এ-কাজে নামলেই তিনি ভাল করতেন।

কেদার মুনসী এ-কথার কোন জবাব দিলেন না।

নায়েবমশাই একবার আড়চোখে তাঁর মুখভাব লক্ষ্য করে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, আপনাকেও আমরা জানি, আর দাদাবাবুর সদিচ্ছা সম্বন্ধেও আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

হুঁঃ···সদিচ্ছা···সদিচ্ছাই বটে! কেদার মুনসী বললেন, আপনিও দেখছি রাতারাতি সুর পালটে ফেলেছেন। সদিচ্ছা থাকা খুবই ভাল কথা, কিন্তু তা মনে মনে। আয়-ব্যয়ের হিসেব না রেখে যারা কাজে নামে তারা কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করে। স্কুল, হাসপাতাল মানে শুধু দু'খানা বাড়ী নয়, কথাটা আপনি কল্যাণচন্দ্রকে বুঝিয়ে দেবেন। আর···

কেদার মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতঃস্তত করে পুনরায় বললেন, আর কালই সর্ব্বত্র ঢোল দিয়ে জানিয়ে দেবেন যে, আমার নিজের শীলমোহর রসিদে না থাকলে সে রসিদ গ্রহণ যোগ্য হবে না। কথাটা আমার আমলা-কর্ম্মচারী সকলেই স্মরণ রাখবেন।

নায়েবমশাইয়ের চোখেমুখে যেন খানিকটা চিন্তার ভাব ফুটে উঠল, তিনি সসঙ্কোচে বললেন, আজ্ঞে এতটা কি ভাল হবে? এতে সকলেই ক্ষুণ্ণ হবে—

কেদার মুনসীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল, তিনি নীরস কণ্ঠে বললেন, হিতোপদেশ অনেক শুনেছি, নতুন করে আর কি শোনাবেন। কেদার মুনসীর চুল এমনি সাদা হয় নি, কথাটা সব সময় আপনারা মনে রাখলে আমি খুশী হব।

কিছু বলবার জন্য নায়েবমশাই মুখ তুলতেই কেদার গর্জ্জন করে উঠলেন, কেদার মুনসী হুকুম দু'বার দেয় না—আপনি এখন যেতে পারেন।

নায়েবমশাই আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে মন্থর পদে প্রস্থান করলেন। আর কেদার চিন্তান্বিত গম্ভীর মুখে আপন শয়নকক্ষে পায়চারী করতে লাগলেন। তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না যে, তিনি এই হুকুমজারী করে নিজেকেও কত বড় প্রতারণা করলেন।

এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পরে। তখনও সন্ধ্যা হয় নি, কেদার তার দু'বছরের নাতির সঙ্গে বসে দাবা খেলছেন—খেলা মানে খেলার অভিনয় করা। কল্যাণ নিঃশব্দে এসে

সেখানে উপস্থিত হলেন। কোনপ্রকার ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করলেন, ঢোল দিয়ে যে হুকুমজারী করা হয়েছে, তা কি আপনার ইচ্ছায় হয়েছে বাবা?

যেন কিছুই হয় নি এমনি সহজ কণ্ঠে কেদার জবাব দিলেন, কথাটা কি তোমার বিশ্বাস হয় নি কল্যাণ? তিনি পুনরায় খেলায় মন দিলেন।

কল্যাণ একটু হাসল। মনে মনে একটা কিছু সিদ্ধান্ত করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এসব কথা থাক, আমি আজই এখান থেকে চলে যাব। অতনুও আমার সঙ্গে যাবে।

কেদার সহসা চমকে উঠলেন। তার হাতের ধাক্কায় মন্ত্রীটা কাত হয়ে পড়ল। অতনুও তার দাদুর ভাবান্তরে ভয় পেয়ে কিছু না বুঝে কেদারকে জড়িয়ে ধরে ডাকল, দাদু আমার মন্ত্রী—

কেদার সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। নাতিকে সস্নেহে কোলে তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে কল্যাণকে বললেন, তোমার সিদ্ধান্তটা কি একেবারে পাকা? এর অন্যথা হবার নয়?

কল্যাণ মাথা নেড়ে জানালেন, আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি।

কেদার পুনরায় সতেজে বললেন, তুমি কি আমায় ভয় দেখাতে চাইছ?

কল্যাণ একটু হাসলেন, কোন জবাব দিলেন না।

কেদার খানিকক্ষণ পুত্রের ভাবলেশহীন মুখের পানে চেয়ে দেখে ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, অতি উত্তম কথা কল্যাণ-বাবু, কিন্তু যেতে হয় তুমি একলা যেতে পার। অতনুকে তুমি পাবে না।

কল্যাণ তেমনি শান্তকণ্ঠে বলল, অতনু আমার ছেলে—

কেদার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বল—থামলে কেন? বল, অতনু যখন তোমার ছেলে তখন জোর করেই তাকে তুমি নিয়ে যেতে পার। তাই নিও হে কল্যাণচন্দ্র, আদালত করে তোমার ছেলেকে নিয়ে যেও—তার আগে নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার এতক্ষণে নেমে এসেছে। কল্যাণ একবার খোলা জানালা-পথে বাইরে দৃষ্টি ফেরালেন। একবার একটু ইতঃস্তত করলেন। একবার চোখ বুজে আপন অন্তরে ডুব দিলেন। একবার দু'পা এগিয়ে গেলেন, আবার পিছিয়ে এলেন। ছেলেটা কি ভেবে দাদুর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। কল্যাণ আর ফিরে তাকালেন না। নিঃশব্দে নত মুখে ঘর থেকে বাইরে এবং সেখান থেকে রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

অতনুকে প্রাণপণে বুকের মধ্যে চেপে ধরে কেদার বিহ্বল দৃষ্টিতে পুত্রের গমন পথের পানে চেয়ে রইলেন, এবং সর্ব্বপ্রথম অনুভব করলেন যে, এতটা রূঢ় না হলেই বোধহয় তিনি ভাল করতেন।

৬

কল্যাণ চলে যাবার পর পাঁচটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আরও বহু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেদার মুন্সীর চরিত্রেও একটা লক্ষ্যণীয় ওলট-পালট হয়েছে। নায়েব-গোমস্তা কারুর উপরই তাঁর আস্থা নেই, অথচ নিজেও চতুর্দ্দিকে নজর রাখতে পারেন না। শুধু মাঝে মাঝে অতি-মাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠতে গিয়ে নির্দ্দোষ লোকের উপর অত্যাচার করেন। বিচারের নামে চলে প্রহসন। অতনু তার দাদুর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ভাল-মন্দ সবকিছুর সঙ্গেই। এই একটি স্থানে কেদার শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল।

মাঝে মাঝে পুত্রের কথা মনে পড়ে। একটা অব্যক্ত বেদনায় ভিতরটা তার মোচড় দিয়ে ওঠে, মুখে কোন প্রকাশ নেই বটে কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে তিনি অবিশ্বাস্য রকম রুক্ষ হয়ে ওঠেন। শিশু অতনুর উপর নতুন করে সুরু হয় পরীক্ষা। ওর মধ্যের কোমল বৃত্তিগুলিকে অঙ্কুরেই তিনি বিনষ্ট করে দিতে চান।

কেদার ভিন্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। অতনুর সম্মুখেই তিনি নায়েব থেকে সুরু করে ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীদের ডেকে ডেকে তিরস্কার করেন তাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য। তারা প্রথম প্রথম আতঙ্কিত হলেও ইদানীং তাদের গা-সহা হয়ে গেছে। কেদার মুন্সীর এই কাঠিন্যের অন্তরালে যে আর একটি অসহায় ক্ষতবিক্ষত আত্মা প্রতি-নিয়ত কেঁদে কেঁদে ফিরছে এ-কথাটা আর তাদের কাছে গোপন নেই—তাই মুখ বন্ধ করে তারা ভবিষ্যতের পানে দৃষ্টি দিল। প্রজারা জমিদারের পায়ে এসে কেঁদে পড়ে। কেদার পা টেনে নিয়ে বেত হাতে ধরেন। বিচারের নাম করে শাস্তিবিধান করেন। দশ বছরের নাতিকে বলেন, কেমন বিচার করেছি দেখেছিস দাদু? ভাল করে শিখে রাখ, নইলে সব লাটে উঠে যাবে ভাই। বেটাদের থাকলেও কাঁদে, না থাকলেও কাঁদে। শয়তান—এক নম্বরের শয়তান ওরা।

অতনু নিতান্তই ছেলেমানুষ, অত বোঝে না। প্রশ্ন করে, ওদের বুঝি টাকা নেই দাদু?

কেদার মাথা নেড়ে জবাব দেন, কথাটা ঠিক হ'ল না দাদুভাই। ওরা সব সময়েই নেই বলে, শক্তের ওরা ভক্ত। কিন্তু এসব কথা এখন থাক, তার চেয়ে চল দু'বাজি খেলা

যাক। হতভাগা আমাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল দাহু।

খেলতে বসেও কিন্তু খেলাটা ঠিক জমছিল না। তাঁর চোখের সম্মুখে বারে বারেই বেত্রাহত অসহায় লোকটির করুণ মুখখানি ভেসে উঠছিল। অতনু চুপ করে হিসেব করে দেখছিল যে এত মারধোর করে দাহুর তহবিলে ক'টা পয়সা এল।

কেদার বললেন, খেলাটা তেমন জমছে না ভাই—

অতনু জবাব দিল, তোমার যে খেলায় মোটেই মন নেই দাহু—

কেদার বললেন, বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম।

অতনু বলল, তা হলে খেলা এখন থাক। আমার মাষ্টারমশাই আসবেন একটু পরেই।

কেদার হেসে বললেন, তা হলে তুলে রাখ ভাই। তোমার আসবেন মাষ্টার—আমি হচ্ছি অন্যমনস্ক। কিন্তু জানিস অনুভাই, তোর দাহু এমনি আগে ছিল না। একটা দুষ্টু লোক তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে—মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিয়েছে। সোজা হয়ে কিছু কি আর করবার উপায় আছে, সঙ্গে সঙ্গেই টনটন্ করে ওঠে, দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয় ভাই।

কেদারের চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে অতনু ব্যাকুল হয়ে ওঠে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কে সে দুষ্ট লোকট', তুমি আমাকে একবার দেখিয়ে দাও ত দাহু, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব—

কেদার অতনুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যান কিছুক্ষণের জন্য। তাঁর বিগত দিনের একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে মনোমুকুরে। কল্যাণ তখন মাত্র বার বছরের বালক। সদ্য-মাতৃহারা বালককে এমনি করেই বুকে জড়িয়ে ধরে নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলেন কেদার মুনসী। তার পর কত দিন, কত মাস, কত বছর অতীত হয়ে গেছে। বালক হ'ল কিশোর, কিশোর হ'ল যুবা। তিনি শিক্ষা দিলেন—দিলেন সংসার। কল্যাণকে ঘিরে কত তাঁর কল্পনা। আজ ভেঙেচুরে সব একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? এই প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি নিজেই কি বড় কম বিস্মিত হন। নিজের মনটাকেও কি তিনি চিনতে পেরেছিলেন? নইলে এত বড় একটা কুৎসিত নির্ম্মম বিচ্ছেদ কেমন করে ঘটতে পারল পিতা-পুত্রের মধ্যে?

অতনু কেদার মুনসীর অন্যমনস্ক মুখের পানে খানিক অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করল, তুমি কি ভাবছ দাহু? সেই দুষ্ট লোকটার কথা? আমাকে একবার দেখিয়ে দাও ত—

কেদার একটি নিঃশ্বাস মোচন করে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, শাস্তি দিতে পারবি সেই দুষ্ট লোকটাকে দাহু-ভাই?

অতনু জবাব দিল, একবার বলেই দেখ না তুমি—

কেদার মুখখানা খুব গম্ভীর করে বলেন, তোমার সে দুষ্ট লোকটা আর কেউ না ভাই, তোমার এই দাহুটি। এবারে দাও কি শাস্তি দেবে।

কিন্তু তাঁর এমনি মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, বরং মনের এই আলোড়ন ভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের কোমল রেখাগুলি কর্কশ হয়ে ওঠে। রুদ্ধ রোষে তাঁর অন্তর ফুলে ফুলে ওঠে।

ভয় পেয়ে অতনু বিহ্বল কণ্ঠে ডাকে, দাহু, তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

কেদার অল্পেই সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে জবাব দেন, কিছু নয় ভাই—ও কিছু নয়। এর পরে কতকটা আত্মগত ভাবেই বলতে থাকেন, তোর দাহুর অনেক দুঃখ ভাই! কেউ তা জানে না—কেউ তা বোঝে না।

অতনু এতক্ষণে কিছুটা সহজ হয়ে উঠেছে। উৎসাহিত কণ্ঠে সে বলল, আমি বড় হয়ে তোমার কোন দুঃখ রাখব না দাহু। তুমি যেমন করে দুষ্ট লোকগুলোকে গাছে বেঁধে চাবুক লাগাও, আমিও ঠিক তেমনি করে সেই দুষ্ট লোকগুলোকে শাস্তি দেব—যারা তোমাকে দুঃখ দেয়।

কেদার মুনসীর বুক ভরে ওঠে। তর্ক বিচার করে তিনি দেখতে চান না। ওতে আজ আর মন ভরে ওঠে না। এতখানি বয়স হ'ল তাঁর—দেখেছেনও বহু, হিসেব করে চলেও দেখেছেন; কিন্তু পেলেন তাতে কতখানি। যোগ করবার নির্ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করে এসে আজ যখন লাভ-লোকসানের হিসেব করতে বসেছেন তখন বারে বারেই তাঁর মন বলছে যে, তিনি একেবারেই দেউলিয়া হয়ে গেছেন।

অতনু পুনরায় কথা কয়ে উঠল, আবার ভাবছ কেন দাহু—।

কেদার চমকে ওঠেন। বড় অসাবধান হয়ে পড়ছেন আজকাল তিনি। ঐ একরত্তি ছেলেটাকেও আর ফাঁকি দিতে পারছেন না।

একটু হেসে অতনুর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ভাবছিলাম আমার দাহুভাই আমাকে

কত ভালবাসে সেই কথা। কিন্তু কি জানিস ভাই, তোর বয়সে সবাই অমন বলে। তার পরে সময়মত ভুলে যায়।

অতনু জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, আমি ভুলব না, তুমি দেখে নিও দাদু।

কিন্তু দেখে নেবার পরিপূর্ণ সুযোগ পাবার আগেই তাঁকে ইহধাম ত্যাগ করতে হ'ল। অতনুর বয়স তখন কুড়ি বছর। অতনু দু'হাতে বারকয়েক তার চোখ রগড়ে আশেপাশে তাকাল। সে মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করল তার দাদুর উপদেশগুলি। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আমলা-কর্মচারীদের মর্মভেদী হাহাকারের অন্তরালে সে অন্য কিছুর সন্ধান পেল। অতনু সতর্ক হয়ে উঠল, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি বিস্ময়কর ভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে। তার মন তাকে জানিয়ে দিল যে, সে একা। যথার্থ দরদ দিয়ে তার কথা ভেবে সহযোগিতার হাত কেউ বাড়িয়ে দিতে আসবে না। তার দাদুকেও শেষ-জীবনে বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। অতনু দেখছে তার চতুর্দ্দিকে রয়েছে সূক্ষ্ম জাল বিছান। শেষের দিকে দাদু কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি একটা কথা বলতেন, দুনিয়াটা দেখছি দিন দিনই বদলে যাচ্ছে দাদুভাই। তাই ত মলাট-সৌন্দর্য্যের এত কদর। ভিতরের সব পচাগলা। দুর্গন্ধ ছড়ায়।

অতনু হেসে বলত, বুড়ো বয়সে তোমাকে এ আবার কি রোগে ধরল দাদু?

কেদার বলতেন, রোগ নয় ভাই—সত্যদর্শন। কিন্তু বড় দেরীতে ঘটেছে, সামলান যাবে না।

অতনু বিস্মিত হয়, দাদুর মুখে নতুন কথা শুনে।

কেদার হেসে বলতেন, যেমন কাজ করেছি তার ফলভোগ করতেই হবে। এই পুরুষেই হোক কিংবা দু'পুরুষ পরেই হোক। তবে তোমাকে ঘাবরাতে হবে না ভাই, শুধু একটু হিসেব করে চলো।

এই ঘটনার পর থেকেই কেদার মুনসীর চালচলন কথা-বার্তা কেমন রহস্যাবৃত হয়ে উঠল এবং এই রহস্যের যবনিকা-পাত ঘটল তাঁর মৃত্যুর মাসতিনেক পরে—কেদার মুনসীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক বলে জলধর বিশ্বাস যখন আইনসঙ্গত ঘোষণা করলেন। আশেপাশের সকলেই বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে পড়ল। অতনুকে বহু উপদেশ দিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। শুধু দু'চারজন অতি হিতৈষী তখনও ঠিক অবস্থাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। তাই অতনুকে তালিম দিয়ে নতুন কোন রহস্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়ে উঠল। অতনু তাদের মহাজনদের পথে চলতে নির্দ্দেশ দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। ছোঁড়াটা এই বয়সেই বুড়োকেও টেক্কা দিয়েছে —তারা বলাবলি করে।

অতনু তার নিজের অবস্থাটা ধীর ভাবে চিন্তা করে দেখতে চায়। চতুর্দ্দিকের এই কলগুঞ্জনের মধ্যে নিজের চিন্তার সূত্রকে হারিয়ে ফেলতে সে চায় না। একটা পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্ভাবনা ধীরে ধীরে তার মাথার উপর চেপে বসেছে। পায়ের তলার মাটিও যেন সরে গেছে। অথচ দুনিয়ার কাউকে সে এই মুহূর্ত্তে বিশ্বাস করতে না পারলেও তার ঠাকুর্দ্দাকে সে অবিশ্বাস করতে পারছে না। তাই থেকে থেকে তার একটা কথাই আজ মনে হচ্ছে, কিসের জন্য দাদু তাকে হিসেব করে চলবার কথাটা উপদেশের ছলে বলে গেছেন। কিন্তু হিসেব করবে সে কি নিয়ে, তার সন্ধান তিনি দেন নি।

অতনু ভাবছিল—আর মাত্র একটি সপ্তাহ তার হাতে আছে। তার পরে চিরদিনের জন্য তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, হয়ত নগণ্য একটা ভিখারীর মত। অতনু ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক ছবি এঁকে নিয়েছে তার মনে। তার জীবনের বিগত দিনগুলি ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে পাঠ নিতেই কেটে গেছে, কিন্তু তার ভিতরের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে যে এমন একটি অধ্যায় এসে দেখা দিতে পারে তার কোন আভাসই সে পূর্ব্বে পায় নি। শুধু আরাম-বিলাস এবং স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত অতনু, তাই বর্ত্তমান পরি-স্থিতিতে শঙ্কিত হয়ে উঠল, কিন্তু ভেঙে পড়ল না। তাকে বাঁচতে হবে এবং তা মানুষের মত। ঠাকুর্দ্দার শিক্ষা তাকে শুধু একটা পথের সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। আজকের এই কলুষিত পৃথিবীতে বাঁচতে হলে যে মূলমন্ত্রের আবশ্যক সেটাও তাকে সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়ে গেছেন। এতদিন যেটা ছিল নিছক কাল্পনিক আজ সেটা বাস্তব রূপ নিয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে অতনু। পায়ের তলায় এই সর্ব্বপ্রথম অনুভব করল একটি কঠিন বস্তু। জীবনের প্রারম্ভের প্রথম সোপান, কঠিন, নির্মম আর পিচ্ছিল।

অতনু সাবধানে পা বাড়াল—সবখানি একাগ্রতা কেন্দ্রীভূত করে। মাটি তার পায়ের তলা থেকে সরে গিয়ে তাকে যে বস্তুর উপর এনে দাঁড় করিয়েছে তা যতই কঠিন আর পিচ্ছিল হোক না কেন শেষ পর্য্যন্ত অতনুকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় নি, বরং তার পায়ের চাপে সেখানে আবির্ভাব ঘটল দানব আলাদিনের। তার পরের কথা না বললেও চলে, তার বিস্ময়কর উপস্থিতি অতনুর ভবিষ্যৎটাকে আরও বিস্ময়কর ভাবে ওলট-পালট করে দিয়ে গেল।

অতনু নিজেই কি কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিল যে, সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় রাতের অন্ধকারে যে যুবক একদিন গ্রাম ত্যাগ করে শহরের এই বিরাট জনসমুদ্রের

মাঝে একলা এসে দাঁড়িয়েছিল সেই যুবকই একদিন এত বিপুল অর্থের অধিকারী হতে পারবে ? সম্মান আর প্রতিপত্তি এমন সহজে তার করায়ত্তে আসবে ? অধ্যবসায় আর ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তিই অতনুকে এখানে নিয়ে এসেছে। অবশ্য শুধুমাত্র অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিকতাই একমাত্র কারণ বলা হলে ভুল করা হবে। বরং এই কথা বললেই উচিত হবে যে, তার দানবীয় হৃদয়হীনতা, অর্থের প্রতি সুগভীর ভালবাসাই ছিল তার সাধনার প্রধান উপকরণ। সিদ্ধিলাভও তাই সহজ পথে ঘটেনি।

কতকটা অনন্যোপায় হয়ে এবং কতকটা ঝোঁকের বশে সেদিনে শহরে চলে এসে সর্ব্বপ্রথমেই অতনুর মনে হ'ল তাদের এটর্নীর কথা। ঠাকুর্দ্দার কথাগুলি নিরর্থক হতে পারে না। তাদের অত বড় জমিদারী বিশ্বাসদের হাতে এমনি চলে যায় নি। একথা কেউ বলে না দিলেও অতনু অনুমান করে নিয়েছে এবং তার অনুমান যে মিথ্যে নয় এটর্নীর কাছে সে খবরও সে পেল। যে টাকা ঠাকুর্দ্দা তার জন্য গচ্ছিত রেখেছেন তার অঙ্কটা অত্যন্ত লোভনীয় হলেও সর্ত্তগুলি তা নয়। সহস্র রকমের বিধিনিষেধ জট্ পাকিয়ে রেখেছে।

অতনু রাগ করে প্রস্থানোদ্যত হতেই বৃদ্ধ এটর্নী নলিনীবাবু তাকে ডেকে বসিয়ে স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন, তুমি রাগ বা দুঃখিত হয়ো না বাবাজী। আমাদের অনেক বয়স হয়েছে, আমি বলছি, কেদার কিছুমাত্র অন্যায় করেন নি। তিনি তোমার যেমন ঠাকুর্দ্দা আমার তেমনি বাল্যবন্ধু, তোমার মঙ্গলের জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতনুর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল, আমার ভালোর জন্যই আমাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে— চমৎকার যুক্তি আপনার।

নলিনীবাবু হাসিমুখে বললেন, তোমার এ প্রশ্নের জবাব কেদারই দিতে পারতেন। আমি আজ্ঞাবহ মাত্র। তবে এই কাজ করেই এতখানি বয়স হয়েছে অতনুবাবু, তাই বলছিলাম ব্যবস্থাটা তিনি বুদ্ধিমানের মতই করে গেছেন।

অতনু উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল, আজ্ঞাবহ না বলে বলুন আপনার বুদ্ধিতেই এই ব্যবস্থা হয়েছে।

নলিনীবাবু এ অভিযোগ হাসিমুখে উপেক্ষা করে শান্তকণ্ঠে বললেন, তুমি বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছ অতনুবাবু।

অতনু জবাব দিল, হলেই বা করবার আছে কি ?

নলিনীবাবু তেমনি সহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, তুমি রাগ করে কথাটা বুঝতে চাইছ না,কিন্তু একদিন সব বুঝবে অতনুবাবু।

অতনুর মুখে খানিকটা বাঁকা হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল, কোন জবাব দিল না।

নলিনীবাবু খানিক তার মুখের পানে চেয়ে থেকে একসময় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, মনে হচ্ছে জলধর বিশ্বাসের নোটিশ পেয়ে আর দেরী কর নি।

অতনু সায় দিল।

এখন আছ কোথায় ? নলিনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

অতনু ইতিমধ্যেই আত্মসম্বরণ করতে সক্ষম হয়েছে। শান্তকণ্ঠে সে জবাব দিল, একটা সস্তা বোর্ডিং হাউসে।

নলিনীবাবু বললেন, ওটা কাজের কথা নয়। কেদার মুনসীর নাতি তুমি। কথাটা তুমি ভুললেও আমরা ভুলতে পারি না। এ ব্যবস্থাটা আমার কার্য্যকেই করতে দিও অতনুবাবু। দিনকতক আর অন্য কোন চিন্তা নয়, একেবারে বিশ্রাম। আর চিন্তা যদি করতেই হয় তবে ভাবতে চেষ্টা কর যে, তোমার ঠাকুর্দ্দা আজও বেঁচে আছেন।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ, এই বয়সেই মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার উপর এতগুলি নগদ টাকা। না অতনুবাবু, কেদার মোটেই ভুল করেন নি—একবিন্দু অন্যায় করেন নি। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমার সত্যিকার প্রয়োজনের দিনে বিমুখ হবে না।

অতনু উঠে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনার কথা আমার সর্ব্বদা মনে থাকবে। তবে আপনিও ভুলে যাবেন না যে, ঠাকুর্দ্দার কাছেই আমার যা কিছু শিক্ষা—

নলিনীবাবু বললেন, কথাটা ঠিক, কিন্তু তোমার ঠাকুর্দ্দা তাঁর শেষ বয়সে মত বদলেছিলেন। যে শিক্ষা তিনি তোমায় দিয়েছিলেন তার উপর তাঁর নিজেরই কোন আস্থা ছিল না অতনু।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল, আপনার একথার মানে ?

নলিনীবাবু বললেন, অত্যন্ত সোজা। নিজের উপর বিশ্বাস হারালে যা হয় ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু এগুলি তুচ্ছ কারণ। আমি আবার বলছি, তুমি মাথা খারাপ করো না। বরং ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করে ফেল। ঠাকুর্দ্দা কি করে গেছেন তার চুলচেরা হিসেব করতে না বসে তুমি কি করতে পার তাই আমাকে জানিও।

অতনু বলল, আপনাকে জানিয়ে লাভ ?

নলিনীবাবু হেসে বললেন, লোকসান যে নেই এ কথাটা ত স্বীকার কর অতনুবাবু ? ভাল কথা—তোমার সঙ্গে আমার একজন লোক গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে আসবে। তোমারও যেমন আমাকে দরকার আমারও তেমনি তোমাকে দরকার।

অতনু মৃদুকণ্ঠে বলল,তার কোন দরকার হবে না, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

নলিনীবাবু হেসে বললেন, তোমার পা এখনও শক্তি অর্জ্জন করে নি অতনুবাবু, তোমার সাহায্যের দরকার। আজ তা হলে তুমি এসো।

ক্রমশঃ

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

৪

নাম আছে, বস্তু নেই। ঝুলা আর ঝোলে না। সার্থকনামা ভয়ঙ্কর লছমনঝুলা অতীতের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আধুনিক স্থপতিবিদ্যার কল্যাণে বর্তমান বস্তুটি কঠিন ইস্পাতের সুদৃঢ়, নিরাপদ পুল। হেলে না, দোলে না; পা ফসকে পড়ে যাবার ভয় একেবারে নেই।

কিন্তু সেকালের ঝুলন্ত পুলের প্রেতাত্মা একালের বাস-এর মধ্যে বাসা করেছে নাকি! ওপারের প্রায় পরিত্যক্ত সরু ও দুর্গম পায়ে-চলা পথে হেঁটে যেতে হবে না বুঝে মনে মনে উল্লসিত হয়ে কি ভুলই যে করেছি তা টের পেলাম বাস চলতে সুরু করবার পরেই। বসেছি লোহা ও কাঠের সুদৃঢ়, নিশ্ছিদ্র আশ্রয়ে। তথাপি অনবরত দোলা লাগছে দেহে। হেলছি যে তা কেবল ডাইনে ও বাঁয়ে নয়, থেকে থেকেই দেহের উর্দ্ধাঙ্গ আসন থেকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, ঠক্ করে মাথা গিয়ে ঠেকল বাস-এর ছাদে। মিনিট দশেক চলতে না চলতেই মনের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল। জ্যা দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান টান অবস্থা দেহের প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রীর। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে—যে দিকেই তাকাই না কেন, স্বস্তি নেই। ভয়ে চোখ বুজে যায়। মাটির সাক্ষাৎ-স্পর্শ ত আগেই হারিয়েছিলাম, পরোক্ষ সংস্পর্শের নিশ্চয়তা সম্বন্ধেও এখন গভীর সন্দেহ মনে।

দোষ অবশ্য বাস-এর নয়, যে পথে বাস চলছে তার। কি মারাত্মক পথে বাস চালিয়েছে এরা!

ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে, পাথর সরিয়ে, গাছ-পালা কেটে পাহাড়ের কোলে কোলে সড়ক তৈরি হয়েছে। মোটর চলবার মত প্রশস্ত নিশ্চয়ই সে পথ। কিন্তু গাড়ীতে বসে পাথর বিস্তার চোখে পড়ে না, দেখা যায় দুদিকেই তার সীমানা। সে দৃশ্য ভয়াবহ। এক দিকে খাড়া পাহাড় সোজা আকাশে উঠে গিয়েছে। সর্ব্বত্রই দেয়ালের মত মসৃণ নয় ওর দেহ, বাঁশের মত সরলও নয় ওর উর্দ্ধগতি। মাঝে মাঝে হাতকয়েক উঁচুতেই কার্ণিশের মত প্রসারিত হয়ে আছে হয়ত একখানি মাত্র পাতলা শিলাখণ্ড, হয়ত বা বিশাল পাহাড়টির মেখলা থেকে চূড়া পর্য্যন্ত ওর বিপুল দেহের অবশিষ্ট সবটুকুই। দূর থেকে দেখলে ভয় হয় বুঝি বা বাস-এর ছাদ ঠেকে যাবে ওতে, হয়ত বা সবটা কার্ণিশই ভেঙে পড়বে বাস-এর উপর। একটির পর একটি পাহাড়ের কোলের উপর দিয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে পথ। বাঁকে বাঁকে বাধা—উপরের কার্ণিস আর মোড়ে মোড়ে পথের উপর এগিয়ে-আসা পাহাড়ের কোণগুলির অচল বাধাই কেবল নয়, পাদচারী পথিক এবং তার চেয়েও মারাত্মক চলন্ত পশুপালের বাধাও অপেক্ষাকৃত সরল পথেও হঠাৎ থামিয়ে দেয় চলতি বাসকে। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ী থামায় ড্রাইভার। সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে যাত্রীমহলে ভূমিকম্পের বিপর্য্যয়।

ঐ খাড়া পাহাড়ের প্রায় গা ঘেঁষে চলে বাস। নীচে সড়কের অস্তিত্বের মত চলতি বাস আর নিথর শিলাময় পাহাড়ের মাঝখানের ব্যবধানটুকুও সম্পূর্ণ অনুমান সাপেক্ষ।

তুলনায় ভয়ঙ্কর রকমে প্রত্যক্ষ বিপরীতদিকের খাদ। খাড়া নীচে নেমে গিয়েছে পাহাড়। দৈত্যের মত বিরাট রাশি রাশি পাথর বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে ওর খাঁজে খাঁজে। বল্লমের মত তীক্ষ্ণ ফলা এক একখানা পাথরের। মাঝে মাঝে আবার ওদের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গাছ সঙ্গীনধারী শত্রুবাহিনীর মত সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। ডালপালা লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে অনেক, অনেক নীচে থেকে থেকে চোখে পড়ে কল্লোলিনী পাগলাঝোরা। বাস-এর এঞ্জিন একটু থামলেই কানে আসে তার প্রমত্ত গর্জ্জন-ধ্বনি। মনে হয় যে শত শত বিপুলায়তন শিলাখণ্ডের দুর্ভেদ্য কারাগারে বন্দিনী নির্ঝরিণীর বিপুল জলধারার আবর্ত্তবিক্ষুব্ধ বক্ষ থেকে মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততাই যেন বাস-এর যাত্রীদের উদ্দেশ্যে খল খল অট্টহাস্যের ভয়ঙ্কর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

লুব্ধ, অধীর, উচ্ছলিত মরণের ভয়ঙ্কর রূপ প্রত্যক্ষ করলাম দেবপ্রয়াগে। ঋষিকেশ থেকে ৪৪ মাইল দূরে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ওটি। ভাগীরথী ওখানেই গঙ্গা হয়েছেন।

প্রয়াগ মানে সঙ্গম। ভাগীরথীর মিলন দেখলাম তেমনি বিপুল আর এক জলধারার সঙ্গে—অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর যুক্তধারা।

পতিতোদ্ধারিণী কলুষনাশিনী গঙ্গা। মা বলে ডাকি আমরা। কিন্তু একি রূপ তার! গঙ্গা এখানে ভয়ঙ্করী।

নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে, নানা কোণ থেকে জাহ্নবীর রূপ দেখলাম। স্বতন্ত্রভাবে একবার ভাগীরথীকে, একবার অলকানন্দাকে। উভয় ধারাকেই একবার এপার থেকে, একবার ওপার থেকে; লোহার পুলের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে নীচে তাকিয়ে তাকিয়ে। উভয়ের সম্মিলিত রূপ দেখলাম আসল সঙ্গম-তীর্থে পাথরের ঘাটের সর্বশেষ শুকনো সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তা সে যেখান থেকেই তাকাই না কেন, একই রূপ চোখে পড়ে। প্রলয়ঙ্কর সে রূপ। একই রকম গর্জ্জনধ্বনি কানে আসে—বুঝি একেই বলে প্রলয়বিষাণের বজ্রনির্ঘোষ।

মহাসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ দেখেছি, শুনেছি তার অবিরাম অশান্ত গর্জ্জন। সত্যই "সুগম্ভীর স্নেহখেলা" তা। সে তরঙ্গভঙ্গের ছন্দ আছে। সে গর্জ্জনের বিষণ্ণ-গম্ভীর সুরে মন অভিভূত হয়, দোলা লাগে যেন দেহের প্রতি অণুপরমাণুতে। কিন্তু এখানে যা শুনছি তা যেন রক্তপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ কোন ভয়ঙ্করী দানবীর খল খল অট্টহাস্য।

কি দুর্ব্বার গতি, কি বিপুল উচ্ছ্বাস, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। হয়ত গভীর তেমন নয়। বেশ অনুমান করা যায় যে, তীরে তীরে যেমন জলের নীচেও তেমনি কঠিন শিলাময় পাহাড় বা পাহাড়েরই অগণিত ভগ্নাংশ ছড়িয়ে পড়ে আছে, ঢলের সঙ্গে তেমনই দুর্ব্বার বেগে উপর থেকে ক্রমাগতই গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। চলার পথে পায়ে পায়ে বাধা পাচ্ছেন বলেই বুঝি ভাগীরথী ও অলকানন্দার ঐ বিদ্রোহিনীর রূপ। তরঙ্গ নেই, আছে অগণিত কুটিল আবর্ত্ত। শূলবিদ্ধ শেষ নাগ যেন তার উদ্যত সহস্র ফণা প্রসারিত করে সহস্র কুটিল, নিষ্ঠুর লেলিহান জিহ্বা থেকে প্রতিহিংসার নীল বিষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে অক্ষম আক্রোশে নিরন্তর ফুঁসছে। জননী জাহ্নবী বলে ওকে পূজা করতে মন চায় না, ও যেন কালো না হয়েও লোলরসনা, করালিনী কালী।

নৃমুণ্ডমালিনীর মতই ইনিও বলি চান না ত?—জিজ্ঞাসা করেছিলাম বৈকালে স্থানীয় এক ভদ্রলোককে।

উত্তরে অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি তার। শুধু তীর্থস্নানই ত নয়, ভাগীরথী অলকানন্দার জল লাগে স্থানীয় লোকের শত প্রয়োজনে। ঘাটও আছে অনেকগুলি। আঘাটারও ব্যবহার হয় প্রয়োজনের তাগিদে। স্ত্রী-পুরুষ ঘাটে যান, স্নান করেন, বাসন মাজেন, কাপড় কাচেন ঐ জলে সাবান দিয়ে। কোনও কারণে পা পিছলে যদি যায় কেউ কেউ ভেসে যায় বই কি। যুবক, নারী, শিশু—নিয়তি যাকে যখন টানে।

খুবই স্বাভাবিক। তবু গা শিউরে উঠেছিল। ভিতলের সমান উঁচুতে বসে আছি। কাছেই একটি ঘাট। নীচে তাকিয়ে দেখি স্থানীয় মহিলারা গিয়েছেন বড় বড় ঘড়া নিয়ে। দু'চারটি শিশুও আছে ওখানে। তাদের পায়ের নীচেই অলকানন্দা ফুঁসছে।

বাসে বসেই সহযাত্রী একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দেবপ্রয়াগ থেকে মাইল চারেক দূরে একটি পাহাড়ের উপর তার পৈতৃক বাড়ী। সেখানেই যাচ্ছিলেন তিনি।

কথায় কথায় বলেছিলেন, দু'টানায় পড়ে হাবুডুবু খাই, মিষ্টার। জমিজমা যা আছে তা থেকে তিন মাসেরও খোরাক আসে না। অথচ ছাড়তেও পারি নে এ জঞ্জাল। তাই মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে দেশে আসতে হয়।

শহরে আপনি চাকরী করেন বুঝি? জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি।

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, না করে উপায় কি। জাতে আমি ক্ষত্রিয়। এই দেবপ্রয়াগের পাণ্ডাদের মত হাত পাতলেই ত পয়সা হবে না আমার।

বাস থেকে নামতে না নামতেই সেই পাণ্ডারা এসে ঘিরে ধরল আমাদের দুজনকে।

কেদার যাবেন ত? না সোজা বদরীনাথ? পাণ্ডা কে আপনাদের? বাড়ী কোথায়? এক সঙ্গে চার পাঁচজনে প্রশ্ন করছে।

মলিন বসন সকলেরই, তাও অপর্য্যাপ্ত। খালি পা। শীর্ণ মুখে দারিদ্র্যের ছাপ। যত জোর সব বুঝি তাদের কণ্ঠস্বরে।

আমার কোন পাণ্ডা নেই। কিন্তু বললে সে কথা শোনে কে। প্রশ্ন হয়: গ্রামের নাম বলুন, যার অর্থ এই যে, কোন কালে আমার গ্রাম থেকেও কেউ যদি এখানে এসে থাকেন তবে তারই পাণ্ডা বা তস্য উত্তরাধিকারীর যজমান হয়ে আছি আমি।

ভাল হ'ত যদি পরিচিত কারও কাছ থেকে তার পাণ্ডার নাম জিজ্ঞাসা করে টুকে নিয়ে আসতাম; সমবেত আক্রমণ থেকে রেহাই পেতাম তা হলে। তা আনি নি বলেই চারিদিক থেকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লাম।

জীতেনের অবস্থাও তাই। তবে তার উপস্থিত বুদ্ধি বেশী; বিশেষতঃ রূঢ় হতে জানে সে। কিছুতেই ওদের নিরস্ত করতে না পেরে অবশেষে সে তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। বললে, তীর্থ করতেই আসি নি আমরা; এসেছি বনের সাপ-বাঘ আর পাহাড়ের মাথার বরফ দেখতে।

বাহাদুরকে সে হুকুম করল ধর্ম্মশালায় যেতে।

কিন্তু সেখানে গিয়েও রেহাই নেই। দু'তিন জন সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। অনবরত বলে যাচ্ছে তারা দেবপ্রয়াগের মাহাত্ম্য, ফিরিস্তি দিচ্ছে স্থানীয় দর্শনীয় মন্দিরের। রঘুনাথজীর মন্দির ত আছেই; তা ছাড়াও দুর্গামায়ী, বিশ্বেশ্বর, ক্ষেত্রপাল, আরও কত কি। এ তীর্থে প্রধান কৃত্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান ইত্যাদি। সে সব করতে হয় সঙ্গমস্থলে। অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি এবং সে সব পালন করলে কত পুণ্য যে লাভ হবে তাই তারা আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

জীতেনের সাফ জবাব: আমরা কিছুই করব না।

পাণ্ডার ধৈর্য্যেরও সীমা আছে; মুখ বেজার করে দু'জন চলে গেল দেখলাম।

আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম; কিছুক্ষণ পর কানে এল মিহিসুরের মৃদু সম্ভাষণ, বাবুজী।

তাকিয়ে দেখি বছর কুড়ি বয়সের একজন, বড়ই যেন করুণ চোখে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। চোখে চোখ মিলতেই কাতর স্বরে সে বললে, আপ ত, বাবুজী, দরিয়া হৈ, হম ত্রিক এক পন্‌ছি।

তার মানে? আমি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছি।

মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে, আমি একটু জল খেলে আপনার কিছুই ফুরাবে না, বাবুজী।

তথাপি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু জীতেন হো হো করে হেসে উঠল। সে-ই বুঝিয়ে বললে আমাকে যে, ঐ লোকটির মতে আমার এত টাকা আছে যে ওকে কিছু দিলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না।

তার পর লোকটির মুখের দিকে সে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তা পনুছি মহারাজ, তোমার আসল নামটি কি?

সে উত্তর দিল, বলবীর উপাধ্যায়। কিন্তু বিরস কণ্ঠস্বর তার।

নির্দ্দয় জীতেন তথাপি তীক্ষ্ণ পরিহাসের স্বরেই আবার জিজ্ঞাসা করল, গোড়াতেই আসল কথাটা না বলে অত আগড়-বাগড় বকছিলে কেন?

ভাল লাগল না আমার; চোখের দৃষ্টিতে জীতেনকে একটু শাসন করলাম আমি; তার পর বলবীরকে বললাম, তুমি ঠাকুর অনর্থক তোমার সময় নষ্ট করছ। এখানে আমরা কিছুই করব না।

সঙ্গমে স্নানও করবেন না?

এ প্রশ্নের উত্তরে "না" বলা যায় না—স্নানের তাগিত রয়েছে আমার নিজের মনের মধ্যেই। তবে ঘুরিয়ে উত্তর দিলাম, বললাম দেরী হবে; তুমি এখন যাও।

ভালই করেছিলাম ওরকম উত্তর দিয়ে। যাকে স্নান করা বলে দেবপ্রয়াগে তা অসম্ভব। বাঁধা ঘাট, সিঁড়িও আছে। তথাপি হাঁটু জল পর্য্যন্তও নামতে ভরসা হয় না—পা ফসকাবার দরকার নেই, স্রোতের টানেই মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় যে গিয়ে পড়ব কে জানে। সুতরাং শুকনো সিঁড়ির উপর বসে তোয়ালে ভিজিয়ে তাই সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে নিলাম, ঘটি ভরে জল তুলে তাই ঢাললাম মাথায়। তাতেই অশেষ তৃপ্তি।

যাত্রীরা তর্পণ করছে—এক একটি দল একসঙ্গে। স্নান করে সিক্ত বস্ত্রেই দাঁড়িয়েছে তারা। দাঁড়িয়েছে সঙ্গমের দিকে মুখ করে। হাতে কিছু ফুলপাতা, তিলও কয়েকটি আছে হয় ত। স্থানীয় পুরোহিতেরা মন্ত্র পড়াচ্ছে। প্রতিটি শব্দ কাণে আসে না, কিন্তু সুরটি চেনা। আজন্মের সংস্কার যাবে কোথায়? শ্রাদ্ধের মন্ত্রের পরিচিত সুর কাণের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মনের বীণার তারেও ঝঙ্কার দেয়।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দৃশ্য দেখছিলাম। ধীরে ধীরে একজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে। প্রৌঢ়। দীর্ঘ, ঋজু দেহ অনাবৃত। বুকের উপর শুভ্র উপবীতগুচ্ছ হাওয়ায় উড়ছে; উড়ছে তার মাথার দীর্ঘ শিখাটিও। ব্রাহ্মণোচিত চেহারাই বটে। উঁচু নাক, রোদে পোড়া হলেও গৌরবর্ণ, ললাটে শ্বেতচন্দনের কয়েকটি রেখা।

কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, ক্রিয়াকর্ম্ম কিছু করবে, বাবুজী?

প্রথমে চমকে উঠেছিলাম, খুশী হলাম তার পরেই। তাকালাম জীতেনের দিকে। সে শ্যাম ও কুল দুই-ই রক্ষা করে বললে, তা দোষ কি—সবাই যখন করছে।

মনে হ'ল প্রীত হয়েছে ব্রাহ্মণ। উপকরণ তার সঙ্গেই ছিল। কিছু আমার কিছু জিতেনের হাতে দিয়ে সে নির্দ্দেশ দিল সঙ্গম থেকে এক এক গণ্ডূষ জল নিতে।

আরম্ভ ভালই হয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই গোলমাল হয়ে গেল।

এতক্ষণ মোটেই দেখা যায় নি। ভীমগর্জ্জনা ভাগীরথীর অমন ভয়ঙ্কর আবর্ত্তসঙ্কুল জলে ওরা যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে তা আমরা ভাবি নি। অথচ সত্যই ভেসে উঠল মহাশোল মাছ—একটি নয়, অন্ততঃ তিনটি। জিতেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে এক ধাপ নীচেই। জিতেনের চোখেই আগে পড়েছে। সে মন্ত্র বলা বন্ধ করে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, দেখেছেন, মণিদা,—এখানেও মাছ।

দেখলাম আমিও। সঙ্গে সঙ্গেই আমারও আবৃত্তি বন্ধ। অধিকন্তু এক ধাপ নীচে নেমে জিতেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর দু'জনেই উপুর হয়ে মাছ দেখছি। সমস্ত মনোযোগ আমাদের ঐ মাছেদের প্রতি।

অমন করে কতক্ষণ কেটেছিল বলতে পারি নি। হঠাৎ যেন গঙ্গার গর্জ্জনধ্বনিকে ডুবিয়ে বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনি কানে এল আমার: তুমলোগ মছলি দেখনে আয়ে হো! তব দেখো উনছিকো।

চমকে মুখ তুলে দেখি আমাদের পুরোহিত বলছে ও কথা। ললাট তার কুঞ্চিত; চোখ দুটিতে যেন আগুন জ্বলছে।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, ঘাট হয়েছে ঠাকুরমশায়? আবার গোড়া থেকে সুরু করছি।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করল না সে। গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে "শ্রীবিষ্ণু", "শ্রীবিষ্ণু" বলতে বলতে খানিকটা জল তার নিজের মাথায় উপর ছিটিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে—একেবারে আমার মুখোমুখি। তারপর তার ডান হাতখানি বিচিত্র ভঙ্গিতে আমার মুখের সামনে এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত মৃদু, কিন্তু তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে বললে, শ্রদ্ধা ছাড়া শ্রাদ্ধ হয় না।

রাগ হ'ল না আমার, হ'ল লজ্জা। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠবার পর আবার যখন মুখ তুলে তাকাতে পারলাম তখন দেখি যে, পুরোহিত বেশ কয়েক ধাপ উপরে উঠে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পথ আটকালাম তার। কুণ্ঠিত স্বরে বললাম, তা হ'লে আপনার দক্ষিণাটা আপনি নিন।

কিন্তু শুনেই আবার জ্বলে উঠল তার চোখ দুটি; যেন কোন অশুচিস্পর্শ এড়াবার জন্যই খানিকটা দূরে সরে গিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে সে বললে, আমি পাণ্ডা, পুরোহিত—ভিখারী নই, বাবুজী।—বলেই মুখ ফিরিয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল সে।

অপ্রতিভের একশেষ আমি; জিতেনের অবস্থাও আমারই মত। পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। তৃতীয় এক ব্যক্তি কাছে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করে সহজ হতে হ'ল।

ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত যে পাণ্ডারা আমাদের পিছনে ধাওয়া করেছিল

তাদেরই একজন বলে চিনতে পারলাম লোকটিকে। মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সে বললে, পাগলা শম্ভুজীর হাতে গিয়ে পড়েছিলেন, বাঙালীবাবু। তাই এমন নাজেহাল হতে হ'ল।

একটু খোঁচা ছিল তার কথায়। প্রতিক্রিয়ায় আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে অতি সচেতন জিতেন বলে উঠল, লোকটা ভারি দাম্ভিক।

কিন্তু সায় দিল না নূতন পাণ্ডাটি, সে বললে, না বাবুজী, তা নয়। শম্ভু পাণ্ডার মাথায় একটু ছিট আছে, কিন্তু সাচ্চা লোক। অশ্রদ্ধা, অনাচার একেবারে সহ্য করেন না বলেই অমন মনে হয়।

একটু চুপ করে থেকে তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এখানেই ওর বাড়ী বুঝি?

উত্তর হ'ল: না। শম্ভুজীর আসল বাড়ী গোপেশ্বরের কাছে। পরিবার সেখানেই থাকে। উনি থাকেন যোশীমঠে, মাঝে মাঝে এই দেবপ্রয়াগে আসেন একা।

একা কেন?

ঐ ত দেখলেন—কে ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে!

একটু থেমে পাণ্ডা আবার বললে, তবে সাচ্চা ব্রাহ্মণ এই শম্ভুজী—ব্রহ্মতেজ অটুট আছে ওর মধ্যে। শাপ দিয়ে উনি ভস্ম করতে পারেন অনাচারী পাপীকে।

এ রকম একটি ঘোষণা আমার পক্ষেও হজম করা কঠিন, জিতেনের ত কথাই নেই। সে হো হো করে হেসে উঠল; আমার গায়ে একটি ঠেলা দিয়ে সে বললে, বড্ড বেঁচে গিয়েছি আমরা, এখন পালাই চলুন।

তা পারলাম না। শম্ভু পাণ্ডার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে না পারলেও এরই মধ্যে মনে মনে তাকে শ্রদ্ধা করতে সুরু করেছিলাম। ভাবছিলাম যে, তীর্থে আমাদের একজন পাণ্ডা যখন না হলেই নয় তখন এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেই তীর্থগুরু করতে পারলে মন্দ হয় না। তাই নূতন পাণ্ডাটির হাতে একটি টাকা দিয়ে তাকে অনুরোধ করলাম শম্ভুজীর বাড়ীটা আমাদের দেখিয়ে দিতে।

খুশী হয়েই বাড়ী দেখিয়ে দিল সে, কিন্তু নিজে ভিতর পর্য্যন্ত সঙ্গে গেল না। শুনিয়ে দিল আমাদের যে, তার নাম চক্রধর; নিচে রঘুনাথজীর মন্দিরে সে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

বেশ খানিকটা উঁচুতে শ্লেট পাথরের মত হালকা টালির ছাদওয়ালা ছোট একখানা বাড়ী শম্ভু পাণ্ডার। ঘর-ভরা পুঁথি, মেঝেতে বিবর্ণ একখানি গালিচা পাতা। তার উপর বসে শম্ভুজী নিবিষ্ট মনে একখানি বুঝি চিঠিই পড়ছিল।

ভয়ে ভয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু না, বিস্ময়ের ঘোরটা তার কেটে যেতেই সে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বসাল আমাদের।

আমি মন ঠিক করেই এসেছিলাম, বললাম, আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে ঠাকুরমশায়। তাই মাফ চাইতে এলাম।

শুনেই একটা যেন ছায়া নেমে এল শম্ভুজীর মুখের উপর; ঈষৎ গম্ভীর স্বরে সে বললে, আমি মার্জ্জনা করবার কে? তবে যিনি করতে পারেন তিনি সত্যই দয়াময়।
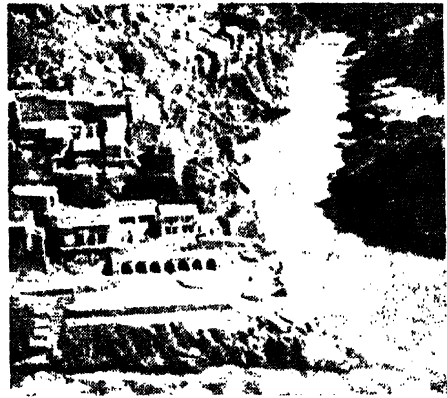
দেবপ্রয়াগ

কিন্তু পরক্ষণেই হেসে ফেলল শম্ভুজী; আমার মুখের দিকে চেয়ে এবার যেন সকৌতুক কণ্ঠেই সে বললে, তোমাদের মত যাত্রীই ত আসে বেশী আজকাল। কিন্তু আমি ভাবি যে, মাছ, জল, পাথর, পর্ব্বত আর বরফ ছাড়া আর কিছু দেখবার চোখ যদি না থাকে তবে এই উত্তরাখণ্ডে আস কেন তোমরা? মুসৌরী-সিমলা গেলেই পার। তোমাদের ঘরের কাছেই দার্জ্জিলিং ত শুনেছি আরও মনোরম।

তর্ক করব না তাও মনে মনে ঠিক করে এসেছিলাম; সুতরাং বললাম যে, চোখ নেই তার জন্য দুঃখ করে আর কি লাভ হবে! তবে বুঝতে পারছি যে, কেদারে একজন পাণ্ডার দরকার হবে আমাদের, অথচ কোন পুরুষানুক্রমিক পাণ্ডা আমাদের নেই। তাই আপনাকে অনুরোধ করতে এলাম—আমাদের তীর্থ-গুরু হবেন আপনি?

শুনে ওষ্ঠপ্রান্তের হাসি সারা মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ল শম্ভুজীর; মনে হ'ল যেন বেশ কোমলও হয়েছে তার চোখের দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি আমার মুখের উপর বিন্যস্ত করে সে বললে, ঈশ্বর তা হলে এরই মধ্যে সুমতি দিয়েছেন তোমাদের! ভাল ভাল। কিন্তু, বাবুজী, আমি ত কেদারের পাণ্ডা নই?

তবে?

আমি বদরীনারায়ণের পাণ্ডা। শ্রীকেদারনাথে তীর্থকৃত্য করাবার অধিকার আমার নেই। তবে বদরীবিশাল পর্য্যন্ত যদি তোমরা যাও সেখানে ক্রিয়াকর্ম্ম করাতে পারি আমি।

এ সব আগে জানতাম না। একই উত্তরাখণ্ডে এই দুই প্রসিদ্ধ তীর্থ যেন দুই জমিদারী। স্বতন্ত্রই কেবল নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীও। দুই দেবতাও নাকি তাই। স্থানীয় কিংবদন্তী বলে যে, শ্রীকেদারনাথ পূর্ব্বে বদরীপুরীতেই বাস করতেন; বদরীনারায়ণ ছলক্রমে

তাঁর মন্দির দখল করে কেদারেশ্বরকে দশ মাইল দূরবর্তী কেদারনাথ পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। হয় ত এ কাহিনী সেই বহু-পুরাতন শৈব ও বৈষ্ণবের প্রতিদ্বন্দ্বী তারই আখ্যায়িকারূপ। বর্তমান সেবায়েৎদের মধ্যে অতীতের সেই তীব্র রেষারেষী না থাকলেও ক্ষেত্রবিভাগের ফলে পার্থক্য কঠিন ও দুরপনেয় হয়েছে। একের অধিকারে অপরে হস্তক্ষেপ করে না; কেদারের পাণ্ডা বদরীতে এবং বদরীর পাণ্ডা কেদারে কোন যাজনিক ক্রিয়া সম্পাদন করে না।

কিছু কিছু শুনলাম শম্ভুজীর মুখে। দেবপ্রয়াগ প্রধানতঃ বদরীনারায়ণের পাণ্ডাদের বাসস্থান। কেদারের পাণ্ডার সন্ধান আমরা পাব গুপ্তকাশীতে।

কেদার থেকে তুঙ্গনাথের পথে আমরা বদরীবিশাল যাব শুনে শম্ভুজী মনে মনে খানিকটা গণনা করে বললে, তবে পথেও তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যেতে পারে।

মণ্ডলচটি ও গোপেশ্বরের মাঝামাঝি একটা জায়গার নাম করল সে।

ওখানেই আপনার বাড়ী বুঝি? জীতেন ফস করে জিজ্ঞাসা করল।

যেন চমকে উঠল শম্ভুজী: কার কাছে শুনলে?

জীতেনের গায়ে একটি চিমটি কেটে তাকে সতর্ক করে দিয়ে তার হয়ে আমিই উত্তর দিলাম, ঘাটেই কে একজন ঐ রকম কি যেন বলছিল।

আর কি বলছিল সে?

শম্ভুজীর তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সামনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। তবে আমার উত্তরের জন্ম পীড়াপীড়ি করল না শম্ভুজী। কিছুক্ষণ পর অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সে নিজেই আবার বললে, সব কথা বিশ্বাস কর না, বাবুজী। একেবারে না মানা যেমন দোষ, অতি বেশী মানাও তেমনি।

একটু থেমে আবার: কেবল ব্রহ্মশাপে কি কিছু হয়? মানুষ ভোগ করে যার যার নিজের কর্মফল। ব্রাহ্মণ যদি বাক্‌সিদ্ধও হয় তা হলেও নিমিত্ত ছাড়া বেশী কিছু হতে পারে না সে।

৫

ধর্মশালা দেবপ্রয়াগের বাস-ষ্টেশন থেকে কতদূর? নিরর্থক প্রশ্ন ওটি। গজের হিসাবে পার্বত্য পথের দূরত্ব মাপবার কোন অর্থই হয় না। সমতল ভূমিতে যে ব্যক্তি হয় ত দশ মাইল পথ হেসে খেলে হেঁটে যায়, মাত্র একটি মাইল চড়াই ভাঙতে জিভ বের হয়ে যাবে তার। উতরাই বেয়ে নামাও তথৈবচ। অথচ পার্বত্য পথ মানে চড়াই ও উতরাই দুই-ই—দিনের পিছনে যেমন রাত্রি।

এ রকম পথের স্বাদ প্রথম পেলাম দেবপ্রয়াগে। সমতল বলতে ওখানে কেবল ভাগীরথীর উপরকার পুলটুকু। তার পরেই চড়াই শুরু হয়েছে। হরিদ্বারেই লোহার বল্লম-আঁটা দীর্ঘ, শক্ত লাঠি কিনেছিলাম। তা এখন কাজে লাগল।

হাঁফ ধরল খানিকটা চলবার পরেই। পাও যেন আর চলে না। মিনিট দশেক পর সমতলের মত একটু জায়গা পেয়েই থেমে গেলাম আমি, ডেকে থামালাম জীতেনকেও। আমাদের কুলি বীর বাহাদুর পিছনে আসছে জানতাম। ফিরে তার দিকে তাকাতেই চোখ দুটি যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

মানুষের স্বাভাবিক আকার আর নেই বাহাদুরের। তার সম্পূর্ণ ঊর্দ্ধাঙ্গ কোমড়ের কাছে বেঁকে গিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মাটি থেকে তার কোমর যতটা উঁচু, প্রায় ততটাই উঁচু হবে তার পিঠের উপরকার বোঝা—আমাদেরই লটবহর। ছোট-বড় সবকটি গাঁটরী মোটা একটি দড়ি দিয়ে এক সঙ্গে বেঁধে সেটি তার নিজস্ব শিকার মত একটি আধারের মধ্যে পুরে হোল্ডঅলের হাতলের মত শিকার-চ্যাপ্টা ফাঁসটা সে পরেছে তার নিজের মাথায়। অর্থাৎ ঐ প্রায় দেড় মণ ওজনের মোটটির অবস্থিতি তার পিঠের উপর হলেও প্রায় সবটা ভারই ধারণ করে আছে তার ব্রহ্মরন্ধ্র। উপর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাধ্যই নেই তার; আমাদের মত লাঠিও নেই তার হাতে। দুটি মাত্র পায়ের জোরে মন্থর গতিতে চড়াই ভেঙ্গে ধুকতে ধুকতে এগিয়ে আসছে সে। দূর থেকেও দেখতে পেলাম আমি তার গাল, গলা ও ললাট থেকে টপ টপ করে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে।

ইস! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি বললাম, দেখেছ জীতেন?

সেও দেখছিল, বললে, হুঁ।

কিন্তু একটু পরেই বেশ সহজ স্বরে সে আবার বললে, তবে আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওর তেমন কষ্ট হয় না।

হয় না?

কেন হবে? জীতেন উত্তর দিল একটু যেন উদ্ধত স্বরেই, যার যা অভ্যাস। কলকাতার পথে মোষ দেখেন না?

শুনে রাগ হ'ল আমার, তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ছিঃ!

কিন্তু জীতেন বেপরোয়া; হাসতে হাসতেই সে বললে, বড্ড সেন্টিমেন্টাল আপনি। এর পর কোন দিন হয় ত জলে মাছ দেখে আপনি বলবেন—আহা, বড্ড শীত লাগছে ওদের।

বাহাদুর ততক্ষণে কাছে এসে গিয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্যে সে বললে, চলিয়ে বাবুজী, সিধা পথ।

কিন্তু আমি তাকে বললাম বোঝাটা নামিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে। নামাতে সাহায্য করবার জন্ম হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়েও গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু 'নেহি' 'নেহি' বলে একটু দূরে সরে গেল সে। তার পর পথের ধারেই একটি দোকানের উঁচু বারান্দার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অপূর্ব কৌশলে ও আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পিঠের বোঝা ঐ বারান্দার উপর নামিয়ে রেখে সে সহজ ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি একটি বিড়ি দিলাম তাকে, তার পর জিজ্ঞাসা করলাম,

এত ভারী বোঝা নিয়ে এ রকম পথে চলতে কষ্ট হচ্ছে না তোমার ?

তার চোখে দেখি বিস্মিত দৃষ্টি, তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিল সে, কষ্ট কেন হবে, বাবুজী ? এ আর কি বোঝা ! পুরা দু' মণ মোট নিয়েও ত কতবার আমি কেদারের বিকট চড়াই ভেঙেছি—কোন কষ্টই হয় নি ।

শেষের দিকে গর্ব্বিত কণ্ঠস্বর তার, হাসি ছড়িয়ে আছে তার মুখের সর্ব্বত্র ।

জীতেনের দিকে তাকিয়ে দেখি যেন বিজয়ী বীরের গর্ব্বিত দৃপ্ত ভঙ্গি তার মুখে, চোখে দুষ্টামির হাসি চিক চিক করছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল, শুনলেন ত, মণিদা ?

দ্বিতীয়বার আমার রাগ হয়েছিল তখন। কিন্তু যথাসময়ে হোটেলে খেতে গিয়ে সব ক্ষোভ মিটে গেল। জীতেনই সব ব্যবস্থা করেছে। খেতে বসে দেখি বাহাদুরও আমাদের সঙ্গেই বসল।

শুধু কুলি সে ; তাকে খেতে দেওয়ার কথা নয় আমাদের। সেই কথা মনে করেই বিস্মিত চোখে জীতেনের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। বুঝতে পেরে সে বললে, এক যাত্রায় আবার পৃথক ফল কেন হবে ? ক'দিনেরই বা ব্যাপার ! আমরা যা খাই, এ ক'দিন আমাদের সঙ্গে বাহাদুরও তাই খাবে ।

পথের খবর জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাহাদুরকে। সে বললে যে, শ্রীনগরে অন্ততঃ একটি দিন থাকা উচিত। আমি শুনেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগের খ্যাতি। কিন্তু বাহাদুর মোটে আমলই দেয় না—দেবপ্রয়াগ বা রুদ্রপ্রয়াগও তাই ; সেখানে আবার সময় নষ্ট করা কেন !—

শ্রীনগরে কি আছে ?

অনেক বাড়ীঘর, দোকানপাট, থানা, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল, সব আছে সেখানে। চড়াই উতরাই একেবারে নেই। অনেক দূর পর্য্যন্ত কেবলই ময়দান ।

সমতলের অধিবাসীর কাছে লোভনীয় নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু বাহাদুরের আগ্রহ প্রবল। সে বার বার বলছে আগামী কাল ওখানে থেকে যেতে ।

এ কথা হয়েছিল রাত্রে ; জীতেন তখন ঘরে ছিল না। তার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাকাপাকি কিছুই ঠিক করা যায় না।—তাই বলেছিলাম বাহাদুরকে।

খাওয়ার পর বাকি দিনটা কেটেছে পথে পথে—দেখবার আগ্রহে ততটা নয় যতটা বাধ্য হয়ে। মাছির যন্ত্রণায় পাঁচটি মিনিটও দু'চোখের পাতা এক করতে পারি নি। সেই জন্যই পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা।

ততক্ষণে প্রথম দর্শনের মোহ কেটে গিয়েছে। দেবপ্রয়াগকে আর অসাধারণ মনে হ'ল না। পাহাড়ের কোলে বলেই গঠনের যা বৈচিত্র্য। আর যা আকর্ষণ তা ঐ দুটি তরঙ্গিনীর। নতুবা বড় একটি গ্রাম। পথ বল, রাজপথ বল, তা ঐ একটি—ভাগীরথীর উপরকার পুল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে সুরু হয়ে অলকানন্দার পুলের উপর দিয়ে ওপারে সেকালের পায়দল মার্গ, মানে হাঁটা-পথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। দু'পাড়েই দোকানপসার আছে। হরিদ্বার-হৃষিকেশে যা যা পাওয়া যায় এখানেও তাই। সভ্যতার বহির্ভূত এলাকা মোটেই নয়। ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, সবই আছে। আর আছে জলের কল। কোন কোনটির কাছে লেখা আছে—যহ্ পানি পটাস সে সুরক্ষিত কিয়া গয়া হৈ।

তাক লাগাবার মত দৃশ্য বা ব্যবস্থা মাত্র দুটি। দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছে দেবপ্রয়াগের স্থানীয় পঞ্চায়েৎ। বাজারের প্রান্তে অলকানন্দার পাড়ে রাজপথের ধারে দেখলাম টেনিসকোর্টের মত সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো লম্বায়-চওড়ায় হাত-দশেক মোটে জায়গা রেলিং দিয়ে ঘিরে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। ভিতরে পাথরের বেঞ্চি খান-কয়েক। একটিও গাছ নেই, এক চাপড়া ঘাস নেই। তথাপি ওরই নাম পার্ক। খেলছে দেখলাম কয়েকটি ছেলেমেয়ে ; বড়রাও এসে বসেছে দু'একজন।

আর আছে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ শৌচাগার। দেয়ালে দেয়ালে লিখিত নির্দ্দেশ রয়েছে যে, নির্দ্দিষ্ট শৌচাগার ছাড়া অন্যত্র কেউ যেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া না দেয়।

কিন্তু কি যে কঠিন সে নির্দ্দেশ মেনে চলা তা এক বেলাতেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আমাদের বাসা থেকে সবচেয়ে কাছের শৌচাগারটির দূরত্বও অন্ততঃ এক ফার্লং। তার আবার প্রায় অর্দ্ধেকটা উতরাই। ঘর থেকে এক ঘটি জল যদি বয়েও নিয়ে যাই তাহলেও হাতমুখ ভাল করে ধোবার জন্য শৌচাগার থেকে কম পক্ষে ত্রিশটি সিঁড়ি ভেঙে নিচে অলকানন্দার ঘাটে যেতে হবে। বলা বাহুল্য যে, ততটাই উপরে উঠতে হবে আবার এবং নিচে নামার চেয়ে উপরে উঠা ঢের বেশী শ্রমসাধ্য।

আসল জল-কষ্ট কাকে বলে, তা ঠিক ঠিক বুঝলাম ঐ দুর্গম পথে দু'চারবার উঠানামা করবার পর। বুঝলাম কেন এখানকার প্রতিটি হোটেল, প্রতিটি খাবারের দোকান অত বেশী নোংরা। জলের কল করে দিয়ে সরকার কেবল যাত্রীদের নয়, স্থানীয় জনসাধারণেরও অসীম উপকার করেছেন। কিন্তু এক ধর্ম্মশালা ছাড়া আর কোন বাড়ীর প্রাঙ্গণেই কল নেই। রাস্তার কলও এত দূরে দূরে যে, তার সুযোগ খুব বেশীসংখ্যক গৃহস্থ পায় না। তা ছাড়া কলের জলের ব্যবহার প্রধানতঃ পানীয় হিসাবে। অন্যান্য প্রয়োজনে সকলকেই নেমে যেতে হয়, হয় ভাগীরথী নয় অলকানন্দার গভীর গর্ভে।

সেই টেনিসকোর্টের মত খেলনাপার্কে বসে অনেক নিচে অলকানন্দার ফেণোচ্ছল আবর্ত্তসঙ্কুল জলের কাছে দেখেছি স্থানীয় মহিলাদের ভিড়। দেখেছি জলভরা ঘড়া মাথায় নিয়ে একটির পর একটি সিঁড়ি ভেঙে তাদের উপরে উঠা। কাহারও কাহারও

মাথার উপর উপর্যুপরি দুটি, তিনটিও ঘড়া ; আবার কাঁধে হয়ত শিশুও। প্রধান সড়ক পর্য্যন্ত উঠেই নিস্তার নেই ; তারপরও চড়াই ভেঙ্গে উঠে যাচ্ছেন তাঁরা যাঁর যাঁর বাড়ীতে—পাঁচতলা, ছ'তলা সমান উঁচুতে।

অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। কোন ফাঁকে জীতেন যে সরে পড়েছে তা বুঝতেই পারি নি। সন্ধ্যার পর ধর্ম্মশালায় ফিরে দেখি যে, সেখানেও সে নেই। বাহাদুরের মুখে রুদ্রপ্রয়াগ ও শ্রীনগরের তুলনামূলক বর্ণনা শুনে কিছুটা সময় কাটল। কিন্তু তার পর ? জীতেনের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে পারলাম না।

রাত আটটা খুব বেশী অবশ্য নয়। কিন্তু বারান্দায় এসে মনটা আরও দমে গেল। নিচের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেটি কৃষ্ণপক্ষ। তার উপর চারিদিকেই আকাশচুম্বী পাহাড়। সুতরাং অন্ধকার আরও নিবিড়, আরও ভয়াবহ। মনুষ্য-কণ্ঠ কানে আসে না। শুনতে পাচ্ছি কেবল অলকানন্দার ভৈরব-গর্জ্জন। হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল আমার—ছেলেটা ডুবে মরল না ত! মনে পড়ে গেল একবার সে বলেছিল যে, অলকানন্দার জলের গভীরতা কত তা জানা দরকার।

বাহাদুরের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, চল, টর্চটা নিয়ে একটু খুঁজে দেখি।

ভাগ্য ভাল, তার প্রয়োজন হ'ল না। আমরা বের হবার পূর্ব্বেই জীতেন ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কোথায় গিয়েছিলেন, বাবুজী ?—বাহাদুরই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল তাকে।

প্রশ্নের উত্তর দিল না জিতেন। পা ছড়িয়ে বসে জুতার ফিতা খুলতে খুলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বললে, অনেক ঘুরলাম মণিদা কিন্তু দেখা পেলাম না। যা শুনলাম তাতে মনে হ'ল যে, বৈকালেই তারা চলে গিয়েছে।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার কথা বলছ ?

সেই গঙ্গোত্রী আর তার মায়ের কথা।

এরূপ একটা সম্ভাবনা কল্পনাও করি নি আমি ; সুতরাং রুদ্ধ-নিশ্বাসে বললাম, তাদের খোঁজ করতে গিয়েছিলে তুমি ? কেন ?

বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল জীতেন, বাঃ রে! খোঁজ করতে হয় না একবার।

আবার জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, কেন ? কিন্তু মোমবাতির মৃদু আলোকে জিতেনের মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে প্রশ্ন আর করা হ'ল না। হেসেই বললাম, ধন্য তুমি! কিন্তু আমায় বললে না কেন ? বললে দু'জনে এক সঙ্গেই খুঁজতে যেতাম।

হাঁ, সেই লোকই আপনি!

অপ্রসন্ন কণ্ঠস্বর জীতেনের ; একটু যেন ঝাঁজও আছে তাতে। একটু থেমে সে আবার বললে, ঋষিকেশ ছাড়বার পর একটিবারও তাদের কথা মুখে এনেছেন আপনি ?

অভিযোগ সত্য ; সত্যই তাদের কথা আর মনে উঠে নি আমার। এতক্ষণ পর সেজন্য নিজেকে একটু যেন অপরাধীই মনে হ'ল।

চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু বাহাদুর আমাদের দুজনকেই আশ্বাস দিয়ে বললে যে, পথে আবার দেখা হবেই—অন্ততঃ কেদার থেকে তাঁরা যখন ফিরবেন তখন নিশ্চয়ই।

একটি ত মাত্র পথ। এ পথের সাথী হারিয়ে যাবে কোথায় ?

শ্রীনগরে যাবার ইচ্ছা ছিল না জীতেনের। কিন্তু ওখানে বাস বদল করতে হয়। নেমে শুনি যে, পরবর্ত্তী বাস পাওয়া যাবে দু'ঘণ্টা পর। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় শীঘ্রই চেপে জল আসবে। ঐ আবহাওয়াতে চারদিক খোলা একটি চালাঘরের মধ্যে তীর্থের কাকের মত বসে থাকার চেয়ে সে দিনটা পাকাপাকি ভাবে ওখানে থেকে যাওয়াই যে ভাল সে কথা বাহাদুর আর একবার বলতেই রাজী হয়ে গেল জীতেন।

ধর্ম্মশালার খোঁজ করছিলাম বাহাদুরের কাছে, শুনেই কিন্তু বুড়োমতন একটি লোক এগিয়ে এসে সেলাম করে বললে, ডাক বাংলোও আছে হুজুর।

শুনেই আমার শহুরে মন উন্মুখ হয়ে উঠল। হৃষ্টচিত্তে অনুসরণ করলাম লোকটির।

আশা মিটল তা বলতে পারি নে। আরাম যা তা কেবল আসবাবপত্রের। আর সবই অস্বস্তিকর। সাহেবী রুচির বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। শোবার ঘর অন্ধকার, মানে দরজা আর ছাদ ফুটো করা ঘুলঘুলি ছাড়া আলো-হাওয়া প্রবেশের অন্য পথ নেই। স্নানের ঘর আরও বেশী অন্ধকার এবং ওর মধ্যে সেই পরিচিত ভাপসা দুর্গন্ধ। এই শৈলাবাসের নির্ম্মল বায়ু ও মুক্ত পরিবেশের সঙ্গে একেবারে বেমানান। স্নান করেও তৃপ্তি হ'ল না। দু'জনের জন্য গুণে দু'বালতি জল, তাও আবার সবটা ভরা নয়। খাওয়ার জন্য বৃষ্টিতে ভিজে এক ফার্লং দূরে হোটেলে যেতে হ'ল। খাদ্য নিরামিষ।

একমাত্র লাভ দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন। জানালা নেই এবং দরজা ঘন চিক ফেলে সব সময়েই সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে বলেই বুঝি বাইরে থাকলেও ঘরের মধ্যে মাছি প্রবেশ করতে পারে না।

বৃষ্টি যখন থামল তখন ঘড়িতে দেখি পাঁচটা। বাহাদুর খাওয়ার পর হোটেল থেকেই সেই যে অদৃশ্য হয়েছিল তার পর আর ফিরে আসে নি। সুতরাং ঘরে তালা দিয়ে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। প্রকৃতি দরাজ হাতে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। বৃষ্টিই কেবল থামে নি, রোদও উঠেছে। বর্ষণ-স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সবুজ চারিদিকেই ঝলমল করছে দেখা গেল।

তবে ঐ পর্য্যন্তই। দ্রষ্টব্য আর কিছুই নেই। পাহাড়

অনেক দূরে, অলকানন্দাও চোখে পড়ে না। ঘরবাড়ী বা গাছ যা আছে তার কোনটাই চমক লাগাবার মত নয়।

তবে চমক লাগল শেষ পর্য্যন্ত। ঐ আমাদের বাহাদুর না?

বাস সড়ক থেকে খানিকটা উঁচুতে শ্লেট পাথরের চালের নিচে পাশাপাশি কয়েকখানি নিচু কুটির। তারই একখানার সামনে জন-পাঁচেক লোক গোল হয়ে বসেছে। স্ত্রীলোক দু'জন। এক জন মনে হ'ল প্রৌঢ়া। পুরুষদের মধ্যে একজন নিঃসংশয়ে আমাদের বীর বাহাদুর।

জীতেন তাকে চিনতে পেরেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল: এই বাহাদুর, কি করছ তুমি এখানে?

মুহূর্ত্তের জন্য একটু যেন অপ্রস্তুত ভাব দেখলাম বাহাদুরের মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই প্রায় লাফ দিয়েই সে পথে নেমে এল। উঠে দাঁড়াল মজলিসের বাকি কজন লোকও—কেবল অল্পবয়সী মেয়েটি ছাড়া। কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে রইল সে।

ততক্ষণে হাসি ছড়িয়ে পড়েছে বাহাদুরের সারা মুখে। সে বিশেষ করে আমার উদ্দেশ্যেই একটি সেলাম ঠুকে পরে বললে, এরা আমার দেশের লোক, বাবুজী। এখানে কোম্পানীর কুলি খাটে।

তাদের দিকে চেয়ে সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবার বললে, ইন বাবুজীয়েঁকা সাথ হম আয়া হৈ। লেকিন আপতো মেরা বাত্রী নেহি হৈ, হৈ মোর পিতামাতা।

তারাও এগিয়ে এসে সেলাম করল আমাদের। বয়স যার সবচেয়ে বেশী সে আমাকে উদ্দেশ করে বিনীত ভাবে বললে, গরীবের ঘরে দয়া করে যখন পায়ের ধূলা দিয়েছেন তখন দু'মিনিট বসুন।

অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। কিন্তু অগ্রাহ্য করতে পারলাম না ঐ সব আমন্ত্রণ। ঘর থেকে একখানি কম্বল এনে পরিপাটি করে পেতে দিল সেই প্রৌঢ় লোকটি। এক একটি করে বিড়ি এগিয়ে দিল আমাদের দিকে, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল আমরা চা ইচ্ছা করি কি না।

চা চাই না বললাম। কিন্তু অত সমাদর করে যারা আমাদের বসিয়েছে তাদের কাছ থেকে তখনই উঠে আসি কেমন করে! ওদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধেই কথা তুললাম। উত্তর পেলাম। কিছু জ্ঞানও লাভ করলাম বই কি! বাস থেকে দোকান পর্য্যন্ত মোট বয়ে নেয় ওরা। কাজ থাকলে দৈনিক দু' টাকাও আয় হতে পারে, না থাকলে কিছুই না।

ডাক বাংলোতে ফিরবার জন্য যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন কর্ত্তার গৃহিণী, মানে সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আমাকে উদ্দেশ করে বললে, তুমি ত ভাল মানুষ আছ শেঠজী। বীর বাহাদুরকে এবার কিছু বেশী টাকা দিয়ো তো। বড় মেয়ে আর কতদিন আমি ঘরে পুষব।

কথাটার অর্থবোধ হয় নি আমার, মূঢ়ের মত জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছ তুমি? কোন মেয়ে?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রৌঢ়া সেই দ্বিতীয় মেয়েটিকে। মুখে বললে, ঐ ত আমার মেয়ে রুক্মিণী।

তথাপি বিহ্বল ভাব আমার, কিন্তু জীতেন সহসা হাসিতে ফেটে পড়বার মত হয়ে বলে উঠল, বাহাদুরের বউ নাকি তোমার মেয়ে?

সজীব কল্পনা জীতেনের, কিন্তু বড় বেশী এগিয়ে গিয়েছিল তা। পরক্ষণেই দেখি দাঁতে জিভ কেটেছে প্রৌঢ়া, বাহাদুরও। প্রৌঢ়া সসংকোচে উত্তর দিল, না বাবুজী, বিয়ে হবে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু হচ্ছে কৈ? বীর বাহাদুরের যে টাকা নেই।

এতক্ষণে কিছুটা অর্থবোধ হ'ল আমার। সচকিতে বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, লজ্জিত হাসিমুখ তার সে আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি থেকে লুকাবার জন্য একেবারে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে তাকালাম ওদের ঐ রুক্মিণীর দিকে। নেপালী মেয়ের সাধারণ গোলগাল মুখ। কিন্তু যৌবনের জোয়ার ও অটুট স্বাস্থ্যশ্রীর মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছে সে মুখে। তার উপর আবার প্রকৃতির ষড়যন্ত্র। রুক্মিণীর মুখের উপর এসে পড়েছে খানিকটা গোধূলির আলো।

একেই কনে দেখা আলো বলে নাকি?

মেয়েটিও দেখি মিটি মিটি হাসছে।

ফিরে প্রৌঢ়ার দিকে তাকাতেই সে আবার বললে, তোমার মেয়ে হলে কি করতে বাবুজী? বিয়ে না দিলে মুখে ভাত রুচত তোমার?

কি উত্তর দেব! মুখ ফিরিয়ে পথে নেমে পড়লাম।

চলতে চলতে জীতেন বললে, হারামজাদার মতলবটা এবার বুঝেছেন ত, মণিদা? এই জন্যই শ্রীনগর এত ভাল জায়গা।

বুঝেছি আমিও। কিন্তু বাহাদুরের উপর রাগ হ'ল না। ততক্ষণে বেশ মিষ্টি একটি রসের স্বাদ পেয়েছে আমার মন। তা চেখে চেখে খাবার লোভ তার। ডাক বাংলোতে ফিরবার পর বাহাদুরকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটিকে তোমার খুব পছন্দ নাকি বাহাদুর?

বাহাদুর নীরব। কিন্তু ওকেই ত শাস্ত্রকারেরা বলেছেন সম্মতির লক্ষণ। সুতরাং আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তা ওকে তুমি বিয়ে করছ না কেন?

শেষ পর্য্যন্ত বাহাদুর যে উত্তর দিল তার সুর ও সার দুই-ই আমার অপ্রত্যাশিত।

পণের টাকার জন্যই যে বিয়ে আটকাচ্ছে তা নয়। আটকাচ্ছে ঋণের দায়ে, আর তা বাহাদুরের পৈতৃক ঋণ। অনেক বৎসর পূর্ব্বে বাহাদুরের পিতা দেশের কোন এক মহাজনের নিকট থেকে কি যেন কারণে পাঁচশ' টাকা ধার নিয়েছিল। বালক বীর বাহাদুর জানতও না সে ঋণের কথা। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সেই ঋণের

বোঝা একমাত্র পুত্র বাহাদুরের ঘাড়ে এসে চেপেছে। তীর্থযাত্রীর মোট বয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে যা বাহাদুর উপার্জ্জন করে তার প্রায় অধিকাংশই গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবৎ সে সেই মহাজনকে দিয়ে আসছে। বৎসরে একবার—যখন এদিকে কাজ একেবারেই পাওয়া যায় না তখন সঞ্চিত সব টাকা সঙ্গে নিয়ে দেশে যায় বাহাদুর। গিয়ে মহাজনের গদীতে গেঁজ উজাড় করে সব ঢেলে দেয়। বার কয়েক গোনবার পর মহাজন সব টাকাই তার লোহার সিন্দুকে তুলে রাখে। তার পর একটি খেরো-বাঁধানো খাতায় কি যেন লিখে বাহাদুরের বাঁ-হাতটি টেনে নিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ নেয় সেই পাতার একটি জায়গায়। এ সব হয়ে গেলে হাসিমুখে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মহাজন তাকে বলে আরও টাকা নিয়ে আসবে। দু'একটি বিড়িও দেয় তার হাতে, কোনবার বা দুটি লাড্ডু ও এক গ্লাস জলও। কৃতার্থ হয়ে তার পৈতৃক ভাঙা বাড়ীতে ফিরে যায় বাহাদুর। পর দিন আবার হরিদ্বারের পথে যাত্রা করে সে। এমনি চলছে বৎসরের পর বৎসর। বাহাদুরের উপার্জ্জিত অর্থ কিছুই থাকছে না তার হাতে, কিন্তু তার পৈতৃক ঋণ তখন পর্য্যন্তও পরিশোধ হয় নি।

উপসংহারে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বাহাদুর বললে, দুসরেকা মাতাপিতা আপনা লড়কাকো কিতনা কুছ দেতা হৈ। লেকিন মেরা মাতাপিতা ত হমকো গড্ডামে গিড়া দিয়া।

ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝলাম—এও সেই চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণের আয়তন-স্ফীতির বহু পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। রাগ হ'ল মহাজনের প্রতি। কিন্তু তখন তাকে পাব কোথায়? যাকে কাছে পেয়েছি গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য সেই বাহাদুরকেই প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়ে কড়া সুরে বললাম, ওরে মুর্খ, তুই বছর বছর তাকে টাকা দিতে যাস কেন? এখান থেকে চিঠি লিখে দে তোর মহাজনকে যে আর একটি পয়সাও তাকে তুই দিবি নে।

কিন্তু বাহাদুরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যা দেখলাম তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। দুই হাতেরই তর্জ্জনী দুই কর্ণরন্ধ্রে ঢুকিয়ে ইঞ্চি-খানেক জিভ বের করে তা দাঁতে কাটল বাহাদুর।

কি হ'ল রে!—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তর হ'ল: সো ক্যায়সে হো সকতা, বাবুজী? তব তো মেরে পিতাজীকা আত্মা নরকমে জ্বলতে রহোগা।

আর কোন কথা বলতে পারলাম না বাহাদুরকে। নীরবে ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে গেলাম। জীতেনও দেখি আমার পিছনে পিছনে এসেছে। একটি বিড়ি ধরিয়ে বার কয়েক টানবার পর তার মুখের দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, শুনলে ত জীতেন?

জীতেন উত্তর দিল, হুঁ।

জ্বলন্ত বিড়িটি উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি বললাম, এখনও ভারবাহী পশু মনে হয় নাকি বাহাদুরকে?

উত্তর না দিয়েই উঠানে নেমে গেল জীতেন।

ক্রমশঃ

স্বখাত সলিলে

শ্রীহরিপদ গুহ

তিলে তিলে নিজ দেহ ক্ষয় করি,গড়েছি যে সংসার,
কী যে দাম আছে তার?
পান হতে চুণ একটু খস্‌লে দেখি—
সকলের মুখ হয়ে যায় যেন ভার!
দেখে নাকো কেউ আমার এ মুখ চেয়ে,
বলদের মত রাতদিন খেটে মরি।
অতীতের সেই সুখ-দিনগুলি
বারে বারে আজ কেন যে স্মরণ করি!

মনেতে তখন কত আশা ছিল,—
বাঁধিব যে নীড় কত না সুখেতে হায়!
সে সুখ-স্বপন ব্যর্থ হয়েছে,
নিঠুর আঘাতে হৃদি মোর ভেঙে যায়!
সকলে হেথায় ব্যস্ত রয়েছে স্বার্থ নিয়ে,
তুষিব সকলে কেমনে আজি, কী ধন দিয়ে?

যৌতুক

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়
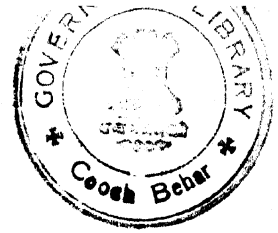
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। কিন্তু তখনও বসে আছেন দুজনে মুখোমুখি। একটা করুণ কাহিনী এতক্ষণ শোনাচ্ছিলেন গঙ্গাচরণ আর তাই নিবিষ্টচিত্তে শুনছিলেন শ্যামাকান্ত। জমিদার শ্যামাকান্ত আর তাঁরই ষ্টেটের ম্যানেজার গঙ্গাচরণ। প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে চলেছেন দুজনেই, এখন বার্দ্ধক্য দেখা দিয়েছে দেহে। মাত্রে এবং বয়সে বড় শ্যামাকান্ত, কিন্তু ঘনিষ্ঠতায় আর অন্তরঙ্গতায় সমান দুজনেই। বড় স্নেহ করেন গঙ্গাচরণকে শ্যামাকান্ত, তাই তাঁর বিশাল জমিদারীর চাবিকাঠিটি তুলে দিয়েছিলেন তাঁরই হাতে। জমিদার শ্যামাকান্ত নামেই। কাজে গঙ্গাচরণ। অন্ততঃ প্রজারা এই কথাটাই জেনে এসেছে এতদিন।

এতক্ষণকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন শ্যামাকান্ত, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, তা হলে সত্যিই তুমি মায়া কাটালে গঙ্গাচরণ? চললে, এতদিনকার বন্ধন ছিন্ন করে?

গঙ্গাচরণ চোখ দুটি মুছে নিলেন উত্তরীয় প্রান্ত দিয়ে। তার পর বললেন, মুখে যত বড়াই করি না কেন দাদা, যতক্ষণ না পৌঁছাতে পাচ্ছি সেখানে গিয়ে, নিশ্চয় করে বলতে পারি না কিছুই।

—পৌঁছাবে, নিশ্চয় তুমি পৌঁছাবে সেখানে। ঠাকুরের টান, বড় সোজা টান নয় ভাই। এ না পৌঁছে তোমার উপায় নেই। তার পর একটা উদ্‌গত শ্বাস গোপন করে আবার বললেন, জান গঙ্গাচরণ, সারা জীবনটাই শুধু ঘেটে এলাম কাদা মাটি। তাই ঘোলা জলই সার হ'ল জীবনে, গঙ্গাজলের সাক্ষাৎ পেলাম না আজও। বিষয়-আশয়ের মোহ যদিও বা কাটিয়ে উঠছিলাম ধীরে ধীরে তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে, শেষ জীবনে তুমিই আমায় জড়িয়ে দিলে। মুক্তি আমার বরাতে নেই।

গঙ্গাচরণ অপরাধী মুখে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তার পর বলে, এ অসম্ভব আমিও কল্পনা করি নি দাদা, এত সৌভাগ্য আমার যে হবে এ ভাবি নি কোনদিন। তাই প্রথম যে দিন স্বপ্ন দেখি, ঠাকুর আমায় ডাকছেন বৃন্দাবনের কুঞ্জ থেকে, তখন বিশ্বাস করি নি। মস্তিষ্কের বিকার বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম মনে মনে হেসে। কিন্তু তিন দিন পর পর যখন সেই একই স্বপ্ন দেখি, তখন অর্ব্বাচীনের হাসি হেসে একে উড়িয়ে দিতে পারি নি দাদা। রাত্রে ঘুমাব না বলে চেষ্টা করি, কিন্তু কখন যে চোখের পাতা দুটি জড়িয়ে আসে আর আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ি নিজেই জানতে পারি না। মনে হয়, কে যেন নিঃশব্দে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে আমায়। ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্ন, সেই তমাল কুঞ্জ থেকে দু'হাত বাড়িয়ে একই ভঙ্গিমায় গোপীনাথ ডাকছেন আমায়, গঙ্গা আয়, আয়, আয়। বড় কষ্ট আমায়। ঠাকুরের মুখ বড় করুণ! চোখ দুটিও করুণ—ছল ছল করছে। শেষের রাত্রে থাকতে না পেরে সাড়া দিয়ে ফেলি। চীৎকার করে বলি, যাই, ঠাকুর যাই। তার পরই ঘুম ভেঙে যায়।

শ্যামাকান্ত চোখ মুছে বলে, তুমি যথার্থ ভাগ্যবান ভাই। ঠাকুর ডেকেছেন তোমায়। তুমি মুক্তির বাণী শুনেছ। তুমি যাও। আর তোমায় ধরে রাখব না আমি।

গঙ্গাচরণ উত্তর দিতে পারেন না মুখ নিচু করে থাকেন।

শ্যামাকান্ত বলেন, এতকাল ত নিশ্চিন্ত ছিলাম তোমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে। এখন সকল দিক সামলাব কি করে বলত ভাই। রণজিতকে তুমিই পাঠিয়েছ বিলেতে। পড়া অসমাপ্ত রেখে তাকে ত তাড়াতাড়ি ডেকে আনা ঠিক হবে না গঙ্গাচরণ।

গঙ্গাচরণ আপত্তি জানান। বলেন, এ সময়ে তাকে ডেকে আনা ঠিক হবে না দাদা। তার পড়াশুনোর ক্ষতি হ'ক এ আমি চাই না। তবে তোমার ভাববারও কিছু নেই। দেবীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি সব, সেই সাহায্য করবে তোমাকে।

শ্যামকান্ত একটু হাসেন। বলেন, দেবী মেয়েছেলে, বয়স অল্প। জমিদারীর কি-ই বা বোঝে সে। আর কি-ই বা সাহায্য করবে আমাকে।

গঙ্গাচরণ একটু মৌন থেকে বলেন, হয়ত তোমার মত বোঝে না—একথা ঠিক। কিন্তু আমার চেয়ে কম বোঝে না—একথাও ঠিক। সে জাত-জমিদারের মেয়ে।

শ্যামাকান্ত বিস্মিত হন। প্রশ্ন করেন, বল কি হে?

—এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না দাদা। বিশ্বাস করতে পার আমাকে, দেবী খাঁটি ইস্পাত, মেকী নয়। তাই এই তিন মাসেতেই সে দক্ষ হয়ে উঠেছে অনেক। তোমার জমিদারীর আমি যতটুকু জানি, প্রায় সবটুকুই জেনে নিয়েছে সে। সব তার নখদর্পণে।

—আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্যই বটে। অদ্ভুত মেধাবী মেয়ে, প্রখর স্মরণশক্তি ওর। লেখাপড়াও শিখেছে যথেষ্ট। বি-এ পাশ করেছে, ইকনমিক অনার্সে।

—ভাল কথা। কিন্তু এখানে তার আগমন হ'ল কি করে?

—সে আসে নি। আনিয়েছি তাকে আমি। তার মা যাবার সময় নাম করে গেছেন আমার। বলে গেছেন অসময়ে

আসার নিতে আমার কাছে। দেবী লিখেছিল কলকাতা থেকে, পৃথিবীতে দাঁড়াবার মত ঠাঁই নেই আমার একটুকু। মায়ের অনুরোধ ছিল আমার ওপর, আপনাকে সব কথা জানাতে। সেইটুকুই জানালাম আমি। একটা চাকরী যদি জুটিয়ে দেন, অকূলে কূল পাই।' চাকরী করে দিতে পারি নি বটে, তবে তাকে আনিয়েছি এখানে। জমিদারীর কাজও শিখিয়েছি যত্নে।

শ্যামাকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। বলেন, মেয়েটিকে ত ঠিক চিনতে পারলাম না গঙ্গাচরণ ?

গঙ্গাচরণ অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। যৌবনের একটা তপ্ত-রক্তস্রোত বার্দ্ধক্যের শীতল স্রোতকে মুহূর্তের জন্ম নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু নিজকে সামলে নিয়ে মুখ নত করে বলেন, দেবী কল্যাণীর মেয়ে দাদা।

শ্যামাকান্ত চমকে উঠেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, আমারই সন্দেহ করা উচিত ছিল আগে। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কল্যাণী তোমার ওপর সুবিচার করে নি ভাই। একটা গোটা জীবনকেই নষ্ট করে দিয়ে গেল নিজের খামখেয়ালীতে।

—তার জন্তে অনেক কষ্টই পেয়েছে সে দাদা। স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে পারে নি জীবনে। দেখা আমাদের আর হয় নি বটে, কিন্তু তার খবর রেখেছিলাম বরাবর। সে শান্তি পায় নি কখনও।

—তুমি খবর রাখ এ কথা জানত কল্যাণী ?

—খুব সম্ভব জানত, তাই মেয়েকে পাঠাতে পেরেছে আমার কাছে।

শ্যামাচরণের ঘাড় নাড়া বন্ধ হয় না। ঘাড় নাড়তে নাড়তেই বলেন, দুঃখ হয় গঙ্গাচরণ। কি ভুলে কি হয়ে গেল দু'জনার জীবনে। কল্যাণী চিনতে পারে নি তোমায়। তাই না পেল শান্তি নিজে, না দিল শান্তি তোমাকে। অথচ সে ভালবাসত তোমায় আগাগোড়া।

গঙ্গাচরণ উত্তর দিতে পারেন না এ কথার। সময়ও পান না। পরিচারক এসে খবর দিয়ে যায়, সন্ধ্যাহ্নিকের যোগাড় করে বসে আছেন দিদিমণি। আমাকে পাঠালেন খবর দিতে।

গঙ্গাচরণ উঠে পড়েন ব্যস্তভাবে। বলেন, আসি দাদা। কাল সকালে যাবার সময় দেখা হবে আবার।

গঙ্গাচরণের অনুরোধ রাখেন শ্যামাকান্ত। দেবী বহাল হয় জমিদারীতে।

কাজ চলে যায় সুশৃঙ্খলভাবেই। গঙ্গাচরণের অভাবে এত বড় জমিদারীর কি যে হাল হবে, এ ভেবে আকুল হয়েছিলেন শ্যামা-কান্ত। কিন্তু দু'দিনেই ভুল বুঝতে পারলেন নিজের। এ পৃথিবীতে অত্যাবশ্যকীয় কেউ নয়। অচল কিছু নয়। কাজও আটকায় না কারোর জন্ম এখানে। একজন যেখানে অবর্ত্তমান, বর্ত্তমান আর একজন। গঙ্গাচরণ গেছেন, দেবী আছেন। তার নিষ্ঠা দেখে প্রীত হয়েছেন শ্যামাকান্ত। বুঝেছেন গঙ্গাচরণের কথাই ঠিক। খাঁটি ইস্পাত দেবী।

সকালবেলা নিয়ন্ত্রিত সময়ে দেবী আসে শ্যামাকান্তর কাছে। ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, নিয়মিত সময়ে খাতাপত্র নিয়ে যখন প্রণাম করে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন খুশীতে চমকে উঠে শ্যামা-কান্তর মন। মনে হয় এরই জন্ম যেন প্রতীক্ষা করে আছেন তিনি সারা সকাল ধরে। দেবী কুশল প্রশ্ন করে দুটো একটা তারপর কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। কোন কোন দিন মৃদু হেসে বলে, আজ আপনাকে অনেকক্ষণ বকিয়েছি জেঠামশাই। একটু সরবং পাঠিয়ে দিতে বলব কি ?

জেঠামশাই মৃদু হাসেন। বলেন, দাও। প্রতিবাদে সুফল পাব না। তর্ক করেও পেরে উঠব না। জিদ যখন পড়েছে, ছুটো মা নিয়ে উড়বে না। না খাইয়ে তুমি নড়বে না এখান থেকে তা আমি বুঝি। তখন অনর্থক অসন্তুষ্ট করে লাভ কি তোমায়।

দেবীও হাসে। খাতা-পত্তরগুলি নামিয়ে রেখে ভিতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর নিজ হাতে পাথরের গেলাসে সরবৎ এনে হাজির করে।

অনেক উপদেশই শ্যামাকান্ত সংগ্রহ করে রেখেছিলেন দেবীর জন্ম। ভেবেছিলেন, জমিদারীর কাজের চাপে দেবী যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠবে, সামলাতে না পেরে ছুটে আসবে তার কাছে, তখন তিনি এই সব উপদেশগুলি একটি একটি করে শোনাবেন তাকে মনের মত করে।

জমিদারীর কাজ যে সহজ নয়, জটিলতায় ভরা, এই কথাই বোঝাবেন তাকে। সহস্র এর জানালা, সহস্র দরজা, তাদের মধ্য দিয়ে অহরহ শয়তানদের আগমন আর নির্গমন। পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ রাখতে না পারলে বিপদ পদে পদে। চুল না পাকলে জমিদারীর কাজে পোক্ত হওয়া যায় না। এই সব কথাগুলি শানিয়ে রেখে-ছিলেন তিনি মনের মধ্যে দেবীকে শোনাবার জন্ম, কিন্তু শোনান হয় না। সে সুযোগ দেয় না দেবী। চুল না পাকিয়েও সে পোক্ত। এমন সহজ এবং সরলভাবে কাজ-কর্ম্ম করে যায় সে, যার মধ্যে গলদ বার করতে পারেন না শ্যামাকান্ত। মাঝে মাঝে আপশোষ যেমন হয়, অবাকও হন তিনি। মেয়েটি সত্যই যাদু জানে।

শ্যামাকান্তর বইয়ের অভাব নাই। আলমারী-ঠাসা বই। জমিদারী সংক্রান্ত বই-ই বেশী। আধুনিক বইগুলিও তিনি কিনে থাকেন নিয়মিতভাবে। কিন্তু পড়ার সে আগ্রহ আর নাই, এক সময় পড়েছেন অনেক। এখন আর পড়েন না কিছুই। দেবী আলমারী খুলে বইগুলি নাড়া-চাড়া করে। দু' একখানি বারও করে নিয়ে যায়। তারপর আবার রেখে দেয় বন্ধ করে। বলে, মাঝে মাঝে একটু নাড়াচাড়া না করলে, পোকায় কাটবে জেঠামশাই।

তাই একটু নাড়াচাড়া করলাম বইগুলি। এ সব কি বুঝতে পারি আমরা।

শ্যামাকান্ত হাসেন। বলেন, ঠিকই ত মা, বুঝতে পার না

বলেই ত অত যত্ন করে দাগ দিয়ে পড়।

ধরা পড়ে দেবী আরক্ত হয়ে উঠে। কোন মতে বলে, যেখানটা একটু বুঝতে পারি আর ভাল লাগে সেইখানেই একটু দাগ দিয়ে রাখি জেঠামশাই, অন্যায় করি কি?

শ্যামাকান্ত সস্নেহে মাথা নাড়েন। বলেন, কিছুমাত্র না। উপযুক্ত জায়গায় দাগ দিয়েছ তুমি। এ সব ত না-বোঝবার লক্ষণ নয় মা। বইগুলি আসে, তোলা থাকে। পড়া হয় না আমার, ভাল লাগে না আর। রণজিৎ যে এ সব পড়বে কোন দিন বলে ত মনে হয় না। তবুও তুমি পড়লে এইটাই আমার আনন্দ। ভারী খুশী হয়েছি দেবী তোমার এই জ্ঞানানুরাগে।

দেবী সলজ্জ মুখখানি নত করে।

অনেক দিন কাছারী বাড়ীতে আসেন নি শ্যামাকান্ত। প্রয়োজনও ছিল না বিশেষ। সবই চলেছে সুশৃঙ্খলভাবে। তবুও সে দিন অদম্য কৌতূহল নিয়ে সকলের অলক্ষিতে এসে উপস্থিত হলেন কাছারী বাড়ীতে। দরোয়ান সসম্ভ্রমে ঘর খুলে দিল। এইখানিই তাঁর ছিল বসবার ঘর। এই ঘরেই তিনি কাটিয়ে গেছেন অনেক গৌরবোজ্জ্বল দিন, অনেক দুশ্চিন্তাপূর্ণ রাত্রি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর, এতটুকু জঞ্জাল নেই কোথায়। শ্যামাকান্ত বোঝেন, অব্যবহৃত ঘর হলেও অত্যাজ্য ঘর নয়। ঘরের যত্ন নেওয়া হয় প্রতিদিন। প্রতিদিনই ধূপ-ধূনোর গন্ধে আমোদিত করে রাখা হয় ঘরখানিকে। হয়ত গঙ্গাচরণের দৃষ্টি ছিল এদিকে সজাগ। সে দৃষ্টি আজও রয়েছে অব্যাহত।

পাশের ঘরখানি ম্যানেজারের ঘর। আগে বসতেন গঙ্গাচরণ; এখন বসে দেবী। দেবীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন শ্যামাকান্ত। শান্ত সংযত স্বর। কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক। দেবী জেরা করছে নায়েব অবিনাশকে।

—পাঁচশত টাকা আপনার নামে ঋণ দেখান আছে অবিনাশ-বাবু। শুধু জের টেনে চলা হচ্ছে বৎসরের পর বৎসর। শোধ আর হ'ল না আজও। অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু।

অবিনাশ আকাশ থেকে পড়ে। বলে, ঋণ? আমার নামে? আপনি ভুল দেখেছেন।

—না। ভুল দেখি নি আমি, পাঁচ বৎসর আগে মেয়ের বিয়েতে ঋণ করেছিলেন আপনি। কথাটা ভুলে যাবার নয়। পাঁচ বৎসর এমন কিছু দীর্ঘ সময়ও নয়। একবার চেষ্টা করে দেখুন, মনে পড়বে আপনারও।

—কই, তেমন ত কিছু মনে পড়ছে না আমার। অবিনাশের স্বরে কাঁপন। গলার তেজও অনেকখানি কম।

টেবিলের উপর একখানা মোটা খাতার শব্দ হয়। তার পর শোনা যায় দেবীর গলা, সইটা কি আপনার অবিনাশবাবু? অবশ্য এমনভাবে খাতার এক কোণে রয়ে গেছে যে, চট করে চোখে পড়বার সম্ভাবনা কম। তাই হয়ত কাকাবাবুর চোখ এড়িয়ে গেছে এতদিন। টাকা-কড়ির ব্যাপার কি না। একটু সাবধান হয়ে দেখা-শুনা করতে হয়। তাই চোখে পড়ে গেল আমার।

অবিনাশের গলা একেবারে ক্ষীণপ্রায় অশ্রুতিগম্য। বলে, সইটা আমারই বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু—

—কিন্তু নয়, আপনারই। কাজের চাপে ভুলে গেছেন আপনি, ভুল হওয়া ত স্বাভাবিক।

—আজ্ঞে—

—আরও এক বছর সময় পাবেন, এই এক বছরে টাকাটা শোধ করে দেবেন এবার থেকে। বেশিদিন টাকাটা এভাবে পড়ে থাকা ভাল নয়।

—তা কি করে হবে?

—মানে?

—এক বছরে শোধ করা সম্ভবপর হবে না আমার দ্বারা। অবিনাশের স্বরে একটু দৃঢ়তা।

—সে ভাবনা আপনার নয়, আমার। হবে কি হবে না বুঝব আমি। খাজাঞ্চী মশাইকে বলে দেব এ মাস থেকে বিয়াল্লিশ টাকা মাইনে যেন কম দেওয়া হয় আপনাকে। তবে সুদটা কর্তাবাবুকে বলে না হয় মাপ করে দেব এবার।

অবিনাশ যেন আৎকে উঠে। মাইনে কেটে নিলে চলবে কি করে আমার? না খেয়ে মারা যাব যে।

দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তরলকণ্ঠে বলে সে, জমিদারের নায়েবকে না খেতে পেয়ে মরতে শুনেছেন কখনও? আপনিও যে মরবেন না এ আমি জানি। পরের টাকার দায়িত্ব অনেক, আপনিও যেমন জমিদারের সাশ্রয় দেখেন, আমাকেও তেমনি দেখতে হয় বই কি। তা না হলে জবাবদিহি করব কি? তবে তিনি যদি সব ঋণটাই মাপ করে দেন আপনার, আমার বলবার কিছু নেই। সেই চেষ্টাই না হয় করে দেখুন একবার। আচ্ছা নমস্কার।

এর পরই শোনা গেল গোমস্তা রাখালচন্দ্রের গলা, আমায় ডেকেছেন?

—ডেকেছি। বসুন বলছি, আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। বলতেও বাধে। অথচ না বলেও ত উপায় নেই।

রাখালের দিক থেকে কোন উত্তর নাই। মনে হয় ভূমিকাটিকে মনে মনে যাচাই করে দেখতে চায় সে।

প্রশ্ন হ'ল, এখানে চাকরি হ'ল ক'বছর? ত্রিশ?

এবারেও রাখালের গলা শোনা গেল না। মনে হ'ল নির্ব্বাক-ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়েই উত্তরের কাজ সমাধা করেছে সে।

—পুরনো লোক আপনারা অথচ চোখ মেলে দেখেন না কিছু। সামান্য একটু জায়গা, তারই মেরামতি খরচ হ'ল আড়াই-শো টাকা? মিস্ত্রী ত খাটল মাত্র দু'দিন, তাইতেই খরচ পড়ল এত? এ ত সম্ভবপর নয় রাখালবাবু?

রাখালের গলায় যেন জোর নাই, কোন মতে ঢোক গিলে উত্তর দিল সে। তাই ত লেগেছে দেখছি।

ভুল লেগেছে, চোখ দিয়ে দেখলে এ লাগত না কিছুতেই ; এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে দেবী আবার বলে, পাঁচশ' টাকার মাছ ছেড়েছেন পুকুরে ? এত টাকার মাছ ছাড়ল কে ?

—জেলেতে।

—জেলে মানে হীরু ত ?

রাখাল নিরুত্তর।

—উত্তর দিন। ধমক দেয় দেবী।

রাখাল ঢোক গেলে, হ্যাঁ, হীরুই।

—জানি। হীরুর মুখে শুনেছি সব। কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকার মাছ ছাড়া হয়েছে ঠাকুর-পুকুরে। আর পদ্মদীঘির জল কমে যাওয়াতে সেখান থেকে কিছু মাছ তুলে ছেড়েছেন দুধ-পুকুরে। এর জন্তে খরচ হয়েছে পাঁচশ' টাকা। রাখালবাবু, আপনারা ভুল করছেন সবাই মিলে। কাকাবাবু নেই বটে, কিন্তু তাঁর চোখ জোড়া এইখানেই রেখে গেছেন তিনি। তাঁদের ফাঁকি দিতে পারবেন না আপনারা। যান ভুল-চুক যা হয়েছে, শুধরে নিয়ে আসুন সব। ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবেন না কখনও।

পাশের ঘরে বসে শ্যামাকান্ত শোনেন আর প্রশান্ত মুখে হাসেন। গঙ্গাচরণ চলে গেছে কিন্তু চোখজোড়া তার এখানেই রেখে গেছে বটে, উপযুক্ত প্রতিনিধিই দিয়ে গেছে সে। একেবারে খাঁটি ইস্পাত। অবিনাশ আর রাখাল দু'জনেই ঘুঘু। অনেক অপকীর্ত্তির কাহিনী এদের কানে এসেছে শ্যামাকান্তর। কিন্তু প্রতিকার করে উঠতে পারেন নি আজও। কিন্তু এবার ঘুঘুরা পা দিয়েছে বড় ফাঁদে। এবার প্রতিকার না হয়ে যায় না।

পর দিন সকালবেলা।

শ্যামাকান্ত বসেছিলেন ইজি-চেয়ারে উত্তর দিকের ঘেরা-বারান্দাতে। সামনে দাঁড়িয়েছিল অবিনাশ, রাখাল এবং আর জন পাঁচ-ছয় কাছারীর কর্ম্মচারী। আজকের অভিযানের মুখপাত্র অবিনাশ। দুটি হাত জোড় করে বলে, বুড়ো বয়সে মান-সম্ভ্রম আর রইল না হুজুর। চাকরী ত যাবেই, তার ওপর চোর বদনাম নিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

রাখাল বলে, এতখানি বে-ইজ্জত আমরা জীবনে হই নি হুজুর, কাল যা হয়েছি। এর বিহিত আপনাকে করতে হবে।

শ্যামাকান্তর চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠে। কিন্তু তিনি ধৈর্য্য হারান না। মিষ্টকণ্ঠেই বলেন, করব বই কি রাখাল, বিহিত একটা করবই। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা এ হতে পারে না। মান-সম্ভ্রম সকলের যাতে বজায় থাকে এ দেখা ত আমার কর্ত্তব্য।

অবিনাশ গদগদকণ্ঠে বলে, হুজুর ধর্ম্মাবতার।

শ্যামাকান্ত বলেন, তোমরা পুরনো লোক তোমাদের মান-সম্ভ্রমে যদি কলঙ্ক লাগে, সে লজ্জা ত আমারই।

—এ কথা বলতে পারেন হুজুর, একশ' বার। অবিনাশের কণ্ঠস্বর অনেকখানি নিস্তেজ।

শ্যামাকান্ত বলতে থাকেন, কাল থেকে সেই কথাটাই ভাবছি অবিনাশ, কি করে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখব তোমাদের। এতদিন গঙ্গাচরণ ছিলেন, কোনরকমে মানিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু দেবী যে একেবারে সিংহিনী। এর হাতে পরিত্রাণ নেই কারও। কাল সব কথাই আমি শুনেছি নিজের কানে, পাশের ঘরে বসে। শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গেছে আমার। পুরনো কর্ম্মচারী তোমরা দু'জনেই। অথচ প্রমাণ হয়ে গেল দাগী দু'জনেই। মেয়ের বয়সী দেবী, তার চোখে ধুলো দিতে গিয়েছিলে তোমরা মিথ্যার প্রশ্রয় নিয়ে ?

অবিনাশের মুখ কালো হয়ে উঠে। রাখাল কাঁপতে থাকে ভয়ে। জোড় হাত করে বলতে যায়, হুজুর—

শ্যামাকান্ত ধমক দেয়, চুপ! নির্লজ্জ কোথাকার! দলবল সঙ্গে নালিশ করতে এসেছ, এই মুখ নিয়েই সাধু সাজতে চাও অসাধুর দল সব। কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত তোমাদের। কিন্তু শাস্তি আমি দেব না, দেবে দেবী। তার রায়ই মেনে নিতে হবে তোমাদের।

দেবীর গলা শোনা যায়, আসতে পারি জ্যেঠামশাই ?

শ্যামাকান্তবাবু চমকে উঠেন। তার পরই সহাস্য-মুখে বলেন, কে দেবী ? এস মা, এস। তোমাকে বারণ করি সাধ্য কি আমার।

দেবী স্মিতমুখে এগিয়ে আসে। কোনদিকে দিকপাত নেই তার। দৃপ্ত-ভঙ্গিমা। ধীরপদেই এসে দাঁড়ায় শ্যামাকান্তবাবুর সামনে।

শ্যামাকান্তবাবু একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখেন দেবীর দিকে। প্রশান্ত মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি। কাব্যের ছন্দ যেন ভেঙে পড়ছে সারা দেহে। তারই মাঝে সন্ধ্যাতারার মত ফুটে আছে অপরূপা এক নারী। সম্ভ্রমময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী নারী এ। তাকালে শান্তিতে বুক ভরে আসে। শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে উঠে।

শ্যামাকান্তবাবু প্রশ্ন করেন, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি মা এত সকালে ?

দেবী ঘাড় নাড়ে। একবার উল্লাসপুরে যেতে হবে জ্যেঠা-মশাই। সেখানকার খবরটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না। প্রজারা একটু অশান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে।

শ্যামাকান্ত ঘাড় নাড়েন, জানি। ক'দিন ধরেই ভাবছি সেই কথাটাই। তোমায় বলব বলব করেও বলে উঠতে পাচ্ছি না।

—পরশু দিন সঠিক খবরটা জানতে পারি আমি। একবার নিজের চোখে দেখে আসতে চাই ব্যাপারটা। কি তাদের অভিযোগ।

—কিন্তু তুমি মেয়েছেলে। সত্যিই যদি বিদ্রোহ করে তারা, কি করবে তুমি ? না-মা, এত বড় ঝুঁকি আমি কখনও তোমায়

ঘাড়ে চাপাতে পারব না। বরং অবিনাশকে পাঠাচ্ছি সেখানে, সবকিছু খবর জেনে আসুক সে।

দেবী হাসে। বলে, অবিনাশবাবুকে সঙ্গে নেব বলেই এখানে এসেছি জ্যেঠামশাই। শুনলাম তিনি এসেছেন আপনার কাছে, ভালই হয়েছে। তাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা তিনিই জানেন সব। তার মুখ থেকেই বিদ্রোহের কাহিনীটা রটে গেছে চারদিকে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার প্রজা—আমার কোন অনিষ্টই করবে না তারা।

শ্যামাকান্তবাবু ব্যাকুল হয়ে উঠেন। অন্তরের ব্যাকুলতা গোপন করতে না পেরে বলেন, কিন্তু এতখানি পথ, এই রোদে যাবে কি করে মা? এতে আমি মত দেব না কিছুতেই।

দেবী বলে, ছিন্না কাল থেকে বলে রেখেছি জ্যেঠামশাই। মাইল পাঁচ-ছয় রাস্তা। কড়া রোদ ওঠবার আগেই পৌঁছে যাব সেখানে। ভাববার বা চিন্তা করবার কোন কারণ নেই আপনার। আশা করি বিকেলের দিকে ফিরে এসে সুখবর দিতে পারব আপনাকে। আর এই সুযোগে জমিদারীরও কিছুটা দেখা হয়ে যাবে আমার।

—কিন্তু মা, প্রজারা যদি অবাধ্য হয়। যদি অসম্মান করে বসে তোমার।

—আপনার আশীর্বাদ আমার মাথায় রইল জ্যেঠামশাই। এর জোরে আপনার সব দুর্ভাবনাকেই জয় করে ফিরে আসব আমি। বলতে বলতে দেবী হাসিমুখে শ্যামাকান্তের পদধূলি মাথায় তুলে নেয়।

বিকালের দিকে দেবী ফিরে আসে। শ্যামাকান্তর পাশটিতে এসে বসে হাসিমুখে। শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেন। বলেন, সারাদিন ঘুরে এলে রোদে রোদে। আগে মুখে-হাতে জল দাও, তার পর কথা।

দেবী বলে, সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে আগেই। মুখে-হাতে জল দিয়েই তবে ছাড়ল তারা। আপনার আশীর্বাদের জোর, একি কম জোর জ্যেঠামশাই?

জ্যেঠামশাই কথা বলেন না। শুধু নবলব্ধ ভাইঝিটির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

দেবী বলে, দোষটা হয়ত আমারই হয়েছে জ্যেঠামশাই। হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে নিজের দিক থেকে। তারই সুযোগ নিয়ে অপপ্রচার হয়েছে সেখানে।

শ্যামাকান্ত বিস্মিত হ'ন। প্রশ্ন করেন, অপপ্রচার? তোমার নামে?

—আমারই নামে। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকে নজর নেই আমার। ঝোঁক শুধু খাজনা বাড়াবার দিকেই। আপনাকেও প্ররোচিত করছি সেই দিকেই। তাদের বোঝান হয়েছে, সামনের মাস থেকেই খাজনা বেড়ে হবে দু'গুণ।

শ্যামাকান্ত ব্যথাহত কণ্ঠে বলেন, বল কি মা? এ অনিষ্ট হ'ল কি করে?

দেবী ঈষৎ হাসে। উত্তর দেয়, হয়ত আমারই অসাবধানতার দোষে। আর সেই জন্তেই প্রজারা অশান্ত হয়ে উঠেছে সেখানে। কিন্তু এখন ভুল ভেঙ্গেছে তাদের। আমি যে তাদের অহিতৈষী নই, এ বুঝেছে তারা। তবে আমার আন্তরিকতার খেসারত আদায় করে নিয়েছে সেই সঙ্গে।

শ্যামাকান্তর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বলেন, এখন ভুল ভেঙেছে তাদের? বুঝেছে তারা তুমি অহিতৈষী নও?

দেবী ঘাড় নাড়ে, আপনার আশীর্ব্বাদের জোরে তাদের বোঝাতে পেরেছি জ্যেঠামশাই। তারা বুঝেছে এ দুষ্টলোকের অপকীর্ত্তি। তাই অবিনাশবাবুর দিনটা গেছে বড় খারাপ। এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত কেউ এগিয়ে দিল না তাকে।

—শয়তানের দল! ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেব সবগুলিকে এবার।

—কিন্তু জ্যেঠামশাই—! দেবী ইতস্ততঃ করে।

—বল, থামলে কেন মা?

—উল্লাসপুরের প্রজাদের দুরবস্থা ভারী। নিজের চোখে দেখে এসেছি বলেই বলতে পাচ্ছি আপনাকে। সেখানে পুকুরে জল নেই, মাঠে শস্য নেই। একটা হাহাকার পড়ে গেছে চারদিকে। ভয় হয়, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে গ্রাম উজাড় না হয়ে যায় শেষ পর্য্যন্ত। তারই ছায়া চোখে দেখতে পেয়েছি বলে আমি দুটো টিউবওয়েলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি তাদের কাছে।

—বেশ করেছ মা। আমি ভারী খুশী হয়েছি এতে।

—জ্যেঠামশাই! দেবী ডাকে একটু আস্তে আস্তে, যেন একটু ভয়ে ভয়ে।

—ভয় কি মা, স্বচ্ছন্দে বল যা বলবার আছে তোমার।

—আর একটা প্রতিশ্রুতি তাদের দিয়ে এসেছি আমি। না দিয়ে উপায় ছিল না কিছু। আশ্বাস দিয়ে এসেছি যে, আপনাকে রাজি করাব এ বছরের খাজনাটা তাদের মকুব করে দিতে। বড় দুর্দ্দশা তাদের জ্যেঠামশাই। চোখে দেখলে সইতে পারা যায় না।

শ্যামাকান্ত চুপ করে থাকেন কিছুক্ষণ। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বলেন, জমিদারের লক্ষ্মী হ'ল প্রজা। জমিদার প্রজাপীড়ক হ'লে উচ্ছন্নে যায় তার জমিদারী। তুমি নিজের চোখ দিয়ে যা দেখে এসেছ তা যদি সত্যি হয় মা, উচ্ছন্নে যাবার হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছ তুমি। আমার জমিদারীর মঙ্গলের জন্ত, প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্ত তোমার ব্যবস্থাই হবে চরম। তার প্রতিবাদ করব না কোনদিনই। বরং আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদই তোমায় জন্তে রেখে যাব আমি।

দেবীর মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সে হেঁট হয়ে আর একবার শ্যামাকান্তর পদধূলি মাথায় তুলে নেয়।

* * *

কয়েকদিনের মধ্যেই একটা থমথমে আবহাওয়া এসে ঘিরে ফেলে সমস্ত জমিদার বাড়ীটিকে। শ্যামাকান্ত পীড়িত। দুশ্চিন্তা সকলের চোখে-মুখে। সকলেই বোঝে এ যাত্রায় হয়ত রক্ষা নাই। শ্যামাকান্তও বোঝেন। তাই পীড়ার একটু উপশম হতেই তিনি দেবীকে নিজের শয়নকক্ষে ডেকে পাঠান। বলেন, বুঝতে পেরেছ মা, আমার ডাক এসেছে উপর থেকে।

দেবী প্রতিবাদ করতে যায় স্তোকবাক্য দিয়ে, কিন্তু শ্যামাকান্ত বাধা দেন, থাক আমি ছোট ছেলেটি নই মা যে বুঝি না কিছু। মৃত্যুর দূত এসেছিল পা টিপে টিপে, আমায় ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু জাগ্রত প্রহরী ছিলে তোমরা যায় আটকে। তাই ফিরে গেছে এবার। এর পরের বারে আর যাবে না জেনো। থ্রম্বসিসের প্রথম পদক্ষেপ এটা, বুঝলে?

দেবী বুঝেছিল। বুঝেছে সবাই, আর রক্ষা নাই। এ যাত্রায় রেহাই পেলেও, এর পরের যাত্রায় ঠেকানো দায়। তাই বিমর্ষ সবাই, তবুও দেবী সাহস দিতে চেষ্টা করে আর একবার। বলে, আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন জ্যেঠামশাই। যদি অনুমতি দেন, রণজিৎবাবুকে তার করে দি একটা, প্লেনেই চলে আসুন তিনি। তবুও বল ও ভরসা দুই পাবেন। শ্যামাকান্ত হাসেন, এক টুকরো ম্লান হাসি মুখের উপর ফুটে উঠে তাঁর। বলেন, বল আর ভরসার কিছুই অভাব নেই মা আমার। যেতে হবে এটা ঠিক, তার জন্ত প্রস্তুতও আমি। তাই বলে, খোকার পড়াশুনাটা নষ্ট করি কেন। আর ত মাসখানেক মাত্র বাকি। তারপরই চলে আসবে সে, একবার এলে আর ত যাওয়া হবে না। মাসখানেক হয়ত টেনেটুনে টি'কে যেতে পারব, কি বল তুমি?

দেবী ঘাড় নাড়ে, পারবেন জ্যেঠাবাবু, নিশ্চয়ই পারবেন। শুধু মাসখানেক কেন, অনেক দিনই সুস্থ থাকবেন আপনি।

এবার অবিশ্বাসের হাসি হাসেন শ্যামাকান্ত। বলেন, তোমাদের মঙ্গল কামনা জয়ী হউক, আমি বাধা দেব না, তবুও একটা ভার দিতে চাই তোমায়। বড় কঠিন ভার মা, তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না তা সইতে।

দেবী তাকিয়ে থাকে। একটা মূক প্রশ্ন ফুটে ওঠে কালো তারা দুটিতে তার।

শ্যামাকান্ত আঙ্গুল দিয়ে দেখান, পাশের ঘরের দরজাটি একবার খোল ত মা। ও ঘরে আমার অজান্তে ঢোকবার হুকুম নেই কারও। শুধু হুকুম দিয়ে গেলাম তোমাকে। তিনটে সিন্দুক আছে পাশাপাশি। তার মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি, যা কিছু আমার আছে ভরা। এ বংশের সোনা-দানা, হীরে-জহরৎ, যা কিছু সবই আছে ওদের মধ্যে। আমার শেষ উইল আছে সেই সঙ্গে, খোকার নামে একখানা চিঠি তাও রেখে গেলাম ওখানে। এদের চাবি সব তুলে দিলাম তোমার হাতে। খোকা ফিরে এলে, তার হাতে দিয়ে, তবে পাবে তুমি মুক্তি।

—জ্যেঠামশাই! দেবী আর্ত্তনাদ করে উঠে। মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে যায়। হাত গুটিয়ে নিয়ে সে বলে, আমায় ক্ষমা করুন জ্যেঠামশাই, এতখানি গুরুদায়িত্ব নিতে আমি অপারগ।

শ্যামাকান্ত বলেন, উপায় নেই মা। এ তোমায় নিতেই হবে। আমার আদেশই বল আর অনুরোধই বল, এ উপেক্ষা করতে পারবে না তুমি। এত বড় দায়িত্ব নেবার মত আর কেউ নেই আমার। বিশ্বাসও করি না কাউকে। ছিল গঙ্গাচরণ, সেও গেছে চলে।

—কিন্তু জ্যেঠাইমা—

—সেকালের মানুষ। একেবারে সরল নিরীহ মানুষ। রাঘব-বোয়াল ভাইটি তার গ্রাস করে বসবে সব। তিনটে সিন্দুকই ফাঁক করে দেবে একাই সে। ফাঁকি দেবে খোকাকে।

—কিন্তু আমি অজ্ঞাতকুলশীল মেয়ে, আমার দুর্ব্বলতা আছে, লোভ আছে। যদি তাদের কাটিয়ে উঠতে না পারি। যদি তারা গ্রাস করে বসে আমাকে।

—শ্যামাকান্ত স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন দেবীর মুখের দিকে। তার পর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, চল্লিশ বছর জমিদারী করার পরও লোক চিনতে যদি আমার ভুল হয় মা, সেটা আমার দুর্ভাগ্য। তবে অপরের বেলায় যাই হোক, তোমাকে ভুল করিনি চিনতে।

দেবী নতচোখে বলে, কিন্তু রণজিৎবাবু—?

—সে আমার ছেলে। ভুল সে করবে না। যদি করে ঠকবে সে নিজে। বরাতে দুর্ভোগ যদি না থাকে তার, এ ভুল সে করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার মা।

কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকতে দিল না নিয়তি। কয়েক দিনের মধ্যেই শ্যামাকান্তকে চিরবিশ্রামে মুক্তি দিল সে। এ বুঝেছিলেন শ্যামাকান্ত। বুঝেছিলেন বলেই, সেই রাত্রেই ডেকে পাঠালেন দেবীকে। বললেন, আজিই আমার শেষরাত্রি মা। খোকা না ফেরা পর্য্যন্ত সব তুলে দিয়ে গেলাম তোমার হাতে। বুড়ো জ্যেঠার সম্মানটুকু রেখো। তার পর একটু দম নিয়ে বলেন যতক্ষণ জ্ঞানটুকু আছে আমার কাছে থেকো তুমি। আর পার ত তারকব্রহ্ম নামটা কাণে শুনিও মাঝে মাঝে।

এ আদেশ অমান্ত করে নি দেবী। সারারাত বসেছিল রোগীর শিয়রে আর গীতাখানি পাঠ করে চলেছিল উদাত্তকণ্ঠে। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, বড় শান্তিতে শুনেছিলেন শ্যামাকান্ত। তার পর শেষ জলটুকু দেবীর হাত থেকে পান করার সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর ক্রোড়ে।

কয়েক দিনের মধ্যেই সারা জমিদার বাড়ীখানির রূপই গেল পাল্টে। দেবী অবাক হয়ে দেখে, এত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কোথায় ছিল শ্যামাকান্তর যে,মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা সব ভুঁই থেকে উঠল গজিয়ে, মুখে-চোখে বিরাট বেদনার বোঝা নিয়ে। হয়ত এই বিরাট হিতৈষীদলের সন্ধান জানতেন না শ্যামাকান্ত, তাই সব দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে গেলেন দেবীর উপর। সব চেয়ে বড় আত্মীয় সেজে বসল শ্যামাকান্তর শ্যালক গিরীন বাবু। মেয়েদের

আকৃতি আর কিচেল-প্রকৃতির লোকটির মধ্যে যে 'হামবড়াই'য়ের ভাবটি ছিল সেইটাই পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সকলের। বাড়ীর কর্ত্তা যে সেই প্রতি পদক্ষেপে এটি তার জানান চাই। দ্বিতীয় দিনেই সে হুকুমজারী করে বসল দেবীর উপর। জমিদারীর হিসাব-নিকাশ, খাতাপত্তর এখন থেকে দেখাতে হবে তাকে। কোন রকম গোঁজামিল সে সইবে না বা বরদাস্ত করবে না। দেবী কান দিয়ে শোনে কিন্তু উত্তর দেয় না। বোঝে অশান্তির ঝড় ঘনিয়ে আসছে অদূরে।

বিকালের দিকে কাছারীতে এসে উপস্থিত হয় গিরীন। দেবীর ঘরে ঢুকে বলে, পঁচিশটা টাকা দিতে হবে এখুনি।

দেবী মুখ তোলে। বলে, টাকা ক্যাশে। আমার কাছে নয়।

গিরীন ধৈর্য্য হারায়। বলে, ও সব কথা শুনতে চাই না আমি। টাকা আমার—মানে দিদির চাই। ক্যাশঘর আর ম্যানেজারের ঘর বার বার ছুটোছুটি করবার সময় নেই আমার।

দেবী উত্তেজনা দমন করে। শান্তকণ্ঠে বলে, আপনি অনর্থক আমার কাছে চেয়ে পাঠালেন।

দেবীর বুকটা ধক্ করে উঠে। আপনা থেকেই ভ্রূদুটি তার কুঞ্চিত হয়ে উঠে। সে তাকিয়ে থাকে গিরীনের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে। মর্ম্মভেদী দৃষ্টি, এ দৃষ্টি সইতে পারে না গিরীন। তাই কেঁপে ওঠে ভিতরে ভিতরে। চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে জড়িত-কণ্ঠে, তাড়াতাড়ি দিন। দাঁড়াবার সময় নেই আমার। দেবী নিজেকে সামলে নেয়। শান্তকণ্ঠে বলে, সিন্দুকের চাবিতে প্রয়োজন কি আপনার?

—আমার নয়, প্রয়োজন দিদির। কৈফিয়ৎ যদি চাইতে হয়, চাইবেন তার কাছেই।

—তাই চাইব। কিন্তু আপনি ব্যস্ত আছেন এখন। আর এ সব কাজ তাড়াহুড়ার কাজ নয়। ধীরে-সুস্থেই হবে খ'ন। আপনি যান। যা বলবার জ্যেঠাইমাকে আমি বলব।

—মানে? আপনি দেবেন না চাবি?

—না। অকারণে সিন্দুকের চাবি হাতছাড়া করার অধিকার নেই আমার।

গিরীন লাফিয়ে উঠে, অকারণে নয়, কারণে। দিদি দেখতে চান কি আছে না আছে সিন্দুকে। বিশ্বাস কি অপরিচিত লোক-জনদের সব। ফাঁক করে দিতে কতক্ষণ?

দেবী আরক্তিম হয়ে উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়। ধীরকণ্ঠে বলে, সেই ভাবনাটা আমারও মামাবাবু। পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়স্বজন কাউকেও বিশ্বাস করা যায় না এ সব ব্যাপারে। কিন্তু এ তথ্য বুঝবেন না আপনি। জ্যেঠাই-মাকে বুঝিয়ে দেব আমি। কিন্তু দু'দিন ধরে যে পঞ্চাশটা টাকা নিলেন জ্যেঠাইমার নাম করে, তার ত হিসেব-নিকেশ দিলেন না কিছুই?

—হিসেব? কেন? আমি চোর? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দেখাচ্ছি মজা। আজই তোমায় বিদেয় করে তবে ছাড়ব।

বাড়ীর ভিতর কোলাহল উঠে। তর্জ্জন-গর্জ্জন আর আস্ফালন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক পড়ে দেবীর। পরিচারিকা খবর দিয়ে যায়, রাণীমা ডাকছেন, দেবী হাসে মনে মনে। তার পর হুকুম তামিল করে।

রাণীমার কাছে এসে নম্রকণ্ঠে বলে, জ্যেঠাইমা ডেকেছেন আমায়?

শ্যামাকান্তর স্ত্রী শৈলজাসুন্দরী একেবারে স্বামীর বিপরীতধর্ম্মী। বুদ্ধিতে ছোট কিন্তু অহঙ্কারে বড়। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেন, তুমি নাকি গিরীনকে অপমান করেছ? স্পর্দ্ধা ত কম নয় তোমার?

দেবী অবিচলিত। অবিচলিতকণ্ঠে বলে, অপমান আমি করি নি জ্যেঠাইমা। লঘুগুরু জ্ঞানটুকু আমার আছে।

গিরীন দাঁড়িয়েছিল পাশে। হুঙ্কার দিয়ে উঠল, অপমান কর নি তুমি আমায়? প্রকারান্তরে চোর বল নি? তাই সিন্দুকের চাবি কিছুতেই দিলে না আমার হাতে।

শৈলজা প্রশ্ন করেন, সিন্দুকের চাবি দাও নি কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না দেবী, নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকে।

—উত্তর দিচ্ছ না যে বড়? বল? ভেবেছ সুযোগমত সিন্দুকগুলিকে ফাঁক করে দিয়ে ভুষ্টি নাশ করবে আমার?

দেবী আর সইতে পারে না এত বড় অপবাদ! এ অসহনীয় তার পক্ষে। সে ভুলে যায় নিজেকে, ভুলে যায় জ্যেঠামহাশয়ের উপদেশবাণীকে। চিৎকার করে ডাকে, জ্যেঠাইমা। চোখ দুটি তার ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়।

শৈলজা বলেন, চোখ রাঙাচ্ছ কাকে? আমি কচি খুকি নই, বুঝি সব। সিন্দুকের চাবি এখুনি দিয়ে দাও গিরীনের হাতে।

দেবী সম্বিৎ ফিরে পায়। অপবাদের তাড়নায় মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিল সে, আবার তাকে উদ্ধার করে আনে। বলে, মেয়ের অপরাধ ক্ষমা করুন জ্যেঠাইমা। আপনার আদেশ পালনে অপারগ আমি। মামাবাবু কেন, পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক ছাড়া এ চাবি কারও হাতে তুলে দিতে পারি না আমি। এমনকি আপনার হাতেও না।

গিরীন উস্কানি দেয়, দেখ দিদি, দেখ। বুকের পাটা দেখ একবার। তোমার সম্পত্তি, তোমাকেই গ্রাহ্য নেই। নবাব-পুত্রী এলেন কোথাকার।

শৈলজাসুন্দরী বোমার মত ফেটে পড়েন, কি, এতদূর আস্পর্দ্ধা তোমার? আমার খাও, আমার পর আর আমাকেই অগ্রাহ্যি। ঘুটে কুড়োনির পুত স্বর্গ দেখেছ? এই মুহূর্ত্তেই তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী ছেড়ে, তোমায় জবাব দিলাম আমি।

এতখানির জন্ত প্রস্তুত ছিল না দেবী। তাই বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়ে সে। সারা মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কিন্তু

মনোবল তার অসীম। নিজেকে সামলে নিয়ে নতকণ্ঠে বলে, যাব জ্যেঠাইমা। আপনি যখন বলেছেন, চলে যাব আমি। আপনার বলাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু জ্যেঠামশাইয়ের কাজটি চুকে যাক্। আর যার হাতে চাবি দেবার কথা তাকে বুঝিয়ে দিই, তার পর যাব।

—কি? তার পর যাবে? কিন্তু কেন? কে সে তোমার আপন জন, ভালবাসার পাত্র যাকে ছাড়া চাবি আমাকেও দিতে চাও না তুমি? এতবড় শয়তানী তোমার পেটে পেটে?

—শয়তানী নয় জ্যেঠাইমা, এ আমার কর্তব্য। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি। এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারব না কোনমতেই। যাঁর হাতে চাবি দেব তিনি আমার কেউ নন। ভালবাসার পাত্র হওয়া দূরে থাক, আমাদের চোক্ষুষ দেখাশোনাও হয় নি আজ পর্যন্ত। আপনারই ছেলে তিনি, রণজিৎবাবু। জ্যেঠামশাই শপথ করিয়ে নিয়েছেন আমায়, এ চাবি দিতে হবে শুধু তাঁরই হাতে। এত-বড় বিরাট দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ভুলচুক যদি করে থাকি কিছু, অপরাধ যদি করে থাকি পায়ে, মেয়ে বলে আমায় ক্ষমা করবেন জ্যেঠাইমা।

শৈলজা চমকে উঠেন। ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি তাঁর। তবুও তাহাই মথিত করে বুদ্বুদ জেগে উঠে স্বামীর একটি কথা। সেদিন বলে-ছিলেন তিনি, যা করে গেলাম তোমার ভালর জন্যেই করে গেলাম শৈল। দেবীকে অবিশ্বাস করতে যেও না। পাকা মাঝি সে। বিপদে হাল ধরবার ক্ষমতা যদি থাকে কারও, আছে তার। সে ঠকাবে না তোমাদের।

তাই শৈলজা চুপ করে যান। কিন্তু দেবী থামে না। আবেগভরেই বলে সে, বিশ্বাস করুন জ্যেঠাইমা, ও আমি চাই নি, কামনাও করি নি কোনদিন। অথচ জ্যেঠামশাইয়ের আদেশ তাকেও অমান্য করতে পারি নি। তাই এতবড় দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ঘাড়ে। আপনাকে দোষারোপ করি না। ঐশ্বর্য্যে অভি-সম্পাত আছে। মুনিদেরও মতিভ্রম ঘটায়। তাই বিশ্বাসের দাবি আমিও করি না। যতদিন রণজিৎবাবু ফিরে না আসেন, দু'জন বিশ্বাসী দারোয়ান বসিয়ে রাখুন ও-ঘরে কোনরূপ অনিষ্ট না ঘটতে পারে কারও দ্বারা।

শৈলজা কথা বলতে পারেন না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। পরাজয় ঘটে গেছে তাঁর ছোট্ট এই মেয়েটির কাছে।

দেবী আর দাঁড়ায় না। চলতে উদ্যত হয়ে বলে, চললাম জ্যেঠাইমা, প্রয়োজন হলে স্মরণ করবেন। এসে হাজির হব আমি। সে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কিন্তু বিস্ময়েরও বড় বিস্ময় আছে। এ বড় বিস্ময় হ'ল গিরীন। সেদিন অতখানি অসম্মানিত হবার পরও এ লোক যে কি করে আবার হাত পাততে পারে এসে, এ ভেবে পায় না দেবী। তাই একদিকে এ লোকটির প্রতি অপরিসীম ঘৃণায়, অপর দিকে রাগে অন্তর ভরে গেল তার। সে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির লোকটির দিকে তীব্রদৃষ্টিতে।

ঘৃণা, রাগ এ-সব সূক্ষ্মতত্ত্ব বোঝবার বালাই গিরীনের নাই। তার প্রয়োজন টাকার। তা সে শ্রদ্ধায়ই হউক, আর অশ্রদ্ধায়ই হউক এ নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। দন্তবিকশিত করে বলে, শ'পাঁচেক টাকা যে দিতে হবে এখুনি।

দেবী কাজ করছিল। মুখ না তুলেই প্রশ্ন করল, কেন?

—কেন তাই বলতে হবে? এত বড় জমিদার—তার কাজ, একটু আমোদ-প্রমোদ হবে না?

—আমোদ-প্রমোদ মানে? দেবী অবাক হয়ে যায়।

—আমোদ-প্রমোদ মানে—কলকাতা থেকে কয়েকজন আর্টিষ্টকে আনাব মনে করেছি।

—আর্টিষ্ট? আর্টিষ্ট করবে কি?

আর্টিষ্টের কাজ লোককে আনন্দ দেওয়া। তারা আনন্দ-বিতরণ করবে লোককে। আর তাদের বলেও রেখেছিলাম আমি—

—যে জমিদার গত হলে আনন্দ বিতরণের জন্যে দল বেঁধে নিয়ে আসবেন তাদের?

গিরীন অপ্রতিভে পড়ে। অপ্রতিভমুখ করে বলে—বাঃ তা কেন। কত উঁচু দরের লোক এরা সব।

—তা হ'ক মামা বাবু। জ্যেঠামশায়ের মৃত্যু আমাদের শোকের বিষয়—আনন্দের নয়। সুতরাং আনন্দ বিতরণের জন্যে কোন আর্টিষ্টই আসবে না এখানে।

—মানে টাকা পাওয়া যাবে না?

—টাকা বড় জিনিস। ঐ বাবদ একটা আধলাও পাওয়া যাবে না।

—কি! স্পর্দ্ধা তোমার বেড়ে চলেছে দিন দিন। শান না দিলে দেখছি ধার উঠবে না।

অপমানে ক্রোধে দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু উত্তেজনা দমন করে আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে বলে, অসভ্যতার পরিবর্তে অসভ্যতা করবার শিক্ষা পাইনি আমি। আপনি যান, চলে যান আমার সামনে থেকে।

গিরীন হকচকিয়ে যায়। কিন্তু এই তেজোদীপ্ত মেয়েটির চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার মত সাহস খুঁজে পায় না সে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কোন মতে বলে, বড় বাড় বেড়েছ তুমি। বাড় ভাঙছি দাঁড়াও, এ বাড়ী থেকে বিদেয় না করে তোমায় ছাড়ছি না আমি।

এরই কিছুক্ষণ পর আবার অন্দরমহলে ডাক পড়ে দেবীর। এর জন্য প্রস্তুত ছিল সে। এতটুকু বিচলিত না হয়েই সে এসে দাঁড়ায় শৈলজাসুন্দরীর সামনে। থমথমে মুখ শৈলজাসুন্দরীর। একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখে নেন দেবীকে। এ মেয়েটিকে অন্তরে অন্তরে চিনেছিলেন তিনি। কিন্তু নিজে

জমিদারের স্ত্রী। তাই গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বলেন, তুমি গিরীনকে অপমান করেছ আবার? কাছারী ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ তাকে?

দেবী বিচলিত হয় না। স্থির কণ্ঠেই বলে, এর জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত জ্যেঠাইমা। গুরুজনদের অসম্মানিত করবার শিক্ষা আমি পাই নি। যেটুকু করেছি শুধু নিজেকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

—বটে! তোমার সম্মানের জন্যে অসম্মান করেছ আমার ভাইকে? আস্পর্দ্ধারও ত সীমা আছে একটা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন?

—এ সব কথা আপনার না শোনাই ভাল ছিল জ্যেঠাইমা। কিন্তু শুনতে যখন চেয়েছেন, তখন গোপন করব না কিছু। পাঁচশ' টাকা চেয়েছিলেন মামাবাবু জ্যেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধে আমোদ-প্রমোদের জন্যে। এ সময়ে আমোদ-প্রমোদ সমীচীন হবে না বলেই টাকাটা দিতে পারিনি আমি।

শৈলজা তাকাল গিরীনের দিকে। চোখে তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

গিরীন অপ্রতিভমুখে বলে, শ' পাঁচেক টাকা বটে দিদি, তবে ফুর্ত্তি করবার জন্যে নয়। এত বড় নামজাদা বাঁড়ুয্যে মশাই, তাঁরই কাজে একটু জলসার ব্যবস্থা করবার জন্যে। কলকাতা থেকে কয়েকজন আর্টিষ্টকে আনতে চেয়েছিলাম। খুব নামকরা আর্টিষ্ট তারা। সুপ্রিয়া, চিত্রা, পূর্ণিমা এরা সব এক একজন 'ষ্টার' মানে সিনেমার তারকা। একবার আনতে পারলে এখানে টিটিকার পড়ে যেত চারিদিকে।

—তা যেত, তবে সম্মানের নয়, অসম্মানের। এতে জ্যেঠামশাইয়ের পুণ্য আত্মার প্রতি অসম্মানই দেখান হ'ত জ্যেঠাইমা। এ আমি সইতে পারব না কিছুতেই। শৈলজা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন গম্ভীর হয়ে। তার পর দেবীকেই আদেশ করেন, তুমি যেতে পার এখন। কি পারা যাবে—না যাবে সে বুঝব আমি। দেবী ফিরে আসে ধীরে ধীরে।

নির্ব্বিঘ্নেই শ্যামাকান্তর শ্রাদ্ধশান্তি সব শেষ হয়ে যায়। সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় দেবীকে সব দিকে। এক দিকে যেমন সে প্রশ্রয় দেয় নি গিরীনের গোঁয়ার্তুমিকে, তার ঔদ্ধত্যকে, অপর দিকেও তেমনি প্রশ্রয় দেয় নি কোনরূপ অমিতচারিতাকে। অনমনীয় দেবী, অনমনীয় ভাবেই উপেক্ষা করে এসেছে সমস্ত অনিয়মকে। কলকাতা থেকে আর্টিষ্ট আসে নি। তাদের শুভ পদার্পণ সম্ভব হয় নি শুধু দেবীর জন্যই। তাই গিরীনের মহা রাগ। শৈলজাসুন্দরীও অসন্তুষ্ট মনে মনে। কিন্তু প্রজাসাধারণের বীতরাগের ভয়ে চুপ করে গেলেন শেষ পর্য্যন্ত। সমস্ত মিলিয়ে যখন একটা থমথমে ভাব চারিদিকে, তখন সুদূর বিদেশ থেকে দেশে পদার্পণ করল রণজিৎ।

প্রস্তুত হ'ল দেবী। জমিদারীর সমস্ত হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে নিজের যাত্রায় সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাখল সে। কিন্তু এক দিন, দু'দিন, তিন দিনও কেটে গেল, তবুও কোন আহ্বান এল না নূতন জমিদারটির কাছ থেকে। প্রবাহমান কাল যেমন চলছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই তার অদৃশ্য পাতা উল্টাতে লাগল একটির পর একটি করে। গিরীনের আস্ফালন এত দিন মাঝে মাঝে গুপ্তপথে ডিগবাজী খেলেও, এখন স্তিমিত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

সে দিন কাছারী ঘরে সভা বসেছিল দেবীর। নায়েব অবিনাশ এবং গোমস্তা রাখালের বিরুদ্ধেই অভিযোগ। গিরীনের সঙ্গে তারা জোট পাকিয়েছে দেবীর বিরুদ্ধে। অপদস্থ করতে চায় দেবীকে—এ প্রমাণ পেয়ে গেছে সে হাতে হাতে। তাই তাদের শাসন করছিল কড়াসুরেই। ধমক দিয়েই বলছিল নায়েবকে, চক্রীর রাজা আপনি অবিনাশবাবু, আপনার দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তের জাজ্বল্যমান প্রমাণ সব সাজান রয়েছে ঐ—আমার সামনে। এর কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করব আমি। আপনাদের নষ্টামীর জন্যে জমিদারীর যে ক্ষতি হয়েছে তার সমস্তই আদায় করা হবে আপনাদের কাছ থেকে। তিন দিন সময় দিলাম। ব্যবস্থা করতে পারেন ভালই, তা না হলে জবাব দিলাম আপনাদের কাজ থেকে।

ধূর্ত্ত নায়েব, বিনয়ের অবতার, দাঁত বার করে বলে, যে আজ্ঞে, ম্যানেজার সাহেবা। আপনার আদেশ খুসি মনেই মেনে নেব যদি সে আদেশ করবার অধিকার থাকে আপনার, কিন্তু তার আগে আপনিই যে কুপোকাৎ হয়ে আছেন রাণীমায়ের কাছে। কথা যা বলবেন, একটু ওজন করে, হুঁস রেখেই বলবেন।

রাগে আত্মহারা হয়ে পড়ে দেবী। কিন্তু স্থিরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ওজন করেই কথা আমি বলি নায়েবমশাই। অনধিকারচর্চ্চা করবার মত সময় আমার নেই। আমার আদেশ চরম আদেশ। স্বয়ং জমিদারবাবুও এর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না জানবেন। এখন যান এখান থেকে।

আদেশ ভারী কড়া। নায়েব বোঝে মর্ম্মে মর্ম্মে। তবুও ব্যঙ্গ করে বলতে যায়, যে আজ্ঞে। যাব বইকি। তবে বিদেয় কে আগে হয়, সেইটাই কথা। বলে তার ধূর্ত্তামী-মাখা মুখখানি ফিরাতে গিয়েই ধরা পড়ে যায় রণজিতের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

ধীর-সংযতপদে রণজিৎ প্রবেশ করে ঘরে। দেবী উঠে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু তাকে ইঙ্গিতে নিবৃত্তি করে নিজেই একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। অবিনাশকে উদ্দেশ করে বলে, আগে-পিছের কথা নয় নায়েবমশাই। কথা হচ্ছে শৃঙ্খলার। যে অভিযোগ উনি করেছেন আপনার বিরুদ্ধে, তার সদুত্তর দিতে হবে তিন দিনের মধ্যে। পারেন ভালই—তা না হলে, ওনার আদেশই চরম জানবেন। এখন যেতে পারেন আপনারা।

অবিনাশ আর রাখাল দু'জনেই বার হয়ে যায় মুখ কালো করে। রণজিৎ ফেরে দেবীর দিকে। এক মুহূর্ত্ত তাঁর আনত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, শুনলাম, আপনি আমাদের ষ্টেটের ম্যানেজার। শুনে পর্য্যন্ত অবাক হয়ে গেছি আমি।

—কেন? প্রশ্ন করে দেবী।

—হবারই ত কথা। নয় কি? এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ—সমস্ত জমিদারীর ম্যানেজার—যার দাপটে বাঘে-গরুতে জল খাবে একঘাটে—সেই পদে একজন মেয়েছেলে। এতে আশ্চর্য্য না হওয়াটাই ত বিচিত্র। কেন বাবা এ পদে আপনাকে নিযুক্ত করেছিলেন আমি জানি না। আপনি জানেন কিছু?

—না। তবে মনে হয় অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনের জন্যেই এ ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। জানতেন, তিনি যখন রয়েছেন পিছনে, তখন বাঘে-গরুতে জলখাবার অসুবিধে হবে না কিছু।

—হবেও বা তা। তবে বাবাকে যতদূর আমি জানি, তাতে খুশী-খেয়ালের বশে কাজ করবার মত মানুষ তিনি নন। অথচ—রণজিৎ থামে। কিন্তু দেবী মুখ তোলে, চোখের প্রশ্ন দিয়ে জানতে চায় বক্তব্যটা তার।

রণজিৎ বলে, এসে পর্য্যন্ত যা-কিছু শুনেছি সবই আপনার বিরুদ্ধে, স্বপক্ষে ত শুনলাম না কিছুই। অবশ্য এটা ঠিক, সুখ্যাতি প্রাপ্য যা কিছু সব জমিদারের, অখ্যাতি ম্যানেজারের। এ দিক দিয়ে গোলমাল কিছু নেই, তবে ব্যতিক্রম দেখলাম এখন?

—ব্যতিক্রম বই কি। দুর্দ্দান্ত নায়েব আর গোমস্তাকে যে ভাবে শাসন করলেন আপনি, শেষ পর্য্যন্ত বরখাস্ত করলেন আমারই চোখের সামনে, সেটা অল্প ক্ষমতার কাজ নয়। আমার মনে হয়, আপনার বিরাগভাজন হবার হেতুটা ঐটাই। অর্থাৎ আপনার অদমনীয় ব্যক্তিত্বটাই। দেবী একটুখানি হাসে, এ হাসির মধ্যে অহমিকা নাই, আছে শান্ত-মাধুর্য্যের দীপ্তি।

রণজিৎ বলে, মেয়েরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, আমার মা বলেন তিনিও মুক্ত নন এ দুর্ব্বলতা থেকে, হয়ত গোল বেধেছে সেইখানেই। তিনি ভুল করেছেন চিনতে আপনাকে।

দেবী বলে, হয়ত ভুল করেছেন তিনি, কিন্তু তাইতেই আমার লাভ। তিনি দিয়েছেন আমার মুক্তি, এখন আপনি দিলেই আমি বাঁচি।

—দেব। মুক্তি পাবার যোগ্য যদি হন, দেব নিশ্চয়ই, কিন্তু বাবা যাকে স্থান দিয়েছেন এক কথায়, তাকে স্থানচ্যুত করা যায় না এক শো কথায়—মায়ের কথাতেও না, আমার কথাতেও না।

দেবী একটু চুপ করে থেকে বলে, জ্যেঠামশাই আমার পরম শ্রদ্ধেয়, তিনি যতখানি স্নেহ করতেন আমায়, যতখানি দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতেন, এ সবাই যদি না পারেন, দোষ দিই না তাদের। দোষ নিশ্চয়ই আমার আছে, তাই ত বিরাগভাজন হয়েছি সকলেরই। তবে যত দোষই করে থাকি, জ্যেঠামশাইয়ের কাছে আমি নির্দ্দোষ, তাঁর আদেশ অমান্য করিনি এক তিলও। এইটাই আমার মস্ত সান্ত্বনা, আর সেই আদেশের শেষটুকু পালন করতেই আজও আমি টিকে আছি এইখানে, কিন্তু তার শেষ আজ, আজই শেষ করে দিতে চাই হিসেব-নিকেশ সব।

—আজ-ই?

—আজ-ই, এর জের টানতে চাই না আর একদিনও।

—কিন্তু নায়েব-গোমস্তা—এদের হিসেব-নিকেশ? সময় ত দিয়েছেন তিন দিনের।

—তাদের ব্যবস্থা করবেন স্বয়ং জমিদার।

—জমিদার অপারগ, ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকেই। লঘু-গুরু জ্ঞান যাদের নেই, যারা অকৃতজ্ঞ, বিচারে শাস্তি পাক তারা, এই আমি চাই, বিচার করবেন আপনি, দর্শক হব আমি।

—বেশ, তাই হবে, বিচার করব আমিই, কিন্তু তার আগে মুক্তি দিতে হবে আমাকে এই বিরাট দায়িত্ব থেকে, সিন্দুকের চাবির গুরুভার থেকে রেহাই পেতে চাই আমি।

রণজিৎ বিব্রত বোধ করে। বলে, দেব, রেহাই আপনাকে দেব, তবে এ বেলা নয়, ব্যস্ত আছি কাজে, সময় পেলেই খবর দেব আপনাকে।

সারাদিনের পর যখন সময় হয় রণজিতের, তখন দেবীর অসময়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্তের বেসাতি তখন সুরু হয়ে গেছে, এমন সময় জ্যেঠামশাইয়ের বসবার ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠে, টিং টিং টিং। দেবী চমকে উঠে। পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখে, বেল বাজাচ্ছে রণজিৎ। সে এক মুহূর্ত্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়, তার পর ঘরে ঢুকে বলে, এত রাত্রে বেল বাজালে পাবেন না কাউকেও।

—রণজিৎ বলে, আর কাউকেও প্রয়োজন নেই আমার, প্রয়োজন আপনাকে।

—আমাকে? দেবী বিস্মিত হয়, ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলে, এত রাত্রে?

—সকাল সকাল আর হ'ল কই। ছাড়া পেলাম একটু আগে, এখন চলুন কি দেখাবেন সিন্দুকে।

দেবী নড়ে না, মাথা নাড়া দিয়ে বলে, না। এখন সময় হবে না আমার।

এবার রণজিৎ বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে কারণ?

দেবী উত্তর দেয়, সবেরই সময় আছে, অসময় আছে। এতখানি রাতে সিন্দুক খোলার উপযুক্ত সময় নয়। এ এক-আধ ঘণ্টার কাজ নয়। সমস্ত জিনিস মিলিয়ে দেখতে সময় লাগবে অনেক।

রণজিৎ বলে, লাগুক, অসুবিধে হবে না আমার।

—আপনার হবে না, কিন্তু আমার হবে। সারারাত আপনার সঙ্গে জেগে বসে থাকতে পারব না আমি। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি?

—এ বাড়ীর লোকেরা ভাল নয়। কুৎসা রটাতে তারা অদ্বিতীয়। তিলকে তাল করতে তাদের জুড়ি কেউ নেই।

রণজিৎ অবাক হয়ে যায়, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দেবীর ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে।

দেবী বলে, আজ থাক। কাল সকালেই সিন্দুক খুলে দেব আপনাকে।

রণজিৎ অসন্তুষ্ট হয় মনে মনে, কিন্তু মনোভাব গোপন করে

গম্ভীরভাবে বলে, বেশ, তাই দেবেন। অনর্থক অসুবিধে বাড়িয়ে লাভ নেই কিছু।

পরদিন সকালেই হাজির হয় দেবী, শুচিস্নাতই হয়ে এসেছে সে। একেবারে সাধারণ বেশভূষা, কিন্তু তারই আবেষ্টনীতে তাকে মানিয়েছে ভাল। কালাপাড় শাড়ীর আঁচল দিয়ে কোমরটা আঁটো করে বাঁধা, হাতে ঝোলান সিন্দুকের চাবি। রণজিৎকে বলে, আজকের সকালটা ভাল। অন্ততঃ পাঁজিতে তাই বলে। শুভদিনে শুভকাজে গোল নেই। সিন্দুক খুলে দিচ্ছি, আসুন।

রণজিতের ইচ্ছা হয় আপত্তি করে। গত রাতের কথা স্মরণ করে মনটা বিরূপ হয়ে উঠে তার, কিন্তু দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে আপত্তি জানাতে ভুলে যায় সে। শুচি-শান্ত মুখ, কোমলে-কঠোরে মেশানো। এ মুখের যা অনুরোধ তা যেন অনেক আদেশেরও বড়। তাই তাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। রণজিৎ কৌতুক অনুভব করে। কৌতুকভরেই সে উঠে আসে দেবীর পিছনে পিছনে।

সিন্দুক ঘর, সিন্দুর চর্চ্চিত তিনটি সিন্দুক দেওয়ালে দেওয়ালে গাঁথা। তাদেরই একটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে দেবী। খবর পেয়ে ছুটে আসেন শৈলজাসুন্দরী—পিছনে পিছনে গিরীন, কিন্তু তাদের বাধা দেয় রণজিৎ। বলে, না। বুঝে নিতে একা আমিই যথেষ্ট। তোমরা বাইরে থাক। অযথা ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই।

অগত্যা বাইরেই থাকতে হয় তাদের।

দেবী সিন্দুক খোলে, নোটে ঠাসা সিন্দুক। নম্বরী নোটগুলি থাক দিয়ে দিয়ে সাজান। খুচরোগুলি বাণ্ডিল করে বাঁধা। পাশে শ্যামাকান্তর হাতে লেখা তালিকা। তারিখ দিয়ে সই করাও তাঁর। তালিকার সঙ্গে মিলে যায় সবই। মেলে না শুধু এক বাণ্ডিল খুচরো নোট। তালিকাতে কোন উল্লেখ নেই তার। রণজিৎ কৌতুক ভরে সেটা ঠেলে দেয় দেবীর দিকে। বলে, তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় যা, তা আমারও অধিকারভুক্ত নয়।

দেবী বিস্মিত হয়। বলে, মানে?

—তা ত জানি না।

—কিন্তু এ নিয়ে আমি করব কি?

—তাও আমার অজানা, বাবা হয়ত ইচ্ছে করেই মালিকশূন্য করে গেছেন এটাকে। তাঁর চুলচিরে হিসেবের মধ্যে এ ভুল অসাবধানতাবশতঃ নয়, হয়ত এরই মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে আপনার পারিশ্রমিকের মূল্য। আপনি নেন ভালই, না হয় দান করে দিতে পারেন কাউকে।

দেবী ঈষৎ হাসে, হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটি নিয়ে বলে, বেশ নিলাম। উল্লাসপুরে প্রজাদের কল্যাণে লাগবে এটা।

পরের সিন্দুকটি অলঙ্কারে ঠাসা। জমিদারবংশের অলঙ্কার, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হয়ে সিন্দুক পূর্ণ করে রেখেছে। জড়োয়া গহনায় বর্ণবৈচিত্রে চোখ ঝলসে উঠে আপনা থেকেই। এখানেও তালিকা প্রস্তুত। শ্যামাকান্তর হাতে লেখা, শ্যামাকান্তর সই-করা সুবৃহৎ তালিকা। তালিকার মিল খুঁজতে গিয়ে রণজিতের চোখ কপালে উঠে, বলে, ওরে বাসরে এ যে আমার কাছে একেবারেই গ্রীক। এর আমি বুঝিই বা কি চিনিই বা কি। দেবী বলে, একটু গম্ভীরভাবেই বলে সে, যিনি বোঝেন, যিনি চেনেন নিয়ে আসুন তাকে।

রণজিৎ তাকায় দেবীর দিকে। তারপর বলে, আনতাম যদি তিনি থাকতেন। কিন্তু যখন নেই তখন অনুশোচনা করে লাভ নেই। এখন আপনিই চিনিয়ে দিন আমায়।

দেবীর মুখ ক্ষণেকের জন্য বর্ণাঢ্য হয়ে উঠে, কিন্তু সে আপত্তি করে না। চিনিয়ে দেয়, তালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে সবকিছু চিনিয়ে দেয় তাকে, কিন্তু তবুও উদবৃত্ত থেকে যায় একটা জিনিস। মূল্যবান কোমল হীরের আংটি একটি, হয়ত এ বংশের কোন বধূরই সম্পত্তি হবে এ আংটি, কিন্তু তালিকায় নাম নেই তার। অনেক চেষ্টা করেও মিলাতে পারে না দু'জনে।

রণজিৎ ঠেলে দেয় দেবীর দিকে, বলে, নিন, ওটাও আপনার।

দেবী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে, বলে না, এ আপনাদের বংশের অলঙ্কার। এতে আমার কোন অধিকার নেই।

রণজিৎ জিদ করে না, বলে, বেশ, দিন আমাকে। হাতে হয় কিনা দেখি। আংটিটি ধারণ করে সে অনামিকাতে।

তৃতীয় সিন্দুক কাগজ-পত্রে ঠাসা। হ্যাণ্ডনোট, বন্ধকী-পাট্টা, জমি-জায়গার হিসাব-নিকাশ সব। সেই সঙ্গে ছিল শ্যামাকান্তর উইল আর রণজিতকে লেখা একখানা পত্র। সব মিলিয়ে নেয় রণজিৎ। তারপর সহাস্যে বলে, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন আপনি। মিলে গেছে সব।

একটা মৃদু হাসি ভেসে উঠে দেবীর ঠোঁটে। বলে, এইবার তা হলে আমার মুক্তি। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট একখানা চাই। কথাটা হাল্কাভাবেই বলতে যায় দেবী। কিন্তু স্বর বিশ্বাসঘাতকতা করে। কোথা থেকে বাষ্প এসে কণ্ঠরুদ্ধ করে দেয়।

রণজিৎ অবাক হয়ে যায়। দেবীর প্রতি সহানুভূতিতে নিজেই বিচলিত হয়ে পড়ে। বলে, দেব, আপনি চাইলে ভাল সার্টিফিকেটই পাবেন, কিন্তু কেন বলুন ত?

দেবী মুখ নত করে বলে, অভাবী মানুষ। চাকরি ছাড়া গতি নেই। বেকার বসে থাকতে পারব না একদিনও। তবুও যদি কিছু-একটা যোগাড় করে নিতে পারি এ সব সার্টিফিকেটের জোরে।

রণজিৎ চমকে উঠে। এ দিকটা ভাববার অবকাশ হয় নি তার। এই প্রথম এই তেজোদ্দীপ্ত মেয়েটির জন্য মনে মনে বেদনা অনুভব করল সে। এমন নির্ভীক তেজী মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না বেশি। আর এই নির্ভীকতা, এই তেজোদ্দীপ্ততাই হ'ল এ চাকরির অন্তরায়। এ বোঝে রণজিৎ। তাই সে বলে আস্তে আস্তে, নির্ভাবনায় থাকুন, ঠিক সময়েই সার্টিফিকেট আপনি পাবেন। যাবার আগেই পৌঁছে দেব আপনার হাতে।

দেবী বলে, যার জন্তে থাকা সে কাজ শেষ হয়ে গেছে আমার, তাই চলে যেতাম আজই, কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। জ্যেঠাইমা অনুরোধ জানিয়েছেন আজ থেকে যেতে। তাই যেতে পারলাম না। কিন্তু কাল যাব, তবে বাবার আগে অবিনাশবাবুর বিচার আমি শেষ করেই যাব।

সেই দিন রাতে আবার শ্যামাকান্তর বসবার ঘর থেকে বেল বাজতে থাকে, টিং, টিং, টিং। দেবী চকিত হয়ে উঠে, উৎকর্ণ হয়ে শোনে, বেল বেজে চলেছে একরেয়ে টিং, টিং, টিং। দেবী বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। তার পর বিরক্তি গোপন করেই ঢোকে রণজিতের ঘরে। বলে, এত রাতে এমনভাবে বেল বাজালে কাউকে পাবেন না, এ কথা ত বলে দিয়েছি কালকেই।

রণজিৎ অপ্রস্তুতে পড়ে না। সপ্রতিভ মুখেই বলে, জানি। সে কথা ভুলি নি আমি। তবে অন্ত কাউকে আমার প্রয়োজন নেই। যাকে প্রয়োজন, পেয়েছি তাকেই।

দেবী ভ্রূ কুঞ্চিত করে, মানে ?

—মানে, প্রয়োজন আপনাকে আমার। আপনাকেই পেয়েছি কাছে।

এবার বিরক্তি চাপতে পারে না দেবী। অধরোষ্ঠ টিপে ধরে বলে, এত রাত্রে ?

—তার জন্তে সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু প্রয়োজন যখন দেখা দিল, তখন অপেক্ষা করতে পারলাম না কাল পর্যন্ত।

দেবী বলে, থাক, আজ রাতটুকু একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন, প্রয়োজন কাল মিটবে।

রণজিৎ হেসে ফেলে বলে, আমি একটু অধৈর্য্যবান লোক। অতখানি ধৈর্য্য নেই বলেই অপেক্ষা করতে পারব না কাল পর্যন্ত, প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে চাই আজই।

দেবীর দু'চোখের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠে। মাথা হেলিয়ে বলে, না। এত রাত্রে এভাবে আপনি বিরক্ত করবেন না আমায়। আপনার যা-কিছু বলবার কাল সকালে বলবেন।

দেবী ফিরতে উদ্যত হয়।

রণজিৎ ডাকে গম্ভীরকণ্ঠে, যাবেন না, শুনুন।

দেবী থমকে দাঁড়ায়। এ স্বরকে উপেক্ষা করতে পারে না সে।

রণজিৎ বলে, আপনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু সব কথা শোনার পর যাবেন না নিশ্চয়ই।

—যাব, শুনলেও যাব, না শুনলেও যাব। গভীর রাত্রে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার মত প্রশস্ত সময় এ নয়। আপনি জমিদার, আপনার যা সাজে আমার তা সাজে না। লোকের জিহ্বা অমৃতবর্ষী আপনার বেলায়, কিন্তু অনলবর্ষী আমার বেলায়। এর পরও আপনি যদি বুঝতে না চান, সে আমার দুরদৃষ্ট।

রণজিৎ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকে। তার পর বলে, বুঝি সব। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার, কোন অনিষ্টই আমার দ্বারা হবে না আপনার। বাবার আদেশ, বড় জরুরী আদেশ। অপেক্ষা করা যায় না। তাই এত রাত্রেই ডাকতে হয়েছে আপনাকে।

দেবী বিস্মিত হয়, জ্যেঠামশাইয়ের আদেশ ?

রণজিৎ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়, তা না হলে সাধ্য কি আমার এত রাত্রে আপনাকে ডাকতে। এই চিঠিখানা পড়ুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন সব। শ্যামাকান্তর চিঠিখানা সে এগিয়ে দেয় দেবীর দিকে।

দেবী ইতস্ততঃ করে বলে, পরের চিঠি আমি পড়ি না।

রণজিৎ একটুখানি হাসে। বলে সব পরই পর নয়। তাদের মধ্যেও আপন জন থাকে। অন্ততঃ আপনার জ্যেঠামশাইকে নিশ্চয়ই পর ভাববেন না আপনি। এ তাঁরই চিঠি, আপনাকে উদ্দেশ করেই লেখা, পড়লেই বুঝতে পারবেন সব।

দেবী ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিচিত্তেই চিঠিখানা গ্রহণ করে সে। তার পরই পড়তে গিয়ে চমকে উঠে। শ্বাসরুদ্ধ করে চিঠিখানা পড়ে চলে। চিঠির মাঝখানে শ্যামাকান্ত লিখেছেন :

"নূতন ম্যানেজার দেবী, আমার কন্যা-সমা। তোমার গঙ্গাচরণ কাকার অতি স্নেহের পাত্রী। তাকে কোনদিন অশ্রদ্ধা কর না তুমি। তেজোদীপ্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে, অগ্নিস্বরূপিণী। সে জানে না, উল্লাসপুর জমিদারের শেষ বংশধর সে। দেনার দায়ে উল্লাসপুরের জমিদারী নিলামে উঠে যখন, তখন উল্লাসপুরের অংশটা বেনামীতে কিনে নিই আমরাই। সেটা উইলে দেবীকেই দিয়ে গেলাম যৌতুকস্বরূপ। দেবীর উপর লোভ আমার বড় বেশী। তাকে পুত্রবধূর আসনে বরণ করে রেখেছি আমি। সাধ আছে, তুমি ফিরে এলে এ কাজ শেষ করব সাড়ম্বরে। সে আমার পুত্রবধূ হবার অনুপযুক্ত নয়। তবে তোমার ফিরে আসার আগে যদি এ জগতে আমি না থাকি, লোকান্তরিত হই, আমার বাসনা পূর্ণ করবে তুমি। উপর থেকে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব আমি। কিন্তু একটা কথা। দেবীর অমতে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে এগুবার চেষ্টা কর না এক পাও। তাতে কল্যাণ হবে না তোমার। দেবীকে এ চিঠি দেখিও। যদি তার মত পাও ভাল, তা না হলে আমার আশীর্ব্বাদসহ উল্লাসপুরের জমিদারী ফিরিয়ে দিও তাকে।

চিঠি পড়া শেষ হয়। দেবী বিহ্বল হয়ে পড়ে, চিঠিসমেত হাতখানা তার কাঁপতে থাকে থরথর করে। নিরক্ত-বিবর্ণ মুখে সে তাকিয়ে থাকে রণজিতের মুখের দিকে।

রণজিৎ সামনের দিকে এগিয়ে আসে। বলে, বাবাকে কি উত্তর দেবেন বলুন। উত্তর দিতে পারে না দেবী। প্রখর বুদ্ধিশালিনী মেয়ে আজ মূক হয়ে যায়। রণজিতের ধৈর্য্য মানে না। উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাড়া দেয়, বলুন কি উত্তর দেবার আছে জ্যেঠামশাইকে আপনার ? কি করে অবাধ্য হবেন তাঁর, অগ্রাহ্য করবেন মহতের শেষ অনুরোধ। রণজিতের কণ্ঠ ভেঙে পড়ে আবেগে,

মিনতি ঝরে পড়ে চোখেমুখে। মনে হয় এই তেজোদীপ্ত মেয়েটিকে এরই মধ্যে ভাল লেগেছে তার।

সহসা দেবী কেঁপে উঠে। একটা অনির্ব্বচনীয় রঙের খেলা তার দুটি গালের উপর দিয়ে খেলে যায়। দু'হাতে সে চিঠিখানাকে সজোরে চেপে ধরে মুখের উপর। একটা অস্ফুট স্বর, আধ-ফোটা কাকলির মত বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে, জানি না।

রণজিৎ পুরুষ, তাই মেয়েদের এ দুর্ব্বলতাকে চেনে। দেবীর দুর্ব্বলতাকেও চিনল সে। তাই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিল এ দুর্ব্বলতার। দেবীর একান্ত সান্নিধ্যে সরে এল ঘনিষ্ঠ হয়ে। তার পর তার ডান হাতখানি নিজ বলিষ্ঠ হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে স্মিতমুখে বলল, এ তোমার জানবার কথা নয় দেবী, কিন্তু আমি জানি। জ্যেঠামশাইয়ের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা তোমার। তাই অগ্রাহ্য করতে পারবে না তাঁর আদেশকে, অস্বীকার করতে পারবে না তাঁর পুত্র-বধূত্বের দাবিকে। তুমি খুব ভাল মেয়ে, তেজী মেয়ে—অগ্নি-স্বরূপিনী, এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে আমিও একমত। খুব ভাল সার্টিফিকেটই তোমায় দেব আমি আজ। শুধু উল্লাসপুর নয়, তার সঙ্গে আমার সমস্ত জমিদারীই এখন থেকে তুলে দিলাম তোমার হাতে। আর সেই সঙ্গে নজরানা দিলাম এইটি, বলে, সকালবেলার সেই কমল হীরের আংটিটি নিজের হাত থেকে খুলে পরিয়ে দিল দেবীর আঙুলে, অতি যত্নসহকারে। তার পর তার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বলল, কেমন রাজি?

আড়ষ্ট দেবী, তার সিঁদুর-রাঙা মুখখানা ঢাকতে যায় এক হাত দিয়ে কিন্তু তারই আগে রণজিতের প্রবল সমর্থন সামলাতে না পেরে নিজেকে ছেড়ে দেয় তার বলিষ্ঠ বাহু দুটির মাঝে।

শৈলশহর ড্যালহৌসী

শ্রীকল্যাণী কর
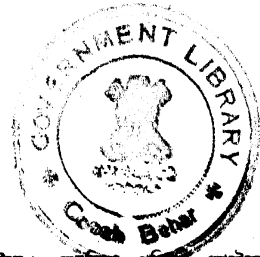
তুষারমৌলী হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণ। কোন্ আনন্দাতীতকে লাভ করবার পরম পিপাসায় যুগ যুগ ধরে নরনারী চিরপরিচিত সংসারের আনন্দ ছেড়ে ছুটে গেছে হিমাদ্রির কাছে, কে জানে? হিমাদ্রির অঙ্গে অঙ্গে শিব-শক্তির লীলা; তার স্তব্ধ তুষারলিপিতে, তার মন্দাকিনী-অলকানন্দার কলরোলে, তার অরণ্যমর্ম্মরে কোন চিরন্তন ব্যাকুল আহ্বান!

সেই তুষারমণ্ডিত হিমাচলের রহস্যময় যবনিকা ঈষৎ উন্মোচিত হবে চোখের সম্মুখে, এই স্বপ্ন নিয়ে চলেছি ড্যালহৌসীর দিকে। পাঠানকোট থেকে বিসর্পিল পথে বাস উঠতে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে। কত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, কত বাঁক ঘুরে, এক পাশে লালমাটির প্রাকার, সঙ্কীর্ণ শস্যক্ষেত, প্রস্তরাকীর্ণ পর্ব্বতদেহ, বিচিত্র তরু-গুল্ম-ঝোপ-ঝাড়, ক্ষীণকায়া গিরিনদী, আর অন্য পাশে বিপজ্জনক খাদ রেখে, পর্ব্বতবাসীর কৌতূহলী দৃষ্টি ছাড়িয়ে বাস চলল সম্মুখের দিকে।

হিমালয়ের প্রত্যেকটি শৈলশহরই ইংরাজ-আমলে গ্রীষ্মাবাসের জন্য তৈরী হয়েছিল। চম্বা উপত্যকায় এই সুন্দর শহরটিও গড়ে উঠে লর্ড ড্যালহৌসীর সময়ে। বছর দু'য়েক আগে এখানে "ড্যালহৌসী" প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব হয়, পণ্ডিত নেহরু সে উৎসবে যোগদান করতে এসেছিলেন। ড্যালহৌসী শহর সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচুতে। বাস থেকে নামতেই কত হোটেলের এজেন্ট এসে হাজির, তাদেরই একজনের সঙ্গে আমরা গেলাম এক হোটেলে। সুসজ্জিত [illegible] হোটেলের রেস্তোরা—সেখানে দুপুরের আহারপর্ব্ব চুকিয়ে মালপত্র নির্দ্দিষ্ট ঘরে স্থানান্তরিত করা হ'ল। কিন্তু সেখানকার অবস্থা দেখে সকলের চক্ষুস্থির! বাইরে প্রশস্ত বারান্দায় টবে রকমারী ফুলের বাহার, জানালায় দরজায় সুদৃশ্য পর্দা, কিন্তু ভেতরে জরাজীর্ণ মেঝে ও দুরবস্থা দেখে এখান থেকে আস্তানা গুটানোই ঠিক করলাম।

মনটা অস্থির হয়ে আছে তুষারশ্রেণী দেখবার জন্য, কিন্তু ক্লান্তদেহ করল অবাধ্যতা, চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। বিকেলে চা-পানে শরীর চাঙ্গা করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আকাশে কালো মেঘের নিশান উড়েছে, হাওয়া বইছে এলোমেলো, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টিও সুরু হ'ল। বিষণ্ণ-মনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বৃষ্টির ঝিরঝিরানি গান, মেঘে মেঘে আবছা হয়ে এল দূরের পাহাড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘ উড়ে গেল, বৃষ্টিও থামল, আমরাও নামলাম পথে। প্রথমেই খাড়া চড়াই, তারপর পথ গেছে উত্তর দিকে ঘুরে। বিরাট বিরাট প্রস্তর পাহাড়ের গায়ে গায়ে; এপাশে-ওপাশে কোথাও জনহীন বাংলো, কোথাও পরিত্যক্ত হোটেল, মাঝে মাঝে লোকের বসতি। কিছু দূর এগিয়েই পর্ব্বত-তরঙ্গের সঙ্গে মুখোমুখি, সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কোন অদৃশ্য-দেবতার অঙ্গুলীহেলনে যেন সমুদ্রের সুবিশাল নীলাভ তরঙ্গমালা এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে!

একপাশে অদূরে ধূসরবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাট হাতীর পিঠের মত

উন্নত, বন্ধ্যাভূমিতে তরুলতা তৃণগুল্মের চিহ্নও নেই, ধূসর প্রস্তরাকীর্ণ দেহের উপর নীলাভ কুয়াশার আচ্ছাদন। অন্যদিকে বাক্রোটার শ্যামস্নিগ্ধ গিরিশ্রেণী চোখ জুড়িয়ে দেয়। সর্ব্বশেষে নীল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত পাঙ্গী শৈলমালা,

তুষারাবৃত পাঙ্গী পর্ব্বতশ্রেণী

তারই শীর্ষে যেন গলান রূপো ঢেলে দিয়েছে কেউ। বেলাশেষের রোদে ঝলমল করছে সেই রজতরাশি। কোথাও বা রজতশুভ্র তুষারের ধারা গলে গলে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ধ্যানমগ্ন তাপসের জটাজাল থেকে যেন বেরিয়ে আসছে পাবকিনী গঙ্গার ধারা। কালোয় সাদায় ও আকাশের নীলিমায় মিলে সে এক অনির্ব্বচনীয় রূপ। শুভ্র মেঘের দল অবনত হয়ে তুষারের মুকুরে দেখছে আপন প্রতিচ্ছবি, রবির কিরণ আপন খেয়ালে খেলে বেড়াচ্ছে তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায়। এ রূপের বন্যায় অবগাহন করে উঠল আমার সারা মন-প্রাণ। রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শময়ী চিরপরিচিত পৃথিবী অবগুণ্ঠন টেনে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে, পরিচিতের সীমারেখায় হিমাদ্রি আপন অকলঙ্ক শুভ্রতায় দীপ্ত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। যেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আশা-নিরাশা, উত্থান-পতন, চাওয়া-পাওয়ার খেলা এপারে, আর ওপারে সব খেলার শেষে চরম চাওয়া ও চরম পাওয়া। ঐ রূপহীন বর্ণহীন শুভ্রতার পরিব্যাপ্তি এক অবিচলিত পরম প্রশান্তিতে, এক সীমাহীন অসীমের রহস্যে, এক ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের উপলব্ধিতে ভরপুর। ধরণীর নীলে-শ্যামলে, পীতে-লোহিতে যে সৌন্দর্য্য ছড়ান, আজকের এই মুহূর্ত্তে বর্ণ বৈচিত্র্যের যবনিকার অন্তরালে এই অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্রতার কাছে সে সবই ম্লান হয়ে গেল।

দু'দিন পরে হোটেল ছেড়ে নূতন আবাসে উঠে গেলাম। চক-চকে ঝকঝকে বাড়ী, পরিচ্ছন্ন সুসমঞ্জস আসবাবের প্রাচুর্য্য, সর্ব্বোপরি সামনে রেলিংঘেরা বাঁধান চত্বর দেখে মনটা খুসীতে ভরে উঠল। সেখানে দাঁড়িয়ে অবাধ দৃষ্টি চলে যায় দূরে—বহু দূরে। পাহাড়ের ঢেউ নেমে গেছে নীচ থেকে আরও নীচে, দূর থেকে আরও দূরে—সুদূরে। কিছু দূরে পাহাড়ের উপর 'বাকলো' সহর—ছোট ছোট বাড়ীগুলি যেন খেলাঘরের মত সাজান, মাঝে মাঝে নীলাভ আলুর ক্ষেত, কোথাও বা ধানক্ষেতের ছোট্ট চিকণ সবুজ গালিচা। আরও আরও দূরে পাহাড় নেমে গেছে উপত্যকায়, সেখানে গাছপালা, ঝোপঝাড়, বাড়ীঘর সব মিলে একাকার হয়ে গেছে। সুপ্রশস্ত 'চাক্কী' নদীর রূপালী জল টলমল করছে, ওপাশ থেকে 'বিপাশা' লুকোচুরী খেলতে খেলতে এসে চাক্কীর বুকে লুটিয়ে পড়েছে হেসে। অন্য দিকে 'ইরাবতী' সর্পিল গতিতে এগিয়ে গেছে, দুপুরের রোদে ঝলমলে জরির পাড়ের মত। আরও আরও দূরে নীল আকাশ নেমে এসে ছুঁয়েছে ধরিত্রীর কোমল অঙ্গ।

ছোট্ট সহর ড্যালহৌসী, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মানদণ্ডে এর স্থান ছোট নয়। টেহরার পাহাড় ও বাক্রোটার পাহাড় ঘিরে তিন ধাপে গড়ে উঠেছে ড্যালহৌসী শহর। প্রথম ধাপেই দোকান-পাট, সদরবাজার, হোটেল, ব্যাঙ্ক, স্কুল ইত্যাদি—নগরের ব্যস্ততা এখানেই। টেহরার দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে 'সুভাষ চক', নেতাজী সুভাষচন্দ্র ড্যালহৌসীতে ছিলেন কিছুদিন, তারই স্মৃতিরক্ষা করছে 'সুভাষ চক।' এখান থেকে দুদিকের পাহাড় ঘুরে এসেছে দুটো রাস্তা, ঠিক বাংলা 'চার' (৪) সংখ্যার মত। আমাদের বাড়ী থেকে নেমে রাস্তার ওপারেই ছিল একটা গেইট, তারই নীচে ডাঃ ধরমবীরের বাংলো। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হয়ে অসুস্থদেহে এ রই কাছে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন।

ড্যালহৌসী পাহাড়ে সমতল জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। 'সুভাষ চকে'ই একটু সমতল জায়গা দেখেছি, তার একপাশে বড় চত্বর, চারদিকে বেঞ্চ পাতা। একদিকে রীডিংরুম, অন্য দিকে একটা ষ্টুডিয়ো এবং চীনাম্যানের জুতার দোকান। চীনা মেয়ে-পুরুষ জুতা তৈরি করছে বসে, গোলগাল ছেলেটা পাশে। এই নিভৃত শৈলসহরেও এসে ব্যবসা করছে এরা, দেখে অবাক হলাম।

এক দিকে উঁচু মাথা তুলেছে একটা পাহাড়ের চূড়া, সর্ব্বোচ্চ-স্থানে ছায়াশীতল পরিবেশে একটা কনভেন্ট, পাশে গীর্জ্জা, তার চার-দিকে সারি সারি দেওদার কেউ যেন নিপুণ ভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছে। তার ঠিক নিচে বুড়া ফেরিওয়ালা বসেছে পসরা সাজিয়ে —সামান্য জিনিস—রংচংয়ে বাঁশী, জলভরা বল, রঙবেরঙয়ের বেলুন তবুও সেখানেই শিশু ভোলানাথদের আনন্দ-কলরোল। কত সহজে খুশী ওরা, সংসারের অতৃপ্তির হাওয়া লাগেনি ওদের গায়ে, তাই সামান্য মাটির খেলনায়ও ওদের মুখে হাসি ফোটে, ভেঙে গেলে ছুড়ে ফেলে দেয়, বালির ঘর ভাঙে-গড়ে, মনের উপর দাগ পড়ে না কোথাও।

সুভাষ চকে সর্ব্বদাই অসংখ্য লোকের ভিড়। এখান থেকে 'গরমী সড়ক' দিয়ে চলে এলাম 'গান্ধী চক' পর্য্যন্ত। সুসজ্জিত নরনারীর মেলা এ পথে, সমস্ত ভারতবর্ষ যেন এসে মিলেছে এখানে। গান্ধী চক শহরের দ্বিতীয় ধাপে, তার পরেই বাক্রোটা পাহাড় সুরু। গান্ধী চক অনেক ছোট, কয়েকটা দোকান রেস্তোরাঁ ও ষ্টুডিওর সমষ্টিমাত্র। মাঝখানে একটা বড় বার্চ্চগাছের

কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে এক বিশ্রামাগার। গাছের গোড়ায় চারদিকে গোল করে বাঁধিয়ে তুলে বেঞ্চ বসান সারি সারি, উপরে বার্চগাছ রয়েছে মাথা তুলে।

একদিকে সাইনবোর্ডে লেখা—'বেঙ্গলী সুইটস শপ', দেখে অবাক হলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জানা গেল, বাঙালী কোনও লোকের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই সে দোকানের, কেবলমাত্র বাংলা দেশের সুবিখ্যাত মিষ্টি রসগোল্লা তৈরি হয় এ দোকানে, তাই নানা প্রদেশের লোককে আকৃষ্ট করবার সহজপন্থা হিসাবে এ নামটি দেওয়া হয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নাই। এগিয়ে গেলাম সামনে, রাস্তার একদিকে কতগুলি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে সওয়ারীর আশায়, ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় সেখানে।

আরও এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম, সামনেই সেই পর্ব্বতের তরঙ্গ, সেই তুষারাচ্ছন্ন শৈলশ্রেণী। সূর্য্য তখন নেমে এসেছে অস্তাচলে। তুষারের বুকে অস্তরবির শেষরশ্মি এঁকে দিল আলিম্পন—পাণ্ডুর পীতাভ আলো ছড়িয়ে গেল শুভ্র পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে; ক্ষণকাল পরে সে আস্তরণ উঠিয়ে কে যেন ছড়িয়ে দিল স্বর্ণাভ আস্তরণ, তার পর কোমল গৈরিক, এমনি করে রঙের পর রঙের মেদুর আভা খেলে গেল তুষারের বুকে, অস্তরবি যাবার বেলায় বিচিত্রবর্ণে শুভ্র তুষারকে রাঙিয়ে গেল! কিন্তু সে রঙ ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটির শুচিশুভ্র অন্তর স্পর্শ করতে পারে কি? রঙীন ধনু হাতেই থাকে পুষ্পধনুর আপনি যায় সে নিঃশেষ হয়ে। হিমাদ্রি জেগে রইল আপন শুভ্রতায় মহীয়ান্ হয়ে। রজনী নেমে এল কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করে। ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল ঐ পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার, মিলিয়ে গেল পাহাড়ের শ্রেণী।

ডালহৌসীর চতুর্দ্দিকে শ্যামল সৌন্দর্য্য। কোনও দিকে সুদীর্ঘ বার্চ ও রোডোডেণ্ড্রেনের রূপালী পাতায় আলোর ঝিলিমিলি, কোনও দিকে বিশাল ওকবৃক্ষের গম্ভীর মূর্ত্তি। তারি ফাঁকে ফাঁকে রকমারি ফার্ণ, নাম-না-জানা ফুল ফুটেছে কোথাও বা। পাথরের গায়ে এক রকম গুচ্ছ গুচ্ছ ফিকে গোলাপী রঙের ফুল, অনেকটা আমাদের লবঙ্গলতার ফুলের মত—দেখে অবাক হই, রসহীন পাষাণের মধ্যে কোথায় রস খুঁজে পেল এই পেলব কুসুম?

রাস্তা চলেছে এঁকে বেঁকে, ঘুরে ঘুরে, তার একদিকে উঠেছে খাড়া পাহাড় উঁচু প্রাচীরের মত, অন্যদিকে নেমে গেছে গভীর তলদেশে, নিচ থেকে উপর পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলালে আতঙ্কে শরীর শিউরে উঠে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সুদৃশ্য বাংলো সাজান, স্লেট-পাথরের চাল চকচক করছে সূর্য্যের আলোয়। অনেক বাড়ীতেই সুন্দর বাগান, হাইড্রেনজিয়া ফুটে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ, থালার আকারের বড় বড় ডালিয়া, কোথাও বা বুনো গোলাপের ঝাড়।

পথ চলল এগিয়ে—পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর যেন সার বেঁধে নেমে এসেছে নিচে। বর্ষায় পাহাড়ের উপর থেকে প্রচণ্ডবেগে জলস্রোত নেমে আসে এ পথে, গ্রীষ্মের শোষণে জলস্রোত গেছে শুকিয়ে, কেবল পাথরের সারি পড়ে আছে তার চলার পথের লিখনখানি বুকে নিয়ে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে রোডোডেণ্ড্রেনের সবুজ পল্লবের বুকে রক্তপুষ্পস্তবক, আগুনের মত তার রং।

সামনে পথ জুড়ে চলেছে একদল ভেড়া, অদ্ভুত লম্বা লম্বা ঝোলান লোম সারা গায়ে, তিব্বতী 'ইয়াকের' মত দেখতে। হঠাৎ ভেড়াগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে দলে দলে নেমে গেল অনেক নিচে, যুবক মেষপালক সরু লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল উপরে। নিচে এক রকম কাঁটাগাছের ঝোপ, সেই অসংখ্য কাঁটায় ভরা গাছ থেকে ভেড়াগুলি মনের আনন্দে পাতা খেতে লাগল। কি রস খুঁজে পেল ওরাই জানে। ইতিমধ্যে আমরা গেলাম এগিয়ে।

কিছুদূর এগিয়েই 'সপ্তধারা' ক্ষীণা নির্ঝরিণী, গ্রীষ্মের শোষণে আরও ক্ষুদ্রকায়া। সাতটি ছিদ্রপথ রয়েছে একসারে পাহাড়ের গায়ে, তাতে বাঁধান পাইপ, কিন্তু সপ্তধারার মধ্যে একটিমাত্র ধারাই ঝরে পড়ছে। অনেকেই জল নিতে আসে এখানে। লোকের বিশ্বাস, সপ্তধারার জলপান করলে লোকে নিরাময় হয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা জানি না, তবে জল আশ্চর্য্য সুস্বাদু ও ঠাণ্ডা সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। পাশেই পাথরের দেয়ালে ঘেরা একটা গুহা, চারদিকের দেয়ালের গা বেয়ে সারাক্ষণ টুপ টুপ জল ঝরছে বৃষ্টির ফোঁটার মত, তাতে সমস্ত গুহা স্নিগ্ধ-শ্যামল শৈবালে আচ্ছন্ন।

সপ্তধারাকে পিছনে ফেলে রাস্তা চলে এগিয়ে বঙ্কিমগতিতে। হঠাৎ পাশ দিয়ে এক সরীসৃপ সর সর করে গিয়ে ঝোপের ভিতর ঢোকে। সাবধান হয়ে চলি এবার। ভাবি, এখানে অনধিকার প্রবেশ কার—ওর কি আমার? মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড় স্তব্ধ প্রহরীর মত, ঘনসন্নিবিষ্ট 'পাইন' ও 'ফার' বৃক্ষের সারি তার উপর থেকে নিচ পর্য্যন্ত, প্যাগোডার মত সূক্ষ্মশীর্ষ গাছগুলো কেউ যেন অতি সন্তর্পণে সাজিয়ে দিয়ে গেছে, একটু অগোছাল নেই এদিকে সেদিকে। একেবারে তৃণশূন্য, মুণ্ডিতমস্তক বৃদ্ধের মত। ওপাশের পাহাড়ে গাছ অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা, নিচের দিকে নেই বললেই চলে। সেদিকে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে খাঁজকাটা, বর্ষায় জল পেলে দরিদ্র পাহাড়ীয়া নীরস পাহাড়ের রস নিঙড়ে কিছুটা চাষবাস করবার চেষ্টা করে। তারই ধারে ধারে পাহাড়ীদের ছোট ছোট ঘর। এরা অত্যন্ত দরিদ্র। শতছিন্ন জামাকাপড় তালি দিয়ে পরা, পায়ে দড়ির বোনা জুতা, মাথায় অপরিচ্ছন্ন টুপি। পিঠের উপর বস্তার টুকরোর প্যাড ঝোলানো গুরুভার বইবার জন্য। অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয় এদের। পথে চলতে সর্ব্বত্র দেখা যায়, ভারবাহী পশুর মত প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা পিঠে নিয়ে কুব্জদেহে এরা নেমে আসছে উপর থেকে। পথের ধারে ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। কপাল বেয়ে, গা বেয়ে,

শীতের মধ্যেও ঘাম ঝরতে থাকে, নিঃশ্বাস পড়ে জোরে জোরে। কিছুক্ষণ হাঁপ নিয়েই আবার চলে, এ ভাবেই চলে জীবনযুদ্ধ। মেয়েরা দারিদ্র্যের মধ্যেও একটু বিলাসিতার সখ ছাড়তে পারে না। নাকে কাণে চার পাঁচ রকম গয়না—নাকে বড় বড় নথ, গলায় রং-বেরংয়ের মোটা মোটা মালা, হাতে বালা কাঁকন। এখানে মেয়েপুরুষ সকলেই খর্ব্বকায়, শীর্ণদেহ। মেয়েদের পিঠে ঝুড়িতে কাঠকয়লার বোঝা, বুকের কাপড়ের ভিতরে কারু বা শিশু। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, "বাবুজী, এক প্যায়সা দে দো, বিবিজী, এক প্যায়সা দে দো।" কিন্তু এরা অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী, এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও এরা প্রলোভনকে জয় করতে পেরেছে—এটাই এদের প্রধান গুণ। বাইরের লোক এসে হোটেল, দোকানপাট, রেস্তোরা, ষ্টুডিও খুলে পয়সা লুটে নিচ্ছে এদেরই দেশ থেকে, আর এরা পড়ে আছে বিংশ শতাব্দীর অনেক পিছনে, দারিদ্র্যের অন্ধকূপে, এই হ'ল বিধিলিপি!

এগিয়ে চলি আমরা, এতক্ষণে খিদে বেশ চনচনে হয়ে উঠেছে। রাস্তার পাশে বিরাট বড় বড় পাথর অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, একটা খুব বড় ও মসৃণ পাথরের উপর সবাই মিলে বসলাম, টিফিনক্যারিয়ারের খাবার ও ফ্লাস্কের চা-এর সদ্ব্যবহার করা হ'ল। এবার ছেলেরা পাথরের পর পাথরে পা রেখে ছুটে চলল উপরের দিকে, এদিকে-ওদিকে হোঁচট খেয়ে পথ খুঁজে খুঁজে আনন্দ-কলরোলে চলেছে ওরা, আমরাও সন্তর্পণে চলেছি পিছনে। বহু দূরে উঠে পাওয়া গেল এক ঝর্ণার সন্ধান, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিমিকি করছে জল, নিচে নামতে নামতে কোথায় হারিয়ে গেছে শেষে। এ যেন চপলা পর্ব্বতদুহিতার লুকোচুরি খেলা। এবার নামবার পালা, অনেক চেষ্টার ফলে রাস্তায় নেমে এলাম।

সামনে কিছু দূর এগিয়েই "পাঁচপুল্লা"—পাঁচটি জলধারার মিলনে একটা ছোট প্রপাত। বর্ষার যৌবনের প্রাচুর্য্যে ভরপুর হয়ে পাথরের পর পাথর ঠেলে এগিয়ে আসে আনন্দ-কলরোলে, দু'দিকে বার্চ ও পাইনের পাতার শনশন্ শব্দ মিশে যায় জলের অশ্রান্ত কলরোলের সঙ্গে। নিচে ছোট পাহাড়ী নদী বয়ে যায় পাহাড়ের গা ঘেঁসে, নৃত্যচপলা ছোট মেয়েটি যেন জননীর ক্রোড়ের কাছে চঞ্চল-লীলাপ্রবাহে নেচে বেড়ায়। গ্রীষ্মে পাঁচপুল্লার সে কলরোল নেই, সেই শুভ্র ফেনার খিলখিল হাসি নেই, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শান্তগতিতে ছল ছল করে বয়ে চলে শুধু। পাঁচপুল্লাকে ঘিরে সু-উচ্চ পাহাড়ের সারি। এর কাছেই স্বদেশপ্রেমিক অজিত সিংহের সমাধি-মন্দির। দেশের জন্ম সারা জীবন উৎসর্গ করে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রভাত-সূর্য্যকে অভিনন্দিত করে ইনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'ন।

গান্ধী চক থেকে ছায়াশীতল জনবিরল অন্য একটি পথ চলেছে পাহাড়ের ধারে ধারে। সে পথ ধরে যাচ্ছি; টুকুন রকমারি ফার্ণ সংগ্রহ করছে, আর কিশোর আছে বেরির সন্ধানে—Straw-berry, Red-berry এদিকে-সেদিকে। মাঝে মাঝে পথ খুব সঙ্কীর্ণ, একপাশে পাহাড়ের প্রাচীর, অন্যপাশে গভীর অতলস্পর্শী খাদ, ভয়ে ভয়ে পথ চলি। উপর দিকে ঘন অরণ্য, লোকের বসতি চোখে পড়ে না, বহুবৎসরের প্রাচীন বৃক্ষের গায়ে বড় বড় কোটর, সরীসৃপ-বৃশ্চিকের আস্তানা। গাছের গায়ে নানাবিধ "লিচেনে"র সুদৃশ্য তিলক-কাটা, অনেক গাছেই বুনোলতার চাদর জড়ানো। অন্যদিকে অতলস্পর্শী খাদের ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নানা আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈবালাচ্ছন্ন পাথর, তারই ধারে ধারে গগনস্পর্শী বৃক্ষের জটলা। নিচে উপত্যকার বুকে মানুষের বসতির চিহ্ন ছড়ানো। নিচু পাহাড়গুলিতে বৃক্ষলতার চিহ্ন নেই, আগাগোড়া ধাপে ধাপে খাঁজকাটা; একেবারে শীর্ষদেশে এক সারি গাছ ঢেউখেলানো পাহাড়গুলির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত চলে গেছে, কোথাও ছেদ পড়ে নি, বড় অদ্ভুত দেখতে। পথের ধারে ধারে 'কায়' গাছ, বাহু বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ফাঁকে সূর্য্যালোক পথ খুঁজে পায় না। চারিদিক নীরব-নিস্তব্ধ, পাইনের বক্ষের মর্ম্মরধ্বনি, বার্চের পাতায় পাতায় বাতাসের ফিসফিসানি আর মাঝে মাঝে অজানা পাখীর কাকলি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। নাম-না-জানা ফুলের গাছ ফুলে ফুলে হলদে হয়ে আছে, কাছে গিয়ে একথোকা তুলে নিলাম, অনেকটা বকুলফুলের মত দেখতে, লাজুক মেয়ের মত একটুখানি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দিল।

আরও একটু এগিয়ে "সুভাষ বাওলি"—বাওলি অর্থাৎ ঝরণা। লোকে বলে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন অসুস্থ হয়ে এখানে আসেন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, সে সময়ে এই ঝরণার অমৃতধারায় তিনি নিরাময় হ'ন, সেই কাহিনীরই স্বাক্ষর বয়ে ঝরে পড়ছে সুভাষ বাওলির জলধারা। এর উপরে কাহারও ছোট একটি অনাড়ম্বর সমাধি-মন্দির। ছাদের উপর গিয়ে বসলাম, দৃষ্টি চলে গেল দূরে—বহু দূরে। কিন্তু তুষারমণ্ডিত শৈলশ্রেণী আজ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে, সাদা মেঘ ভাসছে আকাশে; মেঘে আর তুষারে, আকাশে আর পাহাড়ে সব আজ একাকার; হালকা কুয়াশায় নীলাভ হয়ে উঠেছে সামনের পাহাড়গুলি।

আরও এগিয়ে গিয়ে "জন্দ্রীঘাট"—সুবিস্তৃত পাইন গাছের অভ্যন্তরে চম্বা অর্থাৎ চম্পার রাজার সুদৃশ্য বাংলো-বাড়ী, শিকারের জন্য রাজপুরুষরা এখানে আসেন, বহু মৃত জীবজন্তু সাজানো রয়েছে ভিতরে। এ দিকে রাত্রিতে নেকড়ে বেয়োর শুনি, জ্যোৎস্নালোকে বন্যজন্তুর লীলাভূমি হয়ে উঠে। তাই সন্ধ্যার পর লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্দ্দিকে জনবসতির চিহ্নও নাই। এবার ফিরতে হয় পা চালিয়ে।

ড্যালহৌসী থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে "খাজিয়ার"। ঘোড়ার পিঠে দল বেঁধে লোক চলে এ পথে, হেঁটেও যায় অনেকে। পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এখানে একটা অধিত্যকা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে চারিপাশে শ্যামল পাইনের প্রাচীর-ঘেরা এক বিস্তীর্ণ সরোবর, চারিদিকের পাহাড়ের বর্ষার জল নেমে আসে এখানে; ধাপে ধাপে

সুক্ষ্মাগ্র পাইন উঠেছে উপরের দিকে, তারই ছায়া খেলছে জলের বুকে। যতদূর দৃষ্টি যায় বৃক্ষলতার শ্যামসৌন্দর্য্য যেন নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দেয়। জলের মাঝখানে সুদীর্ঘ ঘাসে আচ্ছন্ন একটা অদ্ভুত দ্বীপ, এটাকে বলা হয় "ভাসমান দ্বীপ", লোকে বলে এই

খাজ্জিয়ারে ভাসমান দ্বীপ
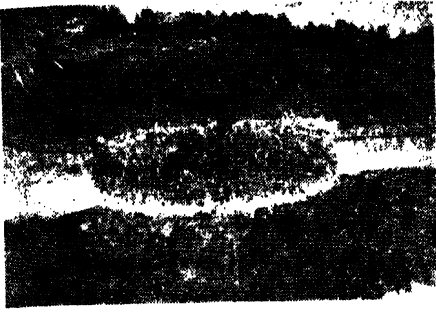
দ্বীপ কখনও সরোবরের উত্তরে, কখনও পূবে, কখনও দক্ষিণে এভাবে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। অদূরে সযত্ন-রক্ষিত গেষ্ট-হাউস, যাত্রীদের জন্য এখানে থাকবার চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে। এখানকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে লোকে এর নাম দিয়েছে "দ্বিতীয় গুলমার্গ।"

খাজ্জিয়ার থেকে আরও নয় মাইল পথ নেমে গেলে চম্পানগরী। হিমালয়ের অভ্যন্তরে একটি নিভৃত ছোট্ট শহর, সভ্য জগতের কলরোল থেকে যেন অনেক অনেক দূরে। একটা ছোট টিলার উপর চম্পার রাজপ্রাসাদ, আগে চম্পা সামন্তরাজের অধীন ছিল। বর্ত্তমানে সেই রাজপ্রাসাদে রয়েছে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মন্দির ইত্যাদি। এখানকার "চম্পাবতী"র মন্দির বিখ্যাত, মন্দিরে মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি। ড্যালহৌসীর চতুর্দ্দিক চম্বা উপত্যকার দ্বারাই পরিবেষ্টিত এবং সেখানকার পাহাড়ী অধিবাসীরা নিজেদেরকে চম্বার লোক বলেই পরিচয় দেয়। এদের নানা রকম কুটীর-শিল্পের মধ্যে কারুকার্য্য-শোভিত "চপ্পল"ই বিশেষভাবে আকর্ষণ করে বিদেশীদের।

......বাকরোটার উপরে ওঠা হয় নি এখনও, সবাই সেজন্য অধীর। যে বাকরোটার সৌন্দর্য্য ভুলিয়েছিল শিশু রবীন্দ্রনাথকে, তাই আকর্ষণ করছিল আমাদের। "গান্ধী চক" থেকে খাড়া চড়াই পথ উঠে গেছে। কিশোর চলল টাট্টু ঘোড়ার পিঠে, আর আমরা চলেছি পায়ে হেঁটে। কিছুদূর গিয়ে ক্লান্তচরণে বসি বড় পাথরের উপর, আবার চলি নূতন উদ্যমে। এরই মাঝে তাকিয়ে দেখি চারিদিকে—পথে পথে যেন সৌন্দর্য্যের সম্ভার ছড়ানো। বিরাট বনস্পতি চতুর্দ্দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, মৌনগম্ভীর মুখে পথচারীর দিকে তাকিয়ে। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড় প্রতিদিন দেখছি, তবুও চির-নূতন।

এক মাইল দূরে "কমলা নেহরু পার্ক", সেখানে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়লাম। নামেই পার্ক, একটা শুকনো মাঠ, গাছপালার চিহ্নও নেই। একটি মাত্র শিশু-বৃক্ষ সযত্নে-রক্ষিত, পণ্ডিত নেহরু দু'বছর আগে এটা রোপণ করে গিয়েছিলেন। এখানে বসেই দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারটা সারা হ'ল সাড়ম্বরেই। তার পর আবার আনন্দের পথ-চলা। এবার পথ আর এত খাড়া নয়, ধীরে ধীরে ঘুরে ঘুরে উঠেছে পাহাড়ের গায়ে। দূরে দূরে সুদৃশ্য বাংলো, জনমানবের দেখা মেলে কদাচিৎ। ট্যাগোর রোড দিয়ে বাঁক ঘুরলাম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামানুসারেই এর নামকরণ হয়েছে। এখানকার সব রাস্তারই ইংরেজ যুগের নাম বদলে "মতিলাল নেহেরু রোড", "রণজিৎ সিং রোড", "তিলক মার্গ" ইত্যাদি নাম রাখা হয়েছে। "ড্যালহৌসী" নামটাই এখনও রয়েছে ইংরেজ-শাসনের স্মৃতি নিয়ে।

উঠে এসেছি অনেক উঁচুতে। চারদিকে অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিচিত্র দেওদারের বিচিত্র রূপ। পাতায় পাতায় শন্‌শন্ শব্দ আর আলো ঝলমলানির খেলা। এ পাহাড়ে চতুর্দ্দিকেই দেওদারের ছড়াছড়ি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাদা ডেইজি তারার মত ছড়ানো, নাম-না-জানা ছোট ছোট হলদে ফুলের আলপনা আঁকা, কোথাও বা ব্লু-বেল ফুটে আছে চন্দন-চর্চ্চিত হয়ে। পত্রঘনলতিকা জড়িয়ে উঠেছে সু-উচ্চ দেওদারের অঙ্গে, তলায় ঝরাপাতার পুরু গালিচা।

Upper Bakrota-তে সব অভিজাত লোকের বাস। দূরে দূরে ঝাউ-দেওদারের ছায়াচ্ছন্ন, গোলাপে-হাইড্রেন্‌জিয়ায় সুশোভিত সুচারু বাংলো, সব ধনীলোকের বসতি। আনন্দে পথ-চলায় ক্লান্তি ভুলে গেলাম, পথ যেন টেনে নিয়ে চলল দূরে—আরও দূরে। পথের শেষ হ'ল "নেহেরু টিকায়"—টিকা অর্থাৎ চূড়া। নেহেরু টিকা ৮,০০০ ফুট উঁচু। বৃক্ষবিরল তৃণহীন চূড়া, চারদিকে গুটি-

নেহেরু টিকা থেকে চম্বা উপত্যকার দৃশ্য
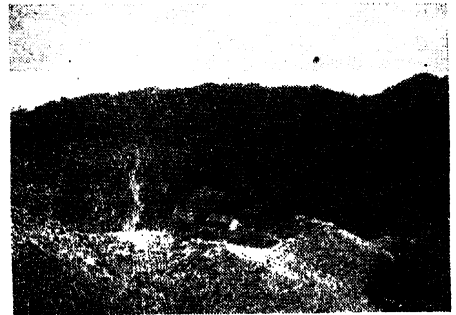
কয়েক শিশুবৃক্ষের ছায়া দেবার দুর্ব্বল প্রয়াস। অল্পপরিসর জায়গায় সবাই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলাম।

চূড়ার পাশেই একটি সুন্দর বাংলো, গেটের পাশে বড় বড় রক্তবরণ গোলাপ ফুটে আছে। প্রায় নব্বই বৎসর আগে শিশু রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেবের সঙ্গে এসে এই বাংলোতেই ছিলেন। এখান থেকেই সন্ধ্যার স্বচ্ছ আকাশে পিতার কাছে তিনি গ্রহ-তারকা চিনতেন, জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন; সূর্য্যোদয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করতেন। এরই একপ্রান্তে ছিল তাঁর শোবার ঘর, সামনে কাচের আবরণে ঘেরা বারান্দা। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কাচের জানলার ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট আলোতে পর্ব্বত-চূড়ার তুষারদীপ্তি দেখে মুগ্ধ হতেন; নিম্নে কেলুবনের ভিতর গিয়ে বিরাট বিরাট প্রাচীন বনস্পতির প্রাণশক্তি অনুভব করতেন। বনের মেদুর ছায়ার একটি স্নিগ্ধ স্পর্শে অভিভূত হতেন। সেই যে ক্ষুদ্র শিশুটি যষ্টি হাতে ঘুরে বেড়াত বনস্পতির ছায়ায় ছায়ায়, পাহাড়ের গায়ে গায়ে—খুঁজে বেড়াত কোথায় লুকানো আছে কোন্ সৌন্দর্য্য, আজ কি সেই শত বৎসরের প্রাচীন বনস্পতিরা মনে রেখেছে সেই শিশুটির কথা? কে জানে? মূক বৃক্ষের দল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

* * * তুষারশিখরের লুকোচুরি খেলা এখনও শেষ হ'ল না, খুঁজে খুঁজে আর দেখা পাই না। যাবার দিন এগিয়ে আসছে, তাই মন খারাপ, আর কি দেখা দেবে না ঐ তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি?

মাঝরাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বৃষ্টির ঝমঝম শব্দে। পাশের পাহাড় থেকে জল নামছে প্রবলবেগে, তার উচ্ছল কলরোল। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই বাইরে গেলাম, পাহাড়ের বৃষ্টি-ধোয়া স্নাত-স্নিগ্ধ রূপ, কুয়াশার যবনিকা সরে গেছে দূরে, লতায়-পাতায় যেন লেগেছে একটি শ্যাম-স্নিগ্ধ স্পর্শ। তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি থামে নি, কালো মেঘ এদিকে-সেদিকে উঁচু পাহাড়ের গায়ে থমকে থেমে আছে। আকাশের কান্না আর থামে না, যেন ছোট মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে কান্না থামানো হয়, আবার মনে পড়ে তার হারানো পুতুলের কথা, আবার তার উচ্ছলে উচ্ছলে কান্না। শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি থামল। এবার তুষারশৃঙ্গ একে একে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, সেই ধবল-তুষারের তরঙ্গ একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত। মনে মনে বললাম—

"নমো নমো হিমালয়!
গিরিরাজ তুমি মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয়!
তুমি অপরূপ, তুমি সুমহান্, তুমি অতুলনীয়!"

ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটির সর্ব্বহারা শুভ্রতায় তুমি মহীয়ান্। তোমার উত্তুঙ্গ শিখরে শিখরে কোন্ অনির্ব্বচনীয়ের আহ্বান, তোমার গিরিনদী-নির্ঝরের কলরোলে কোন্ সর্ব্বস্বত্যাগের মন্ত্র! যুগে যুগে অগণিত নরনারী রেখে গেছে আকুল প্রণাম তোমার চরণতলে, তারই সঙ্গে আমিও রেখে গেলাম আর একটি বিনম্র প্রণতি!

স্মারক লিপি

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

রবার্ট লুইস ষ্টিভেনসন অবলম্বনে

সুবিশাল এই তারকাখচিত আকাশের নীচে মোর
খুঁড়িও কবর, শুতে দিও সেথা সারাটি রজনীভোর।
আনন্দে বেঁচে আনন্দে মরি সুখে ফেলি আঁখিলোর
স্বেচ্ছায় আমি কবরের মাঝে স্থাপিনু আবার মোরে।

এই কবিতা পঙ্‌ক্তি তোমরা খুদিও আমার লাগি:
হেথা সে রয়েছে যেথা সে রহিতে হয়েছিল অনুরাগী;
সাগরের থেকে নাবিক যেমন ঘরে ফিরে আসে জাগি,
শিকারী যেমন ফিরে আসে গৃহে শিকার সমাধা করে!

ওয়াশিংটনস্থ লিঙ্কনের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে শ্রীকাকা কালেলকার
ও শ্রীসরোজিনী নানাভাতি

কায়রোতে ভারতীয় কারুশিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারউন্মোচনরত মাদাম কৈস্সুনী

"দি স্পিরিট অব গ্রীস" মূর্ত্তির পার্শ্বে স্কচ-লেখক সার কম্পটন ম্যাকেঞ্জি

ব্রিটিশ ওভারসীজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎকার

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রবাসী বাঙালী কবি সুদূর লক্ষ্ণৌ শহরে বসে মনের আশ মিটিয়ে স্মৃতি-রোমন্থন করেছিলেন :

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।

আজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দাঁড়িয়ে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি মাতৃভাষার গর্বে গর্বিত কবির আত্মরতি সমর্থনের অযোগ্য নয়। বিশ্ব-সাহিত্যের সমৃদ্ধিশালী ভাষাসমূহের মধ্যেও বাংলার স্থান একেবারে নিচের আসনে নয়।

ভাষা সাহিত্যের প্রাণ কি বাহন,—এ বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ এড়িয়ে আপাততঃ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ভাষাই সাহিত্যের পরিচয় বহন করে। আর সাহিত্যও গদ্য ও পদ্য উভয়েরই সম্মিলিত দান। তাই বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের গদ্য ও পদ্য উভয় রীতির উপরেই দৃষ্টি রেখে ভাষার বিচার করতে হবে। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হলে, অতীত এবং বর্তমান কারও প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্রম-পরিণতিকেই একমাত্র নিরিখ ধরে ভাষার সমৃদ্ধির মূল অনুসন্ধান করতে হবে।

সে হিসাবে দেখতে পাই, কাব্যেই বঙ্গ-ভারতীর প্রথম উচ্চারণ, আর গদ্যেই তার পরিণত বিকাশ। এখন যদি কথা শেষ না করতেই কেউ আতকে উঠে বলে বসেন—সে কি মশাই, 'পরিণত বিকাশ' বলছেন কেন, বাংলা ভাষার বিবর্তনের কি এখানেই শেষ নাকি? তদুত্তরে বিনীতভাবে বলব, বাংলা ভাষার অন্তিম পরিণতি আসন্ন না হলেও অচির-ভবিষ্যতে ত একদিন হবেই। ভাষার জন্ম-মৃত্যু ভাষাতত্ত্বে স্বীকৃত সত্য। প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কাল যেমন যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত থাকে অতীতকে অধ্যয়ন করার জন্য, ঠিক তেমনি মৃত ভাষাসমূহও সাহিত্যের যাদুঘরে রক্ষিত থাকে পুঁথির পাতায়, প্রাচীন যুগের পূর্ব-পুরুষদের সাংস্কৃতিক সাধনার পরিচয় লাভের জন্য। কালজয়ী দিব্যপুরুষগণ মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী জেনেও ক্ষণস্থায়ী দেহের সেবা করে থাকেন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই। জাতিও তদ্রূপ আত্ম-সংস্কৃতি-বিকাশের জন্যই নিজের ভাষাকে সুস্থ, সবল ও প্রাণবান করতে প্রয়াসী হয়ে থাকে ভবিষ্যতের চিন্তা না করেই।

যাকগে সে-কথা। পৃথিবীর অপরাপর সাহিত্যের ন্যায় বাংলা ভাষার আদিমতম রূপও ছন্দোবদ্ধ পদ্যময়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে একদিকে শৌরসেনী ও অপর দিকে পূর্ব্ব-মাগধী বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলার স্বতন্ত্র রূপ ক্রমেই স্পষ্টতর হতে থাকে। সে-সময়কার বৌদ্ধ চর্য্যাপদ বা সহজিয়া দোঁহাবলীকেই পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার প্রাথমিক দ্যোতনা বলে স্বীকার করেছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রান্তীয় লগ্ন থেকেই চণ্ডিদাসের পদাবলীর মাধ্যমেই আমরা খাঁটি বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধান পাচ্ছি। তন্ত্র-সাধনার সঙ্কেত-বাণীতে গদ্যরচনায়ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তিনি। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে গদ্যরূপের নিদর্শন স্থাপন করে, তা' থেকে চণ্ডিদাসের তন্ত্র-কারিকা ভাষার সুষ্ঠুতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। তার পরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকেই প্রাচীন বাংলার পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই অমর কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে। এ-সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বহু কবির সাধনায় ও ধ্যানে প্রাচীন বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সূচিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এ-সাধনা কাব্যরূপেই সে-কালে সমধিক ব্যক্ত হয়ে থাকলেও গদ্য রচনার প্রয়াসও সে-যুগে কিছু কিছু লক্ষিত হয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই লেখ্য-বাংলার গদ্য নিদর্শন আমরা একটু একটু করে পেতে থাকি রাজ-রাজাদের প্রাচীন তাম্রশাসনে, রাজকীয় দলিল-পত্র ও খাজনার হিসাব সম্বন্ধীয় কড়চায় এবং বিবিধ শিলালিপিতে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের পর রূপ গোস্বামীর 'কারিকা', কৃষ্ণদাসের 'রাগময়ী কণা', বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের কড়চা জাতীয় রচনা প্রভৃতিকে চণ্ডিদাস-পরবর্ত্তী যুগের গদ্যায়নের প্রয়াস বলে আমরা মেনে নিতে পারি। তাছাড়া, স্বাধীন ও সামন্ত রাজন্যদের মধ্যে পত্রাদি বিনিময়ের মাধ্যমেও বাংলার লিখিত গদ্যরূপের আদিম কাঠামোর সন্ধানও আমরা কিছুটা পেয়েছি। তবে সে-সব বিচ্ছিন্ন গদ্য-প্রচেষ্টা ততটা উল্লেখযোগ্য নয় বলে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কালকে বাংলা কাব্যের একক যুগই বলব।

এ-সব কবিদের মধ্যে চণ্ডিদাস ও কৃত্তিবাসের পরেই সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য মনসামঙ্গল-রচয়িতা বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস, বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা—নরহরি, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস ও সৈয়দ মর্ত্তজা; মহাভারতের অনুবাদক শ্রীকর নন্দী ও কাশীরামদাস,

চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মুকুন্দরাম, চৈতন্যচরিতাশ্রিত আধ্যাত্মিকা রচনায় কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ইত্যাদি কবিবৃন্দ। তাছাড়া বৈদেশিক মুস্লিম অধ্যাত্ম-কাহিনীর অনুকরণে ও বিভিন্ন তত্ত্বকথা পরিবেশনে মোহাম্মদ সগীর, বাহরাম খান, কাজী দৌলৎ, আলাওল, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি মুসলমান কবিগণও প্রাচীন বাংলা কাব্যকলার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেছেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে অসংখ্য গ্রাম্য-গীতিকার, ছড়াকার, কবিওয়ালা ও পীর-মাহাত্ম্য-রচনাকারীদের দানও বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে জীবন্ত রেখেছে। উচ্চাঙ্গের কবি-কৃতি পাঁচালি, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি, জারি-শারি, ঝুমুর, মুর্শিদা, বাউল ও বিভিন্ন লোক-সঙ্গীতের মধ্যে না থাকলেও সরল-সহজ পল্লীজীবন-চিত্রের যথার্থ রূপ পরিবেশনে সে-সবও সার্থক সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা থাকতে পারে না। সাহিত্যিক মূল্য অবশ্য সে-সবের বিশেষ কিছুই নেই। একমাত্র 'রায়গুণাকর' ভারতচন্দ্রকেই এই প্রাচীন বাংলা কাব্যধারার শেষ শক্তিমান কবি বলে চিহ্নিত করতে পারি।

সে-প্রাচীন বাংলা কাব্যের ভাষা বিচার করতে বসে আজ আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। তৎসম ও প্রাকৃত-প্রভাব বর্জ্জিত দেশজ শব্দ ও ক্রিয়াপদে সমৃদ্ধ খাঁটি বাংলার নিজস্ব রূপটি সেই চতুর্দ্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের বহু কাব্য রচনায় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, সে-সময়কার মুসলমান কবিগণও আরবী, ফারসী, তুর্কী বর্জ্জিত শব্দ-সম্ভারই তাঁদের কাব্যকৃতিতে ব্যবহার করেছেন। তবে প্রাচীন মুসলিম সাহিত্যের বৈদেশিক অনুকরণে বা তরজমায় তাঁরা সঙ্গত কারণেই সে-সব ভাষার কিছু কিছু শব্দসম্পদ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য হিন্দু কবিগণও প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিষয়বস্তু ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করে যে-সব কাব্য রচনা করেছেন, সে-সব ক্ষেত্রেও তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। মোট কথা, স্বদেশীয় সামাজিক রূপচিত্র অঙ্কনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কবিই অধিক সংখ্যায় দেশজ শব্দ ও চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ঘরোয়া কথায়, সহজলভ্য উপাদানে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন স্বভাব-কবিত্বের বিনা আয়াসেই। কাব্য-রচনার এ সহজরীতি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। দেশজ শব্দেও পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত সহজকল্প-চিত্রে তাঁরা কাব্য রচনা করলেও কালোপযোগী বৈদগ্ধ তাঁদের অনেকেরই ছিল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। চতুর্দ্দিকে সংস্কৃত-প্রাকৃত ও আরবী-ফারসী ইত্যাদির প্রবল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলা কাব্য নিজস্ব শব্দসম্পদ নিয়ে অব্যাহতগতিতে এগিয়ে চলতে সমর্থ হয়েছিল। উদগ্র স্বাজাত্য-বোধ ও স্বকীয়তাই বাঙালী মনস্বিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অধিবাসীদের মাতৃভাষার সম্ভ্রম-রক্ষণে আত্মত্যাগ জলন্ত দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হতে পারে। তবে ব্যঙ্গ-কবিতা ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধর্ম্মী কাব্য রচনায় কোনও কোনও কবি ইচ্ছা করেই সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, তুর্কী শব্দাদির প্রয়োগও করেছেন। তবে সে-সব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আবেদনশীলতার ও রসোত্তীর্ণতার বিচারে স্থায়িত্ব অর্জ্জন করতে সমর্থ হয় নি।

এবার প্রাচীন কাব্য-প্রচেষ্টার ভাষার বিশ্লেষণ করতে বসে আর আর একটি কথা সঙ্গত কারণেই উচ্চারণ করতে হয়। অর্দ্ধ-মাগধীর রূপান্তরিত মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী একটু বিশেষ কারণেই বাংলা কাব্য থেকে একেবারে স্বতন্ত্র রাখতে চাই। কেউ কেউ এ-সব প্রচেষ্টাকেও বাংলা পদ্যায়নের পূর্ব্বাভাষ বলে মৃদু ইঙ্গিত করেছেন। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিকে নিয়ে আমাদের গর্ব্ববোধের কারণ থাকলেও তাঁর রচনাকে বাংলার সমর্থনে ব্যবহার করার যুক্তিটি ততটা প্রবল নয়। জানি দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত মিথিলার রাজধানী তদানীন্তন বৃহত্তর বাংলার (সমতট-বর্জ্জিত) পশ্চিম প্রান্তের দ্বারস্বরূপ ছিল বলেই দ্বারবঙ্গ কথাটি প্রচলিত ছিল। তথাপি বলব, রামাই পণ্ডিতের বাংলা বুলি ও চণ্ডীদাসের প্রাঞ্জল বাংলা ভাষা বর্ত্তমান বাংলার এতটা স্বগোত্রীয় যে, বিদ্যাপতির ব্রজবুলিকে জোর করে বাংলায় না টেনে মৈথিলীর ভাগেই পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া অধিকতর সঙ্গত। তা না হলে বাংলার পরিণতি ব্যাখ্যায়ও একটু অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এবার খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সময়ের বাংলা গদ্যের ধারা লক্ষ্য করা যাক। সে সম্পর্কে এক কথায় বলতে গেলে, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের মানগ্রাহ্য কোনই আকার সৃষ্ট হয় নি। তখনকার প্রাচীন যুগে গদ্য ভাষায় পুস্তকাদি রচনার সংখ্যাল্পতার আরও একটি কারণ ছিল। ভুয়োদর্শনের দ্বারা পৃথিবীর অপরাপর জাতির ন্যায় বাঙালীরাও বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভাব-চিত্রকে স্মৃতিতে আবদ্ধ করে রাখতে হলে গীতিধর্ম্মী কোনও বাহনই উপযুক্ত প্রেরণা জোগাতে সমর্থ। ধ্বনি ও অনুপ্রাসযুক্ত ছন্দোবদ্ধ পদ্য কাঠামোই তাই আমাদের দেশেও ভাষার বাহকত্বের কাজ করেছিল সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক প্রয়াসে। শব্দ-সম্ভারের কাব্যরূপ মনের সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলীতে অধিকতর স্থায়ী স্পন্দন জাগাতে সমর্থ বলে বাংলা সাহিত্যেও মুদ্রাযন্ত্রবিহীন যুগে স্মৃতি-শক্তিকে সাহিত্যের গুরুভার বহন করতে পদ্যরীতি এভাবেই সহায়তা করেছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত শূন্যপুরাণ, কড়চা, কারিকা ইত্যাদির পর্য্যায় শেষ হয়ে গেলে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে কিছুটা স্থবিরতা লক্ষিত হয়। তখনকার দিনে সাহিত্যের উপজীব্য তত্ত্বকথা ও আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গই একমাত্র লক্ষ্য থাকায় কাব্যের রূপকের মধ্য দিয়েই সে-আকুতি মুক্তি পেয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তাই নিছক সাহিত্য-রস উপভোগ করার জন্য গদ্যরীতির পরিমার্জ্জনের কোনও কার্য্যকরী প্রয়াস আমরা সে-যুগের আগাগোড়াই দেখতে পাই না। তা ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়ে স্বদেশীয়

উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য গদ্যায়নের নজীর দুর্লভ। এই দেড় শত বৎসরাধিক কালের মধ্যে যে সব গদ্য-নিদর্শন রাজ-রাজাদের পরস্পর পত্র বিনিময় ও দলিলাদির মাধ্যমে আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, তা কোথাও সংস্কৃত-প্রাকৃত-মিশ্রিত শ্রুতিকটু দুর্বোধ্য শব্দের মিছিল, আবার কোথাও বা আরবী-ফার্সী-কণ্টকিত বাংলার নির্যাতিত চিত্ররূপ।

বাংলা গদ্যের এ রাহুমুক্তির সাধনায় বৈদেশিক খ্রীষ্টীয় মিশনারী-দের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণা চিরস্মরণীয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পূর্ববঙ্গীয় খ্রীষ্টান দোঁ আঁতুনিও কর্তৃক রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা গদ্য-সাহিত্যের নবযুগ সূচনা করে। পূর্ববঙ্গীয় বিশেষ একটি আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য এ পুস্তকে স্পষ্ট হয়ে থাকলেও লোক-সাহিত্যের এটাই প্রাথমিক গদ্য-প্রচেষ্টা। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা করেন 'মাওয়েল-দা-আসুম্পসাম' নামক একজন পর্তুগীজ পাদ্রী। পুস্তকটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।' এতে বহু আরবী-ফার্সী ও বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্য থাকায়—বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের কথ্য ভাষা পরিবেষ্টিত হওয়ায়, এর সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নেই। বইটি রোমান হরফেই লিখিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পর্তুগীজ ভাষায় লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়ে এ দেশে প্রচারিত হওয়ার জন্ম আসে। বৈদেশিক প্রচারকদের উদ্দেশ্য যাই হোক, আমরা এ পুস্তক দুটিকে এদের সাহিত্যিক মূল্য বাদ দিয়েও অপেক্ষাকৃত নব্য ধারার গ্রাম্য ভাষার বদলে প্রথম গদ্য-নিদর্শন বলে ধরে নিতে পারি। এর প্রায় চার দশক বাদে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় মিশনারী উইলকিন্‌স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হলেই প্রকৃত প্রস্তাবে খাঁটি বাংলা গদ্যের পত্তন হ'ল বলতে পারি।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার পূর্ব্বে এখন আমরা ক্ষণ-কালের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টিতে সিংহাবলোকন করতে চাই। এ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যম যুগের সন্ধিক্ষণ বা নব-জাগরণের প্রাক্‌লগ্ন। এ সময়ে বাংলার রাজনৈতিক গগনে এক বিপর্যয়ের কালিমা ঘনায়িত হয়ে উঠতে থাকে—যার পরিণতি পলাশীর যুদ্ধ ও চতুর্দ্দিকের নৈরাশ্য ও বেদনা। বাংলার প্রাণ-সত্তার এ-অবসিত মুহূর্ত্তে বাংলা সাহিত্যে কমলাকান্ত, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের নিভৃত গুঞ্জরণ ভিন্ন অপর কোনও উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টা নেই। দাশুরায়, হরুঠাকুর, রাম বসু, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী, ভোলা ময়রা প্রভৃতির খণ্ড খণ্ড পাঁচালী, কবিগান, তরজা ইত্যাদিই তখন বাঙালীর সাহিত্যিক কৃতির একমাত্র ফিরিস্তি। তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, এ-সব রচনায় বৈদেশিক প্রভাব-বর্জ্জিত খাঁটি দেশজ শব্দের চিত্রায়ণের মাধ্যমেই কবিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়বস্তুগুলি পুরাণের আখ্যায়িকা ও প্রাচীন কিংবদন্তীসমূহকে আশ্রয় করে পরিবেশিত হওয়ায় সে-সবের ভাষাও স্বদেশীয় প্রভাবে পুষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে। তা ছাড়া উপরোক্ত কবিদের কেউ-ই উচ্চশিক্ষিতও ছিলেন না।

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পদ্য-গদ্য নির্ব্বিশেষে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ভাষা হিসাবে বাংলা কতখানি শক্তিমান ও তার গতি-প্রকৃতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে এ-ভাষা আরও শ্রীবৃদ্ধির অধিকারী হতে পারে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। ভাষার ঐতিহ্য ও মূলসূত্র বিচারের জন্ম আমাদের এতখানি ভূমিকার প্রয়োজন হ'ল। বাংলার প্রাচীন যুগ ছিল পদ্যের আর এর আধুনিক যুগ হ'ল গদ্যের পৃষ্ঠপোষিত। বর্ত্তমান আধুনিক যুগ সুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই আর উনবিংশতি শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্য্যন্ত সময়টুকুই বাংলা সাহিত্যের মধ্যম যুগ। এ মধ্যম যুগ গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত। এ যাবৎ বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত পরিবেষণ করে আমরা এক্ষণে মধ্যম যুগের দ্বারে সমুপস্থিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলা গদ্যের অভিযান সুরু হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ পূর্ব্বোক্ত শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেসেই ছাপা হয়েছিল। ইংরেজ শাসকগণ স্বদেশীয় সিভিলিয়ানদের এ-দেশীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা দেবার জন্ম ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে যে ফোর্টউইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, তার পাঠ্যতালিকানুযায়ী কয়েকটি বাংলা পুস্তক প্রণয়নের মধ্য দিয়েই কতকগুলি তৎকালীন বাংলা গদ্যরীতির পরিচয় আমরা পাই। কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি ইংরেজ মিশনারীবৃন্দ এবং রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি স্বদেশীয়গণ যে-সব গদ্য রূপ সৃষ্টি করেছিলেন তা বাংলা গদ্যের অভিযানে অগ্রবর্ত্তীদলের প্রথম গৌরব বহন করলেও তাঁর সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই অপ্রতুল। নিছক পাঠ্যপুস্তক কোনও দেশেই, কোনও কালেই, সাহিত্যের স্থান গ্রহণ করতে সমর্থ হয় নি। অবশ্য এর অল্প-বিস্তর ব্যতিক্রম সর্ব্বত্রই আছে। জন-মনের চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে একক ভাবে নীরস পাঠ্য পুস্তকগুলি মননশীলতার প্রবৃত্তিকে বহির্জগৎ থেকে পুস্তকে কেন্দ্রীভূত করে জনগণকে গ্রন্থকীটই করে তোলে মাত্র। সে-সবের দ্বারা বিদ্যায়তনিক শিক্ষার বাইরে যথার্থ গণ-শিক্ষা বিস্তারের বা সাহিত্যপ্রবণতার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না।

তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর অপরাপর দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিই সাহিত্য-বিস্তারে তথা ভাষা সৃষ্টিতে প্রভূত অবদান জুগিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর সাময়িক পত্রগুলিই তৎকালীন বাঙালী মননে পাশ্চাত্ত্য জন-জাগরণের সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে। শ্রীরামপুরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় মিশনারী মার্সম্যান 'দিগদর্শন' নামে একটি মাসিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ বৈদেশিক প্রচেষ্টাই বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম পদযাত্রা। এরই বৎসরাধিককাল বাদে

পুনরায় মার্সম্যানেরই সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' বাংলা সংবাদ সাহিত্যে নবযুগ সূচনা করলে। তার এক দশক বাদে যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহনের উদ্যোগে 'সম্বাদ কৌমুদী' শীর্ষক ধারাবাহিক চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলী বাঙালীর উর্ব্বর মস্তিষ্কে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বিতর্কমূলক সাময়িকীখানা থেকে বাঙালী মনীষা তার বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় কৃষ্টির সংবাদ যেন নূতন করে খুঁজে পেল। তার ফলে, নূতন ধারায় চিন্তাশক্তির সন্ধান পেলেন কৃতবিদ্য বাঙালী সমাজ। অপর দিকে হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর ভাবশিষ্যবৃন্দ ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রভাব মনে-প্রাণে অনুভব করে চিন্তা-জগতে নূতন সম্পদ খুঁজে পেলেন। মিল, বেন্থাম, বেকন, স্পেন্সার, হেগেল প্রভৃতির যুক্তিবাদী দর্শন, রুশো, ভলতেয়ার, দিদেরো প্রভৃতির সমাজ-ব্যবস্থা এবং ফরাসী বিদ্রোহের জ্বালাময়ী প্রেরণা 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীকে কতকটা উৎকেন্দ্রীক করে তুলল। ভাব-প্রবণ উচ্চশিক্ষিত তরুণেরা ইউরোপীয় জীবনবাদের প্রাণপ্রাচুর্য্যে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ইউরোপীয় ভাবের বন্যায় ভেসে যাবার উপক্রম করল। রামমোহনের 'আত্মীয় সভার' প্রেরণায় সমাজ-সংস্কারের উদ্যম বিদ্যাসাগরের উদারনৈতিক সামাজিক তৎপরতা ও রাজা রাধাকান্তের রক্ষণশীলতা তখন পরস্পর-বিরুদ্ধ এমন একটা চিন্তাস্রোতের আবর্ত্ত সৃষ্টি করেছিল চিন্তাশীল মননে—যার অনিবার্য্য কারণে ছাত্র-সমাজে ধর্ম্মে, মতে ও পথে তিন-চারটি উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল সঙ্গত কারণেই। একদল ইউরোপের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণ, অপরদল সনাতন পথের অনুসরণ ও কোনও কোনও দল উভয় মতের সমন্বয়কারী একটি মধ্যপথ অবলম্বন করলেন। মস্তিষ্কের এই বিচিত্র ব্যায়ামের সংঘর্ষমূলক পরিণতিতে আচারে ও চিন্তায় গতানুগতিকতা ত্যাগ করে জীবনকে যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ ও তত্ত্বের দ্বারা সমর্থন করার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল সামগ্রিক সমাজ-জীবনে। প্রগতিময় জীবনবাদই সাহিত্যে গদ্য সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকে। বাংলা সাহিত্যের এ যুগসন্ধিক্ষণে একজন প্রকৃত সাহিত্য-সেবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হ'ল, যিনি প্রাচীন ও নবীন উভয় ধারায় সাহিত্যিক আদর্শই বজায় রেখে একদল শক্তিমান সারস্বত-সাধক ও চিন্তাশীল লেখক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ক্ষণজন্মা সাহিত্য-পৃষ্ঠপোষকই বাংলার ডাঃ জনসন—ঈশ্বরগুপ্ত। এই গুপ্তকবির সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর'ই বঙ্কিমি যুগের অঙ্কুরোদ্গমে সহায়তা করেছিল সর্বাধিক পরিমাণে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষ করে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায়, অক্ষয়কুমারের সুনিপুণ লেখনীতে ও কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাচীনপন্থী চিন্তার মুক্তিসাধন করতে না করতেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সাহিত্যাকাশে উদিত হয়ে জ্যোৎস্নাবাতের স্নিগ্ধতা দান করল পাঠক-কুলকে। সে যুগের সর্ব্বশুভঙ্করী সভাও ইংরেজীর মোহমুক্ত থেকে বাংলা পরিভাষা গঠনে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব ও পূর্ব্বসূরীদের সাধনা যে গদ্যায়নের সূচনা করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে, সেই ক্ষীণ ধারাকেই রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, মাইকেল প্রভৃতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্ত্তী তরুণ দল বাংলা সাহিত্যে সাগর-সঙ্গমের সাক্ষাৎ পেলেন বঙ্কিমি প্রতিভার মাধ্যমে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সমাজ-বিপ্লবের যে রূপায়ণ সুরু হ'ল দ্রুতগতিতে বিশ্বের সর্ব্বত্র তার অমোঘ নির্দ্দেশেই প্রত্যেক দেশের ভাষার গঠন-শৈলীর ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্ত্তন হতে থাকে ত্বরিত গতিতে। আমরা বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বর্ত্তমানের প্রত্যেক উন্নত ভাষাই আজ থেকে পঁচিশ' বৎসর আগে আঙ্গিক কাঠামো ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে প্রায় একই স্তরে পড়ে আছে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে কোনও কোনও ভাষা বিজাতীয় রাজশক্তির প্রভাবে অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে স্বকীয়তা বর্জ্জন করতে বাধ্য হয়েছে, অথবা বিজাতীয় বিদ্বেষে কবলিত হয়ে একেবারে লুপ্তও হয়ে গেছে। সে সব ভাষা-বিপ্লবের অন্তর্নিহিত কারণ বহির্শক্তি বা জুলুমবাজি। এখানে সে-ধরনের কোনও কথা বিবেচ্য নয়। ভাষান্তর হতে ভাষায় শব্দের আমদানী বা পরস্পরের মধ্যে শব্দ-সম্পদের বিনিময় ইত্যাদির কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়। বিশেষ করে দেখতে হবে সেই সেই ভাষা-সমূহের ক্রিয়াপদের ব্যবহার সমাস অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগ ও প্রাথমিক ব্যাকরণের অনুশাসনাদির কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন বহিরাগত প্রভাব ব্যতীত স্বতস্ফূর্ত্তভাবেই সাধিত হয়েছে কি না, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই। সে বিচারে দেখতে পাই, ইউরোপ-খণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে, আর প্রাচ্য ভূখণ্ডে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বিশ্বের কোনও ভাষারই প্রকাশভঙ্গি ও রূপ-কাঠামোর কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি। এর কারণ সুস্পষ্ট।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিই ভাষা-বিপ্লবের একমাত্র কারণ। এ গতিবাদের যুগে আমাদের মানসিক চিন্তার গতি বর্ত্তমান কর্ম্মচঞ্চল জগতের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই দ্রুতবেগে আলোড়িত হচ্ছে। চিন্তারাজ্যের এই পরস্পরের দ্বন্দ্ব থেকে নবতর লক্ষ্যে মানবের চিন্তারশ্মি ধাবিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আমাদের মনের গতি চিরপরিচিত সমাজ ও সংস্কারকে পিছনে ফেলে দেহকে এড়িয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এক অনিশ্চিতের পানে। এই গতির অনুভূতি, মানসিক চাঞ্চল্যের প্রত্যক্ষ দ্যোতনা, সর্ব্বোপরি জীবন-বোধের অসীম প্রসার থেকেই ভৌগোলিক সীমানাও আমাদের মানস-পরিধিতে ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। এ-ভাবে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে ও ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদানও প্রতিদিন নিবিড়তর হচ্ছে। বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে এ মনোবিনিময়ের ব্যাপারে। জীবনবাদের এ আত্যন্তিক আকুতি থেকেই পদ্য-কাঠামোর নিগড় থেকে ভাষার বন্ধনমুক্তি

সম্ভবপর হয়েছে এত দ্রুতগতিতে। আবেগ, কল্পনা, আতিশয্য ও গতানুগতিকতা পদ্যরীতির মানস-উৎস, আর যুক্তি, চিন্তা, সংযম ও বিশ্লেষণই গদ্য-রূপায়ণের সম্মিলিত প্রেরণা। গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যিক রস-বোধের মূল উপকরণ তত্ত্ববোধ ও যুক্তিজ্ঞান। তত্ত্ববোধ যখন রসিক-চিত্তকে রসতৃপ্ত-ভ্রমরের ন্যায় বুঁদ না বানিয়ে তথ্যের বিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়, যুক্তিজ্ঞান যখন নিছক আত্মতৃপ্তির বিলাসে নিজের মর্যাদা না খুঁজে জীবন জিজ্ঞাসার বৃহত্তর অঙ্গনে প্রতিষ্ঠার উপকরণ অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সুপ্ত গদ্যের স্বপ্নভঙ্গ সুরু হয় প্রতিটি জাতির জীবনে। পদ্য-কাঠামোও তখন আত্মপ্রসারণের আকুতি জানায় গতানুগতিক ছন্দানুশাসন ও ব্যাকরণের নির্দ্দেশ অমান্য করে। প্রগতিশীল বিশ্বে জীবনযাত্রার প্রতিপদক্ষেপেই যদি গতানুগতিকতার বন্ধনমুক্তি সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হয়, তবে আমাদের চিন্তারাজ্যের সংক্ষুব্ধ অভিব্যক্তির বাহনের রূপান্তরও অবশ্যই কাম্য। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বাংলা সাহিত্যেও ভাষার নবায়ন সুরু হয়েছিল সঙ্গত কারণেই। তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে কাব্যকৃতি ও গদ্যরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আন্তরিক প্রয়াস দেখে যে-কোনও ভবিষ্যদ্বক্তাই তার সম্বন্ধে আশা পোষণ করতে পারতেন।

বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যরীতির আদি-শিল্পী বলে জাতি বহু পূর্ব্বেই একবাক্যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাংলা-গদ্য সৃষ্টিতে রামমোহন ঈশ্বরগুপ্ত যে ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন বিদ্যাসাগরের প্রতিভা তার উপর স্থাপত্যের বিশেষ একটি শৈলী প্রদর্শন করে ভাষা-নির্মিতির একটি আদর্শ বাঙালীর চোখের সামনে দাঁড় করালেন। বাংলার চর্চায় বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে আধুনিক ব্যাখ্যায় সাহিত্যের পুরোপুরি মর্য্যাদা দান করতে সমর্থ না হলেও ইংরেজী ব্যাকরণের যতিচিহ্ন ব্যবহার করে, সরসভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করে, যে অগ্রগতি দান করলেন ভাষাকে, তার অনুসরণ করে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজনারায়ণ বসু, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সমষ্টিগত পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বঙ্গ-ভারতীর সমৃদ্ধির জন্য, তারই প্রেরণায় বাংলার গদ্যরূপ অচিরেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। বাঙালীকে মাতৃভাষা শিক্ষায় বিদ্যাসাগর শিক্ষকের নীরস ব্রত পালন করেও যেটুকু সাহিত্যকৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন, তাতে বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে। তাঁর 'সীতার বনবাস', বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি সেকালের ছাত্রকুলের মতিবৃদ্ধি করলেও তাঁহার 'শকুন্তলা' ও 'ভ্রান্তিবিলাস' কিন্তু স্বচ্ছন্দে অভিভাবকদের মানস-বিলাসের প্রচুর উপকরণ আজও যুগিয়ে থাকে। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, সংস্কৃত আদর্শে বাংলায় সমাস ও যৌগিক শব্দের প্রয়োগ। সংস্কৃত সাহিত্যের অগাধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ মননশীলতা, ইংরেজী সাহিত্যের পরিচয়, যুগোপযোগী সংস্কারমুক্ত আদর্শ—সর্ব্বোপরি সাহিত্যিক মনীষা বিদ্যাসাগরকে স্থায়ী সৃষ্টির অধিকারী করেছিল। পরে এ-গদ্যরীতিকে পরিপূর্ণ সাহিত্যিক মর্য্যাদা দান করলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এক দশক পরেই।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালী মানসে যে যুক্তিবাদ ও তত্ত্বান্বেষণের প্রবৃত্তি তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, কাব্যের কাঠামোকেও তা' সবেগে নাড়া দিতে কসুর করল না। পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁস-যুগের মহাকাব্যের রীতি অবলম্বন করে ইউরোপীয় চিন্তাদর্শে ও ছান্দিক গঠনে 'তিলোত্তমা সম্ভব', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' ও 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করে মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্যরীতির সনাতন ছান্দস-গঠন ও আঙ্গিককে অস্বীকার করলেন। মাইকেল ইংরেজী Blank Verse, Sonnet ও Accentual Verse-এর অনুকরণে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ কাব্যরীতির সার পদার্থটুকু সংগ্রহ করে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যুগান্তর আনলেন। পদচারীর (পাঁচালীর) মাত্রিক কিঙ্কিণীধ্বনিতে, বৃত্তছন্দের সীমিত অধিকারে ও ত্রিপদী লাচাড়ীর লঘু-তানের বিন্যাসে, যুক্তিবাদী মননশীলতার স্বচ্ছন্দবিহারে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল বলেই, যুগের প্রয়োজনীয়তারই গদ্যরূপ বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া বাংলার মানস-ভূমে সবে সুরু হয়েছিল। মধুসূদন এ-যুগসন্ধিক্ষণেই রিক্ত কাব্যকলার পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করলেন অকল্পনীয় প্রতিভার অর্ঘ্যে। আজ পূর্ণ এক শতাব্দী পরেও আমরা মেঘনাদ বধের কাব্যিক বয়ানকে সমকালীন সাধু গদ্যরীতির মানদণ্ডে অধিকতর প্রবহমান বলে রায় দিতে পারি। সাধু ও চলিত রীতির তৎকালীন দ্বন্দ্ব মধুসূদনের শব্দ-চয়নের সুষমায় ও ওজস্বিতায় স্তব্ধ হয়ে যায়। সাধু ভাষার শ্রী ও ঐশ্বর্য্য কতটা ব্যঞ্জনাময় ও হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা তখনকার শিক্ষিত-সমাজ পদ্য-সাহিত্যে প্রথমবারই উপলব্ধি করলেন। বাংলার রেনেসাঁস-যুগের উদ্বেলিত যুক্তিবাদী মনের খোরাক জোগাতে তখন যেরূপ উদ্দীপনাময় শাব্দিক অলঙ্করণেরই প্রয়োজন ছিল।

ইতালীয় রেনেসাঁসের মৌলিক আদর্শ সম্মুখে রেখে, পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকে নির্ভর করে—সর্ব্বোপরি স্বদেশীয় পৌরাণিক-যুগের উপাদান সংগ্রহ করে, মহাকবি মাইকেল কাব্য সাহিত্যকে সেকালের প্রচলিত গদ্য-সাহিত্যের চেয়েও অধিকতর সার্থক ও তৎকালীন প্রচলিত পদ্যরীতির চেয়েও অধিকতর আবেদনশীল করলেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর Blank Verse-এর হুবহু অনুকরণ নয়। আবার তাঁর Sonnetও পেত্রার্ক-মিলটনের সমন্বয়কারী এক মধ্যপন্থা। এ-সব বৈদেশিক আঙ্গিক কাঠামো প্রবর্ত্তনে তিনি কোনও একটা বিশেষ রীতির হুবহু অনুকরণ করেন নি, অনুসরণই করেছিলেন মাত্র। কবির জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক—বাংলা ভাষায় পদ্য-গদ্য নির্ব্বিশেষে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ইতালীয় রেনেসাঁসের বীজ স্বদেশের মননক্ষেত্রে রোপন করেছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর ইটালীয় রেনেসাঁসের মৌলিক আদর্শ ছিল—Humanism-এর ভিত্তিতে মানবমুখীন সাহিত্যিক সচেতনতা

সৃষ্টি করা প্রাচীন কাব্যের নবতর যুগোপযোগী ব্যাখ্যার মাধ্যমে। সেই প্রাচীন যুগের মৌলিক চিন্তাকে কৈবল্যবাদী-ভগবদ্মুখী না করে মানুষ ও সমাজের প্রত্যক্ষ কল্যাণ বুদ্ধিতে জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে প্রসারিত করাই রেনেসাসের মর্ম্মকথা ছিল। মানুষের মধ্যে হৃদয়-বৃত্তির বিনিময় ও পরস্পরের আত্মীয়তার উন্মেষই ছিল সেই মহান ব্রত। পেত্রার্ক, বোকাচ্চো, এরেজমুজ, সিমগুস ও বুথার্টএর সম্মিলিত কাজ মধুসূদন একাই করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে মাত্র আট বৎসরের সেবার মধ্য দিয়ে। মধুসূদনের কাব্যাদর্শ থেকেই বাংলা কাব্যের রুচির বিবর্ত্তন সুরু হয়। মধ্যযুগের ভঙ্গ-প্রাকৃতানুসারী মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, পয়ার, ত্রিপদী, লাচাড়ি ইত্যাদির অঙ্গরূপের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবার রত হলেন সমসাময়িক অনুজ কবিবৃন্দ। তবে নূতন ধারার প্রবর্ত্তকদের সব দেশেই যেমন অল্পবিস্তর কটূক্তির সম্মুখীন হতে হয়, অমর কবি মধুসূদনের ভাগ্যেও সেরূপ বিদ্রূপোপহার কিছু জুটেছিল। জগবন্ধু ভদ্রের "ছুছুন্দরীবধ-কাব্য", "মেঘনাদ বধ"-এর বিদ্রূপাত্মক অনুকৃতি বলে কিছুদিন অসূয়াকারীদের আত্মপ্রসাদ বিতরণ করলেও সে-অমরকাব্য আজও অক্ষয় হয়ে আছে। পরে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল-দের উত্তরোত্তর কাজে সেবার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার আরও বিকাশ হতে থাকে পদ্যরূপের মাধ্যমে।

উনবিংশ শতকের মধ্যলগ্ন থেকেই কি গদ্যে কি পদ্যে—উভয় ক্ষেত্রেই বাংলার সাধু ও চলিতরূপ নিয়ে বাদানুবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশ উত্তেজনার সঙ্গেই চলতে থাকে। মাইকেল অবশ্য ভাষা-সংস্কারের আদর্শ নিয়ে তাঁর কাব্যকৃতির প্রচেষ্টা করেন নি। তাঁর তৎসম ও তদ্ভব শব্দের আন্তরিক পরিচর্য্যা ও সংস্কৃতানুসারী নামধাতুর আত্যন্তিক প্রীতি ইউরোপীয় রেনেসাসের আদর্শেই সম্ভবপর হয়েছিল। তিনি নাট্যকার হিসাবে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পেলেও মূলতঃ তিনি কবিই ছিলেন। গভীর আত্মানুভূতি ও পূর্ব্বাপরের সংযোগ স্থাপনই কবিত্বের স্বভাব-ধর্ম্ম। তা ছাড়া তাঁর কাব্যের বিষয়-বস্তুর নির্ব্বাচন ও ছন্দশাসনের বৈচিত্র্য একটি উপযুক্ত ভাষা ও ভঙ্গিকেই আশ্রয় করেছিল। মধুসূদনের কাল থেকে পশ্চাৎবর্ত্তী চার শতকের মধ্যবর্ত্তী সময়ের বাংলা কাব্যের ভাষার রূপ-কাঠামো সর্ব্বত্রই প্রায় একই ধরনের। বিচ্ছিন্নভাবে দু'চারটি ক্ষেত্র ভিন্ন সর্ব্বত্রই দেশজ শব্দ ও চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেই কবিগণ সেকালে তাঁদের কাব্য রচনা করেছেন। সে চারশত বৎসর ব্যাপী কালের গঠনরূপের নিদর্শনে কিন্তু দেখতে পাই, পর পর তিনটি ধারা। প্রথম দিকে প্রাকৃত ও তদভব শব্দের আধিক্য ও সংস্কৃত নামধাতুর প্রচলন ; মাঝখানে—আরবী, ফার্সী, পর্ত্তুগীজ দিনেমার প্রভৃতি শব্দাদির প্রাচুর্য্য ও দেশজ ক্রিয়াপদ আর শেষের দিকে, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়ে সংস্কৃত ও তদভব শব্দের আধিক্য এবং ক্রিয়ার ব্যবহারে সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের সঙ্গে খাঁটি চলিত ক্রিয়ার পাশাপাশি অবস্থান।

ক্রমে দেখতে পাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতি গদ্যায়নে সংস্কৃতের প্রভাব বাড়তে থাকে। যুগপৎ রামমোহন ও ঈশ্বরগুপ্তের সার্থক-প্রচেষ্টায় বাংলা-গদ্য পণ্ডিত-অপণ্ডিত নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সাধারণের মনের ভাব-প্রকাশের বাহকতা করতে সমর্থ হয়। পণ্ডিত-গণ তখনকার দিনে পরস্পর বৈঠকী আলাপ-আলোচনায়ও সংস্কৃত-গন্ধী বাক্যই ব্যবহার করতেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপণ্ডিত জন-সাধারণ এবং ঘরোয়া পরিবেশে প্রকৃত পণ্ডিতগণও দেশজ শব্দের প্রাচুর্য্যপূর্ণ ভাষার চলিত রূপই ব্যবহার করতেন। গুপ্ত কবি ও রামমোহনের চলিত রূপের গদ্যরীতি অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর হুবহু গ্রহণ করতে পারলেন না। রামমোহন-গুপ্ত কবির উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি পরিবেশন ও দ্রুত জন-মানসের জাগরণ আর অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল ভাষার উন্নতি ও শিক্ষা-বিস্তার। আবার রামমোহন ছিলেন মুখ্যতঃ সংস্কারক ও অনুপ্রেরক আর বিদ্যাসাগর ছিলেন মূলতঃ সংগঠক ও প্রযোক্তা। ভাষায় লালিত্য, বাহকতা, গাম্ভীর্য্য, ছন্দ ও প্রসাদগুণই বিদ্যাসাগরের আসল লক্ষ্য ছিল। যেন-তেন-প্রকারেণ পণ্ডিত-অপণ্ডিত নির্ব্বিশেষে সাধারণ্যে ভাব-চিত্রের বোধগম্যতাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর মত ছিল—এমন একটি লেখা মাধ্যম সৃষ্টি করা, যার বাহকতায় শুধু মনের ভাব পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হলেই চলবে না। পরন্তু সে শব্দসম্ভারের বাঙ্ময় অভিব্যক্তির যথাযোগ্য কৌলিন্য ও অলঙ্করণও থাকা চাই। অক্ষয়কুমার দত্ত ও 'তত্ত্ববোধিনী'র শিল্পীগণ এ আদর্শ বাস্তবায়িত করতে সেকালে যথেষ্ট প্রয়াসও করেছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়, ভূদেবের রচনারীতিতে জনগণ সম্পূর্ণ পরিতোষ বোধ করতে পারলেন না অত্যধিক সংস্কৃতানুসারী হওয়ার জন্য। তা ছাড়া প্রবন্ধ জাতীয় ভাব-ভূয়িষ্ঠ রচনায় ওই ধরনের গদ্যরীতির প্রয়োগে সাফল্য দেখা দিলেও সহজ মনের সরল আটপৌরে ভাব সার্থকভাবে পরিবেশন করতে সে রীতি সক্ষম নয় বলেই জনসাধারণ রায় দিলেন। ফলে নেহাৎ কথ্যরীতিকেই ভাষায় স্থান দেবার একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল কোনও কোনও মহলে। এদের নেতৃত্ব করলেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাধানাথ শিকদার। সে সমসাময়িক যুগে এই ভাষা-দ্বন্দ্ব নিয়ে 'ভট্টাচার্য্যের চানা' ও 'শব-পোড়া মড়াদাহের' কলহ ও বাদানুবাদ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছিল। একদল বললেন, বাংলাকে আরও সংস্কৃতগন্ধী করে ওজস্বী ও ছন্দোময় করে তুলতে হবে। অপর দল বললেন, খাঁটি দেশজ ও কথ্যবুলিই ভাষায় স্থান পাবে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরে দুলাল' দিয়ে এর পরীক্ষাও হয়ে গেল। কিন্তু রসোত্তীর্ণতার সমাধান হ'ল না।

বিদ্যাসাগরই আবার নূতন করে 'ভানুমতীর খেল' দেখালেন। তিনি সাধ্যানুসারে দেশজ ও প্রাকৃত শব্দকে সংস্কৃতের মর্য্যাদা দান করতে চেষ্টিত হলেন তাঁর অপূর্ব্ব মনীষার বলে। বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় তিনি সংস্কৃতকে চলিতে রূপান্তরিত করতে চাইলেন না। সংস্কৃতকে রূপান্তরিত করার প্রশ্ন উঠে এজন্য যে বিবদমান কোনও

দলেরই সাধ্য নেই রাতারাতি সংস্কৃতকে বাংলা সাহিত্যে অস্বীকার করা। আবার যার অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ হয়েও অস্তিত্ব স্বীকার করতে অস্বস্তিবোধ আছে, সেখানে বাধ্য হয়েই আমাদের যে অস্তিত্ব বেমালুম অস্বীকার করতে হয়, নতুবা অস্তিত্বের বিকৃতি সাধন করতে হয়। বিদ্যাসাগর তাঁর শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলীতে কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে চলিত ও তৎসম শব্দের সুষ্ঠু ও সহজবোধ্য মিশ্রণ ঘটিয়ে নূতন এক শৈলীর গদ্যরূপ প্রবর্তন করলেন। পরবর্তীকালে ঋষি বঙ্কিম এ মধ্যপন্থানুসারী গদ্যরীতিকেই সুসংস্কৃত করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন বাংলা গদ্য-সাহিত্যে—যা এখন পর্যন্ত সাধু-ভাষা নামেই পরিচিত হচ্ছে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র চার বৎসর পূর্ব্বেই এবং 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমসাময়িককালেই আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁর 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক বৈদেশিক অনুকরণে লিখিত পুস্তকে উপরোক্ত মধ্যরীতির প্রয়োগ কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই সার্থকভাবে করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে খ্যাতিমান প্রবন্ধকার-সমালোচক পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ওই পুস্তকখানির ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন :

"······আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।···বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাংলা···আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।"

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর থেকে বাংলা ভাষায় বঙ্কিমি-যুগের সুরু হয়। এর ছ' বৎসর বাদে 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকার আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই একদল শক্তিশালী ভাষা-শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দচন্দ্র মিত্র, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যসেবিবৃন্দ বঙ্কিমি গদ্যরীতির মধ্যপন্থা অনুসরণ করে বাংলাভাষার সমৃদ্ধি সাধন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় অক্ষয়কুমারি ও বঙ্কিমি উভয় ধারারই সেবা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের এ-বঙ্কিমি ধারা রবীন্দ্রযুগকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। স্বয়ং কবিগুরু নিজেই এ মধ্যপন্থী সাধুরীতিতেই তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান-ভাবভূয়িষ্ঠ রচনাদি দেশবাসীকে পরিবেশন করেছেন। সেজন্য পূর্ব্বেই এক স্থানে বলেছি, এ সাধু গদ্যরীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কৌল-কৌলিন্যের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা পেয়েছে।

এবার বাংলার রেনেসাঁসোত্তর মধ্যম-যুগের—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত সময়ের কাব্য-সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। ইতিমধ্যে একবার ইঙ্গিত করেছিলাম যে, কাব্য-সাহিত্যের ভাষা রেনেসাঁসপূর্ব্ব পাঁচশত বৎসর পর্যন্তকাল প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছিল। তৎকালীন বৈদেশিক প্রভাব (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, দিনেমার, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজী) ক্ষণস্থায়ী বৈচিত্র্যের সৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য-কিছু করলেও মূলধারাকে আঘাত করতে কখনই সমর্থ হয় নি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা গদ্যে যতই সংস্কৃতের প্রভাব বাড়তে থাকে, ঠিক তেমনি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে দ্রুত গতিতে দেশজ শব্দের আধিক্য ও ক্রিয়াপদের প্রাকৃত-বিবর্ত্তিত রূপ ক্রমেই আধিপত্য করতে থাকে। অবশ্য উন্নত কাব্য-সাহিত্য এই বিশেষ যুগে সৃষ্টও হয় নি কিছু—একমাত্র ভারতচন্দ্রের দান ছাড়া। সে সময়ের কবিগণ বেশির ভাগই অল্প শিক্ষিত ছিলেন। কারুর বা (ভারতচন্দ্র ভিন্ন) সংস্কৃত, আরবী, ফার্সীর জ্ঞান মোটেই ছিল না। এ-বিশেষ কালটি কেবলমাত্র স্বভাব-কবিদের যুগ ছিল বলেই বোধহয় কবি-কৃতির ভাষায় অলঙ্করণে বৈদগ্ধ্য দৃষ্ট হয় না। মোট কথা, অন্তর্নিহিত কারণ যা-ই থাকুক, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সময়ে বাংলা কাব্যে, গদ্যরীতির বিপরীত পদ্ধতিতে দেশজ ও কথ্যরীতিই স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই সাহিত্যিক-প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীবৃন্দের উদ্দাম বাংলার গদ্যরূপ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। মহাকবি মাইকেলই নূতন আঙ্গিকে সংস্কৃতের উচ্চারণ, ধ্বনিমূলক শব্দবিন্যাস ও শব্দার্থের সমন্বয়-সঙ্গতিকারক রীতি বাংলা কাব্যে প্রয়োগ করে কাব্য-কৃতির নবযুগ সূচনা করলেন। গুপ্ত কবির ভাব-শিষ্যগণ ব্যতীত অপরাপর অধিকাংশ কবিই ক্রমে ক্রমে কবিতায় সাধু-ভাষার মধ্যরীতিই প্রয়োগ করতে সুরু করলেন। অবশ্য মধুসূদনের ভাষা-রীতি অনুকরণ কেউ কেউ করতে চেষ্টা করলেও তাঁরা সার্থক সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন না। রঙ্গলাল, যদুনাথ, যদুগোপাল, হেম, নবীন প্রভৃতি কতিপয় কবি তাঁদের অধিকাংশ কাব্যেই প্রভূত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সমবায়ে উৎকট সাধুরীতিরই প্রয়োগ করেছেন।

অপর একটি দল শব্দ-চয়নে মাইকেলপন্থী মনোভাব ব্যক্ত করলেও ছান্দিক গঠনে কিঞ্চিৎ মৌলিকতা দেখিয়েছেন। ভাষার বিচারে এরা মধ্যপন্থী সাধুরীতিই পছন্দ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যাদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত গোস্বামী-কবিদের ন্যায় এরা চলিত শব্দের পাশে পাশে ধ্বনি ও ব্যঞ্জনামূলক তৎসম-তদ্ভব শব্দাদি ও নামধাতু পর্য্যায়ের এক বিশিষ্ট রীতির ক্রিয়া-পদ ব্যবহার করেছেন। কবি বিহারীলাল এ-মধ্যরীতির ধারক ও বাহক। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যরীতির ন্যায় বিহারীলালের এ মিশ্রধর্ম্মী মধ্যপন্থীয় সাধুরীতিরও বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

এতক্ষণ আমরা বাংলা সাহিত্যের রেনেসাঁস-যুগের কৈশোর লগ্ন থেকে—অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্য্যন্ত সময়ের গদ্য-পদ্য নির্ব্বিশেষে শুধুমাত্র সাধুভাষার বিবর্ত্তিত বা মার্জ্জিত রূপটির সম্বন্ধেই আলোচনা করলাম। পর্য্যালোচনায় স্থিরীকৃত হ'ল—রামমোহন, গুপ্তকবি, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রবর্ত্তিত গদ্যরূপ চলিত কথার পাশাপাশি

সুসংবদ্ধ হয়ে বঙ্কিমি-রীতির প্রবর্ত্তন করল। আবার রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র, হরপ্রসাদ, হীরেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি উত্তর সূরিগণ বঙ্কিম-রাজকৃষ্ণ-শিবনাথের গদ্য-ধারাকেই অব্যাহত রাখেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কাল পর্য্যন্ত। পক্ষান্তরে কাব্য-সাহিত্যে গুপ্তকবি ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের দেশজ স্বাক্ষর অবলুপ্ত হতে না হতেই মাইকেলের তৎসম-প্রভাব কাব্যাকৃতির যুগাদর্শ সৃষ্টি করল ভাষায় ও আঙ্গিকে। এ সংস্কৃতায়ণের ধারা কাব্য-সাহিত্যে কিছুকাল অব্যাহত রাখলেন অংশতঃ রঙ্গলাল ও অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠুভাবে হেম ও নবীন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিহারী-লালের মধ্যমপন্থী সাধু ও চলিতের সমন্বয়কারী ভাষাই বাংলা কাব্যে স্থায়িত্ব লাভ করল রবীন্দ্রযুগের বাহকদের মাধ্যমে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর-কাল পর্য্যন্ত।

এ রেনের্শাস যুগের পূর্ব্বাপর উভয় সন্ধিক্ষণেই দুইজন প্রাতঃ-স্মরণীয় কবি-সাহিত্যিকের এক বিস্ময়কর সমন্বয়ধর্ম্মী সাহিত্য-প্রবণতা দেখতে পাই। তাঁরা হলেন যথাক্রমে, গুপ্তকবি ও কবি-গুরু। উভয়েই গদ্য-পদ্যের সব্যসাচী—উভয়েই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচীন-নবীনের সমন্বয়কারী প্রগতিপন্থী। প্রভাকরের শালীনতা-বোধ জাগ্রত করতে সোমপ্রকাশের প্রয়োজন হয়েছিল বঙ্কিমি-মননে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের উভয়দর্শনেই বঙ্গদর্শন করার জন্য। ব্যক্তিগত চরিত্রে গুপ্তকবি প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরই ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকা-নন্দের ন্যায় গুপ্তকবির প্রতিবেশী (হালিশহর-কাঁঠালপাড়া) ও ভাব-শিষ্য ঋষি বঙ্কিমই গুরুর ঐশ্বরিক বিভাব বাঙালীদের কাঙালি-মনে বিতরণ করেছেন বেন্থাম-রুশোর ব্যাখ্যায় আর গীতা-ভাগবতের ভাষ্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই ভাবে সাহিত্যিক-যুগ-সমন্বয়ের কাজ করেছেন বঙ্কিমি-বিহারীলালের যুগ্মধারা পোষণ করে ও নবোত্তরণের পথিকৃৎ হয়ে।

এবার আমরা উপরোক্ত সে বিশেষ যুগের বাংলা ভাষার অপর একটি অস্ফুট প্রবর্ত্তনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হ'ল চলিত রীতির গদ্যায়ন।

ইউরোপীয় মিশনারীদের বিজাতীয় প্রভাব ও ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের পণ্ডিতি-কবল থেকে বাংলা ভাষার মুক্তিবিধান করে সদ্যোজাত গদ্যরীতিকে বঙ্গবাসীর সাধারণ মনন-ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করলেন রামমোহন ও ঈশ্বরগুপ্ত। এঁদের উভয়েরই প্রয়াস ছিল ভাষাকে কথ্যরীতির অনুগামী করে সহজবোধ্য অথচ লালিত্যময় করে তোলা। যতি-বিযতির সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা উভয়েই যতটা সম্ভব চলিতরূপের আঙ্গিক বজায় রেখে তৎসম-তদ্ভব শব্দ ও ক্রিয়া-পদাদির প্রয়োগ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের সংস্কৃত-প্রভাবিত গুরুগম্ভীর শব্দ-কণ্টকিত ও সমাসবহুল গদ্যরীতি লঘু কথা-সাহিত্যের ভাষায় সামঞ্জস্যবিধান করতে সমর্থ নয় বলে উপন্যাস ও আখ্যায়িকামূলক রচনাদিতে কথ্য বা চলিত রীতির প্রবর্ত্তনের প্রবৃত্তি খুবই উগ্র হয়ে উঠতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই। কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' ও রামমোহনের 'সম্বাদ-চন্দ্রিকা'র রচনানীতি লক্ষ্য করে সাহিত্যামোদীরা নূতন চলিত-রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করলেন।

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রভৃতি পুস্তকই সে-সব প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। কিন্তু সে-সব কথ্যরীতির শ্রুতিমাধুর্য্য ও ঝঙ্কারধ্বনি বিশেষ কিছু না থাকায়, তা সে-কালেও স্বীকৃতি ততটা পায় নি। 'আলালের ঘরের দুলালের' সমকালীন 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'-এ যে চলিত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় সেটাকেই অধিকতর সুসংস্কৃত করে বঙ্কিমি-সাধুরীতি আত্মপ্রকাশ করে—সে-কথা আগেও একবার বলা হয়েছে। মোট কথা সে-সময় থেকেই আলালি-রীতি ও বঙ্কিমি-রীতি অর্থাৎ সাধুভাষা ও চলিত ভাষা—এ দু'টি ধারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যে চলে আসছে।

তবে রসিক-সমাজ ক্রমেই বুঝতে পারলেন যে, গ্রাম্যতা দোষ-যুক্ত হুবহু কথ্য বাক্‌ভঙ্গির আমদানি বেপরোয়া ভাবে করলেই তা সার্থক ও রসোত্তীর্ণ রচনা হয় না। চলিত শব্দ যতটা সম্ভব অবিকৃত রেখে, কথ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, তৎসম-তদ্ভব শব্দের প্রয়োজনানুরূপ লালিত্য বজায় রেখে, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের 'হরিদাসের গুপ্তকথা' চলিত আদর্শের এক নজির সৃষ্টি করল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে। পরবর্ত্তী কালে শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কথ্য-ভাষার ওই লিখন-ভঙ্গির খুবই প্রশংসা করেছিলেন। সে যা হোক, সে-কালে এ-ভাষার নবায়ন সাধারণের মনে তেমন আগ্রহের সৃষ্টি করল না। ভাষার সরসতা, ভাবের গভীরতা, ধ্বনি-মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর জন্য বঙ্কিমি-সাধুরীতিই তখনকার মতন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সরিকানায় মৌরুসী পাট্টা পেয়ে গেল। কিন্তু কর্ম্মব্যস্ত জগতের জটিলতর জীবনযাত্রা ও যুক্তিবাদ আর প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও তত্ত্ববোধ বক্তব্যকে সহজবোধ্য ও বিশ্লেষণধর্ম্মী করার তাগিদ পেশ করায় ভাষার কথ্যরূপের প্রেরণা স্বতঃই বেড়ে চলল। তাই রেনেসাসধর্ম্মী যুক্তিবাদে কথাশিল্পিগণ পাশ্চাত্ত্যের নিদর্শন ও প্রাচ্যের নির্দ্দেশ স্মরণ করে সাব্যস্ত করলেন—রচনার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতানুযায়ী গদ্যরীতির নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে এটাও মেনে নেওয়া হ'ল যে, আখ্যায়িকামূলক কথা-সাহিত্যে ও নাটকে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের ভাষা হুবহু চরিত্র-চিত্রণ বা ভূমিকানুযায়ীই হওয়া দরকার। বিশেষ করে, প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct speech) যেখানে থাকবে সেখানে ভাষা সাধু বা গ্রাম্য, শুদ্ধ বা অশুদ্ধ ইত্যাদি বিচার না করেই হুবহু উক্তিই পরিবেশন করতে হবে—নীতিবোধ ও শ্লীলতার সীমা যথাযথ রক্ষা করে। এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি, 'নীলদর্পণে' স্থান-কাল ও পাত্র-পাত্রী নির্ব্বিশেষে সাধু ভাষার প্রয়োগে রসগ্রহণে কিরূপ বাধার সৃষ্টি করেছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে গিরিশ, অমৃত-লাল, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদির কথ্য বা চলিত রূপের ব্যবহার

সে-কালের তরুণদের কথা-সাহিত্যে গদ্যরীতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দান করে।

কিন্তু এত সব জল্পনা-কল্পনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিত গদ্যের স্বপক্ষে করলে কি হয়। সব-কিছুই 'কালেন পরিচিয়তে'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগ থেকে যখন বাংলা গদ্যের রীতি-সংস্কার ও পদ্যের ছন্দবৈচিত্র্যের উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হ'ল তখন অনেকেই আবার নূতন করে বুঝতে পারলেন, গদ্যের সাধুরীতি ত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়। তাঁরা এটা ভাল করেই বুঝলেন, ভাবার্থের সম্প্রসারণে অক্ষম, নিতান্ত স্থিতিশীল কতকগুলি মুষ্টিমেয় শব্দ-সম্ভার নিয়ে যুগোপযোগী জটিল-মনোবিশ্লেষণধর্মী বাক্‌বিন্যাস সকলের পক্ষেই সম্ভব নয়। তথাপি নূতনীকরণের আকাঙ্ক্ষা ভাষা-শিল্পীদের একাংশে দিনের পর দিন প্রবলতর হচ্ছিল। ভাষা-সংস্কারের এ প্রবল উত্তেজনাকে প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে অনেক মনীষীই সুচক্ষে দেখেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল অনেকটা এ ধরনের—জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহকতা করতে ভাষার পুনর্বিন্যাস স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে, সেজন্য এত চেষ্টা-চরিত্র ও গবেষণার প্রয়োজন কি? ভাষার নিজস্ব শব্দ-সম্ভার (অবশ্য তৎসম ও তদ্ভব) পর্য্যাপ্ত সম্পদশালী থাকা সত্ত্বেও এবং তৎকালীন প্রচলিত সাধু-গদ্যরীতির ক্রিয়াপদ ও বাক্‌ভঙ্গির সুঠাম-শৈলী প্রাণবন্ত থাকা সত্ত্বেও রীতিমত মহড়া দিয়ে, কৃচ্ছ্র-সাধন করে, নূতন পদ্ধতি রপ্ত করার কারণ অনেকের নিকটই তখন দুর্ব্বোধ্য মনে হয়েছিল। তাই বোধ করি অগ্রজদের ওই ব্যঞ্জনাকেই প্রতিধ্বনিত করে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ-দশকে কবি-সমালোচক শ্রদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন—

"বাংলা গদ্য-সরস্বতীর এক চরণ প্রাকৃত-বাংলার কলধ্বনিমুখর রাজহংসটির উপর এবং অপর চরণ সাধু-ভাষার সুসংস্কৃত, গাঢ়বদ্ধ, শুচিশ্রী ও সৌরভময় সহস্রদল পদ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। যে-দিন হইতে ভাষার এই দুই বিপরীত স্বভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছে সেই দিন হইতেই বাংলা গদ্য আপন প্রাণধর্ম্মে সঞ্জীবিত হইয়া অপূর্ব্ব-শ্রী শক্তিলাভ করিয়াছে; তাহার সংস্কৃত জাতি ও প্রাকৃত গোত্র—দুই ধর্ম্মই বজায় রাখিয়া একাধারে সংযম ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।" [সাহিত্য বিচার—মোহিতলাল মজুমদার]

ক্রমশঃ

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

আকাশে মেঘের রঙ, অরণ্যের উদাস মর্ম্মর,
তরুণ তরুর কুঞ্জে পাখীদের করুণ কূজন;
বিচিত্র সোনালী দিন, পুষ্পগন্ধে বাতাস মন্থর,
ছায়া-ঢাকা বনবীথি, চলো সেথা বসিব দুজন।

কনক চাঁপার কুঁড়ি কবরীতে গেঁথে নিও তুমি,
নির্জ্জন বকুল বনে ঘুঘু-ডাকা নিস্তব্ধ দুপুর;
মেঘরাঙা নদীজল, ফুলে ফুলে মুগ্ধ বনভূমি,
মিঠে মিঠে হাওয়া বয়, চলো কোথা দূর আরও দূর।

শব্দহীন গীতিহীন মায়াময়ী নিঃশব্দ প্রকৃতি,
শুধু শাখা অন্তরালে কোকিলের ব্যাকুল কাকলি,—
দূরের উদাস সুর, মনে আসে কবেকার স্মৃতি,
স্মরণের মালা হ'তে খসে পড়ে দু' একটি কলি।

বিস্মৃত কৈশোরকাল, মদির মুহূর্ত্তগুলি বুঝি
রঙীন পাখার ভরে উড়ে এল তোমার আঁচলে;
হাওয়ায় নতুন গান, হারানো সে দিনগুলি খুঁজি,—
ঝিনুক-কুড়ানো দিন শুক্তি-শুভ্র স্বপ্ন জলতলে।

কাশবনে প্রজাপতি, ঘাসে ঘাসে কাঁচপোকা ওড়ে,
তুমি আমি কতদিন চলে গেছি পদ্ম, কেয়াবনে;
বিস্মৃত সুরভি-স্বপ্ন স্মরণের পথে আজও ঘোরে,
আচমকা গন্ধ আসে ছায়া-ঢাকা ব্যাকুল শ্রাবণে।

মনের মৌচাক ভাঙা, মৌমাছিরা তবু জাল বোনে,
যে গান হারায়ে গেছে, তার সুর আজো বুঝি শোনে।

জলস্রোত

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

পূজার কয়েকদিন আগের থেকেই বংশাই নদীর কূলে আনন্দ-উচ্ছলতার ঢেউ যেন ভেঙে পড়ে। নানা দেশ থেকে নৌকো আসে নানা পশরা নিয়ে। আর আসে যাত্রা ও বাইস্কোপটার দল। তীর থেকে একটু দূরেই পলাশপুর গ্রাম। সেই গ্রামকে কেন্দ্র করেই এত আনন্দ—এত উৎসব।

এবারও পূজার আগেরদিন যথারীতি যাত্রার দলের নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ল। চৌধুরী বাড়ীতে প্রতি বছর তিন রাত্রির জন্য তাদের গানের আসর বাঁধা। দলের সঙ্গীত-শিক্ষক মুরারী চক্রবর্তী হাজির হলেন চৌধুরী বাড়ীতে তাদের উপস্থিতির সংবাদ নিয়ে। কিন্তু গিয়েই থমকে গেলেন। পূজার বিরাট আড়ম্বরের মাঝেও যেন বাড়ীটা ঝিমিয়ে পড়েছে। একটা বিষাদের ছায়ায় যেন স্তিমিত হয়ে গেছে বাড়ীর আলোক-সজ্জা।

একটু পরেই তিনি ব্যাপারটি জানতে পারলেন, চৌধুরী বাড়ীর এক মহা বিপর্যয় ঘটেছে। শহর থেকে আসবার পথে নৌকোডুবিতে মারা গেছে বিখ্যাত ধনী শশাঙ্ক চৌধুরীর পুত্রবধূ আর তাঁর দু'বছরের পৌত্র। দু'দিন আগে আচমকা যে ঝড় উঠেছিল তারই ফলে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। পুত্র মৃগাঙ্কও সেই দুর্ঘটনায় পড়েছিল, ভাগ্যক্রমে অন্য এক নৌকোর সহায়তায় সে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু স্ত্রী আর ছেলের খোঁজ পাওয়া যায় নি—জলের স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে।

তাই অতর্কিতভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এবারের উৎসব। এত আয়োজনের মুখেও সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। এবার আর যাত্রার আসর বসবে না। অনেকদিনের নিয়মিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটল এবার।

মর্মাহত হলেন মুরারী চক্রবর্তী। গানের আসর বসবে না বলে নয়, এই দুর্ঘটনার খবর শুনে।

এই সংবাদ তাঁকে মনে করিয়ে দিল—তাঁরই জীবনের অতীতের এক দুর্ঘটনার কথা! বিশ বছর আগে এমনি এক ঝড়ে তিনিও হারিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে।

সেই বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী আবার স্পষ্ট হয়ে তাঁর মনে জেগে উঠল। বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে উঠল অকস্মাৎ।

নৌকোয় ফিরে এসে মুরারী চক্রবর্তী চুপ করে এক কোণে শুয়ে পড়লেন। শশাঙ্ক চৌধুরীর শোক তাঁর নিজের বুকে যেন আজ বিঁধেছে। সেই বিশ বছর আগেকার ঝড়ের সঙ্গে এই ঝড়ের প্রভেদ নেই কিছু। নদীর বুকে একই উত্তাল জলস্রোতে যেন দুই কাহিনীর মিলন ঘটেছে।

মুরারী চক্রবর্তী বিশ বছর আগেও ছিলেন বলিষ্ঠ যুবক। এতটা স্বাস্থ্যের অবনতি তখনও তাঁর হয় নি। ইচ্ছে করলে আবার বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তরুণী স্ত্রী ও অবোধ শিশুপুত্রের স্মৃতির মর্যাদা রেখেছেন তিনি। তপতীর আশায় সম্বরণের প্রতীক্ষার মত এতটা কাল কাটিয়েছেন মুরারী চক্রবর্তী। ভেবেছিলেন হয়ত একদিন স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। জলের স্রোতে ভেসে-যাওয়া মানুষের সন্ধান অনেকদিন পরেও পাওয়া গেছে এমন নজীরও বিরল নয়। আশায় আশায় দিন গুণে মুরারী চক্রবর্তী অকালে প্রৌঢ় হয়ে গেলেন তবু ফিরে পেলেন না তিনি হারানো স্ত্রী আর ছেলেকে।

সেই থেকে মুরারী চক্রবর্তী যাত্রা দলে গানের মাষ্টারীর চাকরি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দলের লোকদের গান শেখান তিনি। বড়দের চেয়ে ছোটদের গান শেখানোর দিকেই তাঁর আগ্রহ বেশি। ছোট ছেলেদের মাঝে তিনি দেখতে পান তাঁর হারানো ছেলের প্রতিচ্ছবি। সেই সব ছেলেদের মাঝে নিজের ছেলের স্মৃতিটুকু মিশিয়ে দিয়ে তিনি ভুলে থাকতে চান।

অনেকদিন দূর গাঁয়ে গানের আসরে সমবেত দর্শক-শিশুদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতেন মুরারী চক্রবর্তী। হয়ত খুঁজতেন তাঁর হারানো ছেলে খোকনের মুখের আদল। যদি ঐ সব ছেলেদের মাঝে কোনক্রমে পাওয়া যায় তাঁর ছেলের সন্ধান!

হাজার হাজার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর নিজের ছেলের চেহারাটা যেন ওদের চেহারার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অস্পষ্ট হয়ে গেছে তাঁর নিজের ছেলের মুখ। ভাল করে মুখটা যেন এখন মনেই পড়ে না।

নৌকো ছাড়বার তখনও দেরি ছিল অনেক। পরিশ্রান্ত হয়েছিল মাঝির দল। এদিকের রাতটা বিশ্রাম করে শেষ রাত্রের দিকে নৌকো ছাড়বে শহরের দিকে—তাই স্থির করা হ'ল। গানের আসর না বসলেও শশাঙ্ক চৌধুরী বায়নার

পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য টাকা না পাঠালেও তাঁরা চাইতে পারতেন না—তবু চৌধুরী তাঁর ভদ্রতা রক্ষা করেছেন।

সন্ধ্যা গড়িয়ে তখন রাত হয়েছে। নৌকোর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মুরারী চক্রবর্তী ঘুমুতে চেষ্টা করলেন, ঘুমুতে পারলেন না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের উপরও তাঁর সমস্ত অতীতস্মৃতি ভাসতে লাগল। চারদিকে তখন গভীর নিস্তব্ধ।

হঠাৎ শিশুর কান্নার শব্দে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন মুরারী চক্রবর্তী। নিশীথ রাত্রে নদীর বুকে কোন্ শিশু কাঁদে? এ কান্না যেন তাঁর খোকনের কান্নার মত। বিশ বছর আগে খোকন ঠিক এমনি করেই কাঁদত।

উঠে বসলেন মুরারী চক্রবর্তী। ভুল হয় নি তাঁর। সত্যি, কার শিশু যেন কাঁদছে। নদীপথে একটি ছোট নৌকো থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ।

অনবরত কাঁদছে শিশু। বিরাম নেই কান্নার। সেই নৌকোর লোকরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কে যেন বলছে তিরিক্ষি মেজাজে—ফেলে দাও ছেলেটাকে জলে। পরের ছেলে রেখে কি হবে? ওর কান্না কি কেউ থামাতে পারবে? যত সব পরের ছেলের ঝামেলা।

পরের ছেলে? নড়ে চড়ে বসলেন মুরারী চক্রবর্তী। বলছে কি নৌকোর লোকেরা? কোন্ পরের ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা?

নৌকোর ঝাপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন মুরারী চক্রবর্তী। গলুইর কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটু দূর দিয়ে একটি নৌকো চলে যাচ্ছে। ডাকলেন—এই মাঝি, নৌকো ভিড়াও।

অনেক ডাকাডাকিতে নৌকো ভিড়ল যাত্রাদলের নৌকোর কাছে। মুরারী চক্রবর্তী লাফ দিয়ে সেই নৌকোয় উঠে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—ছেলে কাঁদছে কেন? কার ছেলে?

নৌকোর লোকগুলি যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল তারা। নৌকোয় কোন স্ত্রীলোক নেই, সবাই পুরুষ। মুরারী চক্রবর্তী বললেন—তোমরা চুরি করে এনেছ এই ছেলেটিকে। পুলিসে দেব তোমাদের।

একজন প্রৌঢ় লোক এগিয়ে এসে বলল—বাবু, আমাদের গাঁয়ের সুমন্ত মাঝির কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে এটি। সুমন্তর বউ নেই, তাই ওর কোন মাসীর কাছে রাখতে চলেছিল এই ছেলেটিকে। আমাদের এই নৌকোতেই যাচ্ছিল সে, আজ সকালে ওর কলেরা হ'ল, পথে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়েছি ওকে। এখন এই ছেলেটিকে নিয়ে কি করি বলুন ত? বড্ড কাঁদে ছেলেটি।

মুরারী চক্রবর্তী এগিয়ে গেলেন। বললেন—দেখি কেমন ছেলে?

মুরারী চক্রবর্তীর কোলে এসে ছেলেটি কান্না ভুলে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। ছেলেটি কি চিনতে পারল মুরারী চক্রবর্তীকে? এত বছর পরেও তাঁর খোকন কি সেই শিশুটিই রয়ে গেছে?

কি ঢলঢলে মুখ! কি সুন্দর ভীরু মৃগের মত চোখ! মুরারী চক্রবর্তী ছেলেটিকে চুমু খেলেন।

নৌকোর লোকেরা বলল—আপনার কোলে গিয়ে ছেলেটি ঠাণ্ডা হয়েছে বাবু! বোধ হয় আপনাকে চেনা লোক মনে করেছে। সুমন্ত মাঝির বাঁচার কোন আশা নেই বাবু, আপনি ওকে নিয়ে যান।

মুরারী চক্রবর্তী বুকে চেপে ধরলেন ছেলেটিকে। বলে কি লোকেরা? এই শিশুটিকে নিয়ে কি করবেন তিনি? কোথায় রাখবেন?

বললেন—না না, পরের ছেলে নিয়ে কি হবে? তোমরা নিয়ে যাও, তোমাদের বউ আছে, ছেলেপুলে আছে, তাদের কাছে থাকবে।

কিন্তু দিতে গেলেও ছেলেটি কোল থেকে নামতে চাইল না। হেসে উঠলেন মুরারী চক্রবর্তী। প্রৌঢ় বয়সে আবার কি তাঁকে সংসারী সাজাবে এই দুগ্ধপোষ্য শিশু?

হয়ত ভগবানের তাই ইচ্ছা। ছেলেটিকে কোলে করে নেমে এলেন মুরারী চক্রবর্তী। ভাবলেন, নিজের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে মাধবী বোষ্টমীর কোলে ফেলে দেবেন এই শিশুটিকে। তাঁরই গানের শিষ্যা সেই বোষ্টমী। কাজেই তাঁর কথা ফেলতে পারবে না। বরং খুশি হবে মাধবী।

মাধবীর কেলিকুঞ্জে বেজে উঠবে দেবশিশুর পদধ্বনি। যশোদার শূন্য গোকুল আবার ভরে উঠবে চপল কানাইয়ের কলকাকলিতে। ছুটোছুটি করবে, ননী চুরি করে খাবে—

কিন্তু এখন? এখন কি খাবে এই শিশুটি? খিদেয় বুঝি আবার ঝিমিয়ে পড়েছে।

মুরারী চক্রবর্তী চললেন চৌধুরী বাড়ীর দিকে। ঝি-চাকরের অভাব নেই, আর শিশুর খাদ্যেরও অভাব নেই সেই বাড়ীতে। সেখানে গিয়েই সুস্থ করে তুলতে হবে শিশুটিকে, তার পর রাত ভোর হতেই যাত্রাদলের সঙ্গে শহরে না গিয়ে সোজা নিজের গাঁয়ে চলে যাবেন মুরারী চক্রবর্তী।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে শশাঙ্ক চৌধুরীর দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এত রাত্রেও বৃদ্ধ চৌধুরী ঘুমোন নি। একটু

ডাকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাত্রের অস্পষ্ট আলোকেও শশাঙ্ক চৌধুরী থমকে গেলেন শিশুটিকে দেখে। চেঁচিয়ে উঠলেন—কোথায় পেলেন এ ছেলেকে ? এযে সুহাস—আমার সুহাস।

বাঘের মত কেড়ে নিলেন ছেলেটিকে মুরারী চক্রবর্তীর কোল থেকে। ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় পেলেন একে ? কে উদ্ধার করেছে ? ডেকে নিয়ে আসুন তাকে।

কিন্তু জবাব দেবার মত ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন মুরারী চক্রবর্তী। তাঁর চোখের সামনে যেন একটা ভোজবাজীর খেলা চলছে। অতিকষ্টে শুধু জবাব দিলেন—একটা নৌকো থেকে উদ্ধার করেছি ওকে।

—কোথায় সে নৌকো ? ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শশাঙ্ক চৌধুরী।

—সে নৌকো চলে গেছে। কোন্ এক মাঝি এই শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। মুরারী চক্রবর্তী কথাগুলি বললেন অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত।

শশাঙ্কবাবু চেঁচিয়ে বললেন—ওরে কে আছিস, শীগগির নৌকো পাঠিয়ে দে বাবুগঞ্জের হাটের দিকে। বোয়ালমারীর দিকেও পাঠিয়ে দে। বাড়ীর আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দে।

মুরারী চক্রবর্তীর দিকে চেয়ে শশাঙ্ক চৌধুরী বললেন—জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী, সুহাসই আমার ছেলের প্রথম ও শেষ সন্তান। তাই ভেবেছিলাম চৌধুরীবংশের প্রদীপ বুঝি নিভে গেল। কিন্তু মা জগদম্বা ফিরিয়ে এনেছেন বংশের প্রদীপকে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শশাঙ্কবাবু। পরে বললেন—আমার বৌমাকেও যদি ফিরে পেতাম এমন করে !

কম্পিত কণ্ঠে বললেন মুরারী চক্রবর্তী—বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে আপনার পুত্রবধূ। খোঁজার কোন দরকার হবে না।

শশাঙ্ক চৌধুরী বললেন—ছেলে ত তাদের জন্যই ছুটে বেড়াচ্ছে পাগলের মত এদিকে-ওদিকে। তাকে খুঁজে আনবার জন্যও লোক পাঠাতে হবে।

ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মুরারী চক্রবর্তী—আমাদের গানের আসর তা হলে কি আবার বসবে ?

শশাঙ্কবাবু জবাব দিলেন—না, আলোই শুধু জ্বলবে, গান বাজনা আর হবে না।

নৌকোয় ফিরে এলেন মুরারী চক্রবর্তী। শুয়ে পড়লেন তাঁর বিছানায়। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেন চৌধুরী-বাড়ীর দিকে। আলো জ্বলে উঠল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মুরারী চক্রবর্তী—তাঁর জীবনে আর আলো জ্বলবে না, তবু তাঁকে গাইতে হবে। গান ছাড়া তাঁর জীবনে যে আর কোন সম্বল নেই।

মুরারী চক্রবর্তী ডাক দিলেন দলের অধিকারীকে। বললেন—উঠুন, উঠুন—রাত বুঝি প্রায় শেষ হয়ে এল। নৌকোর মাঝিদের চেঁচিয়ে বললেন—শীগগির নৌকো ছাড়, নদীতে জোয়ার এসেছে। এপার ছেড়ে ওপারের দিকে পাড়ি দাও।

জলস্রোত তখন সত্যি শব্দমুখর হয়ে উঠেছে। নিস্তরঙ্গ নদীতে উঠেছে ঢেউ।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসতীশ রায়

শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্জ্জনে ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা করবার জন্তে। সমস্ত ভগবৎ প্রেমিকদের তিনি সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বোলপুর ষ্টেশন এবং শহর থেকে মাইলখানেক দূরে, এক বিরল-তরু উন্নত-অবনত পঞ্চাশ ফুট উঁচু বিরাট ডাঙা জমির উপর ছিল ভুবনডাঙা বলে স্বল্প-লোক অধ্যুষিত একখানি গ্রাম, তারি প্রতিবাসী হ'ল 'শান্তি-নিকেতন', দূরদিগন্ত-প্রসারিত মাঠের উপর মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত সাধন-আশ্রম। তার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যে দিকেই চাওয়া যায় ধূ ধূ করছে শূন্য প্রান্তর তামাটে, রোদ-পোড়া, আর তার মাঝে মাঝে প্রকৃতির এই নিদারুণ রিক্ততার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দীর্ঘ তাল গাছের সারি। যেন যষ্ঠীহস্তে নন্দী-ভৃঙ্গীর দল শ্মশানবাসী শিবের প্রহরায় রত।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি দেশে। রবীন্দ্রনাথ তাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি বুঝলেন শুধু ভাঙার মধ্যে নয় গড়ার মধ্যেই প্রকৃত দেশ-সেবা: 'অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে না মানে বাহুর আক্রমণ, একটি প্রদীপ-শিখা সম্মুখে ধরিলে অমনি সে করে পলায়ন।' এ জন্তে চাই প্রকৃত মানুষ গড়া—চাই উপযুক্ত শিক্ষা এবং তা চাইতে গেলে কবিকে প্রাচীন ভারতের দিকে তাকাতে হ'ল। তাঁরা স্থাপন করতেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বাল্য-কালে গুরুগৃহে বাস করে শিষ্যেরা জীবন-পথের পাথেয় সংগ্রহ করতেন। তিনি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থলদের যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে মহর্ষির অনুমতি নিয়ে পিতার সাধন-আশ্রমে 'শান্তিনিকেতন' ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে বিদ্যালয় গড়েন নিজের ও বন্ধুবান্ধবদের ছেলেদের নিয়ে। তাঁর জমিদারীর আমলা কর্ম্মচারীদের মধ্য থেকেই উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন করেন কাউকে কাউকে। বাইরে থেকেও কেউ কেউ যোগ্য শিক্ষক আসেন তাঁর আকর্ষণে।

স্বদেশী আন্দোলনের পাদপ্রদীপ থেকে সহসা সরে পড়ায় সহ-কর্ম্মীদের কাছ থেকে সেকালে অনেক বিরূপ সমালোচনা ও বিদ্রূপ বাণী কবি রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হয়েছিল কিন্তু তিনি তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। দেশের পক্ষে নিজে যা ভাল বলে বুঝেছিলেন সেই পথই অনুসরণ করেছিলেন সেদিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন সাধন-আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন তৎপুত্র রবীন্দ্রনাথেরই পরিকল্পনা।

প্রাচীন ভারতে কিশোরদের বিদ্যাদান-পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ছেলেরা শহরের সমস্ত প্রকার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে লোকালয়ের বাইরে, প্রকৃতির শান্তির মধ্যে আনন্দপূর্ণ-জীবনযাপন করবে, শুধু পাঠ-চর্চ্চা নয়, ধর্ম্মচর্চ্চাও হবে তাদের শিক্ষার অন্তর্গত এই ছিল তাঁর অভিলাষ। কৃত্রিমতাহীন প্রকৃতির প্রাত্যহিক সৌন্দর্য্য আবেষ্টন গান, গল্প, পাঠ ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের সুকুমার জীবন-বিকাশে সহায়তা করবে এই তিনি চেয়েছিলেন। পরিবেশের মধ্যে কোন রকম কৃত্রিমতা থাকবে না। বদ্ধ ঘরের মধ্যে চেয়ার টেবিল বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হয়ে তাদের পাঠ দেওয়া হবে না কিম্বা তারা তা নেবেও না। মুক্ত বাতাসে গাছের তলায়, ছায়া-ঘেরা নিকুঞ্জে আনন্দের সঙ্গে আসন পেতে বসে ছাত্রেরা শিক্ষকদের সহায়তায় পাঠ চর্চ্চা করবে। মোটের উপর শিক্ষা হবে ছাত্রদের আনন্দের ভোজ—তাদের তা গিলিয়ে দেওয়া হবে না। Forced feeding তা কোনও ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য-কর হয় না। এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তখনকার দিনে আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপারে এ সত্য কেউ অনুভব করেন নি এবং এই প্রগতির দিনেও কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রজীবনে ধর্ম্মশিক্ষাকে আমল দেওয়া হয় না। আমাদের রাষ্ট্র যেমন ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ বলে আমরা ঘোষণা করেছি আমাদের বিদ্যালয়ও তারি একটি অঘোষিত রূপ। খ্রীষ্টান বিদ্যালয়ের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু কেবলমাত্র নিয়মানুবর্ত্তিতা বা Discipline শিখিয়ে ছাত্রদের মানুষ করা যায় না, তার একটা ভিত্তি থাকা চাই। ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত বিদ্যার গোড়ার কথা—তাঁকে জানলেই সব জানা যায়, বিশ্বের রহস্য প্রকাশ পায়। তাই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মকে শিক্ষার বিষয় বলে বিবেচনা করে ছিলেন সেদিন। তাঁর মনে হয়েছিল ছাত্রের চরিত্র গঠনে ধর্ম্ম অপরিহার্য্য। এ গানটি আপনারা সকলেই শুনেছেন, 'দিনে দিনে ফুল যে ফোটে, ফুলের মতই ফুটে ওঠে জীবন তোমার আঙিনাতে, নূতন করে নূতন প্রাতে।' মানুষের জীবন-বিকাশ হবে প্রকৃতির বিকাশেরই মত। প্রকৃতির আবেষ্টন থাকবে তার চার পাশে তবেই তার বিকাশ হবে স্বাভাবিক। নইলে সে হয় যন্ত্র—কিন্তু মানুষ ত যন্ত্র নয়।

শান্তিনিকেতনে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০০র কাছাকাছি। কতকগুলি Dormitoryতে আদ্য, মধ্য ও শিশু এই তিন বয়সের ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতি ঘরে দুজন করে অধ্যাপকের দায়িত্বে আমরা বাস করতাম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আমাদের সব কাজ আমাদের নিজে-দেরই করতে হ'ত,আর আমাদের সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডে আমাদের শিক্ষক-দের সক্রিয় সমর্থন ছিল। আমরা জুতা প'তাম না, মাছ মাংস

খেতাম না। যথা সময়ে পালা করে সকাল-সন্ধ্যে নিজেদের ঘর ঝাট দিতাম, নিজেদের থালা-বাসন নিজেরাই মেজে নিতাম। প্রথম দিকে কয়েক বছর শালপাতার থালাতে খাওয়া হয়। বিছানা পাতা, বিছানা তোলা, বই খাতা গুছিয়ে রাখা সবই আমাদের কর্ত্তব্য ছিল। এ সব ব্যাপারে কোন মাইনে করা সেবকের প্রতি আমরা নির্ভরশীল ছিলাম না। খুব ভোরে আমাদের উঠতে হ'ত, বোধ হয় রাত চারটে সাড়ে চারটে। মুক্ত মাঠেই প্রাতঃকৃত্য সেরে ঝাটপাট চুকিয়ে, সমবেত শরীরচর্চ্চায় যোগ দিয়ে প্রাতঃস্নানের ব্যাপার আমাদের হয়ে যেত ভোর থাকতেই—কি শীত কি গ্রীষ্ম। শীতের দিনে সেই ধূ ধূ করা মাঠের মধ্যে শীতের তীব্রতাটা ভেবে দেখবেন। কিন্তু আমাদের কোন কষ্ট হ'ত না। বরং স্নান করতে না পেলেই যেন শরীরের জড়তা কাটতে চাইত না। বোধ হয় দুমকা জেলার, দুজন বিপুলাকৃতি সাওতাল তিন-চারটি বিরাট চৌবাচ্চা আমাদের ব্যবহারের জন্তে কুয়ো থেকে জল তুলে ভর্ত্তি করে রাখত। কাছেই একটা গাব-গাছের তলায় মগভরা তেল থাকত। আমরা জনৈক শিক্ষকের অধীনে শরীরচর্চ্চা সেরেই শীত এড়াবার জন্তে বেশ করে সর্ব্বাঙ্গে তেল মেখে মগে করে জল ঢালতে সুরু করতাম। আশ্চর্য্য, কুয়ো থেকে সন্ত-তোলা জল থেকে যেন ধোঁয়া উঠত—যেন উষ্ণ প্রস্রবণের গরম জল গায়ে ঢালছি মনে হ'ত। কিন্তু বেশীক্ষণ চৌবাচ্চায় পড়ে থাকলেই তা বরফ-গলা জলের মত ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই তাড়াতাড়ি স্নানের ব্যাপারটা সারতেই আমাদের উৎসাহ দেখা যেত। তার পর সমবেত উপাসনার বৈদিক-মন্ত্র উচ্চারণের আগে, খোলা মাঠের মধ্যে আসন নিয়ে আমাদের বসতে হ'ত কিছুক্ষণ ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য। আমাদের বয়স তখন ঈশ্বর-চিন্তার অনুকূল ছিল না অবশ্য। কিন্তু এই বসারও সার্থকতা আছে। জানি না ত কোন মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর করুণার বিন্দু অন্তরের শুক্তির মধ্যে পড়ে মুক্তারূপে সার্থক হবে।—সেজন্য দৈনিক উপাসনার অভ্যাসে অন্তরকে প্রস্তুত রাখাও দরকার।

মোটের উপর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য, কাজ ও বিশ্রাম সবকিছুই কঠিন নিয়মে আবদ্ধ ছিল। তা থেকে পরিত্রাণ ছিল না কারোরই—এক আশ্রমের হাসপাতালের সাময়িক অধিবাসী অসুস্থদের ছাড়া। বাড়ীর আরামে অভ্যস্ত, আমরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং সেজন্যে শাস্তিও পেয়েছি। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চাইতেন সৈনিকরা যেমন ব্যারাকে কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে থেকে কর্ম্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে ওঠে তাঁর ছাত্ররাও তেমনই হউক। তখন সুকুমার শিল্পের মধ্যে নাচ চালু ছিল না। গানই রীতিমত ক্লাস করে হ'ত। প্রসিদ্ধ মারাঠী পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী বীণ যোগে ক্লাসিকাল সঙ্গীত শেখাতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিতেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্লাস। রবীন্দ্র-নাটকও অভিনীত হ'ত তাঁর অধিনায়কত্বায়।

তখন শান্তিনিকেতনে বা' বাড়ীঘর ছিল তা' হাতে গুণা যেত। চারদিকে ধূ ধূ করত দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মত প্রান্তর। আশ্রমের অধিবাসী ব্যতীত বাইরের লোকজনের দেখা কমই পেতাম। বোলপুরের হাটের দিনে রাঙা-মাটির রাস্তা বেয়ে সাওতালরা তাদের সওদা নিয়ে হাটে যেত, আর তাদের অনুসরণ করত কাণে ফুল-গোঁজা তাদের সহচরীরা। ভুবনডাঙা গ্রামের অধিবাসী কেউ কোন দিন হয়ত এসে পড়ত কাজের খোঁজে শান্তিনিকেতনে। আশ্রমে আমাদের গুরুদেব এই কয়টি ছাত্র, অধ্যাপক ও তাঁদের সেবকদের নিয়েই ছিল একটা আলাদা জগৎ। বাইরের বিস্তৃত জনহীনতার মধ্যে শান্তিনিকেতন ছিল যেন একটা মরুদ্যান, গাছপালা, ফলে ফুলে সাজানো।

তবে রবীন্দ্রনাথকে খুব নিকট করে নিবিড় করে আমরা পেয়েছিলাম, যা পরবর্ত্তীদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় নি। তিনি আমাদের ইংরেজী অনুবাদের ক্লাস নিতেন। নামকরা বিদেশী ইংরেজী লিখিয়েরা কিভাবে ভাব প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দগুলিকে ব্যবহার করেন তার ধরন তিনি আমাদের শেখাতেন। অর্থাৎ ইংরেজী থেকে বাংলা করে তার আবার ইংরেজী করার চেষ্টা চলত গুরু ছাত্রের মধ্যে। সে এক সম্পূর্ণ অভিনব রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যা কিছু বাংলা রচনা যখনই করতেন, ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের একত্র করে সন্ধ্যার পর পড়ে শোনাতেন। কবির এ রকম অনেক কিছু রচনা বাইরে ছাপবার আগেই আমাদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর সঙ্গীত সম্বন্ধে ত কথাই নেই। রচনা শেষ হলেই, পাছে সুরটা ভুলে যান এই ভয়ে কবি ছুটতেন লেখাটা হাতে ধরে, তাই গুন গুন করতে করতে নাতি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। তিনি থাকতেন আশ্রমের পশ্চিমদিকে 'বেণুকুঞ্জ' বলে বাংলো বাড়ীতে। দিনেন্দ্রনাথ, কবির কাছ থেকে গানটি রপ্ত করে নিয়ে,তাতে স্বরলিপি আরোপ করতেন এবং ছেলেদের গানের ক্লাসে শিখিয়ে দিতেন। এমনি করে নানা গানের ফুলে সাজি সাজিয়ে প্রায় প্রত্যেক ১১ই মাঘে কলকাতা অভিযান করতেন দিনেন্দ্র সমভিব্যাহারে 'গানের দল'—রবীন্দ্রনাথও সঙ্গে থাকতেন। তাঁর আচার্য্যের অভিভাষণের সঙ্গে সেই সব গান পরিবেশিত হ'ত। তা ছাড়া সে সব গান আশ্রমে বৈতালিকবৃন্দ গেয়ে গেয়ে আশ্রম পরিক্রমা করতেন সান্ধ্য-ভোজনের পর। দারুণ গ্রীষ্মের শেষে যে দিন প্রথম প্রবল ধারাপাত হ'ত, মেঘ ডাকত, বিদ্যুৎ চমকাত, দিগন্তব্যাপী নিবিড় মেঘে বিরাট আকাশ যেন মধুভরা মৌচাকের মত রসের ভারে ভেঙে পড়ত আমাদের হয়ে যেত অনধ্যায়, Rainy day, কলকাতায় ছাত্রদের বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ করবার ভয়ে যে Rainy day হয় এ তা নয়, বৃষ্টিতে ভিজতে যাবার জন্তই Rainy day। আমরা বই খাতা ছুড়ে ফেলে, রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সঙ্গীত করতে করতে দল বেঁধে হৈ চৈ করে মাঠে ছুটে বেরিয়ে পড়তাম। এক একদিন দেখতাম রবীন্দ্রনাথও বেরিয়ে পড়েছেন আমাদের সঙ্গে জলে ভিজতে। তাঁর জামা, পাজামা বৃষ্টিতে ভিজে

শরীরের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে গেছে, শাদা চুল দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরছে—মুখ আনন্দ হাসিতে উদ্ভাসিত।

আশ্রমে প্রতি বুধবার সকালে মন্দিরে উপাসনা হ'ত। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকাকালীন সে উপাসনা তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হ'ত। 'শান্তিনিকেতন' নামক কয়েকখণ্ড পুস্তকে তা সমস্ত লিপিবদ্ধ আছে। উপদেশ দেওয়া কালে তা কোন ছাত্র দ্বারা দ্রুত লিখিত হ'ত। পরে সেটি কবি ভাল করে পুনর্লিখন করে ছাপতে দিতেন। উপাসনাকালে নূতন সঙ্গীতগুলিও গানের দল দ্বারা গীত হ'ত।

বিশ্বপ্রকৃতি কবির মনে যখন যে দোলা দিত তিনি সেই দোলা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন সুরের সাহায্যে এবং এযুগে তিনি ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও প্রকৃতি-সঙ্গীত যত রচনা করেছেন অধিকাংশই তাঁর শিষ্যদের পানে তাকিয়ে। তারাই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে বললে যেন কেমন শোনায় কিন্তু এ কথা সত্যি রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্য ও সঙ্গীত-রচনা কতকটা নিরবলম্ব—যেন নিজের মনের মধ্যে অবগাহন করে ও বিশ্ব প্রকৃতির পানে তাকিয়ে। পরবর্ত্তী যুগের কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের কিছু কিছু শান্তিনিকেতনের শিষ্যদের উপলক্ষ্য করে বললে বোধ হয় গর্ব্ব করা হয় না। উপদেশ, ধর্ম্ম-সঙ্গীত ও প্রকৃতি-নাট্যগুলি অনেকাংশে তাঁর আত্মোপলব্ধি, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের দ্বারা অনুসৃত গীত ও অভিনীত হবার জন্যে। এ যেন তাদের কথা তাদের হয়ে তিনি বলছেন। 'শান্তিনিকেতন' এমন এক বিষয় যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। কারণ তিনি নিজের বিদ্যালয়ের কথা নানা ভাবে নানা রচনায় মধ্যে বলেছেন।

'শান্তিনিকেতনে' প্রাচীন ভারতের আদর্শে এ দেশে ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে কবি রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম্মজীবনকেও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন কবির আত্মবিকাশের জন্যও প্রয়োজন ছিল।

মহর্ষির সাধন-জীবনের পুণ্যফল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আনন্দবাদী ঋষি, তাঁর দেবতা ছিলেন উপনিষদের আনন্দময়, তাই তিনি রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে এই আনন্দমঠ।

আসন্ন সন্ধ্যায়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অস্তোন্মুখ সূর্য্যপানে চেয়ে চেয়ে অপরাহ্ণ শেষে
আসন্ন সন্ধ্যার শুনি পদধ্বনি এবে ;
দিগন্তের কোন্ পারে কারা যেন যায় নিরুদ্দেশে
অনন্তের পথে কবে মোরে ডেকে নেবে ?
স্থিতি মোর স্থাণু নয়, গীতি মোর সুরে সুরে ভরা,
যুগে যুগে আসা যাওয়া বস্তু সত্তা নিয়ে খেলা করা।

মানস-জগত হতে সরে যায় আলোকের রেখা,
বিশ্বপ্রকৃতির স্তরে নামে যেন ছায়া ;
আশা ছিল একদিন হবে সেই অরূপের দেখা,
বিষাদের অশ্রুলীলা করিতেছে মায়া।
অজস্র বিস্তীর্ণ মোর কামনার তুলি ও লেখন,
ক্ষণিক জীবনে জাগে অন্তহীন বিরহ-বেদন।

অনিমেষ নেত্রে আমি হেরিতেছি সূর্য্যাস্তের রূপ,
মুছে আসে দিবসের খণ্ড চিত্রগুলি।
সন্ধ্যার পূরবী তানে তারাদের অর্চনার ধূপ
জ্বলিবে কি নীল নভে আবরণ খুলি ?
দুঃখে সুখে মুহূর্ত্তেরা দিয়ে যায় মর্ম্মে মর্ম্মে দোলা,
অমৃতের যাত্রীদল মৃত্যুপারে রেখেছে কি ঝোলা ?

কত ঝড়, কত মেঘ এল গেল মোর চিত্তাকাশে,
ছিন্ন পৃষ্ঠা উড়িতেছে ইতিহাস হতে।
সংসার সমুদ্রতটে অতীতের প্রতিধ্বনি আসে
হৃদয়-উপল শত ডুবিতেছে স্রোতে।
সৈকত-শয্যার 'পরে দীর্ঘশ্বাসে আঁখি-জল ফেলা,
সীমাহীন পারাপারে সন্ধ্যা নামে, পড়ে আসে বেলা।

ভারতীয় জীবনযাত্রার মান

শ্রীরমেশচন্দ্র পোদ্দার

মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ জি. পি. ওয়াটকিন্স বলেছিলেন—'জীবনযাত্রার মান' নির্দ্ধারিত হয় সততোন্মুখ চাহিদা যে ভোগসীমায় পরিপূর্ণ হয় তাহা দ্বারা এবং 'জীবনযাত্রার মান'ই আর্থিক ও সামাজিক অগ্রগতির কষ্টিপাথর। তাঁর এ মহাবাণীর আলোকে 'ভারতীয় জীবনযাত্রার মান' বিচার করতে চাই। তাই আজকের এ প্রবন্ধের অবতারণা।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা দাদাভাই নওরোজি সর্ব্বপ্রথম ১৮৭৬ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বোম্বের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন সভায় 'ভারতীয় জীবনযাত্রার মান' সম্পর্কে চিন্তাশীল মধ্যবিত্ত সমাজে আলোড়ন আনয়ন করেন।

বৎসরে ভারতীয় জনসাধারণের গড়ে কত আয় হয় তাহা বিবৃত করে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্রোমার (Sir Eveling Barey) এক হিসাব দাখিল করেছিলেন—তাঁর হিসাবে ভারতবাসীর গড়ে বৎসরে আয় ছিল ২৭৲ টাকা করে।

কিন্তু দাদাভাই নওরোজি সেদিন প্রমাণ করেছিলেন যে, ভারতবাসীর গড়ে আয় মাত্র ২০৲ টাকা করে। তিনিই সরকারী নজির দেখিয়ে দাবি করেছিলেন ভারতীয় জনসাধারণের জনপ্রতি খাদ্যশস্যের ভোগসীমা অন্ততঃ গড়ে ৩৫'২৭ আউন্স করে যেন হয়। যখন ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ছিল ২০৲ টাকা মাত্র এবং গড়ে জনপ্রতি খাদ্যগ্রহণের হিসাব ছিল মাত্র ১৪ আউন্স—তখনকার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গড়ে আয় কত ছিল দেখা যাক্ :

দেশ	গড়ে বাৎসরিক আয়
আমেরিকা	২৭ পাউণ্ড
অষ্ট্রেলিয়া	৪৩ ,,
ব্রিটেন	৪১ ,,
ফ্রান্স	২৩ ,,
জার্ম্মানী	১৮ ,,
রুশিয়া	১০ ,,
তুরস্ক	৪ ,,
ভারতবর্ষ	১ ,, ১০ শিলিং

এ সময় সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০,০০০,০০০ জন এবং ভারতে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ছিল ২০০,০০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সেদিন অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ সনে ভারতবাসীকে ৩৬২,৯৬৬,৯৮০৲ টাকায় কর দিতে হয়েছিল।

সেদিন ভারতবর্ষের এই গুরু করভারের সাফাই গেয়ে ১৮৭১ সনের ৩রা মার্চ্চ লর্ড মেয়ো বলেছিলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণকে মাত্র মাথাপিছু ১ শিং ১০ পেঃ করে দিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশের মাথাপিছু করের পরিমাণ :

অষ্ট্রেলিয়া	১৯ শিং. ৭ পে.
রুশিয়া	১২ ,, ২ ,,
তুরস্ক	৭ ,, ৯ ,,

কিন্তু যেখানে মাথাপিছু আয় মাত্র ৩০ শিং, সেখানে ১ শি. ১০ পে. কর কিরূপ জীবনযাত্রার ছবি মনে প্রকটিত করে?

সেদিনের বিদেশী সরকার আর আজকে নেই, বর্ত্তমান ভারতবর্ষ—সার্ব্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র। তাই আজকে আমাদের আর্থিক অগ্রগতি কতদূর পর্য্যন্ত এগুলো তাই বিচার্য্য।

১৯৫১ সনের আদম সুমারী দৃষ্টে জানা যায়, ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪ জন; কিন্তু ভারত সরকারের ১৯৫৭ সনের হিসাবে জানা যায় যে, এই সময়ের মধ্যেই জনসংখ্যা ৩৯'২৪ কোটিতে পৌঁছেছে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে বলা হয়েছিল যে, জনসংখ্যা শতকরা ১'৫ হিসাবে বাড়বে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, উহা প্রতিবৎসরে শতকরা ১'৭৫-এরও বেশী বর্দ্ধিত হচ্ছে। (Commerce 24. 1. 59)। জনসংখ্যা যদি এভাবে বেড়ে যেতে থাকে তবে "জীবনযাত্রার মান" কোথায় দাঁড়াবে এ কথা চিন্তা করবার আবশ্যকতাও আছে।

'ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট' পত্রিকা এক হিসাব গত বৎসরে প্রকাশ করেছিল; উহাতে গত ১৯৪৯-৫৩ সন পর্য্যন্ত খাদ্যোৎপাদনের এক হিসাব দিয়ে একথা লিখেছিল যে, "৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি ভারতবর্ষে রয়েছে এবং ভারতের লোকদের গড়ে ১৪ আউন্সের বেশী খাদ্য গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছে না—অতএব ম্যালথাস সাহেবের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত "Theory of diminishing return" ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

ভারত সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা ডাঃ জ্ঞানচাঁদও একথা তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Some aspects of the Population Problem of India"-তে স্বীকার করেছেন।

---

* পৃথিশ রায় লিখিত "Poverty in India" pp. 339-41 দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ২'৩ একর করে, কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের হিসাব :

রুশিয়া	৩০'৫ একর
আমেরিকা	১২'৬ ,,
চীন	১৩'৫ ,,
ইন্দোনেশিয়া	৬'৪ ,,

উপরোক্ত হিসাব-এর সঙ্গে বিভিন্ন দেশে প্রতি একর জমিতে কিরূপ পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন হয় তাহাও বিচার্য্য :

পাঃ হিসাবে প্রতি একরে ফলনের হিসাব

* (ক) চাউল—	(১) চীন	২৩০০ (চাউল)
	(২) জাপান	৩৬০০ ”
	(৩) ইন্দোনেশিয়া	১৫০০ ”
	(৪) ভারত	১০৫০ ”
(খ) গম—	(১) ফ্রান্স	১৩০০ (গম)
	(২) আমেরিকা	৯৭০ ”
	(৩) আর্জেন্টিনা	৯৮০ ”
	(৪) ভারত	৬১০ ”

এ তথ্যাবলী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় আমরা খাদ্যোৎপাদনেও কিরূপ অবহেলা করে যাচ্ছি।

"মার্ক্সবাদীগণ" "ম্যালথাসের" Theory Population-এ বিশ্বাস করে না, তবুও "নয়া চীন সরকারের" স্বাস্থ্যমন্ত্রী Lu Teh Chuan ১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে Chinese Women's Democratic Federation-এর সভায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ, দেশের আর্থিক উন্নয়ন-পরিকল্পনা জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান চাপে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। এর দ্বারাও আজকে অনুন্নত দেশসমূহে "কার্ল মার্ক্স"-এর মতবাদের ভুল প্রতিভাত হয়েছে।

থাক, এবারে আসা যাক "অর্থনীতিক পরিকল্পনা" গ্রহণের পূর্ব্বে ভারতের "জীবনযাত্রার মান" কিরূপ ছিল সেই প্রসঙ্গে।

আমেরিকার Twentieth century fund (New York) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খাদ্য গ্রহণের এক তালিকা প্রদান করেছিলেন ; ১৯৪৭-৪৮ সনে গড়ে কিরূপ খাদ্য বিভিন্ন দেশে গ্রহণ করেছে এ দ্বারা জানা যাবে :

(পাউণ্ড হিসাবে)

	রুটি	চাউল	চিনি	দুধ, ঘি এবং	ডিমমাছ	তেল	ফল
ব্রিটেন	২০৪'৮	১'০	৭০'৬	৪৪১'০	...	২৮'৪	২২৯'৮
ফিলিপাইন	২৮'৪	১৫৭'৪	২০'০	৩৭'০	৯২'০	১০'০	...
চীন	৮৩'৬	১৪৯'০	১'০	২৩'০	৫'০	১৩'০	...
জাপান	৩৮'৮	২০৪'৮	১'৪	৭'৬	৭৫'৬	১'০	...
আমেরিকা	১৬৮'৪	...	১০৯'৮	৫৮৩'৮	...	৪৫'০	৪৪২'০
ভারতবর্ষ	৩৫'৬	১৩৫'৪	২৭'২	১১৯'৬	২'৮	৭'০	...

উক্ত প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের "খাদ্য গ্রহণের বৈষম্য তালিকা" আলোচনা করা যাক।

	ওজন ব্যতীত	ওজন করা
আমেরিকা	১০০	১০০
ব্রিটেন	৭৫'৬	৭৬'৬
ফিলিপাইন	২৫'৭	২১'৬
ভারতবর্ষ	২০'৮	১৬'৮

বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক "ভোগসীমা রেখা" বিচার করবার পরেও দেখা যাক বিভিন্ন দেশের "ভোগ্যখাদ্যে" কি পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বা ক্যালরি মূল্য আছে :

৩০০০-এর উপরে ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে—
আরজেন্টিনা, কানাডা, আমেরিকা, ব্রিটেন।

২৮০০ ,, ,, ,, ,, ,,—বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী

২৬০০ ,, ,, ,, ,, ,,—অষ্ট্রেলিয়া, তুরস্ক দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি

২৪০০ ,, ,, ,, ,, ,,—গ্রীস, সাইপ্রাস, ইস্রায়েল, ইটালী

২২০০ ,, ,, ,, ,, ,,—মিশর, জাপান, ব্রাজিল, পর্তুগাল ইত্যাদি

২০০০ এবং নীচে ,, ,, ,,—পাকিস্থান, বর্ম্মা, সিলোন, ভারত ইত্যাদি।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের অনগ্রসর দেশগুলির খাদ্যাবস্থা কি ভয়াবহ। এই অনগ্রসর দেশগুলির খাদ্যে আরও কত পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বা ক্যালরি মূল্য থাকা উচিত তার আলোচনা করা যাক।

ক্যালরি

দেশ	বর্ত্তমান মান	আবশ্যকীয় খাদ্যপ্রাণ	শতকরা ঘাটতি হার
সিলোন	১৯৭০	২২৭০	—১৩'২
পাকিস্থান	২০২০	২৩০০	—১২'২
জাপান	২১০০	২৩৩০	— ৯'৯
ফিলিপাইন	১৯৬০	২২৩০	—১২'১
ভারতবর্ষ	১৭৭০	২২৫০	—২৪'৪

Source : F. A. O. Report, Rome, 1952.

* World Population & Production, 1954.

এই যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যগ্রহণের সীমারেখা অর্থাৎ এরও নিম্নে দাঁড়াল অথবা জীবন ধারণের আর শুধু দিন যাপনের গ্লানিতে গিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম—তখন আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সবে যাত্রা সুরু হয়েছে।

এ সময়ে আমাদের জাতীয় আয় ছিল : ১০,৬০০ কোটি টাকা
,, ,, ,, মাথা পিছু ছিল ২৫৫৲ টাকা করে মাত্র
অতঃপর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে আমরা দেখতে পাই :

(ক) আমাদের জাতীয় আয় দাঁড়াল=১০,৮০০ কোটি টাকায়
,, ,, ,, মাথাপিছু হ'ল ২৮০৲ টাকায়।

(খ) খাদ্যোৎপাদন

১৯৫০-৫১

খাদ্যশস্য উৎপাদিত হ'ল—৪৫'৭ মিলিয়ন টন
,, আমদানী ,, —২'০৮ ,, ,,
মোট ৪৭'৭৮ ,, ,,

১৯৫৬-৫৭

খাদ্যশস্য উৎপাদিত হ'ল—৫৭'১ মিলিয়ন টন
,, আমদানী ,, —০'৮ ,, ,,
মোট ৫৭'৯ মিলিয়ন টন

(গ) জন সংখ্যা ৩৫৪ মিলিয়ন ৩৮৪ মিলিয়ন

(ঘ) মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের হিসাব
১৭'৪ আউন্স ২০'৭ আউন্স

এবারে ২য় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন আশা করছেন ১৯৬০-৬১ সনে আমাদের জাতীয় আয় বেড়ে ১৩,৪৮০৲ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত উঠবে এবং মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৮০৲ থেকে ৩৩০৲ টাকায় অর্থাৎ প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ বাড়বে। তবে‡ খাদ্যদ্রব্য মূল্য ১৯৫১ সন থেকে ১৯৫৮ সন যাবৎ ১০০ থেকে ১০৩'৪ এবং সাধারণ সমুদয় দ্রব্য মূল্য ১০০ থেকে ১০৬'১-এ দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আজ আমাদের সামনে রয়েছে দুটো জলন্ত সমস্যার অগ্নি-পরীক্ষা : প্রথমতঃ ক্রমবর্দ্ধমান জনসমস্যা এবং তদ্‌সহ খাদ্য ঘাটতি, দ্বিতীয়তঃ ক্রমবর্দ্ধিত করভার।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে ভোগ্যবস্তুতে কর বসান হয় না, যেমন ডাঃ পি. সি. মহলানবীশ গত সপ্তাহে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন—"In the highly developed countries of the west, taxes on commodities are usually looked upon as regressive as being a burden on the poor." কিন্তু আমাদের জাতীয় সরকার সে কথা ভুলে যান। ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেট দৃষ্টে দেখা যায় যে, জাতীয় আয়ের শতকরা ২৪ ভাগ এসেছে "প্রত্যক্ষ কর" থেকে এবং শতকরা ৬ ভাগ মাত্র এসেছে "অপ্রত্যক্ষ কর" থেকে। অবশ্য ভারত মাত্র ১°/. মাত্র আয়কর দিতে সক্ষম অর্থাৎ প্রায় আনুমানিক ৫ লক্ষ ব্যক্তি মাত্র নূতন আয়করের আওতায় আসেন।

আমাদের যদিও সামনে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আদর্শ, তবু আমাদের দেশে ধনবৈষম্য তার গগনভেদী দম্ভ নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। সে দিন "লক্ষ্ণৌ নগরীতে" যে "ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন" হ'ল—তাতে ৩১তম সভাপতির ভাষণ আমাদের প্রণিধানের যোগ্য। সভাপতি ডাঃ এম. এইচ. গোপাল "অপ্রত্যক্ষ করে"র উপর জোর দিতে সুপারিস করেছেন। এর সঙ্গে অধ্যাপক মহালানবিশের গত সপ্তাহে National Institute of Sciences-এ প্রদত্ত বক্তৃতা আবার স্মরণ করছি—তিনি "দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ"-এর কথা এবং "ব্যয়কর" ও "সম্পদকর" আরও বাড়াবার সুপারিস করেছেন। আমাদের মনে হয়, এ কর্মসূচী সত্যিই গৃহীত হলে Socialistic Pattern of Society প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

আজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় শেষ হবার পূর্ব্বেই "তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাব" আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাজেট

(ক)	মূল শিল্প ও সংগঠিত শিল্প খাতে		২০০০	কোটি	টাকা
(খ)	গৃহ নির্ম্মাণ	,,	১৮০০	,,	,,
(গ)	যানবাহন ও যোগাযোগ	,,	১৭০০	,,	,,
(ঘ)	কৃষি	,,	৮০০	,,	,,
(ঙ)	সেচ	,,	৭০০	,,	,,
(চ)	বিদ্যুৎ	,,	৭০০	,,	,,
(ছ)	তৈল ও খনি	,,	৩০০	,,	,,
(জ)	ক্ষুদ্র শিল্প	,,	৩০০	,,	,,
(ঝ)	অন্যান্য নির্ম্মাণ	,,	৪০০	,,	,,
(ঞ)	স্কুল ও হাসপাতাল	,,	৬০০	,,	,,
(ট)	বিবিধ	,,	৭০০	,,	,,

মুদ্রাবিনিয়োগের হিসাব—১৯৫৭-৫৮ মুদ্রামান
কোটি টাকার হিসাব

বৎসর	সরকারী	বে-সরকারী
১৯৬০-৬১	৯০০	৫০০
১৯৬১-৬২	১০,৫০	৫৫০
১৯৬২-৬৩	১২০০	৬০০
১৯৬৩-৬৪	১,৩৪০	৬৬০
১৯৬৪-৬৫	১,৫০০	৭০০
১৯৬৫-৬৬	১,৬৫০	৭৫০

মোট—৬,৭০০+৩,৩০০ অর্থাৎ—১০,০০০ কোটি টাকা

‡ Reserve Bank of India Bulletin : December, 1958 Index Number of Whole Sale Prices.

অবশেষে 'দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া-রচয়িতা' অধ্যাপক মহলানবীশের মন্তব্য দিয়ে আমার প্রবন্ধে উপসংহার করি :

Let us adopt Rs. 10,000 crores as the targets of investment in the Third Five Year Plan.

Health, education and research have indeed a dual role. These are no doubt significant constituents of the level of living and, in this sense are fruits of national development. On the other hand, the advance of health, education and research is of besic importance in bringing about industrial and social progress.

অর্থাৎ—আসুন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় "মূলধন বিনিয়োগ"-এর পরিমাণ ১০,০০০ কোটি টাকাই অনুমান করি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গবেষণাসমূহের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, "জীবন-যাত্রার মান" নির্দ্ধারণে একটি অপরিহার্য্য মাপকাঠি—বিশেষতঃ জাতীয় উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গবেষণাসমূহের অগ্রগতিতে দেশের মূল শিল্প ও সমাজ লোকায়ত প্রগতির বিস্তৃত পথে সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হয়।

ভীষ্ম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অর্জ্জুন কন "স্থিতপ্রজ্ঞ, মহাযশা, পিতামহ—
হে বীরশ্রেষ্ঠ, প্রণতি আমার লহ।
মহাভারতের মহামহিমার মূর্ত্ত প্রতীক তুমি,
ধন্য করেছ জাতি ও জন্মভূমি।
তব দেহে, মনে বাক্যে শুচিতা, শৌর্য্য ও সদ্ভাব,—
পরিপূর্ণতা তুমিই করেছ লাভ।
শাস্ত্রে শস্ত্রে সম পণ্ডিত—তুমি বিজিতেন্দ্রিয়,
মন ব্রাহ্মণ, দেহ তব ক্ষত্রিয়।
অপ্রতিহতগতি মহারথী কারেও কর না ডর
লাভ করিয়াছ ইচ্ছামৃত্যু বর।
শুধু ক্ষীণ দীন দুর্ব্বলে ডরো করিয়া মরণ পণ—
রোধ করনাকো তাঁদের আক্রমণ।
তাদিকে যে সয়, হয় সুধাময়, চিরদিন রয় টিকি
রত্নাকরকে তারা করে বাল্মীকি।
ভাব আদর্শ গড়ে—আদর্শ ভাবের বন্যা আনে,
পতনোন্মুখ ধরাকে উর্দ্ধে টানে।
একের ত্যাগেতে জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়
বিপর্য্যয়েও আনে সে অভ্যুদয়।
মহৎ জীবন ব্যাহত হয় না পরাজয়ে ক্ষয়ে লয়ে,
মরা চাঁদ ওঠে পূর্ণচন্দ্র হয়ে।
অনাগত কাল স্মরিবে তোমার কীর্ত্তি অসাধারণ
গর্ব্বে করিবে তব স্মৃতি তর্পণ।
হে চিরকুমার, ভোগের রাজ্য গ্রাহ্য ত করনাকো
সুধাই তোমারে কি লইয়া তুমি থাক ?"
হাসিয়া ভীষ্ম বলেন "পার্থ ভাবাচ্য তব মন।
হোক সামান্য—শোন মোর বিবরণ।
ত্যাগই কেবল অমৃতের দিতে পারে সংবাদ,
সেই এনে দেয় অমৃতের আস্বাদ।
মোর আত্মার আত্মীয় যিনি, তারে লয়ে করি ঘর,
সবাই আপন, কেহ নাই মোর পর।
যাঁর তৃপ্তিতে জগৎ তৃপ্ত তাঁহার তৃপ্তিকামী
অফলাকাঙ্ক্ষী—তবু কাজ করি আমি।
সব আনন্দ পরিহরি, আমি পরমানন্দে আছি
অতীন্দ্রিয়ের ভোগেতে সব্যসাচী।
সর্ব্বযুগের সব অনাগত, গত, আগতের, লাগি
মুক্তি, তৃপ্তি, কল্যাণ আমি মাগি।
আমি যে স্বপ্ন দেখি, ফাল্গুনী, সেই সুদিনের কথা
রহিবে না যবে রণের বীভৎসতা।
হরি-অভিমুখী মানব-সমাজে রবে না জিঘাংসা,
প্রেম করে দেবে সকল মীমাংসা।
অর্থে-অস্ত্রে-বলী জাতি হলে দর্পে আত্মহারা—
গোষ্ঠী রচিয়া ধ্বংসে ডাকিবে তারা।
রবে গৌরবে, জয়ী তারা হবে, যাহারা জগজ্জনে
এক করে লবে মৈত্রীর বন্ধনে।"

মাঘী পূর্ণিমা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

উটকামণ্ড থেকে তার এসেছে, নতুন স্বামীজী মৃত্যুশয্যায় আমাকে দেখতে চেয়েছেন। অস্থির হয়ে উঠলাম, আর এক মুহূর্ত্তও থাকা চলে না। স্বামীজী শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার আগে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

শেষরাত্রে গাড়ী ষ্টেশনে থামল, আশ্রমে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রভাত হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে স্নান করে স্বামীজীর কক্ষে যখন প্রবেশ করলাম তখনও তিনি নিদ্রিত। স্বামীজী বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলেন, পাণ্ডুর মুখখানাতে ক্ষীণ হাসি। মনে মনে প্রণাম জানিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

খানিক বাদেই স্বামীজী পাশ ফিরলেন, ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই আমার ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলল, স্বামীজী খুসী হয়ে উঠলেন। বললেন, "বীরু এসেছিস? আমি যে তোর অপেক্ষায়ই ছিলাম, আর কাছে আয়।"

এগিয়ে কাছে গেলাম, তিনি আমার হাতখানা ধরলেন, অতি উত্তপ্ত স্পর্শ, বুঝলাম জ্বর খুবই আছে। বললেন, "কখন এসেছিস? চা খেয়েছিস কিনা?" আর বেশী কথা বলতে পারলেন না, ক্লান্তিতে তার দু'চোখ বুজে এল।

কিছুক্ষণ পরেই দু'জন ব্রহ্মচারী এলেন। একজনের নির্দ্দেশমত ধীরে ধীরে তাকে অনুসরণ করলাম। আশ্রমের প্রধান স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করে নতুন স্বামীজীর অসুখের বিষয় জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আজ সাতদিন ধরে নতুন স্বামীজী প্রবল জ্বর আর শিরঃপীড়ায় শয্যাশায়ী, বর্ত্তমানে অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরই ইচ্ছাক্রমে তোমাকে তার করা হয়েছে। আজ মাঘী পূর্ণিমা, আজ আমাদের একটু সতর্কভাবে তাঁকে রাখতে হবে।"

আমি চমকে বললাম, "কেন?"

স্বামীজী বললেন, "কি জানি কেন, ও মাঝে মাঝে আমাদের বলত যে, এক মাঘী পূর্ণিমায় সে পৃথিবী ছাড়বে।"

এই কথাটা শুনে হঠাৎ আমার শরীরটা যেন কেমন অবশ হয়ে গেল। বিশ বছর আগের একটা কথা মনে পড়ল, কোন কথা বলতে পারলাম না। খানিক পর স্বামীজীর আজ্ঞা নিয়ে চলে গেলাম রোগীর কক্ষে, কোণায় একটা মোড়াতে বসে রইলাম। সমস্ত শরীর মন অবসাদে ভরে গেছে। মনে কত কথা জাগতে লাগল, বাল্যের কত স্মৃতি, কত কথা, কত দৃশ্য মন তোলপাড় করে তুলল।

সারাটা দিন স্বামীজী অস্থিরতায় মধ্যে কাটালেন। প্রবল জ্বর, কখন বেহুঁস, কখনও বা চঞ্চল হয়ে উঠে বসতে চান। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে প্রলাপের মধ্যে দু'চার কথা বলেন। আমি শুধু দু-একটা শব্দে খানিকটা আঁচ করে নিতে পারি। দুপুরবেলা জ্বরের তাতে তার গৌরবর্ণ মুখটা একেবারে লাল হয়ে গেল, তখন তাঁকে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডাক্তার দু'তিনবার আনাগোনা করলেন, আশ্রমবাসী সবাই সশঙ্কিত। ধীরে ধীরে চলাফিরা, ফিসফিস করে কথাবার্ত্তা বলা যাতে রোগীর কোন অসুবিধা না হয়। নতুন স্বামীজীর চেহারা যেমনই সুন্দর শুভ্র ছিল, ব্যবহারও ছিল তেমনি অমায়িক, সবার মনেই তিনি একটা শ্রদ্ধার আসন পেতে বসেছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার কোন কথাই মন খুলে হতে পারল না। একবার শুধু বলেছিলেন, "বীরু সেই মাঘী পূর্ণিমার কথা মনে আছে ত? বিশ বছর আগে?"

আমি সশঙ্কিত হয়ে কথাটা চাপা দিলাম। সারাদিন ছটফট করে সন্ধ্যার দিকে স্বামীজী শান্ত হলেন, জ্বরের বেগ কমল। সবাই আশা করল, হয়ত আজকের ফাঁড়া স্বামীজী কাটিয়ে উঠলেন। স্বামীজী সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। তার পর বললেন, "আমার জপের মালাটা দাও।" দুর্ব্বল হাতে জপ করতে করতে একটু তন্দ্রা এসে গেল। পায়ের নিচের জানালা দিয়ে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম, রজতশুভ্র জ্যোস্নাধারায় পৃথিবী উদ্ভাসিত। হঠাৎ স্বামীজীর প্রিয় গানটা মনে পড়ল, "ও আমার চাঁদের আলো, আজ সন্ধ্যেবেলায় ধরা দিয়েছ।"

এমন সময় হঠাৎ স্বামীজী ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ডাকলেন, "বীরু শিয়রের জানালাটা খুলে দে, তাকে আসতে দে।" আমি চমকে দৌড়ে গিয়ে জানালা খুলতেই একরাশ জ্যোৎস্না স্বামীজীর চোখে-মুখে মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বামীজী মাথা তুলে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, "আঃ কি সুন্দর", বলতে বলতে যেন তন্দ্রার ঘোরে তার চোখ দুটো বুজে এল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "বীরু, বীরু, আজ কি মাঘী পূর্ণিমা, নয়টা কি বেজেছে?" সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা বালিশে গড়িয়ে পড়ল—সব সব শেষ। আমি আর্ত্তনাদ করে উঠলাম, "স্বামীজী, স্বামীজী, সত্যদা…"

ঘরে যে সাধুরা ছিলেন তাঁরা শুধু হাত জোড় করে প্রণাম করে একখানা চাদর দিয়ে মৃতদেহ ঢেকে দিলেন। তার পর খাটের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

"তপসা যে অনাধৃষ্যা, তপসা যে স্বর্যযু
তপো যে চক্রিরে মহ, স্তাবশ্চিদ দেবাপি গচ্ছতাৎ"

যাঁরা তপস্তাবাহ্মা অপরাজেয় হয়েছিলেন, তপস্তা-বলে যাঁরা স্বর্গে গমন করেছেন, যাঁরা মহান্ তপস্তা সৃষ্টি করে গেছেন তাঁদের কাছে সে চলে যাক।

ধীরে ধীরে একে দুয়ে জনতা এসে ভিড় করতে লাগল, স্বামীজীর মুখের আবরণ সরিয়ে দেওয়া হ'ল, কি সুন্দর পবিত্র শান্ত মুখ। সে মুখে মৃত্যুর কোন কালিমা নেই, এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ফুলে ফুলময় করে শবদেহ সাজানো হ'ল, তার পর সমারোহে স্বামীজীকে নিয়ে গেল। কিন্তু তার পূর্ব্বেই তার বালিশের নীচে গেরুয়া-বস্ত্রে ঢাকা একটা পুলিন্দা দেখতে পেয়ে আমি সঙ্গোপনে সরিয়ে নিয়েছিলাম। একবার খুলে দেখলাম অতি সযত্নে ঢাকা আছে একটি ছোট্ট গীতা, আর তার ভিতরে একটি তরুণীর ফটো। সে আর কেউ নয়, আমাদের নীহারদির। হাতটা কেঁপে উঠল, তাড়াতাড়ি ফটোটি সযত্নে মুড়িয়ে ঢেকে আমার জিনিসপত্রের সঙ্গে রেখে দিলাম।

আমি চাইনে কেউ জানুক নতুন স্বামীজীর প্রাণের দুর্ব্বলতা, অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশের তীব্র ব্যথা। যার জ্বালায় তিনি গৃহ ছেড়ে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সংযমী জিতেন্দ্রিয় স্বামীজী জপতপ পূজাধ্যানে নিজের চিত্তকে উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, বিমল শান্তি পেয়েছিলেন। তবু তার স্মৃতি মন থেকে নির্ম্মূল করে দিতে পারেন নি। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে লুকিয়েছিল, বিশ বছর আগে এক মাঘী পূর্ণিমায় রাত নটার সময় সে এই পৃথিবী ছেড়ে অনন্তে মিশে গিয়েছিল, আজ বিশ বছর প্রতীক্ষার পর স্বামীজী বুঝি অনন্তে তারই সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমি যেন দেখতে লাগলাম দুটি পূতঃদিব্য দেহধারী উজ্জ্বল রূপের ছটায় আমার সামনে আলো করে দাঁড়াল, তার পর তাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে আনন্দলোকে মিলিয়ে গেল।

বিশ বছর আগের কথা, আমি আই-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছি, আর আমার নীহারদি তখন বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছেন। আমাদের ইংরেজীর প্রফেসার হলেন সত্যপ্রিয় বানার্জ্জী, তিনি সবে নতুন এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। তিনি শুধু রূপবান বললে হয় না, তাঁর ভিতর যেন একটা অনন্যসাধারণ কিছু ছিল যা আমাদের বিশেষ আকৃষ্ট করত। তাঁর চোখ দুটিতে যেন একটা জ্যোতি ছিল। যা হউক তাঁর স্বভাবের তেজস্বিতায় ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা ছাত্ররা তাঁর খুবই ভক্ত হয়ে উঠলাম। সত্যদা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠল, এক কথায় বলতে গেলে আমি তার ছোট ভাই-এর স্থান দখল করলাম।

নীহারদি তাঁর কাছে শুধু ফোর্থ ইয়ারে পড়েছিল। ফিফথ ইয়ারেই সত্যদাই ইংরেজী পড়াবেন। নীহারদি আর সত্যদার মধ্যে ফোর্থ ইয়ারে কি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল জানি না, তবে ফিফথ ইয়ারে আমি সত্যদা আর নীহারদি এই তিন জন মিলে একটি ব্যূহ তৈরি করলাম যা কেউ ভেদ করতে পারে নি। আমাকে তখন যুবক বলা চলে না, যোল-সতের বছরের কিশোর আমি, প্রেমের কি অর্থ বুঝতাম না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারতাম যে, দুজনেই দুজনকে দেখলে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। তাদের চোখে চোখে কি কথা খেলে যেত জানি না, কিন্তু তাদের কথাবার্ত্তায় আচরণে পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ বুঝতে পারতাম। আমি আধা-জানা, আধা না-জানা রহস্যময় প্রেমের দূত হয়ে দাঁড়ালাম তাদের মাঝে। অতি শুদ্ধ সংযত ছিল তাদের ভালবাসা। তারা প্রেমের ব্যাপারে বুদ্ধি রাখত. দশে মিলে তাদের সমালোচনা করুক, ক্লাসে ক্লাসে তাদের নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ চলুক, এ তারা কখন চাইত না, তাই তাদের প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত গোপনে বয়ে চলত। নীহারদি আমার নিজের বোন নয়, কিন্তু আমাকে তার নিজের ছোট ভাইয়ের মতই ভালবাসত।

পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়, রংটা ছিল খুবই ফর্সা, আর মুখখানা ছিল ভারি মিষ্টি, সে মুখের উপমা চলে সদ্য-ফোটা যুঁইয়ের সঙ্গে। তার মুখে সব সময় একটা মৃদু হাসি লেগেই থাকত।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগত তাদের দৌত্য করতে। নীহারদির একটা আকাশী নীলরঙের শাড়ী আছে, সেটা পরলে তাকে ভারী সুন্দর দেখায়। সেদিন কলেজে একটা উৎসব হবে, দুদিন আগে সত্যদা কথায় কথায় বললে, "হ্যাঁরে বীরু, তোর নীহারদি এই উৎসবে আসবে ত? গান গাইবে তো? নীহারদি বেশ গান গাইত। আমি বললাম, "ঠিক ত বলতে পারি নে।"

'আচ্ছা তোর নীহারদিকে ঐ নীলশাড়ীটাতে চমৎকার দেখায়, না?' আমি বললাম, 'সত্যিই নীলশাড়ীতে নীহারদিকে খুব সুন্দর দেখায়।" সত্যদা যেন কিছু বলি বলি করেও বলে উঠতে পারলেন না, আমি দুপুরবেলা নীহারদির ওখানে গেলাম, বললাম, 'ও নীহারদি, আজকের উৎসবে সেই নীলরঙের শাড়ীটা পরে যেতে সত্যদা বলেছেন, তোমাকে নাকি ভারী সুন্দর দেখায়।' পলকে নীহারদির মুখ রাঙা হয়ে উঠল, বললে, ফাজলামী শিখেছিস, যা লেখাপড়া করগে, আজ আমি তো কখনও নীল শাড়ী পরে যাব না, বয়ে গেছে আবার লোকের কথা শুনতে।' কিন্তু আমি জানতাম নীল শাড়ী না পরে নীহারদি থাকতেই পারবে না, আর সত্যি, উৎসবে যখন গান গাইতে নীহারদি উঠল তখন দেখলাম তার পরণে সেই নীল শাড়ী। নীহারদিও মাঝে মাঝে আমাকে কাছে বসিয়ে সত্যদার সম্বন্ধে নানা কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করত। একদিন বললে, 'তোদের সত্যদা ত ভাল ব্যাডমিণ্টন খেলেন, আমাদের খেলার টিমে ত তিনিও যোগ দিতে পারেন।"

বলাবাহুল্য, বেশীদিন লাগল না, আমাদের ব্যাডমিণ্টন

খেলায় তিনিও আরও একটি মেম্বার হয়ে দাঁড়ালেন। এ ভাবে দুটি তরুণ তরুণীর হৃদয় অর্দ্ধস্ফুট কমলের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হতে লাগল।

শীঘ্রই বড়দিনের ছুটি, আমাদের কলেজ থেকে একদল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক সবাই যাবেন বেড়াতে দক্ষিণে। সত্যদাই লীডার হয়ে দলবল নিয়ে চলেছেন, সঙ্গে আরও দুজন প্রফেসর, নীহারদি প্রথমে ঠিক করল দলের সঙ্গে না গিয়ে সে ছুটিতে তার মার কাছেই চলে যাবে। কিন্তু দলের ছাত্রীরা ধরে বসলো নীহারদি তোমাকে যেতেই হবে, সবাই মিলে খুব মজা করা যাবে। একদিন সত্যদাও বললেন, 'চল না আমাদের দলে, দক্ষিণের কত সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখিয়ে আনব।'

নীহারদি সে প্রলোভন ঠেলতে পারল না। আমাদের সাথী হয়ে চলল। আমরা দলবল নিয়ে এক সন্ধ্যায় ট্রেনে চাপলাম। সত্যদা কি খুসী, প্রাণের আনন্দে সবার তদারক করতে লাগলেন যাতে কারও একটুও অসুবিধে না হয়!

আমরা প্রাণের আনন্দে আজ এ জায়গা, কাল সে জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছি। এক জ্যোৎস্না রাতে আমরা বসলাম সমুদ্রের তীরে, বালিতে। জ্যোৎস্না স্নাত সমুদ্র আর পৃথিবীর কি অপূর্ব্ব শোভা। নীহারদি সেদিন তার ঐ নীল শাড়ীটা পরে বসেছিল, ছাত্রছাত্রীরা ঠিক করলে সবাই গান গাইবে, যে গান জানে না সে কবিতা বলবে। একে একে গানের পালা চলল, নীহারদিও গাইল:

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন
ভেসে যেতে চায় মন
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া···"

গান শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তার মধুর রেশ রয়ে গেল সবার মনে। উথলে পড়া চাঁদের আলোতে। সমুদ্র-সৈকতে নীলশাড়ী পরে বসা নীহারদিকে যেন কেমন রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল, তার মুখখানা যেন কেমন বিষণ্ণ, গম্ভীর।

এবার প্রফেসারদের পালা, তাঁরা কেউ গান গাইতে জানেন না বলে আপত্তি তুললেন, কিন্তু আমরা তাঁদের আপত্তি মানলাম না। তখন তাঁরা কবিতা আবৃত্তি করলেন অতি সুন্দর। সবার শেষে সত্যদার পালা ছিল, তিনি আবৃত্তি করলেন:

"কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে,
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে চায়
জানে না সে কাহারে চায়
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।"

তাঁর গমগমে সুর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সেই সীমাহীন অনন্ত নীল আকাশের নীচে, সীমাহীন অনন্ত নীল সমুদ্রতীরে আমরা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ জোয়ারের জল এসে ছলাৎ ছলাৎ করে আমাদের ভিজিয়ে দিতে এল।

আমাদের পায়ের পাতা, কাপড়ের নীচের দিকের কতকটা ভিজে গেল। সবাই উঠে পড়লাম হোটেলে ফিরতে। কিন্তু নীহারদি বললে, "আর একটু বসো, ভারি ভাল লাগছে ভিজতে।"

যখন আমরা হোটেলে ফিরলাম তখন বেশ রাত হয়েছে, আর সবারই কাপড়-চোপড়ও খানিকটা ভিজে গেছে। পর দিন সকালে নীহারদি উঠল না অনেক বেলা পর্য্যন্ত। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল তার গা গরম, বেশ জ্বর হয়েছে। খবর শুনে সত্যদা এলেন, গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাল রাত্তিরে এভাবে জলে ভেজা ঠিক হয় নি, বিদেশ-বিভুঁইয়ে অসুখে পড়া ভাল নয়।"

নীহারদি মৃদু হেসে বললেন, "ও কিছু নয় সেরে যাবে।"

কিন্তু একদিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, জ্বর ছাড়ল না, বেড়ে চলল, আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। সত্যদার মুখ শুকিয়ে গেল, তিনি একঠায় বসে থাকতেন নীহারদির শিয়রে। কখনও বা কপালে অডিকলোন দিয়ে জলপটি দিতেন, কখনও বা নিঃশব্দে তার হাতখানা ধরে বসে থাকতেন। ডাক্তার এলেন, বললেন যদিও ভয়ের বিশেষ কিছু নেই তবু খুব সতর্ক রাখবেন, যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

সত্যদা ও অন্য প্রফেসার দু'জন আর সাহস পেলেন না থাকতে। ওষুধপত্র, ফল ইত্যাদি নিয়ে সেদিনই আমরা ফিরে চললাম। নীহারদিকে অতি সযত্নে সাবধানে ঢেকে-ঢুকে নেওয়া হ'ল। সত্যদার মুখের হাসি উড়ে গেছে, মনের শক্তিও যেন কমে গেছে। এবার অন্য দুই প্রফেসারের সঙ্গে আমরাই উদ্যোগী হয়ে সব ব্যবস্থা করতে লাগলাম। সত্যদা শুধু নীরবে গম্ভীরভাবে নীহারদির কাছে বসে থাকেন। নীহারদি শুধু কুণ্ঠিতভাবে বলে, "ও কিছু নয়, সেরে যাবে।" রোগশয্যার পড়ে থেকেও তার মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকু মুছে যায় নি।

আমরা স্বস্থানে পৌঁছে গেলাম। নীহারদিকে হোষ্টেলে না নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীতেই মার কাছে আনা হ'ল। মা সেই দিনই নীহারদির মাকে 'তার' করে অসুখের খবর জানালেন। পর দিনই ডাক্তার সহ নীহারদির বাবা এলেন তাকে নিয়ে যেতে। নীহারদিকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হ'ল ভাল চিকিৎসার জন্য। সত্যদা কেন জানি না নীহারদির অসুখে প্রথম থেকেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। যখন নীহারদিকে নিয়ে তার বাবা চলে যান তখন

সত্যদা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, অসম্ভব গম্ভীর আর ব্যথাভরা সে মুখ। নীহারদির গাড়ী ছাড়তেই তার মুখটা যেন পাংশু হয়ে গেল।

কয়েকদিন খুব উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে আমাদের দিন কাটতে লাগল, কখনও খবর আসে রোগী ভালর দিকে, কখনও খবর আসে অবস্থা সুবিধের নয়। দিন সাতেক পর হঠাৎ মার কাছে 'তার' এল নীহারদি আর নেই। মাঘী পূর্ণিমার দিন রাত নয়টায় নীহারদি আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।

সত্যদা সেই খবর শুনামাত্র নিজের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। সেদিন তাকে কেউ ঘর থেকে বের করতে পারল না, খেলেন-দেলেন না। পরদিন তিনি অবশ্য কলেজে গেলেন। আমরা কেউ ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেলাম না। আমাকে একবার শুধু বললেন, "ওর মৃত্যুর কারণ ত আমিই। তাকে আমিই ত জোর করে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

তার পর দিন দেখা গেল সত্যদার ঘরে কেউ নেই, বিছানার উপর দুখানা চিঠি পড়ে আছে, একখানা আমার নামে আর একখানা কলেজের প্রিন্সিপালের নামে কাজে রিজাইন করেছেন তিনি। আর আমাকে লিখেছেন, "বীরু, আমার যা আছে তাই তুই নিস, আর আমাকে ভুলে যা, খোঁজবার চেষ্টা করিস নে, আজ থেকে আমি গৃহহারা।"

তার পর বহুদিন সত্যদার খোঁজ পাই নি। প্রায় আট-নয় বৎসর পর একদিন একখানা কার্ড পেয়ে চমৎকৃত হলাম। সত্যদা এতদিন পর চিঠি লিখেছেন, "মাঘী পূর্ণিমায় অনেক আশীর্ব্বাদ জানবি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে আয়। ইতি—

সত্যদা নতুন স্বামীজী।

পর দিনই দক্ষিণে গেলাম, ঠিকানানুযায়ী আশ্রমে গিয়ে উঠলাম, নতুন স্বামীজীকে দেখলাম। সত্যদার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেই স্যুট-কোট পরিহিত সৌখীন সত্যদার পরিবর্ত্তে মুণ্ডিত-মস্তক, গেরুয়া বস্ত্রধারী সৌম্যশুদ্ধ পবিত্র মুখশ্রীর এক সাধু। ভাল করে চেয়ে দেখলাম এই রূপেই যেন সত্যদাকে বেশী মানায়।

অনেক কথা হ'ল, সেখানে দুইদিন থেকে ফিরে এলাম। তার পর প্রতিবৎসরই মাঘী পূর্ণিমায় নতুন স্বামীজীর একখানা আশীর্ব্বাদী চিঠি পাই, কিন্তু আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। শেষ দেখা হ'ল আর এক মাঘী পূর্ণিমায়—যেদিন বিশ বছর প্রতীক্ষার অবসান হ'ল নতুন স্বামীজীর, তাঁর আত্মা মিলিয়ে গেল উর্দ্ধলোকে।

সময় আছে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

এই তো কাছে এখনও আছে রোদের ছোঁয়াটুকু,
বেলার শেষ হয় নি, আছে এখনও কিছু বাকি,
এখনও ওড়ে শুকনো পাতা—বাতাসও রুখু রুখু;
বলার ছিল যে কথাগুলো, বলাই হ'ল তা কি?

আকাশ ভরা নীলের মায়া, ধুলোয় ভরা মন,
ভাবনা যত এলো-মেলো, ধোঁয়ায় জাল বোনা,
কেমন করে বলব বল আঁকতে গিয়ে কোন্
রঙিন ছবি, দিলাম শুধু জলেরই আলপনা!

যায় যদি তা বাকনা মুছে, লোকসানই বা কার?
লাভের কিছু সম্ভাবনা! তাওতো দেখি নাক,
হাল্কা-হাওয়া দিনটা হ'ল শিসের মত ভার,
কি করে বই? নামাই কোথা! বলব কারে 'রাখো'!

এইত আছে এখনও কাছে রোদের তাতে মাখা
একটু আলো, একটু আশা, একটুখানি ভয়,
তাকেই যদি বাইরে আন লুকিয়ে যেটা রাখা
বলবে সেটা কৌতূহলই, আর কিছু কি নয়?

স্বীকার করো; স্বীকারে ভরা রোদের আলো নাচে
ধারালো ফলা ছুরির মত ছায়াটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
এগিয়ে এসো তফাৎ থেকে এগিয়ে এস কাছে
তোমার মন আমার মনে চিহ্নক ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

কপালকুণ্ডলার জন্মভূমিতে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চৈত্রমাসের আকাশে মেঘের ঘনঘটা বেশিক্ষণ থাকে না। বাতাস বন্ধ হয়ে খানিকটা থমথমে ভাব, অসহ্য গুমোট কিছু-ক্ষণ—তার পর আকাশের এককোণে পাতা একটি মেঘের মাহুরকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কে যেন বিছিয়ে দেয় আকাশ জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড দমকা হাওয়া আসে ছুটে—ধুলো-বালি, খড়কুটো, ঝরাপাতা প্রভৃতি উড়িয়ে হৈ হৈ কাণ্ড বাধায় ক্ষ্যাপা দেবতা। কিছু পরে বর্ষণও নামে। কিন্তু এ সবই প্রকৃতির ক্ষণ-খেয়ালের খেলা। দণ্ড দুই পরে প্রকৃতির বিকারহীন সুস্থ রূপ ফিরে আসে—নীল আকাশে তারা ফোটে, চাঁদ দেখা দেয়, ফুরফুরে হাওয়ায় দেহমন জুড়িয়ে যায়—ভারি ভাল লাগে আরাম-চেয়ারে গা এলিয়ে কল্পনার রাজ্যে ডুব মারতে।

এমনই এক চৈত্রের শেষ দিনে কালবৈশাখীর ঝড় উঠল, আমরা তিন বন্ধুতে তখন বৈঠকখানায় বসে রাজনীতিতত্ত্ব আলোচনা করছিলাম। বলা বাহুল্য, আর দশ জন সাধারণ মানুষের জটলার মতই তর্কবিতর্কের ধারাটা যুক্তিহীন ও উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিষয়টা রাজনীতি হলেও তাতে কোন নীতিরই বালাই ছিল না, রাজতন্ত্র ত এদেশ থেকে অনেকদিন বিদায় গ্রহণ করেছে।

হঠাৎ একজন বন্ধু বললেন, দুত্তোর রাজনীতি, একটা গল্প বল। আবহাওয়াটা গল্প বলা আর গল্প শোনার অনুকূল।

কিন্তু আবহাওয়ার যেমন মর্জি আছে—গল্পেরও তেমনি আছে রুচিভেদ। তপনহীন ঘন তমসায় সেই গল্পই জমে, যা একান্ত প্রিয়জনকে সঙ্গোপনে বলার মত, আবার ওই বর্ষণমুখর সন্ধ্যাকালে অশরীরীদের নিয়ে গল্প হ'ল সব গল্পের সেরা গল্প, কাটফাটা রোদ্দুরভরা দুপুরে চোর-ডাকাতদের কথায় জাগে কৌতূহল আর ছায়াঘন বৈকালে নদীর ধারে বসে দেশবিদেশ ভ্রমণের কথা।

বন্ধুরা কিন্তু ফরমাস দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন না, বিষয়-বস্তুটিও নির্দিষ্ট করে দিলেন, সত্যিকারের ভ্রমণ-কাহিনী শোনাও।

ভ্রমণ-কাহিনী—অর্থাৎ নিছক কাহিনী নয়, নির্ভেজাল ভ্রমণও নয়—দুই মিলিয়ে বসালো একটি বিবরণ। জিনিসটি মোটেই কঠিন নয় তাঁদের পক্ষে—যাঁরা কল্পনার রং মিশিয়ে ধূসর বাস্তবকে বেশ খানিকটা মনোলভ্য করতে পারেন। তাঁরা শিল্পী। রং-তুলির কারবারী নন যাঁরা—তাঁদের ক্যামেরায় যা ধরা পড়ে শুধু সেইটুকুই হুবহু পরিবেশন করতে পারেন, অথচ তা নাকি শ্রোতার চিত্তে তেমন রেখাপাত করতে পারে না। বললাম সেই কথাই, আমি ত কল্পনাশ্রয়ী নই—নিছক ভ্রমণ নিয়ে গল্প জমাব কেমন করে।

বন্ধুরা বললেন, শুধু ভ্রমণ-কথাই শুনব আমরা। অনেক জায়গা ত ঘুরেছ—তার থেকেই—

দূরের কথা শুনবে, না কাছের ছবি দেখবে? শুধোলাম।

কাছের ছবি ত দিনরাতই দেখছি, তাতে আর নূতনত্ব কি আছে!

কিন্তু যদি বলা যায় কাছে আছে বলেই তা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে? রোজ দেখি বলেই বস্তুর বৈশিষ্ট্য ধরতে পারছি না?

ভনিতা রাখ—গল্প বলবে ত বল।

আচ্ছা তা হলে শোন একটা গল্প। ঘরের কাছেই যে দেশ—তার কথা। এর মধ্যে বাস্তব আছে, কল্পনা আছে—দুই মিলিয়ে কাহিনীটাও রোমান্টিক। এককালে ত পাঠক-চিত্তে রীতিমত তরঙ্গ তুলেছিল।

ওরা ঘন হয়ে বসল।

আমি একটা লবঙ্গ মুখে ফেলে দিয়ে গল্প সুরু করলাম, একটি সাহিত্যসভাকে উপলক্ষ্য করে আমরা একবার কপাল-কুণ্ডলার জন্মভূমিতে গিয়েছিলাম।

গল্পের প্রারম্ভেই ওরা বাধা দিলে, ও হরি, এই তোমার বাস্তব! কপালকুণ্ডলার দেশ!

শোনই আগে। বঙ্কিমের মানসকন্যা কপালকুণ্ডলা—আমাদের কালে সে ছিল বাস্তবের চেয়েও সত্য। ওই যে সাগর থেকে ফিরবার মুখে রসুলপুরের নদীতে নৌকা বাঁধার পর নবকুমার যখন কাঠ আনতে বনের মধ্যে ঢুকল—

হাঁ—হাঁ—ওসব জানি আমরা। বন্ধুরা কলরব করে উঠল। ওই বনেই পথ হারিয়ে ঘুরছিল নবকুমার, হঠাৎ

দেখলে সামনে এক বনদেবী। বীণানিন্দিত তাঁর কণ্ঠস্বর, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?'

ঠিক—ঠিক। ওদের কথায় সায় দিয়ে উঠলাম। ওই নবকুমার যেখানে পথ হারিয়েছিল—ঠিক সেইখানটিতে গিয়েছিলাম আমরা। কাহিনীটা বঙ্কিমের কল্পনা, স্থানটি কিন্তু কাল্পনিক নয়। আজও রসুলপুরের নদীর ধারে সেই জায়গাটা কাহিনীর স্মৃতিকে ধরে রেখেছে।

সত্যি ? বন্ধুরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

হাঁ—ওটা হ'ল কপালকুণ্ডলার দেশ। ওই জায়গাটি স্বচক্ষে না দেখলে বঙ্কিমের মানসকন্যা তাঁর মনোগুহাতেই চিরবন্দিনী হয়ে থাকত।

বঙ্কিমবাবু ওখানে গিয়েছিলেন ?

শুধু যান নি—রীতিমত কিছুদিন বাস করেছিলেন—১৮৮০ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত। রসুলপুরের নদী-মোহানা, কাজুবাদামের বন, বালিয়াড়ি—কিন্তু এসব পরে আসবে—আমাদের ভ্রমণের যোগাযোগটা কেমন করে ঘটল বলি।

একালের আমরা অর্থাৎ পাঠকরা সবাই শুনেছি, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন। ইস্কুল-কলেজে ভাসা ভাসা কিছু বক্তৃতাও শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে—তাঁর সংক্ষেপিত উপন্যাস গ্রন্থের আস্বাদও নিয়েছি কিছু কিছু। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তিনি যে সাহিত্যের একজন দিকপাল ছিলেন—এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয় নি। এককথায় বলতে গেলে, একালের সাধারণ পাঠক তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে রীতিমত উদাসীন। তাঁর গ্রন্থাবলী ক্লাসিকস্ হিসাবে আলমারির শোভাবর্দ্ধন করে, পাঠকমনে কৌতূহল সঞ্চার করে না। বঙ্কিমকে নিয়ে আজকালকার দিনে সভাসমিতিও বড় একটা হয় না। তাঁর জন্মদিন মৃত্যুদিনের সঙ্গে এমনই এক হয়ে গেছে যে, কোনটাই স্মৃতির কুয়াশাজাল সরিয়ে আলাদা করে চিনে নেবার উৎসাহ নাই কারও। আজকালকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বঙ্কিম বাতিকের দলে, কারণ সাহিত্যের দিকপাল হয়েও একটি ছাড়া দুটি উল্লেখযোগ্য গান তিনি লেখেন নি, আবৃত্তির মত কবিতা, অভিনয়োপযোগী নাটকও তাঁর নাই। তাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছিলাম—কপালকুণ্ডলার দেশ থেকে সাহিত্যসভার আমন্ত্রণ পেয়ে। সাহিত্যসভার উপলক্ষটি—বঙ্কিম-প্রয়াণ তিথি। চৈত্রের শেষপ্রান্তে একটি দিনকে (২৬শে চৈত্র) এভাবে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা যে বাংলার এক অজ্ঞাতনামা পল্লীতে আজও হয়ে আসছে—এ বড় আশ্চর্য্যের কথা, আনন্দের কথাও। শুধু একদিনের একটি সভা নয়, কতকগুলি শ্রোতা জড়ো করে শহর থেকে দু'একজন নামী বক্তা আনিয়ে দু'তিন ঘণ্টার চর্ব্বিতচর্ব্বণ প্রশস্তিগাথা নয়—রীতিমত সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে এই উপলক্ষ্যে। দূরদূরান্তর পল্লী থেকে আসে ক্রেতা-বিক্রেতা—আসে তথাকথিত সংস্কৃতিবোধহীন সরল মানুষরা—অবোধ শিশুর দল আর ক্ষুদ্র সংসারের ইষ্টানিষ্টে সমর্পিত-প্রাণ গৃহবন্দিনী পল্লীরমণীরা। এরা মেলায় ঘুরে ঘুরে রং-তামাশা দেখে—প্রদর্শনীর পুতুল দেখে, নাগরদোলায় চাপে, কোন মাদুর পেতে ধামা-কুলো-ঘুনসী চুলের ফিতে মাদুলি বঁটি খুন্তি এলুমিনিয়ম আর কলাই-করা বাসন—প্লাষ্টিকের নানা দ্রব্য, দাঁড়ে বসা শোলার ময়না, তালপাতার সিপাই, মাটির পুতুল আর সব টুকিটাকি জিনিস যা ঘর-গৃহস্থালীর পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় আর ছেলেদের খুসি রাখার অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এসব কিন্তু পরের কথা আগে বলে নিচ্ছি স্মৃতিপূজার সার্থকতাটুকু জানাবার জন্য।

যাই হোক, সাদর নিমন্ত্রণ আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলাম। আমরা দুজন সাহিত্যসেবী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হয়ে বঙ্কিম-মেলায় যাব। স্থানটি বাংলার প্রান্ত সীমায়—রেল ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরেই।

রেলপথের দৈর্ঘ্য বাড়বে কণ্টাই রোড ষ্টেশনে নামলে। এর পুরাতন নাম ছিল বেলদা। সেখান থেকে মোটরে পঁয়ত্রিশ মাইল কাঁথি শহর। কাঁথি থেকে মাঠবনের পথ আরও দশ মাইল। দুরধিগম্য না হলেও কিছু আরাম রয়েছে বইকি। সেইখানে সন্ধ্যায় বসবে সাহিত্য সভা। সভা শেষে ফিরে আসব কাঁথিতে। কাঁথিতে নাকি কোন জমিদারের গৃহে থাকবার বন্দোবস্ত করেছেন উদ্যোক্তারা আর মেলার জায়গায় পৌঁছতেও মোটর—খানিকটা পথ অবশ্য পদযান ছাড়া গতি নাই। মোটের উপর, থাকা-খাওয়া, আসা-যাওয়া সবটাই যেন রাজসিক ধরনের।

আমরা কিন্তু কণ্টাই রোডে না নেমে খড়্গপুরে নামলাম—আরও বাইশ মাইল আগে। এখান থেকে বরাবর বাস যাবে কাঁথি শহর পর্য্যন্ত। দিব্য পীচ-বাঁধানো রাস্তা—দু'পাশে গ্রাম্য-প্রকৃতি—মাঠবন, খালবিল, নদীসরোবর নিয়ে খোলামেলা আসর বসিয়েছে। মিলনের আসর—একের সঙ্গে অন্যটির চমৎকার মিল। মাঝে মাঝে গ্রাম পড়ছে—মানুষের হাতেগড়া বলে কিছুমাত্র উদ্ধত নয়, দিব্য সঙ্গতি রেখেছে মাঠবন আর আকাশের সঙ্গে। কেলেঘাই নদীর পোলটা ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সন্ধ্যার আবছা-অন্ধকারে নদীটি অদৃশ্য, কিন্তু পথ-চলা মানুষের হাতে দোদুল্যমান হ্যারিকেনের আলোতে পোলের চেহারা, পথের

চেহারা, পথের দু'ধারে দু'একটি গ্রাম, হাট বা দোকান-পাটের চেহারা স্বপ্নে দেখা বস্তুর মতই অপূর্ব্ব লাগছিল। পথ সোজা—অন্ততঃ খড়্গপুর থেকে কণ্টাই রোড পর্য্যন্ত—তার পর পথ বেঁকেছে অসংখ্য বার। রাতের আবছা অন্ধকারে সেই আঁকাবাঁকা পথ কি সুন্দর যে লাগছিল!

এদিকটায় গ্রাম কম—ধানক্ষেত বেশী—অফলা বালি-ভরা মাঠও অনেক। অন্ধকার ঘন নয়—বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠে অন্ধকার তরল হয়েই থাকে—সেই পাতলা অন্ধকারে যা চোখে পড়ছে—তার অনেকখানিই রয়ে যাচ্ছে জ্ঞানের নেপথ্যে, অথচ আনন্দানুভূতির ক্ষেত্রে একটুও বাধা জন্মাচ্ছে না। সবটুকু জ্ঞানের আয়ত্তে এলে কৌতূহল নিরসন হয় আর সেইক্ষণেই অনুভূতি তীব্রতা হারায়। তখন যা দেখি তাকে বিশেষ করে দেখি না আর বিশেষভাবে তা মনেও গাঁথা থাকে না। এটা আমার দার্শনিকত্ব নয়, অপরোক্ষানু-ভূতির কথা। কেননা আমাদের এই তীর্থযাত্রার পর পুরোপুরি পাঁচটি বছর কেটে গেছে—অনেক ঘটনার প্রবাহ বয়ে গেছে—অনেক অপূর্ব্ব দৃশ্যও দেখেছি দেশদেশান্তর যাত্রাপথে, তবু সেইদিনকার প্রহর-উত্তীর্ণ সন্ধ্যাকাল থেকে রাত্রির প্রথম যাম পর্য্যন্ত দু'পাশের যে ছবিগুলি দ্রুতগামী বাসে বসে যেতে যেতে দেখেছিলাম—তা পথ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ত ফুরিয়ে যায় নি। চোখ বন্ধ করলে আজও পথের দু'ধারে ছবির মিছিল আমাকে বিহ্বল ও পুলকিত করে তোলে।

এমনি করে চোখ মেলে আর মন মিলিয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে দীর্ঘ পথ শেষ হ'ল, আমরা কাঁথি পৌঁছলাম।

পৌঁছে যে খবর পেলাম তা কল্পনাকে রীতিমত একটি রূঢ় ধাক্কা দিলে।

যে জমিদার বাড়ীতে আমাদের থাকবার কথা—শুনলাম তিনি আসন্ন নির্ব্বাচনীদ্বন্দ্বে মেতে ভোট সংগ্রহার্থ দূর পল্লীতে গেছেন, আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে কাঁথির একটি হোটেলে।

হোটেল? মুহূর্ত্তে মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। অপর দেশীয়রা এ সংবাদে পুলকিত হতেন নিশ্চয়, আমাদের ভারতীয় প্রকৃতিটাই আলাদা। আমরা অজানা গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেও অতিথি হয়েই থাকি না। যত স্বল্পকালই থাকি না কেন সেখানে—বিদায়বেলায় আত্মীয়তার মধুর বন্ধনটুকু দু'পক্ষই অনুভব করে থাকি। হোটেলে অভ্যর্থনা আছে—আদর নাই, এখানে যাওয়া আসা, থাকা-খাওয়ার কালে স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্ভ্রমবোধ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে দৃষ্টি থাকে প্রখর; কাঞ্চনমূল্যে আদর-আপ্যায়নের ছড়াছড়ি, ভরপেট খেয়েও তবু মন যেন উপবাসী থাকে।

মফঃস্বল শহরের হোটেল—আমাদের জন্য একখানি আলাদা ঘর বন্দোবস্ত করা সম্ভব ছিল না, তবে বাড়ীটা নতুন—ঘরগুলি বড় আর খোলা-মেলা, শয্যার পারিপাট্য আছে। আহারেও বিশেষ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা—তবু সব সময়েই মনে হচ্ছিল—এটা হোটেল! যাই হোক, বেশিক্ষণ এই চিন্তা করতে হয় নি, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আহারান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কাঁথি খুব বড় শহর না হলেও পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ইস্কুল-কলেজ আছে, আদালত আছে, সিনেমা হাউস আছে, হাট-বাজার, দোকান-পশারে সবেতেই জমজমাট। এ ছাড়া আর একটি আকর্ষণ দীঘা—বাংলার একমাত্র সমুদ্র-তীর, এখান থেকে মাত্র কুড়ি মাইল। সে পথও চমৎকার। দু'ধারে ধূ-ধূ মাঠ, চাষের জমি, অনেক গ্রাম; মাঝে মাঝে পড়বে ইস্কুল, কাছারী বাড়ী, থানা ও দেবালয়। ঘরবাড়ীর দিব্য শ্রী ছাঁদ—যদিও সেগুলি টিন, টালি অথবা খড়ের ছাউনি। বাঁশের খুঁটি, জাফরি দেওয়া ছোট ছোট জানালা, অশ্বত্থ বা বটগাছ তলায়—বাঁশ-বাখারির মাচান—তার উপর বসে বসে তামাক টানছে আর গল্প করছে গ্রামের যুবা-বৃদ্ধ মিলে। এই সঙ্গে আর একটি ছবি দেখব বলে আশা করেছিলাম—যে ছবি বঙ্কিমচন্দ্র যত্রতত্র দেখেছিলেন। সেই ছবিকে স্থান দিয়েছিলেন কপালকুণ্ডলার আখ্যানে। কিন্তু আজ তা বাস্তবক্ষেত্র থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে, বালিয়াড়ির কথা বলছি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আর একটি সমুদ্র—ধূসর রঙের সমুদ্র—তেমনি উচ্ছসিত-তরঙ্গিত, দিগন্ত-বিস্তৃত। কাঁথি থেকে ফিরবার কালে তার সামান্যমাত্র চোখে পড়েছিল—ভোরের আলোয় মনে হয়েছিল অপরূপ অথচ জীবনযাত্রার দীর্ঘপথে কোথাও সে দৃশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয় নি। ভাবছিলাম—সে কি শুধু কাহিনী বুননে—কাপালিককে শাস্তি দিতে আর নবকুমার কপাল-কুণ্ডলার নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে বঙ্কিমের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল?

জিজ্ঞাসায় জেনেছি—ওগুলি একসময়ে বাস্তবই ছিল। দশ-বিশ ক্রোশ জুড়ে ওদের আধিপত্য ছিল অটুট—অন্ততঃ ১৯৪২ সনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। ওই সনের শরৎকালে অবিরাম বর্ষণে সমুদ্রের বাঁধ ভেঙে উদ্দাম জলস্রোত কাঁথি মহকুমাকে ভাসিয়ে দেয়—তেমন ভীষণ বন্যা ইতিপূর্ব্বে নাকি এ অঞ্চলে হয় নি। যেমন তার বেগ তেমনি দুর্ব্বার গতি। তারই আক্রমণে অসংখ্য গ্রাম যেমন নিশ্চিহ্ন হয়েছিল—তেমনি ধ্বসে পড়েছিল বালিয়াড়ির পাহাড়গুলি। আজ বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ফিরে এলে সবিস্ময়ে ভাবতেন—একি সেই নেগুঁয়া যেখানে ঘন অরণ্য নাই—বালিয়াড়ি নাই, এমনকি

স্থানের পুরাতন নামটিও বদলে গেছে। এই নেগুঁয়ার ডাক-বাংলোতে একদা রাত্রিকালে এক সঙ্কেতময়ী ছায়ারমণীকে দেখে স্বল্পবাক্ কপালকুণ্ডলার কল্পনা তাঁর মানসক্ষেত্রে বাসা বেঁধেছিল।

আরও এক রাত্রিকালে সদর দরজায় কড়া নেড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাক দিয়েছিল এক রুদ্রমূর্ত্তি কাপালিক। দীর্ঘ জটাজুটধারী সিন্দুরচর্চ্চিত ললাট—রুদ্রাক্ষভূষণ বাহু ও কণ্ঠদেশ, আরক্ত চক্ষু, বলিষ্ঠ দেহ, হাতে নরকপালের পানপাত্র—কণ্ঠে জলদগম্ভীর ধ্বনি, আমার সঙ্গে এস।

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, না, তোমার সঙ্গে আমি যাব না।

মূর্ত্তি ফিরে গিয়েছিল।

পরের দিন রাত্রিতে আবার এসেছিল সে। আবার বলেছিল, মামনুসর।

না। অস্বীকার করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

তার পরের রাত্রিতেও সেই আবির্ভাব, আহ্বান।

তার পর আর আসে নি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনোরাজ্যে ইতিমধ্যেই সে স্থায়ী আসনখানি পেতে বসেছে। ছ'বছর পরে কপালকুণ্ডলার জীবননাট্যে তাকেই সূত্রধারের ভূমিকাটি দিয়েছিলেন লেখক।

বর্ত্তমান কাঁথির কোন অঞ্চলেই পুরাতন নেগুঁয়াকে এবং সেই প্রকৃতি পরিবেশটিকে যথাযথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বঙ্কিমের কল্পনা আমাদের বাস্তবদৃষ্টিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল হয় ত, তবু অন্য রূপে তা কম মনোহারী নয়।

সকালে উঠে আমরা দীঘায় গিয়েছিলাম, নানা কারণে দীঘা উল্লেখযোগ্য, তবে সে বিবরণ এখানে নয়। পথের মাঝখানে একটি নদীকে আজও ভুলতে পারি নি। সে নদী কিছু রূপবতী নয়, নালার মতই সঙ্কীর্ণ—বৈশিষ্ট্যহীন। তবু স্বাধীনতার সংগ্রামে এই নদী ইতিহাস রচনা করেছে। এর নাম পিছাবনি—এর তীরে স্বৈর-শাসকের লাঠি-বন্দুক বেয়নেটের সামনে বুক ফুলিয়ে অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেশের মুক্তিকামীর দল—প্রতিবাদ জানিয়েছিল দৃঢ়কণ্ঠে—আমরা পিছাবো না।

দীঘার মাইলখানেক আগে থেকেই একটি বাঁধ চোখে পড়ল—আরও খানিকটা এগিয়ে গোসাবাখ্যাত হ্যামিল্টন পরিবারের একটি চমৎকার বাংলো। সবশেষে ঝাউবনের প্রাচীর। দীঘার কঠিন বেলাভূমি জলের সঙ্গে হাতধরাধরি করে সমান্তরাল রেখায় ছুটেছে। যেমন প্রশস্ত বেলাভূমি, তেমনি দিকহারা নীলাম্বুরাশি। ঢেউ কম, গর্জ্জন কম, কিন্তু কম মনলোভা নয়। দুঃখের কথা, এমন সুন্দর নির্জ্জন প্রকৃতি পরিবেশ বাঙালীকে আকর্ষণ করতে পারে নি একটিও দেবমন্দির নাই বলে। শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মেলে না? জীবিকা অর্জ্জনের আশ্বাস কোথাও চোখে পড়ে না—এই কারণে? কারণ আরও হয়ত আছে—রেল ষ্টেশন থেকে ওর দূরত্ব, কলকাতা থেকে টানা মোটরপথের অভাব, বাজার-হাট নাই,—বাঙালী-রসনা তৃপ্তিকর খাবার দোকানও নাই, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

দীঘা থাক, এই যাত্রায় আলোচ্য বঙ্কিমের মানসকন্যা কপালকুণ্ডলার দেশ—কাঁথি শহর থেকে তার দূরত্ব আরও দশ মাইল। খানিকটা পথ কাঁচা-পাকা মিলিয়ে, খানিকটা মাঠ আর বন, কিছুটা পদব্রজেও যেতে হয়।

দুপুরের আহারাদি সেরে সেই পথে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। একখানি মোটরবাসে আমরা ছাড়াও স্থানীয় কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং কাঁথির বাসিন্দা কেউ কেউ উঠলেন। পথ সবে তৈরী হচ্ছে। রীতিমত ঝাঁকানি দিতে দিতে মাইল সাতেক পার হয়ে একটা বাঁধের তলায় এসে বাস থামল। সামনে পথ নাই আর—শুধু মাঠ। চৈত্রের ফসলহীন ধূ-ধূ মাঠ—ভাগ্যিস অপরাহ্নবেলা, না হলে অগ্নিমরীচিকার জাল বুনে অকরুণ দিনকর আমাদের দগ্ধ করতে ছাড়তেন না।

বাস থামতেই অনেকে নেমে পড়লেন। তাঁরা ছুটতে ছুটতে বাঁধের উপর গিয়ে উঠলেন এবং সেখান থেকে হাত নেড়ে ডাকতে লাগলেন আমাদের।

কি ব্যাপার? নদী দেখবেন আসুন। রসুলপুরের নদী, যার কথা কপালকুণ্ডলায় আছে। সাগরতীর্থ থেকে ফিরবার পথে কুয়াশায় পথভ্রান্ত হয়ে নবকুমারদের নৌকা গঙ্গার দিকে না গিয়ে রসুলপুরের দিকে এসেছিল। সমুদ্র-মোহানায় তখন ঘন কুয়াশা নেমেছে—মাঝিরা দিকনির্ণয় করতে পারে নি।

নদী দেখলাম। দূর-দিগন্তে পড়ে আছে; রূপ নাই—জীবন নাই। দাম-শেওলায় আচ্ছন্নই হবে বোধ করি—মাঝখানে একটুখানি চিক্‌চিকে জল। বাঁধ থেকে এত দূরে যে, জোয়ার এলে বনের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারে না।

তবে এর কূলে নবকুমারদের নৌকা লেগেছিল কেমন করে? সে প্রায় এক শতাব্দী আগেকার কথা—যখন নদী ছিল যৌবনবতী—বাঁধের অতি সন্নিকটে, তখন জোয়ারের জল উছল হয়ে রসুলপুরের কান্তারে টেনে আনত বিদেশগামী বহিত্র-বহর। তেমনি এক কুয়াশা-মলিন প্রাতঃকাল।

নদী দেখতে দেখতে আমরাও পৌঁছে গিয়েছিলাম সেই দূর কালে। কল্পনায় প্রত্যক্ষ করছিলাম বঙ্কিমের

বর্ণনাকে। সেই কল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করে হঠাৎ মোটরের হর্ন বেজে উঠল।

এবার মাঠের মাঝখান দিয়েই চলতে লাগল বাস। চৈত্রের কাঠফাটা রোদে পাথরের মত কঠিন হয়েছে মাটি—মাঠময় সরু সরু আল। তারই উপর দিয়ে চলতে লাগল বাস। নিদারুণ ঝাঁকুনী—দেহের পক্ষে আরামপ্রদ নয়—তবু মনে পাওয়া যাচ্ছে নূতনতর স্বাদ। কূলকিনারা নাই—মাঠের সমুদ্র। অনেক দূরে কজ্জলরেখা আঁকা দিগন্ত—ওইখানে বাস থামবে। কপালকুণ্ডলার জন্মভূমি দরিয়াপুর গ্রামের প্রান্তসীমা ওটি।

বনের প্রান্তেই থামল বাস, আমরা নেমে গ্রামে প্রবেশ করলাম। দু'পাশে বাঁশ, গাব, ভেরেণ্ডা, জিওল আরও কি সব নাম-না-জানা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা সব বাগান। বেড়ার ধারে ধারে আনারসের ঝোপ—সবুজরঙের অসংখ্য আনারস উঠেছে করাতের মত পাতার মাঝখান থেকে, খাটো খাটো নারিকেল আর জামরুল গাছ ফলের ভারে শ্রীমতী, আম-কাঁঠালের গাছেও ফলের শ্রী। ঝোপঝাড়ে ডাকছে কোকিল আর পাপিয়া। এই সব বাগানের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ—এধার ওধারের জমিতেও অজস্র ছোটবড় গাছ। তার মধ্যে কাজুবাদাম গাছের সংখ্যাই বেশি। গভীর বনে পথ হারিয়ে ক্ষুধাকাতর নবকুমার এই খাদ্যই গ্রহণ করেছিল।

প্রতি পদে বাঁক ঘুরে চলছিলাম আমরা। আমাদের পিছনে একদল অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৌতূহলী ছেলেমেয়ে। মেলায় যেমন দেখবার অনেক জিনিস আসে—তেমনি দ্রষ্টব্য হয়ে আমরা এসেছি শহর থেকে। বউয়েরা ভেজানো কপাটের ফাঁকে একখানি হাত রেখে অন্য হাতে অবগুণ্ঠন ধরে আমাদের মিছিল দেখছিল, বৃদ্ধ আর যুবকেরা কাজ ফেলে তাকাচ্ছিল ঘন ঘন। এমনি কৌতূহলের জিনিস হয়ে এবং দু'চোখে কৌতূহল ভরে মেলার ক্ষেত্রে পৌঁছলাম আমরা।

কর্ম্মকর্ত্তারা আমাদের নিয়ে গেলেন একটি বড় আটচালার বাংলো ঘরে। সেখানে অতিথি সৎকারের জন্য কাঁদি কাঁদি ডাব কেটে রাখা হয়েছিল।

বাংলোর প্রাঙ্গণে বসে শুনলাম—এইখানে একদিন দপ্তরের কার্য্যোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন। এই বাংলোতে বসিয়েছিলেন অস্থায়ী দপ্তর। আর ওই যে ডানদিকের উঁচু জমিতে একটি শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে—ওটির চারিদিকে তখন গভীর জঙ্গল ছিল। কপালকুণ্ডলা-বর্ণিত করালী-মন্দিরের কল্পনার বীজ নাকি এরই মধ্যে নিহিত। আবার একথাও আমরা শুনলাম—পাশের গ্রাম দৌলতপুরে একটি কালীমন্দির আছে, কিন্তু তার পরিবেশটি অন্যরূপ।

খানিক বিশ্রাম করে আমরা উঁচু বাঁধের উপরে উঠলাম। এখান থেকে নদী মোহানার বিশাল বিস্তারকে দু'চোখ ভরে দেখলাম। আকাশ আর দিক্‌চক্রবাল রেখা দুটিই এই অপরূপ রচনার পরিপূরক। বিরাটের অনুভূতি...মনকে অভিভূত করে এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালে।

এই উঁচু বাঁধ ছাপিয়ে সর্ব্বনাশা বন্যা ঢুকেছিল কাঁথি মহকুমায়। দরিয়াপুর, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বীরকুল প্রভৃতি অসংখ্য গ্রাম গিয়েছিল ডুবে। মানুষ অল্পই ভেসে গিয়েছিল, গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করা যায় নি, গৃহের সম্পত্তিও নয়। ওই যে উঁচু মন্দির-চত্বর—ওইখানে আশ্রয় নিয়েছিল দরিয়া-পুরের যাবতীয় মানুষ। ঠাসাঠাসি—গাদাগাদি, না নিদ্রা—না আহার। সাহায্য আসতে লেগেছিল কয়েক দিন—তত দিন প্রাণভীত পশুর মত দিনযাপন।

মন্দিরটিও দেখলাম—দৌলতপুরের সব চেয়ে উঁচু জায়গায়—শান-বাঁধানো মন্দির-চত্বর। এখান থেকে চার-ধারের পল্লীদৃশ্য ভারি মনোরম। মন্দিরের ঢালু জমিতে ছড়ানো মেলার পণ্যসম্ভার—প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

এরাই দলে দলে এসে বসল সভাক্ষেত্রে। হ্যাজাকের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল, ছেলেমেয়েরা বাঁশী বাজাচ্ছে, বিক্রেতারা বিক্রয়দ্রব্যের নাম ও গুণকীর্ত্তন করছে উচ্চরবে, আসন্ন চড়কের উৎসবে দেব দেব মহাদেবের মহিমা ঘোষণা করছে সন্ন্যাসীদল, নানা কণ্ঠের মিশ্র কলরবে স্থানটি গম গম করছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পল্লী নিশুতি হয় নি—বঙ্কিম-মেলাকে উপলক্ষ্য করে সুরু হয়েছে তার জাগরণ।

অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল সভা। তার পরেও অনেক রাত পর্য্যন্ত ছিল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। কোনদিন যাত্রা, পাঁচালী, তরজা, কালীকীর্ত্তন, কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তনও কোন কোন দিন। পুতুলনাচ ত প্রতিদিনের ব্যাপার।

ওখানে আহারাদি সেরে বাসে উঠলাম রাত এগারটায়। তখনও মেলার কোলাহল থামেনি। রাত বারটার পর ফিরে এলাম কাঁথিতে। অন্ধকার পথে মাঠের মাঝখানে পথ হারিয়েছিল বাস—আরও দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল কাঁথি শহরে—যার ধাক্কায় বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হয়েছে। তখন সেই দুর্ভোগকে বড় বলে রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম বই কি। আজ পাঁচ বছরের ব্যবধান—সেই অশান্তির চিহ্ন-মাত্র রাখেনি, কিন্তু বঙ্কিম-মেলার সেই অল্পক্ষণ-দেখা স্মৃতিটুকু উজ্জ্বল হয়েই রয়েছে।

আজও চৈত্রশেষের এই দিনটিকে স্মরণ করে সেই মেলার ক্ষেত্রে পৌঁছে যায় মন। দেখি বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে জেগে উঠছে নির্জ্জন বনস্থলী। দূরদূরান্তর গ্রামে পৌঁছে

:গছে মেলার বার্ত্তা—দলে দলে মানুষ আসছে মেলা দেখতে। নিরক্ষর সরল কৃষক যুবক ও গ্রামবধূরা, অবোধ ছেলেমেয়ের দল, চলচ্ছক্তিহীন লাঠিমাত্র সম্বল বৃদ্ধরা কতটুকু জানে বঙ্কিমচন্দ্রকে। বাংলা সাহিত্যের দিক্‌চক্রে কোন্ সূর্য্য কোন্ শুভদিনে উদিত হলেন—সে সংবাদ নিয়েও তাদের মাথাব্যথা নাই। হয়ত তারা কোন এক সময়ে বন্দেমাতরম্ গানটি শুনেছে বা গেয়েছে—তার অর্থ বোঝে নি, তার ইতিহাসও জানে না; মন্ত্রস্রষ্টা ঋষিকে জানা ত দূরের কথা। অথচ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছি—ঋষি বঙ্কিমের মৃন্ময় মূর্ত্তির বেদীতলে আবালবৃদ্ধযুবার শ্রদ্ধাঞ্জলি। রাশি রাশি ফুলে বেদীতল আচ্ছন্ন—আবক্ষনির্ম্মিত মূর্ত্তির গলদেশে রাশি রাশি ফুলের মালা—সাদা ফুলের স্তূপটাই যেন বঙ্কিমের মূর্ত্তিকে ছাড়িয়ে উঠতে চাইছে—আর সেই সঙ্গে ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে চারিদিক। স্মৃতিপূজার সার্থকরূপটি আজও চোখের সামনে ভাসছে।

সৃষ্টি যাচে নতুন জীবন

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নতুন বছরের শুভযাত্রা,
মাত্রাহীন কালের যাত্রায়।
শুধু রাত্রি আর দিন নিয়মিত পাদক্ষেপে,
অতীতের আবর্ত্ত রচনা।
জাল তোলা আর জাল বোনা।

জানি এ ত শুধু চলা,
অর্থহীন শুধু কথা বলা।
বর্ত্তমান সে ত আরও দীন, আরও অসহায়,
অতীতের গ্লানি, আর ভবিষ্য সংশয়,
দুই অন্ধকারে,
সংযোগের সেতুর দাক্ষিণ্যে ভরা।
আত্মহারা বালুর প্রাসাদ গড়ে,
থরে থরে সাজাইয়া কামনার সোনা,
জাল তোলা আর জাল বোনা।

নতুন বছর···
সে সেতুর স্তম্ভ নবতর।
জর জর দেহ ভরে অতীত বৎসর···
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।
থিয়া থিয়া নেচে ওঠে কালের ভৈরব,
ডিমি ডিমি ডিমি···ডম্বরুর রব।
ঈশানের মেঘ-বায়ু,
দেয় তারে নবতম আয়ু।
কাল বৈশাখী নাচে,
একটি 'প্রোটন' ঘিরে, দু'টি 'ইলেকট্রোন'
সৃষ্টি যাচে নতুন জীবন।

মিশে যেতে চায় অসীমতা মাঝে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

নদী বয়ে চলে সমুদ্র পানে, সে কি তারে পেতে চায়?
পাওয়ার বিরহ হৃদয়ে কি তার জাগিছে অনুক্ষণ?
নদী বয়ে চলে—কোন সুর তার তীরে তীরে রেখে যায়?
তরঙ্গ-বাহু মেলে ছুটে যায়—কি তার আকিঞ্চন?

মহাসমুদ্র বহুদূর হতে তাহারে বা ডাকে বুঝি,
সীমাহীন প্রেম বুঝি তার লাগি রয়েছে প্রতীক্ষায়!
ক্ষণ-বিলম্ব সহিতে পারে না—দেশে দেশে ফিরে খুঁজি,
শেষে একদিন চায় সে যাহারে, তাহারে দেখিতে পায়!

বিপুল-ব্যাপ্ত মহাসমুদ্র—নাই সীমা, নাই তল,
মহাতরঙ্গ উঠে আর পড়ে যত দূর যায় আঁখি!
যার লাগি হ'ল নদীর হৃদয় অস্থির চঞ্চল,
এ যে সেই এ যে, মহান্ বিরাট—সব দিক আছে ঢাকি'!

ক্ষুদ্র তটিনী মহাসমুদ্রে বাঁধিবে প্রেমের ডোরে?
কল্পনা তার মুহূর্ত্ত মাঝে কোথা হয় অবসান!
বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধুরে—নিজেরে রিক্ত করে,
মিশে যেতে চায় অসীমতা মাঝে—বিলাইতে চায় প্রাণ!

অধিকতর খাদ্য-উৎপাদন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের খাদ্য ও খাদ্যশস্য এবং পশুখাদ্যশস্য
চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

তৃণজাতীয় শস্য

(১) আউস ধান (বোনা)—বেলে, দো-আঁশ এবং এঁটেল মাটিতেও জন্মে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি ১০-১২ সের বীজ লাগে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে, বিঘা প্রতি ৫-৬ মণ ফলন হয়।

(২) আউস ধান (রোয়া)—উপরোক্ত মাটিতে জন্মে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয় ; এক বিঘার উপযুক্ত চারা রোপণের জন্য ৪-৫ সের বীজ লাগে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ৫-৭ মণ ফলন পাওয়া যায়।

(৩) আমন ধান (বোনা)—দোআঁশ ও এটেল মাটিতে জন্মে ; ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে পারা যায়, বিঘা প্রতি ৮ হইতে ১২ সের বীজের প্রয়োজন হয়, অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ মাসের মধ্যে ফল পাকে, বিঘা প্রতি ৭ হইতে ১০ মণ ফলন হয়।

(৪) আমন ধান (রোয়া)—উপরোক্ত মাটিতে জন্মে, জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা উৎপাদন করিতে হয়, আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ৯ ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়, এক বিঘার উপযুক্ত চারার জন্য ৪।৫ সের বীজ লাগে, অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের মধ্যে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ৭ হইতে ১০ মণ ফলন হয়।

(৫) ভুট্টা—জল দাঁড়ায় না এরূপ উচু দো-আঁশ মাটিতে জন্মে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এক হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে এক হাত অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২-৩ সের বীজ লাগে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ২-৩ মণ ফলন (দানা) পাওয়া যায়।

(৬) জোয়ার—উপরোক্ত জমি জোয়ারেরও উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২-৩ সের বীজ লাগে, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২-৩ মণ ফলন (দানা) পাওয়া যায়।

(৭) কাওন—উঁচু বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১-১।০ সের বীজ লাগে, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২-৩ মণ ফলন পাওয়া যায়। ইহার খড় গরুকে খাওয়ানো চলে।

(৮) চীনা—উপরোক্ত জমি চীনারও উপযুক্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১-১।০ সের বীজ লাগে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে, বিঘা প্রতি ১।০-২ মণ ফলন হয়, ইহার খড়ও গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়।

ডাল শস্য

(৯) অড়হর—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু জমি দরকার, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ২।০-৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২।০-৩ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি ২-৩ সের বীজ লাগে মাঘ চৈত্র মাসে ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ২-৩ মণ ফলন হয়।

(১০) মাস কলাই—বেলে দো-আঁশ জমি উপযুক্ত, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি ৪-৫ সের বীজ লাগে, কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে মাঘের শেষ পর্য্যন্ত ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ১।০-২ মণ ফলন হয়।

(১১) বরবটি—এটেল ও দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; বিঘা প্রতি ৫-৬ সের বীজ লাগে, অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝামাঝি ফসল পাকে। বিঘা প্রতি ২-৩।০ মণ ফলন (দানা) পাওয়া যায়।

(১২) সয়াবীন বা গাড়ী কলাই—বেলে-দো-আঁশ ও দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি ৩।০-৪ সের বীজ লাগে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি ফসল পাকে, বিঘা প্রতি ১।০-২।০ মণ ফলন হয়।

শাকসব্জী

(১৩) বেগুন—জল দাঁড়ায় না এইরূপ উচু দো-আঁশ জমি উপযুক্ত, আশু জাতীয়ের জন্য মাঘের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের মাঝামাঝি এবং নাবি জাতীয়ের জন্য বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীজতলায় চারা উৎপাদন করিতে হয়, আশু জাতীয় চারা চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি এবং নাবি জাতীয়ের চারা আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২।০-৩ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১।০-২ ছটাক বীজ লাগে, শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি আশু জাতীয়ের ফলন এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নাবি জাতীয়ের ফলন পাওয়া যায়, বিঘা প্রতি ৩৫-৫০ মণ ফলন হয়।

(১৪) ঢেড়শ—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ২-৩ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২-৩ ফুট অন্তর বীজ

বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি ১-১৷০ সের বীজ লাগে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ২০-২৫ মণ ফলন হয়।

(১৫) লাউ—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি এক পোয়া বীজ লাগে, ৩-৪ মাস পরে ফল ধরে, বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(১৬) কুমড়া—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি এক পোয়া বীজ লাগে, ৩-৪ মাস পরে ফল ধরে। বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(১৭) চিচিঙ্গা—দো-আঁশ মাটিতে জন্মে, চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বপন করিতে হয়, বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে, শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ফলন হয়, বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(১৮) চাল কুমড়া—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে, ৪ মাস পরে ফল ধরে, বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ মণ ফলন হয়।

(১৯) করলা—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি এক পোয়া বীজ লাগে, ৩ মাস পরে ফল ধরে, বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ মণ ফলন হয়। মাচা করিয়া দিতে হয়।

(২০) কাঁকরোল—বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কন্দ রোপণ করিতে হয়। ৩-৪ মাস পরে ফল ধরে, বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২১) ঝিঙ্গা (পালা)—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, বৈশাখ আষাঢ় মাসে ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়, বিঘা প্রতি আধ সের বীজ লাগে, ২-৩ মাস পরে ফল ধরে, বিঘা প্রতি ৩৫-৫০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২২) কাঁকড়ি—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৪-৫ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩-৪ ছটাক বীজ লাগে, বর্ষাকালে ফল দেয়, বিঘা প্রতি ২৫-৩৫ মণ ফলন হয়।

(২৩) সীম—বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়; বিঘা প্রতি ১৷০-২ সের বীজ লাগে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফসল ধরে। বিঘা প্রতি ৩০-৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২৪) বাকলা সীম—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ৯-১২ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২ সের বীজ লাগে। ৩ মাস পরে ফল ধরে। বিঘা-প্রতি ৩০-৩৫ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(২৫) চুকাবী—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ১-১৷০ সের বীজ লাগে। ৫ মাস পরে ফল ধরে, বিঘা প্রতি ১৪-১৫ মণ ফলন হয়।

(২৬) মেটে আলু বা চুবড়ি আলু—বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪-৫ ফুট অন্তর বীজ আলু রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪-৫ মণ বীজ লাগে। ৮-৯ মাস পরে ফলন হয়। বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ মণ ফলন হয়।

(২৭) মূলা—বেলে দো-আঁশ জমিতে জন্মে। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৩ পোয়া হইতে ১ সের বীজ লাগে। ২ মাস পরে ফল পাওয়া যায়। গাছগুলি ৬ ইঞ্চি অন্তর পাতলা করিয়া দিতে হয়। বিঘাপ্রতি ৪০-৫০ মণ ফলন হয়।

(২৮) শিমুল আলু—বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ৫ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৫ ফুট অন্তর ১ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া এবং ৫-৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ডগা বসাইতে হয়। বিঘা প্রতি ২,০০০ ডগা লাগে। ৮-৯ মাস পরে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ১০০ মণ ফলন হয়।

(২৯) কচু—বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৷০-২ ফুট অন্তর "মুখী" রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ১৷০-২ মণ মুখী লাগে। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৬০-৭০ মণ ফলন হয়।

(৩০) মান কচু—বেলে দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ২-২৷০ ফুট অন্তর মূল (পোয়া বা চারা) বসাইতে হয়। পৌষ-ফাল্গুন মাসে কচু পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৪০-৬০ মণ ফলন হয়।

(৩১) ওল—বেলে দো-আঁশ মাটিতে জন্মে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৷০-২ হাত অন্তর "মুখী" রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি ২-৩ মণ "মুখী" লাগে। ৬ মাস পরে ওল তোলা হয়। বিঘা প্রতি ৫০-৭০ মণ ফলন হয়।

(৩২) টেপারি—দো-আঁশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২-৩ তোলা বীজ লাগে। ৪ মাস পরে ফল ধরে।

(৩৩) উচ্ছে—দো-আঁশ মাটিতে জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ৩-৪ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ৪-৫ ছটাক বীজ লাগে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ মণ ফলন হয়। মাচার দরকার।

(৩৪) নানাবিধ দেশী শাক—(নটে, পুঁই, ডাঁটা, ফুলকা) —যে কোন জমিই উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ২-৩ ছটাক বীজ লাগে। ১-১৷০ মাস পর শাক তোলা হয়।

মসলা

(৩৫) হলুদ—বেলে দো-আশ মাটিতে জন্মে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১।০ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে আধ হাত অন্তর মূল বা গেঁড় বসাইতে হয়। বিঘা প্রতি ১ মণ মূল লাগে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা প্রতি ৫-৭ মণ ফলন (শুষ্ক) হয়।

(৩৬) আদা—ঐ। ফলন ২০-৩০ মণ।

(৩৭) লঙ্কা—বৈশাখ-আষাঢ় মাসে ১।০-২ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ১।০-২ ফুট অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারার জন্ত বিঘা প্রতি ১-১।০ ছটাক বীজ লাগে। পৌষ-ফাল্গুন মাসে ফলন হয়, বিঘা প্রতি ৬-১০ মণ ফলন হয়।

(৩৮) গোল মরিচ—নীচু সরস জমি উপযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে ৩ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৩ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি ৩-৪ শত 'কাটিং' বা চারা লাগে। ৩-৪ বৎসর পরে ফলন হয়। প্রত্যেক গাছে ১ সের গোল মরিচ পাওয়া যায়।

(৩৯) পিপুল—বেলে দো-আশ মাটিতে জন্মে। শ্রাবণ মাসে ৩ হাত অন্তর চারা লাগাইতে হয়। বিঘা প্রতি ১৫০টি চারা লাগে। পৌষ-ফাল্গুনে ফলন হয়। বিঘা প্রতি ২ মণ ফলন হয়।

তৈল বীজ

(৪০) চীনাবাদাম—বেলে দো-আশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বিভিন্ন জাতি অনুযায়ী ২ হইতে ২।০ ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ২-২।০ ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা-প্রতি খোসা সমেত ৬-৭ সের বীজ লাগে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ফলন হয়। বিঘা প্রতি ফলন ৬-৭ মণ।

(৪১) তিল (সাদা)—বেলে দো-আশ মাটিতে জন্মে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা-প্রতি ২-৩ সের বীজ লাগে। কার্ত্তিক-পৌষ মাসে ফলন হয়। বিঘা প্রতি ফলন ২-৩ মণ।

ফল

(৪২) কলা—উচু দো-আশ মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তেউড় দেড় ফুট চওড়া এবং দেড় ফুট গভীর গর্ত্তে ৮ হাত অন্তর লাগাইতে হয়। বিঘা-প্রতি একশত তেউড় লাগে। তেউড় বসাইবার দশ-বারো মাস পরে ফলন হয়। "সবরী" বা "চিনি-চম্পা" সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(৪৩) আনারস—বেলে দো-আশ ও এটেল মাটি উপযুক্ত। আষাঢ়-আশ্বিন মাসে দেড় হইতে দুই হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দেড় হাত অন্তর তেউড় লাগাইতে হয়। আঠার মাস পরে ফলন হয়।

(৪৪) পেঁপে—উচু দো-আশ জমিতে জন্মে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজতলায় বীজ বুনিতে হয়। চারাগুলির যখন তিন-চারটি পাতা হয় তখন উহাদিগকে নাড়িয়া সাত-আট ফুট অন্তর রোপণ করিতে হয়। বিঘা-প্রতি দুই তোলা বীজ লাগে। আট-দশ মাস পরে ফল হয়।

(৪৫) শসা—বেলে দোয়াশ মাটি উপযুক্ত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাঁচ-ছয় ফুট অন্তর বীজ বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি দুই-তিন তোলা বীজ লাগে। তিন মাস পরে ফলন পাওয়া যায়। বিঘা-প্রতি পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মণ ফলন হয়।

পশু-খাদ্য

(ইহার ব্যবস্থা করাও একান্ত দরকার)

(১) ভুট্টা—বেলে দো-আশ ও এটেল মাটি উপযুক্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ সের বীজ লাগে। আড়াই হইতে তিন মাস পরে কাটিয়া গরুকে খাওয়াইতে পারা যায়। বিঘা প্রতি একশত মণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়।

(২) জোয়ার—বেলে দো-আশ ও এটেল মাটিতে জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি আট-দশ সের বীজ লাগে। আড়াই হইতে তিন মাস পরে কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো চলে। বিঘা প্রতি পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ মণ কাঁচা শস্য পাওয়া যায়। ইহা ভুট্টা ও জোয়ারের সঙ্গে মিশাইয়া বোনা চলে।

(৩) বরবটী—বেলে দো-আশ ও এটেল মাটি উপযুক্ত। ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস অবধি বীজ ছিটাইয়া বুনিতে পারা যায়। বিঘা প্রতি ছয়-সাত সের বীজ লাগে। দুই হইতে আড়াই মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো চলে। বিঘা প্রতি পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ মণ কাঁচা শস্য পাওয়া যায়। ইহা ভুট্টা ও জোয়ারের সহিত মিশাইয়া বোনা যায়।

(৪) বাজরা—বেলে দো-আশ মাটিতে জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি দুই-তিন সের বীজ লাগে। দেড় হইতে দুই মাস পর কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো চলে। বিঘাপ্রতি ষাট-সত্তর মণ কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়।

(৫) মাস কলাই—বেলে দো-আশ মাটি উপযুক্ত। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি চার-পাঁচ সের বীজ লাগে। দেড় হইতে দুই মাস পরে কাটিয়া গরুকে খাওয়ানো চলে। বিঘা প্রতি পঁয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ মণ ফলন হয়।

পরিশেষে বিশেষভাবে বলা দরকার যে, স্থানীয় মাটি, জলবায়ুর উপরেই শস্য বপন প্রধানতঃ নির্ভর করে। জলবায়ুর অবস্থা অনুসারে শস্য বপনের সময়ও পরিবর্ত্তিত হইবে। বীজের মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ইহার অঙ্কুরোদ্গম শক্তির উপরেই পরিমাণ নির্ভর করে।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

রমলারা এসেছে মাসকয়েক হয়ে গেল। স্কুল-কলেজ খুলতে এখনও দিনকতক দেরি আছে। কেমব্রিজে যাবার আগে কৃষ্ণা একবার তার বিদ্যেটা প্রাইভেট কোচের কাছে ঝালিয়ে নিচ্ছে। আর রমলাকে কয়েকটা সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক কাগজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মার্কাস। তাদের জন্যে কিছু কিছু কাজও করে দিচ্ছে রমলা। কলেজে ঢোকার আগেই যদি হাতেকলমে বেশ খানিকটা শেখা হয়ে যায় ত মন্দ কি?

কিন্তু এসবে রমলার তত মন নেই যত মন আছে গানে। আসলে ও শিল্পী। ওর ফুলন্ত সুন্দর মোটা থেকে সরু হয়ে এসে মাথার কাছে গোল হয়ে ফুলেওঠা আঙুলগুলি সেতারের ঝঙ্কারের জন্যেই তৈরী।

—"গানই তোর লাইন।" কুমার একদিন বলেছিল, —"তুই যদি 'মিউজিকের' একটা কোর্স নিয়ে যেতিস তবে তুই পড়তে পেতিস না। জার্নালিজম শিখে হবে কি? ভেবেছিস বাজার পত্রিকাগুলিতে ঢুকবি,—অসম্ভব, সে আশা ছুড়ে ফেলে দে।"

—"আহা! আনন্দবাজার আর অমৃতবাজার ছাড়া কি আর কাগজ নেই দেশে, কি করে জানলে যে আমি—"

কথা শেষ না করেই রাগ করে উঠে দাঁড়াল রমলা।

—"রাগিস নে রে রাগিস নে, আনন্দবাজারে তুই ত রয়েইছিস, আর অমৃতবাজার তোর মনে।" কথার 'পান' দিয়ে কথা ঘোরাতে চাইলেন মামাবাবু।

—"মামা, তুমি ত জান, কেন আমি 'জার্নালিজম' পড়তে এসেছি।"

রমলার গলার স্বরটা হঠাৎ কেঁপে গেল। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল কুমার, অনেকদিন পরে রমলার সেই পরিচিত অভিমানের আভাস শঙ্কিত করে তুলল কুমারকে।

রমলা বললে,—"তোমরা ভাবছ আমি সখ করে বিলেতে বেড়াতে এসেছি। তোমরা ভুলে গেছ, আমাকে কাজ করে খেতে হবে, চিরজীবনের পথ করে নিতে হবে—"

অবাক হয়ে গেল কুমার। এত কথা আসছে কিসে, ওসব কথা আমি ভাববই বা কেন শুধু শুধু।"

—"জানি, জানি।" রমলা ওকে কথা শেষ করতে দিল না,—"তোমরা সবাই ভাব আমি খেয়ালি। খেয়ালের ঝোঁকেই—"

কথা শেষ না করেই নাকের পাটা লাল করে অন্য ঘরে চলে গেল রমলা।

—"এ কি অন্যায় বল ত মামা।" উঠে দাঁড়াল কুমার, —"ও কি চিরকাল এই রকম অকারণ তম্বি করেই চালিয়ে যাবে? তোমরা ছোট থেকে আদর দিয়ে ওর মাথা খেয়েছ।"

মামা বললেন,—"ওর কথায় দুঃখ পাসনে কুমার, আমাদের উপরেই ও অভিমান দেখায় বটে, আসল অভিমান ওর সেই ভগা মাষ্টারের উপরে। যে ওকে বার বার এক পথ থেকে আরেক পথে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। মনে আছে—"

মামার চোখে অতীতের স্বপ্ন ভেসে উঠল,—"ছোটবেলায় যে ওকে একবার দেখত আর ভুলত না। ওর মধ্যে দুরন্ত প্রাণোচ্ছাস সর্বদা টলমল করত। সবাই বলত বিধাতার এ কি ভুল? এই দীপ্ত প্রাণাবেগকে নারীদেহের গাত্রে ভরে দিলেন কেন। জন্মের আগেই ওর সম্বন্ধে বিধাতার সেই প্রথম ভুল। তোকে আর অমুকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত, মনে নেই? তার কিছুটা আভাস পার্থের মধ্যে আছে।"

—"না।" কুমার বললে,—"পার্থ মোটেই ও রকম নয়।"

—"নয়? বলিস কি রে? মনে নেই 'ওদের ড্রাইভার'কে রোজ কি রকম ঘোড়দৌড় করাত? একবার ওদের বাড়ীর কোন এক বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে ঘরমোছা বালতির ভিতরে বসিয়ে দিয়েছিল।"

—"ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ।" কুমার হেসে উঠল,—"মনে আছে, বড্ড দুষ্টু ছিল। একবার টীয়াদির ছোট্ট ছেলেটাকে ধরে ওর বাবার ক্ষুর দিয়ে কি রকম দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল মনে আছে। কিন্তু এবারে ওকে একেবারে অন্য রকম দেখছি। ও যেন হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে।"

—"সত্যিই, ও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে রে, হঠাৎ এক দিনেই যেন ওর বয়স বেড়ে গিয়েছিল। উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর দিন। কে ভেবেছিল সুশান্তর মত অমন সুস্থ-সবল লোক তিন দিনের সাধারণ একটু জ্বরে একেবারে মারা যেতে পারে,

অত সবল শরীরে এত দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র ! সত্যি, অমন সব ভয়ঙ্কর দিন যে মানুষের জীবনে আসতে পারে তাই বা কে জানত ? তুই ত ছিলি না।"

—"মামা, দূরে থাকা যে কাছে থাকার চেয়ে আরও কত ভয়ানক সে তুমি জান না। মায়ের চিঠিতে যখন সব খবর পেলাম, তখন সুশান্তর মৃত্যুর সাত দিন পেরিয়ে গেছে—"

—"হ্যাঁ, অনেকে বলেছিল তোকে টেলিগ্রাম করতে, আমি বারণ করেছিলাম। খারাপ খবর যত দেরীতে জানা যায় ততই ভাল।"

—"সেদিন কলেজে বাড়তি ক্লাস ছিল না, সকাল সকাল বাড়ীতে ফিরে পেলাম ঐ চিঠি। সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল। কি অদ্ভুত ! মামা আমার বিশ্বাস মনটা শরীরেই 'প্রোডাক্ট'। কিম্বা কি জানি, শরীরটাই মনের। নইলে মনের কষ্টে শরীরে অমন কষ্ট হবে কেন ?"

মামা বললেন,—"আহা রে, একা একা এসব খবরের ভার বহন করা বড় কঠিন।"

মেরীর কথা মনে পড়ল কুমারের। অযাচিত মমতা আর অকারণ স্নেহ দিয়ে সেদিন সে তার শুশ্রূষা করেছিল। নিজের পরমাত্মীয়ের কাছে আজও তার কোন পরিচয় দেয় নি, এ কি অকৃতজ্ঞতা নয় ?

কুমার বললে,—"মামা, সেই দুর্দিনে একটি মেয়ে অন্তরের বেদনা দিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিল। তার ছোঁয়ায় আমার মন জেগে উঠেছিল। একদিন তার গল্প তোমাদের কাছে করব। নইলে অকৃতজ্ঞ নাম রটবে বিধাতার দরবারে।"

মামা বললেন,—"কে সেই মেয়ে ? কোথায় আছে ? এতদিন কেন আনিস নি তাকে ?"

—"তারও মধ্যে রমলার ভাবটাই প্রধান। অভিমানে বোধ হয় সব দেশের সব মেয়েই সমান। সেও অভিমান করেই চলে গেছে আজ মাসচারেক হ'ল। এখনও তার খোঁজ পাই নি, হয়ত আর কোনদিন পাব না। যেমন হঠাৎ ওর আবির্ভাব হয়েছিল জীবনে তেমনি হঠাৎই হয় ত গেল মিলিয়ে। কিন্তু এই এক বছরে ও আমাকে যা দিয়ে গেছে তার মূল্য কোনদিন কমবে না।"

কুমারের কথা শেষ হবার আগেই কৃষ্ণা এসে দাঁড়াল। বলল,—"এ কি দাদু, তোমাদের দেখছি আজ আর নড়বার নাম নেই, ব্যাপার কি ? মামী 'কিচেনের' জানালা দিয়ে কি একটা 'স্কেচ' করতে বসে গেছেন এমন গম্ভীর মুখে যে, কথা বলতে সাহস হ'ল না।"

মামা বললেন,—"রমলা তা হলে রেগে-মেগে স্কেচ করতে বসেছে গিয়ে শেষে।"

কুমার বললে,—"কিন্তু রান্নাঘরের পিছন দিকটা কি খুব 'আর্টিষ্টিক' ?"

কৃষ্ণা বললে,—"নিশ্চয়ই, আজকের দিনে শিল্প ত কুরূপের মধ্যেই সুন্দরকে খুঁজে বের করতে চায়, সেই ত তার অ্যাম্বিশন। তা যাকগে যাক, তুমি তা হলে এখন আর উঠবে বলে মনে হচ্ছে না, কেমন ত দাদু ?"

—"কেন বল ত ?" মামা বললেন,—"আমাকে ওঠাতে তুমি এত ব্যস্ত কেন কৃষ্ণারাণী ?"

—"বাঃ, ভাবছিলাম আমাকে 'এসকর্ট' করবার মহৎ ভারটা আজ তোমাকেই দেব।"

—"ছিঃ ছিঃ কৃষ্ণা।" মামাবাবু হেসে উঠলেন—"বিদেশে এসে লোকে প্রথমেই রাস্তা চিনতে শিখে নেয়, আর আজ তিন মাস ধরে কৃষ্ণারাণী—"

—"বাঃ, তুমি বুঝি তাই ভাবছ ?" অপ্রস্তুত হাসিটা কৃষ্ণা কথার সঙ্গে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেয়,—"তুমি বুঝি ভাবছ, একা গেলে আমি পথভুলে মরব, তা নয়, এই একটু গল্প করতে করতে যাওয়া, তোমার একটুখানি সঙ্গসুখ।"

—"বেশ ত কৃষ্ণা।" কুমার বললে,—"আজ না হয় দাদুর বদলে আমাকেই সে সুখটা দিলে। আমাকে সত্যি এখনই বেরুতে হবে, তোমার শিক্ষিকার ক্লাসও ঐ পাড়ায়। কাজেই চল একটু আগে রওনা হয়ে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাই।"

মামা হাসলেন,—"আরে ছিঃ ছিঃ কৃষ্ণারাণী, একটু যদি নজর করে চলে রাস্তাঘাটগুলো চিনে ফেলতে তা হলে আর এই ফাজিলটার কাছে মান খোয়াতে হ'ত না, অনায়াসে ঘাড় বাঁকিয়ে রাঙা ঠোঁট গোল করে বলতে পারতে—ধন্যবাদ মহাশয়, আমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারি।"

কৃষ্ণা তার ঢাকাই শাড়িঢাকা জঙ্ঘাযুগল ঈষৎ নত করে বিলিতী কায়দায় 'কার্টসি' অর্থাৎ ভদ্রতা জানাল—"ধন্যবাদ মহাশয়, সত্যিই আমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারি, কিন্তু যেন পারি না—এমন ভাব দেখাই। সে কেবল তোমাদের খুসি করবার জন্যে। আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, আমার উপরে সর্দারি করতে তোমরা সকলেই বেশ ভালবাস। 'প্রোটেক্টার' সাজার এমন জায়গা আর পাবে না। আমি যে কিছুই পারি না, নেহাৎ ছেলেমানুষ একথা ভাবতে ভাল লাগে তোমাদের। তাই তোমাদের সেই অহঙ্কারকে খাদ্য জুগিয়ে একটু আনন্দদান করে থাকি। তা বলে ভেব

না সত্যি তাই। দেখ না, আজ সব কাজ সেরে আসব, হারাব না।"

কুমার চেঁচিয়ে বললে,—"মামার কথা শুনো না কৃষ্ণা, আমার ওদিকে কাজ আছে, যেতেই হবে তোমার সঙ্গে।"

ভিতর থেকে জবাব এল না।

মামা হেসে বললেন,—"এদেশের হাওয়ায় জাদু আছে। কেমন করে কথা কইল দেখলি। দু'মাসে অনেক স্মার্ট হয়ে গেছে ও।"

—"তা হোক।" কুমার রাগ করলে,—"কিন্তু আপনি ওকে ক্ষেপালেন কেন মিছিমিছি, এখন আর কিছুতেই যেতে চাইবে না হয় ত। অথচ একা একা এখানে-ওখানে ঘুরে মরবে।"

—"আমি ইচ্ছে করেই ওকে ক্ষেপিয়েছি।" মামা হাসলেন,—"রাস্তাঘাট একটু-আধটু চিনতে শেখা ওর সত্যি দরকার। তোমার কাছে যা সব শুনলাম তাতে ত মনে হচ্ছে যে চিরজীবনের মত ওকে পথ দেখাবার দায়িত্ব নিতে তুমি হয় ত আর রাজী হবে না। তা হলে কেন আর মিছিমিছি?"

—"সে কি মামা?" কুমার বাধা দেয়,—"দু'একবার পথের সঙ্গী হলেই যে, চিরজীবনের মত সে ভার নিতে হবে, তার কি মানে আছে?"

—'হ্যাঁ ভাই, আমাদের দেশে চিরকাল আমরা ঐ রকম মানেই করে এসেছি। সেই জন্যেই এবার থেকে দেখতে হবে যাতে ও তোর ওপরে নির্ভর করতে না শিখে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে শেখে। আর তা ছাড়া আজকালকার যা ব্যাপার-স্যাপার পুরুষ জাতটার উপরে নির্ভর না করাই ভাল, মেয়েরা যে একালে স্বাবলম্বিনী হচ্ছেন এতে করে—"

—"পুরুষেরা যে খুব জব্দ হবেন এমন কথা মনেও করো না মামা।" কুমার পাদপূরণ করে,—"দেখো পুরুষেরা তখন খুব চটপট নিরাবলম্ব হয়ে পড়বে। কারণ, আমার মনে হয়, আশ্রয় পেলে সেটা নির্বিবাদে গ্রহণ করা মনুষ্যস্বভাবের অন্তর্গত। ওর মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। শুনেছি বর্মায় স্ত্রীরাই স্বামীদের পোষে। এদেশেও দেখেছি ছেলেরা তাদের প্রিয়াদের জন্যে যত খরচ করে মেয়েরা তাদের প্রিয়-দের জন্যে তার চেয়ে কিছু কম খরচ করে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে স্বাবলম্বন যে পক্ষেই হোক সমাজের ভারসাম্য ঠিকই থাকে। এ পক্ষের লাভ ও পক্ষের ঘাটতি থেকে পুষিয়ে যায়।"

—"মানলাম না হয় তোর কথা, তা সত্ত্বেও মেয়েদের স্বাবলম্বন শিক্ষাই দেওয়া উচিত। তাতে করে আর অত সহজে ওদের ভোলান চলবে না।"

—"মামা, এ ব্যাপারে চিরকাল স্ত্রীপুরুষ উভয়পক্ষই পুরুষদের গালাগাল দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ সাম্যের যুগে কথাটাকে একটু অন্য দিক দিয়ে দেখবার সময় এসেছে। আচ্ছা, সত্যি করে বল ত, মেয়েরা যে প্রবঞ্চিত হয় সে কি শুধুই পুরুষের জন্যে? মেয়েদের শত রকমের সহস্র লোভও কি তার জন্যে দায়ী নয়?"

—"বেশ মানলাম।" মামাবাবু ঘাড় নাড়লেন,—"তা হলে লোভ জাগাবার প্রয়োজনই বা কি? তাই ত আরও বলছি, কৃষ্ণার মনের সামনে তুমি লোভের বাতি জ্বালাতে এস না। ও ছেলেমানুষ, যদি সে আলো দেখে ভুলে মরে? তুমি ত আর ওকে সব দিতে পারবে না? যেটুকু শুনলাম তাতে ত মনে হ'ল সে সবের অনেকখানিই অন্যের দখলে, কাজেই ও একটু-আধটুর জন্যে আর কি হবে।"

—"বল কি মামা, সব দিতে পারব না বলে যেটুকু পারব সেটুকু দিতেও কেন কুণ্ঠিত হয়ে হাত গুটিয়ে নেব?"

—"হ্যাঁরে সেই ভাল, আমাদের দেশের মেয়েরা যে একেবারে সবটাই চায়। ওসব আধাআধি বখরায় তাঁদের বিশ্বাস নেই।"

সুর করে মামা বললেন,—"আমার ষোল আনা দাম চাই, আমি আট আনা নিই না, আমায় দশে-ছয়ে যোগ করে ষোল আনা দিয়ে যাও।"

—"বুঝলাম না।" একটু চুপ করে থেকে কুমার বলে,—"ষোল আনা মূল্য আমি অস্বীকার করি না বটে, কিন্তু একথাও জানি যে, জীবনে দু'পয়সার দামও তুচ্ছ নয়। ষোল আনা খরচ করতে পারবে না বলে দু'পয়সার ভোগটুকু থেকেও নিজেকে বঞ্চিত রাখবে, এত বোকা নয় এ যুগ।"

ততক্ষণে একটা কাজ করা খদ্দরের থলি কাঁধে ঝুলিয়ে সরু কোমরে কাশ্মীরি সিল্কের আঁচল গুঁজে কালো চুলের লম্বা বিনুনীর নিচে রেশমের থোপনা দুলিয়ে ছাঁচিপানের মত ফ্যাকাশে শ্যামল সুডৌল মুখের ভাসা ভাসা দুই কালো চোখে কিছু বেদনা, কিছু অভিমান আর কিছু অকথিত ভালবাসা ভরে নিয়ে বাঁ হাতে কোট আর ডান হাতের ছোট থলিতে একটু পাউডার, একটু গর্ব আর কিছু বিলিতী পয়সা নিয়ে এসে দাঁড়াল। বললে,—"দেখ দাদু, কত তাড়াতাড়ি তৈরী হয়েছি। এইবারে সব কাজ সেরে আসব, তখন বলবে, হ্যাঁ কবিৎকর্মা মেয়ে বটে!"

একটা দেখান হাসি দিয়ে হঠাৎ নিভে-যাওয়া মনের যে ঈষৎ ছায়াটা মুখের উপরে পড়েছিল সেটা ঢেকে দিল। তার পরে দরজা খুলে যেই বেরুতে যাবে লাফিয়ে উঠল কুমার,—"এক মিনিট কৃষ্ণা, 'প্লীজ' একটু দাঁড়াও, আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে আসছি, মামার কথা শুনো না।"

—"কিছু দরকার নেই।" কৃষ্ণা বললে,—"কেন মিথ্যে কষ্ট করবেন?"

—"কষ্ট আবার কি, আমাকেও ওদিকেই যেতে হবে। বেশত একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। একা একা খবরের কাগজ মুখে করে ঘোরাঘুরি করাটা যদিও আজকাল আমার বেশ ধাতস্থ হয়ে এসেছে কিন্তু তেমন মনস্থ হয় নি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।" ও বড় বড় পা ফেলে এক নিমেষে ভিতরে চলে গেল।

কৃষ্ণা লক্ষ্য করল ও প্রায় ছুটে গেল, কিন্তু আওয়াজ হ'ল না। ছোটবেলায় মামীর সঙ্গে যখন মাঝে মাঝে তার বাপের বাড়ী যেত, দেখত, বারান্দা থেকে ঘরে আসতে ওর হাত-পায়ের ধাক্কায় ছোটখাটো টেবিল-চেয়ারগুলি প্রায় টলমল করে উঠত। আজ সেই মানুষের ছুটতে পায়ে শব্দ হয় না। বড় বেশী যেন সায়েব সায়েব ভাব—ভাবল কৃষ্ণা। মুখ তুলে দেখল, মামাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে আছেন আর নিঃশব্দ হাসিতে তাঁর চোখ চিক্‌চিক্‌ করছে,—"হাসছেন যে?" কৃষ্ণা একটু রাগ দেখায়।

—"কেন ভাই, হাসব না এমন কোন কড়ার তোমার কাছে কোনদিন করেছি বলে ত মনে পড়ে না।"

—"বারে, কড়ার না করলেই কি শুধু শুধু হাসতে হবে?"

—"হয়ত শুধু শুধু নয়, হয় ত কোন কারণ আছে।"

—"কি শুনি?"

মামা মৃদু গলায় সুর করে বললেন,—"রেখে দে সখি রেখে দে। মিছে কথা ভালবাসা, পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রু সাগরে ভাসা—রেখে দে সখি, রেখে দে—"

কাঁধের উপরে কোট ফেলে ট্রাউজারটা একটু টেনেটুনে ঠিক করতে করতে কুমার এল,—"ব্যাপার কি মামা? আবার গান জুড়েছ?"

—"গান ঠিক নয় রে। ওটা হ'ল ভূমিকা—আসল কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, তুই এসে পড়লি একেবারে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত।"

—"আসল কথাটা কি শুনি?" হলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে 'টাই'টা ঠিক করতে করতে কুমার বললে।

—"আসল কথা মনে পড়েছিল তোর দু'পয়সার লজেন্স খাবার ইচ্ছে শুনে, তাই কৃষ্ণাকে বলতে যাচ্ছিলাম। এ যা দেশ, এখানে যেন খুব করে হিসেব কষে থাকে, কিছুতে যেন দাম না কমায়। দু'পয়সার লোভে যেন ফস করে কোন দিন ওর ষোল আনাটি খুইয়ে না বসে।"

—"তাতেই বা ক্ষতি কি?" মামার মুখের দিকে চেয়ে কুমার এক রকম করে হাসল। অমন বিচিত্র হাসি এর আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ল না কৃষ্ণার।

কুমার বললে,—"অত হিসেব কষে কত জমিয়েছ মামা জীবনভোর? ষোল আনা খসাবার ভয়ে ষোল আনাই যে তাকে তুলে রেখেছ? শেষে যদি কোনদিন তল্লাস করতে যাও, দেখবে ও ষোল আনাই বরবাদ হয়ে গেছে। রাজা-মার্কা গোটা টাকাটাই এ যুগে অচল। লেনদেন কর তবে না কারবার জমে উঠবে?"

—"রক্ষে কর ভাই, এ বয়সে আর নতুন করে কারবার ফাঁদতে মন নেই। আমার ঐ অচল টাকাই ভাল।"

—"বেশ, মানলাম তাই, কিন্তু তোমার মত কেন আমাদের উপর চাপাতে চাইছ?"

—"কৃষ্ণাকে বলেছি, তোকে নয়।"

—"কৃষ্ণাকেই বা কেন বলবে? ওর এই জীবন-প্রভাতে ও বুঝি শুধু হিসেব করেই কাটাবে। ঘরের সব কয়টা দরজা খুলে দিয়ে উধাও হাওয়ায় উড়ে যেতে পারবে না।"

—"রক্ষে করুন।" কৃষ্ণা হাসল,—"আমার ডানা নেই, চলতেই পারি না ভাল করে, তায় উড়ব! দাদু নিশ্চিন্ত থাক। যদিও তোমাদের কারু কথাই ভাল বুঝলাম না, তবু যদি কোনদিন তোমার কথামত কোন টাকাকড়ির সন্ধান পাই ত নিশ্চয় ফস্‌ করে বেহিসেবী খরচ করে বসব না, কিন্তু আজ আর সময় নেই। দাদু, তোমরা তর্ক কর—টাকা জমানোর চেয়ে তর্ক জমানো ভাল—আমি যাই।"

দরজা খুলে বেরিয়ে এল কৃষ্ণা, পিছনে পিছনে কুমার এসে দাঁড়াল। বলল,—"রাগ করেছ?"

—"না ত।" ঘাড় বাঁকিয়ে একটু অবাক হয়ে তাকাল কৃষ্ণা,—"রাগ করব কেন শুধু শুধু?" নারীত্বের অভিমান ওকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে সন্দেহ নেই। পাশের লোকে দেখে তাকে চিনতে পারে, কিন্তু ওর নিজের কাছে তার রূপটি তেমন স্পষ্ট নেই। যদিও ওর বয়স প্রায় উনিশ, তবু এখনও ওর মধ্যে সেই চিরকিশোরীর বাস, যে এখনও বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করেনি, যে এখনও বাস করছে সেই প্রয়াগের ধারে—যেখানে শৈশব ও যৌবনের গঙ্গাযমুনার সঙ্গম চলছে। তাই বললে, রাগ করব কেন? কিন্তু রাগ ও সত্যিই করেছিল হয় ত। ওর স্নিগ্ধ সরল টানা টানা চোখের ভিতর থেকে মৃদু অভিমান ওর প্রতিমার মত মুখের উপরে অল্প একটু ছায়া ফেলেছিল। সেদিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে গেল কুমার। এই প্রথম যেন ভাল করে তাকিয়ে দেখল ওর দিকে—এ যেন সেই রূপকথার স্বপ্নপুরীর দেশের মেয়ে। কিন্তু ও যত মৃদু, যত মধুরই হোক লণ্ডনের এই

দ্রুতধাবমান কর্মব্যস্ত রাজপথে একটু যেন বেমানান। যে রকম আস্তে হাঁটছে তাতে আর ঐ বাসটা ধরার আশা নেই। তার চেয়ে টিউবে যাওয়াই ভাল। ট্রেনের বিদ্যুৎগতি ধীর চলনের ব্যালান্স করবে খানিকটা। এদেশে আর একটু চনমনে চটপটে না হলে কোন মেয়েরই চলে না। তাই কুমার ভাবল ওকে পথচলা সম্বন্ধে একটু লেকচার দিলে কেমন হয়। ঠিক লেকচার নয়, মৃদু একটু উপদেশ।

কুমার বললে,—"তোমাকে একটু পরামর্শ দিতে পারি কৃষ্ণা?"

চমকে ফিরে কৃষ্ণা বললে,—"কি?"

কুমার বললে,—"কৃষ্ণা তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি বাংলাদেশের পটুয়াদের আঁকা পট থেকে উঠে এসেছ। আর জান, মার্কাস বলে তুমি নাকি মূর্তিমতী ভারতবর্ষ, আর পিয়েত্রো বলে, তুমি রূপকথার স্বপ্ন।"

একটু অবাক আর একটু লাল হয়ে কৃষ্ণা বলল, —"তার পর?"

কুমার হাসল,—"তার পরে আবার যেন রেগো না,—পিয়েত্রোর সঙ্গে যদিও আমি একমত, তবু তোমাকে বলতে চাই এই যথেষ্ট নয়। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে উঠে আসতে হবে, ভারতকে পিছনে বেঁধে বেড়ালেই চলবে না, ইংলণ্ডে এসেছ, সেকথাও মনে রাখতে হবে।"

—"অর্থাৎ?" কৃষ্ণা বললে,—"রূপকথা থেকে নিজেকে 'ধিঙ্গার' বানাতে হবে?"

কৃষ্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে কুমার হাসল,—"কে বলে কৃষ্ণা তুমি কথা জান না?"

কৃষ্ণাও হাসল,—"সবাই বলে এবং কথাটা সত্যি। হঠাৎ এই কিছুদিন হ'ল দেখছি কথা আপনি আমার মুখে এসে জুটছে ঠিক সময়ে, আমাকে তার জন্যে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে না।"

—"ব্রাভো।" কুমার উৎসাহ দেখাল—"বাঙালীরা জাত-কবি; অনেক শতাব্দী ধরে কথা মুখস্থ করে এসেছে। কথা আমাদের শেখাই আছে। কিন্তু—"

—"কিন্তু কি?" কৃষ্ণা বড় চোখ স্থির করে কুমারের মুখের দিকে তাকাল। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কুমারের কথা বন্ধ হয়ে গেল।

কৃষ্ণা বলল,—"বলুন।"

—"না।" অল্প হেসে চোখ নামাল কুমার।

—"কেন?" কৃষ্ণার চোখে হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এল একটুকরো আগুনের স্ফুলিঙ্গ। ঘাড় বাঁকিয়ে দৃপ্তরাণীর মত বললে,—"কেন?"

—"এমনিই।" কুমার হাসল,—"সত্যি, বলতে ভয় পাচ্ছি কৃষ্ণা।"

—"ভয়? কাকে?"

—"কেন তোমাকে?"

এইবারে হেসে উঠল কৃষ্ণা, স্বচ্ছ সরল হাসি। ওকে যে কেউ ভয় করে, এই খবরে খুশীর হাসি,—"কি যে বলেন।" কৃষ্ণা হাসল,—"আমাকে আবার কেউ ভয় করে নাকি?"

—"আমি করি।"

—"সত্যি?" আর একবার জলতরঙ্গ-হাসি ঝরিয়ে কৃষ্ণা বললে,—"অভয় দিলাম। বলুন আর কি শিখতে হবে?"

—"তা হলে নির্ভয়ে বলি।" ছোঁয়াচে হাসি কুমারের মুখেও জ্বলে উঠল,—"কথা শেষ হয়ে গেছে কৃষ্ণা, এবারে শিখতে হবে চলা।"

—"চলা!"

—"হাঁ চলা।" কুমার বললে,—"তোমাদের গজেন্দ্র-গামিনীর চাল এদেশে চলবে না, কৃষ্ণা তোমাকে হন্‌হন্ করে হাঁটতে শিখতে হবে, আরও অনেক 'স্মার্টলি'।"

—"আর কত শিখব?" হঠাৎ একটা অবোধ্য অপমানের গ্লানি ওর শরীরে অবসাদের মত নেমে এল। অবাধ্য ক্লান্তি ওর কণ্ঠ থেকে বললে,—"আমি যা, আমি তাই। তার চেয়ে বেশি হতে চাই না।"

ও তেমনি চটি ঘষে ঘষেই চলল। চলার ভঙ্গি বদলাল না একটুও।

গলায় সত্যি সত্যি দুঃখ ফুটিয়ে ইংরেজী করে কুমার বললে,—"দুঃখিত কৃষ্ণা', আমি ঠিক ও ভাবে বলি নি, ভুল বুঝো না 'প্লীজ'। আমি শুধু বলছিলাম, ওই চটি ঘষে ঘষে চলার আওয়াজটা অত্যন্ত 'ডিপ্রেসিং' অর্থাৎ অবসাদজনক। তুমি যে আসছ ওই শব্দে তার প্রমাণ নেই। একঘেয়ে একটানা ক্লান্ত আওয়াজ। আবির্ভাবের আগমনীর সুর নেই ওতে।"

—"আপনি দেখছি ভীষণ রকম কবি।" হেসে ফেলল কৃষ্ণা, ছোট্ট একটুকরো মুগ্ধ-সরল হাসি,—"আচ্ছা বেশ, কেমন করে হাঁটব তবে শুনি? দেখিয়ে দিন।" ও চট করে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে কুমারের পদক্ষেপের দিকে তাকাল।

—"এ কি, দাঁড়ালে কেন?" কুমার চট করে পাশে এসে ওর হাত ধরল,—"চলা আবার দেখবে কি? চলতে চলতেই চলা শিখতে হয়—সাঁতারের মত। তুমি আমার সঙ্গে একসঙ্গে পা ফেলে চল, যেমন এরা যায়। দেখবে কিছু এমন শক্ত নয়।"

—"শক্ত আবার কি—ধাঃ?" দম্ভভরে এগিয়ে চলল কৃষ্ণা আর ভাবল, হাতটা এবারে ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত। ভাবতে ভাবতে যেটুকু দেরি হয়ে গেল তার মধ্যেই কৃষ্ণার

হাতটা কুমারের হাতের মধ্যে ভারি একটা নরম নরম খুশীতে মেতে উঠেছিল। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে কুমারের উপরে বিরক্ত হতে চাইল কৃষ্ণা। কুমার কেন ওকে অন্যরকম হতে বলবে? কেন ও যেমন আছে তেমনই ওকে ভালবাসবে না। আয়নায় দেখা নিজের চেহারাটা মনে পড়ল কৃষ্ণার। রঙটা ফরসা না হলেও নিজেকে দেখতে ত ভালই লাগে কৃষ্ণার। আর এই মামা-দাদু ত ওকে দেখলেই গান ধরেন:

'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।'

ও যেমন তাই কেন কুমারের মনের মত নয়। কেন ওকে আবার মনের মত অন্যরকম করে গড়ে নিতে চায় ও? কিন্তু সত্যি কি কৃষ্ণা পারবে কোনদিন কুমারের পছন্দমত করে নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে, ওর ওই শীলা, ক্লারা, ডরোথির মত? না, কৃষ্ণা কিছুতেই ও রকম হতে পারবে না। এই ত অন্যমনস্কে পা এখনই আবার ঘষে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আবার স্খলিত পদক্ষেপ সংশোধন করে নিজেকে ধিক্কার দিল কৃষ্ণা। ছিঃ ছিঃ, কেন এল এর সঙ্গে, না এলেই হ'ত, দাদু ত বারণ করেই ছিলেন, নানারকম ভাবে। কেন ও শুনল না তাই এই লজ্জা পেতে হ'ল, ও যেন কিছুই পারে না, এমনকি একটু ভাল করে 'স্মার্টলি' হাটতেও। মনে মনে ক্ষুণ্ণ অভিমানে পীড়িত হলেও কৃষ্ণার মুখে তার সেই স্নিগ্ধ-শান্তিটি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি। সে দৃঢ়পদক্ষেপে বিলিতী মেয়ের সমতালে চলতে লাগল।

—'ব্রাভো।' বাহবা দিয়ে হাসল কুমার। এ যে একেবারে রীতিমত 'প্যারেড' চলেছে আমাদের—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত।"

—"হঠাৎ ক্লাস 'টু'-এর ছাত্রের মত এক দুই গুনতে সুরু করেছেন যে?"

হাসি দিয়ে মনের ক্ষোভ ঢাকতে চাইল কৃষ্ণা। কুমারের ইচ্ছে হ'ল, বলে টোয়েন চলেছি তাই 'টু'-এর কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সামলে গেল—বলল না। মামাবাবুর শাসন মনে পড়ল—একতিল বাড়াবাড়ি চলবে না। এ মেয়ে যা বোকা, মামাবাবু যার নামকরণ করেন সরল। ঠাট্টা রসিকতা হয়ত বুঝবেই না, সত্যি ভেবে বসে থাকবে। তাই কুমার অল্প একটু হাসল। বলল,—"হঠাৎ ছেলেমানুষ হতে ইচ্ছে হ'ল, ছেলেমানুষের সঙ্গে চলেছি বলে বোধ হয়। শিশুসঙ্গের দ্বারা শৈশবকে ফিরে পাচ্ছি।''

ঘাড় বাঁকিয়ে কৃষ্ণা বললে,—"ঈস্।" আর ওর অজ্ঞাতে একটা শাণিত কটাক্ষ ওর চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হ'ল। ও বললে,—"মনে হচ্ছে একথায় রীতিমত অপমান বোধ করা উচিত। আমি মোটেই শিশু নই।''

—"কেন কৃষ্ণা, শিশু হওয়া কি অন্যায়? শুনেছি এদেশের গুরু বলেছিলেন, শিশুরাই ধন্য। কারণ তারা স্বর্গের অধিকারী?''

কৃষ্ণা বললে,—"সংস্কৃতে স্বর্গ মানে সুখ।"

—"হ্যাঁ সুখই ত।" কুমার বললে,—"সরলতার সুখ, বাঁকাপথ থেকে মুক্তির সুখ। সেই সুখস্বর্গে প্রতি মানুষকেই একদিন পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু তা বড় ক্ষণিক, ঊষা ফুটে প্রভাত হতে না হতেই মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। তবু যে মানুষ আপন স্বভাবে যৌবনেও শৈশবকে চিরসঙ্গী করে রাখতে পারে সে নিশ্চয়ই ধন্য। তার মহিমাকে স্বীকার করা যে তাকে অপমান করা, এমন কথা তুমি ভাবলে কি করে কৃষ্ণা?''

কৃষ্ণা মুখ তুলে চাইল, এতক্ষণের অভিমান সব গলে গিয়ে ওর বিশাল চোখে নবীন প্রেম কথা কয়ে উঠল। চটুল সুরে কৃষ্ণা বললে,—"আপনি ভারি চালাক ত, গালাগালিকে ফস্ করে খোসামদে রূপান্তরিত করতে পারেন। সত্যি আপনিই ধন্য।"

কুমার বুঝেছিল হঠাৎ শিক্ষা দিতে যাওয়া অন্যায় হয়েছে। তাই ভাবলে একটু স্তবগান দিয়ে নতুন পরিচয়ের ভারসাম্যটা আবার ফিরিয়ে আনবে। তাই বললে,—"সত্যি আমিই ধন্য, তোমার সঙ্গে আসতে পেলাম বলে আর তোমাকেও ধন্যবাদ আমার সঙ্গে আসতে রাজী হলে বলে। দেখ ত কেমন ভাব হয়ে গেল। একসঙ্গে না চললে কখনও বন্ধুত্ব হয়? পথচলাতেই বন্ধুত্বের সুরু।"

কৃষ্ণার মনের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ দুলে দুলে উঠল। কি এক আশ্চর্য ভাবে ওর গলা বুঁজে এল। কুমারের এই নেহাৎ সাধারণ কথাগুলি অসামান্য হয়ে ওর কানের কাছে গানের মত বাজতে লাগল। কষ্টে নিজেকে সামলে কৃষ্ণা হালকা সুর আনল গলায়। বললে,—"থ্যাঙ্ক ইউ অলসো। কেমন পথচলার ট্রেনিং পেয়ে গেলাম।"

হাঃ হাঃ করে কুমার হেসে উঠল,—"তুমি শিখলে চলা, আমি পেলাম বন্ধুত্ব। সমানে সমান। এখন চল—খট্‌খট্ খট্‌খট্। কুমার আবার বললে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—"

সেই মুহূর্তে কৃষ্ণার সেই গম্ভীর সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ে গেল—সেই সপ্তপদীর মন্ত্র। বিয়ের সব মন্ত্রের চেয়ে এইটে কৃষ্ণার বেশী ভাল লাগে।

সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ম।

তুমি সপ্তপদ গমন করিয়া আমার সখা হও। আমি যেন তোমার সখ্য লাভ করিতে পারি।

সখ্যাৎ তে মা যোষং সখ্যান্ মে মা যোষ্ঠাঃ।

আমি যেন তোমার সখ্য হতে বিযুক্ত না হই। তুমিও যেন আমার সখ্য হতে বিযুক্ত না হও।

মনে মনে শ্লোকটা আর একবার উচ্চারণ করলে কৃষ্ণা—তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু হও, আমিও যেন তোমার চির সখী হতে পারি।

টিউবে ওরা বসতে পেল না, বেশ ভীড় হয়েছিল। ওরা দুজনে একটা হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়াল। কৃষ্ণার ঠিক পরেই কুমার, বিদ্যুৎযানের তীব্র গর্জনে কারু মুখে কথা নেই। কৃষ্ণার মনে হ'ল—সেই সশব্দ নির্জনতা যেন ওদের দুজনকে লাজবস্ত্রের মত ঘিরে রইল। ওদের কথা কওয়া হ'ল না, শুধু গাড়ীর দুরন্ত গতিবেগের ঝোঁকে ঝোঁকে ওদের পরস্পরের গায়ে গায়ে বারবার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। বার বার ফিসফিস করে কুমার বললে,—"কষ্ট হচ্ছে না ত?" বার বার ঘাড় নেড়ে কৃষ্ণা জানাল—না কষ্ট হয় নি। তবে কি হয়েছে কে জানে, বুকের মধ্যে যেন বোবা সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে, গর্জন করতে পারছে না, কাঁদতে পারছে না, হাসতেও পারছে না। কষ্ট? না কষ্ট না ত। তবে কি সুখ, কে জানে কি—সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

কোচিং স্কুলের বাড়ীর দরজার সামনে ওকে নামিয়ে দিয়ে কুমার বললে,—"কখন ক্লাস শেষ হবে বল?"

কৃষ্ণা হাসল—এ সুযোগ ছাড়বে না সে। বললে,—"কেন কি দরকার? আবার এসে নিয়ে যাবেন বুঝি? খুব একটা শিভ্যলরি দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন যা হোক।"

—"বেশ যদি বারণ কর, না হয় আসব না, কিন্তু যাবে কি করে শুনি? আসবার সময় দেখেছি, তুমি পথের কিছুই লক্ষ্য করলে না।"

—"নিশ্চয়ই করেছি, খুব করেছি।" কৃষ্ণা বললে,—"দেখবেন আপনার আগে গিয়ে বাড়ী পৌঁছে যাব।"

—"অ্যাজ ইউ প্লীজ, মাদাময়সেল।" একটু নত হয়ে বাউ করার ভঙ্গীতে মৃদু হেসে চলে গেল কুমার।

ক্রমশঃ

দেহ-দীপ

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

এই স্বপ্ন, এই কান্না ধীরে ধীরে মুছে যাবে। ফিরে যাবে জীবনের গান।
কতটুকু দিতে পার ওগো মদমত্তা তুমি, কতটুকু করিবে সম্মান
আমার এ দেহদীপে? ঝটিকায় নেভে না সে, অগ্নিরাগে হয় নাকো ছাই
অনির্ব্বাণ শিখা তার; তারে নিয়ে নিশিযান জীবনের যে গানেরে গাই
তার মূল্য তুমি দেবে? কতটুকু দিতে পার? কতটুকু আছে অধিকার?
প্রহত উপল নিজে কভু কি সাগরজলে ক্ষয় তার করিবে স্বীকার?
বিপুল পিথ্বীর তলে চেয়েছিনু শুধু জানি একটিই প্রসন্ন হৃদয়—
যাকে নিয়ে ভুলে রব হেথাকার সর্ব্বগ্লানি, অবিচার, শোক, ক্ষতি-ক্ষয়?
আজ দেখি নীলাকাশ শুধুমাত্র নীল নহে, ঈশানেও ওঠে কালো ঝড়!
কুসুম কামনা নিয়ে তবুও মাটির বুকে ভেঙে পড়ে খেলা ভাঙা ঘর।
চেয়ে চেয়ে ব্যর্থ হই। তার চেয়ে ক্ষোভ ভাল। ভাল মোর এ আত্মপ্রত্যয়
আকুল আমার তৃষা অভিমান দিয়ে তাই মানিয়াছে মোর পরাজয়!
তারে জয় করিবে কি? কি আছে তোমার হায়? যৌবনের একান্ত সে ছল,
না-না-না পারিবে না। দেহদীপ আজও মোর নবরাগে প্রশান্ত উজ্জ্বল।

প্রাচীন ভারতে ক্রীড়াকৌতুক ও প্রমোদ-বৈচিত্র্য

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

আনন্দস্পৃহা ও ক্রীড়ানুরাগ মানব-মনের সহজাত প্রবৃত্তি। জটিল সাংসারিক জীবনে ক্রীড়াকৌতুক এক আনন্দদায়ক পরিবর্ত্তন। যুগে যুগে মানুষের সমাজ-জীবন ও চিন্তাধারার ক্রম-বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া ও প্রমোদবিহারে বৈচিত্র্য এসেছে, বিলাসব্যসনে এসেছে অভিনবত্ব, আনন্দভোগের স্থান, কাল ও পরিবেশের পরিবর্ত্তন হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়ার নব নব উপকরণ, বিস্তৃত হয়েছে সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও শিল্প-জ্ঞানের পরিধি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিতে অরণ্যচারী ও গুহাবাসী মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক। আত্মরক্ষা ও উদরপূরণের স্থূল প্রয়োজনে মৃগয়া-বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। দলবদ্ধ হয়ে বাস করলেও মিথুন-বিহারে তাদের শালীনতা বা সম্বন্ধবোধ ছিল না, ছিল না সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা, ছিল না চিন্তার শক্তি, সৃষ্টির প্রতিভা। বনচর পশুপক্ষীর মাঝে জীবন কাটাবার ফলে তাদের প্রকৃতিতে এসেছিল পশুভাব। মৃগয়াশেষে প্রাপ্তির আনন্দে বা মৃগয়ালব্ধ মাংসে ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে তারা নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাময়িক উচ্ছাস প্রকাশ করত। তবে সেই সমস্ত অনুষ্ঠান আনন্দ পরিবেশন ছাড়া সভ্যতার ইতিহাসে স্থায়ী কিছু দান করে নি। অনিকেত এই আদি মানবের জীবনে যখনই স্থিতি এল, তখনই সে তার খাদ্যান্বেষণের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করে খাদ্য উৎপাদনে মন দিল। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে জাগল সঞ্চয় প্রবৃত্তি, প্রাচুর্য্য সৃষ্টি করল ভোগের বাসনা, আর সেই বাসনা থেকেই সৃষ্টি হ'ল পরিবার। পরিবারের সমষ্টি নিয়েই গড়ে উঠল বৃহত্তর সমাজ-জীবন। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে এল অবসর। সেই অবসর থেকেই মিলল চিন্তার সুযোগ, এল আত্মপ্রকাশের আকুলতা ও সৃষ্টির প্রেরণা। সৃষ্টি হ'ল ধর্ম্ম, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সাহিত্য—সাংস্কৃতিক ইতিহাস গঠনে যাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান হ'ল উন্নত। অর্থনৈতিক প্রাচুর্য্য থেকেই জীবনে বিলাস ও বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হ'ল। জটিল জীবনযাত্রায় সে কামনা করল মনের বিশ্রাম, উপভোগ করতে চাইল আনন্দ, সুখ ও নূতনত্বের স্বাদ। যার ফলেই এল উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রমোদ-বিহার ও ক্রীড়াকৌতুক। প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবনেও এই ধারার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং হিন্দু ভারতের লোকপ্রিয় উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রমোদবিহার ও ক্রীড়াকৌতুকের দিনগুলি ছিল মিলনের দিন, আর আনন্দের দিন সৌন্দর্য্যের দিন;সম্মিলিত মানবের সামগ্রিক শক্তি উপলব্ধি করবার সর্ব্বোত্তম লগ্ন। এই মিলনোৎসবগুলিতে ছিল সঙ্গলাভের সুখ, ভাব বিনিময়ের পরিপূর্ণ সুযোগ, পরম আন্তরিকতা,সার্ব্বজনীন মঙ্গলের শুভ ইচ্ছা ও নবতর সৃষ্টির প্রবৃত্তি। আর তা থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, নৃত্যগীতবাদ্যে, অভিনয়ে, চিত্রাঙ্কনে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে অনেক শ্রেষ্ঠ কৃতি, কীর্ত্তি ও অবদান।

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মানুষের ধারা ভারতের স্থিতিমান জীবনকে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করেছে। নৃতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য চারু ও সুকুমার বিদ্যার পরিপূর্ণ সাহায্য নিয়ে আমরা এই সমস্ত মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ভারতের বস্তুতান্ত্রিক ও মানসিক কৃষ্টির সাধারণ ভাণ্ডারে তাদের দান সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করতে পারি।

প্রাচীন প্রস্তর যুগে ভারতের আদি-মানবেরা ছিল খাদ্য-সংগ্রাহক। আরণ্যক পরিবেষ্টনে মৃগয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন আবর্ত্তিত হ'ত। তখন মৃগয়াকে ব্যসন বলে গণ্য করা হ'ত না, আত্মরক্ষা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায়রূপে স্বীকৃত হ'ত। অরণ্যের অন্তরালে, পর্ব্বতের গুহাগৃহে এই সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা চিত্রাবলী অনুশীলন করলে তৎকালীন মৃগয়া-জীবন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা চলে। চক্রধরপুর, ঘাটশিলা, রায়গড় রাজ্যের সিঙ্গনপুর, উত্তর প্রদেশের মীর্জ্জাপুর, মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ, সুরগুজা রাজ্যের রামগিরি পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় এই আদি-মানব চিত্রকরদের অঙ্কিত ও ক্ষোদিত অনেক চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলির অধিকাংশেরই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে জীবজন্তু, হিংস্র প্রাণী, মৃগয়া-যাত্রা ও সার্থক মৃগয়ার শেষে হর্ষানুষ্ঠান।

এর পরেই এল নব্য-প্রস্তর ও তাম্র-প্রস্তর যুগ। এই দু' যুগের মানুষেরা ছিল খাদ্য-উৎপাদনকারী। খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততাবোধ থেকেই তাদের স্বভাবে এসেছিল সমাজ-প্রিয়তা। তাদের দল-প্রীতির মূলে কিছুটা কুসংস্কার, কিছুটা অন্তর্মুখী মনোবৃত্তি থাকলেও বিপদের সময়ে তাদের চরিত্রে কাপুরুষতা দেখা যেত না। কঠিন পরিশ্রমেও তাদের চরিত্রে সহজ আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত উল্লাস, গভীর সঙ্গীতানুরাগ ও পরিহাস-প্রবৃত্তি পরিস্ফুট হয়ে উঠত। তাদের এই আনন্দ-প্রিয়তার মধ্যে কামজ আসক্তি থাকলেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য ছিল না। হৃদয়াবেগকে তারা কর্ম্মরূপে গ্রহণ করত—আর এই কর্ম্মানুষ্ঠানকে তারা কখনও ক্লান্তি বা চিন্তনের দ্বারা বিলম্বিত ও জটিল করে

তুলত না। তারা ছিল দয়ার্দ্র সারল্য ও সম্মিত উদ্যমের সজীব প্রতিকৃতি। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাদের দান—কৃষিবিদ্যা পশুপালন, মৃৎশিল্প, অগ্নির ব্যবহার, ধাতব অস্ত্রনির্মাণ-পদ্ধতি, ধর্ম্মবিহিত ক্রিয়াকর্ম্ম ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে হরিদ্রা, শাখা ও সিন্দুর ব্যবহার, বাস্তুবিদ্যা, প্রতীক পূজা, নৃত্য, গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা ও নানাবিধ চারু ও কারুশিল্প।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় এ যুগের ক্রীড়া-পদ্ধতি ও প্রমোদবিহার সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা চলে। সে সময় প্রস্তরগুটিকা, কন্দুক ও অক্ষ-ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। খননকার্য্যের ফলে অজস্র অক্ষগুটিকার আবিষ্কার থেকে অক্ষ-ক্রীড়ার ব্যাপক সমাদর প্রমাণিত হয়। সংখ্যা-চিহ্নিত ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণাকৃতি বহুসংখ্যক মসৃণ গজদন্তের গুটিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনও কোনও ক্রীড়ায় গজদন্তনির্ম্মিত মৎসাকৃতি ক্রীড়নকও ব্যবহৃত হ'ত। কবচাকৃতি মুদ্রায় অঙ্কিত বন্য ছাগ ও মৃগকে তীরনিক্ষেপের দৃশ্য থেকে ও হরিণের বৃহদাকার শৃঙ্গাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সে যুগের মানুষের মৃগয়া-প্রীতি প্রমাণ করা চলে। পক্ষীপালনেও আগ্রহের অভাব ছিল না। বৃষযুদ্ধও সাধারণ্যে সমাদৃত হ'ত। মৎস্যশিকারকে নিয়মিত বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেও অনেকে আনন্দলাভ করত। মৃৎশিল্পের বহু অসংস্কৃত নিদর্শন থেকে সেকালের শিশুদের বালসুলভ রসরুচিবোধ, কল্পানুরাগ ও সৃজন-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

চানহু-দড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে চিত্তাকর্ষক, সুসংস্কৃত বিচিত্র সব ক্রীড়নকের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃন্ময় মেষ ও ক্ষুদ্রাকার শকট শিশুদের প্রিয় খেলনা ছিল। স্ত্রীপুরুষ ও পশুপক্ষীর নানা আকারের প্রতিরূপ শব্দায়মান শকট প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হ'ত। সচল বাহুবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি, দণ্ড-আরোহক খর্ব্বকায় জন্তু, কঠিন তন্তুনির্ম্মিত শিরশ্চালন-রত বৃষমূর্ত্তি, রজ্জুবদ্ধ চলমান পুত্তলিকা প্রভৃতি জটিল ক্রীড়নকের প্রচলন থেকে তৎকালীন মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান সৃজনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মহেঞ্জোদাড়োর সিন্ধু-সভ্যতার সমকালে বা পরে ভারতের ইতিহাসে আর্য্য সভ্যতা নামে এক সুমহান সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সভ্যতার স্রষ্টা বহিরাগত যাযাবর আর্য্য জাতি। ভারতের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে তারা এদেশে স্থিতি-শীল হ'ল এবং কালক্রমে এক নবতর সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করল। আর্য্যদের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ ও বেদোত্তর সাহিত্য থেকে তৎকালীন ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান এবং ক্রীড়া-পদ্ধতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই আর্য্য কৃষ্টির মধ্যে ভারতের আদিম মানবদের অবদান নগণ্য নয়।

প্রাচীন আর্য্য-ভারতের সমাজ-জীবন প্রধানতঃ ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হলেও সে যুগের জনসাধারণের লোকপ্রিয় প্রমোদবিহার, উৎসব-অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া-বৈচিত্র্যের প্রতি অনুরাগের অভাব ছিল না। সংস্কারাবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রতিপালিত এই সব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠাতা ও দর্শকদের মনে যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করত, সামাজিক জীবনে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনার্থে ব্যক্তিস্বার্থ সমষ্টির স্বার্থে রূপান্তরিত হ'ল।

ঋগ্বেদের যুগে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সোম-রস নিষ্কাশন কালে ব্রাহ্মণদের সুরসমন্বিত মন্ত্রপাঠের কথা মণ্ডূক স্তোত্রে বলা হয়েছে। ঐ স্তোত্রে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সতর্ক বিশ্লেষণও দৃষ্ট হয়। সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রার্থনা, আবৃত্তি ও স্তোত্রপাঠ প্রচলিত ছিল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা, বেণু ও পটহের উল্লেখ দেখা যায়। তরুণীদের নৃত্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ পুরুষেরাও নৃত্যে অংশ গ্রহণ করত। Dr. Keith-এর মতানুসারে বৈদিক যুগে নাট্যানুষ্ঠানও অজ্ঞাত ছিল না। রথ-প্রতিযোগিতা একটি লোকরঞ্জক অনুষ্ঠান বলে গণ্য হ'ত। দ্যূত-ক্রীড়ার প্রতি জনসাধারণের প্রচণ্ড আসক্তি ছিল। এই আসক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কথা একটি শ্লোকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে।

কৌষিতকি ব্রাহ্মণের মতানুসারে ঋগ্বেদোত্তর যুগেও নৃত্য, গীত ও বাদ্যত্রয়ী শিল্পরূপে গণ্য হ'ত। কণ্ঠ-সঙ্গীত বিজ্ঞানে আর্য্যদের বিস্ময়কর নৈপুণ্য ও মৌলিকত্বের সাক্ষ্য হিসাবে সামবেদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সে যুগে বৃত্তিধারী গায়কের অভাব ছিল না। বীণাকার, বেণুবাদক, মৃদঙ্গ ও শঙ্খবাদকদের অবস্থিতি থেকে বহুবিধ যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চ্চাও প্রমাণ করা চলে। নৃত্যকালে মৃদঙ্গ, পটহ, বেণু, বীণা, সারেঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কথা ঋক্ ও অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হয়েছে। বাজসনেয়ি সংহিতায় নর্ত্তক ও অভিনেতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ যুগে রথ-প্রতিযোগিতা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা লাভ করেছিল। বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠানে এই প্রতিযোগিতা একটি অবশ্য-করণীয় ক্রীড়ারূপে স্বীকৃত ছিল। ঘোড়-দৌড়ও একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানরূপে গণ্য হ'ত। এই প্রতিযোগি-তায় একটি অর্দ্ধচক্রাকার গতিপথ ও পুরস্কার বিতরণের কথা অথর্ব্ব-বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে শাস্ত্র-সম্মত অক্ষ-ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হ'ত। সমসাময়িক ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে অক্ষের সংখ্যা, ক্রীড়ার ধারা ও অক্ষ-গুটিকা পাতের বিভিন্ন অভিধা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। যজুর্ব্বেদে দণ্ড-নর্ত্তক ও যাদুকরের উল্লেখ দেখা যায়।

সূত্র ও উপনিষদের যুগে নৃত্যগীতের চর্চ্চা আরও বৃদ্ধি পায়। সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে বধূকে একটি আনন্দ-সঙ্গীত গাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ত। বিবাহ-উৎসবের অঙ্গ হিসাবে বধূর শিলারোহণের পর পতিকে সুর সহযোগে একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে হ'ত। সাম-বেদের গীতিমূলক আবৃত্তি থেকেই গোভিল গৃহ্যসূত্রে একটি নিয়মের প্রবর্ত্তন সূচিত হয়। সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে প্রত্যেকটি উৎসব-অনুষ্ঠান সঙ্গীত সহযোগে শেষ করা হ'ত। চূড়াকরণ উৎসবে বীণা-বাদকদের বীণা বাদন করতে বলা হ'ত। বিবাহ-উৎসবে চার বা আটজন পুরস্ত্রী নববধূকে ঘিরে নৃত্য করত। নৃত্য, গীত ও বাদনে

অংশ গ্রহণ বা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এর থেকেই কলা-শিল্পের জনপ্রিয়তা অনুমান করা চলে। নৃত্য-ক্রীড়ায় জনসাধারণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল বলেই নগরাভ্যন্তরে একটি সাধারণ ক্রীড়াগার নির্মাণ করা হ'ত। মৈত্রায়নীয় উপনিষদে নটের বেশ-পরিবর্তন ও অঙ্গরাগের উল্লেখ থেকে অভিনয় ও নাট্যকলার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

বৈদিকোত্তর যুগের সমাজ-জীবন সম্পদশ্রীতে আরও পরিপূর্ণতা, কর্মক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও ব্যাপকত্ব লাভ করেছিল। এ যুগের ধর্ম্ম-সাহিত্যে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে দুঃখবাদ ধ্বনিত হওয়ায় তপশ্চর্য্যার দিকে মানুষের অনুরাগ বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ মানুষ জীবনের ভোগবিলাসের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়েছিল। এ যুগের সাধারণ সাহিত্যে জীবনের কলকোলাহল ও কর্ম্মমুখর উল্লাসিত দিকটিই মর্য্যাদা পেয়েছিল, পরিস্ফুট হয়েছিল লঘু ও চঞ্চল এক জীবনপ্রবাহ। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ে এসেছিল বৈচিত্র্য। রামায়ণ, ভাগবত, পুরাণ, মহাভাষ্য, দশকুমারচরিত, ললিতবিস্তার, জাতকমালা, কল্পসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বাদ্যসহযোগে বিভিন্ন হাবভাব ও মুদ্রাসম্বলিত নৃত্যভঙ্গিমা, ঐকতানবাদন, সুর ও ধ্বনি বৈচিত্র্য, অঙ্গরাগ-পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। নৃত্য, গীত ও অভিনয় ছাড়াও বিদূষক, বংশ-নর্ত্তক, ঐন্দ্রজালিক, মাগধ ও চারণেরাও জন-চিত্ত বিনোদনে যথেষ্ট সহায়তা করত। ললিতবিস্তার গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, উদ্যান-রচনা ও পুষ্পমাল্য গ্রন্থনেও অনেকে আনন্দলাভ করত। অন্তর্গেহ ও বহির্গেহ বহুবিধ ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। অন্তর্গেহ ক্রীড়ার মধ্যে অক্ষক্রীড়া, চিন্তাবিচার, সতরঞ্চ ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাকাব্যের যুগে পুত্তলী ক্রীড়াও প্রচলিত ছিল। বিরাট-দুহিতা উত্তরা পুত্তলিকা ক্রীড়ায় যথেষ্ট আনন্দ পেতেন। কাহিনী ও রূপকথা শুনিয়ে অন্তঃপুরিকাদের মনোরঞ্জন করত নপুংসকেরা। বিরাট নৃপতির অন্তঃপুরে ক্লীবের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে অর্জ্জুন রাজকুমারী উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়েছিলেন। বহির্গেহ ক্রীড়ার মধ্যে মৃগয়া, রথচালনা, বর্শা-নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা, মুষ্টিযুদ্ধ, ক্রীড়াকন্দুক ক্ষেপণ, কৃত্রিম হলচালনা, মল্ল-ক্রীড়া বিশেষভাবে আদৃত হ'ত। যৌবনবতী তরুণীদের কন্দুক-ক্রীড়া মত্ততার কথা রামায়ণ ও দশকুমার চরিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। উচ্চ সম্প্রদায়ের তরুণীরা বিবিধবর্ণের কন্দুক ব্যবহার করতেন। এই ক্রীড়ার সাহায্যে তরুণীদের পুরুষ-হৃদয় মৃগয়ার কথাও ভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। রুদ্র একদা বিষ্ণু-সন্দর্শনে এসেছিলেন। বিষ্ণুর আহ্বানে অনিন্দ্যসুন্দরী এক মায়াবিনী নৃত্যক্রীড়ায় শিবের মনোহরণের নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছিল। খর-বায়ুপ্রবাহে অসম্বৃত-বসনা সেই সুযৌবনার বরতনুর কোমলতা প্রকাশিত হওয়ায় স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও মহাদেব ঐ মোহিনীর দিকে কামোন্মত্ত হয়ে ধাবিত হয়েছিলেন।

মহাকাব্যের যুগ থেকে এক আনন্দরস-সন্ধানী ও প্রমোদবিলাসী জগৎ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখনকার উৎসব, সমাজ, বিহার প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠানে কেবলমাত্র আনন্দবর্দ্ধনের ব্যবস্থাই ছিল না, রুচিকর খাদ্য ও উত্তেজক সুরাও পরিবেশিত হ'ত। নৃপতিরা এই সমস্ত লোকরঞ্জক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। মহাভারতে উল্লিখিত নৃপতি রন্তিদেবের উপাখ্যান থেকে জানা যায় যে, উৎসব উপলক্ষে সুরা, মাংস প্রভৃতি খাদ্যপানীয় জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হ'ত। এই প্রসঙ্গে রাজকীয় রন্ধনশালায় দৈনিক বহুশত প্রাণীহত্যার কথা অশোকের প্রথম শিলালিপিতে সমর্থিত হয়েছে।

জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যহীনতা পরিপ্লাবিত হয়ে যেত ঐ সমস্ত রভস উৎসবে। উচ্চ-নীচ সম্প্রদায়ের নারীরাও সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করত। উৎসব-দিনে সমগ্র নগরী পুষ্পে, মাল্যে, সুরঞ্জিত বস্ত্রে ও ধ্বজপটে সুশোভিত করা হ'ত, সমস্ত রাজ-মার্গ বারিসিঞ্চিত করা হ'ত। আর পথে পথে নর্ত্তক-নর্ত্তকী, ঐন্দ্রজালিক, যোদ্ধকুল নিজেদের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করত। উল্লসিত জনতাও বস্ত্রখণ্ড আন্দোলিত করে ক্রীড়ামত্তদের উৎসাহিত করত।

রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, আনন্দ-বিলাসের নিমিত্ত প্রমোদ-পুষ্পবাটিকা, আম্রকানন ও শ্রেণীবদ্ধ শাল বিটপীর অভাব ছিল না। বিলাসী নগরবাসী প্রায়ই দ্রুতগামী শকটে আরোহণ করে বনবিহারে বহির্গত হ'ত। কুমারীকুল সন্ধ্যাসমাগমে লতাকুঞ্জে ক্রীড়ার্থ গমন করত। তরুণীদের অরণ্য-বিহারে প্রবল আসক্তি দেখা যেত। শুক্রকন্যা দেবযানী প্রায়ই বনস্থলীতে আনন্দবিহারে যেতেন। সেখানে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা যত সহচরী-সহ তিনি বিপুল লাস্যে কুঞ্জে কুঞ্জে পরিভ্রমণ করতেন, নৃত্য ও ক্রীড়া করতেন, বনজ ফল খেতেন, মাধ্বী আসবের বিহ্বলতায় উন্মত্তা হতেন। কুশনাভ নৃপতির উদ্গতযৌবনা শতেককন্যা সুসজ্জিতা হয়ে উদ্যানে সমবেত হতেন এবং শারদীয় বিদ্যুল্লতার মত চকিত উল্লাসে নৃত্য-গীত-বাদনে চারিদিক উচ্ছ্বসিত করে তুলতেন। উল্লাস-ক্রীড়া মানসে কৃষ্ণার্জ্জুনসহ পুরস্ত্রীরা একদা যমুনাপুলিনে সমবেত হয়েছিলেন। সমগ্র ক্রীড়াস্থলী তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ছিল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল লতাবাটিকা, প্রাচুর্য্য ছিল সুস্বাদু মাংসের ও সুগন্ধী সুরার। রমেভারু রমণীকুল তাঁদের চিত্তবিমোহন পীনপয়োধর আন্দোলিত করে, আরক্তিম নয়নের কটাক্ষবর্ষণ সহ মত্ত-চঞ্চল পদক্ষেপে ক্রীড়ামত্তা হয়েছিলেন। কেউ অরণ্যে, কেউ শাদ্বল প্রান্তরে, জলবক্ষে কৌতুকক্রীড়া করছিলেন। কেউ বা বন্ধনবিহীন আনন্দে নৃত্য করছিলেন। কেউ বা হাস্য করছিলেন, কেউ বা আসবপানে উন্মত্তা হয়েছিলেন। শালীনতা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করছিলেন, কম্র-কোমল করাঘাত করছিলেন বা নিম্নস্বরে গুপ্তকথা আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। সমগ্র বনস্থলী বেণু বীণার সুস্বরে ও মৃদঙ্গের তালম্বিত নাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

স্ত্রীলোকেরা মুষ্টি ও মল্লযুদ্ধও আনন্দসহকারে উপভোগ করত। ভীম ও জরাসন্ধের মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার জন্য রমণীকুলের সমাবেশ

হয়েছিল। বিরাট রাজার অন্তঃপুরে বল্লভদের সঙ্গে ভীমের নিরন্ত্র সংগ্রাম অন্তঃপুরিকাদের চিত্ত বিনোদন করত। নগরের একাংশে বধূগণের নাট্যশালা প্রস্তুত করা হ'ত। রমণীগণের ক্রীড়াগৃহগুলি নগরকেন্দ্রে ইন্দ্রের অমরাবতীর মত শোভা পেত। নাট্যসঙ্ঘগুলির পরিচালনায় মধ্যে মধ্যে নগর উপকণ্ঠের প্রমোদ-উদ্যানে নৃত্যাভিনয়-সম্বলিত সমাজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হত।

দ্যূত-ক্রীড়া ও আসবপান জনজীবনে পাপপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলত। মহাভারতে দ্যূত-ক্রীড়ায় কুফল স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অশোকের অষ্টম শিলালিপি ও মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীকদেশীয় লেখকদের বিবরণী তৎকালীন নৃপতিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী ও ক্রীড়ানুরাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। রাজারা বিহার-যাত্রায় অত্যধিক আসক্ত ছিলেন। ঐ বিহার-যাত্রায় মৃগয়ার যাত্রাধিক্য দেখা যেত। নারী শিকারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা রথারোহণে, অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে মৃগয়ায় বহির্গত হতেন। মৃগয়াকালে তাঁর পার্শ্বে সব সময় দু'তিনজন শস্ত্রধারিণী নারী উপস্থিত থাকত। রাজকীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে মৃগয়ার পর ষণ্ডের দৌড় প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ত। অশ্ব ও বৃষভবাহিত শকটের ক্রীড়া-প্রতিদ্বন্দ্বিতারও প্রচলন ছিল। বন্য বৃষ, পালিত মেষ, গণ্ডার ও হস্তীর সংগ্রামও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল।

ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রমোদানুষ্ঠানে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের উল্লসিত ধারা গুপ্তযুগেও অব্যাহত ছিল। গুপ্তযুগীয় সাহিত্যে তৎকালীন নগরকেন্দ্রিক সমাজ-জীবনের একটি আনন্দ-উচ্ছল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই হর্ষমুখর জীবনযাত্রা সমসাময়িক নগরবাসীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। এই অভাবমুক্ত হৃষ্ট জীবনই সে যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের নব নব সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিল। তার ফলেই এ যুগের সৃষ্টি-কর্ম্মে দেখা গিয়েছিল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। যার নিদর্শন সুপরিস্ফুট হয়েছে সমসাময়িক মন্দির-ভাস্কর্য্যে ও লোকপ্রিয় ক্রিয়াকাণ্ডে।

এই যুগে নৃত্য-গীত-বাদ্য অভিনয়াদি চতুঃষষ্টি কলার আরও ব্যাপক অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। ললিতবিস্তার, ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র থেকে জানা যায় যে, চতুঃষষ্টি কলায় অপূর্ব্ব সৌকর্য্যের জন্য বহুবল্লভা ও দ্রষ্টা গণিকারাও উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সে যুগের সমাজ ছিল সুরুচির সমাজ। সেই কারণেই গৃহে পতিপ্রাণা প্রেমময়ী পত্নী থাকলেও নগরবাসী পুরুষ নৃত্যপরা, সুধাকণ্ঠী ও কলানিপুণা গণিকাদের সঙ্গই অধিক কামনা করত। বারবণিতাদের অপার কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রমোদ-উৎসবে। জাতক বর্ণিত আম্রপালী, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনা, দশকুমারচরিতের রাগমঞ্জরী ও চন্দ্রসেনা, মাধবানল-কামকন্দলার চরিত্রের মাধ্যমে কলাবতী গণিকাদের সামাজিক মর্য্যাদা ও জনসমাদর সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয়, প্রসাধন, মাল্য-গ্রন্থন, কেশবিন্যাস প্রভৃতি ললিতকলায়, আলোচনা, বিতর্ক, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, সারথ্য, মল্লযুদ্ধ, বর্ষাক্ষেপণ, ব্যায়াম, জলক্রীড়া, প্রমোদযাত্রা প্রভৃতি অন্তর্গেহ ও বহির্গেহ ক্রিয়াকলাপে যুগোপযোগী পরিবর্দ্ধন ও সম্প্রসারণ সাধিত হয়েছিল। নব নব বিষয়বস্তর চর্চ্চা ও অভ্যাসের ফলে রচিত হয়েছিল সহজ ও স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-অভিব্যক্তির প্রশস্ত ক্ষেত্র। আর সেই সাবলীল আত্মপ্রকাশের অনুকূল পরিবেশেই সম্ভব হয়েছিল চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, মৃৎশিল্প, চারু ও কারু শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর সৃজনী-শক্তির উন্মেষ, বিকাশ ও পরিপুষ্ট।

শৃঙ্গার-শতক পুস্তকে বিভিন্ন ঋতুতে জনসাধারণের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও আমোদ-প্রমোদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বসন্তকালে জনসাধারণ পিককুহর-মুখরিত লতামণ্ডপে আনন্দ-উৎসবে মত্ত হ'ত। সেখানে কবিকুলের সমাগম হ'ত। গ্রীষ্মকালে তরুণীকুল কৃত্রিম উৎস-সমন্বিত স্নানাগারে সমবেত হ'ত। শরৎকালে গভীর রাত্রে পুরবাসীরা আসবপানে উন্মত্ত হ'ত।

বাৎস্যায়ন বর্ণিত 'নাগরক' উচ্চ সমাজ-বিহারী নাগরিক। পাণিনি তাকে একাধারে কলাকুশলী ও শঠরূপে চিত্রিত করেছেন। সে যুগে যুবক 'নাগরক' উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। তার ছিল অখণ্ড অবসর আর অপর্য্যাপ্ত সম্পদ। তার বাসগৃহ দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। বহিবাটি তার উদ্দাম নর্ম্মলীলার জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর অন্তঃপুরে থাকত তার গৃহিণী। তার গৃহলগ্ন উদ্যানে ছিল ছায়া-সুশীতল কুঞ্জ, সেই কুঞ্জে থাকত সুদৃশ্য আসনযুক্ত দোলনা। বহির্ম্মহলের বিশ্রাম-কক্ষে থাকত কোমল উপাধান সজ্জিত সুবিন্যস্ত দুটি শয্যা। শয্যার মাথার দিকে একটি দণ্ডে থাকত দেবমূর্ত্তি আর সুউচ্চ বেদীর ওপর সজ্জিত থাকত তার প্রাতঃকালীন প্রসাধন সামগ্রী। প্রাচীর-সংলগ্ন কাষ্ঠাধারে থাকত তার বীণা, চিত্রাঙ্কন-তুলিকা, দর্পণ, কঙ্কতিকা, পুস্তক ও পীত পুষ্পমালিকা। গৃহতলে বিস্তৃত ছিল গালিচা, তার ওপর থাকত উপাধান, চতুরঙ্গ ও অক্ষ-ক্রীড়ার পীঠিকা। কক্ষের বাইরে থাকত পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী আর একটি নির্জ্জন কোণে থাকত তার ব্যায়ামের উপকরণ ও কারুশিল্প চর্চ্চার সরঞ্জামাদি।

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নাগরিকেরা অঙ্গরাগে ব্যাপৃত হ'ত। বিলাসী নাগরিক তার কমনীয় গাত্রত্বককে সুগন্ধী প্রলেপ দ্রব্যে কোমল করে সুবাসিত পরিচ্ছদ ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত হ'ত। তার পর প্রাতঃকালীন কর্ম্মাদি শেষ করে সে স্নানকক্ষে উপনীত হ'ত। সেখানে অঙ্গাদি মর্দ্দনের পর ক্ষৌরক্রিয়া করে সুবাসিত কল্ক, চূর্ণকষায় ও কুঙ্কুমাদি স্নানোপকরণে গাত্র মার্জ্জনা শেষে স্নান করত। দ্বিপ্রহরিক আহারের পর সে পিঞ্জরাবদ্ধ শুক-শারিকার অস্ফুট কাকলি শ্রবণ, পালিত কুক্কুটের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন অথবা সমবেত বান্ধবদের সহিত কলাশিল্পের আলাপ-আলোচনায় আনন্দে সময় অতিবাহিত করত। অপরাহ্নে সুসজ্জিত হয়ে সে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিত এবং সন্ধ্যায় নৃত্যগীত উপভোগ করত। সুসজ্জিত ও সুরভিত কক্ষে সে তার

প্রেমাস্পদাদের আগমন প্রতীক্ষা করত বা তাদের আমন্ত্রণ করে দূতী প্রেরণ করত।

দৈনন্দিন এই আনন্দ-বিলাসিতা ছাড়াও 'নাগরক' সমাজ, ঘটা (দেবার্চ্চনা উপলক্ষে জনসমাবেশ), গোষ্ঠী অনুষ্ঠান, পান-ভোজনের আসর, নৌকাবিহার, উদ্যান-সম্মেলন, লোকরঞ্জক ক্রীড়াকৌতুক প্রভৃতি সাময়িক আমোদ-প্রমোদে যোগদান করত। বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর মন্দিরে সমাজের পাক্ষিক বা মাসিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ত। এই উপলক্ষে বহিরাগত অভিনেতারাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত। বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুসজ্জিত মঞ্চে স্ত্রীপুরুষ উভয় সম্প্রদায়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রী কর্তৃক সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হ'ত। 'নাগরক-সজ্ঘ' সমবেত অতিথি ও অভ্যাগতের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হ'ত। দশকুমারচরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরীর কাহিনী থেকে জানা যায় যে, জনসাধারণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য প্রকাশ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। নর্ত্তকীর গৃহে, জাতীয় রঙ্গশালায় বা 'নাগরক'দের বাসগৃহে বয়স, সম্পদ, বিদ্যা ও স্বভাবে একই শ্রেণীভুক্ত নাগরিকদের গোষ্ঠীমিলন অনুষ্ঠিত হ'ত। এই গোষ্ঠী অনুষ্ঠানকে বিজ্ঞ নগরবাসীরা ক্ষতিকারক হিসাবে বর্জ্জন করলেও সেখানে কলাবিদ্যা ও কাব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা, বিতর্ক ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। পরস্পরের বাসগৃহে নগরবাসীরা পান-ভোজনের অনুষ্ঠান করত। সেখানে বারাঙ্গনা ও নর্ত্তকীকুল বহুপ্রকারের সুরা পরিবেশন করত ও নিজেরাও পানোৎসবে প্রমত্তা হ'ত। গ্রীষ্মকালে উদ্যান-ভ্রমণ ও জলযাত্রায় অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা হ'ত। ঐ সমস্ত প্রমোদ-ভ্রমণে 'নাগরকে'রা রত্নাভরণে ভূষিত হয়ে প্রাতঃকালেই নর্ত্তকী ও ভৃত্য সমভিব্যহারে যাত্রা করত এবং সমস্ত দিন বন্ধনমুক্ত আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করে সন্ধ্যাসমাগমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করত। বিদিশা নগরীর সাহসী যুবকদের নগরসংলগ্ন শিলাগৃহে বারাঙ্গনাসহ প্রমোদ ক্রীড়ার কথা মেঘদূতে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া নাগরকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলিতেও জনসাধারণের সঙ্গে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত এবং নিজেদের সামাজিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় যত্নশীল হ'ত। মৃচ্ছকটিকে বর্ণিত চারুদত্তের চরিত্র নগরবাসী নাগরকের একটি জীবন্ত আলেখ্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী কালের মত এ যুগেও স্ত্রীলোকেরা পীড়ার নিবৃত্তি, পরিণয়, সন্তানের জন্ম প্রভৃতি শুভ উপলক্ষে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান ও পূজাপার্ব্বণের আয়োজন করত। কল্যাণ কামনাই ছিল ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক গৌরবময় অধ্যায়। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সুপ্রতিষ্ঠায় ও ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এক শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে এ যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার চরম বিকাশ ঘটেছিল—এসেছিল আদর্শের নির্ম্মলতা, ভাব-কল্পনার গভীরতা ও নৈপুণ্যের সুচারু সূক্ষ্মতা। বহির্ভারতে-ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছিল এক নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা। আর সেই সভ্যতার বাহকরূপে জনগণের জীবনে এসেছিল বিলাস-ব্যসনের বাহুল্য ও ভোগের বৈচিত্র্য।

গুপ্তোত্তর যুগের লোকপ্রিয় আনন্দ-উৎসব ও ক্রীড়াকৌতুকের ধারাও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে অনুসরণ করে চলেছিল। শুক্রনীতিসার গ্রন্থ থেকে চতুঃষষ্ঠি কলার আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এ যুগে নৃত্যানুশীলনে আরও বৈচিত্র্য এসেছিল। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে বত্রিশ রকম নৃত্যের কথা বর্ণিত রয়েছে। জৈনগ্রন্থ সমবায়সূত্রে স্বরগতম্ (সপ্ততান-জ্ঞান), বাদ্যম (বীণা, মুরজ, মুরলী, কাংসতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন-পদ্ধতি), পুষ্করগতম (পুষ্কর নামক পটহ বাদনরীতি) ও সমতালম (তাল-জ্ঞান) এই চার প্রকার সঙ্গীতকলার উল্লেখ করা হয়েছে। যশোধর-বিরচিত জয়মঙ্গলে পঞ্চদশ রীতির অক্ষক্রীড়া ও শুক্রনীতিসারে বাহু, দণ্ড, মুষ্টি ও অস্থি এই চার প্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা বর্ণিত রয়েছে। এ যুগের মৃগয়াপদ্ধতি ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অতিক্রম করে সমষ্টিগত হয়েছিল। শিকারী কুকুর, বাগুরা প্রভৃতির ব্যবহারে শিকারের জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থ থেকে মৃগয়ার একটি বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভীতিপ্রদ মৃগয়া কোলাহল গুরুগম্ভীর সিংহনাদ, অশ্ব, মৃগ ও মাতঙ্গের বন-আন্দোলন, অরণ্যচারী পশুর বিশৃঙ্খল পলায়ন, বন্য-বরাহ ও শার্দ্দুলের ছুটাছুটি, হস্তীর বৃংহন, তুরঙ্গের হ্রেষা, সিংহের মুহুর্মুহু গর্জ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ভয়ার্ত্ত বিহঙ্গকুলের কলরব। মৃগয়ার কোলাহল স্তব্ধ হতেই শিকারী সারমেয় সহ ভীষণ-দর্শন সেনাপতির নেতৃত্বে কদাকার শস্ত্রধারী শবরসৈন্যেরা এসে উপস্থিত হ'ল।

রাজশেখর-বিরচিত কাব্য মীমাংসা, বিদ্ধশালভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরীতে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, গত যুগের মত এ যুগেও উচ্চ সম্প্রদায়ের তরুণীরা কন্দুক-ক্রীড়ায় আসক্তা ছিল। বসন্ত সমাগমে ও হিন্দোল-উৎসবে উদ্যানের তরুশাখাবদ্ধ দোলনায় তারা যৌবনমত্ততায় আন্দোলিতা হ'ত। উৎসবক্ষণে তাদের নৃত্য-গীতে সমগ্র উদ্যানস্থলী মুখর হয়ে উঠত। তাদের নৃত্যরত দেহলতিকার মত হিল্লোলে, লীলাপূর্ণ বাহুবিক্ষেপ ও করমুদ্রায়, স্মরতরলিত ভ্রূ-ভঙ্গিমায় অনুপম রূপমাধুর্য্য উৎক্ষিপ্ত হতে থাকত। উৎসব-আনন্দে মত্ত যৌবনবতীরা মাঝে মাঝে পরস্পরের গায়ে রত্নখচিত ভৃঙ্গার থেকে সুরভিত জলধারা বর্ষণ করত। কখনও বা উন্মত্ত বন্য পর্ব্বতারোহীর সময়োপযোগী বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে তারা চিত্ত-বিমোহন রূপমাধুরী প্রদর্শন করত বা শ্মশান দৃশ্যের অভিনয়ে যেন করধৃত নরমাংসের অঞ্জলি দিত। এই যুগের বহু শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, চিত্তবিনোদন মানসে তরুণীকুল নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করত। দেবতার সম্মানে অভিনয়-প্রদর্শনের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল।

এ যুগের সাহিত্যে বর্ণিত অন্যান্য প্রমোদ-উৎসবগুলি বাৎসায়নের কামসূত্রে বিবৃত 'নাগরকের' ক্রীড়া-বৈচিত্র্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় কবির দৈনন্দিন জীবনকথা সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুসংস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন আবাসে কবি তাঁর স্বচ্ছল জীবন অতিবাহিত করতেন। কোবিদার, কদম্ব ও অশোক তরু শোভিত উদ্যানবাটিকা, পদ্ম-সমাকীর্ণ দীর্ঘিকা, স্ফাটিক স্নানাগার, পত্রাচ্ছাদিত কেলিকুঞ্জ, পুষ্পপ্রেক্ষা প্রভৃতির সুভগ পরিবেশে, শিখী, শারিকা, কপোত, কঙ্ক, কুরঙ্গ প্রভৃতি বিহঙ্গ ও পশুর সান্নিধ্যে এবং দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব, লিপিকর ও অন্তঃপুরিকাদের প্রীতিপ্রদ সাহচর্যে কবি পরম আনন্দে ও স্বর্গীয় সুখে তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন। প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কবি কাব্যগোষ্ঠীর আয়োজন করতেন। কবির গৃহে কাব্য রচনা ও আলোচনায় একটি সুরুচিপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হ'ত।

কোকলের রতিরহস্য ও রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকাতে সমাজের উচ্চশ্রেণীর সম্পদশালী ব্যক্তি, রাণী ও অন্যান্য নারীদের গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অভিধানরত্নমালায় পান-উৎসবগুলির ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে। রতিরহস্যে আনন্দ-পিপাসু যুবকদের রাত্রিকালে আলোকোজ্জ্বল সুরভিত ও সঙ্গীত-মুখরিত কক্ষে সমবেত হয়ে উদ্দাম নর্মলীলায় মত্ত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। রতিরহস্য থেকে আরও জানা যায় যে, উদ্যান-সম্মেলন, পানযাত্রা, জলযাত্রা প্রভৃতি প্রমোদ-অভিযানে যোগ দিয়ে পুংশ্চলী পুরনারীরা প্রণয়ীদের সঙ্গসুখ লাভের সুযোগ পেত। সন্ধ্যা সমাগমে রত্নখচিত প্রমোদকক্ষ ও নৃত্যশালার দ্বার আনন্দ উৎসবের জন্য উন্মুক্ত হ'ত। সেখানে আভ্যাবহেরা বিশ্রামের জন্য ইতস্ততঃ বিছিয়ে রাখত পর্য্যঙ্ক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্র-পরিহিতা সৈরন্ধ্রীরা তাদের যৌবনশ্রী হিল্লোলিত করে ঘুরে বেড়াত। পূর্ণিমা রাত্রে লীলাগৃহগুলি আলোকিত করা হ'ত হেমদণ্ডের শীর্ষ-শোভিত খরদ্যুতি দীপিকায়, ধূপধুনার সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'ত। আনন্দাভিলাষী ও শৃঙ্গাররসিক যুবকদের জন্য প্রস্তুত থাকত সুকোমল কেলিশয্যা, শত শত খরযৌবনা দূতী কলগুঞ্জনে ভরিয়ে তুলত চারদিক। গ্রীষ্মকালীন সুখকর বিলাস হিসাবে দ্বিপ্রহরে গাত্রে চন্দন অনুলেপন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্নানক্ষেত্রগুলিতে জনতার ক্রীড়ামত্ততা, রাত্রিকালে শীতল সুরাপান ও সুললিত বেণুধ্বনি শ্রবণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অন্ধকার রাত্রিতে তরুণীকুল কর্ণে শিখিপুচ্ছ শোভিত করে, মৃণাল বাহুতে কনক কেয়ূর বন্ধন ও অর্দ্ধউন্মুক্ত স্ফীত বক্ষে মরকত কণ্ঠমালা দোলায়িত করে পুষ্প-মালিকা হস্তে প্রণয়ী মৃগয়ায় অভিযানে বহির্গত হ'ত।

উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথায় আমরা রাজধানীতে বসন্তকালীন উৎসব-মত্ততার একটি জীবন্ত চিত্র দেখতে পাই। বসন্তসমাগমে উৎসব-উৎফুল্ল নগরবাসী নগর-উপান্তের বনস্থলীতে সমবেত হয়ে বকুল-অশোক তরুচ্ছায়ায় আনন্দক্রীড়ায় মত্ত হ'ত। চীৎকার-বহুল প্রমোদলীলায় মাঝে কোনও কোনও অসমসাহসী নাগরিক রত্নখচিত পানপাত্রে সুবাসিত সুরা পান করত এবং মধ্যে মধ্যে তাদের বিলাস সঙ্গীনীদের রক্তিম অধরে সুরাপাত্র তুলে ধরত। প্রমোদ-উৎসব চরমে উঠত যখন রাজাও এসে তাতে যোগদান করতেন। সঙ্গীত, চন্দন ও কুঙ্কুমধারা, বাদ্যধ্বনি, নৃত্য ও হাস্য দিয়ে রাজাকে সাদরে অভিনন্দিত করা হ'ত। রাজা এসে সুরাতর্পণে দেবী চণ্ডিকাকে অর্চনা করতেন আর তাঁকে ঘিরে একটি রস-উৎসবের সৃষ্টি হ'ত। অবশ্য এই উৎসব মাঝে মাঝে শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করত এবং সমস্ত আনন্দের একটি বিয়োগাত্মক পরিসমাপ্তি ঘটত। উদাহরণস্বরূপ উপমিতিভবপ্রপঞ্চকথায় বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। যখন উৎসব-আনন্দ চরমে উঠল তখন রাজভ্রাতার সুতনুকা পত্নী রতিকলা মদমত্ত স্বামীর আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সমবেত জনতার সামনে নৃত্য করতে বাধ্য হলেন। যৌবনবতী নারীর নৃত্যরত দেহবল্লরীর আন্দোলনে পানোন্মত্ত রাজার রতিকামনা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। তিনি রতিকলার দেহের পবিত্রতা নষ্ট করতে উদ্যত হলে রাজভ্রাতা ও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সুরু হ'ল। আর সেই যুদ্ধে রাজা প্রাণ হারালেন।

কুট্টনীমতম্ থেকে আমরা গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ ধারণা করতে পারি। সম্পদশালী গ্রাম্য যুবা সুবাসিত দেহ, মনোহারী পরিচ্ছদ ও রত্নভূষায় সুসজ্জিত করে অনুচরসহ জনসমক্ষে উপস্থিত হ'ত। প্রকাণ্ড কক্ষের নৃত্যস্থলীতে একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট আসনে সে সহচরসহ উপবেশন করত। গ্রামের সমস্ত পণ্যজীবী, শিল্পী, পরান্নভোজী চাটুকার ও দ্যূত-ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিরা এসে সমবেত হ'ত। গ্রাম্য যুবককে এক সুন্দরী তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী তাম্বূল পরিবেশন করত। পাঁচ-ছ'জন শ্মশ্রুশান্ত পরিচারক তাকে ঘিরে থাকত। অহঙ্কারী, পল্লবগ্রাহী, বাকপটু ও কোপন-স্বভাব সেই যুবক শাস্ত্র থেকে অশুদ্ধভাবে শ্লোক আবৃত্তি করত, প্রাজ্ঞব্যক্তির কথোপকথনে বিনা-আমন্ত্রণেই ভূমিকা গ্রহণ করত। না বুঝেই সে নৃত্যপরা তরুণীদের নৃত্যকুশলতায় প্রশংসা বা সমালোচনা করত। সে তার বিলাসবৈভবের জন্য গণিকাদের সহজ-শিকারে পরিণত হ'ত। সমবেত ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গীতকুশলতা, বাক্য-পটুতা, নাট্যানুরাগ, অভিনয়-নৈপুণ্য, তাঁর ঔদার্য্য ও মৃগয়া-লিপ্সা নিয়ে অত্যুক্তি করত। আর সেই মিথ্যা-স্তুতিতে সে অন্তরে অন্তরে পুলকিত হয়ে অর্থবিতরণে মুক্তহস্ত হ'ত।

গুপ্তোত্তর যুগ হীনবল বৌদ্ধধর্মের অস্ত ও পুরাণ-অনুশাসিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থানের যুগ। অবতারবাদে বিশ্বাসী তৎকালীন হিন্দুসমাজে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হ'ল। মূর্ত্তিপূজার এই প্রেরণা থেকেই গড়ে উঠল মূর্ত্তি-ভাস্কর্য্য ও মন্দির-স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শনগুলি। দেবার্চনা উপলক্ষে প্রচলিত হ'ল উৎসব ও নৃত্যগীতাদি প্রমোদানুষ্ঠান। বাংলার সোমপুর বিহার, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ ও রাজরাণীর মন্দির, কোণারকের সূর্য্য-মন্দির এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গাত্রে সৌন্দর্য্য-রসিক মানুষ ক্ষোদিত

কমল তৎকালীন আনন্দ-বিলসিত স্বচ্ছল জীবনের বিচিত্র ঘটনা-পুঞ্জের জীবন্ত প্রতিরূপ। শিল্প-সৃষ্টির ইতিহাসে এগুলি আজও অতুলনীয় ও অসাধারণ।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, হিন্দুভারতের লোকপ্রিয় প্রমোদবিহার, ক্রীড়া-কৌতুক ও উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনগুলি ছিল জাতীয় মহামিলনের দিন, আনন্দের দিন, সৌন্দর্য্যের দিন, সম্মিলিত মানবের সামগ্রিক সামর্থ উপলব্ধি করবার সর্ব্বোত্তম লগ্ন। সার্থক, সুন্দর ও শুভংযু এই মিলনের দিনগুলিতে ঐশ্বর্য্যের সমারোহ ছিল সত্য, কিন্তু এদের প্রাণকেন্দ্রে ছিল আনন্দ-ভোগের অভিলাষ, হৃদয় বিনিময়ের আকুলতা, সার্ব্বজনীন শুভেচ্ছা, পরম আন্তরিকতা আর প্রীতির স্পর্শ। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে অর্গলিত রেখে মানুষ হয় ক্ষুব্ধ, একান্ত আনন্দহীন জীবনে সে হয় রিক্ত, একক, নিঃস্ব। ক্ষুদ্র জীবনের আরাম, আবেশ ও ভাববিহ্বলতা থেকে মুক্তিলাভের আশায় তাই ত আর্য্যভারতের মানুষ প্রমোদ-উৎসব ও ক্রীড়া-কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছিল। এইগুলির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর মানব-সঙ্ঘের সঙ্গে মিলিত হয়ে তারাও বৃহৎ হয়ে উঠত, মহৎ হয়ে উঠত, রচনা করত উদার-উদাত্ত-আনন্দ-সঙ্গীত-মুখরিত এক পরিমণ্ডল। এইখানেই নিহিত ছিল হিন্দুভারতের সমস্ত লোকরঞ্জক অনুষ্ঠান-গুলির তাৎপর্য্য। সেযুগের আনন্দ-ভোগে স্বার্থপরতা ছিল না, ছিল বিশ্বতাধর্ম্ম। গৃহের ঘটনা বিশ্বের ঘটনায়, ব্যক্তিগত ঘটনা বহুর ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। একের হর্ষ পরিণত হয়েছিল সকলের হর্ষে, একের মঙ্গলে হয়েছিল সকলের মঙ্গল, একের প্রাপ্তিতে হয়েছিল সকলের প্রাপ্তি। এই কল্যাণী ইচ্ছাই ছিল প্রাচীন ভারতের আনন্দানুষ্ঠানগুলির প্রাণ।

এই প্রবন্ধ রচনায় নীচের বইগুলি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১। The History and Culture of the Indian People. Vols. I, II, III, IV—Majumdar & Pusalker.

২। Sexual Life in Ancient India—J, J, Meyer,

৩। Social Life in Ancient India—Chakladar.

৪। Hindu Civilisation—Mookherjee.

ক্ষণ-স্মৃতি

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

এই যে ক্ষণগুলি নিবিড় প্রীতিভরা
মেদুর সুধাবেশে উছসি' দেয় ধরা—
এরা কি ফিরিবে না ?···

স্মরণে রবে শুধু সুখের কিছু ছায়া ;
কিছু সে ভাঙা বাণী—স্বপন-লীন মায়া ?
বেভুল মনোলোকে এ হারা ক্ষণ-সুখ
উছলি ফিরিবে না ?···

প্রদোষ-আঁধারের তারকা দীপশিখা
নারিল দিতে এঁকে উষারে জয়টিকা

তবুও মন জানে ধরিতে পারিবে সে
যে জন যায় সরে বুকের কোল ঘেঁসে,
কত না চাওয়া ফিরে—নিভৃত হিয়া-তীরে
তরী কি ভিড়িবে না ?···

আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপুষ্প দেবী

সে আজ বছর চল্লিশ আগের কথা। প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখি মোরাবাদী পাহাড়ের বাড়ীতে রাঁচিতে। আমার শিশু-জীবনে রবিরশ্মির প্রভাব ছিল প্রচুর। সকালে ঘুম ভেঙেছে বাবার গভীর কণ্ঠের আবৃত্তি শুনতে শুনতে। তার মধ্যে গীতা, উপনিষদ, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব সবই থাকত; কিন্তু শিশুর মনোরাজ্যে বাবা সুরের ঝঙ্কার সাড়া তুললেও দেবভাষা ছিল অবোধ্য। তাই বলতাম, 'বাবা! আমি বিচ্ছিরি গান শুনব না, ভাল গান শুনব।' বাবা হেসে আরম্ভ করতেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আমি তাঁর সঙ্গে গলা মেলাতাম। ফলে ৭।৮ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু', 'নৈবেদ্য', 'কথা-কাহিনী', 'খেয়া', 'সোনার তরী'র প্রায় সব কবিতা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। রাত্রে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের মধ্যেও ছিল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। আমার মা শুধু সুগায়িকাই ছিলেন না, তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য ছিল অপূর্ব্ব। কিন্তু মাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু গান গাইতে কখনও শুনি নি। ছোট বেলায় রূপকথার রাজ্যে শিশুদের থাকে অবারিত দ্বার। আমার সেই রূপকথার রাজ্যে সাড়া দিয়েছিল বিশ্বকবির কাব্যের ঝঙ্কার।

রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী ছিল তখন। একেবারে পাহাড়ের উপরে। সেইখানে প্রথম দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তখন তাঁর কালো দাড়ির মধ্যে গোলাপী টকটকে রং, মুক্তার মত সাদা দাঁত, স্বপ্নালু গভীর অপূর্ব্ব চোখ দুটি আমাকে রূপকথার রাজপুত্রের কথাই স্মরণ করিয়ে দিল। মনে হ'ল এই ত সেই রাজার ছেলে যার কাছে আছে সোনার কাঠি, ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম-ভাঙানোর পরশমণি। মনে হ'ল এই মানুষটিই পক্ষীরাজে চড়ে অলঙ্ঘ্য পাহাড় পর্ব্বত পেরিয়ে সাপের মাথার সাত রাজার ধন মাণিক আনতে পারে। তখন বুদ্ধি কম, বেশী বোঝার শক্তি ছিল না। এর পর মনে আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটি তারের যন্ত্র বাজালেন আর তার সঙ্গে মিলল কবির মোহন কণ্ঠস্বর। আমি একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। মনে পড়ল কৃষ্ণনগরের রবিবাসরীয় দিনগুলির কথা। রবিবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে গান, কবিতার আসর বসত। তার মধ্যে কবি যতীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের কথা আজও বিশেষ করে মনে পড়েছে। কবিতা আবৃত্তিতে বাবার অংশই ছিল বেশী। প্রায়ই একটি কথা শুনতাম সে হ'ল রবি ঠাকুর। তাঁকে কেন্দ্র করেই যেন সব আলোচনা হ'ত। আজ বেড়াতে আসার সময় বাবা বলেছিলেন—'চল রবিঠাকুরকে দেখবে।' সেই কথার সঙ্গে এই স্বর্ণ গোধূলি বেলায় সেই পাহাড়ের ওপর লতাকুঞ্জের মধ্যে কবির অপরূপ রূপ আমায় অভিভূত করে ফেলেছিল। মুখে আমার কথা ছিল না, শুধু শিশুর দুটি সরল চোখ তার অন্তরের সমস্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার নিবেদন নিয়ে আরতি-প্রদীপ দিয়ে তাকে বরণ করেছিল মনের গভীরে।

এর পর দীর্ঘকাল তাঁকে দেখি নি। তখন আমাদের অন্তঃপুরে প্রায় অসূর্য্যম্পশ্যই ছিল। কাজেই শত ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে দেখা সহজ ছিল না। বার বছর বয়সে বধূপদে আরোহণ করে সে দেখা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কবির কবিতার মাধ্যমে তাঁর নিত্যসঙ্গ থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারে নি। অনেক সময় কবিতা পড়তে পড়তে কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠত। অনেক তিরস্কার, গঞ্জনা এর জন্য পেতেও হয়েছে। আমার লেখা 'অস্তরবি' কবিতায় এর প্রকাশ আছে :

> "বধূ জীবনের সরম জড়িত যাত্রাপথের দিনে
> তোমার সুরের মোহেতে মুগ্ধ হয়েছি কত না ক্ষণে
> কুণ্ঠাবিহীন দীপ্ত হৃদয়ে
> তোমার কবিতা উঠিয়াছি গেয়ে
> পরিহাস ভরে হেসেছে সবাই হেরিয়া এ লাজ হীনে
> বধূ জীবনের সরম জড়িত যাত্রাপথের দিনে।"

প্রায় আরও দশ বছর পরের কথা। মনে হয় ১৯২৮ সন। আমার স্বামী তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। একটি আমন্ত্রণ-লিপি এল—শ্রদ্ধেয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বরানগরের বাগান-বাড়ীতে তাঁর বিবাহ-তিথি উৎসবের। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেখানে উপস্থিতি আমায় গভীর ভাবে আকর্ষণ করল। বাপের বাড়ী যাচ্ছি বলে সেখানে যাওয়া হবে এই ছিল আমার ইচ্ছে তবুও স্বামীর মনে নানা দ্বিধা—বললেন, 'দুজনের নামে আমন্ত্রণ-লিপি এলেও আমাদের সহকর্ম্মীরা কেউই সস্ত্রীক যাবেন না।' অনেক কষ্টে ত তাঁর মত পেয়েছিলাম। মনে ব্যাকুল আগ্রহ—পথ যেন আর শেষ হয় না। প্রথমে গেটে ঢুকতেই দেখলাম, গরদের জোড়-পরা তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষ শ্রীমহলানবীশকে গলায় ফুলের গোড়েমালা—পাশে কালো রঙয়ের ঢাকাই শাড়ী-পরা রাণী মহালানবীশ। স্নিগ্ধ মাজা রঙ ছাপিয়ে ঝরে পড়ছে মুখের অপূর্ব্ব লাবণী। মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানিয়ে ভেবেছিলাম কি পুণ্যময় দুটি জীবন—কি সৌভাগ্যমণ্ডিত। নইলে এমন সহজ করে পান এঁরা রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সঙ্গ। মনে হয়েছিল এরই জন্ত আজ কবিকে এত কাছে আবার পেলাম। আমরা যখন পৌঁছলাম তখনও বেশী জনসমাগম হয় নি। আমায় কবির কাছে বসিয়ে

রেখে অধ্যাপক মশাই বোধ হয় বন্ধুদের কাছে চলে গেলেন। সব কথা আজ মনে নেই। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছিল। তার মধ্যে আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয় ডাঃ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এর সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা ও আমার স্বামীর শিশু-বয়সের গল্পই বেশী শুনেছিলাম। পাশে অবনী ঠাকুরও বসে ছিলেন। মাঝে মাঝে কয়েকজন এসে কবির ছবি তুলে নিয়ে গেল। আমি কুণ্ঠিত হয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম কবির পদপ্রান্ত থেকে। তিনি সস্নেহে বললেন, 'উঠছ কেন? তুমিও থাক না এর সঙ্গে।' আমি বললাম, 'কিন্তু ওঁরা ত আপনারই ছবি চান।' তাতে হেসে বিশ্বকবি বলেছিলেন, 'যাঁর সে রকম অসদভিপ্রায় থাকবে তিনি ওরই মধ্যে তোমায় বাদ দিয়ে তুলবেন। সেদিনের সারাদিনের স্মৃতি মনের মধ্যে খুব উজ্জ্বল কিন্তু তার স্থান এই ছোট প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভব নয়।

এর পরে আবার রবীন্দ্রনাথকে একেবারে কাছে পেলাম শান্তিনিকেতনে। তখন আমার বাবা স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিকেতন-সচিব। বোধ হয় মাস দুই আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল এবং একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে ওই দুর্লভ মানুষটি। আজ তাঁর শেষ দিনের কথা লিখে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। তখন সবে ভোর হয়েছে, তাঁর 'শ্যামলী' নামে বাড়ীর বারান্দায় তিনি বসে। কাছে ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব শ্রীযুক্ত আলু। তাঁর আলু নামকরণের প্রসঙ্গে বিশ্বকবি বলেছিলেন, 'ওর দাদার নাম পটল আর ও বলে কি না ওর নাম সচ্চিদানন্দ? পটলের ভাই কখনও সচ্চিদানন্দ হয়? আমি বললাম, না বাপু তোমার নাম হচ্ছে আলু।' এখন ওর 'আলু' নামটাই সবাই জানে। উত্তরে আমি আমার কিশোরী কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিয়ে বলি, 'একেও আমার শ্বশুর মশাই আলু বলে ডাকতেন।' পরম স্নেহভরে পার্ব্বতীর মাথায় হাত রেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'না, না, তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ—তিনি আলু বলেন নি, এ মেয়ে ত আলো।' তাঁর ঐ সব দিনের মধু স্মৃতি স্মরণ করে কত কথাই মনে আসে। তাঁর কথা বলার একটি ভারী সুন্দর নিজস্ব ভঙ্গি ছিল যা মানুষকে সম্পূর্ণ অন্য জগতে নিয়ে যেত। এইদিনের তাঁর সঙ্গের ছবিখানি অন্যত্র দিলাম। গভীর মমতায় আমাকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা চলে এস—এখানে ছোট্ট একটি বাড়ী করে থাকবে—আমি কত গান শোনাব কত গল্প শোনাব।'

বাবাকে আসতে বললেন, 'ওহে, সুকুমার, তোমার কন্যে বলে কি? আমি নাকি তার চিঠির উত্তর দিতে দেরী করেছি—এ রকম অসৌজন্য ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রূপায়ন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম যে দিন আমি চোখ মেলে তোমারে দেখেছি
সেদিন তুমি যে ছিলে স্বপ্নমাখা অস্ফুট চেতনা।
সলজ্জ আঁখিতে ছিল কামনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত।
শিহরি শিহরি কাঁপে ভীরু বুকে কিসের বেদনা!

কোমল পৌরুষ স্পর্শে কেটে গেল সকল জড়িমা,
প্রথম স্বীকৃতি পেলে আরক্তিম মৃদু ওষ্ঠপুটে,
উমার তপস্যা শেষে তন্বী শ্যামা ক্ষীণ তনু তব,
প্রণয়ের বীজমন্ত্রে পার্ব্বতীর স্নিগ্ধ রূপে ফুটে।

মোহাবিষ্ট আঁখি পেল অপার্থিব আনন্দ কমল,
ব্রীড়াময়ী ছিলে তুমি, হলে ক্রীড়াময়ী অনুপমা,
রসের রভসলীলা জিনে নিল সর্বসত্তা মোর,
মুহূর্ত্তের মানদণ্ডে সুচিস্মিত তৃপ্তি হ'ল জমা।

অন্তঃপুর তীর্থে তুমি আজও যে প্রধান পূজারিণী,
গৃহের মঙ্গল কর্ম্মে বাজে শুভ কনক-কিঙ্কিনী।

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে ঘুমন্ত সারেংহাটি গ্রাম মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠেছিল। নদীর স্রোতের মত লোকেরা ছুটে এসেছিল দুর্ঘটনাস্থলে। তিন নম্বর কালভার্টের কাছেই ইঞ্জিনটা লাইনচ্যুত হয়ে নিচের নালার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সারেংহাটি জংশন মাঝারী রকমের ষ্টেশন, সেখান থেকেও ষ্টেশন ষ্টাফ এবং কুলীরা সবাই এসে পৌঁছেছিল যথাসময়ে।

শীতের রাতে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনার বিভীষিকা কল্পনাতীত। একটানা আর্ত্তনাদের শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না, দেখা যায় না। তুমুল কলরোলে আর জনতার অসংযত ব্যবহারে দুর্ঘটনার সমগ্র রূপটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি এখনও।

সারেংহাটির মধ্য দিয়ে প্রায় সাত মাইল রেলপথ সমতল ভূমির বিশ ফুট উঁচু দিয়ে সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। দু'পাশের গড়ান ধারে ঘন আগাছার জঙ্গল আর অসমতল মাটির ছোট ছোট স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। গড়ানে ধার যেখানে শেষ হয়েছে, তার দু'পাশেই রয়েছে লম্বা প্রশস্ত খাল। ভাল ইঁট তৈরি করার জন্যে সারেংহাটির খ্যাতি আছে এবং সেই প্রয়োজনে মাটি কেটে নেওয়ার ফলে হয় ত এ খালের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আসপাশের ক্ষেতনিকাশীর কর্দ্দমাক্ত জল এই খালেতেই মিশেছে, আর সমগ্র জলের ধারাটা তিন নম্বর কালভার্টের নিচে দিয়ে রেললাইনের অপরদিকে মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। ডাঙ্গার ধার ঘেঁসে রয়েছে নলখাগড়া, উলুঘাস আর হোগলার জঙ্গল। সারেংহাটি ষ্টেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লাইনটা প্রায় ইংরেজী অক্ষর 'এল'-এর অনুকরণে বেঁকে গিয়েছে, গাড়ীর ইঞ্জিনটা এখানেই লাইনচ্যুত হয়েছিল।

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিঘাতে জনতা প্রথমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল এবং একযোগে সকলেই সাহায্য করার চেষ্টা করতে গিয়ে এক বিশৃঙ্খল তাণ্ডবের সৃষ্টি করল। সারেংহাটির ডাক্তার বলাই পাল চৌধুরীর কৃতিত্ব সেইখানেই। অসংযত জনতার বিশৃঙ্খলাকে রূঢ়ভাবে দমন করে ডাক্তার পাল চৌধুরী তাকে কাজে লাগালেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি সুসংবদ্ধভাবে উদ্ধারের কাজে এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিয়োজিত করলেন। প্রথমেই একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সেটাকে তিনি 'বেস ক্যাম্প' রূপে ব্যবহার করতে মনস্থ করলেন। ভিড় হটানো হ'ল স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম কাজ। উত্তেজিত দর্শকদের তারা জোর করে দূরে সরিয়ে দিলে। হ্যারিকেন, মশাল, টর্চ্চ এবং সারেংহাটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পেট্রোম্যাক্স দুটো কাজে লাগল ডাক্তার বলাই পাল চৌধুরীর। অকস্মাৎ জোয়ার এসেছে যেন তাঁর স্তিমিত থমকে-যাওয়া মাংসপেশী আর মনের মধ্যে। মেডিকেল কলেজে ছাত্র-জীবনের সেই হারানো উৎসাহ আর উদ্দীপনা আবার অনুভব করলেন তিনি।

ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে আহতদের বার করে নিয়ে আসার কাজ সুরু হয়েছে এবার। কাজটা অবশ্য সহজসাধ্য নয়। রাত্রের অন্ধকারে, উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে এবং অপটু অনভ্যস্ত কাজের জন্যে উদ্ধারের কাজ ঠিকমত অগ্রসর হচ্ছে না। একদল লোক গাঁইতি, কোদাল, কুড়ুল নিয়ে বিধ্বস্ত বগীগুলির অন্তরালে অবরুদ্ধ যাত্রীদের বার করার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। তুমুল কলরোল পূর্ব্বাপেক্ষা কমেছে, জনতার মানসিক স্থৈর্য্য এতক্ষণে ফিরে এসেছে বোধ হয়। একমনে তারা নিজেদের কর্ত্তব্য করে চলেছে। যাত্রীদের মধ্যেও কয়েকজন সাহায্যের কাজে হাত লাগিয়েছে, তার মধ্যে একজনের নাম বিনয়—রোগা লম্বা ধরনের যুবক, মেডিকেল কলেজে ওয়ার্ডবাবু হিসেবে কাজ করেছে কয়েক বৎসর। নিজেই সে ডাক্তার বলাই পাল চৌধুরীর সহকারীর কাজের ভার নিলে। অল্প সময়ের মধ্যেই ডাক্তার পাল চৌধুরী বুঝলেন, বিনয় নির্ভরযোগ্য।

ড্রাইভার রবার্ট ডগলাসকে পাওয়া গেল নালার একপাশে। আকস্মিক মৃত্যুর চিহ্ন ওর মুখে ফুটে রয়েছে—চিন্তা করার মত অবসরও পায় নি সে, তাই বিমূঢ় বিস্ময়ের ভঙ্গিটা সুপরিস্ফুট।

একজন আহতকে নিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবকরা। মধ্যবয়স্ক, মোটা ধরনের চেহারা। ডানদিকের আঘাতটাই বেশি হয়েছে। কাঁধের কাছ থেকে বাহু পর্য্যন্ত রক্তাক্ত, চামড়া আর মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। কনুই-এর কাছে

হাড়দুটো মাংস ভেদ করে বাইরে চলে এসেছে, পরিষ্কার সাদা হাড়দুটো দেখা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। বিনয়কে টুর্নিকেট বাঁধতে বললেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, নিজেও একটা ইনজেক্শান দিয়ে দিলেন সেইসঙ্গে। বাহুর সন্ধিস্থলে ধমনী দিয়ে বেগে রক্তের ধারা বয়ে চলেছিল, টুর্নিকেট বাঁধার পর ধীরে ধীরে সেটা কমে আসছে। বিনয় এখনও দড়ির ভেতর একটা কাঠি দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত—চাপ হয়ে দড়িটা বসে গিয়েছে হাতের ওপর, রক্তটা ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে এবার।

মর্ফিন দোব ? জিজ্ঞেস করল বিনয়।

দাও, কিন্তু বুঝে-সুঝে দিতে হবে, আহতের সংখ্যা বেশি, ওষুধ কম, বললেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

ব্যাণ্ডেজ করব ?

কর। তুলো এবং ছেঁড়া কাপড় দিয়ে হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিলে বিনয়।

মুমূর্ষু লোকটা চোখ মেলে তাকাল একবার, তার পর মৃদুকণ্ঠে বলল, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে ডাক্তারবাবু।

কোন ভয় নেই, চোখ বন্ধ করুন, আশ্বাস দিলেন ডাক্তারবাবু।

যদি বাড়ীতে একটু খবর দেন,—আমার নাম ধীরেন ভড়, অস্ফুটস্বরে বলল, আহত লোকটি।

খবর দেওয়া হবে, আপনি নিশ্চিন্ত হন।

ফের অজ্ঞান হয়ে গেল, বলল বিনয়।

ভালই হ'ল, মরফিয়ার কাজ সুরু হয়েছে তা হলে।

বাঁচবে ?

যদি রিলিফ ট্রেনটা তাড়াতাড়ি এসে যায় তা হলে আশা আছে—ব্লাড দেওয়া খুব দরকার, হাতটা অবশ্য বাদ দিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত, 'ক্রাসড' হয়ে গেছে একেবারে। কম্বলটা গায়ে চাপা দিয়ে দাও।

ডাক্তার পাল চৌধুরী অন্য কেসে হাত দিলেন। আস-পাশে মাঝে মাঝে চীৎকার শোনা যাচ্ছে। সারেংহাটি থানা থেকে পুলিস এসে গিয়েছে ইতিমধ্যে, এখন ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা আলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে সেখানে ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত ভিড় দেখা যাচ্ছে।

ঘন কুয়াশা নালার উপর থিতিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে যেন। আলোগুলির উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে হলদে রং-এর হয়ে গিয়েছে।

ষ্ট্রেচারে করে আর একজন আহতকে নিয়ে এসেছে ওরা। ডাক্তার পাল চৌধুরী একবার তাকিয়ে দেখলেন। গেরুয়া পরিহিত একজন আহত যাত্রী মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। ভারী একটা হাতুড়ী দিয়ে কে যেন সাধুজীর মাথা আর মুখটা চূর্ণ করে দিয়েছে একেবারে। ভ্রূর ওপর থেকে চোয়াল পর্য্যন্ত একটানা লম্বা একটা ফাটলের মত দেখা যাচ্ছে। চোখটা অক্ষিকোটর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে প্রায়, কানের ভেতর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর ঘিলু বার হয়ে আসছে ক্রমাগত। বীভৎস মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার পাল চৌধুরী বললেন, এখানে একে আনলে কেন ? ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন তিনি স্বেচ্ছা-সেবকদের দিকে।

মারা গেছে ? জিজ্ঞেস করল ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে—, দেখছ না মাথার খুলী আর মুখটা চূর্ণ হয়ে গেছে, যাও ওকে ওখানে রেখে এস।

মৃত দেহগুলি ঢালু জায়গার একপাশে রাখা হয়েছে। ভিজে নরম ঘাসের ওপর একটার পর একটা বিভিন্ন ভঙ্গিতে সেগুলি শুয়ে রয়েছে। ট্রেনের ধ্বংসাবশেষের মত এগুলিও আর কাজে লাগবে না,—এখন ওগুলি মূল্যহীন, অব্যবহার্য্য ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

পিছনের কামরার যাত্রীদেরও সাহায্যের প্রয়োজন। দৈহিক আঘাত এড়িয়েছে অনেকেই কিন্তু আকস্মিক মানসিক আঘাতে অনেকেই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তারবাবু একবার ওদিকে আসবেন ? আগন্তুকের দিকে তাকালেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

কি হয়েছে ?

আমার স্ত্রী কি রকম হয়ে গেছে যেন। ভীত পাংশু মুখের দিকে একবার তাকালেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, তার পর বিনয়কে বললেন, তুমি একবার যাও, দেখে এস কিছু করতে পার কিনা। হাতে কাজ রয়েছে তাঁর, একজন আহতের পরিচর্য্যা করছেন তিনি। আগন্তুকের সঙ্গে এগিয়ে গেল বিনয়।

বিক্ষিপ্ত কোলাহলের কিছু কিছু অংশ শুনতে পারছেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। বিধ্বস্ত বগীর অন্তরালে সন্ধান পেয়েছে ওরা আর একটি মুমূর্ষু মানুষের—তাই এই আলোড়ন। মনে মনে হাসলেন ডাক্তার, এরা আঘাত করতেও যেমন পটু আবার উদ্ধার করতেও তেমনি ব্যগ্র। কিছুদিন আগে সারেংহাটি বাজারে একজন চোর ধরা পড়েছিল, উন্মত্তের মত জনতা তাকে প্রহার করেছিল নির্দ্দয়ভাবে। মনে পড়ল, চোরটার প্রাথমিক চিকিৎসা তিনিই করেছিলেন।

ডাক্তারবাবু—আহত লোকটা কথা বলছে, আমি কি বাঁচব ?

কেন কি হয়েছে আপনার যে বাঁচবেন না? কলার-বোনটা ফ্র্যাকচার হয়েছে মাত্র, ওতে কেউ মরে না।

কিন্তু শরীরটা কিরকম ঝিম ঝিম করছে যেন।

ওটা ভয়েতে হচ্ছে, আপনি পিছন ফিরে বসুন। কাঁধের পিছনে একটা পাতলা কাঠের টুক্‌রো দিয়ে তার ওপর ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী, তার পর বললেন, এখন আপনার শুয়ে থাকার দরকার নেই।

দরকার নেই?

না, আপনি বরঞ্চ আমাদের একটু সাহায্য করার চেষ্টা করুন।

কি করব বলুন?

ওই লোকটিকে একটু ওয়াচ করুন।

এ কি! এ যে ধীরেন ভড়।

চেনেন?

হ্যাঁ, একই কোম্পানীতে কাজ করি আমরা। রবীন সরকার ধীরেন ভড়ের পাশে গিয়ে বসল।

ডাক্তার পাল চৌধুরী আকাশের দিকে একবার তাকালেন।

কুয়াসার আবরণে আকাশের রংটা দেখা যাচ্ছে না। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরোগুলি ভেসে ভেসে একটা কোণের দিকে জড়ো হচ্ছে এক এক করে।

ডাক্তারবাবু, বিনয় ফিরে এসেছে।

কি হ'ল?

কিছু করতে পারলাম না, ভদ্রমহিলা কেবল চীৎকার করছেন পাগলের মত। একটা মরফিয়া দিয়ে আসব?

না, এসব কেসে মরফিয়া দেওয়া হয় না, তা ছাড়া মরফিয়া বেশী নেই, বাজে খরচ করা চলবে না। আমি যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ ওখানেই থাক। ডাক্তার পাল চৌধুরী ট্রেনের পিছন দিকে এগিয়ে চললেন। অদূরেই দেখা গেল একটা ছোট ভিড় হয়ে রয়েছে। তিনি নিকটে যেতেই ভিড় সরে গেল। একজন ভদ্রমহিলা চীৎকার করছেন ক্রমাগত, দু'পাশ থেকে দুজনে তাকে ধরে রেখেছে।

ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও—তীক্ষ্ণ অনুনাসিক স্বরটা একঘেয়ে আর একটানা। শান্ত করতে কয়েকবার বিফল চেষ্টা করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—নিজেকে মুক্ত করে নিতে চেষ্টা করছেন তিনি।

চুপ করুন, একেবারে চুপ—দু'বাহু ধরে ঝাঁকানী দিয়ে সজোরে চীৎকার করে উঠলেন ডাক্তারবাবু। ফল হ'ল না কিছু।

ছেড়ে দাও, আমায় ধরে রেখ না, ছেড়ে দাও—চীৎকারটা চলেছে সমানে। অকস্মাৎ ডাক্তার পাল চৌধুরী সজোরে চড় মারলেন মহিলাটির গালে। থমকে থেমে গেলেন তিনি, কান্নাটা বন্ধ হ'ল কিন্তু এখনও কি যেন বিড় বিড় করে বকছেন আপন মনে। আবার এক চড়। এবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মহিলাটি। দর্শকরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ডাক্তার পাল চৌধুরীর, সেই ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, ওঁকে নিয়ে একটু নির্জ্জনে চলে যান, এবারে ঘুমিয়ে পড়বেন হয়ত, আর আপনারা এখানে ভিড় করবেন না, সরে যান। শেষের কথাগুলি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি ফিরে চললেন আগের জায়গায়, এসব ক্ষেত্রে এর চেয়ে ফলদায়ক ওষুধ নাকি আর কিছু নেই।

ঘর্ম্মাক্ত হয়ে গিয়েছেন ডাক্তার পাল চোধুরী, ভ্রূ কুঞ্চিত করে একবার পিছন ফিরে তাকালেন তিনি, চিকিৎসার রূঢ় আর অপ্রিয় প্রতিক্রিয়াটা হঠাৎ যেন নিজের মধ্যেই ফুটে উঠছে তাঁর অজ্ঞাতে।

আর একজন আহত তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসলেন তিনি। আগের রোগীর কথা মন থেকে মুছে গেল সঙ্গে সঙ্গে, হাতের কাছে যে এসেছে সেই জুড়ে বসল তাঁর মনটায়।

আর্টারী ফরসেপ দাও—কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে ডাক্তার পাল চৌধুরীর—স্পিরিটে ডুবিয়ে আর্টারী ফরসেপটা এগিয়ে দিলে বিনয়।

ক্যাটগাট—বাঁ হাতটা বাড়ালেন তিনি।

ষ্টেরিলাইজড করা নেই, দ্বিধাভরে বলল বিনয়।

রাখ তোমার ষ্টেরিলাইজেসান, ধমকে উঠলেন যেন তিনি, একটা এ্যাট্রোপিন ইনজেক্‌শান কর। একমনে সেলাই করছেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

বাসদেও শর্ম্মার হাঁটুর ওপরে আঘাত লেগেছে। উরুর চামড়া আর মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে যেন দলা পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমে ছিন্নমুখ শিরাগুলো নির্ভুল ভঙ্গিতে ফরসেপ দিয়ে ধরে একটার পর একটা বেঁধে চলেছেন তিনি। এর পর এলোমেলো মাংসপেশীগুলিকে সাজিয়ে চর্ব্বির আস্তরণটা সেলাই করে সবশেষে ওপরের ত্বকটা সেলাই করতে লাগলেন ধীরে ধীরে। কাজ করতে ভাল লাগছে ডাক্তার পাল চৌধুরীর, খুব ভাল লাগছে। প্রথম জীবনের সজীবতা আর ক্ষিপ্রতা ফিরে এসেছে তাঁর মধ্যে, জড়তা অদৃশ্য হয়ে এসেছে উৎসাহ আর নতুন উদ্দীপনায়।

বাবুজী, এতক্ষণে কথা বলল বাসদেও শর্ম্মা।

কেয়া?

থোড়া পানি, বহুত পিয়াস—। তার মুখে জল ঢেলে দিল বিনয়। আকণ্ঠ জল পান করল বাসদেও, তৃষ্ণায় গলাটা তার কাঠের মত শুকিয়ে গিয়েছে।

ত্বকের ওপর সেলাইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাঁচি দিয়ে বাড়তি ক্যাটগাটগুলি নিপুণ হাতে ছেঁটে দিলেন তিনি তার পর একদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত অনুধাবন করলেন নিজের কাজটা। হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে, জামার আস্তিন দিয়ে ঘর্ম্মাক্ত মুখটা একবার মুছে নিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। অনেকদিন পর আবার যেন জোয়ার এসেছে তার রক্তস্রোতে —পল্লীগ্রামের থিতিয়ে-যাওয়া জীবনে এসেছে উত্তেজনা আর কর্ম্মব্যস্ততা। ভাল লাগছে ডাক্তার পাল চৌধুরীর, বেশ ভাল লাগছে। একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। সজোরে সেটায় টান দিয়ে ধোঁয়াটা আত্মসাৎ করার চেষ্টার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি—শ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়ার অব্যবহৃত অংশটুকু বেরিয়ে এল ক্ষীণ ধারায়।

নতুন কেস এসেছে একটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেসটা কয়েক মুহূর্ত্ত নিরীক্ষণ করলেন তিনি, তার পর বিনয়কে বললেন, পালসটা দেখ। কয়েকবার অনুভব করার বিফল চেষ্টা করে বিনয় বলল, বুঝতে পারছি না।

সর, আমি দেখি—কয়েক সেকেণ্ড হাতের কব্জির কাছে তাঁর তিনটে আঙ্গুলের চাপে অনুভব করতে চেষ্টা করলেন দুর্ব্বল ধমনীর মৃদু কম্পনটা, তার পর বললেন, হ্যাঁ পালস্ আছে, পারকর্টা ইনজেকসানটা বার কর, ব্যাগেই আছে।

হ্যাঁ পেয়েছি, দিয়ে দোব?

দাও, তার আগে গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়ে দাও।

কিন্তু বাইরে ত কোন চোট দেখছি না, মাথায় শুধু একটা জায়গায় একটু কেটে গেছে।

খুব সম্ভব ইন্টারনাল হেমারেজ হচ্ছে, আর মাথার চোটটাও কম নয়, ড্রেস করে দাও ওটা, একটু প্লাসমা পেলে হয়ত লোকটাকে বাঁচান যেত, আমার বড় ব্যাগে গ্লুকো-স্যালাইন আছে বার কর, উপস্থিত তাই দেওয়া যাক।

স্যালাইন সেটটা খাটিয়ে ফেলল বিনয়। স্ট্যাণ্ডের ওপর উল্টান বোতলে রয়েছে গ্লুকোজ এবং স্যালাইন। রবার টিউবের প্রান্তের মোটা সূচটা বাহুর ধমনীতে নির্ভুল ভঙ্গিতে ঢুকিয়ে দিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। রবারের নল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা স্যালাইন ধমনীর ভেতর রক্তের সঙ্গে মিশছে ধীর মন্থর গতিতে। স্তিমিত আলোকে কাঁচের টিউবটার মধ্যে স্যালাইনের ফোঁটাগুলো চোখের জলের মত ঝরে পড়ছে এক-একটা করে।

বুনো ঘাসের সোঁদা গন্ধ ভিজে কুয়াসার সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছে। লোকেরা দলবদ্ধভাবে খালের পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে আনাগোনা করছে বার বার, পায়ের শব্দগুলি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—ছপ ছপ ছপ। অদ্ভুত আকৃতির দীর্ঘ ছায়াগুলি বার বার সরে সরে যাচ্ছে একদিক থেকে অপর দিকে।

ডাক্তার পাল চৌধুরী খালের অপর পারে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ আগে সারেংহাটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরিদাসকে তিনি বাজারে পাঠিয়েছেন ওষুধের খোঁজে, এখনও এসে পৌঁছায় নি সে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি, ওষুধের অভাবে কাজ ব্যাহত হচ্ছে তাঁর।

ডাক্তারবাবু, হরিদাস ফিরেছে।

কি হ'ল?

পেলাম না কিছু।

সে কি, রমণীবাবু কোথায়? বাজারের রমণী মেডিকেল হলের মালিক তিনি।

রমণীবাবু আজ বাড়ী চলে গেছেন।

বাড়ী গেলে না কেন?

সে ত নদীর ওপারে, যেতে আসতে সকাল হয়ে যাবে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী তার পর বললেন, তা হলে এক কাজ কর।

বলুন।

দোকানের দরজা ভেঙ্গে ফেল।

দরজা ভাঙ্গব? বিস্মিত হ'ল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরিদাস।

এতগুলি লোকের প্রাণ নির্ভর করছে ওষুধের ওপর।

কিন্তু—

বুঝেছি, ভয় পাচ্ছ তুমি, ওখানে কে, পয়েণ্টসম্যান জীতনারায়ণ না?

হ্যাঁ।

ডাক ওকে। জীতনারায়ণ এসে দাঁড়াল।

তুমি বাজারের রমণী মেডিক্যাল হল জান?

হ্যাঁ হুজুর জানি।

দরজা ভেঙে ওষুধ আনতে পারবে? আমার ওষুধ চাই।

আমি এখুনি যাচ্ছি। মনের মত কাজ পেয়ে খুশীই হ'ল জীতনারায়ণ, মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের হরিদাসের মত সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল না একমুহূর্ত্তের জন্যেও। জীতনারায়ণের সঙ্গে হরিদাস আর বিনয়ও গেল। কোন্ কোন্ জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন তার একটা ফর্দ্দ মুখে মুখে বলে দিলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

ধোঁয়া বেরুচ্ছে যেন কোথা থেকে, হয়ত কিছু পুড়ছে। রবার, কাঠ বা ঐ জাতীয় কিছু হবে বোধ হয়—কটু, চামসে, উগ্র গন্ধটা সমস্ত জায়গাটায় যেন ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে

আলো নিয়ে ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে লোকেরা ওঠা-নামা করছে বার বার। কুয়াসার আস্তরণটা ভারী হয়ে নিচের দিকে নামছে ধীরে ধীরে—আকাশটা ভালভাবে দেখা যাচ্ছে এতক্ষণে।

জীতনারায়ণ, হরিদাস, বিনয় অনেক ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। প্লাস্মা, গ্লুকোজ্যালাইন, গজ, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, প্লাসটার, পেনিসিলিন, এ্যান্টিটিটেনাস, সিরাম, এ্যাড্রিনালিন, এ্যাট্রোপিন; মরফিন, কোরামিন—প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই নিয়ে এসেছে ওরা, আর এনেছে এক কেটলী গরম চা। ডাক্তারবাবুর দিকে এক গ্লাস চা এগিয়ে দিল হরিদাস।

চা কোথায় পেলে? জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

বাজারে চা তৈরি করে যাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে, উত্তর দিল হরিদাস।

পয়সা নিচ্ছে নাকি?

না, এমনি দিচ্ছে, আমার দোকানেও যা খাবার আর দুধ ছিল সব এখানে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওদিকের কোন খবর ডাক্তার পাল চৌধুরী রাখতে পারেন নি। নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন তিনি যে, অন্যদিকে মন দেওয়ার মত অবসর ছিল না তাঁর। মাত্র কয়েকদিন আগে এই হরিদাস একজন ক্রেতার সঙ্গে কয়েক পয়সা কম দেওয়ার জন্যে তুমুল বচসা করেছিল বলে মনে পড়ল তাঁর, এখন অকাতরে সব বিলিয়ে দিয়ে যেন পরম কৃতার্থ হয়েছে সে। ডাক্তার পাল চৌধুরী বিস্মিত হলেন।

ডাক্তারবাবু, আমায় একটু আইডিন দেবেন? ডাক্তার পাল চৌধুরী তাকালেন, এই যুবকটিও এতক্ষণ অক্লান্ত-ভাবে বিনয়ের মত পরিশ্রম করেছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন, আহতদের বহনকারী, অকুণ্ঠচিত্তে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা ইতিপূর্ব্বেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কি হয়েছে—জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার পাল চৌধুরী।

কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, উত্তর দিল পরেশ, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি—এবার বেশ জ্বালা করছে। জানলার ধারে বসেছিলাম, কি ভাবে যে ছিটকে পড়েছি তা নিজেই জানি না।

কোথায় পড়েছিলেন?

নরম মাটির ওপর—

তাই বেঁচে গেছেন—ডাক্তার পাল চৌধুরী ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বিনয়কে ড্রেস করে দিতে বললেন, তার পর পরেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিলেন?

মাসিমাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছিলাম।

তিনি কোথায়? যুবকটিকে ভাল লাগছিল ডাক্তার পাল চৌধুরীর।

এখনও ভেতরে আটকে রয়েছেন—হয়ত বেঁচে নেই। একদল লোক ওখানে কাজ করছে, তাই ভিড় না বাড়িয়ে এদিকে কিছু করার চেষ্টা করছি।

খবর পেয়েছেন কিছু?

না, এখনও পাই নি, পুলিস জায়গাটা কর্ডন করে রেখেছে, আচ্ছা আপনি ত একলাই সব করছেন, এখানে অন্য কোন ডাক্তার নেই?

নদীর ওপারে আছেন আর একজন, এতক্ষণে হয়ত খবর পেয়ে থাকবেন।

আমার দাদাও ডাক্তার, কলুটোলায় আমাদের বাড়ী।

কি নাম বলুন ত?

ডাক্তার নৃপেশ মুখার্জ্জী।

নৃপেশ আর আমি একসঙ্গেই পড়তাম —।

অন্ধকার ভেদ করে দূর থেকে একটা তীব্র আলোর রশ্মি দেখা গেল। রিলিফ ট্রেন আসছে, আশা আর আশ্বাসের প্রতীক যেন ওটা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল অকস্মাৎ।

রিলিফ ট্রেন থেকে একসঙ্গে অনেক লোক নামল—ডাক্তার, নার্স ইঞ্জিনিয়ার, কুলী, ডোম—। অনেক জিনিস এনেছে ওরা—তাঁবু, স্ট্রেচার, আলো, ওষুধ, ক্রেন, যন্ত্রপাতি। এ ধরনের আকস্মিক বিপদে যা-কিছু প্রয়োজনীয় সব জিনিসই সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা।

মেজর কল্যাণসুন্দরম্ গত মহাযুদ্ধে বর্ম্মাফ্রণ্টে কাজ করেছেন, এ ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা তাঁর কম নয়। তিনিই রিলিফের চার্জ্জে আছেন, এ্যাসিস্টেণ্ট হিসেবে তাঁর সঙ্গে এসেছেন ডাক্তার ভার্গব। এদের সঙ্গে রয়েছেন চার জন নার্স, দু'জন মাদ্রাজী, একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বাঙালী নার্স রেবা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রেল-হাসপাতালে রেবা কাজ করেছে কিন্তু রিলিফের কাজে তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

দুর্ঘটনার সংবাদ তারা আগেই পেয়েছে, কিন্তু এই পথটুকু আসতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় অপব্যয় হয়ে গিয়েছে, তাই ত্রস্ত হয়ে সাজসরঞ্জাম এবং ওষুধপত্রগুলি গুছিয়ে নিচ্ছে নার্সরা। আহতদের ইতিমধ্যে আনা সুরু হয়ে-গিয়েছে।

আমায় কয়েকটি এ্যাট্রোপিন দেবেন? ডাক্তার পাল চৌধুরী রিলিফ ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এ্যাট্রোপিন

ফুরিয়ে গিয়েছে তাই তাঁকে আসতে হয়েছে এখানে। মেজর কল্যাণসুন্দরম্ এগিয়ে এলেন।

আপনি ?

আমি ডাক্তার, এখানে ফার্ষ্ট এডের ব্যবস্থা আমিই করেছি।

চলুন আমি যাচ্ছি—। মেজর কল্যাণসুন্দরম ডাক্তার পাল চৌধুরীর সঙ্গে উঁচু জায়গাটির দিকে এগিয়ে গেলেন—ওখানেই ডাক্তার পাল চৌধুরী তাঁর 'বেস ক্যাম্প' করেছেন। চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলেন মেজর কল্যাণসুন্দরম, খুসী হলেন তিনি। এত অল্প সময়ে এবং এত অসুবিধার মধ্যেও ডাক্তার পাল চৌধুরী যেভাবে আহতদের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করেছেন তা লক্ষ্য করে মেজর কল্যাণসুন্দরম ডাক্তার পাল চৌধুরীকে অভিনন্দন জানালেন।

তীব্র কর্ণভেদী একটা শব্দ হচ্ছে—ক্রেনটা চালু হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর বগীটায় হাত লাগিয়েছে ওরা। ক্রেনের আওয়াজ হচ্ছে ঘড় ঘড় করে। তীব্র আলোর রশ্মি পড়েছে আসগরের মুখের ওপর—ক্রেন চালাচ্ছে সে। চীৎকার করে উঠল আসগর—'হাপিস্'।

অবরুদ্ধ যাত্রীরা জীবিত বা মৃত যে-কোন অবস্থাতেই থাক মুক্তি পাবে এবার। উন্মুখ জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে চারিদিকে ঘিরে। মেজর কল্যাণসুন্দরম এবং ডাক্তার পাল চৌধুরীও এগিয়ে গেলেন সেই দিকে।

আহত ও নিহতদের বার করা হচ্ছে এক এক করে। অকস্মাৎ শিশুর কান্নায় সচকিত হয়ে সকলে তাকাল সেই দিকে। বার করা হ'ল একজন শীর্ণ মহিলার মৃতদেহ, জীবন্ত শিশুটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তিনি—মৃতদেহের ভাঙা পাঁজরার তলায় শিশুটা অদ্ভুত ভাবে বেঁচে গিয়েছে। তারস্বরে চীৎকার করে কাঁদছে শিশুটা—হিমশীতল মৃতের বন্ধনে প্রাণচাঞ্চল্যের উত্তাপ। শুষ্ক শীর্ণ লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে সুহাসিনীদেবী কুসমী মেথরাণীর ছেলেটাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন।

কড়, কড় কড়াৎ—ভাঙা বগীর লোহার কঠামোটাকে ক্রেনে করে টেনে তোলা হচ্ছে—আসগরের কালিমাখা হাতের মাংসপেশীগুলি চেন টানার সময় ফুলে ফুলে উঠছে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠল আসগর—'আরিয়া'।

রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ইসরাইলও এই গাড়ীতেই এসে গিয়েছেন, তিনিও তাঁর প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণের কাজ সুরু করে দিয়েছেন—নিপতিত ইঞ্জিনটার কাছে গিয়ে তিনি ভালভাবে লক্ষ্য করছেন তার বিভিন্ন অংশগুলি।

সকাল হয়ে আসছে, পূর্বদিকের আকাশের রঙ্ প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, অপর দিকের আকাশের রঙ্ কিন্তু এখনও পাণ্ডুর বর্ণের।

ডাক্তার পাল চৌধুরীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে—এবার ফিরতে হবে তাঁকে। গড়ান জায়গাটার কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মৃতদেহগুলি এইখানেই রাখা হয়েছে—অবিন্যস্তভাবে দেহগুলি একটার পর একটা সারবন্দীভাবে রাখা আছে। এক একটার ভঙ্গি এক এক রকমের—কোন মিল নেই, কোন সামঞ্জস্য নেই, যেন অর্থহীন বিচিত্র সমাবেশ একটি। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চললেন তিনি ফিরতি পথে। বাজারের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছেন ডাক্তার পাল চৌধুরী। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সকলে তাঁর দিকে—জনতা নীরবে অভিনন্দন জানাচ্ছে একজন অকুণ্ঠ অক্লান্ত জনসেবককে।

হঠাৎ চোখে পড়ল তাঁর ডিস্‌পেনসারীর ভাঙা দেওয়ালটার ওপর—দেখলেন তাঁর প্রাত্যহিক রুগী মহেশ ভট্টাচার্য্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রতিদিনের মত যকৃৎ ও পেটের পীড়ার হুবহু বিবরণটি পেশ করার জন্যে তিনি একটু সকালেই হাজির হয়েছেন আজ।

অকস্মাৎ বিষাক্ত তিক্ততায় আকণ্ঠ যেন ভরে গেল ডাক্তার পাল চৌধুরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এল তাঁর, মুহূর্ত্তে অবসাদগ্রস্ত আর ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি।

স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে সারেংহাটিতে। রিলিফ ট্রেনটা ফিরে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়েমী এবার ফিরে আসছে ধীরে ধীরে।

রেললাইনটা চালু হয়েছে আবার। পয়েণ্টসম্যান জীতনারায়ণ তার ডিউটিতে চলেছে। ওভারব্রীজ পার হওয়ার সময় একবার লাইনের দিকে তাকাল সে। আর একটা গাড়ী আগের সেই লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে, ইঞ্জিনটাও এক ধরনের—ডাব্লুউ, পি টাইপের। তীক্ষ্ণ হুইসিল বাজিয়ে সগর্জ্জনে এগিয়ে চলল গাড়ীটা সেই দিকে। হঠাৎ জীতনারায়ণের মনে হ'ল মানুষগুলিও ঠিক ইঞ্জিনেরই মত—একটার পর একটা মদগর্ব্বে উন্মত্ত হয়ে একই দিকে এগিয়ে চলেছে গর্জ্জন করতে করতে, আগেরটার পরিণতির কথাটা আর স্মরণ নেই তার। পিছন ফিরে আর একবার দেখল জীতনারায়ণ।

কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীটি ওভারব্রীজের দু'পাশ দিয়ে ধীর-মন্থরগতিতে উঠছে ওপর দিকে—পিছনে তার নীল আকাশ।

সমাপ্ত

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নয়া নোট

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বিগত ২৮শে এপ্রিল তারিখে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই ভারতীয় লোকসভায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করেছেন। বিলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে সোনার চোরা আমদানী এবং ভারত থেকে ভারতীয় মুদ্রার চোরা চালান বন্ধ করা। যেহেতু সেদিন কয়েকজন সদস্য আপত্তি জানিয়েছিলেন সেহেতু ২৯শে এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত বিলের আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছিল। সদস্যরা এই মর্ম্মে অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, বিলটির গুরুত্ব বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ না দিয়েই সরকার তাড়াতাড়ি বিলটি পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছেন।

বিলটি যখন লোকসভায় উত্থাপিত হ'ল তখন শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ মন্তব্য করেছিলেন, বিলটিতে এমন কয়েকটি অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে যেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। অথচ কেবলমাত্র বিলের অনুলিপি প্রচার করা হয়েছে। শ্রী এন, সি, বারুচাও অনেকটা এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না সরকার সদস্যদের নিকট বিলটির তাৎপর্য্য সম্পর্কে বিস্তৃত স্মারকলিপি প্রচার করছেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত সদস্যরা সেটা পর্য্যালোচনার সুযোগ না পাচ্ছেন ততদিন পর্য্যন্ত বিলটির আলোচনা স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অর্থমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই তাড়াতাড়ি বিলটি আইনে বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি সদস্যদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে ভারতে যে সোনার চোরাই আমদানী হয়ে থাকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পরোক্ষভাবে সেটার মূল্য দিতে হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিলটিতে যে বিশেষ নোট প্রচলনের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তাতে সোনার চোরাই আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী এ, সি, গুহ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন:

"There may be legal complications even though the Bank of England has accepted the provisions of the Bill".

পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় অনেক বছর ধরে ভারতীয় মুদ্রা চালু রয়েছে। সেখানকার অধিবাসীরা যাতে ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য অবাধে ভারতীয় নোট নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, এইসব নোট ভারতকে প্রত্যর্পণ করা হলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার ব্যাঙ্কগুলিকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিনিময়ে ষ্টার্লিং দিতে হয়। দেখা গেছে ঐ এলাকার সোনার চোরাকারবারীরা এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভারতের মজুত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, চোরাকারবারীদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিগত কয়েক বছর ধরে বিচার-বিবেচনা করা হচ্ছে। এই চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য সরকার শেষ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার আগে ভারত সরকারকে একদিকে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ সরকার এবং অন্য দিকে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজ্যগুলির শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছে। ভারতীয় লোকসভায় শ্রী মোরারজী দেশাই বলেছেন, চোরাকারবারীরা ভারত থেকে চোরা চালানের মারফৎ পারস্য উপসাগরীয় এলাকা থেকে সোনা কিনে থাকেন। অর্থাৎ ভারতে সোনার চোরাই আমদানী হয়। ফলে, ভারতকে পরোক্ষভাবে চোরাই সোনার মূল্য দিতে হয়। অবশ্য শ্রী দেশাই নিজে মনে করেন না, যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সে ব্যবস্থার ফলে "Smuggling can be stopped altogether" তবে তিনি আশা করছেন:

"By the introduction of distinctive currency notes, which will not be legal tender in India, they will be able by and large to cut the means of payments for smuggled goods".

আমরা আগেই বলেছি, যাতে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় অন্যান্য স্থান থেকে ভারতীয় মুদ্রা এনে ষ্টার্লিং-এ রূপান্তরের পথ বন্ধ করা যেতে পারে সেজন্য সরকার তাড়াতাড়ি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিল বিধিবদ্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশ্য বিশেষ নোট প্রচলনের ফলে কতটা দায় বর্ত্তাবে সেটা সরকার বর্ত্তমানে ঠিকভাবে বলতে পারছেন না। শ্রী দেশাইয়ের ভাষণ থেকে জানা যায়, বিগত ১৯৫৮ সনের প্রথম নয় মাসে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার ব্যাঙ্কগুলি তেত্রিশ কোটি টাকার মত ভারতীয় মুদ্রা প্রত্যর্পণ করেছেন এবং বিনিময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সাতাশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার মত ষ্টার্লিং দিতে হয়েছে। শ্রী দেশাই বলেছেন, ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত প্রথম নয় বছরে ভারত এক শত বিশ কোটি ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ে ষ্টার্লিং প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত ১৯৫৫ সনে
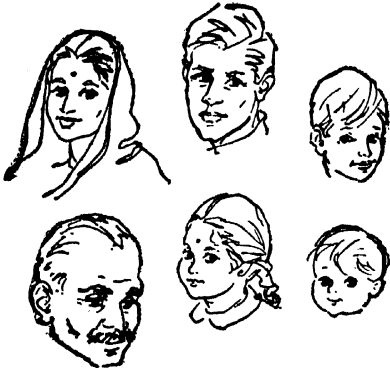
আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন।
একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁঃ যত সব—"।
আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন—"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"
রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই!"

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!" "কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামাকাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?" আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা। বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"
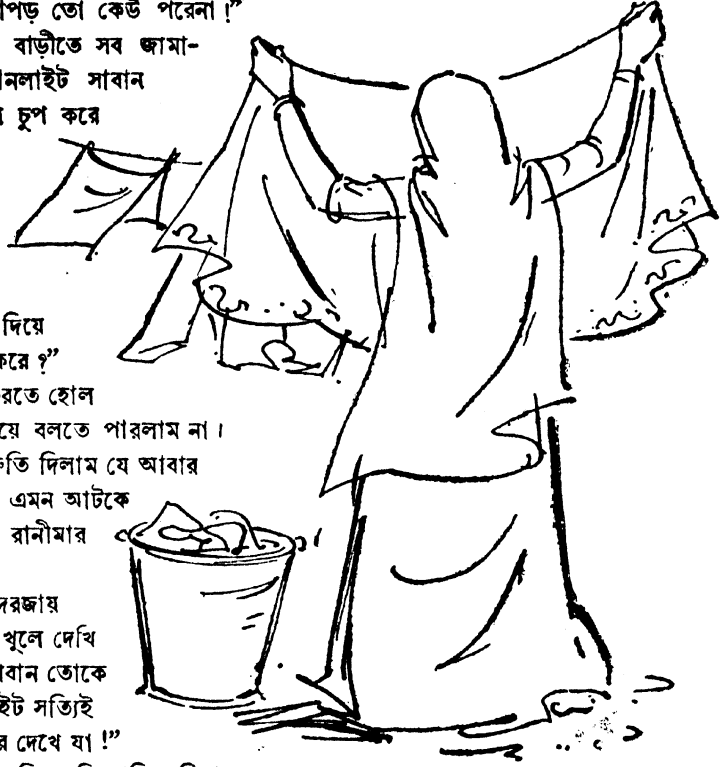
"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

প্রত্যার্পিত ভারতীয় মুদ্রার পরিমাণ ছিল এগার কোটি টাকা। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ বিগত ১৯৫৬ সনে চৌদ্দ কোটি ভারতীয় মুদ্রা প্রত্যার্পণ করা হয়েছে। এই দু'বছরের প্রত্যার্পিত মুদ্রার বিনিময়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বত্রিশ কোটি টাকার মত ষ্টার্লিং প্রদান করেছেন। ১৯৫৭ সনে প্রত্যার্পিত ভারতীয় মুদ্রার পরিমাণ ১৯৫৫ কিম্বা ১৯৫৬ সনের প্রত্যার্পিত মুদ্রার পরিমাণের চাইতে অনেক বেশী। ঐ বছরে চুয়াল্লিশ কোটি টাকার ভারতীয় মুদ্রা প্রত্যার্পিত হয়েছে।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় নোটই হ'ল লেনদেনের জন্য বৈধ মুদ্রা। ভারত থেকে বহির্গামী পর্যটকরা ঐ অঞ্চলের দেশগুলিতে ভারতীয় মুদ্রা দিয়েই খরচ চালিয়ে থাকেন। যাঁরা হজযাত্রী তাঁরা ভারতীয় মুদ্রা নিয়েই যাত্রা করেন। এ ছাড়া আইনে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অন্যান্য লোকও ভারতীয় মুদ্রা স্থানান্তর করতে পারেন। ক্রমে ক্রমে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বাজার-গুলির ব্যাঙ্কে ভারতীয় নোট জমা হয়ে থাকে। এর পর ব্যাঙ্কগুলি আবার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নোটগুলি প্রত্যার্পণ করে বিনিময়ে ব্রিটিশ পাউণ্ড মুদ্রা ভাঙিয়ে নেন। কতটা পরিমাণ ভারতীয় নোট প্রত্যেকটি পর্যটক ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন সে সম্পর্কে আইনের দিক থেকে বাধানিষেধ আছে। কাজেই কি পরিমাণ নোট এই ভাবে স্থানান্তরিত হয় সেটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের না জানার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া যে সব নোট বৈধ ভাবে অন্যান্য পথে স্থানান্তরিত হয় সে সব নোটেরও হিসাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আছে। অথচ যে সব নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ফিরে আসে সে সব নোটের পরিমাণ বৈধ ভাবে স্থানান্তরিত নোটে পরিমাণের চাইতে অনেক বেশী। যেহেতু ভারতের পারস্য উপ-সাগরীয় এলাকা থেকে ব্যাঙ্কের মারফতে আনীত নোটগুলি পাউণ্ মুদ্রায় ভাঙিয়ে দেবার বাধ্যবাধকতা আছে সেহেতু প্রত্যেক বছ এই বাবদ বহু কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা ভারতে লোকসান হয়। প্রশ্ন হতে পারে, বৈধ ভাবে বাইরে স্থানান্তরি নোটের পরিমাণের চাইতে ভারতে প্রত্যার্পিত নোটের পরিমা অত বেশী কেন। এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। অর্থাৎ বে-আইনী ভাবে ভারতে সোনা আমদানী করা হয়ে থাকে। গোপনে ভারতী নোট দিয়ে আমদানীকৃত সোনার মূল্য মিটিয়ে দেওয়া হয়। (সব মহাজন বে-আইনী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাঁরা এর পর নো গুলি বাইরে পাচার করে দেন এবং ধীরে ধীরে নোটগুলিকে পার উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে চালিয়ে দেওয়া হয়। ক্রমে ক্র নোটগুলি ঐ সব দেশের ব্যাঙ্কে মজুত হতে থাকে। এই ভা অল্প কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর ব্যাঙ্কগুলি এই সব নোট বৈ ভাবে স্থানান্তরিত নোটের সঙ্গে একত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাে কাছে প্রত্যার্পণ করে বিনিময়ে পাউণ্ড মুদ্রা ভাঙিয়ে নেন। সুতর কি ভাবে ভারতের মজুত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় এবং ভারতে জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে সেটা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর

চিত্রতারকাদের মত
নিখুঁত লাবণ্য
আপনারও হতে পারে
সাবিত্রী চাটার্জীর মত লাবণ্যময়ী চিত্রতারকা জানেন যে নারীর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে নিখুঁত ত্বকের ওপর। সাবিত্রী চাটার্জী বলেন—"লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত ফেণা আর স্নিগ্ধ সুগন্ধ আমি পছন্দ করি। আমার ত্বককে এটি মোলায়েম আর মসৃণ রাখে।" আপনার লাবণ্যের জন্যেও শুভ্র লাক্স ব্যবহার করুন না কেন? মনে রাখবেন, স্নানের সময় লাক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।
বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LUX
TOILET SOAP
লিভার লিমিটেড এর তৈরী

আর বোধ হয় প্রয়োজন নেই। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়েছে। 'দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা' একটা প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "If the proposed amundment of the Reserve Bank Act is thought likely to check the smuggling of gold and so loss of foreign exchange, it should have been introduced earlier."

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিলে বলা হয়েছে, বর্ত্তমানে যে নোট চালু রয়েছে সেটার অনুরূপ বিশেষ নোটের প্রচলন করা হবে। তবে বিশেষ নোটে কেবলমাত্র রঙের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে। তা ছাড়া কেবলমাত্র ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই শাখা আপিসে নোটগুলি ভাঙানো যাবে এবং বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রচলিত মুদ্রাই দেওয়া হবে। বলা হয়েছে, বৈদেশিক এলাকার যাঁদের কাছে বর্ত্তমান ভারতীয় মুদ্রা আছে তাঁরা যাতে ঐ মুদ্রার বিনিময়ে বিশেষ নোট সংগ্রহ করতে পারেন সেজন্য ছয় সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে। যে মুহূর্ত্তে ছয় সপ্তাহের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে সে মুহূর্ত্তে বৈদেশিক এলাকার বাসিন্দারা কেবলমাত্র ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে বিশেষ নোট পাবেন। বর্ত্তমান ভারতীয় নোটের বিনিময়ে যাঁরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ নোট গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁদের ঐ মুদ্রা ভারতে পাঠিয়ে দিতে হবে এবং এর বিনিময়ে যে ভারতীয় মুদ্রা বিদেশে ভাঙানো যাবে না সে মুদ্রা গ্রহণ করতে হবে।

প্রচারিত খবর থেকে জানা যায়, পারস্য উপসাগরীয় এলাকার প্রচলিত ভারতীয় মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার সময় দুটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ, ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করে এমনি ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন যাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন মেটাবার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বিগত ২৯শে এপ্রিল তারিখে ভারতীয় লোকসভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিলটি গৃহীত হয়েছে। ফলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার প্রচলনের জন্য এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা এবং একশত টাকার বিশেষ নোট ছাড়বার ক্ষমতা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিলটি গৃহীত হবার আগে অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশাই সদস্যদের এই মর্ম্মে আশ্বাস দিয়েছেন :

"The currency notes withdrawn from the Persian Gulf area will be cancelled and not put in circulation within the country".

কাজেই তাঁর মতানুসারে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা অমূলক। বিগত ৩০শে এপ্রিল তারিখে "দি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"To think that the Bill closes the stable door after the horse has vanished is however unrealistic ; as long as the craving for gold exists and the difference in internal and external prices makes it seem worthwhile to defy official restrictions, 'roundabout ways' will continue though the pace at which they are used may vary with circumstances. If the new arrangements under the Bill merely cause smuggled Indian currency to be changed into the new bank and currency notes in the Gulf area, an undesirable sort of free market may arise."

LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।
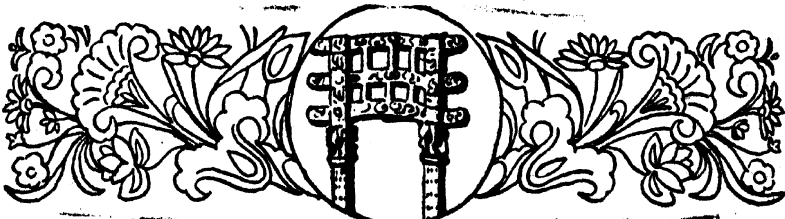
কন্যার প্রতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যে সুখ এ পৃথিবীতে পরম, শাশ্বত—
শাশ্বত সে সুখ হোক্ করতলগত,
আশীর্ব্বাদ করি মা গো। আমরা সবাই
সুখের ভিখারী। তারে খুঁজিয়া বেড়াই
হেথা হোথা ; সে তো নাহি বাহিরে কোথাও।
যে আনন্দ চিরন্তন তারে যদি চাও
অন্তরে সন্ধান করো। সর্ব্ব কামনার
পারে গেলে সে-আনন্দে আসে অধিকার।
সে নহে সহজ লভ্য ; সে-সুখ অক্ষয়—
বহু দুঃখে তারে জয় ক'রে নিতে হয়
তপস্যার দ্বারা। যদি উৎসাহ প্রচুর
থাকে তব, সর্ব্ব বাধা করি দিয়া দূর
যাবে সে আনন্দলোকে যেথা গেলে আর
এ সংসারে থাকে নাকো কিছু চাহিবার।

পরিচয়

শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র অতি তবু তুমি অন্তরের ছবি
তোমা মাঝে আছে মম পরিচয় আমি ছোট কবি
সঞ্চিত রহিল যাহা ক্ষুদ্র তবে তুচ্ছ তাহা নয়
মূল্যহীন অমূল্যতা মানবের চির পরিচয়
তাইত সার্থক তুমি ওগো মম নীরব সাধনা
যুগান্তের প্রান্তে বসি করি যেন তব আরাধনা।

তারার তৃষা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অসীম আকাশে—জ্যোতির জগৎ জুড়ে
মাটির মানুষ মানস-বিহারে মাতি'
হেরিল সহসা 'শতভিষা' আর 'স্বাতী'—
'বিশাখা' 'শ্রবণা' 'অনুরাধা' ঘুরে ঘুরে,
আনন্দ-ঘন জ্যোতির্ম্ময়ের পুরে
ভাতিছে আলোকে বন্ধ্যা সন্ধ্যা—রাতি।
জ্যোতিরে হেরিয়া—জ্যোতিরে করিয়া সাথী
জ্যোতিরই লাগিয়া মানুষ মরিছে ঝুরে।
আঁখির তারায় তারার আলোর তৃষা,—
মানস বিহারে অমৃতের স্বাদ কত !
অথই আঁধারে জ্যোতিকে দেয় দিশা ;—
জন্ম-মৃত্যু বিমথিয়া অবিরত
মাটির মানুষ 'স্বাতী' আর 'শতভিষা'
বক্ষে পাবারই নিলো কি দিব্য-ব্রত !

উপনিষদ মালা

শ্রীপুষ্প দেবী

পাবক রূপে এলে প্রিয় প্রণাম জানাই পায়
দাও ঘুচিয়ে যা কিছু পাপ আছে আমার গায়
ঐ আলোতে পথ দেখিয়ে
আমায় যদি যাওগো নিয়ে
তোমার পুণ্য রশ্মিশিখায় দেখাও আমায় পথ
তোমার দয়ায় পূর্ণ হবে আমার মনোরথ।

যখন যাহা করেছি কাজ সকল তুমি জানো
তাইত আগুন উজল হয়ে বজ্র হয়ে হানো
মিথ্যা দেহের আবর্জ্জনা
পুড়িয়ে তারে করো সোনা
আবরণের কুজ্ঝটিকা কিছুই রাখো নাকো
মুক্তি আমার তৃপ্তি আমার সঙ্গে তুমি থাকো।

অত্যাশ্চর্য্য কাপড় কাচার পাউডার
Surf
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

বাহাদুর—শ্রীননীগোপাল মজুমদার। প্রকাশক শ্রীসুবিমল মজুমদার, ১৬।১৭, বীরেন রায় রোড ইষ্ট, কলিকাতা ৮ ; দাম দু'টাকা ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৭।

বালক-বালিকাগণের উদ্দেশ্যে রচিত উপন্যাস। উপন্যাসখানি দু'খণ্ডে বিভক্ত। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীটি সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকাগণের চিরকৌতূহলী চিত্তকে প্রচুর আনন্দ দেবে। লেখকের ভাষা বেশ ঝরঝরে ; লেখবার ভঙ্গীও ভাল।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশক শ্রীসুধীর রায়, ৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা ৯। দাম এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৬।
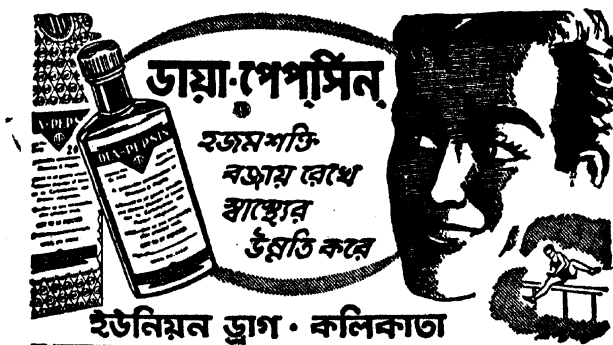
পলাশীযুদ্ধের পর থেকে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে ইংরেজকে বাংলার অধিবাসীদের বশে আনতে কম বেগ পেতে হয় নি। বাংলার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে কৃষক, সাওতালী চাষা ও ফকির সন্ন্যাসীরা কয়েক বারই কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এদের সঙ্গে কিছু কিছু পুরনো জমিদারও যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক ও শাসকবর্গের চেষ্টায় ঘটনাগুলি চাপা পড়ে গেছে। লোকের মনে ধারণা হয়েছে, পলাশীর পরই বাঙালী নবাবী কুশাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কোম্পানী শাসন মেনে নেয়। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ঐ সকল বিদ্রোহের অন্যতম সন্ন্যাসীবিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীরা একতাবদ্ধ হয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দুটি সম্প্রদায় যোগ দিলেও এই বিদ্রোহ—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে ইতিহাসে পরিচিত। আলোচ্যগ্রন্থখানি উক্ত কাহিনীর সঙ্গে বালকবালিকাদের পরিচিত করবার উদ্দেশ্যে একটি গল্পকে আশ্রয় করে রচিত। গল্পটি পড়তে পড়তে বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" ও "আনন্দমঠ"কে মনে পড়ে, তবে বালক-বালিকাদের অধিকাংশেরই এমন না হওয়াই সম্ভব। কাজেই তারা বইখানি পড়ে খুশী হবে এবং বাংলার একটি গৌরবময় কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে জ্ঞান লাভ করবে। কিন্তু মুসলমান ফকিরদের নেতাটির নাম আমরা জানতাম, "মাজনু শা" গ্রন্থকার লিখেছেন "মনজু"। আর শ্রীনিবাস ও লোচনগড়ের রাজদুলালী হীরামালিনীর প্রেমকাহিনী ও আলাপ শিশুসাহিত্যে অচল, যদিও রূপকথায় আদিরস কিছু থাকেই। কিন্তু সব রূপকথা শিশুসাহিত্য নয়, তবে একালে সব রূপকথাকেই শিশুসাহিত্য বলে চালান হয়ে থাকে। অবশ্য এটি রূপকথা নয়, ঐতিহাসিক ঘটনাও নয়। যাহোক লেখকের ভাষা ঝরঝরে ও বেগবতী।

উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র্য—ডঃ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা, পৃষ্ঠা ৮০।

পৃথিবীর কতকগুলি বিশেষ ধরনের তরুলতার কথা নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত। গল্প-উপন্যাস আমাদের বাংলায় শিশুসাহিত্যে বিস্তর এবং প্রতি মাসেই তা প্রকাশিত হচ্ছে। বালকবালিকাদের জন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সম্বলিত পুস্তকের সংখ্যা যা আছে তা অতি অল্প। কেবল তাই নয় বিশেষজ্ঞ রচিত নয় বলে সেগুলির অধিকাংশই ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। তবে আলোচ্য গ্রন্থখানির লেখক বিজ্ঞানী ও আলোচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সে কারণ তথ্যগুলি নির্ভুল ও নিঃসঙ্কোচে বালকবালিকাদের হাতে দেওয়া যায়। রচনাগুলি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, ভাষাও সহজ ও সরস। এমন গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
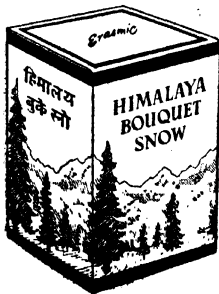
মধ্যম ব্যায়োগ ও স্বপ্নবাসবদত্তা—ভাস বিরচিত, শ্রীরামাপদ বসু কর্তৃক অনূদিত। ৪৪, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা ও দুই টাকা চার আনা।

কবি ভাসের নাম পণ্ডিত-মহলে অপরিচিত নয়। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় অতি অল্পদিন হইল হইয়াছে। গ্রন্থকার অবতরণিকায় বলিয়াছেন, "খ্রীঃ ১৯১০ সনে ত্রিবাঙ্কুরের এক মঠে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী তেরখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন।···মধ্যম ব্যায়োগ তাদেরই অন্যতম।"

এই নাটকের বিষয়বস্তু সামান্য। হিড়িম্বার দীর্ঘ বিরহকাতর-মনে পতি-সন্দর্শনের আয়োজন-পর্ব্ব। ঘটনা সামান্য হইলেও, ঘাত-প্রতিঘাতে এই নাটক রসোত্তীর্ণ হইয়াছে।

খুবই বিস্ময়ের বস্তু, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের রচনার সহিত টেকনিকের দিক দিয়া ইহা আধুনিক নাটকের সমধর্ম্মী। আধুনিক যুগে যাঁহারা নাটকের টেকনিক লইয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের এ-বই পড়িতে অনুরোধ করি।

'বাসবদত্তা' নাটকের কাহিনীটি চমৎকার। কাশ্মীরের মহারাজা শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব সময়ে লেখা কথা-সরিৎসাগর গ্রন্থে বাসবদত্তা আর উদয়নের বৃত্তান্ত আছে। যদিও পরবর্ত্তী ঘটনার সঙ্গে স্বপ্ন-বাসবদত্তার বিশেষ কোন মিল নাই, এইখানেই নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। এই কল্পনাপ্রসূত স্বপ্নবাসবদত্তা কবিমানসের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

তবে ইহাকে নাটক অপেক্ষা দৃশ্য-কাব্য বলাই সঙ্গত। দৃশ্য-কাব্য নাটক নহে। নাটক তাহাকেই বলে যাহা একটিমাত্র গল্পকে কেন্দ্র করিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। এই দিক দিয়া বাসবদত্তা হইয়াছে কাব্য-প্রধান।

মহাকবি ভাসের নাটকের সহিত পরিচয় অনেকেরই নাই। সেদিক দিয়া অনুবাদকার সাধারণ বাঙালী পাঠকদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। অবশ্য অনুবাদে কাব্যের রসানুভূতির ক্ষতি হয়। তবুও তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভাষা প্রাঞ্জল, অনাড়ম্বর এবং নাটকের গতিও সর্ব্বত্র অব্যাহত আছে। সুধীজন সমাজে এই নাটক দুইখানি সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পার্ক—শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার। প্রাচী পাবলিকেশন্‌স, ২।২ বৈদ্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৯। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা দেশে বনে-প্রান্তরে, পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র গল্প ছড়াইয়া আছে, তবে তাহা কুড়াইয়া লইবার মত দক্ষ-শিল্পী কয়জন আছে? যে কারিগর তাহা পারে, সেই গল্পের মালা গাঁথিতে পারে। 'পার্ক' ত সকলেই দেখিতেছে—কিন্তু কয়জন দেখিতে পায় তাহার ভিতরে কত গল্প জমা হইয়া আছে। ওয়েলিংটন পার্কে বোমার ভিতর একটি কাটা হাত পাওয়া গিয়াছিল। সংবাদপত্রের এই সংবাদটুকুকে কেন্দ্র করিয়া লেখক যে গল্প ফাঁদিয়াছেন তাহা যেমনই অভিনব তেমনই রস-মধুর।

'পার্কের চোখে ঘুম নেই।' লেখক এই বলিয়া গল্পের সুরু করিতেছেন। পার্ক এখানে দ্রষ্টা। কত ঘটনা ঘটিতেছে, আবার কালের স্রোতে তাহা মানুষের স্মৃতি-পট হইতে মুছিয়া যাইতেছে। নিত্যকালের সাক্ষী পার্ক—তাহার মুক-মুখে ভাষা ফুটাইয়া লেখক তাহারই মুখ দিয়া গল্প আদায় করিয়া লইতেছেন। এখানে গোলাপ-কুঁড়িটি পর্য্যন্ত জীবন্ত। গল্প তাহারা ধরাইয়া দিয়াছে—এইখানেই তাহাদের ছুটি। ইহার পর লেখককে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। গল্প রচনায় পার্কের চরিত্রগুলি অভিনব রসসৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষ করিয়া 'পেঁচা'র চরিত্র-চিত্রণে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু ইহা ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই টুকরা ঘটনাকেই বাঁধিবার জন্য প্রয়োজন হয় প্লটের। এই প্লটও লেখক অভিনব উপায়ে আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনসপেক্টর হারাণ গুপ্ত কাটা হাতের তল্লাস করিতে বসিয়া এক যুবকের সুটকেশ হইতে একখানি অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাইলেন। এই পাণ্ডুলিপির সূত্র ধরিয়া তিনি প্রকৃত তথ্য জানিতে পারেন। হারাণ গুপ্তের পাণ্ডু-লিপি পাঠের মধ্য দিয়াই লেখক তাঁহার গল্প বলিয়া লইয়াছেন। টেকনিকের দিক দিয়া ইহা নূতনত্বের দাবী করিতে পারে। লেখকের কৃতিত্ব সেইখানেই। ঘটনা নূতন তৈরারী হয় না—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। বলিবার ভঙ্গীতেই ইহা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। দক্ষশিল্পীর মত এই বিভিন্ন ভাবধারাকে লইয়া তিনি আপন ইচ্ছামত যেন খেলাইয়াছেন। তাঁহার বাহাদুরী আছে।

লেখকের ভাষা সহজ সরল—কোথাও আড়ষ্টতা নাই। সেই জন্য গতি হইয়াছে অপ্রতিহত। এ বই যদি তাঁহার প্রথম হয়, আমরা তাঁহাকে স্বাগত জানাই। বইখানি সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস রাখি।

তর্কবিজ্ঞান প্রবেশিকা ও মনস্তত্ত্ব প্রবেশিকা—শ্রীলীনা নন্দী ও ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী। দাম যথাক্রমে আড়াই টাকা ও দুই টাকা। প্রকাশ মন্দির, ৩ কলেজ রো, কলিকাতা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সহজ সরল ভাষায় দুটি দুরূহ এবং জটিল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। যাঁহারা তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁহারা তর্কবিজ্ঞান প্রবেশিকা পাঠে উপকৃত হইবেন। তর্কশাস্ত্রের নিজস্ব ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী আছে। তর্কশাস্ত্রের প্রকাশমাধ্যম সাহিত্যের ভাষা নয়। ডক্টর নন্দী এবং শ্রীযুক্তা নন্দী তর্কশাস্ত্রের মৌলিক প্রকাশভঙ্গীটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে সরল পদ্ধতিতে তর্কশাস্ত্রের বিভিন্ন দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা এই বিষয়ে প্রবেশকের পথে অত্যন্ত অনুকূল হইবে। অধিকাংশক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য মতামতের সহিত ভারতী

দর্শনের মতামতও উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় মতের তুলনামূলক ধারণা গঠনে পাঠককে সহায়তা করিবে। তর্কশাস্ত্র আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হইলেও আলোচনার গুণে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের দুরূহতা ইহার কোথাও নাই।

মনস্তত্ত্ব বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। এই সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় পাঠযোগ্য পুস্তক নাই বলিলেই চলে। মনস্তত্ত্ব প্রবেশিকা এই বিষয়ে সমুৎসুক পাঠকদের অভাববোধ যে বহুল পরিমাণে দূর করিয়াছে তাহার প্রমাণ এক মাসের মধ্যেই পুস্তকের সমগ্র প্রথম সংস্করণটি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পুস্তকটি দ্বিতীয় মুদ্রণ আমাদের কাছে সমালোচনার্থ আসিয়াছে। এই গ্রন্থে যে অধ্যায়গুলি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহা হইল ব্যবহারিক এবং শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত 'ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ', 'পরিসংখ্যান' প্রমুখ অধ্যায়গুলি। পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাষাশ্রয়ী এই গ্রন্থখানিও পাঠকসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তবে পরিশেষে এ কথা না বলিয়া পারি না যে, গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা তৃতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হইলে গ্রন্থখানির মূল্য বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইবে।

আমরা গ্রন্থ দু'খানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌতম সেন

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সঙ্কলিত পুঁথি পরিচিতি—সম্পাদক—আহমদ শরীফ। বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দাম কুড়ি টাকা।

বাংলাভাষায় যে কয়খানি পুথির বিবরণ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পরম অনুরাগী ও একনিষ্ঠ সেবক পরলোকগত জনাব আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনার একটি মূল্যবান্ নিদর্শন। বড়ই দুঃখের কথা, লেখক তাঁহার জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরলোকগমনের পর এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, বাংলা সাহিত্যসেবী মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের পুথি আলোচনার বহু পরিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে। তাঁহার সঙ্কলিত 'বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ' দুই খণ্ড প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রাচীনতম পুথির বিবরণ বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান রচিত গ্রন্থের ৬০০ খানি পুথির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দু-রচিত গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি। বর্ত্তমানে আলোচ্য গ্রন্থে মুখ্যতঃ মুসলমান-রচিত গ্রন্থের প্রায় ছয় শত পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশের বিষয়বস্তু মুসলমান ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি পুথি আরবী অক্ষরে লেখা। এ জাতীয় গ্রন্থ বা পুথির আলোচনা এ পর্য্যন্ত সামান্যই হইয়াছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অল্পপরিচিত দিকের সন্ধান ইহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। সেজন্য বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি রসিকগণ সমাদরের সহিত এই গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন। ইহাকে সাহিত্য-গবেষকের উপযোগী করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহার সাহিত্য-কৃতির পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। একটি পরিশিষ্টে 'নানা সূত্রে অদ্যাবধিজ্ঞাত মধ্যযুগের ও মধ্যযুগীয় ধারার মুসলিম কবি ও তাঁহাদের রচনার নাম আর নিশ্চিত বা আনুমানিক কাল' উল্লিখিত হইয়াছে। অদ্যাবধি প্রকাশিত বাংলা পুথির বিবরণ ও তালিকা গ্রন্থপঞ্জী এবং বিভিন্ন পুথিশালা ও পুথিসংগ্রহের নাম-নির্দেশ বাংলা পুথির আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে। তবে প্রথম সঙ্কলিত এই নির্দ্দেশে দুই-একটি নাম বাদ পড়িয়াছে। যথা, এসিয়াটিক সোসাইটির বাংলা পুথির বিবরণের পরিশিষ্ট, শিলচর নর্ম্যাল স্কুল লাইব্রেরীর পুথির বিবরণ, কুচবিহার রাজ লাইব্রেরির পুথির বিবরণ, বরাহনগর গৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির প্রভৃতি। গ্রন্থ মধ্যে পুথিগুলির নাম বর্ণানুক্রমে না সাজাইয়া বিষয়ানুক্রমে সাজাইলে আলোচনার সুবিধা হইত মনে হয়। একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুথির বর্ণনা অনেক স্থলে পুনরুক্তিদোষ দুষ্ট হইয়াছে। পুথির বিবরণ সম্পাদনে এই দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। অন্যথা গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক সময় পাঠককে বিভ্রান্ত হইতে হয়। পুথির লেখকদের ও মালিকদের নাম-পরিচয় প্রভৃতির মধ্যে অনেক সময় অনেক মূল্যবান ও কৌতুককর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পুথির বিবরণে প্রসঙ্গ-ক্রমে এগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান গ্রন্থে এইরূপ তথ্যের মধ্যে মুসলমানি পুথির দুইজন হিন্দু নকলকারীর নাম উল্লেখযোগ্য। পুথি নকল করা কালিদাস নন্দীর পেশা ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (পৃঃ ৭৭, ২২৩)। কালিদাসের হাতের লেখা দুইখানি পুথি (২০২, ৪৭৬) এই বিবরণের অন্তর্ভুক্ত। রামচন্দ্র গুহদাস আর একখানি পুথির (২০৮) লেখক। হিন্দু সাহিত্যিকগণ যেমন সম্পন্ন মুসলমানদের নিকট হইতে সাহিত্যরচনায় প্রেরণালাভ করিতেন, মুসলমান সাহিত্যিক-গণও সেইরূপ হিন্দু জমিদারদের নিকট হইতে উৎসাহলাভ করিতেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত দুইখানি পুথিতে (১৮, ১৭০) তাহার প্রমাণ আছে। মোহাম্মদ নওয়াজিস খাঁন বালীগ্রামের জমিদার বংশের আদিপুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে গুলে বকাওলি গ্রন্থ রচনা করেন। জমিদার রাহিরাম চৌধুরীর আদেশে মোহাম্মদ নাকি কর্ত্তৃক স্তুতিনামা রচিত হয়। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এইরূপ বিবিধ তথ্য একত্র সংগৃহীত ও সুবিন্যস্ত হইলে দেশের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক নূতন কথা জানা যাইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

না, না! এ 'ডালডা' নয়! 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় না!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যেই এতে কোনও ধুলো ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা' কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও ½ পাঃ টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।
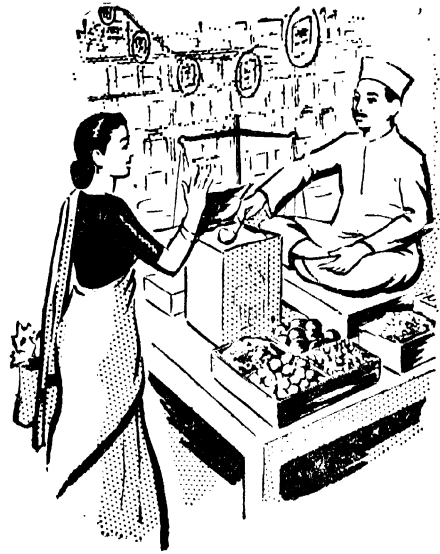
হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা'! এর হলদে টিনের ওপোর খেজুর গাছের ছবি দেখলে সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম। আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে রাঁধবেন সেই সব খাবারের প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।

ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

DL. 469-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

ফকিরের পাথর—শ্রীমন্মথ রায়। অটো প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস। পরিবেশক প্রকাশনী, ৪৯ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় বর্ত্তমানকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম। বিশেষ ভাবে একাঙ্কিকা নাটিকার ক্ষেত্রে তাঁহার তুলনা হয় না। ভাবের গভীরতায়, আখ্যানভাগের বৈচিত্র্যে, নাটকীয় সংঘাতে, চিন্তাধারার গতিশীলতায় তাঁর লেখা অতুলনীয়।

সমালোচ্য পুস্তকখানি একটি নাট্যগুচ্ছ। ইহাতে মোট নয়টি একাঙ্ক নাটিকা আছে। যথা ফকিরের পাথর, অসীমন্তনী, সাবধান, যমালয়ে একবেলা, বিবসনা, বোমা, হারিকেন, একটি পাপ ও ওলট পালট।

একমত ও একপথ অবলম্বন করিতে পারিলে কত সহজে অভীষ্টে পৌঁছান যায় 'ফকিরের পাথরে' একটি মনোরম গল্পের ভিতর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে তাহা সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই নাটিকার মূল কথা—গল্প বলাই নয়। বর্ত্তমান সমস্যাসঙ্কুল ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই মত এবং পথের লড়াই মানুষকে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে পড়িতে পড়িতে এ কথাটাই বারে বারে মনে পড়ে। বিশেষ ভাবে কিছু না বলিয়াও একটা বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক।

"যমালয়ে একবেলা"য় চিত্রগুপ্তের অভিধান হইতে দেশবরেণ্য নেতা, সাধু ব্যবসাদার—তথা দানবীর, পকেটমার এবং শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ অবধূত মহারাজের জীবনালেখ্যে প্রচুর কৌতুকের খোরাক পাওয়া গেলেও সামাজিক জীবনে যে কত রকমের পাপ আর গ্লানি সত্যের জমকালো পোশাক পরিয়া সাধারণ মানুষকে ঠকাইয়া নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া চলিয়াছে লেখক সুনিপুণ ভাবে সেই দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াছেন।

অসীমন্তনীতে এক দারিদ্র্যপীড়িত নারীর স্বামীপুত্রের মঙ্গলের জন্য বিধবার ছদ্মবেশে কর্ম্মভার গ্রহণের ও অবস্থা বিপর্যয়ে আত্ম-প্রকাশের মধ্যে যে বেদনামধুর নাটকীয় সংঘাত ফুটিয়া উঠিয়াছে এক কথায় তাহা অপূর্ব্ব।

ইহা ছাড়া বাকি নাটিকাগুলিও মন্মথ রায়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটির মধ্যে পরিণত চিন্তা এবং অভিজ্ঞ শিল্পবোধের স্বাক্ষর রহিয়াছে। ছাপা ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ভ্রম সংশোধন

দুর্ভাগ্যক্রমে 'আচার্য্য যোগেশচন্দ্রে'র জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল বাহির হইয়াছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। লেখক।

১। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র শৈশবে প্রতাপবাবুর বাগানে প্রবন্ধ-লিখিত বাড়ীতে বাস করেন নাই, অন্য বাড়ীতে বাস করিতেন।

২। তিনি পাটনায় কখনও কার্য্য করেন নাই, কিন্তু কটকেই আচার্য্য যদুনাথের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি হইয়াছিল।

৩। বর্ণানুক্রমিক ভাবে তাঁহাকে নাম তালিকা শোনান হইয়াছিল। কেবল পিতা তখন উপস্থিত ছিলেন।

৪। যোগেশচন্দ্র পূর্ব্বে স্বাস্থ্যলাভার্থ বাঁকুড়ায় আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য বাঁকুড়ায় আসেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সর্ব্বপ্রথম কলেজ উদ্যানের পশ্চিমে বাস করেন।

৫। 'খান্দের পুর' স্থানে 'খণ্ডপাড়া' এবং 'পত্রাবলী' স্থানে 'পত্রালী' হইবে।

৬। শ্রীসুখময় সরকারের প্রবন্ধ 'আচার্য্য সংলাপিকা' গত বৎসর অগ্রহায়ণে নহে, কিন্তু কার্ত্তিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

অর্ঘ্য ঃ স্বর্গতঃ মন্মথনাথ ঘোষ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

অমায়িক হাসি, সরস আন্তরিকতা, বিনয় ও শালীনতা ছিল বিশেষত্ব মন্মথনাথের মৈত্রী সংসদে। অথচ অন্যায় অশোভন পরচর্চ্চা বা অন্যায়ের সমর্থন স্থির রাখতে পারত না মন্মথনাথকে। বৃথা তর্ক বর্জ্জন ছিল তাঁর চরিত্রের মাধুরী। কিন্তু, অসত্যের প্রতিবাদে ছিল না তাঁর কুণ্ঠা। তাই বন্ধু সমাজে ছিল মন্মথনাথের আদর। রবিবাসরে কোন সভায় অনুপস্থিত থাকলে প্রশ্ন উঠত তাঁর না আসার কারণ সম্বন্ধে।

যখন আমার স্বর্গত বন্ধু মন্মথনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করি তখন সন্ধান পাই তাঁর চরিত্রের উৎস-মুখের। আন্তরিক প্রীতি ছিল সে উৎসবের মধুরতা। তিনি কয়েকখানি জীবনচরিত রচনা করেছেন। তার মধ্যে আছে তাঁর পিতামহ গিরিশচন্দ্র এবং মাতৃ কুলের প্রসিদ্ধ নাগরিক কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবন কথা। নিজের কুলের উপর বিশ্বাস, গর্ব্ব এবং প্রেম না থাকলে মানুষ নিজের প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষের জীবনী এবং রচনা সঙ্কলন করতে পারে না।

অপর দিকে দেখতাম তাঁর নিজের পুত্রকন্যা এবং নাতি-নাতনীর প্রতি স্নেহ-স্রোতস্বতী ছিল একটানা। একটা উদাহরণ দিই। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে এই স্নেহের যত্নগুলি যে 'অর্ঘ্য' প্রকাশ করেছে তার মধ্যে আছে মন্মথনাথের জন্মতিথি উৎসবের কথা। জন্মতিথিতে দিব্যদৃষ্টিতে বন্ধু আমার উপলব্ধি করেছিলেন সেই রহস্য যা কবিগুরু বাল্মীকি ব্যক্ত করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের মুখে ভরতকে সান্ত্বনা দেবার অবকাশে রাজা দশরথের স্বর্গারোহণে।
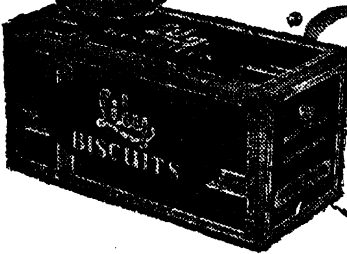
শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন—

'নন্দন্ত্যুদিতে আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতিং হানি
আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্‌।
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্টা নবং নবমিবাগতম্‌।
ঋতুনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ।'

সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে মানুষ আনন্দিত হয়, কিন্তু তখন বোঝে না যে তেমন ঘটনায় তার আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। ঋতু পরিবর্ত্তনেও হয় সেই

মন্মথনাথ ঘোষ

অবস্থা। নবপল্লব মুখরিত হয় বনে উপবনে বসন্তের আনন্দাগমে। কিন্তু মানুষ বোঝে না যে তার 'দেবহিতং আয়ু' এক বৎসর ক্ষয় হ'ল।

জন্মদিবস পালনোৎসবেও সেই দশা। যেন মরণের ছায়া স্পষ্ট দেখে তাঁর চুয়াত্তর বৎসরে, গত ৩রা আশ্বিন ১৩৬৫ সনে মন্মথনাথ আদরের পুত্রকন্যা ও তাদের সন্ততির উৎসবের প্রত্যুত্তরে লিখে-ছিলেন—

চুয়াত্তর পূর্ণ হলো পঁচাত্তর এলো
আর কেন, মায়াপাশ ছিন্ন করে ফেলো;
জীবনের সুখ-দুঃখ দেখা বেশ হলো
ওপারের ডাক এসেছে চলো চলো চলো।

কিন্তু এ ভঙ্গিতে আমেজ আছে কঠোর অকারুণিকতার। তাই তিনি লিখলেন, 'না না, তোমাদের সব ভালো দেখে যাব্‌।' অথচ অন্তর-দৃষ্টি ফুটেছে। তাই শেষ চরণে যা বললেন সাহিত্যিক, তা থেকে তাঁর অপার সাহিত্যরস এবং ধর্ম্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

"ধর্ম্মরাজ বলে—'তুমি ওপারেতে চলো
দিব্যদৃষ্টি লভি সেথা দেখবে আরো ভালো'।"

বহু প্রবন্ধ লিখেছেন মন্মথনাথ নানা পত্রিকায়, ইংরাজি ও বাংলা ভাষায়। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনী ইংরাজী ভাষায়। গ্রন্থের ভাষা অতি চমৎকার। কিন্তু পুস্তকের বিশেষত্ব ঐতিহাসিক তথ্যের যথাযথ সমাধান। একটা মত ছিল যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। যুক্তি প্রমাণে সে মত খণ্ডন করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সে যশের দাবী করতে পারেন গিরিশচন্দ্র। লেখকের যুক্তিতর্কে কোন পক্ষপাতিত্বের দোষ নেই। এ গবেষণা তাই উপভোগ্য।

পরলোকগত মন্মথনাথের প্রণীত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনচরিত, তিন খণ্ডে কবি হেমচন্দ্রের জীবনী, কর্ম্মবীর কিশোরী চাঁদ মিত্রের জীবনী প্রভৃতি বাংলা ভাষায় রচিত। সেগুলি অধ্যয়ন করলে যেমন সে কালের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের কর্ম্মজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বোঝা যায় দেশের সামাজিক অবস্থা তাঁদের সময়ের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবন-বৃত্তান্ত আলোচনায় যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রন্থকারের সাহিত্যরসবোধের।

এ স্থলে সকল কথা আলোচনার অবকাশ নেই। আমার উদ্দেশ্য প্রিয়বন্ধু মন্মথনাথের স্মৃতিতে অর্ঘ্য দেওয়া। বন্ধু-বিয়োগ শোক উৎপীড়ক। কিন্তু সে শোকে শান্তি পাওয়া যায় যখন মনে হয় যে বন্ধু ছিল গুণী, মানী এবং কৃতী।

শোকাহত তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। কিন্তু কবির কথায় বলা যায় আজ—'জগ রোয়ে তু হাঁসো'। সত্যই ত মন্মথনাথের ভক্তি ছিল দৃঢ়। কাজেই তার বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল—

মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।

সত্যই ত ভক্তের ভয় নেই মরণে যদি সে পরাণের আবেগে বলতে পারে—

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে, যখনি যেখানে যবে
চিরজীবনের পরিচিত তুমি, তুমিই চিনাবে সবে।

মন্মথনাথ মৃত্যুকে ভয় করেন নি সে কথা বলেছি। তাই আজ পৃথিবীর শান্ত জীবন ত্যাগ করে হাসিমুখে গিয়েছেন যেথায়—

'আনন্দলোকে মঙ্গললোকে
বিরাজে সত্যসুন্দর।'

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পরদেশী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়
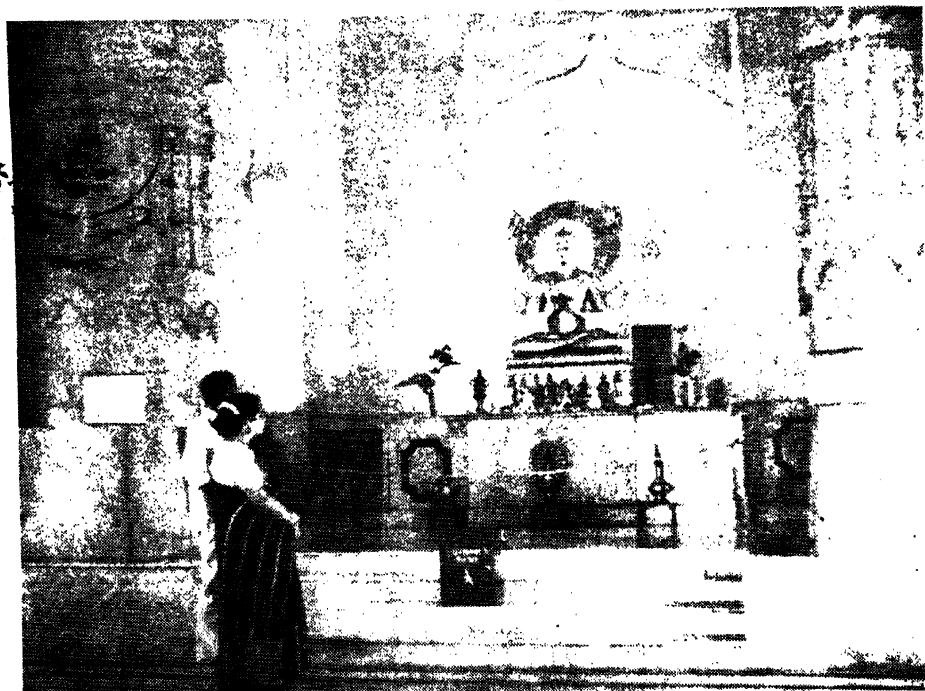
'স্বর্ণ বুদ্ধ' সারনাথ, কাশী

'রথচক্র'—কোণারক সূর্য্যমন্দির, পুরী

প্রবাসী
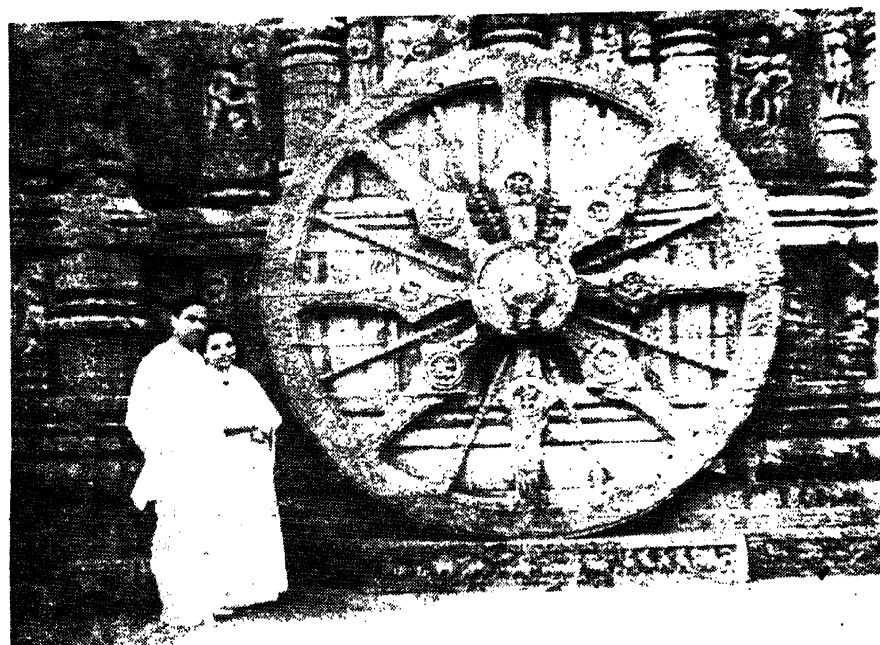
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৬৬ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঝড়ের পূর্ব্বাভাস ?

লিখিবার মুখে একটি সংবাদ আসিল যে, "মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে রবিবার, ১৯শে জুলাই, আয়োজিত এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা ঘোষণা করেন যে, রাজ্য সরকারকে বর্ত্তমান খাদ্যনীতি পরিবর্ত্তনে বাধ্য করার জন্য কমিটি আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি হইতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবে।"

বলা বাহুল্য, আমরা এইরূপ নেতৃত্বে চালিত আন্দোলনের কোনই সমর্থ পাই না এবং ইতিপূর্ব্বেও এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। যদি বুঝিতাম এই নেতৃবৃন্দ সত্য সত্যই কালোবাজার ও কালোবাজারীদিগের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও স্থায়ী আন্দোলন চালনে উদ্যত, যদি বুঝিতাম যে, যে সকল দুষ্কৃতকারীর ষড়যন্ত্রে পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দ্দশা, তাহাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন চালনে ইহারা দৃঢ়সংকল্প ও প্রস্তুত, তবে আমরা ইহাদের কায়মনোবাক্যে সমর্থন করিতাম। কিন্তু কালোবাজারী বা কালোবাজার নামক কামধেনুকে স্পর্শ মাত্র না করিয়া এইরূপ আন্দোলন চালনা একমাত্র তাহাদেরই সুবিধা হয় যাহাদের ইষ্টমন্ত্র "এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই" এবং ঐ দলের মধ্যে কালোবাজারের বৃষভদলই সুপুষ্টতম।

আমরা ঐ সংবাদটি যে দৈনিকে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহার রিপোর্টের মধ্যে "সক্রিয় অভিযান", "সত্যিকারের সংগ্রাম" ইত্যাদি শব্দ পাইয়াছি, কিন্তু ক্রিয়া প্রকরণে আন্দোলন ও বিক্ষোভ ছাড়া আর কিছুরই স্পষ্ট আভাস পাইলাম না।

আন্দোলন যাহাই হউক, সে বিষয়ে বিচারের ক্ষেত্র এখানে নহে। সে বুঝিবেন আন্দোলন-চালকবৃন্দ এবং বুঝিবেন—যদি বুঝিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য কিছু থাকে—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেননা এই রাজনৈতিক পাশাখেলার জুয়ায় আমরা সেই শ্রেণীর মধ্যে পড়ি যাহাদের হারজিত নাই, আছে শুধু হার। অর্থাৎ আমরা পশ্চিমবঙ্গে অভাগা জনসাধারণের সামিল, যাহাদের দুর্দ্দশার অবকাশে এই খেলার আসর বসিতেছে।

কেরলে যাহা চলিতেছে তাহা দৃষ্টে এদেশের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের চক্ষু খুলিবে আমাদের আশা ছিল। কিন্তু মনে হয় যে, সরকারী অঞ্চল সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে এখনও পারেন নাই। এ-দেশের জনসাধারণ এখন সাধারণ জীবনপথে চলিতে প্রতিপদে বাধা পাইতেছে। জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব চড়িয়াছে ও চড়িতেছে। রোগে, অভাবে ও অত্যাচারে সরকারী সাহায্য যাহাকে বলে তাহা পাওয়া অসম্ভব, দুই কারণে। প্রথমতঃ সাধারণ সরকারী কর্ম্মচারী উদ্ধত, উদাসীন ও অত্যাচারপ্রবণ, দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তৃপক্ষ চাটুকারের ব্যাজস্তুতি ও তাহাদের নানা দাবী-দাওয়ার পূরণেই ব্যস্ত। ফলে নিরীহ সাধারণজন এখন অসহায় অবস্থায়, স্কন্ধে দুর্ব্বহভার লইয়া জীবনযাত্রার পথে চলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যপালনের ত্রুটিটাই তাহার সম্মুখে বড় করিয়া দেখানো হইলে সে তাহাই দেখিবে। তাহার এই বিভ্রান্ত ও ক্লিষ্ট অবস্থায় তাহার নিকট সত্যাসত্য জ্ঞান বা সূক্ষ্মভাবে ন্যায়-অন্যায় বিচার কোনটাই আশা করা উচিত নহে। সুতরাং তাহাকেই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিক্ষোভের ভূত নাচাইয়া নিজের ইষ্টসিদ্ধির এই প্রশস্ত অবসর। জনসাধারণের উপকার একবিন্দুও হইবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু অপকার ও ক্ষতি হইবে অপরিমেয় নিশ্চয়ই। লাভ হইবে ফন্দীবাজ নেতৃবর্গের ও তাহাদের অনুচরবর্গের।

বহুদিন পূর্ব্বে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায় যখন বিদেশে গিয়াছেন সেই সময় এক অতি সামান্য অজুহাতে কলিকাতায় বিক্ষোভের ভূত নাচানো হয়। শান্তিশৃঙ্খলার ভার ডাক্তার রায় দিয়া গিয়াছিলেন অতি অযোগ্য ও বিশেষ অকর্ম্মণ্য এক মন্ত্রীপুঙ্গবের হাতে। বিক্ষোভ-চালক নেতৃবর্গ সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া কলিকাতার নাগরিক জীবন লণ্ডভণ্ড করিয়া অচল এবং বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। এ সব কথাই পুরাণো কিন্তু ভুলিবার সময় হয় নাই। আমাদের সেকথা বলার কারণ ঐ নাটকের শেষ অঙ্কের তথ্য।

ডাক্তার রায় ছুটিয়া আসিয়া বিক্ষোভ থামাইলেন—কেননা তখনও তাঁহার সেই প্রতিপত্তি ও কার্য্যক্ষমতা ছিল। তাহার পর এক বিরাট সাংবাদিক বৈঠক ডাকিয়া তাহাদের সুখাদ্য খাওয়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত যদি কেহ বিষমভাবে হইয়া থাকে তবে সে ত কলিকাতার সাধারণ নাগরিক। কর্ত্তৃপক্ষ

ব্যক্তিগতভাবে এক কাণাকড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, শুধু আমার বাড়ীর বাইরের ঘড়ির কাঁচটা ভেঙ্গে দিয়েছে। তোমরা আমায় বলতে পার সাধারণ জন এই বিক্ষোভের অত্যাচার মাথা পেতে নির্ব্বাক ভাবে লইল কেন?

সাংবাদিকের দল দৌড়িল যাঁহারা তাঁহারা, প্রথমে কোনও উত্তর দেন নাই, কেননা বিক্ষোভ হইলে দামামা বাজাইয়া কাগজ বিক্রয়ই তাঁহাদের অধিকাংশের একমাত্র নীতি এবং হাঙ্গামা যত জোর হবে, ভূতের নৃত্য যতই উদ্দাম হবে, ততই তাঁহাদের কাগজ বিক্রয়ের সুবিধা। পরে ডাক্তার রায় উহাদের মধ্যে পদাতিক শ্রেণীর একজনকে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রা এতই দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে যে, সে এখন বিভ্রান্ত ও কাতর। সরকার তাহার এই অবস্থার প্রতি উদাসীন এ ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল এবং সে জানে যে তাহার ক্ষতি হইবেই। সুতরাং সে সক্রিয়ভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে অগ্রসর হইবে না। সাধারণ নাগরিকের জীবন কেন দুর্ব্বহ, ডাক্তার রায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত পদাতিক মহাশয় প্রচুর তথ্য দেওয়ায় ডাক্তার রায় প্রথমে অবিশ্বাস করেন এবং পরে অন্য সকল সংবাদিক সে তথ্যাদি সমর্থন করিলে তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য সংবাদটি দেন যে জনসাধারণের সাধারণ জীবনের সঙ্গে সরকারী তরফের কোনই যোগসূত্র নাই। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ দৈনিকের বিদেশী সম্পাদক তাহাতে চমকিত হইয়া প্রশ্ন করেন "কেন ডাক্তার রায় আপনাদের কংগ্রেস?" ডাক্তার রায় তখন স্বীকার করেন যে, কংগ্রেসও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রাখে নাই।

আজ অবস্থা আরও ঘোরাল। জনসাধারণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন সমাজ ও সাধারণকে সুপরামর্শ দিয়া, নিজ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, উন্নতির পথে চালাইতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষের দুর্বুদ্ধি ও অবহেলার ফলে তাহাদের উচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ। কংগ্রেসের অবনতি এখন প্রায় অতলে নামিয়াছে, সেখানে দুর্নীতিপরায়ণ ভাগ্যান্বেষীরই রাজত্ব। এই সময়ে ভূত নাচিলে সামলাইবে কে?

কেরালা সরকার সরকারী তরফে, দলীয় ভূতপ্রেতের সাহায্য লইয়া দুর্নীতির প্রবল অত্যাচার চালাইয়াও সেখানের আন্দোলন দমন করিতে পারেন নাই। এবং সে কারণে দেশের অন্যান্য রাজ্যে ভূত নাচাইবার হুমকিও তাঁহাদের দল দিয়াছেন। উপরন্তু বাংলা দেশে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবার লোকের অভাব হইবে না।

পশ্চিমবাংলা সরকার কি এ বিষয়ে সচেতন?

দেশের মান উন্নয়নে সি, ডি, দেশমুখ

দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতেই রাষ্ট্রে কল্যাণকর বহুমুখী উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছে। সেজন্য লক্ষ লক্ষ টাকাও জলের মত সরকার ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে হইবে জনসাধারণ ইহাতে কতখানি উপকৃত হইল। মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, প্রত্যেক বৃহৎ কাজেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই কাজে দরিদ্রতম লোক কতটা উপকার পাইবে কিন্তু বর্ত্তমান বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির কাজ যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে সে লক্ষ্য থাকিতেছে কই?

শৃঙ্খলা অপেক্ষা বিশৃঙ্খলা, অর্থব্যয় অপেক্ষা অপচয় ও অপব্যয়, শান্তি অপেক্ষা অশান্তিই আজ সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। অবশ্য অন্যদিকেও প্রশ্ন উঠে, ভারতের নাগরিকগণ কি স্বাধীন নাগরিকরূপে তাঁহাদের মর্য্যাদা ও যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন? তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও নীতিবোধ কি যথেষ্ট সমুন্নত হইতেছে? মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব সি. ডি. দেশমুখ বলিয়াছেন, দেশের প্রশাসনিক ও নৈতিক মানের ক্রমাবনতি ঘটিতেছে।

তিনি বলিয়াছেন, দেশের শাসন-ব্যবস্থায় ভারপ্রাপ্ত অনেকে মনে করেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্যাপারে এমন-কিছু আছে যাহা উদ্বেগের বিষয়। তাঁহার মতে সরকারের পক্ষে ইহা আরও গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সমাজের সর্ব্বস্তরে সর্ব্বক্ষেত্রে যে দুর্নীতির প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইতেছে, তাহাতে শাসক ও শাসিতের নৈতিক মানের অবনতি ঘটিতেছে। উদ্বিগ্ন জনসাধারণ স্বজন-পোষণ, অনাচার, দলবদ্ধ অত্যাচার ও বহুরকম ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও তাহারা শুনিয়া আসিতেছে। অথচ এই সংক্রান্ত উপযুক্ত তথ্যের অভাবে তাহারা অসহায়। এই অসহায় অবস্থা দূরীকরণের জন্যই দেশমুখ বলিয়াছেন, নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই ট্রাইব্যুনাল বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবেন অথবা প্রকৃত তথ্য জানাইবেন, যাহাতে ভবিষ্যতে উহার সংশোধন হইতে পারে।

গত কয়েক বৎসরে এ সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণও ঘুষ ও দুর্নীতির ব্যাপারে লিপ্ত থাকার জন্য কর্মচ্যুত, সাময়িকভাবে বরখাস্ত অথবা অন্যরকমে শাস্তি পাইয়াছেন। ছোট-বড় প্রায় সকল দপ্তর ও সব বিভাগেই দুর্নীতির পাপচক্র এমন অদ্ভুতভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে যে, উহাতে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরকারী কর্ম্মচারীদেরই টিকিয়া থাকা দায় হইয়া পড়িতেছে। কেহ দুর্নীতিতে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে, তাহার বিরুদ্ধে অন্যেরা ষড়যন্ত্র করে এবং তাহাদের কর্ম্মজীবন অসহনীয় করিয়া তোলে, সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেই এরূপ অভিযোগ বিরল নহে। উপরওয়ালা যদি দুর্নীতিপরায়ণ হন, তবে নিম্নপদস্থ সৎ কর্ম্মচারীদের অবস্থা আরও অসহনীয় হইয়া উঠে। সকলে সবরকম খবর রাখেন না অথবা রাখিলেও তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন না। কারণ, তাহাতেও বিপদ আছে।

দেশের এই নৈতিক ও মানসিক মানের অবনতির জন্য শ্রীদেশমুখ মন্ত্রীদেরও রেহাই দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মন্ত্রীদের নৈতিক ও মানসিক মান বিশেষ ভাবে উন্নত হওয়া প্রয়োজন। অনেকের ধারণা আছে যে, সরকারী কর্ম্মচারিগণ মন্ত্রীদের এবং জনসাধারণের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিবে। কিন্তু এ ধারণা অবাস্তব। সরকারী কর্ম্মচারীদের যে কোন ত্রুটির মূলে যে মন্ত্রীদের অক্ষমতা রহিয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। কাহার দোষ বেশী,

সে প্রশ্ন অনাবশ্যক হইলেও কিরূপে দেশের আইন ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা যায়, ইহাই সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয়। এই সব কারণেই দেশমুখ ট্রাইবুনালের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এমনকি তিনি ইহাও বলিয়াছেন, এইরূপ একটি কমিশন নিযুক্ত হইলে, তিনি নিজেই অন্ততঃ এ বিষয়ে আধ ডজন তথ্য জানাইতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত যত সরকারী পরিকল্পনা হইয়াছে তাহার শতকরা বিশভাগ অর্থেরই যে অপচয় বা অপব্যয় হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই।

তিনি অবশ্য অনেক কারণই দেখাইয়াছেন: যাঁহারা যে বিষয়ে কর্ম্মদক্ষ বা উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের উপর সেই কাজের ভার দেওয়া হয়। গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনীয়ারগণ অনেক সময় যথাযথ ভাবে কর্ম্মসম্পাদন করিতে পারেন না, ইহার ফলে কাজও নষ্ট হয়, অর্থেরও অপচয় ঘটে। যে দিকে যে ব্যাপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যাইবে, সেই দিকেই উদ্বেগজনক অবস্থা বিরাজ করিতেছে।

এই জন্যই দেশমুখ সত্যই বলিয়াছেন, দেশের নৈতিক ও মানসিক মান উন্নয়নের প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সমাজ ও তাহার অধোগতি

সমাজের কোথায় কি ভাবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহা কলিকাতার মত জনাকীর্ণ মহানগরীর উপর চোখ বুলাইয়া গেলেই ইহার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। কলিকাতা এমন একটি শহর—যেখানে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকানপসার, যানবাহন প্রভৃতি প্রতিটি পল্লীকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। থিয়েটার-বায়স্কোপ, নৃত্য-গীত, সভা-সমিতি, বিচিত্র অনুষ্ঠানে কলিকাতার জীবন সর্ব্বদা চঞ্চল। এই হৈ-হুল্লোড় ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের আড়ালে নিম্ন-আয়ের গৃহস্থরা, দিন-মজুরী করিয়া খাওয়া মানুষেরা কোথায় কি ভাবে বাস করিতেছে—সংস্কারের সহিত সংস্থানের দ্বন্দ্বে কোথায় তাহারা ধীরে ধীরে তলাইয়া যাইতেছে, তাহা উপরতলার মানুষের জানিবার কথা নয়।

কিন্তু ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন: তাঁহারা দেখিতেছেন, শুধু কলিকাতায় নয়—সমগ্র বাংলা দেশে পেটের ভাত, পরণের কাপড় ও মাথা গুঁজিবার একটি জায়গা সংগ্রহ করিতে নিম্নবিত্ত গৃহস্থরা আজ হিমসিম খাইয়া যাইতেছেন। অনিবার্য্য কারণেই ভদ্রঘরের ছেলেরা ভদ্রতানির সংকোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া গুণ্ডা, ডাকাত বা বিবিধ অশান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছে। মেয়েরাও সম্ভ্রম ও শালীনতা হারাইয়া অনাচার বা অশোভন কার্য্য করিয়া বসিতেছে।

একদা এই মধ্যবিত্ত সমাজই ছিল এদেশের শিক্ষা, সদাচার, শালীনতার প্রধানতম ধারক ও রক্ষক, আজ কেন এরূপ হইল, ইহা ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই অবক্ষয় কতকগুলি বাস্তব কারণেই হইয়াছে।

বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলার ভৌমিক এলাকা সঙ্কুচিত হইয়াছে, অথচ উদ্বাস্তু সমাগমের ফলে তাহার লোকসংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধনশীল বেকার-সমস্যা ও জীবন-যাপনের মানের সমুন্নতি এবং দ্রব্যমূল্যের ক্রমিক ঊর্দ্ধগতির ফলে সাধারণ মানুষের কোনরূপে বাঁচিয়া থাকাই আজ কষ্টকর হইয়াছে। ইহার উপর আছে ক্ষমতাপন্ন মহলের নীতিহীন লালসা ও অবাধ দৌরাত্ম্য—যাহার ফলে বঞ্চিত মহল উদভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

প্রতিদিনের সংবাদপত্র খুলিলেই দুই-তিনটা করিয়া আত্মহত্যার সংবাদ চোখে পড়ে। কোনটার মূলে পারিবারিক অশান্তি, কোনটার দীর্ঘস্থায়ী বেকার-দশার বিড়ম্বনা, কোনটার বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা। আবার ব্যর্থ-প্রণয়ের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। কিন্তু সবার পিছনেই রহিয়াছে সামাজিক অসমন্বয়জনিত নিদারুণ অতৃপ্তি এবং আত্মধিক্কার। এ কথা নিশ্চয়, ভাবাবেগে কেহ বার তলা হইতে ঝাঁপ দেয় না বা কোন মহিলা কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয় না। এক-একটা সময় আসে যখন মানুষ আর বাঁচিয়া থাকার কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। সে অবস্থায় অন্যকে হউক বা নিজেকে হউক হত্যা করিয়া ফেলা তাহার পক্ষে একটা অসম্ভব কিছু নয়। সুস্থ সমাজে ইহা হয় না—যে সমাজে ইহা নিত্যকার ঘটনা তাহাকে কি করিয়া সুস্থ বলা যাইবে? এই অসুস্থ সমাজ হইতেই বিবিধ দুর্নীতি যে প্রকাশ পাইতেছে একথা বলাই বাহুল্য। বহু বিচিত্র দুর্নীতি ও যৌন অনাচারের খবরে প্রতিদিনের সংবাদপত্র আজ ভারাক্রান্ত। কেহ কন্যাদায়গ্রস্ত সংসারে ঢুকিয়া ফাঁকি দিয়া অসহায় বালিকাকে বিবাহ করিতেছে, চাকুরী জুটাইয়া দিবার মিথ্যা আশ্বাসে কুল-কুমারীকে ঘরের বাহিরে আনিয়া শয়তানী চক্রে আটক করিতেছে। গৃহস্থ ঘরের বধূ রাজপথে দাঁড়াইয়া অনুচিত উপায়ে রোজগারের জন্য লোক ডাকিতে গিয়া ধরা পড়িতেছে, আবার ভোজনালয়ে পরিবেশিকার চাকুরী করিতে গিয়া গোপনে পাপ ব্যবসা চালানোর অভিযোগে ধৃতও হইতেছে। অঙ্গ-সংবাহনাগারে চাকুরীর আড়ালেও অনুরূপ অন্যায় ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে ইহাও দেখা যায়। বলা বাহুল্য, জীবনরক্ষার জান্তব প্রয়োজনেই ইহারা এই সব পথে পা দিতেছে। বিপর্য্যয় ও বিড়ম্বনা শুধু নারীর ভাগ্যেই নয়, পুরুষের জীবনও আজ সমান দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত। চুরি, ডাকাতি, খুন, নারীহরণ, বলাৎকার, প্রতারণায় আজ যে সমাজ ধ্বসিয়া পড়ার মত হইয়াছে, তাহা করিতেছে আশা, আদর্শ ও মনুষ্যত্বভ্রষ্ট মানুষরাই। এ মানুষ সহসা মাটি ফুড়িয়া উঠে নাই—সমাজের অব্যবস্থাই তাহাদের এই কদর্য্য রূপান্তর ঘটাইয়াছে।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে, শুধু উপর তলায় গণতন্ত্রের পলস্তারা লাগাইলে ও বিশ্বমৈত্রীর বেদমন্ত্র আওড়াইলে হইবে না। তলা হইতে সংস্কার সুরু করিতে হইবে—শিক্ষা, জীবিকা, বাসস্থান, সর্ব্বজনের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে এবং মনুষ্যশক্তি যাহাতে বাধ্যতামূলক গঠনাত্মক কর্ম্মের মাধ্যমে সমাজে বিত্ত উৎপাদন করিতে পারে তাহার অনুকূল সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু সে চেষ্টা সরকারের কোথায়?

চেষ্টা অবশ্য আমাদের দিক হইতেও কিছু নাই। সে দিক

দিয়া বিচার করিতে হইলে সমাজকে আমরাও ক্রম-নিম্নের পথে কম আগাইয়া লইয়া যাই নাই। যাহার ফলে ছেলেমেয়েরা অভিভাবককে আজ মানিতে চায় না, পথে-ঘাটে শিক্ষক ছাত্রের কাছে লাঞ্ছিত হ'ন। কেন এমন হয়? আমরা পরের দোষ দেখাইতেই অভ্যস্ত—নিজেকে বিচার করিতে জানি না। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় মানবে'—আমরা যাহা দেখাইব, ছেলেরা তাহাই ত শিখিবে। আমাদের লইয়াই ত সমাজ। নূতন করিয়া সমাজ গড়িবার আগে সেই কথাই আজ চিন্তা করিতে হইবে।

তা ছাড়া, যে কর্ম্ম-বিমুখতা আমাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহাও একদিক দিয়া সমাজকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে। ফাঁকি দিয়া উপার্জ্জন করিয়া লইব, কিন্তু পরিশ্রম করিতে নারাজ। ইহা ত আমরা নিত্যই দেখিতেছি। যাহার ফলে সমাজে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ভিক্ষা করিতে লজ্জা নাই, কিন্তু খাটিয়া খাইবার কথা বলিলেই তাহাদের অপমান হয়। আমাদের শাস্ত্রেই আছে—আর যাহাই কর, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। অথচ এই ভিক্ষাকেই আমরা প্রশ্রয় দিয়া সমাজকে নিম্নগামী করিয়াছি।

ইহার প্রতিকারই বা কি? প্রতিকার আছে আত্ম-সচেতনতার মধ্যে। নিজেকে প্রস্তুত না করিতে পারিলে, সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা অবাস্তব।

কৃষিদপ্তর ও খাদ্য উৎপাদনে সক্রিয় অবস্থা

'অধিক ফসল ফলাও।' দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা নূতন কথা নয়। মন্ত্রী মহাশয়রা দপ্তরে বসিয়া আদেশ করিলেই ফসল ফলিবে না। ফলাইতে হইলে যাহা করার প্রয়োজন, সরকার তাহা করিতেছেন কোথায়? সুতরাং সরকারী দপ্তর পরিচালিত আন্দোলনের দৌড় কতদূর তাহা জনসাধারণের জানা আছে। অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী জমির পরিমাণ কম বটে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশী। কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ যেখানে বাড়াইবার উপায় নাই, সেখানে ফলন বাড়াইতে সার ব্যবহার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সাহায্য দিবার কাজে রাজ্যের কৃষি-দপ্তরের জরুরী দায়িত্ব রহিয়াছে।

কৃষি ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের এই ক্রমিক অধোগতির জন্য প্রকৃতির খামখেয়ালী বা কৃষকের অক্ষমতাকে শুধু দায়ী নয়। অন্যান্য রাজ্য যতটুকু পারিতেছে পশ্চিমবঙ্গ তাহা পারিতেছে না কেন?

তাহার কারণ, এই রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়াছে ইহা আজ কে অস্বীকার করিবে? কৃষি, খাদ্য, মৎস্য, সেচ, স্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন প্রভৃতি যে দপ্তরগুলির উপর জন-কল্যাণের দায়িত্ব রহিয়াছে, সেইগুলিতেই দেখা যাইতেছে অকর্ম্মণ্যতার চূড়ান্ত গলদ! কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকার যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করিতে পারেন না, এই অভিযোগও আজ অচল। কারণ, দপ্তরের কর্ম্মদক্ষতা এমন যে, বাজেট বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় এক কোটি টাকা কৃষিবিভাগ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। মহাধিকরণের আরামকক্ষে বসিয়া থানায় থানায় কৃষি-প্রতিষ্ঠান খুলিবার পরিকল্পনা তৈয়ারী হয়, কিন্তু মাঠ পর্য্যন্ত তাহা পৌঁছায় না। বড় ও মাঝারী আকারের সেচ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে শতকরা ত্রিশটি মাত্র কোন মতে চালু করা সম্ভব হইয়াছে। কৃষি ও সেচ-সংক্রান্ত ছোট বড় সব কাজেই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার খেলা চলিতেছে। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের ফলন কমিবে না কেন!

দেশের অধিকাংশ লোক যখন কৃষিজীবী তখন কৃষিদপ্তর একটা না রাখিলে নয়। তার পর দপ্তর থাকিলেই মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, অধিকর্ত্তা ইত্যাদির আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা। ইঁহারা প্রধানতঃ ফাইল চাষ করেন—এই চাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফাইলের ফলনই বৃদ্ধি করেন, শস্য-ফলন বাড়ে কই?

কৃষিবিভাগে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গলদ অনেক দিনের। বর্ত্তমানে দেশময় খাদ্যশস্য উৎপাদনের সমস্যা শঙ্কাজনক হওয়ায় কৃষিবিভাগের প্রতি রাষ্ট্রকর্ত্তাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু পড়িলে কি হইবে, আমলাতন্ত্রের দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইতে পারা সহজ নয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করিতে হইলে কৃষিবিভাগের প্রশাসনিক জটিলতা কমাইতে হইবে এবং সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীগণকে সরাসরি খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যে সকল কর্ম্মচারী থানায় থানায় অথবা গ্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজে সক্রিয় ভূমিকা লইবেন, তাঁহাদের যদি সব বিষয়ে উপরওয়ালার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিতে হয়, তবে কেবল ফাইল বাড়ে, ফসল বাড়িতে পারে না। নালাগড় কমিটি সেইজন্য কৃষিবিভাগীয় সংগঠনকে ঢালিয়া সাজিয়া ক্ষমতা ও দায়িত্ব সকল স্তরে বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করিয়াছেন।

জানি না, এই সুপারিশ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কিনা। কিন্তু ইহার একমাত্র প্রতিকার দপ্তরের পুনর্বিন্যাস—যাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সরকারী উদ্যমটা সত্য সত্যই মাঠ পর্য্যন্ত চাষীর কাছে পৌঁছায়। অবশ্য আমাদের দেশের কৃষকরাও অলস প্রকৃতির। একদা যাহাদের কর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল, যে কারণেই হউক তাহার অবনতি ঘটিয়াছে। সেইজন্যই অনেক স্থলে আজ সাঁওতাল দিয়া চাষ করাইতে হইতেছে। ইহাও দেশকে অবনতির পথে লইয়া চলিয়াছে। কৃষকদের এ অবস্থারই বা পরিবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারে? অথচ বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে ইহাদের আপন কাজে ফিরাইয়া আনা দরকার। নহিলে সমস্যা সমস্যাই রহিয়া যাইবে।

রপ্তানী বৃদ্ধি করিবার পক্ষে বাধা কোথায়

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য-সচিব শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী রপ্তানী বৃদ্ধি বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। জাতীয় সরকারের চেষ্টায় ও উৎসাহে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নূতন নূতন পণ্য উৎপাদনের জন্য কতকগুলি শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে শিল্প-প্রসারের আগ্রহও বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তর্নিহিত কতকগুলি দুর্ব্বলতার জন্য দেশ ইহার সম্পূর্ণ সুফল লাভ

করিতে পারে নাই। এই সার্থকতার পথে প্রধান বাধা হইল, যন্ত্রপাতি এবং অত্যাবশ্যক শিল্প-উপকরণ সম্পর্কে পরনির্ভরতা।

ভারতে শিল্প-যুগ আরম্ভ হইয়াছিল প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা যে, জাতীয় সরকারের উদ্যোগে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যন্ত্রপাতি কিংবা শিল্পে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি তৈয়ারীর জন্য কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। শাস্ত্রীজী দ্রুত শিল্পোন্নতির দ্বারা আগামী দশ হইতে পনের বৎসরের মধ্যে এই পরনির্ভরতা দূরীকরণের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে নূতন যে সব বৃহদাকার শিল্প স্থাপিত হইবে, সরকারই সেইগুলি পরিচালনা করিবেন।

প্রশ্ন হইল, সরকার ইহার পূর্ব্বে অনেক বড় বড় আশ্বাসই প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু কাজ কতটা করিয়াছেন? শাস্ত্রীজী এবং তাঁহার সহযোগী মন্ত্রিগণ যেন স্মরণ রাখেন, বক্তৃতার তুবড়ি ছুটাইয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার সময় পার হইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক কথা ভাবিবার আছে। ভারতীয় শিল্পে আর একটি গুরুতর সমস্যা হইল মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক মান অনুসারে পণ্য তৈয়ারী করিতে অক্ষমতা, পড়তা খরচের আতিশয্য ও বিক্রয়-মূল্যের ঊর্দ্ধগতি। এই একমাত্র কারণেই বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করা দুঃসাধ্য। বিদেশীয় কারখানায় উৎপন্ন জিনিসের তুলনায় ভারতীয় শিল্পজাত জিনিসের দর চড়া এবং মান নীচু। তার পর একরকম নমুনা দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত খারাপ মাল সরবরাহ করিবার এবং চুক্তিতে নির্দ্দিষ্ট দরের সহিত তুলনায় বাজার দর চড়িয়া গেলে চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুসারে মাল সরবরাহ করিতে গাফিলতীর নিদর্শনও কম নয়। অন্যদেশে মাত্র ব্যবসায়ী সমাজে অবজ্ঞাত ব্যক্তিরাই নীতিবিরোধী ও স্বদেশের সুনামহানিকর কৌশলে লিপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতে অনেক খ্যাতনামা এবং দিক্‌পাল ব্যক্তিও জাতীয় মর্য্যাদার কথা ভুলিয়া গিয়া অতিলোভে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য সম্পর্কে একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়ার জন্য মূলতঃ ইঁহারাই দায়ী। অথচ দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নতি—এই রপ্তানী প্রসারের উপরই নির্ভর করিতেছে। কেননা, বিদেশ হইতে ক্রীত যন্ত্রপাতি, অত্যাবশ্যক উপকরণ ও পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করা প্রয়োজন, আর রপ্তানী বাণিজ্যই উহার প্রধান উপায়। ইহার সমাধানকল্পে শাস্ত্রীজী প্রস্তাব করিয়াছেন, দর কমাইয়া বিদেশের বাজারে অন্যান্য দেশজাত পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে।

কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, ভারতে পড়তা খরচের তুলনায় দর কমাইয়া বিদেশে পণ্য বিক্রয় করিলে যে টাকাটা লোকসান পড়িবে তাহা পূরণ করিবে কে? এই বাধা কাটাইবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীজী ইহারও একটি সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক-একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সব সংস্থাকে সংঘবদ্ধ করিয়া লোকসানের বখরা ভাগ করিয়া লইলেই বিপদ এড়ান যাইবে।

রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগে স্বদেশে অসহায় ক্রেতা সাধারণের ট্যাঁক সাফাই করিবার আর একটি চমৎকার অপকৌশল বর্ত্তমান, এই আত্মঘাতী সর্ব্বনাশের পথ বন্ধ করিবার উপায় তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

গুণীর সমাদরে কার্পণ্য

মুর্শিদাবাদের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মৃত্যুতে বাংলার বয়নশিল্পের এক গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটিল। প্রথম যুগে বিদেশী বণিকের অত্যাচারে পরবর্ত্তীকালে যন্ত্রশক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় বাংলার গ্রামে গ্রামে কারুকৃতির অলক্ষ্য ধারাটি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। তবু একেবারে লুপ্ত হয় নাই, নিভৃত কুটিরে কুটিরে শত উপেক্ষা ও অনাদর সহিয়াও শিল্পীরা আপনার মনে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাই এই প্রতিকূল কালেও অতীতের রূপ ও রুচির কিছুটা বাঁচিয়াছে। মসলিন এখন শুধু প্রবাদ, কিন্তু মুর্শিদাবাদের বালুচরের উৎকর্ষ একালেও স্বীকৃত। বিপুল পরিমাণ উৎপাদনের শক্তি যন্ত্রের আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের বিচার যেখানে সূক্ষ্মতা দিয়া সেখানে সে পৌঁছিতে পারে না। যন্ত্রের পরাজয় এখানে। যোগ্য গুরুর যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে হেমচন্দ্র তাঁহার দীর্ঘজীবন ধরিয়া একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁহার প্রয়াণে আক্ষেপের কিছু থাকিত না, যদি এই গুণীরও শেষ জীবনে অর্থাভাবের বিড়ম্বনা না ঘটিত। সরকার তাঁহাকে এককালে দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন সত্য, এক সংবর্দ্ধনায় তিনি নগদ একশত টাকাও পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রথম দিকে যাঁহার সৃষ্টি প্যারিসে বার বার প্রশংসিত হইয়াছে, রেশমশিল্প ছাড়াও চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, হস্তিদন্তের কাজ ইত্যাদি শিল্পেও যিনি পটু ছিলেন, রেশমশিল্পকে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে দেখিতে চান নাই বলিয়া যাঁহার বিষয়সম্পত্তি সবই নষ্ট হইয়া যায়, সেই শিল্পীর প্রকৃত সমাদর কি এই?

পরিতাপের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, আপন গ্রামেও তিনি সমাদর পান নাই। এই দুর্দ্দৈব একা হেমচন্দ্রের নহে, বাংলায় যাঁহারাই বৈষয়িক সাফল্যকে ইষ্ট বরেন নাই, তাঁহাদের দশাই এই। অন্যান্য প্রদেশে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে সেখানকার সরকারের আগ্রহ এবং প্রযত্নের অভাব নাই। নানাভাবে অর্থানুকূল্যে প্রচারের দ্বারা আপন আপন অঞ্চলের শিল্পরূপকে তাঁহারা সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ অনুভব করিতেছি।

অথচ ইহা শুধু সমাদরের দিক দিয়াই নয়, ইহার প্রয়োজন অন্য দিক দিয়াও ছিল। একজন বিদেশী বালুচরের শাড়ি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদি তোমরা এই শাড়ি যথাযথ সরবরাহ করিতে

পার তবে আমি ইহা প্রভূত পরিমাণে কাটাইয়া দিতে পারি—যাহার মূল্য কোটি টাকার কম হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মালের জোগান তাঁহারা দিতে পারিলেন না। কারণ যাহাই থাক, যে কুটিরশিল্পের চাহিদা আজও ব্যাপক, তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সকল রকমে চেষ্টা করা উচিত। বাজার আজও আছে, তবে চাই যথাযথ পরিবেশন। সরকার অন্য বিবিধ খাতে অর্থব্যয় করিতেছেন, এই কুটিরশিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে সরকার সবিশেষ যত্ন লইবেন ইহাই আমরা অতঃপর আশা করিব।

দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতেছে কিসে ?

দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার পূর্ব্বে সরকার যেসব আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, কার্য্যকালে দেখা গেল, সরকার শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন। যে দেশে শস্যের উৎপাদন, বর্দ্ধন ও ফলন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অনুগ্রহদত্ত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল, সে-দেশে যথাসময়ে প্রয়োজনমাফিক জলসেচের আশ্বাস যে কতখানি আশা ও আনন্দের কারণ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। হয়ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ হইলে সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ হইত না। কিন্তু খুবই পরিতাপের কথা যে, আভ্যন্তরীণ কোন গলদ, পরিকল্পনার ত্রুটি বা পরিকল্পনাকে সুষ্ঠু রূপ দিবার অসামর্থ্য, ঔদাসীন্য বা দুর্নীতি যে কারণেই হউক, কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় ও বহু সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দামোদর পরিকল্পনার বিঘোষিত বহু উদ্দেশ্যের মত সেচের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যও সুষ্ঠুভাবে সংসাধিত হইল না। এই ব্যর্থতা সরকারও স্বীকার করিয়াছেন।

প্রতি বৎসরই দেখা যাইতেছে বাঁধের দরুণ দামোদরের জল আবদ্ধ হওয়ায় নিম্ন-দামোদর অতি শীর্ণকায় হইয়া যাইতেছে। ফলে হুগলী ও হাওড়া জেলার কয়েকটি থানার লক্ষ লক্ষ একর জমি জলাভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং যে-পরিকল্পনার ফলে এক পাড় গড়িতে গিয়া অন্য পাড় ভাঙিবার প্রয়োজন হয়, সে-পরিকল্পনার কোথাও নিশ্চয় বড়রকমের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, ইহাই আমাদের মনে করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু অভিযোগ ত শুধু নিম্ন দামোদরের সম্পর্কেই নহে, যেসব অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য খাল কাটা হইয়াছে, সে সব স্থান হইতেও নানারূপ ত্রুটি, শৈথিল্য ও কাজের অসম্পূর্ণতার অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

অথচ নিম্ন-দামোদর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যাহা ফসলের দিক দিয়া সোনার দেশ বলিয়া একদা পরিচিত ছিল, তাহা আজ মরুভূমিতে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে।

যে জল-সেচের ব্যবস্থা হইলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি সোনার ফসলে ভরিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহা আজ তাঁহাদেরই কাজের ত্রুটিতে ব্যর্থ হইয়া গেল। এদিকে সরকার চীৎকার করিতেছেন, উৎপাদন বাড়াও। কৃষক যদি যথাসময়ে প্রয়োজনানুযায়ী সেচের জল না পায় তাহা হইলে আশানুরূপ ফসল উৎপাদন যে তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? যে পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিতে দেশের কোটি কোটি টাকা জলের মত ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে, যাহার উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিত্র পুনঃ পুনঃ দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া দেশের বিপুল অর্থ উহাতে নিয়োগ করিবার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন অজুহাত দেখাইলেই তাহার আংশিক অসাফল্যও দেশবাসী আর মানিয়া লইতে সম্মত নহে।

কিন্তু কেন এমন হইল? সরকার কি ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই চিন্তা করেন নাই, অথবা জানিয়া-শুনিয়াই এতগুলি টাকার ছিনিমিনি খেলিয়াছেন? না, সরকার টাকা ব্যয় করিয়াই খালাস—টাকার ব্যবহার কিরূপ হইতেছে তাহা কাজে লাগিতেছে, কি অসাধুর পকেটে যাইতেছে, এই সন্ধান রাখিবারও প্রয়োজনবোধ করেন না।

সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য সেই সব তথ্যগুলির অনুসন্ধান করা যাহার অব্যবস্থায় এতগুলি টাকার অপচয় হইতেছে। কোথায় ইহার উৎস, কি তাহার কারণ এবং যাহা করিলে এই সব ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হইতে পারে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করিলে ইহার কাজ কোনদিনই সুসম্পূর্ণ হইবে না।

পশ্চিমবাংলার সমস্যা

পশ্চিমবাংলার আজ বহু সমস্যা—খাদ্য সমস্যা, শিক্ষিত বেকার সমস্যা, ভূমি বণ্টন সমস্যা, বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বাসন সমস্যা প্রভৃতি। খাদ্য সমস্যা আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে এবং এই প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী এই এক সমস্যাতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খাদ্য সমস্যা বর্ত্তমানে এমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, খাদ্য সরবরাহের জন্য পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। পশ্চিমবাংলার খাদ্যমন্ত্রী খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে আদৌ নজর দেন নি, এবং সে বিষয়ে তাঁহার কোনও কল্পনা করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মন্ত্রীত্বের গদীতে বসিয়া তিনি এতদিন কেরাণীগিরি করিয়া আসিয়াছেন—নীতি নির্দ্ধারণ এবং তাহার পরিচালন বিষয়ে তিনি অজ্ঞতা এবং অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, এ প্রদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে যে পরিমাণ নজর দেওয়া উচিৎ ছিল তাহা তিনি দেন নি বা তাহা দেওয়া তাঁহার অসাধ্য।

সম্প্রতি খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মানসে পশ্চিমবাংলার খাদ্য-বিভাগকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির ভার অন্য একজন মন্ত্রীর উপর দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি পড়িতেছে এবং ইহার জন্য কেন্দ্রের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছিল এবং অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে কর্ত্তৃপক্ষের বোঝা উচিৎ ছিল যে, মূল্য নির্দ্ধারণের ফতোয়াজারী করিতে করিতেই জোতদার, পাইকারী বিক্রেতা এবং কালোবাজারী ব্যবসায়ীরা ঐ দামেই খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবে না, মূল্য নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা যেন উহাদের সুবিধার জন্যই করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন যদিও

এ বৎসর প্রচুর হইয়াছে বলিয়া বলা হইতেছে, তথাপি বাজারে খাদ্য শস্যের অভাব দেখা যাইতেছে। বাজারকে নিজের গতির উপর ছাড়িয়া দিলে মূল্য চাহিদার দ্বারা আপনা হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইত। মূল্য নিয়ন্ত্রণের দিকে না যাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের উচিত কলিকাতা শহরে অনেকগুলি সরকারী খাদ্যশস্যের দোকান খুলিয়া দেওয়া যেখান হইতে বাজার দর হইতে অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হইত, পাশাপাশি ব্যক্তিগত খোলাবাজারী ব্যবসা অবশ্যই থাকিত। সরকারী প্রতিযোগিতার চাপে খোলাবাজারের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। খাদ্যশস্যের উপর হইতে মূল্যনিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়ার পর হইতেই চাউলের মূল্য মণ প্রতি প্রায় তিন চার টাকার মত কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে জোতদারদের সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্যই যেন মূল্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছিল এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণের সুযোগে এই কয়দিনে তাহারা প্রচুর লাভ করিয়া লইয়াছে।

বাংলা দেশে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে প্রহসন চলিতেছে তাহার তুলনা ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনও প্রদেশে দেখা যায় না। সুতরাং স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে যে কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষের খাদ্যশস্যের নীতি নির্দ্ধারণ বিষয়ে কোনও যোগকারসাজি আছে, এ বিষয়ে জনসাধারণ কিছুই জানিতে পারে না। তাই পূর্ণভাবে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, কারণ খাদ্যশস্য বণ্টননীতির বেচাল পশ্চিম বাংলায় গতানুগতিক হইয়া উঠিয়াছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের চাউলের ঘাটতি সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছেন, তথাপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী বড় বড় চাষীদের নিকট হইতে ধান্য সংগ্রহের কোনও প্রকার চেষ্টা করেন নি, বরং সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। ধানের মিল-গুলির নিকট হইতেও বাধ্যতামূলক ভাবে চাউল সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল, কিন্তু কংগ্রেসী সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন যে পশ্চিম বাংলার খাদ্যশস্যনীতির পিছনে আছে বড় নীতি, অর্থাৎ রাজনীতি। গ্রামে বড় বড় জোতদার এবং অন্যান্য ক্ষুদে জমিদাররা। (জমিদারী প্রথা বিলোপ হইলেও এখনও বহু ক্ষুদে জমিদার আছে) কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর রাজনৈতিক চাপ আনিয়া ফেলিয়াছে, যাহার ফলে কংগ্রেসী সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে ধান্য সংগ্রহ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সাহস পান নি। এই অবস্থার জন্য, কংগ্রেসী সরকার প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হইলেও পরোক্ষভাবে অন্ততঃ দায়ী। মিল মালিকরা এবং বড় বড় জোতদারেরা সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীবৃন্দের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যাহাতে বাধ্যতামূলক ভাবে চাউল সংগ্রহ করা না হয়। কর্ম্মচারীবৃন্দের উপদেশ দ্বারা মন্ত্রী-মণ্ডলী প্রভাবান্বিত হইয়াছেন এবং তাহার ফলে শুধু তাহারাই দুর্নামের ভাগী হন নাই—জনসাধারণও অপরিমেয় দুর্দ্দশার ভোগী হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের দুর্ভাগ্য যে খাদ্যের নামে তাহাদের চালমিশ্রিত কাঁকর খাইতে হইয়াছে, অন্যান্য স্বাধীন দেশ হইলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিত। পশ্চিম বাংলার জোতদার ও সরকারী আমলাতন্ত্র তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর যে যোগকারসাজি আছে তাহা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে। দিল্লী হইতে কংগ্রেসী বড় কর্ত্তারা পশ্চিম বাংলার কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে পারেন যাহাতে জোতদার আড়তদার ও কংগ্রেসী আতাঁৎ ভাঙিয়া যায়। এ আতাঁৎ অবশ্য একেবারে ভাঙিয়া যাইতে পারে না, কারণ গ্রামগুলিকে ভাঙিয়াই কংগ্রেস করিয়া খাইতেছে এবং এই কারণে গ্রামের সংস্থাগুলির উপর, অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের উপর, অর্থাৎ জোতদার আড়তদার মিলমালিক প্রভৃতির উপর কংগ্রেসকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত যে পশ্চিম বাংলার খাদ্যশস্য নীতির দুর্নীতি সম্বন্ধে পূর্ণ অনুসন্ধান করা যাহাতে গোপন তথ্য সকল জনসাধারণের গোচরীভূত হয়।

বর্ত্তমান পুলিস ও দুর্বৃত্তদল

গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহাদের সাহসও অসীম—পুলিস-শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়াই তাহারা তাহাদের দল পুষ্ট করিতেছে। ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত কাঁটাডাঙ্গা গ্রামে যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, দুঃসাহসিকতার দিক হইতে তাহার তুলনা বিরল। ডাকাতেরা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তথাপি গ্রামবাসীদের চেষ্টায় কয়েকজন ধরাও পড়িয়াছে। গুলীর আঘাতে যে যুবকটি প্রাণ দিয়াছে, তাহার বীরোচিত আত্মত্যাগ প্রশংসনীয়। শুনা যাইতেছে, এই অঞ্চলে আরও কয়েকবার ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, কাঁথি, বহরমপুর, ২৪-পরগনা জেলার বিভিন্ন স্থান ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতেও অনুরূপ ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এইভাবে ডাকাতি চলিতে থাকিলে বিবিধ দুর্গতিতে লাঞ্ছিত মানুষের জীবন যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, তাহারা যে প্রতি মুহূর্ত্তেই ধন-প্রাণ লইয়া বিপন্ন হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কেন এমন হয়। খাদ্যাভাব বা অন্য অভাবের তাড়নাই কি ইহার মূল কথা? কিন্তু তাহাদের আচরণে তাহা মনে করিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দল গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা তাহাদের পেশা।

কারণ যাহাই হউক, ডাকাতেরা তাহাদের তাণ্ডবে শহর ও পল্লী-জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, আর তাহার দ্রুত সার্থক প্রতিকারের কিছু ব্যবস্থা হইবে না—ইহাই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই অরাজক রাজ্যে বাস করিতেছে ইহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শহরে ও মফঃস্বলে পুলিস রহিয়াছে—পুলিস-দপ্তরও আছে। পুলিসের দক্ষতা ও কার্য্যকারিতা বজায় রাখার জন্য অর্থব্যয়েও কোন

কার্পণ্য করা হয় বলিয়া আমরা জানি না। রাজ্যের আয়তনের তুলনায় পুলিসের সংখ্যা অপ্রচুর, এ অভিযোগও বোধ হয় করা চলে না। তবে রাজ্যের সর্ব্বত্র দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য এত প্রবল ও দুঃসাহসিক হইয়া উঠে কি করিয়া? আমরা এখানে শুধু ডাকাতির কথাই বলিলাম। কিন্তু যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারাই জানেন যে, শুধু ডাকাতি নহে, অন্যান্য বহুবিধ অপরাধের তাণ্ডবও অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, পুলিস তাহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতেছে না। পুলিসের যে তৎপরতা, দৃঢ়তা ও সতর্কতা থাকিলে দুর্বৃত্তরা অস্বস্তি অনুভব করে, দমিত হইয়া থাকে, পুলিসের মধ্যে তাহার অভাব দেখা দিয়াছে? কিংবা পুলিসী ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা বা ত্রুটি কোথায়, দুর্বৃত্তেরা তাহার সন্ধান পাইয়াই দুঃসাহসিক ও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে?

থানা প্রায় সর্ব্বত্রই আছে—পুলিস চলাচলেরও কমতি নাই। তবে কেন এরূপ হয়? আগেই বা হইত না কেন? তবে কি বুঝিতে হইবে, পুলিসী-ব্যবস্থার মধ্যেই কোথাও গলদ আছে? গলদ যেখানেই থাকুক, যে কোন সভ্য রাজ্যের পক্ষেই এ অবস্থা অসহনীয়। সরকারকে বৃহত্তর বিপত্তি সৃষ্টির পূর্ব্বেই এ অবস্থা প্রতিকারে সচেষ্ট হইতে হইবে।

রেল বিভাগে দুর্নীতি

সর্ব্বস্তরে দুর্নীতি কত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে তাহা রেলপথে চাউল ও সিমেণ্ট চুরির ব্যাপারেই বুঝা যাইতেছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছে, উত্তর-পূর্ব্ব রেলপথে। ওয়াগনের তালা ও সীল ঠিকই ছিল, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মাল ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের পুলিস বিষয়টির তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা সন্দেহ করেন, শিলিগুড়ি ষ্টেশনে কোন কর্ম্মচারীর যোগসাজসে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। যথাযথ ভাবে চালানের রসিদ ইস্যু করিয়া ওয়াগন হইতে কতক মাল সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ির জনৈক টালি-ক্লার্ককে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছে।

রেলপথে মাল চুরির অভিযোগ নূতন নয়, কিন্তু আজ উহা এত ব্যাপক ও গভীর হইয়া পড়িতেছে যে, রেল কর্তৃপক্ষই ইহার প্রতিকারের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। রেলপথে মাল পাঠাইয়া উহা গন্তব্য স্থলে পৌছানো সম্পর্কে প্রেরকগণ যদি নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারেন, তাহা হইলে সমগ্র ব্যবস্থাই যে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। আস্থা নষ্ট হইলে রেলপথে মাল পরিবহনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে, ক্ষতিপূরণের ধাক্কা সামলাইতেও প্রচুর টাকা বাহির হইয়া যাইবে। দুই শত, তিন শত বা ততোধিক মাইলের দূরত্বে আজ-কাল লরী বা ট্রাকযোগে বহু মাল প্রেরিত হইয়া থাকে। জনপথের সহিত রেলপথের এই প্রতিযোগিতা ইতিপূর্ব্বেই রেলপথের সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার উপর লরী, ভ্যান বা ট্রাকে মাল চলাচল যদি অধিক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হইতে থাকে, তবে রেলপথ তাঁহাদের মাল প্রেরণ বাবদ আয় বৃদ্ধি করিবেন কিরূপে? কিন্তু এত কথা যাহারা চুরি করে তাহারা ভাবিয়া দেখে না। ভাবিয়া দেখিলে, সমাজ-জীবনে এতটা দুর্নীতি প্রবেশ করিত না। অপরাধীর কঠোর দণ্ড হয়ত হইবে, কিন্তু তাহাতে কল্যাণ কি হইবে? বরং দেখা গিয়াছে, দণ্ডিতের সংখ্যানুপাতে অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। মানুষের মনে নীতি-বোধ জাগ্রত করিবার দুরূহ সাধনা আজ সরকারকেই লইতে হইবে। কিন্তু সরকারের বোধোদয় আজ বার বৎসরেও হইল না।

পোশাক বৈষম্যে হাসপাতাল

রোগী বা রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী আজকাল হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়া বা তাহার কোন চিকিৎসার যে ব্যবস্থা হয় না—এতদিন পরে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়া-ছেন, এজন্য উপযুক্ত তদ্বির এবং আভিজাত্যপূর্ণ পোশাকের প্রয়োজন হয়। তাঁহার এই নির্ম্মম সত্য উক্তির ফলে কিছু যে ফল হইবে এ বিশ্বাস যদিও আমরা রাখি না, তবু আমরা উল্লসিত হইব তাঁহার মুখ হইতে এই সত্য বাহির হইয়াছে বলিয়া। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর এই উক্তির পরে কিছু পরিবর্ত্তন হইবে এ ভরসা আমরা যে রাখি না, তাহার কারণও সুস্পষ্ট। দেশের কোন্ ক্ষেত্রে কি হইতেছে, কোথায় কি গলদ রহিয়াছে, তাহা আমাদের মন্ত্রী মহাশয়েরা জানেন না—তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর সে অপবাদ আমরা আরোপ করিতে চাহি না, তবু যে কোন প্রতিকার হয় না তাহার কারণ, হয় তাঁহারা সে সম্পর্কে উদাসীন, না হয় কোন কারণে অনিচ্ছুক অথবা প্রতিকার করিবার মত শক্তি তাঁহাদের নাই। কারণ যাহাই হউক, অবস্থার যে কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না—তাহা অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্য। হাসপাতালের এ সব ব্যাপারও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বা অপর কোন মন্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এইবার রেলমন্ত্রীর মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। রেলমন্ত্রী জানেন না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই, তবু বলিতে পারি, শুধু হাসপাতালে নহে, তদ্বির ও আভিজাত্যপূর্ণ পোশাকের মাহাত্ম্যে সকল বিভাগই মুগ্ধ। বিশেষ করিয়া সাহেবী পোশাক হইলে ত কথাই নাই! রেল বিভাগও তাহার ব্যতিক্রম নয়। ইহাও তাঁহার অজ্ঞাত নয়—অন্ততঃ আমরা তাহাই বিশ্বাস করি। জানেন যখন, তখন মুখে তাহা ব্যক্ত করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিবেন না, এ আশা আমরা করিব কি?

বর্ত্তমান শিক্ষক-সমাজ

শিক্ষক-সমাজের অভাব-অভিযোগ লইয়া বর্ত্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে, তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু কথা আমাদের সেখানে নয়। সেকালে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে আদর্শগত সম্বন্ধ ছিল তাহা আজকের দিনে নানা কারণে বিপর্যস্ত। সে আদর্শ আজ ফিরাইয়া আনাও চলে না। যেকালে বিদ্যাদানের সঙ্গে জীবিকার্জ্জনের সম্পর্ক ছিল যৎসামান্য, সেকালের শিক্ষানীতির আদর্শ বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কটের দিনে তা অচল। তাই

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবন সম্ভব না হয় নাই হইল, আধুনিক যুগের উপযোগী আচরণবিধি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কথা সেইখানে।

শিক্ষকতা যখন জীবিকার্জ্জনের উপায় তখন জীবনধারণের প্রয়োজন পূরণের জন্য শিক্ষকগণ সচেষ্ট হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। শিক্ষকগণের আর্থিক অবস্থায় কিছুটা সচ্ছলতা আনিয়া দেওয়ার যে প্রয়োজন ইহা কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন।

কিন্তু শিক্ষকগণ ইহার জন্য যে আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করিতেছেন তাহা শিক্ষাব্রতীর আদর্শের পরিপোষক হইতেছে না। যুগ পরিবর্ত্তনে অনেক-কিছুর বদল হইলেও, শিক্ষাদানকে বিক্রয়-ক্রয়-ব্যবসায় গণ্য করা যায় না—করা উচিতও নয়। কল-কারখানায় উন্নত শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলিতেও শিক্ষকের বিশিষ্ট মর্য্যাদা স্বীকৃত এবং সে মর্য্যাদা নিতান্ত টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে নয়। অবশ্য সে সব দেশে শিক্ষকগণ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন। সে তুলনা করিয়া লাভ নাই। আমাদের দারিদ্র্য দেশব্যাপী, মাথাপিছু গড়পড়তা আয় অতি সামান্য, কাজেই শিক্ষকগণকেও কম বেশী আর্থিক দুর্গতির মধ্যে কাটাইতে হয়, ইহা বিচিত্র নয়। এই অবস্থার প্রতিকার কামনা করাও স্বাভাবিক। কিন্তু প্রতিকার কেবল শিক্ষকদেরই প্রাপ্য নয়, সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা উচিত। তা ছাড়া, অন্যান্য অনেক বৃত্তিজীবীর তুলনায় শিক্ষকগণের সামাজিক দায়িত্ব অনেক বেশী, তাঁহাদের চিন্তাশক্তিও অনেক অংশে সুপরিণত। কাজেই শিক্ষকগণের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার ও আচরণ যুক্তিনিষ্ঠ হইবে, ইহা আশা করা অসঙ্গত নয়। জীবিকার তাড়না কষ্টদায়ক, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু সমাজে শিক্ষার স্থান এরূপ যে শিক্ষক শুধুমাত্র জীবিকা-সর্ব্বস্ব হইতে পারেন না। তিনি একাধারে শিক্ষাজীবী এবং শিক্ষাব্রতীও। ডঃ শ্রীমালী শিক্ষক-সমাজের জন্য একটি 'নৈতিক আচরণবিধি' রচনা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শ বর্ত্তমান যুগের শিক্ষায়তনে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারা অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন ও প্রয়াসের সঙ্গে মিল রাখিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে আচার-আচরণের নবীন ও শোভন বিন্যাসের জরুরী দরকার আছে। কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় শিক্ষক ও ছাত্র সকলেরই নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় মানবে" এই নীতিবাক্য অন্য কাহারও বেলায় না হউক, শিক্ষকদের ইহা সর্ব্বদাই পালন করা উচিত। একথা তাঁহাদের ভুলিলে চলিবে না, ছাত্রদের আদর্শ তাঁহারাই। কিন্তু কালপ্রভাবে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে।

দলীয় রাজনীতি, দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য বিক্ষোভ ধর্ম্মঘট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-সংগ্রামমূলক উপায় শিক্ষাক্ষেত্রের সকল স্তরে আজ জাঁকিয়া বসিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দল ভারী করিয়া সুবিধা আদায়ের জন্য শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছেন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিবার উদ্যোগে শিক্ষকগণ ছাত্রদের সহায় হইতেছেন, ছাত্রেরা শিক্ষকদেরও। ইহার দৃষ্টান্ত কেবল কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কলিকাতার বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সারা পশ্চিমবাংলায় তাহার নজীর আছে।

এই বিষময় পরিণাম এড়াইতে হইলে, শিক্ষকগণের বর্ত্তমান জীবিকা-সর্ব্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জীবিকার দাবি অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহাকে বড় করিয়া শিক্ষাব্রতীর মুখ্য আদর্শকে হেয় করিলে সমস্ত শিক্ষাযজ্ঞ পণ্ড হইবে। বর্ত্তমানে তাহাই হইতে চলিয়াছে।

প্লাটফরমবিহীন রেলওয়ে ষ্টেশন

রেলওয়ে ষ্টেশনে উপযুক্ত প্লাটফরম না থাকিলে যাত্রীদের যে অপরিসীম দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় তাহা এ দেশের ছোট ছোট রেল ষ্টেশনের অবস্থার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা ভাল ভাবেই অবগত আছেন। বলাবাহুল্য, প্লাটফরম না থাকিলে যাত্রীদিগকে একদিকে যেমন রেলের কামরায় উঠিবার সময় রেলের পা-দানি ধরিয়া মই-এ উঠিবার মত কসরৎ করিতে হয়, অপরদিকে তেমনি নামিবার সময় প্রায় গাছের উপর হইতে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িবার মত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। বৃদ্ধ, রুগ্ন, বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে এই রকম ব্যবস্থা যে কতখানি বিপজ্জনক তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই অবস্থায় যে যাত্রীদের মৃত্যুও ঘটিতে পারে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বনগ্রাম লাইনের 'নব বারাকপুর' একটি হল্ট ষ্টেশন। এখানকার যাত্রীসংখ্যা অসংখ্য। এই প্রবল বর্ষায় তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। প্লাটফরমের কথা উঠিলেই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কৌশলে এড়াইয়া যান, কিংবা বলেন, উহা এখনও ষ্টেশনের মর্য্যাদা পায় নাই। শুনিয়াছি, তাঁহারা যাত্রীসংখ্যা দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু নব বারাকপুরের যাত্রীসংখ্যা দেখিলে, সে প্রশ্নই উঠে না। কারণ ঐরূপ সংখ্যায় যাত্রীর উঠা-নামা এক 'দমদম জংসন' ছাড়া আর কোথাও নাই। তাই এইরূপ প্লাটফরমবিহীন ষ্টেশন রাখার কোন যুক্তিই আমরা দেখিতে পাই না।

বর্দ্ধমান জেলার নাদনঘাট হইতে কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, গত ৫ই জুন শুক্রবার নাদনঘাট-নওয়াপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রীকিরণচন্দ্র গড়াই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ভ্রাতৃবধূ প্লাটফরমবিহীন সমুদ্রগড় রেল ষ্টেশনে ৩৩১ নং আপ গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন হইতে নামিবার সময় পড়িয়া যান এবং অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমরা জানি না, স্বাধীন ভারতের রেল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে জনৈক ভারতীয় নাগরিকের এইরূপ শোচনীয় জীবননাশের জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা চলিতে পারে কি না। যাঁহারা উপযুক্ত মাশুল দিয়া রেলে চলাফেরা করিবেন, তাঁহারা

ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠা-নামার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চয়ই দাবি করিতে পারেন। অথচ ভারতীয় রেলপথের বহু ষ্টেশনই প্লাটফরমবিহীন। সাধারণের অর্থ লইয়া, তাহাদের সুখ-সুবিধার প্রতি উদাসীন থাকিবেন, কর্ত্তৃপক্ষের এই উপেক্ষা অমার্জ্জনীয়।

দলবদ্ধ ভাবে স্ত্রীলোকের গুণ্ডামী

চুরি, ডাকাতি, খুন, পকেটমার প্রভৃতি কাজে এতকাল পুরুষরাই সক্রিয় ছিল, বর্ত্তমানে দেখিতেছি মেয়েরাও একাজে হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছে। কাটোয়ার রেল পুলিস সম্প্রতি রেলের মালপত্র চুরি করার অপরাধে একদল স্ত্রীলোককে অভিযুক্ত করিয়াছে। ইহারা দল বাঁধিয়া এইরূপ দুষ্কার্য্য প্রায়ই করিত। একটি নারীর গৃহে কুখ্যাত দলের আড্ডা আছে, ইহাও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, এই দলের সহিত রেল রক্ষী-বাহিনীর কয়েকজন এবং জেলা পুলিসের একটি কনষ্টেবলের যোগ রহিয়াছে। ইহা ধৃত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তিতেই জানা গিয়াছে। কিছুদিন হইতে বংশবাটি এলাকা হইতে প্রায়ই রেলের মাল চুরি যাইত। আজ তাহারা ধরা পড়ায় অনেক গুপ্ত তথ্যই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

যে দুর্নীতি আজ ব্যাপক ভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কয়েকজনের দণ্ডদানেই সংশোধিত হইবে, ইহা আশা করা যায় না। চোরকে শাস্তি দিলেই চুরির সংখ্যা কমে না, ইহার জন্য যে সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন, আমরা সে দিক দিয়া কতখানি কি করিতেছি ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশ স্বাধীন হইবার পর যে সমাজ-উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল, তাহা হয় নাই। বিবেকানন্দ যে 'মানুষ তৈরী'র কথা বলিয়াছিলেন, স্বাধীন রাষ্ট্র সেই 'মানুষ তৈরী'র কথা আদৌ চিন্তা করেন নাই। শিক্ষার বোঝা চাপাইলেই 'চরিত্র' গঠিত হয় না। যাহার অভাবে কেবল অশিক্ষিতদের মধ্যেই নয়, শিক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতরেও এই দুর্নীতি ব্যাধির আকারে দেখা দিয়াছে। আজ রাষ্ট্রের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য সমাজ-সংগঠন। নহিলে যাহা এতকাল পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা স্ত্রীলোকের মধ্যেও সংক্রামিত হইতে চলিয়াছে। আজ যাহা ক্ষুদ্র আকারে দেখা দিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিতে গেলে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবন কলুষিত হইবে। আমাদের আজ এই দিক দিয়াই চিন্তা করিতে হইবে।

সমাজ-চ্যুতা নারীকে সমাজে আনিবার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের নর-নারীকে সমাজের পক্ষে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য উত্তর-প্রদেশ সরকার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ নারী কয়েদী-দের বিবাহের মাধ্যমে সমাজ-জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

কোন মানুষই চোর-ডাকাত, খুনী বা জালিয়াৎ হইয়া জন্মায় না, প্রতিকূল অবস্থা, আবেষ্টনী ও নির্ব্বান্ধব অসহায়তাই যে স্বাভাবিক মানুষকে পাপের পথে ঠেলিয়া দেয়, সুযোগ-সুবিধা পাইলে একদিনের ঘৃণ্য অপরাধীও যে আর একদিন যে কোন ভাল মানুষের মতই ভাল হইয়া উঠিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সোভিয়েট সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন, তখন তাঁহারা পেশাদার পতিতা ও চোর-ডাকাত শ্রেণীর নারীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিবাহকেই একমাত্র পন্থারূপে গণ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ঘর-সংসার ও জীবিকার উপায় করিয়া দিয়াই তাহাদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী দশ বৎসরের হিসাবে তাঁহারা দেখিয়াছেন, এইসব নারীর মধ্যে অনেকে মাতা ও গৃহিণীরূপে অন্য কোন নারীর চেয়েই কম সাধুত্ব, নৈপুণ্য ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেন নাই। ত্রিশ বৎসর পরের খতিয়ানে দেখা গিয়াছে, এইসব অধঃপতিতা নারীর সন্তানরাও সমাজে গণ্যমান্য ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক ও লেখক হইয়াছে। ইহা হইতে এই সত্যই হাতে-কলমে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অপরাধপ্রবণতা প্রতিকূল সমাজ ব্যবস্থার ফল এবং সমাজ-কাঠামোর পরিবর্ত্তন ও ব্যক্তিজীবনের নূতন মূল্যায়ন করা হইলে অপরাধী আর অপরাধী থাকে না।

যাহারা সুশিক্ষা পায় না, শুচি-পরিবেশে বাড়িয়া উঠিতে পারে না, যাহাদের অন্ন-বস্ত্র ও আশ্রয় দিবার কেহ নাই, তাহারাই যে অবস্থাবিপাকে চোর, ডাকাত, দুষ্কৃতকারী হইয়া উপেক্ষাশীল সমাজের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য এই কাজ করিয়া থাকে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। আমাদের দেশে শিক্ষিত সজ্জনই অনুকূল পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গাঁজিয়া মজিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে—ইহা ত চোখের উপরই দেখিতেছি।

সমস্যাটা নারী ও পুরুষের পক্ষে মূলতঃ এক হইলেও, নারীদের সমস্যার আর একটা দিক আছে যা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। সমাজের কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে, পুরুষ শত অন্যায় করিয়াও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু ভারতীয় সমাজে নারীর পদস্খলনের আর ক্ষমা নাই। নৈতিক ব্যভিচার হউক, চুরি-খুনখারাপি হউক, যে-কোন রকমে একবার নারী যদি চলতি জীবনধারা হইতে ছিটকাইয়া বাহিরে পড়েন, তাহা হইলে সমাজ তাহাকে আর ফিরিয়া আসিবার সুযোগ দেয় না। ফিরিয়া আসিবার এই একটিমাত্র দিক আছে, নারী কয়েদীদের বিবাহ দিয়া তাহাদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা এবং বৃত্তিভ্রষ্ট পতিতাদের সমাজসম্মত জীবিকার উপায় বিধান। সারা ভারতে ইহা একটি বৃহৎ সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান করিতে উত্তরপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট যে আগাইয়া আসিয়াছেন ইহা প্রশংসার কথা। তাঁহারা এই পথে সাফল্যলাভ করিলে, আশা করি এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য রাজ্যেও অনুসৃত হইবে। শুনা যাইতেছে, নারী কয়েদীরাই নিজেই তাহাদের পুনর্ব্বসতির জন্য বিবাহের পথকে প্রশস্ততম বলিয়াছে। ঘরের আহ্বান, সংসারের আকর্ষণ নারীর জীবনের কত বড় অংশ, তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝা যাইতেছে।

আবার মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ

হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগের আর অন্ত নাই। এক মেডিক্যাল কলেজ সম্বন্ধেই যতগুলি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তাহার ফাইলগুলি একত্র করিলে একটি ছোট-খাট পাহাড় হইয়া উঠিবে। অথচ, কোন প্রতিকারও হইতেছে না। এ বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তাগণ সম্পূর্ণ উদাসীন। ইদানীং পর পর দুইটি সংবাদ যাহা বাহির হইয়াছে তাহা শুধু নিন্দনীয়ই নয়, অমার্জ্জনীয়। একজন রোগিনী ইডেন হাসপাতালে, না মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তিযোগ্য ইহাই স্থির করিবার জন্য দুই হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স দৌড়াদৌড়ি করিতেই রোগিনী মরিয়া গেল। চমৎকার! মৃত্যু ইঁহাদের নিকট ছেলেখেলা! আর একজন বাসের ধাক্কায় আহত-ব্যক্তিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধ সত্ত্বেও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রাখা হইল না বলিয়া আত্মীয়গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হয় এবং সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

এই দুইটিই অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। অভিযোগ সত্য হইলে, তবে এ ধারণা না করিয়া পারা যায় না যে, মেডিক্যাল কলেজের রোগীদের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শুধু বিবেচনা-শক্তির নহে, হৃদয় নামক বস্তুটিরও একান্ত অভাব রহিয়াছে। সেরূপ লোক রোগীর চিকিৎসার মত পবিত্র ও গুরু দায়িত্ব পালনে কেন, সাধারণ লোক-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। জানি না, গলদ কোথায়? অবস্থাগতিকে বুঝিতে হইতেছে, সেখানে পরিচালকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। সরকারী মেডিক্যাল কলেজের এককালীন সুনাম যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় উহার অখ্যাতি যাহাতে না রটে, সেদিক দিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য-দপ্তরের কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? অবস্থার প্রতিকারের দায়িত্ব কাহার কতখানি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাহা খতাইয়া দেখুন। দায়িত্ব যাঁহাদেরই হউক তাঁহাদেরই বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি যে, অবস্থা নিতাই দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। সরকারকে ইহা স্মরণ করিতে বলি।

মূর্ত্তি অপসারণের কাজে সরকার

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকার অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন রাস্তার বিদেশী নাম পরিবর্ত্তনে এবং স্মরণীয় বিদেশী মূর্ত্তি-গুলির অপসারণে। জানি না ইহার আশু প্রয়োজন কি হইয়া পড়িল? স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে এই অস্থির এক যুগ ধরিয়া এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে যাহাতে আশঙ্কা হয়, ঘৃণা করিতে করিতে আমরাও শেষে কালা-পাহাড়ী মনোবৃত্তি না লাভ করিয়া বসি। স্বাধীন জাতি পরবশতার কলঙ্ক-চিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিতে চাহিবে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু অধীর, অশোভন আগ্রহে, স্থূল হস্তাবলেপে সে ইতিহাসকেও লোপ করিয়া দিতে চাহিবে কেন? আমাদের যাঁহারা স্মরণীয়, বরণীয়—তাঁহারা বিদেশী হইলেও, তাঁহাদের যোগ্য মর্য্যাদা আমরা দিব। তাঁহাদের স্মৃতি ও কীর্ত্তিকে চিরন্তন করিয়া রাখার মধ্যে কি কোন গৌরবই নাই? আর কিছু নাই হউক, একটা ঐতিহাসিক মূল্যও ত ইহার আছে। কিন্তু আমরা স্বাধীনতার গৌরবে মুড়ি-মিছরির দর এক করিয়া দিয়াছি। দেশাত্মবোধের বিকৃত ব্যাখ্যায় ক্লাইভ ও হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিশ ও ক্যানিং, রিপন ও বেন্টিঙ্ক একাকার হইয়া গিয়াছেন।

এত কথা উঠিল, পর পর কয়েকটি মূর্ত্তি অপসারণের জয়োল্লাসে। বেন্টিঙ্কের মূর্ত্তি অপসারিত হইতে না হইতে, কলিকাতার রেড রোড ও ডাফরিণ রোডের সংযোগস্থলে অবস্থিত ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড রিপনের মর্ম্মরমূর্ত্তি সরাইয়া লওয়া হইতেছে।

হলওয়েলের মনুমেন্টটি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। কারণ অন্ধকূপের ঐ স্মৃতিটাই ছিল মিথ্যা। দিল্লীতে সিপাহী-বিদ্রোহ যাঁহারা দলন করেন, সেই বিদেশী সেনাপতিদের মূর্ত্তি সরাইয়া লওয়ায় কেহই প্রতিবাদ করিবে না—কেন না, ঐ মূর্ত্তি-গুলি ছিল শাসক-জাতির ঔদ্ধত্য ও দম্ভের প্রতীক। কিন্তু কলিকাতার বিধানসভার প্রাঙ্গণ হইতে লর্ড বেন্টিঙ্কের মূর্ত্তি অপসারণ কোন মতেই অনুমোদন করা যায় না। লর্ড রিপনই বা কোন দোষে স্থানভ্রষ্ট হইলেন? এই দুই বিদেশী শাসকের প্রথম জন এ দেশের বহু কল্যাণকর আইনের প্রবর্ত্তক। সতীদাহ-প্রথার অবসান ঘটে তাঁহার সময়েই। তাঁহার সময়েই ভারতীয় সিপাহী-দের মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছিল। বেন্টিঙ্কের আমলেই কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর, খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হইলেও এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সংস্থাগুলির সূত্রপাত লর্ড রিপনের শাসনকালে। শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া ইলবার্ট বিল তিনিই পাস করাইয়া লন—এই বিলে বিচার-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃতি পায়।

জানি না, এইরূপ দুই-চারিটা মূর্ত্তি মহানগরীর প্রকাশ্য স্থানে থাকিলে, স্বাধীন রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি হয় কি না। কিন্তু আমরা জানি, ইহাও একরূপ দম্ভ। স্বাধীনতার দম্ভ! কিছুকাল আগেও আমরা এইভাবেই জেমস প্রিন্সেপের অমর্য্যাদা করিয়াছি, তাঁহার নামাঙ্কিত রাস্তাটিও নামান্তরিত হইয়াছে। বার বার সেই একই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে—কিন্তু কেন? প্রিন্সেপ বিদেশী ছিলেন, শুধু কি এই অপরাধে? অথচ, এই প্রিন্সেপই অশোকস্তম্ভের লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রিন্সেপ আমাদের ইতিহাসের একটা বিস্মৃত অংশ উদ্ধার করিয়া আমাদেরই হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক নামগুলি আমাদের কর্ত্তাদের স্মরণ করিতে বলি। আর বলি, দুই-একটা নাম মুছিয়া ফেলিয়া বা মূর্ত্তি অপসারণ করিয়াই ইতিহাসের একটি অধ্যায় মুছিয়া ফেলা যায় না। জাতির পরিচয় তাহার বর্ত্তমানের সাফল্যে, ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে। অতীতকে অস্বীকার করিলেই সে মিথ্যা হইয়া যায় না। এই জ্ঞান আছে বলিয়াই ইউরোপীয়েরা

অতীতের লজ্জাকেও সহিতে পারিয়াছে। মহৎ যদি নাও হইতে পারি, মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করিবার উদারতা যেন আমাদের থাকে।

অবশ্য নাম মুছিয়া ফেলার বাতিক অন্য দেশেও আছে। সেণ্ট-পীটার্সবার্গ নাম মুছিয়া নূতন নামকরণ হইয়াছিল পেট্রোগার্ড। আবার সেই নামেরও বদল হইয়া, হইয়াছে লেনিনগ্রাড। ইহা দুই দিনের দাপট ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এ লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়া আর লাভ কি? কাজ করিবার ত অনেক কিছুই আছে—কাজ যেখানে অনেক বাকী, সেখানে আগের কাজ আগে না সারিয়া আমাদের সরকার হঠাৎ মূর্ত্তিগুলি লইয়া পড়িলেন কেন? অপসারণের যোগ্য আরও কত বস্তুই ত আছে—কত অন্যায়, কত অন্ধ সংস্কার, কত যুক্তিহীন প্রথা—আগে সেইগুলিরই অপসারণের প্রয়োজন নয় কি?

লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধার

কলিকাতার পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে ৪৫ বর্গমাইল জুড়িয়া এক বিরাট এলাকা আছে যাহাকে লবণ হ্রদ নামে অভিহিত করা হয়। এই হ্রদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর লবণ হ্রদ ও দক্ষিণ লবণ হ্রদ। মাণিকতলার নিকট কলিকাতা কর্পোরেশনের যে নূতন খাল খনন করা হইয়াছে তাহারই নিকটবর্ত্তী এলাকায় উত্তর লবণ হ্রদের অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪ বর্গমাইল এলাকাকে পুনরুদ্ধার (reclamation) করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করিয়াছেন। এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পৃথিবীব্যাপী টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন। পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, এই এলাকা লোকবসতির জন্য ব্যবহৃত হইবে। এই পরিকল্পনাটি শেষ করিতে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগিবে এবং ইহার জন্য ১৬ কোটি টাকা খরচ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্তব্য হইতেছে যে, কলিকাতা শহর তাহার দুই পাশের শিল্পাঞ্চল দ্বারা নিষ্পেষিত, সুতরাং যে দ্রুতহারে লোকবসতি বৃদ্ধি পাইতেছে সেই তুলনায় শহরের এলাকা বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহার ফলে লোকবসতির একর প্রতি ঘনত্ব প্রায় পাঁচশত হইয়াছে। এই কারণে কলিকাতার জনস্বাস্থ্য বর্ত্তমানে বিপদাপন্ন, কলেরা প্রভৃতি মহামারী ব্যতীত ক্যান্সার, যক্ষ্মা প্রভৃতি মহামারী দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং কলিকাতার ঘনবসতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়ার আশু প্রয়োজন আছে। কলিকাতার বর্ত্তমান এলাকা প্রায় ৩৮ বর্গমাইল এবং হুগলী নদী, শিল্পাঞ্চল, লবণ হ্রদ প্রভৃতির জন্য পার্শ্বদিকে কলিকাতার বিস্তৃতি আর সম্ভবপর হইতেছে না। লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধারের দ্বারা কলিকাতার বিস্তৃতি পার্শ্বদিকে সম্ভবপর হইবে।

লবণ হ্রদ পরিকল্পনাদ্বারা সরকার দুইটি কার্য্য সমাধা করিতে চাহেন। প্রথমতঃ, কলিকাতার বিস্তৃতি এবং দ্বিতীয়তঃ গঙ্গার সুবহনশীলতার বৃদ্ধি। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গা অত্যধিক পলিমাটির দ্বারা বুজিয়া আসিতেছে। এই পলিমাটিকে ক্যানেলের মাধ্যমে চালান দিয়া লবণ হ্রদে আনিয়া ফেলা হইবে এবং তাহাতে হুগলী নদীর পলিমাটির পরিমাণ কমিবে এবং লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধারও সম্ভবপর হইবে। হুগলী নদীর পলিমাটির দ্বারা লবণ হ্রদ ভরাট করিতে প্রায় ৭ কোটি টাকা খরচ হইবে। লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধারের ফলে প্রায় একলক্ষ কাঠা বসতবাটির জন্য পাওয়া যাইবে, এই এলাকায় পার্ক প্রভৃতি থাকিবে।

লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধারের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা বিরুদ্ধতা করিতেছে। তাহাদের অভিমতে তথাকথিত লবণ হ্রদ এলাকায় লবণও নাই, হ্রদও নাই। এই এলাকা বর্ত্তমান স্থলভূমিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, এখানে চাষ-আবাদ হয় এবং বহু মিষ্ট জলের ভেড়ী আছে। এই এলাকার অধিবাসীরা মৎস্য, ধান্য ও শাকসব্জী চাষে নিযুক্ত আছে। এই চাষীদের সংখ্যা প্রায় ৪২,০০০, ইহাদের মধ্যে পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যাও কম নহে। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার সাত শত বাস্তুভিটা আছে। কৃষি-জমির পরিমাণ প্রায় ৪৪,০০০ হাজার বিঘা এবং ইহাতে বৎসরে প্রায় আড়াই লক্ষ মণ ধান্য উৎপাদিত হয়। ইহা ব্যতীত কয়েক হাজার মণ সব্জী তরকারীও উৎপাদিত হয়।

এই এলাকায় পোনামাছ চাষের বহু ভেড়ী আছে, এবং এই ভেড়ীগুলির পরিমাণ প্রায় ৪২,০০০ হাজার বিঘাব্যাপী এবং প্রায় ১০,০০০ হাজার ধীবর মৎস্য-চাষে নিযুক্ত আছে; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী। এই এলাকা হইতে প্রত্যহ প্রায় পাঁচ শত মণ পোনামাছ কলিকাতা শহরের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা হয়। কলিকাতা শহর সম্প্রসারণের জন্য লবণ হ্রদের যে পৌনে চারি বর্গমাইল এলাকাকে পুনরুদ্ধার করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেই এলাকায় পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্ববৃহৎ শীল মৎস্যচাষ ব্যবস্থা আছে।

এই এলাকার পুনরুদ্ধারের ফলে এই বিরাট মৎস্যচাষ ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং কলিকাতার বাজারসমূহে মৎস্য-সরবরাহ ব্যাহত হইবে। প্রায় চারি হাজার ব্যক্তি বাস্তুহারা হইবে এবং ১,২০০ ধীবর শ্রমিক জীবিকাচ্যুত হইবে। এই এলাকার উর্ব্বরতা খুব বেশী, বিঘাপ্রতি ৮ হইতে ১০ মণ করিয়া ধান হয়। ভারত বিভাগের ফলে বাংলাদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষিজমি পাকিস্থান এলাকায় পড়িয়াছে। বাংলাদেশের প্রতি বিঘা কৃষিজমির বহু মূল্য আছে, এমনই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের ফলে বহু পরিমাণ কৃষিজমি নষ্ট হইয়াছে। লবণ হ্রদের প্রস্তাবিত পুনরুদ্ধারের ফলে বছরে প্রায় দেড় লক্ষ মণ আমন ধানের উৎপাদন নষ্ট হইবে। এক কথায় কলিকাতার তথা পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি বিভিন্নভাবে বিপদাপন্ন হইবে যদি লবণ হ্রদ এলাকাকে কলিকাতা শহর সম্প্রসারণের জন্য পুনরুদ্ধার করা হয়।

সুতরাং বিরোধীদিগের মতে লবণ হ্রদ পরিকল্পনা বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা উচিত। কলিকাতার জনবসতি সম্প্রসারণের জন্য টালিগঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, মাণিকতলা প্রভৃতি এলাকায় এখনও বহু জায়গা আছে, প্রথমে সেই সব এলাকাকে উন্নয়ন করিয়া জনবসতিকে সম্প্রসারণ

করা উচিত। যানবাহনের উন্নয়নও বৃদ্ধি করিলে টালিগঞ্জ, বেহালা, যাদবপুর, গড়িয়া পর্য্যন্ত কলিকাতা শহর বিস্তৃতি লাভ করিবে। টালির নালাকে কুল্টি পর্য্যন্ত পুনরায় খনন করা প্রয়োজন এবং বালিগঞ্জ হইতে সোনারপুর পর্য্যন্ত যদি মোটর-রাস্তা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কলিকাতা শহর ঐদিকে বিস্তৃতিলাভ করিবে।

বৃহৎ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিরাট বিরাট পরিকল্পনা এবং বিরাট খরচ বাঞ্ছনীয় নহে, ছোট ছোট পরিকল্পনা কমখরচে গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং ১৬ কোটি টাকার লবণ হ্রদ পরিকল্পনা বর্ত্তমান অবস্থায় স্থগিত রাখা উচিত কিনা সে বিষয়ে চিন্তার অবসর আছে।

আজেরবাইজানে ভারতীয় মন্দির

আজেরবাইজানের সুরাহানিতে একটি ভারতীয় মন্দির আছে। এই স্থানটি এখন রাজধানী বাকুর এক উপকণ্ঠে পরিণত হইয়াছে। তৈলসমৃদ্ধ এই অঞ্চলের আর সব স্থানেরই মত এখানেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে বহুসংখ্যক ডেরিক বা লৌহমঞ্চ। বাকু শহরের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া ধরিয়াছে যেন এক ডেরিকের অরণ্য। উপরোক্ত ভারতীয় মন্দিরটিরও চারদিকে ডেরিক।

মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রথমেই চোখে পড়িবে মন্দিরগাত্রের একটি ফলক। এই প্রাচীন ফলকে আজেরবাইজান ও রুশভাষায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে—স্থাপত্য নিদর্শন: রাষ্ট্রীয় রক্ষণাবেক্ষণের অধীন।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরটি উহার পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। মন্দিরের করাতের মত কাটা কাটা দেয়ালগুলি, প্রকোষ্ঠগুলি, চাতাল, বেদী ইত্যাদি সবই অক্ষত ও অম্লান রহিয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র মন্দিরটির সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রবেশদ্বার, দেয়াল ও প্রকোষ্ঠগুলির সুষ্ঠু মেরামতের কাজই শুধু হয় নাই, প্রস্তরফলককে গুরুমুখী, দেবনাগরী ও আরবী হরফের প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিরও সংস্কার সাধিত হইয়াছে। একখানা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ আছে শিবদের আরাধনার ভাষা—'ওম্ সংইনামা করতপুরাখা নীর আভৈন'। ইহা ছাড়াও খোদিত রহিয়াছে প্রার্থনাকারীদের নাম—সূত্রধর তারাচন্দ্র, সওদাগর লালা বীরসুহ ও মোহনদাস। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন সুপরিচিত। ভারতীয় এই মৎস্যব্যবসায়ী আস্ত্রাখানে বসবাস করিতেন বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে। মন্দিরের জন্য যাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মন্দিরের অভ্যন্তরের বেদী নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিশিখায় উদ্ভাসিত থাকিয়াছে। এই একটানা অগ্নিশিখার গ্যাসের উৎস নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বহুকাল আগে। মন্দিরটি কিন্তু এখনও তেমনই আছে যেমন ছিল ধর্মবিশ্বাসী ঐ ভারতীয়দের সময়ে।

এই সুন্দর ভারতীয় মন্দিরটি ভবিষ্যতেও বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট দেশের অক্ষয় মৈত্রী-বন্ধনের উজ্জ্বল সাক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

নাট্যজগতে বিস্ময়কর রেকর্ড

হলিউড হইতে রয়টার একটি বিস্ময়কর সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিল। 'ড্রাংকার্ড' নামক একখানি নাটক গত ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া সমানে অভিনয় হইয়া আসিতেছে। এই নাটকটি সর্ব্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৩ সনে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত চল্লিশ লক্ষের বেশী নরনারী ঐ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন। নীলি এডওয়ার্ডস নাটকের একজন প্রধান নায়ক। তিনি প্রথম যখন অভিনয় করিতে অবতীর্ণ হ'ন তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪৯ বৎসর। এখন তিনি ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ। তথাপি অটুট উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া সেদিন পর্য্যন্ত অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম অভিনয়কালের জন্য প্রসিদ্ধ এই নাটকের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে। আগামী ১০ই অক্টোবর হইবে ইহার শেষ অভিনয়। তথাপি নাট্যজগতের ইতিহাসে 'ড্রাংকার্ড' চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আর নীলি এডওয়ার্ডস? ছাব্বিশ বৎসর একই নাটকের একই ভূমিকা অভিনয় করিয়া, সেই একই পাঠ, একই অঙ্গভঙ্গি করিয়া আসিতেছেন—এ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

ফিল্ম বণ্টনে নীতি-বৈষম্য

পশ্চিমবঙ্গ আজ সকল দিক দিয়াই বিপন্ন—শিল্প, ব্যবসায় এবং চাকুরি সকল ক্ষেত্রেই সে আজ কৃপালাভে বঞ্চিত। আজ শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্যোগ এবং ক্ষমতা যেন বোম্বাই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। বাংলার এই দুর্ভাগ্যের সবটাই দৈবযোগ নয়, মাঝে মাঝে ইহার পিছনে সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ছায়াও চোখে পড়ে। আর পড়ে বলিয়াই আমাদের এত কথা বলিতে হয়।

কাঁচা ফিল্ম বণ্টনে অব্যবস্থার যে চিত্রটি বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহার ফলে অচিরে একটা প্রতিকার না হইলে, এই মাসেরই শেষের দিকে কলিকাতার ষ্টুডিওগুলির দুয়ারে দুয়ারে কুলুপ পড়িবে। অথচ ১৯৫৭ সনে কন্ট্রোলে আমদানি মালের যে বাঁটোয়ারা হয় সেই অনুসারে কাঁচা ফিল্মের আট ভাগের এক ভাগ কলিকাতার প্রাপ্য। বোম্বাই আঞ্চলিক কমিটির হস্তক্ষেপের ফলেই কলিকাতার বরাতে সেই শিকাও ছিঁড়িতেছে না। আসন্ন সঙ্কটের প্রতি কেন্দ্রীয় ইম্পোর্ট কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাংলার চলচ্চিত্র-প্রযোজকরা দুইটি দাবি পেশ করিয়াছেন: এক, কাঁচা ফিল্ম বণ্টনের অধিকার বোম্বাই আঞ্চলিক কমিটির হাত হইতে কেন্দ্রীয় ইম্পোর্ট কমিটির উপর অর্পণ, দুই, মোট আমদানির শতকরা সাড়ে বারো ভাগ যাহাতে বাংলা পায় সেই ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা। বিশ্বচলচ্চিত্রের

মানচিত্রে ভারত আজ আপনার জন্ত স্থান করিয়া লইয়াছে—প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট বাংলা ছবির পরিচয়পত্র দেখাইয়াই। অথচ কাঁচা ফিল্ম বণ্টন-ব্যবস্থায় আঘাত পড়িয়াছে কলিকাতার উপরেই। সামান্ত ছিটেফোটা যেটুকু বরাদ্দ, তাহাও জোটে না। চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ে নেতৃত্ব একদা ছিল বাংলারই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ব্যবসায় একেবারে মুমূর্ষু দশায় পৌছিয়াছিল। পঞ্চাশের পর সেই ধাক্কা সামলাইয়া বাংলার এই শিল্প সবে মাথা তুলিতে চাহিতেছে, কিন্তু ভাগ্য বাম। ফিল্ম-সরবরাহ ব্যবস্থার একটা সুরাহা না হইলে এই অঞ্চলে বেকার-সমস্যা আরও ভয়াবহ রূপ লইবে। চলচ্চিত্র-নির্ম্মাণ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উৎস। বিদেশী মুদ্রা-অর্জ্জনেও এই শিল্পের ভূমিকা বৃহৎ। অতএব, কাঁচা ফিল্ম আমদানী-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার আরও একটু উদার হইলে দোষ কি ?

বর্দ্ধমান হাসপাতালে নারকীয় পরিবেশ

'বর্দ্ধমান' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি জেলা-বাসীর নিকট প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। হাসপাতালে অধিকাংশ চিকিৎসক সম্বন্ধে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা, রোগীদের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার এবং বিনা অর্থে রোগী-ভর্ত্তি না করার অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি হাসপাতালে এই দুর্নীতির দুষ্ট-চক্রের বিরুদ্ধে খোসবাগান মহল্লার কতিপয় যুবক বিভাগীয় উৰ্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সমগ্র বিষয়টি জানাইলে বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত একটি তদন্ত হয়। গত ১৭ই মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর স্বহস্তে আসিয়া প্রায় চল্লিশটি নির্যাতিত, উপেক্ষিত, দুর্ব্যবহারপ্রাপ্ত রোগীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ শ্রবণ করেন।

হাসপাতালের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ডাক্তারগণের নিজস্ব নার্সিং হোমগুলিতে ব্যবহার করা হয়। সরকারী বেতনভুক ও হাস-পাতালের দায়িত্বপূর্ণ পদের ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন চিকিৎসক শহরের কয়েকটি নার্সিং হোমে গোপন-ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতে-ছেন। ফলে, হাসপাতালের প্রতি তাহাদের কোনরূপ দৃষ্টি নাই, কর্ত্তব্যকর্ম্মে আগ্রহ নাই। কোনরূপে দায়সারা করিয়া হাস-পাতালের কাজ সারিয়া তাহারা অর্থ উপায়ের জন্ত এই নার্সিং হোমগুলিতে দিবারাত্র নিযুক্ত থাকেন। কতিপয় উচ্চপদস্থ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে হাসপাতালের যক্ষ্মা রোগীদের জন্ত যে মুরগীর মাংসের ব্যবস্থা থাকে তাহা লইয়া সুরা ও নারীসহ পান-ভোজনে মত্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।"

এই মর্ম্মান্তিক সংবাদটির প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বাঁকুড়ায় টিচার্স ট্রেণিং কলেজ

বাঁকুড়ার 'মল্লভূম' জানাইতেছেন :

"দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যেরূপ ব্যাপক পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাতে অধিকসংখ্যক ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত শিক্ষা বিভাগের বর্ত্তমান নীতি ও শিক্ষকদের মাহিনার হার ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া শিক্ষকগণ ট্রেণিং লওয়ার জন্ত অধিকতর আগ্রহশীল হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী তাঁহারা ট্রেণিং কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছেন এবং অদূর-ভবিষ্যতে আরও করিবেন। এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, তাহারা কলিকাতা এবং কলিকাতার পাশাপাশি অঞ্চলে যথা—হুগলী, কল্যাণী, বেলুড় প্রভৃতি স্থানে ট্রেণিং কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার বাহিরে উত্তরবঙ্গে দুইটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ফলে, বাঁকুড়া, মেদিনী-পুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শিক্ষকগণকে হয় কলিকাতায় যাইতে হইতেছে, না হয় দার্জ্জিলিং কিংবা জলপাইগুড়ি পর্য্যন্ত ছুটিতে হইতেছে। সাধারণতঃ যাহারা B. T. পড়িতে যান তাঁহারা অধিকাংশই বয়স্ক ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সাংসারিক দায়িত্ব ও আনুসঙ্গিক ঝামেলায় বিব্রত। ফলে তাঁহাদের পক্ষে নিজেদের কর্ম্মস্থান ছাড়িয়া বেশীদিনের জন্তে বাহিরে থাকা কষ্টকর। এই অবস্থায় কলেজগুলি এমনভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত হওয়া উচিত যাহাতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা ইহার সুবিধা পাইতে পারেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, একটি টিচার্স ট্রেণিং কলেজ বাঁকুড়ায় স্থাপন করা হউক যাহাতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এবং অংশতঃ মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার শিক্ষকগণ উপকৃত হইতে পারেন।"

শ্রীরামপুরে বিপজ্জনক পুল

'দামোদর' জানাইতেছেন :

"বর্দ্ধমান শহরের পার্শ্ববর্ত্তী পালা-শ্রীরামপুরে ক্যানেলের উপর যে পুল ও রাস্তা হইতেছে, তাহা খুবই অপ্রশস্ত। পুলটি যেভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ঢাল অত্যন্ত বিপজ্জনক। উক্ত ঢাল হইতে দক্ষিণ মুখে নামিবার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ থাকায় এবং রাস্তার দুই দিকে রেলিং না থাকায় গোগাড়ী সবেগে নামিবার সময় গাছে ধাক্কা অথবা পার্শ্ববর্ত্তী গভীর খাতে পতিত হইবার সম্ভাবনা। রাস্তার কাজের জন্ত রোলার গাড়ীটি আবার পুলের উপর চাপাইয়া রাখায় পুলটি বিভিন্ন স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। এদিকে পুরাতন পুলটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নূতন পুলটি মেরামত হয় নাই। এজন্ত সাধারণের যাতায়াত ও যানবাহন চলাচলের একান্ত অসুবিধা হইতেছে। পুলটি অবিলম্বে মেরামত করিয়া অশ্বত্থ-গাছটি কাটিয়া দিয়া দুই ধারে রেলিং দিবার জন্ত আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

সেতু চাই

'বর্দ্ধমান বাণী'র এই সংবাদটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি প্রয়োজন :

"থানা ফরিদপুর সামীল অর্জ্জুনপুর গ্রামের দক্ষিণে ডি. ভি. সি. ক্যানেল গিয়াছে। গ্রামবাসীদের অধিকাংশ জমিজমা উক্ত ক্যানেলের দক্ষিণে অবস্থিত। ডি. ভি. সি. কর্তৃপক্ষকে বারংবার

আবেদন-নিবেদনেও কোন ওভারব্রীজ না মঞ্জুর হওয়ায় গ্রামবাসীরা চাষের কার্য্যে অত্যন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। দীর্ঘ দুই মাইল পথ পরিক্রমা করিয়া চাষীদিগকে চাষ করিতে হয়। ভুক্তভোগী ছাড়া তাহাদের দুরবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম রাতুড়িয়া ও অঙ্গদপুরের ব্যবধান এক মাইল তথাপি সেখানে তিনটি ওভারব্রীজ দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুনপুর হইতে রাতুড়িয়া গ্রামের ব্যবধান দেড় মাইল তথাপি ডি. ভি. সি. কর্ত্তৃপক্ষ গ্রামবাসীকে একটি ওভারব্রীজও মঞ্জুর করিতে কুণ্ঠিত। গ্রামের কয়েকটি দেবস্থানও ক্যানেলের পারে পড়িয়াছে এবং তথায় নিত্যপূজা ও শীতলার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সঙ্কট নিরসনে সমাজহিতৈষী এবং ডি. ভি.সি. কর্ত্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন।"

নূতন রেলপথের পরিকল্পনা

'বাঙ্গালী সভ্য পত্রিকা' জানাইতেছেন :

"আসাম ও উত্তর বাংলার মধ্যে নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনায়, খেজুরিয়া, মালদহ, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ব্রড-গেজ লাইন পাতিবার এক পরিকল্পনা গত এপ্রিল মাসে ১৯৫৮ রেল বোর্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত পথে রেল পরিচালনায় উপস্থিত আসাম লিঙ্ক রেলপথের দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল কমিয়া যাইবে, এবং যাতায়াতের সময়সাপেক্ষ দূরত্ব কমিয়া যাইবে উহাই ছিল উক্ত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। প্রকাশ হইয়াছে উক্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, বিহারের মধ্যে আসাম লিঙ্কের একলাখি হইতে কুমোদপুর, বারসাই, কিষণগঞ্জ হইয়া শিলিগুড়ি হইতে আলুয়াবাড় রোড পর্য্যন্ত ব্রড-গেজ রেলপথের পরিকল্পনা রেল বোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর বাংলার মালদহ, ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট প্রভৃতি উত্তর বাংলার দাবী বা পরিকল্পনা বৃথা হইল। ফরাক্কা বাঁধ-পরিকল্পনা এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মোকামায় সেতুবন্ধন সম্পূর্ণ রূপায়িত হইয়াছে; উত্তর বাংলার যাতায়াতের কোন পথ নাই। উত্তর বাংলায় ব্রড-গেজ রেলপথ নির্ম্মাণে আসামের পথের দূরত্ব কমিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েক কোটি টাকা বাৎসরিক আয় বাড়িত। আসামের মালবহনের ক্ষমতা লিঙ্ক মিটার-গেজ লাইনের ক্ষমতার বহির্ভূত, এবং পাকিস্থানের মধ্য দিয়া ষ্টিমারে মাল পাঠান ছাড়া গত্যন্তর নাই, সেই কারণ পাকিস্থানকে কয়েক কোটি টাকা শুল্ক দিতে হইতেছে, ইহার পশ্চাতে আমরা যত যুক্তিই প্রকাশ করি না কেন বিহারের দাবী প্রাধান্য পাইবেই—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে জোর গলায় প্রচার করিব।"

পানীয় জলের অভাব

'বর্ত্তমান ভারত' নিম্নের এই সংবাদটি দিতেছেন :

"হুগলী-চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা পাশাপাশি অবস্থিত। হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকায় পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ। পৌরবাসী হা জল! হা জল! করিতেছে, এক ফোঁটা জল যেন একবিন্দু রক্ত। অপরদিকে বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা জল নাও, জল নাও বলিয়া পৌরবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। এই পৌরসভার জলের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনুরূপ প্রায় অপর একটি পৌর-সভাকে জল সরবরাহ করিতে পারে। এদিকে হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার এমন অর্থ নাই যে, অবিলম্বে কোন সরবরাহ-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারে। আমাদের বক্তব্য দুই পৌর কর্ত্তৃপক্ষ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া হুগলী-চুঁচুড়া পৌর এলাকার জলাভাব সমস্যার কোন আশু সমাধান করিতে পারেন না কি?"

অবাঙালীদের উপদ্রব

"পানাগড়-অঞ্চল কৃষিপ্রধান স্থান। এখানে মিলিটারী ক্যাম্প হওয়ায় নানা প্রদেশের লোক আসিয়া এখানে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে এবং চোরাবাজারী করিয়া অনেকে ধনী হইয়াছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে চাষীদের জমিগুলি গ্রাস করিতেছে। গরীব চাষীরা পেটের দায়ে ক্রমে ক্রমে ভূমিহীন হইতেছে। অবাঙ্গালী-গণ স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহার্য্য পুকুরগুলিও দখল করিয়া জন-সাধারণকে হটাইয়া দিতেছে। সম্প্রতি জি. টি. রোডের পার্শ্বে দেবীপুর মৌজার মাঠপুকুর নামে একটি সেচের পুষ্করিণীকে ক্রয় করিয়া তাহারা মাটি দিয়া ভর্ত্তি করিয়া জমি করিতেছে। অসহায় চাষী নিরুপায় হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।"

'দামোদরে'র এই সংবাদটি সত্য হইলে অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। সরকার কি কোন খোঁজই রাখেন না?

সমাজপাড়ার উন্নয়নে অবহেলা

জলপাইগুড়ির 'জনমত' বলিতেছেন :

"রয়াল প্রিন্টিং প্রেসের পশ্চাতে অবস্থিত সমাজপাড়ার একাংশের উন্নয়ন দীর্ঘকাল হইল অবহেলিত হইয়া আসিতেছে। রাস্তা বলিতে যাহা বুঝায় তেমন কোন পদার্থের অস্তিত্ব এ অঞ্চলের অধিবাসীরা জন্মাবধি অনুভব করে নাই। পায়ে চলার যে রাস্তাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাও বিপদসঙ্কুল। চারিদিক জঙ্গলপূর্ণ এবং ডোবায় ভর্ত্তি। ডোবায় কচুরিপানায় অভাব নাই। বর্ষা হইলেই জল জমিয়া যায়। কখন কখনও বা হাঁটু সমান জল, কখনও বা কোমর সমান জল ভাঙিয়া যাতায়াত করিতে হয়। বর্ষায় যাতায়াতের জন্য এ পাড়ার অধিবাসিবৃন্দ চারটি নৌকার ব্যবস্থা রাখিয়া থাকেন। জল বাড়িলেই নৌকাযোগে পারাপারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। জঙ্গল ও কচুরীপানার জন্য মশামাছির উপদ্রবও বিশেষভাবে প্রবল। জল-নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এখানকার পানীয় জলও দূষিত হইয়া পড়ে। পাড়ায় প্রায় ১৫।১৬টি পাকা কূপ আছে, কিন্তু কোনটির জলই বিশুদ্ধ ও জীবাণু-মুক্ত নহে। ইহার ফলে এ পাড়ার গৃহে গৃহে পেটের রোগ ও অন্যান্য অসুখ-বিসুখ লাগিয়াই আছে। শিশুদের স্বাস্থ্য খুবই

অবনত। এখানে একটি ইটের পাঁজা যুগ যুগ হইল পড়িয়া আছে। আর কিছুকাল পরে ইহা সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার ব্যবহার মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার টিন লুকাইয়া রাখিবার জন্য। ফলে দুর্গন্ধে পাড়ায় তিষ্ঠানো দায়। আর এই ইটের পাঁজায় সর্পকুল নির্ব্বিঘ্নে বাস ও বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইতেছে। ইহার ফলে কেহ নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারে না। তাহার উপর রাত্রে আলোর ব্যবস্থা নাই। আজ পর্য্যন্ত একটি বিজলী-বাতির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।"

হাসপাতাল হইতে মৃতদেহ নিখোঁজ

'দামোদর' নিম্নের সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :

'রায়না থানার উচালন গ্রাম হইতে শ্রীঅজিতকুমার পাল শ্রীমতী সরলা মুখার্জ্জী নাম্নী (৩৬) ধনুষ্টঙ্কার রোগিণীকে ২৪শে জুন বেলা দেড়টার সময় উক্ত হাসপাতালে ভর্ত্তি করেন এবং বৈকাল ৫টায় সেখানে সংবাদ লইয়া জানিতে পারেন রোগিণী পূর্ব্ববৎ আছেন। অদ্য বৈকাল ৫টায় শ্রী পাল হাসপাতালে সংবাদ লইয়া জানিতে পারেন গতকাল বৈকাল ৫-২০ মিনিটে সরলা মুখার্জ্জী মারা গিয়াছেন। শ্রী পাল সংকারের জন্য মৃতদেহ চাহিলে, তাঁহাকে এজন্য আয়োজন করিতে ও লোকজন আনিতে বলা হয়। অতঃপর সংকারের জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া পারবীরহাটার একদল সমাজসেবী যুবকসহ শ্রীপাল মৃতদেহ আনিতে যাইলে তাঁহাকে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় এবং লাসঘরে মৃতদেহ লইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। লাসঘরে যাইলে ভারপ্রাপ্ত ডোম বলে উক্ত মৃতদেহ অদ্য বেলা ৮টায় মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীতে লইয়া গিয়া সংকার করা হইয়াছে। আইনমত মৃতদেহ তাহাদের অভিভাবকদের লইবার জন্য ২৪ ঘণ্টা রাখা হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি সরাইয়া দেওয়ায় সন্দেহ হইলে শ্রীপাল হাসপাতালের আর. এম. ও ডাঃ চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জ্জীর নিকট অভিযোগ করেন। ডাঃ ব্যানার্জ্জী সংশ্লিষ্ট তিন জন ডোমকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেণ্ড করিয়াছেন। শ্রীপাল রাত্রি ১১৷টার সময় নির্ম্মল ঝিল শ্মশানঘাটে গিয়া পুরোহিত ও অন্যান্য লোকেদের নিকট অনুসন্ধান করিলে জানা যায় হাসপাতাল হইতে যে সব মৃতদেহ আসিয়াছিল তাহাতে উক্ত সরলা মুখার্জ্জী নাম আছে বটে, কিন্তু কেহই মৃতদেহ দেখিয়া বা শুনিয়া লয় নাই। সংশ্লিষ্ট মোহনা ডোমকে ইহার পর আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

হাসপাতালের এই অব্যবস্থা প্রায় সর্ব্বত্র। প্রতিকার যাঁহাদের হাতে তাঁহারা উদাসীন।

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী

গত ১৪ই আষাঢ় সোমবার নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার পরলোক-গমন করিয়াছেন। অগণিত অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়া সাম্প্রতিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা শিশিরকুমারের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার এই মৃত্যুসংবাদে বাংলার সংস্কৃতি-অনুরাগী নরনারী মাত্রেই মর্ম্মান্তিক বেদনাবোধ করিবেন। শিশিরকুমার শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ও নাট্য-ব্যবস্থাপক ছিলেন না, বাংলার অভিনয়-শিল্পে তিনি শুধু নিজস্ব একটি ধারাই প্রবর্ত্তন করিয়া যান নাই, তিনি ছিলেন একাই একটা যুগ, একটা ব্যক্তিত্ব—যে ব্যক্তিত্বের গুণে এ যুগের নাট্যকলাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

এদেশের নাট্যমঞ্চের ইতিহাস একশত বৎসরের। সেই ১৮৫৭ সন হইতে যাত্রা সুরু করিয়া বিগত একশত বৎসরে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ দেশকে যে অমিত ঐশ্বর্য্য দিয়াছে তাহার আদিপ্রান্তে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মধ্যপ্রান্তে গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও আধুনিক অধ্যায়ে শিশির-কুমার ভাদুড়ী—এই তিনটি নামই সমুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মত চিরদিন দ্যুতি বিকিরণ করিবে।

শিশিরকুমার গত পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল এ রাজ্যে একচ্ছত্র মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এ যুগের সমস্ত প্রখ্যাত নট ও নাট্য-প্রযোজকই জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমারের সৃজনী-প্রতিভা দেশের জীবন ও মননশীলতাকে বিচিত্র ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

শিশিরকুমারের আদি বাস সাঁত্রাগাছি রামরাজাতলায়। কিন্তু তাঁহার জন্ম হয় মেদিনীপুরে। তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় কিছুটা জেনারেল এসেমব্লীজ (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ) তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে। বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি কর্ম্মজীবন সুরু করেন এবং ১৯২০ সনে তাঁহার অভিনয়-জীবন আরম্ভ হয়। প্রথমে কিছুদিন তিনি পেশাদার অভিনেতারূপে ম্যাডান থিয়েটারে সংযুক্ত থাকেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ—শিল্প-সাধনায় এই ব্যক্তিত্বই তাঁহাকে গৌরবের আসনে বসাইয়া দিয়াছে। চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া তিনি ১৯২৪ সনে নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বয়ং নাট্যাধ্যক্ষ ও নটরূপে দেশের সম্মুখে আবির্ভূত হন। এইরূপে স্বাধীন নাট্য-পরিচালনার ফলে তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হয়।

কিন্তু তাঁহার সেই অতুল কীর্ত্তি মহাশিল্পীকে জীবনের শেষ ধাপে ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। লজ্জা ও বেদনার কথা, স্বাধীন ভারত তাঁহাকে তাঁহার এই নিভৃত নিবাস হইতে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। শেষজীবনে তিনি চাহিয়াছিলেন, একটি জাতীয় নাট্যশালা। দেশ তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করে নাই। সেইজন্যই তিনি অতি দুঃখে সরকারী খেতাব পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই আত্মসচেতন শক্তিমান পুরুষ, সেই প্রতিভাধর শিল্পী সত্তর বৎসর বয়সে আজ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হইতে চিরবিদায় লইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল, তাহা সহসা পূরণ হইবার নহে।

প্রাচ্যের রাষ্ট্রদর্শনে হেগেল ও মার্ক্সের প্রভাব

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

সুদূর জার্মানীর মহানভে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল তার রশ্মিচ্ছটা আজও আকীর্ণ হয়ে রয়েছে দিগ্বিদিকে। আমরা হেগেলের কথা বলছি। মার্ক্স হেগেলীয় শিষ্য। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ মার্ক্সের হাতে যে অমোঘ অস্ত্র দিল, তা যুগান্তকারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল নানান জাতির ইতিহাসে। অনেক রক্তক্ষয় হ'ল; রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ইতিহাসের গতিপথে যে নিশানা রেখে গেলেন হেগেল এবং মার্ক্স তা হ'ল উত্তরসূরীদের পথ-নিয়ামক। হেগেলীয় ভাববাদ এবং মার্ক্সীয় জড়বাদ একই পন্থাকে আশ্রয় করল। দ্বন্দ্ববাদের ত্রিপদী গতি বিরোধের পথে সংঘাতের পথে সৃষ্টির নতুন ব্যাখ্যা করল। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ কালাতীত; মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ কালাশ্রয়ী। মার্ক্সের জড়বাদী পটভূমিতে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের প্রয়াস অসমীচীনতা দোষে দুষ্ট হয়েছে এমন কথা পণ্ডিতজনে বলেন। প্রয়োগ-আপত্তিটুকুর সারবানতা স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে, হেগেল এবং মার্ক্স তাঁদের কাল-পরবর্তী রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভূত ভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। পশ্চিমদেশে তাঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য। প্রবন্ধান্তরে সে প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে। পূর্ব দেশেও তাঁদের প্রভাব অনুভূত হয়েছে।[১] কখনও সাক্ষাৎ প্রভাবে তা কোন এক জাতির রাষ্ট্রদর্শনকে আচ্ছন্ন করেছে আবার কখনও বা অন্তর্গূঢ় বিরোধের পথে প্রভাবিত করেছে অন্যান্য দেশের অগ্রনায়কদের চিন্তাধারাকে। যাঁরা সযত্নে মার্ক্স বা হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনকে পরিহার করতে চেয়েছেন, তাঁদের সজ্ঞান চিন্তায় নেতিমূলক হেগেলীয়-মার্ক্সীয় প্রভাব সুপরিস্ফুট। আর যাঁরা সাগ্রহে এঁদের রাষ্ট্রদর্শনকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা হেগেল-মার্ক্সের অনুপন্থী। নব্যএশীয় রাষ্ট্রদর্শন চিন্তায় এই উভয়বিধ প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। নব্য মহাচীনে মার্ক্সীয় প্রত্যক্ষ প্রভাব অতি-গোচর। নব্যভারতীয় চিন্তায় এই প্রভাব অন্তশ্চারী। আলোচ্য নিবন্ধে মূলতঃ এই দুই এশীয় রাষ্ট্র-দর্শনের ওপর হেগেলীয় ও মার্ক্সীয় প্রভাব আমাদের বিচার্য।

ভারতবর্ষ সমাজবাদী। এই সমাজবাদ আশ্রয় করেছে গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতিকে। অসভ্যতা-প্রত্যুষ থেকে আজ পর্যন্ত যত রাষ্ট্রদর্শন এল-গেল তারা এই সত্যটুকুকে প্রতিষ্ঠিত করল যে, কোন রাষ্ট্রব্যবস্থাই চরম নয়। মার্ক্সীয় দর্শন সেই সহজ সত্যটুকুকে মর্যাদা দিলেও আপন সাধন-পদ্ধতির মন্ত্রতন্ত্র সম্বন্ধে তার গোঁড়ামির অন্ত নেই। এই গোঁড়ামি-শৈথিল্য হয়ত আজ এখানে ওখানে দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশের চিন্তানায়কেরা মার্ক্সীয়-দর্শন-স্বীকৃতি-সিদ্ধ এই তত্ত্বটুকুকে মেনে নিয়ে নতুন পথে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে তৎপর হলেন। আমাদের শাসনতন্ত্র-লক্ষ্যীভূত সমাজবাদ মার্ক্সীয় সমাজবাদ থেকে ভিন্ন। আমরা শ্রেণী-সংগ্রামে অবিশ্বাসী এবং হিংসা-নীতির বিরোধী। আমাদের সমাজবাদ অর্থশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবীর হাতে অর্থনৈতিক শক্তি আসুক এটা আমাদের সমাজবাদের লক্ষ্য। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিকতা থেকে আমাদের সমাজবাদ রস আহরণ করছে, শক্তিসঞ্চয় করছে। ভারতীয় সমাজবাদের ভাষ্যকার ডক্টর রাও বলেন যে, আমরা আমলা-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী নই।[২] আমরা কার্ল মার্ক্সকে চাই না, আমরা সর্বার্থসাধক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ব্যক্তি-চারিত্র্যের পরিণতি এবং বিকাশ হোক্ সহজ স্বাভাবিক পথে, এটা আমরা চাই। আমরা বিবর্তনবাদী; আমাদের অধ্যাত্মবাদী জীবনদর্শন বিপ্লবকে, রক্তক্ষয়কে সযত্নে পরিহার করতে চায়। বৃহদায়তন কোন সংস্থাসৃষ্টির আমরা অপক্ষপাতী। সহজ, গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণে আমাদের আত্যন্তিক বিশ্বাস। দাক্ষিণাত্যে চাষীদের যৌথ প্রচেষ্টায় যে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হচ্ছে তাকে আমরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলি। এই ধরনের ছোট ছোট চাষীদের মালিকানা-স্বত্বশালী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি-প্রচেষ্টাকে পরিণতি দেয় এবং সাধারণ মানুষের সৃষ্টি-

১। বর্তমান লেখকের 'ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় দর্শনে হেগেলীয় মার্ক্সীয় প্রভাব' দ্রষ্টব্য ['সংলাপ', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪]

২। দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্সের ডিরেক্টর ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও ১৯৫৬ সনে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আয়োজিত আলোচনা-সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

প্রচেষ্টাকে খর্ব করে না বলেই এই ধরনের ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মানুষের আত্মিক মুক্তি সম্ভব হয়। এই আত্মিকমুক্তির কথা জড়বাদী মার্ক্সবাদ বিস্মৃত হয়েছে। ডক্টর রাও-এর ভাষা উদ্ধৃত করছি :

"Our socialist movement is built on spiritual, not materialistic Foundations. It seeks economic justice, equality and full regard for human values."

ডক্টর রাও-এর ভাষ্যে মার্ক্সবাদের সঙ্গে ভারতীয় সমাজবাদের পার্থক্যটুকু স্পষ্টতর হয়েছে। হেগেলীয় আধ্যাত্মিকতার অনুরূপ আমাদের আধ্যাত্মিক ধারণা। তবে আমাদের আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য অনেকখানি প্রাচীনতার দাবী রাখে।

ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রতন্ত্রেও মার্ক্সবাদের অত্যর্থক প্রভাব খুব প্রকট নয়। ইন্দোনেশীয়মানুষের জীবনের 'Gotong Rojong' বা পারস্পরিক সহায়তার মূলমন্ত্র বৃহৎ শিল্পতন্ত্রে ইন্দোনেশিয়াকে দীক্ষা গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে। ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র গ্রামে। একটা কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি ব্যবস্থায় ইন্দোনেশিয়া আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। সারা ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় দশ সহস্র কোঅপারেটিভ গড়ে উঠেছে। ছোট ছোট গ্রামীন শিল্পের প্রসারে ছেয়ে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। রবার চাষ এবং চালের কল প্রতিষ্ঠায় দেশের লোক তাদের অর্থ-সামর্থ্য নিয়োজিত করছে। আট কোটি নরনারী অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা চান যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা 'পরিবার-গোষ্ঠী', 'কৃষি-গোষ্ঠী' এবং 'জাতীয়-গোষ্ঠী'র হাতে থাকুক। সর্বহারার একনায়কত্বে এঁরা বিশ্বাসী নন। ইন্দোনেশিয়া মার্ক্স-কথিত কম্যুনিজম বা ক্যাপিটালিজমে বিশ্বাসী নয়। এঁরা স্বাধীন মানুষের অ-বাধ্যতামূলক পারস্পরিক সহায়তার নীতিতে বিশ্বাসী। ব্রহ্মদেশীয় সমাজবাদ বৌদ্ধ অহিংসা মন্ত্রের দ্বারা পরিশোধিত। মার্ক্সীয় কম্যুনিজম বিদ্বেষ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীসংগ্রামের কথা অহিংসাব্রতী বৌদ্ধদের কাছে অর্থহীন, কেননা বৌদ্ধসমাজ শ্রেণীভিত্তিক নয়। সমস্ত মানুষই সমান—ধনী, দরিদ্র, চাষী, জমিদার, নিরক্ষর, পণ্ডিত —এঁদের কোন আত্যন্তিক পার্থক্য বৌদ্ধজীবনবাদ স্বীকার করে না। মার্ক্সীয় সমাজবাদকে যেমন অন্ধ মতাবলম্বীরা সন্দেহ, ভয় এবং উদ্বেগের সঙ্গে বিচার করে ঠিক সেই ভাবে বৌদ্ধ সমাজবাদকে বিচার করবার প্রয়োজন নেই। ব্রহ্মদেশীয় সমাজবাদীরা আত্মসম্প্রসারণের জন্ত উদ্বিগ্ন নন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের কূট কলাকৌশল দুর্বল রাষ্ট্রের ভীতির কারণ হয় নি, হবেও না, কেননা তাঁদের রাষ্ট্রদর্শন মার্ক্সীয় জীবনদর্শন থেকে ভিন্নধর্ম আশ্রয়ী। যে ধর্মচিন্তা ব্রহ্মদেশীয় সমাজবাদকে মার্ক্সীয় সমাজবাদ থেকে স্বতন্ত্র করেছে তাই আবার সিংহলের নব রাষ্ট্র-আন্দোলনকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সিংহলী রাষ্ট্রনীতিবিদেরা এই কথাই বলেন যে, তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। হিংসা করা যেমন গর্হিত, হিংসার কথা চিন্তা করাও তাঁদের কাছে সমান নিন্দনীয়। কাজে কাজেই শ্রেণীসংগ্রাম এবং সর্বহারার একনায়কত্বে বিশ্বাসী মার্ক্সীয় দর্শন সিংহলীদের কাছে অগ্রাহ্য। হেগেল-স্বীকৃত বর্ণ বৈষম্য (গুণগত) এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশগুলির কাছে নিরর্থক হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চরম পরিণত রূপবর্ণনায় মার্ক্সীয় মতবাদ গোঁড়ামির পরিচয় দেয় নি। হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শন এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে যে মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তা অমার্জনীয়। অবশ্য সমধর্মী ভীরু মূঢ়তার নজীর পৃথিবীর দর্শনেতিহাসে অলভ্য নয়। আধুনিক-দর্শন-জনক দেকার্ত বিজ্ঞানসম্মত পথে সত্যের সন্ধান পেয়েও তার প্রচার করতে সাহস পান নি ; সবিনয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর গবেষণালব্ধ তত্ত্বাবলী চার্চ এবং পুরোহিত সমাজের অনুমোদনসাপেক্ষ। যে সত্য কালাতীত তাকে বার বার ভীরু সুবিধাবাদী মনীষীরা সমকালীন শক্তিমত্ত মানুষের কাছে অনুমোদনের জন্য নিবেদন করেছে। আত্মবিশ্বাসের দীনতা ভবিষ্যৎ যুগের কাছে তাদের অপরাধী করে রাখল। তাই ত হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজ দার্শনিক সিডনি হুক বললেন :

"Marxism is a philosophically primitive system, but it never identified the social system of the future with the end or process of history itself in the way in which Hegel identified the Absolute Idea or the way of God with the Prussian State. Because Communism is a dissease of idealism, if only it does not harden into Fanaticism which makes a fetish of the instrument—the instrument of the Communist Party—it may prove to be susceptible to the virus of political Liberalism."[৩]

এই রাজনৈতিক উদার মতবাদের ছোঁয়াচ আছে নব্য চীনের কম্যুনিজমে। মাও সে তুং তাঁর উদারনৈতিক

৩। 'The Import of Ideological Diversity' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। [Problems of Communism, Nov.-Dec. 1957]

মতবাদ ঘোষণা করলেন, "শত পুষ্পের বিকাশ সম্ভব হোক্। শত মতের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলুক।"৪ বাঁধাধরা পথে রাষ্ট্রব্যবস্থার 'বিবর্তন'কে মার্ক্সবাদী সমাজবাদ যতখানি অপরিবর্তনীয় ভেবেছিল এ যুগের উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীর কাছে তা ঠিক ততখানি অনমনীয় রূপে দেখা দেয় নি। সমাজবাদের বন্ধনীর মধ্যেও অনেকখানি স্বাধীন চিন্তার অবকাশ আছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে মাও সে তুং-এর ঘোষণায়। চীনের কৃষ্টি-ঐতিহ্যের প্রাচীনতা প্রত্ন-তাত্ত্বিক-এর গবেষণার বিষয়। কনফুসীয় দর্শনের উত্তরাধিকার মহাচীনের। কনফুসিয়াসের 'সমাজ সচেতনতা'র ধারণা এবং সামাজিক বন্ধনের মূলে নীতিগত ও আদর্শগত যে ঐক্য-বোধের কথা মহাঋষি বলেছিলেন, ডাঃ সান ইয়াৎ সেন তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এই নীতি মহিমাময় পশ্চাদ্-ভূমি হ'ল চীনে মার্ক্সীয় দর্শনের ব্যবহারিক পটভূমি। ডক্টর সানের 'ত্রি-নীতি' জাতীয়তা-আশ্রয়ী। তাঁর মতে বিপ্লব ঘটবে তিনটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে। প্রথমে বিপ্লব হবে এবং নব মতবাদের উদ্গাতারা ক্ষমতাসীন হবেন। তার পরে দেশের লোকের শিক্ষানবিশীর কাল এবং সর্বশেষ পর্যায়ে 'নিয়ম-তান্ত্রিক গণতন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা। ডাঃ সান মার্ক্স-লেনিনীয় সমাজভাষ্যে বিশ্বাস করেন নি। তিনি অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংগ্রামকেও অস্বীকার করেছেন। মানুষের সহজাত শক্তি এবং বুদ্ধিগত যে শ্রেণীবিভাগ, তাকে সত্য বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা বুদ্ধি এবং বিদ্যায় অগ্রণী সেই বুদ্ধিজীবী অভিজাতেরা শাসনযন্ত্র চালাবেন। ডাঃ সান সর্বহারাদের একনায়কত্বে বিশ্বাস করতে পারেন নি।৪ তাঁর কাছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কবল থেকে চীনকে মুক্ত করাই ছিল সব চেয়ে বড় কাজ। এই সাম্রাজ্যবাদীদের পতনের পরে তিনি কোন গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন নি, কেননা তিনি শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করেন নি। তবে ডাঃ সান সামাজিক প্রগতির নিশ্চয়তায় আস্থাবান ছিলেন; তিনি জীবন ও জগতের পরিবর্তনকে দ্বন্দ্ববাদীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং এই দ্বন্দ্ববাদকে তিনি সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই পথেই তাঁর গণতন্ত্রবাদের প্রত্যাশা। গণতন্ত্রই ডাঃ সানের কাছে রাষ্ট্রীয় দর্শনের চরমোন্নত অবস্থা বলে স্বীকৃতি পেয়ে-ছিল। মার্ক্সীয় সমাজবাদ থেকে চৈনিক নব্য গণতন্ত্রের বিচ্যুতি অসংশয়িত; তাই লেনিন একে 'Subjective Socialism' আখ্যা দিলেন।৫ মাও সে তুং মহাচীনের বিপ্লবের গণতান্ত্রিক রূপটুকুকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বললেন যে, চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই সমাজবাদী বিপ্লবকে দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। এর পূর্বভাগে রয়েছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর উত্তরভাগে ঘটবে সমাজবাদী বিপ্লব। মহাচীনের শাসন-তন্ত্রের উপোদ্ঘাতে এ কথার উল্লেখ রয়েছে:

"From the Founding of the People's Republic of Chiana to the attainment of a socialist society is a period of transition. During the transition the fundamental task of the State is, step by step, to bring about the socialist industrialization of the country and step by step, to accomplish the socialist transformation of agriculture, handicrafts and capitalist industry and commerce,

এ সত্যটুকু লক্ষ্যনীয় যে, চীন রিপাবলিকের কর্ণধারেরা সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তনে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনের পোষকতা করেছেন। ধীরে ধীরে দেশের শিল্প-ব্যবস্থায় সমাজবাদকে অনুস্যূত করে দিচ্ছেন তাঁরা। দেশের কৃষি, কারুশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রমুখ সকল ক্ষেত্রেই সাম্য-বাদী নীতির প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রনায়কদের কাম্য হলেও তার ক্রমান্বিত প্রতিষ্ঠা সংগঠন তাঁরা চাইলেন। দেশের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্র ধুরন্ধরদের স্বপ্নের সংযোগ ঘটল, সমন্বয় সাধিত হ'ল। চীনের বিপ্লব-দর্শনের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির বিপ্লব দর্শনের একটা নিকট সম্পর্ক অনুমিত হয়। নব্য চীনের রাষ্ট্রীয় দর্শনে শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের অপমৃত্যু ঘটবে বলে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নি। শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র সর্বোদয় রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সর্বোদয় রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে ডাঃ সান এবং মাও সে তুঙের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ডাঃ সান আশা করেছিলেন যে, চীনের এই নব্য গণতন্ত্র কনফুসিয়াস-কল্পিত স্বর্গরাজ্যে (utopia) নিয়ে যাবে। সেখানে মানুষের জীবন রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধনমুক্ত এবং আদর্শগত নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মাও সে তুঙের মতে চীনের নব্য গণতন্ত্র শ্রেণীহীন নৈরাজ্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় চীনকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাবে।

এবার নব্য ভারতবর্ষের যুগাচার্যদের কথা বলি। নব্য ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের অস্তিত্ব ভাস্বর। এঁদের কথা বর্তমান নিবন্ধে অনালোচিত থাকলে

৪। মাও-সে-তুঙের উদার রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনার জন্ম Benjamin Schwartz লিখিত 'New Trends in Maoism' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য [Problems of Communism, July-Aug. 1957]

৫। Karl Wittfogal-এর Sun Yat Sen দ্রষ্টব্য।

আলোচনা একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এঁদের ওপর হেগেলীয় মার্ক্সীয় ধ্যান-ধারণার নাতিদীর্ঘ আলোচনা করে ইতি করছি এই প্রবন্ধের। প্রথমেই ঋষি অরবিন্দের কথা বলি। হেগেলের মত অরবিন্দ প্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারাকে প্রত্যক্ষ করলেন গতির বৃত্ত-চক্র-পথে ; এই বৃত্তের কেন্দ্রীয় বিন্দুটি সদা-প্রাগ্রসর। এই গতি কখনও পশ্চাদ্‌গামী হয় না। এই চক্রগতির আবর্তনের ফলে অতীত আপনার নাম-গোত্র পরিহার করে ; অতীতের যে ধর্ম, অতীতের যে শক্তি তা অনাক্ষয়ী। বর্তমানের রূপবৈচিত্র্যে তার প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যতের মধ্যে রয়েছে অতীতের ইতি সাধনের নিশানা এবং নতুন উপলব্ধির সম্ভাবনা। অরবিন্দ প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব-বাদী সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করলেন। সামাজিক স্তরে সে সংগ্রামের রূপ হ'ল ব্যক্তিবাদের সঙ্গে গোষ্ঠীবাদের সংঘর্ষ। যখন চিন্তা (thought) জীবনের মর্মমূলে বাসা বাঁধে, কাজ করে জীবনের বিস্মৃতিতে, তখন প্রগতি প্রত্যক্ষ হয়। কখন কখন এই চিন্তাধর্ম জীবনপাত্রের তলায় তলিয়ে যায় আবার কখন কখন সে ভেসে ওঠে উপরের তলায় প্রত্যক্ষ গোচরতায়। যখন চিন্তা তলিয়ে যায় তখন মানবেতিহাসে অন্ধ যুগ নামে। আবার মানুষের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে চিন্তার উর্ধ্বগমন ঘটে এবং যখন জীবনের পাত্রের উপরতলায় সে আবার ভেসে ওঠে তখন মানবচিত্ত উদ্ভাসিত চৈতন্য হয়ে ওঠে। যে চৈতন্য মানবসমাজের বিবর্তন সংঘটিত করে তা সমাজ-চৈতন্য রূপে প্রকট হয়। চৈতন্যময় আত্মবিবর্তনই হ'ল অরবিন্দের ধর্ম।৬ তিনি এই ধর্মে মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছেন, এই ধর্মই ভারতবর্ষের আত্মাকে বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও রক্ষা করে এসেছে। ঋষি অরবিন্দ এই চৈতন্যময় বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে ঘোষণা করলেন দর্শনগত নৈরাজ্যবাদের কথা। এই নৈরাজ্যবাদ মার্ক্সীয় শ্রেণীহীন সমাজের নৈরাজ্যবাদ থেকে স্বতন্ত্র। অরবিন্দের নৈরাজ্যবাদ শ্রেণী-সংগ্রামের অন্তিম অবস্থাকে উত্তরণ করে আবির্ভূত হয় না। তাঁর নৈরাজ্যবাদ মানুষের অন্তরশায়ী দিব্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত। এই দিব্যধর্মেই সমগ্র মানবসমাজের মিলন ঘটে। এই সার্বিক সম্মিলন ঘটানো দুরূহ কর্ম ; এই কর্ম সম্পাদন করা সমাজবাদের সাধ্যাতীত৭ ; সমাজবাদের মধ্যে শ্রেণীচিন্তা, শ্রেণীবিদ্বেষ উপগত। এতদ্ব্যতীত সমাজবাদ যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে তার দ্বারা ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে সারা মানবজাতির পরিপূর্ণ মিলন ঘটে না। অরবিন্দ মার্ক্সীয় সমাজবাদের বিরোধিতা করলেও হেগেলের মতই আমাদের বললেন যে, রাষ্ট্র হ'ল প্রজ্ঞার (Reason) প্রকাশ। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রজ্ঞার আত্মোপলব্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি এ কথাও বললেন যে, মানব সমাজে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা কর্মে প্রজ্ঞা অপারগ।

রবীন্দ্রনাথ জড়বাদী ছিলেন না। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের প্রত্যক্ষীকরণই হ'ল কবির ধর্ম। বাস্তবতা এবং চিন্ময়তা কবির চোখে সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। তাই মার্ক্সীয় জড়বাদী দ্বন্দ্ববাদ কবির কাছে কখনই আপন আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান হয় নি। কবি হেগেলের মতই সৃষ্টবস্তুর চিন্ময় সত্তায় আস্থাবান ছিলেন। যে মানুষ সমগ্র মানব সমাজে, তৃণে-গুল্মে-লতায়-পাতায় এক পরম সত্তার আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেন তার পক্ষে দ্বন্দ্বনীতিতে আস্থাবান হওয়া চলে না। জড়বাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী না হয়েও রুশিয়ায় মার্ক্স-লেনিনীয় দর্শনের ব্যবহারগত সাফল্য কবিগুরুকে অভিভূত করেছিল ৮। তবে রুশীয় পদ্ধতিতে ব্যক্তি-সম্পত্তি জবর-দখলের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বলোপী শাসনব্যবস্থা তাঁর চোখে মর্যাদা পায় নি। রুশিয়ার সমবায় নীতিকে, সমবায়ী প্রচেষ্টাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন এবং এই সমবায়ী যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে দেশের সত্যিকারের কল্যাণ সাধিত হবে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেছেন। হেগেলের মত তিনি 'সার্বভৌম-ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্বে' বিশ্বাস করেন নি। মানুষে মানুষে আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার কবির জীবনদর্শন বিরোধী। কবির মতে :

> 'যে আমি রয়েছে তোমার আমায়
> সে আমি আমারই আমি'।

তাই ত হেগেলের সার্বভৌম-ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্ব রবীন্দ্র-মানসে কোন রেখাপাত করে নি। অরবিন্দের মত তিনি মানুষের ঐক্যবোধকে, ঐক্যধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিশেষ জাতির সহজাত উৎকর্ষে তিনি বিশ্বাস করেন নি। তাঁর জাতীয়তার ধারণা সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধে অবস্থিত বলেই তা হেগেলীয় ধারণার পরিপন্থী। এইজন্যই তিনি আন্তর্জাতিক। রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সীয় অর্থে আন্তর্জাতিক নন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা মানুষের সমধর্মী আধ্যাত্মিক সত্তাকে আশ্রয় করেছে। তাই ত উদগ্র জাতীয়তাবাদ তাঁর জীবন-দর্শন বিরোধী। বিরোধ-আশ্রয়ী দ্বন্দ্বনীতি রবীন্দ্রমানসকে

৬। Thoughts and glimpses, pp. 38-39.

৭। এতদ্ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য Dr. N. Basu কৃত Political philosophy after Hegel and Marx গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮। 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধীরে ধীরে পরিণতির পথে নিয়ে গেছে কি না তা পণ্ডিত-জনের গবেষণার বিষয়। এ নিয়ে গবেষণারও সূত্রপাত ৯ হয়েছে। আমাদের মতে রবীন্দ্রমানস হেগেলীয় বা মার্ক্সীয় দ্বন্দ্বনীতি শাসিত এমন তত্ত্ব ভ্রান্ত কেন না সৃষ্টির মার্গ কখনই পূর্বনির্ধারিত হয় না। আমাদের তন্ত্রে শিল্পীর শিল্পকর্ম সৃষ্টিকে পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ১০। পাখী যেমন এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যায় আপন যাত্রাপথটুকুর কোন চিহ্ন না রেখে শিল্পীও ঠিক তেমনি করেই গোপনে তার সৃষ্টিকে রূপ দেয়। জাতশিল্পীর যন্ত্রচিহ্ন (Tool mark) প্রকট থাকে না কোথাও। তাই বলছিলাম রবীন্দ্রমানসে হেগেলীয় দ্বন্দ্বনীতির কারসাজি প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস অপপ্রয়াস মাত্র।

হেগেলীয় সার্বভৌম ঐতিহাসিক জাতিতত্ত্ব গান্ধীজীর সর্ব-মানবে-প্রেম-তত্ত্বের পরিপন্থী। গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় মতবাদ জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদকে অতিক্রম করে সর্ব মানবে-প্রেম-নীতিকে আশ্রয় করেছিল১১। উপায় এবং উপেয় গান্ধীজীর চোখে ভিন্নধর্মী হলে চলবে না। তাঁর দর্শনে হিংসার দ্বন্দ্বের স্থান নেই। সারা বিশ্বসংসারে যে শুদ্ধসত্ত্বা প্রকাশমান তাঁকে প্রতিনিয়ত গান্ধীজী উপলব্ধি করেছেন এই পরিদৃশ্যমান লাভ-ক্ষতি-সমাকীর্ণ সংসারের মধ্যে। মানুষের সেবাকে তিনি ভগবদ্‌সেবা জ্ঞান করেছেন। সনাতন ভারতবর্ষ অতিথিকে নারায়ণ ভেবেছেন; গান্ধীজী এই মতানুসারী। হিংসা-দ্বেষ গান্ধীজীর জীবনদর্শনে অলভ্য। শ্রম-মর্যাদার মন্ত্র তাঁর জীবনে এবং মননে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রত্যেকটি মানুষকে পরিশ্রমলব্ধ পারি-শ্রমিকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। গান্ধীজীর এই নির্দেশ মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাবজ নয়। এর জন্য তিনি টলস্টয়ের কাছে ঋণী। গান্ধীজী তাঁর সর্বোদয়ের ধারণা আহরণ করেছিলেন রাস্কিনের কাছ থেকে। গান্ধীজীর আদর্শ গণতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষকে পরিশ্রম করতে হবে এবং সেই শ্রমের ভিত্তিতেই নাগরিকের ভোটাধিকার থাকবে। প্রত্যক্ষ-বাদীদের বা প্রয়োজনবাদীদের মত গান্ধীজী সংখ্যাগরিষ্ঠের মহত্তম কল্যাণ কামনা করেন নি। তাঁর সর্বোদয়ের ধারণায় সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ কাম্য। এই সর্বোদয়ের ধারণার মধ্যেই গান্ধীজীর স্বরাজের ধারণা বিধৃত। গান্ধীজীর স্বরাজ হ'ল বুদ্ধিশাসিত (enlightened) নৈরাজ্যবাদ। গান্ধীজী-কল্পিত স্বরাজে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে। গ্রামীণ শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের একটা নিকট সম্পর্ক থাকবে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি গ্রাম এক মহাসামুদ্রিক বৃত্তের মধ্যে বিধৃত হবে যার কেন্দ্রে থাকবে কেন্দ্রীয় শাসকেরা। উপরতলার নীচেরতলার মানুষদের দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিচ্ছেদ সমাজ থেকে অন্তর্হিত হবে, গান্ধীজী এ স্বপ্ন দেখলেন১২। গান্ধীজীর আদর্শ সমাজব্যবস্থা মার্ক্সের শ্রেণী-হীন রাষ্ট্রহীন আদর্শ সমাজের সমগোত্রীয়। গান্ধীজীর সাম্যধর্ম অহিংসার পথে আপনকে মানুষের নিত্যকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। কর্মের মধ্য দিয়ে সত্য আত্মীয়তা অর্জনই গান্ধীজীর রাষ্ট্র-দর্শনের লক্ষ্য। মার্ক্সীয় সাম্যবাদে তিনি বিশ্বাস করেন নি কেন না মার্ক্সীয় সাম্যবাদ হিংসাত্মক। গান্ধীজীর সমাজ-বিপ্লবের ধারণা মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন সাধন করে তবেই সত্য হয়ে উঠবে। এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তাঁর নীতিবোধের ওপর।

হেগেলীয় দর্শনের দূরচারী প্রভাব সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র হেগেল-কথিত চৈতন্য-সত্তায় বিশ্বাস করেছেন। হেগেলের মতে প্রজ্ঞা হ'ল সত্তের অন্তরশায়ী সত্য এবং সৃষ্টি হ'ল এই প্রজ্ঞার বন্ধনমুক্তির ক্রম-উদ্বর্তন। সুভাষচন্দ্রের মতে এই প্রজ্ঞার অন্তরশায়ী তত্ত্বটুকু হ'ল প্রেম। সৃষ্টিতে এই প্রেমের প্রকাশ। প্রেম প্রকট হয় সৃষ্টি-আশ্রয়ী নিত্য দ্বন্দ্বে এবং সেই দ্বন্দ্ব-উত্তর সমাধানে। সমস্ত মানুষের মিলন হবে এই প্রেমের পথে১৩। দ্বন্দ্ববাদে আস্থা থাকলেও সুভাষচন্দ্র হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যাও করেন নি। তাঁর মূল্যায়ন আশ্রয় করল ভাববাদী এবং জড়বাদী জীবনের সমন্বয়কে। হেগেল বলেছিলেন যে, রাষ্ট্র হ'ল সমাজবিবর্তনের চরম লক্ষ্য। সার্বিক কল্যাণ এই রাষ্ট্র ধারণার অনুস্যূত। মার্ক্স এবং অরবিন্দ উত্তর যুগে এই ধরনের রাষ্ট্রপূজা অচল হলেও সুভাষচন্দ্র হেগেলের১৪ মতই রাষ্ট্রকে সমাজবিবর্তন পথের প্রত্যন্ত সীমায় অপ্রয়োজনীয় মনে করেন নি। জাতীয় স্বার্থে

৯। শ্রীগুণময় মান্না লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ' প্রমুখ গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

১০। শ্রীনন্দলাল বসুর 'শিল্পকথা' দ্রষ্টব্য।

১১। ডক্টর নারায়ণী বসু কৃত Political Philosophy after Hegel and Marx গ্রন্থ, পৃঃ ১১৫ দ্রষ্টব্য।

১২। 'হরিজন পত্রিকা' (২৮শে জুলাই, ১৯৪৬) দ্রষ্টব্য।

১৩। সুভাষচন্দ্রের Autobiography, পৃঃ ১৪৪ দ্রষ্টব্য।

১৪। Falckenberg-এর History of Modern Philosophy, পৃঃ ৫০১ দ্রষ্টব্য।

জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং জাতির পুরাণো ইমারতে সংস্কার সাধনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। তবে হেগেলকে কখন কখন স্বীকার করে নিলেও হেগেলকে উত্তীর্ণ হবার দিকেই তাঁর প্রবৃত্তি। একদিকে হেগেলকে যেমন তিনি উত্তীর্ণ হলেন জড়বাদকে আপন দর্শনে স্থান দিয়ে অন্যদিকে আবার তিনি মার্ক্সকেও অতিক্রম করলেন ভাববাদী দর্শনের যথাযথ মূল্য দিয়ে। তাঁর ধর্মীয় এবং মনীষীগত প্রবণতা তাঁকে পুরোপুরি মার্ক্সপন্থী করে নি। কম্যুনিজমের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিশ্বাস করলেও এদেশের মানুষ যে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করবে না এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র অবহিত ছিলেন ১৫। জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র মার্ক্সপন্থীদের মত জাতীয়তাবাদকে 'বুর্জোয়া-ভাবালুতা' বলে অশ্রদ্ধা করেন নি। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ সুভাষচন্দ্রের চোখে পূর্ণ সত্যের মর্যাদা কখনও পায় নি। তাঁর মতে সৎ কখনও কোন একটা বাঁধাধরা পথে নিত্যকাল চলে না। তবে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ সৎ অনুমিত, একথা সুভাষচন্দ্র বলেছেন। ইতিহাসের গতিপথ দ্বন্দ্বময়। এই জন্যই দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদের বিরোধী অবস্থা হিসেবে বামপন্থী রাজনীতির আবশ্যিকতা তাঁর কাছে অবশ্য স্বীকার্য। বামপন্থী রাজনীতির প্রথম পর্যায় হ'ল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং শেষপাদ হ'ল সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা। এইখানে মার্ক্সপন্থী মাও-সে-তুং এবং সুভাষচন্দ্রের সহমতবাদিতা। এখানে উভয়েই লেনিন-মতানুসারী। সুভাষচন্দ্র মার্ক্সপন্থীদের মত শ্রেণীসংগ্রাম সমাজবাদে বিশ্বাস করেছেন। তিনি গতানুগতিক অর্থে গণতন্ত্রী ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্ববাদ তাঁকে কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিবাদের মূলনীতিগুলির একটা আপোষরফা করতে সহায়তা করেছিল। এই সমন্বয়ীকরণের ফলে জন্ম নিল এক নতুন রাষ্ট্রদর্শন—'সাম্যবাদ'। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজম সমন্বয়িত হয়ে যে রূপ পরিগ্রহ করবে তা হ'ল এই 'সাম্যবাদ'। বিশ্বরাষ্ট্রদর্শনে 'সাম্যবাদ' আধুনিক ভারতবর্ষের নবতম কীর্তি।

১৫। Indian Struggle, vol. I, পৃঃ ৪৩২ দ্রষ্টব্য।

আসল কথা

শ্রীকালিদাস রায়

ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চার পাতা ভরা চিঠি এলে
পত্রের মালিক তায় রেখে দেয় ফেলে,
ডাক দিয়ে বলে—"নটবর,
আসল কথাটা এর পড়ে দেখে বল ত সত্বর।"

ঘণ্টা ধ'রে বাগ্মীকণ্ঠে অধ্যাপক দেন লেকচার,
ছাত্রেরা থামায়ে বলে, "স্যার,
আসল কথাটা কি তা বলুন ত টুকে নি খাতায়
পরীক্ষায় যা লাগে না হবে কি বা তায় ?"

কবিতা শোনায় কবি কবিতাটি ছোট খুব নয়,
ছ'চরণ না শুনেই ঘড়ি দেখে শ্রোতা তারে কয়—
"আসল কথাটি কি তা বল কবিবর,
সিনেমায় যেতে হবে, 'হাফি আপ', নেই অবসর।"

প্রিয়তমা কাছে এসে ঘেঁষে বসে কত কথা বলে
হাতখানি রেখে তার পতিটির গলে,
পতি কয়, "থাম থাম, আসল কথাটি বল খালি,
অবসর নেই মোটে শুনতে যে তোমার পাঁচালী।"

আসল কথার যুগে বৃথা চারু কথার অঞ্জলি,
যন্ত্রের গর্জ্জন মাঝে বৃথা কলকণ্ঠের কাকলী।
চায় না পল্লব শাখা পুষ্প কেহ, সবে ফল চায়,
সবুর সয় না কারো না পাকিলে কিলিয়ে পাকায়।

কে শুনিবে কালোয়াতী ঘণ্টা ধরি কণ্ঠে বিলাস,
সবাই টিংক্চার চায়, শিশি ভ'রে সবেরই নির্যাস।
চায় না তটিনী কূপ, কল খুলে নলে পায় জল,
বিজ্ঞান জোগায় আজ হাতে হাতে যা কিছু আসল।
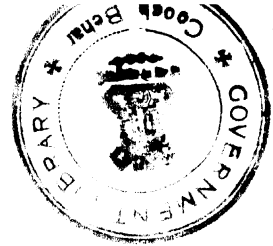
শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১

সকালের রোদ আসিয়া আঙিনায় পড়িয়াছে, বেলা প্রায় ছ'টা, দাঁতনকাঠিটা ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে তিলকা বলে, "কোথায় গো, জলপান নিয়ে আয়।"

সাড়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে রুকিয়া, বড় গোছের একটা কাঁসার বাটি তিলকার সামনে রাখিয়া করুণ ভাবে বলে, "জলপান আজ খুবই কম।"

বাটিটা টানিয়া লইতে লইতে তিলকা বলে, "সে কি আর তোর দোষ, তুই ত নিজে না খেয়ে আমার জন্যে রেখেছিস।"

"আহা, কে বলেছে আমি খাই নি।" রুকি জবাব দেয়।

বাটিটার ভিতরে সামান্য কিছু ভাত, তিলকা বলে, "দে খানিক জল ঢেলে, আর নুন মরচাই নিয়ে আয়।"

একটা শালপাতায় কিছু নুন আর গোটাদুই লঙ্কা আনিয়া রুকিয়া ভাতের মধ্যে হড় হড় করিয়া অনেকখানি জল ঢালিয়া দেয়। যথেষ্ট পরিমাণ নুন ও লঙ্কা দিয়া সেই জলীয় খাদ্যটা সরস করিয়া তিলকা ডাকে, "আয় বেটা।"

সদ্য ঘুম হইতে উঠিয়া পাঁচ বৎসরের ছেলে পরসাদ সবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপের আহ্বানে তাড়াতাড়ি আগাইয়া যায়। রুকিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলে, "দাঁড়া, দাঁড়া, মুখ ধুইয়ে দি।"

মুখ ধোয়া হইলে বাপ-বেটায় জলপান করিতে বসে—কেবল সুপসাপ আওয়াজ। একটু পরে লোটা হাতে লইয়া তিলকা উঠিয়া দাঁড়ায়, রুকিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, "ওকি—জলপান আবার খানিকটা রাখলি কেন?"

তিলকা কোন জবাব দেয় না, মুখ ধুইয়া আসিয়া ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসে, তার পরে ট্যাঁক হইতে খৈনির ছোট কৌটাটি বাহির করিয়া মনোযোগের সঙ্গে এক টিপ খৈনি লইয়া মুখে ফেলিয়া দেয়।

"তিলকা, আরে তিলকা, চল চল।" মনুয়া তিলকার দরজায় আসিয়া হাঁকে, "বেলা হ'ল, আর দেরি করিস নে।"

ভিতর হইতে তিলকা সাড়া দেয়, "আসছি গো মনুয়াদা।"

ময়লা, ছেঁড়া গামছাখানা মাথায় জড়াইয়া তিলকা পরসাদকে কোলে তুলিয়া দরজার দিকে আগাইয়া যায়—পিছনে পিছনে কুড়ুলখানা হাতে লইয়া আসে রুকিয়া। গলিতে ততক্ষণ মনুয়ার সঙ্গে সরযু গুলবা আসিয়া জুটিয়াছে। আঙিনার দরজা খুলিয়া তিলকা গলিতে আসিয়া দাঁড়ায়। মনুয়া বলে, "ভারি রোদ্দুরে, বেলা বাড়লে কাজই করতে পারবি নে, যত শীগগির যাবি তত কাজ এগুবে।"

তিলকা বলে, "চল।"

রুকিয়া কাছে আসিয়া তিলকার কোল হইতে পরসাদকে লইয়া সরিয়া দাঁড়ায়, তিলকা কুড়ুল তুলিয়া লইয়া মনুয়া ও গুলবার পিছনে পিছনে গ্রামের গলিপথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। ক্রমে ক্রমে কুড়ুল হাতে আরও অনেকে ইহাদের সঙ্গে আসিয়া জোটে।

মাইল দুয়েক দূরে একজন ঠিকাদার কিছুদিন হইল জঙ্গল কাটিতে সুরু করিয়াছে। বড় বড় শাল গাছগুলি কাটিয়া জঙ্গলের দুর্গম পথ বর্ষায় দুর্গমতর হইবার আগে নিকটবর্তী ষ্টেশনে চালান করিতে হইবে, তাই চালাক ঠিকাদার দৈনিক বেশি মজুরী দিয়া আশপাশের গ্রাম হইতে বহু কুলী সংগ্রহ করিয়াছে। জঙ্গলের মাঝখানে খানদুই কুশের ঘর বাঁধা হইয়াছে—তাহাই ঠিকাদারের আবাসস্থান, আপিস, গুদাম ইত্যাদি সব। সকাল হইতে কুলিরা আসিয়া জোটে, সারাদিন গাছ কাটা হয়, ডালপালা ছাঁটিয়া বাকল ছাড়াইয়া স্থানে স্থানে গাদা করা হয়, তার পরে গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ষ্টেশনের পথে চালান করা হয়। গ্রামের অনেকের সঙ্গে তিলকা কিছুদিন হইল এই কাজে ভর্তি হইয়াছে।

তিলকা আর রুকিয়া প্রায় সমবয়সী, জাতে তাহারা ঘাটোয়ার, ক্ষেতখামার নাই, তাই বড় গরীব। তিলকা মজুর খাটিয়া যে সামান্য রোজগার করে তাহাতেই অতিকষ্টে তাহাদের সংসার চলে। গ্রামে কাজ না জুটিলে তিলকাকে মাঝে মাঝে বিদেশেও যাইতে হয়। এবার কপালগুণে গ্রামেই ভাল কাজ জুটিয়া গিয়াছে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ভারি খুশী। খাটুনী আছে বটে কিন্তু পয়সাও আছে, আর মাসতিনেক কাজ করিতে পারিলে এ বছরের মত খাবার-পরার ব্যবস্থা ত হইবেই, দু'দশ টাকা হাতেও জমিয়া যাইবে।

তিলকা চলিয়া গেলে রুকিয়া সংসারের কাজে মন দেয়। ছোট ঘর, ছোট্ট আঙিনা, একখানা খাটিয়া, খানতিনেক কাঁসার বাসন ও অনেকগুলি মাটির হাঁড়ি-কলসী লইয়া রুকিয়ার সংসার। ঘর-আঙিনা ঝাঁট দেয়, থালা-ঘটি হাঁড়িকুড়ি ধোওয়াধুয়ি করে তার পরে মুখ-হাত ধুইয়া সে তিলকার পরিত্যক্ত জলপানটুকু লইয়া বসে। ইতিমধ্যে রোদ আঙিনার মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছয়, সেদিকে নজর পড়িতেই রুকিয়া ব্যস্ত হইয়া ওঠে, রান্না চাপাইতে হইবে—বেলা যে অনেকখানি হইয়া গেল। মাথায় কলসী লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের বাড়ীর কুয়া হইতে জল লইয়া আসে, তার পরে উনুন ধরাইয়া ভাত চাপাইয়া দেয়, তরকারী খুঁজিতে গিয়া দেখে কিছুই নাই। আবার ছুটিয়া যায় সই টিপনীর বাড়ী, তাহার ক্ষেত হইতে কিছু শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া আনে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে আঙিনার রোদখানি কতদূর অগ্রসর হইল তাহা দেখিয়া লয়।

২

মাথায় কাপড় ঢাকা একটি ছোট ঝুড়ি লইয়া প্রতিবেশিনী গুলবার মা আঙিনায় ঢুকিয়া বলে, "কই গো বউ, কি করছিস।"

ঘরের ভিতর হইতে রুকিয়া বলে, "এই যে মা।"

রুকিয়ার রান্না শেষ হইয়াছে। একটা বড় বাটিতে ভাত ঢালিয়া তাহার একপাশে যত্ন করিয়া শাকের ঘণ্ট রাখে, শালপাতায় কিছু নুন-লঙ্কা লয়, ঘরের কোণ হইতে ছোট ঝুড়িটি আনিয়া ভাতের বাটি, নুন-লঙ্কা ও এক ঘটি জল তাহার ভিতর সাজাইয়া কাপড় ঢাকা দেয়। গুলবার মা ডাকে, "হয়েছে রান্না তোর।"

ঝুড়িটি মাথায় তুলিয়া লইয়া পরসাদের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে রুকিয়া ঘরের বাহির হইয়া আসে, দেখিয়া গুলবার মা বলে, "এই যে তৈরি হয়ে নিয়েছিস, চল, বেলা হতে চলল, এক ক্রোশ পথ যেতে হবে।"

ঘরের দরজায় তালা লাগাইয়া আঙিনার দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া গুলবার মায়ের সঙ্গে রুকিয়া পথে বাহির হয়। এ গলি ও গলি ঘুরিয়া যাইতে যাইতে মঙ্গুয়ার বউ, সরযুর বউ, বৈজুর মেয়ে একে একে আসিয়া জোটে। দুপুরে খাইবার জন্য কুলিদের দু'ঘণ্টা ছুটি হয়, কিন্তু এত অল্পসময়ে বাড়ী আসিয়া নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া বৈশাখের রোদে আবার দু'মাইল পথ ছুটিয়া গিয়া কাজে লাগা খুবই কষ্টকর, তাই বাড়ীর মেয়েরা তাহাদের দুপুরের খাবার সময়মত কাজের উপরেই পৌঁছাইয়া দেয়।

গ্রামের কোলে ধান ক্ষেত, সঙ্কীর্ণ আলের উপর দিয়া মাথায় ঝুড়ি লইয়াও মেয়েরা অতি সহজভাবেই চলিতে থাকে। ঝাঁ ঝাঁ করে বৈশাখের রোদ, ছায়ার নামমাত্র কোথাও নাই, মাঝে মাঝে গরম বাতাস ধুলা উড়াইয়া ঝড়ের মত বহিয়া যায়, ইহাদের কিন্তু তাহাতে বিশেষ কষ্ট হয় না, দিব্যি গল্প করিতে করিতে পথ চলিতে থাকে। রুকিয়া পরসাদকে কোলে তুলিয়া আঁচল ঢাকা দেয়।

ক্ষেতের শেষে মাঠ শুরু হইয়াছে, উঁচুনীচু কাঁকরময় মাঠ, ঘাসের নামমাত্র নাই, কেবল রোদে-পোড়া শীর্ণ কুলের ঝোপ আর মাঝে মাঝে মহুয়াগাছ। পায়ে-চলার সরু পথটা ভাঙিয়া উঠিয়াছে, চলিতে চলিতে মেয়েরা মহুয়াগাছের নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। মহুয়ার নীচে নিবিড় ছায়া, চৈত্র মাসে পাতা ঝরিয়া গিয়া ফুল ফোটা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আবার পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তাভ কচিপাতায় নগ্ন ডালপালা ভরিয়া গিয়াছে। মেয়েরা গায়ের আঁচল সরাইয়া আরামের নিশ্বাস ফেলে, রুকিয়া ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দেয়। বেশিক্ষণ এ আরাম ভোগ করিবার উপায় নাই, তাহারা আবার পথ ধরে। মাঠের শেষে নদী, মেয়েরা নদীতে গিয়া নামে। প্রশস্ত চড়ার এক প্রান্ত দিয়া অতি শীর্ণ একটি জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। কতকগুলি বড় বড় পাথরের পাশে একটা জামগাছ খানিকটা ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মেয়েরা সেইখানে গিয়া মাথার ঝুড়ি নামাইয়া পাথরের উপর বসে। নীচেই জল, আঁজলা ভরিয়া কেউ জল খায়, কেউ তপ্ত পা দুটি স্রোতে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করে। রুকিয়া পরসাদের আরক্ত মুখখানা হাতে জল লইয়া ভাল করিয়া মুছাইয়া দেয়, তার পরে আঁজলা দুই জল খাইয়া ঝুড়ি তুলিয়া মাথায় রাখে। বৈজুর মেয়ে টুকনী বলে, "আর একটু বোস ভৌজি, এত তাড়া কিসের, বারোটা ত বাজে নি।"

রুকিয়া বলে, "বারোটার আর দেরি কি, খাটিয়ে মানুষের খিদে পায়, দেরি হলে রাগ করবে।"

টুকনী আরাম ছাড়িয়া উঠিতে চায় না, বলে, "আহা, আমরাও ত যাব, আমাদেরও বাপভাই কাজ করছে।"

রুকিয়া জবাব দেয় না, পরসাদের হাত ধরিয়া অগ্রসর হয়—আর সকলেও উঠিয়া পড়ে।"

নদীর পার হইতে জঙ্গল শুরু হয়। শালবনের মধ্য দিয়া সরু পথ, আলোছায়ায় ঝিলমিল করে। রোদের তাত এখানে কম, হাওয়াও তেমন গরম নয়, মেয়েরা তাড়াতাড়ি পা চালায়, মাঝে মাঝে খুট খুট আওয়াজ কানে আসে, যেখানে গাছকাটা চলিতেছে সেখানটা আর বেশী দূরে নয়। গুলবার মায়ের বয়স বেশী, তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না

রুকিয়াকে বলে, "অত ছুটছিস কেন বউ, ওদের ছুটি এখনও হয় নি, ধীরেসুস্থে চল।"

রুকিয়া দাঁড়ায়, হাসিয়া বলে, "না মা, ছুটব কেন?"

চলিতে চলিতে গুলবার মা প্রশ্ন করে, "কি রাঁধলি আজ?"

রুকিয়া বলে, "মরদের জন্তে ভাত আর শাকভাজা, আমার জন্তে মজুয়ার লেপসি রেঁধে রেখেছি।"

গুলবার মা বলে, "তাই নাকি?"

রুকিয়া বলে, "হ্যাঁ মা, যে মরদ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে তার সামনে দুটো ভাত না দিলে সে পারবে কেন? আমি ত ঘরে বসে থাকি, আমি লেপসি খাব না ত কি।"

গুলবার মা মরদের সঙ্গে বলে, "আহা, ঠিককথা বলেছিস বউ।"

৩

বড় একটা পলাশগাছের নীচে কুড়ুলখানা ফেলিয়া দিয়া মাথায় বাঁধা গামছাখানা খুলিয়া তিলকা মুখের ঘাম মোছে। এইমাত্র দুপুরের ছুটি হইয়াছে, কুলিরা সুবিধামত গাছের ছায়ায় আশ্রয় লইতেছে। দেখিতে দেখিতে গুলবা, বৈজু, মনুয়া আসিয়া জোটে। গামছা ঘুরাইয়া হাওয়া করিতে করিতে গুলবা বলে, "বাপরে কি গরম, জান বেরিয়ে যাবার দাখিল।"

তিলকা সংক্ষেপে উত্তর দেয়—বলে, "হুঁ।"

গুলবা চারিদিকে তাকাইয়া দেখে—বলে, "সরযু কোথায় রে?"

তিলকা বলে, "জানি নে।"

হঠাৎ আর একটা গাছের ছায়ায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া গুলবা বলে, "ঐ যে শালা ঐখানে বসেছে, শালার সুন্দরী বউ কিনা তাই কাছাকাছি বসে না।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। তিলকা বলে, "বড্ড পরের বউয়ের উপর নজর দিচ্ছিস আজকাল গুলবা, বছরখানেক হ'ল তোর বউ মরেছে, একটা বিয়ে করে ফেল।"

মনুয়া বলে, "করবি বিয়ে গুলবা? বলিস ত ঘটকালি করি। আমার এক শালী আছে, ভারি খাটিয়ে মেয়ে, বেশ ডাগড়া, একটি থাপ্পরে তোকে কাত করে দেবে।"

হো হো করিয়া সকলে আবার হাসিয়া ওঠে।

বনের পথে মেয়েরা খাবার লইয়া আসিতে সুরু করে। এখানে ওখানে গাছের ছায়ায় ক্ষুধার্ত কুলিরা খাইতে বসিয়া যায়। কথাবার্তায় স্থানটা মুখর হইয়া ওঠে।

তিলকা বলে, "মনুয়াদা, ওরা সব কোথায় গো।"

মনুয়া একবার পথের দিকে তাকাইয়া বলে, "আসবে এখুনি, এক ক্রোশ পথ আসতে হবে।"

ক্ষুধার্ত তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, "পথ ত এক ক্রোশ ঠিকই, একটু আগে বেরুলে কি হয়?"

মনুয়া বলে, "তোর আক্কেল নাই, রেঁধে-বেড়ে তবে ত বেরুবে।"

তিলকা রাগিয়া ওঠে, ঝাঁজের সঙ্গে বলে, "আক্কেল আমার আছে—ওদেরই নাই।"

ঝুড়ি নামাইয়া রুকিয়া জলের ঘটিটা তিলকার দিকে আগাইয়া দেয়। তিলকা অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ঘটিটি তুলিয়া লইয়া হাতেমুখে জল দেয়—কথা বলে না। রুকিয়ার ভিতরটা ভয় ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আসে, মৃদুকণ্ঠে বলে, "আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।"

তিলকা তবু কথা কয় না। ভাতের বাটিটা তাহার সামনে রাখিয়া রুকিয়া বলে, "ছেলেটাকে কোলে নিয়ে এতটা পথ তাড়াতাড়ি আসতে পারি নে।"

ভাতের গ্রাস মুখে পুরিয়া এইবার তিলকা বলে, "ছেলেটাকে রোজ টেনে আনিস্ কেন এ রোদে?"

"কার কাছে রেখে আসব?" বলে রুকিয়া।

জবাব দেয় না তিলকা, গোঁজ হইয়া খাইতে থাকে। পেটে ভাত পড়ায় ক্রমে তাহার মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া আসে, মায়ের কোলের কাছে দাঁড়ান ছেলেটাকে টানিয়া পাশে বসায়, ভাত তুলিয়া তাহার মুখে দেয়। রুকিয়া এতক্ষণে হাসে।

খাওয়া শেষ করিয়া গামছাখানা পাতিয়া তিলকা পা ছড়াইয়া বসে, ছেলেকে কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়। এঁটো বাটিটা ধুইয়া রুকিয়া ঝুড়িতে তুলিয়া রাখে। তিলকা রুকিয়ার দিকে তাকাইয়া চুপি চুপি ছেলেকে বলে, "আরে পরসাদ, মায়ের সঙ্গে বাড়ী যাবি, না থাকবি আমার কাছে?"

পরসাদ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "থাকব বাবা।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।" তিলকা বলে, "তুই মরদ, কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটবি, পয়সা কামাই করবি।"

ছেলে বলে, "হ্যাঁ বাবা।"

রুকিয়া হাসিয়া ফেলে, তিলকাও হাসে।

"খৈনি দে একটু, আরে তিলকা।" গুলবা কাছে আসিয়া বলে।

"খৈনি নেই।" জবাব দেয় তিলকা।

"আরে বার কর, বার কর, এক টিপ খৈনি দিলে পরসাদের মায়ের হাঁসুলি বাঁধা পড়বে না।" বলে গুলবা।

ট্যাঁক হইতে খৈনির কৌটাটি বাহির করিতে করিতে তিলকা বলে, "নেই বলছি, তা তুই বিশ্বাস করবি নে—এই দেখ্।"

কৌটাটা সামনে ধরিতেই গুলবা ছোঁ মারিয়া সেটা তুলিয়া লয়, সামান্য একটু খৈনির গুঁড়ো হাতে ঢালিয়া লইয়া বলে, "সত্যিই নেই রে, বলি পরসাদের মা খৈনির পয়সাটা দেওয়াও বন্ধ করেছ নাকি?"

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া হাসিয়া রুকিয়া বলে, "পয়সা দেবার মালিক আমি নাকি?"

"চল ভৌজি, চল।" হাঁকে বৈজুর মেয়ে টুকনী।

রুকিয়া তাকাইয়া দেখে মনুয়ার বউ, গুলবার মা সকলে যে যাহার ঝুড়ি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রুকিয়াও উঠিয়া পড়ে। তিলকার কোল হইতে ছেলেকে নিজের কোলে তুলিয়া লয়, তিলকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঝুড়িটা রুকিয়ার মাথায় চাপাইয়া দিতে দিতে বলে, "ভারি রোদ গো।"

তিলকার দরদটুকু রুকিয়ার মনকে খুশীতে ভরিয়া দেয়, হাসিয়া বলে, "যাবার মুখে তেমন রোদ লাগবে না।"

বনের পথ ধরিয়া মেয়েরা ফিরিয়া চলে। এবার তাড়া নাই, গতি একটু মন্থর। আগে আগে আর একটি মেয়ে যায়, কাপড়চোপড় বেশ ছিমছাম, চলনটাও একটু কেমন কেমন।

রুকিয়া বলে, "কে যায় রে, চিনতে পারছি নে।"

"তুই ত কাউকেই চিনিস নে পরসাদের মা।" বলে মনুয়ার বউ, "ওর ঠমক দেখেই আমি চিনেছি ওকে।"

রুকিয়া মনুয়ার বউয়ের কাছে ঘেঁষিয়া আসে—বলে, "কে গা ও?"

"রামিয়া গো রামিয়া, সোমরার বোন, দেখনি কোনদিন?" বলে মনুয়ার বউ।

এতক্ষণে রুকিয়া চিনিতে পারে, বলে,—"ও পাড়ার মেয়ে, দেখিনে ত হামেশা।"

ঠোঁট উল্টাইয়া মনুয়ার বউ বলে, "আজ আবার নতুন শাড়ী পরেছে, লজ্জাও নাই ছুঁড়ির।"

"কি হয়েছে বল না দিকি।" উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করে রুকিয়া।

"কি আর হবে?" ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলে মনুয়ার বউ, "ঠিকাদারের সঙ্গে।" হাসিয়া থামিয়া যায় মনুয়ার বউ।

তাহাকে চিমটি কাটিয়া রুকিয়া বলে, "ডাক না দিদি ওকে।"

মনুয়ার বউ বলে, "তুই ডাক, আমি ও হারামজাদীকে ডাকব না।"

পিছন হইতে বৈজুর মেয়ে টুকনী হাঁকে, "রামিয়া দিদি, রামিয়াদিদি গো।"

থামিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় রামিয়া। ফরসা রং, পরিপুষ্ট চেহারা; গলায়, হাতে, পায়ে প্রায়সর্বাঙ্গেই রামিয়ার গহনা। সকলে কাছে আসিতেই রামিয়া ভ্রূ বাঁকাইয়া প্রশ্ন করে, "কি বলছ?"

গুলবার মা বলে, "কি আর বলছি, বলছি যাব এক গাঁয়েই ত একসঙ্গেই সব চল না।"

"আমাদের কত কাজ, তোমাদের মত অত ধীরেসুস্থে চলতে পারিনে আমি—।" বলে রামিয়া।

"স্বামী নেই, পুত্তর নেই, ওঁর যত কাজ।" জবাব দেয় মনুয়ার বউ।

রুখিয়া উঠে রামিয়া, বলে, "স্বামী-পুত্তরের বড়াই আজ করছিস, কাল কি হবে বলতে পারিস্?"

"কি বললি?" চেঁচাইয়া ওঠে মনুয়ার বউ।

তাড়াতাড়ি মাঝখানে আসিয়া গুলবার মা বলে, "আহা, থাম থাম, হেসে-খেলে একসঙ্গে চল, ঝগড়াঝাঁটি কেন বাপু।"

ঝগড়াটা যেমন হঠাৎ সুরু হয় তেমনি হঠাৎ থামিয়া যায়। চুপ করিয়া সকলে চলিতে থাকে, মনুয়ার বউ রুমিয়ার গা টেপে।

নদীতে নামিয়া মেয়েরা জামগাছের ছায়াটিতে আসিয়া আবার জমা হয়। রামিয়া একধারে বসিয়া হাতমুখ ধোয়, তার পরে আঁচল খুলিয়া হাওয়া করে। গয়নাপরা রামিয়াকে রুকিয়া ভারি সুন্দর দেখে। মনুয়ার বউ রুকিয়ার কানে কানে বলে, "হাওয়া খাচ্ছে না ত গয়না দেখাচ্ছে।"

বৈজুর ডেঁপো মেয়েটা রামিয়ার কাছে গিয়া বসে, বলে, "রামিয়াদি, তোমার কানের ফুল জোড়া ত ভারি সুন্দর।"

মাথাটা একবার নাড়িয়া রামিয়া বলে, "সুন্দর হবে না, খাঁটি চাঁদির জিনিস, পয়সা খরচ করে করেছি।"

টুকনী বলে, "আর ঐ হাঁসুলিটা, কত ভরির হবে?"

হাঁসুলিটি দু'একবার ঘুরাইয়া বুকের উপর ঠিক করিয়া বসাইয়া রামিয়া বলে, "তিরিশ ভরির হাঁসুলি—বড্ডই হালকা।"

শুনিয়া রুকিয়া অবাক হইয়া যায়, তাহার একগাছা বারো ভরির হাঁসুলি আছে, সেটাকেই সে একটা ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করে। তিরিশ ভরির হাঁসুলি যদি হালকা হয়, তাহা হইলে তাহার বার ভরির হাঁসুলি যে অতি তুচ্ছ।

রামিয়া বলিয়া যায়, "হাতের কাঙনা জোড়া দশ ভরি

আর বাজু ছ'ভরির। বাজু আমার পছন্দ নয়, এটা ভেঙে আরও পাঁচ ভরি চাঁদি দিয়ে চুড়ি গড়াবো।"

কাঙনাসমেত হাতখানি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া রামিয়া বলে, "চুড়ি না হলে কাঙনা মানায় না।"

রামিয়ার কাঙনাপরা হাত দু'টিকে রুকিয়া ভারি সুন্দর দেখে, নিজের নগ্ন হাত দু'টি সে আঁচল টানিয়া ঢাকিয়া দেয়।

মনুয়ার বউ রুকিয়ার কানে কানে বলে, "বসে বসে চাঁদির হিসেব দিচ্ছে, কাজের তাড়া গেল কোথায়? কাজের তাড়া কিছু নয় বুঝলি পরসাদের মা, লুকিয়ে আসে লুকিয়ে যায়। দেখেছিস কখনো আমাদের সঙ্গে আসতে ওকে?"

রুকিয়ার ভয় হয় পাছে রামিয়া শুনিয়া ফেলে, চুপি চুপি মনুয়ার বউকে থামিতে বলে।

"হয়েছে, অত ভয় কিসের লো!" বলিয়া মনুয়ার বউ উঠিয়া পড়ে।

৪

"পরসাদ, আরে পরসাদ।"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, আঙিনাতে খাটিয়া বিছাইয়া রুকিয়া ছেলেকে লইয়া শুইয়াছিল, ডাক শুনিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। তিলকা ক্লান্তপদে আসিয়া খাটিয়াতে ছেলের পাশে বসে। রুকিয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া বলে, "হাতমুখ ধুয়ে বোস্—রান্না হয়ে গেছে!"

পরসাদকে কাছে টানিয়া তিলকা বলে, "যাচ্ছি।"

রুকিয়া ঘরে ঢুকিয়া ডিবিয়া ধরায়, ধূমায়িত শিখায় ঘরের ভিতরটা সামান্যভাবে আলোকিত হইয়া ওঠে। একেবারেই রিক্ত ঘর, ঘরের একদিকে উনুন, পাশে রান্নার হাঁড়িকুড়ি, আর একদিকে সরা ঢাকা কয়েকটা কলসী, কোণে দড়িতে রাখা খানকয়েক ময়লা কাপড়-চোপড়, ছোট কুলুঙ্গীতে টিনের আয়না ও কাঠের কাঁকুই, দেওয়ালে ঝুলানো একটা মাদল। রুকিয়া ডিবিয়া আনিয়া উনুনের ধারে রাখে, হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া কালো রঙের হালুয়ার মত একটা পদার্থ হাতায় করিয়া বাটি ভর্তি করে, তাহার উপর খানিকটা নুন ও লঙ্কা ছড়াইয়া এক হাতে ডিবিয়া অন্য হাতে বাটিটা তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসে।

খাবারে হাত দিয়া তিলকা বলে, "মকুয়ার লপসি বেঁধেছিস যে।"

রুকিয়া বলে, "হুঁ, চাল নেই ত আর।"

খানিকটা লপসি মুখে তুলিয়া দিয়া তিলকা বলে, "ভাত আর খেতে হবে না, চালের দর যে রকম বেড়ে চলেছে। টাকায় পুরো ছ'সেরও দেয় না।"

"তুই এক কাজ কর।" বলে রুকিয়া, "রবিবারের হাটে আধ মণ মকুয়া কিনে রাখ, গরিব আবার ভাত খায় কবে?"

ঘাড় নাড়িয়া তিলকা বলে, "তাই করব।"

খাওয়া শেষ করিয়া তিলকা খাটিয়ায় বসিয়া খৈনি টেপে, রুকিয়া তাহার পরিত্যক্ত লপসির সঙ্গে আরও কিছুটা লইয়া খাইতে বসে।

ডিবিয়াটা নিভিয়া গিয়াছে, আকাশে অসংখ্য তারা জলজল করিতেছে, ঝিরঝিরে একটা বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে, খাটিয়ার একপাশে পরসাদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া বলে, "পা একটু টিপে দি।"

"দে।" বলিয়া তিলকা পা দুখানা ছড়াইয়া দেয়, রুকিয়া খাটিয়ার একটি ধারে বসিয়া ধীরে ধীরে পা টেপে। ক্লান্ত পায়ের উপরে হাতের চাপ পড়িতেই তিলকা পরম আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বোঁজে।

গলিতে গুলবার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, ডাকে, "আরে তিলকা, মাদলটা নিয়ে আয়, একটু নাচগান করি, আয় জলদি।"

চোখ বুঁজিয়াই জবাব দেয় তিলকা, "আমি যাব না।"

খানিক বাদে রুকিয়া বলে, "ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

তিলকা পাশ ফিরিয়া বলে, "না।"

"একটা কথা বলব, শুনবি?"

"আমি কি বলেছি শুনব না।"

"তুই ত কতবার বলেছিস আমাকে একখানা চাঁদির গয়না গড়িয়ে দিবি।"

"হুঁ, বলেছি ত।"

"দিবি কবে?"

"দেব, হাতে পয়সা হলেই দেব।"

রুকিয়া কিছুক্ষণ কথা কয় না, নিঃশব্দে পা টেপে। হঠাৎ বলে, "আমার কাছে যে এক কুড়ি টাকা রেখেছিস সেইটে আমাকে দিয়ে দে, আমি হাতের কাঙনা গড়াব।"

তিলকা আশ্চর্য হইয়া বলে, "কাঙনা!"

"হ্যাঁ, কাঙনা, কাঙনা আমার বড় পছন্দ।" বলে রুকিয়া।

তিলকা জবাব দেয় না। রুকিয়া অপেক্ষা করে, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে রামিয়ার কাঙনাপরা দুটি বলিষ্ঠ হাত, ভাবে—কাঙনা পরিলে তাহারও হাত দুটি এই রকম সুন্দর দেখাইবে। তিলকার নীরবতায় সে অধীর হইয়া ওঠে, ক্রমে রাগ হয়, ভাবে কিছু চাহিলেই কেন সে এমন ভাবে এড়াইয়া যাইতে চায়? হঠাৎ ঝাঁজের সঙ্গে

বলিয়া ফেলে, "দিবি নে তা জানি, চুপ করে রইলি কেন, বলেই দে।"

তিলকা জবাব দেয় না। রুকিয়া আরও গরম হইয়া ওঠে, বলে, "তোর হাতে পড়ে আমার কোন সাধ পুরলো না, একটা দিনও পেট ভরে খেতে আর ভালমন্দ পরতে পারলাম না।"

"পেট ভরে খেতে পাসনে ত বেঁচে আছিস কেমন করে?" এইবার রূঢ়ভাবে বলে ওঠে তিলকা।

রুকিয়া জবাব দেয়, "না খেয়ে না খেয়ে আমার হাড় বেরিয়ে গেল, জোয়ান বয়সেই বুড়ী হতে বসেছি। চোখ থাকলে ত দেখবি।"

তিলকা আবার চুপ করিয়া থাকে, রুকিয়ার অসহ্য বোধ হয়, বলে, "বৌকে যে একখানা গয়না দিতে পারে না সে আবার মরদ!"

লাফাইয়া উঠিয়া বসে তিলকা, বলে, "কি বললি হারাম-জাদী!"

রাগে রুকিয়ার গা যেন জলিয়া যায়, বলে, "বললুম, বউ রাখবার মুরোদ নাই তোর।"

তিলকার মাথাটাও গরম হইয়া ওঠে, চেঁচাইয়া বলে, "তবে যা, আর একটা ভাতার কর গিয়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় রুকিয়া, "যাব ত, যাব বৈকি।"

একটা ধাক্কা দিয়া রুকিয়াকে সরাইয়া দিয়া তিলকা ঘরে গিয়া ঢোকে, দেয়ালে টাঙানো মাদলটা তুলিয়া লইয়া দুমদাম পা ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলে, "যা এখুনি, না যাস ত মেরে তোকে তাড়াব।"

একটু পরেই দূর হইতে মাদলের আওয়াজ ভাসিয়া আসে। রাত ক্রমে বাড়িয়া যায়, গান ও বাজনার যেন শেষ নাই। অন্ধকার আঙিনায় ছেলের পাশে রুকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। দূরে মাদলের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। গলির পাশে বড় আমগাছটা অন্ধকারে আরও বড় বলিয়া মনে হয়। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস আসে, গাছের ডালপালা দুলিয়া ওঠে, কোথায় যেন খড়খড় করিয়া আওয়াজ হয়, রুকিয়া ভয় পাইয়া ঘুমন্ত ছেলেকে কোলের কাছে টানিয়া লয়।

দুপুর রাত পার হইয়া যায়, মাদলের আওয়াজও আর শোনা যায় না। মাঠের দিক হইতে একটা জানোয়ার ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে কাছে আসে। রুকিয়া একবার বিহ্বলের মত চারিদিকে তাকায়, তার পরে উপুড় হইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকে।

অন্ধকারে ভূতের মত আঙিনায় ঢুকিয়া রুকিয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় তিলকা। চমকিয়া রুকিয়া উঠিয়া বসে।

"জেগে আছিস এখনও?" আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করে তিলকা।

রুকিয়ার শরীরটা কান্নার বেগে কাঁপিতে থাকে।

"কাঁদছিস কেন গো, কি হয়েছে?" দুই হাত বাড়াইয়া রুকিয়াকে জড়াইয়া ধরে তিলকা, বলে, "রাগ করেছিস—হাঁগা, রাগ করেছিস।"

ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে রুকিয়া, শিথিল ভাবে বলে, "ছাড়।"

৫

পরশু রবিবারে তিন ক্রোশ দূরে চৌধুরীডিতে হাট বসিবে। মেয়েরা সব ময়লা কাপড় কাচাকুচি সুরু করে, এইটা তাহাদের হাটে যাইবার উদ্যোগপর্ব। উনুনের ছাই দিয়া একটা বড় মেটে হাঁড়িতে রুকিয়া নিজের ও তিলকার ময়লা কাপড় দুখানা সারা সকাল সিদ্ধ করে। দুপুরের পরে তিলকার খাবার দিয়া ফিরিয়া কাপড়ের হাঁড়িটি মাথায় ও হাতে একখানা ছোট পিঁড়ি লইয়া বাঁধে গিয়া উপস্থিত হয়। বৈশাখ মাস, বাঁধে বিশেষ জল নাই। উঁচু পাড়ের উপর যেখানটায় বড় অর্জুনগাছটা দাঁড়াইয়া আছে তাহার ছায়ায় হাঁড়িটি নামাইয়া রুকিয়া জলের ধারে পিঁড়িখানা পাতে। পরনের ছেঁড়া শাড়ীখানা সে টানিয়া হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া আঁট করিয়া পরে, আঁচলখানা কোমরে জড়াইয়া বাঁধে, তার পরে সিদ্ধ কাপড় লইয়া পিঁড়ির উপর কাচিতে সুরু করে। আরও দুই-একটি বউ এতক্ষণ আসিয়া জোটে, তাহাদের হাতও চলে, মুখও চলে।

হঠাৎ একটা সৌগন্ধে সচকিত হইয়া রুকিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখে রামিয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। এক হাতে একখানা ফরসা শাড়ী আর এক হাতে সাবান, পিঠের উপর তাহার চুল খোলা। সেই খোলা চুল হইতে সদ্যমাখা ফুলেল তেলের গন্ধে ঘাটের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম সম্বন্ধে রামিয়া রুকিয়ার ননদ, সেই হিসাবে রুকিয়া বলে, "কি দিদি, চান করতে এলি বুঝি?"

"হ্যাঁ ভৌজি।" বলে রামিয়া, "এই গরমে রোজ চান না করে আমি থাকতে পারিনে, গা কেমন করে।"

হাতের কাজ বন্ধ করিয়া রুকিয়া রামিয়ার পরিচ্ছন্ন সান্নিধ্যটা উপভোগ করে। রামিয়া ধীরেসুস্থে জলের ধারটিতে গিয়া বসে, সাবান লাগাইয়া দীর্ঘ পুষ্ট বাহু দুটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মাজে। রুকিয়া কখনও চুলে ফুলেল তেল মাখে নাই, সাবান ঘষিয়া স্নানও করে নাই, অনেকের মুখে ইহার বর্ণনাটা শুনিয়াছে মাত্র। আজ রামিয়ার স্নান করাটা সে অবাক হইয়া দেখে। একবার সাবানখানি হাতে তুলিয়া নাকের কাছে আনিয়া সুন্দর গন্ধটা আঘ্রাণ করে।

রামিয়া হাসে, বলে, "এখানা ত ফুরিয়ে এল, আর একখানা আছে। বাবা, সাবান না হলে আমি চান করতে পারিনে।"

রুকিয়া বলে, "অনেক দাম, তাই না দিদি!"

"দাম!" ভুরু দুটি উপরে তুলিয়া রামিয়া বলে, "এক একখানা সাবান বার আনা করে।"

বিস্মিত রুকিয়া বলে, "সত্যি দিদি!"

রামিয়া বলে, "সত্যি না ত কি, ওর চেয়েও দামী সাবান আমি মেখেছি।"

রুকিয়ার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। সর্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া রামিয়া ঝুপ করিয়া জলে গিয়া নামে, অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করে। রুকিয়া আবার কাপড় কাচিতে সুরু করে, সাবান ও ফুলেল তেলের গন্ধে তাহার মনটা মসগুল হইয়া ওঠে। রামিয়া বাঁধের জলটাই যেন সুগন্ধি করিয়া দেয়। কাপড় কাচা শেষ হইলে রুকিয়া রামিয়ার অলক্ষ্যে তাহার সাবান একটুখানি হাতে ঘষিয়া মুখে মাখে, তার পর তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া কাচা কাপড়সমেত হাঁড়িটি মাথায় করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।

বিকালে রুকিয়ার কাজের অন্ত নাই। সইয়ের বাড়ী গিয়া তাহার ঢেঁকিতে মকুয়া গুঁড়া করা, দু'তিন কলসী জল আনা, ঘর-উঠোন ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি কাজের ফাঁকে সে একবার ছোট আয়না আর কাঁকুই লইয়া বসে। অমন দামী সাবান দিয়া ধোয়াতে মুখের শ্রী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না তাহা সে মুখটি ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া আয়নায় দেখিতে চেষ্টা করে। তেলহীন অসংযত চুলগুলি কিছুতেই পাট হইতে চাহে না, রুকিয়া ভাঁড় হইতে একটুখানি তেল আনিয়া সামনের চুলে ঘষিয়া দেয়, নিজের মুখ সম্বন্ধে আজ যেন সে হঠাৎ সচেতন হইয়া ওঠে। সাবানের গন্ধটা তাহার মুখে এখনও লাগিয়া আছে নিশ্চয়, কাছে আসিলে তিলকা কি বুঝিতে পারিবে? কি ভাবিবে, কি বলিবে সে? তিলকার কাছে তাহার মুখটি অন্য দিনের চেয়ে আজ বেশী ভাল লাগিবে না কি? আয়নার সামনে বসিয়া এই সব ভাবে রুকিয়া।

সন্ধ্যার মুখে মনুয়ার বউ আঙিনায় ঢুকিয়া ডাকে, "কই গো পরসাদের মা, কি করছিস।"

"কিছু না দিদি।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে রুকিয়া।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মনুয়ার বউ বলে, "এত ঘষা মাজা কেন গো?"

বিব্রত হইয়া রুকিয়া বলে, "কই আর ঘষামাজা।"

দোরগোড়ায় বসিয়া পড়িয়া মনুয়ার বউ বলে, "রান্না হয়ে গেছে তোর?"

পাছে আবার সাবানের গন্ধটা তাহার নাকে যায় এই ভয়ে একটু দূরে বসিয়া রুকিয়া বলে, "এ বেলা আগুন জ্বালি নি দিদি, ও বেলায় রাঁধা লপসি রয়েছে।"

"আমারও এ ক'দিন তাই চলছে গো।" বলে মনুয়ার বউ, "পাঁচ-পাঁচটা মুখের অন্ন যোগাতে হবে, তা ঐ একা মানুষ পারবে কেন! দু'বেলাই মকুয়া খাচ্ছি আজকাল। আমার বেনোয়ারী ভাত ভাত করে, বলি—আরে বেটা, আষাঢ় মাসে জল পড়ুক, ধান রোপা সুরু হোক, তখন পেট ভরে ভাত খেতে দেব।"

রুকিয়া পরসাদকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলে, "দেখ না দিদি, আধখানা হয়ে গেছে ছেলেটা!"

পরসাদের থুৎনি ধরিয়া চুমা লইয়া মনুয়ার বউ বলে, "সোনার চাঁদ আমার!"

"উঠি।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় মনুয়ার বউ। এক পা আগাইয়াই ফিরিয়া দাঁড়ায়, চাপা গলায় বলে, "একটু নুন দিবি পরসাদের মা, নুন নেই ঘরে। এই এতটুকু দে, রবিবার হাট থেকে এলেই ফেরত দেব।"

রুকিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ে, বলে, "দাঁড়াও দেখি।" ঘরে ঢুকিয়া নুনের পাত্রে হাত দিয়া দেখে সেখানে যথেষ্ট নুন নাই। তবু কিছুটা নুন লইয়া আসে, মনুয়ার বউকে দিয়া বলে, "বেশি দিতে পারলাম না দিদি, আমারও কাল পর্যন্ত চলবে কিনা সন্দেহ।"

"ঢের দিয়েছিস্।" বলে মনুয়ার বউ, "এতেই আমার হবে।"

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, খাটিয়াটি বিছাইয়া ছেলেকে পাশে লইয়া বসে রুকিয়া। আকাশে একটি দুটি তারা ফুটিয়া ওঠে, গরম বাতাস আর বহে না, পৃথিবী হইতে একটা শীতলতা উঠিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। রুকিয়া গায়ের আঁচলখানা আলগা করিয়া দিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলে। কথা কহিতে কহিতে গলি দিয়া এক দল লোক আসে, রুকিয়া উঠি উঠি করে কিন্তু তাহার দরজায় দাঁড়াইয়া কেহ ডাকে না, লোকেরা চলিয়া যায়। একটু পরে আবার পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, আওয়াজ কাছে আসিয়া ক্রমে দূরে মিলাইয়া যায়। এতক্ষণে আকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে, রুকিয়ার কোলের কাছে পরসাদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একটু দূরে কাহারা দুইজন হাসাহাসি করে, মনুয়ার গলা বলিয়া মনে হয়, রুকিয়া উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়, কাহারও আর সাড়া পাওয়া যায় না।

চুপ করিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না রুকিয়া। ঘরে ফিরিতে তিলকার আগেও এক-আধদিন দেরি হইয়াছে বটে, তবু রুকিয়া চিন্তিত হইয়া পড়ে। রাত আরও বাড়িয়া যায়, রুকিয়া কি করিবে ঠিক করিতে পারে না, হঠাৎ মনে হয়, ছুটিয়া মনুয়ার বাড়ী গিয়া খবরটা লইয়া আসে।

আঙিনার দরজাটা ভেজাইয়া গলি ধরিয়া সে তাড়াতাড়ি মনুয়ার বাড়ীর দিকে চলে। কিন্তু মোড়ের কাছে আসিতেই পিছনে পায়ের আওয়াজ পাইয়া থামিয়া যায়, আবার সে ফিরিয়া আসে, আঙিনার দরজাটা খোলা দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভিতরে ঢোকে। একটা গর্জ্জন করিয়া তিলকা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, "কোথায় গিয়েছিলি?"

মুহূর্ত্তে রুকিয়া বুঝিতে পারে তিলকা ভাটিখানা গিয়া মদ খাইয়া আসিয়াছে।

"বল হারামজাদী বল, এত রাত্রে ঘর থেকে কোথায় গিয়েছিলি?"

বেসামাল ভাবে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তিলকা বলে, "বল শীগগির।"

এক পা পিছনে সরিয়া গিয়া রুকিয়া বলে, "যাব আবার কোথায়, তোরই খবর নিতে বেনোয়ারীর মায়ের কাছে যাচ্ছিলাম।"

চেঁচাইয়া তিলকা বলে, "মিছে কথা বলছিস, বল কোথায় গিয়েছিলি।"

রুকিয়া রাগিয়া ওঠে, বলে, "এত চেঁচাচ্ছিস কেন?"

তিলকা তাহার একটা হাত ধরিয়া বলে, "কার সঙ্গে পীরিত করতে গিয়েছিলি বল।"

ঝাঁকানি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া রুকিয়া কঠিনভাবে বলে, "যা খুশী তাই বলিস নে বলছি।"

"তবে রে হারামজাদী।" চেঁচাইয়া ওঠে তিলকা, হাত বাড়াইয়া রুকিয়ার ঘাড়টা ধরিয়া ফেলে, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলে, "মেরে ফেলব আজ তোকে।"

প্রচণ্ড আঘাতে রুকিয়ার মাথাটা ঝিমঝিম করিয়া ওঠে, পড়িতে পড়িতে টাল সামলাইয়া ছুটিয়া কোনমতে খাটিয়ার ওপাশে গিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে আবার ধরিতে গিয়া তিলকা আঙিনার মাঝখানে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়, উঠিতে চেষ্টা করিয়াও বিষম নেশার ঝোঁকে উঠিতে পারে না, সেইখানে বসিয়া গালাগালি করে।

রুকিয়ার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। একটা রাগ মনের মধ্যে ঘনাইয়া ওঠে, মনে হয়—তিলকার মাথায় কাঠের পিঁড়িখানা দিয়া এক ঘা বসাইয়া দেয়। ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। তিলকা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আবোলতাবোল বকিতে থাকে, প্রহর কাটিয়া যায়, ক্রমে কথা জড়াইয়া আসে, রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে।

রুকিয়া ছেলের কাছে আসিয়া খাটিয়ার উপর বসে। মুখের যেখানটায় তিলকা ঘুষি মারিয়াছিল সেখানটা টনটন করিতে থাকে, মাঝে মাঝে সেখানে সে হাত বুলায়। অন্ধকারের মধ্যে আঙিনার মাঝখানে ঘুমন্ত তিলকা তাহার চোখে অদ্ভুত দেখায়, মনে হয় একটা প্রাণহীন পদার্থ পড়িয়া আছে। সমস্ত বিকালটা ইহাকে লইয়া সে কত কল্পনাই না করিয়াছে। সাবানের গন্ধটুকু বুঝি এখনও তাহার মুখে লাগিয়া আছে। রুকিয়ার চোখে আবার জল আসে, এবার রাগে নয়—দুঃখে।

রাত অনেক হইয়া যায়। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। এক-একবার বাতাসে আমগাছের ডালগুলি দুলিয়া ওঠে। ঘুমের মধ্যে তিলকা একবার পাশ ফেরে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। রুকিয়া আবার তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। একটি হাত মাটিতে প্রসারিত করিয়া আর একটি হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া আছে, এই ভাবে তাহাকে যেন বড়ই অসহায় দেখায়। রুকিয়ার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ কেমন করিয়া ওঠে। কত যেন মদ খাইয়াছিল তাই সন্ধ্যায় অমন পাগলামি করিয়াছে। খালি পেটে মদ পড়িলে মানুষের জ্ঞান থাকে না, তাহার বাপভাইকে এমন কতবার দেখিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা এক থালা ভাত খাইয়াও পেট ভরে না, আজ ত কিছুই খায় নাই—আহা!

রুকিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না, উঠিয়া আসে, তিলকার মাথার কাছে বসিয়া এলোমেলো চুলগুলি সরাইয়া দেয়। তার পরে আস্তে ধাক্কা দেয়, ডাকে, "এই ওঠ।"

মাতালের ঘুম সহজে ভাঙিতে চায় না। রুকিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানে।

এইবার সাড়া দেয় তিলকা, বলে, "কি।"

মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া রুকিয়া বলে, "ওঠ—খাবি নে?"

উঠিয়া বসে তিলকা। ঘুমাইয়া নেশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, চারিদিকে তাকাইয়া বলে, "খাই নি আমি—কেন?"

রুকিয়া বলে, "খাবি কি, মদ খেয়ে এসে যা কাণ্ড করলি।"

তিলকার মনে পড়িয়া যায় ছুটি হইলে গুলবার সঙ্গে সে মাইলখানেক দূরে ভাটিখানায় গিয়া দু'বোতল মদ খায়। ইহার বেশি তাহার আর কিছু মনে পড়ে না। গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলে, বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম বুঝি! শালা গুলবা ধরে ভাটিখানায় নিয়ে গিয়েছিল, শালা।"

পিঠের ধুলা ঝাড়িয়া দিয়া রুকিয়া বলে, "ওঠ—খাবি চল।"

রুকিয়াকে ধরিয়া তিলকা উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, "চল।"

ক্রমশঃ

হিন্দী শিখব কি ?

শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী শিখ। হিন্দীভাষীরা আমাদের হিতার্থে এই উপদেশ প্রায়ই দিয়ে থাকেন। এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। করুন, তাতে ক্ষতি নেই। অনেককাল আগে একটি বাল্যশিক্ষার বই দেখেছিলাম। একটি ছোট ছেলের বই। পাতা উল্টাতে উল্টাতে মনস্তত্ত্বের এক[illegible] গূঢ় ইঙ্গিত পেলাম—ছেলেটি হিতবচনগুলোর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেছে। 'সদা সত্য কথা বলিবে'র পর "না" যোগ হয়েছে। 'পরের দ্রব্য না বলিয়া নিবে না'র "না" বিয়োগ হয়েছে। উপদেষ্টারা সাধারণতঃ ভুলে যান যে, মাগনা জিনিস কেউ ছুঁতে চায় না। 'হিন্দী শিখ' শুনলে হয়ত এজন্যই মনে মনে আমরা ঐ ছেলেটির মত একটি 'না' যোগ করে দিই। দৃষ্টান্ত—'হিন্দী শিক্ষার আসর' আরম্ভ হলেই আমাদের রেডিও বন্ধ হয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিক এই বিরূপতাটুকু ঝেড়ে ফেলা উচিত, নচেৎ প্রশ্নের সম্যক বিচার সম্ভব হবে না। অর্থাৎ উপদেশের দিকটা ভুলতে হবে। ভোলা অবশ্য সহজ নয়। উপদেশের কেউ পিছনে লেগেই আছে; অধিকন্তু বিরূপতা সংস্কাররূপে অবচেতনে কাজ করে। তবুও চেষ্টা করা উচিত, কারণ প্রশ্নটি "গুরুত্বপূর্ণ।" অজান্তিতে যদি একটি 'না' যোগ হয়ে থাকে 'পরিস্থিতি' সঙ্কটপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়।

কিছুদিন যাবৎ আমাদের দেশে একটি বহু-ব্যাপক ব্যাধি দেখা দিয়েছে—নাম তার "রাজনীতি।" চাউলে কাঁকর থাকবে কি না, কার লেখা বই পড়ানো উচিত, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য কি না, চোর-ছেঁচড়কে সাজা দেওয়া সঙ্গত কিনা, ইত্যাদি সব সমস্যারই সমাধান হয় রাজনীতির দিক থেকে। সুনীতিবাবু প্রথম মত দিলেন, 'হিন্দী শিখ'; পরে একটি 'না' যোগ করে দিলেন। ছোট ছেলেটির মত নয়, অনেক কিছু দেখে মত বদলাতে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু 'হাঁ' এবং 'না' উভয়ের পিছনে ছিল রাজনৈতিক কারণ, যদিও পরামর্শ তিনি দিয়েছেন রাজনৈতিক হিসাবে নয়, ভাষাবিদ্ বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভাষা ও সাহিত্যের দিকটি সকলেই প্রায় এড়িয়ে চলেন, বা রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন। তার পর রাজাকে সন্তুষ্ট করা প্রজার অবশ্য কর্ত্তব্য, আখেরের ভাবনাও আছে সম্যক দৃষ্টি নিয়ে তাই মৌলিক প্রশ্নটার বিচার হয় না।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন মাতৃভাষা। প্রথমেই দেখা দরকার ভাষান্তর শেখবার অসুবিধা কি? ইংরেজী ভাষা শিখতে গিয়ে যা বিড়ম্বনা ভোগ হয়েছে তা সকলেই জানেন। সাহেবরা এককালে আমাদের ইংরেজীতে Babu's English ব'লে বিদ্রূপ করতেন। তার পর প্রশংসাপত্র লাভ হয়েছে, কিন্তু বিড়ম্বনা ঘোচে নি। মুলক রাজ আনন্দ ভাল ইংরেজী লেখেন, বই আছে, নাম আছে। তাঁর একটি গদ্য-উদ্ধৃতি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়। একজন ইংরেজ অধ্যাপক সেই উদ্ধৃতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন, এক পাতায় তিন রকম প্রকাশভঙ্গি বা style, কোন ইংরেজ এ জাতীয় ভাষা লেখে না। দেখিয়ে দিলেন বলে চোখে পড়ল, কিন্তু ছোটখাট এমনি ভুলত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয়। ফার্সীর একজন অধ্যাপক একটি গল্প বলছিলেন। আরবী-ফার্সীর যেটি প্রামাণিক শব্দকোষ তার রচয়িতা ছিলেন একজন ইরাণী। বিশ বৎসর আরবদেশে থেকে আরবীতে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে শব্দকোষটি লেখেন। লোকের নিকট তিনি আরবদেশীয় বলেই পরিচিত ছিলেন, এবং সেই পরিচয়ের প্রভাবে একটি আরবদেশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। একদিন তাঁর স্ত্রীকে তিনি বারান্দার বাতিটি নিভিয়ে দিতে বলেন। স্ত্রী তাঁর কথা শুনেই বিবাহ-বিচ্ছেদ করে ফেললেন, বললেন, "তুমি আমাকে ঠকিয়ে বিয়ে করেছ, 'বাতি নিবিয়ে দাও' বলে তুমি যে 'কথা' ব্যবহার করেছ তা হচ্ছে ফার্সী কথা বা idiom-এর আরবী তর্জ্জমা, তুমি নিশ্চয় ইরাণী।' তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দী সম্বন্ধে আমাদের এই অসুবিধা চিরদিনই থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দীর উচ্চারণ। একবার দিল্লী থেকে রাঁচী আসছিলাম। কামরাতে অধিকাংশ ছিলেন শিখ, পাঞ্জাবী, দিল্লীওয়ালা, ইত্যাদি। যতদূর মনে পড়ে, টুণ্ডলা ষ্টেশনে আসতেই একজন শিখ ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, এবার আমরা 'হাম্-তুম্'-এর মুলুকে এসেছি। তার পর আরম্ভ হ'ল উত্তর প্রদেশীয়দের হিন্দীর রসাল ব্যঙ্গ। রাঁচীতে এসে একটি চা-এ নিমন্ত্রণ পেলাম; অভ্যাগতদের ভিতর তিন-চার জন উত্তরদেশীয় ও একজন বিহারী। বিহারী ভদ্রলোকের একটু কাজ ছিল, আগেই উঠে গেলেন। তখন উত্তরপ্রদেশীয় যে ক'জনা ছিলেন তাঁরা বিহারীদের হিন্দী ও কথা বলার ঢং অনুসরণ করে কেরিকেচার সুরু করলেন। আমি প্রাণ ও মানের দায়ে ইংরেজীতে কথা বলছিলাম, তাই রক্ষা। হিন্দী বলনেওয়ালাদের রাজ্যে আমাদের কি দশা তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রশ্ন হতে পারে ইংরেজী ও হিন্দী সম্বন্ধে যখন একই অসুবিধা তখন হিন্দী শেখাই উচিত। বরং হিন্দী ভারতীয় ভাষা বলে অসুবিধা অনেক কম। এ যুক্তি ঠিক নয়। প্রথমতঃ ইংরেজী

শিখতে ও বলতে গিয়ে সকলেই আমরা এক ভেলায় ভাসব, কিন্তু হিন্দী সম্বন্ধে আমাদের লঘিমাবৃত্তি ও হিন্দীভাষীদের গরিমাবৃত্তি কাজ করবে। অর্থাৎ কেরিকেচারের মালমসলা যোগাড় করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকবে না।

তৃতীয়তঃ ইংরেজী ভাষার সম্পদের সঙ্গে হিন্দীর কোন তুলনাই হয় না। সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। সাহিত্য মানে আধুনিক সাহিত্য—যে সাহিত্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে ভারতের প্রান্তীয় ভাষায় গড়ে উঠেছে। হিন্দীতে এমন কিছু এখনও বের হয় নি যার জন্য অহিন্দীভাষীদের আগ্রহ হতে পারে—যে আগ্রহে ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে বসান চলে। বিশ্বের দরবারে হিন্দী এখনও নিজের স্থান করে নিতে পারে নি। অনেকে হয়ত বলবেন, হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য ক্রমে সমৃদ্ধ হবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজীর সমকক্ষ ত হবেই, হয়ত ইংরেজীকে পেরিয়েও যেতে পারে। একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারলাম না। আমার এক আত্মীয় ওকালতি করতেন। মক্কেলের সঙ্গে কাজ শেষ হলেই বলতেন—ভাল কথা। আপনাকে বোধ হয় বলি নি। সিঙ্গাপুরের কাছে আমরা একটা অয়েল কনসেশন পেয়েছি—প্রচুর তেল—শেয়ার প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। এর পর দশ টাকার শেয়ার একশ' টাকা হবে, ইত্যাদি। আমি একদিন বললাম, আমাকেও কিছু শেয়ার দিন না? দাদা জবাব দিলেন, রোসো! কোম্পানীর টাকায় সিঙ্গাপুরটা ঘুরে আসি, তার পর দেখা যাবে। এসে বললেন, তেল এখনও দ্বীপের নিচে এবং দ্বীপ জলের নিচে। দ্বীপটি সমুদ্রের জল থেকে পুরোপুরি ভেসে উঠতেও পারে, নাও পারে। ভেসে উঠলেও তেল সেখানে থাকতেও পারে, নাও পারে। দেখাই যাক না।

আমারও ঐ কথা। দেখাই যাক না। আগে থেকে দুর্ভোগ কেন? আজকালকার বাজারে ঢাক পিটিয়ে মাল চালাতে হয় মাল না থাকলেও 'এ এল, এ এল' বলে ঢাক পিটিয়ে যায়। সবুরে যদি সত্য সত্যই মেওয়া ফলে তখন না হয় খাওয়া যাবে। পূর্বাহ্ণে যাঁরা শেয়ার কিনে রেখেছেন তাঁরা হয়ত খাবেন ভাল। কিন্তু South sea bubble যদি হয়? হওয়ার সম্ভাবনা যে নেই তা বলা যায় না। লক্ষণ যা চোখে পড়ে তাতে আশান্বিত হওয়া যায় কি না সেটাই ভাববার কথা। যতদূর মনে হয় ইঙ্গিত খুব শুভ নয়। লক্ষণ এবং ইঙ্গিতের একটু বিশ্লেষণ করা হয়ত দরকার।

প্রত্যেক আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতিরই একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা থাকে। ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই চিন্তাধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং জাতীয় চেতনায় ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে। ভারতীয়দের চিন্তাধারার বিশেষ রূপ হচ্ছে নেতিবাদ। জগতের সুখ-দুঃখ এবং প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধাদি সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। এর সঙ্গে আছে জীবনধারণের মান, ভৌগোলিক পরিবেশ, ঐতিহ্যের ছিন্নসূত্র। ফলে রূপসম্বিৎ বা sense of form কোন দিনই আমাদের চেতনায় স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি। পাশ্চাত্ত্যের ইতিবাদ, সাহিত্য ও চারুকলার সংস্পর্শে এসে আমাদের রূপসম্বিৎ জেগেছে, কিন্তু ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নি। অতীতের সংস্কারকে দু-চার দিনে ঝেড়ে ফেলা যায় না। সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলা কোন দিনই সম্ভব নয়। উচিতও নয়। অতীতের যতটুকু মৃত ততটুকু শুকনো পাতার মত খসে পড়ে, যতটুকু জীবিত ততটুকু বর্তমানে tradition বা ঐতিহ্যরূপে থাকে। ঐতিহ্য না থাকলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না; আবার নূতনকে গ্রহণ করতে না পারলেও সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। জীবনে ও সাহিত্যে নূতন ও পুরাতনের সম্মেলন বা synthesis প্রয়োজন। নেতি ও ইতিকে মেলানো অত্যন্ত দুরূহ কাজ, যাকে-তাকে দিয়ে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা বাংলা দেশে দেখা না দিলে আমরাও হয়ত 'মনসা মঙ্গলে'র স্তর অতিক্রম করে বেশিদূর এগতে পারতাম না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধারার synthesis যে কতটা দুঃসাধ্য তা ধরা যায় আমাদের নাটক-সাহিত্যের দৈন্য দেখে। রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখতে গিয়ে ব্যর্থকাম হয়েছেন। তবুও বাংলা সাহিত্যকে তিনিই পথ চলতে শিখিয়েছেন, যার ফলে বাংলা সাহিত্য খানিকটা স্বপ্রতিষ্ঠ। সঙ্গে আছে ইংরেজী সাহিত্যের দিগদর্শন। পাশ্চাত্ত্য সমাজের বীর্য্য ও সচলতা, রূপসৃষ্টির অভিনবত্ব, গদ্য ও পদ্যের প্রয়োগ-কুশলতা, সভ্যতের বৈচিত্র্য, সমীক্ষা ও বিচারের সূক্ষ্ম নিপুণতা, সব কিছুই অফুরন্ত প্রেরণা জাগিয়ে চলছে। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের মত দিক্‌পাল জন্মান নি, ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনসুর অন্যত্র তেমন সাড়া জাগাতে পারে নি। ইংরেজী সাহিত্যের প্রেরণা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে পুনরায় কূপ-মণ্ডূকত্ব লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটা সুলক্ষণ নয়। ইংরেজীর বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়েছে তার কুফল কিছু কিছু দেখাও দিয়েছে। স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান এবং শিক্ষিত-দের বিদগ্ধতা এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। আর দৃষ্টান্ত হিন্দী ফিল্মের বিস্ময়কর রুচি ও অমর অবদান।

এখানে ভাববার একটা কথা আছে। হিন্দীভাষীদের প্রান্তে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার উন্মেষ হয় নি কেন? অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা দ্বারা তাঁরা সমৃদ্ধ হন নি কেন? ঘুম খানিকটা ভাঙে নি যে তা বলা যায় না—কিন্তু সেটা সমৃদ্ধ অবস্থা নয়। এই পার্থক্যের হেতু কি? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে—সেখানে কলকাতা নেই। একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ত আছে। আমেরিকা বস্তু সভ্যতায় সবাইকে পিছনে ফেলেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন কোন সাহিত্য গড়ে তুলতে পারে নি। অনেক কারণ আছে। একটা মৌলিক কারণের উল্লেখ করেছেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ—আমেরিকাতে কোন সংহত সমাজ ও সমাজ-জীবন নেই। বিরাট দেশ, বিস্তর জায়গা; অমিত সম্পদ। অফুরন্ত কাজ—এসব নিয়ে সবাই ব্যস্ত, হাঁপ ফেলবার সময় নেই। যে জনসন্নিবেশ, সহাবস্থান ও অবকাশ সমাজ-জীবনের জন্য প্রয়োজন, আমেরিকার

তার অত্যন্ত অভাব। এক চাষীর জমি থেকে অন্য চাষী এতটা ব্যবধানে থাকে যে কেউ কারো মুখও দেখে না। ঘনীভূত সমাজ-জীবনে সমাজ-চেতনা দেখা দেয়; এই সমাজ-চেতনাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। সাহিত্য সমাজ চেতনার প্রতিবিম্ব, অভিক্ষেপ। ইউরোপে দেখা যায় কোনও একটা ঘন-বসতি শহরকে আশ্রয় করে সাহিত্য গড়ে উঠেছে—ইংরেজী সাহিত্যের লণ্ডন, ফরাসী সাহিত্যের প্যারিস, জার্মাণ সাহিত্যের বার্লিন, রুশ সাহিত্যের মস্কো, ইতালী সাহিত্যের রোম। আমেরিকানরা এ জাতীয় কেন্দ্রভূমি পায় নি বলে সাহিত্যও সম্ভব হয় নি। এই দৃষ্টান্ত হিন্দি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। হিন্দীভাষীরা এত জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে যে কোনও একটা শহরকে অবলম্বন করে সমাজ-জীবন সংহত হতে পারে নি। জীবনের সব রাস্তার কেন্দ্রস্থল একটি থাকা দরকার। বাংলাদেশে একটি মাত্র শহর—কলকাতা। সব রাস্তা কলকাতা গিয়ে শেষ; সকলের জীবনও। এর অসুবিধা অনেক—জায়গা কম, লোক বেশি, ভিড়, গা ঠেলে এগনো যায় না; এক বাড়ীতে দশ পরিবার, ট্রামে বাসে ওঠা দায়, রাস্তায় হাঁটা ঝকমারী, জীবন-সংগ্রাম লেগেই আছে। আর ঘটনা, দুর্ঘটনা ও মড়ক। কিন্তু জীবন ও সমাজের এই ঘন সংহতি যে চিত্তরাগ জাগায় সেটাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও প্রাণ, এই পরিস্থিতিতে পাই সঙ্ঘর্ষ ও মিলন, রাগ ও দ্বেষ, ঘৃণা ও লজ্জা, ক্ষুধা ও ক্ষোভ, গ্লানি ও দৈন্য এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তি-চেতনায় তাই ফুটে ওঠে ফুল ও ফল, মধু ও গরল, হাসি ও কান্না। সমাজও পায় চেতনার বিভিন্ন রূপায়ণ। সমাজ-চেতনা ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যক্তি সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলে আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নরচনা করে।

হিন্দীভাষীদের এজাতীয় একটি সমাজ নেই, যেখানে সকলের ভাব-কেন্দ্রাভিমুখ হয়ে দানা বাঁধতে পারে, এমন একটি শহর নেই, যেখানে জীবনের সব ঢেউ এসে পৌঁছতে পারে। পাটনার সমাজ বারাণসীর নয়, বারাণসীর সমাজ অযোধ্যার নয়, অযোধ্যার সমাজ এলাহাবাদের নয়, এলাহাবাদের সমাজ জব্বলপুরের নয়, জব্বলপুরের সমাজ আগ্রার নয়—কিন্তু সর্ব্বত্রই ভাষা হিন্দী। এক পাটনার সমাজ নিলেও দেখা যায় ভাবগুলি কেন্দ্রাভিমুগ নয়, উৎকেন্দ্র—যেমন মৈথিল সমাজ, ভোজপুরী সমাজ, ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজ। সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন concentration; হিন্দীসমাজে আছে dissipation—কতকগুলি উড়ো কাগজ। তা দিয়ে নৌকো বানানো চলে না; জোড়া লাগিয়ে হয়ত বহুরূপীর পোশাক হতে পারে। দিল্লীর কথা ইচ্ছা করেই বললাম না—সেখানে সমাজ নেই; হয়ত চিড়িয়াখানা হতে পারে।

কুটিলা প্রকৃতি—এক হাতে দেয়, আর এক হাতে নেয়। যা পাই তাতে খোঁচ থাকে। হ'ত ভাল অনুরূপ হলে। কিন্তু তা হয় না—খানিকটা মাটির গুণ, খানিকটা অবস্থার চাপ। এ নিয়ে আফশোস করা বৃথা। বাংলা দেশে অনেক কিছুই হয় না—সুস্থ-দেহ, সবল মন, বাস্তব বুদ্ধি, কারবারে ঝোঁক এবং লেংড়া আম। লেংড়া আম বাঙালীরা কিনে খায়। হিন্দীভাষীদেরও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, 'যা হয় না, তা হয়' এ না বলে অন্যথা পুষ্টিলাভের প্রযত্ন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিশেষে পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার—ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা-তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যরা এতদূর এগিয়ে আছে আর আমরা এতটা পিছিয়ে আছি যে, কোন দিন আমরা তাদের নাগাল পাব কি না সন্দেহ। অধিকন্তু ইউরোপীয়দের প্রগতিশীলতা ও প্রাণপ্রাচুর্য্য আমাদের ধাতে নেই। আমরা যেখানে এক পা এগই ওরা সেখানে পাঁচ পা এগয়। ইংরেজরা যে নৌ-জাহাজ বাতিল করে আমরা তা কিনে নৌবহর তৈরি করি। আমাদের গতিচ্ছন্দে দ্রুত লয় নেই। যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, আমাদের ঘোড়া সতেজ হবে ও তীব্রগতিতে চলবে তবুও দৌড়ে তার জিত হবে না। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯১৪ সনের পূর্ব্বে ফিল্ম-শিল্পে ইউরোপ অগ্রণী ছিল; প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপ দামামা বাজাচ্ছিল, এই সুযোগে আমেরিকার ফিল্মী ঘোড়া যে এগিয়ে গেছে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপ তার নাগাল পায় নি। বরং দূরত্ব বেড়েই যাচ্ছে। সুতরাং ইউরোপের কাছে শিক্ষানবিশি ছাড়া যখন দেশের গতি নেই তখন একটি ইউরোপীয় ভাষা আমাদের শিখতেই হবে। ঐতিহাসিক কারণে আমাদের পক্ষে 'ইংরেজীই সেই ভাষা। সুবুদ্ধি যদি হেসে উড়াই তবে ইংরেজী হয়ত আমরা ছাড়ব। ফল কি হবে তার ইঙ্গিত দেশে যে নেই তা নয়।

ইউরোপকে পিছনে ফেলবার একটি উপায় অবশ্য আছে। আমেরিকার দৃষ্টান্তে তার আভাস পাওয়া যায়। আমেরিকা এগিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের সুযোগে। সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা কোন দলেই নেই, সুবিধা আছে। আণবিক বিস্ফোরণে যখন ইউরোপ ও আমেরিকা নিশ্চিহ্ন হবে তখন আমাদের দিন আসতে পারে। সেই আশায় যাঁরা ইংরেজি বর্জ্জন করে হিন্দীশিখতে চান তাঁরা আশাবাদী হলেও অন্ধ, কৃপার পাত্র। ইউরোপ নিশ্চিহ্ন হলে ইউরোপীয় তথা যন্ত্রসভ্যতাও নিশ্চিহ্ন হবে, এবং পৃথিবীতে নেবে আসবে অন্ধকারের যুগ। এবং হিন্দীর।

পলাতকা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

হঠাৎ-জাগা ঝড় কি এল ? রাত যে আছে বাকী,
আছড়ে কাঁদে দু'পাশে বন, ককিয়ে ওঠে পাখী,
বনের পথে ঝড়ের রাতে আঁধার এল নেমে,
সামনে নদী মাতাল হ'ল, একটু গো যাও থেমে !
কাঁপে যে বুক, মনের মাঝে জাগে ভয়াল সুর,
সত্যি বল, কোথায় যাব, সে কি অনেক দূর ?
—"অনেক দূর নয় গো সখি, অনেক দূর নয়,
ওপারে পথ, খেয়ার মাঝিই জানি না কোথা রয় !"

আকাশে আজ নেইক তারা, নেক কোথাও চাঁদ,
মেঘের ঘেরে আকাশ পাতে মায়াজালের ফাঁদ,
ডাইনি-পাওয়া রাতটা যেন শিশুর মত কাঁদে,
হঠাৎ নাচা বিদ্যুতেরি ঝলকে চোখ ধাঁধে !
কাঁপে যে বুক, মনের মাঝে জাগে ভয়াল সুর,
সত্যি বল, কোথায় যাব, সে কি অনেক দূর ?
—"অনেক দূর নয় গো সখি, অনেক দূর নয়,
ওপারে পথ, খেয়ার মাঝি জানি না কোথা রয় !"

ভিজে ভিজে গন্ধ মাঠের, মাড়িয়ে চলি ঘাস,
কোথা থেকে আসছে যেন কনকচাঁপার বাস !
ঝড়ের হাতের লকলকে বেত বনের গায়ে ফোটে,
নীড় হারানো বিহঙ্গদল ডুকরে কেঁদে ওঠে !
কাঁপে যে বুক, মনের মাঝে জাগে ভয়াল সুর,
সত্যি বল, কোথায় যাব, সে কি অনেক দূর ?
—"অনেক দূর নয় গো সখি, অনেক দূর নয়,
ওপারে পথ, খেয়ার মাঝি জানি না কোথা রয় !"

চলতে আমি পারি না যে, ধর না মোর হাত,
আমায় তুমি বাসবে ভাল, হলেও কালো রাত ?
আঁচল যে মোর জড়ায় পায়ে, কাঁপছি যে থরথর,
ডাকছে যেন পিছনে মোর কত সাধের ঘর !
ভাঙে যে বুক, মনের মাঝে ওঠে ভয়াল সুর,
সত্যি বল, কোথায় যাব, সে কি অনেক দূর ?
—"অনেক দূর নয় গো সখি, অনেক দূর নয়,
ওপারে পথ, খেয়ার মাঝি জানি না কোথা রয় !"

পৃথিবীটা অনেক বড়, অনেক সাগর নদী,
পায়ে-চলার পথ যে অসীম, কাল যে নিরবধি !
একটি কথা শুধু যে আজ জাগছে আমার মনে,
বাসবে ভাল এমনি করে হারানো যৌবনে ?
কাঁপে যে বুক, প্রাণের মাঝে জাগে ভয়াল সুর,
সত্যি বল, কোথায় যাব, সে কি অনেক দূর ?
—"অনেক দূর নয় গো সখি, অনেক দূর নয়,
ওপারে পথ, খেয়ার মাঝি জানি না কোথা রয় !"

বাদল হাওয়া পাগল হ'ল, ডাকছে মেঘে বাজ,
তোমার বাহুর পাশে আমায় জড়িয়ে রাখ আজ !
এলাম ফেলে সকল স্মৃতি, মন হ'ল পাথর,
আজকে আমায় ডাক দিয়েছে হঠাৎ-জাগা চর !
ভাঙে যে বুক, প্রাণের মাঝে ওঠে ভয়াল সুর,
সত্যি বল, কোথায় যাব ? সে কি অনেক দূর ?
—"অনেক দূর নয় গো সখি, অনেক দূর নয়,
ওপারে পথ, খেয়ার মাঝি জানি না কোথা রয় !'

মল্লিকমশাই

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

ঝড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে প্রকাশ রাস্তার চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিল। তিন দিনের বাসি দাড়িতে মুখখানা একটু অপ্রসন্ন দেখায়। মাথায় দার্শনিকসুলভ এলোমেলো লম্বা চুলের স্তূপ। পকেটে আনা দুয়েক নাগাদ পয়সা নিয়ে সে ভাবছিল, সামনের মাদ্রাজী কফিখানায় ঢুকে পড়বে কি না।

হঠাৎ কানে এল, আরে তুমি!

চোখ ফিরিয়ে সে দেখলে, প্রয়োজন না থাকলেও বিশেষ বিশেষ স্থানে পাউডারের প্রলেপ দেবার চেষ্টা করতে করতে মুখে একটু স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে তুলেছে পার্শ্ববর্তিনী।

—আকস্মিক দর্শন দিয়ে তোমায় বোবা করে দিয়েছি, না?

—মোটেই না, কাল সন্ধ্যাতেও তোমায় মনে করেছি।

আশ্চর্য্য হবার ভান করলে বরুণা। তাই নাকি! মনে কর তা হলে?

উপন্যাসের ঢং-এ অভিনয় করল প্রকাশ, ছেলেবেলার প্রেম কি ভোলা যায়! তুমিই যে আমার প্রথম রোমাঞ্চ!

—অর্থাৎ ইতিমধ্যে তোমার জীবনে আরও কিছু রোমাঞ্চ এসে গেছে বল।

রায় দেবার পূর্ব্বে জজসাহেবের মুখের দিকে আসামী যেমন করে তাকিয়ে থাকে সেইরকম একটা দৃষ্টির সামনে পড়ে থতমত খেয়ে গেল প্রকাশ।

বস্তুটাকে বেমালুম উড়িয়ে দেবার জন্য হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল প্রকাশ।

কৌতূহলের ভিড় জমল বরুণার দুটি চোখে। কিন্তু সেটাকে চাপা দিয়ে সে যেন একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। খুশী-মেশানো কণ্ঠে বললে, একটা সুখবর আছে।

পুরানো প্রেমাস্পদকে নিজের বিয়ের সংবাদ দিয়ে একটু চমক লাগানর হিংস্র খেয়াল আধুনিকাদের মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যায়। সেই রকম একটা-কিছু কল্পনা করে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হ'ল প্রকাশের। বললে, বিয়ে করছ নাকি?

—পাগল! বিয়ে করাটা যদি কপালে জুটবেই তবে এই পেশা নিতে যাব কোন্ দুঃখে।

—তবে কি শুনি?

—সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একটা বাসা নিয়েছি কালীঘাট অঞ্চলে। বেশ লম্বা-চওড়া একখানা ঘর। আমি আর মল্লিক-মশাই, গুছিয়ে আছি দু'জনে।

—মল্লিকমশাই? কণ্ঠস্বরটাকে স্বাভাবিক করতে গিয়েও কি রকম যেন বেসুরো হয়ে গেল প্রকাশের।

—হাঁ গো, হাঁ। মল্লিকমশাই মানে রাঁধুনী।

—মাইনে তা হলে আজকাল বেশ ভালই পাচ্ছ বল। ঠাকুরটা ঠিকে না সব সময়ের।

—বাব্বাঃ, ঠিকে ঠাকুরকে বিশ্বাস আছে! বাড়ীতে থাকি না, চুরি করেই ত ফাঁক করে দেবে দু'দিনে।

—একটা মাত্র ঘর অথচ দু'জনে থাক কি করে? ঠাকুরটা বুঝি খুব বুড়ো।

—ওমা, বুড়ো কি গো! বরঞ্চ বেশ তরুণ।

—অ।

—কই খুশী হলে না ত সংবাদটা শুনে?

—কোনটার জন্য খুশী হব বরুণা! তোমার বাসা পাওয়ার জন্য, না তরুণ রাঁধুনী সংগ্রহের জন্য?

খিল খিল করে হেসে ওঠে বরুণা। হাসলে তার ভরাট গাল দুটোয় ছোট্ট মত মিষ্টি টোল পড়ে। কালো হলেও সে সময় মুখখানা লোভনীয় মনে হয়।

চোখে ঝকঝকে হাসি ফুটিয়ে বরুণা বললে, বাব্বাঃ, মল্লিক-মশাই তোমার মগজে বেশ উত্তাপ সৃষ্টি করেছে দেখছি।

—বাজে বকো না বরুণা। মল্লিক, সরকার, ঘোষ, বোস—যাকে খুশী তোমার কক্ষ-সঙ্গী কর গে, আমার তাতে কি?

—সে ত বটেই। সারা শরীরে একটা কাঁপন তুলে বললে বরুণা, কে কোথাকার নামগোত্রহীনা একটা নার্স, দু'দিনের পরিচয়—তার সঙ্গে আর তোমার কিসের সম্পর্ক? পথে চলতে চলতে একটা বুনো-ফুল হাতে করে তুলেছ বলে সেটাকে ত আর বাটন-হোলে ঢোকানো যায় না! সে আশাও আমি করি না প্রকাশ, কিন্তু নার্স বলে তার সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতাটুকু বজায় রাখলেও কি ছোট হয়ে যেতে?

কপালে এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলিকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে সরিয়ে প্রকাশ বললে, বাঃ! বেশ উল্টো চাপ ত। অভদ্রতা ত তুমিই প্রথম করেছ বরুণা।

—অর্থাৎ বর্দ্ধমানে ট্রেনিং সেন্টারে যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই নি, এই ত? তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবার কোনরকম উপায় ছিল না আমার। সমস্ত ঘটনা লিখে তোমায় চিঠিও দিয়েছিলাম। অভিমান করে তার উত্তর দাও নি। কিন্তু রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনায় পর তোমায় শুধু একবার চোখে দেখতে

চেয়ে যে চিঠি লিখলাম, মৃত্যুপথযাত্রীর সেই অন্তিম প্রার্থনাকে অবহেলা করার মত নির্দ্দয় হলে কি করে তাই ভাবি। মরে গেলে ত আর তোমার সঙ্গে দেখাও হ'ত না। অবশ্য তাতে আর তোমার কি যায় আসে।

বরুণার কথা শুনে প্রকাশ হকচকিয়ে উঠল। বললে, কি বাজে বকছ। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে?

—আজ্ঞে হাঁ। আর সে চিঠি পেয়েও তুমি তার একটা উত্তর পর্য্যন্ত দাও নি।

—বিশ্বাস কর, তেমন-কিছু চিঠি আমি পাই নি।

বরুণা একবার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে প্রকাশের ভিতর-বাহির দেখে নেবার চেষ্টা করল। নাঃ, আর যাই হোক, এতটুকু ছলনা অন্ততঃ নেই লোকটার মুখে। আশ্বস্ত হ'ল বরুণা। এতদিন ধরে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করেছে সে। প্রকাশের দেখতে না-আসার লোকসানের জন্য নয় তার এই ধরনের নিষ্করুণ অবহেলার জন্য। এ অবহেলা যে তার নারী-জীবনের দুঃসহ পরাজয়।

কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামকণাগুলি মুছে বরুণা বললে, ওঃ, কি দিনই যে গেছে!

প্রকাশ এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, চল একটু চা খাইগে সামনের দোকানটায়।

অভিমানে বরুণার ঠোঁটের কোণ দুটো ফুলে উঠেছে তখন। প্রকাশের মুখে অনুতাপের ছায়া স্পষ্ট। জয় হয়েছে বরুণার, তবু কেন যে তার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠতে চায় বুঝতে পারে না। উদ্গত অশ্রু রোধ করে সে বললে, না দোকানে নয়, তার-চেয়ে বরং চল আমার কালীঘাটের বাসায়।

প্রকাশের কোন কিছু বলবার পূর্ব্বেই বাস এসে পড়াতে বরুণা একরকম তাকে টেনে নিয়েই বাসে উঠল। প্রচণ্ড ভিড় বাসে। একটা মহিলা-আসনে বরুণাকে বসিয়ে রডাশ্রয় করে ঝুলতে ঝুলতে প্রকাশের মনে হ'ল হৃদয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বজায় রেখে কলকাতার মত জায়গায় বিচরণ করা একরকম অসম্ভব, বিশেষ করে তাদের মত আর্থিক অবস্থার লোকের।

যথাস্থানে নেমে বরুণা বললে, বাপস, কলকাতাটা দিন দিন বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে।

—তা না হয় হ'ল, কিন্তু কতটা হাঁটতে হবে বলত?

—বেশি দূর নয়। এসো।

—তোমার মল্লিকমশাইওয়ালা বাসায় আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না বরুণা।

—ঘাবড়াচ্ছ কেন। তার মত নিরীহ তুমি দুটি খুঁজে পাবে না। মুখবুজে সে কেবল আমার রান্না করে চলে। আমি কি করি-না-করি সেদিকে তার একটুও লক্ষ্য থাকে না।

—তবু একটা অস্তিত্বকে···। খুঁত খুঁত করতে লাগল প্রকাশ। বরুণাকে দোতালার উপরে তার বাসায় এসে দরজার চাবি খুলতে দেখে প্রকাশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, যাক, তোমার রাঁধুনী বেটা বোধহয় বাইরে গেছে। ঘণ্টাখানেক না ফেরে ত ভাল হয়।

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে বরুণা তাড়াতাড়ি ষ্টোভটা জ্বালিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে বললে, তুমি একটু বস," চায়ের জলটা ততক্ষণে হোক, আমি নিচে হতে স্নানটা সেরে আসি। হাসপাতালের ডিউটি হতে ফিরে স্নান না করলে কিরকম গা ঘিন-ঘিন করে আমার।

প্রকাশ বরুণার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে, তথাস্তু।

বরুণা স্নান করতে যাবার মিনিট খানেক পরেই একটি প্রিয়দর্শন তরুণ 'দিদিমণি' বলে ডেকে ঘরে ঢুকতেই প্রকাশকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

প্রকাশ মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিলে-ছাড়া তীরের মত বিছানার উপর উঠে বসে লক্ষ্য করলে, নগ্নদেহে শুভ্রকান্তি একটি তরুণ একজন একান্ত অপ্রত্যাশিত ও অপরিচিত ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতিতে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাশের ঠোঁটে একটা বক্র হাসির আভাস ফুটে তখনই আবার মিলিয়ে গেল। ভ্রূ কুঁচকে বললে, উনি নিচে স্নান করতে গেছেন।

যুবকটি বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের ভিতর একটা টুলের উপর এসে বসল। ঘরের মধ্যে তার উপস্থিতি প্রকাশের স্নায়ুকেন্দ্রে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। আগেকার দিন হলে তখনই হয়ত ঘুষি বাগিয়ে ডুয়েল লড়ে যেত প্রকাশ।

কিন্তু না। বরুণা স্বেচ্ছায় যখন তাকে নিয়োগ করেছে এবং একই কক্ষে ওকে নিয়ে রাত্রি যাপন করে তখন আর তার বলবার কি আছে!

চোখের একটা কোণ দিয়ে আর একবার লোকটাকে দেখে নিল প্রকাশ। বোকা বোকা চেহারা কিন্তু সুন্দর দেখতে। বরুণা হয়ত মিথ্যা করে তার নতুন প্রেমাস্পদকে রাঁধুনী বলে পরিচয় দিয়েছে তার কাছে।

নিরুপায় ঈর্ষার জ্বালায় দগ্ধ হয়ে মনে মনে প্রকাশ বললে, তা হলে ইনিই বরুণার মল্লিকমশাই, আর একে নিয়েই সে কিছুক্ষণ নির্লজ্জ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে।

একেবারে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল প্রকাশ।

বরুণার ফেরার পূর্ব্বেই কেটে পড়া ভাল। এর পর ভদ্রতা-মাফিক কথা কইতে কইতে চা গেলা মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল। তার চেয়ে এ পথ থেকে সরে দাঁড়ানই যুক্তিসঙ্গত।

ঘরের এক কোণে একটা ছোট টেবিলের উপর বরুণার লেখার সরঞ্জাম সাজান। সেখানে গিয়ে সবুজ লেখবার প্যাডটায় প্রকাশ লিখল, 'চৈত্র দিনের জীর্ণ পাতার মত খসে পড়লাম বরুণা। নতুনকে অভ্যর্থনার পথে অনাবশ্যক বাধা হ'য়ে থেকে লাভ কি! আমার অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, তোমার মল্লিকমশায়ের এবার সুরু হউক। প্রকাশ।'

পকেটে কলমটা গুঁজেই দ্রুতগতিতে প্রকাশ বেরিয়ে পড়ল।

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক বিক্ষোভে রক্তের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এ কি পৈশাচিক খেলা বরুণার! মল্লিকমশায়ের সামনে তার অন্তরের রক্তক্ষরা যন্ত্রণা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবার জন্যই কি বরুণা তাকে ডেকে এনেছিল?

লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলে প্রকাশ। যত তাড়াতাড়ি ট্রামে গিয়ে বসা যায় তত শীঘ্রই নিষ্কৃতি মিলবে এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতি হতে।

হাঁটতে হাঁটতে কখন প্রকাশের হাত দুটো মুঠো হয়ে আসে। সামনের বড় দাঁতটার কঠোর চাপে রক্ত ফুটে বেরোয় নিচের নরম ঠোঁটে। চোখ দুটোয় জিঘাংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সদ্য স্নান শেষ করে সিক্তবাসে ঘরে ঢুকেই সকৌতুকে প্রশ্ন করল বরুণা, আরে, কি ব্যাপার? একেবারে খালি গায়ে, খালি পায়ে চলে এসেছেন যে! কি খবর?

—বৌদির আবার 'লেবার পেন' উঠেছে। খুব চিৎকার করছে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

হঠাৎ শূন্য বিছানার দিকে চোখ পড়তেই উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করল বরুণা, আপনি এসে এক ভদ্রলোককে দেখেন নি?

—হাঁ, তিনি ত একটু আগে চলে গেলেন। আপনার ঐ প্যাডে কি যেন লিখে রেখে গেছেন বোধ হয়।

দু' লাইনের চিঠি, কিন্তু সেটা পড়তে যেন অনাবশ্যক দীর্ঘ সময় লাগে বরুণার। এ দিকে অনভিজ্ঞ তরুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

—দিদিমণি!

—কি যে বিরক্ত করেন, খেঁকিয়ে ওঠে বরুণা—বলেছি না, আপনার বৌদির এখন ডেলিভারী হবে না। অন্ততঃ একমাস পরে যা হবার হবে।

—তা হলে ভয়ের কিছু নাই ত? কাঁচুমাচু হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের মুখখানা।

—না, কিছু হবে না, এখন দয়া করে একটু বাহিরে যান, ভিজে কাপড়টা বদলাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দিদিমণি আমি চলি।

যুবকটি চলে যেতেই বরুণার সারা মন অনুতাপে ভরে ওঠে। এতখানি রূক্ষ কি আর সে ইচ্ছে করে হয়েছে! কেমন যেন মুখ হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল কথাগুলো। ছি ছি, কি যে মনে করবেন ভদ্রলোকেরা। অথচ পাড়ার মধ্যে কেবলমাত্র ঐ পরিবারটির সঙ্গেই বরুণার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ওরা না থাকলে সেবারে ইনফ্লুয়েঞ্জার জোয়ারে আত্মীয়পরিজনহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে যে কোথায় ভেসে যেত—ভাবতেও এখন ভয় করে বরুণার।

সময় মত ওষুধ দেওয়া, পথ্য যোগান, মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া আপন বোনের মত সব করেছে ঐ বৌদি। আর ডাক্তার ডাকা, ফল কিনে আনা—ইত্যাদি, ইত্যাদি, সব করেছে ঐ পাতান দাদা ও তার ভাইটি। অথচ তাদেরই দুঃসময়ে সে কি না—ছি ছি। অনুশোচনার লজ্জায় মনে মনে ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে বরুণা।

এদিকে ষ্টোভের উপর চায়ের জলটা ফুটতে ফুটতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি ষ্টোভটা নিভিয়ে দিয়ে ক্লান্ত-উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায় বরুণা। নিরুদ্ধ প্রাণের দুঃসহ যন্ত্রণাকে বুঝি উদার আকাশে মুক্তি দিতে চায়।

এত ছোট প্রকাশের মন! সে তাকে এতখানি হীন ভাবতে পারে? প্রকাশের চোখে সে কি এতই অনায়াসলভ্যা যে, ঠাকুর-চাকরের কাছেও অসঙ্কোচে আত্মদান করতে পারে?

একুশ বছরের মুখর যৌবন বরুণার সারা অঙ্গে। তারই অহমিকায় আহত মনটাকে পুনরায় সে খাড়া করে তোলে। বলিষ্ঠ চিন্তার ঢেউ লাগে তার অন্তরে। কিসের এত দীনতা। সে যে মেনকা, রম্ভা, উর্বশীদেরই সমগোত্রীয়া! পুরুষের চিরকালের আরাধনার বস্তু। প্রকাশকে এই কথাটাই সে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে।

ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দেয় বরুণা। হাসপাতালের নাইট-ডিউটি ছিল গতকাল। চোখদুটো ঘুমে বুজে আসে তখনই।

ঘুম থেকে যখন সে উঠল তখন বেলা তিনটে বেজে গেছে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। শরীর ও মন অবসাদে পরিপূর্ণ। তবু তাকে বেরোতে হবে। প্রকাশের সঙ্গে আজ দেখা করার ভীষণ প্রয়োজন তার। এবং আজই সে সকল সম্পর্কের শেষ করে আসবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলগুলি ঠিক করে নিল বরুণা। শুকনো মুখের উপর পাওডার-পাফটা আলতো করে বুলিয়ে নিলে। তার পর শাড়ীটা বদলে দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কালীঘাট হতে আসতে হবে বড়বাজার অঞ্চলে। সেখানে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে প্রকাশ। পাঁচটায় তাদের ছুটি। সুতরাং দেখা করতে হলে ওখানেই যেতে হবে বরুণাকে।

মিনিট দশেকের বেশি সে থাকবে না। মাত্র গোটাকতক কথা বলে আসবে শুধু। ঝগড়া নয়, তবু এমন কথা বলবে যাতে প্রকাশের চৈতন্য ফেরে, মনটা একটু উঁচু হয়—অন্ততঃ ভদ্রলোকের মত হয়।

ব্যাঙ্কের গেটে এসে দারোয়ানটাকে চার আনা বকশিস দিয়ে প্রকাশকে ডেকে দিতে বলল বরুণা।

দারোয়ান ফিরে এসে বললে, বাবু চলা গিয়া।

—চলা গিয়া! কাঁহা?

—উ ত মালুম নেহি মেমসাব।

কপালে চিন্তার রেখা ফুটল বরুণার। মিনতি করে সে বললে, রমেনবাবুকে একটু ডেকে দিতে পার বাবা?

রমেন প্রকাশের অফিস-বন্ধু। বরুণার সঙ্গেও পরিচয় আছে। তার কাছ হতে প্রকাশের খবর পাওয়া যেতে পারে।

রমেনবাবু বরুণাকে দেখে নমস্কার করে বললে, প্রকাশকে খুঁজছেন ত? সে যে বাড়ী চলে গেছে।

শুক্নো গলায় বরুণা বললে, এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে?

—প্রকাশ আসানসোল ব্রাঞ্চে বদলি হ'ল কি না। কালই সে চলে যাবে। তাই সব গুছিয়ে নিতে একটু সকাল সকাল বাড়ী গেল।

—অ। কই বদলি হবার কথা আগে ত শুনিনি? বরুণার ভেতরটা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে।

—আর বলেন কেন? অনেক দিন হতেই আসানসোলে একজন লোকের দরকার ছিল। আজ প্রকাশ জেদ করে ধরে বসল যে, সে সেখানে যাবে এবং আজই অর্ডার লিখিয়ে তবে নিষ্কৃতি। চিরকালই একটু একগুঁয়ে স্বভাবের দেখে আসছি ত। বড় খেয়ালী, বলে অমায়িক হাসি হাসল রমেন।

বরুণা রমেনবাবুকে নমস্কার করে বেরিয়ে পড়ল। যেতে হবে বৌবাজারের ফরডাইস লেনে এবং আজই। সঙ্গে বেশি পয়সা থাকলে একটা ট্যাক্সি করত বরুণা। কিন্তু উপায় নাই। মাসের শেষ। অগত্যা সে ট্রামে চড়ে বসল।

এত অভিমানী প্রকাশটা! কলকাতার ছেলে, প্রাণের বিনিময়েও যে কলকাতা ছাড়তে চায় না সে কিনা একটা সামান্য ঘটনায় কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে! খুব আশ্চর্য্য লাগে বরুণার।

ফরডাইস লেনে দোতলা একটা বাড়ীর একতলায় প্রকাশদের বাসা। রাস্তার দিকের ঘরখানায় একটা চৌকির উপর প্রকাশ থাকে। রাস্তা থেকেই দেখা যায়। প্রকাশের মা-বাবার চোখ এড়িয়ে বহুবার বরুণা তাকে ডেকে নিয়ে গেছে এখান হতে।

এবারেও সে জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখে, প্রকাশ বালিসে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। অনুচ্চ কণ্ঠে বরুণা ডাকল, প্রকাশ।

প্রকাশ ধড়মড় করে উঠে বসল। তার পর জামাটা গায়ে গলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

প্রকাশ আসলে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল বরুণা। এই সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ কি চেহারা হয়েছে প্রকাশের। যেন কতদিন রোগ ভোগ করে উঠেছে। মুখের অনেকখানি লালিত্য নাই। চোখের নিচে কালি। মমতায় সারা অন্তর টনটন করে ওঠে বরুণার। কতকটা যেন দুষ্ট ছেলের প্রতি মায়ের মমতা। যে রূঢ়তার সঙ্কল্প নিয়ে সে এসেছিল তা যেন কোথায় ভেসে যায়। ধীরে ধীরে প্রকাশের একখানা হাত ধরে বরুণা বললে, এসো।

—কোথা নিয়ে যেতে চাও বরুণা?

—যদি বলি জাহান্নামে? পরিহাস করতে গিয়েও বরুণার মুখ থমথমে হয়ে ওঠে।

মৃদু হেসে প্রকাশ বললে, সকালে বললে স্বচ্ছন্দে তোমার হাত ধরে জাহান্নমে যেতে পারতাম বরুণা কিন্তু আর হয় না। আমাকে মাপ কর। কাল আসানসোল যাচ্ছি, অনেক জিনিস কেনাকাটা করতে হবে, সুতরাং তোমার বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ কর।

নিরুদ্ধ কান্নায় গলার স্বর বুজে আসে বরুণার। বললে, আমার একটি শেষ মিনতি তোমায় রাখতে হবে। কথাগুলি যেন কাতর প্রার্থনার মত শোনাল।

গম্ভীর ভাবে প্রকাশ বললে, বল।

—একবার আমার বাসায় যেতে হবে তোমায়। মাত্র পাঁচ মিনিট থেকেই চলে আসবে। আর আমি তোমায় আটকে রাখব না।

প্রকাশ এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে বললে, বেশ, চল।

কালীঘাটের ট্রাম ডিপোয় নেমে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। ফার্লং দুয়েক হাঁটলেই বরুণার বাসা এসে পড়বে। মাঝপথে ও-বেলার সেই তরুণটি হাসিখুসী মুখে এসে বললে, দিদিমণি, বৌদির খোকা হয়েছে।

—ওমা, তাই নাকি!

—হ্যাঁ, আপনি বললেন একমাস পরে ডেলিভারী হবে।—দেখুন।

—কথাটা ত আমার নয় ভাই। আমি একজন সামান্য নার্স, কথাটা লেডি ডাক্তারের। যাই হোক, সন্ধ্যায় দেখে আসব আপনার ভাইপোকে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই প্রকাশ খপ করে হাত ধরল বরুণার। আমায় মাপ কর। খালি পায়ে, খালি গায়ে একজন ভদ্রলোক যে নার্স ডাকতে আসতে পারে—এ আমি ধারণাই করতে পারি নি। আমি ভাবলাম ঐ লোকটাই বুঝি তোমার মল্লিকমশাই যার সঙ্গে এক কক্ষে রাত্রি যাপন কর তুমি।

বরুণার চোখের জল বুঝি আর বাধা মানতে চায় না। বহু কষ্টে সেটাকে চেপে সে বললে, চল আমার মল্লিকমশাইকে দেখাইগে।

দরজার তালা খুলেই বরুণা তার ইক্‌মিক্ কুকারটার উপর একটা হাত রেখে বললে, এই দেখ আমার মল্লিকমশাই, যে নীরবে আমার রান্না করে চলে।

প্রকাশ হো হো করে হেসে বললে, ওটার নাম মল্লিকমশাই হ'ল কি করে শুনি?

—ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের আবিষ্কার কিনা। সেই সূত্রে এর নাম রেখেছিলাম মল্লিকমশাই।

তার পর একটু চুপ করে থেকে ধরা-গলায় বরুণা বললে, আত্মীয়স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব পুরীতে নিঃসঙ্গ বসবাসের বেদনা ত কোনদিন পাও নি! পেলে বুঝতে, কোন্ অবস্থায় মানুষ যন্ত্রকেও নিজের অন্তরঙ্গ সাথী করে তোলে।

অনুতপ্ত প্রকাশ দু'হাত দিয়ে বরুণার আনত মুখখানাকে তুলে ধরে বলে, আমায় ক্ষমা কর বরুণা।

উদ্গত অশ্রু নিয়ে বরুণা যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। প্রকাশের দুটো বলিষ্ঠ বাহুর উপর নিঃশেষে ভেঙে পড়ে।

গ্রামীণ খেলাধূলার কথা

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

আজ আমাদের কথা গ্রামের খেলাধূলা নিয়ে। গ্রামীণ খেলাধূলা বলতে এমন কিছু বোঝায় না যে, খেলাগুলি মাত্র গ্রামের বা গ্রাম অঞ্চলের—শহরের একেবারে নয়; যেমন শহরের খেলাধূলার অর্থও আজ এই নয় যে, খেলাগুলি মাত্র শহর বা শহর অঞ্চলের—গ্রামের একেবারে নয়। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের অনেক খেলা শহরের ছেলে-মেয়েরা গ্রহণ করেছে, আবার শহরের নানান খেলা গ্রামে এসে ঢুকে পড়েছে। খেলাধূলার এই যে গ্রাম থেকে শহরে প্রবেশ অথবা শহর থেকে গ্রামের দিকে যাত্রা—এ ব্যাপার বহুকাল ধরে অলক্ষ্যে চলে আসছে; কি করে তা ঘটছে, কোন পথে তাদের গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে গ্রামে যাওয়া-আসা চলছে, কেউ বড় তার খবর রাখে না। কিছুকাল আগেও গ্রাম ছিল শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। রাস্তাঘাট, রেলপথ প্রভৃতি যাতায়াতের উপায় তেমন ছিল না। কিন্তু আজকাল শহর ও গ্রামের যাতায়াতের ব্যবস্থা ক্রমশঃ ভাল হয়ে উঠছে, আদান-প্রদান বাড়ছে। সুতরাং খাঁটি গ্রামীণ খেলা বা খাঁটি শহুরে খেলার পর্য্যায়ে খেলাধূলার আলোচনায় আজকের দিনে অসুবিধা আছে। তথাপি যে খেলাগুলির উৎপত্তি গ্রামে এবং স্থিতিও প্রধানতঃ গ্রাম অঞ্চলে তারই কথা আমরা একটু আলোচনা করব।

প্রথমেই আমরা বলছি কপাটি খেলার কথা। এই খেলার আরও কয়টা নাম আছে—যেমন ভেল দিগ দিগ, হা-ডু-ডু, কিৎ কিৎ। এই অতি চমৎকার, স্বাস্থ্যপ্রদ, আনন্দপ্রদ গ্রামীণ খেলার সর্ব্বভারতীয় নাম আজ কবাডী। কিন্তু আগে গোড়ার কথাটা বলি। ৪৫-৫০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত এই খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। একটা জমির উপর কোনখানে একটা দাগ, সরলরেখা, ক্রমে টেনে নিয়ে তার দুই দিকে দুই কোটে দুটি ভিন্ন দল দাঁড়াত—এই দাগটি হ'ল চড়াই। কপাটি বা হা-ডু-ডু খেলাকে ধারণ করে থাকে এই চড়াই। চড়াইয়ের দুদিকে দুই কোটে দুই বিপক্ষ দল দাঁড়ায়। চড়াই থেকে দম নিয়ে বিপক্ষের কোটে খেলা দিয়ে, দম থাকতে থাকতে চড়াইয়ে ফিরে, চড়াই পার হয়ে, নিজের কোটে ঢুকতে হয়। দম নিয়ে খেলা-দেওয়া মানে এক নিঃশ্বাসে চড়াই থেকে বিপক্ষের কোটে প্রবেশ করে সেই নিঃশ্বাস শেষ হবার অর্থাৎ দম ফুরিয়ে যাবার আগেই চড়াইয়ে ফিরে আসা। এক নিঃশ্বাসে বা এক দমেই যে খেলা-দেওয়া হচ্ছে তা বুঝব কি করে? দু' দম যে হচ্ছে না তা ধরবার উপায় কি? এই জন্যই দম দেবার সময় খেলোয়াড়কে একটা বা হয় কিছু কথা পুনঃ পুনঃ বলে যেতে হয়। খেলা-দেওয়া এক নিঃশ্বাসে হ'ল কি না, এক দমে হ'ল কি না এই থেকে সহজেই ধরা যায়। দম দেবার সময় অনেকে অনেক রকম কথা উচ্চারণ করতে থাকেন। তবে কিৎ কিৎ কিৎ কিৎ এই আওয়াজেরই চলন বেশী। ভেল দিগ দিগ দিগ—এই আওয়াজ করেও খেলোয়াড় অনেক সময় বিপক্ষের কোট কাঁপিয়ে তোলেন। গ্রাম অঞ্চলে দম দেবার জন্য আবার কত রকম ছড়ার চলন আছে। একটা নমুনা দি—খেলোয়াড় চড়াই থেকে বিপক্ষের কোটে ঢুকছেন—শরীর একটু সামনে ঝুঁকে পড়েছে, কাপড় আঁটসাঁট করে মালকোচা-মারা, কখনও কারও বা কপালে লম্বা করে সিঁদুর টানা। হাত দুটি সুমুখে আন্দোলিত করতে করতে খেলোয়াড় বলছেন:

> চু রে রাং চাং
> সোনা দিয়ে বাঁধাব ড্যাং
> মারব ড্যাং-এর বাড়ি
> পাঠাব যমের বাড়ি—
> বাড়ি বাড়ি বাড়ি বাড়ি,
> বাড়ি বাড়ি বাড়ি বাড়ি।

এ দিকে বিপক্ষের কোটের খেলোয়াড়রা সরে সরে যাচ্ছেন, ঘুরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন, পাছে তাঁদের কেউ ছোঁয়া পড়ে যান, কারণ দম-দেওয়া খেলোয়াড় যাকে ছুঁয়ে দেবে সেই 'মোর' হবে। তখন 'মোর'কে বসতে হবে, যতক্ষণ না আবার সে 'বাঁচ' হয়। বিপক্ষ দল এই দম-দেওয়া খেলোয়াড়কে যদি নিজেদের কোটের ভিতর ধরে ফেলতে পারেন, তবে দম-দেওয়া খেলোয়াড় 'মোর' হবেন এবং বিপক্ষদলের কেউ যদি 'মোর' থাকে সে তখন 'বাঁচ' হবে। এইরূপে 'মোর' ও 'বাঁচ' হতে হতে যে দলের সকলেই 'মোর' হয়ে যাবে, তারা এক 'কোট' হারবে। আবার নূতন করে খেলা সুরু হবে। এই ছিল পুরাতন নিয়ম।

কপাটি খেলা কারও সদর বাড়ির উঠানে, ছোট একটু মাঠে বা ডাঙ্গায় বা বড় কোন গাছের তলায় বেশ চলতে পারে। বড় মাঠের দরকার হয় না, কপাটি খেলার এইটে খুব বড় সুবিধা। আগে কেউ দম দিতে গেলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যতদূর ইচ্ছা ছুটে পালিয়ে যেতে পারত; এখন খেলার নিয়মকানুন তৈরী হয়ে গেছে। কোটের চার দিকে এখন সীমানা টানা। তার বাহিরে গেলেই খেলোয়াড় 'মোর' হয়ে যায়। যতদূর জানি, ১৯১৫-১৬ সন আন্দাজ এই খেলার নিয়ম গঠিত হয় চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের ভেল দিগ দিগ চাল প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে। নিয়ম-রচনা কার্য্যে সহায়তা করেন বালীর বীরেশ্বর সম্মিলনী। বালীর 'চন্দ্রশেখর' স্মৃতি কপাটি কাপ প্রতিযোগিতারও তখন খুব নাম হয়েছিল। নিয়মবদ্ধ হবার পর প্রতিযোগিতার সুবিধা হয় এবং কপাটি খেলার দিন দিন প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

আপনারা চন্দননগরের হারাধন বক্সীর নাম অনেকে হয়ত শুনেছেন। হারাধন বক্সী হচ্ছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসী পল্টনে বাঙালী গোলন্দাজ দলের অন্যতম। ইনি এখন পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। এই হারাধনবাবু তখনকার দিনে কপাটি খেলার অন্যতম প্রধান উৎসাহী ছিলেন। বালীর দলেরও একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে—তিনি হলেন ত্রিপুরা ভট্টাচার্য্য। সপক্ষ-বিপক্ষ সকলেই তাঁর খেলার অপূর্ব্ব কলাকৌশল দেখে মুগ্ধ হতেন। সে সময় কপাটি খেলার প্রধান উদ্যোগিগণ স্বপ্ন দেখতেন এই খেলা এককালে কপাটি নামে সর্ব্বভারতীয় মর্য্যাদা পাবে। আজ তাঁদের সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। সর্ব্বভারতীয় নিয়মে আজ ভারতীয় অলিম্পিকে এই সুপ্রাচীন গ্রামীণ খেলা চলেছে। এখন অলিম্পিকে এই খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন প্রদেশের দলের নাম বলছি যথা: মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, কোলাপুর, দিল্লী, পঞ্জাব, রাজপুতনা, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও কোলাপুর দলের মেয়ে বিভাগও আছে। এই অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ কপাটি দল আছে। ভারতীয় অলিম্পিকে ১৯৫৪, '৫৫, '৫৬, ও '৫৭ সনে যথাক্রমে দিল্লী, কলিকাতা, হায়দরাবাদ ও এলাহাবাদে বিভিন্ন প্রদেশের কবাডী দলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ত্তমান বৎসরে এই সুমুখে জুলাই মাসে একটি ভারতীয় কবাডী দল মস্কো যুব-উৎসবে ভারতীয় কবাডী খেলা প্রদর্শন করবার জন্য যাত্রা করছেন। তাঁদের মধ্যে কয়জন বাঙালী খেলোয়াড়ও আছেন। তাঁদের যাত্রা শুভ হোক্।*

কবাডী খেলা বাংলার বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এই গ্রামীণ খেলা গ্রাম থেকে শহরে প্রবেশ করে ক্রমে সর্ব্বভারতীয় রূপ নিয়ে আজ আবার বিশ্বের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। কত আনন্দের কথা! কবাডী খেলার পর গ্রামীণ খেলা সম্বন্ধে গিজো, গাদি বা চিক্ খেলার উল্লেখ করতে হয়। এই খেলার জন্য ঘর কাটতে হয়। মাঝে লম্বালম্বি একটি চিক কাটা থাকে। তাকে বলে শির বা শিরেল। চিক চওড়া হয় তিন পোয়া আন্দাজ—এক হাতের কম। শিরেলের দুই দিকে ঘর কাটা। চৌকা বড় বড় ঘর—দুই ঘরের মধ্যে আবার চিক। আর পার্শে মধ্যের লম্বা চিক হ'ল শিরেল। এক এক চিকে এক এক জন খেলোয়াড় দাঁড়ায়—হাত দুটা লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে চিক ধরে। আর অপর দলের খেলোয়াড় ঘরে থেকে তাকে ঝুল খাটিয়ে সেই চিক পার হয়ে অপর ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করে। খেলোয়ার কেহ ছোঁয়া পড়লেই তখন সেই দল চিক ধরতে যায়, আর অপর দল ঘরে ঢোকে। আর ছোঁয়া না পড়ে এক এক করে সব ঘর ঘুরে যদি প্রথম ঘরে অর্থাৎ গিজো ঘরে ফিরে এসে 'গিজো' হাঁকতে পারে তা হলেই জিত। খেলা আরম্ভ হয় এই গিজো ঘর থেকে। এই খেলা খুব জমে—ছেলেরা মসগুল হয়ে যায়। কপাটি ও গিজো খেলা যেমন অল্প-পরিসর স্থানে বেশ চলে, তেমনি এই দুই খেলায় সরঞ্জামও কোন কিছু দরকার হয় না—খেলার খরচ যোগাবার জন্যে ছেলেদের কোন দুর্ভাবনায় পড়তে হয় না।

এই গ্রামীণ গিজো বা গাদি খেলার জন্য খেলোয়াড়দের দুই দলে ভাগ করার একটি মনোরম পদ্ধতি ছিল। তার উল্লেখ করা যাক্। খেলাটি যেমন গ্রামের, খেলার এই পদ্ধতিটিও তেমনই গ্রামের সরল মনোহারিত্বের আধার। খেলার জন্য দুটি দল ঠিক করতে হবে। দু'জন সর্দ্দার দাঁড়াল—এরা হ'ল মূল। বাকি খেলোয়াড়রা জোড়া জোড়া ভাগ হয়ে প্রত্যেক জোড়ের দু'জন পরস্পরের কাঁধ ধরে, একটু তফাতে গিয়ে চুপি চুপি নাম পাতিয়ে এল। তার পর এক এক জোড় আবার তেমনি করে সহাস্য সুমধুর ভঙ্গিতে পরস্পরের কাঁধ ধরে মূল বা সর্দ্দার দু'জনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কে নেবে শিমুল গাছ, কে নেবে তেঁতুল গাছ। অর্থাৎ জোড়ার এক জন নাম নিয়েছে শিমুল গাছ ও অপর জন তেঁতুল গাছ। তেমনি আবার কে নেবে যুঁইফুল, কে নেবে বেলফুল; কে নেবে কামরাঙ্গা, কে নেবে কুল; কে নেবে লাউ কে নেবে কুমড়ো; কে নেবে শিবাজী, কে নেবে প্রতাপসিংহ। কে নেবে ভারত মহাসাগর, কে নেবে প্রশান্ত মহাসাগর। এমনি শশা-ঝিঙ্গে, কুমীর-হাঙ্গর, নারদ-দুর্ব্বাসা, যোয়ান-মৌরী ইত্যাদি। পালাক্রমে যে সর্দ্দার যার নাম ডেকে নেবে সে তার দলে যাবে। গ্রামীণ পদ্ধতিতে এইরূপে দল ভাগ করে নিয়ে এই গ্রামীণ খেলা আরম্ভের কথা স্মরণ করতে কত আনন্দ হয়।

আর এক গ্রামীণ খেলা হচ্ছে বুড়িবসন্ত। খেলোয়াড়দের একজন বুড়ি হয়ে বসবে—অপর পক্ষের খেলোয়াড়রা তাকে ঘিরে পাহারা দেবে। ভিন্ন পক্ষের খেলোয়াড় তাদের তাড়া দেবে। আর তাক্ বুঝে বুড়ি উঠে পালিয়ে নিজের দলে গিয়ে হাজির হবে। তা হলেই জিং।

গ্রামীণ খেলা ড্যাংগুলি গ্রামের ছায়াস্নিগ্ধ পথে সারা সকাল বা সারা দুপুর দিব্য চলে। ড্যাং ও গুলি কাটারি বা ছুরি দিয়ে গাছের ডাল কেটে তাকে চেঁচে-ছুলে তৈরি করতে হয়। খেলা আরম্ভ হয়ে নিজের ঝোঁকে চলতে থাকে। একদল খেলে, অপর দল খাটে, আর গুলির উপর ড্যাং দিয়ে ভি মেরে মাঝে মাঝে গুলি দূরে পাচার করে দেয়—যেমন ব্যাট দিয়ে মেরে বল পাচার করে ক্রিকেট খেলায়। ড্যাংগুলিকে তাই বলে গ্রামের ক্রিকেট। এ খেলারও নেশা জমে খুব।

গ্রামে ছোট ছেলেদের অত্যন্ত খুব প্রিয় খেলা হ'ল লুকোচুরি ও কানামাছি। লুকিয়ে পড়া ও খুঁজে বার করার আমোদ লুকোচুরি খেলা থেকে সুরু করে জীবনের সব ক্ষেত্রে সব বয়সেই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। তাই লুকোচুরি খেলা ছেলেদের এত ভাল লাগে। কানামাছিও এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপার। সেই চির-অন্বেষণ।

আরও সব গ্রামীণ খেলা আছে—তার মধ্যে সাঁতার ও নৌকা বাওয়া যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ তেমনি চমৎকার। কিন্তু সেকথা বলার সময় এখন আর নেই।

* এই যাত্রা পরে স্থগিত থাকে।

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(৬)

রুদ্রপ্রয়াগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা রুদ্রনাথ। আমায় টেনেছিলেন তিনি। কিন্তু জিতেন অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। বাস কোম্পানীর সময় তালিকাও দেখি তারই অনুকূলে। রুদ্রপ্রয়াগে আবার বাস বদল করতে হয়। নেমেই শুনি যে, আধঘণ্টা পরেই অগস্ত্যমুনির বাস ছাড়বে। শুনেই গোঁ ধরল জিতেন যে, ঐ গাড়ীতেই যেতে হবে।

সুতরাং দূর থেকেই রুদ্রনাথ ও প্রয়াগ তীর্থকে প্রণাম করে বাহাদুরের পিছনে পিছনে মন্দাকিনীর উপরকার পুল পার হয়ে চললাম ওপারের বাস ষ্টেশনের দিকে। মন্দাকিনীর উপত্যকা বা শ্রীকেদারেশ্বরের রাজ্য শুরু হ'ল এবার।

শেষ গাড়ীর টিকেটের জন্ত কাড়াকাড়ি লেগে গিয়েছে তখন। দূর থেকেই দেখি যে, জিতেন টিকেট ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কার সঙ্গে যেন তর্ক করছে। উত্তেজিত দেখলাম ক'জন বাঙালী যাত্রীকেও। ছোট একটি দল হাত-মুখ নেড়ে পরস্পর পরস্পরকে কি যেন বলছে। দলের একটি মাত্র মহিলা একটু দূরে মুখ চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আপনারাও এই গাড়ীতেই যাচ্ছেন নাকি?—জিজ্ঞাসা করলাম দলটির কাছে এগিয়ে গিয়ে।

বিরসবদনে একজন উত্তর দিল, কৈ আর যেতে পারছি মশায়! শেষ মুহূর্ত্তে ছাতার ফরমাশ। তাই কিনতে দলের দু'জন আবার ছুটে গেল ওপারে। এখান থেকে না কিনলে পথে আর কোথাও ত পাওয়া যাবে না।

বাস-এর পথ শেষ হয়ে আসছে, তারই ইঙ্গিত ঐ কথায়। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের উপর ছায়া ফেলেছে। সামনের অপরিচিত পায়ে চলা পথ সম্বন্ধে যত কৌতূহল মনে, আশঙ্কা তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই বুঝি প্রস্তুতির মধ্যে যাতে কোন খুঁৎ না থাকে তার জন্ত অত সতর্কতা দলের নেতাদের।

সুবুদ্ধি ও দূর-দৃষ্টির পরিচয় নিশ্চয়ই! ছাতা সঙ্গে আনতে আমারও অনিচ্ছা ছিল কলকাতায়। ভেবেছিলাম যে, বর্ষাতি যখন নিয়েছি তখন আবার ছাতার বোঝা বওয়া কেন, বিশেষতঃ হাতে যখন লাঠি রাখতেই হবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞ বন্ধু এক রকম জোর করেই ছাতা গছিয়ে দিয়েছিল আমাকে। উপকারই হয়েছে তাতে। অন্ততঃ রোদ থাকলে পথেও জিনিসটি যে অপরিহার্য্য তা ইতিমধ্যেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি। আমিও উপকার করবার উদ্দেশ্যেই নিজের অভিজ্ঞতাটুকু জানিয়ে দিলাম ঐ দলটিকে। কিন্তু সেই ফাঁকে আমার নিজের মনের গোপন বাসনাটুকুও প্রকাশ হয়ে পড়ল বুঝি।

বললাম, তা আজ যদি যাওয়া না-ই হয় তার জন্ত অত ভাবনা কিসের? পথেই ত থাকা, না হয় দশ মাইল পিছনেই থাকলাম। আসুন, আপাততঃ চা খেয়ে মনটাকে ঠাণ্ডা এবং শরীরটাকে চাঙ্গা করে নেওয়া যাক।

কিন্তু চা-এর জন্ত তেমন আগ্রহ নেই তাদের। কেবল এক-জনের সতৃষ্ণ দৃষ্টি দেখলাম পড়ে রয়েছে আমার কাঁধে ঝোলানো জলের বোতলটির উপর। তিনি সেই মহিলা। আমি সম্মতির প্রত্যাশায় পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্য্যন্ত নিরাশ হয়ে একাই যখন নিচে চা-এর দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছি, তখন তিনি মুখ ফুটে বললেন, আপনার বোতলে ভাল জল যদি থাকে তবে তাই একটু দিন।

জলপান শেষ করে যে কৃতজ্ঞতা তিনি ভাষায় প্রকাশ করলেন তা জলের জন্ত ততটা নয় যতটা ছাতার সমর্থনে আমার আচরণ ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটুকুর জন্ত।

বললেন তিনি, ভাগ্যিস সময়মত আপনি এসে পড়েছিলেন, তাই মুখরক্ষা হ'ল আমার—ছাতার ফরমাশ আমিই করেছি কি না। সেই থেকে রাগ করে উনি ত কথাই বলছেন না আমার সঙ্গে।

'উনি' মানে মহিলার স্বামী। তাকে যখন চিনতে পারলাম তারও চোখে দেখি যেন কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি।

বেশ একটু আত্মতুষ্টির ভাব জেগে উঠেছিল মনে—পারিবারিক কলহের মত ব্যাপারটাকে অনাহূত সালিসি তাহলে মন্দ হয় নি আমার। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই জিতেনের তাড়া খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তা—গাড়ী নাকি তখনই ছাড়বে। চা-টুকুও আর খাওয়া হ'ল না।

গাড়ীতে বসবার পর এ যাত্রায় শেষবারের মত পরীক্ষা দিতে হ'ল কলেরার টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্থানীয় পরিদর্শককে দেখিয়ে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা চমৎকার করেছে উত্তর প্রদেশের সরকার। হরিদ্বারে থাকতেই শুনেছিলাম টিকার কড়াকড়ির কথা। ঋষিকেশে টিকেট ঘরের কাছেই দেখি ছুঁচ, পিচকিরি ও ওষুধ নিয়ে বসে আছেন সরকারী কর্ম্মচারীরা। টিকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছেন তাঁরা। উত্তরাখণ্ডের যাত্রাপথে অপরিহার্য্য দলিল ওটি। বারে বারে বাস থামিয়ে পরীক্ষা হয় প্রত্যেকটি যাত্রীর। সার্টিফিকেট দেখাতে না পারলে তৎক্ষণাৎ ছুঁচ ফুটিয়ে দেবে আবার, ত.অ াগে

তুমি যতবারই টিকা নিয়ে থাক না কেন। কেউ যদি টিকা না নিতে চায় তাহলে যাওয়াও হবে না তার।

কেবল টিকা দেওয়ার ব্যাপারেই নয়, জনস্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই নিখুঁৎ মনে হ'ল। যেখানেই যাই না কেন, দেখি যে, দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে লিখিত নির্দ্দেশ রয়েছে—কলের জল ছাড়া আর কোন জল পান করবে না, পচা বা বাসি খাবার খাবে না, রুগ্ন লোককে হাসপাতালে পাঠিয়ে পুণ্য অর্জ্জন কর, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শুষ্কগর্ভ উপদেশ মাত্র নয়। সারা পথেই জলের কল আছে দেখেছি, কৃতবিদ্য চিকিৎসকের পরিচালনাধীনে হাসপাতাল আছে বড় বড় চটিতে, প্রত্যেক "চটি চৌধুরী"র কাছে রাখা আছে "মামুলী বিমারীয়োঁকী দাওয়ায়ে" যার জন্ত দাম দিতে হয় না। শৌচাগারের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এত সতর্কতা ও এত রকমের ব্যবস্থা আছে বলেই প্রত্যহ হাজার হাজার যাত্রীরও চলাফেরা যখন থাকে তখনও কোন রোগই মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে না। বোধ করি একেবারে বিনা চিকিৎসায় কোন রোগীকে মরতেও হয় না।

যাত্রীর কল্যাণে স্থানীয় জনসাধারণেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, অশিক্ষিত নর-নারীরাও সচেতন হয়েছে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

ঘণ্টাখানেকের পথ। বৈকাল পাঁচটা নাগাদ অগস্ত্যমুনি পৌঁছে গেলাম। ড্রাইভারের পাশেই বসেছিলাম আমি। গাড়ী থামবার আগেই সে মাথাটা ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, এবার হাঁটাপথ শুরু হ'ল আপনাদের।

আসল বক্তব্য তার ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকুর মধ্যে, যার অর্থ: বোঝো এবার,আমি ও আমার বাস কি উপকার করেছে তোমাদের।

বাস থেকে নেমেই তাকালাম গাড়ীখানার দিকে; তার পর দেখলাম গ্রামখানি ও তার পরিবেশ যতটা চোখে পড়ে। উপলব্ধি হ'ল চক্ষের পলকেই—দাঁড়িয়ে আছি সীমান্তরেখার উপর। যাকে আমরা সভ্যতা বলি তার একমাত্র নিদর্শন ওখানে ঐ বাসখানি। তাছাড়া চারিদিকে আদিম প্রকৃতি। মাঝে মানুষের বসতি যতটুকু চোখে পড়ে তা সেই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'ল যেন প্রস্তরযুগের ভগ্নাবশেষ।

শ্রীনগরের মতই এটিও একটি উপত্যকা, মোটামুটি সমতল। কিন্তু শ্রীনগরের সঙ্গে অগস্ত্যমুনির যা পার্থক্য তা একেবারে মৌলিক। শ্রীনগরে চৌদ্দ আনাই মানুষের কীর্তি, কিন্তু অগস্ত্যমুনির পনের আনাই প্রকৃতি। ডানদিকের পাহাড়ের উপর ঝাউবনটুকু বাদ দিলে সে প্রকৃতিও আবার উদাসিনী; বৃদ্ধা। সবই শ্রীহীন, রুক্ষ। ঘরবাড়ী কেবল আকারেই ছোট নয়,কোনটাতেই গঠনের পারিপাট্য নেই। বিবর্ণ পাথরের কদাকার এক একখানা কুটীর। চাউল থেকে পাথরের টালি মনে হয় এই বুঝি খসে পড়ল। যেটুকু স্থায়ী মন্দিরগ্রাম এখানে তা কলকাতা বা হাওড়ার যে কোন বস্তিকেই বুঝি লজ্জা দিতে পারে।

দূরে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে যত দূর চোখ যায়। না, চোখ মোটে চলেই না, এতই ঘন মনে হয় এখান থেকে ঐ বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর বিন্যাস। চোখের সামনে সমতলের এই রুক্ষতা অবশ্য তাতে নেই। নিবিড় অরণ্য বুঝি প্রত্যেকটি পাহাড়ের গায়ে ও মাথায়। তাকালে চোখ জুড়ায় নিশ্চয়ই। কিন্তু ভয়ও করে। পিছন দিকে ফিরে তাকিয়েও দেখি ঐ একই দৃশ্য। ফাঁকা যা তা এই নিজের কাছাকাছি জায়গাটুকুতেই। তার পরেই নিবিড়, নিরন্ধ্র, দুর্ভেদ্য প্রাচীর উঠেছে যেন আকাশ পর্য্যন্ত। মনে হয় যে, ওকে অতিক্রম করে অগ্রসর হবার সাধ্যই নেই মানুষের। ফিরে তাকাই গাড়ীখানার দিকে। ফিরে যাবার জন্ত তৈরি করা হচ্ছে সেখানাকে। হঠাৎ ভয়ে বুক কেঁপে উঠল—এটি চলে গেলেই সভ্য জগতের সঙ্গে শেষ সম্পর্কও ছিন্ন হবে আমাদের। তার পর বুঝি হিমালয়ের কারাগারে আজীবন বন্দীদশা!

হঠাৎ মন্দাকিনী-ভাগীরথীর বিদ্রোহিণীর রূপ মনে পড়ে গেল। এই পাষাণকারার বিরুদ্ধেই ত তাদের বিদ্রোহ। সুগম্ভীর হিমালয়ের গভীর গর্ভে আদি অন্তহীন নিথর প্রশান্তি ভাল লাগে নি বলেই ত লহরীর পর লহরী তুলে, আঘাতের পর আঘাত করে, পাষাণ প্রাচীর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমতলে যাবার পথ করে নিয়েছিল ওরা। সেই মুহূর্ত্তে নিজের মনের মধ্যে অসহায় বন্দীত্বের ক্ষণিক অনুভূতি দিয়ে তিন দিন পূর্ব্বে দেবপ্রয়াগে দেখা গঙ্গার বিপুল ফেনিল জলরাশির অবিরাম সরোষ গর্জ্জনের কিছুটা অর্থ যেন বুঝতে পারলাম।

কিন্তু তাই যদি সত্য হয়, তা হলে সমতলের প্রাণী আমাদের এই বিপরীত গতি কেন? প্রাণধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করছি নাকি আমরা—এই সহস্র সহস্র কেদারবদরীর যাত্রীরা?

মহাতপা, মহাতেজা ঋষি অগস্ত্যমুনি। তাঁরই নাকি সাধনক্ষেত্র এই স্থান। পুরাণে আছে যে, সমুদ্র শোষণ করেছিলেন তিনি। সে কি এই জায়গায়? হতেও পারে। পণ্ডিতেরাই ত বলেন যে, সম্পূর্ন হিমালয় পর্ব্বতমালাই এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল। সে না হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক কালেই এ জায়গায় প্রকাণ্ড একটি হ্রদ ছিল বলে অন্ত একদল পণ্ডিত রায় দিয়েছেন। যে জল এককালে ছিল কিন্তু এখন নেই, সে জল অগস্ত্যমুনি পান করে নিঃশেষ করেছেন মনে করলে দোষ কি?

দোষ না থাক, ও কথা মেনে নিলে আর একটি সমস্যা ওঠে। যে অগস্ত্যমুনি সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, শাস্ত্র মতে তিনিই আবার দাম্ভিক বিন্ধ্যপর্ব্বতের উঁচু মাথাটাকে চিরদিনের জন্ত নিচু করে দিয়ে গিয়েছেন। তা নাকি তিনি করেছিলেন বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হয়ে অনার্য্য ও অ-সভ্য দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা প্রচার করতে যাবার পথে।

দুটি কাহিনীর মধ্যে কোন যে অসঙ্গতি আছে তা আমার মনে হয়নি। আমি শুধু ভাবছিলাম যে, সভ্যতার ধারক ও বাহক ঐ মহামুনি, তাঁর নিজের দেশে সভ্যতার দীপ জ্বালবার আগেই অগস্ত্য-যাত্রা করলেন কেন?

কিন্তু কি ভুলই যে করে আমাদের মন! সার ছেড়ে কেবল খোসার কথাই ভেবেছি এতক্ষণ। ভুল ভেঙে গেল ধর্মশালার প্রাঙ্গণে গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতেই।

—আ গয়ে, বাবুজী?

আপ্যায়নের স্বর শুনে চমকে মুখ তুলে দেখি সেই বলবীর উপাধ্যায়। দেবপ্রয়াগের সেই তরুণ পাণ্ডাটিকে এখানেও যে আবার দেখা যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

জিতেন তাকে চিনতে পেরেই উল্লাসের স্বরে বলে উঠল, আরে পনহি মহারাজ যে! তুমি কেমন করে এলে এখানে?

একেবারেই গায়ে মাখল না বলবীর, বরং সেও যেন উৎফুল্ল হয়েই উত্তর দিল: অচেনা পথে যাচ্ছেন আপনারা, এলাম আপনাদের সেবা করতে। আরও ক'জন যাত্রীও পেয়ে গেলাম কিনা?

কেদার পর্য্যন্ত যাবে নাকি তুমি?

হ্যাঁ, বাবুজী।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বাঁ দিকের ছোট ঘরখানা থেকে বের হয়ে এল চক্রধর পাণ্ডা। সাদর সম্বর্দ্ধনা, গভীর আশ্বাস শুনি তারও কণ্ঠে।

—বসুন, হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। এই ত জলের কল। চা খাবেন এখন? বললেই দোকানদার এখানে দিয়ে যাবে। রাত্রে কি খাবেন বলুন, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা এখানে আছি কি জন্য? যাত্রীর সুখ-সুবিধা দেখবার জন্যই ত?

কেবল বিদেশ-বিভূঁই নয়, একটু আগেই মনে হয়েছিল যেন নির্ব্বাসিতের বনবাস শুরু হয়েছে আমাদের। এখন দেখছি একেবারে বিপরীত, এ যেন নিমন্ত্রিতের সম্বর্দ্ধনা পাচ্ছি আমরা। আর তাও পরম আত্মীয়ের কাছে, আন্তরিকতায় ওতপ্রোত প্রতিটি সম্ভাষণ।

অমনি এ পথের সর্ব্বত্রই। আয়োজনের তারতম্য দেখেছি—কোথাও বেশ ভাল পাকা বাড়ী, কোথাও বা চতুর্দ্দিক খোলা জীর্ণ চালা ঘর, কোথাও প্রচুর খাদ্য, কোথাও বা শুধুই চাল-ডাল। কিন্তু আতিথ্য পেয়েছি সর্ব্বত্র এবং তার চেয়েও বেশী পেয়েছি মানুষের দরদী প্রাণের স্পর্শ। চলতে চলতে মনে হয়েছে যে, সারা উত্তরাখণ্ডই যেন পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে পথে বের হয়ে এসেছে নিমন্ত্রিত অতিথি আমাদের অভ্যর্থনা করতে, ঘরে ঘরে যেন শয্যা পাতা আছে আমাদের জন্য, পর্ণপত্রে সাজান রয়েছে অমৃতের চেয়েও সুস্বাদু ভোজ্য বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ো।

নিজেকে ত ভাল করেই জানি—ভিতরে আমার এমন-কিছুই নেই যা যাদুমন্ত্রের মত কাজ করবে বিদেশের এই অসভ্য মানুষ-গুলির উপর। বরং যা আছে তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিপুকে উত্তেজিত করবার মত দোষই বলা চলে। আমার আচার-আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয়, দেব দর্শনেও রুচি কম। সাজ-পোশাক দেখলে যে কোন লোকই বুঝতে পারবে যে, কিছু টাকা পয়সা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে আছে, যা রক্ষা করবার মত দৈহিক শক্তি বা শস্ত্রবল আমাদের নেই। তবু, কৈ, ঘৃণা বা লোভের কোন আভাসই ত দেখি নি এদেশের নিতান্ত দরিদ্র অথচ গোঁড়া হিন্দু জনসাধারণের কোন একজনের চোখেও!

জনাকীর্ণ পথও নয়—ভাঙা হাটে গিয়েছি আমরা। সহযাত্রী পেয়েছি কদাচিৎ। নিজের দল ত তিন জনের, তার একজন আবার অচেনা কুলি, যে শুধু তার দুটি আঙুলেই আমার মত লোকের গলা টিপে ইহলীলা শেষ করে দিতে পারে। অথচ কত দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়ে দু'তিন মাইল পথ হয়ত আমি একে-বারেই একা একা হেঁটে গিয়েছি, কোন কোন রাত্রে নির্জ্জন পল্লীতে আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী একটি ঘরের মধ্যে রাত কাটিয়েছি। কিন্তু আঁচড়টিও লাগে নি কোন দিন গায়ে, একটি নয়া পয়সাও কোন দিন খোয়া যায় নি।

সে সব কথা মনে পড়লে আজও যেন রোমাঞ্চ হয়।

চটির এলাকায় ঢুকতে না ঢুকতেই একসঙ্গে বহু কণ্ঠের সাদর আমন্ত্রণ কাণে আসত—যেন ঘরের লোক আমি, বহু দিন পর প্রবাস থেকে বাড়ীতে ফিরে এসেছি। কেবল পুরুষের ব্যবহারেই নয়, মেয়েদের আচরণেও ঐ একই ছন্দ। শিশুদের ত কথাই নেই। বালিকা ও বৃদ্ধাদের মতই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার যুবতীদেরও। কি নির্ম্মলই যে হাসি তাদের মুখে! নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে পয়সা চায় যুবতীরাও। অথচ প্রার্থনার মধ্যে ভিক্ষুকের দীনতা নেই একেবারেই। বাপ-ভাইয়ের কাছেও যেন তাদের অতি-সঙ্গত দাবী। আবদারের রেশ থাকে তাদের সুরে, শুনে দুলে উঠত বুকের ভিতরটা, ঘরে ছেড়ে-আসা আত্মীয়-পরিজনের বিরহ-বেদনা অন্ততঃ তখনকার মত একেবারেই ভুলে যেতাম। ছোট বড় প্রসারিত কোমল হাতে দুটি-একটি পয়সা দিতে পেরে নিজেই যেন ধন্য হয়েছি।

পণ্ডিতের মনে ব্যাখ্যা শুনেছি ঐ চটি ও তার আনুষঙ্গিক ব্যবহার, উত্তরাখণ্ডের স্ত্রী-পুরুষের ঐ রকম আচরণের। যাত্রী-সেবা নাকি এ অঞ্চলের প্রধান উদ্যোগ, জীবিকা বলেই নাকি অত নিষ্ঠা ওর অনুশীলনে। সত্য হলেও অর্দ্ধসত্য এটি। উদ্যোগ ও ব্যবসা যে কি তা আমাদের সমতলের সভ্যসমাজে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বলেই কেদার-বদরীর দেশেই পার্থক্যটা অত সহজে ধরা পড়ে আমাদের চোখে; পণ্ডিতের ব্যাখ্যা মন মানতে চায় না।

দাতাকর্ণের মত নিষ্ঠা এদের না থাকুক, ধর্ম্মানুশীলনের মত অতিথিসৎকারের প্রবৃত্তি আজও অটুট আছে দেখেছি ঐ উত্তরাখণ্ডে। দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করবার পূর্ব্বে ঋষি অগস্ত্য যা ওখানে দান করে

গিয়েছিলেন সেই মৌলিক হিন্দু-সংস্কৃতি আজও টিঁকে আছে গাড়োয়ালী নরনারীর চিন্তা ও আচরণের মধ্যে।

তবে ভবিষ্যৎ মনে হয় অনিশ্চিত। ঘুণ ধরছে। কৌশলী শত্রুসৈন্যের অনুপ্রবেশের মত আধুনিক সভ্যতার বিষ ধীরে ধীরে ঐ উত্তরাখণ্ডেও প্রবেশ করছে। সে বিষের বাহন বুঝি দ্রুতগামী মোটরগাড়ী।

সেই দিনই গাড়ীতে বসেই সেই অনুপ্রবেশের ঈষৎ যেন একটু আভাস দেখে শিউরে উঠেছিলাম।

বাস ষ্টেশন তখনও একটু দূরে। ধীরে ধীরে চলেছে আমাদের গাড়ী। প্রথম সারিতে বসে বাঁ দিকের খোলা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমি মুগ্ধচোখে দেখছিলাম একেবারে অপরিচিত সব দৃশ্য। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি মেয়ের মুখ। সুন্দরী তরুণী। একটি চা-এর দোকানের বারান্দায় একটি খুঁটি জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বুঝি আমাদের গাড়ীখানাই দেখছিল সে। চকচকে দুটি চোখে কৌতূহলী দৃষ্টি। চলতি গাড়ীতে বসে এক মুহূর্তের দেখা আমার। পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল—শুধু সেই মুখখানাই নয়, বিদ্যুল্লতার মত কালো ঘাগড়া-পরা সোনালী-রঙের তার দেহটিও। নিজের চোখেরই ভ্রম মনে করতাম হয়ত যদি না ঠিক সেই সময়েই আমাদেরই গাড়ীর ড্রাইভার ও তার সহকারী হো হো করে হেসে উঠত। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, তাদের চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব কামনায় কুৎসিৎ।

সভ্যতার বিষক্রিয়ার অন্য লক্ষণও দেখেছি পিপুলকুঠিতে ও গড়ুর গঙ্গায়। সেও ঐ বাস ষ্টেশন ও বাস সড়কের ধারে। কিন্তু সে কাহিনী এখানে নয়।

খুব তোড়জোড় করে জিতেনই রাঁধতে গিয়েছিল। সুতরাং আমি গিয়াছিলাম ঐ ফাঁকে এ জায়গাটা একবার দেখে নিতে। কিন্তু আধ ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এসে দেখি যে জিতেন তার পরিপাটি করে পাতা বিছানায় বুকের নীচে বালিশ দিয়ে শুয়ে মোমবাতির আলোতে নিবিষ্টমনে কি যেন লিখছে।

এরই মধ্যে রান্না ত হয়ে যাবার কথা নয়! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি জিতেন?

তাড়াতাড়ি উঠে বসল সে। মুখেচোখে দেখি অপ্রতিভ ভাব।

এবার হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, বৌমাকে চিঠি লিখছ বুঝি?

উত্তর না দিয়ে সেও হাসল। কিন্তু তার পরেই সেই যে বলে: ঠাকুর ঘরে কে?—না, আমি কলা খাই নি। জিতেন বললে, বড্ড ধোঁয়া রান্নাঘরে। তাই বাহাদুরকেই রাঁধতে বলে এলাম।

খুব যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা তা নয়। তবু—

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, ও পারবে ত?

কেন পারবে না? উদ্ধত উত্তর জিতেনের, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন—এ যাত্রায় এই হ'ল গিয়ে নিয়ম। খেতে দিলে সব কুলিরাই বেঁধেও দেয়। ওর একার জন্য হলেও ওকে ত নিজের হাতেই রাঁধতে হ'ত।

আমি হেসে বললাম, সে-কথা ভেবে ও-কথা বলি নি আমি।

তবে?

খেতে খেতে বুঝিয়ে বলব—বলে ঘটি নিয়ে কলতলায় চলে গেলাম আমি।

ব্যাখ্যা করে আর বলতে হ'ল না। খেতে বসে আড়চোখে চেয়ে দেখি, দু-এক গ্রাস খাওয়ার পর হাত আর মুখে ওঠে না জিতেনের। হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সে বললে, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে মণিদা। স্বাদ হবে কি, চাল-ডাল মোটে সিদ্ধই হয় নি।

আমার ঝোলা থেকে খানিকটা লঙ্কার আচার বের করে নিয়েছিলাম। তবু অর্দ্ধেক ভাত পাতে পড়ে রইল তার। রাত্রে পেট ভরল না বলেই বুঝি পরদিন দেখি খুব ভোরেই উঠে বসেছে সে। তাড়াতাড়ি তৈরী হবার জন্য তাড়া দিল আমাকে।

একটু ভুল হয়েছিল আমার। যত ভোরে উঠেছি মনে করেছিলাম ঠিক ততটা নয়। বারান্দায় বের হয়েই দেখি সেই চক্রধর পাণ্ডা। "জয় কেদারনাথজীকী" বলে সে হাসিমুখে সম্ভাষণ করল আমাকে।

তার পিছনে দেখি দু'হাতে দু'গ্লাস চা নিয়ে এসেছে বুঝি কোন দোকানের এক ছোকরা চাকর।

চক্রধরের কণ্ঠেও জিতেনের নির্দ্দেশেরই প্রতিধ্বনি। চটপট তৈরী হয়ে নিন বাবুজী, এবার হাঁটা-পথ।

স্নান করা আর হ'ল না—নিজেরই একটু শীত শীত করছিল। সাজসজ্জা করতে লেগে গেলাম। সে কি সোজা হাঙ্গাম! জিতেন কনেষ্টবলদের মত পটি বেঁধেছে পায়ে—ওতে নাকি পায়ে বেশী জোর পাওয়া যায়। আমি অতদূর যাই নি। তবে আমাকেও মোজা পরতে হল, কেডস্ জুতা পায়ে দিয়ে শক্ত করে ফিতা বাঁধলাম, ক্লীপ আটলাম ঢোলা পাজামার দুটি প্রান্তেই যাতে চলতে গিয়ে নিজের কাপড়েই পা বেধে না যায়। হাফ-সার্ট গায়ে দিয়ে বেল্ট আঁটলাম কোমড়ে। কান ঢাকা মর্কট টুপীটিও চাপিয়েছিলাম মাথায়। তবে শুনলাম যে এত নীচে অন্ততঃ দিনের বেলায় চলতে গিয়ে ও জিনিসটির দরকার হবে না।

সবচেয়ে সতর্কতা কাঁধের ঝুলি সম্বন্ধে। অবশ্য-প্রয়োজনীয় সব জিনিস তাতে গুছিয়ে রাখতে হবে। এক প্রস্থ জামাকাপড়, পথে যদি বৃষ্টি নামে সেজন্য বর্ষাতি, জলপানের জন্য গ্লাস, চায়ের পেয়ালা, চলতে চলতে মুখ শুকিয়ে এলে গলা ভিজাবার জন্য লজেন্স-মিছরি, কিছু হালকা পথ্য, এমনকি একটি মাঝারি আকারের সসপ্যান ও একখানি থালাও। ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে চলবে আমাদের কুলি। চটিতে পৌঁছতে তেমন যদি দেরী হয় তার, অথবা কোনও কারণে একেবারেই যদি অদৃশ্য হয়ে যায় সে, তারই জন্য এই অতিরিক্ত সতর্কতা।

অতসব জিনিস উপস্থ করে তেমন ভারী না হোক, বেশ মোটা হয়ে উঠল আমার ঝোলাটি। কাঁধে সেই ঝোলা এবং এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে ছাতা নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে সে কি হাসাহাসি আমাদের দু'জনের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সবিস্ময়ে অনুভব করলাম যে, বুঝি এরই মধ্যে আমার খোপ-দুরস্ত শহুরে মনেও কিছুটা গেরুয়ার ছোপ লেগেছে।

বাহাদুর কিন্তু আমার কাঁধে বোঝা দেখে ব্যাকুলস্বরে বলে উঠল, ও কি করছেন বাবুজী? ও ঝোলা আমায় দিন।

কেন রে?

আমি আছি কি জন্ত? অত বড় মোট ঘাড়ে নিয়ে চলতে কষ্ট হবে আপনার।

নির্ভেজাল উৎকণ্ঠা। কিন্তু আমি হেসে উত্তর দিলাম, তেমন কষ্ট হলে তখন দেব তোমাকে। এখন থাক।

উঠানে নেমেই আবার দেখি একখানা হাসিমুখ। এবার সেই পন্‌ছি মহারাজ। উজ্জ্বল মুখ, ললাটের উপর হলুদ রঙের মোটা মোটা কয়েকটি রেখা। এরই মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে সে। যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল এমনি ভাবে সে বললে, তৈয়ার হো গায় বাবুজী? তব আইয়ে, দর্শন কিজিয়ে।

ঠিক দর্শন বলতে পারি নে, তবে দেখা আমার হয়ে গিয়েছিল। ভোরেই মন্দিরে একবার উঁকি দিয়েছিলাম। নিজেরই চোখ না মনের দোষ নিশ্চয়ই, ভুবনমোহন কোন রূপ চোখে পড়ে নি। অগস্ত্যমুনির বিগ্রহ বলে যার খ্যাতি তার উপর তেল-সিঁদুরের পুরু আস্তরণ না থাকলেও নাক বা মুখ কোনটিই তেমন স্পষ্ট দেখতে পাই নি। মুনির মূর্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিগ্রহ আছে কাছাকাছি। নাকের দৈর্ঘ্য দেখে একটি মনে হ'ল বুঝি গরুড় মূর্তি। ইনি এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই বা তার কাছাকাছি আছেন। আর একটি শুনলাম গণেশের মূর্তি। শিবের মূর্তি বলে যার পরিচয় দিয়েছিল স্থানীয় পুরোহিত, সেটি বুদ্ধমূর্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ প্রভাব বা বৌদ্ধদের ধ্বংসপ্রবণতা এই উত্তরাখণ্ডের অনেক স্থানেই লক্ষ্য করেছেন। হয়ত বা এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি মন্দিরই পর্যায়ক্রমে উভয় সম্প্রদায়েরই ধ্বংসলীলার চিহ্ন বহন করে টিকে আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও কম যায় নি তাদের উপর দিয়ে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিরহীতালের প্রচণ্ড বন্যায় এই অগস্ত্যমুনি গ্রামও ভেসে গিয়েছিল। সে বিপর্যয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল মুনির আদি মন্দির। তার পর বিগ্রহকে ঐ পাথরের কুঁড়ে ঘরে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং আগে যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে কি না, অথবা এখন যা দেখা যাচ্ছে তার কোনটি কি, তা সঠিক ভাবে কে বলবে! বলবার তেমন প্রয়োজনও বুঝি নেই। যারা খাঁটি তীর্থযাত্রী তাদের মনে এসব বিগ্রহের দেবসত্তা সম্বন্ধে কোন সংশয়ই জাগে না।

যেমন জাগে নি ঐ বলবীরের যজমান একদল রাজস্থানী পুরুষ ও মহিলা যাত্রীর। যুক্তকরে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। অপেক্ষা করছে পাণ্ডার আগামী নির্দেশের জন্ত।

পাণ্ডা ছাড়াই আমার দর্শন হয়ে গিয়েছে সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না বলবীরকে। হঠাৎ একটি যুক্তি এসে গেল মাথায়। বললাম, কেদারনাথকে মনে করে ঘর থেকে বের হয়েছি। আগে তাঁর দর্শন পাই, পূজা করে; তার পর অন্য দেবদেবী দর্শন করব।

সদর দরজায় আর এক বাধা। জন তিনেক লোক ভিতরে ঢুকছিল—আমার সঙ্গে প্রায় সংঘর্ষ হয় আর কি! তবে মুখ তুলে ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারলাম—কাল এদের দেখেছিলাম রুদ্রপ্রয়াগের বাস ষ্টেশনে।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল আর আসতে পারেন নি বুঝি?

ও দলের অন্ততঃ একজন আমাকেও চিনতে পেরেছিল। 'সে ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, কি করে আর আসি! ছাতা কিনতে একঘণ্টা গেল। সাধে কি আর পণ্ডিতেরা বলেছেন—পথি নারী বিবর্জ্জিতা।'

বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি, পথে ঐ দলের অবশিষ্ট ক'জনকে। কালকের দেখা সেই মহিলাও আছেন তাদের মধ্যে। একা তারই হাতে একটি ছাতা।

৭

মন্দির ও বাজার এলাকা থেকে খানিকটা নীচে যাত্রীশড়ক। লাঠিতে ভর দিয়ে পথে নেমেছিলাম। তার পর হাতের লাঠি মনে হ'ল অনাবশ্যক বোঝা। ঠিক যে সমতল ভূমির উপর দিয়ে পথ তা নয়—হাজারিবাগ জিলার মোটর সড়কের মত ঢেউ-খেলানো পথ। লাঠি ছাড়াই বেশ চলা যায়।

কালকের সেই পাষাণকারার অনুভূতিটাও আর নেই। পাহাড় অবশ্য চারিদিকেই আছে, তবে সড়ক থেকে অনেক দূরে দূরে। মন্দাকিনীও অনেক দূরে। পথের ধারে গাছপালাও একেবারেই নেই। সামনে দু'সারি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অনেক দূরে আকাশের কোলে নিবিড় মেঘই যেন দেখা যাচ্ছে। চলায় কষ্ট মোটে কষ্টই মনে হয় না।

সেইজন্যই রীতিমত বিস্মিত হলাম যখন দেখি যে, চার জন বাহকের কাঁধের উপর ডাণ্ডিতে জড়সড় হয়ে বসে বিপরীত দিক থেকে একজন মহিলা আসছেন।

ডাণ্ডির নাম শুনেছিলাম কলকাতায় থাকতেই, তবে চোখে দেখলাম এই প্রথম। গঠন মোটামুটি আরামকেদারার, কিন্তু আকারে অনেক ছোট—যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থেও। খুব বেঁটে মানুষের পক্ষেও ওতে পা ছড়িয়ে বসা সম্ভব নয়, আর দেহে যদি মেদ একটু বেশী থাকে তবে হাত দুটিকে বুকের উপর দিয়ে কোলের উপর এনে রাখলেও হয়ত মনে হবে যে, গোটা দেহটাই বুঝি হাড়িকাঠে পুরে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন খোলামেলা জায়গায় ও এমন চমৎকার পথে পায়ে না হেঁটে ঐ মাঝবয়সী ও

আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুস্থ ভদ্রমহিলা কেন যে ঐ অস্বস্তিকর যানে আরোহণ করে আসছেন তা আমি বুঝতেই পারলাম না। জিতেনের মুখেও দেখি চাপা ব্যঙ্গের হাসি।

আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর মহিলার স্বামীকে দেখতে পেয়ে জিতেন জিজ্ঞাসাই করে বসল, আপনার স্ত্রী কি অসুস্থ?

প্রশ্নের গূঢ় অর্থটি বুঝতে পেরে ভদ্রলোক মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আর একটু এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন যে, অন্ততঃ চলতে গেলে এ পথে সুস্থ ও অসুস্থের পার্থক্য খুব বেশী থাকে না।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, মহাভারতের বনপর্ব্বে কি লেখা আছে জানেন?

জানি না আমরা। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আবৃত্তি করে শুনালেন:

"ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ।
শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ তেন চ।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী।"

নিজেই তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েও দিলেন: ক্রোশমাত্র পথ গিয়েই দ্রৌপদী সৌকুমার্য্য ও ক্লান্তিবশতঃ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন:

"বহবঃ পর্ব্বতা ভীম বিষমা হিমদুর্গমাঃ
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো কথং নু বিচরিষ্যতি।"

অর্থাৎ, হে ভীম, পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও তেমনি বিষম বহু সংখ্যক পর্ব্বত আছে; দ্রৌপদী কেমন করে সে সব অতিক্রম করবেন?

তখন ভীম তার নিজের পুত্র ঘটোৎকচকে ডেকে দ্রৌপদীকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্ম আদেশ করলেন তাকে, এবং

"এবমুক্তা ততঃ কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ।
পাণ্ডূনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে।"

অর্থাৎ ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে এবং অন্যান্য রাক্ষসেরা অন্যান্য পাণ্ডবকে বয়ে নিয়ে চলল।

শুধু পাণ্ডিত্যই নয়, রসবোধ আছে ভদ্রলোকের। জিতেন শুনে হো হো করে হেসে উঠল। তার পর জিজ্ঞাসা করল, তবে আপনি মহাবীর পাণ্ডবদের চেয়েও বলবান নাকি? কৈ, আপনি ত ডাণ্ডিতে চাপেন নি?

আগের চেয়েও সরস প্রত্যুত্তর ভদ্রলোকের। তিনি বললেন, আমার স্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই বলেই খাঁটি সত্য কথাটি বলতে পারছি আপনাদের মশায়, এক স্ত্রী মারা গেলে অন্য স্ত্রী পেতেও পারি, কিন্তু নিজের প্রাণটা গেলে কিছুতেই আর তা ফিরে পাব না। এ পথে পায়ে হেঁটে চলতে গিয়ে পড়ে যদি যাই, তখন আত্মরক্ষার জন্ম নিজে অন্ততঃ একটু চেষ্টা করতে পারব। ডাণ্ডিতে চাপলে সে স্বাধীনতাটুকুও ত গেল। তখন যা করেন শ্রীকেদারনাথ আর ঘটোৎকচের বংশধর ঐ ডাণ্ডিবাহকেরা।

মনটা বেশ হালকা হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং আর একটু এগিয়েই সৌরী চটিতে এক সঙ্গে কয়েকজন দোকানদারের সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে বসে গেলাম একটি দোকানে। সকালে কিছু খাওয়া হয় নি। সুতরাং পেটের তাগিদও ছিল।

এক পো গরম দুধের দাম মোটে দু' আনা। আসলে পাওয়া যায় অন্ততঃ দেড় পো। থকথকে সর ভাসতে থাকে দুধের উপর। চিনি যতলাগে তাও ঐ দামের মধ্যেই। নিজের সঙ্গে যে বিস্কুট ছিল তাই দিয়ে ভালই হ'ল প্রাতরাশ।

কিন্তু চা দেখেই বমি বমি ভাব ক'দিন থেকেই হচ্ছে। পাওয়া যায় সর্ব্বত্রই। কিন্তু কি বিশ্রী চা! সকালে উনুন ধরিয়েই এক কেতলি জলে ছটাকখানেক চায়ের পাতা ছেড়ে দিয়ে এরা সেই যে কেতলি চাপাবে উনুনের উপর তার পর সারা দিনে আর নামাবে না সেটিকে। জল ফুরিয়ে গেলে আবার জল ঢেলে দেবে কেতলির মধ্যে, আবার পাতা ছাড়বে। সুতরাং চা বলে যে কাথ পরিবেশিত হয় তার যেমন রং তেমনি স্বাদ।

নিতান্ত চা ভাল বলেই ঐ বস্তুও না খেয়ে পারি নি এ ক'দিন। আজ কিন্তু হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। দোকানদারকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বাপু খানিকটা ফুটন্ত গরম জল আমার এই মগে ঢেলে দিতে পার? আর এক চামচ চায়ের পাতা?

বুঝিয়ে বললাম যে, আমার নিজের চা নিজেই তৈরি করতে চাই আমি। শুনে তৎক্ষণাৎ রাজী হ'ল দোকানদার। চার দিন পর মনের মত চা খেয়ে দেহে ও মনে নূতন শক্তিসঞ্চার অনুভব করলাম যেন।

তার পর প্রায় সারাটা পথই ঐ ব্যবস্থা চলেছে। স্বতন্ত্র গরম জলের জন্ম সর্ব্বত্রই ডবল দাম দিতে চেয়েছি। কেউ তা নিয়েছে, কেউ নেয় নি। কিন্তু যত্ন করে জল গরম করে দিয়েছে সকলেই। কেউ কেউ ঝকঝকে কাঁসার ঘটিও এগিয়ে দিয়েছে টি-পট হিসাবে ব্যবহারের জন্ম।

ব্যতিক্রম দেখেছিলাম এক পিপুলকুঠিতে—বদরীনাথের পথে বাস সড়কের শেষ ষ্টেশনে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

বেলা ন'টা নাগাদ আবার চলতে সুরু করলাম।

এবার দেখি যে চলার পথের প্রকৃতি ক্রমেই বদলাচ্ছে। ঢেউ যেমন উচুতে উঠছে, নামছেও সেই অনুপাতে নীচুতে। মন্দাকিনী অনেক কাছে এসে গিয়েছে। বাঁ দিকে পথের যেখানে শেষ খাদেরও সুরু সেখানেই। ডান দিকেও পাহাড় ক্রমশঃই উচু হয়ে উঠছে যেন। সড়কের প্রস্থও কমে আসছে। মাঝে মাঝে এমন যে দু'জনে পাশাপাশি চলতে অসুবিধা হয়, বিপরীত দিক থেকে কেউ এলে এক জন থেমে আর একজনকে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

তাই করতে গিয়েই খানিকক্ষণ পর হঠাৎ চমকে উঠলাম। চোখ তুলে তাকিয়েছিলাম, সে চোখ আর নামতে চায় না।

এই প্রথম দর্শন।

সামনে, অনেক দূরে এতক্ষণ যাকে মেঘ বলে উপেক্ষা করেছি এখন তাই দেখি আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। থাকে থাকে স্তূপাকৃতি পালিশ করা রূপা যেন। না, রূপার চেয়েও বুঝি সাদা। তার চেয়ে স্নিগ্ধ ত নিশ্চয়ই। ঝলসে যায় না চোখ, তা নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে ঐ দৃশ্যের উপর। কিন্তু বুকের মধ্যে মনে হয় উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ সুরু হয়েছে। পড়ে যাব নাকি! উত্তেজনায় বজ্রমুষ্টি আমার আরও দৃঢ় হ'ল হাতের লাঠির উপর।

এই দেশীয় যে ভদ্রলোককে পথ দিতে গিয়ে এই ব্যাপার ঘটল তাকে উদ্দেশ করে রুদ্ধনিশ্বাসে বললাম, ও কি?

উত্তর হ'ল, ঐ ত কেদারনাথ।

অত ঝকঝক করছে যে?

ও ত বরফ।

সত্যি!

যাকে দেখিয়ে,—বলে মুচকি হেসে চলে গেল ভদ্রলোক।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমাকে ঠেলে এগিয়ে এল জিতেন। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, দেখেছ জিতেন, ঐ নাকি কেদারনাথ।

জিতেন বললে, হুঁ।

তার পর হন হন করে এগিয়ে চলছে সে। আমি সবিস্ময়ে বললাম, ওকি, অত ছুটছ কেন?

উত্তর হ'ল: কেদারনাথ যে টানছেন।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, টানছেন ত আমাকেও। কিন্তু তোমার চেয়ে আমার বয়স যে অন্ততঃ দশ বৎসর বেশী। তুমি পুরা দমে চললে আমি তাল রাখতে পারব কেন?

শুনে থামল জিতেন; কিন্তু দূর থেকেই আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, এই এক পথ, ভুল হবার সম্ভাবনা একেবারে নেই মণিদা। আর বাহাদুরই ত আপনার পিছনে আসছে। আমি এগিয়ে যাই; ভাল চটি যদি পাই সেখানে অপেক্ষা করব।

পিছনে তাকিয়ে দেখি অনেক দূরে ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে বাহাদুর। অগত্যা একাই এগিয়ে চললাম আমি।

সামনের টান যত বাড়ছে, চলার পথের বাধাও বুঝি ততই। পথ ক্রমশঃই সরু হতে হতে চলেছে যেন। তাতেও আটকাত না যদি স্থানে স্থানে ভাঙাচোরা না হ'ত। মনে হ'ল যেন দু'এক দিনের মধ্যেই এ পথ মেরামত করা হয়েছে। নূতন মাটি পড়েছে পথের উপর, অথচ দুরমুস করা হয় নি। চলতে গেলে পায়ের আঘাতে আলগা মাটি নড়ে যায়, ঝুর ঝুর করে গড়িয়ে পড়ে যেদিকে ঢালু সেই দিকে।

তথাপি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে থামতে হ'ল। একটি ঢেউ অতিক্রম করতে হবে।

দৈর্ঘ্য খুব বেশী নয়, কিন্তু কাছিমের পিঠের মত উঁচু যে জায়গাটুকু প্রস্থেও তা খুব সরু। আর মাটি মনে হ'ল একেবারে আলগা। আমার পায়ের চাপে মাটি যদি সরে যায় তবে সেই মাটির সঙ্গে আমিও নির্ঘাৎ বাঁ দিকের খাদে পড়ে যাব। ডান দিকে পাহাড়ের দেয়াল ঠিক ঐ জায়গাটাতেই এত মসৃণ যে, সেখানে আঁকড়ে ধরবার একেবারেই কিছু নেই।

সুতরাং থমকে দাঁড়ালাম। বাহাদুর এলে যা হয় করা যাবে।

কিন্তু বিপরীত দিক থেকে দেখি এদেশীয় দু'জন লোক চটপট পার হয়ে এল জায়গাটা। তাদের একজন চলে গেল আমাকে অতিক্রম করে। দ্বিতীয় জনও চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু পা বাড়িয়েও আবার তা পিছনে টেনে এনে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কাঁচা সড়ক দেখে ভয় করছে নাকি বাবুজী?

স্বীকার করতে লজ্জা হয় আমার। প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, আমার কুলির জন্য অপেক্ষা করছি। সে এলে দু'জনে এক সঙ্গে পার হব জায়গাটা।

বাহাদুর তখনও অনেক দূরে। লোকটি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে পরে আমায় বললে, আসুন, আমিই পার করে দিই আপনাকে।

আমার হাত ধরল সে সঙ্গে সঙ্গেই; আমাকে পাহাড়ের দিকে রেখে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আমাকে সত্যই পার করে দিল জায়গাটা। তার পর সহাস্য অভিবাদন তার। জয় কেদার-নাথজীওকী—

সঙ্কটের জায়গাটা এমনি ভাবে নিরাপদে পার হয়ে এসেও তৎক্ষণাৎ আর এগিয়ে গেলাম না আমি; বাহাদুরের কথা ভেবে ভয় ভয় ভাব আমার মনে। অতবড় ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে লোকটা নিরাপদে পার হতে পারবে ত!

কিন্তু এ পারে দাঁড়িয়ে দেখি যে, একটি বারও না থেমে বাহাদুর অবলীলাক্রমে পার হয়ে এল জায়গাটা।

বাহাদুর বটে!

অগস্ত্যমুনি থেকে মাইলদশেক উত্তরে কুণ্ডচটি। চটি মানে চটিই। স্থানীয় লোকের ঘর-বাড়ী আরও উঁচুতে। এখানে বুঝি কেবল যাত্রীসেবার জন্যই দোকানপাট ও ছোট বড় চটিঘর। দুটি সারি যাত্রী সড়কের দু'ধারে। দোতলা হলেও কুটিরই বলতে হয়। সংখ্যায় এক এক সারিতে খানদশেক হয়ত। ঘর-বাড়ী যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই ডান দিকে পাহাড় বল, জমি বল, তা ঢালু হয়ে নীচে মন্দাকিনীর জল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে। পায়ে ঝষি-কেশের মত অগণিত শিলাখণ্ড।

অগস্ত্যমুনিতে যেমন, এখানেও তেমনি। গাছপালার প্রাচুর্য্য থাকলে কি হবে, ঘর-বাড়ীর সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ। দোতলা

বাড়ীরও না আছে শ্রী, না গঠনের পারিপাট্য। টালির ছাদের উপর পুরু হয়ে ধুলা জমে রয়েছে। মাটির মেঝেতে ছেঁড়া ছেঁড়া মাদুর পাতা। অগস্ত্যমুনির মতই রুক্ষ রুক্ষ মনে হয় জায়গাটা।

মন্দাকিনীর উপরকার পুল পার হয়ে কুণ্ডচটির এলাকায় যখন প্রবেশ করলাম তখন ঘড়িতে দেখি ঠিক বারটা। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় প্রায় ১১ মাইল হেঁটে এসেছি বুঝে নিজের মনই বাহবা দিল নিজেকে—সমতলেও ত একটানা হাঁটায় ঘণ্টায় তিন মাইল চলাই সাধারণ নিয়ম।

প্রথম দোকানদারই ডেকে বাধা দিল আমাকে। তার পরেই দেখি দোতলা থেকে নেমে এল জিতেন, হাসিমুখে বললে, আজকের মত এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী।

বিস্মিত হলাম আমি। আর দু'মাইল গেলেই ত গুপ্তকাশী। শুনেছি যে সেখানে থাকলে কেবল কাশীবাসের পুণ্যই নয়, কাশীর মত শহরের আরামও পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও—

কিন্তু খুব স্বাভাবিক ও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিল জিতেন।

কাল রাত্রে পেট ভরে খাওয়া হয় নি, তা মনে নেই আপনার? রাঁধতেও সময় লাগবে ত।

কেদারের টান নয় তা হলে, পেটের আগুনের ঠেলাতেই অত দ্রুতবেগে হেঁটে এসেছে জিতেন। আয়োজনও দেখি এরই মধ্যে সম্পূর্ণ করেছে সে। শুধু চাল-ডাল নয়, টাটকা সব্জীও কিছু সে কিনেছে অন্য এক চটিওয়ালার দোকান থেকে। মশলা সে কিনে রেখেছিল পথে চন্দ্রপুরী চটিতেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব তার কাঁচা লঙ্কা আহরণে। কোন দোকানেই ও বস্তু পাওয়া যায় না, কিন্তু একজনের কাছে সন্ধান ও তার অনুমতি পেয়ে সে খানিকটা চড়াই ভেঙে উপরের এক ক্ষেতে গিয়ে একেবারে গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছে আধপাকা চারটি বড় বড় লঙ্কা। তাই আমাকে দেখিয়ে জিতেন উৎফুল্লকণ্ঠে বললে, আজ এমন ডাল আপনাকে খাওয়াব যার আস্বাদ আপনি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

অত উৎসাহ দেখেও মনের সন্দেহ যায় না আমার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু রাঁধবে কে?

উত্তর হল: কেন, আমি।

কাল যেমন রেঁধেছিলে?

লজ্জা পেল জিতেন, কিন্তু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, না, বাহাদুরকে আজ কাছেও ঘেঁষতে দেব না, ঠকে' শিখেছি—ছাগল দিয়ে কি ধান মাড়ান হয়?

তথাপি সংশয়ের স্বরেই আমি বললাম, কিন্তু রান্নাটা যে তোমারই কর্ম তা আমি মানব কেমন করে?

এখন না মানলেন, উত্তর দিল জিতেন, তবে মানতে হবে খাওয়ার পর।

তা মানতে হয়েছিল। জিতেন একে ব্রাহ্মণ সন্তান, তায় আবার আশ্রমে কিছুদিন সাগরেদি করে হাত পাকিয়েছে, মন্দ রাঁধে না সে, তার উপর এখানে প্রকৃতি আবার তার মত রাঁধুনীর অনুকূলে, জল-হাওয়ার গুণ আছে, রুক্ষদেহে পেটের আগুন জ্বলেও বেশী, যে কোন অহুতিই গ্রহ্য তার।

বাসন মেজে উনোন ধরিয়ে দিল বাহাদুর। তার পর সে লেগে গেল মশলা পিষতে আমি তরকারীকটি টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটতে সুরু করেছিলাম, জিতেন কিন্তু জোর করে টেনে নিয়ে গেল তা। আজ সে পণ করে এসেছে ভাই হয়েছে আমার, আমাকে কোন কাজই করতে দেবে না।

বিব্রতভাবে বললাম, তা হলে আমি কি করব?

উত্তর হ'ল: মন্দাকিনীতে গিয়ে স্নান করুন, ততক্ষণেও আমার রান্না যদি শেষ না হয় তা হলে ঘুমিয়ে নেবেন খানিকটা, এখানে তেমন মাছি নেই দেখছি।

সত্যিই মাছি নেই, কিন্তু অন্য উপদ্রব আছে, তা পাণ্ডার, সেই বলবীর আর চক্রধরকে দেখি এখানেও।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এক সঙ্গেই পালন করে এরা, পর পর দু'জনেই এসে এক সঙ্গে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। আমাদের শুনিয়েই চটিওয়ালাকে ধমক দিয়ে বললে,আমাদের সকল রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে।

অতিথিসৎকারের ফাঁকে ফাঁকে আবার ধর্ম্মকথাও শুনায় তারা, শ্রীকেদারনাথের মাহাত্ম্য বর্ণনা ত আছেই, তা ছাড়াও নানা দেব-দেবীর কত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আশ্চর্য্য! দু'জনে একত্র কাছে আসে না কখনও। একজন চলে গেলে তখন আর একজনের আবির্ভাব হয়। তবে দু'জনেরই ব্যবহার একই রকম। কাছে ঘনিয়ে বসে, বেশ মোলায়েম সুরে হেসে হেসে কথা বলে, ধৈর্য্য হারিয়ে আমি যদি রূঢ় কথাও বলে ফেলি তা হলেও তাদের কারও মুখের হাসি ম্লান হয় না।

কি করছে ওরা এখানে? এক সময়ে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে কেমন যেন একটু সন্দেহ জেগে উঠল। সেই দেবপ্রয়াগ থেকে কেবল আমাদেরই অনুসরণ করে ওরা দু'জনে যদি এত দূর পর্য্যন্ত এসে থাকে তা হলে একটু ভাববার কথা বই কি?

সন্দিগ্ধ মন নিয়েই এক ফাঁকে নীচে নেমে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরলাম আশ্বস্ত হয়ে। পাশের চটিতেই একতলায় দেখি সেই রাজস্থানী যাত্রীদলের যেন আক্ষরিক অর্থেই বার রাজপুতের তের হাঁড়ির ব্যাপার। সংখ্যায় বেশ কয়েকটি উনোন জ্বলছে আর সেই দলের মেয়ে-পুরুষ বড় বড় আটার তাল এবং হাঁড়ি, কড়া, চাল, ডাল নিয়ে উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। বলবীর দেখি প্রসন্ন মুখে বসে আছে রকের উপর।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল আমার যে, অনেক পাণ্ডার দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় একটি মাত্র পাণ্ডাকে নিজের বলে মেনে নেওয়া, আর তা যদি হয় তা হলে এই পন্‌ছি মহারাজকেই বরণ করতে দোষ কি? বয়স যাই হোক তার, দেখতে মনে হয় ছেলেমানুষ। দেবপ্রয়াগের ধর্ম্মশালা থেকে সেদিন বেচারা মুখ চুণ করে যখন বের হয়ে যায় তখনই কেমন যেন মায়া পড়েছিল ওর উপর।

সুতরাং বলবীরকে মোটামুটি কথা দিয়েই উপরে এসেছিলাম। সেই জন্তই সন্ধ্যার পর চক্রধর আমার কাছে এসে জেঁকে বসতেই আমার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলাম আমি। বললাম, ঐ বলবীরকেই পাণ্ডা ঠিক করেছি আমি।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা, শুনে চক্রধর প্রথমে একটু চমকে উঠে থাকলেও পরক্ষণেই সে তার স্বভাবসিদ্ধ মোলায়েম হাসি হেসে বললে, তা কি হয় বাবুজী? ও আবার পাণ্ডা নাকি?

কি তবে?

ও হ'ল গিয়ে ছড়িদার।

মানেই বুঝি না কথাটার। হাঁ করে চক্রধরের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি, বোধ করি তাই লক্ষ্য করেই জিতেন আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল। প্রায় গর্জ্জন করে চক্রধরকে সে বললে, তুমি, ঠাকুর, এই শেষ কথা শোন আমার। কোন পাণ্ডারই দরকার নেই আমাদের, তুমি এখন কেটে পড়।

জিতেনকে সমর্থন করল বাহাদুরও। তারও দেখি যেন ভৈরব ভাব, তাড়না তার ভাষা ও কণ্ঠস্বরেই কেবল নয়, হস্ত সঙ্কেতেও। এই প্রথম অপ্রসন্নমুখে নেমে গেল চক্রধর।

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল আমার, আবার সেই সন্দেহ বা আশঙ্কার ভাব। এবার পরিবেশও প্রতিকূল। কিছুক্ষণ পর নীচে নেমে আকাশে বাঁকা চাঁদ চোখে পড়লেও নীচে তার ক্ষীণ আলোকও দেখতে পেলাম না। একে ত বাঁদিকে বেশ উঁচু পাহাড়। তার উপর আমাদের চটির সামনেই প্রকাণ্ড একটি বট না অশ্বত্থের ডালপালা চটির চাল ছাড়িয়েও অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। দু'একটি দোকানে মিট মিট করে যে আলো জ্বলছে তাতে অন্ধকার মনে হয় আরও বেশী কালো। পাশের চটিতে উঁকি দিয়ে দেখি সেই রাজস্থানী যাত্রীদল সেখানে আর নেই। কুণ্ডচটির এলাকায় আর কোন যাত্রী যে আছে তাও মনে হয় না। মানুষ বলতে দেখছি কেবল আমাদের চটিওয়ালাকে—একটি ঝুলন্ত হারিকেন লণ্ঠনের সামনে ঘাড় হেঁট করে নীরবে বোধ করি হিসাব লিখছে সে। এইবার মন্দাকিনীর গর্জ্জন কানে এল। গা ছম ছম করছে।

উপরে গিয়ে জিতেনকে বললাম, আজ ত আর কিছু করবার উপায় নেই। তবে ভালয় ভালয় রাত যদি কাটে তবে ভবিষ্যতে অন্ততঃ রাত্রে এ রকম ছোট নির্জ্জন চটিতে আশ্রয় নিও না।

প্রতিবাদ করাই জিতেনের স্বভাব। কিন্তু আমার ও কথার উত্তরে কথাই বললে না সে।

কিছুক্ষণ পর আমাদের চটিওয়ালা উপরে উঠে এল। এক হাতে কৃপাণ তার।

সে বললে, অব তো মৈ ঘর যাতা হুঁ।

আমি শুষ্ককণ্ঠে বললাম, আপ ভি য়হা নেহি রহেঙ্গে?

উত্তর হ'ল: নেহি বাবুজী, মেরা ঘর তো উপর বস্তিমে।

রুদ্রপ্রয়াগ

তব?

অপর হাতে অভয়ও আছে তার। সে আমার মুখখানা একবার দেখে নিয়ে অল্প একটু হেসে উত্তর দিল, কোই ফিকর মত কিজিয়ে। কেদারনাথজীকা রাজ হৈ।

তবে দরজা-জানালা বন্ধ করবার কৌশল শিখিয়ে দিয়ে গেল সে।

পালা করে রাত জাগবার কথা বলেছিলাম জিতেনকে। কিন্তু ক্লান্ত দেহে তা সম্ভব হয় নি। এক ঘুমেই রাত শেষ। সকালে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নীচে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল অনেক দূরে কেদারনাথের অমল ধবল শৃঙ্গ একটি। আকাশে মেঘ নেই। সকালের রোদে বরফ ঢাকা শিখরটি ঝলমল্ করছে।

আগের দিনই শুনেছিলাম যে, ঐ কুণ্ডচটি ছাড়াবার পরেই চড়াই শুরু হবে। গা করি নি কথাটি। এক বেলায় প্রায় এগার মাইল পথ হেঁটে এসে মনে যা জমেছে তা আত্মপ্রসাদের সীমা ছাড়িয়ে অহঙ্কারের ধাপে গিয়ে উঠে আর কি! চড়াই তা হয়েছে কি? তর তর করে উঠে যাব।

কিন্তু মিনিট পনের চলবার পরেই ভুল ভেঙ্গে গেল। কেবল গা থেকে ঘামই যে বের হচ্ছে তা নয়, চোখেও যেন জল আসতে চায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই মহিলাকে—প্রথমে রুদ্রপ্রয়াগ ও দ্বিতীয়বার অগস্ত্যমুনিতে দেখা, সেই বাঙালী যাত্রীদলের একমাত্র মহিলাকে। কাল সন্ধ্যায় কুণ্ডচটিতে আবার দেখা তার সঙ্গে।

নীচে রকের উপর বসে দেখলাম এক এক করে গুপ্তকাশীর

দিকে যাচ্ছে সেই দলের লোকেরা। অনেক পরে এলেন সেই মহিলা। তার পিছনে মাত্র একজন এবং তিনি তার স্বামী। ভদ্রমহিলার মুখ দেখি শুখিয়ে গিয়েছে, পা যেন আর চলতে চায় না। তথাপি চলেছেন তিনি।

চিনতে পারলেন তিনি আমাকে। তার ক্লিষ্ট মুখে দেখি একটু হাসিও ফুটল। তিনিই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা বুঝি আজ এখানেই থেকে যাচ্ছেন?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম, তার পর বললাম, আপনারাও থেকে গেলেন না কেন? সামনে ত শুনেছি চড়াই।

শুনেছি আমিও, উত্তর দিলেন মহিলা, কিন্তু দলের লোককে বলতে আর সাহস হ'ল না। আমি ছাতা চেয়েছিলাম বলেই নাকি রুদ্রপ্রয়াগে তাদের একটি বেলা নষ্ট হয়েছে। আবার আরও এক বেলা যদি নষ্ট করতে বলি তা হলে হয়ত দলই ভেঙে যাবে আমাদের।

শ্রান্ত দেহ ও মন নিয়ে এই চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে গত রাত্রে কি কষ্টই যে পেয়েছেন ভদ্র মহিলা তা এখন বেশ অনুমান করতে পারলাম আমি।

খুব যে খাড়া তা নয়। তবে প্রথম অভিজ্ঞতা ত! বেশ কষ্টই হচ্ছে। হাতের লাঠি এখন আর অলঙ্কার নয়, প্রধান নির্ভর ওটি। দেহের ভার বুঝি অর্দ্ধেকই বহন করছে ঐ লাঠি। তথাপি পা দুটি মনে হয় বুঝি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। নিশ্বাস পড়ছে দ্রুততালে। ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছি, তথাপি রোদ মনে হয় অসহ্য। আসল কথা, আকাশের সূর্য্যের মত বাঁ দিকের পাহাড়ও ক্রমাগত তাপ ছড়াচ্ছে। গলা শুকিয়ে আসছে দেখে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত একটির পর একটি লজেন্স মুখে পুরছি। তথাপি খানিকটা গিয়েই থামতে হয়। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করি কিছুক্ষণ, হয়ত বা বসেই পড়ি পথের ধারে কোন একখানি পাথরের উপর। চলবার সময় চোখে যা তেমন ধরা পড়ে না তা স্পষ্ট দেখতে পাই তখন—পায়ের নীচে পথ ত নয়, খাড়া করে পাতা একখানা যেন মই।

আরও দুর্ভোগ, বড়ই যেন একা মনে হয় নিজেকে। শক্ত শরীর জিতেনের; তার ফুসফুসের জোরও বেশী। তর্ তর্ করে উঠে যায় সে, ডাকলেও থামে না। বাহাদুর পড়ে আছে পিছনে। কষ্টের কথা মুখ ফুটে বলতেও পারি নে কাউকে।

তবে ক্ষতিপূরণও আছে বই কি! এ যে এক নূতন জগৎ। প্রথম কদিন বাসে বসে যা দেখেছি তা মনে হয়েছে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত—দেখা দিয়েই আবার গা ঢাকা দিয়েছে এক একটি দৃশ্য। কিন্তু আজ হিমালয়ের সঙ্গে একেবারে কোলাকুলি সম্বন্ধ। কাছে থেকে দেখছি তার ভীষণ মধুর রূপ, স্পর্শ করছি তাকে, লুণ্ঠনও করছি কিছু কিছু তার সম্পদ।

জুলনায় সব এ দিকের যাত্রীসড়ক। পাহাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে হাত দিয়ে তাকে ছুঁই। মাঝে মাঝেই দেখি পাহাড়ের গা বেয়ে সরু বা মোটা জলের ধারা নেমে আসছে, পথ ভিজিয়ে ডান দিকে খাদের পথে ঢল নেমে যাচ্ছে নীচে মন্দাকিনীতে। সে জলের ছিটা এসে মুখে লাগে আমার, দুই পায়ে মাড়িয়ে যাই পথের উপর পাতলা জলস্রোতকে। ডান দিকের খাদ ভয়ঙ্কর। তথাপি ঢালু জমি দেখলে খানিকটা নেমে যাই ওর মধ্যে। বুক যত কাঁপে আনন্দও যেন তত বেশী।

গাছপালা দু'দিকেই। চোখে যা দেখি সবই ত পাথর। তাই ফুঁড়ে কি করে যে এই লক্ষ লক্ষ গাছ উঠল তা ভেবে পাই নে। বড় গাছ যেখানে নেই সেখানেও দেখি তৃণগুল্মের ঘন আস্তরণ। মাঝে মাঝে থোকায় থোকায় ফুল ফুটে আছে। নন্দন কাননের প্রত্যাশা অবশ্য মেটাতে পারে না তারা। হয়ত এটি বসন্তকাল নয় বলেই এই সুদীর্ঘ পথের কোথাও বহুবর্ণিত ও আমার নিজের বহু প্রত্যাশিত নন্দন কানন কোথাও দেখতে পাই নি। গুপ্তকাশীর পথে যা চোখে পড়েছে তা নিতান্তই ছোট ছোট বুনো ফুল। তবু ফুল ত! দেখতে ভাল লাগে বই কি! নীল কি বেগুনী রং। ছাই রংও আছে। কাপাসিয়া, কোকড়ি— কত কি নাম এদেশের ভাষায়। থোকা থোকা ফুল জোনাকির মত মিট মিট করে।

আর থেকে থেকে দেখি, সামনে অনেক দূরে সেই কেদারশৃঙ্গের শুভ্র মহিমা—স্বয়ং কেদারনাথেরই হাতের ইসারা যেন। কি যে যাদু আছে ঐ স্নিগ্ধ শুভ্রতায়—চোখে পড়লেই এই কঠিন চড়াই ভাঙবার সব শ্রান্তি যেন নিমেষে দূর হয়ে যায়।

আড়াই মাইল হাঁটতে তিন ঘণ্টা। বেলা ন'টা নাগাদ গুপ্তকাশীতে পৌঁছলাম।

"গুপ্ত"কাশী কেন? স্বয়ং কেদারনাথকে জড়িয়ে কাহিনী। পঞ্চপাণ্ডবকে ধরা দেবেন না বলেই নাকি কাশীর বিশ্বনাথ পালিয়ে এসেছিলেন হিমালয়ের এই দুর্গম গিরিশিরে। এই গুপ্তকাশীতে কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। নাছোরবান্দা পাণ্ডবেরা এ পর্য্যন্ত ধাওয়া করে এল দেখে তখন তিনি পালিয়ে যান আরও উত্তরে কেদারের দিকে। ঐতিহাসিকের মন দলিল-দস্তাবেজের সমর্থন না পেলেও কিংবদন্তীকে অগ্রাহ্য করে একটি ঘটনা কল্পনা করতে পারে। ভগিনী নিবেদিতার মনে উঠেছিল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের বারানসী লুণ্ঠনের কথা। হতেও পারে যে কাশীর বিশ্বনাথকে এখানে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কিছুদিন।

তা হোক বা না হোক, এখনও বিশ্বনাথ আছেন এই গুপ্ত-কাশীতে। একই মন্দিরে অন্নপূর্ণাও। লোকজনের বসতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুর্গের মত প্রাচীর-ঘেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ মন্দির এলাকা। বেশ কয়েকখানা ঘর ঐ চত্বরের মধ্যে। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা ছাড়াও আরও নাকি দেবদেবী আছেন ওখানে। তবে খুব স্পষ্ট দেখা যায় না কোন বিগ্রহই। সবচেয়ে স্পষ্ট এবং একেবারে অবিসংবাদিত যা ঐ মহলের মধ্যে আছে তা যাঁতারি আকারের একটি কুণ্ড। কোন

পাহাড়ের ঝর্ণার জল যেন এসে জমে ঐ কুণ্ডের মধ্যে। ওকেই এখানে বলা হয় মণিকর্ণিকা। মোটামুটি গুপ্তকাশী বারাণসীরই এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

বিশ্বনাথের কৃপাতেই হবে হয়ত, এখানে আসতে না আসতেই আমাদের একটি জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এখানেও দেখা সেই চক্রধর পাণ্ডার সঙ্গে—যেন ওঁৎ পেতে বসে ছিল সে। খেরো-বাঁধানো মোটা মোটা খানকয়েক খাতা বগলে নিয়ে সে সম্মুখীন হ'ল আমাদের। ঐ গন্ধমাদন পর্ব্বত থেকে বিশল্যকরণী, মানে আমাদের পাণ্ডা-পরিচয় খুঁজে বের করবে সে।

হঠাৎ জিতেনের মনে পড়ে গেল যে, কনখলের আশ্রমে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মুখে শুনে কেদারের একজন পাণ্ডার নাম তার নোট-বুকে টুকে নিয়েছিল—মহাদেবপ্রসাদ উপাধ্যায়। নিজেই খুঁজে বের করে জিতেন সেই নামটি উচ্চারণ করতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল চক্রধর।

—তবে ত আমারই যজমান আপনারা। উনি যে আমারই কাকা।

চেয়ে দেখি তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার সারা মুখে। জোড়া-হাত কপালে ঠেকিয়ে সে বললে, কেদারনাথজীর কি কৃপা দেখুন! সেই দেবপ্রয়াগ থেকে আমাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন তিনি।

কেদার পর্য্যন্তও তুমি সঙ্গে যাবে নাকি আমাদের? জিতেন জিজ্ঞাসা করল তাকে।

উত্তর হ'ল: নিশ্চয়ই যাব—আপনারা যে আমাদের যজমান।

খুশী হলেও আশ্বস্ত হতে পারি নি আমি। ভয়ে ভয়ে বললাম, কিন্তু পাণ্ডাঠাকুর, আমাদের ত টাকাপয়সা তেমন নেই। আমাদের সঙ্গে গেলে মজুরী পোষাবে না তোমার।

সেও কেদারনাথজীর ইচ্ছা। বলে তথাপি হাসে চক্রধর।

কত অলৌকিক কাহিনীই না শুনছি এ ক'দিন ধরে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় সুরলোক এই পঞ্চকেদারের দেশে। দেবদেবীরা বিহার করেন সেখানে, কিন্নর-কিন্নরীরা স্বর্গীয় নৃত্যগীতে মনোরঞ্জন-সাধন করে সেই দেবতাদের। মনে বিশ্বাস আর ভক্তি যদি থাকে তবে এই নীচের পথ দিয়ে চলতে চলতেও কোন কোন ভাগ্যবান যাত্রী দেখতেও পায় কোন কোন দিব্য আবির্ভাব।

ভক্তি-বিশ্বাস আমার নেই, আস্থা নেই ভাগ্যের উপরেও। অলৌকিক কিছুই দেখি নি এখন পর্য্যন্ত। তবে এই ক'দিনেই হঁটিমাত্র চর্ম্মচক্ষু দিয়েই ষোল আনা প্রাকৃতিক দৃশ্য যা সব দেখেছি তাতেই সার্থক মনে হয়েছে সব শারীরিক কষ্ট ও সব অর্থব্যয়। যেমন প্রকৃতি তেমনি মানুষও। অলৌকিক যদি থাকেও তবে কি আর এমন বেশী হবে তা!

এই ত আসতে আসতেই দেখলাম তিনটি পাহাড়ী মেয়ে—দল বেঁধে উপর থেকে নীচে যাচ্ছে। বয়সে তরুণী। কণকচাঁপা রং স্বাস্থ্যের লাবণ্যে চল চল করছে। একটু যেন চ্যাপটা মুখের গড়ন, তবু দেখলেই মুগ্ধ হয় মন।

আমি পুরুষ বলে একটুও সঙ্কোচ নেই। মুক্তার মত ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল তিনটি মেয়েই। একজন হাত বাড়িয়ে বললে, ও শেঠ, তাগা-সূঁই দেও।

শুনেছিলাম যে, ছুঁচ-সুতো যাত্রীদের কাছে চায় এদেশের মেয়েরা। কিন্তু সঙ্গে ও জিনিস আনতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা দু'জনেই। সুতরাং কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, নেই।

তব পাই দেও।

নৈরাশ্যে একটুও ম্লান হয় নি মুখের হাসি তার। এ ত ভিক্ষা-প্রার্থনা নয়, এ যে ওদের খেলা।

একটু যা লাগে আমার চোখে তা ওদের অত সুন্দর মুখে কুৎসিৎ অলঙ্কারের অত প্রাচুর্য্য। কান, নাক দুই-ই ফুড়ে ফুড়ে যেন ঝাঁজরা করেছে। প্রত্যেকটি ফুটোর মধ্যেই একটি করে যেন গরুর গাড়ীর চাকা। নাকে বেসর ও কানে নথের মত মাকড়ি। নাকের চাকা আবার শিকল দিয়ে কানের সঙ্গে টেনে বাঁধা। রূপার জিনিস। অনেক ব্যবহারে সাদা রং কালচে হয়েছে।

একটি করে পয়সা প্রত্যেকের হাতে দেবার পর মনের ক্ষোভ আর মনে চেপে রাখতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ও-সব পরেছ কেন?

তিনটি মেয়েই এক সঙ্গে উত্তর দিল, রেওয়াজ হৈ, রেওয়াজ—মানে প্রথা।

কষ্ট হয় না পরতে?

না, ভাল লাগে।

বুঝি দুষ্টামি করেই একটি মেয়ে বললে, তুমি শেঠ, একটি বেসর গড়িয়ে দেবে আমাকে?

কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গেল তারা। ঝম্-ঝম্ আওয়াজ কানে আসছে আমার। চেয়ে দেখি পায়েও মল আছে তাদের।

গুপ্তকাশীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আর এক মধুর অভিজ্ঞতা। একপাল ছেলেমেয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল আমাদের। ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে সবাই সমস্বরে বলছে, ও শেঠ, পাই দেও।

ফুলো ফুলো গাল, টুকটুকে লাল ঠোঁট, মুক্তার মত দাঁত, ছোট ছোট চকচকে চোখ। হাসি যেন মুখে আর ধরে না। যত দেখি ততই মনে হয় যে ব্যর্থ হয়েছে সব নামকরা শিল্পীর তুলিতে দেব-দূতের রূপায়ণ। এরাই যখন নেচে নেচে কি এক দুর্বোধ্য ভাষায় গান সুরু করে দিল তখন আর কি পথশ্রম থাকে।

তিন সন্তানের পিতা জিতেন, সেও দেখি আত্মহারা। আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, যা থাকে কপালে, ফিরবার সময় এদের একটিকে চুরি করে নিয়ে যাব।

তবে তৃপ্তি নেই। যত'দেখছি ততই প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে

উঠছে মন। মনের উত্তেজক রয়েছে বুঝি ঐ পথের বিন্যাসের মধ্যেই। এক সঙ্গে খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় না ত—এঁকে-বেঁকে চলেছে আমাদের পথ। এক একটা বাঁক যেন এক একখানা পরদা। একখানা উঠলেই যেন আর একখানাতে দৃষ্টি বাধা পায় আবার। সুতরাং আরও উগ্র হয়ে ওঠে মনের কৌতূহল।

জিতেনের অধৈর্য্য আমার চেয়েও বেশী। সে চক্রধরের সঙ্গে একটি রফা করবার পরেই তাড়া দিল আমাকে, উঠুন মণিদা, সামনে নাকি আরও সুন্দর।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঐ মধুর আবিষ্কার।

দেখি সেই গঙ্গোত্রী আর তার মা। বাজারের দিক থেকে আসছেন, গতি কেদারের দিকে।

প্রথমে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় নি; তাদেরও বুঝি সেই অবস্থা। তার পর আমাদের চার জনের মুখই এক সঙ্গে প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ যেন আমাদের পারিবারিক পুনর্ম্মিলন।

গঙ্গোত্রীই প্রথমে কথা বললেন, কেদারনাথজীকে ধন্যবাদ যে, আবার দেখা হ'ল আমাদের।

জিতেন বললে, আমি ত আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম—কোথায় যে হারিয়ে গেলেন আপনারা!

হারিয়ে আর যাব কোথায়? গঙ্গোত্রী উত্তর দিলেন, এই ত এক পথ।

জিতেন বললে, তা হলে বলব যে, পালিয়ে গেলেন, নইলে দেবপ্রয়াগেই ত থাকবার কথা ছিল আপনাদের।

খুজেছিলেন নাকি সেখানে?

খুব—এবার উত্তর দিলাম আমি: পাঁতি পাঁতি করে আপনাকে খুজেছিল জিতেন। বিকেল থেকে প্রায় দুপুর রাত পর্য্যন্ত—প্রতিটি পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়ে গিয়ে।

শুনে হাসছেন গঙ্গোত্রী। যত হাসছেন ততই লাল হয়ে উঠছে তাঁর মুখ। না, মুখ লাল হচ্ছেন বলেই হাসছেন অত বেশী! শেষে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি বৃদ্ধার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে, তাকেই সম্বোধন করে বললেন, শুনলে ত মা, ফুট করে চলে এসে ভাইয়াকে সেদিন তুমি কি কষ্ট দিয়েছ! দেবপ্রয়াগে উনি ঘরে ঘরে খুজেছেন তোমাকে।

হাসলেন বৃদ্ধাও। তিনি বললেন, আমরাও ভেবেছি তোমাদের কথা। এখানে এসেই পাণ্ডাকে বলে রেখেছিলাম তোমাদের জন্য পথের উপর একটি চোখ রাখতে। তা কখন এলে তোমরা? কাল ত দেখি নি।

কাল থেকেই এখানে আছেন বুঝি? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

গঙ্গোত্রী উত্তর দিলেন, কাল কেন? পরশু থেকে আছি।

এতদিন এক জায়গায় কেন?

চোখ এবং হাতের ইঙ্গিতে বৃদ্ধাকে দেখিয়ে দিলেন গঙ্গোত্রী—সেই প্রথম দিন স্বর্গাশ্রম পরিক্রমা শেষ করে গঙ্গার ধারে খেয়াঘাটে বসে যে ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি তার গঙ্গোত্রী নাম সত্ত্বেও ভাগীরথীর মত ছুটে ছুটে বেড়ান।

আমি হেসে বললাম, গুপ্তকাশীতে বিশ্বনাথ লুকিয়ে আছেন মনে করে বেশী বেশী খুজতে হ'ল বুঝি?

আমার তরল পরিহাস বিদ্রূপে কঠিন হয়ে বাজল নাকি আমার কণ্ঠস্বরে? হঠাৎ দেখি বৃদ্ধার মুখের হাসি নিবে গেল যেন! গঙ্গোত্রীর মুখেও কেমন যেন বিব্রত ভাব।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আমি আবার বললাম, আমরা দু'জন ঠিক তীর্থযাত্রী ত নই, তাই বিশ্বনাথের মন্দিরে একটিবার উঁকি দিয়েই চলবার উপক্রম করেছিলাম।

গঙ্গোত্রী বললেন, চলুন তবে, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।

বলতে বলতেই আবার সহজ হয়ে উঠল তাঁর মুখের ভাব। তার চেয়েও যেন বেশী। সহাস্য চোখ দু'টির একটি বৃদ্ধার ও অপরটি যেন জিতেনের মুখের উপর রেখে সকৌতুক কণ্ঠে তিনি আবার বললেন, মাইয়ার আর কোন ভয় নেই এখন। ভাইয়ার উপরেই ভার থাকল তার, কেমন?

মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিহ্বল হ'ল বৈ কি জিতেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সেও কৌতুকের স্বরেই বললে, তা না হয় থাকল। কিন্তু বহিন তা হলে কি করবে।

—চাচাকে আগলাবে।

হাসি এবার রূপ ছেড়ে ধ্বনিকে আশ্রয় করেছে। গঙ্গোত্রী অকস্মাৎ বাঁধ ভেঙে আবার ভাগীরথী হয়েছেন।

ক্রমশঃ

আমার ফুল বাগান

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়

ফুল আমি ভালবাসি। কে না ভালবাসে ফুল? নিজে হাতে জমি কুপিয়ে ফুল বাগান করেছি—মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা।

যুগ-যুগান্তর চলে গেছে তার পর। দু'দুটো মহাযুদ্ধ গেছে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে। দুনিয়ার অনেককিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। কত চলেছে হানাহানি, রক্তপাত, ধ্বংসলীলা, কত রাষ্ট্রের হয়েছে ভাঙাগড়া, উত্থান-পতন। কত দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছে, কত দেশ হয়েছে স্বাধীন। বিজ্ঞানের চলেছে নব নব আবিষ্কার—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। অভিনেতার কণ্ঠ সারা দুনিয়া ছুটে বেড়ায় সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে। শব্দকে অনুসরণ করছে দৃশ্য। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে বিলেত ও আমেরিকার ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ দেখছি। মহাকাশে ঘুরছে স্পুটনিক। চন্দ্রলোক কি মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়া এখন আর কল্পনাবিলাস নয়। অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত আমরা টিকিট কাটব পাড়ি জমাবার।

প্রগতি শুধু বিজ্ঞানেই নয়। প্রগতির কল্যাণে ভাঙন ধরেছে সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার। নারীরাও পর্দা ছিঁড়ে দলে দলে বেরিয়েছে স্কুলে, কলেজে, সিনেমা, রেস্তোরায়, হাটে, ঘাটে, খেলার মাঠে। হেঁসেলের হাতা-বেড়ি, উঠানের ঝাঁটা, পতিদেবতার পদসেবা ছেড়ে ধরেছে আপিসের কলম, মাষ্টারের চাবুক, ডাক্তারের ষ্টেথিস্কোপ, মোটরের ষ্টিয়ারিং, মায় পুলিসের ডাণ্ডা।

আমরাও এখন স্বাধীন। স্বাধীনতার মূল্য দিতে কত লোক হারিয়েছে বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষের ভিটে, এমন কি মান, সম্মান, জীবন। কারুর আশ্রয় আকাশের চন্দ্রাতপতলে, ফুটপাথে, সরকারী তাঁবুতে, কি শিয়ালদহ ষ্টেশনে বে-ওয়ারিশ মালের মত। কেউ দিয়েছে পাড়ি আন্দামানে। দণ্ডকারণ্যে যাত্রার সুরু হয়ে গেছে।

ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি ভাবছেন হয়ত। তা নয়, কালের খরস্রোতে, জীবনের ঘূর্ণিপাকে ভেসে বেড়িয়েছি ঘাটে-ঘাটে, দেশ-দেশান্তরে। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম আমি, কোন্ অতল-তলে তলিয়ে গিয়েছিল আমার ফুল! এবার বুঝি ফুল আমার কূল পেয়েছে। তাই এত কথা।

কোথা হতে ছিটকে এসে কোথায় পড়েছি। বড় রাস্তার ধারে আমার ছোট বাড়ী, হোক না ছোট, তবু ত নিজের বাড়ী—মাথা গোঁজার পক্ষে যথেষ্ট, নাই বা হ'ল মস্ত বাড়ী, নাই বা হ'ল শান-বাঁধান পুকুর আর ফলের বাগান। ফুলের বাগান ত আছে।

সামনের এক ফালি জমিতে আমার ফুল বাগান নিতান্ত অগোছাল, এলোমেলো। কাঁচা হাতের ছাপ আগাগোড়া। ফুল গাছগুলি বেড়ে ওঠে আমারি প্রাণ-ঢালা যত্নে। নিজের হাতে ফুলের চারা বসাই, জমিতে সার দেই, ঘাস বাছি ছুটির দিনে। কারও অপেক্ষা রাখি না।

গাছ বাড়ে, মুকুল ধরে, ফুল ফোটে। ফোটে কত রকমের ফুল—কত বর্ণের, কত গন্ধের—গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে, বসন্তে। বাগান আলো করে থাকে জবা, স্থলপদ্ম, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, কসমস। গন্ধ বিলায় যুঁই, বেল, শিউলী, গোলাপ, গন্ধরাজ। আবার ফিরে পেয়েছি আমার হারিয়ে-যাওয়া ফুল বাগান। কি আনন্দ আমার!

পাড়ার ছেলে, বুড়ো, বউ, ঝি, গিন্নীরা বেড়াতে এসে তারিফ করে ফুলের। বড় রাস্তায় চলে অগুণতি লোক। কত লোক পথ চলে ফুলের দিকে চেয়ে—কেউ বা দু'দণ্ড দাঁড়ায়। আনন্দ শুধু আমার একলার নয়, অংশীদার অনেক। টাটকা, তাজাফুল শোভা পায় আমার ফুলদানিতে, প্রিয়জনকে উপহার দেই আমার ফুলে, অর্ঘ্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে আমার ফুল দেবতার পায়। খুশীতে মনটা ভরে ওঠে।

ফুলের নেশায় মসগুল হয়ে থাকে মন। ফুল দেখে দেখে আমার সাধ মেটে না, ঘুম থেকে চোখ মেলে সোনালীর প্রভাতে দেখি ফুলের হাসি, কর্ম্ম-ক্লান্ত দিনের শেষে আনমনে চেয়ে থাকি আমারি মত ক্লান্ত ফুলের দিকে। নিঝুম-রাতের অন্ধকারে তন্দ্রা-জড়িত চোখে সুইচ টিপে তারা-ভরা আকাশের তলে দেখি আধ-জাগা, আধ-ঘুমান, আধ-ফোটা ফুলেদের। জ্যোছনায় আবছা আলোয় ফুলগুলি কি যেন কানাকানি করে! বর্ষার হিমেল হাওয়ায় দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসে হাসনা-হানা আর রজনী-গন্ধার সুবাস, ভেসে আসে শরতের শিশির-ভেজা শিউলীর সুগন্ধ।

দুঃখও পাই অনেক। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা লুকিয়ে ফুল ছেঁড়ে, কোনও দিন বা ঘুম থেকে উঠে দেখি চুরি হয়ে গেছে রাশি রাশি ফুল। ফুল শুকিয়ে আসে, ঝরে শিউলী, ঝরে গোলাপ, ডালিয়ার পাঁপড়ি। রুদ্র বৈশাখ নিয়ে আসে নির্ম্মম দাহন আর রিক্ততা। আনন্দ মিলিয়ে যায় বুদবুদের মত বড় তাড়াতাড়ি। মনের কোণে ব্যথা ঘনিয়ে আসে, ভাবি 'দুত্তোর, আর নয়।' কিন্তু পারি না, আবার ভাবি 'জগতের কিই বা চিরস্থায়ী?'

বছর ঘুরে আসে। আবার রথের মেলায় ঘুরে, কলেজের মালীর কাছ থেকে ফুলের চারা নিয়ে আসি। ছুটির দিনে লেগে যাই বাগানের কাজে। ফুলের নেশা মাতিয়ে তোলে মনকে।

শনিবার বিকেল বেলা একটু অবসর পেয়ে ব্যস্ত আছি বাগানের কাজে। ভাই-বোন এসে হাজির। ছোট ছেলেটা বলে এক জাহাজ লজেঞ্চ চাই তার, বড় মেয়েটার চাই এবার পূজায় হাল-ফ্যাসানের এক ছড়া নেক্‌লেস, সঙ্গে মানান-সই একটা নাইলনের শাড়ী। গৃহিণীরও আবির্ভাব হয়েছে কোন ফাকে, সে এসব চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে, তবে ঘরকন্নার নেহাৎ যা না হলে নয়। বলে, 'আর সের দশেক চাল হলেই মাসটা পাড়ি দিতে পারি।' তিড়িং করে খুরপি হাতে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে ফেললাম—

'বজ্রসম তব বাণী পড়ে শিরে মম !
দিব আনি, চাল ছাড়া, আর যাহা চাহ।'

প্রশ্ন :—'কি গিলিবে গোষ্ঠী তব ?'
উত্তর :—'খাও আটা যত পার দিবসে নিশীথে।'
'এহ বাহ্য, আগে কহ আর।'

দু'সপ্তাহ পরে। রবিবার সকালে চা-মুড়ি খেয়ে ফুল গাছে জল দিচ্ছি। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গৃহিণী আরজি পেশ করলে—

'ছেলেপিলেদের পরীক্ষা সামনে, ওদের পড়ায় মন নেই। মাষ্টারের ঘড়ি-ধরা পড়ানোতে আর কতটুকু কি হয় ? অকাজে বাগানে সময় নষ্ট না করে মাসখানেক ওদের দেখলে এ যাত্রায় যত ওরা পরীক্ষা-সমুদ্রটা পার হতে পারে।'

সামনেই আমার সিজন-ফ্লাওয়ারের সময়। বলে কি ? দশটা-পাঁচটার ওপর আবার ডেলী-প্যাসেঞ্জারী, আমার ফুরসুৎ কোথায় ? তা ছাড়া ছেলেপিলেদের বিদ্যের বহর দেখে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে—ও পথ মাড়াই না। আমার মাষ্টারীতে ওরা হয়ে উঠবে লম্বকর্ণ, চোখের জলের মন্দাকিনীতে ভেসে যাবে বইপত্র, খাতা-পেন্সিল, মগজে সৃষ্টি হবে মরুভূমি। পড়াবার জন্ত রয়েছে স্কুলভরা মাষ্টার, তার ওপর বাড়ীর মাষ্টার। মাসে মাসে মাইনে গুনছি, আবার আমি কেন ?

এই ত দু'দিন আগে চালের জটিল সমস্তার সুন্দর একটা সমাধান করে দিয়েছি। একটা সমস্তার সমাধান হতে না হতে পাঁচটা নূতন সমস্তা গজায়। নিত্য-নূতন সমস্তার অন্ত নেই। আমি ভুলে থাকতে চাই সব। ফুলের সঙ্গে আমার মিতালি চির-দিনের। চোখ-জুড়ান, কান-ভুলান, মন-ভুলান ফুলই আমার ভাল।

তাই ফুল আমি ভালবাসি।

উপনিষদ্‌মালা

শ্রীপুষ্প দেবী

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান্ মৈক্ষদ্ আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥১

নয়ন মুগ্ধ বাহিরের রূপে শ্রবণ শব্দে ভরা
ঘ্রাণের মাঝেতে সুগন্ধ পশে পরাণ আকুল করা
রসনা ব্যাকুল ভাষা হয়ে যায়
বিভিন্ন পথে লয়ে যেতে চায়
অন্তর মাঝে রাজেন যেজন তাঁহারে হেরি না তা
বাহিরের মোহে ভুলি অবিরত যেথায় সেজন নাই।

কেঁদে বলি প্রভু একি লীলা তব বোঝা যে কঠিন বড়
সহজেতে ভুলি তাই কি ভোলালে ওগো অন্তরতর
কাহারে হিংসা করে দূরে রহ
একি অভিমান বোঝা দুঃসহ
বুঝালে মোদের বাহিরেরে নিয়ে মত্ত যেজন হয়
অন্তরতম অন্তর হতে আরো তার দূরে যায়।

কঠোপনিষদ, ২য় অধ্যায়, প্রথম বল্লী।

শঙ্কর দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৩

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্কর মতানুযায়ী মোক্ষের নিত্যত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় সে বিষয়ে আরো কিছু বলা হচ্ছে।

শঙ্করের মতে, 'মোক্ষকালে বা মোক্ষাবস্থায় মুক্ত জীব ব্রহ্মকে লাভ করেন', প্রমুখ বাক্য আমরা ব্যবহার করলেও বস্তুতঃ, 'মোক্ষ' ও 'ব্রহ্ম' দুটি বিভিন্ন বস্তু নন। সাধারণতঃ একটি বিশেষ কালে বা অবস্থায় কোনো একটি ঘটনা ঘটলে, সেই ঘটনা সেই কাল বা অবস্থা থেকে বিভিন্ন বলেই গৃহীত হয়। যেমন, 'প্রভাতকালে সূর্য উদিত হয়'। কিন্তু মোক্ষের ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। প্রভাতের ন্যায় 'মোক্ষ' কোনো বিশেষ কাল বা অবস্থা নয়—'মোক্ষ' আত্মারই স্বরূপ—যেহেতু জীব নিত্যমুক্ত। মোক্ষ হ'ল আত্মার স্বরূপাবরণেরই অপসারণ, বা 'ব্রহ্ম'। যেমন, মেঘাবরণের অপসারণ হলেই সূর্যের প্রকাশ হয়। এই অপসারণই হ'ল 'সূর্য'। অপসারণ কেবল নঞর্থক বাধাভাব মাত্রই নয়, সদর্থক স্বরূপবিকাশ বা স্বরূপই স্বয়ং। একই ভাবে, মোক্ষ কেবল অবিদ্যাকরণের অপসারণ মাত্রই নয়, ব্রহ্মস্বরূপের বিকাশ বা ব্রহ্মই স্বয়ং। সেজন্যই শঙ্কর বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলছেন যে, মোক্ষই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই মোক্ষ, সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য বলে মোক্ষও নিত্য।

"অতোঽবিদ্যা-কল্পিত-সংসারিত্ব-নিবর্তনেন
নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণান্ন মোক্ষস্যানিত্যত্ব-দোষঃ।"
(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—১-১-৪)।

অর্থাৎ, অবিদ্যা-কল্পিত-সংসারিত্ব নিবর্তন করে' নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপ সমর্পণ করে বলে, মোক্ষ অনিত্য নয়।

সেজন্য, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ সূত্রে শঙ্কর বলছেন:

"তদ্ব্যসাধ্যং নিত্যসিদ্ধ-স্বভাবভূতমেব বিদ্যয়াধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিষ্ম।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৩-৪-৫২)।

অর্থাৎ, মোক্ষ আত্মার স্বরূপভূত, এবং সেজন্য নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসাধ্য নয়। বিদ্যাদ্বারা এই নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ প্রকাশিতই হয় মাত্র।

এই কারণে, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানরূপ আবরণের বিনাশমাত্র করে, নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত করে, জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ প্রকটিত করে, নূতন কিছুরই সৃষ্টি করে না, যেরূপ আলোক ঘট-পটাদির আবরণস্বরূপ অন্ধকার বিনাশ করে', পূর্ব থেকে বিরাজমান ঘট-পটাদিকে প্রকাশিত মাত্রই করে, নূতন ঘট-পটাদির সৃষ্টি নয়।

"শ্রুতয়ো মোক্ষ-প্রতিবন্ধ-নিবৃত্তিমাত্রমেবাত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শয়ন্তি।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—১-১-৪)।

অতএব মোক্ষের কারণ কর্ম ত নয়ই, এমন কি জ্ঞানও নয়—মোক্ষ কর্ম, জ্ঞান, কোনো কিছুরই কার্য নয়; মোক্ষ নিত্য।

যা' পূর্বেই বলা হয়েছে, জীব প্রকৃতপক্ষে নিত্যমুক্ত বলে, কোনোদিনই মুহূর্তের জন্যও সংসারাবদ্ধ হন না, চিরকালই অনাবদ্ধই থাকেন। সেজন্য, আপাতদৃষ্টিতে জগৎ "সর্বং দুঃখম্ দুঃখম্" হলেও প্রকৃতপক্ষে দুঃখ সত্য ও শাশ্বত বস্তু নয়। দুঃখকে কেবল ব্যবহারিক দিক্ থেকেই সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু পারমার্থিক দিক্ থেকে দুঃখ মিথ্যাই মাত্র—সচ্চিদানন্দ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যবুদ্ধ পরব্রহ্মের ক্ষেত্রে দুঃখের প্রশ্ন কোথায়?

সেজন্য শঙ্কর বলছেন:

"দেহাদ্যভিমানবৎ দুঃখিতাদ্যভিমানস্য মিথ্যাভিমানত্বোপপত্তেঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য—৪-১-২)।

অর্থাৎ, দেহাদি অভিমান বা আত্মায় দেহাদিবুদ্ধি যেরূপ মিথ্যাসৃষ্ট, আত্মায় দুঃখাদি আরোপও ঠিক তাই।

দৃষ্টান্ত দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, দেহ ছিন্ন বা দগ্ধ হলে 'আমিও' ছিন্ন বা দগ্ধ হই, পুত্রাদি সন্তপ্ত হলে 'আমিও' সন্তপ্ত হই—এরূপ দেহাদি অভিমান বা দেহাদির ধর্মাদি আত্মায় আরোপ—প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। একই ভাবে, আত্মায় দুঃখাদিও অধ্যস্ত করা হয়।

তর্কপাদে (২২), সাংখ্যমতবাদ নিরাসন কালে (২-২-১০) শঙ্কর এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এস্থলে পূর্বপক্ষবাদী সাংখ্য বলছেন যে, অদ্বৈত-বেদান্ত-দর্শন অসমঞ্জস, যেহেতু এই বেদান্তানুসারে, তপ্য বা পুরুষ এবং তাপক বা দুঃখসঙ্কুল জগৎ এক ও অভিন্ন—কিন্তু যিনি তাপিত হন এবং যিনি তাপ দান করেন—তাঁরা এক ও অভিন্ন হবেন কিরূপে?

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, একাত্মবাদে অদ্বৈতবেদান্ত

মতে, তপ্য-তাপক-ভাব অযৌক্তিক। কারণ, এই মতানুসারে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য—একটি মাত্র তত্ত্ব বা বস্তুই যদি থাকে, তা হলে কে কাকে তাপ বা দুঃখ দেবে? যেমন, অগ্নি কেবল অপরকেই দগ্ধ করে, নিজেকে নয়। সেজন্য, কূটস্থ ব্রহ্মে তপ্য-তাপক-ভাব অসম্ভব। কিন্তু ব্যবহারিক দিক্ থেকে ভেদ স্বীকার করা হয় বলে, তপ্য-তাপক-ভাবও যুক্তিসঙ্গত। যেমন, দেহ তপ্য, সূর্য তাপক। সুতরাং সংসারাবস্থায়, মিথ্যা-দেহাদি-অভিমানবশতঃ, আত্মায় দুঃখাদি আরোপ করে, জীব যেন তাপযুক্তের মতই হন কেবল, সত্যই তাপযুক্ত হন না। এরূপে, আত্মা যদি সত্যই দুঃখ-শোকাতীত হন, তা হলে 'আত্মা যেন দুঃখক্লিষ্ট হন, 'আত্মা দুঃখিতের ন্যায় হন, প্রমুখ বললে কোনো দোষের হয় না। ডুণ্ডুভকে (ঢোঁড়া সাপকে) সর্প এবং সর্পকে ডুণ্ডুভ বললে ডুণ্ডুভও বিষধর হয় না, বিষধরও ডুণ্ডুভ হয় না। অতএব, সিদ্ধান্ত করা চলে যে, তপ্য-তাপক-ভাব ও শোকক্লেশাদি আবিদ্যিক, মিথ্যা, ব্যবহারিকই মাত্র—পারমার্থিক নয়।

"অতশ্চাবিদ্যা-কৃতোঽয়ং তপ্য-তাপক-ভাবো ন পারমার্থিক ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিতি।" (ব্রহ্মসূত্র—২-২ ১০)।

এরূপে, শঙ্করের মতে, সংসার যেরূপ মিথ্যা, স্বয়ং ব্রহ্মরূপ জীবের শরীরধারণ যেরূপ মিথ্যা, সেরূপ সংসারজ দুঃখ-ক্লেশ ও শরীরজ জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মরণও সমভাবে মিথ্যা। সেজন্য, চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপ মোক্ষ দুঃখ ধ্বংস করে না, কেবল 'আমি দুঃখী' প্রমুখ ভ্রান্ত ধারণার নিরাস করে—যেরূপ রজ্জু-জ্ঞান সর্প ধ্বংস করে না,—যেহেতু প্রথমতঃ সর্পটির ত অস্তিত্বই নেই এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান দ্বারাও বস্তুর ধ্বংস সাধন অসম্ভব—কেবল মিথ্যা সর্প-জ্ঞানই ধ্বংস করে মাত্র। সুতরাং, শঙ্করের মতে, বন্ধ ও তজ্জনিত দুঃখ আত্মার কোনোরূপ সাময়িক বাস্তব অবস্থামাত্রও নয়—একেবারেই মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রান্তি।

মুক্তি নিত্য বলে, শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপেরই স্বরূপাবরণ অবিদ্যার নিবৃত্তি মাত্র বলে, মোক্ষকালে জীবকে দেহ থেকে বহির্গমন করে, ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়ে, ব্রহ্মলাভ করতে হয় না। পূর্বেই বলা হয়েছে, কি ভাবে শঙ্কর জীবন্মুক্তিবাদ প্রমাণ করেছেন নানা উপায়ের সাহায্যে। জীবন্মুক্তি-বাদের অর্থই হ'ল এই যে, যে মুহূর্তে তত্ত্বজ্ঞান, সেই মুহূর্তেই মুক্তি—অপর কোন কিছুর প্রশ্নই এ স্থলে উঠে না। যেমন, যে মুহূর্তে সূর্যের উদয়, সেই মুহূর্তেই অন্ধকার বিনাশ ও আবৃত ঘট-পটাদির প্রকাশ—মধ্যে অপর কিছুই নেই। পূর্বে অন্ধকারাবৃত ঘটপটাদিকে প্রত্যক্ষ করবার জন্য প্রয়োজন কেবল আলোকের উদয় ও অন্ধকারের বিনাশ, অপর কোন কিছুই নয়। একই ভাবে, আত্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যও প্রয়োজন জ্ঞানের উদয় ও অজ্ঞানের বিনাশ, অপর কোন কিছুই নয়। সেজন্য পূর্বে ব্যবহারিক দিক থেকে, সগুণ ব্রহ্মোপাসকের দেহ থেকে বহির্গমন, দেবযান-পন্থানুসরণ, কার্য-ব্রহ্মলোকে অবস্থান, ও পরিশেষে ক্রমমুক্তি লাভ বা কার্যব্রহ্মসহ পরব্রহ্ম-লাভের বিষয় যা বলা হয়েছে, তা পারমার্থিক দিক থেকে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ক্ষেত্রে যে প্রযোজ্য নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই কারণে প্রকৃত মুক্তি হ'ল সদ্যোমুক্তি—জ্ঞানোদয় মাত্রেই আত্মার ব্রহ্মস্বস্বরূপস্বোপলব্ধি।

শঙ্কর বলছেন:

"ন তু পরস্মিন্ ব্রহ্মনি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্বাঽবকল্পতে, সর্বগতত্বাৎ, প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৄণাম্।"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ৪-৩-৭)

অর্থাৎ, পরব্রহ্মকে গমনকারী বা গন্তব্য লক্ষ্য বলে কল্পনামাত্র করা যায় না, তাঁর গতিও তাই, যেহেতু তিনি সর্বগত ও গমনকারীর আত্মস্বরূপ।

যে স্থলে গমনাগমনের প্রশ্ন উঠে, সে স্থলে গমনকারী গন্তব্য-লক্ষ্য এবং গতি—যারই সাহায্যে গমনকারী গন্তব্য-লক্ষ্যে উপনীত হন—এই তিন বস্তুর প্রয়োজন, এবং গমনকারী ও গন্তব্য-লক্ষ্য বিভিন্ন হওয়ারও প্রয়োজন। কিন্তু এ স্থলে গমনকারী জীবও পরব্রহ্ম, গন্তব্য-লক্ষ্য ব্রহ্মও পরব্রহ্ম, অর্থাৎ গমনকারী ও গন্তব্য-লক্ষ্য উভয়েই এক ও অভিন্ন। সুতরাং এক্ষেত্রে এক স্থল থেকে অন্য স্থলে গতির প্রয়োজনই নেই, সম্ভাবনাই নেই। অন্য অপর এক দিক থেকেও, এক্ষেত্রে গতি অসম্ভব, যেহেতু পূর্বেই যা বলা হয়েছে, ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপেই নিষ্ক্রিয়।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (৪-৩-১৪) শঙ্কর এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমেই বলছেন:

"গন্তব্যত্বানুপপত্তেব্রর্হ্মণ,...ন হি গতমেব গম্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৩-১৪)

ব্রহ্ম গন্তব্য লক্ষ্য হতে পারেন না, কারণ যা যাওয়াই বা পাওয়াই আছে, তা পুনরায় যাওয়া বা পাওয়া যেতে পারে কিরূপে?

এর উত্তরে পূর্বপক্ষবাদী বলতে পারেন যে, যা যাওয়াই বা পাওয়াই আছে, তাও ত অনায়াসে পুনরায় যাওয়া বা পাওয়া যেতে পারে স্থলবিশেষে। যেমন, পৃথিবী প্রথম থেকেই যাওয়াই বা পাওয়াই আছে। তা সত্ত্বেও, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে গমন ও নূতন প্রদেশে প্রাপ্তি অতি সাধারণ ঘটনা। একই ভাবে, মানুষ একই, যেই বালক, সেই যুবা, সেই বৃদ্ধ, সেজন্য বার্ধক্যও ত প্রথম থেকেই গত ও প্রাপ্ত হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও, আমরা

সিংহলে পোলোন্নরুয়া দর্শনরত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

সিংহলে ভারতীয় হাই-কমিশনের কর্মিবৃন্দসহ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

মথুরাস্থিত ভূতেশ্বরে দুটি খোদাইকরা মূর্তি

নেপালের কাঠমুণ্ডুতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুশিশুদের নিকট হইতে ফুলেরমালা ও তোড়া লইতেছেন

বলি যে, এই যুবকটি বার্ধক্যে গমন করেছে, বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়েছে। এরূপে পূর্বে গত ও প্রাপ্ত বস্তুও পরে পুনরায় গত ও প্রাপ্ত হতে পারে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক এ স্থলে সমান নয়। সাধারণ ভাবে পৃথিবী প্রথম থেকেই গত ও প্রাপ্ত হয়ে থাকলেও, পৃথিবীর অংশ আছে এবং সেজন্যই পৃথিবীর এক অংশ বা প্রদেশ থেকে অপর এক অংশ বা প্রদেশে গমন সম্ভবপর। একই ভাবে, সাধারণ ভাবে মানুষের স্বরূপ এক ও অভিন্ন বলে তা প্রথম থেকেই গত ও প্রাপ্ত হয়ে থাকলেও, মানুষের অবস্থাভেদ ও পরিণতি আছে, এবং সেজন্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় গমন, এক বয়স থেকে অন্য বয়স প্রাপ্তি এক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়। কিন্তু নিষ্কল, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের অংশও নেই, পরিণতিও নেই, গতিও নেই। সেজন্য তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ গমন, গন্তৃত্ব, গন্তব্যত্ব প্রভৃতি সবই অসম্ভব।

প্রকৃত পক্ষে, উপরের দৃষ্টান্ত দুটী নির্দোষ নয় যেহেতু এই দৃষ্টান্তেও দুটী গতি সম্ভবপর নয়। প্রথমতঃ পৃথিবীর এক প্রদেশ ত শাশ্বতকাল পৃথিবীরই প্রদেশ, সেজন্য সেই প্রদেশেই, গান্ধার প্রদেশেই, পৃথিবী চিরগত ও চিরপ্রাপ্ত। একই ভাবে, মৃত্তিকার বিকার ঘট যেরূপ সর্বদাই মৃত্তিকা-প্রাপ্ত হয়ে আছে, কোনকালেই মৃত্তিকাস্বভাব পরিত্যাগ করে না, পরিত্যাগ করা মাত্রেই নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়, সেরূপ এক অর্থে মানব সর্বদাই শৈশব যৌবন বার্ধক্যাদি মানবস্বভাব সদাসর্বদাই প্রাপ্তই হয়ে আছে। সেজন্য তর্কের খাতিরে, জীবকে ব্রহ্মের অংশ বা বিকার বলে স্বীকার করলেও, ব্রহ্ম জীবের নিকট সদাপ্রাপ্ত হয়ে আছেন বলে, পুনরায় জীবের ব্রহ্মগমন অসম্ভব।

"নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ পুনর্ব্রহ্ম গমনমুপপদ্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৩-১২)

এরূপে, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন বলে, মোক্ষকালে জীবের ব্রহ্মগমন নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব:

"অত্যন্ত-তাদাত্ম্যে গমনানুপপত্তেঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৩-২)

পুনরায়, মোক্ষ জীবের নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ বিনাশই মাত্র বলেও, মুক্ত জীবের ব্রহ্মগমন নিষ্প্রয়োজন ও অসম্ভব।

"তত্র প্ররোচনং তাবৎ ব্রহ্মবিদো ন গত্যুৎক্রান্তী ক্রিয়তে, স সদ্যোহৈবাব্যবহিতেন বিদ্যা সমর্পিতেন আত্মেন তৎসিদ্ধেঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-৩-২২)।

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞের গতিই নেই, যেহেতু, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বরূপোপলব্ধি হয়। যে বিজ্ঞান অন্য কোনো কিছু ফল প্রসব করে না, কেবলমাত্র আত্মার নিত্য-সিদ্ধ মোক্ষরূপতা নিবেদনই মাত্র করে—সেই বিজ্ঞানের পরে গতির অবকাশ কোথায়?

সেজন্য, শঙ্কর পারমার্থিক দিক্‌ থেকে ব্রহ্মজ্ঞের সদ্যো-মুক্তি, জীবন্মুক্তি, ও নিত্যমুক্তির কথা উল্লেখ করে', স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন:

"ন চ ব্রহ্মবিদঃ সর্বগত-ব্রহ্মাত্মভূতস্য প্রক্ষীণ-কাম-কর্মণ উৎক্রান্তির্গতির্বোপপদ্যতে, নিমিত্তাভাবাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য; ৪-২-১৩)।

অর্থাৎ, সর্বগত ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্নাত্মা, এবং কাম্য-কর্ম-রহিত ব্রহ্মজ্ঞের উৎক্রান্তি ও গতি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, যেহেতু তাদের কোনোরূপ কারণ বিদ্যমান নেই।

গীতা ভাষ্যেও শঙ্কর বহু ক্ষেত্রেই সগুণ উপাসকের ক্রম-মুক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞের সদ্যোমুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন:

"তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসনাপরা জনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। নহি সদ্যোমুক্তি ভাজাং সম্যগ্‌ দর্শন নিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা কচিদস্তি। ব্রহ্মসংলীনপ্রাণাঃ এব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এব তে। ক্রমেণ তু গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ৮-২৪)।

এস্থলে "ব্রহ্মবিৎ" শব্দের অর্থ সগুণ ব্রহ্মোপাসক। এরূপ ব্রহ্মোপাসকগণ দেবযান-পন্থাবলম্বনে ক্রমশঃ ব্রহ্মলাভ করেন। কিন্তু সদ্যোমুক্তির অধিকারী তত্ত্বজ্ঞানিগণের গমনাগমন সম্ভব নয়। তাঁদের প্রাণ ব্রহ্মে সংলীন হয়েই আছে, সেজন্য তাঁরা ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মভূত। অপর পক্ষে, সগুণোপাসকগণ ক্রমশঃ ব্রহ্মে গমন করেন।

বলাই বাহুল্য যে, মুক্তি বা মোক্ষই হ'ল মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সাধারণতঃ, বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ: এই হ'ল 'চতুর্বর্গ', বা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সেজন্য প্রাজ্ঞ বলছেন:

"ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং
যস্য কোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব
তস্য জন্ম নিরর্থকম্‌।"

অর্থাৎ, যাঁর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে একটিও নেই, তাঁর জন্ম অজের (ছাগলের) গলকম্বলের ন্যায়ই নিরর্থক।

কিন্তু শঙ্করের মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম, একেবারেই নয়—

একমাত্র মোক্ষই হ'ল জীবনের এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য। এমন কি, ধর্মের স্থানও আছে কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিক্ থেকেই। কারণ, ধর্ম উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদের ভিত্তিতেই গঠিত। কিন্তু যদি প্রকৃতরূপে, ভেদের কোনোরূপ অস্তিত্বই না থাকে, তা হলে উপাসকই স্বয়ং উপাস্য হয়ে পড়েন, এবং এরূপে, ধর্মেরও কোনোরূপ অস্তিত্ব থাকতে পারে না সেক্ষেত্রে। অর্থ ও কামের কোনোরূপ প্রশ্নই যে পরমার্থিক দিক্ থেকে থাকতে পারে না—তা' স্বতঃসিদ্ধ।

বস্তুতঃ, অজ্ঞানাবরণই সকল অনর্থের মূল বলে', সেই আবরণ অপসারণ ব্যতীত অন্য আর কি উদ্দেশ্য জীবের থাকতে পারে? যে ব্যক্তি অন্ধকারে পথভ্রষ্ট ও পঙ্কিল জলাভূমিতে নিমজ্জিত হয়ে, অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল আলোকের সাহায্যে অন্ধকার দূর করে, পুনরায় পথ প্রাপ্ত হওয়া। একই ভাবে, অজ্ঞানাবৃত, সংসার-পঙ্ক-নিমজ্জিত তথাকথিত বদ্ধ জীবও অশেষ দুঃখক্লেশাদি ভোগ করে, জ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানের কবল থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসী হন। অপর কোনো আকাঙ্ক্ষা, প্রয়াস বা উদ্দেশ্য তাঁর নেই, থাকতেও পারে না।

সেজন্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যে বলছেন:

"মহাত্মানঃ যতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং পরমাং প্রকৃষ্টাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ।" (গীতা-ভাষ্য, ৮-১৫)।

অর্থাৎ, মোক্ষ হ'ল সেই সংসিদ্ধি যা' পরমা ও প্রকৃষ্টা, মহাত্মা মুনিগণ এরূপ সংসিদ্ধি লাভেই কৃতকৃতার্থ ও ধন্য হন।

এরূপে, জ্ঞানবাদী শঙ্কর অতি সুন্দরভাবে, একমাত্র জ্ঞানকেই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে নির্দেশ করেছেন। পরমা সম্পদ লাভের জন্য অন্য কোনোরূপ উপায়াবলম্বনের প্রয়োজন নেই, যেহেতু সেই সম্পদ ত আমাদের চিরপ্রাপ্ত, অথচ অজ্ঞাত। সেজন্য অজ্ঞাতকে উপলব্ধি করাই হ'ল মোক্ষ, জ্ঞানই হ'ল মোক্ষ—জীবনের একমাত্র সংসিদ্ধি ও সংস্থিতি।

"রাঙা হয়ে উঠে শ্রাবণ গঙ্গা—"

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নিভৃত নিলয়ে পরভৃতিকার গোপন চর্যাসম
বায়সে ভুলায়ে তাহারি কুলায়ে আপন ডিম্ব পাড়ে,—
সেই পরবাসে বায়সের পাশে দিনে দিনে দুর্দম
ইঙ্গ কুলায়ে বঙ্গদুলাল কলায় কলায় বাড়ে।

আপন স্বভাব সুলভ কণ্ঠে কুহুর মুহুস্বরে
আভিজাত্যের মর্যাদা আর বৈশিষ্ট্যের গুণে,—
আপনার বুলি ভুলে না কখনো মুহূর্তেকেরো তরে
শিখিবার যাহা শিখিয়া জানিয়া শুনিবার যাহা শুনে।

বায়সের পালে ফলে যথাকালে পিকজননীর আশা
কাকানুকরণে কাকানুসরণে ভাষে না শাবক পিক,—
সতত সঙ্গ সহবাসে পাশে ভাষে সে মাতৃভাষা
বাণীর বোধন কৃচ্ছ্রসাধন ব্রতে মহাঋত্বিক।

বিশ্বভুবন ভ্রমিয়া যেজন কলাচার কৃষ্টির
সৃষ্টি আহরি ভরিয়া আনিল পুষ্পসাজিটি নিজে
উজাড় করিয়া চরণে ঢালিল বিস্মিত ভারতীর
(তাই) বিশ্বভারতে বিশ্বভারতী আমরা লভিয়াছি যে।

পৃথ্বীর আলো উজ্জ্বল হ'ল যে রবির পরকাশে
যে রবি উদিল হেথায় সে-রবি উঠেনি ভূমণ্ডলে,—
অস্তমনেও অনস্তমিত অরুণরশ্মি হাসে
(তবু) অবোধ ধরণী শোকবিহ্বল সিক্ত নয়নজলে।

অভ্রংলিহ বনস্পতির পতন হইলে পরে
মৃত্তিকারসে লভিয়া পোষণ বর্ধিত প্রসারণে
নীড়হারা পাখী শাখামৃগ শাখী কাঁদে গদ্গদ স্বরে
তাই, দিষাম্পতির তিরোধানে পড়ে বনস্পতিরে মনে।

শুভ্র তুষার কিরীট যাঁহার সিন্ধুচরণচারী
সেই ভারতের মেরুদণ্ড কি ভাঙিয়া পড়িল আজি?
ইউরোপেদীয় যুগ্মদশীয় সাধনা ধনাধিকারী
বিতরি কিরণ বিশ্বে ডুবিল গৈরিকরাঙা সাজি।

গঙ্গাহৃদয়া বঙ্গজননী চূড়ামণিখানি হারা
অস্তরবির রক্তকিরণে তপ্ত শোণিতবাহী
গঙ্গা এ নহে, বঙ্গ শোণিত বক্ষোদ্গত ধারা
রাঙা হয়ে উঠে শ্রাবণ গঙ্গা সজ্ঞা তাহার নাহি।

রাজা রাণীর যুগ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"এক যে ছিল রাজা" এ গল্প যে কোন দেশে কোন কালের ছেলে-মেয়েরা না শুনেছে জানি না। সকল দেশের যত রূপকথা বা উপকথার কাহিনীর গোড়ার কথার মানুষই প্রায় হ'ল 'এক যে ছিল রাজা।' রাজা, রাণী, রাজপুত্র, মন্ত্রী, কোটাল, সদাগর তাদের ছেলেমেয়ে বা পাত্র মিত্র সখা সহচর, হীরা মুক্তা সোনাদানা, হাতীশাল, ঘোড়াশাল, প্রাসাদ ও অট্টালিকার, ঐশ্বর্য্যময় রাজা, রাজপুত্রের বীর্য্য ও শৌর্য্যময় সে কাহিনী। আমাদের দেশে তার সঙ্গে দুয়ো সুয়ো রাণীর নানা সুখ দুঃখের সে কাহিনী। ধনীর প্রাসাদ থেকে চাষার কুটীর অবধি বাল্যকালে এ গল্প কে না শুনেছেন বলা শক্ত।

তখন সব দেশেই রাজা আর রাণী অনেক ছিলেন ছোট বড়। আমাদের দেশের রাণীরা রাজার জন্যে সোনার থালায় ভাত বেড়ে আনতেন, এবং বেনারসীর আঁচলখানি বাঁশের দরজার আগড়ের খোঁচায় ছিঁড়েও যেত শোনা গেছে। ছলনাময়ী দাসীরা কখনও রাজকন্যার পোষাক পরলেই এক কথায় রাণী হয়ে যেতে পারত। অপরাধিনী রাণীদের অনায়াসেই 'হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা' দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলাও সম্ভব হ'ত। সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থীকে তাঁরা আমাদের মতই সদরে এসে ভিক্ষে-টিক্ষে দিতে পারতেন। মোটকথা তাঁরা ছিলেন যেন নিতান্তই আমাদের রূপকথার ঘরোয়া রাজা রাণী। রাণীরা রাঁধতেন বাড়তেন বটে, তবে রাজারা হাট বাজার করতেন কি না জানা যায় না।

এ ত রূপকথার রাজা রাণীর কথা। আমি বলতে বসেছি সত্যি-কারের দেখা এক দেশের রাজারাণীর কথা। 'এক যে ছিল রাজা'র গল্প। যাঁরা এ যুগে প্রায় ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে উঠেছেন ও উঠছেন। কেন না আমাদের চোখের সামনেই ত দেখলাম, দেশে বিদেশে কত রাজা রাণী সম্রাট সম্রাজ্ঞীর রাজ্যপাট ল্যাটে উঠে গেল। দুটি মহাযুদ্ধের প্রভাবে বা অন্য কারণে যাই হউক। যদি বা কেউ কেউ থাকেন, তাঁরা আর প্রবল প্রতাপান্বিত সব শক্তিমান সেকালের বাদশা, সম্রাট, মহারাজা ভাবে নাই। এ যুগের সিংহাসনে বসানো মন্দিরের দেবতাদের মত তাঁদের ভোগ রাগ বিলাস ব্যসন ঐশ্বর্য্য কোষাগার, ক্ষমতা প্রতাপের চাবী কাঠিটির ব্যবহার প্রজা প্রধানদের হাতে এবং মন্ত্রাধক্তে। রাজা রাখতে যারা ভালবাসে তারা রাজা রাখছে ঐ ভাবে। যারা ভালবাসে না তারা আর রাজাদের চিহ্নমাত্র রাখে নি। পাঁচ বছুরে প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতিকর্ত্তা রেখেছে। এরাও তা বলে সে রকম দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা নন। অনেক মানুষের মত নিয়ে অনেক লাল ফিতের বাঁধন খুলে বেঁধে তাঁদের রাজত্বের কাজ চলে। প্রতীচ্যে বা ইউরোপে কি ধরনের প্রতাপ ছিল ঠিক করে জানি না। কিন্তু প্রাচ্য দেশের বাদশা বেগম নিজাম নবাব রাজা রাণীদের যে ধরনের প্রতাপ ছিল, হুকুম হুকার ছিল তা মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সংস্করণ দেশীয় রাজ্যগুলিতে এ দিনেও দেখা গেছে।

অকস্মাৎ একেবারে তার পরের যুগ এসে পড়ল তাঁদের উপর দেশ স্বাধীন হবার পর। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে অনেক কিছুই অদল বদল হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ভাবে বদলেছে রাজা মহারাজা নিজাম নবাবী জমিদারীগিরির প্রথা। কয়েক শতাব্দীর মোগল আমলে যা বদলায় নি, দু'শো বছর ইংরেজ আমলেও যে প্রথা বজায় ছিল, দশ বছরের স্বাধীনতার আমল সেই রাজা মহারাজাদের প্রবল প্রতাপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিত অনাচার, অত্যাচার, অগাধ অপব্যয়, বহুদান, বহুপুণ্য, বহুকীর্ত্তিকলাপের কাহিনীকে ইতিহাসের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছে।

রাজ্যহীন রাজা মহারাজারা এখন কিছু সম্পত্তি আর কিছু মাসোহারা বা ভাতা নিয়ে এখনও পুরান প্রাসাদে বসবাস করছেন বটে। নূতন নাম করণও হয়েছে 'রাজপ্রমুখ'। আগমধনহীন কোষাগারে কুলগত বংশগত মণিমুক্তা ধনরত্ন হয়ত কিছু আছে, এবং সেপাই শান্ত্রী প্রহরী প্রতিহারী দেহরক্ষীরাও হয়ত নামমাত্র ভূমিকায় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিতা রাজমাতা রাজরাণী, রাজকুমারী, তাঁদের অসংখ্য সখি সহচরী অন্তঃপুর রক্ষী খোজা প্রতিহারী, খিদমৎগার, বনাতঘেরা কাঠের পর্দ্দার অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরের মহিমার আভাস মাত্র এখনও আছে। কিন্তু মনে হয় প্রাসাদে প্রাসাদে অন্ধকার সুড়ঙ্গময় প্রদীপজ্বালা পথে মহলে মহলে যাতায়াতের দিন চলে গেল। মহলে মহলে দরবার হুকুম, সেলাম, আরজি এত্তেলার দিনও একেবারেই শেষ হয়ে গেল সম্ভবতঃ।

রাণী মহারাণীদের প্রাসাদ, সখি সহচরীদের 'রাওনা বা মহল' আর খোজা প্রতিহারীদের রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে না মনে হয়।

আমোদ প্রমোদের ধরন ধারণও বদলেছে। সাচ্চা জরির মুক্তা খচিত সোনা রূপার কাজ করা জুতা পায়ে বিপুল ওজনের সোনা হীরা মুক্তাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিতা, নানা রঙের বসন আবরণে শোভিতা কানাতঘেরা পর্দ্দার আড়ালে থেকে গজেন্দ্রগামিনী

মহারাণীদের আর রথে বা অন্য যানে আরোহণ করে বেড়াতে যেতে হয় না। এখন নূপুর মঞ্জীরহীন চরণে উঁচু গোড়ালীর দামী জুতো পায়ে আধুনিক বসন ভূষণে সজ্জিতা আধুনিক রাণী, রাজকুমারীরা বিনা পর্দায় জনতার মাঝে খুট খুট করে পা ফেলে এসে মোটরে ওঠেন। সেকালের মত কৌতূহলী জনতা বন্ধগাড়ীর আশপাশে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়েও থাকে না, জয়ধ্বনিও করে না। বরং কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাভরে বলে "একি আর রাণীর মত হ'ল। সে সব 'জমানা' যুগ চলে গেছে।" এক কথায় যুগ দেবতা বা কাল তাঁদের উপরও কলম চালিয়েছেন। এঁরাই এখন 'এক যে ছিল রাজা' হয়ে গেছেন।

পুণ্য কারখানা

রাজাদের রাজ্য শাসনের আইন কানুন ঐতিহাসিকেরা জানেন। এবং তাঁরাই বলবেন—বলেনও। আমি এখন বলছি কয়েকটি ছোট বড় নিয়ম প্রথা ও অন্তঃপুরের কিছু কথা এবং কাহিনী যা কখনও দেখেছি ও শুনেছি।

দেশীয় রাজত্বে ছিল বা থাকত একটি করে 'পুণ্য কারখানা'। যে কারখানাটির কর্মপন্থা বিশাল। কি কি কাজ হয়? রাজ্যের আয় ব্যয়ের (ঠিক জানি না কত) একটা অংশ ব্যয় করা হ'ত নানা পুণ্যকাজে। দানখয়রাত, দেবালয়, জলাশয় সংস্কার ইত্যাদি। 'পুণ্য কারখানা' নামটি কিন্তু সেকালে মজার মনে হ'ত। পুণ্যের আবার কারখানা কি? সে কি কলকারখানার মত? পরে বুঝলাম, আসলে পুণ্য কর্ম্মশালা।

অত বড় রাজ্যের দীন দরিদ্র অনাথ আতুর ও অন্ধদের কিছু সাহায্য ও সেবা কার্য্যালয় বিশেষ। যাহাই হউক বিশেষ মন্ত্রী আর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের মারফৎ সেই নানাবিধ পুণ্যকাজ ও সদাব্রত কারখানার কাজ নির্ব্বাচন ও নিরূপণ হ'ত। এই পুণ্য কারখানায় কাজ যেমন ব্যাপক তেমনি নানা ধরনের। ধর্ম্মশালা তৈরীও এর মধ্যে পড়ে। যদিও সেটা প্রায় ধনীরা ও শেঠেরাই করে থাকেন। এই সব ধর্ম্মশালার দালানে দিনের পর দিন রেঁধে বেড়ে এক শ্রেণীর ভিখিরী আতুর খায় ও শুয়ে থাকে। এরা প্রায়ই ভিখারী। কিন্তু পুণ্য কারখানায় সদাব্রতের দানও পেয়ে থাকে। একবার কোন রকমে নাম লেখান যদি হয়ে যায় কমিটির (মিউনিসিপ্যালিটির) কারুর যারা দয়া ধর্ম্মেই হউক বা ধরাধরির দ্বারাই হউক। রোজ হিসাবে এক সের বা তিন পোয়া যবের আটা, এক ছটাক করে খোসাশুদ্ধ কোন ডাল, একটু নুন আর দুটি করে পয়সা তেল নুন লকড়ির জন্য আমরণ কাল পাবে। কেউ কেউ বেশী পরিমাণে পরিবার হিসাবে পেত। প্রায়ই যবের আটাই দেওয়া হ'ত। ওদেশে দীন দরিদ্ররা যব, বাজরা, ভুট্টার আটাই বেশী খায়। গম জোটে না।

আমাদের বাড়ীতে একটি অর্দ্ধোন্মাদ ধরনের অনাথ ছিল। তাকে বাওলা (বাতুল) বলা হইত। পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া। নাম ছিল অবশ্য ভাল 'নারায়ণ।' 'বাওলা' সপ্তাহে সপ্তাহে কিংবা ১৫ দিন অন্তর পুণ্য কারখানা থেকে আটা, ডাল, পয়সা নুন নিয়ে আসত। কোনখানে বসে দুখানা পাথরের উনুনে কাঠ কুটো জেলে রুটি করত। বাড়ীর গোয়ালে কিম্বা আস্তাবলের এককোণে একখানা দড়ির খাটিয়া পেতে শুত। আর ভোর বেলা কুয়া চালাত বলদ জুতে একটি মাত্র গান গেয়ে। মাত্র দু'লাইন, "কীলো ভরিয়ো কুয়া চলিয়ো' এই ছিল তার গানের কথা। নিরীহ পাগল, হাসি মুখ ভীরু প্রকৃতির। ঝাঁকড়া চুল উন্মাদের মতই দেখতে। জল তোলা, বাগানে জল দেওয়া নানা কাজে সারাদিন তাকে গাধার মত খাটিয়ে নিত অন্য সব বুদ্ধিমান ভৃত্যেরা। এই পুণ্যকারখানার কাজ বিস্তৃতভাবে হ'ত বলেছি।

অনেক ধনীও মেয়েদের জন্য বৈধব্যের দিনে বা অভাব অভিযোগের সময়ে পুণ্য কারখানাতে আবেদন করে এর সাহায্য সুযোগ নিতেন। রোজ নগদ টাকা হিসাবে সাহায্য নিতে চাইতেন। সাহায্য অনেক রকমের শস্য, গম আটা অর্থ। কেউ পেলেন দিন আড়াই টাকা হিসাবে, কেউ বা দিন এক টাকা হিসাবে। আরও বেশী ও নানা ভাবে পেতেন। কেউবা মাসে দু' টাকা বা চার টাকা, এক টাকা আট আনা, যেমন অবস্থা তার অনুযায়ী পেতেন দেখেছি, অনেকে পেত দৈনিক। আবার মহারাণীর বা রাজমাতার কাছে দুঃস্থ যাচক কেউ প্রিয়পাত্রী কেউ বিধবা, বৃদ্ধা ও অপুত্রক কেউ হলে তার জন্যে এ ছাড়াও তাঁদের রাজভাণ্ডার থেকে 'সিন্নি' অর্থাৎ মিষ্টান্ন প্রতিদিন বরাদ্দ থাকত। এটা আবার ষ্টেটের পুণ্যভাণ্ডার থেকে নাও হতে পারে। রাজরাণীর ব্যক্তিগত পুণ্যভাণ্ডারের এলাকায় পড়ত। একথা যাক।

এইসব দানকে 'রোজীনদারী' বলা হ'ত। বহু পদস্থ ব্যক্তিও কন্যা ভগ্নি ছাড়াও অকর্ম্মণ্য বা কর্ম্মহীন বেকার নাবালক ভাইপো, ভাগ্নে, ভাই, জামাতা অথবা অন্য দরিদ্র গলগ্রহ আত্মীয়-কুটুম্বের নাম লিখিয়ে সাহায্য নিতেন। তাঁরা চিরজীবন রাজ্য পুণ্যশালা থেকে 'রোজীনদার' ভাবে (দৈনিক বরাদ্দ ভোগী) দান পেতেন। বহিন বেটিদের জন্য (বোন এবং কন্যা) কিছু নিতে ওঁদের ওদেশে সঙ্কোচ নেই। তাঁরা 'যাচকের'ই পর্য্যায়ে পড়তে পারেন দুর্দ্দিনে।

রাজস্থানে 'বহিন বেটি'র কাছে কিছু নেওয়া বড় লজ্জার কথা দেওয়াই সম্পর্ক। দুঃস্থ কর্ম্মচারীর স্ত্রীরা ছেলেমেয়েরাও এই সাহায্য পেতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে মৃত কর্ম্মচারী, বিপন্ন দুঃস্থ কর্ম্মচারী, কর্ত্তব্যপালনের সময় গত কর্ম্মচারীদের স্ত্রীরাও আমরণ এই ভাতা বা সাহায্য পেয়েছেন। রোজীনদার অর্থে প্রতিদিনের সাহায্য বৃত্তিভোগী। এই রোজীনদারী আমরা বড় বড় বাড়ীতেও দেখেছি পেতে বা নিতে।

একটা জানা ঘটনা বলি। একদিন সহসা দেখি আমাদের বাড়ীর ভিতরের দালানের এক কোণে একটি ঘোমটা দেওয়া বাঙালী মহিলা বসে আছেন একটি ছোট মেয়ে নিয়ে। সে সময়ে জয়পুরে খুব প্লেগের প্রকোপ। তাঁরা থাকতেন শহরের খুব পুরাণো অংশে। তাঁর স্বামী রাজার ভাণ্ডারের যাবতীয় যোগাওয়াটার সরবরাহ

করতেন। অকস্মাৎ সোডাওয়াটার সরবরাহকারী ভদ্রলোকের প্লেগে মৃত্যু হ'ল। বেচারী নারীটি সেই দুর্য্যোগের দিনে একটি মাত্র মেয়ে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়লেন।

ওখানকার রাজকর্ম্মচারীরা খবর পেল। বাঙালীরাও খবর পেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনকে 'তার করে' দেওয়া হ'ল বাংলা দেশে। শেষকৃত্য বাঙালীরা করিয়ে দিলেন। তার পর সদ্য-বিধবা মহিলাটিকে নিয়ে আসা হ'ল আমাদের বাড়ীতে। কোথায় একলা প্লেগের ঘোরতর মড়কের ছোঁয়াচের মধ্যে থাকবে। তাঁকে বাড়ীতে আনায়ও অবশ্য ছোঁয়াচের ভয় কম ছিল না বাড়ীর লোকের। তবু তাঁকে আনা হ'ল এবং রাখাও হ'ল। আমাদের ছোটদের সঙ্গে বেজায় আলাপ ও ভাব হয়ে গেল। কম বয়সী বধূটি। বাড়ীর রাঁধুনী ব্রাহ্মণ তাঁদের খাবার-দাবার নিয়মমত দিয়ে যেত। অশৌচের ক'দিন দালানের কোণে সেইখানে রাত্রে বিছানা পেতে মাতা-কন্যা শুতেন। ছোটরা নাম দিয়েছিল 'সোডাওয়াটারের বৌ'। চাকরদের 'সোডাওয়াটারওয়ালী' থেকে। তার পর যতদিন না এই মহিলাটির কিছু সাহায্য একত্রে—তার পর যাবজ্জীবন বেশ কিছু ভাতা বা 'রোজীনদারীর' ব্যবস্থা রাজ্য পুণ্য কারখানা থেকে হ'ল ততদিন বাড়ীতে রইলেন। পরে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

বহুদিন পরেও তিনি প্রায় কুড়ি বছর পরে মেয়েটির বিয়ে দিয়েও কি জন্য এলেন একবার মনে হয়। মাঝে মাঝে আসতেন, বেঁচে আছেন সেটা প্রমাণ করবার জন্য। এসে 'রোজীনদারীর' সাহায্য নিয়ে গেলেনও। এ প্রমাণেরও প্রয়োজন হয় বিদেশী নরনারীর। এই ভাতা বা 'রোজীনদারী' জাতিবর্ণ দেশী-বিদেশী নির্ব্বিশেষে পুণ্য কারখানা দিত। দীন-দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী নিরাশ্রয় আতুর যাচক শ্রেণীরাও পেতেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর বা জীবিতাবস্থাতেই দুর্দ্দশার দিনে বহু নারী আবেদন করে নিজের অবস্থামত বৃত্তির ব্যবস্থা করে নিতেন। আমৃত্যুকাল সেই ভাতা পেতেনও। যাচক ব্রাহ্মণ গ্রহাচার্য্য টোলের অধ্যাপক টোল প্রতিষ্ঠাপক ব্রাহ্মণরাও এই বৃত্তি কখনও চেয়ে বা কখনও অবস্থানুযায়ী পেতেন। এই পুণ্যকর্ম্মশালা আর এখনও আছে কিনা জানি না। বাড়ী ভাড়া সেকালে সেখানে খুব সস্তা ছিল, তিন-চার টাকাতে একখানা ছোট বাড়ী পাওয়া যেত শহরে। সুতরাং সামান্য আয়েও লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হতে পারত।

পরবরিষ

এ ছাড়া আর একরকমের দান বা সাহায্যের প্রথা রাজ্য সরকারের নিয়মের মধ্যে ছিল। একে বলে পরবরিষ। সেটা হচ্ছে ছেলেমেয়ের বিবাহে ভাত পৈতে, পিতৃ-মাতৃদায়, রাজকীয় বা সাহায্য ভাণ্ডার থেকে একটা প্রথামত বা পদানুসারে সাহায্য পাওয়া, এটার জন্য আবেদন করতে হ'ত। পদমর্য্যাদা অনুসারে একটা বিশেষ পরিমাণ বা হিসাব মত সেই সাহায্য পেতেন লোকেরা এবং পদমর্য্যাদার প্রথামত কেউ বা 'নজর' করে নিমন্ত্রণ করে আসতেন রাজাকে। উচ্চ পদস্থেরাই অবশ্য। কাহারও বা নজর পাঁচ টাকা, কাহারও বা দুই টাকা, যেমনই হোক। 'নজর' মানে রাজার সামনে গিয়ে অভিবাদন সেলাম বা কুর্ণিশ করে দু'হাতে অঞ্জলি করে মুদ্রাগুলি হাতে রাখা, রাজা তুলে নিবেন। নিমন্ত্রণে আসা না আসা রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত। কিন্তু এ নিমন্ত্রণটি না করলে 'পরবরিষ' বা সাহায্য পাওয়া হ'ত না। ওটা যেন জানানো, আবার ছেলের বা মেয়ের বিয়ে অথবা অন্য কোন দায় কিংবা উৎসব। রাজ্য কর্ম্মচারীরা পদানুসারে পুত্র কন্যার বিয়েতে তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার অবধি পেতে দেখেছি বাড়ীতে। অন্যত্র আরও বেশী বা কম হ'ত। স্থানীয় পদস্থদের পিতৃমাতৃ দায় এবং বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের শ্রাদ্ধে দেওয়ার নিয়ম ছিল। সেটি প্রায় দেওয়া হ'ত এই ভাবে। শ্রাদ্ধক্রিয়ার যা কিছু জিনিস যেগুলি সম্ভব যেমন অধ্যাপক বিদায়ের ঘড়া বা শাল দোশালা শ্রাদ্ধের ষোড়শের বাসন, বিছানার উপকরণ, অধ্যাপকদের বিদায়ের টাকা সব ষ্টেটের বা রাজ্য সরকারের নিজের দোকান থেকে নিতে পারবেন। শুধু হিসাব দেবার সময় রাজকর্ম্মচারীদের দেখাতে হবে, কত জিনিসপত্র নিলেন। খাট পালঙ্ক বাসনাদি সব—যতটা খরচই হোক না কেন। শ্রাদ্ধের লোক খাওয়ানো, ব্রাহ্মণ-ভোজন তার দক্ষিণা এমনকি কুটুম্ব আত্মীয়দের বিদেশ থেকে আনার রেল-ভাড়া অবধি, তাদের লৌকিকতার কিছু দেওয়া সব রাজভাণ্ডার থেকে সরবরাহ হ'ত।

ভোজের বা যজ্ঞির আটা, ময়দা, চাল ডাল ঘি তেল মশলাদি ভারে ভারে ও ক্যানেস্তারা টিন ভর্ত্তি হয়ে আসত। সব ভাঁড়ারে উঠত। শুধু বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষরা বলে দিতেন বিশেষভাবে—যা খরচ হয়ে উদ্বৃত্ত হবে একটুও যেন যজ্ঞের পর রাখা না হয়। সব ঠেলা গাড়ী করে ষ্টেটের দোকানে ফেরৎ যাবে। নানারকম তরকারী আলু আদিও তাই। খরচের অনুপাতের বেশী আনানো হ'ত না। এমনকি রান্নার কাঠও গাড়ী গাড়ী দেবার প্রথা ছিল। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে খাওয়ানোতে আবার জিজ্ঞাসা করতেন রাজ-তরফের লোক—'তোমাদের দেশের গ্রামের লোকদের কি খাওয়াতে চাও? তার জন্য আবেদন কর, মঞ্জুর হবে।

দু'জন মন্ত্রী পর পর বাঙালী ছিলেন। কান্তি মুখোপাধ্যায় ও সংসার সেন। এ দু'জনের শ্রাদ্ধেই মহারাজার আদেশে ইহাতে যতটা ব্যয় করতে চেয়েছেন করেছেন, তাঁদের সন্তানরা ততটাই রাজ্য সরকার থেকে পেয়েছেন। সংসার সেনের আদ্যশ্রাদ্ধে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খরচ হয়েছিল সব মিলিয়ে। তাঁর নিজ গ্রামের বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের ও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে শ্রাদ্ধ ভোজের খরচও রাজ্য কর্ত্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। তাঁর পত্নীর যখন মৃত্যু হ'ল কলকাতায় সেখানেও ষ্টেটের সরবরাহকারী বিশেষ দোকান বড়বাজার থেকে এল যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। সে খরচও রাজ্য সরকার বহন করলেন।

সেকালের মহারাজারা প্রিয় ও পদস্থ কর্মচারীদের পারিবারিক জীবনের দুর্দ্দিন দুর্যোগের খোঁজ রাখতেন ও নিতেন। পুরাতন কর্মচারীদের স্ত্রীরা কোথায় কি ভাবে থাকতেন তাও খোঁজ করতেন। সন্তানদের চাকরী, পড়া মেয়েদের সুখ-দুঃখ বৈধব্যের খবরও রাখতেন। এ দাক্ষিণ্য অন্য ধরনেরও ছিল। যেমন জায়গীর দেওয়া (নিষ্কর জমিদারী দান) রাজকর্মচারীদের। নিজের দেশের লোক ছাড়া অন্য প্রদেশীয়েরাও সেই সম্মান ও দাক্ষিণ্য ভোগ করতেন পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী বাঙালী কাশ্মীরি মধ্যপ্রদেশীয় অন্য প্রদেশবাসী সকলেই হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে গুণানুসারে যোগ্যতানুসারে চাকরি পেতেন। আর রাজ অনুগ্রহ হলে জায়গীরও পেতেন। দুই, পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঁচিশ হাজার তারও বেশী অবধি সে জায়গীরের আয় ছিল। বাড়ীঘরও রাজ্য থেকেই দেওয়া হ'ত। নয়ত করিয়ে দেওয়া হত। এই দাক্ষিণ্যে প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা একেবারেই ছিল না।

জয়পুর রাজ্যে চার পাঁচ জন বাঙালীর নাম বলবার মত। প্রথম ছিলেন পণ্ডিত বিদ্যাধরজী। যিনি রাজা জয়সিংহের সময়ে জয়পুর নগরীর পরিকল্পনা করেন। যাঁর নাম অনেকেই জানেন।

পরে বাঙালী দু'জন প্রধানমন্ত্রীর আগে রাজ্যের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন আর এক বাঙালী হরিমোহন সেন। (কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠতাত ও রামকমল সেনের পুত্র) বাগান, লাইব্রেরী, মিউজিয়ম ইত্যাদিতে তাঁর সময়েই রাজ্যের নানা শোভা ও সংস্কার হয়। এর পরে মন্ত্রী ছিলেন এক কাশ্মীরি পণ্ডিত অটলজী। বাঙালী মন্ত্রী দু'জনের পরে* যিনি মন্ত্রী হলেন তিনি ওখানকার এক বৃদ্ধ নবাব সাহেব। ইংরেজী জানতেন না মোটেই। এতেই বোঝা যাবে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় অথবা দলগত ক্ষমতা পাওয়ার চেষ্টা সেকালে ছিল না। এবং নবাবজীকেও রাজ্যের সাধারণ প্রথাকে কখনও অতিক্রম করে সাম্প্রদায়িক করে তোলবার চেষ্টাও শুনি নি।

এ ছাড়া এই জায়গীর দেওয়াতে দেবত্র ব্রহ্মত্রও দেবার প্রথা ছিল। ছোট ছোট দেবালয় দেবতার ভোগরাগের জন্য লোকে জায়গীর পেয়েছেন। অবশ্য এই জায়গীর অপুত্রক হলে বা দত্তক না নিলে রাজে 'খালসা' বা রাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। 'খালসা' হবার ভয়ে লোকে ওদেশে সাধারণতঃ প্রায়ই পোষ্যপুত্র নেয়। এবং এই জায়গীর দেবার প্রথা সমগ্র রাজস্থানেই আছে।

এই জায়গীর বা বিশেষ খেতাব বা খেলাত দানের জন্য রাজাদের বিশেষ দিন ছিল। রাজাদের সালগিরা (জন্মতিথি) উৎসবের দিনে দেওয়া হ'ত জয়পুরে। কিন্তু জয়পুরে বিশেষ দিন ছিল, জয়পুরের রাজার ইষ্টদেবী শ্রীরাধিকা লাডলীজীর (আদরিণী) জন্মতিথি রাধাষ্টমীর দিন। সেদিন রাজ্যময় আশা দুরাশা হতাশা উৎসাহের সীমাহীন উদ্বেগ দেখা যেত। এর কথা পরে বলব।

---

* কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সংসারচন্দ্র সেন। পরবর্তীকালে অবিনাশচন্দ্র সেনও অন্যতম ও শেষ বাঙালী মন্ত্রী ছিলেন।

মনোজ্যোছনায় প্রণয়ের মাধুকরী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অলি ও কুসুমে প্রণয়-সোহাগ রাতের কণিকা মেখে
মিথুন-মিলনে মাধুরী রচনা করে।
ভেঙে ভেঙে পড়ে হাসির লহরী রাঙা ওষ্ঠেতে লেগে
কামনা-কাঁপানো শয়ন শিয়র 'পরে।
বিহগীর মত উড়ে এলে যেন মোর কুহকের নীড়ে,
পিছনের পানে কেন তবু রাণু! চেয়ে দেখ ফিরে ফিরে?

তোমার আমার দেয়া-নেয়া প্রেম যেন আলোছায়াসম
করে লুকোচুরি খেলা কুঠুরির কোণে।
তব যৌবন নদীতে জোয়ার, ঢেউ লাগে তটে মম,
চকিত মৃগের মত আশা রহে মনে।
স্মৃতি-দিগন্তে ছিলে কি আমার স্বপনের চাঁদ হয়ে,
রূপের নেশায় বুঁদ হয়েছিনু নিদ্‌হারা আঁখি লয়ে!

এ রাতে ঝড়ের সঙ্কেত রেখা ধীরে ধীরে ওঠে ফুটে,
কুণ্ঠা-কাতর অবসর নাহি আর।
বাহুবন্ধনে আলিঙ্গনেতে সরম গেছে কি টুটে?
খোলা বাতায়নে উল্লাসে অভিসার।
তোমার নিটোল সোনালী বুকেতে ফুলের ফসল জাগে,
ঝড়ের দোলায় দুলিবে কি তারী বর্ষণ অনুরাগে?

মোদের মাঝে কি দ্রুত হয়ে আসে রাত্রির নিঃশ্বাস?
মনোজ্যোছনায় প্রণয়ের মাধুকরী।
বহু বেদনায় এসেছে আজিকে সুন্দর অবকাশ,
শিথিল হিয়ায় শিহরিছে বিভাবরী।
সময়ের ফাঁকে কি কথাটি তব সহসা রঙীন হ'ল?
দেহের বীণাতে মীড় তুলে তুলে লাজ-গুণ্ঠন খোল।

মহুয়া কাব্যে 'নির্ঝরিণী'

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

কবি সুন্দরের পূজারী। সুন্দরকে তিনি শুধু গ্রহণই করেন নাই—উপভোগ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার লীলা।

বিশ্বসৃষ্টির যেখানেই আছে চিরন্তন আনন্দের প্রকাশ সেখানটিই হইয়া উঠে সুন্দর। কবির নির্ঝরিণী কবিতাটি প্রকৃতির প্রতীক। অসীম আনন্দের চিরনবীন সৌন্দর্য্য, তাই প্রকৃতির মাঝে লীলা-চঞ্চল। তাহার লীলার অকৃপণ বহিঃপ্রকাশই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। এই অসীম সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা প্রকৃতি সুন্দরী—তাই প্রকৃতি চিরনবীন। নির্ঝরিণী কবিতায় আছে বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি। আনন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্র তারই সঙ্গে রহিয়াছে—

তারি এক ধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে দুলায়ো তাহারে
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো কলধ্বনি
দিও তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী

যে সৌন্দর্য্যলাভে প্রকৃতি সুন্দর, কবি সেই সৌন্দর্য্য বহিতেছেন। সেই মোহহীন সৌন্দর্য্য। প্রকৃতি বিশেষ সৌন্দর্য্যে গভীর বন্ধন মুহূর্ত্তে গ্রহণ করিয়া পরক্ষণেই আপনাকে করিয়া লয় বন্ধন-পাশ মুক্ত। শ্যামল তরুটি পত্রভার উন্মোচন করিয়াই মুহূর্ত্তে ফুল ফোটাইবার খেলা খেলিতে যায়, আবার পরক্ষণেই ভাবে পাতা ঝরাইবার নূতন খেলার কথা। তবু প্রকৃতির মধ্যে যেটুকু বন্ধন গ্রহণের স্বীকৃতি আছে এই অসীম আনন্দের সৌন্দর্য্য সেটুকু বন্ধনও স্বীকার করে নাই। চিরন্তন আনন্দ সকল সুন্দরের মাঝেই প্রকাশিত, তবু কখনও করে না রূপ গ্রহণ। তাই কবির ভাষায় 'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।' এই বন্ধনহীন অরূপ রূপের রহস্যময় ইঙ্গিতের যে সীমাহীন সমগ্রতা তাহার বিস্তৃতি প্রকৃতি হইতে বৃহত্তর। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের সীমা হতে প্রকৃতির সীমার গণ্ডী বড়। প্রকৃতির রূপের মাঝে আছে সেই বিশ্ব আনন্দের প্রকাশ, আছে জীবন হইতে জীবনান্তরে যাওয়ার আনন্দময় স্বীকৃতি। এই গতির সুর যদি জীবনের সুরে মিলাইয়া লওয়া যায়—হওয়া যায় প্রকৃতির সহিত একাত্ম, তবে সেই জীবনের মাঝেও প্রকাশিত হইবে সেই চির আনন্দের ছায়া। কিন্তু প্রকৃতির সহিত ব্যক্তি-জীবন মিলিবে কোথায়? সীমা-টানা ক্ষুদ্র জীবনের মাঝে যেখানে হইবে আত্মার প্রকাশ, শাশ্বত সত্যের প্রকাশ সেই শ্রেয়তার বন্ধনই প্রকৃতির সহিত ব্যক্তি-জীবনের যোগসূত্র। যখনই ব্যক্তি-জীবনে হয় আত্মার প্রকাশ তখনই তাহা মিলিতে পারে বিশ্ব আনন্দের লীলাভূমি প্রকৃতির সহিত—তখনই এই ব্যক্তি-জীবন লাভ করে অখণ্ড জীবনের মহিমা। তখন সে কেবল-মাত্র এই ছোট্ট জীবনের অধিকারী নহে, অখণ্ড জীবনের সৌন্দর্য্যের অংশীদার সে। তাই মানুষ পাইতে চায় আনন্দের চিরন্তন বাণীকে। তবেই তাহার মাঝে হইবে অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ—সে হইবে সত্য-সুন্দর। এই আকাঙ্ক্ষাই কাব্য-মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে "নির্ঝরিণী" কবিতায়।

এ কবিতায় কবি বলিতেছেন, নির্ঝরিণী বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে বুকে লইয়া হইয়াছে সুন্দরী। প্রকৃতির বুকের মাঝে রহিয়াছে অসীম আনন্দের লাস্য লীলার প্রকাশ, তাহারই সহিত মিলিত হউক কবির লীলা-চঞ্চল অনুভূতি। তাই কবির প্রার্থনা, ঝর্ণার যে জল-ধারার মাঝে সূর্য্য-তারা আপনাকে যেমন প্রতিফলিত করিতেছে তেমনি তাহারই সহিত প্রতিবিম্বিত হউক কবির মুগ্ধ হৃদয়। সেই মিলনেই ত কবির প্রকাশ। কবি তাই বলিতেছেন—

"আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি
তাই নিয়ে আজ পরাণে আমার
মেতেছে কবি।"

প্রকৃতির "আলোর ঝলকে" কবির প্রাণে জাগে ভাষা। এই জীবনে যাহা আছে আর যাহা চাই—বস্তু-জীবন ও ধ্যান-জীবন এ দুয়ের ভাব সামঞ্জস্যই গান। এই প্রেয়তা ও শ্রেয়তার মিলিত গানই কবির বাণী। তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এই নির্ঝরিণী কবিতায়। ঝর্ণা অন্তরে রাখিয়াছে সূর্য্যের মহত্ত্ব আর দৃষ্টি রহিয়াছে সাগরের পানে। কবির বাণীও তাই। তাঁহারও অন্তরে আছে প্রেম, লক্ষ্য মানবতা। আর তাঁহার আছে নির্ঝরিণীর মতই জীবনে চলমানতা। "নির্ঝরিণী" কবির বাণীর তরঙ্গায়িত প্রতি-রূপ। তাহাকে দেখিয়াই কবি বলিতেছেন—

"মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী
তোমার প্রবাহ মনেরে জাগায়—
নিজেরে চিনি"

মহত্তর জীবনের পথেই রহিয়াছে রবীন্দ্র তত্ত্বের প্রকৃত সত্তা। ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রই কিন্তু তাহার মাঝে আছে মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা। বীজ, বীজই তবু তাতে আছে মহীরুহের ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিত যখন ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া আপনার এগিয়ে-যাওয়াকে প্রকাশ করে

তখন আর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা থাকে না। সে তখন অনন্তের—অসীম অজের অংশ। তখন সেই মুহূর্তের মাঝে দেখা দেয় অনন্তের লীলা-মাধুর্য্য। এই মুহূর্তটি সাধারণ হতে পারে কিন্তু তাহার মধ্যে থাকে না কোনও ক্লেদ কোনও মালিন্য। সেই অপাপবিদ্ধ শুভ্রতার মুহূর্তেই আছে অনন্ত সৌন্দর্য্যের লীলা প্রকাশ। সেই অরূপ রতন আহরণই কবি-জীবনের সব চেয়ে বড় কথা—যে-কথা কবি অন্তর বলিয়াছেন—"কান পেতেছি চোখ মেলেছি

ডুব দিয়েছি ঢেলেছি পরাণ
বিস্ময়ে আজ জেগেছে মোর গান।"

এই অরূপ সৌন্দর্য্য আপন জীবনে সঞ্চারিত করিয়া বিশ্ব সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়—জীবনের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া লওয়ার মধ্যেই তাহার সার্থকতা। কবি তাহার সার্থক রূপটিই প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার 'নির্ঝরিণী' কবিতায়।

পথ আর পথ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

পথ আর শুধু পথ—নেই নেই নেই শেষ,
যত যাই পাইনাক' সীমানার দিগ্‌দেশ।
গুণে চলি দিনমাস, গুণে চলি বৎসর,
হদিশ ত নাহি পাই, তবু হই তৎপর।

পথ আর পথ শুধু, শেষ নেই, শেষ নেই,
তবু ভাবি যেতে হবে লক্ষ্যের প্রান্তেই।
একদিক ছেড়ে চলি অজানা দিগন্তর,
পার হই গিরি-দরী-নদী আর প্রান্তর।

পথ আর পথ শুধু—চলে যাই কোন্ দূর।
আমারে যে ডাক দেয়—কোন্ সীমাহীন সুর।
কোনখানে নেই ঠাঁই—একটুকু থামবার,
পথ মোরে নিয়ে চলে জীবনের কোন্ পার?

আকাশের তারাগুলি ডাকে মোরে—"আয় আয়।"
আঁধারের বুকে ওরা জ্বলে আলোকের প্রায়।
বুঝি ওরা জানে মানে—জীবন-রহস্যের,
দেয় বুঝি আশ্বাস কোন্ দূর প্রান্তের।

সমুদ্র-তীরে গিয়ে হয়ে যাই আন্‌মন,
ছুটে যেতে চায় প্রাণ—টুটে সব বন্ধন।
হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা চায় মহাবিস্তার।
অইখানে বুঝি শেষ সীমাহীন পন্থার।

পথ আর পথ শুধু—কিছু যেন নেই আর।
মনে হয় সব মিছা—জগতের চারধার।
লক্ষ্য হোক্ না দূর—থাক্ না সে অন্তর—
তবু তার লাগি যাই—অজানা দিগন্তর।

৭

এর পরে আর বাদানুবাদ করা চলে না। অতনুকে চলে আসতে হ'ল। কিন্তু নলিনীবাবু মুখে তাকে যতই ভরসা দিক না কেন তার খুব বেশী মূল্য অতনু দিল না। উইলখানি সে আগাগোড়া পড়েছে। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়েছে। তবে এইটুকুই আশার কথা যে, তাকে আজই ভিক্ষাপাত্র হাতে করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। তার বর্ত্তমানের প্রয়োজন নলিনীবাবুই মেটাবেন। কিন্তু বসে খেলে তার অংশের টাকাটা কতদিন চলতে পারে। কথাটা আজ তাকে ভাবতে হচ্ছে। কারণ শিশুকাল থেকে যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে তার প্রভাব থেকে এককথায় মুক্ত হতে পারা সহজ নয়। ভবিষ্যতে পারবে বলেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না। অতীতকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না বলেই আগামী দিনের জন্য সে এত ব্যগ্র-ভাবে চিন্তা করতে সুরু করেছে। নিজের ভবিষ্যৎকে সে নিজেই গড়ে তুলবে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, ঠাকুর্দ্দার ব্যবস্থায় সেখানেও নলিনীবাবু এসে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা এবং যুক্তিই সেখানে প্রবল। অর্থাৎ তার নিজের টাকাও অগাধ জলে।

অতনুর ইচ্ছা হচ্ছিল লোকটিকে উচিতমত শিক্ষা দিয়ে আসে। কিন্তু মনের এই সদিচ্ছাটা সে বাইরে প্রকাশ করল না। হাসিমুখেই নলিনীবাবুর ওখান থেকে চলে এল। ঠাকুর্দ্দা প্রায়ই বলতেন, বিদ্রোহ করবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিলেও যে লোক আত্মসম্বরণ করতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে সে হেরে গেছে মনে হলেও আসলে সেই লোকই শেষ পর্য্যন্ত জিতে যায়। অথচ তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল এই বস্তুটির একান্ত অভাব। দাদু বলতেন, সেই জন্যেই তিনি নাকি উপদেশ দিতে ভরসা পাচ্ছেন।

অতনু হেসে বলত,'এটা কেমন কথা হ'ল দাদুভাই?

কেদার বলতেন, এটা নিছক কথা নয় ভাই। এ আমার অভিজ্ঞতা। নিজের জীবনে ঠেকে ঠেকে আর ঠকে ঠকে যে শিক্ষা পেলাম সে পথের বিপদ কোথায় তা যদি সময় থাকতে তোকে না জানিয়ে যাই তবে যে নিজের কাছেও আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারব না দাদু। উপদেশটা দাদু অনেক বিলম্বে দিলেও এর প্রয়োজনীয়তায় অতনুর প্রচণ্ড বিশ্বাস।

কিন্তু নলিনীবাবু সম্বন্ধে অতনু মনে মনে বিরূপ হলেও এই পরিবারের উপর তাঁর সত্যিই একটা আন্তরিক ভালবাসা ছিল। যে ভালবাসা নিম্নগামী নয়। কথাটা সামান্য কয়েকটা বছরের ব্যবধানেই অতনু বুঝতে পারল। নইলে তার ভাগ্যগগনে আবার নতুন করে সূর্য্যোদয় ঘটত না।

নলিনীবাবুর সদিচ্ছা আর আন্তরিকতার পুরো সুযোগ অতনু গ্রহণ করল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি। সময়মত নলিনীবাবু হলেন মুক্তহস্ত। আর অতনু ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগল অবিশ্বাস্য ভাবে। অর্থাগমের অলি-গলির সন্ধান পেয়ে অতনু দানবীয় শক্তিতে এগিয়ে চলল। বেয়াল্লিশের মন্বন্তরে লাখ লাখ মৃতের অস্থিপঞ্জরের উপর গড়ে উঠল তার ধনভাণ্ডারের আকাশচুম্বী পিরামিড।

যুদ্ধ থেমে গেল, কিন্তু অতনু থামতে পারল না। শুধু চলার গতি ভিন্ন পথ নিল। অন্ধকার থেকে সে আত্মপ্রকাশ করল আলোর জগতে। জমিদার কেদার মুন্সীর নাতি হ'ল শিল্পপতি। আলো আর অন্ধকারের মধ্যে একটা চমৎকার সামঞ্জস্য রেখে সে জেঁকে বসল। অভিজ্ঞতা আর দুঃসাহস তার অফুরন্ত। সেই সঙ্গে কাজ করে চলল তার নির্ভুল হিসাব-পদ্ধতি।

অতনু অবাক হয়ে গেল। হবার কথাও। আলোর জগতে চলাটা যে কত সোজা কথাটা অন্ধকার জগতে থাকতে সে কল্পনাও করতে পারে নি। তার ভয়-ভাবনা ঘুচে গেল। এ জগতে যা কিছু তা সকলের চোখের সম্মুখেই ঘটে থাকে। খেলার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। পাওয়া যায় সম্মান, পাওয়া যায় প্রতিষ্ঠা। অথচ কালির দাগ গায় লাগে না। শুধু সব সময় চোখ

মেনে চলতে জানলেই চুকে গেল। জীবনের এই নব-পর্য্যায়ে অতনু নতুন খেলায় মেতে উঠল। সাধারণ চোখে দেখতে গেলে সে অনেক কিছু খুইয়েছে কিন্তু অতনু বলে, ওটা দুর্ব্বলের খেদোক্তি। যার কোন অর্থ হয় না। তার মতে ওটা হ'ল জীবনধারণের একটা প্রধান অঙ্গ। প্রয়োজনীয়ও বটে। সুতরাং প্রয়োজন মেটাবার নামকে যদি কোন দুষ্ট লোক অন্যায় আর খারাপ বলে অভিহিত করতে চায় করুক তাতে প্রয়োজনের মূল্য হ্রাস পায় না। তবে হ্যাঁ, সবকিছুর মধ্যে একটা রাজসিক জাঁক থাকা চাই, নইলে সৌন্দর্য্য আর রুচিবোধে আঘাত লাগতে পারে।

অতনু জানে আজকের দিনের ব্যবসার নবপদ্ধতি। জানতে তাকে হয়েছে, নইলে তার স্বপ্ন সফল হয় না। আঁকা, বাঁকা, সরু আর অন্ধকার কোন পথই তার অজানা নয়। মহাজনেরা এই পথেই আনাগোনা করে থাকেন। অতনু সন্ধান পেয়ে তাদের দলভুক্ত হয়েছে মাত্র।

সেই অতনুর আজ কোন দিক থেকে কোন অভাব নেই। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, দুর্নাম কোনটাই তাকে আজ আর বিচলিত করতে পারে না। অথচ সেই কিনা শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে করল শ্রীমতীকে।

বন্য মেয়ে শ্রীমতী তাকে মুগ্ধ করেছিল সত্য, কিন্তু এমন কত মেয়েই ত তার জীবনপথে এসেছে, চলে গিয়েছে। কিন্তু তারা কোনদিন তার দেহকে ছাড়িয়ে মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি। তাদের যা কিছু উত্তাপ তা জ্বলে উঠবার পূর্ব্বেই গলে জল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শ্রীমতীর মধ্যে সে সর্ব্বপ্রথম খুঁজে পেল এর ব্যতিক্রম। অতনু তার মনের কথাটা ডাক্তারকে জানালেন। এর পরে অতনুর নিজের ইচ্ছে বলে কিছু ছিল না। তিনি কাছে না এলেও দূরে বসে অতনুকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অতনুর ইচ্ছেটাও প্রবল ছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেও এমনি বহু ব্যাপারে সে এই প্রৌঢ় ডাক্তারটিকে যেন কতকটা বেশী সম্মান দেখিয়ে ফেলেছে। অবজ্ঞা করা কিংবা পাশ কাটিয়ে চলার কথাটা কোনদিন ভুলেও তার মনে উদয় হয় নি। বরং একটা অজ্ঞাত দুর্ব্বলতা যেন বারে বারেই তার উদ্দাম প্রকৃতিকে রাশ টেনে ধরেছে। অতনু চেষ্টা করেও তাঁর প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারে নি। অতনু নিজেকে এ নিয়ে বহু প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে বিস্মিত হয়েছে নিজেকে আবিষ্কার করে। তার অতৃপ্ত মন এই ডাক্তারটির অনুশাসনের মধ্যে কি যেন খুঁজে পেয়ে বেশ খানিকটা খুশীই হয়েছে বলে মনে হয়। তাই ডাক্তারের কথাগুলি বারে বারে উচ্চারণ করে। অপরকে 'শোনাবার ছলে নিজেও নতুন করে শোনে। তাই ত শ্রীমতীর মুখে ডাক্তারের কথার প্রতিধ্বনি শুনে অতনুর চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। উপেক্ষাভরে সব কিছু উড়িয়ে দিতে গিয়েও বাইরের মহলকে অবহেলা করে ভিতর মহলে স্ত্রীর পিছু পিছু এসে উপস্থিত হ'ল।

ঘরে পা দিয়ে শ্রীমতীই প্রথমে কথা কইল, আমি তোমাকে বুঝতে চাই নি, তোমার কথাটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম।

ওটা একই কথা হ'ল শ্রী। অতনু বলল, যে কথাটা মুখ থেকে বেরোয় সেইটেই মানুষের কানে যায়। মানুষ মূল্য দেয় শুধু সেইটুকুরই।

শ্রীমতী হেসে উত্তর করল, আর তাদের ব্যবহার এবং চালচলন পড়ে চোখে। অনুভব করা যায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, তাই নয় কি?

অতনু বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর মুখের পানে তাকাল। এই মেয়েটিকে সে যতটা সহজ এবং সাধারণ মনে করেছিল সে যে তা নয় কথাটা তার চালচলন এবং কথাবার্ত্তায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে এ মেয়ে যে খালি স্বাস্থ্য-সম্পদের অধিকারিণী হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে বুদ্ধির চর্চ্চাও যে রীতিমত করেছে তা অতনুকে স্বীকার করতেই হবে।

অতনুর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, কিছু ভুল বলেছি নাকি?

অতনু সামলে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিল, আমার মনেও ঐ একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শ্রীমতী।

শ্রীমতী হেসে উঠল, ভারী আশ্চর্য্য ত! আমাদের চিন্তা করবার পথটাও যে এক হয়ে যাচ্ছে।

অতনু সহসা অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, বলল, তুমি লেখাপড়া কতদূর পর্য্যন্ত করেছ শ্রীমতী?

শ্রীমতী হেসে ফেলে জবাব দিল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

অতনু বলল, একটা কৌতূহল মাত্র—

শ্রীমতী রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলল, কৌতূহল থাকা ভাল। মিটে গেলেই সব ফুরিয়ে যায়। তাছাড়া বিয়ের আগে যে কথাটা জানতে চাও নি—

কথাটা শেষ না করেই শ্রীমতী পুনরায় হেসে উঠল।

অতনু অকারণে খানিকটা অপ্রস্তুত হ'ল। সে বলল, তুমি কি কোন কথাই সোজাভাবে বলতে পার না শ্রী?

শ্রীমতীর চোখ দুটো কৌতুকে মেচে উঠল। সে বলল, না, পারি না। কিন্তু সোজা নিশানা করে তীর ছুঁড়তে পারি।

অতনু বলল, তা পার—নইলে সেদিনে বুনো শূয়োরের হাতেই প্রাণটা যেত।

শ্রীমতী পরিহাস তরল কণ্ঠে বলল, তাই তোমার উচিত ছিল। তা হলে এই অপকর্মটি তোমাকে করতে হ'ত না, আর আমিও জবাবদিহির হাত থেকে রেহাই পেতাম।

অতনু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। শ্রীমতীর রহস্য করবার ধরনটা মৌলিক।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, কিন্তু দু'জনে মিলেই যখন কাজটা করে ফেলেছি তখন আর ভেবে কি করবে? তাছাড়া—কথার মাঝেই শ্রীমতীকে থামতে হ'ল ভৃত্যের উপস্থিতিতে।

—হুজুর...

অতনু অকারণে ভৃত্যের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। কি খবর? ডানকান আর আগরওয়ালা এসেছে, এই খবর ত?

—জি হুজুর।

—তাদের বলে দাও, বাবুর তবিয়ৎ ভাল নেই। আজ আর দেখা করা সম্ভব হবে না। অতনু বলল।

ভৃত্য চলে যেতেই শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, শরীরটা কি সত্যিই তোমার ভাল নেই?

অতনু সজীব কণ্ঠে বলল, শরীর ভাল থাকবে না কেন? ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না আজ।

শ্রীমতী বলল, কিন্তু সেকথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলে না কেন?

অতনু একথার কোন জবাব দিল না।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, তোমার এই সাহেব দুটি রোজের অতিথি বুঝি?

ঠিক এমনি প্রশ্নের সম্মুখীন হবার জন্য অতনু প্রস্তুত না থাকলেও সে সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, কতকটা তাই।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, অতিথি নারায়ণ। ফেরাতে নেই। ওকে ডাক।

অতনু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, ডাকতে হয় ডাক, কিন্তু অতিথি সৎকারের ভার তা হলে তোমাকেই নিতে হবে। ডানকান সাহেব হয়ত এক গ্লাস মদ পেলেই খুশী হবে, কিন্তু আগরওয়ালা সাহেবের শুধু মদে মন ওঠে না। চালচলনে তিনি সাবেক দিনের জমিদারদের অনুকরণ করতে পছন্দ করেন—

অতনু আর একবার হেসে উঠল।

শ্রীমতী উগ্র হয়ে উঠল, থাম। আমি তোমার স্ত্রী, কথাটা সব সময় স্মরণ রেখ।

বিলক্ষণ—অতনু জবাব দিল, কথাটা মনে আছে বলেই ত ওদের ফিরিয়ে দিলাম। অতনু হো হো করে হেসে উঠল।

শ্রীমতী বিস্মিত হ'ল তার কথা এবং হাসির রকম দেখে।

অতনু সহসা তার হাসি থামিয়ে বলল, অবাক হয়ে গেছ মনে হচ্ছে? নিয়মের এত বড় ব্যতিক্রম দেখে আমার ভৃত্যটি পর্য্যন্ত কম বিস্মিত হয় নি। কিন্তু আমাদের ডাক্তারটি শুনলে বলবেন, এটা ব্যতিক্রম নয়। স্বাভাবিক পরিণতি।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, আমার অতীতের দিনগুলি এদেরই মত আরও বহুর সঙ্গে কাটাতে হয়েছে। উপায় ছিল না আমার। ডুবে গিয়ে ভেসে ওঠার কৌশল আয়ত্ত করতে এদেরই সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে।

শ্রীমতী শান্তকণ্ঠে বলল, সে প্রয়োজন ত অনেক পূর্ব্বেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল।

অতনুর ঠোঁটের প্রান্তে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল, সে বারকয়েক মাথা নেড়ে বলল, প্রয়োজনের কোন শেষ নেই শ্রীমতী। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে, ডাক্তার কি কথাগুলি আমার অজ্ঞাতে তোমায় শিখিয়ে দিয়ে গেছেন?

শ্রীমতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল, অর্থাৎ—

নইলে—অতনু বলল, তার কথাগুলি তোমার মুখে হুবহু প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কেমন করে?

শ্রীমতী গভীর কণ্ঠে জবাব দিল, তিনিও হয়ত সত্যিই তোমার মঙ্গল চান—

অতনু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, ঠিক জানিনে শ্রীমতী, তবে তাঁর এই গায়পড়া উপদেশ আমার সব সময় ভাল লাগে না।

শ্রীমতী অর্থপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তোমার কথাটা আমার মনে থাকবে—

উত্তরটা গায় না মেখে অতনু বলল, মনে রাখাই ত উচিত। যাঁরা উপদেশ দিতে আসেন তাঁদের বোঝা উচিত যে, প্রয়োজনের কোন সীমা নেই। অন্ততঃ সব মানুষের প্রয়োজনবোধ একই ধরনের হওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার ডাক্তারটিকে কথাটা খোলাখুলি জানিয়ে দাও না কেন?

অতনু বলল, দিয়েছি। একবার নয়, বহুবার, কিন্তু ফল হয় নি। তিনি জবাব দেন না।

শ্রীমতী বলল, তবে যে শুনি তুমি খুব কড়া মুনিব। কিন্তু আমার কাছে তুমি জবাব পাবে। প্রয়োজন হলে খুব শক্ত জবাব দিতেও আমি জানি।

অতনু একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। শান্ত কণ্ঠে বলল, তারও দরকার আছে শ্রীমতী, প্রয়োজনবোধেই মানুষের মনের রং বদলায়—তার বাইরের রূপের পরিবর্ত্তন

ঘটে। যে মুখে মানুষ হাসে সেই মুখেই সে ইতর-কথা বলে। কিন্তু আমাদের ডাক্তারবাবুকে এই ধরনের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত, খাপছাড়া মানুষ। ওঁর একমুখ দাড়ি আর রঙিন চশমায় মনের কোন প্রতিবিম্বই পড়ে না।

কিন্তু তাঁর ব্যবহারে? শ্রীমতী প্রশ্ন করল।

অতনু বলল, বড্ড বেশী মূল্য দিতে চাইছ তুমি শ্রীমতী।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, আমি হয়ত দিতে চাইছি, কিন্তু তুমি যে দিয়ে বসে আছ। যোগ্য লোককে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ায় লজ্জার কিছু নেই।

অতনু একটু হেসে বলল, তবুও তাঁকে আজও চোখে দেখ নি, শুধু কানে শুনেছ।

শ্রীমতী বলল, আমি তোমার মুখ থেকে শুনেছি, আর কারুর কাছ থেকে নয়।

কথাটা শেষ করে অতনুকে অন্য কথা বলার অবকাশ না দিয়ে পুনরায় বলল, সত্যি, ভারী দেখতে ইচ্ছে করে ডাক্তারবাবুকে।

অতনু বলল, ডাক্তার এখানে নেই। আগামী সপ্তাহে আসবেন। এলেই ডেকে পাঠিও। ভালই লাগবে তোমার, নিরহঙ্কারী সাদাসিধে লোক।

শ্রীমতী হেসে বলল, একটু আগেই কিন্তু অন্য কথা বলছিলে। রঙিন চশমা, একমুখ দাড়ি—অথচ সমালোচনা করতে বসে সেই আমার কথায় ফিরে এলে।

অতনুও এ হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, তোমার কথাও ঠিক, আমার কথাও মিথ্যে নয়।

শ্রীমতী বলল, বুঝলাম না।

অতনু একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল, তুমি আয়নায় মুখ দেখ শ্রীমতী?

শ্রীমতী মুহূর্তে অনেক কথা ভেবে নিল। কিছু না বোঝার ভান করে বলল, এ আবার একটা কথা হ'ল নাকি?

অতনু রহস্য করে বলল, তা হলে বোধহয় চোখে ভাল দেখতে পাও না তুমি।

শ্রীমতী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠে বলল, এটা কিন্তু সত্য কথা বললে না। এক তীরে যে দুটো প্রাণী বধ করতে পারে তাকে আর যা বল অন্ধ বল না।

এবারে অতনুর বিস্মিত হবার পালা। সে বলল, অর্থাৎ?

শ্রীমতী বলল, তোমার স্মরণশক্তিকে প্রশংসা করা চলে না। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে?

ভুলব কেন? অতনু জবাব দিল, তোমার তীরের আঘাতে দাঁতালটাই মরেছিল জানি, আর কোন প্রাণীর কথা ত মনে পড়ছে না শ্রীমতী।

শ্রীমতী এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে স্বামীর মুখের পানে পলক-হীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সেই দিকে চোখ পড়তেই অতনু সজাগ হয়ে উঠল। হেসে উঠে শ্রীমতীর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, একবিন্দু মিথ্যে বলিনি তোমায়। একটা হত হলেও অপরটা হয়েছিল আহত। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সহসা কানের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে আবেগভরে শ্রীমতীকে বেষ্টন করে ধরল সে।

শ্রীমতী অনায়াসে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একটু হেসে বলল, যে শিকারী সে কিন্তু সব সময় সজাগ থাকে।

অতনু তরল কণ্ঠে বলল, আহত জন্তু সবসময়ই একটু বেপরোয়া হয়ে থাকে।

অসাবধান হলেই মৃত্যু—শ্রীমতী বলল।

অতনু হেসে বলল, মৃত্যুর হাত থেকে ত তুমি বাঁচতে পার নি শ্রী।

শ্রীমতী বলল, ওকে মৃত্যু বলে না। ওকে বলে রূপান্তর। শ্রীমতীর কুমারী-জীবন শেষ হয়ে সংসারে প্রবেশ। কিন্তু—

পুনরায় অতনুর ভৃত্য এসে উপস্থিত হ'ল। জানাল, সাহেবদের জরুরী দরকার, একবার না গেলেই নয়।

অতনুকে উঠতে হ'ল।

শ্রীমতীর চোখের সম্মুখে নেমে এল অন্ধকার। এবং সেই অন্ধকারে বিদ্যুতের মত চমকে উঠল তার একজোড়া চোখ। ডানকান, আগরওয়ালাকে উপেক্ষা করবার শক্তি অতনুর নেই—আর তার নেই সেই অতনুকে ধরে রাখবার ক্ষমতা। নিজের এই অক্ষমতার লজ্জায় সে ম্লান হয়ে গেল।

কেষ্ট কোথা থেকে এসে উপস্থিত হ'ল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল, আপনি যেতে দিলেন কেন বৌদিরাণী—কাজটা ভাল করেন নি।

দিলাম—কতকটা উপেক্ষাভরেই সে জবাব দিল।

শ্রীমতীর জবাব দেবার ধরনটা কেষ্টর কাছে নতুন লাগল। এর পরে কি বলা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে সে অকারণে খানিকটা হেসে পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করল, এমন করলে ত চলবে না—আরও অনেক বেশী শক্ত হতে হবে যে বৌদিরাণী।

শ্রীমতী পুনরায় হাসল কিন্তু জবাব দিল না।

৮

মনে পড়ল সূর্য্যদার কথা। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে। তার অতীত জীবনের যে অংশটা একটা অকল্পিত পরিবেশ আর বিচিত্র সমারোহের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ সূর্য্যদা তার সম্মুখে এসে পড়ায় এই সর্ব্বপ্রথম সে মুখ থেকে

জেগে উঠল। আশ্চর্য্য! কি নিয়ে সে এমন বিভোর হয়ে আছে যে, কোন দিকে তার নজর নেই। এই যে তার বিয়ের পরে একদিনের জন্য সূর্য্যদা খোঁজ-খবর করে নি, এ কথাটা কি একবারও সে ভেবে দেখেছে?

ক'দিন ধরেই শ্রীমতীর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে তার দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়েছে। অতনুকে কথাটা সে জানায় নি। অকারণে বড় বেশী হৈ চৈ করে। শ্রীমতীর ভাল লাগে না। বড় বেশী কৃত্রিম মনে হয় এদের ব্যবহার।

শ্রীমতী চুপ করে বসে আছে। মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা সর্ব্বোচ্চ বেগে ঘুরছে, বেগ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শ্রীমতী শেষ পয়েন্টে ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অস্থির বোধ করছে শ্রীমতী। শরীরটা থেকে থেকে পাক খায়। কিছু-দিন ধরেই এমনি একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে তার। সময় নেই অসময় নেই।

এমনি ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে তা শ্রীমতীর খেয়াল নেই। কতগুলি বিক্ষিপ্ত চিন্তা তাকে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। এ চিন্তার মধ্যে খানিক আনন্দ, খানিক উৎকণ্ঠা হয়ত বা কিছুটা ভয়ও ছিল।

কিছুক্ষণ হ'ল অতনু ফিরে এসেছে। এমন নিঃশব্দে এসে সে ঘরে প্রবেশ করেছে যে, শ্রীমতী জানতেই পারে নি। অতনু ডাকল, শ্রী—শ্রীমতী—

শ্রীমতী চোখ তুলে তাকাল।

অতনু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, তোমার মাথা ধরেছে নাকি? চোখ দুটো খুব লাল মনে হচ্ছে।

শ্রীমতী মনে মনে খুশী হ'ল। বলল, সামান্য—ও কিছু না। তুমি বস। একটু থেমে পুনরায় বলল, তোমার আগরওয়ালা আর ডানকান এরই মধ্যে চলে গেল? শ্রীমতী তার শারীরিক গ্লানির কথাটা চাপা দিতে চায়।

অতনু কিন্তু তার নিজের প্রশ্নে ফিরে এল, কিন্তু চোখ দুটো তোমার সামান্য লাল হয় নি শ্রী। আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী বাধা দিয়ে হেসে বলল, এত সামান্যকে এমন বড় করে তুল না। আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু আমার লাগে, অতনু জবাব দিল। শুধু লাগে বললে কম করে বলা হবে। বরং ঠিক এমনটি না করলেই অত্যন্ত বেমানান হবে।

শ্রীমতী ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তোমার কাছে বেমানান হবে বলে এই রাত দুপুরে মিথ্যে ভদ্রলোককে কষ্ট দেবে?

অতনু বলল, কষ্ট দেবার প্রশ্ন এখানে আসে না। তাকে আমি মাইনে দিয়ে রেখেছি, অসময় ডাকার জন্য আলাদা ফী দেওয়া হয়। তাছাড়া রাত দুপুর তুমি কাকে বলছ। একবার হাতঘড়িটার উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে পুনরায় হেসে বলল, মাত্র দশটা। এই ত সবে সন্ধ্যা হ'ল শ্রীমতী।

শ্রীমতীর কথা বলতেও কেমন আলস্য লাগছিল। অতনুর কথার নতুন করে আর সে জবাব দিল না। তার চেয়ে ডাক্তারবাবু আসুন। এতদিন শুধু নামই শুনে আসছে, আজ চোখের দেখাটাও হয়ে যাক। তার এই শারীরিক গ্লানির একটা কারণ সে মনে মনে আঁচ করেছে, সেই জন্যেই বারে বারে সে বাধা দিয়েছে।

পাশের ঘর থেকে অতনুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, না না এমন কিছু না। তা হলেও আপনাকে একবার আমার দরকার আছে। আজ সকালেই এসেছেন আমি শুনেছি। বিয়ের পরে একদিনের জন্যেও আপনাকে আসতে হয় নি। কি বলছেন? ডাক্তারের প্রয়োজন যত কম হয় ততই মঙ্গল? বেহিসাবী কথা হ'ল এটা। ডাক্তার হয়ে একথা বলা ঠিক হচ্ছে না। এলেই আপনার টাকা। নইলে ত সেই গোনাগুনতি। আপনি অবিশ্যি আসবেন।

অতনু পুনরায় শ্রীমতীর ঘরে ফিরে এল। হেসে বলল, খরচ করবার জন্যই টাকা। তুমি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে আর আমি বাইরে বসে টাকার হিসেব নেব—এ হয় না। ভাল কথা, ডাক্তারকে অবস্থাটা ভেঙে বলে একটা প্রেসক্রিপশান লিখিয়ে নিয়ে কেষ্টকে দিয়ে ওষুধটা আনিয়ে নিও।

শ্রীমতী সহসা মুখ তুলে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, কেন তুমি! তুমি থাকছ না? আবার কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

অতনু একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোমাকে এখনও বলা হয় নি। একটা বড়রকমের লেন-দেন হবে আজ রাত্রে তাই ডানকান আগরওয়ালার সঙ্গে আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে।

নিজের কণ্ঠস্বরে অতনু নিজেই চমকে উঠল। সে কি কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করল নিজের কাজের! আর তা শ্রীমতীকে—সামান্য কয়েক মাস পূর্ব্বে যে মেয়েটিকে সে কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে গৃহে নিয়ে এসেছে! আশ্চর্য্য! তার বিগত জীবনে এ বস্তুটি কোন-দিনই আবশ্যকীয় বলে মনে হয় নি।

অতনুর চিন্তা রেখাঙ্কিত মুখের পানে খানিক পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে সহসা শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, যখন মোটা টাকার লেন-দেন তখন অবশ্যই যেতে হবে। কিন্তু কথাটা যখন তোমার জানাই ছিল, তখন ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাবার কি দরকার ছিল। তুমি বরং তাঁকে আসতে নিষেধ করে আবার ফোন করে দাও।

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কথা ক'টি বলা হলেও তার মধ্যে যে অনেকখানি দৃঢ়তা রয়েছে এ কথা অতনু অনায়াসে বুঝে নিল। এবং সে নিজেও যে দুর্ব্বল নয় সহসা এই কথাটা শ্রীমতীকে বুঝিয়ে দিতে সে তৎপর হয়ে উঠল। অতনু ধীর-শান্ত কণ্ঠে বলল, ডাক্তার আমার জন্যে ডেকে পাঠাই নি। আর বাইরে তুমি যাচ্ছ না। কথাটা আমার মনে আছে। তাছাড়া এ বাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণী আজ পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছাকেই নিঃশব্দে মেনে এসেছে। এইটেই এ বাড়ীর রেওয়াজ। তুমি এ বাড়ীর গৃহিণী—অবশ্যই তোমার একটা আলাদা মর্য্যাদা আছে। তা বলে সে মর্য্যাদাবোধ যদি বাড়ীর কর্ত্তাকে ছাপিয়ে উঠতে চেষ্টা করে তা হলে তুমি বাধা পাবে। কথাটা তোমার জেনে রাখা ভাল। তাতে ভবিষ্যতে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারব।

কথাকটি যেভাবেই বলা হোক তার মধ্যে যে কতখানি রূঢ় কর্ত্তৃত্বের সুর লুকান আছে তা শ্রীমতীর অগোচর রইল না। কিন্তু কেন এ অভিযোগ—কেন এই মুহূর্ত্তে অতনুর কথাকটি বলবার প্রয়োজন হ'ল তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। শ্রীমতীর মনের ভাব বাইরে প্রকাশ পেল না। যেন কিছুই হয় নি এমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে সে বলল, কথাটা আমার জানা ছিল না। না জেনে যদি তোমার সম্মানে আঘাত করে থাকি তার জন্যে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। ভবিষ্যতে সব সময় তোমার কথাটা মনে করে রাখব। কিন্তু তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে না ত? বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন—এতবড় মোটা টাকার লেন-দেন যখন। তুমি যাও। ডাক্তারবাবু এলে তাঁর যাতে কোন অসম্মান না হয় সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকবে।

শ্রীমতীর কথাকটি খুব মনোযোগ দিয়েই অতনু শুনল। তার অন্তরাত্মা তাকে বারংবার সাবধান করে দিল এই মেয়েটির সঙ্গে আরও ঢের বেশী হিসেব করে চলবার জন্য। এ সহজ নয়—শক্ত। নিজের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ অথচ নিঃশব্দ।

অতনু চুপ করে রয়েছে দেখে শ্রীমতী পুনরায় একটু হেসে বলল, কথা কইছ না যে? বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? যত বুনো আমায় তুমি ভাব ততটা ঠিক আমি নই। মানী-লোকের মান রেখে কেমন করে চলতে হয় সে শিক্ষাটুকু অন্ততঃ পেয়েছি। তবে ডাক্তারবাবুকে অন্য কোন কারণে যদি ডেকে পাঠিয়ে থাক সে আলাদা কথা।

অতনু শ্রীমতীর শেষ কথাকটিতে আপন অজ্ঞাতে খানিকটা চমকে উঠল। আজ এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীমতীর মুখে এই ধরনের কথা, ওর বক্তব্যটা সহজবোধ্য নয়। তার অতীত জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলির উপর কেউ কি আলোকপাত করেছে? নইলে—আশ্চর্য্য ইতিপূর্ব্বে এক-দিনের জন্যও অতনু নিজের চলাফেরা সম্বন্ধে ভেবে দেখা আবশ্যকবোধ করে নি। প্রয়োজনও ছিল না। আজই বা হঠাৎ এ সম্বন্ধে সে ভাবতে সুরু করেছে কেন? আর এই কেনর সমাধান খুঁজতে গিয়ে আজ নতুন করে তার অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে অতনু বলল, কারণ ছাড়া কাজ হয় না। ওর একটার সঙ্গে অবশ্যই আর একটার যোগ আছে। কিন্তু তা নিয়ে অঙ্ক কষতে বসলে এক রাত্রে শেষ হবে না। সে বরং আর একদিন দেখা যাবে।

শ্রীমতী বলল, বেশ যা হোক এই কথাটাই ত তোমাকে এতক্ষণ ধরে বলছিলাম। মিথ্যে তুমি এতটা সময় অযথা নষ্ট করে দিলে। তোমার ডানকান আর আগরওয়ালা সাহেব নিশ্চয়ই তোমার ওপর অত্যন্ত চটে গেছেন।

শ্রীমতীর কথাগুলি রীতিমত বাঁকা—অর্থপূর্ণ। কিন্তু তাকে মূল্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে অতনু রাজী নয় বরং অবহেলায় অগ্রাহ্য করে সে বুঝিয়ে দিতে চায় যে, সোজা বাঁকার কোন দাম তার কাছে নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়েই কথাগুলি বলা হয়ে থাক তা নিরর্থক। অথচ মনে মনে সে এত কথা ভেবে নিলেও প্রকাশ্যে সহজ হয়ে উঠতে পারল না। চেষ্টা করে মুখে হাসি টেনে এনে তাকে বলতে হ'ল, তাদের ইচ্ছে হলে যতখুশী রাগ করতে পারে তা নিয়ে আমার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। তবে রাগ আমার নিজের উপর হওয়া উচিত কারণ লাভ-লোকসান তাদের নয়। আমার।

শ্রীমতী বলল, তবু এতদিনে সুবুদ্ধি হ'ল। আজ ক'মাস ধরেই নাকি কাজ-কারবারে অবহেলা করছিলে। লোকে আমাকেই দোষারোপ করতে সুরু করেছিল কিনা।

অতনু কোন জবাব দিল না। শুধু আরও খানিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

শ্রীমতী অতনুর মুখের এই পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য করে পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলল, বিয়ের আগে বুঝি দিন-রাত শুধু কাজ করতে?

অতনুর কাছে শ্রীমতী ক্রমশঃই যেন দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে, এবং এই মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই ভাল হয়। কথাটা উপলব্ধি করেও কিন্তু সে চুপ করে থাকতে পারল না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, দিন-রাত কেউ কাজ নিয়ে থাকতে পারে না। পারা সম্ভবও নয়। কথাটা তোমার বোঝা উচিত।

শ্রীমতী হেসে ফেলল, আশ্চর্য্য আমারও যে এইটেই প্রশ্ন। সত্যিই ত এ আবার কখনও সম্ভব হয় কেমন করে। মানুষ সব সময়ই মানুষ। কিন্তু তুমি অকারণে রাগ করে বসে আছ কেন? কথাটা আমার কানে এসেছে বলেই জিজ্ঞেস করেছি। নইলে এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা!

অতনু বলল, তবুও প্রশ্ন করবার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে বল ত। এত বেশী কথা কইছ কেন?

শ্রীমতী বলল, একটাকে ভুলতে আর একটার দরকার হয়েছে।

অতনু পুনরায় চোখ তুলে তাকাল।

শ্রীমতী হেসে বলল, তুমি দেখছি কিছুতেই আমার মাথা-ধরার কথাটা ভুলতে দেবে না। চেষ্টা করে দেখছিলাম যে, ডাক্তারবাবু আসবার আগেই মাথা ধরা ভূতটাকে ভাগাতে পারি কিনা। আচ্ছা তুমি এবারে যেতে পার।

অতনু এতক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সে বলল, এতক্ষণ ধরে যত কথা তুমি বলে গেলে শ্রী তুমি হয়ত নিজেই জান না তার মধ্যে কত গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে।

শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, তা হলে আয়ত্ত করে নিয়েছি বল? ছিলাম গরীবের মেয়ে, ছিলাম বুনো। মনে আর মুখে কোন প্রভেদ ছিল না অথচ কত সহজে তোমাদের সমাজের সেরা বৈশিষ্ট্যটি আয়ত্ত করে নিয়েছি। এমনকি তোমাকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছি। একবার অন্ততঃ সাধুবাদ দাও।

অতনু আর একবার হোঁচট খেল। প্রশ্ন করল, এ কথার মানে?

সহসা শ্রীমতী মাত্রাধিক গম্ভীর হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশী ভাল করে দিতে পারবে।

অতনু বলল, তা হলে প্রশ্ন করতাম না শ্রীমতী।

শ্রীমতী জবাব দিল, সব কথা প্রশ্ন করে জানতে চেও না। বিচার করে সমাধান করে নিও।

অতনু অন্যমনস্ক ভাবে বলল, সেই চেষ্টাই এবার থেকে করব।

শ্রীমতীর মুখের ভাব সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, তুমি সত্যি বলছো?

তেমনি ছাড়া ছাড়া ভাবে অতনু উত্তর করল, অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে আমার কথাটাকে অত্যন্ত বড় সত্য বলে ধরে নিতে পার। কিন্তু আর নয়। ডাক্তারবাবুও এখুনি এসে পড়বেন, ওদিকে ডানকান, আগরওয়ালাও অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

অতনু দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের বড় সত্যটা এখন তার কাছে একটা প্রকাণ্ড পরিহাস বলেই মনে হচ্ছে। শ্রীমতীর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখখানা পুনরায় ম্লান হয়ে গেল।

৯

কৃষ্ণচন্দ্র অতনুর বহুদিনের পুরাতন এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য। অতনুর গতিবিধি থেকে আরম্ভ করে বহু খবর তার জানা। লোকটি অতনুকে ভালবাসে। তার হিতাকাঙ্ক্ষী। আভাসে-ইঙ্গিতে সে অনেক কথাই শ্রীমতীকে জানাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভৃত্যের মুখ থেকে তার মুনিব সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে সে চায় না। এটা খুব সম্মানজনক বলে তার মনে হয় নি। তাই অন্য উপায়ে সে তার কৌতূহল চরিতার্থ করে নিয়েছে। গল্পের ছলে জেনে নিয়েছে ডানকান আর আগরওয়ালার ইতিকথা, জেনেছে ওদের সঙ্গে অতনুর সম্পর্ক। তাই সে সতর্ক হয়ে উঠেছে। অতনুকে আয়ত্তে সে আনবেই। অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি সে রাখবে না। তাই সোজা পথকে সে সযত্নে পরিহার করেছে। অতনুর স্বভাবের যতটুকু পরিচয় সে পেয়েছে তাতে শ্রীমতীর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, জোর করে, ভয় দেখিয়ে কিংবা চোখের জল ফেলে এই শ্রেণীর মানুষকে স্ব-বশে আনা সম্ভব হবে না। তাই সে এই পথ বেছে নিয়েছে। প্রচ্ছন্ন উপেক্ষার খাদ মিশিয়েছে সহজ এবং স্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গে। যাতে করে অবহেলায় উপেক্ষা করতে না পারে, অথবা সোজাসুজি জ্বলে ওঠাও না সম্ভব হয়। নিজেকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে এক পা সরে যেতেও সে রাজি নয়। বিবাহের পূর্ব্বে তার চিন্তা করবার পথ ছিল আলাদা। স্বপ্ন দেখেছে অনেক। সূর্য্যদার জনসেবার মধ্যে তা ছিল সীমাবদ্ধ। সেদিনের সে-সব বিক্ষিপ্ত কল্পনা আজ আর তেমন করে মনকে নাড়া দেয় না। তার চেয়ে ঢের বেশী বড় হয়ে উঠেছে তার বর্ত্তমানের স্বপ্ন। যা আজ আর শুধুমাত্র স্বপ্ন নয়। পৃথিবীর মাটিতে তার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে, যে অঙ্কুরের পূর্ণরূপ দেখতে মন তার বিভোর হয়ে যায়।

ক'মাস চুপ করে থেকে হঠাৎ সূর্য্যদা জেগে উঠেছে আজই তার একখানা চিঠি পেয়েছে শ্রীমতী। সংক্ষিপ্ত চিঠি। কিন্তু তার চেয়েও সংক্ষেপে জানিয়ে দেবে শ্রীমতী তার অক্ষমতার কথা। এ ছাড়া আর উপায় কি। আশ্চর্য্য! মানুষের চিন্তার সঙ্গে এমন একটা যোগাযোগ বড় একটা

চোখে পড়ে না। সূর্য্যদাকে শ্রীমতী জানে। সে চুপ করে থাকবে না তাও সে বোঝে, কিন্তু তার চেয়েও ভাল করে বুঝতে আরম্ভ করেছে তার বর্ত্তমান অবস্থাটা। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার নিজের সম্মান—তার বাবার সম্মান। যা কোনকিছুর বিনিময়ে শ্রীমতী আজ আর খোয়াতে রাজি নয়।

শ্রীমতীর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। ভারী জুতার আওয়াজ আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে এল একটি অপরিচিত কণ্ঠের আহ্বান। ঘর অন্ধকার কেন? বৌমা কি ঘরে নেই?

শ্রীমতী সসব্যস্তে আলো জালিয়ে দোরের কাছে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে আহ্বান জানাল, আসুন ডাক্তারবাবু—

অতনু—অতনু বাবু গেল কোথায়? ঘরে প্রবেশ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, এতক্ষণ আপনার জন্যে অপেক্ষা করে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। ডানকান সাহেব আর শেঠ আগরওয়ালা এই মাত্র ডেকে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবুকে একটু যেন চিন্তিত মনে হ'ল, কিন্তু সে ভাবটা সম্পূর্ণ গোপন করে তিনি অন্য প্রসঙ্গে এলেন, দিন-রাত শুধু কাজ আর কাজ। এমন কাজ-পাগলা লোক আমি জীবনে দেখি নি। কিন্তু ঐ দেখ যার জন্যে এত রাতে এখানে আসা সেই কথাটাই এখনও জানা হ'ল না। তোমার নাকি শরীরটা কিছুদিন ধরে খুব খারাপ যাচ্ছে?

একটুখানি হেসে শ্রীমতী বলল, বাড়িয়ে বলেছেন আপনাকে। আসলে আমার কিছুই হয় নি।

প্রশান্ত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বললেন, তা বলে তোমার কথা শুনে আমি ত ফিরে যেতে পারি না। আমাকে দেখেও যেতে হবে—বিধানও একটা দিতে হবে।

ডাক্তারবাবুর কথা বলার ধরনে শ্রীমতী কৌতুক বোধ করছিল। সে হাসিমুখে বলল, তা আমার কোন অসুখ করুক আর না করুক?

ডাক্তারবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। শ্রীমতী সে হাসির শব্দে আচমকা চমকে উঠল। তার বাবাও ঠিক এমনি করে হাসেন। এমনি কারণে অকারণে।

ডাক্তারবাবু সহসা হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, ঠিক তাই মা, তুমি একটুও মিথ্যে বল নি। চাকরী বজায় রাখতে হলে এ সব করতে হয়।

ডাক্তারবাবুর সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রাণপূর্ণ কথাবার্ত্তায় শ্রীমতীর সঙ্কোচের যদিওবা কিছু কারণ ছিল আপন অজ্ঞাতে তা কখন যে দূর হয়ে গেছে তা সে নিজেও জানতে পারল না। নইলে কখনই সে এমন অসংকোচে বলে উঠতে পারত না, তাই বলে আপনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবেন?

ডাক্তারবাবু পুনরায় হেসে উঠে বললেন, না দিয়ে উপায় কি মা? আমি ছেড়ে দিলেও আর কেউ হয়ত দেবে না। মাঝখান থেকে আমাকেই বঞ্চিত হতে হবে। বুঝলে মা এরা হ'ল সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির মানুষ। আমি না নিলেও অতনুবাবু আর কাউকে বিলিয়ে দেবে। খরচ করাটা এদের বিলাস। আর আমার হ'ল প্রয়োজন।

শ্রীমতী ডাক্তারবাবুর কাছে এগিয়ে এসে হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, বেশ তা হলে দেখুন।

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠে স্নেহের বান ডেকেছে। আর সেই জলের টানে শ্রীমতীর ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, তার চেয়ে তুমি আমার পাশে বস মা। মা বেটাতে খানিক গল্প করি।

শ্রীমতী হেসে বলল, রুগী দেখতে এসে গল্প করলে বুঝি কোন দোষ হয় না? আর তাতে বুঝি মুনিব রাগ করেন না?

ডাক্তারবাবুও হেসে বলল, এ সময়টা আমার মাইনের মধ্যে পড়ে না কিনা তাই খুশী মত ব্যবহার করতে চাইছি। তাছাড়া যে রুগী রোগকে স্বীকার করে না তাদের রোগ আমাদের অনেক সময় গল্পের ভিতর দিয়ে নির্ণয় করতে হয়।

শ্রীমতী সহসা অন্য কথায় এল। বলল, আপনাকে সত্যি বলছি এমনি কথায় কথায় ডাক্তার দেখান কিংবা ওষুধ খেতে আমি অভ্যস্ত নই। তাই ঠিক—

তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তখন তুমি ছিলে এ দেশের এক স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে। সহস্র প্রয়োজনেও ডাক্তার দেখান কিংবা ঔষধ খাওয়াটাকে বিলাসিতা বলে ভাবতে বাধ্য হয়েছ। কিন্তু আজ তুমি মস্ত বড়লোকের স্ত্রী। আজ তোমার প্রয়োজন না থাকলেও প্রয়োজন হবে। নইলে যে মানাবে না মা।

শ্রীমতী বলল, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় হো হো করে হেসে উঠে বললেন, তুমি খুব দুষ্টু ত!

শ্রীমতী একথার কোন জবাব না দিয়ে অন্য কথা বলল, কণ্ঠস্বর তার অত্যন্ত কোমল হয়ে উঠেছে, জানেন ডাক্তার-বাবু আপনাকে দেখে অবধি আমার বার বার বাবার কথা মনে পড়ছে।

তার কণ্ঠস্বর সহসা বুজে এল। খানিক চুপ করে থেকে সে পুনশ্চ বলতে সুরু করল, আপনাকে আজই প্রথম দেখার সুযোগ আমার হ'ল, কিন্তু আপনার চোখের রঙিন চশমা থেকে সুরু করে অনেক খবরই আমার জানা। অথচ আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় পাবার কৌতূহল থাকলেও বিশেষ

বড় রকমের আগ্রহ ছিল না। এমন জানলে কিন্তু রোজই আমার অসুখ করত।

শ্রীমতী মিষ্টি করে একটু হাসল।

ডাক্তারবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কি এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে মা?

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, কষ্ট হবে কেন ডাক্তারবাবু? এত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রয়েছি, এটা ত আমার পরম ভাগ্য। কথাটা তা নয়। ও আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। তার চেয়ে আপনি আমাকে পরীক্ষা করুন আমি না করব না।

ডাক্তারবাবু সহজভাবেই শ্রীমতীর একখানি হাত তুলে ধরে নাড়ি টিপলেন, অনুভব করলেন তার গতিবেগ। তার পর মৃদু হেসে বললেন, রোগ তোমার নেই সত্যি, কিন্তু ঔষধের প্রয়োজন আছে। ব্যবস্থাপত্র আমি অতনুকেই দেব মা।

ডাক্তারবাবু একটু থেমে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় বললেন, পরীক্ষা আমার হয়ে গেছে। এবারে বল, এখানে তোমার মন বসছে না কেন?

শ্রীমতী বলল, আমি এমন কথা একবারও আপনাকে বলেছি কি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, না জেনে বলে ফেলেছ। সব সময় সব কথা কি বলবার দরকার হয় মা?

শ্রীমতী তর্কের দিক দিয়ে গেল না, বরং কথাটা এক-প্রকার মেনে নিয়ে বলল, যদি বুঝেই থাকেন তাহলে আমার মুখ থেকে সেকথা নতুন করে শুনে আর কি হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, বললে ভাল করতে মা। হয়ত চেষ্টা করলে তোমার কিছুটা কাজে আসতে পারতাম। অতনুবাবু আমার মনিব হলেও আমার অনুরোধের মর্য্যাদা দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। যাবে নাকি কিছুদিনের জন্য মা-বাবার কাছে?

এখন থাক ডাক্তারবাবু। শ্রীমতী নরম গলায় বলল, তার চেয়ে আপনি রোজ একবার করে আসবেন।

শ্রীমতীর কথা বলার মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম আন্তরিকতা ফুটে উঠল যে, খুশীতে ডাক্তারবাবুর বুক ভরে উঠেছে। তিনি স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন, আসব বৈকি মা, নিশ্চয় আসব। এমন ডাক অবহেলা করবার কি আমার ক্ষমতা আছে? পুরুষগুলো বোকা, সব কথা তারা ভাল বোঝে না। তুমি ঠিকই বলেছ, তুমি গেলে এদিকে দেখবে কে?...

ডাক্তারবাবুর কথা বলার ধরনে শ্রীমতী খানিকটা অবাক হ'ল, অবশ্য কিছু সে বলল না। ডাক্তারবাবু তখনও বলে চলেছেন, কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করলে না। লোভ দেখিয়ে দিলে, এরপরে সামলাতে পারবে ত মা? আর হ্যাঁ, আর একটা কথাও একটু মনে রেখ। অতনুবাবুকে বলে এই দরিদ্র ডাক্তারটির কিছু অর্থপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিও। কি বল মা, কিছু অন্যায় দাবী করেছি? রোজ যখন একবার করে আসতে হবে। তিনি পুনরায় উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির সঙ্গে শ্রীমতীও যোগ দিল। বলল, বলতে বলেন বলব কিন্তু তাতে আপনার আধিক ক্ষতিই হবে।

ডাক্তারবাবু বিস্ময়ের ভান করে বললেন, তোমার কথাটা ত ভাল বুঝলাম না মা।

শ্রীমতী বলল, আমি কিন্তু ডাক্তারবাবুকে আসতে অনুরোধ করি নি। আমি আপনাকে আসতে বলেছি—যাঁর

কথা বলা, আর হাসি বার বার আমাকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় গভীর হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবুরও রঙিন চশমার আড়ালে চোখ দুটো কি জানি কেন সজল হয়ে উঠল। তিনি বিগলিত কণ্ঠে বার বার বলতে লাগলেন, দুষ্টু মেয়ে—তুমি খুবই দুষ্টু মেয়ে।

ক্রমশঃ

হরতাল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কোন একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার পূর্বে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় তাহার সকল কিছুই পালিত হইয়াছিল গত ২৫শে জুনের ব্যাপক হরতালের পূর্বে। এই হরতালের মূল কথা ছিল সরকারের জনস্বার্থবিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। কোনরূপ অবাঞ্ছিত ঘটনা যাহাতে না ঘটে সেইজন্য সরকার পূর্বাহ্নেই রাষ্ট্রীয় পরিবহনব্যবস্থা হরতালের নির্দিষ্ট সময় বন্ধ রাখিবার আদেশ দেন, অর্থাৎ সরকার পরোক্ষে সরকারবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করিয়া বসিলেন। ২৬শে জুনের সকল পত্রিকায় হরতালের সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

খাদ্যসমস্যা এমনই একটি সমস্যা যাহা সর্বস্তরের জনসাধারণকেই বিব্রত করিয়া থাকে, কেবল ডিগ্রীর কমবেশী মাত্র। সুতরাং এই সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কোন আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন আছে কিনা তাহা বিচার্য; জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঐরূপ কোন আন্দোলনে যোগ দেবেন ইহাই স্বাভাবিক। বাংলা দেশের খাদ্যসঙ্কট আজ চরমে পৌঁছিয়াছে, সরকারের সকল নীতি কায়েমী স্বার্থের নিকট পরাভূত হইয়াছে; এবং জনসাধারণ বহুমূল্যে নিকৃষ্ট চাউল কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। গ্রামাঞ্চলেও খাদ্য নাই, অনাহার-অধাহারের সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে, কলিকাতার পথে পথে গ্রাম হইতে আগত বুভুক্ষু নরনারীর ভীড় জমিতেছে, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ পূর্ণ সাজে আসিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যসঙ্কটে সকলকারই শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

কিন্তু ২৫শে জুন কলিকাতা শহরে যে রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে খাদ্যসঙ্কটজনিত সার্বজনীন উদ্বিগ্নতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই; রাস্তায় রাস্তায় সারাদিন ধরিয়া যুবকেরা ক্রিকেট-ফুটবল খেলিয়াছিলেন, প্রৌঢ় আপিসবাবুরা হরতালের মাধ্যমে হঠাৎ-আসা এই ছুটি ভোগ করিয়াছেন তাস খেলিয়া এবং ঘুমাইয়া, অর্থাৎ ক্রীড়ার মধ্য দিয়া উদযাপিত হইয়াছিল এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ দিবস। সংবাদপত্রে হরতালের সংবাদের সঙ্গে রাস্তায় খেলাধূলার ছবিও প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা—বাঙালীরা আজ দুর্দশার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাঙালীরই এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কর্তব্য আছে, কিন্তু আমরা সর্ববিষয়েই লঘুচিত্ততার পরিচয় দিতেছি। যখন আমাদের চিন্তাশীলতার প্রয়োজন তখন আমরা চিন্তাহীনতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছি।

যাঁহারা হরতালের উদ্যোক্তা তাঁহারা হরতালের বাহ্যিক সাফল্যে নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণকে সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিতে তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের স্বীকার করিতেই হইবে, রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের দিক হইতে এই প্রকার হরতালের আবশ্যকতা থাকিতে পারে কিন্তু জাতীয় সঙ্কট মোচনের কোন ইঙ্গিত ইহার মধ্যে নিহিত থাকে না।

গত বারো বৎসরে সরকার সক্ষম হন নাই আমাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে; বিশেষতঃ খাদ্যসমস্যা ব্যাপারে তাঁহারা বার বার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। খাদ্যসম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি তাঁহারা বহুবার গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে নীতির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে। সরকারের সদিচ্ছা থাকিতে পারে কিন্তু সর্ব ব্যাপারেই যবনিকার অন্তরাল হইতে কাহার বা কাহাদের নিয়ন্ত্রণে সরকার নীতিভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং এখনও হইতেছেন। কৃষিবিভাগের বার্ষিক পরিসংখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের জমির ফলন প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু লোকসংখ্যা হিসাবে ফলনের আনুপাতিক বৃদ্ধি এতই কম যে, প্রতি বৎসরই আমাদের খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সহজসাধ্য উপায় থাকিতে বহু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। সরকারী সহানুভূতি এবং আনুকূল্যে দেশের কৃষকেরা অনায়াসেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে, জলসেচন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন; গ্রামীণ অর্থনীতিতে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার গুরুত্ব কোন বৃহৎ সর্বার্থসাধক নদী-পরিকল্পনা হইতে অনেক বেশী; বর্তমানের এই যান্ত্রিক যুগে বৎসরের

পর বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে শস্য না জন্মান সরকারের পক্ষে গৌরবের নহে। সরকারী অর্থব্যয়ে কার্পণ্য নাই বটে, কিন্তু বণ্টনের মধ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নাই এবং তাহারও অধিকাংশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়; পাটের বীজ আসিতে আসিতে ধান রোপণের সময় আসিয়া যায় এবং ধানের বীজ পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে বীজ-তলা তৈয়ারির সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, ফলে কাগজে-কলমে যে সকল পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাই তাহার কার্যকারিতা বাস্তব ক্ষেত্রে ততদূর অগ্রসর হয় না, এই কারণে আমাদের সমস্যারও কোন সুরাহা হয় না। খাদ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থাদির সম্যক প্রয়োগে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের খাদ্যাবস্থা উন্নত হইতে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিরোধীপক্ষও খাদ্যসঙ্কট মোচনের কোন বিকল্প ব্যবহারিক প্রস্তাব দেন নাই, তাঁহারা উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বলিয়া উহা বণ্টনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবী করিতেছেন। তাঁহাদের এই দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতেছি না, কারণ শাসন-যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করিয়াছে তাহার সমূল উৎপাটন করিতে পারিলে খাদ্যশস্য যে পরিমাণেই হউক না কেন তাহা যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারিত। কিন্তু খাদ্যসঙ্কট দূরীকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি, তাই উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্পর্কিত কোন বিকল্প প্রস্তাব আমরা বিরোধীপক্ষ হইতে পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এদিকে খুব বেশী উদ্‌গ্রীব বলিয়া মনে হইতেছে না, হরতালের মাধ্যমে ধরিয়া লইতেছি প্রতিবাদ জানান হইল কিন্তু তাহা জমির ফসল বৃদ্ধিতে কতটুকু সাহায্য করিবে?

খাদ্যসঙ্কট জাতীয় সঙ্কট, ইহা সরকারী দুর্বলনীতি অথবা বিপরীতপক্ষের শহুরে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দূরীভূত হইবে না, ইহার জন্য চাই সর্বাত্মক পরিকল্পনা। ভিক্ষার পাত্র লইয়া প্রতি বৎসর কেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হওয়া সরকার এবং সরকারবিরোধী পক্ষ উভয় দলেরই ক্লীবত্বের পরিচয় দেয়। আমরা আশা করিব, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে নয় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উভয়পক্ষই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসঙ্কট মোচনে অগ্রণী হইয়া অগণিত জনসাধারণের দুর্বিসহ দুর্গতি মোচনে বদ্ধপরিকর হইবেন।

বিধুর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কোথায় গেছে সে ঘনশ্যাম সখী, কোথা আজ বনোয়ারি?
খুঁজে খুঁজে আমি পাগলিনী, তবু মিলিল না গিরিধারী।
পুছিনু বৃন্দাবনে মধুবনে,
বার বার কত কুঞ্জকাননে,
লতায় পাতায় পুছিনু ব্যথায়—ঝরায়ে নয়ন বারি।

পুছিনু গোকুলে প্রতি বীথিকায়,
কলি কিশলয়ে, কুসুমে কাঁটায়,
মাঠে বাটে ধূলিরজেরে পুছিনু—কোথা কুঞ্জবিহারী?
পুছিনু সুনীল ঢেউয়ে যমুনার
"দেখেছ কি প্রাণকান্তে আমার?
যাহার শ্যামল অঙ্গ পরশি' তুমি গো শ্যামলী প্যারী?"
পুছিনু দেখিয়া ব্রজের ললনা,
রাখাল বালকে—"কোথা সে বলো না!"
পুছিনু গগনে তারায় তপনে—দিল না দেখা দিশারি!
কেঁদে কেঁদে মীরা গায় দিনরাতি:
জনমে মরণে ওগো চিরসাথী!
এসো তরী বেয়ে আছি পথ চেয়ে, পার করো ওগো পারী!*

* ইন্দিরা দেবীর সমাধিলব্ধ মীরা ভজনের অনুবাদ।

অবজ্ঞাত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হাঁটার পথে অনেক কাঁটা—আঘাতও পায় শত শত,
অগাধ তাহার সহিষ্ণুতা—অনটন তার অবিরত।
ব্যাকুল ডাকে কি যে মধু—
সে জানে—আর পায় সে শুধু,
আমার চোখে জীবন তাহার রামপ্রসাদের গানের মত।

২

লোকে শুধায় ধানের কথা—ধ্যানের খপর রাখে না আর
রুক্ষ দেহ দেখে ভাবে সবার সাথে প্রভেদ কি তার?
রয় কোনো দিন অর্দ্ধাশনে—
প্রসন্নতা তার আননে,
নিত্য অভ্যাগতের তরে, তাহার গৃহের মুক্ত যে দ্বার।

৩

সংসারী সে পূজারি সে—ভাবে মাকে কি আজ দিব?
সামান্য হোক পূজার জিনিস—দেয় সে যা তা—অপার্থিব।
অভাব—তাহার শ্রদ্ধা দেখে,
অপ্রতিভ হয় অলক্ষ্যে যে,
সে ব্রহ্মণ্য দরিদ্রতার স্নিগ্ধ শোভা কি বর্ণিব?

৪

ভক্তিতে তার পূর্ণ হৃদয়—কথায় তাহার সুধা ক্ষরে,—
পাতার ঠোঙায় অমৃত দেয়, এমন দয়াল দেখিনে রে।
স্বল্প-তোয়া তার তড়াগে,
পদ্ম ফোটে অনুরাগে
ভালবাসি শ্যামাপদ কোকনদের সেই ভ্রমরে।

৫

তাহার ভবন তপোবনই—পর্ণকুটীর আমরা চিনি,
মহামায়ার শঙ্খ লয়ে সে যে খেলায় ছিনিমিনি।
দেব-দেবীরা আসেন নিজে—
হয়ে ঘরে আত্মীয় যে,
ভাবের 'জোয়ার' লেগেই আছে—উৎসব তার নিশিদিন।

৬

ভোগেই তাহার ত্যাগের মত, গানই তাহার উপাসনা,
কাছে থাকি, আরও তাহার কাছে থাকি হয় কামনা।
গঙ্গাধারার উৎস মুখে—
উল্লাসেতে ভ্রমি সুখে,
চন্দ্রমৌলি প্রদক্ষিণের পুণ্য লভে আনাগোনা।

৭

চোখে তাহার লবণ সাগর, সে তরঙ্গের নাইক সীমা,
সে দেখতে পায় হয়তো সেথায় সদাই 'কমলকামিনী' মা।
কিসের আবেশ তাহার চোখে—
যায় না দেখা এ আলোকে,
দেখি অপাপবিদ্ধ মানুষ—পবিত্রতার কি মহিমা।

৮

অবজ্ঞা ও অবহেলার বেড়ায়-ঘেরা ভালই থাকে,
কেউ দেখে, কেউ দেখে না তার আড়ম্বরহীন তপস্যাকে।
পাথরসম আছে পড়ি—
শিব বুঝি হয় এই পাথরই,
আগে থেকে পরশ করি—প্রণাম করে রাখি তাকে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সুন্দর অনুপম এই বিশ্ব। এর প্রকৃতি সুন্দর, প্রাণীরা সুন্দর, মানুষ সুন্দর। এর এই সৌন্দর্য শিশুগণ প্রত্যক্ষ করে। ক্ষুদ্র এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন তার দৃষ্টি যেন একনিশ্বাসে জগতের এই সৌন্দর্যসুধা পান করছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর এই দৃষ্টি সঙ্কুচিত হতে থাকে। চল্লিশে এসে আমাদের চালশে ধরে। অনেকের তার অনেক পূর্বেই ধরে। আমাদের অধিকাংশেরই চালশে ধরেছে। আমাদের এত কাছের এই বিচিত্র সৌন্দর্যলীলা আমরা দেখতে পাই না। প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অতিসন্নিকটে যে-মাধুর্যের হোরিখেলা চলেছে তা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথের "শিশুর দৃষ্টি" শেষ দিন পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে-দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হয়েছিল। এমন দৃষ্টি নিয়ে কয়জন এ জগৎকে দেখেছে?

এই চিরনূতন পৃথিবীকে তিনি আমরণ চিরনূতন দেখেছেন। এই নিত্যনবীনা, স্থিরযৌবনা, লীলাচঞ্চলা সৃষ্টি তাঁর প্রাণে আনন্দের তরঙ্গ জাগিয়েছে। বিশ্বের আনন্দরূপ তিনি নিয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি,—"জরাহীন, মৃত্যুহীন, আনন্দরূপ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাচ্ছে।" কবে, কত লক্ষ বছর পূর্বে এই সৃষ্টির প্রথম বিকাশ—কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোথাও কোনখানে বিন্দুমাত্র জরা স্পর্শ করে নি। প্রতিদিন নব নব রূপে, নব নব সৌন্দর্যে, তার আনন্দময় অমৃতময় রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। কে তা দেখছে? কে তার খবর রাখছে? কিন্তু একজন সে-সৌন্দর্য, সে-আনন্দ, সে-অমৃত তাঁর লোচন দিয়ে, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করে গেছেন।

কবে কত হাজার বছর পূর্বে ভারতের কোন্ তপোবনে কোন ঋষি এইভাবে তাঁর অপূর্ব দৃষ্টি দিয়ে এই সৃষ্টির আনন্দরূপ দর্শন করেছিলেন—যার সাক্ষ্য রয়ে গেছে ঐ অপরূপ বাক্যে—আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।

তারপর কত পণ্ডিত উপনিষদ্ পড়েছেন, তার ভাষ্য করেছেন, টীকা করেছেন; সেই ভাষ্যে, সেই টীকায় তাঁদের বুদ্ধির বাহুখেলা দেখিয়েছেন, কিন্তু আনন্দরূপ তাঁদের অগোচরে রয়ে গেছে।

হাজার বছর পরে ঐ বাক্য, ঐ মন্ত্র একজনের কাছে সত্য হয়ে উঠল, জীবন্ত হয়ে উঠল। তিনি বিশ্বের এই আনন্দ-রূপ, অমৃতরূপ দর্শন করলেন। জীবনের প্রতি দিনে, প্রতি ক্ষণে, জাগরণে, শয়নে, স্বপনে এই অপূর্ব রূপ তাঁর চিত্তকে ভরে দিল।

তাঁর কণ্ঠে অগণিত বার এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে এবং আমার তা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। তিমিরান্ধ আমার কাছে বিশ্বের আনন্দরূপ ধরা দেয় নাই, কিন্তু যখন তিনি ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল আমাকে আনন্দরূপের আভাস দিয়েছে।

তাঁকে দেখেই "মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি" এই কথাটির অর্থ বুঝেছি। একই মন্ত্র হাজারবার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করছে কয়জন? যিনি প্রত্যক্ষ করছেন তিনিই ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মন্ত্র চিরন্তন, অনাদি—অনন্ত। যুগে যুগে, বার বার সেই চিরন্তন মন্ত্র পুরাতন এবং নবীন ঋষিগণ প্রত্যক্ষ করেছেন—করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি—এযুগে রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বসৃষ্টির এই আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ করে' অনুভব করে' তিনি আর এক আনন্দরূপ সৃষ্টি করেছেন।

পুরাণে আছে, বিশ্বামিত্র ঋষি দেবতার সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। মহাকবিও এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁর রচিত কাব্যই এই জগৎ। বিধাতার সৃষ্টির পাশে মানবের এই সৃষ্টি আসন গ্রহণ করে, কিন্তু এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ। বিধাতার সৃষ্টির সৌন্দর্যই এই সৃষ্টির জনক।

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ"—মহাকবি বাল্মীকির সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"যতদিন গিরিরাজি বিরাজ করবে, ততদিন তাঁর কাব্য জগতে স্থায়ী হবে"—অর্থাৎ যতদিন বিধাতার সৃষ্টি থাকবে, ততদিন এই মানবের সৃষ্টিও বিরাজ করবে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কাব্য সম্বন্ধে—এই বাক্য পূর্ণভাবে

প্রযোজ্য। কবিমাত্রই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেন—কিন্তু আংশিক ভাবে। শস্যশ্যামলা ধরণী, পুষ্পবিকশিত কুঞ্জ, জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা রজনী, প্রকৃতির মনোহারিণী রূপ কবিদের প্রাণে আনন্দ দেয়, কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র রূপ, করাল রূপ কয়জনকে সত্যিকারের আনন্দ দেয়?

তরুবিরল পুরাতন শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রুদ্ররূপ, মধ্যাহ্নে, প্রসারিত নয়নে ধ্যানস্থ প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ যেন পঞ্চতপা ঋষির প্রচণ্ড তপস্যা।

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার"—ইন্দ্রিয়ের দ্বার পূর্ণভাবে মুক্ত রেখে, তিনি বিশ্বের সমস্ত স্বাদ, গন্ধ, গান গ্রহণ করেছেন। তাঁর যোগাসন অপূর্ব।

শেষ বয়সে যখন তাঁর চক্ষের দৃষ্টি স্বভাবতই ম্লান হয়ে আসছিল, সেই সময় একদিন সন্ধ্যাকালে আমার এক শিশু-কন্যাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি শিশুটিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—"বাঃ! বাঃ! আবার কাজল পরা হয়েছে।"

আমি বললাম—"আপনি যে দুঃখ করেন, আপনার চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে তা ত ঠিক নয়। এই সন্ধ্যায় ওর চোখের কাজল ত দেখতে পেলেন।"

তিনি তখন পরিহাসের সঙ্গে বললেন—"আমি বলি, হায় প্রকৃতি! তোকে এমনভাবে দেখবে কে? যে দেখছে তারই চোখ তুই নিয়ে নিচ্ছিস!"

মহাপুরুষের পরিহাসবিজল্পিত বাক্যও সত্য! কিন্তু প্রকৃতি অকৃতজ্ঞ নয়, শেষদিন পর্যন্ত কবির দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টির আনন্দরূপ তিনি দেখে গেছেন। এই পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত তাঁর কাছে মধুময় ছিল। পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্বে তিনি বলে গেলেন:

"...মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"
"মধুময় পৃথিবীর ধূলি"—আরোগ্য।

কবি যেমন তাঁর কাব্যের মধ্যে অমর হয়ে থাকেন, কর্মীও তেমনই তাঁর কর্মের মধ্যে অমরত্ব লাভ করেন। কিন্তু একাধারে কবি ও কর্মীর দেখা পাওয়া দুর্লভ—অতি দুর্লভ!

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা কবি ও কর্মীকে দেখেছি। অথবা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা এক কবি-কর্মীকে দেখেছি। তিনি স্বভাবতঃ কবি। তাই তাঁর কর্মও কাব্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী'কে আমরা বলতে পারি তাঁর এক কাব্য। তাঁর বিশ্বভারতীও তাঁর অন্য কাব্যের ন্যায় অমর হয়ে থাকবে।

পরমদরদী এক হৃদয় নিয়ে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের জীবনে যে-দুঃখ তিনি পেয়েছেন, সেই দুঃখ যাতে অন্য কেউ না পায়, তার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করতেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি শুষ্ক, নীরস এবং বিভীষিকাপূর্ণ ছিল। শিক্ষার নামে শিশু-দের উপর যে-অত্যাচার হ'ত তা ভয়ঙ্কর—এমনকি বীভৎস ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার কিছু আস্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা গ্রাম্য বালকেরা তার যে-আস্বাদ পেয়েছি তার তুলনায় তা কিছু নয়। আমার জীবনের একটি বছর এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কেটেছে, সে-দিনগুলি এক বিভীষিকা-পূর্ণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় এখনও আতঙ্ক জাগায়।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের এই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনসাধনের জন্য শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। প্রাচীন ভারতে তপোবনে, গুরুগৃহে, বালকবালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। গুরুদের পুত্রকন্যাদের ন্যায় বিদ্যার্থীরা এক পরিবারে পরম স্নেহে পালিত হ'ত। প্রকৃতির মনোরম পরিবেষ্টনীতে, গুরু ও গুরুপত্নীর স্নেহময় পরিচর্যায়, আশ্রমের তরুশিশুর ন্যায় সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভ করত শিশুবিদ্যার্থিগণ। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি এই তপোবনের অনুপ্রেরণায়, শান্তিনিকেতনে এক অভিনব বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সে-যুগের প্রাথমিক শিক্ষকগণের দৃষ্টিতে শিশুশিক্ষার নামে কবি শিশুদের এক "খেলাঘর" নির্মাণ করলেন।

এইরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সে-যুগে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ই দুর্লভ ছিল। তদুপরি রবীন্দ্রনাথের অর্থকৃচ্ছ্রতা বিদ্যালয় গঠনে মস্ত বাধারূপে উপস্থিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথের মন কোন বাধাতেই অবসন্ন হ'ল না। ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পুষ্টিলাভ করল। সেখানের "তরুমূলের মেলায়, খোলা মাঠের খেলায়, নীলগগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলায়" শিশুগুলি পরমানন্দে মানুষ হতে লাগল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি—এই তিনটি ভাষা তিনি নিজে তাদের পড়াতে লাগলেন। সকাল সাতটা হতে দশটা তিনি তাদের ক্লাশ নেন, দুপুরে পাঠ তৈরি করেন। সন্ধ্যায় তাঁদের নিয়ে বেড়াতে যান, সন্ধ্যার পর তাদের অভিনয় শিক্ষা দেন। শোবার সময় তাদের ঘরে ঘরে গল্প বলেন। বর্ষার বারিধারার মধ্যে তাদের নিয়ে খোয়াই এ খোয়াই-এ ঘুরে বেড়ান। জ্যোৎস্না-

রাতে তাদের সঙ্গে শালবনে সঙ্গীতের মহোৎসব লাগান।

বছরের পর বছর এইভাবে তাঁর সময় কেটেছে। ১৯১৭ সনে আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখনও আমি তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা এইরূপই দেখেছি। তার পরও কয়েক বছর এইভাবে চলে।

আমি যখন আমার শিক্ষা সমাপ্ত করে বাইরে যাই, তখন পূর্ববঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একবার এক নৌকায় বার ঘণ্টা কাটাবার সৌভাগ্য হয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ঐ কর্মপদ্ধতির কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠেন: "বল কি হে, বল কি! এইভাবে তিনি তাঁর অমূল্য সময় তোমাদের দিয়েছেন। এই সময়ে তিনি কত অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করতে পারতেন! তোমরা তাঁর ছাত্রেরা সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত করেছ!"

আপাতদৃষ্টিতে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন হিসাব রবীন্দ্রনাথ কখনও করেন নি। বস্তুতঃ বেহিসেবী মন নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া ঐশ্বর্যের যাঁর অন্ত নাই, তিনি হিসেব করবেন কোন্ দুঃখে? বিধাতার বিশ্বসৃষ্টিতে কত কোটি কোটি কুসুম ঝরে পড়ছে, কত লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ভেঙে পড়ছে, কত হাজার হাজার মানুষ অন্তর্ধান করছে—বিধাতা তার হিসেব করেন কি?

কোটি কুসুম ঝরে পড়ছে, শতকোটি কুসুম বিকশিত হচ্ছে, শত তরঙ্গ মিলিয়ে যাচ্ছে, সহস্র তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথেরও ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। তাই অজস্র ছড়িয়ে ফেলিয়েও তিনি অজস্র দান করে গেছেন। তা ছাড়া কবির সময় নষ্ট হয়েছে কি? তাঁর অপূর্ব "শিশুকাব্যে"র সৃষ্টিতে, শিশুদের জন্য এই বেহিসেবি সময় ব্যয় কাজে লাগে নি কি? কেউ কেউ ত এমনও মন্তব্য করতে পারেন, এই ভাবে শিশুদের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলেই তাঁর অনুপম শিশু-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তা ছাড়া এত সময় শিশুদের পরিচর্যায় দান করলেও, তাঁর কাব্যসৃষ্টির সময়ের অভাব হয় নি। কেননা তিনি ছিলেন, জিতনিদ্র পুরুষ। রাত্রি এগারোটার পূর্বে তিনি নিদ্রা যেতেন না। অথচ তিনটার পরই তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না।

তাঁর বৃদ্ধবয়সে, মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে আমার একবার কৌতূহল হ'ল—দুপুর বারটা থেকে চারটা পর্যন্ত তিনি কি করেন দেখতে হবে। অর্থাৎ তিনি কোন সময় নিদ্রা যান কিনা তাই দেখব।

বারটা—একটা—দুটো—তিনটে—চারটে, বিভিন্ন সময়ে তাঁর ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছি, কিন্তু যখনই গেছি দেখেছি—তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ছেন। শেষে একদিন আমি বলে ফেললাম, "আপনি দিনে ঘুমোন কিনা দেখবার জন্য দুপুরের নানা সময়ে আপনার ঘরে ঢুকেছি—কিন্তু আপনাকে শুতে দেখিনি। আপনি কি দিনে একেবারেই ঘুমোন না?"

তিনি মৃদু হেসে পরিহাসের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন—"পৈতের সময় প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল—'মা দিবা স্বাপ্সীঃ'। আমি তো তোদের মত নই—সেকেলে মানুষ, প্রতিজ্ঞা করে তা ভাঙি কেমন করে?"

মহাপুরুষের পরিহাসবিজড়িত বাক্যও সত্য!

পূর্বেই বলেছি—বিশ্বভারতী তাঁর এক কাব্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই পূর্ণ পরিণতি বিশ্বভারতীতে। মানুষের মন যেমন ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে, রবীন্দ্র-সৃষ্টিও সেইরূপ ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করেছে। তপোবন বিকশিত হয়েছে—বিশ্বভারতীতে।

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন। "এ জীবনে যে যোগী সিদ্ধিলাভের পূর্বেই পথভ্রষ্ট হলেন—তিনি কি বিনষ্ট হবেন?"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—"না। কল্যাণকারীর বিনাশ নাই। তাঁর এ জীবনের অর্জিত শক্তি—পরজীবনে বিকশিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। জন্মান্তরে সেই যোগী ঐশ্বর্যসম্পন্ন পবিত্র গৃহে জন্ম নেবেন।

এমনই এক যোগভ্রষ্ট সাধক পরিপূর্ণতা লাভের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে ঐশ্বর্যসম্পন্ন পূতচরিত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যে গৃহে নিত্য উপনিষদ পাঠ হয়, ব্রহ্ম সাধনার বিষয় নিয়ত আলোচিত হয় সেই গৃহের তপোবনসদৃশ আবেষ্টনীতে তাঁর আবির্ভাব হ'ল।

উপনিষদের রচয়িতাগণ যেমন ঋষি ছিলেন, তেমনি কবি ছিলেন। বেদান্ত যেমন চরম জ্ঞান, তেমনই পরম কাব্য। প্রাচীনযুগের সেই ঋষিকবিদের কাব্য এযুগের এই মহাকবির চিত্ত আকর্ষণ করল। তাঁর কাব্যে কাব্যে উপনিষদের প্রভাব ছাপ রেখে গেছে।

বেদে, উপনিষদে তিনি পাঠ করলেন—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"—"যে-সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব নীড় বেঁধেছে"—কবির কল্পনা এই বেদবাক্যকে নূতন রূপ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। "সমস্ত বিশ্ব যেখানে নীড় বেঁধেছে"—এই পৃথিবীতে এমন এক স্বর্গ কি রচনা করা যায় না?

কবির কর্মীপ্রকৃতি এই বাণীকে রূপদান করল—বিশ্ব-

ভারতীতে। যেদিন তিনি এই আদর্শের কথা ব্যক্ত করে সমস্ত পৃথিবীকে তাঁর সাদর আহ্বান জানালেন, সেদিন দেশে-বিদেশে তাঁর বিশ্বপ্রেমিক সমধর্মীরা সাড়া দিলেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বেদান্তবিশারদ আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরমাগ্রহে বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপন করলেন। পৃথিবীর সর্বদেশ হতে সুধিগণের সমাগম হ'ল। দশ বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পরিপূর্ণ মূর্তি গ্রহণ করল। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসীক, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বিশ্বভারতীতে একটি পরিবার গঠন করল; যে-পরিবারে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পরমপ্রীতি। এ যুগে পৃথিবীতে এ এক অপূর্ব কীর্তি।

মতবিরোধের জন্য যেখানে রক্তারক্তি, খুনাখুনি, ধর্ম-বিরোধের জন্য যেখানে নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যার তাণ্ডবলীলা, সেই পৃথিবীতে সর্বমতের সর্বধর্মের লোক নির্বিরোধে, সুখে-শান্তিতে একস্থানে বাস করছে, একি এক অসাধ্যসাধন নয়? তাই বলি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ন্যায় তার বিশ্বভারতীও অমর হয়ে থাকবে।

সম্রাট বিক্রমাদিত্য তাঁর রাজসভার জন্য নবরত্ন সংগ্রহ করেছিলেন। তার দু'একটি ব্যতীত কারোরই আলোক ভারতের সীমা অতিক্রম করে নি। তার কারণ, রত্নের সংগ্রাহক ছিলেন সম্রাট। কালিদাসের উপর রত্নসংগ্রহের ভার পড়লে অন্য রূপ হ'ত।

এ যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রত্নসংগ্রাহক। তাই তাঁর সংগৃহীত রত্নগুলি ছিল উজ্জ্বলতর। দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, এণ্ড্রুজ, পিয়ারসন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, এলমহার্স্ট, হরিচরণের মত রত্ন পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে দুর্লভ। পৃথিবীর সাতসমুদ্রের বিবিধ রত্ন নিয়ে একটি রত্নাবলী গ্রথিত হয়েছিল—যার মধ্যমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই রত্নাবলী দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর কণ্ঠাভরণরূপে শোভাবর্ধন করেছে।

সুদূর অতীত আমাদের চক্ষে কল্পনায় রঙীন হয়ে দেখা দেয়। ভাবুকের দৃষ্টিতে অনেক লঘু বস্তুও গুরু এবং গুরু বস্তু গুরুতররূপে প্রতিভাত হয়। এদিকে বর্তমানের গুরু বস্তুরও আমাদের কাছে গুরুত্ব থাকে না।

বিশ্বভারতীর গুরুত্ব আজ ভারতবাসীর নিকট অনুভূত হয় না। ভারতে রাজনীতিবিদ্ আছেন, রাষ্ট্রচালক আছেন, সমাজসেবী আছেন, ধার্মিক আছেন, ধর্মগুরু আছেন, শিক্ষাবিদ্ আছেন, সাহিত্যিক আছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমধর্মা নাই।

উৎপৎস্যতে মম কোপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

আজ ভারতে রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী কেউ নাই। কিন্তু এই বিপুলা পৃথিবীতে কোন না কোন সময়ে তাঁর সমধর্মী কেউ না কেউ জন্মগ্রহণ করবেন। যিনি বিশ্বভারতীর আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করে প্রাণপণে এর অর্ধসমাপ্ত ব্রত পূর্ণ করবেন।

তখন যদি বাংলা দেশের শান্তিনিকেতনে এই বিশ্বভারতীর অস্তিত্ব নাও থাকে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানেও যদি অনুরূপ বিশ্বভারতী গড়ে উঠে পূর্ণতা লাভ করে, রবীন্দ্রনাথের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবে।

নালন্দা, বিক্রমশিলার আজ অস্তিত্ব নাই। তাদের ধ্বংসাবশিষ্ট কঙ্কাল আজ পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারাই আজ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। যুগে যুগে, কালে কালে, এইরূপই ঘটে থাকে।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

ক্লাসে গিয়ে পড়তে পড়তে কতবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল কৃষ্ণা। মিস্ রথচাইল্ড বললেন, 'কি হ'ল ডিয়ার, আজ তোমার মন ভাল নয় কি?" ভাল ভাল—বেশী রকম ভাল। এত ভাল যে, সে আর নড়তে চাইছে না। বার বার সেই একই যায়গায় ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে। পার হয়ে আসা মুহূর্ত্তগুলিতে লুব্ধ ভ্রমরের মত ফিরে ফিরে উড়ে যাচ্ছে। যেন সেই মুহূর্ত্তের ফুলগুলি এখনও তাদের মধুভাণ্ডে অনেক মধু চুরি করে জমা করে রেখে দিয়েছে। ওর মন যখন প্রথম তাদের উপর দিয়ে উড়ে এসেছিল তখনও যেন তাদের ভাল করে ভোগ করা হয় নি, শুধু স্পর্শ করা হয়েছিল মাত্র। এখন আবার সেইখানে ফিরে যেতে চায় মন। চেখে চেখে পান করতে তার শেষবিন্দু রস, ডুবে যেতে চায় রোমন্থনের সুখে।

ক্লাসের শেষে যখন বেরিয়ে এল ঘর থেকে তখনও ওর ঘোর কাটে নি। যেন মোহতে চলেছে।

—হঠাৎ মনে হ'ল বাড়ী ফিরতে হবে ত? 'অলডুইচ' ষ্টেশনটা ত বাঁদিকে পড়বে? যেতে পারবে ত? নিশ্চয়ই, কি এমন শক্ত? কিন্তু যেতে গিয়ে দেখলে বাঁদিকে ত কোন আণ্ডার গ্রাউণ্ড নেই,—তা হলে? ওঃ! তা হলে ষ্টেশনটা ত বরাবর ডানদিকেই আছে। অথচ কৃষ্ণা বরাবর ঐ ল্যাণ্ডমার্কটিকে বাঁয়ে বসিয়ে এসেছে। কি কাণ্ড! কৃষ্ণা সত্যিই এদেশের অনুপযুক্ত। হাঁটতেও ভুলে গেল আবার এরই মধ্যে। সেই খট্‌খট্ পথ-চলার কায়দা! নবযুগের মার্চকরা সপ্তপদীগমন।

আসতে আসতে অনেকবার অনেক ভুল করল কৃষ্ণা। কলকাতায় বরাবর গাড়ী করে সব জায়গায় যেত। পুরণো ড্রাইভার সব কিছুই চিনত-জানত। গাড়ীতে বসে ঠিকানা বলে দিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে যেত কৃষ্ণা। হয় গুনগুন্ করে গাইত আপন মনে, নয়ত অন্যমনে চেয়ে থাকত রাস্তার বিচিত্র জনপ্রবাহের দিকে। কিছুই লক্ষ্য করত না,—এজন্যে অনেক ঠাট্টা সইতে হয়েছে ওকে, তবু নিজেকে সচেতন করে তুলতে পারে নি। কিন্তু আজ মুস্কিলে পড়ে, সারা পথটা ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে অনেককে জিজ্ঞেস করে ভুলে ভুলে অনেকবার মোড় পেরিয়ে যখন ফিরে এল তখন বিকেলের আলো মিলিয়েছে আকাশের প্রান্তে। আর তার ছায়া পড়েছে ভাবনার মত সকলের মনে। রমলা এসে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। বুড়ী মিসেস গ্রেহামও টুপী পরে ব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়াল। আজ রাত্রে রোস্টমাটন্ হবার আর আশা নেই। ঠাণ্ডা-বাক্সে তুলে রাখা শূকরের মাংসের টুকরো আর স্যালাড খেয়েই কাটাতে হবে। কারণ বুড়ীর মন এখন আর রান্নাঘরে নেই। মার্কাস পার্থকে নিয়ে গেছে 'সায়েন্স মিউজিয়ম' দেখাতে। ওরা এখনও ফেরে নি। কুমার কখন আসবে কে জানে। রমলা আর মিসেস গ্রেহাম দু'জনে দু'রাস্তায় গেল কৃষ্ণার খোঁজে। সাড়ে তিনটে থেকেই রমলা একটু একটু করে ব্যস্ত হচ্ছিল। পোনে পাঁচটায় আর ওকে রাখা গেল না। শুধু মামাবাবু আছেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

—"আমিই তোকে সর্বপ্রথমে খুঁজে পাব বলেছিলাম। তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

কৃষ্ণা নিঃশব্দে হাসল।

মামা বললেন,—"ক'বার পথ হারিয়েছ বল দেখি মহারাণী। ক'টা ভৃত্য এগিয়ে এসেছে সাহায্য করতে?"

—"সত্যি দাদু।" কৃষ্ণা হাসল,—"সাহায্য অনেক নিতে হ'ল। পথে পথে ভুলও অনেক করেছি,—কিন্তু তা সত্ত্বেও এসে ত গেছি।"

—"হ্যাঁ।" মামা বললেন,—"অলডুইচ থেকে চেলসী পর্য্যন্ত যদি নির্বিঘ্নে পৌছতে পারিস, তবে একদিন জীবনের পথও এমনি করেই পার হয়ে যেতে পারবি।"

—"হ্যাঁ দাদু।" উদ্ভাসিত মুখে কৃষ্ণা বলল,—"ভুল হবে অনেক জানি, কিন্তু সে সব শুধরে লক্ষ্যে পৌছতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস।"

মামাবাবু হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন,—"না ভাই,—শহরের পথে যত ভুলই হোক, জীবনের পথে খুব বেশী ভুল হবে না তোমার। স্পষ্ট দেখছি, তোর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে একজন গাইড সর্বদা তোর সঙ্গেই আছে। ঠিক পথেই বোধ হয় নিয়ে যাবে তোকে। তুই যদি বেশী স্মার্ট হতিস তাহলেই হয়ত সে অপ্রয়োজনীয় বোধে তোকে ছেড়ে যেত।"

—"তার মানে কি বলুন?"

—"আজ আর নয় দিদি,—অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওরা এসে পড়বার আগেই মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও।"

—"কিন্তু বঙ্কুনিটা 'মিস' করতে ইচ্ছে করছে না।"

—"না না, সে আর একদিন হবে, আজ তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

সেদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণা একটু বিশেষ করে সাজল। চোখে কাজল ঘন করে দিয়ে, ঠোঁটে এঁকে দিল মৃদু রক্তিমা। 'ডোনাট' দিয়ে মস্ত কালো খোঁপা করে রূপোর মালা দিয়ে সাজিয়ে দিল। হলুদে রঙের কটকি সিল্ক-সাড়ির চওড়া রেশমী আঁচলে আধখানা কাঁধ বাঁকা করে ঢেকে কুমারের জন্যে প্রতীক্ষা করে রইল। এলে দেখিয়ে দেবে, অচেনা পথেও কে আগে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কুমারের ফিরতে কেবলই দেরী হতে লাগল। পার্থকে নিয়ে ফিরে এল মার্কাস। ওকে মিউজিয়াম দেখিয়ে, হাইড পার্কে নৌকো চড়িয়ে, 'লায়ন্সে'র বড় দোকানে চা খাইয়ে নিয়ে এসেছে। পার্থর মুখে গল্পের ফোয়ারা—মোটরগাড়ীর পরিণতির ইতিহাস,—আর রেলগাড়ীর জন্মের। পার্থ আশ্চর্য্য হয়ে গেছে, আর ওর প্রশ্নে প্রশ্নে মার্কাস কেন যে এখনও পাগল হয়ে যায় নি, একথা ভেবে রমলাও আশ্চর্য্য হয়ে গেছে।

মার্কাস কিন্তু অস্থির হয় নি মোটেই, বরং ধীরভাবে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে, ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগে মার্কাসের। বাইরে থেকে পার্থকে দেখতে যদিও শান্ত ধীর,—কিন্তু যে একবারে ওর মনের কাছাকাছি এসে যেতে পারে, তার কাছে ওর দুরন্ত কৌতূহল অজস্র প্রশ্নে লাফালাফি করতে থাকে।

মার্কাস বললে,—"ছুটি ফুরোবার আগে আগামী সপ্তাহে একবার পার্থকে আমার মা-বাবার কাছে ঘুরিয়ে আনতে চাই। ওঁরা প্রত্যেক চিঠিতে তোমাদের খবর জানতে চান। বিশেষতঃ পার্থকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন তাঁরা।

—"বেশ ত", রমলা হাসল, "তুমি যদি সখ করে কষ্ট করতে রাজী থাক, আমি কেন বাধা দেব,—কিন্তু দেখ, শেষকালে তোমার মা-বাবা না ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন।"

—"বেশ ত",—রমলার চোখে আবার চোখ রেখে হেসে ওঠে মার্কাস,—"বেশ ত,—তা হলে ওর মাকেও নিয়ে চল না ওর সঙ্গে, শুধু ওকে সামলাবার জন্যে?"

বলতে বলতে নরম হয়ে এল মার্কাসের গলা,—"মা-বাবা দু'জনেই যে কত খুশী হবেন, তুমি ভাবতেও পার না। চল না,—যাবে? মাত্র ত একদিনের জন্যে?"

—"আমি?" অল্প হাসি দিয়ে মস্ত দ্বিধা ঢাকতে চাইল রমলা,—কি মুস্কিলেই পড়ে গেল হঠাৎ। কি জবাব দেবে? কি বলা উচিত?

—"হাঁ, নিশ্চয়ই তুমি। দেখ, কৃতজ্ঞতা শোধবার এমন সুযোগ হারিও না—তুমি শুধু একবার আমাদের বাড়ী পদার্পণ করলেই আমি তোমার কাছে অনেক বছর পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।"

মামা বললেন,—"যাও না দুটো দিন ঘুরে এস, ভালই লাগবে,—নতুন পরিবেশে, জার্নালিষ্ট হিসাবে যত বেশী ঘোরা যায়, যত বেশী দেখা যায় ততই ভাল।"

—"তা বটে", রমলা হাসে,—"কিন্তু—"

—"কিন্তু আবার কি? ও 'কিন্তু'কে উড়িয়ে দাও,—একেবারে হাওয়ায় উড়িয়ে দাও,—তা হলে পরের শুক্রবার আমি বেলা তিনটের সময় গাড়ী নিয়ে এসে হর্ন দেব,—তোমরা নেমে আসবে। একেবারে গর্জের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের।"

—"ওঃ হো, চেডার গর্জ?" উৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠল পার্থ।

—"তুমি চেডার গর্জের কথাও জান?"

—"হ্যাঁ জানি বৈকি,—ঐ পাহাড়েই ত স্ট্যালেকটাইটের গুহা আছে?"

ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মার্কাস বললে,—"ভারতবর্ষের শিশুরা কি আশ্চর্য্য!"

—"হাঁ", মামাবাবু হাসলেন,—"ভারতের শিশুরা সত্যিই ফাদার অব ম্যান,—মানবের পিতা, যুবাদের পিঠ চাপড়ে চলে।"

—"আর ভারতের বুড়োরা?" দুষ্ট হাসি হেসে কৃষ্ণা বলে।

—"আহা জানিস নে? ভারতের বুড়োরা একেবারে শিশু, চির-খোকা, কিছুতেই তাদের চোখ ফোটে না।"

মার্কাস বললে,—"তা হলে এই কথা রইল,—শুক্রবার। মামাবাবু আর কৃষ্ণাকেও আমার নিয়ে যাবার ইচ্ছে আছে, সেটা এর পরের বারে হবে। কারণ আমার গাড়ীটা নেহাৎই সুকুমারী,—দু'তিনজনের বেশী সে ভার বইতে পারে না।" মার্কাস হাসলে।

মামাবাবুও হাসলেন,—"তা ছাড়া রমলার সঙ্গে আমাদের না যাওয়াই ভাল। রমলা সকলকে এত বেশী ইমপ্রেস করবে যে, আমি আর কৃষ্ণা একেবারে ব্যাকগ্রাউণ্ডে পড়ে যাব। তার চেয়ে আমাদের পরে যাওয়াই ভাল। কি বল কৃষ্ণা?"

কৃষ্ণা শুনে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। সে হাসি শুনে মার্কাস ওর মুখের দিকে মুগ্ধ চোখ তুলে তাকাল।

কৃষ্ণার মন সারাদিন খুশীতে টলমল করছিল। হাসতে পেয়ে বেঁচে গেল ও। কিন্তু যার জন্যে সারাদিন ধরে ওর মনের মধ্যে হাসির অর্ঘ্য রচিত হয়ে উঠেছিল, সে দেখতে

গেল না। ক্রমে সন্ধ্যে ঘন হয়ে এল। মার্কাস ফিরে গেল। বুড়ী গ্রেগার টেবিলের উপরে স্যালাড আর পর্কসেদ্ধ, রুটি আর 'চীজ' সাজিয়ে সবাইকে ডাক দিল। খেতে বসে কুমারের কথা মনে পড়ল সকলের।

—"দুষ্ট ছেলে, খাবে না, এ খবরটাও ত জানানো উচিত ছিল। এত দেরী ত কখনও করে না।" বললে রমলা। ও ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বোঝা গেল। ঘর-পোড়া গরুর মত একটু দেরী হলেই ওর ভাবনা সুরু হয়।

পার্থ শুধু অস্থির হয়ে উঠল, আজকের দিনের সব আশ্চর্য্য গল্পগুলি কুমারকে বলতে দেরী হয়ে যাবে। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল। কুমারের ফোন, বিশেষ কাজে আটকা পড়েছে, যেতে দেরী হবে, খাবে না বাড়ীতে। শুনে সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল,—খবরটা বলেই মামাবাবু হঠাৎ একবার কৃষ্ণার দিকে তাকালেন, কিন্তু উত্তরে কৃষ্ণার চোখ প্রতিবারের মত হেসে উঠল না। কাঁটা-ছুরি নিয়ে টুংটাং করতে করতে কৃষ্ণা ফিরিয়ে নিল চোখ, নামিয়ে নিল মুখ।

পিয়েত্রো বাইরে থেকে খেয়ে এসেছিল, এদের সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে বার বার কৃষ্ণার সাজের দিকে চেয়ে দেখল, কিন্তু ওর সাজের উপরে ততক্ষণে মন খারাপের ছায়া পড়ে গেছে। এলো খোঁপার সাদা রূপো স্তিমিত হয়ে এসেছে যেন। আর কালো চোখে অভিমানের টুকরো টুকরো জ্বালা হীরের মত জ্বলে উঠেছে। ফোনে কুমার একবারও খোঁজ করে নি—কৃষ্ণা ফিরেছে কি না।

খাওয়া হয়ে গেলে ওরা সবাই রাস্তায় একটু পায়চারী করতে করতে গল্প করতে লাগল। পার্থর গল্পই সবচেয়ে বেশী। নতুন জীবন ওকে হাতছানি দিয়েছে।

—"Science দিয়ে কত কি করা যায় দাদু, এ ত মস্ত ম্যাজিক!"

—"ম্যাজিকই বটে", দাদু বলেন,—"একেবারে আলা-দিনের প্রদীপ। এইটি হাতে পেয়েই ত হঠাৎ মানুষের এত বাড় বেড়ে উঠেছে।"

—"মানে?"

—"মানে আর একটু বড় হলে বুঝবি।" মামা হাসেন।

কৃষ্ণা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, হঠাৎ বললে,—"আমার মাথা ধরেছে মামী, গা কেমন করছে, আমি শুতে যাই।"

পিয়েত্রো ওর মুখ চেয়ে হাসলে,—"হ্যাঁ সত্যি, শিশুদের রাত করে শুতে নেই।"

কৃষ্ণার মুখের ম্লান ছায়া আরও একটু কালো হয়ে উঠল। ওকে দেখে সকলেরই বুঝি শুধু শিশু বলে মনে হয়, তাই ওর প্রতি মনোযোগ দেবার কথা কারও মনেই থাকে না। পিয়েত্রোর কথার জবাবে হাসল না কৃষ্ণা, অন্য-মনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়ে রইল। পিয়েত্রো অবাক হয়ে ভাবল, হ'ল কি!

মামা বললেন,—"সত্যি কৃষ্ণা, তোমাকে ক্লান্ত লাগছে দেখতে। বিশ্রাম নেওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন, শুতে যাও তাই। গুডনাইট।"

ক্ষুণ্ণ অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পিয়েত্রো বললে, —"গুডনাইট।"

তেমনি স্বরেই শুভরাত্রি জানাল কৃষ্ণা, অন্যমনস্ক নত চোখে শুতে চলে গেল।

সবাই একে একে ঘরে গিয়ে যখন আলো নিভিয়ে দিল, মামাবাবু নিজের দেড়তলার ঘরে শুতে এসে দেখলেন, কৃষ্ণার ঘরের নীলাভ আলোটা জ্বলে উঠেছে। ঘরে এসে গলাবন্ধ, গরম কোট আর ট্রাউজার বদলে সাদা পাঞ্জাবী আর পায়জামার উপরে মস্ত মোটা ড্রেসিং গাউনটা পরে মামা এসে বন্ধ জানলার কাছে বসলেন। এখানে এসে অবধি প্রত্যহ শোবার আগে কিছুক্ষণ এই জানলার ধারে বসা মামাবাবুর একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসেছিলেন ডিসেম্বরের শেষে। তার পরে শীতের দুটো মাসে প্রায় রোজ রাতেই বরফ নিয়ে হোরিখেলা সুরু হ'ত। কার যেন মস্ত লেপটা ছিঁড়ে ফেলে আকাশ জুড়ে তুলো ছিটিয়ে ধুনুরীরা তুলো ধুনছে।

আজ কিন্তু আকাশ নীল, আর চাঁদের আলোয় যেন থম্ থম্ করছে চারিদিক। এ যে লণ্ডন শহরের এক কোণার ছোট্ট এক টুকরো পৃথিবী, তা যেন মনেই হচ্ছে না। এই মুহূর্তে এই জায়গাটা বিশেষ দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে শুধুমাত্র এই বিশেষ কালখণ্ডটুকুর মধ্যে অবস্থান করছে। এই চন্দ্রালোকিত রজনীর বিশেষ ক্ষণটুকু। এর সবটাই অস্পষ্ট, সবটাই ঝাপসা, সবটাই সুন্দর, সবটাই মায়া। এই মায়ায় ঢেকে গেছে, যা কিছু বিরূপ কুশ্রী, যত কিছু গ্লানি। মনে হচ্ছে এখানে যেন দুঃখ বলে কিছু নেই। প্রেমের যেন কোন বিষয় নেই, প্রেম যেন আপনাতে আপনি পূর্ণ হয়ে আকাশ জুড়ে টলটল করছে। কোন বিশেষ দেশকে এর বিষয় করে নি। অর্থাৎ এই সৌন্দর্যের প্লাবনে যে কোন দেশের বিশেষত্বই অবান্তর। এ বন্যা নিজের মধ্যেই পূর্ণ তাই সব দেশকেই সমান ভাসিয়ে নিতে পারে। এ যেন সেই প্রাচীন ভারতের সতী নারীর প্রেম। মনে মনে উপমা খুঁজছিলেন মামাবাবু, স্বামী যেই হোক, তারি জন্যে ঘট পূর্ণ করে রাখে। বিচার করে না যোগ্যতা, চায় না প্রতিদান, এমন কি স্বামী বেঁচে আছে কিনা তারও পরোয়া করে না। শুধু নিজের মধ্যেই পূর্ণপ্রেমরস স্বামী-বিষয়কে অবলম্বন করে

আনন্দে সতী অর্থাৎ সত্য হয়ে থাকে। আজকের এই বিশেষ ক্ষণটুকুও যেন কার প্রেমবিহ্বল চোখের ঝাপসা দৃষ্টির আলো। এই আলোয় মিলিয়ে গেছে ওপারের বাড়ীর মাথার কুশ্রী কালো চিমনীগুলো তাদের পাশে লুটিয়ে পড়েছে, দিনে-দেখা নেহাৎ সাধারণ নাম না-জানা গাছের ডালের আবছা সিলুয়েট। সব ঢেকে রূপোর কুয়াশা দিয়ে মায়াজাল বুনছে জ্যোৎস্না। এই মায়ালোকে দুঃখকে তেমন সত্য বলে মনে হচ্ছে না। বুদ্ধের সেই প্রথম আর্যসত্য তার মূল্য হারিয়েছে যেন। মামাবাবু ভাবলেন, দুঃখ হয় ত আছে, কিন্তু যেন মিথ্যা হয়ে আছে। এই যে উপরের এক রুদ্ধ ঘরে নীল আলো জ্বালিয়ে নবীনা কাঁদছে প্রথম-প্রেমের বেদনায়। আর তার পাশেই আর একটা অন্ধকার ঘরে, শুষ্ক চোখে বিনিদ্র বিছানায় বঞ্চিত জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আছে পূর্ণ-যৌবনা নারী। তাদের দুঃখ থেকে ক্লেদটুকু ধুয়ে ফেলে, শুধু মাধুরীটুকুই যেন ফুটিয়ে তুলেছে এই জ্যোৎস্না। শুধু কি এই? শুধু কি এখানেই? কোথায় কোন দূরদেশে নদীর জলে বান ডেকেছে, মৃত্যু হানা দিচ্ছে ভাঙা ঘরে। হাহাকার করে ফিরছে ক্ষুধা। তার জ্বালায় লুপ্ত হয়ে গেছে সব মাধুরীর আবেদন। পচা ডোবায় নোংরা খানা কন্দরে, খোলা নর্দমার ধারে। দুর্গন্ধ ক্লেদাক্ত পরিবেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে মানবজীবনের চরম অপমান। কুৎসিত নরকের মধ্যেও প্রাণের বিষাক্ত গ্যাসটা কোনমতে জ্বালিয়ে বেঁচে আছে মানুষ। এই মুহূর্তেই হয়ত কোথাও ঈর্ষাদ্বেষের গুপ্ত মন্ত্রণা ফেনিয়ে উঠছে। প্রবৃত্তিতে পাগল হয়ে মানুষ খুন করছে মানুষকে। কোথায় মতে মতে বাধছে সঙ্ঘর্ষ,—পথে পথে লড়াই উঠছে মাতাল হয়ে। রাজনীতি হানা দিচ্ছে মানবনীতির গূঢ় অন্তঃপুরে। হিংস্র লোভ দুর্বিষহ মূঢ়তায় আচ্ছন্ন করছে মানুষের শুভ চৈতন্য। কলুষিত হচ্ছে পবিত্র-সুন্দর, যেন দগ্ধ হচ্ছে আত্মা। কিন্তু সেখানেও এই চাঁদের আলো সেই কুৎসিত রূঢ়তার উপরে একটা রূপালী জালের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

গৌতম রায়ের চোখের সামনে হঠাৎ যেন ভেসে উঠল সেই কোন দূর দেশের ক্ষুদ্র গ্রামের ছবি। সেখানে পচা ডোবার ঘোলাটে জলে চিক্ চিক্ করছে তৃতীয় প্রহরের চাঁদ, আর তারই আভা যেন লণ্ডনের প্রথম প্রহর রাত্রির কালো বাড়ীর শ্রীহীন চিমনীগুলিকে আবৃত করে একটা অপার্থিব সুষমায় মূর্চ্ছাহতের মত পড়ে আছে। শুধু চেয়ে থাকার নেশায় তাঁর চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। অনেক কিছুই করবেন বলে ঠিক করেছিলেন আজ রাতে। একটা লেকচার তৈরি করার কথা আছে, তার জন্যে কয়েকটা বই দেখতে হবে ঠিক করেছিলেন। নয়ত যে প্রবন্ধটা আধখানা হয়ে আছে। সেটা শেষ করে ফেলবেন ভেবে-ছিলেন,—কিন্তু কিছুই করা গেল না। শুধু বাইরে চেয়ে বসে রইলেন। আর গলার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গুণগুণ করে ফিরতে লাগল—"পূর্ণ চাঁদের মায়া।"

ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে এল। এমন রাতে যে কোন শব্দই বেমানান, এমনকি গুণ গুণ গানের আওয়াজও। এ সময়ে নিঃশব্দ সুরেরা অদৃশ্য পরীর মত চাঁদের কিরণে খেলা করে বেড়ায়। সর্বাঙ্গের রোমকূপের রন্ধ্র দিয়ে তাদের গ্রহণ করতে হয়,—আর অনুভব করতে হয় দেহমনের অতল গভীরে ডুব দিয়ে। আপনা থেকেই সেই অতলে ধীরে ধীরে কে যেন ডুবিয়ে নিয়ে চলল তাঁকে। আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন সেটির উপরে। আর তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে বন্ধ কাঁচের জানালা ভেদ করে মধ্যরাত্রির পূর্ণ জ্যোৎস্না ঝিমঝিম করতে লাগল।

রাত প্রায় সাড়ে বারটা নাগাদ স্তিমিত চোখ মেলে মামাবাবু দেখলেন কুমারের দীর্ঘদেহ ঘাসে-ঢাকা ছোট উঠানের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকে এল।

একটু পরেই কুমারের ঘরে আলো জ্বলে উঠল, আর মামাবাবুর অবাক চোখের সামনে কৃষ্ণার ঘরের সেই নীল আলোটা খুট্ করে নিভে গেল।

পরদিন ব্রেকফাস্টে টেবিলে কুমারের দেখা মিলল বেশ কিছুক্ষণ পরে। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সবাই। চেহারা দেখে মনে হ'ল, একরাতে ওর শরীরের উপর দিয়ে যেন মস্ত ঝড় বয়ে গেছে—একটা হৃতপত্র গাছকে যেন ডালপালা ভেঙে মুচড়ে ফেলে রেখে গিয়েছে। হঠাৎ দেখে যেন চেনা যাচ্ছে না। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে রমলার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল।—আহা, ওদের জ্যাঠতুত-খুড়তুত সব মিলিয়ে শুধু মেজকাকার এই ছেলে। ওর নিজেরও আর ভাই নেই, ছোটকাকারও কোন ছেলে হয় নি, তাই ঠাকুমার কাছে বরাবর মেজকাকীর আদর ছিল বেশী। তাই নিয়ে মায়ের মনের ঈর্ষায় বেশ যে ওদের মনেও কখন কখনও টান ধরায় নি বলতে পারে না। তবু ওদের ভাই বলতে ওই একজনই আছে। তার উপর ছোট থেকেই সমবয়সী, কুমারের সঙ্গেই ওর সবচেয়ে ভাব আর সবচেয়ে আড়ি। আহা, এসে পর্য্যন্ত সেই ভাইয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখে নি, নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত ছিল শুধু। যেন তার দুঃখেই জগৎভরা। পৃথিবীতে আর কারও যেন মন বলে জিনিস নেই, তাতে আঘাত পড়ে কিনা একবার তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ নেই রমলার। আহা, এত বড় অসুখ থেকে উঠেছে। অবশ্য রমলা এসে অবধি তার

খাওয়া-দাওয়ার যত্ন করেছে, জোর করে টনিক আনিয়ে খাইয়ে তার চেহারা প্রায় ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু সে কেবল শারীরিক যত্ন। তাও বড় বেশী রাগ দেখিয়ে করা। স্নেহের প্রয়োজনেও রমলা তার দীপ্তভঙ্গিমাই প্রকাশ করে থাকে। মিষ্টি কথার বাজে খরচ করে না। স্বামীর উপরেও করতে পারে নি কোনদিন। অনুমতি চায়নি কোন বিষয়ে—এমনকি তার নিজের বিষয়েও না। কে কি খাবে, কি পরবে, কাকে কি দিতে হবে, কাকে কি বলতে হবে, কাকে কি করতে হবে, সব রমলার কথামত হবে। অবশ্য রমলার ব্যবস্থায় সবাই খুশীই থাকত, বিদ্রোহের কারণ বেশি ঘটত না। কারণ ওর ব্যবস্থায় সকলের দিকটাই দেখা হয়ে থাকত, তবু হয়ত মনের দিকটায় ঘাটতি পড়ত খানিকটা। এ নিয়ে অনেক ভেবেছে রমলা। স্বামীকে ও যা দিয়েছে, অথবা যদি ধরা যায়, স্বামীর সম্বন্ধে অনুভবে ওর কতটা ছিল ভালবাসা আর কতটাই বা গর্ব। মেয়েরা মনে করে তাদের অভিমানটা ভালবাসারই নামান্তর। কথাটা অবশ্য এক হিসাবে সত্য। অভিমানের মধ্যে খানিকটা ভালবাসা আছে—কিন্তু তার সবটাই প্রায় নিজের প্রতি। কাজেই অভিমানকে বলা যেতে পারে অহঙ্কারের নামান্তর, ভালবাসার নয়। তাই যে কোন সত্য অনুভূতির সামনে এসে মানুষ দেখতে পায়—অভিমানটা কতদূর মিথ্যা হয়ে সরে গেছে। সত্যিকার ভালবাসার কাছে সব জোর মিলিয়ে যায়, অভিমানের ফাঁকিটা ধরা পড়তে দেরী লাগে না। কিন্তু তেমন অনুভব মানুষের জীবনে যদি বা আসে ত ক'বার আসে—কতদিনের জন্তে? কত লোকই তো বেঁচে-বর্তে, সংসার করতে করতে মরে যায়। বিয়ে করে অনেক সন্তানের জন্ম দিয়েও, একবারও হয়ত জানতেই পারে না—সত্যিকার ভালবাসা কাকে বলে। কোন মানুষ কচিৎ কখনও হয়ত তার সন্ধান পায়। রমলা কি পেয়েছিল—রমলা কি জানে, হয়ত জানে—হয়ত নয়। কিন্তু এখন সে বিষয়ে ভাবতে চায় না ও। এখন শুধু ওর বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে—কুমারের ব্যথাকাতর মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। মনে হয় সবটাই ওর দোষ—কেন একটু তাকিয়ে দেখে নি এতদিন কুমারের দিকে, কেন বুঝতে পারে নি কোথায় ওর মনের কোণায় রসের ঘাটতি ঘটেছে। ওর এটা শরীর খারাপের চেহারা আদবেই নয়—মন খারাপের চাবুকের দাগ ওর রোদের মত উজ্জল মুখে খেজুরগাছের ছায়ার মত কেটে কেটে বসে গেছে। আহা, কেন এমন চেহারা হ'ল একদিনে? কি কোথায় ঘটল, জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় রমলার। কিন্তু বলার সময় শুধু বলে,—"তুমি চা খাবে না কফি, কুমার?"

কোনদিকে না চেয়ে কুমার বললে—"চা।"

তার পরে হঠাৎ রমলার হুকুমকে সরাসরি অগ্রাহ্য করল কুমার, কিছু সে খেল না—ডিম, বেকন্ অথবা মাছ। শুধু একটা টোস্টে মাখন লাগিয়ে বললে,—"এই যথেষ্ট আজ।"

রমলা ছোট করে বলল,—"কেন?"

তার উত্তরে কুমার অন্য দিকে তাকাল—অন্য কোন দিকে—কোন বিশেষ দিকেই নয়—কোন্ একটা অদ্ভুত শূন্যের দিকে তাকিয়ে ও রমলার প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। তার পরে হঠাৎ কৃষ্ণার দিকে ফিরে যেন শূন্যকে সম্বোধন করে বললে,—"আজ চারটের ট্রেনে ব্রিস্টলে যাচ্ছি।"

—"আজকেই?" বিস্মিত প্রশ্ন করল রমলা।

কৃষ্ণা অবাক হয়ে ভাবল—কুমার কাকে বলল ও কথা। —তাকে কি? বোধ হয় না—বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করেই হয় ত নয়। কিন্তু তার দিকে তবে বিশেষ করে চাইল কেন? এইত একটু আগে কুমারের চেহারা দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল। কুমারের ব্যবহার ওর মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছিল। কুমার ওর দিকে নজরই করে নি—একটা কথাও বলে নি। মনে হচ্ছিল যেন কৃষ্ণার অস্তিত্ব শুধু ওর মনের সামনে নয়, চোখের সামনেও নেই। তবে কি গতকালের সেই ক্ষণিক বন্ধুত্বের জন্তে ও অনুতপ্ত, এখন খারাপ ব্যবহার দিয়ে পুষিয়ে নিতে চাইছে তার দাম। কে জানে?

কিন্তু কি রকম যেন নার্ভাস লাগছিল এতক্ষণ কৃষ্ণার—হাতের তলাটা ঘেমে উঠছিল এই ঠাণ্ডায়। তবে হঠাৎ আবার কেন ওর দিকে তাকাল, ওর দিকেই বিশেষ করে। উত্তরে ওরও ত কিছু বলা উচিত—অন্তত একটু কিছু ভদ্রতার কথা। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না কৃষ্ণা, শুধু থতমত খেয়ে চুপ করে চেয়ে রইল—চোখে কথা ভরে এলেও মুখে ফুটল না। আজই কুমার চলে যাবে, এই খবর আর কুমারের সেই অন্যমনস্ক চাউনি এই দুটোর ভারে ও যেন হকচকিয়ে গেল। কি বলবে কি করবে ভেবে পেল না।

মামাবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন,—"বাস ড্রাইভাররা সব ষ্ট্রাইক করেছে লিভারপুলে।"

এতক্ষণে বলার মত কথা খুঁজে পেল কৃষ্ণা।—"কেন?" রমলা আর কুমার চুপ করে বসে রইল—বাস ষ্ট্রাইক নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মন ছিল না তখন ওদের।

মামা বললেন,—"কারণ গুরুতর কৃষ্ণারাণী। একজন ভারতীয় ড্রাইভার নিযুক্ত করেছিল কর্তৃপক্ষ। সাদা ড্রাইভারদের তাই মনে লেগেছে, মানে বেধেছে। কালো

ড্রাইভারদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলে তাদের জাত যাবে।"

—"সত্যি ?"—এতক্ষণে কুমার মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

—"দেখই না।" কুমারের দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন মামা। কাগজের দিকে মন দিল কুমার।

রমলা বললে,—"কে ভারতীয় ড্রাইভার হতে এদেশে এসেছিল ? এরা যায় আমাদের দেশে হাতে চাবুক নিয়ে বড়সাহেব হতে। আমরা আসি এখানে ড্রাইভার আর মিস্ত্রী হয়ে চাবুক খেতে। কেন আসি এখানে আমরা।" রমলার গলা ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

শান্তস্বরে মামা বলেন,—"আসি যখন কারণও নিশ্চয়ই আছে। আর সে কারণই কি একটা ?" মামা বলেন,—"না এসে লোকে করবেই বা কি ? ভেবে দেখ না—ঐ ছেলেটা বেশ সচ্ছল ঘরের ছেলে। ছেলেবেলায় নিজেদের গাড়ী ছিল, তাইতেই ড্রাইভারীতে হাত পাকিয়েছে। ম্যাট্রিক দিতে না দিতেই বাপ গেল মরে। হাতে যেটুকু যা ছিল তাই দিয়ে আই-এ পাস করে বোনের বিয়ে দিল। তার পরে টিউশনি করতে করতে বি-এ পাস করে ভেবেছিল কোথাও ঢুকতে পারবে। কিন্তু হায় রে বি-এ পাস—হায় রে ভারতবর্ষ ! দু'বছর ধরে যখন কিছুই হ'ল না তখন বেচারী শেষে এই ভেঞ্চার করলে। অনেক কষ্টে জাহাজে মিনিয়েলের কাজ জোগাড় করে চলে এল এখানে। ভেবেছিল এখানে 'ফুল এমপ্লয়মেণ্ট'। কাজ সব পাকা ফলের মত একেবারে নাগালের মধ্যে ঝুলছে, পেড়ে নিতে পারলেই হ'ল। অবশ্য এখানে যে বিদেশীদের জন্যেও কাজ পাওয়া যায়, সেকথা সত্যি।"

—"হোক সত্যি। কিন্তু ড্রাইভারী ছাড়া কি আর কাজ নেই ?"

কাগজ থেকে মুখ তুলে কুমার বললে,—"তা হোক না ড্রাইভার, ক্ষতি কি ? ড্রাইভারী করে, পোস্ট আপিসের পিয়ন হয়ে এমনকি ডকের কুলীগিরি করে যদি মাসে শ'-তিনেক টাকা রোজগার হয় ত মন্দ কি। দেশে থাকলে ত সাধারণ বি-এ পাসকে পঁচাত্তর টাকার জন্যে বসে থাকতে হ'ত। কাজের মধ্যে আমাদের মত এদের এত মান-অপমান নেই।"

—"না, নেই আবার।" গর্জ্জে উঠল রমলা।

—"শুধু কাজের জাত নয়, জন্মের জাত। দ্যাখো গে যাও কিঙ্গলে আর ক্যাম্বেল টাউন। আমরাই শুধু জাত বিচার করি, বাগ্দীপাড়ায় ঢুকিনে। এরাও ঠিক সেই কাজেই করে, শুধু আর একটু পালিশ করে রং মাখিয়ে করে। কিঙ্গলেতে যদি তুমি প্রাসাদও কর তবু লোকে তোমার দিকে নাক সিঁটকে তাকাবে। সোসাইটিতে উঠতে শুধু অর্থদণ্ডই হবে। তবু বাড়ীতে পার্টি জমবে না।"

—"সেটা সত্যি", মামা বললেন,—"শুনেছি পার্কলেনের ছোট ফ্ল্যাটের চেয়েও ওসব পাড়ার প্রাসাদেরও দাম কম।

—"তবে ? এর নাম জাতবিচার নয় ?"

কুমার চোখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকাল, রমলার দিকে ফিরে বললে,—"ঠিক বলেছিস। প্রথমটা ধরা যায় না বটে, কিন্তু জাতবিচার দেখছি সব দেশে সব জাতেই আছে। শুধু ধরা পড়েছি আমরাই।"

মামা বললেন,—"শুধু জাত নয়, কাজেরও বিচার এরা কিছু কম করে না, আপিসে যতই সমান সমান ব্যবহার করুক না, উপরআলাদের নেমন্তন্নে-আমন্ত্রণে কখনই এদের ডাক পড়ে না।"

—"কিন্তু মামা।" কুমার বললে,—"আপিস ও কলেজের ঐ সমান সমান ব্যবহার, ঐ নাম ধরে পরস্পরকে ডাকার সাম্য ঐটুকুতেই যথেষ্ট ভাল লাগে। দেশে ত এটুকু পাবারও যো নেই। এক গ্রেড উপরে উঠলেই তার ব্যবহারে অধস্তনের সঙ্গে দশ গ্রেড তফাৎ হয়ে যায়। সেই জন্যেই এখানে এসে এদের উপরআলাদের সঙ্গে বন্ধুর মত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখেই প্রথমে মন গলে যায়। দেখে মনে হয় dignity of labour কথাটার মানে এরা সত্যিই জানে।"

—"তা খানিকটা জানে নিশ্চয়। অন্ততঃ আমাদের চেয়ে বেশী, তবু সবটা জানে না।" মামার কথা কেড়ে নিয়ে রমলা বলে,—"কিন্তু আমাদের দেশে গিয়ে কাজের এত ভাগ ওরাই বাড়িয়েছে। ওদের বেয়ারা, বাবুর্চি কেউ কারও কাজ ছোঁবে না। মেঝেয় দু'ফোঁটা জল পড়লে মুছে নিতে জমাদারকে ডাকবে। আমাদের ছত্রিশ জাতের পরে আরও ছত্রিশ এরা যোগ দিয়েছে।

—"অথচ", কুমার বলে,—"নিজের দেশে এরা সবাই ত সব কাজ করে। জুতো সাফ থেকে চণ্ডীপাঠ। এই ত এই বাড়ীতেই দেখ না। এত বড় বাড়ী, অথচ সব ঐ বুড়ী একলা ম্যানেজ করে। তার উপরে রান্না। ছেলেরাও তাই, ঐ মার্কাসকেই দেখ না। শুনেছি বড়লোকের ছেলে, বাড়ীতে ঝি-চাকর আছে, কিন্তু দেখ সব কাজই ওর জানা। কারও জন্যেই ওকে অপেক্ষা করতে হয় না।"

মামা বললেন,—"খুব ঠিক বলেছিস, নিজেদের জন্যে জীবনের একটা নির্দিষ্ট পথ ওরা বেছে নিতে জানে, দ্বিধা করে না অকারণ। নিজেদের জন্যে কোন কাজকেই এরা তুচ্ছ করে না।"

—"কিন্তু আমাদের দেশে যখন ওরা গেছে, তখন এই জিনিসটি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। ওদের অর্থনীতি,

সমাজনীতি, অর্থনীতি সাজসজ্জা, ওদের ক্লাব, পার্টি, খেলাধূলা সবই নিয়ে গেছে, কিন্তু চরিত্রের যে শিক্ষার গুণে, ইংরেজ ইংরেজ—সেই শিক্ষাটা সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে।"

—"ভুলে যায় নি, ইচ্ছে করে ফেলে গেছে", রমলার গলায় অসহিষ্ণু অধীরতা, "সেখানে ওরা গেছে শুধু বড়লোকী করতে আর চাল দেখাতে, ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে তাক লাগিয়ে দিতে, আর সেই দীপ্তির রসদ সংগ্রহ করতে। আমাদের দারিদ্র্যের মূল্য দিয়েই কেনা হয়েছে লণ্ডন শহরের এই যত ঝকমকানি, বিলাসবৈভব। এই যে রাস্তায় মাটি পাথরের বদলে কাঠের পাটাতন। এই যে সুড়ঙ্গপথের রাজপুরী, এ সবের গোড়ায় সেই অযোধ্যার বেগমদের অলঙ্কার আর দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের মুখের গ্রাস এখনও লেগে আছে।"

—"হয়ত ভালই হয়েছে", এতক্ষণে মামা হাসলেন, রমলার অধীর উত্তেজনাকে হয়ত হাসি দিয়ে একটু নরম করে আনতে চাইলেন,—"হয়ত ভালই হয়েছে অযোধ্যার বেগমদের লোহার সিন্দুকে বন্ধ না থেকে আর অযোধ্যার নবাবদের কামনার ইন্ধন না জুটিয়ে সে টাকা যদি মানুষের জ্ঞানের পরীক্ষায় খাটান হয়ে থাকে, তা সে যে কোন দেশের মানুষই হোক না, একটা জাতকে, তা সে যে জাতই হোক, সুখের পথে, সমৃদ্ধির পথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে থাকে তবে এমন কি ক্ষতি হয়েছে। বাকী রইল ভারতবর্ষের দুঃখী প্রজারা, তারা আর ক'টা দিন বেশী বেঁচেই বা করত কি—তারা ত মরতেই এসেছে। চিরকাল মরেই এসেছে, হয় মহামারীতে, নয় বন্যায়, নয় দুর্ভিক্ষে। সেবারে না হয় দুর্ভিক্ষের মাত্রা একটু বেশী হয়েছিল। পরিধি একটু ব্যাপক হয়েছিল এই মাত্র।"

—"ঠিক বলেছ মামা, এরা সত্যিই একথা মনে মনে বিশ্বাস করে। যেহেতু ভারতবর্ষ শান্ত নির্বিরোধী, আর সেকেলে। যেহেতু সে আধুনিক বিজ্ঞানের লোহার সিন্দুকের চাবিটা হাতে পায় নি, তাই তাদের নিজের দেশে তাদের অধিকার নেই। আর তাদের ধন পরের ভোগের জন্যেই সঞ্চিত রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যঙ্গ-কৌতুকের ডেঁয়ে পিঁপড়ের যুক্তি আর কি। যেহেতু পিঁপড়েরা নেহাৎই পিঁপড়ে, তাই তাদের ধনে রাজবংশী ডেঁয়েদের নিত্য অধিকার।"

—"অত উত্তেজিত হোস নে রে", মামাবাবু শান্ত গলায় বল্লেন,—

কার ধন কে নেয়?

"একে একে পাখী যায়, গানের পসরা

তবুও না হয় শূন্য।"

"তাই বসুমতী নিত্য আছে বসুন্ধরা।" সমস্ত জিনিসটাকে যদি আর একটু বড় পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারতিস তা হলে—"

—"রাখ রাখ মামা, তোমাদের বড় বড় কথা আর বড় বড় দর্শন। ঐ করেই দেশটা বারবার মার খেয়ে এসেছে। বড় কথা আর বড় প্রেক্ষণা, তা হলে ছোট কথাগুলো যাবে কোথায়? জীবনের প্রতি মুহূর্তের এই সব ছোট ছোট কথা। এই অতি তুচ্ছ খাওয়া, পরা আর তার জোগাড় করা, এরই মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে মানব-বংশধারা। এই গুলোই জীবনের ভিত্তি—তাই মনুষ্যত্বেরও প্রতিষ্ঠা—এদের তুচ্ছ করে—"

—"আরে তুচ্ছ করতে কে বলেছে। আমি শুধু বলছি, ছোট কথাকে বড় কথা দিয়ে মুড়ে নিতে হবে।"

—"এ তুমি কি বলছ? বড় কথার ঢাকা দিয়ে ছোট কথার মূল সত্যকে আচ্ছন্ন করতে হবে কেন? তবে কেন সেই ঋষি প্রার্থনা করেছেন—'তত্ত্বং পূষণ অপাবৃণু'। হে পূষণ, সোনার পাত্রের ঢাকনা সরাও দেখাও সত্যের সত্যরূপ। যত বড়ই কথা হোক, যত ব্যাপকই তার প্রভাব হোক, তা যদি সত্যকে আচ্ছন্ন করে তবে তা বর্জনীয়।"

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ হ'ল আস্তে আস্তে উঠে নিঃশব্দে টেবিল পরিষ্কার করছিল। একথা শুনে হাতের কাজ ফেলে একটা চেয়ারের পিছনে এসে ভর দিয়ে দাঁড়াল। কুমার এতক্ষণ খবরের কাগজ আড়াল করে ওদের বিতর্ক শুনছিল। এইবারে সোজাসুজি রমলার প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকাল।

মামাবাবু কথা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। রমলা যদি আরও কথা বলতে চায় বলুক না, বাধা দিলে তার সৌন্দর্য ব্যাহত হবে। রমলার সত্তায় প্রকাশসত্তার প্রশ্রয় আছে। এতদিন শোকের বাষ্প ঘন কুয়াশার মত তাকে চেপে রেখেছিল। আজ যদি কিছু তার ছিঁড়ে খুঁড়ে বেরিয়ে পড়তে চায় ত পড়ুক না।

রমলা বললে,—"ছোট কথাকে, বড় কথার মালা পরিয়ে কেন সাজাতে চাইছ? ছোট যে সে ছোট বলেই সুন্দর, তার অস্তিত্বের সত্যে সে স্বতঃই উদ্ভাসিত। বড় কথা দিয়ে তার মহিমা বাড়াতে গিয়ে তোমরা চিরকাল তাকে খর্বই করে এসেছ। সোনার পাত দিয়ে মুড়লেও পাথর, সোনার পাতে মোড়া পাথরই থাকবে। পেটের মধ্যে ক্ষিধেটাও তেমনি সত্যি। তাকে যে নামেই ডাকনা কেন। সেই অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক প্রয়োজনটার উপরেই এই বিশ্বসংসার দুলছে। তাকে কিছু নয় বলে অস্বীকার করলেই ত আর সে সত্যি উড়ে যাবে না।"

—"সে কথা এত চট করে বলা যায় না।" এতক্ষণে কথা বলেন মামা,—কিন্তু কে বলেছে যে, আমাদের শাস্ত্র

তাকে অস্বীকার করতে চাইছে? জানিস, উপনিষদ বলেছেন, 'অল্পং ন নিন্দ্যাৎ তদ্‌ব্রতম্‌'।"

—"উপনিষদের কথা ছাড় মামা, ওগুলো যত প্রাচীন কালেরই রচনা হোক না কেন, মতামতের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতম বইকেও হার মানায়। জীবনে মানুষের পূর্ণভাবে বাঁচবার অধিকারকে বারবার সগৌরবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সে শিক্ষা ত পুঁথির পাতায়, ঠাকুর ঘরের তাকের উপরে তুলে রেখে দিয়েছ। আর যা নিয়ে ব্যবহার চলছে, সে ত জীবনকে এড়িয়ে যাবার শিক্ষা। চোখ বুজে সত্যকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। তাই আজ আমাদের জীবন এত মিথ্যা, এত ব্যর্থ। আশ্চর্য মামা, আমি কেবল ভাবি আমাদের দেশে এত সব মহাত্মা জন্মেছেন, এত মহৎ, এত প্রকাণ্ড কথা তাঁরা বলে গেছেন তবু আজও কেন আমরা ছোট কথার মহত্বকে স্বীকার করতে পারলাম না। প্রাণের সহজ-স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে তুচ্ছ বলে নিন্দা করে বড় বড় দর্শনের ফাঁকা কথা দিয়ে জীবনের মস্ত ফাঁকটাকে ভরাট করতে চাইছি। তাতে শূন্য ভরছে না, শুধু বাড়ছে অহঙ্কার। আমরা ভারী দার্শনিক, ভারী আধ্যাত্মিক জাত—এই অহঙ্কার। এদিকে দর্শনের ঠেলায় যে ভিকিরী হতে হ'ল, আমাদের বাড়াভাত যে বারবার পাঁচজনে এসে লুটেপুটে খেয়ে নিল, তখন চেয়ে দেখলাম না। শুধু শূন্য চোখ শূন্যে তুলে বললাম, যেতে দাও, ভূমৈব সুখম্‌, নাল্পে সুখমস্তি; কিন্তু সেই অল্প ত আমাদের ছাড়ে না। পেটের মধ্যে নাড়ীর পাকে পাকে জ্বালা ধরিয়ে সে যখন তার প্রাপ্য আদায় করতে ছোটে—তখন ত আর দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞান থাকে না, পাপপুণ্যের বিচার থাকে না, তখন ত যে কোন হীনতাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা থাকে না। বড় হতে গিয়ে ছোট হয়ে যাই।" ক্রমশঃ

আকাশের প্রতি

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

ধূসর ধূমল কভু পাটল পাণ্ডুর স্তব্ধ নীলাক্ত ব্যঞ্জনে
দেখেছি তোমারে ওগো, উষার অলক্ত-আঁকা পদাঙ্ক-রেখায়
নিবিড় প্রশান্তিভরা যেন কোন্ প্রেমিকের মুগ্ধ শিহরণে,
অজস্র মুক্তার-বিম্বে-ভেসে-ওঠা দিব্য ছবি নির্মোহ-লেখায়।

দেখেছি মধ্যাহ্নে পুনঃ তাম্র-তপ্ত বিশুষ্কের নগ্ন মহিমায়,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষুর বিশীর্ণ কঙ্কাল-ত্যক্ত আত্মার নির্বেদে,
যা' হ'তে অঞ্জলি ভরি', বুভুক্ষু হে, কর পান উন্মাদ হিংসায়
মিটাতে অনন্ত জ্বালা শোষণের ছায়া-নৃত্যে রুদ্রের-সংবেদে।

সন্ধ্যায় সে এক রূপ।—অবসাদ অভিগ্রস্ত বিহ্বল চেতনা—
প্রত্যূষ-প্রেয়সী তব বিদায়-হিন্দোলে দোলে, দিনান্ত চিতায়,
—আসন্ন এ বিচ্ছেদের পটভূমে পুঞ্জিত কী রক্তের যন্ত্রণা
দিয়েছে যে স্বপ্ন-রূপ স্বাদ-সুখ চিরন্তনী শৃঙ্গার-শিখায়।

আঁধার নিশীথে তব ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির হিমাদ্রি আসন,
নিশ্চল নিরুদ্ধ নিত্য গম্ভীর গহন গূঢ় আশ্চর্য্য প্রকাশ—
দেখেছি বিস্ময় চোখে গ্রহ-তারা-জ্যোতিষ্কের প্রবাহ-শাসন
নির্ব্বিশঙ্ক দুঃখে লীন তোমার বিরাট বক্ষে, হে মুক্ত আকাশ।

তোমার ঐশ্বর্য্য হ'তে দাও মোরে সমুদার তৃপ্তির পরশ,
কভু বা বিতৃষ্ণা জ্বালা, অনির্ব্বাণ পিয়াসের পীড়ন দুঃশীল—
বিচ্ছেদ-ব্যথায়-বেঁধা রিক্ত মনে দাও মন্ত্র কল্মষ-হরষ
সমাহিত, সর্ব্বজয়—ব্যাপ্তির বিথারে তব, ওগো মৃত্যু-নীল।

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়
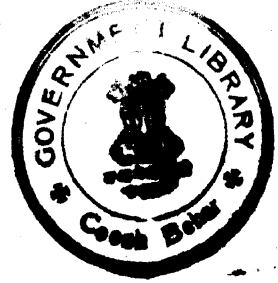
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সুরু হ'ল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্য লগ্ন থেকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্য দিয়েই এর প্রস্তুতি। এটা পুরোমাত্রায় গদ্যেরই যুগ বলে ধরে নিতে পারি।

সব দেশেই সাময়িক পত্র-পত্রিকাই সাহিত্য প্রচারের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করে থাকে। আমাদের বাংলা দেশেও সাময়িক পত্রিকাগুলিই সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তারে সর্ব্বাধিক সহায়তা করেছে। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের যোগাযোগ যতই ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, ততই পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও সমাজ-সচেতনতা আমাদের বাঙালী তরুণ সাহিত্যিকদের মনন-লোকে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ ও বৈদেশিক আবহাওয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত উদারপন্থী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারকেই বাংলার আর্থিক ও সাহিত্যিক রেনেসাঁসের এক বরেণ্য অগ্রদূত বলে জাতি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃতি জানিয়েছে। আবার এ-ঠাকুর পরিবারের মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথই বাংলার নব-সারস্বত যুগের স্রষ্টা। পূর্ব্বেই বলেছি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাতঃস্মরণীয় গুপ্তকবির ন্যায় রবীন্দ্রনাথও রেনেসাঁস উত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের 'ভগ্নদূত' ও আধুনিক যুগের 'অগ্রদূত'। জাতির পরম সৌভাগ্যের বলে স্বল্পায়ু বাঙালীর ঘরে তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জীবন লাভ করে কিঞ্চিদূন সত্তর বৎসর কাল বাংলা ভাষাকে সর্ব্বশক্তি দিয়ে সেবা করে সর্ব্বভাবে পুষ্ট করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে এই কালজয়ী মহারথ পদ্য-গদ্য নির্ব্বিশেষে ভাষাকে নিপুণ দক্ষতায় পরিচর্য্যা করেছেন। সে সব কথা এ সীমিত পরিবেশে আজ আমাদের আলোচ্য নয়। বাংলা সাহিত্যে নব-ধারার ভগীরথ হিসাবে তাঁর বিপুল অবদানের সূত্র ধরেই আমরা এখন বাংলা ভাষার আধুনিক নবায়নের প্রবৃত্তি বিচার করব।

গদ্যে বঙ্কিমী-রীতির ও পদ্যে বিহারীলালের প্রবর্ত্তনীর বাহকত্বের উত্তরাধিকারত্ব বঙ্গ-ভারতী রবীন্দ্রনাথকেই দান করেছিলেন—এ কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। বলা বাহুল্য, ভারতীর এই ক্ষণজন্মা পুত্র স্বকীয় প্রতিভার সপ্তশিখার নির্দ্দেশে পরবর্ত্তীদের সাহিত্য সেবার আদর্শ দেখিয়েছেন। নামাকরণের সহজলভ্য রীতিতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে 'কবিগুরু' বলেই Nom-de-plume দিয়েছি। তাঁর সপ্তর্ষির ভেদ অতিক্রম করলে আমরা দেখতে পাই তিনি সর্ব্বান্তঃকরণেই মানবতার শিল্পী। সার্থক শিল্পীর প্রেরণা নিত্য-নূতনের উপাসনা, ও উপাস্য তত্ত্বে তন্ময় হয়ে যাওয়া। তাঁর বিরাট জীবন-দর্শন সত্য-শিব-সুন্দরের মধ্য দিয়ে জীবন-কলার অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণতার সাফল্য অর্জ্জন করেছে। তাই আমরা দেখতে পাই, নৃত্য-গীত-অঙ্কন কাব্য-সাহিত্যের ন্যায় ভাষাকেও তিনি অন্তরের শিল্পী-সত্তা দিয়েই বরাবর অনুভব করেছেন। ভাষার অভিব্যক্তিকে তিনি গীতধর্ম্মী বাচনিক বাহকতা বলেই গ্রহণ করেছিলেন। শিল্পী মন দিয়ে তিনি যা-কিছু শিখেছেন, দেখেছেন—শিল্পীর অন্তর দিয়েই সে সব তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবায়িত করেছেন সর্ব্বত্র—আচারে, নিষ্ঠায় অনুশীলনে ও অনুশাসনে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম-সাহিত্য সমাজাদর্শ নির্ব্বিশেষে সব-কিছুর সৌন্দর্য্য নিঙড়ান সুষমার সমন্বয় করেই তিনি সামগ্রিক ভাবে কলাতত্ত্ব বিচার করেছেন। আবার বোধি ও হৃদয়ের যুক্ত অনুমোদন নিয়েই তিনি তা জাতীয় জীবনেও রূপায়িত করেছেন।

নিতান্ত শিশুসুলভ বৈচিত্র্য-পিপাসাই কবিগুরুর শিল্পচর্য্যার মৌলিক প্রেরণার মর্ম্মকথা। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, সাধক যেমন ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে স্বীয় শাসনে রেখে জগৎকে ভাগবত উপচারে ভোগ করেন, কবিগুরুও ঠিক তেমনি যৌবনেই সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে, বঙ্গ-ভারতীর অমোঘ বর লাভ করে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, সত্য-শিব-সুন্দরকে বিচিত্র রসে ও দর্শনে ভোগ করলেন। পরে আত্মবিস্মৃত জাতিকেও সে ভূমা তৃপ্তির রস আস্বাদন করিয়ে দিলেন। কাব্যেই তাঁর সাহিত্যের হাতে-খড়ি, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল বিচিত্র মানস-অভিযান। তাই দেখি, তিন শতকের বিস্মৃত-প্রায় পদাবলীর নবতর আঙ্গিক তিনি সৃষ্টি করলেন ভানুসিংহের বেনামীতে কৈশোরের প্রান্ত অতিক্রম না করতেই। বঙ্গ-'ভারতী'র বিদগ্ধ আসর এ মৌলধর্ম্মী অনুকরণে পরে নির্ব্বাক বিস্ময়ে কিশোর কবির অপরিমেয় সম্ভাবনার কথা চিন্তা করছিলেন। কাব্যসাধনার গুরুদত্ত বীজমন্ত্র হজম করে তিনি নিজের প্রভাব মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে সমর্থ হলেন প্রথম যৌবনে। কাব্য-সাহিত্যে ছন্দ ও বাকভঙ্গির অসংখ্য রীতি ও কৌশল প্রবর্ত্তন করে বাংলা কাব্যের নব যুগ সৃষ্টি করলেন মাইকেলের পরেই। বাংলা কাব্যের সীমিত অঙ্গন ছাড়িয়েও তাঁর কাব্যরীতির বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি বিশ্বসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই স্বীকৃত হয়েছে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনায়।

গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অপরিসীম। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গ-কৌতুক, চিঠিপত্র, চরিত্র-চিত্রণ, সমালোচনা, নাটক, প্রবন্ধ,

লিপিলিপি, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি রচনায় তিনি যে মৌলিক শৈলী (style) প্রবর্তন করেছিলেন বাংলা গদ্য সাহিত্যে, আজ পর্যন্ত বাঙালী সে সবের চর্বিত-চর্বণই করেছেন মাত্র। এ ছাড়া, তাঁর গীতধর্মী মননশীলতা সঙ্গীতের মান ও আবেদন নূতন করে মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মনের সন্ধান আমরা এ গীতি-কবিতাগুলি থেকেই আবিষ্কার করতে পারি। শিল্পচেতনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর নিজস্ব সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিধিতে তিনি যা-কিছু সংস্কার করেছেন তার সবটাই যে অত্যাবশ্যক বোধেই তিনি করেছেন—তা মনে করতে পারি না। কিছুটা সংস্কার করেছেন যুগের প্রয়োজনের দাবীতে, কিছুটা বা করেছেন নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছলে, আবার সময় বিশেষে কিছুটা করেছেন শুধুমাত্র নবায়নের প্রতিযোগিতায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই তাঁর অসামান্য প্রতিভা, ব্যক্তিগত জীবনের আন্তর্জাতিক ব্যাপক অভিজ্ঞতা—সর্বোপরি সংস্কারমুক্ত হৃদয়-বৃত্তি যুগপৎ সমন্বয়-প্রয়াসী হয়ে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত করেছিল।

আলোচ্য বাংলা ভাষার আধুনিককালের গতিনির্ণয়ের সমীক্ষায় বসে আমরা কবিগুরুর এ শিল্পী-মনের পরিচয়ে বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পারি। শিল্পবোধের চরমকথা আত্মরতি—আত্মাকে নন্দিত করাই এর ধর্ম। আত্মসমীক্ষা ও সৌন্দর্য্যবোধ শিল্পী-মনের সহজাত বৈশিষ্ট্য। সে মৌলিক বিচারে জগতের সকল শিল্পীই মানস-ভূমে একটা সমসূত্রের স্তরে বিরাজ করেন। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয় শিল্পীর মনোবিশ্লেষণে, শিল্পী-মনের এ সর্বসামান্য দিক ছাড়াও মানস-গঠনের অপরূপের বৃত্তির তারতম্যেই শিল্পসৃষ্টির কার্য্যকারিতা ও আবেদনের তারতম্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র শিল্পীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান, দার্শনিক ও স্বয়ংসিদ্ধ সাধকও, এ সব-কিছুর বিশেষণের সমবায়েই আমরা পেয়েছি আমাদের কবিগুরুকে। এ সব শক্তিধর মহাপুরুষগণ খেলায় যা কিছু সৃষ্টি করেন তাও বহুকাল স্থায়িত্ব অর্জন করতে সক্ষম, এ শ্রেণীর মনস্বিগণ যুগের সীমিত আবেষ্টন অতিক্রম করেও অনাগত ভবিষ্যতের সুদূর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করতে বিনা ক্লেশেই সমর্থ। কিন্তু সমসাময়িক জনসাধারণ সীমিত দৃষ্টিশক্তি ও সংস্কারাচ্ছন্ন জরাগ্রস্ত মন দিয়েই সব-কিছু পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার-বিবেচনা করে থাকেন।

সব দেশের ইতিহাসেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সংস্কারমুক্ত অগ্রগামী দিশারীবৃন্দ জাতির কটুক্তি ও লাঞ্ছনাই পুরস্কার পেয়েছেন। আমাদের দেশেও তার কিছু ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্য প্রচেষ্টার 'ভট্টাচার্য্যের চানা' ও 'শব-পোড়া মড়া দাহের' পরম্পর কণ্ডুতির পরও রামগতি ন্যায়রত্ন বঙ্কিমী-গদ্যরীতিকে হুতোমের স্বগোত্রীয় বলে ব্যাখ্যা করলেন বিদ্রূপের তূর্য্যনিনাদে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙালীর যুগ-জাগরণে মুসলমান রাজত্বের কাল থেকেই বহু বিষয়েই পুরোধা ছিলেন বলে 'পিরলী' (পীর-আলী) আখ্যায় সমাজচ্যুত অনেক আগেই হয়েছিলেন। তার পর ইংরেজ রাজত্বে 'কালাপানী' পার হয়ে দ্বারকানাথ নাকি গোটা বাঙালী জাতিটাকেই বিধর্মী করেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক চাল-চলনে অত্যন্ত প্রগতিশীল ঠাকুরগোষ্ঠী ক্রমেই সাধারণ জনমন থেকে সরে রইলেন বহুদিন পর্য্যন্ত। তাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সাহিত্যচর্চ্চার অভিনবত্ব অনভ্যস্ত সাধারণ বাঙালী সমাজ সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত কালের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যে সব গদ্য-পদ্য সৃষ্টি হতে থাকে ঠাকুরগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে সাধনা-ভারতী জ্ঞানাঙ্কুর-প্রতিবিম্ব-বঙ্গদর্শন-(নবপর্য্যায়) বালক প্রভৃতির মাধ্যমে, তাতে তৎকালীন বহু কৃতবিদ্য বাঙালীই প্রচুর ব্যঙ্গোক্তি ও বিরোধিতা করেছেন। এটা অতি সত্যি কথা ঠাকুরগোষ্ঠীর তৎকালীন সাহিত্য-কৃতি ও বৈদেশিক প্রবর্ত্তনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে সাধারণ শিক্ষিতদের মানসিক স্তরের নাগালের বাইরেই ছিল। এমনকি, উচ্চ-শিক্ষিতেরাও ঠাকুরগোষ্ঠীর এ নবায়নের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাই দেখি, স্বয়ং ডি. এল. রায়, বিপিন পাল, নলিনী গুপ্ত, সুরেশ সমাজপতি, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, ফণীন্দ্র পাল প্রমুখ মধ্যমপন্থী প্রগতিশীলের দলও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভাবকল্পের দুর্বোধ্যতা ও রচনারীতির অভিনবত্ব কটাক্ষ করে বহু বাকবিতণ্ডা ও সাহিত্যিক কণ্ডুয়ন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মোহিতলালের 'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা' বিষয়ক রচনা থেকে একটু উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি—

"মাইকেলের কাব্যের শব্দ-দুরূহতা যতটা না বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অনভ্যস্ত ভঙ্গি তদপেক্ষা অধিক বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এক সমসাময়িক কবি একদা ব্যঙ্গ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন—

ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাষা, ইংরাজীতে ভাজা
ড্যাফোডিল পুষ্পে যেন মনসার পূজা।

তা সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে।…"

স্বর্গতঃ মোহিতলাল অবশ্য তাঁর উপরোক্ত 'ভঙ্গি' বোঝাতে মুখ্যতঃ রাবীন্দ্রিক গদ্য-শৈলীর কথাই মনে রেখে ঐ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু আমরা জানি, সে 'সমসাময়িক কবি' কিন্তু রাবীন্দ্রিক গদ্য-পদ্য উভয় রীতিকেই আক্রমণ করে ঐ ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন।

আজ উত্তর-পুরুষ আমরা, আমাদের প্রাচীনপন্থী অভিভাবকদের তৎকালীন ক্ষোভের কারণটা উপলব্ধি করতে পারি। তাঁদের রোষ যতটা না অসূয়াপ্রসূত, তার চেয়েও বেশি অভিমানসঞ্জাত। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল বিশুদ্ধ সাধু রীতিতে, প্রাচীন ব্যাকরণের নৈষ্ঠিক অনুসরণে যিনি বাংলা ভাষার মান ও বিস্তৃতি একটা বাড়িয়েছেন, শেষে কিনা তিনি নিজেই রাতারাতি ভাষার একটা চমকপ্রদ নবায়ন করবেন, এটা সকলেরই কল্পনার বাইরে ছিল। তাই দেখি রক্ষণপন্থীরা ত বটেই, এমনকি মধ্যমপন্থীরাও তা বরদাস্ত করতে পারলেন না। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত

সদ্যোজাত 'ডন সোসাইটি'র যথেষ্ট সংস্কারধর্মী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও—তাঁরাও রাবীন্দ্রিক রীতি পছন্দ করলেন না। প্রতিবাদকারীরা অনেকেই বলাবলি করলেন—এ দেখছি সবুজগোষ্ঠীরও বাড়া। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের ভাষাও সাহিত্য কৃতির নিদর্শন বলে স্বীকৃত হতে দেখে তাঁরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। চলিত রূপে তাঁদের যতটা না আপত্তি ছিল—তার চেয়েও বেশী ক্ষোভ ছিল গদ্যরূপে চিরাচরিত পদ-যোজনার (syntax)-এর অঙ্গহানি দেখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের চলিত গদ্য-রীতিতে দুরধের (দুরূহ নয়) যে শিল্প-চাতুর্য্য দেখিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সুরুতেই, তা প্রথমাবস্থায় তাঁর গীতিমুখর কাব্য প্রতিভার বহির্দ্যোতনা বলেই কেউ কেউ মেনেও নিয়েছিলেন নির্বিবাদে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তখন বাংলা দেশের জন-মানসে একেবারে অজ্ঞাত না হলেও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। শান্তিনিকেতনের শান্তসমাহিত আবেষ্টনেই তার অনুশীলন ও আবেদন সীমাবদ্ধ। তাই গোড়ার দিকে, আধুনিক চলিত রীতির গদ্যায়নে কবির প্রয়াসকে শিল্পী-মনের সাময়িক খেয়াল-খুসি মনে করেই তখন বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই কিঞ্চিৎ কৌতুকও বোধ করে থাকবেন। তাঁরা ভেবেছিলেন রসগ্রাহী শিল্পী-মনের বৈচিত্র্যপিয়াসী আকুতি তাঁর লীলা পরিবারদের মধ্যেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত নৃত্যকলাদির মতন সীমিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু তাঁদের ভুল ভাঙতে বেশি দেরি হ'ল না। গোল বাধল রবীন্দ্রানুসারী গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। সবুজগোষ্ঠীই এ আক্রোশে ইন্ধন জোগালেন। রবি প্রদক্ষিণকারী বলে পরিচয় দিয়ে তাঁরাও যখন কবির অনুকরণ করতে সচেষ্ট হলেন অতি-কৃতির উন্মাদনায়, তখন উপরোক্ত সাহিত্য 'সমাজপতি'গণ আর নীরব থাকতে পারলেন না। এ যে সাহিত্য আর ভাষার প্রশ্ন। বিশেষ করে কথা-সাহিত্য ত আর সঙ্গীতের বা নৃত্যকলার বিশেষ ঘরানায় সীমায়িত হয়ে থাকতে পারে না। অচিরে হস্তক্ষেপ না করলে যে শেষে এ দুষ্টরীতি জাতির সাহিত্যের ক্ষেত্রে তথা জাতির মানসমূলেই বিপর্য্যয়ের আঘাত হানবে অচির ভবিষ্যতে। তাই চেতনাশীল (?) 'সমাজপতিরা' বাংলা ভাষার অঙ্গ-বৈকল্যের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে কবির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

কিন্তু তার পূর্ব্বে সবুজগোষ্ঠীর চর্চ্চায় না আসলে ঐ প্রসঙ্গ সঙ্গতিবিহীন হয়ে পড়বে। বাংলা ভাষার আধুনিক চলিতরূপ ও বাকসংযমের পদ্ধতিতে লিখনরীতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন প্রমথ চৌধুরী ও সবুজগোষ্ঠী। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগ থেকেই মাসিক সবুজ পত্রের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা সুরু হয়। স্বয়ং কবিগুরুর অনুপ্রেরণায় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী এ সাহিত্যপত্র ও সবুজগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। বিগত শতাব্দীর চলিত রূপের গদ্যায়নের সাহিত্যিক-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে এঁরা বুঝতে পারলেন যে, বিচ্ছিন্ন ভাবে দু'দশখানা বই চলিত রূপের আদর্শ দেখিয়ে বাজারে ছাড়লেই কথ্যভাষার গদ্যায়ন সম্ভব হবে না। বিগত শতকের ন্যায় বর্ত্তমান শতকেও সাহিত্যপত্রগুলিরই এ গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে ভাষার সংস্কার সাধনে। তাই সর্ব্বাগ্রে চাই প্রথম শ্রেণীর প্রচারধর্মী সাহিত্যপত্র। তাই কবিগুরু স্বয়ং সবুজপত্রের প্রস্তাব করেন।

তা ছাড়া গত শতাব্দীর চলিত ভাষার সাহিত্যিক রূপায়ণের ব্যর্থতার আসল কারণটিও এ নবীন শিল্পীরা খুঁজে বের করলেন। এঁরা বুঝতে পারলেন যে, শুধু কথ্য-ভাষা সাহিত্যে হুবহু প্রয়োগ করলেই বাঞ্ছিত অভিব্যক্তির যথাযথ আত্মস্ফূর্তি হয় না। এতে ভাষার প্রবহমানতা ও ধ্বনি-সামঞ্জস্য (cadence) পরম্পরের পরিপূরকতা করতে সমর্থ হয় না। ছন্দ, মাধুর্য্য ও ওজঃ গুণাবলীর সমাবেশ না হলে ভাষা কোনও কালেই হৃদয়ের বার্ত্তা হৃদয়ে পৌঁছিয়ে দিতে সমর্থ হবে না। তাঁরা এটাও বুঝলেন, হুবহু কথ্যভাষার মনের ভাবই প্রকাশ করা যায়—তাকে স্থায়িত্ব দিয়ে হৃদয়কন্দরে প্রসারিত করে পরম্পর সংক্রামিত করা যায় না। কথ্যভাষার ব্যঞ্জনা অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ এবং শব্দসম্ভারও খুবই অপ্রচুর। তা ছাড়া, স্বরবৈচিত্র্য ও ধ্বনিব্যঞ্জনা দেশজ শব্দের খুবই কম। তাই কোনও কথ্য-রূপের সাহিত্যিক বাহকতায় উপযুক্ততা অর্জন করতে হলে তার সম্বন্ধে অনেক-কিছু বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। চলিত রূপের এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমথ চৌধুরীর অধ্যবসায় ও ত্যাগ বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে বাঙালী স্মরণ করবে। তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায়ই তৎকালীন প্রচলিত কলিকাতা সন্নিহিত অঞ্চলের কথ্য-ভাষার সংস্কার করে বাংলার চলিত রূপের একটা দৃঢ় লেখ্যকাঠামো বাঙালী সাহিত্যিকদের চোখের সামনে দাঁড় করালেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ব্যাখ্যানুযায়ী অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলা ভাষার চলিত শব্দসম্ভার ও ক্রিয়াপদসমূহে বীর ও বীভৎস রসের সৃষ্টি করা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। নাটকীয় আবেদনে ছন্দ, ধ্বনি, তাল প্রভৃতির সুসংবদ্ধ প্রয়োগে বাঙনিষ্পত্তির যথেষ্ট সুযোগ থাকায় সে সব ক্ষেত্রে হুবহু কথ্য-রীতিতে তা কতকটা সম্ভব হলেও উচ্ছ্বাসবর্জ্জিত কথ্য বা চলিত রূপে শুধু মাত্র দেশজ শব্দ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে সেটা কখনই সম্ভব নয়। তাই প্রমথ চৌধুরী চলিত গদ্য রূপের সাহিত্যিক মর্য্যাদা সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখলেন, সংস্কৃত শব্দের ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য কথ্য রীতির ফাঁকে ফাঁকে জুড়ে দিতে পারলে ধ্বনির পতোৎকর্ষ দোষ (decadence of flow) দূর করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ করা দরকার যে, সংস্কৃত ক্রিয়াপদের শ্রুতিকটুত্ব ও দুরূহতাই সাধুভাষা বর্জ্জনের প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছিল বিগত শতকের মধ্যভাগেও। তাই প্রমথ চৌধুরী মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ ও প্রয়োজনমত সুললিত ব্যঞ্জনাময় তৎসম শব্দের যুগপৎ ব্যবহার করে কথ্য-ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করলেন। অপর কথায়, হুতোমের চলিত রূপকে বঙ্কিম যে ভাবে সাধু ভাষার মর্য্যাদা দিয়েছিলেন ঠিক সে ভাবেই আলালের কথ্যভাষাকে প্রমথ চৌধুরী যুগোপযোগী সংস্কারের পর চলিত ভাষার নামে সাহিত্যের লেখ্য বাহকতার ছাড়পত্র মঞ্জুর করলেন।

এ পর্য্যন্ত কেবল ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই সবুজগোষ্ঠীর চলিত বাংলার সাহিত্যিক রূপায়ণের প্রচেষ্টার কথা বলা হ'ল। এবার সে চলিত রূপের শৈলী বা style প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলব। তাঁরা দেখলেন বাস্তবধর্মী ও আখ্যানমূলক বর্ণনায় রম্যতার সৃষ্টি করতে গেলে কথ্য-ভাষায় তা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দেশজ শব্দের সীমাবদ্ধ অভিব্যক্তিতে তা সম্ভব নয় বলে তাঁরা বাক্যগুলি যথাসম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে অল্প কথায় ভাব পরিস্ফুট করার ফরাসী সাহিত্যের কৌশল বাংলায় প্রবর্ত্তন করলেন। প্রমথ চৌধুরীই এ রীতির প্রথম প্রদর্শক। ইংরাজী সাহিত্যের Oscar Wilde-এর সরস নীতি তিনি বাংলায়ও সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে এক নূতন নজীর সৃষ্টি করলেন বাংলা গদ্যরীতিতে। তাঁর সমসাময়িক কালে চলিত রীতির পক্ষ সমর্থনকারীরা কথ্য রীতিকে যথাসম্ভব সরল ও সহজ করে লেখা তবে আবারই পক্ষপাতী ছিলেন। ভাষার প্রসার গুণ ও অলঙ্করণে তাঁদের মনোনিবেশ ততটা ছিল না। অবশ্য চলিত রীতির অলঙ্কার বলতে আমরা কখনই প্রাচীন শাস্ত্রীয় অলঙ্কারের কথা ভাবতে পারি না। ভাষার রূপ, কাঠামো ও রীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের বিভাবন ও প্রয়োগ-রীতিরও পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। চৌধুরী মহাশয় ভাষা সংস্কারে হাত দিয়ে সমসাময়িক সংস্কারপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিলেন। তিনি ওয়াইল্ডীয় সরস ও সংযত রীতির অনুকরণে ভাষার যে শুধু সরসতাই আনলেন তাই নয়—সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবের গভীরতা, বক্তব্যের সরসতা ও বাকভঙ্গির ধ্বন্যাত্মক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দ এবং সমাসেরও প্রয়োগ করলেন বীরবলি রীতিতে।

তা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। যেখানে সংস্কৃতানুসারী এ কাজটি করতে তিনি বা তাঁর দলের লোকেরা ইতস্ততঃ করেছেন, সেখানে বাধ্য হয়েই খাপছাড়া ধরনের দেশজ সমাস অথবা বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করে, তাঁরা বাংলা ভাষাকে অযথা পীড়িত করেছেন। তাঁর বৈদেশিক শব্দের প্রতি আন্তরিক অনুরূপ সবুজগোষ্ঠীকেও অতিক্রম করে পরে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক সংক্রামণ সৃষ্টি করেছিল। যথাসময়ে সে প্রসঙ্গে আসব।

এ যাবৎ আমরা দেখলাম বাংলা গদ্যের চলিত রীতির লেখ্য সংস্করণের একটা মানগ্রাহ্য রীতি প্রমথ চৌধুরীর ব্যক্তিগত অধ্যবসায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সবুজ গোষ্ঠীর দ্বারাই সূচিত হয়েছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায়ও নেই। চলিত গদ্যের প্রবর্ত্তনায় রবীন্দ্রনাথ পদ্যরীতির অনুসরণে গদ্যে-পদ্যের ছন্দের প্রথা চালু করতেই অধিক প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর সবুজগোষ্ঠী সে পথে না গিয়ে চলিত-রূপের ব্যাকরণসম্মত একটা স্থায়ী রীতির প্রবর্ত্তন নিয়ে প্রয়াস করেছিলেন। কবিগুরু এ সংস্কারে সহযোগিতা করে এ উদ্যম ত্বরান্বিত ও সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন বটে, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত নেপথ্যে থেকেই সংস্কারকদের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। মুখোমুখি বা সরাসরি আসরে তিনি নামলেন সবুজ পত্র প্রতিষ্ঠায় আরও তিন-চার বছর বাদে। ইউরোপের Futurism ও Symbolism তখন Neo-humanism ও Pragmatism-এর সমাজাদর্শ যাচাই করে আমাদের বাংলার শিল্পীগোষ্ঠীর মননলোকেও তাঁদের আবেদন পৌঁছে দিতে সবে মাত্র সুরু করেছে। ওদিকে রাম রাখাল ঘোষ ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় 'গৃহস্থ' সম্প্রদায় ও 'ডন সোসাইটি' নব্য বাংলায় সংস্কৃতির ও জাগৃতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টি করল। তার সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের উদ্দাম চাঞ্চল্য জড়িত হয়ে যে দ্বিধারা আবর্ত্তের সৃষ্টি করল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তার অনিবার্য্য সংঘর্ষের ফলে নবতর জীবন-জিজ্ঞাসার সুরু হ'ল নব্য বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে। বিশ্ব-সাহিত্যের মানবমুখীন আকুতি ও ইউরোপীয় জীবনবাদের আদর্শ ও স্পর্শ আমাদের কবিগুরু ব্যক্তিগত জীবনে অবশ্য কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই অর্থাৎ বর্ত্তমান শতকের গোড়ায় দিকেই মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। তাই সবুজ পত্রের উদ্বোধন করে তিনি দেশের তরুণ সাহিত্যিকদের যুগোপযোগী শিল্পমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য ডাকলেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

"ওই-যে প্রবীণ, ওই-যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

আজ বলতে দ্বিধা নেই, অনেক কাঁচাই কবিগুরুর এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন প্রত্যেকের দলীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। 'বলাকা'র মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের যে স্বচ্ছন্দ বিহারের চিত্র তিনি ঝিলমের তীরে বসে এঁকেছিলেন আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে, তার প্রেরণা বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের আবার কাব্যপ্রীতির সন্ধান জুগিয়ে দিল মুক্তকের স্বচ্ছন্দ বাহন। সেই বিশেষ যুগটাই বাংলা সাহিত্যের চলিত রূপের গদ্য-পদ্যের সন্ধিক্ষণ। রাবীন্দ্রিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তরুণদের শ্লথ-ছন্দের-রীতির গদ্য কাব্যধর্ম্মী আঙ্গিকের দিকে হাত বাড়াল। আবার ওদিকে বীরবলি সরস চলিত রীতি মুক্তককে গদ্যের আঙিনায় টেনে আনল। এ-ধরনের পরস্পর সংঘর্ষের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শকে লক্ষ্য রেখে আর গুরুদেবের 'লিপিকা' অনুসরণ করে কাব্য-ছন্দ-রীতির নূতন কাঠামো তৈরি করলেন ভাব-শিষ্যবৃন্দ। বাংলা ভাষার গদ্য ও পদ্য রূপের এ ভাবেই সমীকরণ সাধিত হ'ল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।

গোড়াতেই ভণিতায় জানিয়েছি, সাহিত্য বিচার বা কাব্য-পরিক্রমা আমাদের বর্ত্তমান সমীক্ষার বিষয়বস্তু নয়। শুধুমাত্র ভাষার গতিই আমাদের একক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু। এবার আমরা গদ্য-পদ্য নির্বিশেষে ভাষার রূপের বিচার করলেই তার প্রকৃতির আঁচ

করতে সমর্থ হব। আর সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার কোষাগারে কি বিশেষ উপকরণের অভাব সেটাও বুঝতে পারব।

Washington Irving একস্থানে বলেছিলেন—'Man wars not with dead, আমি এ ইংরেজী বাক্যটির আদ্য ও অন্ত্য কথা দুটিকে পরস্পর স্থানচ্যুত করেই আপাতত এর ভাবার্থ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। এখন ভাষা সমীক্ষায় বসে আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্ত্তকদের ঋণ যেমন নতশিরে স্বীকার করব, ঠিক তেমনি আবার তাঁদের ত্রুটির কথাও (যদি কিছু থেকে থাকে) আলোচনা করব নিঃশঙ্ক চিত্তে। নইলে আমার কর্ত্তব্যের হানি থেকে যায়। তাই মৃতের দরবারে কসুরির আরজি আগেই পেশ করেছি। আশা করি স্বর্গতঃ ধীমানগণ আমাকে নেহাৎ কর্ত্তব্যরত জেনেই অপ্রিয়ভাজনের অপরাধ থেকে রেহাই দেবেন।

প্রথমেই বিচার করতে হয়, চালিত ভাষার সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোনও লেখ্যমান আজ অবাধ স্বীকৃত হয়েছে কি? এর জবাবে এক কথায় এ পর্য্যন্তই বলা যায় যে, মান একটা সাধারণ ভাবে স্থির হয়েছে ঠিকই। আর তার স্রষ্টাও স্বয়ং কবিগুরুই। এ কথা সত্য যে, প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয় গদ্য-লিখন-ভঙ্গি থেকেই আমরা চলিত রীতির অলঙ্কার খুঁজে পেয়েছি। তা হলেও তাঁর কাব্যের গঠন-রীতিকে হুবহু আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। বিদ্যাসাগরের রীতিকে সুসংস্কৃত করলেন বঙ্কিম, বঙ্কিমীকে শোধরালেন রবীন্দ্রনাথ। আবার আর একদিক দিয়ে দেখি আলালিরীতিকে শোধরালেন প্রমথ চৌধুরী, আবার বীরবলি ঢঙকে সুসংস্কৃত করলেন সেই রবীন্দ্রনাথই। এখানে 'রীতি' বলতে 'শৈলী'ই বোঝাচ্ছি—ভঙ্গি, ঢঙ বা style নয়। সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

তাই নিখুঁত বিচারে দেখতে পাই, কাব্যক্ষেত্রে, ছন্দের নবায়নে ও প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বে আর গদ্যের প্রাঙ্গণে ভাবের ব্যঞ্জনায় ও ভাষার শাসনে তিনিই সর্ব্বশেষ সংস্কার সাধন করলেন উভয়তঃ। তবে তুলনামূলক বিচারে রবীন্দ্রনাথের চলিতরূপে চমকের দ্যুতিও যেমন আছে আর স্থানে স্থানে ক্রিয়াপদের অতি-বিকৃতিও দৃষ্ট হয়। সে বিচারে প্রমথ চৌধুরী যথেষ্ট সংযত। চৌধুরী মহাশয়ের গদ্য-প্রচেষ্টার স্বকীয়তা চিঠিপত্র সাহিত্যকৃতি নির্ব্বিশেষে (মুখের বাচন-ভঙ্গি জানি না) আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ মহিমায় সমাহিত। তাঁর নিজস্ব শৈলীর একটা স্থায়ীরূপ ছিল শেষ দিনের রচনা পর্য্যন্ত। কবিগুরুর মতন ভাষার রীতি-নীতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তার সাজ-সজ্জা নিয়ে রঙ্গ-তামাসা তিনি করেন নি। কাজেই বীরবলি-রীতি বলতে আমরা একটা বিশেষ শৈলীকেই বুঝি, কিন্তু কবিগুরুর রীতি তবে কোনটাকে বলব? অথচ আমি একটু আগেই রায় দিয়েছি, কবিগুরুর রীতিই আধুনিক চলিত রূপের আদর্শ বলে স্বীকৃত।

এর উত্তরে বলতে হয়, মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ একটা রীতিকেই কথ্যের আদর্শ হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তার চলিত রীতির আদর্শ খুঁজতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফিরে যেতে হয়। সে সময়কার চিঠি-পত্রাদির কথ্য-ভাষাকেই আমরা যাচাই করে দেখতে পারি। পূর্ব্বেই বলেছি কবি ছিলেন আজীবন নবায়নের পূজারী ও শিল্পবিলাসী। তাঁর অকতজ্ঞগণ যখন গুরু-দেবের বাজারের হিসাবকেও সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা বলে মুদ্রাযন্ত্রের মাধ্যমে প্রচারিত করার উৎসাহ বোধ করলেন, ঠিক তখন থেকেই কবিগুরু পদ্যানুসারী পদদ্বয় ছুট্রীতিতে কথ্য-বুলির ও অঙ্গসজ্জা করলেন শিল্পীমনের সবটুকু রূপ-রস দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায়, বর্ণাঢ্য চিত্রণে। সে সব সৃষ্টিকে পদ্য বলে প্রচার করার দায়িত্ব কবির নিজের নয়—তাঁর তৎকালীন পরিকর-প্রচারকদেরই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক কাল পর্য্যন্ত চলিত রূপের যে সব গদ্যকৃতি রবীন্দ্রনাথ করেছেন, সেগুলিকে গদ্য না বলে পদ্যই বলা অধিকতর সঙ্গত। লিপিকার ছাঁদে পদ্যরীতিতে বাক্যগুলির বিন্যাস করলে কি আমরা তাকে কাব্য বলব না? তবে এ আদর্শ কবির মৌলিক সৃষ্টি, কি ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব—তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই বলতে হয়, রসরাজ ও শিল্পীশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বৈদেশিক অতিমুক্তক ছন্দরীতির অনুসরণে বাংলার চলিত গদ্যেও প্রথম দিকে ছন্দানুসারী বহু কারিগরির পর দুরুশ্চয় রীতি সমূলে বর্জ্জন করে, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রান্তীয় লগ্নে শেষের কবিতায় আধুনিক চলিত রূপের আদর্শ স্থাপন করলেন। রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যে সংস্কৃত ও তদ্ভব শব্দ-চয়নে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন প্রতিটি রচনায়। সবুজগোষ্ঠীর একটা সংস্কৃত-ঘেঁষা মন ছিল না। তাই সবুজের গদ্য-অভিযান বাংলার জনমনে যতটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, কবিগুরুর সংস্কৃত চলিত রূপ তার চেয়ে বহু বহুগুণ কার্য্যকরী হয়েছিল। তা ছাড়া মনস্তাত্ত্বিক কারণে ও প্রাচীনপন্থীদের চলিত রূপে যে উন্নাসিকতা ছিল রবীন্দ্রকৃতিতে কিছুটা সংস্কৃত গন্ধ থাকায় তা উভয় কুল রক্ষা করে। নবীন-প্রবীণ উভয়পন্থীরাই তা সাগ্রহে বরণ করতে দ্বিধা করলেন না।

চলিত ও সাধুরীতির দ্বন্দ্ব আজ অবসিতপ্রায় বললেই চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাধুরীতির প্রচলন ক্রমেই কমে আসছে। গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি উচ্চারণে ধ্বনি সৃষ্টি করতে ও ভাবার্থে গভীরতা দান করতে তৎসম শব্দের স্থান পূর্ণ করতে দেশজ শব্দ যে কখনই সমর্থ নয়, তার কয়েকটি নমুনা অতি সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল।

(ক) বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চার পাশে তার ধপধপে সাদা চুল; নাকের উপর মস্ত এক চাঁদির চশমা, গম্ভীর শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ।

(এস. ওয়াজেদ আলি)

(খ) কর্ত্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি, রক্তের জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন। সারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথায় কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায়

বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিকপ্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপাণির বীণায় গুঞ্জরণ।

(রবীন্দ্রনাথ—১৯৪০ অব্দে লেখা একটি পত্রাংশ)

(গ) নিদাঘান্তে মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসেছি।

(শ্রীরাজশেখর বসু—মহাভারতের অনুবাদ)

উপরে পর পর তিনটি চলিত রীতির নমুনা দেখান হ'ল। রচয়িতাদের নাম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। সর্ব্বশেষ নিদর্শনটি ভিন্ন আবার দুটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, কয়টা তৎসম শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে—তার পরিবর্ত্তে অপর কোনও দেশজ শব্দ ব্যবহার করলে ভাষার প্রবাহের গতি ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া গতির কথা বাদ দিলেও আর কোনও দেশজ শব্দ, ঠিক ওই ভাব বজায় রেখে ব্যবহার করতে গেলে দেশজ সমাসবদ্ধ রীতি ছাড়া সম্ভবও নয়। 'গম্ভীর' শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য মুখ' এর পরিবর্ত্তে বলতে পারি—'মুখখানা রাশ ভারি, গোঁফ-দাড়ির বালাই নেই, অথবা গোঁফ-দাড়ি-কামানো গুমড়ো মুখ। দ্বিতীয় নিদর্শনটিতে তৎসম শব্দগুলির পরিবর্ত্তন করা সহজ হলেও ভাষার লালিত্য ক্ষুণ্ণ হয়। আর তৃতীয় রচনাটি ত একেবারে খাঁটি সাধুরীতি। শুধু মাত্র 'করিয়া'র পরিবর্ত্তে 'করে', 'যাহাতে'র স্থানে যাতে, ইত্যাদি রূপে নামমাত্র চলিত রীতি।

এ সব নিদর্শন থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, শুধুমাত্র কথা-কাহিনী—সমাজচিত্র-মূলক রচনার জন্যই চলিত রূপ যথার্থ উপযোগী। অপরাপর রচনায় সাধুরীতিই উপযুক্ত বাহন। তবে স্বতঃই কথা উঠতে পারে—আমরা কি তবে আবার সাধু-রীতিতেই প্রত্যাবর্ত্তন করব? তদুত্তরে বলতে হয়—চলিত রূপ যুগের চাহিদার জোরেই সাধুরীতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের স্থান করে নিয়েছে। কাজেই পেছু-পা হওয়ার প্রশ্ন আর কোনও ক্রমেই উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ব্যাখ্যা আমরা আর একবার স্মরণ করতে পারি। নবযুগের তদানিন্তন সারস্বত মুখপত্রের অন্যতম 'পরিচয়'কে বাঙালী মানসে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বিগত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ দশকের গোড়ায় কবিগুরু লিখলেন :

'সবুজ পত্র' বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল।···এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু সে ছিল খিড়কির রাস্তায় অন্দর মহলে···। একবার যেমনি তাকে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাধার জাল ভিড়িয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ, এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যে। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ যখন এ যুগান্তকারী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন প্রায় সাতাশ বছর আগে তখনও সাধু গদ্যরীতিই বাংলা সাহিত্যের বাহকতায় চোদ্দ আনা দাবি মেটাত। অবশ্য এটাকে তাঁর ব্যক্তিগত উক্তি না বলে বাংলার নবজাগ্রত সাহিত্য-চেতনার অভিব্যক্তি বলেই গ্রহণ করতে পারি।

তবে এ সম্বন্ধে আরও একটু কিছু বলার আছে। গানের ভাব ও ছন্দকে মূর্ত্ত করার জন্য যেমন পৃথক পৃথক রাগরাগিণীর প্রয়োজন অনুভূত হয়ে থাকে, আমাদের বাংলা ভাষার ও ভাববস্তুর অভিব্যক্তির জন্যও ঠিক তেমনি কখনও দেশজ শব্দবহুল চলিত রীতি, কখনও বা তৎসম শব্দবহুল মার্জ্জিত চলিত রীতির প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে। সে বিচারে উপরোক্ত গ-সংখ্যক নিদর্শনের ভাষারও উপযোগিতা আছে।

পূর্ব্বেই একস্থানে বলা হয়েছে, মনের ভাবকে শব্দসমষ্টির সাহায্যে ব্যক্ত করাই কোনও উন্নতিকামী ভাষার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কথ্য-রীতির আবেদন স্থূল ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাময়িক স্পন্দন জাগিয়েই, দৈনন্দিন প্রয়োজনের অন্তেই, অবসিত হয়ে যায়। সেই সাদা-মাঠা ক্ষণিকের অস্তিত্বকে স্থায়িত্ব দান করতে গেলে তাতে গীতিধর্ম্মী প্রাণ-চাঞ্চল্য ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের ওজস্বিতাও সঞ্চার করা দরকার। এ প্রসঙ্গে এ কথা স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন যে, এ প্রাণধর্ম্মী সৃষ্টির কাজটি ভাষার বিশেষ একটি ঘরানা ও অলঙ্করণের দ্বারা করলেই সে কাজ সিদ্ধ হ'ল না। শক্তিমান কথাশিল্পীর লিখন-রীতির স্বকীয় একটি style ভাষাকে অধিকতর প্রাণস্পর্শী করে পাঠকের হৃদয়ে মুদ্রিত করে দিতে হয়ত পারে, কিন্তু তাতে ভাষার নিজস্ব শ্রীবৃদ্ধি কিছু হ'ল কি? পরোক্ষ ভাবে তার অনুকরণ দ্বারা ভাষার সমৃদ্ধি কিছুটা হয় বটে, তবে সেটা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। বৈঠকী আলাপে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, মুজতবা প্রভৃতি কয়েকজন কৃতী ব্যক্তি যেরূপ সরসতা ও মাধুর্য্য ভাষার গঠনে দেখিয়েছেন বা এখনও দেখাচ্ছেন সেরূপ হয়ত অনেকেই পারেন না। তা বলে কথ্য-ভাষার সম্পদ কিছু বাড়ল কি? অবশ্য এ কথা ঠিক, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহ্যিক সৌজন্যবোধ বেড়ে যাওয়ায় কথ্য-ভাষা ও লেখ্য-ভাষার পার্থক্য ক্রমেই কমে আসছে। ব্যক্তি-বিশেষের বাকপটুতার ন্যায় লেখ্যরীতির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিবিশেষের সাহিত্যিক প্রতিভা ও শিল্পজ্ঞান স্বীয় সৃষ্টির মধ্যেই ভাষার চমৎকারিত্ব সীমায়িত করে রেখেছে। একের নিজস্ব শৈলী বা পদ্ধতি অপরের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নয়—তার চেষ্টা উচিতও নয়। শুধুমাত্র সাহিত্যের অঙ্গনেই নয়, জীবনের যে কোনও বৃহত্তর ক্ষেত্রেও অনুকরণ সমর্থনযোগ্য নয়। নবীন শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরে যতটুকু অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য্য মাত্র ততটুকুই অনুসৃত হওয়া উচিত। কোনও লেখকের নিজস্ব রীতিকে ভাষার

অলঙ্করণের মাপকাঠি না করে ভাষারই নিজস্ব শৈলী থাকা দরকার। ভাষা যতটা ব্যক্তিধর্ম্মী না হয়ে ব্যাকরণধর্ম্মী হয় সাহিত্যের ততই শ্রীবৃদ্ধি। আর সাহিত্যের শ্রীসম্পদ বাড়াতে গেলেই ভাষাকে অধিকতর শক্তিশালী করা দরকার—ভাবে, ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে। ব্যাকরণকে ভিত্তি করেই এ প্রচেষ্টা সার্থক করতে হবে।

তবে এ কথাও মানতে হয় যে, ভাষার ব্যাকরণ যতই কড়াকড়ি করে বেঁধে দেওয়া হউক না কেন—ব্যক্তিমানসের বৈচিত্র্যের ছাপ প্রত্যেকের রচনায় অবশ্যই থাকবে। আমরাও তাই চাই। সৃষ্টি অর্থই বৈচিত্র্য, আর উৎপাদন মানেই একঘেয়েমি। সাহিত্যে সৃষ্টিরই প্রয়াস, উৎপাদনের স্থান নেই এখানে। ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষের আঙ্গিক গঠনে সবাই মানুষ, বিশেষ করে ভারতবাসী মানুষ। প্রত্যেকের অবয়বে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও এদের একটিও শিম্পাঞ্জী বা ওরাংওটাং নয়। আমাদের অভ্যস্ত চোখে ত বটেই, বিদেশীর অনভ্যস্ত চোখেও ভারতবাসী ভারতবাসী বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকে। ভাষার বেলায়ও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় সহস্র প্রকারের লিখনরীতির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা style থাক, ক্ষতি নেই, বরং সেটা সুলক্ষণই। কিন্তু তা বলে যিনি যাঁর খুসিমতন এক একটি ব্যাকরণ তৈরি করে নেবেন, এটা ত সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, সুধীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, বিনয়কুমার, অন্নদাশঙ্কর, রাজশেখর, ওয়াজেদ আলি, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, অচিন্ত্যকুমার, মুজতবা, শিবরাম, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, দিলীপকুমার, তারাশঙ্কর, নিরঞ্জন প্রমুখ শক্তিমান শৈলী প্রবর্ত্তকগণ সকলেই বাংলা চলিত রচনা-রীতিতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তবে নিছক রীতির বিচারে কোনটাকেই জাতীয় আদর্শের Trade mark দেওয়া যায় না। অবশ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা আজ বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের (মৃত্যুর অব্যবহিত এক দশক পূর্ব্ব থেকে) চলিতরীতিই সাধারণ ভাবে অনসৃত হচ্ছে আজ পর্য্যন্ত।

বিগত চার দশকের সাহিত্যকৃতির সূক্ষ্ম সমীক্ষা করে এখন অনেকেই বুঝতে পেরেছেন, হুবহু কথ্যরীতিতে অনেক বিষয়-বস্তুকেই সর্ব্বাঙ্গকরণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না—সাবলীল ভঙ্গিতে মনের কথা যথাযথ অপরের চিত্তে সংক্রামিত করা যায় না। সাধু-রীতিতে মনের ভাব লিখিতরূপে ব্যক্ত করার জন্য আমাদের অনেকেরই মোটেই চিন্তা করতে হয় না। পক্ষান্তরে চলিত-রীতিতে রচনা প্রকাশ করতে হলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও চিন্তা করতে হয়। তার একমাত্র কারণ চলিত শব্দ-সম্ভার অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ও ব্যঞ্জনা-দৈন্য-পীড়িত। আবার তৎসম শব্দের বাহুল্যে ও সংস্কৃতানুসারী নামধাতু পর্য্যায়ের ক্রিয়াপদে শ্রুতিকটুত্বের জন্য অনেক সহজ উপজীব্যই গাম্ভীর্য্যের পাকামিতে সরসতা হারিয়ে ফেলে। উভয় রীতির মিশ্রণ করে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, সুধীন দত্ত, অন্নদাশঙ্কর, সুনীতিকুমার, তারাশঙ্কর ও নিরঞ্জন যে ব্যাকরণীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তাঁদের রচনাসমূহে সেটাই সাধু-চলতির দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এক কথায়—আধুনিক বাংলা গদ্য-রূপ বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে সুধীন দত্তের ক্রিয়াপদে আরও চলিত রূপ যোগ করে নিতে হবে।

বাংলার গদ্যরীতিতে আজকাল চলিত রূপের প্রাধান্য দিন দিনই বাড়ছে সত্য, কিন্তু সাধু-চলতির দ্বন্দ্ব এখনও মেটেনি। পাকিস্থান-ভারত নির্ব্বিশেষে বেতার-অনুষ্ঠান, সভা-সমিতির ভাষণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজন, সবাক-চিত্র ও রঙ্গ-মঞ্চাদির আবেদন প্রভৃতির মাধ্যমে কথ্য ভাষা খুবই প্রসার লাভ করেছে। আর কথা-সাহিত্য মুখ্যতঃ কথ্যরীতিকেই পরিচর্য্যা করছে বর্ণাঢ্য বিলাসে। সাময়িকপত্র-পত্রিকাগুলি সাধুভাষার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন না করলেও কথ্যরীতিকেই আন্তরিক সেবা করছে, দেখতে পাচ্ছি। তথাপি বলব, বাংলা গদ্যরীতিতে সংবাদপত্রে, বিদ্যায়তনে আর সাহিত্যিক আসরে যে দ্বিধা স্রোত এখনও চলছে তারও একটা সমন্বয় খুঁজে বার করলে ভাল হয়। এতে যে শুধু শিক্ষার্থীদেরই অযথা শ্রম করতে হয় তাই নয়, ভাষার অনাবশ্যক জটিলতা বেড়ে যাচ্ছে।

আজকাল অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়—ভাষাকে আরও সহজবোধ্য ও প্রবহমান করতে হবে। সহজবোধ্য বলতে কেউ মনে করেন আরও অধিক কথ্যরীতির প্রবর্ত্তন, আর কেউ মনে করেন নির্ব্বিচারে বৈদেশিক শব্দের সংযোজনা। এই শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রমথ চৌধুরী আমাদের ভাষার সত্যিকারের কোনও শ্রীবৃদ্ধি করেছেন কিনা তা খতিয়ে দেখবার সময় হয়েছে, মনে করি। বাংলা ক্রিয়াপদের সুষ্ঠু প্রয়োগ করে আর চলিত কথার পাশে পাশে তৎসম শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করে চলিত রীতির তিনি সাহিত্যিক মর্য্যাদা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ওদিকে নির্ব্বিচারে বৈদেশিক শব্দের আমদানির নেশা ধরিয়ে তিনি ভাষার ক্ষতিও করেছেন বেশ। তার কুফল বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে ফলিয়েছেন—বিনয় ঘোষ, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, বীরেন ভদ্র, শিবরাম, সুধীন দত্ত প্রভৃতি শিল্পীগণ। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের একবড় ভক্ত হয়েও যে কি করে শব্দ আমদানি রীতির সমর্থন খুঁজে পেলেন, ভাবতে একটু বিস্মতই হই। স্বদেশীয় ভাষায় শব্দকোষ সৃষ্টিতে তৎসম শব্দের মৌলিক সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু, রামেন্দ্র-সুন্দর, হরপ্রসাদ, যোগেশ রায়, বিধুভূষণ, মোহিতলাল, ক্ষিতিমোহন, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বী-গণ যে প্রচেষ্টা করেছেন প্রমথ বাবু তাতে সহযোগিতা করলে আমা-দের শব্দসম্ভার আরও বেড়ে যেত আজ। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী-কালে কল্লোলগোষ্ঠীর কয়েকজনের শ্রম ও তারাশঙ্কর, নিরঞ্জন, নারায়ণ চৌধুরীর প্রয়াসও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভাষার প্রসারকেই একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করলে চলবে না। তার গভীরতাও মাঝে মাঝে পরখ করে দেখতে হবে। লক্ষ্য বড় থাকলেই হ'ল না, বৃহত্তর আদর্শের জন্য বৃহত্তর প্রস্তুতিও দরকার। না হলে বিশ্ব-সাহিত্যের সাগর-সঙ্গমে পৌঁছবার আগেই অগভীর

সাহিত্য-প্রাণ-গঙ্গায় চড়ায় অভিযাত্রীদের সাহিত্যের বাহন আটকে যাবে। তখন বিলাতি Tugboat ও Dredger-এর সহায়তা ভিন্ন গতি থাকবে না। ইংরাজী সাহিত্যের পর-ভাষায় সম্পদ পেলায় সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস যতটা রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে উৎসাহিত হয়েছে, ততটা সাহিত্যিক প্রেরণায় অবশ্যই নয়। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, মার্কিনী, ইংরাজী, রাশ্যান্—সব ভাষাই নিজ নিজ সমৃদ্ধি ও সংস্কার, নিজস্ব আভ্যন্তরিক পদ্ধতিতেই করেছে, নির্বিচারে অপরের দানগ্রহণ বা অপরের বস্তুলুণ্ঠন না করেই। বিশেষ করে ফরাসী জাতীয় আকাদমি এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নীতিপরায়ণ। আর আমরাই কিনা আত্মবিক্রয়ের দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাতে এতটা উৎসাহী। বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি এখানে একেবারেই অচল। তাঁদের মতে ইংরাজী না জানার অর্থ ই অজ্ঞতা। সম্প্রতি নিবন্ধ-লেখক ইউরোপের দূতাবাসসমূহে পত্রালাপ করে একথা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, গ্রেট বৃটেন ভিন্ন ইউরোপ খণ্ডের শ্রেষ্ঠ নগরীগুলিতেও ইংরাজী সাহিত্যপত্রের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। একদিন যে 'অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও' কথাটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়েছিল আজ আবার 'আকাশবাণী' কথাটি অপর দেশের লোকেরাও শিখবে সাংস্কৃতিক আগ্রহেই। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কথা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

বলবেন, এই শব্দসম্ভারের দৈন্য তবে কি করে ঘুচান যায়? তার জবাবে বলতে চাই—সেজন্য জাতীয় ভিত্তিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। মননশীলতায় বাঙালী আজও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় নি। মানসিক কৃষ্টি তার এখনও প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্তব্য আছে। বিগত চতুর্থ ইংরেজী দশকের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষার প্রচলিত রীতিনীতি সমীক্ষা করে কোনও সংশোধন ও সংযোজনের যুক্তি কি আজও খুঁজে পাচ্ছেন না? প্রগতির দ্রুত ঘূর্ণায়মান পারস্পরিক সংঘর্ষে বিশ্বের সমস্ত ভাষা ও সাহিত্যই উল্কাবেগে বিবর্তিত হচ্ছে। এ বিবর্তনের গতি কতকটা গুণোত্তর সমুন্নতির (Geometrical Progression) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কাজেই অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সঙ্ঘটিত প্রতিক্রিয়া বাংলা ভাষার যুগোপযোগী সংস্কারসাধনের প্রশ্নটিও জাতীয় কর্তব্যের দাবী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ বা জাতীয় আকাদমি শ্রেণীর কোনও সংস্থার উপরই বর্তে। এ কাজটি সাহিত্যিক, শিক্ষক, প্রকাশক, সংবাদপত্রসেবীদের সমবেত প্রচেষ্টারই জাতীয় দাবী গ্রহণ করতে পারে।

পরিভাষা সঙ্কলন ও নূতন শব্দসৃষ্টির সম্পর্কে বলতে চাই—জার্মান ভাষার অনুকরণে আমরাও বহু চলিত কথায় সমাসবদ্ধ শব্দ রচনা করে বক্তব্যকে অনায়াসেই প্রকাশ করতে পারি। সাপ-খেলান সুর, পাতে খাওয়া ঘি, লেখাপড়া-জানা লোক, তুষার-গলা জল প্রভৃতিকেই এর নজির হিসাবে ব্যবহার করা যায়। সংস্কৃতের দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইত্যাদির অনুসরণে বায়ুশূন্য নাই দুগ্ধবৎ, বিরল কেশ, টাক প্রভৃতির আদর্শে পূর্ববর্ণিত ব্যবস্থায় সাহিত্যিক শ্রমের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আরও সাধন করতে পারি। এ প্রস্তাব মোটেই অভিনব নয়। আর সাহিত্যিকগোষ্ঠী ও সাংবাদিকগণ কিছু কিছু না করছেন এমনও নয়। তবে কথা হচ্ছে, ব্যাপক ভাবে ও সর্বজন গ্রাহ্যনীতিতে এ শ্রম যথাযথ প্রযুক্ত হচ্ছে না।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার রূপ-কাঠামো নিয়েই আলোচনা করার কথা। রচনানীতির বিশেষ কোনও ভঙ্গি ও আলঙ্কারিক কলা-কৌশল আমাদের প্রতিপাদ্য না হলেও দু' একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা খুবই প্রয়োজন বোধ করছি। ভাষাকে সুর ও ছন্দে গীতিময় করা, কিংবা ঝঙ্কারে-স্পন্দনে নৃত্য-মুখরতা দান করা—যার যা করতে পারেন স্বচ্ছন্দে। শুধু একটিমাত্র সর্ত থাকবে এতে যে, সৃষ্টির প্রসাদগুণ ও রসোত্তীর্ণতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। কেবলমাত্র বাকচাতুর্যের আতসবাজি সৃষ্টি করে, অর্থহীন প্রলাপকে ঢাক-ঢোল-সানাইয়ের উচ্চরোলে ঢেকে রাখলে চলবে না। কিংবা চমকপ্রদ ও শ্রুতিমধুর বাক-বিন্যাসের কুহেলিকা তৈরি করে, মস্তিষ্কের ধাঁধা সৃষ্টি করে, পাঠককে মোহাচ্ছন্ন রাখলেই চলবে না। এ ধরনের রচনা আজকাল কোনও কোনও মহলে হাততালি কুড়োচ্ছে বলেই এ অপ্রিয় কথা বলতে হ'ল। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর বেশি কথা না বাড়িয়ে সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার ও সমালোচক স্বর্গতঃ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতা স্মরণ করছি।

"...তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুর তাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, বিস্মিত হইতাম, কিন্তু কখনও নিজের জিনিস বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত কিন্তু প্রাণে লাগিত না।...কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বরগুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত।"

[উদ্ধৃতাংশটি মোহিতলাল মজুমদারের 'সাহিত্য বিচার' পুস্তক থেকে গৃহীত]

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর তরুণ বয়সের যে অভিজ্ঞতার কথা উপরে বলেছেন পরিণত বয়সে সে দুর্বোধ্যতারই তিনি নির্মম সমালোচনা করেছেন। মোহিতবাবু অক্ষয়চন্দ্রের ভাল-না-লাগাকে style-এর অভাব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। পরন্তু আমি বলতে চাই—সেটা প্রসাদগুণেরই অভাব। আজকালকার তরুণেরাও কি তাঁদের কোনও কোনও অগ্রজের রচনা সম্পর্কে ও কথা বলতে পারেন না?

এবার বানান সম্বন্ধে একটু বলতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রচারিত বানান-সংস্কারের নির্দেশনামাটি আবার বিস্তৃততর করে সাধারণ্যে প্রচার করা দরকার। একক ভাবে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এ সংস্কার আশানুরূপ ভাবে সার্থক করা সম্ভবও নয়। সেজন্য জাতীয় ভিত্তিতেই এর একটা সমাধান হওয়া উচিত। এ বিষয়ে উপযুক্ত অভিধানাদি প্রণয়নের জন্য

গ্রন্থের রাজশেখর বসুর ন্যায় আরও কতিপয় পরিনিষ্ঠিত সাহিত্য-সেবীর একান্ত প্রয়োজন আছে। বানানের স্বৈরাচার ও বহুরূপতায় বাংলা রচনায় আজ যেন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ইংরেজ জাতির কেবল বাহ্যিক এবং সহজগ্রাহ্য দিকটাই আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করতে খুবই উৎসাহিত হচ্ছি। কিন্তু তাঁর জাতীয় সাহিত্যের বানান-সংযমের দৃষ্টান্ত থেকে কি আমাদের গ্রহণ করবার কিছুই নেই? দু'চার জন সাহিত্যসেবী ও অধ্যাপক কালেভদ্রে এ দারুণ সমস্যাটি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করেছেন।

সবদেশেই সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলিই জাতির সাহিত্যসেবা ও ভাষা-সংস্কারের কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও এ আদর্শের ব্যতিক্রম বিন্দুমাত্র নেই। সে সব কথা পূর্ব্বে যথাস্থানে বলাও হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষ, প্রবাসী, সাহিত্য, বসুমতী, গৃহস্থ, অবসর, তোষণী, নারায়ণ প্রভৃতি মাসিক সাহিত্য পত্রিকাগুলি সবুজ পত্রের সমসাময়িক কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচুর সেবা করেছে। তখন সবুজ পত্রই ভাষার সংস্কারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিল চলিত রীতির মাধ্যমে। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে, কল্লোল যুগে, সাময়িক পত্রগুলি চলিত রীতিকেই পরিচর্য্যা করতে সমধিক প্রয়াসী হয়। কল্লোল, উত্তরা (উত্তর প্রদেশ), কালি-কলম, ধূপছায়া, প্রগতি, শনিবারের চিঠি, নবশক্তি, আত্মশক্তি, মহাকাল, হসন্তিকা, যমুনা, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি পত্রিকাগুলি পারস্পরিক বাদানুবাদ ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য-রীতির ক্রমোন্নতি বিধান করে। ভাষার নবায়নে ও চলিত রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কল্লোলগোষ্ঠীর (কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, সংহতি) অবদান অনস্বীকার্য্য। তার আরও পরে পরিচয়, চতুরঙ্গ, বৈজয়ন্তী বাংলার চলিতরীতির বিজয়-কেতন উড়িয়ে বাঙালী মননে সাহিত্যের বীজ বুনতে থাকে অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে। সে সময়কার অধিকাংশ পত্রিকাই ব্যবসায়-বুদ্ধি থেকে সাহিত্য-সেবা-বুদ্ধিকেই পত্রিকা পরিচালনার মূলমন্ত্র করেছিল। সবুজ পত্রের সবুজগোষ্ঠীর ন্যায় কল্লোলগোষ্ঠীও অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ, নৃপেন্দ্র, শিবরাম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, ধূর্জটি প্রভৃতির হাত দিয়ে আধুনিক চলিত বাংলার বহু গবেষণা সাফল্যের সঙ্গে চালিয়েছেন। আজকালকার দিনেও নূতন পত্র-পত্রিকাগুলি গোষ্ঠী গঠন করেছেন। কিন্তু সে সবের অধিকাংশেরই চরিত্র বুঝা ভার। অর্থাৎ সেগুলি সাহিত্যিক কি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নির্ণয় করা শক্ত। নূতন পত্রিকাগুলি যদি কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ অর্থেই গোষ্ঠী গঠনের পরিকল্পনা না নিয়ে ভাষা গঠনের ও তার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হয় তবেই আমরা কথঞ্চিৎ আশান্বিত হতে পারি। ছাপার অক্ষরের একটা মোহ আছে। কাজেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ ও পুস্তক প্রকাশকগণ যদি রচনাপত্র ও পুস্তকাদি প্রকাশের পূর্ব্বেই লেখকদের ভাষার দিকে নজর দিতে বাধ্য করান তবে জাতির একটা সত্যিকারের বৃহৎ কাজ অতি অল্প প্রয়েই করা যায়। নতুবা ছাত্র-সম্প্রদায় ও তরুণ সাহিত্যিকগণ অগ্রজদের স্বেচ্ছাচারকেই নিজেদের অধিকার বলে জ্ঞান করবেন।

সাধু ও চলিত রীতির দ্বন্দ্বে নিবন্ধ লেখক ব্যক্তিগত মন্তব্যে চলিত রীতির অনুকূলেই রায় দিয়েছেন। অবশ্য কারও ব্যক্তিগত মতামত বা রায়ের সমীহ না করেই চলিত রীতি আপনার স্থান কায়েমী করে নিচ্ছে দিনের পর দিন। ভাষাতাত্ত্বিক বিচার-বিবেচনা ছাড়াও কথ্য-রীতিকে ভাষার বাহন করার একটা বাস্তব লাভ আছে। সাধুরীতির আধিপত্যকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের চিন্তা করতে হ'ত এক রীতিতে আর তাকে ভাষার লেখ্য আকারে রূপ দিতে হ'ত অন্য পদ্ধতিতে। কথ্য ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মৌখিক ভাষার ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে—অর্থাৎ কথ্য ভাষা ক্রমেই মার্জ্জিত হচ্ছে। কারণ মৌখিক রীতি ও লেখ্য রীতিতে কোনও প্রভেদ সৃষ্টির যাতে কোনও অবকাশ না থাকে, এ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেই চলিত রীতিকে লেখ্য ভাষায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সাধুরীতিতে সে সংস্কারের সম্ভাবনা কোনও কালেই ছিল না—চেষ্টা করলেও হ'ত না। সম্ভব হয় চেষ্টা সে ভাবে খুঁজতে গেলে—"To bring the Alps to me"র মতন সাধু ভাষাকেই মৌখিক ভাষার কাছে এসেই করমর্দ্দন করতে হ'ত—শুধু মাত্র একাত্ম হয়েই নয়—একেবারে আত্মবিলোপ করে, একাকার হয়েই। সাধু ভাষার প্রচলন কালে লেখককে কথ্য-ভাষার জন্য মোটেই মাথা ঘামাতে হ'ত না। কারণ কেরাণী বাবু বাড়ীতে সারাদিন গামছা পরে থাকলেও লজ্জাবোধের হেতু খুঁজে পান না কোনও ক্রমেই, যদি তাঁর ধোপ-দুরস্ত আপিসের পোষাক ঘরে মজুত থাকে। কাগজে-কলমে লিখিত রূপের বা ছাপার হরপের মুদ্রিত ভাষায় সাধুরীতি বজায় থাকলেই তখনকার লোক তৃপ্ত থাকতেন, কথ্য-ভাষার আঞ্চলিক আড়ষ্টতা বা দুর্ব্বোধ্যতা যতই থাক না কেন, সেটা তখন মোটেই ভাববার বিষয় ছিল না। যদি নেহাৎ কথ্য-ভাষার দ্বারাই সামাজিক আভিজাত্যের প্রয়োজন মেটাতে হ'ত, তবে কলকাতা নদীয়া অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত কথ্যরীতির অনুকরণ করেই তা সম্পন্ন করা হ'ত বাঙালীর সার্ব্বজনীন সাংস্কৃতিক স্তরে। পক্ষান্তরে আজকাল সাধু ভাষার সাহিত্যিক বাহকতা ক্রমেই সীমিত হওয়ায় কথ্য ভাষাকেই সে গুরু দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। আবার সামাজিক প্রতিচ্ছবিবাদ নীতিতেই আধুনিক সাহিত্য গড়ে উঠায় চিন্তা বক্তব্য প্রকাশের রীতি-সমন্বয় করতে গিয়ে কথ্য রীতিকে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ক্রমেই মার্জ্জিত করে তুলছেন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাষী-মজুর নির্ব্বিশেষে এ রীতিতে আরও ছড়িয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে।

তবে আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাব-কল্প ছাড়াও ভাষার গঠননীতিতে ইংরেজীর প্রভাব যে কত গভীর, তা বোঝাতে কোনও বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র ইংরেজীর বাক্-

চিহ্নাদির ব্যবহারই নয়, এমনকি ইংরেজী সাহিত্যের উক্তি-সংলাপের প্রয়োগ-কৌশলাদির সার্থক অনুকরণ বাংলা গদ্যরীতিকেই নয়, বাংলার কাব্য-কাঠামোকেও যথেষ্ট প্রকাশ-সামর্থ দান করেছে। ইংরেজী সাহিত্যের এ ঋণ আমরা কোনও দিনই পরিশোধ করতে পারব না। তবে বড়ই দুঃখের কথা, আমরা আঙ্গিকের কল-কৌশল ও বাকবিন্যাস পদ্ধতি কেবল সাগর পার থেকে আমদানিই করছি, সামান্য কিছু রপ্তানী করা দূরের কথা, নিজেরা এ বিষয়ে ন্যূনতম সম্পদও সৃষ্টি করতে পারছি না।

কেউ কেউ আধুনিকতম উপযোগিতায় নিরিখে বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সংস্কার করতে উৎসাহ বোধ করছেন। সংস্কার সাধন করতে কোনই দ্বিধা থাকা উচিত নয়, এ কথা যেমন ঠিক, আবার তেমনি শুধুমাত্র হুজুগেপনা যেন এ উদ্যমের মূলমন্ত্র না হয়, সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। ভাষার সরলীকরণ কথাটাকেই অনেকে বড় করে বিবেচনা করেন। তাঁদের ধারণা এ ভাবে বাংলাকে এককালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপরিচিত করান সহজসাধ্য হবে। কিন্তু বোধ করি এটা মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। ব্যাকরণের সংস্কার সাধনে দৃষ্টি শুধুমাত্র সরলীকরণের দিকেই নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। এ ভাবে বাংলা ভাষা এক উপ-মহাদেশীয় অঞ্চল নিয়ে হয়ত Lingua Francaর কাজই কিছুটা করতে সমর্থ হবে, ভাষার সাহিত্যিক মান এতে আরও অবনমিত হবে। কথায় কথায় অনেকে ইংরেজী ভাষার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে এ যুক্তি অসার প্রতিপন্ন করতে চান। সে সব অত্যুৎসাহীদের বলতে হয়, নব-জাগ্রত ইংরেজ জাতির (নিউ ইংল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রভৃতি পূর্ব্ব-পুরুষদের সহ) বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী প্রসারেই সম্ভব হয়েছে। ইংরেজীর এ একাধিপত্য অচির ভবিষ্যতে ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। আজ পর্য্যন্তও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের শতকরা আশীটি শব্দ Latin ও Greek থেকেই আহরণ করা হয়েছে, কোথাও বা suffix-prefix যোগে, আর কোথাও বা কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তিত করে এবং সে প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। আর ব্যাকরণের ছোট-খাট পরিবর্ত্তন বিশ্বের সব উন্নত ভাষাই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করে যাচ্ছে। কাজেই ব্যাকরণের সংস্কারে রক্ষণপন্থীদের অহেতুক শঙ্কিত হওয়ার কারণ কিছুই নেই। আমাদেরও সেই আদর্শে তৎসম শব্দের ভিত্তিতেই শব্দ-সম্পদ যতটা সম্ভব আহরণ করে আমাদের শব্দকোষ বাড়াতে হবে। এ সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব, নগেন বসু, অমূল্য বিদ্যারত্ন, রাজেন্দ্র মিত্র, যোগেশ রায় প্রভৃতি মনীষীদের মতামত এ পরিবর্ত্তিত যুগে কতটা সাহায্য করতে পারে, তাও ভেবে দেখা দরকার। তৎসম শব্দের সাহায্য নিতে আমাদের অনেকেরই দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈদেশিক শব্দে তাঁদের মোটেই আপত্তি নেই। শুনেছি ইংরেজী রাজভাষায় (চসারের সময়কার) Bannock, Ass প্রভৃতি তিন-চারটি শব্দ ভিন্ন বাকী সমস্ত শব্দই প্রাচীন Greek, Latin, Kelt ও অপরাপর ভাষা থেকে ধার করা।

আর ঠিক একই যুক্তিতে যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাকরণের, বিশেষ করে, বানানের জটিলতা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। বানান প্রসঙ্গ নিয়ে পূর্ব্বে একবার কিছু বলেছি। তাই এখন আর সে বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলে, শুধু ইঙ্গিত করতে চাই, শ্রদ্ধেয় বিজন বাবু, সুনীতিবাবু, রাজশেখরবাবু প্রভৃতির ন্যায় আরও কয়েকজন শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যসেবী এ বিষয়ে উদ্যোগী হ'লে ব্যাপারটার সুমীমাংসার সূত্র খুঁজে বার করা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত নীতিতে বিষয়টির জটিলতার সম্যক্ মীমাংসা হয় নি বলা চলে। পিতার সংযত শাসন ও মাতার অপরিসীম স্নেহের মধ্যে দিয়েই যেমন সন্তানের চরিত্র সুগঠিত হয়ে উঠে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্রতে, ঠিক অনুরূপভাবেই ব্যাকরণের সংযম ও লিখন-শৈলীর স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই ভাষা ও সমৃদ্ধি অর্জ্জন করে জাতির কৃষ্টি-লালনের কর্ত্তব্যে। আর একটি কথা, ভাষাকে আন্তর্জ্জাতিক স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করাতে হলে শুধুমাত্র সরলীকরণ করেই নয়—সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য সৃষ্টি করেই তা সম্ভব। আমাদের বাংলা দেশে যদি আরও দু-চারজন মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণ জন্মাতেন তবে ইতিমধ্যেই বাংলা অন্যতম বিশ্বভাষার পরিণত হ'ত। বঙ্গ-ভারতীর চরণ-বেদীতলে এ আকুতি জানিয়েই আমি আলোচ্য প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টানলাম।

বৃহদীশ্বর মন্দির গাত্রে অঙ্কিত নারী চিত্র

(প্রথম যুগের লোক শিল্প, গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম্)

চোল শিল্প

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

মৌর্য্যযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ মৌর্য্যযুগ হইতে মুসলমানগণের ভারত আগমনের কাল পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসকে তিনটি বিশেষ যুগে বিভক্ত করেন।

(১) মৌর্য্যোত্তর যুগ (আঃ ১৮৪ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৩২০ খ্রীঃ অঃ)

(২) গুপ্তোত্তর যুগ (আঃ ৫৬৭ খ্রীঃ অঃ—৬০৩ খ্রীঃ অঃ)

(৩) হর্ষোত্তর যুগ (আঃ ৬৪৭ খ্রীঃ—১২০০ খ্রীঃ)

সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে যতদূর জানা যায় প্রথমোক্ত যুগে ভারতের সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলে চারিটি রাজ্য ছিল ; কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে চোল, কন্যাকুমারী অঞ্চলে পাণ্ড্য, উত্তর মালাবারে সত্যপুত্র, এবং দক্ষিণ-মালাবারে কেরলপুত্র। ইহাদের মধ্যে চোল রাজ্যই বিশেষ ক্ষমতাশালী। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চোলরাজ "এলর" সিংহল অধিকার করেন।

দ্বিতীয় যুগে ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে কাঞ্চীর পল্লবরাজ সিংহ-বিষ্ণু বাহুবলে চোল, পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য জয় করিয়া তামিল ভাষী-গণের মধ্যে এক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করেন। এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতেই দাক্ষিণাত্যের তামিল সাহিত্য ও শিল্প-কলা প্রভৃতির বীজ অঙ্কুরিত হয়। পল্লব বংশের শেষ রাজা নরসিংহ বর্ম্মণের মৃত্যুর পর পল্লবগণ শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং চোলরাজ প্রথম আদিত্য ক্ষমতা অধিকার করেন।

চোলগণ কর্ত্তৃক ক্ষমতা পুনরধিকারের কাল হইতেই দাক্ষিণাত্যের তৃতীয় যুগের সূচনা হয়। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়ালয় চোলের সময় হইতে চোল বংশের গৌরবময় যুগ সূচিত হয়। তিনি উত্তরে কলিঙ্গ ও দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত রাজ্য জয় করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি "গঙ্গৈকোণ্ড" অর্থাৎ গঙ্গাতীর বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রিচিনোপল্লী অঞ্চলে গঙ্গৈকোণ্ড চোলপুরম্ নামে এক রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রণতরী নিকোবর, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপের কতকাংশ অধিকার করে। তাহার ফলে ঐ সব দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অবসানে চোলগণ হীনবল হইয়া পড়ে।

দ্বাদশ শতাব্দীর উন্নত শিল্প পুরুষ ও নারী মূর্ত্তি
(কোদাম্বলূর)

সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম দক্ষিণ-ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু জৈনধর্ম্ম তাহার পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যে বিস্তার লাভ করে এবং প্রথম যুগের জৈন মন্দির প্রভৃতির নিদর্শনগুলি হইতে অনুমান করা যায়, প্রথম যুগে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা জৈনধর্ম্মের প্রভাব অধিকতর ছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্বিতীয় যুগে পল্লব অধিকারের কালে সুদূর দক্ষিণে সমগ্র তামিল রাজ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য সাধিত হইয়াছিল। তামিল সাহিত্য, শিল্পকলা ও স্থাপত্যে সেই সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পল্লবদের সময় হইতে বৈদিক ধর্ম্মের একটা স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই সময় হইতে যে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান সূচিত হয় চোল ভাস্কর্যশিল্প ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলি তাহার প্রমাণ।

পল্লব সংস্কৃতির ধারায় চোল ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্প বিকশিত হয়। তামিল সভ্যতার ইতিহাসে পল্লবরাজ মহেন্দ্র বর্ম্মা একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন (কুমারস্বামী)। ত্রিচিনোপল্লী ও মামল্লপুরমের (মহাবলীপুরমের) গুহামন্দির ওরথ পল্লব শিল্পের নিদর্শন। পল্লবগণের পরে চোলরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নবম-শতাব্দী হইতে এই শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। স্থপতিবিদ্যার দিক দিয়া চোল যুগ দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। রাজারাজের সময় নির্ম্মিত তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির চোল যুগের শ্রেষ্ঠ মন্দির। রাজেন্দ্র চোল দেবের নূতন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের বিমান (মন্দির শীর্ষের কারুকার্য্য খচিত অংশ) ও তাঞ্জোরের মন্দিরের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন (ক্রামরিশ)। চোলযুগের মন্দিরের অপর বৈশিষ্ট্য গোপুরম্ বা প্রবেশ-তোরণও তাহার শিল্প কার্য্য। কুম্ভকোণমের বিরাট গোপুরম সুবিখ্যাত। চোল যুগের শিল্পপ্রভাব অদ্যাপি যবদ্বীপ, কাম্বোজ প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরে দৃষ্টি-গোচর হয়। রাজেন্দ্র চোল প্রতিষ্ঠিত গঙ্গৈকোণ্ড চোলপুরমের বিরাট শিব মন্দির ও প্রশস্ত প্রাসাদ চোলরাজগণের শিল্প-প্রীতির নিদর্শন। চোল যুগ দাক্ষিণাত্যে ভাস্কর ও স্থপতি শিল্প-বিপ্লবের এবং কিংবদন্তী ও ঐতিহ্যের যুগ। ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন আপনাদের গৌরব ও যশ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ও যে তাঁহাদের বহু মন্দির ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণে উদ্বুদ্ধ করে নাই তাহা বলা চলে না।

চোল যুগের পিত্তলশিল্প ও ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। শিবভক্তদের, বিশেষভাবে আপ্পর স্বামীর মূর্ত্তি সকলের চিত্তাকর্ষক। ভক্তি-ভাবাবনত হৃদয়ে করজোড়ে অপ্পর স্বামী একটি নিড়ানী হস্তে মন্দিরের আগাছা উৎপাটনের জন্য মন্দির হইতে মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। রাজারাজের তাঞ্জোর মন্দিরের নটরাজ এবং ঐ জেলায় প্রাপ্ত (মাদ্রাজ যাদুঘরে রক্ষিত) আরও দুইটি নটরাজের মূর্ত্তি চোল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন। এই তাণ্ডব নৃত্যের মূর্ত্তিতে চতুর্ভুজ শিব (নটরাজ) অন্তগামী সূর্য রূপ অগ্নি-মণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া ত্রিপুরাসুরের উপর নৃত্য করিতেছেন। ঊর্দ্ধে উত্তোলিত এক হস্তে প্রলয়াগ্নি ও অপর হস্তে ডমরু, নিম্নের এক হস্তে বিশ্ববাসীকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিতেছেন ও অপর হস্ত নৃত্যতালে উত্থিত চরণের দিকে প্রসারিত করিয়া এই পদই পরম ও চরম আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

গুপ্ত যুগের ভারতীয় উন্নত শিল্পের ধারায় দাক্ষিণাত্যে শিল্পের উদ্ভব হইলেও চোল ও দাক্ষিণাত্য শিল্পের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। চোল যুগেই সর্ব্ব প্রথম দাক্ষিণাত্যের বহু "তিরু" বা পবিত্র মন্দির নগরী গড়িয়া ওঠে। এই সকল মন্দির নগরী কোনও একটি কেন্দ্রীয় প্রধান মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দিরের যোজনায় ক্রমশঃ কালে এক একটি তীর্থ নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপেই তাঞ্জোর, গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম, দারাসুরম, ত্রিভুবনম, বাহুর প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। চোল যুগেই চিদাম্বরমে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম ক্ষুদ্র নটরাজ মন্দির বিরাট মন্দিরে পরিণত হয়। এই যুগে সিংহলের পোলন্নারুভ ও অনুরাধাপুরম হইতে গোদাবরী যোজনায় অবস্থিত দ্রাক্ষারাম পর্য্যন্ত বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণে তীর্থ নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। অনুমান করা যায় এই কার্য্যে চোলরাজ্যের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজ্য হইতেও বহু শিল্পী সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের শিল্পে উহাদের প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু স্থানীয় চোলশিল্পীগণ তাহাদের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিজস্ব একটি বৈশিষ্টপূর্ণ পৃথক চোল শিল্প গড়িয়া তোলে। সামান্য মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেই গুপ্ত যুগের অজন্তা প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলির দেহাকৃতি ও গঠন ভঙ্গিমার সহিত পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। অজন্তার ক্ষীণ কটি ও

গান্দেশসহ হইতেছে স্থূল বক্ষ ও নিতম্ব চোল শিল্পে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গ্রাম্য-লোক শিল্পের ধারায় সেখানে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-পুষ্ট দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। চোল শিল্পের মূর্ত্তিগুলির স্থূল কটি ও গন্ডদেশ-কর্ম্মঠ অবয়ব ও গ্রাম্য পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম যুগের চোল শিল্প অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্য স্থূল রুচির পরিচয় দিলেও একাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগ হইতে এই বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মন্দির গাত্রের কারুকার্য্যে ও মূর্ত্তিগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত পল্লীর লোক শিল্পের অপূর্ব্ব উন্নত সমন্বয় দেখা যায়। কোদাম্বলুরের মন্দির বিমান, কালুগামালাইর ভেট্টুভন কবিলের শৃঙ্গ প্রভৃতি উহার নিদর্শন। কুম্ভকোণমের নাগেশ্বর এবং কালুগামালাইর অসম্পূর্ণ পর্ব্বত-খোদিত মন্দির পল্লী লোক শিল্প ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব্ব সমন্বয়ের নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই শিল্পের সমন্বয়ধারা ও ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা যায়। পরবর্ত্তী বিজয়নগর রাজ্যে এই শিল্পধারাই তাহাদের পথপ্রদর্শক। ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্যের শিল্পে চোল শিল্প একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তর-ভারতে এমন কি অজন্তা, এলোরা প্রভৃতি স্থানেও প্রাচীন ভারতীয় নন্দীকেশ্বর নৃত্যভঙ্গিমার রূপ ও প্রভাব দেখা যায়; অপর পক্ষে দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে ভরতনাট্যমের রূপ ও প্রভাব সেইরূপই অনুধাবন করা যায়। নন্দীকেশ্বরের ঐতিহ্যময় নাট্যধর্ম্মী অলৌকিক নৃত্য ও দেহভঙ্গিমা অজন্তা প্রভৃতির ভাস্কর শিল্পে স্পষ্ট; অপর দিকে ভরতনাট্যমের লৌকিক-নৃত্য ও দেহভঙ্গিমাই চোল শিল্পে অধিকতর পরিস্ফুট। চোল লোক শিল্পের সমন্বয় ধারা অবলম্বনেই কেরলা প্রদেশের কথাকলি নৃত্যের জন্ম। চোল শিল্পের অনেক স্থলে মন্দির প্রভৃতির অঙ্কনে কথাকলির নৃত্য ভঙ্গিমা ধরা যায়। দাক্ষিণাত্যের সকল প্রকার শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও নৃত্য-নাট্য প্রভৃতি মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রগুলির সহিত জড়িত থাকিয়া উৎকর্ষ লাভ করে। এই শিল্পে নায়নার (শৈব) ও আলভার (বৈষ্ণব) উভয় সম্প্রদায়েরই প্রায় সমান প্রভাব দেখা যায়। দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত মন্দিরগুলি অতি বিশাল, শত-সহস্র স্তম্ভযুক্ত এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য মণ্ডিত। রামেশ্বর মন্দির উহাদের একটি নিদর্শন। গুপ্ত যুগে অজন্তা প্রভৃতিতে শিল্পীগণ প্রস্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং চোল শিল্পীগণ মন্দিরে মন্দিরে সেই প্রাণস্পন্দন ধ্বনির ঝঙ্কার শোনাইয়াছেন।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

শ্রীবিভা সরকার

কে উদাসী আষাঢ়ের নবঘন দিনে
হোমবহ্নি দিল জ্বালি হৃদয়ের বীণে।
কারে চাহি হেনা তার গন্ধ মনোহরা
অমিত ধারায় ঢালি ভরি দিল ধরা?
কণ্টকের আবরণে নিজেরে গোপনী
কেতকী সুবাস ঢালি করে আলাপনি।
বেপথু লগনে এই চঞ্চল পবন
ঘর ভোলা এ বাতাসে ব্যাকুলিত মন।

বৃষ্টির নূপুরে ফেলি চরণ চঞ্চলা
আকাশ দিগন্তে মেলি বাদল মেখলা
দেবকন্যা বিরহিনী বর্ষা ঐ আসে
কদম্ব কেশর মাখি আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।
অব্যক্ত বেদনা বহি বিশ্বের বিরহী
কোন কথা গুঞ্জরিছে অন্তরালে বহি।
ভুবন ভরি কি কাঁদে বক্ষের বেদনা
বিরহ কাঁদে না শুধু কাঁদে সাথে নিঃসঙ্গ চেতনা।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট নিমু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিমু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিমুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিমু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

প্রথম উৎসাহ লাভ করে যে ৩৫টি গীতি সংগ্রহ করেছিলাম—তাহারই রামায়ণ আখ্যানমূলক ৮টি গীতি এখানে উপস্থিত করব। তৎপূর্ব্বে আরও কিছু বলার প্রয়োজন আছে। কৃষ্ণপুরের গাজন-উৎসব এই অঞ্চলে সুপরিচিত। গাজন ও চড়ক উৎসবের পূর্ব্বাহ্নে গ্রাম্য গায়েনগণ এই গীতিগুলি শিবঠাকুরের উদ্দেশ্যে গাহিয়া থাকেন। যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে এই গানগুলি গীত হয় তাহার পূর্ণ বিবরণ আমি অন্যত্র দিয়াছি—সেখানে "বোলানগান" সম্বন্ধেও সবিস্তারে আলোচনা করেছি।৪ ঐ ৩৫টি গানই শিব-ঠাকুরের উদ্দেশ্যে গীত হয়। কিন্তু শিবকথামূলক গান খুব বেশী নয়। রামায়ণ, মহাভারত,পুরাণ, কৃষ্ণলীলা, শচীনিমাই, শিবমাহাত্ম্য-সূচক সকলপ্রকার গানই এগুলির মধ্যে আছে। প্রহ্লাদচন্দ্র তরফদার নামক এক পাটনী এই গীতিগুলির স্রষ্টা বলে পরিচিত। আমার উক্ত প্রবন্ধে এই প্রহ্লাদচন্দ্রের একটি নাতিদীর্ঘ জীবনীও দিয়েছি, ঐ সঙ্গে এই গীতিগুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছি। কিন্তু প্রহ্লাদচন্দ্র এই সব গীতিগুলির স্রষ্টা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ সকল গীতের শেষে প্রহ্লাদের ভনিতা নেই। আমাদের আলোচ্য রামায়ণ গানগুলিতে ত কোন ভনিতাই নেই—কেবলমাত্র ৫নং গীতে হরিদাস নামক এক ব্যক্তির ভনিতা পাওয়া যায়। সংগৃহীত পল্লীগীতিগুলি পাঠ করলে একটি বিষয় চোখে পড়ে, তা হচ্ছে—পল্লীকবি ও গানের শ্রোতাদের পৃথক দেবদেবী ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সমদৃষ্টি। দুঃখ ও দারিদ্র্যের ফলে যে কারুণ্য তাদের গার্হস্থ্যজীবনেই বারে বারে দেখা দেয়—গার্হস্থ্যজীবনের সেই কারুণ্যই এই আখ্যানগীতিগুলির প্রাণ। কি রামায়ণ, কি মহাভারত, কি শিব-কথা—সকল গীতেই আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তা হচ্ছে—নদীয়াবাসীদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বৈষ্ণবরস বা হরিভক্তি। রামায়ণ গীতগুলিও সেই রসধারায় প্লাবিত। তাই দেখি :

আগে রাম মধ্যে সীতা পিছু লক্ষ্মণ যায়,
অযোধ্যা সহিত কেঁদে করে হায় হায়। (৫নং গীতি)

চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নবদ্বীপের যে অবস্থা হয়েছিল—অযোধ্যায় এ অবস্থাও যেন সেইরূপ। আবার হরি-ভক্তির প্লাবনে একটি রামায়ণ আখ্যানের শেষ হয়েছে এই ভাবে :

তবে মদন মুরারী হরি তাইতে আমরা চরণ ধরি
আর তোমরা সবে বল হরিহরি। (৮নং গীতি)

বাংলা দেশের রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের পূর্ণ ঐশ্বর্য্য নেই। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থ যেন এদেশের সামাজিক উত্তরাধিকার। কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে সামনে রেখেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাঙালী সমাজ-জীবন ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সর্ব্বাংশে মিলিয়ে-মিশিয়ে তাঁর রচনাকে ঢেলে সেজেছিলেন। তাই এ গ্রন্থ বাংলা দেশের এক স্বতন্ত্র মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। এ একদিক দিয়ে লাভ হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা বাল্মীকি রামায়ণের পৌরুষদীপ্ত চরিত্র, গাম্ভীর্য্য, বলিষ্ঠতা এবং বর্ণনার চমৎকারিত্ব পাই না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে গাম্ভীর্য্যটুকু ছিল তাও নানা কারণে, বিশেষ করে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে, লুপ্ত হয়ে যায়। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পরেই এই নদীয়াতেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয় এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রভাব রামায়ণকেও স্পর্শ করে।

১৩০৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পাদনা করতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম কৃত্তিবাসের মূল রচনার দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। ১৩১০ সালে সাহিত্য পরিষৎ হতে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ছায়াপাত সুস্পষ্ট, কিন্তু এই উত্তরাকাণ্ডে শৈবপ্রভাবই লক্ষিত হয়।" এর থেকে বোঝা যায় যে, কৃত্তিবাসের মূল রচনা আমাদের মধ্যে রক্ষিত হয় নি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্যত্র লিখেছেন—"কৃত্তিবাস অন্যূন ৪৫০ বৎসরের লোক। কিন্তু তদরচিত রামায়ণের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ১৮০২ সন অপেক্ষা প্রাচীনতর নহে। ইহার পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে বটতলায় কৃত্তি-বাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। শেষোক্ত মুদ্রিত হস্তকের আদর্শ ১৮০২ সনে মুদ্রিত হস্তকের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর বটতলা হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হয়, তাহা উক্ত শ্রীরামপুরী রামায়ণের ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংশোধিত সংস্করণ। কালে এই সংস্করণই সাধারণ্যে বহুল প্রসার লাভ করে। এবং ইহার প্রতিযোগিতায় অপর সংস্করণ লুপ্ত হইয়া যায়। এখন এদেশে সর্ব্বত্র যে রামায়ণ পঠিত হইতেছে তাহা ঐ জয়গোপালী সংস্করণের পুনঃসংস্করণ মাত্র।"৫ এই রামায়ণের সঙ্গেই আবার এসে মিশেছে এদেশেরই পূর্ব্ব-রচিত নানা করুণ কাহিনী ও উপাখ্যান। যা স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ, কাল্পনিক ও কোমল। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন স্বীকারই করেছেন যে, "Many of the incidents described in our Bengali Ramayanas and Mahabharatas, were gathered from local folklove. These do not form a part of the original Sanskrit epics".৬ গ্রামের প্রাচীন ধারায় ঐ গানগুলির সৃষ্টি হয়েছিল আনন্দের তাগিদেই। পূজা, পার্ব্বণ উৎসব ও আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেই এগুলির জন্ম। বিশেষ করে বাংলার পেলব পলিমাটিতে যা জন্ম নেয় তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কোমলতা ও মধুরতা। আমাদের আলোচ্য এই পল্লীগীতি-গুলির ক্ষেত্রেও এদেশের চিরাচরিত রামায়ণ প্রবাহের ধারা ক্রিয়া করেছে। পল্লী-কবিরা প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে যেগুলিতে তাঁদের নিজ জীবনের ছবি রূপ পেয়েছে সেইগুলিই গ্রহণ করেছেন এবং প্রচলিত রামায়ণ মহাকাব্যই তাঁদের আদর্শ হয়েছে। তাঁরা

৪। নদীয়ার পল্লীগীতি—বোলান। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬৪।

৫। অযোধ্যাকাণ্ডের ভূমিকা (১৩০৭)—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬। Folk Literature of Bengal, p. 17. D. C. Sen,

সহরের কারসাজী

ভুতোদা: আহাহা কি রান্না! কি স্বাদ! কিরে বিমলা বল বল।

বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না। আমাকে আর একটু মাছের ঝোল দিনতো।

বিনয়: আমাকেও। আর একটু চচ্চড়ী। সত্যিই ডালনা, মাছ, তরকারী, মাংস সবই অপূর্ব।

ভুতোদা: ভাগ্যিস সেদিন মেনি-দির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তানাহলে এই পোড়া সহরে কি এমন রান্না খাওয়া যায়।

মেনিদি ৪ মাস আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে খেয়েছি সে রান্নার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো। এত বিরাট সহর-এত লোকজন; এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না খাওয়ালাম!

ভুতোদা: ছ্যাঃ! এ সহরের লোকজনের তাড়াহুড়ো করেই জীবন কেটে যায়। রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?

বিনয়। তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা। মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার জন্য প্রান হাতে করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গাদাগাদি ভীড়। চৌরঙ্গীর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক পিঠে খোঁচা খেয়ে হাত ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন" আপনি আমার পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ৯ টা ৪৫ মিঃ এখন সোয়া দশটা দয়া করে যদি নামেন তাহলে আমি অফিস যেতে পারি।

বিমল: হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ

ভুতোদা: হাসছিস কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও ফাইন আর্ট বাঁচে? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট। অনেক সময় লাগে, অনেক যত্ন লাগে। মেনিদি, যদি এই পোড়া শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না করতে পারতেন?

বিনয়: কেন না? তাড়াহুড়ো তো আমরা করছি। রান্না তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহুড়ো কোথায়?

ভুতোদা: ইকনমিক্স পড়েছিস? ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের ব্যাপারটা জানিস। যারা খাবে তারা যদি ভাল খাবার না খায় তাহলে তারা রান্না করে তাদের ভাল খাবার করার উৎসাহ থাকে?

আর সারাদিন বাসে ট্রামে আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে আর ভাল খাবার সম্বন্ধে ভাবার উৎসাহ কোথায় ?

বিমল: আপনি বলতে চান যে এখানে ভাল রান্না হতে পারেনা ?

ভুতোদা: হয় তো হতে পারে কিন্তু আমাদের মধুপুরের মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ নেই লোকে মনের আনন্দে খায়, মেয়েরা সব সময়ই নতুন নতুন খাবারের কথা ভাবে। এই মেনিদির রান্নাই দ্যখনা।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা বলছো ভুতো। রান্না সম্বন্ধে আমরা কি সহরের কাছ থেকে কম শিখেছি ?

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেকট্রিক গ্যাস' এ্যালুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।

বিনয়: আপনি রান্নাবান্নার কথা বলছেন তো "ডালডার" কথাই ধরুননা। "ডালডা" এখন সহরে গ্রামে লক্ষ, লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু "ডালডা" প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেরই বাজারে।

ভুতোদা: তুমিও কি "ডালডা" ব্যবহার কর নাকি মেনিদি:

মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো "ডালডা"য় হয়েছে।

ভুতোদা এ্যাঁ: ! ডাল, চচ্চড়ি, শুক্‌তো,মাছ, মাংস, সবই "ডালডা"য় ? আমিতো জানতাম "ডালডা"য় শুধু ভাজা-ভুজিই হয়।

বিমল: কেন ভুতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই বলেছি যে "ডালডা" সব রান্নার পক্ষেই ভাল এবং পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে "ডালডা" ব্যবহার হচ্ছে।

ভুতোদা: ও: সেইজন্তে ! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল হয়েছিল কেন। এতক্ষণে বুঝলাম

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই "ডালডায়" হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলে সেদিনও সব রান্নাই "ডালডায়" হয়েছিল।

বিমল: কি ভুতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন।

DL/P. 8B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড থে

বাল্মীকি কৃত্তিবাসী রামায়ণ এসব কিছুই বোঝে না। গ্রামীণ কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন এগুলির একটা বিশেষ আবেদন আছে। এগুলি একাধারে, ধর্ম্ম, নীতিকথা, আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী। পল্লী-কবিরা এই সবগুলির উপর লক্ষ্য রেখেই তাঁদের গান রচনা করেন। আমাদের পল্লী-কবিও এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। এছাড়া মধ্যবঙ্গের গাঙ্গের বদ্বীপে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান। মাথাভাঙা, চূর্ণী ও ইছামতীর সলিলপ্রবাহে লীলাচঞ্চল এই অঞ্চলে নদীর প্রভাবও কম নয়। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স এই মাথাভাঙাকেই "Great feeder canal of Central Bengal" বলেছেন। এদের প্রবাহিত পীযূষধারায় আমরা নিত্য অভিষিক্ত হই। এই সমস্তগুলিও আমাদের পল্লী-কবিদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

বাংলা দেশে হিন্দু রেনেসাঁর আরম্ভ হয় বোধ হয় ত্রয়োদশ শতকে এবং এই সময় হতে এদেশের সাহিত্যেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সময় হতে রচিত অধিকাংশ বাংলা গ্রন্থে—সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। ঠিক এই সময়কার গ্রামীণ সাহিত্যেও হিন্দু-মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে। ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব্বে সৃষ্ট বাংলা গ্রামীণ সাহিত্যে হিন্দু কাব্য ও পুরাণের প্রভাব তেমন দেখা যায় না। বরং সওদাগরী বণিক জাতির কথাতেই তখনকার রূপকথা, গাথা ও আখ্যানগুলি রচিত। কাঞ্চনমালা, মধুমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গল্পে তার পরিচয় আছে। আমাদের নদীয়ার এই অঞ্চলে লোক-সংস্কৃতির বিকাশ না হবারই কথা। কারণ কিছুদিন আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শিবনিবাসকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য বিধি প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীনকাল হতেই ভাগীরথীর দু'তীর ব্যাপ্ত হয়ে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু-সংস্কৃতির অনুশীলন চলছে এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে। তাই প্রাক-ব্রাহ্মণ্য যুগেও এই অঞ্চলে বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতির যে উপাদান বর্ত্তমান ছিল তা প্রবল হিন্দু প্রভাবের ফলে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে নি। চূর্ণীতীরের এই অঞ্চল ভাগীরথী বা বঙ্গের বারাণসী নবদ্বীপ হতে খুব বেশি দূর নয়। তবু অব্রাহ্মণ্য, প্রাগার্য ও বৌদ্ধ-স্মৃতির দু'একটি উৎসব এখনও এই অঞ্চলে জীবিত আছে—কিন্তু সেগুলি ব্রাহ্মণ্য উৎসবের সঙ্গে মিতালী করেই বেঁচে থাকতে পেরেছে। হাজরা ঠাকুর, পাঁচুঠাকুর, শীতলা, ষষ্ঠী, মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতির পূজা-উৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। চড়ক পূজা ও নীলপূজা ত বৌদ্ধ-স্মৃতিকেই বহন করে চলেছে। আবার কোন কোন স্থলে এ সবগুলি মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। আবার এসবগুলির উপরে বৈষ্ণবতাই যেন বেশি। আমাদের গ্রাম্য গায়েনেরা এই 'বোলানগানগুলি' গাইবার পূর্ব্বে একটি বন্দনা গান করেন। এই বন্দনা গান শিবের উদ্দেশ্যে গীত হলেও এখানে অনেক দেবদেবীর উল্লেখ আছে। বিশেষ করে নবদ্বীপ ও চৈতন্যদেবের মহিমাই বেশি করে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বন্দনা গানখানি এখানে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে। গ্রাম্য গায়েনদের খাতায় যেমন আছে ঠিক সেই ভাবেই উপস্থিত করলাম।

এস মাগো সরস্বতী কি বলিতে জানি।
ওগো প্রথমে বন্দিব মায়ের চরণ দু'খানি॥
এস মাগো সরস্বতী স্কন্ধে দে মা পা।
গলায় দে মা সুরধনী কণ্ঠে সুর যায়॥
এস মাগো সরস্বতী বস মাগো রথে।
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে॥
যে বুলান বলিবা মাগো তাই বলিব আমি।
দশের মাঝে ভাঙলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি॥
বন্দনা করিতে আমার হবে অনেকক্ষণ।
একেবারে বন্দে গাব যত দেবতাগণ॥
এ বন্দনা করিতে আমার যে দেবতা এড়ায়।
লক্ষ লক্ষ প্রণাম হই সেই দেবতার পায়॥
শুন শুন সভাজন করি নিবেদন।
প্রথমে বন্দিব হরগৌরীর চরণ॥
নবদ্বীপে বন্দে গাব নদের বুড়োশিব।
চারি দিকে বেড়া গঙ্গা মধ্যে নবদ্বীপ॥
গিরিমাখা বস্ত্রখানি ধড়ি উড়ে যায়।
এখান হতে প্রণাম হই সেই দেবতার পায়॥
নবদ্বীপে বন্দে গাব চৈতন্য গোঁসাই।
হরি বলে বাহু তুলে নাচে দুটি ভাই॥
উত্তরে বাহিনী গঙ্গা দক্ষিণেতে বসি।
যাহা গঙ্গা গয়া কাশী গোলক বারাণসী॥
দরশনে মুক্তি মায়ের পরশিলে হয়।
বিমানেতে স্বর্গে যেতে যম দাঁড়ায়ে রয়॥
ভূমণ্ডলে এসে মাগো অধম করলে পার।
সাগর রাজার বংশ ধ্বনী করিলে উদ্ধার॥
সংসারেতে এসে মাগো ভিন্ন করে নিলে।
শত বৎসর শিবনাথের জটার মধ্যে ছিলে॥
জ্যান্ত থাকতে বাড়ীর কর্ত্তা মনে হয় পর।
আগে বলি মৃত্যু মরা বাড়ীর বাহির কর॥
গঙ্গার কিনারে লয়ে পুড়ায়ে করে ছাই।
কোথায় রইল পিতামাতা কোথাই রইল ভাই॥
ভাই বল বন্ধু বল কেহ কারো নয়।
অসময়ে আছেন সেই কৃষ্ণ দয়াময়॥
কালীঘাটে বন্দে গাব ঠাকুর জগন্নাথ।
কে কোথায় দেখে তোমায় ওগো দীননাথ॥
শ্রীক্ষেত্র যেতে ভাই পথে বড় দুখ।
তাহার জনম আর হবে না দেখলে চাঁদ মুখ॥

বাগনা পাড়ায়[৭] বন্দে গাব ঠাকুর গোপেশ্বর।
তাহার মহিমা দেখ জগৎ ভিতর।
বৃন্দাবনে বন্দে গাব মদন গোপাল।
রাখাল বেশে চরিয়ে ছিল নব লক্ষ পাল।
গুপ্তিপাড়ায়[৮] বন্দে গাব গুপ্ত বারাণসী।
বৃন্দাবনচন্দ্রের হাতে আছে সোনার বাঁশী।
এই পর্য্যন্ত রইল ভাই এই বন্দনার গান।
প্রহ্লাদ পাটনী ভনে এই দেব নাম।

আমাদের পল্লীকবি কিন্তু নিজগ্রামের অর্থাৎ শিবনিবাসের বুড়োশিবের বন্দনা করতে ভুলে গেছেন। এ বুড়োশিব হয়ত খুব আপন বলেই এমন হয়েছে। আমাদের পল্লীকবি হরগৌরীর বন্দনা শেষ করেই, নদের বুড়োশিব,' নবদ্বীপের চৈতন্যদেব, আমাদেরই বাড়ীর কাছের গঙ্গা নদী, কালীঘাট, শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, বাগনাপাড়ার গোপেশ্বর, গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র এবং বৃন্দাবনের মদনগোপালকে বন্দনা করেছেন। শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবন ছাড়া পল্লীকবি বর্ণিত সকল স্থানই তার আপন গ্রাম-মাতার নিকটবর্ত্তী। আরও উল্লেখযোগ্য গঙ্গা নদীর বন্দনা করতে গিয়ে কবি অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন এবং অতি সরল ভাষায়। এই বন্দনাগীতি যে প্রহ্লাদ তরফদারের নামে প্রচলিত তাঁর পেশা ছিল ঘাটের খেয়া দেওয়া। সে জন্যই বোধ হয় এই দীর্ঘ নদীপ্রসঙ্গ। শিবের বন্দনা করতে গিয়ে কবির কত দেবদেবীর কথাই না মনে হয়েছে। কবি যথাসাধ্য তাঁদের স্মরণ করেছেন। যাঁদের স্মরণ করতে কবি ভুলে গেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেও কবি সভয়ে বলেছেন—

এ বন্দনা করিতে আমার যে দেবতা এড়ায়,
লক্ষ লক্ষ প্রণাম হই সেই দেবতার পায় (বন্দনা গীত)

দেবদেবী সম্বন্ধে এই ভীতি-প্রবণতা আমাদের পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে আজও বিরল নয়।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এদেশের রামায়ণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

"Everywhere in the Bengali Ramayanas we find Bengali life with its good and bad qualities shadowing the epic of Valmiki, but bringing it a step nearer to the Beagali home. Indeed the idea of the Bengali rustics are strewn over the pages of the Bengali Ramayanas so profusely, that the poets, it may be said, fully succeeded in making these Ramayanas their own in every respect."[৯]

বাংলা রামায়ণ সম্বন্ধে একথা সর্ব্বৈব সত্য। এ দেশের রামায়ণকারেরা এ দেশের জীবনের ছবিই রামায়ণের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন্যই রামায়ণ এত প্রিয়। তাই আজও গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার এত সমাদর। এখনও আমাদের গ্রামাঞ্চলে সায়ংকালে বারোয়ারী তলায় রামায়ণ, পাঁচালী গীত হয়—শ্রোতারা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তা আস্বাদন করে। চড়ক পূজার প্রাকালে নদীয়ার এই গ্রামাঞ্চলে বর্ত্তমান রামায়ণ গীতিগুলি পক্ষকাল ব্যাপী গীত হয়, গ্রামের আকাশ-বাতাসে গায়েনদের সুর ছড়িয়ে পড়ে। ওদের সুরের সঙ্গে যে কাহিনীগুলি বাঙ্ময় হয়ে উঠে তা যেন কোন দেবদেবতার নয়, এ যেন তাদের নিজেরই কথা। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, দশাননের সীতাহরণ, রামলক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস, দশরথের পুত্রশোক, রামলক্ষ্মণের বিদায় গ্রহণ, সীতা কর্ত্তৃক বনবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণন, অন্ধমুনির পুত্রবধ, সুর্পনখা উপাখ্যান, এই কয়টিই আমাদের গীতের আখ্যান বিষয়। এগুলির মধ্য দিয়ে এ দেশের পারিবারিক জীবনের ব্যথা, বেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি বাঙালী চরিত্র লক্ষণগুলি যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ইহাই এই পল্লীগীতিগুলির বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথও দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথার' ভূমিকায় এ দেশের গৃহাশ্রম ধর্ম্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজের ভিত্তি, রামায়ণ সে গৃহাশ্রমের কাব্য।" এই ঘরের কথাই নদীয়ার এই পল্লীগীতিগুলিতেও মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

১

ও রাম বনে গিয়ে রাজা দশরথ করলেন স্বর্গেতে গমন
ঐ শুনে ভরত এলেন ত্বরা অযোধ্যা ভুবন।
ও রাম গেছেন যে পথে ভরত গেলেন সেই পথে
গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্ম আনলেন গৃহেতে
দেখে শত্রুঘ্ন কয় রায় অনুজে পদ পেলে কার কাছে?

---

(৭) বাগনাপাড়া—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। ধর্ম্মচর্চ্চার অন্যতম কেন্দ্র। এখানকার গোপেশ্বর বিগ্রহ অতি প্রসিদ্ধ।

(৮) গুপ্তিপাড়া—হুগলী জেলার সদর মহকুমার বলাগড় থানার গ্রাম। ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লাইনের ষ্টেশন, কলিকাতা হইতে ৪৭ মাইল, গঙ্গাতীরের প্রাচীন গ্রাম, এখানে বহু দেবমন্দিরের মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের পোড়ামাটির মূর্ত্তির কারুকার্য্য অপূর্ব্ব। এককালে বহু সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাস ছিল। নবজ্ঞান ভারতী, পৃঃ ১৯৭।)

(৯) The Bengali Ramayanas (1920)—D. C. Sen; p-88.

ভরত বলরে সত্য করে রাম বনে কেমন আছে
গিয়েছিলে রাঘাবন, করে এলে অন্বেষণ,
ভাল ত আছে সে লক্ষ্মণ, আছে কুশলে কি মা
জানকী বল বিবরণ।
সেই সীতা সতী রঘুপতি সঙ্গেতে বাস করতেছে।

অভাগিনী মায়ের নাম বুঝি ভুলেও গিয়েছে—
বনেতে যখন ও রাম করলেন গমন,
ভরত, তোর জননী বলেছিল কুবচন।
সেই নিষ্ঠুর বাক্যে আমার বক্ষে শেল হেনে যে রয়েছে।

পদ্ম নয় বিভিন্ন এতো সেই শ্রীরামধনের শ্রীপদচিহ্ন
যেখানে আমায় ভুলে ডাকুক আমায় মা বলে,
বধির দূর হয়ে যাক কর্ণ।

ও রাম পদ যদি আমায় মা বলে তোমায় করি আশীর্ব্বাদ
ঐ শোক নিবারণ হবে যে আমার হবে না প্রমাদ।
রামের পাদুকা ভরত করিয়া সখা রাখে আপন মনে সিংহাসনে
আমার রামের কথা মনে হলে যাবো পদকার কাছে।

২

আমি দশরথের পুত্রবধূ আমার নাম সীতা সতী,
ঐ সূর্য্য বংশের চূড়ামণি নাম যে রঘুনাথ আমার সে
হন প্রাণপতি।
ও-হায় ঐ পিতৃসত্য পালনে রাম হন বনচারী সঙ্গে
ছিলেন তার নারী
মায়া মৃগরূপ হেরে চিত্ত চঞ্চল করে গো গেলেন আমার
বাক্যে মৃগ ধরতে রাম ধনুকধারী।
ও হায়, সেই অবসরে যোগীর বেশে দুষ্ট দশানন,
আমায় আনলে হরে অশোক বনে ভাসতেছি নয়ন জলে।

মরকটের বেশে তুমি এখানে এলে কোন ছলে—
মিটির মিটির চায় আবার লোম ছাটা
তুমি কও দেখি কার বেটা
শুনি পশুর মুখে ডাকতেছে ধ্বনি জয় রাম বলে।

এমন মধুমাখা রামের নাম কেমনে পেলে
ঐ রাম বিহনে মম আগুনে জীবন দগ্ধ হয়—

তুমি কে এমন সময় রামের নাম শুনালে সবিশেষ
খাওনা বলে
ওগো এই অশোক বনে কেন এলে শুনবো পরিচয়।
রাবণ মায়াধারী মায়া করে মন ছলে আমারও হায়
আমার মন ভুলাতে দুষ্ট রাবণ বেড়ায় ছলে কৌশলে।

দুষ্ট রাবণ রাজার চেড়ী,
যদি তার বাক্যেতে দুঃখেতে ওগো যন্ত্রণা দেয় ভারী।
কেউ বা ধরে প্রহার করে মারে গো আমায়
আমি বলবো কি তোমায়,
আমার কাঁদিতে জন্ম গেল হয়ে রাজকুমারী।

তুমি নর কি বানর হও নিশাচর সত্য তাই কও আমার কাছে,
ঐ কত মায়া জানে সেই রাবণ তাই সন্দেহ হতেছে।
ঐ দাঁত খিচিয়ে লেজ গুটিয়ে বেড়াও এখানে,
দেখে সন্দেহ হয় মনে—
আমি জনক নন্দিনী দয়াল রামের ঘরণী গো—
করলে ছল চাতুরী আমায় সনে বাঁচবে না প্রাণে।
আমার জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব ধন রাম রঘুমণি
রামের অদর্শনে অশোক বনে জীবন আমার যায় জ্বলে।

এমন রামায়ণ-গান নদীয়ার এই অঞ্চলে আরও প্রচলিত আছে—এ বিষয়ে উদ্যমী লোকেরা সচেষ্ট হলে এই লুপ্তপ্রায় গীতগুলি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ—বিশেষ করে বটতলার রামায়ণ কাহিনীই—এই অসংবদ্ধ ও অসংস্কৃত গানগুলির উৎস। তবে পল্লী কবিরা নিজের ভাব ভাষা দিয়ে এগুলির আদল বদলেছেন। গ্রাম্য সুরই এগুলির প্রাণ। সেই বিশেষ পরিবেশ—বিশেষ সুরে গীত না হলে এ গানের কোনই মূল্য থাকে না। বাংলার গ্রাম্য সাহিত্যে ও ছড়ায় রামায়ণের কথা তেমন প্রচার লাভ করে নি—যেমন প্রচারিত হয়েছে হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথা। কিন্তু এই হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কাহিনীগুলির মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন—"বাংলা দেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"১০ আমাদের এই গীতিকাটি সেই দুর্লভ গ্রাম্য রামায়ণ সাহিত্যে নূতন সংযোজনা হ'ল বলে মনে করি।

(১০) লোক-সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ

অনুভা গুপ্তা বলেন! "বিশুদ্ধ ও মোলায়েম লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করার দরুণই আমার লাবণ্য সুন্দর থাকে। লাক্স টয়লেট সাবানের মোলায়েম সরের মত ফেণা আমার ত্বককে উজ্জ্বল রাখে।"
আপনার সৌন্দর্য্য চর্চ্চার জন্যে সর্বদাই লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন। লাক্সের কোমল সুগন্ধ আপনাকে স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখবে।
বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাক্স
টয়লেট
সাবান
LUX
TOILET SOAP

পরিচয়

শ্রীদীপককুমার দত্ত

এক সময় চাঁদ ডুবে গেল।—রাত অনেক হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল নিলয়। এতক্ষণ ছাদের উপর বসেছিল চুপচাপ। একাকী বসে বসে চিন্তা করতে ভারি ভাল লাগছিল তার। একটা মধুর আবেশে এতক্ষণ বিভোর হয়ে ছিল। এত রাত হয়ে গিয়েছে, তা সে ভাবতেই পারে নি।—আকাশের দিকে তাকাতেই চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল তার। দেখতে পেল সপ্তর্ষিকে। মুগ্ধ হয়ে গেল। ভারি ভাল লাগল তার। রোজই ত সপ্তর্ষিকে দেখছে ও। কিন্তু আজকের মত এত মধুর, এত অপরূপ ত তার কোন দিন মনে হয় নি।

বিকেলবেলা নূতন শিল্পীদের চিত্র-প্রদর্শনী থেকে এসে নিলয়ের সব কিছু ভাল লাগছে। বাড়ী এসে কিছুক্ষণ গুন্ গুন্ করে গানও গেয়েছে। একটা উপন্যাসের পরিসমাপ্তি নিয়ে আজ ক'দিন যে মহা সমস্যায় পড়েছিল—তার সুন্দর সমাধানও করে ফেলেছে।

তার পর ছাদে এসে বসেছে। চিন্তার আবেশে এতক্ষণ বিভোর হয়ে ছিল সে।

একটা অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভরে গিয়েছে নিলয়ের মন। সাহিত্যিক বন্ধু অমিত সরকারের সঙ্গে চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল সে।—দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল স্থির। সমস্ত সত্তা হারিয়ে গিয়েছিল একটা সৃষ্টির মাঝে। একটা অপূর্ব্ব সার্থক-সৃষ্টি। সাত-রঙা কল্পনার রং মিশে সৃষ্ট অপরূপ জীবন্ত, আশ্চর্য্য দীপ্যমান। চিত্রটি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। অসীমা সেন নামে একজন মহিলা চিত্রটির সৃষ্টিকর্ত্রী। সুকুমার শিল্প-জগতে নবাগতা শিল্পীকে মনে মনে বার বার অভিনন্দন জানিয়েছে সে। সত্যিই একটা মন-জয়-করা শিল্প-সৃষ্টি।

একটা আশ্চর্য্য শিহরণ, অপূর্ব্ব অনুভূতি নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছিল নিলয়।

ছাদ থেকে নেমে ধীরে ধীরে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল সে। বিছানায় শুয়ে ঘুমবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। কেম যেন শুধু অসীমা সেনের কথাই মনে পড়ছে। অসীমা সেনের চিন্তাই তার মনকে পেয়ে বসেছে। সব চিন্তার বড় চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।—সহসা তার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী-মূর্ত্তি। একাগ্রচিত্তে এঁকে চলেছে ছবি। তুলির এক এক আঁচড়ে বাস্তব হয়ে উঠছে—কল্পনা। চারদিকে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি তৈলচিত্র, ওয়াটার পেণ্টিং, স্কেচ।

হঠাৎ তার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল সেই চিত্রাঙ্কনরতা নারী। নিলয়ের মনটা যেন কেমন হয়ে গেল।

অসীমা সেন তবে তাঁর সৃষ্টির মতই সুন্দর, তাঁর সৃষ্টির মতই অপরূপ। সে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারল, কোন রকম অবস্থাই অসীমাকে বিচলিত করতে পারে না। সব রকম পরিবেশেই সে অপরূপ, শান্ত, স্নিগ্ধ। অসীমা সেনের কথা ভাবতে কেন যেন তার ভারি ভাল লাগছে। সাহিত্যিক জীবনে বহু কিছু দেখেছে নিলয়। কত লোকের কত সৃষ্টি দেখেছে, দেখেছে ভাবের সুন্দর রূপায়ণ। কোন কিছুই ত তার মনে এমন দোলা দিতে পারে নি! কাকেও নিয়ে ত তার মন এমন চিন্তা করে নি। আজ কেন তবে অসীমা সেনের কথা তার বার বার মনে পড়ছে? যাকে জানে না, চেনে না, শুধু মাত্র তার সৃষ্টি দেখেই তার মনে এল অদ্ভুত আলোড়ন। চিন্তার কোন অর্থ হয় না, তবু সে চিন্তা করে চলল। বাস্তব চেতনার অজ্ঞাতে তার অসংবৃত মন কাজ করে চলেছে, রচনা করে চলেছে এক উজ্জ্বল পটভূমি।···আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের মধ্যে দিয়ে তার রাত যে কখন কেটে গেল, তা সে একটুও টের পেল না।

সকালে আবার সে চিত্র-প্রদর্শনীতে গেল। কাহাকেও সঙ্গে নিল না, গেল একা। গতকাল প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিটি দেখে তার তৃপ্তি হয় নি। তন্ময় বিস্ময়ে ছবিটি আবার দেখল। তার পর প্রদর্শনী থেকে অসীমা সেনের ঠিকানা সংগ্রহ করে ফিরে এল। মুগ্ধ হৃদয়ের বিপুল অভিনন্দন অসীমা সেনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পরিচয় করতে হবে অসীমা সেনের সঙ্গে।

একখানা চিঠি লিখল সে অসীমা দেবীকে—তার শিল্প সৃষ্টির প্রশংসা করে। ছবিগুলি সে যে বার বার দেখেছে এবং তার দেহে মনে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি যে এখনও লেগে রয়েছে, তা জানাতে ভুলল না।

কয়েক দিন পর সে একখানা চিঠি পেল। সাগরনীল খামে-ভরা একখানা চিঠি। অসীমা সেনের চিঠি। মুক্তার অক্ষরে লেখা একখানি চিঠি। এত সুন্দর হাতের লেখা। অসীমা সেনের সব কিছুই বুঝি সুন্দর! তার আচার-ব্যবহার, প্রতিটি কাজ, দেহ-মন—সবই সুন্দর।

নিলয় বার বার পড়ল চিঠিটা। বেশ বড় চিঠি। চিঠির এক জায়গায় লিখেছে—'আপনার চিঠিটা আমাকে কতখানি যে আনন্দ দিয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারব না।' চিঠির শেষে লিখেছে—

'সময় পেলে একদিন আসবেন। খুব খুশী হব, আপনার মত সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। আমি সেই ভাগ্যেরই অধিকারিণী হতে চাই।'...কথাগুলি তার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। সযত্নে রেখে দিল চিঠিটা।

বারোর-তিন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন খুঁজে পেতে দেরী হ'ল না। বিকেলবেলা আজ কোথাও না গিয়ে এখানেই এল। বন্ধু অমিতের বাড়ীতে আজ তার নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সকালের সাগরনীল খামের চিঠিটা তাকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার খুঁজে খুঁজে নম্বরটা বার করল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে নিলয় বাড়ীটার দিকে একবার মাথা উঁচু করে তাকাল। বেশ চমৎকার একটা দোতলা বাড়ী। বাইরে থেকে বেশ লাগে বাড়ীটাকে দেখতে।

কড়া নাড়ল নিলয়। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। একটি চৌদ্দ-পনর বৎসরের ছেলে বেরিয়ে এল। বোধ হয় বাড়ীর চাকর।

নিলয় বলল, অসীমা দেবীর কাছে এসেছিলাম। তিনি কি—

—দিদিমণি ত বাড়ীতে নেই। ফিরতে তাঁর দেরী হবে।

নিলয়ের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। খুশীমনে এত দূর সে এল, এমনভাবে ফিরে যাবার জন্তে?

ফিরে এসে ট্যাক্সিতে বসল। ভেবেছিল—বিকেলটা চমৎকার কাটবে। কিন্তু তা আর হ'ল না। দুর্ভাগ্য তার। এসে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। ব্যর্থ হয়ে গেল হৃদয়ের রঙিন আয়োজন। অসীমা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার কি উদগ্র ইচ্ছা নিয়েই না সে এসেছিল! কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল তার মন। রংচটা স্বাদহীন বিকেল! নেই আনন্দ, প্রাণের মিষ্টি পরিচয়।

—আজকেই সে আসবে, অসীমা দেবী হয়ত তা ভাবতে পারেন নি। নইলে নিশ্চয়ই বাইরে বেরোতেন না। মনে মনে নিলয় নিজেকে বোঝাতে থাকে।

বাড়ী ফিরতেই মা বললেন, একটা মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গেছে। এই কিছুক্ষণ আগে গেল।

—কি রকম দেখতে? কত বয়স? অস্বাভাবিক উৎকর্ণ হয়ে ওঠে নিলয়।

—দেখতে খুবই সুন্দর। মাথাভর্তি কোঁকড়ান চুল। বয়স কত, তা কেমন করে বলব? তবে একুশ-বাইশ হতে পারে।

—নাম কি? চোখ দুটো জলজল্ করতে থাকে নিলয়ের।

—যাঃ, নাম জিজ্ঞেস করতে ত ভুলে গেছি।

নিশ্চয়ই অসীমা দেবী এসেছিলেন। তা ছাড়া ঐ রকম চেহারার কোন মহিলাকে ত তার মনে পড়ছে না। ইস, বাড়ী থেকে বের হয়ে আজ সে কি ভুলই না করেছে। নিজের উপর তার ভারী রাগ হয়। বসে বসে শুধু ঠোঁট কামড়াতে থাকে সে।

একটা মাসিক পত্রিকার মধ্যে মন বসাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'ল, কেবলই অসীমা সেনের কথা মনে পড়ছে তার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমকের মত ভেসে উঠছে, সুন্দর একটি মুখ, টানা টানা চোখ, মিষ্টি হাসি, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল।

একটা সিগারেট ধরাল নিলয়। সিগারেটটা ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে এল। ছোট্ট আগুনের গোল চুরুকিটা ছাইয়ের মাঝে ঢাকা পড়ে গেল এক সময়। আর একটা সিগারেট ধরাল সে।

সিগারেট টানতে টানতে একটা অদ্ভুত শিহরণে ভরে গেল নিলয়ের মন। দুলে উঠল বুকটা। সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করল একটা নতুন কিছু। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার নিজের ঘরের মধ্যে বসে সে হঠাৎ বুঝতে পারল, অপরিচিতা অদেখা অসীমা সেন তার মনের বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে বসেছেন। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, অসীমা সেনকে সে ভালবেসে ফেলেছে। তা নইলে তাঁর কথা সে এত চিন্তা করবে কেন?...তাঁর দেখা না পাওয়ায় মনটাই বা এমন মিইয়ে যাবে কেন?...দৃষ্টির দুরধিগম্য অন্তরালে তার মন কেমন অদ্ভুত অভিনয়ই না করে চলেছে।

পর দিন সমস্ত দিনটা বাড়ীতেই কাটাল। কোথাও বেরোল না। যদি অসীমা দেবী এসে ফিরে যান! সারা দিন কেউই এল না।

সন্ধ্যে বেলায় বারোর-তিন গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে গিয়ে নিলয় হাজির হ'ল।

কড়া নাড়তেই একজন স্ত্রীলোক বের হয়ে এল। আপাদ-মস্তক নিলয়কে লক্ষ্য করে বলল, কি দরকার?

নিলয় একটু চমকে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অসীমা দেবী কি বাড়ী আছেন?—বলে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মহিলাটির দিকে।

—নমস্কার! আমিই অসীমা দেবী। আপনার নামটা কি?

নিলয়ের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। একটা ঢোক গিলে কোন মতে একটা মিথ্যা নাম ছুঁড়ে দিল, হরিপদ পাঠক। প্রতিনমস্কার জানাতে ভুলে গেল সে।

—আসুন, ভিতরে আসুন।

—না, ভিতরে আর যাব না। কি বলবে, কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলে উঠল, আপনার পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটা যদি বিক্রী করেন, তবে কিনতাম। কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে উঠল নিলয়ের।

—মাপ করবেন, ওটা আমি ইউনিভারসিটিকে প্রেজেণ্ট করব

দ্রুত-প্রকম্প পদক্ষেপে সেখান থেকে সরে এল নিলয়। অসীমা দেবীর মুখখানার কথা মনে পড়তেই আবার আঁৎকে উঠল সে। চ্যাপ্টা মুখ, কালো কুচকুচে, বসন্তের দাগে ভরা, চোখ দুটো কুতকুতে, ভ্রূ নেই বললেই চলে, সামনের দুটো দাঁত বেশ উঁচু।

চলতে চলতে হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে উঠল। চকিতে পাশের লাইট-পোষ্টটা চেপে ধরল দু'হাতে।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে সে টের পেল, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ভারী লজ্জা পেল সে। ছিঃ, সে এত দুর্বল!

একটা ট্যাক্সিতে উঠে বলল, চালাও শ্যামবাজার।

প্রাচীন ভারতের দু'টি লিপি

শ্রীদীপক সেন

ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী

প্রাচীন ভারতে কবে থেকে লেখার মাধ্যমে ভাষাকে প্রকাশ করা সুরু হয়েছিল সে কথা বলা শক্ত। তবে অন্যান্য দেশের মতই লেখার প্রচলন ভারতীয় সভ্যতা আরম্ভের বেশ অনেক পরে যে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য হচ্ছে বৈদিক সাহিত্য। সেই সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য যে লেখা হয়েছিল এমন কোনও নজির আমাদের নেই। যে সব সাধক মুনি ঋষিরা বেদ রচনা করেছিলেন তাঁরা লেখনীর পরিবর্ত্তে স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিতেন। বহুকাল যাবৎ সুধু শ্রুতি এবং স্মৃতির সহায়তায় বৈদিক সাহিত্যকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে অবশ্য লিপিবদ্ধই করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষে লেখার প্রচলনের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ের একটি বৌদ্ধ সুত্তন্তে আছে যে বালকদের মধ্যে 'অখরিক' (lettering বা word-making) খেলা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। ভগবান বুদ্ধের জীবন চরিত 'ললিত বিস্তারে' বলা হয়েছে যে অতি শৈশবেই বুদ্ধদেব লিখবার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। যাঁরা লিখবার কৌশল জানতেন তাঁদের জনসাধারণ খুবই সম্মান করতেন। ব্যক্তি-গত বা সমষ্টিগত সর্ব্ববিধ বৈষয়িক ব্যাপারেই যে প্রাচীন ভারতে লিখিত প্রমাণ রাখা হ'ত বৌদ্ধ সাহিত্যে তার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। অতএব এ কথা বেশ সহজেই প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতক বরাবর ভারতবর্ষে লেখার প্রচলন বেশ প্রসার লাভ করেছিল।

লিপিমালার প্রচলন ব্যতীত লেখার প্রচলন হওয়া সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন লিপিমালার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে যেমন অনেক কথা জানা গেছে, প্রাচীন ভারতে প্রচলিত লিপিমালার ক্ষেত্রে আবার তেমনই অনেক কথা অজানা রয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম উল্লেখযোগ্য সভ্যতা হচ্ছে সিন্ধু উপত্যকার। মহেঞ্জদারো এবং হরাপ্পার। সিন্ধু সভ্যতার লোকেরাও লিপিমালার ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে এই লিপিমালা ব্যবহৃত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত অনেক পণ্ডিত ও গবেষকের অক্লান্ত পরিশ্রমেও এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। এই প্রসঙ্গে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, ষ্টিফেন ল্যাংডন, ফাদার হেরাস, হান্টার, হোর্জনে, স্বামী শঙ্করানন্দের নাম উল্লেখ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

প্রাচীনত্বের বিচারে সিন্ধু উপত্যকার লিপিমালার পরেই ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর স্থান। ব্রাহ্মী লিপি লেখা হ'ত বাঁ থেকে ডাইনে। পরবর্ত্তী কালের বহু ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত লিপির জনক হিসাবে ব্রাহ্মী লিপির মূল্য অপরিমেয়। অনেক পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও লিপিতাত্ত্বিক মনে করেন যে, ভারতীয়েরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বাহন হিসাবে এই লিপিমালার প্রবর্ত্তন করেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা ব্রাহ্মী লিপির মধ্যে খুব সুষ্ঠুভাবেই বজায় রাখা হয়। এই কারণে পৃথিবীর প্রাচীন লিপিমালার মধ্যে ব্রাহ্মী নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। সুধু সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাকেও ব্রাহ্মী লিপি রূপায়োপে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মী লিপির নামকরণ কি ভাবে এবং কি কারণে এ রকম হ'ল সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন যে, এই লিপির প্রবর্ত্তনের বহু বৎসর পরে বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নামে এর নামকরণ হয় ব্রাহ্মী।

কানিংহাম, ডওসন প্রমুখ গবেষকের মতে ভারতবর্ষের মাটিতেই ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি। এডওয়ার্ড টমাস ও তাঁর অনুবর্ত্তনকারীরা বলেন যে, এই লিপিমালার উৎপত্তির মূলে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাব ছিল। জেমস প্রিন্সেপ, সেনার্ট, মূলার প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে গ্রীক্ লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গে 'সেমিটিক' আর কেউ কেউ 'ফিনিশির' লিপির সাদৃশ্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন। এ ছাড়া এই ব্যাপারে আরও অনেক মতবাদ আছে।

ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য জেমস প্রিন্সেপ। ভারত বিদ্যা তথা প্রাচ্য সংস্কৃতির তথ্যানুসন্ধানে জেমস প্রিন্সেপের সাধনা ও দান অসামান্য। প্রিন্সেপের উত্তরসাধকদের মধ্যে ম্যাসন, ল্যাসেন, নরিস, কানিংহাম, বুলোর প্রমুখ অনেকে ব্রাহ্মী লিপি নিয়ে গবেষণা করেছেন।

ব্রাহ্মী লিপির সাহায্যে যে সব শিলালিপি, অনুশাসন ও লেখ রচিত হয়েছিল সেগুলি পাঠোদ্ধার করার পর প্রাচীন ভারতেতিহাসের অনেক অধ্যায়ই আজ আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপর হয়েছে। সুধু অনুশাসন, শিলালিপি নয়, বিভিন্ন রাজার মুদ্রায়, এমন কি উপ-জাতীয় সঙ্ঘ (Tribal) সমূহের মুদ্রায় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মী হরফের ব্যবহার হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত প্রাচীনতম অনুশাসনগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশের বস্তিজেলার প্রাপ্ত পিপরাওয়ার vase inscription অথবা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় ও গোরখপুরের নিকট সোহগৌরায় প্রাপ্ত অনুশাসন সমূহ সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

ছাড়া মৌর্য্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে, অশোকের পৌত্র দশরথের অনুশাসনে, মৌর্য্যোত্তর যুগে, কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালিপিতে, এমন কি ব্যাকটিয়ান গ্রীক রাজ প্যান্টালিয়ন ও এ্যাগাথোক্লিসের মুদ্রায়, গুপ্তরাজন্যের শিলালিপি শীলমোহর ও মুদ্রায়, খখরাত বংশীয় ক্ষত্রপদের মুদ্রায় এবং গুপ্তোত্তর যুগের রাজন্যদের সময়েও ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রাজকার্য্যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক থেকে প্রায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, এমন কি দক্ষিণাত্যেও। বর্ত্তমান দেবনাগরী লিপিতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হয়ে ব্রাহ্মী লিপিই নূতন রূপ পরিগ্রহ করে আত্মগোপন করে আছে—এ অতি বড় ঐতিহাসিক সত্য।

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম, চতুর্থ শতক থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে, পাঞ্জাবে, গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের উত্তর-পশ্চিম অংশে 'খরোষ্ঠী' নামে পরিচিত একটি লিপির প্রচলন ছিল। 'খরোষ্ঠী' হচ্ছে 'এ্যারামাইক' গোষ্ঠীভুক্ত এবং আরবী, ফারসীর মত এরও লিখবার পদ্ধতি হচ্ছে ডান থেকে বাঁয়ে। বৈদেশিক গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা খরোষ্ঠী, ব্যাকট্রো-পালি, এরিয়ানো-পালি প্রভৃতি নামেও এই খরোষ্ঠি লিপিকেই আখ্যা দিয়েছেন। এডওয়ার্ড টমাস মনে করেন যে, খরোষ্ঠি সুধু 'এ্যারামাইক' গোষ্ঠীর লিপিই নয়, 'সেমিটিক' গোষ্ঠীর লিপির সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে। কানিংহাম, টেলর প্রমুখ মনীষীরাও টমাসের এই মতবাদ সমর্থন করেছেন। আর যাই হোক, খরোষ্ঠী লিপির উৎপত্তি যে বহির্ভারতীয় এবং বৈদেশিক রাজারাই যে এই লিপিমালার ব্যবহার করতেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ পর্য্যন্তও নাই।

পারস্যের সম্রাট দারায়ুস (অনুমান ৫০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে) উত্তর পশ্চিম ভারতে হিন্দু এবং গন্দার (সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকা ও গন্ধার) অধিকার করেছিলেন। সে সময়ে পারস্যে, পশ্চিম এশিয়ায়, সিরিয়া ও মিশরে এ্যারামায়িক ভাষা ও লিপির প্রচলন ছিল। তক্ষশীলা (পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলা, পাকিস্থান) ও আফগানিস্থানে) এরামিক শিলালিপি পাওয়া গেছে। কাজেই দারায়ুসের রাজত্বকালে এবং তার পরবর্ত্তীকালে রাজনৈতিক কারণে, বিশেষতঃ প্রয়োজনের তাগিদেই বোধ হয় এই এরামিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত খরোষ্ঠি লিপিমালার প্রচলন হয়।

পারসিক সম্রাট দারায়ুসের পরবর্ত্তী যে ইন্দো-গ্রীক্ বা ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক্, সিথিয়ান, কুষাণ ও ক্ষত্রপ বংশীয়েরা উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতে শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরা তাঁদের মুদ্রায় এবং অনুশাসনসমূহে খরোষ্ঠি লিপিতে তৎকাল প্রচলিত ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। ওয়ারদক (আফগানিস্থান), সোয়াট (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), তীরথ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), ভাকড়িবাহী রাজাতীর (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্থান), উদ্দ বা উদভাণ্ডপুর, তক্ষশীলা ফতেজঙ্গ, মানকিয়ালা, আরা (পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্থান), মানসেরা (হাজারা জেলা) ও শাহবাজগরী (পেশওয়ার জেলা) প্রভৃতি স্থানের খরোষ্ঠী শিলালিপি ও অনুশাসন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষের থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনেক উপাদানের সন্ধান পেয়ে থাকি। মানসেরা ও শাহবাজগরী হচ্ছে ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশে (অধুনা পাকিস্থান)। এই দুই জায়গায় সম্রাট অশোকের যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তা হচ্ছে খরোষ্ঠীতে লেখা। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্থানীয় এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে স্বয়ং ভারতীয় রাজন্যবর্গও খরোষ্ঠীর সাহায্য নিয়েছেন। কুনিন্দ এবং উদুম্বর প্রমুখ সঙ্ঘ বা শ্রেণীবদ্ধ ভারতীয় উপজাতিয়েরাও তাদের মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক কারণেই যে খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত হ'ত ভারতীয় উপজাতীয়দের মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

উজ্জয়িনী, কাথিওয়াড় ও নাসিকে যে ক্ষত্রপ বংশীয় রাজারা ছিলেন তাঁদের শিলালিপি, অনুশাসন এবং মুদ্রায় খরোষ্ঠী ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু শেষের দিকে তাঁরাও ব্রাহ্মীর ব্যবহার সুরু করেন। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত হয় নি আদৌ। তার কারণ হচ্ছে এই যে, বহির্ভারতীয়েরা ভারতবর্ষে বসবাস করার পর অচিরেই তাদের বহির্ভারতীয় স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা ভারতীয় হয়েছেন মনেপ্রাণে। উত্তর ভারতেই তাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন নি, কাজেই যতদিনে তাঁদের পদচিহ্ন দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে পৌঁছায় ততদিনে তাঁরা সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে গিয়েছেন।

পূর্ব্ব তুর্কিস্থানের নিয়া ও লৌলানে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে খরোষ্ঠী দলিল দস্তাবেজে ও নথিপত্রের আবিষ্কারের পর এ কথাও প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষের বাইরেও খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত হ'ত। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর অরেল ষ্টাইন হচ্ছেন পূর্ব্ব তুর্কিস্থানের খরোষ্ঠী নথিপত্রের আবিষ্কর্ত্তা।

খরোষ্ঠী লিপি সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্যর অরেল, কানিংহাম, টমাস, বয়ার, টেলর, র‍্যাপসন, সেনার্ট লেভী, কিসেল, স্মিথ, বুলার, বেইলী, বারো, হোয়াইটহেড, ননীগোপাল মজুমদার, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র দাশগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খরোষ্ঠী লিপির নাম এ রকম কেন হ'ল এ নিয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'খর' শব্দের অর্থ 'গাধা'। খর এবং ওষ্ঠ এই দুই নিয়ে ইংরেজীতে হয় 'ass lip' শুনতেই যেন কেমন কেমন করে।

খরোষ্ঠী লিপি বহুকাল হ'ল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যদিচ এর প্রভাবে আর কোনও ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি হয় নি তবুও ভারত ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়ের অনেক কথাই খরোষ্ঠী লিপির সহায়তায় আমরা জানতে পেরেছি। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী এই

দুটি লিপিই বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহারের বাইরে চলে গেছে, তথাপি এদের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়।

অর্থাৎ

অভিষেকের পর বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে দেবতাদের প্রিয়

ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম অধুনা রুম্মিনডাই-এ প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের শিলালিপির অনুকৃতি। ব্রাহ্মী হরফে লিখিত এই কয়টি ছত্রের রূপ বাংলা হরফে এই প্রকার হইবে।

দেবানপিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন
অতন আগাচ মহীয়িতে হিদ বুধ জাতে সক্যমুনীতি
সিলাবিগডভীচা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে
হিদ ভগবং জাতে তি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে
অঠভাগিয়ে চ।

প্রিয়দর্শী রাজা এই স্থানে এসে উপাসনা (শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ) করেন কারণ এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এই স্থানে আগমনকে স্মরণীয় করার জন্য তিনি একটি প্রস্তর নির্মিত দেওয়াল এবং শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়েছিলেন। যেহেতু এই স্থানে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেহেতু তিনি লুম্বিনীগ্রামকে করমুক্ত করেন এবং সেই স্থানের জমির খাজনা নির্দ্ধারিত হারের পরিবর্ত্তে ⅛ অংশ করে দেন।

শাহবাজগঢ়ীতে প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের শিলালিপির (সপ্তম) অনুকৃতি। খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত। এই লিপি ডান থেকে বাঁয়ে পড়তে হয়।

অর্থাৎ

দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করেন যে সর্ব্বত্র তাঁহার সাম্রাজ্যের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিবে। বস্তুতঃ তাহাদের (ধর্ম্ম সম্প্রদায়) সকলেই আত্ম-সংযম

দেবনম্প্রিয়ো প্রিয়সি রজ সবত্র ইছতি সব
প্রষণ্ড বসেয়ু সবে হি তে সয়মে ভবশুধি চ ইছতি
জনো চু উচবুচছন্দো উচবুচরগো তে সবত্রম একদেশম ব
পি কষতি বিপুলে পি চু দানে যস নস্তি সয়ম ভব
শুধি কিত্রঞত দ্রিঢভতিত নিচ পঢম

ও চিত্তের শুচিতা লাভ করিতে ইচ্ছুক। মানুষ অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রবণতা ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাহারা স্বীয় কর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ মাত্র সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেহ যদি খুব দানশীলও হয় অথচ যদি আত্মসংযমী না হয় যদি তার চিত্তের শুদ্ধি না থাকে, কৃতজ্ঞতা না থাকে এবং অচলা ভক্তি না থাকে তাহা হইলে সে অতি অপদার্থ (নির্গুণ)।

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।

কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য পাঁচ টাকা। পৃষ্ঠা ২৪৯।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও তাহার সম্প্রসার তথ্য লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। এই গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলি দেখিয়া স্বতঃই মনে হইবে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতে কত মনীষীর সাধনা ও শ্রম ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কাঠামোর উপর আধুনিক যুগের নব্য সংস্কৃতি জন্মলাভ করিয়াছে। যদিও ইহার অনেক উপকরণই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর হইতে আহরণ করিয়া আনা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক জ্ঞান-বিনিময়ের মাধ্যমেই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশ এইরূপেই সমৃদ্ধ হইয়াছে। এই নূতন রূপপরিগ্রহের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মধ্যযুগের আলো-আঁধারি প্রাঙ্গণতলে আর এক নব রশ্মিপাত।

এই চেষ্টা বাংলা দেশ হইতেই প্রথম হইয়াছে। কয়েকজন ইংরেজ-মনীষীর সহায়তায় বাঙালীর অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার সংস্কৃতি তিলে তিলে জন্মলাভ করিয়াছে। এজন্য বাধা-বিঘ্নও তাঁহাদের কম অতিক্রম করিতে হয় নাই। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির যে ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার গঠনে তাই বাঙালীর কৃতিত্বই সর্ব্ববাদিসম্মত।

এই গ্রন্থে দেখিতে পাই, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন, টাউন হল, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, কৃষি সমাজ, মাধ্যমিক পাঠশালা, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, হেয়ার স্কুল, ডাফ সাহেবের স্কুল, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ, মেটকাফ হল, ফ্রীস্কুল, বেথুন স্কুল ও কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলা-মহাবিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ, সেনেট হল, অ্যালবার্ট হল, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, বঙ্গীয় সাহিত্য

অত্যাশ্চর্য্য
কাপড় কাচার
পাউডার
Surf
নীলা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
মূল্য:
সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)
নীল
সার্ফ

পরিষদ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, সায়ান্স কলেজ, বসুবিজ্ঞান-মন্দির প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা, তাহাদের ইতিহাসকাল এবং তথ্যাদির বিষয় লইয়া আলোচিত হইয়াছে।

ঠিক এই ধরনের তথ্যমূলক পুস্তক আমাদের দেশে বিরল। বিশেষ অনুসন্ধিৎসা-মন না থাকিলে এই কাজ সুসম্পূর্ণও করা সম্ভব নয়। পূর্ব্বসূরিদের মধ্যে যাঁহারা এই কাজ করিয়া গিয়াছেন, সার্থকদান হিসাবে তাঁহাদের সহিত এক পঙক্তিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উদ্যম এবং নির্ভুল তথ্যসংগ্রহের প্রতি নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। যাঁহারা ইতিহাসের ছাত্র, জ্ঞান-পিপাসা যাঁহাদের প্রবল এবং যাঁহারা গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক তথ্যের সন্ধান পাইবেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয়। তাই জ্ঞানানুসন্ধানে ভারতের দীপঙ্কর পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, হুয়েন-সাঙ ছুটিয়া আসিয়াছিলেন সুদূর চীন হইতে। তাই মনে হয়, যোগেশবাবু যে সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর যে কোন জ্ঞান-পিপাসুর প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইবে। কারণ, "এই প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের সহিত এ যুগের বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানসিক প্রগতির ইতিহাস অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত হইয়া আছে।" ইহা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভূমিকাতেই বলিয়াছেন।
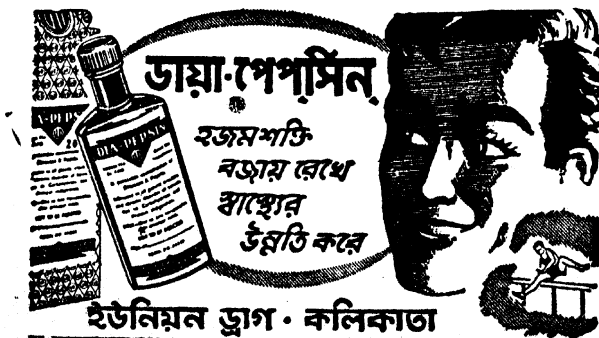
যোগেশবাবু সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হইল, তিনি শুধু তথ্য সংগ্রহ করিয়াই ছুটি লন নাই, ইহাকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার ভাবা প্রাঞ্জল এবং সুসংবদ্ধ। তাঁহার নিকট দেশ আরও অনেক কিছু আশা রাখে।

গ্রন্থের প্রকাশ-নৈপুণ্য এবং প্রচ্ছদপট রুচিসম্মত। বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা গ্রন্থের বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

একটি স্বাক্ষর—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

'একটি স্বাক্ষর' উপন্যাস। মন্মথ, তাঁহার স্ত্রী উর্ম্মিলা এবং লীলা, তপতী, স্বপন, স্বাতী এই কয়টি ছেলেমেয়ে লইয়া একটি সংসার। মন্মথ বড় অফিসার, উপার্জ্জন ভালই করেন—ইচ্ছা করিলে অন্য উপায়ে আরও রোজগার করিতে পারিতেন, কিন্তু ইহা তাঁহার চরিত্রে নাই। তিনি আদর্শ-বিলাসী, কিন্তু কোন লক্ষ্য নাই। তিনি নিজে আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইবেন এবং ছেলেমেয়েদের সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিবেন এমনি বিচিত্র খেয়ালের ভূত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। যে খেয়ালের যূপকাষ্ঠে তাঁহার স্ত্রী উর্ম্মিলাকেও আত্মবলি দিতে হইয়াছে। মন্মথ ভগবান মানেন না অথচ আদর্শ রাখিয়া যাইতে চান। এমনি অদ্ভুত চরিত্রের একটি টাইপ এই মন্মথ। একদিন চমৎকার উত্তর দিয়াছিলেন তাঁহার স্ত্রী উর্ম্মিলা। বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর মান না তুমি, অথচ আদর্শ সৃষ্টি করতে চাও মানুষকে ভালবাসা দেখিয়ে—এ যেন সূর্য্যকে বাদ দিয়ে দিনের কল্পনা।"

চাকুরির জন্য মন্মথকে প্রায় বাহিরেই থাকিতে হইত। কাজেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবার ভার সম্পূর্ণ তাহাদের মাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া মন্মথকে নিশ্চিন্ত হইতে হইয়াছে। চিঠিতে সেই নির্দ্দেশই প্রায় থাকে—"আধুনিক সমাজের প্রজাপতি-মার্কা ছেলে-মেয়েদের দলে ওরা যেন ভিড় না জমায়। যেন সিনেমা, পার্টি, লেক, ময়দান, সংস্কৃতি চর্চ্চার ছলে নাচ-গানের আসর বসানো, এ সব নেশার রঙ ওদের মনে না ধরে।" ইত্যাদি। উর্ম্মিলার মনে আঘাত লাগে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, "এমন ভাবে নিয়ম-কানুনের নিগড় চাপিয়ে তরুণদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ করা যায় না। জীবন চায় আলো, চায় আনন্দ, উৎসব।

হইয়াছিলও তাহাই। একদিন তাহারা নিয়মের কঠিন বেড়া ভাঙিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

স্ত্রী-বিয়োগের পর মন্মথ আপন ভুল বুঝিতে পারিলেন। তখন ছেলে-মেয়েরা তাঁহার নাগালের বাইরে। আঘাতের পর আঘাত পাইয়া মন্মথ তখন বদলাইয়া গিয়াছেন। তাই স্বাতীর কথার উত্তরে তিনি নিজেই একস্থানে বলিয়া ফেলিয়াছেন—"মানুষের শক্তি সবদিক দিয়ে পূর্ণ নয়। এমন একটা না একটা দিক আছে—যা অন্যকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণ হয়। একটি শক্তি—প্রবল শক্তি—সে ঈশ্বরই হউক কিংবা প্রকৃতিই হউক তাকে অস্বীকার করা চলে না।"

এমনি সংঘাতের মধ্য দিয়া লেখক চমৎকার একটি শেষ পরিণতিতে গল্পটিকে লইয়া গিয়াছেন। আদর্শচ্যুত আধুনিক সমাজের প্রতি 'একটি স্বাক্ষর' চমৎকার চাবুক। বর্তমান সমাজে এই দিকদর্শনের প্রয়োজন ছিল। বিষয়বস্তুর জটিলতায় গল্পের গতি কোথাও মন্থর হয় নাই। বলিষ্ঠ হাতের কলা-কুশলতায় উপদেশকেও কোথাও উপদেশ বলিয়া মনে হয় নাই—লেখকের ইহাই বড় কৃতিত্ব। জানি না সাধারণে ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমরা বলিব 'একটি স্বাক্ষর' একটি সার্থক রচনা।

উপল উপকূলে—শ্রীনিমাইসাধন বসু, ২০।৩, চারুচন্দ্র সিংহ লেন, হাওড়া। মূল্য দু টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

লেখক ছাত্র-জীবনে কিছুদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, সেই সময়কার দেখা কয়েকটি অভিজ্ঞতার পট ভূমিকায় কয়েকটি গল্প লইয়া এই বইখানি লিখিয়াছেন। বিদেশ সম্বন্ধে জানিবার কৌতূহল আজও লোকের কমে নাই। কিন্তু যাঁহারাই তাঁহাদের কথা শুনাইয়াছেন, উপরতলার মানুষের কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। সাধারণ ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া আরও এক স্তরের মানুষ যে সেখানে বাস করে এবং তাহাদের জীবনও যে বৈচিত্র্যময় এ কথা কেহই জানিতে চান না বা জানিবার চেষ্টাও করেন না। লেখক তাঁহার এই গল্পগুলিতে সেই স্তরেরই কথা শুনাইয়াছেন যাঁহারা এ যাবৎ উপেক্ষাই পাইয়া আসিয়াছে। লেখকের ব্যক্তিত্ব এখানে সুস্পষ্ট। গল্পগুলি আপন বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়।

ইংলণ্ডের যে দিকটি এতকাল অন্ধকারের আড়ালে ছিল, লেখক সেখানে আলোকপাত করিয়া আমাদের অনেক নূতন জিনিস দেখাইলেন। অদ্ভুত সুন্দর লাগিল 'বিলেতে বাঙালী পিয়ন' গল্পটি। এমন আত্মীয়তা, এমন দরদ সত্যই বিরল। গল্প হিসাবে সকল গল্পেই নূতনত্ব আছে। লেখকের লিখিবার মুন্সিয়ানা আছে। পড়িতে ভাল লাগে। পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়াই বিশ্বাস রাখি।

শ্রীগৌতম সেন

আলোক-তীর্থ—শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল। প্রকাশক: ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী, সত্যধাম, কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর। মূল্য—সাত টাকা।

গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। শুধু ধর্ম্ম ও তত্ত্বের আলোচনা নয়, ভ্রান্ত সংস্কারের সমালোচনাও আছে। পাতা উল্টাইয়া এখানে-ওখানে চক্ষু বুলাইলে মনে হইতে পারে বইখানি বুঝি কোন তার্কিক র‍্যাশন্যালিষ্টের লেখা। সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে লেখক সত্যসন্ধানী শাস্ত্রবিৎ। নানারূপ বিশ্বাস ও সংস্কারে ধর্ম্ম ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, যুক্তিবাদী গ্রন্থকার তাহা নানা ভাবে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদ ও উপনিষদের আলোকে অস্পষ্টতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার জ্ঞানমার্গে বিশ্বাসী, ভক্তিমার্গের উপর ততটা শ্রদ্ধাশীল নন। প্রকৃত গুরু কে, মন্ত্র কি, নামজপের অর্থ কি প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পাঠকের স্তিমিত মনকে সক্রিয় করিয়া তোলে। গ্রন্থে পাঁচটি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগে পাঁচটি করিয়া অধ্যায়। লেখকের মতে অবতারবাদ বেদবিরুদ্ধ। গুরুকেও বিচার করিয়া বরণ করিতে হইবে। তিনি বলেন, সদ্‌গুরুলাভ শ্রেয়লাভের পথ। 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ তিনি বলিতেছেন, "সারা ভারত পর্য্যটন ক'রে বহু শাস্ত্র, সাধু এবং মঠ-মিশনের সংস্পর্শে এসে লক্ষ্য করলাম মনুষ্যত্বের অভাব, অভাব মানবিক মূল্যবোধের। ধর্ম্মের নামে চলেছে অনাচার। স্বাধীন চিন্তাশীলতার অভাব। মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে একরকম প্রায় বাঁধা। সম্প্রদায় আছে, সত্য নাই।" তাই লেখক বিচার-বুদ্ধির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়াছেন, পুস্তকের নামকরণ করিয়াছেন "আলোকতীর্থ।" কিন্তু বেদ-উপনিষদের উপর নির্ভর করিতে গিয়া তিনি পুরাণের উপর কিছু অবিচার করিয়াছেন। পুরাণের নিজস্ব মূল্য আছে। ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'পুরাণ-প্রবেশ' গ্রন্থে সে মূল্য নির্দ্ধারণের পরিচয় পাই। পার্জ্জিটার, জয়সাল অথবা আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অবশ্য পুরাণের ঐতিহাসিক দিকটাই বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের চিন্তার নির্ভীকতা প্রশংসনীয়। তিনি বহু দুরূহ বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইয়াছেন। বিচার-বুদ্ধি ভিন্ন অগ্রসর হইবার উপায় নাই। জ্ঞান জীবনের পথকে আলোকিত করে। ভক্তি চিত্তকে সরস করে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক গ্রন্থে বহু অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া আনন্দিত হইবেন। "আলোকতীর্থ" তাঁহার চিন্তাকে উদ্রিক্ত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আলোর আকাশ—শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত। এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—২৲।

স্বপ্ন সাধনা—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত। গ্রন্থ বলাকা, ১৫, ভূপেন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪। মূল্য—২৷০।

মৌনমুখর—প্রকাশক: এম্. এল্. দাস। ১৬৩এ, ডায়মণ্ড হারবার রোড। কলিকাতা-৩৪। মূল্য—০০.৫০ ন. প.।

ছাইভস্ম—২য় পর্যায়। শ্রীকেশবলাল দাস। প্রাপ্তিস্থান—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, মূল্য—৩৷০।

মালিকা—শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা। প্রাপ্তিস্থান: শরৎ বুক হাউস, ১৪-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১০

বনবীথি—শ্রীসলিল মিত্র ও অন্যান্য। চাঁদপুর, পোঃ চেঁচুড়া, দশঘরা, হুগলী। মূল্য—১৲।

এক যে ছিল রাজা—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত। প্রকাশক: শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং। ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—২৲।

কয়েকখানি কবিতার বই।

'আলোর আকাশ' ভাবে ভাষায় সমুজ্জ্বল। এতে প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা আছে। কবি বর্তমান যুগের দুঃখ দৈন্য হতাশাকে উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু একটি সমগ্র জীবনের মহিমার মধ্যে সব কিছুকে মিলিয়ে দেখেছেন।

'স্বপ্ন সাধনা'র কবিও প্রকৃতির সৌন্দর্যে ও জীবনের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ। রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর কবিতায় এনে দিয়েছে বর্ণচ্ছটা ও সৌকুমার্য।

'মৌনমুখর' ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সম্ভবতঃ কবি কঠিন রোগে পীড়িত, ছন্দোভঙ্গ সত্ত্বেও রচনায় একটি করুণ জীবন-পিপাসার সুর শুনতে পাওয়া যায়।

'ছাইভস্মে'র কবি প্রাচীন। আধুনিক পাঠক সম্ভবতঃ এ বইয়ে রস পাবেন না। অনুভূতি বা লালিত্য নয়, তুচ্ছ কথাকে পদ্যে সাজানোর খেলা এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

'মলিকা'র কবিও প্রাচীন, কিন্তু তিনি রবীন্দ্র-রস-তীর্থে অবগাহন, এবং কাব্য-সিদ্ধি লাভ করেছেন। এক সময়ে সাময়িক পত্রিকার পাঠকদের কাছে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এ কাব্য পুরানো হলেও চির নতুন।

'বনবীথি'তে পাঁচজন তরুণ কবি এক সঙ্গে তাঁদের কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের রচনা এখনও অপরিণত, কিন্তু তাঁদের কল্পনা এবং প্রকাশের ক্ষমতা আছে।

'এক যে ছিল রাজা' ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছোট্ট বই। এতে লেখক পদ্যে রাজা রামমোহন রায়ের জীবন কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাপের কথা—পরিবেশক: শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ। ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—১৷০।

ভারতবর্ষ নানা জাতীয় সাপের দেশ এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। কথাটা সত্য। বাংলা দেশে গ্রামে এই সাপের উপদ্রব খুব বেশী। বিষধর এবং নির্বিষ সাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবে বহুক্ষেত্রে নির্বিষ সাপের কামড়েও মানুষ আতঙ্কে প্রাণ হারায়। সময় মত সাবধান হইতে পারিলে বিষধর সাপের কামড়েও মানুষ মরে না।

বিভিন্ন জাতের সাপের চেহারার ও চরিত্রের বর্ণনা এই পুস্তকখানির মধ্যে সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে। সাপ সম্বন্ধে অহেতুক ভয় ও অজ্ঞতা যে কত বিপদ ডাকিয়া আনে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহা সহজেই জানা যায়।

পুস্তকখানির জন্য ভারত সরকার লেখককে ১৯৫৮ সনে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

মধুমালা—কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকাশক: ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য—২৲

গীতি নাট্য। এক সময় এই গীতি নাট্যটি মঞ্চস্থ হইলে প্রচুর প্রশংসা পাইয়াছিল।

প্রেমের একটি বিচিত্র সুর কল্পনা ও বাস্তবের সঙ্গে চমৎকার সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ঘুম পরী, স্বপন পরীকেও কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। কাজী নজরুল ইসলামের অপরূপ দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক-প্রকাশ পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

দণ্ডকারণ্যে ধান্য বপনোৎসব

দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত কয়াসগাঁও অঞ্চলের বড়গাঁও পুনর্ব্বাসন শিবিরবাসী পূর্ব্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু কৃষকগণ নূতন প্রস্তুত কৃষিক্ষেত্রে প্রথম বীজ বপন অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে গত ১১ই জুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন তিনটার সময় শুভলগ্নে স্বল্প আড়ম্বরে কিন্তু ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রমতে দেবার্চ্চনা করা হয়। পূজা শেষে যথারীতি শান্তিজলসেক ও প্রসাদ বিতরণের পর ঐ দিনকার অনুষ্ঠান শেষ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সদ্য উদ্ধৃত ধান্যক্ষেত্রে ভূমিপূজা, লাঙ্গল, মই ও বলদ বরণ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর নূতন ভূমিতে সদ্যক্রীত উৎকৃষ্ট বলদ সহযোগে ভূমিতে মই ও হলচালনসহ আশু ধান্যের বীজ বপন করা হয়। উভয় দিনের অনুষ্ঠানেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল উদ্বাস্তু তথা উচ্চ ও অধস্তন বিভিন্ন পদাধিকারী সকল কর্ম্মচারীই যোগদান করেন। সরকারী ও বেসরকারী কৃষিবিশেষজ্ঞগণ সকলেই জমির ও ওখানকার ভবিষ্যৎ ফসলের উৎকর্ষ সম্পর্কে আস্থাবান দণ্ডকারণ্যে সম্প্রতি ধান্য-রোপণ উপযোগী বিস্তর জমি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বর্ষাগমে সেই সব জমিতে কৃষি প্রবর্ত্তন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সকল জমিই অবশ্য ধান চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে না। বাঁধবিহীন বহু বৃহদায়তন কৃষিক্ষেত্রে অন্যান্য ফসলের যান্ত্রিক চাষও প্রবর্ত্তিত হইবে।

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ, বাংলা সাহিত্যের একজন প্রবীণতম বিদগ্ধ লেখক। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর এবং এখনও তাঁহার লেখনী সক্রিয়। জীবনের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তিনি নিষ্ঠার সহিত এবং কতকটা নিঃশব্দে বঙ্গবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বজনবিদিত, চিন্তাশীল লেখক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দানের কথা আলোচনা করিবার সময় আজ আসিতেছে। বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যকে শ্রীসাহানা তাঁহার বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-সমস্যার সূত্রপাত তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রধানতঃ শ্রী সাহানার গবেষণার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথি সংগ্রহপূর্ব্বক এই বহু বিতর্ক-মূলক সমস্যাটির সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রী সাহানার পাণ্ডিত্য ও মনীষা এ কালের সকল বিদ্বজ্জনেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা পাইয়াছে।

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা

বঙ্গভাষার এই কৃতী সাহিত্যিককে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে উপযুক্ত মর্য্যাদায় ভূষিত করেন, সম্প্রতি সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যগণের নিকট বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গণের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত স্মারকলিপিতে শ্রী সাহানাকে ডি লিট উপাধি দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবটি সমীচীন হইয়াছে। আমরা উহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।
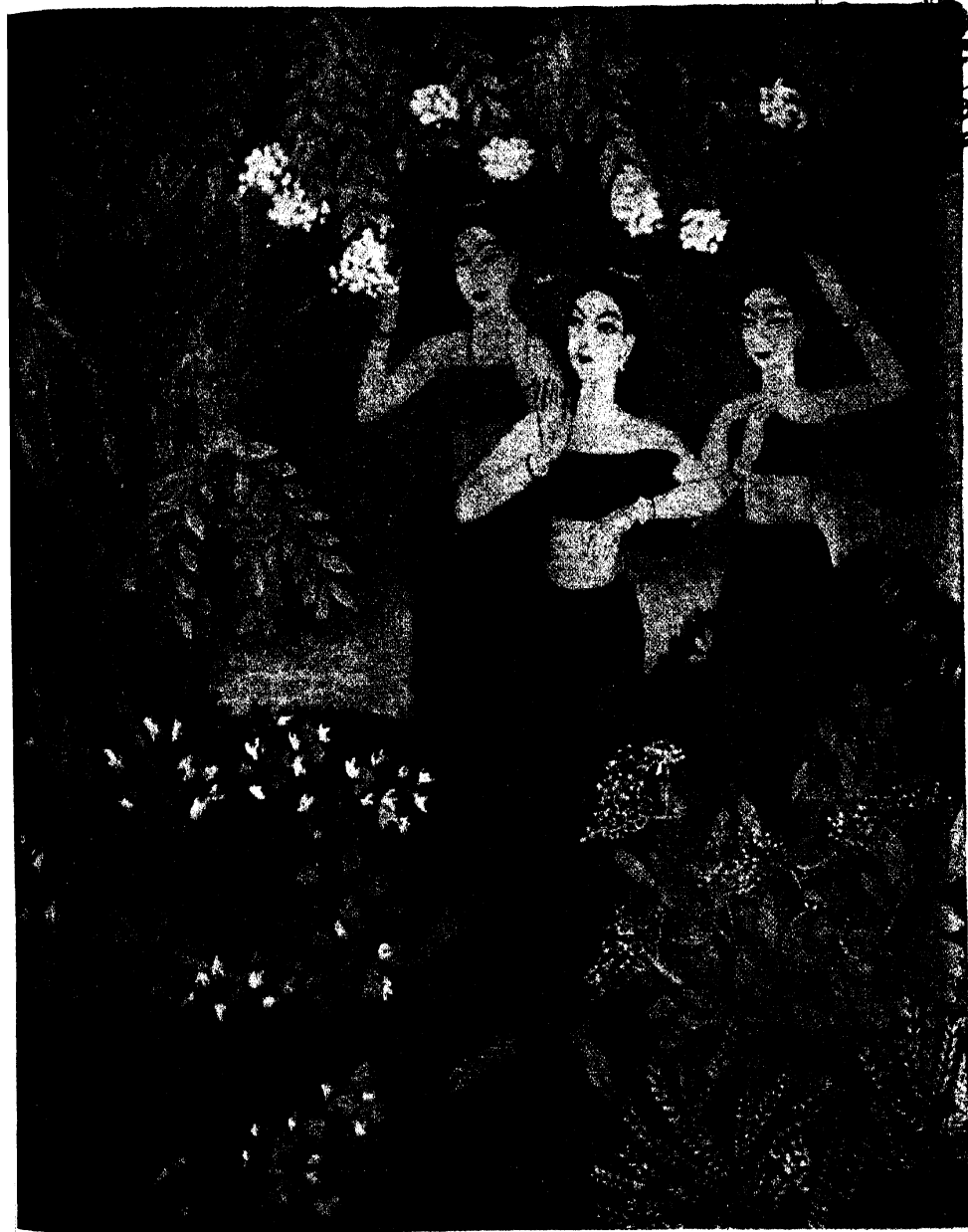
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দুর্বৃত্ত মধুকর
শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা
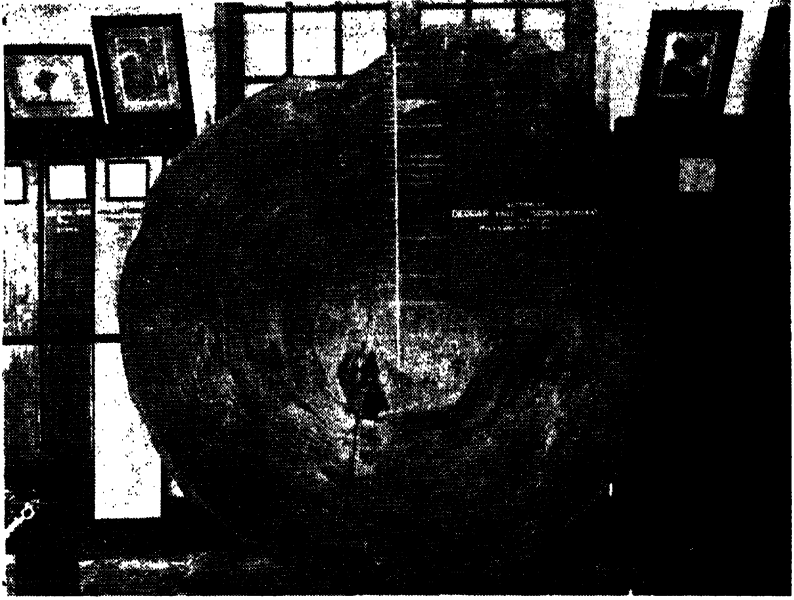
সাত শত চারি বৎসরের পুরাতন তেহরি গাড়োয়ালের দেবদারু বৃক্ষের একাংশ

কুয়ালালামপুর শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পী শ্রীযামিনী রায় অঙ্কিত "সাঁওতালী নৃত্য"

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
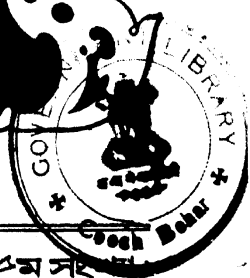
৫৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৬৬

৫ম সং

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধ

স্বাধীনতা দিবস আরও একবার এসে গেল। কিন্তু এখনও ত স্বাধীনতার দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতার মর্য্যাদাজ্ঞান আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠে নাই। বারো বৎসর আগে এই স্বাধীনতার আস্বাদে আমরা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। জানি না তখন স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের চেতনা কতটা ছিল। পাঁচ শত বৎসর যে শক্তির পরিচয় আমরা পাই নাই তাহার আগমনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, সে আনন্দের রূপ আমরা প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থচিন্তা ও সুখের স্বপ্নের মধ্য দিয়া রঙীন আলোকে দেখিয়াছিলাম নিশ্চয়। স্বাধীনতার আবাহন আমরা করিয়াছিলাম সেই বীরভোগ্যা শক্তিরূপে নয় নিশ্চয়, যাহার সেবা যাহার পূজা সমস্ত জাতির সকল স্বার্থ বলি দিয়া করিতে হয়। তাহা না হইলে আজ সমস্ত দেশের সমস্ত জাতির এই বিকারগ্রস্ত অবস্থা কেন? একদিকে দরিদ্রের শোষক অর্থপিশাচের উল্লাস, অন্যদিকে দুর্দ্দশাগ্রস্তের নিস্ক্রীয় নিস্তেজ মানসিক অবস্থার সুযোগ-গ্রাহী ভাগ্যান্বেষীর দলগত স্বার্থচিন্তা। আমাদের চৈতন্য আর কবে হবে? এখন ত স্বার্থসিদ্ধিই দেখি লোকের একমাত্র চিন্তা এবং সেখানে বাধা পড়িলেই হতাশ্বাসের প্রলাপ।

দেশের নেতৃত্ব যাঁহাদের হাতে, তাঁহাদেরও দৃষ্টি আজ আচ্ছন্ন চিন্তায় মোহগ্রস্ত। চাটুকারের স্তুতিবাদরূপ মাদক সেবনে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্তপ্রায়। তাহা না হইলে দেশবাসীকে স্বার্থান্বেষী শিবাদলের মুখে ফেলিয়া দিয়া তাঁহারা শুধু স্তোকবাক্যে বা অঙ্কের আড়ম্বরে নিজেদের দিনগত পাপক্ষয়ের চেষ্টায় সন্তুষ্ট কেন? দেশাত্ম-বোধ শব্দটার প্রয়োগ আজকাল অতি অকারণে ও অযথা হইয়া থাকে, সেই জন্যই বোধহয় তাঁহারা সে বিষয়ে সকল জ্ঞানবুদ্ধি হারাইতে বসিয়াছেন। দেশের লোক কি তাঁহাদের আপনজন নয়? না তাঁহারা মনে করেন যে, এই ব্রিটিশসিংহের চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ভূমিকায় তাঁহারা সকল দায়িত্বের অবসান করিতে পারিবেন?

রাষ্ট্রপতির ভাষণে শুনি আত্মনিয়োগের জন্য উদাত্ত-কণ্ঠে আহ্বান। সেই সঙ্গে শুনি জনকল্যাণের জন্য তন দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ এবং সমস্ত জাতির সমগ্র শক্তি ও সম্পদের ব্যবহারে সকলের পূর্ণ সহযোগিতার আবেদন। বস্তুতঃপক্ষে রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দ যথার্থ, সত্য ও মূল্যবান। কিন্তু সেই সঙ্গেই বলি, ঐ ভাষণ আজ সম্পূর্ণ অকেজো। কারণ উহার ধ্বনিতে আজ দেশবাসীর মনে কোনও স্পন্দন জাগাইবে না, কাহারও দেহে কোনও নূতন অনুভূতি বা নূতন কর্ম্মতৎপরতার চেতনা আনিবে না।

কারণ দেশের লোক দেখিতেছে, চতুর্দ্দিকেই স্বার্থান্বেষী ও ভাগ্যান্বেষীর জয়-জয়কার। যে স্বার্থত্যাগ বা আত্মবলির আদর্শ একদিন এদেশকে জাগ্রত করিয়াছিল, আজ দেশের অধিকারীবর্গের মধ্যে তাহার সমাদর কোথায়? যদি সে আদর্শের আবাহন তাঁহারা সত্য সত্যই করিতে চাহেন, তবে পথ দেখাইতে হইবে তাঁহাদেরই। কিন্তু সেই কঠোর কণ্টকময় পথে চলিবার মত দৃঢ়চিত্ত ও অকলুষ-প্রাণ কি আর তাঁহাদের আছে?

এখন ত দেশবাসী ও নেতৃবর্গের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে খাদ্য-খাদকের। শাসনতন্ত্রের অধিকারী যিনি তিনি দেশের লোকের প্রকৃত অবস্থা কি সে বিষয়ে কোন সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভের চেষ্টা মাত্রও করেন না। আবার বিরোধীপক্ষও তাহাই। অধিকারী-দল নিজের অধিকার রক্ষায় ব্যস্ত এবং শক্তি-কাঙ্গাল 'হ্যাভ নট'-এর দল সেই অধিকার ছিনাইতে ব্যস্ত। দেশের লোক মরুক, তাহারা চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, এবং তাহাদের তুচ্ছ প্রাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ ত দলীয় স্বার্থের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর!

যদি বিশ্বাস না করেন তবে এই পশ্চিমবঙ্গের মাঠে-ময়দানে অধিকারীদলের আস্ফালন পূর্ণ ভুয়া অভিভাষণ ও বিপক্ষদলের ততোধিক ভুয়া প্রতিধ্বনি পড়িয়া দেখুন। আপনার, আমার, দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় বা সেবায় কোনও পরিচয় যদি আপনি পাইয়া থাকেন আমাদের জানাইবেন। আমরা ত পাই নাই।

ব্যাপক আইন-অমান্য সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলাফল বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত যে কতদূর দলগত স্বার্থমূলক এবং আদৌ দেশকল্যাণ চিন্তাপ্রসূত কিনা সে বিষয়ে আগেও আমরা স্পষ্টই লিখিয়াছি এবং এখনও

বলিব, ইহা ধ্বংসাত্মক কার্য্য মাত্র। আইন-অমান্য আন্দোলনকে উচ্চমার্গে তুলিবার একমাত্র পথ সত্যের পথ এবং সেই সত্যের সন্ধান করিতে হইলে যে ত্যাগের ও দেশাত্মবোধের প্রয়োজন তাহার কোনও চিহ্ন আমরা এই সিদ্ধান্তে পাই নাই।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষও এটা দলীয় শক্তি-পরীক্ষার সমরাহ্বানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। দেশের লোককে সজাগ করিবার কোনও চেষ্টা তাঁহাদের দেখি না। দেশবাসীকে দুর্দ্দশার অবসানের কোনও বাস্তব আশ্বাস তাঁহারা যদি না দিতে পারেন তবে আজিকার শক্তি-পরীক্ষায় জয়ী হইলেও তাঁহাদের পরাজয় অনিবার্য্য। স্বাধীন দেশকে চালাইতে হইলে শুধু রাজনীতির "বড়ের চালে" শেষরক্ষা হয় না।

কেরল মন্ত্রীত্বের অবসান

কেরল লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, এতদিনে তাহার সমাধান হইল। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি কেরলের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

গত জুন মাস হইতে কেরলের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে যে ব্যাপক ও সংঘর্ষমূলক আন্দোলন চলিতেছিল, তাহাতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কেরল মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি ও বিধানসভা বাতিলের সংবাদে কোন নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে বহু কারণ একত্র হইয়া কেরলের আভ্যন্তরীণ শাসনে এমন অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল যে, দৈনন্দিন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

একথা নিঃসন্দেহ যে, দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনের পর সারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষ এক নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। গত চল্লিশ বৎসরের সোভিয়েট বিপ্লবের পর এইভাবে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্যালট-বক্সের মারফত পৃথিবীর আর কোন অংশে কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠিত হয় নাই। তবে শেষ পর্য্যন্ত নানা কারণে তাহা রাখিতে পারিলেন না। কে দোষী, কে নির্দ্দোষ এই বিচার ছাড়িয়া দিয়াও যাহা একটি সুস্পষ্ট বাস্তব সত্যরূপে দেখা যাইতেছে তাহা এই যে, কেরলের জন-জীবন নিরাপত্তা হারাইয়াছে এবং সেই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা কমিউনিষ্ট কেরল সরকারের ছিল না।

কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপকে 'সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর স্বেচ্ছাকৃত আঘাত' বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু তাঁহাদের অবগতির জন্যই বলিতে হইতেছে, কম্যুনিষ্ট কেরল সরকারও গণতান্ত্রিক রীতির অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা ভারতের অন্যান্য রাজ্য-সরকারের অর্থাৎ বিভিন্ন কংগ্রেসী রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছেন। সরকার-বিরোধীর দমনকার্য্যে অন্যান্য রাজ্য-সরকার নাকি কেরল সরকারের তুলনায় অনেক বেশী কঠোর। এবং কেরলের সরকার-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান নাকি গণ-অভ্যুত্থানই নয়। ইহা সম্পন্ন ভূস্বামীদিগের প্রেরণায় পরিচালিত স্বার্থবাদের আন্দোলন।

কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকার সম্পর্কে যে অভিযোগের স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাইয়াছেন তাহাও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। স্মারকলিপিতে ১৯৪৮ সন হইতে ১৯৫৯ সন পর্য্যন্ত—এগার বৎসর রাজ্য-সরকারের কার্য্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করিয়া এইরূপ মন্তব্য করা হয় যে, সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা তাঁহাদের এগার বৎসরের কুশাসনের মধ্য দিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে বিপর্য্যয়ের পথে টানিয়া নামাইয়াছেন এবং জনসাধারণের সর্ব্বস্তরে হতাশা, ব্যর্থতা ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ইহার মধ্যে আছে—সরকারী শাসনযন্ত্রের অপব্যবহার, সংবিধানের অমর্য্যাদা, জনগণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ, জমিদার, জোতদার, দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থসংরক্ষণ, সরকারী অর্থের অপচয়, পারমিট ও কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে বন্ধু বা আত্মীয়পোষণ, দুর্নীতি-পরায়ণ উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের ক্ষেত্রে সাজার বদলে পদোন্নতির ব্যবস্থা প্রভৃতি। পরিশেষে স্মারকলিপিতে এই বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, রাজ্য-সরকার বৃহৎ ব্যবসায়ী এবং চোরা-কারবারীদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করিয়া অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্যের এবং ধান-চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা প্রত্যাহার করিয়া থাকেন। নির্ব্বাচনে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিযোগ করিয়া বলা হয় যে, যে-কোনপ্রকারে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার খোলাখুলি ভাবেই সরকারী শাসনযন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন।

দু'পক্ষেরই অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, শুধু বলিব এই স্মারকলিপি প্রদানের রীতি সম্বন্ধে। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর সংবাদ-পত্রের মারফত প্রকাশ করিবার বিরুদ্ধেই আমাদের বক্তব্য। রাষ্ট্র-পতির নিকট প্রদেশ কংগ্রেসের প্রদত্ত স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই প্রদেশ কংগ্রেস সেই স্মারকলিপির বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। কেরল রাজ্য-সরকারের যুক্তি এই যে, অগত্যা তাঁহারাও সরাসরি সংবাদপত্রেই অভিযোগের উত্তর প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এই ঘটনা হইতে ইহাই কি বুঝা যাইতেছে না যে, কেরল রাজ্য-সরকার বিস্মৃত হইয়াছেন তাঁহারা সংবিধানের অধীন একটি রাজ্য-সরকার? রাজ্য-সরকার ত একটা পার্টি নহেন। রাষ্ট্রপতির নিকট যে অভিযোগ প্রেরিত হইয়াছিল তাহা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মারফত রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করাই রাজ্য-সরকারের পক্ষে নিয়মতন্ত্রোচিত কর্ত্তব্য ছিল।

শুধু তাই নয়, সরকারীভাবে যে রীতি অনুসরণ করা কেরল রাজ্য-সরকারের পক্ষে অপরিহার্য্য, সে রীতি তুচ্ছ করিবার অশোভন ঔদ্ধত্যকেই বক্তব্যের আরম্ভে একটা যুক্তিরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কেরল রাজ্য-সরকার অভিযোগের জবাব দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা জবাব

হিসাবে আখ্যাত হইলেও যে ঠিক জবাব হয় নাই তাহা তাঁহার বক্তব্যেই ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন, অভিযোগ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। অভিযোগে যে সব ঘটনা ও তথ্যের উল্লেখ আছে, সেগুলির উত্তর প্রদানের চেষ্টা অবশ্য করিয়াছেন, কিন্তু যথোচিত হয় নাই। নিরপেক্ষ কর্তৃত্বের অধীনে তদন্তের দ্বারা এই সব অভিযোগের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত করিবার ব্যবস্থাও প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করিয়াছিলেন, তাঁহারা এ দাবির চ্যালেঞ্জও এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহা কৌশল হইলেও ভীরু কৌশল, এবং ইহার দ্বারাই রাজ্য-সরকারের প্রতিবাদের নৈতিকতা অসার হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগ ছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে বহু। বিভিন্ন কংগ্রেসী রাজ্য-সরকারের বিরুদ্ধেও তাঁহারা অনেক কথা বলিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের বক্তব্য সামান্য বিশ্লেষণ করিলেই যে অসামান্য উদ্দেশ্যের স্বরূপটি ধরা পড়িয়া যায়, তাহা এই যে, কেরলের কম্যুনিষ্ট সরকার বস্তুত রাজ্যের পুলিসী-ব্যবস্থা এবং বিচার-ব্যবস্থাকেও এক উৎকট নীতির সহায়ক অস্ত্রহিসাবে কাজে লাগাইয়া বিরোধী জনশক্তির সমূহ উচ্ছেদ সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই হস্তক্ষেপে রাজ্যের কম্যুনিষ্ট জনসমাজ—যাহারা নিতান্ত সংখ্যালঘু, হয়ত একমাত্র তাহারাই বিষণ্ণ হইবে, কিন্তু তাহারা ছাড়া রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকই যে এই ব্যবস্থায় নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

খাদ্য না বিষ ?

কাগজে খবর বাহির হইয়াছে, কলিকাতা বন্দরের আট নম্বর জেটির একটি শেডে তিন হাজার টন মার্কিন গমের কিছু অংশ ডি-ডি-টিতে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় দুই হাজার বস্তা গম এমন ভাবে পচিয়া গিয়াছে যে, উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া এমনকি পশুরও অখাদ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এ ত গেল খাদ্য অপচয়ের কথা, ইহার চেয়েও মারাত্মক কথা এই যে, এই পচা দুর্গন্ধযুক্ত অখাদ্য গম সরকারী ব্যয়েই বেহালার এক সরকারী গুদামে নাকি বোঝাই করা হইতেছে।

ইহা সত্য হইলে, যাঁহাদের ব্যবস্থার ফলে এই বিপজ্জনক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে তাঁহারা কিছুতেই ক্ষমার্হ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। গম বিষাক্ত হইবার ফলে কেরলে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে স্মৃতি জনমন হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। সরকারী মন হইতেও এরূপ শোচনীয় ব্যাপার মুছিয়া যাইবার কথা নয়। কেরলের সেই বেদনাদায়ক কাণ্ড ঘটিবার পরেও যে পোর্ট কমিশনার্সের কর্ম্মচারীরা ডি-ডি-টি পাউডার ছড়ান গুদামে গম মজুত রাখিতে পারে, ইহা ভাবিতেও অবাক লাগে! শুধু তাই নয়, ঐ গমের মধ্য হইতে ত্রিশ হাজার মণ গম কলিকাতায় এবং কয়েক হাজার মণ গম বাহিরে বণ্টিত হইয়াছে। সংবাদটি এমনিই উদ্বেগজনক যে, সরকার শীঘ্র এ বিষয়ে অবহিত না হইলে, সর্ব্বনাশ ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

কিন্তু শুনা যাইতেছে যে, কেলেঙ্কারিটি ধরা পড়িবার পরেও সরকার উহা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখন জন-সাধারণের মনে ইহাই ধারণা হইতেছে, পচা গম ভাল গমের সহিত মিশাইয়া ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করা হইবে। কথাটাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না। কারণ ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য না থাকিলে, উহা সযত্নে গুদামজাত করা হইবে কেন—যাহা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করিয়া ফেলাই উচিত ছিল। অভিযোগ এবং সন্দেহ যদি সত্য হয়, তবে শুনিতে যতই খারাপ লাগুক—না বলিয়া উপায় থাকে না যে, কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকিবার যে গুরুতর অপরাধ ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাকে ধামাচাপা দিবারই ইহা এক নিষ্ঠুর অপপ্রয়াস। 'জনস্বাস্থ্য' কি তাঁহাদের নিকট এতই ছেলে-খেলার বস্তু! নহিলে যে গম পশুরও অখাদ্য, তাহাকে মানুষের মুখে তুলিয়া দিবার মত এত বড় একটা হৃদয়হীন ব্যবস্থা কিছুতেই সম্ভব হইত না। যাঁহাদের অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের ফলে তীব্র এই খাদ্যসঙ্কটের মুহূর্তে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসম্ভার পচিয়া গিয়াছে এবং অমানুষিক এক ধূর্ত্ততার আশ্রয় লইয়া সেই অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যকে যাঁহারা এখন চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন—সরকার তাঁহাদের জন্য কোন্ শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন, জনসাধারণ আজ জানিতে চায়।

অপরাধীর সুনাম রক্ষা

বর্ত্তমানে দেশবিরোধী এবং অসামাজিক কার্য্যকলাপ বহু হইতেছে,তাহার সব যে ধরা পড়িতেছে তাহা অবশ্য নহে। বর্ত্তমানে দেশবিরোধী কার্য্যকলাপের মধ্যে প্রধান হইতেছে যে, ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গোপনে পাকিস্থানে চালান দেওয়া। এই চোরাই রপ্তানি জলপথে এবং স্থলপথে উভয় পথেই হইতেছে। সম্প্রতি গোপনে জাহাজে করিয়া কয়েক হাজার মণ চিনি পাকিস্থানে রপ্তানি করা হইতেছিল এবং পুলিসের তৎপরতায় তাহা ধরা পড়িয়াছে। ইহা অবশ্য মনে করিলে ভুল হইবে যে, এইরূপ চোরাই রপ্তানি এই প্রথম হইতেছে। নিয়মিত-ভাবে এইরূপ কারবার চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে দুই-একটি ধরাও পড়ে, আর এই রকম ধরা পড়াতে আশ্চর্য্য হইবার মত কিছু নাই।

আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি অবশ্য অন্য বিষয়ে। তাহা হইতেছে যে, এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের নাম কেন গোপন রাখা হইতেছে। কাগজে উঠিয়াছে যে, চিনির চোরাই রপ্তানি বিষয়ে দোষী ব্যক্তিদের কোর্টে হাজির করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের নাম কেন গোপন রাখা হইয়াছে ? সে কাহার নির্দ্দেশ ? মন্ত্রী মহাশয়দের, না পুলিসের, না কাগজওয়ালাদের ? চুনোপুঁটি দোষ-করিলে তাহাদের নাম কাগজে বাহির হয়। কিন্তু রুই-কাতলাই দোষ করিলে তাহাদের নাম প্রকাশ করা হয় না কেন ? ইহা কি ? নাম আগে প্রকাশ করা প্রয়োজন, কারণ ইহারা সমাজরো সজাগ

দেশবিরোধী। সুতরাং ইহাদের নাম জনসাধারণের জানিবার অধিকার আছে এবং তাহার প্রয়োজনও আছে, কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইহাদের বয়কট করা প্রয়োজন।

এই সকল ব্যক্তিরা সমাজে অবশ্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং ইহাদের দাপটে ছোট-খাট মন্ত্রীদের গদী উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাদের দণ্ডবিধি আইনে ফাঁক থাকার জন্য ইহাদের নামমাত্র সাজা হইবে। অথচ ইহাদের অপরাধ এত ঘৃণ্য যে, একবার কেন, তিনবার ফাঁসী দিলেও ইহাদের অন্যায়ের শাস্তি হইবে না। ভারতের দণ্ডবিধি আইনের সংশোধন প্রয়োজন, যাহাতে এই সকল অপরাধ দেশদ্রোহী অপরাধের সামিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রাশিয়াকে আণবিক তথ্য সরবরাহের অপরাধে আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ড হয়। সেইরূপ ভারতবর্ষ হইতে যাহারা আবশ্যকীয় দ্রব্য বিদেশে চোরাই রপ্তানি করে তাহাদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা থাকা উচিত, অন্ততঃ ব্যক্তিগত কারাবাস ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়াউচিৎ।

পশ্চিমবঙ্গে পলাতক আসামী

শুধু কলিকাতায় নয়—সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নাকি প্রায় পনের হাজার পলাতক আসামী পুলিসের চোখে ধুলা দিয়া সর্ব্বত্রই আত্মগোপন করিয়া আছে। তাদের মধ্যে খুনীও আছে, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মোটা টাকা আত্মসাৎ করিয়া গা ঢাকা দিয়াছে এমন লোকও আছে। অবশ্য অন্যান্য অপরাধীরাও যে ইহার মধ্যে নাই এমন নয়—যেমন, কোনরূপ অবৈধ বা অনুচিত কার্য্য করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়া আছে। গত পনের বৎসর ধরিয়া ইহাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে আজ এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহাতে ইহাদের নাকি আর নাগাল পাওয়া যাইবে না—এই আন্দাজ করিয়া পুলিস ইহাদের পলাতকের খাতা হইতে নাম কাটিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা খুব গৌরবের কথাই বটে! এই সব লোক দীর্ঘ সুযোগে সাধু-মোহান্ত, শিল্পী, সমাজসেবী, ব্যবসায়ী ও কলোনী-বিশারদ প্রভৃতি কে কি হইয়াছে তাহা অবশ্য তাহাদের বিবরণ হইতে বুঝিবার উপায় নাই। তবে সমাজের হালচাল দেখিয়া ইহাদের সর্ব্ব ঘটে অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই কারণ থাকে না।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, ইংরেজ আমলে গোয়েন্দা পুলিশ ভাতের হাঁড়ীর ভিতর হইতে বিড়ালবার বাহির করিয়াছে। আর স্বাধীন ভারতে পনর হাজার জলজ্যান্ত মানুষও তাঁহাদের নজর এড়াইতে পারিতেছে, ইহা যেমন বিস্ময়ের কথা, তেমনি লজ্জারও। সে যুগে পুলিসের কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে কত কথাই না শুনা গিয়াছে, সেই একই আসনে একই ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাহাদের এই অকর্ম্মণ্যতা স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে কি কলঙ্কের কথা নয়?

পুলিস বিভাগের উপরে যে সাক্ষীগোপাল-রূপ মন্ত্রীটি আছেন তাঁহাকে এবিষয়ে অবহিত হইতে বলাও যেন অবান্তর। অবহিত হইতে হইলে যে বুদ্ধি-বিবেচনা ও কর্ম্মতৎপরতার প্রয়োজন তাঁহার মধ্যে কি সে সব শক্তি লুপ্ত না সুপ্ত?

খাদ্য লইয়া খেলা

কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় চাউলের নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াই চলিয়াছে। শুধু খোলা বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছে না তাহা নহে, অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষে কিনিতেও পারিতেছে না। কলিকাতার ও শহরতলীর দুর্ম্মূল্যতার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, মফঃস্বলেও চাউলের দাম বর্ত্তমানে বত্রিশ-তেত্রিশ টাকার উর্দ্ধে। ডাঃ রায় বলিয়াছেন, গত বৎসরের গড়পড়তা দরের তুলনায় এ বৎসরের গড়পড়তা দর বৃদ্ধি পায় নাই। যাহারা বুভুক্ষু তাহারা এই সংবাদে সান্ত্বনা পাইতেছে না। এই হিসাব পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রটি এমনি ধাঁধাপূর্ণ যে, তাহা দ্বারা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও, মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বর্ত্তমানে যে দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে তাহা কি সকলের ক্রয়সাধ্য? রাজ্যের অধিবাসীদের গড়পড়তা আয়ও তাঁহার অজ্ঞাত নয়। আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে অধিকাংশ লোক অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য এ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। সেই জন্যই মফঃস্বলের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অর্দ্ধাহার, কদাহার ও অনাহারের সংবাদ নিত্যই পাওয়া যাইতেছে। একে চাউলের উচ্চমূল্য দেখিয়া দরিদ্র জনসাধারণ খোলা বাজারের চাউলের দিকে দুর্ল্লভ বস্তুর মত একবার ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়াই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার উপর সরকারী ব্যবস্থা তাহাদের দুঃখের বোঝা আরও বাড়াইয়া দিতেছে। অনেক লোক রেশনের দোকান-মারফত কিছু কিছু চাউল পাওয়াতে সপ্তাহে সপ্তাহে তবু ভাতের আস্বাদ পাইতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে খ ও গ শ্রেণীর রেশন-কার্ডধারীদের চাউল দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়াতে, বহুলোক সে সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এই শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল যাঁহারা আট আনা ইউনিয়ন কর দেন—এখন নিয়ম হইয়াছে আট আনার কম যাঁহারা কর দেন তাঁহারাই শুধু 'ক' শ্রেণীভুক্ত হইয়া চাউলের সুবিধা পাইবেন।

সরকার যদি প্রতি ইউনিয়নের ধার্য্য-ট্যাক্সের অঙ্কগুলি খতাইয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন, প্রতি ইউনিয়নে আট আনা বা তাহার বেশী ট্যাক্স যাহারা দেয় সংখ্যার দিক দিয়া তাহারাই বেশী। কাজেই এ ব্যবস্থার ফলে গ্রামের অধিকাংশ লোককে রেশনপ্রাপ্তির সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মানুষের খাদ্য লইয়া এ যেন এক নির্ম্মম খেলা। বর্ত্তমানে টেষ্ট রিলিফের কাজও সর্ব্বত্র চালু রাখা সম্ভব হইতেছে না। ডাঃ রায় নিজেই সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। পল্লীবাসীদের শোচনীয় দারিদ্র্য ও তাহার পাশাপাশি চাউলের এইরূপ অসম্ভব উচ্চমূল্য, ইহাতে জনসাধারণের ভাগ্যে কি পরিমাণ খাদ্য জুটিতে পারে, তাহা

তাঁহাদেরকেই অনুধাবন করিতে বলি। পেটের অন্নের জন্ত এ দুর্ভোগ কখনও ঘুচিবে কি না হতবুদ্ধি মানুষ আজ সেই কথাই ভাবিতে বসিয়াছে।

ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়াছেন, অভিশীঘ্র গ্রামাঞ্চলের ১০ লক্ষ লোককে যাহাতে আংশিক রেশন দেওয়া যায় তাহার জন্ত রাজ্য-সরকার কেন্দ্রের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

প্রার্থনা পেশ করা হইয়াছে, মঞ্জুর হইবে কি হইবে না তাহা অনিশ্চয়তার গহ্বরে। যদি মঞ্জুর হয় তবে কবে হইবে এবং সে চাউল পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পৌঁছাইতে বা পৌঁছিয়া গ্রামবাসীদের ঘরে যাইতে নূতন শস্য উঠিতে আরম্ভ করিবে কি না কে জানে?

এরূপ আশ্বাস আমরা বহুবার পাইয়াছি। সরকার আর কত আশা দিবেন? দেখিতেছি সরকার রাজ্যের খাদ্য-সমস্যা লইয়া যেরূপ পটুতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে, বর্ত্তমান ত দূরের কথা, ভবিষ্যতেও কোন সমাধান করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করিতে পারি না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি আর কতকাল চলিবে?

পুলিস বিভাগের চৈতন্য

পশ্চিমবঙ্গের পুলিস-বাহিনীর আমূল সংস্কার সাধন যে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ইহা এতদিন পরে পুলিস-দপ্তরও স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে ধারায় পুলিস-শাসন চলিতেছে তাহা যে ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত ধারারই অনুকৃতি তা বলাই বাহুল্য। পুলিস-দপ্তর একটি প্রস্তাব মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্ত পাঠাইয়াছেন এবং উহার বিচার্য্য বিষয় কি হইবে সে সম্বন্ধেও একটা খসড়া ঐ প্রস্তাবের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই 'টার্ম্স অব রেফারেন্সে'র মধ্যে স্বভাবতঃই পুলিস-বাহিনীর সংখ্যা, সংগঠন, প্রকৃতি এবং উহার নিয়মাবলী, ট্রেনিং ও শৃঙ্খলা ইত্যাদি প্রশ্নের আমূল পুনর্বিবেচনার কথা তোলা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া, দুর্নীতি কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ স্তরে ঘটিয়া থাকে এবং উহার প্রতিকার কি হইতে পারে, সে বিষয়েও তদন্ত এবং সুপারিশ করার জন্ত কমিশনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। পুলিস এবং সাধারণ শাসন বিভাগের দুইজন উর্দ্ধতন অফিসার এবং একজন বিশিষ্ট নাগরিককে লইয়া এই কমিটি গঠন করার জন্ত পুলিস বিভাগ প্রস্তাব করিয়াছেন।

আজিকার দিনে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পুলিস কর্ম্মচারীদের দিক হইতে এই ধরনের একটি কমিশন নিঃসন্দেহে প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল এ কথা বলাই বাহুল্য। জনসাধারণের দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, ক্রমশঃ আইন এবং নৈতিক শৃঙ্খলার মান যখন আমাদের চোখের সম্মুখেই অবনমিত হইতেছে এবং শিল্প ও যন্ত্রযুগের জটিলতার মধ্যে যখন পরিবর্ত্তনশীল অর্থনীতির ধাক্কায় মানুষের জীবন, তাহার সমাজ ও চরিত্র একটা প্রকাণ্ড ওলট-পালটের অবস্থায় আসিয়া পড়িতেছে, তখন এই সমগ্র বিষয়টিকে গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার প্রয়োজন হইয়াছে। অর্থাৎ যদিও ইহা মূলতঃ একটা প্রশাসনিক ব্যাপার, অথবা পুলিশ-দপ্তর হইতেও ইহার প্রশাসনিক গুরুত্বের দিকটাই হয়ত বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু আসলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এই মূল প্রশ্নটির সহিত নানাদিক হইতে আজিকার দিনের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির প্রশ্ন গভীরভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছে।

স্বাধীনতার পরেই কিন্তু এই প্রশাসনিক দপ্তরগুলির জন্ত নূতন ষ্টাণ্ডার্ড স্থাপন করার দাবী উঠিয়াছিল। কেন না, ইহা সহজবুদ্ধির কথা যে, উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক গবর্ণমেন্ট যে প্রশাসনিক কাঠামো বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহার দ্বারা বিংশ শতাব্দীর 'সমাজ-তান্ত্রিক' ধাঁচের রাষ্ট্র চলিতে পারে না। যদিও তাঁহারা ইহার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন পোশাকি-পরিবর্ত্তন। প্রকৃতি বদলাইল কোথায়? সুখের বিষয়, পুলিসদপ্তর এতদিন পরে নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন, প্রশাসনিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না ঘটাইলে পুলিসের চরিত্র বা মনের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

টালিগঞ্জ অঞ্চলে গুণ্ডাদলের গুপ্ত ঘাঁটি

কলিকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জ, বোড়াল, গড়িয়া, গাঙ্গুলীবাগান প্রভৃতি অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া গুণ্ডারা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। শুনা যাইতেছে, একশ্রেণীর সমাজ-বিরোধী ও গুণ্ডাদের সহিত কোন কোন থানার কোন কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর যোগসাজসের ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইতেছে। জনসাধারণ সুবিচারের আশা করিয়াও কোন ফল পায় নাই। অবশ্য এ সম্বন্ধে তদন্তও হইয়াছে এবং ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিতও হইয়াছে। পুলিসের জনৈক পদস্থ অফিসার যাহা রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা অতীব ভয়াবহ। তিনি বলিয়াছেন, পথে-ঘাটে গুণ্ডামি রাহাজানি অপেক্ষা মেয়ে ফুসলান, ভয় দেখাইয়া অর্থ আদায়, প্রতারণা প্রভৃতি যে ধরনের অপরাধের আধিক্য ঐ অঞ্চলে দেখা গিয়াছে, সেইগুলির পিছনে কিছুটা বুদ্ধি চিন্তাশক্তি এবং পরিকল্পনার পরিচয় আছে।

তাঁহার ধারণা, বিভিন্ন কারণে জীবনসম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, অসংসঙ্গ ও বিকৃত যৌনরুচি একশ্রেণীর যুবককে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আস্থাহীন করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শ্রেণীর যুবকরাই এই অপরাধের পিছনে মস্তিষ্করূপে কাজ করিতেছে। রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে ঐ ধরনের যুবকদের পথভ্রান্ত করিতেছে, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস।

শুনা যাইতেছে, এই দলটি বিভিন্ন ঘাটি তৈয়ারী করিয়াছে, যেখান হইতে নারীদের লইয়া পাপ-ব্যবসা চালানো হইতেছে। এবং তাহাদের অন্যান্য রাজ্যেও পাঠানো হইতেছে।

আমাদের বলিবার কথা এই, এত বড় একটা বিরাট দল কিন্তু একদিনেই গড়িয়া উঠে নাই। এবং টালিগঞ্জ অঞ্চল পুলিস-এলাকার বহির্ভূতও নয়, তবু ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই ভাবিতেছি। ইহাতে পুলিসের অকর্ম্মণ্যতাই প্রমাণ হয় না কি? এই সুযোগ তাহারা কখনই পাইত না যদি তাহারা সজাগ

থাকিত। শুনা যায় তাহারা জাগিয়া ঘুমায়। যদিও একথা সত্য, আমাদের সমাজ-জীবন আজ বিকৃত। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আজ অস্বীকার করা যায় না, উহাদের ঐ বিকৃত-জীবনকে পুলিসই এ পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে। নহিলে এতটা অবাধ-আধিপত্য তাহাদের হইত না। এই অবস্থার অবনতির প্রধান কারণ ঐ অঞ্চলের পুলিসের যোগসাজস, একথা আমরা বহুবার শুনিয়াছি। তাহার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার মৎস্যচাষ

জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে পশ্চিম বাংলা সরকারের ভূমি-উন্নয়ন বিভাগের হাতে প্রায় দুই লক্ষ একর বিল এবং বাওড় আসে। এইগুলিতে পূর্ব্বে মৎস্যচাষ করা হইত। কিছুদিন যাবৎ ভূমি-উন্নয়ন বিভাগ ও মৎস্য বিভাগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল যে, জমিগুলি কোন বিভাগের হাতে থাকিবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই দুই লক্ষ একর জমি মৎস্য বিভাগের অধীনে থাকিবে এবং জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৎস্যচাষ করা হইবে।

পশ্চিম বাংলার মৎস্য বিভাগ আজ পর্য্যন্ত বাস্তবিক কোনও কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যেটুকু করিয়াছে তাহাতে ভালর চেয়ে খারাপই হইয়াছে। কারণ মৎস্য উৎপাদন ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে; সুতরাং এই বিভাগের আদৌ কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। এই দুই লক্ষ একর ভূমি উন্নয়ন বিভাগের হাতে থাকিলে তবু হয়ত কিছু মৎস্য উৎপাদন হইতে পারিত, কিন্তু মৎস্য বিভাগের হাতে যাওয়াতে সে সম্ভাবনাও আর রহিল না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলায় মৎস্যচাষের জন্ম ১৩ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল, ইহার নাকি মোটা একটি অংশ খরচ করা হয় নাই। কারণ মৎস্যচাষের উন্নয়ন যথাযথভাবে হইতেছে না। পশ্চিম বাংলার খাদ্যশস্য এবং মৎস্য বিভাগ—দুইটিই অকর্ম্মণ্যতায় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। মৎস্য বিভাগের অকর্ম্মণ্যতার প্রধান কারণ সংশ্লিষ্ট রাঘববোয়ালদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া। সুন্দরবন এলাকায় যে সকল স্থানে মাছের ভেড়ী আছে তাহার অনেক জায়গায় বাঁধ না থাকায় সমুদ্রের লোনা জল ঢুকিয়া ভেড়ীগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। এদিকে আবার বিদ্যাধরীর জলধারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকার ভেড়ীগুলিতে বাহিত করা হইতেছে, ফলে অন্যান্য ভেড়ীগুলি মিষ্টজলের অভাবে মৎস্যচাষ করিতে পারিতেছে না। এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পোৎপাদনে অবনতি

পরিকল্পিত অর্থনীতিক কাঠামোয় শিল্পোৎপাদন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়, যেমন হইয়াছে সোভিয়েট রাশিয়ায়। কিন্তু ভারতবর্ষে গত দুই বৎসরে শিল্পোৎপাদনে অবনতি ঘটিয়াছে। শিল্পোৎপাদনের সাধারণ সূচী হইতে দেখা যায় (ভিত্তি: ১৯৫১=১০০) যে ১৯৫৮ সনের উৎপাদন সূচী ছিল মাত্র ১'৫ শতাংশ, ১৯৫৭ সনে ছিল ৩'৫ শতাংশ এবং ১৯৫৬ সনে ছিল ৬'২ শতাংশ। এই অবনতির জন্ম প্রধানতঃ দুইটি শিল্প দায়ী, যথা—বস্ত্র শিল্প ও শর্করা শিল্প। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন-সূচী ৭'২ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে; ইহার অবশ্য কারণও আছে। বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধির তুলনায় চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না, ফলে কাপড়ের বিরাট পরিমাণ মজুত থাকিয়া যাইতেছে। বস্ত্র-শিল্পের রপ্তানিও ইদানীং হ্রাস পাইয়াছে, সুতরাং আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক কারণে এই শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না।

যদিও সম্প্রতি বহুপ্রকার বৃহদায়তন এবং ছোটখাট শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে, তথাপি অতি-আবশ্যকীয় শিল্পের উন্নতি এবং উৎপাদনকে অব্যাহত রাখিতে না পারিলে শিল্প-কাঠামো বেসামাল হইয়া পড়িবে। অনুন্নত দেশের প্রধান দোষ যে, শিল্পোৎপাদনের মধ্যে সামগ্রিক কোনও সমন্বয় থাকে না, ফলে একদিকে যেমন অতি-বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে তেমনি বৃদ্ধি হয় না। ১৯৫৮ সনে যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং পাটশিল্প উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর প্রায় ৩২,০০০ টন অতিরিক্ত পাটজাত শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইহার চাহিদাও সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৭ সনের তুলনায় ১৯৫৮ সনে ইস্পাত উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, আবার সিমেন্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেল-মোটর পথের সহযোগিতা

কিছুদিন যাবৎ রেল ও মোটর পথের মধ্যে সহযোগিতার আবশ্যকতা প্রায় সকলেই অনুভব করিতেছেন। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি কমিটিও নিয়োগ করিয়াছিলেন। মাসানী কমিটির রিপোর্ট-এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছে এবং বহু প্রকার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছে। কিন্তু মাসানী কমিটির অনুমোদনগুলিকে আশু-কার্য্যকরী না করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার আবার নিয়োগী কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন এবং অনেকের মতে মাসানী কমিটির অনুমোদনকে বানচাল করিয়া দেওয়ার জন্যই বোধহয় নিয়োগী কমিটি গঠিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁহারা রেলযানকে যে পরিমাণে এবং যে ভাবে সাহায্য করিতেছেন, মোটরযানকে তাঁহারা সে ভাবে সাহায্য করিতেছেন না এবং সেই কারণে দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশব্যাপী যানবাহনের ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ লাভ করিতেছে না।

রেলপথকে রাষ্ট্র বহুপ্রকার সহায়ক সাহায্য দেয় এবং পরন্তু মোটরযান ব্যবস্থাকে বহুপ্রকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর দিতে হয় যাহার ফলে মোটরযান দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে না। রেলপথ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার বৎসরে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা আয় করেন, কিন্তু মোটরযানের উপর বিভিন্ন কর হইতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারসমূহ বৎসরে প্রায় একশত কোটি টাকার উপর আয় করেন। মোটরযানের আর একটি সুবিধা এই যে, বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্ম মোটরযানের অবদান ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। রেলযান হইতে মোটরযানে আয়ও বেশী হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে সর্ব্ব-দেশব্যাপী উন্নত মোটরযান পথ আছে এবং তাহার ফলে গ্রাম-

গুলিতে জনবসতি বৃদ্ধি পায়, তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সহরগুলির উপর হইতে জনবসতির চাপ হ্রাস পায়। ভারতবর্ষে গ্রামগুলির উন্নতির জন্য যদিও] বড় [বড় কথা বলা হয়, তথাপি উন্নতিসাধনের জন্য সহজ ও প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

ভারতবর্ষে মোটরযান ও মোটরপথ-উন্নয়ন ব্যাপারে প্রাদেশিক বৈষম্য এবং সরকারী উদাসীনতা দেখা যায়। উত্তর প্রদেশ বোধহয় মোটরপথ ও মোটর যানবাহনে সবচেয়ে উন্নত। সেখানে সমস্ত প্রদেশে মোটরযান জাতীয়করণ করা হইয়াছে এবং সমস্ত প্রদেশব্যাপী পাকা মোটর রাস্তা আছে। শুধু তাহাই নহে, ওখানকার এক শহর হইতে আর এক শহরে যাইবার জন্য নিয়মিত মোটরযান ব্যবস্থা আছে এবং দৈনিক লক্ষ লক্ষ লোক এই পথে যাতায়াত করিতেছে। আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, হরিদ্বার, কাণপুর প্রভৃতি শহরগুলি মোটরপথ দ্বারা সংযুক্ত এবং দৈনিক নিয়মিতভাবে মোটরযান যাতায়াত করে।

পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে খুবই পিছনে পড়িয়া আছে, এখানে রাস্তা, পথঘাট তেমন উন্নত নহে এবং এক শহর হইতে আর এক শহরে যাইতে হইলে রেল ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কলিকাতার সহিত পশ্চিম-দক্ষিণ বাংলার (অর্থাৎ মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা) এবং উত্তর বাংলার মোটরপথ দ্বারা সংযোগ অতীব প্রয়োজন, কিন্তু এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার উভয়েই উদাসীন। মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গার উপরে সেতু এবং কোলাঘাটের নিকট রূপনারায়ণের উপরে সেতু সত্বর তৈয়ার করা প্রয়োজন। কোলাঘাটের উপর মোটরপথের সেতু করিলে মেদিনীপুর জেলা ও বাঁকুড়া জেলার সহিত সহজ-সংযোগ স্থাপিত হইবে এবং ইহাতে মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূল যথেষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু ও উন্নত হইবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার রূপনারায়ণ নদের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে গড়িমসী করিতেছেন, আর মুর্শিদাবাদের নিকট গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ কবে হইবে তাহার কোনও ঠিক নাই। অথচ গঙ্গার উপর সেতুর অভাবে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করা খুবই সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় যাতায়াত করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তুলনায় দেখা যায় যে, এক আগ্রাতেই যমুনা নদীর উপর চারিটি সেতু আছে, মথুরায় যমুনা নদীর উপর দুইটি সেতু আছে। আর রূপনারায়ণ কিংবা গঙ্গার উপর সেতু করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের যত গাফিলতী ও উদাসীনতা। বিহারে মোকামা ঘাটের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে যে পরিমাণ তৎপরতা দেখা গিয়াছে, বাংলার ব্যাপারে সেই পরিমাণ উদাসীনতা পরিলক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত যে, নিজেরাই অগ্রণী হইয়া এই সেতু দুইটি নির্ম্মাণ করা। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন সারা প্রদেশব্যাপী মোটরপথ তৈয়ারি করা এবং প্রাদেশিক মোটর যানবাহনকে জাতীয়করণ করিয়া নিয়মিতভাবে চালনা করা। ইহাতে পশ্চিম বাংলার বেকারসমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাইবে।

এ দেশে ঔষধের কারখানা

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার যেরূপ প্রসার হইয়াছে তদনুরূপ ঔষধ মিলিতেছে না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বারো বৎসর পরেও ভারতকে সেজন্য আজও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের উপর নির্ভর করিতে হয়। এবং এই জন্য এ দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকাও বিদেশে চলিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, কোন কারণে, কোন দরকারী অথচ ফলপ্রদ ঔষধের আমদানী বন্ধ হইলে সুচিকিৎসার বাধাও জন্মে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ঘটিতেছে। ইহার ফলে, কোন কোন স্থলে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতেছে। দেশে উপযুক্ত ঔষধ তৈয়ারীর ব্যবস্থা না করিয়া সরকার এই আমদানী বন্ধ করিয়া দিলেন কোন্ যুক্তিতে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।

শুনা যাইতেছে, সরকার এত দিন পরে এ দেশেই উৎকৃষ্ট নির্ভরযোগ্য ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যও পাইবেন জানাইয়াছেন। শ্রীমনুভাই শাহ মস্কোতে সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের সহিত যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন তাহার সর্ত্তানুসারে ঔষধ প্রস্তুতের কার্য্যে ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য এক দল রুশ বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই নাকি ভারতে আসিতেছেন। শুনা যাইতেছে, বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঁচটি কারখানা স্থাপিত হইবে। অবশ্য এই পরিকল্পনার কথা অনেক পূর্ব্বেই শুনা গিয়াছিল, কিন্তু এত দিন তাঁহারা কাজে নামিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, সরকারের এবারে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। এবং তাঁহারা এজন্য বাণিজ্য ও শিল্প-দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, পরিকল্পনা কার্য্যকর হইলে দেশের একটি গুরুতর অভাব যে দূর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের মতিগতি

বহুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের শহরাঞ্চলে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবেন। এজন্য তাঁহারা বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির নিকট সে সময় পরিকল্পনাও চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যের পৌরসভাগুলির এ বিষয়ে এমনিই আগ্রহ যে, মাত্র কয়েকটি ছাড়া এ পরিকল্পনা পাঠাইতে পারেন নাই। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, কলিকাতা কর্পোরেশনের মত প্রতিষ্ঠান ব্যয়াধিক্যের ভয়ে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

সুতরাং আর্থিক প্রশ্নই এখানে বড় বাধা হইয়া পরিকল্পনা কাগজে-কলমেই রহিয়া গেল।

কিন্তু ইহা ত শুধু রাজ্য-সরকারেরই কথা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারেরই এইরূপ আদেশ ছিল। দেখা যাইতেছে, কোন বিষয়ে তৎপরতার সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া অবিচল ভাবে সেই পদ্ধতি অবলম্বনে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যেন কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রেত নহে। নতুবা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাহার নীতি-নির্দ্ধারণ আর ব্যবস্থাপনে এত বিলম্ব হইবে কেন? এ অব্যবস্থা শুধু উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেই নহে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাও ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অথচ ভারতীয় সংবিধানে একটি ধারা আছে—সংবিধান আরম্ভ হইবার পর দশ বৎসর সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র পুরা চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করিবেন। ধারাটিতে সময়ের কোন নির্দ্দেশ দেওয়া নাই বটে, কিন্তু যখন একটা সময়ের পরিমাণ জ্ঞাপন করা হইয়াছে তখন সংবিধান কর্ত্তাদের মনে এরূপ ধারণা থাকাই স্বাভাবিক যে, দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পক্ষে ধারায় উল্লিখিত সময়ই যথেষ্ট। কিন্তু সংবিধান গ্রহণের পর দশ বৎসর হইতে চলিল, তাঁহারা কার্য্যতঃ কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারেও এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্ব্বিচারে ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দিতে আপত্তি করিয়াছেন। এ আপত্তি একেবারে অযৌক্তিক সে-কথা আমরা বলিব না। কিন্তু প্রচলিত যে পরীক্ষারীতির সাহায্যে উপযুক্ততা নিরূপিত হইতেছে তাহা ঠিক নহে। বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী। তাহা ছাড়া বিবেচনা করিবার আরও দিক আছে। যাহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা-লাভের অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইল, তাহাদের ভবিষ্যৎ? তাহারা কি করিবে? প্রায়ই বলা হয়, তাহারা রুচি ও শক্তি অনুসারে কোন বৃত্তি বা কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিবে। কিন্তু সেরূপ যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে কি? সুতরাং পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া শিক্ষা-সংস্কারের এই প্রয়াস অযৌক্তিক এবং দেশের অকল্যাণকর।

পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে সরকারের ব্যর্থতা

মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন, দেশের পল্লী-অঞ্চলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। এই জন্য তিনি সে সময় গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘ নামে একটি সংস্থাও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সেদিন টনক নড়িয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধী যদি এই সংস্থার মধ্য দিয়া পল্লী-অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেন, তবে বিপদ ঘটিবে। সেই ভয়ে পল্লী-অঞ্চলের উন্নতির জন্য তাড়াতাড়ি কিছু টাকাও দিয়া দেন। পরে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে তাহা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতালাভের পর এই প্রচেষ্টা আবার উজ্জীবিত হয়। গত ১৯৫২ সনের ২রা অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে আমেরিকার অর্থানুকূল্যে ভারতের ৩০ হাজার পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য দেশে ৫৫টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়, কমিউনিটি ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্ট। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সর্ব্বত্র পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে নিজেদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং তাহাদিগকে এই জন্য সর্ব্ব ব্যাপারে সমবেত ভাবে কর্ম্ম বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা। সুতরাং কমিউনিটি প্রজেক্ট আন্দোলনকে সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা না বলিয়া, পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ইহাও আজ সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই দীর্ঘ সাত বৎসরে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়াও, তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা রিপোর্টের পর রিপোর্টই পেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাজ সেরূপ কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। এবং নিষ্ফলতার কারণও কিছু দেখান নাই।

অবস্থা বুঝিয়া ভারত সরকার শ্রীবলবন্ত রায় মেহেতার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি বলেন, পল্লীবাসীর কি ভাবে উন্নতি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব পল্লীবাসীর উপর প্রদত্ত না হইলে অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। শ্রীভি. টি. কৃষ্ণমাচারিও এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত পরিকল্পনার জন্য যে অর্থব্যয় হইতেছে সেই তুলনায় কাজ পাওয়া যাইতেছে না। উহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদের কর্মশক্তিকে কাজে লাগান সম্ভবপর হইতেছে না। এই জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন—এখন হইতে দেশে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসী-দের দ্বারা পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি গঠনই সমাজ উন্নয়ন-পরি-কল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইবে। এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বাবদে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে ইহাও স্থির হইয়াছে।

কিন্তু ব্যয় ত আগেও হইয়াছে, আসল গলদ কোথায় ইহা বাহির করিতে না পারিলে টাকাগুলি জলে ফেলাই হইবে। আসল গলদ হইতেছে, কেহই আপন আপন কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে চাহিতেছে না। কৃষি-ঋণ, খালের জল, রাসায়নিক সার চাষী যাহা পাইতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। তাহাও আবার সময়মত পাওয়া যায় না। বাধ্য হইয়া চাষীদের মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। ঠিক এই একই কারণে জাপানী-পদ্ধতিতে কৃষি-ব্যবস্থা চালু হইতেও পারিতেছে না, কুটীর-শিল্পেরও উন্নতির পথে বাধা জন্মিতেছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পল্লীর আপামর জনসাধারণকে সমাজ-সচেতন ও উন্নয়নমুখী করিয়া তুলিবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন-কমিশনারের মন্তব্য অনুসারে যে-ক্ষেত্রে উন্নয়ন-মূলক কাজ সম্বন্ধে ব্লকের কর্ম্মকর্ত্তাগণের সহিত পল্লীর অধিবাসীদের কোন বুঝাপড়া নাই এবং যেক্ষেত্রে এই কাজ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগ, সেচ-বিভাগ, সমবায়-বিভাগ, শিল্প-বিভাগ, অর্থ-বিভাগ ইত্যাদির কোন সহযোগিতা নাই, সে ক্ষেত্রে টাকা খরচ হইলেও কাজ যে কিছুমাত্র অগ্রসর হইবে না তাহা যে কেহই বলিয়া দিতে পারে। এই ধরনের গলদ সরকারের সর্ব্বত্র, তবু চৈতন্ম হয় না ইহাই আশ্চর্য্য।

মূলকথা অযোগ্য লোকই চাকুরী হিসাবে এই কাজে ঢুকিতেছে এবং আত্মীয়-পোষণরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্তই এইরূপ ঘটিতেছে। শুধু যোগ্যতার প্রশ্নই এখানে নয়, এই বিভাগের উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীরাও ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের কার্য্য সমাধা করেন। পল্লীর কোথায় কি ঘটিতেছে—এমন কি পল্লী সম্বন্ধে ধারণাও হয়ত কাহারও কাহারও নাই। ইহারাই হইলেন পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের দণ্ডমুণ্ড কর্ত্তা! এই গলদ সরকারী দপ্তরে সর্ব্বত্র। যাঁহার যেখানে বসিবার স্থান নয়, তাঁহাদের সেইখানে বসাইয়া দিয়া সরকার তামাসা দেখিতেছেন। কিন্তু এই তামাসা আর কতদিন চলিবে?

খাদ্য-নীতি কোন্ পথে চলিতেছে?

বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতি প্রসঙ্গে দেরাদুনে রোটারি ক্লাবের ভোজ-সভায় উত্তর প্রদেশের গবর্ণর শ্রী ভি. ভি. গিরি বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলিয়াছেন, মোট উৎপাদন সর্ব্বত্র সমভাবে বণ্টন করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাতে কোন অঞ্চলই প্রয়োজনের তুলনায় বেশী সম্পদের সমাবেশে ফুলিয়া ফাঁপিয়া না উঠে এবং অন্যান্য অঞ্চলে অভাবের জন্ম লোকে অনাহারে প্রাণ না হারায়।

কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বে সঙ্কলিত তথ্যাদি দ্বারাই প্রমাণ হইয়াছে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীতে মোট সম্পদের রাজভাগ গ্রাস করিতেছে, আর অনুন্নত দেশগুলি ন্যূনতম প্রয়োজনের একটা নগণ্য অংশও পাইতেছে না। ইহাই বিশ্বের একাংশে অতি-সমৃদ্ধির, অন্য অংশে নিদারুণ বঞ্চনার কারণ। এরূপ অসম ব্যবস্থা সংশোধনের জন্ম শিল্পোন্নত দেশগুলি সাড়া দিলে বিভিন্ন দেশের বৈষয়িক অবস্থার গুরুতর বৈষম্যের কতকটা প্রতিকার সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, বঞ্চিত দেশগুলি দুর্ভাগ্য প্রতিরোধের জন্য জীবন-পণ চেষ্টা না করিলে কায়েমী স্বার্থভোগী দেশগুলিই বা বর্ত্তমান প্রাধান্ত ও প্রতিপত্তি ত্যাগ করিবে কেন? মানবতাবোধের নিকট আবেদন করিয়া স্বদেশবাসীর নিকটও সাড়া পাওয়া যায় না। এ দেশেই অধিকতর ভাগ্যবান শ্রেণীগুলি বঞ্চিতদের সহিত ন্যায্য ভাবে বখরা করিয়া জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য উপকরণসমূহ ভোগ করিতে সম্মত হইলে নিজেদের চেষ্টা দ্বারাই বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সম্ভব হইত। কথা আছে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়।" সর্ব্বাগ্রে স্বদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন লোকের মধ্যে এই আকাশ-পাতাল বৈষম্যের অবসান ঘটান প্রয়োজন। কিন্তু স্বার্থ আগাইতে দিবে কি?

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল শ্রী গিরি বলিয়াছেন, খাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কে ভুল হিসাবের জন্ম অর্থনীতিবিদরাই দায়ী। তাঁহারা নাকি এক সময় এক রকম কথা বলেন, পরে আবার সম্পূর্ণ উল্টা কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলিলেন, দেশে প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে, কয়েকদিন পরেই জানাইলেন, চাহিদা পূরণের জন্ম পর্য্যাপ্ত খাদ্য নাই। অবশ্য শ্রী গিরি বলিয়াছেন, কোথায় যেন একটা গুরুতর গোলমাল আছে। তাঁহার এই শেষের কথাটি সত্য। খাদ্য ও বাজারদর সম্পর্কে ভুল বিবরণ সঙ্কলনের ও প্রকাশের জন্ম অর্থনীতিবিদগণ যে দায়ী নহেন, এ কথা রাজ্য-পালের আসনে বসিয়া তিনি কি জানেন না? অর্থনীতিবিদগণ এ হিসাব সঙ্কলন করেন না। সরকারী দপ্তরে কর্ম্মরত বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাই এগুলি সঙ্কলন করেন। আর এই উৎপাদন-সংক্রান্ত মন-ভুলানো হিসাবগুলি তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই তৈয়ারি করিয়া থাকেন—তাহাও এবারে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। অর্থনীতি-বিদগণের ত্রুটি এসব মন-গড়া ও সাজান হিসাবকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা। ভারতে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বাজারদর সংক্রান্ত হিসাব সঙ্কলনের পদ্ধতিতে যে একটা গুরুতর গোলমাল আছে—শ্রী গিরির এ অনুমান অভ্রান্ত। তবে ইহার জন্ম সরকারই সম্পূর্ণ দায়ী।

কলিকাতার সৌন্দর্য্য রক্ষায় পুলিস

অসংখ্য প্রাচীর-পত্রে কলিকাতার প্রতিটি গৃহ কলঙ্কিত। শ্লীল-অশ্লীল প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াও ইহার কুশ্রীতাই সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে। কলিকাতা নগরীর সৌন্দর্য্য যাহাতে রক্ষিত হয় তাহার জন্ম পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সজাগ হইয়াছেন। শীঘ্রই এই মহানগরীর দেওয়াল হইতে বিজ্ঞাপন ও প্রাচীর-পত্র সরাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহারা নাকি উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য এই তিন ভাগে কলিকাতাকে ভাগ করিয়া লইয়া অভিযান সুরু করিবেন। সুতরাং আশা করিতে পারা যায়, কলিকাতা আবার পূর্ব্ব-শ্রী ফিরিয়া পাইবে। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কলিকাতা নগরী এখন অনেকটা বিজ্ঞাপন নগরীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কলিকাতার নোংরামি কি শুধু এই বিজ্ঞাপন ও প্রাচীর-পত্রের জনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার দুর্গন্ধযুক্ত গলি, মলমূত্র-পরিকীর্ণ-চলতি-পথ, হাইড্রাণ্ট-নিঃসৃত ঘোলা জলে কর্দ্দমাক্ত গৃহস্থ পল্লী, পুরীষাস্তীর্ণ সাধারণ শৌচাগার, নরককুল্য বাজার এবং ষাড়-গরু, ঘেয়ো কুকুর ও বিকৃত বিকলাঙ্গ ভিখারী বা পাগল-অধ্যুষিত যে কলিকাতায় সাধারণ গৃহস্থেরা বাস করেন, তাহার অপেক্ষাও কি প্রাচীর-পত্র বেশী নোংরা? অথচ এই নোংরামি রদ করিবার জন্ম তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। বুঝিতেছি, তাঁহারা কলিকাতাকে চেনেন, চৌরঙ্গী, পার্ক ষ্ট্রীট, রেড রোড, সেণ্ট্রাল এভিন্যু,

হরিশ মুখার্জ্জি রোড, রাসবিহারী এভিনুার মধ্য দিয়া। আর সে চেনাও প্রধানতঃ চলন্ত গাড়ী হইতে। তাই দেওয়াল-সংলগ্ন বিজ্ঞাপন ও প্রাচীর চিত্রগুলিই তাঁহাদের বেশী করিয়া চোখে পড়িতেছে। চোখে পড়ে না, পথের মধ্যে মরা কুকুর, এঁটো বাসনের ছাই, স্তূপাকার শাল পাতা, মাটির ভাঁড় প্রভৃতি। এই সব আপদ ও আবর্জ্জনা যাহা কলিকাতার কণ্ঠ রোধ করিতেছে তাহার তবে কি গতি হইবে? জানি এ লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইবেন না। বেকার, উদ্বাস্তু, দিন-মজুর ফুটপাথবাসী বিচিত্র পর্য্যায়ের মানুষদের শহরে শুচিতা, সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা শুধু তাঁহারা পোষ্টার-উৎসাদনেই সম্পন্ন করিবেন!

আগেকার দিনে পথে ঘাটে, প্রকাশ্য স্থলে মলমূত্র ত্যাগ বা উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা অসম্ভব ছিল। সেই আইন-কানুন আজও আছে, কিন্তু পুলিসের নাকের সামনে হইলেও এ বিষয়ে কোনও কিছু করা হয় না। বোধ হয় যে, সংবিধানে এ বিষয়ে বাধা দেওয়ার কিছু আছে।

যাহা হউক কলিকাতা নামক মহানরককে উদ্ধার করিবার কথাও যে কর্ত্তৃপক্ষের মনে উদয় হইয়াছে, তাহাতেই আমরা ধন্য।

পৌরসভায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ

শালীনতা ও ভদ্রতার সীমারেখা কোথায় টানিতে হইবে, ইহা পরিমাপ করিয়া বলা না গেলেও, রুচি বলিয়া একটি জিনিস আছে, সেই রুচিতে আঘাত লাগে এইরূপ আচরণই গর্হিত। উচ্চতর মহলে আলস্য, দুর্নীতি, শৈথিল্য, ঔদাসিন্য, অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতা আর নিম্নতর মহলে অসহিষ্ণুতা, ঔদ্ধত্য, শৃঙ্খলাভাব ও অধীরতা। ইহাই দেশের মোটামুটি চিত্র। আজকের সমাজ-চিত্র এই কারণেই ভয়াবহ। দেশপ্রেম, দেশসেবা, লোক-কল্যাণ, সমাজ-উন্নয়ন, পল্লী-সংগঠন এগুলি নামের গরিমায় সমৃদ্ধ। চরিত্রের দিক দিয়া মানুষ যে কোন পথে চলিয়াছে তাহা নিরূপণ করাও শক্ত। সততার কথা না বলিলেও, সাধারণ শালীনতা, শোভনতা এবং ভদ্রতা পর্য্যন্ত মানুষ আজ হারাইয়া বসিয়াছে। স্বার্থই আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, যে কারণে দেশ ও সমাজের প্রতি মানুষের কোন দায়িত্বই নাই।

এই অবস্থা শুধু ব্যক্তিগতই নয়, জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলিও হইয়াছে তাই। কি বিধানমণ্ডলী, কি পৌরসভা সর্ব্বত্রই চলিয়াছে সমাজ-বহির্ভূত আচরণ!

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা পৌরসভার এক সাপ্তাহিক অধিবেশনে যে অদ্ভুত ও অভাবিতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা দেশের সামগ্রিক চিত্রটিকে চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। ইহাই যদি দেশের সত্যিকার রূপ হয়, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? পৌরকর্ম্মীরা সেদিন পৌরসভায় যে দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে নিন্দা করিবার ভাষাও খুঁজি নাই। সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কলিকাতা পৌর-সভা এক গৌরবজনক ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান এককালে ছিল। কলিকাতা পৌরসভার মেয়রের পদ সর্ব্বজন-সম্মানিত। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হইয়া যাঁহারা উহার মর্য্যাদাহানি করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না, তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আস্ফালন, অভদ্র আচরণ আর উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভ যে প্রকৃত শক্তির পরিচায়ক নহে, দুর্ব্বলতার নগ্ন প্রকাশ-মাত্র, ইহা তাঁহারা আজও বুঝিলেন না ইহাই দুঃখ। তাঁহাদের অধৈর্য্য হইবার কারণ হয়ত ছিল, কিন্তু তাহার প্রকাশ কি ঐ ভাবে করা সঙ্গত ছিল? ভবিষ্যতে তাঁহারা দাবি উত্থাপনের, অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শোভন ও সংযত পথ বাছিয়া লইলে সুখের কারণ হইবে।

কোন পক্ষের আচরণকেই আমরা সমর্থন করিতেছি না। অপরাধ উভয় পক্ষেরই। দাবি জানাইবার পথ উহা নহে। গত চার পাঁচ বৎসর ধরিয়া ফাইনান্স কমিটি, সাব-কমিটি, স্পেশাল কমিটি, পৌরসভা, আবার নূতন ফাইনান্স কমিটি—এই জটিল-চক্রের মধ্যে পড়িয়া পৌরকর্ম্মীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তনের প্রশ্নটি যেরূপ ঘূরপাক খাইতেছে তাহাতে তাহাদের মাথা যদি কিছু গরম হইয়াই উঠে তবে দোষ খুব দেওয়া যায় না, কিন্তু তাহাদের মাথা গরম হইলেই যে অপর পক্ষের মাথা বিগড়াইতেই হইবে এরূপ কি কথা আছে? প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, এতদিনে বেতনের পরিবর্ত্তিত হার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই করা হয় নাই—শুধু তাহাই যে চুক্তি অনুসারে পৌরকর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট করিতে বিরত রহিয়াছেন, তাহাও রক্ষিত হয় নাই। এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে সংসার পরিচালনা যে কি দুরূহ সমস্যা, বিশেষ করিয়া যাঁহাদের আয় অল্প তাঁহাদের পক্ষে, তাহা পৌর-পিতারা কি বুঝেন না? বুঝিলে এই ভাবে সময়ক্ষেপ করিতে স্বতঃই সঙ্কোচবোধ করিতেন। এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা যদি এই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করেন যে, পৌরসভা শুধু বক্তৃতা দিবার স্থান নহে, কাজ করিবার স্থান—অন্ততঃ কাজটা মুখ্য, বক্তৃতা গৌণ তবে অনেক ঝঞ্ঝাট এড়ানো সম্ভব হইতে পারে, পৌরসভার খ্যাতিও ক্ষুণ্ণ হয় না।

নূতন রেলপথে বাধা

বর্ত্তমানে উত্তরবঙ্গের মালদহ ও অন্যান্য জেলা হইতে পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আসিতে হইলে, বিহারের সকরিগলিঘাট ও মনিহারীঘাট দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হয়। এইরূপ বহু পথেই যাতায়াতের বড় অসুবিধা। রেল কর্ত্তৃপক্ষ সেই জন্যই তিলডাঙ্গা, ফরাক্কা ও মালদহ খেজুরিয়া ঘাট এই দুইটি লাইনের কাজে হাত দিয়াছেন। এক বৎসরের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণও হইবে বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন।

এই লাইন দুটি চালু হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফরাক্কা গঙ্গানদী পারাপারের ব্যবস্থা হইলে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার লোক পশ্চিম-বঙ্গের মধ্য দিয়াই যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু তবু বলিব, ইহা দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। এই সমস্যা হইতেছে, সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়া উত্তরবঙ্গের এবং দক্ষিণবঙ্গের যাত্রী

ও মাল চলাচলের অবাধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির সমস্যা। ফরাক্কাতে গঙ্গানদীর উপর যদি একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া সেই বাঁধের উপর দিয়া উভয় তীরস্থ রেলপথের সংযোগ সাধিত হয় এবং ফরাক্কা হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত ব্রডগেজ রেলপথের সম্পূর্ণাংশ যদি পশ্চিমবঙ্গের এলাকার মধ্য দিয়া প্রসারিত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত সরাসরি রেলপথে যাত্রী এবং মাল আদান-প্রদানের সুবিধা হইতে পারে।

কিন্তু শুনা যাইতেছে তাহা হইবে না। পরিবর্ত্তে ঐ রেলপথ বিহারের রেলপথের সহিত যুক্ত করিয়া দিবেন। এই ব্যবস্থায় মাল পাঠাইতে অযথা বিলম্বও হইবে, খরচও বেশী পড়িবে। এখানেও সেই প্রাদেশিক ভেদ-বুদ্ধির ক্রিয়া চলিয়াছে। ফরাক্কা বাঁধের কাজও সেই একই কারণে বিলম্বিত হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে দাবি উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উঠিবে। কিন্তু ইহা অরণ্যে রোদন—উঁহারা যাহা করিবার তাহা করিবেনই।

শোনা যায় যে, ফরাক্কা সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তির সময় আসিয়াছে, সরকার এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। এখানেও যাহা ঘটিতেছে, তাহাও কয়েকটি লোকের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব দুষ্ট লোকের নিয়োগ বৈষম্যে সরকারের অর্থই শুধু অপচয় হইতেছে না, জনসাধারণও তাহাদের ব্যবস্থায় তিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি

সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারের দিকে সরকারের এবার দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুখের কথা। এই শিক্ষা-প্রসারের সুবিধার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক ১৯৫৬ সনের অক্টোবর মাসে একটি কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তাহা—গোপনই ছিল। বর্ত্তমানে দেখিতেছি কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার এক্ষণে নয় জন সদস্য লইয়া একটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড গঠন করিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন পর্য্যায়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রকার-নির্দ্ধারণ, পাঠক্রমের সংযোগসাধন, বে-সরকারী গবেষণা-সংস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ড ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

বুঝিতে অসুবিধা হয় না এবং বুঝিয়া আনন্দ হয় যে, সংস্কৃতের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে ভারত সরকারের একটি প্রবল আগ্রহ বর্ত্তমান। রস এবং ঐশ্বর্য্যের বিচারে ভারতের এই প্রাচীন ভাষাটির স্থান যে কোথায়, সেকথা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু দেখিয়া দুঃখ হয় যে, দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের গতি যেদিন রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই রস এবং ঐশ্বর্য্যকে সম্ভোগ করিবার অধিকার নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া আছে! কিন্তু একথা ত মিথ্যা নয়, এদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এবং ভারতীয় মানসের মহিমা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণায় পৌঁছাইতে হইলে সংস্কৃতের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। সংস্কৃত না জানিলে দেশের অতীত রূপটিকে যেমন জানা যায় না, তেমনি দেশের অতীত রূপটিকে জানা না থাকিলে বর্ত্তমানকেও জানা যায় না। সংস্কৃতের চর্চ্চা যে আরও ব্যাপক হওয়া দরকার সে এই কারণেই। তাহা ছাড়া সংস্কৃতের সহিত আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহেরও যোগ এতই নিবিড় যে, সংস্কৃত না জানিলে আধুনিক ভাষাকেও ভাল করিয়া আয়ত্ত করা যায় না। আশা করিব যে, প্রয়োজনীয় আনুকূল্যের অভাবে সংস্কৃত-চর্চ্চার যেসব কেন্দ্র বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, সেগুলির দুর্দ্দশামোচন করিয়া কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ড এবারে সংস্কৃত শিক্ষার পন্থাকে আরও সুগম এবং উদ্যমকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবেন।

চর বিশ্বনাথপুরে ভাগীরথীর খাল

ফরাক্কা বাঁধের বিকল্প হিসাবে যে খাল কাটিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহার কাজ নাকি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই খালের প্রয়োজনীয়তার কথা কেহই অস্বীকার করে না। ভাগীরথীর বুকে পলিমাটি জমিয়া জমিয়া তাহা সকল কাজেরই বাহিরে যাইতেছিল। কলিকাতা হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই নদীটিতে সারা বৎসরই যাহাতে জাহাজ চলাচল সম্ভব হয়, এবং নদীর জলরাশিতে লবণাক্ততার পরিমাণ যাহাতে হ্রাস পায়, তাহার জন্যই ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যে সংযোগ-সাধনের প্রয়োজন ছিল। প্রস্তাবিত খালের পথে পদ্মা হইতে ভাগীরথীতে যাহাতে প্রয়োজনানুরূপ জল আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই খাল কাটা হইবে, ইহাও অনুমান করা গিয়াছিল, অর্থাৎ কতখানি গভীর করিলে, জলপ্রবাহ অব্যাহত থাকিবে, তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার ছিল—দুঃখের বিষয়, খাল প্রায় সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু তাহা আশানুরূপ গভীর হয় নাই। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে পদ্মার জলোচ্ছাস যখন কমিয়া যাইবে তখন ভাগীরথীতে জল আসিবে কি না সন্দেহ। খালের গভীরতা পদ্মার স্বাভাবিক জলপৃষ্ঠ হইতে নাকি নীচু নয়, এই কারণে অনুমান করা যাইতেছে, শীতকালে হয়ত ভাগীরথী আবার পদ্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

যদি ইহা সত্য হয়, তবে এই খাল কাটিবার মূল উদ্দেশ্যটাই যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সরকার অবিলম্বে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই আশা করি।

বহির্বিশ্বে ভারতীয় ভাষা

দীর্ঘ দুইশত বৎসর ধরিয়া আমরা প্রতীচ্যের ভাষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। ইহাতে আমরা লাভবানই হইয়াছি। অনুরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা কিন্তু প্রাচ্যের নিকট হইতে সামান্যই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য কিছুই গ্রহণ করেন নাই বলিলে ভুলই বলা হয়। অনেক মনীষী আমাদের বেদ,

উপনিষদ, হিন্দু-দর্শন, জ্যোতিষ ও কাব্য, নাটক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। কেউ কেউ হয়ত রবীন্দ্র, গান্ধী ও অরবিন্দ-সাহিত্য পর্য্যালোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিতসমাজে আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প বা বিত্তা-বৈদগ্ধ সম্বন্ধে প্রায় কোন জ্ঞানই নাই। পৃথিবীর দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে ইউরোপ-আমেরিকার বাজার-চলতি পুস্তকাদিতে তাঁদের কথাই শুধু ফলাও করিয়া পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, আরব প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা থাকে তাহা নামেমাত্র। আর যাহাও বা প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয় কম।

দীর্ঘ দুইশত বৎসর বিদেশী শাসনে দমিত থাকিতে থাকিতে আমরা ইহাতে এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, উহাতে বিচলিত হইতেও ভুলিয়া গিয়াছি। বরং কোন শ্বেতকায় দৈবাৎ যদি আমাদের কোন গ্রন্থ, ছবি বা গানের প্রশংসা করিলে তাহাতেই আমরা কৃতার্থ বোধ করিয়াছি।

কিন্তু আশা এবং আনন্দের কথা, আমাদের এই দুর্দ্দিন কাটিয়া যাইতে সুরু করিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ এবং প্রণিধান করার প্রয়োজন তাঁহারা অনুভব করিতেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিত্তালয়ে বাংলা, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, তামিল ও তেলেগু ভাষা শেখানোর বর্ত্তমান আয়োজন করার চেষ্টা ব্যাপক চলিতেছে। মার্কিন স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগকে ভিত্তি করিয়া দৃঢ় বা ঘনিষ্ঠ হইতে পারে না—এজন্য চাই ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিতর দিয়া মানুষের মর্ম্মানুসন্ধান

দেরীতে হইলেও এ উপলব্ধি যে তাঁহাদের হইয়াছে ইহা আশার কথা। অবশ্য ইংলণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে অগ্রণী রাশিয়ায় বাংলা, হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ব্যাপক চর্চ্চা তাঁহারা অনেক আগেই সুরু করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সোভিয়েটের আগ্রহ সমধিক। বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা, বাংলা বইয়ের রুশ এবং রুশ বইয়ের বাংলা ভাষান্তর প্রকাশ, কথ্য বাংলা বলিতে শেখানো এবং নানা পথে তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি মূল বাংলা হইতে রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ এবং খণ্ডে খণ্ডে তাহা প্রকাশ। শুধু রবীন্দ্র-রচনার নয়, রবীন্দ্র-পরবর্ত্তীকালের বাঙালী লেখকদের কাহারও কাহারও রচনার অনুবাদও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এ কাজ এখনও চলিতেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া হইতেও রবীন্দ্র-রচনাবলীর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশের আয়োজন চলিতেছে। এই ব্যাপক-প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিলে, আজ যেমন আমরা হুইটম্যান, আপ্টন সিনক্লেয়ার, পার্ল-বাক, ও'নিল প্রভৃতির বইয়ের সমাদর করিতেছি—একদিন দেখিতে পাইব, তাঁহাদেরও ঘরে ঘরে মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বইগুলি শোভা পাইতেছে। এই অবস্থা যতদিন না আসিতেছে, ততদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সত্যকার অন্তরঙ্গতা কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না।

নূতন পদ্ধতিতে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা

বাংলা দেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিয়াছে, তদনুরূপ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। হাসপাতালের শয্যা-সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট। তাহার উপর এদেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। যাহারা পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পায় না, তাহারা এই দুরূহ রোগের চিকিৎসা করাইবে কিরূপে? কারণ প্রতিকার ত সহজ-সাধ্য নয়।

এই প্রতিকারের ব্যবস্থাগত আয়োজনের প্রধানতঃ তিনটি দিক আছে। প্রথম, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, যাহা পুষ্টি ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়টি হইল, চিকিৎসার ব্যবস্থা। তৃতীয়, আরোগ্যোত্তর তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা।

গরীবের পক্ষে কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়। যক্ষ্মা চিকিৎসার ক্লিনিক স্থাপিত হইতেছে, আরোগ্যোত্তর উপনিবেশও স্থাপিত হইতেছে—যদিও প্রয়োজনের দিক দিয়া এই উদ্যোগ যথেষ্ট নহে। কিন্তু ইহা ত হইতেছে ধনী লোকের জন্য। যাহাদের ধন নাই, তাহারা কি করিবে? সুতরাং বহুসংখ্যক ক্লিনিক ও আরোগ্যোত্তর কলোনি স্থাপন করাই যে প্রতিকার-সাধনের একমাত্র পন্থা ইহা বলিতে পারিতেছি কই? তাই মনে হয়, পাঁচ লক্ষ যক্ষ্মারোগীর দেশ এই ভারতের সমস্যাটি অন্য উন্নত দেশের সমস্যার অনুরূপ নহে। আজ সরকারও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। তাই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, স্বল্পব্যয়ে গৃহচিকিৎসা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনাও রচিত হইয়াছে। আমরাও এই পদ্ধতিকে একটি সার্থক পদ্ধতি হিসাবে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে পারি, যেখানে অধিকাংশ রোগীই অত্যন্ত দরিদ্র সেখানে এইরূপ পদ্ধতিরই প্রয়োজন ছিল। হাসপাতালের বেড যতই অল্প-ব্যয়সাধ্য করা হউক না কেন, সেই অল্পতারও একটা সীমা আছে এবং তাহাও গরীবের আর্থিক যোগ্যতার সাধ্যায়ত্ত হইবে না। পাঁচ লক্ষ রোগীকে আশ্রয় দিবার মত হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নহে। সুতরাং শুধু হাসপাতাল-নির্ভর চিকিৎসার উপর নির্ভর করিলে ভারতের যক্ষ্মারোগের প্রতিকার দুরূহতর হইবে। এবং এই সঙ্গে আমরা এই কথাই বলিব, যে-পদ্ধতিতে চিকিৎসার কথা সরকার বলিতেছেন, তাহার ব্যয় যেন গরীবের সাধ্যায়ত্ত হয়। তবেই সরকারের পরিকল্পনাটি যথার্থ জাতীয় কল্যাণের সহায়ক হইবে।

কিন্তু সকলের চাইতে গুরুত্ব আমরা দিই প্রতিরক্ষাকারক খাদ্যের উপর (protective diet)। বাঙালীর খাদ্যের মধ্যে

দুধ ও মাছই প্রধানতঃ ঐ গুণসম্পন্ন। দুধের মূল্য কিছু কমিয়াছে কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পাওয়া যায় না এবং কিনিবার পয়সাও দেশের সাধারণ জনের নাই। মাছ লইয়া ত জুয়াখেলা চলিতেছে। এই বাজারে চোরাকারবারী বা তাহার সহায়ক সরকারী দলবল ছাড়া আর কাহারও মাছকে খাদ্য হিসাবে কিনিবার ক্ষমতা নাই।

খাদ্য না থাকিলে ঔষধে যক্ষ্মারোগকে হটাইতে পারা যাইবে না। সুতরাং মূলকথা ঐরূপ খাদ্য সহজলভ্য করা।

চিনির বাজারে ব্যবসায়িদের কারসাজি

বর্ত্তমানে চিনির মূল্য ক্রম-বর্দ্ধিত হারে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার কারণ অনেকগুলিই নির্দ্দিষ্ট হইলেও, মুনাফালোভীর চক্রান্তই যে বেশী ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার চিনি-বণ্টনের দায়িত্ব লইয়াছেন এবং লাইসেন্স ভিন্ন কেহ চিনির পাইকারী ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না, এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এবং সরকার ঐ সঙ্গে ইহাও জানাইয়াছেন, কোন ব্যবসায়ী ভারত সরকারের অনুমতি না লইয়া ভারতের এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে চিনি পাঠাইতে পারিবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ব্যবসায়ীগণ গবর্ণমেণ্টের এই নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া গোপনে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে—সরকারের কোন সম্মতি না লইয়াই জাহাজযোগে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের দশ হাজার মণ চিনি আসামে পাচার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুলিস পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকায় এই চিনি রপ্তানী হইতে পারে নাই। পুলিস চারিটি ফার্ম্মের বারোজন কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, পুলিস আসল অপরাধীর অঙ্গ স্পর্শও করে না, ধরা পড়ে অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা। ইহার ভিতরের অর্থ যাহাই থাক, আমরা বলিব অপরাধ করিবার জন্যই তাহাদের জীয়াইয়া রাখা হইতেছে। উপযুক্ত শাস্তি পাইলে এইরূপ অপক্রিয়া হয়ত কমিয়া যাইত।

তিস্তার ভাঙ্গন

জলপাইগুড়ির 'জনমত পত্রিকা' জানাইতেছেন:

"তিস্তা নদীর ভাঙ্গন ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। শিবোকে রেল পুল অতিক্রম করিয়া বিপুল জলরাশি হঠাৎ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। পাহাড় ও জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আসাম রেলের স্থানে স্থানে কুড়ি হাতের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। কখন যে লাইনটি ভাঙ্গিয়া যায় ইহা বলা যায় না। রেল পুল হইতে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বদিকে প্রবল স্রোত সোজাভাবে পাহাড়ে আঘাত করিতেছে। কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার হইয়াছে। সে স্থান হইতে রেল লাইন দুইশত হাতের মধ্যে। ১৯৫০ সনে নির্ম্মিত কংক্রীট টানেলটির প্রায় এক হাজার গজ পশ্চিম হইতে টানেলের নিকট পর্য্যন্ত স্থানে পাড় প্রায় ৯০ ফুট খাড়া, নীচে প্রচণ্ড স্রোত, রেল লাইন পনর হইতে কুড়ি হাতের মধ্যে। টানেলের উপরে পাহাড় ধ্বসিয়া গিয়াছে। এখানে পাড় প্রায় দুই শত ফুট খাড়া। এই ভাঙ্গন হইতে রেল লাইন ও টানেলটি রক্ষা করিতে প্রায় এক হাজার শ্রমিক ও দশজন কর্ম্মচারী জঙ্গলের মধ্যে দিন রাত্রি কাজ করিতেছেন। লোহার জালের মধ্যে বড় বড় পাথর দিয়া নদীর গতি ফিরাইবার চেষ্টা চলিতেছে। রাত্রিতে বিজলী বাতিতে সর্ব্বস্থান আলোকিত করিয়া রাখা হইয়াছে। দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত-ভাবে নদীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছে। মনে হয় চেষ্টার কোন ত্রুটি হইতেছে না। এত করিয়াও রেল লাইনটি যে রক্ষা পাইবে তাহা মনে হয় না। এ বৎসর বাঁচিলেও আগামী বর্ষায় কি হইবে বলা যায় না। রেল পুলের দক্ষিণে একটি বিরাট চর পড়িয়াছে। ইহাতে ধাক্কা লাগিয়া স্রোত পূর্ব্বদিকে যাইতেছে। স্রোতের গতি দেখিয়া স্পষ্টই ইহা প্রতীয়মান হয়। এই স্রোত আরও পূর্ব্বদিকে ভাঙ্গিয়াছে কাঠাম বস্তী, সরকারী ধান্য ক্ষেত্র ও আপালচাঁদ সরকারী বন। তারপর দক্ষিণে ফিরিয়াছে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে। নদীর গতি দেখিয়া মনে হয় অতি সত্বর অন্ততঃ ত্রিশ মাইল দক্ষিণে দোমহনীর নিকটে তিস্তার উপর আর একটি পুল করিয়া নূতন আর একটি রেল লাইন এখনই করিয়া না রাখিলে ডুয়ার্স ও আসামের সহিত যোগাযোগ যে কোনও মুহূর্ত্তে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে। এই বৎসরের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় রেল বোর্ডকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাই এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে এই বৎসর হইতেই। বিলম্বে হয়ত চারি গুণ অর্থব্যয় হইবে এবং জনগণের দুঃখ ও ক্ষতি হইবে ইহার দ্বিগুণ।'

সরকারী রাজস্বের অপচয়

বর্দ্ধমানের 'বাঙালী সঙ্ঘ' পত্রিকা জানাইতেছেন:

"আত্মীয়তোষণ ও পোষণ নীতিতে বাংলা রাজ্যসরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যে সরকারী টাকার যে অপচয় বিগত ১২ বৎসর হইয়াছে ও হইতেছে ইহার শেষ কোথায়? প্রতিবিধানে মন্ত্রী-মণ্ডলী নীরব, প্রতিবিধান কে করিবে?

কলিকাতার বেলিয়াঘাটা-অঞ্চলে একটি পরিত্যক্ত পাটের গুদামে উদ্বাস্তু শিবির প্রতিষ্ঠায় গুদামের মালিককে মাসিক ৬,০০০৲ হাজার টাকা একুনে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।

বারাসতে উদ্বাস্তুদের ঋণের টাকা দালাল মারফত অন্যান্য লোককে দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্তকারী যাঁহার টাকা তিনি পান নাই। সমাজকল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হইয়াছে।

মৎস্যবিভাগের কর্ত্তাদের অনুগ্রহে কর্ম্মচারীদের মধ্যে কিছু কর্ম্মীকে ২,৫০০৲ টাকা খরচ দিয়া মৎস্য বিশেষজ্ঞের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হইয়াছে। মৎস্যচাষের উন্নয়নে তাঁহাদের কোন কাজ নাই। তাঁহারা বিভাগের কেরাণীর কার্য্য করিতেছেন।

মৎস্যচাষকারী মাহিষ্যকে টাকা দেওয়া হয় না। যাঁহারা মৎস্য খাইতে জানেন কখনও মৎস্যচাষ করেন নাই এই প্রকার লোককে টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ঋণগ্রাহী উক্ত টাকায় মৎস্যচাষের পরিবর্ত্তে কেহ কাপড়ের দোকান, কেহ গরু, কেহ বাড়ী করিয়াছেন।

নববারাকপুরে পৌরসভা

নববারাকপুরের 'বোধন' জানাইতেছেন :

"সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন দপ্তরের অর্থসাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হইয়া নববারাকপুর প্রভৃতি কয়েকটি বে-সরকারী ও সরকারী কলোনীতে পৌরসভা স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। নববারাকপুরবাসী পৌরসভা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কিছুসংখ্যক অধিবাসীর চেষ্টায় সে প্রয়োজন সরকারী স্তরে স্বীকৃতও হইয়াছিল। কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় কিছু লোক এই সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর্ম্মে সক্রিয় বাধাদান করিয়াছেন।

নববারাকপুরের মানুষ আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন স্থানীয় জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পথে বিজলিবাতির সুব্যবস্থা, ধন-প্রাণের নিরাপত্তা, নাগরিক জীবনের সর্ব্বনিম্ন সুখ-সুবিধার জন্য থানা পৌরসভা প্রভৃতি স্থাপন অপরিহার্য্য। জনসাধারণের এই অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কিছুসংখ্যক বিরুদ্ধবাদীর সরব প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।"

ঐসব ধনবসতি অঞ্চলসমূহে জল-নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকায় পল্লীবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। এদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের গোলযোগ

জলপাইগুড়ীর 'জনমত' পত্রিকা নিম্নের সংবাদটি পরিবেশন করিতেছেন :

"পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে যে অ-সহযোগ চলিতেছিল তাহা আজও মিটিল না। বরং বেশী জটিল হইয়া উঠিয়াছে—ছাত্রদের বহু দাবি রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কিছুটা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহা মানিতে নারাজ। অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্র হইতে এই পলিটেকনিকের ছাত্রেরা পড়াশুনা সম্বন্ধে অনেকটা মনোযোগী। এই কারিগরী বিদ্যালয় সম্বন্ধে জনসাধারণের ভিতর একটা অভিযোগ রহিয়াছে। কয়েকজন ওভারসিয়ার ছাড়া আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কারিগর বাহির হয় নাই। এ পর্য্যন্ত বহু ছাত্রছাত্রী বহু কিছু পড়িয়াছে। কিন্তু কিছু শিখিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। বহু টাকা ব্যয়ে এই কারিগরী বিদ্যালয়টি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। অনেকেই ইহাকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ বিল্ডিংকে বড় করিয়া ওখানে জিনিসপত্র রাখিবার দিকে জোর না দিয়া সত্য সত্যই যদি কি শিখান হইতেছে সেদিকে নজর দেন তাহা হইলে বিদ্যালয়টিও গড়িয়া উঠিবে। ছাত্রছাত্রী যথার্থ শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।"

পৌরসভার অব্যবস্থা

বজবজের 'অগ্নিশিখা' নিম্নের সংবাদটি দিতেছেন :

"বজবজ পৌরসভা, পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলির মধ্যে আয়ের দিক হইতে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। আর স্বাস্থ্যহীনতা, দুর্নীতি প্রভৃতির দিক হইতেও প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। ইহার জন্য ইহার কমিশনাররা তাঁহাদের দলাদলি, ইহার কর্ম্মচারীদের কর্ম্মজ্ঞানহীনতা ও অলসতা দায়ী।

"এই পৌরসভাটির প্রচুর আয় সত্ত্বেও এখানকার ড্রেনগুলির অধিকাংশের কোন সংস্কার হয় নি, মল নিষ্কাষণের ট্রেলারগুলি অব্যবস্থার জন্য ফুটে যায় এবং রাস্তা অপরিষ্কার করে। বনজঙ্গল, কচুরীপানা হইয়া মশাদের রাজত্বের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। একটু জল হইলে ইহার অনেক রাস্তা দিয়াই চলা দায় হইয়া পড়ে। কমিশনারদের অনুগ্রহে ও যোগ্য কর্ম্মচারীদের ব্যবস্থাপনায় করদাতাদের বাড়ীর ঠিক পাশেই খাটাল ওঠে। দুর্গন্ধ ও মশায় তা বজবজের লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

"পানীয় জলের ব্যবস্থা বড় রাস্তাতেই সীমাবদ্ধ।

পৌরসভার অব্যবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই। ইহার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

বর্দ্ধমান পৌরসভার অপকীর্ত্তি

'বর্দ্ধমান' পত্রিকায় সংবাদটির প্রতি আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

রসিকপুরের পৌরসভার সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত দশ মাস ধরিয়া সাহায্য লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল। অপরাধ—এই মহল্লার অধিবাসীগণ গত পৌরসভার নির্ব্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীকে পরাজিত করিয়াছে। সুতরাং এক হাত দেখিয়া লইতে হইবে। ইতিমধ্যেই যে মহল্লাগুলিতে বামপন্থী কমিশনার নির্ব্বাচিত হন নাই সেখানে পৌরসভার সকল সুবিধা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু আবেদন নিবেদনের পরেও রসিকপুরের অধিবাসীগণ বিদ্যালয়টির জন্য কোন সাহায্য না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়ে। অবশেষে শিক্ষকগণ দশ মাস ধরিয়া বেতন না পাওয়ায় অনশনের সিদ্ধান্ত করিলে অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া বিদ্যালয়টিকে ছয় মাসের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পশ্চিমবঙ্গ পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকগণের একটি সমিতি থাকা সত্ত্বেও এই বিষয় লইয়া কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। পাছে বামপন্থী পৌরসভার অপকীর্ত্তি ফাঁস হইয়া যায় সেই জন্যই কি এই শিক্ষক সমিতিটির অস্বাভাবিক নীরবতা?

মৃতের চক্ষুর সাহায্যে অন্ধের দৃষ্টিলাভ

আমেরিকার রিপোর্টারে প্রকাশ :

"নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডগলাস ম্যাক্‌কের (Douglas Mckay) মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই জন অন্ধ ব্যক্তি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার সুযোগলাভ করেন। মিঃ ম্যাককের চক্ষুর কর্নিয়া ঐ দুই ব্যক্তির চক্ষুতে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

মিসেস ম্যাককে বলেছেন, জীবিতাবস্থায় মিঃ ম্যাক্‌কে তাঁর চক্ষু দুটি একটি চক্ষু-ব্যাঙ্ককে উইল করে দিয়ে যান। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা হয়।"

আইন অমান্য সম্পর্কে ডাঃ রায়ের বিবৃতি

আইন অমান্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন, আমরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

"পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের প্রশ্ন সম্পর্কে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি (কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দলের জোট) আগামী ২০শে আগষ্ট যে "ব্যাপক আইন অমান্য" আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তৎসম্পর্কে এক সুদীর্ঘ বিবৃতিতে উক্ত কমিটিকে সতর্ক করিয়া দেন।

রাজ্যের খাদ্যাবস্থা ও রাজ্য সরকারের নিকট মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সমস্ত "ন্যায়সঙ্গত দাবি" বিশ্লেষণ করিয়া, একাদিক্রমে এই সমস্ত দাবির উত্তর দানের পর ডাঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে বলেন, "এইরূপ আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর কোন দায়িত্বশীল সরকার নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন না।"

মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিকে সতর্ক করিয়া দিয়া আরও বলেন, "যাঁহারা আইন ভঙ্গ করিতে চান, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কার্য্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" তিনি বলেন যে, এই "ব্যাপক আইন অমান্য" আন্দোলনে বাধা দানের জন্য সরকার সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কোন জনসমষ্টি আইন ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের যথেষ্ট ক্ষমতা সংবিধান ও আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষকে দিয়াছে।

ডাঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে আরও বলেন : "খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার উদ্বিগ্ন—যদিও আউশ ধান উঠিতে আরম্ভ করার পর গত কয়েক সপ্তাহে ভালর দিকে খাদ্যপরিস্থিতির মোড় ফিরিয়াছে। তাহা হইলেও সরকার এই ধরনের কোন আন্দোলনকে (প্রতিরোধ কমিটি কর্তৃক পরিকল্পিত) "আইন ভঙ্গের" জন্য ব্যাপক আন্দোলনে পরিণত হইতে দিতে পারেন না।"

পরিকল্পিত আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আইন অমান্যের চেষ্টার ফলে এই রাজ্যে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। তাহা ছাড়া, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ফলে স্বাভাবিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও লোকের কাজ-কারবারের ক্ষতি হওয়ায় খাদ্য-পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিতে পারে।"

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিরোধ কমিটির কার্য্য-সূচীর একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ডাঃ রায় বলেন, "পৃথিবীর কোন রাজ্যে আজ কি এমন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আছেন, যাঁহারা অক্লেশে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে এবং ব্যাপক আইন অমান্য করিবার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাইতে পারেন।"

প্রতিরোধ কমিটির কার্য্যসূচীর উল্লিখিত অংশটি নিম্নরূপ, "২০শে আগষ্ট হইতে সমগ্র রাজ্যে বৃহত্তর গণসংগ্রাম আরম্ভ হইবে। এই সংগ্রাম এক দিকে মজুতদারিবিরোধী অভিযানের ও উদ্ধার করা মজুত চাউল যুক্তিসঙ্গত রূপে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় ব্যবস্থার আকার ধারণ করিবে এবং অপর দিকে তাহা ব্যাপক আইন অমান্য, বাধা সৃষ্টির জন্য উপবেশন, পিকেটিং ইত্যাদির রূপ গ্রহণ করিবে।"

মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে সরকারের অভিমত অনুসারে প্রতিরোধ কমিটির প্রত্যেকটি দাবির যে উত্তর দিয়াছেন, খাদ্য-পরিস্থিতি সমাধানের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাহার বিচারের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি তাঁহার বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, আংশিক রেশন গ্রহীতাদের সংখ্যা আরও ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। রেশন-গ্রহীতাদের বর্ত্তমান সংখ্যা ১ কোটি ৩৩ লক্ষ।

মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন যে, পল্লী-অঞ্চলসমূহের আংশিক রেশনের দোকানের মাধ্যমে সমস্ত লোককেই গম দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৫৯ সনে) আংশিক রেশনের দোকানের মাধ্যমে মোট যত লোককে রেশন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা গত বৎসরের রেশন-গ্রহীতাদের সংখ্যার প্রায় দেড় গুণ।

তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন : গত জুলাই মাসে যত জনকে রেশন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পশ্চিম-বঙ্গের জনসংখ্যা ৩ কোটির মধ্যে ৬৬ লক্ষ লোক যথেষ্ট পরিমাণে ধান উৎপাদন করে বলিয়া বাজার হইতে চাউল ক্রয় করে না। আরও ৮ লক্ষ লোককে সাহায্যদান-ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্য দেওয়া হইতেছে। অবশিষ্ট ২৬ কোটি ২ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ লোককে সেপ্টেম্বর মাসে রেশন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় শনিবার নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :—

রাজ্য সরকারকে খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে তাহার দাবিসমূহ গ্রহণ কিম্বা পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে ২০শে আগষ্ট দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রাজ্যব্যাপী এক আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য উহার কার্য্যসূচী আলোচনা ও বিবেচনার্থ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ

কমিটির উদ্যোগে গত ৮ই আগষ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সমস্ত ন্যায্য দাবি কি? এই সমুদয় বিশ্লেষণ করা শ্রেয়:—

"১ ও ২। রাজ্যের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সাড়ে ১৭ টাকা মণ দরে খাওয়ার উপযুক্ত চাউল সরবরাহ এবং খাওয়ার উপযুক্ত দেড় সের চাউল ও এক সের গম সরবরাহের নিশ্চিত ব্যবস্থা সহ রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে আংশিক রেশনিং সম্প্রসারণ। কার্ডধারী ব্যক্তিদিগকে দুইবারে সাপ্তাহিক রেশন লইতে দেওয়া।"

এই রাজ্যের চাউল সরবরাহ পরিস্থিতি নিম্নে দেওয়া হইল। পল্লী অঞ্চলে যাহাদের জমি আছে তাহাদিগকে সপ্তাহে দুইবার রেশন লইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

নিম্নোক্ত সংখ্যক লোক (লক্ষে) আংশিক রেশন পাইয়াছে:

১৯৫৯ সনের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার আরও অধিক পরিমাণ চাউল সরবরাহ করায় আংশিক রেশনিং স্কীম অনুযায়ী অধিকতর সংখ্যক লোককে চাউল পাওয়ার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

এখন আংশিক রেশন দোকানসমূহ হইতে কলিকাতা ও শিল্প-অঞ্চলে ৪৮ লক্ষ এবং জেলাগুলিতে ৮৫ লক্ষ, মোট ১ কোটি ৩৩ লক্ষ লোক চাউল পাইতেছে।

রেশনিং আরও ১৫ লক্ষ লোকের নিকট সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে সপ্তাহে দেড় সের চাউল ও এক সের গম এবং জেলাগুলিকে এক সের চাউল ও এক সের গম দেওয়া হইতেছে। এই বৈষম্যের প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের লোকদের চাউল পাওয়ার আর কোন উপায় নাই; কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের একজন ক্ষুদ্র চাষীর ও তাহার নিজের কিংবা অপরাপরের সামান্য উদ্বৃত্ত হইতে আরও কিছু চাউল সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে। অনুৎপাদক কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে উচ্চতর হারে চাউল বরাদ্দ করার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ অঞ্চল পল্লী-অঞ্চল হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল আনিয়া তথায় চাউলের অভাবের সৃষ্টি করিবে না।

উক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, আংশিক রেশন দোকান-সমূহের মাধ্যমে ১৯৫৮ সনে মোট যত লোককে রেশন দেওয়া হইয়াছে ১৯৫৯ সনে উহার প্রায় দেড়গুণ লোককে রেশন দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৯ সনের জুলাই মাসে মোট ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার লোককে রেশন দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আগষ্ট মাসে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ লোককে রেশন দিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি, তন্মধ্যে ৬৬ লক্ষ লোক যে সমস্ত পরিবারভুক্ত সেই সমস্ত পরিবার বাজার হইতে চাউল কেনে না, কারণ তাহারা নিজেদের জমি হইতে যথেষ্ট পরিমাণ ধান উৎপাদন করে। আর ৮ লক্ষ লোককে রিলিফ কার্য্যের মাধ্যমে খাদ্যশস্য দেওয়া হইয়া থাকে। অবশিষ্ট ২ কোটি ২৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ১ কোটি ৪৮ লক্ষ জনকে সেপ্টেম্বর মাসে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। গম সরবরাহ সম্বন্ধে কোন অসুবিধা নাই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চাউল অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে গম পাওয়া যায়। চাউলের অপ্রতুলতা-বশতঃ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী রাজ্যের সকল লোককে আংশিক রেশন দোকানসমূহের মাধ্যমে চাউল দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার আংশিক রেশন দোকানসমূহের মাধ্যমে রাজ্যের সকল লোককে গম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৯৫৯ সন

মাস	কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল	জেলাসমূহ	মোট
জানুয়ারী	৪০·৯	১৬·৭	৫৭·৬
ফেব্রুয়ারী	৪৪·৮	২৯·১	৭৩·৯
মার্চ্চ	৪৩.৪	৩১·৬	৭৫
এপ্রিল	৪১	৩৪·৮	৭৫·৮
মে	৪৩·৫	৪৮·৩	৯১·৮
জুন	৪৭·৪	৬১·৪	১০৮·৮
জুলাই	৪৮	৭১·৭	১১৯·৭

১৯৫৮ সন

মাস	কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল	জেলাসমূহ	মোট
জানুয়ারী	২১·৪	১৮·১	৩৯·৫
ফেব্রুয়ারী	২৩·২	১৭·৫	৪০·৭
মার্চ্চ	১৯	১৪·৫	৩৩·৫
এপ্রিল	১৯	১৩	৩২
মে	২৪·৩	২৩	৪৭·৩
জুন	২৮·৭	২৪·৭	৫৭·৪
জুলাই	৩৬·৭	৪৮·৭	৮৫·৪

পরলোকে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবীণ খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৩ বৎসর বয়সে তাঁহার চন্দননগর বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। একালের যুবকেরা তাঁহার নাম হয়ত অনেকেই জানেন না, কিন্তু প্রবীণের নিকট তাঁহার নাম অজ্ঞাত নয়। সেকালের 'হিতবাদী পত্রিকা' যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন, 'বুড়োর বচন' বলিয়া 'শ্রীবুড়' লিখিত ঐ কাগজে একটি কলম থাকিত। এমন ব্যঙ্গাত্মক রসপূর্ণ রচনা শুধু সেকালে কেন, আজও খুব কমই দেখা যায়। যোগেন্দ্রকুমার 'শ্রীবুড়' নামেই পরিচিত। তিনি 'হিতবাদী' পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে তাঁহার সাংবাদিক-জীবন সুরু করেন এবং পরে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হন।

সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি তদানীন্তন বিভিন্ন মাসিক পত্রে নিয়মিত ছোট গল্পের লেখকও ছিলেন। 'প্রবাসী'তেও তিনি বহু লেখা লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে একটি বিশেষ ভঙ্গি ছিল—যাহার জন্য 'শ্রীবুড়' শ্রীবুড়ই।
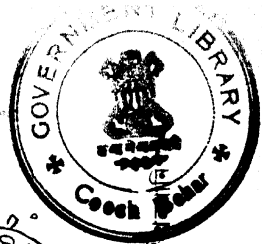
"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

সংসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। একদল কেজো একদল অকেজো, কেজোরা ভাবনাকে কাজে লাগায়, অকেজোরা ভাবনা নিয়ে খেলা করে। তোমাকে কোন্ দলের কোঠায় ফেলব নিশ্চিত ছিলুম না। এখন দেখছি কোনো মানুষের সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। তোমার লেখনী দিয়েও ছন্দের ধারা বেরোচ্ছে [illegible] পায় নি এ দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।

ফুলের সঙ্গে তোমার অর্থের খেলাবার সময় নেই কিন্তু যদি বা ও অনুবাদ হয় তাহলেও দোষ কী। লাইনগুলো তোমার বেশ ঠিকই চলে গেছে।

সাধুবাদসহ আশীর্বাদ। [illegible] অর্পিত। আশা করি পুরীতে তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য লাভ করবেন।

ইতি ২০।৭।৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টেনিসনের 'ইন্‌মেমোরিয়াম' কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে [illegible] শুকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত

সাহিত্যের দ্বৈত সাধনা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড Literature of Power ও Literature of Knowledge আখ্যায় সাহিত্যসৃষ্টিকে দুই প্রধান ভাগে ভাগ করে গেছেন। Literature of Power বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সৃষ্টিমূলক বা রসধর্মী সাহিত্যকে, আর Literature of Knowledge বলতে বুঝিয়েছেন জ্ঞানবাদী সাহিত্যকে, অর্থাৎ এমন সাহিত্য যা পড়লে জ্ঞান হয়, বুদ্ধি পরিশীলিত হয়, মনন তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজী ভাষায় এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যেরই যুগপৎ সমান চর্চা হয়ে এসেছে এবং ইংরেজী সাহিত্যের বিস্ময়কর সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যেরই এককালীন বিধিবদ্ধ চর্চা। বস্তুতঃ, এই দ্বিবিধ সাহিত্য একে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। একটিকে বাদ দিয়ে বা একটির পুষ্টি খর্ব করে অপরটির পুষ্টি আশা করা যায় না। একটি অপরটিকে শুধু যে ধারণ করে আছে তাই নয়, প্রতিনিয়ত তাকে বল যোগাচ্ছে। দুইয়ের যুগপৎ শ্রীবৃদ্ধিতেই সাহিত্যের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি।

কিন্তু মনে হয় বাংলা সাহিত্যে আমরা রসবাদী ও জ্ঞানবাদী সাহিত্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা স্বীকার করি না। বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত রসবাদী সাহিত্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত সমারোহ ; তদনুপাতে জ্ঞানবাদী সাহিত্যের অনুশীলন দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে কম। এবং যা আরও আশঙ্কার কথা, জ্ঞানবাদী সাহিত্যের যেটুকু বা অনুশীলন হয়ে থাকে, সমাজের কাছে তার মূল্য বা মর্যাদা বিশেষ কিছু নেই। রসবাদী সাহিত্যের পূর্বে 'তথাকথিত' বিশেষণটি বসানোর তাৎপর্য এই যে, আমাদের সাহিত্যের রসবাদী আখ্যায় আখ্যাত বেশীর ভাগ রচনাতেই মেকিত্বের লক্ষণ প্রবল। রসসাহিত্য সৃষ্টি করে আমরা পাঠকের আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছি বলে অভিমানস্ফীত হতে পারি, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব আমাদের এই অভিমানের ভিত্তি কত দুর্বল। জ্ঞানবাদী সাহিত্যের দাবি অতৃপ্ত বা অপূর্ণ রেখে সত্যিকার রসসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়, এ কথা যদি আমরা মনেপ্রাণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম তা হলে একতরফা রসসাহিত্য সৃষ্টির গতিমান মন থেকে আমাদের কবেই উবে যেত। জ্ঞানসাহিত্য রসসাহিত্যে প্রয়োজনীয় শক্তিসঞ্চার করে ; জ্ঞানের ভিত্তিভূমি-ব্যতিরিক্ত রসসাহিত্যের প্রাকার নড়বড়ে ও শিথিল হতে বাধ্য। এমনতর রসসাহিত্যের রস ফিকে ও জোলো হওয়াই নিয়ম। ওর দ্বারা সত্যিকার আনন্দ সৃষ্টি হয় না, বড়জোর পাঠকমনের হালকা আমোদপ্রবণতার তৃপ্তি সাধন হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতির এই বর্ণনা কিছু পক্ষপাতী বর্ণনা নয়। এই বর্ণনার উপর আমরা আমাদের নিজেদের প্রবণতার রঙ চড়াই নি। জ্ঞানবাদী সাহিত্য আমাদের ভাল লাগে বলে সমস্ত বিশ্বভুবন কেবলমাত্র জ্ঞানবাদী সাহিত্যের আচ্ছাদনেই আবৃত হোক, এমনতর অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা থেকে এ বর্ণনার উদ্ভব হয় নি। প্লেটো তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ-রাজ্য থেকে কবি ও কল্পনাবিলাসীদের নির্বাসনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, আমরা প্লেটোর ভাবশিষ্য নই। নিছক অনুমান বা আন্দাজী ধারণার উপর নির্ভর করেও বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই একদেশদর্শিতার অভিযোগ করা হয় নি। এ অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি আছে। অতিসম্প্রতি শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয় এক নিবন্ধে ('দেশ', সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৬৬) বাংলা সাহিত্যের এই সমস্যাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন বাংলা সাহিত্য জ্ঞানাত্মক রচনার দিক দিয়ে কত দুর্বল। এ সাহিত্যে মাসে মাসে যত বই বেরয় তার প্রায় শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর ভাগই হল নভেল ও গল্পের বই। এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা। যে সাহিত্যে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগকে দুর্বল ও পঙ্গু রেখে গল্পোপন্যাসের এত ছড়াছড়ি, সে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিশেষ আশান্বিত হওয়া যায় না।

অবশ্য সব সাহিত্যেই গল্পোপন্যাসের কিছু প্রাধান্য থাকে। গল্প-পড়ার আগ্রহ মানবমনে সহজাত ; এই আগ্রহের পরিতৃপ্তি বিধানের আয়োজন সব সাহিত্যেই কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় হয়ে থাকে। তা বলে বাংলা ভাষায় যে হারে হচ্ছে, এমন বোধ হয় আর কোন ভাষার সাহিত্যেই নয়। এখানে লেখকেরা খেয়ে না-খেয়ে কেবল গল্পোপন্যাসের বই-ই লেখে, প্রকাশকেরা সে সব বই গাঁটের পয়সা খরচ করে ছাপে, আর পাঠকেরা সে সব গোগ্রাসে গেলে। প্রকাশকদের অবশ্য

দোষ দেওয়া যায় না। তারা ব্যবসা করতে নেমেছে, যে বইয়ে মুনাফার সম্ভাবনা বেশী সে বইয়ের দিকেই স্বভাবতঃ তাদের নজর পড়বে সব আগে। পাঠক-সম্প্রদায়েরও একটা বৃহৎ অংশের রুচি অপরিণত, সস্তা নাটক-নভেল ছাড়া অন্য কোন জাতের বই পরিবেশন করলে সে বই তারা ছোঁবে বলে মনে হয় না। যে মানসিক প্রস্তুতি ও কৌতূহলের সম্মার্জন ঘটলে জ্ঞানবাদী সাহিত্য পাঠকমনের গ্রহণীয় হয়, তেমন জিজ্ঞাসা বর্তমানের অনুন্নত শিক্ষা-পরিস্থিতিতে বোধ হয় তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। লেখকদের প্রস্তুতিও আশানুরূপ নয়। সুছাঁদ ও সুবিন্যস্ত ভাষায় কাহিনী পরিবেশনের কলাকৌশল তাঁরা কেউ কেউ আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু জ্ঞানবাদী সাহিত্যরচনার পক্ষে অত্যাবশ্যক বিষয়জ্ঞান, তথ্যনিষ্ঠা, মননের সক্রিয়তা ও চিন্তার অভ্যাস ইত্যাদি শৃঙ্খলার মধ্যে যেতে তাঁদের মন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারাজ। বেশীর ভাগ লেখক সহজপটুত্বের নীতিতে বিশ্বাসী, আয়াস ও কষ্ট স্বীকারপূর্বক পটুত্ব অর্জনের নীতিতে তাঁদের বিশ্বাস তেমন দৃঢ়মূল নয়। তাঁদের মনোভাবের অপূর্ণতা ত আছেই, বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতিও তাঁদের শৈথিল্যের জন্য কম দায়ী নয়। এ ভাষায় জ্ঞানবাদী সাহিত্য রচনা তেমন অর্থকরী নয়, সামাজিক মান-মর্যাদা আহরণেও তার কার্যকারিতা অনুল্লেখ্য—এই বোধের থেকেও অনেক লেখক-ব্যবসায়ী তথাকথিত রসসাহিত্যের সহজ-আয়াসের পথটা বেছে নেন। ফলে, কোন মহলেই জ্ঞানবাদী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তেমন ফলবতী হয়ে উঠতে পারছে না। উপযুক্ত আনুকূল্য, উৎসাহ আর অনুশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই বিশিষ্ট দিকটি অদ্যাবধি অপুষ্টই রয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট মহলগুলির ঔদাসীন্য আর অনুৎসাহের কারণ বুঝি, কিন্তু এ বিষয়ে কারও কোন দায়িত্ব থাকবে না তা হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি যাঁরা মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের এ সম্পর্কে স্পষ্টতঃই কর্তব্য রয়েছে। শুধু অভাবের বোধ মনের ভিতর জাগ্রত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, সেই অভাবের পূরণের জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টিত হওয়াও প্রয়োজন। চেতনারই প্রমাণ যেখানে পাওয়া যাচ্ছে না, সে স্থলে কর্মের প্রেরণায় উদ্দীপিত হওয়া ত আরও পরের কথা। বসু মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে সাময়িক পত্রাদিতে কোনরূপ আলোচনা হয়েছে বলে দেখি নি। এ সমস্ত বিষয়ে কারও মাথাব্যথা নেই, নবীন কথাসাহিত্যিকরা প্রবীণ কথাসাহিত্যিকদের কি চোখে দেখেন সেইটে জানা ও প্রচার করা আমাদের সাহিত্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট অনেক বেশী জরুরী বিষয়। এতে কি প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই কথাই যে, বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্যার বিষয়ে আমরা সকলেই প্রায় অল্প-বিস্তর নিশ্চেতন। সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণতঃ নিতান্ত সঙ্কুচিত-পরিসর সুকুমার সাহিত্যকে বুঝে থাকি। সাহিত্যের পরিধি যে এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত, প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ববিধ জ্ঞানবাহী রচনাকে সাহিত্যের পরিধির অন্তর্ভুক্ত না করলে যে সাহিত্যের বৃত্ত পূর্ণ হয় না, রস-সাহিত্যেরও শক্তিদৈন্য থেকে যায়—এই বোধ এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে জাগে নি। ফলে বাংলায় নিতান্ত এক-দেশদর্শী একপক্ষাবলম্বী রচনারীতির ব্যাপক চর্চা হচ্ছে; আনন্দসৃষ্টির নামে আমোদ, স্বতোৎসার প্রেরণা অনুসরণের নামে চটুলতারই এ সাহিত্যে জয়জয়কার।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সমস্যা যদি কিছু থাকে তা হল এই জ্ঞানগর্ভতার অভাব। এ সাহিত্যে রস থেকে জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ফলে রসেরও যথার্থ উদ্বোধন ঘটতে পারছে না। বৈদগ্ধ্যের অভাব তথা জ্ঞানচর্চার অভাবকে নিছক বিদ্যাবত্তার অনুশীলনের অভাব মনে করলে সমস্যাটিকে খুবই সঙ্কুচিত অর্থে বিচার করা হয়। দেশে বিদ্যার প্রচার হলেই যে সমস্যা ফুরিয়ে গেল তা নয়, সেই বিদ্যাকে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির কাজে লাগাতে হবে। সাহিত্যের সৌন্দর্যকুসুম মুঞ্জরিত করে তোলবার জন্য উপযুক্ত মাত্রায় বিদ্যার আলো জলহাওয়া চাই। বিদ্যার পৃষ্ঠপট না পেলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ঔজ্জ্বল্য ও শ্রী খুলবে কিসের উপরে ভর করে? বিদ্যা এবং বিদ্যার নির্যাস যে প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞাবিবর্জিত রসবাদ—রসবাদের নামে চটুলতাচর্চা ভিন্ন আর কিছু নয়। আজকের সাহিত্যে 'রম্যরচনা' নামধেয় যে এক ধরনের হাল্কা লেখার উদ্ভব হয়েছে তা এই জ্ঞানবিহীন রসবাদী মনোভঙ্গিরই পরিণামফল মাত্র। এ-জাতীয় রচনার অনুশীলনের দ্বারা সাহিত্যের সামান্যই শ্রীবৃদ্ধি হয়, অথচ এ-জাতীয় রচনারই সমধিক চর্চা হচ্ছে আজকের বাংলা সাহিত্যে। এর থেকে বর্তমান সাহিত্যের রচয়িতা ও পাঠকদের আত্যন্তিক চটুলধর্মিতারই পরিচয় মেলে শুধু।

বাংলা ভাষায় রসবাদী সাহিত্যচর্চার আধিক্যের একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। অনেকে এই যুক্তিতে তথা-কথিত রসবাদী রচনার আত্যন্তিকতায় দোষ দেখতে পান না। এঁদের কথা হল, বাংলা দেশ কাব্যের দেশ, এখানে ইংরেজ আগমনের পূর্বে একাদিক্রমে প্রায় পাঁচ শো বছর একটানা কবিত্বের চর্চা হয়ে এসেছে। বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গল-কাব্য ও কবিওয়ালাদের যুগে এত বেশী ধর্মীয়তা, ভাবাকুলতা এবং ধ্বনি ও ছন্দপ্রবণতার অনুশীলন হয়েছে এদেশে যে, পরবর্তীকালের সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি অনেকাংশে

সাহিত্যের এই প্রাথমিক রূপ-লক্ষণের বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই নিরূপিত হয়ে গেছে ; আজ আমরা চেষ্টা করলেই বাংলা সাহিত্যের ধারাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করতে পারি না। এ দেশ কাব্যের দেশ, এ দেশের প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ক্ষুদে ক্ষুদে একজন কবি, ভাবুকতা আর কল্পনাপ্রিয়তা আমাদের স্বভাবের একেবারে মজ্জায় ; সুতরাং এ দেশের ভাষায় ও সাহিত্যে রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমধিক অনুশীলন হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিন্তু এর উত্তরে বলব, বাংলা দেশ ত শুধু কাব্যেরই দেশ নয়, তা একই কালে নব্যন্যায়েরও দেশ। বাংলা দেশের পুরাতন ক্ষুরধার দার্শনিক বিশ্লেষণবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র কাব্যভাবালুতা নিয়ে পড়ে থাকায় আমরা যে পুরোপুরি লাভবান হয়েছি এমন কথা কেউ বলবে না। ইংরেজ আগমনের পরে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূত্রপাতে, বাংলাদেশে এক প্রবল জ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তিবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। বস্তুতঃ জ্ঞানস্পৃহা, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই নবজাগরণের প্রধান লক্ষণ। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই নবস্ফুরিত যুক্তিবাদী মনোভঙ্গীর কয়েকজন প্রধান ধারক ও বাহক। বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বী রূপ তাঁর ঔপন্যাসিক রূপ থেকে কোন অংশে কম উজ্জ্বল নয়, বরং খতিয়ে দেখলে, খরতর। আমাদের সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যকল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ যেমন রয়েছেন তেমনি তাঁর পাশে পাশে স্রষ্টার আধারে মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশক রূপে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আজকের দিনের ভাবাদর্শের মানদণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন মতামত আমাদের পছন্দসই না হতে পারে কিন্তু তাঁর মনীষার খরদ্যুতিকে অগ্রাহ্য করবার উপায় কারুরই নেই। এঁদের সম্মিলিত যুক্তিবাদী চিন্তার ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতির ভাবের ঘরের একটি প্রধান সম্পদ ছিল, কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সে সম্পদ আমরা হেলায় হারিয়েছি। উনিশ-শতকীয় যুক্তিবাদী গদ্যলেখকদের প্রভাব একালীন বাঙালী মনোজীবনের উপর ব্যর্থ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের পর থেকে সেই যে বাংলা সাহিত্যে আত্যন্তিক গীতলতা তথা রোমান্টিক ভাবাকুলতার অনুশীলনের সুরু হয়েছে আজও পর্যন্ত, তার প্রবল স্রোতের টানে ভাঁটার টান দেখা গেল না। আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, রসে টইটুম্বুর হয়ে থাকাটাকেই আমরা আমাদের মোক্ষলাভের উপায় বলে জেনেছি।

কথাটা ধীরভাবে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, জ্ঞানসাহিত্যের চর্চা ভিন্ন রসসাহিত্যের চর্চা জোরালো হয়ে উঠতে পারে না। জ্ঞানের দ্যোতনাবিহীন রস, রস নামের যোগ্য নয়। সাহিত্যে একদিকে রসসাহিত্যের চর্চা হবে, অন্যদিকে সেই রসসাহিত্যের উপর প্রস্ফুরিত হবে নানা আলোচনা-সমালোচনা প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সন্দর্ভসম্ভার। তারই পাশে পাশে রচিত হবে ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজ-তত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান নানা গ্রন্থ। পুরাতনের গবেষণা এবং নূতনের মূল্যায়ন দুই ই বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্য-চর্চার অঙ্গ হিসাবে পাশাপাশি চলতে থাকবে। সৃষ্টিধর্মিতায় সংশ্লেষণ, আলোচনায় বিশ্লেষণ। এই দুই ধারার রচনার উপর একসঙ্গে সমান জোর পড়লে তবে সাহিত্যের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়, নচেৎ নয়। আমাদের বুঝতে হবে, সৃষ্টি এবং সৃষ্টির উপর আলোচনা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি অন্যটির মূলে শক্তি জোগায়। আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টিতে উৎসাহ ও সচলতার সঞ্চার করে; সৃষ্টি আলোচনা-সমালোচনার বিচিত্র বক্তব্যের উৎসমুখ উন্মুক্ত করে দেয়। সাহিত্যসৃষ্টির মান সুউচ্চে বিধৃত রাখবার জন্যও আলোচনা-সমালোচনার নিরন্তর সক্রিয়তার প্রয়োজন। এ ছাড়া সাহিত্য-নিরপেক্ষ ভাবেও বহু বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন আছে। ইতিহাস দর্শন অর্থনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতির যত বেশী অনুশীলন হবে তত দেশের আবহাওয়ায় মুক্তবুদ্ধির সংস্কার ক্রমব্যাপ্ত হতে থাকবে। সৃষ্টিধর্মী মনকে নির্মোহ ও কুসংস্কারমুক্ত করবার জন্য এই স্বচ্ছ বুদ্ধির একান্তই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে মন অন্ধকারে ডুবে আছে সে সাহিত্য সৃষ্টি করবে কি। মুক্তি বুদ্ধির সংস্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির যথার্থ রসসাহিত্য রচনার ক্ষমতা জন্মায় বলে আমরা বিশ্বাস করি না। সুতরাং সমস্যাটিকে যে ভাবেই বিচার করা হোক না কেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে, জ্ঞানবাদী সাহিত্য ও রসবাদী সাহিত্যের এককালীন যুগ্ম অনুশীলন প্রয়োজন। এই একনিষ্ঠ দ্বৈত সাধনার উপর বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করছে।

"রামেশ্বর"

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

ধর্ম্মান্ধতা ও ধর্ম্ম-সমন্বয়

মানব-জীবনে ধর্ম্মই প্রকৃত শান্তির উৎস। অবশ্য ভাবটি খাঁটি হওয়া চাই এবং তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত খাঁটি রাখা চাই।

দুর্ভাগ্যের বিষয় জগতে খাঁটি জিনিস বিরল, স্বল্প বা অধিক মাত্রায় ভেজাল প্রায় সর্ব্বত্র ঢুকিয়া পড়ে। মনোভাবের বেলায় ইহা অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারেই হয়। উপনিষদে আছে দেবতারা ও অসুরেরা একই প্রজাপতির সন্তান। দেবতারা সংখ্যায় অল্প, অসুরেরা বহুতর। জগতে আধিপত্য লাভের জন্য দুইপক্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দেবতারা বলিলেন, আমরা উদ্‌গীত দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিব। তাঁহারা বাক্‌-কে বলিলেন, তুমি আমাদের হইয়া উদ্‌গান কর। বাক্‌ সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অসুরেরা তাহার অন্তরে একটু প্রচ্ছন্ন স্বার্থবুদ্ধির সন্ধান পাইয়া তাহাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। ফলে বাক্‌ সু ও কু দুই ধারাতেই চলিল, দেবতাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। তখন তাঁহারা একে একে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রোত্র ও মনকে উদ্‌গানে প্রবৃত্ত করিলেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অসুরেরা পূর্ব্বোক্তরূপ ছিদ্র ধরিয়া উহাদিগকেও পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল।

ধর্ম্ম দেবতাদের দান; উদ্দেশ্য—মানব-সমাজে শান্তি স্থাপন। গীতায় আছে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হ'ন। তখন অসুরেরা কি নিশ্চেষ্ট থাকে? তাহারা আপনাদের প্রবল অনর্থ দেখিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে ভেজালরূপে অলক্ষিতে একটু অন্ধতা জুড়িয়া দেয়, উহা ধর্ম্মভাবের মধ্যে গুপ্ত থাকিয়া ব্যক্তি ও সমাজের অনিষ্ট সাধন করে।

ব্যক্তিগত জীবনের কথা কিছু বলিব না, সমষ্টিগত জীবন হইতে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেই। ঈশ্বরের পুত্র বা পুত্ররূপ ঈশ্বর (God is Son) আসিলেন প্রেমধর্ম্মের প্রচার দ্বারা জগতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে। তাহার স্বজাতি য়িহুদিরা ভাবিয়াছিল তিনি তাহাদিগের নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিবেন। যখন তাহারা দেখিল যে, সে সম্ভাবনা নাই, তখন য়িহুদি পুরোহিতেরা আক্রোশবশে রোমান শাসনকর্ত্তাকে বুঝাইয়া দিল যীশু রাজদ্রোহী, এবং নানারূপ প্ররোচনা দ্বারা তাহাকে দিয়া যীশুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট গেলেও খ্রীষ্টানধর্ম্ম গেল না। কালক্রমে উহা ইউরোপের সকল দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে খ্রীষ্টানগণ এককালের য়িহুদি পুরোহিতদিগের কুকার্য্যের প্রতিশোধ রূপে শত শত বৎসর ধরিয়া সর্ব্বত্র য়িহুদীজাতির উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। ইহা অবশ্যই প্রেমধর্ম্মের প্রচারক যীশুর শিক্ষা নহে। উত্তরকালীন খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মান্ধতার নিদর্শন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে আরও একটি উদাহরণ দেই। (আশা করি কেহ মনে করিবেন না ধর্ম্মান্ধতা ঐ ধর্ম্মের গণ্ডীতেই নিবদ্ধ)। খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজেলাম বহুকাল মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল। তজ্জন্য খ্রীষ্টান যাত্রীদের অবশ্যই অনেক অসুবিধা এবং বিধর্ম্মীদের হস্তে কিছু নিগ্রহও সহ্য করিতে হইত। ইহার প্রতিকারের জন্য একাদশ শতাব্দীতে এক পোপ (প্রধানতম ধর্ম্মগুরু) অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি স্বীয় ধর্ম্মের সু-শিক্ষা অনুসারে মৈত্রীর বা আপোষের পথে না গিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের জিগির তুলিলেন এবং ইউরোপের সকল রাজ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই বিপুল ধর্ম্মোন্মাদের সৃষ্টি করিলেন। ফলে দলে দলে রণশিক্ষাহীন অ-সঙ্ঘবদ্ধ, উৎসাহমাত্র-সম্বল বহু খ্রীষ্টান সৈন্য নানা নেতার অধীনে যুদ্ধ করিবার জন্য প্যালেষ্টাইনের দিকে ছুটিল। তিনশত বৎসর এই ধর্ম্মোন্মাদ ছিল। ন্যূনাধিক ত্রিশ লক্ষ খ্রীষ্টান এই পথে প্রাণ দিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত সুফল কিছুই হয় নাই।

একই ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যেও ধর্ম্মান্ধতা—অল্প অনিষ্ট করে নাই। ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শত শত লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় বা অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার অছিলায় "ইনকুইজিশনে" বহু লোককে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

ধর্ম্মান্ধতা ভারতবর্ষে গজনীর সুলতান মামুদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের কাল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত বহু হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস, বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন, নরহত্যা, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরীকরণ ইত্যাদি উৎকট অপকর্ম্মের উত্তেজনা

জোগাইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিকেও শাসকবর্গের কূটনীতির ফলে ধর্ম্মান্ধতা দেশের ও সমাজের অল্প অনিষ্ট করে নাই।

যে সকল ধর্ম্মে প্রচারের উপর খুব জোর দেওয়া হয় তাহাতে প্রচারের অত্যুৎসাহে ধর্ম্মের সহায়রূপে এবং তাহার আবরণে অধর্ম্মকে ডাকিয়া আনা হয়। ইহার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষেত্রে। ইহা ভারত হইতে সমগ্র এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি ইহাতে পূর্ব্বোক্তরূপ কলঙ্কস্পর্শ ঘটে নাই।

ইহা হিন্দুজাতির গৌরব। বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুধর্ম্মে বহু দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—দেবতা প্রকৃতপক্ষে একই, নামে ও ক্রিয়ায় বিভেদ। "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্যস্বরূপ একজনকেই উপাসকগণ বহু নামে অভিহিত করেন, যথা অগ্নি, বরুণ, মাতরিশ্বা, ইন্দ্র, মিত্র, গরুত্মান্। ফলে বৈদিক সমাজে সাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন দেখা যায় না। উপনিষৎসমূহ স্পষ্ট ভাষায়ই একত্বের সমর্থক, যদিও তাহাতে দেবগণের বহুত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। মানুষের মনোভাব অনন্ত বলিয়াই এক এক ভাবের এক একজন অনুগ্রাহকরূপে দেবগণও অনন্ত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। "অনন্তং বৈ মনঃ, অনন্তা বিশ্বে দেবাঃ।" পৌরাণিক যুগে সম্ভবতঃ আর্য্যেতর জাতি হইতে উচ্ছ্বাসধর্ম্মী ভক্তির আমদানীর ফলে দেবতা বিষয়ে বৈদিক নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইতে পারে নাই। এক এক দেবতাকে বড় করিবার জন্য অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবতায়ও অজ্ঞজনোচিত মনোভাব ও আচরণ আরোপ করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত বা অপ্রতিভ করিবার পর তাহাদের দ্বারা স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে মনোরম ভাষায় স্তুতি করান হইয়াছে (ভাগবত পুরাণে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব দ্রষ্টব্য)। তবে যেহেতু নানা দেবতার প্রাধান্য ঘোষণার্থ রচিত নানা পুরাণে ঐ একই রীতি ও নীতি অনুসৃত হইয়াছিল, সেইজন্য ঐ বিবরণগুলি যে পারমার্থিক সত্যতাবর্জ্জিত একটা প্রথা বা pattern মাত্র এ বিষয়ে বিজ্ঞ সমাজ-পতিগণের সন্দেহ ছিল না; তাই একই কালে মূল দেবতার একত্বের কথাও নানাভাবে যুগে যুগে প্রচারিত হইতেছিল। এমনকি দর্শন-শাস্ত্রসমূহের মধ্যেও গুরুতর মতভেদ সত্ত্বেও বলা হইত, "প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ"—এক এক প্রস্থানে এক একটি বিশিষ্ট মত শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর বলিয়া গণ্য। যেমন ঋজুকুটিল নানা পথে প্রবহনশীল নদীসমূহের সমুদ্রই একমাত্র গম্যস্থল, সেইরূপ সাধকগণের রুচির বৈচিত্র্য অনুসারে সাধন ভিন্ন ভিন্ন ধারায় চলিয়া একই পরমেশ্বরে মিলিত হয়। এমন উদারতার কথা এমন মনোরমভাবে বোধ করি আর কোনও ধর্ম্মের গ্রন্থে বলা হয় নাই।

ইহারই প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা কখনও মারাত্মক আকার ধারণ করে নাই। উহা প্রায় বাদানুবাদেই নিবদ্ধ ছিল। বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে প্রবল মতভেদ ছিল, তজ্জন্য কখনও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। উত্তর-ভারতে অন্য প্রদেশেও শৈবে ও বৈষ্ণবে মতভেদ ছিল, কিন্তু কোথাও লাঠালাঠির কথা শুনা যায় না। কেবল দাক্ষিণাত্যে অল্প কিছুকালের জন্য, সম্ভবতঃ স্থানীয় কারণে, শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়াছিল। উহাও বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের সমন্বয় বুদ্ধির পুনঃ প্রতিষ্ঠার ফলে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে। দ্বন্দ্বের যুগে শিবকাঞ্চীর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বিষ্ণুকাঞ্চী প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরঙ্গমে প্রাচীনতর জম্বুকেশ্বর শিবের সুবৃহৎ মন্দির হইতে কিছুদূরে অনন্তশয্যাশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি রঙ্গনাথের বৃহত্তর মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। আবার সমন্বয়-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে চিদম্বরমে নটরাজ শিবের মন্দির প্রাঙ্গণেই ঐ মন্দিরের কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান অনন্তশয়নে শায়িত শ্রীবিষ্ণুর মন্দির স্থাপিত হয়।

এই সমন্বয় সাধনে বা সমন্বয়ের দৃঢ়ীকরণে নিম্নলিখিত কাহিনীটি অনেকটা সহায়তা করিয়া থাকিবে। উহা ইদানীং সূত্ররূপেই পাওয়া যায়। তাহা হইতে এখানে সম্ভাব্যরূপে পুনর্গঠিত হইতেছে।

দশ মাস ব্যাপী লঙ্কা-যুদ্ধে রাবণবধের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্গৃহীতা হইয়াছেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন চলিতেছে। এমন সময়ে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন, "শুনা যায় লঙ্কাপতি কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল। কামান্তক সেই দেবতাই যে আমার ধর্ম্ম রক্ষায় সহায়তা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অযোধ্যায় যাত্রার পূর্ব্বে শিবপূজা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য মনে হয়।" এই প্রস্তাবে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমি শুধু শিবপূজা নয়, শিব-স্থাপনই করিব।" এতদুদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলে সু-বিচক্ষণ জাম্বুবান্ বলিলেন, "প্রভু, আপনি যে স্থানে শিবস্থাপন করিবেন উহা চিরকালের জন্য একটি মহাতীর্থ হইবে। লঙ্কা ভারতের জনসাধারণের পক্ষে অতি দুর্গম স্থান; সেইজন্য আমার মনে হয়, সমুদ্রের ওপারে ভারত ভূমিতেই শিব স্থাপন কর্ত্তব্য।"

অতঃপর নলনীলাদি ইঞ্জিনিয়ারগণ ভূমি আবহাওয়াদি পরীক্ষা করিয়া রামচন্দ্র যে স্থানে সমুদ্রবন্ধনার্থ সেতুর ভিত্তি

স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার অনতিদূরে শিবস্থাপনের স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। বিভীষণ উক্ত কার্য্যের জন্ম বিপুল আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের সকল মুনি-তপস্বী ও পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইলেন। বিরাট সভা বসিল। একদিকে রামচন্দ্র শিব প্রতিষ্ঠাব্রত, অন্তদিকে পণ্ডিতগণ চিরাচরিত প্রথামত তর্কে প্রবৃত্ত। শিবস্থাপন করিতে হইলে স্থাপনীয় লিঙ্গের একটি নামকরণ করিতে হয়। এ স্থলে রামচন্দ্র নাম নির্দ্ধারণ করিলেন, "রামেশ্বর"। ঐ শব্দটির ব্যুৎপত্তিই হইল পণ্ডিতগণের তর্কের বিষয়। কিন্তু তাঁহাদের যেমন স্বভাব মূল বিষয়টি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে নাম কি, শব্দ কি, বর্ণ কি, শব্দের শক্তি কত প্রকার, শব্দ সকলই ব্যুৎপন্ন কিনা ইত্যাদি নানা মতবাদে জটিল বিষয় নিয়া তাঁহারা তর্কে মাতিয়া উঠিলেন। তখন সভাস্থ একজন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সুধিগণ, শান্ত হউন; আমি প্রস্তাব করি রামেশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় জন্ম এই সভার প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তি রামচন্দ্র সকাশে প্রেরিত হউন। প্রস্তাবটি তার্কিকগণের মনঃপূত না হইলেও বিপুল মতাধিক্যে গৃহীত হইল এবং গণ্যমান্ত পাঁচজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া রামচন্দ্র সমীপে গমন করিয়া সভার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, "ব্যুৎপত্তি ত অতি সহজ। রামস্য ঈশ্বর—রামের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস ধরিয়া অর্থ করা হউক।" প্রতিনিধিগণ সভায় ফিরিয়া রামচন্দ্রের মত ব্যক্ত করিলে তত্রত্য শৈবগণ খুব উল্লসিত হইলেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বিশেষতঃ রামভক্তগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, কেহ বলিলেন, রামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম তাঁহার আবার প্রভু কে? এমন সময়ে সহসা রামেশ্বর লিঙ্গ হইতে "ত্রিশূল চন্দ্রাহিধর মহাবৃষভবাহন" শিব আবির্ভূত হইয়া সভায় আসিয়া বলিলেন, রামচন্দ্র নির্দ্ধারিত ব্যুৎপত্তি ঠিক নয়। রামঃ ঈশ্বরঃ যস্য—রাম যাহার প্রভু—এইরূপ বহুব্রীহি সমাস দ্বারা এখানে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে হইবে।

তখন এক অপূর্ব্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। রামভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, শিবের কথাই প্রামাণিক, শৈবগণ বলিতে লাগিলেন, রামের কথা প্রামাণিক। এমন সময় দেখা গেল আকাশ হইতে এক জ্যোতিঃপুঞ্জ অবতরণ করিতেছে। ভূতলে অবতীর্ণ হইলে দেখা গেল উহা একটি হংসযুক্ত বিমান, তাহাতে অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। তিনি দ্রুতপদে বিমান হইতে নামিয়া আসিয়া সভাস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের তর্কবিতর্ক আমি ব্রহ্মলোকে বসিয়া শুনিতেছিলাম। রামচন্দ্র ও মহেশ্বর উভয়েই বিনয়ের আদর্শ। প্রকৃত ব্যুৎপত্তি আমি বলিতেছি। জানই ত ব্যাকরণ একটি বেদাঙ্গ এবং সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ আমারই চারিমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। আমি বলিতেছি, রামশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চ—উনিই রাম, আবার ঈশ্বর অর্থাৎ শিবও বটেন কিংবা যিনি রাম তিনিই ঈশ্বর (শিব) এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাস এখানে স্বীকার্য্য, কেননা রামত্ব ও ঈশ্বরত্ব (অর্থাৎ শিবত্ব) এক অধিকরণেই অবস্থিত। রামে ও শিবে কোনও ভেদ নাই, ভেদবুদ্ধি ধর্ম্মান্ধতা-প্রসূত। উহা আসুরিক বৃত্তি।

তখন সভাস্থলে বিপুল হর্ষধ্বনি উৎপন্ন হইল। উহা শান্ত হইলে দেখা গেল ব্রহ্মা ও শিব উভয়ে ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই ঘটনাটি ইদানীং রামেশ্বরম্ নামে প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে ঘটিলেও, ত্রেতাযুগের "রেডিও"তে ভারতের সর্ব্বত্র উহার বিবরণ প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কেননা অদ্যাপি সমগ্র ভারতের নানা প্রদেশে প্রাচীন ব্যাকরণের পুঁথিতে এই বচনটি পাওয়া যায়—

রামস্তৎপুরুষং প্রাহ বহুব্রীহিং মহেশ্বরঃ।
রামেশ্বর পদে ব্রহ্মা কর্ম্মধারয়ম্ অব্রবীৎ॥

যাদু
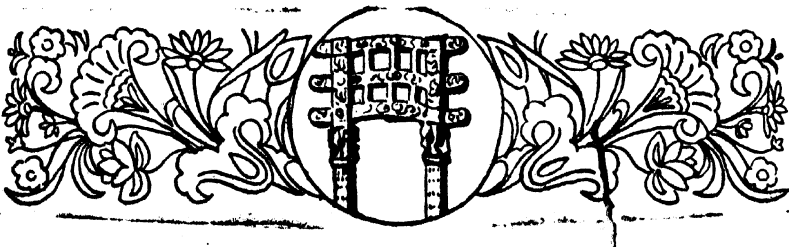
শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

শেষটায় চোরের মত পালাতে হ'ল। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসেছিল প্রিয়তোষ—একা, সঙ্গীহীন, নির্বান্ধব।

ভাবনার কথা বৈকি! নবেম্বর মাসের প্রথম—শীত আসছে। আর এই সময়েই নাকি সে চলেছে দার্জিলিং! চেঞ্জাররা ফিরে আসছে পাহাড় থেকে দলে দলে। যাওয়ার তাগিদ যে কারও নেই তার প্রমাণ খালি কামরায়। তা ছাড়া ট্রেনে দার্জিলিং যাওয়া আজকাল যা ঝকমারি। বাংলা যখন ভাগ হয় নি তখন দার্জিলিং ত ছিল হাতের কাছে। শিয়ালদহে রাত নয়টা নাগাদ মেলে চাপো, আরাম করে ঘুমোও সারারাত, সকালে নেমে পড় শিলিগুড়ি। তার পরে ট্রেনে বা মোটরে চলে যাও দার্জিলিং। ক'ঘণ্টারই বা ব্যাপার? আর এখন? পাকিস্থানকে এড়িয়ে সাত সমুদ্দুর ঘুরে পৌঁছও শিলিগুড়ি। জান কাবার একেবারে!

শিয়ালদা থেকে সকরিগলিঘাট, তার পর ফেরি ষ্টীমারে মনিহারি। মনিহারিঘাটে ট্রেনে চেপে হোল্ড-অলটা খুলে বিছানা করে দিয়েছে প্রিয়তোষ। শুয়েও পড়েছিল, কিন্তু ঘুম নেই চোখে। সুতরাং তাকে উঠে বসতে হ'ল বিছানায়, বসে বসেই সে ভাবছিল। ভাগ্যিস, শিয়ালদা স্টেশনে কোনও বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয় নি তার! তাকে একা দেখে কি ভাবত তারা? সাত বছরের বিবাহিত জীবনে কলকাতার বাইরে যেতে একা তাকে দেখেছে কি কেউ? এবারই তার ব্যতিক্রম। তার এই একাকিত্বকে ব্যাখ্যা করত সে কেমন করে?

প্রিয়তোষ ভাবছিল আর একের পর এক সিগারেট শেষ করছিল। সিগারেটের ধোঁয়ার মতই তার চিন্তা পাক খেয়ে ঘুরছিল। হায়রে, শেষটায় গৃহও তার কাছে অরণ্যের মত হয়ে উঠল!

কিন্তু এমন ত হওয়ার কথা নয়। খুব ধনী না হলেও অর্থের জন্য দুশ্চিন্তা তার নাই। মাঝারি ধরনের পৈত্রিক বাড়ী, পিতার ব্যবসার সে মালিক। ব্যবসার আয়ও তার মন্দ নয়, কমপক্ষে হাজারখানেক টাকা। তার ওপর ভাগ বসানোর জন্য অংশীদারও কেউ নেই। এজন্য সে তার পিতার কাছে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু সুপ্রীতির ব্যবহার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সুপ্রীতি সুন্দরী, শিক্ষিতা। সাত বছরের বিবাহিত জীবন—তবু তার দেহ যৌবনের হিল্লোলে এখনও টলমল। বিরূপতা আসার কারণ এখনও কিছু হয় নি। তবু তাই ঘটল।

প্রথমটা প্রিয়তোষ খেয়াল করে নি। দাম্পত্য-জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর হাসিতে, গল্পে, গানে, দেশভ্রমণের বৈচিত্র্যের মধ্যে মন তাদের পূর্ণ ছিল—যেন একসুরে হৃদয়-তন্ত্রী বাঁধা দুজনের। কিন্তু সেই ঐকতান কখন যে বেসুরো হয়ে উঠেছে—প্রথমটা খেয়াল করেনি প্রিয়তোষ। ভেবেছিল একই সুর বাজছে বুঝি। কিন্তু যখন হুঁস হ'ল সুপ্রীতি দেহের দিক দিয়ে না হলেও মনের দিক থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে।

সুপ্রীতি গিয়েছিল তার এক বন্ধুর বাড়ী, ফিরে এল সন্ধ্যার পর। প্রিয়তোষ অবাক হ'ল তার মুখের থমথমে ভাব দেখে। মেঘ জমেছে মুখের ওপর—ঝড়ের পূর্বাভাধ। অথচ উল্টোটাই আশা করেছিল প্রিয়তোষ।

অনেক দিন পর এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা সুপ্রীতির। এক সঙ্গে বি-এ পাস করেছে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে সুপ্রীতির বিয়ের অনেক পরে। এই বন্ধুটির কথা উঠলেই সুপ্রীতি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠত যেন। বন্ধুর গুণপনা বর্ণনায় আতিশয্য প্রকাশ করত। পাঠ্যাবস্থায় তার যে কয়টি বন্ধু জুটেছিল তাদের মধ্যে এইটিই নাকি সর্বোত্তমা।

বন্ধুটি থাকে স্বামীর কর্মস্থল এলাহাবাদে। স্বামী প্রফেসর, বিয়ের পর এই তাদের প্রথম দেখা। সুতরাং প্রিয়তোষ আশা করেছিল বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নিশ্চয়ই সুপ্রীতি প্রীতির রসে টলমল হয়ে ফিরবে। বন্ধুর মুখ থেকে সদ্য-শোনা দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলতে থাকবে আর প্রিয়তোষ তাই শুনবে। বিয়ের পর মেয়েদের গল্প করবার আর কিই-বা থাকতে পারে?

কিন্তু না। একটা কথাও সুপ্রীতি বলেনি। প্রিয়তোষ অবাক, হতভম্ব! শুধু সে বলতে পেরেছিল—বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল?

—হুঁ! একাক্ষরে উত্তর সেরে দিল সুপ্রীতি।

সাহস করে প্রিয়তোষ বলেছিল—হঠাৎ এত গম্ভীর যে?

সুপ্রীতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল —তুমি ওসব বুঝবে না।

রাত্রে পাশাপাশি আরামদায়ক নরম বিছানায় শুয়ে আছে দুইজন—কারও মুখে কথা নাই। প্রিয়তোষ একবার সুপ্রীতিকে আকর্ষণ করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সুপ্রীতি হাত সরিয়ে শুধু বলেছিল—থাক।

আধ ঘণ্টা পর প্রিয়তোষ বলেছিল—ঘুমুলে ?

—না।

—তোমার কি হয়েছে বল ত ? গেলে বন্ধুর বাড়ী, ফিরলে গম্ভীর হয়ে। আমি কিন্তু উল্টোটাই আশা করেছিলাম, আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ বল ত ?

সুপ্রীতি তড়িৎগতিতে শয্যায় উঠে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বলেছিল—সে তুমি বুঝবে না। তার পর তার কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

প্রিয়তোষ বিমূঢ়, হতবাক।

নারীর অভিমান, ক্রোধের উপশম হয় চোখের জলে—এ মনস্তত্ত্ব প্রিয়তোষের জানা আছে। সে কিছুক্ষণ ক্রন্দনরতা স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল। অবশেষে সাময়িক প্রশান্তি।

শাস্ত্রে আছে—নারীর মনোভাব নাকি দেবতারাও বুঝতে পারেন না—মানুষ ত ছার। কিন্তু ইহা বাহ্য। দরদী মানুষের নারীর মনকে বুঝতে খুব বেশীক্ষণ লাগে না। বোধ হয় সুপ্রীতির মনের মেঘ কিছুটা কেটে এসেছিল কয়েক দিন পর। তাই সেদিন প্রিয়তোষকে ধীরে ধীরে তার বন্ধুর গল্প বলতে সুরু করেছিল। চার বৎসরের বিবাহিত জীবনে তিনটি সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে তার বন্ধু, সন্তানের গরবে গরবিনী সে।

প্রিয়তোষ চো˝ কপালে তুলে বিস্ময়ের ভান করে বলেছিল—বল কি সুপ্রীতি ? চার বছরে তিনটি! বেশ খাসা আছে ত তোমার বন্ধুটি।

সুপ্রীতির কপাল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হ'ল। তবু মুখে হাসির ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করে বললে—তার মানে ?

হো হো করে হেসে উঠল প্রিয়তোষ—খাসা নয় ? চার বছরে তিনটি। তোমার বন্ধুটির স্বামী অধ্যাপক ত ? শুনতে পাই—মাষ্টার আর প্রফেসারের ঘরে মা ষষ্ঠীর কৃপা নাকি খুব বেশী।

ইতিমধ্যে সুপ্রীতির মুখে মেঘ জমে উঠেছে পুরোপুরি। ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল—আর ব্যবসাদারের ঘরে ? সাত বছরে একটিও নয়। কি বিরাট ঐতিহ্য! হ্যাঁ, অহঙ্কার তুমি করতে পার বটে!

কথার চাবুকে প্রিয়তোষের বিমূঢ় হওয়ার কথা। তবু হাসি মুখেই বলবার চেষ্টা করেছিল—না, ঠিক ঐতিহ্যের কথা বলছি না। তবে—

—তবে পৌরুষের কথা নিশ্চয়ই—কি বল ? ভাগ্যে প্রফেসার হওনি!

খোঁচা খেয়ে প্রিয়তোষ নির্বাক। বুঝতে তার আর কিছুই বাকি রইল না।

কিন্তু বুঝলেই বা সে করতে পারে কি ? অথচ করল সে অনেক কিছুই। ডাক্তার বন্ধুদের উপদেশ শুনল, ঘনঘন জ্যোতিষীর বাড়ী যাতায়াত করল, এমন কি মা বেঁচে থাকলে যে ব্যবস্থা করতেন তাও বাদ দিল না। করল দেবতার মানসিক, পূজো পাঠাল মন্দিরে মন্দিরে, সুপ্রীতির হাতে, গলায়, কোমরে ঝুলতে লাগল তাগা আর মাদুলি।

কিন্তু কিছুই হ'ল না, অবশেষে ছাড়তে হল বাড়ী। চোরের মত পালিয়ে আসতে হ'ল।

ভাবতে ভাবতে কখন যে বিছানায় শুয়ে পড়েছে প্রিয়তোষ, কখন যে তার তন্দ্রার মত ভাব এসেছে সে বুঝতে পারে নি। গাড়ীর দরজা খোলার শব্দ, তার পর দুমদাম করে জিনিস ফেলার আওয়াজে তন্দ্রা তার পালিয়েছে। দেখতে পেল প্রিয়তোষ গাড়ী একটা স্টেশনে থেমেছে আর তিনটি মেয়ে তাদের হাঁড়িকুড়ি, ঝোড়া, পুঁটলি নিয়ে হুড়মুড় করে তারই কামরায় উঠে পড়েছে। বিছানায় উঠে বসে প্রিয়তোষ, বিরক্তির সুরে বলে উঠল—এখানে কেন, এখানে কেন ? এটা ফার্স্টক্লাস যে। নেমে যাও—নেমে যাও।

কিন্তু তার কথায় গ্রাহ্য করল না কেউ। ধীরে-সুস্থে তাদের মোটঘাট কামরার মধ্যে গুছিয়ে রাখতে লাগল। এরা বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়—ভবঘুরে বেদের জাত। উপায়ান্তর না দেখে প্রিয়তোষ একখানা বই নিয়ে মুখের সামনে ধরে বসল। ভাবখানা এই—যেন বিস্ময়োৎপাদনকারী ম্লেচ্ছ নারীদের মুখদর্শন করতে না হয়।

কিন্তু কৌতূহলও তার কম নয়। মুখের সামনে বই ধরা থাকলেও সে ফাঁকে ফাঁকে এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছিল। এই নারীদলটির মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠাটির বয়স বোধ হয় বছর-চল্লিশ হবে, কনিষ্ঠাটির বয়স বোধ হয় বছর বারো-তেরো। আর প্রিয়তোষের সম্মুখে বসে আছে ষোল-সতের বছরের যুবতীটি—তার কোলে এক শিশু। সকলেরই পরণে ঘাগরা, গায়ে আঁটসাট জামা। যুবতীটির মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা। আধখানা কপাল-ঢাকা মুখখানি মনে হ'ল প্রিয়তোষের দেখবার মত।

মুখের সামনে বই রেখে খুব বেশী দেখা যায় না। অথচ ইচ্ছা থাকলেও বইখানি সরিয়ে রেখে সরাসরি এদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেও তার যেন কেমন লজ্জা করছিল।

—বাবুজী ?

বই থেকে মুখ সরিয়ে প্রিয়তোষ দেখল বয়োজ্যেষ্ঠা বেদের মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে। চেহারাটি তার মোটেই আকর্ষণীয় নয়। মুখের ওপর লম্বা নাক খাড়া হয়ে আছে—সেটা আবার অস্বাভাবিক লাল। দুই গালে অসংখ্য কালো কালো দাগ। তার হাতে একটা রং-বেরঙের পাখীর পালকের ঝাড়ন।

সে হেসে বলল—ঝাড়ন নিবি ?

ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রিয়তোষ বলল—না, ও চাইনে আমার।

ছোট মেয়েটি বলে উঠল—বাবু ঝাড়ন লিবে না, লিবে না। তার পর হি হি করে হাসি।

বয়োজ্যেষ্ঠাটি হাতের ঝাড়নটা প্রায় প্রিয়তোষের নাকের ডগায় ছুঁইয়ে বলতে লাগল—সস্তায় দিয়ে দেব তোকে বাবুজি—এক টাকার মাল আট আনায়। লিয়ে যা, আমি নিজের হাতে তৈরি করলাম বাবু, খুব ভাল চীজ আছে। চেয়ার ঝাড়বি, টেবিল ঝাড়বি, খাট-বিছানা ঝাড়বি আর ইচ্ছা হয় ত তোর বউকে ভি ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে দিবি—একদম ময়লা থাকবে না। বেদের হাতের জিনিস বাবুজি, যাদু আছে।

বেদেনীর প্রগলভতায় বিরক্ত হ'ল প্রিয়তোষ, কিন্তু বেশী আর কি বলতে পারে ? শুধু বললে—না না, চাইনে আমার ঝাড়ন ; বললাম ত আমি।

ছোট মেয়েটি তখনও হাসছে। হাসতে হাসতেই বলল—না না, বাবু লিবে না, ঝাড়ন লিবে না। তুই এদিকে আয় মা, ও লিবে না।

—হামারা কপাল ! বেদেনী সরে গেল।

প্রিয়তোষ মুখের কাছে বই তুলে ধরেছে আবার। কিন্তু এই পরিবেশে পড়ার ছলনা করাও কঠিন। চোখের সামনে বই ধরা থাকলেও যুবতী মেয়েটির দিকে এক-একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল প্রিয়তোষ। শুধু মেয়েটির দিকে নয়—তার কোলের শিশুটির দিকেও। কি সুন্দর বলিষ্ঠ কোমল শিশুটি। সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল। ভাবল বইখানা মুখের সামনে ধরে থাকার ছলনা না করে সরাসরি ভাল করে চেয়ে দেখে শিশুটিকে আর তার মাকে।

ইতিমধ্যে শিশুটি কেঁদে উঠতেই যুবতীটি বক্ষবাস কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করে তার সুডৌল স্তন তার মুখে চেপে ধরেছে। দৃশ্যটি অনবদ্য মনে হ'ল প্রিয়তোষের। ক্রমেই বইয়ের পাতায় দৃষ্টি আবদ্ধ রাখাও অসহ্য হয়ে উঠছে। বই থেকে মুখ তুলতেই তার নজরে পড়ল মেয়েটি তারই দিকে চেয়ে যেন দুষ্টমীর হাসি হাসছে। মনে হ'ল প্রিয়তোষের, তার চুরি করে দেখার মর্মটা যেন বুঝতে পেরেছে মেয়েটি। ভারি লজ্জিত হয়ে মুখের সামনে ভাল করে বই তুলে ধরল প্রিয়তোষ।

—বাবুজি !

প্রৌঢ়া বেদেনীর আবার সেই বিশ্রী সম্বোধন। প্রিয়তোষ মনে মনে যে চিত্র আঁকছিল, ছিন্ন হয়ে গেল সেই কল্পনা। বইটা নামিয়ে বিরক্তির সুরে বলল—আবার কি চাই ?

—ধনেশ পাখীর তেল নিবি বাবু ? বড় ভারি গুণের তেল। মালিশ করলে বাত ভাল হয়ে যাবে—বেকসুর ভাল হোবে।

—না, না, কিছু চাইনে আমার। ঝাঁঝালো সুর প্রিয়তোষের।

ছোট মেয়েটি হি হি করে হাসতে হাসতে বললে—ও কিছু লিবে না, কিছু লিবে না—তুই মিছিমিছি বকছিস।

—আচ্ছা, তেল না নিস ত শিলাজতু নে—সস্তায় দেব, টাকা টাকা ভরি। শিলাজতু, জানিস বাবু, পাথরের ঘাম। গরম দুধের সাথে খেলে শরীরে তাগদ হবে, ব্যারাম-স্যারাম কিছু থাকবে না, পাথরের মত মজবুত হবে শরীর, মরদ পুরুষের মত চেহারা হবে, বউভি বশে থাকবে, আমার নাতির মত ব্যাটা হবে তোর—বছর বছর একটা করে। লিয়ে যা বাবু শিলাজতু।

বেদেনীর কথায় চমকে উঠল প্রিয়তোষ। তার মনের কথা কি জানতে পেরেছে বেদেনী ? তাপহীন কণ্ঠে বললে প্রিয়তোষ—না না। আমার ওসব কিছু দরকার নেই।

—হামারা কপাল ! প্রৌঢ়াটি কপালে একবার হাত দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। যুবতীটি কোনও কথা বলে নি এ পর্যন্ত, কিন্তু তার মুখে দুষ্টমির হাসিটি লেগেই আছে। চোখের সামনের বইখানি সরে যেতেই প্রিয়তোষ দেখলে যুবতীটির দৃষ্টিটাও তারই দিকে নিবদ্ধ। ফিক করে হেসে যুবতীটি বললে—মিছিমিছি ওটা কেন মুখের কাছে ধরে আছিস বাবু ! দেখবি ত ভাল করে দেখ্ না। কাকে দেখবি—ছেলেকে না আমাকে। ছেলেকে দেখবি ত টাকা দিয়ে মুখ দেখতে হবে তোর। সে ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠল।

তার কথা শুনে মাথাটা ঝাঁঝাঁ করে উঠল প্রিয়তোষের,

সে তড়াক করে দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখব তোমার ছেলের মুখ।

—হ্যাঁ দ্যাখ্‌—ভাল করে দ্যাখ্‌, চুরি করে দেখে কি মন ভরে বাবুজি। স্তন্যপানরত ছেলের মুখ সরিয়ে নিয়ে ব্লাউজের বোতাম আঁটতে লাগল যুবতীটি।

প্রিয়তোষের মাথার ঠিক ছিল না। সে বাঙ্কের উপরের সুটকেসটি খুলে মনিব্যাগ থেকে দুটি টাকা বের করল। তার পর টাকা দুটো ছেলেটার ছোট্ট হাতে গুঁজে দিয়ে বোকার মত হাসতে লাগল।

প্রিয়তোষের কাণ্ড দেখে যুবতীটি খিল খিল করে হেসে উঠে বলল—মা, বাবুজি বড় ভালরে। দুটো টাকা দিয়ে দিল আমার ছেলেকে।

মা অবশ্য সবই দেখেছে, কিন্তু সে ঝানু প্রৌঢ়া—মুখে কিছু বলল না।

ছোট মেয়েটি হি হি করে হাসতে হাসতে বললে—ছেলেকে দিলি বাবু কিন্তু ছেলের মাকে? দিদির মুখ দেখেই ত ছেলেকে টাকা দিলি। লাজ নাই বাবুজি, দিদিকেও দিয়ে দে কিছু।

প্রৌঢ়া কৃত্রিম ধমকের ভঙ্গিতে বললে—থাম থাম ছুঁড়ি, বকবক করিস নে।

এদিকে প্রিয়তোষ তখন লজ্জিতভাবে আবার মুখের কাছে বই তুলে ধরেছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—বাবুজি!

আবার সেই প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বর। প্রিয়তোষ মুখের কাছ থেকে বই সরিয়ে বলল—আবার কি?

—নাতিকে টাকা দিয়ে মুখ দেখলি—বড় ভাল আদমি আছিস তুই বাবুজি। আমরা গরীব আছি—তোকে আর দেব কি। হাত দেখাবি বাবু, হাত? হাত দেখে তোর সব কথা বলে দেব আমি। প্রিয়তোষের ডান হাতখানি টেনে নিয়ে করতলের দিকে চেয়ে রইল বেদেনী।

প্রিয়তোষ ঝিমিয়ে পড়েছিল যেন। সে কোনও বাধা দিল না, বরং ভবিষ্যদ্বাণী শুনবার জন্য মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

প্রিয়তোষের প্রসারিত করতলের উপর নিজের করতল বুলিয়ে নিয়ে বেদেনী উচ্চকণ্ঠে বলল—দেখে যা, দেখে যা মেয়েরা বাবুর হাত। কি বাহার হাতের রঙের, কি মজাদার রেখাগুলো।

দুই মেয়ে তখন হিহি শব্দে হাসতে হাসতে মায়ের দুই পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

বাণী দিতে সুরু করেছে তখন প্রৌঢ়া বেদেনী। বিহ্বল প্রিয়তোষের কানে তার টুকরো টুকরো কথাগুলি প্রবেশ করছে আর সে আরও বিহ্বল হয়ে পড়ছে যেন।—টাকার অভাব তোর কোনওদিন হবে না বাবু, লক্ষ্মী তোর ঘরে বাঁধা থাকবে। ভাগ্যরেখা তোর খুব ভাল। ব্যবসায় তোর বাড়বাড়ন্ত হবে। বউভি তোকে খুব ভালবাসে। কিন্তু—

একটু থেমে করতল খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করছে—এই ভাব দেখিয়ে আবার সুরু করল—কিন্তু তোর মনে একটা কষ্ট আছে বাবুজি। তোর বউ তোকে 'সন্দ' করতে সুরু করেছে।

প্রিয়তোষের মনে তখন দারুণ অস্বস্তি।

বড় মেয়েটি হি হি করে হাসতে হাসতে বলল—তুই আচ্ছা কথা বলছিস মা। বউ ভালবাসে বাবুজিকে, আবার 'সন্দ' করে। খুব ভাল বউ বাবুজির, না মা?

প্রৌঢ়া ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—থাম্ থাম্ দুষ্টু মেয়ে। তুই কি বুঝবি? কোলে পেয়েছিস সোনারচাঁদ ছেলে, তুই কি বুঝবি বাবুজির মনের কথা? সাত-আট বছর বিয়ে হ'ল এখনও না একটা ছেলে না একটা মেয়ে। মন খারাপ হবে না? বউয়ের আমার দোষ কি? বাবুজি, 'সন্দ' তার ঘুচে যাবে। তুই সত্যিকারের মরদ আছিস; তোর বউ একথা বুঝবে, বুঝবে, বুঝবে।

প্রিয়তোষের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বেদেনী বলে কি? তার মনের কথা ও জানল কেমন করে? আশ্চর্য!

—তুই বউয়ের ওপর রাগ করে বাড়ী ছেড়েছিস বাবু। আমি বলি তুই ফিরে যা। এই শীতের মরশুমে তুই পাহাড়ে যাবি কেন? বাড়ী ফিরে দেখতে পাবি—তোর বউয়ের মুখে হাসি ফেটে পড়ছে। আট মাস পর তার কোলে আসবে, আসমানের চাঁদ—হীরের টুকরো। আমার কথা মিথ্যে হয় না বাবুজি। আর কিছু শুনতে চাস বাবুজি?

প্রিয়তোষের মনে তখন আনন্দের জোয়ার বইতে সুরু করেছে, বিহ্বলতাও কেটে গিয়েছে। বেদেনীর মুখের দিকে চেয়ে সে ভাবল—না, যতটা কুশ্রী তাকে মনে হয়েছিল, ততটা কুৎসিত ও নয়। সে হেসে বলল—না, আর কিছু শুনতে চাইনে। জোর করে অনেক কথাই ত শুনিয়ে দিলে তুমি।

—শোনাব না? তুই আমার নাতিকে ভালবেসে টাকা দিলি—তোর মনের কষ্ট দূর করে দেব না? বেদের জাত নেমকহারাম নয় বাবুজি। তোরা যা ভাবিস্ তা আমরা নয়। আমরা লোকের মন বুঝি—মনের কাঁটা তুলে ফেলি।

মনে মনে ভারী প্রীত হয়ে উঠল প্রিয়তোষ। ইচ্ছা হ'ল

কিছু বকৃশিস দেয়। কতটা দিলে ঠিক হয় আন্দাজ করে নিচ্ছিল প্রিয়তোষ। কিন্তু চতুরা বেদিনী তার মনের কথা ঠিক ধরে ফেলেছে।

—'তুই ভাবছিস বকৃশিস দিবি? না বাবুজি, সে হামি লিব না। তুই হামার নাতিকে দু' দুটো টাকা দিয়ে দিলি। ফির টাকা লেবো তুর কাছে? হামি কিছুতে নেবো নি বাবু। চুপ করে বসে থাক এখানে। তোর ছেলে হোক। কলকাতা যেয়ে বকৃশিস নিয়ে আসবো। হ্যাঁ বাবুজি, ঠিক বাত বলছি হামি।...

তার কথা শুনে প্রিয়তোষ হাসতে লাগল। প্রথম দিকটার বিরূপ মন প্রীতিতে ভরে উঠেছে।

ট্রেণের গতি মন্থর হয়ে আসছে—একটা ষ্টেশন এল বোধ-হয়। ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই বেদেনীর দল জিনিসপত্র নিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। একটু আগেও প্রিয়তোষ বুঝতে পারে নি যে, তারা এই ষ্টেশনেই নেমে পড়বে। মনটা কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠল প্রিয়তোষের।

গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াল প্রিয়তোষ। প্রৌঢ়া আর তার দুই মেয়ে হাত তুলে নমস্কার করল তাকে—নমস্তে বাবুজি। মুখে তাদের মিষ্ট হাসি।

ট্রেণ ছাড়ল। সন্তান-ক্রোড়ে যুবতীটির দিকে যতক্ষণ দেখা যায় নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে রইল প্রিয়তোষ।

আবার ট্রেণে সে একা। এবার তার ভাবনা ভিন্নমুখী। ভাবছিল বেদেনীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। ওদের সত্যিই ক্ষমতা আছে। মনের কথা কেমন আশ্চর্য্যভাবে ধরতে পারে ওরা।

কতক্ষণ কল্পনা-বিলাস চলেছে ঠিক খেয়াল ছিল না প্রিয়তোষের। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই তার চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তখনও সে ভাবছে, দার্জ্জিলিং যাবে, না কলকাতায় ফিরবে।

সুটকেশ নামাতে গিয়ে দেখল, শিশুটিকে দেবার জন্ম মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে মানিব্যাগটি রেখে সুটকেশ বন্ধ করে নি। নিজের বিহ্বল ভাবের কথা স্মরণ করে মনে মনেই হাসল প্রিয়তোষ। তার পর মানিব্যাগটি পকেটে রাখবে মনে করে সুটকেসের ভিতর হাত দিয়ে দেখল ব্যাগটা নাই। তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হ'ল। সুটকেশের ভেতরের জিনিস ওলোট-পালোট করে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও ফল হ'ল না। বুঝতে পারলে এতক্ষণে—বেদেনীদের সঙ্গে মানিব্যাগ সমেত দেড়শো' টাকাও অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

দিন তিনেক পর প্রিয়তোষকে আবার দেখা গেল কলকাতায়। ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। হৃদ্‌-পিণ্ডের ধুকধুকুনিটা দ্রুত হ'ল প্রিয়তোষের। কি ভাববে সুপ্রীতি তাকে দেখে? সত্যই সে ভীরু, কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন।

বাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই দেখা পুরাতন ভৃত্য মাধবের সঙ্গে। প্রিয়তোষকে দেখে সে একগাল হেসে বললে—দার্জ্জিলিং থেকে এত শীগ্‌গির ফিরে এলে দাদাবাবু?

—হ্যাঁ ফিরে এলাম। কোনওরকমে জবাব দিলে প্রিয়তোষ। তোর বৌদি কি করছে রে মাধবদা? ভাল আছে ত সব?

মাধব হেঁয়ালি করে বলল, তা ভালও বলতি পার—ভাল নাই তাও বলতি পার। তুমি যেদিন 'আগ্‌' দেখিয়ে চলে গেলে না দাদাবাবু, তার পর থেকেই ত সেই কাণ্ডখানা হচ্ছে কিনা!

প্রিয়তোষের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কোনও রকমে বললে—কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বল না মাধবদা?

—বলব আর কি দাদাবাবু? বৌদিমণি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন তোমার যাওয়ার পর থেকেই।

মাধবের মুখে দুষ্টু হাসি।

—খাওয়া ছেড়েছে? বল কি মাধবদা?

হাসতে হাসতে মাধব বলল, ঠিক ছাড়ে নি। কিন্তু ছাড়তি হয়েছে। গলা দিয়ে নামলি ত! একটু কিছু মুখি দিলিই—ওয়াক। তয়ে ত ডাকতর ডাকনু দাদাবাবু। তখন বৌদির কি 'আগ'। ডাকৃতর কি বললি জান?

—জানি।...বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে প্রিয়তোষ। তার পর বুক টান করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

বঙ্গের নবজাগৃতি ও নারীসমাজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

গত পঞ্চাশ বৎসরের কথা এখানে বলিব না। এ সময়ের কাহিনী লইয়া বই-পুঁথি রচিত হইয়াছে, প্রবন্ধাদিতেও আলোচনা হইয়াছে কিছু কিছু। স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর সাক্ষাৎ যোগদান বর্ত্তমান শতাব্দীর একটি যুগান্তকারী ব্যাপার। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ থাকিলেও উক্ত রচনাগুলিতে ইহার আভাস যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। এখানে বঙ্গের নবজাগৃতিতে বাংলার নারী-সমাজ গত শতাব্দীতে কতখানি সার্থক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই। আমার বক্তব্য প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে আবদ্ধ—বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দের দ্বারা রচিত পুস্তক-পুস্তিকাদিতে বিধৃত বিবরণ হইতে আমরা সামাজিক কোন কোন বিষয়ে কতকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারি, নরনারী নির্ব্বিশেষে বাংলার জনসাধারণ যে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এ কথা বিদেশীয়েরা প্রায় সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বিদ্যার চর্চ্চা শ্রেণীবিশেষের ভিতরে আবদ্ধ থাকিলেও, জনসাধারণের মধ্যে যে এক প্রকার লোক-শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবহমান ছিল এ বিষয়টি বিদেশীদের চোখে ধরা পড়ে নাই। নারীসমাজও এই লোক-সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য, দায়িত্ব এবং ধর্ম্মবোধ ঐ যুগেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহাদের ব্যক্তি-মানসকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে যে, লেখাপড়া জানা আবশ্যক তাহা যেন আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম ঐ সময়ে। তাই দেখি, 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকে (১৮২২) পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রচলিত কু-ধারণাগুলির উল্লেখ করিয়া তাহা নিরসন পূর্ব্বক বিদ্যাচর্চ্চার আবশ্যকতা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন। তখন মিশনরী-দের স্ত্রীগণ এবং ইউরোপীয় কতিপয় মহিলা সোসাইটি বা সমাজ স্থাপন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে স্ত্রী-পাঠশালা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ত্তৃক এরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশ খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এই পুস্তক রচনার মূলে যিনি ছিলেন তাঁহার নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। সমাজ-সংস্কারে বিষম বিরোধী ও অতিমাত্রায় রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া রাধাকান্ত পরবর্ত্তীকালের কোন কোন লেখক কর্ত্তৃক তাচ্ছিল্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরে বঙ্গসংস্কৃতি বিষয়ে নব্য গবেষণার ফলে যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাজা রাধাকান্ত দেব গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরেজী শিক্ষা, জনশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাসমূহে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রথম যুগেই স্ত্রীশিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগের কথা আজ আমরা অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিব।

স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব সর্ব্বজন বিদিত এবং সর্ব্বজন স্বীকার্য্য। ঐ উদ্দেশ্যে যে সব প্রাথমিক বাধা যেমন সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি তাহা বিদূরণে তিনি নিরতিশয় তৎপর হইয়াছিলেন। রামমোহন ছিলেন সংস্কারবাদী এবং এদিক হইতে রাজা রাধাকান্ত দেবের বিপরীতধর্ম্মী। সতীদাহ নিরোধক পুস্তিকাদিতে রামমোহন সমাজে নারীর সমান অধিকার ঘোষণায় তিনি নারীর একটি মৌলিক অধিকারের কথাও তুলিলেন। একদা রাষ্ট্রে যে নারীগণ পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবেন ইহার মধ্যে তাহারই পূর্ব্বাভাস লক্ষ্য করি। ১৮২৯ সনে সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং তিন বৎসর পরে প্রিভি কৌন্সিলে সতীদাহ পক্ষীয়দের আপীল নাকচ হওয়ায় এ বিষয়ে আন্দোলনের নিবৃত্তি হইল। পুরুষের ন্যায় নারীরও বাঁচিবার শাশ্বত অধিকার এইরূপে স্বীকৃত হয়।

হিন্দু কলেজের নবশিক্ষিত যুবকেরা তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতিকল্পে চিন্তায় রত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তখন কর্ম্মে রূপায়িত হইতে পারে নাই। বড়লাটের আইন-সদস্য বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৪৯ সনের ৭ই মে কলিকাতায় ভদ্রবালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত ধর্ম্মনিরপেক্ষ প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বাংলার নারী-প্রগতির ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদল, এমন কি পণ্ডিত মদনমোহন বিদ্যালঙ্কার, এবং কিছু পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি ইহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। সরকার এই বিদ্যালয়টির আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৮৫৬ সনে এবং শিক্ষা অধিকর্ত্তার বার্ষিক বিবরণে ১৮৬০ সন নাগাদ ইহার কথা আলোচিত হইতে থাকে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী আনুকূল্যে আবার যে সকল বালিকা বিদ্যালয় মফঃস্বলে স্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলি ক্রমশঃ অনাদর লাভ করিতে লাগিল। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ১৮৬৪ সন অবধি রাঢ় অঞ্চলে কোথায়ও নূতন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং অধিকাংশ স্থলে আগেকার বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার" অভিনব আয়োজনে রত হন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত একদল যুবক বামাবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা বিবিধ উপায়ে স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞান বিস্তারে ব্রতী হইলেন এই সময়ে।

কিন্তু এই সকল আয়োজনের সমকালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে সাধারণ নারীদের দ্বারা বিদ্যাচর্চ্চা কি মোটেই হইত না? এই প্রসঙ্গে তৃতীয় দশকে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত শান্তিপুর নিবাসিনীর অমন সুললিত তথ্যপূর্ণ পত্রখানির উল্লেখ না হয় নাই করিলাম। সম্প্রতি কোন কোন লেখক এখানি নারীর লেখা নয় বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশিনী মুলেন্স প্রণীত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) পুস্তকখানিরও উল্লেখ করিব না। তবে এই পঞ্চম দশকেই যে কোন কোন বঙ্গ মহিলা বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন কোন কামিনীর কবিতা নিজ টিপ্পনী সহ 'সংবাদ প্রভাকরে' পত্রস্থ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৫৫-৫৬ সনের কথা। ইহার দশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ সাত জন মহিলা লেখিকার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৬৫-৬৬ সনের শিক্ষা অধিকর্ত্তার বার্ষিক বিবরণে রচিত বিষয়ের উল্লেখসহ তাঁহাদের নাম পাইতেছি। এই সাত জনের মধ্যেই পাঁচ জন কলিকাতা, একজন ঢাকা ও একজন পাবনা নিবাসিনী। আমরা অনেকে হয়ত রাসসুন্দরীর আত্মকথার সঙ্গে পরিচিত। তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চার বিস্ময়কর প্রয়াসের বিষয় এই পুস্তকখানি পাঠে জানা যায়। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেকার রমণীরা কেহ কেহ নিরক্ষর হইয়াও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও মঙ্গল কাব্যাদির বিষয়বস্তুর সহিত বেশ পরিচিত ছিলেন, প্রাচীনেরা এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যক্তিবিশেষের প্রযত্নকে ব্যাপকতর ও যুগোপযোগী করিয়া তোলা তখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল; আর ইহারই ভিত্তি রচনা করিতেছিল উপরি-উক্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টাগুলির। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব'-এর (১৮৬৯) মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি সমাজপতিদের অনাচার-অবিচারের কথা প্রতি পক্ষান্তে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সদ্য-প্রকাশিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও (১৮৬৮) নারী জাতির দুরবস্থা এবং উন্নতি বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু ঐ সব প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হওয়া সম্ভব যখন নারীগণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিবেন।

এইমাত্র স্ত্রীশিক্ষার ভিত্তি রচনার কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এই ভিত্তি রচনা ত্বরান্বিত এবং ইহার উপরে সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে আরও কিছু প্রয়াস আবশ্যক। কোন কোন ইংরেজ ও বাঙালী মনীষী এ বিষয়ে যে চিন্তা না করিতেছিলেন এমন নয়। প্রখ্যাত সমাজসেবী মিস মেরী কার্পেন্টার ১৮৬৬ সনের শেষে বিলাত হইতে এ দেশে আসেন স্ত্রীশিক্ষার বিবিধ আয়োজন স্বচক্ষে দেখিবার নিমিত্ত। তখন বাংলা দেশে বালিকা বিদ্যালয় বেশ দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বালিকাদের সুষ্ঠুরূপে শিক্ষাদানের নিমিত্ত তিনি একদল শিক্ষয়িত্রী তৈরী করার স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের অনুরোধ জানান সরকারকে। এ বিষয়ে বহু বঙ্গ-মনীষী, যেমন কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গোড়া হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। সরকার মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বেথুন স্কুলের সঙ্গে একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাই শেষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তিন বৎসর পরে ছাত্রীর অভাবে বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে এবং নারীর যুগোপযোগী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বালিকা বিদ্যালয়ে যে নারী-শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ অত্যাবশ্যক, এ কথা তখন পাশ্চাত্ত্য দেশে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। এ দেশেও ইহার ব্যতিক্রম নহে, যদিও স্থান কাল পাত্র ভেদে এখানে তখনই নারী-শিক্ষয়িত্রী পাওয়া সম্ভব না হইলে স্ত্রীশিক্ষার আশু অপচয় ঘটিতে পারিবে না বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন। সরকার স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয়গণের দ্বারা এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে সুফল দর্শাইতে পারে। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে ফিরিয়াই ভারত সংস্কার সভা নামে একটি সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। সভার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রী-জাতির উন্নতি। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৮৭২ সন নাগাদ একটি স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় খুলিলেন এবং খুলিবার অল্পকাল পরেই সরকার হইতে থোক সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাইলেন। এই স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্ম যুবক ও কর্ম্মীদের লইয়া অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে "ভারত আশ্রম" নামে একটি যৌথ পরিবার গঠন করেন। যুবককর্ম্মীদের স্ত্রীগণ এবং নিকট আত্মীয়া-গণ এখানে থাকিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে রত হন। তাঁহাদের সন্তানদের জন্য উহার সঙ্গে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও খোলা হইল। এইরূপে কেশবচন্দ্রের দূরদৃষ্টিহেতু দৃঢ় ভিত্তির উপর একটি স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বাংলার নারী-সমাজের মধ্যে নবজাগৃতি আনয়নে এই বিদ্যালয়টির কৃতিত্ব সমধিক। এ সম্বন্ধে একটু পরে আরও বলা যাইবে।

"অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা" ঐ কার্য্যে যে বিশেষ সহায় হইয়াছিল তাহার বিষয়ে এখন কিছু বলি। নাম হইতেই বুঝা যায়, অন্তঃপুরে নারীগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এই সভা দ্বারা। কি বালিকা, কি তাহার মাতা ও মাতৃস্থানীয়া, সকলেই এই ব্যবস্থার আওতায় আসিয়া পড়িলেন। শ্রেণী বিভাগ করতঃ পাঠ্যপুস্তকসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কখন কখন পাঠার্থিনীদের পাঠ্যপুস্তক

নিঃখরচায় সমবরাহ করা হইত। তিন মাস, ছয় মাস ও এক বৎসর পরে পাঠার্থিনীদের নিকট প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহারা উত্তর লিখিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিত। দুষ্ট লোকেরা বলিত, উত্তরপত্র অভিভাবকেরা লিখিয়া দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে যে এরূপ না হইত তাহা বলা যায় না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীতি রক্ষা করিয়া চলা হইত। শুধু কলিকাতা নয়, সুদূর মফঃস্বল যেমন—ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি স্থান হইতে পাঠার্থিনীরা উত্তরপত্র পাঠাইতেন। পরীক্ষান্তে গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া তাহাদের পুরস্কৃত করা হইত। ষষ্ঠ দশকে ব্রাহ্মবন্ধু সভা এবং পরে বামাবোধিনী সভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কোন কোন বিশিষ্ট পরিবারে এবম্বিধ অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন চলিতেছিল ব্যক্তিগতভাবে। শোভাবাজারের রাজবাটীর মহিলারা যে লেখাপড়া জানিতেন তাহা পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বহুপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠ দশকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে আধুনিক ধরনে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আয়োজন হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিবারের স্ত্রী ও কন্যাগণকে সযত্নে পড়াইতে অগ্রসর হন। ইহার ফলে যে তাঁহারা বাংলা ভাষা-সাহিত্যে বেশ পাকা-পোক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন সে বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখিতভাবে সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে এতই কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে, এক সময়ে তিনি সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী বলিয়া বাংলার পাঠক-সাধারণের নিকট আখ্যাত হইয়াছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সাহিত্যিক কৃতিত্ব নিতান্ত কম নহে। কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত—এই সমযকার এবং পরবর্ত্তীকালেরও অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টা নারীদিগের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া আনিয়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ভারত-সংস্কার সভার আনুকুল্যে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত এখানে স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বা ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলটির কথা বিশেষভাবে মনে উদিত হয়। আধুনিককালের কোন কোন লেখক বাংলার নবজাগৃতির কথা বলিতে গিয়া এই বিদ্যালয়টির কথা উল্লেখ করিতেই ভুলিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টি শুধু বয়স্কা-নারীদের যুগোপযোগী শিক্ষাদানে অগ্রসর হয় নাই, তথাকার পাঠার্থিনীরা বৃহত্তর সমাজের নারীদের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেরই কল্যাণচিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সত্য বটে, পঞ্চম দশকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আন্দোলন দ্বারা সমাজচিত্তে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ দশকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্ম-চর্য্যায় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নরনারীর সমান অধিকার ঘোষণা করেন। সপ্তম দশকে পুরুষের বহু-বিবাহ নিরোধক আইনের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা পুনরায় আন্দোলনের উদ্ভব হয়। আর এই সকলের ফ[illegible] একটি অপূর্ব্ব আত্ম-সচেতনতা জাগ্রত হইতেছিল। স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুণে বয়স্কা মহিলারা বি[illegible] বৎসরের উন্নতি-প্রয়াসকে যেন বস্তুগত করিয়া লইতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। সমাজ-জীবনে নারী যে একটি মহিমময় স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতে পারেন, এই বোধ তাহাদের মনে জাগ্রত হইল প্রধানতঃ উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুণে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র ব্যতিরেকে পরবর্ত্তীকালের সুবিখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অঘোরনাথ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়), শশীভূষণ দত্ত, উমানাথ গুপ্ত প্রভৃতি। কেশবচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় এই নারী-পাঠার্থিনীরা "বামা হিতৈষিনী সভা" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সভায় শুধু যে বয়স্কা ছাত্রীরা উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন তাহা নহে, সে যুগে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পত্নীরা, যেমন ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি) পত্নী, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহধর্ম্মিনী এবং এইরূপ আরও অনেকে আসিয়া মিলিত হইতেন। সমাজে নারীর দায়িত্ব, সন্তানপালন, পোষাক-পরিচ্ছদ, গৃহধর্ম্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ে নারীগণ প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। নারীরা যাহাতে সুকন্যা, সুগৃহিণী এবং সু-মাতা হইয়া পরিবারের এবং সমাজের গুরু কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে পারেন—কি বিদ্যালয়ের, কি সভার তাহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

পাঠার্থিনীরা শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন সে বিষয়ে মধ্যে মধ্যে এবং বর্ষান্তে পরীক্ষা লওয়া হইত। বাহির হইতেও পরীক্ষকগণ আসিতেন। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (পরে মহামহোপাধ্যায় এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রমুখ কৃতবিদ্যগণ উত্তরপত্রের উৎকর্ষ দেখিয়া বিমোহিত হইতেন। বিদ্যালয়ে বাংলার মাধ্যমে পাঠনা চলিলেও ইংরেজী সাহিত্য পড়ানোরও রেওয়াজ ছিল। বামাবোধিনী পত্রিকায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উৎকৃষ্ট বাংলা রচনা, এবং সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি যথারীতি স্থান পাইত। মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) প্রকাশ হইতে হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদি স্ত্রীপাঠোপযোগী করিয়া প্রধানতঃ পুরুষদের দ্বারা রচিত হইতেছিল। এখন নারীরাও সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার এবং বিশেষভাবে স্ত্রীপাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ক্রমে অধিকতর ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে নারীর গদ্য পদ্য রচনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত বামাবোধিনী পত্রিকার প্রায় প্রতিষ্ঠাবধি (১৮৬৩) নারীদের রচনা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হইত। এই সময় হইতে দশ বৎসরের মধ্যে পত্রিকায় তাঁহাদের বিস্তর গদ্য পদ্য রচনা বাহির হয়। এসকল রচনা হইতে যেগুলি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় তাহা

উমেশচন্দ্র সঙ্কলন করিয়া বামারচনাবলী নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। উপযোক্ত হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের অর্থানুকূল্যে ইহার প্রথম ভাগ ১৮৭২ সনে মুদ্রাঙ্কিত করেন। পুস্তকখানির উপক্রমণিকায় স্ত্রী-শিক্ষা এবং নারী-জাতির সাহিত্য-চর্চ্চা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

"এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার এক্ষণে যেরূপ প্রথমোদ্যম তাহাতে কোন ভাল রচনা দেখিলে সহসা স্ত্রীলোকের বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই পুস্তকে যে-সকল রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতেও যে কাহার সংশয় উপস্থিত হইবে না কিরূপে আশা করা যায়? কিন্তু আমাদিগের পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি বক্তব্য যে, এ বিষয়ে বামাবোধিনী পত্রিকা পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বামা রচনা সকল গ্রহণ করিয়াছেন। লেখিকাদিগের অধিকাংশ আমাদিগের বিশেষ পরিচিত, অবশিষ্ট সকলের লেখা বিশ্বাসযোগ্য যথোচিত প্রমাণ ভিন্ন গৃহীত হয় নাই। লেখিকাদিগের রচনার নিম্নে তাহাদের নাম চিহ্নিত আছে, কেবল যাহারা প্রকাশ্যে স্ব স্ব নাম জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত বা অনিচ্ছুক, তাহাদের নাম প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের লেখা অল্প বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কেহ বিবেচনা না করেন। রচনা সকল পত্রিকাতে যেরূপ অবিকল মুদ্রিত হইয়াছিল, পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কণের সময়ে আমরা স্থল বিশেষে তাহার কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি ও কোন কোন অংশ কিছু কিছু সংশোধন করিয়া দিয়াছি।"

এই বিষয়ে বলিতে গিয়া আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথা মনে হইতেছে। সপ্তম দশকের প্রথমাবধি নারী-সমাজের চিত্তোৎকর্ষক বিধানে ইহা কৃতিত্ব দেখাইতে থাকে। মিস মেরী কার্পেণ্টারের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেনের বিলাত প্রবাসকালে তিনি ব্রিষ্টলে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে এদেশের নারী-জাতির হিতকল্পে একটি সভা স্থাপন করেন ১৮৭০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। কেশবচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠা সভায় উপস্থিত থাকিয়া একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার ফিমেল নর্ম্মাল স্কুলে প্রথম দিকে এই সভা অর্থাদি দিয়াও সাহায্য করিয়াছিলেন, সভা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা-সমিতি স্থাপিত হয়। বাংলা দেশেও কলিকাতায় এবং ঢাকায় শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শাখা-সমিতিগুলি স্থানীয় স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টায় অর্থ, পুস্তক, বৃত্তি আদি দিয়া সাহায্য করিতেছিল। নারী-চিত্তোপযোগী নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশেও কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগী হন। স্ত্রীজাতির উন্নতি-প্রয়াসী কোন কোন নেতা, যেমন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং যুব-সাহিত্যিক, যেমন রজনীকান্ত গুপ্ত এবং ব্রাহ্মনেতা ও সাহিত্যিক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভৃতির দ্বারা পুস্তক রচনা করাইয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। এই প্রসিদ্ধ লেখকত্রয়ের পুস্তকগুলির নাম যথাক্রমে—"সুরুচি'র কুটীর" (২য় সং), "প্রবন্ধ কুসুম" (কয়েকজন মহীয়সী নারীর জীবনী) এবং "মেজবৌ" (উপন্যাস)। মিস কার্পেণ্টারের মৃত্যুর পর মিস ম্যানিং মূল সভার কর্ণধার হন। তিনিও এদেশে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ করিয়াছিলেন। মিস মেরী কার্পেণ্টার ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হয় স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ লইয়া। এই কথাটিও আজকাল লেখকেরা ভুলিয়া যান যে, কেশবচন্দ্র সেনের যাবতীয় কর্ম্মের নিয়ামক ছিল স্বদেশের উন্নতি-চিন্তা, প্রত্যেকটি বিষয়ে ভারতীয়তা রক্ষা, বিশেষতঃ নারী-শিক্ষা বিষয়ে এই আদর্শবাদ ঐ সময়ের তথাকথিত প্রগতিবাদী ব্রাহ্মদের মনোমত ছিল না। মিস কার্পেণ্টারের পক্ষে ইহা অনুধাবন করা ত সম্ভবপরই ছিল না। উক্ত আদর্শবাদ রক্ষা করিতে গিয়া কেশবচন্দ্রকে স্বদেশে ও বিদেশে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই আদর্শবাদেরই জয় হয় পরবর্ত্তীকালে। কিন্তু সেকথা এখানে বলা চলিবে না।

এই যে আদর্শ-সংঘাত, ইহার ফলে স্ত্রীশিক্ষার আর একটি ধারাও সুরু হইল। শিক্ষায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য থাকিবে না—কেশব-বিরোধীদের ছিল এইরূপ মতবাদ। এই মতবাদের প্রতিপোষকগণ (যেমন দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) মিস এনেট এক্রয়েডকে দিয়া হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বোর্ডিং-স্কুল কলিকাতার বুকে স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জন বাড ফিয়ার ও তদীয় পত্নী বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ সনে সিভিলিয়ান বিভারিজের সঙ্গে মিস এক্রয়েডের বিবাহ হওয়ায় স্কুলটি কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকে। বৎসরখানেক পরে, ১৮৭৬ সনে বিদ্যালয়টি নবকলেবরে আবির্ভূত হইল—নাম হইল 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়।' এবারে ইহার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কাদম্বিনী বসু (পরে গঙ্গোপাধ্যায়), সরলা দাস (পরে মিসেস সরলা রায়) ও অবলা দাস (পরে লেডী অবলা বসু) এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ছাত্রীদের বাংলা রচনা-শক্তি বেশ উৎকর্ষ লাভ করে। 'বামা বোধিনী' পত্রিকায় এই সব রচনা দেখিয়াছি। এই পত্রিকায় আহমদাবাদ হইতে জনৈক বঙ্গ মহিলার পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক রচনাটিও ঐ সময়ে বিশেষ আদৃত হয়। এই বঙ্গ মহিলা আর কেহই নন—সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ইহার কথা আগেও বলিয়াছি। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় এবং বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষায় নরনারীর মধ্যে পার্থক্য বিবেচিত হয় নাই বটে, কিন্তু এখানকার ছাত্রীরাও ঐ সময়ের নব ভাবনা তথা নব-জাতীয়তা মন্ত্রে খানিকটা উদ্বুদ্ধ হইতেছিল। আমি লেডী অবলা বসুর মুখে শুনিয়াছি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালীন শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি হিন্দুমেলার সাধারণ অধিবেশনে একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এখানে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় পরবর্ত্তীকালেও ছাত্রীরা অনেকে তাহার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা একটু পরেই পাইব।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্ম নেতৃবর্গ নবজাতীয়তা

মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু বিবিধ সমাজোন্নতি প্রচেষ্টায় অগ্রণী। তিনি রাজনৈতিক নেতারূপে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদেও বৃত হন (১৮৯৮)। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক ও অন্যতম উৎসাহী পরিচালক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় "অবলা বান্ধব" সম্পাদনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 'বীরনারী নাটকে' সমাজে নারীর স্বাভাবিক মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায়ও তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। "না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না" শীর্ষক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটির রচয়িতা তিনিই। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ যে জাতীয়তার প্রেরণা লাভ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

১৮৭৭ সন নাগাদ বঙ্গের শিক্ষা অধিকর্ত্তার বার্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের মিলন প্রস্তাব চলিতেছিল কিন্তু এ প্রস্তাব কার্য্যকর হয় নাই। সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭৭ সনে উঠিয়া গেল। ১৮৭৮ সনে আগষ্ট মাসে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে কয়েকটি সর্ত্ত-সাপেক্ষে মিলিত হয়। এই মিলন উপলক্ষে কেশবপক্ষীয়েরা এই বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, নারী ও পুরুষের শিক্ষা একই ধাঁচের হইলে উভয়ের ভিতরকার স্বাভাবিক পার্থক্য এবং সামাজিক ও পারিবারিক পৃথক ধরনের কর্ত্তব্যে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হইবে। যাহা হউক এই সম্মিলিত বেথুন বিদ্যালয় হইতেই এই বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কাদম্বিনী বসু উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৬ সনে চন্দ্রমুখী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট মান অনুযায়ী একটি বিশেষ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ও পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় কাদম্বিনী বসুই প্রথম উত্তীর্ণ বঙ্গ-মহিলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার এইরূপে নারী-সমাজের নিকট উন্মুক্ত হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যেও তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কাদম্বিনী বসুকে উপলক্ষ করিয়াই সরকার পক্ষে ঘোষণা করা হইল যে, তিনি যদি উচ্চতর শিক্ষালাভে ব্রতী হ'ন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে একটি মাসিক বৃত্তি দিবেন। কলেজী শিক্ষালাভে উৎসুক হইলে সরকার বেথুন স্কুলে একজন মাত্র অধ্যাপক লইয়া একটি কলেজ শ্রেণী খুলিলেন। এই অধ্যাপকের নাম শশীভূষণ দত্ত। তাঁহার কথা আগেও আমরা একবার পাইয়াছি। এইরূপে কলিকাতায় নারী-সমাজের উচ্চশিক্ষালাভের উপায় হইল। ক্রমে ঢাকায় ইডেন স্কুল নামে একটি মহিলা উচ্চ ইংরেজী স্কুলও খোলা হইল। এই বিদ্যালয়টি পরে কলেজে পরিণত হয়। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া কেশবচন্দ্র সেন একটি স্বতন্ত্র ধরনের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। অষ্টম দশকের গোড়ার দিকে ইহা একটি কলেজে পরিণত হয়। ইহা কিন্তু সাধারণ কলেজের অনুরূপ ছিল না। ইহার কথা পরে বলিতেছি।

স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় উঠিয়া গেলে বামাহিতৈষিণী সভার কার্য্যকলাপও বিশেষ সঙ্কুচিত হয়। প্রথমাবধি এই সভার সম্পাদিকা ছিলেন উক্ত স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী। তিনি আজীবন কুমারী থাকিয়া অতীব নিষ্ঠার সহিত শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন। সপ্তম দশকের শেষে কলিকাতায় একাধিক মহিলা সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মসমাজে আত্মকলহ হেতু ব্রাহ্মগণ দুইটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইয়া যান। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ ধর্ম্মভিত্তিক হইয়াও একেবারে পৃথক হইয়া গেল। বামাবোধিনী পত্রিকা কিছুকাল বন্ধ থাকিয়া পুনঃ প্রচারিত হইল। তখনও ইহার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, কেশব-বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রধান নেতা। কেশব-পন্থী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (পরে নববিধান) নারীদের পক্ষে প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'পরিচারিকা' মাসিকপত্র বাহির হইল। কেশবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী জগন্মোহিনী দেবীর নেতৃত্বে কেশব-অনুরাগী মহিলারা আর্য্য-নারীসমাজ গঠন করিলেন। নাম হইতেই প্রকাশ, সমাজের সদস্যারা আর্য্য-নারীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে সচেষ্ট হন। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য-নারীগণের গুণাবলী অনুশীলন করিবার নিমিত্ত ব্যক্তিগতভাবে ব্রতাদির অনুষ্ঠানে সভ্যাগণ প্রবৃত্ত হইলেন। আবার সমষ্টিগত কার্য্যেও তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠেন। বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনাভার এই সমাজের উপরই বর্ত্তাইল। পরিচারিকারও পরিচালক হইলেন তাঁহারা। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরে ইহার সম্পাদনাকার্য্যও মহিলারা নিজহস্তে লইলেন।

আর্য্য-নারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সনের এপ্রিল মাসে। ইহার মাত্র কয়েক মাস পরে আগষ্ট মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মহিলারা একটি মহিলা সভা স্থাপন করিলেন। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন বঙ্গ-মহিলা সমাজ। এই সময়ে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী বেথুন স্কুলে শিক্ষিকার কর্ম্ম লইয়া আসেন। তিনি হইলেন সমাজের প্রথম সভাপতি। ব্রাহ্ম-নেতা ব্যারিষ্টার আনন্দ-মোহন বসুর সহধর্ম্মিণী স্বর্ণপ্রভা বসু হন ইহার প্রথম সম্পাদক। নারীসমাজের প্রগতিমূলক কার্য্যে উৎসাহ দান এই সভার প্রধান কাজ হইল। ব্রাহ্ম-মহিলাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি স্থাপন এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ব্যাপকতর হিন্দুসমাজের নারীদের মধ্যেও ইহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ষষ্ঠ দশকে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় মুখ্যতঃ নারীদের মধ্যে ধর্ম্মবোধ উন্মেষের জন্য। এবারকার সমাজ বা সভাগুলি বিবিধ উপায়ে সমাজ-সেবায় অগ্রসর হইল। সমাজের সভাপতি রাধারাণী 'প্রবন্ধলতিকা' নামে একখানি স্ত্রী-পাঠ্যপুস্তক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশ করেন। তৎকালীন উচ্চশিক্ষিতা অথচ সেবাপরায়ণা মহিলারা একে একে ইহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। মহিলা-সদস্যারা বঙ্গ-মহিলা সমাজের অধীনে একটি শিল্প-প্রদর্শনীরও একবার

আয়োজন করিয়াছিলেন। মনে হয়, মহিলা-পরিচালিত শিল্প-প্রদর্শনী এইটিই প্রথম। বঙ্গ-মহিলাসমাজ দীর্ঘকাল চলিবার পরে ১৯০৫ সনে উঠিয়া যায়। প্রধানতঃ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও সমাজ-নেতারা মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি দ্বারা মহিলাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। এ প্রসঙ্গে বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। সভার উদ্যোগে মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কথা প্রচারের জন্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ করা হইত। সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাঁফো নারীদের সম্মুখে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। পূর্ব্বে বামাহিতৈষিণী সভায় এবং পরে ভিক্টোরিয়া কলেজে তিনি এইরূপ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বঙ্গ-মহিলাসমাজে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুও বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সপ্তম দশকের শেষে নারীদের ভিতরে সভা-সমিতির মাধ্যমে যে কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দেয় তাহা আরও ব্যাপক ও গভীর হইল পরবর্ত্তী দশকে।

নারী যে একদা সর্ব্বকর্ম্মে পুরুষের সহায় হইবেন এবং স্বদেশের বিবিধ সমাজোন্নতি প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে যোগ দিবেন তাহার সূচনা দেখি সপ্তম দশকের প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে। অষ্টম দশকে নারী-প্রগতি দুইটি বিশিষ্ট খাতে চলিয়াছিল : (১) নারীদের ভিতরে কলিকাতা ও মফঃস্বলে শিক্ষা-বিস্তার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংগঠন। (২) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কলিকাতা প্রবাসী বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা সভা-সমিতি-সম্মিলনী স্থাপন। ইহাদের মধ্যে মধ্যবঙ্গ-সম্মিলনী এবং বিক্রমপুর-সম্মিলনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। প্রথমটির নায়ক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। দ্বিতীয়টির দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মফঃস্বলেও কোন কোন শহরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। উত্তরপাড়া-হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টায় অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তীকালের কোন কোন বিখ্যাত লেখিকা ছাত্রাবস্থায় হিতকরী সভার বৃত্তিলাভে সমর্থ হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই জনের মাত্র নাম এখানে করিব : কামিনী সেন—পরবর্ত্তী কালের কবি কামিনী রায় এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু (পরে সরকার)। স্ত্রীশিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা কি প্রণালীতে হইবে তাহা লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে বরাবর মতপার্থক্য ছিল। আবার এই দশকেই কোন কোন বিষয়ের শিক্ষায় প্রবল প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। কিন্তু এ সকল বাধা-বিপত্তি ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়।

স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি এই দশকের গোড়াতেই নারীচিত্তে সম্যক বিকাশের একটি সুষ্ঠু পন্থা আয়োজন করেন ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক ধারণার বিষয়ও এই কলেজের কার্য্যকলাপের মধ্যে পাওয়া যাইবে। ভিক্টোরিয়া কলেজ আধুনিক কালের কলেজের অপেক্ষা ভিন্ন ধরনের ছিল। এখানে নির্দ্দিষ্ট মান পর্য্যন্ত বালিকাদের পঠন-পাঠনার ব্যবস্থা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তা নারীদের উচ্চশিক্ষার একটি অভিনব ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা বয়স্কা নারীগণের নিকট বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া কলেজ পরিচালনার ভার অর্পিত হয় একটি সিণ্ডিকেটের উপর। এই সিণ্ডিকেট অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা ও মফঃস্বলে দূর দূর অঞ্চলেও বালিকা ও বয়স্কা নারীদের শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরূপতা ক্রমশঃ বিদূরিত হইতেছিল। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই সার্থক ও সুদূরপ্রসারী আয়োজনে ভাটা পড়িয়া গেল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব-রূপ আর রহিল না। ইহা তখন একটি সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ে মাত্র পরিণত হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পার হইয়া এই অভিনব বিদ্যালয়টি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন নামে একটি সাধারণমাত্র কলেজে বর্ত্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বেথুন স্কুল ও ইহার কলেজবিভাগে শিক্ষারীতিই সাধারণতঃ অনুকৃত হইতে থাকে। ফ্রি চার্চ্চ প্রবর্ত্তিত নর্ম্মাল স্কুল নামে খ্রীষ্টান মহিলাদের একটি বিদ্যালয় ছিল, এখানেও কলেজবিভাগ খোলা হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই একই রীতি। ক্রমশঃ ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও কলেজী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ করেন। আবার ইঁহাদের কেহ কেহ ছাত্রাবস্থাতেই সাধারণ সামাজিক কার্য্যেও যোগ দিলেন। কাদম্বিনী বসু কলেজে অধ্যয়ন কালে বঙ্গ-মহিলাসমাজের সম্পাদিকার কার্য্যও করেন। একটি ধারণা লোকের মনে বলবৎ দেখা যায় যে, যেহেতু ইংরেজরা উন্নত জাতি সেহেতু তাহারা প্রত্যেকটি বিষয়েই প্রগতিশীল। নারীদের উচ্চশিক্ষালাভে এবং রাষ্ট্রে অধিকার দানে তাহারা সাধারণ ভাবে এ সময় খুবই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এ দেশের নেতৃস্থানীয়েরা কি রক্ষণশীল কি প্রগতিবাদী স্ত্রী-শিক্ষার যে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন তাহা আগেই আমরা দেখিয়াছি। আনন্দমোহন বসু, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় বিদগ্ধজনেরা নারীদের উচ্চশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষকেও ইহার সপক্ষে আনয়ন করিতে সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজে তখন ইংরেজ চিকিৎসাবিদ্ অধ্যাপকদের প্রাধান্য; তাঁহারা কিছুতেই নারীদের চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে দিবেন না। অবলা দাস (লেডী বসু)-কে ডাক্তারী পড়িতে মাদ্রাজে যাইতে হইল। পর বৎসর কাদম্বিনী বসু বি-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশার্থিনী হইলেন। কলেজ কৌন্সিল নারাজ। বাহিরে আন্দোলন হইতে লাগিল। বঙ্গের ছোটলাট সার অগষ্টাস রিভার্স টমসন এক দীর্ঘ হেতুবাদ সম্বলিত বিধানপত্র জারি করিয়া নিজ ক্ষমতা বলে নারীদের নিকট কলিকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে মহিলারা ক্রমে ক্রমে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

পনের আগষ্ট

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

শহরের বড় রাস্তাটার একটা শাখা অপরিসর হয়ে বাঁয়ে চলে গেছে, তারই দুই কিনারে ছোট ছোট এক একটা ঘরে গরীব লোকদের বসতি। খাপড়ার ছাউনি, মাটির দেয়াল, কোন কুঁড়েঘরের সামনে ছোট একফালি বারান্দা, কোনটাতে তাও নেই, ঘরের দুয়ার থেকে নামলেই রাস্তা।

এমনি একটা কুঁড়েতে সুভাগা বসে রান্না করছিল। ঘরের দেয়ালের চারদিক ছেলে মোহন শূন্য রাখে নি। ক্যালেণ্ডারের ছবি আর দেব-দেবীর ছবিতে ভরে রেখেছে। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ বোস আর পণ্ডিত নেহেরুর ছবিও বাদ যায় নি। ঘরের একধারে একটা ছোট দড়ির খাটিয়ায় জীর্ণ মলিন শয্যা ভাঁজ-করা আছে। একপাশের দেয়ালে একটা বাঁশ লটকানো, তাতে দু'চারখানা কাপড়-চোপড় রাখা, রান্নার জায়গায় কয়েকটি পিতল আর এলুমিনিয়ামের পাত্র, ঘরে দৃষ্টি বুলালেই দৈন্যদশা নজরে পড়ে।

হঠাৎ দূর হতে জনতার কলরব ভেসে আসতে লাগল, সুভাগা কান খাড়া করে শুনতে লাগল, জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়, জয় ভারত-মাতার জয়। কলকোলাহল ক্রমশঃ এগিয়ে এল। সুভাগা তাড়াতাড়ি রান্নার কড়াইটি উনান থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে, ঘর থেকে নেমে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

শোভাযাত্রা চলেছে, আজ পনের আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস। সাদাসার্ট আর খাকী হাফপ্যান্ট পরে ছেলের দলেরা নিশান হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে। একে একে প্রাইমারী স্কুলের, হাইস্কুলের বালকরা এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকারা আনন্দে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে চলেছে, কলেজের তরুণীরাও এতে যোগ দিয়েছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে মেঘলা আবহাওয়া, তাতে কারও দৃকপাত নেই। বালক-বালিকাদের কচিমুখ খুশীর আলোয় ঝলমল করছে, কলেজের ছেলের দল ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজাচ্ছে। সুভাগা তন্ময় হয়ে স্বাধীনতা দিবসে নবীনের জয়যাত্রা দেখছিল। হঠাৎ দর্শকরা অবাক হয়ে দেখতে পেল সুদীর্ঘ মিছিলের সর্বশেষে কলেজের সুসজ্জিতা দুটি তরুণী ঘোড়ায় চড়ে আসছে। তরুণী দুটির বয়স সতের-আঠারো হবে। তারা পরেছে সোনালী সার্টিনের সালোয়ার পাঞ্জাবী, সাদা পাতলা ওড়না বুকে জড়িয়ে কোমরে এনে বেঁধেছে, পিঠে একরাশ খোলা চুল লালরিবণে আটকানো। কোমলমুখে তাদের দীপ্তভাব, চোখের দৃষ্টি আনন্দে উত্তেজনায় উজ্জ্বল। স্বাধীনতার গৌরব ফুটে উঠেছে তাদের চোখে-মুখে। তরুণী দুটির তেজী কালো ঘোড়া সুভাগার পাশ দিয়ে কন্ধার দিকে যেতেই হঠাৎ যেন তার সর্বশরীরে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সুভাগার মন চলে গেল বিস্মৃতপ্রায় সুদূর অতীতে—বিগত-যৌবনা, হৃতশ্রী, রুক্ষকায়া, মলিনবসনা সুভাগা হঠাৎ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণীতে রূপান্তরিতা হয়ে গেল। কানে ভাসল—

"সুভাগা, আর একটু জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, ওরা আমাদের পিছু নিলে আর রক্ষা নেই। আর পাঁচ-ছ' ক্রোশ গেলেই অবন্তী গাঁ এসে পড়বে, তখন আমরা নিরাপদ।"

দুটো ঘোড়া পাশাপাশি ছুটেছে তীব্রবেগে। কানে শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ ভেসে আসছে, খটাখট খটাখট।

*　　*　　*

সে বহুদিন আগেকার কাহিনী, রাজপুত ঠাকুর সিং মস্তবড় জায়গীরদার। তাঁর তিনমহলা বাড়ী, লোকজন গিসগিস করছে, দুয়ারে হাতী বাঁধা। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁকে পুত্রধনে বঞ্চিত করলেন। অবশেষে বৃদ্ধবয়সে অপুত্রক অসুখী ঠাকুর সিং-এর এক কন্যার জন্ম হ'ল। সেই কন্যা সুভাগা বাপের নয়নের মণি। ঠাকুর সিং পুত্রবৎ কন্যাকে নিয়ে বাইরে চলাফেরা করতে লাগলেন। সুভাগা যখন আট বছরের হ'ল তখন থেকে তাকে ঘোড়ায়-চড়া, তীরধনু চালানো এ-সব শেখাতে লাগলেন। সুভাগার সমবয়সীদের সঙ্গে বসে বসে পুতুল খেলতে ভাল লাগত না, তার ভাল লাগত কৃত্রিম লড়াই করতে, ঘোড়ায় চড়তে, ডানপিটেগিরি করতে।

রাজপুত অন্দরমহল, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। অসূর্য্যম্পশ্যা নারীরা একহাত অবগুণ্ঠনে মুখকমল ঢেকে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে আনাগোনা করে। সুভাগার মা চাইলেন কন্যাকে বন্দিনী করতে সে মহলে। কিন্তু চঞ্চল সুভাগা ছুটে পালাত পিতার কাছে। সুভাগার মা মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে অনুযোগ করতেন। ঠাকুর সিং পরমস্নেহে বলতেন, "ওই ত একটা মেয়ে, এখনও অবুঝ, ওর মনে কষ্ট দিয়ে কি লাভ ?"

সুভাগার মা বলতেন, "এই ত মেয়ে বারোতে পা দেবে, তার বিয়ে দিতে হবে না ভাল ঘরে ? এমন দস্যিপনা করলে কে ঘরের বউ করে নেবে ?"

ঠাকুর সিং প্রত্যুত্তরে বলতেন, "আমার মেয়ে আসল রাজপুতানী, সে যখন ঘোড়া ছুটিয়ে চলে তখন মনে হয় :আমি সে যুগে ফিরে গেছি। দশ গজ ঘাঘরা-ওড়নার অবগুণ্ঠনে তোমরা ত নকল রাজপুতানী।"

সুভাগার মা হেসে পরাজয় স্বীকার করতেন স্বামীর কাছে।

রূপলাবণ্য, তেজস্বিতায় তাঁরও বুক ভরে উঠত আনন্দ আর গৌরবে।

* * *

সেদিন যথাসময়ে সুভাগা ঘোড়া ছুটাবার জন্য তৈরী হয়ে এসে অবাক হয়ে গেল, দেখতে পেল তার ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতশ্মশ্রু মাধব সিং-এর পরিবর্তে এক যুবক। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সরু এক জোড়া কালো গোঁফ আর চোখের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, মুখে বীরত্বব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। যুবকের বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়। সুভাগার বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে যুবকের মুগ্ধ-দৃষ্টি মিলিত হ'ল।

ঠাকুর সিং আসতেই যুবক নত হয়ে প্রণাম জানাল। ঠাকুর সিং বললেন, সুভাগা, মাধব সিং কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়েছে, তার ছেলে বীরভানু আজ থেকে আমাদের ঘোড়ার "চাবুক সওয়ার" হ'ল।

বীরভানু সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার ও তীর-খেলোয়াড়, সে সুভাগাকে এ দুটি বিদ্যা অতি যত্নের সঙ্গে শেখাতে লাগল। বীরভানুর ঘোড়া-দৌড়াবার বহু কায়দা-কানুন পিতা-কন্যা প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেন।

আজকাল রোজই প্রভাতে ঠাকুর সিং আর সুভাগা ঘোড়া ছুটিয়ে বনের পথে কয়েক মাইল ঘুরে আসেন। বীরভানু তাদের দেহরক্ষী। একপাশে ঠাকুর সিং মধ্যভাগে সুভাগা আর পাশে বীরভানু। তিন ঘোড়া একভাবে ছুটে। মাঝে মাঝে সুভাগার ঘোড়া এগিয়ে ছুটে যায়। ঠাকুর সিং আর বীরভানু সচকিত হয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে সুভাগার সাথী হন। বীরভানুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সুভাগার ঘর্মাক্ত আর সুন্দর মুখখানা প্রশংসমান নেত্রে দেখে।

শীতের হাওয়ায় শরীর সতেজ হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ ঠাকুর সিং কিশোরী কন্যার সঙ্গে কিশোর বনে গেলেন। কন্যার আগ্রহে তাদের অশ্বারোহণে ভ্রমণ দীর্ঘতর হয়ে উঠল। কখনও পিতা-কন্যার, কখনও বা সুভাগা-বীরভানুতে ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলে, অবশ্য সব সময়ই বীরভানু হেরে যায়। একি ঘোড়-দৌড়ের অক্ষমতায় না প্রভু-কন্যার প্রতি সৌজন্যে?

সুখের সংসারে আগুন লাগল, হঠাৎ সুভাগার মা মারা গেলেন সামান্য অসুখে। বৃদ্ধবয়সে সে ধাক্কা সামলানো ঠাকুর সিং-এর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলেন। সুভাগা অন্দরমহলবাসিনী হ'ল। বৃদ্ধ, কিশোরী এবং উৎসাহী অনুচর মিলে ঘোড়-দৌড়ের যে একটা আমোদ জমত তা ভেঙে গেল। এখন আর বীরভানুর দরকার পড়ে না ঘোড়ায় চড়ার সাহচর্য্য করবার জন্য।

সুখ-দুঃখের মধ্যে দিন কেটে যেতে লাগল। পর্দানশীনা সুভাগা মায়ের স্থান দখল করে গৃহকার্য্য পরিচালনায় ডুবে গেল। বৃদ্ধ পিতা দিনরাত তার বিয়ের জন্য চিন্তিত, মাতৃহীনা কন্যা করে আবার পিতৃহীনা হয়ে যায় সে চিন্তায় তাঁর চোখে ঘুম নেই। বিয়ের বহু আলাপ আসে কিন্তু পছন্দ হয়ে উঠে না। ঠাকুর সিং পদস্থ লোক, সুখের ক্রোড়ে লালিত তাঁর কন্যাকেও উনি সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধি দিয়ে আশৈশব ঘিরে রেখেছেন। তাই ধনী ও পদস্থ লোক ছাড়া কন্যার বর করতে চান না। এভাবে তাঁদের সমাজ-অনুযায়ী সুভাগার বিয়ের বয়স অতিক্রম হয়ে গেল। অবশেষে বহু চেষ্টায় এক সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে আলাপ এল। আলাপ জমে উঠল, ঘটকের আনাগোনা চলল।

সেদিন দূর-সম্পর্কের ভাই-বৌ বললেন, "কি গো সুভাগাদেবী, এবার ত আর তোমার পাত্তাই পাওয়া যাবে না, সোহানপুরের সামন্ত-বাড়ীর বধূ হয়ে তুমি যাচ্ছ, আর কি আমাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকবে?"

সুভাগা "ধ্যেৎ বলে চলে গেল।" কিন্তু রাত্রে খাবার সময় নারী-মজলিশে বর সম্বন্ধে যে আলোচনা শুনল তাতে তার শরীর হিম হয়ে গেল। সুভাগা এখন একেবারে কিশোরী নয়, ষোলতে পা দিয়েছে, সবই বুঝতে পারে।

বুড়ী ঠানদি বললেন, "আমাদের সুভাগার অদৃষ্ট ভাল, সোহান-পুরের সামন্ত-বাড়ীর বউ হয়ে যাচ্ছে, এমন বড় বংশে আমাদের ঘরের মেয়ে দেওয়া কঠিন ছিল। জানিস সুভাগা, শুধু তোর রূপের জোরেই তুই ওই সামন্ত-বাড়ীর বউ হতে পারবি।

রাঁধুনী মাসী বললে, "তা বরের নাকি একটু বেশী বয়েস আর দোজবরে?"

ঠানদি বললেন, "তাতে কি? ওর ত ধনদৌলতের অভাব নেই, আমাদের মত দশটা জমিদারী ও কিনতে পারে। আমাদের সুভাগা রাণী হবে। পুরুষ মানুষের এই একটু বয়েসে কিছু আসে যায় না। জামাই আমাদের আট বেহারার কাঁধে পাল্কীতে করে চলাফিরা করেন, রূপোর থালায় খান, হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শোন, দশটা বড় ঘরের সঙ্গে সাদি-সম্বন্ধ, এমন ঘর-বর পাওয়া কি সোজা ভাগ্য? হলেই বা দোজবরে।"

সুভাগা বীরত্বের পূজারিণী, ভাবী বরের বর্ণনা শুনে তার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। পরদিন বউদিকে বললে, "বউদি, কার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ের ঠিক করেছ? সে নাকি পাল্কীতে চড়ে চলে, সে কিরকম রাজপুত?—"

বউদি বললে, "পাল্কী চড়ায় দোষ কি? রাজপুত হলেই বুঝি ঘোড়ায় চড়তে হবে?"

—"ঘোড়ায় না চড়ুক, মানুষের ঘাড়ে চড়বে কেন? সে কি রকম পুরুষ? তার জন্য একটা শাড়ী আর এক জোড়া চুড়ি ভেট পাঠিয়ে দিও।"

—"সুভাগা সে দিন-কাল চলে গেছে, আজকাল পদমর্য্যাদা আর বীরত্বের মাপকাঠি হ'ল ধন ঐশ্বর্য্য।"

—"তা হোক গো, আমি অমন একটা মেয়েলী স্বভাবের বুড়ো বড়লোকের ঘরণী হতে চাইনে।"

পরদিন নারী-মহলে রাষ্ট্র হয়ে গেল, সোহানপুরের আলাপে সুভাগার আপত্তি। বউ-ঝিরা কানাকানি করে মৃদু হাসতে লাগল। বড়ীরা গালে হাত দিয়ে বললে, "একি কাণ্ড, মেয়ের কি সাহস!

বাপ বিয়ে ঠিক করেছে, মেয়ে বলছে করবে না।" ঠানদি সুভাগাকে শাসিয়ে গেলেন, এসব অলক্ষুণে কথা যেন আর না শুনেন। সব ঠিক হয়ে গেছে, আর পনের দিন পরই পাকাকথা ও আশীর্বাদ।

সোহানপুরের আলাপে জ্ঞাতিরা খুব উৎসাহিত হয়ে রোজই বৈঠকখানায় এসে বসে আসর জমায়। ঠাকুর সিং-কে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করেন। ঘটকের মুখে-শোনা বরের ঐশ্বর্য্যের নানা কাহিনী আলোচনা করে। কন্যার অমতের কথা শুনে ঠাকুর সিং-এর মন কিঞ্চিৎ দোদুল্যমান হয়েছিল। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধুদের আগ্রহের আতিশয্যে তাঁর মনের সব দ্বিধা দূর হয়ে গেল। তাঁর মেয়ে এমন ঘরে পড়লে রাজরাণী তুল্য সুখ-সম্মানে থাকবে।

ঠাকুর সিং একদিন সুভাগাকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন। বরের ঐশ্বর্য্যের গৌরবে কন্যার মন কিছুমাত্র মুগ্ধ হ'ল না। সুভাগা নীরবে পিতার কথা শুনে গেল, কোন প্রতিবাদ করল না, বুঝতে পারল, তার বিয়ে একেবারে ঠিক, নড়চড় হবে না কিছুতেই। কিন্তু তার পর থেকেই সুভাগার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, মনে শান্তি নেই। আশীর্বাদের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হতে লাগল ততই তার চাঞ্চল্য বেড়ে চলল।

তার ভাবী বরের বর্ণনা শুনে তার মনে হতে লাগল, বরটি একটি জড়ভরত বিশেষ, যতই তার অর্থ থাক না কেন, এই জড়ভরতকে সে বিয়ে করবে না, কিন্তু কি করে এই বিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে তা ও ভেবে পায় না, এমন কি কেউ নেই যে, তাকে সাহায্য করতে পারে ?

আশীর্বাদের আর তিন দিন বাকী, সেদিন পিতার কক্ষে ঢুকে সুভাগা দেখতে পেল, জমিতে বসে বসে বীরভানু তার পিতার অশ্বারোহণের পোষাক, সাজ সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছে, বীরভানু সুভাগাকে দেখে চমকে উঠে নিশ্চপে দাঁড়িয়ে রইল, হঠাৎ সুভাগার মাথায় একটা কল্পনা খেলে গেল, সে স্থিরদৃষ্টিতে বীরভানুর চোখে চোখে চেয়ে বলল, "বীরভানু একটা বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে ?"

বীরভানু নম্রভাবে বললে, "কি ?"

—"আমি বড় বিপদে পড়েছি বীরভানু, বাবা আমাকে একটা জড়ভরতের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান, সে পাল্কীতে বসে চলাফেরা করে, তার ধনঐশ্বর্য্য প্রচুর, তাই বাবা তাকে পছন্দ করেছেন, কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না।"

বীরভানু বললে, "তা বাবাকে কি বল নি ?"

—"বাবা আমার মত জানেন, কোন ফল হয় নি, আর হবেও না। আর দুদিন পরে আশীর্বাদ।"

—"তুমি কি করতে চাও সুভাগাদেবী ?"

—"আমি শক্রপুরী থেকে বের হয়ে যেতে চাই, তুমি আমাকে একটা ঘোড়া এনে দিতে পারবে ?"

"ঘোড়া ?"

—"হাঁ, হাঁ, ঘোড়া, অসহিষ্ণু ভাবে সুভাগা বললে।"

—"ঘোড়া নিয়ে কোথায় যাবে ?"

—"কোথায় ? তাই তো ? আচ্ছা বীরভানু, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? আমরা দুজনে দুটো ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাব এই গ্রাম ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, দূর থেকে দূরে, বহু দূরে, যেখানে কেউ আমার সন্ধান পাবে না, আমাকে ধরে এনে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবে না।"

—"তোমার সঙ্গে পালাব ? প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ?"

—"হাঁ।" হঠাৎ বীরভানুর চোখে চোখে চেয়ে সুভাগা বললে, "বীরভানু তুমি আমার পিতার অনুচর, এ কথা ভুলে গিয়ে ভাবতে পার না যে তুমি রাজপুত, রাজপুতানীর মান রক্ষা করতে যাচ্ছ ?"

বীরভানুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুহূর্ত্তের তরে ভুলে গেল সে ওবাড়ীর অনুচর মাত্র, সে সুভাগার উজ্জ্বল দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে মুহূর্ত্তকাল চুপ করে রইল, তার পর আস্তে আস্তে দৃঢ়ভাবে বললে, "এ ভাবে পালিয়ে গিয়ে মান রক্ষা হয় না, তবে এ ভাবে চলে যাওয়া সম্ভবপর হতে পারে যদি তুমি আমাকে বিয়ে কর, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে ? আমি ভৃত্য, তুমি প্রভু, আমি গরীব তুমি ধনী, আমি—"

সুভাগা তার কথা কেটে বলল, "তুমি সত্যিকার রাজপুত আর আমি সত্যিকার রাজপুতানী। তুমি আমায় বিয়ে করবে বীরভানু, তোমার সে সাহস আছে ?"

দুজনে দুজনার দিকে চাইল, দুজনার চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কয়েক মুহূর্ত দুজনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর বীরভানু বললে, "বামন হয়ে চাঁদ ধরবার সাহস কেমন করে হবে সুভাগাদেবী ? তোমার মত ধনী কন্যাকে সুখী করবার মত আমার কি শক্তি আছে ?"

—"খুব আছে, তুমি যদি ধনী কন্যাকে নয়, এক রাজপুতানীকে সুখী করতে না পার তবে সুখী করবে কে ?

—"তোমার জন্তে আমি অসাধ্য সাধন করতে প্রস্তুত আছি দেবী।"

বীরভানু সুভাগার কোমল হাত দুখানি নিজের সবল দৃঢ়মুষ্টির ভিতর নিয়ে বললে, কিন্তু সুভাগা, তুমি কি ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এই গরীবের ঘরণী হতে পারবে ?

সুভাগা ব্যাকুল ভাবে বীরভানুর হাত জড়িয়ে মুগ্ধ বিহ্বল ভাবে বললে 'নিশ্চয়।"

তিনদিন পর ঠাকুর সিং-এর তিনমহলা পুরী সুষুপ্ত-সুভাগা ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদে খিড়কীর দুয়ারের পাশে দাঁড়াল, ভয়ে উত্তেজনায় তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, পলকের মধ্যে বহু ভাবনায় তার মন ভরে উঠল, খানিকক্ষণ নিস্পন্দ থেকে সে ধীরে ধীরে দরজায় হুড়কা খুলে বেরিয়ে পড়ল। পাশে অশ্বত্থ গাছের নীচে দণ্ডায়মান বীরভানুর দিকে এগিয়ে গেল, বীরভানু সাদরে

তার হাত ধরে কাছে টেনে নিল। চিরদিনের মত সুভাগা পিতৃগৃহ ছেড়ে চলল সুদূরে হাত ধরে। গ্রামের কিছু দূরে গোপনে দুটা ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছিল বীরভানু। দুজনে হাত ধরাধরি করে নিঃশব্দে চলল সেখানে, বৃদ্ধ অশ্বত্থ আর আকাশের চন্দ্রমা শুধু সাক্ষী হয়ে রইল এই গোপন অভিসারের।

দুজনে দুটা ঘোড়ায় উঠে বসে পড়ল, ঘোড়া ছুটাল অবন্তী গ্রামের পথে রাতারাতি দু'তিখানা গ্রাম পার হতে হবে, নইলে ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে। ঘোড়া ছুটে চলেছে তীব্রবেগে, কানে শুধু ভাসছে খুরের আওয়াজ খটাখট খটাখট।

সে পঁচিশ বছর আগেকার স্মৃতি, সুভাগার হৃদয়পটে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। গভীর রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দুটি ঘোড়া ছুটে চলেছে তীব্রবেগে, আরোহী দুটির মনে এক তীব্র অনুভূতি। গ্রামের পর গ্রাম তারা পেছনে ফেলে ছুটেছে। ধীরে ধীরে অমানিশা ভেদ করে ভোরের সূর্য্য তার রাঙা কিরণ ছড়িয়ে দিল চারদিকে, তারি আভায় মাঝে মাঝে দু'চারজন গ্রামবাসী দেখতে পাচ্ছে একটি সুন্দরী আর একটি যুবক পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

—ভোরের মিঠে বাতাস এসে ক্লান্ত আরোহীদের চোখে-মুখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে গেল, সুভাগার যেন ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, সুভাগা ঘোড়ার গতিবেগ কমিয়ে দিল। বীরভানু সুভাগার ক্লান্ত আরক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

বীরভানু মিষ্টি গলায় ডাকলে, "সুভাগা, খুব ক্লান্ত হয়ে গেছ, তোমার কষ্ট হচ্ছে ?"

—"মোটেই না, আমি ত এই চাই বীরভানু। যেদিন প্রথম তোমার ঘোড়া দৌড়াবার নানা রকম কসরৎ আমায় দেখিয়েছিলে, সেদিন আমার এত ভাল লেগেছিল, মনে হয়েছিল, আমি যদি রোজ তোমার সঙ্গে এমনি ভাবে দূর দূর, বহুদূর ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে পারি কি ভাল লাগবে! আজ সে কল্পনা বাস্তব হ'ল।"

বীরভানু সুভাগার মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর ধীরে ধীরে বলল, প্রথম যে দিন তোমার ঘোড়ায় চড়া মূর্ত্তি দেখি তখন কি মনে হয়েছিল তা আর বলব না, তবে একদিন দেবী ভবানীর পায়ে নারকেল দিয়ে যে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, তা আজ পূর্ণ হ'ল, দুজনে দুজনের দিকে মুগ্ধ নয়নে চাইল, আশায় আনন্দে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তারা ঘোড়ায় চড়ে অবন্তী গ্রাম পার হয়ে নিরাপদ স্থানে এল, তার পর সেখান থেকে রেলে বসে বোম্বে পৌঁছে মহানগরীর জনতার মধ্যে মিশে গেল। ঠাকুর সিং-এর অনুচরেরা সুভাগার খোঁজ পেল না। জন্মের মত সুভাগার নাম মুছে গেল পিতৃগৃহ থেকে।

সুভাগা ও বীরভানু একটা হিন্দু হোটেলে উঠল,এবং সেখানকার ম্যানেজারের সাহায্যে বৈদিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। সুভাগা সঙ্গে বেশ কিছু অর্থ এনেছিল, তাই দিয়ে তারা কয়েক মাস বেশ আনন্দে কাটাল, মাঝে মাঝে তারা জুহুর উপকূলে ঘোড়াভাড়া করে বেড়িয়ে আসত। ধীরে ধীরে রসদ ফুরিয়ে আসতে লাগল। বোম্বে মহানগরীতে বীরভানু সুবিধে করে উঠতে পারল না, এ ব্যবসা সে ব্যবসা করে অবশেষে একটা ছোট হোটেল দিল, বীরভানু হাট বাজার করে, সুভাগা হোটেল পরিচালনা করে। কিছুদিন পর শিশু মোহন এসে তাদের ঘর আলো করে তুলল, শিশুপুত্রকে অবলম্বন করে তাদের প্রেম আরও গভীর হয়ে উঠল। শিশু মোহন কর্ম্মক্লান্ত দম্পতীকে ভবিষ্যতের একটা রঙীন মধুর আশায় উৎফুল্ল করে তুলত।

কিন্তু হোটেলে আশানুরূপ আয় হতে লাগল না, এবার তাদের কঠিন জীবনসংগ্রাম সুরু হ'ল, বীরভানু হঠাৎ অসুস্থ হ'ল, উপযুক্ত চিকিৎসা নেই, দেখতে দেখতে তার শরীর ভেঙে পড়ল, ভগ্নস্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার মনের আশা-ভরসা আনন্দ সব লোপ পেয়ে গেল, দিনরাত তার মনে শুধু এক ভাবনা জেগে রইল, সে না থাকলে ধনীর দুলালী তার আদরিণী সুভাগার কি উপায় হবে।

সুভাগা ভেঙে পড়লেও মনে অসীম সাহস রেখে বীরভানুকে আশ্বাস দিত, কিছু ভাবনা কর না, রাজপুতানী কিছুতেই ভয় পায় না, তুমি শিগ্‌গির সেরে উঠ, মোহনকে নিয়ে আমাদের সোনার সংসার গড়ব।"

কিন্তু তা আর হ'ল না, নিষ্ঠুর কাল এসে একদিন অসময়ে বীরভানুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, রাজপুতানীর গভীর প্রেম আর সাহস বাধা দিতে পারল না।

সুভাগা গভীর শোক চেপে শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে হোটেল চালাতে লাগল, কিন্তু পারল না, হোটেল ফেল হ'ল। উপায়ান্তর না দেখে সুভাগা লোকের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ ধরল এবং অবশেষে এক পরিবারকে আশ্রয় করে এক ছোট শহরে এসে আস্তানা গাড়ল।

এক একবার সুভাগার বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিজের পিতৃগৃহের কথা মনে হয়েছে। সেখানকার বিশালগৃহ দাস, দাসী, বৈভব সবই স্বপ্নের মত মনে হয়। সে পরম স্নেহময় পিতার বুক ভেঙে দিয়েছে নিষ্ঠুর আঘাতে, বড় বংশে কলঙ্ক লেপন করেছে পালিয়ে গিয়ে। বালিকা-সুলভ উত্তেজনায় বিবেচনার অভাবে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে নি। এই জীবনের কি পরিণাম কল্পনা করে নি, তার পিতৃগৃহের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছে নিজ হাতে।

আজ কঠোর দারিদ্র্যের আঘাতে সুভাগা ক্লিষ্ট, তবু সমস্ত দুঃখ কষ্টের ভিতর সে একটা বড় আশা পোষণ করে এসেছে যে, একমাত্র পুত্রকে ভাল করে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবে, সে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, তার মধ্যে রাজপুত বংশের হারান গৌরব আবার ফিরে আসবে।

মোহন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে এখন মিডিল ইংলিস স্কুলে পড়ে।

শোভাযাত্রা চলেছে, ছেলেরা সজোরে গান গাইছে, সুভাগার সম্বিৎ ফিরে এল, সে ছেলেদের দিকে চেয়ে রইল, হঠাৎ দেখল তার মোহনও ওই দলে, তার মুখ খুসীতে উজ্জ্বল দেখে সুভাগার খুব ভাল লাগল।

সহসা সুভাগার চোখের সামনে এক রঙীন স্বপ্ন জাগল, স্বাধীনতার গান তার ধমনীর রাজপুত রক্ত নাচিয়ে তুলেছে। তার মনে হ'ল, মোহন কোন সাধারণ লোক হবে না, সে দেশের সেনাদলে ভর্ত্তি হবে, ভবিষ্যতে সেনাপতি হয়ে রাজপুত জাতের মুখ উজ্জ্বল করবে, তার বীরত্বে দেশ ধন্য হবে। ক্ষণকালের জন্য সুভাগার দুঃখক্লিষ্ট মুখ আনন্দে উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ষ্টীমার ঘাট

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

তখন নেমেছে বুঝি ধূসর আঁধার।
পৃথিবীর তৃণ, গাছ, মাটি, ঘাস, পাখি
উদার ললাটে স্পর্শ মেখে নেয় তার।
দূরে দূরে দেখা যায় নৌকা, ডিঙি,
ধোঁয়া ধোঁয়া অনেক ষ্টীমার,
ছোট ছোট পান্সী জেলেদের
আশেপাশে ঢের
হয়ত পাখির মত ছোঁ-উঁচিয়ে জাল ফাঁদে বৃহৎ মাছের।
সোঁদাগন্ধ নদীর মাটির
ঘ্রাণ আনে দূরাগত হাওয়াময় ঝড়,
হাওয়ায় হাওয়ায় যেন শীতল শরীর,
ঢেউ ভাঙে—কাঁপে নদীতীর।

কত লোক যায়-আসে, আসে আর যায়
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি—এক ঝাঁক পাখি
যেন আবছা সন্ধ্যায়;—
কত না ষ্টীমার
ফুঁ দিয়ে আবার
চলে যায়—রেখে যায় মনের কাগজে যেন
একটি বেদনাঘন দাগ,
অনেক সবজ অনুরাগ।

কত মুখ ভেসে ওঠে, কত চেনা চেনা
লাখো জনতার ভিড়ে—সাগরের ফেনা :
রঙিন স্বপন যেন আবার মিলিয়ে যায়
জনতার ঢেউয়ের সাগরে,
তাদের কারেও তবু ঠিক মনে পড়ে?
মনে পড়ে, কারো মুখ সবচেয়ে স্মৃতির নিকষে ঝলমলে?
জানো ত শতেক তারা ম্লান করে এক চাঁদ
অনেক প্রোজ্জ্বল হয়ে জ্বলে।
তাদের কারেও শেষ কোনদিন দেখেছো কি
জনতার ভিড় ঠেলে ঠেলে
ভালবেসে একটি প্রদীপ গেছে জ্বেলে?

চেনা ও অচেনা কত মুখ
স্মৃতির কুয়াশা ঠেলে খুঁজে খুঁজে ফিরি,
খুঁজে ফিরি মনের সাগর জলে পরিচিত মুক্তার ঝিনুক,
ভালবেসে কে দিয়েছে একপল সুখ?

সন্ধ্যা আসে, ছেড়ে যায় যাত্রীবাহী আরেক ষ্টীমার,
এক—দুই—তিন—চার কত গেছে, যায় কত আর ;
চেনা মুখ—এখন ধসর অন্ধকার

নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ

শ্রীঅণিমা রায়

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিজের অপূর্ব্ব প্রতিভা, সত্যনিষ্ঠা, সাধনা ও নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা তৎকালীন একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের একছত্র কর্ণধারের আসন অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আততায়ীর হস্তে মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল সেই আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরে মহাত্মা ভারতবাসীকে বহু নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেন, বহু সত্যের আলোক দেশবাসীকে দেখান এবং ভারতবাসীর ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সম্যক পরিপুষ্টির জন্ত কতকগুলি প্রকৃত মূল্য (ভ্যালু) নির্দ্ধারিত করেন। অসহযোগ, অহিংসা ও অন্তায় আইনভঙ্গ প্রভৃতি তাঁহার মৌলিক অস্ত্র দ্বারা একদিকে যেমন তিনি বিদেশী কবল হইতে দেশটিকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অপরদিকে নানাবিধ উপায়ে দরিদ্র দেশবাসীকে নির্ভীক করিয়া তুলিতেছিলেন ও তাঁহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি বারংবার ঘোষণা করেন যে, কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেই ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীন হইবে না ; ভারতবাসীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও লাভ করিতে হইবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতাও নিস্ফল হইয়া যাইবে। ভারতের শতকরা প্রায় আশীজন লোক গ্রামবাসী ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। তাই গ্রামবাসীর উন্নতির জন্ত কৃষিজাত ফসল উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে তিনি বিশেষ নজর দিয়াছিলেন। তিনি বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে শুধু ইংরাজের কবল হইতে বাঁচাইলেই হইবে না, জমিদার, মহাজন, ব্যাধি ও বেকার-সমস্তার হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে। দেশে বেকার-সমস্তা দূরীভূত করিবার জন্ত প্রতি গ্রামে কুটিরশিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা চাই। ফসল বৃদ্ধি করিবার জন্ত উন্নত বীজ ও সার সহযোগে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে খরচ করার প্রয়োজন, মহাজন দূরীভূত করিলে এ সব খরচ কে যোগাইবে ? তার উত্তর মহাত্মা দিয়াছিলেন—'সমবায়িক প্রথায় চাষ করিলে সরকার সমবায়িক সমিতিকে নামমাত্র সুদে টাকা ধার দিতে পারেন।' গ্রামে কাপড়ের অভাব দূরীভূত করিবার জন্ত মহাত্মা চরকা ও খদ্দরের উপর ঝোঁক দিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনার ফলে দেশে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রব (স্লোগান) তুলিয়াছিলেন (এখনও সেই রব শোনা যায়) যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া দরিদ্র কৃষকদের ভূমির মালিকানা দিলেই তাহাদের ও দেশের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে। কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত কৃষকগণ উন্নত উপায়ে চাষ করিবার অর্থ কোথায় পাইবে ? মহাত্মা অথচ স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনিতে হইলে প্রতি গ্রামটিকে স্বাবলম্বী করিতে হইবে ও তজ্জন্য প্রতি গ্রামে সমবায়িক সমিতি গঠন করিতে হইবে এবং সমবায়িক প্রথায় চাষ ও অন্তান্ত জনকল্যাণকর কার্য্য করাইতে হইবে। ১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'হরিজনে' মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সমবায়িক প্রথায় চাষ না করাইলে আমরা কৃষিকার্য্যে ষোল আনা ফল কখনও পাইব না। এ কথা কি যুক্তিসঙ্গত নয় যে কোন গ্রামের সমস্ত জমি যে কোনও উপায়ে একশত টুকরা করিয়া একশো পরিবারকে বণ্টন না করিয়া সেই একশত পরিবারের দ্বারা সমস্ত জমি যৌথ চাষ করাইয়া তাহাদের মধ্যে ফসল বণ্টন করিয়া দেওয়া বহুল পরিমাণে কল্যাণপ্রদ ?" জমির মালিকগণ সমবায়িক ভাবে কৃষিকার্য্য করিবেন এবং মূলধন, যন্ত্রপাতি, বীজ, পশু প্রভৃতি সমবায় সমিতির সম্পত্তি হইবে। আমি জোর গলায় বলিতে পারি যে আমার আদর্শমত সমবায়িক চাষ দেশের চেহারা বদলাইয়া দিবে এবং দেশ হইতে দারিদ্র্য ও আলস্য দূরীভূত করিবে। অবশ্য এই সকল সম্ভব হইবে যদি গ্রামবাসী পরস্পরের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং অনুভব করেন যে,সকলে তাঁহারা একই পরিবারভুক্ত।" ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় মহাত্মার অভিপ্রায় ছিল যে, সমস্ত গ্রামবাসী গ্রামের সমগ্র জমির সমবায়িক মালিক হইবেন ও যৌথ সমবায়িক প্রথায় গ্রামের জমি চাষ করা হইবে। ইহাই ভারতের কংগ্রেসী মহলে সমবায়িক প্রথায় জমি চাষ করাইবার সঙ্কল্পের মূলভিত্তি। অবশ্য বহু বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের মনে এই সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে।

মহাত্মার নেতৃত্বে ভারতবাসী এগার বৎসর পূর্ব্বে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এখনও বহু দূরে রহিয়াছে, সমবায়িক প্রথায় চাষের বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অবশ্য কংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষ ও কংগ্রেসী সরকার এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেসী মহলে, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের এবং বিভিন্ন রাজ্য-সরকারে বহু আলোচনা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে এরূপ বিপ্লবাত্মক কার্য্য হঠাৎ করা যায় না বা করা উচিত নহে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে, ১৯৪৫ সনে কংগ্রেসের

প্ররোচনায় ভারত সরকার একটি সমবায়িক পরিকল্পনা সমিতি গঠন করেন। ১৯৪৮ সনের ইকোনমিক প্রোগ্রাম কমিটি (অর্থনৈতিক কর্মসূচি সমিতি), ১৯৪৯ সনের কৃষিভূমি-সংস্কার সমিতি, ১৯৫৫ সনের কংগ্রেস গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গ্রামশিল্প ও সমবায় সমিতি প্রভৃতি নানাবিধ সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং এই সকল সমিতি এক বাক্যে সমবায় পরিকল্পনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এই ভাবে বহু গবেষণা করিয়া ও বিশেষজ্ঞদিগের মত লইয়া ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কার সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—(১) জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন; (২) জমির মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দেশ; (৩) জমির ন্যায্য খাজনা নির্দ্ধারণ; (৪) খণ্ড খণ্ড ভাবে বিক্ষিপ্ত জমির একত্রীকরণ; (৫) সমবায়িক প্রথায় কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন (৬) মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করার জন্য উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদিগের মধ্যে বণ্টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সকল প্রস্তাব পূর্ণ গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে আজ পর্য্যন্ত মাত্র ১নং এবং ২নং প্রস্তাব কতক পরিমাণে কার্য্যকরী হইয়াছে—যথা ভারতের সব রাজ্যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি রাজ্যে মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে (পশ্চিমবাংলায় ২৫ একর)। ইদানীং কোন কোন স্থানে অতি সামান্য জমিতে সমবায়িক প্রথায় কৃষির ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতের প্রায় সমুদয় আবাদী জমি এখনও বিচ্ছিন্নভাবে কর্ষিত হইতেছে। ফলে, দেশে খাদ্যশস্যের বিশেষ উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নাই। ৪নং এবং ৬নং প্রস্তাবে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

সমবায়িক কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকার জন্য সাধারণ লোকে নানাবিধ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া থাকে। মূলতঃ তিন প্রকারের কৃষিকার্য্যকে সমবায়িক কৃষি বলা যাইতে পারে: (১) সমবায়িক যৌথ চাষ (Co-operative Joint Farming)—এই প্রথায় যদিও সমগ্র জমি একত্রিত করিয়া চাষ করা হয়, কৃষকদিগের জমির মালিকানা বজায় থাকে। ফসল বা লাভ বণ্টন করিবার সময় প্রতি কৃষক পরিবার-প্রদত্ত শ্রম, লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্র, পশু, সার ইত্যাদির সহিত তাহার জমির মূল্যও তাহার প্রাপ্য লভ্যাংশের একটি কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই প্রথায় কৃষক কতকগুলি সর্ত্তে নিজেকে সমবায়িক সংস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারে। (২) সমষ্টিগত সমবায়িক কৃষি-সমিতি (Co-operative Collective Farming Society): এই প্রথায় কৃষকদিগের ভূমি, অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ (পশু, যন্ত্র প্রভৃতি একত্রিত করিয়া চাষ করা হয়। লাভ বা ফসল কিন্তু কেবল কৃষকদের প্রদত্ত শ্রম-অনুসারে বণ্টন করা হয়। ইহা হইতে কেহ এই প্রকার সমবায় সমিতিকে সোভিয়েটদের কোলখোজের একটি সংস্করণ মনে না করেন। সমষ্টিগত সমবায় সমিতির পরিচালনার ভার গণতান্ত্রিক ভাবে সদস্যদের উপর থাকে এবং কৃষকগণ স্বেচ্ছায় সদস্য হইতে পারেন ও পদত্যাগ করিতে পারেন। কোলখোজে এই সকল প্রথা চলে না। (৩) চাষের বিভিন্ন স্তরে সমবায়িক প্রচেষ্টা চলিতে পারে যথা নিড়ান দেওয়া, ফসল কাটা, ফসল ঝাড়া, সার দেওয়া, সেচ দেওয়া প্রভৃতির জন্য সমবায়িক সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। কৃষিকার্য্যে এইরূপ পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য সমবায়কে সারভিস কো-অপারেটিভ বলা হয়। জার্ম্মান সমবায়-বিশারদ শ্রীঅটোশিলার এইরূপ সমবায়কে "সমবায়িক প্রথায় ব্যক্তিগত চাষ" বলিয়াছেন ('Individual Farming on co-operative lines')। কেবলমাত্র একটি বিষয়ের জন্য সমবায় গঠন করিলে তাহাকে একার্থক সমবায়িক সমিতি বলা হয়। গ্রামবাসীর বহুবিধ কল্যাণের জন্য সারভিস কো-অপারেটিভ গঠন করিলে তাহাকে নানার্থক সমবায় সমিতি বা সমাজ বলা যাইতে পারে।

গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমবায় সমিতি গঠন করিবেন গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ইহাই উপরোক্ত ত্রিবিধ-সমবায়ের মূল ভিত্তি। বাধ্যতামূলক আইন প্রণোদন করিয়া বা গ্রামবাসীর উপর জুলুম করিয়া ভারতে সমবায় সমিতি গঠন করা হইবে না—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বারবার ইহাই ঘোষণা করিতেছেন। তিনি আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, মালিকানার নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ সীমার অন্তর্গত জমির মালিকদিগের জমির মালিকানা সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে।

গণতান্ত্রিক ভারতে দেশবাসী কংগ্রেসী দলের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; কাজেই দেশবাসীর অর্থাৎ গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা ব্যাপারে কংগ্রেসী দলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসী দল ও কংগ্রেসী সরকার বহু কালাবধি এই সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা করিতেছিলেন। ফলে কংগ্রেসের বিগত নাগপুর অধিবেশনে ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে: (১) গ্রামগুলির সুব্যবস্থার ভিত্তি হইবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও গ্রাম্য সমবায় সমিতি। কাজেই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সমিতির হস্তে উপযুক্ত ক্ষমতা ও অর্থশক্তি অর্পণ করা হইবে। ভূমির মালিক হউন বা না হউন, গ্রামের সমস্ত অধিবাসী স্ব স্ব গ্রামের সমবায় সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন। উন্নত কৃষি-প্রণালী, পশুপালন, মৎস্যচাষ, কুটীরশিল্প স্থাপন, কৃষকদিগের উৎপন্ন দ্রব্য ও ফসল বিক্রয় এবং সুরক্ষিত গুদামজাত করিবার ব্যবস্থা করা—এক কথায় সর্ব্ববিধ গ্রামোন্নয়ন কার্য্যে লিপ্ত থাকা গ্রাম্য সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েতের কর্ত্তব্য হইবে। উভয়েই একর-প্রতি কৃষি ফসল বৃদ্ধির জন্য কৃষকদিগকে নিবিড়ভাবে কৃষিকার্য্য করিতে উৎসাহদান করিবেন। সমগ্র জমি একত্রিত না করিয়া এইরূপে গঠিত সমবায় সমিতিগুলির নাম সারভিস কো-অপারেটিভ বা "নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ।" (২) জমির উপর কৃষকদিগের স্ব স্ব মালিকানা বজায় রাখিয়া ও সমস্ত জমি একত্রিত

করিয়া সমবায়িকভাবে চাষ করা ভারতে ভবিষ্যৎ কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি হইবে। কৃষকগণ নিজ নিজ জমির অনুপাতে কৃষিলব্ধ ফসলের ভাগ পাইবেন। ইহা ব্যতীত যাঁহারা ঐ সকল যৌথ জমি চাষের জন্য মেহনত করিবেন, তাঁহারা জমির মালিক হউন বা না হউন, নিজেদের মেহনত অনুযায়ী ফসলের অংশ পাইবেন।

দেশবাসীকে সমবায়িক প্রথার কল্যাণ বুঝাইবার জন্য ও তাহাদের মধ্যে সমবায়িক মনোভাব সৃষ্টি করিবার জন্য, একত্রিত ভাবে অর্থাৎ সকলের জমি একত্রিত করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সারা ভারতের গ্রামগুলিতে এখন সারভিস কো-অপারেটিভ বা "নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ" গঠন করিতে হইবে। আগামী তিন বৎসর কাল এই সকল নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীর কল্যাণে ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা আনয়নে লিপ্ত থাকিবে। তিন বৎসর পরে সমস্ত গ্রামে কৃষকদিগের জমির উপর মালিকানাসত্ব বজায় রাখিয়া সমস্ত জমি একত্রিত করিয়া সমবায়িক ভাবে কৃষিকার্য্য সুরু করা হইবে। অবশ্য কোন গ্রামের কৃষকগণ একমত হইলে ও ইচ্ছা করিলে তিন বৎসরের মধ্যেও যৌথ সমবায়িক চাষ করিতে পারিবেন।

৩। ১৯৫৯ সন শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারতের সমস্ত রাজ্যগুলিতে আইন প্রণয়ন করিয়া কৃষক ও রাজ্যসরকারের মধ্যবর্ত্তী সকল ব্যক্তির জমির উপর সর্ব্বপ্রকার দাবী লুপ্ত করিতে হইবে এবং কৃষকদিগের জমির মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। অবশ্য ইহার অর্থ নয় যে কৃষকদিগের "আয়ের" কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাঁহারা নিবিড়ভাবে চাষ করিয়া ও অবসরকালে কুটিরশিল্প বা অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া যথেচ্ছ আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন—তাঁহাদের আয়ের কোন সীমাই থাকিবে না। জমির মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া যে সকল উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা গ্রামের পঞ্চায়েতে অর্শাইবে এবং গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদিগের দ্বারা সমষ্টিগত সমবায়িক সমিতি (কো-অপারেটিভ কলেকটিভ ফারমিং সোসাইটি) গঠন করিয়া চাষ করাইতে হইবে।

[পশ্চিম বাংলার জমির মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা ২৫ একর নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে এবং এই বাবদ প্রায় চার লক্ষ একর উদ্বৃত্ত চাষের জমি সংগৃহীত হইবে। ইহার অধিকাংশ জমি বোধ হয় ভালভাবে চাষের উপযুক্ত নয়। সালানপুরে ইহার কতকটা প্রমাণিত হইয়াছে। ১২২,০০০ একর জমি ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় প্রায় নয় লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার বাস করেন এবং তাঁহারা দারিদ্র্যের চরম সীমায় রহিয়াছেন। কয়েকটি রাজনৈতিক দল পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিম বাংলায় উদ্বৃত্ত জমিগুলি ব্যবস্থা দিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাহা হইলে পশ্চিম বাংলার নিজস্ব এই অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক পরিবারের অবস্থা কি হইবে? তাহাদিগকে কি উদ্বাস্তু হইতে হইবে? পশ্চিম বাংলায় পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন করাইবার পূর্ব্বে এ সকল কথা চিন্তা করা দরকার। —লেখিকা]

৪। কৃষকগণ ফসলের যাহাতে উচিত মূল্য পান তজ্জন্য কৃষিকার্য্য আরম্ভের সময় কোন ফসলের বীজ বপনের প্রারম্ভে সেই ফসলের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে কৃষকের নিকট হইতে রাজ্যসরকার ফসল ক্রয় করিয়া লইবেন।

৫। রাজ্যদপ্তর খাদ্যশস্যের পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

৬। বিভিন্ন রাজ্যের চাষোপযোগী পতিত জমিগুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাতে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই সকল পতিত জমি কাজে লাগাইবার পন্থা স্থির করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করিবেন।

ভূমিসংস্কার দ্বারা ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত উপরি-উক্ত ছয় দফা প্রস্তাবগুলির মধ্যে সমবায়িক প্রথায় কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তনের প্রাথমিক ব্যবস্থা—ভারতের গ্রামে গ্রামে নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ স্থাপন প্রস্তাবটি গত ২৮শে মার্চ ১৯৫৯ সন ভারতীয় লোকসভায় অনুমোদিত হয়। ইহার অর্থ গণতান্ত্রিক ভারতে ভারতবাসী স্ব স্ব প্রতিনিধি মারফৎ ভারতের প্রতি গ্রামে নানার্থক পল্লীসমাজ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। গত ৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে দিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ স্থাপন কার্য্যের উপর যথোচিত গুরুত্বদান সম্বন্ধে সদস্যগণ সকলেই একমত হন। এই সংস্থাগুলির আয়তন, গঠন ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য পরিষদ একটি শাখাসমিতি গঠন করিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিগণ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের অর্থমন্ত্রী এবং উড়িষ্যার উন্নয়নমন্ত্রী এই শাখাসমিতির সদস্য হইয়াছেন।

ভারতে পাঁচ লক্ষ নানার্থক পল্লীসমাজ গঠন করিয়া আগামী তিন বৎসরের মধ্যে কার্য্যকরী করিতে হইবে—এই বিরাট পরিকল্পনা রূপায়িত করিবার জন্য শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রকেই কার্য্যে নামিতে হইবে। কেবল শহরে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিলে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইবে না, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংরক্ষণশীল দারিদ্র্য-নিপীড়িত অর্দ্ধভুক্ত গ্রামবাসীকে সমবায়িক জীবনযাত্রায় সুবিধা বুঝাইতে হইবে। ভারতের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সমাজ সেবক-দলকে ভেদাভেদ ভুলিয়া এ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য করিতে হইবে ও গ্রামবাসী কর্তৃক স্বেচ্ছায় নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ গঠনে সহায়তা করিতে হইবে। ভারতবাসী আজ দারুণ সমস্যার সম্মুখীন। বৎসরের পর বৎসর লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে অথচ জমির উর্ব্বরাশক্তি কমিতেছে। অধিকন্তু বংশবৃদ্ধির সহিত জমি এইরূপ ভাবে টুকরা হইয়া যাইতেছে যে, তাহাতে পারিবারিক চাষ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। সমবায়িক কৃষিকার্য্য ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

ভারতের দুইটি বড় রাজনৈতিক দল—কম্যুনিষ্ট দল ও প্রজা-সোসালিষ্ট দল ভূমিসংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেসের নাগপুরের প্রস্তাবগুলি মোটামুটি ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদের আশঙ্কা প্রস্তাবগুলি হয়ত কার্য্যে পরিণত করা হইবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কংগ্রেস দলের মধ্যে ইহা লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ভারতে যে সমবায়িক যৌথ কৃষিকার্য্যের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা সোভিয়েট বা চীন প্রভৃতি দেশে প্রচলিত কৃষি-প্রণালীর হুবহু নকল (কার্বন কপি)। একথা একেবারেই সত্য নহে। কমিউনিষ্ট দেশগুলির ন্যায় ভারতে কাহাকেও জমির মালিকানা ছাড়িতে হইবে না ও জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও যৌথ সমবায় সমিতিতে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইবে না। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রফেসর রঙ্গ, শ্রীরাজাগোপালাচারী, শ্রী কে, এম, মুন্সী প্রভৃতি কংগ্রেসী মহারথী পণ্ডিতগণও এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করিতেছেন। তাঁহাদের বিবৃতিগুলিতে বা সমালোচনায় পরিকল্পনাটির দোষগুণ সম্বন্ধে একটি কথাও পাওয়া যায় না—শুধু দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের অসাধুতা, অনাচার, পীড়ন ও পক্ষপাতিত্বে গ্রামবাসী কৃতদাসের সামিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই কর্তৃপক্ষ কে? গ্রামবাসীরা নিজেরা। সরকার শুধু গ্রামবাসীদের সমস্যা-সাধনে পরামর্শ দিবেন মাত্র। গ্রামবাসীদের সততা ও কর্ম্মদক্ষতার উপর এতটুকু শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস না থাকিলে ভারতে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়া কি করিয়া সম্ভব হইবে? এরূপ অবিশ্বাসের কোন কারণই নাই। দায়িত্ব স্কন্ধে পড়িলে গ্রামবাসীর মধ্য হইতে উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, ভারতের প্রতিগ্রামে সারভিস কো-অপারেটিভ বা নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ গঠনে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। যাঁহারা যৌথ কৃষিকার্য্য সমবায়ের পক্ষপাতী তাঁহারা নিশ্চয় আপত্তি করিবেন না। কেননা ইহা সমবায়িক কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তনের প্রাথমিক ব্যবস্থা। যাঁহারা যৌথ কৃষিসমবায়ের বিরোধী তাঁহাদেরও নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ স্থাপনে আপত্তি করা উচিত নহে। কেননা আগামী তিন বৎসরে এই সংস্থাগুলি কৃতকার্য্য হইলে, অর্থাৎ একরপ্রতি ফসল বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিলে, বেকার-সমস্যা কতক পরিমাণে প্রতিরোধ করিতে পারিলে এবং সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিতে পারিলে, যৌথ বা সমষ্টিগত কৃষি-সমবায় স্থাপনের আর প্রয়োজন হইবে না। সমবায়িক পরিকল্পনা সমিতি ও কংগ্রেস ভূমিসংস্কার সমিতি উভয়েই বিভিন্নরূপ সমবায়িক প্রথায় পরীক্ষামূলক কৃষিকার্য্য করিয়া ভারতের উপযোগী সমবায়িক কৃষি-কৌশল নির্দ্ধারণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু আমরা কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া শুধু পুঁথিগত বিতর্ক করিয়া গত তিন বৎসরকাল কাটাইয়াছি। এখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেই হইবে—নতুবা বাঁচিবার কোন আশা নাই।

পল্লীগ্রামে কৃষকেরা খাদ্যশস্য, তুলা বা পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের বিনিময়ে গ্রামস্থ দোকান হইতে দৈনন্দিন সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করেন। এইরূপ বিনিময়ে তাঁহাদের সচরাচর অত্যন্ত ঠকিতে হয় কারণ দোকানদার দ্রব্যাদি ওজন না করিয়াই বিনিময় করে। নানার্থক সমবায় সমাজগুলিকে শ্রম বা ফসলের বিনিময়ে কৃষক ও শ্রমিকদিগের সাংসারিক চাহিদা মিটাইতে হইবে। তবে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, গ্রামবাসীর নিকট হইতে কি পরিমাণ শ্রম বা উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যাইতে পারে। তাহার মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া কৃষিকার্য্য বা সংসার চালাইবার মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নানার্থক সমবায়িক পল্লী-সমাজ গ্রামবাসীদিগকে দিতে থাকিবেন। বিশেষ প্রয়োজন (যথা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, মৃত-সংকার, পূজা প্রভৃতি) ব্যতীত ঋণস্বরূপ অর্থ ধার দেওয়া সচরাচর উচিত হইবে না। স্বেচ্ছায় গ্রামবাসীর প্রত্যেকটি গৃহস্থ পরিবার নানার্থক পল্লী-সমাজের সদস্য হইবেন, ইহাই আমাদের আদর্শ; প্রতি সদস্যের নিকট সমাজ ব্যাঙ্কের পাস বই-এর মত খাতা রাখিবেন যাহাতে সদস্যপ্রদত্ত ফসল বা শ্রমের জমার খাতে লিখিত হইবে এবং সমাজ-প্রদত্ত দ্রব্যাদির মূল্য খরচের খাতে লেখা হইবে।

প্রতি নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজে একজন বেতনভোগী পূর্ণকাল শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকিবেন। গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে এইসব অধ্যক্ষ বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে এই কার্য্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে। পাঁচ লক্ষ সমাজের অধ্যক্ষ শিক্ষণের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করা প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ বা সারভিস কো-অপারেটিভের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। এই সকল সমাজ গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। সমাজগুলির মাধ্যমে ভারতীয় গ্রামবাসীর মধ্যে সমবায়িক মনোবৃত্তি আসিবে, গ্রামবাসী একতাবদ্ধ হইবেন এবং প্রকৃত ভারতীয় জাতি গঠিত হইবে।

পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার চাপ অত্যন্ত অধিক, অথচ চাষোপযোগী জমির পরিমাণ নিতান্ত কম। এরূপ পরিস্থিতিতে সমবায়িক প্রথায় কৃষিকার্য্য না করিলে বাঙালীর খাদ্যাভাব কখনও ঘুচিবে না। পশ্চিমবঙ্গের অশেষ সৌভাগ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার। সমবায়িক প্রথার উপর ডাঃ রায়ের উৎসাহ ও বিশ্বাস সর্ব্বজনবিদিত। ইতিমধ্যেই মৎস্যচাষ, তাঁতশিল্প ও অন্যান্য নানাবিধ কুটির-শিল্পে তাঁহার প্রচেষ্টায় অনেকগুলি সমবায়-সমিতি গঠিত হইয়াছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন—তাঁহার চেষ্টায় সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে নানার্থক সমবায়িক পল্লীসমাজ গড়িয়া উঠিয়া বাঙালী গ্রামবাসীর হৃদয়ে পুনরায় আশা আনন্দ ও উৎসাহ আনয়ন করুক।

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৬

জলের কলসী ঘরে রাখিয়া রুকিয়া একবার আঙিনায় আসিয়া রোদটা দেখিয়া নেয়। না, বেলা বেশী হয় নাই, সে গিয়া উনুনে আগুন দেয়। পরসাদ আসিয়া সামনে উবু হইয়া বসে, রুকিয়া বলে, "এই যে বেটা উনুন ধরিয়েছি, আর বেশী দেরী নাই। দে ত ঐ বাটিটা এদিকে এগিয়ে।"

পরসাদ ছোট হাতদুটিতে ধরিয়া ভারী বাটিটা কোন রকমে আগাইয়া দেয়, রুকিয়া তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলে বলে, "এই ত বেটা জোয়ান হয়ে উঠেছে, আর কদিন বাদেই বাপের সঙ্গে কাজ করতে যাবে—তাই না বেটা ?"

পরসাদ মাথা ঝাঁকাইয়া বলে, "হাঁ।"

হাঁড়ির তলায় যেটুকু লপসি পড়িয়াছিল সেটুকু কাঁখিয়া-ঝুঁখিয়া বাটিতে রাখিয়া রুকিয়া হাঁড়িটা উনুনে চাপাইয়া দেয়। আজ তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, রাত্রে কিছুই খায় নাই, তাই উনুনে আঁচ ঠেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি লপসির বাটিটা সামনে লইয়া বসে। হঠাৎ আঙিনার দরজায় ধাক্কা দিয়া কে যেন ডাকে, "পরসাদ, আরে পরসাদ।" এ সময় কে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল, বিরক্ত হইয়া রুকিয়া লপসির বাটিটা ঠেলিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিয়া বলে, "কে—কে গো ?"

"আমি সরযু—দরজাটা খোল।"

রুকিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়।

আঙিনায় ঢুকিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া সরযু বলে, "একটা খারাপ খবর দিতে এলাম পরসাদের মা।"

"খারাপ খবর! কি খবর গো ?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে রুকিয়া।

সরযু বলে, "একটা মোটা শালগাছের গুঁড়ি উল্টে এসে তিলকার বাঁ পায়ের উপর পড়েছে—বড্ড জখম হয়েছে পাখানা।"

রুকিয়ার হৃৎপিণ্ড সজোরে ধক্ করিয়া ওঠে, শুকনো গলায় প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ গো, প্রাণে বেঁচে আছে ত ?"

খানিকটা হাল্‌কা ভাবে সরযু বলে, "কি যে বল—বেঁচে আছে বৈকি! তবে হ্যাঁ, চোট লেগেছে বেশ, চলতে পারছে না, তোমাকে যেতে বলেছে।"

রুকিয়ার বুকের ভিতরটা কাঁপিতে সুরু করে, সরযুর আশ্বাস তাহার মন গ্রহণ করিতে চায় না।

সরযু বলে, "তুমি এগোও, আমি একবার বাড়ীতে ঢুঁ মেরে যাচ্ছি।"

সরযু চলিয়া যায় রুকিয়ার পাদুটি হঠাৎ দুর্বল হইয়া আসে, একটা কিছু ধরিয়া দাঁড়াইতে চায়। কে জানে কি হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ, এক মুহূর্ত দেরী করিতেও তাহার আর সাহস হয় না। ছুটিয়া গিয়া উনুনের উপর হইতে হাঁড়ি নামাইয়া রাখে, ঘরে তাড়াতাড়ি তালা লাগায়। তার পরে ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়ে। রোদ খুব, মাটি তাতিতে সুরু করিয়াছে। ক্ষেতের আল-পথ কোনমতে অতিক্রম করিয়া রুকিয়া মাঠের পথে একরকম ছুটিতে আরম্ভ করে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে নদীতে গিয়া নামে, মুখে চোখে জল দিয়া ও কয়েক আঁজল জল খাইয়া সে আবার চলিতে থাকে। মনের আবেগ ক্লান্ত পাদুখানাকে ঠেলিয়া লইয়া চলে।

কাজের জায়গায় আসিয়া রুকিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, কিন্তু কোথায় তিলকা! কুলিরা এদিকে ওদিকে কাজ করিতেছে, ব্যস্ততার কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না। মুহূর্তের জন্যে রুকিয়ার মন স্বস্তিবোধ করে, তবে ব্যাপারটা কিছু নয়, সরযু একটু রহস্য করিয়াছে। আরও খানিক আগাইয়া যায় রুকিয়া, গাছের আড়ালে ঠিকাদারের ঘরখানা দেখা যায়, সেখানেও কেহ নাই। ছিঃ, এমন রসিকতাও করিতে আছে, বাপরে, কি ভয়টাই পাইয়াছিল সে। একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখিয়া নেয়, বাঁদিকে কাঠের একটা প্রকাণ্ড গাদা, সেইদিক দিয়া ঘুরিয়া সে ফিরিয়া চলে। গাদার কাছাকাছি আসিয়া সে যেন কয়েকটা চেনা গলার আওয়াজ শুনিতে পায়। তাড়াতাড়ি গাদাটাকে পাশ কাটাইয়া ওপাশে উঁকি মারিয়া দেখিতেই তাহার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন থামিয়া যায়। পা চলিতে চায় না, তবু সে আচ্ছন্নভাবে অগ্রসর হয়, সামনে একটা গাছের নীচে দেখে তিলকা পড়িয়া আছে, তাহার আশেপাশে আরও কয়েকজন লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধীরে ধীরে রুকিয়া গিয়া একপাশে দাঁড়ায়, তিলকার পায়ে বাঁধা তাহারই রক্তাক্ত গামছাখানার দিকে চোখদুটি বিস্ফারিত করিয়া

তাকাইয়া থাকে, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। হঠাৎ মনুয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া চাপা গলায় বলে, "এই যে এসেছ পরসাদের মা, ওঃ, দেখতে দেখতে কি কাণ্ডটা হয়ে গেল।"

তবু রুকিয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না। একটু একটু করিয়া ঘাড় ফিরায় তিলকা, মুখটি উঁচু করিয়া তাকায় রুকিয়ার দিকে, চোখদুটি তাহার ব্যথায় কাতর হইয়া ওঠে।

হঠাৎ যেন রুকিয়ার বুকের মধ্যে একটা বাঁধ ভাঙিয়া যায়, রুদ্ধ আবেগ তুফানের বেগে আসিয়া পড়ে, রুকিয়া ছুটিয়া গিয়া তিলকাকে দুহাত দিয়া জড়াইয়া ধরে, কাঁদিয়া বলিয়া ওঠে, "ওগো কি হয়েছে তোর?"

তিলকা চোখ বুঁজিয়া একটা ব্যথাকাতর ধ্বনি করে।

মনুয়া বলে, "কেউ বলতে পারে না কখন কি হয় পরসাদের মা। গুঁড়িটার মোটা দিক ধরেছি আমি আর বৈজু, সরু দিকটা ধরেছে তিলকা, তুলে নিয়ে গাদায় ফেলব। কম করেও একশ' কাঠ এমনি করে গাদায় ফেলছি রোজ, কৈ, কিছু ত হয় নি কোন দিন? আজ হবার কিনা তাই হ'ল, যেমন রোজ বলি আজও বললাম—হুঁশিয়ার, একসঙ্গে ছাড়বি—আমরা দিলাম ছেড়ে কিন্তু ছাড়তে তিলকা করল দেরী, আর যাবে কোথায়, কাঠটা লাফিয়ে উঠে পড়ল ওর পায়ের উপর। অত বড় জোয়ান, ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—আহা!"

"এক সের রক্ত পড়েছে," বলে বৈজু।

শুনিয়া রুকিয়ার শরীরটা শিহরিয়া ওঠে।

মনুয়া বলে, "ঠিকাদার এসে কি একটা অষুধ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল, গরীবের জান থাকল-গেল তাতে ওদের কিছু আসে যায় না।"

বৈজু বলে, "চোট খুবই লেগেছে, তবে ভয় পাবার কিছু নাই, সেরে যাবে কিন্তু ভোগাবে কয়েকদিন।"

তিলক আর একবার কাতরাইয়া ওঠে।

একখানা ছোট খাটিয়া মাথায় লইয়া সরযু আসিয়া উপস্থিত হয়। মনুয়া বলে, "যাক, এসে পড়েছে খাটিয়া, এইবার সাবধানে তুলে শুইয়ে দে দেখি।"

রুকিয়া তিলকাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়, সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তিলকাকে খাটিয়াতে তুলিয়া শোয়াইয়া দেয়। তিলকা আহত পাখানা দুহাতে ধরিয়া কাতর ভাবে বলে, "একটু জল দে মনুয়াদা, একটু জল দে।"

মনুয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, "দেখলে কাণ্ডটা, গুলবাকে বললাম, এক ঘটি জল নিয়ে আয় আপিস থেকে, তা এখনও এল না।"

বৈজু বলে, "পালিয়েছে ওশালা খাটিয়া টানতে হলে কাজে লাগা হয়ে যাবে, তাই সটকেছে, ওটা মানুষ না।"

মনুয়া বলে, "চল, নদীতে গিয়ে জল দেব, আর দেরী করিস নে, ঝাঁঝ বইতে সুরু করেছে।"

চারজনে মিলিয়া খাটিয়া হাতে ঝুলাইয়া চলিতে সুরু করে। "বাবা গো" চীৎকার করিয়া ওঠে তিলকা, "একটু আস্তে চলো তোমরা, একটু আস্তে গো, বড্ড লাগছে।" ধীরে ধীরে চলে তাহারা। ছেলের হাত ধরিয়া রুকিয়া চলে পিছনে।

৭

সকালবেলা মনুয়া আর বৈজু আঙিনায় আসিয়া ঢোকে। এক কোণে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল রুকিয়া, তাহাদের দেখিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মনুয়া বলে, "কেমন আছে তিলকা?"

রুকিয়া জবাব দেয়, "ঘুমোয় নি সারা রাত, বড্ড কষ্ট গেছে।"

ইহাদের গলার আওয়াজ পাইয়া ভিতর হইতে তিলকা ডাকে, "মনুয়াদা, এখানে এস ভাই।"

"যাচ্ছি," বলিয়া মনুয়া আর বৈজু ঘরে গিয়া ঢোকে।

ঘরের এক কোণে খাটিয়ার উপর একখানা ময়লা কাঁথা বিছান, তাহার উপর তিলকা শুইয়া আছে। মনুয়াকে দেখিয়া কাতরভাবে বলে, "পা নাড়তে পারছিনে মনুয়াদা, কি হবে বল ত? সারা রাত কে যেন পাখানা করাত দিয়ে কেটেছে—বাপরে! কি ব্যথা গো।" পায়ের আহত স্থানটাতে রক্তাক্ত ময়লা গামছাখানা সেইভাবেই বাঁধা আছে, খুলিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

বৈজু বলে, "অমন চোট লেগেছে ব্যথা হবে না! একটা কাঁটা ফুটলে রাতভোর ঘুম হয় না, আর এত ভীষণ কাণ্ড!"

শুনিয়া কাতরাইয়া ওঠে তিলকা। মনুয়া বলে, "অষুধ পত্তর করতে হবে, তার ব্যবস্থা কর।"

"তোমরাই একটা ব্যবস্থা কর মনুয়াদা," বলে তিলকা।

বৈজু বলে, "ভবানীকে ডেকে আন।"

মাথা নাড়িয়া মনুয়া বলে, "ভবানীর কর্ম নয়, আমি বলি সোনাগোপকে ডাক। জানকীর পায়ের উপর দিয়ে গত বছর বোঝাই গাড়ীর চাকা চলে গিয়েছিল, হাড় ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছিল, সোনা তাকে পনের দিনে ভাল করে তুললে। সোনাকে খবর দে।"

আশান্বিত হইয়া তিলকা বলে, "তোরা যা বলবি তাই করব।"

এতক্ষণ দরজার পাশটিতে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল রুকিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া মনুয়া তাহাকে বলে, "জান ত পরসাদের মা সোনাগোপের বাড়ী? মণ্ডপের ডান দিকে, বাঁকা আমগাছটার কাছে। একবার গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

রুকিয়া বলে, "হাতের কাজ সেরে আমি যাব গো।"

মনুয়া ও বৈজু চলিয়া যায়। আজ কাজের তাড়া নাই, ভারী মন লইয়া রুকিয়া ঘরদোর ঝাঁট দেয়, এক কলসী জল লইয়া আসে, তার পরে পরসাদকে কিছু বাসি লপসী খাইতে দিয়া তিলকার পাশটিতে গিয়া বসে।

"যা গো, একবার সোনাকে ডেকে নিয়ে আয়," বলে তিলকা।

রুকিয়া বলে, "তুই একটু কিছু মুখে দে, আমি গিয়ে সোনাকে ডেকে নিয়ে আসছি।"

তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, "না গো, কিছু খাব না আমি, খেতে ইচ্ছে করছে না। পা'টা ধরে একটু সোজা করে দে ত।"

রুকিয়া তিলকার আহত পাখানা সাবধানে ধরিয়া সোজা করিয়া দেয়—একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে তিলকা।

ছেলেকে কোলে লইয়া রুকিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সোনার বাড়ী না চিনিলেও বাঁকা আমগাছটা সে চেনে, গলি ধরিয়া সেই দিকে চলে। সোনার বাড়ী সে সহজেই খুঁজিয়া বাহির করে। বাড়ী নাই সোনা, পাশের গ্রামে রোগী দেখিতে গিয়াছে। সোনার বউকে রুকিয়া মিনতি করিয়া বলে, "ওগো, নিশ্চয় করে আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিও তাকে।"

ফিরিবার পথে বটতলায় দেবতার মণ্ডপের সামনে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে রুকিয়া, মনে মনে কাতর ভাবে প্রার্থনা করে, "হে দেবতা! হে মহারাজ! তুমি ইচ্ছে করলে সব করতে পার, পরসাদের বাপের ভাঙা পা ভাল করে দাও। আশ্বিন মাসে আমি তোমাকে পুজো দেব।"

মণ্ডপের দেবতা জাগ্রত, সহজেই তিনি প্রসন্ন হন, ইহার প্রমাণ বহুবার পাওয়া গিয়াছে, তাই প্রার্থনার পর রুকিয়ার মন অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া যায়, সে প্রায় নিশ্চিন্ত মনেই ঘরের দিকে ফেরে।

সাড়া পাইয়া তিলকা ডাকে, "এলি নাকি?"

ঘরে ঢুকিয়া রুকিয়া বলে, "সোনা বাড়ী নেই, রোগী দেখতে গেছে, তার বউকে বলে এসেছি—ওবেলা পাঠিয়ে দেবে।"

একটু হতাশ হইয়া হাতখানা কপালের উপর রাখিয়া ঘাড় ফিরায় তিলকা।

রুকিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, আস্তে বলে, "শোন।"

তিলকা রুকিয়ার দিকে তাকাইয়া বলে, "কি?"

রুকিয়া বলে, "সোনার বাড়ী থেকে ফিরে আসবার সময় মণ্ডপে গিয়েছিলাম, মানত করে এসেছি দেবতা তোকে ভাল করে দিলে আশ্বিন মাসে পুজো দেব।"

শুনিয়া তিলকার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, হাত জোড় করিয়া বার বার কপালে ঠেকাইয়া বলে, "পুজো দেব বইকি দেবতা, তুমি আমাকে ভাল করে দাও, গরীবের প্রাণ বাঁচাও, আমি তোমাকে পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।"

বিকালে সোনাগোপ আসিয়া উপস্থিত হয়। রুকিয়া বলে, "ভিতরে এস মহতো।"

বয়স ষাটের উপরে, শীর্ণ বেঁটে মানুষ, মাথায় মস্ত টাক, হাতে একখানা লাঠি। সোনা সাবধানে তিলকার খাটিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। কাঁদ কাঁদ গলায় তিলকা বলে, "পা-খানা গেছে আমার, একেবারে পিষে গেছে—মহতো গো, কি উপায় হবে আমার?"

শান্ত মৃদুকণ্ঠে সোনা বলে, "আমরা বৈদ আছি কেন, ভাল করবার জন্যেই না! তা অত ভাবছ কেন? ভাল হয়ে যাবে।"

সন্তর্পণে সোনা ক্ষতের উপর শুকাইয়া আঁটিয়া যাওয়া রক্তাক্ত গামছাখানা খুলতে চেষ্টা করে, বেদনায় তিলকা বার বার কাতরাইয়া ওঠে। অবশেষে গামছা খুলিয়া আসে, কিন্তু টানাটানিতে রক্ত বাহির হইয়া পড়ে। হেঁট হইয়া সোনা ক্ষত পরীক্ষা করে, বাঁ পায়ের পাতা প্রায় সবটা পিষিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে মাংস কাটিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সে এক ভীষণ দৃশ্য! সোনা প্রবীণ বৈদ্য, মোটেই ঘাবড়ায় না, আঙুল দিয়া এপাশ-ওপাশ টিপিয়া দেখে। "পাটা নাড়াতে পার?" প্রশ্ন করে সোনা।

"পারি, কিন্তু বড্ড ব্যথা পাই গো।" জবাব দেয় তিলকা।

"দেখি, একটু এগিয়ে দাও ত এ পাশে।"

আঃ উঃ করিয়া তিলকা তিল তিল করিয়া পা সরায়। হঠাৎ গাঁটের কাছটা ধরিয়া সোনা ঝাঁ করিয়া টান দেয়, ব্যথায় আর্তনাদ করিয়া ওঠে তিলকা, "মলাম গো, গেলাম গো।"

পা ছাড়িয়া দিয়া খুশী হইয়া সোনা বলে, "দেখলুম গাঁট ভেঙেছে কিনা; না, ভাঙে নি, খট করে আওয়াজ দিল —শুনলে?"

যন্ত্রণায় তিলকার পায়ের প্রত্যেক শিরা টনটন করিতে থাকে, সে জবাব দেয় না, দু'হাতে পা ধরিয়া হাঁপায়। একটু-

ক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ভাবিয়া সোনা বলে, "একটা অষুধ তৈরি করে দেব, কালকে গিয়ে নিয়ে এস পরসাদের মা। ঘরে ত সব জড়িবুটি নেই, জঙ্গল থেকে খুঁজে আনতে হবে, পিষতে হবে, মেহনত আছে।"

"হ্যাঁ গো, তাড়াতাড়ি ভাল হবে ত?" প্রশ্ন করে রুকিয়া।

মৃদু হাসিয়া সোনা বলে, "আমার অষুধ ব্যর্থ হয় না পরসাদের মা।"

বাহিরে আসিয়া রুকিয়া সোনার হাতে একটা আধুলি তুলিয়া দেয়।

চোখ দুটি বড় করিয়া একান্ত বিস্ময়ে সোনা বলে, "এটা কি দিলে পরসাদের মা?"

রুকিয়া বলে, "আমরা গরীব মানুষ, সাধ্যমত দিয়েছি মহন্তো।"

"তা কি হয় গো", বলে সোনা, "আমার মজুরি, অষুধের দাম, আট আনায় পোষাবে কেন?"

আঁচলের কোণ হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া রুকিয়া বলে, "এই নাও মহন্তো, এর বেশী আর দেবার ক্ষমতা নেই গো। গরীব বলে দয়া কর।"

সিকিটা লইয়া সোনা বলে, "অষুধের দাম আলাদা দিও, তা হলেই হবে। জখমী জায়গার সব খুন-খারাপ হয়ে গেছে, অষুধ দিয়ে নতুন খুন পয়দা করতে হবে, তবে ত ঘা সারবে।"

রুকিয়া ধরা গলায় বলে, "আচ্ছা, ভাল করে দাও, যাবত বাঁচব তাবত তোমার নাম নেব গো।"

সোনা বলে, "অষুধটা এনে সকাল-বিকেল ২'বেলা লাগাবে।" তার পরে লাঠি ঠুক ঠুক করিয়া চলিয়া যায়।

৮

সকালবেলা তিলকা কোনমতে বাহিরে আসিয়া বসে। এ কয়দিনেই তাহার চোখদুটি বসিয়া মুখখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আহত পাখানা বাড়াইয়া দিয়া সে ডাকে, "কৈ গো, অষুধটা লাগিয়ে দে।"

"দিচ্ছি," বলিয়া রুকিয়া ওষুধের ভাঁড় লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসে, হেঁট হইয়া বসিয়া পায়ে বাঁধা ছেঁড়া ন্যাকড়াটা খুলিয়া ওষুধ লাগাইয়া দেয়।

ক্লান্তকণ্ঠে তিলকা বলে, "হপ্তাখানেক হতে চলল, কোন ফল হচ্ছে না ত, যেমন ঘা তেমনি আছে।"

রুকিয়া বলে, "নগদ আরও আট আনা পয়সা নিয়ে অষুধ দিল—বলল তিন-চার দিনেই ঘা শুকিয়ে যাবে।"

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, "ঘা কমে নি, ব্যথা, বিষও কমে নি। না গো, ভাল হবার লক্ষণ ত দেখছি নে!"

"ইচ্ছে ত হয় একদিনে ভাল হয়ে যাক কিন্তু তা কি হয় গো, আরও ক'দিন দেখ।" বলে রুকিয়া। ক্ষতে ওষুধ লাগাইয়া তাহার উপর একটা কাঁচা শালপাতা চাপাইয়া ন্যাকড়াখানা আবার জড়াইয়া দেয় রুকিয়া।

তিলকা বলে, "চল, ঘরে ভিতরে নিয়ে চল, বসে আর থাকতে পারছিনে।"

তিলকা তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দেয়। রুকিয়া তাহাকে ধরিয়া আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া খাটিয়াতে শোয়াইয়া দেয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিলকা।

ঘরে একখানিও জ্বালানী কাঠ নাই, প্রত্যেক রবিবারে তিলকা জঙ্গলে গিয়া জ্বালানী কাঠ লইয়া আসিত, কিন্তু গত রবিবারে সে যাইতে পারে নাই, তাই কাঠের অভাব ঘটিয়াছে। গতরাত্রে রান্না চাপে নাই, সকলে সকালের রাঁধা লপসি খাইয়াছে, আজ না রাঁধিলে ত চলিবে না। তড়িঘড়ি ঘরের কাজ সারিয়া পরসাদকে আনিয়া তিলকার পাশে বসাইয়া দিয়া রুকিয়া বলে, "দুসাদটোলার মেয়েরা কাঠ আনতে জঙ্গলে যাচ্ছে, আমিও যাব তাদের সঙ্গে। ঘরে কাঠকুটো কিছু নেই, ছেলেটার দিকে নজর রাখিস।"

ছেলের হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া তিলকা বলে, "যা, বেশী দেরী করিস নে।"

"যাব আর আসব," রুকিয়া বলে।

একগাছা দড়ি ও ছোট কুড়ুলখানি লইয়া রুকিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়। দুসাদটোলার মেয়েরা সবে মাঠে গিয়া নামিয়াছে,এমন সময় রুকিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে জোটে। বড় জঙ্গলে তাহারা যায় না, গাঁয়ের কাছাকাছি ঝোপঝাড় ও ছোটখাট পলাশের জঙ্গল হইতে কাঠ সংগ্রহ করে। ছোটবড় প্রত্যেকের হাতেই একখানি করিয়া কুড়ুল। ছুটাছুটি হৈ-চৈ করিয়া তাহারা শুক্‌নো ডালপালা কাটিতে সুরু করে। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রদগ্ধ পলাশবনটা ইহারা হাসিগল্পে মুখর করিয়া তোলে।

মাজায় আঁচল জড়াইয়া রুকিয়া শুক্‌নো ডালপালা কাটিয়া একত্র করে। সে দুর্বল নহে, সবল হাতদুটি তাহার ক্লান্ত হয় না, পলাশের মোটা মোটা ডাল সে সহজেই কাটিয়া ফেলে। শীঘ্রই সে এক বোঝা কাঠ সংগ্রহ করে। সকলের আগে তাহার বোঝা বাঁধা শেষ হইয়া যায়। বেলা বাড়িয়া গিয়াছে, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে, বোঝা খুব ভারী, নিজে মাথায়

তুলিতে পারে না, তাই আর সকলের জন্ত অপেক্ষা করে। কিন্তু বেশীক্ষণ নিশ্চিন্তমনে দাঁড়াইয়া থাকিতেও সে পারে না, পাশের গল্পমুখর মেয়েটিকে ডাকিয়া বলে, "দে ভাই লছমী, বোঝাটা আমার মাথায় তুলে, আমি চলি।"

লছমীর বিশেষ তাড়া নাই, সে একটা রসের কথা সবে সুরু করিয়াছে, রুকিয়ার ডাক কানে ঢোকে না। খুব রাগ হয় রুকিয়ার, একটা পলাশের গুঁড়ির সঙ্গে কাঠের বোঝাটা খাড়া করিয়া সাবধানে বসাইয়া বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লয়, তার পরে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। এক বার যখন সে কাহারও সাহায্য লয় নাই তখন সে আর লইবেও না। দাঁতে দাঁত চাপিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়ায়, মাথাটা বোঁ করিয়া ওঠে কিন্তু মুহূর্তে সে টাল সামলাইয়া লয়। বোঝা বিষম ভারী, কিছুদূর চলিতেই রুকিয়ার কপাল বাহিয়া ঘাম ঝরিতে থাকে, ঘাড়টা টনটন করে। পথের পাশে মহুয়াগাছটার তলায় একটু জিরাইয়া লইতে চায় কিন্তু বোঝা নামাইলে একা মাথায় তুলিতে পারিবে না, রুকিয়া তাই দাঁড়ায় না। ক্ষেতের আলে নামিবার আগে মাঠের ধারে যে বড় পাথরখানি খাড়া হইয়া আছে, রুকিয়া একটু হেঁট হইয়া বোঝাটা সন্তর্পণে তাহার উপর রাখে। একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া আঁচল দিয়া স্বেদসিক্ত মুখখানা মুছিয়া ফেলে, ঘাড়টা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া জড়তা হাল্‌কা করিয়া লয়। আঁচল আবার আঁটিয়া বাঁধিয়া সে বোঝাটা মাথায় তুলিয়া লয়, সরু আলের উপর দিয়া সাবধানে চলে। দমকা বাতাস আসিয়া তাহাকে বোঝাসমেত কাত করিয়া ফেলিতে চায়, সমস্ত শক্তি দিয়া ধীরে ধীরে সে পথটুকু অতিক্রম করে।

আঙিনায় ঢুকিয়াই শুনিতে পায় পরসাদ কাঁদিতেছে। এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায় নাই, জোয়ান মানুষ কাবু হইয়া পড়ে, ও ত কচি ছেলে! দুম্ করিয়া কাঠের বোঝা ফেলিয়া রুকিয়া ডাকে, "এই যে বেটা আমি এসেছি।"

মায়ের সাড়া পাইয়া পরসাদের কান্না থামিয়া যায়, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসে। ঘরের দাওয়ায় ক্লান্ত ভাবে বসিয়া পড়িয়া রুকিয়া ছেলেকে কোলে টানিয়া লয়।

৯

"আমি বাঁচব না আমি আর বাঁচব না," ব্যথাজড়িত গলায় বলে তিলকা।

অন্ধকারে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুকিয়া বলে, আমি হাওয়া করছি, তুই একটু ঘুমো।"

সারারাত তিলকা যেমন বলিয়াছে এখনও তেমনি বলে; "ওগো, আমি বাঁচব না, বাঁচব না, বাঁচব না।"

রুকিয়া উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দেয়, পুবের আকাশ রাঙা করিয়া ভোর হইতেছে। ক্ষীণ আলোর সঙ্গে ঝির্‌ঝির্ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢোকে। রুকিয়া দরজা ধরিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সামনের আমগাছের মাথায় রোদ আসিয়া পড়ে, দেওয়ালের উপর এক জোড়া শালিক ডাকাডাকি করে, সে কিছু দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

"কোথায় গো," ডাকে তিলকা।

রুকিয়ার হুঁশ ফিরিয়া আসে, তাড়াতাড়ি তিলকার পাশে গিয়া দাঁড়ায়।

তিলকা কাতরাইয়া বলে, "পায়ের পটিটা খুলে দে, আর সইতে পারছি নে।"

পায়ে হাত দিতেই তিলকা চীৎকার করিয়া ওঠে, "বাবা গো!"

পায়ের দিকে তাকাইয়া রুকিয়াও চমকিয়া ওঠে, একি, হাঁটু পর্যন্ত অসম্ভব ফুলিয়া গিয়াছে যে! কাল ত এমন ছিল না, সন্ধ্যায় সে যখন ওষুধ লাগাইয়া প্রতিদিনের মত ঘা বাঁধিয়া দেয় তখন ফোলা ছিল না, ব্যথাও ছিল না। হঠাৎ দুপুর রাত হইতে তিলকা চেঁচামেচি সুরু করে, রুকিয়া হাত বুলাইয়া দেয়, হাওয়া করে কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না তিলকা।

কোনমতে পটি খুলিয়া ফেলে রুকিয়া, উত্তপ্ত ফোলা পায়ের উপর হাত রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

"দেখলি? কি হয়েছে বল ত?" প্রশ্ন করে তিলকা, "পা যে একেবারেই নাড়াতে পারছি নে, পাথরের মত ভারী হয়ে গেছে।"

পাছে তিলকা ভয় পায় তাই সাবধানে রুকিয়া বলে, "ফুলেছে একটু গো।"

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকে তিলকা, তার পরে হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ওঠে, বলে, "যা, মনুয়াদাকে ডেকে নিয়ে আয়, এ পথ দিয়ে আসে না আর। তাড়াতাড়ি যা, তা না হলে কাজে বেরিয়ে যাবে।"

রুকিয়া বাহির হইয়া যায়। মনুয়া আসিয়া তিলকার ফোলা পা দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া ওঠে, মানুষের পা বলিয়াই মনে হয় না। তিলকা তাহার মুখের দিকে করুণভাবে তাকাইয়া বলে, "দেখলে মনুয়াদা, রাতভোর ব্যথায় ঘুমোতে পারি নি, কি করি বল ত?"

মনুয়ার মাথায় কোন বুদ্ধিই খেলে না, বলে, "তাই ত রে, সোনার অসুখে ভাল হ'ল না, ভাবনার কথা বটে!"

শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলে তিলকা, বলে, "আমি আর বাঁচব না গো।"

সান্ত্বনা দিয়া মনুয়া বলে, "অত ভয় পেলে চলবে কেন, সোনার ওষুধে কাজ হ'ল না, সরকারী ডাক্তার ত রয়েছে, তাকেই ডেকে নিয়ে আসব।"

"তাই কর মনুয়াদা।" কাতর হইয়া বলে তিলকা।

তিন ক্রোশ দূরে সরকারী হাসপাতাল, মনুয়া যাইতে রাজী হয়।

"কিন্তু টাকা-পয়সার জোগাড় আছে ত," জিজ্ঞাসা করে মনুয়া, "সরকারী ডাক্তারের চাহিদা অনেক, ঘরে এলে চার টাকা দেবে, সুঁইয়া দিলে তার দাম নেবে, কম করেও হাতে দশটা টাকা রাখা চাই।"

তিলকা রুকিয়ার মুখের দিকে তাকায়, রুকিয়া বলে, "টাকার জোগাড় হবে বেনোয়ারীর বাপ, তুমি ডাক্তার ডেকে আন।"

মনুয়া কাজের দিকে না গিয়া ডাক্তার আনিতে যায়।

বিকালের দিকে ডাক্তারবাবু সাইকেলে চাপিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। আধাবয়সী লোক, মাথায় হ্যাট, গায়ে হাফ-সার্ট, পরনে শার্ট, পায়ে ক্যানভাসের জুতো। গ্রামে হামেশা ডাক্তার আসেন না, তাই তাঁর আগমন একটা বৃহৎ ব্যাপার, দেখিতে দেখিতে লোক জুটিয়া যায়।

তিলকার ঘরে দ্বিতীয় খাটিয়া নাই, একজন ছুটিয়া গিয়া কাছাকাছি কাহারও বাড়ী হইতে একখানা খাটিয়া আনিয়া আঙিনায় বিছাইয়া দেয়। ডাক্তারবাবু বসিয়া রুমালে ঘাম মুছিতে মুছিতে প্রশ্ন করেন, "রোগী কোথায়?"

মনুয়া বলে, "ভিতরে রয়েছে বাবু।"

ডাক্তারবাবু বলেন, "বাইরে আসতে পারে না?"

মনুয়া বলে, "না বাবু, নড়তে পারে না।"

"চলো", বলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান ডাক্তারবাবু, মনুয়া তাঁহাকে লইয়া ঘরে ঢোকে।

তিলকা পায়ের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করেন ডাক্তারবাবু, "কি হয়েছিল?"

মনুয়া বলে, "কাঠ গাদা করতে গিয়ে একখানা ভারী কাঠ পড়ে গিয়েছিল।"

পায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করেন, "কতদিন হ'ল?"

—"আজ্ঞে দু'সপ্তাহ।"

"দু' সপ্তাহ—চোদ্দ দিন?" ভ্রূ কুঁচকাইয়া ডাক্তারবাবু মনুয়াকে বলেন, "এতদিন করছিলে কি—ঘুমিয়ে ছিলে?"

মনুয়া কোন জবাব খুঁজিয়া পায় না, রুকিয়া পিছন হইতে চাপা গলায় বলে, "সোনা গোপ অষুধ দিচ্ছিল।"

ডাক্তারবাবু ভ্রূ আরও উঁচুতে উঠাইয়া প্রশ্ন করেন, "সোনা গোপ কে?"

মনুয়া বলে, "আজ্ঞে বৈদ—দেশী দাওয়াই দেয়।"

অপরিসীম অবজ্ঞায় ডাক্তারবাবুর মুখ বিকৃত হইয়া ওঠে, বলেন, "বৈদই বটে—সুস্থ ঘা সেপটিক করে ছেড়েছে।"

মনুয়া কথাটার অর্থ বোঝে না, নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে। ডাক্তারবাবু এতক্ষণে তিলকার পা টিপিয়া-টাপিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখেন, তার পরে বলেন, "কি করতে হবে?"

হাত জোড় করিয়া তিলকা বলে, "ভাল করে দেন ডাক্তারবাবু।"

গম্ভীর হইয়া ডাক্তারবাবু বলেন, "ভাল করতে পারি কিন্তু এখানে হবে না বাপু, হাসপাতালে যেতে হবে।"

কেহই জবাব দেয় না, তিলকা নির্বোধের মত মনুয়ার মুখের দিকে তাকায়, মনুয়া বলে, "অতদূরে যেতে পারবে না বাবু।"

"পারব না বললেই ত হবে না, পারতে হবে," বলেন ডাক্তারবাবু।

তিলকা বলে, "ঘরে দ্বিতীয় লোক নেই ডাক্তারবাবু, কে নিয়ে যাবে, কে হেপাজত করবে। আপনি ভাল অষুধ দেন বাবু, আমি এখানেই ভাল হয়ে উঠব।"

হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলেন, "অত সহজ নয় বুঝলে? দেশী দাওয়াই দিয়ে যা অবস্থা করেছ, না চিরলে আর হবে না, রোজ ধুতে হবে, ওষুধ লাগাতে হবে, তবে ভাল হবে।"

চেরার কথায় তিলকা ভীষণ ভয় পাইয়া যায়, হাসপাতালে যাইবার যাহা একটা ইচ্ছা ছিল তাহাও মিলাইয়া যায়, শুকনো গলায় বলে, "চিরলে আমি বাঁচব না হুজুর, আমি মরে যাব।"

রুকিয়া পিছন হইতে আসিয়া তিলকার পাশে দাঁড়ায়, একটা হাত তিলকার হাতের উপর রাখিয়া বলে, "না বাবু, ওকে আমি হাসপাতালে পাঠাব না, চিরতেও দেব না, আপনি গরীবের মা-বাপ, অষুধ দিয়ে ভাল করুন।"

ডাক্তারবাবু রুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারেন এই গরীব মেয়েটা অন্যান্য অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মতই একগুঁয়ে, যাহা তাহার সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা ও চিরাচরিত প্রথার বাহিরে তাহাকে সে প্রাণপণে বর্জন করে। আর অনর্থক ইহাদের বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেন, "আরে বাবা, আমার কি, তোমরা যা বলবে তাই করব।" বাহিরে আসিয়া সাইকেলের কেরিয়ারে বাঁধা ছোট বাক্সটি খুলিয়া ষ্টেথেস্কোপ, ওষুধপত্র, ইনজেকসনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি বাহির করিতে করিতে বলেন, "সুঁই দিতে হবে তিনটে, বুঝলে? জব্বর রোগের সঙ্গে জব্বর লড়াই করতে হবে ত।"

"হাঁ বাবু, তা ত বটেই", বলে মনুয়া।

ইদানীং ডাক্তারদের একসঙ্গে তিন-চারিটি শুঁই দেওয়া দেখিয়া মনুয়া ইহাকে চিকিৎসার একটা অঙ্গ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। তাহার মনে পড়িয়া যায় পাশের গাঁয়ের হরি মহন্তোকে ডাক্তার দুই-তিনটি করিয়া শুঁই দিত—আখিরে হরি বাচিল না, তা আর কি হইবে, বৈদ করে বৈদগিরি—আসলে দেবতাই ত জীবন মরণের মালিক।

একটি পেনিসিলিন ও দুইটি ডিস্‌টিল্ড ওয়াটার ইনজেকসন করিয়া ডাক্তারবাবু ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। মনুয়া রুকিয়াকে বলে, "টাকা বার কর পরসাদের মা।"

ঘরের অন্ধকার কোণে দেয়ালের গায় একটা ছোট হাঁড়ি বসান ছিল, তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া রুকিয়া একখানা ন্যাকড়া বাহির করিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। ততক্ষণে ডাক্তারবাবু মনুয়াকে তাঁহার মজুরি, ওষুধের দাম ইত্যাদি হিসাব করিয়া শুনাইয়া দেন, "আমার ভিজিট চার টাকা তা ত জানই তোমরা, আর তিনটে আমপুলের দাম বার টাকা, মোট ষোল টাকা।"

মনুয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে, এত টাকা দিতে হইবে তাহা সে ভাবে নাই, বলে, "গরীব মানুষ ডাক্তারবাবু, অত টাকা দিতে পারবে না।"

ডাক্তারবাবু বলেন, "দয়াই ত করলাম হে, কি চাইলাম বল ত? তিনটে ওষুধের দাম ঘর থেকে দিতে পারব না, সে ত তোমাকে দিতেই হবে, ভিজিট দেবে মাত্র চারটি টাকা, তার পরে এই যে মেহনত করলাম, তিন তিনটে শুঁই দিলাম এর মজুরি কোথায় দিচ্ছ? কম করে চাইলেই তোমরা পেয়ে বস।"

মনুয়া বলে, "না না, তা কেন হবে ডাক্তারবাবু।"

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলেন, "এ ব্যবসায় পেট ভরে না হে, এ বড় বেয়াড়া ব্যবসা। তবে করা কেন? লোকের উপকার হয় এই জন্যে করা।"

মনুয়া আসিয়া রুকিয়ার কাছে ষোল টাকা চায়। ষোল টাকা! না, কথাটা ঠিক শোনে নাই সে, রুকিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কত বললে বেনোয়ারীর বাপ?"

"ষোল টাকা গো," বলে মনুয়া।

বুকের ভিতরটা ধক করিয়া ওঠে রুকিয়ার—এতদিনের পরিশ্রমে সঞ্চিত কুড়িটি টাকার সবই ত চলিয়া যাইবে। না, তা হয় না, ন্যাকড়ার পুটলিটাকে সে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরে।

"দাও গো, দেরী করছ কেন?" হাত বাড়াইয়া দেয় মনুয়া।

রুকিয়া বলে, "কোথায় পাব গো এত টাকা?"

"কি করবে গো পরসাদের মা," বলে মনুয়া, "চিকিচ্ছা করতে গেলে খরচপত্তর করতেই হবে। খুঁজে পেতে দাও, ডাক্তার যখন ডেকেছ তখন না দিলে ত চলবে না।"

রুকিয়া গিয়া আবার ঘরের অন্ধকার কোণটিতে দাঁড়ায় কিন্তু এই কুড়িটি টাকা বিশ্বের অগোচরে লুকাইয়া রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পায় না।

"কৈ গো," ডাকে মনুয়া।

ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসে রুকিয়া, টাকা দিতে গিয়া তাহার বুক ও হাত দুই-ই কাঁপিতে থাকে। যাইবার সময় ডাক্তারবাবু বলেন, "কাল হাসপাতাল যাবে, একটা ওষুধ নিয়ে আসবে—ভেব না, ভাল হয়ে যাবে।"

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পাড়ার লোক আঙিনা শূন্য করিয়া চলিয়া যায়, রুকিয়া আসিয়া তিলকার পাশে দাঁড়ায়। তিলকা প্রশ্ন করে, "কি বললে ডাক্তার?"

পায়ের উপর হাত রাখিয়া রুকিয়া বলে, "বললে ভেব না গো, ভাল হয়ে যাবে।"

"আহা, দেবতা গো দেবতা," বলে তিলকা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রুকিয়া বলে, "ষোল টাকা দিতে হ'ল।"

"কত?"

"ষোল টাকা গো, এত খেটে কুড়িটি টাকা জমিয়েছিলি, তা সবই ত একদিনে শেষ হয়ে গেল—কি হবে গো?"

তিলকা চোখ বুঁজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকে। রুকিয়া আবার বলে, "একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে এইকটি টাকা হয়েছিল, তা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল গো।"

হঠাৎ চেঁচাইয়া ওঠে তিলকা, "থাম, টাকা টাকা করিসনে। আমার প্রাণের চেয়ে তোর টাকা বড় হ'ল হারামজাদী বজ্জাত?"

রুকিয়ার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে, মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

১০

মাণিকডিহার সরকারী হাসপাতাল তিন ক্রোশ দূরে। রুকিয়া ওষুধটা আনিয়া দিবার জন্য অনেককেই খোসামোদ করে কিন্তু কাজ ফেলিয়া কেহই যাইতে রাজী হয় না। অবশেষে সে নিজেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়।

খুব ভোরে উঠিয়া ঘরদোর পরিষ্কার করে। এক কলসী জল আনে, বাটিতে করিয়া বাসি লপসি আর এক ঘটি জল খাটিয়ার ধারে রাখিয়া তিলকাকে বলে, "এইখানে জলপান রাখলাম, হাত বাড়িয়ে তুলে নিস্, আমার ফিরতে দেরী হবে—তিন ক্রোশ পথ যাব আসব।

তিলকা একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করিয়া সম্মতি জানায়। দু'আনার পয়সা আঁচলের কোণে বাঁধিয়া পরসাদকে আদর

করিয়া বলে, "খেলা কর বেটা, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, কাঁদাকাটা করিস নে।"

এতক্ষণ পরসাদ মায়ের আশেপাশে ঘুরিতেছিল, এইবার মাকে যাইতে দেখিয়া জড়াইয়া ধরে।

"ছাড় বেটা, যেতে দে লক্ষ্মী ছেলে।" বলে রুকিয়া।

কিন্তু পরসাদ কিছুতেই ছাড়ে না। এদিকে দেরী হইতে থাকে, অগত্যা রুকিয়া জোর করিয়া পরসাদের হাত দুটি ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া আঙিনার দরজায় শিকল চড়াইয়া দেয়। পরসাদ আঙিনায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকে। রুকিয়া একটুক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া শোনে, তার পরে তাড়াতাড়ি চলিতে সুরু করে। গলির মোড়ে আসিয়াও রুকিয়া পরসাদের কান্নার ক্ষীণ আওয়াজ শুনিতে পায়, মাঠের পথে নামিবার আগে সে দাঁড়ায়, কান পাতিয়া শোনে, কিন্তু কিছুই শুনিতে পায় না। তাড়াতাড়ি সে চলে, আলপথের মাঝামাঝি আসিয়া আবার দাঁড়ায়, মনের মধ্যে একটা অশান্তি বোধ করে, হয় ত ছেলেটা এখনও পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে, বেলা বাড়িলে রোদে পড়িয়া থাকিবে, তিলকা ত কিছুই করিতে পারিবে না। পূবের আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে সূর্য বেশ খানিকটা উঠিয়াছে, সে আবার চলিতে সুরু করে। কিন্তু দু'চার পা চলিয়া সে হঠাৎ ফিরিয়া একরকম ছুটিয়াই বাড়ীর দিকে চলে। দরজার সামনে আসিয়া সে শোনে পরসাদ তখনও পড়িয়া ক্লান্তভাবে কাঁদিতেছে। শিকল খুলিয়া সে আঙিনায় ঢোকে, ধুলি-ধূসরিত পরসাদ উঠিয়া আসিয়া আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরে। হাত বাড়াইয়া রুকিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়, ধুলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে তিলকাকে ডাকিয়া বলে, "পর-সাদকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি গো।"

মাইল দুই রাস্তা যাইতেই রোদ বেশ চড়িয়া যায়। মাঠের উপর দিয়া পথ, একটি দুটি মহুয়াগাছ ছাড়া ছায়া বলিয়া কোন বস্তু নাই। রুকিয়া পরসাদকে কোলে লইয়া তাড়াতাড়ি চলে। রোদের তাতে বালু ও কাঁকরময় পথ তাতিয়া উঠে, পা পুড়িয়া যায়। আরও খানিকটা পথ চলিয়া তেষ্টা পায় রুকিয়ার। পথের মাঝে দু'একটা শীর্ণ নদীতে নামিয়া রুকিয়া জল খোঁজে, কিন্তু কোথাও জল নাই—শুকাইয়া গিয়াছে। ছেলেটার মাথায় আঁচল চাপা দিয়া সে চলে। কিছুটা পথ শালবনের ভিতর দিয়া গিয়াছে, শালগাছের ডালে ফিকে-সবুজ নতুন পাতা গজাইয়াছে, রুকিয়া চলিতে চলিতে হাত বাড়াইয়া কচিপাতা ছিঁড়িয়া লয়, সরস বোঁটাগুলি দাঁত দিয়া কাটিয়া চিবাইতে থাকে। বনের পরে আবার মাঠ, তারপরে কুমোরদের একখানা গ্রাম। গ্রামে ঢুকিয়া কুয়া হইতে জল তুলিয়া রুকিয়া পেট ভরিয়া খায়, আঁচল ভিজাইয়া মাথার উপর ফেলিয়া আবার পথ চলে।

মাণিকডিহার সরকারী হাসপাতালটি দেখিতে বেশ, চুণকাম করা পরিচ্ছন্ন ছোট বাড়ীটির চারিদিকে ঘুরানো লাল কাঁকরের পথ, মাঝে মাঝে রক্তকরবীর ঝোপ। এক পাশে একটা মস্তবড় ইঁদারা, সামনে দুটি বড় বড় মহুয়াগাছ। রুকিয়া মহুয়াগাছের নীচে ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। বহুক্ষণ সে বসিয়া থাকে, ধীরে ধীরে পথচলার ক্লান্তি তাহার দূর হইয়া যায়। হাস-পাতাল ছোট হইলেও সেখানে ব্যস্ততার অভাব নাই। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসারের হাঁকডাক, রোগীদের আনাগোনা স্থানটাকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। রুকিয়া আর দেরী করে না—উঠিয়া পড়ে, ছেলের হাত ধরিয়া ডাক্তারের ঘরের দরজায় অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে গিয়া দাঁড়ায়। ডাক্তারবাবু ভারী ব্যস্ত—পুরনো রোগীর কাগজ দেখিয়া মিকশ্চার রিপিট করিতেছেন, নতুন রোগী হইলে পেট টিপিয়া, নাড়ী দেখিয়া ওষুধের ব্যবস্থা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে খাতায় নাম-ঠিকানা, বয়স, রোগের বর্ণনা লিখিতেছেন। এই ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ এক-একবার জানালা দিয়া বাহিরে মাঠের দিকে তাকাইয়া হাঁকিতেছেন, "এই মহাবীর, গরুটা দেখছি না ত, দেখ কোথায় গেল।"

দুই-চারিজন রোগীর পরেই রুকিয়ার পালা আসে, ডাক্তারবাবু হাত বাড়াইয়া বলেন, "কাগজ দাও।"

"কাগজ নাই বাবু।" বলে রুকিয়া।

"ওঃ, নতুন রোগী, কি হয়েছে?" চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করে ডাক্তারবাবু।

রুকিয়া বলে, "কিছু ত হয় নি।"

"তবে কি দিল্লাগি করতে এসেছ?" গর্জন করিয়া ওঠেন ডাক্তারবাবু।

থতমত খাইয়া রুকিয়া পিছাইয়া যায়, অন্য রোগী আগাইয়া আসে।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়িয়া যায়, রোগীর ভিড় ক্রমে কমিয়া আসে, রুকিয়া দরজার পাশে মুখটি বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

"কি গো, কি চাও তুমি, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ এখানে?"

প্রশ্ন শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় রুকিয়া, চাহিয়া দেখে ফিট-ফাট পোশাক, তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ে। তাহার স্নিগ্ধ চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া অনেকখানি সাহস পায় রুকিয়া, হাত দুটি জোড় করিয়া বলে, "ওষুধ নিতে এসেছি মা।"

"পাও নি ওষুধ? কি হয়েছে তোমার?"

"আমার ত কিছু হয় নি, ওষুধ নেব এর বাপের।"

পয়সাদের মাথায় হাত দিয়া বলে রুকিয়া, "পায়ে চোট লেগেছে, ডাক্তারবাবু গিয়ে সূঁই দিয়ে এসেছেন, হাসপাতালে এসে ওষুধ নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"তা যাও না; ওষুধ নাও গিয়ে।" বলে মেয়েটি।

ডাক্তারবাবুর সামনে যাইবার নামে রুকিয়া আবার ভীত হইয়া পড়ে। বলে, "গিয়েছিলাম মা, ডাক্তারবাবু তাড়িয়ে দিলেন।"

"এসো," বলিয়া মেয়েটি আগাইয়া যায়।

ডাক্তারবাবু উঠি উঠি করিতেছিলেন, রুকিয়াকে লইয়া সে ঘরে ঢোকে, বলে, "এর স্বামীর ওষুধ দেবেন বলেছিলেন, অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে।"

রুকিয়ার দিকে তাকাইয়া এইবার ডাক্তারবাবুর মনে পড়িয়া যায়, মাথা নাড়িয়া বলেন, "ওহো, সেই সেপটিক রোগীটা। তা কেমন আছে গো?"

"একই রকম ডাক্তারবাবু—ব্যথা কমে নি।"

"কমে যাবে, কমে যাবে।" ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনায় ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর এবার খুবই সহানুভূতিপূর্ণ। এক টুকরা কাগজে এক কলম লিখিয়া বলেন, "ঐ ঘরে গিয়ে কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাও, আর কেমন থাকে আমাকে খবর দিও—দরকার হলে যাব।"

কাগজের টুকরা হাতে লইয়া রুকিয়া বলে, "হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, তুমি মা-বাপ, খবর দেব বৈকি।"

আইডোফর্মের পুরিয়াটি লইয়া রুকিয়া মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ মা, তুমি বুঝি ডাক্তারবাবুর বেটী?"

হাসিয়া মাথা নাড়ে মেয়েটি, বলে, "না গো, আমি এখানে চাকরি করি, আমি নার্স।"

কথার অর্থ বুঝিতে পারে না রুকিয়া, তবে এইটুকু বোঝে, সে সকলের মত নয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, রুকিয়া পয়সাদের দিকে তাকাইয়া দেখে, মুখখানি তাহার ক্ষুধায় শুকাইয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালের সামনে পথের ধারে দুই-তিনখানি মুদীর দোকান ও মিঠাই-এর দোকান। অদূরে একখানা ভাঙা ঘরের বারান্দায় কয়েকটা হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া একটি বুড়ী বসিয়া আছে, রুকিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত: করিয়া বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগা আঁকুর আছে, ভিজে ছোলা?"

বুড়ী বলে, "আছে— ক'পয়সার চাই?"

"দু'পয়সার আঁকুর আর এক আনার ছাতু দাও," বলে রুকিয়া।

আঁচলের এক কোণে ছাতুর পুঁটলি আর এক কোণে ভিজে ছোলা বাঁধিয়া ছেলেকে কোলে লইয়া রুকিয়া ঘরে ফিরিয়া চলে। ছেলেকে আঁচল ঢাকা দিয়া ভিজে ছোলার পুঁটলিটি খুলিয়া তাহার হাতে দেয়, পরম আগ্রহে পয়সা একটি একটি করিয়া তা খুঁটিয়া খাইতে থাকে। ভীষণ রোদ, তাহার উপর এখন হাওয়া চলতে সুরু করিয়াছে— পথ চলা বড় কষ্টকর। মাঝে মাঝে গরম বাতাসের ঝাপটা আসিয়া ধুলাবালি উড়াইয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া দেয়।

আকাশের দিকে তাকাইয়া রুকিয়া দেখে, সূর্য প্রায় মাথার উপর। অর্ধেক পথ এখনও বাকি, রুকিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে চেষ্টা করে কিন্তু পা যেন চলিতে চায় না। গলা তাহার শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে কুমোরদের গ্রামখানা দেখা যায়, প্রাণপণ শক্তিতে চলিয়া সে কুয়ার ধারে আসিয়া পৌঁছায়। ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া সে এক বালতি জল তুলিয়া এক নিশ্বাসে চোঁ চোঁ করিয়া অনেকখানি জল খাইয়া ফেলে। তার পরে উত্তপ্ত পা দুটিতে জল ঢালিয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়ে। আর যেন তাহার উঠিতে ইচ্ছা করে না। ধীরে ধীরে আঁচলের কোণ হইতে ছাতুর পুঁটলিটা খুলিয়া সামনে রাখে, দুই আঙুলে করিয়া এক ফোঁটা তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়—অমৃতের আস্বাদ! আবার আর এক ফোঁটা মুখে ফেলিয়া দেয়। হঠাৎ উঠিয়া গিয়া এক বালতি জল লইয়া আসে, পাশের একটা পলাশগাছ হইতে গোটাকয়েক বড় বড় পাতা, ছিঁড়িয়া আনিয়া যত্ন করিয়া বিছায়, তার পরে সবটুকু ছাতু তাহার উপর ঢালিয়া দেয়। বালতি হইতে আঁজলা ভরিয়া জল তুলিতে গিয়া আর তোলে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। হঠাৎ বালতি কাত করিয়া সবটা জল তপ্ত মাটিতে ঢালিয়া দেয়, তার পরে ছাতুটুকু আবার আঁচলে বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, হাত বাড়াইয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লয়।

শিকল খোলার আওয়াজে ভিতর হইতে তিলকা বলে, "এলি গো?"

রুকিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে, তার পরে ধীরে ধীরে তিলকার খাটিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

"এত দেরি করলি কেন?" অনুযোগের কণ্ঠে বলে তিলকা। রুকিয়া সে কথার উত্তর দেয় না, বলে, "ক্ষিধে পেয়েছে খুব—না গো?"

অসহায় শিশুর মত তিলকা বলে, "হ্যাঁ গো, কতবার যে আওয়াজ পেয়ে ভাবলুম—তুই এলি।"

"একটু সবুর কর", বলে রুকিয়া তার পরে তাড়াতাড়ি আঁচলে বাঁধা ছাতুটুকু একটা বাটিতে ঢালিয়া দেয়, নুন-লঙ্কা দিয়া বেশ করিয়া মাখিয়া তিলকার হাতে তুলিয়া দেয়।

'কি গো—ছাতু?" বলে তিলকা, বিস্ময় ও আনন্দে তাহার বেদনাক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। ক্রমশঃ

উদ্দীয়ানা

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

অতি প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে ও বর্ত্তমান পশ্চিম পাকিস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, চিত্রাল ও গিলগিটের দক্ষিণে পার্ব্বত্য সোয়াট নদী-উপত্যকায় উদ্যান বা উদ্দীয়ানা নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যটি কোনও দিন সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল বলিয়া জানা যায় না। সম্ভবতঃ অন্যান্য বৃহত্তর রাজ্যের সামন্ত রাজ্য হিসাবেই চিরকাল এই ক্ষুদ্র রাজ্য আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। এ রাজ্যের স্বীয় নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা অথবা অন্য কোনও নিদর্শন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। সিলভাঁ লেভীর মতে হুণ আক্রমণের পরবর্ত্তীকালে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার সুযোগে অল্প কিছুদিনের জন্য এই রাজ্য স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত (পণ্ডিত কহ্লন) কাশ্মীর নৃপতি গোনন্দের কাল (খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮) হইতে কাশ্মীর-রাজ সংগ্রামের কাল (খ্রীঃ অঃ ১০০৮) পর্য্যন্ত ইহার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নহে। এই রাজ্য বিভিন্ন কালে পর্য্যায়ক্রমে প্রাচীন গান্ধার, গ্রীক, মগধ (মৌর্য্য), পারস্য, কুষাণ, পারদ, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অংশ ছিল। এই পথেই প্রাচীন-কালে চৈনিক পরিব্রাজক সুঙ-যুন, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ প্রভৃতি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই রাজ্য সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। প্রাচীনকালে এই রাজ্য উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ছিল। স্থাপত্য ও ভাস্করশিল্পেও এই রাজ্য অনেক উন্নত ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরবর্ত্তীকালের নিদর্শন-গুলি হইতে গান্ধার শিল্পের ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাসের ধারণা পাওয়া যায়। মৌর্য্যসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এই রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে। কিন্তু এই রাজ্যে শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাধান্য থাকায় এই স্থানের বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম প্রবেশের পর এই স্থানে হীনযান মতবাদই প্রধান ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই রাজ্য মহাযানপন্থীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কুষাণসম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে এই রাজ্যে অথবা ইহারই সন্নিকট স্থানে কোনও চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই সম্মেলনেই মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হইয়াছিল। এই স্থানের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও তান্ত্রিক তারা প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি ইহার পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা যায়। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের রাজত্বকালেই এই রাজ্য হইতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করে এবং

সম্ভবতঃ সেই কারণেই এই রাজ্য তিব্বতীয়গণের একটি তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। 'হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে জানা যায় এই রাজ্যে সেই সময় বহু বৌদ্ধ মঠ, মন্দির ও স্তূপ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

এই রাজ্যে নির্মিত শিল্প-নিদর্শনগুলি প্রাচীনকালে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতির আক্রমণের পরেও অক্ষত অবস্থায় ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। তাঁহারা মনে করেন এই সকল শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতির বহুলাংশে ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ, (১) মামুদগজনী ও তাহার পরবর্তী পাঠান-মুঘল আক্রমণ ও লুণ্ঠন, (২) প্লাবন ও (৩) পর্ব্বতগাত্র হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ডের আবরণ ও বর্ষায় প্রস্তর শিলাদির স্খলন।

বিগত ১৯৫৫ সনে বিখ্যাত ইটালীয় প্রত্নতাত্ত্বিক যোশেফ টুক্কী খননকার্য্যের স্থান নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণের একটি অভিযানে সোয়াট উপত্যকায় এই রাজ্যে আগমন করেন। বর্ত্তমান সোয়াট রাজ্য পশ্চিম-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এবং জনৈক প্রাক্তন নবাব ওয়ালি সাহেবের শাসনাধীনে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই রাজ্য পূর্ব্বকালে উত্থান, উদ্দীয়ন, উদ্দীয়ানা (তিব্বতীয়), উড়িঙ্গিয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। 'উড়িগ্রাম' ও মিঙ্গোরা নামক দুইটি নগরী বিভিন্ন কালে পর্য্যায়ক্রমে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। হিউয়েন সাঙ বর্ণিত মিঙ-চি-লি যে এই মিঙ্গোরা নগরী এই মত যোশেফ টুক্কী অতি দৃঢ় ভাবে পোষণ করেন। এই মিঙ্গোরা বর্ত্তমান সৈয়দু-শরীফ হইতে সওয়া মাইল উত্তরে অবস্থিত। একটি আধুনিক অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা খননকালে এই স্থানে সহসা একটি অতি-প্রাচীন প্রাসাদের প্রাচীরশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। এই আবিষ্কার যোশেফ টুক্কীর মতের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। এখন ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত মিঙ-চি-লি বা মিঙ্গোরা অন্ততঃ তাঁহার আগমনকালে প্রাচীন উত্থান বা উদ্দীয়ানা রাজ্যের রাজধানী ছিল। অপর একটি রাজবংশ মিঙ্গোরার দক্ষিণ-পশ্চিমে সোয়াট নদীর তীরে উড়িগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। এই দুই বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিবাদের সামান্য বিবরণ প্রাচীন কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল ষ্টাইন বলেন আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের গ্রীক বিবরণীতে উল্লিখিত 'হুড়িগ্রামের অবরোধ' যে এই উড়িগ্রাম সম্পর্কে, সেই বিষয় কোনও সন্দেহ নাই।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার অরেল ষ্টাইন সর্ব্বপ্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে সোয়াট উপত্যকায় পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় পথঘাটের যথেষ্ট অভাব ও যানবাহন চলাচলের বহুবিধ অসুবিধার জন্য তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের বিবৃতির উপর ভিত্তি করিয়াই যোশেফটুক্কী বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। যোশেফ টুক্কী তাঁহারই ভিত্তিতে "উড়িগ্রাম" ও "মিঙ্গোরা"র প্রাথমিক খননকার্য্য আরম্ভ করার অগ্রগণ্যতা স্থাপন করেন। বিগত ১৯৫৬ সনে এই কার্য্য আরম্ভ করা হয়। খননকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে যোশেফ টুক্কী সমগ্র বর্ত্তমান সোয়াট রাজ্য পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহার প্রত্নতাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণের এ.টি বিবরণ পেশ করেন। তাঁহার এই বিবরণ বহু নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছে।

অধ্যাপক যোশেফ টুক্কীর বিবরণ মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত, (ক) সোয়াট নদীর পূর্ব্ব বা দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ভূভাগ, ও (খ) সোয়াট নদীর পশ্চিম বা উত্তর তীরে অবস্থিত ভূভাগ।

স্যার অরেল ষ্টাইনের মতে "উড়িগ্রাম" প্রাচীন উদ্দীয়ন রাজ্যের আদি রঙ্গভূমি। এই উড়িগ্রামের নামানুসারেই পরবর্ত্তী উত্থান, উদ্দীয়ন বা উদ্দীয়ানা রাজ্যের নামের উৎপত্তি। যোশেফ টুক্কী এই উড়িগ্রাম ও মিঙ্গোরা নগরীদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া ২৫।৩০ মাইল ব্যাসের একটি বৃত্তের মধ্যে তাঁহার প্রত্নতাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন। এই বৃত্তের পরিধির মধ্যে বহু প্রাচীন ক্ষুদ্র বৃহৎ নগরী, স্থাপত্য ও শিল্প-নিদর্শন প্রভৃতির ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোয়াট নদীর পূর্ব্ব তীরে, উত্তরে অবস্থিত কালাম হইতে দক্ষিণে আব্বাসাহেব-চায়না ও ইলাম পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব প্রান্তে মঙ্গল থান ও জাম্ভিল পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। সোয়াট নদীর পশ্চিম তীরে, দক্ষিণে গাম্বাটুনা হইতে উত্তরে সরাই টাঙ্গী পর্য্যন্ত এবং আলিগ্রাম হইতে পশ্চিমে আকট কিলা পর্য্যন্ত বহু প্রকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অট্টালিকা প্রাসাদাদি প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ চিহ্নগুলি প্রমাণ করে যে, কোনও এক সময় এই রাজ্য ঘন বসতিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। সুঙ-য়ুন ও হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

উড়িগ্রাম

উদ্দীয়ন রাজ্যে উড়িগ্রাম নগরী যে প্রাচীনতম, প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হইতে তাহা অনুমান করা যায়। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট দারায়ুসের আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও ইহার অস্তিত্ব ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের গ্রীক বিবরণীতে "হুড়িগ্রাম" নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, সুঙ-য়ুন, হিউয়েন-সাঙ প্রমুখ অনেকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

উড়িগ্রাম নগরীর উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্ব্বতমালা বেষ্টিত এবং পশ্চিম প্রান্তে সোয়াট নদী প্রবাহিত। নগরীটি নাতি উচ্চ রাজগিরি পর্ব্বতের ঢালু উপত্যকায় সোয়াট নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। একটি বিশাল দুর্গ-প্রাসাদকে কেন্দ্র করিয়া এই নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাক্-বৌদ্ধযুগেই ইহার সমৃদ্ধি ও গৌরব অধিকতর উজ্জ্বল ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় দুর্গ-প্রাসাদটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুধাবন করা যায় যে, বিভিন্ন কালে এই প্রাসাদ-দুর্গ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিভিন্ন কালে নির্ম্মিত বিভিন্ন অংশের নির্ম্মাণ-কৌশল অনুধাবন করিয়া কালানুক্রমিক

একটি ইতিহাস রচনা হয়ত ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে বলিয়া যোশেফ টুক্কী অনুমান করেন। প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদ-দুর্গের একটি তোরণ অদ্যাবধি প্রায় অবিকৃত রহিয়াছে। ইহার সম্মুখবর্ত্তী পরিখায় পর্ব্বতগাত্র-নির্গত নির্ঝরের স্রোতধারা অদ্যাবধি প্রবাহিত হইতেছে। উড়িগ্রামের প্রাচীন ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা প্রাসাদাদির প্রাকারশ্রেণী পর্ব্বতগাত্রের উচ্চ স্থান হইতে নিম্নাভিমুখী উপত্যকায় একটি সুদীর্ঘ বিশাল সোপানাবলীর ন্যায় দৃশ্যমান। এই সোপান-সদৃশ অট্টালিকাশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে উড়িগ্রামের রাজ-গিরি দুর্গ-প্রাসাদ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ প্রান্তে একটি বৃহৎ চত্বরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অনুমান করা হয় ইহা সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। চতুস্পার্শ্বের প্রস্তর প্রাকারে ও পর্ব্বতগাত্রে বহু প্রকার জীবজন্তুর আকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়। এইগুলি যে বহু প্রাচীনতর সে বিষয় সন্দেহ নাই। আলেক-জান্দারের আক্রমণের পূর্ব্বেও যে এই সকল অঙ্কন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার কিয়দংশ দেখিয়া অনুধাবন করা যায় যে, ইহা কোনও প্রকার ধাতব অস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা ক্ষোদিত নহে। সম্ভবতঃ ইহা কঠিনতর প্রস্তরফলক বা যন্ত্র অঙ্কিত। এই সকল অঙ্কনের কিয়দংশ যে ইতিহাসের আদি যুগের সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি বলা যায় যে, এই সকল অঙ্কনে অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পপরিচয় রহিয়াছে। মার্জ্জার, চিতা প্রভৃতির দেহাঙ্কনে বৃহৎ বিন্দু দাগ তাহাদের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে। এই প্রাণীগুলির লাঙ্গুল শঙ্খাকারে পাক দিয়া (spiral) প্রান্ত ভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। দেহ গঠন দুইটি ত্রিভুজের শীর্ষ সংযুক্তির দ্বারা অঙ্কিত। এইরূপ অঙ্কন-প্রণালী প্রাচীন ইরাণের অঙ্কনেও দেখা যায়। অধ্যাপক টুক্কী আশা করেন যে, খননকার্য্য অগ্রসর হইলে প্রাচীন শিল্পাঙ্কন ও গান্ধার শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সূত্রের কিয়দংশ এই স্থানে আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে। তিনি আরও আশা করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রও এইখানে আবিষ্কার হইতে পারে।

মিঙ্গোরা

উড়িগ্রামের উত্তর-পূর্ব্বে কতিপয় ক্রোশ দূরে সোয়াট নদীর শাখা জাম্ভিল নদীর তীরে অপর নগরী মিঙ্গোরা বা হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত "মিঙ-চি-লি" অবস্থিত। এই নগরী বর্ত্তমানকালের সৈয়দু-শরীফের সওয়া মাইল উত্তরে বর্ত্তমান বাজারের নিকট অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই মৃত্তিকা খননকালে ভূগর্ভে প্রাচীন অট্টালিকাদি ও প্রাকারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রাচীন নগরীর ভগ্নস্তূপ বহু বর্গমাইল ব্যাপী ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জাম্ভীল শাখা-নদী উপত্যকার ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে অর্দ্ধাধিক মাইলব্যাপী একটি প্রাচীরের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বুরুজ ও সান্ত্রী আবাসের চূড়ার স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। অনুমান করা যায়

দুর্গ-প্রাসাদ এই প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যেই অবস্থিত ছিল এবং নিম্ন-ভাগে নগরীটি বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানকালের বুটকারাগ্রাম এই নিম্নভাগে অবস্থিত। পুস্তু ভাষায় (আফগান) বুটকারা অর্থ বহু প্রতিমার মূর্ত্তি। ইহার সহিত সুঙ-যুন ও হিউয়েন-সাঙ বর্ণিত "সহস্র মঠ" ও "সহস্র মূর্ত্তির" দেশ কথাটির মিল আছে। তিব্বতীয় বর্ণনায় মিঙ্গোরাকে "কুম-বুম" (কু-আবুম=লক্ষ প্রতিমা) নামে উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় এই স্থানে বহু বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ অবস্থিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয়ের বর্ণিত বুদ্ধদেবের স্বর্ণমূর্ত্তি বা স্বর্ণমণ্ডিত মূর্ত্তি শত শত বৈদেশিক আক্রমণের পরেও অদ্যাপি দৃষ্টি-গোচর হওয়া যে অসম্ভব ইহা বলাই বাহুল্য। তথাপি অদ্যাপি বহু মূর্ত্তি ও মঠাদির ধ্বংসস্তূপ মৃত অতীতের সমাধির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজ-মান। অধ্যাপক টুক্কী অনুমান করেন গান্ধার শিল্পের ক্রম-বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র এই স্থান এবং সামগ্রিক ভাবে উদ্দীয়নরাজ্য। এই রাজ্য মহাযানপন্থীদিগেরও একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সম্ভবত মিঙ্গোরা রাজের আগ্রহাতিশয্যে কণিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সম্মেলন এই স্থানে অথবা ইহার সন্নিহিত কোনও স্থানে আহূত হইয়াছিল। এই স্থানের খননকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম এবং গান্ধার শিল্পের ক্রম-বিকাশের উপর নূতন আলোকসম্পাত করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

কাটেলাই

উড়িগ্রাম ও মিঙ্গোরা, এই দুইটি প্রাচীন রাজধানী ব্যতীত নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলেও বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কাটেলাই গ্রাম তাহাদের অন্যতম। ইহা মিঙ্গোরা-থানা সড়কের পার্শ্বে কাটেলাই নামক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গাত্রে ও তরাইতে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধ যুগে মঠ বা মন্দির নগরীরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র নগরীটি দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত অংশ, এবং, (খ) তরাইতে সমতল ভূমিতে অবস্থিত অংশ। (ক) অংশের বহু প্রাচীরে বিচিত্র অঙ্কন দেখা যায়। পথ ও প্রাচীর পার্শ্ব দিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত নালী দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল ভগ্নাবশেষের উর্দ্ধপ্রান্তে একটি গন্ধক নির্ঝর অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত উর্গ্যা-পা সম্ভবতঃ "আয়ু-পানি" নামে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানের জল ব্যাধি-নিরাময়ের গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে একটি ভগ্ন বৌদ্ধস্তূপও দেখা যায়। স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে বহু ভগ্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর শিল্প-নিদর্শনও যথেষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশনে উদ্যত অবস্থায় একটি যোদ্ধা মূর্ত্তিও এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তরনির্ম্মিত কার্ণিসে অঙ্কিত কতিপয় অংশও সংগৃহীত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে দুইটি যোগী-মূর্ত্তির মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব ও বজ্রপাণি মূর্ত্তিদ্বয় উল্লেখযোগ্য। অপর একটি কার্ণিসের অংশে অঙ্কিত পুষ্পমাল্যের অঙ্কন-প্রণালী অতি সুন্দর। এক হস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া "রাজলীলাসনে" উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটিও উল্লেখযোগ্য। (খ) অংশে উপবিষ্ট ভঙ্গিতে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং সেইখানে খননকার্য্য ধীরে সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতেছে।

ঘালেগাই

মিঙ্গোরা-থানা সড়কের নিকটবর্তী কাটেলাই ভিন্ন কাম্বার, গোগডারা, টিণ্ডোদাগ ও ঘালেগাই উল্লেখযোগ্য স্থান। ঘালেগাইর সন্নিকটে প্রাপ্ত বিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি একটি প্রধান আবিষ্কার। এই স্থানে প্রাপ্ত অপর একটি অর্দ্ধভগ্ন মূর্ত্তি রাজা উত্তর সেনের বলিয়া অনুমিত হয়। একটি বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় এই ঘালেগাইর উল্লেখ আছে। উত্তর সেনের মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে অনেকের মতদ্বৈধ আছে। ইলাম উপনদী উপত্যকায় কোটা ও শাঙ্গালায় প্রাপ্ত মূর্ত্তিগুলির সহিত ইহার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। ঐ অভগ্ন মূর্ত্তিগুলি কুষাণ রাজত্বকালের মুদ্রায় অঙ্কিত মূর্ত্তির অনুরূপ।

বারিকোট

ঘালেগাইর দক্ষিণ-পশ্চিমে সোয়াট নদীতীরে বারিকোট, অপর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বজ্রস্থান নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতল ভূমির চতুর্দ্দিকে অতি-প্রাচীন প্রাচীরসমূহের ধ্বংসস্তূপও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। দুই চারিটি ভগ্ন বৌদ্ধস্তূপও দেখা গিয়াছে। এই স্থান যে, কোনও এককালে ঘন জনাকীর্ণ ছিল সে বিষয় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। প্রাক্-কুষাণ যুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় বহু মুদ্রা এই স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গান্ধার শিল্পের বহু নিদর্শনও এই স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। বারিকোটের সন্নিহিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিখরে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ভগ্নাবশেষ হইতে অনুধাবন করা যায় এই প্রাসাদটি কুষাণ রাজত্বের পরবর্তী যুগে সংস্কৃত ও নূতন ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের পাদদেশে একটি লোকেশ্বরের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই স্থানে একটি স্তূপের অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের চিতাভস্মের অংশ রক্ষিত ছিল বলিয়া হিউয়েন-সাঙের বর্ণনায় কথিত আছে। এই স্থানের খননকার্য্য সম্পূর্ণ হইলে বহু তথ্য সংগৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মিঙ্গোরা-কালাম সড়ক

মিঙ্গোরা-কালাম সড়কটি মিঙ্গোরা হইতে উত্তরাভিমুখে চরবাগ, কাজাখেলা, ও জারী হইয়া কালাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সোয়াট নদীর পূর্ব্বতীরে এই সড়ক গিলগিট পর্য্যন্ত প্রসারিত ও পশ্চিম তীরে একটি সড়ক চিত্রাল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই সড়কের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাচীন নগর ও শিল্প-নিদর্শনাদির ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত তিরাৎ ও মর্পাণ্ডাইর মধ্যবর্তী স্থানটি উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত বুদ্ধদেবের বলিয়া কথিত একটি পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। ইহার নিম্নাংশে একটি খরষ্ঠী লিপি ক্ষোদিত আছে। জার্ম্মান পণ্ডিত বুহলার সর্ব্বপ্রথম এই লিপি পাঠ করিয়া অনুবাদ করেন (Corpus Inscriptionum Indicurum)। চৈনিক পর্য্যটকগণের বর্ণনানুসারে "দর্শকের গুণানুসারে এই পদচিহ্ন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারে দেখিয়া থাকে।" ইহা ভিন্ন ছত্রের আকারে বিস্তৃত সর্পের ফণার নিম্নে স্থাপিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। এই স্থানটি একটি তীর্থ স্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত নানা আকারের মৃন্ময় পাত্র প্রভৃতি দেখা যায়। সোয়াট নদীর বিপরীত পার্শ্বে (পূর্ব্ব) একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে (জারী)। চৈনিক ও তিব্বতীয় বিবরণীতে অবলোকিতেশ্বর ও তারাদেবী রক্ষক ও অভয়দাতা বলিয়া বর্ণিত।

মিঙ্গোরা-কালাম সড়কের পূর্ব্বে তিতাবাদ গ্রামের সন্নিকটে প্রায় দুই বর্গমাইল ব্যাপী একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই স্থানে কতিপয় কারুকার্য্য-খচিত প্রসাধনের নিমিত্ত পাত্র ও দর্পণের পাত (ধাতব) পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই স্থানে স্বর্ণনির্ম্মিত তৈজস-অলঙ্কারাদি প্রভৃতির অংশ ও মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। অদ্যাপি দরিদ্র গ্রামবাসীদের কেহ কেহ দৈবাৎ মৃত্তিকা খননকালে স্বর্ণ-খণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। এই স্থানের সন্নিকটে সেচ-

কার্য্যে ব্যবহৃত একটি থালে লোকেশ্বরের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

শাখোরাই

মিঙ্গোরা হইতে প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে বৌদ্ধদিগের একটি পবিত্র স্থান অবস্থিত ছিল। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম শাখোরাই। এই স্থানে একটি বিশাল প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ আছে, ইহা "অদ্ভুত স্তূপ নামে খ্যাত। পর্ব্বত গুহামন্দিরে খোদিত একটি বিরাটকায় বুদ্ধমূর্ত্তি এই স্থানে অবস্থিত।

হিউয়েনসাঙের বিবরণীতে আছে যে, ভগবান তথাগত এই স্থানে মানব ও দেবগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রের শিলায় মহাযান "নির্ব্বাণ সূত্রের" ও "ধর্ম্ম-পদ"-এর বহু পদ তৃতীয় শতাব্দীর প্রচলিত ভাষায় খোদিত দেখা যায়। ইহার সন্নিকটে একটি বৌদ্ধবিহার ও অপর একটি স্তূপেরও ভগ্নাবশেষ আছে। শাখোরাইর নিকটবর্ত্তী পার্শা গ্রামে কণিষ্ক ও বাসুদেবের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত কিছু মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে।

মাঙ্গলাওর-আজবিরাই ও মিঙ্গোরা-জাম্বিল সড়ক

মাঙ্গলাওর-আজবিরাই ও মিঙ্গোরা-জাম্বিল সড়কের দুই পার্শ্বেও বহু প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আজবিরাইর সন্নিকটে পর্ব্বতগাত্রের অঙ্কনগুলি উল্লেখযোগ্য। রাজলীলাসনে উপবিষ্ট লোকেশ্বর ও বুদ্ধদেবের পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তি দুইটি প্রধান। মিঙ্গোরা-জাম্বিল সড়কের কুকারাই গ্রামের সন্নিকটে একটি বিশাল বিহার ও অনেকগুলি স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে গান্ধার-শিল্পের বহু নিদর্শনও দেখা যায়। অলঙ্কারাদি রাখিবার একটি সুন্দর পেটিকায় একটি মুক্তামালা ও স্মারক চিতাভস্ম পাওয়া গিয়াছে। এই পথেই সরাবাইর সন্নিকটে দুই জন ভিক্ষুসহ বুদ্ধদেবের সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কুকারাই হইতে জাম্বিলের পথের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রাচীন সেতুর স্তম্ভরূপে লোকেশ্বর মূর্ত্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; ইহাকে গান্ধার-শিল্পের একটি উচ্চশ্রেণীর নিদর্শন বলিয়া মনে করা যায়। জাম্বিল হইতে কিছু দূরে আমাবুট গ্রামের নিকট মৃত্তিকা-স্তূপের নিম্নে একটি পূর্ণাবয়ব দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অপর একটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির একটি হস্ত বরদা মুদ্রার ভঙ্গিতে প্রসারিত এবং অপর হস্তে একটি দণ্ড। একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর সন্নিকটে একটি বজ্রপাণি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জাম্বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বহু ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন মূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

মিঙ্গোরা-ইলাম সড়ক

অপর একটি পথ কুকারাই হইতে মিয়ানা ও মার্গাজার গ্রাম হইয়া ইলাম পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই পথে গ্রামের সন্নিকটে একটি বিশাল স্তূপের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেও বহু স্তূপ, অট্টালিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। অনুমান করা যায় ইলাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল কোনও এককালে ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। স্থানে স্থানে শিলায় ও পর্ব্বতগাত্রে লোকেশ্বর প্রভৃতির মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। কালাম গ্রামের সন্নিকটে একটি চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধ দক্ষিণ বাহুতে ধৃত ত্রিশূল ও বাম বাহুতে ডমরু, নিম্নের বাম বাহুতে কমণ্ডলু ও অপর হস্তে বরাভয় মুদ্রা (আংশিক ভগ্ন)। এই স্থানে বৌদ্ধ ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

নওয়াগাই ও নাটমেরা

বারিকোট-কারাকার গিরিপথের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকা আছে। এই স্থানে নওয়াগাই গ্রামের নিকটে একটি বিশাল প্রাচীন দুর্গের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরের কোন কোনও অংশ এখনও অভগ্ন আছে। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে একটি মঠ ও কতকগুলি স্তূপের ভগ্নাবশেষও দেখা যায়। মঠটি ভগ্ন হইলেও ইহার আদি আকৃতি নিরূপণ করা কঠিন নহে। নিকটবর্ত্তী অপর স্থান নাটমেরাতেও চতুর্দ্দিকে বিবিধ ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

বারিকোট-আব্বাসাহেব-চারনা

বারিকোট হইতে একটি পথ নাজিগ্রাম ও টোকার হইয়া

দক্ষিণদিকে আব্বাসাহেব-চায়না পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। নাজিগ্রামে গান্ধার-শিল্পের বহু নিদর্শন দেখা যায়। প্রাচীরের উপরিভাগের অংশ, ছাদ ও খিলানশ্রেণী গান্ধার-আদর্শে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে স্তূপের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। নিকটে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি বিশাল চতুষ্কোণ স্থান আছে। এই বিশাল প্রাচীরটি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত। এই আবেষ্টনীর মধ্যে কোনও অট্টালিকা বা প্রাসাদের চিহ্ন দেখা যায় না। মধ্যস্থলের সুবৃহৎ গহ্বরটি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই স্থলে একটি বিশাল কৃত্রিম জলাধার বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানে মৃত্তিকা স্তরের নিম্নে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত বলিয়া অনুমান করা হয়। বহু উচ্চ ভূমিতে প্রাচীর-বেষ্টিত পরিষদ-কক্ষের ন্যায় একটি বিশাল কক্ষ (হল) দৃষ্টিগোচর হয়। নিদর্শনগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করা হয় যে, এই স্থানে মঠবাসী বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত একটি পেটিকায় একটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত নাতিক্ষুদ্র বাক্স পাওয়া যায়। এই বাক্সে কতকগুলি প্রাচীন স্মারকচিহ্ন রক্ষিত ছিল; তাহার মধ্যে ভূর্জ্জপত্রে লিখিত একটি লিপিও রক্ষিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে লিপিটি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিকটের অপর একটি স্থানে কুষাণ-যুগের বহু নিদর্শন দেখা যায়।

এই স্থান হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত পর্ব্বতগাত্র হইতে একটি নির্ঝর উৎসারিত হইয়া মান্দারনালায় প্রবাহিত হইতেছে। কিংবদন্তি আছে ইহার জল সর্ব্বব্যাধি-নিবারক। এই উপত্যকার উচ্চতর ঢালু ভূমিতে বহু বৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহ ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে একটি বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট ভবনাসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম আব্বাসাহেব-চায়না। এই স্থানটি কুষাণ-যুগের বিবিধ আকৃতির মৃন্ময়পাত্র এবং গান্ধার-ভাস্কর-শিল্প নিদর্শনের ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ।

সোয়াট নদীর পশ্চিম তীরের প্রাকৃতিক অবস্থা পূর্ব্বতীর হইতে কিছুটা পৃথক। পশ্চিম তীরের অধিকাংশ স্থান প্রস্তরময় ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব তীরের ন্যায় এই স্থান ঘনবসতিপূর্ণ ছিল না। বারিকোট-গাম্বাটানার পথে গাম্বাটানার নিকট একটি স্তূপ দেখা যায়। সন্নিহিত ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে একটি বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ আছে। এই অট্টালিকাটি উড়িগ্রামের প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা যায়।

মিঙ্গোরা সেতু—আলিগ্রামকাবেল

মিঙ্গোরা সেতু হইতে আলিগ্রামের পথে দেওলাই খাওয়ার উপত্যকায় বহু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানটি একটি ক্ষুদ্র দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই স্থানে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও কিছু ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আরও দক্ষিণে আবুলকালাই গ্রামের সন্নিকটে কুষাণ-যুগের বহু ধাতুপাত্র ও তৈজসাদি দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় এই স্থানটি ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। এই স্থানে কুষাণ-যুগের লোহিত মৃন্ময়পাত্রও বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

আলিগ্রাম-আয়কোটকিলা

আলিগ্রাম হইতে পশ্চিমগামী পথে অগ্রসর হইলে ভুতান-বন্দে গ্রামে পৌঁছান যায়। এই স্থানে কুষাণ-যুগের বহু মুদ্রা ও লৌহ-নির্ম্মিত দুই-চারিটি তীরের ফলা পাওয়া গিয়াছে। কিছু মৃন্ময়পাত্র ও কাচজাতীয় বস্তু নির্ম্মিত মাল্যের গুটিকা (Beads) প্রভৃতিও এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে। আরও অগ্রসর হইয়া শুষ্ক মাকান-নদী অতিক্রম করিলে ধ্বংসস্তূপাবৃত একটি স্থানে পৌঁছান যায়। তাহার মধ্যে একটি ভগ্ন বৌদ্ধস্তূপও আছে। আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইলে আয়কোটকিলায় প্রবেশ করা যায়। এই স্থানে একটি উচ্চভূমির উপর একটি ভগ্ন দুর্গ অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে কণিষ্কের নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা ও একটি প্রসাধন পেটিকা পাওয়া গিয়াছে।

শকরদরা

পুনরায় আলিগ্রাম হইতে মিঙ্গোরা সেতুর পথে উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে শকরদরা গ্রাম পাওয়া যায়। এই স্থানে বিবিধ চিত্র-ক্ষোদিত প্রস্তর-প্রাচীরশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। অদূরে বর্ত্তমান আফগানিস্থানের সীমান্তের নিকট বাযশোয়ে একটি বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত। এই দুর্গে একটি বিশালাকার প্রস্তর-নির্ম্মিত জলাধার রক্ষিত দেখা যায়। একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের মধ্যভাগ খনন করিয়া এই আধার নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ আকৃতির জলাধার উড়িগ্রাম দুর্গপ্রাসাদেও অনেকগুলি স্থাপিত আছে।

সুরাই-টাঙ্গী

শকরদরা হইতে উত্তরের সরলপথে অগ্রসর হইলে সুরাই-টাঙ্গীতে আসা যায়। এই স্থানের পর্ব্বত-পৃষ্ঠে ও উচ্চভূমিতে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপসমূহ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সম্ভবতঃ উড়িগ্রাম ভিন্ন উদ্দায়ানা রাজ্যের বৃহত্তম ও দৃঢ়তম দুর্গ সুরাই-টাঙ্গীতে অবস্থিত ছিল। সুরাই-টাঙ্গীর নিকটে অবস্থিত মেরামারীতে গান্ধার-শিল্পের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

উদ্দীয়ন রাজ্যের বুদ্ধমূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য

বর্ত্তমান সোয়াটরাজ্য পর্য্যটন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক যোশেফাটুকী প্রাচীন উদ্দীয়ন বা উত্তান নামে পরিচিত রাজ্য সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাকে ভূমিকাস্বরূপ প্রাথমিক বিবরণ বলা হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্র সম্পর্কে কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি প্রস্তর-ক্ষোদিত ভাস্কর-শিল্প এবং বিশেষভাবে মূর্ত্তিগুলি হইতে উদ্দীয়ন রাজ্যের ধর্ম্মধারণায় একটি প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উদ্দীয়ন রাজ্যকে মহাযান সম্প্রদায়ের জন্মভূমি বলা হয়। মহাযান মতবাদ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজারাধনায় সমর্থন করে। ইহার ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী শৈব ও

তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি অনেকাংশে বৌদ্ধ-মহাযান মতবাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। মহাযানপন্থীদিগের একটি সাধনপন্থার নাম বজ্রযান। এই মতে "সাধকের সাধনার শক্তিতে মন্ত্র বা ধ্যান অর্থাৎ তাহার ধ্বনিরূপ-মূর্ত্তি লাভ করে; এইরূপ রূপ-মূর্ত্তিরাই বিভিন্ন দেবদেবী।" কালে বুদ্ধমূর্ত্তির সহিত এই সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ ধ্যানধারণায় চারিপ্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি কল্পিত হয়। (১) মৈত্রেয় অর্থাৎ ভাবীবুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব; ইনি দানশীলতা ও করুণার প্রতীক। (২) ধ্যানীবুদ্ধ বা আলোকের প্রতীক। (৩) মঞ্জুশ্রী বা নির্ম্মলতার প্রতীক ও (৪) অবলোকিতেশ্বর বা প্রজ্ঞা ও পবিত্র আত্মার প্রতীক। উদ্দীয়ন রাজ্যে এই সকল মূর্ত্তি-কল্পনা শৈব আকার ধারণ করে।

বর্ত্তমান সোয়াট রাজ্যে অদ্যাবধি যে সকল মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অনেকগুলি দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং কিছুসংখ্যক উপবিষ্ট ভঙ্গিতে। এইগুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক একক এবং কতকগুলি একাধিক মূর্ত্তিসহ। দেখা যায় বুদ্ধমূর্ত্তি অপেক্ষা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। এই বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি দুইপ্রকার ভঙ্গীতে দেখা যায়; (১) রাজলীলাসনা ভঙ্গিতে লোকেশ্বর মূর্ত্তিরূপে অর্থাৎ বামপদ সিংহাসন হইতে মৃদুভাবে ঝুলাইয়া নিম্নে স্থাপিত এবং দক্ষিণপদ আসনাকারে সিংহাসন বা বেদীতে স্থাপিত; বামহস্তে পদ্ম ও অপর হস্তে অভয়মুদ্রা। (২) দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি। এই লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি যে শিব মূর্ত্তির রূপান্তর সে বিষয় সন্দেহ নাই। উদ্দীয়ন রাজ্যে এই বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্ত্তির পূজাই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, সেই কথার সমর্থন হিউয়েন-সাঙের বিবরণীতে পাওয়া যায়। সাধনমালায় (Introduction to Sadhanamala, page 32) উদ্দীয়ানা ক্রমানুসারে লোকেশ্বরের পূজা ও সাধনাবিধি দেখা যায়। লোকেশ্বরের অপর একটি রূপ ত্রৈলোক্যাভা-শঙ্কর-লোকেশ্বর (সয়াহপাদ); ইহাতে বোধিসত্ত্বের ষড়্ভুজ ও ত্রিলোচন-রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার হস্তে বজ্রাঙ্কিত পাশ এবং অঙ্কুশ। এই মূর্ত্তিসংখ্যা বর্ত্তমানে অল্পসংখ্যক। দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বের যে মূর্ত্তি পাওয়া যায় তাহার দক্ষিণ-হস্ত বরদা-মুদ্রা ভঙ্গিতে প্রসারিত ও বামহস্তে দণ্ড। বজ্রপাণি মূর্ত্তিটিরও দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা এবং বামহস্তে পদ্ম ও বজ্র। বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি ভিন্ন চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিব্বত রাজ্যের তারা মূর্ত্তির সংখ্যার তুলনায় বর্ত্তমান সোয়াট রাজ্যে তারামূর্ত্তি নাই বলিলেও চলে। সম্ভবতঃ সেইগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব গান্ধার-শিল্প বিকাশের সুযোগ আনয়ন করিয়াছিল। ধর্ম্মের ধারা পরিবর্ত্তনের সহিত শিল্পের ধারাও কিছু পরিমাণে বিবর্ত্তিত হয়। উদ্দীয়ন রাজ্যে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তির যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, উদ্দীয়ন রাজ্যে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতেও সেইরূপ সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যোশেফ টুক্কীর মতে এই স্থানের শিল্প-পদ্ধতির সহিত সুদূর বঙ্গদেশের "পাল-শিল্পের" সহিত অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। তাহার অর্থ এই নহে যে, উদ্দীয়ন-শিল্পের সহিত পাল-শিল্পের কোনও প্রকার যোগ ছিল * ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা। আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে উদ্দীয়নের শিল্প ও ইতিহাস সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হইবে এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু ঘটনাবলীর উপরও আলোকসম্পাত করিবে—উড়িগ্রামের অন্ধকার ভূগর্ভস্থ প্রস্তর-শিল্প নিদর্শনগুলির উদ্‌ঘাটনে।

* প্রত্নতাত্ত্বিক যোশেফ টুক্কীর "Preliminary Report on an Archaeological Survey in Swet" নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

চিত্র জাতক

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

সকল কথা যায় ফুরিয়ে হেথায় কথা কইতে এসে,
হিমালয়ের হাড় জুড়ালো শালগ্রামের শিলায় শেষে!
একটি অবাক শিশির কৌটায় সাতটি সাগর হীরের দানা,
কাঁটার বোঁটায় ফুটল আকাশ আচমকা নীল পদ্মে হেসে!

বিশ্বলোকের বার্ত্তা নিয়ে এই বিধাতার বেতার বাজে
ভাঙ্গা কুলো, হাটের ধূলো, আস্তাকুঁড়ের ছাইয়ের মাঝে।
ঝাপসা চোখে এ কোন আলো সোনার আঙুল বুলিয়ে দিল
ঘুচিয়ে গ্লানি হতাশ মুখের, বলীর রেখা, মলিন লাজে!

সকল কালের মানুষ এল আজ পঁচিশের যোগের স্নানে,
স্পর্দ্ধা যে তার উত্তরণের ঊর্দ্ধতমের শিখর পানে।
ইতিহাসের উপকূলে কুড়িয়ে পাওয়া পরশমণি,
অন্ধকারের বন্দীশালায় বজ্রশিখায় মুক্তি আনে!

তারার ছটা ছড়িয়ে দিল তার কলমের কালির ছিটে,
ঝড়ের ডানা গজিয়ে ওঠে কপালপোড়া মাটীর ইটে,
পথের কথা পঞ্চমুখী দশ-দিগন্ত-কথার পথে,
আবার কখন ডাক দিয়ে নেয় সেই যেখানে মনের ভিটে।

কে করে দাম, কে কষে দর, কোন ঘরে তার পাতবে পিঁড়ি
পংক্তি ভোজে খোঁজ কি পাবে? সুরের সেতু, স্বপন সিঁড়ি।
প্রণাম আমার পাখীর মতন ব্যাকুল ডানায় চলছে উড়ে
সেই চরণের নিরুদ্দেশে, হতাশ হয়েই আসছে ফিরি।
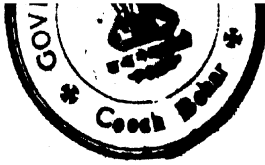
চোখের হাসি

শ্রীসত্যেন সিংহ

আজ নিশ্বাস ফেলবার অবসর নেই বিনতার।

সেই ভোরবেলা গিয়েছিল নয়ানজুলির মাঠে ঝুড়ি করে খড়ি-মাটি আনতে। পাড়ার বিন্দি, মিমি, সোহাগ, চুনি সবাই এলো-মেলো চুলে, সদ্য-ঘুমভাঙ্গা ফোলা ফোলা চোখে শক্ত করে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঝুড়ি মাথায় ছুটেছিল। দেরী করলে ভাল মাটি পাওয়া যাবে না। ষষ্ঠীতলার বাঁকা বটগাছটার তলায় তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার ষষ্ঠী-বুড়ির মতই জুবুথবু হয়ে বসেছিল। তারই মধ্যে দাঁড়িয়েছিল কাজল আর লখিন্দর একটা গাঁইতা ও কোদাল হাতে নিয়ে। প্রতিজনের কাছে একটা করে চিনির নাড়ু আর জিলিপির লোভে ওরা কাল সন্ধ্যাবেলায় যেতে রাজী হয়েছিল।

—ওলো ও বিন্তি! চা মুড়ি খেয়ে নে, তার পর খড়ি-হাত কাঁদিস না। ওপাশের রান্নাঘর থেকে মা ডেকে বলে বিনতাকে।

বিন্তি কিন্তু ততক্ষণে পুরণো ডালের হাঁড়িটায় সাদা মাটি গুলে ফেলেছে। রান্নাঘরের পাশেই ঐ যে ছোট্ট ঘরটি এখুনি নিকানো হয়ে যাবে। দণ্ডটার মধ্যে কাজল আসবে বাবুদের ছেলের কাছে কম্পাস নিয়ে, দোরের দু-পাশে দুটো পদ্মফুল এঁকে দিতে, দেরী করলে কি চলে? সাহায্যকারিণী ছোট বোনকে বলে—যা অনি, মুড়ি খাবি যা। মাকে চেঁচিয়ে বলে—হাত করে ফেলেছি মা, একেবারে ঘর নিকিয়ে চান করে খাব। মা বিড় বিড় করে বকে, বিনি কানই দেয় না। ছোট ভাই-এর সাত-হাতি ধুতিটা পরে হাতের চুড়িতে নেকড়া জড়িয়ে একটা চঞ্চল ব্যগ্রতা আর ব্যস্ততা তার সারা দেহে উপচে পড়ে।

বিনতা ওরফে বিন্তি। পঞ্চদশী কিশোরীর দ্বারে যৌবন তার প্রথম পদচিহ্ন স্থাপন করেছে সবেমাত্র। গায়ের রংটি চিকণ শ্যামল, দীঘল ছাঁদের দেহটিতে ভাস্করের বাঁকা রেখাগুলি ফুটে উঠছে একে একে। পাতলা ঠোঁটের দু-পাশে একটা কেমন সলজ্জতা ধরা দিয়েছে। ছোট নাকের উপর একজোড়া কালো পরিষ্কার বুদ্ধি ও কৌতুকে ঝলমলে চোখ। সে চোখের আর একটা বৈশিষ্ট্য—বিনতা হাসুক আর নাই হাসুক, ওর চোখ দুটো যেন সর্ব্বদাই হাসে। তাই ত এ বছর প্রথম ভাদুর বায়না দিতে গেলে সুমন্ত দাস কারিগর অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে তার দিকে।—কাদের মেয়ে গো, কখনও দেখি নাই যে তোকে?—দেখবে কি করে, ই বছর পেথম ভাদু কচ্ছি, আর তুমি ত যাও নাই আমাদের পাড়া। সুমন্ত দাস বলেছিল, বেশ! বেশ! তোর চোখের হাসি দেব এবার ভাদুর চোখে।—যাও! লজ্জায় মুখ নত করেছিল বিনতা। খুব হেসে ওর থুৎনিটা তুলে সুমন্ত দাস বলেছিল—লজ্জা কি, আমি বুড়ো মানুষ, সত্যি ভাই, তোর চোখের হাসিটি তুলে নেবার মতই বটে। বুড়োর কাণ্ড দেখে হেসে পালিয়ে এসেছিল বিনতা। সুমন্ত দাস ঘরের মধ্যে থেকেই বলেছিল—আসিস ভাই মাঝে মাঝে, তোর ভাদু আমি খুব ভাল করে গড়ে দেব।

অনেক দিন যাবার ইচ্ছে হয়েছিল বিনতার, কিন্তু 'চোখের হাসি' বলে সুমন্ত দাস ক্ষেপাবে বলে যেতে পারে নি। 'চোখের হাসি'—সে আবার কি? মনে পড়লে ওর নিজেরই হাসি পায়। আজ অবশ্য যেতেই হবে ভাদু আনতে। ঘর নিকিয়ে সবাইকে ডেকে নিয়ে যাবে মতিঝিলের বাঁধে স্নান করতে। এসে জল-খাবার খেয়ে আলপনা আঁকবে। কাজলও এসে পড়বে ততক্ষণে। ভাত খেয়ে চুল বেঁধে যাবে ভাদু আনতে। আজ যদি বুড়ো সুমন্ত দাস অমনি করে সকলের সামনে বলে তবে কিন্তু বিনতা ভয়ানক রেগে যাবে।

সাদা খড়ি-মাটির প্রলেপে ঘরের দেওয়ালগুলি ঝকঝক্ করে উঠল—জাগরণের দিন কাজল যদি একটা ডে-লাইট আনতে পারে তবে আরও চক্‌চক্ করবে। নাঃ, কাজলের এখনও দেখা নেই। দোরের কাছে মাটির ভাঁড় ও সরায় দু-তিনটে রং, শিউলি ফুলের রস, কাপড়ে দেওয়ার নীল ও পুরণো আলতায় সবটাই রেখে বিনতা স্নান করতে বেরিয়ে পড়ল।

মতিঝিলেই দেখা হ'ল কাজলের সঙ্গে। সদ্য বর্ষার পর কানায় কানায় ভরা টলটলে মতিঝিলের বুকে ফুটেছে অসংখ্য পদ্ম ও শালুক। এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে তাই সংগ্রহ করছে কাজল। সোনালি রোদ পড়েছে ওর ঈষৎ-ক'টা চুলে, ফর্সা ঠোঁটের চাপা হাসিতে।

বিনতার সারা গায়ে সাদা মাটির দাগ, গালে মুখে কোথাও বাদ নেই। তাকে দেখে কাজল হাসছে ভেবে ঝঙ্কার দিয়ে বলে—এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে আর হাসতে হবে না। আমি না খেয়ে না দেয়ে ঘর নিকিয়ে সারা, বলি এখুনি এসে ফুল আঁকবে—আমার যেন একারই গরজ? গজ গজ করেই ঘাটে নাবে বিন্তি। এক বোঝা পদ্ম আর শালুক কাঁধে ঘাটে উঠে আসে কাজল, বলে—এই দেখ আমারও গরজ আছে, তোর ভাদুকে সাজাবো বলেই না এত ফুল তুললাম! এক-ঝলক মিষ্টি জল-ফুলের গন্ধ লাগে বিনতার নাকে। হেসে বলে—যা তাড়াতাড়ি, দোরের কাছেই রং রেখে দিয়েছি।

ঘাট ছেড়ে এক-বুক জলে নেমে গিয়েছিল বিনতা, কাজল এগিয়ে এসে বলে—তুই একটা ফুল নিবি না বিন্তি?

—আমি কি করব ফুল নিয়ে, এগুলো সব ত আমাদের ভাদুকেই দিবি ?

—হু দেব, কিন্তু এই বড়টা তোর জন্তে অনেক কষ্টে ঐ মাঝখান থেকে তুলে এনেছিলাম। বোঝার ভেতর থেকে একটা বড় শ্বেত-পদ্ম বার করে ধরে কাজল।

—বাঃ কি সুন্দর! বলে ফেলে বিন্তি। কিন্তু পরক্ষণেই বলে, এত ভাল পদ্ম ভাদুমনির পায়ে দিতে হয়, তুই কি বোকা রে কাজল. আমায় দিচ্ছিস অমন সুন্দর ফুলটা ? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে সুমন্ত দাসের কথা—'তোর চোখের হাসি ভাদুর চোখে দেব।' আপন মনেই সে হেসে ওঠে। কিন্তু এই হাসির যে এমন বিপরীত ফল হবে কে জানত ? চোখের পলকে সেই শ্বেত পদ্মটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে কাজল—না নিলি ত বয়েই গেল। রাগে সে কেঁদে ফেলত আর একটু হলে।

সকালবেলা থেকে আনন্দের যতগুলি দীপ একে একে বিনতার অন্তরে জ্বলে উঠেছিল সবগুলিকে এক সঙ্গে নিভিয়ে দিয়ে কাজল হন্ হন্ করে চলে গেল।

বিনতা ভাবল কাজল আজ আর তাদের বাড়ী যাবে না, দেওয়ালে ফুল আঁকাও হবে না। সেও ভাদু আনবে না। মাথা ধরেছে বলে চুপচাপ শুয়ে থাকবে। বিনা কারণে কাজল যদি রাগ করতে পারে তবে তারই কি রাগ নেই ?

কিন্তু ঘরে পা দিতেই সে অবাক হয়ে যায়। কাজল এক মনে সাদা দেওয়ালের গায়ে কম্পাস দিয়ে দাগ কাটছে। বিনতার আগমন বুঝতে পেরেও সে ফিরে তাকায় না। সুন্দর ফুলের শোকটা ভুলতে না পারলেও ওকে ফুল আঁকতে দেখে বিনতার মন অনেকখানি সান্ত্বনা পায়। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে এসে খোলা সিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর এলিয়ে ও এসে দাঁড়ায় কাজলের কাছে। কাজল কথা কইছে না দেখে নিচের ঠোঁটটাকে কেবলই উপরের ঠোঁট দিয়ে চাপতে থাকে। মা ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলে, ওলো ও বিন্তি! খাওয়া-দাওয়া সব ভুলে গেলি নাকি ? পড়ুক ভাদর মাসে পিত্তি পড়ে জ্বর হউক, তখন ভাদু পুজো বেরিয়ে যাবে।
বিনতা একটুও নড়ে না, সাড়া দেয় না, মাটিতে চোখ নত করে সমস্ত দেহটাকে শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার ঠোঁটের মধ্যে কাপড়ের খুঁটটাকেও চেপে ধরে। কাজল একবার সন্তর্পণে ওর মুখের দিকে চায়। রাগে অভিমানে সারা মুখটা ফুলে উঠেছে, কিন্তু চোখ দুটিতে তার ছোঁয়া লাগে নি। সেখানে কৌতুক ও আনন্দের শেষ নেই। ঐটাই চোখের গঠন-বৈচিত্র্য—এমন চোখ যার তার রাগ দেখলে হাসি পেয়ে যায়। কাজলও হেসে ফেলে, বলে, এই বিন্তি, তোর মা ডাকছে, যা খাবি যা।

ওর হাসিতে বিনতা আরও রেগে যায়, বলে, তুই খেয়েছিস ?

কাজল বলে, সে খবরে তোর কাজ কি ? তুই ত আমার ফুলটা নিলি না। আমি বোকা, আমার ফুল দেখে হি হি করে হাসি। বেশ করেছি ফুল ছিঁড়েছি, আমার তোলা ফুল আমি ছিঁড়ব।

বিনতা কি বলত, ওর মা এবার 'হ্যালা বিন্তি' বলে বেরিয়ে আসে আর কাজলকে দেখে বলে, কে রে কাজল নাকি ?

কাজল সেদিকে না চেয়েই বলে, হু মাসী।

মা বলে, তুই সকাল থেকে কোথায় ছিলি—রে কাজল ? এই একটু আগে তোর বাবা খুঁজতে এসেছিল। বলে সকাল থেকে ছেলের দেখা নেই, ওদিকে ঘরে কুটুম এসেছে। তা তুইও থাক নি, আর দুধ মেখে দুটো চিঁড়ে খাবি, তার পর বাড়ী যাস। কাজলকে নিয়ে আয় মা বিন্তি, আমি তোদের খেতে দিয়ে চান করতে যাই, ভাদুরে রোদ কেবলই বাড়ছে।

বিনতা বলে, চল খাবি।

কাজল উঠে দাঁড়ায়, বলে, তোর জন্তে আজ আমার বাবার কাছে মার খেতে হবে বিন্তি।

—কেন আমি কি করলাম শুনি ? তুই বাড়ী থাকবি না তার জন্তে কি আমি দায়ী ?

মুখ ভেঙচিয়ে কাজল বলে, 'তার জন্তে কি আমি দায়ী ?' আমি ঘরে থাকলে মাটি-খোঁড়া, ফুল-তোলা, কম্পাস আনা, ফুল-আঁকা সব আপনি হয়ে যেত. না ? তোর মা বলছে আবার কুটুম এসেছে। একা বোধ করি সামলাতে না পেরে আমায় খুঁজতে এসেছিল। আজ বেশ ঘা-কতক দেবে বুঝতে পারছি।

—তা এসব না করলেই পারতিস।

—'না করলেই পারতিস', তবে মুখ ফুলিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলি কেন ?

রান্নাঘরের দাওয়ায় মায়ের কাছে এসে কথার মোড়টা ঘুরে যায়। মা স্নান করতে গেলে বিন্তি বলে বেশ সঙ্কোচের সঙ্গে—হ্যাঁরে, ভাত খেয়ে ও-বেলা আমাদের সঙ্গে ভাদু আনতে যাবি না ?

কাজল বলে, এখন কি করে বলব ? আগে দেখি—বাবা কি রকম দেয় তার পর তো ?

দু'জনেই বাপের এই দেওয়ার ইঙ্গিতে হেসে ফেলে।

বেলা তিনটের সময় ঢাক, কাঁসি ও বাঁশি নিয়ে ডোমেরা আসে। ডোম-বুড়োর কাঁধে ঢাক, ছেলের হাতে বাঁশি, নাতির হাতে কাঁসি। কাজল আসে না। বিনতার চুল বাঁধা সবে শেষ হয়েছে। চিকণ-কালো চুলে একটা চাটাই খোঁপা, টেপারী ও কাঁটায় ভরা। বাঁকা সিঁথির দু'-পাশে দুটো প্রজাপতি ক্লিপ। কপালে লাল টিপ, নাকে নাকছাবি। রেশমের জামার ওপর সুতোর লাল ফুলপাড় সাড়ি। মা বলে, মল দুটো পর পায়ে। ভ্রূ কুঁচকে সে প্রত্যাখ্যান করল—দূর, আজকাল কেউ পরে না মা। মলের বদলে আলতায় পায়ের পাতা রাঙিয়ে নেয়। আঁচলটা কোমরে গুঁজে টপ করে একটা পান আলগোছে মুখে ফেলে ওর সকালবেলার সঙ্গিনীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুমন্ত কাবিগরের বাড়ীর পানে।

কাজলদের দোরের সামনে দিয়ে পথ। কাজলকে কোথাও দেখা যায় না। ওর বাবার গলায় হাসির আওয়াজটা শুধু শোনা যায়। কি জানি যদি মারধোর করে থাকে আর কাজল যদি রাগ করে

কোথায় চলে যায় ? চোখে হাসি থাকলেও ঠোঁটের কোণে বিষাদের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। না, তাকে না বলে কাজল কোথাও যাবে না, আর গেলে তার ভাদু আনাই যে মিথ্যে হবে।

বুড়ো সুমন্ত দাস বারান্দায় বসে হুকোতে তামাক খাচ্ছিল। বিনতাকে দেখে হুকোর পারেই হেসে নিল খানিকটা। গুন্ গুন্ করে পুরনো কালের সুরে গেয়ে উঠল—

"এলো মোদের ভাদুমণি সোনার শরতে
মনটি কেড়ে নিল সে যে চোখের হাসিতে।"

—তার পর ভাই 'চোখের হাসি' ভাদু নিতে এলে তা হলে ?

—যাও, অমন বল না বুড়ো।

নিমি, সোহাগ, চুনি কিছু না বুঝেই খিল খিল করে হেসে ওঠে। বারান্দায় দেওয়াল ঘেসে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ভাদুর দল। বিনতা একটার পর একটা দেখতে থাকে।

হুকো এক কোণে রেখে সুমন্ত দাস বলে, ওগুলি কি দেখছিস ভাই, তোর লেগে আলাদা ভাদু গড়ে আমি ঘরের ভেতর রেখেছি।

একটু পরেই দু'হাতে মৃন্ময় মূর্তিটাকে বুকের কাছে ধরে বেরিয়ে আসে সুমন্ত দাস। যেন ওর প্রাণের কোন পরম বস্তুকে বার করে আনে। ঘন সাদা ভ্রূর নিচে ভিজে ভিজে চোখে ওর এক অপরিসীম পরিতৃপ্তি ফুটে ওঠে। মাটিতে নামিয়ে দিতেই ওরা অবাক হয়ে যায়। বিনতা প্রথমে অতটা বুঝতে পারে না কিন্তু নিমি হঠাৎ বলে ওঠে, ওলো বিন্তি, ভাদুর চোখ দুটো একেবারে হুবহু তোর মত ভাই।

—যাঃ, তা কি হয় ? বিনতা লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

—হয় কি না হয় আয়নায় মিলিয়ে দেখগে যা, এমনি ত পেত্যায় যাবি নে।

—তবে এ ভাদু আমি নেব না। প্রায় কান্নার সুরে বলে বিনতা।

বৃদ্ধ কারিগর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিল, বিনতার কথা শুনে তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, বলে—সে কি ভাই 'চোখের হাসি, এই ভাদুর চোখে হাসি ফোটাতে আমার তিন রাত জেগে পরিশ্রম করতে হয়েছে। তুই না নিলে এ যে আমি আর কাউকে দিতে পারব না।

চোখ দুটি ছাড়া অবশ্য আর কোথাও কোন মিল নেই। বয়ঃ বাকিটুকু বিনতার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর করে গড়া। বুড়ো শিল্পী সেদিন বিনতার চোখে কিসের প্রেরণা পেয়েছিল কে জানে, ও যেন ওর সারা জীবনের তপস্যার ফল এই একটি মূর্তির পেছনে ঢেলে দিয়েছে। ওটাকে মাটির মূর্তি হতে বুড়োর হাত সজীব একটি কিশোরী মেয়ের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে। সারা অঙ্গের লাবণ্য, চঞ্চলতা ও কৈশোরের পবিত্রতায় ভরা একমুখ হাসি নিয়ে মেয়েটি যেন এক্ষুনি কথা কইবে।

বিনতার নিজেরও ভাল লেগেছিল। আঁচলের খুঁট থেকে পয়সা বার করতে থাকে সে। কিন্তু বাধা দিয়ে সুমন্ত দাস বলে, ওটি হবে না ভাই, এর জন্যে পয়সা আমি নেব না আর নিলে এর দায় তুই দিতে পারবি না। এটা তোকে দেব বলেই এমন করে গড়েছি। তার চেয়ে জাগরণের দিন তোর কুঞ্জে নিশি পোহাব। সবাই হেসে ওঠে বুড়োর রসিকতায়। কিন্তু বিন্তি ক্ষেপে যায়—তবে রইল তোমার ভাদু, আমার চাই না।

সুমন্ত উঠে কাছে আসে, বলে, আমার কথায় কি রাগ করতে আছে ? বেশ, ওসব আর বলব না, কেমন ? ভাদুরাণী যেমন আমার মা, তুইও ঠিক তেমনি, মায়ের হাতে এই বুড়ো ছেলের খাবার সাধ হয়েছে। ঐ পয়সা দিয়ে আমার জন্যে ভাল ভাল খাবার করে রাখিস, সন্ধ্যাবেলা তোর ওখানে গিয়ে খাব।

পাগলা বুড়ো।

বিনতা বলে, দেখ ঠিক যাবে ত ? বিনি পয়সায় তোমার ভাদু আমি নেব না।

—না গো না, নিশ্চয় যাব। বলিস ত রোজ সন্ধ্যাবেলা যাব তোর ঘরে।

ঢাক, বাঁশি ও কাঁসির বাদ্যে পাড়া মুখরিত করে বিনতা ভাদু নিয়ে আসে।

তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়ার একটু পরেই বুড়ো সুমন্ত দাস বাঁ-হাতে লণ্ঠন ও ডান হাতে লাঠি নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে উপস্থিত হয়। একবার থমকে দাঁড়ায় বুড়ো—সামনেই ভাদুর ঘর। ভাদুর সামনে বসে পাড়ার কয়েকটি মেয়ে মালা গাঁথে আর একসঙ্গে ভাদুর গান গায়—

ঐ যে মোদের ভাদু শোভিছে
যেমন মৃগনয়নী
তেমনি সোহাগ ভরা মধুর হাসি
রূপে ভুবন আলো করেছে।

কিন্তু বিনতা নেই ওদের মধ্যে। সাড়া দিয়ে ডাকতেই বিনতার মা বেরিয়ে আসে—ওমা ! সুমন্ত কাকা !

—হ্যাঁগো, তোমার মেয়ে 'চোখের হাসি' নেমন্তন্ন করেছে আমায়, তা তাকে দেখছি না যে ?

—দেখবে কি করে কাকা, সেই বিকেল থেকে বসেছে খাবার তৈরি করতে, এখনও তা শেষ হ'ল না। তুমি ঘরে উঠে বস, আমি দেখি তার কতদূর হ'ল।

'হো হো' করে হেসে ওঠে সুমন্ত দাস। বাকি মেয়েদের সঙ্গে ভাদুর সামনে চাটাইয়ের উপর বসে।

খানিক পরেই বিনতা আসে। কোমরে শক্ত করে আঁচলটা বাঁধা, আগুনের আঁচে মুখটা ঘামে সিক্ত। একেবারে খাবারের থালা নিয়েই প্রবেশ করে। পেছনে মা আসে জলের গ্লাস নিয়ে।

—সত্যি সত্যিই আমার খাওয়াবার ব্যবস্থা করে ফেলেছ ভাই 'চোখের হাসি', আমি তখন ঠাট্টা করে বলেছিলাম।

থালাটা নামিয়ে দিয়েছিল বিনতা, গরম গরম ভাজা মালপোয়া

আয়সে, একবাটি ঘন ক্ষীর। সহসা থালাটা তুলে নিয়ে বলে—না খাবে ত তোমার ভাদু ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

—না না ভাই, অত কি রাগ করতে আছে? বলে থালাটা ওর হাত থেকে টেনে নেয় সুমন্ত দাস।

বিনতার মা বলে, বেশ পেট ভরে খাও কাকা 'তোমাকে খাওয়াবে বলেই ও সাধ করে অত সব করেছে।

খাওয়ার পর সুমন্ত দাস তার বেনিয়ানের পকেট থেকে একটা ছোট হুঁকো, কল্কে ও কাগজে মোড়া তামাক বার করে সাজতে বসে। বিনতা যখন মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসে তখন বুড়ো পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ছোট হুঁকোটিতে আরামের সঙ্গে টান দিতে সুরু করে। বেশ একটি শব্দ উঠে—ফুড়ুর ফুড়ুর। কিশোরী মেয়েরা শব্দ শুনে হাসে।

কিন্তু বিনতার আজ মোটেই হাসতে ইচ্ছে করে না। ওর সঙ্গিনীরা হাসে, ভাদুমণিও হাসেন কিন্তু ও কিছুতেই হাসতে পারে না। তার এত সাধের ভাদু কাজল দেখল না। ভাদুর পায়ের কাছে কাজলের তোলা পদ্মগুলি এখনও ম্লান হয় নি। চোখের দু-পাশে কি সুন্দর পদ্ম দুটো এঁকেছে কাজল, বুড়ো সুমন্ত দাস দেখে নি। দেখলে নিশ্চয়ই প্রশংসা করত। দেখাবে না কি একবার বুড়োকে, না, কেমন যেন লজ্জা হয় বিনতার। ভাদুর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে—যত রাতই হউক কাজল যেন একবার আসে।

সবাইকে নীরব দেখে সুমন্ত দাস বলে, বল গো, তোরা ভাদুর গান বল, শুনি। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে বিনতা—আচ্ছা সুমন্ত দাদা ভাদু কি দেবতা? মা দুর্গা, লক্ষ্মী সরস্বতীর মতন।

—দুর্গা! লক্ষ্মী! সরস্বতী। হুঁকো নামিয়ে রেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে সুমন্ত দাস।

—না ভাই, ওঁদের মত নন ভাদুরাণী। তিনি ছিলেন তোমারই মত একটি মেয়ে।

—আমার মত? যাও বুড়ো, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। বল না ভাল করে, ভাদুরাণী কে?

পা দুটো গুটিয়ে সোজা হয়ে বসে সুমন্ত দাস। —না ভাই ঠাট্টা নয়, তোমার মতই একটি মেয়ে, তবে তিনি রাজার মেয়ে।

—কোথাকার রাজার মেয়ে সুমন্তদাদা? সবাই কৌতূহলে একাগ্র হয়ে উঠে।

বুড়ো সুমন্ত দাসের ঘোলা চোখে স্বপ্ন নেমে আসে।

—"ঐ যে দক্ষিণে লম্বা নীল পাহাড়টা দেখা যায় দিনের বেলা, বর্ষাকালে যার মাথায় মেঘ এসে বসে—সেই পঞ্চকোট পাহাড়ের উপর ছিল—পঞ্চকোটের রাজার পাথরের বিরাট গড়। তার হাতীশালে শত শত হাতী, ঘোড়াশালে, লাল, নীল, সাদা, কালো ঘোড়া, পিঁজরায় কত নাম-না-জানা বনের পাখী, বাঘ, সিংহ, বুনো মোষ আর গড়ের উপর পেখম তুলে নাচতো হাজার হাজার ময়ূর। সেই রাজার একমাত্র মেয়ে আমাদের ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরাণী।"

—তবে যে তুমি বললে, আমাদের বিন্তির মত? চুণি বলে উঠে।

—হাঁ ভাই, ওরই বয়সি আর মনটি অমনি সুন্দর বলে চোখ দুটি কেবলি হাসত।

বিন্তি বলে, থাম না চুণি, বলতে দে না সুমন্ত দাদাকে। তার পর, তার পর সেই রাজকন্তে কেমন করে ভাদুরাণী হলেন সুমন্ত দাদা?

—"রাজকুমারী ভদ্রেশ্বরীর বিয়ের জন্ত রাজা ব্যস্ত হয়ে উঠেন। কালো সাদা ঘোড়ায় চেপে, মাথায় লাল নীল পাগড়ি বেঁধে, কোমরে চকচকে তরোয়াল ঝুলিয়ে লোকলস্কর ছুটে যায় উপযুক্ত রাজপুত্রের সন্ধানে। রাজকুমারীও জানতে পারেন তাঁর বিয়ে। স্বপ্নে দেখেন এক অপরূপ রূপবান রাজপুত্রকে ঘোড়ায় চড়ে আসছে—ঝড়ের বেগে চারিদিকে ধুলোর অন্ধকার তুলে সে আসে আর ঘোড়া থেকে না নেমেই এক ঝটকায় রাজকন্তাকে তুলে নেয় ঘোড়ার পিঠে—তার পর কত দেশ-দেশান্তর, নদ-নদী পার হয়ে একদিন গিয়ে উঠে দুধের মত সাদা এক বাড়ীতে, যার দেওয়ালে হীরে-মাণিকের ছড়াছড়ি। রাজকুমারীর ঘুম ভেঙে যায়। ওদিকে লাল নীল পাগড়ী বাঁধা লোকলস্কর ফিরতে থাকে একে একে দূর দূর দেশের রাজপুত্রের সন্ধান নিয়ে। রাজা শোনেন রাজপুত্রদের রূপ আর গুণের কথা, শেষে পছন্দ করেন একজনকে। অমনি পঁচিশটা তোপ পাহাড়ের উপর থেকে দুম্ দুম্ আওয়াজ করে জানিয়ে দেয় রাজকন্তা ভদ্রেশ্বরীর বিয়ে। পুরুৎঠাকুর এসে দিন ঠিক করে দেন। সংবাদ নিয়ে লোকজন আবার ছুটে যায় রাজপুত্রের দেশে।"

—তার পর? বিনতা যেন নিজেই ছুটে চলেছে রাজপুত্রের দেশে এমনি ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করে।

ছোট হুঁকোয় জোর জোর টান দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ে সুমন্ত দাস।

—"তার পর রাজকুমারী ভদ্রেশ্বরীর গায়ে-হলুদ সেদিন সকাল বেলা। পাহাড়ের নিচে থেকে উপরে অদ্ভুত অদ্ভুত সব বাজনা বাজে, বুনো মোষ, ঘোড়া হাতী আর ময়ূর সেই বাজনার তালে তালে নাচে। সারা নীল পাহাড়টা রাজার লক্ষ লক্ষ প্রজায় যায় ভরে। হাসি আর আনন্দ। আনন্দ আর হাসি। শাক-পালার সবুজ পাতাগুলি পর্যান্ত সোনার রোদ পেয়ে হাসে। অন্দর মহলে সোনার পিঁড়িতে বসেন রাজকন্তে। একে একে তাঁর গা থেকে সব অলঙ্কার খুলে রাখে দাসীরা—চুল খুলে দিয়ে একখানি হলুদ-বরণ শাড়ি পরিয়ে দেয়। সামনে সাজিয়ে রাখে থরে থরে সোনার বাটিতে হলুদ, চন্দন, ধান, দূর্ব্বা আর লোকাচারের নানান জিনিস। সখীরা, দাসীরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে, অপেক্ষা করে

রাজপুত্রের। তিনি এলে তাঁর গায়ে হলুদ ঠেকিয়ে সেই হলুদ মাখান হবে রাজকন্যার গায়ে। এমনিই নিয়ম।

—"ওদিকে বাইরের মহলে রাজা অস্থির হয়ে ঘন ঘন পায়চারি করেন। রাজপুত্র এখনও আসেন না কেন। লগ্ন যে বয়ে যায় যায়। পাহাড়ের সব লোক চেয়ে আছে দূরে পথের পানে, কখন সেখানে ধূলো উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে রাজপুত্র ছুটে আসবেন। নাঃ কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পথ একেবারে ঝাঁকা।"

সব কটি শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সুমন্ত দাসের ঘোলাটে চোখের দিকে। দোরের পাশেও কয়েকজন এসে দাঁড়ায়।

সুমন্তদাস বলে চলে, "না, আর অপেক্ষা করা যায় না। রাজ-পুরোহিত এসে নিবেদন করেন—"সময় পার হয়ে যাচ্ছে। চিন্তিত বড় বড় চোখ তুলে রাজা চেয়ে থাকেন পুরোহিতের দিকে। না, আর অপেক্ষা করা যায় না সত্যিই। পাঁচটা ঘোড়সোয়ার অল্প পরেই তীর বেগে পাহাড় বেয়ে নেমে যায় সেই পরিষ্কার পথের উপর, কোথায় রাজপুত্র খবর নিতে।"

রাজার চেয়েও ব্যাকুল হয়ে বলে বিনতা, "কি হ'ল রাজ-পুত্রের?"

সুমন্ত দাস শুনতে পায় না, বলতে বলতে বিভোর হয়ে যায়।

সারা পাহাড়ের লোকের মুখ শুকিয়ে যায়। সোনার পিড়িতে রাজকন্যা অপমানে, দুঃখে ভাবেন, রাজপুত্র এলেন না, কেন? ফোঁটা ফোঁটা জল জমে ওঠে, কালো চোখের পাতায়। বাজনা-গুলোতে অন্যমনস্ক বাজিয়ের হাতে থেমে থেমে দুঃখের সুর বেজে ওঠে।

পাহাড়ের উপর দুর্গের সবচেয়ে উঁচু ছাদে পথের দিকে দূরবীণ দিয়ে দেখেন রাজা। ফুরফুরে বাতাসেও তাঁর শরীর ঘেমে উঠে। এমন সময় দূর বনপথে কালো কালো ফোঁটার মত কি যেন দেখা যায়, পরিষ্কার হয়ে আসে, শত শত ঘোড়া ঘোড়ার পিঠে মানুষ—অসংখ্য লোক-লস্কর—অসম্ভব বেগে ছুটে আসে তারা, আরও কাছে, পাহাড়ের নীচে এবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কোন শব্দ নেই, নেই ডঙ্কা, শিঙ্গা, জয়ঢাকের গুরু গুরু শব্দ নেই, চারিদিক পাগল-করা সানাই আর বাঁশীর মোহন সুর। তবু ত এসেছে, দূরবীণ ফেলে রাজা ছুটে আসেন নীচে। গর্জ্জে ওঠে একসঙ্গে প্রলয় গর্জ্জনের মত পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পঁচিশটা তোপ। মন্ত্রগুলো চীৎকার করে ওঠে, বাজনাগুলো নূতন করে বাজে। সেই আওয়াজে রাজকন্যার জমানো চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে লজ্জায় পাতা জড়িয়ে আসে—স্বপ্নের সেই মোহ। রাজার পেছনে সহস্র পুরনারী বেরিয়ে আসেন সহস্র শঙ্খ বাজিয়ে রাজপুত্রকে বরণ করে নিতে, সোনার থালায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে উলু দিতে দিতে। কিন্তু একি! ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্র অমন করে নেতিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন কেন? মুখ তুলে দেখা গেল, ঠোঁটের পাশ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত এসে জমাট বেঁধেছে ঘোড়ার পিঠে—অমন সুন্দর চোখ দুটি বুজে গেছে, ম্লান মুখখানি আবার ঝুলে পড়ে ঘোড়ার কাঁধে। মাথায় করাঘাত করে বসে পড়েন রাজা। সেনাপতির বার্ত্তা শোনে সারা পাহাড়—ঘোড়া হতে পড়ে রাজপুত্র চলে গেছেন অন্তলোকে। সোনার পিড়িতে মূর্চ্ছিতা হন ভদ্রেশ্বরী। বাজনা থেমে গিয়ে সারা পাহাড় আবার নীরব শোকে থমথম করে।

অস্ফুট কাতর শব্দ ভেসে ওঠে চারপাশ থেকে। বুড়ো সুমন্তের চোখে জল, বিনতার চোখেও, শুধু ভানুর চোখে তেমনি হাসি।

ধরা গলায় তবু বলে বুড়ো কারিগর, "রাজকন্যার চেতনা হয়, দেখেন বাবা-মা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের দিকে চাওয়া যায় না। রাজকুমারী বলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর বাবা, আমি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী যাই। অবাক হন রাজারাণী, মেয়ে কি শোকে পাগল হ'ল?" "আগুন জ্বালতে আদেশ দাও বাবা, স্বামীর সঙ্গে যাব, তিনি অপেক্ষায় অধীর হচ্ছেন আমার জন্য।" বুঝতে পারেন রাজা। অনেক যোঝান আদরের আদরিণী একমাত্র মেয়েকে কিন্তু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে সব বাবা মাই ত এমনি কাতর হন, শেষে পাঠাতেও হয়।"

পাহাড়ের মাঝখানে রাত্রির অন্ধকারে বরের চিতা জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। আকাশমুখী সেই লকলকে শিখায় নাচনে শাল, পলাশ আর মহুয়ার গাছগুলো কাঁপতে থাকে থর থর করে—তেল চুকচুকে হয়ে ওঠে তাদের পাতা। কয়েকটা পাথর ফেটে যায় আগুনের তাপে। এখনও কিন্তু পঞ্চকোট রাজের কোলে ভানুমনি বসে আছেন, ঠিক যেন গিরিরাজের কোলে পার্ব্বতী। ধীরে ধীরে রাজকন্যা বলেন, "বাবা, শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে সব মেয়েই তার বাবার কাছে কিছু চেয়ে থাকে—আমিও চাইব। সামলাতে না পেরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন রাজা, বার বার মেয়ের মাথায় চুমু খান। রাজকন্যা বলেন, "কেঁদো না বাবা, যাওয়ার আগে আমার ভিক্ষা, আমার এই যাওয়ার কথা তোমার রাজ্যের সব মেয়েকেই জানিয়ে দিও, তাতেই আমি সুখী হব।"

শোকে পাগল রাজা বলে ওঠেন, "তাই হবে মা, তাই হবে। চিরকাল—চিরকাল আমার রাজ্যে মেয়েরা তোমার পূজা করবে, কিন্তু—"

"আর কিন্তু নেই—রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী—ভানুমণি বাবা মাকে প্রণাম করে এসে দাঁড়ান চিতার সম্মুখে। সোনার বর্ণ তাঁর আগুনের প্রভায় জ্বলে ওঠে। হাত জোড় করে প্রণাম করেন অগ্নিকে, তার পর হাসি মুখে গিয়ে দাঁড়ান আগুনের মাঝখানে।

স্তব্ধ হয়ে যায় বুড়ো সুমন্ত দাস। বাকি সকলের মুখেও কথা নেই। সেদিনের পঞ্চকোট পাহাড়ের শোক যেন থমথম করে সবার মুখে।

সেই ভাদু, ভানুমণি আমাদের তখন থেকেই পূজো পেয়ে আসছেন।

বুড়ো সুমন্ত দাস উঠে দাঁড়ায়, "অনেক রাত হ'ল, আজ আসি তাই চোখের হাসি।"

কাহিনী শেষ হয়েছে কিন্তু তার মোহ কাটে নি। বিশেষ
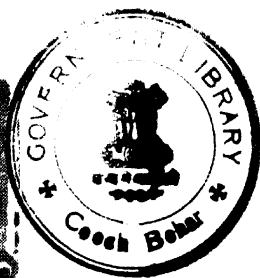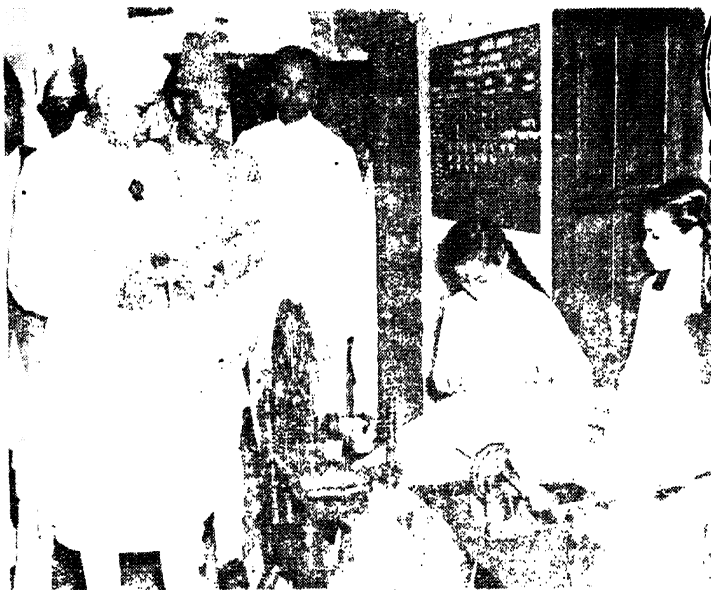
কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত কুটির-শিল্প প্রদর্শনীর সীবন-বিভাগ দর্শনরত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

কিউবার জাতীয়-নেতা আর্নেস্টো গোয়েভেরা ও শ্রীজবাহরলাল পণ্ডিত

হিমালয়ের অন্যতম শৃঙ্গ বুন্দর পঞ্চ অভিযাত্রিদল, দেশরক্ষামন্ত্রী কর্তৃক অভিনন্দিত

বুয়েনো এয়ারেস-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর একাংশ—এখানে নারিকেলের ছোবড়ার তৈয়ারী বিবিধ দ্রব্য দেখা যাইতেছে

করে বিনতা যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে পক্ষীরাজ পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে। রাজকুমারীর সোনার অঙ্গ গলে গলে মিলিয়ে যাচ্ছে আগুনে। ঝিঁঝি, সোহাগ, চুনি কখন একে একে উঠে গেছে নীরবে—ও তেমনি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

"এই বিন্তি, বসে বসে ঘুমুচ্ছিস নাকি?" ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় বিনতা—কাজল?"

"চিনতে পারছিস না বুঝি?"

না ঠিকই চিনেছে বিনতা। প্রদীপের আলোগুলো নিভে গেছে, অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোকে কাজলের ধোয়া মুখটাকে রাজপুত্র বলে ভুল করেনি সে। তবু বলে, "না চেনবারই কথা, কি হয়েছিল রে? এলি না কেন?"

"বাবা কিছুতেই আসতে দিলেন না বিন্তি, এখন শুয়ে পড়তেই আমি পালিয়ে এসেছি। বাঃ বাঃ ভারি সুন্দর সাজ পেয়েছিস ত।

কাছে এগিয়ে যায় কাজল, ভাল করে লণ্ঠন তুলে দেখতে থাকে মূর্তিটাকে। হঠাৎ এক সময় লণ্ঠনের আলোটা বিনতার মুখের দিকে ফেলে বলে ওঠে—"কিন্তু দেখ বিন্তি, চোখ দুটো যেন ঠিক তোর মত।

কাজল সেটা বুঝি এইমাত্র আবিষ্কার করে।

বিনতা বলে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে, "যাঃ, তাই কি কখনও হয়?"

খুব বাস্তভাবেই কাজল বলে, "সত্যি বলছি বিন্তি, তুই অন্য কাউকে শুধাস।"

"বাঃ আমি বুঝি ঠাকুর মত অমনি সুন্দর?"

এবার যেন এই প্রথম জীবনে খুব ভাল করে বিনতার মুখটা কেবলমাত্র দেখবার জন্যই দেখে কাজল। বলে, "সুন্দর? হ্যাঁ, সুন্দরই কি. খুব সুন্দর।"

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বিন্তি ওর মুখের কাছ থেকে বাতিটা সরিয়ে দেয়।

"খুব হয়েছে. এখন দেরী করে এসে মিথ্যে আমার গুণ-গান করে ভোলাতে হবে না।"

এই মুখ দেখার পর কাজল কেমন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "ওরা কেন এসেছে জানিস বিন্তি?"

"কারা?"

"ঐ যে বাবার কুটুম।"

"কেন?",

উশখুশ করে কাজল শেষে ছোট করে বলে, "আমার বিয়ের তরে।"

"বিয়ে?" চমকে ওঠে বিনতা।

"হ্যাঁ. আমার তাই দেখতে এসেছিল। ক'দিন পর আমিও যাব কনে দেখতে। খুব মজা হবে কি বল বিন্তি?"

অপলক চোখে কাজলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে বিনতা, কেন কথা ওর গলা দিয়ে বার হয় না। কেন ও যেন নিজেই জানে না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মুখখানি শুকিয়ে গেছে, কপালের একগাছি চুল এলিয়ে পড়েছে গালের উপর। কাজলও অবাক হয় ওর এই ভাবান্তরে। এত বড় একটা আনন্দের সংবাদ, বিন্তি কিনা চুপ করে রইল? হয়ত অবাক হয়ে গেছে।

"কি হ'ল রে?"

গলাটা আপনিই ধরে আসে, "কিছু না, বিকেলে খাবার করেছিলাম সুমন্ত বুড়োর জন্যে, খুব ভাল খাবার; তোর জন্যে রেখেছি, খাবি?

—আজ ত ভাল ভাল খাবার খেয়ে পেট ভরে আছে। তবু চল তোর কি আছে দেখি।

খাবার সময় বিনতা কোন কথা বলে না। কাজলও সাহস করে না ওর মুখ দেখে। হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসে কাজল। গুন্-গুন্ করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে যখন সদর-দরজায় পা দিয়েছে অমনি পেছন থেকে ছুটে এসে বিন্তি ওর একখানি হাত ধরে ফেলে। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে যায় কাজল।

—হ্যাঁরে তুই সত্যি বিয়ে করবি? স্বরটা ভাঙা। চোখ দুটো ছলছল করে, কেমন পাগলের মত দেখায় চাঁদের আলোতে।

কাজল বলে, কেন? তোর ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি আমার ওপর?

অদ্ভুত চোখে চায় বিনতা—হ্যাঁ হচ্ছে, তুই কোথাও বিয়ে করতে পাবি না।

এবার ভয় পেয়ে যায় কাজল,—কিন্তু বাবা—

—তুই দেখে এসে বলবি পছন্দ হয় নি, কেমন?

—তা অবশ্যি বললে হয়, কিন্তু কেন বিয়ে করব না?

কঠিন কণ্ঠে বলে বিনতা—যদি বিয়ে করিস তবে—

—তবে কি?

কি যেন একটা বলতে চায়, অথচ পারে না। না পারার যন্ত্রণাটা ফুলে ওঠে সারা মুখে, অবশেষে হার মানে উত্তেজনায়—তবে, তবে আমি জানি না। তার পর একপ্রকার ছুটেই ফিরে আসে ঘরের মধ্যে। বোকার মত কাজল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে পরে ওকে শোনাবার চেষ্টা করে জোরেই বলে, যা বলছি তাই করব, তাই হবে।

কথাটা বিন্তি ঠিক শুনতে পেল কিনা সে বিষয়ে কাজলের একটু সন্দেহ ছিল, তাই পরদিন সকালবেলাই সে এসে হাজির হয়। ঠাকুর ঘরে এসে দেখে সেখানে বিনতা নেই। ঘরটায় ঝাঁট পর্যন্ত পড়ে নি। খাবারের উচ্ছিষ্ট-পাত্র, তামাকের গুল ও ছাই এখনও সেখানে ছড়িয়ে আছে। বাড়ীর মধ্যেও বিনতাকে দেখা গেল না। মা বলে, এইমাত্র ত ছিল, আবার কোথায় গেল। বাড়ীর পেছনে খামার বাড়ী। আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে বিনতা কাজলের বাড়ীর দিকেই চেয়ে আছে। কাজল চুপি চুপি গিয়ে পেছন থেকে ওর দুটি চোখ চেপে ধরে। প্রথমে একটু চমকে ওঠে বিনতা, তার পর সমস্ত শরীর পাথরের মত শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজলের হাত দুটোকে নিজের চোখ থেকে সরিয়ে ফেলার পর্যন্ত চেষ্টা করে

না। অপ্রস্তুত হয়ে কাজল সামনে এগিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিনতা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়।

ওর ভাবগতিক দেখে কাজল বলে, তুই যখন বলছিস তখন বিয়ে করব না বিন্তি, তবে বাবাকে ত না বলা যাবে না। ঐ মেয়ে দেখে এসে বলব পছন্দ হ'ল না। নে, আর রাগ করে থাকিস না, ভাল করে চা এদিকে।

তেমনি মুখ ফিরিয়েই বিনতা বলে, রাগের কি আছে, তুই বিয়ে করবি তাতে আমার কি?

—বারে, কাল রাত্রে তুই বারণ করলি না?

—করেছি বেশ করেছি, সে আমার খুসি। আমার বারণ তুই শুনবি কেন? তোর বৌ যখন বারণ করবে, তার কথা শুনিস।

—এতো তোর রাগের কথা। বলছি ত বিয়ে করব না। আচ্ছা কেন বারণ করলি এবার বল।

শরাহত হরিণীর মত চেয়ে থাকে বিনতা। দৃষ্টির সে ভাষা কাজল পড়তে পারে না, শুধু আরও বিব্রত হয়ে পড়ে। খপ করে ওর হাত দুটো ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করে—বলবি না?

কাজল কি কিছুই বোঝে না? বিনতা আর সামলাতে পারে না নিজেকে, ওর হাতের ওপর মাথা রেখে জমাট অভিমানটা ঢেলে দেয়। কেঁদে ফেলে ঝরঝর করে। বিয়ে করলে তুই আমায় ভুলে যাবি।

কাজল ব্যস্ত হয়ে ওর মুখটা তুলে ধরে নিজের কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দেয়। তার পর বলে, ছিঃ ছিঃ বিন্তি, তাই কি কখনও হয়, তোকে ভুলে যাব আমি? কে পারে ভোলাতে আমায়? এই তোর পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, বিয়ে আমি কিছুতেই করব না। কিন্তু তোরও যে বিয়ে হবে, তখন তুইও ত আমায় ভুলে যেতে পারিস?

এটা একবারও মনে হয় নি বিনতার। নিজের দিকটা ভেবে দেখে নি সে একবারও; কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সুমন্ত বুড়োর কাল রাতের কাহিনীটা তখনও ঘোরে মাথার মধ্যে, ঝোঁকের মাথায় বলে বসে—আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

কাজল হাসে—ইস! কার সঙ্গে?

—সে বলব না, যা, সলজ্জভাবে জানাতে চাইল কিন্তু কাজল ধরে ফেলল ওকে,—না বলতেই হবে।

—আচ্ছা ছেড়ে দে বলছি।

সন্দিগ্ধভাবে কাজল তাকে ছেড়ে দিতেই সে কাজলের কানের কাছে মুখ নিয়ে দুটি কথা বলেই পড়ি-কি-মরি করে ছুট দিল ঘরের মধ্যে।

একটা নূতন চেতনা যেন অস্ফুটভাবে গুঞ্জন করতে থাকে কাজলের কানে কানে—তোর সঙ্গে। বিনতার সঙ্গে তার বিয়ে, বিন্তি তার বউ, কোনদিন ত ভাবে নি সে। হাঃ সব বাজে কথা, ওর যত চালাকি। তবু এ বিয়ে বন্ধ করে আসতে হবে নইলে ঐ মেয়ে হয়ত কথাই কইবে না, আর বিন্তির সঙ্গে কথা না করে থাকতে পারবে না কাজল।

ভাদুর জাগরণের তিন দিন আগে ইন্দ্রাজের পুজোর দিন সকালবেলা ঐ বিয়ে বন্ধ করতেই গেল কাজল। সঙ্গে গেল এক মামা। পাত্রের পক্ষে মেয়ে দেখতে যাবার রীতি ওদের মধ্যে মোটেই প্রচলিত নেই, পাত্রীপক্ষের মেয়েরা—পাত্রীর মা, পিসীমা ইত্যাদি একবার ভাবি জামাইকে দেখবেন বলেই এই অনুরোধ করে পাঠানো। কাজল কিন্তু তার নিজের পছন্দের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে জেনেই খুব উৎসাহের সঙ্গে বিন্তির অমনোনীত বিয়েটাকে ভেঙে দিতে রওনা হয়। যাবার সময় বিন্তি হাসিমুখেই বিদায় দেয়—দেখিস কাজল, কথা রাখিস, চাঁদপানা কনের মুখ দেখে ভুলে যাস নি। মুখে হাসলেও শঙ্কা থাকে ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে। কাজল তাড়াতাড়ি একটা দিব্যি করে ওকে নিশ্চিন্ত করতে চায়।

—আর ভাদুর জাগরণের দিন নিশ্চয়ই ফিরবি ত? না এলে সব নষ্ট হবে। সে আর বলতে। কাজল বেরিয়ে যায়। বিনতা অপলক চোখে চেয়ে থাকে। কাপড়-জামা পরে কি সুন্দরই না দেখায় আজ কাজলকে।

কাজল কি করে আসে আর অপছন্দ করে এলেও ওর বাবা যদি জোর করে বিয়ে দেয় এই চিন্তাটা সারাক্ষণ বিনতার মনে গুরুভারের মত চেপে থাকে।

শুধু সন্ধ্যাবেলাটা কাটে একটু আমোদে। তখন সুমন্ত দাস আসে, আসে ওর সঙ্গিনীরা সোহাগ, বিন্দি, চুণী, পাড়ার আরও অনেক মেয়ে। লখিন্দর ওর বাবার যৌবনকালের সখের বস্তু বর্তমানে এক অর্দ্ধেক রীডওয়ালা হারমোনিয়াম নিয়ে আসে। ভাদুর গানের সময় ঐটাকে ওস্তাদের মত এক কোণে নিয়ে বসে আর খুশীমত টিপতে থাকে। বুড়ো সুমন্ত দাস হাসে আর হাততালি দেয়। ক'নে দেখতে যাবার আগে ক'দিন কাজলও এসেছিল ওর বাঁশীটা নিয়ে। ভারি সুন্দর বাঁশী বাজায় কাজল। ভাদুর গানের সুরে সুর মিলিয়ে সে বাজাত। বিনতার গানগুলি সেই সুরে হয়ে উঠত আশ্চর্য্য রকম সুন্দর। এখন কাজল নেই, বিনতারও গানে মন বসে না। সুমন্তদাস যেন কি একটা অনুভব করে, রহস্য করে মোটা গলায় গেয়ে ওঠে—

ওহে কানাই বংশীধারী কোথায় গেলে কাহার গলিতে,
শ্রীরাধিকার মন বসে না ফিরে ফিরে চায় যে চকিতে।

বেশী দিন নয়, মাত্র তিনটি দিন। আশঙ্কার কালো ছায়া নিয়ে ধীরে ধীরে সরে যায়। আসে ভাদ্র-সংক্রান্তি—ভাদুর জাগরণ। অধীর প্রতীক্ষার মধ্যেই বিনতা মহাসমারোহে ভাদুকে সাজাতে বসে। কাজল নেই। লখিন্দর আনে ফুল তুলে। মেঝেতে পড়ে নূতন আলপনা। মিষ্টির দোকানে বায়না দিয়ে আসে। অস্বাভাবিক আকারের বড় বড় চিনির নাড়ু আর জিলিপি দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে ভাদুর সামনে। সুমন্ত দাদাকে নেমন্তন্ন করে আসে নূতন করে। কিন্তু আলো? আলো না পেলে যে সবই অন্ধকার। লখিন্দরকে বলে—পারবি না ভাই? কাজল থাকলে আনত। মাথা চুলকে লখিন্দর খানিক ভাবে—আমাকে

কি দেবে ? মাড়োয়ারীদের একটা হ্যাসাক আছে। আচ্ছা দেখি। সে চলে যায়। দুপুর বেলা এসে বলে, আমাকে দিচ্ছে না, বলছে ছোট ছেলে ভেঙে ফেলবি। কি যে করি, যাত্রাদলের একটা ছিল, ভেঙে গেছে। শেষ চেষ্টা করে বিনতা সুমন্ত দাসকে বলে।

সন্ধ্যাবেলা সুমন্ত দাসই নিয়ে আসে মাড়োয়ারীদের আলোটা এক টাকা ভাড়া দিয়ে—একেবারে জ্বালিয়ে। গমগম করে সমস্ত ঘরটাকে চমকে দেয়, ভাদুরাণীর চোখমুখ উঠে জ্বলে। কিন্তু কাজলের তখনও পাত্তা নেই—বার বার পাঠায় লখিন্দরকে ওদের বাড়ী। বার বার মনে হয়—সোনার পিঁড়িতে বসে আছেন ভাদুরাণী, রাজপুত্র এসে পৌঁছাচ্ছেন না। ওদিকে নিমি, সোহাগ, চুণি সবাই একে একে এসে পড়ে। সুমন্ত দাস অধীর হয়ে উঠে। এমন উৎসবের দিনে মেয়েগুলি ভাদুর গান করে না কেন ? কি হয়েছে ওদের ? ঘরের কোণ থেকে লখিন্দরের ভাঙা হারমোনিয়ামটা তুলে নিয়ে আসে সুমন্ত দাস, ঐটাই সজোরে টিপে, ওদের শুনিয়ে ধরে ভাদুর গান। বাকি মেয়েরা বিনতার অভাবেই চুপ করে ছিল, হঠাৎ উৎসাহ পেয়ে হাসতে হাসতে বুড়োর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেয় :

> ভুলে কি আছিস তোরা আজকে ভাদুর জাগরণ ?
> এত মেজাজ কিসেরি কারণ ?
> হেসেখুশে করতে হয় যে সারা নিশি জাগরণ।
> কাজল পরে কবে নে ভাই চক্ষেরি বাহার
> রাঙা গাল কর মেখে গোলাপী পাউডার,
> বিড়ি এঁটে শাড়ী পরে নূপুর বাজাও রুনরণ।

বিনতা দাঁড়িয়ে থাকে সদর-দরজায় ঠেস দিয়ে। চেয়ে থাকে শরতের চাঁদধোয়া পল্লিপথে, কখন ওখানে ছুটে আসবে কাজল। লখিন্দর গেছে ডাকতে। ওদিকে ভাদুর ঘরে গানটা খুব জমে উঠেছে, বুড়ো কারিগর মাতিয়ে তুলেছে সবকটা মেয়েকে, ওরা এখন ভুলে গেছে বিনতার অনুপস্থিতি।···পঞ্চকোট পাহাড়ে নানা সুরে বাজনা বাজে, ময়ূর নাচে পেখম তুলে, সারা পাহাড় অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে রাজপুত্রের। এত দেরী হবার ত কথা নয়, তবে কি কাজলের কোন বিপদ হ'ল ? না, ঐ যে পথের উপর কারা দুজন যেন আসছে ? সোজা হয়ে দাঁড়ায় বিনতা। হাঁ লখিন্দরের গলা শোনা যাচ্ছে। খানিকটা পথ ছুটেই আসে লখিন্দর কিন্তু ও একা, ওর পেছনের ছায়াটাকেই আর একটা মানুষ ভেবেছিল বিনতা। হাঁপাতে হাঁপাতে লখিন্দর বলে, কাজল এসেছে।

আনন্দে নেচে উঠে বিনতা—এসেছে ? কৈ ?

বার বার গিয়ে খুব বিরক্ত হয়েছিল লখিন্দর, বলে, এখন আসবেন না, মেজাজ হয়েছে লাটসাহেবের। বিয়ে যেন আর কেউ করে না। বললেন পান্‌-খাচ্ছে বেদনা, এক ঘুম দিয়ে তার পর যাব।

—এইমাত্র বুঝি এল ?

—এই মাত্র এলে কি হবে। হেঁটে ত আসে নি, ট্রেনে চেপে এসেছে। নে মে ওর জন্তে আমাদের আনন্দটা মাটি করিস নে, ও একেবারে বদলে গেছে।

—বদলে গেছে কিরে ? বিনতা লখিন্দরের কাঁধ দুটো চেপে ধরে—কি হয়েছে বল ভাই লখিন্দর, ওকি—

—হাঁটুর নীচে ত বাবুর কোন দিন ধুতি নামে নি, আজ একেবারে পায়ের পাতা ঢাকা কোঁচান ধুতি, ও-পাড়ার অঘোরবাবুর মত চকচকে সিল্কের জামা তাতে আবার সোনার বোতাম। হাতে সোনার আংটি, মুখে পান ব্যজব্যজ করছে, আর যে কখনও বিড়ি খায় না তার মুখে সিগারেট। জানিস বিড়ি, আমায় আবার আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে।

—কোথায় পেল এসব ?

—কেন ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা দিয়েছে, বললে তারা নাকি খুব বড়লোক, তিনটি ধানের মরাই আর দুটো মোষ আছে ঘরে বাঁধা। রুমালে জড়ানো এক থোক টাকাও দেখালে আমাকে। ওর হবু শ্বশুর দিয়েছে ওকে। ঐ বুড়ো সুমন্ত আমার হারমোনিয়ামের দফা সারল, আয় আয় ও বড়লোকের আশা ছেড়ে দে।

লখিন্দর চলে গেল ভাদুঘরের দিকে। বিনতা ঠায় তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। বড়লোক ! তবে কি কাজল সেই বড়লোকের মেয়েকে দেখে নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল ? বিনতার বাবা নেই, তারা গরীব। ঐ সোনার আংটি, বোতাম কোথায় পাবে তারা ? না এবার সত্যিই সে কাজলকে ভুলে যাবে, একটি কথাও আর কখনও কইবে না তার সঙ্গে। নূতন গান ভেসে আসে ভাদু ঘর থেকে :

> গাঁথা রয়েছে যে প্রাণে প্রাণে
> ছাড়িতে পারি কি তেন ধনে
> (মোদের) আঁখি বারি ঝরিছে।

বুকের ভিতরটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে, ইচ্ছে হয় বুকফাটা চীৎকার করে কাঁদে, তার পর ভাদুটাদু ভেঙে দিয়ে দোর বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকে। কিন্তু তখুনি আবার কল্পনায় ভেসে উঠে ভাদুরাণীর সেই দৃপ্ত মুখ—চোখের জল শুকিয়ে গেছে, হাসিমুখে আগুনকে বরণ করছেন তিনি। ধীরে ধীরে এক সময় বিনতা ভাদুঘরে গিয়ে সকলের করুণ সুরে আপনার গলা মিলিয়ে দেয়। গান থামলে চোখ দুটি ভাল করে মুছে সুমন্ত দাসকে বলে, সুমন্ত দাদা সেই ভাদুরাণীর কাহিনীটা আজকে আর একবার বল।

—ভাদুরাণীর কাহিনী বুঝি খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু সে ত ভাই একদিন বলেছি, এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?

—ভুলি নি, আজ জাগণের দিন আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।

নিমি সোহাগও বলে, হাঁ বল সুমন্তদাদা, ঠিক তেমনি করে।

সুমন্ত দাস বলে, বেশ বলব আবার, কিন্তু ভাই চোখের হাসি চোখের কাজল ত আজও এল না ?

অরিন্দম বলে, চোখের কাজল ধুয়ে গেছে, এসেছে ভদ্রলোক হয়ে। একঘুম দিয়ে মাঝ-রাতে আসবেন।

তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জাদুরাণীর গল্প আবার বলে যায় সুমন্ত দাস। ঠিক তেমনি করে, হুবহু সেদিনের মতই, সেই পঞ্চকোট পাহাড়, সোনার পিঁড়িতে রাজকন্যা, ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্র, হাজার হাজার ময়ূর আর বুনো মোষ। আজও তেমনি আগুন জ্বলে উঠে দাউ দাউ করে, রাজকুমারী—ভদ্রেশ্বরী আগুনে প্রবেশ করেন।

সকলের চোখে আবার জল আসে শুধু জাদুর চোখ আর আশ্চর্য্যের বিষয় আজ বিনতার চোখ থাকে শুষ্ক। আনমনে বিনতা জাদুর পানেই চেয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে একটা বাঁশীর সুর ভেসে উঠে বাইরে, সকলে উৎকর্ণ হয়ে উঠে না, এ পঞ্চকোট পাহাড়ের বাঁশী নয়, এ বাঁশী সত্যিকার, জ্যোৎস্না-ঝরা পথের ধুলায় এর জন্ম।

অরিন্দমই বলে, ঐ এতক্ষণে আসছেন বোধ হয়, যাক, মনে করে বাঁশীটাও আনছেন।

বিনতা ভেবে রেখেছিল কাজলের সঙ্গে সে আর কথা কইবে না। তাই বাঁশী শুনেও সে কঠিন অভিমানে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। কিন্তু কোন সময় বাঁশী এসে থেমেছে ওদের বাইরের দরজার সামনে আর কখন যে বিনতা গিয়ে ছুটে দাঁড়িয়েছে সেখানে তার নিজেরই মনে নেই।

—কাজল কাজল! অরিন্দমের সব কথা যেন ভুলে যায় বিনতা। কিন্তু অরিন্দম মিথ্যা বলে নি। বুকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কোনরূপে চৌকাঠ ধরে সে থমকে দাঁড়ায়। সত্যিই কি বিনতার চোখের কাজল ধুয়ে গেছে? নইলে কৈ তাকে দেখতে পাচ্ছে সে? এমন কাপড়-জামা, বোতাম-আংটির স্রোতে কাজল ভেসে গেছে। অনভ্যস্ত ঠোঁটের চারপাশে পানের রস গড়িয়ে গড়িয়ে লাল হয়ে উঠেছে। যেন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেছে মুখ দিয়ে। না, না, কাজলের বিয়ে হউক, আর সে বাধা দেবে না তাকে।

গলাটাকে বেশ সহজ করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিনতা, বৌ দেখে এলি কাজল?

বিনতার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কাছে এতটুকু হয়ে যায় কাজল। কাঁচুমাচু করে বলে, এই দেখ বিন্তি, বাবাকে বললাম মেয়ে আমার পছন্দ হয় নি, করব না বিয়ে ওখানে—তা বাবা কিছুতেই শুনবে না, তাই ত আমার আসতে এত দেরী হ'ল এখন কি করা যায় বল ত, আমি ভাবছি বিয়ের দিন কোথাও পালিয়ে যাব।

সব মিথ্যা। বিনতা বুঝতে পারে কাজল কেবল তার খেলার সঙ্গিনীকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে। হাসে সে একটু, বলে, তোর কি সত্যিই পছন্দ হয় নি?

কাজলের খানিকটা সাহস ফিরে আসে, মুখও খুলে যায় ওর।

—পছন্দ হলে কি হবে, তুই ত বারণ করলি। শোন তবে—প্রথমে ত বাবার সঙ্গে বসে বসে দেখলাম, ওরা কত কি ভাল ভাল খেতে দিল তারপর বাবা উঠে গেলে আমার যে শ্বশুর হবে সেই বুড়ো এসে বলল, হাঁ বাবা আমার মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়েছে ত? আমি তোর বারণ মনে করে সোজা বলে দিলাম—না আমার পছন্দ হয় নি। বুড়োর মুখখানা অমনি একেবারে চুপসে গেল। বাবা ত আমাকে সারাদিন খুব বকাবকি করলে, তার পর সন্ধ্যাবেলা আবার সেই শ্বশুর এসে হাজির। এই জামা-কাপড়, সোনার বোতাম আংটি আমার হাতে দিয়ে বলল, পরত বাবা, পরতে হয়। বাবা বললেন, পর। আমিও না বলতে পারলাম না, পরে ফেললাম। তখন শ্বশুর বললে, বড় দুঃখের কথা বাবা, আমার মেয়েকে তোমার পছন্দ হ'ল না, সে ত দেখতে বিশ্রী নয়—আমার কপাল! আমার কেমন মায়া হ'ল, আর এত সুন্দর জামা-কাপড়, এমন ভাল আংটি যে দেয় তার কাছে মিথ্যে বলতে কেমন লাগে, তুইই বল বিন্তি। আমি বাবার কানে কানে বললাম, বলে দাও হয়েছে পছন্দ। শুনে খুব খুশী হ'ল ওরা। আসবার সময় আবার রুমালে বেঁধে এতগুলো টাকা দিলে।

পকেট থেকে রুমালের পুটলিটা বার করে বিনতা কি বলে তারই অপেক্ষা করতে থাকে কাজল।

—তা হ'লে তোর পছন্দ হয়েছে। যে বৌ হবে সে বুঝি খুব সুন্দরী?

লজ্জায় হাসি হাসি মুখটা নীচু করে কাজল—হাঁ, তা বটে, গায়ের রংটা খুব ফর্সা, তোর মত কালো নয়। কিন্তু তুই ভাই যেন রাগ করবি—আমি বিয়ের দিন ঠিক পালিয়ে যাব দেখিস।

কাঁচের বাসনের মত চুরমার হয়ে যায় বিনতার বুক, কিন্তু বাইরে তার আওয়াজ একটুও পাওয়া যায় না। বলে, পালাবি কেন? আমার বারণ তুলে নিলাম।

—সে তুই রাগ করে বলছিস।

—না রে রাগ করব কেন, তোর বৌ এলে ত আমারই মজা। কেমন খেলা করতে পারব দু'জনে।

—সত্যি বলছিস বিন্তি সত্যি? দেখ না কি সুন্দর আংটটা দিয়েছে ওরা। তুই পরবি একবার?

—ওটা তোকে দিয়েছে, আমার পরতে নেই।

—তাতে কি? এখন ত এটা আমার। আমি যদি তোকে দি—না দিলে কিন্তু জানব তুই রাগ করে আছিস বিন্তি।

কেমন ভাবে চায় বিনতা কাজলের দিকে, কতকটা অসহায়ের মত। কাজল হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে আংটিটা, লাল পদ্ম ফুলটাকে সেদিন যেমন কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিল। পাগলে উস্কো-খুস্কো চুলটাকে মাথায় তুলে নিয়ে সে হাতটা বাড়িয়ে দেয়—আচ্ছা, তুই পরিয়ে দে।

পাতলা আঙুলটা টেনে নিয়ে আংটি পরাতে পরাতে কাজল বলে, তোর হাতটা এত কাঁপছে কেন রে বিন্তি?

বিনতার চোখের কোণে জল টল টল করে, কথা কইতে সে পারে না। অনেক কষ্টে বলে, আয় ভেতরে আয়।

কালো বাষ্পের মত অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। আকাশের এক কোণে শুকতারা দপদপ করে হাতছানি দিচ্ছে উষাকে। সুমন্ত দাস, কাজল, কবিরাও চলে গেছে ঘুমুতে। নিমি, সোহাগ, চুনি চাটাই-এর উপর হাত পা মেলে ঘুমুচ্ছে। বিনতা এতক্ষণ ভাদুকেই দেখছিল ভাদু যেন আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওর কাছে। নিমি, সোহাগ, চুনিকে ঠেলে ওঠায়—আগরবে ঘুমুচ্ছিস? চল, সবার আগে ভাদু ভাসাব আমরা।

গাঁয়ের বাইরে পুকুর। চিরকাল এই পুকুরেই ভাদু বিসর্জন দেওয়া হয়। তাই এর নামও ভাদু-পুকুর। পাড়ে বড় বড় গাছের সারি, আলোকলতার জালে গুঁড়িগুলি দেখা যায় না। কেউ ব্যবহার করে না বলে কোথাও একটা ঘাট নেই। অজস্র শালুক আর শামুক বুকে নিয়ে কানায় কানায় টলমল করছে এর কালো জল। পশ্চিম-পাড়ের উপর এসে দাঁড়ায় বিনতা আর ওর সঙ্গিনীরা। বিনতার মাথায় ভাদু। ওদিকে পূব-আকাশ লালে লাল হয়ে আসে, তার সেই রাঙা আভা নাচে গাছের ফাঁকে, এখানে সেখানে পুকুরের জলে। গাঁয়ের দিকে চেয়ে নিমি বলে, আর দেরী নয় ভাই, আর একদল আসছে। এখুনি ঝগড়া করবে তারা আগে এসেছে বলে।

পাড় বেয়ে বিনতা নামে ধীরে ধীরে। জলের কাছে পৌঁছাতেই সোহাগ বলে একটা পা ডুবিয়ে দেখে নে কত জল, বলা ত যায় না। ওদের ভয় দেখে বিনতা হাসে—আমি বুঝি সাঁতার জানি না? ভাদুকে বুকে ধরে জলের মধ্যে দু-পা নামিয়ে দেয় সে, আর মুহূর্তে ওর সমস্ত দেহটা চলে যায় জলের নীচে। শুধু চুলগুলি ভাসতে থাকে জলের উপরে। সোহাগ চীৎকার করে ওঠে—ভাদু ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কাট, আর বাহাদুরি করতে হবে না। কিন্তু বিনতার মাথা ওঠে না। ওদের মুখ শুকিয়ে যায়, বিনতা রঙ্গ করছে কি না ঠিক বুঝতে পারে না। হাঁকবে ছেলেদের দলটাকে ডাকতে থাকে ওরা ছুটে আসে কিছু না জেনেই। না, তখনও ওঠে না, চুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঁ হাতে সাঁতার কাটে আর ডান হাতে ধরে বিনতার চুলের মুঠি, কিন্তু আরও যেন জলের মধ্যেই তলিয়ে যায়। ভয় পেয়ে কান্নার সুরে বলে, সোহাগ আয় আমি একা পারছি না, আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সোহাগও ঝাঁপ দেয়, সে গিয়ে ধরে চুনির একটা হাত। তবু ওরা ক্রমশঃ গভীর জলের দিকেই যেন এগিয়ে যায়। আর্তস্বরে ডাক ছাড়ে সোহাগ—নিমি ভাই, আমাদের টেনে তলিয়ে দিচ্ছে, ছুটে যা, ডেকে আন কাউকে। ততক্ষণে ছেলেদের দলটাও এসে পড়ে, কিন্তু সবাই মেয়েমানুষ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা চেঁচামেচি সুরু করে, কেউ কাঁদে। নিমি ঊর্দ্ধশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটে যায়। চুনি সোহাগের হাত-পা অসাড় হয়ে আসে, এদের দল থেকে তাকে সাহায্য করতে। এরা বলে, ভূত আছে, ভূতে টানছে, উঠে আয় তোরা।

সোহাগ-চুনির সত্যিই মনে হয়, কেউ যেন ওদের টানছে তবু ওরা ছাড়তে পারে না সখীকে। কিন্তু এক সময় মরণের আতঙ্কে ওরা যেমনি বিনতাকে ছেড়ে সাঁতার কাটতে কাটতে ওপারে উঠে আসছে ঠিক সেই সময়েই ছুটতে ছুটতে এল কাজল, সুমন্ত দাস, পাড়ার আরও অনেক ছেলে। বিনতার মা আর্তকরুণ-ক্রন্দন তুলে ছুটে আসে তাদের পেছনে পেছনে। কাজলই আগে ঝাঁপ দিল জলে। জলের মধ্যে হাতড়ে বিনতার দেহটাকে ধরে ফেলে, কিন্তু তুলতে পারে না। চেঁচিয়ে বলে, তুলতে পারছি না, বড্ড ভারি। নাব কেউ।

সুমন্ত দাস গেল ছুটে। ছেলেরা বাধা দিল—এই বুড়ো মরবি নাকি? দৃকপাত নেই বুড়োর, পড়ল জলে—দু-একটি ছেলেও সঙ্গে সঙ্গে দিল লাফ।

সুমন্ত দাস ও কাজল যখন দেহটাকে উপরে টেনে তুলল, তখুনি বুঝতে পারল কেন সেটা এত ভারী। বুকের মাঝে প্রাণপণ শক্তিতে ভাদুর প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরে আছে বিনতা। ওর কঠিন হাত দুটো কিছুতেই আলগা হয় না। পাড়ের উপর শুইয়ে দেয় ওরা বিনতাকে, দু-তিন জনে জোর করে ভাদুটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় জলে।

নানা প্রক্রিয়ায় ওর শরীরের জল বার করতে চেষ্টা করে সুমন্ত দাস, কিন্তু ওর নিজের চোখেই শুধু জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। কাজল কাঁদে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর এক দল আসে ভাদু নিয়ে অন্য গাঁয় থেকে, ওরা জানে না, গান গেয়ে আসে—

গাঁথা রয়েছে যে প্রাণে প্রাণে
ছাড়িতে পারি কি কেন মনে
(মোদের) আঁখি বারি ঝরিছে।

সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়ে বিনতার আঙুলে, সেই রাজের দেওয়া সোনার আংটিটায়। কে একজন চুপিসাড়ে খুলতে যায়—কাজল বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে তার উপর—খবরদার! আমার আংটি, থাকবে।

সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়—সুমন্ত দাস পাগলের মত চায় বিনতার চোখ দুটির দিকে। সে দুটি তখনও হাসছে।

জীবনে আর ভাদু গড়বে না সুমন্ত দাস।

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

৮

বিচিত্র হিমালয়। বসন্তকালে শুনি ফুলে ফুলে সবাই নন্দনকানন হয়ে উঠে। তখন গাছে ফুল, লতায় ফুল। যে ডালে ফোটে তাতে আর ফাঁক থাকে না। যেমন রূপ, তেমনি বর্ণের বৈচিত্র্য। সৌরভে ভারী হয়ে থাকে বাতাস। কিন্তু এটি বসন্তকাল নয়, শরতের শেষ। ফুল তেমন চোখে পড়ছে না। তবু বিচিত্র।

এক পাথরেরই কত রূপ আর কত রং। ঠিকই বলা হবে যদি বলি যে, কালো আর গেরুয়া রং এদিকের পাহাড়গুলির। তবু কিছুই বলা হ'ল না। এক কালোই দেখি কত জাতের। মেটে কালো আর নিকষ কালো ত আছেই, তার উপর ঐ দুই সীমান্তের মাঝখানে ঐ কালোরই আরও দশ-বার স্তর কি না হবে। গেরুয়ারও তেমনি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ি এক এক জায়গায়—পাথরের গায়ে অত যে ঝকঝক করছে, অভ্র নাকি তা!

অনন্ত বৈচিত্র্য গঠনেরও। কোথাও বাঁ হাত দিয়ে টানলেই পুরনো ভাঙ্গা বাড়ীর চুণ-সুরকির মত ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে; আবার কোথাও মনে হয় যে, ডিনামাইট ফাটিয়েও ঐ পাথরের গায়ে সুতোর মত একটি আঁচড়ও কাটা যাবে না।

আর কি বিচিত্র বিন্যাস! বিরাট ত কথার কথা নয় এখানে, জাজ্বল্যমান সত্য! তার কতটুকুই বা ধরা পড়বে আমার মত মাত্র সাড়ে-তিন হাত মাপের মানুষের দুটি মাত্র চশমাপরা চোখে! তবু সেই চোখ দুটি দিয়েই কোথাও দেখি রাশি রাশি পাথর—মুদীর দোকানের এক পোয়া ওজনের বাটখারার মত আকারের অগুণতি পাথরের গুলির সঙ্গে হালগোল পাকিয়ে জড়িয়ে আছে দৈত্যের মত বিরাট শত শত নিরেট পর্ব্বত-শিশু। বুঝি নিতান্ত অমনোযোগী ও খামখেয়ালী কোন এক ময়দানব কিছু-একটা গড়বার উদ্দেশ্যে শিলাখণ্ডগুলিকে ওখানে এনে ফেলবার পরেই কোনও কারণে পালিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি বলেই আমাদের মত পথচারীর শুভাকাঙ্ক্ষী কোন দেবতা সেই বিশৃঙ্খল স্তূপকেই বর দিয়ে অনন্ত ও অক্ষয় করে রেখেছেন। কোথাও আবার না-জানি কোন অদ্ভুতকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মার নিপুণ হাতের অতুলনীয় শিল্পকর্ম্ম চোখে পড়ে আকাশচুম্বী কোন কোন পাষাণ প্রাকারের মধ্যে, স্তরের পর স্তরের নিখুঁত ও নীরন্ধ্র কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট বিন্যাসের মধ্যে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে খুব পাতলা পাতলা ইট একখানার উপর আর একখানা পাতা রয়েছে। কি দিয়ে যে জুড়েছিল বিশ্বকর্ম্মা, ভেবে আর কূল পাই না।

ভূতত্ত্ববিদের কাছে খোলা বইয়ের পাতা একখানা—পাহাড়ের বয়স নাকি নির্ভুলভাবে লেখা আছে তাতে।

বুঝি সেই পণ্ডিতকেও বিকল করতে পারে একেবারে ভিন্ন জাতের এক একটি পাহাড়। জোড়াতালির বালাই তাতে একেবারেই নেই। সবটা পাহাড়ই বুঝি একখানি মাত্র শিলা—জ্যামিতিশাস্ত্রের নিয়মে যত রকমের আকার হতে পারে একই দেহে তার সব ধারণ করে সোজা একেবারে আকাশেই উঠে গিয়েছে।

কিন্তু এমনই সব পাহাড়ের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে প্রাণের লীলা।

আমাদের সমতল অঞ্চলে বোল আনাই যেখানে মাটি তার চেয়েও উর্বর নাকি এই শিলাময় হিমালয়। গাছপালা, লতাগুল্ম, এমনকি শস্যশষ্পাদিরও এত প্রাচুর্য এখানে যে, চোখে দেখে তা না মানি কেমন করে! এক ব্যাকরণকে উপেক্ষা করলে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে এরও 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বিশেষণ।

মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেতও চোখে পড়ে। আমাদের দেশের মত দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত অবশ্য নয়, তবু ধানের ক্ষেত ত বটে! পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি যেন। কোনটি প্রস্থে হয়ত এক হাতও হবে না, আবার কোনটি চার-পাঁচ হাতও হতে পারে। আল বেঁধে জল ধরে রাখবার জন্য যতটুকু সমতল জায়গা যেখানে পাওয়া গিয়েছে সেইটুকু নিয়েই এক একখানা ক্ষেত। আমন ধান পেকে এসেছে এখন। ফিকে সবুজের ফাঁকে ফাঁকে মা লক্ষ্মীর সোনা ঝলমল করছে।

ফল কত যে আছে কে জানে! পাকা কমলালেবু দেখেছি গাছে ঝুলছে, দেখেছি ডালিম, ঝিঙে-কুমড়ো দেখেছি ঘরের চালায়। এ সব অবশ্য মানুষের হাতে-গড়া বাগানে। তার বাইরে ঐ যে অনন্ত অরণ্যে অগুনতি গাছ-গাছড়া সেগুলি কি সব নিষ্ফল হতে পারে! কাঁচা আখরোট ত পেয়েছি হাতের হেলোতে যদিও তা মুখে দেবার সাহস হয় নি। কোন কোন গাছের পরিচয় পেয়েছি আমলকী বলে। ঋষি মুনিদের যেখানে বাস সেখানে কি হরীতকী না থেকে পারে! ভেষজ তরুগুল্মের প্রাচুর্য এখানে না থাকলে অত যে আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় দেখলাম তাদের যোগান আসে কোথা থেকে?

অরণ্যই বেশী।

কত রকমের গাছ। তাকিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে যাই। তবে মোটের উপর নেতিবাচক উপলব্ধি। যে সব গাছ চিনি তা চোখে পড়ে না। যা দেখি তাদের অধিকাংশই চিনি না। তবে স্পষ্ট দেখি দুর্ভেদ্য, অন্তহীন অরণ্য। খুব চেনা যে গাছ তাকে দেবদারু বলব না ঝাউ, ভেবে পাই নে। আকার, আয়তন ও বর্ণের পার্থক্য ধাঁধা লাগায় চোখে।

একটানা নিবিড় অরণ্যে বৈচিত্র্য এনেছে সারি সারি ঐ দেবদারু বা পাইন গাছ। গুল্মরা বুঝি ভয় পায় ঐ গাছগুলিকে। ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় যেখানে এক ঝাঁক দেবদারু মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। বাতাস সেখানে বাঁশী বাজায় ওদের চামরের মত ডালের ফাঁকে ফাঁকে ফু দিয়ে। কাছে এসে ক্ষণেকের জন্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মনে হয় যেন বন পার হয়ে পার্বতীর উপবনে এসে ঢুকলাম।

ফল তেমন নাও যদি থাকে, বর্ণের সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ সত্য। ফুল ছাড়াও এত যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে গাছের বর্ণে তা আগে কখনও বুঝি নি। এক এক জায়গায় মনে হয় বুঝি হাজার হাজার ময়ূর ময়ূরী গায়ে গা মিলিয়ে পেখম তুলে এক সঙ্গে অনবরত নেচে চলেছে। কোথাও আবার অমানিশার অন্ধকার।

সুজলাও বলতে হবে বই কি! প্রচুর জল না পেলে এই কোটি কোটি গাছ হয় এবং হয়ে বেঁচে থাকে কেমন করে! বিরাট বিরাট হ্রদ নাকি আছে অনেক উপরে দুই সারি পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। জল আছে এই সব পাহাড়ের পরতে পরতে। তা থাক আর না থাক, চোখে যা দেখছি তাই বা কম কি! প্রত্যক্ষ সত্য মন্দাকিনী—উত্তর থেকে দক্ষিণে সগর্জনে ছুটে চলেছেন তিনি। অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি এখন। মন্দাকিনী এখন অনেক নীচে। তবু তারই ধারে ধারেই ত এই পায়ে-চলা পথ—দেখা পাই তার থেকে থেকেই। তারই উপত্যকা এটি। তবু একা নন তিনি। নিজের চোখেই দেখলাম আরও কত কত ছোট-বড় মন্দাকিনী এখানে বয়ে চলেছেন উপর থেকে নীচে, যে খাড়া পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা তাদেরই গা বেয়ে বেয়ে ঐ মন্দাকিনীর সঙ্গেই নিজেদের মিশিয়ে দেবার জন্য।

স্থানীয় লোকেরা বলে "ঈশ্বরকী মায়া।" তা হউক বা না হউক আমি ত নিজের চোখেই দেখেছি—কোথাও কিছু নেই, পাহাড়ের মাটি না পাথর ফুঁড়ে তীরের মত বেগে এক বা একাধিক সুতোর মত ক্ষীণ জলের ধারা উঠছে। ঐ রকম স্বাভাবিক উৎস নাকি লাখে লাখে আছে এই পর্বতশ্রেণীতে। লক্ষ ধারায় জল উঠছে সেই সব উৎস থেকে। আবার লক্ষ লক্ষ ধারায় ঝরেও পড়ছে আকাশ থেকে জল—থেকে থেকেই ত বৃষ্টি হচ্ছে এখানে। সেই সব ধারা অনবরত বয়ে চলে নীচের দিকে। দুই, দশ, শত ধারা মিলে এক হয়। সেই এক আবার গিয়ে মিলিত হয় অমনি আর একটি সমষ্টির সঙ্গে। ধারা আর ধারা থাকে না তখন, হয় নির্ঝর। নির্ঝর আর নির্ঝরের মিলনে হয় পাগলা-ঝোরা। দু'দশ পা চললেই এখানে এদের কোন একটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে আমার।

বিজন অরণ্যে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাথরের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের উপর অপ্সরীর নাচই দেখি বুঝি, শুনি কিন্নরীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ নির্ঝরিণী তরতর করে নেমে আসে উপর থেকে। নানা সুরে বাজে অপ্সরীর পায়ের নূপুর—ঝিমঝিম ঝিমঝিম—কুলুকুলু কুলু—ছল ছল ছল। সুর সব এসে পৌঁছে যেখানে দুই পাহাড়ের মিলন—এক পাহাড় ছেড়ে আর এক পাহাড়ের পাদমূলে যেখানে পা ফেলতে হবে যাত্রীকে। নির্ঝরিণী সেখানে পাগলা ঝোরা, ঝিমঝিম তালের সমাপ্তি সেখানে খল খল অট্টহাস্যে। কালভার্ট বা পুল আছে সেখানে।

এই নৃত্যলীলার পরিপূর্ণতা দেখলাম শোণ গঙ্গা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমক্ষেত্রে।

অভিসারিকা শোণ গঙ্গা নামছেন উপর থেকে। কত দূর থেকে আসছেন তিনি, কত দীর্ঘকালের প্রতীক্ষা তার, কে জানে! শুরুতে দুরু দুরু বুক কাঁপছে, অভিসারিকার মতই রাত্রির অন্ধকারে লোকচক্ষু এড়িয়ে ধীর, সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু পথের প্রান্তে উপস্থিত হবার পর সবই উল্টে গেল। মন

আর বাঁধ মানে না তখন। উদ্দাম হয়ে উঠল বুকের রক্ত, তাল কেটে গেল গতির। পাহাড়ের গা বেয়ে নামবার মত ধৈর্য্য তখন আর তার নেই—অদূরে মন্দাকিনীকে সে যে দেখতে পেয়েছে, কানে শুনেছে তার জলদগম্ভীর আহ্বান। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মাদিনী শোণগঙ্গা লাফিয়ে পড়লেন পর্ব্বতশৃঙ্গ থেকে।

সেই দৃশ্য ত্রিযুগীনারায়ণ পর্ব্বতের পাদদেশে উত্তর সীমান্তে। খাঁটি জলপ্রপাত।

কত ফুট উঁচু থেকে প্রতি সেকেণ্ডে কি পরিমাণ জল পড়ছে সে হিসাব জানা নেই আমার। আমি শুধু দেখছি এক ভীষণ মধুর দৃশ্য। ধারা নয়, জলস্তম্ভ। বিপুল জলরাশি বিরাট এক স্ফটিক-স্তম্ভের আকারে উপরের শিখর থেকে মাঝামাঝি আর একটি শিখরের উপর পড়েই ডিগবাজী খেয়ে আবার উপর দিকে প্রায় অর্দ্ধেকটা পথ উঠবার পর ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গঙ্গাবতরণের যে ছবি আমাদের দেশের হাটে-বাজারে দেখতে পাই আমরা তারই আসল রূপ। সম্পূর্ণ জীবন্ত। পার্থক্য কেবল এই যে, শোণগঙ্গা এখানে যার মস্তকে অবতরণ করছেন তিনি কৈলাসপতি নন, হিমালয়—হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীরই একটি পাদশৈল। পাহাড় বলেই সে তার জটার জালে আটকাতে পারে নি দুর্দ্দান্ত শোণগঙ্গাকে, আর চূর্ণ হয়ে ভেঙেও যায় নি। তবু ঐ বিপুল জলস্রোতের অবিরাম আঘাতে তার মাঝখানটা, স্পষ্ট দেখছি উদূখলের মতই গভীর।

যেমন আয়তন ও পরিবেশ এই বিপুল জলরাশির তেমনই গর্জ্জনও। দেবপ্রয়াগকে হার মানতে হবে উপরের এই শোণ-প্রয়াগের কাছে।

ভয়ঙ্কর এই জলপ্রপাতের রূপ! কিন্তু কি সুন্দর! চোখ আর ফিরতে চায় না। ঐ যে বিপুল জলধারা পাদশৈলের উপর পড়েই আবার উপর দিকে লাফিয়ে উঠে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে জলকে আর জলই মনে হয় না। আগুনের নয়, রূপার ফুলঝুরি দেখছি, একটি নয়, এক লক্ষ, ভঙ্গুর নয়, স্থির।

গুপ্তকাশী থেকে গৌরীকুণ্ড ২১ মাইল পথ, তিন দিন লাগল পার হতে।

পাণ্ডারা বলে কেদারের 'বিকট পথ', 'বিকট' বলতে মন চায় না আমার—এ যে নিঃসংশয়ে বিচিত্র। তবু কি কঠিন পথ। সুন্দর, কিন্তু ভয়ঙ্কর।

কি কঠিন চড়াই। আর অসংখ্য, একটির পর একটি পার হয়ে আসছি, তবু শেষ আর হয় না। সামনেরটি দেখি আরও উঁচু, চড়াই শেষ হলেই উতরাই আসে। দশ গজ পথও সমতল আর পাই নে—চটির এলাকাতেও নয়।

দুঃসহ পথশ্রম।

পিঠের বোঝা এখন অনেক হাল্কা। বাহাদুর ছাড়ে নি। বোঝা আমার প্রায় খালি করে বাড়তি বোঝা নিজের পিঠে তুলে নিয়েছে সে। তথাপি পা আর চলতে চায় না।

উঠছি ত উঠছিই। হাঁটু ভেঙে আসে, বুক ধড়ফড় করে, ক্রমেই ছোট হতে হতে শেষে নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তবু যেখানে সেখানে থামবার উপায় নেই। এমন খাড়া পথ যে মনে হয় যে, থামলেই বুঝি নীচে গড়িয়ে পড়ব। স্থির হয়ে দাঁড়াবার মত হাত পাঁচ-ছয় সমভূমি কোথাও যদি পাই সেখানেও সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে ভরসা হয় না। থামবার আগেই ঘুরে তাকাই বিপরীত দিকে, বল্লম-আঁটা লাঠিখানা কোন দু'খানা পাথরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর মোটা মুণ্ডটির উপর প্রথমে পর পর দুটি হাতের তেলো পেতে যুক্ত হাতের পিঠের উপর চিবুক বিন্যস্ত করে তবে দাঁড়াতে পারি—দাঁড়িয়েও ঐ লাঠিগাছটি যেন একমাত্র আশ্রয়। তাতে ঐ পা দুটিরই যা একটু বিশ্রাম। এখানকার বাতাসে অক্সিজেন-গ্যাসের পরিমাণ কম বলেই বুক হাঁস-ফাঁস ভাবটা একেবারে যেতে চায় না। মনের বিশ্রাম হয় আরও কম। দাঁড়ালেই যেন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে মন এক দিকে খাদ ও অপর দিকে পাহাড়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। এত উপরে উঠে এসেছি, তবু কি উঁচু দু'দিকের পাহাড়। যতখানি সম্ভব ঘাড় বেঁকিয়েও উপরে চূড়া দেখতে পাই না। অনেক নীচে মন্দাকিনীও চোখে পড়ে কদাচিৎ। উপরে বা নীচে যেদিকেই তাকাই মাথা যেন ঘুরে উঠে, যেন ঐ ভয়টাকে এড়াবার জন্যই আবার চলতে থাকি। আশঙ্কার তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে আশারও একটু হাতছানি আছে বই কি! ভাবি বুঝি আর একটু চললেই চড়াই শেষ হবে।

কিন্তু আলেয়ার আলো!

এক সময়ে চড়াই শেষ হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তখনই শুরু হয় উতরাই।

নামতেও তেমনি কষ্ট—যেমন দেহের তেমনি মনেরও। নামছি ত নামছিই। উহুঃ, ঠিক হ'ল না কথাটা। উতরাইয়ের পথে আমি আর কর্ত্তা নই। পা দুটি চলছে বটে, চলছে আমার তৃতীয় চরণ মানে হাতের লাঠিটিও। তবে আমি যেন আর চলছি না। কে এক শক্তিশালী পুরুষ যেন পিছনে লুকিয়ে থেকে তার অদৃশ্য হাত ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ইচ্ছা দূরে থাক, চেষ্টা করলেও উতরাইয়ের পথে আমার থামবার উপায় নেই। মনে হয় যে, পায়ের যান্ত্রিক গতি বন্ধ করলেই বুঝি পিছনের ঠেলায় হয়ত ছিটকে পথের উপর পড়ে যাব এবং তার পর আমার এই সজীব দেহটি নির্জীব একটি মাংসপিণ্ডের মতই গড়িয়ে গড়িয়ে কোন অন্ধকূপের অতলে যে গিয়ে পড়বে, কে জানে!

দুঃসহ পরিশ্রম কেবল মাংসপেশীগুলিরই নয়, বিষম চাপ পড়ছে স্নায়ুমণ্ডলীর উপরেও। প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ সতর্কতা। লাঠির মত সিধা পথ ত নয়, সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেছে পাহাড়ের

ধারে ধারে। বাঁক নিয়েছে হয় ত একখানি পাথরের একেবারে শেষ প্রান্তে—সূক্ষ্ম কোণ রচনা করে প্রায় বিপরীত গতিতে নীচের বা উপরের দিকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবিড়, ঘন লতাগুল্মে ঢাকা সেই কোণটি, ওদের সঙ্গে কোলাকুলি হয়েছে নীচের গাছ-গুলির ডালপালার। চোরা বালির চেয়েও মারাত্মক পাহাড়ী পথের এই চোরা ফাঁকগুলি। ঠিক পথের উপর চোখদুটির স্থিরদৃষ্টি যদি পাতা না থাকে, অথবা দৃষ্টি স্থির থাকলেও মন যদি চোখদুটিকে ফেলে কোনও কারণে উধাও হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে নীচে শক্ত পাথর আছে ভেবে সেই বাঁকের মুখে সবুজের ঢাকনির উপর আর একটি পা ফেললেই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত কয়েক হাজার ফুট নীচে মন্দাকিনীর গর্ভে গিয়ে পড়তে হবে। তা যদি নাও হয়, পড়তে পড়তে কোন একখানি পাথর বা কোন একটি গাছের গুঁড়িতে পড়ন্ত দেহটি আটকেও যদি যায়, তা হলেও সেখান থেকে উঠে আসবার শক্তি আর থাকবে না।

বাঁকে বাঁকে সবুজ বনানীর নীচে মৃত্যুর ঐ রকম গোপন ফাঁদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একবার সজাগ হবার পর আর কি ঘুম আসে মনের! চলবার সময় আর কি ঢিলা হতে পারে গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত যাত্রীদেহের টান টান স্নায়ুগুলি!

অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত যেখানে পথ সেখানেও স্বস্তি নেই মনের। অরণ্য নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। গাছে গাছে ঠাসাঠাসি। গাছের গোড়ায় লতাগুল্মের জড়াজড়ি,উপরে অগণিত শাখাপ্রশাখার। পাথরের পাহাড়ের মতই বুঝি নিশ্ছিদ্র উদ্ভিদের এই দ্বিতীয় প্রাকার। আকাশের বিরুদ্ধে বুঝি সুপরিকল্পিত অভিযান তাদের। দু-দিক থেকেই গাছ উঠে ঢেকে ফেলেছে পায়ে-চলা পথ, মুছে ফেলেছে যেন আকাশ। মধ্যাহ্নেও অন্ধকার যেন দুই হাতে ঠেলে এগিয়ে চলেছি—অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে।

অন্ধকারের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। চড়াই-উতরাইগুলি যেন মহাতরঙ্গ তার। আমার নিজের ইচ্ছা বা চেষ্টার কোন মূল্য নেই এখানে। আকাশ-ছোঁওয়া ঢেউ-এর তাড়নায় একটিবার হয়ত ভুস করে ভেসে উঠছি ওদেরই একটির মাথার উপর। একটি মুহূর্ত আকাশের আলো দেখছি এক নজর; কিন্তু আরও বেশী দেখছি সামনের আরও উঁচু ঢেউটিকে। ঐ একটি মুহূর্ত মাত্র! পরমুহূর্তেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে আমার ক্ষণিকের আশ্রয় মহাতরঙ্গের উত্থিত শৃঙ্গ। তার ভগ্নাবশেষের সঙ্গে সঙ্গে আবার অতলে তলিয়ে যাচ্ছি আমি।

জাহাজ-ডুবির বলি মুমূর্ষু মানুষের উপলব্ধিই আমার মনে। কিন্তু এ ত জল নয়! আমার দু'দিকেই শক্ত পাথর; পায়ের নীচেও তাই। তাছাড়া আর যা দেখছি তা ঐ পাথরের মতই কালো আর বিরাট সব গাছ।

একটু দম নেবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম একটি সুদীর্ঘ উত্তরাই-পথের শেষ প্রান্তে মাঝারি আকারের একটি পাগলা-ঝোরার ধারে। গভীর অরণ্যের অন্ধকারগর্ভে একেবারে একা। শুনতে পাচ্ছি সেই পাগলা-ঝোরার খল খল অট্টহাস্য। চোখে পড়ছে পাহাড়ের মতই আকাশচুম্বী অসংখ্য বৃক্ষের পিঙ্গল ছবি, উলঙ্গ কাণ্ড ও শাখা-গুলি। হঠাৎ একটি দমকা হাওয়ায় তার অনেকগুলি দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটি যেন শিহরণ খেলে গেল আর মাথার মধ্যে সবই তালগোল পাকিয়ে গেল।

অদ্ভুত একটি উপলব্ধি আমার মনে। এ ত সমুদ্র নয়! তবে এই কি মহাকালের জটাজাল? সেই জটার জালে ভাগীরথীর মত আমিও জড়িয়ে পড়েছি নাকি?

তবে থেকে থেকে আকাশের হাতছানিও দেখতে পাই। চড়াই ভেঙে উপরে উঠলে আলো পাই, বাতাস পাই। দু'দণ্ডের স্থিতি তখন। সেই সুযোগে মানুষের সমাজও পাই—সহযাত্রী ও স্থানীয় নর-নারীর প্রাণের একটু উষ্ণ স্পর্শও। সব মিলিয়ে যে জিনিসটি হয় তাই বুঝি কেদারনাথের আশীর্বাদ।

চাচাকে আগলাবার ইচ্ছা হয়ত ছিল গঙ্গোত্রীর। কিন্তু বিপরীত টানের জোর বেশী। সে টান রক্তের তত নয় যত বুঝি ঐ বিদঘুটে পথের। পাশাপাশি চলবার উপায় নেই এ পথে। চললে লাভও কিছু নেই। চলতে চলতে কথা বলতে গেলে নিশ্বাস বন্ধ করতে হয়, নিশ্বাস নিতে গেলে কথা। সুতরাং চলতে হয় সারি বেঁধে আগুপাছু। আর তা হলেই কোন আবর্তের টানে কে যে কোথায় ছিটকে পড়বে তার কিছুই বলা যায় না। গুপ্তকাশী ছাড়বার মিনিট পনের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আমাদের সম্মিলিত দল।

তবে পারিবারিক পুনর্মিলন হয় আমাদের যেখানে চটি বা চা-এর দোকান আছে। অলিখিত চুক্তি হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে —চলার পথের ধারে মাত্র একখানা চা-এর দোকানও যদি পাওয়া যায় তবে সেখানেই থামবে যে তার পায়ের জোরে বা পথের টানে এগিয়ে চলে গিয়েছে; অপেক্ষা করবে যতক্ষণ দলের শেষ লোকটি সেখানে এসে না জোটে। সেখানে এক সঙ্গে বসে বিশ্রামের নাম করে গল্প হবে কিছুক্ষণ। তারপর আবার চলা।

এমনি এক বিশ্রামের ফাঁকে দেখা তাঁর সঙ্গে। যুবক সন্ন্যাসী। বয়স বড় জোর বছর পঁচিশেক হবে। সুঠাম গঠন, শ্যামবর্ণ। কিন্তু মুণ্ডিত মস্তক, কৌপীনবস্ত্র সন্ন্যাসী। একখানি মাত্র কম্বল গুটিয়ে গামছা দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে খালি পায়ে হেঁটে আসছেন তিনি। ঠিক আমার পিছনে পিছনেই আসছিলেন হয়ত। বিউঙ্গ চটিতে আমি এসে পৌঁছবার পর তিনিও সেই দোকানেরই আর এক কোণে এসে বসলেন।

তাঁকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে থাকবে জিতেন; একটু পরেই দেখি যে, গঙ্গোত্রীর সঙ্গে বক বক করা ছেড়ে সে উঠে এসে ঘনিয়ে বসল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই জমে উঠল তাদের আলাপ।

ইংরেজী ভালই জানেন ঐ সন্ন্যাসী; হিন্দীও বলতে পারেন মোটামুটি। পর্যায়ক্রমে উভয় ভাষাতেই কথা হচ্ছিল তাদের।

অনেক কথাই কানে এল আমার। বুঝলাম যে, কেরলের অধিবাসী তিনি। ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত উঠেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই সংসার ছেড়ে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী তিনি। সংসার ছেড়েই উঠেছিলেন গিয়ে শৃঙ্গেরী মঠে। এখন গুরুর আদেশে আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত আরও তিনটি মঠ দর্শন করবার উদ্দেশ্যে পরিব্রাজক হয়েছেন। অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের পরিকল্পনা তাঁর।

হেঁটেই চলেন নাকি আপনি?—জিজ্ঞাসা করল জিতেন।

তিনি উত্তর দিলেন, যখন যেমন—কখনও হাঁটি, কখনও গাড়ীতে যাই।

খরচ চলে কিসে আপনার?

ভিক্ষা করি।

কেমন যেন একটা টান অনুভব করে এগিয়ে গিয়ে আমিও ঘেঁষে বসলাম সন্ন্যাসীর কাছে। শুনলাম, জিতেন জিজ্ঞাসা করছে, ভিক্ষা করতে লজ্জা করে না আপনার?

করেই ত, হেসে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী, আর সেই জন্যই ত ভিক্ষা করতে আদেশ দিয়েছেন গুরু মহারাজ।

তার মানে?—এবার প্রশ্ন করলাম আমি।

আগের চেয়েও মধুরকণ্ঠে সহাস্য প্রত্যুত্তর সন্ন্যাসীর, ভিক্ষা না করলে অহঙ্কার নির্মূল হবে কিসে?

দৃঢ় কণ্ঠস্বর। বিশ্বাস আর উপলব্ধির সুস্পষ্ট ঝঙ্কার সেই সুরে। তবু মন সায় দেয় না আমার। আমার চেনা-জানা বাস্তব জগৎকে প্রতিপক্ষ দেখি এই সন্ন্যাসীর। রোজই পথে-ঘাটে কতজনকেই ত দেখি ভিক্ষা করতে। কোন দিনই মনে হয় নি যে তারা অহঙ্কার-মুক্ত হয়ে শনৈঃ শনৈঃ সাধনার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিদ্রূপ বা প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি সেদিন মনে জাগল না আমার। একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সংসারে ফিরে যাবার ইচ্ছা হয় না আপনার?

তেমনই হাসিমুখেই, কিন্তু তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী, ক্যা হৈ সন্‌সারমে।

তার পরের ঘটনাটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

সন্ন্যাসীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গম্ভীর, কিন্তু তীক্ষ্ণ নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন কানে এল আমার, সন্‌সার কিস্‌নে বনায়া হৈ, বেটা?

চমকে চোখ ফিরিয়ে দেখি গঙ্গোত্রীর মা এসে আমার কাছে বসেছেন; তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন ঐ প্রশ্ন।

সন্ন্যাসীর কাছেও ঐ প্রশ্ন ও প্রশ্নকর্ত্রী দুই-ই নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত। থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে তিনি বলিলেন, সন্‌সার ঈশ্বরকী মায়া হৈ, মাতাজী।

তব্‌?—প্রায় উদ্ধত ভর্ৎসনার কণ্ঠস্বর বৃদ্ধার; মায়া ভী তো ঈশ্বরকী হী হৈ। তব তুম, বেটা, সন্‌সার ছোড়কে ক্যোঁও আয়া?

ঘাবড়ে গেলাম আমি। মোটামুটি জানি মহাপণ্ডিত, দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্যের বিস্ময়কর জীবন-কাহিনী। ভাসা ভাসা রকমে মনে পড়ছে মণ্ডল-মিশ্রের বিদুষী শ্রীউভয়ভারতীর কাছে সেই মহা-পণ্ডিতের অন্ততঃ সাময়িক পরাজয়ের গল্প। সুদূর অতীতের ঘটনা তা। কিন্তু কি বিস্ময়কর সাদৃশ্য বর্ত্তমানের এই পরিস্থিতির সঙ্গে। সেই কেরলেরই অধিবাসী এই নবীন সন্ন্যাসী। তাঁর প্রতিপক্ষ একজন মহিলা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে নাকি এখানে? এক হিসাবে তাই ঘটল, ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বুঝি সন্ন্যাসীও। তর্ক না করেই হার মানলেন তিনি। যে কথা একটু আগে আমাকে তিনি বলেছিলেন সেই কথাই একটু ঘুরিয়ে আবার বললেন তিনি, সংসারে কোন সুখ নেই, মাতাজী।

কিন্তু বৃদ্ধা ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি বললেন, তা হলে, বাবা, নিজের সুখটাই বড় বুঝি তোমার কাছে? যাদের স্নেহ যত্নে এত বড় হতে পেরেছ তুমি তাদের সুখশান্তির কথা কি ভাবতে নেই? যিনি তাঁর নিজের বুক থেকে দুধ দিয়েছেন তোমার মুখে তাঁর মুখে তুমি কি এক ফোঁটা জলও দেবে না?

সন্ন্যাসী নিরুত্তর। তাঁর মুখের হাসিটুকু ক্রমেই যেন নিভে আসছে। বুঝি তাই লক্ষ্য করেই একটু পরে বৃদ্ধা কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কে কে আছেন তোমার?

উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী, সব আছে।

বিয়ে করেছ?

না।

তবে যে বললে সব আছে?—যেন বিরক্ত হয়েই বললেন বৃদ্ধা।

কিন্তু উত্তর না পেয়ে আবার কোমলকণ্ঠে তিনি বললেন, তবে, বেটা, কেদারনাথ বদরীনারায়ণকে দর্শন করবার পর ঘরে ফিরে যাও তুমি, গিয়ে বে-থা করে সংসারী হও। সংসারে থেকেও ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

তথাপি সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর আনত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধা, তার পর একটু হেসে আবার বললেন, চুপ করে রইলে কেন, বাবা? সংসার করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না? উত্তর দাও ত আমার মুখের দিকে চেয়ে। বল ত, আমি সংসারে আছি বলেই নরকে যাব নাকি?

এবার কিন্তু হেসে ফেললেন নবীন সন্ন্যাসী—সেই প্রশান্ত হাসি যা প্রথম দিকে তাঁর মুখে দেখেছিলাম। বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সুরে তিনি বললেন, না মা, আপনি স্বর্গে যাবেন।

শুনে ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকু সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বৃদ্ধার। তিনিও উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাবা। তবে তোমার নিজের মাকেও তুমি এই কথা বল গে। দেখবে যে সংসারেই স্বর্গ হয়েছে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, কেবল তোমাকে নয়, উদাসী সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁকে এই কথা বলি আমি। সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? আর সংসার কি সত্যই ছাড়তে পারে কেউ? ঘর-বাড়ী ছেড়ে এই যে হিমালয়ের বনে এসে ঢুকেছি এখানেও ত দেখছি পায়ে পায়ে সংসার। না থাকলে কেদারনাথের চরণ পর্য্যন্ত কি যেতে পারত কেউ? দেখেছি তোমাদের মঠ-মন্দিরও। তাও ত এক একটি সংসার। তফাৎ যা তা ছোট আর বড়র।

আরও একটু তফাৎ আছে মা, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী, একটি আমার সংসার, অপরটি ঈশ্বরের।

বলেই হাসতে হাসতে পথে নেমে হন হন করে এগিয়ে চললেন তিনি।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, মুখের হাসি তাঁর দেখতে দেখতে যেন মরে গেল। আর তখনই গঙ্গোত্রী এসে হাত ধরলেন তাঁর। বললেন, বিশ্রামও হ'ল, তর্কও হ'ল। এখন ওঠ ত মা, পথ আমাদের এখনও অনেক বাকি।

উঠলেন গঙ্গোত্রীর জননী। উঠতে গিয়েই আমার চোখের সঙ্গে চোখ মিলে গেল তাঁর। চমকে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শুনলে ত ভাই? আচ্ছা, তুমিও বল ত, 'আমি' কি 'তিনি' ছাড়া? 'আমি'র মধ্যে তিনি না থাকলে এত মায়া-মমতা আমরা পাই কোথা থেকে? আমাদের সংসার যদি ফাঁদই হয় তবে শিব, পার্ব্বতী, গঙ্গা—এ রা হিমালয় ছেড়ে আমাদের ছোট ছোট ঘরে গিয়ে উঠেন কেন?

গঙ্গোত্রী দেখি মুচকে মুচকে হাসছেন, তিনি এবার তাঁর মায়ের হাতে বেশ জোরে একটি টান দিয়ে বললেন, আবার চাচার সঙ্গে লাগতে যাও কেন মা? উনি ত আর সন্ন্যাসী হন নি—দিব্যি দেখছি সংসারী মানুষ। না, চাচা?

সেই গঙ্গোত্রী। আর মাইল খানেক মাত্র চলবার পর তারই নিবন্ধাতিশয্যে সে দিনের মত চলা থামাতে হ'ল।

গঙ্গোত্রী বললেন, আমরা ত খাওয়া-দাওয়া সেরে বের হয়েছি, চললে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলতে পারি। কিন্তু আপনারা এখানে না থামলে রেঁধেবেড়ে খাবেন কখন? বেলা ত দুটো বাজতে চলেছে।

এ রকম একটা কথা শোনবার জন্য মন প্রস্তুত ছিল না আমার। সুতরাং বেশ একটু দোলা লাগল তাতে। প্রায় আধ মিনিট পর আমি অপ্রস্তুতের মত বললাম, তা হলে এগিয়ে যান আপনারা। অনর্থক সময় নষ্ট করবেন কেন?

কিন্তু শুনে স্মিতমুখে বললেন গঙ্গোত্রী, এখানে থাকলে সময় আমাদের নষ্ট হবে কেন? তীর্থ করতে বের হয়েছি ত আমরা। তা সে সম্বন্ধে কি না একটা কবিতা আছে গুরুদেবের—যার মানে এই যে, পথের দু'ধারেই ত আসল তীর্থ? জানেন কবিতাটা আপনি?

আমি রীতিমত বিস্মিত হয়ে বললাম, গুরুদেব বলতে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন?

কৃত্রিম কোপে বেঁকে গেল গঙ্গোত্রীর ভ্রূকুটি; বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ বুঝি কেবল বাঙালীদেরই? তিনি ত সারা হিন্দুস্থানের সকলেরই গুরুদেব।

ততক্ষণে বিস্ময় আমার সম্ভ্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। মনের মধ্যে আনন্দও যেন আর ধরে না। গঙ্গোত্রীকে তখন খুবই আপন জন মনে হ'ল আমার। গাঢ়স্বরে বললাম, ঠিক বলেছেন আপনি। বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে আমার।

তার পর স্মৃতির অতলে হাতড়ে হাতড়ে উদ্ধার করলাম সেই বিশেষ দুটি লাইন যা আমার অজ্ঞাত কোন কারণে গঙ্গোত্রীর হৃদয়ে একেবারে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। সুর করে আবৃত্তিও করলাম লাইন দুটি:

"পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
পথের দু'ধারে আছে মোর দেবালয়।"

ঠিক, ঠিক!—উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠলেন গঙ্গোত্রী। তার পর ঈষৎ জড়িতস্বরে তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন ঐ লাইন দুটি।

চেয়ে দেখি যে আনন্দে উজ্জ্বল, আবেশে বিহ্বল হয়েছে গঙ্গোত্রীর মুখখানি।

(৯)

ছাপা পুঁথিতে নামই নেই "বরাসু"র। খানদুই খড়ের চালার কুঁড়েঘর ও একখানা ছোট পাকা দোতলা বাড়ী মাত্র সম্বল ছিল ঐ চটির। বুঝি সেই জন্যই চটি বলে ওকে মানতেই চায় নি পাণ্ডারা। কিন্তু ইতিমধ্যে কুঁড়ে ক'খানি ও পাকা দালানখানার মাঝখানে কাঠের দোতলা বাড়ী উঠেছে একখানা। সদ্য রংকরা ঝকঝকে তকতকে।

গঙ্গোত্রীর ইচ্ছা এবং জিতেনের লোভ ঐ নূতন বাড়ীখানা ত থাকবার। আমার মনে কেমন যেন আশঙ্কা—অমন ছবির মত বাড়ীখানি কি আর যাত্রীকে থাকতে দেবার জন্য হয়েছে? কুঁড়ে-ঘরের চাওলার কাছে খোঁজ নিয়ে পুরনো পাকা বাড়ীখানার নীচের তলায় পাঁচমিশালী দোকানের মালিক শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করতেই সে আশঙ্কা একেবারে নির্ম্মূল হয়ে গেল। পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে ঘর খুলে দিলেন শেঠজী।

কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল কথাটা। ধর্ম্মশালাগুলিই না হয় দশ জনের টাকায় তৈরী হয়েছে। কিন্তু এই চটিগুলি? নিতান্ত কুঁড়েঘর হলেও তা তৈরি করবার একটা খরচ আছে ত! কে বহন করে সে খরচ? আজ এই ঝকঝকে নূতন বাড়ীখানাতে অতিথির সমাদর ও নিমন্ত্রিতের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রশ্নটি খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করলাম শেঠজীকে, এ সব চটি তৈরি করবার খরচ সরকার থেকে পাওয়া যায় নাকি?

এক পয়সাও না, ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন শেঠজী, বরং লাইসেন্স পাবার জন্ত টাকা দিতে হয় সরকারকে।

তার পর নিজে থেকেই তিনি আবার বললেন, পাঁচ হাজার টাকা, বাবুজী, খরচ হয়েছে আমার ঐ দোতলা বাড়ী করতে। তাছাড়া ঐ জলের কল আনিয়েছি ও বসিয়েছি আমার নিজের খরচে। সরকার বাহাদুর আমাকে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য ত করেই নি বরং উলটে পাঁচশ' টাকা ইনকাম-টেক্স চাপিয়েছে আমার উপর।

তা হলে শূন্যগর্ভ নয় তার ঐ শেঠজী খেতাব! নিশ্চয়ই শাঁসালো লোক তিনি। তা হলেও তার ধনের চেয়ে মনটাই বেশী চোখে পড়ল আমার। ধন তিনি যে উপায়েই উপার্জ্জন করুন না কেন, তার বেশ একটি মোটা অংশই যে তিনি যাত্রীসেবার জন্ত ব্যয় করেছেন তার প্রমাণ ত রয়েছে আমার চোখের সামনেই। আর অমন জাজ্বল্যমান প্রমাণ না-ও যদি থাকত তবু মুক্তকণ্ঠে বলতাম যে, বরান্নুর সেই শেঠজী কেবলই দোকানদার নন।

বেশ ভাল লোক তিনি। অত্যন্ত অমায়িক, সহৃদয় ব্যবহার তাঁর। কিছুক্ষণ পর সওদা করবার জন্ত যখন তাঁর দোকানে গিয়ে বললাম, তখন হেসে বললেন তিনি, আপনাদের মনের মত চাল আজ আপনাদের দেব, বাঙ্গালীবাবু। কেবল সরুই নয়, দেশে যা আপনারা খান সেই সেদ্ধ চাল।

দাম অবশ্য সের প্রতি দুই টাকা। তবু খুশী হলাম বই কি?

তবে ঐ চাল পর্য্যন্তই। ডাল পাওয়া গেল অড়হর। আর আলু।

কিছু সবজি পাওয়া যায় না শেঠজী? আশা না থাকলেও জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন তিনি, না বাবুজী। স্বর শুনে বুঝলাম যে তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ উল্লাসে চীৎকার করে উঠল জিতেন, ঐ ত কি যেন ঝুলছে গাছে। ঝিঙ্গে নাকি?

দোকান-ঘরের গা-লাগা কি যেন একটা গাছ। চোখে পড়েছিল বটে যে, ওকেই জড়িয়ে পুষ্ট পুষ্ট অনেকগুলি লতা প্রচুর পাতা মেলে ছাদ পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। ওতে যে ঝিঙ্গে ফলে থাকতে পারে তা মনে হয় নি আমার। জিতেনের ডাক শুনে কাছে গিয়ে দেখি যে, সত্যই ঝিঙ্গের মত কয়টি ফল ঝুলছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে। দেখে উল্লাসিত হলাম আমিও। জিতেনের মতই আমিও চীৎকার করেই বললাম, সত্যই ত শেঠজী, সবজি ত রয়েছে আপনার গাছেই।

দোকান থেকে উঠে এসে নিজেও তিনি দেখলেন ঝিঙ্গে কয়টি। পরে হেসে বললেন, তুলে নিন যে কয়টি বড় বড় হয়েছে। এর জন্ত কোন দাম দিতে হবে না।

শুনে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অবিশ্বাসও করতে পারি না শেঠজীর মুখের দিকে চেয়ে। কেবল হাসি নয়, পরিতৃপ্তির হাসি তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে—বিদেশী তীর্থযাত্রীকে তাঁর নিজের গাছের সবজি উপহার দিতে পেরে, নিজেই যেন তিনি কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন।

পাঁচ-ছ'টি ফল পাওয়া গেল। ঝিঙ্গের মত হলেও ঝিঙ্গে বুঝি নয়। অথবা পাহাড়ের ফসল বলেই অত মোটা ওগুলির খোসা—ছাড়ালে তিন ভাগের দু'ভাগই চলে গেল।

তবু ত সবজি। আলুর সঙ্গে মিশাল দিলে বাঙ্গালীর অভ্যস্ত ব্যঞ্জন পাতে পড়বে আমাদের। সেই জন্তই লোভও বেড়ে গেল আমার। শেঠজীর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দোকানে পিঁয়াজ নেই শেঠজী?

পিঁয়াজ! বলে মুখ তুলে তিনি তাকালেন আমার মুখের দিকে।

ভাবখানা এই যে, পিঁয়াজ খেতে চায় এ আবার কেমন যাত্রী। কিন্তু হেসেই উত্তর দিলেন তিনি, দেখছি খুঁজে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন সেদিন। তিনটি বড় বড় পিঁয়াজ পাওয়া গেল দোকানের একটি ভাণ্ডের মধ্যে। ওজনে এক পোয়ারও বেশী। তীর্থধর্ম্ম সব ভুলে গিয়ে সশব্দে কেদারনাথকে ধন্যবাদ দিলাম।

আর ঠিক সেই সময়েই গঙ্গোত্রী তার তরফের বাজার করবার জন্ত উপস্থিত হলেন সেখানে। ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন বুঝি, এলো চুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠের উপর। পরিচ্ছন্ন মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমাদের আয়োজন দেখে তাঁর সেই মুখে হাসি যেন আর ধরে না। হাসতে হাসতে বললেন তিনি, এত কম সব জিনিস নিয়েছেন কেন? কেবল নিজেরাই খাবেন বুঝি? কেমন চাচা তা হলে?

হেসে উত্তর দিলাম, আমরা যে পাষণ্ড বাঙ্গালী! এখানে মাছ পাওয়া যায় না, তাই ভড়ংটুকু রাখতে পেরেছি। তবু ত দেখুন পিঁয়াজ কিনে ফেলেছি এরই মধ্যে।

তাতে কি হয়েছে?

পিঁয়াজ খান আপনি?

খাই না আবার? এখনই ত জিভে জল আসছে আমার।

পরিহাস যে নয় তা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতরের সব সঙ্কোচ এক নিমেষেই বাষ্প হয়ে উড়ে গেল যেন। অনুনয়ের সুরেই আমি বললাম, তা হলে গঙ্গোত্রী দেবী, আলাদা আর সওদা করবেন না। চাল-ডাল যা দুটি আমি জুটাতে পারি তাই সবাই এক সঙ্গে বসে ভাগ করে খাব।

শুনে হাসি যেন উথলে উঠল গঙ্গোত্রীর দুটি চোখে। তিনি বললেন, রাঁধবে কে? ভাইয়া?

আমি উত্তর দিলাম, না। কাল দু'বেলাই রেঁধেছে জিতেন। আজ আমি রাঁধব।

কি রাঁধবেন?

ভাত, ডাল আর তরকারি।

একটু কি যেন ভাবলেন গঙ্গোত্রী, তার পর বললেন, আপনার নিমন্ত্রণ চাচা, কবুল করতে পারি, তবে একটি সর্ত্তে।

কি সেটি?

আপনাদের ডাল আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের ডালের সঙ্গে এক হাঁড়িতে রাঁধব।

সত্যই বিস্মিত হয়ে বললাম, তা হলে আর আমার নিমন্ত্রণ আপনারা গ্রহণ করলেন কোথায়? চাচার ঘরে নিমন্ত্রণ খেলে নিজের ঘরে আবার রাঁধতে হবে কেন?

বাঃ রে? ভাগীরথী কল কল করে উঠল যেন; মা-বেটি সঙ্গে আছে না? আমি পিঁয়াজ খাই বলে উনিও খাবেন নাকি?

অকাট্য যুক্তি মেনে নিতে হ'ল। সুতরাং মানতে হ'ল গঙ্গোত্রীর প্রস্তাবও।

জিতেন দেখি খুশী হয়েছে আমার চেয়েও বেশী। কিন্তু বুঝলাম ক্ষুব্ধও সে হয়েছে, আমি রাঁধতে যাব শুনে। একটু অভিমানের সুরেই সে বললে, আপনি, মণিদা, রাঁধতে গেলে আমি বসে বসে করব কি?

আমি হেসে উত্তর দিলাম, তুমি গুপ্তকাশীতে কথা দিয়েও কিছুই ত কর নি। এখন মাইয়ার একটু সেবাযত্ন কর গে।

আমার কাজ সোজা। তা আরও সোজা করে দিল আমাদের বাহাদুর। আমার পায়ে সে লুটিয়ে পড়ে আর কি! আর বলে, আমি থাকতে বাবুজী, আপনারা মেহনৎ করবেন কেন? কাছে থেকে আপনি কেবল দেখিয়ে দিন যাতে দামী জিনিস আমার হাতে নষ্ট না হয়; কাজ যেটুকু তা আমার হাতদুখানাই করুক।

উনুন থেকে অনেকটা দূরে তার নিজের কম্বলখানা সে দু'ভাঁজ করে পেতে দিল আমার বসবার জন্ম।

রান্না ত হবে কেবল চা'টি ভাত আর আলু-ঝিঙে-পিঁয়াজের ঘণ্ট। তার দেখবই বা কি আর দেখাবই বা কি! তরকারিটুকু নিজের পছন্দমত কুটে রেখে হাঁড়ির ভাত টিপে দেখি যে তা সুসিদ্ধ হতে আরও সময় নেবে খানিকটা! অগত্যা উঠে গেলাম বারান্দায়।

মুখোমুখি দেখা হিমালয়ের সঙ্গে। শুধু তিনি আর আমি। এমন সুযোগ বুঝি অধিকাংশ যাত্রীরই হয় না। কিন্তু উদাসী সন্ন্যাসী যে চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন!

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। কিন্তু আকাশে সূর্য্য বা ধরাতে রোদ চোখে পড়ল না। লোকজনও নেই—না পথে, না সামনে কাছিমের পিঠের মত পাহাড়টার উপর, না যাত্রী, না স্থানীয় কোন লোক। শব্দের মধ্যে অনেক নীচে মন্দাকিনীর সেই পরিচিত গর্জ্জনধ্বনি—এত দূরে চাপা গোঙানির মত কানে আসছে। পাখীর ডাক শুনব আশা করেছিলাম—এই ত তাদের কলরব করে কুলায় যাবার সময়। কিন্তু কানে এল না তা, চোখেও পড়ল না কোন পাখী। আশ্চর্য্য! হিমালয়ে পাখী নেই নাকি? হরিদ্বার ছাড়বার পর পাখী আর দেখেছি বলে মনে ত হয় না! নিরাশ হলাম আরও এক কারণে। কেবল দার্জ্জিলিং অঞ্চলে নয়, কেদারের পার্ব্বত্য অঞ্চলেও একটু উপরে উঠে গেলেই হামেশাই চোখে পড়েছে নীচে পেঁজা তুলোর মত হালকা সাদা সাদা মেঘের ভেসে ভেসে লুকোচুরি খেলা। কিন্তু এই হিমালয়ে কৈ, এখন পর্য্যন্ত একবারও ত মনে হ'ল না যে, মাথার উপরকার চিরপরিচিত আকাশটা কোন সময়ে বুঝি পিছিয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে। পাঁচ হাজার ফুটের চেয়েও বেশী উঁচুতে সেই বরাসু গ্রামে চটির দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে চেয়ে সেদিন অনেক দূর পর্য্যন্ত মন্দাকিনীর উপত্যকা বেশ দেখতে পেলাম, কিন্তু মেঘ বা মেঘের মত কুয়াশার একটি ফালিও নয়। বৃথাই খুঁজলাম সন্ধ্যার আকাশে বর্ণের সমারোহ। ছাই রং সামনের এক ফালি আকাশের। দূরের গাছগুলিও এখন মনে হয় বিবর্ণ।

তবে ওরই মধ্যে একটি চমক। চোখদুটি আমার দূরে দূরে ফিরছিল বলেই বুঝি এতক্ষণ দেখতে পাই নি আমি, দৃষ্টি গুটিয়ে আনতেই এখন চোখে পড়ল। এই সরু বারান্দারই দক্ষিণ প্রান্তে কম্বল পেতে মুখোমুখি ঘন হয়ে বসেছে জিতেন আর গাঙ্গোত্রীর জননী। চুপচাপ বসে থাকা নয়, গল্পে মেতে উঠেছে দু'জনে। বৃদ্ধা বসেছেন পথের দিকে মুখ করে, তাই ধোঁয়াটে আলোকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তাঁর সম্পূর্ণ মুখখানিই। কুঞ্চিত চর্ম্মের ভাঁজে ভাঁজে স্বাভাবিক রেখাগুলি আরও বুঝি গভীর হয়েছে বলেই দূর থেকেও দেখতে পেলাম আমি। করুণ মুখখানি আরও করুণ দেখাচ্ছে যেন। থেকে থেকে তিনি হাত নাড়ছেন, মাথা নাড়ছেন, যা থেকে মনে হয় যেন একটু উত্তেজিত হয়েছেন তিনি।

জিতেনও কথা বলছে দেখলাম, কিন্তু শুনছেই সে বেশী। মনে হ'ল যেন থমথমে দেখাচ্ছে তার মুখখানিও।

ইচ্ছা ছিল যে, ওদের কাছে গিয়েই বসব যতক্ষণ উনুনের উপর আমার ভাত সুসিদ্ধ না হয়। কিন্তু ওরা তন্ময় হয়ে আলাপ করছে বুঝে দমন করলাম আমার ইচ্ছাটি। একটু ইতস্ততঃ করবার পর ঢুকলাম গিয়ে গাঙ্গোত্রীর রান্নাঘরেই।

রুটি গড়ছিলেন গাঙ্গোত্রী। আমাকে দেখে আটার তালসুদ্ধ থালাখানি সরিয়ে রেখে কুণ্ঠিতস্বরে তিনি বললেন, ডাল নিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছি, চাচা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সেদ্ধ হচ্ছে না, উত্তর দিলেন গাঙ্গোত্রী। অস্বাভাবিক অবশ্য নয়। এসব জায়গার জল এমন যে, ডাল তাতে পড়লেই যেন লোহা হয়ে যায়। যত উপরে যাব ততই এই ঝামেলা বাড়বে। অথচ কি যে ভুল হয়ে গেল আমার, সোডার শিশিটাই ফেলে এলাম।

আমি হেসে বললাম, ডাল তেমন সেদ্ধ না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমরা আধসেদ্ধ ডালই বেশ খেতে পারব।

আপনারা খেতে পারলেও আমি পাতে দেব কেমন করে ?

পরিচিত সুর। কিন্তু এ পথে ত ও সুর শুনবার আশা ছিল না। বুকের ভিতরটা আবার দুলে উঠল আমার। এবং সেই জন্তই শব্দ করে হেসে উঠে আমি বললাম, তা হলেও ঘাবড়াবার কারণ নেই। আমার তরকারি ত এখন পর্য্যন্ত চাপেই নি উনুনের উপর। এই জলেই ত ভাত সেদ্ধ হবে। দোষী হবে আমারও। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে রাধুন।

গুণ হোক, দোষ হোক—তা ঐ জলেরই। আমার ক্ষেত্রে মা-মনসার সঙ্গে ধূপের গন্ধ হয়ে জুটেছে সেদ্ধ চাল। দ্বিতীয় বার সেদ্ধ হতে বুঝি ঘোর আপত্তি তার। সে রাত্রে খেতে বসলাম আমরা আটটায়।

অত তন্ময় হয়ে কি আলাপ করছিল জিতেন গাঙ্গোত্রীর মায়ের সঙ্গে ? খাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। রাত্রে শোবার পর জিজ্ঞাসা করবার দরকারই হ'ল না।

জিতেনই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বলতে পারেন মণিদা, গাঙ্গোত্রীর বিয়ে হয়েছে কি না ?

প্রশ্নটি অদ্ভুত বলেই হেসে উত্তর দিলাম আমি, না। তবে অনুমান করি যে বিয়ে হয় নি।

জিতেন বললে, আমার অনুমান মাত্র নয়, সঠিক জেনেছি আমি। গাঙ্গোত্রীর বিয়ে হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, তখন ওঁর মায়ের সঙ্গে তোমার এই সব কথাই হচ্ছিল বুঝি ?

কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে স্বীকার করল জিতেন। শুনে ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি বললাম, ভাল কর নি জিতেন। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজের লোক আমরা। ওঁদের সঙ্গে পথের পরিচয় আমাদের। এইটুকু পরিচয়ের সূত্রে কি বয়স্থা মেয়ের বিয়ের কথা জিগ্যেস করতে আছে !

যেমন তার স্বভাব, আমার আপত্তি যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল জিতেন। সে বললে, মেয়ের বিয়ের কথা জিগ্যেস করেছি মেয়ের মাকে, আর কাউকে ত নয়। আর আপনার মত সাহেবী ও শহুরে-মনই নয় বুড়ী মাসীমার। কথাটা আমি তুলতেই তিনি গড় গড় করে বলে গেলেন।

কিন্তু শুনে লাভটা কি হ'ল তোমার ?

যা জানতাম না তা জানলাম। শুধু জানাটাই ত একটা মস্ত লাভ।

তর্ক নিরর্থক বুঝে আর উত্তর দিলাম না। কিন্তু জিতেনের বুঝি পেট ফুলছিল। একটু পরেই সে আবার জিজ্ঞাসা করল, বলতে পারেন মণিদা, ঐ দক্ষিণী সাধুকে মাসীমা তখন অমনভাবে তাড়া করেছিলেন কেন ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তাড়া আবার উনি কখন করলেন তাঁকে ?

জিতেন বললে, ঐ যে সাধুকে ঘরে ফিরে গিয়ে বে-থা করতে বললেন, ওকেই তাড়া করা বলে। ওর কারণটা কি জানেন ?

না।

আমি জানি। মাসীমার মনে অনেক ক্ষোভ জমে রয়েছে, কেননা ওঁর স্বামী সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন।

অসম্ভব অবশ্য নয়, তবু চমকে উঠলাম। যে দুটি সদ্য-পরিচিতা নারীকে এতক্ষণ পথের সাথী হিসাবে কেবলই ভাল লেগেছে এখন তাদের জন্য অকস্মাৎ অনেকখানি যেন সমবেদনা অনুভব করলাম। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, উনি নিজে বললেন তোমাকে এ কথা ?

হ্যাঁ, জিতেন উত্তর দিল, আর বললেন তাঁর স্বামীর বিরাগী হবার কারণও। তা ঐ গঙ্গোত্রী।

কি !—বলতে বলতে উঠেই বসলাম আমি।

অন্ধকারেও বুঝতে পেরে জিতেন হাসল। হাসতে হাসতেই সে বললে, আমার চমকেছিলেন মণিদা। এখন বুঝুন, আপনার মনেও কৌতূহল আছে কিনা।

মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গোত্রীর কথা কি বললেন উনি ?

তা খুব রসিয়েই বলেছেন, উত্তর দিল জিতেন, বললেন যে ও মেয়ে দেখতে শুনতে অত ভাল হলে কি হবে, বড্ড গোঁ ঐ গঙ্গোত্রীর। ও নাকি ভাঙবে, তবু মচকাবে না।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি—এ কোন অপবাদ নয়। ঠিক এইরকমই আমারও মনে হয়েছিল। তবে সঙ্গে সঙ্গেই আমার জানবার ইচ্ছাও অনেক বেড়ে গেল। জিতেন আরও হাসবে বুঝেও প্রায় অনুনয়ের স্বরেই তাকে আমি বললাম, যা সে জানতে পেরেছে তা সব খুলে বলতে।

তার শোনা কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনলাম জিতেনের মুখে। তেমন দীর্ঘ বা অসাধারণ কাহিনী নয়; তবু তখন মনে হয়েছিল যে, বুঝি কাহিনীই শুনছি।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবার গঙ্গোত্রীদের। নেপালী হয়েও উত্তর-প্রদেশের অধিবাসী। প্রাদেশিক সরকারের পি-ডব্লিউ-ডি'র ওভারসিয়ার গঙ্গোত্রীর পিতা। ইংরেজের আমল থেকে সরকারী কর্ম্মচারী তিনি। রাজভক্তি তাঁর একালে দেশের রাজা না থাকলেও সেকালের মতই খাঁটি ছিল। তেমনি গভীর ছিল তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠা। সরকারের যে কাহন তিনি নিতেন তাঁর বেতন হিসাবে তা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল দিতেন সরকারী কর্ত্তব্য স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে। সরকারী কাজের বাইরে যে বে-সরকারী জগতটাতে একেবারে ভিন্ন জাতের ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে সে জগতের কোন খোঁজই রাখতেন না তিনি। সরকারী কাজ শেষ হলেই ঢুকে যেতেন তিনি তাঁর নিজের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে, যার একটা কোণে স্ত্রী আর ঐ একমাত্র সন্তান গঙ্গোত্রী ও বাকি সবটাই অধিকার করে থাকতেন পশুপতিনাথ। ছত্রিশ জাতের কুলিকামিন নিয়ে যাঁর কারবার ও জলাজঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বতেই বেশীর ভাগ কাজ তাঁর

সন্ধ্যা-আহ্নিক কোনদিন একবেলাও বাদ যেত না। মাথার চুলে পাক ধরবার পূর্ব্বেই দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি কাশীর এক সন্ন্যাসীর কাছে। তার পর থেকে প্রায়ই স্ত্রীকে তিনি বলতেন যে, গঙ্গোত্রীর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই চাকরি ছেড়ে বানপ্রস্থ নেবেন তিনি।

গঙ্গোত্রীর জন্ম মোটামুটি সম্বন্ধও স্থির করে রেখেছিলেন তাঁর পিতা। নেপাল দরবারে উঁচুস্তরের ওমরাহ একজনের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্ত্তা একরকম পাকাই হয়ে ছিল। হীরের টুকরো ছেলে নাকি সে। বংশ ও অর্থকৌলিন্যের উপরেও বিদ্যা ছিল তার। বি এ পাশ ছেলে। নেপালে সরকারেরই চাকুরে। বাকি ছিল তার কেবল চাকরিতে পাকা হওয়া। সেইটুকুর জন্ম বিয়েতে দেরী হচ্ছিল বলেই ম্যাট্রিক পাশ গঙ্গোত্রীকে তার পিতা আবার কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন।

আদুরে মেয়ে গঙ্গোত্রী। বাপের মনে পশুপতিনাথের ঠিক নীচেই বুঝি তার স্থান। মেয়ের গুণ মুখে ধরত না ওভারসিয়র সাহেবের। আর গুণও ছিল বই কি গঙ্গোত্রীর। যেমন ঘরের কাজে তেমনি লেখাপড়াতেও মনোযোগ তার। কলেজের শিক্ষিকারা বাড়ীতে এসে মায়ের কাছে প্রশংসা করতেন তাঁর মেয়ের। বিশেষ করে বলতেন তাঁরা কলেজের বিতর্ক সভায় গঙ্গোত্রীর কৃতিত্বের কথা—তার বক্তৃতায় নাকি আগুন ছুটত। তার উপর গঙ্গোত্রীর ছিল দশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার ঝোঁক। সুতরাং ছোট শহর আলমোড়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সুখ্যাতি, জড়িয়ে পড়েছিল সে নিজে স্থানীয় নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে।

সেই গঙ্গোত্রী। একদিন কলেজ থেকে বাড়ীতে ফিরে এল না সে। রাত্রে চেনাজানা সব জায়গায় খোঁজ করেও সন্ধান পাওয়া গেল না তার। তিন দিন পর ওভারসিয়র সাহেবের কাছে খবর এল যে, কাঠমাণ্ডুর পথে একদল বিদ্রোহীর সঙ্গে গঙ্গোত্রীও নেপাল সরকারের পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

ঐ যে ভাঙ্গল গঙ্গোত্রীর জননীর সংসার তার পর তা আর জোড়া লাগে নি।

গঙ্গোত্রীর পিতা ছাড়িয়ে এনেছিলেন মেয়েকে। এনেই তার বিয়ের আয়োজন সুরু করেছিলেন। পাত্র সেই নেপাল দরবারের ওমরাহের চাকুরে পুত্র। রাণাশাহীর পতন হয় নি তখনও। আর পতন হলেও ছেলেটির চাকরি মারে কে? নিজের দৃষ্টান্ত থেকেই ত ওভারসিয়র সাহেব জানেন যে, রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পূর্ণ ও সার্থক হলেও সরকারী চাকুরিয়ার চাকরি যায় না।

কিন্তু বেঁকে বসল গঙ্গোত্রী স্বয়ং। অত যে বাপসোহাগী মেয়ে সেই সেদিন বাপের মুখের উপরেই স্পষ্ট বলে বসল যে, মুক্তিফৌজের দলে নাম না লিখিয়ে যে নেপালী যুবক ঐ যুগে সরকারী কাজ নিয়েছে তার গলায় কিছুতেই সে বরমাল্য দেবে না।

স্তম্ভিত পিতা রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন, কিন্তু মা, আমি যে তাদের কথা দিয়েছি।

গঙ্গোত্রীর উত্তর আগের চেয়েও স্পষ্ট, তা হলে বাবা, তোমার কথা রাখবার জন্ম আমার দেহটাই তাদের হাতে তুমি তুলে দিতে পারবে, তার আগে আমার প্রাণটা আমি নিবেদন করে দেব যাকে আমি কথা দিয়েছি।

তার মাকে জানিয়েছিল গঙ্গোত্রী তার দয়িতের পরিচয়। বিদ্রোহী দলের নীচের স্তরের একজন নেতা সে যুবক যার সঙ্গে মাসতিনেক আগে নিজেও সে একটি অভিযানে যোগ দিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল। লক্ষ্ণৌতে মেডিকেল কলেজের ছাত্র সে যুবক, কিন্তু তখন নেপালের জেলে বিচারাধীন কয়েদী।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন ওভারসিয়র সাহেব যে, চালচুলো নেই সে ছেলের। ওর চেয়েও গুরুতর অযোগ্যতা তার—সে জাতিতে বৈশ্য। এই সব আপত্তি পিতার মুখ থেকে শুনবার পর গঙ্গোত্রী খুব শান্ত দৃঢ় স্বরে উত্তর দিয়েছিল, তোমার কথা অমান্য করে আমি তাকে বিয়ে করব না, বাবা। কথা দিচ্ছি তোমায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই আর একটি কথা আছে আমার—আমি মোটে বিয়ে করবই না।

বছরদশেক আগের ঘটনা এ সব। পিতা ও পুত্রীর মধ্যে তখন যে সন্ধি হয়েছিল তার কোন সর্ত্ত কোন পক্ষই ভঙ্গ করে নি। ওভারসিয়র সাহেব ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর কাজ আর পূজার মধ্যে, গঙ্গোত্রী ফিরে গিয়েছিল তার কলেজে। কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করবার পর গঙ্গোত্রী যখন চাকুরি খুঁজতে সুরু করল তখন দ্বিতীয়বার ধ্যান ভাঙ্গল তার পিতার। একবার লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে এলেন তিনি। এসে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে আবার গেলেন পশুপতিনাথের মন্দিরে পূজা দিতে। আলমোড়াতে ফিরে এসে মায়ের সামনে মেয়ের মাথার উপর ডান হাতখানি রেখে ওভারসিয়র সাহেব বললেন, অসবর্ণ বিয়েতে আমার যে আপত্তি ছিল তা আমি প্রত্যাহার করলাম, মা। ছেলেটিকে আমি দেখে এসেছি। এবারই মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবে সে। তারপর বিয়েতে তোমাদের দু'জনেরই মত যদি হয় তবে আমার আশীর্ব্বাদও তোমরা পাবে।

পরদিনই কাজের নাম করে বের হয়ে গিয়েছিলেন ওভারসিয়র সাহেব। আর ফিরে আসেন নি। গঙ্গোত্রীর জননী জিতেনকে বলেছেন যে, মনের দুঃখে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন তিনি—হয়ত পরিব্রাজক হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করি নি। তন্ময় হয়ে শুনছিলাম জিতেনের মুখে গঙ্গোত্রীর পারিবারিক ইতিহাস। শুনছিলাম বলাটা ঠিক হ'ল না—বুঝি মনে মনে এতক্ষণ বিচরণ করছিলাম কখনও আলমোড়া, কখনও কাঠমাণ্ডু, কখনও বা লক্ষ্ণৌ শহরে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ থাকলে এতক্ষণ বাইরে বৃষ্টিপাতের অমন

মধুর ঝমঝম আওয়াজ কানে আসে নি কেন? এতক্ষণ পর মনে পড়ল যে, আমি কেদারনাথের পথে বরাসু গ্রামে একটি চটিতে শুয়ে আছি। তবে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা কাহিনীর অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধেও সজাগ হয়ে উঠল আমার মন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে গঙ্গোত্রী বিয়ে করলেন না কেন? —তাঁর বাবা যখন তাঁকে অনুমতি দিয়েই গিয়েছেন।

উত্তরে জিতেন বললে, মাসীমাও ত সেই দুঃখই করছেন। কতবার নাকি উনি অনুরোধ করেছেন মেয়েকে, কিন্তু গঙ্গোত্রী রাজী হন নি। সেই ছেলেটিও নাকি অনেকবার ওদের আলমোড়ার বাড়ীতে এসেছে। গঙ্গোত্রী অভ্যর্থনা করেছেন তাকে, মিশেছেনও খুব তার সঙ্গে। তবু দু'জনের বিয়ে হয় নি।

একটু থেমে জিতেন আবার বললে, সেই পুরনো কথা, মণিদা, মনে পড়ছে আমার, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা। ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

বলেই সশব্দে হেসে উঠল সে।

হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না আমি। বাইরে অত হাসি-খুশী যে মেয়েটি, বুকের মধ্যে কি যে গভীর দুঃখ সে বহন করে বেড়াচ্ছে তাই কিছু কিছু অনুমান করে ততক্ষণে মনটা আমার মুষড়ে পড়েছে।

ঘুমও আসে না চোখে। বুকের মধ্যে কি একটা কাঁটা যেন খচ খচ করছে।

ক্রমশঃ

ভরা ভাদরে

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভরা এ ভাদরেতে গাঙেরি কূলে কূলে
গগনে ধরণীতে কে ওই গাহে গান?
তাহারি সুর শুনে ধানের দোলনাতে
নিখিল কবিহৃদি করিছে আনচান।
শেফালীবন থেকে কে দেয় হাতছানি
বকুল ফুল বয়ে এলরে কার চিঠি?
ভোরেরি লালরোদে সোনালী পাল তোলা
তরীর মাঝে ঐ মধুর কার দিঠি?
ঘোমটা খোলা তার চমকি ওঠে দুটি
হেঁয়ালি ভরা কালো পটলচেরা চোখ,
নিখিল মানবের মনেরি বধূ সে যে
তরীর বুকে চলে ঝরায়ে মধুশ্লোক।
একদা যৌবনে গাঙেরি কূলে বসি
দেখেছি এরি মত হৃদয় টলমল,
সেদিনও তরণীতে এমনি বসেছিল
মুখেতে ছিল হাসি লাবণ্য ঝলমল।
তাহারি সাথে সাথে সিকতাপথ বাহি
আমি যে চলেছিনু জানিনা কতদূর,
চলে সে গিয়েছিল পাগল দিঠি দিয়ে
মিলায়ে গেল দূরে জানিনা কোনপুর?

একদা পুনঃ ফিরে তারে যে পেয়েছিনু
ঘরের মাঝে মম সে যে যে এসেছিল,
আমারে যাদু করি কোন্ সে রূপরাণী
স্বপন সম করে ভাল যে বেসেছিল?
হঠাৎ একদিন এমনি নদীতীরে
ফেলেছি হারায়ে যে হয়নি আর দেখা,
সেদিনও এমনিটি ভাদর ভরা ছিল
আমি যে সেই থেকে জীবনপথে একা।
ভাল যে লাগে তাই ভাদরে নদীপথ
ভাল যে লাগে তাই তরীর ছলছল,
কাছেতে পাই পাই হারায়ে ফেলি হায়
গগনে ধলো মেঘ হাসে যে খল্‌খল্।
পাখী যে ডাকে তাই বৌ গো কথা কও
কথা সে কয়নাকো চলে সে কোন্‌পুর,
গাঙেরি বুক তাই করে যে থই থই
ভরা এ ভাদরেতে কই সে কতদূর?
এ ভরা ভাদরেরি একদা নদীতীরে
হৃদয় ভেঙে মোর তাহারি চলে যাওয়া,
ভাদর তোরি বুকে দেখিব তারি ছবি
জীবনে তারে হায় যাবে না আর পাওয়া।

১০

ঘড়িতে এইমাত্র বারো বাজল। অতনু এখনও ফিরে আসে নি। শ্রীমতী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার বাইরে নিবদ্ধ। ঘরের মধ্যে তখনও বৈদ্যুতিক পাখাটা পূর্ণ বেগে ঘুরছে। যদিও জানালা পথে ঝলকে ঝলকে দখিনা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করছিল। দূরে দেখা যাচ্ছে, অতনুর কারখানার সারি সারি ঘরগুলি। ঘুমিয়ে আছে, একেবারে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। সকাল থেকে দেখা দেবে প্রাণচাঞ্চল্য।

ডাক্তারবাবু বহুপূর্ব্বেই চলে গেছেন। তার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। কেষ্ট বারকয়েক ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে নিঃশব্দে। শ্রীমতী ফিরে তাকায় নি, তবে টের পেয়েছে। নিজের লজ্জা ঢাকতেই শ্রীমতী চুপ করেছিল। কেষ্ট অনেক দিনের পুরন লোক, বহু তথ্যই হয় ত তার জানা। অতনুর রাত বারটায় বাড়ী ফিরে না আসার কারণটাও কেষ্ট জানে। লোকটির বেশ বয়স হয়েছে, হিসেব করে কথা বলে না—অযাচিত উপদেশ দেয়। উদ্দেশ্য তার ভাল হলেও শ্রীমতীর ভাল লাগে না।

অতনুর সম্বন্ধে টুকরো টুকরো অনেক কথাই তার কানে এসেছে। সেসব কথা তার কানে মধু বর্ষণ করে নি, তাকে খোসামোদ করবার ছলে কথাগুলি শোনাবার প্রয়াস। তারা হয় ত একেবারে মিথ্যে বলে নি, কিন্তু তার বিবাহিত জীবনের এই ক'টা মাসের মধ্যে এমন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইতিপূর্ব্বে ঘটে নি, যার জন্য সেই টুকরো কথাগুলি একত্র করে তাকে দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান হতে হবে। তথাপি নিজের অজ্ঞাতেই যে শ্রীমতী অনেকখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এ কথাটা হয়ত সে ঠিক জানে না। তাই নীরবে অগ্রাহ্য করে চলবার এই আগ্রহ।

স্বামীস্ত্রীর সহজ জীবনযাত্রার যতগুলি দৃশ্য আজ পর্য্যন্ত তার চোখে পড়েছে, তাদের জীবনে তেমনটি আজও দেখা দেয় নি। হয়ত এদের সমাজে এইটিই স্বাভাবিক—রাত দশটায় তাই এদের সন্ধ্যা।

কম্পাউণ্ডের প্রান্তে মালির ঘর থেকে তখনও আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে। মালি এবং তার বউ বহুক্ষণ ধরে ফুল-বাগানের বেঞ্চিটার উপর বসে আছে। ঐ একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ওদের প্রায় প্রতিদিনই এমনি সময় বসে থাকতে দেখা যায়।

পাশের ঘরে অতনু যখন গভীর নিদ্রামগ্ন—এপাশের ঘরে শ্রীমতী তখন হয়ত আকাশের তারা গোনে। অথবা মালি-দম্পতির প্রেম নিবেদনের দৃশ্যগুলি চেয়ে চেয়ে দেখে। ওদের কথা যেন শেষ হতে চায় না, সময় ওদের জন্য থেমে আছে যেন।

অতনু একটা জীবন্ত ঝড়। ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চলে যায়, পিছনে পড়ে থাকে একটা প্রকাণ্ড অবসাদ, একটা অনির্ব্বচনীয় ক্লান্তি। নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রীমতী যখন চোখ মেলে তাকায় তখন কোথায় বা সে ঝড়ের দাপট আর কোথায় বা সে শক্তির উৎস। ঝড়-দানব তখন অবসাদে ভেঙে পড়েছে—প্রকৃতি উঠেছে জেগে, ভাঙার মধ্যে তার আনন্দ কোথায়, সৃজনের মধ্যে সে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটাতে তৎপর হয়ে ওঠে।

শ্রীমতীর চিন্তাধারা কোন্ পথ ধরে আজ চলতে সুরু করেছে? কি সে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই মুহূর্ত্তে…?

শ্রীমতী নিঃশব্দে এসে শয্যার আশ্রয় নিল। কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই। ডাক্তারবাবুর কথা তার মনে পড়ল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল তার বাবার কথা, মায়ের কথা আর দাদার কথা। সূর্য্যদাও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার রূপ আলাদা। ওদের কোন দাবি নেই, সূর্য্যদার আছে।

এইমাত্র রাত একটার সঙ্কেত শোনা গেল, বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামার শব্দ শোনা গেল। শ্রীমতী নিঃশব্দে উঠে এসে জানালার কাছে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নেমে ড্রাইভার দরজা খুলে খানিক অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে কেষ্ট এসে উপস্থিত

হ'ল। ওদের চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছে এমনি ঘটনার সঙ্গে তাদের ইতিপূর্ব্বেও পরিচয় ঘটেছে।

কেষ্টর সাহায্যে অতনু ধীরে ধীরে নেমে এল, ড্রাইভার গাড়ী গ্যারেজে তুলতে গেল।

মনে হ'ল কেষ্ট কিছু যেন বলছে। প্রশ্নটা শোনা না গেলেও উত্তরটা শ্রীমতীর কানে গেল। সব ঘুমিয়ে পড়েছে বলছিলি, না? বদমাসগুলির কথা শুনতে গিয়েই··· তুই থাম ব্যাটা···তোর বৌদি আসবার পর আর খেয়েছি আমি···কিন্তু খবরদার কেষ্ট একটি কথাও যদি ফাঁস করেছ তা হলে তোমায় আমি ডিস্‌মিস্ করব—হ্যাঁ···

কেষ্ট এত কথার একটিও জবাব না দিয়ে ধীরপদে অপর দিকে এগিয়ে চলল, আর শ্রীমতী দ্রুত নিজের শয্যায় ফিরে এসে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। পরস্পর কানাঘুষার একটা দিক এই মুহূর্ত্তে তার কাছে আর অস্পষ্ট নয়। কিন্তু অতনুর একটা কথা শ্রীমতীর ভাল লাগল—স্ত্রীকে তার সঙ্কোচ এবং খানিকটা ভয়। ঐটুকুই তার মূলধন, এই মূলধনকেই সে অবলম্বন করবে।

আদর্শ পিতার কন্যা সে। পিতাকে সম্মুখে রেখেই এত দিন শ্রীমতী মানুষকে বিচার করে এসেছে, তার আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়িয়েছে তারা এদের সগোত্র নয়—দরিদ্র কিন্তু সংযত। শ্রীমতী ভাবছিল—এর পরে কেমন করে আর কোন্ পথে সে এগিয়ে যাবে, এ নিয়েই তার চিন্তা। হার মানবে না সে—মাথা নীচুও করবে না, তেমন শিক্ষা সে তার বাবার কাছে পায় নি। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে সে শেখে নি, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলার মন্ত্র তার জানা।

পাশের ঘরে অতনু ঘুমাচ্ছে। এ ঘরে শ্রীমতী জেগে জেগে ভাবছে—কে এই ডানকান আর শেঠজী আগরওয়ালা। যাদের সরাসরি উপেক্ষা করতে সে পারে নি!

শ্রীমতী সারারাত ভাল করে ঘুমুতে পারে নি। একটা অদ্ভুত চিন্তা ঘুমের মধ্যেও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তথাপি পরদিন যথাসময়েই তার ঘুম ভাঙল। নিঃশব্দে শয্যা ত্যাগ করে সে স্নানঘরে গিয়ে প্রাণভরে স্নান করে ফিরে এসে খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অতনু ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে চায়ের টেবিলে এসে শ্রীমতীর জন্য অপেক্ষা করছে। শ্রীমতী একদৃষ্টিতে অতনুর আপাদমস্তক দেখে নিল এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একখানি চেয়ারে বসে মৃদুকণ্ঠে বলল, আজ খুব সকাল সকাল উঠেছ ত?

অতনু বলল, তুমি কিন্তু আজ আর ডেকে ঘুম ভাঙাও নি।

শ্রীমতী শান্তভাবে বলল, ভাবলাম, হয়ত অনেক রাতে ফিরেছ, তাই আর ডাকিনি। সে নীরবে চা তৈরি করতে মনোনিবেশ করল।

অতনু বেশ খানিকটা অবাক হ'ল। যারা অনুযোগ দেয় কিংবা প্রতিবাদ করে তাদের বোঝা শক্ত নয়, তার একটা সহজ অর্থ সে বোঝে। কিন্তু নীরব নিস্পৃহতার কোন অর্থই সে খুঁজে পায় না। খানিক শঙ্কা তার মনে উদয় হয়। এখানে তার শক্তি সীমাবদ্ধ, কথাটা সে বোঝে। একটু বেশী করেই আজকাল বুঝতে আরম্ভ করেছে। তাই গত রাত্রের ঘটনাটার উপর সে খানিকটা ঠাণ্ডা প্রলেপ দেবার চেষ্টা করছে। অথচ যাকে কেন্দ্র করে এই দুর্ভাবনা তার তরফ থেকে আভাসে-ইঙ্গিতেও কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না।

অতনুর অন্যমনস্ক মুখের পানে খানিক আড়চোখে চেয়ে দেখে সহসা চা করা বন্ধ করে শ্রীমতী বলল, তুমি কর্নফ্লেক নেবে না পরিজ দেব? তোমার কুককে আমি স্ক্রাম্বলড এগস দেবার জন্য বলে এসেছি! ওতেই হবে না অন্য কিছুর কথাও বলে পাঠাব?

অতনু বলল, ওতেই হবে, কিন্তু তার আগে আমাকে এক পেয়ালা চা দাও।

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, কি করব বল—আজ তোমার বেড-টি পাঠাবার পর্য্যন্ত অবকাশ দিলে না। কাল রাত্রে কিছু খাও নি বলেই মনে হ'ল। খাবার তোমার ঘরেই এনে রেখেছিলাম, যেমন ঢাকা দেওয়া ছিল তেমনি পড়ে আছে দেখলাম।

অতনুর অনুসন্ধানী দৃষ্টি পুনরায় সজাগ হয়ে উঠেও তার ঈপ্সিত কোন বস্তুর সন্ধানই শ্রীমতীর মধ্যে খুঁজে পেল না।

শ্রীমতী বলে চলল, ভাবলাম হয়ত রাগ করেই শুয়ে পড়েছ। আমাকে ত দেখছই বড্ড ঘুমকাতুরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছি। তুমিও খেলে না, আমাকেও খেতে দিলে না।

শ্রীমতী একটুখানি হাসল।

অতনু মনে মনে খুশী হলেও মুখে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলল, কি অন্যায় বল দেখি, আমার যখন দেরী দেখলে তখন নিজে তুমি খেয়ে নিলে না কেন শ্রী?

শ্রীমতী পরিহাসের ছলে বলল, আর একটু সময় নেবে। কিন্তু কোনটা অন্যায়? আমার না খেয়ে রাত কাটান না তোমার দেরী করে ফিরে আসা?

অতনু পুনরায় সজাগ হয়ে উঠল।

শ্রীমতী তেমনি হাসিমুখেই বলল, একেবারে চুপ করে থাকবে? একটা জবাব অন্ততঃ দাও।

অতনু বলল, জবাব দিয়ে কোন লাভ নেই—তা ছাড়া তোমাদের এই সব ঠাকুরমার যুগের নিয়ম-নিষ্ঠা নিয়ে বাদানুবাদ করতে আমার ভাল লাগে না, বিরক্ত বোধ করি।

শ্রীমতী হেসে উঠে বলল, ওটা প্রকাশ্যে। মনেমনে তোমরা খুশীই হও, খানিক পুলকিত হয়েও ওঠ এই বোকা জাতটার নরম মনোবৃত্তি দেখে।

অতনু বলল, এই মিথ্যা আত্মনিপীড়নের কোন অর্থ হয় না।

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। শান্তকণ্ঠে সে বলল, কি হয় আর কি হয় না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সমাধান হবে না। ওটা একান্তই অনুভূতির বস্তু। আর ও বস্তুটি তোমার মধ্যে অত্যন্ত অভাব। সহসা শ্রীমতী তার কথার গতিকে রাশ টেনে থামিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এল, কথায় পেলে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তোমাকে চা দেওয়াই হয় নি যে।

এক পেয়ালা চা সে অতনুর দিকে এগিয়ে দিল।

এক নিঃশ্বাসে চাটুকু পান করে অতনু বলল, তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীমতী রহস্য-তরলকণ্ঠে জবাব দিল, বোঝার চেষ্টা করো না, মিথ্যা সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে তোমার খাবার এসেছে, সেই দিকে নজর দাও।

শ্রীমতীর মুখ বন্ধ হলেও হাত দুখানি চঞ্চল হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে মনটাও, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সহজ কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারে নিজেও সে অবাক হ'ল। বিস্মিত হবার কথাও। গতরাত্রের গ্লানিময় অধ্যায়টি তার মনে কিছুমাত্র দাগ কাটতে পারে নি একথা বলা চলে না। অথচ মন এবং মুখের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের একটা ব্যবধান রেখে সে নিখুঁত অভিনয় করে চলেছে। এমন সুন্দর সে অভিনয় যে অতনু পর্য্যন্ত হতচকিত হয়ে গেছে। কথাটা তার মুখ দেখেই শ্রীমতী অনুমান করেছে।

খাবার প্লেটগুলি অতনুর সম্মুখে ধরে দিতেই সে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোথায়?

শ্রীমতী জবাব দিল, আমি শুধু পরিজ খাব—

সহসা একটা কথা মনে পড়তেই অতনু অন্য প্রসঙ্গে এল, আজ থেকে এই আলাদা ব্যবস্থা কেন? ডাক্তারবাবুর নির্দ্দেশ নাকি?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে একটুখানি হাসল।

অতনু পুনরায় বলল, কি বললেন ডাক্তারবাবু?

শ্রীমতী বলল, তুমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করো, আমাকে কিছু বলেন নি।

তাই করব। অতনু বলল, কোন প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে গেছেন?

না। সংক্ষিপ্ত জবাব এল শ্রীমতীর কাছ থেকে, তোমার সঙ্গেই কথা বলবেন তিনি। কিন্তু এ সব কথা পরে হবে, তুমি খেয়ে নাও আগে।

অতনু আহারে মন দিল।

১১

প্রাতঃরাশ সমাপন করে অতনু তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করল। উঠে দাঁড়িয়ে খানিক কি চিন্তা করে সে বলল, ডাক্তারবাবু সম্ভবতঃ সকালেই আসবেন, আমি বাইরের ঘরে আছি, এলে আমাকে ডেকে পাঠিও।

শ্রীমতী নীরব। অতনু ধীরে ধীরে বাইরের পথে এগিয়ে গেল। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সহজভাবে কথা বলতে কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করছে অতনু। এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে বের হয়ে এসে সহসা ডানকান-আগরওয়ালাগোষ্ঠীর উপর সে বিরূপ হয়ে উঠল।

শ্রীমতী খাবার ঘর থেকে সোজা নিজের শয়নকক্ষে চলে এল। খানিক অকারণে এটা সেটা নাড়াচাড়ি করে চলে এল রান্নাঘরে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে কতকটা তৈরী হয়ে এসেছে সে।

গৃহকর্ত্রীকে এমন অসময় তাদের মহলে আসতে দেখে সকলে তটস্থ হয়ে উঠেছে। শুধু কেষ্টর চোখেমুখে খুশীর আভাস পাওয়া গেল, তার ভাবে-ভঙ্গিতে তা এতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শ্রীমতীর তা দৃষ্টি এড়াল না। কেষ্টকে উদ্দেশ করে সহাস্যে সে বলল, আজ সব রান্নাই দেশী মতে হবে কেষ্ট। ঠাকুরের অভ্যেস আছে ত সুক্তো কিংবা ঘণ্ট রান্না করবার?

কেষ্ট একগাল হেসে বলল, আপনি কি যে বলেন বৌদিরাণী—

শ্রীমতী পুনরায় বলল, বহুদিনের অনভ্যাস বলেই জিজ্ঞেস করছি। আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দেব। আজ একজন বাইরের লোক খাবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি এখনই ডাক্তারবাবুকে ফোন করে এখানে একবার আসবার কথা বলে এস কেষ্ট, দেরী করো না যেন, তোমাকেও আমার দরকার হবে।

কেষ্ট চলে যেতেই ঠাকুর একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, রান্না করাই আমার কাজ মা, আপনি শুধু হুকুম দিয়ে চলে যান, আপনার কথামতই সব হবে। এখানে থেকে মিথ্যে আপনি কষ্ট পাবেন কেন!

শ্রীমতী প্রসন্নকণ্ঠে বলল, রান্নাঘরে থাকতে আমার কষ্ট হবে না ঠাকুর, আমার অভ্যেস আছে। তা ছাড়া ভালও লাগে।

ঠাকুর খানিক কৃতার্থের হাসি হাসল।

কেষ্ট ফিরে এসে বলল, ডাক্তারবাবু তাঁর বস্তি দর্শনে বেরুচ্ছিলেন, ওখানকার কাজ হয়ে গেলে সোজা এখানে চলে আসবেন বললেন।

একটু থেমে একটু দ্বিধা করে সে পুনরায় বলল, বলছিলাম কি—

শ্রীমতী হেসে বলল, কি বলছিলে কেষ্ট?

কেষ্ট বলল, বাইরের লোকটি কি আমাদের ডাক্তারবাবু বৌদিরাণী?

শ্রীমতী জানাল, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ কেষ্ট, আমি ডাক্তারবাবুর কথাই ভাবছিলাম।

কেষ্ট বলল, আমাদের ডাক্তারবাবু আর দাদাবাবু কিন্তু একই জিনিস পছন্দ করেন না—ডাক্তারবাবু মাংস একেবারে ছোন না।

শ্রীমতী বলল, কথাটা আমাকে জানিয়ে তুমি ভাল করেছ কেষ্ট, নইলে লজ্জা পেতে হ'ত। আর শোন, বাজার যাবার আগে এখন থেকে রোজ আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলো সরকার মশাইকে।

ঘাড় নেড়ে কেষ্ট সায় দিল এবং আর একবার রান্নাঘরের অন্যান্য উপস্থিত সকলের মুখের চেহারাটা আড়চোখে দেখে নিল। ওদের চাঞ্চল্য আর সন্ত্রস্ত ভাব সে মনে মনে উপভোগ করছে বলে মনে হ'ল।

আর একটা কথা কেষ্ট। শ্রীমতী পুনরায় বলল, তুমি এখন থেকে রোজ সরকার মশাইয়ের সঙ্গে বাজারে যাবে। কি প্রয়োজন হবে তা তুমিই আমার কাছ থেকে জেনে নেবে। সরকার মশাইয়ের দেখা করবার কোন দরকার নেই।

কেষ্ট বলল, রোজই যেতে হবে বৌদিরাণী?

শ্রীমতী এক নজরে কিছু অনুমান করে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, রোজই এই নিয়মে চলবে, তুমি আমার সঙ্গে চল। বলে কেষ্টকে সঙ্গে করে সে তার শয়নকক্ষে চলে এল। অনতিবিলম্বে কেষ্ট একখানি দীর্ঘ ফর্দ্দ হাতে খুশীমনে সরকার মশাইয়ের উদ্দেশে বাহির-মহলে চলে গেল।

কর্ত্রীঠাকুরাণীর সহসা রান্নাঘরের উপর নেকনজর পড়ায় চাকর-চাকরাণী মহলে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। এ বাড়ীর অভ্যস্ত জীবনযাত্রা পথে এই সর্ব্বপ্রথম এল বাধা। কেউ কেউ পেল ভয়। কেউ ভাবল, এ একটা বড়মানুষী খেয়াল, দু'দিনেই সখ মিটে যাবে।' শুধু দু'চারদিন একটু চোখ-কান বুজে থাকলেই গোল মিটে যাবে, তবু তারা জেগে উঠেছে। যে খেয়ালের বশে তিনি রান্নাঘরে ছুটে এসেছেন তারই বশে অন্ন মারতেও পারেন।

শ্রীমতী ওদের রকম দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'ল। তার উপস্থিতিটা যে ওদের কাছে সুখদায়ক হয় নি তা সে অনুমান করে নিলেও তার অন্য কোন উপায় নেই। গতকাল সারারাতই সে তার ভবিষ্যৎ চলার পথ সম্বন্ধে চিন্তা করেছে—চিন্তা করে দেখেছে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তার বিবাহের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত থেকে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সবকিছুই কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। অথচ এর কোনকিছুই মিথ্যা নয়—সত্য। এত বড় সত্য সে এমন মনপ্রাণ দিয়ে কোন দিন অনুভব করে নি। ডাক্তারবাবুকে সে আহ্বান জানিয়েছে। মনে হয় তিনি খাঁটি লোক, শুনে এবং দেখে অবধি তার ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

হেরে যেতে সে রাজি নয়। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে দুই বিপরীতপন্থী মানুষের মধ্যে সে সেতু রচনায় ব্রতী হয়েছে। চেষ্টার সে ত্রুটি রাখবে না।

কেষ্ট এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। নিঃশব্দ-চিন্তায় তার অনেকক্ষণ কেটে গেছে, বুঝতে পারে নি। শ্রীমতী খবর পেয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল। হেসে বলল, খুব তাড়াতাড়ি এসেছ ত কেষ্ট!

কেষ্ট একমুখ হাসি দিয়ে জবাব দিল।

শ্রীমতী নিজেই হেঁসেলে প্রবেশ করেছে। নিজে হাতে সে আজ সব ক'টি রান্না করবে। সংসারের এই অংশের সঙ্গে যে তার কত গভীর যোগ রয়েছে কথাটা আবার নতুন করে সে অনুভব করল।

ঠাকুর বারে বারেই বলছিল যে, এত পরিশ্রম নাকি তার সইবে না. এসব কাজ কি সকলের জন্যে?

শ্রীমতী মনে মনে হাসল, কোন জবাব দিল না। কিন্তু কেষ্ট চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, তুমি মেলা বকছ কেন ঠাকুর।

ঠাকুর একবার আগুনভরা দৃষ্টিতে কেষ্টর পানে তাকাল। কেষ্ট হয়ত আরও কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু শ্রীমতী তাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে বলল, আজকের দিনটা বিশ্রাম নাও ঠাকুর। রোজই—। কথাটা সে শেষ করতে পারল না। বাইরে ডাক্তারবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি কেষ্টর নাম ধরে হাঁকডাক সুরু করে দিয়েছেন।

কেষ্ট সাড়া দিয়ে দ্রুত চলে গেল।

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল, রান্নাঘরে

তোমার বৌদিরাণী ! কেন,তোমাদের ঠাকুর গেলেন কোথায় ? অসুখ-বিসুখ করে নি ত ?

কেষ্টর উত্তরটাও শ্রীমতীর কানে এল, আজ্ঞে অসুখ করতে যাবে কেন। বৌদিরাণী ইচ্ছে করেই রান্নাঘরে গেছেন।

এতক্ষণে শ্রীমতীও এসে উপস্থিত হয়েছে। লালপেড়ে সাধারণ একখানি শাড়ী পরেছে সে। আঁচলটি আঁটসাট করে কোমরে জড়ান, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, দু'চোখে অপরিসীম ক্লান্তি, মুখে প্রফুল্ল হাসি।

এক নজরে শ্রীমতীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে ডাক্তারবাবু গভীর কণ্ঠে বললেন, বাঃ, সুন্দর—এই না হলে মানায় !

শ্রীমতী মাথা নত করল।

ডাক্তারবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে চললেন, তোমায় দেখে অনেক দিন পরে আবার নতুন করে আমার নিজের মাকে মনে পড়ল। সে এক মস্ত বড় ইতিহাস, একদিন তোমাকে শোনাব। কিন্তু এ বাড়ীতে এই নতুন নিয়ম কি চালাতে পারবে মা ?

শ্রীমতী একটু হেসে বলল, হুকুমজারী করে এ নিয়ম চালান হবে না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু কি জানি কেন কথাটা এইখানেই চাপা দিলেন। বললেন, কিন্তু হঠাৎ এ বুড়োকে এমন জরুরী তলব কেন তা ত এখনও বললে না মা ?

বলছি। শ্রীমতী বলল, তার আগে আমার ঘরে চলুন। সে মন্থর পদে এগিয়ে চলল, ডাক্তারবাবু তাকে অনুসরণ করলেন।

চলতে চলতে শ্রীমতী বলল, আপনার এ বেলার কাজ শেষ করে এসেছেন ত ডাক্তারবাবু ? না, আবার বেরুতে হবে ?

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে জবাব দিলেন, একরকম শেষ করেই এসেছি।

ভালই হ'ল। শ্রীমতী জানাল, আপনাকে আজ আমার বড্ড দরকার।

ডাক্তারবাবু উৎকণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন, শরীর খারাপ নয় ত ?

শ্রীমতী হেসে ফেলে বলল, তা হলে কি রান্নাঘরে দেখতে পেতেন ?

ডাক্তারবাবুও হাসিমুখে বললেন, তাও ত বটে ! অভ্যেসের দোষ মা ; ভাল কোন কিছুই আর মনে আসে না। ডাক শুনলেই রোগের কথা মনে পড়ে যায়।

শ্রীমতী পুনরায় হেসে উঠল।

ঘরে এসে ডাক্তারবাবুকে সমাদর করে বসিয়ে শ্রীমতী তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করে জুতোর ফিতে খুলতে যেতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমার মতলবটা কি বল দেখি মা ?

শ্রীমতী কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল, আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে, আমি জানি আপনি না করতে পারবেন না, তাই আর অনুমতির অপেক্ষা রাখি নি। কাল থেকেই বাবাকে বড্ড মনে পড়ছে।—একটু থেমে সে পুনরায় বলল, বাবাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে আমি বড্ড ভালবাসতাম।

তাই বুঝি বেছে বেছে এই বুড়োকে ডেকে পাঠিয়েছ ? ডাক্তারবাবু প্রসন্নহাস্যে বললেন, কিন্তু এর পরে ঝক্কি পোহাতে পারবে ত মা ? এই কাঙাল বুড়োকে নিয়ে পাগল হয়ে যাবে যে—

শ্রীমতী গভীরকণ্ঠে বলল, না—বেঁচে উঠব। আপনি আমাকে পাগল করেই দিন, আমি তাইত চাই।

ডাক্তারবাবু সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন, করে দিতে হবে না আপনিই হবে। এ তুমি দেখে নিও।

ডাক্তারবাবুকে যেন কথায় পেয়েছে, তিনি বলতে থাকেন, এ জাতটা পাগল বলেই আর একটা জাত বেঁচে আছে। নইলে দুঃখের অবধি থাকত না, পাগল বলেই এদের আর নতুন করে পাগল হতে হয় না মা।

শ্রীমতী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে, কথা বলে না।

ডাক্তারবাবু সহসা অন্য প্রসঙ্গে এলেন, আমার মন বলছে এমনি একটা নেমন্তন্ন পাবার আমার দরকার ছিল। কাঁচকলা আর আলুসেদ্ধ খেয়ে খেয়ে পেটে আমার চড়া পড়ে গিয়েছে।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, ইচ্ছেটা নিশ্চয়ই আপনার ঐকান্তিক ছিল—

বিলক্ষণ ! ডাক্তারবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, নইলে এত সহজে কি অন্নপূর্ণার আসন টলে উঠত মা।

শ্রীমতী লজ্জিতভাবে মাথা নত করল। ডাক্তারবাবু তার আনত মুখের পানে দৃষ্টি রেখে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

খেতে বসেও পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরে ডাক্তারবাবু বললেন, ইচ্ছেটা যতদিন মনে মনে ছিল তখন তা পূরণ না হওয়ার জন্য দুঃখের অবধি ছিল না, কিন্তু আজ যখন তা মিটল তখনই মন উল্‌টো সুরে গাইতে সুরু করেছে। এ পথে ত নিবৃত্তি হবে না, বরং ইন্ধন জোগান হ'ল।

শ্রীমতী একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ একথা কেন ?

ডাক্তারবাবু সহসা আহারে মন দিলেন। শ্রীমতীর প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বুঝলে মা, এই সে শুক্তনীটা খেলাম, এমন সুন্দর রান্না যে, কোনদিন খেয়েছি তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম—তেমনি হয়েছে সোনামুগের ডালটি। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার কথা বলব তাই বুঝে উঠতে পারছি না। মোচাঘণ্ট, এঁচোরের ডালনা, মুড়ীঘণ্ট, চিতল মাছের পেটির ঝাল, রুইমাছের কালিয়া, কইমাছের পাতুরী। সব ভাল—খাসা হয়েছে, কিন্তু এতগুলি কখন মানুষ খেতে পারে? আমি বলে তাই··· ডাক্তারবাবু থামলেন।

শ্রীমতী একাগ্রভাবে কথাগুলি শুনতে শুনতে তাঁর শেষ কথায় হেসে ফেলল।

ডাক্তারবাবু একবার শ্রীমতীর মুখের পানে একবার তাঁর থালার চতুর্দ্দিকের শূন্য বাটিগুলির পানে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন। এবং পরমুহূর্তে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, হেসো না মা, এত খাওয়া সত্যিই ভদ্রলোকের জন্য নয়। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি বর্ত্তমানকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তাই মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ পেয়ে এমন করে চেঁছে-পুছে নিঃশেষ করে ফেলেছি। পরিমাপ আর পরিমাণের কথাটা মনেই ছিল না।

শ্রীমতী লজ্জিত হ'ল, ডাক্তারবাবুর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি প্রসন্নহাস্যে বললেন, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন মা? নিজের গর্ভধারিণীই আমাকে ক্ষুদে-রাক্ষস বলে ডাকতেন। তবেই বোঝ, তার উপর আবার দীর্ঘদিনের উপুসী ব্রাহ্মণ!

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনশ্চ বলতে সুরু করলেন, কি দিনই তখন ছিল মা!···

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী বলল, আপনি শুধু কথাই কইছেন—

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন,আর কিছু খাচ্ছি না, কি বল? কিন্তু এত খাবার সব গেল কোথায় বলতে পার? তুমি কিছু ভেব না, কোথাও যাতে একটি কণা পরে না থাকে তারই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। পেট আমার মাত্র একটা যে মা। তার পরে শোন যে কথা তোমাকে বলছিলাম, এদিকে মা মুখে বলে বেড়াতেন ক্ষুদে-রাক্ষস; অথচ ভালমন্দ নানা রসদ জোগাতেন তিনি নিজেই। রান্না করে সামনে বসিয়ে না খাইয়েও তাঁর শান্তি ছিল না—পাছে একটু কম খাওয়া হয়। মাগুলি সব এমনিই বোকা আর এমনিই পাগল!

শ্রীমতী বলল, আর ছেলেগুলি ষোল আনা সুযোগ আদায় করে নেয় সেই সুযোগের।

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে। স্নেহময়ী মায়ের কথা পরিহাসের ছলে বলতে বলতে অকস্মাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কণ্ঠস্বর তাঁর গভীর আবেগে বুজে এল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, না নিয়ে উপায় কি মা, নইলে কোন তরফেরই মন ভরে না। যে নেয় তারও না, যে দেয় তারও না। সংসারে এ বড় চমৎকার খেলা।

খানিক চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন ডাক্তারবাবু। শ্রীমতী তাঁর মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে বসে আছে, ডাক্তারবাবু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর অতীত-জীবনের দিনগুলি প্রদক্ষিণ করে এসেছেন। তিনি পুনরায় কথা কয়ে উঠলেন, বাবা অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন। বাবার যেমন ছিল পয়সা, তেমনি ছিলেন দাম্ভিক আর একরোখা। মায়ের গরিবী গিন্নিপনা তিনি সহ্য করতে পারতেন না—মা ছিলেন তেমনি নিঃশব্দ, চেঁচামেচি করতে পারতেন না, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ—যেটুকু করবার করে যেতেন। বিশেষ করে আমার ব্যাপারে তিনি কারুর হুকুমনামা গ্রাহ্য করতেন না। এ নিয়ে মা এবং বাবার মধ্যে সব সময় প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকত না।

কথার মাঝেই সহসা ডাক্তারবাবু থামলেন। শ্রীমতী একাগ্রচিত্তে শুনছিল, তাঁর কথা বন্ধ হতেই মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে এল, তার পর?

ডাক্তারবাবু ততক্ষণে একটি গোটা রসগোল্লা মুখে পুরে দিয়েছেন। তিনি হাত নেড়ে জানালেন, হচ্ছে হচ্ছে···

রসগোল্লাটি গলাধঃকরণ করে তিনি পুনরায় নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, বাবার কাছে যেটা আত্ম-সম্মানের প্রশ্ন, মায়ের কাছে সেটা আত্মতৃপ্তির প্রশ্ন। কলহ করতে কেউই তাঁরা পছন্দ করতেন না—অন্ততঃ সব জিনিসের জের টেনে চলাটা। সুতরাং সুরু হ'ল এক অভিনব লুকোচুরি খেলা। আমি তখন মাত্র বছরদশেকের বালক। এত রাগারাগি আর এত লুকোচুরির কোন সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পেতাম না, কিন্তু আমাকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ানকে কেন্দ্র করেই যে বাবার সঙ্গে মায়ের মতান্তর এ কথাটা আমি অনুভব করতাম। কেমন একটা চাপা বেদনায় আমার মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠত।··

ডাক্তারবাবু পুনরায় থামলেন। শ্রীমতী তেমনি নিঃশব্দে বসে আছে। সেই দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তিনি পুনরায় বলতে সুরু করেন, আমার মা কিন্তু খুব বেশী দিন বাঁচেন নি। একদিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই চলে গেলেন।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তিনি মারা গেলেন?

ডাক্তারবাবু জানালেন, হ্যাঁ মা।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, তার পর?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, তোমাদের আজ খেতে হবে না মা? অতনুবাবুর যে আসবার সময় হয়ে গেছে।

তা হোক! শ্রীমতী বলল, খাওয়া একদিনেই ফুরিয়ে যাবে না।

ডাক্তারবাবু একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, তার পরে কম করে পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। মা বলে আমার কেউ কোনদিন ছিল তা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। দশ বছরের ইতিহাস পঁয়তাল্লিশ বছরের গহ্বরে তলিয়ে গেল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যায় নি, আত্মগোপন করে ছিল— সময়মত ভেসে উঠেছে। সেদিনের সেই সুলভ বস্তুটি আজ দুর্লভ হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনি করেই মূল্য নিরূপণ হয়, বুঝলে মা?

শ্রীমতীর দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল, ডাক্তারবাবুর কথাগুলি বড় দুর্বোধ্য লাগছে।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা কিছুদিনের জন্য থেমে গেলেন। তাঁর হাঁকডাক, অকারণে চেঁচামেচি আর বড় একটা শোনা যায় না। চতুর্দ্দিকে বাবাকে নিয়ে রীতিমত জল্পনা-কল্পনা দানা বেঁধে উঠল। সব কথা আমার মনে নেই, মনে থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কথাটা নানা ভাবে বড় বেশী আলোচিত হয়েছিল বলেই হয়ত এটা সম্ভব হয়েছে। ডাক্তারবাবু থামলেন।

শ্রীমতী প্রশ্ন করল, কি কথা?

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, বাবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথাটা। এই সব আলোচনার মাঝ থেকে আমি সকলের অলক্ষ্যে সরে যেতাম। নিঃশব্দে কত কান্নাই না কেঁদেছি।

ডাক্তারবাবু থামলেন। তাঁর চোখেমুখে বড় মধুর নরম খানিকটা হাসি লেগে আছে।

তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, কথাটা কে বলবে এই নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসিমা কাজটির ভার নিলেন। বাবার সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল তা অবশ্য আমি শুনিনি। কিন্তু পিসিমাকে তার পরদিনই আমাদের বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। পিসিমা চলে যাবার আগে আমাকে বুকে চেপে ধরে কি কান্নাই না কাঁদলেন। আমি কাঠ হয়ে তাঁর এই স্নেহের উৎপাত সহ্য করেছিলাম। বাবা আমাকে তাঁর হাত থেকে বাঁচালেন। ধমক দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ছেলেটাকে অযথা কাঁদিয়ে রেখে যেও না সবিতা।

শ্রীমতী সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, আপনার বাবা নিশ্চয় আর বিয়ে করেন নি—

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, না, বিয়ে তিনি আর শেষ জীবন পর্য্যন্ত করেন নি। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবার চালচলনে একদিনের জন্যও কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেতে দেখা যায় নি। মৃত্যুটাকে তিনি খুব সহজ ভাবে মেনে নিতে পেরেছেন এই কথাটাই সকলে বলাবলি করতে সুরু করে দিল। বাবার মত পুরুষসিংহের কাছে এমনটিই নাকি সকলে আশা করেছিলেন। আমি তখন খুবই ছেলেমানুষ। বোধশক্তি অপরিণত হলেও সব সময়ই আমার মনে হ'ত আসল সত্যের সন্ধান ওরা কেউ পায় নি। বাবা নির্জ্জন ঘরে সকলের অলক্ষ্যে যখন মাঝে মাঝে আমাকে নিতান্ত অকারণে বুকে চেপে ধরতেন—তখন আমি কথাটা অনুভব করতাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভব করত যে, বাবা একটা মস্তবড় ব্যথা সারাদিনরাত অতি সঙ্গোপনে বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি প্রায়ই চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতেন, তোর খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট হচ্ছে না রে? আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে, আমি বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে সবেগে মাথা নেড়েছিলাম, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে নি। ফলে হ'ল কি জান মা? আমার সঙ্গে সঙ্গে বাবাও হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সেদিনের সেসব কথা মনে হলেই ভাবি, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কত বদলে যায়। নিজের মত আর পথটা এতই বড় হয়ে ওঠে যে, মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে অবলীলাক্রমে গলা টিপে মারতেও এতটুকু হাত কাঁপে না।

ডাক্তারবাবু থামলেন এবং সহসা উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, আর একদিন শুনো মা। অতনু এতক্ষণে নিশ্চয় এসে গেছে

১২

খাওয়া-দাওয়ার এই নতুন ব্যবস্থা নিয়ে অতনু শ্রীমতীকে কোন প্রশ্ন করল না। যদিও সে খানিকটা বিস্মিত হয়েছে। তা ছাড়া চেয়ার-টেবিলের পরিবর্ত্তে মেঝেতে আসনে বসে খেতে নেহাত মন্দও লাগছে না আজ।

কিন্তু অতনু প্রশ্ন করতে না চাইলেও শ্রীমতী চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, তোমার খেতে বোধ হয় খুব অসুবিধা হচ্ছে?

অতনু সহজ ভাবে উত্তর দিল, বিশেষ করে আমার অসুবিধা হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। আমরা সাহেব নই আর জন্মাবধি কিছু চেয়ার-টেবিলে খেতেও

অভ্যস্ত নই। বরং অনেক দিন পরে এই পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে এসে ভালই লাগছে।

শ্রীমতী খুশী হ'ল জবাব শুনে। বলল, চেয়ার-টেবিলের কথাটাও না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু খাবার জিনিসগুলি? এগুলি তোমার মনের মত হয়েছে ত? শুক্তো, ঘণ্ট, মাছের পাতুরি······

তাকে বাধা দিয়ে খেতে খেতেই অতনু বলল, এগুলির স্বাদ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠাকুর হতভাগাকে জরিমানা করতে হবে—

শ্রীমতী হাসি মুখে বলল, তার অপরাধ?

এমন সুন্দর সুন্দর রান্না জানা সত্বেও আমাকে এতদিন ফাঁকি দিয়েছে বলে, অতনু রীতিমত গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিল।

শ্রীমতী স্মিতহেসে বলল, এসব রান্না তোমার ঠাকুর করে নি। হুকুম কর যে রেঁধেছেত তাকেই আজ থেকে বাহাল করে দিই।তোমার ঠাকুর থাকবে পোশাকী রান্নার জন্য।

কথাটা মন্দ বল নি, একমুখ হেসে অতনু বলল, কিন্তু লোকটি কে শুনি?

শ্রীমতী বলল, লোকটি তোমার সামনেই বসে আছে।

অতনুর কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল, তুমি! মানে আমার স্ত্রী এতগুলি ঠাকুর চাকরের সামনে হেঁসেলে ঢুকে রান্না করেছে। ওরা সব ভেবেছে কি।···

অতনুর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তনে শ্রীমতী অবাক হয়ে গেল। কিন্তু মনের ভাব তার কথায় প্রকাশ পেল না। বলল, ওরা কি ভেবেছে না ভেবেছে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।

কিন্তু আমার আছে, গম্ভীর হয়ে অতনু বলল, আমি স্বীকার করছি তুমি খুব চমৎকার রান্না করতে পার। আমি এ কথাও অস্বীকার করছি না যে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে এমন খাওয়ার তুলনা হয় না। এমন কি একথাও আমি মেনে নিচ্ছি যে, এমনি ভাবে বসে খেয়ে আর খাইয়ে খুব আনন্দ পাওয়া যায়, তাই বলে তুমি রান্না ঘরে ঢুকে হাতা খুন্তি নিয়ে নাড়া-চাড়া করবে—হাতে, কাপড়ে-চোপড়ে হলুদের ছোপ লাগিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে—; অতনু ভ্রূকুঁচকে এক বিচিত্র মুখভঙ্গি করে পুনরায় বলল, হরিবল ······এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না।

রান্নার ব্যাপার নিয়ে যে এমনি এক অভাবিত দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে একথা শ্রীমতী কল্পনা করতেও পারে নি। সে খানিকটা বিস্মিত ভাবেই জবাব দিল, তোমার বক্তব্যটা আর একটু সহজ করে বললে ভাল হয়।

অতনু প্রচ্ছন্ন আদেশের সুরে বলল, যে বাড়ীর যেটা রেওয়াজ সেইটে মেনে চলবার কথা বলছিলাম আমি।

শ্রীমতী কথাটা তেমন গায় না মেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, আমরা অন্যরকম দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম।

অতনু অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল, আশ্চর্য্য এটা যে, তোমার বাপের বাড়ী নয় এ কথাটাও আমাকে বলে দিতে হবে নাকি?

শ্রীমতীর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু আশ্চর্য্যরকম সংযতকণ্ঠে সে বলল, ভুলব কেন। বরং এটা আমার নিজের বাড়ী বলেই আমার ইচ্ছেমত চলবার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। আর আমার এলাকায় আমার কাজের কেউ কৈফিয়ৎ চাইলে আমি তার জবাব দিতে বাধ্য নই এ কথাটা তোমাকেও আমি জানিয়ে দিতে চাই।

শ্রীমতীর উত্তর দেবার ধরনে অতনু চমকিত হ'ল এবং তার অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, তোমার বাড়ী··· তোমার এলাকা···

শ্রীমতী তেমনি শান্ত সংযতকণ্ঠে বলল, ওটা আমার কথা নয় তোমাদেরই কথা। তোমরাই একথা সব সময় বলে থাক। অস্বীকার করতে পার একথা?

অতনুর মুখে এ প্রশ্নের কোন উত্তর জোগাল না। সে শুধু ভাবছিল শ্রীমতীর কথা। ওঁর সম্বন্ধে তার আরও ঢের বেশী সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ঢের ঢের বেশী।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, একেবারে থেমে গেলে কেন— বল যে ওটা ঠিক কথা নয়—প্রয়োজনে সুবিধে আদায় করে নেবার ছল মাত্র। আসলে আমার যেটা সেটা আমারই।

অতনু ভিতরে ভিতরে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেও সহজ হয়ে উঠবার চেষ্টা করে বলল, তোমার এ কথার জবাব আমি দেব না। অতনু উঠে দাঁড়াল।

শ্রীমতী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, দিলে ভাল করতে। কারণ তোমার কাছে যেটা ফাঁকা আত্মসম্মানের প্রশ্ন, আমার কাছে সেটা জীবনমরণ সমস্যা। তোমাদের এই আতিশয্যের মধ্যে আমি আর নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমার একটা আলাদা পৃথিবী আছে। সেখানে তুমি স্বাধীন বেপরোয়া। ইচ্ছে খুশী যা প্রাণ চায় তাই করতে পার। সঙ্গত বাধা থাকলেও অসঙ্গত খেয়াল চরিতার্থ করে গেলেও বলবার কিছু নেই, অথচ আমাদের বেলা এই অনুদার সীমাবদ্ধ গণ্ডী কেন?

অতনু এতক্ষণে হাসল। শ্রীমতীর কথার ঝাঁজ বেশ খানিকটা করুণ শোনাচ্ছে এতক্ষণ পরে। অতনু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করে বলল, কিন্তু আমার মান সম্মান কি

তোমার কিছু নয় শ্রী? আমার ভাল এবং মন্দ লাগাটাকে কেন তুমি আলাদা করে দেখছ?

শ্রীমতীর মুখে একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে বলল, ঠিক একই প্রশ্ন আমারও— তুমি কি জবাব দেবে শুনি? কিন্তু এসব তর্কযুদ্ধ এখন থাক। আমার অনুরোধ—একটু চোখ মেলে চলতে শেখো। দিন অত্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

অতনু শ্লেষ করে জবাব দিল, কথাটা তুমি ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছ আর আমি—

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, সেই জন্যেই আমি গৃহ-সংস্কারে লেগেছি। বাইরের জন্য ত তোমরাই আছ। কিন্তু ঘরে-বাইরে সমানভাবে কর্তৃত্ব করতে এস না, এইটেই অনুরোধ। এতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থেকে যায়। তা ছাড়া এ কথাটা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, স্বামী বা প্রিয়জনদের নিজে হাতে রান্না করে বসে খাওয়ানোর মধ্যে মান-সম্মানের কথাটা দেখা দেয় কেমন করে। একটু থেমে শ্রীমতী প্রসঙ্গান্তরে এল, আচ্ছা তুমি কেমন করে এত বড় একটা কোম্পানী চালাও বলতে পার?

অতনু বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে জবাব দিল, অবান্তর প্রশ্ন।

শ্রীমতী বলল, হয়ত তাই। এটা একটা কৌতূহল। কিন্তু তোমার যখন আপত্তি আছে তখন থাক।

অতনু আর একটি কথাও না বলে চলে গেল।

সে চলে যেতেই শ্রীমতীর মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা এসে ভীড় করে দাঁড়াল। বিশেষ করে ডাক্তারবাবুর কথাগুলিই ঘুরে ফিরে উঁকি দিচ্ছে। তিনি কি গল্পের ছলে নিজের মা-বাবাকে সামনে রেখে তারই ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত করে গেলেন? এ বাড়ীতে শ্রীমতী এসেছে মাত্র মাস কয়েক পূর্ব্বে কিন্তু ডাক্তারবাবু এঁদের দেখছেন বহু বছর ধরে। সে হয়ত খানিকটা বিশেষ পদমর্য্যাদার অধিকারী হয়ে এসেছে। কিন্তু ক্ষমতাহীন এ পদমর্য্যাদার কতটুকু মূল্য? তার নিজের ইচ্ছেমত এক পা এগুবার কিংবা পিছু-বার অধিকারটুকুও নেই। অন্ততঃ আজ এই মুহূর্ত্তে কথাটা আর অস্পষ্ট নয়। তার চেয়ে বরং কেষ্টরও স্বাধীন-সত্ত্বা আছে। নানা বিধি নিষেধ তার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করে না।

বিকেল বেলা পাচক এসে জিজ্ঞেস করল, আজ রাত্রে কি রান্না হবে মা?

শ্রীমতী আনমনা ভাবে বসেছিল। পাচকের আহ্বানে সচকিত হয়ে উঠল। পাচক পুনরায় তার বক্তব্য জানাল।

শ্রীমতী জবাব দিল, আমাকে জিজ্ঞেস করে কি রোজ ব্যবস্থা করা হয় ঠাকুর? যা হয় তুমিই করগে।

পাচক বিনীতকণ্ঠে জানাল, আজ্ঞে কেষ্ট আপনার হুকুম নেবার কথা বলল।

একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে শ্রীমতী বলল, তোমাদের বাবুর পছন্দমত ব্যবস্থা করবে।

পাচক হেসে বলল, আপনি যেমন বলেন তাই হবে মা—কিন্তু আপনার জন্যেও কি একই—

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, রাত্রে আমি কিছু খাব না ঠাকুর। বড্ড অবেলায় খেয়েছি।

পাচক তথাপি দাঁড়িয়ে আছে দেখে শ্রীমতী পুনরায় বলল, আর কিছু বলবে আমায়?

আজ্ঞে না—তবে বলছিলাম কি…আপনার জন্যে খান-কয়েক ফুলকো লুচি করে রাখব কি? ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে বলল

শ্রীমতী বলল, যদি দরকার মনে করি তোমাকে আমি খবর পাঠাব।

পাচক প্রস্থান করল।

পরদিন অতি-প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে সর্ব্বপ্রথম তার চোখে পড়ল অতনুর গত রাত্রের অভুক্ত খাবারগুলি। এর কারণটাও আজ আর তার কাছে অজানা নয়। কিন্তু এই নিয়ে মাথা খারাপ করে কোন লাভ নেই। শুধু মনটা তার দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীমতী তার ঘাসের চটিতে পা গলিয়ে নিঃশব্দে বাগানে চলে এল। একটা লতানো যুঁইয়ের ঝোপের আড়ালে একখানি বেঞ্চির উপর অন্যমনস্ক ভাবে সে বসে আছে। মনটা তার বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। আবার নতুন করে তার বাবার কথা মনে পড়ল—মনে পড়ল এই বিবাহে তাঁর দ্বিধার কথা, তাঁর দাদার যুক্তি-জালের কথা। কিন্তু মা রুদ্র-রূপ ধারণ করলেন। ভালমানুষ বাবা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। শ্রীমতী এল এগিয়ে হাসিমুখে। বরণ করল অতনুকে। হলেই বা অতনু ধনী আর তার বাবা দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। অর্থের প্রভেদ কখনও মানুষকে আড়াল করে রাখতে পারে না। বাবার কাছে সে একেবারে মিথ্যা শিক্ষা পায় নি। তার সহিষ্ণুতা, প্রেম আর সেবা দিয়েও কি এই কৃত্রিম দূরত্বকে এবং ব্যবধানকে জয় করতে পারবে না?

সূর্য্যদার কথাও তার একই সঙ্গে মনে পড়ছে। কিন্তু তাকে নিয়ে শ্রীমতীর কোন দিনই দুশ্চিন্তা ছিল না। আজও নেই। এই কাজের লোকটির মধ্যে চিরদিনই সে সূক্ষ্ম বোধের একান্ত অভাব লক্ষ্য করেছে—শুধু কাজ আর কাজ। এই কাজ-পাগলা লোকটিকে তাই সে বন্ধুভাবে সাহায্য করেছে—তার নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করে। সূর্য্যদাকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করেছে, কিন্তু তাকে

নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেনি। কিন্তু তার বাবা সহজ পথে চিন্তা করতে পারে নি বলেই তার বিবাহের কথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তার মনে একটা মধুর কল্পনা বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু শ্রীমতী তাঁর সম্বন্ধে অন্য চিন্তা পোষণ করত। পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে অকারণে দেহ ও মনকে ক্ষত-বিক্ষত করাটা সে পছন্দ করতে পারে নি। তবুও আজ এই নিরালা লতাকুঞ্জে বসে আবার নতুন করে তার মনে হ'ল, তার হিসাব করতে কোথাও হয়ত একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। হিসাব মিলাতে যদিও তার যত্নের ত্রুটি নেই, তথাপি বারে বারে অক্ষরগুলির উপর কালি ঢেলে পড়ে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।

এই বাগানটির এই বিশেষ স্থানটির উপর শ্রীমতীর প্রবল আকর্ষণ। কথাটা সকলেই জানে। মালি প্রাণপণে বাগানের পরিচর্য্যা করে। কখনও সামনে দাঁড়িয়ে কখনও শয়নঘর থেকে শ্রীমতী চেয়ে চেয়ে দেখে, মাঝে মাঝে নিজেও সে হাত দিতে চায়—মালীকে নানা প্রশ্ন করে। মালী সহজকে জটিল করে কর্ত্রীকে বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম্ম হয়ে যায়। পাছে এ বাড়ীর রীতিনীতির গায়ে আঁচড় লাগে সেই জন্যেই এই পথে তাকে চলতে হয়। শ্রীমতী তার বাবাকে জোর গলায় বলেছিল যে, তাঁর দেওয়া শিক্ষাই শ্রীমতীকে জয়যুক্ত করবে। তার এত বড় অহঙ্কারকে সে মিথ্যে প্রতিপন্ন হতে দেবে না, নইলে সে তার বাবার কাছে কোনদিনই গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শ্রীমতী লতাকুঞ্জ থেকে বের হয়ে এল। আকাশে সূর্য্য দেখা দিয়েছে; খানিক কাঁচা রোদ বাগানময় ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীমতী অন্যমনস্ক ভাবে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। কখন মালী এসে তার কাজে হাত লাগিয়েছে তা পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করে নি। অতনুর টেরিয়ারটাও ছাড়া পেয়েছে, হেমন্তের মিঠে ঠাণ্ডায় অসুখ হতে পারে। তাই ওর গায়ে সময়োপযোগী একটা জামা উঠেছে। কুকুরের উৎফুল্ল চীৎকারে শ্রীমতী সজাগ হয়ে উঠল। নীচু হয়ে কুকুরটার পিঠে বারকয়েক মৃদু চাপড় দিতেই সে ছুটে বাগানের অপর প্রান্তে চলে গেল। মালী ওখানে বসেই গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিচ্ছিল। মালী কাজ বন্ধ করে কুকুরটাকে আদর করল। চুরি করে কুকুরের গায়ের জামাটা হাত বুলিয়ে অনুভব করে দেখল। কাপড়টা বড় ভাল—কর্ত্তাবাবুর কুকুরটা বড় আদরে আছে। কোন অভাব রাখেন নি তিনি।

ওপাশ থেকে মালী-বৌয়ের সরোষ চীৎকার শোনা গেল, মিনসের নবাবী দেখে আর বাঁচি নে। সহসা বাগানের অপর প্রান্তে শ্রীমতীর পানে তার দৃষ্টি পড়তেই সে বোবা হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ, কথাগুলো বলে বসলেই হয়েছিল আর কি! তার কথা বন্ধ হয়ে গেলেও সে কিছু একটা ইসারা করল মালীকে। মালী দেখেও দেখল না। শ্রীমতী কিন্তু তার এই নীরব সঙ্কেত লক্ষ্য করল। সে ধীরে ধীরে মালী-বৌয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, মালী তোমার কথা শুনছে না বুঝি?

মালী-বৌ সসঙ্কোচে বলল, দেখুন ত রাণীমা—এই পিরানটা পরে ঘর থেকে এল আর···। কথাটা সে শেষ করল না—শেষ করে দিল শ্রীমতী। একটু হেসে বলল, আর এখন দেখছ মালী খালি গায়ে কাজ করছে। ভারী অন্যায় কথা, এই হিমে একটা অসুখ-বিসুখ করলে তখন দেখবে কে! কিন্তু জামাটা তুমি পেলে কোথায়?

ঘরের দাওয়ায় রাণীমা। জামাটা সেলাই করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই মিনসের—। মালী-বৌ জিভ কেটে দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

মালীর কোন দিকে খেয়াল নেই, ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। কুকুরটা তখনও বাগানময় ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী আর সেখানে দাঁড়াতে পারে না, লজ্জা আর সঙ্কোচ তাকে চতুর্দ্দিক থেকে চেপে ধরেছে। সে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায়, কুকুরটাও অনতিবিলম্বে তাকে অনুসরণ করে। খাবার টেবিলের পাশে বসে তাদের আহার্য্যের ভাগ নেওয়াটা ওর নিত্যকার অভ্যাস।

শ্রীমতী ফিরে আসতেই সামনাসামনি অতনুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আজও তার বেশ সকালেই ঘুম ভেঙেছে। শ্রীমতী পাশ কাটিয়ে ভিতরে যাচ্ছিল, অতনুর আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়াল। বলল, কিছু বলবে আমাকে?

হ্যাঁ। অতনু জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

লতাকুঞ্জে, শ্রীমতী জবাব দিল।

অতনু একটু হেসে বলল, না মালী-বৌর সঙ্গে গল্প করতে ব্যস্ত ছিলে?

এক ঝলক রক্ত তার মুখের উপর ছুটে এল। মনটা তার বিষিয়ে উঠল, কিন্তু মনের বিরাগ তার কথায় প্রকাশ পেল না। সে একটু হাসবার চেষ্টা করেই বলল, পিছু নিয়েছিলে বুঝি? তুমি ঠিকই ধরেছ, মালী-বৌয়ের সঙ্গেই গল্প করছিলাম। কোন দোষ করেছি কি?

অত্যন্ত সহজ উত্তর—অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু এর একটা সহজ জবাব অতনুর মুখে জোগাল না।

শ্রীমতী হাসিমুখে পুনরায় বলল, জবাব দিচ্ছ না কেন? আমাকে সব জেনে নেবার সুযোগ দেবে ত, নইলে কখন আবার না জেনে কি অন্যায় করে বসব!

অতনু সংক্ষেপে বলল, এসব কথা এখন থাক।

শ্রীমতী বলল, যেকথা একবার সুরু করেছ সেটা শেষ না করলে আমার মন খুঁত খুঁত করবে। তুমি বল, আমাকে সব কথা জানতে দাও।

যার যতটুকু পাওনা—, অতনুর কণ্ঠে খানিকটা প্রচ্ছন্ন আদেশ, সে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, যার যতটুকু প্রাপ্য তার বেশী দিতে গেলে সে মাথায় উঠে বসতে চায়। মালী-বৌ মালী-বৌ আর তুমি তুমি।

শ্রীমতী পুনরায় হেসে জবাব দিল, এ আর নতুন কথা বললে কি? কিন্তু মাথায় ওঠার কথাটা আমি স্বীকার করি না। তবে মালী-বৌ যে শুধু মালী-বৌ তা সে নিজেও তোমার চেয়ে বেশী করে জানে। দেখলে না আমার সামনে দাঁড়িয়ে দুটো সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিতে পর্য্যন্ত পারলে না? এমনিতেই ওরা নিজেদের কাছে ছোট হয়ে আছে। বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।

খুশী হলাম শুনে, অতনু গম্ভীর গলায় বলল।

শ্রীমতী অতনুর জবাব শুনে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হ'ল না—এমনি জবাবই সে প্রত্যাশা করেছিল। তবুও সে থামতে পারল না। মৃদুকণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি খুশী হতে পারি না এদের মনোবৃত্তি দেখে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে মনটা ছোট হবে কেন, কোন কাজই ছোট নয়।

অতনু প্রশ্ন করল, তুমি কাজ বলতে কি মনে কর?

শ্রীমতী হেসে জবাব দিল, অকাজ বা কুকাজ নয়—আমি শ্রমের কথা বলতে চাইছি। কিন্তু দেখ দেখি, কথায় কথায় চায়ের দেরী হয়ে গেল—চল।

ক্রমশঃ

এই কি জীবন?

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এ জীবনে যদি নাহি বিশ্রাম,—
শুধু যদি খাটাখাটি,
কেন নাহি দিলে আকাশে বাতাসে
কাজের লেবেল আঁটি?
কারখানা যদি তোমার ভুবন—
লতাপুষ্পের কোন্ প্রয়োজন!
থাকুক নিক্তি-দাঁড়ির ওজন,
লেন-দেন পরিপাটি।
মানুষ—সে যে গো রঙীন ফানুস—
জাপানের আমদানী,
অন্তরহীন যন্ত্র—তবু সে
ঝাড়িছে লম্বা বাণী!
হাটের এ ভিড়ে খুঁজে মরি হায়,
হৃদয় হারায়ে ফেলিনু কোথায়!
কোথায় রসিক—রসের ব্যাপারী?
চারিদিকে ধনী, মানী!
কে কাহার পানে দেখিবে চাহিয়া,
শুনিবে প্রাণের কথা;
কাহার পরশে ফুলের মতন
ফুটিবে হিয়ার ব্যথা!

কোথা ছায়াতরু দিবে শীতল ছায়া,
করুণা-সাগর বুক-ভরা মায়া!
বচনসুধায় কে হরিবে ক্ষুধা,
মরমের আকুলতা!
আয় তোরা আয় ক্ষণিকের তরে
অকেজোর দল যত,
লেজারের খাতা হউক বেজোর
একটি দিনের মত!
অধঃপাতের যাত্রীরা আয়
করি সবে মিলি—প্রাণ যাহা চায়;
কি ফল কেবল কলের চাকার
মতো ঘুরে অবিরত?
ক্ষণিকের লাগি দুটি চোখ মেলি
দেখিব বিশ্বশোভা,
লতাপল্লব সাথে কব কথা,—
ছিনু এতদিন বোবা।
আজ কাজ নয়—মন নিয়ে খেলা,
আবোলতাবোল ভাবা সারা বেলা!
আর কেহ নয়,—আজ সাথী মোর
কল্পনা মনোলোভা।

৺পশুপতি বসু

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

৺পশুপতি বসু কলিকাতার নিকটস্থ রাজপুর কোদালিয়ার বিখ্যাত বসু বংশে ১২৮৩ সালের ২৪শে চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। গত ১৩৬৬ সালের ৯ই আষাঢ়ে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮২ বৎসর ৩ মাস বয়স হইয়াছিল। ইহার পিতা ৺কেদারনাথ বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা ৺জানকীনাথ বসুর অগ্রজ।

কেদারনাথ বসুর আর্থিক অবস্থা অতি অস্বচ্ছল ছিল, কিন্তু তিনি অতিশয় সত্যপরায়ণ, তেজস্বী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার নিজের একটি বিশিষ্ট আদর্শ ছিল এবং অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্বেও সেই আদর্শে পুত্রকন্যাদের গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পাছে পুত্রকন্যাগণ তাঁহার আদর্শচ্যুত হয়, তিনি দূর দেশে অধিকতর বেতনে চাকরী গ্রহণ করেন নাই। কারণ এখনকার মত সে যুগে বিদেশে কর্ম্ম-স্থানে নিজ পরিবার লইয়া বাস করার রীতি ছিল না।

পশুপতি বসু কেদারনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্য-কাল হইতেই পুত্রের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কেদারনাথ বসু মহাশয় নিজের তত্ত্বাবধানে পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পশুপতি বসুর মাতার নাম ৺সারদা দেবী। তিনিও উদারহৃদয়া দয়াবতী মহিলা ছিলেন। পরের উপকার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ ও ক্লেশ সহ্য করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না; ছোট-বড় সকলকেই তিনি সমান চোখে দেখিতেন। মাতাপিতার সমুদায় দুর্লভ গুণগুলি পশুপতিবাবু সম্পূর্ণভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৮ বৎসর বয়সে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এবং পরবৎসর মাইনর পরীক্ষায় (ইংরাজী লইয়া) বৃত্তি ও পদক লাভ করেন। ৯ বৎসর ২ মাস বয়সে তিনি বঙ্গবাসী বিদ্যালয়ে ৺গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সৌজন্যে বিনা বেতনে চতুর্থশ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ইংরাজী ১৮১৯ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি পান। অর্থাৎ ১৩ বৎসরে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ক্রমশঃ তিনি সম্মানের সহিত বি. এ., বি. এল. ও এম. এ. (কেমিষ্ট্রি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই কঠিন ছিল না। অঙ্কশাস্ত্র তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ছিল। অঙ্ক-শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার শিক্ষক মহাশয়রা চমৎকৃত হইতেন। বাংলা ও সংস্কৃতের চর্চ্চা তিনি আজীবন করিয়া গেছেন। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

পশুপতি বাবুর কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয় কটকে তাঁহার ছোট কাকা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা ৺জানকীনাথ বসুর কাছে। তাঁহারই নিকট তিনি ওকালতির ক, খ শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে কলিকাতার সম্রান্ত বংশীয় ৺প্রিয়নাথ ঘোষের মধ্যমা কন্যা পান্নালতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পশুপতি বাবুকে বেশীদিন ওকালতি করিতে হয় নাই; তিনি মুন্সেফের পদপ্রার্থী হন; তখন তাঁহার বয়স সাধারণ পদপ্রার্থীদের অপেক্ষা কম। যখন তিনি এই পদের জন্য কর্তৃপক্ষদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা তাঁহার অল্প বয়স দেখিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সাক্ষাতের সময় তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মনোনীত করেন। চাকরি-জীবনে তাঁহাকে অবিভক্ত বাংলার বহুস্থানে যাইতে হইয়াছে এবং সকল স্থানেই তাঁহার সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, অমায়িক ও সদাশয় ব্যবহার এবং পরোপ-কারীতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্ম্মজীবনেও তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসান জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং ১৯৩২ সনে আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসান জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

দেশভ্রমণ পশুপতি বাবুর অতি প্রিয় ছিল। ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশের কোন দর্শনীয় স্থান ও তীর্থস্থান তাঁহার অপরিচিত ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে ইউরোপ ও জাপানের বহুস্থান তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শেষজীবন পর্য্যন্ত তাঁহার আক্ষেপ ছিল যে, আমেরিকায় তাঁহার যাওয়া হইল না। রেলওয়ে টাইমটেবিল তাঁহার মুখস্থ থাকিত।

মানুষ হিসাবে তিনি খুবই বড় ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি অতি দরিদ্র পরিবারভুক্ত ছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না, তাই প্রবেশিকা পরীক্ষার বৃত্তি জমাইয়া তিনি প্রথমেই মায়ের জন্য বালা গড়াইয়া দেন। কর্ম্মজীবনে অতি উচ্চ পদে অবস্থিত থাকিয়াও তিনি অতি সাধারণ মানুষের মত যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহা শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়, এক স্থানে তিনি যখন সাব-জজ ছিলেন, তিনি এক সায়াহ্নে ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলেন যে, কত-গুলি মেছুনী তাহাদের মাছের ঝাঁকা লইয়া যাইবার জন্য কুলী খুঁজিতেছে, কুলীর অভাবে তাহারা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, পশুপতি বাবু বিনা দ্বিধায় তাহাদের ঝাঁকা বহন করিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি এই দয়া এবং সুব্যবহার তিনি তাঁহার মাতার নিকট শিখিয়াছিলেন। তিনি যখন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাঁহার আফিসের চাপরাসীরা তাঁহার বাড়ীতে

আহার করিত, আহারান্তে পশুপতি বাবুর মাতা নিজহস্তে তাহাদের পান দিতেন, গরীব-দুঃখীদের মশার কষ্ট নিবারণের জন্য নিজহস্তে মশারি সেলাই করিয়া দিতেন। পশুপতি বাবুর উদারতার পরিচয় অনেক ঘটনা হইতেই পাওয়া যায়।

ভৃত্যদের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে কিনা না দেখিয়া তিনি নিজে আহার করিতেন না। তাঁহার এক বৈবাহিক বলেন যে, পুত্রের বিবাহের সময় পশুপতি বাবু দেনা-পাওনার কোন কথাই তোলেন নাই। এমন কি বিবাহ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। বৈবাহিক (কন্যার পিতা) যখন পশুপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নমস্কারী সাড়ী কয়খানা দিতে হইবে? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন উহার মধ্যে আমি এক খানা কি পাইব? আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে একখানা পাইলে সুবিধা হয়। বৈবাহিক উত্তর দিয়াছিলেন নমস্কারী কাপড় পুরুষেরা পায় না। তখন পশুপতি বাবু বলিয়াছিলেন তাহলে আমি উহা কিছু জানি না। উক্ত বৈবাহিক মহাশয় ইহাও বলেন যে, পুত্রের জুতার মাপের কথা বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন, জুতাই যে দিতে হইবে তাহা আপনাকে কে বলিল? খড়ম দিলেই চলিবে। শেষ পর্য্যন্ত জুতার মাপ পাওয়া যায় নাই, খড়ম দিয়াই পাদুকা দেওয়া হইয়াছিল। নূতন বৈবাহিক (পশুপতি বাবু) তাঁহার বৈবাহিকের বাড়ী হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার জলযোগের জন্য বৈবাহিক আয়োজন করিতে বলিলেন—পশুপতি বাবু বলিলেন, ভাত আছে? যদি দুটি ভাত দেন তাহলে এখান থেকেই ভাত খেয়ে পেনসান আনবার জন্য এ. জি, বি-র আপিসে যেতে পারি। তিনি তৃপ্তিসহকারে ভাত খাইলেন। ইহা একদিনের ঘটনা নয়, এইরূপ তিনি মাঝে মাঝে করিতেন। তাঁহার মন অতি খোলা ছিল। তাঁহার নিকট একজন তাঁর এক আত্মীয়ের পরিচয় করিয়া দিবার সময় বলিয়াছিলেন, অমুক আমার ভাই-পো হয়—নিজের নয় জ্ঞাতি হিসাবে? তৎক্ষণাৎ পশুপতিবাবু বলিলেন, শেষের কথাটা নাইবা বলিতেন, উহাকে অত দূরে ঠেলিয়া দিলেন কেন? কর্ম্মস্থলে ইহার নাম ছিল আদালতে হাকিম পথে-ঘাটে কুলি। পশুপতি বাবুর সম্বন্ধে এইরূপ কত কাহিনীই না বলা যায়? তিনি রসিকও কম ছিলেন না। পূর্ব্বে তাঁহার দাড়ি গোঁফ কিছুই ছিল না; ইউরোপে ভ্রমণকালে তিনি দাড়ি ও গোঁফ রাখিলেন; ইউরোপ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পরিচিত এক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পশুপতি তোমাকে চেনা যাইতেছে না, তোমার ত দাড়ি গোঁফ ছিল না? তৎক্ষণাৎ পশুপতি বাবু উত্তর দিলেন, তোমাদের দেশ থেকে ফিরিতেছি, তোমাদের রাজা পৃথিবীর সর্ব্ববরেণ্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকেই অনুকরণ করিয়াছি। তিনি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়াছিলেন। উক্ত রাজপুরুষ পশুপতি বাবুর কথা শুনিয়া খুবই হাসিলেন। তিনি যখন রোমে গিয়াছিলেন, একদিন এক হোটেলে গিয়া চিকেন রোষ্ট চাহিয়াছিলেন; ওয়েটার ইংরেজী বোঝে না,
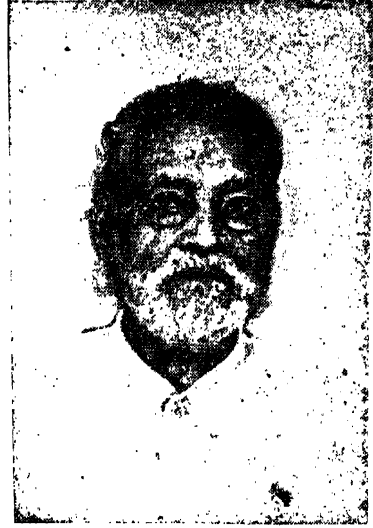
৺পশুপতি বসু

তিনিও তাদের ভাষা বোঝেন না, এই মুস্কিলের সময় পশুপতি বাবু মুরগীর ডাক ডাকিয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি চিকেন রোষ্ট চান। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ভাগাড়ের ইংরেজী কি বলুন ত? তিনি বলিয়াছিলেন, A piece of waste land inhabited by dead cows. তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল Banana ও Plantain-এর প্রভেদ কি? তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, We eat banana and show plantain. এইরূপ অনেক গল্পই তাঁহার নিকট শোনা গেছে। বিপদ ও আপদে প্রভেদ কি—জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, মনে করুন একজন বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে (পণ্ডিতের সন্তান) বাংলা পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষক হচ্ছেন একজন ইংরেজ রাজপুরুষ। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে তাঁহার কর্ম্মস্থল হইতে বহুদূর নৌকাযোগে পরীক্ষার স্থানে যাইতে হইয়াছিল। পথিমধ্যে প্রবল ঝড়ের জন্য নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল—এটা ছিল তাঁহার বিপদ—আর বাঙ্গালী পণ্ডিতের সন্তান হইয়া তাঁহাকে এক ইংরেজ রাজপুরুষের নিকট বাংলা পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হইয়াছিল—এটা হ'ল তাঁহার আপদ। তাহার পর তিনি মন্তব্য করিলেন, চাকরি জীবনে কত বাঙ্গালীকে এইরূপ আপদের সম্মুখীন হইতে হয়।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে পশুপতি বাবু অটুট স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন ছিল পরিশ্রমশীল ও অনলস। তাঁহার স্বভাব ছিল শিশুর মত সরল। তাঁহার গৃহ বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের জন্যই অবারিত ছিল। তিনি সঙ্গীতা-

নুরাগী ছিলেন এবং পাশা খেলা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও চার কন্যা, বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর বহু পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহার মৃতদেহ বহন করা হইবে, কি প্রণালীতে পুত্র কন্যাগণ অশৌচ পালন করিবে এবং কোথায় কি ভাবে তাঁর পারলৌকিক কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার মধ্যে গোঁড়ামীর স্পর্শ ছিল না। পরিণত বয়সেই পশুপতি বাবুর মৃত্যু ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে একজন অসাধারণ ব্যক্তির তিরোধান হইল।

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

ইথর-সমুদ্রে ভাসে অগণিত বিন্দু নীহারিকা
যুগ হতে যুগান্তর, আহরিয়া একাগ্র স্পন্দন,
সংঘাত, সংযমশক্তি উদ্যমের উদ্দৃপ্ত স্ফুরণ,
বিশ্ব যার নরদেহে আঁকে চির দ্যুতি-বিচ্ছুরিকা!
স্বভাব-সম্পূর্ণ সেই অলৌকিক অস্তিত্ব-ভঙ্গিমা
বিরাটের বক্ষতটে আলোড়িত অনন্ত ব্যাপক—
সবিতৃ-সংরাগ তার কাঁপায় কি আশ্চর্য্য দীপক—
দিন হতে দিনান্তরে অতিক্রান্ত ভয়ের-ত্রিসীমা!

তোমার ছবির-পানে চেয়ে থাকি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস,
উদ্বেল রোমাঞ্চ লাগে অসমঞ্জ সত্তার গভীরে,
যেন ভুরি শুদ্ধ কোন্ অতলান্ত ভাবনার নীরে,
পাই খুঁজে জড়দ্রোহী চেতনার প্রসন্ন প্রকাশ!
চঞ্চল কৈশোর তব বহ্নিমান প্রবুদ্ধ যৌবন
একটি সুরের ছন্দে হ'ল লীন ব্রহ্মকোষ হতে,
সংহার তাণ্ডব-তাল, লয় যার চিদানন্দ-স্রোতে—
প্রাণেয়-প্রসূনে জাগা অমরার প্রেম-শিহরণ!

মোদের সঞ্চয় নেই, নেই কোন ঋদ্ধ-আহরণ,—
নির্ব্বাক বৈক্লব্যে যাপি সময়ের রূঢ় অত্যাচার,
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানি তার ভ্রুকুটি-অঙ্কুশ;
প্রত্যহেরে ক্লেশ-গ্লানি-ক্ষয়-ক্ষতি ক্ষিপ্ন আকিঞ্চন
রোধিয়া সে বহ্নিমন্ত্রে নির্জ্জীবের ভাঙি অপস্মার
করকুঞ্জে দিলে সে-কি, যোগীশ হে, জ্ঞানের গণ্ডূষ!

সৃষ্টির অতীত উর্দ্ধে মৃত্যু যেথা নহে মহাঘোর,—
দেবতার সুধাপান এ-মৃত্তির নিরক্ত অধরে,
সন্মার্গ-প্রয়াস তব বিশ্বাসের আনে ব্রহ্মবাণী
এই দেহ জরাব্যাধি বিক্ষয়ের পূর্ণ অশ্রুলোর,
লভিবে সে দিব্য প্রাণ জ্যোতির্ম্ময়ী চেতন-অম্বরে
উত্তরিয়া ক্ষুধাতুর জীবনের ব্যর্থ হানাহানি!

অঙ্গার

শ্রীসুব্রতেশ ঘোষ
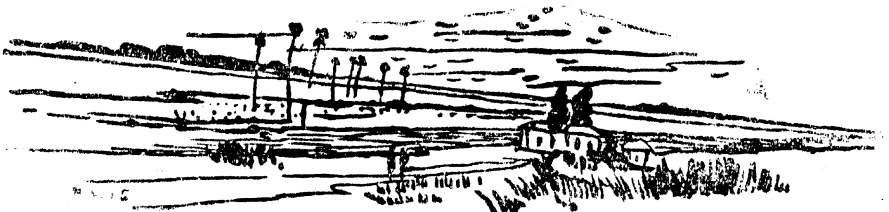
ছাদে উঠে অন্ধকার আকাশটার দিকে তাকিয়ে ভারী ভাল লাগল সুস্মিতার। অমাবস্যার গহন অন্ধকার যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে পৃথিবীর ওপর। মাঝে মাঝে বহু বিস্তৃত ব্যবধানের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার এক-একটা লাইটপোষ্টের আলো যেন সেই ক্লান্ত বিশাল দেহে বর্ষাফলকের মত বিঁধতে চায়! কিন্তু কতটুকুই বা বিঁধতে পারে?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের জীবনের কথা মনে পড়ে গেল সুস্মিতার। সেও ত বড় ক্লান্ত। যদি পারত, তবে সেও ত এমনি অসীম ক্লান্তির শয্যায় ভেঙে পড়তে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু সে অবকাশ তার কোথায়? জীবনের অবিচ্ছেদ্য সর্ত জীবিকা। বিশেষতঃ অন্য কারও বলিষ্ঠবাহুর অবলম্বন যার কাছে অনুপস্থিত, জীবনধারণের জন্য অবিশ্রাম ছুটাছুটির হাত থেকে সে রেহাই পাবে কি করে?

অথচ ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে যে, সামাজিক চুক্তিটির জোরে শতকরা নব্বইটি মেয়ে জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে, সেই চুক্তি-বন্ধনে আরও একটি মানুষকে আবদ্ধ সেও করেছিল। তবু—

ভাবতেই অবশ্য সুস্মিতার হাসি পেয়ে গেল। কি উপযুক্ত মানুষই না সে যোগাড় করেছিল। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনের উপযুক্ত অবলম্বনই বটে।

অথচ এ নিয়ে তার অভিযোগ করবারও উপায় নেই। শ্রীমন্তকে সে বিয়ে করেছিল ভালবেসে। কি দেখে যে সে মুগ্ধ হয়েছিল সে কথা তখন আশ্চর্য্য হয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, ঐশ্বর্য্যে—কোনদিকেই লোভনীয় ত দূরের কথা, কাম্যতার সাধারণ স্তর পর্য্যন্ত পৌছুতে শ্রীমন্ত পারে নি।

কিন্তু লোভনীয় কি কিছুই ছিল না? একবার চোখ মুদল সুস্মিতা। যেন আরও একবার নিরীক্ষণ করে নিতে চাইল তার সেদিনের সেই মনের মানুষটিকে। আশ্চর্য্য! এত তিক্ততা, এত সুগভীর বিচ্ছেদের পরেও শ্রীমন্তের সুদর্শন চেহারাটা ভাবতে সত্যিই অবাক হবার মত ভাল লাগে। যেন নিকষ কালো একটি পাথরের মূর্ত্তি। সেরকমই দৃঢ়, আর সুগঠিত শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী। নিখুঁত চোখ আর নাসিকার নীচে দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর। মানুষটিকে প্রথম দিন দেখেই তার মজা হয়েছিল, বহুদিন আগে পাহাড়ী দেশে দেখা এক পাথুরে দুর্গের কথা। তেমনিই সুদৃঢ় তেমনিই যেন অজেয়।

কিন্তু জীবনের লড়াইয়ে দেখা গেল সেই পাথরের দুর্গই সব-চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিয়ের আগে সে একেবারে কিছুই জানত না তা নয়—তবু ভেবেছিল ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ের পরে দেখা গেল, পাঁচ-সাত হাজার বছরের অবিশ্রাম উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা আদিযুগের অরণ্যচারীদের সঙ্গে যে যে পার্থক্য এযুগে অর্জ্জন করেছে, তার সবই শ্রীমন্তের মধ্যে অনুপস্থিত। ওর নিকষ কৃষ্ণবর্ণের মত ওর মনের অমানিশাও চিরস্থায়ী। কিন্তু এ সত্য যেদিন সুস্মিতা আবিষ্কার করল, তখন বড় দেরী হয়ে গিয়েছে।

জীবিকার জন্য পরিশ্রম করার কথা ভাবতেও রাজী নয় শ্রীমন্ত। তার চেয়ে অনেক ভাল লাগে তার অন্যের পরিশ্রমের ফসল গায়ের জোরে ছিনিয়ে আনতে। মানুষকে লুণ্ঠন বা বঞ্চনা করার বিন্দুমাত্র সুযোগ আবিষ্কার করতে পারলে ও যেন এভাবেই জয়ের আনন্দে মাতাল হয়ে ওঠে।

তবু সুস্মিতা চেষ্টা করেছিল। অসীম ধৈর্য্যে আশা করেছিল, ভালবাসার যে যাদুদণ্ড বহু লোহাকে সোনা করেছে, তার প্রভাব শ্রীমন্তও এড়াতে পারবে না। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতে সে ভুলও তার ভাঙল। দুঃসহ বেদনার মূল্যে তার অর্জ্জিত জ্ঞান এই শেখাল যে, ভাল সে একাই বেসেছে। শ্রীমন্তের মনে প্রথম থেকেই যা ছিল, তার নাম প্রেম নয়; সেটি আদি ও অকৃত্রিম লালসা। প্রেম নামক অপ্রয়োজনীয় বস্তুটির অস্তিত্ব শ্রীমন্তের কাছে তার আদিযুগের স্বধর্ম্মীদের মতই নিরর্থক। তাই পুরনো হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সুস্মিতার মূল্য একটা ভাঙা পেলনারই সমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুতরাং এর পরে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। প্রথমে মন-কষাকষি, তার পরে প্রকাশ্য কলহ। এবং সবশেষে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর ভাবে সুস্মিতাকে ফেলে রেখে সেই যে উধাও হ'ল শ্রীমন্ত তার পর আর তার সাক্ষাৎ মেলে নি।

খবরও পাওয়া যায় নি বিশেষ। একবার লোক পরম্পরায় শোনা গিয়েছিল, কি এক বড় ডাকাতির মামলায় ওকে পুলিসে ধরেছে। পরে আর একটা গুজব শুনেছিল যে, সে নাকি জেল ভেঙে পালিয়েছে। কিন্তু ও-সব খবর নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় নি সুস্মিতা। সে তখন নিজের একটা স্থিতি করতে ব্যস্ত। শ্রীমন্তের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর অবশ্য দাদারা আবার এসেছিল। চেয়েছিল মা-বাপ মরা বোনটিকে পরম সমাদরে ঘরে ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু যে বাড়ী থেকে সে একদিন সকলের নিষেধ সত্ত্বেও একজনের

ভরসায় বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিল, সেই ভরসা ভেঙে যাবার পরে সেখানেই সে ফিরে যায় কেমন করে ?

এর পর কয়েকটা বছর যেন কেটেছে দুর্যোগের দুঃসীম রাতের মত। তবু ভাগ্য ভাল, কুমারী-জীবনের কণ্ঠসম্পদ তাকে ত্যাগ করে নি। সেই অবলম্বন নিয়েই ভাগ্যবিপর্যয়ের দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল সুস্মিতা। সে চেষ্টা আজ সাফল্যের গর্ব্বে স্মৃতিকে অভিষিক্ত করে। কিন্তু তবু এতদিন পরে এই প্রথম নিজের মনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন সুস্মিতার মনে হ'ল যে, জীবনধারণের জন্য তার এত প্রয়াস, সেই জীবনেরই কোন অর্থ সে আর খুঁজে পাচ্ছে না।

হঠাৎ চমক ভাঙল ঝিয়ের ডাকে। "দিদিমনি, রাত যে অনেক হ'ল। শুতে যাবে না ?"

তাই ত রাত অনেক হয়েছে। কাল ভোরে উঠতে হবে। একটা রেডিও প্রোগ্রাম আছে কাল সন্ধ্যায়। সকালে উঠে গান-গুলি ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

ক্লান্ত পায়ে নীচে নেমে এল সুস্মিতা। সিঁড়ি থেকে সিঁড়ি-ঘর। তার পর নিজের ঘর।

কিন্তু ঘরে ঢুকে কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল তার। কেমন যেন একটা অজানা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি স্বস্তির শেকড়ে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কিছু দেখা বা শোনা যায় না। তবু কেন সব যেন আর ঠিক নেই।

কিন্তু বেশী ভাববার আর অবসর হ'ল না। মুহূর্ত্তের মধ্যেই খাটের নীচ থেকে যে মানুষটি বেরিয়ে এল, অন্ততঃ তাকে ঠিক এ মুহূর্ত্তে কিছুতেই সুস্মিতা আশা করে নি।

চিনতে একটুও ভুল হবার কথা নয়। নিঃসন্দেহে এ শ্রীমন্ত। সুস্মিতাকে দেখে সেও কম অবাক হয় নি, বলল, "আরে এ বাড়ী তোমার! জানলে কোন শালা এতক্ষণ ধরে খাটের নীচে মশার কামড় খায়? আমার ধারণা ছিল তুমি তোমার দাদার ওখানেই আজকাল থাক।"

কিছুক্ষণ বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'ল না সুস্মিতার। রাগে তখন তার সমস্ত শরীর রি রি করছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে, শ্রীমন্ত আবারও বলল, "বাঃ ফার্নিচারগুলি ত বেশ ভাল! বাড়ীটাও বেশ বড় বলেই মনে হয়। এত সব হ'ল কি করে? চাকরি বাকরি করছো বোধ হয় ভাল মতই কিছু?"

"সে খবরে তোমার কি দরকার?" এতক্ষণে ফেটে পড়ল সুস্মিতা, "ঢুকেছিলে ত চুরি করতে! এ বাড়ি আমার কি কার, তা জেনে তোমার কি হবে?"

"আরে ছিঃ, ছিঃ, শেষকালে সিঁদেল চোর বলে মনে করলে? আমার কি পিঁজরাপোলে যাবার বয়স হয়েছে নাকি?"

"তবে চোরের মত বাড়ী ঢুকেছ কেন এত রাত্রে?"

নির্লজ্জের মত একবার অষ্টপংক্তিদন্ত বের করে ফেলল শ্রীমন্ত, "হেঃ, হেঃ, তুমি কি কিছুই শোন নি? শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি যে, তোমার ভায়েরা সব তাড়া করে ফিরছে। এ বাড়ীতে ঢুকেই ত বেঁচে গেলাম। শালারা বোধ হয় বুঝতেও পারে নি, এত উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে কি ভাবে মানুষ ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে! মরুক হারামজাদারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে।"

বলতে বলতে পরম নিশ্চিন্তে ধুলো-কাদামাখা পায়েই সে বিছানায় উঠে বসল। আর তার পরেই গা এলিয়ে দিল বিছানাটায়।

রাগে ঘৃণায় সুস্মিতার শরীর তখন জ্বলছে। ওই লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যেন অসহ্য!

কোন রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল সে। আশ্চর্য্য! কত বড় স্পর্দ্ধা ওই মানুষটার! একটা বিষাক্ত সরীসৃপের মতন সে সমাজ-জীবনকে দুর্ব্বিষহ করে তুলেছে। আর তার পরেও তার আশা যে মেয়েটির দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্ব্বনাশ করতেও তার বাধে নি, সেই তাকে আগলে রাখবে নিশ্চিন্ত নীতি আর নিরাপদ শয্যার আশ্রয়ে?

কিন্তু এখন সে কি করবে? চাকরটার ঘরটা এখান থেকে একটু দূরে এখান থেকে চেঁচামেচি করে তাকে ডাকবে? না রান্নাঘর থেকে ঝিটাকেই আলগোছে ডেকে তুলে পাঠিয়ে দেবে প্রতিবেশীদের কাছে?

কিন্তু সে সমস্যার আর প্রয়োজন ছিল না। ইতিমধ্যেই ঝনঝন করে বেজে উঠেছে কলিংবেল। বাইরের গেট থেকে কারা যেন ভিতরে প্রবেশাধিকার চাইছে।

এত রাত্রে আর কারা হবে? নিশ্চয়ই পুলিসের লোক। ফেরারী আসামীর সন্ধানে এসে পৌঁচেছে। ভারী একটা স্বস্তিবোধ করল সুস্মিতা। সত্যিই যদি তারা হয়, তবে তার অনেক ঝঞ্ঝাট বেঁচে যাবে সন্দেহ নেই।

পুলিসই এসে পৌঁছেছিল। গেট খুলতেই দেখা গেল একজন অফিসারের নেতৃত্বে ছ' সাতজন সশস্ত্র রক্ষীর একটি দল অপেক্ষা করছে। অফিসারটি বোঝা গেল সুস্মিতাকে চেনেন। একটু এগিয়ে এসে সম্ভ্রমের সুরেই তিনি বললেন, মাপ করবেন সুস্মিতা দেবী! আমরা একটা খুনে ডাকাতের পেছনে তাড়া করেছিলাম। এর কাছাকাছি এসেই তার আর কোন খোঁজ পাচ্ছি না। আপনার বাড়ীতে আবার কোন ফাঁকে ঢুকে পড়ে নি ত?"

কি যেন কি হয়ে গেল হঠাৎ। সুস্মিতা শুনতে পেল, তার গলাতেই কে যেন বলছে, "আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। আমি ত এতক্ষণ জেগেই ছিলাম। আমার বাড়ী কেউ ঢোকে নি। ঢুকে পড়লে নিশ্চয়ই টের পেতাম।

অফিসারটি একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন, "আপনি ঠিক বলতে পারেন, কারও পক্ষে আপনার অজান্তে এ বাড়ীতে ঢোকা সম্ভব নয়?"

"তবে কি আমি মিথ্যে কথা বলছি?" এবার বেশ একটু চড়াই শুনাল সুস্মিতার গলা, "গেট বন্ধ, এত বড় পাঁচিল! আমি

নিজেও জেগে আছি। কেমন করে আমার অজান্তে লোক ঢুকবে ?"

পুলিসের লোক চলে যাবার পরেও সুস্মিতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ সে কি করল? একটু আগেই সে না শ্রীমন্তকে ধরিয়ে দেবার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছিল! নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কেন সে এমন ভাবে তা ছেড়ে দিল ?

একবার মনে হ'ল ছুটে গিয়ে পুলিসের দলটাকে ডেকে ফেরায়, এখনও তারা বেশী দূরে যায় নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হ'ল, তবে তার আবার আচরণের কি কৈফিয়ৎ এদের কাছে দেবে ?

ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল সুস্মিতা। কিন্তু ঢুকেই আবার তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল।

শ্রীমন্ত দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, "ওঃ, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ যা হউক! কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ দেব ?"

আবার সেই পুরনো বিতৃষ্ণাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করবার নেই। অনেক কষ্টে মনের ভাব সাধারণ করে সুস্মিতা বলল, "তুমি কি ঘুমের ভাণ করে পড়েছিলে নাকি, আমি কি করি দেখবার জন্যে ?"

"পাগল! শুলেই কি ফেরারী আসামীর ঘুম হয় ? তবে খুব ফিরিয়ে দিয়েছ যা হউক! যে রকম চড়া গলায় ওদের ধমক দিচ্ছিলে! এখান থেকে পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম। তার পরেও আর কেঁচোর ডিমগুলির এগোবার সাহস থাকে ?"

সুস্মিতার বোধহয় আর সহ্য হ'ল না। বলল, "কেঁচোর ডিমগুলির থাকে কি না জানি না, তবে কুকুরের মত যারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তাদের সাহসের পরিচয় কিন্তু খুবই পাচ্ছি।"

এর পরেই সুস্মিতা আশঙ্কা করেছিল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। এত শক্ত কথা দূরে থাক, এর থেকে বহুগুণে নরম কোন তিরস্কার পর্যন্ত মুখ বুজে কোনদিন সহ্য করে নি শ্রীমন্ত। প্রতিবারেই তুমুল কিছু ঘটেছে।

এবার কিন্তু সেরকম কিছুই হ'ল না। দু পা এগিয়ে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শ্রীমন্ত। তার পরে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল সুস্মিতার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে ওর দু'হাত এগিয়ে এল সুস্মিতার দিকে। দু হাতে তাকে বুকের কাছে ঘন করে টেনে আনতে আনতে সে বলল, "আমি তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি, নয় ?"

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছিল সুস্মিতা। কিন্তু হঠাৎ শ্রীমন্তের মুখের দিকে চোখ পড়ায় কেমন যেন অবাক লাগল তারও। শ্রীমন্তের এ মুখ ত তার চেনা নয়! এত স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি আজ হঠাৎ কোথা থেকে পেল সেই চির বর্বর আরণ্যক ?

আর একবার তাকিয়ে শ্রীমন্তের চেহারাতেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করল সুস্মিতা। আশ্চর্য! আগের তুলনায় কত শীর্ণ, কত দুর্বল দেখাচ্ছে ওকে? যাকে একদিন দানবের মত দেখাত, এই কি সেই লোকটি ?

শ্রীমন্ত তখন বোধহয় নিজের মনেই বলে চলেছে, "বলবার আর আমার মুখ নেই জানি। তবু আজ কেন জানি মনে হচ্ছে। আমার এ জীবনকে আবার নতুন করে ঢেলে-সাজতে পারলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। দেবে তুমি আমায় সে সুযোগ? আর একটি বারের মত আমায় তুমি মাপ করতে পারবে সু—?"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুস্মিতা। তার জীবনের পুষ্পিত রাত কি আরও একবার এসে পৌঁছাল ?

শ্রীমন্তের বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে নিজেকে নিঃশেষে ছেড়ে দিতে দিতে অস্ফুটস্বরে সে শুধু একবার বলেছিল, "পারব।"

পর দিন ভোরে উঠতে একটু দেরীই হয়েছিল সুস্মিতার। ঘুম ভাঙল ঝিয়ের চেঁচামেচিতে, "কাল রাত্রে বাড়ীতে চোর এসেছিল দিদিমণি।"

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুস্মিতা। তার হৃতসম্পদ ভাঙা আলমারিটাও যেন তারই মত অসহ্য বেদনায় স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে।

প্রশ্নের আর কিছু নেই। তবু একবার সুস্মিতা একবার ক্লান্ত পায়ে যেন কিসের ব্যর্থ আশায় সারা বাড়ীটা ঘুরে এল।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে কলরবমুখর ঝি-চাকরগুলিকে সে রকম স্তিমিত গলাতেই একবার বলল, 'যাক্, যা যাবার গিয়েছে। এ নিয়ে আর বেশী হৈ চৈ কর না।"
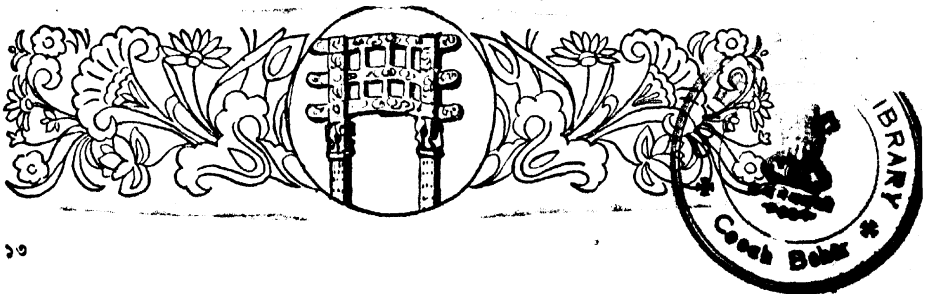
অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

—"দাদু, দাদু, দাদু।" উজ্জ্বল মুখে ছুটে এল পার্থ বনাম তিতির,—"নেহরু আসছেন আজ বিকেলে,জান দাদু ? পরশু তাঁর জন্যে ইণ্ডিয়া হাউসে মস্ত পার্টি হবে। হিঃ হিঃ হিঃ, দাদু কি মজা!"

ওর হাসির ছোঁয়া মামার মুখেও ছড়িয়ে পড়ল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন,—"নেহরু আসছেন ত তোমার কি ?"

—"বাঃ, আমি যে এখানে তাঁকে দেখতে পাব, একেবারে কাছে থেকে। দেশে থাকতে তো আর তা হ'ত না! সেখানে ত শুধু পিন্টুদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম দু'ধারে জনসমুদ্রের মাঝখান দিয়ে খোলা গাড়ীতে করে চলেছেন, মুখে হাসি, হাতে নমস্কার, কিন্তু তবু সে কত দূরে। আমরা না হয় তাঁকে দেখতাম, তিনি ত আর আমাদের দেখতে পেতেন না। এখানে কি মজা, একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে দেখব। চাই কি কথাও হবে দু' একটা। আমাদের সকলের 'ইনভিটেশন' আসবে।"

—"তোমাকে সে খবর এই সকালে কে দিল তিতি ?"

রমলার স্বরে উচ্ছ্বাসের আভাস নেই দেখে তিতিরের উৎসাহ দমে গেল। তবু প্রশ্নের উত্তরে অপ্রস্তুত মুখে কিছু দ্বিধা আর কিছু খুশীভরা বড় চোখ মেলে পার্থ বললে,—"আমি কাগজে খবর দেখেই অমিকাকাকে ফোন করেছিলাম, অটোগ্রাফ আনিয়ে দেবার জন্যে। তাতে কাকা বললে, কাল সকালের মধ্যেই কার্ড পাঠাবে। তা হলে নিজে গিয়ে অটোগ্রাফ চেয়ে নেওয়া যাবে। কি মজা—"

—"কি এমন হাতী-ঘোড়া লাভ হবে তোমার তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে ?"

—"বাঃ!" পার্থর গলায় চড় খাওয়া উৎসাহের ক্ষুব্ধ গুঞ্জন,—"বাঃ!"

—"তা হলে নেহরুর অটোগ্রাফ নিতে তোমার দিল্লী না গিয়ে একেবারে লণ্ডনে আসতে হ'ল ?" কুমার হাসল।

—"হ্যাঁ মামা, আমিও কেবল সেই কথাই ভাবছি," তিতির বললে,—"দেশের লোকের দেখা পাব বিদেশে এসে।" তিতির হাসল, স্বচ্ছ সরল হাসি। কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে হাসল,—"দিদি, আমি কিন্তু তোমার জন্যেই অটোগ্রাফের খোঁজ করছিলাম। আমার ত খাতাই নেই। দেখ কেমন জোগাড় করে দিলাম। কিন্তু দিদি, অটোগ্রাফটা তোমার নিজেকে নিতে হবে। তখন যে চুপি চুপি আমার হাতে খাতা দিয়ে বলবে, ভাই তিতি, লক্ষ্মীটি, তুই গিয়ে নিয়ে আয়।"

কৃষ্ণার চোখে খুশী ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠল,—"না রে না, আমরা দু'জনে যাব—"

—"মোটেই না, আমি দূরে থাকব। চট্ করে আমার বক্স ক্যামেরাটা দিয়ে একটা ছবি তুলে ফেলব, পরে সেটা পাঠিয়ে দেব মণিমেলায়—পণ্ডিত নেহরু লণ্ডনে একটি ভারতীয় বালিকাকে স্বাক্ষর দিতেছেন। বালিকা লিখব না তরুণী লিখব, বল্ না রে দিদি ?"

তিতিরের কথায় ঘরভরা গুমটে যেন এক ঝলক রোদ্দুর হেসে উঠল। কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে কুমার চোখেমুখে হাসল, এবার আর সেই অন্যমনস্ক চাউনি নয়—কৌতুকোজ্জ্বল চোখে চোখে মেলানো, চেনাশোনার আদর মাখানো হাসি এতক্ষণে কুমারের তবে কৃষ্ণাকে মনে পড়ল। আর সেই অকথিত খবরের ঢেউ কৃষ্ণার বুকের মধ্যে দ্রুত-নিশ্বাসে দুলতে লাগল, গত সন্ধ্যার সব অভিমান, আজ সকালের উদ্বেগ, আশঙ্কা, সমস্ত ছাপিয়ে সেই খবরের রং ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ হাসিখুসির হাওয়ায় কুমারের মুখের কালো ছায়াও একটু যেন সরে গেল। সেদিকে তাকিয়ে রমলা ভাবলে—কৃষ্ণার সঙ্গেই কুমারের বিয়ে দিতে হবে। নইলে, এদেশে কুমারের মত সুপুরুষ ছেলের কুমার থাকার সম্ভাবনা কম। কে জানে, এখনই দেরী হয়ে গেছে কিনা ? কাল রাতে ওর কি হয়েছে কে জানে—এখনও ত ওকে দেখতে রীতিমত অসুস্থ লাগছে, এ হাসি শুধু বাইরের হাসি। কি জানি ওর কি আবার কোন অসুখই করল নাকি!

রমলার মনে মনে যতক্ষণ নারীস্নেহ আর কৌতূহল কথা বলাবলি করছিল, ততক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামাবাবু বললেন,—"নেহরু কি জানেন, যে তাঁর দেশের একজন বি-এ পাস নবযুবকের জন্যে ইংলণ্ডের বাস-ড্রাইভাররা ষ্ট্রাইক করেছে।"

—"নিশ্চয় জানেন দাদু।" তিতির লাফিয়ে উঠল—"খবরের কাগজ ত তাঁকে পড়তেই হয়। আমি জানলাম আর পণ্ডিতজী জানবেন না এ কি হতে পারে ?"

—"কিন্তু মামা তিনি জেনেই বা কি করতে পারেন?" কুমার বললে দ্বিধান্বিত কণ্ঠে।

"কেন সাউথ আফ্রিকার বিষয় নিয়ে যদি এত বলা যায়, তবে এটা নিয়েও কেন আমরা কিছু বলতে পারব না?" এতক্ষণে কৃষ্ণা একটা বলার মত কথা খুঁজে পেল। কিন্তু বলেই বুঝল, ভুল হয়ে গেছে—না বললেই ভাল ছিল।

কিন্তু মামাবাবু হেসে ওঠার আগেই কুমার কথা কইল। আগে হলে ও নিজেও হেসে উঠত। কিন্তু আজকাল কাউকে কোন রকমেই আঘাত দিতে ওর কোথায় যেন বাজে। অন্যের দিকটা স্বভাবতঃই মনে পড়ে যায়। বেচারা কৃষ্ণা এখনও বড়দের তর্কসভায় তেমন করে যোগ দিতে পারে না, কিন্তু তা বলে ওর যোগ্যতা কম নয়।

শুধু নিজের বিষয়ে ও এখনও অনেকখানি অচেতন। প্রতি কথায় বড়দের মুখ চেয়ে থাকে বলেই ও এখনও ছোট হয়েই আছে। হঠাৎ কুমারের মনে হ'ল, মামাবাবু যতই ঠাট্টা করুন, এই অন্ধতা থেকে ও কৃষ্ণাকে মুক্তি দিয়ে যাবে। না হলে, সেই ভীতু পাখীর বাচ্ছার মত ওর পাখার জোর যাবে কমে। আকাশকে ভয় করে বাসার কোণে লুকিয়ে থাকবে, আর মুখ দেখালেই কাক-চিলের ঠোকর খাবে।

হঠাৎ কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে কুমারের মনে হ'ল যে, ও সেই বাংলা দেশের মেয়ে, যে নিজের অসীম শক্তিকে মিথ্যে একটা অহেতুক লজ্জা দিয়ে ঢেকে রেখে দেয়। ওকে এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ওর ছেলেমানুষী যে সকলের কৌতুকের খোরাক জোগায়, এমনকি কুমারেরও,—এই কথাটা হঠাৎ মনে মনে পীড়িত করল কুমারকে। হয় ত তখনই এত কথা স্পষ্ট করে কুমারের মনে হয় নি, এসব কথাই তার মনে ছিল। তাই কৃষ্ণার মুখে অপ্রস্তুত ভাব ফুটিয়ে অন্য কারুর হেসে ওঠবার আগেই কুমার কথা কইলে, এমন ভাবে কইলে যেন কৃষ্ণার কথায় কোন ছেলেমানুষী—কোন অপরিণতি নেই, যেন সে ওদেরই মত একজন সাধারণ—বড়।

কুমার বললে,—"সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে এর ঠিক তুলনা করা চলে কি? আমার মনে হয়, চলে না। কারণ সাউথ আফ্রিকায় কালা-নির্যাতন সরকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এখানে সরকারের দিক থেকে কোথাও কোন আপত্তিকর ব্যবস্থা নেই। কতকগুলি লোক যদি কোন কারণে স্ট্রাইক করে, তবে আমাদের পক্ষেও সরকারের দিক থেকে কিছু করা যায় না।"

—"কিন্তু শুধু এই ত নয়।" রমলা বলে,—"বাড়ীভাড়া নিয়ে কি কাণ্ড হ'ল বল ত। কালো চামড়ার জন্যে কি দুর্ভোগ।"

কুমার জিতেছে—এরই নাম সূক্ষ্ম প্রপাগাণ্ডা। কুমার কৃষ্ণার সঙ্গে সমকক্ষের মত কথা বলায় রমলাও বলেছে। ওরা হঠাৎ ভুলে গেছে যে, ওরা কৃষ্ণাকে ছেলেমানুষ মনে করে। কুমার যে ইচ্ছে করেই ওকে এই মর্য্যাদা দিয়েছে, সেটা না বুঝেও চকিতের জন্যে কুমারকে একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টির অর্ঘ্য দিয়ে টেবিল-ক্লথটা তুলে রাখল কৃষ্ণা।

কুমার বললে,—"বাড়ীভাড়ার ব্যাপারেই বা কে কি করতে পারে বল। আমার বাড়ী আমি যাকে ইচ্ছে ভাড়া দেব।"

—"তাই ত বলছি।" রমলা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, "এই ধরনের ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করা চলে না বলেই তা আরো অসহ্য। মনের মধ্যে হুল ফুটিয়ে দেয়, পালটা হুল ফোটাবার কোন উপায় না রেখেই।"

—"এই রে! রমলা আবার ক্ষেপেছে।" মামাবাবু হেসে ওঠেন, এই খ্রীষ্টধর্মের দেশে বসে তুই হুলের বদলে হুল ফোটাতে চাইছিস। একেবারে a tooth for a tooth, & an eye for an eyeএর ব্যাপার।"

—"আঃ হাঃ।" রমলার মুখে হেসে ওঠে শাণিত বিদ্রূপ —"আঃ হাঃ! যীশুর কথা এদেশে, ভূতের মুখে রামনামের চেয়েও বোধহয় বেশী বেমানান। বেচারী য়িহুদীরা তবু দাঁতের বদলে দাঁত নিত। এ যুগের খ্রীস্টানরা বদলি না দিয়েই দাঁতটি তুলে নেয়।"

রমলা রেগে গেলে সাধারণতঃ এরা চুপ করে যায়, কিন্তু আজ কুমার তর্ক তুললে। বললে,—"শুধু কি খ্রীস্টানরাই করে? বৌদ্ধ জাপান চীনের ওপরে কি কম অত্যাচারটা করেছে?"

—"এ নিয়ে তর্ক তুলে লাভ কি?" মামাবাবু হাসলেন, "এ ত পৃথিবীর সর্বত্রই চলেছে, শুধু আজ নয়—চিরকালই। তারই মধ্যে থেকে থেকে বিভিন্ন দেশে কালে বিভিন্ন সব মহামানব জন্মে গেছেন। তবু আজও মানুষ সভ্য হতে শেখেনি। আজও সুযোগ পেলেই তাদের বন্যস্বভাব জেগে ওঠে। তখন বাঘের মত পরস্পরের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে কোন বাধা থাকে না।"

—"আপাততঃ আমাকে একটু কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হবে। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব ঠিকঠাক করে ফিরে এসে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।"

—"আর তোর জিনিস যদি আমি গুছিয়ে দিই? খুব একটা ক্ষতি হবে কি তাতে?" রমলা বললে,—"ছোট

বেলায় ত সবই আমাকে গুছিয়ে দিতে হ'ত। এই ক'বছর বিলেতে থেকে হঠাং স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিস ?"

—"তা যাই বলিস্।" কুমার উঠে দাঁড়াল,—"এদেশে আর কিছু না শিখি ত স্বাবলম্বী হতে যে শিখেছি, সেটা তোকেও স্বীকার করতে হবে রমু।"

—"তা করছি, কিন্তু এও ভাবছি এত স্বাবলম্বী হতেই বা শিখলি কি করে ? শিক্ষিকা কেউ ছিল নাকি ?"

—"কে জানে!"

কুমার হাসল, কৃষ্ণাও হাসল। আর দুজনেরই হাসির মধ্যে একটা অলক্ষ্যপ্রায় কালোছায়া দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। কুমারের মুখে বেদনার আর কৃষ্ণার মুখে ভয়ের। ছিল কি সত্যি ? কে জানে ?

কুমার বললে,—"এদেশের মেয়েরা ছেলেদের স্বাবলম্বী হওয়াই পছন্দ করে, মানে তোদের মত গোটা পুরুষ জাতটাকে পকেটে পুরে, খুড়ি, আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিয়ে চাবির গোছার মত ঝনাৎ করে পিঠের উপরে ফেলে বেড়াতে চায় না। এরা যেমন নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা ভালবাসে, তেমনি ছেলেদেরও পরাধীন করে রাখতে চায় না।"

—"বাবাঃ এত !" রমলার মুখে হাসির মধ্যেও বিস্ময় কম ফোটে না,—"এত গুণগানে মুখরিত করে তুলল কে শুনি ? সত্যি বল্ না, আছে নাকি কিছু এর মধ্যে ?"

—"হুঁ হুঁ।" কুমার হাসল, আর কৃষ্ণার বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল। কুমার হাসতে হাসতে বললে,—"সময় হলেই জানতে পারবে।"

মামাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"আমাকে এখন একবার বেরুতে হবে।"

—"তিতিরকে তা হলে তুমিই নিয়ে যাও মামা, আমি তা হলে মিস্ ম্যানিংয়ের কাজটা সেরে আসি। আজ না হলে আর সময় হবে না।"

—"বেশ ত", মামা বললেন,—"তুমি যাও না তোমার সেই বৃদ্ধাকুমারী কর্মসঙ্গিনীর কাছে। আমি পার্থকে তার টীচারের কাছে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ফেরার সময় তুলে নিয়ে, একেবারে ওর স্কুলের পোশাকের মাপ দিয়ে ফিরব।"

রমলা বললে,—"বাঁচালে মামা, আমি তা হলে যাচ্ছি। তুমি আর পার্থ তা হলে পথে কিছু খেয়ে নিও, কুমারের ট্রেণ ত চারটে বাইশে, আমি তার অনেক আগেই ফিরে আসব।"

কুমার বললে,—"দুঃখিত, আমি এখন বেশ কিছুদিন তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারব না।"

—"যেন এতদিন সারাক্ষণ আমাদের কাজে লেগে-ছিলে ?" রমলা হাসল।

—"আরে, আমার উপস্থিতিতেই তোমাদের অনেক কার্যসিদ্ধি। কি বল মিঃ পার্থসারথি ?"

কুমারের এতক্ষণের ম্লান হাসি হঠাৎ যেন জোর ফিরে পেল। শুনে কৃষ্ণার ইচ্ছে করতে লাগল একবার কুমারের মুখের দিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কিছুতেই নতনয়ন তুলতে না পেরে একদৃষ্টে রমলার সুগঠিত আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

মামা বললেন,—"আরে, কৃষ্ণারাণীও ত আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন, ঐ পথে ত পড়বে।"

চমকে কৃষ্ণা মুখ তুললে,—স্কুল ?—না, আজ নয়। আজ কোন কর্তব্য মনে নেই, আজ কোথাও বেরুতে একটুও ইচ্ছা করছে না ওর। আজ ও একটু একলা থাকতে চায়, এই মুহূর্তে ওর সমস্ত প্রাণ চাইছে, তার নিজের ঘরে জানালার ধারে গিয়ে নিঃসঙ্গ একটু বসতে। এখন সে ঘরের বাইরে পাদমেকংও যাবে না। হঠাৎ একটা ডাহা মিথ্যা কথা বলে ফেলল কৃষ্ণা,—"আজ ত স্কুল নেই, ভুলেই গিয়ে-ছিলাম বলতে। মিস্ রথচাইল্ডের কি একটা যেন কাজ আছে।"

—"তবে ?"

—"আমি বাড়ীতেই থাকব। কিছু কাজ দিয়েছেন বাড়ীতে করতে, সেগুলি সেরে রাখব।"

সবাই চলে গেলে কৃষ্ণা নিজের ঘরে এসে জানালার ধারে কুশন চেয়ারটার উপরে বসে পড়ে ধোঁয়াটে আকাশটার দিকে চেয়ে দেখল।

আজ সকাল থেকে ঘন কুয়াসার স্তূপ যেন চারিদিকে ঝুলে রয়েছে। বসন্তের সুরু—তবু আকাশ পৃথিবী সব যেন একেবারে লেপেপুঁছে এক করে দিয়েছে। তার মধ্যে ওরা সবাই যে-যার পথে চলে গেল। এক দিকে কুমার অন্য দিকে রমলা,—আর একটা অন্য দিকে মামাবাবু আর তিতির। কুয়াসার মাঝে মাঝে গাছের ছায়াগুলি গাঢ়তর আর একটা আবরণ পরেছে যেন।

হঠাৎ-পাওয়া এই একলা বসে থাকাটুকু কৃষ্ণার ভাল লাগছে। এই অকারণ মিছিমিছি জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকা আর শুধু চেয়ে থাকা।

ধীরে ধীরে কখন যে কুয়াসা গলে ঝিরঝিরে বাদলা সুরু হয়ে গেছে, কৃষ্ণার অন্যমনা চোখ তা টের পায় নি। শুধু কি যেন একটা অলক্ষিত কষ্টে মনের ভিতরটা টন টন করে উঠেছে। বিশেষ কোন কারণে নয়, বিশেষ কোন ভাবনায় নয়। তবু শুধু শুধুই মন যেন কেমন করছে, কেন কে জানে ? হঠাৎ এদের সঙ্গে এই দূর দেশে পাড়ি দিয়ে কেন এল কৃষ্ণা ? এরা কেউই ত ওর তেমন আপনার নয়। বিধবা

মামী আর তার বাপের বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে, তাকে মা-বাপ পাঠালেন কেন?

হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম অভিমান ওর মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠল আর বাড়ীর জন্যে মনটা দুলে উঠল। অবশ্য রমলাকে কেউ বিধবা বউ বলে মনে করে না ওদের বাড়ীতে। না, সকলেই তাকে ভালবেসে এখনও সকলের কর্ত্রীপদই দিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণার মা ত রমলার আপন ননদ, তবু তাকে ভালবাসে। এটা বেশ একটু আশ্চর্য্য ব্যাপার—বাঙালীর সংসারে এ রকম ঠিক হয় না, তবু যে তা সম্ভব হয়েছিল ওদের বাড়ীতে সে কি রমলার গুণ, নাকি ওদের বাড়ীর? কি জানি কার, সেকথা ভেবে লাভ কি? কিন্তু মামীর কথা ভাবতে গেলেই থেকে থেকেই ওর নিজের মামাকে মনে পড়ে যায়। কি হাসিখুসি মানুষ ছিলেন, আর কি রসিক। মামার জন্যেই সকলে রমলাকে এত বাড়িয়েছে—

মামা যে ওকে মাথার মুকুট করেছিলেন—এই খবর অন্য সকলের চোখেও ওকে সেই মর্য্যাদাই দিয়েছিল। ওর গৌরব বাড়িয়ে দিয়ে মামা নিজে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চাইতেন, মামার ভালবাসা যে কত গভীর আর কত তীব্র ছিল, আজ হঠাৎ যেন তা কৃষ্ণার বোধের সীমানায় এসে পৌঁছল। মামীর বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ, বিদ্যে যতই বিস্তৃত হোক না মামার মত আনন্দ নেই তাঁর—ভালবাসাও নেই বোধহয়। এমন কি মামার কাছে এসে মামার স্নেহের সেই অতলস্পর্শের মধ্যে ডুবে থেকেও রমলা কেন পূর্ণতা পেল না জীবনে—কেন এখনও ওর মধ্যে অসহিষ্ণু ক্ষোভ ক্রুদ্ধ বিদ্রোহে ঝটাপটি বাধিয়ে দেয়? অবাক হয়ে কৃষ্ণা ভাবে, চারিদিক থেকে এত আদর, এত প্রেম, এত শ্রদ্ধা পেয়েও কেন রমলার জীবন ভরে ওঠে নি। এত শ্রদ্ধা, এত মনোযোগই বা কি করে ও টেনে নেয় লোকের কাছ থেকে, তাও জানে না কৃষ্ণা। এই ত এখানে আসামাত্র তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে মার্কাসের মধ্যে। ওই লোকটি যে এরই মধ্যে রমলার জন্যে নিজের মনে একটি বিচিত্র আসন পেতে দিয়েছে—সেকথা বুঝতে কারুর দেরী হবার কথা নয়। কৃষ্ণা লক্ষ্য করেছে অনেকবার—রমলা যখন কথা বলে মার্কাসের চোখ যেন তাকে আরতি করে। কেন রমলার এত বেশী প্রাপ্য—শুধু কি রূপ আর তীক্ষ্ণতা? তাই হয়ত। নইলে কৃষ্ণার বয়স ত আরও অনেক কম, তবু কেউ যেন তাকে নজরই করে না। পিয়েত্রো যদিও মাঝে মাঝে একটু মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু কৃষ্ণা বেশ বোঝে সে কেবল বাইরের। সব কমবয়সী মেয়েদেরই ওটুকু প্রাপ্য—অন্ততঃ এদেশে। কৃষ্ণার সঙ্গে হয়ত ওর একটু ভাব করতে সখ হয়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তা ছাড়া যে কৃষ্ণার জন্যে এতটুকু ত্যাগ করতে পিয়েত্রো কখনও এগিয়ে আসবে এমন মনে হয় না কৃষ্ণার। অথচ রমলাকে এতটুকু খুসী করতে মার্কাসের আগ্রহ লক্ষ্য না করে উপায় নেই। কিন্তু কৃষ্ণাকে কেউ ভালবাসে কি? মা-বাবা ছাড়া আর কেউ? কে জানে—রমলা হয়ত বাসে—অন্তত এককালে বাসত যখন ওর মামা বেঁচেছিল—টুক্‌রো-টাক্‌রা কত সোহাগে ওরা দুজনে ওকে ভরিয়ে রাখত। যখন-তখন খেলনা, পুতুল, টফি, লজেন্স আর নানা উপলক্ষে নতুন জামাকাপড়। রমলার যখন বিয়ে হয় কৃষ্ণার বয়স তখন সাত। টুক্‌টুকে রাঙা রাঙা নতুন বৌকে কৃষ্ণা সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরে থাকত। মনে আছে, মামা যখন কেমন একরকম ভাবে তাকিয়ে রমলার দিকে এগিয়ে আসতেন, কৃষ্ণা তখন তার ছোট দু'হাতে মামীকে আড়াল করে চেঁচিয়ে বলত,—"না না, খবরদার মামীর গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

শুনে রমলা দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে খিল্ খিল করে হেসে উঠত,—"ঠিক করেছ কৃষ্ণা, মামাকে তাড়িয়ে দিয়েছ ত?"

ওদের সেই নতুন বিয়ের দিনগুলি কৃষ্ণার চারিদিক ঘিরে চন্দনের ধূপের মত ঘুরে ঘুরে উঠত। ধূপের ধোঁয়ার মতই আজ তারা কোথায় উড়ে গেছে। সেই সঙ্গেই কৃষ্ণার দিন-গুলিতে পড়েছে ম্লান ছায়া। ওর এই উনিশ বছরের জীবনটাও তেমন রঙীন হয়ে উঠতে পারছে না। মামা নেই, মামার সেই আনন্দ নেই, কে আর ওকে ভালবাসবে? এই দাদুও যেন ওকে আর তেমন করে ডাকেন না। উনি যে রমলার মামা, তাই উনিও রমলাকেই বেশী ভালবাসেন। কৃষ্ণার কথা বোধ হয় একবার মনেও হয় না। মাও ওকে কতখানি ভালবাসেন কে জানে। কেবলই ত সংশোধন করে চলেন - ওকে দেখতে না দেখতেই ওর দোষগুলি মায়ের চোখে পড়ে যায়, যে যেখানে আছে সকলের গুণাবলী শুনিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই ওকে কেবল মানুষ করে চলেন। আর বাবা? বাবার কথা যেন তেমন করে মনেই পড়ে না। মনে পড়লে বাবাকে ভালই লাগে কৃষ্ণার, কিন্তু বাবার তাকে কেমন লাগে কে জানে? হয়ত কিছুই লাগে না, মনেই পড়ে না হয়ত কখনও। আসলে তিনি কাজের লোক। কাজের ফাঁকে কখন যে বাড়ীতে আসেন আর কখন যে বেরিয়ে যান তা অনেক সময় টেরও পায় না ওরা। খানিকটা ভয়ও যে না করে বাবাকে তাও নয়, কিন্তু ওটা ভয় না অপরিচিতির শঙ্কা? বাবা যেন প্রায় অপরিচিত ওদের কাছে। বাবার কাছে যা কিছু পাওনা সবই আসে মায়ের হাত দিয়ে। কাজেই বাবাকে ওরা তেমন চেনেই না। বাবাই কি ওদের চেনেন? হয়ত চেনেন তাঁর নিজের মতন

করে। কিন্তু—কিন্তু ভালবাসার সময় নেই তাঁর। ভালবাসা হচ্ছে বিলাসী-মনের ভোগ, তাঁদের মত শ্রমিকধর্মী মনের জিনিস নয়। ঠিক এই কথা না হোক—এই ধরনের কথা বাবার মুখে সে শুনেছে মায়ের অভিযোগের উত্তরে। ভাল না বেসেও বাবার বেশ চলে যায়—এমনকি বোধহয় ভালবাসা না পেয়েও। কিন্তু কৃষ্ণার চলে কি? না না না, ওর চলে না—একেবারেই না। ভালবাসায় ভরে আছে ওর মন। ও ঢেলে দিতে চায়, কিন্তু কাকে দেবে, কেউ ত এগিয়ে আসছে না অঞ্জলি পেতে। কুমার? না না, কুমার নয়, কুমার ওর কথা ভাবেও না, বেশ বুঝেছে কৃষ্ণা। সে বোকা, নেহাৎ বোকা। তাই একবার ও ভেবেছিল বুঝি কুমারের ওকে ভাল লেগেছে, তাই ওকে আরও মনের মত করে তুলতে চায়। না না, মিথ্যে কথা। ও সবকিছুই ওর ক্ষণিকের খেয়াল। কৃষ্ণা বেশ বুঝছে, কাল রাতে কুমারের জীবনে অথবা মনে কোথাও একটা বিষম ওলট পালট হয়ে গেছে। কি ব্যাপার, জানতে ইচ্ছে হয় কৃষ্ণার—ইচ্ছে হয়, একটু সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে অসম্ভব। সুযোগ পেলেও কৃষ্ণা ওসব কোন কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু—

আর বেশীক্ষণ কৃষ্ণার এই একা বসে ভাবনাবিলাস চালানো উচিত কি? উঠে কিছু করা উচিত নিশ্চয় ওর। লাঞ্চটা তৈরি করে রাখলে হ'ত, কিন্তু সবাই ত বললে খেয়ে আসবে। কুমার অবশ্য কিছু বলে নি, কিন্তু সেও নিশ্চয়ই খেয়ে আসবে। নিশ্চয়ই আশা করবে না যে, কৃষ্ণা তার জন্যে খাবার তৈরি করে রাখবে। তবু ও যখন বাড়ীতেই রইল, ওর উচিত ছিল সবাইকে একবার খাবার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা। আঃ ও যদি রমলার মত যোগ্য হতে পারত, সকলের সব প্রয়োজন না বলতেই বুঝে নিতে পারত। দক্ষতার সঙ্গে সকলের জন্যেই কিছু না কিছু করতে পারত—দিতে পারত সবাইকে ওর নিজের বুদ্ধির আশ্রয়, তবে কেউ ওকে অবজ্ঞা করতে পারত না। কিন্তু এসব কথা কিছুতেই ঠিক সময়ে ওর মাথায় আসে না। বেশীর ভাগ সময়েই মনটা অন্যমনস্ক হয়ে কোন খেলায় মেতে থাকে, কেউ কিছু স্পষ্ট করে না বললে নিজে থেকে কোন কথাই যেন খেয়াল হতে চায় না। নইলে বাড়ীতেই যখন রইল, অন্ততঃ কুমারের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবার প্রস্তাবটাও ত ও করতে পারত।

কিন্তু যদি তাতে কেউ কিছু ভাবত? মামা যদি হঠাৎ বাঁকা চোখে হেসে উঠতেন, রমলা যদি অবাক হয়ে চাইত? কুমার যদি বলত, দরকার নেই—তা হলে? তা হলে মরমে মরে যেত কৃষ্ণা। কিন্তু না বলেও ত ও কুমারের জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারে। যদি সত্যি সুন্দর করে সব গুছিয়ে রাখে—কুমার ফিরে আসার আগেই। তবে বেশ হয়? ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যদি দেখে কেউ সুন্দর করে তার বাক্স গুছিয়ে রেখে দিয়েছে, তবে খুসী হয় না এমন পুরুষ বিরল।

ধীরে ধীরে কুমারের ঘরের কাছে এসে চুপ করে দাঁড়াল কৃষ্ণা। ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। একবার মনে হ'ল ঢোকা উচিত কি? আবার মনে হ'ল, কি হবে, কেউ ত নেই। ভারী পর্দাটা নিষেধের মত স্তব্ধ অনড়। আজ হঠাৎ নিষেধ অমান্য করবার দুরন্ত স্পৃহা, ওর মনের সূক্ষ্ম নীতিবোধের মাপকাঠিটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। যাই না একবার, কি আর হয়েছে, কেউ ত আসছে না।

টুপ করে পর্দা সরিয়ে একমুহূর্তে ঘরে ঢুকে পড়ল কৃষ্ণা, আর সেই চমৎকারিত্বের গৌরবে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখল। সামনেই কুমারের একাকী শয্যা দলিত মথিত চাদরে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন এঁকে পায়ের কাছে লেপকম্বলের স্তূপ নিয়ে পড়ে আছে। আর টেবিলের উপরে দুটো সুটকেস। ওয়ার্ডরোবের দরজা খোলা। কুমার হয়ত সকালেই জিনিস প্যাক করে নেবে ভেবেছিল। তার পরে ঠিক করেছে, কাজ সেরে এসে করবে। একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কৃষ্ণা কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিল। প্রথমেই সুটকেস একটা মাটিতে কার্পেটের উপরে নামিয়ে রেখে অন্য সুটকেসটা ভাল করে টেবিলের উপরেই রাখল। ওয়ার্ডরোব থেকে প্রথম সুটটি বার করে বিছানার উপরে রেখে সমস্যায় পড়ল কৃষ্ণা। হ্যাঙ্গার থেকে কোটটা বার করে হাতে নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল কৃষ্ণা। কোট ভাঁজ করতে জানে না সে, ট্রাউসার ত আরও না। যদি ক্রীজ পড়ে যায়। বাবার জামা কাপড় রাখে তাঁর বেয়ারা, আর তার উপরে তদ্বির করেন মা। কাজেই সুট ভাঁজ করার কায়দা কৃষ্ণা শেখে নি, কিন্তু ভাঁজ ঠিকমত না হলে যে উল্টো বিপত্তি হয়, তা সে বাবার কাছে শুনেছে। ছি ছি, কেন এল মিছি মিছি! সুটটা ওয়ার্ডরোবে তুলে দিয়ে যেমন এসেছে তেমনি পালিয়ে যাবে ভাবল কৃষ্ণা। চুপি চুপি, কেউ জানবে না। হঠাৎ দেখে বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে আছে একটা চকচকে ফটোগ্রাফ—কার ফটো? সকালের সেই হাসিঠাট্টার টুকরো কথাগুলি কৃষ্ণার মনে পড়েছিল কি না কে জানে। কিন্তু ওর হাত গিয়ে সেই ফ্টোগ্রাফটা বালিশের তলা থেকে অনায়াসে টেনে বার করে আনল। কে এই মেয়েটি? কোনদিন দেখে নি ত, কুমারের কাছে শোনেও নি নাম। ঘাড়ের কাছে চুলের কুণ্ডলী সাপের মত গোল হয়ে আছে। তারার মত উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সারা রাত ওর বালিশের নীচে মুখ গুঁজে

পড়ে থেকে কানে কানে কি কথা বলেছে কে জানে? কেন কুমার এই ছবি নিয়ে শুয়েছিল রাতে? বোধ হয় হাতে নিয়ে দেখছিল, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই, কিন্তু মেয়েটি কে? কৃষ্ণা ভুলে গেল যে, ও ঠিক করেছিল, এই মুহূর্তে এ ঘর থেকে চলে যাবে। অন্যমনস্ক হয়ে বিছানার একপাশে বসে পড়ে কৃষ্ণা ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। অনেক উৎসাহ নিয়ে জিনিস গোছাতে এসেছিল। হঠাৎ একটা সূক্ষ্ম বিষাদের তীব্র রেখা মনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে ওকে যেন আচ্ছন্নপ্রায় করে দিল। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল সেই লাইনটা—সখ্যাৎতে মা যোষং সখ্যান্ মে মা যোষ্ঠাঃ—তুমি আমার চিরজীবনের বন্ধু হও, আমিও যেন তোমার চিরসাথী হই। তার পরের সংস্কৃত পদটা কৃষ্ণা মনে করতে পারল না, কিন্তু মানেটা মনে পড়ল—আমাদের এ বন্ধুত্ব যেন অন্য নারীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়।

টুকিটাকি কাজ সেরে ঘরে ফিরতে কুমারের প্রায় বারোটা বাজল। তাড়াতাড়ি দশ মিনিটে প্যাক করে বাইরে কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নেবে ভেবেছিল কুমার। রবারসোলের নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এদেশের অভ্যাস মতো আস্তে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দেখে, মেরীর ছবি হাতে করে আচ্ছন্নের মত বসে আছে কৃষ্ণা। আর চারিদিকে কুমারের অসংস্কৃত ঘর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে আছে।

এক মুহূর্ত অবাক হয়ে গেল কুমার। পরেই বুঝতে পারল, বোধ হয় ওর জিনিস গুছিয়ে দেবার সদিচ্ছার বশবর্তী হয়েই কৃষ্ণা এ ঘরে এসেছে। আর এসেই মেরীর ছবিটি আবিষ্কার করেছে। তা করুক, কিন্তু ছবিটা হাতে করে ভাবছে কি?

কুমার ঘরে ঢুকল একটু শব্দ করে। চমকে মুখ তুলল কৃষ্ণা, ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া মুখ। ছবিটা হাত থেকে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচত কৃষ্ণা, তা পারল না, বরং শিথিলমুঠি-হাত থেকে সেটা আপনি খসে পড়ল কার্পেটের উপর। কুমার দেখল, কৃষ্ণার পায়ের কাছে মেরীর ছবিটা নিতান্ত নির্বিকার ভাবে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ছবিটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণা। আর সেই সময়টুকুর মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এল ওর একটু আগের মুছে-যাওয়া হাসি। বললে,—"নিতান্ত পরোপকারের বাসনায় আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম সব প্যাক্-ট্যাক্ করে রেখে আপনাকে অবাক করে দেব, তা আপনি সে সুযোগ দিলেন না, আগেই এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ এই চমৎকার ছবিটি দেখতে পেলাম। ভারী সুন্দর দেখতে [illegible]-কে?" কুমারের মুখের উপরের কৃষ্ণার বড় বড় চোখ দুটো মস্ত জিজ্ঞাসা ভরে চেয়ে রইল। সেদিকে চোখ ফেলল না কুমার, কৃষ্ণার হাত থেকে ছবিটি নিয়ে সযত্নে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল। কুমার বলল,—"ওর নাম মেরী ডিকসন, না, ডিকসন নয়, এখন হয়ত অন্য কিছু।"

—"তার মানে? ও! এখন বুঝি বিয়ে করে অন্য নাম নিয়েছেন?"

—"হ্যাঁ তাই ত মনে হ'ল?"

—"মনে হ'ল মানে?"

—"মানে, সেই রকমই বোধ হ'ল।"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ—কিছু নেই।"

কুমার ঘাড় নাড়িয়ে বিলিতী কায়দায় হাসল। এই কায়দাটা কৃষ্ণার মোটেই ভাল লাগে না। ইচ্ছে হ'ল, সেদিনের হাঁটতে শেখানোর পালটা শোধ নেয়, বলে,—ঐ ঘাড় নাড়াটা বিলিতী ফ্যাশান বটে, কিন্তু আপনাকে মোটেই মানায় না। কিন্তু বলতে পারল না।

কুমার বললে,—"তা হলে এস, আমিও তোমার কাজে হাত লাগাই, নইলে এগুলি বোধহয় কালও গোছান হয়ে উঠবে না।"

কুমারের সহজ কথা কৃষ্ণার মনের মধ্যে আবার এসে বেঁকে বেঁকে গেল। ভাবলে—আবার তাকে হারতে হ'ল, সে যে ভেবেছিল, একাই সব গুছিয়ে শেষ করবে—তা আর হ'ল না। তা না হোক, দু'জনে মিলে কাজ করায় খুব তাড়াতাড়ি প্যাকিং শেষ হয়ে গেল।

ছুটোছুটি করে কাজ করায় অগোছালো বেশবাসে আর ঈষৎ এলোমেলো চুলে, কৃষ্ণার চেহারায় এমন একটা দীপ্তি এসেছিল, যা দেখামাত্র মনকে বেশ একটু নাড়া দিয়ে দেয়। সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল কুমার। বললে,—"ধন্যবাদ, তুমি না থাকলে আরও ঘণ্টাখানেক আমায় এখানে হাবুডুবু খেতে হ'ত।"

—"তা না হয় হ'ল, কিন্তু আপনার খাবার একটা ব্যবস্থা এখন করা উচিত নয় কি? ঘরে রুটি আছে, ডিম আছে, টম্যাটো আছে। আর একটা ছোট মাংসের টিন খুলব?"

—"তার চেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়?" কুমার বললে,—"আজ ত চলেই যাচ্ছি, চল না একটু পিক্‌নিক্ করি।"

—"পিক্‌নিক্?" কৃষ্ণার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—"পিক্‌নিক্—শুধু দু'জনে? সে কি রকম?"

—"হাঁ শুধু দুজনেই। ক্ষতি কি? আপাততঃ আর কেউ যখন ধারে-কাছে নেই। মোট কথা, বাইরে এমন ঝিকি-মিকি রোদ উঠলে ঘরে বসে রান্নার আয়োজন করা রীতিমত পাপ। তা ছাড়া এতক্ষণ এই বন্ধ ঘরে বসে এই দারুণ ক্লান্তিকর কাজ করে, একেবারে হাঁপিয়ে গেছি। তুমি না থাকলেও আজ আমি বাইরে কোথাও গাছের ছায়ায় বাগানের কোণে বসে স্যাণ্ডউইচ খেতাম, আর পরের কুকুরের দিকে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতাম। এখন তোমাকে দেখে লোভ হচ্ছে, দু'জনে মিলে পিক্‌নিক্‌টা জমবে ভাল। একলা হলে শুধু খাওয়াই চলত। দু'জনে মিলে সেই জিনিসটাই হবে মজা অর্থাৎ পিক্‌নিক্‌। তা ছাড়া তুমি আমার এত কাজ করে দিলে, তার বদলে যদি তোমাকে একটু স্যাণ্ডুউইচ খাবারও নেমন্তন্ন না করি তা হলে সেটা কি দারুণ অভদ্রতা হয় না?"

ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা জানে না কৃষ্ণা, কিন্তু প্রস্তাবটা মনোরম সন্দেহ নেই। কৃষ্ণা বললে,—"ধন্যবাদ।"

ও কোট পরতে চলে গেল নিজের ঘরে। কোট পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক করতে করতে ওর মনে হ'ল—কাজটা হয়ত ভাল হচ্ছে না—না যাওয়াই উচিত। কিন্তু অন্য মনটা তখুনি বললে—এখানে ত এমনই খোলাটাই রেওয়াজ। সবাই ত যায়, গেলে ক্ষতি কি? দুটো মানুষ, একসঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে যদি বাগানে বসে দুটো স্যাণ্ডউইচ খায়, তাতে অন্যায় কোথায়? ভাগ্যক্রমে পুরুষ এবং স্ত্রী হয়ে জন্মেছে বলে কি মানুষের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? কৃষ্ণার লোভী মনটা আধুনিক নীতি-কথার বেত উঁচিয়ে কৃষ্ণার সেকেলে মনটাকে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিল।

ঘর থেকে বেরিয়েই সামনের বড় রাস্তা দিয়ে ডান দিকে একটু দূর গেলেই, একটা ছোট্ট সাদা স্যাণ্ডউইচের দোকান। যত ছোট তত পরিচ্ছন্ন, তত পরিপাটি। এ দোকানটা ওদের বাড়ীর সকলেরই খুব প্রিয়। কতদিন ওরা এখান থেকে স্যাণ্ডুইচ কিনে নিয়ে দুপুরের লাঞ্চ সেরেছে। এর পাশেই একটা ছোট মিষ্টির দোকান, আর তার বাঁ দিক ঘেঁষে এক পা গেলেই সব্‌জির। আর বড় রাস্তাটা পার হয়ে উলটো দিকে একটা বাঁধান গলি দিয়ে একটু এগুলেই বাগানের গেট। ওরা সেই ছায়াকরা পথ দিয়ে বাগানে এসে পৌঁছল।

বিশ্বকবির উদ্দেশে

শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষুদ্র দেবালয়ে মোর ক্ষুদ্র সাধনারে
বৃহতের আগমন করিল সফল
ভাষা তাই প্রবেশিল বাণীর মন্দিরে
যেথা নিত্য প্রস্ফুটিত কাব্য শতদল।
সত্য যেথা নিত্য জ্বালে জ্ঞানের প্রদীপ
মন যেথা নম্র ঐ সাধনার দ্বারে
ভাষা মোর স্তব্ধ সেথা বিস্ময়ের মাঝে
কুণ্ঠা আসে সাজাইতে ক্ষুদ্র উপহারে।

মন যেথা নিত্য রচে নিজ উপহার
কাব্যপুষ্প সুরভিত দেবালয় মাঝে
সেথা মম অর্ঘ্য থাকে সঙ্কুচিত অতি
চিত্ত তাই কুণ্ঠারত সে কঠিন কাজে।
তবু মম ক্ষুদ্র দান ক্ষুদ্র অর্ঘ্য ডালি
উজাড় করিয়া রাখি সম্মুখে তোমার
অপরাধী হই যদি মার্জ্জনার মাঝে
সার্থক হইবে মম তুচ্ছ উপহার।

হাওড়া জেলার পঞ্চানন্দ ও পঞ্চানন্দ পাঁচালী

শ্রীঅশান্ত সোম

বাবা পঞ্চানন্দ গ্রাম্যদেবতা এবং গ্রাম্যদেবতাদের মধ্যে এর মত উগ্রস্বভাব দেবতার জুড়ি আর নেই। হাওড়া জেলার বাগনান ও শ্যামপুর অঞ্চলে পঞ্চানন্দ ঠাকুর যে ভাবে গ্রামে গ্রামে অন্যান্য গ্রামদেবতাসহ বিরাজ করছেন—এমন আর কোথাও নেই। এই অঞ্চলের প্রতি গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবতা হিসেবে যেমন পঞ্চানন্দ আছেন, তেমনি আছেন শীতলা, দক্ষিণরায়, মনসা প্রভৃতি। কিন্তু পঞ্চানন্দ ঠাকুরের প্রাধান্যক্ষেত্র শুধুমাত্র হাওড়া জেলাতেই নয়, দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা জুড়েও এর আধিপত্য দেখা যায়। এ সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি"-তে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মহাশয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে লিখেছেন যে, "··· হঠাৎ হাওড়া ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের এরকম দোর্দণ্ড আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল কেন এবং কি কারণে, সে সম্বন্ধে কেউ কোন অনুসন্ধান বা চিন্তা করেন নি। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাস-অনুরাগীদের কাছে বাংলার গ্রামদেবতারা চিরকাল অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়ে আছেন।" (১) বিনয়বাবু ঠিকই বলেছেন, বাংলার এই গ্রামদেবতাদের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা ও অনুসন্ধান খুব কমই হয়েছে এবং যার ফলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বহু তথ্যই আজ সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, হাওড়া ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে পঞ্চানন্দের এত আধিপত্য কেন? এ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবার আগে অন্যান্য দেবদেবীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়।

পশ্চিম-বাংলার গ্রামীণ দেবদেবীকে নিয়ে যে লোকধর্ম গড়ে উঠেছে, তার পিছনে ছিল সেকালের গোষ্ঠীপ্রধান আদিবাসী সমাজের বৃক্ষ ও জন্তুপূজা। আগেকার প্রত্যেক গোষ্ঠীরই নিজস্ব টোটেম থাকত। 'টোটেম' হিসেবে কোন বৃক্ষ বা জন্তুকেই স্বীকার করে নিয়ে তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হ'ত। এই টোটেম পূজাই হচ্ছে আজকের দিনের মানুষের দেবতাপূজার আদিরূপ। যেখানে পথ চলতে সাপের ভয়—সেখানে সেই আদি অকৃত্রিম বিষাক্ত সাপের ভীতি থেকে আদিম সর্পপূজার উৎপত্তি হয়ে পরে 'মনসা' নামে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সর্পটি হয়ে গেছে দেবীর বাহনস্বরূপ। মূলে সেই ভয়াবহ জন্তুপূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই পশ্চিম বাংলার বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে সাপের ভয় বেশি সেখানেই মনসার প্রভাব প্রতিপত্তি অসাধারণ।

তেমনি যেখানে বাঘের ভয় বেশি, সেখানে বাঘের দেবতারূপে কল্পিত দক্ষিণ রায় ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ সেই আদিম টোটেম সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণতঃ দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার বাগনান শ্যামপুর অঞ্চলে এই দক্ষিণ রায় ঠাকুরের আধিপত্য দেখা যায়। অর্থাৎ বনাঞ্চলের দেবতা হিসেবেই দক্ষিণ রায় ঠাকুরের আবির্ভাব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হাওড়ার বাগনান ও শ্যামপুর অঞ্চলে এই দক্ষিণ রায় ঠাকুরের ছড়াছড়ির একমাত্র কারণ হ'ল এর ভৌগোলিক প্রভাব। এককালে এখানে সুন্দরবনেরই তুল্য জঙ্গল ছিল, তার পর প্লাবনের ফলে তার উপর গভীর পলি পড়েছে এবং পলির চাপে মাটি বসে যাওয়ায় বন ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয়েছে। এখন জঙ্গল নেই বটে, কিন্তু সেই আদিম অরণ্যবাসীর ব্যাঘ্র-পূজার নিদর্শন এখনও এই সব গ্রামাঞ্চলে টিঁকে রয়েছে।

তা হলে পঞ্চানন্দের পটভূমিকাটা কি? সেই আদিম টোটেম বিশ্বাসের সঙ্গে কি পঞ্চানন্দের কোন যোগ আছে? এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'-তে কোন স্বচ্ছ আলোকপাত করেন নি। তিনি প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য করেছেন, "···আমার ধারণা, ধর্মঠাকুর ক্রমে যখন শিবে পরিণত হয়েছেন, তখন তারই সন্ধিক্ষণে ভৈরবের ভয়াবহতা নিয়ে পঞ্চানন্দের পূজার প্রচলন হয়েছে।"(২) শুধু বিনয়বাবুই নন, এ সম্পর্কে অন্যান্য লেখকরাও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। পঞ্চানন্দ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু 'দেশ' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত 'বাবা পঞ্চানন্দ ও মহাগণপতি' প্রবন্ধে বলেছেন, "শিবেরই ভৈরব রুদ্রমূর্তি···।"(৩) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় পঞ্চানন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইনি বটুক ভৈরব। প্রবাদ যে, শিবই পশুবলি গ্রহণের জন্য পঞ্চানন্দ মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।"(৪)

কিন্তু পঞ্চানন্দ সম্পর্কে উল্লিখিত ধারণাগুলি মোটেই স্বচ্ছ নয় এবং স্বচ্ছ নয় বলেই পঞ্চানন্দ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা ক্রমশঃই জটিলতার মধ্যে আটকে পড়ছি। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত 'প্রবাসী' মাসিকে প্রকাশিত 'নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা' প্রবন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। এবং সুন্দরবন অঞ্চলের 'বাবাঠাকুর' ওরফে পঞ্চানন্দ সম্পর্কে বলেছেন যে, যিনিই শিব তিনিই পঞ্চানন্দ নন। তিনি লিখেছেন, ···"উহার

(১) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৪০৬।

(২) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৫২১।

(৩) দেশ: ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৬১, পৃঃ ৯০২।

(৪) প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৮, পৃঃ ৪৯০।

রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রক্‌টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রক্‌টাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রক্‌টা দেখলো তার-পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রক্‌টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রক্‌টা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্‌টা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে।

রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রক্‌টা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি? "ফ্রক্‌টার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এমন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ

(বাবাঠাকুর) পূজারী ব্রাহ্মণগণ উহাকে শিবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন এবং পঞ্চানন্দ নামে অভিহিত করেন। উক্ত পঞ্চানন্দ কথার ব্যুৎপত্তি কি তাহা জানা যায় না।···সাধারণতঃ একটি উচ্চ বেদীর উপর দক্ষিণ পা মুড়িয়া ও বাম পা ঝুলাইয়া ঐ মূর্ত্তিটিকে উপবিষ্টরূপে প্রদর্শিত হয় এবং উহার দক্ষিণ হস্তটি ঐ পায়ের গোড়ালির উপর রক্ষিত থাকে। আকারে উহা একটি মল্লের অনুরূপ। উহার রং রক্তবর্ণ, গাত্রদেশ নগ্ন, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম মস্তকোপরি কেশরাশি বেণীর আকারে গুটাইয়া সজ্জিত, মুখে দীর্ঘ ঘন গোঁফ, চক্ষু দুইটি উন্মুক্ত ও আকারে বৃহৎ এবং দুই কানে দুইটি কলিকা ফুল থাকে। ঐরূপ স্বাভাবিক আকারে গঠিত হইলেও উহাতে আদিমভাব এখনও সুস্পষ্ট আছে। এতদ্ভিন্ন উহার 'বাবাঠাকুর' নামটি আদিম ধরনের।···"(৫)

শ্রীযুক্ত কালিদাস বাবু উল্লিখিত বাবাঠাকুর ওরফে পঞ্চানন্দ সম্পর্কে যা বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে হাওড়া জেলার বাগনান ও শ্যামপুর অঞ্চলের পঞ্চানন্দের যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু কালিদাস বাবু আসল বিষয়টিরই অবতারণা করতে সক্ষম হন নি। এ বিষয়ে এই অঞ্চলের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের বর্ণনা দিলেই বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে।

এই অঞ্চলের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মূর্ত্তির মধ্যে একটা উগ্রভাব ফুটে উঠেছে। ঠাকুরের দুটি বড় বড় গোলাকার চোখ, জটাজুট চুল ও বিরাট গোঁফ। কানে ধুতুরোর ফুল এবং মাথায় সাপের ফণা। ডান পা মুড়ে বাঁ পায়ের উপর রেখে, ডান হাত অভয়মুদ্রার ভঙ্গিতে তুলে উপবিষ্ট। ঠাকুরের পায়ের কাছে একটি বিরাট ভল্লুক হাঁ করে আছে আর ডানদিকে নগ্ন অবস্থায় বিকৃত মুখব্যাদান করে আছে অন্যতম অনুচর পেঁচো ওরফে পাঁচু ঠাকুর।

তা হলে পঞ্চানন্দের বাহন হিসেবে ভল্লুককে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই 'ভল্লুক' বাহন থাকার জন্যে পঞ্চানন্দের মধ্যে আদিম ভাবটি পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে এবং তিনি যে জঙ্গলের অনার্য্য দেবতা-এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। মূলে এখানেও সেই আদিম 'টোটেম' সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়ে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে গোপভূমের অনার্য্য ঐতিহ্য-প্রসঙ্গে 'বিনয়বাবু' স্বীকার করেছেন যে, ভল্লুক ছিল পালিত পশুদের অন্যতম এবং পশ্চিমবঙ্গের একটি শাখার বা ক্ল্যানের টোটেমও ছিল ভল্লুক।

এবারে বিনয়বাবু হাওড়া ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের আধিপত্য সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন—তার মোটামুটি সমাধান করা যেতে পারে। কেননা, হাওড়ার গ্রামাঞ্চল যে এককালে সুন্দরবনের তুল্য জঙ্গল ছিল, সেকথা আগেই বলেছি আর দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণায় ত জঙ্গল ছিলই এবং এখনও সুন্দরবনে জঙ্গল রয়েছে। তাই জঙ্গলের দেবতারূপে পঞ্চানন্দের আবির্ভাব এবং তাই তার মূল ভৌগোলিক সীমানা হ'ল হাওড়া ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা। ক্রমে এখান থেকে কিছুটা বিকীর্ণ হয়ে আশে পাশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বনাঞ্চলের এই অনার্য্য দেবতা ক্রমে আর্য্যীকরণের মধ্য দিয়ে এমন এক পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে, যেখানে পঞ্চানন্দের আরাধনার হাজারটা ধান সংগ্রহ করলেও বা পঞ্চানন্দের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাহনযুক্ত দেখলেও পঞ্চানন্দের আবির্ভাবের মূল সূত্রটিকে আমরা খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে পড়েছি।

পঞ্চানন্দের আবির্ভাবের মূল সূত্রটিকে খুঁজতে গিয়ে বিনয়বাবু পঞ্চানন্দের পাঁচালী বা পঞ্চাননমঙ্গল জাতীয় কাব্যের পুথির প্রয়োজন অনুভব করেছেন এবং তিনি বহু সন্ধান করেও ঐ ধরনের পুথি সংগ্রহ করতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "···তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও হাওড়া, হুগলী বা চব্বিশ-পরগণায় পঞ্চানন্দের কোন পাঁচালী বা পঞ্চাননমঙ্গল জাতীয় কাব্যের কোন পুথি কোথাও পাই নি···"৬

কিন্তু 'প্রবাসী' মাসিকে শ্রীযুক্ত কোতিময় কান্তিকরণ পঞ্চানন মঙ্গল জাতীয় কাহিনীর কথা উল্লেখ করেছেন৭ এবং ঐ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কয়ালাল মহাশয়ও 'পঞ্চানন-মঙ্গল' জাতীয় কয়েকখানি পুথিপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছেন ৮

এদের এই ঘোষণার পরও কেন যে বিনয়বাবু এই প্রশ্ন তুললেন বা কেন যে অক্ষয়বাবু এখনও সাধারণে এই পঞ্চানন-মঙ্গল জাতীয় পুথির প্রকাশ করছেন না—তার কোন কারণই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কেননা ঐ ধরনের পুঁথি বা পাঁচালী জাতীয় কিছু পাওয়া গেলে এই সমস্যার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত হ'তে পারে। এ সম্পর্কে আমরাও বহু অনুসন্ধান করে কোন পুথিসংগ্রহ করতে পারি নি বটে, কিন্তু ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে লোকমুখে শুনা পঞ্চানন্দ পাঁচালী জাতীয় কিছু অংশ উদ্ধার করতে পেরেছি।

শোনা গেল পূর্ব্বে হাওড়া জেলায় পঞ্চানন্দের জাগরণ গান হ'ত। যেমন, এখনও শীতলামঙ্গল মনসামঙ্গল প্রভৃতি পুথির পালা ধরে বছরের এক নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামদেবতাদের স্থানে চামর দুলিয়ে খোল-করতাল সহকারে পাঁচালী গান গাওয়া হয়, তেমনি পঞ্চানন্দের মহিমা কীর্ত্তন নিয়ে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে এককালে পাঁচালী গান গাওয়া হ'ত। পঞ্চানন্দের পাঁচালী গায়কদের আজ আর অনেকেই বেঁচে নেই, আসল পাঁচালীর আখ্যানবস্তু সহ পুথিও সেই সঙ্গে হয়েছে অদৃশ্য। তবুও দু'এক কলি যা জানতে পারা গেছে তার মূল্যও কম নয়।

একটু আগে পঞ্চানন্দের অবস্থান ও তাঁর বাহন সম্পর্কে যে যুক্তি খাড়া করেছিলাম তা পঞ্চানন্দের পাঁচালীর মধ্যে তারই যথার্থতা প্রমাণিত হয়। যেখানে কবি পঞ্চানন্দকে আবাহন করছেন :

(৫) প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃঃ ২২৯।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ৫৯৬।

(৭) প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃঃ ২৪২।

(৮) প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৮, পৃঃ ৪৬৮।

"উলূক বাহন, বন্দো পঞ্চানন
নৃত্যগীতে দেহ মন।
অজ্ঞান কিংকরে তোমারে স্মরে
ত্যজ হে শ্যাওড়ার বন।
করি যোড় পুটে, উর (আবির্ভাব) নিজ ঘটে
আসরে করহ ভর।
পূজা আয়োজন লহ পঞ্চানন
নায়কেরে দেহ বর।
মঙ্গল বাসরে আজ্ঞা করিলে আমারে
স্বপনে শিয়রে বসি।
দিলেন গুরুভার না দেখি নিস্তার
তোমায় ভাবি দিবা নিশি।
শোভে ত্রিলোচন, এ পঞ্চবদন
শিশু যেন চাঁপা কলা।
অজ্ঞান কিংকরে তোমারে স্মরে
ত্যজ হে শ্যাওড়া তলা।
কবিতা সাজান, কিছু নাহি জ্ঞান
কেবল তোমার মায়া।
প্রেমানন্দ বলে রক্ষিবেন গোপালে
দিয়ে শ্রীচরণ ছায়া।"

উপরি-উক্ত আবাহনটির মধ্যে পঞ্চানন্দ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আর ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে পঞ্চানন্দ পাঁচালী রচয়িতা কবি প্রেমানন্দের নাম। পঞ্চানন্দ যে প্রকৃতই বনের দেবতা এবং উলূক যে তার বাহন—এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নাই। মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে যে, অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পাঁচালীর মত পঞ্চানন্দ পাঁচালীর অস্তিত্ব এককালে ছিল।

এবারে আসছি পঞ্চানন্দ পাঁচালীর আখ্যান বস্তু নিয়ে। যেটুকু আমরা লোকমুখে শুনেছি তাই ব্যক্ত করছি। সাধারণতঃ মঙ্গল-কাব্যগুলির দুটি প্রধান ধারা থাকে, একটি লৌকিক ধারা অর্থাৎ যা বাংলার মাটি থেকে গড়ে উঠেছে আর একটি পৌরাণিক ধারা, অর্থাৎ পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যের বিষয়। এক সময়ে বাংলার সমাজের উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের পরস্পরের যোগাযোগের ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক—এই দুই ধারার মধ্যে সংযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দুই বর্গের দেবদেবীর চরিত্র মিলেমিশে গিয়ে শিব-চণ্ডী প্রভৃতি এক-একটি মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীও মিশ্রিত রূপ লাভ করেছিল। আলোচ্য অংশে পঞ্চানন পাঁচালী সম্পর্কে ঠিক সেই কথা বলা যেতে পারে এবং পাঁচালীর মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে সেই লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার সমন্বয় দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চানন পাঁচালীর মূল আখ্যানভাগ হ'ল মহাদেবকে নিয়ে। মহাদেব কুঁচালী নগরে ভিক্ষা করতে যান। পথিমধ্যে একটি নদী পারাপারের জন্য তিনি ঝুলির মধ্যে দুটি করে মুড়ির মোয়া নিয়ে যান এবং ঐ মোয়া খেয়ারীকে দিয়ে পারাপার হন।

হীরা বাগ্দিনী নামে এক নীচজাতীয়া রমণী কুঁচালী নগরের কাছাকাছি বাস করতেন এবং তিনি হঠাৎ একদিন মহাদেবের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে রতিবিহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহাদেব হীরা বাগ্দিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং রতিদান দেন। ফলে মহাদেবের ঔরসে হীরা বাগ্দিনীর গর্ভে পঞ্চানন্দের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই পঞ্চানন্দ দারুণ রুক্ষ-মেজাজী। তাই দেখে হীরা বাগ্দিনী মহাদেবের কাছে ধর্ণা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই ছেলে দেবতা হিসেবে পূজো পেতে পারে কিনা? উত্তরে মহাদেব বললেন যে, মর্ত্যধামে পঞ্চানন্দ পূজা পেতে পারে এবং সেই সঙ্গে তিনি পঞ্চানন্দের ফাইফরমাস খাটার জন্যে একজন সহচর নিযুক্ত করে দিলেন। সেই সহচরের নাম 'তড়ঙ্গা' ওরফে পেঁচো বা পাঁচু ঠাকুর। পাঁচু ঠাকুর দেখতে যেমন কুশ্রী তেমনি গুণপনায় কম যান না। পঞ্চানন পাঁচালী-রচয়িতা পাঁচুঠাকুরের গুণাবলী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন:—

"কিড়মিড়ে কাঁসা রোগ, হাসা পাচু পাচু,
রুগিকে হাঁসায় ঘন, যারে ধরে পাঁচু।
শনি মঙ্গল বার দিন, সোনার ভাঁটা করি হাতে,
রাখালের বেশে খেলে, তেমাথানী পথে।
ঋতুবতী মেয়ে যদি পথ দিয়া যায়,
সুগন্ধ পাইলে পাঁচু, ছাড়ে নাইক তায়।
ঋতুবতী মেয়ে যদি আঁচড়ায় কেশ,
পাঁচু তারে পায় যেন মোলায়েম সন্দেশ।
গুণী জনা হয়ে যদি অঙ্গে মারে স্বর,
ছেড়ে দিয়ে লুকায় পাঁচু, আড়াই গোড় চালের ভিতর।"

পাঁচুঠাকুরের গুণাবলী বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তৎকালীন ঝাড়ফুক, তুকতাক ইত্যাদি তান্ত্রিক ভাবধারায় বিশ্বাসী সমাজের চিত্র। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ যা অনুমান করেছেন তা মোটেই অমূলক নয়। তিনি লিখেছেন, "ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব পূজা, ম্যাজিক বা যাদুবিদ্যা (শবরী বিদ্যা), তান্ত্রিক আলকিমি ইত্যাদি পঞ্চানন্দের পূজানুষ্ঠানের মধ্যে মিশে রয়েছে মনে হয়…।"৯

সত্যই তাই, এখনও এই অঞ্চলে পঞ্চানন্দের থানে (স্থান শব্দের অপভ্রংশ) শনি মঙ্গলবার দিন ভর হয়ে থাকে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট মহিলার উপর ভর করে পঞ্চানন্দ ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করে দেন। তা ছাড়া ছোট ছোট ছেলেদের ধনুষ্টঙ্কার হলে লোকে পেঁচোয় পাওয়া বলে থাকে। মোট কথা, সেই তন্ত্রমন্ত্রের ছড়াছড়ি পঞ্চানন্দকে নিয়ে।

আবার কাহিনী প্রসঙ্গে আসি। অবশেষে পঞ্চানন্দ যখন সাবালক হলেন তখন তিনি পূজো নেবার কথা ভাবলেন এবং তাঁর অনুচর 'তড়ঙ্গা' মারফত শুনলেন যে, মানিকা ভবনের রাজা সত্যবান

(৯) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ৬৮৩।

একদিন যা ঘটেছিল······ওদের মায়ে ছেলের ছোট্ট সংসার। মাধুরী এসেছে নতুন বৌ হয়ে। খাস্ কোলকাতার মেয়ে মাধুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। রাত্রি হলে এখনও তার ভূতের ভয় করে। শেয়ালের ডাকে ঘরে দোর দেয়। হুতুম প্যাচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দেও নাকি মাধুরীর ভীষন ভয়। গাঁয়ের

তারাপদ মাষ্টার

বৌ-রা সহুরে মাধুরীকে নিয়ে হাসাহাসি করে। মাধবপুরের মতো অ-জ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই তবে বোকা বনে যায়!······তবু মাধুরীর গ্রামকে কিন্তু ভাললাগে। ভালবেসে ফেলে মাধুরী ও গাঁয়ের মাটি আর মানুষগুলোকে—আপ্রান চেষ্টা করে ওদের আপন করে নিতে।······

বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী সরলাবালার যত্ন নিতে মাধুরী কখনও ভুল করে না। তাইতো তিনি মাধুরীকে এত ভালবাসেন। ফায়ফরমাস মতো তাঁকে মাধুরী ভালটা মন্দটা রেঁধে খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাধুরী বৃদ্ধার সব অনুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের ছোট্ট সংসারে মাধুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী খুশী হয়েছেন তার শ্বাশুড়ী।······কত অনুনয়ের পর তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে। মাধুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সাঁঝে মা'র মোকাবেলায় যেতে হয়না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যায় নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার সে আপনারজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের নিয়েই তারাপদর দিন কেটেছে।······মাধুরী আজ তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।······ ইতিমধ্যে মাধুরী সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে রান্নায় মাধুরী পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী ভাবলেও আজকাল কাজের ফাঁকে গাঁয়ের বৌ-রাই এসে মাধুরীর কাছে ভীড় জমায়। বুড়ীদের আসরে সরলাদেবী বৌ-মার যা প্রশংসা করে বেড়ান, তাতে সব শ্বাশুড়ীই চায় বৌ-রা তাদের মাধুরী-বৌ-র মতো কাজকম্ম শিখুক।······

গাঁয়ের বৌ-দের যত্ন নিয়ে রান্না শেখায়—মাধুরী। অবাক হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নার নতুন ঢং। মাধুরী তার সব রান্নাতেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজব লাগে। কালু মুদীর দোকান সাজানো খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিন তারা অনেকেই দেখেছে। বৌ-রা জানে 'ডাল্‌ডা' দিয়ে মেঠাই-মণ্ডা ভাজাভুজি হয়—সব রকম রান্নার কাজও যে 'ডালডা'য় হয় এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। তাই মাধুরীকে 'ডাল্‌ডা' দিয়ে সব রান্না রাঁধতে দেখে ওদের অত আশ্চর্য্য লাগে। কৌতূহল বাড়ে—তবু মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায় লজ্জার মাথা খেয়ে 'বেনু-বৌ' জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে 'ডালডার' কাহিনী। 'বেনু-বৌ, পায় তার প্রশ্নের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার করে।……

"খাঁটি ভেষজ তেল থেকে 'ডাল্‌ডা' তৈরী। আর প্রতি "আউন্স" 'ডাল্‌ডা'তেই আছে ভিটামিন 'এ'র ৭০০ 'ইণ্টার ন্যাশানালইউনিট' এবং 'ডি'র ৫৬ 'ইণ্টার ন্যাশনাল ইউ-নিট'—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই 'ডাল্‌ডা' ব্যবহার হয় না, 'ডাল্‌ডা' দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই রাঁধতে পারি। আর 'ডাল্‌ডা' সবসময় সীল করা টিনে পাওয়া যায় বলে ধুলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয় থাকে না। 'ডাল্‌ডা' চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল করা টিনের গায়ের 'খেজুরগাছ' মার্কা ছাপ"—মাধুরী তার 'ডাল্‌ডা'র বিশ্লেষন পর্ব্ব শেষ করে। গাঁয়ের বৌ-রা ঘরে ফেরে।……

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গনেশ ব্যাপারীর গলা শুনে মাধুরী দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গনেশ ব্যাপারীর হাতে 'ডাল্‌ডা'র একটা ছোট্ট টিন। আজই হয়ত গনেশ কিনেছে। সত্যতা জেনে নিতে মাষ্টারের কাছে ছুটে আসা। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব বেনু-বৌ-র পরামর্শে। নইলে গনেশ আবার 'ডাল্‌ডা' কিনতে যাবে কেন।…… স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে চলে আসে। ভেতর থেকে কান পেতে শোনে স্বামীর কথা "হ্যাঁ গনেশ, একেবারে খাঁটি জিনিষ 'ডাল্‌ডা' ওতে আর বলার কি আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পরবে……হেঁসে মাধুরী কাজে চলে যায়।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড বোম্বাই।

DL/P. 4B-X52 BG

তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পূজার আয়োজন করেছেন বটে কিন্তু তাঁর পূজার কোন ব্যবস্থাই নেই। তাই তিনি ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি ধরে মাণিকা ভবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। কবির বর্ণনায়:

"তড়ঙ্গা পাত্র যদি কহিল বিশেষ,
শীঘ্রগতি হইল দোঁহে ব্রহ্মচারী বেশ।
স্কন্ধেতে ঝলমল করে কনক পৈতা,
সত্য করে নিলেন প্রভু সুবর্ণের ছাতা।
হস্তেতে লয়েছেন প্রভু সিদ্ধ বেত্র নড়ি (ছড়ি?)
শ্রীগোবিন্দ যান যেন বিদুরের বাড়ী।
পূজা অর্থে সাজিয়া চলিলেন পঞ্চানন,
উপনীত হইল গিয়া মাণিকা ভবন।"

তার পর রাজা সত্যবানের প্রাসাদে এসে জয়ধ্বনি দিলেন এবং আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেন:

"মথুরা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, বারাণসী,
কুরুক্ষেত্রে স্নান করি দেখে এলাম কাশী।
অবশেষে চলেছি করিতে গঙ্গাস্নান,
পথিমধ্যে শুনিলাম রাজা, আপনি ভাগ্যবান।
তেত্রিশ কোটি দেবদেবী পূজিছ যতনে,
পঞ্চানন্দ বলি কেন, না বল বদনে।
পঞ্চানন্দ বলি, যদি পূজহ যতনে,
স্বরাজ্য সহিত তোমার থাকিবে কল্যাণে।
পঞ্চানন্দ বলি, যদি কর উপহাস,
অকস্মাৎ রাজপুরে হবে সর্ব্বনাশ।"

রাজা ব্রহ্মচারী বেশধারী পঞ্চানন্দের কথায় কান দিলেন না। পঞ্চানন্দ ত রেগেই আগুন। তাই তড়ঙ্গার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি খ্যাচ ব্যাধিকে (ধনুষ্টংকার?) ডেকে পাঠালেন এবং হুকুম দিলেন সত্যবানের পুত্র সুবুদ্ধিশেখর যখন বাগানে খেলা করবে তখন যেন তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়।

এদিকে রাজা সত্যবানের ছেলে সুবুদ্ধিশেখর বাগানে খেলা করতে করতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়াতে মহারাজ ধন্বন্তরি জাবোড় সিংহ রায়কে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু পঞ্চানন্দের হুকুমে তড়ঙ্গা মন্ত্র দিয়ে ধন্বন্তরি জাবোড় সিংহের স্বর বন্ধ করে দিলেন। ফলে রাজার ছেলের আর চিকিৎসা হয় না এবং ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

এমন সময় মহারাজের স্মরণ হ'ল সেই ব্রহ্মচারীর কথা। তিনি তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে পঞ্চানন্দের পূজার আয়োজন করলেন। সেই থেকেই মর্ত্যধামে পঞ্চানন্দের পূজার প্রচলন হ'ল এবং পঞ্চানন্দ ঠাকুর শিশুদের খ্যাচ বা বিকলাঙ্গ প্রভৃতি রোগের নিরাময়ের দেবতা অর্থাৎ শিশুদের মঙ্গল-অমঙ্গলের কর্ত্তা বলে গণ্য হলেন।

মোটামুটি এই হ'ল আখ্যানবস্তু। পাঁচালীর সব অংশটুকু পাওয়া যায় নি। কেবলমাত্র পাঁচালী-রচয়িতার নামটুকুই বা পাওয়া গেছে, পাওয়া যায় নি সাল তারিখের হিসেব। তবে যা পাওয়া গেছে, তারই মধ্যে দেখা যাচ্ছে শ্যাওড়া বনের এই অনার্য্য দেবতাকে তাঁর তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তার করে লোকসমাজে আর্য্য আভিজাত্য পেতে কম কষ্ট সহ্য করতে হয় নি। ওমালী সাহেব জেলা গেজেটিয়ারে এ সম্পর্কে তাই লিখেছেন:

"The tradition runs that he was the son of Siva by a koch woman and that on account of his low birth, none paid him reverence untill he was made master of eight diseases." (১০)

অবশ্য আর্য্য-অনার্য্যের এই মিলনপথে বিশেষ ভাবে অনার্য্য দেবদেবীগণই আলোচ্য মিলনের সুযোগ নিয়েছিলেন বেশী পরিমাণে আর তারই পরিণামে দেখা দিয়েছিল বাংলার মঙ্গলকাব্য সমূহ। আর্য্যীকরণের এই সুযোগে মনসা, চণ্ডী ও ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেব-দেবী যেমন রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তেমন পঞ্চানন্দের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতদিন পঞ্চানন্দ সংস্কৃতি বিজ্ঞানীদের সমাজে অনাদৃত ছিল বলেই খোঁজ পড়ে নি পঞ্চানন্দ পাঁচালীর কথা। তাই পঞ্চানন্দ পাঁচালীর মত একটি কাব্যিক ও ঐতিহাসিক সম্পদ ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গেছে, যার ফলে সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের কাছে বাবা পঞ্চানন্দ আজ একটা মহাবিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চানন্দ পাঁচালীর পটভূমিকা বা অন্যান্য উল্লিখিত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা এ সম্পর্কে আরও দুই-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারি। দেখা যাচ্ছে, পঞ্চানন্দকে নিয়ে সর্ব্বত্র একটা তান্ত্রিক ভাবধারা গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর আসল উৎসটা কোথা থেকে?

পঞ্চানন্দ সম্পর্কে আগে যা বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কঁচালী নগরে (কোচ রাজ্যে?) এক কোচ জাতীয়া রমণীর গর্ভে পঞ্চানন্দের জন্ম। কোচ জাতির প্রসঙ্গ যখন উঠেছে তখন কোচ জাতির অতীত ইতিহাসটা একবার অনুশীলন করা যাক্।

পনেরো শতকের শেষ দিকে কামরূপে কোচজাতির গোষ্ঠী-প্রধানদের অভ্যুত্থান হতে থাকে এবং এর নেতৃত্ব করে বিশ্বা কোঁচ। এই কোঁচদের মধ্যে কথিত হয় যে, বিশ্বা কোঁচ শিব ও কুঁচনীর পুত্র এবং তিনি শিব-দুর্গার ভক্ত আর কামরূপের কামাখ্যাদেবীর আরাধক। এই বিশ্বা কোঁচের আরাধ্যা দেবী কামাখ্যার পটভূমি তখন কি ছিল? দেখা যাচ্ছে যে, কামরূপের শক্তির অধিষ্ঠাত্রী এই কামাখ্যাদেবীকে ঘিরে এককালে কামরূপে তন্ত্র ক্রিয়াচারের এক শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে ওঠে। নানারকমের সব কিম্ভুত আর যৌনবিকারে ভরা 'চিচুয়ালস' অর্থাৎ ক্রিয়াচার এখানে অনুষ্ঠিত

(১০) District Gazetteer (Howrah) Page 44

হ'ত এবং সেই সঙ্গে কামরূপ হয়ে উঠেছিল অদ্ভুত রহস্যে ভরা ইন্দ্রজাল তন্ত্রমন্ত্রের দেশ।

দেখা যাচ্ছে বিশা কোঁচের মত পঞ্চানন্দও শিব ও কুঁচনীর পুত্র বলে আখ্যা পেয়েছে এবং পঞ্চানন্দের সঙ্গেও এক অলৌকিক ও তান্ত্রিক ভাবধারা জড়িয়ে রয়েছে সর্ব্বত্র। তা হলে পঞ্চানন্দের উৎস সম্পর্কে যে সব সূত্র পাওয়া গেল, তাতে বোঝা যায় পঞ্চানন্দেরও আদি উৎপত্তি কামরূপ এবং সম্ভবতঃ এককালে বঙ্গ কোঁচদেরও দেবতাহিসাবেও পঞ্চানন্দ মর্য্যাদা লাভ করেছিল। পরে পঞ্চানন্দ ঠাকুর তার উৎপত্তিস্থল থেকে বিকীর্ণ হয়ে বর্ত্তমানের ভৌগোলিক প্রাধান্যক্ষেত্র হাওড়া ও দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার বনাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। কেন হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় পঞ্চানন্দের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে—সে কথা আগেই বলেছি।

এ ছাড়া পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাংলা দেশে আদিম সংস্কৃতির রূপটির অস্তিত্ব কখনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সেই আদিম কৌম ব্যবস্থায় 'টোটেম' ও 'রিচুয়ালস'-এর যে সগৌরব স্থান ছিল তারই অবশেষ এখনও টিকে আছে পঞ্চানন্দের পূজার মধ্যে এবং আর্য্যীকরণের পরেও যে সেই তন্ত্রমন্ত্র ও লৌকিক ক্রিয়াচার এখনও লোপ পেয়ে যায় নি তা পঞ্চানন্দের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে এই তথ্যই আমরা জানতে পারি। তবে পঞ্চানন্দের মধ্যে যে অতীত ইতিহাসের নানান নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি তথ্য তত্ত্ব আত্মগোপন করে আছে—তা আজ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে এবং জটিলতা দূর করতে গেলে এই সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার বলে মনে করি।

পনেরই আগষ্ট স্মরণে

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

জনদর্চী আশা লয়ে উদয়াচলের প্রান্ত ভাগে
এসেছিল এই দিনখানি।
পাঞ্চজন্য হাতে লয়ে, লয়ে মাথে শুভ আশীর্বাণী
সেই দিন আসে বারে বারে,
লাঞ্ছিত গর্বের অপবাদে লজ্জিত হয়ে সে যায় ফিরে।
আজও ওঠে কলকণ্ঠ রব,
মুক্তির বাতাস কেন এখনও করি না অনুভব,
মনে ত আসে না
পাওয়া সে ত শুধু নয়। কর্ম-মূল্য দিয়ে যায় কেনা।
স্বাধীন যে মন
আপনার ভালমন্দ লয়ে নহে ব্যস্ত অনুক্ষণ,
সেই পেতে পারে
আশীর্বাদ শুভ্র-মুক্ত পর্য্যাপ্ত সুখেরে,
এ দিন ত নহে সাজাবার
প্রতি দিনে প্রতিক্ষণে চাই ব্রত উদযাপন তার।
স্বাধীনতা তপলব্ধ ধন
যোগ্যতার জয় চায়, চায় সত্য কর্ম-নিষ্ঠ মন।

উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্প দেবী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ

কর্ম্মফলের সুধাপান রত যে ভোগী রয়েছে দেহে
তার সাথে বাস করে সেই জন হৃদয় কমল গেহে
ভিন্ন দুজন তবু এক সনে
বাস করে যেই সবাকার মনে
আলো ছায়া সম পৃথক হ'ও পাশাপাশি দোঁহে রয়
কর্ম্মের ফল তবুও একাকী আত্মাই জেনো লয়
মনীষী জনেরা তাঁর দেখা পায় সকলের মাঝখানে
বিকশিত যার হৃদয়কমল তাঁর প্রেমসুধা পানে
সে প্রিয়তমের পেয়ে সন্ধান
ত্যজে হর্ষ ও শোক অভিমান
জানে মিছে সব সকল ত্যেয়াগী অন্তরতমে চায়
চির অতুলন অরূপ রতন তাঁহারে বক্ষে পায়।

(কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লী)

বাঙালীর নবজাগরণে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

(১)

বাংলা উপন্যাস-জগতে বঙ্কিমের মত শিল্পীর আবির্ভাব সে যুগে যেমনি আকস্মিক তেমনি কতকটা অপ্রত্যাশিত। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল বঙ্কিমের শিল্প-সাধনার যুগ। এ যুগে শিল্পী বঙ্কিম মনোময় গল্পে ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাসে সমকালীন নব্য-শিক্ষিত বাঙালী সমাজের নিকট যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস পরিবেশন করলেন তা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ অভাবনীয় অন্যদিকে তেমনি উচ্চশ্রেণীর। কি ভাষার গাম্ভীর্য্যে, কি ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে, কি ঘটনার চকিত-চমকে, কি সুদূর-প্রসারী কল্পনায়, কি মনস্তত্ত্বে, কি সমাজতত্ত্বে শুধুমাত্র একজন লেখকের সাধনায় বাংলা উপন্যাসের এ অভাবনীয় উন্নতি দেখে এ ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার নিকট সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীর মন শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ল। চারদিকে বঙ্কিমের জয়জয়কার পড়ে গেল। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য পাঠকমাত্রই বঙ্কিমকে 'সাহিত্যসম্রাট' বলে আখ্যায়িত করে আত্মশ্লাঘা করতে লাগল।

কিন্তু লোকপ্রিয়তার এ চরম শীর্ষে আরোহণ করেও বঙ্কিম অকস্মাৎ তাঁর সাহিত্য সাধনার দিক পরিবর্তন করলেন। বঙ্কিম রচিত কাহিনী মুগ্ধ পাঠক যখন এ প্রতিভাশালী শিল্পীর নিকট আরও নিত্যনতুন উপন্যাস প্রত্যাশা করছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁর অনুরাগী পাঠকের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করে রসচর্চ্চার ক্ষেত্র হতে বিদায় নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন ধর্ম্মচর্চ্চায়। এ ধর্ম্মচর্চ্চার মুখ্য ফল "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও "কৃষ্ণচরিত্র।"

সৃষ্টিমূলক সরস সাহিত্যচর্চ্চা হতে চিরতরে অবসর গ্রহণ যে কত বড় আত্মহত্যার সামিল সে সম্পর্কে বঙ্কিম যে অনবহিত ছিলেন তা নয়, কিন্তু জাতির প্রতি একটা মহত্তর কর্ত্তব্যবোধ প্রেরণা তাঁকে কেবল রসচর্চ্চার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবিষ্ট করে রাখতে পারেনি। সাহিত্যচর্চ্চাকে তিনি কখনও অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সাহিত্য ছিল এ স্বদেশপ্রেমিক মনীষীর স্বদেশ ও স্বজাতিসেবার প্রধান বাহন।

কি অবস্থায় ও কতবড় খ্যাতির মোহ পরিত্যাগ করে স্বজাতিসেবার প্রেরণায় বঙ্কিম কৃষ্ণচরিত্র রচনা আরম্ভ করেছিলেন তা বুঝবার জন্যে বোধ হয় এ ভূমিকার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যখন থেকে মনীষী বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন যে, পরানুকরণ-স্পৃহা সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের জন্যে রসচর্চ্চার ব্যাপক আয়োজন জাতীয় প্রয়োজনের দিক হতে অর্থহীন, সে দিন থেকে কোথায় পড়ে রইল তাঁর প্রিয় সেক্সপীয়ার, শেলী, বায়রণ, কীটস, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস—এখন থেকে বঙ্কিমের টেবিলে শোভা পেতে লাগল, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ পুরাণ, বেদান্ত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র, পরকালতত্ত্ব, miracle, আর ইউরোপীয় দার্শনিক মিল, কঁত, হিকুটে, সিলি, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দার্শনিকদের অমূল্য গ্রন্থগুলি সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে বঙ্কিম বুঝতে পারলেন যে, একটা সংস্কারমুক্ত সবল জাতি গঠিত না হলে কেবল সাহিত্য কেন, ভবিষ্যতে কোন সুকুমার শিল্পের সৃষ্টি এবং উপভোগও সম্ভব হবে না। সে জন্য এখন থেকে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হ'ল কি করে তৎকালীন বাঙালীর বহু যুগ-সঞ্চিত মোহ ও সংস্কারের মূলে একটা রূঢ় আঘাত দিয়ে তার দৃষ্টিকে মোহমুক্ত, মনোবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক এবং ধারণাকে বাস্তবমুখী করে দেবেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আকস্মিক প্রভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবাদের কয়েকটি ক্ষীণ রশ্মি বাঙালীর তমসাচ্ছন্ন চিত্তভূমিকে কিছুটা আলোকিত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় বাঙালীর জাতীয় জীবন তখন পর্যন্ত নানা প্রকার সংস্কারের প্রভাবে প্রাণহীন। এ অবস্থায় কি ভাবে সে যুগের বাঙালী মানসকে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত করে আধুনিক করে তোলা যায় তাই হ'ল বঙ্কিমের অতন্দ্র চিন্তার বিষয়। এ চিন্তার প্রত্যক্ষ ফল, এ সময় বাঙালীর চিন্তারাজ্যে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত একটা প্রবল ভাবান্দোলন সৃষ্টি।

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মন চিরকালই অন্তর্মুখী; রাষ্ট্রচিন্তা তার অন্তরে সাড়া জাগায় না, যেমন সাড়া জাগায় ধর্ম্মচিন্তা। স্মরণাতীত কাল হতে বাঙালী আর ভারতবাসীর ধর্ম্মবিশ্বাস বিকাশলাভ করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস —"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।" 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপক্রমণিকায় বঙ্কিম বাঙালীর কৃষ্ণভক্তির পরিচয় দিয়েছেন এ ভাবে:

> "বাংলা দেশে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণমন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। ...কৃষ্ণ এ দেশে সর্ব্বব্যাপক।"

অথচ যে কৃষ্ণপূজাকে বাঙালী তার জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পুরাণেতিহাসে বর্ণিত সে কৃষ্ণ সম্বন্ধেই এমন কতগুলো অলৌকিক ও অসম্ভব উপাখ্যানে

করে যাতে তার জাতীয় চরিত্র দুর্ব্বল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে :

"কিন্তু ইহারা ভগবানকে কিরূপ ভাবেন ? ভাবেন, ইনি বাল্যে ননীচোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন, কৈশোরে পরদারিক, অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন ।

কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা

ভগবান সম্বন্ধে এরূপ বিকৃত চিন্তার ফলে বাঙালীর জাতীয় চরিত্র যে ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছিল বঙ্কিম তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছিলেন :

"ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতন ধর্ম্মদ্বেষীগণ ইহা বলিয়া থাকেন এবং সেই কথার প্রতিবাদ করিতে কখনও কাহাকেও দেখি নাই ।"

কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা

তৎকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিম নিজেও এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দুর চিরপূজ্য দেবতা সম্পর্কে এ অন্ধ বিচারহীন বিশ্বাসই বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। কৃষ্ণচরিত্রের পৌরুষ ও বীর্য্যের আদর্শকে গ্রহণ না করে তরল ভাবালুতাপূর্ণ প্রেমের আদর্শকে গ্রহণ করায় বঙ্কিম তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে অতি দুঃখে লিখেছিলেন :

"জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না। কৃষ্ণচরিত্র—৮৮ পৃঃ

দূরদর্শী বঙ্কিম তাই উপলব্ধি করলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর জড় প্রাণে চেতনার সঞ্চার করতে হলে জয়দেবের কৃষ্ণকে নয়, মহাপৌরুষের প্রতীক পাঞ্চজন্যের অধিকারী "মহাভারতের সেই আদর্শ পুরুষকে আবার জাতীয় জীবনে জাগরিত করিতে হইবে।" কারণ মহাভারতের কৃষ্ণই সে আদর্শ পুরুষ যার ভিতর সমস্ত মানবীয় বৃত্তির চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য হয়েছে। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরুদের জীবন বিশ্লেষণ করে তিনি বুঝতে পারলেন, এঁদের চরিত্রে দয়া, ধর্ম্ম, জীবপ্রেম ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ মানবীয় বৃত্তির স্ফুরণ হলেও রাজকার্য্যের জন্য যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন অপরিহার্য্য তা তাঁরা করেন নি। অথচ এরূপ ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল।

ভারতীয় কাব্য-পুরাণ-ইতিহাসাদি আলোচনা করে বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে মানবোচিত এমন সমস্ত গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় পুরাণোল্লিখিত অন্য কোন চরিত্রে দেখা যায় না :

"কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্ম্মপ্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ।" কৃষ্ণচরিত্র—৮৭ পৃঃ

মিলের হিতবাদ, কোঁতের গ্রুববাদ এবং হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের অনুশীলনবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের সঙ্গে নিজের স্বাধীন চিন্তার সহযোগে বঙ্কিম যখন উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তিনি সিলি প্রণীত Ecce Home গ্রন্থের কতকটা অনুসরণে কৃষ্ণকে মানুষরূপে—স্বপ্রচারিত অনুশীলনধর্ম্মের আদর্শরূপে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সামনে তুলে ধরলেন। এই হ'ল বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২

কৃষ্ণচরিত্র রচনা ও কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করতে বঙ্কিম আমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশী নানা শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে এবং স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে মহাভারতের মূল প্রক্ষিপ্ত অংশের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে গভীর পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে। যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি প্রত্যেকটি পুরাণোল্লিখিত তথ্যের বিচার করেছেন, অনেক স্থানে বিদেশী মতের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা অসার ও কবি কল্পনামাত্র তা ত্যাগ করেছেন এবং যা প্রয়োজনীয় তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মানবাদর্শের পূজারী Rationalist বঙ্কিম "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" এ বিশ্বাস হতে কখনও বিচ্যুত হন নি।

"আমি নিজেও কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।"

এখানেই বঙ্কিম প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে দীপ্যমান হয়ে উঠে। বঙ্কিমের সমস্ত জীবনসাধনাই হ'ল সামঞ্জস্যের সাধনা, এবং কৃষ্ণচরিত্রে সে সমন্বয়-সাধনা একটা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোহময় মন্ত্রে দীক্ষিত হলেও বঙ্কিম সে যুগের কালচারবাদী ইংরেজী শিক্ষিতদের মত প্রাচীন হিন্দু আদর্শ কখনও বিসর্জ্জন দিতে পারেন নি। তাঁর গ্রহীষ্ণু মনের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ধর্ম্মীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন।

"তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকার কৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি, ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপ-সংস্পর্শশূন্য আদর্শচরিত্র আর কোথাও নাই, কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, দেশীয় কাব্যেও না।"

কৃষ্ণচরিত্র-উপক্রমণিকা

জাতির হিতের জন্যে এ মহৎ চরিত্রের আলোচনায় ও আদর্শ চরিত্রের স্থাপনায় স্বজাতিপ্রেমিক বঙ্কিম তাঁর জীবনের শেষ কয়টি বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে নিয়োজিত করেছিলেন।

৩

যে মহান উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণের মানব-চরিত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার প্রভাব তৎকালীন বাঙালী সমাজের উপর কতটা কার্য্যকরী হয়েছিল তার একটা সংক্ষেপ পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

আজকালকার কালচারবাদী বাঙালী dilettante সাহিত্যিক নীরস ধর্ম্মতত্ত্ব বলে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়েন না সত্য, কিন্তু সে যুগের বাঙালী সমাজে এ একখানি বই যে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা ভাবতেও আজ বিস্ময় লাগে। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণ-চরিত্র'কে শুধুমাত্র ধর্ম্মতত্ত্ব বলে ধারণা করার মত ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুতঃ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র যুগ যুগ সঞ্চিত বাঙালীর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটা বিরাট অভিযান, বাঙালীর চিন্তারাজ্যে যুগান্তরকারী বিপ্লব ঘটিয়ে দেবার একটা উপায় মাত্র। আধুনিক বাঙালীর মধ্যযুগীয় মানসিকতার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম সবল অভিযান আরম্ভ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু রামমোহন প্রবর্ত্তিত মানস-বিপ্লব বাঙালী হিন্দুর চিত্তে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ, রামমোহন হিন্দুর সুপ্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করে জাতির চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর (রামমোহনের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অভিজ্ঞতার দ্বারা বঙ্কিম কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন যে, রক্ষণশীল হিন্দুর চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে হলে হিন্দু সমাজের বাইরে গিয়ে সে অনড় সমাজকে আঘাত করলে চলবে না, সংস্কারকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে হলে কাজ করতে হবে হিন্দু সমাজের ভিতরে থেকে। সেজন্য মনীষী বঙ্কিম হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে অবিকৃত রেখে তার সঙ্গে যুক্তিবাদী নবতর চিন্তার সংযোগে বাঙালীর জাতীয় জীবনসৌধ গড়ে তোলবার প্রয়াস পেলেন। ভূয়োদর্শনজনিত বঙ্কিমের এ সংস্কার-প্রয়াসের ফল ফলতে দেরী হ'ল না। নতুন চিন্তার আলোকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বাঙালী গড়ে তুলল একটা নতুন সাহিত্য, শিল্প ও সমাজ। বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় যোজিত হ'ল বঙ্কিমের সমন্বয়ধর্ম্মী ভাবধারার স্পর্শে।

তথাপি তৎকালীন বঙ্গ সমাজে বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের যে তীব্র কঠোর সমালোচনা না হয়েছিল এমন নয়। বাঙালী হিন্দুর দীর্ঘকালের সংস্কারে এ যুক্তিবাদী গ্রন্থখানি এমন আঘাত দিয়েছিল যে, গোঁড়া হিন্দুরা বঙ্কিমকে 'অবিশ্বাসী', 'নাস্তিক', প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেও দ্বিধা করে নি। কত সংবাদপত্রে যে এ গ্রন্থখানির কত বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল তার সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু উদার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মনের উপর এ যুক্তিবাদী গ্রন্থখানির প্রভাব বিস্তৃত হতে দেরী হয় নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর সমাজে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে যে একটা নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল তার পশ্চাতে আছে বাঙালীর ভাবমুক্তি, আর বাঙালী মানসের এ ভাবমুক্তি সাধনায় কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব অপরিমেয়।

কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম প্রচারিত নতুন ধর্ম্মচেতনার বৈশিষ্ট্য হ'ল একটা প্রবল মানবত্তাবোধ। এ নবজাগ্রত মানবত্তাবোধের (humanism) প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হ'ল এ যুগের সাহিত্যে। মানুষের আনন্দবেদনার গভীরে প্রবেশ করবার প্রয়াস আর মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর নিয়ে এ যুগের সাহিত্য যেন একটা অভূত-পূর্ব্ব প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে উঠল: নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে হ'ল নব-মানবতার প্রতিষ্ঠা, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গীতিকাব্যে শোনা গেল ব্যক্তি-সচেতন মানব-চিত্তের নতুন সুর; সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, ত্রৈলোক্যনাথ, বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গদ্যলেখক বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন বিচিত্র-ধর্ম্মী গদ্য রচনায়। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্র-লাল প্রভৃতি নাট্যকার বাংলা নাটকের উষর ক্ষেত্রে আনলেন সমৃদ্ধি। ভাবধর্ম্ম ও রূপকর্ম্মের (form and matter) দিক দিয়ে এদের মনন ও প্রাণধর্ম্মী রচনা বাংলা গদ্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে যে কতখানি প্রসারিত করে দিল তা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠক-মাত্রের কাছে অবিদিত নয়। কেউ কেউ মনে করেন, নবীনচন্দ্রের নবমহাভারত—মহাকাব্যত্রয়ীর ওপর বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের প্রভাব অনিবার্য্যভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। বস্তুতঃ, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য যা নিয়ে গর্ব্ব করতে পারে, বাংলা সাহিত্যে যা 'ক্লাসিক' বলে সম্মানিত, তার অধিকাংশই রচিত হয়েছিল বঙ্কিমের এই প্রবল ভাবান্দোলনের যুগে।

এ ভাবমুক্তির ফলে রাষ্ট্রজীবনেও তৎকালীন বাঙালী যে প্রবল প্রাণস্পন্দন অনুভব করে তার ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাঙ্কে যে তীব্র স্বাজাত্যবোধ বাঙালীকে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হতে প্রবল প্রেরণা দিয়েছিল তার প্রধান ঋত্বিকও বঙ্কিমচন্দ্র। কৃষ্ণের মানবচরিত্র ব্যাখ্যায় বঙ্কিম একথা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, বৈষ্ণবীয় ভাবাতিশায়ী অনুভবের পথে নয়, বীর্য্যবান কর্ম্মের পথেই জাতির মুক্তির উপায় নিহিত। এ সবল চিন্তা ও কর্ম্মান্দোলনের পথে জাতিকে জাগিয়ে তুললেন রামগোপাল ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জী, উমেশ-চন্দ্র বটব্যাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তানেতা, আর গড়ে তুললেন দেশের মধ্যে প্রবল শক্তিমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশের দিক-দিগন্তে জাতির চিত্তে মুক্তির বাণী ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে সে যুগে স্বাধিকার চেতনায় যে মাতিয়ে তুলেছিল তার স্বাক্ষর বহন করে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস।

বাঙালীর সামাজিক জীবনেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা হয় এ সময়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চিন্তা ও কর্ম্মবীর রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী চিত্তে পাশ্চাত্ত্য

LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করলে পাবেন সেই
পরিস্কার ও ঝরঝরে আমেজ।

জ্ঞানবিজ্ঞানের সচল ধারা প্রবাহিত করে দিয়ে সে যুগের বাঙালীকে যুক্তিবাদী ও বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন করতে প্রাণান্ত প্রয়াস পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যুগের রক্ষণশীল বাঙালী সমাজ মনে-প্রাণে সে যুক্তিবাদী ভাবধারা গ্রহণ করতে পারে নি,—কারণ তখন পর্য্যন্ত তার ভাবমুক্তি হয় নি, দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচারিত 'নতুন জ্ঞান' এবং বঙ্কিম পরিকল্পিত 'নব-মানবধর্ম্ম' (New-humanism) প্রচারের ফলে বাঙালীর মন যখন উদার ও সংস্কারমুক্ত হ'ল, তখন হতে সুরু হ'ল বাঙালীর সমাজ-জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয়। জাতীয় বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করতে বাঙালীর আর কোন দ্বিধা রইল না। ফলে, দেশের মধ্যে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বাঙালী এক নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করল। এক কথায় ভারতীয় সমাজে বাঙালী যে আজ নিজেকে অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে গর্ব্ব করে তারও প্রস্তুতি হয় এ সময়ে।

বস্তুতঃ, গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে দেখা যাবে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে সমস্ত মহৎ ও চিন্তাশীল গ্রন্থ বাঙালীর ভাবমুক্তি ও নবজাগরণে সহায়তা করেছিল, মনীষী বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' তাদের মধ্যে অন্যতম।

বাঁশীর আগুন—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। বিমলাংশুন প্রকাশন, ৮।১ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

এখানি কাব্যগ্রন্থ। পঁয়ত্রিশটি গীতিকবিতার সমষ্টি। শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য খ্যাতনামা কবি। প্রীতি, প্রকৃতি এবং সুষমা একদা তাঁহার রচনাকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিত। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার গান তাঁহার কাব্যে ক্ষণে ক্ষণে ঝঙ্কৃত হইত। সেখানে শোনা যাইত শান্ত জীবনের সুর। কিন্তু বর্ত্তমান জীবন-পরিবেশ তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। প্রশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও দুর্নীতি সমাজকে শ্রীহীন এবং মলিন করিয়াছে। কবি আজ ক্রুদ্ধ এবং কঠোর। 'সকল জনের হৃদয়ের ব্যথার কথা'য় মুখর তাঁহার বাঁশীতে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের গ্লানিতে মন অশান্ত, কিন্তু কবি ভবিষ্যতে বিশ্বাস হারান নাই।

দুষ্কৃত আর দুর্নীতদের ধ্বংস লাগি আসছি আমি,
শঙ্কিতেরা শঙ্কা মোছো, আর দূরে নয়—সম্ভবামি।

তিনি বলিতেছেন,

আসে মুক্তি-গুরু, শঙ্খ বাজাও, মাল্য গাঁথো, দীপ জ্বালো।

অধর্ম্ম চিরদিন প্রবল হইয়া থাকিতে পারে না।

ওরে গা রে তোরা জয়গান,
আসে রক্ত আকাশে তপ্ত ধরার মুক্তির ভগবান।

কিন্তু আজ?

অতলের অন্ধকারে কি ভীষণ শব্দ আসে,
যত সব শতাব্দী ঐ ডুবে যায় মহাত্রাসে।

কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। 'আর তবে
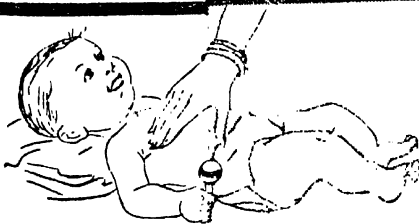
আর, খেলবি কে আজ জীবন-মরণ নৃত্য-হোলি।' জাতি আজ মোহগ্রস্ত। মোহমুক্তির জন্ত আঘাতের প্রয়োজন।

আজ প্রলয়-রোষের আশীর্ব্বাদে হও গো অধিষ্ঠান,
তুমি বজ্রাঘাতে ওদের জাগাও রুদ্র ভগবান।

বিপ্লবী কে? বন্ধনভাঙা জীবনের সন্ধানী যে—সেই বিপ্লবী। 'বিপ্লবী ভগবান' কবিতাটি সেই বিপ্লবীর বন্দনা। ছন্দে, শব্দে, ভাবে, অলঙ্কারে নানাবিধ রূপ ধরিয়া অন্তরের ক্রোধাগ্নি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তাহার ক্ষমা নাই। কিন্তু কবি সমাজ বা মনুষ্য-বিদ্বেষী হইয়া পড়েন নাই। বেদনার জ্বালা রোষের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পাপ ও দুর্নীতির উদগ্রতায় মন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। 'অমৃতেরি পুত্র সবাই আত্মা যেথায় মৃত্যুহীন।' তাই তিনি 'উত্থানের ডাক' দিয়াছেন। 'অগ্নিস্নানে' সবাইকে শুদ্ধ হইতে বলিয়াছেন।

শুধু পুরুষকে নয় কবি নারীকেও আহ্বান করিয়াছেন। 'বিদ্রোহিণী' 'বজ্রসুন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় সেই আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে। আর 'বিষাদ দলি' গর্জ্জে দাঁড়াও ক্লৈব্য নাশি শৌর্য্যে বীর' বলিয়া বাঙালীকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে ডাক দিয়াছেন।

তরুণের এই স্বপ্ন
জাতির জীবন-স্বপ্ন মাঝে রইল হয়ে মগ্ন—

বলিয়া কতকটা সান্ত্বনালাভ করিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে বইখানি উৎসর্গীকৃত। শেষের কবিতাটিও নেতাজীর উদ্দেশে লেখা। গোড়ায় অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি সুলিখিত ভূমিকা আছে। শেষের দিকের কবিতাগুলিতে কবি বঙ্গ, বঙ্গভাষা ও মহাভারতবর্ষকে বন্দনা করিয়াছেন। আন্তরিকতা তাঁহার রচনাকে অকৃত্রিম করিয়াছে। যে বেদনার জ্বালা অশ্রুজলে প্রকাশিত হইতে পারিত তাহা রোষাগ্নি-রূপে কবিতাগুলির মধ্যে উত্তাপের সঞ্চার করিয়াছে। "বাঁশীর আগুনে" কবি শৌরীন্দ্রনাথের নূতন সুর শুনিতে পাই। সে সুর পাঠককে আকর্ষণ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সাহিত্যের সমস্যা—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। সকলগুলিই সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা। আলোচনা বিভিন্ন হইলেও, একটির সহিত অপরটি বিচ্ছিন্ন নয়। যেন একই সুতায় বিভিন্ন ফুলের মালা গাঁথা হইয়াছে। প্রবন্ধ লিখিয়ে হিসেবে নারায়ণবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বলিষ্ঠ রচনা-কৌশলে, সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ-পটুতায় প্রবন্ধগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বিশেষ করিয়া, তাঁহার বলিবার সাহস—যাহা সকলের থাকে না, সেইখানেই নারায়ণবাবুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। এই আত্ম-সচেতনতা না থাকিলে অপরকে সমালোচনা করা যায় না। সন তারিখ মিলাইয়া তথ্য পরিবেশন করার নামই যে প্রবন্ধ নয় তা নারায়ণবাবুর লেখা না পড়িলে বুঝা যাইবে না। যে সুক্ষ্মদৃষ্টি থাকিলে চুল-চেরা বিচার করা যায়, যে অনুভূতি থাকিলে মানুষ রস গ্রহণে সমর্থ হয়, সেই শক্তির অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি নারায়ণবাবুর মধ্যে। যেমন তিনি 'জীবনশিল্প' অধ্যায়ের এক স্থানে বলিয়াছেন, "প্রকৃত জীবনসাধকের হাতে জীবনটাই একটা মস্ত বড় রচনা। জীবনসাধক বিচিত্রপথগামী জীবনযাপনের দ্বারা জীবনকে নূতন করে সৃষ্টি করেন। তিনি জীবনকে শিল্পরূপ দেন। বোধ করি খতিয়ে দেখতে গেলে জীবন-শিল্প সব শিল্পের সেরা। জীবনশিল্প সংরচনের মধ্যে যে মহত্ত্ব বিরাটত্ব সৌন্দর্য্যোৎকর্ষ প্রকটিত, লৌকিক শিল্পগুলিতে তার শতাংশের একাংশও প্রকটিত হয় কি না সন্দেহ।"

সাহিত্যের সমালোচনা করা অতি দুরূহ কাজ। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব না থাকিলে কেহ সমালোচক হইতে পারে না। কারণ দায়িত্বের সঙ্গে কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাকে দৃঢ়চেতা হইতে হয়। এ সম্বন্ধে নারায়ণবাবু চমৎকার কথা বলিয়াছেন—"সত্যের পথে চলবার সাধনা করলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, আবার ব্যক্তিত্বের অনুশীলন করলে সত্যস্পৃহা বাড়ে। ক্রমাগত এইরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমালোচক শক্তি-সংগ্রহ করতে থাকেন। তার পর এক সময়ে তিনি অপ্রতিরোধ্য হন।"

এই ব্যক্তিত্বই নারায়ণবাবুকে কৃতী সমালোচক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে না বলিয়া পারিলাম না, এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বাংলার মফঃস্বল শহর' যেন উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে। যদিও তিনি মফঃস্বল শহরের কথা বলিতে বলিতে তাহার সাহিত্যকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তবু বলিব, এইখানে মালার সুত ছিঁড়িয়াছে। নারায়ণবাবু ভাবিয়া দেখিলে ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বর্ত্তমানে সাহিত্যের সমস্যা লইয়া যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার একটি বড় কাজ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সকল দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। সাহিত্য-রসিক মাত্রেই ইহাকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন আমরা বিশ্বাস করি।

বনের ডাক—স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ, এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

"ফিরে দাও মোরে সে অরণ্য" এই ডাক আজ মানুষের অন্তর

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে সুন্দর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার সরের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে··· রেক্সোনা

রেক্সোনা প্রো, লিঃ, অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

হইতে উঠিয়াছে। কৃত্রিম শহর-সভ্যতায় তাহার জীবন-বায়ু বিষাইয়া দিয়াছে। সে চায় মুক্ত বায়ু, চায় আলো, চায় অরণ্য। প্রকৃতির কোলে আবার সে ফিরিয়া যাইতে চায়। কারণ তাহার রক্তের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে এই অরণ্য মিশিয়া আছে। মানুষের দেহ পুষ্ট হইতেছে—শুধু মানুষ কেন, যাবতীয় জীব-জন্তুর জীবন-রস নিহিত রহিয়াছে ঐ গাছপালার মধ্যেই। ঐ গাছপালাই প্রকৃতি হইতে জীবনী-শক্তি আহরণ করিয়া লয়। এই আহরণ করিবার শক্তি একমাত্র গাছেরই আছে—মানুষ বা জীব-জন্তুর নাই। তাই বন এবং বনজাত ফলমূলের মধ্যেই যাবতীয় জীবের প্রাণশক্তি লুক্কায়িত আছে। এই বনের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার ফলে একদিকে আমাদের জীবনী-শক্তি যেমন হারাইয়াছি, তেমনি হারাইয়াছি আমাদের প্রকৃতি-জাত সহজ সারল্য। যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

গ্রন্থকার সেই ভুলে-যাওয়া বন-লতার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাদের পরিচয়, মানুষের সঙ্গে কতটুকু তাদের যোগ, তাদের ফুল ফলের কথা, গাছপালার আবির্ভাব, তাদের শারীরিক গঠনের বিকাশ—ঐ সঙ্গে পৃথিবীর জন্ম ও ক্রমবিকাশ আর মানুষের প্রাগৈতিহাসিক জীবনের কথাও এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে কারণ মানুষের সঙ্গে উহারা অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

'বনের ডাক'-এর পরিচয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"গাছ-পালারা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে ঠিক, তাতে তাদের এমন কোন অসুবিধা বা ক্ষতি হয় নি। কিন্তু ওরা যদি পাখি বা পশুদের মত অন্ততঃ দু একটা অস্ফুট শব্দও করতে পারত তা হলে পৃথিবীতে তাদের স্থান হত অতি উঁচে। মহত্বের দিক দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রাণীই যে তাদের ধারে-কাছেও যেতে পারত না তার পরিচয় পাওয়া যাবে নীলকণ্ঠ আর সৌরচুল্লী অধ্যায় পড়লে। মনে হবে যে, এরা নিজেরা অবিরাম বিষ পান করে চলেছে আর বিশ্ববাসী সব মানুষ আর প্রাণীকে করে যাচ্ছে অমৃত পরিবেশন—যেন প্রত্যেকে ওরা এক এক জন নীলকণ্ঠ।"
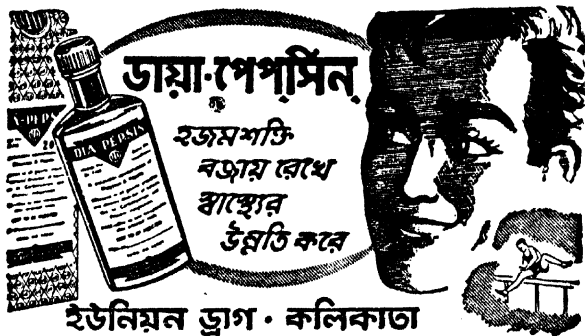
গ্রন্থকার অতি সুললিত ও বোধগম্য ভাষায় বনের সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। আজ মানুষের মতিগতি ফিরিতেছে, বনকে জানিবার কৌতূহলও তাহাদের আছে। সেই দিক দিয়া বইখানির প্রকাশ অতি সাময়িক হইয়াছে।

শ্রীগৌতম সেন

কবি ও কান্তা—শ্রীবিমলজ্যোতি দাস। গ্রন্থ-বলাকা। ১৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা ৪। মূল্য আড়াই টাকা।

উপন্যাসের গল্পটি মোটামুটি এইরূপ: দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টারের ছেলে অনুপমের সঙ্গে ধনী-পুত্র বিজয়ের বাল্যকাল থেকেই বন্ধুত্ব। অনুপম কবিতা লেখে। বিত্তবান বিজয়ের একান্ত ইচ্ছা বন্ধুকে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া (সাহিত্য?) চর্চা করে আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়ে দেয়। এতে অনুপমের আপত্তি। অবশেষে
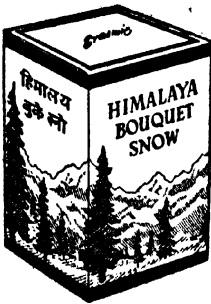
তার আপত্তি গ্রাহ্য না করে বিজয় তাকে নিজের সংসারভুক্ত করে নেয়। প্রথমটায় বাধা আসে বিজয়ের স্ত্রী ইন্দ্রানীর তরফ থেকে। পরে অনুপমের সংস্পর্শে এসে ইন্দ্রানীর বিরূপ মনোভাব কেটে যায়—আলাপ-আলোচনা কবিতাপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পরের অন্তরঙ্গতা জমে ওঠে। অনুপমের কবিসত্তা ইন্দ্রানীকে কেন্দ্র করে উদ্বেল হয়। কিন্তু এই অন্তরঙ্গতার মূলে প্রচ্ছন্ন কামনাকে অনুভব করে অনুপম বিজয়ের আশ্রয় ছেড়ে চলে যায়। ঘটনার আবর্ত্তে কিছুদিন পরে ফিরে আসে অনুপম। ইন্দ্রানী নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি বালবিধবা তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে।

বলা বাহুল্য গল্পটি ছকে বাঁধা সরল কাহিনী। কোন প্রশ্নকে ইঙ্গিত করে, কোন সমস্যাকে তুলে ধরে, নানা ঘটনা ও চরিত্রের ভিড় জমিয়ে পাঠককে কৌতূহলাক্রান্ত করার কৌশল এতে নাই। কবির কবিতাগুলিও সাহিত্য-রসিক পাঠক মনকে স্পর্শও করতে পারবে কিনা সন্দেহ হয়।

১। ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন। ২। যৌগিক ব্যায়াম ও ব্যায়ামে রোগ নিবারণ—শ্রীনীরোদ-কুমার সরকার। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য যথাক্রমে—১·৪০ নয়া পয়সা ও ৩্ টাকা।
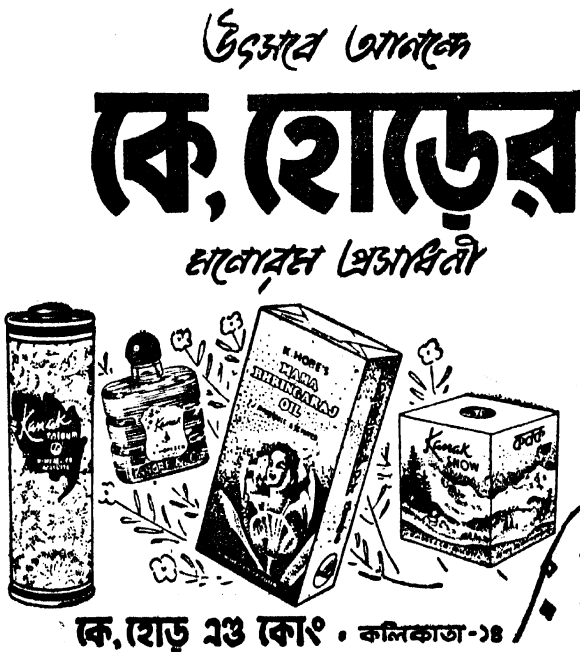
বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—"আত্ম রেখে ধর্ম্ম, পিতৃলোকের কর্ম্ম।" আত্ম কিনা আপনার স্বাস্থ্য। দেহ সুস্থ না থাকলে মনকে বশে আনা সুকঠিন—আবার অনায়ত্ত মনকে নিয়ে কোন ধর্ম্মসাধনাই (তা সে জ্ঞান বা জীবিকার্জ্জন কিংবা ঈশ্বর ভজনা যাই হোক) চলে না। সুতরাং দেহযন্ত্রকে সুস্থ ও নীরোগ রাখাই হ'ল ইহ বা পারলৌকিক কর্ম্মকৃতির আদি কথা—অর্থাৎ শরীরম্ আদ্যম্। এই শরীরকে কি ভাবে সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রাখা যায় তারই কথা আলোচ্য বই দু'খানিতে বলেছেন ব্যায়ামবিদ শ্রী সরকার।

প্রথম বইখানি বিশেষ করে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখা। প্রথম জীবনপ্রবেশমুখে বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ব্যায়ামচর্চ্চা

করে তরুণরা সুগঠিত দেহ লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে খালি-হাতে ব্যায়াম, সরল বুক ডন, স্প্রিং বারে ব্যায়াম প্রভৃতির সঙ্গে যোগ ব্যায়ামের নানাবিধ আসনের কথা সরল প্রণালীতে ছবির সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াও অনায়াসে ও বিনা খরচে যাতে এগুলি চর্চা করা যেতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছেন লেখক। ফলে আসনগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি অবশ্য প্রথমটিরই পরিপূরক। এতে বলা হয়েছে যৌগিক নিয়ম ও ব্যায়ামে কেমন করে রোগ নিরাময় সম্ভব হতে পারে। যাবতীয় পেটের গোলমাল, হাঁপানি, হার্ণিয়া, অম্বল, অম্লশূল, পিত্ত ও শিরঃরোগ, টন্‌সিল প্রভৃতি রোগের লক্ষণ, হেতু ও নিরসনের পন্থাগুলি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'খানি বই-ই যে কোন বয়সের মানুষের স্বাস্থ্যবিধি পালনে পরম সহায়ক হবে—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আমরা ফসল ফলাই—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানিতে এই সকল অধ্যায় আছে—কেন চাষ করব, উদ্ভিদের বিষয়ে মূল কথা কেন জানব? উপযুক্ত জমি কি? উপযুক্ত খাদ্য কি? ফসলের শত্রু কারা? ফসল ফলানো ব্রত, ফসল ফলানো ব্রতের নিয়ম (ইহার মধ্যে আছে—জমি বাছাই, জমি বানানো, সারের ব্যবহার, সেচের ব্যবস্থা, শত্রু হতে রক্ষা, ভাল বীজের ব্যবস্থা)। ভাল প্রথায় চাষ—জাপানী প্রথায় ধান চাষ, ঘরের জন্য সবজি ও ফলের চাষ। কতকগুলি ছবির সাহায্যে কয়েকটি বিষয় বুঝানো হইয়াছে।

শিশুবোধ্য সরল ভাষায় পুস্তকখানি প্রধানতঃ লিখিত। কিন্তু কৃষিকার্যে লিপ্ত বা অনুরাগী সকলেই পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে এই পুস্তকখানির প্রচলন অতি বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষির জ্ঞান যতই বাড়িবে, দেশের ততই মঙ্গল হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান—আর্ণেস্টগার্ড ইবার্ট প্রণীত। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯ মূল্য ১'৫০, পৃষ্ঠা ১৭০।

অনুবাদ গ্রন্থ—Modern Medical Discoveries নামক ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে যথা, জীবনত্রাতাপেনিসিলিন, বিশ্বজনীন আলকা ওষুধ, এ যুগের নতুন জীবাণুনাশক, নবজীবনের স্পন্দন, শোণিতপ্রবাহের আরও রহস্য, বীজাণুর প্রতিষেধ ব্যবস্থা, খাদ্যপ্রাণের সন্ধানে এবং ভবিষ্যতের তোরণ। ভিটামিন, পেনিসিলিন, ডি ডি টি, প্লাজমা, আলকা, ড্রাগস, আমিনোপটেরিন, অটোস্ত্রিন, স্ট্রেপ্টমাইসিন, গামাগ্লোবুলিন, গ্রামিসিডিন, ভেকসিন এবং পোটিজোন প্রভৃতি নানা ঔষধ এবং রোগ প্রতিষেধক দ্রব্যের আবিষ্কারের জন্মকথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক চিকিৎসকগণের জন্য নহে তবে যে সকল তরুণ-তরুণী বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ভবিষ্যতে চিকিৎসাব্রতী হইতে চান তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে নানা জ্ঞাতব্যের সন্ধান পাইবেন এবং যে সকল বৈজ্ঞানিকের জীবনালেখ্য ইহাতে দেওয়া হইয়াছে তাহাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভ্রম সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে দুইটি ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। ছবি দুটির নাম—'বধূ' ও 'সারসপক্ষী'। ভুলক্রমে উহাতে শিল্পীর নাম ছাপা হয় নাই। উহার শিল্পী শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ। এবং গত আষাঢ় সংখ্যায় 'জীবনযাত্রায় মান' প্রবন্ধটির লেখক ভুলক্রমে শ্রীরমেশচন্দ্র পোদ্দার ছাপা হইয়াছে। উহার স্থলে লেখকের নাম শ্রীরণেশচন্দ্র পোদ্দার হইবে। ঐ প্রবন্ধে আরও একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে 'Sir Eveling Barey' স্থলে 'Sir eveling Baring' হইবে।
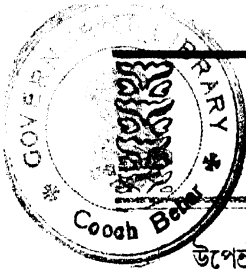
দেশ-বিদেশের কথা

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ একানব্বই বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রায়েরকাঠি গ্রামে বিখ্যাত জমিদার রায়চৌধুরী বংশে ১৮৬৭, ১৫ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় মধ্য ইংরেজী

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া একটি সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। নানা কারণে তাঁহার পিতা শশীভূষণ রায়চৌধুরীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় এই বৃত্তিই উচ্চতর শিক্ষালাভে তাঁহার বিশেষ সহায় হয়। তিনি দুই বৎসর পিরোজপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে এবং শেষ দুই বৎসর বরিশাল জেলা-স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময়েও তিনি সরকারী জেলা-বৃত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার একটি গভীর আকর্ষণ ছিল, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় উপেন্দ্রনাথ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এখান হইতে তিনি এফ, এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তিনি অনার্স পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি হেতু তিনি সরকার কর্ত্তৃক 'বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি অতঃপর কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানকার সিটি কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া আসেন। ১৯৩৮ সনে অবসর গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় দীর্ঘকাল এই কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত ছিলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে তিনি কিছুকাল রিপন কলেজে আংশিক অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য হেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিলাতের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক তিনি ইহার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত অধ্যাপনা সে যুগে ছাত্রদের মনে বেশ একটা সাড়া আনিয়া দেয়। কলেজের সংস্কৃত বিভাগে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে অন্যান্য কলেজের ছেলেরাও সিটি কলেজে তাঁহার ক্লাসে যোগ দিতেন। তিনি কলেজের বাংলা সাহিত্যেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বহু বৎসর।

সিটি কলেজের পরিচালনা কার্য্যেও তাঁহার যোগ ছিল অনেকখানি। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া বরিশালে চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে উপেন্দ্রনাথ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে কার্য্য করিতে থাকেন। অবিরত পরিশ্রম হেতু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরে কিছুকাল কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল বা সহ-অধ্যক্ষের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। আমরা কৈশোরে তাঁহার সংকলিত কোন কোন সংস্কৃত পাঠ্য-পুস্তক পাঠ করিয়াছি। সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া অতি সহজ সরল আকারে তিনি আমাদিগকে এই সকল পুস্তকে বিভিন্ন কাহিনী পরিবেশন করিয়াছিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার লেখা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বহু দিন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। Beginner's Sanskrit Grammar and Composition এবং Higher Sanskrit Grammar আজও বহুল প্রচারিত পাঠ্য-গ্রন্থ। বঙ্গদেশের নাট্যশালার সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থের নাট্যরূপও দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার লিখিত গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জীবনী-গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পুণ্যধাম

শ্রীশিবশঙ্কর কুণ্ডু

কাণামাছি ফোটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

দণ্ডকারণ্য। স্থানীয় আদিবাসীরা ধান কাটিতেছে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৬৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শান্তি ও শৃঙ্খলা

খাদ্যমূল্য ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধের অজুহাতে যে মাৎস্যন্যায়ের বন্যা কলিকাতা ও হাওড়ার উপর দিয়া বহিয়া গেল তাহার পূর্ণ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং কোনও দিন হইবে কি না সন্দেহ। সন্দেহ এই জন্য বলিতেছি যে, যাঁহাদের প্ররোচনায় এই বিষম ক্ষতিকর ঘটনাবলী ঘটিয়া গেল তাঁহারা সমস্ত ব্যাপার ধামা-চাপা দিবার জন্য পুলিসের কার্য্যাবলী সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্তের দাবীতে আকাশ ফাটাইতেছেন, "শহীদ স্মৃতি"র জন্য বিরাট নিঃশব্দ শোকের মিছিল চালাইতেছেন, এবং আমরা বাঙালী সুতরাং কোন এক পক্ষের উপর সকল দোষ চাপাইতে পারিলেই দ্বিগুণ অন্ন ধ্বংস করিতে পারি। কিন্তু ক্ষতি কিসের দরুণ হইল, কতটা হইল এবং তাহা পুনর্ব্বার যাহাতে না ঘটে তাহার ব্যবস্থা কি করা হইতেছে সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। পতনের পথের যাত্রীর ইহাই স্বভাবগত দোষ।

যাহা ঘটিয়াছে তাহার আংশিক বিবরণ আমরা ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের বিবৃতিতে এই সংখ্যায় অন্যত্র দিয়াছি, এই আন্দোলনের নেতৃবর্গ সম্পর্কেও অন্যত্র লিখিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই যে, সামান্য কয়েক জন বেপরোয়া, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতালোলুপ "নেতা" এই ভাবে এই বিরাট মহা-নগরীর প্রায় অর্দ্ধকোটি লোকের জীবনযাত্রা শুধু ব্যাহত নহে বিপন্ন করিতে সক্ষম হইলেন কি প্রকারে? দেশের লোকের ধনমান-প্রাণ কি তবে রাজনৈতিক জুয়াখেলার "রেস্ত" মাত্র? বিদেশে যেখানে ডিমোক্রাসী নামক অমূল্য পদার্থ সচল সেখানে এরূপ ধ্বংসাত্মক কাজের তদন্ত ঢের বেশী সূক্ষ্মভাবে করা হয় এবং ক্ষতির দায়িত্ব পূর্ণভাবেই দোষীর উপর ন্যস্ত হয়, রাজনীতির নামে ধামাচাপা দেওয়া হয় না।

ধর্ম্মঘট বা ষ্ট্রাইক কেবল এক কারণেই বিদেশে চলে এবং তাহা কোন এক শ্রমিক দলের সঙ্ঘবদ্ধ দাবীর বিশেষ প্রয়োজনে। কিন্তু তাহাও যথাযথ, যুক্তিসঙ্গত ও পূর্ণভাবে অন্য জনসাধারণের ক্ষতির দিকে নজর রাখিয়া। হঠকারিতার সহিত করিলে কি হয় তাহার উদাহরণ আমরা পাই মার্কিন দেশে C. L. O. নামক বিরাট শ্রমিকসঙ্ঘের উপর দশ লক্ষ ডলার জরিমানায়। বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রধান পরিচালকদিগের ভূস্বর্গ দুইটিতে এইরূপ আন্দোলন কতটা সম্ভব তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি হাঙ্গেরী ও তিব্বতে।

ফ্রান্সে দ্য গলের অধিনায়ক হইবার পূর্ব্বে বারো বৎসরে ছাব্বিশ বার শাসনতন্ত্রের পতন ও পরিবর্ত্তন হইলেও কোনও শহরে বা কোনও অঞ্চলে এরূপ ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কাহারও হয় নাই।

ভারতবর্ষেও, এই অভাগা পশ্চিম-বাংলা ছাড়া অন্য কোথায়ও, এরূপ বিশেষভাবে পূর্ব্বকল্পিত হাঙ্গামা ও গুণ্ডামির প্রবাহ বহিতে পারে নাই। কেরলে এরূপ ধ্বংসাত্মক কাজ বা পুলিস ষ্টেশনের উপর প্রবল আক্রমণ কোথায়ও হয় নাই, তবুও গুলি চলিয়াছিল, ১৫ জন মারা গিয়াছিল। এখানকার মত হইলে কি হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখানে হাওড়ায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আরও দুশ্চিন্তার কারণ আছে। সেখানে শুধু মাৎস্যন্যায় নহে বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবল শত্রুতা সৃষ্টির জন্য অতি সূক্ষ্মভাবে গঠিত চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া হিন্দী কাগজে প্রকাশিত খবরে অনুমান করা যায়। এখানে দলবদ্ধভাবে লুঠপাটের চেষ্টা ও ধ্বংসাত্মক কাজে প্রতিবাদ করিলে তাহার সর্ব্বনাশের ভীতি প্রদর্শন, এ ত বহু অঞ্চলে হইয়াছে। বিবেকানন্দ রোডে যে সরকারী পরিবহনের বাসটিতে আগুন দেওয়া হয়, তাহার অধিকাংশ জিনিসই সহজদাহ্য ছিল না। অত দ্রুত এবং ঐরূপ ধ্বংসকারী আগুন, বিশেষ জ্ঞান ও প্রস্তুতি না থাকিলে দেওয়া সম্ভব হইত না। তারপর আগুন নিভিবার পূর্ব্বেই হুমর, হাতুড়ী, ছেনী ও বাটালী লইয়া মিস্ত্রী জাতীয় লোকের এবং চোরাইমালের কারবারীদিগের আগমন, গঙ্গাজলের হাইড্রাণ্ট খুলিয়া, বালতী ভরিয়া জল ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়া, ভাঙিয়া-চুরিয়া লুঠ ও নগদ মূল্যে বিক্রী এ ত ওখানকার বাসিন্দার প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য। এও কি হঠাৎ ঘটিয়াছিল?

পুলিসের কার্য্যপদ্ধতি ইত্যাদির তদন্ত হয় হউক। কিন্তু এই হাঙ্গামার সূত্রপাত কি ভাবে হইল এবং তাহাতে ঐ তথাকথিত নেতৃবর্গের দায়িত্ব কিছু আছে কিনা তাহারও পূর্ণ বিচার প্রয়োজন এবং সর্ব্বোপরি প্রয়োজন এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধ।

খাদ্য-আন্দোলনের মাধ্যমে গুণ্ডামী

খাদ্য-আন্দোলনের মাধ্যমে "মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি" গত ৩১শে আগষ্ট আইন অমান্য করিতে রাইটার্স বিল্ডিং' অভিযান সুরু করেন এবং ইহার ফলেই এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইঁহাদের আর একটি ঘোষণা ছিল ৩রা সেপ্টেম্বর সম্পূর্ণ হরতাল পালন এবং প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম। মহাত্মা গান্ধী এই হরতাল পালনে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান হরতালের রূপটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে নীতি অনুসৃত হইত, ইঁহারা সে পথ ধরিয়া চলিতে পারেন নাই। ফলে, কয়েকটা দিন কলিকাতা যেন অরাজকের রাজ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় তাঁহারা কি এই পরিণামের কথা চিন্তাও করেন নাই? না, জানিয়া শুনিয়াই তাঁহারা এইরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন? নহিলে, কি করিয়া সম্ভব, একটা সঙ্ঘবদ্ধ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আইন অমান্যের স্তর অতিক্রম করিয়া এরূপ হিংসাত্মক তাণ্ডবে পরিণত হয়!

প্রকৃতপক্ষে ৩১শে আগষ্টের পর হইতেই এই হাঙ্গামা সুরু হয়। মিছিল আইন অমান্য করিতে চাহিলে পুলিস লাঠি চালাইয়া এবং কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়িয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করে। কিন্তু তাহার পর হইতেই আন্দোলন অন্য আকার ধারণ করে। যে ব্যাপক হাঙ্গামার সূচনা দেখা গেল, তাহার সঙ্গে ছাত্ররাও আসিয়া যোগ দিল। ছাত্রদের উত্তেজিত করা সহজ। সহজে বাজীমাৎ করিবার লোভে যাঁহারা উহাদের ব্যবহার করেন, তাঁহারা তাহাদের সর্ব্বনাশই করিতেছেন। সবচেয়ে দুঃখের কথা, এই আন্দোলনে তাঁহারা গুণ্ডার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। ইহারা সুযোগই খোঁজে। উপযুক্ত কাজ পাইয়া তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুতরাং শহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হয়।

কিন্তু সবই বুঝিলাম, কেবল একটি কথা বুঝিতে কষ্ট হইতেছে—কমিটি 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম' ঘোষণা করিয়াছিলেন কাহার বিরুদ্ধে? সরকারের বিরুদ্ধেই উঁহারা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সরকার ত ব্যক্তি নয়। ব্যক্তির অপসারণ চলিতে পারে, সরকারের অপসারণ জাতীয়তা বিরোধী। সুতরাং ব্যক্তিগত আক্রোশ রাষ্ট্রের উপর পড়ে কেন? ইহাতে ক্ষতি ত আমাদেরই।

প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের ঘোষণা দেখিয়া আর একটি কথাও মনে হইয়াছিল, হয়ত তাঁহাদের লক্ষ্য মজুতদার—যাহারা খাদ্য আটকাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, সেদিক দিয়া তাঁহারা যান নাই। যে আক্রমণের ফলে এই খাদ্য-আন্দোলন সফল হইতে পারিত তাহাকে কৌশলে এড়াইয়া গিয়া উল্টাপথ ধরিয়াছেন। অক্ষমতা হেতু খাদ্য-মন্ত্রীর পরিবর্ত্তনও তাঁহারা পূর্ব্বে কোথাও চান নাই। তাঁহারা কি চাহিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদের আচরণ হইতে বোঝা যায় না। তবে কি তাঁহারা শুধু একটি বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন? ইহাতে সাধারণ নাগরিক জীবন কিরূপ বিপন্ন হইয়া পড়ে, সে চিন্তা একবারও তাঁহাদের হইল না ইহাই আশ্চর্য্য।

একবার ধ্বংসের নেশায় পাইয়া বসিলে, মানুষের আর মাত্রা জ্ঞান থাকে না। এক্ষেত্রে হইয়াছিলও তাহাই। সেখানেই প্রয়োজন হয় সংযমের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই শিক্ষা আমাদের হওয়া উচিত ছিল। যাহার ফলে, আজও আমরা আমাদের সমাজকে, জীবনকে সুগঠিত ও সংহত করিতে পারিলাম না।

খাদ্য আমরা চাই, কিন্তু গুণ্ডামীও চাই না। যাঁহারা এই গুণ্ডার দলকেই ডাকিয়া আনিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাদের বিতাড়ন যেখানে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে দেশের নেতারাই আপন প্রয়োজনে উহাদের কাজে লাগাইতেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে গুণ্ডা পোষণ করিয়া যাঁহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাঁহারা দেশের শত্রু। ঠিক এই কারণেই, জনসাধারণের সমর্থন তাঁহারা কোন দিনই পাইবেন না।

চীন ও ভারত-নীতি

চীনের দাবি প্রায় সমস্ত হিমালয় অঞ্চল। পরিমাণ চল্লিশ হাজার বর্গমাইল আন্দাজ।

চীন এবারে সত্যসত্যই ভারতে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইল। এতদিন পরে শ্রীনেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লোকসভায় তাহা ঘোষণা করিয়াছেন। এবং এইজন্য তিনি ভারতকে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আহ্বান করিয়াছেন।

এই আশঙ্কা আমাদের সকলেরই ছিল যে, চীন একদিন ভারতের দিকে হাত বাড়াইবেই। কিন্তু শ্রীনেহরু তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে চীনকে একদিন তিনি আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা যে এত শীঘ্র ভাঙিয়া যাইতে পারে, মানুষ হিসাবে শ্রীনেহরু তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাজনীতি অতি জটিল, মানবতার সেখানে স্থান নাই। রাজনীতিজ্ঞ হইয়া শ্রীনেহরুর ইহা জানা উচিত ছিল। আমরা দোষ দিব সেই দিক দিয়া।

শ্রীনেহরুর পঞ্চশীল-নীতি আর কিছু না হউক, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে ভারতের উত্তর-সীমান্তের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত আশ্বাস বহন করিতেছিল। চীনের আচরণ সে-নীতির ভিত্তিমূল নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। এখন আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

শ্রীনেহরু কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, চীন ও ভারতের মধ্যে সম্প্রতি একটি 'নীরবতার প্রাচীর' গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নীরবতাই অবশেষে 'কাল' হইল! কিন্তু ঘটনা ত একটি নয়। সবগুলির সত্যতা সম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ করিলেই শ্রীনেহরুই অবগত

হইতে পারিতেন, উঁহাদের অভিপ্রায় ভাল নয়। তিব্বতের চীনা-কর্তৃপক্ষ হিমালয় অঞ্চলের অধিবাসিগণের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ সুরু করিয়াছেন এবং ভুটান ও সিকিমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করিয়াছেন ইহাও ত নেহরুর অজ্ঞাত ছিল না। তা ছাড়া, তিব্বতে বিশ্বাসভঙ্গের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতার পর শ্রীনেহরুর সজাগ হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য কূটনৈতিক কারণে অনেক বিষয়ে স্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু ছোট-বড় অনেক ব্যাপারে ভারত সীমান্তে চীন সরকারের আচরণ যে গভীর সন্দেহজনক, ইহা ভারত সরকারের পক্ষ হইতে জাতীয় সম্মান এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও পূর্ব্বেই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত ছিল।

চীন সরকার যদি বহু-বিঘোষিত মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতসরকারের সহিত সব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনায় সম্মত হইতেন তবে বর্ত্তমান পরিস্থিতি এতটা ঘোরালো হইতে পারিত না। প্রবল প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকে, সাধারণ সৌজন্যের খাতিরে পত্রালাপে পর্য্যন্ত সম্মত না হয় তাহা হইলে পঞ্চশীল, শান্তি, মৈত্রী ইত্যাদির কোন অর্থই হয় না।

কিন্তু এ সব ত মানবতার কথা। রাজনীতি স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া চলে। উপরন্তু, চীন কেবল প্রবল ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র নয়, কম্যুনিষ্ট বৈপ্লবিক আদর্শের উন্মাদনায় ভরপুর। চীন সরকার অ-কম্যুনিষ্ট দুনিয়াকে 'মুক্ত' করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িবেন কেন? তিব্বতের 'মুক্তি' কম্যুনিষ্ট আদর্শ এবং পন্থানুযায়ী চীন সরকার যে ভাবে পরিচালনা করিতেছেন সেই ভাবে সিকিম ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে অগ্রসর হইবার অভিসন্ধি থাকা আদৌ অসম্ভব নয়। শ্রীনেহরু ঘোষণা করিয়াছেন, যদি কোনও বৈদেশিক শক্তি সিকিম ও ভুটানের সার্ব্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে উভয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ভারতের দায়িত্ব।

এই সুস্পষ্ট ঘোষণার পর, উত্তর-সীমান্তে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা প্রয়োজন, জানি না ভারত সরকার ইহার কতটা আয়োজন করিয়াছেন।

অনেকে বলিতেছেন, দলাই লামাকে আশ্রয় দেওয়ার ফলেই ভারত বিপন্ন হইল। ইহা কিছুমাত্র সত্য নহে। ভারতের চরিত্র যাহারা জানেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, আশ্রিতকে আশ্রয়দান ভারতের ধর্ম্ম। এবং ইহা সভ্যজগতেও Political asylum (রাজনৈতিক আশ্রয়দান) রূপে গ্রাহ্য। চৌ এন লাই কি এই ভারত-নীতি অবগত নহেন? না জানিলেও, তিনি জানিয়া রাখুন, ভারত তাহার এই নীতি রক্ষার্থে যে-কোন প্রতিকূল অবস্থারই সম্মুখীন হইতে রাজী আছে। ভারত আত্মরক্ষায় অক্ষম ভাবিয়া চৌ এন লাই ভুল করিয়াছেন।

অন্যদিকে বিগত পাঁচ বৎসরের পত্রাদি প্রকাশের পর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, চীন ভারত সীমান্তের অঞ্চলগুলির দিকে লোলুপ দৃষ্টি তিব্বত 'মুক্ত' করার বহু পূর্ব্বেই নিক্ষেপ করিয়াছে। সুতরাং তিব্বত 'মুক্তি' ঐ চীন সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি আঙ্গিক অভিযান বলিয়া স্থির করাই সমীচীন।

টাকার মূল্যহ্রাস

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের অভিমতে ভারতীয় টাকার মূল্য দ্রুতহারে হ্রাস পাইতেছে এবং স্বাধীনতালাভের পর হইতে ইহার মূল্য প্রায় ২৯ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে। এই কয় বৎসরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মুদ্রার মূল্য আরও অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের মূল্য মাত্র ১৯ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য অনেকখানি স্থায়ী আছে; কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর মনে করেন যে, ভারতীয় মুদ্রার ক্রয়মূল্য যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলে দেশের অর্থনীতির পক্ষে তাহা ক্ষতিকারক হইবে।

কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজস্বভাবে টাকার আভ্যন্তরিক ক্রয়মূল্যকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে না কারণ সরকারী নীতি যদি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে তাহা হইলে টাকার মূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে যে পরিমাণে ভারতবর্ষে টাকার সৃষ্টি হইয়াছে সেই পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে কার্য্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, দেশের সরকারের কর্ত্তব্য টাকার ক্রয়-মূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখা, কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টাও সর্ব্বতোভাবে মূল্যের স্থায়িত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম নহে। ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত দাদন দিয়া জনগণের চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল ক্ষেত্রে এই দাদনের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কগুলি এত অধিক পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিতেছে যে, তাহাতে মোট টাকার পরিমাণ অযথা বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে, কিন্তু টাকার মূল্য দ্রুতহারে হ্রাস পাইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর বলিয়াছেন যে, দেশে যদি দ্রুতহারে এবং অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে সমূহ বিপদ আছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক-দাদন এবং ঘাটতি-ব্যয় প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহাতে মুদ্রার ক্রয়মূল্য কমিয়া যাইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিকে প্রধানতঃ দায়ী করা হয় এবং কিছু পরিমাণে তাহা সত্য; কিন্তু ইহার সবটাই সত্য নহে।

ভারতীয় মুদ্রার হ্রাসমান ক্রয়মূল্য বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর যে পরিমাণে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা অযথা। পরিকল্পিত অর্থনীতি যদি না-ও থাকিত তাহা হইলে কি ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাস পাইত না; নিশ্চয়ই পাইত, যেমন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যদিও কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নাই তথাপি ঐ সকল দেশের অর্থের ক্রয়মূল্য ভারতবর্ষের চেয়ে অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সহজ কথা যে কোনও দেশের অর্থের চিরস্থায়ী ক্রয়মূল্য বলিয়া কিছু নাই, অর্থের মূল্য হ্রাস পাইতে বাধ্য এবং তাহার প্রধান কারণ জন-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং কার্য্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি। তোডরমল্লের সময়ে

ভারতে টাকায় আঠারো মণ করিয়া চাউল ছিল বলিয়া যে চিরকাল তাহাই থাকিবে তাহা নহে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টাকার এবং দ্রব্যের চাহিদা যুগপৎ বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য এবং তাহার ফলে টাকার ক্রয়মূল্যও হ্রাস পাইবে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না থাকিলেও মুদ্রার ক্রয়মূল্য স্থায়ী থাকিতে পারে না যদি জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধনশীল থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সকলপ্রকার দ্রব্যের দ্রুতহারে এবং অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে বিগত একশত বৎসর ধরিয়া, তথাপি ডলারের ক্রয়মূল্য দশ বৎসর পূর্ব্বে যা ছিল বর্ত্তমানে তাহার তুলনায় অনেক হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহা পাইতে বাধ্য।

সুতরাং দ্রব্য-উৎপাদনের দ্বারাই টাকার ক্রয়মূল্যকে স্থায়ীভাবে বজায় রাখা যায় না। ইহা অবশ্য ঠিক যে, অনুন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে জনসংখ্যা, উৎপাদন ও কার্য্যকরী চাহিদা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় এবং তাহার ফলে ব্যবহারিক দ্রব্যের অভাব ঘটে এবং তাহাতে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে মুদ্রাস্ফীতি কথাটির নূতন করিয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মুদ্রার মূল্য ক্রমহ্রাসমান থাকিতে বাধ্য, তবে বেশী আর কম। অনুন্নত দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, দ্রব্যমূল্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় কারণ জনসাধারণের দারিদ্র্যের জন্য কার্য্যকরী চাহিদার বৃদ্ধিও ধীর মন্থর গতিতে হয়, সেজন্য অল্প সময়ের ব্যবধানে তাহা অনুভূত হয় না কিন্তু দশ কি বিশ বৎসরের ব্যবধানে তাহা সহজেই অনুভূত হয়; ১৯১০ সনে ভারতবর্ষে টাকার যে মূল্য ছিল, ১৯২০ সনে সেই তুলনায় টাকার মূল্য অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯০০ শতকের প্রথমদিকেও টাকার ক্রয়মূল্য এত অধিক ছিল, অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য এত কম ছিল যে, গ্রামে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য কড়ি ব্যবহৃত হইত। সুতরাং টাকার আভ্যন্তরিক ক্রয়মূল্য হ্রাসে শঙ্কিত হইবার মত কিছু নাই এবং এমন কোন সহজ পন্থা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি যাহাতে টাকার মূল্যকে স্থায়ী রাখা যায়। তবে একটি উপায় আছে—যদি ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোকের সংখ্যা হঠাৎ ১০ কোটিতে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে টাকার মূল্য তোডরমলের যুগে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু এ উপায় কোনও দিন সম্ভবপর হইবে না, তবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহৃত হইলে কি হইবে বলা যায় না।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর খুব সুনজরে দেখেন নাই, তাঁহার ধারণা ইহা সাময়িক ব্যবস্থামাত্র. যদি বেসরকারী শিল্প-সংস্থাগুলি এবং উৎপাদন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা ও নিয়ন্ত্রণের প্রসার আর না-ও হইতে পারে। কিন্তু এ তথ্য তিনি কোথা হইতে পাইলেন তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইহাতে যেন রাজনীতির গন্ধ আছে এবং হস্তক্ষেপ বিষয়ে অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণরের নেই, কারণ ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ হইতেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবসা।

অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নয়ন

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ইউজিন ব্ল্যাক সম্প্রতি "নূতন শিল্প-বিপ্লব" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ইহাতে বহুপ্রকার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমতে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে শিল্পোন্নয়ন অতীব প্রয়োজনীয় এবং অর্থনীতিতে উন্নত দেশগুলির উচিত যে, অনুন্নত দেশগুলিকে এই বিষয়ে সাহায্য করা। অতীতে আর্থিক উন্নয়নের ধারা ছিল ভিন্ন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিশেষ বিশেষ ধরনের শিল্প উৎপাদন করিত, বৈশিষ্ট্যমূলক পারদর্শিতা ছিল। শিল্পোৎপাদনের ভিত্তি যেমন, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মানী শিল্প উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছেন, অন্যান্য দেশগুলি প্রধানতঃ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি খনিজ ও কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছিল, যেমন মধ্যপ্রাচ্য উৎপাদন করিত পেট্রোলিয়াম, মালয়দেশ প্রধানতঃ উৎপাদন করিত রবার, আফ্রিকায় হইত কোকো, দক্ষিণ আমেরিকায় হইত কদলী, বলিভিয়ায় হইত টিন, ইত্যাদি।

মিঃ ব্ল্যাক মনে করেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদন-ব্যবস্থা আর্থিক উন্নয়নের গোড়াপত্তনী বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু অতীতের আন্তর্জ্জাতিক বিশিষ্টতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থা বর্ত্তমানে নানাকারণে অচল হইয়া উঠিয়াছে। প্রধানতঃ অনুন্নত দেশগুলিতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপের ফলে নূতন নূতন শিল্পবিনিয়োগ-ব্যবস্থার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়াছে। শিল্পোন্নয়নই একমাত্র ব্যবস্থা যাহার দ্বারা নূতন নূতন বিনিয়োগধারা উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং ইহার দ্বারা জীবনধারণের মানের নিম্নগতিকে শুধু প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইবে যে তাহা নহে, তাহাকে উন্নয়ন করাও সম্ভবপর হইবে। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের পথে বাধাও আছে অনেক যথা, উপযুক্ত শ্রমিক-নিয়োগ ও তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, এবং অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গের অভাব। অনুন্নত দেশে শুধু যে পরিচালকবর্গ অনভিজ্ঞ তাহা নহে, সমস্যামূলক সিদ্ধান্ত তাহারা সহজে করিয়া উঠিতে পারে না। তথাপি এই সকল অসুবিধা অল্প সময়ের মধ্যেই দূরীভূত করা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা যে, অনুন্নত দেশসমূহে অভিজ্ঞ ও কর্ম্মশালী পরিচালকবর্গের অভাবে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়। কিন্তু মিঃ ব্ল্যাক মনে করেন যে, অনুন্নত দেশগুলি যদি সত্যিকারভাবে আগ্রহান্বিত থাকে তাহা হইলে শিল্প-কুশলী অভিজ্ঞতা অল্প সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করা যায়।

তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি পাকিস্থানের কর্ণফুলী কাগজের কলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে পাকিস্থান সরকার চট্টগ্রামের কর্ণফুলী এলাকায় এই কাগজের মিলটি স্থাপন করেন। এখানে পূর্ব্বে কোনও প্রকার শিল্পসংস্থা ছিল না, কেবল-মাত্র প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপাদন হইত। ইহা একটি বন্য জায়গা, বুনো হাতী এবং বাঘের জন্য বিখ্যাত। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা ছিল

একটি কাদা-মাটির গ্রাম, কেবলমাত্র ২৫০ ধীবর ও ছোট ছোট চাষী বাস করিত। আজ দশ বৎসর পরে এখানে দুই মাইলব্যাপী একটি মিল গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার চতুর্দ্দিকে পাকা বাড়ীতে ভর্ত্তি। পশ্চিম-পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষ হইতেও বহু শ্রমিক আসিয়া কাজ করিতেছে, এখানে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কাজ করে এবং তাহাদের সকলের গৃহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম প্রথম কোনও উৎপাদন হইত না এবং পরে যাহা হইত তাহাও যৎ-সামান্য। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক এই মিলটির জন্য আড়াই কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের উপদেশ অনুসারে পাকিস্থান একজন কানাডিয়ান বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করে, ফলে আজ ইহাতে বৎসরে ২৫,০০০ টন করিয়া কাগজ উৎপাদন হইতেছে, এবং তাহা পাকিস্থানের সারা বৎসরের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এখন আর ইহাতে কোনও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নাই, পাকিস্থানীরাই সমস্ত মিলটিকে পরিচালনা করিতেছে। পাকিস্থান পূর্ব্বে বৎসরে আড়াই কোটি টাকার কাগজ বিদেশ হইতে আমদানী করিত, বর্ত্তমানে ইহা কাগজ আমদানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

এই মিলটির সমস্ত অংশীদারী স্বত্ব জনসাধারণের মধ্যে বিলিকৃত করা হইয়াছে, ইহার প্রায় ২৮,০০০ হাজার অংশীদার আছে এবং অনেক অংশীদার মাত্র ১০ টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছে। বর্ত্তমানে মিলটি শতকরা সাড়ে সাত শতাংশ হিসাবে লভ্যাংশ দিতেছে। এই এলাকায় দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রায়ই হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ছোট ছোট চাষীরাও ইহার মালিকানার স্বত্ব ভোগ করিতেছে এবং প্রতি বৎসরে কিছু পরিমাণ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে পাইতেছে, অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারী এই সকল ছোট ছোট অংশীদারদের বাৎসরিক লভ্যাংশগত আয়কে ব্যাহত করিতে পারিতেছে না।

শ্রমিকেরা যে বেতন পাইতেছে তাহাতে তাহাদের সংসার নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে এবং চাষের অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন-যাপন করিতে হইতেছে না। এইরূপ ভাবে শিল্পোন্নয়ন অবশ্য পৃথিবীর বহু অনুন্নত দেশেই হইতেছে, কিন্তু অনুন্নত দেশের শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, তাহা না হইলে পরিচালন-ক্ষমতায় এবং কারিগরি শিক্ষায় দেশ কোন দিনও স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। ভারতবর্ষেও ভিলাই এবং রাউর-কেল্লা পূর্ব্বে বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল, আজ সেখানে বৃহৎ বৃহৎ কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরিচালনা-ব্যাপারে স্বাবলম্বী এবং আত্ম-নির্ভরশীল হইতে এখনও বহু বৎসর লাগিবে। আর একটি কথা, কর্ণফুলী কাগজের মিলের দৃষ্টান্তে বলা যাইতে পারে যে, ভারত-বর্ষেও বে-সরকারী শিল্পের অংশীদারী স্বত্ব যেন ব্যাপকভাবে জন-সাধারণের মধ্যে বিলিকৃত করার বন্দোবস্ত করা হয়। বর্ত্তমানে বে-সরকারী শিল্পের মালিকানা মুষ্টিমেয় মালিকানায় সীমাবদ্ধ।

বর্ত্তমান বাজারে কাগজের অবস্থা

খাদ্যের সঙ্গে কাগজের অভাবও আজ চরমে পৌঁছিয়াছে। শিক্ষার সঙ্গে কাগজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। আজ কয়েক বৎসর হইতে অতি প্রয়োজনীয় বইগুলিও ছাপা হইতেছে না। ইহার ভবিষ্যৎ ফল ভয়াবহ। দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির গোড়ার বনিয়াদ যে ইহার ফলে ধ্বসিয়া পড়িতেছে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। সমস্যাটি শুধু মুদ্রক, প্রকাশক, গ্রন্থক ও পুস্তক-বিক্রেতাদেরই নয়, ইহার সহিত সমগ্র জাতির স্বার্থ বিজড়িত। কোন জাতির বৈশিষ্ট্য শুধু তাহার সভা-সমিতি, নৃত্য-গীত বা কারুকলা প্রদর্শনীর মধ্য দিয়াই প্রকাশমান হয় না। জাতির মহত্বর পরিচয় হইল, তাহার চিন্তা, চর্চা, মননশীলতা, অনুভূতি ও আবিষ্কারের মধ্যে এবং ইহার অনুশীলন করিতে হইলেই প্রয়োজন গ্রন্থের। সে গ্রন্থ যদি কাগজের অভাবে প্রকাশ হইবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে মানুষের মনের স্বাক্ষর আর কোথায় লিপিবদ্ধ থাকিবে? ঠিক আজই হয়ত ইহার বিপদটা বুঝা যাইবে না, কিন্তু দশ বৎসর পরের হিসাবনিকাশে এই সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাদশার মারাত্মক ফল উৎকটরূপে বাহির হইয়া পড়িবে।

কিন্তু ইহা ছাড়াও আরও একটি গুরুতর সমস্যা আছে। এ দেশে অল্পসংখ্যক মানুষই স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে বা কলেজে পড়িবার সুযোগ পান। অল্পস্বল্প ভাষা, গণিত ও ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞান লইয়াই বেশীর ভাগ নরনারী কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া যান। তাঁদের মানসিকতা গড়িয়া তোলে বাজারের বিবিধ বই—গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, ধর্ম্মগ্রন্থ এবং জনপ্রিয় মাসিক ও সাপ্তাহিক। যদিও ইহার মধ্যে অধিকাংশই সস্তাদরের বই, তবু সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে এ সবেরও দাম কম নয়। আজ কাগজের অভাবে সে দিকটাও রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এমনকি, স্কুল-কলেজের একান্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তকই এই কাগজের অভাবে ছাপা হইতেছে না। কিন্তু কাগজের এই নিদারুণ অভাবের হেতুটা কি? প্রকাশকরা বলেন, বিদেশ হইতে সকল শ্রেণীর কাগজ আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়াছে এবং দেশে যে কাগজ উৎপন্ন হয় তাহাও সমভাবে বণ্টিত হইতেছে না। তাহা ছাড়া, যে শ্রেণীর কাগজ বিক্রয় করিয়া লাভ বেশি থাকে তাহাই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। সে কাগজে বই ছাপানো চলে না। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে সরকারী নীতির কড়াকড়ি। মোটের উপর, এই নানামুখী অবস্থা ও ব্যবস্থার বিপাকেই কাগজ দুর্লভ হইয়াছে।

পূর্ব্বে বাহির হইতে কাগজ আসিত। বাহিরের কাগজে ঘরের কাগজে মিশাইয়া একরূপ চলিয়া যাইত। আজ বাহিরের আমদানি বন্ধ, শুধু নিজেদের উৎপাদনের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। যদিও আগেকার তুলনায় কাগজের উৎপাদন কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু কাগজের ব্যবহারও সেই সঙ্গে কম বাড়ে নাই। সে বৃদ্ধি সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই সমান সক্রিয়। অর্থাৎ মোট উৎপন্ন কাগজের বৃহত্তর অংশই সরকার নেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অবশিষ্টাংশ লইয়া বাধে কাড়াকাড়ি। আবার কালোবাজারের

বর্দ্ধিত মূল্যে কাগজ কিনিয়া এবং অতিস্ফীত মুদ্রণ-ব্যয় জোগাইয়া বইপত্র প্রকাশ করিলে, তাহাতে পড়তা পোষায় না। কাজেই তাঁহারা ক্রমশঃই হাত গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুধু হাত গুটাইলেও বা কথা ছিল, বিপদ অন্যত্রও দেখা দিয়াছে। বিদেশে মুদ্রিত উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মলাটে সজ্জিত বাংলা বই কলিকাতায় আমদানি হইতেছে এবং নামমাত্র মূল্যে বিক্রী হইতে সুরু করিয়াছে। শিশু-সাহিত্য, উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞানগ্রন্থ —নানাশ্রেণীর বই বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। এই অসম প্রতি-প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠা দেশী প্রকাশকদের পক্ষে কোনরূপেই সম্ভব নয়।

দেশের ব্যবসা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে হইলে ইহার আশু-প্রতিকার আবশ্যক। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে উদাসীন। এখন প্রয়োজন, মুদ্রণযোগ্য কাগজ সঙ্গত মূল্যে এবং যথা পরিমাণে বাজারে ছাড়া, নূতন নূতন কল বসান ও সরকারী কাগজ গ্রহণের হাত খাটো করা। দুঃখের বিষয় এই সঙ্কট অবস্থা জানিয়াও সরকার নীরব রহিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পমন্ত্রীর নিকট সম্প্রতি মুদ্রক ও প্রকাশক সমাজের একটি প্রতিনিধিদল এক স্মারকপত্র পেশ করিয়াছেন এবং ১৯৫৭ সন হইতে সমস্যাটি কি ভাবে উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে তাঁহারা তাহা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। প্রতিকারের পথ কি তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন সরকার কি করিবেন, আমরা তাহাই জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

বে-আইনীভাবে পাকিস্থানে অর্থপাচার

শুনা যাইতেছে, ভারত হইতে বে-আইনীভাবে পাকিস্থানে অর্থপাচার হইতেছে। সংবাদ সত্য হইলে, উহা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা কি সত্য, কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলগুলি হইতেই 'প্রাইভেট হুণ্ডি'র মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় এক কোটি টাকা পাকিস্থানে পাঠানো হইতেছে? ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্থানী নাগরিকেরা এই ব্যাপারে এতই দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকারী বিধি-নিষেধকে তাহারা গ্রাহ্যও করিতেছে না। তাহাদের বহু লোকই এখানে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে—যাহাদের মাসিক আয় তুচ্ছ করিবার মত নয়, তবু তাহাদের পরিবারবর্গ এ রাষ্ট্রে থাকে না। ভারত-রাষ্ট্রে উপার্জ্জিত অর্থ ভারতে খরচ না হইয়া যে কিভাবে তাহাদের হাতে গিয়া পৌঁছায়, তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। সব-চেয়ে আশ্চর্য্য, কল-কারখানায় এই সব পাকিস্থানী নাগরিকদের নিয়োগের পিছনে নাকি পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভাব বর্ত্তমান। অনুরূপ অভিযোগ শ্রমিক-দরদী কোনও কোনও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধেও পাওয়া গিয়াছে এবং অনুমান অসঙ্গত নয় যে, দুই রাষ্ট্রেই যাহাদের কাজ-কারবার চলে, এমন-কিছু অসাধু ব্যবসায়ীও এই চক্রান্তের সহিত জড়িত। নহিলে 'প্রাইভেট হুণ্ডি'র ব্যবস্থাটা কিছুতেই এত ব্যাপক হইতে পারিত না।

কথা হইতেছে এই যে, অভিযোগ আর আশঙ্কার কোনটাই বড় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারত-রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোটা যাহাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া না পড়ে, বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া তাহার আশু প্রতিকার করিতে হইবে। সহায়তা যাহারা করিতেছে, মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদের অপরাধ আসলে দেশদ্রোহেরই অপরাধ।

মজুত খাদ্যের পরিণাম

আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব। কিন্তু সংবাদপত্রে দেখিতেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত অধিক পরিমাণে গম জমিয়া উঠিয়াছে যাহা তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁহারা গমের উৎপাদন যাহাতে হ্রাস পায়, আইসেনহাওয়ার-সরকার সেজন্য আগামী বৎসর একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিবেন। কৃষি-বিভাগীয় সেক্রেটারী শ্রী বেনসনও এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, গম সম্পর্কে যদি নূতন আইন প্রণয়ন করা না হয় তাহা হইলে ১৯৫০ সনে আলু ও ডিমের মূল্য হ্রাস-নিরোধ ব্যবস্থায় যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, এবারের অবস্থা তাহার অপেক্ষাও শোচনীয় হইবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে সেবারে সেই উদ্বৃত্ত আলু কিনিয়া লইয়া মাটিতে পুঁতিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। অনুমান করিতেছি, এবারে উদ্বৃত্ত গমকে সমুদ্রজলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে।

ইহাই হয়, শস্য জমাইয়া রাখিয়া যাহারা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা এই ভাবেই দেশের ক্ষতি করেন। আমাদের দেশেও যে অনুরূপ ঘটনা না ঘটিয়াছে এমন নয়। অধিক দিন গুদামজাত থাকিয়া সেই চাউল পচিয়া মানুষের অখাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষকে খাইতে দিব না, পচাইয়া নষ্ট করিব তাও স্বীকার তবু বাজারে ছাড়িয়া বাজার নষ্ট করিব না, এই নীতি আজ আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। জানি না, ইহাদের চৈতন্য আর কতদিনে হইবে। যে ভাবে খাদ্য আন্দোলন চলে তাহাতে ইহাদের বোধ হয় সুবিধাই হয়।

বর্ত্তমান পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি ও তাহার সংস্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পদ্ধতিতে আমাদের দেশের পরীক্ষাগ্রহণ চলিতেছে, তাহার সংস্কারের আবশ্যকতা লইয়া এ পর্য্যন্ত বহু আলোচনা হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্তও আবার নূতন করিয়া এই কথারই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "আমাদের পরীক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ অভিযোগপত্র রচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি সেকেলে অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার পরিবর্ত্তে বাস্তব পরিস্থিতির আবশ্যকতানুযায়ী এবং

জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া উচিত।"

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কেবল এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পরীক্ষা-পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করিবার জন্ত তিনি নিজেই কয়েকটি সুপারিশও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সকল পরীক্ষকই যাহাতে একই আদর্শ ও নীতি মানিয়া চলেন তাহার ব্যবস্থা ছাড়া, পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহার সম্বন্ধে সকলের সচেতন হওয়া দরকার। ছাত্রদের মস্তিষ্কে সঞ্চিত তথ্য অথবা জ্ঞানের পরিমাণ কত অথবা তাহারা কতগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছে এবং অধীত বিষয়ের কতখানি মনে রাখিতে পারিয়াছে, ইহা যাচাই করিয়া লওয়াই পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। পরীক্ষায় যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয় তাহাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্রের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করা। ছাত্রের নিজের চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে কিনা এবং নিজের চিন্তাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করিবার যোগ্যতা আছে কিনা, ইহা জানিয়া লওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এই অভিমতের সহিত দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ সকলেই একমত হইবেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষা পরিচালনা করা এক জিনিস, আর বাস্তব-ক্ষেত্রে তাহা কার্যে পরিণত করা ভিন্ন জিনিস। দশ বৎসর পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এই প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উহা পুরাতন কথারই অনুবৃত্তি।

এই পরীক্ষা-পদ্ধতি একদিন সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আলোচনা সেদেশেও হইয়াছে এবং এই পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি লইয়া পুস্তকাদিও লেখা হইয়াছে। তাহাতে প্রমাণ করা হইয়াছে, প্রচলিত পরীক্ষাগ্রহণ অনেকটা লটারীর মত। বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে একই পরীক্ষাপত্রের ভিন্ন ভিন্ন নম্বর পাওয়ার কথা সকলেই জানেন। সুতরাং ইহা পরীক্ষাই নহে। অথচ, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই পরীক্ষাই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষার এই কৃত্রিম গুরুত্ব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই চাপা দিতেছে। সুতরাং ফাঁক এবং ফাঁকি পরীক্ষার ব্যাপারে প্রভূত পরিমাণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষকরাও কয়েকটি বাছা বাছা প্রশ্নের উত্তর ছেলেদের মুখস্থ করাইয়া দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। ইহার জন্ত নূতন নূতন বইও বাহির হইতেছে। ছাত্রেরাও এই ফাঁকি শিখিয়া লইয়া বই পড়িতে আর চাহে না। অথচ দেখা যাইতেছে, না পড়িয়াও তাহারা সম্মানের সহিত পরীক্ষা পাস করিয়া কৃতিত্ব লাভ করিতেছে। প্রকৃত অধ্যয়নশীল ছাত্রদের ভাগ্যে পরীক্ষা-লটারীর পুরস্কারলাভ অনেক সময় অসম্ভব হয় এবং জীবন-সংগ্রামেও তাহারা পিছনে পড়িয়া থাকে।

এই পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি সংশোধনের জন্ত বিশেষজ্ঞেরা যেসব উপায়ের সুপারিশ করিতেছেন তাহার মধ্যে একটি হইল, ক্লাশে ছাত্রেরা কিরূপ কাজ করে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নম্বর দেওয়া, বৎসরের শেষে অথবা সমস্ত পাঠ্য সমাপনান্তে কেবল একটি পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের ভাগ্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা না করিয়া সারা বৎসর ধরিয়া ছাত্রগণ ক্লাশে কিরূপ পড়াশুনা করে তাহার খতিয়ান রাখিলে এবং শেষ পরীক্ষার সময় ইহা বিবেচনার মধ্যে আনিলে পরীক্ষাকে একেবারে লটারীর হাত হইতে রক্ষা করা যায়।

দুঃখের বিষয়, এইরূপ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও তাঁহারা কাজে নামিতে বিলম্ব করিতেছেন। তাঁহারা কি ইহা বুঝিতেছেন না, এই অবহেলার ফলে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছে?

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী হস্তান্তরে ব্রিটিশ

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বার বৎসর পরেও ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরী সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না, ইহা আমাদের বিস্মিত করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বহুবার বহু কথা উঠিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি রাজ্যসভার একজন সদস্য 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রের একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতির প্রামাণ্যে বলেন যে, লাইব্রেরী সম্পর্কিত বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই উক্ত লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি হোয়াইট হলের বিভিন্ন বিভাগে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। তিনি ভারত সরকারকে এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বলেন। কিন্তু একজন ব্রিটিশ মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, লণ্ডনের কমনওয়েলথ রিলেশনস আপিসে লাইব্রেরীটি অটুট অবস্থায় আছে এবং প্রাপ্ত ও ক্রীত পুস্তকের দ্বারা লাইব্রেরীর গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা হস্তান্তরিত করা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার একটি বড় আপত্তি তুলিয়াছেন। সে আপত্তিটি হইল, ভারত ও পাকিস্থান যুক্তভাবে কোন দিনই এই লাইব্রেরী দাবি করে নাই। এইবারে শুনিতেছি, ভারত ও পাকিস্থান যুক্তভাবেই উহা দাবি করিবে।

ইহার পরও যদি ব্রিটিশ সরকার লাইব্রেরী হস্তান্তরে আপত্তি করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিতান্ত জেদের বশেই তাহা করিবেন। আমরা আশা করিব, অতঃপর ব্রিটিশ সরকার সুষ্ঠুভাবেই ইহার নিষ্পত্তি করিবেন।

পাকিস্থানে সামরিক ঘাঁটি কি মিথ্যা?

পাকিস্থানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির কথা প্রায়ই শুনা যায়। এ সম্বন্ধে সরকারের তরফ হইতে কেহই কোন উত্তর দেন না বা দিতে চাহেন না। শ্রীনেহরুর কথাও অস্পষ্ট। অবশ্য তাঁহার নিকট হইতে কোন দিনই স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় নাই। যাইলে, চীন-সমস্যা এতখানি জটিল আকার ধারণ করিত না।

৬ই সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা বলিতেছেন, "পাকিস্থানের কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলিয়া যাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রেসনোটে প্রকাশিত, পেশোয়ারে,

গিলগিটে ও কোয়েটাতে মার্কিন রকেট ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ প্রেসনোটে আরও বলা হইয়াছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেশোয়ারে একটি সংযোগ-রক্ষা ঘাটি প্রস্তুত করিতেছেন।"

এই সংযোগ-রক্ষা ঘাটি যে কি বস্তু আমাদের তাহা জানা নাই। শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, যে কোন বড় বিমানঘাটি, এমন কি অন্যান্য অসামরিক সংস্থাও সামরিক ঘাটিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। শ্রীনেহরুর এ তথ্যও হৃদয়ঙ্গম হইল না। বস্তুতঃ, প্রধানমন্ত্রীর জবাব পড়িয়া মনে হয় যে, সরকার এ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না বা রাখিলেও প্রকাশ করিতে চাহেন না।

কিন্তু কথা হইতেছে, যাহা রব বার বার রটে, তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি করিয়া? সাপের বিষ নাই বলিলেই তাহা লোপ পায় না। চোখ বুজিয়া ঘটনাকে অস্বীকার করিলেই তাহা মিথ্যা হইবে কিরূপে? দেখিতেছি, সরকার প্রায় সকল বিষয়েই চোখ বুজিয়া থাকাটাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফল কোন দিক দিয়াই ভাল হইতেছে না। আরও কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ শহরের নিকট আণবিক অস্ত্রবহনক্ষম দূরপাল্লার বোমারু বিমানের একটি বৃহৎ ঘাটি নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতেছে।

ঘটনা যাহাই হউক, সংবাদটি উদ্বেগজনক। সরকার চোখ খুলিয়া জগত দেখিবার চেষ্টা করুন, জনসাধারণ ইহাতেই তৃপ্ত হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষায় পৌরসভার আর এক উদ্যম

অতি ছোটবেলা হইতেই স্কুলে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা পুস্তকের পাতাতেই রহিয়া যায়, মানুষের স্বভাব-পরিবর্ত্তনের কোন কাজেই লাগিতেছে না। যাহার ফলে আজকের সামাজিক জীবন কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। অথচ অপরের ক্ষতি হইতে পারে এমন কোন আচরণ করিব না, ইহা সমাজ-জীবনের প্রথম পাঠ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে শিক্ষা আমাদের আজও হইল না। আমরা পুকুরের যে জল ব্যবহার করি, সেই জলেই সাবান কাচি, ময়লা পরিষ্কার করি। একবারও ভাবি না, ইহা আমারই মত অপরেও ব্যবহার করিবে। আমরা সংক্রামক রোগের বীজাণুদুষ্ট মলমূত্র বা নিষ্ঠীবনাদি নির্ব্বিচারে যেখানে সেখানে ফেলিয়া জনস্বাস্থ্যের হানি ঘটাই। এই আচরণের দ্বারা যে মনুষ্য-সমাজে ক্ষতি হইতেছে তাহার বোধ পর্য্যন্ত আমাদের নাই। কিন্তু অপরের আচরণে আমরা ক্ষুব্ধ হই। সুতরাং গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অবহিত। কাজেই প্রশ্ন জাগে, এইরূপ আচরণকে যদি তাহারা অন্যায় বলিয়াই জানে তবে সেইরূপ আচরণ করে কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাস সাধারণতঃ এই সব আচরণের মূলে থাকে।

ক্ষয়রোগের প্রকোপ বহুদিন হইতেই নগরবাসীকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে সব কারণে এই ভয়াবহ রোগ বিস্তৃতিলাভ করে, তাহার মধ্যে যেখানে-সেখানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ অন্যতম। এই কু-অভ্যাসের ফলে রোগ যে ক্রমশঃ প্রসারলাভ করে ইহা কাহারও অবিদিত নয়। মানুষের স্বভাব হইতে এই অভ্যাসটি দূর করিতে না পারিলে, রোগের প্রকোপ কিছুতেই কমান যাইবে না। কলিকাতা পৌরসভা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে নাগরিকদের এই বদভ্যাসটি দূর করিবার জন্য সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে একটি অভিযান সুরু করিবেন। এজন্য তাঁহারা প্রচারপত্র ও ধ্বনিসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শোভাযাত্রা বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। শহরের বিভিন্ন পথের মোড়ে, ট্রামে-বাসে এই বদভ্যাসত্যাগের অনুরোধ জানাইয়াও প্রচারপত্র টাঙাইয়া দিবেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা যেসব স্থানে নিষ্ঠীবনাদি নিক্ষেপ করা যাইবে সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

পৌরসভার এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু কালের গতিতে মানুষের স্বভাব এতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় পৌরসভার এ আয়োজন না ব্যর্থ হয়। কারণ ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ট্রামে-বাসে, সিনেমা-থিয়েটারে ধূমপানের অপকারিতা বুঝাইয়া জনসাধারণকে বার বার অনুরোধ করা হইয়াছিল। শেষে বাধ্য হইয়া আইনের আশ্রয়ে তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে রাস্তাঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করিলে পাঁচ আইন-বলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইত। জানি না সে আইন বর্ত্তমানে আছে কি না। বর্ত্তমানে দেখা যায়, অতি নির্লজ্জভাবে স্ত্রীলোকের সম্মুখেও এই আপত্তিকর কার্য্যগুলি হইয়া থাকে। আমরা সভ্যতার বড়াই করি, কিন্তু ইহাই কি সভ্যতার নিদর্শন? যুক্তি দিয়া, আদর্শ খাড়া করিয়া যেখানে মানুষকে বুঝান যাইবে না সেখানে আইনের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় কি? কিন্তু আইন করিয়া একটি বৃহৎ সমাজের সামগ্রিক আচরণ সংশোধন করা সম্ভব নহে, আর তাহা উচিতও নহে। উঠিতে বসিতে মানুষকে সকল বিষয়েই আইন তাড়া করিবে, ইহা কোন মানুষের কাছেই সুব্যবস্থা বলিয়া মনে হইবে না। যদিও আইন আমাদের সকল দিক দিয়াই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিতেছে, তবুও বলিব মানুষের অবাঞ্ছিত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সব সময় আইনের হাত প্রসারিত হউক, ইহা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। প্রচারণা, সুশিক্ষা ও রুচিবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে মানসিক উন্নয়ন-সাধন করিয়া মানুষকে অবাঞ্ছনীয় আচরণ হইতে বিরত করার চেষ্টা করিলে তাহার সুফল হওয়া উচিত এবং তাহাতে বাধ্যতার চাপ থাকে না বলিয়া সে ফল স্থায়ী ও কল্যাণকর হয়। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মহাত্মা গান্ধী সাফাইকে তাঁহার চতুর্দ্দশ দফা গঠনকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

পৌরসভা যে আইনের আশ্রয় না লইয়া এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সদ্‌বুদ্ধিরই পরিচয় পাই। সেই সঙ্গে

জনসাধারণকেও আমরা অনুরোধ করি, এরূপ একটি কল্যাণকর কার্য্যে তাঁহারা পৌরসভার সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া সদবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবেন। যাহাতে আইন করিয়া তাঁহাদের সুবুদ্ধি জাগ্রত করিতে না হয়।

দেশের ছেলে দেশে ফেরে না কেন

ঠিক সরকারী মহল হইতে না হইলেও, দিল্লীতে এই লইয়া আলোচনা উঠিয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভারত হইতে যে সকল লোক বিদেশে যায়, তাহাদের প্রায়ই কেহ দেশে ফিরিতে চাহেন না। শিক্ষা-সমাপ্তির পর সেখানেই কাজ পাইয়া থাকিয়া যাইতেছেন। উন্নয়ন-পরিকল্পনা উপলক্ষ্যে ভারত সরকার যখন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক, কারিগর, ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক প্রভৃতির জন্য সাড়ম্বরে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন, তখনও তাঁহারা নীরব কেন? কেনই বা তাঁহারা বিদেশে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনে অধিক আকৃষ্ট হইতেছেন? দেশের কাজে স্বদেশবাসীকে আহ্বান—ইহাও তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া যায় কোন প্রলোভনে?

কারণ নিশ্চয়ই আছে। একটি প্রধান কারণ হইল, ভারতবর্ষে সরকারী ও বে-সরকারী কাজে যোগ্যতার উপযুক্ত সমাদর হয় না। বিদেশে কর্ম্মজীবন-যাপনের অনেক অসুবিধা। সবচেয়ে বড় অসুবিধা আত্মীয়স্বজনের নিকট অর্থপ্রেরণ সম্পর্কে বাধা-নিষেধ। এতগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহারা রহিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বিদেশে থাকার অসুবিধা বাড়িলেও এখনও যে সুযোগ-সুবিধা আছে এদেশে তাহা নাই। ভাল বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, ডাক্তার সেখানে সহজেই কোন-না-কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারে। তাহারা যে বেতন দেয়, ভারতে তাহা পাওয়া যায় না। এখানে অল্প বেতনে কাজ করিতে রাজী হইলেও, কাজের সম্ভাবনা যেমন অনিশ্চিত, তেমনি নিয়োগকর্ত্তাদের ধরন ধারণও অপ্রীতিকর এবং রহস্যজনক। এবং ইহাও কাহারও অবিদিত নয় যে, এদেশে ধরাধরি, সুপারিশ ও স্বজনস্থানীয় না হইলে, শুধু বিদ্যা বা জ্ঞানের জোরে কাজ পাওয়া যায় না। এখানে কাজ ও চাকুরীর ক্ষেত্রে এমন এক পাপচক্রের আবর্ত্তন চলিতেছে যে, সেখানে যোগ্যতা অপেক্ষা ধরাধরি এবং সুপারিশেরই জোর বেশী। যোগ্য হইলেও, 'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার' বলিয়া হতাশ হইয়া ফিরারই এ দেশের রীতি। এমনকি আপন লোকের জোরে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া কম-যোগ্যতা লোককে বসাইতেও তাঁহারা কসুর করেন না।

ইহার সহজ ও সরল অর্থ—এদেশে যাহার কাজের আদর হয় না, বিদেশে তাহারই যোগ্যতা সহজে স্বীকৃত হয়। এরূপ উদাহরণও যথেষ্ট মিলিবে। বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দীর্ঘকাল কলিকাতায় কাজ করিয়া উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সমাদরে 'কাঙ্গাস' বা ছত্রাক গবেষণার চেয়ার দিয়া বহু উচ্চ বেতনে নিয়োগ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। সুতরাং আক্ষেপ করিয়া আর কি হইবে? সরকার এ বিষয়ে অবহিত না হইলে দেশ একে একে কৃতি সন্তানদের হারাইবেন।

রাষ্ট্রপতির আক্ষেপ

অনন্ধ্র প্রদেশ সর্ব্বোদয় সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায়, রাষ্ট্রপতি অভিযোগ করিয়াছেন, জনজীবনে আত্মনির্ভরতার আগ্রহ পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। এবং স্বাধীনতা লাভের পর জনসাধারণের চিন্তায় ও আচরণে সরকারের উপর নির্ভর করিবার ঝোঁক বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্ব্বে যে কাজ জনসাধারণের নিজের প্রচেষ্টায় সাধিত হইয়াছে, তেমন কাজও অধুনা সরকারের করণীয় বলিয়া মনে করিয়া জনসাধারণ চেষ্টা হইতে বিরত রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি জনসেবক কর্ম্মীসমাজের মনোভাব সম্বন্ধেও সমালোচনা করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে যাঁহারা অনলস কর্ম্মের দ্বারা জনহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহারা অলসের দিন যাপন করিতেছেন—যেন তাঁহাদের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন অবসর লইবার সময়।

রাষ্ট্রপতি ঠিকই বলিয়াছেন এবং আক্ষেপ করিবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, কিন্তু কেন এরূপ হইল, রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে কোথাও উল্লেখ করেন নাই। এই নিরলস কর্ম্মীরা সহসা উদ্যম হারাইলেন কেন? জনসাধারণই বা সরকারের উপর নির্ভর করিতে এতটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছে কেন? এক কথায় বলা যায়, এই অবস্থার জন্য জাতীয় চরিত্রই দায়ী। প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে এই জাতীয় চরিত্রের যদি কোন গলদ ছিল না বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে স্বাধীনতার পরেই বা এ ত্রুটি কোথা হইতে আসিল?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী কালের জাতীয় জীবনে পরিবেশের সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন, জাতীয় সরকারের দায়িত্বে ও ক্ষমতায় জনজীবন চালিত হইতেছে। জন-শক্তির আত্মনির্ভরতাহীন ম্রিয়মাণ অবস্থাটি জন-সমাজের একক ত্রুটি নহে, সরকারী নীতি, মনোভাব এবং আচরণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। জনচরিত্রের প্রশস্তি না করিয়াও বলা যাইতে পারে, জনচিত্তের এই নিরুদ্যম ও আগ্রহহীন অবস্থা মূলতঃ প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রপতি জনসমাজের নিকট হইতে যে ধরনের উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা দাবী করিতেছেন, তাহার অন্তরায় সরকারী নীতির ফলেই ঘটিতেছে কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিদ্রূপ করিয়া প্রায়ই বলেন, সরকার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা বর্ত্তমানে একটা ইণ্ডাষ্ট্রিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই বিদ্রূপটিকেই যদি তাহারা ঘুরাইয়া বলে, জনসাধারণের সমালোচনার প্রতি বধিরতা প্রদর্শন করাও যেন সরকার-পরিচালিত একটি ইণ্ডাষ্ট্রিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইলে

খুব দোষ দেওয়া যায় কি ? রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন দেশকর্ম্মীদের বর্ত্তমান উৎসাহহীনতার অভিযোগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সরকারী দায়িত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, এমন প্রাক্তন দেশকর্ম্মীদের কথাই সম্ভবতঃ রাষ্ট্রপতি বলিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহার উত্তরেও বলা যায়, ইহাতে জাতীয় নেতৃত্বেরই ত্রুটি রহিয়াছে। যাঁহারা সরকারী দায়িত্ব লইয়া আছেন, তাঁহাদের মনোভাবে এমন একটি আভিজাতিক গর্ব্ব আছে, যাহার ফলে তাঁহারা জনসাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। জন-জীবনের সহিত একাত্মক হইয়া তাঁহারা প্রশাসনিক কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন নাই, যাহা থাকিলে জনসমাজের আত্ম-নির্ভর-আগ্রহের জাগৃতি সম্ভব হয়। আজ সেই কারণেই, যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখা হইয়াছে, তাহারাই জাতীয় সরকারের নেতৃত্বকে পশ্চাতে টানিতেছে। ইহাই ত স্বাভাবিক। গণতন্ত্রের কথা আমরা যেভাবেই উচ্চারণ করি, আজ একথা ভুলিলে চলিবে না, জনসাধারণের সঙ্গে থাকিয়া অগ্রসর হওয়াই গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব।

গান্ধীজী যে সর্ব্বোদয় আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন, আজ কংগ্রেসও সে কথা ভুলিতে বসিয়াছেন। সেই আদর্শপথ স্মরণে রাখিলে আজ তাঁহারা কখনই ভুলপথে চলিতে পারিতেন না। যুগের সমস্যার নিরসনে সর্ব্বোদয় আজ যুগের দাবী। কালের অমোঘ নির্দ্দেশ। আজ সেই দিক দিয়াই সকলকে চিন্তা করিতে হইবে।

ভাকরা বাঁধের বর্ত্তমান অবস্থা

ভাকরা বাঁধ সম্বন্ধে অনেক কথাই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত তাহার মধ্যে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। কিন্তু আজ অস্বীকার করা যায় না, ভাকরা বাঁধের বিজলী উৎপাদন-কেন্দ্রে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা গুরুতর। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে যতই হালকা করিবার চেষ্টা করুন না কেন, আজ ইহা এমনভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যাহাকে কোনরূপেই ধামাচাপা দেওয়া যায় না। ঐ বিজলী উৎপাদন-কেন্দ্রে হয়েষ্ট চেম্বারের দেওয়াল ভাঙিয়া কারখানায় ও কেবল গ্যালারির মধ্যে তুমুল বেগে জল প্রবেশ করায় বহুমূল্য যন্ত্রপাতি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা আশা করিয়াছিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে জল বাহির করিয়া দিতে পারিলে সেগুলির গুরুতর ক্ষতি হইবে না, সামান্য মেরামত করিয়া কাজে লাগানো যাইবে এবং ভাঙনের জায়গা ও যন্ত্রাদি মেরামতের খরচ বাবদ লাখ পঞ্চাশ টাকার উপর দিয়া এ ফাঁড়া কাটিবে। কিন্তু সাত দিনের স্থানে বারো দিন গত হইয়া গিয়াছে—তাঁহারা কারখানার ভিতর হইতে জল বাহির করিতে সমর্থ হন নাই।

দেওয়ালে পঞ্চাশ ফুট চওড়ার মত জায়গা ভাঙিয়া গিয়াছে। সেখানে সাত শত মণ ওজনের একটি ইস্পাতের দরজা বসাইয়া জলস্রোত রোধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু প্রবল স্রোতে দরজাটি ভাসিয়া গিয়াছে। জলের তোড় ছিল ঘণ্টায় এক শত মাইলের মত। এখন চেষ্টা চলিতেছে ফাটলের মুখে একটি সুড়ঙ্গ বসাইয়া স্রোতপথকে ভিন্ন দিকে লইয়া যাইবার। অবশ্য ইহা সার্থক হইলে ভাগ্যের কথা। এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আশঙ্কা করিতেছেন এই ক্ষতির পরিমাণ ছয় কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। মার্কিন বিশেষজ্ঞ মিঃ স্লোকুমকে আহ্বান করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি জানাইয়াছেন, চূড়ান্ত ক্ষমতা না পাইলে মেরামতি কাজের দায়িত্ব লইবেন না।

যাহা হউক ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। এই গুরুতর অবস্থার কথা কর্ত্তৃপক্ষ হয় পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারেন নাই, কিংবা ইচ্ছা করিয়াই প্রকৃত অবস্থা এতদিন গোপন করিয়াছিলেন। যাহা সত্য তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টার ফলে যে অর্থদণ্ড আজ দিতে হইতেছে তাহাও কি কর্ত্তৃপক্ষ কোনদিন ভাবিয়া দেখিবেন না ?

বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বভারতীর কনষ্ট্রাকসন ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মীর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শোনা যাইতেছে, বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া ঐ কনষ্ট্রাকসন ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের সাহায্যেই আঠার লক্ষ টাকার জলসরবরাহ পরিকল্পনায় হাত দিয়াছেন। যদিও, নূতন উপাচার্য্য নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কাজ বন্ধ রাখার নির্দ্দেশ আসে, আরও শোনা যাইতেছে, অস্থায়ী উপাচার্য্যের নির্দ্দেশে নাকি ঐ পরিকল্পনার বহু লক্ষ টাকার মাল কেনা হইয়াছে এবং এই সব মাল ক্রয়ের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া টেণ্ডার পর্য্যন্ত নাকি আহ্বান করা হয় নাই। অভিযোগ কেবল ইহাতেই সীমাবদ্ধ নয়। উচ্চপদস্থ কর্ম্মীদের বাড়ীর ঝি-চাকরের বেতন সরকারী তহবিল হইতে দান, কোন কোন বিভাগের বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ রীতিবহির্ভূত ভাবে খয়রাতি, বিশেষ ব্যক্তিগণের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর বহুবিধ অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বভারতীর পরিচালনা সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ নানাসূত্রে জানা গিয়াছে এবং সংবাদপত্রেও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, যোগ্য ব্যক্তি যিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত আছেন তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে রীডার পদে নিয়োগদান, কিন্তু যেহেতু তিনি লণ্ডন হইতে ২৫ দিনের মধ্যে আসিয়া যোগ দিতে অক্ষম, অমনি পত্রপাঠ তাঁহাকে বরখাস্ত করা, সাতাশ বৎসর যিনি বিশ্বভারতীর কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, কোন কারণ না দেখাইয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করা, এম-এ পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দুই বৎসর অতিক্রান্ত না হইতেই কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসিতে অনুমতিদান প্রভৃতি।

এ সব অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইতেছে, কারণ, বিশ্বভারতী কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিবাদই করেন নাই।

অতি দুঃখের সহিত আমাদের বলিতে হইতেছে, যে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কবিগুরুর নাম জড়িত—তাঁহার আদর্শ এত শীঘ্র নষ্ট হইতে দেখিলে মনে ব্যথা লাগে। অন্ততঃ এটুকু আমরা আশা করিব, কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বড় সাধের বিশ্বভারতী কলঙ্কমুক্ত হইবে।

সর্পবিষ-চিকিৎসায় নূতন সিরাম

"সোভিয়েট মেডিসিন" পত্রিকায় (৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৫৯) সর্পদংশনের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়া সম্প্রতি সর্পদংশনের চিকিৎসায় একটি অত্যাশ্চর্য্য সিরাম ব্যবহার করিয়া লোকের মৃত্যুসংখ্যা কমাইয়া আনিয়াছেন। গত বৎসরে পৃথিবীর নানা দেশের মোট ৭২টি সর্পবিষ-গবেষণাগারে এই সোভিয়েট সিরামের নমুনা পাঠান হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে ৭০টি গবেষণাগার হইতেই যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সর্পবিষের ক্রিয়ারোধী সিরামগুলির মধ্যে এই সোভিয়েট সিরামই সবচেয়ে কার্য্যকরী। ইহার জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিখুঁত এবং রোগীর দেহে ইহার রোগোত্তর প্রতিক্রিয়া হয় সবচেয়ে কম।

এই সিরামটি প্রাথমিকভাবে আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৭ সনে। বাকুর জীবাণুবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা-সংস্থার গবেষক ডাক্তার এম. এলিস্তইসি এবং তাশখন্দের জীবাণু-গবেষক এম. ম্যাক্সিমোভিচ এই সিরামটি প্রাথমিক অবস্থায় পাইতে সমর্থ হন। তার পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইঁহারা দুজনে অনুশীলন এবং প্রয়োগ-পরীক্ষার ভিতর দিয়া ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়া পৌঁছিয়াছে।

১৯৫৭ সন হইতে এই সিরাম সোভিয়েটের সমস্ত হাসপাতালে, বিশেষ করিয়া সর্পবহুল অঞ্চলগুলিতে, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে দেখা গিয়াছে, সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্য সব রোগের সিরাম যে ভাবে তৈরি করা হয়, এই সর্পবিষ-প্রতিষেধক সিরামও তৈরি করা হয় সেই-ভাবেই। সম্পূর্ণ নিরোগ ও সবল একটি ঘোড়ার দেহে অতি সামান্য মাত্রায় সাপের বিষ প্রয়োজনীয় পরিমাণে ফর্ম্যালিনের সহিত মিশাইয়া পেশীর মধ্যে ইনজেকসন করা হয়। এই অতি সামান্য মাত্রার বিষে ঘোড়াটা মরে না, কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার দেহে এই বিষের প্রতিরোধ-শক্তি-বৃদ্ধিকারী "অ্যান্টিবডি" সৃষ্টি হয়। তার পর কিছুদিন পর পর বিষের মাত্রা বাড়াইয়া ঐরূপে ইনজেকসন দেওয়া হয়। ঘোড়াটির প্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রক্তে ঐ অ্যান্টিবডির পরিমাণও বাড়িতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ঘোড়াটির রক্তে এত বেশী অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় যে, মারাত্মক মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করার পরেও ঘোড়াটির কোন ক্ষতি হয় না। এই অবস্থায় ঘোড়াটির দেহ হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া লইয়া উক্ত সিরাম প্রস্তুত হইতেছে।

এই সিরামের ব্যবহার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

দণ্ডকারণ্যের গোলমাল কোথায়

দণ্ডকারণ্য বর্ত্তমানে আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বহু জনশ্রুতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের যেটা প্রধান বাধা, সেটা দুইদিক হইতেই আসিয়াছে। একদিকে আছেন উদ্বাস্তুদেরই কপট-দরদী কিছু বামপন্থী নেতা। আর অন্যদিকে আছেন, সরকারের কিছু অকর্ম্মণ্য ও কর্ম্মবিমুখ অফিসার-সম্প্রদায়। বামপন্থী নেতারা যে দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার কারণ অবশ্যই এই নয় যে, উদ্বাস্তুদের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা সকলেই খুব চিন্তিত। আসল কথা হইল, সাধারণের জন্য একটা সমস্যাকে জীয়াইয়া রাখাই তাঁহাদের নীতি! সমস্যা না থাকিলে তাঁহাদের চলে না। অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যও তাঁহাদের এবম্বিধ আস্ফালনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। নহিলে উদ্বাস্তুদের মঙ্গলের জন্য কোন মাথাব্যথাই তাঁহাদের নাই।

অন্যদিকে অফিসারদের আচরণও প্রায় সমান নিন্দনীয়। ইহাদের অযোগ্যতা এবং কাজ করিয়া দিবার অছিলায় দরিদ্র উদ্বাস্তুদের কাছ হইতে উৎকোচ গ্রহণের সংবাদও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহা বেদনাদায়ক ত বটেই, আপত্তিজনকও। বলিতে বাধা নাই, দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু-পুনর্ব্বাসনের কাজটা যে মোটেই দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে না, এই অফিসার-চক্রের অযোগ্যতা তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। অথচ এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারের তদন্তও আজ পর্য্যন্ত হইল না ইহাই আশ্চর্য্য! আমরা সরকারকে ইহাই অনুরোধ করিব, জরুরী তদন্ত করিয়া যাঁহারা দোষী সাব্যস্ত হইবেন, তাঁহাদের দণ্ডকারণ্য হইতে অবিলম্বে অপসারণ করুন। নহিলে অর্থের অপচয়ই শুধু হইবে, কাজ হইবে না।

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় যাত্রীদের দুর্ভোগ

ট্রেন এবং ট্রেন-ষ্টেশনগুলির অব্যবস্থা সম্বন্ধে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু রেল-কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতায় যাত্রীদের দুর্ভোগ সমানই রহিয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে, ট্রেন চড়িতে দুর্ভোগ, চড়িবার পড়েও দুর্ভোগ। এই দুই দফা দ্বিবিধ দুর্ভোগের পরেও, আর একটি দুর্ভোগ রহিয়া যাইতেছে যাহা যাত্রীর জীবনে একটা সাধারণ নির্য্যাতনে পরিণত হইয়াছে। সেটি হইল ষ্টেশনের অব্যবস্থাক্লিষ্ট অবস্থা। যাহার ফলে অপেক্ষমান যাত্রীরা কষ্ট পায়। অধিকাংশ ষ্টেশনে প্লাটফরম-শেড নাই। এই দারুণ বর্ষা। ট্রেনের অপেক্ষায় যাত্রীদের স্নান করিয়া গাড়ীতে উঠিতে হয়। পয়সা দিয়া

তাহারা গাড়ীতে চাপে। যাহার পয়সা খাইব, তাহার সুখ-সুবিধা দেখিব না, ইহা বর্ব্বরের নীতি। ইহা ছাড়া অনেক ষ্টেশনে আবার প্লাটফরম পর্য্যন্ত নাই। বর্ষায় গাড়ী হইতে নামিতে তাহাদের কিরূপ বেগ পাইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

বিশ্রামাগারের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। নামে মাত্র যাহা আছে তাহা অব্যবহার্য্য। এই সব অব্যবস্থার এবং ব্যবস্থার অভাব দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষারত যাত্রীর এই নিগ্রহ ঘটাইতেছে। প্রায় সকল ষ্টেশনেরই এই অবস্থা। সুতরাং কাহার নাম করিব? রেল-কোম্পানীর আয় কম নয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই, এগুলির সংস্কার এবং ভাল ব্যবস্থা করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, অভাব সেই ইচ্ছার।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ডাঃ লিনাস পলিং বলিয়াছেন যে, গত ১৪ বৎসর যে সকল পরমাণু-অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চলিয়াছে।

ডাঃ পলিং ক্যালিফোর্ণিয়াস্থ প্রয়োগ বিজ্ঞান পরিষদের গেটস অ্যাণ্ড ক্রেলিন ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর। জনসভায় এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যে সকল পরমাণু বোমা ফাটানো হইবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য ৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিবে।

ডাঃ পলিং ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনারারী ডিগ্রী দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেড় লক্ষ লোক রক্তে লোহিত কণিকার অভাব ও অস্থির ক্যান্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মানুষের প্রজনন-যন্ত্রের উপর তেজস্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াজনিত-রোগে মারা যাইবে দেড় লক্ষ। আর কার্ব্বন-১৪ নামক তেজস্ক্রিয়ার উপাদানের দরুণ আগামী এক হাজার বৎসরে সাড়ে বার লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিবে।

তিনি বলেন, প্রত্যেকটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের পরিণতিতে ১৫ হইতে ৩০ হাজার লোক ক্যানসার ও অনুরূপ পরিমাণ লোক প্রজনন-শক্তির উপর প্রতিক্রিয়াজনিত রোগে মারা যাইবে।

এই ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর যাঁহারা মারণাস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছেন, তাঁহাদের উপর কি প্রতিক্রিয়া করিবে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চ্যানেল অতিক্রমে আরতী সাহা

এবারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দুরূহ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হইল। ইহাতে আর্জেন্টিনার আলফ্রেড ক্যামেরেরো প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং শ্রীব্রজেন দাশ পঞ্চম হইয়াছেন। একজন ভারতীয় ডাঃ বিমল চন্দ্রও পরে চ্যানেল অতিক্রমের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন, এই চ্যানেল অতিক্রম করিবার জন্য ভারত হইতে শ্রীমতী আরতি সাহা গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি সে দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে বহুবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার জন্য অনেক সাঁতারুই সেখানে গিয়াছেন। এই অভিযানের সাহস ও আকর্ষণ যত মানুষকে এরূপ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামাইয়াছে, তাঁহাদের অধিকাংশের ভাগ্যেই সাফল্যের গৌরব জোটে নাই। ভারতবর্ষ হইতে প্রথম শ্রীমিহির সেন সে গৌরব অর্জ্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য সেবারেও চ্যানেলের জলস্ফীতি ভয়াবহ ছিল, কিন্তু এবারের জলস্ফীতি ভিন্ন প্রকৃতির। এবারে ছিল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। যাহার ফলে হিমশীতল উত্তাল জল আরও প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এমনকি, সন্তরণকারীদের পথ দেখাইবার জন্য যে পাইলট বোটগুলি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলি সেই দুর্যোগে পথ হারাইয়াছে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি কয়েকজন সাঁতারু এই দুর্জ্জয় বাধা অস্বীকার করিয়া রাত্রির অন্ধকার শেষে ডোভারের উপকূল স্পর্শ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী আরতি সাহা প্রায় চোদ্দ ঘণ্টা সংগ্রামের পর মধ্যপথে অবসর লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে শ্রীমতী সাহা প্রথম এই সাহস দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। সাফল্যের উপকূলে পৌঁছাইতে না পারিলেও অভিযান-বৃত্তির গৌরব তিনি নিঃসন্দেহে অর্জ্জন করিলেন। ১৪ ঘণ্টা ঐ দুর্জ্জয় তরঙ্গের মধ্যে যুঝিবার ক্ষমতা এবং দুর্দ্ধর্ষ সাহস যে তিনি দেখাইয়াছেন, সে জন্য ভারতের অভিনন্দন তিনি নিশ্চয়ই লাভ করিবেন।

শিশু-সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথের খ্যাতিলাভ

মস্কোর রাষ্ট্রীয় শিশুপাঠ্য-গ্রন্থ প্রকাশালয় হইতে ১৯৫৮-৫৯ সনে ভারতীয় লেখকদের অনেকগুলি শিশুপাঠ্য-রচনার রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ অন্যান্য সোভিয়েট ভাষাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিশু-রচনা সংকলন অন্যতম। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্য রচয়িতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'ভোম্বল সর্দ্দার' বইখানিরও তাঁহারা রুশ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' লিখিয়া গবেষক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এ প্রচেষ্টা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন।

"খাদ্য আন্দোলনে"র হাঙ্গামা

বিগত ১৮ই ভাদ্র, শুক্রবার, 'আনন্দবাজার পত্রিকা, নিম্নস্থ সংবাদগুলি দিয়াছেন :

প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির খাদ্য-আন্দোলনের জেরস্বরূপ এক্ষণে কলিকাতা, হাওড়া এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে যে সব হাঙ্গামা হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সহিত

আলোচনাকালে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত কণ্ঠে তাহার নিন্দা করিয়া বলেন যে, কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নাশকতামূলক ঐসব কাজকে তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে দুষ্কৃতকারীদের সহিত ঐ সব দলের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ আছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।

ডাঃ রায় কলিকাতা ও হাওড়ায় বিভিন্ন হাঙ্গামার ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স ও দুধের গাড়ী পোড়ান, পুলিস হত্যা, থানা, ফাঁড়ি ও রেল ষ্টেশন আক্রমণ ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই-গুলি নিছক গুণ্ডাবাজী এবং আন্দোলনে সমাজবিরোধীরাই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

তিনি আরও বলেন যে, "হাওড়ায় হাঙ্গামাজনক পরিস্থিতি এরূপ পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে যে, আমাদের আজ (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্ন চার ঘটিকা হইতে হাওড়া এবং উহার শহরতলী অঞ্চলসমূহে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থ ও অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য সামরিকবাহিনীকে ডাকিতে হইয়াছে।"

মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কলিকাতায় সামরিক বাহিনীকে আহ্বানের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া এখনও মনে হয় না। সান্ধ্য আইনজারী করা হইবে কিনা এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, উহা জারী হইলে নাগরিক সাধারণ যে অসুবিধায় পড়িবেন তাহা বিবেচনা করিয়াই ঐ আইন কোথাও এখনও পর্যন্ত জারী করা হয় নাই।

ডাঃ রায় বলেন যে, কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত রাজ্যসভায় এরূপ এক বিবৃতি দিয়াছেন যে, কলিকাতায় আর-ডব্লু-এ-সি'র যে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স পোড়ান হইয়াছে সেইগুলিতে পুলিস লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তিনি বলেন যে, শ্রীগুপ্তের ঐ বিবৃতি 'নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং নির্জ্জলা অসত্য'।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, আর-ডব্লু-এ-সি'র সভাপতি নিজেই এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, দ্বারভাঙা বিল্ডিং হইতে আটক ছাত্রীদের স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের অনুরোধে ঐ অ্যাম্বুলেন্সগুলি পাঠান হয়। তাহা ছাড়া পোড়াইবার সময় ঐগুলির ভিতর কোন লোক ছিল না। পুলিসবাহিনীর নিজস্ব গাড়ী আছে এবং তাঁহারা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী ব্যবহার করেন না বলিয়াও মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক অন্যান্য কাজগুলি উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজবিরোধীদের কার্য্যকলাপ বলিয়াই সরকারের ধারণা। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐ ঘটনাগুলিকে 'অন্য রঙে রাঙাইবার' চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। এইদিন হাওড়ায় একজন পুলিসকে হত্যা করা হয়। ইহা দুষ্কৃত-কারীরাই করিয়াছে। কিন্তু বামপন্থী নেতারা ইহাকে 'হারিকিরি' বলিবেন কি না তাহা কে জানে!

ডাঃ রায় এইরূপ অভিযোগও করেন, বৃহস্পতিবার হাওড়া অঞ্চলে বাঙালী-বিহারী দাঙ্গা বাধাইবার অপচেষ্টাও হয় এবং একটি ক্ষেত্রে দুই দল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যথেষ্ট উত্তেজনা ও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। হাওড়ায় নিহত ঐ পুলিস কনষ্টেবলের মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার কালে পুলিস ভ্যানের উপর নয়টি জায়গায় নয়বার মারাত্মক ধরনের বোমা ফেলা হয়। কলিকাতায় কাশীবিশ্বনাথ সমিতির জলসরবরাহের এক পথিপার্শ্বস্থ শেড পোড়াইয়া দেওয়া হয়। কতকগুলি ষ্টেট বাসের গুমটিতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ যাবত কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে ১২।১৩টি থানা ও ফাঁড়ি আক্রান্ত হয়। দমদমে থানার উপর এবং হাওড়ায় এমনকি পুলিস কণ্ট্রোল আপিসের উপরও আক্রমণ চালান হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতার এই ধরনের আক্রমণ সবক্ষেত্রেই প্রতিহত করা হয়। এইসব ঘটনাই গুণ্ডাগণ ও দুষ্কৃতকারীদের কার্য্যকলাপ বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ঐসব কার্য্যকে তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার দ্বারা দুষ্কৃতকারীদের সহিত তাঁহাদের একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী লোকসভায় এরূপ এক বিবৃতি দেন যে, কলিকাতায় মিলিটারী ডাকা হইয়াছে এবং সৈন্যবাহিনী রাজপথসমূহে সশস্ত্রভাবে টহল দিতেছে। ডাঃ রায় বলেন যে, এই বিবৃতি সম্পূর্ণ অসত্য। প্রকৃত কথা এই যে, এবং প্রধানমন্ত্রীও ইহা বলিয়াছেন—যদি জরুরী অবস্থা দেখা দেয় তবে সেই সময় কলিকাতার জন্য মিলিটারী ডাকা হইলে তাহাদের কিরূপ কাজ করিতে হইবে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনীর অফিসারগণ কলিকাতা এলাকায় 'পর্য্যবেক্ষণ-ভ্রমণ' করিয়া বেড়ান। কলিকাতায় এখনও সামরিকবাহিনীর সাহায্য আহ্বান করা হয় নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্ত্তার এক প্রেসনোটে কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি, পুলিসবাহিনী ও টহলদার দলের প্রতি বোমা ও পটকা নিক্ষেপ, কয়েকটি হরিণঘাটার দুগ্ধ বিক্রয়-কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় পরিবহনের গুমটিতে অগ্নিসংযোগ, ট্রাম লাইন ও ইলেকট্রিক পোষ্টের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা কয়েক স্থানে ঘটিলেও কলিকাতার অবস্থার ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিসকে কয়েকবার টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিতে ও গুলী চালাইতে হয়। তিন ব্যক্তি—বুলেটের আঘাতে আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। তাহাদের মধ্যে একজন পরে মারা যায়। প্রায় ২০০ দুষ্কৃতিকারীকে ঐ দিন গ্রেপ্তার করা হয়। বেলঘরিয়া রেলষ্টেশনের উপর এক জনতা আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিসকে গুলী চালাইতে হয়। সোদপুর পুলিস ফাঁড়িও জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রেও পুলিসকে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের হাওড়া-খড়্গপুর সুবার্ব্বান সেকশনে

কতকগুলি স্থানে জনতা কর্তৃক রেল লাইন অবরোধ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে বৃহস্পতিবার সকালের দিকে পুরুলিয়া-আদ্রা-হাওড়া প্যাসেঞ্জার, পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেস প্যাসেঞ্জার এবং রাঁচী এক্সপ্রেস ছাড়া আর কোন ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইতে পারে নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব রেলপথের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার এই সম্পর্কে এক প্রেসনোট প্রচার করিয়া জানাইতেছেন যে, হাওড়া-খড়্গপুর সেকশনের ট্রেন চলাচলে বাধা দেওয়া হয়। ফলে কতকগুলি লোকাল ট্রেন বাতিল করিয়া দিতে হয়। নাগপুর-হাওড়া প্যাসেঞ্জার (৩২৪ ডাউন) এবং পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেস (৩০২ ডাউন) ট্রেন দুইটিকে হাওড়া হইতে ৩৬ মাইল দূরে মেচাদা ষ্টেশনে আটক করা হয়। বোম্বাই মেল (১ ডাউন) হায়দরাবাদ জনতা এক্সপ্রেস (১০ ডাউন) এবং মাদ্রাজ মেল (৪ ডাউন) খড়্গপুর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে থাকে।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে খড়্গপুর এবং মেচাদায় আটক ট্রেন-গুলি হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হয়। ৩ আপ মাদ্রাজ মেল সাড়ে তিন ঘণ্টা বিলম্বে প্রথম হাওড়া ষ্টেশন ছাড়ে। অন্যান্য আপ থ্রু ট্রেনগুলিও বিলম্বে ছাড়ে। দেউলটি লোকাল ছাড়া অন্যান্য আপ লোকালগুলি বাতিল করিয়া দিতে হয়।

জঙ্গীপুর কলেজে অনার্স প্রবর্ত্তনের দাবী

জঙ্গীপুর হইতে 'ভারতী' পত্রিকা জানাইতেছেন :

১৯৫০ সনে ডিসপার্সাল স্কীমে জঙ্গীপুর কলেজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে বিভিন্ন দিকে কলেজের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইন্টার-মিডিয়েট কলেজরূপে কাজ আরম্ভ করিয়া স্পনসর্ড স্কীমের আওতায় বর্ত্তমানে ইহা পুরোপুরী ডিগ্রী কলেজ রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখন ইহার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলেজ সম্প্রসারণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও অর্থমঞ্জুরীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেদিকে বিশেষ কোন ত্রুটি নাই।

কলেজটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য টাকা পয়সা খরচের বিশেষ কোন কার্পণ্য না থাকিলেও পঠন-পাঠনের দিকে একটি গুরুতর অভাব থাকিয়াই যাইতেছে এবং তাহা পূরণ করিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে কোন উচ্চবাচ্য শোনা যাইতেছে না। বিষয়টি এই যে, বি-এর পাঠক্রমের মধ্যে—ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, দর্শন, স্পেশাল বাংলা প্রভৃতি মোটামুটি কতকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে কিন্তু কোন বিষয়েই 'অনার্স' পড়িবার ব্যবস্থা নাই। আজ চার বৎসর ডিগ্রী ক্লাশ খোলা হইয়াছে এবং এ বৎসর বি-এসসি খোলা হইল কিন্তু 'অনার্স' পড়াইবার ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। বি-এতে যাহারা 'অনার্স' পড়িতে ইচ্ছুক টাকা পয়সার ঝুঁকি লইয়া তাহারা অন্য কলেজে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে আর না হয় টাকা পয়সার অভাবে শেষ পর্য্যন্ত এই কলেজেই পড়িয়া 'পাসকোর্সে' পাস করিতেছে।

সাদিপুর মহিলা-কেন্দ্রে গুঁড়া দুধ

বর্দ্ধমান সমাজকল্যাণ রূপায়ণ সমিতির পরিচালিত জামালপুর থানার বেরুগ্রাম ইউনিয়নের সাদিপুর মহিলা-কেন্দ্রে উক্ত থানার পাঁচড়া কেন্দ্র হইতে প্রেরিত ২০টি বাক্স গুঁড়া দুধ পচিয়া উহা দুর্গন্ধ বাহির হইয়া স্থানীয় অধিবাসীদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিটি বাক্সে ৪॥০ পাউণ্ড হিসাবে ১২টি করিয়া পেটি আছে অর্থাৎ ২৪০টি পেটিতে ১,০৮০ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের বিনা আদেশে উহা ফেলিয়া দেওয়া যাইতেছে না।

'দামোদর' পত্রিকার সংবাদ সত্য হইলে বলিব, এ ঔদাসীন্য সর্ব্বত্র। এইভাবে খাদ্য অপচয় করিয়া সমাজ-ব্যবস্থারই তাঁহারা দুর্নাম করিতেছেন।

বাঁকুড়া মহিলা কলেজ

বাঁকুড়া 'হিন্দুবাণী' নিম্নের সংবাদটি দিতেছেন :

বাঁকুড়া মহিলা কলেজ অত্যন্ত উৎসাহের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে উহার অবস্থা দেখিয়া গভীর বেদনা বোধ না করিয়া পারিতেছি না। মহিলা কলেজ স্থাপনের কয়েক মাস পরেই বাঁকুড়ার সরকারী স্কীম অনুযায়ী একটি মহিলা কলেজ গঠনের তোড়জোড় সুরু হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত অর্থের প্রতিশ্রুতি অনায়াসেই সংগ্রহ করেন। তখন প্রথমোক্ত কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা উহার অঙ্কুরে বিনাশ আশঙ্কা করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। উভয় পক্ষের আলোচনার ফলে উক্ত কলেজের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া একটি নূতন কমিটি গঠিত হয়। প্রথমোক্ত কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কলেজ নূতন কমিটির হাতে তুলিয়া দেন।

মৌখিক ভাবে নয়া কমিটি কলেজটির পরিচালনাভার গ্রহণ করিলেও একমাত্র স্থান সংগ্রহের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করেন নাই। ফলে বর্ত্তমান বৎসরে ছাত্রী ভর্ত্তির ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল কাহারেও ভর্ত্তি করেন নাই।

বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ এই কলেজকে—শুধু এই কলেজ কেন, বাঁকুড়ার কোনও কলেজকেই তাঁহারা সুনজরে দেখেন নাই। এইবার তাঁহারা ছাত্রীদের সকলকেই নির্ব্বিচারে ভর্ত্তি করিয়াছেন। এই ছাত্রী ভর্ত্তি নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক এবং বাঁকুড়া মহিলা কলেজকে নষ্ট করার অভিসন্ধির গন্ধ ইহাতে পাওয়া যায়।

মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অভিভাবক-সমিতির উচিত ছিল, ছাত্রীদের সুনামের হানি যাহাতে না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। আশা করি, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া বর্ত্তমান অবস্থার মীমাংসা করিবেন।

স্কুল বোর্ডের অব্যবস্থায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

এই মহকুমার পুরুষোত্তমপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি ছয় বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ইহার কাজ চলিতেছে। বর্ত্তমানে গৃহটি একান্ত জরাজীর্ণ হইয়া শিক্ষক ও ছাত্রদের জীবনহানি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। বর্ষায় ঘরের মেঝেয় জল প্রবেশ করে। দেওয়ালেরও চূণবালি খসিয়া পড়িতেছে। গত ২২শে আগষ্ট উক্ত বিদ্যালয়ের এক কোণে অবস্থানকারী শিক্ষকের বিছানার মধ্য হইতে একটি বিষধর সর্প বাহির হওয়ায়, বিদ্যালয়-গৃহটি ছাড়িয়া একটি শিব মন্দিরের বারান্দায় বিদ্যালয় বসান হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়-গৃহ হইতে ৭টি বিষধর সর্প মারা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৃশ্চিকের উপদ্রব আছে। স্কুল বোর্ডকে বহু আবেদন করিয়াও বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মিত হইল না।

'দামোদর' পত্রিকার উক্ত সংবাদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মৌলবীবাজার রাস্তার দুরবস্থা

শ্রীহট্টের 'জনশক্তি' জানাইতেছেন :

শ্রীমঙ্গল হইতে মৌলবী বাজার পর্য্যন্ত ১০ মাইল যে সি, এন, বি, রাস্তাটি আছে তাহা এ জেলার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই রাস্তা দিয়া জেলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অর্থাৎ আখাউড়া হইতে তামাবিল পর্য্যন্ত মোটরযোগে যাতায়াত করা চলে। অদূরভবিষ্যতে ইহা চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। প্রতিদিন কয়েক সহস্র যাত্রী এই রাস্তা দিয়া পথ চলেন এবং অন্ততঃ শতাধিক ট্রাক, বাস, ও ট্যাক্সি এই পথ দিয়া প্রত্যহ চলাচল করিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিগত কয়েক বৎসর যাবত এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির প্রতি কর্তৃপক্ষের নিদারুণ অবহেলার দরুণ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ রাস্তাটির এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, স্বচ্ছন্দে মোটর চলাচল ত দূরের কথা পায়ে হাঁটিয়া চলাচল করাই অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। বাসগুলি কিছুদূর গিয়াই কাদায় আটকাইয়া থাকে। অতি কষ্টে প্যাসেঞ্জারদেরই নামিয়া মোটর ঠেলিতে হয়। ইহার ফলে যাত্রীদের শ্রীমঙ্গলে ট্রেন ধরা কিংবা মৌলবী বাজারে উপস্থিত হইয়া কোর্ট কাছারী করা অত্যন্ত দুর্ঘট ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার স্থানে স্থানে এমন অবস্থা যে, ধান বুনিয়া দিলে ভাল ফসলই হইতে পারে। রাস্তাটির দুরবস্থায় ২০।২৫ বৎসর আগেকার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। অবিলম্বে এই রাস্তাটির উপযুক্ত সংস্কার সাধনের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের পথ চলার দুর্গতি লাঘব করার জন্য সি, এন, বি, বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের ও ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

হাসপাতাল আউটডোরের অব্যবস্থা

'বর্দ্ধমান' পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

বিজয়চাঁদ হাসপাতালে আউটডোর বিভাগে সাধারণতঃ ৮টা হইতে ঠিক ১০টা পর্য্যন্ত রুগীর টিকিট দেওয়া হয়। কিন্তু মফঃস্বল হইতে অধিকাংশ রুগী উক্ত সময়ের মধ্যে হাসপাতালে উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ ট্রেন বা বাসের অধিকাংশই ৯-৩০, ৯-৪৫ এ বর্দ্ধমানে আসে এবং সেখান হইতে সময়মত টিকিট কাটা সম্ভব হয় না যাহার ফলে দূরদূরান্ত হইতে অনেক রুগী এখানে আসিয়া পরবর্তী সময়ের জন্য হরিসভার বারান্দা, ষ্টেশন, শ্যামসাগরের ঘাট ইত্যাদি স্থানে রাত্রি কাটাতে হয়। সকাল ৮টা-১০টার পরিবর্ত্তে সকাল ৮॥ হইতে ১১টা অথবা ৮॥ হইতে ১০॥ পর্য্যন্ত সময় ঠিক করিয়া দিলে দূরাগত বহু রোগীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষি বিভাগের উপেক্ষায় জমির ধান ধ্বংসের পথে

দেগঙ্গা থানার আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি জানাইতেছেন যে, ৭০০ বিঘা জমির ধান ঝাপির আক্রমণে ধ্বংস হইতেছে তবুও বারাসাত মহকুমার কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। দেগঙ্গা থানার হাদিপুর ঝিকরা ইউনিয়নের চামদামার পূর্ব্ব পার্শ্বে বোবাই বিলের সাত শত বিঘা জমির ধান ঝাপি সেওলার প্রভাবে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। এক হাঁটুর উপর জলের মাথায় ধান গাছগুলির বৃদ্ধির পথে ঝাপি সেওলা চাপিয়া ধরিতেছে। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ একান্ত নিরুপায় হইয়া বি, ডি, ও অফিসে সংবাদ দেয় কিন্তু অদ্যাবধি সরকারের তরফ হইতে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই বা গ্রামবাসীদের সাহায্য করা হয় নাই। বারাসাত মহকুমার কৃষি অফিসেও নাকি খবর দিয়া গ্রামবাসীবৃন্দ কোন প্রকার উত্তর পান নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

'বারাসাত' পত্রিকার এই সংবাদ সত্য হইলে ইহা সত্যই মর্ম্মান্তিক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশু ইহার প্রতিকার করিবেন ইহাই আশা করিতেছি।

ভাগচাষী অফিসারের কীর্তি

বাঁকুড়ার 'হিন্দুবাণী' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"ওন্দা থানার ভাগচাষ সংক্রান্ত মামলার বিচার জন্য যে অফিসার রহিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ উঠিতেছে।

কিছুদিন আগে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট নেতা ভূপাল পাণ্ডা দলবল সহ ভাগচাষ বোর্ড অফিস ঘেরাও করিয়া বহুবিধ হুমকী দেন। ঐদিন হইতে অফিসার মহোদয়ের বিচারের ধরনও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শুধুমাত্র হুমকী দ্বারা দলবিশেষের খেয়ালমত আইনের অপপ্রয়োগ করান গেলে তাহা অরাজক রাজত্ব ব্যতীত আর কি বলা যায়?

বর্ত্তমান বিচারে বর্গাদারদের পোয়াবারো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন অধিকাংশ জমির মালিক বা জোতদার কম্যুনিষ্টদের প্রচারিত বিপুল জমির মালিক নহেন। যাঁহাদের অল্পস্বল্প জমি বর্গায় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন—ফসলের কোনও ভাগ পাইতেছেন না। অনেকেরই দুর্দ্দশার সীমা নাই। আইন অনুযায়ী না চলিয়া এই ভাগচাষী অফিসার দলবিশেষের ডিকটেশনে চলিতেছেন কি না, তাহা তদন্ত করিয়া সরকার অবিলম্বে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।

ডাক-বিভাগের অব্যবস্থায় ডাক-বিলি ব্যাহত

'দামোদর' পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটির প্রতি ডাক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

গত ৩রা আগষ্ট হইতে আজ পর্য্যন্ত দুই সপ্তাহ জামালপুর থানার সাদিপুর ডাকঘর হইতে এখানকার গ্রামগুলিতে ডাক পিয়ন ডাক বিলি করিতে আসে নাই। জানা গেল সে ছুটি লইয়াছে। এই গ্রামবাসী বর্দ্ধমানে ডাক-বিভাগের সুপারকে জানাইয়াও প্রতিকার পান নাই। চক্ষণজাদী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এক অভিযোগ পি-এম-জিকে করা হইয়াছে।

রাস্তা সংস্কার চাই

'বর্দ্ধমান বাণী' জানাইতেছেন :

নিগন মঙ্গলকোট ও কর্জ্জনা মঙ্গলকোট রোডের জংশন হইতে ২২০ গজ পূর্ব্বে নিগন মঙ্গলকোট রোডের এক স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ার গরুর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমনকি মানুষ যাতায়াত খুব কষ্টকর হইয়াছে। এই স্থান হইতে আধ মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ বৎসর মাটি দিয়া উঁচু করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৃষ্টির জলে সমস্ত মাটি ধুইয়া যাইয়া রাস্তা পূর্ব্বেকার মত হইয়াছে। যাহা হউক যানবাহন চলাচল পূর্ব্বে কখনও বন্ধ হয় নাই, যদিও ক্যানেল জল ও বৃষ্টির জল একত্রিত হইলেই রাস্তা ডুবিয়া যাইত, অত্যধিক কাদা হইত। কিন্তু স্থানীয় লোকের অদৃষ্ট ফেরে এ বৎসর যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়াছে ও মানুষ চলাচল দুঃসাধ্য হইয়াছে। যাহাতে এই স্থানটি আশু মেরামত হয় সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

শিল্পপতি সুধীরকুমার সেন

খ্যাতনামা শিল্পপতি ও সেন র‍্যালে ইণ্ডাষ্ট্রিজের কর্ণধার সুধীরকুমার সেন মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে পশ্চিমবাংলার শিল্প-জগতে একজন দিকপালের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে চারিশত টাকা মূলধন লইয়া তিনি সাইকেল ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষুরধার ব্যবসা-বুদ্ধি, কঠোর শ্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পুরুষকার তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়াছে। তিনি ছিলেন ভারতে সাইকেল শিল্পের অগ্রদূত এবং চামড়া শিল্পের অন্যতম প্রবর্ত্তক। আত্মপ্রচারের প্রলোভন জয় করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার পরিচালনাধীন কারবারগুলির উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সকল কারবারে আজ আড়াই হাজারেরও বেশী লোকের কর্ম্ম সংস্থান হইতেছে। আরও গৌরবের কথা যে, ইহার মধ্যে দুইটি প্রতিষ্ঠান ভারতের শিল্পক্ষেত্রে, নিজ নিজ শাখায়, শীর্ষস্থান গ্রহণ করিয়া আছে। তাঁহার মৃত্যুতে শিল্প-ব্যবসাক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল, শীঘ্র তাহা পূরণ হইবার নহে। সুধীরকুমার ছিলেন, ডাক্তার নীলরতন সরকারের অন্যতম জামাতা।

তিনি অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাংবাদিকতাতেও তাঁহার আগ্রহ কম ছিল না। ১৯১৭ সনে 'ইণ্ডিয়ান সাইকেল এণ্ড মোটর জার্নাল' প্রতিষ্ঠা করেন।

পরলোকে ডাক্তার গণপতি পাঁজা

ভারতের বিখ্যাত চর্ম্মরোগবিশেষজ্ঞ ডাক্তার গণপতি পাঁজা গত ৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার পরলোক গমন করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি পিতৃ-মাতৃহীন হন। গ্রামে মধ্যস্কুল পর্য্যন্ত অধ্যয়নের পর তিনি বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জ্ঞানান্বেষণে কলিকাতায় আসেন এবং দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁহারই অভিভাবকতায় হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে স্বীয় প্রতিভাবলে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল এম. বি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ধীরে ধীরে নিজের অসাধারণ চেষ্টায় ও বিদ্যোৎসাহে তিনি চিকিৎসাজগতে সুনাম লাভ করিতে থাকেন এবং তৎকালীন ইংরাজ অধ্যাপকগণের সহিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চর্ম্মরোগ বিভাগের উদ্বোধন করেন। দীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সহিত যুক্ত থাকাকালীন তিনি সেখানকার প্যাথলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং বহু মৌলিক গবেষণা ও রচনা প্রকাশ করিয়া ভারতের বাহিরেও নিজের সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'কোটস' স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেন এবং ১৯৪৭ সনে তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রভূত সুনাম ও অর্থোপার্জ্জন করিয়াও তিনি জন্মস্থান বর্দ্ধমানের মাজিগ্রামের কথা ভুলিয়া যান নাই। তাঁহার অর্থসাহায্যে বহু দরিদ্র কৃতী ছাত্র শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়। তাঁহার জীবনের একমাত্র অসমাপ্ত স্বপ্ন সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রথম চর্ম্মরোগ গবেষণা-মন্দির স্থাপনের জন্য শেষ দিনটি পর্য্যন্ত তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন ঐ গবেষণা-মন্দিরের কর্ম্ম প্রধান ও স্থাপয়িতা। বঙ্গের সুসন্তান তিনি। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

কাব্যের স্বরূপ

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

বাংলা ভাষায় আমরা কাব্য বলিতে সাধারণতঃ কবিতা-পুস্তককেই বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু ব্যুৎপত্তি দ্বারা অর্থ বিচার করিলে কাব্য শব্দের অর্থ আরও অনেক বেশী ব্যাপক হওয়া আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য শব্দটি ব্যাপক অর্থেই গৃহীত হইয়াছে এবং প্রথিতযশাঃ ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ কাব্য শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, লক্ষণ, উদাহরণ সবকিছুই প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্যুৎপত্তি অনুসারে—কবির কর্ম্মবিশেষই কাব্য। আলঙ্কারিকপ্রবর রাজশেখর তাঁহার 'কাব্য-মীমাংসা' নামক গ্রন্থে এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবির কর্ম্মবিশেষ বলিতে তাঁহার রচনাকেই বুঝায়। কবির আহার, বিহার বা অন্যান্য কর্ম্মকে কেহই কাব্য বলেন নাই।

কবি শব্দের অর্থও সংস্কৃতে বহু ব্যাপক। 'কব্' ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা'। শব্দ-রচনায় যিনি নূতন কিছু দিতে পারেন, তাঁহাকেই কবি বলা হয়, অবশ্য এই নূতন রচনা এমন হওয়া আবশ্যক, যাহা শ্রোতৃবর্গের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। রাজশেখর বলিয়াছেন :

"শব্দার্থোক্তিষু যঃ পশ্যেদিহ কিঞ্চন নূতনম্
উল্লিখেৎ কিঞ্চন্ প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ।"

অর্থাৎ শব্দ, অর্থ বা উক্তির মধ্যে যিনি নূতন কিছু উপলব্ধি করিয়া স্বকীয় রচনায় প্রকাশ করেন ; অথবা পূর্ব্বাচার্য্যগণের উপলব্ধ সত্যকে নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই মহাকবি-পদবাচ্য। ইহা মহাকবির পরিমাণিক গুণ বটে, কিন্তু সাধারণ কবিদের মধ্যেও অল্পবিস্তর এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, তুলসীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হোমার, শেলি, কীট্স্, মিল্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রত্যেকেই নূতন ভঙ্গীতে নূতন ভাবধারা ভাষার ভিতর দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এই কারণেই তাঁহারা কবি। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লোকাতীত-প্রতিভা-সম্পন্ন কাব্যলেখকগণ নূতন ভাব প্রকাশে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন ; এই কারণেই তাঁহারা মহাকবি।

অনেকের ধারণা, যাঁহারা সুবৃহৎ কবিতাগ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারাই বুঝি মহাকবি নামে অভিহিত হন ; কিন্তু এই ধারণা ভুল। ক্ষুদ্র একখানা গ্রন্থেও (গদ্য, পদ্য বা গদ্য-পদ্য মিশ্র) যদি সুন্দর-সুললিত ভাষায় কোন নূতন সত্যের প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থের রচয়িতাকেও আমরা মহাকবি নামে অভিহিত করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যে 'গীতাঞ্জলি' নামক গ্রন্থখানা লিখিয়া নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহা আকারে বড় নহে। কালিদাস বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়া মহাকবি আখ্যা লাভ করেন নাই। তিনি জগৎকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া নূতন ভাব ও ভাষার সাহায্যে তাহাকে প্রকাশ করার ফলেই মহাকবিত্ব লাভ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণ আকারে বৃহৎ বটে, কিন্তু গ্রন্থের বৃহৎ আয়তনের জন্যই তাহার রচয়িতা মহাকবিরূপে স্বীকৃত হন নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে বিভিন্ন ঋতু, স্থান, নগর, যুদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনায় যে নূতন দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন, তাহারই ফলে তাঁহার মহাকবিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

কালিদাসের গ্রন্থসমূহের মধ্যে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম" নামক নাটকখানিকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহার মধ্যেও আবার চতুর্থ অঙ্কটিকে সার-স্বরূপ এবং এই চতুর্থ অঙ্কের চারিটি বিশেষ শ্লোককে কালিদাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া স্বীকার করা হয় :

কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কস্তত্র শ্লোক-চতুষ্টয়ম্।

উল্লিখিত চারিটি শ্লোকে কবি তাঁহার লোকাতীত মনন-শীলতা দ্বারা মানুষ, পশু, পক্ষী এমনকি অচেতন বৃক্ষাদির মধ্যেও এক লোকোত্তর অনুভূতি উপলব্ধ করিয়া অভিনব ভঙ্গীতে, চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই নাটকের অন্যান্য স্থলেও কবি এমন মনোরম শ্লোকসমূহ রচনা করিয়াছেন যে, তাহার নূতনত্ব, গাম্ভীর্য্য, বাস্তবতা এবং চিত্তগ্রাহিতার জন্য ঐ সকল শ্লোক পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক অবনত হইয়া আসে :

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবাস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥"

এই একটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে আমরা কবির যে অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যদর্শনের পরিচয় পাই এবং এই শ্লোকটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় ব্যক্তিগণের অন্তরে বিভিন্ন ভাবের সমাগমে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তাহা ভাবুক ব্যক্তিকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না। এইরূপ নূতন দৃষ্টিতে নূতন সত্য দর্শন করিয়া অভিনব ভঙ্গিতে তাহার প্রকাশই মহাকবিত্বের লক্ষণ।

সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতি তাঁহার গ্রন্থসমূহে, বিশেষ করিয়া "উত্তর-রামচরিতে" নূতন উপলব্ধ সত্যসমূহকে নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া মহাকবিত্ব লাভ করিয়াছেন। উত্তর রামচরিতের এক-একটি শ্লোক আমাদিগকে একেবারে বিভোর করিয়া ফেলে। ভারতীয় সমালোচকগণ কবির এই নূতন সত্যোপলব্ধি ও লোকাতীত প্রকাশভঙ্গী দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া নাট্যকার হিসাবে কালিদাসেরও উপরে ভবভূতিকে স্থান দিয়াছেন :

(কবয়ঃ কালিদাসাদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ।)

ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের :

"জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥"

অথবা :

"ন কিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ॥"

কিংবা :

"আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি কথ্যতে।"

প্রভৃতি এক-একটি শ্লোক বা শ্লোকাংশ পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কত সুখদুঃখের স্মৃতি আসিয়া আমাদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহা সহৃদয় পাঠক-মাত্রেরই সুবিদিত। সীতা-বিরহ-সন্তপ্ত শ্রীরামের মানসিক অবস্থা-বর্ণনায় কবি মাত্র দুইটি পঙ্‌ক্তি দ্বারা যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা একমাত্র ভবভূতির পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলিয়াছেন :

"অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাক-প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥"

মাত্র কয়েকটি শব্দদ্বারা কবি এমন নিপুণভাবে বিরহ-কাতর রামের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শ্লোকটি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই অবস্থাটি মনে মনে উপলব্ধি করিতে পারি। এইরূপ লোকাতীত বর্ণনাভঙ্গিই মহা-কবিত্বের পরিচায়ক।

শ্রীহর্ষের নৈষধীয়চরিতে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং অন্যান্য খ্যাতিমান সংস্কৃত কবির রচনায়ও আমরা লোকাতীত বর্ণনাভঙ্গিই দেখিতে পাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনায় নূতন-উপলব্ধ সত্যের নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশের অজস্র দৃষ্টান্ত বিদ্যমান :

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি
ভেসে যায় তারা সরে যায়;
জীবনেরে করে যায় ক্ষণিক বিদ্রূপ
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।"
—বলাকা

অথবা :

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়মাঝে যদি স্থান পাই॥"

প্রভৃতি বিভিন্ন কবিতায় কবির নূতন দৃষ্টি ও নূতন প্রকাশভঙ্গি পরিস্ফুট।

মিলটন, কীট্‌স্, বাইরন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি ইংরেজ কবিরাও এইরূপে নূতন দৃষ্টিতে বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য পাঠকগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা মহাকবি।

গদ্যকবিদের মধ্যে বাণভট্টের নাম সর্ব্বজনবিদিত। বাণভট্ট কবিতা রচনা করিয়া মহাকবি হন নাই। তিনি এক বিচিত্র গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াই মহাকবিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই গদ্যকাব্য 'কাদম্বরী' বর্ণনাভঙ্গী, ভাবসম্পদ ও নবীনতার জন্য আজও বিশ্বের বিস্ময়স্থল হইয়া রহিয়াছে।

ভবভূতি যে নাট্যরচনা করিয়া মহাকবি হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার রামায়ণ-চম্পূ, মহাভারত-চম্পূ, গোপালচম্পূ, নলচম্পূ প্রভৃতি গদ্য-পদ্যাত্মক চম্পূ কাব্যগুলির রচয়িতারাও তাঁহাদের নূতন ভাব ও নূতন রচনাভঙ্গির জন্য কবি অথবা মহাকবি হিসাবেই পরিচিত।

সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে কাব্যের প্রকারভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যভেদে কাব্যের দুইটি বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্যগুলিকে আবার রূপক ও উপরূপক ভেদে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া রূপকের মধ্যে দশটি এবং উপরূপকের মধ্যে আঠারোটি অবান্তর বিভাগও প্রদর্শন করা হইয়াছে। শ্রব্যকাব্যগুলি প্রথমতঃ পদ্য, গদ্য ও মিশ্রভেদে ত্রিধাবিভক্ত। তন্মধ্যে পদ্য-কাব্যগুলি খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্যভেদে দ্বিবিধ। গদ্যকাব্য-গুলি কথা ও আখ্যায়িকা ভেদে দুইপ্রকার এবং মিশ্রকাব্য-গুলি চম্পূ ও বিরুদভেদে দ্বিধাবিভক্ত। অতএব দেখা

যাইতেছে যে, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মতে গদ্য, পদ্য, মিশ্র, নাটক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর গ্রন্থই কাব্য হিসাবে বিবেচিত।

২

রচনার মধ্যে কিরূপ বৈচিত্র্য থাকিলে তাহাকে কাব্য বলা যায়—এই সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তানায়কগণের বিভিন্ন চিন্তাধারা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া বিভিন্ন গ্রন্থের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতি প্রাচীন গ্রন্থ অগ্নিপুরাণেও আমরা কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা দেখিতে পাই। অগ্নিপুরাণের মতে কাব্যের লক্ষণ, যথা :

"কাব্যং স্ফুটদলঙ্কারং গুণবদ্দোষবর্জ্জিতম্।"

অর্থাৎ যাহার মধ্যে স্পষ্টতঃই কোন অলঙ্কার আছে, এবং গুণেরও প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু কোন দোষ নাই, তাহাই কাব্য।

সাধারণতঃ অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রচনাভঙ্গী অলঙ্কার নামে পরিচিত। নারীদেহে যেমন হার, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার শোভাবৃদ্ধি করে, অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতিও তেমনি কাব্যের শোভাবৃদ্ধি করে বলিয়াই ইহাদিগকে অলঙ্কার বলা হয়। সাহিত্যদর্পণকার ত স্পষ্টই বলিয়াছেন :

"শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিসায়িনঃ
রসাদীনুপকুর্ব্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ।"

১০ম পরিচ্ছেদ

অগ্নিপুরাণকার নিজেও যে ইহা স্বীকার করিতেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী লেখা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। ৩৪৪তম অধ্যায়ে অগ্নিপুরাণকার লিখিয়াছেন :

"অর্থালঙ্কার-রহিতা বিধবেব সরস্বতী।"

অর্থাৎ অর্থালঙ্কার-রহিতা কাব্যরূপিণী সরস্বতী বিধবার তুল্য। অভিপ্রায় এই যে, বিধবারা যেমন দেহে আভরণ ধারণ না করায় শোভিত হন না, অলঙ্কার-রহিত কাব্যও তেমনি শোভা পায় না।

আচার্য্য দণ্ডীও তাঁহার কাব্যাদর্শ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অলঙ্কারকে কাব্যের শোভাবৃদ্ধিকারী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে)।

অলঙ্কারের এই স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে, হার, বলয় প্রভৃতি যেমন নারীত্বের অপরিহার্য্য চিহ্ন নহে, অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারও তেমনি কাব্যের অপরিহার্য্য চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে না।

"দমারামদমাদিন্দুরারাম-মদরা-দরাঃ।
দুরেরাম-মদারারি-মামদা গণসূচকাঃ॥"

এই জ্যোতিষশাস্ত্রীয় শ্লোকে অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কারের ছড়াছড়ি দেখা যায়; কিন্তু কোন মনোরম ভাব প্রকাশ না করায় উক্ত শ্লোককে কাব্য বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না।

"চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চটিজুতা পায়ে দিয়া চটার চটায় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।"—এই বাক্যে চকারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হইয়াছে; কিন্তু এই বাক্যটি কাব্য নহে, কারণ ইহাতে কোন চিত্তাকর্ষক ভাব নাই।

অর্থালঙ্কারযুক্ত যে কোন বাক্যকে হয় ত কাব্য হিসাবে স্বীকার করা চলে; কিন্তু অগ্নিপুরাণকার লক্ষণে সাধারণ ভাবে অলঙ্কারশব্দ গ্রহণ করিয়া শব্দালঙ্কারেরও গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার লক্ষণের এই অংশটি স্বীকার্য্য নহে।

তাহা ছাড়া 'অলঙ্কারযুক্ত বাক্যই কাব্য'—এইরূপ নিয়ম করিলে অলঙ্কারহীন কাব্যের কাব্যত্ব স্বীকার করা চলে না; কিন্তু বস্তুতঃ অলঙ্কারহীন বাক্যেও রস, ধ্বনি ইত্যাদি থাকিলে তাদৃশ বাক্যের কাব্যত্ব মনীষীগণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে।

'স্ফুটদলঙ্কার' শব্দটি দ্বারা অগ্নিপুরাণকার বলিতে চাহিয়াছেন যে, অলঙ্কার স্পষ্ট না হইলে সেই অলঙ্কারযুক্ত কাব্যের কাব্যত্ব হইবে না। কিন্তু :

"উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি।"

এই বাক্যে স্পষ্ট কোন অলঙ্কার নাই, অথচ মনোরম অর্থ প্রকাশ করায় এই বাক্যের কাব্যত্ব আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি। সুতরাং 'স্ফুটদলঙ্কার' শব্দটিও বৃথা হইতেছে।

'গুণবৎ' বিশেষণটিও লক্ষণে প্রযোজ্য নহে; কারণ কাব্যের গুণ যে মনুষ্যদেহের লালিত্য-প্রভৃতির তুল্য, একথা অগ্নিপুরাণকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ৩৪৬তম অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন :

"অলঙ্কৃতমপি প্রীত্যৈ ন কাব্যং নির্গুণং ভবেৎ।
বপুষ্যললিতে স্ত্রীণাং হারো ভারায়তে পরম্॥"

অর্থাৎ অলঙ্কারযুক্ত কাব্যেও যদি গুণ না থাকে, তাহা হইলে ঐ কাব্য প্রীতিজনক হয় না। স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য্য না থাকিলে যেমন হার ভারের তুল্য হয়; এক্ষেত্রেও তেমনি।

সৌন্দর্য্য বা লালিত্য প্রভৃতি গুণ যেমন নারীত্বের অপরিহার্য্য চিহ্ন নহে, বস্তুতঃ গুণও তেমনি কাব্যের অপরিহার্য্য চিহ্ন হইতে পারে না। অগ্নিপুরাণকার নিজেই শ্লেষ প্রভৃতি যে সাতটি শব্দগুণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের যে কোন একটি প্রত্যেক বাক্যে অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বথা গুণরহিত বাক্য পাওয়া অসম্ভব। পরবর্ত্তী-কালের আলঙ্কারিকগণও গুণের যে সকল বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতেও এই সত্যেরই উপলব্ধি হয়। আচার্য্য দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শ নামক গ্রন্থে শ্লেষ প্রভৃতি দশটি শব্দগুণের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ এবং সাহিত্যদর্পণে তিনটি মাত্র গুণ স্বীকার করিয়া তাহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শব্দরচনার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি গুণ থাকে—(১) দীর্ঘসমাসতা, (২) হ্রস্বসমাসতা এবং (৩) সমাসরাহিত্য।

সাত বা দশটি গুণের স্বীকর্ত্তারা এই তিনটি গুণের মধ্যেই অবান্তর বিভাগ কল্পনা করিয়াছেন। দীর্ঘসমাসতার নাম ওজঃগুণ (ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বম্)। হ্রস্বসমাসযুক্ত বাক্যে কতকগুলি শ্রুতিকটু বর্ণ না থাকিলেই তাহাতে মাধুর্য্যগুণ স্বীকার করা হয়, আর সমাসরহিত বাক্যে সরল অর্থ থাকিলে তাহাতে প্রসাদগুণ স্বীকার করা হইয়া থাকে (শব্দাস্তদ্-ব্যঞ্জকা অর্থ বোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ)। আপাতদৃষ্টিতে যদিও ইহাদের অতিরিক্ত স্থলেও বাক্য হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, তথাপি মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্য্যগণ উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ প্রাচীনোক্ত সাতটি বা দশটি গুণ এই তিন গুণেরই অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ, যে বাক্যে সমাস খুব কম থাকে, তাহা দ্বারা অতি শীঘ্র অর্থবোধ হয় বলিয়া তাদৃশ বাক্যে প্রসাদগুণ স্বীকার্য্য। চার-পাঁচটি সমাসযুক্ত বাক্যে, অথবা তিন-চারটি পদ মিলিয়া এক-একটি সমাস হইয়াছে—এমন, বাক্যে সাধারণতঃ মাধুর্য্যগুণই স্বীকার্য্য। যদি এতাদৃশ বাক্যে ট, ঠ, ড, ঢ প্রভৃতি বর্ণের অথবা শ্রুতিকটু সংযুক্ত বর্ণের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে তথায় মাধুর্য্যগুণ স্বীকার না করিয়া ওজোগুণই স্বীকার্য্য। অতএব প্রত্যেকটি বাক্যেই একটি না একটি গুণ থাকায়, গুণহীন বাক্যের সত্তা অসম্ভব।

সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন—"গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ" অর্থাৎ মানুষের দেহে যেমন শৌর্য্য প্রভৃতি গুণ থাকে, কাব্যের গুণও তেমনি। শৌর্য্যহীন মানুষের মনুষ্যত্ব যেমন ব্যাহত হয় না, তেমনি শ্লেষ প্রভৃতি বা ওজঃ প্রভৃতি গুণ না থাকিলেও কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট হইবে না। বস্তুতঃ শৌর্য্যহীন মনুষ্যের মধ্যে অন্যান্য গুণ বিদ্যমান থাকে। কোন মানুষই সর্ব্বথা গুণরহিত হয় না। কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি।

"দোষবর্জ্জিতম" শব্দটিও কাব্যলক্ষণে যুক্তিযুক্ত নহে। মনুষ্যদেহের আন্ধ্য, কুষ্ঠ প্রভৃতি যেমন তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে না, কাব্যদোষও তেমনি কাব্যের কাব্যত্ব নষ্ট করিতে পারে না। আচার্য্য বিশ্বনাথ ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"রত্ন কীটবিদ্ধ হইলেও যেমন তাহার রত্নত্ব নষ্ট হয় না, তেমনি দোষযুক্ত কাব্যের কাব্যত্বও অস্বীকার করা চলে না।" তবে দোষ কাব্যের উৎকর্ষহানি ঘটায়—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কাব্যের উৎকর্ষহানি আর কাব্যত্ব হানি কিন্তু এক কথা নহে।

আচার্য্য ভামহ তাঁহার "কাব্যালঙ্কার" নামক গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন—"শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।" অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ সম্মিলিত ভাবে কাব্যসংজ্ঞা লাভ করে। ভামহের অল্প-পরবর্ত্তী কাব্যাদর্শকার দণ্ডীও অনুরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। আচার্য্য দণ্ডী যদিও কাব্যের কোন লক্ষণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার মতে যে অর্থযুক্ত পদ-সমূহই কাব্যের শরীররূপে কল্পিত হয়, একথা তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন—(শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী)। পরবর্ত্তীকালে আচার্য্য রুদ্রট তাঁহার কাব্যালঙ্কার নামক গ্রন্থে "ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্" বলিয়া এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আচার্য্য বিদ্যাধরও তাঁহার একাবলী নামক গ্রন্থে "শব্দার্থৌ বপুরস্য" কথাটি দ্বারা ইহারই অনুকূলে মত দিয়াছেন।

বক্তা যে কোন একটা অর্থপ্রকাশের জন্যই বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রত্যেক বাক্যেরই বক্তার অভিপ্রেত একটি অর্থ অবশ্যই থাকে। রাম ভাত খায়; গরু মাঠে চরে; শিক্ষক ছাত্রদিগকে পড়ান—প্রভৃতি প্রত্যেকটি বাক্যই বক্তার ইষ্টার্থব্যবচ্ছিন্ন। কিন্তু এইরূপ সাধারণ বাক্যের কাব্যত্ব কেহই স্বীকার করেন না। এতাদৃশ বাক্যের কাব্যত্ব স্বীকার করিলে বাজারের হিসাব, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ছুটির দরখাস্ত প্রভৃতি সবকিছুই কাব্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধারণ ভাবে অর্থ থাকিলেই পদ-সমষ্টির কাব্যত্ব হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, সাধারণ অর্থযুক্ত নহে, কিন্তু বিশেষ অর্থে সমৃদ্ধ পদাবলীরই কাব্যত্ব হইয়া থাকে; তাহা হইলেও সেই বিশেষ অর্থ কিরূপ, তাহা বলা আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভামহ, দণ্ডী

প্রভৃতি আচার্য্যগণের উল্লিখিতকথাগুলিকে কাব্যের লক্ষণ বলা চলে না।

আচার্য্য বামনের মতে রীতিই কাব্যের আত্মা (রীতিরাত্মা কাব্যস্য)। বস্তুতঃ রচনার কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতিই রীতি নামে পরিচিত। আলঙ্কারিকপ্রবর বিশ্বনাথের মতে রীতি চারিপ্রকার, যথা—(১) বৈদর্ভী, (২) গৌড়ী, (৩) পাঞ্চালী এবং (৪) লাটী। আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণ' নামক গ্রন্থে উক্ত চারিপ্রকার রীতির লক্ষণ এবং উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সমাসরহিত বা অল্প সমাসযুক্ত রচনাকে বৈদর্ভী রীতির এবং দীর্ঘ সমাসযুক্ত রচনাকে গৌড়ীরীতির উদাহরণরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যে রচনায় চারি-পাঁচটি পদ মিলাইয়া এক-একটি সমাস করা হয় তাহা পাঞ্চালী রীতির এবং বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যবর্ত্তী রচনা লাটী রীতির উদাহরণ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কারণেই আচার্য্য বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদে বামনের উল্লিখিত মত খণ্ডন করিয়া লিখিয়াছেন :

"যত্তু বামনেনোক্তং 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' ইতি, তন্ন, রীতেঃ সংঘটনা-বিশেষত্বাৎ। সংঘটনায়াশ্চাবয়বসংস্থানরূপত্বাৎ, আত্মনশ্চ তদ্ভিন্নত্বাৎ।" অর্থাৎ—রীতি অবয়বস্বরূপমাত্র ; এই কারণেই মানুষের হস্তপদাদি সংস্থানকে যেমন মানুষ বলা যায় না, তেমনি রীতিকেও কাব্য বলা চলে না।

আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার "ধ্বন্যালোক" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—ধ্বনিযুক্ত পদসমষ্টিই কাব্য (কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ)। বস্তুতঃ কোন কোন সময়ে ধ্বনি থাকা সত্ত্বেও কাব্যত্ব হয় না ; আবার কখনও কখনও ধ্বনিব্যতিরিক্ত স্থলেও কাব্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ধ্বনি কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ বা আত্মস্বরূপ নহে। আচার্য্য বিশ্বনাথ আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যের উল্লিখিত মতের উপর দোষারোপ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রহেলিকাতেও ধ্বনি থাকে ; কিন্তু তাহার কাব্যত্ব অঙ্গীকৃত হয় না, সুতরাং ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা অসঙ্গত।

'যত্তু ধ্বনিকারেণোক্তম্—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ—' ইতি, তৎ কিং বস্ত্বলঙ্কার-রসাদিলক্ষণস্ত্রিরূপো ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মা', উত রসাদিরূপমাত্রো বা ? নাদ্যঃ, প্রহেলিকাদাবতিব্যাপ্তেঃ।..."

—সাহিত্যদর্পণ, ১ম পরিচ্ছেদ।

"পণ্ডিত মহাশয় নিমন্ত্রণে যাইতেছেন।' এই বাক্যটিকে কেহই কাব্য বলিবেন না। কিন্তু ইহার মধ্যেও ধ্বন্যর্থ নিহিত হইতে পারে। উক্ত বাক্য শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারে, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁহার ছাত্রেরাও নিমন্ত্রণে যাইতেছে, উক্ত দ্বিতীয় অর্থটিকে ধ্বন্যর্থই বলিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ ধ্বনি থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত বাক্যটির কাব্যত্ব হয় না। আচার্য বিশ্বনাথ এই দিক দিয়াও আনন্দবর্দ্ধনের লক্ষণে দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"অন্যথা-'দেবদত্তো গ্রামং যাতী'তি বাক্যে তদ্‌ভৃত্যস্য অনুসরণরূপব্যঙ্গ্যাবগতেরপি কাব্যত্বং স্যাৎ।"

আচার্য্য মম্মট তাঁহার কাব্যপ্রকাশ নামক গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন—"অদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ কাপি।" অর্থাৎ দোষহীন এবং গুণযুক্ত শব্দার্থই কাব্য। 'শব্দার্থৌ' পদটি দ্বারা তিনি শব্দ এবং অর্থ উভয়েরই কাব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'অনলঙ্কৃতী পুনঃ কাপি' বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ অলঙ্কার-সমৃদ্ধ শব্দার্থেরই কাব্যত্ব হইয়া থাকে বটে, তবে কখনও কখনও অলঙ্কার-বিরহিত স্থলেও কাব্যত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মম্মটের মতে অলঙ্কার কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। তিনি 'অদোষৌ' এবং 'সগুণৌ' এই দুইটি বিশেষণের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ দোষযুক্ত স্থলেও যে কাব্যত্ব স্বীকার করা চলে, একথা তিনি নিজেই অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন :

"ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ।
ধিক্ ধিক্ শক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিংকুম্ভকর্ণেন বা
স্বর্গগ্রামটিকা-বিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ॥"

এই শ্লোকটির উত্তমকাব্যতা মম্মটভট্ট স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই শ্লোকে দুইটি বিধেয়াবিমর্শ দোষ বিদ্যমান। দোষহীনতা বা গুণযুক্ততা যে কাব্যের লক্ষণ হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

আচার্য্য ক্ষেমেন্দ্রের মতে ঔচিত্যযুক্ত বাক্যই কাব্য। কিন্তু উক্ত আচার্য্য তাঁহার ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা' নামক গ্রন্থে ঔচিত্য এবং অনৌচিত্যের যে সকল লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি দোষরাহিত্য অর্থেই অনৌচিত্য শব্দটিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

বক্রোক্তিজীবিতকার আচার্য্য রাজানক কুন্তলের মতে 'বক্রোক্তিযুক্ত বাক্যই কাব্য' (বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্), তিনি বক্রোক্তির লক্ষণ করিয়াছেন—"বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে"। অর্থাৎ পাণ্ডিত্যসূচক প্রকাশভঙ্গীরই নাম বক্রোক্তি। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা এক বস্তু নহে। শব্দপণ্ডিতের রচিত অর্থগাম্ভীর্য্যহীন শব্দবিন্যাসকে প্রায় কেহই কাব্য বলেন না। প্রতিভা-সম্পর্কবিহীন বর্ণাদি-

সাদৃশ্যমাত্রের কাব্যত্ব যে আমাদের অনভিপ্রেত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রতিভা বলিতে নূতন ভাবে প্রকাশ করিবার বিশেষ ক্ষমতাকে বুঝায় (প্রজ্ঞাং নবনবোন্মেষশালিনীং প্রতিভাং বিদুঃ)। বর্ণসাদৃশ্যমাত্র সংগঠনে এইরূপ প্রতিভা আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি না। যে সকল আলঙ্কারিক শব্দালঙ্কার স্থলের কাব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহাকে অধমকাব্যের পর্য্যায়েই স্থান দিয়াছেন। আচার্য্য কুন্তলের মতে, অর্থগাম্ভীর্য্যহীন কেবলমাত্র অনুপ্রাস বা যমকাদিযুক্ত বাক্যও কাব্যরূপে বিবেচনীয়। তিনি বক্রোক্তির মধ্যে যে ছয়টি প্রধান বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে "বর্ণবিন্যাসবক্রত্বং পদপূর্ব্বার্দ্ধবক্রতা" প্রভৃতি কথাদ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমরা আচার্য্য কুন্তলের সহিত একমত নহি।

সাহিত্যদর্পণকার আচার্য্য বিশ্বনাথ বলেন—রসই কাব্যের আত্মা (বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম) তিনি শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত এবং বৎসল নামে দশটি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায়, উক্ত দশটি রসের অতিরিক্ত স্থলেও কাব্যত্ব হইতে পারে। ধ্বনিযুক্ত বাক্যের উত্তম-কাব্যতা স্বীকার করিয়া আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এমন একটি উত্তম-কাব্যের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, যাহাতে কোন রসই নাই। তিনি বলিয়াছেন:

"নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।"

এই বাক্যে অন্ধ শব্দটি অপ্রকাশ রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছে; এবং ফলে এখানে হইয়াছে —"উত্তমকাব্যত্ব"। অন্ধ শব্দের অপ্রকাশ রূপ অর্থ প্রকাশে কোনরূপ রসের উপস্থিতি হয় না; সুতরাং এখানে নীরস বাক্যেরই উত্তম-কাব্যতা স্বীকৃত হইল। অতএব, রসকে কাব্যের আত্মা বা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলা চলে না।

কেহ কেহ বলেন—উক্ত পংক্তিটির পূর্ব্বে বাল্মীকি-রামায়ণে যে আর একটি পংক্তি আছে, তাহার যোগে এখানেও শৃঙ্গাররস ধ্বনিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্বের পংক্তি যথা:

"রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারাবিলমণ্ডলঃ।"

এখানে দুইটি কথা লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ ধ্বনি যে শব্দটি দ্বারা হইয়াছে বলিয়া স্বয়ং বিশ্বনাথই স্বীকার করিয়াছেন, তাহার ধ্বন্যর্থপ্রকাশে পূর্ব্ববর্ত্তী পংক্তির কোন উপযোগিতা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে দর্পণকার নিজেই উদাহরণ প্রদর্শনকালে সমগ্র শ্লোকটি প্রদর্শন করিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, এখানে শৃঙ্গাররস স্বীকার করিবার মত কোন কারণ নাই। এখানে না আছে 'রতি' স্থায়ীভাব, না আছে তাহার কোন বিভাব বা অনুভাব। একটি স্বভাবোক্তি এবং আর একটি উপমা অলঙ্কার আছে বটে, কিন্তু ইহারা রসের জনক নহে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, উল্লিখিত বাক্যে রস ছাড়াই কেবল একটি মনোরম ধ্বনি থাকার ফলে উত্তম-কাব্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

আলঙ্কারিক-প্রবর জগন্নাথ তাঁহার "রসগঙ্গাধর" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"। তাঁহার মতে, রমণীয়তা শব্দের অর্থ—'লোকোত্তরাহ্লাদ-জনক-জ্ঞান-গোচরতা'। অর্থাৎ, জগন্নাথ পণ্ডিতের মতে লোকাতীত আনন্দের উৎপাদক শব্দই কাব্য। এই রমণীয়তাকে তিনি চমৎকারিতা নামেও অভিহিত করিয়াছেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, বিস্ময় নামক আস্বাদ-বিশেষই চমৎকারিতা-পদবাচ্য। এইরূপ বিভিন্ন বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি বিশেষ আনন্দের উৎপাদক শব্দেরই কাব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শব্দ থাকিলেই তাহার একটি অর্থ থাকে—এই মত স্বীকার করিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শব্দ বলিতে সার্থক শব্দকেই বুঝিয়াছেন।

সকল মানুষের অনুভব বা গ্রহণ ক্ষমতা সমান নহে। একজনের মনে যে শব্দ আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে না, অপর ব্যক্তির মনে সেই শব্দই লোকাতীত আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, সহৃদয় ব্যক্তির মনে আনন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ শব্দেরই কাব্যত্ব স্বীকার্য্য। সহৃদয় বলিতে কাব্যের বা রস, ধ্বনি প্রভৃতির আস্বাদনে সমর্থ ব্যক্তিকেই বুঝা যায়।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে। জগন্নাথ পণ্ডিতের উক্ত লক্ষণ স্বীকার করিয়া লইলে বেণু, বীণা প্রভৃতির বাদ্য-ধ্বনিরও কাব্যত্ব হইয়া পড়ে, কারণ এইগুলিও সমজদার ব্যক্তির অন্তরে আনন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ এবং ইহারা শব্দও বটে। ইহাদের অর্থ নাই—একথা বলাও সঙ্গত হইবে না, কারণ প্রয়োজন অর্থে অর্থ শব্দটিকে গ্রহণ করিলে ইহাদিগকে সার্থকই বলিতে হইবে। মানুষের মনে আনন্দ উৎপাদনরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই বীণা, বেণু প্রভৃতির বাদন করা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা যে আনন্দ জন্মে সাধারণ আনন্দ হইতে তাহার পার্থক্যও পরিস্ফুট। সুতরাং এই আনন্দকে লোকাতীত আনন্দই বলা উচিত। বস্তুতঃ কেহই বীণা প্রভৃতির শব্দকে কাব্য বলেন না।

তাহা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের অপানবায়ুর শব্দ, কিংবা উপসর্য্যা গাভীর পশ্চাতে ধাবমান বৃষের কামজ হুঙ্কারধ্বনি

অনেক সময়ে শ্রোতার মনে অসাধারণ আনন্দ সৃষ্টি করে। সুতরাং জগন্নাথ পণ্ডিতের লক্ষণ অনুসারে তাদৃশ শব্দেরও কাব্যত্ব স্বীকার্য্য। কিন্তু কোন মনীষী ব্যক্তিই এতাদৃশ শব্দের কাব্যত্ব স্বীকার করিবেন না। অপানবায়ুর শব্দ বা বৃষের হুঙ্কারধ্বনিদ্বারা যাঁহাদের আনন্দ জন্মে, তাঁহারা সহৃদয় নহেন—এই যুক্তিতেও উক্ত লক্ষণ স্বীকার করা চলে না, কারণ ইহারা যে সহৃদয় নহেন তাহার প্রমাণ কি? আর উক্ত প্রকার আনন্দকে লোকাতীত না বলিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। কেবলমাত্র এক শ্রেণীর আনন্দপ্রিয় রসিক ব্যক্তিরাই তাদৃশ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সাধারণ সকল মানুষ নহে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, জগন্নাথ পণ্ডিতের উল্লিখিত কাব্যলক্ষণও নির্দ্দোষ নহে।

এতদ্ব্যতীত আরও কোন কোন মৌলিক বা টিকাগ্রন্থের রচয়িতা আলঙ্কারিক আচার্য্য কাব্যের লক্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষণও নানাবিধ দোষে দুষ্ট।

৩

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের কৃত কাব্যলক্ষণসমূহের মধ্যে একটিকেও আমরা স্বীকার করিতেছি না। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় কাব্যের লক্ষণ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাও এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় কাব্যের লক্ষণ হিসাবে বলা যাইতে পারে ঃ

"বাক্যস্যৈব হি কাব্যত্বং পণ্ডিতৈঃ পরিকল্প্যতে।
প্রতিভা-রচিতন্তত্র বৈচিত্র্যং নিহিতং যদি॥"

অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে যদি প্রতিভা-রচিত বৈচিত্র্য অন্তর্নিহিত থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ বাক্যের কাব্যত্ব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, "বৈচিত্র্যবদ্ বাক্যং কাব্যম্" এইরূপ লক্ষণ করিলেই ত চলিতে পারে, তাহার সঙ্গে আবার 'প্রতিভারচিত' প্রভৃতি বিশেষণ সংযোগের আবশ্যক কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিব—বৈচিত্র্য কোন কোন সময়ে প্রতিভা ব্যতিরেকেও থাকিতে পারে। দেব, মনুষ্য এবং রাক্ষস এই তিনটি শব্দের আদ্যক্ষরগুলিকে পর পর সাজাইয়া যখন "দশারাম-দশাদিন্দু-রারাম..." প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় শ্লোকে কতকগুলি অনুপ্রাস সৃষ্টি করা হয়, তখন তাদৃশ শ্লোকে আমরা কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় আছে বলিয়া মনে করি না—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল অনুপ্রাসযুক্ত 'চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়...' ইত্যাদি বাক্যের যে কাব্যত্ব হয় না, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। উল্লিখিত স্থলসমূহে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তাহা প্রতিভারচিত নহে, সুতরাং তাদৃশ-বৈচিত্র্যযুক্ত বাক্যের কাব্যত্ব হয় না। এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই লক্ষণে 'প্রতিভা-রচিত' বিশেষণটি প্রয়োগ করিয়াছি।

জ্যোতিষ, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে বিবিধ তত্ত্বের বিশ্লেষণে যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশের সময় মনোরম শব্দরচনা চাতুর্য্যের সাহায্য গ্রহণ না করায় আলঙ্কারিকগণ তাদৃশ প্রতিভাসূচক জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের বাক্যকেও কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন না। আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁহার সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, শ্রোত্রিয় মীমাংসক প্রভৃতির রত্যাদি বাসনা না থাকায় তাঁহাদের রসাস্বাদ হয় না (বাসনা চ ইদানীন্তনী প্রাক্তনী চ রসাস্বাদ-হেতুঃ। তত্র যদি আদ্যা ন স্যাত্তদা শ্রোত্রিয়-জরন্মীমাংসমানায়পি সা স্যাৎ...)। যিনি রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে রসসৃষ্টিও সম্ভবপর নহে। নৈয়ায়িক, মীমাংসক প্রভৃতিকে কেহই সাহিত্যিক বলেন না, সুতরাং তাঁহাদের রচনাও সাহিত্য নহে। সাধারণ অর্থে তাঁহারা কবিও নহেন, সুতরাং তাঁহাদের রচনাও কাব্য নহে। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, বাক্যের মধ্যে প্রতিভারচিত বৈচিত্র্য মনোরম শব্দার্থবিন্যাসের দ্বারা নিহিত হইলেই তাদৃশ বাক্যের কাব্যত্ব স্বীকৃত হয়, অন্যথা নহে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আমরা লক্ষণে 'নিহিতং' পদটি গ্রহণ করিয়াছি।

উল্লিখিত প্রতিভা-রচিত বৈচিত্র্য, রস, ভাব, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি যে কোনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে; এবং উক্ত রসাদির যে কোন একটি দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেই তাদৃশ বাক্য বা বাক্যসমষ্টির কাব্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠ কথা

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

জীবনের শ্রেষ্ঠ কথাটি অলক বোঝাইতে চায় স্বস্তিকাকে। সেই অনুরোধ জানিয়েছিল তাকে, শুনতে রাজি হয়েছে স্বস্তিকা। তাই এ অনুরোধকে স্বীকৃতি দিয়েছে সে—সে শুনবে অলকের শ্রেষ্ঠ কথা। এ শোনা তার নূতন নয়, যৌবনবতী মেয়েদের একুশ-বাইশ বছর জীবনে, অনেকেরই যৌবনের শ্রেষ্ঠ কথা শুনতে হয়। কানের কাছে অস্ফুট গুঞ্জনে অনেকবারই শোনে—আমি তোমায় ভালবাসি। শুনতে মন্দ লাগে না। সব মেয়েই পুরুষদের মুখ থেকে এ কথা শুনতে চায়, এ শুনে আশা মিটে না, জীবনের শেষ-ক্ষণটি পর্যন্ত শুনলেও এ আশা মিটবে না, মেটবারও নয়। তাই অলকের মুখ থেকে আর একবার একথা শুনতে সে রাজি হয়। কলেজ-ফেরত কার্জন পার্কের এক ছায়াঘন তরুতলে বসে সে শুনতে চায় অলকের জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা।

সামনাসামনি বসেছিল দু'জনে। স্বস্তিকা বসেছিল একটু আড় হয়ে, হাতের ওপর দেহের ভর রেখে। অলক বসে-ছিল তারই সামনে স্বস্তিকার কলেজ-পাঠ্য কাব্যগ্রন্থখানি হাতে করে। কথা বলছিল স্বস্তিকা, বলছিল, মর্তধামে এত সব বৈচিত্র্যপূর্ণ, ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান থাকতে এ স্থানটি তোমার পছন্দ হবার হেতু কি ?

অলক জবাব দিল, জানি না। নিজেকে প্রশ্ন করেও দেখিনি। তবে এমনি একটা জায়গার প্রয়োজন ছিল বলেই হয়ত খুঁজে পেয়েছি জায়গাটা—মন্দ কি!

—মন্দ নয়, ভালই। বলব তোমার পছন্দ আছে।

—ওকথা বন্ধুরাও বলে, আমার পছন্দ যে ভাল একথা তারা স্বীকার করে। আবার আমার মুখে তোমার কথা শুনে ঈর্ষাও করে।

—ঈর্ষা করে তোমাকে ? কারণ ?

—কারণ একটা নয় একাধিক, শুনলে হয়ত ঈর্ষা করবে তুমিও। অলক হাসে।

স্বস্তিকাও মুখ টিপে হাসে। বলে, না, করব না—তুমি বল।

—বলি, বলব বলেই তোমায় আবাহন জানিয়ে ডেকে এনেছি এখানে।

—আশ্চর্য!

—কেন ?

—ঈর্ষা করব জেনেও আমায় ডেকে এনেছ এখানে, প্রকৃতির এই রম্য উদ্যানে, এই শান্ত পরিবেশে ?

—উপায় নেই। এমন পরিবেশ না হলে জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা বলা যায় না। সেকথা বলার দিনক্ষণ আছে, তিথিনক্ষত্র আছে, পরিবেশ আছে। তাই ত কবি বলেছেন, এমন দিনে তারে বলা যায়।

স্বস্তিকা বাধা দিয়ে বলে উঠে, না গো মশাই, কবি এমন দিনের কথা নিশ্চয়ই বলেন নি, এমন পরিবেশের কথাও বলেন নি। কোথাও বলেন নি যে, এসপ্লানেডের মোড়ে এসে, কর্মব্যস্ত মহানগরীর মাঝখানে বসে প্রকাশ্য দিবালোকে শত-সহস্র কৌতূহলী আঁখির ধাক্কা খেয়ে কাঠফাটা রোদে ঘেমে-নেয়ে সেকথা বলতে। বরঞ্চ বলেছেন, ঘনঘোর বরষার কথা। তপনহীন ঘন তমসার কথা, ঝরঝরে বাদলের ধারার কথা, আরও চারিধার যখন নির্জন সেই সময়ের কথা। আর বলেছেন, শ্রাবণ বরিষণে, একদা গৃহকোণে। বলেন নি যে, তপন হুতাশনে, মাঠের মাঝখানে। এ পরিবেশ তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল।

অলক বলে, ও সেকেলে কবির কথা। একালের কবিরা বলেন :

এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন মোহময় তরুছায়।

দু'জনেই হেসে ওঠে—উন্মুক্ত ময়দানে উন্মুক্ত হাসি। পথচারীর দল ঈর্ষাকাতর চোখে ফিরে ফিরে তাকায়। স্বস্তিকা বলে, মাগো, কি মনে করছে লোকেরা সব!

—কিছু না, অন্ততঃ অনুচিত কিছু নয়। যা স্বাভাবিক হয়ত মনে করছে তাই। কিন্তু ও সব তুচ্ছ ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামানই ভাল।

—ভাল কথা, মাথা ঘামাব না। কিন্তু মহারাজের দ্বিতীয় আদেশ কি জানতে পারি ?

—পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধর মহারাণী, বললেই ফুরিয়ে যাবে এখুনি। বলার মাধুর্য ততক্ষণ যতক্ষণ কথাটা না বলা যায়।

স্বস্তিকা মুচকি হাসে। বলে, কথাটা একালের কবির মত হ'ল। সেকালের কবি হলে বলতেন, বলার মাধুর্য ততক্ষণ যতক্ষণ সেটাকে বলা যায়। কিন্তু কবির লড়াইয়ে

কাজ নেই। তোমার বলা না বলার দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত আমার শোনার মাধুর্যই উবে যাবে।

—ও কাজটি কর না, লক্ষ্মীটি মহারাণী। এইটাই আমার জীবনের এক মাত্র মুখ্য কথা। আর এর সৃষ্টি আমার অন্তরে শুধু তোমাকে শোনাব বলে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধরে একে গড়ে তুলেছি তিলে তিলে।

—তা হলে তিলোত্তমা বল।

—ঠিক তাই। যত উত্তম কথার সার আছে, তাদের অংশ নিয়েই এর জন্ম। তাই এ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা এবং একমাত্র মুখ্য কথা।

—বেশ লাগছে কিন্তু, তুমি থেম না, বল।

—আরও ভাল লাগবে যখন সবটা শুনবে।

—আচ্ছা এইটাই তোমার যদি একমাত্র মুখ্য কথা হয় তা হলে এতদিন যা শুনিয়েছ বা শুনে এসেছি, সে সব গৌণ ?

—তোমার অনুমান মিথ্যে নয়।

—আশ্চর্য !

—আশ্চর্যই ত। আমিও ভাবি, এতদিন এ কথাটা তোমায় না শুনিয়ে শুধু বকে গিয়েছি আবোলতাবোল।

—বল কি ? এও বিশ্বাস করতে হবে আমায় ?

—হবে। শুনলেই বুঝতে পারবে আজকের কথাটা আমার একেবারে টাটকা, আনকোরা। এ কথা বলবার সৌভাগ্য আমার যেমন হয় নি, শোনবার সৌভাগ্যও তোমার তেমনি হয় নি।

—হা ভগবান! আমার এ দুর্ভাগ্যের কারণ ? স্বস্তিকা একটু বাঁকা চোখে তাকায় ভ্রূ দুটি কুঁচকে।

—আমার সাহসের অভাব।

—বল কি ? সাহসের অভাব মানে ভয় ?

—তাই।

—ভারী আশ্চর্য ত! কিন্তু এত ভয় কাকে ?

—তোমাকে। পাছে মনে কর ভারী হ্যাংলা, ভারী লোভী আমি, তাই বলি নি। লুকিয়ে রেখেছি মনের কোণে।

স্বস্তিকা মুখ টিপে একটু মিষ্টি হাসি হাসে। তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, ওগো নির্লোভী, নির্ব্যক্ত পুরুষ! এতদিন যা লুকিয়ে রেখেছ বক্ষে তা লুকান থাক বক্ষে। তাকে ব্যক্ত করে কাজ নেই তোমার।

অলক বলে, ওগো মহারাণী! আমি নির্লোভী নই। আমি মধুলোভী। সুতরাং অব্যক্তকে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাব না আমি।

'স্বস্তি' কথাটার উপর জোর দেয় অলক।

স্বস্তিকা বোঝে। কিন্তু না বোঝারই ভান করে। ঘাড়টা বেঁকিয়ে মুখখানাকে একটু আড়াল করে মাত্র।

অলক একটু ইতস্ততঃ করে তার পর বলে, শুনেছ বোধ হয় একটা চাকরী পেয়েছি আমি ?

—শুনেছি। স্কুল মাষ্টারের চাকরি। স্বস্তিকা বলে, ভাল মানুষের মত।

—অলক প্রতিবাদ করে, কক্ষণ না। কলেজের লেকচারারের।

—ঐ একই হ'ল। স্কুল মাষ্টারও যা, লেকচারারও তা।

—বল কি ? স্কুল মাষ্টারও যা, লেকচারারও তা!

—আমি ত জানি তাই। তফাৎ শুধু টিকিতে। এক-জন টিকিধারী আর একজনের টিকি নেই।

—তুমি ঠাট্টা করছ ?

—মোটেই নয়, যা জানি তাই বললাম।

—এ তোমার ভুল জানা।

—তা হবে।

—তুমি ত জান, কলেজে লেকচারার আছে, এ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর আছে, প্রফেসরও আছে।

স্বস্তিকা প্রশান্ত মুখে বলে, জানি বলেই ত বলছি গো মশাই। তুমি বঁড়শীও নও, টঁড়শীও নও, একেবারে লোহা বেঁকান। কিন্তু দক্ষিণে পাবে কত ? একে শূন্য দশ, দশে শূন্য—।

—না। দু'শো থেকে ছ'শ স্কেল। এ্যাসিষ্টেন্ট প্রফেসর ছ'শ থেকে হাজার। প্রফেসর পনর'শ।

—দু'শো ? ফুঃ, আজকাল দু'শো টাকা আবার টাকা নাকি। একজনেরই ত হাত খরচ।

অলক কেমন যেন মিইয়ে যায়। বোকার মত তাকিয়ে থাকে স্বস্তিকার মুখের দিকে।

স্বস্তিকা বলে, গত মাসে আমার কত টাকা হাত-খরচ হয়েছিল জান ? দু'শো, তোমার মাইনে যা, তাই।

—দু'শো ? অলক ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে।

দু'শো। অবশ্য বাবা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন বটে, কিন্তু সমাজে একটু ভদ্রভাবে চলাফেরা করতে গেলে ওর চেয়ে কমে যে কি করে হতে পারে, আমি বুঝতে পারি না। তিনখানা শাড়ীরই ত দাম নিল দেড়'শ টাকা। তার উপর জামা আছে, জুতো আছে, এটা আছে, ওটা আছে। একটার পর একটা লেগেই ত আছে। টায়েটুয়ে কুলিয়েছে কোন মতে।

অলকের জিভটা আড়ষ্ট হয়ে আসে। তবুও কোন মতে বলে, দু'শো টাকা নেহাৎ ত কম নয় স্বস্তি! একা লোকের পক্ষে—।

স্বস্তি একটুখানি হাসে। বলে, কম ত নয় বুঝলাম। কিন্তু দিনকাল যে বড় বিশ্রী। এক টাকার জিনিসটার দাম পাঁচ টাকা। এই কাপড়খানার দাম কত নিয়েছে জান? পঞ্চাশ টাকা। এর চেয়ে আর কি খেলো কাপড় পরব বল ত? বলে নিজের শাড়ীর আঁচলখানা তুলে ধরে হাতে করে।

অলক আড় চোখে তাকিয়ে দেখে। ছুধে গরদে শাড়ী। তার কুচকুচে কালো ভোমরা-পাড়ের বাহারই বা কত। ও শাড়ী সাধারণের জন্ম নয়। যার জন্ম এ শাড়ী, সমাজে বাস করবার এই হ'ল তার নিম্নস্তরের অঙ্গাবরণ। অলকের কান দুটি বর্ণ-বৈচিত্রে রক্তিমাভ ধারণ করে।

সমাজে বাস করবার উপকরণের প্রকরণ নিয়ে অলক তর্ক করে না। শুধু বলে, খেলো কাপড় তোমায় পড়তে বলি না। তোমার দেহে বা মনে যা সহ্য হবে না সে কাজে তোমায় প্রবৃত্তি আমি দেব না। দু'শো টাকা খরচ করবার সৌভাগ্য তোমার যদি হয়, আমার হিংসা করা উচিত নয়। তবে এমনতর সৌভাগ্যবতীর সংখ্যা আমাদের দেশে সত্যিই বিরল। অলক থামে। পরমুহূর্তে মুখে একটু ম্লান হাসি টেনে এনে কতকটা আত্মগত ভাবে বলে, কিন্তু যার আয় মাত্র দু'শো টাকা, তার ঘরে হাত খরচই যদি দু'শো টাকা হয় তা হলে মনের ক্ষুধাই মিটবে, পেটের নয়।

স্বস্তিকা আড় নয়নে তাকায়। ঠোঁটে তার বাঁকা হাসি। দৃষ্টি করুণাঘন। বলে, থাক, ও সব কথা নাই বা ভাবলে তুমি। এখন শোনাও তোমার 'মুখ্য কথার' কাহিনী।

অলক ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ে। একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভাব দেখা দেয় তার মধ্যে। একটা পরিবর্তন এসে যায় তার মুখে-চোখে। বলে, না থাক।

স্বস্তিকা বলে, থাকবে কেন, তুমি বল।

অলক এবার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে। মনে হ'ল, সে যেন তার সর্ব অন্তর্দ্বন্দ্বে জয়ী হ'ল এতক্ষণে। বলল, না, এ বলবার নয়, আর এ তোমার শোনবারও নয়। মুখ্য কথা বলার মত মূর্খামি আর কখনও প্রকাশ পাবে না যেন।

—কারণ?

—অপ্রকাশ্য। তবে এর পরও সে কথা বলার মত ধৃষ্টতা যদি জাগে, জেন, সে হবে আমার পক্ষে চরম বেয়াদপি।

এতক্ষণকার মধুর পরিবেশ সহসা বিধুর হয়ে উঠে। এটুকু বুঝতে পারে স্বস্তিকা। তাই প্রসঙ্গটির গতি পরিবর্তনের চেষ্টা করে। বলে, শুনেছ বোধ হয়, বিকাশ ফিরছে।

—বিকাশ! অলক চমকে উঠে।

—হ্যাঁ বিকাশ। চিনতে পারছ না তাকে?

অলক ঘাড় নাড়ে, পাচ্ছি। তাকে ভুলি নি। সে ভুলবার নয়।

স্বস্তিকা বলে, এর পর আরও ভুলতে পারবে না। মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়র হয়ে ফিরছে সে। বিলিতী কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়র। বিলেতে থাকতেই চাকরি যোগাড় করে আসছে। মাইনেও বড় কম নয়। বার'শ টাকা। এ ছাড়া গঙ্গার ধারে ফ্রি কোয়ার্টার। চাকর দারোয়ান সব ফ্রি। পরশু এয়ারে এসে পৌঁছায় দমদমে।

—ভাল কথা। কিন্তু এত খবর পেলে কোথা থেকে? চিঠি দিয়ে জানিয়েছে বুঝি? অলকের কণ্ঠ শুষ্ক, স্বরও শুষ্ক।

—না, জানায় নি। তবে খবর পেয়েছি। তাকে রিসিভ করতে যাব দমদমায়।

অলক অবাক হয়ে যায়। বলে, আশ্চর্য! তোমাকে জানায় নি, তবুও যাবে? এমন রবাহূতের মত যাওয়া শোভনীয় হবে?

—না, হবে না। এ আমি জানি। এ শোভনীয়ও নয়, লোভনীয়ও নয়। তবুও যেতে হবে। না গিয়ে উপায় নেই আমার।

—কেন?

স্বস্তিকা উত্তর দেয় না। মুখ নীচু করে চুপ করে থাকে। অলক জিদ করে, বলে, বল, কেন উপায় নেই তোমার?

স্বস্তিকা এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে। কচি ঘাসগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে মুখ না তুলেই উত্তর দেয়, এ কেনর উত্তর সকলকে দেওয়া যায় না। তোমাকেও যায় না। তবে এইটুকু জেনে রেখ, আমার কাছে তার ঋণ অসীম।

—ঋণ? অর্থাৎ সে টাকা ধারে তোমার কাছে?

স্বস্তিকা মুখ তোলে। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, টাকা ছাড়াও মেয়েদের অনেক ঐশ্বর্য আছে যার ওপর পুরুষদের দৃষ্টি চিরদিনই, যার কাছে তারা ঋণী চিরদিনই।

উত্তর শুনে অলক স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে স্বস্তিকার মুখের দিকে।

স্বস্তিকা বলে, এ অপরিশোধ্য ঋণ। এ থেকে মুক্তি তার নেই। আমিও দেব না তাকে মুক্তি। তাই তাকে আগলাতে চাই গোড়া থেকে।

অলকের মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে বার হয়ে আসে, বিকাশকে বাঁধতে পারবে? সে ত আগলহীন অবন্ধনা। তাকে বাঁধবে কি দিয়ে? স্বস্তিকার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠে। চোখে মদালস দৃষ্টি জাগে। বলে, জান না, মেয়েরা পুরুষকে বাঁধে কি দিয়ে?

—অপরিশোধ্য ঋণ দিয়ে? কিন্তু এ অপরিশোধ্য ঋণের পরিণাম যে কি তা ত জেনেছ তুমি।

স্বস্তিকার মুখের উপর দিয়ে একটা রক্তোচ্ছাস বহে যায়। চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, জেনেছি। সে দিন ছিলাম আমি অজ্ঞ, আজ প্রাজ্ঞ হয়েছি। সে দিনের অক্ষমতা, আজ আমায় ক্ষমতা দিয়েছে। সে দিন যে ছন্দপতন ঘটেছিল আশা করি এবার তা ঘটবে না। এবার ছন্দে-বন্ধন দিয়ে নেব। তার রিহার্সালও দিয়ে রেখেছি আগে থেকেই।

—কিন্তু এ কথা ত এতদিন বল নি। বল নি ত যে তোমার পতনশীল ছন্দে বন্ধন দিয়ে প্রতীক্ষা করে আছ তারই জন্যে? বরং এতদিন একটা প্রবল বিতৃষ্ণা, এক উৎকট বিরূপতার ভাব দেখিয়ে এসেছ তার প্রতি।

স্বস্তিকা মুখ নত করে খাতার পাতা উল্টাচ্ছিল। সেই ভাবেই বলল, মন ভারী জটিল পদার্থ। মেয়েদের মন আরও। নিজের মনকে মেয়েরা কোন দিনই চিনতে পারে না। তাদের নিত্য-পরিবর্তনশীল মনের রূপও অসংখ্য। সূর্যোদয়ের সময় যে রূপের বিকাশ, সূর্যাস্তের সময় হয়ত বিপরীত তার প্রকাশ। বিকাশের প্রতি সে দিন যে মনভাবটা প্রকাশ পেয়েছিল, সেটা ছিল নির্ভেজাল। তার আদিম বর্বরতা আর অসভ্যতার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না আমার।

—কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে সতৃষ্ণ হবার কারণ কি?

—কারণ ঠিক জানি না। হয়ত—। স্বস্তিকা ইতস্তত: করে।

—বল।

—হয়ত তার অপরিশোধ্য ঋণের মোহ।

—শুধু ঋণের মোহ? আর কিছু নয়?

—হয়ত আরও কিছুটা আছে। হয়ত সেটা বলিষ্ঠ পুরুষের পীড়ন। এই পীড়ন প্রকাশ্যে মনকে যেমন পীড়িত করে তেমনি অপ্রকাশ্যে অর্থাৎ নিভৃতে অন্তরের গোপন তলে তাকে অনুরঞ্জিতও করে। হয়ত মেয়েরা বলিষ্ঠ বাহুর পীড়নই কামনা করে বেশী। তাই এক দিনের বিতৃষ্ণ মন, অন্তরের গোপন তলে রূপ পাল্টে সতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে আজ।

অলক একটু কঠোর হয়। কঠিন কণ্ঠে বলে, বলিষ্ঠ পুরুষের পীড়নের লোভে তোমার মনের রূপ পাল্টায় নি স্বস্তি, পাল্টেছে বার'শো টাকার মাইনের লোভে। গঙ্গার ধারে ফ্রি কোয়ার্টারের লোভে, আর বিনা বেতনে দাসদাসীর লোভে। সেখানে দু'শো টাকা হাত খরচ করেও কিছু অকুলান হবে না, এটাও একটা মস্ত লোভ। তোমরা লোভী, এ জানতাম। কিন্তু এতখানি যে, এ আমার নতুন জানা।

স্বস্তিকার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, তুমি কি আমাকে এতখানি ছোট মনে কর?

—এতদিন করি নি। কিন্তু তুমিই ত এ সুযোগ করে দিলে স্বস্তি।

—না, আমি কোন সুযোগই করে দিই নি। এ তোমার না-জানার ভুল, না-বোঝার ভুল। আমি বলেছি, সে এক অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী আমার কাছে। এরই বদলে তাকে আমি পেতে চাই।

অলক হাসে, অবিশ্বাসের হাসি। বলে, এ তোমার বৃথা আশ্বাস। এর মধ্যে সান্ত্বনার সন্ধান আছে, কিন্তু তৃষ্ণার তৃপ্তি নেই। তুমি মনে মনে জান, অধমর্ণ তুমি, উত্তমর্ণ সেই। এই অধমর্ণের ঋণ পরিশোধের জন্যেই আজ তুমি উদ্‌গ্রীব। তাই এরেই স্বীকৃতি দিতে চাও নতুন করে।

স্বস্তিকা চোখ নত করে। নত-কণ্ঠেই বলে, তুমি রাগ করছ। কিন্তু এ রাগ তোমার সাজে না। তুমি জ্ঞানী, তুমি গুণী। জেনে শুনে তোমাকে প্রতারিত করতে চাই না বলেই বলি, পুরোনোকে স্বীকৃতি দেওয়া মানে নতুন কিছু করা নয়।

অলক স্তব্ধ হয়ে যায়। এক রূঢ় আঘাতে সে মূক হয়ে পড়ে ক্ষণতরে।

তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, রাগ আমি করি নি স্বস্তি। রাগের মর্যাদা যেখানে পাওয়া যায় রাগ সেখানে শোভনীয়। কিন্তু একটা কথা বলি—পুরুষকে জীবনে স্বীকৃতি দেওয়াই নারীর স্বভাবধর্ম। যদি এ স্বীকৃতি দেয় ভালবেসে, সে স্বীকৃতি সার্থক হয়। কিন্তু যদি মোহে পড়ে দেয়, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে দেয়, তবে সবই নিরর্থক হয়। আচ্ছা, আজ উঠি, চল।

স্বস্তিকা সচকিত হয়ে উঠে। বলে, বাঃ, সে কি! এরই মধ্যে?

—হ্যাঁ, এরই মধ্যে।

—কিন্তু যে জন্যে এখানে আসা, তার কিছুই ত শোনা হ'ল না আমার?

—আমার দুরদৃষ্ট। তবে শোনাতে আমি চেয়েছিলাম—

—জানি। কিন্তু কি হ'ল তার?

—সলিল সমাধি।

—সলিল সমাধি!

—তাই, তবে নিজে সে ডুবে আমায় বাঁচিয়েছে। আমি রক্ষা পেয়েছি স্বস্তি।

স্বস্তিকা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রশ্ন করে, মানে?

—তোমার সব কথা শোনার পর, জীবনের এই নিভৃত অবসরে ঘনীভূত অন্তরের সেই বাণীকে প্রকাশ করার মত

মুর্খামি আর কিছু হত না। পাষাণের গায়ে আছড়ে পড়ে রক্তাক্ত অপমৃত্যু ঘটার চাইতে, স্বেচ্ছায় এই যে বিসর্জন, এ লক্ষগুণ ভাল।

অলক উঠে দাঁড়ায়। স্বস্তিকা উপর দিকে মুখ তুলে বলে, তোমার ঐ ঘনীভূত অন্তরের মর্মস্থলে যে আঘাত তুমি পেলে, তার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। তার এই সলিল সমাধির অন্তরালে আমার দায়িত্বহীনতা যদি কিছু থাকে, আমায় ক্ষমা কর তুমি।

স্বস্তিকা চুপ করে। অলক দাঁড়িয়ে থাকে। শীতের বিকাল নিঃশব্দে নিঃশেষিত হয়ে আসে।

আট বছর পর।

এই দীর্ঘ সময়ের অন্তরালে অনেক পরিবর্তনই ঘটে গিয়েছে অনেকের জীবনের উপর দিয়ে। সে এখন প্রফেসর। তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, অনন্যসাধারণ আবিষ্কারের খ্যাতি তাকে দেশ-বিশ্রুত করে তুলেছে। মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে তার কাজ। এই অদৃশ্য রশ্মির বর্ণালীকে সে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছে তার নিজের আবিষ্কৃত স্পেকট্রোস্কপিক যন্ত্রে। এই নিয়েই তার গবেষণা, সাধনা আরাধনা। পশ্চিম জার্মানী সে ঘুরে এসেছে। সেখানে সুবিখ্যাত অধ্যাপক প্রফেসর রিচার্ডের অধীনে সে কাজ করেছে। সেই কাজই তাকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে। আজ সে প্রফেসর। আজ দু'শো টাকা মাইনের লেকচারারের স্মৃতি বিলুপ্তপ্রায়। দেশ-জোড়া তার নাম, দেশ-জোড়া খ্যাতি, দেশ-জোড়া প্রতিপত্তি।

নূতন আর এক শক্তির সন্ধান পেয়েছে অলক। এই শক্তিই হয়ত মহাজাগতিক রশ্মির প্রাণ কেন্দ্র। তাই নিয়ে সে ভুলে গেছে নাওয়া-খাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অঙ্ক কষে চলেছে খাতার পাতায়। ত্রিকোণামিতি আর ক্যালকুলাসের দুরূহ ফরমুলায় খাতার পাতা তার ভরা। এই পথ ধরেই তার সাধনা চলেছে। থিটা, ফিটা, মিউ, কিউ-এর মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আজও সন্ধ্যায় এদেরই মধ্যে সে হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, এমন সময়ে নিধু-চাকরের পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল স্বস্তিকা। দীর্ঘ আট বছরের পর সে আবার এসে দাঁড়াল অলকের সামনে। এই আট বছরে তার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। সে দিনের সেই রজনীগন্ধার সরস বৃন্ত আজ সরসতা হারিয়ে নিরস। মুখের লালিমায় পাণ্ডুরতার ছায়া। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ। চঞ্চল চোখের কটাক্ষ স্থির। বয়সের ভার যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবেই চেপে বসেছে সারা অঙ্গের উপর। স্বস্তিকা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে একেবারে অলকের টেবিলের কাছে। অলকের একাগ্র দৃষ্টি খাতার উপর নিবদ্ধ। মস্তিষ্ক থিটা-ফিটার নব নব রহস্যের রূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত। এমন সময় টেবিলের উপর আকস্মিক ছায়াপাতে সে চমকে উঠে। অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কে?

—আমি। স্বস্তিকা আরও এক পা এগিয়ে আসে। ডান হাতের আঙুলের চিমটি দিয়ে মাথার ঘোমটাটা আর একটু পিছন দিকে নামিয়ে দিয়ে বলে, আমি স্বস্তিকা।

অলক চিনতে পারে। চিনতে পারে সেই পরিচিত ভঙ্গিমাকে। তাই চঞ্চল হয়ে উঠে বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে বলে, তুমি স্বস্তি! তুমি!

স্বস্তিকা ঘাড় নাড়ে। বলে, চিনতে পাচ্ছ না?

অলক আস্তে আস্তে বলে, পাচ্ছি বলেই অবাক হয়ে গেছি। এতদিন পরে তুমি যে আসবে হঠাৎ এ আমি ভাবতে পারি নি।

—হঠাৎ নয়, আসতামই। তবে তুমি সন্ধ্যার পর কলেজ থেকে ফের বলে এই সময়ে এলাম।

—বেশ করেছ। অলক চুপ করে যায়, হঠাৎ-সাক্ষাতে কোন কথা খুঁজে পায় না বলে মনের মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতা অনুভব করে।

স্বস্তিকা বলে, কত নাম হয়েছে তোমার! কাগজে কাগজে কত না সুখ্যাতি, কত না প্রশস্তি তোমার দেখি!

অলক সলজ্জ হয়ে উঠে। স্মিতমুখে বলে, তুমি শুনে আশ্বস্ত হবে স্বস্তি যে এত দিনে আমার সেই দুশ' টাকা মাইনের মাষ্টারীর চাকরিটা খোয়া গেছে।

পলকের জন্য স্বস্তিকা রাঙা হয়ে উঠে। ঘাড় নেড়ে সমর্থনের ভঙ্গিতে বলে, জানি, তুমি এখন প্রফেসর, পনেরশ' টাকা মাইনে তোমার। তার ওপর জগৎজোড়া নাম। এখন তুমি দুশ' টাকা হাত-খরচ করতে পার অনায়াসে। খরচ করেও মেটাতে পার মনের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা দুই-ই।

অলকের মুখে শান্ত হাসি ফুটে উঠে, কিন্তু কোন উত্তর দেয় না।

—পার না? স্বস্তিকা প্রশ্ন করে।

—জানি না। ক্ষুধা থাকলে হয় ত মেটাতে পারি। কিন্তু যার কোন ক্ষুধাই নেই, তার বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কতদিন পর আমাদের দেখা বল ত?

—আট বছর।

—আট বছর, মনে হচ্ছে যেন আট যুগ। কি খবর তোমার বল, বিকাশের খবর কি?

—জানি না।

—অবাক কাণ্ড, তুমি না জানলে জানবে কে? ঝগড়া করে এসেছ বুঝি?

—না।

তবে? অলকের চোখেমুখে কৌতুক।

স্বস্তিকা একটু স্নেহের হাসি হাসে। বলে, এর মধ্যে 'তবে'র কিছু নেই।

অলক বোঝে না এ হেঁয়ালিটুকু, তাই স্বস্তিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বিস্ময়ভরা মুখে।

স্বস্তিকা মুখ নামিয়ে নেয়, নিজের দৃষ্টিকে অলকের দৃষ্টির ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে বলে, তুমি জান না, কিন্তু আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আজ চার বছরেরও ওপর।

—ছাড়াছাড়ি? অলক বিস্ময়ে ফেটে পড়ে।

স্বস্তিকা মুখ তোলে না। নতমুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

—বল কি? ছাড়াছাড়ি মানে বিবাহবিচ্ছেদ?

—তাও না, সেটুকু মর্যাদাও সে দেয় নি আমায়?

— মানে?

—যেখানে বিবাহ হয় নি সেখানে বিচ্ছেদের প্রশ্ন ওঠে না।

—বল কি?

স্বস্তিকা শান্ত কণ্ঠে বলে, মিথ্যে বলি নি, আমি ঠকেছি, প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু উপায় ছিল না, স্বখাত-সলিলে আত্মনিমজ্জন করেছি, নিজেকে জলাঞ্জলি দিয়েছি তাই ফেরা সম্ভবপর হ'ল না।

অলক তাকিয়ে থাকে স্বস্তিকার মুখের দিকে। এই প্রথম মনে হয় তার, বড় রহস্যঘন ঐ মুখখানি। রহস্যঘন কাহিনী নিয়ে ঘেরা এর চারিপাশ—অতলান্ত সে কাহিনী। তার রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, স্পর্শ নেই—তবুও কাহিনী আছে। সহৃদয় কি নিহৃদয় এ কাহিনীতে সেকথা বোঝা যায় না, কিন্তু প্রাণবন্ত কাহিনী। চোখেমুখে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার শিখা।

স্বস্তিকা বলে চলে, তোমাকে সেদিন বিকাশের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম সে আমার কাছে পুরনো, পুরনোকে জীবনে স্বীকার করে নেওয়ার মাঝে অন্যায় কিছু নেই—একথা বলে নিজেকে ঠকিয়েছিলাম, তোমাকেও ঠকিয়েছিলাম। বিকাশ কোনদিনই পুরনো নয়, সে নিত্যনূতন। তাই পুরনো দিনের সবকিছুকে নস্যাৎ করে দিয়ে আমাকেও গ্রহণ করেছিল নতুন ভাবে।

—নতুন ভাবে মানে?

স্বস্তিকা একটুখানি হাসে, ভারী করুণ হাসি। বলে, এত বড় লজ্জার কথা মুখে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা যখন করেছ তখন সব লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার কাছেই বলব শুধু।

স্বস্তিকা একবার থামে, এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে আবার বলে, মেয়েদের তিনটে রূপ—মাতা, কন্যা, বধূ। এই শেষের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলাম তার কাছে। কিন্তু স্বীকৃতি দিল না সে।

—বল কি?

—অসত্য বলি নি কিছু। কিন্তু তখন পিছুবার উপায় ছিল না, নিজেকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি।

—ওটি তোমার অহঙ্কার স্বস্তি, জলাঞ্জলি না ভেবে যদি ভাবতে পারতে পুষ্পাঞ্জলি তা হলে নিজেকে প্রতারিত মনে হ'ত না তোমার।

—পুষ্পাঞ্জলি? স্বস্তিকা শ্লেষের হাসি হাসে, পুষ্পাঞ্জলি দেবতার অর্ঘ, দানবের নয়। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করি নি, নিজের অগৌরবকে ঢাকবার জন্যে একজন মেয়ের পক্ষে যা সম্ভব, সবই করেছি আমি। বুকের মধ্যে বিষের জ্বালা গোপন করে তৃপ্তি দিয়েছি তাকে, তবুও মন পেলাম না।

—কিন্তু কেন? কি বলত বিকাশ? অলক প্রশ্ন করে একটু সন্দিগ্ধ ভাবে।

—কি বলত? হায়রে! তার চোখের ভাষা আমি পড়তে পারতাম। সে ভাষার মধ্যে ছিল শুধু ব্যঙ্গ, সে যেন ব্যঙ্গ করে সর্বদাই বলত আমায় তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং, মুহূং, যাবৎ মধু, পিবস্তেহম।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ কিছু নয়। মধুপান শেষ হলে একদিন স্বাভাবিক ভাবেই সে জানাল আমায়, তোমাতে আমার কাজ ফুরিয়েছে, এবার মিরাণ্ডা আছে, তুমি পথ দেখ।

— মিরাণ্ডা?

—তার পাটরাণী। বিলেতজাত মেয়ে—মা ইহুদী, বাপ ইংরেজ। বিলেতে আলাপ হয় দুজনের, সেইখানেই হয় তাদের আত্মদান, আত্মোৎসর্গ সবকিছু।

অলক প্রশ্ন করে, তবে এ ব্যবহার সে কেন করল তোমার সঙ্গে?

স্বস্তিকা এক মুহূর্ত নীরব থাকে। তার পর বলে, লোভ। বলেছিল, অপ্রত্যাশিত আর অযাচিত ভাবে যখন তোমায় পেলাম, তখন ছাড়তে পারলাম না। মিরাণ্ডার অনাগমনের দিনগুলির অভাব তোমার দ্বারাই পূর্ণ করে নেব স্থির করলাম। অথচ মিরাণ্ডাকেও চাই। সেই আমার পাটরাণী।

—হতভাগা স্কাউন্ড্রেল! অলক গর্জে উঠে।

—হতভাগা নয়, ওরা সুভাগা। ঐশ্বর্যকে অনাদর করতে শেখে নি, তাই ঠকে নি। আমি করেছি, ঠকেছি।

—একে জেতা বলে! দাম্পত্য হ'ল জয়মাল্য!

—সব পুরুষের কাছে নয়, পুরুষেরও প্রকারভেদ আছে। বিকাশের স্বরূপ আমার কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না। তবুও তাকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলাম জীবনে। এ অতি লোভেরই পরিণতি—ফলও পেলাম। কিন্তু শাস্তি দিতে পারলাম না—এইটাই আমার সব আপশোষের বড় আপশোষ। যার ওপর জোর ছিল, ভরসা ছিল, যার মুখ্য কথাকে একদিন তাচ্ছিল্য করে হতাদর করেছিলাম, সে তখন জার্মানীতে, বস্তি তখন প্রফেসর রিচার্ডের কাছে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে।

—আমি? অলক অবাক হয়ে যায়। বলে, কিন্তু আমার দ্বারা কি উপকার হ'ত তোমার?

—জানি না। তবুও ভরসা, হয়ত দৈনন্দিন এই সরীসৃপ-লালসার ইন্ধন যোগানোর ইতরতা থেকে পরিত্রাণ পেতাম। যেখানে পত্নীত্বের দাবী নেই, সেখানে উপপত্নীত্বের হীনতা থেকে মুক্তি পেতাম।

অলক মুখ নীচু করে, তার পর কতকটা আত্মগতভাবেই বলে, বিকাশকে আমি চিনেছিলাম, সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলাম কিন্তু তোমাকে ফেরাতে পারি নি।

স্বস্তিকা বলে, অহমিকার পরিণতি পতনে। সেই পরিণতি থেকে রক্ষা পেলাম না আমিও। রোধ করবার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। বিকাশ তলিয়ে দিল আমাকে, অহঙ্কারে যা করি নি কোনদিন সেদিন তাই করেছিলাম। পা দুটি জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, সুয়োরাণীর সম্মান না দাও, দুয়োরাণীর দাও। এত বড় কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাই আমি।

—এতেও রাজি হ'ল না সে? স্কাউনড্রেল!

স্বস্তিকা ম্লান হাসি হাসে।

—কি বলল রাস্কেলটা?

—বলল, মিরাণ্ডার প্রেমের মূল্য দিয়েছি লক্ষ টাকা। অর্থাৎ লক্ষ টাকার জীবনবীমা লিখে দিয়েছি তার নামে, তবেই পেয়েছি তার স্বামীত্বের অধিকার, তাই সে আসছে আমার দেশে। তোমার সম্মানেরও মূল্য দেব আমি, হাজার পঞ্চাশেক টাকার সার্টিফিকেট কেনা আছে আমার, সেইটাই লিখে দেব তোমায়।

অলক চুপ করে যায়, একটা কথা তার জিহ্বাগ্রে এসেও থমকে পড়ে।

স্বস্তিকা আবার একটু হাসবার চেষ্টা করে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে রৌদ্রের মত খিন্ন, ক্লিষ্ট হাসির ছায়াস্মুখে এসে পড়ে। ম্লান চোখে তাকিয়ে বলে, একটা কথা বলব?

অলক মৌনমুখে তাকায়। চোখে সম্মতির চাহনি।

স্বস্তিকা বলে, কত নাম হয়েছে তোমার। কাগজে কাগজে যত ছবি বেরোয় চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি, সেদিন যদি মোহমুক্ত হতে পারতাম, যদি তোমার মুখ্য কথার সম্মান দিতে পারতাম, তা হলে তোমার পাশে থেকে এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারিণী হতেম আমিও আজ। মানীর সাহচর্যেই মান আর জ্ঞানীর সাহচর্যেই জ্ঞান। এ সাহচর্য লোভনীয়, কল্যাণীয়। মনে হয়, এ কল্যাণস্পর্শ আজও যদি পাই, জীবনটা ধন্য হয়ে যায়।

অলক উত্তর দিতে যায় কিন্তু থেমে যায়। বলতে যায় যে, এ সাহচর্য, এ কল্যাণস্পর্শ অনেক আগেই দিতে চেয়েছিল সে, কিন্তু স্বস্তিকা নিতে পারে নি। দুরাকাঙ্ক্ষ-মনে ছিল শুধুই দুরাশা, সেখানে বাসনার তৃপ্তি ছিল না। তাই অলকের দু'শ' টাকা বেতনে সে খুশী হতে পারে নি, ছুটেছিল বিকাশের পিছু পিছু, কিন্তু ব্যথাতুর হৃদয়কে এত কথা বলতে পারে না সে।

স্বস্তিকা বলে চলে, অনেক দিনই ভেবেছি, যদি একটা খণ্ডপ্রলয়ের ঝঞ্ঝাঘাতে জীবনের ধারাটাকে পালটে আবার ফিরে যেতে পারি সেই কার্জন পার্কের ধারটিতে, আর তোমার মুখ্য কথাটিকে শুনে তাকে রূপ দিতে পারি জীবনে, তা হলে এই যে শুষ্ক শীর্ণ-শতদল আবার বিকশিত হয়ে উঠতে পারে সহস্রদলে।

স্বস্তিকা থামে। তার পর বিকাশের মুখের উপর করুণ চক্ষু দুটি মেলে ধরে বলে, বল ত, দুরাশার কি কোন আশা নেই? তার বাস্তব রূপায়ণ কোনদিনই কি সম্ভবপর নয়?

বড় মর্মস্পর্শী আবেদন। অলক বিচলিত হয়ে উঠে, কিন্তু অন্তরের মানুষটি তার মাথা নাড়া দেয়। যেন কানে কানে বলে, না না না, এ সম্ভবপর নয়। এ অবাস্তবের রূপদানে সামর্থ্য তার নেই। মৃতের পুনর্জীবনের মতই এ অসম্ভব। কিন্তু লাজুক অলক অপ্রিয় সত্যকে মুখ ফুটে বলতে পারে না বলেই এবারও নিরুত্তর থাকে।

কিন্তু থাকতে পারে না স্বস্তিকা, আর্তকণ্ঠে বলে উঠে, তুমি চুপ করে আছ কেন, উত্তর দাও। বল, মুখ খোল কথা কও। আমার যা মহাজিজ্ঞাসা আমি করেছি, যা মুখ্য কথা তোমায় শুনিয়েছি। এবার তুমি বল, দোহাই তোমার, আমার মহাজিজ্ঞাসার উত্তর দাও।

অলক মুখ খোলে। ধীরে ধীরে বলে, উত্তর শুনে তুমি সুখী হবে না স্বস্তি।

—কেন? স্বস্তিকার কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে।

—তোমার মহাজিজ্ঞাসা এতদিন পর আবার আমার মহাজিজ্ঞাসাকে পুনর্জীবিত করে তুলেছে স্বস্তি। তারা দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। এদের দিকে তাকিয়ে

বুঝেছি যে, এদের রূপ এক, মিল এক। আর—আর হয়ত পরিণতিও এক।

—মানে? পরিণতি এক এ কথার অর্থ কি তোমার? স্বস্তিকা আশঙ্কায় পাষাণ হয়ে যায়।

—অর্থ শুনলে তুমি সুখী হতে পারবে না স্বস্তি।

—না পারি, তবুও আমায় শুনতে হবে, তুমি বল।

—আমাদের ভাগ্যাকাশে দুই মহাজিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে বটে, কিন্তু একই সময়ে নয়। একের যখন সলিলসমাধি হ'ল তখন দেখা দিল আর এক। এরা সমগোত্রী, তাই এদের নিয়তিও সমগোত্রী। একের যদি সমাধি হয়ে থাকে, অপরেও নিষ্কৃতি পাবে না তা থেকে, সেও তলিয়ে যাবে ঐ একই সঙ্গে—এ অপ্রতিরোধ্য।

অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত। স্বস্তিকা মূক হয়ে যায়, বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টি মেলে।

অলক বলে, উপায় নেই স্বস্তি। বিনাশশীল জগতে অবিনাশী কিছুই নয়, মহাজিজ্ঞাসারও বিনাশ আছে। তবে এ বিনাশ ধ্বংস নয়, এ রূপান্তর। একদিন যে মহাজিজ্ঞাসা অপার্থিব রূপ নিয়ে আত্মার সত্তায় ব্যস্ত ছিল, সে রূপের পরিবর্তন হ'ল, সত্তার রূপ তলিয়ে গেল কিন্তু আত্মার রূপ রক্ষা পেল। তাকে রক্ষা করেছ তুমি।

—আমি! স্বস্তিকা অবাক হয়ে যায়।

—তুমি। তুমি প্রেম দিয়েছিলে অন্তরে। ভালবাসতে শিখিয়েছিলে মনেপ্রাণে। সেই প্রেম ব্যাপ্ত হয়েছিল আমার আত্মার সত্তায়। সত্তার বিনাশ হ'ল কিন্তু আত্মা রইল জেগে। এই অতৃপ্ত আত্মা, এই জাগ্রত আত্মা একদিন সতৃষ্ণ হয়ে উঠল এক অপরূপার আহ্বানে। মুগ্ধ হয়ে গেল তার রূপে। সকল ভুলে তাতেই করল আত্মসমর্পণ।

—নবরূপা? স্বস্তিকা চমকে উঠে।

—নবরূপা—আমার নতুন প্রেয়সী। তুমি ছিলে সত্তার, এ হ'ল আত্মার। সত্তার যে প্রেম এতদিন স্তব্ধ হয়েছিল তোমার প্রত্যাখ্যানে, তাকেই উজাড় করে ঢেলে দিলাম আত্মার চরণে। আর সেইখানে আত্মাহুতি দিলাম নিজেকে। এই আত্মনিবেদনে আজ সার্থক হয়েছি আমি।

—সত্যি? স্বস্তিকা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে।

—মিথ্যে নয়। দান-প্রতিদানে এই প্রেমই আমাকে সম্রাট করেছে, মহীয়ান করেছে। সেই আমার মহাজিজ্ঞাসার, মুখ্য কথার ক্ষুধা মিটিয়েছে। এই যে নব প্রেয়সী এর কাছে আজ অশেষ ঋণে ঋণী আমি।

স্বস্তিকা বিহ্বল কণ্ঠে বলে, আশ্চর্য! কিন্তু এ প্রেয়সী তোমার কে? একবার কি তাকে দেখতে পাই না আমি?

—পাবে। এখুনি যদি দেখতে চাও দেখাব তোমায়। তবে সশরীরে নয়, তার ছায়াশরীরে।

—ছায়াশরীরে মানে?

—তার ফটো আছে আমার কাছে, দেখতে চাও দেখাব তোমায়। অলক ড্রয়ারের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেয়, একখানা ছবি বার করে তুলে দেয় স্বস্তিকার হাতে। ছবির দিকে তাকিয়ে স্বস্তিকা চমকে উঠে, এ কি এ! এ কার ছবি! এ ত কোন মেয়ের ছবি নয়। তোমার ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।

অলক হাসে। ম্লান করুণ হাসিতে মুখখানি ভরে ওঠে তার। বলে, ভুল হয় নি স্বস্তি। এই বিশাল জগতে মেয়ে ছাড়াও পুরুষের ভালবাসার জিনিস আরও অনেক আছে। তাই মেয়ের ওপর ভালবাসার দাবি যেদিন আমার প্রত্যাখ্যাত হ'ল সেই দিন আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম একে নিয়ে। এই আমার স্পেকট্রস্কোপ, আমার নব প্রেয়সী। এরই প্রেমে আজ আত্মহারা আমি। মহাজাগতিক রশ্মির যে নতুন রূপ, যে নতুন বর্ণালী জগৎসমক্ষে প্রচার করেছি তা সম্ভবপর হয়েছে এরই সহায়তায়। যে বিজ্ঞানীর সাহচর্যের জন্যে আজ তুমি লালায়িত, তাকে যশে, মানে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এই। একে ত্যাগ করা আমার পক্ষে আজ আর সম্ভবপর নয়।

স্বস্তিকা তাকায় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে—একবার ছবিখানির দিকে আর একবার অলকের দিকে। তার পর ধীরে ধীরে সেখানিকে ফিরিয়ে দেয় অলকের হাতে।

শাশ্বতী নারী

শ্রীশান্তি পাল

রুচির বিমল মুখ-শতদল ভাবাকুল চারুলোচনে।
অয়ি, মোহময়ী মধুবচনে!
আশ্বাস দাও পরাজয়-ভয়ে,
বিশ্বাস ভরো যত সংশয়ে,
দানো প্রেমে প্রাণ, আনো নব বল
সব বন্ধন-মোচনে।
ভাবাকুল চারুলোচনে!

রতির আরতি লাগি তব রূপ পুড়ে যায় ধূপ সম।
তুমি মহীয়সী নিরুপম!
তুমি আছ তাই এ মর ধরায়
শক্তি-সাধনা দিকে দিকে ধায়,
তোমার সেবার স্নিগ্ধ পরশে
কুৎসিতও মনোরম
মহীয়সী নিরুপম!

উটজ-অঙ্গ হয় অনঙ্গ তোমারি শঙ্খ রবে।
দেবি, ঘনায় সন্ধ্যা যবে।
স্বর্গ হইতে অমৃত হরিয়া
আপন বক্ষে রেখেছ ভরিয়া
ক্লান্তির মাঝে আনো প্রশান্তি,
দীপ আলো উৎসবে।
ঘনায় সন্ধ্যা যবে।

দুঃখ-বেদনা-পাপ-তাপ-গ্লানি ছুঁয়ে যায় শুধু চরণে,
অয়ি, ব্যথিত-পতিত-শরণে!
দৈন্তের মাঝে আনিছ পুণ্য,
ভরিছ নিখিলে যেথায় শূন্য,
প্রেয়সী হইতে প্রসূতি হইয়া
জয় করি যাও মরণে।
গানে ও মন্ত্রে তুমি থাকো বেঁচে
কত না ছন্দে বরণে!

ঝুলন বেশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নবঘনশ্যাম রসের পাথার—
ভুবন-ভোলানো মোরে,
ভুবন এবং ভুবনেশ্বরে—
আজ দিল এক করে।
স্নিগ্ধ ও রূপে জুড়াইয়া গেল আঁখি
বিস্ময়ে আমি অবাক হইয়া থাকি,
চোখোচোখী সাথে জগবন্ধুর—
আসি মন্দির দোরে।

২

এই যে পৃথিবী, নিতি নিতি হেথা—
দেবের আবির্ভাব,
রসে ভরপুর অণু-পরমাণু—
গড়া বটে দিয়ে ভাব।
একি আনন্দ! একি উৎসব আলো।
সব সুন্দর, সব শুচি, সব ভাল,
রূপী দেহে এ যে একই জীবনে
পুনর্জন্ম লাভ।

৩

সমীরণে কার সুধার পরশ
কাহার মধুর স্বর,
বৃষ্টিতে ঝরে সুধা অবিরাম
করে যে জাতিস্মর।
কতবার হলো এইখানে যাওয়া আসা
কতই বাঁধন স্নেহমায়া ভালবাসা,
যাদ্ কেন নাই তাঁহার লীলায়
মোরে—ভুবনেশ্বর।

বঙ্গের নবজাগৃতি ও নারীসমাজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

২

সপ্তম, অষ্টম ও নবম দশকের মধ্যে কয়েকজন মহীয়সী মহিলার কার্যকলাপ নারীচিত্তে কম আত্মচেতনা জাগ্রত করে নাই। ইহারও শতবর্ষ পূর্ব্বে রাণী ভবানী দানশীলতায় ও সেবাপরায়ণতায় সেই মাৎস্যন্যায়ের যুগেও সকলের মনে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। এ যুগেও কাশীমবাজারের রাণী স্বর্ণময়ী, পুটিয়ার রাণী শরৎকুমারী এবং ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের রাণী বিন্দুবাসিনী দানশীলতায় পরাকাষ্ঠা দেখান। সপ্তম দশকের বঙ্গ-বিহার দুর্ভিক্ষকালে তাঁহারা কেহ কেহ দুর্গতদের সাহায্যকল্পে প্রচুর অর্থ দান করেন। ১৮৭৬ সন নাগাদ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের যে সব প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়াছিল, কলিকাতা গেজেটে তাহা মুদ্রিত দেখিয়াছি। আকস্মিক দুর্বিপাক ব্যতিরেকে স্বদেশের স্থায়ী উন্নতিকল্পে এবং বিশেষ করিয়া সাধারণ ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তাঁহাদের দান ছিল অপরিসীম। মেডিক্যাল কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল-কলেজ, স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রয়াস এবং রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননে, তাহাদের বিস্তর অর্থদান ও-যুগেও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থেই কলিকাতা ভারত সভা লালমোহন ঘোষকে রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য বিলাত পাঠাইতে সক্ষম হয়। 'অবলাবান্ধবে' রাণী শরৎকুমারীর দানের একটি দীর্ঘ ফিরিস্তী আমি দেখিয়াছি। মহীয়সী মহিলাদের এতাদৃশ সৎকর্ম্মে দিকে দিকে স্বদেশের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণ ভাবে নারীচিত্তে একটি আত্মবিশ্বাস এবং মর্য্যাদাবোধের উন্মেষও দেখা যাইতেছিল। তখনকার নব্যশিক্ষিতা মহিলারা যে ইহার ফলে খুবই আত্মপ্রত্যয় লাভ করেন তাহা বলাই বাহুল্য।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীচিত্তেও নব জাতীয়তার ছোঁয়াচ লাগে। হিন্দুমেলার সাধারণ অধিবেশনে ছাত্রী অবলা দাস কর্তৃক ভারতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অষ্টম দশকের প্রথম পাঁচ বৎসরে বিবিধ কারণে জনচিত্তে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই বিক্ষোভে বেথুন স্কুলের ও কলেজ বিভাগের ছাত্রীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথের কারাবরণ, ইলবার্ট বিল আন্দোলন, বড়লাট রিপনের ভারত-প্রীতি ও তজ্জনিত তাহার উপরে মর্ম্মান্তিক নিপীড়ন প্রয়াস—এই এই সকল হইতে ছাত্রীরা দূরে থাকিতে পারিলেন না। এই সময় তাহাদের নেত্রী ছিলেন কামিনী সেন (রায়) ও অবলা দাস (লেডী বসু)। ছাত্রী সরলা দেবীর কিশোর মনে উক্ত ব্যাপারগুলি কিরূপ দাগ কাটিয়া যায় তাহা "জীবনের ঝরাপাতায়" এইরূপে [illegible] করিয়াছেন :

"এ দিকে স্কুলে উপর ক্লাসের কতকগুলি মেয়েদের নেতৃত্ব প্রভাবে আমাদের জাতীয়তার ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে লাগল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নেত্রী ছিলেন কামিনী দিদি—ও অবলা দিদি—কবি কামিনী রায় ও লেডী অবলা বসু। তাঁদের নির্দ্দেশগুলি আমাদের কাছে প্রবহমান হয়ে আসত আমার দিদি ও তার সহপাঠিনীদের মধ্য দিয়ে। সব সময় সব ব্যাপারগুলি না বুঝেও তাঁদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতাম। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে সুরেন বাঁড়ুর্য্যে যখন জেলে যান, তখন সবাই একটা কালো রঙের ফিতে আস্তিনে বাঁধলাম। কেন তা ঠিক জানতাম না। কিন্তু রাস্তায় স্কুল-যাত্রী অনেক ছেলেদের হাতে সেই রকম ফিতে দেখে একটা সমবেদনার বৈদ্যুতী খেলতে লাগল মনে। একটা বড় কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি অনুভব করতে লাগলাম। লর্ড রিপনের বিরাট অভ্যর্থনায় ষ্টেশনে সারবন্দী 'flower girls'দের মধ্যে আমায় একজন মনোনীত করা হ'ল। অভ্যর্থনা কমিটির দেওয়া একই রকমের শাড়ীজামা পরে হাতে ফুলের সাজি নিয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ট্রেন আসবার প্রতীক্ষায়। যেমন গাড়ী এসে থামল, লর্ড রিপণ নামলেন, তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করলে ফুলকুমারীরা। আমার জীবনে ৯.১০ বছর বয়সে এই প্রথম পাবলিক অনুষ্ঠানে অবতারণা। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিষ্টার গিরিজাশঙ্কর সেন। তাঁর ছোট বোন প্রমীলা আমার সহপাঠী বন্ধু। তারই বড় বোন আজকালকার কংগ্রেসকর্ম্মী 'মোহিনী দেবী'।" (পৃঃ ২৮-২৯)

কিছু ভুলচুক থাকিলেও এই সময়কার ছাত্রীদের মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপ ইহাতে সুন্দর ভাবে বিবৃত আছে।

সপ্তম দশকের শেষ হইতে অষ্টম দশকের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে এমন একটি আন্দোলন উপস্থিত হয় যাহার ফলে নব্যশিক্ষিত নরনারীরা স্বদেশের শিক্ষা-সাহিত্য, ধর্ম্ম-সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে উদ্বুদ্ধ হন। বিদেশিনী মহিলা হইয়াও মাদাম ব্লাভাটস্কি থিওজফিক্যাল সোসাইটি স্থাপনান্তর এই সকল বিষয়ের শাশ্বতরূপ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন কর্ণেল অলকট। বিভিন্ন ধর্ম্মের মূল সূত্র আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম্মশ্রেণীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনাই ছিল এই সোসাইটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাংলা দেশের তৎকালীন নব্যশিক্ষিতদের অনেকে ইহার সভ্য হইলেন। বহু মহিলাও মাদাম ব্লাভাটস্কি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কলিকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটির একটি শাখা-সভা স্থাপন করেন। এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি

হইলেন মহিলা-শাখার সম্পাদিকা। থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্তেরা, নরনারী-নির্ব্বিশেষে প্রায়ই ছিলেন নূতন শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। মাদাম ব্লাভাটস্কির কতকগুলি অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে তাঁহারা অনেকেই ক্রমে তাঁহার উপর আস্থা হারাইলেন। স্থানীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটি রহিল বটে, কিন্তু মহিলা-শাখা ভাঙিয়া গেল। সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী মহিলা-শাখার সদস্যাদের সঙ্গে এই ক'বৎসর বেশ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়া সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট সবিশেষ পরিচিতা হইতেছিলেন। গঠনকর্ম্মে স্বাভাবিকী প্রীতিবশতঃ মহিলা-সভা উঠিয়া গেলেও তিনি আর বসিয়া রহিলেন না। এই সকল মহিলা সদস্যাদের লইয়া তিনি আর একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাঙালী মহিলাদের সমাজকল্যাণে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এই সমিতির মধ্যেই প্রথম সূচিত হয় বলা যায়। ইহার কথা এখন বলিতেছি।

এই সমিতির নাম সখী-সমিতি। নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সখী-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব্বেকার থিওসফিক্যাল সোসাইটির মহিলা সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৮৮৬ সনে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ী গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের স্ত্রীদের মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন, অন্যদিকে তেমনি 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়া সমগ্রভাবে স্বদেশের কল্যাণ-চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। সাধারণে স্বর্ণকুমারী দেবীকে উপন্যাস লেখিকা বলিয়াই জানেন। কিন্তু 'ভারতী'র মাধ্যমে মনন-সাহিত্য তথা ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমালোচনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের আলোচনায়ও তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার এই সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা সখীসমিতি দ্বারা রূপায়িত করিতে অগ্রসর হন। সখী সমিতি মহিলাদের সমিতি। সমাজের নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে নারী-গণেরও সর্ব্বপ্রকারে উন্নতিসাধনে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নারীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষাপ্রচার, অনাথা বিধবাদের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা, বিনা ব্যয়ে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাহাদিগকে নিয়োগ করা, সমিতি তাহাদের নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা বেতনের কিয়দংশ দিয়া তাহাদের পরিশোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্য্যকর উপায় সখী-সমিতি গ্রহণের উদ্যোগ করিলেন। সখী-সমিতির পরিচালকবর্গ, কর্ম্মীবৃন্দ সকলেই মহিলা, উদ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রও মহিলাদের মধ্যে। এই সমিতির দ্বারা যেমন তাহাদের কর্ম্মশক্তি উদ্বোধিত হইতে লাগিল, তেমনি আত্মশক্তির উপরেও আস্থা জন্মিবার সুযোগ ঘটিল। ভারতীর পৃষ্ঠায় সখী-সমিতির সভা ও কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপের বিবরণ বাহির হইতে থাকে। সখী-সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একটি মহিলা শিল্প-প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণও ইহাতে আমরা পাইয়াছি। এইরূপ প্রদর্শনী একাধিকবার আয়োজিত হইয়াছিল। মহিলাদের হস্তে তৈরী বিবিধপ্রকার শিল্পের মেলা হয় এখানে। ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রদর্শিত শিল্প-সম্ভার মহিলাদের কৃত ; ক্রেতা-বিক্রেতা, দর্শক সকলেই মহিলা ; স্বেচ্ছাসেবিকা মহিলা, পরিচালকবর্গ মহিলা। প্রদর্শনী-ক্ষেত্র ছিল বেথুন স্কুল। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' এখানে অভিনীত হয়। নায়ক-নায়িকা সকল ভূমিকায়ই অভিনয় করেন মহিলারা। নারী-চিত্তে আত্মশক্তির উন্মেষসাধনে সখী-সমিতির কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

এই সমিতি বহু বৎসর চলিয়া, স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর বিধবা শিল্পাশ্রমে লীন হইয়া যায় (১৯০৬)। ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী মিসেস সরলা রায় (পূর্ব্বে সরলা দাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি) ঢাকায় অবস্থানকালে একটি নারী সমিতি স্থাপন করিয়া অনাথা নারীদের শিল্প-শিক্ষা ও চর্চ্চার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার এই সেবাকার্য্য পরবর্ত্তীকালে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করে। তিনি কলিকাতার ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের প্রথম মহিলা সম্পাদিকা। সুবিখ্যাত গোখলে মেমোরিয়াল স্কুলের (বর্ত্তমান স্কুল ও কলেজ) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও তিনি প্রথম মহিলা সদস্যা।

কি গৃহাভ্যন্তরে, কি গৃহের বাহিরে উভয়ত্রই নারীগণ যথোচিত শিক্ষালাভ করিয়া বিবিধ প্রকারে সমাজসেবায় আগুয়ান হইলেন। অষ্টম দশকের শেষ দিকে প্রতি বৎসর উচ্চ শিক্ষালাভে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাদান কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছেন বহু মহিলা। কেহ কেহ চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন সমাপন করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার অধ্যায়নেও লিপ্ত। সাহিত্য-সেবায়ও তখন কেহ কেহ ব্যাপৃত। বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রী কামিনী সেনের (কবি কামিনী রায়) 'আলো ও ছায়া' বিখ্যাত কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ ১৮৮৯ সনে প্রকাশিত হইল। নারীচিত্তে যে কতখানি উচ্চভাবপূর্ণ কবিত্বশক্তি বিরাজ করিতে পারে পুস্তকখানি প্রকাশে তাহা একেবারে প্রমাণিত হইয়া গেল। আরও বহু কবি ও সাহিত্যিকের রচনা পুস্তকাকারে এবং বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সাধারণভাবে স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহদানে এবং বিশেষ ভাবে নারীদের মধ্যে রচনাশক্তির বিকাশ এবং স্ত্রী-শিক্ষা প্রীতির উন্মেষে কত যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরবর্ত্তীকালের বহু বিখ্যাত মহিলা কবি ও সাহিত্যিকের প্রথম দিককার রচনা এই পত্রিকাখানিতে স্থান পাইয়াছিল। কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কবি মানকুমারী বসুর নাম আজ কে না জানেন? স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী'তেও মহিলাদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হইলেই স্থান পাইত। শরৎকুমারী চৌধুরাণীর বহু উৎকৃষ্ট রচনা 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। মহিলাদের সাহিত্যানুশীলনে এই পত্রিকার কৃতিত্ব ভুলিবার নয়। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' নামক পত্রিকাখানির নামও আমাদের মনে আসে। নাম হইতেই বুঝা

যায়, এখানি ছিল কিশোর-কিশোরীদের নিমিত্ত মাসিক পত্রিকা। ইহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, বড়দের রচনা ইহাতে কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও প্রধানতঃ কিশোর ছেলেমেয়েদের রচনা যথোপযুক্ত সংশোধনান্তর ইহাতে স্থান পাইত। এখানি মূলতঃ ঠাকুর পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্যই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গঠনের সূচনা হইয়াছিল তাহা পরবর্তীকালে সমাজের ও বাংলা সাহিত্যের বিশেষ হিত সাধন করিয়াছে। প্রতিভা দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলাদেবী প্রভৃতির প্রকাশিত রচনাসমূহ ইহাতে বাহির হইয়াছিল। সঙ্গীত-চর্চারও একটি আসর হইয়া উঠে 'ভারতী' এবং 'বালক' পত্রিকা। সঙ্গীত-চর্চায় এবং স্বরলিপি রচনায় প্রতিভা দেবী এবং সরলাদেবী বিশেষ কৃতিত্ব দেখান ঐ যুগেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সাধনায় উভয়েই, বিশেষ করিয়া সরলা দেবী যে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন সরলাদেবীর লেখা হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি।*

অষ্টম দশকের শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারী আদেশবলে মফঃস্বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার বিভিন্ন জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড গ্রহণ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকা উভয়েই পড়িতে পাইত। এ কারণ নবম দশক নাগাদ ছাত্রীসংখ্যা আশাতীত রূপ বাড়িয়া চলিল। শিক্ষা-অধিকর্তার বার্ষিক বিবরণগুলিতে ছাত্রীদের পঠন-পাঠনার পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও সন্নিবেশিত হইতে থাকে। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রমুখ নারী হিতৈষী সভা-সমিতিগুলি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে যথাসাধ্য সহায়তা করিতেছিল। তাহাদের কৃতিসম্বন্ধীয় বিবরণগুলির সপ্রশংস উল্লেখ পাই প্রতি বৎসর শিক্ষা-অধিকর্তার বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে।

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষা-ব্যবস্থাও ক্রমে কলিকাতা হইতে ঢাকা ও পরে অন্যান্য শহরে প্রবর্তিত হইতে থাকে। বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা—বঙ্গমহিলা। প্রথম এম-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা চন্দ্রমুখী বসু দীর্ঘকাল বেথুন কলেজের অধ্যক্ষারূপে কর্ম করিয়া নারীজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান করিতেছিলেন। কামিনী সেন, এবং অন্যান্য বেথুন কলেজের উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা ক্রমে কলেজ ও স্কুলে এবং অন্যত্র শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্রী কুমুদিনী খাস্তগিরি (পরে কুমুদিনী দাস) বাংলার বাহিরে সুদূর মহীশূরে অল্পকালের জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেখানকার মহারাজা গার্লস কলেজের শিক্ষাব্রতী হইয়া।—সরলা দেবী এইরূপ লিখিয়াছেন। সেখান হইতে তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অল্পকাল পরেই ১৮৯৫ সনে সরলা দেবী স্বয়ং সেখানে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া গেলেন। সরলা দেবীও বেথুন কলেজের বি-এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা কৃতী ছাত্রী। অল্প বয়সেই মাতুল রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্য সেবায়ও তৎপর হইলেন। কোন কোন রচনার জন্য সেই সময়েই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। কুমুদিনী খাস্তগিরি বেথুন স্কুলে ও কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া চন্দ্রমুখী বসুর অবসর গ্রহণান্তে কলেজে অধ্যক্ষা পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

---

* সরলা দেবী জীবনের ঝরাপাতায় লেখেন :

"প্রাণের গভীরে আমার যে সুরদেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁকে নিত্য হবিঃদানে তাঁর পুষ্টি সাধনা করে তার দ্বারা আমারও পুষ্টি বিধানের হোতা হলেন রবিমামা। আমি গানের বাতিকগ্রস্ত ছিলুম। যেখান সেখান থেকে নতুন নতুন গান ও গানের সুর কুড়তুম। রাস্তায় গান গেয়ে যাওয়া বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী ভিখারীদের ডেকে ডেকে পয়সা দিয়ে তাদের কাছে তাদের গান শিখে নিতুম। আজও সে ঝোঁক আছে।

"কর্তাদাদা মহাশয় চুঁচড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করছিলুম। যা-কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্যে প্রাণ ব্যস্ত থাকত—তাঁর মত সমজদার আর কেউ ছিল না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙ্গে কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ।' 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,' 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।

"মহীশূরে যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় সে গানের সাজিখানি ঢেলে না দেওয়া পর্যন্ত মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, সেগুলিকে মুগ্ধ চিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হ'ল। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এস হে গৃহদেবতা', 'এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ', 'চির বন্ধু চির নির্ভর' প্রভৃতি আমার আনা সুরে বসান গান।

"আমার সব সঙ্গীত সঞ্চয়ের মূলে তাঁকে নিবেদনের আগ্রহ লুকিয়ে বাস করত। দিতে তাকেই চায় প্রাণ, যে নিতে জানে। বাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রহীতা ছিলেন রবিমামা, তাই আমার দাক্ষিণ্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তাতে।

'বন্দে মাতরম্' এর প্রথম দুটী পদে তিনি সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হ'ত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন—'বাকী কথাগুলতে ওই সুর বসা।' তাই 'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলুম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল" (পৃ ৩৩-৩৪)

সাহিত্য-সাধনা এবং সাময়িকপত্র সম্পাদনার সমগ্র দায়িত্বও নারীরা ক্রমে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়টি বলিবার পূর্ব্বে এই সময়ে অন্ত যে আর একটি বিষয়ের প্রতি নারীদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল তৎসম্পর্কে কিছু বলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতিধর্ম্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেরই স্বার্থরক্ষায় ইহা নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এইরূপ একটি নিখিল ভারতীয় সমাজকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হইতে নারীরা দূরে থাকিবেন কেন? বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে (১৮৮৯) কয়েকজন মহিলা সর্ব্বপ্রথম দর্শক রূপে উপস্থিত হন। পর বৎসর ১৮৯০ সনে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল কলিকাতায়। বোম্বাইয়ে ও মান্দ্রাজে মহিলাদের মধ্যে পর্দ্দা-প্রথা নাই। এ কারণ পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা বরাবর সম্ভব হয়। উত্তর ভারতে এবং বাংলা দেশেও পর্দ্দা-প্রথার চল রহিয়াছে। বাংলায় বিশেষতঃ পল্লী-বাংলায় পর্দ্দা-প্রথার কড়াকড়ি কখনও ছিল না। তথাপি নানা কারণে পুরুষের সঙ্গে নারীর একযোগে কার্য্য করায় বেশ একটা সঙ্কোচ পরিলক্ষিত হইত। কলিকাতায় শিক্ষিতা এবং বরেণ্যা মহিলারা তখনই এই সঙ্কোচ খানিকটা কাটাইয়া উঠিতে কতকটা সক্ষম হন। ১৮৯০ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে কয়েকজন বাঙালী মহিলা সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত হলেন। ইহার মধ্যে একজন ছিলেন 'ভারতী' সম্পাদিকা সখী-সমিতির কর্ণধার স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁহার স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল কংগ্রেসের প্রথম যুগে ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও একজন প্রথম শ্রেণীর জাতীয়তাপন্থী রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা। কাদম্বিনী সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হইলে সভাপতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। এই ঘটনাটিকে মিসেস এনি বেসাণ্ট "How India wrought for Freedom" পুস্তকে এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে এবারেই প্রথম বুঝা গেল ভারতের মুক্তি-আহবে নারীও একদা পুরুষের মত আহুতি দিতে অগ্রসর হইবেন। পরবর্ত্তী যুগে বাংলা তথা ভারতীয় নারীরা মুক্তি-সংগ্রামে যেরূপ কায়মনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে বেসাণ্টের উক্তির যাথার্থ্যই প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহিলাদের সাহিত্য-সাধনার কথা এখন একটু বিশেষ বলিব। বঙ্গনারীরা একান্তভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই চিত্তোৎকর্ষ বিধানে তৎপর হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বঙ্গের মহিলা কবি" শীর্ষক পুস্তকখানির সঙ্গে বাংলাভাষী মাত্রেই পরিচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। পুস্তকের নাম হইতে কেহ মনে না করেন, বাঙালী মহিলা সাহিত্যিক মাত্রেই কবি। তাঁহাদের রচনা সাধারণতঃ কাব্যধর্ম্মী বলিয়াই হয়ত তিনি উহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গদ্য পদ্য উভয় রচনাতেই তাঁহারা দক্ষতা প্রদর্শন করিতে থাকেন এই সময়ে। "রাসসুন্দরীর আত্মকথা" বইখানি বাংলা গদ্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও 'ভারতী' সম্পাদনা কালে বিস্তর কঠিন কঠিন বিষয়ে তাঁহাকে প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছে। বিজ্ঞানের বইও তাঁহার আছে। প্রসন্নময়ীর বাংলা গদ্য এত সহজ ও স্বাবলীল যে একবার পাঠ আরম্ভ করিলে বই শেষ না করিয়া উঠা যায় না। সরলা দেবীর (পরে চৌধুরাণী) গদ্য রচনায় যেমনি তেজোব্যঞ্জক তেমনি উদ্দীপনাময়ী, কিন্তু রচনায় প্রসাদগুণ কখন ব্যাহত হয় নাই। স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর গদ্য রচনারও একটি সহজ-সারল্য লক্ষণীয়। প্রায় পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারের (তখন 'সরলাবালা দাসী' নামে লিখিতেন) গদ্য রচনা সরলতা গুণে সকলের হৃদয়গ্রাহী হইত। তখন বহু মহিলা কবিতা রচনায়ও নৈপুণ্য দেখান। তাঁহাদের শীর্ষস্থানে রহিয়াছেন কবি কামিনী রায়। তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনার কথা জীবনভর চলিয়াছিল। যাঁহারা বঙ্গ-নারীর সাহিত্য সাধনা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে মহিলা' পুস্তকখানি উহার নির্দ্দেশিকাস্বরূপ পাঠ করিতে বলি।

সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনে বঙ্গ-নারীর উদ্যোগের আভাস ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। এ বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্ব অনন্যতুল্য। তিনি নয় বৎসর (১২৯১-৯৯) যাবৎ একক্রমে 'ভারতী' সম্পাদনায় কেবল নিজ সাহিত্য-চর্চ্চাই চরিতার্থ করেন নাই, বাংলায় নর-নারী উভয়েরই সাহিত্য-সাধনার একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণভাবে সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহের আলোচনায় ছিল পত্রিকাখানি মুখর। পুরুষের ন্যায় নারীগণও বিবিধ আলোচনায় যোগ দিতে লাগিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর পরে 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হইল তাঁহার দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর উপর। সরলা দেবী স্বয়ং ইহার সম্পাদনা ভার নেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। তিনি ১৩১৪ সাল পর্য্যন্ত আট বৎসর 'ভারতী'র ভার গ্রহণ করিয়া সাময়িক পত্র সম্পাদনা ক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনা করিলেন। শুধু পত্রিকা সম্পাদনাই নয়, বাঙালী চিত্তে নবচেতনার উদ্রেকেও ইহা একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম হইয়া উঠিল। বোম্বাইয়ের গণপতি ও শিবাজী উৎসবের মত বাংলায় প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব এবং এই সকলকে উপলক্ষ্য করিয়া শরীর-চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের প্রস্তাব তিনি 'ভারতী'র মাধ্যমে সর্ব্বসাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। ভাবনা এবং কর্ম্ম উভয়ই যেন সরলা দেবীতে একীভূত হইয়া যায়। স্বদেশীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া তিনি স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বেই দেশবাসীকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিবিধ উৎসব শক্তি-চর্চ্চার আয়োজন এবং বিশেষ করিয়া বীরাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা সরলা দেবী বাঙালী জাতিকে বিশেষতঃ যুবক সমাজকে বীরধর্ম্মের উপাসক

করিয়া তুলিতে তৎপর হইয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও প্রচারের মাধ্যম হইল তৎসম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা। 'ভারতী' দেশী, বিদেশী চিন্তাশীল লেখকদের রচনায় একটি জ্ঞান-চর্চ্চারও কেন্দ্র হইয়া উঠিল। নবম দশকে 'ভারতী'র ন্যায় আরও কোন কোন পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালনার ভার লন মহিলারা।

বঙ্গের রেনেসাঁস বা নব জাগৃতিকে দৃঢ়মূল করিতে সঙ্গীতেরও বিশেষ কৃতিত্ব রহিয়াছে, তাহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ী এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতরীতি পুনরুজ্জীবনে এবং আধুনিক সঙ্গীতরীতি প্রবর্ত্তনে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এক দিকে এবং অপর দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতচর্চ্চাকে শুধু পুরুষের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখেন নাই, নারীর ভিতরেও ইহা সংক্রামিত করিতে যথোচিত তৎপর হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী এবং দৌহিত্রীগণ যেমন, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী সঙ্গীতবিদ্যা অনুশীলনে নিরতিশয় যত্নবান হইলেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী অতি বৃদ্ধ অবস্থায়ও সঙ্গীত, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতচর্চ্চায় একান্তভাবে লিপ্ত রহিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যার পুনরুজ্জীবনে এবং প্রবর্ত্তনে সমগ্র নারী-সমাজের পক্ষে ইঁহারা যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

সরলা দেবীর আর একটি কৃতিত্বও উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং 'জীবনের ঝরাপাতা'য় কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়েরা এবং সরকারী বিশিষ্ট কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই ছিলেন বিলাতে শিক্ষিত। বিলাত-প্রবাস এবং বার বার বিলাত-গমন হেতু তাঁহারা এক দিকে যেমন স্বভাবতঃই স্বাধীনতাকামী হইয়াছিলেন অন্য দিকে স্বদেশীয় আচার-আচরণ এবং পূজা-পার্ব্বণাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বিতীয় কারণে তাঁহারা স্বদেশবাসীদের হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। এ কারণ তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রযত্ন স্বদেশবাসীর মনে তেমন আশার সঞ্চার করিতে পারে নাই। তবে এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবার যে একান্ত ভাবেই স্বদেশের রাজনৈতিক উন্নতিকামী ছিলেন তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই—বাংলার প্রথম বিপ্লবকর্ম্মী ও নায়ক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (পরে স্বামী নিরালম্ব) তাঁহাদের প্রচুর অর্থ সাহায্যদান হইতে। সরলা দেবী ইঁহাদের ভিতর থাকিয়াও স্বজাতীয়তাবোধ উন্মেষের উদ্দেশ্যে স্বদেশীয় আচার-অনুষ্ঠানকে সংস্কৃত করিয়া প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ করিলেন। বিজয়ার দিনে পরস্পর নমস্কার ও প্রীতি-সম্ভাষণ, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে ভাইফোঁটা উৎসব, সরস্বতী পূজার দিনে বাসন্তী উৎসব, স্বদেশীয় নানা প্রকার পিষ্টকাদি পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগকে স্বদেশীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতাকামী এই বিলাত ফেরত সমাজকে 'ঈঙ্গবঙ্গ' সমাজ বলা হইত। এই 'ঈঙ্গবঙ্গ' সমাজকে 'স্বদেশী' করিয়া তুলিতে সরলা দেবীর প্রচেষ্টা শুধু সময়োপযোগী নয়, বিশেষ প্রয়োজনীয়ও হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্বও অনস্বীকার্য্য।

নারীচিত্তে যে নবভাবনা ও নবচেতনার উদ্রেক হইতেছিল তাহা দেখিয়া পশ্চিম-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। নারী-জাতির মধ্যে নূতন শিক্ষা-প্রচারের ভার তিনি প্রিয় শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। নারীর উন্নতি প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। সরলা দেবী 'ভারতী' সম্পাদনায় এবং বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উন্নতি প্রয়াসকে সার্থক করিয়া তুলিতে অগ্রসর হন। তাঁহার কার্য্য নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতের শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিতে বাংলার যুবশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে তিনি যে যত্নপর হইয়াছিলেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া সম্যক অবগত হইলেন। তিনি সরলা দেবীকে পরপর তিনখানি পত্র লেখেন। ইহাতে তিনি সরলা দেবীর কৃতিসমূহের প্রশস্তিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের নারীজাতির আদর্শ বহির্জগতে প্রচারের জন্য যোগ্যতর প্রতিনিধি রূপে তাঁহাকে প্রেরণেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব অবশ্য নানাবিধ কারণে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নাই।

স্ত্রীশিক্ষার দুইটি আদর্শের কথা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিতে গলদ অনেক। ইহার খানিকটা বিদূরণে কেহ কেহ তৎপর হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকজন মহিলা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা ভট্টাচার্য্য, গুরুচরণ মহালনবিশের কন্যা সরলা মহালনবীশ, ভগবানচন্দ্র বসুর কন্যা ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রভৃতি একযোগে একটি নীতি-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন—বালক-বালিকাদের ভিতরে নীতিবোধ উন্মেষের নিমিত্ত। এই নীতি-বিদ্যালয়ের আনুকূল্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'মুকুল' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শিবনাথ বালক-বালিকাদের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের গোড়া পত্তন করেন। এই শিক্ষায়তনের পরিচালনায় নারীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নবম দশকের প্রথমে মহারাষ্ট্রী মাতাজী তপস্বিনী কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বালিকাদের হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষাদান মাতাজীর আশু উদ্দেশ্য ছিল। বালিকাদের নিয়মিত গঙ্গাস্নান, স্তোত্রপাঠ, ব্রত ও পূজার্চ্চনা এই পাঠশালায় শিক্ষাদানের অঙ্গীভূত হয়।

এই দশকের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার (পূর্ব্ব নাম মিস মার্গারেট নোবল) আবির্ভাব। তিনি স্বামিজী-ব্যাখ্যাত ভারতবর্ষে আত্মশীলা হইয়া ১৮৯৭

সনের শেষে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পর বৎসর কালী-পূজার দিনে মাতা শ্রী সারদামণির আশীর্বাদ লইয়া স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৯০২ সনে স্বামিজীর অন্যতম শিষ্যা মিস ক্রিষ্টিনার আগমনের পর দৃঢ়ভিত্তির উপর ইহা স্থাপিত হয়। সত্য বটে, নবম দশকের প্রথমে কলিকাতায় মহারাণী মাতাজী তপস্বিনী সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু আচার-আচরণ পূজা-ব্রতাদি শিক্ষার উদ্দেশ্যে মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিবেদিতার বিদ্যালয়টি ভারতধর্মের মূলে গিয়া ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্ব্বরকম বিদ্যাশিক্ষা দানেই প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার অভিনব অথচ মৌলিক শিক্ষাদানরীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী (সরকার) 'নিবেদিতা' পুস্তকে মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তনে নব্য-শিক্ষাপ্রাপ্তা ব্রাহ্ম-নারীগণও বিশেষ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। গত শতাব্দীর নবজাগৃতির ভিত্তি রচনায় পুরুষের সঙ্গে নারীরাও যে নানাভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা আমাদের ভুলিয়া যাওয়া কখনও উচিত হইবে না।

তুমি ও আমি

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

তেলাকুচ লতা লতিয়ে লতিয়ে বেড়াটি ঢেকেছে প্রায়
তারই পিছুটিতে লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে থাকি আঙিনায় :
রূপার তোড়াটি বাজিয়ে বাজিয়ে
চরণ দুখানি নাচিয়ে নাচিয়ে
এ ঘরে ও ঘরে আসো যাও তুমি, ঘোমটা সরানো মুখে,
ভিজে এলোচুল গুচ্ছ গুচ্ছ ছড়ানো পিঠে ও বুকে।

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ সুরে আঙিনাটি ক্ষণে ক্ষণে সুরময়
চুরি করে করে সেই রূপ দেখি : তুমিও অসংশয় :
অনায়াস গতি, সহজ ভঙ্গী,
হাসি অধরের লীলার সঙ্গী,
সুন্দর দুটি কালো নয়নের সলজ্জ চাহনিতে
স্বপ্নজড়ানো নব মুকুলিত যৌবন লাবণীতে।

তুমি কথা কও, ভেঙে ভেঙে পড় হাস্যের ঝরণায়
চোখোচোখি হলে এ প্রগলভ লীলা বাধা পায় লজ্জায় :
তাই ত লুকিয়ে আঁখি দুটি ভরে'
লতার আড়ালে চুরি করে করে
চুপি চুপি দেখি, তুমি ভাবো বুঝি ধারে কাছে আমি নাই...
এত কাছাকাছি তবু ভালো করে আজো যারে দেখি নাই।

যে দেহ নবনী হৃদয়ে হেনেছি, আদরে ধরেছি বুকে
কত নব নব নর্ম-নিশীথে বিস্ময় কৌতুকে,
তবু মনে হয় ভরে নি ত বুক
দুটি আঁখি ভরে দেখিবার সুখ
মিটেনি এখনো যত দেখি তত দেখারই পিপাসা যেন,
আধো দেখাদেখি কবে হবে শেষ ? এখনো কুয়াশা কেন ?

কতবার এই কথাটি সেদিন ভেবেছি যে মনে মনে
কতদিন সেই ছায়া নির্জন লতাবিতানের কোণে।
সময়ের স্রোতে ভেসে তার পর
গলে গলে গেল কত বৎসর
কত কাছাকাছি এসেছি এখন দুজনেই দুজনার
কুহেলির ছায়া একটুও নেই চোখের আকাশে আর ;

তুমি আমি আর বিস্ময় নয়। রহস্য-রাঙা সেই
আলো ছায়া-বোনা স্বপ্নের চিক দুজনের মাঝে নেই।
আজ অবারিত স্বচ্ছ আকাশ
মেদুরতাহীন সহজ প্রকাশ,
তোমারে পেয়েছি, তবু একি ব্যথা ! পাই না ত আর ফিরে
সেদিনের সেই চুরি করে করে রূপ দেখা মনটিরে !

দৈবাদেশ

শ্রীদীপেন রাহা

গণেশ ক্যানভাসার।

ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ায়। কখনও হাওড়ার লাইনে আবার কখনও শিয়ালদার লাইনে। তার গতিবিধির যেমন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, ঠিক তেমনই কখন কোন্ জিনিস বিক্রী করে তারও ঠিক নেই। হাত-কাটা তেল থেকে সাড়ে ছ'আনায় ঝরণা-কলম কোনটাই বাদ যায় না। বিক্রীরও কোন কিছু ঠিক নেই। কোন দিন পাঁচ টাকা আবার কোন দিন হয়ত পাঁচ-সিকে। বিক্রী একটু কম-বেশী হলে মহাজন কথা শোনায়। বেশী বিক্রী হলে বলে, টাকায় দু'আনা কমিশন আর দেওয়া যাবে না। আবার কম হলে, বলে, অন্য লোক দেখতে হবে।

এক এক সময় গণেশের ইচ্ছা হয়, জিনিসগুলি মহাজনের মুখের উপর ছুড়ে ফেলে কাজে ইস্তফা দিতে। কিন্তু তা সে পারে না। ছোট বোন সাবিত্রীর করুণ ও অসহায় মুখখানা মনে পড়লে তার হাত-পাগুলি যেন অসাড় হয়ে পড়ে। নিজের খেয়াল-খুশীর জন্যে নিরপরাধ বোনকে সে কষ্ট দিতে পারে না।

গণেশের সঙ্গে রতনের দেখা হয় ডাউন ট্রেনে। দু'জনে একসঙ্গে রাত্রে বাড়ী ফেরে।

পাশাপাশি বাড়ী।

গলির দু'ধারে দুটো খোলার ঘর।

বাড়ী ফেরার সময় সুখ-দুঃখের কথাবার্তা দু'জনের মধ্যে হয়।

গণেশ বলে, আর সহ্য হয় না মহাজনের কাট কাট কথা।

—যা বলেছিস, বেটারা যেন নিজেদের একটা কেউ-কেটা মনে করে।

গণেশ প্রকাশ করে তার মনের কথা, যদি কিছু টাকা পেতাম, তা হলে নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতাম।

রতন কথাটা লুফে নেয়, বলে, আমারও ঠিক তাই ইচ্ছে।

তারপর পরামর্শ চলে, কি করা যায়! গণেশ প্রস্তাব করে, ধূপকাঠির ব্যবসা। কাঠি ও মশলা নিয়ে এসে বাড়ীতে বসে তৈরি করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে উদাহরণ দেয়, হাবড়ার সনাতন এই করে অনেক পয়সা করেছে। আজ তার কারখানায় অনেক লোক খাটে।

প্রস্তাবটা রতনের বেশ মনঃপূত হয়। সে জানায়, মূলধন সেই দেবে। আসল উদ্দেশ্যটা সে চেপে যায়। গণেশকে কোনরকমে নিজের আওতার মধ্যে আনতে পারলে সাবিত্রীকে বৌ করে আনতে তার বেগ পেতে হবে না।

গণেশ সরল-সহজ মানুষ। রতনের নিকট আশ্বাস পেয়ে সে খুশী হয়। বাড়ী এসে সে সাবিত্রীকে সুখবরটা দেয়। সাবিত্রী এতটুকু উৎসাহ প্রকাশ করে না। বলে, দেখ দাদা, রতনা লোকটাকে আমার ভাল মনে হয় না। শেষে না তোকে পথে বসায়।

গণেশ বোনকে বুঝায়, বাইরের খোলস দেখে মানুষ চেনা শক্ত। রতন সত্যি লোক ভাল। পাছে গণেশ মনে কষ্ট পায়, তাই সাবিত্রী আর প্রতিবাদ করে না।

গণেশের উৎসাহ বেড়ে যায়। সে বলতে থাকে, তার স্বপ্ন সার্থক হবে। কাঁচা পয়সা আসবে, কারিগর রাখবে, ব্যবসা ফেঁপে উঠবে। বোনকে ঠাট্টা করে বলে, ভাবিস নি, তোকে বিয়ে দেব অনেক শাড়ী-গয়না দিয়ে।

সাবিত্রী উত্তরে তার সাধ-আকাঙ্খার ইঙ্গিত দেয়।

—আগে একটা টুকটুকে বৌ···।

গণেশ শুনে হাসে, বলে, শুড়ে বালি।

সাবিত্রী অভিমান করে বলে, থাক-গে, আমি চাইনে তোর সোনা-দানা।

হঠাৎ রতনের কণ্ঠস্বর কানে আসতেই দু'জনের কথা থেমে যায়। সাবিত্রী চলে যায় রান্নার জোগাড় করতে। ছেঁড়া কম্বলটার উপর বসে পড়ে রতন।

গণেশ জিজ্ঞাসা করে, কতদূর এগোলে?

—সব ঠিক। এবার মালপত্তর কিনলেই হয়।

—সত্যি? বলে, আনন্দে লাফিয়ে উঠে গণেশ রতনের হাত চেপে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, সাবি একটু চা দিতে পারিস? সাবিত্রী অপ্রসন্ন মুখে কলাই-করা রং চটা দু'গেলাস চা দিয়ে যায়।

রতনকে দেখলেই সাবিত্রীর অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠে। সে কিছুতেই তাকে সহ্য করতে পারে না। রতন হাঁ করে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে রক্ত-শোষকের দৃষ্টিতে। এক নিমেষে যেন সাবিত্রীর রক্ত শুকিয়ে আসে লোকটার দৃষ্টিতে।

সাবিত্রী আড়ালে যেতেই রতন বললে, তোর বোনটি ত বেশ ডাগর হয়েছে।

গণেশ উত্তর দেয়, তা ত হয়েছে, কিন্তু······।

রতন পরামর্শ দেয়, এক কাজ কর, বিয়ে দিয়ে দে। আপদ চুকে যাবে। তোরও পিছুটান থাকবে না। প্রাণভরে কাজ করবি, দু'হাতে মজা লুটবি।

গণেশ রতনের কথায় বিরক্ত হয়ে বলে, এ সব কথা এখন থাক।

রতন আর এগোতে পারে না। বাধ্য হয়ে প্রস্তাবটাকে চেপে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে পড়ে, বলে, কাল থেকে আমার বাড়ীতে কাজ আরম্ভ হবে। সাবিত্রীকে নিয়ে যাস। হাতে হাতে কাজ এগোবে। দিনে দু'চারশত প্যাকেট তৈরি করতেই হবে।

রতন চলে যেতেই সাবিত্রী দাদাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সে তার বাড়ী গিয়ে ধূপকাঠির প্যাকেট তৈরি করতে পারবে না।

কথাটা রতনের কানে যায়। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। মূলধন জোগাবে সে, আর তার কথার কোন দাম থাকবে না, এ হতে পারে না।

গণেশ সাবিত্রীকে বুঝাতে চেষ্টা করে, তোর আপত্তির কি আছে? রতনের বোন বাসন্তীও ত থাকবে। দু'জনে মিলেমিশে কাজ করবি, আর তা ছাড়া রতনের দয়ার উপরই যখন···।

সাবিত্রী গর্জ্জে উঠে, দাদা!

অগত্যা গণেশ একাই রওনা হয় রতনদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। তাকেও হাত লাগাতে হয় কাজে। অনেক সময় বাজী রেখে কাজ হয়, কে কত প্যাকেট তৈরি করতে পারে, গণেশ হেরে যায়।

বাসন্তী মুচকি হাসে, বলে, ভগবান শুধু চেহারাটাই দিয়েছেন।

কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। গণেশ তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন। ট্রেনে বক্তৃতা দিতে গিয়েও সে অনেক সময় নাকাল হয়েছে। তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে কতবার মুখে কথা জড়িয়ে গিয়েছে। সহকর্মীরা ঠাট্টা করে বলেছে, ডাল লেবু দিয়ে খাস।

ক্ষোভে দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসে। পরে বাসন্তী অনুতপ্ত হয় তার মন্তব্যের জন্যে। কাছে এসে শিখিয়ে দেয়, তাড়াতাড়ি প্যাকেট তৈরি করার কায়দাটা। গণেশের মুখে আবার হাসি ফোটে। উৎসাহ তার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। বাসন্তী তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর ভাবে, লোকটা কি সরল।

গণেশের সরল স্বভাব বাসন্তীকে মুগ্ধ করে। সুযোগ পেলেই দু'জনে কাজের ফাঁকে গল্প করে। বাসন্তী নিপুণ হাতে প্যাকেটের স্তাক সাজায়। গণেশ মুগ্ধ হয়ে দেখে। মাঝে মাঝে সে শোনায় তার বীরত্বের কাহিনী। কবে কাকে ঠেঙিয়েছে, টিকিটবাবু হাজরার বুকের পাঁজরা কবে ভেঙে দিয়েছে। অর্দ্ধেক কাঠি পুরো দামে ক'দিন সে বেঁচেছে, ইত্যাদি। শুনতে বাসন্তীর ভালই লাগে।

কাজ করতে করতে কখনও গণেশের হাত অজান্তে থেমে যায়? মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাসন্তীর দিকে। কি সুন্দর গড়ন, চোখ, মুখ। রংটা কালো হওয়াতে রূপটা যেন আরও খুলেছে। দেখে দেখে তার আশ মেটে না।

বাসন্তী ধমক দেয়, ওকি হচ্ছে?

গণেশ আবার কাজে হাত দেয়। ধূপকাঠিকে সে খুব ভালবাসে। এই ধূপকাঠিই তার জীবনে প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়েছে।

রতন, গণেশ ও বাসন্তীর হাসি ঠাট্টার অর্থ করে না। তার ধারণা কোন মেয়েই ক্যাবলা গণেশের প্রেমে পড়তে পারে না। বাসন্তী ত নয়ই।

সাবিত্রী মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়, ব্যবসা কি রকম হচ্ছে। গণেশ জানায় খুব ভাল। সাবিত্রী লক্ষ্য করে যে তার দাদার মনটা আগের চাইতে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এতেই সে খুশী।

দিন কয়েক পরে দেখা গেল গণেশের আগের মত আর কাজে মন বসে না। সাবিত্রী দাদার পরিবর্ত্তনটা লক্ষ্য করে। ভাবে, দাদার নিশ্চয়ই অসুখ করেছে, দাদার কপালে হাত দিয়ে সে পরখ করে দেখে জ্বর হয়েছে কি না।

বোনের হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে গণেশ বলে, আমার কিছু হয় নি।

চারদিকে 'ফ্লু' ছড়িয়ে পড়ছে। এ বোধ হয় ফ্লু'র পূর্ব্ব-লক্ষণ। সাবিত্রী অস্থির হয়ে পড়ে। তার একমাত্র অবলম্বন দাদা। সে ছুটে যায় পাশের ঘরের চক্রবর্ত্তীর কাছে। চক্রবর্ত্তী খুশী হয়। ভাঙা কাঠের বাক্স থেকে সাবুদানার মত কয়েকটা ছোট্ট বড়ি সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলে, যাও এক্ষুণি খাইয়ে দাও, 'ফ্লু' বাপ বাপ করে পালাবে। যোগেশ চক্রবর্ত্তীর ওষুধে কথা কয়।

ঘরে এসে সাবিত্রী একপ্রকার জোর করে দাদার মুখে পুরে দিলে বড়ি ক'টা। তার দৃঢ়বিশ্বাস, এতে কাজ হবে।

সন্ধ্যা হতেই গণেশ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। তার মাথায় শুধু একই চিন্তা, বাসন্তী আর বাসন্তী। নানা উপায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। শেষ রাত্রে কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল হরিহরের ঘরের জানালার পাশে।

এ দিকে রতন ও সারারাত জেগে কাটাল। তার মাথায় শুধু সাবিত্রীকে পাবার চিন্তা। সে ভাবল সরাসরি প্রস্তাবটা পেশ করবে সাবিত্রীর কাছে। যদি সাবিত্রী রাজী না থাকে তবে আর অনর্থক সে গণেশকে মূলধন জোগাবে না। ভোর হতে তখনও একটু বাকী। রতন নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল।

হরিহরের জপ-তপ সারতে অনেক রাত হয়। তাই সে একা বাইরের ঘরে শোয়। গণেশ জানালা দিয়ে দেখল, হরিহর অঘোরে ঘুমুচ্ছে, নাক ডাকছে।

ভোর রাত্রে এক দৈববাণী শুনে হরিহরের ঘুম ভাঙল। সে স্পষ্ট শুনেছে, ঠাকুর বলেছেন, গণেশের সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে দিতে। গিন্নীকে ডেকে হরিহর সবকথা তাকে জানাল। গিন্নী অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করলে। বললে, ঠাকুর যখন বলেছেন তখন এ বিয়ে দিতেই হবে।

দেবাদেশের কথা গোপনেই রইল। বিয়ের আয়োজন হতে

লাগল। রতন কিছুই জানে না। একদিন সকালে এসে গণেশের দরজায় সে ডাকাডাকি সুরু করলে।

সে জানে সাবিত্রী নিশ্চয়ই দরজা খুলতে আসবে। তখন এ-কথা সে-কথার পর সে তার বক্তব্য বাসন্তীর কাছে পেশ করে ফেলবে, এই তার ইচ্ছা।

পাছে দাদার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, এই ভেবে সাবিত্রী নিজে উঠে গিয়ে সদরের খিল খুলে দিল। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে অনিদ্রাজনিত রতনের লাল চোখ দুটির দিকে সাবিত্রীর দৃষ্টি পড়তেই ভয়ে সে আৎকে উঠল। তার মনে হ'ল, রতন বোধ হয় নেশা করে এসেছে। নইলে এমন অসময়ে সে আসবে কেন? ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় তার মন বিষিয়ে উঠল। রতনের মুখের উপরই সে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

নিরাশ হয়ে রতন বাড়ী ফিরে এল। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবেই। ছলে-বলে-কৌশলে যে ভাবেই হউক সে সাবিত্রীকে হাত করবে, তার পর তার বিষদাঁত ভাঙবে।

বাড়ী ফিরতেই হরিহর রতনকে জানাল, তিন দিনের মধ্যেই বাসীর বিয়ে দেবে সে গণেশের সঙ্গে।

রতন প্রতিবাদে খানিকক্ষণ নিস্ফল আস্ফালন করলে। পুত্রের প্রতিবাদের উত্তর না দিয়ে হরিহর হুকো থেকে মুখ তুলে একগাল ধোঁয়া শূন্যে ছুড়ে দিল। শেষে মনের দুঃখে রতন ব্যবসার অজুহাতে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

রতনের অনুপস্থিতে নির্দিষ্ট দিনে গণেশের সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে হয়ে গেল।

বাসরঘরে বাসন্তীকে গণেশ বলল, আজকের দিনে রতনা বাড়ী থাকলে কত আনন্দ হ'ত।

বাসন্তী হেসে বলল, তুমি কিছু বোঝ না। দাদা ভেবেছিল তোমার বোনকে বউ করে আনবে, উল্টে তুমি তার বোনকে বিয়ে করলে। বোকা হয়ে তার উপর টেক্কা মারলে। এই আঘাত সে সহ্য করতে পারল না বলেই ত পালাল।

গণেশ প্রতিবাদ জানাল, বলল, কি, আমি বোকা? আমি বোকা হলে তুমি আমাকে পেতে না।

বাসন্তী গণেশের কথার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, মানে?

গণেশ আস্তে আস্তে তার দৈববাণীর কথা খুলে বলল। বলল, সেইত জানলার পাশ থেকে তোমার বাবার কানে দৈববাণী শুনিয়ে এসেছে। ঘুমের ঘোরে তোমার বাবা কিছুই বুঝতে পারেন নি। সব শুনে বাসন্তী হেসে উঠল, বলল, বটে, লেখা পড়া শিখলে তুমি হাকিম হতে।

তার পর দুজনের হাসিতে ঘর ভরে উঠল।

হরিহরের স্ত্রী তাকে আড়ালে ডেকে বলল, জানলে, দু'জনে বেশ ভাব হয়েছে।

হরিহর একগাল হেসে বলল, তা আর হবে না। এদের মিলন যে দৈবাদেশে হয়েছে গো!

জটায়ু

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

ডানায় আমার নীল দিগন্ত সাহস দিয়েছে এঁকে,—
নখরে আমার সংগ্রাম ঘন লাল,—
অনেক যুগের অত্যাচারের সমস্ত কালো মেখে
দুরন্ত তুমি কে এসেছ হে ভয়াল।

কার আশাভরা যৌবন নিয়ে রাক্ষসী এই খেলা?
আগুন লাগানো কার কাপাসের ক্ষেতে?
কোন্ কিশোরীর কান্না আমার ভরল সন্ধ্যাবেলা?
একমুঠো প্রাণ কে চায় আঁচল পেতে?

রাবণ অত্যাচারের জ্বালায় কার বাড়ী গেল পুড়ে?
কাম-হোমে কার আহুতি এ নারীমেধ?
ডানায় আমার কালো সংগ্রাম। পিঙ্গল বুক জুড়ে
জিঘাংসা ভরা জ্বলেছে লোহিত জেদ।

পঞ্চবটীর শ্যামল ছায়ায় ভীরু ডাকাতের হানা
হানতে দেব না—দেব না যদিন আছি,
বহুদিগন্ত জাগানো ঝড়েতে প্রচণ্ড এই ডানা
ঝাপটাবে আজ; বাঁচি আর নাই বাঁচি।

হয়ত অযুত যুগের সাগর পার করা এই চোখ
ধুঁধবে আজকে নতুন যুগের দোরে;
হয়ত অযুত যুগের জরায় নখরে বিলীন রোখ;
তবুও রাবণ দেখব কেমন করে—

না দিয়ে আমার মানার ডানায় শেষ বিদায়ের কোপ
হরণ করবে চির জীবনের সীতা;
জটায়ুর পাখা ধুলোয় লুটোবে। ধুলোয় প্রাণের ছোপ
রক্ত লেখায় লিখবে অমর গীতা।

স্মৃতিঘেরা সারনাথ

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

স্বচ্ছসলিলা বরুণা নদীর ব্রিজ অতিক্রম করে সাইকেল রিক্সা দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। পিচের প্রশস্ত পথ। দু'পাশের ঘন আম্রকুঞ্জের মধ্যে আত্মগোপনকারী অতীতের হাতছানি। নির্ম্মল নীল আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে আলোর ঝরণা। প্রভাতী সূর্য্য যেন পথিকের শিরে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করছেন। কাশী থেকে পাঁচ মাইল দূরে এসে সারনাথের দ্বারপ্রান্তে আমাদের রিক্সা থামল। বাঁ পাশের প্রথম উঁচু ঢিবিটি লক্ষ্য করে বাণুর জিজ্ঞাসু নেত্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পরিচয় ঠিক জানা ছিল না ঢিবিটির। তবু অনুমানের উপর নির্ভর করে বললাম—ওটি চৌখণ্ডী স্তূপ, বুদ্ধদেবের শিষ্যদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের স্থান। ওখানে প্রথম ত্রিশরণ মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। চুয়ান্ন জন সংসারবিরাগী ওখানেই নির্ব্বাণের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন বুদ্ধদেবের কণ্ঠনিঃসৃত 'চরথ ভিক্‌খবে চারিক' বাণী শুনে। পরে জেনেছিলাম আমার বলাটা মিথ্যে হয় নি সেদিন। ওটি চৌখণ্ডী স্তূপের চৌহদ্দিই বটে। স্তূপটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। উপরে আটকোণ বিশিষ্ট একটি বুরুজ আছে। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ওটি হুমায়ুনের স্মৃতিরক্ষার্থে আকবর নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন।

কাশী থেকে সারনাথ আসা খুবই সোজা। নূতন ঝকমকে রেল ষ্টেশন হয়েছে বুদ্ধজয়ন্তীর সময়। রেলপথে ত আসা যায়ই সারনাথ। তা ছাড়া মোটর, রিক্সা, টাঙ্গা—এদের যে কোন একটাতে আপন মর্জ্জিমত যে কোন সময়ে আসা যেতে পারে।

প্রথম স্তূপটি অতিক্রম করে আমরা চীনা মন্দিরের দ্বারে রিক্সা হতে নামলাম। পিকিংনিবাসী লি চুং সেঙ এ মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়েছেন। এ্যাসবেসটাস শেড দিয়ে প্যাগোডা প্যাটার্ণে তৈরী হয়েছে এ মন্দিরটি। মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলাম সম্মুখভাগে সিল্কের কাজ-করা ঝালর ঝুলছে। মোজেইক করা মেঝের মাঝখানে মর্ম্মর বেদীতে হরিদ্রাভ বস্ত্রাচ্ছাদিত ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধদেবের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে। মূর্ত্তিটির ধ্যানশ্রী-মণ্ডিত ভাব চিত্তাকর্ষক। ঠিক পশ্চাৎ ভাগে আছে বিড়লাপ্রদত্ত বুদ্ধদেবের আর একটি অনিন্দ্যসুন্দর ধাতব মূর্ত্তি। ফ্রেস্কো পেন্টিং-এ দেওয়াল ভরা। বৌদ্ধ জাতক হতে বুদ্ধজীবনী-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের সুন্দর চিত্রাবলী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মর্ম্মর মূর্ত্তির উত্তর পার্শ্বে কাচের আধারে রক্ষিত আছে প্রজ্জলিত দীপশিখা। প্রণাম নিবেদন করে মন্দির থেকে নিক্রান্ত হলাম। সম্মুখের মহাবোধি মহাবিদ্যালয় দেখলাম। বর্ম্মা, সিংহল, তিব্বত, সিকিম প্রভৃতি দেশের অর্থানুকুল্যে এটি গড়ে উঠেছে। এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। নাম মহাবোধি চিকিৎসালয়।

হঠাৎ বুদ্ধরাজ্যে শিবের উপস্থিতি নয়নগোচর হ'ল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটি অনুচ্চ ঢিবিতে সারঙ্গনাথ মহাদেব আসর জমিয়ে বসেছেন। তবে শ্রাবণী পূর্ণিমা এবং শ্রাবণ মাসেই মহাদেবের মাহাত্ম্য জাহির হয়। অন্য সময় বড় একটা কেউ মহাদেব দর্শনে আসে না। কেই বা আসবে শিবরাজ্য বারাণসী ছেড়ে সারনাথে সারঙ্গনাথ দেখতে?

একটু অগ্রসর হতেই বিড়লার আর্য্য-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ধর্ম্মশালা চোখের উপর ভেসে উঠল। একটি প্রাসাদ বললেই হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শেঠ বলদেব দাস বিড়লা এটি নির্ম্মাণ করিয়েছেন। এর কক্ষগুলি সুন্দর, প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন এবং প্রচুর আলোবাতাস-যুক্ত। এ ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাওয়া যায় এবং খরচ দিলে আহার্য্যও পাওয়া যায়। আমরা এসেছি কাশী হতে আবার বিকেলে সেখানেই ফিরে যাব। সঙ্গে আহার্য্য আছে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র অপেক্ষা করব সারনাথের সবুজের ছক-কাটা প্রান্তরে। প্রান্তরের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে আছে মূলগন্ধকুটী বিহার। এটি নব-নির্ম্মিত। মানুষ যেন তার অন্তরের আবেগ-আকুতিতে মন্দির মাধ্যমে অন্তরের পদপ্রান্তে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। মানুষের মৃত্যু থেকে অমৃতে ফিরে যাবার অভীপ্সা, অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার ইচ্ছা, অনিত্য থেকে শাশ্বতে যাবার অন্তহীন অভিলাষ যেন বিহারের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। একটি শান্ত রসাস্পদ পরিবেশে স্থানটি আজও শান্তিময়। বুদ্ধদেবের সাম্যের বাণী, অহিংসার বাণী, যেন আজও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে উচ্চারিত হয়ে স্বস্তিবাচন শোনাচ্ছে সারা জগতকে, পঞ্চশীলের প্রেরণা দিচ্ছে হিংসা, লোভ, ভয় ও আতঙ্কগ্রস্ত পৃথিবীকে। প্রান্তরে যেন সেই প্রাচীন সূক্তিই অনুরণিত হচ্ছে :

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ
অন্তরিক্ষঃ শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিঃ
আপঃ শান্তিঃ
বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ
সর্ব্বঃ শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তি রে ধি।

হৃদয়ঙ্গম করলাম হত্যা-সমাচ্ছন্ন হিংসা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে

তথাগতের বাণী এখনও শান্তির প্রলেপদানে হয়ত সক্ষম। আমাদের অন্তরে অপরিমেয় প্রসন্নতা মন্দিরটিতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হতেই ফুটে উঠল।

মূলগন্ধকুটী বিহার স্বর্গীয় অনাগরিক দেবমিত্র ধর্ম্মপালের অমরকীর্ত্তি। অধ্যক্ষ হারগ্রীভস ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইসিপতনের খনন-কার্য্যের সময় এক শিলালেখ আবিষ্কার করেন। শিলালেখটিতে মূলগন্ধ কুটী নাম খোদিত ছিল। ধর্মপাল তখন ইসিপতনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মূলগন্ধকুটী বিহারের নবরূপায়ণ দেবার সঙ্কল্প নিলেন। তাই ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আজকের এই গগনস্পর্শী বিহারটি নির্ম্মিত হ'ল। দাতাদের নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিহারগাত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বৌদ্ধ-উপাসিকা মেরী এলিজাবেথ ফষ্টার ও মিঃ বি এল ব্রাউন্টেনের নাম উল্লেখযোগ্য কারণ ব্যয়ভারের মোটা অংশটাই তাঁরা বহন করেছেন।

প্রবেশ করলাম মন্দিরে, মন্দিরমধ্যে বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন মূর্ত্তিটি সুন্দর ভাবে স্থাপিত হয়েছে। এটি সংগ্রহালয়ে রক্ষিত প্রাচীন ধর্ম্মচক্র মূর্ত্তির অনুকরণে নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটির বক্ষোপরি ন্যস্ত হস্তদ্বয়ের মুদ্রাটি ধর্ম্মচক্র মুদ্রা। মূর্ত্তিটির মুখে দিব্যভাব, পরিধানে সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা সূচিত অতি সাধারণ ভিক্ষু-কাষায় বস্ত্র। শিল্প-সুষমার অনবদ্য অবদান এটি। অভ্যন্তরের প্রাচীরগাত্রে অজন্তার অনুকরণে বুদ্ধ-জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। প্রধান চিত্রশিল্পী জাপানী চিত্রকর কসিটুনোসু।

আমরা একের পর এক চিত্র দেখে চলেছি। প্রথম চিত্রে দেবগণ বোধিসত্ত্বকে ধরাধামে অবতীর্ণ হবার আবেদন জানালেন। তার পরের চিত্রে দেখান হয়েছে নিদ্রামগ্না মহারাণী মায়াদেবীকে। এক শ্বেতহস্তী শ্বেতপদ্ম শুণ্ডে ধারণ করে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে। তার পরের চিত্রে দেখলাম সিদ্ধার্থের জন্ম। এর পর দেখলাম ঋষি অসিত এসেছেন সিদ্ধার্থকে দেখতে। শুদ্ধোধন ঋষির আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন। ঋষি বললেন—ইনি হবেন বুদ্ধ। এঁর অমৃত-বাণীতে ধরণী ধন্য হবে। এই ভাবে একে একে বুদ্ধ বাল্য জীবনী রঙ তুলির আঁচড়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মন্দিরগাত্রে। ক্রমে ঘনিয়ে এল সেই নিশীথ রাত্রি। নিদ্রামগ্না যশোধরা, পাশে নবজাত রাহুল। উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে স্থিরদৃষ্টিতে মাতা-পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন সিদ্ধার্থ। এখনই ছেড়ে যেতে হবে সবকিছু। পরের চিত্রে সারথি ছন্দকের সঙ্গে চলেছেন সংসার ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ। মুখে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, চোখে অপার করুণা, তার পর চিত্রশিল্পীর তুলিতে রূপায়িত হয়েছে কৃশতনু তপস্বী সিদ্ধার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তি। শ্রেষ্ঠী দুহিতা সুজাতার পরমান্ন নিবেদন চিত্রটি অনবদ্য। এর পরের চিত্রটি অবিস্মরণীয়। বৈশাখী পূর্ণিমা, আকাশে পূর্ণচন্দ্র, ধরণী নীরব, নিথর। বজ্রতীরে উরুবিল্বে অশ্বত্থ তরুমূলে ধ্যাননিমগ্ন সিদ্ধার্থ। মারের অভিযান সুরু হয়েছে। কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ প্রভৃতি চেষ্টা করছে মারের নির্দ্দেশে সিদ্ধার্থকে মোহগ্রস্ত করতে। কিন্তু না, তারা পরাজিত হ'ল। সিদ্ধার্থ হলেন মার-বিজয়ী সম্বুদ্ধ। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষসিংহের চারিপাশে মারের ব্যর্থতা-চিত্র নিপুণ চিত্র-শিল্পী তুলির সূক্ষ্ম আঁচড়ে অমর করে দিয়েছেন।

আর একখানি চিত্রের সম্মুখে আমরা স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন। সূর্য্য ডুবুডুবু। বুদ্ধ এলেন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের অমৃতের সন্ধান দিতে, শিষ্যরা ব্যতিব্যস্ত, কেউ পাত্র আনেন, কেউ অর্ঘ, কেউ আসন। বুদ্ধ তাঁদের স্থির হতে বললেন, এই দিনেই তিনি প্রবর্ত্তন করলেন ধর্ম্মচক্রের। এই ভাবের কত ফ্রেস্কো পেন্টিংয়ে চারিধার চিত্রিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চিত্র রয়েছে এখানে তেইশটি।

মন্দির হতে বাইরে আসছি, এমন সময় মুণ্ডিত মস্তক, পীতবাস-পরিহিত পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আনন্দের উৎস যেন তাঁরা, মুখে মৃদু হাসির প্রলেপ লেগে আছে। হয়ত তাঁদের মন সম্প্রসারিত, কামনা তাঁদের আত্মাকে সঙ্কুচিত করে নি। লোভ নেই তাঁদের, অতএব পাপও করেন না। তাই পরি-নির্ব্বাণের পথযাত্রী তাঁরা, স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে তাঁরা উচ্চারণ করলেন উপাসনার মন্ত্র। স্তব্ধ হয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা শুনতে লাগলাম সেই মধুস্রাবী মন্ত্র উচ্চারণ। কতক্ষণ আবিষ্টের মত দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। দারোয়ানের কণ্ঠস্বরে সচকিত হলাম, সে বললে, দরওয়াজা ছোড়, সাধুলোগ বাহার যায়ে গা। সলজ্জ ভাবে পথ ছেড়ে প্রান্তরে নেমে এলাম।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান সারনাথ, এর পূর্ব্ব নাম ইসিপতন মৃগদায়। ইসিপতন ঋষিপতন শব্দের অপভ্রংশ। ঋষিদের দেহ এখানে পতিত হ'ত। কিন্তু কেন? এ সম্পর্কে বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উক্ত আছে যে, পুরাকালে বারাণসীর উত্তর প্রান্তে এক মহাবন ছিল। সেখানে পাঁচশ 'প্রত্যেক' বুদ্ধ বাস করতেন। তাঁরা আকাশে উঠে পরিনির্ব্বাপিত হতেন। তাঁদের স্ব স্ব মাংস-শোণিতময় দেহ তেজ ধাতুর দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে বনখণ্ডে পতিত হ'ত। আবার কোথাও লিখিত আছে, ঋষিরা হিমালয় হতে আকাশমার্গে বারাণসী আসবার সময় এখানেই অবতরণ করতেন। মৃগদায় নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও এক কাহিনী প্রচলিত আছে। অতীতের কোন এক জন্মে গৌতম বুদ্ধ পাঁচশ মৃগের অধিপতি হয়ে এক মহারণ্যে বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল ন্যগ্রোধমৃগ। শাখামৃগ নামে অপর এক মৃগদলের দলপতি সেই একই বনে বাস করতেন। বারাণসীর তৎকালীন নৃপতি ব্রহ্মদত্ত প্রত্যহ সানুচর মৃগয়া করতেন সেই মহা-বনে। বহু মৃগ প্রাণ হারাত প্রতিদিন। অবশেষে ন্যগ্রোধের পরামর্শক্রমে স্থির হ'ল যে, প্রত্যহ রাজার রন্ধনশালায় একটি করে মৃগ পাঠান হবে। রাজা উভয় দলপতিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কোন দিন তাঁদের কেউ হত্যা করবে না। একদিন শাখামৃগের দলের এক গর্ভিণীর পালা, সে দলপতির কাছে গিয়ে পালা রক্ষা করার অসমর্থতার কথা জানাল, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। তখন সে ন্যগ্রোধের শরণাপন্ন হ'ল। ন্যগ্রোধ তাকে অভয় দিলেন। তিনি নিজে তার পালা রক্ষার জন্য কাশীরাজের রন্ধনশালায় উপস্থিত

চীনা মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি

হলেন। মৃগটির অপূর্ব্ব রূপে আকৃষ্ট হয়ে ঘাতক রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা এসেই দেখেন স্বয়ং মৃগরাজ উপস্থিত। কারণ জিজ্ঞাসা করে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জ্ঞাত হলেন কাশীরাজ। পরার্থে জীবনদানের সঙ্কল্প রাজাকে করুণায় আর্দ্র করে তুলল। তিনি হিংসা পরিত্যাগ করলেন। বনের সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিলেন। মৃগয়া সে দিন দায়মুক্ত হ'ল, তাই এই মহারণ্যের নাম হয়েছিল, মৃগদায়।

স্থানটির বর্ত্তমান নাম সারনাথের উল্লেখ কোন পালি সাহিত্যে নেই। ঠিক কখন হতে যে স্থানটি সারনাথ নামে পরিচিত হ'ল তারও সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। ফাহিয়ান বা হিউয়েনসাং এ নামের উল্লেখ করেন নি। অশোক, কনিষ্ক, হর্ষবর্দ্ধন বা পাল রাজাদের সময়েও এ নামের প্রচলন হয় নি। কোন প্রাপ্ত শিলালিপিতেও এ নামের উল্লেখ নেই। অনুমান করা যায় শৈবমতাবলম্বিগণই হয়ত এই নামের প্রচারক। ইসিপতনের অদূরে এক টিলায় এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছিল। লিঙ্গের নাম সারঙ্গনাথ। হয়ত তারই অপভ্রংশ।

প্রান্তরের সুরকি-ঢালা পথে অগ্রসর হয়ে চলি। হেথাহোথা অতীত উকি মারে। কিছু পরে ধামেক স্তূপের পাদদেশে এসে পৌছলাম। স্তূপটি যেন মহাস্থবিরের মূর্ত্ত মূর্ত্তি। এ স্তূপও ধর্ম্মচক্রের স্মৃতিবাহী। ধামেক ধর্ম্মোপদেশক শব্দের অপভ্রংশ। আনন্দের কথা মাত্র এই একটি স্তূপই ধ্বংসকারীদের হাত হতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। স্তূপটি ঘণ্টাকৃতি এবং অর্দ্ধ গোলাকার। স্তূপ নিম্নভাগে এখনও আটটি কুলুঙ্গী দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে প্রত্যেকটি কুলুঙ্গীতে এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি থাকত। স্তূপটির জীর্ণাবস্থা। ইট খসে পড়ছে। নীচে দাঁড়াতে সাহস হয় না, পাছে কোন ইট খসে ঘাড়ে পড়ে যায়। স্তূপটি নির্ম্মিত হয়েছিল অশোকের সময়ে। পরে গুপ্তযুগে এর সংস্কারকার্য্য এবং অলঙ্করণ সম্পন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এর সুক্ষ্ম লতানো কার্য্যগুলি গুপ্তযুগের স্মৃতিবাহী। এক যায়গায় গ্রীবাতে একজোড়া পাখী আর পদ্মফুল এখনও অক্ষত রয়েছে দেখতে পেলাম। এর থেকে স্তূপটি যে পূর্ব্বে কারুশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল তা বেশ অনুমান করা যায়। একটি শিকল বাঁধা রয়েছে স্তূপের শীর্ষদেশে। এর বয়স দু'হাজার বছরেরও বেশী। ছাপাখানা ছিল না সে যুগে, বইও ছিল না। তাই পাষাণকেই বাহন করে ভাবীকালের দরবারে ধর্ম্মের অনুশাসনগুলিকে পৌঁছে দেবার উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন প্রিয়দর্শী অশোক। স্তম্ভ, স্তূপ, পাষাণ ছত্রিকা, খোদিত গুহা প্রভৃতির পাষাণ গাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছিল ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে ধর্ম্মের তথা নীতির অনুশাসন। অশোকের কারুশিল্প আর্টের অপূর্ব্ব নিদর্শন। আর্টকে ধর্ম্মের বাহন করার পথিকৃৎরূপে অশোক চিরদিনই নন্দিত হবেন।

ধামেক স্তূপ থেকে একটু অগ্রসর হয়ে একটি জৈন মন্দির দেখলাম। এটি আধুনিক কালের, তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশনাথের এটি। এই জৈন মন্দিরের পাশেই ছিল একটি সংঘারাম। আজ তার কোন চিহ্ন নেই।

সোজা অগ্রসর হয়ে চলি। চোখে পড়ে সারিবদ্ধ ভগ্ন স্তূপ। যেদিকে তাকাই মাটি অপসারিত-করা ধ্বংসাবশেষ হাতছানি দেয়। বড় বড় নিমগাছের ছায়ায় স্থবির অতীত যেন বিশ্রাম করছে। নিমগাছগুলি মৃদু কম্পনে শাখা আন্দোলিত করে ক্লান্ত অতীতকে ব্যজন করছে। এই নিমের পরিবেষ্টনের মধ্যে কত সংঘারামই না ছিল। কত সন্ন্যাসী থাকতেন একদিন এখানে। এখান থেকে ধর্ম্ম-অভিযানে বাহির হতেন দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু, আলোর মত দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত বৌদ্ধধর্ম্ম। পরে সংঘারামগুলি যখন প্রকৃত মানুষ তৈরি করার ক্ষমতা হারালো, তখনই হ'ল এদের ধ্বংস, অবলুপ্তি। মধ্য-এসিয়া, মহাচীন, সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে জিজ্ঞাসু আসত এখানে জ্ঞান লাভ করতে। তারা স্বদেশে ফিরে যেত দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের জ্যোতির ধারায় স্নান করে, মৈত্রীর মন্ত্র বহন করে, প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হয়ে।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি আমরা, কত কক্ষ, কত চত্বর, কত ভগ্ন সোপান অতিক্রম করলাম, পরিক্রমা করলাম উচ্চাবচ কত উপাসনা-ভূমি, ভিত্তি-সম্বল সংঘারাম। পাশেই শ্যামল বনানী, ঘন না হলেও বৃক্ষ সমাচ্ছন্ন বটে। সেদিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি, কারণ বনানী সংলগ্ন কতকগুলি ধ্বংসাবশেষও কম দর্শনীয় নয়। হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল হতে চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল, 'মিতা, ছবিটা শেষ করে ফেলেছি।'

'ধামেক স্তূপের ?'

'না, তোমার।'

'কাল প্রিন্সিপ্যালকে দেখাবে কি, আমার ছবি আঁকতে ত তিনি তোমাকে এখানে পাঠান নি।'

'তা সত্যি, কিন্তু তুমি এত কাছে আছ আজ যে তোমার ছবি আঁকা ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না।

আমাদের কৌতূহলী আঁখি লতাগুল্মের আবরণ ভেদ করে এক জোড়া তরুণ তরুণীকে ঘন হয়ে উপবিষ্ট থাকতে দেখতে পেল। পাছে তাদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা সৃষ্টি হয় তাই আমরা অন্য পথ ধরলাম। সে পথের প্রান্তে দেখতে পেলাম একদল তরুণ এবং তিনজনা তরুণী চিত্রশিল্প নিয়ে মসগুল হয়ে আছে। সকলেই অঙ্কনকার্য্যে ব্যস্ত। বুঝলাম কোন আর্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সারনাথে বেড়াতে এসেছে।

বাঁদিকের মোড় ভেঙে অগ্রসর হয়ে চলেছি আমরা। পথি-মধ্যে এক বৃক্ষ ছায়ায় বসে গেছে একদল দর্শনার্থী। সামনে তাদের লোটা-ভরা জল আর উত্তরীয়ে বাঁধা জলে-ভেজানো ছাতুর তাল, লঙ্কা কামড়াচ্ছে আর ছাতু উদরস্থ করছে পরম তৃপ্তিতে। হঠাৎ এরা এখানে এসে পড়ল কেমন করে? এ স্থান ত এদের জন্য নয়। কৌতূহলী হয়ে আমরা বসলাম এদের কাছে। খাওয়া শেষ করে এরা আবার চলা সুরু করলে প্রতিটি শিলাখণ্ডকে প্রণাম করতে করতে। এদের প্রাণের ঠাকুর লুকিয়ে আছে যেন প্রতিটি ভগ্নস্তূপে। কিসের স্তূপ, কোন যুগের—এ পরিচয় এদের অজ্ঞাত। জানতে চায় না এরা এ সব কিছু। শুধু প্রণাম আর পথ চলা—পিঠে গাঁঠরি, হাতে লাঠি, এরা তীর্থ-যাত্রী, এদের মনে অনুসন্ধিৎসা নেই, আছে ভক্তি-কুসুম। সেই কুসুমই এরা পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনে দেবতা চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। চলে গেল তীর্থযাত্রীরা দ্রুতপদক্ষেপে।

আমরা বসে আছি নিমের ছায়ায়। অতীত ভাসছে চোখের সামনে। একদা মাত্র চুয়ান্ন জন শিষ্য সম্বল করে বুদ্ধদেব এখান থেকেই পাণ্ডিত্যের মহাদুর্গ দেবধানী বারাণসীধাম জয় করতে চেয়েছিলেন। বারাণসীকে জয় করতে আনার অর্থ সারা ভারতবর্ষকে দলে টানা। বারাণসীর তীর্থক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য যাত্রীদের সঙ্গে বৌদ্ধ যাত্রীদের মহামিলন ঘটেছিল। তাই হুয়েন সাং দেখে গেছেন বারাণসীতে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার এবং তিন চার হাজার বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোক। কিন্তু আজ বৌদ্ধধর্ম্ম বারাণসী হতে নির্ব্বাসিত, তবে সারনাথে যে বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য এখনও বেঁচে আছে তা অনুভব করা যায়। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বেঁধে বসেছে। সে যেন বলতে চায় জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, সুখ অনিত্য, ধনজন সব অনিত্য, শাশ্বত শুধু ধর্ম্ম। অতএব 'যা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্।' অহিংসা, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী একদিন উৎসারিত হয়েছিল এখান থেকে। পানং না হানে, ন চ দিন্ন যা দিয়ে, মুসা ন ভাসে—প্রভৃতি শীলকে সম্বল করে চরিত্র-গঠনের অনুশাসন এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। শীল মানেই মঙ্গল। মঙ্গল লাভই মুক্তির সোপান। আবার মঙ্গল লাভ করতে হলে 'মেত্তি ভাবনা' বা মৈত্রী ভাবনার প্রয়োজন, ভাবতে হবে—সব্বে সত্তা সুখিত্তা হোন্তু—সকল প্রাণী সুখী হোক, অবেরা হোন্তু শত্রুহীন হোক, অব্যাপজ্জা হোন্তু (অহিংসা হোক)। এই উদার নীতির জন্য উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন—সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল একদিন। বুদ্ধদেবের শিষ্যদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার ছিলেন, ব্রাহ্মণ সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন, শাক্য কুলোদ্ভব আনন্দ ছিলেন, বণিক অনাথ পিণ্ডদ ছিলেন, পরামাণিক উপালী ছিলেন, পতিতা অম্বপালী ছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম সকল মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল, তাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাই বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত তা দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। অমোঘ সত্যের আহ্বানকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে নি। কবি তাই গেয়েছেন—

আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণতঃ চরণে যাঁর।

কিন্তু দৈবী মায়া বোঝা ভার। এত বড় অহিংসার ক্ষেত্র হিংসার দাবদাহে জর্জ্জরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এক হাতে অস্ত্র, অপর হাতে কোরাণ নিয়ে উদ্ধত অশ্বারোহীর দল ছুটে এসেছে ধর্ম্মে রূপান্তরিত করতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের। অহিংসার কত বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সে দিন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, হাসিমুখে হিংসার অত্যাচার সহ্য করে উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন তাঁরা, তবু ধর্ম্মত্যাগ করেন নি। সেই হতে নির্ব্বাপিত জ্যোতিষ্কের মত পড়ে আছে সারনাথ তার সারবত্তা হারিয়ে।

কিছু আহার করে নিয়ে আবার অগ্রসর হলাম। পাশেই ধর্ম্মরাজিক স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীরাজ চেত-সিংহের দেওয়ান জগৎসিং স্তূপটি বিধ্বস্ত করে তার ইট-পাথর নিয়ে কাশীতে 'জগৎ মহল্লা' গড়ে তোলেন। ধর্ম্মরাজিক স্তূপের পাশেই ছিল পুরাকালের প্রধান মন্দির—মূলগন্ধকুটী বিহার। এই বিহারের পশ্চিম পার্শ্বে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অশোক স্তম্ভটির অবস্থান ক্ষেত্র। এর সিংহচক্র-খোদিত শীর্ষভাগটি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। আজ সারনাথের পূর্ব্ব গৌরব নেই। কঙ্কালসার স্মৃতিটুকু নিয়ে সারনাথ বেঁচে আছে। সারনাথের সর্ব্বপ্রাচীন শিল্পকীর্ত্তির নিদর্শন হ'ল অশোকস্তম্ভ, ধর্ম্মরাজিক স্তূপ এবং অশোক বেদিকা। এগুলি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের। এখানের সর্ব্বশেষ শিল্প-নিদর্শন হ'ল দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কুমরদেবীর ধর্ম্মচক্র জিন বিহার। সারনাথ গড়ে উঠেছিল দেড় হাজার বছরের সাধনায়। মৌর্য, শক, গুপ্ত, মৌখরী, হর্ষবর্দ্ধন, প্রতীহার, কলচুরি, পাল এবং মহারাণী কুমরদেবী—এঁরা প্রত্যেকেই সারনাথের সমৃদ্ধিবর্দ্ধক। গৌরবময় বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস, বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ক্রমবিকাশের ধারা আজও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে সারা সারনাথে।

আর একবার বসলাম আমরা। বিশ্রামান্তে মিউজিয়ামের দিকে অগ্রসর হলাম। এইটিই আমাদের শেষ গন্তব্যস্থান। টিকিট কাটতে হ'ল যাদুঘরে প্রবেশের জন্য।

যাদুঘরে প্রবেশ করেই প্রথমে চোখে পড়ল প্রখ্যাত অশোক-

সারনাথের সিংহস্তম্ভ

স্তম্ভের চারিসিংহ-সম্বলিত শীর্ষভাগ। এটি ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন সন্দেহ নেই। গাম্ভীর্য্যে ও স্বাভাবিকতায় এটি মৌর্য্যশিল্পের প্রাণ-ভ্রমর বলা যায়। স্তম্ভটি মসৃণ চুণার পাথরে নির্ম্মিত। এত মসৃণ মনে হয় যেন একখানি ঝকঝকে আয়না। স্তম্ভটি যেন কেউ এইমাত্র নির্ম্মাণ করে রেখে গেছে। হাত দিলে হয়ত এর অপূর্ব্ব বজ্রলেপ বর্ণ হাতে লেগে যেতে পারে। যদিও এটি দু হাজার বছরের পূর্ব্বের তৈরী। স্তম্ভের কটিদেশে চারটি চক্র। প্রত্যেক দুটি চক্রের মধ্যভাগে বৃষ, অশ্ব, মৃগ, সিংহ গতিশীল ভঙ্গিতে খোদিত। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত এবং চলিষ্ণু। উপরে পরস্পর পৃষ্ঠ সংলগ্ন চারটি সিংহমূর্ত্তির তেজো-দৃপ্ত অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা। সবার উপর ছিল ধর্ম্মচক্র। সেটি ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে। তার কিছু ভগ্ন অংশ পার্শ্বের কাচাধারে রক্ষিত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই স্তম্ভের সিংহগুলি গ্রীক আর্টের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। মৌর্য্য যুগের আর্টের উপর ইরাণী এবং গ্রীক আর্টের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। তবে মসৃণতা এবং গঠন-পারিপাট্য ভারতীয় আর্টের বিরল বৈশিষ্ট্য।

স্তম্ভের পাশের কুশান যুগের দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটি দর্শকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূর্ত্তির মাথায় অতিকায় পদ্মাকৃতি পাষাণ ছত্রিকাখানি নষ্ট হয়ে গেলেও জোড়াতালি দিয়ে পাশে রাখা হয়েছে। আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগল এই কক্ষের দক্ষিণ পাশে স্থাপিত ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় সমাসীন ধ্যান-নিমীলিত বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি। এর পাদপীঠের মধ্যভাগে চক্রখোদিত থাকায় সারনাথেই যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার খোদিত মৃগমূর্ত্তি মৃগদাবের প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অগ্রসর হয়ে চলি। পাশের কক্ষে প্রবেশ করতেই মনে হ'ল কে যেন বলে দিলে কানে, অতীত ঘুমিয়ে আছে এখানে, ধীরে অগ্রসর হও, যেন ওদের ঘুম না ভাঙে। মোটামুটি সাল-তারিখের দিক থেকে সাজান হয়েছে মূর্ত্তিগুলি, এক এক যুগের মূর্ত্তি এক এক দিকে অথবা এক একটি কক্ষে স্থানলাভ করেছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক থেকে ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন যুগের শিল্প-কর্ম্মের নিদর্শন সাজানো আছে সারনাথের এই প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে।

পাশের কক্ষে প্রবেশ করে বুদ্ধ-জীবনের দ্বাদশটি প্রধান ঘটনার চিত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখে বিস্মিত হলাম। কক্ষদ্বারের বহির্দ্দেশে স্থাপিত দীর্ঘ সর্দ্দলটির শিল্প-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব। কত আর দেখি। বুদ্ধ আর বুদ্ধ, সারি সারি বুদ্ধমূর্ত্তির সমারোহ। ধ্যানী বুদ্ধ, জ্ঞানি বুদ্ধ, পদ্মাসন বুদ্ধ, বজ্রপাণি বুদ্ধ, যে দিকে তাকাই সুষমা-সমৃদ্ধ প্রশান্ত পাষাণ। মূর্ত্তিগুলির সমস্তভালে প্রসন্নতার ছাপ, মুখে শান্তির সুমধুর হাসি, অমৃতের বাণী বহন করে চলেছেন ওঁরা অমৃতের পুত্রদের জন্য যুগ হতে যুগান্তরে।

মধ্যের হলঘরটিতে প্রবেশ করলাম। এর সংলগ্ন অন্য কক্ষগুলি বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের প্রভূত মূল্যবান শিলালিপিতে পূর্ণ। শুধু বৌদ্ধই নয়, হিন্দুযুগের প্রচুর শিল্পকর্ম্মের নমুনাও প্রাচীন বারাণসী হতে উদ্ধার করে এখানে রক্ষা করা হয়েছে। একাদশ শতাব্দীর কার্ত্তিকেয়, শিব, ভৈরব, ব্রহ্মা, সূর্য্য, ত্রিমূর্ত্তি, উমা, মহেশ্বর, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নবগ্রহ, মুখহীন অগ্নিমূর্ত্তি প্রভৃতি দেখলাম আমরা। বসুধারা ও জম্ভালার কাহিনী অবলম্বনে একটি ভাস্কর্য্য অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় স্থাপিত রয়েছে এখানে।

অপর একটি কক্ষে অসুর নিধনরত উদ্যত ত্রিশূল শিবমূর্ত্তিটি আমাদের আকৃষ্ট করল তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির মূর্ত্তিও রয়েছে এ কক্ষে।

যাদুঘরে শিল্পকলার মাধ্যমে গুপ্তযুগের ভারতবর্ষকে দেখতে পেলাম, হিন্দু ধর্ম্ম-সংস্কৃতির নব-জাগরণের যুগ এটি। নব নব প্রতিভার উন্মেষে এ যুগ সমুজ্জ্বল। এ যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য্য ভাবগাম্ভীর্য্যে ও অঙ্গবিন্যাসের সামঞ্জস্যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল। পূর্ব্বতন ভাস্কর্য্যের রূঢ়তা মুক্ত হয়ে, গান্ধার রীতির গ্রীক প্রভাবকে স্নিগ্ধ-সুষমায় আচ্ছাদিত করে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নিজস্ব রীতি এই যুগে বিকশিত হয়, তারই নিদর্শনে সারনাথ যাদুঘরের অনেকগুলি কক্ষই পূর্ণ দেখতে পেলাম।

হাত ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে দেখলাম, এবার ফেরার পালা, যাদুঘরের বাইরে এসে আবার রাস্তায় উঠলাম, সামনেই সারনাথের বিশাল প্রান্তর, তাকিয়ে রইলাম অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে। মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে উচ্চারিত হয়ে গেল তথাগতের উদ্দেশে—

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

---

* প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য লেখক কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচারের নিকট ঋণী।

পল্লী সমাজ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
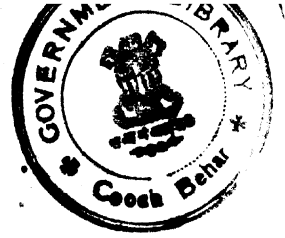
পল্লী অঞ্চলের উন্নতিবিধানের জন্য রাষ্ট্র নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং অজস্র অর্থও ব্যয় করিতেছেন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা সহরে থাকেন, পল্লী অঞ্চলের সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নাই, অথচ পল্লী-দরদী, তাঁহারা সংবাদপত্রে সরকারী বিবরণী, ফিরিস্তি প্রভৃতি পাঠ করিয়া মনে করিবেন, পল্লী অঞ্চলে সোনা ফলিতেছে, জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু যথার্থ তাই কি? নিজের পল্লী অঞ্চলের কথা জানি, বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন লোকের সহিত যোগাযোগ আছে—আমার পল্লী অঞ্চল যেমন দুঃখ-দারিদ্রে ক্লিষ্ট—অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও তেমন। কাহারও মুখে শুনি নাই, পরিকল্পনা-সমূহের ফলে জনসাধারণের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। পরন্ত জনসাধারণ সকল দিকেই বিপর্য্যস্ত।

পরিসংখ্যানের দ্বারা বুঝান হয়, জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের আঘাত ততটা তীব্র নয়। বাস্তবে এ কথা কি সত্য? পরিসংখ্যানের মূল্য কি—তাহা আমরা খাদ্য সংক্রান্ত প্রচারিত নানাবিধ পরিসংখ্যানের দ্বারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। রাষ্ট্র কি জানেন দুর্ম্মূল্যের ফলে পল্লী অঞ্চলের একদা সমৃদ্ধ কত পরিবারের কত লোক অনাহারে এবং প্রায় নগ্ন অবস্থায় ঈশ্বরের উপর ভাগ্য ন্যস্ত করিয়া দিনের পর দিন যাপন করিতেছেন? তাঁহারা একেবারে সঙ্গতিশূন্য, যাহা কিছু ছিল স্থাবর-অস্থাবর সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পরিসংখ্যান লওয়া হইয়াছে কি? এবং যদি লওয়া হইয়া থাকে ইহাদের মানুষের মত বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে?

সাধারণ কৃষক শ্রেণীর এবং ভূমিশূন্য শ্রমিকের অবস্থা কি? তাহাদের ক্রয়শক্তি যতটুকু বাড়িয়াছে তাহা দ্বারা তাহারা কি দুর্ম্মূল্যের আঘাত সহ্য করিতে পারে? ইহা জানিবার জন্য কোন পরিসংখ্যানের বা হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নাই। রাস্তা-ঘাটে চক্ষু খুলিয়া চলিলেই নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী প্রভৃতির সংখ্যা ত কম নহে। ইহাদের সফরের খরচের হিসাব পড়িলে চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু ইহারা সফরে যাইয়া কি করেন, বিশেষতঃ কি দেখেন এবং সেই করা বা দেখার ফল পল্লীর জনসাধারণের কোন্ দিকে কতটুকু উপকার হয় তাহা হয়ত চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা থাকে। ইহাদের সফরের জন্য পল্লী-বাসীরও বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। এই বিড়ম্বনার কথা বিস্তৃত ভাবে আর লিখিলাম না।

মন্ত্রী বা উপমন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইয়া বা নূতন নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়া এবং কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়াইয়া পল্লী সমাজের উন্নতি সাধন করা যায় না। যদি করা যাইত, তাহা হইলে এই বারো বৎসরের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ বঙ্গদেশকে "শস্য শ্যামলা, মলয়জশীতলা" করা যাইত। নূতন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার। এখনও মহাত্মা গান্ধীকে সামনে রাখিয়া কত অকাজ কুকাজ করা হইতেছে, তাঁহার কোন কথাটা স্মরণে রাখা হইয়াছে বা পালিত হইতেছে? অনেকে বলেন তিনি মরিয়া বাঁচিয়াছেন, বর্ত্তমান দৃশ্য তাঁহার পক্ষে মৃত্যুবৎ হইত। তাঁহার শিষ্যগণ জাঁকজমক আড়ম্বরে ব্রিটিশকেও পরাজিত করিয়াছেন। এই তীক্ষ্ণ সত্য কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মন্ত্রী-উপমন্ত্রী মহোদয়গণ পল্লী অঞ্চল পরিক্রমণ করিতে পারেন না কি? তাঁহারা যদি চক্ষু খুলিয়া ভ্রমণ করেন তাহা হইলে সর্ব্বহারাদের সংখ্যাই বেশী দেখিবেন।

জনসাধারণের উপযোগী কোন পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে জনসাধারণের প্রতি প্রকৃত দরদ থাকা চাই, আচার, ব্যবহার, চালচলন, কার্য্যকলাপ প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণকে প্রথমেই আপনার করিয়া লইতে হইবে। এই আপনার করার মূলেই সকল পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব।" মন্ত্রী-উপমন্ত্রী এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণের মধ্যে এইরূপ প্রতিভা কয়জনের আছে? অন্যকে ইহারা দূরে রাখিতেই চাহেন। রক্ষিত ও পুলিশ বেষ্টিত ঘরে ইহাদের স্থান—পল্লী অঞ্চলের কয়জন ইহাদের নাগাল পান? পরকে আপনার করিয়া লইতে না পারিলে কেবল বক্তৃতা ও মুখের বুলির দ্বারা পল্লীর উন্নতি বিধান করা যায় না। কেবল ভোট সংগ্রহের সময় পল্লী সমাজের উন্নতিমূলক কার্য্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া ভোট সংগ্রহ করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা পল্লী সমাজকে আপনার করিয়া লওয়া যায় না। আমাদের নেতৃবর্গ ভোট সংগ্রহের সময় কিরূপ প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করেন, কিরূপ বক্তৃতা করেন, কত রকমের প্রতিশ্রুতি দেন তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তেইশ বৎসরের যুবক এব্রাহাম লিনকন্ ভোট সংগ্রহের সময় বলিয়াছিলেন, "খুবই সম্ভব আমার বয়সের অনুপাতে আমি হয় ত অনেক বেশী কথা বলিয়াছি, যাহা আমার পক্ষে বলা উচিত হয় নি। যাহা হউক যে সকল বিষয়ে আমি বলিয়াছি,

সেই সকল বিষয়ে আমি যেমন ভাবিয়াছি, ঠিক তেমনি বলিয়াছি। কোন কোন বিষয়ে কিম্বা সকল বিষয়েই আমি ভুল বলিয়াছি, কিন্তু নীতিবচন অনুসারে বলিতে পারি যে, সব সময়ে ভুল করা অপেক্ষা সময়ে সময়ে ভুল না করা প্রশস্ত এবং যখনি আমি বুঝিতে পারিব যে আমার মতামত ঠিক নহে তখনি আমি উহা বর্জ্জন করিব।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "প্রত্যেক মানুষের একটা না একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই কথা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি কেবল আমার দেশবাসীর প্রীতি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিতে চাই এবং আমি যেন আমার কাজের দ্বারা তাঁহাদের ভালবাসা ও প্রীতির উপযুক্ত হইতে পারি।" উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যুবক, আপনাদের অনেকের নিকটেই অপরিচিত, আমি দীন-দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এখনও দীন-দরিদ্র স্তরেই জীবনযাপন করিতেছি। আমার এমন কেহ ধনী বা নামজাদা আত্মীয় নাই যিনি আপনাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিবেন, বা আমার পক্ষে কিছু বলিবেন। আপনাদের ন্যায় স্বাধীন ভোটদানকারী জনসাধারণই আমার উপযুক্ততা বিবেচনা করিবেন। এবং আমি যদি জয়ী হই, তাঁহারা আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ বর্ষিত করিবেন এবং সেই অনুগ্রহের প্রতিদানে এবং সেই অনুগ্রহ পরিপূরণের জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনাদের বিবেচনায় আমাকে যদি আপনারা পশ্চাতে রাখিতে চান তাহাতেও আমি হতাশ হইব না কারণ হতাশার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ পরিচিত।" ভোট গ্রহণের প্রাক্কালে আমাদের নেতৃবৃন্দের প্রচার-বক্তৃতার সঙ্গে এব্রাহাম লিনকনের বক্তৃতার কত প্রভেদ! ভবিষ্যতে এই এব্রাহাম লিনকনই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন।

পরিকল্পনার মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, কাজের মধ্যেও ভুলভ্রান্তি থাকে; কিন্তু এই ভুলভ্রান্তির দ্বারাই মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে, শিক্ষালাভ করে। কিন্তু চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেও আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তারা ভুলভ্রান্তি স্বীকার করিয়া পরিকল্পনার রদবদল করিতে চান না—পাছে "প্রেসটিজের" হানি হয়। আমরা ইতিহাস পড়ি কেন? কারণ অতীতের লোকদের কার্য্যকলাপ ও ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে জ্ঞান লাভ করা সহজ হইবে। এ কথা ফরাসী মনীষী রুশো বলিয়াছেন। 'Emile is to be made wise and good at the expense of those who have gone before.' তাই বলিতেছি মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মহোদয়গণ তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদের ভুলভ্রান্তি ত্রুটিবিচ্যুতি উপলব্ধি করিয়া অধিকতর জ্ঞানী ও উত্তম হউন। ইহাও ইতিহাস পড়ার মত। আর একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, 'Conflict is always distressing, but it can be useful.' কথাটা খুবই সত্য। এই Conflict বা বিরুদ্ধ মতামতের মধ্য দিয়াই অধিকতর ফলপ্রদ পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের কর্ত্তারা Conflictকেও দমন করিতে চান। এখন উপায় কি?

আজ ঃ কাল

শ্রীশান্তশীল দাশ

আকাশপথে কালো মেঘের আনাগোনা বাড়ছে শুধু,
মাটির বুকে কঠিন মরু করছে ধূ ধূ—
দিনে দিনেই হচ্ছে প্রসার:
আকাশে কই চোখ-জুড়ানো নীলের মেলা?
দেখতে আর
পাইনে কোথাও; হাতছানি কই শ্যামল ঘাসের?
রুক্ষ ধূসর পথের বুকে ক্লান্ত চলা—সর্বনাশের
শেষ পথে কি চলছি সবাই?
তাই যদি হয়, হোক সে ভালো:
অসহ্য এই জমাট কালো।

যাক ভেঙে যাক তাসের প্রাসাদ, ধ্বংস হয়ে লুটুক ধুলোয়;
সেই ধুলোতে নতুন যুগের নতুন মানুষ নতুন আলোয়
জাগুক আবার।
থাকব নাকো আমরা সেদিন? নাই বা থাকি,
ফুরিয়ে যাবার সেইতো বাকী।
যেটুক আছি, মিথ্যে থাকা—বেঁচে থাকার এই প্রহসন!
আসুক অনিবার্য যা তা হাসিমুখেই করব গ্রহণ।

হায়দ্রাবাদে অন্ধ্রপ্রদেশের স্কাউট ও বুলবুল সমাবেশে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত জিগুড ভাণ্ডেমার ফন স্যুমের্ণ ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

শ্রমদান কর্ম্মিদল গ্রামের একটি পুরাতন কূপ সংস্কারে রত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা

ফ্রাঙ্কফুর্টে আয়োজিত পি-ই-এন'এর ত্রিংশৎ সম্মেলনে ড. রাধাকৃষ্ণণ বিমানযোগে পৌঁছিবার দৃশ্য

(১৩)

ডাক্তারবাবু ঘরে প্রবেশ করতেই শ্রীমতী সহাস্যে এগিয়ে এসে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, আমি না ডাকলে বুঝি একবারও আসতে নেই ? আপনি এলে যে আমি কত খুশী হই তা আপনি জানেন না ডাক্তারবাবু।

স্মিতকণ্ঠে ডাক্তারবাবু বললেন, আমারই কি আমার মাকে রোজ একবার দেখতে ইচ্ছে হয় না ? কিন্তু কর্ত্তব্য আমাকে ঠেকিয়ে রাখে। যে সব দুর্ভাগা রুগী-রুগিণীরা পথ চেয়ে বসে থাকে তাদের প্রয়োজনের কথা মনে হ'লে অন্য সব কথা ভুলে যাই মা।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, ওরই ফাঁকে আমার কথাও একটু মনে রাখবেন। আমারও খুব প্রয়োজন।

শ্রীমতীর মুখের পানে খানিক স্নেহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, কিন্তু ওদের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। তাই নিজের কথাটা সময়মত মনেই আসে না। তাছাড়া তুমি যা নও তা কেমন করে ভাবি বলত মা !

শ্রীমতী গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, কোন দিন ওজন করে দেখেন নি বলেই একথা বলতে পারছেন। এক দিকে উদ্বৃত্ত অপর দিকে সমপরিমাণ শূন্যতা। অঙ্ক কষে দেখুন, ফল শূন্যই হবে।

ডাক্তারবাবু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, আমি তর্কের কথা বলছি না, অনুভূতির কথাটা তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি মা।

শ্রীমতী বলল, সেই জন্যেই ত বিশ্বাস করতে বলছি। ওর মুখে হাসি দেখা গেল।

ডাক্তারবাবু খানিক প্রসন্ন দৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার কিন্তু স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে না হয়ে উকিলের মেয়ে হওয়া উচিত ছিল। তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারব না মা, ওতে মিথ্যে দুঃখ বাড়বে। তার চেয়ে বিশ্বাস করা ঢের সোজা। তাতে অনেক আনন্দ।

জানেন ডাক্তারবাবু—শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল, আমি যদি এ বাড়ীর মালিক হ'তাম তাহলে সব সময়ের জন্য আপনাকে এখানে ধরে রাখতাম।

ডাক্তারবাবুর দৃষ্টিতে নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল। কিন্তু সোজা কোন প্রশ্ন না করে ঘুরিয়ে বললেন, তুমি ধরে রাখতে চাইলেও আমি যে তোমার অবাধ্য হতে পারব না একথা তোমায় কে বললে মা ?

শ্রীমতী সহসা উঠে এসে ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল। তাঁর চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে গভীরকণ্ঠে বলল, আপনার অনেক চুল পেকেছে ডাক্তারবাবু। জানেন, বাবার পাকা চুল বেছে দেওয়া আমার প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজের একটা বলে আমি মনে করতাম।

শ্রীমতী থামল। অন্যমনস্ক ভাবে তাঁর চুলগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনি বলছিলেন যে, আমি চাইলেই আমার ইচ্ছা পূরণ হবে। এ কথার সত্যিই কি কোন মানে আছে ? আমি কিন্তু ওকথা স্বীকার করি না। বরং বিশ্বাস করি যে, চাইবার মত করে চাইতে জানলে পাওয়াটা মোটেই শক্ত নয়।

ডাক্তারবাবু হাত বাড়িয়ে শ্রীমতীকে পিছন থেকে সামনে টেনে এনে বললেন, বড় ভাল কথা বলেছ মা। লাজ, মান, ভয় আর দ্বিধা ত্যাগ করে চাইতে জানলে কোথাও কোন গোল দেখা দেয় না।

শ্রীমতী খিল খিল করে হেসে উঠে স্মিতকণ্ঠে বলল, উকিলের মেয়ে হওয়ার চেয়ে আমার কিন্তু আপনার মেয়ে হতে লোভ বেশী।

ডাক্তারবাবু পরম স্নেহে একখানি হাত শ্রীমতীর মাথার উপর রেখে গভীরকণ্ঠে বললেন, পাগলী মেয়ে—একটু থেমে, একটু হেসে তিনি পুনরায় বলেন, এটাই বা মন্দ হয়েছে কি ?...

শ্রীমতী বলল, জোর করতে পারি নে যে—

ডাক্তারবাবু বললেন, এখন যদি না পার তাহলে তখনও পারতে না মা।

শ্রীমতী দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, নিশ্চয় পারতাম।

বারকয়েক মাথা নেড়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে এখন পারতেই বা বাধা কোথায় ?

আপনি স্বীকার করছেন যে, বাধা কোথাও নেই ? শ্রীমতী পাল্টা প্রশ্ন করল।

ডাক্তারবাবু কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ঐরে,আবার সেই জেরায় পড়লাম! কিন্তু ওটা আমার জিজ্ঞাসা। উত্তর নয়।

শ্রীমতী উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে উঠে বলল, আপনি কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছেন।

উঁহু—ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, তাতে আমার নিজেরই সবচেয়ে বেশী লোকসান মা।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, এতক্ষণে দুটো ভাল কথা শোনা গেল। আমার মনের মত কথা।

ডাক্তারবাবু প্রাণভরে হাসতে থাকেন।

শ্রীমতী সহসা অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, আপনাকে ডেকে পাঠান হয়েছিল কেন একথা এখনও কিন্তু জিজ্ঞেস করেন নি।

ডাক্তারবাবু মুখে একপ্রকার শব্দ করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, অপরাধ নিও না মা। বেশী কথা বলার দোষই এই। কিন্তু তোমার শরীর ভাল আছে ত ? ঔষধপত্র ঠিকমত খাচ্ছ ত ?

শ্রীমতী নিরীহকণ্ঠে জবাব দিল, শরীর আমার খুব ভাল আছে, ঔষুধপত্র একেবারেই খাই না। খেতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু সেজন্য আপনার স্মরণাপন্ন হই নি আমি।

ডাক্তারবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, খুব অন্যায় কথা এটা। তোমাকে আমি ভাল মেয়ে বলেই জানতাম। তোমার এ অবাধ্যতা আমি আশা করতে পারি নি। তোমার অনুরোধে খবরটা এখনও অতনু বাবুকে আমি দিইনি, কিন্তু আমার অবাধ্যতা ক'রলে শেষ পর্য্যন্ত আমাকেও অবাধ্য হ'তে হবে তা বলে রাখছি মা।

শ্রীমতী কোন জবাব না দিয়ে চোখে-মুখে খানিকটা বিমর্ষ ভাব ফুটিয়ে তুলে নীরবে বসে রইল।

তার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে ডাক্তারবাবু একটু যেন উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন, তোমার উপর আমার কতখানি ভরসা তা যদি তুমি জানতে মা.তা হলে কখনই এমন—অত্যন্ত দ্রুতগামী শিক্ষিত ঘোড়া এগিয়ে চলতে চলতে সম্মুখে অতল গহ্বর দেখে যেমন করে সম্মুখের দু'খানি পা তুলে আপন গতি রোধ করে—ডাক্তারবাবুও ঠিক তেমনি করে কথার মাঝে থমকে দাঁড়ালেন।

তাঁর এই আকস্মিক ভাবান্তরে শ্রীমতী বিস্মিত হ'ল। এবং বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, আপনি কার কাছে কি ভরসা করেন ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু ইতিমধ্যেই সামলে নিয়েছেন। তিনি হেসে বললেন, এটাও বেশী কথা বলার দোষ মা। মাত্রা থাকে না। নইলে এতবড় একটা গোপন কথা কেউ প্রকাশ করতে উদ্যত হয় ?

শ্রীমতীর চোখে একরাশ প্রশ্ন। ডাক্তারবাবুর বক্তব্যটা রীতিমত গোলমেলে।

ডাক্তারবাবু লক্ষ্য করলেন কি না বোঝা গেল না। তিনি অন্য কথায় চলে গিয়েছেন, এই অবস্থাটা মেয়েদের জীবনের একটি বাঞ্ছিত স্বাভাবিক পরিণতি বলেই তাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা উন্নত বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে না চলতে চাই তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে মা ?

শ্রীমতী এতক্ষণে মৃদু হেসে বলল, শুধু পরিতাপের কথা নয়—ঘোরতর অন্যায় করা হবে ডাক্তারবাবু। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি,আপনার আদেশ এবার থেকে আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু এর সঙ্গে আপনার নিজের আশা-ভরসার কি সম্বন্ধ তা ত বললেন না ?

ডাক্তারবাবু সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কেন এ কথাটা বলেছি তা আমি ঠিক জানতাম না। বোধহয় আমার অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে বাসা বেঁধে ছিল। অসতর্ক মুহূর্ত্তে আপনিই প্রকাশ পেয়েছে। জান মা, জীবনের অনেকগুলি বছর পিছনে ফেলে এসেছি বটে, কিন্তু কোনদিন এমনি করে পিছন ফিরে তাকাই নি। ভাবতাম, বেশ ত চলে যাচ্ছে। যাচ্ছিল ঠিকই। আজ কিন্তু মনে হচ্ছে ওর মধ্যে একটা বিরাট ফাঁক ছিল। যে ফাঁক বোজাতে আমার মন খুঁজে ফিরছিল বন্ধন। তাই মানুষের সেবাকে আমি ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করেছি। অথচ সে পথে আমার মনের ক্ষুধা পরিপূর্ণ ভাবে মিটছে না। এ আমি টের পেয়েছি।

শ্রীমতী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলল, আপনার আজ কি হয়েছে ডাক্তারবাবু ? আপনার শরীর খারাপ নয় ত ?

ডাক্তারবাবুর মুখে স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। তিনি স্মিতকণ্ঠে বললেন, বোধহয় তোমার কথাটা মিথ্যে নয় মা। এ একটা মনের ব্যাধি এবং এতবড় ব্যাধি বুঝি জীবজগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রকৃতির নিয়ম। যে নিয়মের মধ্যে আমিও দিনের পর দিন আটকে যাচ্ছি।

ডাক্তারবাবুর কথাগুলির মধ্যে কিসের ইঙ্গিত শ্রীমতী তার সন্ধান পায় না, কিন্তু শুনতে বড় ভাল লাগছিল। তিনি থামতেই মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, কি সে নিয়ম ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু শান্ত হেসে বললেন, কেন মা—বন্ধনের মধ্যে

মুক্তি। আনন্দময় মুক্তি। এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করেই আমি সেই মুক্তির সন্ধান করতে সুরু করেছি।

শ্রীমতী বলল, কিছু পেলেন কি ?

পেয়েছি বৈকি মা। ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর গভীর আবেগে কেঁপে উঠল। তিনি কতকটা বিচলিত কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয় পেয়েছি। মা ছিল না মা পেয়েছি। মেয়ে ছিল না মেয়ে পেয়েছি। ওরে বেটি, তাই ত আমার এত ভয়, পাছে এই সুখটুকুও আমার ভাগ্যে না সয়!

ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে শ্রীমতী বিচলিত হয়েছে মনে হ'ল। তার কণ্ঠস্বরেও সে ভাব প্রকাশ পেল। সে ছেলে-মানুষের মত বলতে লাগল, নিশ্চয় সইবে কাকাবাবু। নইলে যাকে নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা তার দিনগুলি যে একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

শ্রীমতী থামল। আশ্চর্য্য! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে স্বর তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তা যেন আর কারুর। শ্রীমতীর নয়। মুহূর্ত্তমধ্যে সামলে নিয়ে শ্রীমতী পুনরায় কথা কয়ে উঠল, কিন্তু একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমাকে নিয়ে আপনার এই অকারণ উদ্বিগ্নতার হেতু কি ?

ডাক্তার আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, বড় শক্ত প্রশ্ন মা। নিজেই যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না, তা তোমাকে কেমন করে বোঝাব ? তবে খুব সম্ভব বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছি বলেই ভালটা কিছুতেই চোখে পড়ছে না।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, যে সংসারকে বড় বেশী আপন মনে করতাম সেই সংসারই আমাকে সবার চেয়ে বড় প্রতারণা করেছে, তাই তোমাদের কেন্দ্র করে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেই আবার নতুন করে দিশাহারা হয়ে পড়েছি। পাছে আমার এ স্বপ্নটাও—

বাধা দিয়ে বিস্মিতকণ্ঠে শ্রীমতী বলল, এ কেমন কথা কাকাবাবু!

ডাক্তার বলেন, প্রশ্ন করো না, যুক্তি-বিচার করতেও যেও না, আমি জবাব দিতে পারব না। কিন্তু আপাততঃ আমার কাছে এটা একটা বড় সত্য—আমার বুকের জিনিস। রোগ আর রোগী নিয়ে দিন কাটত। ভাবতাম বেশ আছি, মন আমার ভরে আছে, আর কিছুই বুঝি আমার চাইবার নেই। সেই মনই আবার তোমাকে পাবার পর নতুন সুরে কথা কইতে সুরু করেছে।

একটু থেমে তিনি পুনশ্চ বলতে লাগলেন, যা এতদিন ধরে পেয়ে এসেছি তা সম্পূর্ণ নয়, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। যাদের নিয়ে মনের ক্ষিদে মেটাতে গেছি তারা আমাকে দেবতার মত ভক্তি করেছে, পূজো করেছে, সম্মান দেখিয়েছে। কিন্তু যে পুজো দেবতার জন্য তাতে মানুষের মন ভরবে কেন ?

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, এটা ভালবাসার আর একটা দিক নয় কি কাকাবাবু ?

ডাক্তারবাবু বললেন, কি জানি মা কোন্ কথাটা ঠিক! কিন্তু এমনি এক উঁচু আসনে বসে শুধু ভক্তি আর শ্রদ্ধা কুড়োতে আমার ভাল লাগে না। অথচ ওরা আমাকে কিছুতেই মাটিতে টেনে নামাতে পারে না। আমি অনেক পেয়েও তাই শূন্য হাতে ঘুরে বেড়াই।

শ্রীমতী বলল, এ ব্যবধানটুকু আপনি কি ইচ্ছে করলে দূর করতে পারেন না ?

ডাক্তারবাবু মৃদু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, ইচ্ছে করলেই পারতাম কিনা তা জানি না, কিন্তু এই ইচ্ছেটারই ইতিপূর্ব্বে একান্ত অভাব ছিল।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, ভারী আশ্চর্য্য কথা, এত দিন যা চান নি, এমনকি তার প্রয়োজনবোধও করেন নি, আজই তা পাবার জন্য এত উৎসুক হয়ে উঠেছেন কেন ?

ডাক্তারবাবু কোমল কণ্ঠে বললেন, যদি বলি আমার মনের এই পরিবর্ত্তন তুমি ঘটিয়েছ, তা হলে কি তা তোমার বিশ্বাস হবে মা ?

শ্রীমতী পুনরায় ডাক্তারবাবুর চেয়ারের হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, অবিশ্বাস করতে পারব না সত্য, কিন্তু মনে আমার প্রশ্ন দেখা দেবে।

দেবার কথাও মা। ডাক্তারবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না, কিন্তু প্রথম যেদিন তুমি আমায় নিজের হাতে রান্না করে সামনে বসে খাওয়ালে, সেই দিনই আমি সর্ব্বপ্রথম অনুভব করলাম—দূর ছাই, কি হবে আর নিজের মনকে নিয়ে এই লুকোচুরি করে। তার চেয়ে ঘরে ফিরে আমার মায়ের কোলে আশ্রয় নিই। মাঝপথে হঠাৎ থেমে কতকটা অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, কত বড় আহাম্মুকি দেখ দেখি মা ? একটু স্নেহের স্বাদ পেয়েই সব ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে, এ বাড়ীর আমি মাইনেকরা লোক, তার চেয়ে একটুও বেশী না।

এটা ঠিককথা বলেন নি কাকাবাবু। শ্রীমতী বলল, আর কেউ না জানলেও আমি বুঝি এ বাড়ীর আপনি পরমাত্মীয়।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তিবোধ করলেও মুখে তাঁর কথা জোগাল না।

শ্রীমতী পুনরায় বলল, আমার এ ধারণা সন্দেহাতীত।...

ডাক্তারবাবু সহসা হো হো করে হেসে উঠলেন। শ্রীমতী

চমকে উঠল। তিনি বললেন, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে ত সকলের চলবে না মা। ভাবের ঘোরে যত কথাই বলে থাকি, আর যত স্বপ্নই দেখে থাকি বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে তার কতটুকু মূল্য ?

শ্রীমতী স্নিগ্ধহাস্যে বলল, আপনি উল্টো-পাল্টা কথা বলতে সুরু করেছেন। কি যেন বলতে চান—আবার চানও না। আপত্তি যখন আছে তখন থাক, তবে একটা অনুরোধ যে, নিজেকে এভাবে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করবেন না, আমি খুব দুঃখ পাব।

ডাক্তারবাবু সহসা উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীমতীর দুই চোখের উপর এক জোড়া অনুসন্ধানী দৃষ্টি স্থাপন করে কিছু খোঁজ করলেন। রঙীন চশমার আড়ালের সে চাহনি শ্রীমতীর চোখে পড়ে না। সে হেসে বলে, আপনি কি এখুনি চলে যাচ্ছেন কাকাবাবু ? আর একটু বসবেন না ?

ডাক্তারবাবু পুনরায় হতাশভাবে বসে পড়লেন। শ্রীমতীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, লোভে পড়ে হয়ত আমার পতন হয়েছে। ছিলাম দেবতা, নেমে এসেছি মানুষের পর্য্যায়ে। মন খুশী হয়ে বলে, এই ত বেশ, চোখ দুটো চলে যায় উঁচু সিংহাসনের পানে। কত রঙের জেল্লা তাতে।

শ্রীমতী আবদারের সুরে বলল, আপনার এই ভক্তের দলকে একবার দেখতে পাই না কাকাবাবু ? তাদের একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। তারা কেমন মানুষ যে, এত অল্পে যে দেবতা তুষ্ট তার মনকেও ভরে দিতে পারছে না !

ডাক্তারবাবু আর একবার উচ্চ হেসে রহস্য-তরলকণ্ঠে বললেন, মন্ত্র জানা চাই মা—

শ্রীমতীও হাসিমুখেই জবাব দিল, না কাকাবাবু, শুধু মন্ত্রে কাজ হয় না। তা হলে এত নৈবেদ্য আর উপচারের প্রয়োজন হ'ত না। আমি ওদের দীক্ষা দিয়ে আসব।

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি কি এরই মধ্যে ভয় পেয়ে গেলে যে, ওদের আমার পিছনে লেলিয়ে দিতে চাইছ ? তা হলে আমায় দেশত্যাগী হতে হবে মা, এ কথাটাও তোমাকে আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি।

শ্রীমতী হাসতে লাগল।

ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি হাসছ বটে, কিন্তু আমি মোটেই হাসির কথা বলি নি। ওদের চোখ ফুটিও না মা, দেবতা হয়ে আমি বরং ভালই আছি। ভক্তির সঙ্গে খানিকটা ভয় জড়ান আছে। চেয়ে না পেলে বড় জোর মনঃক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু অপমান করে না, আঘাত পেলেও পালটা আঘাত করে না।

শ্রীমতী হেসে উঠে বলল, আপনি ত কম লোক নন! ভক্তিও চান—ভয়ও চান, আবার মন ভাল না বলে অনুযোগও দেন।

অনুযোগ দেব কেন মা। ডাক্তারবাবু স্মিতহাস্যে বললেন, আবার নিজেকেও মিথ্যে ফাঁকি দিতে চাই না। তুমি দীক্ষা দিয়ে আসতে চাও যেও, তবে যাবার আগে বেশ করে আগুপিছু ভেবে নিও। কিন্তু আজ আর নয়। ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। চলতে চলতে পুনরায় শ্রীমতীকে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক থাকার উপদেশ এবং নিয়মিত ঔষধ সেবনের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

১৪

কেষ্টর সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটি এসে বসবার ঘরে প্রবেশ করল সে শ্রীমতীর সূর্য্যদা। তাকে বসতে বলে কেষ্ট অন্দর পথে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং অনতিকাল মধ্যে শ্রীমতী এসে উপস্থিত হ'ল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করে শ্রীমতী বলল, কোন খবর না দিয়েই উপস্থিত হয়েছ যে সূর্য্যদা। আগে একটা চিঠি পাঠালে না কেন ?

সূর্য্য নীরসকণ্ঠে জবাব দিল, তাতে আর এমন কি লাভ হ'ত ?

শ্রীমতী একটু থতিয়ে গিয়ে উত্তর দিল, অন্ততঃ স্টেশনে একটা গাড়ী পাঠাতে পারতাম। তাতে কুটুমের মর্য্যাদা থাকত।

সূর্য্য বলল, আমি তিন দিন আগে এসেছি, এবং এই তিনদিন ধরেই একবার করে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছি।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, আমায় খবর পাঠাও নি কেন ?

সূর্য্য একটু হেসে জবাব দিল, এ বাড়ীর সঙ্গে অতটা বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে চাইনি বলেই—

শ্রীমতী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সূর্য্যের মুখের পানে চেয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, সেই জন্যই বুঝি চিরকুট পাঠিয়েছিলে ? চাকরটা ঠিক বুঝেছে, তাই তোমাকে বাইরে বসিয়ে আমাকে খবর দিতে গেছে। আমি আবার অতটা তলিয়ে বুঝি নি, তাই তাকে অনর্থক গালমন্দ করে নিজেই ছুটে এসেছি। থাকগে ওসব কথা—কিন্তু একটা বিষয় আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না যে, গত তিনদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেও ফিরে চলে গেছ কেন ? আমি ত বাড়ীতেই ছিলাম।

সূর্য্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, এই সাধারণ

কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে দেখা করাটাই আমার ইচ্ছে ছিল। আমাদের মধ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর অপর কাউকে আমি জানাতে চাইনি বলেই ফিরে গেছি।

শ্রীমতী লাল হয়ে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, আজ নতুন কথা শোনাচ্ছ তুমি সূর্য্যদা। আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল বা আছে বলে আমি আজও মনে করি না, কোনদিন করতামও না।

সূর্য্য একটু যেন চমকে উঠেছে মনে হ'ল। অত্যন্ত সংযতভাবে শ্রীমতী কথা কয়টি বললেও তার মধ্যের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্য তাকে নির্ব্বাক করে দিল। কিন্তু অল্পেই সে ভাব কাটিয়ে উঠে যথাসম্ভব কোমলকণ্ঠে সূর্য্য বলল, কথার লড়াই থাক শ্রী। কথা চিরদিনই তুমি খুব ভাল বলতে পার, তার চেয়ে দুটো কাজের কথা বলে আমি বিদায় নিচ্ছি। সময় আমার অত্যন্ত কম।

শ্রীমতী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত দেখতেই পাচ্ছি। বল কি তোমার বক্তব্য।

সূর্য্য বলল, তোমাকে অন্ততঃ চারখানা চিঠি দিয়েছি,তার একটারও জবাব দাও নি কেন?

শ্রীমতী স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, সময় হলেই জবাব পেতে—

সূর্য্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তোমার সময় হ'ল না?

শ্রীমতী বক্রকণ্ঠে বলল, তুমি ত শুধু চিঠির জবাব প্রত্যাশা কর নি সূর্য্যদা, তুমি জানিয়েছ দাবী। যাঁরা আমার কুশল জানতে চেয়েছেন তাঁদের আমি সময়মত জবাবও দিয়েছি। তুমি নতুন সুরে কথা কইতে সুরু করেছিলে বলেই আমি নীরব ছিলাম।

সূর্য্য উষ্ণকণ্ঠে বলল, আমার দাবীটা কি খুবই অসঙ্গত হয়েছে বলে তুমি মনে কর? আমি জানতে চাই যে, আমি কি শ্রীমতীর সঙ্গে কথা কইছি না আর কেউ তার হয়ে কথা কইছে?

তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে সূর্য্যদা? শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

সূর্য্য তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলল, তোমার কথার ধারাই আমাকে একথা জিজ্ঞেস করতে বাধ্য করিয়েছে। আমি না হয় কোন কথাই বলব না, কিন্তু তুমি নিজেকেই একবার জিজ্ঞেস করে দেখ ত?

শ্রীমতী হেসে উঠল, তুমি কি আমায় আজও এতই ছেলেমানুষ মনে কর? অনেক ভেবেচিন্তেই একথা তোমাকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি। তুমি টাকার দাবী এই কি প্রথম করলে?

শ্রীমতীর কথার ধরনে সূর্য্য আরও বিস্মিত হ'ল। এটা সে ঠিক কল্পনা করে উঠতে পারে নি। সে বলল, বার বারই তুমি টাকা দাবীর উল্লেখ করছ কিন্তু আমি যে আমার নিজের জন্য একটি কানাকড়ির প্রত্যাশী নই, একথা তোমার চেয়ে বেশী আর কে জানে?

আমি কতখানি জানি আর তোমার কতটুকু প্রয়োজন সে প্রশ্ন আজ থাক সূর্য্যদা। শ্রীমতী একটু থেমে বলল, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার এমন কিছু নেই যা তোমার কোন উপকারে আসতে পারে।

খানিকটা অবিশ্বাসের হাসি সূর্য্যর মুখে দেখা দিল। সে বলল, এ অসম্ভব কথাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল? যার স্বামী এত পয়সার মালিক তার হাতে কিছু নেই।

তাকে বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, থাম সূর্য্যদা। আমার স্বামীর অনেক টাকা থাকতে পারে তাতে আমার কি?

সূর্য্য গভীর কণ্ঠে বলল, তুমি স্বামীর স্ত্রী নও? সেখানে তোমার কোন অধিকার নেই এই কথাই কি আমাকে আজ বিশ্বাস করতে হবে?

শ্রীমতী হেসে উঠল।

সূর্য্য বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমি হাসছ?

হাসির কথা বলেই হাসছি সূর্য্যদা। শ্রীমতী বলল, আমাকে যখন তুমি স্বামীর স্ত্রী বলেই জান তখন তার টাকা চুরি করে তোমার হাতে তুলে দিতে বল কোন যুক্তিতে?

সূর্য্য উষ্ণকণ্ঠে বলল, আমার কাছে অন্য কোন যুক্তি নেই—আমার যুক্তি হ'ল দেশের মঙ্গল করা।

শ্রীমতী উত্তাপহীনকণ্ঠে বলল, কিন্তু এই পথে যে মঙ্গল আসবে তা তোমায় কে বলল?

সূর্য্য রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে উঠে বলল, আমি বলছি তোমায়—

শ্রীমতী তেমনি শান্ত-স্থিরকণ্ঠে বলল, তুমি যে অভ্রান্ত সে কথা যদি আমি স্বীকার করে না নিতে পারি—

সূর্য্য তীব্রকণ্ঠে বলল, কিন্তু একদিন করতে। তার মুখ কাল হয়ে উঠল।

শ্রীমতীর মধ্যে কোন চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হ'ল না। সে তেমনি ধীরকণ্ঠে বলল, তখন বুদ্ধি কম ছিল—উত্তেজনা ছিল বেশী। তলিয়ে দেখবার আগেই লাফিয়ে উঠতাম। সূর্য্যদা, যে পথে চলেছ তা ছাড়। এ পথে মঙ্গল নেই।

শ্রীমতীকে থামিয়ে দিয়ে সূর্য্য বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলল, আমি তোমার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি শ্রীমতী।

সে আমি জানি সূর্য্যদা। শ্রীমতীর কণ্ঠে এতক্ষণে বিরক্তি ফুটে উঠল। সে বলল, তুমি টাকা চাও—আমি জানিয়েছি আমার অক্ষমতা—টাকা আমার নেই। চুরি করে টাকা দিতে আমি কোনদিনই পারব না।

সূর্য্য জ্বলে উঠল, কথাটা চিঠিতে জানিয়ে দিলে পারতে, তা হলে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে আসতে হ'ত না।

শ্রীমতী অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, তুমি এত বোঝ আর এই সামান্য কথাটা বুঝলে না? জবাবটা চিঠিতে দেওয়া আমি পছন্দ করি না।

সূর্য্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শ্রীমতীর মুখের পানে চেয়ে থেকে গর্জ্জন করে উঠল, এত অবিশ্বাস! তার সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপতে সুরু করেছে।

শ্রীমতীও এতক্ষণে ধৈর্য্য হারাল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, ঠিক তাই। তুমি কি মনে কর একমাত্র তুমিই পৃথিবীতে বুদ্ধিমান? তোমার মত এবং পথ যে একেবারে বদলে গেছে তা আমি জানি না মনে কর? তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমার জানা। তোমাকে অপমান করে বিদায় করতে আমায় বাধ্য করো না। তুমি চলে যাও, আমাকে আমার মত করে বাঁচতে দাও।

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়তে সে থামল। একটু কি চিন্তা করে পুনরায় বলল, হাঁ, ভাল কথা। একেবারে খালি হাতে তোমাকে বিদায় করতে আমি পারব না। বস, আমার বলতে যা আছে এনে দিচ্ছি। গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর।

শ্রীমতী দ্রুত ঘর ছেড়ে সোজা তার শয়নকক্ষে চলে এল, এবং শয়নকক্ষে উপস্থিত হয়ে আর একবার নতুন করে তার দাদার লেখা চিঠিখানা পড়তে বসল। এই একটি সপ্তাহে অন্ততঃ দশবার সে চিঠিখানা পড়ে ফেলেছে।

অরুণের চিঠি—

শ্রী:

তোমার চিঠি পেয়েছি। সূর্য্যদা তোমার কাছে বারে বারে টাকার জন্য চিঠি দিচ্ছেন লিখেছ। যেটা শুধু অনুবোধ করা চলে সেইটেই তিনি দাবী করেছেন। এটা সূর্য্যদার পক্ষেই সম্ভব। তোমার বিয়ের পরে বারে বারে তার রং বদলাচ্ছে। তার মত এবং পথ আগাগোড়া বদলে গেছে। আদর্শবাদ আজ আত্মস্বার্থের যূপকাষ্ঠে তিনি বলি দিয়েছেন। আলোর চেয়ে অন্ধকারের তিনি ভক্ত হয়ে পড়েছেন। ঐ পথেই চলেছে তাঁর সাধনা।

সত্য কথা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সব সময়ই সত্য। সূর্য্যদা এতদিন তার সারাদেহে সমাজসেবার বর্ম্ম এঁটে সম্পদের স্বপ্ন দেখেছেন। একদিন তাকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলাম, এমন কোনদিন ভাবতেও পারি নি দাদা। অর্থের প্রতি এমন তীব্র আসক্তি—আপনার মত লোকের! কালোবাজারের কাল রং যে আপনার উজ্জ্বল বর্ণকে বিবর্ণ করে ফেলেছে।

সূর্য্যদা নির্লজ্জের মত হেসে জবাব দিলেন, ওটা কাঁচা রং অরুণ, ধুয়ে ফেললেই উঠে যাবে।

আঘাত দেবার জন্যই আমি বললাম, না টাকার জেল্লায় ঢাকা পড়বে?

সূর্য্যদা এতেও লজ্জিত হলেন না। বললেন, তাতে দেহের ময়লা রংটাই ঢাকা পড়বে, কিন্তু মনের মালিন্য ঘুচবে কেমন করে? বোকা ছেলে—যে টাকা আমি রোজগার করেছি তা আমি না নিলে আর কেউ সরিয়ে ফেলত, অথচ তুমি জান টাকার আমার কত দরকার। টাকা ছাড়া কোন কাজ হয় না। সে তোমার সমাজসেবাই বল আর রাজনীতিই বল।

বিস্মিত এবং ব্যথিত হলাম। এতদিন ধরে যা-কিছু দেখেছি আর বুঝেছি তা কি আগাগোড়াই ভুল হতে পারে। কিন্তু নিজের চোখ আর কানকে অবিশ্বাস করি কেমন করে! তা ছাড়া কথাটা যখন সূর্য্যদার নিজের মুখ থেকে শোনা।

সূর্য্যদা আমাকে নীরব দেখে পিঠ চাপড়ে বললেন, জীবনের অনেকখানি সময় নিঃস্বার্থভাবে লোকের সেবা করে পেলাম কি বলতে পার অরু?

জবাব দিলাম, কেন আত্মতৃপ্তি!

সূর্য্যদা বিজ্ঞের মত হেসে বললেন, ওতে পেট ভরে না—মন ভরতে পারে। ওরে অরু, আজকের দুনিয়ায় লোকে ফাঁকি দিয়ে ফাঁক বোজাতে চায়।

জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কি সত্যিই ফাঁক বুজে যায় দাদা? না সেই সামান্য ফাঁক বিরাট গহ্বরে পরিণত হয়?

সূর্য্যদা হেসে বললেন, ওটা কথার মারপ্যাঁচ অরু। এ শুধু বালির পলস্তারা দিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া ইঁটের স্বরূপ ঢেকে রাখা।

বললাম, ক্ষয়ে-যাওয়া ইটের জীবনীশক্তি তাতে কিছুই কি বৃদ্ধি পায় না দাদা?

সূর্য্যদা হেসে বললেন, ওটা আরও মারাত্মক অরুণ। যা ক্ষয়ে গেছে তাকে শেষ হয়ে যেতে দাও। তাতে দেশের এবং দশের মঙ্গল হবে। সে যা তা সকলকে দেখতে দাও, জানতে দাও। তার বিষাক্ত আর দূষিত স্পর্শ থেকে সরে গিয়ে বাঁচবার সুযোগ পাক তারা—যারা অন্ততঃ বাঁচতে চায়।

সূর্য্যদার বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাকে বুঝতে আজ আর কষ্ট হচ্ছে না শ্রী। আমি কিন্তু তার বর্ত্তমান রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেছি। সে যেন তার অতীত জীবনের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তার নীতিবোধ, চারিত্রিক নিষ্ঠা, আদর্শ-বাদ সবকিছুই বিসর্জ্জন দিয়েছে। সাঁওতাল পল্লীতে পূর্ব্বেও ঘুরে বেড়াতেন, কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, তার যে হাত একদিন ওদের অন্ধকার ঘরে আলো জেলে দিতে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই হাতেই নিজের জ্বালা আলো তিনি নিভিয়ে দিয়ে তাদের আরও নিরন্ধ্র অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রথমে ওরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারেনি তাঁর আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু জানতে পারল চরম সর্ব্বনাশ ঘটে যাবার পরে। ভুলুয়া সর্দ্দারের মেয়ে লছমিয়াকে নিয়ে তিনি যে কাণ্ডটি করেছেন তা কল্পনা করতেও মন সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সূর্য্যদা শেষ পর্য্যন্ত পালিয়েছেন। সম্ভবতঃ এ তল্লাটে আর আসবেন না। না এলেই ভাল হয়।

সূর্য্যদা নাকি অনেক টাকা রোজগার করেছেন শুনতে পাই। কয়লাখাদের বড়কর্ত্তাদের কাছ থেকে নিয়মিত তিনি প্রচুর পেয়েছেন। সেবার নামে এ শঠতা অমার্জ্জনীয়। সূর্য্যদাকেও তাই কেউ ক্ষমা করতে পারে নি। ভুলুয়া টাঙ্গি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচেও তাকে দেখা যায়। মুখে স্বীকার না করলেও আমাদের উপরও তার একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ওকে দোষ দিচ্ছি না। আমরাও একসময় তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলাম—তাঁর কাজের সঙ্গী ছিলাম।

তোমাকে এত কথা জানাতাম না শ্রী, কিন্তু আমি খবর পেয়েছি যে, সে এখন কলকাতায় আছে। যদি কোনদিন কোন কারণে তোমার সঙ্গে দেখা করে তার দাবী নতুন করে জানাতে চায় তা হলে এই খবরটা তোমার উপকারে আসবে।

সব দেখেশুনে বাবা কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সূর্য্যদা তাঁরই একজন বিশ্বস্ত ছাত্র, একান্তভাবে তাঁরই হাতে গড়া, তাই বোধহয় এতবড় আঘাত পেয়েছেন। বাবার মুখের পানে তাকান যায় না। তিনি বলেন, এমন ত কোন দিন ভাবতে পারি নি অরুণ। এতদিন ধরে এত কষ্ট আর এত সাধনা করে যা কিছু সে অর্জ্জন করল তাকে এমন নির্দ্দয় ভাবে পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিল সে কিসের লোভে? টাকার তার কিসের প্রয়োজন? আর প্রয়োজন যদি ছিলই তবে এ পথে এল কেন? আর এলই যদি তবে আবার ফিরে গেল কেন?

বুঝতে ঠিক আমিও পারি না—তবুও বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। বলি, তার সাধনায় গলদ ছিল বাবা।

মা এসে বহুক্ষণ আমাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা কেউ টের পাই নি। জানতে পারলাম মা সাড়া দিতে। তাঁর এমন শান্ত, ধীর কণ্ঠস্বর ইতিপূর্ব্বে কোনদিন শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। তিনি বললেন, এমন যে হবে তা আমি জানতাম। তাই তোমাদের মত সূর্য্যকে নিয়ে মাতামাতি করতে পারি নি।

বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দিন পালটে যাচ্ছে একথা সব সময় ভুলে থাকতে চাও বলেই এত কষ্ট পাও।

বাবা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় বললেন, এ তোমাদের অন্যায় কথা—যুগ পালটে যাচ্ছে, বলেই মানুষকেও বদলে যেতে হবে, তার স্বভাব-মাধুর্য্য হারিয়ে ফেলতে হবে, এ আমি মেনে নিতে পারি না।

মা হেসে জবাব দিলেন, তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে মানুষ পালটে যাবে না। ও নিয়ে কারুর মাথাব্যথাও নেই।

মার হাসি বাবাকে আঘাত করে। তাঁর মুখের ভাব পরিবর্ত্তন দেখে অনুভব করলাম। তিনি আর্ত্তকণ্ঠে মাকে বললেন, অন্য লোকের কথা আমি ভাবছি না, কিন্তু সূর্য্য আমার ছাত্র। তাকে আমি যথার্থ মানুষ হবার শিক্ষাই দিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে আমার অহঙ্কারের সীমা ছিল না।

মা কিন্তু বাবার মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। তিনি সহজ ভাবেই বললেন, সূর্য্যকে নিয়ে মিথ্যে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ। সে এমন কিছু অসাধারণ নয়, সাধারণকে অসাধারণ ভাবতে গিয়েই তুমি দুঃখ পাচ্ছ। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করেছ—সে তার পথ বেছে নিয়েছে। এইটুকুই সত্য। একে স্বীকার করে নিলেই চুকে গেল।

আগে হলে তর্ক করতাম, প্রতিবাদ জানাতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মা বোধ হয় মিথ্যে বলেন না। আসলে আমরা মানুষকে দেবতা ভাবতে গিয়ে না খুঁজে পাই দেবতাকে না মানুষকে। সূর্য্যদার বেলায়ও তাই হয়েছে। অথচ তাকে নিয়ে কত সম্ভব-অসম্ভব কল্পনা আমি নিজেও করেছি। তোমার বিয়ের আগে কত তর্ক-বিচার করেছি। দেখেশুনে আজ মনে হচ্ছে আমাদের চিন্তা করবার গণ্ডী কত সীমাবদ্ধ, কত সামান্য আমাদের পুঁজি। বাস্তব আর কল্পনায় কত প্রভেদ।

আর ভাল লাগছে না, আবার পরে জানাবার মত কিছু থাকলে লিখব। ইতি—

—দাদা

চিঠিখানি পড়া শেষ হলে যত্ন করে তা যথাস্থানে রেখে দিয়ে শ্রীমতী তার গহনার বাক্স খুলে একটি অত্যন্ত মূল্যবান আংটি তুলে নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল এবং ঘরে প্রবেশ করে কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সূর্য্যকে বলল, বড্ড দেরী হয়ে গেল, অনেক খুঁজে পেতে দেখতে হ'ল। তোমাকে খালি হাতে ফেরালে সত্যিই অন্যায় হয়ে যেত। কি ভাগ্যি মনে পড়ে গেল।

একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ করে সে তার হাতের মুঠো সূর্য্যর চোখের সম্মুখে মেলে ধরল। একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, আংটিটা চিনতে পার সূর্য্যদা? এটা তুমি আমার বিয়েতে উপহার দিয়েছিলে। এর মূল্য তখন আমি জানতাম না, ভেবেছিলাম কাচ, কিন্তু হাতে পরলাম অমূল্যনিধি মনে করে।

সূর্য্য স্তম্ভিত। তার মুখে কথা যোগাল না, শুধু চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শ্রীমতী থামতে পারল না। সে বলে চলল, কিন্তু এ বাড়ীতে এসে এর যথার্থ মূল্য জানতে পারলাম। আমার কপালগুণে কাচ হ'ল হীরা, সূর্য্যদা আমায় দিয়েছেন হীরার আংটি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম স্বচ্ছ-শুভ্র একখণ্ড পাথর, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সামান্য ক'টা মাসের ব্যবধানে পাথর-খণ্ড নীল হয়ে গেছে।

সূর্য্যর বিস্মিত কণ্ঠ থেকে তার অজ্ঞাতে বেরিয়ে এল একটিমাত্র শব্দ, নীলা!

হ্যাঁ নীলা। শ্রীমতী একটু হেসে বলল, পাথরের নীচে লুকনো ছিল বিষের পাত্র। দেখছ কি অমন করে, সত্যিই তাই। নীল হয়ে গেছে পাথর, তাই ভয় পেয়ে খুলে ফেললাম। ভালই হ'ল তুমি এসেছ, তোমার জিনিস তোমায় ফেরত দিয়ে আমি দায়মুক্ত হব।

আংটিটি সূর্য্যর হাতে তুলে দিল শ্রীমতী। তার বিহ্বল দৃষ্টি আংটির উপর ন্যস্ত। শ্রীমতী পুনরায় বলল, আমি বাঁচতে চাই সূর্য্যদা। তাই এই মারাত্মক বস্তুটি তোমাকে ফেরৎ দিলাম। এটা তুমি নিয়ে যাও। পয়সার প্রয়োজন থাকলে বিক্রি করে দিও। নইলে রেখে দিও আর কাউকে বিয়েতে যৌতুক দিতে পারবে।

সূর্য্যর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। শ্রীমতীর তা দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু সে তা ভ্রূক্ষেপ না করে শান্তকণ্ঠে বলতে লাগল, আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি সূর্য্যদা— যদি কখনও সকলের সামনে সহজ ভাবে কোন উদ্দেশ্য না নিয়ে আমার কাছে আসতে চাও এস, নইলে এইখানেই যেন শেষ হয়। নিজেকে আর ছোট কর না।

সূর্য্য এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছে। তার চোখ-মুখের ভাব পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল। সে বলল, এতটা আমি কল্পনাও করতে পারি নি, কিন্তু তোমার আজকের কথা আর ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। আংটিটা ফেরৎ দিয়ে ভালই করেছ। আমার ভুল তুমি সংশোধন করে দিয়েছ বলে ধন্যবাদ। অনেকগুলি টাকা সত্যিই অপাত্রে পড়েছিল।

একটু থেমে সূর্য্য পুনরায় বলল, আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি শ্রীমতী। টাকার আমার খুব প্রয়োজন থাকলেও এ আংটি আমি বেচব না। এই আংটির দ্যুতি আমাকে ভবিষ্যতে পথ দেখাবে। যে বিষের সন্ধান তুমি আমাকে দিলে তা আমার অজানা ছিল। জেনে ভালই হ'ল। এই বিষকেই আর একবার নতুন করে মূলধন করব—

সূর্য্য ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে চলে গেল। শ্রীমতী আরও খানিকক্ষণ সেইখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মন্থর পদে প্রস্থান করল।

ক্রমশঃ

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১০
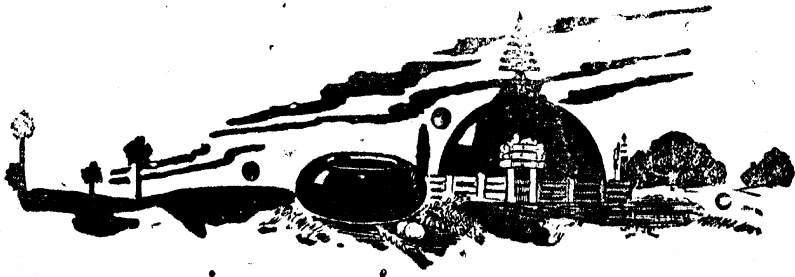
মৈখণ্ডা নামকরা চটি। কিন্তু চটির চেয়েও তীর্থমাহাত্ম্য বেশী ঐ স্থানের। মহিষ-মর্দ্দিনীর পীঠস্থান এটি। মৈ মানে মহিষ। মহিষাসুরকে এখানেই নাকি দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন দেবী ভগবতী। তার পর সে কি উল্লাস দেবীর। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তখন দোলায় দোল খেয়েছিলেন তিনি। দোলা এখনও আছে মন্দিরের প্রাঙ্গণে। একালের যাত্রীরাও কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়ে দোল খায় তাতে।

কিন্তু যে মহিষ মৈখণ্ডাতে অসুর, সেই মহিষই কেদারনাথে গিয়ে দেবতা হলেন কেমন করে? শ্রীকেদারনাথের বিগ্রহই ত শুনেছি বিশাল আকারের একটি মহিষের পশ্চাদ্দেশ।

গল্প শুনেছিলাম পাণ্ডার মুখে। অবিশ্বাস্য গল্প। দেবতার অদ্ভুত লীলা না মানুষের উদ্ভট কল্পনা, ভেবে পাই না। কাশীর বিশ্বনাথকে ধরবার জন্য দুর্দ্দান্ত পাণ্ডবেরা গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে দেখে বিশ্বনাথ সেখান থেকে আবার ছুটলেন উত্তর দিকে। অনেক পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করবার পর কেদারনাথের অধিত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন তিনি। কিন্তু নাছোড়বান্দা পঞ্চ-পাণ্ডব। তাঁরাও পিছে পিছে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। এইবার ফাঁদে পড়লেন মহেশ্বর। উত্তর দিকে আরও উঁচু পাহাড়; তা আবার বরফে ঢাকা। অত পথ ছুটে আসবার পর ক্লান্তদেহে আর তাঁর সাধ্য নেই ঐ আকাশ সমান উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর অতিক্রম করবার। সুতরাং হাল ছেড়ে দিয়ে মহিষের আকার ধারণ করে ঐ জন্তুদের একটি দলের মধ্যে চলে গেলেন আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশী মহেশ্বরকে চিনে ফেলেছেন। 'ধর' 'ধর' করে ছুটে এলেন পাঁচ ভাই পাণ্ডব। তখন সামনেই একটি সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে সেই পথে পাতালে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মহিষরূপী মহাদেব ঢুকে গেলেন সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে। তাতেও বাধা পড়ল। মহিষের মাথার দিকটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব ছুটে এসে দুই হাতে মহিষের পাছাটা ধরে ফেলে গতিরোধ করলেন তার। অগত্যা হার মানতে হ'ল বিশ্বনাথকে। পাণ্ডবদের বর দিলেন তিনি। মহিষরূপী শিবদেহের যে অংশটুকু তখন পর্য্যন্তও মাটির উপরে ছিল বলে ভীম তা ধরতে পেরেছিলেন, তা আপাততঃ পাণ্ডবদের ও ভবিষ্যতে সকল ভক্তের পূজার জন্য কেদারনাথ পর্ব্বতের সেই জায়গাতেই চিরস্থায়ী হয়ে থেকে গেল। কাশীর বিশ্বনাথ এমনি এক দুর্দৈবের ভিতর দিয়ে উত্তরাখণ্ডে শ্রীকেদারেশ্বর হলেন।

কেদারখণ্ড স্কন্দপুরাণের পবিত্র কাহিনী। তবু? আমি নিজে কেদারনাথের যাত্রী হয়েও শুনে হাসি গোপন করতে পারি নি। তার পর ঐ গল্প ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু মৈখণ্ডা পার হবার পর তুচ্ছ মহিষের এ-হেন বিপুল গৌরবলাভের তাৎপর্য্য কিছুটা যেন বুঝতে পারলাম আমি।

মহিষকে ভুলে থাকবার উপায় নেই এই উত্তরাখণ্ডে।

কলকাতায় টাকা টাকা সের দরে কিনেও খাঁটি দুধ পাই না আমরা। আর এখানে আট আনা সের দরে জ্বাল দেওয়া খাঁটি ঘন দুধ পাচ্ছি। সরবরাহ অঢেল। আকার পরিবর্ত্তন করেও দুধই পাতে আসে ঘুরে-ফিরে। জিতেনের পেটে দুধ সয় না, সে পেড়া খাচ্ছে মুঠা মুঠা। দইও খোঁজ করলে পাওয়া যায় কোন কোন চটিতে। চিনি-পাতা দই না হলেও মিষ্টি আস্বাদ তার। একেবারে খাঁটি জিনিস। জল মিশেয়ে দুধের, সুতরাং লাভেরও পরিমাণ যে বাড়ানো যায় তা যেন জানেই না এদেশের লোকেরা।

তবে মোষের দুধই সর্ব্বত্র। গরুর দুধ খুঁজেছিলাম, কিন্তু কোথাও পাই নি।

পথ চলতে চলতে সেই মোষ দেখছি দলে দলে। বিপরীত দিক থেকে আসছে, মানে, নেমে আসছে উপর থেকে। লক্ষ্য না করে উপায় নেই। স্ত্রীপুত্রপরিজন নিয়ে বেশ বড় বড় এক একটি যূথ। ঐ সরু আঁকা-বাঁকা পথে ওদের মুখোমুখি হলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। আত্মরক্ষার জন্য খাদের মধ্যে নেমে যেতে ভরসা হয় না; সুতরাং প্রাণের ভয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে রুদ্ধনিঃশ্বাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ মোষের পাল আমাকে অতিক্রম করে না যায়।

সংখ্যায় এত যেখানে মহিষ এবং জীবনধারণের জন্য এত যার প্রয়োজন সেখানে সংস্কৃতির কুলুঙ্গিতে উঁচু একটি আসন পাবে বৈকি ঐ বিশেষ জন্তুটি।

তবে চলন্ত মোষগুলির অধিকাংশই মনে হয় যে, স্থানীয় নয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, ওরাও এক হিসাবে কেদারনাথের যাত্রী। যাযাবর ওদের মালিকেরা, ওরাও তাই। যাত্রীর মরশুম শুরু হলেই দুধের চাহিদা বাড়ে এই পার্ব্বত্য-অঞ্চলে। তখন মোষের পাল নিয়ে উপরে আসে ওদের পালকেরা যেমন নানারকম সওদা নিয়ে দোকান খুলতে আসে চটিওয়ালারা। যাত্রীর চলাচল যত-দিন থাকে ততদিন ওরাও থাকে এখানে। গরুর মত বাবু-পশু ত আর নয়! সুতরাং তেমন অসুবিধা হয় না ওদের। বনে বনে বিচরণ করে খায়, যেখানে-সেখানে শুয়ে রাত কাটায়। ওরাই প্রয়োজনীয় ও কখনও বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করে

চটিগুলিতে। তার পর যাত্রীর মরশুম যখন শেষ হয়ে যায়, বরফ পড়বার সময় যখন এগিয়ে আসতে থাকে তখন ওরাও উপর থেকে ক্রমেই নীচে নামতে থাকে। হরিদ্বার পার হয়েও আরও নীচে চলে যায়—কখনও কখনও বাংলাদেশ পর্য্যন্ত।

আমাদের ওদিকেও ত মাঝে মাঝে দেখেছি। শহরের উপান্তে বা পল্লীর সীমানার বাইরে—দূরপাল্লার সড়কের ধারে ধারে। আগের দিন বৈকালেই হয়ত দেখে গিয়েছি ফাঁকা মাঠ; কিন্তু পরদিন সকালে দেখেছি পঙ্গপালের মত পশুরা এসে সে মাঠ ছেয়ে ফেলেছে। দেখেছি পালে পালে মোষ; সঙ্গে কয়েকটি টাট্টু-ঘোড়া বা খচ্চর আর অবশ্যই দু'একটি ভীষণ-দর্শন কুকুর। পশু-পাল থেকে একটু দূরে দেখেছি দু'চারটি তাঁবু পড়েছে এবং তার ভিতরে বসে আছে বা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচিত্র আকৃতি ও বিচিত্র সাজের বিভিন্ন বয়সের কিছুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষ। শুনেছি যে, তারা যাযাবর—পূর্ব্ববঙ্গে সম্পূর্ণ ঘরসংসার ছোট একটি ডিঙ্গি নৌকার মধ্যে পুরে নদীনালায় ভেসে বেড়ায় যে বেদেরা তাদেরই সগোত্র স্থলপথের অসভ্য, বর্ব্বর পশুপালক।

দীর্ঘজীবনে কতবার, কত জায়গাতেই ত চোখে পড়েছে এই যাযাবর ও তাদের পশুপাল। তবে দেখা যাকে বলে তা হ'ল এই প্রথম।

গভীর বনের ভিতর দিয়ে একা একা চলছিলাম। ঐ দুপুর বেলাতেও মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পায়ের দিকে চেয়েই চলছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল যে, কিকে আঁধার বুঝি গভীর কালো হয়ে উঠল।

পথের উপরেই শুয়ে আছে কয়েকটি মোষ, কয়েকটি আবার একটু উপরে পাহাড়ের কোলে। একটু যেখানে বেঁকে গিয়েছে পথটা সেখানেই এই কাণ্ড। আবার ঐ বাঁকের মুখেই পাহাড়ের গা ঘেঁষে উঠেছে প্রকাণ্ড একটি মহীরুহ। গাছটির ওপারে কি যে আছে তা বোধ করি চনচনে রোদ থাকলেও সঠিক বুঝা যেত না।

একটি মোষের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিয়েছিলাম। চোখ ও মনের ঐরকম বিকল অবস্থাতেই ছায়া-মূর্ত্তির মত সেই লোকটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

সে যে ছায়া নয়, আমারই মত রক্ত-মাংসের মানুষ তা ঠিক বুঝতে বুঝি পুরা একটি মিনিটই লেগেছিল আমার। বেঁটে, খাটো মানুষটি। পরণে কম্বলের পাৎলুন আর জওহর-কোট ধাঁচের একটি জামা। শ'খানেক বুঝি তালি এক একটিতে। বৃষ্টির জলে ছাড়া আর কোনরকমে কখনও যে কাচা হয়েছে ও-পোষাক তা মনে হয় না। তবে লোকটির মুখের রঙ ফর্সা, গঠনও মন্দ নয়। মাথার চুল তার ছোট ছোট করে ছাঁটা যেমন আর সকলেরও দেখেছি উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করবার পর থেকেই। কিন্তু যা আর কোন লোকের মুখেই দেখি নি তাই দেখলাম এ লোকটির মুখে—তার চিবুকে ছোট মত মুসলমানী দুর একটি।

কত তার বয়স কে জানে! কিন্তু মুখখানি কাঁচা, সেই মুখে এক গাল হেসে ডান হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে, জরী বুটি লেওগে, বাবু?

গোড়াতে বিহ্বল হয়ে ছিলাম, এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, কি হবে ওতে?

আরও যেন মোলায়েম স্বরে উত্তর দিল লোকটি, সাপের বিষের ওষুধ বাবু! কালকেউটের বিষও জল করে দিতে পারে।

বুঝলাম যে, পাকা ক্যানভাসার লোকটি, হেসে বললাম, দরকার নেই। বলেই ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি।

লোকটি তথাপি বললে, মাত্র আট আনা দাম বাবুজী।

আমি বললাম, বিনে পয়সায় পেলেও চাই না।

শুনে কেমন অবস্থা হ'ল লোকটির মুখের তাই দেখবার জন্য মুখ ফেরাতে চেষ্টা করেছিলাম। বাঁ দিকে পাহাড়, সেই দিক দিয়ে মুখ ফিরবে আমার। কিন্তু অর্দ্ধবৃত্তের অর্দ্ধেকটা পার হতে না হতেই আমার চোখ দুটির সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও নিশ্চল হয়ে গেল।

আলোয় আলো হয়ে রয়েছে পাহাড়ের কোল।

গাছের গুড়িটা এতক্ষণ আড়াল করেছিল ভৈসালের সংসার। ছোট একটি তাঁবু পড়েছে গাছের গা ঘেঁষে। কাছাকাছি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি ছোট-বড় কলাই-করা হাঁড়ি কড়া। এতক্ষণ শুধু মোষই দেখছিলাম, এখন দেখলাম গলায় বকলস আঁটা বাঘের মত বড় বড় দুটি কুকুর, শিকল দিয়ে বাঁধা আছে তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে। আর একটি কুকুরের সামনে কানা উঁচু বড় একটি থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী যুবতী।

পরিধানে তার কত বর্ণের শত তালি দেওয়া বিচিত্র ঘাগরা, পীনোন্নত বক্ষে আঁটসাঁট কাঁচুলী, ছোট একখানি ওড়নাও দুই কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে গিয়ে পড়েছে। তবে ঢাকা পড়ে নি দেহের অনেকখানিই। দুটি পায়েরই পাতা থেকে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্তই চোখে পড়ে, চোখে পড়ে অনাবৃত, সুডৌল দুখানি হাত, সাপের মত লকলকে দীর্ঘ একটি বেণী, কাঁচা-সোনার রঙের ঢল-ঢলে মুখখানিতে টিকালো নাক আর দুটি টানা টানা নীল কালো চোখ।

ঘাড় বেঁকিয়ে সেই চোখ দুটি মেলে মেয়েটিও তাকিয়েছে আমার দিকে। বিজলীর ঝিলিক সেই দৃষ্টিতে।

কিন্তু আমার হৃদপিণ্ডটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই তখনকার মত একেবারে যে থেমে গেল তা অন্য কারণে। হঠাৎ যেন বাঘের গর্জ্জন কানে এল আমার। মেয়েটির উপর আমার চোখ গিয়ে পড়েছে বলেই ঘেউ ঘেউ ডেকে উঠেছে প্রভুভক্ত একটি কুকুর।

তবে পরের মুহূর্ত্তেই ভয় কেটে গেল আমার। মেয়েটি দেখি তার বাঁ হাতখানি কুকুরটির মাথার উপর রেখে বললে, চোপরও—যাত্রী হৈ।

ফিরে আমার দিকে চেয়ে সে বললে, ঘাবড়াও মৎ।

তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন থেমে গেল কুকুরের। আশ্বস্ত হলাম আমি

এবং আরও একটু বেশী। এগিয়ে যাবার জন্ত পা বাড়িয়েও পুনরায় থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটিকে, কুত্তা তুমহারা হৈ।

হাঁ—উত্তর দিল মেয়েটি।

ভৈস ?

স—ব। ওহ—ভী।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখি যে, সেই নূরওয়ালা যুবকটি কখন যেন নিঃশব্দে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—মুচকি মুচকি হাসছে সেও।

মেয়েটিই আবার বললে, মেরা মরদ।

লোকটির মুখে হাসি দেখে আমি আশ্বস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমলোগ ক্যা করতে হো ?

মেয়েটিই উত্তর দিল আমারই মত অশুদ্ধ হিন্দীতে—ভৈস চরাতা, দুধ বেচতা।

বলছে আর হাসছে সে। তার যৌবনপুষ্পিত দেহের লাবণ্যের মতই তার সতেজ প্রাণের অকারণের খুশীও যেন উপচে পড়ছে তার টুকটুকে লাল দুটি ওষ্ঠ ও ঝকঝকে চোখ দুটি থেকে। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে মুক্তার মত কটি দাঁত।

আমি একটি হাঁড়ির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা হৈ ইসমে ? দুধ ?

হা-া-া—মেয়েটি উত্তর দিল।

একটি বর্ণের ত উত্তর। কিন্তু আকারটিকে টেনে নিয়ে নিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ করতে লাগছে তার প্রায় এক মিনিট। হেসে কথা বলার মত টেনে টেনে কথা বলাও ঐ মেয়েটির বুঝি স্বভাব।

এতক্ষণ কুকুরটি এক দৃষ্টে আমার দিকেই তাকিয়েছিল, এখন অধৈর্য্য হয়ে উঠল সেটি। গোঁ গোঁ করল কয়েকবার, সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব খাড়া হয়ে সামনের পা দুটি দিয়ে আঁচড়াতে লাগল মেয়েটির ঘাঘরাতে। দেখে হাসতে হাসতে মেয়েটি তার হাতের থালাখানি মাটিতে নামিয়ে রাখল কুকুরটির মুখের কাছে। এখন চোখে পড়ল আমার যে থালাভরা সাদা তরল কি একটা জিনিস রয়েছে। মুখের সামনে পাওয়া মাত্রই কুকুরটি চুক চুক করে খেতে আরম্ভ করল তা।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, ক্যা হৈ থালিমে ?

মাঠ-ঠা—উত্তর দিল মেয়েটি।

মানে ঘোল। লোভনীয় পানীয় আমার। একটু লুব্ধ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, কৌন বনায়া হৈ ?

সে উত্তর দিল, হম—আপনা হাতসে বনায়া।

বেশ যেন গর্ব্বিত কণ্ঠস্বর তার। শুনে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, মাঠ-ঠা ঔর হৈ ?

সে উত্তর দিল, হৈ।

পিলাওগে হমকো ?

জরুর—উত্তর দিল মেয়েটি, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে আবার বললে, চার আনা সের।

আমি বললাম, দেও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিতল কি তামার একটি ঘটি ঐ বড় বড় হাঁড়িগুলির একটির মধ্যে ডুবিয়ে তুলে পূর্ণ এক ঘটি ঘোল নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল সে।

বেশ বুঝতে পারলাম যে, হাঁড়ি ভরা ঘোলের মধ্যে প্রায় কনুই পর্য্যন্ত ডুবিয়ে ঘটিটি পূর্ণ করেছে সে। তার সুগোল, সুডৌল, সোনালী রঙের হাতখানি থেকে বিন্দু বিন্দু ঘোল তখনও ঝরে পড়ছে, অনিবার্য্য রূপেই এখানে সেখানে লেগে রয়েছে ফেণার মত হাল্কা মাখন, ডান হাতের দুটি অঙ্গুলীর অনেকখানি তখনও ডুবে রয়েছে ঘটিভরা ঘোলের মধ্যে।

এ ঘোল মুখে দেওয়া যায় না। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একটি সিকি বের করে মেয়েটির প্রসারিত বাঁ হাতের তেলোতে টুপ করে ফেলে দিলাম সেটি। তার পর হেসে বললাম, তুম হি পী-লেও বেটি। হম এ্যায়সা হি কহা থা।

তুম নেহি পিও গে ?—বিস্মিত জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

মুখ ফুটে 'না' বলতে পারলাম না, শুধু ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম।

অসম্ভব ওর হাত থেকে ঘোল নিয়ে খাওয়া। বেশ কাছে থেকেই দেখছি এখন ওকে। ওর পরিধেয় কেবল যে জরাজীর্ণ তাই নয়, অত্যন্ত নোংরা, নোংরা ওর দেহও। চাপ চাপ ময়লা এখানে সেখানে জমে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে ওর হাত-পায়ের বড় বড় নখের ভিতরেও। কাছে থেকে ওর মাথার চুল দেখে মনে হয় বুঝি, জন্মের পর এই মেয়েটি আর কোন দিনই স্নান করে নি। ও আমার কাছে এসে দাঁড়াবার পর যে গন্ধটা নাকে আসছে তাকে সুবাস বলা যায় না।

না, ঘোল দূরে যাক, কিছুই নেওয়া যায় না এই মেয়েটির হাত থেকে। কোন প্রয়োজনেই লাগতে পারে না সে।

তথাপি সুন্দরী রূপসী। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি তার মুখের দিকে। কি যেন যাদু আছে তাতে। দেখলেই যেন আনন্দের জোয়ার আসে মনে। ঐ অনেক দূরের কেদারনাথ পাহাড়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গগুলির মত। কোন কাজে লাগবে না তা, কাছেই যাওয়া যাবে না তার। তবু মন টানে, তা দেখতে ভাল লাগে এবং সে ভাল লাগার আর শেষ নেই।

কেদারশৃঙ্গের অপরূপ রূপেরই স্বগোত্র মহিষমর্দ্দিনীর দেশে এই যাযাবরী মহিষপালিকার রূপ।

কিন্তু কেদারনাথের পথে এ সব যেন ক্ষণপ্রভা। চকিতে ফুটে উঠে পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। তার পর অন্ধকার মনে হয় আগের চেয়েও গভীর।

কল্পনা নয় আমার, সত্যই অন্ধকার। গহন বনের ভিতর

দিয়ে পথ। ও জায়গাটা একটা চড়াইয়ের মাথায় ছিল বলে গাছের পাতার রোদের একটু ঝিলিমিলি ও ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে দু'এক ফালি আকাশ চোখে পড়েছিল। তার পরেই উতরাই সুরু হ'ল আবার। মনে হল যে, সুড়ঙ্গপথে বুঝি বা পাতালেই নেমে যাচ্ছি।

চড়াই ভেঙেও লাভ নেই, চূড়ায় আর ওঠা হয় না। চলারও শেষ নেই।

চলছি একেবারে একা। খুব ভোরে উঠেই গঙ্গোত্রীরা রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। বরাসুর চটিতে গঙ্গোত্রীর ডাকেই সকালে ঘুম ভেঙেছিল আমার; চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে তারই মুখে শুনেছিলাম তার পরিকল্পনা; শুনেছিলাম তার কণ্ঠের আশ্বাসও। মাইল পাঁচেক দূরে রামপুর চটি—এ পথের প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং প্রায় কেদারের সমানই উঁচু, ত্রিযুগী নারায়ণ পাহাড়ের কাছাকাছি। চুক্তি করা কুলিরা বোঝা নিয়ে অতিরিক্ত চড়াই ভাঙতে রাজী হয় না বলে রামপুর একবার ছেড়ে গেলে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত না গিয়ে যাত্রীর নিস্তার নেই। এই পথেই তিন মাইল খাড়া চড়াই ত্রিযুগী নারায়ণের, স্বভাবতঃই আবার নামতেও হয় ঐ অতিরিক্ত তিন মাইল। সুতরাং রামপুরেই ইঞ্জিনে জল ভরবার ইচ্ছা গঙ্গোত্রীর। অর্থাৎ রামপুরেই খাওয়াটা সেরে নিয়ে তার পর গৌরীকুণ্ডের পথে যাত্রা করবার পরিকল্পনা তার। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের তিন জনের জন্যও ভাতে-ভাত রেঁধে রাখবেন তিনি।

আশ্বাস হিসাবে নিশ্চয়ই তুচ্ছ নয় তা। তবু মন মানে কই! আমার পা দুটির সঙ্গে সঙ্গে তাও বুঝি ভেঙে আসছে।

জিতেনও সঙ্গে নেই। পায়ে বুঝি পাখা আছে তার। রোজই দেখছি যে, পথে নামলেই যেন উড়তে সুরু করে সে। এই অচেনা দেশের দুর্গম পথে কত রকম দুর্ঘটনাই যে ঘটতে পারে তা তাদের বলতে গেলে এমনি ভাবেই হেসে উড়িয়ে দেয় সে যে, সাহস করে আর বলতেই পারি নি তাকে যে, লক্ষ্মণ ভাইয়ের ভরসাতেই কলির রাম এবার বনবাসে আসতে রাজী হয়েছিল। গত দু'দিন যেমন আজও তেমনি হয়েছে। বাহাদুরকে আমার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দিয়ে নিজে হন হন করে এগিয়ে গিয়েছে সে।

কিন্তু বাহাদুর ত আমাদের পাপের বোঝা তার পিঠে নিয়ে পিছনে পড়ে আছে। অন্য যাত্রীও পথে নেই। আপাততঃ সুড়ঙ্গ পথে চলেছি আমি একা।

ক্লান্ত দেহ। তিন দিন যাবৎ হাঁটছি। অভ্যস্ত জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সময়-মত খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। দাড়ি কামাই না, চুলে তেল দি না। যেটে দাওয়াতে বসতে বা নগ্ন পাথরের উপরেই শুয়ে পড়তে কোন দ্বিধা জাগে না মনে। জামাকাপড় ময়লা হচ্ছে, ভ্রূক্ষেপ নেই। অজানাতেই কখন যেন গাজনের সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এ ত আমার সঙ্কল্প করে কৃচ্ছ্রসাধনা গ্রহণ করা নয়। কাজেই থেকে থেকে দেহ আমার প্রতিবাদ করছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠছে মন।

সারা গায়ে ব্যথা, পা দুটি আর চলতে চায় না। আর মন? সে বুঝি মুক্তি চায় এই জটার জাল থেকে।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। দুঃখের মত উচ্চতারও সঠিক নির্দেশ রয়েছে একটু দূরে দূরেই শিলালিপিতে। ৬,০০০ ফুট উঠে এসেছি, দেখলাম এক জায়গায়। কিন্তু মন বিশ্বাস করতে চায় না। একই রকম পরিবেশ। সেই ঘোর ঘোর ভাব, সেই বন, চারিদিকেই সেই পাষাণ-প্রাকার। চড়াই ভেঙে উপরে যখন উঠি তখনও দিগন্ত অদৃশ্য, আকাশও বড় একটা চোখে পড়ে না।

জীবনের অনেকগুলি বৎসর জেলে কাটিয়েছি আমি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেল। কিন্তু সব এক ছাঁচে ঢালা। হাজার মাইল পার হয়ে গিয়েও দেখেছি একই রকম ঘরবাড়ী, একই মাপ ও বর্ণের উঁচু দেয়াল আমার চারিদিকে। দুঃসহ, একঘেয়ে বন্দী-জীবন। অথচ সেই জীবনেরই দম-আটকানো অনুভূতিই যেন আমার মনে জেগে উঠল হিমালয়ের কোলে কোলে এই মহামুক্তির পথে ক্রমাগত চলতে চলতেও। পট বড়, দৃশ্যও অনেক, কিন্তু ছবি এক। কত পথ পার হয়ে এলাম, ডিঙিয়ে এলাম কত পাহাড়। কিন্তু সে যেন ঐ এক জেল থেকে আর এক জেলে যাওয়া। আবর্তনের ঘূর্ণ্যাবর্তে বৈচিত্র্যের সমাধি হয়েছে এখানে।

সেই চড়াই আর উতরাই, পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন। পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে পুনঃ পুনঃ পরাজিত আমি। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই মনে হচ্ছে যে, চারিদিকের পাহাড় যেন আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, ক্রমেই যেন চারিদিক থেকেই এগিয়ে আসছে আমার দিকে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে আমাকে পিষে মারবার জন্য। নিবিড় হতে নিবিড়তর বনের গাঢ় অন্ধকার, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে আবার।

বার বার চোখ যায় অনেক নীচে মন্দাকিনীর দিকে। বিপরীত দিকে গতি তার। মনে মনে সেই গতিপথে আমিও যেন পার হয়ে আসা সম্পূর্ণ পথটাই অতিক্রম করে আবার নীচে চলে যাই—যেখানে পায়ের নীচে সমভূমি, মাথার উপর উদার, মুক্ত, নীল আকাশ, যেখানে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে কোন বাধা পায় না দুটি চোখের অস্থির, কৌতূহলী দৃষ্টি।

সর্বনাশ! মনের অগোচর ত পাপ নেই। কেদারনাথে গিয়ে পৌঁছবার পূর্ব্বেই সমতলের ডাক আমার মনের কানে এসে প্রবেশ করল নাকি।

কিন্তু গুছিয়ে ভাবতেও পারি না। দেহ বড় ক্লান্ত। গতি নয়, সে এখন চায় বিশ্রাম।

রামপুরে ধর্ম্মশালার সামনে পথেই আমার জন্য অপেক্ষা কর-

ছিলেন গঙ্গোত্রী। আমাকে দেখেই মুখে হাসি ফুটল তাঁর। বললেন, এই যে চাচা, ত্রিযুগী নারায়ণ এখান থেকে মন্দির পর্য্যন্ত ঠিক পাঁচ মাইল।

আমি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেও হাসতে পারলাম না। ফস করে মুখ থেকে উত্তর বের হ'ল, ত্রিযুগী নারায়ণ মাথায় থাকুন আমার, আমি নীচের পথটাই ধরব।

ততক্ষণে বুঝি আমার অবস্থা চোখে পড়েছে গঙ্গোত্রীর, হাসি থামিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, আপনার শরীরটা কি খারাপ হয়েছে?

শুষ্ক হাসি হেসে উত্তর দিলাম, হলে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না, হাঁটা ত কম হচ্ছে না! আর যে পথ!

আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলেন গাঙ্গোত্রী, তার পর শুধু একটু হেসে বললেন, আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। আপনি স্নানটান করুন, ভাতে-ভাত তৈরীই আছে আমার। তবে একেবারে শুকনো খেতে হবে না। ভাল দই পাওয়া গিয়েছে এক ময়রার দোকানে।

(১১)

কেরলের সেই নবীন সন্ন্যাসীকে গঙ্গোত্রীর জননী সেদিন বলে-ছিলেন যে, এই দুর্গম হিমালয়ের কোলে কোলে সংসার ছড়িয়ে রয়েছে। গঙ্গোত্রীর নিজের হাতের রাঁধা ভাতে-ভাত খেতে খেতে সেই কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। পরে বুঝলাম যে, আর এক গভীরতর অর্থেও কথাটা সত্য।

শিব-পার্ব্বতীর সংসারে এসে পড়েছি আমরা। তাঁদের ঘর-গৃহস্থালীর কাহিনী শুনলাম আমাদের চক্রধর পাণ্ডার মুখে।

মৈথগুাও ত পার্ব্বতীরই লীলাক্ষেত্র, তবে দেবী সেখানে মহিষ-মর্দ্দিনী ভয়ঙ্করী। কিন্তু এখানে তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে, ঘরের বধূ। বাংলা দেশে শিউলী-ফোটা শরৎকালে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণীর ষড়ৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধ মূর্ত্তির ষোড়শোপচার পূজার বিপুল আড়ম্বর সত্ত্বেও সকালের সোনালী রোদ ও নহবৎখানার সানাইতে আগমনীর সুরে সুরে লালপেড়ে শাড়ীপরা যে মেয়েটির অদৃশ্য আবির্ভাব মনের চোখে প্রত্যক্ষ করি আমরা সেই মেয়েটিকেই যেন মুখোমুখি দেখলাম চক্রধরের মুখে শিব-পার্ব্বতীর গার্হস্থালীলার বিচিত্র কাহিনী শুনতে শুনতে।

অপ্রত্যাশিত নয় চক্রধরের আবির্ভাব। ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দিরে যজমানের জন্ম কিছু কর্ত্তব্য আছে তাঁর, প্রতিদানে কিছু দক্ষিণাও আমাদের কাছে আশা করে সে। তারও অন্তরের ইচ্ছা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবার, কিন্তু বাধা পড়ল। আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই চেপে জল এল। ভিজে ভিজে হাত মুখ ধোওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করা যায় না। সুতরাং খাওয়ার পর বারান্দায় উনোনের ধারেই সকলে মিলে গোল হয়ে বসেছিলাম, মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে ও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কিছুটা সময় কাটল। তার পর সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে শুরু হ'ল চক্রধরের মুখে লীলাকীর্ত্তন।

অনুকূল পরিবেশ। বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি হচ্ছে, একে ত আকাশ বেশী দেখাই যায় না, তার আবার এখন মেঘে-ছাওয়া সে আকাশ। দুপুর বেলাতেই যেন রাত রাত ভাব। বসে আছি প্রকৃতি ও অপ্রকৃতির সীমান্ত-ভূমিতে। অতি সহজেই সীমান্ত পার হয়ে কল্পনায় দেব দেবীর স্বর্গরাজ্যে চলে গেল চক্রধর। অতটা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবু কথার জালে বেঁধে আমাকেও যেন অনেক দূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেল সে। ঐ রামপুরের চটিতে বসেই মনে মনে আমি ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে গৌরীকুণ্ড অবধি বিচরণ করে এলাম।

পুরাণের গল্পের সঙ্গে সব জায়গায় মিল নেই। বিগ্রহের গায়ে চাপ চাপ চন্দন-সিঁদুরের মত পৌরাণিক মূল কাহিনীর উপর চক্রধরের মত বহু পাণ্ডা-কথকের উদ্ভট কল্পনার রং লেগেছে, ক্ষতি নেই তাতে, বরং ভালই হয়েছে। শিব-পার্ব্বতীকে পেলাম আমরা আমাদের ঘরের মানুষের মত।

দক্ষরাজকন্যা সতী পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে কনখলে পিতৃগৃহে দেহত্যাগ করবার পর হিমালয়ের ঘরে উমা হয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, এ সেই ঘর। হিমালয় ত রাজা, ঘর তার রাজপ্রাসাদ। এক একটি পাহাড় এখানে সেই রাজপ্রাসাদেরই এক একটি কক্ষ। এই পিত্রালয়েই কেটেছে উমার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন। মাণিক-মুক্তা নিয়ে এখানেই খেলা করেছেন তিনি। হাতের বালা, পায়ের মল বাজিয়ে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছেন এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে। আদরিণী মেয়ে দিনে-রাতে, সকাল-সন্ধ্যায় কক্ষ বদল করেছেন। পাহাড়ে পাহাড়ে নিদর্শন রয়ে গিয়েছে সেই সুমধুর বাল্য, কৈশোর ও যৌবন লীলার, সেকালের লীলাক্ষেত্র হয়েছে একালের তীর্থ।

যেমন ঐ ত্রিযুগী-নারায়ণ পাহাড়।

নিশ্চয়ই গৌরীদান করেছিলেন পিতা হিমালয়।

উমার বর এল কৈলাস থেকে। শ্মশানচারী শিব, নামেও ভোলানাথ কাজেও তাই। দক্ষ-দুহিতা সতীর শব কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করলে কি হবে—পত্নী-শোক ভুলতে আর কদিন লাগে তাঁর। হিমালয়ের ঘরে সুলক্ষণা কন্যা আছে শুনে নন্দীভৃঙ্গী, ভূত-প্রেতসহ সদলবলে এলেন তিনি হিমালয়ের এই বাড়ীতে। বিবাহ-বাসর সামনের ঐ পাহাড়টার উপর।

যে সে ব্যাপার ত নয়! শিবের সঙ্গে শক্তির বিবাহ। তার আয়োজন-অনুষ্ঠান ত আর সাধারণ পর্য্যায়ের হতে পারে না। ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করে আনা হ'ল পৌরোহিত্য করবার জন্ম। তথাপি হিমালয়ের মনে সন্দেহ, বাপের মন ত! বর হলেন ভোলানাথ শিব। শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। সালঙ্কারা কন্যারত্নের পানিগ্রহণ করবার পর এক দিন যদি তিনি বিয়েটাই অস্বীকার করে

বসেন ! আর তেমন বেইমানি উনি না করলেও বিয়ের কথাটা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। সুতরাং হিমালয় মনে করলেন যে, বিয়ের একজন অতিরিক্ত সাক্ষী থাকা উচিত। সে সাক্ষীও এমন সাক্ষী হওয়া চাই যার সাক্ষ্য শিব অবিশ্বাস করতে না পারেন। ভাবতে ভাবতে নারায়ণের কথা মনে পড়ল। তখন হিমালয় বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে এলেন তাঁকে। তার পর তাঁকে সাক্ষী রেখে শিবের হাতে কন্যা দান করলেন হিমালয়। সম্প্রদানের পর কুশণ্ডিকা। খোঁড়া হ'ল যজ্ঞ-কুণ্ড। কদম্বকাষ্ঠে অগ্নি সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হ'ল হোমাগ্নি। তাতে পূর্ণাহুতি দিয়ে শিব-পার্ব্বতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

ঐ সামনের পাহাড়টার উপর। গল্প শোনবার পর সেদিকে তাকিয়ে গায়ে কাঁটা দেয়।

সেই সত্য যুগের ঘটনা। বিয়ের পর আর সবাই চলে গেলেন, যেতে পারলেন না শুধু নারায়ণ। সেই থেকেই নাকি কৃতকর্ম্মের বন্ধনে ওখানেই বন্দী হয়ে রয়েছেন তিনি। সেই রাত্রে হোমকুণ্ডে যে পবিত্র অনল জ্বলে উঠেছিল, নিয়মিত ইন্ধনের যোগান পেয়ে আজও নাকি সেই অনলই জ্বলছে সেই সত্যযুগের হোমকুণ্ডে। ত্রিযুগ-বয়স্ক ত্রিযুগী-নারায়ণ ঐ পাহাড়ের উপর বসে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে শিবের সঙ্গে সত্যই পার্ব্বতীর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর নীরব সাক্ষ্যের জ্বলন্ত সমর্থন সামনের হোমকুণ্ডে।

তবে অত তোড়জোড় না করলেও চলত। ভুল হয় নি ভোলানাথের। কে জানে কার বেশী প্রভাব—নারায়ণের সতর্ক খবরদারীর, না সদ্য-বিবাহিতা গৌরীর কটাক্ষের। তখনও ছেলেমানুষ গৌরী। বাপের বাড়ী ছেড়ে বরের ঘর করতে কৈলাসে যেতে চান না তিনি। সুতরাং গাঁটছড়া খুলবার পরেও কি যেন, এক অদৃশ্য বন্ধনে বন্দী হয়ে পড়ে রইলেন শিব ঐ হিমালয়ের শিখরে শিখরেই। খাঁ খাঁ করতে থাকল কৈলাস, এদিকে শ্মশানচারীর সংসার জমে উঠল ঐ হিমালয়ের কোলে। নইলে গৌরীকুণ্ড ওখানে আসে কোথা থেকে ?

বালিকা গৌরী অকস্মাৎ একদিন নারী হয়ে উঠলেন। রজস্বলা হলেন তিনি।

পার্ব্বতীর কাছে পথের দূরত্ব কিছুই নয়। গৌরী ঋতুস্নান করলেন প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরীকুণ্ডে। স্ফটিকশুভ্র কুণ্ডবারী পার্ব্বতীর অঙ্গরাগে রঞ্জিত হয়ে গেল।

এও তিন যুগ আগের ঘটনা। কিন্তু আজও হেমবর্ণ রয়েছে গৌরীকুণ্ডের শীতল জল।

ত্রিযুগী-নারায়ণ ও গৌরীকুণ্ডের মাঝামাঝি এক জায়গায় শোণপ্রয়াগ থেকে খানিকটা উত্তরে গণেশের মন্দির। প্রচুর তেল-সিঁদুর মাখা টকটকে লাল রংয়ের বিগ্রহ। কিন্তু বেচারা, শিরহীন বিগ্রহ, নামও তাই—মুণ্ডকাটা গণেশ।

তাঁর কাহিনীও শুনলাম চক্রধরের মুখে।

গণেশজননী হবার পর ভাবান্তর হ'ল গৌরীর। পঙ্কর্দুতের ফাঁদে পড়ে থাকলেও আসলে ত তিনি আভাশক্তি। স্বীয় চিন্ময়-সত্তার জন্ম ব্যাকুল হলেন পার্ব্বতী। তখন যোগিনী-ভাব তাঁর। জপতপের দিকে মন। স্বামীকে কাছে ঘেঁষতে দিতে চান না। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ধ্যানে বসলেন একদিন—সিদ্ধিলাভ না করে উঠবেন না। দ্বারপাল রাখলেন পুত্র গণেশকে। কড়া হুকুম তাঁর উপর যেন কাউকে ধ্যান-ঘরে ঢুকতে না দেওয়া হয়। শিব তখন কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অন্দরমহলে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন গণেশের কাছে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি।

তৃতীয় নয়নে ধ্বক্ ধ্বক্ আগুন জ্বলে উঠল মহেশ্বরের। বললেন তিনি, আমি তোর পিতা !

কর্ত্তব্যপরায়ণ গণেশ অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমার মাতৃ-আজ্ঞা। আপনাকে ঢুকতে দেব না আমি।

প্রলয়ের দেবতা নটরাজ শিব। প্রত্যাখ্যান ও অপমানের কষাঘাতে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। চক্ষের পলকে শিবের ত্রিশূলের আঘাতে মুণ্ড উড়ে গেল গণেশের।

আধ-বোঁজা চোখে তন্ময় হয়ে গল্প বলে যাচ্ছিল চক্রধর। কিন্তু সে এই পর্য্যন্ত আসতেই বাধা পড়ল।

জিতেন কেবল বিস্মিত নয়, বুঝি শিবের মতই রুষ্ট হয়ে বলে উঠল, এ কি গাঁজাখুরি গল্প তুমি বলছ ঠাকুর ? আমরা ত জানি যে শনির দৃষ্টিতেই গণেশের মুণ্ড উড়ে গিয়েছিল।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্ম একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল চক্রধর। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে পরম-বিজ্ঞের মত গম্ভীর স্বরে সে উত্তর দিল, সে গণেশ হ'ল গণপতি—শ্বেতহস্তীর মুণ্ড কেটে এনে কবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পুনর্জীবিত করা হয়েছিল যাকে। আমি বলছি কেদারখণ্ডের মুণ্ডকাটা গণেশের কথা। এখন বিশ্বাস না করেন আপনারা এগিয়ে চলুন। তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন যে, এ গণেশের কাটামুণ্ড আর জোড়া লাগে নি।

মোক্ষম যুক্তি। জিতেনের পক্ষেও আর প্রতিবাদ করা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু এর পর কথকতাও আর আগের মত জমল না।

দেব-দেবীকে ছেড়ে পথের কথা উঠল তখন। একা আমি ছাড়া দলের আর প্রত্যেকেরই এগিয়ে যাবার ইচ্ছা। কিন্তু বাদ সেধেছে ঐ বৃষ্টি। ঝম ঝম বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। আকাশ যেন আগের চেয়েও কালো। তথাপি জিতেন বললে, চলুন, রওনা হওয়া যাক।

কিন্তু দাঁতে জিভ কেটে মাথা নেড়ে চক্রধর বলে উঠল, না বাবুজী, এমন বৃষ্টি থাকতে পাহাড়ের পথে চলতে নেই।

ঘড়ি দেখলেন গঙ্গোত্রী। তার পর বললেন, বৃষ্টি থামলেও আজ আর যাওয়া হবে না। বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। চলতে শুরু করলেই যেতে হবে একেবারে গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত—কমপক্ষে দশ মাইল পথ। অবেলায় অতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

জিতেন অধৈর্য্য হয়ে বললে, ঝুঁকি আবার কি ! দশ মাইল

পথ চলতে বড় জোর চার ঘণ্টা লাগবে। এখন ত মোটে দুটো।

মুচকি হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী, কিন্তু ভাইয়া, এখনই ত বের হতে পারছি নে আমরা। বৃষ্টি ত চলছেই। থামতে থামতে যদি তিনটে বেজে যায় তখন ত আর আপনার হিসাব টিকবে না।

যুক্তি অকাট্য বুঝে গুম হয়ে রইল জিতেন।

গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম বলে এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি আমরা। এখন চোখে পড়ল যে, আমাদের বাহাদুর ও গঙ্গোত্রীদের ছত্রী দু'জনেই একটু দূরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গঙ্গোত্রীর জননীর নিষ্প্রভ চোখেও ঢুলুঢুলু ভাব।

বোধ করি তার মায়ের কথা ভেবেই গঙ্গোত্রী আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, যাত্রা যখন শুরু করা যাচ্ছে না তখন আর বসে থেকে কি লাভ? তার চেয়ে সবাই একটু ঘুমিয়ে নিলে হয় না!

ঠিক আমারই মনের কথা ওট; সুতরাং সায় দিতে একটুও দেরি হ'ল না আমার।

ঘুম ভাঙবার পর বিছানায় শুয়েই বেশ বুঝতে পারলাম যে, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। বাইরে এসে দেখি যে, আরও একটু বেশী। কাছাকাছি পাহাড়গুলির চূড়ায় চোখে পড়ল ঝিকিমিকি রোদ। এ ক'দিনে বেশ বুঝতে পেরেছি যে, এই রকমই হয় এখানে—রোদ নিভিয়ে বৃষ্টি নামে, আবার রোদ ওঠে বৃষ্টি থামলেই। বসন্ত ও বর্ষার নির্ব্বিবাদ সহ-অবস্থান দেখছি এই হিমালয়ে।

গঙ্গোত্রী আর বাহাদুর দেখি বারান্দার গল্পে মেতে উঠেছে। বেশ উৎফুল্ল বাহাদুরের মুখের ভাব।

গঙ্গোত্রীর মুখেই শুনলাম যে, সেদিন আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না বুঝে ক্ষুব্ধ জিতেন বৃষ্টি থামবার পর কিছুটা ক্ষতি-পূরণের আশায় সামনের ঐ পাহাড়টিকে আবিষ্কার করতে বের হয়েছে, তার পথপ্রদর্শক হয়েছে গাড়োয়ালী কুলি ছত্রী। গঙ্গোত্রীর জননী শুনলাম চক্রধরের সঙ্গে গিয়েছেন স্থানীয় এক সাধুর আস্তানায়।

শুনতে শুনতে আড়চোখে বাহাদুরকে দেখছিলাম আমি। তখনও খুশী খুশী ভাব তার। কারণটা মনে মনে আন্দাজ করে গঙ্গোত্রীকে বললাম, আপনাকে দেশের লোক পেয়ে খুব খুশী হয়েছে বাহাদুর।

হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী, তা ঠিক—এতক্ষণ আমাদের দেশের চলতি ভাষায় কথা বলছিলাম আমরা।

আমিও হেসেই বললাম, তা হলে কুলি বদল করলে হয় না? আপনাদের দলে যেতে পারলে বাহাদুর বোধ করি আরও খুশী হবে।

মোটেই নয়।

গঙ্গোত্রীর উত্তর শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম আমি, কিন্তু ব্যাখ্যা শুনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম।

গঙ্গোত্রী বললেন, আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যে, দু'জনে আমরা আমাদের দেশের কথা আলোচনা করছিলাম? তা মোটেই নয়। দেশী ভাষায় বললেও বাহাদুর বলছিল আপনাদেরই কথা—আপনাদের সঙ্গে ও নাকি বাড়ীর আদর ও আরামে আছে। আমি ডবল ভাড়া দিতে চাইলেও যাত্রী বদল করবে না ও।

হিন্দী ত ভালই বোঝে বাহাদুর। গঙ্গোত্রীর কথা শুনে দেখি যে সে হাসছে। সে হাসি পরিতৃপ্তির, সমর্থনেরও।

টেনে আর বাড়ালাম না কথাটা। একটু ইতস্ততঃ করবার পর গঙ্গোত্রীকে বললাম, চলুন একটা ভাল দোকানে গিয়ে চা খেয়ে আসি। আমি কেমন চা তৈরি করতে পারি তা পরখ করবেন।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন গঙ্গোত্রী, কিন্তু আমার প্রস্তাবে সায় দেবার জন্য নয়। বাহাদুরকে তিনি হুকুম করলেন উনান ধরাতে; তার পর এক মুখ হাসি হেসে আমাকে বললেন, বাহাদুরের মুখে শুনেছি আমি কেমন চা আপনি খান। ততটা ভাল চা আমি তৈরি করতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারব আশা করি।

কিন্তু তার পরেই যা তিনি বললেন এবং যে ভঙ্গিতে বললেন তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আমার কাছে। সারা মুখে ছড়িয়ে-পড়া হাসি তার শুধু যেন চোখ দুটির মধ্যে গুটিয়ে এনে ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ বেঁকিয়ে প্রায় আবদারের স্বরেই তিনি বললেন, আমি ত গোড়া থেকেই 'চাচা' বলে ডাকছি আপনাকে। আপনি তবে আমাকে 'তুমি' না বলে ক্রমাগতই 'আপনি' বলছেন কেন?

অনুযোগের নীচে সুস্পষ্ট অনুরোধ। বেশ বুঝতে পারলাম যে, একটুও ভেজাল নেই তাতে। আমার নিজের মন ত গতরাত্রি থেকেই অনুকম্পায় আর্দ্র হয়ে রয়েছে, এখন তা গলে জল হয় আর কি! কিন্তু মন চাইলেও তৎক্ষণাৎ 'তুমি' সম্বোধন মুখে আসে না আমার।

হাসিমুখে চুপ করেই ছিলাম তখন। চা খেতে খেতেও ভাব-বাচ্যে কথা বলে সমূহ সঙ্কট এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আবার আমাকে চেপে ধরলেন গঙ্গোত্রী। বললেন, আমার নাম ধরে আর 'তুমি' বলে আমাকে যদি না ডাকেন আপনি তবে আমিও এর পর আপনাকে 'চাচা' না বলে মিঃ রায় বলে ডাকব।

সশ্রদ্ধ স্নেহের ঐ শেষ আঘাতে আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল এবং গত রাত্রে জিতেনের মুখে সংক্ষেপে গঙ্গোত্রীদের পারিবারিক ইতিহাস শুনবার পর থেকে যত অনুভূতি ও যত প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে জমে উঠেছিল তা বাঁধ-ভাঙা জল-স্রোতের মতই বের হয়ে এল।

খেয়ালই হয় নি তখন যে, ঐ প্রবল স্রোতের মুখে কি দুর্দ্দশা হতে পারে বেচারী গঙ্গোত্রীর।

অবরুদ্ধ আবেগ আমার মনের অর্গল ভেঙে বের হয়ে এসেছে—গলা একটু কাঁপবে বৈকি!

আমি বললাম, অন্ত কাছে আমাকে টানলে তুমি যে বিপদে

পড়ে যাবে, মা। শেষে যদি বাপ-খুড়োর মতই খবরদারি শুরু করে দিই?

তাতে ত আমারই লাভ, হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী, বাপের খবরদারি যে কি মিষ্টি, হারাবার পরেই না তা ঠিক বুঝতে পেরেছি।

তাহলে গঙ্গোত্রী, তুমি বিয়ে করলে না কেন? সন্ন্যাসী হবার আগে তিনি ত তোমাকে অনুমতি দিয়েই গিয়েছেন।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেছিলাম আমি; কিন্তু বলেই চমকে উঠলাম। ভাল করে চেয়ে দেখি যে গঙ্গোত্রীর মুখের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। হাসি নিশ্চিহ্ন, রক্ত চলাচলও বুঝি বন্ধ হয়েছে তার মুখের উপর; স্বাভাবিক হরিদ্রাভ বর্ণ, এখন মনে হয় অসুস্থ পাণ্ডুর; নীল চোখের কালো তারা দুটি তার অকস্মাৎ যেন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, কি হ'ল তোমার?

উত্তর দিলেন না গঙ্গোত্রী। দেখে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠল আমার। অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে আমি আবার বললাম, যদি আমার বেয়াদবি হয়ে থাকে তবে তা মার্জ্জনা করবেন গঙ্গোত্রীদেবী।

কিন্তু এই কথা শুনেই আবার বদলে গেল গঙ্গোত্রীর মুখের চেহারা। একসঙ্গে অনেকখানি রক্ত যেন শিরা-উপশিরার পথে ছুটে এসে ছড়িয়ে পড়ল তার মুখের উপর। প্রতিবাদের দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, না, 'দেবী' আবার কেন জুড়ছেন নামের সঙ্গে? বলুন 'গঙ্গোত্রী'—'বেটি' বলুন। বেয়াদবি কেন হবে আপনার? আপন চাচার মতই ত কথা বলেছেন আপনি। আমি শুধু ভাবছিলাম—

বলতে বলতে থেমে গেলেন গঙ্গোত্রী। হঠাৎ বাধা পাওয়া নির্ঝরের মতই ভাবখানা তার—এক সঙ্গেই বিব্রত ও অসহিষ্ণু। কিন্তু তা ঐ কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তার পরেই হেসে ফেললেন তিনি। আবার তিনি যেন বেশী বয়সের ছোট মেয়েটি।

জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, কে বললে আপনাকে? মা?

তখনও কুণ্ঠিত ভাব আমার; ঘাড় কাৎ করে স্বীকার করলাম।

আর কি বলেছেন?

বলেছেন যে, তোমার উপর অভিমান করেই তোমার বাবা সন্ন্যাসী হয়েছেন।

মুখের হাসি গঙ্গোত্রীর আবার নিভে গেল। চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি, শক্ত মুঠায় চেপে ধরলেন তাঁর নিজের শাড়ীর আঁচলেরই একটি কোণ। কিছুক্ষণ পর আবার যখন তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন তখন দেখি যে গম্ভীর তাঁর মুখের ভাব, দৃষ্টি বিষণ্ণ। বিষণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন, ওটা, চাচা, আমার মায়ের ভ্রান্তি—একটা অসুস্থ আবেগ। আমার বাবা বেঁচে নেই।

অ্যাঁ!—একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

গঙ্গোত্রী কিন্তু সহজ ভাবেই বললেন, হ্যাঁ চাচা, আমাদের বাড়ীতে ত মারা যান নি তিনি, কাজ করতে গিয়ে মারা পড়েছিলেন। তাঁর শবদেহও আমরা পাই নি, সেই জন্যই বাবার মৃত্যু-সংবাদ আমার মা বিশ্বাস করেন নি তখন। সন্ন্যাসী হবার একটা ঝোঁক চিরদিনই বাবার ছিল বলেই মা তখন ধরে নিলেন যে মনের দুঃখে সন্ন্যাসীই হয়েছেন তিনি। পাঁচ বছর হয়ে এল তার পর, কিন্তু সেই আবেশই রয়ে গেছে মায়ের মনে। এই যে ওঁর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান এও আসলে আমার বাবারই খোঁজে। মায়ের ধারণা যে, কোন তীর্থস্থানে বা তীর্থের পথেই বাবার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়ে যাবে।

কিছু কিছু যেন বুঝলাম ব্যাপারটা, বুঝলাম কেন সাধু সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আগ্রহ সত্ত্বেও সন্ন্যাস সম্বন্ধে অত বিরূপ ধারণা এ বুদ্ধার। গত রাত্রে জিতেনের মুখে অন্য রকমের কাহিনী শুনেও সমবেদনা বোধ করেছিলাম ঐ জরাজীর্ণা মহিলার প্রতি, এখন আরও বাড়ল তা, কিন্তু কি করতে পারি আমি! স্বয়ং কন্যা হয়েও অত শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী গঙ্গোত্রী যে রোগ আরাম করতে পারেন নি আমি তার কি করব?

কিছুক্ষণ পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গঙ্গোত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছিল তোমার বাবার?

কিছুই হয় নি, মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী, নিয়তি তাকে টেনে নিয়েছে।

তার মানে?

ওথাই অঞ্চলে রাস্তা তৈরী করাচ্ছিলেন আমার বাবা। তখন ধস নামল, চাপা পড়ে মারা গেলেন তিনি।

ধস কি?

পাহাড়ের ধস নামে জানেন না?

শব্দটি জানা থাকলেও ওর অর্থ সম্বন্ধে আমার তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন গঙ্গোত্রীর মুখে শুনে কিছু কিছু বুঝলাম ব্যাপারটা।

দৈত্যের মত বিরাট আর আকাশ সমান উঁচু হলে কি হবে। অনেক পাহাড়েরই ভিতরটা নাকি কাঁচা। বৃষ্টির জল সে সব পাহাড়ের পরতে পরতে ঢুকে যায়। মাটি দিয়ে গাঁথা ইঁটের দেওয়ালের মত পাথর আর পাথরের মাঝখানের মাটি গলে যায় তখন, নড়বড়ে হয়ে যায় পাথরগুলি। তখন যদি আরও বৃষ্টি হতে থাকে তা হলে নীচের দিকে বসে যেতে থাকে পাহাড়। উপরের মাটি পাথর ঝুর ঝুর করে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়তে থাকে। পাহাড় অঞ্চলে বর্ষাকালে এ হ'ল গিয়ে অতি সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা, তবে বারিপাতের পরিমাণ তেমন বেশী যদি হয় অথবা যদি ভূমিকম্প হয় তা হলে পাহাড়ের স্বাভাবিক ধস অসাধারণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বল্মীকের ছোট একটি স্তূপের মতই বড় বড় পাহাড়ও তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে রকম অবস্থায় দু একটি মানুষ ত কোন ছার, গ্রামকে গ্রামও ভগ্ন স্তূপের নীচে চাপা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এমনি এক বিপর্য্যয়ের বলি হয়েছিলেন গঙ্গোত্রীর পিতা। অনেক কুলী-কামিন নিয়ে ওভারসিয়ার সাহেব নাকি নূতন একটি সড়ক নির্ম্মাণ করছিলেন উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে। সরকারী কাজ, সতর্কতার ত্রুটি হয় নি, তবু ধস নেমেছিল। তারই নীচে চাপা পড়েছিল স্বয়ং ওভারসিয়র সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তারই দলের জনদশেক লোক। তাদের একজনকেও জীবন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

না, সংশয়ের কোন অবকাশই নেই। আমার প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করলেন গঙ্গোত্রী যে তার পিতার মৃত্যুর সম্পূর্ণ ও নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ সরকারী দপ্তর থেকে যথাসময়েই পেয়েছিলেন তিনি।

আমার মনেও আর সংশয় থাকল না। বুঝি সেইজন্যই আর একটা সংশয় জেগে উঠল সেখানে। সেই সঙ্গে ক্ষীণ একটু আশাও। গলার স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি, তা হলে, মা, আর যে একটা কথা আমি শুনেছি তাও কি ভুল?

স্মৃতির অনুসরণ করে গঙ্গোত্রীর মনটা বুঝি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের অতীতে ফিরে গিয়েছিল। সুতরাং আমার প্রশ্ন শুনে বিহ্বলের মত তিনি বললেন, কোনটা?

আমি বললাম, তোমার বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা!

বুঝতে আরও একটু সময় লাগল গঙ্গোত্রীর, বুঝেই চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি, মুখে বললেন, না, ওটা ঠিকই শুনেছেন আপনি।

একটু আশাভঙ্গ হ'ল বই কি। তবু কথার টানেই কথা বের হয়ে গেল আমার মুখ থেকে। আমি বললাম, তা হলে, মা, বিয়ে তুমি করলে না কেন? তোমার বাবা, শুনেছি, তোমাকে অনুমতি দিয়েই গিয়েছিলেন। আর তোমার মাও ত আপত্তি করেন নি।

তাই বলেই কি বিয়ে করতে পারি আমি?

গঙ্গোত্রী যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বললেন কথাটা। কিন্তু তার পর চোখ তুলে সোজা তিনি তাকালেন আমার চোখের দিকে। অন্তরের স্বাভাবিক সঙ্কোচটুকু যেন জোর করেই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আবার বললেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থাও বদলে যায়, চাচা, বাবা থাকতে ব্যাপারটা চুকে গেলে ভাল মন্দ যা হবার হয়েই যেত, তা হয় নি বলেই পরেও বিয়ে আর হ'ল না।

তা কেন?

বাঃ! এই ত দেখছেন আমার মায়ের অবস্থা। বছর পাঁচেক যাবৎ এই রকমই চলছে। এই মাকে ফেলে আর এক-জনের ঘরে আমি যাই কেমন করে? আর তার ঘরেই যদি না যেতে পারি তবে তাকে বাঁধতে যাব কেন?

এত কথা আমি ভাবি নি। শুনে সম্ভ্রম বিস্ময়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম গঙ্গোত্রীর মুখের দিকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মেয়েটির উপর আমার যে মায়া পড়েছে। ওর আত্মত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হয়েও ওর বুকের তলে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বঞ্চিতের বেদনার প্রবাহ কল্পনা করে সমবেদনায় ব্যথিয়ে উঠল আমার মন।

ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দির

গাঢ়স্বরে আমি বললাম, কিন্তু, গঙ্গোত্রী, এ ত তোমার স্বাভাবিক জীবন নয়, মা। আর মানুষের জীবনটা তার যে কোন আবেগের চেয়েও দীর্ঘ।

আশ্চর্য্য! শুনে হেসে ফেললেন গঙ্গোত্রী। হাসতে হাসতেই বললেন, আমার জীবন কিন্তু, চাচা, আমার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না, কলেজে যাদের আমি পড়াই তারাই মনে হয় যেন আমার বোন। আর কিছু দিন পরে মনে হবে বুঝি 'আমারই মেয়ে তারা। আর বিয়ে করি নি বলেই ত মাকে নিয়ে এত তীর্থে তীর্থে বেড়াতে পারছি। সব মিলিয়ে আমি ত দেখছি যে ক্ষতি পূরণ হয়েও লাভ হচ্ছে আমার।

হেরেই গিয়েছি ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আর একটি যুক্তি মনে এল। এবার পরিহাসের তরল কণ্ঠেই গঙ্গোত্রীকে বললাম, কিন্তু, মা, সেই ডাক্তারটি আর কত দিন অপেক্ষা করে থাকবে! তার কথাটাও ত তোমার ভাবা উচিত।

কিন্তু ব্যর্থ হ'ল আমার ব্রহ্মাস্ত্রও। কেবল যে, গঙ্গোত্রীর হাসির বর্ম্মে বাধা পেয়েই ফিরে এল তা, তা নয়, যে লক্ষ্য ভেদ করবার কথা আমার ব্রহ্মাস্ত্রের, সেই নিশানার অস্তিত্বই মোটে নেই। হেসে উত্তর দিলেন গঙ্গোত্রী, সে কর্ত্তব্যেরও ত্রুটি হয় নি, চাচা। দু'জনেই দু'জনকে মুক্তি দিয়েছি আমরা। তিনি তার পর বিয়েও করেছেন। তাই ত গোড়াতেই বললাম আপনাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বদলে যায়।

এবার খট করে কানে এসে লাগল আগে একবার-শোনা শেষের ঐ কথাটা। কিন্তু ঐটুকুতেই নিস্তার নেই। আমার চোখ ও মন দুয়েরই বিভ্রম নাকি? গঙ্গোত্রীর মুখে হাসি না চোখে জল দেখছি আমি?

কিন্তু ঠিক ঐ সময়েই তাল কেটে গেল। বাইরে থেকে আমার কানে এল জিতেনের উল্লসিত কণ্ঠস্বর : ঘরে আছেন নাকি মণিদা ? দেখুন কাকে ধরে এনেছি।

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন গঙ্গোত্রী, তার পর মিনতিভরা চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে, চাচা, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করাই ভাল। সব কথা ত বুঝতে পারেন না তিনি, শুধু দুঃখই বেড়ে যায় তাঁর।

চেনা মুখ ভদ্রলোকের। রুদ্রপ্রয়াগে যে বাঙালী যাত্রীদলকে দেখেছিলাম তাদেরই একজন। দ্বিতীয়বার তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই মনে পড়ল যে, যে মহিলার ছাতার জন্য আবদার সমর্থন করে সেদিন তাঁর একটু কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, ইনি সেই মহিলারই স্বামী। দ্বিতীয়বার তাকে আমি দেখেছিলাম কুণ্ড চটিতে।

নাম জানবার সুযোগ হ'ল এখন—হরেন্দ্রনাথ রক্ষিত।

দুঃখের কাহিনী বললেন তিনি, দল তাদের ভেঙে গিয়েছে। সেদিন রুদ্রপ্রয়াগে মনোমালিন্যের যে অদৃশ্য বীজ পড়েছিল তাদের কারও কারও মনের মাটিতে তাই থেকেই উদ্ভূত বিষবৃক্ষ। এবারও কারণ হরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী। পথশ্রম আর সহ্য করতে না পেরে একটি সম্পূর্ণ দিন এই চটিতে বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন মৃন্ময়ী, কিন্তু দলের নেতা ও অধিকাংশ সদস্য রাজী হন নি সে প্রস্তাবে। অগত্যা স্বামীর কর্তব্য পালন করেছেন হরেন্দ্রবাবু। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের খাতিরে দলকে ছেড়ে স্ত্রীর সঙ্গে গতকাল থেকে এই রামপুর চটিতেই রয়ে গিয়েছেন দুজনে।

ততক্ষণে গঙ্গোত্রীর জননীকে নিয়ে চক্রধর পাণ্ডাও ফিরে এসেছে। কাছে দাঁড়িয়ে শেষের কথাটা শুনেছিল সে। শুনে বললে, এ পথে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে, বাবুজী,এও কেদারনাথজীর এক লীলা। বাড়ী থেকে মস্ত দলবল নিয়ে বের হয়ে এলেন, কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন হয় ত মোটে দু'জন। চলতে চলতে দলের মধ্যে মন কষাকষি হয়, রাগারাগি হয়, অসুখও হয়, হয়ত দলের কোন লোকের। এই সব কারণে ভাঙতে ভাঙতে তেমন বড় দলও কখনও কখনও খুব ছোট হয়ে যায়।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে হরেন্দ্রবাবু বললেন, আমাদের বেলায় তাই ত হ'ল দেখলাম।

কিন্তু তার পরেই তিনি আবার বললেন, তবে ভালই করেছিলাম এখানে থেকে গিয়ে। আজ সকালে উঠে দেখি যে স্ত্রীর জ্বর হয়েছে, খুব বেশী অবশ্য নয়, তথাপি মনে হয় যে আমাকে দিয়ে বাবা কেদারনাথ যে আমাদের দল ভাঙলেন সে বুঝি আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

তবে মৃন্ময়ী মানতে চান না ঐ ব্যাখ্যা। তাঁর মনে কেমন যেন একটু ভয় হয়েছে তাদের চটির বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ মালিকের কথা শুনে।

হরেন্দ্রবাবুর সঙ্গেই আমি আর জিতেন দেখতে গিয়েছিলাম তাঁর স্ত্রীকে। মহা খুশী তিনি আমাদের দেখে। তীর্থভ্রমণের, বিশেষতঃ এই কেদারবদরীর হাঁটা পথে, এই আমি দেখছি একটি মস্ত লাভ। আগে যাকে কোনদিনই দেখি নি এবং হয় ত বা কয়েক ঘণ্টা পরেই যার সঙ্গে হয় ত বা জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হবে তাকেও পথে বা চটিতে মনে হয় যেন পরম আত্মীয়। একবার ছাড়াছাড়ির পর দ্বিতীয়বার দেখা হলে উভয় পক্ষেরই মনে হয় বুঝি হারানিধি ফিরে পাওয়া গিয়েছে।

আমাদের দু'জনকে দেখে তেমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন মৃন্ময়ী। খুব উৎসাহের সঙ্গে তিনি খোঁজখবর নিলেন আমাদের। কিন্তু বিদায়কালে বিষণ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুর তাঁর কাছে আমাদের যেতে দেবেন কিনা কে জানে। আমাদের চটির চৌধুরী ত বলছে যে, অনেক যাত্রীকেই তিনি পথ থেকেই ফিরিয়ে দেন।

পরে এ কথাও সমর্থন করেছিল আমাদের চক্রধর পাণ্ডা। পরিহাস নয়। বরং কথাটা উঠতেই মুখের হাসি নিভে গেল তার। যুক্তকর ললাটে ঠেকিয়ে উদ্দেশে কেদারনাথকে প্রণাম করে কেমন যেন ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে সে বললে, চৌধুরী ঠিক কথাই বলেছে, বাবুজী। সকলেই কি কেদারনাথের চরণ পর্য্যন্ত যেতে পারে! যত টাকাই কেউ খরচ করুক না কেন, মনে যদি ভক্তি না থাকে, বাবাকে দর্শন করতে এসেও পথে সংযম-নিয়ম পালন না করে তবে বাবা তেমন যাত্রীকে পথ থেকেই ফিরিয়ে দেন। নিজের চোখেই কত দেখেছি আমি—কারও হয়ত হাত-পা ভাঙে, কারও অন্য কোনও শক্ত ব্যারাম হয়, কারও হয়ত আর কিছু। এই রামপুর ত অনেক দূর; সেবার রামোয়ারা পার হয়ে যাবার পরেও এমন জ্বর হ'ল এক যাত্রীর যে ডাণ্ডিওয়ালারাই ভয় পেয়ে গৌরীকুণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাকে। সেখানেই হাসপাতালে মারা গেল সে।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকবার পর একেবারে মোক্ষম উদাহরণ দিল চক্রধর—সর্ব্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকেও দর্শন দেন নি কেদারনাথ।

পথের কথা কি বলছেন বাবুজী ? বললে চক্রধর : সেবার কেদারনাথের নাটমন্দির পর্য্যন্ত গিয়েও জয়প্রকাশজী বাবার দর্শন পেলেন না।

সে কি কথা !—বিস্মিত হয়ে বললাম আমি।

চক্রধর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, কেদারনাথজীর নাম নিয়ে মিছে কথা কি বলতে পারি বাঙালীবাবু ? একজন অছুৎ ছিল জয়প্রকাশজীর দলে। তাকে রাওলসাহেব মন্দিরে ঢুকতে দিলেন না দেখে জয়প্রকাশজী মন্দিরের দোরগোড়া থেকে ফিরে গেলেন।

ঘটনা যদি সত্য হয় তবে আচরণ জয়প্রকাশনারায়ণের মতই বটে। কিন্তু চক্রধর সে কথা মানবে কেন ? সে উপসংহারে আবার বললে, কেদারনাথজী জয়প্রকাশের উপর রুষ্ট হয়েছিলেন বলেই অমনভাবে তার বুদ্ধিনাশ করেছিলেন। সুতরাং দর্শন আর তার ভাগ্যে হ'ল না।

ক্রমশঃ

মরা বেড়াল

শ্রীউর্ম্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজবৌ সুরমার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হয়ে ওঠে না। মার অসুখ, বার বার বলেন, "সুরমা দুদিন এসে থাক্ আমার কাছে।" সুরমারও মনটা মাঝে মাঝে খারাপ লাগে—মা যতদিন আছেন তত দিনই ডাকবেন, মা না থাকলে ভাই-ভাজের সংসারে গিয়ে থাকাই ত উপদ্রব।

কিন্তু যাওয়াই সমস্যা—বিপত্নীক ভাসুর সংসারের হিসাবের খাতা ছাড়া আর কোনদিকেই তাঁর নজর নেই। মা-মরা ছেলে-মেয়ে দুটিকে সুরমাই মানুষ করেছে। মেয়ে থাকে শ্বশুর বাড়ী, তার বাড়ী তত্ত্ব-তালাস সবই সুরমার দায়। নিজেরও তিনটি ছেলে-মেয়ে, তাদের স্কুল—ভাসুরপোর কলেজ—কর্ত্তা ত তাঁর কোর্ট আর মক্কেল নিয়েই মেতে আছেন। ছোট দেওর থাকে বিদেশে কাজেই সব ঝক্কি সুরমারই মাথায়। বাপের বাড়ী যাওয়া আর তার হয় না। পূজার সময়—বাড়ীতে পূজার পালা তাই মনে ভাবল পূজার পর যাবে, এমন সময় ভাসুর-ঝি এল—"কাকিমা, সীতার সেই বর্দ্ধমানের ছেলেটির সঙ্গেই অনেকটা এগিয়েছে, তারা অগ্রহায়ণের গোড়াকেই বিয়ে দিতে চায়। ছেলেকে তাদের কোম্পানী থেকে বিলেত পাঠাবে—সীতাকে নিয়েই যাবে বলেছে—তোমাদের কি মত? সকলেই এক মত যে, এমন পাত্র হাত-ছাড়া করা ঠিক নয়।' যাবার সময় বলল বেলা, "কাকীমা, তোমার কিন্তু ফুলশয্যার তত্ত্বর ভার দিলাম—তা ছাড়া মেয়ের একটা ব্লাউজ ও জামাইয়ের একটা পুলওভার বুনে দেবে—আর টেবিলক্লথ ও বালিশের ঢাকায় ফুল তোলা সে ত তুমি ছাড়া হবে না—জান ত আমাদের বাড়ীর ব্যাপার? সুরমার বাপের বাড়ী যাওয়া মুলতুবি রইল। গয়নার প্যাটার্ণ পছন্দ, অর্ডার দেওয়া—কাপড়-জামা কেনা, সবেতেই কাকীমা না করলে পছন্দ হয় না। বেলার মেয়ে কি দেওয়া যায়, কর্ত্তাকে বললে তিনি বলেন, "আমি এ সব জানি না, দাদাকে বল"। দাদা ত হিসাবের খাতা নিয়ে বসে বলেন, "এখন সব বিষয়েই খরচ কমান উচিত"। কিন্তু সুরমা ভাবে, মা-মরা মেয়েটার প্রথম কাজ—আজ তার মা নেই। বেলার সহজেই মনে হবে, মা নেই—তা-ই। অথচ দিদি থাকলে বড়ঠাকুর যাতে "না" বলতে পারতেন না সুরমার কথায় কি সে কাজ হয়? তবু সুরমা হাল ছাড়ে না, তাকেই সব করতে হবে। দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেল। ভাসুরকে বুঝিয়ে গয়না-কাপড় যা দেওয়া হ'ল তা বেশ ভালই—কিছু নিন্দার হয় নি।

বিয়ে চুকলেও তার জের মেটে না, নতুন জামাই আসবে জোড়ে—তাকে নেমন্তন্ন করা, খাওয়ান ইত্যাদি চুকলে পরে সুরমা ভাবে, এবার সামনের বড়দিনের ছুটিতে মার কাছে থাকবে। মা বলেন, "অন্তত পনের দিন থাকার ব্যবস্থা করে আসিস।"

সুরমা বলে, "পনের দিন হবে না মা, মিথ্যে বলা, সাত দিন ধরে রাখ।"

রাত্রে কর্ত্তা বলেন, "সা-ত দিন? ঝুনুর মাষ্টার কামাই হবে।"

সুরমা বলে, "তাঁকে ওখানে যেতে বললেই হবে ত?"

কর্ত্তা বলেন, "সামনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, অত বই নিয়ে যাওয়া কি সোজা?"

সুরমা বলে, "ও! তা হলে থাক্।" শুনে ঝুনুর মুখটা ভার হয়ে যায়, মোটে ত সাত দিন, কি এমন পড়ার ক্ষতি হ'ত? সেখানে মণ্টুদাও ত পরীক্ষা দেবে, এক সঙ্গে পড়তাম, গোঁজ গোঁজ করতে থাকে। সমবয়সী মামাতো ভাই-বোনের সঙ্গে কদিন থাকা হ'ল না বলে।

ঝুনু বলে, "তা হলে টুকুনও থাক নইলে আমি একা কি করে থাকব?"

সুরমা রেগে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "তাই থাক।" কোলের ছেলে খোকনকে নিয়ে সুরমা বাপের বাড়ী যাবে ঠিক হ'ল। ভাসুরকে বলতে তিনি অম্লান বদনে বলে দিলেন, "যাও।" তাতে সুরমার মনে একটু অভিমান হয়, তার কি কোনও প্রয়োজন নেই যে অত সহজে বড়ঠাকুর বলে দিলেন, "যাও।" পরে ভাবে, "যেও-না" বললে কি ভাল হ'ত—না, তাতেও অভিমান হ'ত, আশ্চর্য্য মানুষের মন, সে কি যে চায় সে নিজেই জানে না।

পুরনো ঠাকুরকে চাকরকে রেখে সব বন্দোবস্ত করে সুরমা গেল বাপের বাড়ী, সাত দিন থাকবে।

প্রথম দিন গিয়ে সারাদিন মা-বাবার সঙ্গে গল্পে বেশ কাটল, ভাজেরা তাকে খুবই যত্ন করে, বড়লোক ননদ এবং যে মোটেই এসে থাকে না তাকে ভাজেরা একটু প্রীতির চক্ষে দেখেই থাকে; কিন্তু সন্ধ্যে হতেই সুরমার মন খারাপ, টুকুন যা দুষ্ট, ওকে কি ঝুনু সামলাতে পারবে? রাত্রে যদি মার জন্যে কাঁদে।

মা বললেন, "মন খারাপ করিস নি, জামাইকে বলে ওদের দুজনকে কাল আনিয়ে নিলেই হবে।"

সুরমা বলে, "না মা, ঝুনুর আসা সম্ভব নয়, টুকুন এলে ঝুনুই বা একলা থাকে কি করে?"

পর দিন বাড়ীর চাকর নন্দ এসে বলল, "মা, বাড়ীতে সবাই ত ভালই আছেন, তবে একটা মুশকিল হয়েছেন, দাদাবাবুর পড়ার ঘরের পেছনে একটা বেড়াল মরেছে।"

সুরমা বলে জমাদারণীকে ডেকে ফেলে দিতে বল না?"

নন্দ মুখটা হাঁড়ি করে বলে, "জানেন ত সে কি আমাদের কথা শোনে? বলে, ফেলব না।" সরকারবাবুকে বলতে বললাম, তা তেঁনি গেরাহ্যিই করলেন না।"

সুরমা বলল, "দাদাবাবুকে বল, বলে দেবে।"

পর দিন নন্দ এসে জানায়, "দাদাবাবু বলল, ও সব আমি পারব না, মেজ মাকে বলগে যা।"

সুরমা ফোন করে কর্ত্তাকে বলে।

কর্ত্তা বলেন, "ওসব ঝামেলা আমি পারব না, তুমি এসে যা হয় কোরো।" —"ওমা! সে কি কথা গো? আমার যেতে এখনও পাঁচ দিন দেরি, পাঁচ দিন ধরে বাড়ীতে বেড়াল পচবে—এত লোকে তার ব্যবস্থা করবে না এমন কথা ত কখনও শুনি নি।"

কর্ত্তা বলেন, "যার যা কাজ। তোমার যদি মনে হয় অত দিন বেড়াল পচা ঠিক নয়, তুমি তাড়াতাড়ি চলে এলেই ত পার।" —"বা রে! এত দিন বাদে এলাম, সামান্য একটা বেড়ালের জন্যে তাড়াতাড়ি চলে যাব?" কর্ত্তা উত্তর দিলেন, "তা হলে পচুক।" বলে রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

সুরমার মনে স্বস্তি নেই, বাড়ীতে একটা বেড়াল পচছে, কেউ তার ব্যবস্থা করছে না? একি জ্বালা! খেয়ে সুখ নেই, গল্প করে সুখ নেই। মা বলেন, "দু'দিনের জন্যে এলি—তা শেষে কিনা একটা বেড়ালের জন্যে মনে অশান্তি পাচ্ছিস? অত ভাবিস নি, গন্ধ বেরুলেই ওরা ঠিক ব্যবস্থা করবে।"

সুরমা বলে, "তুমি ওদের জান না মা, ওদের কি নাক আছে?" ভাজেরা বলে, "ঠাকুর-জামাই ইচ্ছে করেই বেড়াল পচাচ্ছে—বুঝতে পারছ না? ওটা একটা ছুতো।"

পরদিন নন্দ এসে বলে, "কাল বেলা দিদিমণি এসেছিল, বলল, কাকীমা নেই বলে কি তোরা বাড়ীটাকে ভাগাড় করে রেখেছিস? আমি দিদিমণিকে সব বললাম—বললাম আপনি একটু বড় কর্ত্তা-বাবুকে বলুন।

দিদিমণি বললেন, ওসব আমি পারব নি। বলে চলে গেলেন।

সুরমার মা বললেন, "জমাদারণীকে চার আনা পয়সা দিলেই ফেলে দেবে" সুরমাও তা জানে। কিন্তু কোথায় যে আটকাচ্ছে তা ত মাকে বলতে পারে না। বলে, "তুই আমার নাম করে বড় কর্ত্তাবাবুকে বল।

পরদিন নন্দ এসে জানায়, "বাবু বললেন, জমাদারণী মাসে মাসে মাইনে পাচ্ছে, আবার কেন তাকে পয়সা দেওয়া হবে? জমাদারণী বলে, বেড়াল ফেলবার কি কথা ছিল আমার সঙ্গে?"

শেষে সুরমা বলে, "মা, আমি আজই যাই—কাল বাদে পরশুই ত যেতাম, শেষে ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখ করে যায় যদি ঐ পচা বেড়ালের গ্যাসে।

সন্ধ্যে সাতটার সময় ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সুরমা নেমে এল। ভাসুরকে প্রণাম করে চলে গেল ওপরে। ভাসুরের আবাহনও নেই বিসর্জ্জনও নেই। "তাড়াতাড়ি কেন এলে" তাও জিজ্ঞাসা করবেন না।

ভাসুরপো বলল, "কাকিমা, এলে বাঁচলাম। পচা বেড়ালের গন্ধে পড়ার ঘর ছেড়ে ওপরে এসে পড়ছি। বাবা কি বলেছেন জান? বলেছেন অনিলের যদি গন্ধ লাগে জানালা দুটো বন্ধ করে রাখলেই ত পারে। সব বাড়ীতে কি এত জানলা থাকে?"

সুরমা বলে, "তোমরা সবাই এক একটি কুঁড়ের বাদশা।" খুকু ও টুকুন ছুটে এল, "মা, পচা বেড়ালের কি গন্ধ তুমি একটু শুঁকে এস।" সুরমা বলে, "সেই শুঁকতেই ত এলাম।" ঘরে ঢুকতেই কর্ত্তা বললে, "আজ যে হঠাৎ চলে এলে?" সুরমা রেগে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, "আমার কর্ম্মভোগ করতে এলাম। তোমরা কি আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে? বাড়ীতে বেড়াল পচিয়ে বসে আছ।" কর্ত্তা রেগে উত্তর দেন, "আমি কি ফেলতে যাব?" "সুরমা বলে, "কোনও ব্যবস্থা তো করতে পার।"

কর্ত্তা বলেন, "দাদা বাড়ীর কর্ত্তা, তিনি থাকতে আমি কেন ব্যবস্থা করব?" সুরমা কোনও কথা বলে না, গোঁজ হয়ে থাকে।

পরদিন জমাদারণীকে ডেকে সুরমা আলমারি খুলে চার আনা পয়সা দিতে জমাদারণী একগাল হেসে বলে, "পয়সা দেবার কি দরকার আছে মা? এমনিই ফেলে দিতাম্, লেকিন্ বড্ড গন্ধ নিক্‌লেছে। তাই মুখে পান না দিলে কি এসব নোংরা কাম করা যায়?" সুরমা হেসে বলে, "সে ত নিশ্চয়ই? মুখে পান না দিয়ে ট্যাকে পয়সা দিলেও করা যায়।"

জমাদারণী কথার তাৎপর্য্য না বুঝেই বলে, "মা সব ঠিক বাত বলে।" বলে একগাল হেসে অম্লানবদনে পচা বিড়ালটাকে নিয়ে চলে যায়।
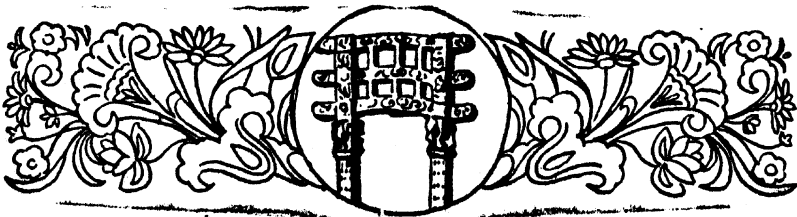
যৌথ হিন্দু পরিবার

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দীর্ঘকালের মানব সভ্যতার সমাজে অনেক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যাযাবর মানুষ, স্থায়ী কৃষক হইয়াছে, এক স্থানে ঘর বাঁধিয়াছে, সমাজ গড়িয়াছে, প্রকৃতির সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ জ্ঞান নিজের কাজে লাগাইয়াছে, শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে, প্রথমে দ্রব্য বিনিময় দ্বারা নিজের অভাব মিটাইয়াছে পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব হইয়াছে, মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই উন্নতি ও ক্রম পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই ক্রম পরিণতি ইহা খুবই সরল, সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। তবুও সমাজগঠনের কতকগুলি মৌলিক জিনিস বহুদিন পর্য্যন্ত নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া টিকিয়া ছিল। আর্য্যজাতির যৌথ পরিবার ইহাদের অন্যতম।

মনস্বী এইচ. জি. ওয়েলস তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The out line of History'' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন, "ইউরোপ ও আমেরিকায় বিরাট জনমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থালীতে দেখা যায় কিন্তু একদিন আর্য্যগণের, কেবল আর্য্য কেন, বোধ হয় সকল আদিম সমাজেই ছোট ছোট গৃহস্থালী একেবারে ছিল না—সেস্থানে ছিল বৃহৎ একটা পরিবারকে লইয়া জাতি বা ট্রাইব, আবার ক্ষুদ্র কয়েকটি জাতি লইয়া ছিল নেশন—নেশন ছিল কয়েকটি ট্রাইবের সমষ্টি এবং এক একটি গৃহস্থের পরিবার ছিল শত শত ব্যক্তি।... আজ নর বা নারী আদিমকালের মত বড় একটি পরিবার আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায় না কারণ রাষ্ট্র এবং সমাজ তাহাদের জন্য নূতন নিরাপত্তা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে এককালে যাহা পরিবারের মধ্যে থাকিলে পাওয়া সম্ভব হইত।"

অতঃপর ওয়েলস বলিতেছেন, "আজও হিন্দুদের মধ্যে পূর্ব্বকালের মত বড় বড় গৃহস্থ পরিবার দেখা যায়। মিষ্টার ভূপেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি একটি আদর্শ হিন্দু পরিবারের বর্ণনা দিয়াছেন। এই আর্য্য পরিবারটি সহস্র বৎসরের সভ্যতায় খুবই সংস্কৃতিসম্পন্ন কিন্তু ইহার সামাজিক কাঠামো আর্য্যজাতির প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণিত গৃহস্থেরই মত।"

ওয়েলস ইহার পরে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর লেখা উদ্ধৃত করিতেছেন। বসু মহাশয় বলিতেছেন, "যৌথ পরিবার প্রথা অনন্ত কাল হইতে আমাদের মধ্যে চলিতেছে—আর্য্যদের পিতৃকর্তৃত্বপূর্ণ সমাজ-প্রথা আজও ভারতে পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। যদিও এই প্রথা প্রাচীন কিন্তু আজও ইহা প্রাণবন্ত। যৌথ পরিবার একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান—এখানে স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকেরই একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। পরিবারের শীর্ষে পরিবারে এক জন জ্যেষ্ঠের স্থান, সাধারণতঃ তিনি পুরুষগণের মধ্যে [illegible] বয়োজ্যেষ্ঠ, এরূপ কেহ না থাকিলে বয়োজ্যেষ্ঠা কোন মহিলাও সে স্থানে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন।

"পরিবারের প্রত্যেক অক্ষম ব্যক্তি তাহার অর্জ্জিত অর্থ বা শ্রম —তাহা ব্যক্তিগত গুণ কিম্বা কৃষি বা বাণিজ্য সম্পর্কীয় যোগ্যতাই হোক সাধারণ তহবিলে দিতে বাধ্য; বিধবা, পিতৃমাতৃহীন এবং নিরাশ্রয়—পরিবারের যাহারা এরূপ রহিয়াছে তাহারা অবশ্য রক্ষণীয় এবং পালনীয়; ছেলে, ভাইপো, ভাই, খুড়তুত ভাই (কাজিন) ইত্যাদি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে—কারণ কোথাও পক্ষপাত হইলে পরিবার অর্থাৎ সংসার ভাঙিয়া যাইবে। আমাদের ভাষায় জ্যাঠা বা খুড়া বা মাতুলের ছেলেমেয়েকে ভাইবোন বলিয়া অভিহিত করা হয়, কাজিন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই। কোন কাজিন কত ডিগ্রী তফাৎ আমরা জানি না। মামাত পিসতুত ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা যেমন 'ভাইপো', 'ভাইঝি' নিজের সহোদর ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাও সেইরূপ ভাইপো, ভাইঝি। যত দূরেরই হউক, এই ভাইবোন সম্পর্কীত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ—যেরূপ সহোদর ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হয় না। একমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশে ইহার ব্যতিক্রম—মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করা যায়। পরিবারের ব্যক্তিগণের মধ্যে স্নেহের বন্ধন খুবই শক্ত এজন্য আপাতদৃষ্টিতে সকলের জন্য সমান জীবনধারণের মান রক্ষা করা কঠিন মনে হইলেও উহা রক্ষা করা সম্ভব। জীবনধারণের মান খুব সরল। অল্পদিন পূর্ব্বেও সাধারণ ভাবে পাদুকার ব্যবহার ছিল না—সকলে খড়ম ব্যবহার করিত। আমি জানি একটি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েক জন সহোদর এবং খুড়তুত জ্যেঠতুত ভাই সকলে মিলিয়া দুই তিন জোড়া চামড়ার জুতা কেবলমাত্র বাহিরে যাইবার সময় ব্যবহার করিত। জামা পোষাক ব্যবহারের বেলাও ঐ একই ব্যবস্থা ছিল। শালের ব্যবহার ঐরূপ হইত। দ্রব্যের যত বয়স বাড়িত ততই উহাকে সম্মানের চোখে দেখা হইত কারণ শ্রদ্ধাভাজন পূর্ব্বপুরুষেরা ঐগুলি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

"যৌথ পরিবার কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিত—যখন খুব বড় হইয়া পড়িত তখন উহা ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়িত। এজন্য দেখা যায় এক একটি গ্রাম এক এক গোষ্ঠীর লোকে পূর্ণ। আগে বলিয়াছি যে, এরূপ পরিবার একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান বা সমিতি। ইহাকে একটি ছোট রাজ্য (ষ্টেট) বলা চলে, কারণ ভক্তি এবং ভালবাসার জন্য এরূপ পরিবার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা

রক্ষা করিতে সক্ষম হইত। আপনি দেখিতে পাইবেন প্রতিদিন কনিষ্ঠেরা গুরুজনদের পদধূলি ও আশীর্বাদ লইয়া কাজে যাত্রা করিতেছে···নানা বন্ধনে পরিবারের লোকেরা পরিবারের সহিত বাঁধা—এ বন্ধন সহানুভূতির, সকলে আনন্দ ও শোকে সমান অংশীদার। কাহারও মৃত্যু হইলে সকলের অশৌচ হয়, জন্ম ও বিবাহে পরিবারের সকলের সমান আনন্দ। সকলের উপরে গৃহদেবতা—বিষ্ণুমূর্ত্তি—সংসারের বা স্থিতির রক্ষা বা স্থিতির কর্ত্তা—তাঁহার জন্ম একখানি পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে—ইহাকে বলা হয় 'ঠাকুর ঘর।' অর্থশালী পরিবারে পৃথক মন্দিরের ব্যবস্থা আছে—সেখানে পরিবারের লোকেরা প্রত্যহ পূজা করে। বিগ্রহের সহিত যেন পরিবারের প্রত্যেকের একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। এই বিগ্রহ পুরাকালে পরিবারের কোন ধার্ম্মিক পূর্ব্বপুরুষ কোন অদ্ভুত উপায়ে লাভ করিয়াছিলেন। এই গৃহদেবতার সহিত আবার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন পরিবারের পুরোহিত। হিন্দু পুরোহিত হিন্দু পরিবারেরই একজন, পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বহু পুরুষের। পুরোহিত সকল সময়ই সুশিক্ষিত ব্যক্তি হবেন এরূপ নহে—তবে তিনি ধর্ম্মের আচার-নিয়মে অভিজ্ঞ। পুরোহিতের বোঝাও বড় বোঝা নহে—তিনি কয়েক মুষ্টি চাউল, বাড়ীর গাছের কলা ও ক্ষেতের তরিতরকারী, গ্রামে প্রস্তুত নিকৃষ্ট চিনি (গুড়) এবং কখনও কখনও কয়েক পয়সা দক্ষিণা পাইয়াই খুসী।

"গৃহের ভৃত্যের কথা না বলিলে পরিবারের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। চাকরাণীকে বাংলা ভাষায় 'ঝি' অর্থাৎ 'কন্যা' বলা হয়। সে প্রকৃতই গৃহে কন্যার মত। সে কর্ত্তা ও গৃহিণীকে 'বাবা' এবং 'মা' বলিয়া সম্বোধন করে। পরিবারের পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে সে 'দাদা' 'দিদি' বা 'ভাই' এবং 'বোন' বলে। পরিবারের মধ্যে সেও যেন একজন আপনার জন। গৃহিণীর সহিত সে তীর্থ দর্শনে যায়—গৃহিণী তাহাকে ফেলিয়া কিরূপে যাইবেন? 'ঝি' যে পরিবারকে আপনার করিয়া লইয়াছে তাহাতে সে জীবন কাটাইয়া দেয়। তাহার ছেলে কোলে থাকিলে মনিব পরিবারের লোকেরাই তাহাদের দেখে শোনে। পুরুষ চাকরেরাও ঐরূপ ব্যবহার পায়। এই সকল চাকর-চাকরাণী কিঞ্চিৎ নিম্ন জাতের লোকেরাই হইয়া থাকে। কিন্তু বহু দিন পরিবারে থাকার দরুন তাহাদের সহিত ব্যক্তিগত স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়—পরিবারের ছেলেমেয়েরা 'দাদা' 'দিদি' খুড়ো' 'খুড়ি' সম্বোধন করে।

"বড় বড় পরিবারে একজন গৃহশিক্ষক থাকে—তিনি পরিবারের ছেলেমেয়েদের এবং গ্রামের বালকদের শিক্ষা দেন। স্কুলের জন্ম বড় বাড়ী তৈরি করিতে হয় না। বারান্দায় বা একখানি চালাঘরে ছেলেমেয়েদের লইয়া শিক্ষক বসেন। এখানে নিম্ন-জাতের ছেলেদেরও অবাধে পড়িতে দেওয়া হয়। অবশ্য এই সকল বিদ্যালয় (পাঠশালা) খুব উচ্চ ধরনের নহে—কিন্তু সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্ম এই প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই উপযুক্ত যাহা হয়ত পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে নাই।"

"হিন্দু জীবনে অতিথিপরায়ণতা অস্থিমজ্জাগত। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে গৃহে কোন অভুক্ত অতিথি আসিলে তাহাকে আহার করান হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহের সকলকে খাওয়াইয়া তবে গৃহিণী আহার করেন—অনেক সময় সকলের ভোজনের পরে যাহা বাকী থাকে তাহাই তাঁহার ভোজ্য। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে গৃহিণী নিজে আহার করিতে বসেন না কারণ কোন অভুক্ত অতিথি উক্ত সময়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন।"

(The Outline of History—পৃষ্ঠা ২৮২-২৮৫)

ওয়েলস বলিতেছেন, "আমরা মিঃ বসুর লেখা হইতে অনেকটা উদ্ধৃত করিলাম কারণ পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্র ও পৌরপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিস্তার এবং বৃহৎ শিল্পের প্রসারের ফলে মানুষ স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে সুযোগ পাইয়াছে যৌথ পরিবারের মধ্যে তাহা কখনও সম্ভব হয় নাই।"

স্বর্গীয় বসু মহাশয় তাঁহার বর্ণনায় যৌথ পরিবারের সকল সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। তিনি যখন ইহা লিখিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ গৃহের বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা মনে রাখিয়াছিলেন। তিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে অপর এক চিত্র দেখিতে পাইতেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে যৌথ পরিবার সম্বন্ধে নূতন এবং বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতে হইত। একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী হিসাবে তিনি যৌথ পরিবারের মামলা-মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা খুবই ছিল এবং সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিলে তাহার পুরাতন দিনের আদর্শ পরিবারের যে ত্রুটিপূর্ণ চিত্র প্রকাশ হইয়া পড়িত তাহাতে প্রাচ্যের গৌরব নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারত ও বাংলাদেশেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে হইয়াছে। এই ব্যক্তিস্বাধীনতা কেবল পুরুষের নহে নারীরও হইয়াছে। নারী স্বীয় দৈহিক অক্ষমতার দরুণ সকল বিষয়ে পুরুষের সমান স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে না কিন্তু নারী এবং পুরুষ যে সমভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি করিতে পারে এ বিষয়ে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক আদর্শ এবং রাষ্ট্রসংঘের সার্ব্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ইহার সমর্থক। পরিবারের সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে এতদিন হিন্দু আইনে যে ব্যবস্থা ছিল তাহাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুত্রকন্যাগণ পৈত্রিক সম্পত্তির সমান অধিকারী। আইন পরিবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বেও একই পিতার বিভিন্ন পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে কোনই তারতম্য ছিল না। প্রত্যেক পুত্রই তুল্য অংশের অধিকারী ছিল, এই বিষয়ে শাস্ত্রমতে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না যদিও তাঁহার উপর বিশেষভাবে কতকগুলি পারলৌকিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত ছিল। যে সমতা ও স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ আজ হিন্দু সমাজে দেখা যায় তাহা পুত্রগণের পৈত্রিক সম্পত্তিতে প্রত্যেকের তুল্য অধিকারেরই পরিণতি ইহা অনস্বীকার্য্য। পরিবারের কর্ত্তাও অন্যায়

সকল ভ্রাতাগণের মত সম্পত্তিতে সমান অধিকারী মাত্র। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া এবং পৈত্রিক, চারিত্রিক গুণে সকলকে 'একান্ন' বা 'যৌথ' রাখিবেন ইহাই ছিল স্বাভাবিক চিন্তাধারা। তৎকালিক সমাজচেতনাও ছিল ঐরূপ। বিশেষতঃ পল্লী-অঞ্চলে। স্বল্প বা অশিক্ষিত সমাজের ত কথাই নাই। পরিবারের কনিষ্ঠেরা যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে, স্ত্রীগণের পৃথক ব্যক্তিত্ব সম্ভব ইহা ছিল চিন্তার অতীত। একান্নবর্ত্তী পরিবারের স্ত্রীগণকে অনেকে দেবীর আসনে বসাইয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু যে অবাঞ্ছনীয় পারিবারিক অবস্থার মধ্যে বাংলার নারী তাহার ব্যক্তিত্ব এবং নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া জীবন কাটাইয়াছে একবার ভাবিয়া দেখেন না। আদর্শবাদের বহিরাবরণ যতই সুচিত্রিত হউক একান্নবর্ত্তী পরিবার বহুকাল ধরিয়া নানা পুরাতন সংস্কারের মত বাংলা-সমাজের বহু ক্ষতি করিয়াছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে এক পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যে ভ্রাতাগণ এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ বাস করিত এজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা অবাস্তব বলিয়া মনে হইত। চলমান সমাজেই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের কথা আসে। সমাজ তখন ছিল 'স্থির' অন্ততঃ ধরিয়া লওয়া হইত উহা 'অচল' বা 'ষ্টেটিক'। এজন্য একান্নবর্ত্তী যৌথ পরিবারের কথা জাতীয়-জীবনের পক্ষে খুবই সমীচীন বলিয়া মনে করা হইত। পরিবারের বাহিরে ছিল বৃহৎ হিন্দু সমাজের জাতিভেদের প্রাচীর। সেদিনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরস্পরকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। আজ সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এককালের আশ্রয় আমাদিগকে নিরাশ্রয় এবং অসহায় অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আশ্চর্য্য এই যে, একান্নবর্ত্তী যৌথ পরিবারের কথা কেবল ভারতে হিন্দুর বেলাই শুনা যায়, ইহা অপর কাহারও উপর অন্ততঃ আইনতঃ প্রযোজ্য নহে। ভারতীয় মুসলমান বা খ্রীষ্টান পরিবারেরা যৌথ পর্য্যায়ে পড়ে না। কেন এরূপ হইয়াছে তাহার কারণ অস্পষ্ট নহে। স্বর্গীয় ভূপেন বসু মহাশয়ের বর্ণনাটি ভাল করিয়া পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। তিনি এই প্রকার পরিবারের বহু 'বন্ধনের' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বন্ধন একমাত্র হিন্দু পরিবারেই সম্ভব। অবশ্য ইহার অনেকগুলিই আইনের বন্ধন নহে। অধিকাংশই পারমার্থিক, সামাজিক, মানবিক এবং স্নেহের বন্ধন; আর্থিক বন্ধন বা খাওয়াপরার বন্ধন যে পাই তাহা নহে। আজ বাস্তবের মুখে সকল ভাসিয়া চলিয়াছে। এক পরিবারের লোকেরা এক স্থানে বাস করে না, ছেলেমেয়েরা এক ভাবে মানুষ হয় না বা শিক্ষা পায় না। ইহারা বড় হইলেও যে এক স্থানে থাকিবে এরূপ সম্ভাবনা অল্প, জীবনধারণের জন্য নানা পেশা অবলম্বন করে। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা প্রত্যেক পরিবারকে ভাঙ্গিয়া বিভিন্নমুখী করিয়া দিতেছে—ইহা স্বাভাবিকভাবে এবং আর্থিক কারণে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় 'যৌথ পরিবার' রক্ষা করা অস্বাভাবিককে রাখিবার চেষ্টা মাত্র। যৌথ পরিবার ভাঙ্গিবার আর একটি বড় কারণ হইতেছে নারীর নারীত্ব বিকাশের পথে স্বাধীন সুযোগ। পূর্ব্বে যৌথ পরিবারে পুরুষের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি নানাভাবে সঙ্কুচিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু নারী পরিবারের হিতের জন্য আত্মবলি দিতে বাধ্য হইত। নারীর যেন নিজস্ব বলিয়া কিছুই ছিল না। নারী সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের বহু স্থানে বহু ভাল ভাল কথা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কন্যা বধূ এবং মাতা সকল সময়ই 'রক্ষণীয়া', সকল সময়ই পরের গলগ্রহ এই ধারণাটি সুস্পষ্ট। বর্ত্তমানকালে নারী আপনার আত্মাকে ফিরাইয়া পাইয়াছে। ইহা নারীর জাগরণের যুগ। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বিভাগ এই নারী-জাগরণের সুফল ভোগ করিবে।

পুরুষ ও নারীকে লইয়া পরিবার গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানে স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী প্রাপ্ত বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ ও নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যৌথ পরিবার মিটাইতে অক্ষম [illegible] যৌথ পরিবারে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সীমাবদ্ধ অথচ প্রত্যেকের উপর কর্ত্তব্যের বোঝা চাপান আছে। পূর্ব্বেকার মত স্নেহের বন্ধনের স্থানে আসিয়াছে ব্যক্তির স্বার্থ ও চিন্তা। আজ বিবাহিত পুত্রও পিতার সহিত বাস না করাই পছন্দ করে। যৌথ পরিবারের মূল ভিত্তি ব্যক্তির ত্যাগের উপর পরিবারের অপর সকলের মঙ্গল প্রতিষ্ঠার ধারণা—ধ্বসিয়া গিয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে আজ নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, এই সমাজে বিবাহিত পুরুষ-নারীর এবং তাহার পুত্র-কন্যা লইয়া এক একটা পরিবার। ইহাই আদর্শ পরিবার, ব্যক্তি-স্বার্থের সমন্বয় ইহার ভিত্তি।

যে দেশ যত অগ্রসর হইয়াছে সেখানে সেই পরিমাণে রাষ্ট্র বা পৌর-প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও ব্যক্তির শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তার ভার লইয়াছে। যৌথ পরিবার এই সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে। বাংলার মনীষীগণের দৃষ্টিও এই দিকে পূর্ব্বেই পড়িয়াছিল এবং ইহার প্রতিকারের এবং প্রতিবিধানের চেষ্টাও তাহারা করিয়াছিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গেলে বিধবাগণ আশ্রয়চ্যুত হইবেন, এজন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙ্গালী মনীষীগণ প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার পরে দেশে বহু পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আজ রাষ্ট্র নানা ভাবে ব্যক্তির সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতেছে। বালক, বৃদ্ধ, বিধবা, পুরুষ ও নারী সকলের প্রতিই রাষ্ট্র কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিতেছে। আজ যৌথ পরিবার ও বৃহৎ সমাজের কর্ত্তব্য রাষ্ট্রে বর্ত্তাইতেছে। অবশ্য রাষ্ট্রের শক্তিও আসিতেছে ব্যক্তি সক্রিয় সহযোগিতা হইতে নানা ভাবে রাষ্ট্র তাহার প্রাপ্যগণ্ডা বুঝিয়া লইতেছে নূতন নূতন কর চাপাইয়া এবং সম্ভবমত তাহাই আবার সমাজ ও ব্যক্তি স্বার্থে ব্যয়িত হইতেছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ-সমন্বয় ও মঙ্গলবিধানই বর্ত্তমানের একমাত্র প্রশ্ন ও সমস্যা, রাষ্ট্র তাহা করিতেছে।

আজ একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই। বরং প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত যাহাতে বিনা তিক্ততায় নূতন একক-পরিবারগুলি গড়িয়া উঠে। পরিবর্ত্তিত

মানসিক ও আর্থিক অবস্থায় যাহা বাঁচিবার নহে এরূপ সমাজগঠনকে আঁকড়াইয়া থাকা কোন জাতির পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অনেক সময় ব্যক্তি-স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া অক্ষমেরা যৌথ পরিবার বা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বাধ্য হইয়া থাকিতে চায়। এই উপায়ে নিজের দানের তুলনায় পাওনাটা বেশী হয়। এরূপ স্থলে পরিবারে যিনি বেশী আয় করেন তাঁহারই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কথা। পরিবারের সকলের আয় এক হাঁড়িতে রাখিবার মত মন যেখানে নাই এবং যেখানে প্রত্যেকের চেষ্টা অপর সকল অপেক্ষা বেশী লাভ হওয়া, সেখানে আর যাহাই সম্ভব হউক যৌথ পরিবার সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে ভারতের যৌথ পরিবারের ইহাই প্রকৃত রূপ। বৃহৎ পরিবারের ভিত্তি স্বার্থত্যাগ স্থানে আজ ব্যক্তি-স্বার্থ প্রবল, এ জন্যই একান্নবর্তী পরিবার আজ কলহ-বিবাদ, মামলা, মোকর্দ্দমার ক্ষেত্র। ক্ষম ও সহানুভূতিশীল ভ্রাতা ও পরিবারে অক্ষম ও দুর্ব্বল ভ্রাতার সহিত একান্নবর্তী হইতে সঙ্কোচ বোধ করে, কারণ এরূপ পরিবার-সম্পর্কীত আইনের পদ্ধতি, এরূপ ব্যক্তির স্বোপার্জ্জিত ধন রক্ষায় সহায়ক নহে। এই বিষয়ে একটি 'হিন্দু যৌথ পরিবার আইন' প্রণীত হইয়া পরিবারের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা করিলে তাহাদ্বারা প্রকৃতই হিন্দু সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং যৌথ পরিবার লোপ পাইলেও আর্থিক কারণে সমবায় পরিবার গঠিত হইতে পারে। ব্যক্তি ও বৃহৎ পরিবারের উভয়ের স্বার্থ আইন দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হইলেই,ভঙ্গুর একান্নবর্তী হিন্দু পরিবার বা তৎস্থানে সমবায় পরিবার আরও কিছুদিন হয়ত সমাজের কল্যাণের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিষয়টি ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

যৌবনজ্বালা

শ্রীসুনীল বসু

যৌবন তুমি অনেক ব্যথার মুখোমুখি আজ দাঁড়িয়ে
আগুনের দিকে দিয়েছ তোমার ভিখারী দু'হাত বাড়িয়ে।
কত কান্নার কাচমালা তুমি স্মৃতির গলায় পরালে
প্রেম ধূপগুলি ব্যথা-দেশলাই জেলে জেলে দেখি ধরালে।
কত রাত তুমি পথে পথে একা বাউলের বেশে ফিরলে
কত বাসনার অঞ্চল তুমি আশার ছুরিতে চিরলে,—
তবু যৌবন আশার আলেয়া তোমাকে করেছে অন্ধ
পাগল করেছে তোমাকে স্মৃতির প্রেম কস্তুরী গন্ধ।
বেহায়া যে তুমি পানমুখ দেখে ভুলে যায় ভীরু চিত্ত
রঙীন ঠোঁটের হাসির পালিশে মনের জ্যোছনা সিক্ত।
তোমার জন্যে কত অপবাদ কত কলংক চিহ্ন,
শত বিদ্রূপ বিদ্যুতে আজ আমার বক্ষ দীর্ণ।
যৌবন তুমি বড় অপরাধী একথা কখনো ভুলো না—
যদিও জানি হে তোমার সংগে কিছুরই নেই ত তুলনা।
বৃথা যৌবন বৃথা জানি তুমি মোমের দেহটি পুড়িয়ে
ধূলার ভস্মের মরীচিকা হয়ে নিমেষে যাও যে ফুরিয়ে।

প্রলোভন

শ্রীহরিপদ গুহ

চারপাশে মোর কত প্রলোভন হাতছানি দিয়ে ডাকে।
মাথার বিলু ঘুলিয়ে ওঠে যে—কারে ধরি, ছাড়ি কাকে।
টেবিলের 'পরে নোটের গাদা থাকে থাকে পড়ে রয়,—
দিবসের শেষে ক্যাশের খাতায় হিসাব রাখিতে হয়।
বলদের মত বয়ে মরি শুধু, এর বেশী কিছু নয়।
স্পর্শ করিতে কেঁপে ওঠে বুক, শঙ্কা ও শুধু ভয়।
তরুণী-চোখের বহ্নি-ইসারা কামনা জানায় কত।
সরমেতে চোখ বুজে আসে মোর, মুখ হয়ে যায় নত।
এর বিনিময়ে আমিও হয় ত হৃদয় জিনিতে পারি।
কিন্তু এমন বেয়াকুব আমি—অবহেলে দেই ছাড়ি।
বন্ধুরা কত অনুরোধ করে—যেতে তাহাদের সাথে,
কত আনন্দ-মেলা বসে যাবে—তাদের বাগানে রাতে।
সেই প্রলোভনও জয় করেছি যে অবহেলে, অনায়াসে।
কত প্রলোভন রয়েছে এখনো বসে আছি সেই আশে।
সাথে থেকে সদা হৃদে দিও বল, দয়াল জ্যোতির্ম্ময়,
সব প্রলোভন অনায়াসে যেন করিবারে পারি জয়।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

হঠাৎ-পাওয়া রোদে বাগানটা তখন ঝলমল করছে। কুয়াশা-গলা আকাশ ধোয়া-নীলে মুহূর্ত-আগের ঝাপ্‌সা আকাশটাকে যেন আর চেনা যাচ্ছে না। অদূরে কারুকার্য্য করা কাঠের ঢাকা মন্দিরে "এলবার্টের" মূর্ত্তির কালো পাথর আলো পেয়ে জ্বলছে।

পরিবেশটা অতীব রোমান্টিক সন্দেহ নেই, কৃষ্ণা ভাবল। কি যেন একটা নরম নরম উত্তেজনা ওকে ভিতরে ভিতরে তপ্ত করে তুলছিল। সেই মৃদু উত্তাপকে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত করে তাকিয়ে দেখল, কুমারের কপালের উপরে উলটোনো ব্রাশকরা চুলের সীমানায় সূর্য্যের সাত রং একটা সরু রেখায় চিকৃচিক্ করছে। সমস্ত মিলিয়ে উজ্জ্বল দিনটা আলস্যমন্থর হয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায়, ঝোপের ধারে ধারে পড়ে আছে। তারই মাঝখানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে বসে কুমারের সামনে স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে লজ্জা করছিল কৃষ্ণার। কিন্তু লজ্জা করছে দেখানটাই লজ্জা।

কুমার বললে,—"তোমার কাছে একটা অপরাধ অনেক দিন ধরে করে আসছি কৃষ্ণা। অনেকবারই ভেবেছি সেটা সংশোধন করা উচিত, সুযোগ মেলে নি। তা ছাড়া একটু সঙ্কোচও যে, হয় নি, তা বলতে পারি না। কিন্তু আজ চলে যাবার আগে মাপ চাওয়া উচিত—"

—"ব্যাপার কি ?"

কৃষ্ণার বিস্মিত জিজ্ঞাসার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কুমার বললে,—"ব্যাপার এমন কিছু ভয়ানক নয় অবশ্য, কিন্তু অন্যায়। আমি অন্তদের কথাবার্ত্তায়, আর প্রথম দেখায় ভ্রান্ত হয়ে তোমাকে খুব ছেলেমানুষ ভেবেছিলাম, আর তাই অসঙ্কোচে অন্যদের মতই 'তুমি' বলতে সুরু করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলাম যত ছেলেমানুষই হও না, আপনি হবার মর্য্যাদা তোমার প্রাপ্য। কিন্তু একবার বলে ফেলে আবার—"

উদ্গত হাসির উচ্ছ্বাস মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাতে চেষ্টা করল কৃষ্ণা, কিন্তু পারল না। সঙ্গে সঙ্গে কুমারও হাসল। বলল,—"হাসি নয়, সত্যি।"

—"কি সত্যি ?"

—"মানে আবার তোমাকে আপনি সুরু করা চলে কিনা ভাবছি।"

—"না, চলে না। এ ব্যাপারে, অর্থাৎ এই আপনি-তুমির চলাচলে ক্রমোন্নতি অসিদ্ধ। এক্ষেত্রে অবনতির পথটাই প্রসিদ্ধ। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামাই চল,—তুমি থেকে আপনিতে ওঠা নয়। কাজেই আপনি নির্ভয়ে 'তুমি' চালিয়ে যান। আমি জানব, আমি বড় বলে আপনি ভয় পান নি।"

—"তা হলে তুমিও ভয় করো না, 'তুমি' চালাও, না হলে সমমর্য্যাদা হবে না।"

লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণা বললে,—"কি দরকার সমমর্য্যাদার ? আপনি বয়েসে ত অন্ততঃ আমার চেয়ে অনেকটাই বড়।"

—"ঈস, আমাকে বুড়ো বানিয়ে দিলে।" কুমার হাসল। নিশ্বাস ফেলে বললে,—"আর ও তর্কে কাজই বা কি ? আর যে তোমার সঙ্গে বেশী দেখা হবে এমন ত মনে হয় না। আর বছরখানেকও আমার মেয়াদ নেই। ইতিমধ্যে রমলার সঙ্গেও যে ঘন ঘন দেখা করতে পারব তাও নয়।"

কৃষ্ণা চুপ করে রইল। কুমার যে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে যাবে, আর হয়ত ওর সঙ্গে দেখা হবারই উপলক্ষ্য ঘটবে না—এ খবরটা কৃষ্ণার মনে তেমন করে থিতিয়ে বসতে পারল না। শুধু অদ্ভুত একটা অস্ফুট সুখ, না-চেনা একটা অন্যমনস্ক ভাললাগা কুমারের সান্নিধ্যের মত কৃষ্ণাকে আচ্ছন্ন করে রইল। কুমারের মুখের দিকে চাইতে লজ্জা করল কৃষ্ণার, নির্জন দুপুরের মোহমাখা লজ্জা। তাই চোখ মেলে চারিদিকে তাকাল কৃষ্ণা।

দেখল—এধারে-ওধারে নানা দিকে নানা সাজের, নানা বয়সের জোড়ায় জোড়ায় নরনারী শুয়ে-বসে আড্ডা দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কৃষ্ণার মুখ লাল হয়ে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল, ও নিজেও যেন ঐ রকম আর একটা জোড়ার অন্তর্গত। আজন্মদক্ষিত সূক্ষ্ম একটা অপরাধবোধের সংস্কার ওকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল এ অন্যায়। এই নির্জনে কুমারের সঙ্গে পিকনিক্ করতে আসা ওর উচিত হয় নি। চারিদিকে সঘন প্রেমের প্রকাশ।

ইচ্ছে হ'ল এখুনি উঠে ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু সেটা আরও লজ্জার হবে বলে চুপ করে বসে রইল। ভাবল বলে, ঢের পিকনিক্ হয়েছে, এবারে বাড়ী চলুন। বলতে গিয়ে মুখ তুলে তাকাল কৃষ্ণা। কুমারের দিকে চেয়ে কথা আটকে গেল। এতক্ষণের জোর করে টেনে আনা হাসির রেখা মুছে গেছে ওর মুখে। সমস্ত চেহারায় সকালের দেখা সেই তীব্র বেদনার ছাপ। যেন কি একটা ভীষণ কিছু হয়ে গেছে ওর জীবনে। ও একটা ঘাসের শীষ নিয়ে দাঁতে কাটছিল, আর ওর চারিপাশ ঘিরে শীত-শেষের নতুন দিনের হাওয়া আর বৃষ্টিধোয়া নতুন আকাশের রং বৃথাই ঝরে ঝরে পড়ছিল, ওর মন ছিল কোথায়, কত দূরে কে জানে? চারিপাশের প্রেমদৃশ্য যে ওর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে এমন মনে হ'ল না, ওগুলি যেন ওর চোখেও পড়েনি। কিছুই যেন ও দেখছে না। কি একটা বোবাকষ্টে ওর সমস্ত মুখ যেন থমথম্ করছে।

অনেকক্ষণ ধরেই কৃষ্ণার ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা কাজ করছিল, ও আর থাকতে পারল না, বললে,—"আপনার কি হয়েছে আমায় বলুন।"

কুমারের প্রাণটাও হাঁফিয়ে উঠেছিল কারুর কাছে প্রাণ খুলতে না পেরে। মনের অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, অন্য কোন মনের ছোঁওয়া না পেলে বুঝি আর টেঁকে না—আজকাল এইটেই কুমারের সবচেয়ে কষ্ট। কোন বন্ধু নেই, কোন সঙ্গী নেই যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়।' যে যতই আত্মীয় হোক, সবাই যেন বাইরের লোক, বাইরের সব নিয়েই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা। অন্তরঙ্গ কেউ নেই, যার কাছে বলা যায় অন্তরের কথা। এমন অন্তরঙ্গতা একমাত্র অনাত্মীয়ের সঙ্গেই সম্ভব, যার জন্যে নেই কোন আত্মীয়তার দায়। আগে মেরীর কাছেই সব কথা বলত। আজ কতদিন হয়ে গেল, কারু সঙ্গে নিজের বিষয়ে কোন কথা বলে নি। আজ কৃষ্ণাকে নিজে থেকে এসে ওর জিনিস গোছাতে দেখে ওর মনটা তৃষিত হয়ে উঠেছিল একটু সঙ্গ পাবার জন্যে। শুধু মানুষের সঙ্গ নয়—মেয়ের সঙ্গ। প্রেমিকা নয়, যে মেয়ে করুণাময়ী, যে মেয়ে সত্যকার বান্ধবী। তাই কৃষ্ণার দরদভরা সুরে, কুমারের মনটা এক মুহূর্তে দুলে উঠল। কৃষ্ণার মুখের পরে ভাবভরা চোখ তুলে কুমার বললে,—"তুমি শুনবে কৃষ্ণা?"

চোখে চোখ তুলে তাকাতে সাধারণতঃ কেমন যেন সঙ্কোচ লাগে কৃষ্ণার। কিন্তু আজ সব সঙ্কোচ ভুলে গেল। বন্ধুত্বের আহ্বানে ওর মনের মধ্যে জেগে উঠল মেয়েমানুষের বদলে বন্ধু। পূর্ণ চোখ বিস্তৃত করে কৃষ্ণা বললে,—"বলুন, আমি শুনব।"

তখন কৃষ্ণার চোখ থেকে দৃষ্টি তুলে দিগন্তে নিক্ষেপ করে কুমার বললে,—"জান, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম।"

এ কথার পরে কুমার বেশ একটুক্ষণ চুপ করে রইল, আর সেই একটুক্ষণ অনন্তকালের মত কৃষ্ণার কানের কাছে ড্রাম পিটিয়ে বাজতে লাগল—"জান আমি একজনকে ভালবাসতাম।"

স্বপ্নগুলি সাধারণতঃ মিথ্যেই হয়, কল্পনাগুলি ব্যর্থ। মালাবদল হয়ে গেছে অনেক আগে, তবে কৃষ্ণার সঙ্গে নয়। কৃষ্ণা এসেছে অন্য নারীর ভূমিকায়। না না, কৃষ্ণা সে ভূমিকা নেবে না। সে কুমারের জীবনে দ্বিতীয় নারী হয়ে আসতে চায় না কখনোই। তার চেয়ে সে তার বন্ধু হবে—সপ্ত পদক্ষেপের দ্বারা যে বন্ধুত্ব কুমার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে।

কে বলে স্ত্রীপুরুষে শুধু প্রেম হয়—বন্ধুত্ব হয় না? এই ত এখুনি ছুটির বাঁশীতে বন্ধুত্বের সুর বাজছে। এই ত শেষ পর্যন্ত কুমারই এসে দাঁড়াল তার কাছে অঞ্জলি পেতে—ভিক্ষা চাইল বন্ধুত্ব। ভেবে দেখে, তাই ভেবে কৃষ্ণা, প্রেমের চেয়ে বন্ধুত্ব অনেক ভাল। এর মধ্যে লজ্জা নেই, ভয় নেই, ঠাট্‌-ঠমকের ভান নেই—আছে শুধু নিরাবিল প্রীতি আর সমবেদনা।—'জান, আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম'—এই একটা লাইন। হঠাৎ বেদনাকে সমবেদনায় পরিণত করল, কৃষ্ণার বুকের মধ্যে জেগে উঠল নারী—যে নারী মা, যে নারী সহধর্মিনী, সঙ্গিনী—প্রিয়া নয়। আর তারই বলে একটু আগের বিষম হৃদয়ভার কান্না হয়ে ঝরে না পড়ে, মুহূর্তে হালকা হয়ে উড়ে গেল আকাশে—হাসি হয়ে ফুটে উঠল তাম্রাভ ঠোঁটের কোণে।

কৃষ্ণা বললে,—"বাসতাম বলছেন কেন? এখন কি আর বাসেন না?"

—"কি জানি!" দূরের দিকে তেমনি করেই চেয়ে থেকে কুমার আবার বললে,—"কি জানি,—এখনও কি বাসি?"

বন্ধুত্বের দাবী স্বল্পভাষিণীকে বাগ্মী করে তুলল। কৃষ্ণা বলল,—"বর্তমান ত অতীতেরই পরিণতি। তার ধ্বংস ত নয়। আপনার ভালবাসাও নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয় নি, পরিণত হয়েছে মাত্র।"

—"হতে পারে।" তেমনি অন্যমনস্ক হয়ে বলতে গিয়ে হঠাৎ কৃষ্ণার মুখের দিকে চমকে তাকায় কুমার।

ওর দু'চোখ জলজল করছে। একি কৌতুক না করুণা!

—"কৃষ্ণা, কৃষ্ণা!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুমার,—"তুমি এত কথা জানলে কি করে? তুমি ত কাউকে ভালবাস নি?"

কুমারের প্রশ্ন থামল না, উদাস চোখে কৌতূহল ভরে বলল,—"না কি বেসেছ?"

হঠাৎ কেন কৃষ্ণা মাথা হেলাল কে জানে। মৃদুস্বরে বললে,—"বেসেছিই ত, এখনও বাসি।"

—"বাসো? বল কি কৃষ্ণা?" কুমারের বিস্ময় যেন থামতে চায় না,—"ভালবাসো? সত্যি? তা হলে বল তার নাম, আমি যেখান থেকে পারি তাকে খুঁজে এনে দেব। তোমাকে আমার ভাল লাগছে কৃষ্ণা—নিজের ছোট বোনের মত। মনে হচ্ছে তোমার জন্যে অনেক কিছু করতে পারি। বল কৃষ্ণা, কে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করব।"

—"ভালবাসা মানে বুঝি কষ্ট?" কৃষ্ণা হাসল—ঝরনার মত ভরামন খুশীর হাসি,—"আমি ত জানতাম না।"

কৃষ্ণার ঝরঝরে হাসির ছোঁওয়া কুমারকেও হাসাল, ওর উদাস অন্যমনস্কতা অনেকখানি কেটে গেল। হাসতে হাসতে বললে,—"তবে তুমি বাজে কথা বলেছ কৃষ্ণা। ভালবাসা কাকে বলে তুমি জান না, ওর ত পনর আনাই কষ্ট, মাত্র এক আনা সুখ।"

—"ওমা, তাই নাকি?" কৃষ্ণা আবার হাসল,—"তবে কেন লোকে ভালবাসা চায়?"

—"ভালবাসা পেতে অনেকেই চায়, কিন্তু ভালবাসতে বিশেষ কেউ চায় কি? একবার যে ভালবেসেছে, কবিরা বলেন, তার নাকি আর কোন আশা নেই, সে মরেছে, অর্থাৎ কষ্ট তাকে পেতেই হবে।"

কৃষ্ণা গুণ গুণ করে মৃদু সুর গলায় তুলল—

"রেখে দে, সখি রেখে দে, মিছে কথা ভালবাসা,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা।"

—"তবে দেখছ ত কবিরা কি বলেন।"

কৃষ্ণা বললে,—"কবির বাণী কবিরই থাক, আমি মানি না। যদি ভদ্রলোক বেঁচে থাকতেন ত গিয়ে সোজা তর্ক তুলতাম—আমার মনে হয় বিনা কষ্টেও ভালবাসা যায় গর্ব ভরে কৃষ্ণা বললে,—যেমন আমি বাসি।"

—"তাই নাকি?" কৌতুকে কৃষ্ণার চোখে চেয়ে কুমার বললে,—"বল না কৃষ্ণা, কে সে এমন, যাঁর প্রেমে বেদনা নেই, শুধু আনন্দ আছে?"

—"হাঃ হাঃ" কৃষ্ণা হাসল। হঠাৎ যেন ওর মনের ভার নেমে গেছে, বাঁধ ভেঙে গেছে, ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে ফুলে ফুলে হাসির বাণ ডাকছে। ও বললে,—"তোমার অল্প একটু ভুল হয়েছে কুমারদা, ঠিক ধরতে পার নি। আমার প্রেমে বিশেষ কোন মানুষের নাম নেই। এটা সাবজেকটিভ অবজেকটিভ' নয়। এখানে বিষয়ের চেয়ে বিষয়ী বড়। আমার ভালবাসা আমারই, তবু যদি তার বিষয়টা কি, এই প্রশ্ন তোল, ত বলব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"

—"অর্থাৎ?" কুমার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকাল।

—"অর্থাৎ এই পৃথিবী, এই যা কিছু সব, এই গাছপালা, ওই দাদু, তিতি, মামী। এই তুমি যে তুমি, সবাইকেই আমি ভালবাসি, তাতেই মন ভরে থাকে। আমার ভালবাসা কোন বিশেষ মানুষকে আশ্রয় করে তাকেই ঘিরে ঘিরে বদ্ধ জলাশয় রচনা করে নি। তাই সমস্তকে নিয়ে সে নিজে থেকেই পূর্ণ হয়ে আছে।"

—"ব্যাপার কি কৃষ্ণা?" বিস্ময়ে উঠে বসল কুমার,—"তুমি ত সাংঘাতিক মেয়ে! এত সব বড় বড় কথা বলতে জান। অথচ ভাব দেখাও যেন নেহাৎ—"

—"কচি খুকী?" পাদপূরণ করে কৃষ্ণা,—"ওটা মেয়েলী ন্যাকামি।"

—"খুব সম্ভব।" কুমার মৃদু হাসল,—"কিন্তু এত কথা তুমি জানলে কি করে? শুনেছি বি-এতে তোমার ফিলসফি অনার্স ছিল। তাতে কি এত শেখা যায়? তুমি ত রীতিমত দার্শনিক।"

—"কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আলোচনার কথা আজ ত ছিল না। আপনার গল্প শোনাবেন, এই রকমই ত কথা ছিল। তা শুধু একলাইন মাত্র বলেছেন। আচ্ছা তার দ্বিতীয় লাইনটা না হয় আমি বলে দিচ্ছি, আপনি বলেছেন আপনি একটি মেয়েকে ভালবাসেন। আমি বলছি তার নাম মেরী ডিকসন, তার পর?"

—"তার পর সেই মেয়েটি একদিন রাগ করে ভুল বুঝে আমায় ছেড়ে চলে গেল, আর তার দেখা পেলাম না। আমি শক্ত অসুখে পড়লাম। সেরে উঠে কত খোঁজ করলাম, কোথাও তার সন্ধান পেলাম না, সে কারুর কাছে কোন ঠিকানাই দিয়ে যায় নি।"

করুণ মুখে কৃষ্ণা বললে,—"তার পর?"

—"তার পর আর কি, আমার কোন সঙ্গী নেই, সাথী নেই, ভালবাসার জন নেই। সেই একটি মানুষের অভাবে, জীবনে আমার স্বাদ চলে গেছে। কোন সুখেই আর তেমন রস নেই। কৃষ্ণা, আমার প্রেম তোমার মত নির্বিশেষ নয়, সে একটি মানুষকেই ঘিরে ঘিরে লতার মত বেড়ে উঠতে চায়।"

ঈর্ষার কাঁটাগুলি মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে সুরু করলেও তাদের আমল দিল না কৃষ্ণা। তেমনি কৌতুক-জলা চোখ কুমারের চোখে এই প্রথম অসঙ্কোচে তুলে ধরে বললে, "আবার সেই আপনারই প্রশ্ন আসছে কিন্তু কুমারদা —আপনি ভালবাসতে চান,—না, ভালবাসা পেতে ? আমার মনে হয়, আপনি প্রেমে পাগল নন, প্রেমের কাঙাল। কিন্তু সেই মেয়েটি হয়ত আপনাকে পাগল হয়েই ভালবেসেছিল। তা না হলে নিজেকে এমন করে আপনার চোখের সামনে থেকে মুছে ফেলতে পারত না। এই ধরনের গল্প যত পড়েছি, তাতে মনে হয় আপনি হয়ত খুব শীগগিরই অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে যাবেন। কিন্তু সেই মেয়েটির জীবন হয়ত একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে।"

—"হাঃ হাঃ" কুমার হেসে উঠল।—"এতক্ষণে বাঁচালে কৃষ্ণা, বোঝা গেল তোমার দার্শনিক কথাবার্তাগুলি শুধু রঙীন কাঁচের মায়া। ওদের মধ্যে কোন সত্যদর্শন নেই।"

—"অর্থাৎ ?" এবারে অবাক হবার পালা কৃষ্ণার।

—"অর্থাৎ, মেরী বিয়ে করেছে। কাল খবর পেলাম।"

—"ভুল খবরও হতে পারে," কৃষ্ণা বাধা দিল,—"কে বললে আপনাকে ?"

"খবরটা মোটেই ভুল নয় কৃষ্ণা দেবী, সেই কথাই বলার জন্যে এতক্ষণ আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল, কিন্তু সকাল থেকে ঠিক বলার লোক অথবা ঠিক বলার 'মুড' কিছুই পাচ্ছিলাম না। তাই তোমাকে ধরে নিয়ে এসেছি, ভুল করেছি কি ?"

—"মোটেই না",—ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে আস্তে আস্তে বললে কৃষ্ণা। ওর বাচালতার বেগ যেমন এসেছিল, তেমনি হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

কুমার বললে,—"তুমি অলৌকিক অর্থাৎ super natural-এ বিশ্বাস কর ?"

তেমনি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লে কৃষ্ণা—"না।"

—"না ? তুমি কি বিশ্বাস কর যা চোখে দেখা যায় শুধু তাই সত্যি ?"

—"তা কেন, যা কানে শোনা যায়, হাতে ছোঁয়া যায়, তাও, যা মনে ভাবা যায়, বুদ্ধিতে ধরা যায় তাও।"

—"আর যা শুধু অনুভবে জানা যায় ?"

—"তাও, কিন্তু"—ফিস্‌ফিসে গলায় কৃষ্ণা একটু দ্বিধা করল, একটু কথার জন্যে হাতড়ালো, "কিন্তু সব অনুভবেরই একটা বিষয় আছে।"

—"সেই কথাই বলছি। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এমন অনুভব আছে, চোখের দেখায়, কানের শোনায় অথবা হাতের ছোঁয়ায় যার কোন প্রত্যক্ষ বিষয় অথবা কারণ নেই ?"

স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় কৃষ্ণা বলল,—"না।"

"না ?" কুমার অবাক হয়ে বললে,—"ধর, কখনো কি তোমার অকারণ মন খারাপ হয় না ?"

—"হয় বৈ কি, কিন্তু তার সবটাই হয়ত অকারণ নয়, হয়ত তারও কোন অজানা কারণ থাকে,—শারীরিক অথবা মানসিক। হয়ত ভিতরে ভিতরে কারও জন্যে অথবা কিছুর জন্যে মন কেমন করতে থাকে, কিংবা হয়ত এমনি কোন রকম শরীর খারাপ হয়ে থাকে, মনে তার ছায়া পড়ে।"

—"এমন কখনো হয়েছে কি—সারাদিন বেশ হাসিখুশী হৈ হৈ করে কাটালে, হঠাৎ সন্ধ্যার ছায়া যেই নামল, অমনি মনটা বিষণ্ণ উদাস হয়ে উঠল ? সে কেন হয় ?"

—"বোধহয় হঠাৎ আলো মিলিয়ে আঁধার হয়ে আসে বলে। দিন-রাত, আলো-অন্ধকার এবং বিভিন্ন ঋতুগুলির যে বিভিন্ন প্রভাব আছে মানুষের দেহে এবং মনে—একথা ত আজকের দিনে সবাই বলে থাকেন। কিন্তু আপনি বলুন আপনার গল্প, আমি বিশ্বাস করব !"

—"না থাক, তুমি হয়ত হাসবে।"

—"না আপনি বলুন।"

—"আমার এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, তার নাম তপন মজুমদার। তার বান্ধবীর নাম ডোরা লিটলস্। এইখানে শতকরা কতজনের ভাগ্যে যে বান্ধবী জোটে তার ঠিক নেই। এই নিয়ে আমরা আগে অনেক হেসেছি। সেই আমারও যে বান্ধবী জুটবে কে জানত। কিন্তু যখন জুটল, মনে হ'ল এইটেই স্বাভাবিক। থাক সে কথা।"

"ডোরা লিটলস্ ভারী মিষ্টি, ছোটখাটো সুন্দর মেয়ে। দু'জনে জোর ভাব চলল বছরখানেক ধরে। তার পরে একদিন তপন মজুমদার ভারতের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে একটা চাকরি বাগিয়ে ফিরে গেল দেশে। বলে গেল, ওখানে সব ব্যবস্থা করে খবর দেবে। আর খবর দিল না। অন্য মেয়ে হলে তপন এমন পার পেত না, ভারতবর্ষ পর্যন্ত ধাওয়া করে ওকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত। কিন্তু ডোরা সেসব কিছু করল না। এইখানেই একটা সাধারণ চাকরি করতে লাগল, আর দিন দিন রোগা ম্লান হয়ে যেতে লাগল। ওকে নিয়ে মেরী আমাকে অনেক কথা শুনিয়েছে।"

—"যথা ?"

"যথা", কৃষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে হেসে উঠল কুমার।

—যথা, "তোমরা ভারতীয়েরা এমনি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাস-ঘাতক। আজ মনে মনে তাকে সামনে রেখে অনেক গালাগালি করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যদি সামনে

এসে দাঁড়ায়, তবে বোধহয় কোন কথাই বলতে পারব না।"

—শুনে আবার এক মুহূর্তের জন্যে বিপুল হৃদয়াবেগ কৃষ্ণার বুকের মধ্যে যন্ত্রণার মত ঠেলে উঠে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। লজ্জা লজ্জা, এত ছোট কেন কৃষ্ণার মন, এত ঈর্ষা কেন? নিজের দীনতায় নিজেই অবাক হয়ে গেল কৃষ্ণা। আস্তে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলতে গেল জল, ধরা পড়ে গেল কুমারের চোখে।

—"এ কি কৃষ্ণা, চোখে জল? এত কোমল তোমার মন? একটু দুঃখের কথা শুনেই কেঁদে ফেল?"

ছি ছি, কি লজ্জা, শুধু ভুল নয়, মিথ্যে। কুমার ভেবেছে, ও বুঝি তার দুঃখে-করুণায় গলে গিয়ে কাঁদছে। জানে না একেবারে উল্টো ব্যাপার। করুণা নয় ঈর্ষা, সমবেদনা নয় অভিমান আর অহঙ্কার। চোখ মুছে মুখ তুলল কৃষ্ণা, যা ইচ্ছে ভাবুক কুমার, ও তার ভুল ভাঙাতে যাবে না। বললে,—"যেতে দিন কান্নাকাটি, তার পর?"

—"তার পর ডোরা একদিন হারিয়ে গেল, অর্থাৎ পুরনো বাসা বদলে যেখানে গেল তার ঠিকানা দিল না কাউকে। অনেকদিন পরে এই সেদিন পোষ্টঅফিসে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তার চেহারা বদলে গেছে। স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্য্যে সে আগের মতই ফুল্ল হয়ে উঠেছে। সে আমাকে ধরে নিয়ে গেল এক রেস্তোঁরায়। চা খাওয়াল আর তার গল্প বলল। সে নাকি যোগসাধনা করছে কি এক ভারতীয় পদ্ধতিতে। তাদের নাকি একটা ছোট প্রতিষ্ঠান আছে। একটি হাঙ্গেরীয়ান মেয়ে ও ভারতীয় ছেলে এর প্রতিষ্ঠাতা। তাদের ধর্ম কি কেউ জানে না। অনেকে বলে ওরা সুফী মুসলমান। কেউ বলে বাঙালী—বৈষ্ণব অথবা তান্ত্রিক, অথবা সহজিয়া সাধক। অর্থাৎ—" কুমার হেসে উঠল।—ঐ নামগুলির প্রত্যেকটাই এত দুর্বোধ্য যে, যে কোন একটাই অন্য যে কোনটার সমান। তা যাই হোক, তাকে জিজ্ঞেস করলে, সে নাকি বলে, মানুষের ধর্মই তার ধর্ম। অন্ততঃ ডোরা সেই কথাই আমাকে বললে। আরও বললে, বছরখানেক আগে সে নাকি মেরীকে কয়েকবার তাদের যৌগিক স্কুলে আসতে দেখেছে। কিন্তু মেরীকে কে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। সে সব খবর ডোরা জানে না। মেরীর সঙ্গে তার তখন কথাবার্তাও হয় নি। কারণ সে তখন কিছুদিন নাকি মৌন থেকে কি একটা সাধনা করছিল, তাই ওর দিকে মন দিতে পারে নি। কিন্তু, ডোরা বললে, আমি যদি চাই সে মেরীর সন্ধান এনে দিতে পারবে কিংবা আমি নিজেই নাকি তার খোঁজ নিতে পারি, একটু চেষ্টা করলেই। আর সেটাই নাকি বেশী সোজা। আমি অবাক হয়ে বললাম,—কি করে করব? যোগ করে নাকি?" "হাঁ নিশ্চয়", ডোরা দৃঢ়বিশ্বাসের সুরে বললে,—"যোগ করেই ত।"

—"আমাকে পর পর দুদিন তাদের প্রতিষ্ঠানে ধরে নিয়ে গেল ডোরা। প্রতি শনিবার, সান্ধ্য আমোদের বদলে ওখানে হয় বক্তৃতা আর demonstrations. আধাবয়সী বেশ কয়েকজন মেয়েপুরুষ যে যার নিজের আসন পেতে কার্পেটের উপরে বসে আছে—রীতিমতো ধ্যানমগ্ন ভাব। প্রথম দিন আমার ভারী হাসি পাচ্ছিল। সত্যি! এমন মজার ব্যাপার, ক্লাস করে যোগ শেখানো, তাও আবার সব সায়েব যোগী। কিন্তু শুনে অবাক হবে। কাল আমি নিজেই সেখানে গিয়েছিলাম। কেন জানি না, কাল সারাদিন মেরীর জন্যে মন-কেমন করেছে। তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যেতে যেতে কেবল মেরীকে মনে পড়ছিল, অথচ তোমাদের দু'জনের কোন মিল নেই। না মনে, না বাইরে।"

মনে মনে চমকে উঠে কৃষ্ণা অস্ফুটে প্রশ্ন করল,—"কেন?"

সে প্রশ্ন শুনতে পেল না কুমার, নিজের ঘোরেই বলে চলল,—"হঠাৎ বিকেল বেলা, কাজ থেকে ফেরার পথে, ওই চত্বরের কাছে নিজেকে আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম ভালই হয়েছে, হয়ত এখানে আজ তার কোন খোঁজ পাওয়া যাবে। হয়ত আমার এই আসার ভিতরে অন্য কারও বাসনার টান আছে। হয়ত কোন অদৃষ্ট ভবিষ্যতের নতুন খেলা সুরু হবে আজকে আমায় নিয়ে, নইলে নিজের অজ্ঞাতে কার ইচ্ছার নির্দেশে এখানে পৌঁছালাম?"

—"ডোরা আমাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেল, তিনতলার উপরে 'এটিকে'র মত ছোট একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আসন পেতে বসিয়ে দিল। ঘরে আলো নেই, শুধু এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছে আর ধূপ। সেইখানে আসন করে বসে, ডোরার কথামত মেরীর কথা ভাবতে সুরু করে দিলাম। সে এক বিষম সমস্যা। কি ভাবব, মেরীর কোন কথা? সমস্যার সঙ্গেই এল বিদ্রোহ—কেন ভাবব? মেরী এমন কি, আর এমন কে, আমার জীবনেই বা কি এমন তার অধিকার যে, এই নির্জন অন্ধকারে বসে ঈশ্বরের ধ্যানের মত তার ধ্যান করতে হবে? ভীষণ রাগ হ'ল নিজের উপরে, এ কি কাণ্ড করতে যাচ্ছি। একবার মনে হ'ল চলে যাই এখনি, আবার শেষকালে লোভী কৌতূহল হল জয়ী, শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে সত্যি এর মধ্যে কোন ব্যাপার আছে কিনা, নাকি সবই নেহাৎ ফাঁকি। আমি আসন ছাড়লাম না। তখন কতশত বিভিন্ন ভাবনা, বিচিত্র কথা, নানাদিক থেকে একেবারে হুড়মুড়িয়ে এসে মনের বন্ধ দরজার উপরে পড়তে লাগল। মেরীর কথা ভাবতে গিয়ে

পুষি বেড়ালটার কথা মনে পড়ে গেল, কত অজস্র কথা, অবান্তর ছবি। রেগে উঠে মনটাকে সব ভাবনা থেকে মুক্ত করতে চাইলাম। শুধু মেরীর সন্ধান পাবার বাসনাটিকে রেখে দিয়ে মন থেকে আর সব ভাবনা দূরে ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করলাম। আর কিছুই ভাবব না, কিছুই না, মনটাকে শূন্য করে ফেলব। তোমাদের দর্শনের কি সব থিয়োরী আছে না, আপ্রায়োরী, না কি যেন ? কোন দার্শনিক বলেছিলেন, বল ত যে শিশু যে মন নিয়ে জন্মায় তা হচ্ছে খালি খাতার মত। তার মধ্যে লাইনে লাইনে কাল তার নিজের আখরে কাব্যরচনা করে চলেছে।"

মন্ত্রমুগ্ধার মত শুনছিল কৃষ্ণা, বাধা পেয়ে খুশী হ'ল না, বললে,—"ঠিক মনে নেই, কাণ্ট কি হেগেল, কি ঐ রকম কেউ একজন হবেন আর কি, তার পর ?"

—"তার পর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, আমার মনটাকে জন্মমুহূর্তের সেই অলিখিত খাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।" কথা বলতে বলতে কুমারের অন্যমনস্কতা ঘুচে গিয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছিল। কাল রাতের কথা মনে করে এখন যেন ওর চোখের ভিতরে সার্চ-লাইটের মত জ্বলে উঠল। সেই তীব্র বিদ্যুতের মত চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কৃষ্ণার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে এল। দুই হাতে মুখ ঢেকে ও অস্ফুট চীৎকার করে উঠল।

—"কি হ'ল কৃষ্ণা, কি হ'ল ?" একটু ঝুঁকে ওর হাঁটুতে নাড়া দিয়ে কুমার বললে,—"হঠাৎ ভয় পেলে কেন ?"

নিজের হাঁটুতে রাখা কুমারের ডানহাতটা সবলে চেপে ধরে কৃষ্ণা বললে,—"না না, কিছুতেই না, আপনি আর কখনও এমন কাজ করতে পারবেন না, কখনও না।"

—"কেন বল ত, কি হয়েছে ?" অন্য হাত দিয়ে কৃষ্ণার সেই ধরা হাতটায় অল্প একটু আদরের চাপ দিয়ে কুমার বললে,—"এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ভাই ?"

—"না না", উত্তেজিত কৃষ্ণা বাধা মানল না।—"মেরীর জন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খোঁজ করে ফিরুন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিন নয়ত ডিটেকটিভ লাগান, যা করবেন স্বাভাবিক ভাবে করুন, natural way-তে। প্রকৃতিকে অতিক্রম করতে গেলে ফল হবে উল্টো। super natural-এর বিষম ভারে natural মানুষ গুঁড়িয়ে যায়।"

—"কেন কেন গুঁড়োবার কি লক্ষণ দেখলে ?" কৃষ্ণার আরও অনেক কাছে সরে এল কুমার, একেবারে ওর পাশে।

তাই দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে নিজের দুই উঁচু-করা হাঁটুর উপরে রেখে কৃষ্ণার তন্বীদেহ চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল, আর অনুভব করল কুমারের দেহ তার বড় কাছাকাছি। এত কাছে যে, ওর গায়ের সুরভি সাবানের মিশ্রিত গন্ধ কৃষ্ণার ইন্দ্রিয়বুদ্ধির সীমানায় এসে পৌঁছাচ্ছে, আর ওর অস্তিত্ব কৃষ্ণার সর্বাঙ্গে যেন আলিঙ্গনের মত ঘিরে রয়েছে। ছি ছি, কৃষ্ণা এমন করে নিজেকে হারাল কেন ? এখনও পারে, এখনও কৃষ্ণা ফিরে আসতে পারে। এখনও কৃষ্ণা হাসির ছটায় খর সূর্য্যের মত জ্বলে উঠতে পারে। সেই তীব্রতায় ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এই মোহের আবেশ। কিন্তু তার আগেই কুমার বাহু দিয়ে ওর পিঠ বেষ্টন করে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেমন করে লোকে ছোট একটা নরম পাখীকে আদর করে, তেমনি করে। আর কৃষ্ণার মাথার ভিতর থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত সমস্ত সত্তা সেই আদরের স্পর্শে বার বার শিউরে উঠে ভাবতে লাগল, এই সময়টুকু যেন এখনি শেষ হয়ে না যায়। এই ক্ষণকাল আরো অনেক অনেকক্ষণ ধরে বয়ে চলুক। কিছুতে যেন শেষ না হয় এর রেশ।

ওর মাথায় মৃদু নাড়া দিয়ে কুমার বললে,—"কাঁদে না, ছিঃ, লক্ষী মেয়ে, ওঠ, মুখ তোল।"

কৃষ্ণার ভয় হ'ল, এইবারে বোধহয় কুমার জোর করে ওর মুখ তুলে ধরবে, আর সেই সম্ভাবনায় শিউরে উঠল মনে মনে।—ছি ছি, অন্য মেয়ের পুরুষের স্পর্শ কেন তার এত ভাল লাগছে। না, কৃষ্ণা আর নিজেকে হারিয়ে যেতে দেবে না, লুটিয়ে ফেলবে না তার নারীত্বের গর্ব। তাই মুখ তুলল কৃষ্ণা।

কুমার একটু সরে বসে বলল,—"কি হয়েছিল বল ত কৃষ্ণারাণী ?"

তখন দুচোখভরা জল নিয়ে টেনে টেনে হাসতে লাগল কৃষ্ণা। বেশ কষ্ট করা কান্না দিয়ে বানানো হাসি। বললে, —"আমি ভয় পেয়েছিলাম হঠাৎ, আপনার চোখে যেন আলো জ্বলছিল।"

—"আলো ?" এবারে কুমারের হাসির পালা। "আলোই বটে, একেবারে যার নাম দিব্যজ্যোতি, ঠিকই দেখেছিলে, আমার মধ্যে দেবভাবটা যথেষ্ট বেশী—"

—"মোটেই না।" এবারে কৃষ্ণার ছোট্ট হাসি একটু সত্যি হ'ল,—"দেবতা-টেবতা সব বাজে।"

—"ইস্ !" কুমার আবার বাধা দিল,—"দেবতা নয় ত কি অপদেবতা এসে চোখে আলো জ্বালিয়েছিল বলতে চাও।"

—"জানি না।" এবারে গম্ভীর হ'ল কৃষ্ণা, ভারী গলায় বললে,—"আমি শুনেছি উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা না

নিয়ে এই সব করতে গিয়ে কত লোকের যে কত সর্বনাশ হয়ে গেছে তার ঠিক নেই।"

—"সর্বনাশ বলতে কি বলতে চাইছ?" কুমারের স্বর আবার আগের মত উদাস হয়ে এসেছে,—"সর্বনাশ মানে কি?"

—"কি জানি কি।" কৃষ্ণার গলা দ্বিধা করতে লাগল, —"মানে, শুনেছি, এতে নাকি লোকে পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়?"

—"হয়ত যায়, কিন্তু তোমার ভয় নেই কৃষ্ণা, আমি পাগল হব না।" কৃষ্ণার চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলল কুমার।

—"বলা যায় না।" কুমারের চোখের হাসিকে আমল না দিয়ে বিজ্ঞের মত কৃষ্ণা বলল,—"এ সব সাধনা করতে হলে দীর্ঘদিন ধরে শরীরমনকে তেমনি করে গড়তে হয়। 'সুপার ন্যাচারাল'কে আয়ত্ত করতে গেলে 'সুপারম্যান' হতে হয় সত্যি, অলৌকিককে পেতে গেলে হতে হয় অসাধারণ।" দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক দিল এতক্ষণে কৃষ্ণার চোখে। আবার তেমনি হাঁটুতে মাথা রেখে বললে, —"এবারে গল্পটা শেষ করুন।"

—"আর গল্প নয়।"

মস্ত একটা হাই হাত দিয়ে চাপা দিয়ে কুমার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ঘাসের উপরে। বিকেলের আলো ততক্ষণে ঝিরঝিরে গাছের পাতায় গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা ঢেলে কাঁপতে সুরু করেছে। কাল সারারাত ঘুম হয় নি কুমারের। আজ সারাদিন পরে ওর শরীর ক্লান্ত হয়ে এসেছে। শুয়ে শুয়েই কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে অল্প একটু হেসে বললে,—"বড় ক্লান্ত লাগছে কৃষ্ণা, একটু চুপ করে শুয়ে নিই—দু'মিনিট।"

মাথা হেলিয়ে কৃষ্ণার হ্যাঁ বলার আগেই কুমারের চোখ বুজে এল। একটা হাত চোখের উপরে তোলা, কুমারের সুগঠিত দেহ কৃষ্ণার চোখের সামনে ঘাসের উপরে বিশ্রামে মগ্ন হয়ে পড়ে রইল। অন্য হাত অলসভাবে বুকের উপর ফেলা। তাঁর শিল্পীসুলভ দীর্ঘ অনামিকায় ওর বাপের বিয়ের হীরের আংটিটা পরা। তাতে লক্ষ যোজন দূর থেকে লাল সূর্য জ্বলে জ্বলে উঠছে, আর বসন্তবাতাস ওদের দু'জনকে ঘিরে ঘিরে সুখের মত শিউরে উঠছে, ক্লান্ত পাখীরা কিচিরমিচির সুরু করেছে। যারা এসেছিল রোদমাখা দিনটাকে ভোগ করতে, ভোগশেষে উচ্ছিষ্ট দিনাবশেষটাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা ফিরে চলেছে ঘরে। এখনও যারা এখানে-ওখানে ছিটিয়ে রয়েছে তারাও যাব যাব করছে মনে মনে, সংগ্রহ করে নিচ্ছে তাদের ছড়ান জিনিসপত্র। কুমারের চুলগুলি বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওর বুকের উপরে রাখা হাতটা নিশ্বাসপতনের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে। কৃষ্ণার হাত আকুল হয়ে উঠছে ওর এলোমেলো চুলের মধ্যে ডুবে যাবার জন্যে। কিন্তু সে হাতকে মনে মনে শাসন করে কৃষ্ণা বসে রইল, ফিরিয়ে নিল তার দৃষ্টি, মেলে দিল দূর শূন্যে। কুমারের হাতের উপরে হাত রাখার অধিকার নেই কৃষ্ণার, ও অন্যের, ও অস্পৃশ্য।—কেন? তর্ক ঘনায় কৃষ্ণার মনে—ভালবাসার কি জাত আছে? সে কি ছোঁয়া যায়? কুমার আর একজনকে তার প্রেম দিয়েছে বলে কৃষ্ণা কেন তাকে ভালবাসবে না? এইটুকু কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞা করতে পারে, যে, সে কাড়াকাড়ি করবে না, কারণ কাড়াকাড়ি করে নেওয়া বড় বিশ্রী—অসুন্দর, ওতে ভালবাসা ব্যাহত হয়—প্রেমের মূল্য যায় কমে। কাড়াকাড়ি না হয় নাই করল, কিন্তু ভালবাসতে দোষ কি? মনে মনে? গোপনে? কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না, শুধু কৃষ্ণার ছোট্ট বুকের গোপন ঘরে, সে ভালবাসা প্রদীপের মত জ্বলবে। ক্রমশঃ

উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্প দেবী

অন্য দেবাহু বিদ্যয়াহন্যদাহুরবিদ্যয়া
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।

বিশ্বজনের কল্যাণকামী যত মুণি-ঋষি দল
যাঁদের জ্ঞানের প্রভা বিতরণে উজ্জ্বল ধরাতল
আঁধার সরমে দূরেতে লুকায়
সত্য প্রকাশে চিত্ত রাঙায়
তাঁহাদেরি মুখে শুনেছি জ্ঞানের পৃথক ফলের কথা
ধেয়ানের ফল করমের ফল কত সে বিভিন্নতা।

বলেছেন তাঁরা অজ্ঞ যেজন ডুবেছে বিষয় পাকে
আঁধার কারায় বন্দী হইয়া চিরদিন সেই থাকে
আবার যেজন জ্ঞান লভে শুধু
শুষ্ক হৃদয় নাই প্রেম মধু
জ্ঞান তর্কের অরণ্য মাঝে হারায় সে পথ তার
জ্ঞানে শুধু তাঁরে জানা যেতে পারে পাওয়া যে কঠিন তার।

ঈশোপনিষদ ১০ম শ্লোক।

কেনিয়া

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

অজ্ঞাত অন্ধকার আফ্রিকা বর্ত্তমান যুগে অনেকের নিকটেই অধিকতর পরিচিত। ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতে উপনীত হইয়াছিলেন। আফ্রিকার সহিত পাশ্চাত্ত্য জগতের (ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী অঞ্চল ব্যতীত) ইহাই প্রথম পরিচয়। তৎপরবর্ত্তী যুগে ডেভিড লিভিংষ্টোন ও ষ্ট্যানলীর আফ্রিকা ভ্রমণের কাহিনী (১৮৪০-৮০) বহু ইউরোপীয়ের মনে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগরিত করে। পাশ্চাত্ত্য জগত জানিতে পারে যে, সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ সাহারার ন্যায় মরুময় নহে। এই মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগ বিশাল বনানী, নদ-নদী, পর্ব্বত ও হ্রদ প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ এবং বহু প্রাকৃতিক সম্পদের আকর। ইহার পরবর্ত্তীকালে ইউরোপীয়গণ দলে দলে আফ্রিকার সমুদ্রোপকূলের স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। এক কথায় লিভিংষ্টোনের রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী ইউরোপীয়গণের চিত্তে একটি বিস্ময়কর কাল্পনিক রাজ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিপ্লব আনয়ন করে। লিভিংষ্টোনের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের ও খৃষ্টধর্ম্মের বাণী বহন ও প্রচার করা, অপর পক্ষে পরবর্ত্তী ইউরোপীয়গণের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করা নয়, স্বর্ণ ও হীরক প্রভৃতি আহরণ করিয়া বিপুল সম্পদ ও বিত্তের অধিকারী হওয়া। অনেক ক্ষেত্রে লোভ হইতেই কলহের উৎপত্তি হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য হইতে আগত বিভিন্ন দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় কলহে পরিণত হইল। এই কলহ কিছুকাল অতি গুরুতর আকার ধারণ করিল। অবশেষে প্রথম বুয়ার যুদ্ধান্তে জার্ম্মান দেশীয় বিখ্যাত কূটনৈতিক বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৮৪ সনে বার্লিনে একটি সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের "প্রভাবান্বিত এলাকায়" আফ্রিকা বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার ফলে সমগ্র আফ্রিকা বিভিন্ন রাষ্ট্রের এলাকাধীন অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। ব্রিটিশ সরকার দক্ষিণে রোডেশিয়াসহ কেপ-কলোনি, পশ্চিমে নাইজেরিয়া এবং পূর্ব্বে "পূর্ব্ব-আফ্রিকা কোম্পানীর" মাধ্যমে কেনিয়া ও উগাণ্ডার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। কেনিয়া রাজ্যের ইহাই আধুনিক ইতিহাস।

অতি প্রাচীন কালে মিশরের বাণিজ্য পোত কেনিয়া সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত টোনাইক বন্দরে (বর্ত্তমান মোম্বাসা) আসিয়া ভিড়িত। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিশরের সহিত লোহিত সাগরের পথে কেনিয়ার বাণিজ্যিক যোগ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। আরব দেশে ইসলাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে অষ্টম শতাব্দী হইতে বহু আরবীয় কেনিয়ার উত্তরাংশে বর্ত্তমান সোমালী-ল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার অধিবাসী বর্ত্তমান সোমালীগণ আরব বংশোদ্ভূত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষ অভিযানের পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ব আফ্রিকা অঞ্চল পর্ত্তুগীজগণের অধিকারে আসে। খ্রীষ্টীয় ১৬৯৮ সনে আরবগণ এই রাজ্য পুনরধিকার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল হইতে বহু ইংরেজ এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইংরেজগণের "পূর্ব্ব আফ্রিকা কোম্পানী" ক্রমশঃ এই স্থানের শাসনক্ষমতা অধিকার করে ও ১৮৮৪ সনের বার্লিন চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার এই স্থানে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে।

কেনিয়া রাজ্য মধ্য-আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রান্তে ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) ও দক্ষিণে টাঙ্গানাইকা। এই উপনিবেশ-রাজ্যটির মধ্যভাগ দিয়া বিষুবরেখা গমন করিয়াছে। বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল উত্তপ্ত, শুষ্ক, অনুর্ব্বর ও প্রায় জনশূন্য। বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ দেখা যায় ; (১) সমুদ্রোপকূলের আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চল, (২) তিন হইতে দশ সহস্র ফুট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত নাতিশীতোষ্ণ ও শীতল অঞ্চল, এবং (৩) ভিক্টোরিয়া হ্রদের নিকটবর্ত্তী গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। কেনিয়ার প্রায় সমস্ত অঞ্চলই অসমতল তরঙ্গায়িত পর্ব্বতাকীর্ণ ভূমি। সমুদ্রোপকূল হইতে ভিক্টোরিয়া হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতুলনীয়। অপর পক্ষে এই রাজ্য একটি প্রাকৃতিক পশুশালা। এই বিশাল পশুশালায় সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা, বেবুন, উটপক্ষী প্রভৃতি অগণিত পশুপক্ষী মানুষের সহিত সহ-অবস্থিতিতে অভ্যস্থ। বর্ত্তমানকালের আধুনিক প্রশস্ত পথের পার্শ্বে মোটর গাড়ী হইতে অনেক সময় সিংহ-শাবকবৃন্দকে পরম নিশ্চিন্তে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখা যায়। কেনিয়ার উচ্চ মালভূমি অঞ্চলকে "শ্বেত অঞ্চল" (আফ্রিকান ভাষায় 'কিলিনাইয়া' শ্বেত পর্ব্বত) বলা হয়। এই স্থানে কেনিয়ার উচ্চতম তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। কেনিয়ার পর্ব্বতশৃঙ্গ সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় উচ্চতম। আফ্রিকান ভাষায় 'কিলিনাইয়া' শব্দটি হইতেই বর্ত্তমান কেনিয়া নামের উৎপত্তি।

বর্ত্তমান কেনিয়ার অধিবাসীবৃন্দকে চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় ; (১) আফ্রিকান (২) আরব, (৩) ইউরোপীয় ও (৪) ভারতীয়। (১) কেনিয়া রাজ্যে আফ্রিকান অধিবাসীগণের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক, অর্থাৎ প্রায় ষাট লক্ষ। আফ্রিকানগণের মধ্যেও

বহু জাতি ও উপজাতি আছে। ইহাদের মধ্যে কিবুয়ু জাতির সংখ্যা শতকরা প্রায় কুড়ি জন। ইহারা আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের আদি অধিবাসী। ইহার পরেই ওয়ামাসাই ও ওয়াকওয়ারী; ইহারা আবিসিনীয় বংশোদ্ভূত। তৎপরে গল্লা, ইহারা সম্ভবত যাযাবর, আরব ও আফ্রিকীয় নিগ্রোর মিশ্রনে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে। ইহাদের পরেই সোমালী জাতি; সোমালীগণ সম্পূর্ণ আরব বংশোদ্ভূত, প্রাচীন কাল হইতে পূর্ব্ব-আফ্রিকার স্থায়ী অধিবাসী রূপে বসবাস করে। জন সংখ্যায় ইহাদের পরেই ওয়ানিয়ামওয়াদিগণ, ইহারা প্রধানতঃ আফ্রিকার মধ্যভাগের অধিবাসী, ও পশ্চিম-আফ্রিকার ঘানা ও নাইগেরিয়ার অধিবাসীদের অনুরূপ দেহাবয়ব। তাহাদের পরেই কাফ্রী ও হোটেনটদিগের স্থান। এই সকল জাতি ও উপজাতির প্রায় সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে। আফ্রিকা মহাদেশে ভাষা সম্পর্কে একটি সুবিধা আছে যে, ভারতের হিন্দী ভাষার ন্যায় সোয়াহিলি ভাষায় আফ্রিকার সর্ব্বস্থানে এবং বিশেষভাবে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মোটামুটি ভাবে যে কেহ মনোভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। (২) আরব বংশোদ্ভূত সোমালীগণ ব্যতীত কিছুসংখ্যক বর্ত্তমান আরব ঔপনিবেশিক আছে। দুইয়ের ভাষাও সম্পূর্ণ এক নহে। (৩) ইউরোপীয়গণের মধ্যে সংখ্যায় গরিষ্ঠ ইংরেজ ব্যতীত, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালীয়, গ্রীক, পোল, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বহু ঔপনিবেশিক অধিবাসী আছে। (৪) হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বহু ভারতীয় ঔপনিবেশিকের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের মধ্যে গুজরাটি ও পাঞ্জাবীর সংখ্যাই অধিক। কেনিয়া রাজ্যের মোট জনসংখ্যা চৌষট্টি লক্ষের কম। কেনিয়ার প্রায় সওয়া দুই লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের তুলনায় এই জনসংখ্যা অতি সামান্য। আফ্রিকীয় ষাট লক্ষ অধিবাসী ভিন্ন, মোট এসিয়াবাসী ঔপনিবেশিকের সংখ্যা দুই লক্ষ, এবং পঁয়ষট্টি হাজারের অধিক ইউরোপীয়। বিশেষ ঋতুতে সময় সময় ইউরোপীয়ানগণের সংখ্যা (আমেরিকান সহ) প্রায় দশ হইতে বিশ শতাংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

নাতিশীতোষ্ণ "শ্বেত পর্ব্বত" অঞ্চলে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে কেনিয়ার রাজধানী "নাইরোবি" অবস্থিত। এই নগরীতে বর্ত্তমানে প্রায় দুই লক্ষ বিশ হাজার নাগরিকের বাস। বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রকার আধুনিক ব্যবস্থা এই নগরীতে আছে। আধুনিক বিমান-বন্দর, সিনেমা-গৃহ, প্রাসাদোপম অট্টালিকা (দশ তলা পর্য্যন্ত), বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। যানবাহনের সংখ্যাধিক্যের জন্য যানবাহন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সমস্যাও দেখা দিয়াছে। বাসের জন্য বাটী ভাড়া পাওয়ার সমস্যা কলিকাতা নগরী হইতেও কঠিন। নবাগতের পক্ষে ব্যয়সাধ্য হোটেলে বাস ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই। নাইরোবির বাজারে প্রবেশ করিলে আফ্রিকার "পশুশালার" একটি নূতন দৃশ্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। প্রায় বিশ-বাইশ প্রকার আফ্রিকীয় ভাষার সহিত ইংরেজী, জার্ম্মান, ইটালীয়, প্রভৃতি বহুবিধ ইউরোপীয় ভাষা এবং তদুপরি হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটি, পাঞ্জাবী আরবী, প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রিত চীৎকার ও কলধ্বনিতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহার নিকট সম্ভবতঃ গভীর বনানীর শত শত পশু-পক্ষীর মিলিত হুঙ্কার ও কূজন অতি তুচ্ছ। প্রাসাদ নগরী নাইরোবির উপকণ্ঠে কদলীপত্রে আচ্ছাদিত দীনতম কুটীরের শ্রেণীও দেখা যায়।

কেনিয়া রাজ্য ব্রিটিশ উপনিবেশ দপ্তর কর্ত্তৃক নিযুক্ত গবর্ণর শাসিত। গবর্ণর ও তাঁহার সহকারী (ডেপুটি গবর্ণর) একটি মন্ত্রিমণ্ডলী ও একটি শাসন-পরিষদের সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। কেনিয়া রাজ্য আংশিক ভাবে উপনিবেশ ও আংশিক জাঞ্জিবারের সুলতানের আশ্রিত রাজ্য।

এই রাজ্যে সরকারপক্ষীয় নরমপন্থী ও বিরোধী চরমপন্থী উভয়েই সমভাবে প্রবল। সরকারপক্ষীয় বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার নেতা কিকুয়ু, ডাঃ গিকোমিও কিয়ানো এবং খ্রীষ্টীয় নেতা মাইকেল ব্লুণ্ডেল অগ্রগণ্য। চরমপন্থী "মাউ মাউ" দলের নেতা কেনিয়াট্টা বর্ত্তমানে কারাগৃহে অবরুদ্ধ আছেন। ডাঃ গিকোমিও ও শ্রীযুত ব্লুণ্ডেল একটি মীমাংসার দ্বারা স্থায়ী শান্তি আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ব্রিটিশ সরকার ক্রমশঃ ধাপে ধাপে আফ্রিকা-বাসীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। অপর একটি চরমপন্থী বিরোধী দল "কিয়ামা কিয়া মুইঙ্গী" ইউরোপীয়-গণের আতঙ্ক। ইহা একটি গুপ্ত সমিতি, ইউরোপীয় আধিপত্যের উচ্ছেদই ইহাদের উদ্দেশ্য। ভারতীয় দৃষ্টান্তে ডাঃ গিকোমিও আফ্রিকাবাসীকে অহিংস পথে চলিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। মাউ মাউ ও কিয়ামা কিয়া মুইঙ্গী দলের কার্য্যক্রমের একটি পরোক্ষ ফল। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় দেখা যায় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। সেই স্থলে ইসলাম ধর্ম্ম কিছু প্রসার লাভ করিয়াছে। কেনিয়া রাজ্যে কিছু প্রতিপত্তিশালী 'ইসমাইলী' (আগাখান সম্প্রদায়) মুসলমানের বাস আছে।

এই রাজ্যে খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত কিছু বিদ্যালয় আছে। বর্ত্তমানে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নাইরোবি ও মোম্বাসা প্রভৃতি প্রধান নগরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আফ্রিকা মহাদেশে প্রথম যুগের লিভিংষ্টোন প্রমুখের পদাঙ্ক অনুসরণকারী নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের অবদান নগণ্য নহে।

কেনিয়া রাজ্যকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা চলে। আফ্রিকানগণের চাষাবাদ ব্যবস্থা অতি অনুন্নত। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকের অনেকে আধুনিক ব্যবস্থায় চাষাবাদ করে। উৎপাদনের মধ্যে কফি, শণ জাতীয় উদ্ভিদ হইতে নির্ম্মিত দড়ি, ও স্বর্ণলতা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত কীটনাশক ঔষধ (Pyrethrum)। বর্ত্তমানে রাসায়নিক দ্রব্য, বস্ত্র, কাচ, প্লাষ্টিক প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য দুই-চারিটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উগাণ্ডা ও কেনিয়ার পশ্চিমাংশে প্রচুর

পরিমাণে কদলী উৎপন্ন হয়। কদলী হইতে আফ্রিকাবাসীর খাদ্য, পেয়, গৃহাচ্ছাদনের পত্র, বন্ধনের রজ্জু প্রভৃতি বহু দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বৈদেশিক পর্য্যটকগণের আগমনেও কেনিয়ার যথেষ্ট উপার্জ্জন হয়।

বর্ত্তমান কালে কেনিয়া হোলিউড চিত্রতারকাগণের একটি তীর্থক্ষেত্র। কেবলমাত্র আমেরিকার তীর্থযাত্রীর ভিড় বলা চলে না, বর্ত্তমানে সমগ্র ইউরোপের চিত্রতারকা ও চলচ্চিত্রাধ্যক্ষের ভিড় বৃদ্ধি পাইতেছে। ওয়াল্টডিজনীর "আফ্রিকার সিংহ", টারজন অন্যান্য বহু আফ্রিকার বনানী ও পশুপক্ষীর দৃশ্যাবলীর সহচিত্রগ্রহণের পর হইতে দলে দলে চিত্রতারকাবৃন্দ অনেক সময় কেবলমাত্র বিলাস ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও এই স্থানে আসেন। আম্বোসেলীর জাতীয় সংরক্ষিত বনের (National Reserve Forest) সন্নিকটে ওল-টুকাইতে অবস্থিত "সফরী নিবাস" (Safari Lodge) চিত্রতারকাগণের প্রধান আকর্ষণ। এই সফরী নিবাস হইতে সুদূরে অবস্থিত তুষারাবৃত কিলিমাঞ্জেরো ও তাহার সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। পর্ব্বতমালা ও বনানী পরিবেষ্টিত এই স্থানটির সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। শত শত বন্য পশুপক্ষীকে উন্মুক্তস্থানে বিচরণ করিতে প্রায়ই দেখা যায়। এই স্থান বহু চিত্রতারকার বিবাহ বন্ধন ও বিচ্ছেদের কেন্দ্রস্থল। এই বিখ্যাত সফরী নিবাস হোটেলের পরিচালকবৃন্দের বাৎসরিক আয় অনেক বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা নগণ্য নহে।

কেনিয়ার সমুদ্রোপকূলের দৃশ্যও অতি মনোরম। সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত মোম্বাসা কেনিয়ার প্রধান বন্দর। এই স্থানে বহু ভারতীয় বসবাস করে এবং তাহারাই প্রধান ব্যবসায়ী। মোম্বাসা-নাইরোবি রেলপথ নির্ম্মাণের কালে বহু ভারতীয় শ্রমিক, কেরাণী, বিবিধ কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি এদেশে আগমন করে। তাহাদের অনেকে এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। মোম্বাসায় ও নাইরোবিতে ভারতীয়গণ পরিচালিত পৃথক বিদ্যালয়, সংবাদপত্র ও ক্লাব প্রভৃতি আছে। মোম্বাসা বন্দর নগরীটি একটি প্রবাল দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং একটি সেতুর দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত। মোম্বাসা-নাইরোবি রেলপথটি বর্ত্তমানে ভিক্টোরিয়া হ্রদ পর্য্যন্ত প্রসারিত।

উত্তর-আফ্রিকার মিশর প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস ইউরোপীয় ইতিহাস অপেক্ষা বহু প্রাচীন। অবশিষ্ট আফ্রিকার অতীতের প্রাচীন ইতিহাসের কোনও সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। মিশরের সহিত কোনও কোনও স্থানের যোগাযোগ ছিল, তাহাই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে। ১৮৮৪ সনের বার্লিন চুক্তিদ্বারা আফ্রিকা বিভাগের কাল হইতে পর্ব্বত, বনানী ও পশুপক্ষীর ন্যায় মূক আফ্রিকাবাসীর মতামতের কোনও মূল্য দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানকালে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আফ্রিকাবাসীগণ তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে।

প্রকাশ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

উপরে অসীম নীল, ভেসে ভেসে যায়
লঘু, খণ্ড, শুভ্র মেঘ দূরদূরান্তরে,
কোথাও থামে না তারা মুহূর্ত্তের তরে,
কোন্ সে দিগন্তে এসে আপনা হারায়।
মনের আকাশে মোর নিরুদ্দেশে ধায়
নির্ভার ভাবনা-ভাব অবহেলা-ভরে,
ধরে না ত রূপ তারা, সে কি অনাদরে?
বেদনায় প্রাণ কাঁদে, জানে না কি চায়।

খণ্ড আর পূর্ণ মিলে হ'ল একাকার,
বৃথা দুঃখ, মিলে গেল অসীমায় সীমা।
শুভ্র আর নীলে রচে পটভূমি কার?
অনন্ত আকাশে জাগে অপূর্ব্ব মহিমা।
অব্যক্ত যা ছিল আজ নিল সে আকার,
নীলাম্বরে জেগে ওঠে দিব্য সে প্রতিমা।

চোখের দোষ

শ্রীসমর বসু

অতি পরিচিত চীৎকারটা কানে যেতেই বুঝলাম আটটা বেজেছে। ঘড়ি দেখবার দরকার হয় না। ঠিক আটটার সময় রোজই ঐ চীৎকারটা শুনতে পাই—'মাগো একমুঠো ভিক্ষে দাও মা।'

রোজই শুনি কিন্তু ছেলেদের পড়ান আর নিজের খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে কোনও দিনই উঠে দেখিনি কে আসে ভিক্ষে নিতে, কেনই বা ভিক্ষে চায়।

আজ আর অফিস যাবার তাড়া নেই, বাজারটাও সেরে রেখেছি সকালে—সুতরাং কৌতূহল নিবৃত্তির উদগ্র ইচ্ছায় তাকে ডাকলাম। দেখলাম নীরোগ, সুস্থ, সক্ষম একটি স্ত্রীলোক। বয়স হয়ত চল্লিশের কাছাকাছি। কপাল থেকে নাকের ডগা পর্য্যন্ত চন্দন কিংবা গেরি মাটির তিলক কাটা। গলায় তুলসীর মালা। পরণে সাদা থান, গায়ে লংক্লথের ব্লাউজ। ভিক্ষায় দিন যাপনের মত দৈন্যের কালিমা কোথাও নেই, চোখেমুখে শরীরে কোথাও নেই অপুষ্টির জীর্ণতা। তাই ওর জীবনধারণের অবলম্বন সম্বন্ধে একটা কুৎসিত ধারণা মনের মধ্যে দানা বাঁধতে লাগল। তার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাবার মত হাতের কাছে কিছুই খুঁজে না পেয়ে জিগ্যেস করলাম—'তুমি ভিক্ষে কর কেন? তুমি অথর্ব্ব নও, তোমার সামর্থ্য রয়েছে—ভদ্র ভাবে লোকের বাড়ী চাকরী করতে পার ত?'

'ভদ্রভাবে' কথাটায় কোনও ইঙ্গিত হয়ত প্রকাশ পেয়ে থাকবে, যার জন্যে ভিখারিণী একটু বিব্রত বোধ করল। বললে—'ভিক্ষে মানুষ সাধ করে করে না দাদাবাবু। কোথাও কিছু না জুটলেই লোকের কাছে সে হাত পাতে। এ্যাদ্দিন ত আপনার বাড়ীতে আসছি, কখনও চাল পেয়েছি, কখনও বা পয়সা, কই, কোনও দিন ত বলেন নি—ভিক্ষে আর তোমায় করতে হবে না—এখানে এসে কাজ কর?'

এমন লম্বা-চওড়া কথা বলে ভিক্ষে করাটা বোধহয় আজ-কালকার রেওয়াজ হয়েছে, তাই কোনও কিছু প্রতিবাদ না করে বললাম, 'রোজ আস বলেই ত জিগ্যেস করছি, অচেনা, অজানা হলে কি এ সব কথা বলতাম।'

আমার গলায় হয়ত অন্তরঙ্গতার সুর ছিল, যা ওকে সেই মুহূর্তে অভিভূত করে ফেলেছিল। বারান্দায় উঠে এসে সে বসল। আমার চোখের উপর চোখ রেখে কি যেন সে সন্ধান করল অনেক-ক্ষণ। ঠোঁটের কোণে একটুকরা মরা হাসি কখন সজীব হয়ে উঠল, বললে, 'সবই ভাগ্য দাদাবাবু। নইলে আমার এ পোড়া দশা হবে কেন? অদৃষ্টের দোষ নয় দাদাবাবু, চোখের দোষ। অদৃষ্টের দোষই বা নয় কেমন করে বলি, চোখের দোষ, সেটাও ত অদৃষ্টের দোষ।'

কথাগুলি ওর খুব পরিষ্কার নয়। বুঝতে চেষ্টা করেও বোঝা যায় না। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, না, সেখানে কোনও গোলমাল নেই। মনে হ'ল চোখ তার ভালই আছে। দৃষ্টিশক্তি সে হারায় নি। তা হলে? জিগ্যেস করলাম, 'চোখের দোষ কেন বলছ? তুমি কি দেখতে পাও না?'

এবার সে হেসে উঠল। হাসি যেন আর থামতে চায় না। ভিক্ষে করে যারা পেট চালায় তারা যে এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে—সে ধারণা আমার ছিল না। কুৎসিত সন্দেহটা মনের কোণে আবার উঁকি দিতেই, ধমকে উঠলাম আমি—'হাসছ কেন? যা জিগ্যেস করলাম তার উত্তর দেবে ত!'

আশ্চর্য্য! ধমক খেয়েও এতটুকু পরিবর্ত্তন হ'ল না তার। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাসি থামিয়ে বললে,'অনেক দিন পরে হাসবার সুযোগ দিয়েছেন, তাই অমন করে হেসে উঠলাম। দোষ নেবেন না, দাদাবাবু।' হঠাৎ মুখটা তার গম্ভীর হয়ে গেল। 'চোখ আমার ভালই আছে দাদাবাবু, সবই দেখতে পাই। ভাবি যদি না দেখতে পেতাম তা হলেই হয়ত ভাল হ'ত। চোখের মাথা খেয়ে যদি অন্ধ হতাম তা হলেও আমার দুঃখু ছিল না। তা হলে এমন ভাবে আমার কপালও পুড়ত না; লোকের গালাগালি খেয়ে হন্যে কুকুরের মত ছুটেও বেড়াতে হ'ত না।'

ওর কথার মাথামুণ্ডু-ছাইভস্ম কিছুই আমার বোধগম্য হ'ল না। মুখে-চোখে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বললাম, 'ছুটি নিয়ে বাড়ী আছি বলে তুমি কি ভেবেছ আমার সময়ের কোনও দাম নেই। তাড়া-তাড়ি সব কথা খুলে বলবে ত বল, নয় ত এখান থেকে কেটে পড়। আর কোনও দিন এ মুখো হয়ো না।'

ওর বেদনাক্লিষ্ট জীবনের করুণ কাহিনী শোনবার আগ্রহ আমার যতটা না ছিল ওর শোনানোর আগ্রহ ছিল তার চেয়ে ঢের বেশী। এই মারাত্মক সত্যটা আবিষ্কার করেই ঔষধ প্রয়োগ করলাম। পর মুহূর্ত্তেই তার ফল পেলাম। পা ছড়িয়ে বসে এবার সে ভাল করেই সুরু করল—

'কাজ করতাম উত্তরপাড়ায় এক বামুন বাড়ীতে। বাটনা-বাটা, জল তোলা আর রান্না করা। খাওয়া-পরা পনের টাকা মাইনে দিত ওরা। বেশ সুখেই ছিলাম ওদের বাড়ী। হঠাৎ কি যে হ'ল—এক দিন গিন্নীমা বললেন, বামুন মা ছেলেরা যখন খেতে

বসবে তুমি তখন যেন বাইরে এস না।' আমি ত বরাবরই রান্না ঘরে থাকি, ওরা যখন খাওয়া-দাওয়া করে—এমনিতেই আমি বাইরে আসার সময় পাই না। বৌয়েদের সব গুছিয়ে দিই, ওরাই যে-যার ছেলেদের পাতে দিয়ে আসে। আজ আবার নতুন করে আমার উপর এ হুকুম হ'ল কেন বুঝতে পারলাম না। কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। কিন্তু কাউকে কিছু জিগ্যেস করতেও সাহস হ'ল না। গিন্নী মা যখন বলেছেন, তখন সে কথার আর ব্যত্যয় হবে না। ক্রমে ব্যাপারটা সয়ে গেল। মনেও আর কোনও দুঃখু রইল না।

হঠাৎ একদিন ছেলেরা যখন খেতে বসেছে—কি একটা কাজের জন্তে রান্নাঘর থেকে আমি বাইরে এলাম। গিন্নীমার হুকুমের কথা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেলাম। বাইরে বেরুতেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, ও বাসুর মা, ঘরে ঢোক—ঘরে ঢোক! লজ্জায় আমার সারা শরীরটা কাঁপতে লাগল। অপমানে ভয়ে আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। ঘরে এসে দুটো হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কেউ এসে একবার জিগ্যেসও করল না—হ্যাঁ, বাসুর মা তোমার কি হয়েছে? কতক্ষণ অমন করে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে একটা গোলমাল শুনে চমক ভাঙল। মেজবাবুর বড় ছেলে ভাত খেয়ে উঠেই বমি করতে সুরু করেছে, আর সবাই এক সঙ্গে চীৎকার করে বলছে—বাসুর মা ঘর থেকে বেরিয়েছিল বলেই এমন কাণ্ড হ'ল। কথা শুনে আমি বুক চাপড়ে মরি। হা আমার পোড়াকপাল—এ কি হ'ল! আমার হাত ধরে গিন্নীমার কাছে টেনে নিয়ে গেল মেজবৌ। তেনাকে গিয়ে বললাম, ভাতে হয়ত চুল কিংবা মাছি ছিল—অসাবধানে খেয়ে ফেলেছে। তা আমার কথা শোনে কে? এমনিতে গিন্নীমা খুব ভাল মানুষ। কিন্তু রাগলে তেনার জ্ঞান থাকে না। আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে—আঁচল থেকে ঝনাৎ করে খুলে দিলেন এক থোলো চাবি। মেজ-বৌকে বললেন, ও হতভাগীর মাইনে মিটিয়ে দিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দাও। মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—যেন সব দোষই আমার। গিন্নীমা গজ গজ করে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা বলে গেলেন। কবে ও-পাড়ার চাটুজ্যে পিসীর বাড়ীতে আমি গিয়েছিলাম, ওরা তখন খেতে বসেছিল—সে খাওয়া কারুর নাকি পেটে সয় নি, সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। নাপতে-বৌয়ের ছোট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আমি যেন কবে বলেছিলাম, আহা, ছেলে যেন রাজপুত্তুর, সেই দিন থেকেই সেই ছেলের নাকি অসুখ ধরেছে আজও সারেনি। কবে আমরা গিয়েছিলাম বেলুড় মঠের মেলায়—ঠোঙাভর্ত্তি খাবারের দিকে তাকাতেই ছেলেটার হাত থেকে সমস্ত খাবার পড়ে গিয়েছিল, মেজবৌ নাকি স্বচক্ষে সে কাণ্ড দেখেছে।···এই রকম কত কথা শুনিয়ে গিন্নীমা বললেন, তোকে পই পই করে বারণ করেছিলাম যে, বাসুর মা, ঘর থেকে তুই বেরোস নি। আমার কথায় তাচ্ছিল্য, এতদূর আস্পর্দ্ধা।

মাইনে মিটিয়ে দিয়ে সেই ভরদুপুরে আমায় ঘর থেকে বার করে দিল মেজবৌ—তখনও আমার পেটে একটি দানাও পড়ে নি।

কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘোরার পর আবার কাজ জুটিয়ে নিলাম—ভদ্রকালীর দোলতলায় মিত্তিরদের বাড়ী। সেখানেও সেই এক কথা। আমার নাকি নজরে বিষ আছে।

আমি আসার কিছু দিন পরেই মিত্তির মশায়ের ছোটছেলের হ'ল টাইফয়েড—এগারো বছরের জলজ্যান্ত ছেলেটা দিন-দশেক ভুগেই মারা গেল। আমার বাসুও ঠিক ওর মতনই ছিল—ঐ পোড়া রোগে সেও মারা গেছে। নিজের ছেলের শোকটা নূতন করে গুমরে উঠল বুকের মধ্যে—চীৎকার করে আমি আছড়ে পড়লাম, কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম কখন। পাড়ার সবাই সন্দেহ করল। পরের ছেলে মরে যেতে এমন করে কাঁদতে কাউকে তারা দেখে নি। আমি নাকি ডাইনী, মায়ের চেয়ে তাই আমার বেশী দরদ।

এতক্ষণে থামল ভিখারিণী। আঁচল দিয়ে উদ্গত কান্নাকে রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। আমারও মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। ওর বাকী জীবনের ইতিহাস শোনবার মত ধৈর্য্য আর রইল না। দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীও যে এতক্ষণ ওর কথাগুলি শুনছিল তা খেয়াল করি নি। পিছন ফিরে তাকাতেই চকিতে সে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। সেখান থেকে ইসারায় আমায় ডাকল।

কাছে আসতেই দেখলাম মুখে তার গভীর আতঙ্কের ছায়া। বিবর্ণ ঠোঁট দুটোয় দুঃসহ হতাশা। কিছু জিগ্যেস করতে কেন জানি না, আমার সাহস হ'ল না।

ছোট ছেলেটাকে আমার বুকে তুলে দিয়ে একটা তামার পয়সা ওর মাথায় ছুঁইয়ে ঠাকুরের কাছে রেখে দিয়ে বললে, ডাইনীটাকে আর এখানে আসতে দিও না। এখনই তাড়িয়ে দাও।

বাহিরের বারান্দায় এসে দেখি রাস্তা দিয়ে সে ছুটে পালাচ্ছে। আমার স্ত্রীর কথাগুলি হয়ত সে শুনতে পেয়েছিল। তাই লজ্জায় চোরের মত সে ছুটে পালিয়ে গেল। ভাবলাম, পালিয়ে গিয়ে আমাকেও সে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে।

বর্ত্তমান সভ্যতা ও মহাত্মা গান্ধী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৮, ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভ্যতার সঙ্কট' নামক প্রবন্ধের একস্থানে বলেছেন—"মানবপীড়ার মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।" কথাগুলি পাঠ করে স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়—তবে কি মানবপীড়ার মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর বাসা বেঁধেছে? মজ্জার ভিতর মহামারীর প্রবেশ কি করে সম্ভব হ'ল? কোন্ সে ছিদ্রপথ, যে-পথে এত বড় শক্তিশালী সভ্যতার মর্ম্মস্থল এমনি করে বিধ্বস্ত হয়ে উঠল? বর্ত্তমান সভ্যতা জল, স্থল আকাশে আপন বিজয়-পতাকা সগৌরবে উড্ডীন করেছে। তবুও সেই অমিতপরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী সভ্যতার উপর পরাজয়ের ঘন মেঘসঞ্চারের এই আশঙ্কা কেন?

মানব-অভ্যুদয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল সুগভীর—একথা সর্ব্বজনবিদিত। সারা জীবন ধরে তিনি ত সত্যের উপলব্ধি, সুন্দরের বন্দনা-গান ও মঙ্গলের সাধন করে গেছেন। তথাপি দেহত্যাগের মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে তিনি মানবপীড়ার এই ঘোর আশঙ্কায় একান্ত পীড়িত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে য়ুরোপ মহাদেশে বর্ব্বরতার নখদন্তী বিকাশের বিভীষিকা তাঁর মানব-অভ্যুদয়ের আজন্মপোষিত বিশ্বাসকে নিদারুণ আঘাত হেনেছিল। ভগ্নহৃদয়ে কবি বলেছিলেন—"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" সভ্যতায় একি সঙ্কট দেখা দিল? রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, উড়ো-জাহাজের বিপুল বিস্ময়, সমুদ্রবক্ষে বৃহৎ অর্ণবযানের গর্ব্বদৃপ্ত নির্ভর যাত্রা, শহরের অট্টালিকা, আলোকমালা, সিনেমার স্বর্গদ্বার, বড় বড় কলকারখানায় ভূরি উৎপাদন, বিচিত্র শিল্পসম্ভারের অপরূপ সমাবেশ, আরোগ্যশালা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগারে প্রকৃতির গোপন রহস্যের নিত্য-নূতন উদ্‌ঘাটন—তথাপি রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বললেন—"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।"

কবি ইহধাম ত্যাগ করে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর কয় বৎসরের মধ্যে আণবিক বোমার আকস্মিক বিস্ফোরণে জাপানে হিরোসিমা শহরে লক্ষাধিক লোক নিমেষে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপই বটে। মানবতার এই নগ্ন নিরয়গামিতার ভয়ে, ত্রাসে, লজ্জায়, অপমানে সারা পৃথিবী জুড়ে মানবসমাজের মাথা হেঁট হয়ে গেল। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবের সঙ্গে মহতী বিনষ্টির বার্ত্তা নিয়ে আধুনিক সভ্যতা তার সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসী-মূর্ত্তি প্রকাশ করে ধরল।

এই সন্ধিক্ষণে "হরিজন" পত্রিকা পুনরুজ্জীবিত করা উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী বললেন—"পৃথিবীতে বিপর্য্যয়কারী পরিবর্ত্তন সব ঘটে গেল। আমি কি এখনও সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে আছি? আণবিক বোমা কি আমার সে বিশ্বাসের গৌরব ভেঙে দেয় নি? ভেঙে ত দেয়ই নি, তার অধিক, ঐ বোমা আমার কাছে স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সত্য ও অহিংসার যুগল-মিলনে পৃথিবীর প্রবলতম শক্তি বিধৃত হয়ে আছে, আণবিক বোমার শক্তি তার কাছে ব্যর্থ। এই দুই শক্তির একটি নৈতিক ও আত্মিক, অপরটি দৈহিক ও জড়। একটি অপরটির চেয়ে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এই আত্মিক শক্তি নারী-পুরুষ-বালক—সমভাবে সকলের অন্তর-বাসী। এই শক্তি সাদা কালো চামড়ার প্রভেদ রাখে না। অনেকের মধ্যেই এই শক্তি সুপ্ত হয়ে থাকে, অভ্যাসযোগের দ্বারা একে জাগিয়ে তোলা যায়।" মহাত্মা বার বার বলেছেন, এই সত্যকে স্বীকার এবং এর উপলব্ধির জন্য বিহিত চেষ্টা না করলে আত্মনাশ হতে মানুষের অব্যাহতি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বর্ত্তমান সভ্যতার উপকরণ বহুল আড়ম্বরের পশ্চাতে তার অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই দুর্ভেদ্য নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের উপর বিশ্বাস হারান নি। তিনি বলেছিলেন—"আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে।" মানুষের চরম আশ্বাসের কথা শোনবার জন্য কান পেতেছিলেন এই পূর্ব্ব-দিগন্তে। এই আশ্বাসের কথাই মহাত্মা গান্ধী মানুষকে শুনিয়ে গিয়েছেন। মানুষ যখন আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠেছে—

> "জানি নে পথ, নাই যে আলো
> ভিতর বাহির কালোয় কালো"

তখন সেই অন্ধকারের তীরে তীরে সর্ব্ব মানবের সঙ্গে চলতে চলতে 'ধ্রুবাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়' গান্ধীজী জ্যোতির্ময়ের স্মরণ নিয়ে বলছেন মাভৈঃ

> "তোমার চরণ শব্দ বরণ করেছি—
> আজ এই অরণ্য গভীরে।"

সত্য ও অহিংসার যুগল মিলনে পৃথিবীর প্রবলতম শক্তি বিধৃত হয়ে আছে। পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত "অনেক চিত্ত বিভ্রান্ত

মোহজাল সমাবৃতঃ" তখন সত্য ও অহিংসার দীপশিখা নিবাত-নিষ্কম্প হয়ে গান্ধীজীর সকল কর্ম্ম ও সকল মননকে সমুজ্জল করে রেখেছে এবং হিংসামত্ত দিশাহারা মানব-সমাজকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করছে।

পৃথিবীতে এত হিংসা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে কেন? কি দোষ ঘটল এই বিপুল বস্তুসমৃদ্ধ সভ্যতার? গীতা বলেছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদম্ দ্বারম্ নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

কাম, ক্রোধ ও লোভ—আত্মনাশ এবং নরকের এই ত্রিদ্বার। এই ত্রিদ্বার আজ খুলে গিয়েছে। মানুষ তাই মহাঘোরে যমদ্বারে উপনীত। মানুষের মাথার উপর আকাশপথে আজ আণবিক বোমা ঝুলছে। আণবিক বোমা ত মানুষের সৃষ্টি, মানুষেরই কীর্ত্তি। প্রবল নিষ্ঠা ও বিপুল অধ্যবসায় সহকারে মানুষ এ কি দানবের সৃষ্টি করল? এই সৃষ্টিতে শক্তি আছে, কিন্তু শান্তি কোথায়? বুদ্ধি আছে কিন্তু শুদ্ধি কোথায়, বিস্ময় আছে কিন্তু মঙ্গল কোথায়, চমক আছে, কিন্তু আলো কোথায়? হিংসার এই বিশ্বগ্রাসী মূর্ত্তির সম্মুখে গান্ধীজী সারাজীবনের একনিষ্ঠ সাধনার শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করলেন সত্য ও অহিংসার যুগলমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিই হবে মুক্তিদাত্রী।

আসুর জনের বর্ণনায় গীতা বলছেন—

"ঈহন্তে কাম ভোগার্থ মন্যায়ে নার্থ সঞ্চয়ান"

বিষয়-তৃষ্ণায় মত্ত হয়ে আসুর জন অপরিমিত বাসনার তৃপ্তির জন্য অন্যায় ও অসৎ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করে। ঐশ্বর্য্য কেন্দ্রীভূত হলে মানবসমাজে গ্লানির সৃষ্টি হয়। বহুকে রিক্ত করেই একের স্ফীত হওয়া সম্ভব। এই রিক্ততা হাহাকারের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এক দিকে অতিরিক্ততা, অপর দিকে রিক্ততা, একদিকে লোভ অপর দিকে অভাব, একদিকে দম্ভ অপর দিকে ভয়—এই বৈষম্যের মধ্যে সমাজ ও সভ্যতার স্বাভাবিক গতি ও ছন্দ ব্যাহত হয়েছে। এই নিদারুণ বৈষম্যের ছিদ্রপথেই সভ্যতার মজ্জায় মানবপীড়ার মহামারী প্রবেশ করেছে। ঐশ্বর্য্যকে সকল দিক থেকে শোষণ, আকর্ষণ ও আহরণ করে নিয়ে এসে মানুষের লোভকে দুর্দ্দান্ত করে তোলবার ইন্ধন যুগিয়েছে যন্ত্র। পুঞ্জীভূত তৃষ্ণার শান্তির জন্য চাই স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য্য। যন্ত্র হয়েছে মানুষের এই লোভের বাহন—শোষণের বেদী তার যমদ্বার। গান্ধীজী বলেছেন—এই শোষণই হ'ল হিংসার মূল। এই শোষণের সহস্র পথে নিয়ত মানবসমাজে হিংসার সঞ্চার হচ্ছে। যন্ত্রসহায়ে একের শ্রমলব্ধ ধন অপরে অপহরণ করছে—হিংসা ও অসত্য, লোভ ও অধর্ম্ম যন্ত্রকে সহায় করে নরসমাজকে উদ্বেজিত করে তুলেছে। এই শোষণই হ'ল মানবপীড়ার মহামারী। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা এই শোষণকে অচল ও বন্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে গান্ধী-পন্থা।

গান্ধীজী বলেছেন—আধুনিক সভ্যতা একটা অধর্ম্ম। এই সভ্যতার বাহন হয়ে ইংরেজ এ দেশে এসেছে। এই সভ্যতার সকল ব্যবস্থার মূলে আছে শোষণ। এই সভ্যতার রীতি হ'ল মানুষের লোভ ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে অধিকাংশকে দারিদ্র্যের পথে বসানো, তাদের কর্ম্মহীন আশাহীন অবসন্ন করে তোলা। যন্ত্রসহায়ে এই পাপাচরণ সহজ ও সর্ব্বব্যাপী হয়েছে। অপর দিকে অতিক্রান্ত ভূরি উৎপাদনে, উৎকট ভোগের পথে সভ্যতা হয়েছে বিকৃত। সত্য বিচ্যুত ও কুৎসিত। গান্ধীজী বলেন, আধুনিক সভ্যতা একটা ব্যাধিস্বরূপ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে। এই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা গঠন করাই হবে ভারতের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যসাধনে প্রথম কথা হ'ল সমাজে শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়া। মহাযন্ত্র যদি মহাশোষণের সহায়, তবে যন্ত্রকে সর্ব্বাগ্রে সংযত করা চাই। গান্ধীজী যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তিনি সর্বদাই বলেছেন, যন্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়। যন্ত্রের সৃষ্টি করে মানুষ হাত জোড় করে যন্ত্রের পূজায় লেগে যাবে—যন্ত্র এসে বসবে মানুষের ঘাড়ের উপর, আর মানুষের হাত পা হয়ে যাবে আড়ষ্ট অচল। এ দিকে শোষণের অনিবার্য্য পরিণতি হবে ধন-বৈষম্য ও শ্রেণী-সংগ্রাম—যন্ত্রের এই শোষণের মুখটা তিনি একবারে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। যন্ত্রশক্তির সহায়ে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করে ধনিকশ্রেণী শহরগুলিকে স্ফীতকায় করে তুলেছে, আর কারখানার কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম জুগিয়ে জুগিয়ে গ্রাম হয়েছে সর্ব্বস্বান্ত, অবসন্ন ও নিরন্ন। যে যন্ত্র এই শোষণের সহায়, গান্ধীজী ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিরোধী। সেখানে কোন আপোষ নেই—অহিংসার পূজারী শোষণ ও অহিংসার মূল এই মহাযন্ত্রের কোন স্তুতিই কোন দিন কানে তোলেন নি।

জনসাধারণের সুখ বিধানের জন্য গান্ধীজীও ভূরি উৎপাদন চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বহু-উৎপাদন হবে বহু-লোকের হাত দিয়ে বহু-লোকের কল্যাণের জন্যে। এই পথ সহযোগিতার, প্রতিযোগিতার নয়। তাই মহাযন্ত্রের বিলোপ ঘটাবার জন্যে তিনি চরকার প্রতিষ্ঠা করেতে সারা জীবন সাধনা করে গেছেন। চরকার গুঞ্জনে তিনি মানবসমাজের মুক্তির গীত শুনেছিলেন। চরকা তাঁর কাছে ছিল শোষণহীন অহিংস সমাজের প্রতীক। চরকার প্রতিষ্ঠাপথে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ভারতের গ্রামগুলি আপনি চোখের সামনে ভেসে উঠে। কারণ গ্রামে গাঁথা ভারতবর্ষের জনগণ গ্রামেই থাকে শতকরা ৯০ জন। এই গ্রামকে যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায় তবে শোষণের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই চরকার সঙ্গে চরকার অন্তর্নিহিত সকল কথা তিনি অনুধাবন করে দেখতে বলেছেন। চরকাকে কেন্দ্র করে গ্রামশিল্পের উদ্ধার ও গ্রামে শোষণহীন সমাজপ্রতিষ্ঠা—এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। চরকার এই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করতেই তিনি বলেছেন, নতুবা মাত্র চরকা হয়ে উঠবে নতুন একটা গোঁড়ামি।

যেমন ভগবানে মনে না রেখে জপের মালায় আবর্ত্তন নিষ্ফল, তেমনি চরকাকে স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম গঠনকার্য্যের মধ্যমান হিসাবে গ্রহণ না করলে তারও আবর্ত্তন হবে অনুরূপ নিষ্ফল। গ্রাম স্বয়ংপূর্ণ হলে শোষণ আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। শোষণ ত শুধু সবলের দ্বারা দুর্ব্বলের নয়। যন্ত্রসহায়ে এক দেশ অপর দেশকে শোষণ করতে চায়, বাধা পেলেই মারণ অস্ত্রের সৃষ্টি করে জগতে যুদ্ধের হাহাকার সৃষ্টি করে। যন্ত্রকে সংযত করতে পারলেই মানব-পীড়ায় এই মহামারী সভ্যতার মজ্জা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়ে তার রক্ষার পথ মুক্ত করে দেবে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ তাই গান্ধীপন্থার মূল কথা। এই নীতির উপরই তিনি নব্যভারত গঠনের স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। গ্রাম স্বয়ংপূর্ণ হলেই আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে—তার জন্যে চাই অপর কুটির শিল্পের উদ্ধার, বনিয়াদী শিক্ষা, গ্রাম স্বাস্থ্য, গোসেবা, মাদকবর্জ্জন, নরনারীর সমমর্য্যাদা স্থাপন প্রভৃতি আঠার দফা গঠনকর্ম্ম। গ্রামে গ্রামে বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পের উদ্যোগ জাগলে জাতি হয়ে উঠবে সবল ও আত্মনির্ভর। গান্ধীজী জানতেন গ্রামের অভ্যুত্থানই ভারতীয় জাতির অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের পথে শোষণ বন্ধ হলে শ্রেণী-সংগ্রাম মাথা তুলতে পারবে না। এই পথ অহিংসার পথ, সত্যের পথ, প্রেমের পথ। এই পথে লোভ নেই তাই হিংসা নেই। যে যন্ত্র মানুষের বেকার দশা সৃষ্টি করে না, অতি আধুনিক হলেও গান্ধীজী তার বিরোধী ছিলেন না—যন্ত্র কদাপি শোষণের সহায় না হয়, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

গঠনকর্ম্ম গান্ধীপন্থার স্থিতির দিক। গতির দিক হ'ল সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহের মূল হ'ল অহিংসা ও সত্য। হিংসার দ্বারা হিংসা বেড়েই যায়—এক মারণ অস্ত্রের স্থলে অধিকতর শক্তিশালী মারণ অস্ত্রের সৃষ্টি হয়ে ক্রমে আবির্ভাব হয় আণবিক বোমার। এই পথে হিংসার আর বিরাম নেই। তাই তিনি প্রাচীন ভারতের সেই সনাতনপন্থার পুনরাবিষ্কার ও পুনঃ প্রয়োগ করে গেছেন—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা এবং সত্যের দ্বারা অসত্যকে জয় করা। এই বিজয় অভিযানে সংঘর্ষ যখন অনিবার্য্য হয়, তখন অহিংসাকে সত্যাগ্রহের অস্ত্রে পরিণত করে তার বুদ্ধিদীপ্ত সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রয়োগ তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সার্থকভাবে করে গেছেন। হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান তিনি সম্ভব করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেথানে তাঁর অনুশাসন এই—"মরব তবু মারব না।" এই একটা মস্ত বড় কথা—একটা বাণী এটা ধর্ম্মযুদ্ধ। অধর্ম্মযুদ্ধে মরাটা মরা—ধর্ম্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। মহাত্মার সাধনায় ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যের দীক্ষা এক হয়ে গেছে। সত্য ও অহিংসার এই দীক্ষাই সভ্যতার রক্ষাকবচ হতে পারে। নান্য পন্থা।*

* কলিকাতা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

পুনরাবৃত্তি

শ্রীমায়া বসু

কেন ফিরে ডাক দাও? আজি এই শিশির সন্ধ্যায়,
অসমাপ্ত জীবনের অপ্রস্তুত সব আয়োজন,
কম্পমান নক্ষত্রেরা মর্ম্মরিছে আকাশগঙ্গায়
ভেসে আসে হিমতীক্ষ্ণ বাতাসের গভীর নিঃস্বন।

এখন আঁধার হ'ল। সূর্য্য সোনা গলে গলে শেষ,
যদি কিছু থাকে কথা, যদি কিছু থাকে বলিবার,
বাকী থাক সব আজ; রুদ্ধ উৎস খুঁজুক উদ্দেশ,
জীবন সমুদ্রে মিছে কেন আনো উত্তাল জোয়ার!

নক্ষত্র মালিকা হাতে প্রতীক্ষিছে স্তব্ধ নিশীথিনী
সূর্য্যের তপস্যা তার, মৃত্যু হতে নবজন্ম মাগি
চির বিরহের প্রান্তে জেগে রয় চির একাকিনী
ধ্যানের আসনে মগ্না, অথবা সে আকাঙ্খিত লাগি।

প্রশান্তির বন্যা নামে, নির্ব্বাক নয়নে দেখো চেয়ে
নীরন্ধ্র তমসাবৃতা সূর্য্যমুখী রাত্রি আসে ছেয়ে।

প্রকৃতির পরশ ও প্রভাব

শ্রীললিতকুমার পাকড়াশী

মনে হচ্ছে মনটি যেন কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন যে তা বলা বেশ শক্ত। যাই হউক, ক্লান্ত মনটিকে অক্লান্ত করে তুলতে হলে এমন পরিবেশের প্রয়োজন যেখানে প্রকৃতির স্নেহ-পরশের পরিমাণ পাওয়া যায় একটু বেশী রকমের। এই বস্তুটি মেলে এক পার্ব্বত্য অঞ্চলে কিংবা সমুদ্রতীরে। ঠিক করলাম, যেতে হবে সমুদ্রতীরেই; যে স্থান ঠিক করলাম সেটি নিতান্তই কাছে-পিঠে এবং অসংখ্যবার সেখানে ঘুরে এসেছি—অর্থাৎ পুরী।

পুরীর কথা মনে হলেই সকলের আগে যে আকর্ষণটি মনে পড়ে সেটি হ'ল সমুদ্রস্নান। এই ত সেদিনেও ঘুরে এলাম সারা দক্ষিণ-ভারত; মাদ্রাজ, মহাবলীপুরম্, রামেশ্বরম, ধমুষ্কোটি ও কন্যাকুমারী—সব স্থানেই সমুদ্র পেয়েছি, কোথাও মিলন দেখলাম দুটির, কোথাও বা আবার তিনটির। কিন্তু কোথাও সমুদ্রস্নান হয় নি—এক কন্যা-কুমারী ছাড়া। স্নানোপযোগী বেলাভূমি ঠিক কোথাও পাই নি। এই দিক দিয়ে দেখলে পুরীর বেলাভূমি প্রকৃতই স্নানের উপযুক্ত। অন্যত্র যা সব দেখলাম, সেখানে বেশ অসুবিধা এবং ঢেউ-এর নীচে ডুবে স্নান করা চলে না, কাজেই সমুদ্রস্নানের যে বিশেষত্ব ও তার আনন্দ এ দুটির অভাব। কোথাও দেখলাম ঢেউগুলি একেবারে ভয়ঙ্কর, কোথাও বা একেবারে শান্ত আর বেলাভূমির প্রশস্ততা অনেক স্থানেই বেশ ক্ষীণ। তরঙ্গমালার রূপ পুরীতেই যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তীরে বসে বসে দেখছি ঢেউয়ের শেষ নেই; একের পর এক আসছে নাচতে নাচতে। ভাবলাম, এর শেষ কোথায়? আদিই বা কোথায়? পৃথিবীর কোন আদিকাল হতে আরম্ভ হয়ে এখনও না জানি কোন অসীম অনন্তের দিকে ধেয়ে চলেছে। ভাবতে ভাবতে মন যে খুব শান্ত হয়ে যায় এটি অনুভব করলাম। মন যেন খুঁজতে চায় এই সব বিস্ময়কর, ভয়ঙ্কর দৃশ্যপটের ও সুনিয়ন্ত্রিত ঘটনাবলীর মালিক কে? কে এ সবের সৃষ্টিকর্ত্তা, কারই-বা আজ্ঞায় এ সব পরিচালিত হচ্ছে? যিনিই হউন, তাঁর শক্তি যে বিরাট এটুকু উপলব্ধি করতে সময় লাগে না। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ভাবি, মানুষ আমরা, কত তুচ্ছ, কত অসহায় আর কতটুকুই বা আমাদের শক্তি? যতই না কেন আনবিক অস্ত্র আমরা আবিষ্কার করি—সেই অসীম শক্তিশালী ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্ত্তার অসংখ্য সৃজনের মধ্যে আমরাও সৃষ্ট। ভাবি, মহাকালের কবলে সকল জীব ও পদার্থের মত আমাদেরও বিলীন অবশ্যম্ভাবী। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষ কতই না দুর্ব্যবহার করে, মানুষে মানুষে কত হিংসা, ঈর্ষা ও কলহ-বিবাদ। ক'দিনের আস্তানা আমাদের? মানুষ আজ আছে কাল নেই, এই ত বিশ্বের নিয়ম। ক্ষমতা নেই এক দিনের পরমায়ু বাড়িয়ে নেবার। রোগে, শোকে, অভাবে, দুঃখে কত কাতর হয়ে যায়। নিজের শক্তি বা বুদ্ধিতে কুলায় না উপশম করার—সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া। যাঁর সবই সীমাহীন তাঁর করুণাও অনন্ত অসীম। তাই প্রার্থনা আমাদের সব সময়েই মঞ্জুর করতে প্রস্তুত থাকেন তিনি, যদি সেই প্রার্থনা মন-প্রাণ দিয়ে জানানো যায়।

আমার নিজের জীবনেই একবার নয় অনেকবারই উপলব্ধি করেছি যে, যে প্রার্থনাই তাঁর কাছে জানিয়েছি চরম আত্মনিবেদনের ভেতর দিয়ে তাঁর অবদান পেয়েছি। দেখেছি, বুঝেছি কত অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। তাই না কবি বলেছেন, "Prayers can work miracles."

মানুষ কিন্তু সব সময়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার বুদ্ধি ও সংস্কারের প্রভাবে। ভাবে, সে যা করে, তার ঐ বুদ্ধির দ্বারাই করছে, কারণ সে যে বুদ্ধিমান! কিন্তু ভুলে যায় যে, যা হচ্ছে, যা হয়েছিল, বা যা হবে, সে সবই পূর্ব্ব-নিয়ন্ত্রিত, যাকে বলে predestined. আবার দেখা যায় এই বুদ্ধিকে ঘিরে থাকে একটি বস্তু, যাকে সাধারণত: বলে থাকি সংস্কার; সেটিও বেশ অনবচ্ছিন্ন, তার প্রভাব বিস্তার করে আমাদের সকল কার্য্যকলাপে। এই সংস্কার আমাদের যে অনেক স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এ আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তবুও আমরা সব সময়ে সংস্কারমুক্ত হতে পারি না। আবার যখন সক্ষম হই তখন বেশ স্বচ্ছ-সাবলীলভাবেই সবকিছুর সমাধান যেন হয়ে যায়।

মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কারের জালে জড়িয়ে জীবনকে টেনে নিয়ে যায় জটিলতা ও জড়তার মধ্যে। যে প্রথা বা নিয়ম এক-কালে সুফল দেয়, সেই প্রথা বা নিয়ম পরবর্ত্তীকালেও যে ঠিক সেই রকম সুফল দেবে এ কথা বলা যায় না। টেনিসন বলেছেন, "The old order changeth yielding place to new, lest one good custom should corrupt the world.' অর্থাৎ যেটি এক সময়ে 'সু' সেটিও পরবর্ত্তীকালে 'কু' হতে পারে। সময়ে সব বদলে যায়—সেই বদলটিকে না গ্রহণ করতে পারলে সুরাহা পাওয়া যাবে না। যারা এই রকম সব সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছে না তারাই যেন বেশী কষ্ট পায়। অবশ্য এ সবের ফলাফল ভাল কি মন্দ সে অন্য প্রশ্ন। একদিন ছিল, যখন হিন্দু মেয়েরা পায়ে জুতো পরাকে দোষের বলে মনে করত। খুব বেশী দিনের কথা নয়, বছর ২৫।৩০ আগে আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম। পাণ্ডবদের পুরানো কেল্লা দেখাতে নিয়ে যাই আমার পিতামহীকে। কেল্লার তোরণে উঠতে হলে বহু প্রস্তরখণ্ড এলোমেলো ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকায় পায়ে রীতিমত আঘাত লাগে। এই আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য পিতামহীকে ক্যানভাসের জুতা কোন মতে পরাতে

পারি নি। সেও একদিন দেখেছি। কিন্তু এই সংস্কারগত ভাবধারা এখন আর নেই—কালের কবলে সব বদলায়। মেয়েদের বর্ত্তমানে নিজের অন্ন-সংস্থানের জন্ম পুরুষের স্তায় ঘরের বাইরে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে হয়; না থাকলে উপায় নেই এমনই অর্থনৈতিক সমস্যা। এ ত গেল বুদ্ধি-সংস্কারের কথা।

কিন্তু বেশ অনুভব করা যায় যে, অপরিসীম শক্তিশালী করে যে বস্তুটি সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের অন্তরে দিয়েছেন তা হ'ল হৃদয়বৃত্তি বা হৃদয়াবেগ। উত্তাল তরঙ্গমালার চেয়ে কোন অংশে তার বেগ ও শক্তি কম নয়। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, করুণা, মায়া, মমতা এই সব যখন মানবহৃদয়ে একবার জন্ম নেয় তার আর মৃত্যু হয় না। স্নেহের আকর্ষণ অত্যন্ত নিবিড়, প্রীতির বন্ধন অচ্ছেদ্য, আর ভালবাসা—সে ত একেবারে অন্ধ। হৃদয়ের সকল বৃত্তির মধ্যে এইটির মাধুর্য্য সকলের চেয়ে বেশী। অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা, প্রীতি, ভালবাসা পাত্র-অপাত্রের বিচার করে না; তারা উচিত-অনুচিতের সীমানার বাহিরে। এই উচিত-অনুচিতের সিদ্ধান্ত করে বুদ্ধি ও সংস্কার। করুণা, সহানুভূতি এদের মাধুর্য্য ও শক্তি—সেও কিছু কম নয়। এরাও পরকে আপন করে।

সাধারণতঃ মানুষ কি চায়? যশ, ঐশ্বর্য্য? কিন্তু স্নেহ-মমতাহীন, প্রীতি-ভালবাসাহীন জীবনে বিশ্বব্যাপী যশ ও কুবেরের ঐশ্বর্য্যও শ্রী, শান্তি ও আনন্দ দিতে পারে না। জীবমাত্রেই চায় করুণা, সহানুভূতি, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা তার পর অন্য সম্পদ। এই সবেরই রূপ, রস ও মাধুর্য্য নিয়ে মানুষের অশ্রুজলের সৃষ্টি। আনন্দ, বিষাদ, তৃপ্তি, অশান্তি এ সবেরই প্রতীক হয়ে অশ্রুধারা যেন নেমে আসে। তাই হৃদয়বৃত্তির দান অমূল্য। তার শক্তিও বিরাট, অসীম, সর্ব্বজয়ী।

পাহাড়ে গিয়ে ত অনুভব করেছি যে,এই আকাশচুম্বি শিলাস্তূপ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে কে? প্রকৃতির রূপ দেখে পাগল হয়েছে যারা আত্মহারা হয়ে তারাই কাব্যরচনা করেছে। মহাকবি কালিদাস রামগিরি পর্ব্বতশিখরে মেঘের খেলা, নৃত্য ও তার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে তাঁর অমরকাব্য "মেঘদূত" সৃজন করেছিলেন। মেঘের নৃত্যভঙ্গি, তার রং ও রূপের যে কি পাগল-করা খেলা, সে যে না নিরীক্ষণ করেছে তাকে বোঝান যায় না। এই রামগিরি পর্ব্বতকেই এখন রামগড় বলা হয়।* বরকাকানা থেকে এই রামগড় মাত্র আড়াই মাইল। বর্ষার সময় রামগড় ঘুরেছি। অসীমের ছোট্ট শান্তি কুটিরের সংলগ্ন বাগানটিতে বসে বসে সম্মুখবর্ত্তী সেই প্রাচীন রামগিরি পর্ব্বতের শিখরচূড়ায় বর্ণাঢ্য মেঘের রূপমাধুরী দেখে তৃপ্তিতে মৌন হয়ে গিয়েছি। কত যে রঙ, কি যে তার রূপ, আর কি তার খেলায় ভঙ্গি তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। ভরা বর্ষাতেই এই মেঘ তার মনোমুগ্ধকর লীলায় দুলতে দুলতে কোন দেশে যে যায় জানি না। কবি ত বলে গেছেন, মেঘ যায় উজ্জয়িনীতে।

মানুষ প্রকৃতিগত জীব। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে ঠিক যেন থাকতে পারে না। প্রকৃতি থেকে সব কিছু আহরণ করে প্রকৃতির মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়।

সারা বিশ্বে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে রয়েছে, আর মানুষ তার অনুভূতি দিয়ে এই সৌন্দর্য্যসুধা পান করে, কারণ সৌন্দর্য্য-পিপাসা তার একটি সহজাত বৃত্তি। সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য আমাদের হৃদয়মনকে এক আনন্দলোকে কি নিয়ে যায় না? নদীর জলের কলধ্বনি, কোকিলের কুহুতান, পাখীর কাকলী, বৃক্ষলতায় মর্ম্মরধ্বনি, সেই কোন পুরাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একই ভাবে আমাদের প্রাণে আনন্দ দিয়ে আসছে। পূর্ণিমা রাতে সারা পৃথিবী যখন অবর্ণনীয় রূপধারায় স্নান করে, তখন সাগরের বুকেই যে কেবল আনন্দের জোয়ার আসে তা নয়—মানুষের মনও তখন এক অব্যক্ত, অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি তার বিস্তৃতি, সমুদ্রের তীরে বসে নিরীক্ষণ করি তার বিশালতা, নির্জ্জন অরণ্যের গভীরে দেখেছি স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্য, দিগন্ত-প্রসারিত পর্ব্বত-মালায় বিরাজ করছে এক অনির্ব্বচনীয় শ্যামশোভা। আমাদের চোখে এই সব সৌন্দর্য্য যে মায়ার অঞ্জন বুলিয়ে দেয়। আবার রাত্রির দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে সমস্ত জগত যখন একাকার তখন প্রকৃতির ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তির মধ্যেও এক আশ্চর্য্য রূপ আমরা দেখে মুগ্ধ হই। আকাশ-ভরা মেঘের ঘনঘটায়, ঝড়ের প্রলয় নাচনে এবং বিদ্যুতের চকিতস্ফুরণেও আছে অবর্ণনীয় রূপমাধুরী। দেখা যায়, প্রকৃতি কখনও কোমল মধুর, কখনও বা ভয়ঙ্করী। অমাবস্যায় নদীতীরে মহাশ্মশানেও আছে এক ভয়ঙ্করী মৃত্যুময়ী অপার সৌন্দর্য্য! কোথায় যে সৌন্দর্য্য নেই জানি না। আলোয়, ছায়ায়, আগুনে, জলে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, মহাসাগরে, সৃষ্টিতে, প্রলয়ে সর্ব্বত্রই সব সময়েই প্রকৃতির বিচিত্র রূপের খেলা। মানুষ এই রূপ-মাধুর্য্য দেখে আনন্দে-বিস্ময়ে আত্মহারা হয়। তার মন সেই বিরাট শক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার ধ্যানেই তখন মগ্ন হয়ে যায়।

প্রকৃতির শোভা উপভোগের জন্ম দেশবিদেশে ভ্রমণের আবশ্যকতা আছে বটে কিন্তু ঘরের সুমুখেই প্রকৃতির যে আনন্দধারা সর্ব্বসময়ে প্রবহমান সেটি উপলব্ধি করার মন মনে হয় আমাদের অনেকেরই নেই। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের যে বিচিত্র প্রবাহ চতুর্দ্দিকে সহস্রধারায় উচ্ছলিত তার অনেকখানিই বোধ করি ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কিছুই ত প্রকৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন কোনটি নয়? প্রকৃতিপূজা যে মানুষের আদিমধর্ম্ম। মানুষের কণ্ঠে প্রথম যে বন্দনাগীতি ধ্বনিত হয় সে প্রকৃতিরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে। দেখা যায়, ঋগ্বেদের সূক্তগুলিই যে প্রকৃতির স্তুতি ও বর্ণনা। ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রকৃতির এক-একটি রূপের প্রকাশ, আর উষা, নিশা, বসুন্ধরা প্রকৃতির এক একটি বিভূতি।

তাই মনে হয়, প্রকৃতির পরশ মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত পরমপুরুষের শক্তি ও রূপের ধ্যানে অনুপ্রাণিত করে।

* ভিন্ন মতে একে কেউ কেউ রামটেক বলে থাকে।

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১১

একটি একটি করিয়া দিন চলিয়া যায়, তিলকার পায়ের ঘা ভাল ত হয়ই না, ক্রমে তা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। আর একবার ডাক্তার ডাকিবার সৎপরামর্শ অনেকে দেয় কিন্তু পরবির টাকা কোথা হইতে আসিবে সে বিষয়ে কেহ পরামর্শ দিতে পারে না। অতএব ডাক্তারী চিকিৎসার পর্ব শেষ হইয়া যায়।

তিলকা বলে, "যা গো, সোনাকেই আবার ডেকে নিয়ে আয়—যদি বরাতে থাকে তা হলে ওর ওষুধেই ঘা সারবে।"

সকালবেলা ঘরের কাজ শেষ করিয়া রুকিয়া সোনার বাড়ীর দিকে চলে। গলিটার মোড় ফিরিতেই রুকিয়া দেখে সামনে মাথায় একটা ঝুড়ি লইয়া লালচাঁদের মা গোবর কুড়াইতে চলিয়াছে। মেয়েমহলে লালচাঁদের মায়ের বিশেষ প্রতিপত্তি, ঝগড়া-বিবাদে, অসুখ-বিসুখে সকলেই তাহার পরামর্শ লইয়া থাকে। এমন মানুষটিকে পথে পাইয়া রুকিয়া একটা পরামর্শ লইবার সুবর্ণসুযোগ ছাড়িতে চায় না, তাড়াতাড়ি আসিয়া ডাকে, "শুনছ গো মা!"

ডাক শুনিয়া লালচাঁদের মা ফিরিয়া দাঁড়ায়, রুকিয়াকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলে, "এই যে তিলকার বউ, শুনেছি সব, খুবই ভাবনার কথা গো।"

"বরাত মা!" বলে রুকিয়া, "এত পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকলাম তাও ত কিছু হ'ল না, আবার ত সোনাকেই ডাকতে যাচ্ছি।"

"সোনা গোপ!" চোখ দুটি কপালে তুলিয়া লালচাঁদের মা বলে, "সোনা গোপ করবে কি গো, এ কি জড়িবুটির কাজ!"

অবাক হইয়া রুকিয়া প্রশ্ন করে, "কেন মা?"

ঝুড়িটা মাথা হইতে নামাইয়া কাঁখে লইয়া লালচাঁদের মা বলে, "গত বছর অমনি ডান পায়ে ঘা হয়েছিল সোমবার, কিছুতেই সারে না, কত বদ্যির ওষুধ মিথ্যা হয়ে গেল, তার পরে এল আমার কাছে।"

উদ্‌গ্রীব হইয়া রুকিয়া বলে, "কি হ'ল মা!"

"বদ্যির কাজই নয়, বদ্যি করবে কি গো, বললুম ওঝা ডাক, তবে ভাল হবে—হ'লও তাই।"

করুণকণ্ঠে রুকিয়া বলে, "ওঝা!"

লালচাঁদের মা বলে, "হ্যাঁ গো, ও যে-সে ঘা নয়, বাণ মেরেছে, বুঝতে পারছ না?"

ভীতভাবে শোনে রুকিয়া।

লালচাঁদের মা বলে, "গাছ পড়ে পায়ে চোট লেগেছিল, সেরেও প্রায় গিয়েছিল, হঠাৎ আবার রাতারাতি বেড়ে উঠল কেন? আমি শুনেই বুঝেছি তোমরা এত দিন বোঝ নি সেইটাই আশ্চয্যি!"

"হ্যাঁ মা, কি করব তা হলে।" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে রুকিয়া।

লালচাঁদের মা বিজ্ঞভাবে বলে, "বিষুণভকতের কাছে যা, সে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।"

রুকিয়া সোনা গোপের বাড়ী না গিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। সাড়া পাইয়া তিলকা বলে, "পেলি সোনাকে?"

রুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, "না গো, সোনার বাড়ী যাই নি, পথে লালচাঁদের মায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল।"

"কি বললে লালচাঁদের মা?" প্রশ্ন করে তিলকা।

"বললে, জড়িবুটিতে কাজ হবে না বউ, বিষুণভকতকে ডেকে নিয়ে যা—বুঝতে পারছিস নে, বাণ মেরেছে।"

শুনিয়া তিলকা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, বিচক্ষণ লালচাঁদের মা যাহা বলিয়াছে তাহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। ঘা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে কেন? সোনা কিছু করিতে পারিল না, ডাক্তার কিছু করিতে পারিল না, এ যে ডাক্তার-বৈদ্যের অসাধ্য তাহা ত প্রমাণই হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই কেহ বাণ মারিয়াছে। কাতরাইয়া ওঠে তিলকা, বলে, "যা গো বিষুণভকতের বাড়ী, সওয়া পাঁচ আনার পয়সা রেখে দেকুলি লাগা, শুনে আয় কি বলে সে।"

বিকালের দিকে আঁচলে একমুঠো আলোচাল ও সওয়া পাঁচ আনার পয়সা বাঁধিয়া ছেলে কোলে করিয়া রুকিয়া গ্রামের একপ্রান্তে বিষুণভকতের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। বাড়ীর সামনে একটা লম্বা বাঁশের মাথায় ঝাণ্ডা উড়িতেছে। জাতে বিষুণ দুসাদ, কিন্তু মা ভগবতীর ভক্ত বলিয়া এ তল্লাটে তাহার যথেষ্ট খ্যাতি। লম্বা কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে একটি জটা বিদ্যমান, সেইটাতেই তাহার দৈবশক্তি। দুঃখের ইতিহাস শেষ করিয়া রুকিয়া বলে, "কেন

সরেও ঘা সারছে না গো তাই তোমার কাছে জানতে এলুম —বলে দাও কি হয়েছে।"

ঘাড় নাড়িয়া বিষুণভকত বলে, "দেবীর ইচ্ছে হলে সবই বলে দেবেন।"

রুকিয়া একখানা কুলায় আঁচলের আলোচাল ও সওয়া পাঁচ আনার পয়সা খুলিয়া রাখে। ভকত কুলাখানা ধরিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়ে।

তিন-চারবার এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষুণ আলো চাল হইতে কয়েক দানা তুলিয়া লইয়া মাটিতে রাখে তার পরে দুটি দুটি করিয়া জোড়াচাল পৃথক করিয়া রাখিয়া দেখে একটি মিল হইয়া যায়। আবার ভকত আরও কয়েকটি দানা তুলিয়া জোড় লাগায়, এবারেও মিল হইয়া যায়। এই বার নিজের মনে মাথা নাড়ে ভকত, অন্ধকারে যেন আলো দেখিতে পায়।

উৎসুক রুকিয়া প্রশ্ন করে, "কি দেখলে গো?"

মুখ তুলিয়া ভকত বলে, "দেখলুম, কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা নয়।"

"কি নয় গো?" বলে রুকিয়া।

ভকত চোখ দুটি নিমীলিত করিয়া বলে, "বাণ কেউ মারে নি পরসাদের মা।"

"তবে?" ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে রুকিয়া।

"বাণ কেউ মারে নি, তবে নজর চালিয়েছে।" বলে ভকত।

বিস্মিত রুকিয়া প্রশ্ন করে, "জাত না পরজাত?"

মাটিতে ছড়ান চালের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ভকত বলে, "জাত নয়, পরজাত।"

রুকিয়া ভীষণ ভাবিত হইয়া পড়ে, পরজাত কে এমন শত্রু তাহাদের আছে যে, নজর চালাইয়া তাহার স্বামীর পায়ের ঘা রাতারাতি বাড়াইয়া দেয়!

"কে গো—কে সে?"

"তা বলতে পারব না পরসাদের মা,তবে দেখলুম তোমার ঘরের পুবদিকে তার ঘর।"

"পুবদিকে? পুবদিকে ত কোন পরজাতের ঘর নাই," বলে রুকিয়া।

হাসিয়া ভকত বলে, "এ গাঁয়েরই যে লোক হবে এমন কথা কে বলেছে গা, ভিনগাঁয়ের লোকও ত হতে পারে।"

রুকিয়া আবার ভাবিতে বসে।

ভকত বলে, "ও ভেবে আর কি হবে গো, উপায় কিছু করতে বল ত করতে পারি।"

"তাই কর, তাই কর গো।" ব্যাকুল হইয়া বলে রুকিয়া।

"তবে যা যা বলি তা জোগাড় কর—কপ্পুর, গন্ধক, সিঁদুর, সুতো, তাগাদ। সামনের শনিবারে আমি গিয়ে চহনমহন করব।"

"কত খরচ হবে?" ভীতভাবে প্রশ্ন করে রুকিয়া।

"তা জিনিসপত্তরে দুটো টাকা ত খরচ হবেই, তা ছাড়া ভকতকেও ত কিছু দিতে হবে—কম করেও পাঁচ টাকা।"

শুনিয়া রুকিয়ার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠে, ঘরে যে কিছুই নাই, এত টাকা কোথায় পাইবে সে! শুকনো মুখে বলে, "তুমি কাজ করে দেবে, তোমাকে ত কিছু দিতেই হবে। তা পাঁচ টাকা দিতে পারব না, গরীব আমরা, যা পারি তাই দেব।"

"পাঁচ টাকা ত কম করেই বলেছি, ওর কমে হবেই না।" বলে বিষুণ।

রুকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, "দয়া তোমাকে করতেই হবে, সারাজীবন তোমার নাম নেব। জিনিস যা বললে তা সব আমি জোগাড় করে রাখব, তুমি শনিবারে এস।"

"তা যাব।" বলে বিষুণ, "কিন্তু মজুরি পাঁচ টাকাই নেব, ওর কমে হবে না।"

১২

অনেক রাত, তিলকা ডাকে, "জেগে আছিস?"

জাগিয়াই আছে রুকিয়া, বলে, "হুঁ।"

"বুঝলি, ভকতকে খুশী না করলে মন্তর লাগে না; সাত দিন হয়ে গেল, ওর বাকি তিনটে টাকা দিলি নে, তা জখম সারবে কেন?" কাতরাইয়া বলে তিলকা।

রুকিয়া জবাব দেয় না, চুপ করিয়া থাকে।

তিলকা বলে, "দেবতার কাছে ফাঁকি চলে না, ফাঁকি দিতে গেলে ফাঁকিতে পড়তে হয়, গছেছিস্ যখন তখন ভকতের টাকা দিয়ে দে।"

এতক্ষণে রুকিয়া কথা কয়, ঝাঁজের সঙ্গে বলে, "টাকা কোথায় যে দেব? তোর কাছে টাকা থাকে ত দে, আমি পাব কোথায়?"

তিলকা চুপ হইয়া যায়, ঘরে যে টাকা নেই তা সে জানে। কয়েক মিনিট চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া তিলকা বলে, "এক কাজ কর, থালা ত দু'খানা আছে, তার একখানা বন্দক রেখে টাকা নিয়ে আয়, প্রাণে বাঁচলে অনেক থালা হবে।"

ইহা ছাড়া টাকা জোগাড়ের অন্য উপায় যে নাই রুকিয়াও তাহা জানে, তাই "হুঁ" বলিয়া সম্মতি জানায়।

সকালবেলা রুকিয়া ঘষিয়া-মাজিয়া থালাখানা ঝকঝকে করিয়া আকলুমুদীর বাড়ীর দিকে রওনা হয়। আকলুর বাড়ী বেশী দূরে নয়, দু'তিনখানা বাড়ীর পরেই তাহার ছোট দোকান, পাশেই গুলবার বাড়ী।

কাজে যাইবার সময় হইয়াছে, গুলবা পথে দাঁড়াইয়া খৈনি টিপিতেছে, রুকিয়াকে দেখিয়া বলে, "কোথায় চললে গো পরসাদের মা?"

রুকিয়া আঁচলখানা সংযত করিয়া দাঁড়ায়, বলে, "এই আকলুমুদীর দোকানে যাচ্ছি।"

"তা থালা কি হবে?" প্রশ্ন করে গুলবা।

রুকিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ে, বলে, "কি আর বলব, জানই ত অবস্থা।"

থালা দেখিয়াই গুলবা আঁচ করিয়া লইয়াছে, দরদের সঙ্গে বলে, "আহা, বড্ডই কষ্ট পাচ্ছে তিলকা, তা তুমি তার জন্যে যা করেছ তার তুলনা হয় না, ডাক্তার-বদ্যি, গুণীজ্ঞানী কিছু বাকি রাখলে না।"

সহানুভূতিতে রুকিয়ার মন ভিজিয়া ওঠে, বলে,"তোমরা দশজনই ভরসা গো।"

গুলবা বলে, "টাকাপয়সার খুবই অভাব হয়েছে বুঝি? তা ভারি চামার ঐ আকলুমুদী, বন্ধকী জিনিসের সিকি দামও দেয় না। এদিকে সুদের বেলা কড়াকড়ি।"

"কি করব বল, বাসনপত্তর সহজে কেউ বন্ধক রাখতে চায় না, ওই রাখে। কম হোক বেশী হোক, ওই দেয়" বলে রুকিয়া।

"ক'টাকার দরকার গো।" প্রশ্ন করে গুলবা।

রুকিয়া বলে, "দরকার ত অনেক, তা দিচ্ছে কে? বিযুণভকত পূজো করেছিল তিন টাকা দেব বলে আজও দিতে পারিনি। তার টাকা শোধ ত করতেই হবে, নইলে মন্তরতন্তর লাগছে না।"

গুলবা একবার রুকিয়ার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে, তার পর বলে, এস গো পরসাদের মা, গোটা পাঁচেক আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি, যখন পার শোধ দিও। চামার আকলুমুদীর কাছে আর যেতে হবে না।"

গুলবার পিছনে পিছনে রুকিয়া তাহার আঙিনায় গিয়া দাঁড়ায়। পায়ের সাড়া পাইয়া ঘরের ভিতর হইতে গুলবার মা প্রশ্ন করে, "কে রে—কে?"

গুলবা বলে, "আমি গো।"

"ফিরে এলি যে?"

"খৈনির কৌটো ফেলে গিয়েছিলুম তাই নিতে এলুম।" বলে গুলবা।

রুকিয়াকে ইঙ্গিতে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া সে ঘরে ঢোকে। একটু পরে বাহির হইয়া আসে, হাতের মুঠো হইতে পাঁচটা টাকা লইয়া হঠাৎ রুকিয়ার আঁচলটি টানিয়া তাহাতে বাঁধিয়া দিয়া নিঃশব্দে হাসে। রুকিয়া বিব্রত হইয়া পড়ে, গুলবা তাহাকে ইসারায় চলিতে বলিয়া আগাইয়া যায়।

পথে আসিয়া রুকিয়া চাপা গলায় বলে, "থালাখানা নাও গো।"

ঘুরিয়া দাঁড়ায় গুলবা, রুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, "থালা বন্ধকী রেখে তোমাকে টাকা দিচ্ছিনে পরসাদের মা, অমনি তোমাকে দিচ্ছি, তোমার কষ্ট বলে দিচ্ছি।"

অবাক হইয়া রুকিয়া বলে, "তা কেমন করে হবে গো, আমরা গরীব, টাকা ফেরত দিতে এক মাসের জায়গায় হয়ত দু'মাস হয়ে যাবে।"

'তা হোক, দু'মাস কেন, তিন মাস হোক, আমি ত সুদখোর বেনে নই যে দিনরাত তাগাদা করব।" বলে গুলবা।

রুকিয়ার মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া যায়, ধরা গলায় বলে, "তোমাকে আর কি বলব, আমাদের বড্ড উপকার তুমি করলে। যত শীগগির পারি টাকাটা ফেরত দেবার চেষ্টা করব।"

"সে জন্যে ভাবতে হবে না।" বলে গুলবা, তার পরে রুকিয়ার পিঠে ছোট একটা ঠেলা দিয়া বলে,"যাও গো, বাড়ী যাও, আমিও কাজে যাই।"

গুলবার স্পর্শে রুকিয়া চমকাইয়া ওঠে, আঁচলটা সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে।

কি ভাবিয়া থালাখানা বাহিরে রাখিয়া রুকিয়া ঘরে ঢোকে। উৎকণ্ঠিত ভাবে তিলকা প্রশ্ন করে, "কি হ'ল গো?"

কাছে আসিয়া আঁচল হইতে টাকা পাঁচটা খুলিতে খুলিতে রুকিয়া বলে, "দিয়েছে টাকা।"

কিন্তু কে দিয়াছে টাকা সে কথাটা বলিতে গিয়াও বলিতে পারে না, কেন যেন একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

তিলকা বলে, "কত দিয়েছে?"

টাকা পাঁচটা তিলকার পাশে বিছানার উপর রাখিয়া রুকিয়া বলে, "পাঁচ টাকা দিয়েছে।"

দুর্বল একখানা হাত টাকার উপর রাখিয়া তিলকা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ধীরে ধীরে বলে, "তিন টাক

বিষুণভকতকে আজকেই দিয়ে দিবি, দেবী তুষ্ট হলেই আমার ঘা ভাল হয়ে যাবে।”

একটু থামিয়া সে নিজের মনেই বলিয়া যায়, “ভাল হতে শুরু করলে উঠে দাঁড়াতে আর ক'দিন লাগবে, বড়জোর এক সপ্তাহ! আবার কাজে যাব, এখন ত ধুমধারাক্কা কাজ চলেছে—বর্ষা এসে পড়ল!” হঠাৎ রুকিয়ার হাতখানা ধরিয়া বলে, “কাজে গেলে তোকে হাঁসুলী গড়িয়ে দিতে আমার ক'দিন লাগবে! নতুন শাড়ী, নতুন ঝুলাও কিনে নেব। আহা, কি হাল হয়েছে তোর!”

তিলকার হাতখানা হাতের মধ্যে লইয়া রুকিয়া বলে, “আমার আবার কি হয়েছে, আমি ত ভালই আছি।”

নীরবে মাথা নাড়ে তিলকা।

১৩

“হারামজাদী বজ্জাত, তুই পয়সা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিস।” হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে তিলকা, “তুই রাক্ষুসী, তুই ডাইনী, তুই আমাকে মেরে ফেলতে চাস। বল কি করলি টাকা, বল্ শীগগির।”

কপাট ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে রুকিয়া, কোন জবাব দেয় না।

ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচায় তিলকা, “থালা বন্ধক রেখে পাঁচ টাকা আনলি, তিন টাকা দিলি ভকতকে, আর দু'টাকা পাঁচ দিনে শেষ হয়ে গেল, বললে আমি বিশ্বেস করব!”

রুকিয়া তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে।

তিলকা গর্জন করে, “বার কর টাকা হারামজাদী, জলদি বার কর, তা না হলে—” কথা শেষ না করিয়া সে হাঁপায়।

আজ বিকেলে ব্যাপারটা ঘটে এই রকম—ভকতের প্রাপ্য পাই-পয়সাটি পর্যন্ত মিটাইয়া দেওয়ার পরেও দেবী যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছেন তাহা মনে হয় না, কেননা তিলকার পায়ের ঘা একটু একটু করিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই কয়দিনে সে খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ভকতের দেনা মিটাইয়া যে টাকা দুইটি বাঁচিয়াছিল রুকিয়া তাহা খরচ করিয়া ফেলে। টাকায় মাত্র পাঁচপো চাল, তাই তিলকার জন্য এক টাকার চাল, নিজের জন্য আট আনার মারুয়া আর আট আনায় নুন, তেল, একপো অড়হর ডাল সে কেনে। এই সামান্য চাল-ডালে দু'দিনও চলে না, তবু কোন রকমে সে চারদিন চালাইয়াছে, আজ ঘরে কিছুই নাই। মহুয়ার স্ত্রীর নিকট হইতে একমুঠো চাল ধার করিয়া আনিয়া তিলকাকে সে দুপুরে রাঁধিয়া দিয়াছে। তাহাতে পেট ভরে নাই, বেলা পড়িতেই তাহার আবার ক্ষুধা পায়, সে রুকিয়াকে ভাত রাঁধিতে বলে। উপবাসক্লান্ত রুকিয়া তাহাতে খাপিয়া উঠিয়া বলে, “ঘরে একদানা চাল নাই, হাতে একটা পয়সা নাই, অত তাড়াতাড়ি খিদে পেলে চলবে কেন?”

রুগ্ন দুর্বল তিলকার বিচারশক্তি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে, সে উত্তেজিত হইয়া প্রশ্ন করে, “পয়সা নেই কি? টাকা দুটো কি করলি?”

রুকিয়া জবাব দেয়, “খরচ হয়ে গেছে সে টাকা।”

দুই-দুইটা টাকা এই কয়দিনেই খরচ হইয়া গিয়াছে। তিলকা হঠাৎ ক্ষেপিয়া ওঠে, তাহার সন্দেহ হয়, আসলে টাকা দুইটা রুকিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে, খরচ করে নাই। সে চীৎকার সুরু করে, “টাকা তুই লুকিয়ে রেখেছিস, তুই চোরণী, বার কর টাকা!”

রাগে উত্তেজনায় রুগ্ন দুর্বল তিলকা অল্পক্ষণেই আরও দুর্বল হইয়া পড়ে, কণ্ঠস্বর নামিয়া আসে, গালাগালি ক্রমে থামিয়া যায়, বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া সে হাঁপায়, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। চেঁচামেচিতে রুকিয়াও ক্লান্তবোধ করে, ধীরে ধীরে সে গলির ধারে দোরগোড়ায় আসিয়া বসে। সমস্ত মনটাতেও তাহার সন্ধ্যার মত অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, কোন দিকে কোন পথ দেখিতে পায় না—সে যেন কিছু ভাবিতেও পারে না।

বহুক্ষণ সে আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকে, সামনের আম-গাছের উপরে একটি-দুটি করিয়া বহু তারা ফুটিয়া ওঠে। হঠাৎ তাহার ঘোর কাটিয়া যায়, কে যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। মুখ তুলিয়া সে দেখে গুলবা।

গুলবা প্রশ্ন করে, “এখানে একলাটি চুপ করে বসে আছ পরসাদের মা!”

মাথার আঁচলটা একটু টানিয়া রুকিয়া বলে, “কাজ কিছু নেই তাই বসে আছি।”

“কাজ নেই কি গো, রান্নাবান্না নেই?” অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করে গুলবা।

রুকিয়া কোন জবাব দেয় না। গুলবা বলে, “বুঝেছি—গো, ঘরে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।”

মাথা নাড়িয়া রুকিয়া বলে, “না, ঝগড়াঝাঁটি কেন, কার সঙ্গে হবে, ঐ রোগা মানুষটার সঙ্গে? তা নয়—সত্যিই কাজ নেই কিছু।”

গুলবা একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তার পরে বলে, “পরসাদের মা, বুঝি সবই, কামাই করবার লোক খাটিয়ায় পড়ে থাকলে সংসারের কি হাল হয় তা জানি। সারাদিন খাওয়া হয় নি, তোমার চেহারা দেখেই তা বুঝেছি।”

রুকিয়া এইবার উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, "কষ্ট কপালে লেখা থাকলে তা পাবই।"

গুলবা গলা নামাইয়া বলে, "হ্যাগা, তা আমাকে বল নি কেন? দরকার হলে দু'চার টাকা কি আমি দিতে পারিনে, ধার হিসেবেই না হয় নিলে!"

রুকিয়া জবাব দেয় না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

গুলবা বলে, "বিপদ-আপদ আছে সবারই, আজ তোমাকে দিলুম, কাল হয়ত তুমি আমাকে দেবে। ক'টা চাই বল, আমি ঘর থেকে নিয়ে আসি।"

করুণকণ্ঠে রুকিয়া বলে, "তা ঠিক বলেছ, বিপদ যে কার ঘাড়ে কখন এসে পড়ে তা কেউ জানে না। তোমার কাছ থেকে আর টাকা চাইতে আমার লজ্জা করে, পাঁচ টাকা সেদিন নিয়েছি, আজ আবার—" কথা শেষ না করিয়াই রুকিয়া থামিয়া যায়।

গুলবা ঘাড় নাড়িয়া বলে, "তাতে কি গো, ক'টাকা বল, আমি এনে দিচ্ছি।"

রুকিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "বেশী চাইনে, নিলেই ত হবে না, আবার দিতে ত হবে, আমাকে দুটো টাকা দাও, তা হলে এখন চলে যাবে, তার পরে যা বরাতে থাকে হবে।"

গুলবা ঘরের দিকে পা চালাইয়া বলে, "তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এনে দিচ্ছি।"

অল্পক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসে। জামার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া রুকিয়াকে দিয়া বলে, "এই নাও।"

টাকা হাতে নিয়া রুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, "এ যে তিন টাকা! ভুল করে এক টাকা বেশী দিয়েছ গো।"

হাসিয়া গুলবা বলে, "ভুল করিনি পরসাদের মা, তিন টাকাই দিয়েছি।"

রুকিয়া টাকা তিনটা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলে, "কেন আবার তিন টাকা দিলে গো?"

গুলবা একটু আগাইয়া আসিয়া গলা নামাইয়া বলে, "টাকা-পয়সার কথা তিলকাকে আর কিছু বলো না গো—রোগা মানুষ কিনা, তাই বলছি।"

মাথা নাড়িয়া রুকিয়া বলে, "বললে রক্ষে থাকবে না, যেমন চুপি চুপি নিলুম এমনি চুপি চুপি শোধ করতে হবে।"

গুলবা বলে, "সে দিও যখন পারবে, তার জন্ত মোটেই ভেবো না।"

গুলবার সহৃদয় ব্যবহারে রুকিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে, কৃতজ্ঞ চোখ দুটি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকায়। গুলবা হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া রুকিয়ার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়। চমকাইয়া দুই পা পিছাইয়া যায় রুকিয়া, গুলবার হিংস্র, ক্ষুধার্ত চোখের দিকে তাকাইয়া মুহূর্তে চোখ নামাইয়া নেয়। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলে, "অনেক রাত হয়েছে গো, তুমি বাড়ী যাও।"

অনেক রাত পর্যন্ত রুকিয়া জাগিয়া থাকে, তাহার ঘুম আসে না। এপাশ-ওপাশ করে, কখনও উঠিয়া বসে, কখনও ছেলেকে কাছে টানিয়া নেয়, তার এমনি করিয়া প্রহর কাটিতে থাকে। তিলকা মাঝে মাঝে আঃ, উঃ করে, ঘুমের মধ্যে দু'একটা অস্পষ্ট কথা বলে। কোথাও আর কোন সাড়াশব্দ নাই। রুকিয়া অন্ধকারে চোখ মেলিয়া কত কি ভাবে, কি খাইবে, কি খাওয়াইবে, কেমন করিয়া দিন গুজরান করিবে—ভাবনার যেন অন্ত নাই।

পাশের রোগা মানুষটা যে সহজে ভাল হইয়া উঠিবে সে ভরসা তাহার নাই, তবে তাহাদের সংসার চলিবে কেমন করিয়া! টাকা ধার করিয়া কত দিন চলিবে, তাহা আবার শোধ দিতে হইবে ত? কেমন করিয়া শোধ দিবে? রুকিয়া ভাবে, এ কি ব্যাপার, পুরুষ মানুষটা বিছানায় পড়িলে না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে! বাঁচিবার কোন কি উপায় নাই? রুকিয়া অসহায় ভাবে পুনঃ পুনঃ কাহাকে যেন প্রশ্ন করে, "কোন কি উপায় নাই, হ্যাঁ গা, কোন কি উপায় নাই?"

না, সে ভয় পাইবে না, কিছুতেই ভয় পাইবে না, ভয় পাইলে দুঃখের প্লাবনে তাহাকে মুহূর্তে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। মরদ বিছানায় পড়িয়াছে কিন্তু সে ত সুস্থ আছে—মরদের চেয়ে তাহার শক্তি কিছু কম নয়! মরদের কাজ সে কেন করিতে পারিবে না? কাল সে কুড়ুল লইয়া ঠিকাদারের গাছ কাটিতে যাইবে। হয়ত প্রথম দিন কম কাটিবে কিন্তু কিছু ত রোজগার হইবে! লজ্জা! লজ্জা নিশ্চয়ই করিবে, মনুয়া গুলবা ইহাদের সামনে গাছ কাটিতে লজ্জা করিবেই। তবে! ভাবিতে ভাবিতে রুকিয়া ইহারও একটা উত্তর পায়, গাছ না কাটিলে লোকের কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পাতিতে হইবে, কোনটা লজ্জার? কাল সে গাছ কাটিতে যাইবে, ইহাতে লজ্জার কিছু নাই। রুকিয়ার সাহস ফিরিয়া আসে, মন শান্তিতে ভরিয়া যায়। ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

শেষরাত্রে তিলকার ডাকে রুকিয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়, সে উঠিয়া বসে, বলে, "কি গো?"

তিলকা বলে, "বড্ড গরম, দরজা খুলে দে, ঘরে হাওয়া আসুক, প্রাণ যে আর বাঁচে না।"

রুকিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দেয়। ফুর্‌ফুর্‌ করিয়া ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢোকে, তিলকা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে।

"কত রাত ?" প্রশ্ন করে তিলকা।

রুকিয়া বলে, "রাত শেষ হয়ে এসেছে।"

"আয় এদিকে, শোন একটা কথা।" ডাকে তিলকা।

রুকিয়া উঠিয়া আসিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার হাতখানা ধরিয়া আরও কাছে টানিয়া তিলকা বলে, "কাল তোকে যা খুশী তাই বললাম—চোরণী বললাম, কিন্তু চুরি ত তুই করিস নি, ঘরে টাকা নাই তা চুরি করবি কি।"

রুকিয়া জবাব দেয় না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

তিলকা বলে, "কেন তোকে গালাগালি করলাম বল ত, এমন পাগলামো কেন করলাম বল ত ?"

তিলকার কপালের উপর আসিয়া পড়া ঘামেভেজা চুলগুলি সরাইয়া দিয়া রুকিয়া বলে, "তোর কথায় কোন দোষ নেই, ও আমার গায়ে লাগে না। কত কষ্ট পাচ্ছিস তুই।"

তিলকা তাহার শীর্ণ বাহু দিয়া রুকিয়াকে জড়াইয়া ধরে, টানিয়া কাছে বসায়, কোলের উপর দুর্বল মাথাটি রাখিয়া চোখ বোজে। রুকিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলে, "ঘুমো।"

১৪

ভোরবেলা রুকিয়া তাড়াতাড়ি মুদীর দোকান হইতে এক টাকার চাল আনিয়া উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া দেয়। ভাত হইয়া গেলে বাটি ভরিয়া আনিয়া তিলকাকে বলে, "খাও গো।"

"আজ এত সকাল সকাল কেন গো ?" অবাক হইয়া প্রশ্ন করে তিলকা।

রুকিয়া বলে, "কাজে যেতে হবে যে।"

"কাজ !" আরও আশ্চর্য হইয়া তিলকা বলে, "কোথায় কাজ ?"

সত্য কথাটা গোপন করিয়া রুকিয়া জবাব দেয়, "গোবিন্দ মহন্তোর কোঠাঘরে মাটি দেবার জন্যে ডেকেছে, দু'সের ধান দেবে, দু'সের ধান আমাদের দু'দিনের খোরাক।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিলকা বলে, "তা যা, পরসাদকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

"তাই যাব গো, দুপুরে এক ফাঁকে আবার আসব।" বলে রুকিয়া।

সইয়ের কাছে পরসাদকে রাখিয়া রুকিয়া ঠিকাদারের ছাউনীর দিকে রওনা হয়। গাঁয়ের লোকেদের পাশ কাটাইয়া সে জঙ্গলের পথ ধরিয়া চলে। যখন সে ছাউনীতে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন কুলিরা প্রায় সবাই আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা যে যাহার কুড়ুল লইয়া কাজের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। রুকিয়া কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে আসিয়া থামে, এতগুলি মরদের সামনে হঠাৎ গিয়া দাঁড়াইতে তাহার লজ্জা করে। কিন্তু আর বেশীক্ষণ ত লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না, কাজে লাগিতে হইলে এখনই গিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে হইবে। একবার ভাবে পলাইয়া যায়।

"এখানে কি করছ পরসাদের মা ?"

পিছন হইতে প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায় রুকিয়া, দেখে মনুয়া কখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে কোন জবাবই আসে না রুকিয়ার, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পাগড়িটা বাঁধিতে বাঁধিতে মনুয়া বলে, "এ ক'দিন তিলকাকে দেখতে যেতে পারি নি, কেমন আছে গো ?"

"ভাল নয়, দিন দিন খারাপই হচ্ছে।" বলে রুকিয়া।

দরদের সঙ্গে মনুয়া বলে, "আহা, গরীব মানুষ, দু'পয়সা রোজগার করছিল তা ভগবানের সইল না।"

রুকিয়া বলে, "আমার বরাত গো।"

"তোমার কাঁধে ওটা কি গো পরসাদের মা ?" হঠাৎ প্রশ্ন করে মনুয়া।

এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে, আর লুকাইবার চেষ্টা করিয়া "কি হইবে, রুকিয়া কুড়ুলখানা আঁচলের আড়াল হইতে বাহির করিয়া বলে, "আমাকে গাছ কাটবার কাজে লাগিয়ে দাও বেনোয়ারীর বাপ।"

শুনিয়া অবাক হইয়া রুকিয়ার দিকে তাকাইয়া থাকে মনুয়া, পাগড়িবাঁধা তাহার বন্ধ হইয়া যায়। রুকিয়া অনুনয় করিয়া বলে, "আমি সেইজন্যেই এখানে এসেছি, তুমি আমাকে কাজে লাগিয়ে-দাও।"

রুকিয়ার কথাগুলি মনুয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, বলে, "গাছ কাটবে কি বলছ পরসাদের মা, কে গাছ কাটবে, তুমি ?"

"কেন গো আমিই ত কাটব, এই দেখ না, পরসাদের বাপেরডু কুল সঙ্গে করে এনেছি।"

মাথা নাড়িয়া মনুয়া বলে, "পাগল হলে নাকি পরসাদের মা, মেয়েমানুষ হয়ে গাছ কাটবে তুমি !"

"পাগল হব কেন গো, সত্যিই কাজ করতে এসেছি, না

কাজ করলে খাব কি? তুমি ত জান আমাদের অবস্থা।" বলে রুকিয়া।

"কিন্তু এ কাজ যে মরদের কাজ, এসব কেন তুমি পারবে?"

"পারব গো, পারব, আমি মেয়েমানুষ হলেও গায়ে তাগদ আছে। একদিনে না পারি দু'দিনে পারব।"

"বাড়ী যাও পরসাদের মা, পাগলামি করো না।"

"ফিরে অমনি যাব না বেনোয়ারীর বাপ। ঘরে আমার একদানা আনাজ নেই, রোগা মানুষটাকে কি খাওয়াব, ছেলেটার মুখে কি দেব?"

"দিনান্তে আমরা হিমসিম খেয়ে যাই, তুমি ত মরে যাবে বাছা।"

"তা হলে যে বাঁচি বেনোয়ারীর বাপ। না গো না, আমি মরব না, কপালে যার দুঃখু লেখা থাকে সে মরে না। আমাকে তুমি কাজে লাগিয়ে দাও, আমি পারব, নিশ্চয় পারব।"

কাজের সময় চলিয়া যায়, মনুয়া অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, "তা হলে এস আমার সঙ্গে দেখি কি হয়।"

মনুয়ার পিছনে পিছনে ঠিকাদারের ঘরের দিকে চলে রুকিয়া।

বারান্দায় খাটিয়াতে বসিয়া ঠিকাদার রামলালবাবু হিসাব দেখিতেছিলেন, মনুয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়ায়। আধা-বয়সী গোলগাল বেঁটে রামলালবাবু হিসাব হইতে ছোট ছোট চোখ দুটি তুলিয়া প্রশ্ন করেন, "কি চাই?"

মনুয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে, 'তিলকা সিং এসেছে হুজুর।"

"তিলকা, কোন্ তিলকা?" প্রশ্ন করেন রামলাল-বাবু।

"হুজুর সেদিন চোট লেগে যার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল।" বলে মনুয়া।

হিসাবের দিকে নজর দিয়া রামলালবাবু বলেন, "ভাল হয়ে কাজে এসেছে বুঝি? তা কাজ করতে বল?"

মনুয়া বলে, "সে এখনও ভাল হয়ে ওঠে নি হুজুর, সে আসে নি তার বউ এসেছে।"

হিসাব হইতে আবার চোখ তুলিয়া রামলালবাবু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করেন, "কেন, কোথায় সে?"

"এই যে হুজুর।" বলে মনুয়া।

রুকিয়া মাথার আঁচলখানা একটু টানিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়ায়। রামলালবাবু রুকিয়ার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখেন, তার পরে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন এসেছ গো?"

রুকিয়ার হইয়া মনুয়াই জবাব দেয়, বলে, "কাজ চায় হুজুর।"

"কি কাজ, এখানে ত মেয়েমানুষের কাজ নেই।" বলেন রামলালবাবু।

একটু কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া মনুয়া বলে, 'আমাদের সঙ্গে ও গাছ কাটতে চায়।"

ছোট ছোট চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া রামলালবাবু বলেন, "অ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে গাছ কাটতে চায়—বল কি মনুয়া!"

মনুয়া বিব্রত হইয়া বলে, "বড় গরীব বাবু, না খেয়ে শুকিয়ে মরছে তাই কাজ করতে এসেছে, বলছে গাছ কাটতে পারবে!"

বিস্মিত রামলালবাবু খাটিয়া হইতে উঠিয়া রুকিয়ার সামনে আসিয়া দাঁড়ান, ছোট ছোট চোখ দুটি দিয়া আর একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলেন, "সত্যি নাকি গো, তুমি গাছ কাটবে?"

ভয়ে ভয়ে রুকিয়া বলে, "কাটব বাবু।"

এইবার হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠেন রামলালবাবু। আশপাশ হইতে কুলিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য আসিয়া জমা হয়। এতক্ষণ রুকিয়া ভারি লজ্জাবোধ করিতেছিল, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সকৌতুক দৃষ্টি এবং রামলালবাবুর অট্টহাস্য তাহার ভিতরটায় জ্বালা ধরাইয়া দেয়। সে মাথা তুলিয়া এইবার ঠিকাদারের দিকে নির্ভয়ে তাকায়।

রামলালবাবু বলেন, "দেখি গো, তোমার হাত দু'খানা—কুড়ুল ধরতে পারবে কিনা দেখি।"

অকুণ্ঠিত ভাবেই রুকিয়া আঁচলের আড়াল হইতে সবল, সুডৌল বাহু দুটি বাহির করিয়া প্রসারিত করিয়া দেয়। রামলালবাবু মুচকি হাসিয়া বলেন, "না গো না, এ হাত কুড়ুল ধরবার জন্যে নয়, এ হাতে অন্য কাজ।"

রসিকতাটা রুকিয়া বুঝিতে পারে না, জোর করিয়া বলে, "আমি কুড়ুল ধরতে পারি বাবু।"

"মেয়েমানুষ গাছ কাটে না—তুমি বাড়ী যাও গো।" মাথা নাড়িয়া বলেন রামলালবাবু।

রুকিয়ার যত আশা, যত ভরসা সব এক মুহূর্তে নিবিয়া যায়, সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে, বাড়ী ফিরিয়া যাইবার শক্তিও যেন তাহার লোপ পায়। কুলীরা একে একে যে যাহার কাজে চলিয়া যায়। মনুয়া কুড়ুল তুলিয়া লইয়া

বলে, "আমি চললুম পয়লাদের মা, তুমি ঘরে যাও, বেলা হয়েছে অনেক।"

মঙ্গুয়া চলিয়া যায়, রুকিয়াও ফেরে. তাহার বুক জুড়িয়া কান্না ঠেলিয়া ওঠে, পা চলিতে চায় না।

রামলালবাবু ভ্রূ দুটি কুঁচকাইয়া রুকিয়ার যৌবনপ্লাবিত দেহের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, হঠাৎ একপা আগাইয়া গিয়া ডাকেন, "ওগো তিলকার বউ, শোন ত।"

ডাক শুনিয়া রুকিয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়। রামলালবাবু তাহাকে হাতছানি দিয়া কাছে আসিতে বলেন। রুকিয়া আশান্বিত হইয়া ওঠে, ফিরিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়ায়।

রামলালবাবু বেশ মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, "সত্যিই তুমি কাজ করবে গো?"

"হ্যাঁ বাবু, করব বইকি, সেই জন্মেই ত এসেছি।" বলে রুকিয়া।

রামলালবাবু হাসিয়া বলেন, "তা বেশ, কাজ আমি তোমাকে দিচ্ছি, গাছ কাটতে হবে না, ঘরের কাজ করতে হবে।"

খুশীতে রুকিয়ার মন ভরিয়া যায়, হাত জোড় করিয়া বলে, "করব বাবু, তুমি যা বলবে তাই করব, গরীবের তুমি মা-বাপ।"

রামলালবাবু সোনা বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া বলেন, "হালকা কাজ গো, ঘর ঝাঁট দেওয়া দু'একখানা বাসন মাজা, উনুন ধরান এই সব আর কি। তা যাও, আজ থেকেই কাজ সুরু কর।"

একটা লোকের সামান্য গৃহস্থালীর কাজ রুকিয়ার পক্ষে কিছুই নয়। পরিপাটি করিয়া ঘর ঝাঁট দেয়, থালা-লোটা পরিষ্কার করিয়া মাজে, মশলা পিষিয়া উনুন ধরাইয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়। রামলালবাবু 'এটা কর, ওটা কর' বলিয়া তাহার আশেপাশে ঘোরাফেরা করেন।

বেলা বাড়িয়া যায়, রুকিয়া ব্যস্ত হইয়া ওঠে, বলে, "কাজ ত সব করেছি বাবু, এখন আমি বাড়ী যাই।"

রামলালবাবু আশ্চর্য হইয়া বলেন, "এখনই যাবে গো?"

"আর ত কোন কাজ বাকি নেই।" বলে রুকিয়া।

রামলাল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসেন। রুকিয়া মাথার আঁচলটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। "তা যাও গো, কাল আবার এস, একটু সকাল সকাল এস।" বলেন রামলালবাবু।

জিনিসপত্র যথাযথভাবে আছে কিনা একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া রুকিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। রামলাল বাবুও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসেন, পকেট হইতে একটা টাকা লইয়া বলেন, "এই নাও গো আজকের মজুরী।"

রুকিয়া কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়ে, টাকাটি লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে রওনা হয়।

১৫

ঠিকাদারের কথামত রুকিয়া আজ সকাল সকাল আসিয়া কাজে লাগে। কুলীরা তখনও কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই, বারান্দায় খাটিয়া বিছাইয়া রামলালবাবু হিসাব দেখেন, ভিতরে রুকিয়া একমনে কাজ করে।

হঠাৎ হিসাবের খাতা ফেলিয়া দিয়া রামলালবাবু ডাকেন, "শুনছ তিলকার বউ, বিড়ির কৌটোটা তাকের উপর আছে, এনে দাও ত।"

রুকিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া বিড়ির কৌটা লইয়া বাহিরে আসে। হাত বাড়াইয়া কৌটাটি লইয়া রামলালবাবু বলেন, "বসো।"

"কাজ যে অনেক বাকি আছে বাবু।" বলে রুকিয়া।

রামলালবাবু হাত নাড়িয়া বলেন, "তা থাক, তুমি বসো।"

রুকিয়া বসে না, দরজার পাশটিতে দাঁড়াইয়া থাকে। কৌটা হইতে কয়েকটা বিড়ি বাহির করিয়া রামলালবাবু বলেন, "এই নাও গো, বিড়ি খাবে।"

রুকিয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। বলে, "আমি বিড়ি খাইনে বাবু।"

"অ্যাঁ, বিড়ি খাও না, বল কি?" অবাক হইয়া বলেন রামলালবাবু। তার পরে একগাল হাসিয়া বলেন, "লজ্জা কি গো, খাও। আমি নিজে হাতে করে দিচ্ছি—খাও।"

রুকিয়া আরো সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বলে, "সত্যি বলছি বাবু, আমি বিড়ি খাইনে।"

রামলালবাবু রুকিয়ার মুখের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখেন, তার পরে একটা বিড়ি ধরাইয়া বলেন, "হ্যাঁ গা, এই কাঁচা বয়সে তোমার কোন সখ নেই কেন?"

কথাটা রুকিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারে না, চোখ তুলিয়া রামলালবাবুর মুখের দিকে তাকায়। রামলালবাবু একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া আবার বলেন, "এই কাঁচা বয়স তোমার, গায়ে গয়না নেই, পরনে ভাল শাড়ী নেই—কেন গো?"

"খেতে পাইনে, গরীব মানুষ আমরা, গয়না কোথায় পাব বাবু?" বলে রুকিয়া।

মাথা নাড়িয়া রামলালবাবু বলেন, "গরীব হলে কি সখ থাকতে নেই গো?"

রুকিয়া বলে, "পেটে দুটি খেতে পেলেই আমরা খুশী হই বাবু।"

বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া রামলালবাবু বলেন, "অমন দুটি সুন্দর হাতে দুটি কাঙনা হলে কি শোভাই হ'ত। তা, একটা কথা বলি শুনবে ?"

"কি কথা বাবু।" বলে রুকিয়া।

একটু হাসিয়া রামলালবাবু বলেন, "দু'গাছা কাঙনা আমি গড়িয়ে দেব—নেবে ?"

কথাটা রুকিয়া শোনে কিন্তু তাহার অর্থ যেন বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া রামলালবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সোনা বাঁধানো দাঁত দুটি বাহির করিয়া রামলাল বাবু আবার হাসেন। রুকিয়ার সম্বিৎ হঠাৎ ফিরিয়া আসে, দরজার আড়ালে আরও একটু সরিয়া গিয়া বলে, "না বাবু, কাঙনা আমি নেব না, আমার ওসবে দরকার নাই।"

রুকিয়ার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রামলাল বাবু বলেন, "ভয় কি গো, কেউ ত জানছে না যে, আমি তোমাকে কাঙনা দিচ্ছি, এখন না হয় কিছুদিন তুলে রেখ, পরে সুযোগমত হাতে পরো।"

মাথা নাড়িয়া রুকিয়া বলে, "না বাবু।"

রামলালবাবু আর কিছু না বলিয়া একমনে বিড়ি টানিতে শুরু করেন, রুকিয়া ফিরিয়া গিয়া কাজে মন দেয়।

কুলির দল কাজে আসিয়া লাগে, রামলালবাবু এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করেন, ক্রমে বেলা বাড়িয়া যায়। রুকিয়া কাজ শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, রামলালবাবু তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলেন, "কাজ শেষ হয়েছে গো ?"

"হ্যাঁ বাবু, সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, আমি এখন বাড়ী যাব।" বলে রুকিয়া।

"তোমার মজুরীটা নেবে না গো ?" হাসিয়া বলেন রামলালবাবু।

রুকিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলে, "মজুরী না নিলে খাব কি বাবু ?"

পকেট হইতে দুটি টাকা তুলিয়া লইয়া রামলালবাবু রুকিয়ার হাতে ফেলিয়া দেন। অবাক হইয়া রুকিয়া বলে, "বাবু দু'টাকা দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ গো, দু'টাকাই দিয়েছি, দিতে ত আমি আরও চাই, তুমি নাও কোথায় ?" বলেন রামলালবাবু।

রুকিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলে, "আমরা গরীব মানুষ, গরীব মানুষ পেলেই নেয়, কিন্তু নেয্য পাওনার বেশী আপনিই বা দেবেন কেন, আমিই বা নেব কেন ?"

জবাব শুনিয়া রামলালবাবু যথেষ্ট গম্ভীর হইয়া যান। রুকিয়া ঘরের পথ ধরে।

সন্ধ্যার দিকে আঙিনায় খাটিয়া টানিয়া রুকিয়া ছেলেকে লইয়া বসে। জ্যৈষ্ঠ শেষের গরম হাওয়া তখনও ঠাণ্ডা হয় নাই, মাঝে মাঝে দুই-এক ঝাপটা বহিয়া যায়। এমন সময় বেনোয়ারীকে কোলে লইয়া মঙ্গুয়ার বউ আসিয়া আঙিনায় ঢোকে। রুকিয়া খাটিয়ার একপাশে সরিয়া গিয়া বলে, "এস বেনোয়ারীর মা, বসো।"

বেনোয়ারীর মা ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া আসিয়া বসে।

"এবার বর্ষার কোন লক্ষণ নেই গো, জেঠ শেষ হতে চলল, আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নাই।" বলে মঙ্গুয়ার বউ।

রুকিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বলে, "সেকথা আর বলো না দিদি, আর দু'চারদিন বিষ্টি না হলে পৃথিবী পুড়ে যাবে।"

মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া খাটিয়ায় হেলিয়া পড়িয়া মঙ্গুয়ার বউ বলে, "সকালবেলা কোথা গিয়েছিলি গা, এসে দেখতে পেলুম না ?"

রুকিয়া বলে, "তোকে বলিনি দিদি, কাল থেকে কাজে লেগেছি যে।"

"কোথায় গো ?"

"ঠিকাদারের ছাউনীতে।"

"তামাসা করিস নে, তুই আবার কি কাজ করবি ওখানে ?"

"তামাসা নয় গো সত্যিই বলছি, সকালবেলা ঠিকাদারের চৌকাবর্তন করে দিচ্ছি।"

"কথাটা তা হলে ঠিকই।" বলে মঙ্গুয়ার বউ।

রুকিয়া বলে, "জান ত দিদি ঘরের অবস্থা, এ কাজটা না পেলে না খেয়ে মরতে হ'ত, ভিক্ষে করতে হ'ত।"

মঙ্গুয়ার বউ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে, তার পরে বলে, "ভারী বজ্জাত ঐ রামিয়া বুড়ি।"

"কেন গো ?" আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করে রুকিয়া।

গলা খাটো করিয়া মঙ্গুয়ার বউ বলে, "হারামজাদী বলে বেড়াচ্ছে কি জানিস্—বলে বেড়াচ্ছে—।" কথাটা শেষ না করিয়া থামিয়া যায় মঙ্গুয়ার বউ।

রুকিয়া উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি বলে বেড়াচ্ছে গো ?"

মঙ্গুয়ার বউ বলে, "ও মানুষ ভাল নয় জানিস ত।"

মঙ্গুয়ার বউকে একটা ঠেলা দিয়া রুকিয়া বলে, "তা ত জানি, কিন্তু কি বলে বেড়াচ্ছে তা বল না।"

ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুকিয়ার কানের কাছে মুখ লইয়া

মনুয়ার বউ চুপি চুপি যাহা বলে তাহা শুনিয়া রুকিয়ার মুখখানা লাল হইয়া ওঠে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিয়া সে বলে, "তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দিদি, এসব মিছে কথা—এ কখনও হতে পারে গো ?"

মাথা নাড়িয়া মনুয়ার বউ বলে, "আমি হারামজাদীর এক কথাও বিশ্বাস করি নি, ওকে আমি ভাল করে চিনি, নিজে যেমন সবাইকে তেমনি ভাবে।"

এমন করিয়া কেহ যে তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইতে পারে রুকিয়া কখনও তাহা ভাবিতে পারে নাই। রাগে তাহার ভিতরটা আগুন হইয়া ওঠে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, খাটিয়া হইতে উঠিয়া দাঁড়ায়, দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলে, "হারামজাদী এদিকে এলে আমি ঠেঙিয়ে ওর হাড় ভেঙে দেব, যদি না দিই তা হলে আমি শোভা সিংয়ের বেটি নই।"

মনুয়ার বউ তাহার দিকে তাকাইয়া বলে, "রামিয়ার সঙ্গে লড়তে যাসনে পরসাদের মা, তুই পারবি নে ওর সঙ্গে, তুই এক কথা বললে ও এক শ' কথা বলবে, তুই একবার গাল দিলে ও একশ'বার গাল দেবে—একশ' মিছে কথা বলবে।"

রুকিয়া কঠিন ভাবে বলে, "গা আমার জলে যাচ্ছে বেনোয়ারীর মা, আমি যে সইতে পারছি নে।"

মনুয়ার বউ বলে, "আমার কথা শোন্ মাথা ঠাণ্ডা করে, আয়, বোস্ এসে।"

রুকিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বসে। মনুয়ার বউ বলে, "ওর সঙ্গে লড়তে যাসনে, ও পাড়ায় পাড়ায় মিছে কথা বলে বেড়াবে ; জানিস্ ত গাঁয়ের দশ জনকে, ভেবেও দেখবে না, যা শুনবে তাই বিশ্বাস করে নেবে।"

রুকিয়া চুপ করিয়া থাকে, কোন জবাব দেয় না। মনুয়ার বউ বলে, "ঠিকাদারের কাজ তুই ছেড়ে দে পরসাদের মা, ও হারামজাদী কেন এসব মিছে কথা রটাচ্ছে তা ত বুঝতেই পারছিস।"

বসিয়া রুকিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবে, তার পরে বলে, "কাজে আর আমি যাব না গো বেনোয়ারীর মা, না খেয়ে মরব তবু যাব না।"

"সেই ভাল গো"' বলে মনুয়ার বউ।

মনুয়ার বউ চলিয়া গেলে রুকিয়া খাটিয়ার উপর নেতাইয়া পড়ে। দেহমন তাহার যেন একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসে, আকাশে একটি-দুটি করিয়া বহু তারা ফুটিয়া ওঠে, রুকিয়া মূর্ছিতের মত অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকে। গত দুই দিন ধরিয়া সে কত নিশ্চিন্ত ছিল। রুগ্ন স্বামী আর শিশু-পুত্রের মুখে দুটি অন্ন সকাল-সন্ধ্যায় দিতে পারিবে ভাবিয়া ভগবানের পায়ে সে কত প্রণামই না জানাইয়াছে। কিন্তু মুহূর্তে আলোটুকু নিভিয়া গেল। অন্ধকারে পথ আবার হারাইয়া গেল। কোথায় পাইবে আবার কাজ, কি খাইবে, কেমন করিয়া বাঁচিবে এসব প্রশ্নের কোন জবাবই সে খুঁজিয়া পায় না। তারা-ঝলমল আকাশের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে সে তাকাইয়া থাকে।

কোলের কাছে পরসাদ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গায়ের উপর রুকিয়া ক্লান্ত হাতখানা রাখে। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে পরসাদের ক্ষুদ্র বুক দুলিয়া দুলিয়া ওঠে, রুকিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহা অনুভব করে। এই কোমল অমৃতময় স্পর্শ তাহার বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা চেতনার সঞ্চার করে। না, তাহাকে নিরাশ হইলে, দুর্বল হইলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক এই শিশুকে বাঁচাইতে হইবে। রুকিয়া উঠিয়া বসে, একটু একটু করিয়া তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে, সে ভাবে, রামিয়া তাহার অপকার না করিয়া উপকারই করিল। রামলালবাবুর কথাবার্তা তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই, হয়ত একদিন তাহাকে বিপদে পড়িতে হইত।

ঘুমন্ত পরসাদকে কোলে তুলিয়া রুকিয়া ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ক্রমশঃ
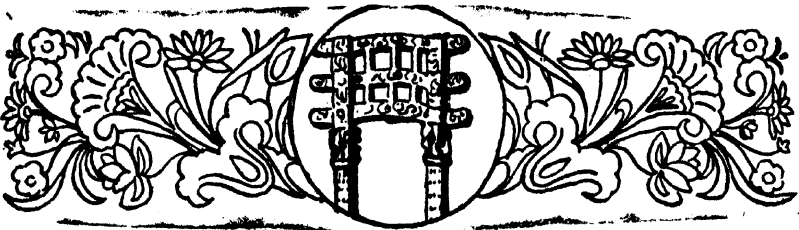
নায়ক-চরিত্র—বাল্মীকি ও মধুসূদন

অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়

মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার মহাকাব্যের নায়ক-চরিত্রের পরিকল্পনাকালে দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ।
আত্মবান কো জিতক্রোধঃ ক্ষমাবান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি সংযুগে জাতরোষস্য দেবতাঃ।

কবি রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির এই প্রশ্নকেই আরও উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন—

"কহ মোরে বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত?
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত?
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক?
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম?"

ঋষি-কবি বাল্মীকি তাঁহার মহাকাব্যের নায়ক করিতে চাহিয়াছেন এমন এক চরিত্রকে—যাঁহার মধ্যে রূপ ও গুণ, বীর্য্য ও ক্ষমা, দৃঢ়তা ও সংযম, চারিত্র্য ও সত্য এবং ধর্ম্ম ও নিষ্ঠা—মণি-কাঞ্চন-মিলনে মিলিত হইয়া শাশ্বত সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, মহর্ষি তাঁহার কল্পনাকে পরিপূর্ণ ভাবেই রূপদানে সমর্থ হইয়াছেন, এমনই ভাবে যে, এই চরিত্র শত সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি নর-নারীর সর্ব্ববিধ রসপিপাসাকে তৃপ্ত করিয়া চলিয়াছে।

মহাকবি মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে বন্ধুকে লিখিয়াছেন—"I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit.… Let me have what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow and, but for the scoundrel Bibhisana, would have kicked the monkey army into the sea…. People hear grumble and say that the heart of the Poet in Meghnada is with the Rakshasas. And that is the real truth…. I despise Rama and his rabble, but the idea of Ravana kindles and elevates my imagination. He was a grand fellow."

এই ইন্দ্রজিৎ ও এই রাবণ, কবির কল্পনায় কিরূপ ছিল—নিম্নের উক্তিসমূহ হইতে তাহা বুঝা যাইবে। মেঘনাদ সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলে লঙ্কাপুরীর বন্দিদল বীণাধ্বনিসহকারে বন্দনা-সঙ্গীত আরম্ভ করিল :—

"উঠ রাণি! ওই দেখ ভীম বাম করে
কোদণ্ড; টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম।
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী
কামিনী-রঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে।
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃপতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা, ওগো, শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্ত-কণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ! ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ রক্ষঃকুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে প্রমীলাসহ মেঘনাদ জননীর পাদ-বন্দনা করিতে গেলে, ত্রিজটা মহারাণী মন্দোদরীকে উহাদের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে—

"হে কৃত্তিকে হৈমবতি! শক্তিধর তব
কার্ত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন মোহিনী সতী—প্রমীলা সুন্দরী।"

মধুসূদনের রাবণের প্রথম আবির্ভাব যেমন বিরাট, তেমনি উত্তুঙ্গ। বিশালতায়, সমুন্নতিতে, মহিমায়, ঐশ্বর্য্যে ইহা যেন নগরাজ হিমাচলকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—

কনক আসনে বসে দশানন বলী
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি

সভাসদ, নত ভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, পীত, নীল স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরারে। ঝলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারু-লোচনা কিঙ্করী
ঢুলায় ; মৃণাল-ভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হর কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে।
ফেরে দ্বারে দৌবারিক ভীষণ মূরতি
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি
অনন্ত বসন্ত বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর যথা
বাঁশরী-স্বর-লহরী গোকুল-বিপিনে॥

কবির দৃষ্টিতে প্রাসাদ-শিখরে রাক্ষসপতি "কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন অংশুমালী" ; তাঁহার চক্ষে নিকষানন্দন—"শূরসিংহ"; রাবণ—"রাজ-রাজেন্দ্র"।

রাম ও লক্ষ্মণ সম্বন্ধে মধুসূদন নানাবিধ ভাল বিশেষণ প্রয়োগ করিলেও কবি-কল্পনার স্বাভাবিক উল্লাস ও স্ফূর্তি যে রাবণকে ও ইন্দ্রজিতকে অবলম্বন করিয়া, মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিলেই তাহার প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ চিঠিপত্রে কবি যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, কাব্য-সৃষ্টিতে তাহাকেই রূপদান করিয়াছেন।

নায়ক-চরিত্রের পরিকল্পনায় উভয় মহাকবির আদর্শের পার্থক্য মূলগত। একজনের আদর্শ নায়ক হইবেন গুণবান, বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাক্‌, ব্রতনিষ্ঠ, আত্মবান ও বিদ্বান। শারীরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা ও রূপ-লাবণ্যের চরমসীমা নায়ক-চরিত্রে দৃষ্ট হইবে এ-কথা বলিতে বাল্মীকি বিস্মৃত হন নাই। তবে তাঁহার লক্ষ্য দেহ হইতে দেহাতীতের প্রতি। নায়কের দৈহিক রূপ-লাবণ্য ও বীর্য্যবত্তা অপেক্ষা তাঁহার মানসিক ও আত্মিক সম্পদের পরিস্ফুটনের প্রতি বাল্মীকির দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ। নায়ক-চরিত্রকে বিভিন্ন সঙ্কট, মুহূর্ত্তে ফেলিয়া মহাকবি বাল্মীকি তাহার ধর্ম্ম-বীররসের দিকটিকেই উজ্জ্বল ভাবে দেখাইয়াছেন।

অপর দিকে যেখানে পার্থিব শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের অবাধ উল্লাস মধুসূদনের আকর্ষণ সেই দিকেই বেশী ; যেখানে মানবের অদম্য প্রবৃত্তি সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্নকে সদম্ভে অস্বীকার করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কবি-হৃদয় তাহাকেই পরম বিস্ময়ে ও গৌরবে বরণ করিয়া লইয়াছে। পরিপূর্ণ মানবত্ব যে দেহ ও আত্মার সম্যক বিকাশে গঠিত হয়—এ সত্য মধুসূদন গ্রহণ করেন নাই। সেই কারণে তাঁহার নায়ক রাবণ নানা গুণে ও ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত এক বিরাট পুরুষ হইয়াও সেই আধ্যাত্মিক সম্পদে বঞ্চিত, সেই বিশাল ধর্ম্মবুদ্ধি ও সুদৃঢ় সংযম হইতে বিযুক্ত, যাহার ফলে ধ্বংস ও শোকাবহ পরিণামকে অতিক্রম করিয়াও মানবাত্মার জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়—চরম শোকের মধ্যেও মনুষ্যত্বের পরম গৌরব দিব্য-দ্যুতিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকে। মধুসূদন আমাদিগকে অমোঘ নিয়তির নিষ্ঠুর পীড়নে প্রপীড়িত মানবের করুণ ক্রন্দন শুনাইয়াছেন, অকরুণ দৈবের নির্ম্মম আঘাতে মানুষের ঐশ্বর্য্য ও শক্তি কিরূপ ভাবে বিধ্বস্ত হয়, তাহার মর্ম্মবিদারী শাশ্বতচিত্র উপহার দিয়াছেন, মর্ত্ত্য মানবের বজ্র-কঠোর মানসিক শক্তি কুলধ্বংসী সর্ব্বনাশের মধ্যস্থলে ভ্রূক্ষেপবিহীন আত্ম-গরিমায় কিরূপ অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকে—তাহার ভীষণ মধুর আলেখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু যে আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের পরমতম সম্পদ, তাহার দিব্যরূপ অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্মীকির রামচন্দ্র মানবাত্মার মহান প্রকাশ, মধুসূদনের রাবণ মর্ত্ত্য-মানবের শাশ্বত ক্রন্দন। রস-সৃষ্টিতে কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন—নিজ নিজ উদ্দেশ্যে উভয়েই সার্থক। আমাদের বক্তব্য হইতেছে উভয়ের লক্ষ্য বিভিন্ন।

প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হইল? ভারতবর্ষ কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া যে রামচন্দ্রকে ভালবাসিয়াছে, পূজা করিয়াছে, বিশ্ব-স্রষ্টা ভগবানের সহিত অভিন্ন ভাবিয়াছে, পুত্র, ভ্রাতা, পতি ও নরপতি রূপে যে রামচন্দ্রের আদর্শ আজও জগতে অনতিক্রমনীয় হইয়া রহিয়াছে, মধুসূদন সেই রামচন্দ্রকে ভালবাসিতে পারিলেন না কেন? শুধু ভালবাসিতে পারিলেন না নয়···তাঁহাকে ঘৃণা করেন বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিলেন! কেন এমন হইল? খৃষ্টান ধর্ম্ম? বানর-সেনা? যুগ-প্রভাব? ইউরোপীয় সাহিত্য? ইহার সব কয়টিকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিলেও প্রশ্নের সম্যক সদুত্তর হয় বলিয়া মনে হয় না।

মেঘনাদবধের রাবণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন···

"মেঘনাদবধের' রাবণ বাল্মীকির রাবণ নয়। মেঘনাদবধের রাবণের অনুপ্রেরণার মূলে বায়রণের বিদ্রোহী নায়কগণ···আবার তাহাদের মূলে মিল্টনের শয়তান।"

মেঘনাদবধের রাবণের অনুপ্রেরণার এই একটি দিক ; আর একটি দিক তৎকালীন, মধুসূদনের সমকালীন সমাজবিদ্রোহের ভাব, এই আর্য্যদ্রোহী, অনাচারী, দুর্দ্দান্ত ঐশ্বর্য্যবান রাবণ-চরিত্রে তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজ আপনার প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া রাখিয়াছে, বস্তুতঃ সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী, হিন্দু কলেজের

বাঙালী ছাত্র, ডিরোজিওর ছাত্রগণ···প্রত্যেকেই এক একজন ক্ষুদে রাবণ ছিলেন। মধুসূদন সমাজের এই নূতন চৈতন্যকে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন বাঙালীর মানস-মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন; এই রাবণ-চরিত্রের মধ্যে বাঙালীর একটা সমগ্র যুগের ইতিহাস ভাস্বর হইয়া আছে।···

ইউরোপে রোমাণ্টিক কল্পনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূলতঃ বীভৎস, ভীষণ, রুদ্র, শয়তান চরিত্রে বিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।··· মধুসূদনের রাবণেও রোমাণ্টিক কবি-কল্পনার এই একই লীলা; রাবণ একাধারে বীভৎস-সুন্দর, ভীষণ-মধুর, দুষ্প্রাপ্য-লোভনীয়; সে কঠোরে কোমল, সে অশ্রুতে নির্ঘন, ভয়াগ্রহের বিষম ধাতুতে তাহার শরীর গঠিত।" [মাইকেল মধুসূদন : পৃঃ ১১-১২]

কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার শ্রীমধুসূদন গ্রন্থে মেঘনাদবধ কাব্যের মূল প্রেরণা ও তাহার নায়ক-চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন···

"মানব-ভাগ্য বা মনুষ্য-জীবনের রহস্য কবিকে একটি সহজ-সরল সংবেদনায় আবিষ্ট করিয়াছে, কোন গভীরতর আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্ন করে নাই।···ক্লাসিক রচনাভঙ্গি ও রোমাণ্টিক মনোবৃত্তি, মহাকাব্যীর কল্পনা ও গীতিকাব্যীর ভাবোচ্ছ্বাস, বিরাট ও বৃহত্তের প্রতি পক্ষপাত এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বল মানব-প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি···করুণ ও মধুরের বশ্যতা, এ সকলই এ কাব্যের রসপুষ্টি করিয়াছে।···প্রবৃত্তির নাগপাশ ও দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রে মানুষের ঐশ্বর্য্যের ও বলবীর্য্যের যে পরাজয়···আত্মবিশ্বাসী, অপ্রতিহত শক্তি, দিগ্বিজয়ী বীরের নিয়তি-নিহত মূর্ত্তির যে আরক্তিম দীপ্তি···মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাগরোর্ম্মিদল মানবজীবনের অন্ধকারময় সৈকতে আছাড়িয়া পড়িয়া তাহারই নৈশ-সঙ্গীতে উদ্বেলিত হইয়াছে।" [কবি শ্রীমধুসূদন : পৃঃ ৩৬-৩৭ ও ৫১]

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"মেঘনাদবধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, উহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই।···তিনি (মধুসূদন) স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।···এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য; ইহার হর্ম্মচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে···যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনক্রমেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চাহে না, বিদায়কালে কাব্য-লক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" [সাহিত্য]৭

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত মন্তব্য গ্রহণ করিয়া মোহিতলালও বলিয়াছেন—"এ কাব্যের মূল প্রেরণা ছিল ইহাই—রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি পক্ষপাত এই কারণেই ঘটিয়াছে।

[কবি শ্রীমধুসূদন]

কিন্তু তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায়—এই কাব্যের মূল প্রেরণা কেন এই "ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের" দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল?" "আত্মবিশ্বাসী, অপ্রতিহতশক্তি দিগ্বিজয়ী বীরের নিয়তি-নিহত মূর্ত্তির আরক্তিম দীপ্তি রচনাই যদি মহাকবির উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে সমগ্র রামায়ণে রামের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত ত আর ছিল না! মহাভারতের ভীষ্ম ও কর্ণ কেন আমাদের মহাকবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হলেন না? বিশাল ও সম্পন্ন পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে চেষ্টা করিলেই কবি বহুতর উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কেন তাঁহার সমগ্র সহানুভূতি ও কবি-কল্পনার বিচিত্র উল্লাস রাবণ-চরিত্রকেই কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল?"

রাবণচরিত্র-পরিকল্পনায় সমসাময়িক যুগ ও রোমাণ্টিক কবি-কল্পনার প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা আংশিক সত্য। মধুসূদন যে যুগের সৃষ্টি—মধুসূদনের বন্ধু ভূদেব ও রাজনারায়ণ এবং মধুসূদনের পরম হিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই যুগেরই সৃষ্টি; মেঘনাদবধ কাব্য যে কালের রচনা, তাহারই সমসাময়িক রচনা হইতেছে সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, 'একাল ও সেকাল' সুতরাং যুগমানস রাবণচরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিলে সমগ্র সত্য বলা হয় না। আর রোমাণ্টিক কবি-কল্পনা যে অন্য চরিত্রেও স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারিত—বীরঙ্গনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার জন্য রাবণ-চরিত্রকেই গ্রহণ করিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজন ছিল না।

বস্তুতঃ মধুসূদনের রাবণ-চরিত্র পরিকল্পনায় রোমাণ্টিক কবি-কল্পনা, ইউরোপীয় সাহিত্য সমসাময়িক কবি, মানবভাগ্যের নিয়তি-নিহত মূর্ত্তি-রচনার ইচ্ছা ইত্যাদির প্রভাব স্বীকার করিয়াও মন যেন বলে—ইহ বাহ্য, আগে কহ আর। আশ্চর্য্যের কথা—সেই আগের কথাটি—সেই গোড়ার কথাটি এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ বলেন নাই। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের কথা স্বীকার করিয়াও অন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন।

'মধুসূদনের অন্তর্জীবন' গ্রন্থে কবি-সমালোচক শশাঙ্ক মোহন সেন মহাশয়, সরস্বতীর সাধনাকে ছাড়িয়া লক্ষ্মীর আরাধনার চেষ্টাকে মধুসূদনের জীবনের বিনষ্টির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশী মহাশয়ের ধারণাও অনুরূপ। আমাদের বিশ্বাস, মধুসূদনের জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুটিকে তাঁহারা সঠিকভাবে ধরিতে পারেন নাই। অর্থের আকাঙ্ক্ষা মধুসূদন চিরদিনই করিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মীর সাধনা কখনও করেন নাই। Michael M.S. Dutt, Esq. of the Inner Temple, Barrister-at-Law হইতে গিয়াও তিনি সারস্বত সাধনাতেই নিমগ্ন হইয়াছিলেন। বিদেশে ঋণদায়ে আসন্ন কারাবরণ উপেক্ষা করিয়া এবং অনশনক্লিষ্ট পত্নীর

ও শিশুসন্তানদের ম্লান মুখগুলি বিস্মৃত হইয়া তিনি তন্ময়-চিত্তে সারস্বত কুঞ্জে বিহার করিয়াও জীবনের সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি ভুলিয়া থাকিতেন। মাতৃভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন ভাষা শিক্ষা করিতেন। ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াও লক্ষ্মীলাভের উদ্দেশ্যে মোকর্দ্দমা জয়ের কৌশল-শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। প্রমথবাবুর মন্তব্য—"এক পথে তাঁহার সাধনা, অন্য পথে কৃতার্থতা"—(মাইকেল মধুসূদন : পৃঃ ৪৩) আর যাঁহার পক্ষে সত্য হউক—মধুসূদনের পক্ষে নিশ্চয়ই সত্য নহে। যে পথে তাঁহার সাধনা, তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান, তাঁহার নিষ্ঠা-সেবা, সেই সারস্বত সাধনার পথেই তাঁহার সিদ্ধি ও কৃতকৃতার্থতা লাভ হইয়াছে।

মধুসূদনের মহতী বিনষ্টির কারণ রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের কাব্য-বিচার প্রসঙ্গে প্রায় ঠিকই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভ"। আমরা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে চাই, এই মহতী বিনষ্টির মূলে আছে—ধর্ম্মদ্রোহী অসংযম। দম্ভ এই সংস্কারগত অসংযমের বহিঃপ্রকাশমাত্র। এই অসংযম মধুসূদন ও রাবণ উভয় চরিত্রেই বিদ্যমান। "যাহা চায় তাহার জন্য" "যে শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে চায় না,...যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনক্রমেই হার মানিতে চাহে না"—মধুসূদন ও রাবণ সেই অসংযত মহাশক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ। উভয়ে পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। তাই এক জনকে দেখিয়া আর একজনের হৃদয়ে আবেগ উত্তাল হইয়া উঠে—যেমন পৌর্ণমাসী চন্দ্রের আকর্ষণে সাগর-হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ যুগধর্ম্ম, রোমান্টিক কল্পনা ও ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব সত্ত্বেও কবির সংস্কারের গভীরে যদি রাবণের সহিত তাঁহার ভাবসাম্য না থাকিত, এই অদম্য ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অপ্রতিরোধ্য অসংযম কবি-সত্তার গভীরতম প্রদেশে যদি বাসা বাঁধিয়া না থাকিত, তাহা হইলে কিছুতেই নায়ক-চরিত্র কল্পনাকালে মধুসূদন রাবণকে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে রাবণ ব্যতীত আরও অনেক অসংযত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র ছিল—কবি তাহাদের একটিকে গ্রহণ করিলেন না কেন? কারণ এই যে, শুধু ত অসংযম নহে—শক্তিতে ও ঐশ্বর্য্যে, গুণ-গরিমায় ও বিশালতায় এই চরিত্রকে মহিমান্বিত হইতে হইবে। মহাশক্তির সহিত মহৎ অসংযমের সম্মিলনে যে চরিত্র প্রদীপ্ত তাহার পরিণাম যতই ভয়াবহ হউক, কেবলমাত্র সেই চরিত্রই মধুসূদনের কল্পনাকে উজ্জীবিত করিতে পারে। সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যে একমাত্র রাবণ-চরিত্রেই অনুরূপ সম্মিলন ঘটিয়াছে এবং সেই কারণেই রাবণই মধুসূদনের উপজীব্য—আর কোন চরিত্র নহে।

বাল্মীকির রামায়ণেও আছে যে, হনুমান রাবণকে প্রথম দেখিয়া তাঁহার শক্তিতে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন :

> অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
> অহো রাক্ষস-রাজস্য সর্ব্বলক্ষণ যুক্ততা॥
> যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
> স্যাদয়ং সুরলোকস্য স শক্রস্যাপি রক্ষিতা॥

রূপে, ধৈর্য্যে, সত্ত্বে ও দ্যুতিতে সুরলোক ও বাসবের রক্ষয়িতা হইবার যোগ্য যে রাবণ—অথচ অধর্ম্মাশ্রয় জন্য যাঁহার সবকিছুই ব্যর্থ হইল—তিনিই মধুসূদনের কবি-কল্পনার অধিকারী হইবার উপযুক্ত—অন্য কেহ নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার নিগূঢ় কারণ কবির নিজ স্বভাবেই আছে। বীর্য্যে রূপে, সহনশীলতায়, দ্যুতিতে, শক্তিতে, প্রতিভায়, ঐশ্বর্য্যে, মহিমায়, মধুসূদনের মত তাঁহার সমসাময়িক কালে কেন—পরবর্ত্তী কালেই বা কয়জন ছিলেন? বিধিদত্ত যে শক্তির অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সংযত সাধনায় তাহার অনুশীলন করিলে তিনিও ত্রিলোককে বিমোহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু রাবণের মতই অসংযমের অধর্ম্ম তাঁহার চরিত্রের কেন্দ্রমূলে অবস্থান করিয়া তাঁহার সর্ব্ব সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাঁহাকে সার্থক করিবার জন্য তাহার আত্মীয়-বন্ধুগণের সর্ব্বপ্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে বিফল করিয়া দিয়াছে।

বস্তুতঃ রাবণের সহিত মধুসূদনের চরিত্রের একটি নিগূঢ় অথচ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রতিভাশালী, উভয়েই শক্তিধর, উভয়েই নানাগুণে বিভূষিত ও প্রাণরসে উচ্ছসিত, উভয়েই জ্ঞানবান অথচ উভয়েই অমোঘ মানবীয় দুর্ব্বলতার দাস। ত্রিলোকজেতা রাবণ জানিতেন পরস্ত্রী অপহরণ করা পাপ, কিন্তু যে রামলক্ষ্মণ তাঁহার রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার ভগ্নীকে অপমানিত করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা করিবেন কিরূপে? জগতের অধিকাংশ নারী-সৌন্দর্য্য যিনি অপহরণ করিয়া উপভোগ করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের ললামভূতা সীতাকে অঙ্কশায়িনী করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তিনি দমন করিবেন কি ভাবে? সুতরাং রাবণ বিদ্যাবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিলেন, বিচার-বিবেচনাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলেন, প্রবৃত্তির প্রেরণায় "জলন্ত পাবক শিখার" দিকে ছুটিয়া গিয়া সবংশে ধ্বংস হইলেন। মধুসূদনের জীবনও অনুরূপ, তাঁহার সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত শিক্ষা, সুতীব্র প্রবৃত্তির পাদমূলে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি উল্কাপিণ্ডের মত ছুটিয়া চলিয়াছেন ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকে। পিতার আদেশ, মাতার ক্রন্দন, বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ, হিতৈষীবর্গের উপদেশ কিছুই এই 'মদ-কল করী'কে বাঁধিতে পারে নাই, 'আশার ছলনে' বিভ্রান্ত করিয়া নিজ হৃদয়ের অন্ধ আবেগ ও অসংযত কামনা জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সর্ব্বনাশা পরিণামের দিকে উল্কাবেগে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

যে শক্তি ও প্রতিভা সংযমে শৃঙ্খলিত হইলে পরিণাম সুন্দর সফলতা লাভ করিয়া সকলের আনন্দবিধান করিতে পারিত, তাহা হৃদয়বিদারণকারী নিদারুণ শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—কাব্য দুই প্রকার, এক প্রকার কাব্যে থাকে কবির self-vision ও, অন্য প্রকার কাব্যে থাকে কবির

world-vision। মধুসূদনের মহাকাব্যে কিন্তু self-vision-এর সহিত world vision-এর সমন্বয় ঘটিয়াছে। মধুসূদনের কবি-মানস শক্তির বিশালতায় মহাকাব্য রচনায় উপযুক্ত ছিল, তাই কবি মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু কবি একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশের medium খুঁজিতেছিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন এমন একটি চরিত্রকে যাহা একই সঙ্গে মহাকাব্যের নায়ক হইয়া মানবসাধারণের নিয়তি-নিহত মূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলিবে অথচ কবির ব্যক্তিজীবনেরও প্রতিনিধি হইবে। আত্মজীবনের সহিত মানব-সাধারণের ভাগ্য-বিড়ম্বিত রূপটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এই বিদগ্ধ কবি একই সূত্রে লিরিক ও এপিক কাব্যের মালা গাঁথিয়া মেঘনাদ-বধ রচনা করিলেন, "সপ্তদিবানিশি" ব্যাপিয়া লঙ্কাপুরীর যে বিষাদ-ক্রন্দন, তাহার মধ্যে, কান পাতিলে, মানবসাধারণের ক্রন্দনের সহিত কবির ব্যক্তিজীবনের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনিও শোনা যাইবে।

বাল্মীকির মত মধুসূদন কি রামচন্দ্রকে নিজ কাব্যের নায়ক করিতে পারিতেন না? কখনই নহে। কারণ রামচন্দ্র সংযত বীরধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি আর মধুসূদন অসংযত শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ, শক্তিকে যে শৃঙ্খলিত করিতে হয় এ সত্য মধুসূদন হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, চ্যবন ঋষির দস্যুপুত্র তিক্ত অভিজ্ঞতায়, কঠোর সাধনায় তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হিংস্র ও অসংযত শক্তিকে নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধনায় বশীভূত করিয়া তিনি দম ও তিতিক্ষার শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—উচ্ছৃঙ্খল শক্তির বিস্ফারিত লীলাবিলাস নিজের ও অপর সকলের পক্ষে সর্ব্বনাশের ও দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র জীবনে এই সত্যকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই কারণেই যেখানে বাল্মীকি চাহিয়াছেন—আত্মবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাক্য, দৃঢ়ব্রত রামচন্দ্রকে, সেখানে মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন অধর্ম্ম ও অসংযমের মূর্ত্ত বিগ্রহ অলৌকিক শক্তিশালী রাবণকে। উভয় কবির পক্ষেই এইরূপ বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। কেন না কোন মানুষই নিজ স্বভাব, সংস্কার ও সাধনাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। "যে অটলশক্তি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনক্রমেই হার মানিতে চাহে না," "যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চাহে না"—রাবণ ও মধুসূদনের জীবনের অধিদেবতা হইতেছে সেই অসংযত শক্তি। Milton-এর শয়তানের "To be weak is miserable—doing or suffering" মধুসূদনকে প্রভাবিত করিয়াছে এই কারণে যে, ইহা মধুসূদনের তথা রাবণের মর্ম্মবাণী। Milton-এর প্রভাব বহিরঙ্গের। মধুসূদনের অন্তরে যে অসংযমের ও শক্তির স্পর্দ্ধা সংস্কারগত হইয়া অবস্থান করিতেছিল, ইহা তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছে মাত্র।

পূর্ব্বে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে আছে, "যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্দ্ধাভরে কিছুই মানিতে চাহে না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" উদ্ধৃত বাক্যে রামচন্দ্রের সম্বন্ধে ইঙ্গিতটি অতি সুস্পষ্ট। মধুসূদন রাম-চরিত্রকে যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য সুপ্রযুক্তই হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য হইতেছে—মধুসূদন বাল্মীকির রাম-চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণাই করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, রাবণের তুলনায় রামচন্দ্র শক্তিতে হীন। নানা সঙ্কট মুহূর্ত্তে এই ধীরোদাত্ত বীরচরিত্রটি যে দৈহিক ও আত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা, শান্ত ও সুশীতল বলিয়া, মধুসূদনের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; যুদ্ধজয়ের মধ্যেও বাক্যের ঘনঘটা ও আত্মঘোষণায় মেঘাড়ম্বর ছিল না বলিয়া রামচন্দ্রের বীর্য্য ও রণনৈপুণ্যের দিকটিও মধু-চিত্তকে তেমন ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে—এরূপ চরিত্রের সহিত মধুসূদনের আত্মার সদ্ভাব নাই। পিতৃ-সত্য পালন করিবার জন্য যৌবরাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করিতে হয়—এ শিক্ষা মধুসূদন লাভ করেন নাই—সুতরাং ইহার মহিমা বুঝিতে তিনি অসমর্থ; প্রজানুরঞ্জনের জন্য প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এ ধারণা মধুসূদন করিতে পারেন নাই, সুতরাং রাজা রামের বেদনা-নিপীড়িত বীর মূর্ত্তির গৌরব উপলব্ধি করিতে তিনি অক্ষম; সত্যরক্ষার জন্য প্রাণাধিক ভ্রাতাকেও বর্জ্জন করার বজ্রাঘাত শির পাতিয়া গ্রহণ করিতে হয় সত্যাগ্রহীর এই সুকঠোর বীর মূর্ত্তির দিব্য বিভায় হৃদয় আলোকিত করার শক্তি মধুসূদনের ছিল না; এ সমস্তই তাঁহার ধারণাতীত, যাঁহার সমগ্র জীবনের গতি হইতেছে, অপরের ইচ্ছাকে সম্মান দেখান নয়, নিজ ইচ্ছাকে অনুসরণ করার দিকে, তাহাতে পরিণাম যাহাই হউক, যাঁহার প্রতি শোণিতবিন্দুতে স্বেচ্ছাচারিতা সুতীব্র বেগে প্রবাহিত তিনি আদর্শপুরুষ রামচন্দ্রকে ভালবাসিবেন কিরূপে? অতি সঙ্গত ভাবেই তাঁহার আদর্শ হইবে অপর এক দুর্দ্দম স্বেচ্ছাচারী রাক্ষস-রাজ রাবণ। রাবণ-চরিত্রেই তিনি আত্মার আত্মীয়কে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। সেই কারণেই তাঁহার সদম্ভ ঘোষণা—

"I despise Rama and his rabble, but the idea of Ravana kindles and elevates my imagination. He was a grand fellow."

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার সাদৃশ্য বড় কৌতূহলজনক। রাবণের জন্মকাহিনী রামায়ণে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী পিতার আদেশ অনুসারে বিশ্রবা মুনির নিকট গমন করিবার পর .

স তু জ্ঞাত্বা মুনির্ধ্যানে বাক্যমেতদুবাচ হ।
বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্।
সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি॥
দারুণায়ান্তু বেলায়াং যস্মাত্ত্বং মামুপস্থিতা।
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি।

দারুণান্ দারুণাকারান্ দারুণাভিজন-প্রিয়ান্।
প্রসবিষ্যসি সুশ্রোণি, রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ।

(মুনি ধ্যান করিয়া কন্যার মনোগত ইচ্ছা জানিতে পারিয়া বলিলেন, হে কন্যে বুঝিলাম, তুমি আমা হইতে পুত্রলাভের ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছ। এই দারুণ বেলায় আগমন হেতু তোমার সন্তানেরাও দারুণ, দারুণাকার ও দারুণ জনপ্রিয় ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস হইবে)।

সংযমী ঋষি পিতা ও অসংযতা ইন্দ্রিয়পরায়ণা মাতা—উভয়ের মিলনে রাবণের জন্ম। সে কারণে তিনি অলৌকিক শক্তি ও বিভূতির অধিকারী হইয়াও সংযমবিহীন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। অপর দিকে মধুসূদনের মাতা জাহ্নবী দেবী সুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাবতী কিন্তু পিতা রাজনারায়ণ বাক্যে ও ব্যবহারে নিতান্ত অসংযত। উভয়ের সন্তান মধুসূদনের মধ্যেও দেখা যায় অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তির সহিত রহিয়াছে অদম্য উচ্ছৃঙ্খলতা। বিধাতার কোন দুর্বোধ্য বিধানে জানি না রাবণ ও মধুসূদন একই Heredity-র উত্তরাধিকারী হইয়া জীবনে ও পরিণামে একই ভয়াবহ সমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঋষি-কবি রচনা করিয়াছেন রামায়ণ—সুতরাং তাঁহার নায়ক হইয়াছেন পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র; মানব-কবি রচনা করিয়াছেন মেঘনাদবধ; সুতরাং তাঁহার নায়ক হইয়াছেন শক্তিশালী অথচ প্রবৃত্তিপরায়ণ রাবণ। পুরুষোত্তম হইলেও শ্রীরামচন্দ্র মানুষ; আবার অসংযত প্রবৃত্তির যূপকাষ্ঠে আত্মদান করিলেও রাবণও মানুষ। সেই কারণে উভয় নায়কই মানবভাগ্যের যাহা সাধারণ পরিণাম, সেই মহা নিষ্ফলতায় বিলীন হইয়াছেন। কিন্তু সেই মহা নিষ্ফলতার মধ্যেও ঋষি-কবির নায়ক যেখানে মানবমহিমার চির-ভাস্বর হিরণ্যদ্যুতি রাখিয়া গিয়াছেন, মধুসূদনের নায়ক সেখানে মহাশূন্যতার উপকূলে বসিয়া মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছেন।

দিন ফুরানোর গান

শ্রীকালিদাস রায়

পাখীরা সব চঞ্চুপুটে আহার বয়ে ফিরছে নীড়ে।
পাটনী শেষ খেয়া বেয়ে নৌকা ভিড়ায় নদীর তীরে।
তপন আপন দিনের পাড়ির শেষে নামে অস্তাচলে।
হাটের শেষে হাটুরেরা ঘরের পানে ধায় সকলে।
দিনের পূজা সমাপিয়া দেউলে শাঁখ ঘণ্টা বাজে,
আমার শুধু দিন ফুরাল হায় অকাজে।

গন্ধরাশি বিলিয়ে দিয়ে বৃন্তে কুসুম পড়ছে ঢুলে,
দিনের কর্ম্ম সেরে বধূ প্রদীপ জ্বালে তুলসী মূলে।
শ্রমিকরা কারখানা থেকে ফিরছে ডেরায় মলিন গায়ে,
ফিরছে চাষী লাঙল কাঁধে বলদ নিয়ে ক্লান্ত পায়ে।
ভিখারীরা ঝোলার চাউল দেখছে মেপে কতটা যে।
আমার শুধু দিন ফুরালো হায় অকাজে।

ধরার কর্মক্ষেত্র থেকে হয়ে গেছে আমার ছুটি,
সারাটা দিন কী যে করি হাই তুলি আর বসি উঠি।
কাজ যে হাতে মস্ত বড়, সেই কথাটা ভুলে থাকি,
যেতে হবে অনেক দূরে, আয়োজন তার সবই বাকি।
চমকে উঠে করছি স্মরণ কাণ্ডারীরে আজকে সাঁঝে,
আমার শুধু দিন ফুরালো বৃথা কাজে।

রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রকটা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। ফ্রকটাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রকটা দেখলো তারপর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রকটা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমতন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রকটা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রকটা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রকটা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি? "ফ্রকটার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এমন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধমকালো—" তোর মাথা খারাপ

হল নাকি' এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস। "মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রক্টা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।"

ফ্রক্টা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি।"

"এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো, "কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"

আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?"

"আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামা-কাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দেখ, একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্ব্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

তক্ষুনি আমি একটা সানলাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার স্তূপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রকটা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ্‌ পরিয়ে দিলাম।

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই

S/P. 3 B-X52 BG
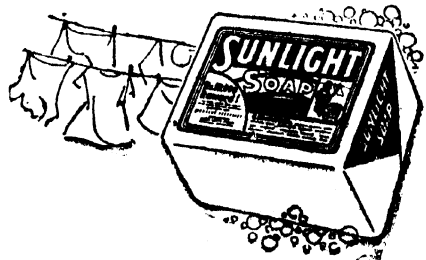
রবীন্দ্র-পরিচয়-গ্রন্থপঞ্জী

ভাদ্র ১৩৬৪ — শ্রাবণ ১৩৬৬

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সঙ্কলিত

রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠকদিগের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত এই তালিকায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গত দুই বৎসরে যে-সকল আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উল্লেখের প্রযত্ন করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে এইরূপ সূচী 'দেশ' পত্রে তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে— ২৩ বৈশাখ ১৩৬২, ১৯ শ্রাবণ ১৩৬৩ ও ২৫ শ্রাবণ ১৩৬৪। শ্রীসুবিমল লাহিড়ী বর্তমান তালিকা প্রণয়নে সঙ্কলয়িতাকে সাহায্য করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবনী

অমিতা মিত্র। রবীন্দ্র-কাব্যালোক। এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। কার্তিক ১৩৬৪। পৃ [।০]+২২২। মূল্য পাঁচ টাকা।

সূচী। রবীন্দ্রনাথ, মানবসাধক, আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ, রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখানুভূতি, লীলাসঙ্গিনী, বৈষ্ণবপ্রভাব, সৌন্দর্যানুভূতি, সৃষ্টির স্বরূপ, নারী ও প্রেম, বর্ষার ভাবব্যঞ্জনা, মৃত্যুর স্বরূপ, উৎকণ্ঠিতা, মিলন ও বিরহ, অভিসার, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের মহুয়া। শান্তি লাইব্রেরী। আষাঢ় ১৩৬৫। পৃ [।০]+২২০+।০। মূল্য পাঁচ টাকা।

সূচী। উপক্রম, উজ্জীবন, বসন্ত, অপরাজিত, সবলা, নাম্নী, ছায়ালোক, বিরহ, পরিশেষ।

অশোক সেন। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং। মাঘ ১৩৬৪। পৃ ১৲+২৯৮। মূল্য ছয় টাকা।

সূচী। প্রথম খণ্ড: নাট্যসাহিত্য, বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা, রাজা ও রানী, বিসর্জন, মালিনী, শেষরক্ষা, বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, গৃহপ্রবেশ, শোধবোধ, বাঁশরী।

দ্বিতীয় খণ্ড: সাঙ্কেতিকতা, রবীন্দ্রনাট্যে সাঙ্কেতিকতা, শারদোৎসব, পরিত্রাণ, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, ফাল্গুনী, মুক্তধারা ও রক্তকরবী, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, কবির দীক্ষা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ।

আদিত্য ওহদেদার। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা। এভারেষ্ট বুক হাউস। ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬। পৃ [৵০]+৩২১। মূল্য সাত টাকা।

'বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার আদি বিকাশ থেকে হাল-আমল পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। হাল-আমলের সীমা হল বাংলা তেরশ বাট সন পর্যন্ত। এই ইতিবৃত্ত মারফৎ বিগত সত্তর-আশী বৎসর ধরে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে দেশের সুধীজনচিত্তের প্রতিক্রিয়া তথা রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার অভিব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা সুবিধে হবে।' —গ্রন্থকারের নিবেদন।

জীবনবল্লভ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যপরিচয়। প্রকাশক নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ১৫।২ একডালিয়া প্লেস। ১৯৫৯। পৃ [।০]+৯৪। মূল্য দুই টাকা।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। রক্ত-করবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য। মডার্ণ বুক এজেন্সি। ১৮ জানুয়ারী ১৯৫৯। পৃ [8]+।০+৬৭।

সূচী। উপক্রমণিকা, মানসিক পটভূমিকা, বস্তু-চেতনার ক্রমবিকাশ, সূচনা ও পরিবেশ, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও তার রূপায়ণ, স্থান-কাল-পাত্র, নন্দিনী-রক্তকরবী-রঞ্জন, রক্তকরবীর রাজা, সঙ্কেতের নির্দেশ, নাটকের রচনারীতি ও তার তাৎপর্য, গ্রন্থ-নির্দেশিকা, প্রবন্ধ-নির্দেশিকা।

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। দরদী রবীন্দ্রনাথ। দিলরুবা পাবলিকেশনস, ৩ প্যারীদাস রোড, ঢাকা। নবেম্বর ১৯৫৫। পৃ [২], +।০+১১২। মূল্য এক টাকা।†

সূচী। রবীন্দ্রনাথ ও শাহজাদপুর, দরদী রবীন্দ্রনাথ, ভৃত্যের না দেখা পাই প্রান্তে, লাল মিঞার কাণ্ড, শিশুপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ, যম রাজার সঙ্গে হাউ ডু ডু, ফুল, মোমিন মিঞার প্রভুভক্তি, এনাত আলীর বাহাদুরী, পোষ্ট মাষ্টার, রামগতির ঋণমুক্তি, প্রজাপালক রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ, উৎসাহদাতা রবীন্দ্রনাথ, গোপাল সার ঘাট, মানুষ রবীন্দ্রনাথ, 'ছুটি' গল্পের গোড়াপত্তন।

বিভাস রায় চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী। মডার্ণ বুক এজেন্সি। মাঘ ১৩৬৫। পৃ ৮০। মূল্য দুই টাকা।

সূচী। আধুনিক সাহিত্যে দুর্বোধ্যতা, রক্তকরবী কি দুর্বোধ্য?

---

† পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি সংগৃহীত না হওয়ায় পূর্বমুদ্রিত তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই। ফরিদপুর হইতে শ্রীরবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী এই বইটির প্রতি সঙ্কলয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ও একখণ্ড বই পাঠাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাবনা, নাটক ও নাট্যাভিনয়, রক্তকরবীর কাহিনী, মর্মকথা ও পরিকল্পনা, আঙ্গিক, চরিত্র-সৃষ্টি, রক্তকরবী কোন শ্রেণীর নাটক, রক্তকরবীর ট্র্যাজিডি, রক্তকরবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য, মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য, রক্তকরবীর নামকরণ, 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে', রক্তকরবীতে প্রকৃতি-প্রেম, রক্তকরবী নাটক কি আধুনিক ?, রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে শিল্পকলা, রক্তকরবীতে হাস্যরস, রবীন্দ্রনাট্যাবলীর তালিকা।

বিমলকান্তি সমদ্দার। রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। আশ্বিন ১৩৬৫। পৃ [২]+৪+১৷০+২১৪। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

"আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের গঠনেই কালিদাসের সহিত স্বাভাবিক ঐক্য ছিল, এই কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের কবিবর্গের মধ্যে তিনি কালিদাসের দ্বারাই সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন।...উভয় কবির মানসসাদৃশ্য আমরা দেখিয়াছি শব্দ-প্রয়োগে, চিত্র-কল্পনায়, জীবনের আদর্শের অনুচিন্তনে, ভাববিলাসে, অলঙ্করণ-পারিপাট্যে, প্রত্যভিজ্ঞাশ্রয়ী ভাবের রোম্যান্টিক বিষাদে ও অতীতমুখিতায় ; বৈসাদৃশ্য দেখিয়াছি কাব্যের গঠনে— যে-বৈসাদৃশ্য উভয়ের কাব্যে স্বাভাবিক, কারণ একজনের রীতি স্থপতিসুলভ...অপরের গীতিকাব্যসুলভ...।... সর্বোপরি আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা কোথাও এই প্রভাবের ফলে আচ্ছন্ন হয় নাই।" —গ্রন্থকারের 'মুখবন্ধ'। পরিশিষ্টে 'কালিদাস ব্যতীত লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের অপরাপর কবিগণের প্রভাব আলোচিত।

মনোরঞ্জন জানা। রবীন্দ্র-নাটকের ভাব-ধারা। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং। পৌষ ১৩৬৫। পৃ [।০]+২২০। মূল্য ছয় টাকা।

সূচী। প্রকৃতির প্রতিশোধ, মালিনী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী, রক্তকরবী, গৃহপ্রবেশ, তপতী, বাঁশরী।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম। নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস। বৈশাখ ১৩৬৬। পৃ ১৩২+[৵০]। মূল্য তিন টাকা।

সূচী। বাংলা সাহিত্যে প্রেম, রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা-সাহিত্যে প্রেমের রূপ, প্রেম-সম্পর্কে রবীন্দ্র-আদর্শের স্বরূপ, রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রেমসাহিত্যের সূচনা।

রেণু মিত্র। রবীন্দ্র-হৃদয়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। অক্টোবর ১৯৫৮। পৃ [১২]+২৫৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

সূচী। [নাটক] নটীর পূজা, ফাল্গুনী, বাঁশরী, চিত্রাঙ্গদা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ঋণশোধ, রক্তকরবী, [উপন্যাস] শেষের কবিতা, যোগাযোগ, গোরা, চতুরঙ্গ, মালঞ্চ ; [গল্প] ক্ষুধিত পাষাণ, এক রাত্রি ; [বিবিধ] নারীর মুক্তি, নূতন কথা, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের শিশু-শিক্ষা, পঁচিশে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের 'উজ্জ্বল ভারত', যুগ্মসত্তা, প্রকাশের পথে, রবীন্দ্র প্রয়াণে।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে। আনন্দ পাবলিশার্স। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬। পৃ [।০]+১৫৪। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জমিদারিতে পল্লী-উন্নয়নের যে-সকল উদযোগ করিয়াছিলেন স্মৃতি ও শ্রুতি হইতে তাহার বিবরণ। প্রসঙ্গক্রমে কুশীলবদিগের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠিও আচার্য্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সূচী। পল্লীসংগঠনের প্রথম পর্ব, জমিদারী পরিচালনা, স্বদেশী মেলা, ম্যানেজার এডওয়ার্ড সাহেব, তাঁতের কারখানা। অজ্ঞাত-বাসের সঙ্গী, কালী চক্রবর্তী, মেহের সর্দার, মুন্সীবাবু, আনন্দ ব্যাপারী, জানকী রায়, কুঠীবাড়ীর গৃহস্থালী। জমিদারীর আমলা, লৌকিক ব্যবহার, কেরাণীগিরি, কালীগ্রামে শেষবার, জীবিত ও মৃত। দেবী মৃণালিনী, লরেন্স সাহেব, জাপানী মিস্ত্রীর বৌ, ভুই লাল। কল্যাণ রায়, যুগল শা, খোরসেদ ফকির, শিলাইদহ কুঠীবাড়ী, শিলাইদহে শেষবার।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-স্মৃতি। শিশির পাবলিশিং হাউস। পৌষ ১৩৬৪। পৃ [।০]+২৩৬। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সূচী। উদয়-রবির কিরণে, দিকে দিকে জাগে আলো, অরুণ-রথে জয়যাত্রা, কত পাখী গায় কত ফুল ফোটে জেগে ওঠে কত প্রাণ, কিশোর চিত্ত করিল অমৃত পান, রবীন্দ্রবিবেক, জোড়াসাঁকোর বাড়ীর আসর, পঞ্চাশত্তম বর্ষের উৎসব, গীতাঞ্জলি, বিদেশ ভ্রমণ, নোবেল পুরস্কার, সবুজপত্র, বিদেশ-ভ্রমণ, বিচিত্রার আসর, রবীন্দ্র-নাথ ও রাজনীতি, জাতিপ্রেম, আত্মমর্য্যাদাবোধ, য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, দিগ্বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ, তেজস্বী রবীন্দ্রনাথ, নানা কথা।

হেমেন্দ্রকুমার রায়। সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ২৫শে বৈশাখ ১৮৮১ শক। পৃ [।৵০]+১৪৯। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সূচী। বাংলা দেশে সৌখীন অভিনয়ের ধারা, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টত্ব, রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিনয়, নাট্যজীবনের ক্রমবিকাশ, নাট্যজগতের নূতন পথে, বিবিধ বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্র-সংগীত

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসংগীতের ভূমিকা। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৫। পৃ [৸০]+৮৫। মূল্য দুই টাকা।

সূচী। রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরবিন্যাস, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্যা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতা, ছোটদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ

অসিতকুমার হালদার। রবিতীর্থে। পাইওনিয়র বুক কোং। ১লা মাঘ ১৩৬৫। পৃ [।।০]+১৭৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

সূচী। শৈশব কথা, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগ, রবিদাদার ভাইবোন, বড়দাদা, মেজদাদা, জ্যোতিদাদা, সেজদাদা, সোমদাদা, এবং রবিদাদার কয়েকটি ভ্রাতুষ্পুত্র, শান্তিনিকেতন আশ্রম ও আমার বসবাস, নোবেল প্রাইজ, ওকাকুরা এবং কবি সম্বর্দ্ধনা, কবির সাধনা, কবির গান ও অনুপ্রেরণা, উইলি পিয়ার্সন ও এণ্ড্রুজ সাহেব, আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন, আশ্রমের দু'একটি কথা, রবিদাদার গয়া ও এলাহাবাদ যাত্রা, আশ্রমের অধ্যাপকগণ, বিশ্বভারতী এবং দেশ-বিদেশের অধ্যাপকগণ, আশ্রমের অতিথি অভ্যাগত, আশ্রম থেকে আমার রামগড় ও বাগগুহা যাত্রা, কবির নাট্যকলা, বিচিত্রার কথা, বিচিত্রার আনুষঙ্গিক কথা, বিচিত্রা সভার অভিনয়, বিচিত্রা সভার কালে আরও কথা, বিচিত্রার কালে আমার দুটি স্মরণীয় ঘটনা, আশ্রমে গবর্ণরদের শুভাগমন, ঘরোয়া ভাবে রবিদাদার সঙ্গ, আশ্রমের মাধ্যমে যাত্রীদের প্রথম দেশী আর্টের প্রচার, রবিদাদার আলমোড়া যাত্রা, শ্রীনিকেতন, শেষ বয়সে কবির ছবি আঁকা, রবিতীর্থ থেকে বিদায়ের পর, শেষ অঙ্কে, তিরোধান।

কবিতা

অবনী। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ স্মরণে। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৬। পৃ ৩২। প্রকাশক তারকচন্দ্র, ৭বি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

নিম্নলিখিত গ্রন্থের নূতন উপকরণ সম্বলিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ১৯৫৮। পৃ [।।০]+১৩২।

"রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে দুটি অপ্রকাশিত রচনা পরিশিষ্টে যুক্ত করা হল এবং লেখককে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিও খানকয়েক দেওয়া হল সেই সঙ্গে।"— নূতন সংস্করণের বক্তব্য।

পুনরাবৃত্তি

শ্রীহাসিরাশি দেবী

এবার কি বলে যাব। কি আছে বলার
মত—যা কেবল তোমার—আমার
মাঝখানে শুধু ঘুরে ঘুরে
বেজে রবে নতুনের সুরে।
সে সুরে কি চৈতালীর দিন,
হলুদ পাতার পথে ধীরে ধীরে
হবে না বিলীন
'আবার আসব' বলে। সে গানে কি ঘুমহারা রাত
জাগাবে না বহুদূরে আর কোন লালরঙা চাঁদ
নীল-বন-পারে। সে আলোর আমের বউলে,—
আর কোন্ রেণুগন্ধ উঠিবে না দুলে?

এবার কি বলে যাব। কি এমন কথা,
রাতের শিশির আর দিনের শুষ্কতা
নিয়ে হঠাৎ-হাওয়ার ছোঁওয়া লেগে,
মনের অতলে রবে জেগে!
সে জাগার পথে কোন হারানো ঠিকানা,
ছেঁড়া খাতা খুঁজে খুঁজে কোনদিন যাবে নাকি জানা
গোধূলি-ধুলোয়? আর কোন পলাশের বনে
পথহারা মন নিয়ে ঘুমাবে না কেউ অকারণে?

পুরানো এসব কথা; তবু কোন্ কথা বলা চাই,—
যা জান না। যা তোমায় বলা হয় নাই।

মরণও এড়ানো যায়

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

থাক্ সখা, থাক্ গহনা গড়ানো ;
জীবন-পথেই মরণ ছড়ানো ;
স্বর্ণ-কায়ারে কায়ায় জড়ানো
মুহূর্ত্তেকের মোহ ;—
মৃত্যুরে কেহ এড়াতে পারে কি
করিলেও বিদ্রোহ ?

২

থাকিবে না সখি, থাকিবে না মোটে ;
স্নেহ-বুদ্বুদ যতক্ষণ ফোটে ;
সূর্য্যেরও সোনা বুদ্বুদে লোটে ;—
ঠোঁটে ঠোঁটে ওঠে হাসি ।—
ক্ষণ-ভঙ্গুর স্বর্ণ-কায়ারে
এস আরও ভালবাসি ।

৩

থাক্ সখা; থাক্—সরাইখানায়
বালের গড়ানো কিছুতে কি যায় ?
সময়ের সাথে এঁটে ওঠা, হায়,
মুসাফিরে সে কি পারে ?
এ আসরে আর গীতি-ঝঙ্কার
শোভে কি গো বীণা-তারে !

৪

থাকিবে না সখি, থাকিবে না গান ;—
সরাইখানায় পরাণে পরাণ
ভেঙে পড়িবার তিল পরিমাণ
সময় যদি বা পায়,
আমরা দেখাব সে-প্রেম ঢালিয়া
মরণও এড়ানো যায় ।

মরমীয়া গান

শ্রীসজল বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে ভাবি কি হবে লিখিয়া,
এই ছন্দিত গীতিমালা ।
কি হবে আঁকিয়া শুভ্র পাতায়,
আমার মনের দুখজ্বালা ।
অনেক কিছুই পাইনি জীবনে,
অনেক কিছুই চেয়েছি হায় ।
কিবা হবে লাভ স্মরিয়া সে দুখে,
কি হবে রচিয়া কবিতা তায় ।
আজ বসে আছি বিষণ্ণ মনে,
ফুঁসিছে কান্না বক্ষ জুড়ে ।
সঞ্চিত দুখ-বহ্নি জ্বালায়
মোর মন প্রাণ যায় যে পুড়ে ।
কণ্ঠ ছাড়িয়া ক্রন্দিয়া দেখি,
মোর ক্রন্দন বেদনা হায় ।
ছন্দেতে ভরা চরণে, চরণে
লভিয়াছে রূপ সাদা পাতায় ।
এ ত গাথা নয় বেদনার মালা,
কোনদিনও আমি নহিকো কবি ।
মরম-বেদনা স্রষ্টা ইহার,
আমি শুধু আঁকি তাহার ছবি ।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড. কর্তৃক প্রস্তুত।
L/P. 2-X52 BG
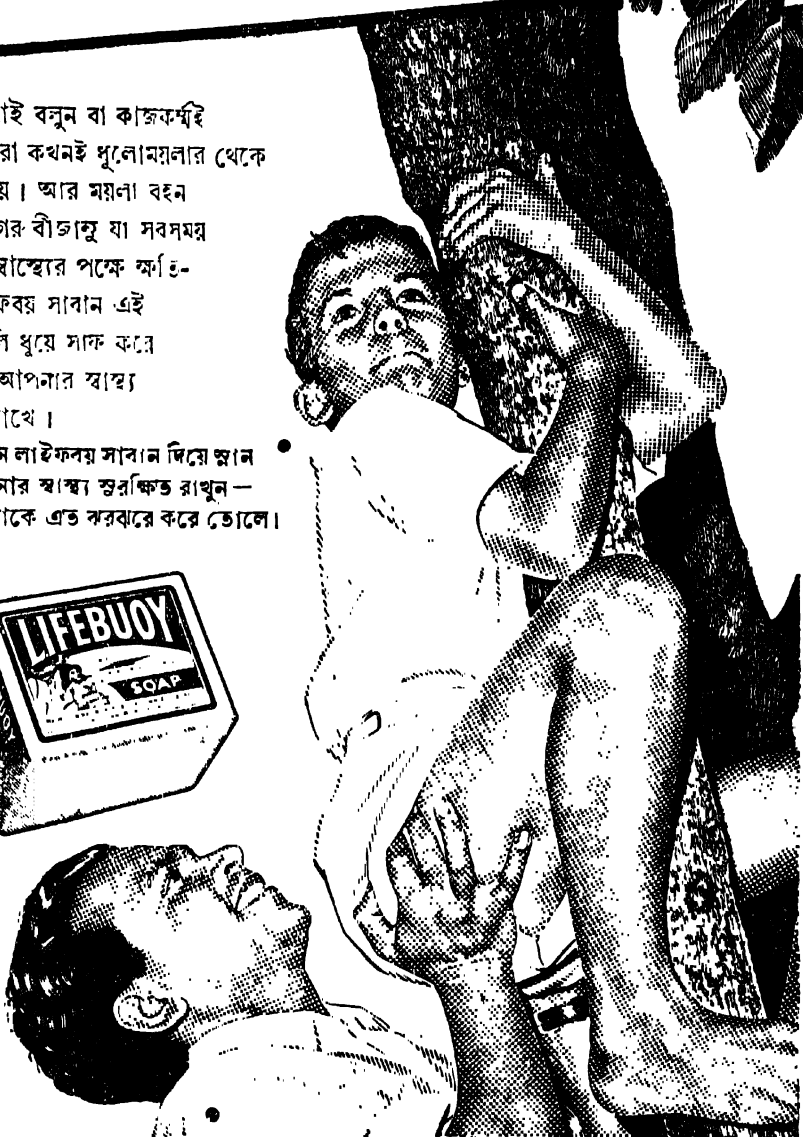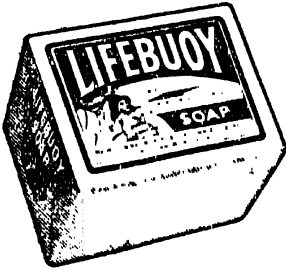
ময়নামতীর দীক্ষা

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

ময়নামতী বাঙালী রাজা মাণিকচাঁদের মহিষী। বর্ত্তমান পাকিস্থানের রংপুর জেলায় পাটিকা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ময়নামতীর পিতার নাম তিলকচাঁদ। দেশ-বিদেশে গীত-কীর্ত্তি গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের প্রতাপশালিনী মাতা ময়নামতীর ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং দুর্জ্জয় ব্যক্তিত্বও ছিল। দেশ-বিদেশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বাঙালী রাজা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের যে গৌরবগাথা সসম্মানে আদৃত হইয়া আসিতেছে, সেই গৌরবগাথার মূল তাঁহারই প্রতাপশালিনী মাতা ময়নামতী। গোপীচাঁদ ও তাঁহার মাতা ময়নামতী উপন্যাসের সৃষ্টি নহেন, ইঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

নাথ সাহিত্যে ময়নামতী সুপরিচিতা। বিভিন্ন পুস্তকে এই নাম বিভিন্ন আকারে দৃষ্ট হয়। যথা—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'ময়না' ও 'ময়নামতী', বুকানন সাহেবের রঙ্গপুর বিবরণে 'ময়নামতী', গ্রেজিয়ারের রংপুর বিবরণে 'মিনবতী', গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে দেখা যায় ময়নামতী বলিতেছেন—"পিতা-এ রাখিল নাম যুবুদ্ধি তারাই।" তারা+আই, আই অর্থ মাতা, অর্থাৎ তারা-মা। আবার ময়নামতী বলিতেছেন—"জোগ পথে হৈল নাম মত্রনামন্তি রাই।" গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে একাধিকবার ময়নামতীকে 'মুনি' বলা হইয়াছে, যথা—"মুনি বোলে গুপিচন্দ্র কেনে হও ভুলা। হাড়িকার চরণ শেব না করিও হেলা।" (৩১ পৃঃ)। ভবানী দাস নাম করিয়াছেন—"শিশুমতী আই।"

"বাপ মাত্র নাম থুইল শিশুমতী আই।
গোর্খ নাথ থুইল নাম সুন্দর মৈনাই।"
(ভবানী দাস)।

"গোপীচাঁদ আখ্যায়িকা পর্য্যায়ের প্রায় সমস্ত রচনাতেই বলা হইয়াছে যে, ময়নামতীর গুরু ছিলেন গোরক্ষনাথ"(১)। তিলকচাঁদের দুই কন্যা—ময়নামতী ও সিন্দুরমতী। তিলকচাঁদ যথাকালে ইঁহাদেরে পাঠশালায় পড়িতে দিলেন—

"রোজ রোজ যায় দুই বইন বিধ্যা পড়িবারে(১)।
আসিবার কালে চান(২) করে ডিঙ্গি সরোবরে।"
(ময়নামতীর গান)।

রাজমাতা ময়নামতী বলিতেছেন—

"যে কালে জনক গৃহে আছিলাম আমি।
মোরে গ্যান(৩) দিয়াছেন গোরক্ষ নাথ মুনি।"
(গোবিন্দচন্দ্রের গীত—দুর্ল্লভ মল্লিক)।

"পিতা বোলে জন্মিল(৪) কন্না(৫) অতি ভাগ্যবান।
শর্ব্বক্ষণ(৬) শাস্ত্র যুগে বড়ো ধৰ্ম্মগ্যান (৭)।
এতেক ভাবিয়া পিতা আপোনার মোনে।
পড়িবা কারণে দিলা দ্রিজ(৮) গুরুর শধানে(৯)।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৬ পৃঃ)।

পিতা তিলকচাঁদ ব্রাহ্মণের পাঠশালায় ময়নামতী ও সিন্দুরমতীর বিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রত্যহ দুই ভগ্নি একত্রে পাঠশালায় যাতায়াত করেন। একদিন—

"পাঠশালে পড়ি আমি জাই নিকেতনে।
সোলশত জুগী লইয়া গোরক্ষর গমন॥
* * *
আসির্ব্বাদ করি গুরু মহাজ্ঞান দিল।
চারি জুগ অমর করিয়া মোরে গেল।"
(গোবিন্দচন্দ্রের গীত—দুর্ল্লভ মল্লিক)।

"প্রাত্তেককালে প্রতিদিন(১০) হশতে(১১) করি খড়ি।
পড়িবা কারণে জাই গুরুদেবের বাড়ি।
এহিরূপে শাশত্র(১২) পড়ি গুরুর পাটশালে।
উদত্র(১৩) হইল গুরু আমার কপালে।
গুরুর বাড়ী যাই আমি শাশত্র পড়িতে।
দৈবযোগে দেখা হৈল জতি গোর্ক্ষর শাতে।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৬,২৭ পৃঃ)।

গুরু গোরক্ষনাথের আবির্ভাব হইল। ময়নামতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার এবং স্নেহের সঞ্চার হইল। ময়নামতীকে তিনি মহাজ্ঞান শিক্ষা দিবেন মনস্থ করিলেন। ময়নার মন্ত্রগ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না গোরক্ষনাথ বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহা

---

(১) সাহিত্য প্রকাশিকা—বাঙালার নাথ সাহিত্য, ১১৩ পৃঃ, (বিশ্ব-ভারতী)।

(১) বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য। (২) স্নান। (৩) জ্ঞান। (৪) জন্মিল। (৫) কন্যা। (৬) সর্ব্বক্ষণ। (৭) ধর্ম্মজ্ঞান। (৮) দ্বিজ। (৯) অধীনে। (১০) প্রতিদিন। (১১) হস্তে। (১২) শাস্ত্র। (১৩) উদয়।
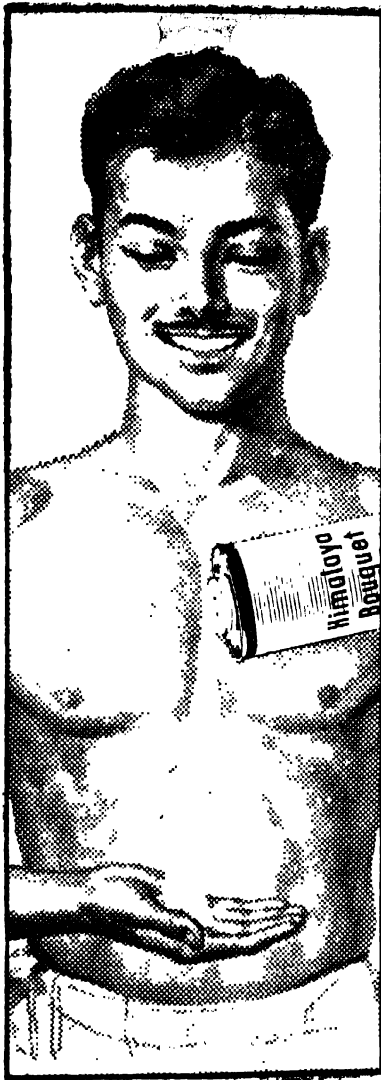
পরীক্ষা করিলেন। দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া সিদ্ধা গোরক্ষনাথ ময়নামতীর মত সতী শিষ্যার সন্ধান পাইলেন—

"হেনকালে পূর্ব্বেত গোর্খ পশ্চিমেতে জাত্র।
বার বছর ধরি গোর্খ শূন্যেতে ভ্রমত্র।
দেশে দেশে ভ্রমে তবে জাতিশা গোর্ক্ষাত্র।
সতী কন্যায় লাগ গোর্খে কবু নাহি পাত্র।"
(গোপীচাঁদের গান-২য় খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ)।

"এতো সুন্দর বাবোকি(১৪) জাবে যমের পুরিতে।
গুরু বোলে শঙ্খারে(১৫) খ্যাতি(১৬) রাখিব।
নিজ নাম দিয়া কন্নকি(১৭) অমর করিব।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৭ পৃঃ)।

ময়নামতী পুষ্পোদ্যানের ("ফুলটঙ্গির মৈর্দ্ধে") পৃথক উচ্চগৃহে গোরক্ষনাথকে বসিতে দিয়া তাঁহার যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। গোরক্ষনাথ ময়নামতীকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দিয়া অমর করিবেন, তাঁহার দেহ অস্ত্রে বিদ্ধ হইবে না, জলে ডুবিবে না, অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না। এমন কি—

"গুরু বোলে দিনে, মৈলে(১৮) মৈনামতী আই।
সূর্য্য বান্দি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই(১৯)।
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে মএনামতী আই।
চন্দ্রবান্দি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই।"
(গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী)।

গোরক্ষনাথের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ময়নামতী সানন্দে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইতে সম্মত হইলেন। মন্ত্রগ্রহণের প্রয়োজনীয় সকল আচার-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল। মন্ত্রগ্রহণের যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়াও গুরু বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ময়নামতীর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। গোরক্ষনাথ এই মহীয়সী রমণীকে দীক্ষা দিয়া একটা অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন—

"দেখিয়া আনন্দ হৈল অতি গোর্ক্ষনাথ।
হস্তপ ধরি গুরুদেব বৈশাইল শায়োনে।
এক নাম চৈর্দ্ধবেদ যুনাইল কানে।
নাম বর্ম্ম(২০) যুনি তখন যুন্তেতে(২১) উড়িনু।
চৈন্ত(২২) ভুবন বাছা পর্ব্বকে(২৩) দেখিনু।
থাবা দিয়া গুরুদেব ধরিল বাম হাতে।
ত্রিধিনি আশোনে(২৪) নাথ বৈশাইল শাক্ষাতে।
এক অক্ষরে তিন নাম (২৫) শর্ব্বনামের সার।
শেহি ব্রহ্ম নাম গুরু যুনাইল তিন বার।
এক নামে অনন্ত নাম অনন্তে এক হও।
শেহিশে অজপা(২৬) নাম গুরুদেবে কএ।
এহি নাম জপিহ বাছা আশোন করিয়া।
কি করিতে পারে জম আপনে আশিয়া।
আশোনে বসিয়া নাম জপিনু শাক্ষাতে।
ভঙ্গ দিল জমদূত কাল জমদূতে।
জোগ আশোনে তখন শাধিনু নিজ নাম।
গুরুদেবে বোলে বাছা শিদ্ধি হৈল কাম।"
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৭, ২৮ পৃঃ)।

ময়নামতী যে গুরু গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন তাহা ময়নামতীর গান ও গোপীচাঁদের বৈরাগ্যগাথায় বার বার সসম্মানে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শিশুকালে ময়নামতীর পাঠশালায় গমন, অধ্যয়ন ও গুরু গোরক্ষনাথের নিকট দীক্ষাগ্রহণ প্রাচীন ও প্রবল মতবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

নাথসিদ্ধা গোরক্ষনাথের সে সময়কার বেশভূষা সম্বন্ধে ময়নামতী বলিতেছেন—

"পরিধানে ছিল নাথের কপিন করপটি(২৭)।
ভূষন আছিল আর কর্ন্নে কর্ন্নপাটি।(২৮)
মশতম(২৯) মুণ্ডন ছিল মুখে চাপদাড়ি।
চরনে শোনার খড়ম হশতে(৩০) শোনার নড়ি।
গলায়ে দেখনু নাথের ইন্দ্রোর মেখিলি(৩১)।
উদ্রাক্ষ(৩২) ভজাক্ষ মালা গলাএ শোভন।
কপালে চনদন কোটা মুখেতে ভুশন(৩৩)।
জুগিরূপ দেখি মোনে না করিনু আন।
গলাএ বশন দিয়া করিনু প্রণাম।
(গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—২৭ পৃঃ)।

প্রচলিত ছড়াতে দেখা যায় মাণিকচাঁদের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য ময়নামতী যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং রুদ্রচণ্ডীর মূর্ত্তি ধরিয়া যমদূতদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তখন স্বয়ং মহাদেব আসিয়া ময়নাকে প্রবোধবাক্য দিয়া শান্ত করিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে ময়না সহমরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য, অগ্নি তাঁহাকে দাহন করিতে পারে নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ময়না যমের শক্তির অতীত হইয়াছেন। মহাজ্ঞান-প্রাপ্তা ময়নামতীকে মহাদেব পর্য্যন্ত ভয় করিতেন।

(১৪) বালিকা। (১৫) সংসারে। (১৬) খ্যাতি। (১৭) কন্যাকে। (১৮) মৃত্যু হইলে। (১৯) ছাড়াছাড়ি নাই।
(২০) ব্রহ্ম। (২১) শূন্যে। (২২) চৌদ্দ। (২৩) পলকে। (২৪) খেচরী মুদ্রায়। (২৫) প্রণব (অ+উ+ম যোগে)

(২৬) হংসগায়ত্রী। (২৭) কর্পটী—ছিন্নবস্ত্র। (২৮) ব্রহ্ম। (২৯) মস্তক। (৩০) হস্তে। (৩১) মেখলা। (৩২) রুদ্রাক্ষ। (৩৩) ভস্ম।

বিশ্ব যেথায় একান্তে এক বেঁধেছে নীড়

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাইশে শ্রাবণ প্রভাতে উত্তরায়ণে, রবীন্দ্রভবনের উদ্যানে কয়েকটি শিশুর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম। দেশী, বিদেশী, নানাজাতীয় পুষ্পে উদ্যানটি অতি মনোহররূপ ধারণ করিয়াছে। উদ্যানের কৃত্রিম হ্রদে পদ্মও ফুটিয়াছে। রূপে, গন্ধে, উন্মত্ত মধুকরবৃন্দের ন্যায় শিশুগণ উদ্যানের দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে। আমিও আত্মবিস্মৃত হইয়া শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেছি।

কত বিচিত্র রূপ! কত বিচিত্র গন্ধ! কত বিচিত্র আকৃতিই না এই পুষ্পরাজির! শিশুদের প্রশ্ন করিলাম, "কোন ফুল সবচেয়ে ভাল বল দেখি?"

কেহ বলিল, "গোলাপ।" কেহ বলিল, "পদ্ম।" কেহ বলিল, "রজনীগন্ধা।" নিজেদের মধ্যে তাহারা তর্ক জুড়িয়া দিল।

তাহাদের নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা। ধর, যদি বাগানে কেবল গোলাপই রাখা যায়, বা পদ্মই থাকে, অথবা কেবল রজনীগন্ধা ফোটে ত কেমন হয়?"

সকলেরই দেখিলাম তাহাতে প্রবল আপত্তি। "না, না। সব ফুলই থাকবে। তা না হলে মোটেই ভাল লাগবে না।"

কেহ বা মন্তব্য করিল, "হ্যাঁ, সব রঙের, সব বর্ণের, সব ফুল থাকবে।"

অন্য এক জন যোগ দিল, "কাঁঠালপরও থাকবে।"

হঠাৎ আমার মনে হইল আমি যেন গুরুদেবের কথা শুনিলাম। শিশুর কণ্ঠে যেন বিশ্বভারতীর স্রষ্টার কণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মালিকার ন্যায়, বিবিধ দেশবাসী জনগণ, তাঁহাদের নিজ নিজ সংস্কৃতির অর্ঘ্য লইয়া, বিশ্বভারতীর উপাসনা করিবে।"

বিচিত্র কুসুম গ্রথিত মালিকায় যেমন সমস্ত কুসুম স্থান পায়, তেমনই বিশ্বভারতীতে সর্ব্ব জাতির, সর্ব্ব ধর্ম্মের, বিচিত্র প্রকৃতির সমস্ত মানব তাহার নিজ সম্পদসহ স্থান লাভ করিবে। কেবলমাত্র কোনরূপে একটু স্থান লাভ করিবে তাহা নহে, একটি প্রীতির সম্মিগ্ধ পরিবারে, একটি সুখশান্তিময় নীড়ে একত্রে,পরমানন্দে বাস করিবে।

রবীন্দ্রনাথের সে আশা কি সফল হয় নাই?

হইয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশের, বিবিধ দ্বীপপুঞ্জের, এসিয়ার, ইউরোপের,আফ্রিকার, আমেরিকার, বিশ্বের সকল জাতির, সকল ধর্ম্মের নরনারী এখানে আসিয়াছেন। এক পরিবারের লোকের মতই তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া কেবলমাত্র উপরে উপরে ইহাকে দেখিয়া, যাঁহারা আমার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহাদের আমি বলি, "উপরের দিক হইতে দৃষ্টি নাবান। নীচের দিকে দেখুন। বিদ্যার্থীদের দিকে দৃষ্টি দিন। দেখুন, তাঁহারা দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সর্ব্বপ্রকারের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়াছেন। সহজ, সরল ভাবে ভ্রাতা যেমন ভ্রাতার সঙ্গে, ভগিনী যেমন ভগিনীর সহিত, স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তেমনই প্রীতিবদ্ধ হইয়া, তাঁহারা এক স্নেহের স্বর্গ রচনা করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের এই তপোবনে, এই শান্তিনিকেতনে।"

দেশ বিভাগের পরে, যখন পাঞ্জাবে, পঞ্চনদীর তীরে, "মরণ আলিঙ্গনে, কণ্ঠ পাকড়ি, ধরিল আঁকড়ি দুই জনা দুই জনে"—ভ্রাতৃহত্যার সেই তাণ্ডবলীলার দিনে নিজের চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শান্তিনিকেতনে—লোকালয় হইতে দূরে, নির্জ্জনে, খোয়াইয়ের বক্ষে, একটি তরুণ শিখ এবং একটি সমবয়স্ক মুসলমান ছাত্র, পরস্পরের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

মহাযুদ্ধের অবসানে, বিশ্বভারতীর চীনভবনে, একই অট্টালিকার দুই প্রকোষ্ঠে, চীন ও জাপানবাসী সুধীগণ সাধনার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মানী, ইহুদী ও খ্রীষ্টান, রাশিয়া ও আমেরিকাবাসী একত্রে, শান্তিনিকেতনে, শান্তিতে বাস করিতেছেন।

"যেথায় বিধু-রবি ত্যজিয়া দ্বন্দ্ব
জাগি থাকি, জাগান লোক—"

স্বপাকভোজী ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য্য বিধুশেখর, উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের সহিত একযোগে, এক প্রাণে, বিশ্বভারতীর গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইসলামধর্ম্মাবলম্বী জিয়াউদ্দিন, সৈয়দ মুজতবা। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মবান্ধব, ইংরেজ এনড্রুজ, পিয়ারসন, এলমহার্ষ্ট, এই আশ্রম, এই বিশ্বভারতীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিয়াছেন।

কেবলমাত্র সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীই নহে, সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত নাস্তিকও ইহাকে ভালবাসিয়াছেন এবং এখানে এক পরিবারে বাস করিতেছেন। এখানে মন্দির এবং মন্দিরের পার্শ্বেই নাস্তিক রহিয়াছেন।

ইহাই বিশ্বভারতী। বিশ্ব যেখানে একটি নীড়ে আশ্রয় লইয়াছে। বিধিনির্দ্দেশ-গ্রথিত বিচিত্র বিদ্যাকুসুম মালিকারাজির দ্বারা, ইহার উপাসনা করিতে হইবে।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সমস্ত উপাসকের জন্য, এখানের আকাশে, বাতাসে, রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে।

ইহার বৃদ্ধি হউক। ইহার সমৃদ্ধ হউক।[১]

---

১ বিশ্বভারতীর সঙ্কল্প বচন :—অথেয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।...সেয়মুপাসনীয়া নো বিশ্বভারতী বিবিধদেশপ্রথিতাভির্বিচিত্রবিদ্যাকুসুমমালিকাভিরিতি হি প্রাচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চেতি সর্ব্বেপ্যুপাসকাঃ। * *

তদিদমৃধ্যতাম্। তদিদং সমৃধ্যতাম্।

"'ভানুমতী'র অপূর্ণ অংশ

শ্রীদীপককুমার সেন

[কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'ভানুমতী' উপন্যাসখানি পাঠকালে আমরা দশম-অধ্যায়ের একস্থানে (পৃঃ ১১৭-২০) বিস্তৃত একটি অংশ অপূর্ণ অবস্থায় দীর্ঘকালযাবৎ লক্ষ্য করে আসছি। বর্ত্তমানে সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই মূল্যবান বিস্তৃত অংশটি সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছি। অদূর-ভবিষ্যতে 'ভানুমতী'তে সংযোজিত হতে পারে, এই ভরসায় আমরা অপূর্ণাংশটি পরিচয়পত্র সহ উদ্ধৃত করলাম।

'ভানুমতী' উপন্যাসখানি সর্ব্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৬ সালের চৈত্রমাসে। তৎপূর্ব্বে ১৩০৫ সালের 'সাহিত্য পত্রিকাতেও এ'খানি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। দুই ক্ষেত্রেই আমরা এই অপূর্ণাংশ লক্ষ্য করি। অবশেষে ১৩১৪ সালের নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (আশ্বিন, পৃঃ ২৮৫-৮৭) 'ত্রিদোষ' শীর্ষনামে এই অপূর্ণাংশ প্রকাশিত হয়। প্রকাশকালে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের পরিচয়পত্র উদ্ধারযোগ্য,—"দশ বৎসর পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র যখন তাঁহার ভানুমতী উপন্যাস রচনা করেন, তখন তিনি রাজকার্য্যে লিপ্ত। নানা কারণে গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে অনাথনাথ ও সাহেবের কথোপকথন কতকাংশে এইজন্য মুদ্রাঙ্কনকালে তারকাচিহ্ন দিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই সেই অংশ—নবীনবাবু এক্ষণে অবসরপ্রাপ্ত—ঐ গ্রন্থেরও এই অংশসহ পুনর্মুদ্রণ হইতেছে। স্বদেশী সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত পুরাতন মতামত প্রণিধানযোগ্য। ব স।" বর্ত্তমানে বঙ্গদর্শনের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে আলোচ্য অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :]

সাহেব। আপনি কি বলিতে চাহেন, আপনাদের ধর্ম্মের কি সমাজের কোনরূপ সংস্কারের প্রয়োজন নাই?

অনাথনাথ। না, আমি এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ ৭০০ বৎসর দাসত্বের ফলে একরাশি আবর্জ্জনায় চাপা পড়িয়াছে। আমরা এখন ধর্ম্মের ও সমাজের নামে সেই আবর্জ্জনা ঘাটিয়াই মরিতেছি। আর কিছুদিন এভাবে চলিলে কেবল আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম নহে, আমরাও লুপ্ত হইব। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে সংস্কার করিবে কে? পূর্ব্বে রাজা করিতেন। এখন রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী, আর আমরা? আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিব কি, আমাদের জীবনরক্ষাই বিষম সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কাহারও ঘরে অন্ন নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই। এই অন্নজলের হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ।

সা। তাহার কারণ কি?

অ। কারণ ব্রিটিশ রাজ্যের ত্রিদোষ—কারণ তিনটা প্রণালী। তিনটা tion—Foreign Competition, Litigation এবং Education—অবাধ-বাণিজ্য-প্রণালী, বিচার-প্রণালী ও শিক্ষা-প্রণালী। অবাধ-বাণিজ্যে ভারতের তাঁতী, কামার, কুমার, সর্ব্বপ্রকার শিল্পীর অন্ন মারিয়াছে। ভারতবাসী সকলেরই কৃষি বা মাটিমাত্র সম্বল হইয়াছে। এরূপে মাটির ব্যবসায়ী বাড়িয়াছে, কিন্তু মাটি ত বাড়ে না। দীঘি-পুষ্করিণীর পার পর্য্যন্ত লোকে চষিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ফলে দেশের গরুবাছুর মারা যাইতেছে। তাহাদের চরিবার স্থানমাত্র নাই। সাহেব, হিন্দুরা কি সাধে গাভীকে মা ভগবতী বলিয়া পূজা করে এবং গোমাংস ভক্ষণ মহাপাতক মনে করে? দেশের বিশ কোটি হিন্দু যদি গোখাদক হইত, তবে এই কৃষিজীবী দেশের গোজাতি লুপ্ত হইয়া কি শোচনীয় অবস্থা হইত? অবাধ-বাণিজ্যের ফলে একদিকে এরূপে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। অন্যদিকে কৃষিসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং দেশের গরুর কঙ্কালসার ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া ধ্বংস হইতেছে। মোট কথা, এখন ত্রিশকোটি ভারতবাসীর ব্যবসায় চাষ ও চাকরি। অন্নজলের জন্যে হাহাকার করিবে না কেন?

সা। বিচারপ্রণালীতে কি ক্ষতি হইতেছে? এমন সুশাসন ও সুবিচার কি ভারতবর্ষে কখনও ছিল?

অ। সাহেব, আমাদের ভাষায় আদালত, দেওয়ানি, ফৌজদারি, মকদ্দমা, উকিল, মোক্তার, এ সকল কথা নাই। এ সকল এ দেশে ছিল না। আপনি 'এলফিন্সটোনের' ইতিহাস পড়িয়াছেন, ছিল গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত। গ্রামের প্রধান পাঁচ জনে মিলিয়া কেবল ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের সমস্ত বিবাদ মিটাইত। গ্রামের কোন জমি কাহার, কাহার সঙ্গে কাহার কি কারবার, কি কথা লইয়া মতান্তর, এই পাঁচ জনে প্রত্যক্ষভাবে জানিত। অতএব কোন বিবাদ মিটাইতে সাক্ষী, দলিল, কোর্ট-ফি, প্রোসেস ফি, উকিল, মোক্তার ও জটিল আইন, কিছুই আবশ্যক হইত না। তাহারা গ্রামের সকল অবস্থা জানিত বলিয়া এবং তাহাদের কাছে বিচার হইত বলিয়া বিবাদও কম হইত। দেশময় শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করিত। যিনি রাজা হন না কেন, তাঁহাকে কেবল গ্রামের রাজস্ব দিলেই হইল। গ্রামে চোর ডাকাত পড়িলে তাহাদের ধরিয়া রাজকর্ম্মচারীর কাছে পাঠাইলেই হইল। এই জন্যেই ভারতে মহাশক্তির সঙ্গে প্রতিশক্তির কখনও সংঘর্ষণ

অত্যাশ্চর্য্য
কাপড় কাচার
পাউডার
Surf
AMAZING BLUE POWDER
FOR THE CLEANEST WASH EVER!
মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

হয় নাই। রাজা নিজেও সিংহাসনে সন্ন্যাসিমাত্র;—প্রজারঞ্জন তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। প্রজা জানিত "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" তাহার ধর্ম্ম রাজভক্তি। বলুন দেখি, এমন সবল ও সুন্দর স্বায়ত্তশাসন (Home Rule or Republic), এমন রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সামঞ্জস্য জগতে কোথায়ও আছে কি? আর এখন বিচারক বিদেশী। বিচারালয় গ্রাম হইতে বহুদূরে, বিদেশে। বিচারক স্থানীয় অবস্থা কিছুই জানেন না। বিচারে যাহার টাকা আছে, যে মিথ্যা সাক্ষী ও ভাল উকিল বা ব্যারিষ্টার দিতে পারে, তাহারই জয়। আইন জটিল। মকদ্দমা মাদকের মত উত্তেজক, এবং তাহার পরিণাম জুয়াখেলার মত অনিশ্চিত। যে একবার ধর্ম্মাধিকরণের ত্রিসীমায় পদার্পণ করে, একবার উকিল, মোক্তার, এটর্নী ও আমলার পাল্লায় পড়ে, তাহার ধর্ম্মভ্রষ্ট, অর্থনষ্ট, মনঃকষ্ট, এ ত্রিবর্গই লাভ হয়। গ্রামে গ্রামে মকদ্দমা, গ্রামে গ্রামে দলাদলি। মকদ্দমায় মকদ্দমায় দেশ উৎসন্ন ও দরিদ্র হইতেছে। অন্নজলের জন্যে হাহাকার উঠিবে না কেন?

আর শাসনপ্রণালী? তাহার ফলে ভারতবর্ষ নিরস্ত্র, বন্যপশু হইতে কৃষি ও জীবন রক্ষা করিতে ভারতবাসীর সামান্য অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। ভারত ইতিমধ্যেই এরূপ নির্বীর্য্য হইয়াছে যে আপনাদের নেপাল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে। বীরভূমি পঞ্চনদ, ও রাজস্থান আজ বীরহীন। অন্যদিকে ভারতের ৭০ কোটি রাজস্বের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি বিলাতের ব্যয়ে, সৈন্য-বিভাগের ও সিবিল বিভাগের ব্যয়ে প্রত্যেক বৎসর বিলাত চলিয়া যাইতেছে। তাহার উপর অবাধ-বাণিজ্যে ও ঋণে বৎসরে কত কোটি যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এরূপে ভারতবর্ষের মত একটি দরিদ্রদেশের উপার্জ্জনের অর্দ্ধাধিক অংশ ভিন্ন দেশে চলিয়া গেলে, সে দেশে অন্নজলের হাহাকার উঠিবে না কেন? সে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং কোটি কোটি লোক দুর্ভিক্ষগ্রাসে মরিবে না কেন? আপনাদেরই অঙ্কপাত—১০ বৎসরে ৮,০০০,০০০ লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে।

সংসদ অ্যাংলো-বেঙ্গলী ডিক্‌সনারী—শিশু-সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২ এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ১২।০ টাকা।

অভিধান দেখিতে গিয়া যে অভাববোধ নিয়ত পীড়া দিয়াছে তাহা হইল মনোমত অর্থ কোথাও পাই নাই। অর্থ পাইলাম ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রয়োজনীয় পরিভাষা পাইলাম না। সংসদের এই অভিধানটি দেখিয়া আমাদের সে অভাব মিটিয়াছে। ইহাতে ইংরেজী শব্দগুলির শুধু বাংলা অর্থই দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়, উপরন্তু ইংরেজী অর্থও উহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। দেখিলাম শব্দ-চয়ন ব্যাপারেও ইঁহারা সচেতন। অপ্রয়োজনীয় শব্দের ভারে অভিধানখানি ভারাক্রান্ত হয় নাই। যাহা প্রায় সকল অভিধানেই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিধান রচনাকালে যে বিশেষ কয়েকটি প্রণালীর দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহার একটি তালিকাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেমন, শব্দচয়ন, অর্থবিন্যাস, বাংলা অর্থ, ইংরেজী অর্থ, প্রয়োগ, বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ, প্রবচন প্রভৃতি, বিদেশী শব্দ, ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, প্রত্যয়ান্ত শব্দ, যৌগিক শব্দ, হাইফেন-যুক্ত শব্দ প্রভৃতি।

অভিধান যাঁহারা সংকলন করেন, তাঁহারাই জানেন ইহা কত বড় দুরূহ কাজ। বিভিন্ন ভাষায় ভালরূপ জ্ঞান না থাকিলে ইহার প্রয়োগ-কৌশল যথাযথ হয় না। সংসদ এই দুরূহ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছেন ইহাই তাঁহাদের বড় কৃতিত্ব। আর একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করিলাম, জোড়াতাড়া দিয়া কোনরূপে অভিধান বাহির করিবার চেষ্টা ইঁহারা করেন নাই। সুন্দর করিবার চেষ্টা ইঁহাদের প্রযত্নের মধ্যে রহিয়াছে। ইহা রুচির কথা। এ রুচি সকলের থাকে না। বইখানি হাতে পড়িলেই দুদণ্ড দেখিতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, পাতলা অথচ যথেষ্ট মজবুত বাইবেল কাগজে ইহা মুদ্রিত হওয়ায় সহজ ব্যবহার্য্য হইয়াছে।

এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধানের সমাদর নিশ্চয়ই হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস রাখি।

জলের রূপকথা—শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ।

ধাতুর রূপকথা—শ্রীকানাইলাল রায়।

মহাকাশ জয়ের রূপকথা—শ্রীঅজিত বসু।

শিশু-সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২ এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। প্রত্যেকটির মূল্য এক টাকা।

এই তিনখানিই বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা। আকারে ছোট হইলেও বিষয়বস্তুতে ইহার গুরুত্ব অনেকখানি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রচার আমাদের দেশে যত হয় ততই মঙ্গল। সাহিত্য সংসদের এ উদ্যম প্রশংসনীয়। বিষয়বস্তুতে এই তিনখানি বই-ই মূল্যবান। কারণ ব্যবহারিক জীবনে মানুষ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

জলের রূপকথায় গ্রন্থকার জলের জন্ম হইতে জীব-জগতের উৎপত্তি এবং তাহার ক্রম-বিকাশ প্রভৃতির কথা বলিয়া জলের প্রয়োজনীয়তা মানুষের কতখানি এবং কি কি উপাদান জলের ভিতরে আছে, জলের প্রকার ভেদ, বিভিন্ন জলের গুণাগুণ এবং তাহাদের পার্থক্য সকল বিষয়ই গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া বলিয়াছেন। ইহার পর গ্রন্থকার বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি, যেমন প্রকৃতিতে জলের পরিবর্তন, জলদ্রাবক, জলের সংবৃত্তি, জলের উপর ধাতুর ক্রিয়া, ভারী জল ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ধাতুর রূপকথা বলিতে গিয়া গ্রন্থকার আদিম যুগে কোন্ কোন্ ধাতুর প্রচলন ছিল তাহার উল্লেখ করিয়া ধাতুর ক্রমবিস্তার এবং কোন কোন ধাতুর মিশ্রণে অতি মূল্যবান ধাতুর উদ্ভব হইয়াছে তাহা চিত্রযোগে অতি সহজ ভাবে বলিয়াছেন। বর্তমান যুগকে বলা হয় যন্ত্রযুগ। এই যন্ত্রযুগের সবিস্তার বর্ণনা অতি সুকৌশলে গ্রন্থকার করিয়াছেন। কিন্তু গোড়ার কথা ধরিলে, আদিতে সেই অষ্টধাতুকেই বিজ্ঞানীরা নানাভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রয়োগ-কৌশলেরই ফলে বর্তমানের বিস্ময় রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম প্রভৃতির প্রস্তুত-বিধি জানিতে পারিলাম।

মহাকাশ জয়ের রূপকথায় গ্রন্থকার সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের কথা বলিতে গিয়া তাহাদের প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে তাহাদের কতখানি যোগাযোগ তাহা সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে মানুষ কি ছিল, অনুসন্ধিৎসা কি ভাবে তাহাদের আগাইয়া লইয়া গিয়াছে, যাহার জন্য মানুষ আজ চন্দ্রলোকে যাইবার বাসনা করিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ কি এবং কি ভাবে সেই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে, বায়ুমণ্ডল, বায়ুর চাপ এবং সেই বায়ু কোথায় কি ভাবে বর্তমান সকল কথাই ইহাতে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। আসল কথা হইল, পৃথিবীর সহিত গ্রহ-উপগ্রহের কতটা সম্বন্ধ ইহা না জানিলে কিছুই জানা হয় না। জানিবার কৌতূহল মানুষের অদম্য। এই অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে আজ এত বড় করিয়াছে। যে রকেট-রহস্য আমাদের অভিভূত করে তাহার তথ্যও এই গ্রন্থসাহায্যে জানিতে পারিলাম।

বিজ্ঞান-রহস্যকে জানিবার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থগুলি প্রচার করিয়া সংসদ একটি কাজের মত কাজ করিয়াছেন। বইগুলি ছাত্রদের খুবই কাজে লাগিবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, জটিল তথ্যগুলি অতি সহজ করিয়া বলিবার দক্ষতা ইঁহাদের আছে। সাধারণের নিকট ইহা সমাদর পাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীগৌতম সেন

অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ—শ্রী বি. বিশ্বনাথম। প্রকাশক: শ্রীনিরঞ্জন বসু। গণসাহিত্য ভবন, ১৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২। দাম দু' টাকা।

গ্রন্থখানি চৌদ্দটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গ্রন্থকার গল্পগুলি নিজ মাতৃভাষা তেলেগু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতে, বিশেষ করে তামিল, তেলেগু ও মালয়ালম সাহিত্য সুসমৃদ্ধ। ঐ সকল সাহিত্যে বিবিধ অমূল্য সম্পদ বর্তমান যেগুলির কিঞ্চিৎ আভাস আমরা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। কিন্তু তা থেকে জানা যায় না যে, সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা কি প্রকার, তাঁদের জীবনদর্শনই বা কি আর সাহিত্যিক-সমাজের শিল্পী-মন তাঁদের কথা চিন্তা করে কিনা। এ যুগে সভ্য-মনুষ্যসমাজের সাহিত্য মোটামুটি জীবনধর্মী, সাধারণ মানুষের জীবনধর্মী। তাই বলে রোমান্সও উপেক্ষিত নয় এবং তা করাও যায় না। এই গ্রন্থের গল্পগুলি যুগধর্মের প্রভাবেই রচিত। গল্প-গুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, অন্ধ্রের কথা-শিল্পীদের দরদী মন স্বতঃই সেই সত্যপথগামী হয়ে চরিত্র, কাহিনী, সংলাপ ও অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এমনি অবস্থা আমাদের সাধারণ বাঙালী সমাজেও। গল্পের একটি প্রধান গুণ রস। গল্পগুলি পাঠে পাঠকচিত্ত রস উপভোগ করেও আনন্দলাভ করবে, বিশেষতঃ "ঝড়", "মূক মানুষ", "কেনকেন্দ্র" ও "কেরাণীর জীবন" নামক গল্প কয়টি থেকে। অনুবাদক আমাদের সাহিত্যের যে উপকার করলেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সঙ্গীতের ঝঙ্কার—শ্রীপ্রণয় গোস্বামী। প্রকাশক: মাতৃভাষা, ৩৬-এফ কালীঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫। মূল্য ২·৫০ নয়া পয়সা।

দিনের পর দিন প্রতিদিনে...
রেক্সোনা সাবান
আপনার ত্বককে আরও সুন্দর করে
আপনার সৌন্দর্য্যের জন্যে··· রেক্সোনা
Rexona
BLENDED WITH CADYL

পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য পটভূমিকায় একটি প্রণয়মূলক কাহিনী। জেলের ছেলে নিশি—জোতদার তারিণী চৌধুরীর বাড়ী থেকে লেখা-পড়া করে। ঐ চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে শ্যামলী ওর বাল্যকালের সাথী। নিশির গানের গলাটি ভারি মিষ্ট। ও যাত্রার দলে অভিনয় করে, কীর্ত্তনও গায় চমৎকার। শ্যামলী ওর গান ভাল-বাসে। এই সূত্রটি ধরে দু'জনের মেলামেশা, প্রীতি প্রণয়ের বিকাশ। জাতি ও বর্ণের ব্যবধান মিলনের প্রধান অন্তরায় জেনেও ওরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে। এদিকে ঘটনাক্রমে এক রূপবান বিত্তবান যুক পাত্রের সঙ্গে শ্যামলীর বিয়ে হয়। শ্যামলী সুখী হ'ল না। ওর অন্তরের ক্ষুধা আশ্রয় করে রইল বাল্য-স্মৃতিকে আর সেই স্মৃতিকে দিনে দিনে উদ্দীপ্ত করে তুলল প্রতিকূল পারি-পার্শ্বিক ও শ্বশুরকুলের অকরুণ আচরণ। উৎপীড়িত শ্যামলী একদিন গৃহত্যাগ করে নিশির সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করল।

গল্পের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইটুকু হলেও পূর্ব্ববঙ্গের দু' একটি গ্রাম এবং অনেকগুলি মানুষ তাদের বৃত্তি ব্যবসা সমেত ধরা পড়েছে। এদের আলাপ-আলোচনা চলেছে প্রাদেশিক ভাষায়, আচার-আচরণেও ওই দেশের ছাপ লেগেছে। এতে ছবিটা হয়েছে উজ্জ্বল, মানুষগুলিও স্পষ্ট।

উপন্যাসের প্রথমার্দ্ধের ঘটনা ও ভাষা শিথিলবদ্ধ, কিন্তু শেষাংশে দু'টি অনুরাগদিগ্ধ চরিত্রের সঙ্গে লিখনভঙ্গির সামঞ্জস্যসাধন হওয়ায় গল্পটি পাঠক মনে স্থান করে নিতে পেরেছে। নবীন লেখকের পক্ষে এটি আশার কথা।

শিল্পীর মৃত্যু—শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক: শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সরকার। ধুবড়ী। মূল্য ২.৭৫ নয়া পয়সা।

গল্পের বই। বর্ত্তমান সমাজের নানাদিক ও সমস্যা নিয়ে গল্প রচনার প্রয়াস করেছেন লেখক। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। তবে ছোট গল্প রচনার কৌশল বা রূপকল্প সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন হলে গল্পগুলি সার্থক হয়ে উঠত।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

আঁটপুরে শিক্ষা-শিবির

জেঃ হুগলী, আঁটপুর বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আমন্ত্রণে, কলিকাতা-বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দেড়শত আশ্রমিক ছাত্রের, গত ১৩ই আগষ্ট হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিন দিনব্যাপী এক শিক্ষা-শিবির আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ভবনে খোলা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নিরন্তরানন্দের নির্দ্দেশে, স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং স্বামী আপ্তানন্দ যথাক্রমে শিক্ষা-শিবিরের প্রধান এবং সহকারী পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের চাঁপাডাঙা শাখায় একটি রেল ষ্টেশন আঁটপুর। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে, মূলশিক্ষাশিবির বিদ্যালয়ভবনে এবং শিবিরবাসী ছাত্রগণ, পরিচালকবর্গ ও পরিচালনা কার্য্যে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে সমাগত মহোদয়গণের আহারাদির স্থান, রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের অন্যতম আঁটপুর ঘোষবাটির স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের (বাবুরাম মহারাজ) পৈত্রিক বাসভবনে, স্বামীজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরেরাম ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১৩ই আগষ্ট উষাকাল হইতে শিক্ষাশিবিরের সূচনা। সুতরাং ছাত্রগণ পরিচালকবর্গ ও সহায়তাকারীরা পূর্ব্বদিন রেল ও মোটর-যোগে বেলা চারিটার সময়েই আসিয়া উপস্থিত হন। পরিচালক-বর্গের সুব্যবস্থায় গ্রামের এই বিদ্যালয়গৃহটিকে বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করার ব্যবস্থা হয় এবং প্রায় ফার্লিং দূরবর্ত্তী ঘোষবাটি পর্য্যন্ত টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়।

শিক্ষা-শিবির কর্ত্তৃপক্ষ, এই শিক্ষাশিবিরের জন্য এক বিস্তৃত এবং অতি-সুসংবদ্ধ কার্য্যসূচী রচনা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ভোর রাত্রি ৪-৪০ মিনিট হইতে ঐ দিনের কর্ম্ম-সূচনা এবং রাত্রি ১০-৫ মিনিটে শিবিরবাসীদের শয্যাগ্রহণে উহার পরিসমাপ্তি। আঁটপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিশেষ আহ্বান ও আমন্ত্রণে হুগলীর জেলাশাসক শ্রী এস. এন. বিশ্বাস, আই, এ, এস, শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক শ্রী ...কুমার দত্ত, আই, এ, এস. মহাশয়গণ, সুদূর চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর শহর হইতে অনুগ্রহ করিয়া আগমন করিয়া ১৩ই আগষ্ট, বেলা ... ঘটিকায়, শিবিরের এবং শিবিরবাসীদের আয়োজিত বিবিধ কারুশিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ইহার পর, জেলাশাসক মহাশয় শিবিরবাসীদের উদ্দেশ্যে এক অতি-মূল্যবান ভাষণ দান করেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী অনুসারে বিকাল দুই ঘটিকায় আঁটপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শিবীরবাসীদের নিকট "এদেশে ও বিদেশে জনগণের শৃঙ্খলাবোধ" সম্বন্ধে বলেন।

১৪ই আগষ্ট তারিখের কর্ম্মসূচীর বিশেষ অনুষ্ঠানে, আঁটপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিশেষ নিমন্ত্রণে শিক্ষাশিবির পরিদর্শনে আগত, হুগলী জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত, এম-এস-সি, বি-টি, মহাশয়, বেলা চার ঘটিকায় এক শিক্ষাপ্রদ ও আবেগময় ভাষণ দেন। বর্ত্তমানে, সাধারণভাবে ছাত্রদের মধ্যে যে নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে তিনি সকলকে সতর্ক করেন এবং শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত মনোভাববিশিষ্ট হইতে আহ্বান জানান।

১৩ই ও ১৪ই আগষ্ট, উভয়দিনই রাত্রি আটটায় বিবিধ জনশিক্ষামূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল।

১৫ই আগষ্ট, শিবিরবাসী ও শিবিরের পরিচালক এবং আটপুর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, কর্ম্মী ও ছাত্রছাত্রীগণ একযোগে স্বাধীনতাদিবস উৎসব উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত পালন করেন। শহীদবেদীতে বিভিন্ন পক্ষ হইতে মাল্যদান করার পর প্রাতঃ আট ঘটিকায় আটপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় আটপুর বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীশশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্বাধীনতাদিবস উৎসবপালনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বলেন।

বিকাল তিনটায়, "উদ্বোধন" পত্রিকার সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে শিবিরবাসী ছাত্রদের "সাহিত্যসভার" অনুষ্ঠান হয়। শিবিরবাসী ছাত্রদের গদ্য ও পদ্যরচনা পঠিত ও আলোচিত হইলে সভাপতি মহাশয় এক জ্ঞানপ্রদ ও মনোহর ভাষণ দানে সকলকে আনন্দিত করেন।

অপরাহ্নে আটপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সহিত আশ্রমিক ছাত্র-দলের এক প্রীতি ফুটবল খেলা হয়। ইহাতে আশ্রমিক বালকেরা জয়লাভ করে।

এই দিন রাত্রে শিবিরবাসী ছাত্রগণ "কুশধ্বজ" নামক স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত একখানি নাটকের অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখিবার জন্য বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

শিবিরের কার্য্যক্রম ১৬ই আগষ্ট, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। কার্য্যক্রমের পরিসমাপ্তির পর বিদায়সম্ভাষণের পালা আসে। বেশ

বুঝা যায়, শিবিরবাসীদের আটপুরকে ভালই লাগিয়াছিল। অতীব শৃঙ্খলার সহিত এই বিদায়গ্রহণ কার্য্যটির পরিসমাপ্তি হয়। সকলেরই মনে যে শিক্ষাশিবিরের অধিবেশন গভীর রেখাপাত করিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষাশিবিরের কার্য্যকলাপ দৃষ্টে সে সব কিছু জানিবার ও শিখিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিবির-বাসীদের শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়নিষ্ঠা, কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি তাহাদের অনুরাগ, উপাসনা ও প্রার্থনা-সঙ্গীতের মাধ্যমে তাহাদের ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ আদর্শ তাহাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছে। তাহারা নিজেদের জীবনে এই সকল সদ্‌গুণকে প্রতিফলিত করিতে সচেষ্ট হইতে পারিবে।

অপর দিকে, আশ্রমিক বালকগণ পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট গ্রামাঞ্চলের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পাইল। গ্রামাঞ্চলে দেবমন্দিরাদি যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেকেরই কোনও ধারণা ছিল না। আমাদের সুমহান্ ঐতিহ্যের ধারাসমূহের অনেক কিছুই গ্রামাঞ্চলে বর্ত্তমান, এগুলি উপেক্ষণীয় নহে।

শিক্ষাশিবিরের কার্য্যক্রমে যে সমবেত ব্যায়াম, যৌগিক আসন এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিবিধ শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল তাহাও দর্শকসাধারণকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ

যদিও এ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ, আই-এস-সি ও বি-এ পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ৩৮, ৫০ ও ৪২, লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের পাশের হার ৯৫, ৯৪ ও ৯০। এই বৎসর দর্শনশাস্ত্রে ও ভূগোল অনার্সে এই কলেজের শ্রীমতী তপতী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী ব্রততী রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৯৫৬ সনেও এই কলেজে দর্শনশাস্ত্র অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান এবং ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সনেও প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই বৎসর ৪৩ জন ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স এবং ৬ জন ডিষ্টিংসন লাভ করিয়াছেন।

সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

সংস্কৃত নাট্যাভিনয় ও সংস্কৃত সঙ্গীতের মাধ্যমে সংস্কৃত প্রচারে ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। কিছুকাল আগে তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্য-শিষ্যাদিগকে লইয়া দিল্লী নগরীতে "সামার ফেষ্টিভ্যাল" উপলক্ষ্যে ডাঃ চৌধুরী রচিত "মহিমময় ভারতম্" নামক নূতন সংস্কৃত নাটক এবং ভাস রচিত "প্রতিমা" নাটক সগৌরবে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করিয়া অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তার পরে "বিশ্বরূপা" মহাজাতি-সদন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানেও তাঁহারা ডাঃ চৌধুরী বিরচিত সঙ্গীতমুখর নূতন সংস্কৃত নাটক "প্রীতি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্", "মহাপ্রভু হরিদাসম্" এবং সর্ব্বশেষে "দাস রঘুনাথম্" অভিনয় করিয়া দেশবাসীর পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ডক্টর দম্পতী এই ভাবে কেবল সংস্কৃতের প্রচার করিতেছেন না, প্রেম ভক্তিধর্ম্মের প্রচারও করিতেছেন। আমরা ইঁহাদের উভয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন ১৯৫৯ এপ্রিল মাসে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট, জব্বলপুরে মাননীয় বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীসেন যশোহর জেলাস্থ বেন্দা (কালিয়া) নিবাসী শ্রীইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। খুলনা জেলা স্কুল হইতে ম্যাট্রিক, কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আই-এস-সি, কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে বি-এ এবং তৎপর নাগপুর হইতে এম-এ ও ল' পাশ করিয়া নাগপুরেই ১৯[illegible] সন হইতে ওকালতী আরম্ভ করেন। পরে ১৯৩৯ সনে নাগপুর হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ঐখানেই এ্যাডভোকেট হন। ১৯[illegible] সনে পাব্লিক প্রসিকিউটার ও ১৯৫৬ সনে গভর্ণমেণ্ট এ্যাডভোকেট পদে যথাক্রমে নিযুক্ত হন। রাজ্যপুনর্গঠনের সময় ১৯৫৭ সনে উক্ত পদেই জব্বলপুরে তাঁহার বদলী হয়। প্রথম হইতেই তিনি অসাধারণ অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণধীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক মধুর স্বভাব তাঁহার বুদ্ধিমত্তাকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। শ্রীযুক্ত সেন রায়বাহাদুর ৺জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্তের কনিষ্ঠ জামাতা ও খুলনার জনপ্রিয় উকীল ৺সূর্য্যকুমার সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীসেনের বর্ত্তমান বয়স ৪[illegible] বৎসর মাত্র।

উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অমৃতসর খালসা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ইন্দোনেশীয় সরকার কর্তৃক যোগজাকর্ত্তা (Jogjakarta) গজা ম্যাডা (Gadjah Mada) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নূতন কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিবেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রতিভাবান্ শিক্ষক এবং শক্তিমান্ লেখক। চীন, রাশিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার লেখা বই সুধীসমাজ সমাদৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি বহু ইংরেজী ও বাংলা পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখক। 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ণ রিভিয়ুর' লেখক এবং পুস্তক-সমালোচক রূপে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুদিনের। তাঁহার বিনয়নম্র, মধুর ব্যবহারে আমরা সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। তিনি বিদেশে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করুন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।